লীলা মজুমদার অনূদিত

সচিত্র টারজান সমগ্র

এডগার রাইস বারোজ

সচিত্র টারজান সমগ্র

সচিত্র টারজান সমগ্র

প্রকাশকাল :
কলকাতা বইমেলা
২৯ জানুয়ারী, ১৯৮৬

প্রকাশক :
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১এ কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর : ডায়নামিক প্রিন্টার্স
২৪ এ, বাগমারি রোড,
কলিকাতা-৫৪

মূল্য— ১৫০ টাকা মাত্র

এডগার রাইস্ বারোজ অবলম্বনে

সচিত্র টারজান সমগ্র

[অখণ্ড রাজসংস্করণ]

অনুবাদ — লীলা মজুমদার

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ — কুমারঅজিত

মৌসুমী প্রকাশনী

কেহ এই গ্রন্থের ভাষান্তর ও অলঙ্করণ পরিকল্পনা এবং পুস্তকের অন্যান্য বিষয়বস্তু নকল করিলে অথবা কিছু-কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া প্রকাশ করিলে, ভারতীয় কপিরাইট আইনের মধ্যে পড়িতে হইবে এবং সম্পূর্ণ খেসারত দিতে বাধ্য থাকিবে

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মৌসুমী প্রকাশনী

ভূমিকা

ছোটবেলায় টারজানের বই পড়ে আর চলচ্চিত্র দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। যা পড়তাম, যা দেখতাম, তার অভিনব আস্বাদ আমাদের অভিভূত করে ফেলত। ভালোমন্দ বিচারবোধ আমাদের তখনো গজায়নি।

টারজানের রচয়িতা কোনো দিনও সেরা সাহিত্যিকদের দলে ভিড়বার চেষ্টা করেননি। তাঁর সব রচনাই অভাবনীয় পরিবেশে দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প এবং সবগুলি থেকেই প্রচুর আনন্দ আর শিক্ষা পাওয়া যায়। সেকালে সত্যিকার ভ্রমণকারী আর অভিযাত্রী ছাড়া, কেউ বনবাসী মানুষ আর পশুদের জীবনযাত্রার এমন নিপুণ বর্ণনা দিতে উৎসাহ পেতেন না।

অনেক গল্পই আজগুবি ও মনগড়া শোনালেও, পড়তে পড়তে টারজানের চরিত্রের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ পৌরুষের আদর্শ রূপ নেয়। সে জীবকে দয়া করে, দুর্বলের সেবা করে, দুর্জনকে সাজা দেয়, নিষ্কাম নির্ভীক ভাবে কর্তব্য পালন করে। সে দেশপ্রেমিক, দুঃখ-কষ্ট আর শারীরিক পরিশ্রমকে সে তুচ্ছ করে, সে নির্লোভ আর নিঃস্বার্থ; দরকার হলে জীবহত্যা করলেও, সে অহিংস। পৌরুষের এমন প্রতিমূর্তি পাঠকের চোখের সামনে আর কোথায় পাওয়া যাবে?

টারজানের সৃষ্টিকার এডগার রাইস্ বারোজের প্রথম উপন্যাস 'এ প্রিন্সেস্ অফ মার্স্' (মঙ্গলগ্রহের রাজকুমারী) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ সালে। ১৯৫০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। হনলুলুতে শেষ জীবন কেটেছিল। এর মধ্যে প্রায় চল্লিশখানা বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে টারজানের চব্বিশখানা উপন্যাস সবচেয়ে বিখ্যাত। তাদের কল্পিত ঘটনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত। শেষ বইটি ১৯৪৪ সালের ব্যাপার।

বলা বাহুল্য সব গল্প সমান উৎরোয়নি। মনে হয় প্রথম পাঁচ ছয়টি আর শেষের তিনটি বইতে লেখকের নৈপুণ্য সব চেয়ে ফুটতে পেরেছে। অনেকগুলি হয়তো চলচ্চিত্রের উদ্দেশে, কিম্বা প্রকাশকদের অনুরোধে লেখা। তাতে শুধু কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনার সমাবেশ ছাড়া কিছু পাই না। সাহিত্যগুণ কম হলেও, চমৎকার চরিত্রচিত্রণ।

অনুপযুক্ত অংশ বাদ দিয়ে, কিন্তু কাহিনীর ধারাবাহিকতা আগাগোড়া রক্ষা করে, সহজ ভাষায় কিশোরদের জন্য এই বই সম্পাদিত হল। সব কিশোর সাহিত্যের মতো এরও উদ্দেশ্য একাধারে আনন্দ আর জ্ঞান পরিবেশন করা।

চব্বিশখানি বই থেকে একটি গল্পকে উদ্ধার করে আনা খুব সহজ নয়। কয়েকজন স্নেহভাজন আত্মীয়-বন্ধুর সাহায্য না পেলে, এ কাজ সম্ভব হত না। তাঁরা হলেন—আমার বোন, শ্রীশিক্ষায়তনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা লতিকা নাগ, আমার মেয়ে কমলা চট্টোপাধ্যায়, যিনি আমার রান্নার বই এবং অন্য কখানি লেখাতেও সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন; আমার কম-বয়সী বন্ধু অজেয় রায়, শিশু-সাহিত্যে যাঁর অনেক লেখা খুব মূল্যবান সংযোজন এবং সবার শেষে কিন্তু সবচেয়ে ব্যাপক ভাবে, কবি প্রণব মুখোপাধ্যায়, যিনি ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপকও বটে।

ছয়মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল, এই বইখানি আমার পরম স্নেহের কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে আদর পেলে, তবেই আমাদের সব চেষ্টা সার্থক হবে। ইতি—

২৯. ১. '৮৬

লীলা মজুমদার

সূচীপত্র

১	বনমানুষের ছেলে টারজান অফ দি এপস		৯
২	টারজানের প্রত্যাবর্তন দি রিটার্ন অফ টারজান		৫৩
৩	টারজানের বন্য বন্ধুরা দি বিস্টস অফ টারজান		১১৬
৪	টারজানের ছেলে দি সন অফ টারজান		১৫৩
৫	টারজান আর ওপারের রত্নগুহা টারজান অ্যাণ্ড দি জুয়েলস অফ ওপার		১৮৪
৬	টারজানের বনজঙ্গলের গল্প জাঙ্গল টেলস অফ টারজান		২১৫
৭	অদম্য টারজান টারজান দি আন্‌টেমড্		২৪৬
৮	ভয়ঙ্কর টারজান টারজান দি টেরিবল		২৮৪
৯	টারজান এবং সোনালী সিংহ টারজান অ্যাণ্ড দি গোল্ডেন লায়ন		৩৩৯
১০	টারজান এবং পিঁপড়ে মানুষ টারজান অ্যাণ্ড দি অ্যাণ্ট ম্যান		৩৭৪
১১	বনের প্রভু টারজান টারজান,লর্ড অফ দি জাঙ্গল		৪০৫
১২	লুপ্ত সাম্রাজ্যে টারজান টারজান অ্যাণ্ড দি লস্ট এম্পায়ার		৪৪২

সূচীপত্র

১৩	ভূগর্ভে টারজান টারজান অ্যাট দি আর্থস কোর		৪৭০
১৪	অজেয় টারজান টারজান দি ইনভিন্সিবল্		৫০১
১৫	বিজয়ী টারজান টারজান দি ট্রায়াম্ফ্যান্ট		৫২৯
১৬	সুবর্ণ নগরীতে টারজান টারজান অ্যাণ্ড দি সিটি অফ গোল্ড		৫৭২
১৭	টারজান এবং সিংহ মানুষ টারজান অ্যাণ্ড লায়ন ম্যান		৬০২
১৮	টারজান এবং চিতা মানুষ টারজান অ্যাণ্ড দি লিওপার্ড ম্যান		৬২৩
১৯	টারজানের অভিযান টারজানস কোয়েস্ট		৬৪৮
২০	নিষিদ্ধ নগরীতে টারজান টারজান অ্যাণ্ড দি ফরবিডন সিটি		৬৭৩
২১	মহামহীয়ান টারজান টারজান দি ম্যাগনিফিসেন্ট		৭০২
২২	টারজান এবং ফরেন লীজিয়ন টারজান অ্যাণ্ড দি ফরেন লীজিয়ন		৭৩৪
২৩	টারজান আর খ্যাপার কথা টারজান অ্যাণ্ড দি ম্যাড ম্যান		৭৬০
২৪	টারজানের জাহাজ ডুবির গল্প টারজান অ্যাণ্ড দি কাস্ট এ্যাওয়েজ		৮০০

SACHITRA TARJAN SAMAGRA

Rendered into Bengali by :

Lila Majumder

Illustrated by :

Kumarajit

বনমানুষের ছেলে

টারজান অফ দি এপস

এহলো লোকমুখে শোনা গল্প। রানী ভিক্টোরিয়ার সময়কার ব্রিটিশ উপনিবেশ দপ্তরের নথিপত্রে এর নাকি সামান্য একটু উল্লেখ আর একটা হলদে হয়ে যাওয়া ডায়েরী বিষয়ে গুজব—এসবকে কোনো গল্পের যাথার্থ্যের প্রমাণ বলা যায় না। বলাবাহুল্য এখানে নামধাম সবই বদলে দেওয়া হয়েছে। ঐ সময়ে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের বিস্তীর্ণ জায়গা ইংরেজদের অধীনে ছিল। একবার গুজব উঠল যে অন্য এক ইউরোপীয় দেশ নিজেদের একটি ছোটখাটো সৈন্যদল গড়ে ব্রিটিশ এলাকার সরল গ্রামবাসীদের ভরতি করে নিচ্ছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল কঙ্গো আর আরুউইমি নদীর তীরের অসভ্য

অধিবাসীদের কাছ থেকে জোর করে রবার আর হাতির দাঁত কেড়ে নেওয়া। গুজবটা শুনে অবধি ব্রিটিশ সরকারের মনে হয়েছিল এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ গোপনীয়তা অবলম্বন করে, কিন্তু বিশদভাবে তদন্ত করা দরকার। ঐ ইউরোপীয় দেশটি আবার বন্ধুদেশ।

ব্রিটিশ উপনিবেশের আফ্রিকান বাসিন্দারা বলছিল, ওদের ছেলে-ছোকরাদের নানা রকম লোভ দেখিয়ে খাতায় নাম লিখিয়ে নেওয়া হয়; ওখানকার ইংরেজরা বলছিল, মুখ্যু বেচারাদের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও তাদের বলা হয় এখনো অনেক বছর বাকি আছে। তাই যারা যায় তারা বড় একটা ফেরে না।

সে যাই হোক, উপনিবেশ দপ্তর নতুন এক পদের সৃষ্টি করে জন ক্লেটন বা লর্ড গ্রেস্টোক বলে একজন অভিজাত আর গুণী যুবককে সেখানে পাঠালেন। তাঁকে অবিশ্যি কোনো তদন্ত করতে হয় নি; গন্তব্যস্থলে তিনি পৌঁছতেই পারেন নি। গল্পটা বড়ই দুঃখের।

চমৎকার মানুষ ছিলেন ক্লেটন। দেখতেও যেমন সুপুরুষ, মনের দিক থেকেও তেমনি গুণী। সাধারণের চেয়ে মাথায় লম্বা, ছাই রঙের চোখ, সুন্দর মুখ, শক্তিশালী শরীর, সৈন্যবিভাগে প্রশিক্ষিত। রাজনীতির ক্ষেত্রে নাম করার আশায় ঐ বিভাগ ছেড়ে এখানে আসা। সঙ্গে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, মাত্র তিন মাস আগে বিয়ে হয়েছে।

এ গল্পের প্রথম মর্মান্তিক অধ্যায়টি খুব সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। ১৮৮৮ সালের মে মাসে, তাঁরা ডোভার থেকে ব্রিটিশ জাহাজে রওনা হলেন। আফ্রিকার ফ্রী-টাউনে পৌঁছতে এক মাস লাগল। সেখান থেকে সরকারী জাহাজের ব্যবস্থা না থাকাতে, ফুলওয়াডা বলে ছোট একটা প্রাইভেট বাণিজ্য জাহাজ ভাড়া করা হলো। ১০০ টন তার ওজন; নাবিকরা যেমনি খুনে ডাকাত, অফিসাররাও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল আর অত্যাচারী। জাহাজের জীবনযাত্রা বিভীষিকার মতো।

জাহাজ ছাড়বার দিন দুই পরেই ক্লেটনদের সামনে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। দু-জন নাবিক ডেক মুছছিল, ক্যাপ্টেন আচমকা দেখতে না পেয়ে আছাড় খেলেন। আর যাবে কোথায়! রোগা বুড়ো নাবিককে অমনি মারধোর করতে আরম্ভ করে দিলেন। তার সঙ্গীটি ছিল লম্বা চওড়া শক্তিশালী মানুষ, সে সইতে না পেরে তেড়ে এলো। ক্যাপ্টেনও রিভলবার বের করে তাকে মেরেই ফেলতেন, যদি না ক্লেটন বাধা দিতেন। এর ফলে সমস্ত অফিসাররা তাঁর উপর বিরূপ হলেন; অবিশ্যি ঐ নাবিক এসে কৃতজ্ঞতা জানাল। তার নাম ব্ল্যাক মাইকেল।

এ ধরনের ঘটনা মাঝেমাঝেই ঘটত। একদিন দু-জন নাবিকের মৃতদেহ জলে ফেলে দেওয়াও হলো। বিদ্রোহের চাপা আগুন ভিতরে ভিতরে জ্বলতে লাগল। এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে ক্লেটনরা মুক্তি পাবার সুযোগ যে পাননি, তাও নয়। একটা বড় ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ কাছ দিয়ে চলে গেল। চেষ্টা করলেই তাদের সংকেত করা যেত, তারা ওঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু জন ক্লেটনের পৌরুষে বাধল। ক্রমে তিনি জানতে পারলেন বিদ্রোহ করাই স্থির হয়েছে। ব্ল্যাক মাইকেল আর তার সঙ্গীটি তাঁদের সাবধান করে দিয়ে গেল যেন তাঁরা নিজেদের কেবিনেই থাকেন, ওদের কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন। তাহলে তাঁদের কোনো ভয়ের কারণ থাকবে না। অফিসাররা অবিশ্যি একজনও বাঁচবে না। ক্লেটনের বিবেক তাঁকে স্থির থাকতে দিল না। তিনি ক্যাপ্টেনের ঘরে গিয়ে আসন্ন বিপদের কথা বললেন।

ফলে ক্যাপ্টেন তাঁকে যাচ্ছেতাইভাবে অপমান করলেন, তাঁর অফিসাররা ছুটে গেলেন আর নাবিকরা তাঁকে শত্রু ঠাওরাল। ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে ফিরে এসে ক্লেটন দেখলেন তাঁদের কেবিনের জিনিসপত্র তচনচ করে বন্দুক, রিভলবার, গুলি-বারুদ যা ছিল, সব কারা সরিয়ে ফেলেছে।

কথায় কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। যা অবশ্যম্ভাবী, তাই একদিন ঘটল। সেদিন ব্রেকফাস্টের আগেই গোলাগুলির শব্দ কানে এলো। ক্লেটন ডেকে গিয়ে দেখলেন এক দিকে ক্যাপ্টেন আর তাঁর অফিসার পাঁচজন, অন্য দিকে সমস্ত নাবিকরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের গুলি খেয়ে দুজন নাবিক ধরাশায়ী হলো; বাকিরা আড়ালে সরে গিয়ে লড়াই দেবার জন্য তৈরি হলো। তারা দলে ভারি হলেও, সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র মাত্র ছয়টি। তার অভাব কুড়ুল টাঙ্গি লোহার ডাণ্ডা ইত্যাদি হাতিয়ার দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছিল। ডেকের সে নারকীয় দৃশ্য কল্পনা করা যায় না। দেখতে দেখতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাবিকরা সব অফিসারদের হতাহত করে পেড়ে ফেলল। নিজেরাও কিছু লোকসান দিল। তারপর নিরপেক্ষভাবে দুই দলের মৃত আর আহতদের টেনে টেনে জলে ফেলে দেওয়া হলো। ক্লেটন এ সমস্ত ব্যাপারের নির্বাক দর্শক। ওঁর স্ত্রীও যে কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল নেই। ব্যাপার দেখে তিনিও স্তম্ভিত। হঠাৎ তাঁদের উপর একজন নাবিকের চোখ পড়তেই, কর্কশ গলায় সে গর্জে উঠল, 'এ দুটোই বা বাদ যায় কেন?' এই বলে সে ছুটে এলো। ব্ল্যাক মাইকেলের রিভলবারের এক গুলিতেই তার দফা শেষ। আর কেউ এগোতে সাহস পেল না। রিভলবার তুলে ব্ল্যাক মাইকেল বলল, 'সবাই মনে রেখো এঁরা আমার বন্ধু। এঁদের ক্ষতি করা চলবে না।

তার দৈত্যের মতো চেহারা আর তেমনি তেজ। অফিসারদের জায়গায় সে-ই এখন নাবিকদের দলপতি। তখনকার মতো বিপদ মিটে গেলেও, অবস্থাটা খুব সুবিধের ছিল না। এক সময় ব্ল্যাক মাইকেল ক্লেটনদের সাবধান করে দিল, 'যদিও আমি আপনাদের জন্য যথা-সাধ্য করব, তবু আমার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। এরা সব খুনে ডাকাতের জাত। আপনারা কেবিন থেকে বেরোবেন না। আমি খাবার-দাবার পৌঁছে দেবো। আপনাদের বলে রাখছি, একটা সুবিধামতো নির্জন জায়গা পেলেই এরা একজোট হয়ে আপনাদের নামিয়ে দেবে। যথেষ্ট খাবার-দাবার অস্ত্রশস্ত্র বিছানাপত্র নানা হাতিয়ার আর আপনাদের সব জিনিসপত্রও নামিয়ে দেবে। যাতে জাহাজে আপনাদের কোনো চিহ্ন কেউ খুঁজে না পায়।'

এ-কথা শুনে ক্লেটনের রক্ত হিম হয়ে গেল। বারবার অনুনয় করে বললেন, 'লোকালয়ে নামিয়ে দিও, ভাই, আমার স্ত্রীর কয়েক মাস পরেই ছেলে হবে। এই সব ঘন বনে হিংস্র জানোয়ার ছাড়া কেউ থাকে না। আমরা বাঁচব কি করে? কথা দিচ্ছি আমরা কাউকে কিছু বলব না।'

ব্ল্যাক মাইকেলের সেই এক কথা—'লোকালয়ে গেলেই জানাজানি হবে। তাহলে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজের কাছ থেকে একজনও রেহাই পাবো না।'

নিদারুণ দুঃখ ও হতাশার মধ্যে পাঁচ দিন কাটল। তারপর সেই ভয়ংকর দিনটি এলো। যদিও ব্ল্যাক মাইকেল বারবার বলল, 'আমরা এদিক-ওদিক একটু গুছিয়ে নিয়ে, তারপর ব্রিটিশ সরকারকে খবর দিয়ে দেবো। তারা আপনাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। মাস তিনেকের দ্রব্যসামগ্রীও রেখে যাব। সেরকম ভাবনার কিছু নেই। এর বেশি কিছু করার ক্ষমতাও নেই আমার।'

আগের দিন বিকেলের দিকে জাহাজ সুন্দর এক বনভূমির কাছে পৌঁছল। তার সামনে একটা স্বাভাবিক ছোট উপসাগরের মতো হয়ে রয়েছে; তার তিন দিক ডাঙায় ঘেরা, এক দিকে সমুদ্র থেকে যাতায়াতের পথ আছে। ভিতরে স্থির জল। লোকালয়ের চিহ্ন নেই, কিন্তু ছোট জানোয়ার, পাখি, ফলগাছের অভাব নেই। তিরতির করে একটা ঝরনা বনভূমি থেকে নেমে এসে সমুদ্রে পড়েছে। চারদিকের দৃশ্যপট শান্ত সুন্দর, কিন্তু মনে শুধু ভয়-ভাবনা।

পরদিন সকাল থেকে সত্যি সত্যি তিন-চার মাসের প্রয়োজনীয় খাবার দাবার, জিনিসপত্র আর ব্ল্যাক মাইকেল যা যা বলেছিল সবই নামানো হলো। সে নিজে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত তদারক করল। তারপর সব হয়ে গেলে এক সময় নৌকো করে তারা বিদায় নিল। ফুলওয়াডাও ধোঁয়া ছেড়ে রওনা হয়ে গেল। এতক্ষণ অ্যালিস গ্রেস্টোক আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন, এবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন, 'এমন সর্বনাশও কপালে ছিল! এখন কি উপায় হবে?'

ক্লেটন বললেন, 'উপায় একটাই। খাটতে হবে। যা থাকে কপালে তার মোকাবিলার জন্য তৈরি হতে হবে। এই রকম বিপদসঙ্কুল ঘন বনে হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যেমন হয়েছিলেন। আমাদের সুবিধা বেশি, কারণ সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে।'

ততক্ষণে বিকেল হয়ে এসেছে। ক্লেটন অস্ত্রশস্ত্রের বাক্সটা সবার আগে খুলে ফেললেন। আগে রাতের একটা আশ্রয় ঠিক করতে হবে। সমুদ্রতীর থেকে ১০০ গজ দূরে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় সুবিধামতো চারটে গাছ বেছে নিয়ে, দড়ি আর ডালের সাহায্যে মাটি থেকে আট-দশ ফুট উঁচুতে একটা মাচা তৈরি করলেন। ছেঁড়া পাল রেখে গেছিল মাইকেল। তাই দিয়ে মাচার দেয়াল, মেঝে আর ছাদ হলো। মেঝেতে বড় বড় পাতা বিছিয়ে বিছানা হলো। ঘড়া ভরে খাবার জল তুলে রাখা হলো। বালিশ কম্বলও আনা হলো। তাছাড়া অস্ত্রশস্ত্র তো ছিলই। মনে হলো এতেই অনেকটা নিরাপদে রাত কাটানো যাবে। আলো থাকতে থাকতে অ্যালিসের ওঠানামার জন্য একটা মইও তৈরি করা গেল। তারপর কিছু শুকনো খাবার খেয়ে, ক্লান্ত শরীরগুলো বিছানায় এলিয়ে দিলেন দুজনে।

এলিয়ে দিলেও ঘুম সহজে এলো না। সারা দিনের পাখির ডাক থেমে গেলেও, মনে হচ্ছিল বড় বড় ভারি জানোয়ার নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। একবার টিলার পিছনে ফুটফুটে চাঁদের আলোয় বিশালবপু মানুষের মতো কোনো জানোয়ার দেখে অ্যালিস ভয়েই আধমরা। ভালো ঘুম না হলেও, সে রাতে কেউ ওদের আক্রমণ করার চেষ্টা করল না। তবে মাঝে মাঝে বিকট সব চিৎকার শুনে ঘুমের মধ্যেও আঁৎকে উঠতে হচ্ছিল।

বলা বাহুল্য সকালে ঘুম ভাঙলেও শরীরের ক্লান্তি গেল না। সামান্য জলখাবার খেয়ে ক্লেটন কাজে লেগে গেলেন। চারটি পুরু দেয়াল, মজবুত দরজা-জানলা আর শক্ত ছাদ লাগানো একটা বাড়ি না করলেই নয়। আগের দিনই উঁচু, ঝরঝরে, চারকোণা, ঝোপঝাড় থেকে একটু দূরে একটা ভালো জায়গা পছন্দ করে রেখেছিলেন। মাচাটার খুব কাছেই। একমাস লেগেছিল বাড়িটা তৈরি করতে। ততদিন মাচায় বাস।

একটাই ঘর হলো। শক্ত ভিতের ওপর গাছের গুঁড়ির দেয়াল, তার ওপর পুরু এঁটেল মাটির প্রলেপ। একটা দরজা, একটা জানলা, তাতে মজবুত কাঠের শিক বসানো। ঘরের এক মাথায় নুড়ি আর পাথর দিয়ে উনুনের জায়গা হলো। ধোঁয়া বেরোবার পথ রাখা হলো। মেলা প্যাকিং কেস জমেছিল, যাতে করে জিনিসপত্র নামানো হয়েছিল। চারস্তর প্যাকিং কেসের কাঠ দিয়ে এমন মজবুত দরজা হলো যে তা ভাঙা প্রায় অসম্ভব। ব্ল্যাক মাইকেল যে হাতিয়ারের বাক্স রেখে গেছিল, তাতে হাতুড়ি, বাটালি, র‍্যাঁদা, পেরেক, স্ক্রুড্রাইভার ইত্যাদি সব ছিল। দড়িদাড়ার অভাব ছিল না।

দরজার তালা ছিটকিনি নিয়ে সমস্যা উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত অতি মজবুত কাঠ দিয়ে তাও হলো। তাছাড়া রাতে দরজার সামনে বাক্সের গাদা রাখা হতো। ভেতরে-বাইরে সমস্ত দেয়ালে চার ইঞ্চি পুরু করে এঁটেল মাটির পলেস্তারা লাগিয়ে এক দিন বাড়ি শেষ হলো। তারপর আসবাবপত্রও তৈরি করলেন ক্লেটন। সব হলে বেশ আরামের একটা বাসস্থান হলো।

ততদিনে পাখিদের আর ছোট ছোট বাঁদরদের সঙ্গে ওঁদের খুব ভাব হয়ে গেছিল। হিংস্র জানোয়ারও যে যথেষ্ট আছে, রাতে সেটা মালুম দিত—সিংহ, প্যান্থার আর সেই বিরাট মানুষের মতো জীবের বার তিনেক দেখা পাওয়া গেছিল। হয়তো খুব বড় জাতের বনমানুষ হতে পারে। খুব কাছে থেকে এখনো দেখতে পাননি ওঁরা। তবে পাখিরা, বাঁদররা নেমে এসে, হাত থেকে খাবার নিতে শিখেছিল।

এক দিন বিকেলের দিকে ক্লেটন আরেকটা ঘর তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন, এমন সময় এক দল ছোট বাঁদর ভয়ে কিচির-মিচির করতে করতে টিলার দিকের গাছের ওপর দিয়ে ছুটে এলো। ক্লেটনের কাছে এসে তারা থমকে দাঁড়িয়ে কিচির-মিচির করে কি যে বলতে লাগল বোঝে কার সাধ্যি। তাছাড়া বারবার টিলার দিকে তাকাতেও লাগল, যেন সাবধান করে দিচ্ছে ওদিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তারপরেই চোঁ-চাঁ দৌড়।

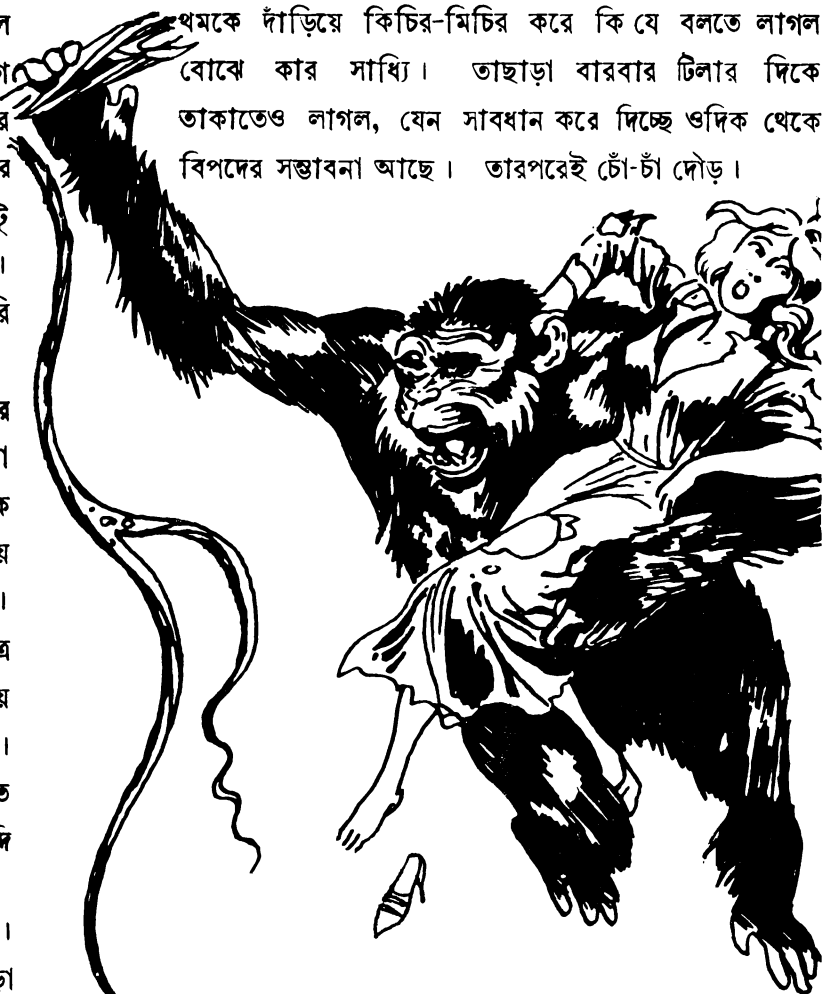

এতক্ষণ পরে ক্লেটন দেখতে পেলেন সেই বনমানুষটা এগিয়ে আসছে। একেবারে সোজা হয়ে মানুষের মতো হেঁটে নয়, একটু নিচু হয়ে থেকে থেকে হাতের পিঠের দিকে ভর দিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। গলা থেকে একটা চাপা গরগর শব্দও শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে খেঁকিয়ে উঠছে। মেজাজ ভালো নেই নিঃসন্দেহে। এদিকে ক্লেটনের হাতে একটা কুড়ুল ছাড়া কোনো অস্ত্র ছিল না। সময় থাকতে ঘরে পৌঁছতে পারবেন কিনা সন্দেহ। অ্যালিসও বাইরে এসে বসেছিলেন।

ডাক দিয়ে ক্লেটন তাকে বললেন, 'ছুটে ঘরে ঢুকে দোর দাও।' দরজা দিয়ে ঢুকে অ্যালিস ফিরে তাকিয়ে দেখেন বনমানুষটা তাঁর স্বামীকে আক্রমণ করবার জোগাড় করছে আর ক্লেটন কুড়ুল তুলে ধরেছেন। অ্যালিস আর অপেক্ষা করলেন না। ছুটে ঘরে ঢুকে দেয়াল থেকে ক্লেটনের বন্দুকটা তুলে নিয়ে আবার বেরিয়ে এলেন।

ক্লেটন বললেন, 'ঘরে যাও, দরজায় হুড়কো দাও!' তারপরেই বনমানুষটা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর

অ্যালিস, আগ্নেয়াস্ত্রে যাঁর বড় ভয়, সেই অ্যালিস বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলেন। গুড়ুম করে বন কাঁপিয়ে শব্দ হলো। বনমানুষটা ক্লেটনকে ফেলে অ্যালিসকে আক্রমণ করল। অ্যালিস মাটিতে পড়ে গেলেন, তাঁর পিঠের ওপর বনমানুষটাও পড়ল। পাগলের মতো ছুটে এসে ক্লেটন জানোয়ারটাকে তুলতে গেলেন। সে অনায়াসে গড়িয়ে পড়ল। গুলিটা তার পিঠের মধ্যিখানে লাগাতে, তার ভবলীলা সঙ্গে হয়েছে।

তখন স্ত্রীর অচেতন দেহ কোলে করে ঘরে নিয়ে গিয়ে, খাটে শুইয়ে দিয়ে মনে হলো কোথাও কোনো আঘাত লাগেনি। কিন্তু জ্ঞান ফিরতেই অ্যালিস বললেন, 'ওগো, বাড়ি ফিরে বাঁচলাম। কি যে দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল আমরা লণ্ডনে নেই, কোথায় যেন ঘোর জঙ্গলে গেছি, হিংস্র জানোয়াররা আমাদের আক্রমণ করেছে।'

ক্লেটন তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'নাও, ঘুমিয়ে পড়, স্বপ্নের কথা ভুলে যাও।'

বাইরে সিংহের গর্জন শোনা যাচ্ছিল, ঘরের মধ্যে ক্লেটন আর অ্যালিসের ছোট্ট একটি খোকা জন্মাল।

অ্যালিস আর প্রকৃতিস্থ হননি। তাঁর বিশ্বাস তাঁরা লণ্ডনেই আছেন। মাঝেমাঝে চাকর-বাকর বন্ধু-বান্ধবের অভাব, এই রকম কাঠের বাড়িতে কেন আছেন, এ-সব নিয়ে খটকা লাগলেও, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। ছেলেটার খুব যত্ন করতেন। কিন্তু প্রায় এক বছর পরে এক গভীর রাতে ঘুমের মধ্যেই অ্যালিস ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন।

এই একটা বছর ওঁদের অদ্ভুত একরকম সুখেই কেটেছিল। অ্যালিসের মনে কোনো দুঃখ ছিল না। রাশি রাশি বই ছিল সঙ্গে। ক্লেটন দেয়ালে সারি সারি তাক করে তাতে সেগুলি সাজিয়ে ছিলেন। মাটি দিয়ে সুন্দর সব ফুলদানি তৈরি করেছিলেন। দেয়ালে, মেঝেতে জন্তু-জানোয়ারের ছাল পেতেছিলেন। অবসর সময়ে বই পড়তেন, অ্যালিসকে পড়ে শোনাতেন আর ডায়েরী লিখতেন।

অ্যালিসের মৃত্যুর পরদিন সকালে শেষবারের মতো লিখলেন, 'আমার ছেলে দুধ খাবার জন্য কাঁদছে। আমি কি করব, অ্যালিস্ ?' তারপর ক্লান্তিতে চোখ বুজে এলো। টেবিলে মাথা রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

অ্যালিসের দেহ আর ছোট ছেলেটা যে যার খাটে শুয়ে রইল।

এই অবধি হলো পটভূমিকা। এবার আমাদের আসল গল্প শুরু হচ্ছে।

ঐ সমুদ্রের ধার থেকে এক মাইল দূরে ঘন জঙ্গলে ঢাকা বনভূমি। সেখানকার বনমানুষদের গোদা কেরচাক সেদিন প্রচণ্ড রাগে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল। দলের ছোট এবং ওজনে যারা হাল্কা তারা মগডালের কাছাকাছি সরু সরু উঁচু ডালে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকে আছাড় খাবার ভয় থাকলেও গোদার সামনে পড়ার চেয়ে সে বরং ভালো। বড়রা ইদিক-উদিক ভেগেছিল, তার আগে এক বেচারার ঘাড় মটকেছিল কেরচাক। মেয়েগুলোও রেহাই পায়নি। একজন হাত ফস্কে বুড়োর সামনে পড়তেই ডাল দিয়ে পিটিয়ে কেরচাক তার মাথা গুঁড়ো করে দিল। মাঝে মাঝে তাকে ঐ রকম চণ্ডাল রাগে পেতো।

হঠাৎ কালার উপর চোখ পড়ল। চমৎকার চেহারা তার, বয়স বেশি নয়। তার পিঠে তার প্রথম বাচ্চা আঁকড়ে ঝুলে ছিল। কালাকে কেরচাক তাড়া করল। পায়ের কব্জিটা প্রায় ধরেই ফেলেছিল। নেহাৎ শেষ মুহূর্তে প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে কালা সে গাছের ডাল থেকে ঝুলে অন্য একটাতে পেঁছে গেল। দুঃখের বিষয় ঝাঁকানির চোটে বাচ্চাটার হাত খসে গিয়ে ঐ ত্রিশ ফুট উঁচু থেকে বেচারি মাটিতে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কেরচাকের ভয় ভুলে কালাও নিচে নেমে এসে মরা বাচ্চাটাকে বুকে তুলে করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগল।

অমনি হঠাৎ যেমন মাথায় চণ্ডাল রাগ চেপেছিল তেমনি ঝুপ করে রাগটা পড়েও গেল কেরচাকের। সঙ্গে সঙ্গে যে যার গেছো আশ্রয় থেকে নেমে এসে আবার খাবারের খোঁজে লেগে গেল। কেউ বা ফল, পাখি, পাখির ডিমের সন্ধান করতে লাগল। কেউ গাছের ছাল ছাড়িয়ে তলাকার পোকা-মাকড় খুঁটে খেতে লাগল। বড়দের অনেকে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পাথর উল্টে ঘাসপাতা সরিয়ে খাবার খোঁজায় মন দিল। রোজকার মতো সময় কাটতে লাগল, যেন কিছুই হয়নি। খালি কালা তার মরা ছেলে বুকে করে শোকে ডুবে রইল।

কেরচাক ছিল গায়ের জোরে, মনের তেজে আর আস্ফালনে সবার শ্রেষ্ঠ। বয়সেও জ্যেষ্ঠ। সকলেই তাকে দলপতি বলে মেনে নিয়েছিল। দলে ছিল আট-

দশটি পরিবার; তাদের মধ্যে পুরুষ স্ত্রী কাচ্চাবাচ্চা সবই ছিল। অন্য জাতের বনমানুষদের চেয়ে এরা যেমন আকারেও বড়, তেমনি বুদ্ধিও বেশি। বিশাল চওড়া কাঁধ, পেশীগুলো উঁচু হয়ে রয়েছে ছোট ছোট চোখ, থ্যাবড়া নাক, এই বড় বড় দাঁত, কপালটা চ্যাটালো, সরু। হাত দুটো হাঁটুর নিচে ঝুলে রয়েছে, সোজা হয়ে চলতে পারলেও, হাতের পিঠের দিকে ভর দিয়ে বড় বড় লাফ দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এগোতেও পারে। গোরিলাদের জাতভাই, কিন্তু তাদের চেয়ে জোর আর বুদ্ধি বেশি। নিজেদের একটা ভাষাও আছে। খুব প্রাথমিক, খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ভাষাই বটে।

সেদিন দুপুরের পর কেরচাক দলবল নিয়ে টিলা পেরিয়ে সেই অদ্ভুত বাসাটার দিকে চলল। অনেক দিন থেকেই সেটার ওপর ওর লক্ষ্য ছিল। বাসায় এক জোড়া সাদা বনমানুষ থাকত। তাদের ওপর কেরচাকের যেমনি রাগ, তেমনি ভয়। তাদের হাতে লম্বামতো আগুন লাঠি থাকে। দূর থেকে যার দিকেই সেটা তাড়া করে, আগুন ছুটে তাকেই মেরে ফেলে। এ কেরচাকের নিজের চোখে দেখা। দলের কয়েকজন মরেওছে ঐ ভাবে। এক দিন সাদা বনমানুষটাকে বাগে পেলে কেরচাক তাকে দেখে নেবে, এই রকম তার মতলব। ওটার গলায় দাঁত বসাতে পারলে কেরচাক বড় খুশি হয়।

আজ তাদের কোনো সাড়াশব্দ নেই। সাহস পেয়ে, নিঃশব্দে কেরচাক ঘরটার দিকে এগোল। তার পেছন পেছন একটু তফাৎ রেখে দলের কয়েকজনও ছিল। আজ দরজাটা খোলা। পা টিপে টিপে কেরচাক আগে উঁকি মেরে দেখল, তারপর সাবধানে ভিতরে ঢুকল। পেছন পেছন দলের দুজন পুরুষ আর আশ্চর্যের বিষয়, মরা ছেলে বুকে নিয়ে কালা।

সাদা বনমানুষটা হাতের ওপর মাথা গুঁজে বসে ছিল। কেরচাক তার কাছে পৌঁছতেই, সে মুখ তুলে তাকিয়েই, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। কেরচাক আর অপেক্ষা করল না, ঐ মানুষটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর যখন তাকে ছেড়ে দিল তার দেহে প্রাণের চিহ্ন ছিল না। এবার কেরচাক খুদে খাটটার দিকে চাইতেই, কালা টপ করে সাদা বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিয়ে, মরা ছানাটাকে সেই জায়গায় ফেলে রেখে, এক লাফে ঘরের বাইরে, উঁচু গাছের মগডালে! সাদা ছানাটার কান্না শুনে তার বুকের মধ্যেকার ব্যথিত মাতৃত্ব জেগে উঠেছিল। বাচ্চাটা প্রথমে কঁকিয়ে কেঁদে উঠেছিল, তারপর কি করে জানি কালার গভীর ভালোবাসা সে টের পেল, অমনি কান্না থামল। তারপর খিদের চোটে কালার বুকে মুখ লাগিয়ে চোঁ-চোঁ করে চুষতে লাগল। এ দুধ তার মায়ের দুধের চেয়ে এতটুকু কম মিষ্টি নয়।

এদিকে অন্য বনমানুষগুলো ঘরের মধ্যেকার জিনিস-পত্র পরখ করে দেখতে লাগল। কেরচাক একবার অ্যালিসের প্রাণহীন শরীরটা তুলেছিল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার নামিয়ে রেখেছিল। দেয়ালে ঝোলানো রাইফেলটা সম্বন্ধে সকলের বেজায় কৌতূহল। এই সেই ভয়ংকর আগুন-লাঠি। এর মধ্যে থেকেই আগুন বেরিয়ে সবাইকে মেরে ফেলে। এখন চুপচাপ ঝুলে আছে। তবু ছুঁতে ভয় করছে। যদি কিছু করে!

বন্দুকটার সামনে বেশ কিছুক্ষণ পায়চারি করে, দু-একবার বিকট চিৎকার করে, শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে, দু-চারবার হাত সরিয়ে নেবার পর, হঠাৎ কেরচাক সেটাকে পেড়ে ফেলল। কিচ্ছু বলল না বন্দুকটা। তাতে অন্য বনমানুষ দুটোও কাছে এগিয়ে আসার সাহস পেল। কেরচাক বন্দুকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ ঘোড়াটা টিপে বসল। সঙ্গে সঙ্গে সে কি কান ফাটানো গর্জন। তিনজনে পালাবার পথ পায় না। শেষটা কোনোমতে খোলা দরজা দিয়ে পালিয়ে বাঁচল। ভয়ের চোটে বন্দুকটা ফেলে দিতে পর্যন্ত ভুলে গেল হুড়মুড় করে বেরোবার সময়, দরজার পাল্লায় ধাক্কা লেগে, দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল আর তার বিচিত্র কৌশলে তৈরি করা হাঁসকলও বন্ধ হয়ে গেল। পরে হাজার চেষ্টা করেও এরা কেউ সে দরজা খুলতে পারেনি।

এদিকে ঘরটা থেকে খানিক তফাতে গিয়ে কেরচাকের খেয়াল হলো, কি সর্বনাশ, আগুন লাঠি যে তার হাতে ধরা! সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে তো দিলই আর কখনো তুলে নেবার চেষ্টাও করেনি। ওর ধারণা ওটাকে যতক্ষণ না ছোঁয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ কোনো ভয় নেই। এবার দলবল নিয়ে নিজেদের এলাকায় ফেরা। কালাকে অনেক ডাকাডাকি করেও গাছের উঁচু ডাল থেকে নামানো গেল না।

সাদা বাচ্চাটাকে এক মুহূর্তের জন্যেও কালা হাত-ছাড়া করতে রাজি নয়। অন্যদের ভালো করে দেখতেই দিল না। মনে মনে কালা বুঝেছিল এ বড় ক্ষীণ, দুর্বল,

এর অনেক যত্ন দরকার। সঙ্গীদের কর্কশ হাত ওর গায়ে লাগানো চলবে না। একটাকে বড় দুঃখে হারিয়েছে। আর নয়।

পিঠেও চড়াল না সাদা ছানাটাকে, চব্বিশ ঘণ্টা লর্ড গ্রেস্টোকের বংশধর তার বনমানুষ মায়ের কোলে থাকত। কচি কচি হাতে তার বুকের লম্বা লম্বা লোম আঁকড়ে ধরত। খিদে পেলে মায়ের দুধ খেতো।

এইভাবে প্রায় বছর ঘুরে এলো, কিন্তু অন্য সমবয়সী ছানাদের মতো এ সাদা বাচ্চাটা অতটা বাড়লও না, গায়েও লোম গজাল না। তারা যেমন দৌড় ঝাঁপ করত, নিজেদের মতো চরে বেড়াত, এর সে রকম কোনো চেষ্টাই নেই। মায়ের কোলে কোলেই বেড়াত সে। কালার তাই দেখে মনে বড় ভাবনা হতো।

অন্য বন-গিন্নিদের সঙ্গে পরামর্শ করেও কোনো সুবিধে হলো না। তারাও বাপের কালে এমন দেখেনি। কালার স্বামী টুবলাট ভারি বিরক্ত। খালি বলত, 'ওটা বাড়বে-টারবে না, কোনো জন্মে চলে ফিরে বেড়াতে পারবে না। তার চেয়ে বরং ঘুমিয়ে পড়লে পর ওকে লম্বা ঘাসে শুইয়ে রেখে কেটে পড়লে হয়। তোমার কত চমৎকার চমৎকার দাঁতওয়ালা, গা ভরা লোম, শক্তপোক্ত ছানা হবে দেখো। কদ্দিন একে কোলে নিয়ে বেড়াবে?'

কালা রেগেমেগে বলত, 'তেমন হলে চিরকাল বেড়াব।' কেরচাকের কাছে নালিশ করেও টুবলাট সুবিধা করতে পারল না। পালের গোদা বলল, 'থাক না ওর সাদা ছানা নিয়ে। বেশি কিছু বললে, দল ছেড়ে কালা বাচ্চা নিয়ে চলে যাবে।'

বাস্তবিক বড় বনমানুষদের সে নিয়মও ছিল। কেউ যদি দলের মধ্যে সুখে থাকতে না পারে, সে ইচ্ছামতো চলে যেতে পারে। কালার মতো সুন্দর স্বাস্থ্যবতী সদস্যাকে হারাতে কেরচাক রাজি ছিল না।

কাজেই নিরাপদে থেকে গেল বাচ্চাটা তার নাম হল টারজান। তার মানে সাদা চামড়া। ক্রমে সে বাড়তেও লাগল। মায়ের কোল ছেড়ে গাছ থেকে গাছে ঝুলে ২০ ফুট লাফ দিতে ও যেমন পারত, ওর সমবয়সী বন্ধুরা কেউ পারত না। মাটিতে নেমে অদ্ভুত সব কাজ করত, দেখেও ওরা তাজ্জব বনে যেত। দশ বছর বয়স হতেই তারা সব মাথায় ছয় ফুট, ইয়া ষণ্ডামার্কণ্ড হয়ে উঠল বটে, কিন্তু বুদ্ধি রইল ভোঁতা।

উঁচু উঁচু গাছের মগডালে টারজান তরতর করে উঠে যেত। আবার সেখান থেকে একেবারে ২০ ফুট ঝাঁপ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে নেমে আসত। অন্যদের মতো অতটা না হলেও, দশ বছর বয়সে টারজানের শরীরের যে বাড় আর জোর হলো, সাধারণ মানুষের ঘরে ত্রিশ বছরেও তা হয় না।

কালার সাদা ছানা অন্য বনমানুষদের ছেলেদের মতো না হলেও, তাদের সঙ্গে তার জীবন খুব সুখেই কাটত। অন্য কোনো রকম জীবন যে থাকতে পারে সে সন্দেহও তার মনে কখনো জাগেনি। সে ভাবত সে কালার ছেলে, কেরচাকের দলের একজন।

সেই সন্দেহ প্রথম মনে এলো দশ বছর বয়সে পুকুরের জলে নিজের ছায়া দেখে। এ কি বিশ্রী চেহারা তার! সাদা, পাৎলা, গায়ে একটা লোম নেই, খুদে খুদে দাঁত, আছে কি নেই মালুম দিচ্ছে না। লজ্জায় মরে গেল টারজান। সারা গায়ে কাদা মেখে কদাকার চেহারাটা ঢাকার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু কাদা শুকিয়ে চড়চড় করতে লাগল। তার চেয়ে ঐ লজ্জাকর চেহারাও ভালো। সত্যি, ও কি বিশ্রী মুখ! দেখেও ঘেন্না হয়।

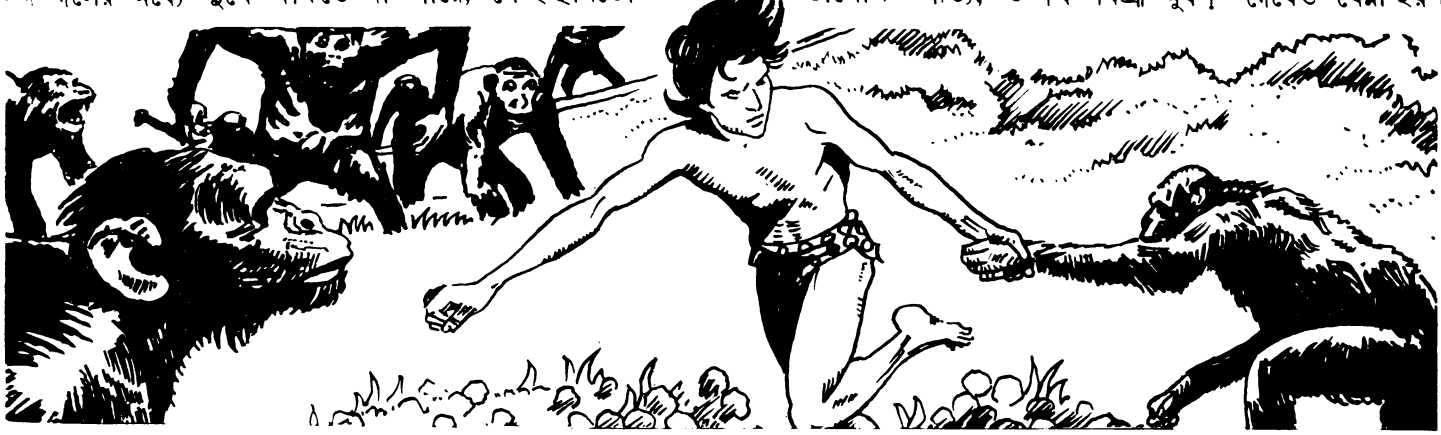

নাকটা একটা চিমটি খাওয়া সরু পাতলা ব্যাপার। বন্ধুদের নাক কেমন থ্যাবড়া মুখের এতখানি জুড়ে আছে। তাতে এই বড় বড় লাল ছ্যাঁদা! টারজানের চোখ দুটোও যেন ছাই রঙের দুটো ফুটকি, তার ধারটা আবার সাদা মতো। মাগো! এমন চোখও হয়! এর চেয়ে সাপের চোখও ভালো। সঙ্গে এক বন্ধু ছিল, তার কি চমৎকার চেহারা।

এমনি তন্ময় হয়ে নিজেদের ছায়া দেখছিল ওরা যে কখন ওদের থেকে ত্রিশ হাত দূরের থেকে শাবর সিংহী গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে তা দু'জনের কেউ টের পায়নি। বন্ধু আবার চকাৎ চকাৎ করে জল খাচ্ছিল, তাই শাবরের পায়ের শব্দও টারজানের কানে যায় নি। এমনিতে তার কান বড় তীক্ষ্ণ।

এইভাবে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিল শাবর সিংহী, পেটটা প্রায় মাটি ছোঁয়, লেজ আছড়াচ্ছে, এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। লেজ এখন স্থির সোজা। এ মুহূর্ত রইল যেন পাথরে কোঁদা। তারপর বিকট গর্জন করে দিল লাফ। অনেকে ভাবতে পারে গর্জন করে জানান না দিলেই সুবিধা হতো। কিন্তু বনের হালচাল শাবরের জানা, কি তীক্ষ্ণ কান জানোয়ারদের, ঘাস মাড়ালেও শুনতে পায়, আর কি ক্ষিপ্র গতি! ওটা জানান দেবার গর্জন নয়, পিলে চমকাবার ডাক। ভয়ের চোটে এক মুহূর্তের জন্য শিকার আড়ষ্ট হয়ে যায়, তারই মধ্যে ধারালো নখ দিয়ে তাকে এমন করে ধরা যায় যে পালাবার উপায় থাকে না।

বনমানুষটার বেলায় বুদ্ধিটা খাটল, তাতেই তার সর্বনাশ হলো। মানুষের ছেলে টারজান অন্য পদার্থে গড়া। তেষ্টা মেটাবার সময় ছাড়া জলকে তার বড় ভয়। এই সেদিন-ও চোখের সামনে খুদে নীতা ডুবে মরেছিল। কিন্তু এখন পেছনে সাক্ষাৎ যম, সামনে জল। টারজান টুপ করে ডুব দিল।

টারজান সাঁতার জানত না, পুকুরটাও বেশ গভীর। প্রথমটা একেবারে তলিয়ে গেল। কিন্তু তার জন্মগত সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি এবার কাজে দিল। যেমন করে হোক ভেসে থাকতে হবে। খুব খানিকটা হাত-পা ছুঁড়ে কি করে জানি যে কায়দায় কুকুর ভেসে থাকে, সেই কায়দা বুঝে নিল। শুধু ভেসে থাকা নয়, বিশেষ ভাবে হাত-পা নেড়ে এগিয়েও যেতে পারছে দেখে ছেলেটা নিজেই অবাক হলো।

তীর বরাবর সাঁতরে যেতে যেতে চোখে পড়ল শাবর তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তখন টারজান গলা তুলে বন কাঁপিয়ে বনমানুষদের বিপদ সংকেত দিল। সঙ্গে সঙ্গে বন থেকে উত্তরও এলো। দেখতে দেখতে চল্লিশ-পঞ্চাশটা ধাড়ি বনমানুষ ছুটে এলো। সবার আগে কালা! কালা তার বুকের ধনের গলা চিনতে পেরেছিল। তার সঙ্গে ছিল টারজানের হত বন্ধুর মা। ব্যাপার দেখে শাবর সিংহী জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিল।

তারপর টারজান সাঁতরে ডাঙায় উঠল। তার শরীরে মনে ঐ ঠাণ্ডা জলে ডুব দিয়ে, সাঁতার কেটে, অদ্ভুত এক রকম ফুর্তি লাগল। এর পর থেকে সে রোজ সাঁতার কাটা ধরল। কালার কি ভয়! অভ্যস্ত হতে অনেক দিন লেগেছিল। দরকার হলে বনমানুষরা সাঁতার কাটতে পারলেও সহজে তারা জলে নামতে চায় না। তাদের জীবন বড় একঘেয়ে। খাবার খোঁজা, খাবার খাওয়া আর শত্রুর মোকাবিলা! এতে টারজানের মন উঠত না।

ওদের বিচরণ-ভূমিটা ছিল সমুদ্রের তীর বরাবর পঁচিশ মাইল আর বনের ভিতর দিয়ে পঞ্চাশ মাইল চওড়া জায়গা জুড়ে। এক জায়গায় কয়েক মাস থাকলেই খাবার-দাবারে টান পড়ত, তখন দল বেঁধে অন্য জায়গায় যাওয়া হতো। আসলে কেরচাকের বেশি দিন এক জায়গায় ভালো লাগত না। ক্ষিপ্রগতিতে চলাফেরা করা হতো। রাত পড়লে, যে যার শুয়ে পড়ত। হয়তো বড় বড় পাতা দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে। কিম্বা তিন-চারজন গাদাগাদি করে, যদি শীত করত।

টারজান বরাবর কালার বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকত। কালা তাকে যেমনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত, টারজানও কালাকে মা বলেই জানত। অবাধ্য হলে কালা ওর কান মলে দিত। কিন্তু সে ক্বচিৎ—কদাচিৎ, সাধারণতঃ আদর ছাড়া কিছু পেতো না।

টুবলাট কিন্তু টারজানকে দেখতে পারত না, অনেকবার তাকে মেরে ফেলার চেষ্টাও করেছিল। টারজানও তার পাতানো বাপের মনের ভাব কড়ায়-গণ্ডায় ফিরিয়ে দিত। সরু ডালে চড়ে ভেংচি কাটত, মায়ের কোলে চেপে নানারকম অপমান করত। তার অনেক বেশি বুদ্ধি থাকাতে বুড়োর জীবন প্রায় অতিষ্ঠ করে তুলত।

খুব ছোটবেলাতেই টারজান লম্বা লম্বা ঘাস পাকিয়ে

দড়ি বানাতে শিখেছিল। যেখানে সেখানে দড়ি পেতে টুবলাটকে আছাড় খাওয়াত। মাঝে মাঝে গাছের ডাল থেকে দড়ি নামিয়ে বেচারাকে ঝুলোতেও চেষ্টা করত। ক্রমে টারজান গিট বাঁধার কায়দা শিখল। তারপর ফাঁস পরাবার কৌশল। একা শিখে সুখ নেই, বন্ধুর দলকেও শেখাল। একবার দৈবাৎ একটা ফাঁস পড়ল গিয়ে টুবলাটের গলায়! হ্যাঁচকা টানে সে থমকে দাঁড়াল। টারজানের মনে হলো, এ তো বেড়ে খেলা! ধৈর্য ধরে সে ল্যাসো বিদ্যায় হাত পাকাতে লাগল। টুবলাট বেচারার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।

কালা ছেলেকে শাসন করত। টুবলাট নানা রকম ভয় দেখাত। কেরচাকের কানে কথাটা গেলে, সেও বহুবার বকাঝকা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। থেকে থেকেই টুবলাটের গলায় ফাঁস পড়ত। তাকে কেউ পছন্দ করত না বলে অন্যরা মহা মজা পেতো।

এই সময় থেকে টারজানের মাথায় আরেকটা বুদ্ধি জাগল। ফাঁস দিয়ে যদি এদের জব্দ করা যায়, তাহলে আরেকটু হাত সড়গড় হলে বনমানুষদের জাত-শত্রু শাবরকেই বা জব্দ করা যাবে না কেন!

এ বুদ্ধি কার্যে পরিণত হতে অবিশ্যি আরো সময় লেগেছিল।

ঘুরতে ঘুরতে কেরচাকের দল মাঝেমাঝেই সেই ছোট উপসাগরের ধারে অদ্ভুত বাসাটার কাছে এসে পৌঁছত। বাড়িটা সম্বন্ধে দলের বড়দের মনে ভয় থাকলেও, টারজানের ছিল অদম্য কৌতূহল। বাড়ির বিগত ইতিহাস সে কিছুই জানত না। একলাই যেত সে। চারদিক এঁটে বন্ধ করা; ভেতরে বাইরে কোনো সাড়াশব্দ নেই; টারজানের কাছে রহস্যময় ঘরটা ছিল ভারি উপভোগ্য। বারবার চারদিক ঘুরে দেখত। পুরু দরজা এমনভাবে বন্ধ যে সেটাকে দেয়ালেরই অংশ মনে হতো। জানলার ভেতরে পরদা, কিছু দেখা যায় না ঢালু ছাদেও চড়ত টারজান। ধোঁয়া বেরোবার চিমনিটাকে ভারি অদ্ভুত মনে হতো। তার মধ্যে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করত; সব অন্ধকার লাগত।

সিংহী মারার ব্যাপারের কিছুদিন পরে টারজান একবার একলাই সেখানে গেল। কেউ যেতে চাইতও না, সবাই বলত ওখানে আগুন-লাঠির ভয়। যারা ভেতরে ঢুকেছিল তাদের বাঁহুরে বুদ্ধি দিয়ে ঘরের জিনিসপত্রের মাথামুণ্ডু বুঝবার সাধ্য ছিল না। তাছাড়া এর মধ্যে প্রায় দশ বছর কেটে গেছে, অনেক কথা ভুলেও গেছিল। মনে রাখবার ক্ষমতাও ওদের কম। কালা অবিশ্যি বলেছিল ওখানে একটা সাদা বনমানুষ থাকত, সে-ই হলো টারজানের বাবা। টুবলাট ওর কেউ নয়। মায়ের কথা কিছু বলেনি কালা। মরা মেয়েটাই যে টারজানের মা, এ-কথা কালা নিজেও হয়তো বুঝতে পারেনি। বাবা যে-ই হোক, কালাই যে ওর মা, এ বিষয়ে টারজানের মনেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। না থাকবারই কথা। মায়ের অভাব কালা তাকে কোনো দিন-ও বুঝতে দেয়নি।

সেদিন দূর থেকে দরজাটার ওপর চোখ পড়তেই কেমন খটকা লাগল। ওটা যেন দেয়ালের অংশ নয়, আলাদা কাঠ বসিয়ে তৈরি। কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে টারজান দরজার হাতল, হাঁসকল ইত্যাদি নেড়েচেড়ে পরখ করে দেখতে লাগল। হঠাৎ দৈবাৎ কলের ওপর চাপ দেওয়াতে, দরজা গেল খুলে। প্রথমটা টারজান তাজ্জব বনে গিয়েছিল, ভেতরে পা দিতে ঘাবড়াচ্ছিল। তারপর অন্ধকারটা চোখ সওয়া হয়ে গেলে আস্তে আস্তে খুব সন্তর্পণে ঢুকেই পড়ল।

দেখল ঘরের মেঝেতে একটা কংকাল পড়ে আছে। খাটে আরেকটা আরেকটু ছোট কংকাল। আর খুদে একটা খাটে ছোট্ট একটা কংকাল। জঙ্গলে মানুষ হয়েছে, সেখানে নিত্যি জানোয়াররা মরছে, এখানে ওখানে হাড়গোড় পড়ে থাকছে। ওসব দেখে টারজানের অভ্যাস ছিল। তাছাড়া এগুলোর সঙ্গে ওর নিজের জীবনের যে কোনো সম্বন্ধ ছিল, তাই-বা সে জানবে কি করে? সত্যি কথা বলতে কি, জানলেও কিছু এসে যেত না। বনের শিক্ষা বড় নির্মম।

তার চেয়ে ঘরের জিনিসপত্র বিষয়ে দশ বছরের ছেলেটার বেশি আগ্রহ। সব সে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। অদ্ভুত চেহারার যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, বই, খাতা, কাগজপত্র। তার বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। যেখানে পারল দেরাজ টেনে, আলমারি খুলে দেখল। ভেতরকার জিনিস ততটা নষ্ট হয়নি।

একটা ধারালো ছুরি পেল, শিকারীরা যে-রকম ব্যবহার করে! নাড়াচড়া করতে গিয়ে আঙুল কাটল, টেবিল-চেয়ারের চাকলা চেঁচে তুলল। বেশ জিনিসটা! একটা আলমারিতে অন্য বইয়ের সঙ্গে রঙীন ছবিতে ভরা একটা এ-বি-সি-র বই পেল। বইটা খুলে ছবি দেখে ছেলে মুগ্ধ। এমন জিনিস সে স্বপ্নেও ভাবেনি। নিজের মতো চেহারার

ছবি দেখতে পেল। ছোট বাঁদরের ছবি পেল। কিন্তু কালা বা টুবলাটের মতো একটাও পেল না। ছবিগুলোকে আঙুল দিয়ে খুঁটে তুলবার অনেক চেষ্টাও করল। সুবিধা করতে পারল না। বুঝল এগুলো সত্যিকার জিনিস নয়। তবে এ-সব কি, তা ভেবে পেল না।

গোরু ঘোড়া জাহাজ রেলগাড়ি জন্মে কখনো দেখেনি, কাজেই সে সব চিনতেই পারল না। তার চেয়েও অদ্ভুত লাগল ছবিগুলোর তলায়, ওপরে, আশেপাশে ছোট ছোট কালো পোকার মতো সারি সারি কি সব যেন। তাদের কারো কারো ঠ্যাঙের মতো থাকলেও, মুখ-চোখ নেই। নড়েচড়েও না।

বইটার মাঝখানে দেখল শাবরের চেহারা, আর হিসটা সাপ পাক খেয়ে রয়েছে। এইসব দেখতে দেখতে দিনের আলো কমে এলো। এবার দলের কাছে ফিরতে হয়। তখন ঘর থেকে বেরিয়ে, টারজান দরজার হাতল হাঁসকলের রহস্য ভালো করে শিখে নিয়ে, দরজাটা বন্ধ করে দিল। ওর ইচ্ছা ছিল না ও ছাড়া কেউ এ-ঘরে ঢোকে, কিম্বা ও নিজে ঢুকলে ব্যাঘাত ঘটায়। নেবার মধ্যে খালি সেই শিকারীদের ধারালো ছুরিটা হাতে করে নিল।

ভাগ্যিস নিয়েছিল! কারণ দরজা বন্ধ করে আস্তানার পথ ধরবামাত্র, বিশালদেহ গোরিলা বল্লানি ওকে আক্রমণ করল। বোধ হয় এতক্ষণ ওঁৎ পেতে ছিল।

গোড়ায় আধা-অন্ধকারে বল্লানিকে দেখে দলের কেউ বলে মনে করেছিল টারজান। ভুল যখন ভাঙল তখন গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ারও উপায় ছিল না। মুখোমুখি হতেই হলো। ভয় পায়নি ছেলেটা, ভয় কাকে বলে ও জানত না, তবে এ-ও বুঝেছিল যে সম্ভব হলে পালানোই বুদ্ধির কাজ হবে। সে যখন হবার নয়, টারজান লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলো।

সে কি লড়াই! এক দিকে ঐ বিকট বিশাল হুলো গোরিলা, অন্য দিকে পাতলা ছিপছিপে দশ বছরের ছেলে টারজান। হতে পারে সে সাধারণ মানুষের ছেলের পাঁচগুণ শক্তিশালী, তবু বল্লানির কাছে নস্যি। ওর ওপর লাফিয়ে পড়ে, গোরিলাদের যেমন নিয়ম, বল্লানি চড়-চাপড় আঁচড়-কামড় কিছু বাদ রাখল না। টারজান ভুলেই গিয়েছিল ছোরাটা তার হাতে ধরা। হঠাৎ খেয়াল হতেই গোরিলার বুকে সেটা বারবার হাতল পর্যন্ত বসিয়ে দিতে লাগল। গোড়ায় বল্লানি জয়োল্লাসে গর্জন করছিল, এখন বেদনায়, রাগে চ্যাঁচাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে টারজানের গলার পাশ থেকে বুক থেকে, মাংস ছিঁড়ে তুলবার চেষ্টা। ক্রমে দশ বছরের টারজান দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। তবু বল্লানির বুকে কোপের পর কোপ দিতে দিতে এক সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

এদিকে প্রায় মাইলখানেক দূর থেকে কেরচাকের দলের কানে ঐ অসমান লড়াইয়ের বিকট শব্দ ক্ষীণ ভাবে পৌঁছল। ও তো বল্লানির আওয়াজ!

তখন সকলের খেয়াল হলো দলের সবাই আছে, কিন্তু কালার ছেলে টারজান তো ফেরেনি! ওদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বনমানুষদের অ-লিখিত নিয়ম হলো দলের কেউ বিপদে পড়লে সকলে তার সাহায্যে ছুটবে, তা সে যে-ই হোক না কেন। এই নিয়মেই দলগুলো বেঁচে থাকে। কিন্তু এ ছেলেটা তো দলের কেউ নয়, কেরচাক আর টুবলাট ওকে দেখতে পারত না। আর কেউ না গেলেও একা কালা গাছের ডাল ধরে ঝুলে ঝুলে আশ্চর্য রকম তাড়াতাড়ি উপসাগরের ধারের সেই অদ্ভুত বাসাটার কাছে পৌঁছে গেল। ঐ দিক থেকেই তর্জন-গর্জনের শব্দ আসছিল। এখন সব চুপচাপ। ভয়ে কালার গায়ের রক্ত হিম। কিন্তু ব্যাপারটা সে বুঝে উঠতে পারছিল না। শেষের দিকে কেন মনে হচ্ছিল বল্লানি মর্মান্তিক যন্ত্রণায় চ্যাঁচাচ্ছে, অথচ টারজানের সাড়াশব্দ নেই! ঐটুকু ছেলে যে ঐ বিকট জানোয়ারটাকে ঘায়েল করতে পারে, এ তো ভাবা যায় না!

ততক্ষণে চাঁদের আলোয় আকাশ ভরে গেছে, সেই আলোতে কালা দেখতে পেল বাসাটার সামনের খোলা জায়গাতে বল্লানি তার বিশাল দেহ এলিয়ে মাটিতে মরে পড়ে আছে আর তারই পাশে পড়ে আছে টারজানের ছিপছিপে, ছোট, সাদা শরীরটা। তার সর্বাঙ্গে রক্ত মাখা। চাপা আর্ত-নাদ করে অচেতন দেহটাকে বুকে তুলে নিল কালা। একবার কান পেতে শুনল বুকের ক্ষীণ ধুকধুক শব্দ। তারপর তাকে কোলে নিয়ে, কত যত্নে, কত স্নেহে আস্তানায় ফিরে এলো।

এরপর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, কালা তার সেবা করতে লাগল। বনের জানোয়ার, ওষুধপত্রের সে আর কি জানবে? টারজানের গলার আর বুকের সাংঘাতিক ক্ষত-গুলোকে সে বারবার চেটে পরিষ্কার করে দিত, পোকামাকড় বসতে দিত না। দু-তিন জায়গার মাংস উঠে শিরা দেখা যাচ্ছিল; একটা হাত প্রায় ছিঁড়েই এনেছিল বল্লানি। ঝোপের নিচে চুপ করে পড়ে থাকত টারজান। এতটুকু শব্দ

না করে সেই অভাবনীয় যন্ত্রণা সহ্য করত। বনের পশুরা তাই করে। কালা একা তার সেবা করত। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিত না। টারজান জল চাইলে নিজের মুখে করে জল এনে খাওয়াত। নিজের খাওয়া-দাওয়া, আরাম-বিশ্রাম সব ভুলে, চব্বিশ ঘণ্টা প্রাণের ধন, এই পোষ্যপুত্রকে আগলাতো। কোনো মানুষ-মা এর বেশি করতে পারত না। উপোস করে করে আধখানা হয়েছিল কালা।

টারজানের মনে হয়েছিল উঠে দাঁড়াতে তার এক যুগ লেগেছে। তারপর থেকেই কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে লাগল। এই সময়ে মনে মনে বল্লানির সঙ্গে লড়াইটাকে আবার মনে করার চেষ্টা করত টারজান। অমনি ছোরাটার কথা মনে পড়ল। ওটার জন্যই দানবটাকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছিল। বাসাটাতে ফিরে গিয়ে সেটাকে উদ্ধার করতে আর ঐ সব আশ্চর্য জিনিসপত্র পরখ করতে হবে।

তার জন্যে আরেকটু সময় নিল। অবশেষে একদিন সকালে সেখানে গিয়ে শুকনো পাতার নিচে ছোরাটাকে পেল। কিন্তু তার সে ঝকঝকে চেহারা আর নেই দেখে খানিকটা হতাশ হলেও মনে মনে বুঝতে পারছিল শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে এবার ভারি সুবিধা হবে। দরকার হলে টুবলাটের সঙ্গেও।

ঘরে ঢুকে দেখল দরজাটা ভেতর থেকেও বন্ধ করা যায়। তাহলে কেউ এসে জ্বালাতে পারবে না। দরজা বন্ধ করে, চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল। ওর যত আকর্ষণ বইগুলোর ওপরে। সেগুলোর মধ্যে কিছু শিশুপাঠ্য বই ছিল, মেলা ছবির বই, বিরাট একটা ছবিতে ভরা অভিধান। সবার ওপর ওর নজর ছিল ছবি দেওয়া এ-বি-সির বইটাতে। অচেনা বাপের তৈরি টেবিলের ওপর চড়ে উবু হয়ে বসে, বইটার মধ্যে ডুবে গেল।

সে এক দেখবার জিনিস। ছেলেটার মাথা ভরা কালো চুলের রাশি, মুখের গড়ন বড় সুন্দর, দু'টি সুগঠিত হাতে বইটি ধরা, তার ওপর বুদ্ধিদীপ্ত দু'চোখ নিবদ্ধ। দেখলে মনে হতো যেন আদিম মানুষ হাত বাড়িয়েছে জ্ঞানের আলোর দিকে।

মুখে একটা উত্তেজনার ভাবও দেখা যাচ্ছিল। দুর্বোধ্য কালো আঁচড়গুলোর একটা মানের যেন অস্পষ্ট সন্ধান পাচ্ছিল। খোলা পাতাটাতে ওর নিজেরই মতো একটা সাদা বনমানুষের ছবি। তার হাত মুখ ছাড়া সবটা কিসে ঢাকা। তলায় এই রকম তিনটে পোকা **B O Y**। তারপর লক্ষ্য করল ঐ ভাবে এক সঙ্গে ঐ তিনটে পোকার মতোই আঁচড় আরো অনেক জায়গাতেই রয়েছে।

আরো কয়েকটা পাতা উল্টে দেখল আরেকটা ছবিতে ঐ সাদা বনমানুষটার পাশে শেয়ালের মতো একটা জানোয়ার। তবে ঠিক শেয়ালও নয়। তাঁর নিচেও ঐ তিনটে আঁচড়ের পাশে আরো কিছু পোকার মতো আঁচড়। সেগুলো এই রকম দেখতে :—

A BOY AND A DOG যেখানেই সাদা বনমানুষের ছবি তার তলায় **BOY** আর যেখানে অদ্ভুত শেয়ালটার ছবি, তার তলায় **DOG**। তা হলে বোঝা যাচ্ছে টারজান হলো **BOY** আর শেয়ালমতোটা হলো **DOG**।

এই ভাবে অক্ষর না চিনে, উচ্চারণ না জেনে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর, অসীম ধৈর্যের আর অসাধারণ অধ্যাবসায়ের ফলে বইয়ের পাতার কালো পোকার সারির রহস্য ক্রমে ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে এলো। ছবিতে শুধু নামগুলোই থাকা সম্ভব। বাকি যত ক্রিয়াপদ, গুণবাচক কথা, অব্যয় ইত্যাদির ছবি হয় না, সেগুলো আন্দাজে আঁচ করে নিয়ে, পাঁচ বছরে টারজান মনে মনে বইটা পড়তে শিখল। লিখিত ভাষা আর মৌখিক ভাষা বলে যে দু'টো আলাদা ব্যাপার আছে, তখনো তার সে বিষয়ে কোনো জ্ঞানই হয়নি। তবে শুধু মনে মনে পড়তে নয়, অনেক চেষ্টার আর অভ্যাসের ফলে ঐ আঁচড়গুলো দিয়ে লিখতেও শিখল। ঘরে কাগজ, পেন্সিলের অভাব ছিল না। বনেও লেখার উপকরণ থাকে।

ঐ বিশাল অভিধানের ছবি দেখে অনেক জিনিসের নাম লিখতে শিখল। কিন্তু মনের কথা অন্যকে জানাতে হলে, বনমানুষদের সামান্য ক'টি কথা ছাড়া উপায় ছিল না। উচ্চারণ তো আর শেখা হয় নি। শিখলেও বনমানুষ সঙ্গীরা তার কিছুই বুঝবে না।

এমনি করে আরো দু বছর কাটল। টারজান এখন বুঝতে পেরেছে দলের অন্যদের থেকে সে আলাদা। সে হলো **BOY** আর অভিধানের ছবি দেখে বুঝেছে ওরা হলো **APE**। তবু কালা যে তার মা এ বিশ্বাসের নড়চড় হয়নি। এখন আর নিজের লোমশূন্য শরীর, সরু নাক, সাদা ঝকঝকে ছোট ছোট দাঁত দেখে আর তার লজ্জা হয় না।

গাছের ছালে মাটির ওপর, বড় বড় পাতায় টারজান

লেখা অভ্যাস করে। তাই বলে দড়ির কায়দা আর ছোরার ব্যবহার সে ভোলেনি। ছোরাটাকে পাথরে ঘষে ঝকঝকে করে রাখত। ওটি ওর দিনরাতের সঙ্গী।

ততদিনে দলটাও আরো ভারি হয়েছে। কেরচাক যতই না দুর্দান্ত নিষ্ঠুর হোক, নেতা হিসাবে তার তুলনা ছিল না। দল ভেঙে চলে যাওয়া দূরে থাকুক জোয়ানরা অন্য দল থেকে অনেক সময় পছন্দমতো জুড়ি নিয়ে এসে দলের মধ্যেই ঘর করত। মাঝে মাঝে দু-একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছোকরার বুড়োকে সরাবার ইচ্ছা হলেও, কাজের বেলায় কেরচাকের কাছে রামধোলাই খেয়ে তারা সায়েস্তা হয়ে যেত।

টারজানকে কমবয়সীরা নিজেদের একজন মনে করত। জন্মে অবধি তারা তাকে কালার ছেলে বলেই জানত। তার সঙ্গে ওদের কোনো ঝগড়া ছিল না। ধাড়িদের কথা আলাদা, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ওকে যেন দেখতেই পেতো না আর কেউ কেউ দু'চক্ষে দেখতে পারত না। তবে কিছু করতেও পারত না তারা। প্রথম কথা হলো, তার মতো দক্ষ আর ক্ষিপ্র কেউ ছিল না। দ্বিতীয় কথা হলো কালা তাকে হিংস্রভাবে রক্ষা করত। নইলে কোন্ কালে তার ভবলীলা সাঙ্গ হতো।

দলের ছোটরা ছিল টারজানের সঙ্গী ও বন্ধু। তারা ওর কাছ থেকে নানা বিদ্যা রপ্ত করত। তার মধ্যে দড়ির খেলা ছিল প্রধান। তাদের ভোঁতাআঙুল টারজানের দক্ষ আঙুলের মতো কোনো দিনই হয়ে উঠবে না এটা নিশ্চিত। তবু অনেক ছোট বিদ্যা তারা আয়ত্ত করেছিল। টুবলাট ছিল ছেলেটার জাত শত্রু; টুবলাটের প্ররোচনায় দলের অন্য শত্রুরা টারজানকে বড় উত্যক্ত করত। এর মধ্যে টারজানের যখন তেরো-চোদ্দ বছর বয়স, সমস্ত পরিস্থিতিটা পাল্টে গিয়েছিল। আর কেউ টারজানের পেছনে লাগতে সাহস পেতো না। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। এখানে বলা যেতে পারে। বনমানুষদের বিচরণ ভূমির মধ্যিখানে একটা ফাঁকা জায়গা ছিল তার চারদিকে বিশাল গাছের ঘন বেড়া। ডাল বেয়ে ছাড়া ভিতরে ঢোকার উপায় ছিল না। এইখানে নিরিবিলি দলের সদস্যরা মিলত। জায়গাটার মধ্যিখানে, বনমানুষরা একটা মাটির ঢাক বানিয়েছিল। সেই ঢাকের শব্দ কোনো কোনো মানুষও শুনেছিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা কেউ চোখে দেখেনি। ঢাকগুলোও দেখে থাকতে পারে, কিন্তু ওখানে কি হয় কেউ জানত না। তাকে বলা হতো দুম-দুমের উন্মত্ত আদিম উৎসব।

এই উৎসব থেকেই হয়তো সভ্য জগতের অনেক ধর্মানুষ্ঠানের জন্মও হয়েছিল। কেউ বলতে পারে না। সে যাই হোক, এই রকম একটা বিশেষ দুমদুম উৎসবের দিন থেকেই টারজানের প্রতিষ্ঠা শুরু হলো। এ-সব উৎসবের একটা উপলক্ষ্য থাকে। শত্রু নিধন, কিম্বা নতুন দলপতি নির্বাচন। তার নির্দিষ্ট একটা পদ্ধতিও ছিল।

সেদিনের উৎসবের কারণ ছিল দুর্দান্ত এক শত্রুর পরাজয়। তার মৃতদেহটা এনে নিভৃত জায়গার মধ্যিখানে দুমদুমের ঢাকের সামনে ফেলা হলো। একে একে শতখানেক বীর এসে ক্রমে জড়ো হলো। চাঁদ ওঠার জন্য সবাই অপেক্ষা করতে লাগল। চারদিক চুপচাপ, খালি মাঝে মধ্যে কটকটে রঙের টিয়াজাতীয় পাখির কর্কশ চিৎকার। মেয়েরা আর বাচ্চারা নিঃশব্দে বাইরের দিকে জায়গা নিয়েছিল। তাদের সামনে ধাড়ি পুরুষরা গোল হয়ে বসল। তিনজন বুড়ি বনমানুষী হাতখানেক লম্বা গাছের ডাল নিয়ে ঢাকের সামনে বসেছিল। এক সময় আস্তে আস্তে দুমদুমের ঢাকে তাদের কাঠি পড়ল।

তারপর চাঁদের আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত উল্লাসের সঙ্গে নাচ শুরু হলো। ঢাকের বাদ্যির তাল-ও আরো জোরে, আরো দ্রুত শোনাতে লাগল। শ্রোতাদের রক্তে এক রকম খ্যাপামি জাগতে লাগল।

দূর থেকে দলের অন্য বনমানুষরাও সে শব্দ শুনে অকুস্থলে

এসে জুটতে লাগল। সভ্য জগতের অনেক ভ্রমণকারী ঘোর বনে দুমদুমের ফাঁপা মাটির ঢিপি দেখে অবাক হয়েছে, কিন্তু টারজান ছাড়া দুমদুমের পাগল নাচ কোনো মানুষ চোখে দেখেনি, যোগ দেওয়া দূরে থাক।

দুমদুমের ক্রিয়াকর্মের কয়েকটা অঙ্গ ছিল। একটা উপযুক্ত উপলক্ষ্য থাকার দরকার, শত্রু বিজয়, বা কোনো শত্রুকে বন্দী করা, কি কোনো হিংস্র জানোয়ার হত্যা, বা

পুরানো দলপতির মৃত্যু, কিম্বা নতুন দলপতি নির্বাচন। সেই তাণ্ডব নাচনের মধ্যিখানে, কেরচাক লাফিয়ে উঠে মাঝখানের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে, তার বিশাল বুক চাপড়ে, তিনবার গায়ের রক্ত-জল-করা বিকট হংকার ছেড়ে, শত্রুর মৃতদেহটার চারদিকে ঘুরতে লাগল। অমনি একে একে আরো অনেক-গুলো বীর ঐ রকম হুংকার দিয়ে, দলপতির পেছন পেছন ঘুরতে লাগল।

সবাই জড়ো হলে, মোটা মোটা গাছের ডাল দিয়ে মৃত-দেহটাকে পিটোতে পিটোতে সে এক তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে গেল। শত্রুর শরীর ছিঁড়ে খাওয়া। টারজানও বাদ গেল না। একটা বড় টুকরো নিয়ে সবে সে ভিড় থেকে বেরিয়ে এসেছে, এমন সময় টুবলাট তার পিছু নিল। টারজান একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। টুবলাটও তার পিছন পিছন ঐ গাছে চড়ল। কিন্তু টারজান তরতর করে পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে সরু ডালে বসে, বুড়োকে নানা অপমান করতে লাগল। রাগে অন্ধ হলেও সেখানে ওঠা ভোঁদা টুবলাটের কর্ম নয়।

তখন টুবলাট খেপে গেল। মাটিতে নেমে ছোট ছোট বাচ্চাদের আক্রমণ করল। গোটা বারো বাচ্চার ঘাড় কামড়ে শেষ করতে তার বেশি সময় লাগল না। বাচ্চাদের সন্ত্রস্ত মা-রাও তার নিষ্ঠুর হাত থেকে রেহাই পেল না। সবাই তখন গাছে চড়ে প্রাণ বাঁচাল। খালি এক বেচারি একটু পেছিয়ে পড়েছিল। টারজান স্তম্ভিত হয়ে দেখল সে কালা ছাড়া কেউ নয়।

তরতর করে টারজান একটা নিচের ডালে নেমে এলো। কালাও এক লাফে অন্য একটা ডাল ধরে বেঁচে যেতে পারত, কিন্তু ডালটা মড়মড় করে কালাকে সুদ্ধ মাটিতে পড়ল। পড়ল টুবলাটের মাথার ওপর। দু'জনেই মাটিতে গড়াগড়ি। সঙ্গে সঙ্গে উঠেও পড়ল। টুবলাট কিন্তু কোথায় কালাকে শেষ করবে, তা নয়। চেয়ে দেখে কালার বদলে টারজান তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সে তো আরো ভালো। এক লাফে টারজানের ওপর টুবলাট ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবার কচি গলাটাতে দাঁত বসালেই হলো! কিন্তু তা আর হলো না। একটা বলিষ্ঠ হাত টুবলাটের গলা চেপে ধরল। আরেকটা বলিষ্ঠ হাতে ধরা ঝকঝকে ছোরা দশ-বারোবার তার বুকে উঠল বসল। শেষ পর্যন্ত টুবলাটের প্রাণহীন শরীরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আর টারজান তার গলায় পা রেখে বুক চাপড়ে ওদের জাতের চিরকেলে গা-শিউরে-ওঠা গর্জন করে বন কাঁপিয়ে তুলল। তখন একে একে দলের সকলে গাছের নিরাপত্তা থেকে নেমে, ওদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়াল। সবাই এলে টারজান চিৎকার করে বনমানুষদের ভাষায় বলল, আমি টারজান। আমি শত্রু হত্যা করি!! সকলে যেন টারজানকে আর তার মা কালাকে সম্মান করে। শত্রুরা সাবধান!'

তারপর কেরচাকের ছোট ছোট নিষ্ঠুর চোখের দিকে চেয়ে, আরেক বার সেই বিকট হুংকার দিল। বন শিউরে উঠল।

দমদুমের পরদিন বনমানুষদের দল আবার বনের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রতীরে চলল। টুবলাটের মৃতদেহটা সেই-খানেই পড়ে রইল। এরা নিজেদের দলের সদস্যদের খায় না। এই যাত্রাটা হলো খাবারের খোঁজে ধীরে ধীরে এগোনো, ছোটবড় নানা গাছের পাতা, ফল, ছাল, বুনো আনারস মাঝে মাঝে ছোট ছোট গিরগিটি, পোকামাকড়, পাখি, পাখির ডিম। বাদাম পেলে দাঁতে ভাঙল; বেশি শক্ত হলে পাথর দিয়ে ছেঁচে নিল।

একবার বুড়ি শাবরকে দেখে বনমানুষরা মাটি ছেড়ে গাছে আশ্রয় নিল। এরা পারতপক্ষে পরস্পরকে ঘাঁটাত না। টারজান একটা নিচু ডাল থেকে শাবরের গায়ে আনারস ছুঁড়ে মারল। অব্যর্থ লক্ষ্য। লেজ আছড়িয়ে, চোখ পাকিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে, সোজা টারজানের চোখের দিকে চেয়ে শাবর যুদ্ধে ডাক দিল। গাছের নিরাপত্তা থেকে টারজানও তার উত্তর দিল। এক মিনিট চোখা-চোখি, তারপর শাবর ঘন বনে গা-ঢাকা দিল।

কিন্তু সেই থেকে টারজানের মনে একটা মতলব পাক খেতে লাগল। দুরন্ত টুবলাটকে মেরে সকলের চোখে সে বড় যোদ্ধা হয়েছে। তাহলে শাবরকে মেরে বড় শিকারী বলেই বা স্বীকৃতি পাবে না কেন! মনের সঙ্গোপনে আরেকটা অভিসন্ধিও ছিল। সে তো আর APE কিংবা MONKEY নয় যে ন্যাংটো থাকবে। বইতে দেখেছে সে MAN। MAN-রা গা ঢেকে রাখে। শাবরের চমৎকার লোমে ঢাকা ছালটি পেলে, সে-ও গা ঢাকতে পারবে। এরপর এই চিন্তাই টারজানকে পেয়ে বসল। যেমন করে হোক, শাবরকে মেরে ওর ছালটা খুলে নিজে পরবে।

এই সময়ে একদিন বনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব নাচন শুরু হলো। সকলের মাথা থেকে অন্য সব চিন্তা দূরে গেল। সে কি প্রবল বাতাস! তারপর বিদ্যুৎ, বাজ আর ঝমঝম

বৃষ্টি। বড় বড় বনস্পতি মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। পড়বার সময় আরো দু'চারটে গাছকে নিয়ে পড়ল। অনেকের প্রাণ গেল। বাকিরা গাছতলায় জড়োসড়ো হয়ে কোনো রকমে ঝড়ের প্রকোপ থেকে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। এত বিপদের মধ্যেও টারজানের সেই একই চিন্তা, আহা! কোনোমতে যদি শাবরের ছালটা বাগানো যায়, তা হলে জল ঝড়ে শীতের নিষ্ঠুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়!

তারপর যেমনি হঠাৎ ঝড় এসেছিল, তেমনি হঠাৎ কেটেও গেল। মেঘ উধাও হলো; বাতাস বন্ধ হলো; রোদ উঠল; পাখিরা ডাকতে লাগল। এরপর উপসাগরের তীরে ছোট বাসাটার কাছে ওরা কিছু দিন ছিল। আর সকলে ভয়ের চোটে কখনো ও-দিকে মাড়াত না। খালি টারজান একা গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই পড়ে কাটাত। তাই বলে দড়ির খেলাতেও ক্রমে আরো ওস্তাদ হয়ে উঠছিল। প্রথমে ফাঁস লাগিয়ে ছোট ছোট জানোয়ার ধরত। মোট কথা ফাঁস নিয়ে সে সর্বদা তৈরি থাকত। একবার বুনো শুওর হর্টার গলায় ফাঁস পড়ল। ফাঁসে টান দিতেই হর্টা এমনি লাফ-ঝাঁপ শুরু করে দিল, যে দড়ির অন্য মাথা হাতে নিয়ে টারজান যে ডালে বসেছিল, সে টাল সামলাতে না পেরে, ধপাস্ করে মাটিতে পড়ল।

আর যাবে কোথায়! মাথা নিচু করে হর্টা তার দিকে তেড়ে এলো। ভাগ্যিস বেশি লাগেনি টারজানের। এক লাফে আবার গাছের নিরাপত্তায় পৌঁছে গিয়েছিল। এই ব্যাপার থেকে এক বড় শিক্ষাও সে পেল। ফাঁস লাগানোর সুবিধাও যেমন অনেক, তেমনি কিছু ঝুঁকিও আছে। সে বিষয়ে সাবধান হতে হবে। শাবরের মোকাবিলা করবার জন্য তৈরি হতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল। নতুন একটা আরো মজবুত দড়ি পাকাতে হলো। তারপর ফাঁস লাগা জানোয়ারের টানে যাতে গাছ থেকে পড়তে না হয়, তার ব্যবস্থা ভাবতে হলো। সেদিন হর্টার জায়গায় শাবর হলেই তো হয়েছিল আর কি!

নতুন বিদ্যেটা পরখ করবার উপযুক্ত শিকার চাই। অর্থাৎ ছোট জানোয়ার দিয়ে হবে না। শাবর ছাড়া কাউকে দিয়ে চলবে না। দড়ির ফাঁস নিয়ে, ঘন পাতাল আড়ালে মজবুত ডালের উপর শুয়ে টারজান শাবরের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। নিঃশব্দ পদচারণে গাছের তলা দিয়ে সে চলেছিল। ওপরে কিছু লক্ষ্যও করেনি। এমন সময় টারজানের ফাঁস সাপের মতো এঁকে বেঁকে তার গলায় নামল। ফাঁসটাতে টান দিয়েই টারজান ছেড়ে দিল। দড়ির অন্য মাথা গাছের মোটা ডালে প্যাঁচ দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। টারজান দু-হাত দিয়ে ডালটাকে জড়িয়ে ধরে রইল, যাতে পড়ে না যায়।

আঁৎকে উঠে শাবর পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। ফাঁসটা আরো এঁটে বসল। টানের চোটে শাবরও চিৎপাত হলো। টারজান ভেবেছিল, দড়ি টেনে শাবরকে শূন্যে ঝুলিয়ে নেবে। কিন্তু ঐ ভারী দেহ তোলে কার সাধ্য। পালাবার চেষ্টা ছেড়ে শাবর উঁচু দিকে লাফ দিল। টারজান ততক্ষণে আরো উপরের ডালে চড়ে বসেছে। ধরতে না পেরে কি রাগ শাবরের! তবে এতক্ষণে তার চোখে পড়ল ফাঁসের দড়িটা খুব মোটা নয়। দাঁত দিয়ে ঘসে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটাকে দু' টুকরো করে শাবর পালাল।

আসল কাজ না হলেও ব্যাপারটা থেকে অনেক শিক্ষা হয়েছিল টারজানের। দলের কাছে ফিরে গিয়ে সমবয়সীদের সামনে খুব খানিকটা আস্ফালন করেছিল। এমন অভাবনীয় কাণ্ডের কথা শুনে শত্রুরা পর্যন্ত তাজ্জব বনে গেল। আর কালার তো গর্বে মাটিতে পা পড়ে না!

আরো ক-টা বছর কেটে গেল। আরো কিছু বই পড়ল টারজান। এই আদিম বনের বাইরে যে আরেকটা অন্য রকম জগৎ আছে, ক্রমে ওর সে জ্ঞানও হলো। তবু এ জীবনটিও ভারি উপভোগ্য। নদী থেকে বিল থেকে পিসা মাছ ধরা, শাবর আর নুমা সিংহী-সিংহের সঙ্গে প্রাণ নিয়ে খেলা, মাঝে মাঝে একটা পাতার ব্যবধানে ওদের ধারালো নখ থেকে নিজেকে বাঁচানো, এ সব খেলার উত্তেজনা কত! খালি তান্তর হাতির সঙ্গে তার বড় ভাব। তার পিঠে শুয়ে চাঁদনি রাতে বনে ঘুরে বেড়ানোর কি আনন্দ! কেন যে এত ভালোবাসা নিজেও বুঝত না।

ক্রমে টারজানের আঠারো বছর বয়স হলো। এই ক-বছরের অনেকটা সময় তার বই নিয়ে ছোট ঘরটাতে কেটে-ছিল। কংকালগুলো যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল। টারজান কিন্তু যে বই-ই হাতে নিত, মনে মনে আজকাল গড়গড় করে পড়তে পারত এবং বেশির ভাগের মানেও একটা আন্দাজে বুঝে নিতে পারত। তাছাড়া টানা লেখা না পারলেও ছাপার হরপে লেখাও অভ্যাস হয়ে গেছিল। অবশ্যি এক বর্ণ উচ্চারণ করতে পারত না। তাছাড়া নিজেকে আর বইয়ের ছবিগুলোকে ছাড়া কোনো মানুষ-ও দেখেনি।

বনমানুষদের ঐ এলাকাটার এক দিকে সমুদ্র, বাকি তিন

দিকে পাহাড়। অগুন্তি জন্তু-জানোয়ারের আবাস, কিন্তু বাইরে থেকে এতকাল কোনো মানুষের আগমন হয়নি। এই সময় একদিন টারজান ঘরের মধ্যে বইয়ের রহস্যোদ্ধারে ডুবে আছে, এমন সময় সকলের অজ্ঞাতসারে একের পেছনে এক সারি বেঁধে, জনাপঞ্চাশেক কালো যোদ্ধা হাতে কাঠের বর্শা ও গোল ঢাল নিয়ে পাহাড়ের ওপরকার বনপথ ধরে ঐ এলাকায় প্রবেশ করল। মাথায় পালক, নাকে বড় বড় গোল নোলক, কপালে তিন সারি উল্কি, বুকেও গোল নক্সার উল্কি, হলদে দাঁত ঘষে ছুঁচলো করা। তাদের পেছনে কয়েকশো মেয়ে আর ছেলেপুলে। মেয়েদের মাথায় হাঁড়ি-কুড়ি, হাতির দাঁতের বোঝা। তারও পেছনে আরো একশো ঐ রকম যোদ্ধা। এরা সাদা মানুষদের সেপাইদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার আশায় পালিয়ে এসেছে। আগে দলে আরো ভারি ছিল, কিন্তু পেছন থেকে সেপাইরা আক্রমণ করে অনেককে মেরে ফেলেছিল। যে ক-জন বেঁচেছিল, তারাই বনমানুষদের দেশে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। এরা অসভ্য নরখাদকের জাত। ওদের কাছে যে অবস্থার মানে নিরাপদে বসবাস, বনের জানোয়ারদের পক্ষে তাই হলো সর্বনাশ। তাদের এতদিনের সুখের স্বর্গে শত্রু ঢুকল।

বনের ভিতর দিয়ে তিন দিনের হাঁটা পথ পার হয়ে, ঝরঝরে একটি নদীর ধারে কালোরা গ্রামের পত্তন করল। এখানে গাছপালা একটু কম, হাতের কাছে মিষ্টি জল। মাস খানেকের মধ্যে গাছ কেটে উঁচু বেড়া হলো, কুঁড়ে ঘর হলো, ইয়াম বলে কন্দ, আলু আর ভুট্টার খেত হলো। এখানে সাদা মানুষদের সেপাইদের ভয় ছিল না; নিষ্ঠুর মালিকদের জন্য রবার আর হাতির দাঁত সংগ্রহ করতে হতো না।

এর মধ্যে এক দিন বুড়ো রাজা এম্বঙ্গার ছেলে কুলঙ্গা গোল ঢাল আর লম্বা বর্শা নিয়ে শিকারে বেরোল। পিঠে ঝুলিয়ে নিল ধনুক আর তূণ ভরা তীর। তীরের ফলায় কালো চটচটে বিষ মাখানো, তার এক ফোঁটা রক্তে মিশেছে তো সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল! এদিকে ছোট ঘরটাতে যাবার পথে দু-একটা ছোট জানোয়ার মেরে টারজান পেট ভরে খেয়ে নিয়েছিল। অন্য বনমানুষরা দু-তিনজন একসঙ্গে খাবারের খোঁজে ইদিক-উদিক ঘুরছিল, তবে এত দূরে কেউ যাচ্ছিল না যে ডাক দিলে শুনতে না পায়।

হাতির যাবার পথ ধরে, কালা একলা মাটিতে খসে-পড়া ডালপালা উল্টে রসালো পোকা-মাকড় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ কানে একটা নতুন রকম শব্দ এলো। চমকে উঠে দেখে

হাতি চলার সরু পথ দিয়ে একটা দু'পেয়ে ভয়াবহ প্রাণী এগোচ্ছে। প্রাণীটা হলো কুলঙ্গা। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে কালা ধীরেসুস্থে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করল। সামনে একটা বড়সড় শিকার পেয়ে কুলঙ্গা কিন্তু মহা খুশি। এতক্ষণ কিছু পায়নি। কুলঙ্গা আরেকটু এগোল। মোড় ঘুরতেই জানোয়ার-টাকে আবার দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে বর্শা ছুড়ল। ঠিক জায়গায় না লাগলেও, গায়ে ঘষটে গেল। ব্যথার চোটে রেগে কালা গর্জে উঠল। সঙ্গীদের কানে সে ডাক পৌঁছতেই, তারাও ঝোপঝাপ ভেঙে ছুটতে লাগল।

কালাও কুলঙ্গার দিকে তেড়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে সেও একটা বিষাক্ত তীর কালার বুকে ছুঁড়ে দিল। ততক্ষণে সঙ্গীরাও এসে গেছে। তাদের স্তম্ভিত চোখের সামনে অতবড় জানোয়ারটা সেই যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল আর নড়ল না। কালা সেখানেই পড়ে রইল, সঙ্গীরা কুলঙ্গার পিছু নিল। এমন অদ্ভুত জীব তারা কখনো দেখেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মেনে যে যার ফিরে এলো।

এদিকে উপসাগরের তীরের ছোট ঘরে টারজানের কানেও বিপর্যয়ের আওয়াজ পৌঁছল।

অকুস্থলে পৌঁছে সে দেখল তার এত ভালোবাসার মা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আর গোটা দলটা তাকে ঘিরে কিচির-মিচির করছে।

তাই দেখে টারজানের বুকে শোকের ঝড় উঠল। তার উপর সে কি উন্মত্ত রাগ! বারবার বিকট গর্জন করে সে রাগ জানান দিল। তারপর বুক চাপড়ে কেঁদে উঠে, মায়ের বুকে আছড়ে পড়ল। জীবনে তার ভালোবাসার মানুষ ঐ একটিই ছিল। তাকে হারানো ওর পক্ষে কি সর্বনাশের কথা তা ভাবা যায় না। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে গুমরে গুমরে শোক করতে লাগল সে, বনমানুষরা যেমন করে।

অন্য দর্শকদের চোখে কালাকে একটা বিকটাকার হিংস্র বনমানুষ মনে হতে পারে, কিন্তু টারজানের কাছে সে ছিল স্নেহ-মমতার প্রতিমূর্তি এবং পরমাসুন্দরী! আর কোনো মায়ের কথা সে ভাবতেও পারত না।

শোকের প্রথম আবেগ সামলে নিয়ে, দলের অন্যদের কাছে সে সব কথা শুনল। তারপর বৃথা সময় নষ্ট না করে, একটা বড় গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ে, তার অব্যর্থ অনুসন্ধানী শক্তির সাহায্যে কুলঙ্গা যে-পথে গিয়েছিল, সেই পথ ধরল। বোঝা গেল সে হাতি যাবার ঢাকা পথ ধরেই গিয়েছিল।

কারো সাধ্য ছিল না টারজানের নজর এড়িয়ে পালায়। খুদে এক নদীর ধারে পায়ের ছাপ দেখে টারজান বুঝল যার পিছু নিয়েছে সে একটা MAN। তবে কি ওর-ই স্বজাতি? ছাপ থেকে বুঝতে দেরি হলো না, সে এখান দিয়ে সদ্য সদ্য গেছে। টারজান আবার গাছ নিল।

মাইলখানেক পার হতেই চমকে দেখে একটুখানি খোলা জায়গা। সেইখানে কালো MAN তীর ধনুক নিয়ে হর্টা বলে বুনো শুওরের মুখোমুখি হয়েছে। ভারি কৌতূহল হচ্ছিল তাকে দেখে। এ যে একটা NEGRO, এর ছবি আছে বইতে। কিন্তু এ নড়ে-চড়ে। এ শুধু NEGRO নয়, এ একটা ARCHER। কি আশ্চর্য, এর ছবিও দেখেছে টারজান। উৎসাহের চোটে আরেকটু হলেই নিজের উপস্থিতির মালুম দিয়ে ফেলছিল সে। ভাগ্যিস, সময় মতো সামলে নিল।

এদিকে হর্টা ARCHER এর দিকে তেড়ে যেতেই সে টং করে তীর ছেড়ে দিল। তীরটা হর্টার গলায় লাগল। তখুনি আরেকটা তীরও পরিয়ে নিয়েছিল সে। ততক্ষণে হর্টা ওর বড় কাছে এসে পৌঁছে গিয়েছিল, তাই সে তীরটা ছুঁড়েই গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। এদিকে হর্টাও মাটিতে ঘুরে পড়ল। লোকটা অমনি নেমে এসে ওর গা থেকে কয়েকটা বড় বড় রসালো মাংসের টুকরো কেটে নিল। তারপর পথের মধ্যিখানেই ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বেলে কয়েক টুকরো ঝলসে খেয়ে নিল। বাকিটা সেখানেই পড়ে রইল। কুলঙ্গা আবার পথ ধরে, দেখতে দেখতে মোড় ঘুরে চোখের বাইরে চলে গেল।

টারজানও গাছ থেকে নেমে এলো। দারুণ কৌতূহলসহ সমস্ত ব্যাপারটা সে দেখছিল। মায়ের হত্যাকারীকে মেরে ফেলার সঙ্কল্প তার টলেনি। তবে সেটা কিছু পরে করলেও ক্ষতি নেই। এবার টারজান শূওরের গা থেকে বড় বড় লম্বা লম্বা অনেকগুলো টুকরো কেটে নিল।

কিন্তু সেগুলো রাঁধবার চেষ্টা করল না। কাঁচা খাওয়াই ওদের নিয়ম। আগুন আরো দেখেছে টারজান। ঝড়ের সময় 'আরা'কে কত সময়ে চোখ ঝলসে, কানে তালা লাগিয়ে আকাশ থেকে নেমে বনের গাছে আগুন ধরাতে দেখেছে। কিন্তু কোনো বনবাসীকে কখনো ও-কাজ করতে দেখেনি। ভালো ভালো কাঁচা মাংস পুড়িয়ে নষ্ট করা কেন? এই ARCHER হয়তো আরা'র বন্ধু-টন্ধু হবে। আপাততঃ কোত্থেকে এসেছিল, কোথায় গেল, সেটা দেখা দরকার। তারপর মারা যাবে।

সারা দিন তার পেছনে ঘুরল টারজান। ঐ তীর দিয়ে তাকে একবার ডাঙ্গো হায়নাকে, একবার মানু বাঁদরকে এক নিমেষে মেরে ফেলতে দেখল। মনে মনে বুঝল শুধু তীরের খোঁচায় এ হতে পারে না। এর মধ্যে আরো কিছু রহস্য আছে। সেটাও দেখতে হবে।

সে রাতে কুলঙ্গা গাঁয়ে ফিরতে পারল না। একটা বড় গাছের ডালের ফ্যাকড়ায় শুয়ে ঘুমোল। ঐ গাছেরই একটা উঁচু ডালে টারজান গুঁড়ি মেরে বসল। ঘুম থেকে উঠে কুলঙ্গা দেখে ইতিমধ্যে ওর তীর-ধনুক অস্ত্রশস্ত্র অদৃশ্য হয়ে গেছে!! খুব রাগ হলো। ওপরে নিচে খোঁজাখুঁজি করেও যখন কিছু পেল না, তখন বেজায় ভয়ও হলো। সঙ্গে একটা ছোরা ছাড়া কোনো অস্ত্র নেই। যত তাড়াতাড়ি গাঁয়ে পৌঁছনো যায় ততই ভালো। গ্রাম খুব দূরেও নয়, সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কুলঙ্গা দৌড়তে আরম্ভ করল।

এ দিকে তীর ধনুক লুকিয়ে রেখে, দড়ির ফাঁস আর ছোরা নিয়ে, নিচু নিচু ডাল ধরে টারজানও সঙ্গে চলেছিল। হঠাৎ বন শেষ হয়ে, দুশো গজ খোলা জমি দেখা দিল। তার এক মাথায় বেশ কিছু অদ্ভুত বাসা।

যা করবার এখনি করতে হয়। যেই না কুলঙ্গা বনের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়েছে, এম্বঙ্গার কুঁড়ের একেবারে সামনেই, ঠিক তখনি বনের শেষ বড় গাছের ওপর থেকে একটা দড়ির ফাঁস সাপের মতো এঁকেবেঁকে কুলঙ্গার গলায় এঁটে বসল। এমনি এঁটে ধরল যে কুলঙ্গা এতটুকু শব্দ করতে পারল না। শূন্যে ঝুলে রইল তার শরীরটা। দড়ির অন্য মাথা গাছে শক্ত করে বাঁধা। তারপর ওপরের ডাল থেকে নেমে এসে, তার হৃৎপিণ্ডে ছোরা বসিয়ে টারজান মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল।

মৃতদেহটাকে ভালো করে পরীক্ষা করল টারজান। এমন সে আর কখনো দেখেনি। খাপে-ভরা ছোরাটা নিয়ে নিল। মাথার পালক-বসানো টুপিটা, পায়ের তামার বেড়িও নিল। বেশ জিনিসগুলো। তারপর শরীরটাকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায় কি না ভাবতে বসল। বনমানুষরা স্বজাতিদের মাংস খায় না। এ MAN-টা তো আর ওদের স্বজাতি নয়।

কিন্তু—কিন্তু—ওদের স্বজাতি না হলেও, টারজানের স্বজাতি নয় কি? ARCHER-ও তো MAN। না, ওকে খাওয়া যায় না। হতে পারে কালো, তবু ও MAN।

ওকে কখনোই খাওয়া যায় না। ওর গলার ফাঁস খুলে, শরীরটা গাছতলায় নামিয়ে রেখে, টারজান আবার গাছের মগডালে চড়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

বন এসে এক জায়গায় গ্রামের সীমানা ছুঁয়েছে। সেইখানে গেল টারজান, স্বজাতিদের ভালো করে দেখতে হবে ; কি রকম হালচাল তাদের, কি রকম বাসায় থাকে, তা জানতে বড় কৌতূহল। বনের হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে আজন্ম কাটিয়ে স্বজাতিদের শত্রু ছাড়া কিছু ভাবতে পারছিল না সে। ওকে ওরা দেখতে পেলে কি রকম অভ্যর্থনা পাবে তা বুঝতে ওর বাকি ছিল না। নিজেদের দলের বাইরে সবাই শত্রু—এক তান্তর হাতি বাদে—একথা জানতে তার বাকি ছিল না। বনের জানোয়ারদের খেলাধুলো বলতেই প্রাণী হত্যা। ওতে কারো কিছু এসে যেত না। নিজে বাঁচলেই হলো। ও নিজেও হাসিমুখে প্রাণী হত্যা করত, হিংসার কারণে নয়, সাধারণতঃ আহার সংগ্রহের জন্য। কিন্তু আত্মরক্ষার বা প্রতিশোধ নেবার জন্য অন্য প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে একমাত্র মানুষই আনন্দ পায়। জানোয়াররা নিষ্কাম।

সীমানায় একটা বিশাল বনস্পতি, ডাল পালা, ঘন লতা-পাতা নিয়ে গাঁয়ের ওপর একরকম ঝুঁকে পড়েছিল। তারই নিরাপদ আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে, গ্রামের অন্তরঙ্গ জীবন পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। ন্যাংটো ছেলেপুলেরা পথে খেলা করছে। মেয়েরা শুকনো কলা গুঁড়ো করে, পিঠের মতো করে গড়ে রাখছে। খেতে মেয়েরা মাটি কোপাচ্ছে, নিড়োচ্ছে, ফসল তুলছে। কোমরে তাদের ঘাসের ঘাগ্‌রা, গায়ে পেতলের আর তামার গয়না পরা। দূরে কয়েকজন যোদ্ধা গাঁ পাহারা দিচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয়, শুধু মেয়েরাই খাটছে, পুরুষরা গাছতলায় শুয়ে আরাম করছে। টারজান নিজে যে গাছে বসেছিল, তারই তলায় একটা ছোট উনুনে একটা হাঁড়ি চাপানো। হাঁড়িতে লালচে আঠা-আঠা কি যেন বুড়-বুড় করে ফুটছে।

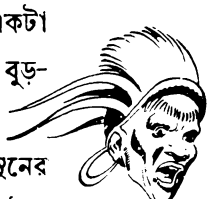

এক পাশে এক গোছা তীর পড়ে আছে আর উনুনের পাশে বসা এক বুড়ি একটা করে তীর তুলছে, লাল আঠায় ডুবোচ্ছে, আবার সারি সারি রোদে শুকোতে দিচ্ছে। এই হলো তাহলে ঐ সাংঘাতিক তীরের রহস্যের উত্তর। আরো ক'টা তীর হাতাতে পারলে বেশ হতো। বুড়ি একবার উঠে গেলেই এক নিমেষের মধ্যে নেমে এসে তীরের গোছা তুলে নিয়ে টারজান হাওয়া হয়ে যেতে পারত।

এমন সময় হল্লা শুনে বোঝা গেল কালার হত্যাকারীর মৃতদেহ পাহারাদারদের কেউ দেখতে পেয়েছে। অমনি হৈ-চৈ লেগে গেল। দেখতে দেখতে গাঁ খালি হয়ে গেল। টারজানও টুপ করে নেমে এলো।

সামনের কুঁড়েঘরের দরজা খোলা দেখে কিছুতেই সে কৌতূহল চাপতে পারল না। আধা-অন্ধকারে নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকল। দেয়ালে কত রকম অস্ত্রশস্ত্র ঝুলছে, সরু লম্বা ঢালও আছে। ঘরের মধ্যিখানে একটা হাঁড়ি। এককোণে একগোছা ঘাসের মাদুর। মেঝেতে কয়েকটা মড়ার খুলি পড়ে আছে।

লম্বা বর্শা একটা নেবার ইচ্ছা থাকলেও, এ যাত্রা হবে না, কারণ তীরগুলো নিতেই হবে। বড় রসিক টারজান। অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে ঘরের মধ্যিখানে ঢিপি করে, তার ওপর হাঁড়িটা উল্টে বসাল। তার ওপর খুলিগুলো চূড়ো করে সাজিয়ে, হঠাৎ খেয়াল হলো গ্রামবাসীরা ফিরছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বাইরে। তারপর উঠোন পেরিয়ে হাঁড়ির পাশে যে তীরগুলো শুকোচ্ছিল, এক বগলে তার যতগুলো ধরে তুলে নিয়ে, লাথি মেরে বিষের হাঁড়ি উল্টে, এক লাফে গাছের ডালপালার নিরাপত্তায়।

যদিও বিপদের এতটুকু চিহ্ন দেখলেই পালাবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল, তবুও এর পর কি হয় না দেখে যায়ই বা কি করে?

চারজন কুলঙ্গার মৃতদেহ বয়ে আনছিল। তাদের পেছনে এক পাল মেয়ে চিৎকার করতে করতে আসছিল। সবার আগে জনাছয়েক গাছতলার কুঁড়েঘরে একবার পা দিয়েই বিকট চিৎকার করে আবার ছুটে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে হাত-পা নেড়ে উত্তেজিতভাবে অন্যদের কাছে বোধ হয় রিপোর্ট দিল। আরো ছয়-সাতজন ঘরে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। সবার শেষে হাতে পায়ে এক রাশি তামা পেতলের গয়না পরা এক বুড়ো এলো। তার গলায় ঝুলছিল মরা মানুষের শুকনো হাড়ের মালা।

এ লোকটা হলো কুলঙ্গার বাবা এম্‌বঙ্গা। কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ। তারপর এম্‌বঙ্গা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, তার বিকট মুখে রাগ, দুঃখ আর ভয়ের ছাপ। বেরিয়েই যোদ্ধাদের কি যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে তারাও ছুটল, ঘরে ঘরে কাকে যেন খুঁজতে লাগল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিষের হাঁড়ি উল্টনোর আর তীর চুরি যাবার দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কোথাও নেই, কিচ্ছু নেই। ভয়ে আধমরা হয়ে, গাঁয়ের লোকেরা মোড়লকে ঘিরে

ধরল। বেড়ার বাইরে গাছতলায় কুলঙ্গার মৃতদেহ পাওয়াটাই যথেষ্ট ভয়াবহ। তার ওপর ঘরের মধ্যে এ সব কাণ্ডকে ভৌতিক ছাড়া কি বলবে? এখানে-ওখানে ছোট ছোট দল নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছিল আর ভয়ে ভয়ে পেছন দিকে তাকাচ্ছিল।

সমস্ত ব্যাপারটাই টারজান বুঝে উঠতে পারছিল না। ভয় কাকে বলে ও জানত না। কুসংস্কার বলে কোনো জিনিস থাকতে পারে, ওর ধারণাই ছিল না।

এদিকে বেলা বেড়েছে, খাওয়া-দাওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত ঐ রকম অদৃশ্য ভাবেই গেছোপথে টারজান বিদায় নিল।

আস্তানায় যখন ফিরল তখনো অন্ধকার নামেনি। পথে দু'বার থামতে হলো। একবার কাল থেকে লুকিয়ে রাখা হটার রসালো মাংস খুঁজে বের করে, পেট ভরে খাওয়া হলো। এক বার গাছে ঝোলানো কুলঙ্গার অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করতে হলো। তারপর ঐ সব মূল্যবান জিনিসসহ টারজান যখন গাছ থেকে ঝুপ করে দলের মধ্যিখানে নামল, সবাই তো হাঁ! নাটকীয় ভঙ্গীতে সদর্পে টারজান তার বীরত্বের কাহিনী বলল।

কেরচাক মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। হিংসায় তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। টারজান হয়ে উঠেছিল তার দু'চক্ষের বিষ! মনে মনে সে প্রতিশোধের নানা উপায়ের কথা ভাবছিল। এদিকে টারজান তীর ছোঁড়া অভ্যাস করতে শুরু করল। গোড়ায় সব লক্ষ্য বিফল হতো। কিন্তু এক মাসের মধ্যে সে পাকা তীরন্দাজ হয়ে উঠল। এদিকে তীরের পুঁজিও শেষ।

উপসাগরের কাছাকাছি বনভূমিতে প্রচুর খাবার জিনিস পাওয়া যেত। কাজেই দলটা ওর-ই আশেপাশে ঘুরত আর টারজান ঘরে ঢুকে তার অচেনা বাপের ছোট বইয়ের সংগ্রহটিকে প্রায় শেষ করে এনেছিল। এমন সময় একটা আলমারির পিছন দিক হাতড়ে সে একটা ছোট পেতলের বাক্স খুঁজে পেল। তার গায়ে চাবিটা লাগানোই ছিল। একটু চেষ্টা করতেই বাক্সটা খুলে গেল। ভেতরে একটা সোনার চেনে হীরে বসানো একটা লকেট, কয়েকটা চিঠি, ছোট একটা নোটবই আর একটা ফটো। সেটি টারজানের বড় ভালো লাগল। হাসি ভরা চোখ, সরল মুখের ভাব! আসলে ওটি ওর বাবার ফটো।

চেনটা তখনি সে গলায় পরে নিল। ওর বলিষ্ঠ বুকের ওপর তার জেল্লা আরো খুলল।

তারপর নোটবইটা নিয়ে বসল। টানা হাতের লেখা পড়তে একটু কষ্ট হলেও, একটু চেষ্টা করতেই অক্ষরগুলো চিনতে পারল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক বর্ণ মানে বুঝতে পারল না। তার কারণ ডায়েরীটা ফরাসি ভাষায় লেখা। ছবিওয়ালা অভিধানটাও কোনো কাজে এলো না। চেনটা গলায় রইল, অন্য জিনিস বাক্সে ভরে, বাক্সটা আবার আলমারির তাকের পেছন দিকে গুঁজে রেখে দিল। পরে এর রহস্য ভেদ করতেও শিখতে হবে।

আপাততঃ আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। কালোদের গাঁয়ে গিয়ে আরেক গোছা তীর আনতে হবে। পরদিন ভোরে রওনা হয়ে, দুপুরের আগেই সেখানে পৌঁছে গেল। সেই গাছতলায় সেই বুড়ির হাঁড়ি ফুটছে, তাতে তীর ডুবিয়ে শুকোতে দেওয়াও হচ্ছে। কিন্তু চারদিকে লোকজন, একটু ফাঁকা না পেলে তীর নেয় কি করে?

বেলা বাড়তে লাগল, মেয়েরা খেত থেকে, শিকারীরা বন থেকে ঘরে এলো। বেড়ার ফটক বন্ধ হলো, ঘরের বাইরে উনুন ধরল, হাঁড়ি বসল, রান্না চড়ল। শুকনো কলার পিঠে আর কাসাভার মণ্ড ভাঁড়ার থেকে বেরোল। হঠাৎ বেড়ার বাইরে কোলাহল। কি ব্যাপার? না, তারা একটা মানুষ ধরে এনেছে। ধরে বেঁধে এনেছে, সে বেচারা প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ছে।

গ্রামময় একটা আনন্দের রোল পড়ে গেল। গ্রামের মধ্যিখানে মস্ত এক খুঁটিতে হতভাগ্যকে বাঁধা হলো। তাকে ঘিরে সে কি তাণ্ডব নৃত্য। মাঝে মাঝে বর্শা দিয়ে খোঁচাও দেওয়া হচ্ছিল। মানুষদের নিষ্ঠুরতা দেখে টারজান হতভম্ব! হিংস্র জানোয়াররাও অন্য জানোয়ার কিম্বা হয়তো মানুষ খায়, কিন্তু এ ভাবে কষ্ট দেয় না। সবচেয়ে খারাপ লাগল যে মেয়েদের আর ছেলেপুলেদেরও ফুর্তি দেখে কে!

এই হলো সুযোগ! সকলের চোখ ঐ বেচারার ওপর। এদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। টুপ করে টারজান ডাল থেকে নেমে সব ক'টি তীর গোছা করে তুলে নিয়ে এক সঙ্গে বেঁধে, গাছের গোড়ায় রেখে, আরেকবার কুলঙ্গার ঘরে ঢুকে একটা মড়ার খুলি তুলে নিল। ঠিক সেই সময় একটা মেয়ে ঘরে ঢুকে ইদিক-উদিক খুঁজে একটা হাঁড়ি নিয়ে আবার বেরিয়ে গেল। টারজান দেয়াল ঘেঁষে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল, সে টের-ও পেল না।

তারপর তীরের গোছা নিয়ে আবার গাছের ওপর।

যাবার আগে মড়ার খুলিটা ছুঁড়ে দিল খুঁটির কাছে একটা লোকের মাথা লক্ষ্য করে। সে অমনি ধরাশায়ী হলো আর টারজান নিঃশব্দে তীরসহ বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। এদিকে ঐ নরখাদকদের দল আকাশ থেকে পড়া মড়ার খুলির দিকে তাকিয়ে ভয়ে আধমরা। তাদের পেছনে যে কোনো অপদেবতা লেগেছে, সে বিষয়ে তাদেব কোনো সন্দেহ রইল না।

এদিকে আস্তানায় ফেরার পথে আরেক ব্যাপার! শাবরের সঙ্গে বোঝাপড়া। এই সুযোগের জন্যই টারজান এতকাল অপেক্ষা করছিল। আজ হাতে শুধু দড়ির ফাঁস নয়, অনেক বেশি মারাত্মক অস্ত্রও ছিল। খুব বেশি সময়ও ছিল না। মাটিতে নেমে খাবার খুঁজছিল টারজান। শাবরকে দেখেও গাছ না নিয়ে, তার সম্মুখীন হলো।

সঙ্গে সঙ্গে শাবরও আক্রমণ করল আর অমনি পর পর তিনটে বিষাক্ত তীর গিয়ে তার পায়ে বিঁধল। শাবরের তেজের তুলনা হয় না। তীর খেয়েও টারজানের ওপর ঝাঁপ দিয়েছিল। তবে ঐ তার শেষ ঝাঁপ। গায়ের ওপর থেকে বিশাল ভারি মৃতদেহটা ঠেলে ফেলে দিয়ে, তার ঘাড়ে পা রেখে টারজান নরবানরদের বিকট জয়ধ্বনি দিয়েছিল।

শাববের মাংসটা খেতে কিছু ভালো লাগল না। ছিবড়ে মতো, বোঁট্‌কা গন্ধ। তবে খিদের সময় অত বাছবিচার করলে চলে না। খাওয়া হলে, ক্ষিপ্র হাতে ধারালো ছুরির সাহায্যে, শাবরের ছালটা ছাড়িয়ে নিল টারজান। এই ছিল তার বহু বছরের স্বপ্ন। শাবরের সুন্দর চামড়া দিয়ে গা ঢাকতে হবে। তারপব উঁচু গাছে চড়ে, একটা বড় ফ্যাকড়ার মধ্যে গুটিশুটি শুয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটাল। ঘুম ভাঙল পরদিন সূর্য যখন মাঝ গগনে। উঠেই আবার খিদে পেতে লাগল। শাবরের দেহাবশেষ শেয়ালে হায়নাতে রাতারাতি শেষ করেছিল। টারজান একটা হরিণ মেরে খানিকটা মাংস খেল।

তারপর দলের কাছে ফিরে গেল। তাদের কাছে শাবরের চামড়া দেখিয়ে জাঁক করে বলতে লাগল 'এই দেখ! তোমাদের জাতের কেউ কখনো শাবর মেরেছে? টারজানের মতো কে আছে তোমাদের দলে? টারজান তো আর বন-মানুষ নয়। সে হলো—' এর বেশি কি বলা যায়? দলের কেউ কখনো মানুষ দেখেনি। MAN বললেও কেউ বুঝবে না। তাছাড়া বলবেই বা কি করে? পড়তে পারে, লিখতেও পারে, কিন্তু উচ্চারণ করতে তো আর জানে না। চুপ করতে হলো।

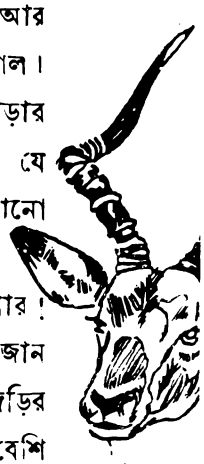

এদিকে কেরচাক সমস্ত ব্যাপার দেখে শুনে রাগে হিংসায় ফেটে পড়ছিল। হঠাৎ যেন মগজের মধ্যে কিসের একটা বিস্ফোরণ ঘটল। বিকট হুংকার দিয়ে কেরচাক তার দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আঁচড়ে কামড়ে, থাবড়া মেরে, কতজনকে যে জখম করল তার ঠিক নেই। কয়েক বেচারা প্রাণও হারাল। বাকিরা সরু মগডালে পালিয়ে বাঁচল।

কেরচাকের অবস্থা তখন উন্মাদের মতো। মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, চিৎকার করছে, গর্জন করছে। চারদিকে তাকিয়ে, চোখ দুটো তার সমস্ত রাগ-বিদ্বেষের পাত্র টার-জানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাছেই একটা ডালের ওপর টারজান বসে ছিল। তাকে দেখতে পেয়েই কেরচাক গর্জে উঠল, 'নেমে আয়, মস্ত বড় যোদ্ধা। নেমে এসে তোর চেয়েও বড় যোদ্ধার দাঁতের ধার দেখে নে! বিপদ দেখলেই বীররা আবার গাছের ডালে উঠে পড়ে নাকি?'

ঝুপ করে, টারজান নেমে এলো। দলের সকলে নিশ্বাস বন্ধ করে গাছ থেকেই দেখতে লাগল। টারজানকে দেখেই কেরচাক তেড়ে গেল। তার ঐ প্রায় সাত ফুট উঁচু বিশাল বপুর তুলনায় টারজানকে একটা ছোট ছেলের মতো মনে হতে লাগল। কেরচাকের ঘাড়ের পেশীগুলো ফুলে এতটা উঁচু হয়ে ছিল। মুণ্ডুটাকে ছোট্ট দেখাচ্ছিল। শরীরের তুলনায় পা দুটো বেঁটে। টারজানও ছয় ফুট মাথায়, তার চমৎকার সুগঠিত শরীরের পেশীগুলোও কম যায় না। তীর ধনুক সঙ্গে ছিল না। ছিল খালি তার বাপের সেই ধারালো ছোরা। শুধু সেই ছোরা আর নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নিয়ে টারজান শত্রুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত।

বিকট গর্জন করে কেরচাক যেই তেড়ে এলো, টারজান খাপ থেকে ছোরা বের করে তৈরি। টারজানের গর্জনও

কেরচাকের চেয়ে কিছু কম বীভৎস নয়। শুনলেও হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। গর্জন করে টারজানও তেড়ে গেল আর কেরচাকের প্রসারিত দুটো লম্বা হাত ওকে বন্দী করে ফেলার আগেই, তার হৃৎপিণ্ডের একটু নিচে ছোরাটা আমূল বসিয়ে দিল। কিন্তু সেটা টেনে বের করে আনবার আগেই কেরচাকের বিকট বাহুর ঝাপটা লেগে সেটা হাত থেকে ফস্কে গেল, কেরচাকের গায়েই বিঁধে রইল।

কেরচাক টারজানের মাথা লক্ষ্য করে ভয়ংকর এক চাপড় দেবার চেষ্টা করল। লাগলে মুণ্ডু গুঁড়িয়ে যেত। টারজান সুড করে বেরিয়ে গিয়ে কেরচাকের পেটে এক ভীম ঘুঁষি কষিয়ে দিল। ছোরা খেয়ে কেরচাকের শক্তি কমে এসেছিল। এবার তারা পরস্পরকে জাপ্টে ধরল। কেরচাকের চেষ্টা টারজানের গলায় দাঁত বসায়। টারজানের লক্ষ্য কেরচাকের গলা টিপে দম বন্ধ করে দেওয়া।

কে জানে, হয়তো শেষ পর্যন্ত কেরচাকের প্রচণ্ড বল-ই জয়ী হতো, ঠিক তখনি তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল, তারপর কেমন আড়ষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। বুকে ছোরা নিয়ে কত লড়বে? এমনি করে দুরন্ত কেরচাক মরে গেল। তার মৃতদেহ থেকে ছোরাটা টেনে বের করে আনল টারজান। এই ছোরার জন্যেই কতবার ওর চেয়ে কত শক্তিশালী শত্রুকে পরাস্ত করতে পেরেছিল সে।

তারপর মরা কেরচাকের গলায় পা রেখে টারজান তার জয়ধ্বনি দিল। চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি উঠল। এইভাবে সে বনমানুষদের দলপতি হয়েছিল।

নতুন দলপতির তত্ত্বাবধানে বনমানুষরা প্রায় সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। কেরচাকের মতো নিষ্ঠুর ছিল না টারজান। দলপতির প্রধান দু'টি কাজ হলো বিপদের মুখে দলকে রক্ষা করা আর খিদের মুখে শিকার করে, তাদের জন্য তাজা মাংস জোগাড় করা। এই দুটি কর্তব্যেই টারজান ছিল দক্ষ। বেশির ভাগ খুশি থাকলেও, একজন কিন্তু তাকে বিষ নজরে দেখত। সে হলো টুবলাটের ছেলে টেরকজ্। গায়ের জোরে সে কিছু কম যেত না। প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ শরীর তার; সাহসও কম ছিল না। ছিল না শুধু ছোরা আর তীর ধনুক আর সেগুলি ব্যবহারের দক্ষতা। তাই খোলাখুলি কিছু করতে সাহস পেতো না। মাঝে মাঝে ছোটখাটো আদেশ অমান্য করা, ব্যবহারে একটু বেয়াড়াপনা—ঐ পর্যন্ত।

দলকে টারজান কিছু সৎ শিক্ষাও দিত। বলতো, কালো মানুষদের খেত থেকে সুবিধে পেলে শস্য নিয়ে খেও কিন্তু মাঠকে মাঠ উজাড় করে দিও না। তাহলে তারাও শস্য বোনা বন্ধ করে দেবে। নিজে রাতে গিয়ে গাঁ থেকে তীর নিয়ে আসত। অপদেবতা পেছনে লেগেছে ভেবে গাঁয়ের লোকের বড় ভয়। তাকে তুষ্ট করার আশায় বেড়ার পাশের বড় গাছটার গোড়ায় ওরা হাঁড়ি করে খাবার রেখে দিত। টারজান পরখ করে নিয়ে, সেগুলো আজকাল খেয়ে ফেলত।

তাই দেখে গাঁয়ের লোকদের কি ভয়! এতকাল খাবার পড়ে থাকত। ওরা ভাবত সে হয়তো চলে গেছে। আবার তীরও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে! খাবারগুলো কে খেয়ে যাচ্ছে? ওরা তৈরি তীর ঘরে নিয়ে মাথার কাছে রেখে শুতে লাগল। গভীর রাতে নিঃশব্দে এসে, টারজান তাও সরাতে লাগল। বুড়ো এম্‌বঙ্গাও ঘাবড়ে গিয়ে, এ জায়গা ছেড়ে, বনের মধ্যে অন্য কোনো সুবিধার জায়গা দেখে নিয়ে নতুন বসতি করার কথা ভাবতে শুরু করেছিল।

শিকার করতে যাবার সময়ে কালো যোদ্ধারা আরো দক্ষিণ দিকের বনে যেতে আরম্ভ করল, যদি কোনো সুবিধামতো জায়গা চোখে পড়ে। এর ফলে বনমানুষদের বিচরণভূমির নির্জন নিরাপত্তার ব্যাঘাত হতে লাগল। অন্য জানোয়ারদের সঙ্গে মানুষদের ঐ তফাৎ। হিংস্র জানোয়াররা খাবারের খোঁজে নানা জায়গায় দিনে রাতে হানা দিলেই, ছোট জানোয়াররা তাদের নাগালের বাইরে পালিয়ে যেত। তারা চলে গেলে, আবার যে যার জায়গায় ফিরে আসত। মানুষের বেলা আলাদা। তারা যেখানে যায়, পশুপাখি কারো নিরাপত্তা থাকে না। তারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

উপসাগরের কাছের বনে টারজানের দল অনেক দিন থেকে গিয়েছিল। ওরা বুঝেছিল ঐ বাসাটা ছেড়ে যেতে টারজানের মন চায় না। তারপর টারজানই তাদের নিয়ে নতুন বিচরণক্ষেত্রের খোঁজে চলে যেতে বাধ্য হলো, কারণ ঐ কালো মানুষ মিষ্টি জলের ঝরনার কাছে গাছ কাটতে শুরু করেছিল। মাসে দু'একবার টারজান এসে বই নিয়ে সারাদিন কাটাত আর গাঁ থেকে আরো কিছু তীর সংগ্রহ করে নিয়ে যেত।

এত দিন পর্যন্ত কালো মানুষেরা বাসাটার সন্ধান পায়নি। পেলেই হয়তো সব তচনচ করবে। দিনে দিনে

টারজানের মন বনমানুষদের জীবন থেকে সরে যেতে লাগল। সে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগল। পালের গোদারা এই নিয়ে অভিযোগও করেছিল। ছোট ছোট খিটিমিটি অশান্তি লেগেই ছিল। দুপুরে হয়তো থাকা এসে নালিশ করল বুড়ো মুঙ্গো ওর নতুন বৌকে চুরি করে নিয়ে গেছে। টারজান সভা ডেকে রায় দিল বৌ যদি মুঙ্গোর কাছেই থাকতে চায়, তাহলে তার বদলে মুঙ্গো যেন থাকাকে নিজের একটা মেয়ে দান করে।

কিম্বা হয়তো রক্তাক্ত দেহে তানা নালিশ করল, ওর স্বামী গুণ্টো ওকে কামড়ে দিয়েছে। গুণ্টো বলল, 'বৌ কোনো কাজ করে না, পোকা-মাকড় খুঁজে আনে না, পিঠ চুলকে দেয় না, মারব না তো কি করব?' বিচার হলো টানাকে তার ন্যায্য কাজকর্ম করতে হবে আর গুণ্টো ওকে ফের কামড়ালে সাংঘাতিক তীর খাবে।

কিন্তু টারজানের এ-সব কাজ ভালো লাগত না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বনমানুষদের জীবন থেকে মনে মনে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। বই পড়ে ওর মনশ্চক্ষে একটা নতুন জগৎ খুলে গিয়েছিল। পুরানো বন্ধুরাও এত দিনে পূর্ণ বয়স্ক বনমানুষ হয়ে উঠেছে। ভারিক্কে, গুরুগম্ভীর, ফুর্তি নেই। তাদের সঙ্গে মেশা যায় না। কালা বেঁচে থাকলে, তার ভালোবাসার জন্যে টারজান সব ছাড়তে পারত। সে-ও নেই। আছে খালি একটা বাধা, নইলে আজই সে বনমানুষদের পালের গোদার পদে, নিজের চেয়ে যোগ্যতর একজনকে বসিয়ে অন্য রকম জীবনের চেষ্টা করত। সে বাধাটা হলো ঐ যোগ্যতর ব্যক্তিটি নিজে। কারণ সে হলো টেরকজ। দেহের বলিষ্ঠতায়, বাহুবলে, সাহসে তার মতো এ-দলে আর কেউ নেই।

কিন্তু ব্যাটা ভারি বেয়াড়া। এমনি এমনি পদ ছেড়ে চলে গেলে সে বলবে তারই ভয়ে টারজান পালিয়েছে। তা হয় না। ওকে আচ্ছা করে উচিত শিক্ষা দিয়ে, তবে বীরদর্পে চলে যেতে হবে। ছোরা বা তীর ধনুকের সাহায্য নেওয়াও চলবে না। সমানে সমানে লড়তে হবে, খালি হাতে। কিন্তু খালি হাতে লড়লেও টেরকজের মতো বিকট লম্বা দাঁত কোথায় পাবে টারজান? নাঃ, একটু ভেবে দেখতে হবে। দাঁতের বিরুদ্ধে ছোরা চলতে পারে।

কাজের বেলায় ভেবে দেখার খুব বেশি সময় পায়নি টারজান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। এক দিন সকালে সবাই চরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় স্ত্রীকণ্ঠে আর্তনাদ শোনা গেল। হুদ্দাড় করে সকলে ছুটে গিয়ে দেখে টেরকজ এক বেচারি বুড়ির চুলের মুঠি ধরে তাকে বেদম পেটাচ্ছে। অন্যের স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা ওদের কাছে বে-আইনী। সেটা টেরকজ ভাল করেই জানত। বুড়ির স্বামী অসমর্থ বুড়ো। সে কিছুই করতে পারছিল না।

টারজান ডেকে টেরকজকে সাবধান করে দিল। আড়-চোখে চেয়ে সে ব্যাটা টারজানের হাতে তীরধনুক নেই দেখে, তার কথায় কান দিল না। অমনি টারজানও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লড়াইটা হলো সমানে সমানে। দেহের বিশালতায়, বাহুবলে টেরকজকেই শ্রেষ্ঠ বলতে হয়। কিন্তু টারজানের বুদ্ধি আর কৌশল তার মতো মূর্খ জানোয়ার পাবে কোথায়?

টারজান আর টেরকজ ততক্ষণে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে লড়ছে। টেরকজের গায়ে যত ছোরার দাগ, টারজানের গায়ে ততই দাঁতের কামড়। শুধু গায়ের জোরের কথা হলে টারজান হেরে যেত। কিন্তু সঙ্গে ছিল বুদ্ধির খেলা। গাছের নিরাপদ আশ্রয় থেকে অন্য বনমানুষরা দেখছিল সেই মরণপণ খেলা।

টারজান ভেবেছিল, একবার পেছন দিক থেকে টেরকজকে জাপ্টে ধরতে পারলে, ছোরার আঘাতে তাকে শেষ করা যায়। কিন্তু কাজটা তত সহজ ছিল না। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে এক সময়ে ছোরাটাও হাত থেকে ছিটকে খানিক দূরে পড়ে গেল। নিরস্ত্র টারজান এতটুকু পেছপাও হলো না। টেরকজের পেছন দিক থেকে কাঁধের ওপর দিয়ে, বগলের তলা দিয়ে ঘুরে, তার ঘাড়ে পৌঁছল টারজানের একটা হাত। পাকা কুস্তিগীররা যাকে বলে হাফ-নেলসন। তারপর টেরকজের হাজার ছটফটানি সত্ত্বেও একটু পরেই, টারজানের অন্য হাতটাও টেরকজের অন্য বগলের তলা দিয়ে, আগের হাতের সঙ্গে মিলল। হলো ফুল-নেলসন। এবার জোরে চাপ দিলেই টেরকজের ঘাড় মটকে যেত।

কিন্তু টারজানের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। টেরকজের কানের কাছে সে বলল, 'কা—গোদা?' অর্থাৎ হার মানছ? টেরকজ চুপ। আর একটু চাপ দিতেই যন্ত্রণায় কাতরে উঠল টেরকজ। টারজান আবার বলল, 'কা—গোদা?'

টেরকজ বলল, 'কা—গোদা!'

তখন টারজান বলল, 'মনে থাকে যেন সকলের সামনে তুমি হার মেনেছ। আর কখনো দলপতির সঙ্গে ঝগড়া

করবে না, বুঝলে ?

টেরকজ বলল, 'হুঁ।'

তখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে, টারজান তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'করলে তোমাকে মেরে ফেলব।'

সে দিন বিকেলে সকলে এক জায়গায় জড়ো হলে, টারজান বলল, 'সকলেই দেখলে তো দলের মধ্যে টারজান সবচেয়ে বড়।'

তারা বলল, 'দেখলাম।' কিন্তু পরাজিত শত্রুকে কেন সে ছেড়ে দিল সেটা তারা বুঝতে পারল না।

টারজান আরো বলল, 'টারজান আসলে বনমানুষ নয়। দলের লোকদের মতো সে নয়। তোমরা এবার একজন নতুন দলপতি ঠিক কর। টারজান উপসাগরের তীরে নিজের বাসায় চলে যাচ্ছে। সে আর ফিরবে না।'

টেরকজের সঙ্গে লড়াইয়ের ফলে ক্ষতবিক্ষত দেহে পরদিন ভোরে টারজান পশ্চিম সাগরের তীরের দিকে রওনা হলো। ধীরে সুস্থে এগোতে লাগল সে, পথে জঙ্গলে একটা রাত কাটল। তার পরদিন বেলা হলে পৈত্রিক ঘরে পৌঁছল। বেশ কয়েক দিন সেখানে চুপচাপ পড়ে রইল। খিদে মেটাবার জন্য কাছাকাছি বন থেকে ফলমূল বাদাম সংগ্রহ করে এনেছিল। বাঁ ভুরুর ওপর থেকে, মাথার চাঁদির ওপর দিয়ে ডান কান পর্যন্ত লম্বা একটা বিশ্রী দাগ ছাড়া, দশদিনে শরীরের আর সব গ্লানি ঘুচে গেল। ঐ দাগটা তখনো সম্পূর্ণ শুকোয়নি।

এই বয়সে চমৎকার চেহারা হয়েছিল টারজানের। প্রাচীন রোমান যোদ্ধাদের মতো সুগঠিত শরীর, মাথা ভরা কালো চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। কপালের দিকে চুলটাকে সে ছোরা দিয়ে ছেঁটে নিয়েছিল, যাতে দেখবার অসুবিধা না হয়। নিখুঁত মুখখানি সেকালের কোনো দেবতার মতো সুন্দর। অবিশ্যি সে বিষয়ে তার কোনো ধারণাই ছিল না। উপস্থিত তার বড়ই দুশ্চিন্তা। মোলায়েম মসৃণ মুখে কেন বনমানুষদের মতো লোম গজাচ্ছে ? তবে কি তাদের সঙ্গে মিশে মিশে বাঁদুরে বনে যাচ্ছে ? ছবির বইতে তো MAN-দের পরিষ্কার মুখ। অবিশ্যি ঐ বইতেই ঠোঁটে থুতনিতে লম্বা লম্বা লোমওয়ালা MAN-ও দেখেছে। তবু বড়ই ভাবনা হলো। শেষ পর্যন্ত ধারালো ছোরাটা দিয়ে বিশ্রী লোমগুলো দেখা দিলেই সে চেঁচে ফেলে দিতে আরম্ভ করেছিল।

তাছাড়া কাপড়-চোপড় দিয়ে গা ঢাকতে হবে। শাবরের ছালটা শুকিয়ে এত শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে তাই দিয়ে কিছু করার উপায় ছিল না। গলায় না হয় হীরের লকেট দেওয়া সোনার চেন পরেছিল, সেই তো আর যথেষ্ট হলো না। কালোদের গ্রাম থেকে কিছু পরনীয় সরানো ছাড়া টারজান কোনো উপায় ভেবে পেল না।

যোদ্ধার মতোই চেহারা বটে। কোমরে নিজের তৈরি চামড়ার কোমরবন্ধ। তাতে ছোরার খাপ ঝোলানো। পিঠে ধনুক আর তীরের তূণ। গায়ে কালোদের চামড়ার আর তামার সাজসজ্জা। সঙ্গে দড়ির ফাঁস। এই বেশে এক দিন বনপথে তিনজন কালোর সঙ্গে মুখো-মুখি দেখা! সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে বিকট চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে তারা পালাল। টারজান টপ করে গাছে চড়ে ওদের পিছু নিল। তারপর একজন একটু পেছিয়ে পড়তেই ফাঁস দিয়ে তাকে ধরে টেনে গাছে তুলে ফেলল। ততক্ষণে বেচারার প্রাণটা বেরিয়ে গেছে! টারজান তার হরিণের চামড়ার ল্যাঙট ও গয়না-গাঁটি ছাড়িয়ে নিজে পরে নিল। সব অস্ত্রশস্ত্রও আত্মসাৎ করল। তারপর মরা মানুষটাকে কাঁধে নিয়ে কালোদের গ্রামের দিকে গাছপথেই চলল।

ততক্ষণে সে দুটো লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এম্‌বঙ্গার কাছে অপদেবতার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা, তার হাতে মিরাণ্ডোকে হারানোর কথা বলল। এম্‌বঙ্গা এক বর্ণ বিশ্বাস করল না, মহা রেগে তাদের যাচ্ছেতাই করে বকতে লাগল, 'নিশ্চয় তোরা সিংহের মুখে তাকে একা ফেলে পালিয়ে এসে মিছে কথা বলছিস। যা, আবার গিয়ে দ্যাখ, তার কি হলো।' ঠিক সেই সময়, যেন তার কথার উত্তরে গাছের ওপর থেকে হুড়মুড় করে মিরাণ্ডোর মৃতদেহ এম্‌বঙ্গার পায়ের কাছে পড়ল। আর দেখতে হলো না! এক নিমেষে গ্রাম সুদ্ধ সবাই ঘর ছেড়ে বনে পালাল।

এদিকে টারজান এইসব কাণ্ড করে ঘরে ফিরে দেখে উপসাগরে একটা বড় জাহাজ ভাসছে আর তীরের বালির ওপর একটা ছোট নৌকো বাঁধা। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ঐ নৌকোটা থেকে কয়েকজন ওরই বইয়ের ছবির মতো দেখতে MAN ওরই ঘরের দিকে যাচ্ছে।

গাছের ওপর দিয়ে যতটা সম্ভব কাছে গিয়ে খুব নজর করে টারজান দেখল দশজন মানুষ, রোদে পোড়া

মুখ, ধূর্ত বদমাইসের মতো দেখতে, নৌকাটার কাছে জটলা করে হাত-পা নেড়ে নিজেদের মধ্যে তারা খুব রাগারাগী করছে। দৈত্যের মতো লম্বাচওড়া একটার সঙ্গে বাকিদের ঝগড়া হচ্ছে। তাদের মধ্যে ছুঁচোমুখো হঠাৎ দূরে কি একটা দেখাতেই দৈত্য সেদিকে মুখ ফেরাল আর অমনি ছুঁচোমুখো তার বেঁটে বন্দুক বের করে দৈত্যের পিঠে গুড়ুম করে মেরে দিল। মাথার ওপর দু-হাত তুলে মুখ থুবড়ে লোকটা পড়ে গেল, আর উঠল না। টারজান এই প্রথম বন্দুকের গুলির শব্দ শুনল। তাই শুনে সে যতটা হতভম্ব হলো তার চেয়েও ঢের বেশি হতাশ হলো এদের নির্মম আচরণ দেখে। কালোদের চেয়ে এরা একটুও ভালো নয়: বনমানুষের চেয়ে এতটুকু বেশি সভ্য নয়; নিষ্ঠুরতায় শাবরের চেয়ে এতটুকু কম নয়। ভাগ্যিস, প্রথম দর্শনেই এদের 'ভাই' বলে বুকে জড়িয়ে ধরেনি!

টারজান অবাক হয়ে দেখল, দলের একজন আবার ঐ কুকর্মের জন্য ছুঁচোমুখোর পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে। ঝগড়া-ঝাঁটিও কমে গেল। নৌকো জলে নামিয়ে তারা সবাই জাহাজের দিকে চলে গেল।

ওরা জাহাজে পৌঁছে গেলে, গাছ থেকে নেমে টারজান নিঃশব্দে তার ঘরে ঢুকে দেখে ঘরটার জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে তচনচ করে রেখেছে। বই খাতা কাগজ পেন্সিল অন্যান্য শখের জিনিস, অস্ত্রশস্ত্র, ঢাল, বর্শা গড়াগড়ি যাচ্ছে। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। ছুটে গিয়ে আলমারি খুলে দেখে তাকের পেছনে নিরাপদ জায়গায় ছোট বাক্সটা ঠিক আছে। ভেতরকার জিনিসও কেউ ছোঁয়নি!

হঠাৎ কানে অস্পষ্ট একটু শব্দ শুনে, জানলা দিয়ে চেয়ে টারজান দেখল, জাহাজ থেকে আরেকটা নৌকোও আগেরটার পাশে নামানো হচ্ছে। তার মানে দলেবলে ওরা আবার ফিরে আসছে। নৌকোতে জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে দেখে, একটা কাগজে পেন্সিল দিয়ে সটসট করে ছাপার হরপে টারজান কি সব লিখে, দরজায় আটকে দিয়ে, বাক্সটি আর যতগুলি তীর ধনুক অস্ত্রশস্ত্র বইতে পারে, সব নিয়ে, বনের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

যতক্ষণে নৌকোদুটো তীরে ভিড়ল, তার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। মোট কুড়িজন লোক। পনরোজনের আগের লোকগুলোর মতোই খুনে গুণ্ডা চেহারা, বাকি পাঁচজন একেবারে অন্য জাতের মানুষ। তাদের একজনের বয়স হয়েছে, চুল পেকেছে, চোখে বড় বড় লেন্সের চশমা।

পরনে ফ্যাসানেবল ফ্রক্ কোট, চকচকে সিল্কের টুপি, যদিও সবই ঢলঢল করছে, ফিট করছে না। কুঁজো হয়ে হাঁটছেন। তাঁর সাজসজ্জাকে কোনোমতেই আফ্রিকার ঘন বনের উপযুক্ত বলা যায় না।

দ্বিতীয় লোকটির বয়স কম, মাথায় লম্বা, পরনে সাদা সুতির পোশাক। তার পেছনে আরেকজন বয়স্ক লোক, উঁচু কপাল, কেমন একটা খুঁৎখুঁতে চঞ্চল ভাব। তার পেছনে ভীষণ লম্বা মোটা এক নিগ্রো মহিলা, গায়ে রং-চং পোশাক, এই বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে ভয়ে ভয়ে ইদিক-উদিক তাকাচ্ছে। নাবিকরা নৌকো থেকে বাক্স-প্যাঁটরা পোঁটলা-পাটলি নামাতে ব্যস্ত।

সবার পরে নৌকো থেকে নামল বছর উনিশের একটি মেয়ে। লম্বা যুবকটি তাকে কোলপাঁজা করে নামাল যাতে তার পা না ভিজে যায়। মেয়েটি তার দিকে চেয়ে একটু হাসল। সে হাসিতে ছিল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে একটু সাহস মেশানো। কেউ কোনো কথা বলছিল না।

নিঃশব্দে সবাই ঘরের দিকে এগোল। আগের থেকেই নিশ্চয় সব কথা ঠিক হয়ে ছিল, তাই এখন কারো কিছু বলার ছিল না। হঠাৎ নাবিকদের একজনের দরজায় লটকানো নোটিসটার ওপর চোখ পড়ল। সে তো অবাক! 'আরে! এটা তো এক ঘণ্টা আগেও এখানে ছিল না!'

নোটিস্‌টা পড়বে কি! সবাই তো সমান পণ্ডিত। 'ও পরফিসর, এটা একটু পড়ে দিন না, মশাই।' কাছে গিয়ে, চশমা ঠিক করে, লেখা পড়ে, প্রফেসর বললেন, 'ভারি আশ্চর্য! ভারি আশ্চর্য!' এই বলে সরে যাচ্ছিলেন, প্রথম বুড়োটা ডাক দিয়ে বলল, 'ও কি হলো? চলে যাচ্ছ যে বড়! আমাদেরও পড়ে শোনাও।' ফিরে এসে, আরেকবার পড়ে, অন্যমনস্কভাবে আবার চলে যাচ্ছিলেন, ধমক খেয়ে নরম গলায় বললেন, 'ও হ্যাঁ, তাইতো! তোমাদেরও শোনাতে হবে। তা এতে লেখা আছে –

"এটা টারজানের বাড়ি। জীবজন্তু কালো মানুষ সকলের হত্যাকারী। এ ঘরের সব জিনিস টারজানের। কিছু নষ্ট করো না। টারজান পাহারায় আছে।—বনমানুষদের দলের টারজান।"

সেই নাবিক বলল, 'টারজান আবার কে?'

যুবক বলল, 'দেখাই যাচ্ছে সে ইংরিজি জানে।'

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু বনমানুষদের দলের টারজান মানে কি?'

—'তা তো বলতে পারছি না, মিস্ পর্টার। এক যদি লণ্ডনের চিড়িয়াখানা থেকে কোনো পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বনমানুষ পালিয়ে এসে থাকে। কি বলেন প্রফেসর?'

প্রফেসর বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়। এর আগে আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তার বেশি আমার কিছু বলার নেই।' এই বলে জঙ্গলের দিকে রওনা দিলেন।

মেয়ে বলল, 'কিন্তু কই, বাবা, তুমি তো আগে কিছুই বলনি!'

প্রফেসর বললেন, 'কি মুস্কিল, এ সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কি দরকার, মা?' এই বলে তিনি অন্য এক দিকে চললেন।

ছুঁচোমুখো নাবিক বলল, 'আসলে আমরাও যেটুকু জানি, বুড়ো তার চেয়ে এক ফোঁটাও বেশি জানে না।'

এ কথা শুনে লম্বা যুবক চটে গেল, 'দেখ, মুখ সামলে কথা বল। আমাদের অফিসারদের খুন করেছ, আমাদের সর্বস্ব লুট করেছ, আমাদের কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই, তবু বলছি প্রফেসরকে অসম্মান দেখালে আমি তোমার গলা টিপে মেরে ফেলব!'

গাছের ওপরে পাতার আড়াল থেকে টারজান সবই দেখতে পাচ্ছিল। এই ছুঁচোমুখোই কিছু আগে তার নিজের দলের একজনকে তার আগুন-লাঠির সাহায্যে খুন করেছিল। এখন ঐ সাহসী যুবককেও না তাই করে, হাত তো গেছে কোমরে। আর অপেক্ষা করা নয়। ধনুকে একটা বিষাক্ত তীর পরিয়ে দেবে নাকি ছেড়ে? কিন্তু ডালপালায় বাধা পেতে পারে। তার চেয়ে বর্শাই ভালো।

ঐ যুবকের নাম ক্লেটন। সে সবে কয়েক পা এগিয়েছে। ছুঁচোমুখোর রিভল্‌বারের আধখানা বেরিয়েছে। অন্য নাবিকরা হাঁ করে মজা দেখছে। প্রফেসর আর তাঁর সহকারী বন্ধু ডক্টর টি ফিল্যাণ্ডার জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কালো মেয়ে এস্‌মারেল্ডা তার দিদিমণির জিনিসপত্র বাছছে।

এমন সময় প্রায় একসঙ্গে তিনটে ব্যাপার ঘটল। ছুঁচোমুখো রিভল্‌বার বের করে ক্লেটনের দিকে লক্ষ্য করল মিস্ পর্টার চিৎকার করে ক্লেটনকে সতর্ক করে দিল আর লোহার ফলা-লাগানো লম্বা একটা বর্শা কোথা থেকে ছুটে এসে ছুঁচোমুখোর ডান বাহু এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। গুলিটা শূন্যে ফেটে গেল। ছুঁচোমুখো বিকট চিৎকার করে পড়ে গেল আর নাবিকরা ভয়ে আধমরা হয়ে বনের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। টপ করে রিভল্‌বারটা তুলে নিয়ে, ক্লেটন-ও তাই করল।

জেন পর্টার বলল, 'কে হতে পারে?'

ক্লেটন বলল, 'টারজান তাহলে সত্যিই পাহারা দিচ্ছে। ভালো কথা, তোমার বাবা আর মিঃ ফিল্যাণ্ডার কোথায় গেলেন?'

কি সর্বনাশ! সত্যিই তো তাঁদের কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। দুই অন্যমনস্ক বুড়ো পণ্ডিত একবার ঐ পথহীন ঘন বনে ঢুকলেই তো হয়ে গেল! আর তাঁদের পাওয়া যাবে না। তখনো নাবিকরা চলে যায়নি, কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাবার কথাই ওঠে না। বরং তার উল্টোটা হতে পারে। অথচ এখনি তাঁদের খোঁজে যাওয়া দরকার। কিন্তু তাহলে জেনকে আর এস্‌মারেল্ডাকে কে রক্ষা করবে? ততক্ষণে নাবিকরা চলে যাবার জোগাড় করছে দেখে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ক্লেটনের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। জেনকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি না রিভল্‌বার ছুড়তে জান?'

—'তা জানি।'

—'তাহলে এইটা তোমার কাছে রেখে, দরজা এঁটে দু'জনে বসে থাক। আমি দুই বুড়োকে খুঁজে আনি।' জেন তখুনি রাজি।

ছুঁচোমুখোর বন্দুকটা তার হাতে দিয়ে, টারজানের বর্শাটা কুড়িয়ে নিয়ে ক্লেটন জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। কতটুকু আর এগিয়েছেন তাঁরা এই অল্প সময়ের মধ্যে?

একটু দূর যায় আর দু'জনার নাম ধরে ডাকে। জেনরা কিছুক্ষণ তার গলা শুনতে পাচ্ছিল, তারপর সব চুপচাপ। এদিকে দুই বুড়ো কোনো একটা জটিল তত্ত্ব নিয়ে তর্ক করতে করতে যখন আবার উপকূলে পৌঁছলেন, অবাক হয়ে দেখলেন এ তো সে জায়গা নয়! এ আবার কোথায় এলাম! অতএব আবার বনে ঢুকে উল্টোমুখো হাঁটা দিলেন।

এদিকে খুদে কেবিনটার দরজা আঁটতে না আঁটতে বিকট চিৎকার করে এস্‌মারেল্ডা জেনকে জাপটিয়ে ধরল। ঘরের কংকালগুলো এতক্ষণ পরে তার চোখে পড়েছিল। জেন-ও ভাবল, 'এ কি বিকট জায়গায় এলাম আমরা!' প্রথমে এক ধমক দিয়ে দাসীর বিলাপ বন্ধ করে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দু'জনে একটা কাঠের বেঞ্চে অপেক্ষা করতে বসল।

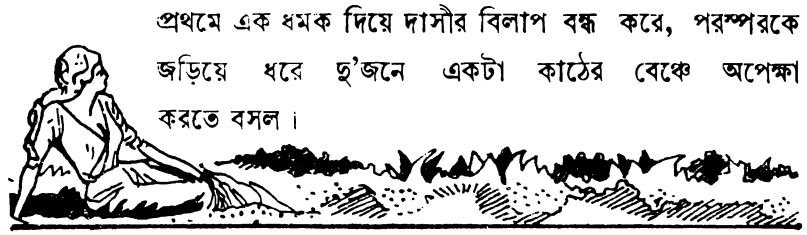

এদিকে অদৃশ্য টারজানের সাংঘাতিক বর্শা দেখে নাবিকরা এমনি ভয় পেয়েছিল যে ক্লেটন বনে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারাও নৌকো দুটোয় চেপে জাহাজ অভিমুখে রওনা হলো। টারজান তার গাছের পাতার আড়াল থেকে সবই লক্ষ্য করল। শিক্ষিত সাদা মানুষরাও এত নিষ্ঠুর হয় দেখে সে হতাশ হয়েছিল। বাকিরাও হয়তো তাই। তবে ঐ সুন্দর মেয়েটিকে বড় ভালো লাগল; সে নিশ্চয় খুব ভালো। ঐ মোটা কালো মেয়েও সুন্দর মেয়ের দেখাশুনো করে; সে-ও তাহলে খুব ভালো।

এদের ঘরের মধ্যে একা ফেলে পুরুষরা কেন বনে গেল বুঝতে টারজানের বেশি সময় লাগেনি। নিশ্চয়, ঐ বুড়ো দু'টোকে খুঁজে আনতে। সঙ্গে তো বর্শাটি ছাড়া কিছু নেই। আগুন-লাঠিটাও মেয়েটাকে দিয়ে গেল। বনে যে কত রকম বিপদ সে বিষয়ে এদের কোনো ধারণাই নেই। দূর থেকে লম্বা যুবকের গলা শোনা যাচ্ছিল। বোধ হয় বুড়োদের ডাকছে। কি ব্যাপার দেখতে হবে, এই মনে করে, গাছ-পথে টারজানও বনে ঢুকে গেল।

একটু পরেই তাকে দেখতেও পেল। ঘেমে, হাঁপিয়ে একাকার। একটা গাছে ঠেস দিয়ে দম নিচ্ছে। তখনো মাঝেমাঝে ডাক দিচ্ছে। সবে ভাবছে, যাই, খুঁজে নিয়ে আসি', এমন সময় চোখে পড়ল ঝোপের আড়ালে একটা চকচকে হলদে শরীর সাবধানে এগোচ্ছে। ঐ হলো চিতাবাঘ শীতা! তার পায়ের চাপে ঘাস দুমড়ে যাচ্ছে তার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। লোকটা কি কালা নাকি? হঠাৎ ঘন বনের নৈঃশব্দ ভেঙে টারজানের বিকট জয়ধ্বনি শোনা গেল। আর কি চিতাবাঘ সেখানে থাকে! ঝোপঝাপ ভেঙে দৌড়। ক্লেটন একেবারে স্তম্ভিত। কে তাকে বাঁচাল? সে যে তারই জ্যাঠামশায়ের ছেলে. আসল লর্ড গ্রেস্টোক, সে কথা তো আর ক্লেটনের বা টারজানের কারো জানবার উপায় ছিল না।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, মেয়েদের কাছে ক্লেটনের ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু বুড়োমানুষদের না নিয়ে ফেরেই বা কি করে! কিন্তু তাঁরা যদি এর মধ্যে ফিরে এসে থাকেন? একবার দেখে আসা ভালো। এই বলে সে ফিরে চলল। কিন্তু কেবিনটার দিকে নয়. এমবঙ্গার গাঁয়ের দিকে। টারজান বুঝল, লোকটা পথ হারিয়েছে। বুড়োগুলো যে পথে গেছে তারও তো চিহ্ন রয়েছে, সে দিকেও যাচ্ছে না লোকটা। এক্ষুণি বুনো জন্তুরা ওকে খেয়ে ফেলবে। এমন বোকাও হয়!

বলতে না বলতে টারজান দেখে নুমা সিংহ লোকটার পিছু নিয়েছে। এত কাছে এসে গেছে যে সে-ও শুনতে পেয়েছে! তারপরেই সিংহের গর্জন শোনা গেল। ক্লেটন ভীরু ছিল না। বর্শা উঁচিয়ে সে তৈরি। হঠাৎ ওপর থেকে টং করে একটা শব্দ হলো। অবাক হয়ে ক্লেটন দেখল কোথা থেকে একটা তীর এসে সিংহের গায়ে বিঁধল! সঙ্গে সঙ্গে একজন নেংটিপরা দৈত্যের মতো চেহারার লোক ঝুপ করে সিংহের পিঠে নামল। কি চমৎকার শরীরের গড়ন তার। হাতে একটা শিকারীদের ছোরা। নুমার গলা জড়িয়ে ধরে, তার গায়ে বারবার ছোরাটা সে বসিয়ে দিতে লাগল। শেষটা সিংহের প্রাণহীন দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর তার ওপর দাঁড়িয়ে আবার সেই বিকট জয়ধ্বনি।

এবার ভালো করে তাকে দেখতে পেল ক্লেটন। কি সুন্দর মুখ, কি চমৎকার শরীর। গলায় একটা সোনার চেনে হীরের লকেট। এই কি টারজান? তবে তো সে ইংরিজি জানে। কিন্তু সে যে ইংরিজি বোঝে না একটু পরেই তা টের পেল ক্লেটন। লোকটা একেবারে বুনো। মরা সিংহের গা থেকে মাংস কেটে কাঁচা কাঁচাই খেতে লাগল। ইশারা করে ওকেও ডেকেছিল, কিন্তু ওতো আর কাঁচা মাংস খায় না। শিউরে সরে গিয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর, ক্লেটনকে অন্য একটা পথ দেখিয়ে দিল টারজান। তাকে সে-পথে যেতে অনিচ্ছুক দেখে কোট ধরে খানিকটা হিড় হিড় করে টেনেও নিয়ে গেল। তার-পর নতুন পথে নিজে এগোতেই, ক্লেটনও চলল। এমন সময় দূর থেকে একটা রিভলবারের গুলির শব্দ কানে এলো।

এদিকে ঘরে বসে বাকি তিনজনের জন্য ভেবে জেন আকুল হচ্ছিল। হঠাৎ বাইরে একটা ভারি দেহের নড়াচড়ার শব্দ শুনে দু'জনে ভয়ে কাঠ। তারপর বন্ধ দরজার বাইরে থেকে কিছুতে ফোঁশফোঁশ করে শুঁকতে আরম্ভ করল। তাতে এসমারেল্ডা এমনি চ্যাঁ-ভ্যাঁ লাগাল যে তাকে ধমক দিয়ে থামাতে হলো। দরজায় বড় বড় নখ দিয়ে কিছুতে আঁচড়াতে লাগল। তারপর জানলার দিকে তাকিয়ে জেনের চক্ষুস্থির। প্রকাণ্ড এক সিংহী জুলজুল করে তাকিয়ে আছে।

'ওরে এসমারেল্ডা, দ্যাখ্! দ্যাখ্!'

আর দ্যাখ! একবার তাকিয়েই এসমারেল্ডা দাসী মূর্ছা গিয়ে ঝুপ করে মাটিতে শুয়ে পড়ল!

জানলাটাতে মজবুত কাঠের শিক লাগানো ছিল।

সিংহীটা জানলা ছেড়ে দরজায় প্রায় আধঘণ্টা ধাক্কাধাক্কি আঁচড়ানি-খামচানি করে আবার মরিয়া হয়ে জানলার কাছে ফিরে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করে একটা শিক বের করে ফেলল। তারপর আরেকটা। এবার ফোকর দিয়ে একটা থাবা আর মাথার খানিকটা ঢুকিয়ে দিতেই, দৈবাৎ বুকে গোঁজা রিভলবারের ওপর জেনের হাত পড়তেই সেটাকে সে টেনে বের করে সিংহীর দিকে গুলি করল। সেই গুলির শব্দই ক্লেটনের আর টারজানের কানে গিয়েছিল।

ততক্ষণে গুলি খেয়ে সিংহীটার মাথা জানলা থেকে অদৃশ্য হয়েছিল আর জেনও শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে এসমারেল্ডার পাশে ভূমিশয্যা নিয়েছিল।

দুঃখের বিষয় গুলিটা কোনো মারাত্মক জায়গায় লাগেনি। লেগেছিল কাঁধে। সে হাতটাতে জোর পাচ্ছিল না সিংহীটা। তবু একটু সামলে নিয়ে, মুণ্ডুটা আর একটা থাবা ভেতরে সেঁদিয়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে জেন পর্টার আবার চোখ খুলল।

এদিকে ক্লেটন অনিচ্ছা সত্ত্বেও টারজানের দেখানো পথ দিয়ে চলেছে, আছাড় খাচ্ছে, পথভ্রম হচ্ছে। হঠাৎ ঝুপ করে সাদা বুনো লোকটা গাছের ডাল থেকে নেমে ওকে ইশারা করে বলল ওর গলা জড়িয়ে ধরতে। তারপর তাকে পিঠে ঝুলিয়ে গাছ থেকে গাছে লাফ দিয়ে সে কি রক্ত-জল-করা যাত্রা! একটু পরে ক্লেটনের ভয় ভেঙে গেলে মনটা এই অদ্ভুত মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে গেল। এ-ও কেউ পারে নাকি!

দেখতে দেখতে উপসাগরের তীরে পৌঁছেই শাবরের হাঁচড়-পাচড় হাঁকডাক কানে গেল। অমনি ঝুপ করে একশো ফুট উঁচু থেকে ক্লেটন সহ টারজানের মাটিতে নিরাপদে অবতরণ। ততক্ষণে কি সর্বনাশ! শাবরের শরীরের সামনের অর্ধেকটা ঠেলেঠুলে জানলা দিয়ে সেঁদিয়ে গেছে, পশ্চাৎ ভাগটা বাইরে আছে। এক লাফে টারজান তার লম্বা লেজটা ধরে গায়ের জোরে টান দিল! ক্লেটনও ছুটে তার সাহায্যে এলো। টারজান যে কটর-মটর করে কি বলল, সে তো বোঝা গেল না। আসলে সে বলছিল টারজানের তূণ থেকে নিয়ে বিষ তীরের খোঁচা মারতে আর কোমর থেকে ছোরাটা বের করে দিতে। তা বোকাটা ওর ভাষাই বুঝল না।

অগত্যা দু'জনে মিলে অনেক কষ্টে জন্তুটাকে টেনে বের করবামাত্র, টারজান তার পিঠে লাফিয়ে পড়ে সেই রকম ডবল-নেলসনের কৌশলে তার বিশাল ঘাড় মটকে দিল। তারপর আবার সেই বিকট জয়ধ্বনি!

ঘরের ভিতর থেকে জেন বলল, 'কি হলো? কি হলো?'

ক্লেটন বলল, 'দরজা খুলে বাইরে এসে তোমার প্রাণ-দাতাকে ধন্যবাদ দাও।' কিন্তু জানলার কাছে এসে তার কোনো চিহ্নই দেখা গেল না।

জেন বলল, 'কে সে?'

—'কি জানি, প্রথমে ভাবলাম বুঝি ও-ই টারজান। কিন্তু এক বর্ণ ইংরিজি জানে না।'

জেন বলল, 'তা, সে যে-ই হোক, ভগবান তাকে আশীর্বাদ করুন।

ক্লেটনও বলল, 'তাই করুন।'

ঠিক এই সময় এসমারেল্ডা উঠে বসে চারদিকে চেয়ে বলল, 'হেই ভগবান, তবে কি আমি মরিনি?'

এতক্ষণ পরে জেন পর্টারের মনের উপর এই বিকট অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। বেঞ্চের উপরে আছড়ে পড়ে সে হেসে কেঁদে আকুল হলো।

এদিকে খুদে কেবিনটা থেকে বেশ কয়েক মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরের বেলাভূমিতে দুই বুড়োকে দাঁড়িয়ে দারুণ তর্ক করতে দেখা গেল। সামনে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর, পেছনে আফ্রিকার ঘন বন। সেখান থেকে নানা হিংস্র জানোয়ারের ডাক কানে পৌঁছচ্ছিল। বাড়ির পথ কোথায় ভেবে দু'জনার আকুল হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেদিকে ওঁদের ভ্রূক্ষেপও ছিল না। ফিল্যাণ্ডার বলছিলেন, 'তা আপনি যা-ই বলুন, আমি তবু মনে করি পনরো শতকে ফার্ডিন্যাণ্ড আর ইসাবেলা যদি মূরদের পরাজিত না করতেন, তাহলে এতদিনে সভ্যতা আরো হাজার বছর এগিয়ে যেত!'

প্রফেসর পর্টার বললেন, 'বাজে বকো না, ওদের ধর্মটাতেই এত গোঁড়ামি আছে যে সেটা সম্ভব হতো না।'

ফিল্যাণ্ডার বললেন, 'কি মুস্কিল! ও আবার কে এলো?'

প্রফেসর ভারি বিরক্ত, 'একটা সিংহ এসেছে বলে তুমি আমার বিতর্কে বাধা দেবে?'

ততক্ষণে সিংহটা দশ পা দূর থেকে মহা কৌতূহল নিয়ে ওঁদের দেখছিল। প্রফেসর ভারি বিরক্ত, 'এ তো বড় অন্যায় কথা। আমি কড়া চিঠি দেবো। ওটাকে চিড়িয়া-খানায় পোরা দরকার।'

ফিল্যাণ্ডার বললেন, 'সেই ভালো। এবার বাড়ি চলুন। ও কাজটা যত শীঘ্র হয় ততই ভালো।' এই বলে প্রফেসরের হাত ধরে ফিল্যাণ্ডার যেখানে সিংহ তার উল্টোদিকে রওনা দিলেন। কিন্তু কি সর্বনাশ! ওটা আবার পেছন পেছন চলছে কেন? প্রফেসর তো বকেই চলেছেন। সিংহের দূরত্ব পাঁচ পা, এই ঝাঁপ দিল বলে! এতক্ষণে প্রফেসরের চৈতন্য হলো। একটু দূরেই একটা গাছ, সেটাতে চড়লেই নিরাপদ! এই ভেবে আগে প্রফেসর, পেছনে ফিল্যাণ্ডার দৌড় লাগালেন। পাতার আড়াল থেকে মুখে এক গাল হাসি নিয়ে টারজান মজা দেখছিল। আসলে নুমার খিদে পেলে অনেক আগেই ওঁদের মেরে ফেলত। এখনো একজন যদি হোঁচট খেয়ে আছাড় খান, সে লোভ সামলাতে না-ও পারে। এই মনে করে ফিল্যাণ্ডার গাছতলায় পৌছলেই টারজান তাঁর কোটের কলার ধরে টেনে গাছে তুলে ফেলে, নিমেষের মধ্যে প্রফেসরকে তুলেও তাঁর পাশে বসিয়ে নিজে একটু সরে আড়ালে বসল। প্রফেসর ভাবলেন ফিল্যাণ্ডার তাঁকে তুলেছে, তাই তাঁর ওপর রাগমাগ করতে লাগলেন। তারপর ধমক খেয়ে চুপ করলেন। পরে বললেন, 'ভাগ্যিস্ তুলেছিলে, নইলে আমার হয়ে যেত।'

ফিল্যাণ্ডার বললেন, 'আমি তুলিনি। এই গাছে আর কেউ বা কিছু আছে যে আমাদের দু'জনকেই তুলে বাঁচিয়েছে।'

এবার টারজানের মনে হলো অনেকক্ষণ হয়ে গেল, নুমাকে এখন ভাগানো দরকার। এই ভেবে গাছে বসে সেই বিকট জয়ধ্বনি ছাড়ল। দুই বুড়ো ভয়ে কাঠ। নুমা প্রথমে থমকে দাঁড়াল, তারপর নিঃশব্দে ঝোপঝাড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। দুই পণ্ডিত কিন্তু এমনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে ভারসাম্য হারিয়ে, পরস্পরকে জাপটিয়ে ধরে, হুড়মুড় করে পপাত ধরণীতলে। তাতে কারো হাড়গোড়ও ভাঙল না, কোনো ক্ষতিও হলো না। চাঁদের আলোয় টুপি কুড়িয়ে নিতেও পারলেন।

হঠাৎ দেখেন সামনে একজন নেংটিপরা দৈত্য। হ্যাট তুলে প্রফেসর তাকে অভিবাদন করলেন। সে ইশারা করে তাঁদের সঙ্গে আসতে বলল। ফিল্যাণ্ডার বললেন, 'ওর সঙ্গে যাওয়াই বুদ্ধির কাজ হবে।'

দু'জনে কিছুদূর যান, আবার দাঁড়িয়ে তর্কে ডুবে যান। শেষটা ধৈর্য হারিয়ে, দু'জনার গলায়দড়ি বেঁধে, তাঁদের কোনো আপত্তিতে কান না দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই টারজান খুদে বাড়ির একশো গজের মধ্যে পৌছে দিল। তারপর দড়ি খুলে দিয়ে, আঙুল দিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে, নিমেষের মধ্যে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণ পর পাঁচজন মিলিত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কিন্তু কে যে তাঁদের এভাবে মৃত্যুমুখ থেকে বারে বারে উদ্ধার করছে ভেবে পেলেন না।

এস্মারেল্ডা বলল, 'দেবদূত ছাড়া আবার কে!'

ক্লেটন বলল, 'দেবদূতটিকে কাঁচা মাংস খেতে দেখলে তাকে দেবতার চেয়ে আরেকটু স্থূলদেহী ভাবতে।'

জেন বলল, 'অন্ততঃ গলার আওয়াজে স্বর্গীয় ভাব নেই।'

প্রফেসর পর্টার বললেন, 'তাছাড়া দু'জন বিশিষ্ট পণ্ডিতের গলায় দড়ি বেঁধে গোরুর মতো টেনে আনাকেও কিছু দেবতাসুলভ ব্যবহার বলা যায় না।'

সে যাই হোক, ততক্ষণে ভোর হয়ে এসেছিল। আগের দিন সকাল থেকে কারো কিছু খাওয়া হয়নি। অ্যারো জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকরা শুকনো মাংস ইত্যাদি খাবারও অন্য জিনিসের সঙ্গে রেখে গিয়েছিল। সেই সব দিয়ে সকলে মিলে যেমন তেমন করে খিদে মেটালেন।

এবার কেবিনটাকে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। সবার আগে হাড়গোড়গুলোর সৎকার করা দরকার। খৃশ্চানদের নিয়ম মতে ও-গুলিকে সমাধি দিতে হবে। তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে ক্লেটন দেখে মাটিতে লুটানো পুরুষ কংকালের হাতের আঙুলে প্রকাণ্ড একটা সোনার সিগনেট-রিং চকচক করছে। তাতে হয়তো এদের পরিচয় পাবার সুবিধা হতে পারে ভেবে আংটি তুলে দেখে তাতে নিজের গ্রেস্টোক বংশের চিহ্ন খোদাই করা। ক্লেটন তাজ্জব বনে গেল। একটু আগেই প্রফেসর পর্টার বলেছিলেন বড় কংকাল দুটি সভ্য শ্বেতাঙ্গের দেহাবশেষ। শিশুটি নিশ্চয় তাদেরই সন্তান।

এতক্ষণে ক্লেটন বুঝতে পারল এ তারই জ্যাঠামশায় আর জ্যাঠাইমার দেহাবশেষ ঐটি তাঁদের সন্তান। হায়! হায়! এত রূপগুণের অধিকারীদের বিজনে বিভূঁয়ে এ কি শোচনীয় মৃত্যু। কিন্তু সমাধি দেবার আগে, শিশুর মাথার খুলিটা একটু নজর করে দেখে ফিল্যাণ্ডার চমকে উঠে, নিচু গলায় বললেন, 'সে কি! এ তো নর-কংকাল নয়। ক্লেটনকে বলা দরকার।'

প্রফেসর বললেন, 'চেপে যাও। যা গত হয়েছে, তাকে যেতে দাও।'

তিরপলে মুড়ে তিনটি দেহাবশেষকে মাটিতে সমাধিস্থ করা হলো। প্রফেসর খৃশ্চান নিয়ম অনুসারে ভগবানের নাম করলেন। ততক্ষণ অন্যরা খালি মাথায়, মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

পাতার আড়াল থেকে সমস্ত ব্যাপার দেখে টারজান বড়ই অবাক হলো। খালি মনে হচ্ছিল এই মানুষগুলোর জন্য আমার এত ভাবনা কেন। বিশেষ করে ঐ মিষ্টিমুখ মেয়েটার জন্য। পুরুষগুলো তো নির্বোধের একশেষ। এরাই তার স্বজাতি নাকি?

এদিকে দূরে দেখা গেল উপসাগরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে অ্যারো জাহাজ মহাসাগরে পাড়ি দিচ্ছে। ক্লেটন বলল, 'দেখলে কি নির্মম নিষ্ঠুর ওরা! বলেছিল গুলি-বন্দুক রেখে যাবে, তাও গেল না।'

প্রফেসর বললেন, 'যাবার আগে দেখাও করে গেল না। ভেবেছিলাম ধনরত্নগুলো আমার কাছে রেখে যেতে বলব। নইলে আমি তো একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যাব!'

জেন করুণ ভাবে তার স্বপ্নবিলাসী বাপের দিকে চেয়ে বলল, 'তাই কি রেখে যায় কখনো? ঐ ধনরত্নের জন্যেই না ওরা জাহাজের অফিসারদের খুন করল আর আমাদের এই ভয়ংকর জায়গায় নির্বাসন দিয়ে গেল।'

বাপ বললেন, 'তুমি বড় লক্ষ্মীমেয়ে জেন, কিন্তু কিছুই বোঝ না।' এই বলে মাটির দিকে চেয়ে সেখান থেকে সরে গেলেন।

জেন ফিল্যাণ্ডারকে বলল, 'কাকা, ওঁকে কালকের মতো একা একা ঘুরতে দিও না। আমি তোমার ওপর নির্ভর করে আছি।'

হতাশভাবে ফিল্যাণ্ডার বললেন, 'ওঁকে সামলানো দিনে দিনে যে কি কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে আর কি বলব!'

টারজান তার গাছের আড়াল থেকে ওদের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া লক্ষ্য করেছিল। তীর বেগে গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে প্রায় জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে উপসাগরের মুখে পৌঁছল। সেখান থেকে জাহাজের ডেক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। জনা কুড়ি লোক দড়িদড়া টানছে, দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ চোখে পড়ল সুদূর উত্তর দিগন্তে ধোঁয়ার রেখা।

মনে হলো জাহাজের নাবিকরাও সেটা লক্ষ্য করে, মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের গতির দিক বদলিয়ে আবার তীরের দিকে ফিরল। ডেক থেকে একজন নাবিক কেবলি জলে একটা মোটা দড়ি ছাড়ছিল। তার অন্য মাথায় একটা ভারি জিনিস বাঁধা। তীরের কাছে এসে জাহাজ নোঙর ফেলল। একটা নৌকো নামানো হলো। তাতে একটা মস্ত সিন্দুক তোলা হলো। তারপর নৌকোটা আরো কাছে এলো। টারজান ছুঁচোমুখোকে দেখতে পেল।

সবাই মিলে সিন্দুকটা নামাল। এ জায়গাটাকে কেবিন থেকে দেখা যায় না। ছুঁচোমুখো ইদিক-উদিক তাকিয়ে টারজানের গাছটাকে দেখিয়ে বলল, 'এর গোড়াতেই হবে। এইখানেই খোঁড়ো। আর পিটার, তুমি জায়গাটার একটা ম্যাপ এঁকে ফেল। নাও, শুরু কর। আরো লোক দরকার হলে ডেকে আনো। আমি এখন ক্যাপ্টেন, আমি ও-সব ধরব না।'

ট্যারাণ্ট বলে একজন দুর্দান্ত নাবিক তেড়ে বলল, 'ধরবি না মানে, ছুঁচো? কোদাল না ধরিস্, গাঁইতি ধর্।'

ছুঁচোমুখো রিভলবার বের করছিল। তার আগেই ট্যারাণ্টের গাঁইতি তার চাঁদি ফুটো করে দিল। সঙ্গীদের একজন বলল, 'ঠিক হয়েছে!' তারপর তাড়াতাড়ি করে গর্ত খুঁড়ে, সিন্দুক নামিয়ে সেই সঙ্গে ছুঁচোমুখোর মৃতদেহটাও পুরে দিয়ে, ভালো করে মাটি চাপা দেওয়া হলো। তার ওপর এক রাশি শুকনো আগাছা চাপানো হলো। পায়ের ছাপটাপ মুছে দিয়ে, ওরা তাড়াতাড়ি নৌকো চেপে জাহাজের দিকে রওনা হলো।

সমস্ত ব্যাপার দেখে টারজান তাজ্জব বনে গেল। কি নিষ্ঠুর এরা সব। বাক্সটার দরকার না থাকলে জলে ফেলে দিলেই হতো। তা হলে নিশ্চয় দরকার আছে। তা হলে বাক্সে কি আছে দেখতে হবে। এই মনে করে নেমে এলো টারজান। একটা খুরপিও ওরা ফেলে গিয়েছিল, তার সাহায্যে মাটি সরিয়ে, মৃতদেহটা টেনে বের করে এক পাশে রেখে, তার তলা থেকে বাক্সটা খুঁড়ে বের করল। তারপর মৃতদেহটাকে আবার পুঁতে, মাটি চাপা দিয়ে, আগাছায় ঢেকে বাক্স বগলে আরো ঘন বনে গিয়ে ঢুকল।

খুলে দেখার যথেষ্ট ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লোহার ব্যাণ্ড দিয়ে ঘেরা, ভারি তালা লাগানো সিন্দুক কিছুতেই খুলতে না

পেরে, শেষ পর্যন্ত বনমানুষদের দুমদুম নাচের প্রায় অগম্য খোলা জায়গার একপাশে সিন্দুকটাকে পুঁতে রাখল।

কেবিনের কাছে পৌঁছে টারজান দেখল ঘরে আলো জ্বলছে। ক্লেটন পুরানো এক টিন জ্বালানি তেল খুঁজে পেয়েছিল। বাতির ছবি টারজানের বইতে ছিল, কিন্তু সেগুলো যে কি কাজে আসে সে ভেবেই পেতো না। এখন বুঝল তাতে আগুন দিলে রাতকে দিন করে দেওয়া যায়।

জানলা দিয়ে উঁকি মেরে টারজান দেখল মাঝখানে তিরপলের পরদা ঝুলিয়ে ঘরটা দু'ভাগ করা হয়েছে। এক দিকে দুই বুড়ো বসে সমানে তর্ক করছেন, আর লম্বা যুবক টুলে বসে টারজানের একটা বই পড়ছে। অন্য দিকে ঘাসের বিছানায় মোটা কালো মেয়েটা ঘুমোচ্ছে আর সুন্দর মেয়েটি পিঠে এক রাশি সোনালী চুল ছড়িয়ে টারজানের টেবিলে বসে কি যেন লিখছে। তারপর আলো নিবিয়ে সেও বোধ হয় শুয়ে পড়ল। আধ ঘণ্টার মধ্যে তার শান্ত নিশ্বাসের শব্দ শুনে মনে হলো ঘুমিয়েও পড়েছে।

তখন সন্তর্পণে হাত ঢুকিয়ে টারজান ঐ লেখাটি বের করে, এনে, ছোট করে ভাঁজ করে, তীর রাখার তূণে গুঁজে, বনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরদিন আলো হতেই চিঠি পড়তে বসল টারজান। সুন্দরী মেয়ে কি লিখেছে জানবার বড়ই কৌতূহল। প্রথম দৃষ্টিতে হতাশ হলো, এক বর্ণ পড়া যায় না। ইকড়ি-মিকড়ি কি ছাই লেখা, বইয়ের গুবরে পোকার সারির সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য নেই !! আরো আধঘণ্টা তাকিয়ে থেকে মনে হলো একেবারেই যে সাদৃশ্য নেই তাও নয়। অবিশ্যি খুব বিকৃত। সুন্দরী চিঠি লিখেছে HAZEL বলে কাউকে।

"বাবার সঙ্গে কঙ্গোতে, বৈজ্ঞানিক অভিযানের পথে নাবিকরা বিদ্রোহী হয়ে আমাদের এই ঘন বনে নামিয়ে দিয়েছে। সবাই জানত ওঁরা কোনো এক হারানো প্রাচীন নগরের খোঁজে এসেছেন। আসলে একটা পুরানো বইয়ের দোকানে তিনশো বছরের পুরানো একটা বইয়ের মধ্যে পুরানো একচিঠি পাওয়া গিয়েছিল। তাতে এদিককার কোনো দ্বীপে জলদস্যুদের পুঁতে রাখা গুপ্তধনের খবর ছিল। সেই গুপ্তধন উদ্ধার করাও একটা উদ্দেশ্য ছিল।

জাহাজ ছাড়ার পর বাবার কাছে এই আসল উদ্দেশ্যের কথা শুনে আমি শিউরে উঠেছিলাম। বাবার বন্ধু মিঃ ফিল্যাণ্ডার আর লর্ড গ্রেস্টোকের ছেলে জন ক্লেটন দুঃসাহসিক অভিযানের লোভে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরাও হতভম্ব আশ্চর্যের বিষয় দ্বীপটার নির্দেশ দেওয়া ছিল এবং সেখানে সিন্দুক ভরা ধনরত্ন পাওয়া গেল।

নাবিকরা ধরাধরি করে সেটা জাহাজে তুলল। কথাটা জানাজানি হলো। ফলে ঐ সব খুনে নাবিকরা বিদ্রোহ করে অফিসারদের মেরে ফেলে, আমাদের এখানে নামিয়ে দিয়ে বাক্স নিয়ে চলে গেছে।

এখানে আমাদের নানা রকম ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছে। বারে বারে নানা হিংস্র জানোয়ারের হাত থেকে আশ্চর্য একজন বনবাসী আমাদের বাঁচিয়েছে। অদ্ভুত তার শরীরের বল, অসম্ভব সাহস আর দেখতে দেবতার মতো সুন্দর। আপাততঃ একটা কুটিরে আমরা আশ্রয় পেয়েছি। কপালে কি আছে জানি না। ইতি—তোমার জেন পর্টার।"

টারজান সবই বুঝল। সঙ্গে পেন্সিল ছিল, তাই দিয়ে চিঠির নিচে স্পষ্ট অক্ষরে লিখল—আমি টারজান।

মনে হলো ওতেই হবে। চিঠিটা আবার টেবিলে রেখে দেওয়া যাবে।

পরে টারজানের লেখা দেখে জেন ভয়েই মরে—'ও বাবা! সব সময় চোখ রাখছে!'

ক্লেটন বলল, 'তাতে কি? ও তো আমাদের বন্ধু। কাল রাতে দোরগোড়ায় আমাদের জন্য বুনো শুওরের তাজা মাংস রেখে গেছে।' মাঝে মাঝেই তাই করতে লাগল টারজান।

এই ভাবে মাসখানেক কেটে গেল। প্রফেসর যাতে গভীর বনে হারিয়ে না যান, তাই অষ্টপ্রহর তাঁকে আগলাতে হতো। ফিল্যাণ্ডার ক্রমে রোগা হয়ে যেতে লাগলেন। এদিকে টারজান স্থির করেছিল সে দিনের বেলাতেই এবার দেখা দেবে।

সে দিন সবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। ক্লেটন গেছে উপসাগরের মুখে যদি কোনো জাহাজ-টাহাজ দেখতে পায়। নিশানা দেবার জন্য সেখানে কিছু শুকনো কাঠকুটো সে জমা করে রেখেছিল। দুই বুড়ো সমুদ্রতীরে জ্ঞানালোচনায় ব্যস্ত। মেয়েরা দু'জন কাছাকাছি বনের মধ্যে ফল, বেরি ইত্যাদি সংগ্রহ করতে গেছে।

এমন সময় টারজান এসে খালি বাড়ি দেখে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জেনকে একখানা চিঠি লিখল। সভ্য সমাজে কখনো মেশেনি বেচারি। অনাত্মীয়া মহিলাকে কি ভাবে চিঠি লিখতে হয় জানে না। সে লিখল—

'আমি বনমানুষের ছেলে টারজান। আমার তোমাকে বড় ভালো লাগে। আমার বাড়িতে এসে থাকলে, আমি প্রাণ দিয়ে তোমার যত্ন করব। আমার মতো বলশালী সাহসী যোদ্ধা এ বনে আর নেই।—টারজান।'

হঠাৎ কানে এলো একটা পরিচিত শব্দ। এ যে গাছের নিচু ডাল পাতার মধ্যে দিয়ে কোনো বিশালদেহী বন মানুষ যাবার শব্দ!! তার পরেই বন থেকে মেয়েলী গলার আর্তনাদ। ঐখানে চিঠিটা মাটিতে ফেলে টারজান তীরের মতো বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চিৎকারটা ক্লেটনের আর দুই বুড়োর কানেও গিয়েছিল। হন্তদন্ত হয়ে সকলে ছুটে এসেছিলেন। এসে দেখেন সর্বনাশ, ঘরে কেউ নেই!

সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে বনে ছুটলেন। চিৎকার করে ওদের ডাকতে লাগলেন। আধঘণ্টার মধ্যে এসমারেল্ডার অচেতন শরীরটাকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। ক্লেটন তাকে তুলে বসাল, 'এসমারেল্ডা, জেন কোথায়?'

এসমারেল্ডা একবার তাকিয়ে ক্লেটনকে আর চারদিকের গাছপালা দেখল। তারপর আবার ঢলে পড়ল। ততক্ষণে বুড়োরাও এসে গেছেন।

প্রফেসর বললেন, 'কি হবে? সে কোথায় গেল? ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর?'

ক্লেটন বলল, 'আগে এসমারেল্ডাকে সুস্থ করে জিজ্ঞাসা করা যাক।'

তাকে ধরে জোরে এক ঝাঁকানি দিতেই মূর্ছা ভেঙে গেল। চোখ বুজে সে বলতে লাগল, 'হেই ভগবান আমাকে, মরে যেতে দাও! ঐ বিকট মুখ আর যেন দেখতে না হয়!'

ক্লেটন বলল, 'আহা, কি জ্বালা, এখানে ভগবান আসেননি, ক্লেটন এসেছে। চোখ খোল।'

চোখ খুলে সে বলল, 'উঃ, বাঁচলাম! সেই বরং ভালো।'

—'মিস পর্টার কোথায়?'

—'এ্যাঁ! নেই নাকি? তা হলে সে তাকে ধরে নিয়ে গেছে!

প্রফেসর বললেন, 'কে নিয়ে গেছে?'

—'বিকট একটা লোমশ দৈত্য!'

ফিল্যাণ্ডার বললেন, 'গোরিলা নাকি?'

এসমারেল্ডা খালি কেঁদেই সারা হলো। 'হয়তো তাই। আমি ভাবলাম স্বয়ং শয়তান! ঐ গোরিলেফ্যাণ্টই হবে তা হলে!'

ক্লেটন চারদিকে পায়ের চিহ্ন বৃথাই খুঁজে বেড়াল। সন্ধ্যা হতেই বনের মধ্যে অন্ধকার নেমে এলো। তখন বাধ্য হয়ে সকলকে ঘরে ফিরতে হলো। প্রফেসর কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'রাতটা বিশ্রাম করে, সকালে উঠে নিতান্ত দরকারি কিছু জিনিস সঙ্গে নিয়ে খুঁজতে বেরোব। ওকে না নিয়ে ফিরব না।' সবাই চুপ।

তারপর ক্লেটন উঠে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমিও অবশ্যই সঙ্গে যাব।

প্রফেসর বললেন, 'জানতাম তুমি যেতে চাইবে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। ওকে, জীবন্ত পাওয়া যাবে না। দু'জনে একই ভূমিশয্যা নেবো।'

ক্লেটন বলল, 'তবুও আমি যাব।'

—'বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছা।'

ফিল্যাণ্ডার বললেন, 'আমিও যাব।'

এবার প্রফেসর বাধা দিলেন, 'না, এসমারেল্ডাকে একলা ফেলে যাওয়া নিষ্ঠুরতা হবে। এমনিতেই জঙ্গলে যথেষ্ট নিষ্ঠুরতা দেখতে পাওয়া যায়। তুমি ওর কাছে থাকবে।'

এখানে একটু পুরানো কথায় ফিরে যাওয়া দরকার। টারজান দল ছেড়ে চলে যাবার পরে দলে বড় অশান্তি দেখা দিয়েছিল। টেরকজের মাথায় যদি একটু বুদ্ধি থাকত সে স্বচ্ছন্দে দলপতি হয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে পারত। কিন্তু তাহলে সকলের সঙ্গে ভালোব্যবহার করতে হতো। টেরকজের পক্ষে সেটা অসম্ভব। এতই খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করল যে শেষ পর্যন্ত দলের পুরুষরা তাকে পিটিয়ে দল থেকে তাড়িয়ে দিল। সেই ইস্তক বুকভরা রাগ, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা নিয়ে সে একা একা ঘুরে বেড়াত।

একদিন দুপুরে বনের মধ্যে দৈবাৎ দেখে দু'টি মেয়ে, তাদের সঙ্গে কোনো রক্ষী নেই! আর যাবে কোথায়! টপ করে গাছ থেকে নেমে জেনকে বগলদাবা করে আবার গাছের ডালে। জেন খালি একটা জোরে আর্তনাদ করে উঠবার সময় পেয়েছিল।

সেই আর্তনাদ শুনেই ক্লেটনরা তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ঘরে ফিরেছিল। কিন্তু গাছপথে মাইল তিনেক যেতে না যেতে টারজান তাদের ধরে ফেলল। তখন পালাবার পথ বন্ধ দেখে, টেরকজকে গাছ থেকে নেমে যুদ্ধ দিতে হলো। সে খুব মন্দ যোদ্ধা ছিল না। তার উপর টারজান তাকে পরাজয় স্বীকার করিয়েছিল বলে, আর সকলের চেয়ে তার ওপরেই

বিদ্বেষটা সবচেয়ে বেশি।

গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, দুরুদুরু বক্ষে জেন পটার সে লড়াই দেখেছিল কখনো ভয়ে আধমরা হয়ে, কখনো উল্লাসে। সে বুঝেছিল তারই জন্যে এ লড়াই। দলের সকলকে নানা রকম বিপদ থেকে সর্বদা যে উদ্ধার করেছে, এ যুদ্ধেও যে সে-ই জয়ী হবে, এ-কথা জেন জানত।

হলোও তাই। টেরকজের মতো দাঁত না থাকলেও, হাতে ছোরা ছিল টারজানের। টেরকজের পিঠে লাফিয়ে পড়ে, আঁকড়ে ধরে পেড়ে ফেলে ছোরার কয়েকটা আঘাতে তাকে শেষ করতেও খুব বেশি সময় লাগেনি। তারপর তার মৃতদেহের ওপর পা রেখে সেই ভয়ংকর জয়ধ্বনি দিয়ে, জেনকে তুলে নিয়ে সে জায়গা ছেড়ে চলে গেল টারজান।

সে রাতটা কেবিনের চারটি মানুষের কি ভাবে কেটেছিল ভাবা যায় না। পরদিন ভোরে কামানের তোপ শুনে চমকে সবাই জেগে উঠল। সবার আগে ছুটে বাইরে গিয়ে ক্লেটন দেখল উপসাগরের মুখে দু'টি জাহাজ নোঙর করেছে। একটি সেই অ্যারো, অন্যটা একটা ফরাসী ক্রুইজার। তার ডেকে মেলা লোকজন। কিন্তু তীর থেকে তারা এত দূরে যে দূরবীন দিয়েও হয়তো এদের ছোট দলটিকে দেখতে পাচ্ছিল না।

এসমারেল্ডা লাল সায়া নাড়ল। অন্যরা সাদা শার্ট নাড়ল। ক্লেটন বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে উপসাগরের মুখে পৌঁছে, বেশ কয়েকটা জায়গায় কাঠ-কুটোর স্তূপে আগুন জ্বালাল। তার ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে বনের গাছের মাথার ওপর উঠতেই ডেকের দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। জাহাজ দুটো রওনা হবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ফরাসী জাহাজটি তীরের দিকে ফিরল, অ্যারো সেখানেই ভাসতে লাগল।

তীর থেকে কিছু দূরে জাহাজ নোঙর করল। একটা নৌকো নামানো হলো। নৌকো থেকে একজন অল্পবয়সী অফিসার নেমেই বলল, 'আপনিই নিশ্চয় ক্লেটন!'

ক্লেটন বলল, 'ভাগ্যিস আপনারা এসে গেছেন। এখনো হয় তো বড় বেশি দেরি হয়ে যায়নি।'

সব শুনে অফিসার অবাক হয়ে দুঃখ করে বলল, 'হায় ভগবান, কাল এসে পৌঁছলেও এ-বিপদ হতো না।'

তারপর আরো অনেকগুলো নৌকোও নামানো হলো। ক্লেটনের নির্দেশমতো জাহাজটাকে উপসাগরের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা হলো। শেষ নৌকোতে ছিলেন জাহাজের কম্যাণ্ডার। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কুড়িজন নাবিক আর দুইজন অফিসার দিয়ে একটি সার্চ পার্টি তৈরি করে ফেললেন। তাদের সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র খাবার-দাবার দেওয়া হলো। দেখা গেল নাবিকরা সবাই যেতে প্রস্তুত। অত দরকার ছিল না।

কম্যাণ্ডারের নাম ক্যাপ্টেন ডুফ্রান্। তিনি বললেন, মাসখানেক আগে মহাসাগরে, অ্যারো জাহাজকে দেখা গেল পাল তুলে মহাবেগে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলেছে। কোনো সংকেতের জবাবও দিল না। ঐ ভাবে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। ক্রুইজারের কাজ টহল দেওয়া, কাজেই এর পর ওটা নিয়ে ওরা আর মাথা ঘামায় নি। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে তাকে আবার দেখা গেল। উত্তাল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। বোঝা গেল তার হাল ধরবার কেউ নেই। পাল ছিঁড়ে ঝুলছে। এত ঝোড়ো আবহাওয়া যে জাহাজটাতে উঠবার চেষ্টা করাও বিপজ্জনক। হাল ছেড়ে চলেই আসছিল ওরা, এমন সময় দেখে একটা আধমরা চেহারার লোক রেলিং আঁকড়ে ধরে, দুর্বল ভাবে ইশারা করছে।

অনেক কষ্টে জাহাজে উঠল কয়েকজন। উঠে যে বীভৎস দৃশ্য দেখল সে বর্ণনার বাইরে। জনা বারো মৃত আর অর্ধমৃত লোক ডেকে পড়ে আছে। দুটোকে কিছুতে খুবলে খেয়েছে। সে যাই হোক, কিছু পরে অ্যারো জাহাজ আবার উপযুক্ত হাতে পড়ে ঠিক দিকে চলল। মৃতদের সলিলসমাধি দেওয়া হলো। অর্ধমৃতদের কেবিনে নিয়ে গিয়ে ওষুধপত্র দেওয়া হলো। প্রথমটা সকলেই অজ্ঞান অচেতন। কারণটাও বোঝা গেল। জাহাজে এক ফোঁটা জল বা খাবার নেই!

অ্যারোর নাবিক ক-জন একটু সুস্থ হলে তাদের কাছে সমস্ত অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা শোনা গেল। যে লোকটাকে মেরে গুপ্তধনের সঙ্গে পুঁতে ফেলা হয়েছিল, সে ছাড়া কেউ জাহাজ চালাতে জানত না। সে জাহাজ যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছবে না, তাতে আশ্চর্য কি! প্রফেসর ও তাঁর দলবলকে ঠিক কোন্ জায়গায় নামিয়ে দিয়েছে, তাই ওরা বলতে পারছিল না। সেই জন্য ক্রুইজারটা নিয়ে তীর পর্যবেক্ষণ করে ঘুরে বেড়ানো ঠিক হয়েছিল। ঠিক তখনি ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে ওদের খুঁজে পাওয়া গেল।

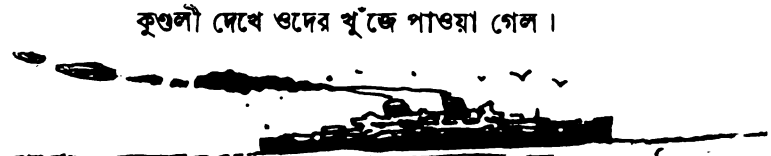

এ সব কথা শুনতে শুনতে সার্চ পার্টির কুড়ি জন নাবিক, দুইজন অফিসার, প্রফেসর পর্টার আর ক্লেটন যাবার জন্য তৈরি হলেন। তারপর বনের মধ্যে সেই বিফল যাত্রা শুরু হলো।

প্রথমটা খুব ভয় পেয়েছিল জেন। বিকট দৈত্যের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, এ আবার কি নতুন বিপদে পড়া গেল! তারপরেই বুনো রক্ষাকর্তাটির দেবতার মতো সুন্দর চেহারা আর নির্মল নিষ্পাপ মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারল এ তার কোনো ক্ষতি করবে না।

তীরবেগে গাছের মগডালের তলা দিয়ে টারজান তাকে বনমানুষদের দুমদুম উৎসবের খোলা জায়গায় নামাল। চারদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। হিংস্র জন্তুরা এখানে আসে না। এইখানে নরম ঘাসের উপর তাকে নামিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে সাহস দিয়ে টারজান আবার লাফ দিয়ে গাছে চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। জেন তো ভয়েই মরে। আর যদি সে না আসে? যদি কোনো বিকট জানোয়ার গাছ থেকে নেমে আসে?

সব বৃথা ভয়। একটু পরেই রাশিরাশি নানা রকম ফলের গোছা নিয়ে টারজান ফিরে এলো। দুম-দুম বাজাবার মাটির ঢিপির ওপর বসে জেন খুব তৃপ্তি করে সে-সব খেল। টারজান পাশে বসে ফল ছাড়িয়ে, বিচি ফেলে, ওর হাতে তুলে দিল। নিজেও খেল।

চারদিকে কি শান্তি। জায়গাটাকে আর মানুষটাকে বড় ভালো লাগল জেনের। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে দেখল, সে কিছুই বোঝে না। তবু তাকে একেবারে বুনো বলা যায় না। ব্যবহারে ভারি একটা ভদ্রতা। গলায় একটা হীরের লকেট দেওয়া সোনার হার।

খাওয়া-দাওয়ার পর আরো দু-তিনবার বনে গিয়ে টারজান অনেক নরম ঘাস, বড় বড় পাতাওয়ালা ফার্ণ-গাছ ইত্যাদি নিয়ে এসে, একটা গাছের গোড়ায় বেশ একটা ছাউনির মতো করে দিল। তাতে ঘাসের বিছানা পাতা হলো। তারপর জেনের হাতে আত্মরক্ষার জন্য ছোরাটি দিয়ে, নিজে ছাউনির দরজার বাইরে সারারাত শুয়ে রইল, যাতে কোনো জানোয়ার না ঢুকতে পারে।

তার আগে আরেকবার ফলমূল খাওয়া হলো। খিদে তেষ্টা দুই-ই তাতে দূর হলো। তখনো দিনের আলো যায় নি। লকেটের বিষয়ে জেনের কৌতূহল দেখে, সেটি খুলে টারজান জেনের হাতে দিল। খুট করে লকেট খুলে জেন দেখে ভিতরে সুন্দর দু'টি ফটো। একটি কোনো সুন্দর মেয়ে আর অন্যটির সঙ্গে টারজানের মুখের অদ্ভুত সাদৃশ্য! লকেটটা টারজানের মুখের পাশে ধরতেই, কি যেন মনে পড়ল তার। তীরের খাপের ভিতর থেকে সযত্নে কাগজে মোড়া ফটোটি বের করে জেনের হাতে দিল। এ যে সেই একই লোকের ছবি! তার নাম গ্রেস্টোক, লেখা রয়েছে। এগুলো কি টারজান ঐ কেবিনে কুড়িয়ে পেয়েছিল? তাহলে ওর সঙ্গে এত সাদৃশ্য কেন? শুতে যাবার আগে টারজান এক রকম জোর করে চেন-লকেটটা জেনকে দিয়ে দিল। না নিলে দুঃখিত হবে বুঝে জেন বেশি আপত্তি করল না।

সকালে ঘুম ভাঙলে জেন টারজানকে কোথাও দেখতে পেল না। একটু পরেই সে আরো ফল নিয়ে ফিরে এলো। দু'জনে একসঙ্গে প্রাতরাশ করবারপর, টারজান ছাউনি থেকে তার ছোরাটা এনে খাপে ভরল। তারপর উঠে পড়ল। জেন বুঝল, এবার বাড়ি যাবার সময় হয়েছে।

আবার টারজান তাকে এক বগলে নিয়ে এক লাফে গাছে চড়ে রওনা দিল। সে অনেক দূরে। পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। জেনের ইচ্ছা ছিল টারজানকে নিয়ে ঘরে ঢোকে, কিন্তু টারজান মাথা নেড়ে, ওকে একটু আদর করে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ দূরে অনেক গুলির শব্দ শোনা গেল। কোথাও গোলমাল বেধেছে। টারজান সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে জানিয়ে দিল সেইখানে যাচ্ছে। তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এদিকে কেবিনের দরজা খুলে ফিল্যাণ্ডার আর এসমারেল্ডাও বেরিয়ে এসেছিল। আধো অন্ধকারে জেন কেবিনের দিকে এগিয়ে যেতেই, ফিল্যাণ্ডার চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'ওরে বাবা! এ যে সিংহী! ঘরে চল, ঘরে চল!' আর বলতে হলো না। এসমারেল্ডা ঘরে ঢুকেই দড়াম করে দরজা এঁটে দিল। ফিল্যাণ্ডার রইলেন বাইরে! তিনি দরজা পেটাতে লাগলেন, 'ওরে খোল্, খোল্! আমাকে সিংহীতে খেয়ে ফেলল!' আর দরজা খোল্! এসমারেল্ডা ততক্ষণে মূর্ছা গেছে।

ফিল্যাণ্ডার শুনেছিলেন বাঘ-সিংহরা মরা জানোয়ার খায় না। তাই অমনি চোখ বুজে ও কাঠ হয়ে শুয়ে পড়লেন। সিংহীটা এসে পড়ল বলে! এঁদের কাণ্ড দেখে জেন তো অবাক! তারপর ফিক্‌ফিক্ করে হেসে ফেলল। সে হাসি কানে যেতেই পাশ ফিরে ফিল্যাণ্ডার বললেন, 'এ্যাঁ! জেন্

নাকি? জেন্ আবার কোত্থেকে এলো? কোথায় গিয়েছিলে? কি করে?'

জেন বলল, 'অত কথার কি উত্তর দেওয়া যায়, কাকা?'

—'তা বটে, তা বটে। তোমাকে নিরাপদে ফিরে পেয়ে বিস্ময়ে আর আনন্দে কি আমার মাথার কিছু ঠিক আছে?

এদিকে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে সার্চ পার্টিটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল। জেনের দেহাবশেষ ছাড়া আর কিছু পাবার আশা কারো মনে ছিল না। ফরাসী লেফটেনান্ট ডার্ণো পদে পদে বুঝতে পারছিলেন তাকে উদ্ধার করার কোনো আশা নেই, তবু প্রফেসরের আর ক্লেটনের শোকার্ত মুখের দিকে চেয়ে ফেরার কথা উত্থাপন করতে পারছিলেন না। হাতি চলার পথ ধরে ওঁরাও এগোচ্ছিলেন। ডার্ণো ছিলেন সবার আগে। হঠাৎ ঝোপের মধ্যে থেকে জনা ছয়-সাত কালো মানুষ তাঁকে ঘিরে ফেলল। অন্যরা খানিক পেছিয়ে পড়েছিল। একটা জোরে চিৎকার দিয়ে সকলকে সাবধান করে দেবার সময়টুকু মাত্র পেলেন, তারপর কালোরা তাঁকে টেনে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল।

অন্যরা রিভলবার নিয়ে দৌড়ে এসে তাঁকে দেখতে পেল না। খালি ঘন বনের আড়াল থেকে একটা বর্শা এসে এক হতভাগ্য নাবিককে গেঁথে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক তীর। বনের দিকে আন্দাজে অনেকগুলো গুলি ছোঁড়া হলো। তার ফলাফল জানা গেল না। নাবিকরা কালোদের খোঁজে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর তাদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই হলো। চারজন নাবিক প্রাণ হারাল। কালোরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে, হাতি চলার পথটাকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত ভগ্নহৃদয় দলটি সেখানে ধুনি জ্বেলে রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করতে লাগল। ডার্ণোকে উদ্ধার করার আশাও রইল না।

এই কালোরা হলো নরখাদক এম্বঙ্গার গাঁয়ের লোক। একটা সাদা শিকার নিয়ে যোদ্ধারা ফিরেছে, এই খবর রাষ্ট্র হতেই গাঁয়ে আনন্দ উল্লাস পড়ে গেল। ডার্ণো প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মরতেই যখন হবে পুরুষের মতো মরবেন—এই সংকল্প করেছিলেন। গ্রামে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। তীরের খোঁচায়, বর্শার খোঁচায় দেহ রক্তাক্ত হয়ে গেল। ছোটদের আর মেয়েদের বীভৎস আনন্দ দেখে তিনি অবাক্ হলেন। তারপর গ্রামের মধ্যিখানের বড় খুঁটিতে তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হলো। তখন তাঁর আধা অচেতন অবস্থা। ঐ খুঁটিতে যাদের বাঁধা হয়, তারা কখনো ছাড়া পায় না, নরখাদকদের এই নিয়মের কথা তিনি শুনেছিলেন। মনে মনে দ্রুত মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। এবার খুঁটির চারদিকে আগুন ধরানো হবে।

এদিকে দূর থেকে সেই গুলিবর্ষণের শব্দ টারজানের কানে যাওয়ামাত্র সে রওনা হয়ে পড়ল। ঐ গুলির অর্থ তার বুঝতে দেরি হয়নি। সে তীরবেগে গাছ পথে সোজা এম্বঙ্গার গাঁয়ের দিকে চলল। আধ মাইল দূরে ফরাসীদের ক্যাম্পের ধুনির আগুন দেখতে পেলো! তার চেয়েও ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ এম্বঙ্গার গ্রামের লোকদের উল্লসিত চিৎকার। কে জানে বড় বেশি দেরি হয়ে গেল কি না! তবে শেষের সে পৈশাচিক চিৎকার এখনো শোনা যায় নি।

গাঁয়ের ওপরে ঝুঁকে পড়া গাছের ডাল থেকে টারজান দেখল, সাদা মানুষটার দেহ অসাড় হয়ে ঝুলে রয়েছে! এক্ষুণি ছোরা নিয়ে এম্বঙ্গা তার একটা কান কেটে ফেলবে। খুঁটিটা গাছ থেকে চল্লিশ ফুট দূরে। হঠাৎ আকাশ ভেদ করে বনমানুষের বিকট জয়ধ্বনি শোনা গেল। দড়ির ফাঁস নিয়ে টারজান তৈরি হয়েছিল। লোকগুলোর উন্মত্ত নাচ এক মুহূর্তে বন্ধ হলো। অল্প আলোতে দড়িটা দেখা যাচ্ছিল না। শাঁই শব্দ করে সেটা কালোদের মাথার উপর দিয়ে একটা বিশালদেহী গ্রামবাসীর গলায় বসল। ভয়ে কাঠ হয়ে গাঁয়ের লোকরা দেখল তার শরীরটা গড়িয়ে গাছতলায় পৌঁছে সটাং শূন্যে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পড়িমরি করে গাঁ খালি করে সবাই ফটকের দিকে ছুটল।

ডার্ণো চোখ খুলে এ-সমস্তই দেখল। তারপর ধড়াম করে কালো লোকটার মৃতদেহ নিচে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ এক দৈত্যও নেমে এলো। ডার্ণো তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কি সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা! টারজান এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে, তার বাঁধনগুলো কেটে দিল। সে পড়েই যেত, কিন্তু টারজান তাকে তুলে ধরে এক লাফে গাছে উঠে পড়ল। মনে হলো শূন্য দিয়ে উড়ে চলেছে। ডার্ণো জ্ঞান হারাল।

ভোর হতেই ফরাসীরা ক্যাম্প তুলে বিষণ্ণ মনে কেবিনের পথ ধরল। সঙ্গে তাদের ছয়টি মৃতদেহ। যখন কেবিনের কাছে পৌঁছল তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। কেবিনের দরজায় জেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে

প্রফেসর আর ক্লেটন তাঁদের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেলেন।

শেষে জেন জিজ্ঞাসা করল, 'সেই বনবাসীর কি হলো? সে তোমাদের খুঁজতে গিয়েছিল!'

ক্লেটন বলল, 'কার কথা বলছ?'

—'কেন, যে আমাদের দলের সকলের প্রাণ বারবার বাঁচিয়েছে।'

—'কই তাকে তো দেখলাম না। হয়তো সে তার দলের লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, ঐ যারা আমাদের আক্রমণ করেছিল।'

জেন বলল, 'কখনো না। ওরা তো অসভ্য!'

—'এদিকে তো অসভ্য জাতি ছাড়া কেউ থাকে না। সে-ও নরখাদক হলে আশ্চর্য হবো না!'

জেন বলল, 'না, সে একজন ভদ্রলোক। ঠিক ফিরে আসবে, দেখো!'

পর দিন সকালে ডার্ণোকে উদ্ধার করবার জন্য দলবল নিয়ে এম্বঙ্গার গাঁয়ে হানা দিল শ'দুই সশস্ত্র সৈনিক, দশজন অফিসার, দু'জন ডাক্তার। বিছানাপত্র, ওষুধ, খাবার-দাবার সব সঙ্গে গেল। গাঁটাকে ঘেরাও করে ফেলা হলো, তারা ফটক বন্ধ করবারও সময় পেল না। যোদ্ধারা লড়াই দিলেও, এদের সঙ্গে পারবে কেন? বহু যোদ্ধা মারা পড়ল, তবে মেয়েদের আর ছোটদের কেউ কিছু বলল না। কিন্তু ঘরে ঘরে খোঁজ করেও ডার্ণোর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। একটা রাত গ্রামে রইল সকলে। যোদ্ধারা সবাই তাদের বন্দী। এমন কি গাঁ জ্বালিয়ে দেবার কথাও উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত পরদিন সকালে বন্দীদের ছেড়ে দিয়ে, গাঁ অক্ষত রেখেই ওরা ফিরে এলো। সঙ্গে আটজন আহত আর দু'টি মৃতদেহ। ডার্ণোর জন্য সকলের মন খারাপ। তারা ধরে নিয়েছিল তাকে এরা মেরে খেয়ে শেষ করে এখন ভালোমানুষ সাজছে।

দলের সঙ্গে ক্লেটনও গিয়েছিল। সে ফিরে এসে আবার টারজান সম্বন্ধে জেনের কাছে নানা অযোগ্য সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত জেন রাগ করে উঠে গেল। আসলে টারজানের প্রতি জেনের শ্রদ্ধা দেখে ক্লেটনের হিংসা হচ্ছিল। লোক সে খারাপ ছিল না। পরে চিঠি লিখে ক্ষমাও চেয়েছিল।

টারজানের লেখা সেই চিঠিটা জেন বাইরে কুড়িয়ে পেয়ে, পড়ে অবাক হয়েছিল। ওর মনে ধারণা হয়েছিল যে টারজান বলে মানুষটি আর ঐ সুন্দর বনবাসী দু'জন আলাদা লোক। টারজান ইংরিজি জানে, লিখতেও পারে। এ কেবিনটা তার। বনবাসীটি বনেই থাকে। কোনো সভ্য ভাষা জানে না। কিন্তু সে বড় ভালো। জেনের তাকে বড় ভালো লাগে।

চোখে ঘুম আসে না জেনের। এসমারেল্ডা ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে দেখে তাকে ঠেলে তুলে দিল। সে ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, 'কোথায়? হিপ্নোনোসেরস বুঝি? কই সে?'

জেন চটে গেল, 'তোমার ঘুম যথেষ্ট খারাপ এসমারেল্ডা, কিন্তু জেগে ওঠাটা আরো খারাপ। বরং ঘুমিয়েই পড়।'

সে বলল, 'হ্যাঁ। তুমিও বরং তাই করো। তুমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়ছে না? তা হবে না, মিঃ ফিল্যাণ্ডার যে-সব বিকট জন্তুর গল্প বলেন!' জেন হেসে ফেলল।

জ্ঞান ফিরলে ডার্ণো দেখে সে নরম ঘাস পাতার বিছানায় ডালপালা দিয়ে তৈরি একটা তাঁবু ধরনের ছাউনির তলায় শুয়ে আছে। চারদিকে খাস জমি, তাকে ঘিরে সবুজ দুর্ভেদ্য জঙ্গল। সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, শরীরের প্রতিটি হাড়ে স্নায়ুতে অসহ্য যন্ত্রণা। আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়ল। সাদা মানুষটি ওকে বাঁচিয়েছিল। তারই কোলে সে জ্ঞান হারিয়েছিল। কপালে কি আছে কে জানে! কাউকে ধারে কাছে দেখা যাচ্ছে না। খালি পাখির কলরব, কীটপতঙ্গের গুঞ্জন। কেমন যেন দেহ মন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

আবার যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা হয়েছে। ছাউনির ফাঁক দিয়ে একটা সাদা মানুষের বলিষ্ঠ পিঠ দেখা যাচ্ছিল। ক্ষীণস্বরে ডাক দিতেই সে কাছে এসে ওর কপালে শীতল একটা হাত রাখল। তার সুন্দর মুখখানি দেখে ডার্ণোর সব ভাবনা দূর হয়ে গেল। তার সঙ্গে নানা ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলবার চেষ্টা করল ডার্ণো, কিন্তু সে কিছুই বুঝল না। মনে হলো, বড় করুণ ভাবে মাথা নাড়ল সে। যেন বুঝতে পারছে না বলে ভারি দুঃখিত।

ডার্ণোর ক্ষতগুলো পরীক্ষা করে, সাদা লোকটি চলে গেল। কিছু পরে লাউয়ের খোলায় ভরে জল আর ফলমূল নিয়ে ফিরে এলো। জ্বর আসেনি দেখে ডার্ণো নিজেই অবাক হলো। লোকটি আবার উঠে গিয়ে খানিকটা গাছের ছাল আর একটা পেন্সিল নিয়ে লিখতে বসল। ডার্ণো দেখে অবাক হলো যে গাছের ছালে স্পষ্ট হরপে ইংরিজিতে লেখা—'আমি বনমানুষদের ছেলে টারজান। তুমি কে? এ ভাষা

পড়তে পার ?'

ডার্ণো পেন্সিলটা নিয়ে মুখে বলল, 'হ্যাঁ। ইংরিজি পড়তে পারি, বলতেও পারি। তাহলে কথাই বলা যাক।'

সে মাথা নেড়ে গাছের ছালটা দেখিয়ে দিল। ডার্ণো আশ্চর্য হলো, তবে কি লোকটা বোবা? হয়তো কালা-বোবা। সে লিখল, 'আমি পল ডার্ণো, ফরাসী নৌবহরের লেফটেনাণ্ট। তুমি ইংরিজি লেখ, কিন্তু বল না কেন?'

টারজান লিখল, 'আমি আমার জাতের ভাষাই খাল বলি, বনমানুষদের ভাষা। তাছাড়া তান্তর হাতি, নুমা সিংহ আর অন্য বনবাসীদের ভাষাও কিছু কিছু। কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলিনি। জেন পর্টারের সঙ্গে একবার ছাড়া। লিখে কথা বলছি এই প্রথম।'

এ রহস্যটা বুঝে উঠল না ডার্ণো। জিজ্ঞাসা করল জেন পর্টার কোথায়?

—'টারজানের ঘরে, নিজের লোকদের কাছে।'

—'ওর কি হয়েছিল?'

—'টেরকজ বলে বনমানুষ ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে মেরে ফেলেছি। তুমি ভালো হলে, তোমাকেও ওদের কাছে দিয়ে আসব।'

এর পর ডার্ণোর খুব জ্বর হলো। তাকে নিয়ে যাবার কোনো কথাই ওঠে না, কিন্তু তাদের যদি টারজান এখানে আনে? টারজান লিখল, 'তোমাকে একা রেখে গেলে অন্য বনমানুষরা মেরে ফেলবে।'

দু-তিন দিন পরেই টারজানকে ধরে ডার্ণো কয়েক পা হাঁটতেও পারল। এর মধ্যে একবার ডার্ণো লিখেছিল, 'তুমি আমার জন্য এত করছ, আমি কি করতে পারি?'

—'আমাকে মানুষের ভাষা বলতে শেখাও।'

—তখুনি লেখাপড়া শুরু হয়ে গেল। আশেপাশের সব জিনিসের ফরাসী নাম শিখল টারজান। ডার্ণোর কাছে তার নিজের ভাষাটাই সহজে আসত। টারজানের মতো ভালো ছাত্র হয় না। কয়েক দিনের মধ্যেই সে ছোট ছোট ফরাসী বাক্য বলতে পারত। ওটা গাছ। এটা ঘাস। আমার খিদে পেয়েছে। ইংরিজিতে ছোট ছোট পাঠ লিখে দিত ডার্ণো। টারজান সেগুলো ফরাসী করে পড়ত। নিয়মটা হয়তো ভুল কিন্তু ততদিনে টারজানের শিক্ষা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল।

তিন দিন পরে টারজান লিখল, 'এবার তোমাকে পিঠে করে আমার ঘরে অন্যদের কাছে নিয়ে যাই?'

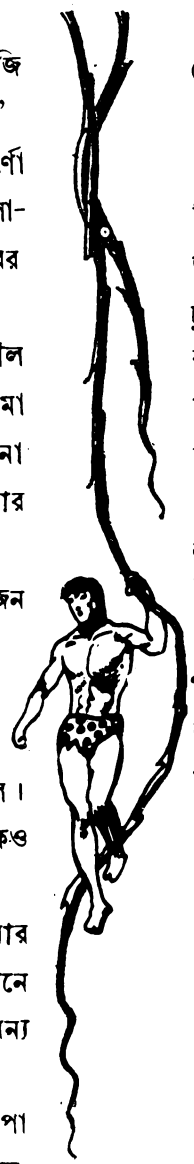

ডার্ণো তো যেতেই চায়। —'কিন্তু অতদূরে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে আমাকে?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

তখনি রওনা হয়ে বিকেলের দিকে পৌঁছে গেল ওরা। কিন্তু গিয়ে দেখে, হায়, হায়, কেউ কোথাও নেই! উপসাগরে জাহাজ দুটোও নেই। পাগলের মতো ডার্ণো ছুটে ঘরে ঢুকে দেখল অস্ত্র-শস্ত্র, খাবার-দাবার, বিছানা, কম্বল মজুত রাখা আছে। মানুষ একজনও নেই। তবে কি তারা আবার ফিরে আসবে? তারপর চেয়ে দেখল টেবিলে টারজানের নামে দু'খানি চিঠি।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে টারজানকে ডাকাডাকি করতে লাগল ডার্ণো। সে-ও কোথাও নেই। সে-ও ওকে ফেলে নিজের দলের কাছে ফিরে গেছে!

এদিকে বুক ভরা হতাশা নিয়ে টারজান তীরবেগে গাছে গাছে ঝুলে ঘন বনের দিকে চলেছে। হঠাৎ একটা খটকা লাগল। 'আমি কি তা হলে মানুষ নই, একটা বনমানুষ মাত্র? ঐ লোকটা নুমার, কি শাবরের, কি শীতার সঙ্গে লড়তে পারবে? আমি যদি বনমানুষ হই তাহলে অন্য বন-মানুষদের মতো সঙ্গীকে বিপদে ফেলে নিজে পথ দেখব। আর যদি মানুষ হই তো ফিরে যাব।'

এদিকে কেবিনের দরজা বন্ধ করে, একটা বন্দুকে গুলি ভরে, হাতের কাছে রেখে, টেবিলের ওপর থেকে পুরুষ হস্তাক্ষরের চিঠিটা খুলে ডার্ণো দেখল, ক্লেটন লিখেছে, টারজানকে সম্বোধন করে।

"আপনার ঘরদোর ব্যবহার করতে পারার জন্য অনেক ধন্যবাদ। দেখা হলো না, এই দুঃখ। কোনো জিনিস নষ্ট করিনি, বরং কিছু এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আপনার নির্জন কুটিরে কাজে লাগতে পারে। যে আশ্চর্য শ্বেতাঙ্গটি বহুবার আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে, তার সঙ্গে চেনা থাকলে তাকেও আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবেন।

আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চিরকালের মতো এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনাদের সদয় ব্যবহারের কথা কখনো ভুলব না তার প্রতিদানে আমরা কিছুই করতে পারিনি। ইতি—বিনীত উইলিয়ম সেসিল ক্লেটন।"

—'তাহলে ওরা আর ফিরবে না!' হতাশ কণ্ঠে এই কথা বলে খাটের উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ডার্ণো।

ঘণ্টাখানেক পরে চমকে উঠে বসল। কিছু একটা দরজা খুলতে চেষ্টা করছে। সন্ধ্যা নেমেছে, ঘর অন্ধকার, তবু

দেখা গেল দরজার হুড়কোটা আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। তারপর যেই না দরজাটা এক চিলতে খুলেছে, সেই ফাঁক দিয়ে টিপ করে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিল ডার্ণো।

এবার কিছু আগের ঘটনায় ফিরে যাওয়া যাক। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ দুটো চলে যায়নি। বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করেছিল। একমাত্র জেনের আরো কিছুদিন থাকার ইচ্ছা। অন্য সকলে অপেক্ষা করার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছিল না। ডার্ণো যে বেঁচে নেই সে বিষয়ে জেন ছাড়া সকলে নিঃসন্দেহ। ডার্ণোর অস্ত্র-শস্ত্র, পোশাক-আশাক এম্‌বঙ্গার গাঁয়ে পাওয়া গিয়েছিল। সেই তো যথেষ্ট প্রমাণ। তাদের প্রচুর সাজাও দেওয়া হয়েছে। এখন চলে যাওয়াই উচিত।

আর ঐ সাদা বনবাসীর জন্য অত ভাবনা কিসের? সে-ও ওদেরই দলের লোক। এদের অনেক উপকার করলেও শেষ রক্ষা করল কোথায়? স্রেফ সরে পড়ল। তার ওপর জেনের বড় বেশি টান দেখে ক্লেটনের বিদ্বেষ আরো বেড়ে যেতে লাগল। সে সকলের কাছে যা-তা বলতে লাগল। ক্রমে এদের অনেকখানি প্রত্যয় হলো। সত্যি তো, সে যদি লোক ভালো হতো তো এ সময়ে গেল কোথায়! জেনের বাবাও বিরূপ হলেন।

অনেক বলে কয়ে অপেক্ষা করার মেয়াদ আরো সাত দিন বাড়িয়েও, শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে জেনও যাবার আয়োজন করতে লাগল। যাবার আগে একবার হাঁটু গেড়ে ঐ সুন্দর বনদেবতার মতো মানুষটির মঙ্গল প্রার্থনা করল। মনে মনে বলল, 'সকলে তোমাকে অবিশ্বাস করলেও, আমি কিন্তু বিশ্বাস হারাইনি। তুমি আমাকে ডাকলেই আমি চলে যেতাম।'

অবশেষে সত্যি সত্যি লোক বোঝাই জাহাজ দুটি রওনা হয়ে গেল। জেনের মনটা কিন্তু পিছনে পড়ে রইল।

গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল আর একটা লোক হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ল। ভয়ের চোটে ডার্ণো আরেকবার বন্দুক তুলেই দেখে সে টারজান! অমনি দুঃখে অনুতাপে চেঁচিয়ে উঠে টারজানের মাথাটা তুলে কোলে নিল। কোনো সাড়া নেই। বুকে কান পেতে শুনল হৃৎপিণ্ডটা শান্তভাবেই ধুকধুক করছে। গুলিটা কোথাও লাগেনি, মাথার খুলি ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। আঃ, বাঁচা গেল।

তখন টারজানকে তুলে খাটে শুইয়ে ডার্ণো আলো জ্বালল। তারপর তার মুখে মাথায় জলের ছিটে দিল। চোখ খুলে সে অবাক হয়ে ডার্ণোর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ডার্ণো তাড়াতাড়ি একটা কাগজে তার ভুল বোঝার কথা লিখে দেখাল। উঠে বসে টারজানের সে কি হাসি! ফরাসীতে বলল, 'এ তো কিছুই নয়!' আর ভাষার বিদ্যায় কুলোল না। কাগজে লিখল, 'বোল্‌গানি, কেরচাক আর টেরকজ মরার আগে আমার কি অবস্থা করেছিল, সে যদি দেখতে!'

তখন ডার্ণো চিঠি দুটি দিল। ক্লেটনেরটাতে একবার চোখ বুলিয়ে সরিয়ে রেখে, অন্যটা টারজান উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। খামে বন্ধ চিঠি সে কখনো দেখেনি। ডার্ণো খাম খুলে চিঠি বের করে দিল। জেন পর্টার টারজানকে লিখেছে—

"যাবার আগে আমিও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলে না বলে আমাদের বড় দুঃখ। আরেকজনকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই। তার নাম জানি না। লম্বা চওড়া শ্বেতাঙ্গ দৈত্যের মতো চেহারা, গলায় একটা হীরের লকেট ছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে, তাঁকে বলো যে তার জন্যে সাত দিন অপেক্ষা করেছিলাম।

আরো বলো, আমাদের বাড়ি অ্যামেরিকায়। বল্টিমোর শহরে। সেখানে যদি সে আসে, আমরা বড় খুশি হবো। ইতি—জেন পর্টার।"

অনেকক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল টারজান। চিঠি দুটো পড়ে বোঝাই হচ্ছিল ওরা টের পায়নি যে ও আর টারজান আলাদা মানুষ নয়। ওর যে মনে হয়েছিল ওর প্রতি জেনের মনে একটু ভালোবাসা জন্মেছে, সে ধারণাও বোধ হয় ভুল।

শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ে ডার্ণোকে গুড্‌-নাইট্‌ বলে জেনের পাতার বিছানায় টারজান শুয়ে পড়ল। ডার্ণোও খাটটাতে শুয়ে পড়ল। এর পর এক সপ্তাহ ধরে ওরা বিশ্রাম করল। ডার্ণো রোজ টারজানকে ফরাসী ভাষায় পাঠ দিত। তার ফলে টারজানের মুখে ফরাসীটা বেশ সড়গড় হয়ে এলো।

এক দিন রাতে শুতে যাবার আগে টারজান হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যামেরিকা কোথায়?'

ডার্ণো উত্তর-পশ্চিম দিকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ দিকে, বহু হাজার মাইল সমুদ্র পার হয়ে যেতে হয়। কেন?'

—'আমি সেখানে যাব।'

—ডার্নো মাথা নাড়ল, 'সে তো অসম্ভব কথা বন্ধু।'

টারজান উঠে আলমারি খুলে একটা বহু ব্যবহৃত ভূগোলের বই বের করে, পৃথিবীর মানচিত্র দেখিয়ে বলল, 'এটাকে আমি বুঝতেই পারি না। তুমি বুঝিয়ে দাও।'

তাই করল ডার্নো, 'এই দেখ, নীল জায়গাগুলো সমুদ্র। নানা রঙের জায়গাগুলো নানা দেশ।'

টারজান বলল, 'আমরা কোথায় আছি, দেখাও!'

ডার্নো দেখিয়ে দিল।

—'অ্যামেরিকা কোথায়?' ডার্নো তাও দেখাল।

টারজান বলল, 'তবে তো বেশি দূরে নয়। মাত্র এক বিঘৎ।'

ডার্নো বলল, 'ওটাই আসলে বহু দূরে।'

টারজান বলল, 'আফ্রিকায় সাদা মানুষ থাকে না?'

—'হ্যাঁ, থাকে।'

—'কোথায় থাকে?'

ডার্নো ম্যাপটাতে ওদের কেবিনের উত্তরে একটা ফুটকি দিয়ে বলল, 'এইখানে।'

—'এঁ্যা! এত কাছে?'

—'কাছে না বন্ধু, আসলে অনেক দূরে।'

—'সেখানে অ্যামেরিকা যাবার জাহাজ পাওয়া যায়?'

—'হ্যাঁ, যায়।'

—'বেশ, কাল আমরা সেখানে যাব।'

ডার্নো হেসে মাথা নাড়ল, 'বড় বেশি দূরে, ভাই। পথেই মরে যাব।'

টারজান বলল, 'তবে কি চিরকাল এখানে থাকতে চাও?'

—'না।'

—'তাহলে, কালই রওনা হবো। আমিও এখানে আর থাকতে চাই না। তার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।'

ডার্নো বলল, 'আমিও তাই।'

—'তবে তাই ঠিক রইল। কাল রওনা হওয়া।'

ডার্নো জিজ্ঞাসা করল, 'টাকা না থাকলে যাবে কি করে?'

টারজান অবাক হলো, 'টাকা আবার কি?'

অনেকক্ষণ সময় লাগল টাকার মানে বোঝাতে। শেষটা টারজান বলল, 'লোকেরা টাকা কোথায় পায়?'

—'খেটে রোজগার করে।'

—'আমিও তাই করব।'

ডার্নো বলল, 'না বন্ধু, টাকার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার নিজের যা আছে, দু'জনের পক্ষে সে-ই যথেষ্ট। দু'জন কেন, বিশজনের পক্ষেও যথেষ্ট। একটা লোকের হাতে অত টাকা থাকা ভালো না। যদি আমরা সভ্য জগতে পৌঁছতে পারি, তোমার যত লাগবে, আমিই সব দেবো।'

পরদিন ওরা সত্যি রওনা হয়ে গেল। সঙ্গে নিল একটা করে বন্দুক, তার জন্য গুলি, ছোট্ট বিছানা, কিছু খাবার, দু-তিনটে বাসন। শেষেরটাকে বাজে বোঝা মনে করে টারজান নিজেরগুলো ফেলে দিল। ডার্নো বলল, 'সভ্য জগতে রান্না জিনিস খায় সকলে।'

টারজান উত্তর দিল, 'সেখানে পৌঁছে শেখা যাবে। এখন থেকে ভালো মাংসের স্বাদ নষ্ট করব কেন?'

এক মাস ধরে ওরা ক্রমাগত উত্তর দিকে চলল। কখনো প্রচুর খাবার-দাবার পেতো, কখনো উপোস দিত। এতাবৎ কোনো অসভ্য জাতি বা বুনো জন্তুর দেখা পায়নি। আশ্চর্য রকম আরামেই এগোতে লাগল। রাতে ডার্নো ওকে সভ্য সমাজের হালচাল শেখাবার চেষ্টা করত। ছুরি কাঁটা ব্যবহার পর্যন্ত; ও-সব সঙ্গে এনেছিল ডার্নো। মাঝে মাঝে সেগুলো ফেলে দু'হাতে ধরে দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়ে খেত টারজান।

ডার্নো চটে যেত, 'আমি তোমাকে ভদ্রলোক বানাবার চেষ্টা করছি আর তুমি কিনা জন্তুদের মতো করে খেতে চাও!' লজ্জা পেয়ে টারজান আবার ছুরি কাঁটা তুলে নিত, যদিও মনে মনে সেগুলোকে দেখতে পারত না।'

যেতে যেতে এক দিন হঠাৎ নাবিকদের পোঁতা সেই সিন্দুকটার গল্প করল টারজান। সেটাকে সে তুলে অন্য জায়গায় পুঁতে রেখেছে তাও বলল। ডার্নো চমকে উঠল, 'ওটাই তাহলে প্রফেসর পটারের আবিষ্কৃত গুপ্তধনের সিন্দুক। নাবিকরা কেড়ে নিয়েছিল।'

টারজান বলল, 'তাহলে কালই ফিরে গিয়ে ওটাকে নিয়ে আসা যাক।'

ডার্নো আঁতকে উঠল, 'ফিরে যাব! বল কি! এই তিন হপ্তার পথ ফিরে গিয়ে ঐ ভারি সিন্দুক নিয়ে আবার আসা, সে কি চাট্টিখানিক কথা!'

—'তাহলে তুমি এগোও, আমি বরং নিয়ে আসি। ওঁর জিনিস আনতেই হবে।'

ডার্নো বলল, 'তার চেয়ে ঢের ভালো বুদ্ধি হলো, সভ্য

উপনিবেশে পৌঁছে একটা জাহাজ ভাড়া করে, সেখানে গিয়ে ওটাকে উদ্ধার করে আনা। কি বল? তাড়াতাড়িও হবে, নিরাপদও হবে।'

এতে টারজানের কোনো আপত্তি হলো না। বিশেষতঃ ডার্ণোকে একা ছেড়ে গেলে সে নিরাপদে সভ্য জগতে পৌঁছতে পারবে কি না, সে বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। যা অসহায় আর বোকা মানুষরা হয়! এতদিন টিঁকে আছে কি করে তাই বোঝা যায় না।

তাতে ডার্ণো বলেছিল, 'সত্যিই বনে একা ছেড়ে দিলে অসহায় বটে, কিন্তু একসঙ্গে কাজ করার সময়ে মানুষের সঙ্গে বনের জানোয়াররা কোনোভাবেই পেরে উঠবে না। তাদের সে বুদ্ধি, কৌশল, দূরদৃষ্টি কোথায়?'

টারজান বলল, 'তা সত্যি, ওরা এক জোট হয়ে কাজ করতে জানে না। কেরচাক যদি টুবলাটকে সাহায্য করত, আমি কি তাদের সঙ্গে পারতাম! এমন কি আমার মা কালাও কখনো ভবিষ্যতের কথা ভাবত না। কোথাও প্রচুর খাবার পেল তো যা পারে খেয়ে নিয়ে খালি হাতেই এগিয়ে যেত। পরে হয়তো অভাবে পড়ত।'

ডার্ণো আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তোমার মা-কে তুমি দেখেছিলে?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়। চমৎকার এক বনমানুষী। আমার চেয়ে মাথায় লম্বা, ডবল ওজন।'

—'আর, বাবা?'

—'তাকে দেখিনি। মা বলত, সেও ছিল নাকি আমারই মতো সাদা। লোম ছিল না।'

ডার্ণো বলল, 'টারজান, কালা তোমার সত্যিকার মা হতে পারে না। ও-রকম হয় না। তাছাড়া তোমার গায়ে বনমানুষের রক্ত থাকলে তুমি এইরকম উচ্চবংশজাত সভ্য মানুষের বুদ্ধি ও চেহারা পেতে না। তোমার পরিচয় সম্বন্ধে ঐ কেবিনে কি কিছুই লেখা পাওনি?'

টারজান বলল, 'সেখানকার সব বই-টই আমার পড়া। খাতার কিছুই বুঝতে পারিনি।' এই বলে তীরের খাপ থেকে ছোট নোটবইটি বের করে দিল।

নোটবই খুলেই ডার্ণো চমকে উঠল, 'আরে এ যে জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোকের ডায়েরী, ফরাসী ভাষায় লেখা।' তারপর কুড়ি বছর আগে লেখা ডায়েরীটা জোরে জোরে পড়ে শোনাল ডার্ণো। সে এত দুঃখ বেদনায় ভরা কাহিনী যে পড়তে পড়তে গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। টারজান তন্ময় হয়ে শুনছিল।

সেই করুণ কাহিনীতে একটুখানি আনন্দের আভাস ছিল, যেখানে ছোট খোকাটির কথা লেখা হয়েছিল। এক জায়গায় লিখেছিলেন, "আজ আমাদের ছেলের ছয় মাস পূর্ণ হলো। আমি স্বপ্ন দেখি বড় হয়ে একদিন সে তার ন্যায্য স্থান নিয়ে, গেস্টোক নামকে আরো সম্মানিত করবে। ঐ দেখ, আমার কথা যেন সমর্থন করবার জন্যেই ব্যাটা আমার কলম খাবলে ধরেছে।" ফলে এই পাতাটাতে তার কালিমাখা ছোট্ট হাতের সুন্দর একটা ছাপ পড়ে গেছে। —এইখানে খুদে হাতের ছাপটিও দেখা যাচ্ছিল।

বই পড়া হলে, মুখ তুলে ডার্ণো বলল, 'এতেও কি তোমার জন্ম-রহস্যের সমাধান হলো না, বন্ধু? তুমিই এখন লর্ড গ্রেস্টোক।'

টারজান মাথা নাড়ল, 'ডায়েরীতে তো একটি ছেলেরই কথা আছে। তার কংকালও ঐ কেবিনেই পাওয়া গেছে। কালাই আমার মা।' ডার্ণো অবিশ্যি সে-কথা মানল না।

এর এক সপ্তাহ পরে ওরা বনের মধ্যে খানিকটা খোলা জায়গা, কয়েকটা বাড়ি-ঘর আর শস্য খেত দেখতে পেল। সেখানে কয়েকজন কালো মানুষ কাজ করছিল। তাদের দেখেই টারজান তার ধনুকে বিষাক্ত তীর পরিয়ে তৈরি। ডার্ণো বাধা দিল, 'আহা, ওরা হয়তো বন্ধু লোক। মিছি-মিছি মারবে কেন? সাদা মানুষরা শুধু শত্রুদের মারে।'

টারজান তীর তুলে রেখে বলল, 'আমাদের বনে আমরা কালো দেখলেই মেরে ফেলি। ওরা সবাই আমাদের শত্রু।'

ডার্ণো বলল, 'আগে ওরা আক্রমণ করুক, তারপর মেরো।'

—'তাহলে চল, ওরাই আমাদের মারুক।' এই বলে শুধু একটি নেংটি পরা টারজান আগে আগে চলল। তার পেছনে ক্লেটনের ফেলে-যাওয়া পুরানো জামা প্যান্ট পরে ডার্ণো চলল।

কালোরা টারজানকে দেখে খুরপি কোদাল ফেলে ভয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পালিয়েছিল। তারপর ঘর থেকে বন্দুক কাঁধে একজন শ্বেতাঙ্গ বেরিয়ে এলেন। ডার্ণো চেঁচিয়ে বলল, 'গুলি করবেন না, আমরা বন্ধুজন।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে লোকটি ফরাসীতে বললেন, 'কোন্ দেশী লোক তোমরা?'

—'আমরা ইউরোপীয়। পথ হারিয়ে অনেক দিন বনে বনে ঘুরছি।'

বন্দুক নামিয়ে, হাত বাড়িয়ে তিনি এগিয়ে এলেন, 'আমি এখানকার ফরাসী মিশনের ফাদার কন্সট্যান্টাইন। তোমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাই।'

ডার্ণো বলল, ইনি মঁসিয়ে টারজান, আর আমি ফরাসী নৌবহরের লেফ্‌টেনান্ট ডার্ণো। টারজানও ওঁদের দেখাদেখি হাত বাড়িয়ে দিল। হাত ধরে ফাদার তাদের ঘরে নিয়ে এলেন। সভ্যজগতের সঙ্গে টারজানের প্রথম পরিচয় হলো। এক সপ্তাহ ওরা সেখানে বিশ্রাম করেছিল। মিশনের দক্ষ মেয়ে কারিগররা ওদের জন্য সাদা ড্রিলের কোট প্যান্ট সেলাই করে দিয়েছিল, যাতে ওরা ভদ্রবেশে যাত্রাপথে এগিয়ে যেতে পারে।

আরো এক মাস হাঁটার পর ওরা একটা চওড়া নদীর মুখে, কতকগুলো বাড়িঘর দেখতে পেল! নদীতে অনেক নৌকো ভাসছিল। এত লোকজন দেখে টারজান আবার একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে সভ্য সমাজের হাল-চালের সঙ্গে ওর আরো পরিচয় হতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ ধবধবে সাদা পোশাক পরা কায়দাদুরস্ত সুদর্শন ফরাসী ভদ্রলোককে দেখে সেই গাছে ঝোলা নেংটি পরা বনবাসী বলে কারো চেনার জো রইল না। এর মধ্যে লোকের সঙ্গে হেসে গল্প করতে সে শিখে গেছে। সেই ঘৃণিত কাঁটা-ছুরিও এমন দক্ষভাবে চালায় যে ডার্ণোও তার চেয়ে বেশি যায় না।

বাইরে থেকেও ডার্ণো তাকে একজন মার্জিত ফরাসী ভদ্রলোক বানিয়ে দিয়েছিল, অন্তরে অন্তরে যেমন সে আগেও ছিল। ছোট বন্দরটাতে পৌঁছেই ডার্ণো কেবল করে তিন মাসের ছুটি মঞ্জুর করে নিয়েছিল। টাকাকড়িও আনিয়েছিল। তবু জাহাজ ভাড়া করতে আরেক মাস দেরি হলো।

ঐ এক মাসে বন্দরের কালো ও সাদা অধিবাসীদের মধ্যে টারজানের গায়ের শক্তি আর দুঃসাহস একটা প্রবাদ বাক্যের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একবার একটা বিশাল দেহ খ্যাপা নিগ্রো ছোরা হাতে হোটেলের বারান্দায় উঠে, চারজন নিরীহ লোককে আক্রমণ করেছিল। তারা তো ভয়ে পালাল। তখন সে ব্যাটা টারজানের দিকে তেড়ে এলো। তাকে চেপে ধরে হাতে একটা মোচড় দিতেই হাড্ডিটা গেল ভেঙে, ছোরা গেল পড়ে, নেশার সঙ্গে খ্যাপামিও গেল ছুটে! সবাই দেখে স্তম্ভিত।

এর কিছুদিন পরে হোটেলের বারান্দায় বসে সন্ধ্যা-বেলায় খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, এমন সময় বনের মধ্যে সিংহের গর্জন শোনা গেল। একজন হেসে টারজানকে বলল, 'তুমি না বলেছিলে দলবল, বন্দুক, বীটার নিয়ে সিংহ শিকারে কোনো বাহাদুরি নেই? কেউ যদি খালি গায়ে খালি একটা দড়ি আর ছোরা নিয়ে বনে গিয়ে সিংহ মারতে পারে তবেই বোঝা যাবে।' বলা বাহুল্য ডার্ণো আর টারজান সকলের কাছ থেকে টারজানের পূর্ব ইতিহাস গোপন রাখাই স্থির করেছিল।

নতুন বন্ধুরা হাসতে লাগল। একজন বলল, 'ঐ তো সিংহ ডাকছে। এবার খালি গায়ে, ছোরা নিয়ে চলে যাও না!'

টারজান বলল, 'ছোরা আর দড়ি। কিন্তু আমার তো খিদে পায়নি। কারণ না থাকলে মারব কেন?'

সে লোকটার জেদ চেপে গিয়েছিল। সে বলল, 'বেশ, পাঁচ হাজার ফ্র্যাঙ্ক কি যথেষ্ট কারণ নয়?'

ডার্ণো বলল 'দশ হাজার।'

লোকটা বলল, 'দশ হাজারই সই।'

সঙ্গে সঙ্গে টারজান উঠে পড়ল। দড়ি আর ছোরা এনে বলল, 'বনের কিনারায় কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে যাব। ফিরতে যদি সকাল হয়ে যায়, খালি গায়ে তো ফেরা যাবে না!'

এবার সকলে বেশ ঘাবড়ে গেল। লোকটা কি সত্যি যাবে নাকি? নির্ঘাৎ মারা পড়বে! তারাও সঙ্গে সঙ্গে বনের কিনারা পর্যন্ত চলল, 'ও মশাই, ঢের হয়েছে। আপনি খালি হাতে খুব সিংহ মারতে পারেন। আর গিয়ে কাজ নেই।'

সেই লোকটা বলতে লাগল, 'কি সর্বনাশ! সত্যি চলল যে! আমি হার মানছি। আমি বাজি হেরে গেছি। এক্ষুণি টাকা দিয়ে দিচ্ছি। দোহাই, যাবেন না।'

কে কার কথা শোনে! বনের ধারে বনরক্ষীর ঘরে কাপড়-চোপড় ছেড়ে, নিমেষের মধ্যে ছোরা আর দড়ি নিয়ে সে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্যরা বিষণ্ণমনে হোটেলের বারান্দায় অপেক্ষা করতে বসল। সকলের মন খারাপ। ওদের জন্যেই কি অমন চমৎকার মানুষটার বেঘোরে প্রাণ যাবে? খালি ডার্ণো নির্বিকার। অন্যরা সবে দল বেঁধে বনে গিয়ে টারজানকে ফিরিয়ে আনবে স্থির করছেন। এমন সময় অন্ধকার ভেদ

করে একটা গায়ের রক্ত হিম করা বিকট হুংকার ওদের কানে এলো। কে যেন বলল, 'পুরুষ বনমানুষরা যুদ্ধে জয়ী হলে ঐ রকম জয়ধ্বনি দেয়।' তখন সকলে মিলে আবার বনের কিনারায় ছুটে গেল। একটু পরেই যা দেখল তাতে নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করা যায় না। একটা প্রকাণ্ড সিংহের মৃতদেহ পিঠে নিয়ে টারজান বন থেকে অক্ষত দেহে বেরিয়ে এলো। তাই দেখে ডার্ণো পর্যন্ত হতবাক্। এত অল্প সময়ে এ-ও সম্ভব !!

সকলে টারজানকে ঘিরে হাজার প্রশ্ন করতে লাগল, সে খালি হেসে মাথা নাড়ল। যেন কিছুই হয়নি। সে যাই হোক, এ-ব্যাপার থেকে টারজানের দশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক লাভ হলো। ডার্ণো এক পয়সাও ছাড়তে দিল না।

এর অল্পদিন পরেই পুরানো এক খুদে টাগ্ বোট্ ভাড়া পাওয়া গেল। তাতে করে নিরাপদে ওরা ঐ কেবিনের সামনে নোঙর ফেলল। পর দিন সকালে জংলি সাজে, খুরপি নিয়ে টারজান গিয়ে সিন্দুকটাকে একাই কাঁধে করে নিয়ে এলো। ফেরার পথেও কোনো বিপদ-আপদ হলো না।

এর তিন সপ্তাহ পরে একটা ফরাসী স্টীমার চড়ে ডার্ণো আর টারজান লিয়ঁ শহরে পৌঁছল। সেখানে কয়েক দিন কাটাবার পর ডার্ণো টারজানকে প্যারিসে নিয়ে গেল।

টারজান তখনি অ্যামেরিকা যেতে চাইছিল। কিন্তু ডার্ণো বলল, প্যারিসে ওর কিছু জরুরী কাজ আছে। কাজটা কি তা খুলে বলল না। প্যারিসে পৌঁছেই টারজানকে সে তার এক বন্ধুর কাছে নিয়ে গেল। বন্ধুটি একজন উচ্চ-পদস্থ পুলিস অফিসার। তার সঙ্গে এ-কথা সে-কথা বলার পর, আঙুলের ছাপ দিয়ে মানুষ সনাক্ত করার কথা উঠল।

টারজান বলল, 'আঙুলের ছাপ নিশ্চয় বয়সের সঙ্গে বদলে যায়। তাই দিয়ে সনাক্ত করার কি কোনো মূল্য আছে?'

অফিসারটি বললেন, 'না, ছাপ কখনো বদলায় না। ছোট থেকে বড় হলেও না।'

ডার্ণো বলল, 'আমার ছাপগুলো নাও তো দেখি কেমন।' তাই নেওয়া হলো। তারপর টারজানের ছাপও নেওয়া হলো। সে কোনো আপত্তি করল না।

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'মানুষের আর বনমানুষের ছাপ কি একই রকম হয়?

—'না, তা হয় না।'

—'কিন্তু মানুষ বাপ আর বনমানুষ মা হলে?'

—'কি জানি। হয়তো এক দিকের ধারা পেতে পারে।'

ডার্ণো বলল, 'ছাপ মিলিয়ে সনাক্ত করতে কি খুব দেরি হয়?'

—'সাধারণতঃ হয় না। কোনো সমস্যা থাকলে একটু সময় নেয়।'

ডার্ণো তখন পুলিস অফিসারকে বলল, 'এই খুদে ছাপের সঙ্গে আমাদের দু'জনার কারো ছাপ মেলে কি না ভালো করে পরীক্ষা কর। সমস্ত আশ্চর্য ব্যাপারটা তোমাকে পরে বলব।'

অফিসারটি নোটবইটার ওপর চোখ বুলিয়ে, চমকে উঠলেন। তারপর বললেন, 'বুঝেছি। এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। আমাদের বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই মতামত জানাব।'

ডার্ণো বলল, মঁসিয়ে টারজান কাল অ্যামেরিকা যাচ্ছেন।'

অফিসার বললেন, 'পনরো দিনের মধ্যে কেব্‌ল্ করে তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্ত জানাতে পারব।'

আরো কিছু দিন পরে, অ্যামেরিকার বল্টিমোর শহরের উপকণ্ঠে একটা সেকেলে বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। একজন বছর চল্লিশের স্বাস্থ্যবান সুশ্রী পুরুষ নেমে চালককে বিদায় করে দিলেন।

বাড়ির লাইব্রেরীতে পা দেওয়ামাত্র একজন বৃদ্ধ উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন, 'মিঃ ক্যানলার যে!'

—'নমস্কার, প্রফেসর। আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। আপনি তো জেন সম্বন্ধে আমার মনের ইচ্ছার কথা জানেন। আপনার সম্মতিও আছে।'

এ কথা তুললেই কিন্তু প্রফেসরের অস্বস্তি লাগত। নিজেই বুঝতেন না কেন। এর সঙ্গে বিয়ে হলে তো জেনের ভাগ্য! এর অবস্থা খুবই ভালো।

ক্যানলার বললেন, 'কিন্তু জেনের মন আমি বুঝতে পারি না। খালি মনে হয় আমি যেই চলে যাই ও যেন ভারি নিশ্চিন্ত হয়।'

প্রফেসর বললেন, 'তাই নিয়ে ভাববেন না। আমি যা বলব, ও তাই করবে।'

ক্যানলার তবু বললেন, 'ও হয়তো ক্লেটনকেই পছন্দ করে। সে তো বাপের টাইটেল্, সম্পত্তি সবই পাচ্ছে। তবে আপনি যদি বলেন আমার সঙ্গে এখনি বিয়ে হোক, তাহলেই হয়।'

প্রফেসর বললেন, 'জেন এখনি কাউকেই বিয়ে করতে রাজি নয়। আমরা তাই উইসকনসিনে ওর মায়ের দিয়ে যাওয়া খামারে চলে যাচ্ছি। ক্লেটন গোছগাছ করতে গেছে।'

ক্যানলার বললেন, 'আহা, সে তো আমিও করতে পারতাম।'

প্রফেসর দুঃখিত স্বরে বললেন, 'আর ঋণ বাড়াব না। ঐ বিফল অভিযানের সব খরচ আপনি ধার দিয়েছিলেন, সেই যথেষ্ট।' এই সময়ে জেন এসে বিশেষ কাজের কথা বলাতে প্রফেসর চলে গেলেন।

সেই সুযোগে ক্যানলার জেনকে বললেন, 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না, তার একটা হ্যাঁ-না স্পষ্ট উত্তর দাও।'

জেন বলল, 'নিজের ইচ্ছায় কখনোই করতাম না। তবে বাবা আপনার কাছে ঋণী, সে ঋণ শোধ করবার অন্য উপায় না থাকলে, শেষ পর্যন্ত ভাবতে হবে।'

ক্যানলারের বড় টাকাকড়ি নামডাকের গর্ব ছিল, তিনিও একটু চটে গেলেন, 'আমি সহজে ছাড়ছি না। তোমার বাবাও তো এই সম্বন্ধটা চান।'

এর কয়েকদিন পরে প্রফেসরের সঙ্গে জেন আর এস্-মারেল্ডা খামার বাড়িতে চলে গেল। সেখানে ক্লেটন অপেক্ষা করছিল। জেন লক্ষ্য করল বাড়ি-ঘর সংস্কার করতে ক্লেটন যথেষ্ট খরচ করেছে। জেন বলল, 'কেন এত করলে তুমি? তুমি যা চাও, তা তো হতে পারে না। আমার যে অন্য রকম পছন্দ।'

—'কাকে পছন্দ? ক্যানলারকে?'

—'মোটেই না।'

—'কিন্তু ক্যানলার বলছিল তার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে। সে কি টাকার জন্য? আমার তো আরো বেশি টাকা। আমি তো এখন লর্ড গ্রেস্টোক।' জেন তবু রাজি হলো না।

এর মধ্যে ক্যানলার এসে এতই জোরজার করতে লাগলেন যে ঋণের কথা মনে করে জেন হার মানল। পরদিন ক্যানলার বিয়ের লাইসেন্স আর একজন পাদ্রীর ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

এর আগে সাত দিন ধরে পুব দিকের বনের উপরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল। কোথাও দাবানল লেগে থাকবে। তবে পশ্চিম থেকে বাতাস বইছিল, তাই এ-সব অঞ্চলের কোনো ভয়ের কারণ ছিল না।

দুপুরে জেন একলা বেড়াতে বেরোল। বাড়িতে প্রফেসর আর ফিল্যাণ্ডার মহা তর্কে ডুবে ছিলেন। নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে ক্লেটন অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

এদিকে বাতাসের দিক বদলাল। দাবানলও এমুখো হলো। তারপর তাড়াতাড়ি এদিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। সেদিন ছিল হাটবার। খামারের সব চাষবাড়ির বাসিন্দারা হাটে গেছে। দেখতে দেখতে দক্ষিণ থেকে আসবার রাজপথটি আগুন গ্রাস করল। ক্যানলারের পথ বন্ধ হলো। একটা দমকা হাওয়ায় খানিকটা আগুন উত্তর দিকেও ছড়িয়ে পড়ল। তারপর যেন থমকে থেমে ঐভাবে জ্বলতে লাগল।

উত্তর-পূর্ব দিক থেকে একটা মস্ত কালো গাড়ি বাড়ির সামনে এসে থামল। একজন কালো চুল বিশাল দেহ মানুষ লাফিয়ে নেমে বারান্দায় উঠল। সেখানে কৌচে শুয়ে ক্লেটন ঘুমোচ্ছিল। লোকটি তাকে ঝাঁকিয়ে তুলল, 'তোমরা কি সবাই পাগল হয়েছ? জান না, দাবানল তোমাদের ঘিরে

ফেলেছে? মিস্ পর্টার কোথায়'

ক্লেটন লাফিয়ে উঠে চারদিকে চেয়ে আঁৎকে উঠে, ডাকতে লাগল, 'জেন! জেন! কোথায় গেলে?'

এস্মারেল্ডা, প্রফেসর, ফিল্যাণ্ডার তিন জনেই দৌড়ে এলেন। লোকটাকে কেউ চিনলেন না। এস্মারেল্ডা বলল, জেন তো বেড়াতে গেছে।'

কালো চুল লম্বা লোকটি বলল, 'কোন্ দিকে?'

—'ঐ যে ঐ দিকে।'

সে দিকে এখন একটা আগুনের দেয়াল তৈরি হয়ে গেছে। লোকটি ক্লেটনকে বলল, 'আরেকটা গাড়ি দেখলাম।' তাতে এদের সবাইকে পুরে উত্তর দিকের পথ দিয়ে চলে যাও। মিস্ পর্টারকে পেলে ওটা আমার দরকার হবে। না পেলে, ও আর কারো কোনো কাজে লাগবে না।'

এই বলে সেই বলিষ্ঠ লোকটি ক্ষিপ্রগতিতে খোলা জায়গা পার হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে ছুটল। আগুন তখনো সেখানে পৌছয় নি। বাকিদের ঘাড় থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। লোকটিকে কিন্তু কেউ চিনতে পারল না। সকলে তখন ক্লেটনের গাড়ির দিকে এগোল। আর দেরি করা নয়।

এদিকে জেন ফিরবার পথ ধরবে বলে ঘুরেই বুঝল চারদিকে আগুন। পাগলের মতো খানিক দৌড়ে বেড়াল। সে আগুনের বেড় থেকে বেরোবার পথ ছিল না। তখন সে পথের ধুলোয় হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল, অন্যরা যেন রক্ষা পায় আর সে নিজে নির্ভয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারে।

হঠাৎ মনে হলো কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে, 'জেন! জেন! জেন পর্টার!'

জেন উত্তর দিল, 'এই যে আমি, পথের ওপর!' গাছের ওপর থেকে মনে হলো কে একজন লাফিয়ে নেমে ওকে জড়িয়ে ধরে, আবার গাছের ওপর দিয়ে বাতাস বেগে যেন উড়ে চলল।

চোখ বুজেছিল জেন। একবার চোখ খুলে তার ত্রাণকর্তার দিকে চেয়ে ভাবল, এও কি সম্ভব?

—'এ যে আমার বনবাসী! নাকি ভুল দেখছি।'

সে বলল, 'তোমার বনবাসীই বটে। তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে, তাই তোমাকে নিতে এসেছি।'

জেন বলল, 'পালিয়ে যাই নি। ওরা যে এক সপ্তাহের বেশি থাকতে রাজি হলো না।' ততক্ষণে বন পেরিয়ে ওরা বাড়িটার সামনের খোলা জায়গায় পৌছে মাটিতে নেমে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল।

জেন বলল, 'ফিরে এলে না কেন?'

—'ডার্ণো বড় বেশি আহত হয়েছিল, তার সেবা করছিলাম।'

জেনের কি আনন্দ, 'আমি জানতাম! ওরা বলছিল তুমি কালোদের দলের লোক। তাদের কাছে ফিরে গেছ।'

—'কিন্তু তুমি তো সে-কথা বিশ্বাস করনি?'

—'না কখনোই না। তোমার নাম কি?'

—'টারজান।'

—'তুমিই টারজান! আমি ভাবলাম তুমি ইংরিজি জান না, সে ইংরিজিতে চিঠি লেখে। তোমরা বুঝি দু'জন লোক।'

টারজান বলল, 'সে অনেক কথা, পরে বলব। তখন সত্যিই ইংরিজি বলতে পারতাম না। ডার্ণো আবার ফরাসী বলতে শিখিয়ে আরো গুলিয়ে দিল। বল্টিমোরে শুনে এলাম ক্যানলার বলে একজন লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে। সে কি সত্যি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন, তাকে তুমি ভালোবাস?'

—'না।'

—'আমাকে ভালোবাস?'

জেন দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

টারজান বলল, 'আর বলতে হবে না। তবে কেন ওকে বিয়ে করবে?'

—'বাবা ওর কাছে টাকা ধারেন।'

—'যদি ধার শোধ করতে পারতেন, তাহলে কি আমাকে বিয়ে করতে পারতে?'

জেন বলল, 'কি জানি, নিজের মনকে নিজেই বুঝতে পারি না। সভ্য সমাজের শহুরে জীবনের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হলে তুমি সুখী হতে না। বনের মধ্যে সারা জীবন কাটাতে হলে আমি সুখী হতাম না।'

টারজান বলল, 'আর বলো না। তোমার সমস্যা আমি বুঝেছি। তুমি যাতে সুখী হও, আমিও তাই চাই। বনমানুষের ছেলেকে নিয়ে তুমি সুখী হবে না।' আর কিছু বলা হলো না। ওরা একটা ছোট গ্রামে পৌছে গেল।

সামনে ক্লেটনের গাড়ির চারদিকে বাকিরা দাঁড়িয়ে, ওদেরই জন্যে অপেক্ষা করছিল।

জেনকে দেখে সকলের কি আনন্দ। ক্লেটন টারজানকে সকলের হয়ে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো, তা জানি না। কেন জানি মনে হচ্ছে অনেক দিন আগে অন্য পরিবেশে আপনাকে খুব ভালো করে চিনতাম।'

টারজান হেসে হ্যাণ্ডসেক করে বলল, 'ঠিকই মনে হচ্ছে। ফরাসী বলছি, কিছু মনে করবেন না। ইংরিজি বলতে সবে শিখছি।'

ক্লেটন এবার ফরাসীতে বলল, 'কিন্তু আপনার নাম কি?'

—'আমি বনমানুষদের ছেলে টারজান।'

ক্লেটন ভীষণ চমকে উঠে বলল, 'আরে, তাই তো!'

ততক্ষণে ওরা গ্রামের খুদে সরাইখানার বসবার ঘরে এসে বসেছে। এমন সময় ঝুকঝুক করে একটা গাড়ি এসে থামল এবং তার থেকে ক্যানলার নামলেন।

ফিল্যাণ্ডার একটু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'এই রে, ক্যানলার এসে পৌঁছেছে। আমি বড় আশা করেছিলাম—ইয়ে—মানে উনি নিরাপদে পৌঁছেছেন বলে খুশি হয়েছি।'

প্রফেসর বললেন, 'আহা, কতবার বলেছি, কিছু বলবার আগে একটু ভেবো কি বলবে।'

ক্যানলারের সঙ্গে একজন পাদ্রীকে দেখে সকলে আঁৎকে উঠল। খালি টারজান কিছুই বুঝতে পারল না। জেন বলল, 'মিঃ ক্যানলার, ইনিই মিঃ টারজান, আমাদের পুরানো বন্ধু।'

ক্যানলার বললেন, 'তাহলে বিয়েটা এখনি হয়ে যাক।'

জেন বলল, 'কয়েক দিন অপেক্ষা করলে ভালো হয়। আমাদের ওপর দিয়ে বড় ধকল গিয়েছে।'

ক্যানলার চটে গেলেন, 'যথেষ্ট অপেক্ষা করা হয়েছে, আর নয়। লাইসেন্স রয়েছে, পুরুত রয়েছেন, এসো।' এই বলে যেই না জেনের হাত ধরে টেনেছেন, অমনি কে তাঁর হাতটা বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে, আরেকটা হাত দিয়ে তাঁর গলা ধরে শূন্যে তুলে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিল। জেন চেয়ে দেখল টেরকজকে মারবার সময়ে টারজানের কপালে যেমন একটা সুতোর মতো পুরানো দাগ লাল টকটকে হয়ে উঠেছিল, আবার তেমনি হয়েছে।

ক্লেটন আর জেন বিপদ বুঝে ছুটে গেল। ক্লেটন ক্যানলারকে টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করল। টারজানের বিশাল হাতের এক ঝাপটায় ছিটকে অনেকটা দূরে পড়ে গেল। জেন টারজানের হাতের ওপর হাত রেখে চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'আমার জন্যে ছেড়ে দাও।'

টারজান অবাক হয়ে বলল, 'তুমি সত্যি চাও ও বেঁচে থাকে?'

—'তোমার হাতে মরে, তা চাই না। তুমি খুনে হও, তা চাই না।'

টারজান ক্যানলারকে বলল, 'ওকে কথা থেকে মুক্তি দিলে ছেড়ে দেবো।'

ক্যানলার মাথা নেড়ে রাজি হলো।

—'আর কখনো জ্বালাবে না?'

ক্যানলার তাতেও রাজি। টারজান অমনি তাকে ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রীসহ ক্যানলারের প্রস্থান।

টারজান জেনকে বলল, 'তোমার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে চাই।'

প্রফেসর বললেন, দাঁড়াও। এর ফলে ক্যানলার কখনোই জেনকে বিয়ে করবে না, তা জান?'

টারজান বলল, 'করবে না-ই তো। কিন্তু এতে আপনার অপমান হবার কোনো কারণ থাকবে না। ওর টাকা আপনি নিজেই শোধ করে দিতে পারবেন।'

—'এ্যাঁ! বল কি!'

—'আপনার হারানো ধন উদ্ধার হয়েছে।'

—'না, তা হতে পারে না।'

—'তবু হয়েছে। আমিই সরিয়ে রেখেছিলাম। ডার্ণোর সঙ্গে গিয়ে উদ্ধার করে এনেছি। তারই পরামর্শে সেটা ব্যাংকে জমা দিয়ে, এই লেটার অফ ক্রেডিট এনেছি নিন, ধরুন। বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দাম স্থির করানো হয়েছে, দুশো একচল্লিশ হাজার ডলার। ডার্ণো নিজে জামিন হয়েছেন।'

কম্পিত গলায় প্রফেসর বললেন, আঁরো নতুন ঋণে বাঁধলে আমাদের।'

ক্লেটন ফিরে এসে বলল, 'অন্ধকার হয়ে এসেছে, এবার প্রথম ট্রেন ধরে এ বনের এলাকা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত।'

ফিল্যাণ্ডার টারজানের গাড়িতে গেলেন, অন্যরা ক্লেটনের। বৃদ্ধ বললেন, 'সেদিন দেখলাম গাছে ঝুলে বেড়াচ্ছ আর আজ ফরাসী মোটর চালাচ্ছ! কি আশ্চর্য!'

হঠাৎ টারজান বলল, 'আচ্ছা স্যার, কেবিনের যে তিনটি কংকালকে কবর দেওয়া হলো, তার সব ক'টিই কি মানুষের কংকাল ?

ফিল্যাণ্ডার বললেন, 'কেন বলতো ?'

টারজান বলল, 'জানতে পারলে হয়তো একটা রহস্যের সমাধান হয়।'

ফিল্যাণ্ডার বললেন, 'বড় দুটি মানুষের। কিন্তু খুদেটা বনমানুষের বাচ্চার কঙ্কাল।'

এদিকে জেন মনে ভেবে স্থির করেছিল আধা বনবাসীকে সে বিয়ে করতে পারবে না ; সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকবে। তাই ক্লেটন যখন বিয়ের প্রস্তাব করল, সে রাজি হয়ে গেল।

পরে টারজানকেও কথাটা বলল। যদিও বলতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। টারজান কিন্তু তার কথাই মেনে নিল।

ট্রেনের ওয়েটিং রুমেই ওর নামে একটা তার এলো, ডার্ণো পাঠিয়েছে, 'আঙুলের ছাপ থেকে প্রমাণ হচ্ছে তুমিই গ্রেস্টোকের ছেলে।'

টারজান কাউকে কিছু বলল না। তার এক কথায় ক্লেটন নিঃস্ব হয়ে যেতে পারত। জেনকে বিয়ে করে সে সুখী হোক। ক্লেটন হঠাৎ বলল, 'তুমি ঐ ঘোর বনে কি করে গিয়ে পড়েছিলে ?'

'আমি যে ওখানেই জন্মেছিলাম। আমার মা একজন বনমানুষ, বাপের পরিচয় জানি না।'

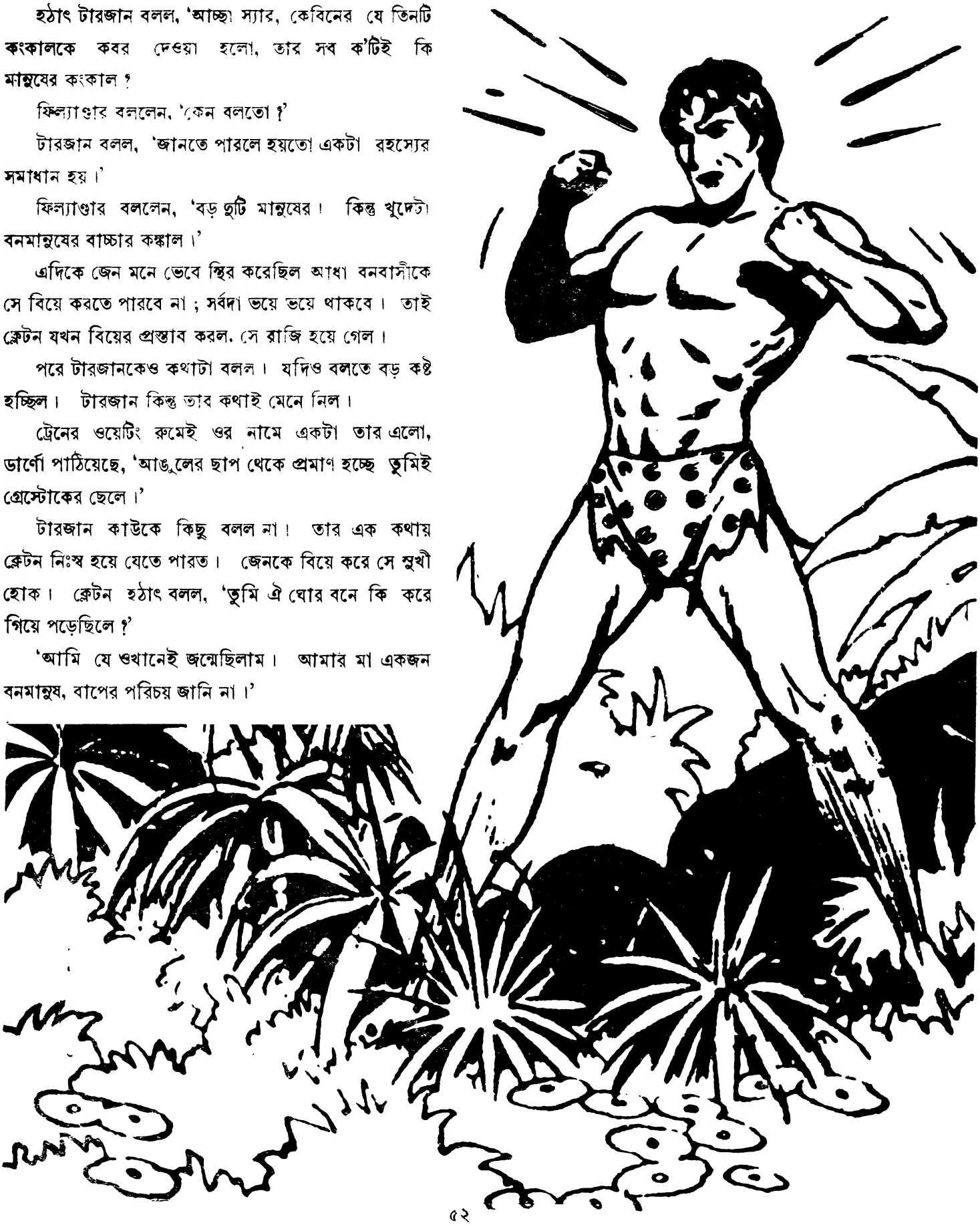

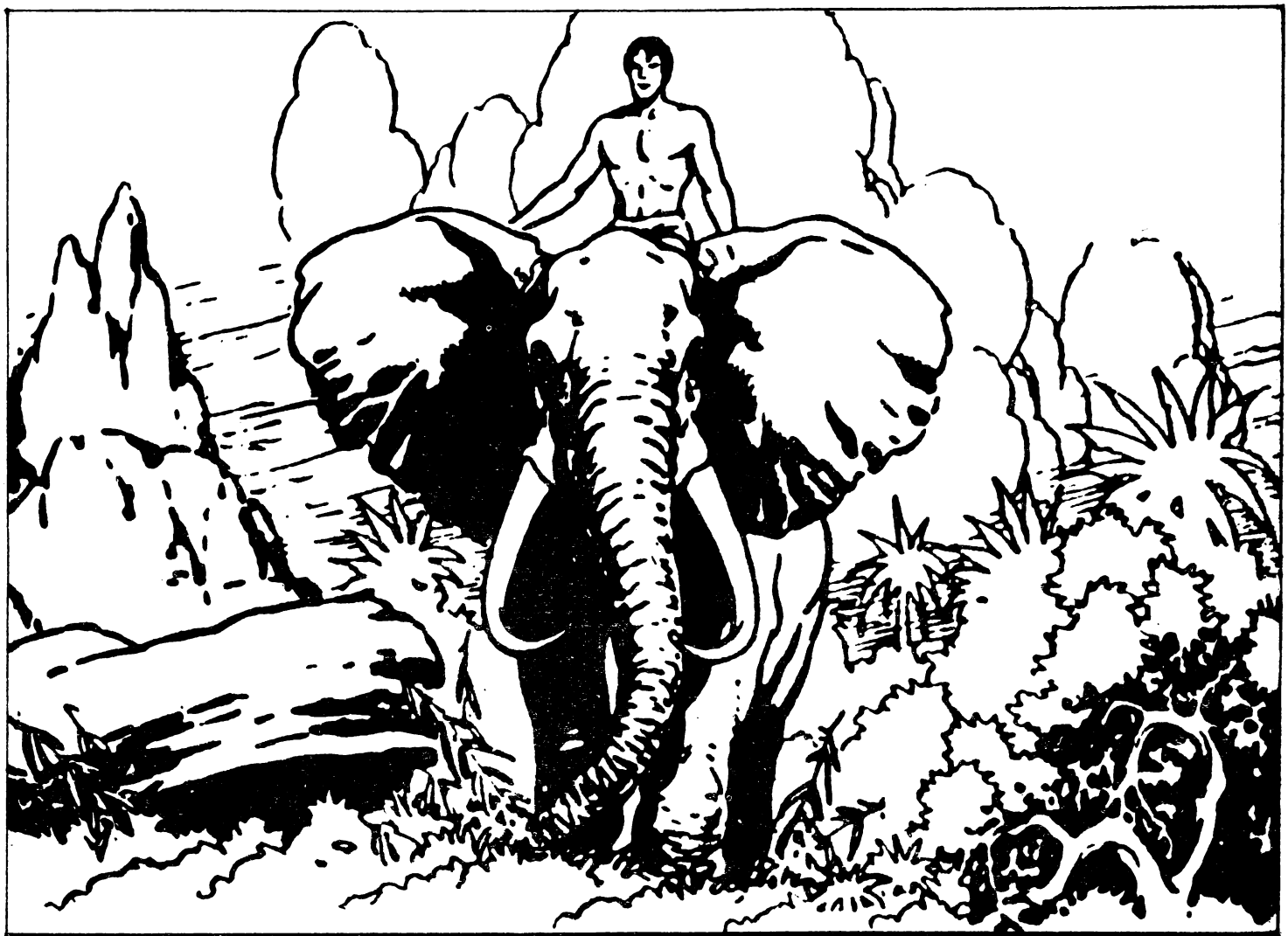

টারজানের প্রত্যাবর্তন

দি রিটার্ন অফ টারজান

নিউইয়র্ক বন্দর ছেড়ে প্যারিসের দিকে বিশাল সমুদ্রগামী জাহাজটা মাত্র তিন দিনের পথ এগিয়েছে, এরই মধ্যে মধ্যে একজন দীর্ঘদেহী বলশালী সুপুরুষ যাত্রীকে ঘিরে একটা চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে গেছে। কে সে? কোথা থেকে আসছে? কোথায় যাবে? কৌতূহলীদের মধ্যে একজন লোক জাহাজের অফিসারদের কাছ থেকে খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে খাতায় তার নাম লেখা আছে—আফ্রিকার মিঃ টারজান।

এত কৌতূহলের মূল টারজান নিজে কিন্তু নির্বিকার। একদিন বেড়াতে বেড়াতে সে জাহাজের স্মোকিং রুমে এক ধূমপানের কামরায় ঢুকতে যাবার সময় দরজার কাছে দু'জন সন্দেহজনক লোককে দেখতে পেল। তারা ঘরের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করছিল। টারজান তাদের উপর কেবলমাত্র চোখ বুলিয়ে কামরার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেখানে সকলের কাছ থেকে একটু দূরে আরাম কেদারায় বসে, পছন্দমতো পানীয়ের গেলায় হাতে নিয়ে নিজের চিন্তায় ডুবে গেল। নিজের জন্ম সম্বন্ধে যে প্রচণ্ড একটা হেঁয়ালি ছিল তারই কথা সে তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগল।

অ্যামেরিকা ছাড়বার আগে টারজান নিজের জন্মগত

অধিকার আরেকজনের হাতে তুলে দিয়ে এসেছে। এর কারণ এই নয় যে সে তার আত্মীয় উইলিয়ম ক্লেটনকে খুব বেশি স্নেহ করে, বা তার কাছে কোনো ভাবে সে ঋণী। না তা নয়। এর কারণ হলো জেন পর্টার। ধনীর দুলালী জেন দুর্ভাগ্যক্রমে উইলিয়ম ক্লেটনের বাগদত্তা। কিন্তু আসলে সে টারজানকেই ভালবাসতো। টারজানও এক সময় তাকে নিজের জীবনসঙ্গিনী রূপে পাবার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু বিধি বাম! তাই টারজান নিজের সমস্ত সম্পত্তি উইলিয়মকে দিয়ে তাদের বিবাহিত জীবন যাতে সুখের ও স্বাচ্ছন্দ্যের হয় তার ব্যবস্থা করে নিজে সরে দাঁড়িয়েছে। উইলিয়ম এখন লর্ড গ্রেস্টোক, যে নামের আসল অধিকারী টারজান নিজে।

অতীতের চিন্তাধারা ক্রমশঃ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলল। এখন টারজান তার জন্মস্থানের দিকে চলেছে। চলেছে সেই গভীর জঙ্গলে, যেখানে তার বাইশ বছরের জীবনের কুড়ি বছর কেটেছে। সেখানকার কোলাহলহীন জীবনধারা তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেখানে বন্ধু বা সঙ্গী কেউ নেই বটে, কিন্তু রয়েছে অবাধ স্বাধীনতা, সভ্যতার বাইরে প্রকৃতির বুকের কাছে নিবিড় শান্তি।

টারজানের চিন্তায় এখানে বাধা পড়ল। সামনের দেয়ালে ঝোলানো বিরাট আয়নায় দেখতে পেল, এতক্ষণ একটা টেবিলে যে চারজান তাস খেলায় মগ্ন ছিল, তাদের একজন খেলা শেষ করে উঠে গেছে, কিন্তু আরেকজন যাত্রী এসে তার জায়গা নেবার আবেদন জানাচ্ছে। সন্দেহজনক কিছু থাকবার কথা নয় এতে, যদি এই নতুন খেলোয়াড়কে টারজান চিনতে না পারত। সে হলো টারজানের কামরার বাইরে দাঁড়ানো আলোচনাকারীদের মধ্যে একজন।

যে ভদ্রলোকের সামনে বসে সে খেলা শুরু করল তার নাম টারজান শুনেছিল। তিনি হলেন কাউন্ট রাউল দ্য কুদ্—ফরাসী সরকারের সামরিক দপ্তরের একজন বিশিষ্ট সদস্য। হঠাৎ টারজানের খেয়াল হলো যে আগের দেখা অন্য লোকটাও কামরায় উপস্থিত হয়েছে। সে কাউন্টের চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার আড়চোখে চেয়ে (চোরা চাহনী দিয়ে) অতি সাবধানে নিজের পকেট থেকে কি একটা জিনিস বের করে সমান সন্তর্পনে কাউন্টের পকেটে চালান করে দিল। তারপর নির্বিকার ভাবে কাউন্টের পিছনে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগল। টারজানও আয়নায় সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে দেখতে লাগল।

এরপর প্রায় দশ মিনিট নির্বিঘ্নে খেলা চলবার পর যখন কাউন্ট দ্য কুদ্ জিতে গেলেন আর তখনই শুরু হলো গণ্ডগোল। পরাজিত নতুন খেলোয়াড় চোখ তুলে কাউন্টের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গীর কাছ থেকে কি একটা ইশারা পেয়ে কাউন্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আমি যদি জানতাম যে আপনি একজন পেশাদার তাসচোর তা হলে কোন মতেই এ খেলায় যোগ দিতাম না'

তৎক্ষণাৎ কাউন্ট ও অন্য খেলোয়াড়রা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কাউন্ট স্তম্ভিত গলায় বললেন, 'কি বলছেন আপনি? জানেন, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?'

—'আমি কথা বলছি যার সঙ্গে সে তাসখেলায় চুরি করে।'

তখন কাউন্ট রাগে অন্ধ হয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে আগন্তুকের মুখে প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে দিলেন। এবার অন্যরা ছুটে এসে দু'জনের মধ্যে দাঁড়িয়ে শান্তি আনবার চেষ্টা করতে লাগল।

একজন বলল, 'মশাই এতে নিশ্চয় কিছু ভুল আছে। ইনি হলেন ফ্রান্সের কাউন্ট দ্য কুদ্।'

অভিযোগকারী বলল, 'যদি আমি ভুল করে থাকি তাহলে নিশ্চয় ক্ষমা চাইব, কিন্তু তার আগে যে বাড়তি তাসগুলো কাউন্ট কিছুক্ষণ আগে নিজের পকেটে রাখলেন তার কৈফিয়ত দিতে হবে।'

এই সুযোগে যে লোকটা কাউন্টের পকেটে তাস রেখেছিল সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই অবাক হয়ে দেখল তার রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা চওড়া ছাই রঙের চোখের একজন লোক।

পাশ কাটিয়ে যাবার সময় টারজান গম্ভীর গলায় বলল, 'দাঁড়ান।'

—'কেন? দয়া করে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ান।'

—দাঁড়ান। আমার মনে হয় এ বিষয়ে আপনি নিশ্চয় কিছু বলতে পারেন।'

লোকটা রেগে ঝটকা মেরে টারজানকে সরিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করতেই, টারজান মৃদু হেসে তার কোটের কলার ধরে টেনে তাকে তাস খেলার টেবিলের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম নিকোলাস রোকফ্ টারজানের অমানুষিক শক্তির সঙ্গে পরিচিত হলো।

এই শক্তির কাছে আফ্রিকার জঙ্গলের প্রবল শক্তিশালী সিংহ নুমা আর অতিকায় বনমানুষ টেরকজকেও হার মানতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে তাসের টেবিল ঘিরে অন্যান্য যাত্রীরা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। চক্রান্তের চূড়ান্ত দেখবার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে।

কাউন্ট বললেন, 'এটা একটা পাগল। আপনারা একজন দয়া করে আমাকে খুঁজে দেখুন।'

একজন যাত্রী বলল, 'এ অভিযোগ হাস্যকর।'

অভিযোগকারী বলল, 'বেশ তো, আপনাদের একজন এর পকেটে হাত দিয়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন অভিযোগের কতখানি গুরুত্ব। আর কেউ যদি তা করতে রাজি না হন, তো আমি নিজেই খুঁজে দিচ্ছি।'

কাউন্ট বললেন, 'না শুধু একজন ভদ্রলোকই আমাকে তল্লাস করবেন।'

—'কাউন্টকে তল্লাসী করবার প্রয়োজন নেই। তাস তাঁর পকেটেই আছে। আমি স্বচক্ষে সেগুলো ওখানে চালান হতে দেখেছি।'

সকলে অবাক হয়ে এই নতুন বক্তার দিকে ফিরে তাকাল। দেখল, একজন ষণ্ডামতো যুবক অন্য একজনকে ঘাড় ধরে নিয়ে আসছে।

কাউন্ট রেগে বললেন, 'এ একটা ষড়যন্ত্র। আমার পকেটে কোনো তাস নেই।' এই বলে নিজের পকেটে হাত দিলেন। পর মুহূর্তে তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দর্শকরা নিঃশব্দে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি হাত বের করে দেখালেন হাতে তিনটি তাস রয়েছে।

লজ্জায় অপমানে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল আর বাকিদের মুখে কিছুটা দয়া কিছুটা অবজ্ঞার ছাপ পড়ল।

তখন টারজান বলল, 'এটা সত্যিই একটা ষড়যন্ত্র। কাউন্টের অজান্তে তাঁর পকেটে এই তাসগুলো রাখা হয়েছে। আমার চেয়ার থেকে আয়নার মধ্যে আমি সমস্ত ঘটনাটা দেখতে পেয়েছি।' কাউন্ট যখন খেলায় মগ্ন ছিলেন এই লোকটিই তখন তাঁর পকেটে তাস রেখে, এখন পালাবার চেষ্টা করছিল।

কাউন্ট অপরাধীর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে বললেন, 'নিকোলাস! তুমি?' তারপর অভিযোগকারীর দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাকেও দাড়ি ছাড়া চিনতে পারিনি, পলভিচ। এখন সব বুঝতে পারলাম।'

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'এখন এদের নিয়ে কি করা যায়? ক্যাপ্‌টেনের কাছে জমা দেওয়া যাক?'

কাউন্ট তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, আপনারা দয়া করে সব ভুলে যান। তাছাড়া, এই সব লোকদের সঙ্গে যত কম মেলামেশা করা যায় তত ভাল। কিন্তু আপনার কাছে আমি চিরদিনের মতো ঋণী হলাম, কারণ আপনি আমাকে একটা সাংঘাতিক অপবাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এই আমার কার্ড রইল। ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন আমাকে দিয়ে আপনার কোনো উপকার হয়, তাহলে জানাতে দ্বিধা করবেন না।'

টারজান রোকফ্‌কে ছেড়ে দিয়েছিল। সে তার সঙ্গীর সঙ্গে চলে যাবার আগে তাকিয়ে বলল, 'অন্য লোকের ব্যাপারে মাথা গলাবার জন্য ভবিষ্যতে আপনাকে পস্তাতে হবে।'

টারজান সামান্য হেসে কাউন্টকে নিজের নাম লেখা কার্ড এগিয়ে দিল। তাতে লেখা—মিঃ জন সি টারজান।

কাউন্ট দুঃখিত হয়ে বললেন, 'মিঃ টারজান আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় না হলেই ভাল ছিল, কারণ এর জন্য আপনি দু'জন অতি নীচমনা দুর্বৃত্তের শত্রুতা লাভ করলেন। যে ভাবেই হোক, এদের দু'জনকে সর্বদা এড়িয়ে চলবেন।'

টারজান বলল, 'আপনি চিন্তা করবেন না। এদের থেকেও অনেক দুর্ধর্ষ শত্রু লাভ করেও আমি এখনো বেঁচে আছি। আমার মনে হয় না এরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে।'

সেই রাত্রে নিজের কেবিনে শুতে যাবার সময় একটা চিরকুট কুড়িয়ে পেল টারজান। তাতে লেখা রয়েছে—

'মিঃ টারজান, খুব সম্ভবতঃ আপনি নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি, তাই আজকে যা করবার তা করেছেন। যাই হোক, এর জন্য যদি আপনি ক্ষমা চেয়ে আমাকে একটা চিঠি লেখেন আর কথা দেন যে ভবিষ্যতে কখনও অন্যের ব্যাপারে বাধা দেবেন না, তাহলে আমি আজকের ঘটনাকে একজন অপরিচিতের অজ্ঞতা মনে করে ভুলে যাবার চেষ্টা করব। ইতি বিনীত—নিকোলস রোকফ।

টারজান চিঠি পড়ে একবার একটু কঠিন হেসে মন থেকে ঘটনাটাকে সরিয়ে দিয়ে শুতে গেল।

সেই রাত্রে আরেকটি কেবিনে কাউন্ট দ্য কুদ্ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'অল্‌গা, নিকোলাস এই জাহাজে রয়েছে! তুমি কি জানতে?'

তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন 'নিকোলাস! কিন্তু সে যে অসম্ভব। নিকোলাস তো জার্মানিতে বন্দী।'

—'আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ তাকে ও তার কুচক্রী সঙ্গী পলভিচকে দেখলাম। অল্‌গা, আমার পক্ষে এই নির্যাতন আর সহ্য করা সম্ভব নয়। তোমার জন্যও নয়। আমার ইচ্ছা এই জাহাজের ক্যাপ্‌টেনকে ডেকে সব কথা খুলে বলি, যাতে চিরদিনের মতো একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।'

কাউন্টেস হাঁটু গেড়ে স্বামীর সামনে বসে পড়ে বললেন, 'না না রাউল। ও রকম কিছু কর না। তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। ও কাজ কক্ষনো কর না।'

—'বেশ তাই হোক। কিন্তু আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি না। এই লোকটা তোমার আর তোমার স্বামীর সব রকমের অমঙ্গল কামনা করে আর সব সময় জোচ্চুরি করে। আশাকরি এর জন্য তোমাকে ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।'

কাউন্টেস্ দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমিও তাকে তোমারই মতো ঘৃণা করি রাউল। কিন্তু রক্তের টান জলের থেকেও বেশি।'

কঠিন স্বরে কাউন্ট বললেন, 'আজ এরা দু'জনে আমার সততার উপর কালি মাখাতে চেষ্টা করেছিল।' বলে তাস খেলার টেবিলে যা ঘটেছিল সব বলে টারজানের প্রচুর প্রশংসা করলেন।

অল্‌গা অবাক হয়ে বললেন, 'টারজান?'

—'কেন তুমি টারজানকে চেন?'

—'আমি তাকে দেখেছি। একজন স্টুয়ার্ড তার কথা আমাকে বলেছে।'

এরপর সুন্দরী তরুণী কাউন্টেস অল্‌গা কথার মোড় ফিরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

পর দিন বিকেলবেলা সেই দু'জন ষড়যন্ত্রীর সঙ্গে টারজানের আবার দেখা হলো। ডেকের এক নির্জন কোণায় রোকফ্ আর পলভিচ এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল। মহিলার মুখ 'ভেল' দিয়ে ঢাকা, কিন্তু দেখে মনে হলো বয়স বেশ কম আর একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের মতন পোশাক পরা। তিনজনেই টারজানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকাতে তাকে কেউ লক্ষ্য করল না। তারা যে ভাষায় কথা বলছিল তা টারজানের জানা ছিল না, তবে মহিলাটি যে ভয় পেয়েছে হাবভাবে বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

নীচমনা রোকফ্ ঠিক সেই সময় মহিলার হাত ধরে এমন জোরে ঝাঁকুনি দিল যাতে বেশ লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাতের মতো কঠিন এক হাত দিয়ে টারজান তাকে নিজের মুখোমুখি ঘুরিয়ে দাঁড় করাল।

রেগে চিৎকার করে রোকফ্ বলে উঠল, 'তুমি কি রকম বুদ্ধিহীন লোক যে এ ভাবে নিকোলাস রোকফ্‌কে আবার অপমান করলে?'

—'তোমার চিঠির এই আমার উত্তর।' বলে টারজান রোকফ্‌কে রেলিংয়ের দিকে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

—'এর জন্য তোমাকে মরতে হবে।' বলে রোকফ্ নিজের পকেট থেকে রিভলবার বের করতে করতে টারজানের দিকে ছুটে এগিয়ে এলো।

মহিলাটি চিৎকার করে বলে উঠল, 'না না নিকোলাস, ও কাজও কোরো না। আপনি এক্ষুনি সরে যান, তা না হলে ও আপনাকে মেরে ফেলবে।'

টারজান নির্ভয়ে রোকফের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এ রকম বোকার মতো কাজ করো না রোকফ্।'

কিন্তু ততক্ষণে রাগে অন্ধ হয়ে রোকফ্ টারজানের বুক লক্ষ্য করে গুলি করল। কিন্তু শুধুমাত্র খট্ করে একটা ফাঁকা আওয়াজ হলো—রিভলবারে একটাও গুলি নেই।

তখন সাপের মতন তীব্রগতিতে টারজানের হাত এসে রিভলবারটি ছিনিয়ে নিল। পরমুহূর্তেই সেটি অ্যাটলান্টিক সাগরের জলে ছিটকে পড়ল।

রোকফ্‌ই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল, 'এই নিয়ে দু' বার তুমি অন্যলোকের ব্যাপারে অনধিকার প্রবেশ করলে। তুমি নিকোলাস রোকফ্‌কে অপমান করলে। প্রথমবার তোমার অজ্ঞতার জন্য ক্ষমা করা হয়েছিল, কিন্তু এবারকার ঘটনা উপেক্ষা করা যাবে না। এখনও যদি নিকোলাস রোকফ্‌কে চিনতে না পেরে থাক, তাহলে ভবিষ্যতে তোমার এই উদ্ধত স্বভাবের জন্য নিশ্চয় চিনতে পারবে।'

টারজান গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমাকে একজন ভীতু ও ইতর লোক বলেই চিনেছি। তার বেশি জানবার প্রয়োজন নেই।' এই বলে সে মহিলার কোনো আঘাত লেগেছে কিনা জানবার জন্য ফিরে তাকিয়ে দেখল সে কখন সেখান থেকে চলে গিয়েছে। টারজানও আর সময় নষ্ট না করে ডেক্‌ দিয়ে এগিয়ে গেল।

টারজান এই ঘটনার পর বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারল যে একটা কোন গভীর ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হচ্ছে আর তাতে এই দু'জন ষড়যন্ত্রীর জঘন্য কোনো মতলব আছে। মহিলাটিই বা কে? তার মুখ যদিও দেখা যায় নি, টারজান কিন্তু তার হাতের আংটি লক্ষ্য করেছিল। তাতে অদ্ভুত কারুকার্য করা ছিল। কি জানি, ভবিষ্যতে হয়তো এই আংটি দিয়েই তার পরিচয় পাওয়া যাবে!

কিছুক্ষণ পরে একটা ডেক্‌ চেয়ারে বসে টারজান মানুষের নানা রকমের নিষ্ঠুরতা স্বার্থপরতা ও হিংসার কথা ভাবতে লাগল। চার বছর আগে টারজান যাকে 'মা' বলে জানত সেই কালা নামের বনমানুষীকে সে হারিয়েছিল। কুলঙ্গা অধিবাসীর নিষ্ঠুর বর্শার ফলকে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। আরেকবার প্রফেসর পর্টার আর তাঁর দলকে জাহাজের নাবিকদের হিংসাত্মক বিদ্রোহের সামনা-সামনি হতে হয়েছিল। আরও দেখেছিল আফ্রিকার জঙ্গলের উপজাতিরা তাদের বন্দীদের কি রকম অনায়াসে নির্মম শাস্তি দিত। এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে হলো কেউ যেন আড়াল থেকে তাকে দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের পশুদের কাছ থেকে শেখা প্রবৃত্তিগুলো সজাগ হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে তাকাতেই একজন অতি সুন্দরী মহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। সে লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে নিল। কিছুক্ষণ পর মহিলাটি উঠে চলে যাবার সময় টারজানের চোখে পড়ল তার হাতের আঙুলে অদ্ভুত কারুকার্য করা একটি আংটি। এই মহিলাই যে রোকফের সঙ্গে কথা বলছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ রইল না। তবে অমন সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে রোকফের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে তা ভেবে পেল না।

সেদিন রাত্রে ডিনারের পর টারজান অলস পায়ে ডেকের উপর ঘোরাফেরা করছিল আর মাঝে মাঝে একজন দু'জন জাহাজের অফিসারের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলছিল। কিন্তু বেশির ভাগ সময় সমুদ্রের শান্ত জলের উপর চাঁদের আলোর অপরূপ খেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিল। এমন সময় চাপা গলার কথাবার্তা তার কানে গেল। গলার মালিক কারা তাও সে বুঝতে পারল। নিজেকে যথাসম্ভব আড়ালে রেখে টারজান তাদের কথা শুনতে লাগল। একজন বলল, 'যদি সে চিৎকার করে তাহলে তার গলা—' এইটুকুই টারজানের পক্ষে যথেষ্ট। সে তৎক্ষণাৎ রোকফের আর পলভিচের পিছু নিল, তাদের দুরভিসন্ধিটা দেখবার জন্য।

ক্রমশঃ তারা উপরের ডেকের প্রথম শ্রেণীর একটা কেবিনের সামনে দাঁড়াল। টারজান তাড়াতাড়ি কাছের সরু করিডরে লুকিয়ে সব দেখতে লাগল।

রোকফ্‌ দরজায় টোকা দিলে ভিতর থেকে ফরাসী ভাষায় কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

রোকফ্‌ বলল, 'অল্‌গা আমি, নিকোলাস। ভিতরে আসতে পারি?'

—'তুমি কেন আমাকে এ ভাবে নির্যাতন করছ, নিকোলাস? আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি,' অল্‌গার গলার স্বর শোনা গেল।

রোকফ্‌ মোলায়েম গলায় বলল, 'না না অল্‌গা, আমার শুধু কয়েকটা কথা বলবার আছে। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না বা তোমার কেবিনেও ঢুকব না, কিন্তু আমার যা বলার তা এখান থেকে চেঁচিয়ে বলাও যাবে না।'

দরজা খোলার আওয়াজ টারজানের কানে আসাতে সে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সব দেখবার জন্য। দেখল, রোকফ্‌ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে আর পলভিচ দরজার বাইরের দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে।

রোকফ্‌ খোলা দরজা দিয়ে এক পা এগোতেই অল্‌গা বলল, 'নিকোলাস, কোনো লাভ নেই এতে। তুমি আমাকে যত শাসাও না কেন, তোমার দাবি আমি

রাখব না। এখন চলে যাও, তোমার এখানে আসার কোনো অধিকার নেই। তুমি বলেছিলে ঘরে ঢুকবে না।'

—'বেশ আমি ঘরে ঢুকব না, কিন্তু তুমি অত সহজে ছাড়া পাবে না। শেষ পর্যন্ত আমার জয় হবেই, সুতরাং যদি নিজের ভাল ও আমার সময়ের অপচয় করতে না চাও—'

অল্‌গা বাধা দিয়ে বলল, 'কখনো না, নিকোলাস।' তখন রোকফ্‌ তার সঙ্গীকে ইশারা করা মাত্র সে এক দৌড়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আর রোকফ্‌ মুখে নিষ্ঠুর হাসি নিয়ে দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল।

এদিকে টারজান শুনতে পেল ঘরের মধ্যে অল্‌গা পলভিচকে বলছে, 'এক্ষুণি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, তা না হলে আমার স্বামীকে ডাকব, আর তিনি তোমাদের এতটুকুও ক্ষমা করবেন না।'

পলভিচ অবজ্ঞার সুরে বলল, 'আপনার স্বামীকে খবর দেওয়া হয়েছে যে আপনি এক বাইরের লোকের সঙ্গে আপনার কেবিনে কথা বলছেন।'

অল্‌গা বলল, 'বাঃ! আমার স্বামী ব্যাপারটা ঠিকই বুঝতে পারবেন।'

—'আপনার স্বামী বুঝতে পারবেন বটে, কিন্তু জাহাজের যে অফিসার তাঁকে ডাকতে গিয়েছে সে বুঝবে না আর আমরা যখন ডাঙায় নামব তখন খবরের কাগজের রিপোর্টাররাও বুঝতে পারবে না।

কঠিন ও নির্ভীক গলায় অল্‌গা বলল, 'পলভিচ, তুমি একটা নীচ-কাপুরুষ। কিন্তু আমি তোমার কানে এমন একটা নাম বলতে পারি, যা শুনলে তুমি তোমার শাসানি ভুলে কোনো দিনও আমাকে এ ভাবে জ্বালাতন করবে না।'

এর পর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তার পরেই একটা আওয়াজ, একটা মেয়েলী গলার আর্তনাদ, তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে রোকফ্‌ পালাবার চেষ্টা করতে টারজান দৌড়ে এসে তার জামার কলার চেপে ধরে এক ধাক্কায় কেবিনের পল্‌কা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে দেখল অল্‌গার গলা টিপে ধরেছে পলভিচ্‌। বেচারা অল্‌গা ব্যর্থভাবে নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

দরজা ভাঙার আওয়াজে পলভিচ উঠে দাঁড়াল। টারজান তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এর মানে কি?' তারপর রোকফ্‌কে নষ্টের গোড়া বুঝতে পেরে বলল, 'ঐ বোতাম টিপে একজন অফিসারকে ডাকো। এ ব্যাপার এখন বড় বেশি দূর এগিয়েছে।'

অল্‌গা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না না। আমার মনে হয় না এরা আসলে আমার কোনো ক্ষতি করতে চেয়েছিল। আমি ওকে চটিয়ে দিয়েছিলাম তাই ও খেপে গিয়েছিল। এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

তার গলায় এমন একটা মিনতির সুর ছিল যাতে টারজান বুঝতে পারল যে ও সত্যিই কাউকে কিছু বলতে চায় না।

—'আপনি চান যে এই দু'জন আপনাকে জ্বালাতন করেই যাক?'

এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবে অল্‌গা তা ভেবে পেল না। কিন্তু রোকফের নিষ্ঠুর হাসি দেখে টারজান বুঝতে পারল যে অল্‌গা এদের অত্যন্ত ভয় করে বলেই কিছু করতে চাইছে না।

তখন টারজান বলল, 'বেশ এবার থেকে আমি নিজেই দায়িত্বটা নিলাম।' রোকফ্‌কে বলল, 'এখন থেকে আমি তোমাদের দু'জনের উপর কড়া নজর রাখব আর যদি কখনো দেখি যে তোমরা এই মহিলাকে কোনোভাবে নির্যাতন করছ, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ আমার কাছে দিতে হবে আর এখানে বলে রাখি যে সে অভিজ্ঞতা তোমাদের কারো মনোমতো হবে না। এখন এখান থেকে যাও।'

এই বলে সত্যি সত্যি তাদের ঘাড় ধরে ছুঁড়ে দরজা দিয়ে বের করে দিয়ে, দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর আপনিও দয়া করে আমাকে একটু জানাবেন এরা যদি আপনাকে আবার বিরক্ত করে।'

অল্‌গা বলল, 'আপনি কিন্তু দু'জন অতি নীচ কিন্তু অত্যন্ত চালাক লোকের শত্রুতা করলেন। আপনি খুব সাবধানে থাকবেন, মিঃ…'

—'আমার নাম টারজান।'

—'আমি কোন দিন আপনার ঋণ শোধ করতে পারব না। গুড নাইট।'

এর পর রোকফ্‌ আর পলভিচকে টারজান দূর

থেকেই দেখেছিল, কিন্তু জাহাজের ভিড়বার আগের দিন সন্ধ্যের দিকে মহিলার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। অল্‌গা বলল, 'সেদিনের পর এই প্রথম কেবিন থেকে বেরিয়েছি। সেদিনকার ব্যাপারে আমি খুব লজ্জিত। আশাকরি আমাকে আপনি ভুল বোঝেননি।'

—'একদমই না। এর আগেও একদিন ওদের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচয় স্মোকিংরুমে হয়েছিল।'

—'হ্যাঁ, আমার স্বামীর কাছ থেকে আমি সব শুনেছি। তিনি আপনার অনেক প্রশংসা করেছিলেন। আমি কাউন্টেস দ্য কুদ্‌।'

এর পর ফ্রান্সের বন্দরে জাহাজ লাগার নানা গোলমালে টারজানের সঙ্গে ওঁদের আর দেখা হলো না।

প্যারিসে পৌঁছে টারজান সোজা তার বন্ধু পল্‌ ডার্ণোর বাড়ি গেল। তিনি ফরাসী নৌবাহিনীর অফিসার। তিনি খুব কড়া ভাবেই টারজানের সম্পত্তি অন্য লোককে দিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করলেন। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাই এত সহজে অমন বিরাট সম্পত্তি ছেড়ে দিলে। পৃথিবীর কাছে জানানো উচিত ছিল যে তোমার শিরায় ইংলণ্ডের এক বিখ্যাত অভিজাত বংশের রক্ত বইছে, বনমানুষের নয়। অন্যান্যরা যে কি করে এই উদ্ভট কথা বিশ্বাস করতে পারল তা বুঝতে পারলাম না, বিশেষ করে মিস্‌ পর্টার। আমি তো কোনো দিনও বিশ্বাস করিনি যে তোমার মা বনমানুষী। আফ্রিকার জঙ্গলে যখন তুমি অন্যান্য হিংস্র জানোয়ারদের মতো কাঁচা মাংস খেতে তখনও নয়, আর এখন তোমার বাবার ডায়েরী থেকে তো সবই জানা গেছে। কি ভাবে তিনি ও তোমার মা আফ্রিকার জঙ্গলে অসহ্য অবস্থায় দিন কাটিয়েছিলেন আর সব থেকে বড় প্রমাণ ঐ ডায়েরীর পাতায় তোমার শিশু হাতের ছাপ। এত সব ছেড়ে এখন তুমি একজন নামহীন অর্থহীন ভবঘুরে!'

—'টারজানের চেয়ে ভালো নামে আমার দরকার নেই আর অর্থহীন ভবঘুরে হবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। বরঞ্চ তোমার বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে এখন একটা চাকরির বন্দোবস্ত করতে হবে।'

—'বেশ, বেশ, সে হবে এখন! তুমি খুব ভালো করেই জানো আমার যথেষ্ট পয়সাকড়ি আছে আর তার অর্ধেক তোমার। তোমার ঋণ কোনোদিনও শোধ করতে পারব না। আফ্রিকার জঙ্গলের সেই নরখাদক অধিবাসীদের হাত থেকে কি ভাবে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছিলে! তার পরে কি ভাবে আমার শুশ্রূষা করেছিলে, বিশেষ করে যখন তোমার ইচ্ছা ছিল পর্টার পরিবারের সঙ্গে ফিরে যাবার। একজন অচেনা লোকের চিকিৎসার জন্য তুমি কত বড় স্বার্থত্যাগ করেছিলে! এ সব কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। তবে তুমি ভেবোনা যে আমি অর্থ দিয়ে ঋণ শোধ করতে চাইছি, তা নয়। এখন তোমার অর্থের প্রয়োজন, সেটা আমার প্রচুর রয়েছে। তাই তোমাকে খানিকটা ভোগ করবার জন্য দিচ্ছি।'

টারজান হেসে বলল, 'বেশ তো, এ বিষয়ে আর ঝগড়া করে দরকার নেই। আমাকে খেতে পরতে হবে তাই টাকা নেবো, তবে যদি আমি কোনো একটা কাজ পেতাম তাহলে আরো ভালো হতো। অলসভাবে জীবন কাটানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে। আমার পৈত্রিক সম্পত্তি তো একজন ভালো লোকের হাতেই আছে। ক্লেটন সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে যে সে-ই হলো আসল লর্ড গ্রেস্টোক। তাছাড়া একজন ইংলিশ লর্ডের পদ তাকেই বেশি মানাবে। আমি এখন পর্যন্ত সভ্য জগতের কায়দাকানুন সম্পূর্ণ শিখতে পারিনি। এখনও রেগে গেলে চোখের সামনে লাল রঙ ফুটে ওঠে আর হিংস্র বন্য জন্তুর সমস্ত অনুভূতি জেগে ওঠে। যেটুকু সভ্যতা শিখেছি তা সমস্তই চাপা পড়ে যায়। তাছাড়া আমি যদি লর্ড গ্রেস্টোক হবার ইচ্ছা প্রকাশ করতাম তাহলে যে মেয়েকে আমি ভালবাসি তাকে পদ-মর্যাদা আর অর্থ থেকে বঞ্চিত করতাম। ক্লেটনের বাগদত্তা জেন পর্টার কিছুই পেতো না। আমার পক্ষে তা অসম্ভব, পল্‌। পদমর্যাদাকে আমি গ্রাহ্য করিনা। আমার জন্মদাত্রী ইংরেজ মা'কে আমার এতটুকু মনে নেই। তার জায়গা নিয়েছিল একজন হিংস্র বনমানুষী—কালা। বুকের দুধ খাইয়ে সে আমাকে মানুষ করেছিল। জঙ্গলের অন্যান্য জন্তুর সঙ্গে ভয়ঙ্কর লড়াই করে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আমিও তাকে ভালোবাসতাম পল্‌। যখন তাকে মেরে ফেলল জঙ্গলের এক নিষ্ঠুর অধিবাসী তখন আমি তার বুকের উপর আছড়ে পড়ে কেঁদেছিলাম। তোমাদের কাছে সে হয়ত কুৎসিত বনমানুষী ছিল, কিন্তু আমার কাছে সে ছিল মায়ের প্রতীক।'

পল্ ডার্ণো বলল, 'সবই বুঝলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে একদিন তোমার পৈত্রিক অধিকারের প্রয়োজন হতে পারে। মনে রেখো, প্রফেসর পটার আর মিঃ ফিল্যাণ্ডার জানেন যে তোমার বাবার কেবিনে যে ছোট্ট কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল সেটা আসলে একটি বনমানুষ শিশুর। তাঁরা দু'জনেই এখন বৃদ্ধ, কিন্তু তাঁদের সাক্ষ্য খুবই মূল্যবান। তারপর একদিন যখন মিস্ পটার তোমার আসল পরিচয় জানতে পারবে তখনো কি সে ক্লেটনকে বিয়ে করতে রাজি হবে? তুমি কি কখনও ভাবোনি যে পদমর্যাদা বিষয়-সম্পত্তি এবং যাকে ভালোবাসো, সবই তুমি অনায়াসে লাভ করতে পার?'

টারজান মাথা নেড়ে বলল, 'না বন্ধু তুমি জেন্‌কে চেনো না। সে অ্যামেরিকার একটা অভিজাত পরিবারের মেয়ে। ভাগ্যের যদি কোন বিপর্যয় ঘটে তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ় ভাবে পালন করবে।'

এর পর টারজান দুই সপ্তাহ ধরে প্যারিসের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে পুরানো পরিচিতদের সঙ্গে আবার দেখা করতে লাগল। দিনের বেলায় লাইব্রেরী ও ছবির গ্যালারিতে সময় কাটাত। জ্ঞান অর্জনের গভীর সমুদ্রে নিজেকে ডুবিয়ে রাখত। সন্ধ্যেবেলা সে বিখ্যাত প্যারিস শহরে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা উপভোগ করত।

এক দিন মিউজিক হল থেকে বেরিয়ে টারজান হাঁটতে লাগল। একজন লোক যে তার পিছু নিয়েছে তা কিন্তু লক্ষ্যই করল না। এই ভাবে যে আগেও তাকে অনুসরণ করা হয়েছে তাও টারজানের জানা ছিল না। রাত্রে যে রাস্তা দিয়ে টারজান সাধারণতঃ বাড়ি ফিরত তার নাম ছিল রু মল্। এই নির্জন অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে টারজানের আফ্রিকার জঙ্গলের কথা মনে পড়ত। এ জায়গাটা যেন সভ্য জগতের বাইরে। রাস্তাটার বেশ দুর্নাম ছিল, বিশেষ করে রাত্রিবেলা।

সে রাত্রে টারজান কিছু দূর এগিয়েছে এমন সময় নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ তার কানে এলো। কিছু বিবেচনা না করেই আওয়াজটা লক্ষ্য করে একটা পুরানো বাড়িতে ঢুকে, সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে, টারজান একটা ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরটি আবছা অন্ধকার, একটা তেলের বাতি জ্বলছে! তাতেই টারজান দেখল যে ঘরের জনা বারো লোকের মধ্যে একজন ছাড়া প্রত্যেকেই পুরুষ। মহিলাটির বয়স বোধহয় বছর ত্রিশ হবে। চেহারায় এক কালে সৌন্দর্য থাকলেও এখন অসৎ জীবন যাপনের ছায়া পড়েছে। সে গলায় হাত দিয়ে একটা কোণায় ঘেঁসে দাঁড়িয়ে টারজানকে দেখে বলল, 'বাঁচান বাঁচান, এরা আমাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে।'

টারজান চারদিকে তাকিয়ে দেখল যে প্রত্যেকটি লোক দাগী গুণ্ডা। এরা যে কেন পালাবার কোন চেষ্টা করছে না তাও একবার মনে হলো। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে ফিরে দাঁড়াতেই টারজানের দুটি জিনিস চোখে পড়ল। যে লোকটি পা টিপেটিপে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, সে হলো নিকোলাস রোকফ্। তাছাড়া ভীষণ ষণ্ডা একটা লোক মুগুর হাতে, তার দিকে এগিয়ে আসছে। ধরা পড়ে গেছে দেখে এরা সকলে এক জোটে টারজানকে আক্রমণ করল।

টারজান প্রথমে মুগুর হাতে লোকটাকে ধরে চোয়ালে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি মেরে ধরাশায়ী করে ফেলল। তারপর এক এক করে অন্যদের সঙ্গে লড়ল। এ যেন সেই আফ্রিকার জঙ্গলে বুনো লড়াই। টারজান এ লড়াই সত্যি সত্যি উপভোগ করছিল, কিন্তু অন্যদের ক্রমশঃ মনে হতে লাগল তারা যেন এক হিংস্র বুনো জন্তুর সঙ্গে লড়াই করছে। তার প্রচণ্ড বলের কাছে তাদের শক্তি একেবারে তুচ্ছ।

মহিলাটি ক্রমেই অবাক হয়ে যেতে লাগল, পরে যুদ্ধের পরিণতি দেখে ভয় পেয়ে নিচু গলায় বলে উঠল, 'হে ভগবান! এ যে একটা বন্য জানোয়ার!' এ কথা বলার কারণ ছিল। টারজান বুনো জানোয়ারদের মতনই তখন দাঁত দিয়ে একজন আততায়ীর টুঁটি চেপে ধরেছিল। ঠিক যেন একটা চিতাবাঘে ধরেছে! কারো কব্জির হাড় ভাঙল; কারো কাঁধের হাড় সরল; কারো মাথা ফাটল।

যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে তারা পালিয়ে যেতে লাগল। রোকফ্ করিডরে অপেক্ষা করছিল টারজানের মৃত্যুর জন্য। এখন বেগতিক দেখে দৌড়ে পাশের বাড়ি থেকে পুলিসকে টেলিফোন করে খবর দিয়ে দিল যে র-মল্-এর এক বাড়িতে খুন হয়েছে।

পুলিস এসে দেখল যে ঘরের মেঝেতে তিনজন লোক গোঙাচ্ছে, একটি অত্যন্ত ভীত মহিলা বিছানায় মুখ ঢেকে শুয়ে আছে আর ঘরের মাঝখানে ভালো কাপড়-চোপড় পরা এক তরুণ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

একজন পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করল, 'কি হচ্ছে এখানে?'

টারজান সংক্ষেপে সব বলল। কিন্তু মহিলাটি চিৎকার করে বলে উঠল, 'সব মিথ্যা কথা! এ লোকটা জোর করে আমার ঘরে ঢুকেছিল। আমার চিৎকারে এরা সব আমাকে বাঁচাতে এলো। শুধু হাতে ও দাঁত দিয়ে এ লোকটা প্রত্যেককে প্রায় মেরে ফেলেছে।'

মেয়েটির অকৃতজ্ঞতা দেখে টারজান হতভম্ব হয়ে গেল। পুলিসরা অবশ্য তার কথায় কান দিল না, কারণ তারা তাকে আর তার সঙ্গীদেরও ভালো করেই চিনত। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে তারা ঘরের সবাইকে গ্রেপ্তার করল।

টারজানকে যখন জোর করে ধরতে গেল তখন পুলিসরাও তার শক্তির পরিচয় পেল। টারজান প্রথমে ভদ্রভাবেই বলল, 'আমি কোনো দোষ করিনি, শুধু নিজের প্রাণ রক্ষা করেছি। এই মহিলা কেন মিথ্যা কথা বলছে তা বুঝলাম না। এরই চিৎকার শুনে আমি এখানে এসেছি।

একজন অফিসার বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ও সব কথা শুনবার জন্য জজ্‌রা রয়েছেন।' এই বলে তার দিকে এগিয়ে যেতেই মুহূর্তের মধ্যে ধরাশায়ী হলো। সঙ্গীরা দৌড়ে আসাতে তাদেরও একই অবস্থা হলো। এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটল যে কেউ বন্দুক বের করবার সময়ও পেল না।

এরই মধ্যে টারজান জানলার বাইরে একটা গাছের গুঁড়ি লক্ষ্য করেছিল। যেই একজন পুলিস বন্দুক ছুঁড়বার জন্য উঠে দাঁড়াল টারজান ঘরের বাতিটা ফেলে দিয়ে, এক দৌড়ে জানলার বাইরের গাছের গুঁড়ি বেয়ে নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

পুলিসরা নিচে এসে আরেকজন টহলদারী পুলিসকে টারজান কোথায় গেল জিজ্ঞেস করাতে সে কিছুই বলতে পারল না। তার সঙ্গীরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করল, কিন্তু কিছুই প্রমাণ করতে পারল না।

আসলে টারজান নিচে নামতে গিয়ে পুলিসকে দেখে নিচে না নেমে ওপরে উঠে গিয়েছিল। তারপর অনায়াসেই এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফিয়ে যেতে যেতে চৌরাস্তায় পৌঁছে একটা পোস্ট বেয়ে রাস্তায় নেমে একটা কাফেতে ঢুকে পড়ল। সেখানকার বাথরুমে হাত মুখ ধুয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর শুনতে পেল মেয়েলী গলায় তাকে কে ডাকছে। দেখল একটা গাড়ির ভিতরে কাউন্টেস অলগা দ্য কুদ তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। টারজান তাকে অভিবাদন জানাতে গাড়িটা চলে গেল।

টারজান তখন আবার পথ চলতে চলতে নিজের মনে ভাবতে লাগল প্যারিস শহরের সীমা সত্যিই বড় ছোট। তাই একই রাত্রে রোকফ্ আর কাউন্টেস্ দ্য কুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!

পরদিন সকালবেলা টারজান তার বন্ধু পল্ ডার্ণোকে রাত্রের সব ঘটনা বলে বলল, 'তোমাদের এই প্যারিস শহর আমার জঙ্গলের চেয়েও মারাত্মক! কেন ওরা আমাকে ওরকম করে ডেকে নিয়ে গেল? ওদের কি খিদে পেয়েছিল?

ডার্ণো শিউরে উঠে বলল, 'জঙ্গলের মাপকাঠি দিয়ে সভ্য জগতের আচার-ব্যবহার বোঝা বোধ হয় তোমার পক্ষে কঠিন।'

—'সভ্যজগতের আচার-ব্যবহার! জঙ্গলে কেউ অহেতুক অত্যাচার বা খুন করে না। সেখানে শুধু খিদে পেলে বা আত্মরক্ষার জন্য একজন আরেকজনকে মেরে ফেলে। কিন্তু এখানে! লোভ দেখিয়ে মিথ্যা অজুহাতে লোক ডেকে তাকে খুন করবার চেষ্টা করা হয়। একজন মহিলা যে এত নীচ হতে পারে তা জানতাম না। আর রোকফ্ নিশ্চয় জানত যে আমি এই রাস্তা দিয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরি।'

ডার্ণো বলল, 'এখন বুঝলে তো কেন তোমার ঐ রাস্তা দিয়ে রাত্রে ফেরা বন্ধ হোল?'

টারজান বলল, 'ঠিক তার উল্টো। প্যারিসে ঐ একটি রাস্তাই আছে, যেখানে আমি জঙ্গলের স্বাদ খানিকটা

পেয়েছি। আমি আর অন্য কোনো রাস্তা নেবো না।'

—'আশা করি তার জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে না। কারণ প্যারিসের পুলিস বাহিনী অত সহজে তোমার হাতে তাদের অপমান ভুলে যাবে না। একদিন না একদিন তোমাকে তারা লোহার কপাটের পিছনে বন্ধ করবেই।'

—'টারজানকে কেউ কোনদিন লোহার কপাটের পিছনে বন্ধ করতে পারবে না।'

তার গলার স্বরে এমন একটা কিছুর আভাস ছিল যার জন্য ডার্ণো তাকিয়ে দেখল টারজানের চোয়াল শক্ত হয়ে আছে আর ছাই রঙের চোখে কঠিন দৃষ্টি।

গম্ভীর গলায় ডার্ণো বলল, 'তোমার অনেক কিছু শেখার বাকি আছে টারজান। তার মধ্যে একটা হলো পুলিসকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া। আমি আজ তাদের কাছে তোমার ব্যবহারের কারণ বুঝিয়ে দেবো, কিন্তু এর পর থেকে তোমাকে তাদের কথা মেনে নিতেই হবে। তা না হলে অনেক বিপদে পড়তে হবে।'

পুলিস স্টেশনের কর্তার কাছে ডার্ণো সব খুলে বলার পর তিনি টারজানের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি খুব অন্যায় কাজ করেছেন, কিন্তু এখন সব ব্যাপারটা শোনার পর আমি সেই পুলিস অফিসারদের ডেকে পাঠাবো, যারা গত রাত্রে আপনার হাতে জখম হয়েছে। তারা সব শোনার পর নিজেরাই ঠিক করবে আপনার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আনবে কি না। যারা আপনাকে ধররার চেষ্টা করেছিল তারা শুধু নিজেদের কর্তব্য পালনই করছিল। প্রত্যেকদিন পুলিসরা নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে পরের সাহায্য করবার চেষ্টা করে। দরকার হলে আপনাকেও করবে। পুলিস কর্মচারীরা অত্যন্ত সাহসী, কিন্তু তাদের পক্ষে এ অপমান সহ্য করা খুব কঠিন।'

এমন সময় সেই চার জন পুলিস সেখানে উপস্থিত হয়ে টারজানের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

পুলিস-কর্তা তাদের ডার্ণোর কাছে সমস্ত ঘটনা শুনতে বলল। ডার্ণো আধঘণ্টা ধরে অনেক কিছু বলল। তাতে টারজানের জীবনের খানিকটা ইতিহাসও বাদ পড়ল না। শুনতে শুনতে পুলিসরা ভাল করেই বুঝতে পারল যে টারজান তার বুনো অনুভূতির ওপর ভরসা করেই ওভাবে লড়াই করেছিল। সে পুলিসদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি।

ডার্ণো শেষ করবার আগে পুলিসদের বুঝিয়ে বলল, 'আসলে আপনাদের আত্মাভিমানে লেগেছিল। একজনের কাছে অতজন লোকের হার সত্যিই অপমানের কথা, বিশেষ করে পুলিসের। কিন্তু আপনারা কি করে জানবেন যে যার কাছে আপনাদের হার হয়েছে তার কাছে গভীর জঙ্গলের হিংস্র জন্তুরাও বারবার হার মেনেছে। টারজানের অমানুষিক শক্তির কাছে মাথা নত করা কিছু অপমানের কথা নয়।'

পুলিসরা টারজানের দিকে তাকাতেই সে ধীর পায়ে এসে নিজের ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যে ভুল করেছি তার জন্য আমি দুঃখিত। এখন থেকে আমি তোমাদের বন্ধু।'

পুলিসদের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। এর পরে বহুদিন ধরে পুলিস ব্যারাকে টারজানকে ঘিরে নানারকম আলোচনা চলতে লাগল আর টারজানেরও বন্ধু বৃদ্ধি হলো—সেই চারজন পুলিস।

বাড়ি ফিরে ডার্ণো তার ইংরেজ বন্ধু উইলিয়ম সেসিল্ ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোকের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। আফ্রিকার জঙ্গলের অভিজ্ঞতার পর থেকে ডার্ণো আর ক্লেটনের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান চলত।

চিঠি পড়া শেষ করে ডার্ণো সংক্ষেপে বলল, 'দু'মাস পরে ওদের বিয়ে।' টারজানকে বলে দিতে হলো না, ওদের মানে কাদের।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ডার্ণোর সঙ্গে অপেরা দেখতে গিয়ে কিছুতেই আর মন দিয়ে শুনতে পারছিল না। তার চোখের সামনে কেবলই জেন্ পর্টারের ছবি ভেসে উঠতে লাগল আর তার মিষ্টি স্বর কানে আসতে লাগল। টারজান বহু কষ্টে নিজেকে সচেতন করে অপেরা শুনতে লাগল। এমন সময় তার চোখ পড়ল কাউন্টেস্ অল্গা দ্য কুদের ওপর। বিরতির সময় সে কাউন্টেসের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

কাউন্টেস বললেন, 'আপনি নিশ্চয় আমার স্বামীকে আর আমাকে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ মনে করছেন, কারণ বারবার আমাদের সাহায্য করার পরও রোকফের ব্যবহারের কারণ আপনাকে আমরা খুলে বলছি না। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপার আপনার কাছে বলার প্রয়োজন হয়েছে। আমি এ-ও জানি যে রোকফ্ আপনাকে সহজে ছেড়ে দেবে না। তাই আপনাকে সব খুলে বলতে চাই,

কিন্তু এখানে নয়। আসছে কাল বিকেল পাঁচটার সময় আমাদের বাড়িতে আসবেন।'

টারজান হাসিমুখে রাজি হয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। কিন্তু লক্ষ্য করল না যে থিয়েটারের আরেক কোণা থেকে রোকফ্ আর পল্‌ভিচ্ ওদের কথাবার্তা বলতে দেখে নিজেদের মধ্যে একটু হাসল।

পরদিন বিকেল সাড়ে চারটের সময় দ্য কুদ্-প্রাসাদের পিছনের দরজার ঘণ্টা বাজল। লম্বা চেহারা আর একমুখ দাড়ি নিয়ে কে এসেছে। যে চাকরটি দরজা খুলল সে কিন্তু চিনতে পেরে একটু অবাক হলো। নিচু গলায় কথাবার্তায় প্রথমে চাকরটাকে কিছু একটা ব্যাপারে নারাজ মনে হলো কিন্তু পর মুহূর্তে এর হাত থেকে ওর হাতে একটা জিনিস চালান হতেই সে দরজা দিয়ে আগন্তুককে ভিতরে নিয়ে একটা ঘরের কোণায় লুকানো জায়গায় পৌঁছে দিল। জায়গাটার সামনে ভারি পর্দা ঝুলছে আর এই ঘরেই প্রত্যেকদিন বিকেলে কাউন্টেস অল্‌গা চা খান।

আধঘণ্টা পরে টারজানকে সেই ঘরে কাউন্টেস নিয়ে এলেন।

কিছুক্ষণ এ-কথা ও-কথা বলার পর কাউন্টেস বললেন, 'আপনি নিশ্চয় ভাবছেন আমাদের ওপর রোকফের এই নির্যাতনের কারণ কি? ব্যাপারটা আসলে খুবই সহজ। আমার স্বামীর কাছে অনেক সময় সামরিক দপ্তরের এমন সব খবরাখবর বা কাগজপত্র থাকে যা পাবার জন্য শত্রুপক্ষ খুন-রাহাজানি, দরকার হলে আরও অনেক নিকৃষ্ট কাজ করতেও প্রস্তুত থাকে।

এই মুহূর্তে তাঁর কাছে ঐ রকম কোন খবর আছে যা হাতে পেলে কোনো রাশিয়ানের প্রচুর অর্থ ও সুনাম লাভ হবে। রোকফ্ আর পল্‌ভিচ হলো রাশিয়ার স্পাই। এরা যে কোনো ভাবে সেই বিশেষ খবর যোগাড় করতে পিছপাও হবে না। জাহাজে ঐসব ফাঁদ পেতে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে যাতে আমার স্বামী গুপ্তকথা ফাঁস করে দেন আর সমাজ ও সরকারের চোখে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ হন। কিন্তু প্রত্যেকবার আপনিই তাদের ব্যর্থ করেছেন। আমাকে কথা দিন, আপনি সর্বদা সর্তক থাকবেন, কারণ এর জন্য আপনার যদি কিছু বিপদ হয় তাহলে আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না।'

টারজান বলল, 'এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওদের দু'জনের থেকেও অনেক সাংঘাতিক শত্রুর সঙ্গে যুঁঝে আমি আজও বেঁচে আছি। কিন্তু আপনি কেন এই দু'জন দুর্বৃত্তকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিচ্ছেন না?'

কাউন্টেস একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'এর দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ হলো নিকোলাস রোকফ্ আমার নিজেরই ভাই। আমরা রাশিয়ান। ছোটবেলা থেকেই নিকোলাসের চরিত্রে খুঁত ছিল। তাকে সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেনের পদ থেকে সরে যেতে হয়েছিল এক অতি নিন্দনীয় কারণের জন্য। যখন এই নিয়ে গোলমাল মিটে গেল তখন আমাদের বাবা তাকে গুপ্তচর বিভাগের কাজে লাগালেন। সেখানেও নিকোলাস অনেক নিকৃষ্ট কাজ করেছিল, কিন্তু যা হোক করে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এখন সে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতককে ধরিয়ে দিয়ে রাশিয়ার জারের কাছ থেকে সুখ্যাতি পেয়েছে এবং তার আগেকার সমস্ত অপরাধকে ক্ষমা করে দেওয়াও হয়েছে।'

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু আপনাদের ওপর সে যে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তার জন্য ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আপনাদের পক্ষে নিশ্চয় অসম্ভব হয়ে পড়েছে? আপনি তার ভগ্নী কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার চরিত্রের ওপর সে দোষ চাপাতে চেয়েছিল।'

কাউন্টেস উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমার বড় ভয় করে। ছোটবেলা থেকে পুরুষদের আমি ভয় পাই। প্রথমে আমার বাবা, পরে নিকোলাস, তারপর কনভেন্টের ফাদার-দের। আমার সব বন্ধুরাই তাদের স্বামীদের ভয় পায়।'

টারজান অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু মেয়েরা কেন পুরুষদের ভয় পাবে? আমি অবশ্য জঙ্গলের কথা জানি। কিন্তু সভ্যজগতের মেয়েরা কেন পুরুষদের ভয় পেতে যাবে, পুরুষরা তো জন্মেছে দুর্বলদের রক্ষা করার জন্য! আমাকে কোন মেয়ে ভয় করে, এ কথা ভাবতে খারাপ লাগে।'

নিচু গলায় কাউন্টেস বললেন, 'আপনাকে কোন মেয়ে ভয় করবে না। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্প হলেও এরই মধ্যে আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনাকে ভয় করবার কোন কারণ নেই, যদিও আপনার দেহে সাংঘাতিক শক্তি। কি রকম সহজেই আপনি সেদিন জাহাজে আমার কেবিন থেকে নিকোলাস আর পল্‌ভিচকে বের করে দিলেন! আশ্চর্য!'

এদিকে টারজান চলে যাবার পর কাউন্টেস্ ফিরে দাঁড়াতেই নিকোলাস রোকফের সঙ্গে মুখোমুখি হলেন।

তিনি চমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কতক্ষণ ধরে এখানে আছ?'

রোকফ্ নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলল, 'তোমার ফ্রেণ্ড আসবার আগে থেকেই।'

কাউন্টেস রেগে বললেন, 'চুপ করো। নিজের বোনকে এসব কথা বলতে লজ্জা করছে না। আমি রাউলকে সব বলে দেবো।'

রোকফ্ গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি কিছু বলবে না। তোমারই একজন চাকরের সাহায্যে আমি এখানে এসেছি আর দরকার হলে সে তোমার বিরুদ্ধে তোমার স্বামীর কাছে সব কথা বলতে পারবে।'

ব্যাপারটা আগের থেকেও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু কাউন্টেস তাঁর স্বামীকে কিছু বলতে পারলেন না। হয়তো তাঁর মনে যে ভয় দানা বেঁধেছিল, এখন তাঁর বিবেক-বুদ্ধি সেটাকে আরো দশগুণ বাড়িয়ে তুলতে লাগল।

এর পর প্রায় এক মাস ধরে টারজান কাউন্টেস দ্য কুদের চায়ের আসরে নিয়মিত যোগ দিতে লাগল। প্যারিস শহরের অন্যান্য কিছু বাসিন্দার সঙ্গেও তার আলাপ-পরিচয় হলো। প্রথম প্রথম যাতায়াতের জন্য নিকোলাস রোকফ্ কি ভাববে তার জন্য কাউন্টেস উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ক্রমশঃ টারজানের মিষ্টি ব্যবহারে সে চিন্তা মন থেকে সরে যেতে লাগল।

রোকফ্ কিন্তু দূর থেকে টারজানের সব গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। যেদিন থেকে সে জানতে পারল যে সে একজন রাশিয়ান স্পাই এ কথা টারজান জেনে ফেলেছে সেদিন থেকে তার ভয় হয়েছে যদি টারজান সেকথা ফাঁস করে দেয়। কি ভাবে টারজানকে চিরদিনের মতো সরিয়ে ফেলে সেই সূত্রে প্রচুর টাকাও পাওয়া যায় তার চিন্তায় ডুবে রইল। তাছাড়া এভাবে টারজানের হাতে যে লাঞ্ছনা পেয়েছিল তারও প্রতিশোধ নেওয়া যাবে।

দ্য কুদ্ পরিবারের এই আতিথেয়তা টারজান উপভোগ করতে লাগল। কাউন্টেসের চায়ের আসরে নানা ধরনের কথাবার্তা, নানান লোকের সঙ্গে পরিচয় তার নিঃসঙ্গ মনের ওপর একটা মোলায়েম প্রলেপ লাগিয়ে দিল। ক্রমশঃ তার ভিতরে একটা গভীর শান্তির ছায়া পড়ল।

অন্যদিকে রোকফের মনে কিন্তু কু-অভিসন্ধি বেড়েই চলল। কিভাবে টারজানকে কাউন্ট দ্য কুদের সামনে অপদস্থ করতে পারবে, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে টারজানের মেলামেশার অজুহাত দিয়ে - তারই রাস্তা খুঁজতে লাগল। একদিন সে সুযোগ এসেও পড়ল।

একজন জার্মান মন্ত্রী সেই সময় প্যারিস সফরে এসেছিলেন। দেশে ফিরে যাবার আগে তিনি প্যারিসের গণ্যমান্য লোকদের জন্য একটা নৈশভোজের আয়োজন করলেন। অতিথি তালিকায় কাউন্ট দ্য কুদের নামও ছিল।

নিকোলাস রোকফ্ আর পলভিচের কুৎসিত মন এই সুযোগে উল্লসিত হয়ে উঠল। পলভিচ্ সেদিন সন্ধ্যেবেলা জার্মান মন্ত্রীর বাড়ির সামনে অপেক্ষা করতে লাগল যতক্ষণ না কাউন্ট সেখানে এসে পৌছলেন। বেশিক্ষণ লাগল না। যেই কাউন্ট তাঁর গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে গেলেন, পলভিচ্ রোকফের কাছে ছুটে গিয়ে খবরটা দিল। রোকফ্ তখন টারজানের বন্ধু পল্ ডার্ণোর বাড়ি টেলিফোন করে টারজানকে বলল যে সে কাউন্টেস দ্য কুদের একজন বিশ্বস্ত চাকর। কাউন্টেস অত্যন্ত বিপদে পড়ে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি যেন সময় নষ্ট না করে এক্ষুণি কাউন্টেসের বাড়ি চলে যান।

এরপর নিজেরাও সময় নষ্ট না করে কাউন্ট দ্য কুদের কাছে একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখে পাঠাল। চিঠিতে লেখা ছিল -

'কাউন্ট দ্য কুদ, আপনার পরিবারের সুনামের একজন শুভার্থী আপনাকে সতর্ক করে দিতে চায় যে, যে লোকটি আজ কয়েক মাস হলো আপনার বাড়ি নিয়মিত যাতায়াত

করছে সে এখন আপনার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। আপনি যদি এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যান, তাহলে তাদের দু'জনকেই সেখানে দেখতে পাবেন। ইতি—আপনার বন্ধু

চিঠি পড়ে কাউন্টের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল আর তার হাত কাঁপতে লাগল।

কুচক্রী রোকফ্ ঠিক এ-ই চেয়েছিল!

রোকফ এবার কাউন্টেসকে টেলিফোন করে তাঁর খাস চাকরানীর সঙ্গে কথা বলল। তার কাছ থেকে কাউন্টেস শুতে গিয়েছেন শুনে বলল, 'তাড়াতাড়ি তাঁকে খবর দাও যা হয় কিছু গায়ে জড়িয়ে এক্ষুণি যেন টেলিফোনের কাছে আসেন। বিশেষ জরুরী কথা আছে। আমি পাঁচ মিনিট পরে আবার ফোন করব।'

রোকফের এই সমস্ত অভিসন্ধির মূল কারণ হলো যে সে জানত সারা প্যারিস শহরের মধ্যে তলোয়ার আর পিস্তল খেলায় কাউন্টের মতো দক্ষ আর একজনও নেই। তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে টারজান কোনমতেই পারবে না। কাজে কাজেই কাউন্টকে দিয়ে তার আসল কার্যসিদ্ধি হতে দেরি হবে না।

গভীর রাত্রে টারজান যখন দ্য কুদ্ বাসভবনে উপস্থিত হল তখন একজন চাকর তাকে একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে ঢুকে টারজান দেখল অল্গা দ্য কুদ্ রাত্রির পোশাক পরে একটা টেলিফোনের কাছে বসে অপেক্ষা করছেন। তাঁর মুখে একটা অসহিষ্ণুতার ছাপ। টারজানকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রাত্রে আপনি এখানে কি করছেন? কে আপনাকে ঢুকতে দিল?'

টারজান আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আপনার কিছু হয় নি? টেলিফোনে আপনি আমাকে ডেকে পাঠান নি?'

—'সে কি! এত রাত্রে? আমি কি পাগল?'

—'কিন্তু আপনার চাকর ফ্রাঁসওয়া যে বলল?'

—'ও নামে তো আমার কোন চাকর নেই!'

—'কাউন্ট কোথায়?'

—'তিনি তো জার্মান রাজদূতের বাড়ি ডিনারে গিয়েছেন।'

—'তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা আপনার ভাইয়ের চক্রান্ত। কাল কাউন্ট সব ব্যাপারটা শুনতে পাবেন আর রোকফের অভিসন্ধি পূরণ হবে।'

অল্গা ভীত হয়ে বললেন, 'তা হলে কি হবে? এখন কি করা যায়? সারা প্যারিসে যে রোকফ্ খবর ছড়িয়ে দেবে!'

তাঁর হাবভাবে এমন একটা অসহায় ভাব দেখা দিয়েছিল যা টারজানের পৌরুষে সাড়া জাগিয়ে দিল। সে অল্গার দুটি হাত ধরে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

চিঠি পাবার পর থেকে কাউন্টের চেহারা বদলে গেল। কিন্তু বাড়ি পৌঁছে তাঁর সেই জড় ভাব কেটে গিয়ে একটা কাঠিন্য দেখা দিল। হাতে একটি মজবুত লাঠি নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে তিনি তাঁর স্ত্রীর ঘরের দরজা খুলে ঢুকলেন।

অল্গাই প্রথমে তাঁর স্বামীকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন। আর কাউন্ট তাদের দেখে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে এসে সেই লাঠি দিয়ে টারজানকে বার বার আঘাত করতে লাগলেন।

মুহূর্তের মধ্যে টারজান এক সভ্য যুবাপুরুষ থেকে একটা বুনো জানোয়ার হয়ে গেল। সে কাউন্টের হাত থেকে মজবুত লাঠিটা কেড়ে নিয়ে অনায়াসে তাকে দু-টুকরো করে ভেঙে ফেলে দিল। তারপর তাঁর টুঁটি টিপে ধরে কুকুর যে রকম করে ইঁদুর মারে সেই ভাবে ঝাঁকিয়ে দম বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

কাউন্টেসের অবস্থা বর্ণনা করা দায়! চোখের সামনে এক বুনো জানোয়ার তাঁর স্বামীকে হত্যা করছে দেখে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'জন্, জন্, তুমি যে আমার স্বামীকে মেরে ফেলছ।'

টারজান তখন উন্মাদের মতো হয়ে কাউন্টকে মাটিতে ফেলে, তাঁর বুকের ওপর একটা পা রেখে জঙ্গলের বন-মানুষের জয়ধ্বনি করে উঠল। এই বিকট আওয়াজ শুনে বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দারা ভয়ে কেঁপে উঠল আর কাউন্টেস তাঁর স্বামীর দেহের পাশে বসে পড়ে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন।

ক্রমশঃ টারজানের চোখের সামনে থেকে একটা লাল পর্দা সরে যেতে লাগল। তার সম্বিত ফিরে এলো, পায়ের কাছে অল্গাকে আর তাঁর স্বামীকে দেখতে পেল।

কাউন্টেস চোখ তুলে দেখলেন যে টারজানের চেহারায় এখন গভীর অনুতাপের ছাপ। তিনি বললেন, 'আমার স্বামীকে আমি ভালবাসতাম, কিন্তু তুমি তাঁকে

মেরে ফেলেছ—এ কি করলে, টারজান ?'

অতি যত্নের সঙ্গে কাউন্টের দেহটিকে মাটি থেকে তুলে টারজান একটা সোফায় শুইয়ে দিল। তারপর তাঁর বুকে মাথা দিয়ে স্পন্দন শুনতে পেয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি একটু ব্র্যাণ্ডি আনুন।'

ব্র্যাণ্ডি গলায় যেতে কাউন্ট একটা অস্ফুট শব্দ করলেন। টারজান বলল, 'যাক্, ভগবানের দয়ায় উনি বেঁচে আছেন।

অল্গা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু কেন তুমি এ-রকম কাজ করলে, টারজান ?'

—'আমি বলতে পারব না। শুধু যখন উনি লাঠি দিয়ে আমাকে মারতে লাগলেন তখন আমি উন্মাদের মতো হয়ে গেলাম। জঙ্গলের বনমানুষদের মধ্যে এই রকম ব্যবহার দেখেছিলাম। আমার বাবাকে আমি জীবনে দেখিনি। এক অতিকায় বনমানুষীকে মা বলে জানতাম। পনেরো বছর বয়স অবধি কোনো মানুষকে আমি দেখিনি। কুড়ি বছর বয়সে প্রথম একজন শ্বেতকায় মানুষকে দেখতে পেলাম বছর কয়েক আগে পর্যন্ত বন্যপ্রাণীর মতো উলঙ্গ ভাবে আফ্রিকার জঙ্গলে জীবন কাটিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করতে চেষ্টা করবেন। এখন বুঝতে পারছি দু'বছরে সম্পূর্ণ সভ্য হওয়া যায় না।'

—'তোমাকে ক্ষমা করার কিছুই নেই, কারণ সম্পূর্ণ দোষ আমার। কিন্তু এখন তুমি এখান থেকে চলে যাও যাতে কাউন্ট জ্ঞান ফিরে পাবার পর তোমাকে দেখতে না পান।'

ধীর পায়ে মাথা নিচু করে টারজান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় বেরিয়ে টারজানের সম্পূর্ণ বোধজ্ঞান ফিরে এলো। সে রু মল্-এর কাছে এক পুলিস স্টেশনে ঢুকতেই তার পূর্ব পরিচিত পুলিস অফিসারদের মধ্যে একজনের সঙ্গে দেখা হলো। সে সানন্দে টারজানকে অভিবাদন জানালা। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর টারজান তাকে জিজ্ঞাসা করল নিকোলাস রোকফ্ বা আলেক্সিস্ পল্ভিচের বিষয় সে কিছু জানে কি না।

পুলিস বলল, 'নিশ্চয়। পুলিসের খাতায় দু'জনেরই নাম লেখানো আছে কারণ প্রত্যেক অপরাধী ব্যক্তির ওপর আমরা কড়া নজর রাখতে চাই। আপনি এদের কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?'

টারজান বলল, 'আমি এদের চিনি। একটু বিশেষ কাজের জন্য এদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। দয়া করে যদি ঠিকানাটা দেন।'

অল্পক্ষণ পরে পুলিস স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে টারজান তার গন্তব্যস্থানের দিকে চলল।

নিজেদের বাড়িতে বসে রোকফ্ আর পল্ভিচ তাদের ষড়যন্ত্রের চূড়ান্তের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা দুটি খবরের কাগজের দপ্তরে টেলিফোন করে তাদের রিপোর্টারদের ডেকে পাঠিয়েছিল। আসছে কাল সকালের কাগজে প্যারিস শহরের এক অভিজাত পরিবারের কুৎসার কথা প্রকাশিত হয়ে যাবে।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। দরজায় টোকা পড়তেই রোকফ্ দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে তার মুখের হাসি শুকিয়ে গেল।

গম্ভীর গলায় টারজান বলল, 'কেন আমি এখানে এসেছি তা তোমরা খুব ভালো ভাবেই জানো। তোমাদের মেরে ফেলাই উচিত কিন্তু তুমি অল্গা দ্য কুদের ভাই বলে এখন সে কাজ করব না। আমি তোমাদের বাঁচবার সুযোগ দেবো। পল্ভিচ একজন সামান্য আজ্ঞাবাহী দাস। তাকে মেরে কোনোই লাভ নেই যতক্ষণ তুমি বেঁচে আছ।

এ ঘর থেকে আমি চলে যাবার আগে তোমাদের দুটি কাজ করতে হবে। প্রথম, আজ রাত্রের সমস্ত চক্রান্তের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্কেও বিশদ বর্ণনা দিয়ে একটা চিঠি লিখে তোমাদের নিজেদের নাম সই করতে হবে। দ্বিতীয়, আমাকে কথা দিতে হবে যে আজ রাত্রের ঘটনার কথা খবরের কাগজে ছাপানো হবে না। যদি এ-কথায় রাজি না হও, তাহলে তোমরা দু'জনের কেউ-ই জীবন্ত ছাড়া পাবে না। সামনেই কাগজ-কলম রয়েছে, লিখতে আরম্ভ করো।'

রোকফ্ যখন রেগে আপত্তি জানাবার চেষ্টা করল তখন কঠিন আঙুলে টারজান তার টুঁটি টিপে ধরল আর সেই মুহূর্তে পলভিচ পালাবার চেষ্টা করাতে অন্য হাত দিয়ে তাকে ধরে ভীষণ জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পল্ভিচ জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই পড়ে রইল। রোকফ্ কোনো উপায় না দেখে গোমড়া মুখ করে লিখতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ পর পল্ভিচও জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভয়ে আধমরা হয়ে, রোকফের পাশের চেয়ারে এসে বসল।

অল্পক্ষণ পরেই দরজায় আবার টোকা পড়াতে টারজানই দরজা খুলে দেখল প্যারিস শহরের এক নামকরা

খবরের কাগজের দপ্তর থেকে একটি রিপোর্টার দাঁড়িয়ে। সে বিশেষ কোনো খবর জানতে চাইলে টারজান গুরু গম্ভীর স্বরে বলল, 'আপনি ভুল করেছেন, মিঃ রোকফ্, আপনাকে কোনো খবরই দিতে পারেন না, তাই না রোকফ্?'

বেগতিক রোকফ মাথা নেড়ে সায় দিল। হতাশ হয়ে রিপোর্টার চলে গেল।

ঘণ্টা খানেক পরে টারজান হাতে একটা পুরু খাম নিয়ে চলে যাবার আগে রোকফ্‌কে বলল, 'আমার মতে এরপর তোমার ফ্রান্স থেকে চলে যাওয়াই ভালো, কারণ একদিন কোনো না কোনো কারণে তোমাকে আমি মেরে ফেলবই।'

পরদিন সকালে কোনো কিছু বাদ না দিয়ে টারজান তার বন্ধু পল্ ডার্ণোকে রাত্রের ঘটনা খুলে বলল। সব শোনার পর ডার্ণো জিজ্ঞাসা করল, 'টারজান, তুমি কি অল্‌গা দ্য কুদ্‌কে ভালোবাস?'

টারজান বলল, 'আমিও কাউন্টেস্‌কে ভালোবাসি না আর তিনিও আমাকে বাসেন না! এখন বুঝতে পারছি প্যারিস শহর আমার মতো লোকের জন্য নয়। এখানে থাকলে পদে পদে আমাকে বিপদে পড়তে হবে, কারণ মানুষের তৈরি এই আইন-কানুনগুলো আমার পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। আফ্রিকার জঙ্গলেই ফিরে যাব ভাবছি। সেখানে জীবন কাটাবার জন্যই ভগবান আমাকে জন্ম দিয়েছেন।'

—'হতাশ হয়ে যেও না, বন্ধু।' ডার্ণো উত্তর দিলেন, 'এক্ষেত্রে সাধারণ লোকে যে রকম ব্যবহার করত, তার থেকে অনেক ভদ্র ব্যবহারই তুমি করেছ। আর তাছাড়া, এখন প্যারিস ছাড়ার বিষয়ে কাউন্ট রাউল দ্য কুদের কিছু মতামতও থাকতে পারে।'

ঠিক হলোও তাই। সপ্তাহ পর সকালবেলা মঁসিয়ে ফ্লবেয়ার এসে উপস্থিত হলেন আর অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানালেন যে কাউন্ট দ্য কুদ্ টারজানকে ডুয়েল খেলায় আহ্বান জানিয়েছেন। টারজান যেন কোনো বন্ধুকে তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত করবার জন্য পাঠান। টারজান খুশি হয়েই ডার্ণোর হাতে সমস্ত ব্যাপারটা ছেড়ে দিল আর ঠিক হলো যে সেইদিন বিকেলবেলা মঁসিয়ে ফ্লবেয়ার-এর সঙ্গে ডার্ণো দেখা করে ডুয়েলের বন্দোবস্ত করবে।

ফ্লবেয়ার চলে যাবার পর টারজান দুঃখিত ভাবে বলল, 'এখন আমার কপালে হয় খুন, নয় মৃত্যু। খুব তাড়াতাড়িই সভ্যতার রাস্তা দিয়ে চলা রপ্ত করে ফেলেছি।'

পল্ বলল, 'কি হাতিয়ার দিয়ে তুমি ডুয়েল লড়বে? দ্য কুদ্ একজন নামকরা তলোয়ার খেলোয়াড় আর অতি দক্ষ পিস্তল-চালক।

টারজান হেসে বলল, 'তাহলে তো আমাকে বিষ মাখানো তীরধনু দিয়ে লড়তে হয়! পিস্তলই ঠিক করো।'

—'জন, কাউন্ট তোমাকে মেরে ফেলবে।'

—'জানি, কিন্তু একদিন তো মরতেই হবে'

এরপর টারজান আর কোনো কথা শুনল না। সুতরাং পল্ পরদিন ভোরবেলা ঠিক সূর্যোদয়ের সময় এক নিভৃত জায়গায় ডুয়েল খেলার সব বন্দোবস্ত করে এলো।

সে রাত্রে টারজান নিজের ঘরে বসে অনেকগুলো চিঠি লিখল। তারপর সেগুলো ডার্ণোর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেল।

পরদিন ভোরের আবছা অন্ধকারে দু'জন বন্ধু ডুয়েল খেলার জায়গায় গেল। দু'জনেই কোনো কথা না বলে নিজেদের চিন্তায় ডুবে রইল। ডার্ণোর মন দুঃখে ভরা, কারণ সে সত্যিই টারজানকে অতি নিকট বন্ধু বলে ভালোবাসত। তাদের দু'জনের স্বভাব একই ধরনের ছিল। উঁচুদরের বিবেক বিবেচনা, পৌরুষ, সাহস ও সততা নিজেদের প্রগাঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল।

আর টারজান কি ভাবছিল? তার মনের ভিতরে ছবির মতো অতীতের কথা ভেসে আসছিল। জঙ্গলের আনন্দ-মাখা মুহূর্তগুলো, ছেলেবেলার স্মৃতি, মৃত পিতার কেবিনে বসে ছবির বই দেখা। আর মনে পড়তে লাগল জেন্ পর্টারকে।

এই ভাবে তারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেল। এর কিছুক্ষণ পরেই দ্য কুদ্, ফ্লবেয়ার ও একজন চিকিৎসক সেখানে এসে পৌঁছলেন। ডুয়েল খেলার প্রাথমিক আইনগুলো বলার পর দ্য কুদ্ আর টারজান পিঠোপিঠি দাঁড়িয়ে সাক্ষীদের আজ্ঞা পেয়ে এক-পা দু-পা করে দশ-পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ল।

কিন্তু কে গুলি ছুঁড়ল? কাউন্ট দ্য কুদ্ তো নিশ্চয় ছুড়লেন, কিন্তু টারজান হাত নামিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

কাউন্ট আবার গুলি ছুঁড়লেন, তবুও টারজান নড়ল না। কিন্তু গুলি ঠিকই লেগেছিল। দ্য কুদের হতভম্ব মন হঠাৎ বুঝতে পারল যে টারজান বোধ হয় ইচ্ছা করেই এ রকম ব্যবহার করেছে। খুব সম্ভব সে সময় বুঝে তাঁকে মেরে ফেলবে।

টারজান ক্রমশঃ তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তার উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে পেরে অন্যরা ছুটে আসতেই সে তাদের বাধা দিয়ে বলল, 'ভয় নেই, আমি এঁর কোনো ক্ষতি করব না! কিন্তু আপনার পিস্তলে নিশ্চয় কোনো দোষ আছে, তাই আমাকে মারতে পারছেন না। আমারটা নিন।'

অবাক দ্য কুদ্ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি পাগল?'

—'না বন্ধু, কিন্তু একজন নিরপরাধ ভদ্রমহিলার যা ক্ষতি করেছি, তার জন্যে আমার মৃত্যু হওয়াই উচিত। অতএব আমার পিস্তলটা নিয়ে আপনার কাজ শেষ করুন।'

দ্য কুদ্ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বলছেন সব দোষ আপনার?'

'সমস্ত। আপনার স্ত্রীর কোনো দোষ নেই। তিনি ফুলের মতো পবিত্র আর আপনাকে ভালোবাসেন। কিন্তু যে কারণে সে-রাত্রে আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম সেটা হলো এই—'বলে পকেট থেকে রকোফের লেখা চিঠিটা বের করে দিল। সেটা পড়ে সব বুঝতে পেরে কাউন্ট অভিভূত হয়ে টারজানকে বললেন, 'আপনি একজন অতি উঁচুদরের বীরপুরুষ, আপনাকে মেরে ফেলিনি বলে আমি ভগবানের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।'

এতক্ষণে চিকিৎসকটি এগিয়ে এসে টারজানের ক্ষত পরিষ্কার করে দেবার পর সকলে একসঙ্গে বন্ধুভাবে প্যারিস শহরে ফিরে গেল।

টারজানকে অবশ্য বেশ কিছুদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল।

কাউন্ট তাঁর সহৃদয়তার প্রমাণ স্বরূপ প্রায়ই টারজানকে দেখতে আসতেন। তিনি টারজানের সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছিলেন যে সে যে কোনো রকমের কাজ করতে রাজি আছে। তাই যেদিন টারজান বাড়ির বাইরে যাবার অনুমতি পেল সেদিন দ্য কুদ্ তাকে অফিসে ডেকে পাঠালেন।

সেখানে পৌঁছলে দ্য কুদ্ তার সঙ্গে জেনারেল রশেয়ার-এর আলাপ করিয়ে দিলেন। টারজান যে কাজ করতে চলেছে তার আসল অধিকর্তা হলেন এই জেনারেল। জেনারেলের সঙ্গে কথাবার্তায় টারজান বুঝতে পারল যে তাকে বিদেশে যেতে হবে আর খুব সম্ভবত তার পরের দিনই।

উৎফুল্ল মনে বাড়ি এসে পল্ ডার্ণোকে সব বলার পর ডার্ণো হেসে বলল, 'এতদিন আমাকে ছেড়ে থাকবে ভেবে তোমার বেশ ভালোই লাগছে, মনে হচ্ছে?'

টারজান বলল, 'তা নয়। আমি একজন ছোট ছেলের মতো নতুন খেলনা পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছি।'

এইভাবে, পরদিন প্যারিস ছেড়ে টারজান মার্সাই এবং ওরান-এর দিকে রওনা হলো।

সাহি সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত লেফটেনান্ট্ জেরনোয়াকে ফ্রান্সের সরকার সন্দেহ করতেন যে সে ইউরোপের কোনো একটা রাজ্যের সঙ্গে অসৎভাবে জড়িত রয়েছে। জেরনোয়া এখন উত্তর আফ্রিকার সিদি-বেল-আব্স নামে একটা জায়গায় প্রধান ফরাসী সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ করছিল। এই দপ্তরে যুদ্ধ সংক্রান্ত অনেক জরুরী খবরের আদান প্রদান চলে। আর এইসব খবর জেরনোয়া অন্যান্য রাজ্যে টাকা পয়সার বদলে চালান করে।

টারজানকে তাই পাঠানো হলো যাতে সে জেরনোয়ার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পারে, কিন্তু টারজান নামে নয়—এক আমেরিকান শিকারী ও পর্যটক পরিচয়ে।

টারজান আলজিরিয়াতে এসে পৌঁছল।

এরপর ওরান হয়ে সিদি-বেল-আব্স-এ পৌঁছে তার নতুন পরিচয়পত্র সেখানকার নাগরিক আর সামরিক দুটো দপ্তরেই পেশ করল। সেখানে থাকাকালীন সকলের সঙ্গে ক্রমশঃ আলাপ পরিচয় হতে লাগল।

যথাসময় জেরনোয়ার সঙ্গে আলাপ হলো। টারজান দেখল জেরনোয়ার বয়স বছর চল্লিশ আর স্বভাবের মধ্যে কেমন যেন বেশি কথা না বলার ভাব রয়েছে, একটু যেন রুক্ষ ভাব। তাছাড়া, জেরনোয়ার কোনো বন্ধু ছিল না। কারো সঙ্গে সে বড় একটা মেলামেশা করত না, বিশেষ করে স্পাই গোছের কারো সঙ্গে তো নয়-ই। বেশ কিছু দিন তার ওপর নজর রাখার পর টারজানের মনে হলো হয়ত জেরনোয়ার বিষয়ে খবরগুলো ভুল। কিন্তু কিছু দিন পরেই

খবর এলো যে জেরনোয়াকে দক্ষিণে সাহারার কাছে বু-সাদা নামে একটা জায়গায় বদলী করা হয়েছে।

সেখানে স্পাহি সৈন্যদের সঙ্গে তিনজন অফিসারও যাবে।

টারজানও যাবার জন্য আবেদন জানাল এবং মঞ্জুরও হলো। সে শিকার করবার ছুতো দেখাল, যাতে কারো সন্দেহও না হয়।

রেলপথে তারা বুইরা বলে একটা জায়গায় পৌঁছল। এর পর থেকে রাস্তা দুর্গম তাই ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে।

অন্যান্যরা যখন নিজেদের কাজে ব্যস্ত, টারজান তখন ছোট্ট বুইরা শহরটাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। একদিন একটা জায়গায় ভালো ঘোড়ার খোঁজ করতে গিয়ে হঠাৎ তার নজর পড়ল একজন ইউরোপীয় পোশাক পরা লোকের ওপর। ভালো করে দেখবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই লোকটা একটা কফি হাউসে ঢুকে পড়ল। কিন্তু টারজানের মনে হলো লোকটা যেন চেনা-চেনা।

পরদিন তারা ঘোড়ায় চড়ে বু-সাদার দিকে এগিয়ে চলল। সন্ধ্যের দিকে ক্লান্ত হয়ে অ-মেল নামে একটা জায়গায় পৌঁছল। সেখানকার একটা সামান্য হোটেলে টারজান রাত কাটাল।

পরদিন খুব ভোরে স্পাহি সৈন্যরা আবার বেরিয়ে পড়ল। টারজানেরও যাবার জন্য ডাক পড়েছিল, কিন্তু তার প্রাতঃরাশ সারতে দেরি হয়ে গেল বলে সে পিছিয়ে পড়ল। তৈরি হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে যাতে সৈন্যদের আবার ধরতে পারে, এমন সময় টারজানের হঠাৎ চোখে পড়ল জেরনোয়া ডাইনিং রুমের পাশের ঘরে সেই ইউরোপীয়ান লোকটির সঙ্গে কথা বলছে। লোকটি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু টারজানের আবার তাকে চেনা মনে হলো। এদিকে টারজানের ওপর জেরনোয়ার চোখ পড়তেই সে তাড়াতাড়ি লোকটাকে নিয়ে সেখানে থেকে সরে গেল।

এই প্রথম টারজানের মনে জেরনোয়া সম্পর্কে সন্দেহ জাগল। সে-ও দৌড়ে পাশের ঘরে গেল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না! অথচ ক্রমাগত মনে হতে লাগল লোকটা অতি পরিচিত। তার সঙ্গে জেরনোয়ার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে তা বুঝতে পারল না। টারজান বুঝল, খুব সতর্ক থাকতে হবে।

এখন আর কিছু করার নেই দেখে টারজান আবার রাস্তা ধরল। সিদি-আইসৎ নামে একটা জায়গায় টারজানের সঙ্গীরা এক ঘণ্টার বিশ্রামের জন্য থেমেছিল। টারজান সেখানে পৌঁছে দেখল জেরনোয়া রয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গীটি নেই।

সিদি আইসতে সেদিন হাটবার। দূর দূর গ্রাম থেকে নানা রকমের লোক নানা ধরনের জিনিষপত্র নিয়ে হাজির হয়েছে। মালবাহী উটগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আর চতুর্দিকে আরবরা উঁচু গলায় দর কষাকষি করছে। টারজানের সমস্ত আবহাওয়া এত ভালো লাগল যে সেখানে একটা দিন কাটাবে বলে সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিল।

তারপর একটা ভালো দেখে সরাইখানা বেছে নিয়ে সেখানকার মালিকের মনোনীত এক বিশ্বস্ত দো-ভাষীকে সঙ্গে নিয়ে সে সন্ধ্যে না হওয়া পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। দো-ভাষীর নাম আবদুল, জাতে আরব আর খুবই অল্প বয়স।

তার কথা মতো টারজান একটা ভালো আরবী ঘোড়া কিনল। ঘোড়ার মালিকের নাম কাদুর বেন সাদেন। অতি সৌম্য চেহারার এক শেখ। তাঁর বাস সেখান থেকে অনেক দক্ষিণে জেল্‌ফা মরুবাসীদের মধ্যে। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে টারজানের এত ভালো লাগল যে শেখকে সে রাত্রে ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানাল।

সরাইখানার দিকে যাবার সময় হঠাৎ আবদুল নিচু গলায় টারজানকে বলল, 'পিছন দিকে তাকিয়ে দেখুন, ঐ লোকটা সারা বিকেল ধরে আমাদের অনুসরণ করছে।'

টারজান বলল, 'আমি তো একজন নীল রঙের বারনুস আর সাদা পাগড়ি পরা আরবকে মুহূর্তের জন্য দেখলাম। সে-ই কি?'

আবদুল বলল, 'হ্যাঁ। আর ও এখানকার লোক নয়, কারণ লক্ষ্য করলাম আমাদের পিছু নেওয়া ছাড়া ওর আর কোনো কাজ নেই। তাছাড়া ও কখনোই ভালো লোক নয়, কারণ শুধু চোখ দুটো ছাড়া নিজের সারা মুখ ঢেকে রেখেছে। ওর ভাবভঙ্গী আমার মোটেই ভাল লাগছে না।'

টারজান বলল, 'তাহলে ও নিশ্চয় ভুল করেছে। কারণ এখানে আমাকে কেউ চেনে না, তাই আমার ওপর কারোর আক্রোশ থাকতে পারে না। আমি তো এই প্রথম তোমার দেশে এলাম।'

আবদুল বলল, 'বোধ হয় ডাকাতি করতে চায়।'

—'তাহলে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। তবে এখন আমরা সজাগ আছি, ডাকাতি করলে যে ওরই লোকসান হবে তাতে সন্দেহ নেই।'

রাত্রের ডিনারের পর অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ কাদুর বেন সাদেন বিদায় নিলেন। যাবার আগে তাঁর দেশে যাবার জন্য টারজানকে বারবার অনুরোধ করে গেলেন। সে দেশে হরিণ, বুনো শূয়োর, চিতাবাঘ—নানা রকমের শিকার পাওয়া যায়, এমন কি সিংহও পাওয়া যাবে। টারজান কিছুতেই নিরাশ হবে না।

তিনি চলে যাবার পর টারজান রাত বেশি হয় নি দেখে আবদুলকে সঙ্গে নিয়ে সিদি এস্‌সার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটা কাফেতে হৈ-হট্টগোল শুনে টারজান সেখানে ঢুকে পড়ল। তখন রাত আটটা বেজেছে, ঘরের ভিতর প্রচুর লোকের ভিড়ও জমেছে। চতুর্দিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আর সকলে তাদের প্রিয় গরম ঘন কফি খাচ্ছে।

টারজান আর আবদুল ঘরের মাঝখানের দিকে একটা টেবিলে গিয়ে বসল। নর্তকী সুন্দরী ও তরুণী, টারজানের বিদেশী বেশভূষা দেখে কিছু উপরি পয়সা পাবার লোভে তার কাছে এসে একটি রেশমী রুমাল উপহার দিল। সে চলে যাবার পর আরেকজন নর্তকী তার জায়গা নিল। এই ভাবে মজা ক্রমশঃই জমে উঠতে লাগল। সজাগ আবদুল কিন্তু লক্ষ্য করল যে প্রথম মেয়েটি ঘরের এক কোণায় দুটি আরবের সঙ্গে নিচু গলায় কি সব কথাবার্তা বলছে। একজন আরব টারজানের দিকে তাকিয়ে কিছু ইঙ্গিত করল, তারপর পিছন দিকের একটা ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তারপর সেই প্রথম মেয়েটি এসে ঠিক আগের মতো আরেকটি রেশমী রুমাল দিয়ে টারজানের কাছ থেকে এক ফ্র্যাঙ্ক আদায় করল। কিন্তু এবার সে চুপিচুপি টারজানের কানে বলল, 'বাইরে দুজন আপনার ক্ষতি করবার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে বলা হয়েছে যে আপনাদের ফুসলিয়ে তাদের কাছে নিয়ে যেতে। কিন্তু আপনি সদয় লোক, তাই আমি একাজ করতে পারব না বলে সাবধান করে দিচ্ছি। আপনারা শিগগিরই এখান থেকে চলে যান।'

টারজান তাকে অনেক ধন্যবাদ দিল বটে কিন্তু তার কথা মতো সেখান থেকে চলে গেল না। বরঞ্চ মনে হলো কিছুর জন্য যেন সে অপেক্ষা করছে।

হলো-ও ঠিক তাই। আধ ঘণ্টা নির্বিঘ্নে কেটে যাবার পর একজন আরব সেখানে এসে নিজেদের ভাষায় চেঁচিয়ে কি সব বলতে লাগল। তার ফলে জনতার মধ্যে একটা ক্ষুব্ধ আলোড়ন দেখা দিল। আবদুল টারজানকে জানাল যে লোকটা বলে বেড়াচ্ছে যে টারজান তার নর্তকীকে অপমান করেছে। টারজান কিছু না বলে মৃদু হেসে দাঁড়িয়ে উঠে হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে লোকটিকে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলল। মুহূর্তের মধ্যে ঘরের ভিতর এক প্রলয় কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। একধারে টারজান আর অন্যদিকে ক্ষুব্ধ জনতা। ব্যাপারটা ক্রমশঃই গুরুতর হয়ে উঠতে লাগল। ছোরাছুরি হাতে জনতাকে সামনে রেখে টারজান আর আবদুল এক পা করে পিছিয়ে ছোট দরজাটার দিকে যেতে লাগল।

দরজার কাছে এসেই তারা দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে একটি অন্ধকার উঠোনে এসে পড়ল। সেখানে দেখল সেই নর্তকীটি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে টারজান আর আবদুলকে সঙ্গে করে একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'অন্যদিকের জানলা দিয়ে লাফিয়ে পিছনের রাস্তায় নেমে নিজের হোটেলে চলে যেতে পারবেন।'

কিন্তু এখন সে রাস্তাও বন্ধ হলো। পিছনের রাস্তাতেও ক্ষুব্ধ আরবরা ঘেরাও করতে লাগল। অন্যদিকে তাদের অনুসরণ করে সিঁড়ি দিয়ে অন্যরাও ততক্ষণে এসে পড়েছে। সময় নষ্ট করবার উপায় নেই দেখে তীক্ষ্ণবুদ্ধি টারজান যে জানালা দিয়ে রাস্তায় নামা যায় সেটার কার্ণিশ বেয়ে ছাদে উঠে গেল। জঙ্গলে গাছে চড়া অভ্যস্ত মজবুত শরীরে কিছুমাত্র কষ্ট হলো না। এরপর একে একে মেয়েটিকে আর আবদুলকে টেনে তুলতে বেশি সময়ও লাগল না।

শিকার পালিয়েছে দেখে ঘরের ভিতরকার আর পিছনের রাস্তার ভিড়ে অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের মধ্যে বচসা আর তর্কাতর্কি করে অগত্যা জনতা যে যার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। রাতও ক্রমশঃ বেড়ে চলল।

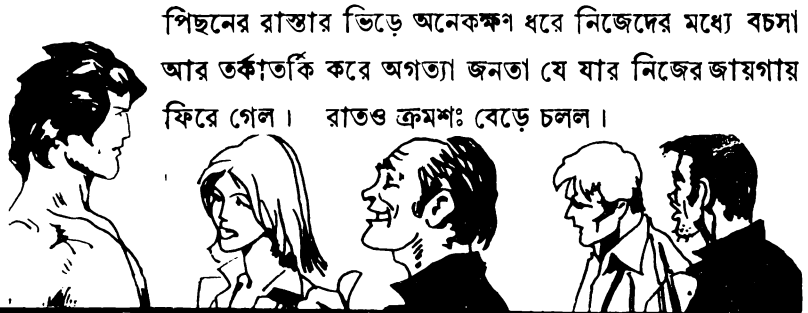

ছাদের ওপর ঘাপটি মেরে বসে থাকা তিনজন এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। টারজান এবার মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে শুনল যে সে আসলে একজন বড় ঘরের মেয়ে। ডাকাতরা তাকে তার বাবার তাঁবু থেকে চুরি করে এনে ক্রীতদাসী হিসাবে সরাইখানার মালিককে বিক্রি করেছে। আজ প্রায় দু'বছর হলো তার নিজের লোকের সঙ্গে দেখা হয় নি। কারণ তার বাবার জায়গীর এখান থেকে অনেক দক্ষিণে। তারা সিদি আইসতে কখনো আসেও না। কিন্তু এখন তার আর কোনো যাবার জায়গা নেই, কারণ সরাইখানার মালিক এতক্ষণে নিশ্চয় জানতে পেরেছে যে সে টারজানকে পালাতে সাহায্য করেছে। এখন সে ফিরে গেলে তাকে অতি অবশ্যই মেরে ফেলবে। আর তাছাড়া সেখানে ফিরে যাবার মেয়েটির আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নেই।

সর্বদা-সহৃদয় টারজান তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে তার নিজের লোকের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কথা দিয়ে বলল, 'কিন্তু তোমার বাবার নাম কি?'

মেয়েটি বলল, 'কাদুর বেন সাদেন।'

শুনে আশ্চর্য হয়ে টারজান জানাল যে তার বাবা সেই রাত্রে সিদি আইসতেই রয়েছেন আর কয়েক ঘণ্টা আগে তার সঙ্গে ডিনার পর্যন্ত খেয়েছেন।

হঠাৎ আবদুল তাদের সাবধান করে চুপ করতে বলল। তারপর রাস্তায় কয়েকজন লোকের কথাবার্তা শুনে বলল, 'মঁসিয়ে, এরা শুধু আপনাকেই খুঁজছে আর বলাবলি করছে যে একজন বিদেশী আপনার প্রাণহত্যার জন্য এদের অনেক টাকা ঘুষ দিয়েছে। সেই লোকটি আহমেদ-দিন-সুলেফ্ নামে একজনের বাড়িতে বাস করছে। কিন্তু এখন আগের থেকেও বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে বলেছে আপনাকে বু-সাদার রাস্তায় হত্যা করতে হবে। এই লোকটাই আজ বাজারে আমাদের পিছু নিয়েছিল। তারপর আজ কাফেতেও তাকেই দেখলাম এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু বলুন তো, এ কেন আপনাকে মেরে ফেলতে চায়?'

টারজান বলল, 'আমি জানি না।' তারপর খানিকটা থেমে বলল, 'যদি না—'কিন্তু আর কিছু বলল না।

এতক্ষণে রাস্তা থেকে লোকগুলো সব চলে গিয়েছে, কাফেও বন্ধ হয়ে গেছে। এবার খুব সাবধানে টারজান জানলা বেয়ে ঘরে ঢুকে দেখল সেটাও খালি। তখন তারা আবার জানলা দিয়ে একেবারে রাস্তায় নেমে পড়ল। এরপর আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না, আর তিনজনে নিরাপদে হোটেলে ফিরে এলো।

সেই রাত্রেই টারজান হোটেলের মালিককে কিছু নজরানা দিয়ে রাজি করাল একজন চাকরকে কাদুর বেন সাদেনের কাছে পাঠাতে। আধ ঘণ্টা পর চাকরটা শেখকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে উপস্থিত হলো। এরপর বাবা আর তাঁর হারানো মেয়ের মিলন দৃশ্যকে আর কথায় বর্ণনা করা যায় না। সব ঘটনা বলা শেষ হলে, সব ধন্যবাদ জানানো হলে ঠিক হলো যে পরদিন খুব ভোরে তারা বু সাদার দিকে রওনা হয়ে যাবে। দলের মধ্যে ছিল টারজান, আবদুল, শেখ ও তাঁর কন্যা, আর শেখের চার-জন অতি বিশ্বস্ত সশস্ত্র অনুচর। সুতরাং রাস্তায় কোনো বিপদে পড়লে তার সম্মুখীন হওয়া কঠিন হবে না।

যাত্রাপথে রাস্তা প্রথম দিকে বেশ সুগমই ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ সেটা একটা রুক্ষ পাথর ছড়ানো প্রান্তরে পরিণত হল। মাঝে মাঝে নিচু ঢিপি আর কাঁটাঝোপ কিন্তু আবদুল প্রত্যেকটি ঢিপির ওপর উঠে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে নিচ্ছিল। হঠাৎ সে একটা ঢিপির ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলে, উঠল 'আমাদের পিছনে ছ'জন ঘোড়-সওয়ার আসছে।'

শেখ কাষ্ঠহাসি হেসে টারজানকে বললেন, 'এরা নিশ্চয় আপনার গতকালের বন্ধুরা!'

টারজান তাতে সায় দিয়ে বলল, 'কিন্তু এই ঝগড়ায় আপনারা কেন জড়িত হবেন? আমি সামনের গ্রামে অপেক্ষা করে এদের মতিগতি লক্ষ্য করব, কিন্তু আপনারা নিজের গন্তব্যস্থানের দিকে এগিয়ে চলে যান।'

শেখ কিছুতেই এ কথায় রাজি হলেন না। একসঙ্গে থাকার স্বীকৃতি নিলেন।

সেদিন সারাদিন ধরে সেই একই ভাবে ঘোড়সওয়াররা তাদের অনুসরণ করে চলল—এগিয়েও এলো না, পিছিয়েও পড়ল না। বোঝা গেল তারা রাতের অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করছে। সত্যি সত্যিই সন্ধ্যে হবার আগে আবদুল দেখল যে ঘোড়সওয়াররা ক্রমশঃ তাদের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে, দূরত্বের ব্যবধানও কমে আসছে। টারজানকে এ খবরটা দেওয়াতে সে বলল, 'আবদুল, এ ঝগড়া আমার

নিজস্ব। তুমি অন্যদের সঙ্গে এগিয়ে চলে যাও বু'-সাদার দিকে, আর আমি সুবিধা মতো জায়গা বেছে এদের অপেক্ষায় থাকব।'

আবদুল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'তাহলে আবদুল-ও আপনার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে।'

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী শেখ দলবল নিয়ে রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চললেন দূরে বু-সাদার আলো লক্ষ্য করে। আর টারজান আবদুলকে নিয়ে রাস্তার ধারে পাথরের ঢিপির পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘোড়াগুলোকে ঢিপির আড়ালে শত্রুর গুলির লক্ষ্যের বাইরে

লুকিয়ে রাখল।

টারজান তার স্বভাবসুলভ নির্ভীক মনে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। বেশিক্ষণ লাগল না। রাতের অন্ধকারের বুকে সাদা পোশাক পরা আরবদের সহজেই দেখতে পাওয়া গেল। তারা কাছে আসতেই টারজান চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, তা না হলে আমরা গুলি করব।'

ঘোড়সওয়াররা মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল আর নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। তারপর অকস্মাৎ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল আর মরুভূমির বুকে আবার স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। তবে বেশিক্ষণের জন্যে নয় —শুরু হলো গুলিবর্ষণ। এদিক-ওদিক সব জায়গা থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো গুলি ছুটে আসতে লাগল। আবদুল আর টারজানও নিজেদের যথাসম্ভব আড়ালে রেখে বন্দুক চালাতে লাগল। এভাবে দু'জন ঘোড়সওয়ারের জীবন নাশও হলো, কিন্তু বাকিরা তা উপেক্ষা করে বারবার আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ টারজানরা শুনতে পেল বু-সাদার দিক থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। আক্রমণকারীরাও তা শুনতে পেয়েছিল তাই সেদিক থেকে প্রথম গুলিবর্ষণেই তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে সেই অন্ধকারেই সিদি-আইসার দিকে পালিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে শেখ কাদুর তাঁর দলের লোকদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। টারজানদের অক্ষত অবস্থায় দেখে শেখ যারপরনাই নিশ্চিন্ত হলেন। সকলে এক সঙ্গে বু-সাদার দিকে এগিয়ে চললেন।

এর দু'দিন পর শেখ তাঁর কন্যাসহ দক্ষিণ দিকে তাঁর নিজের দেশের অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। টারজানকে বারবার তাঁদের সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু টারজান এবারকার মতো তার অক্ষমতা জানিয়ে বলল, ভবিষ্যতে নিশ্চয় একদিন তাঁদের দেশে বেড়িয়ে আসবে।

শেখকে বিদায় দিয়ে টারজান হোটেলে ফিরে এলো। হোটেলের নাম 'পেটি সাহারা' বা ছোট সাহারা। এখানে দুটি ডাইনিং-রুম। তার একটিকে সেখানকার সামরিক বাহিনীর অফিসার দখল করে নিয়েছিল। টারজান দূর থেকে দেখল যে ঘরের মধ্যে জেরনোয়া প্রাতরাশ সারছেন। ঠিক সেই সময় একজন সাদা পোশাক পরা আরব তার কানে কানে কি যেন বলে বাইরে যাবার দরজা দিয়ে চলে গেল।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয় কিন্তু আরব লোকটি নিচু হয়ে কথা বলবার সময় টারজান দেখল তার বাঁ হাত পট্টি দিয়ে ঝুলিয়ে বাঁধা।

যেদিন শেখ কাদুর বেন সাদেন কন্যাসহ নিজের দেশে ফিরে গেলেন, সেদিন টারজান তার বন্ধু পল্ ডার্ণোর একটা চিঠি পেল। তাতে লেখা—

'প্রিয় জন, তোমাকে শেষ চিঠি লেখার পরই আমি তিন দিনের জন্য লণ্ডন গিয়েছিলাম। সেখানে প্রথম দিনই তোমার এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি হলেন মিঃ স্যামুয়েল টি ফিল্যাণ্ডার। তাঁর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে তাঁদের হোটেলে গিয়ে দেখলাম বাকি সকলেই সেখানে উপস্থিত। প্রোফেসর আর্কিমেডিস পার্টার কন্যা জেন আর তার বিশালকায় নিগ্রো দাসী এসমারেল্ডা আর ক্লেটন। জেন আর ক্লেটনের বিয়ের দেরি নেই, তবে খুবই সংক্ষেপে অনুষ্ঠান সারা হবে ক্লেটনের বাবার মৃত্যুর জন্য।

ফিল্যাণ্ডারের সঙ্গে আমার নিভৃতে অনেক কথা হলো। তাতে জানলাম এর মধ্যে তিন তিনবার জেন তার বিবাহ পিছিয়ে দিয়েছে। ফিল্যাণ্ডারের মতে জেনের এই বিবাহে কোনো ইচ্ছা নেই। কিন্তু আর কোনো উপায় না থাকাতে

হয়ত এবার সত্যি বিয়ে হবে।

স্বভাবতঃই সকলে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আমি আসল কথা গুপ্ত রেখে তুমি এখন কোথায় আছ তা বললাম।

তোমার সম্বন্ধে জানবার জন্য সব থেকে আগ্রহী মিস পার্টার। তোমার আসল ইচ্ছা যে জঙ্গলে ফিরে যাবার তা জানাতে মিস পার্টার প্রথমে খুবই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। পরে বললেন, কি জানি হয়ত মিঃ টারজান প্রকৃত শান্তি ঐ জঙ্গলেই পাবেন যার বুকে তিনি মানুষ হয়েছেন। সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে ভয়াবহ হলেও এখন আমি বুঝতে পারছি যে আমার জীবনের সব থেকে আনন্দের মুহূর্তগুলো ঐখানেই কেটেছিল।

মিস পার্টারের মুখে দুঃখের ছায়া নেমে এসেছিল আর আমার মনে হলো তিনি যেন ঐ কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে তোমাকে কোন একটা বার্তা পাঠাতে চাইছেন। আমার মনে হল তাঁর মনে তোমার মূর্তি চিরদিন বিরাজ করবে, যদিও তিনি অন্য কাউকে বিবাহ করতে চলেছেন।

তোমার বিষয় সকলে যখন কথা বলছিল ক্লেটনকে দেখে মনে হলো সে যেন ঘাবড়ে আছে। তার হাবভাবে কেমন একটা উদ্বেগের ছাপ।

এরপর সেখানে টেনিংটনও এসে উপস্থিত হলো। দেখলাম ক্লেটনের সঙ্গে তার খুব ভাব। টেনিংটন এবার তার 'ইয়ট্' নিয়ে আফ্রিকার পরিসীমা ঘুরে আসতে চায়। সে সকলকে তার অতিথি হবার জন্য নিমন্ত্রণ জানাল, আমাকেও।

গত পরশু আমি প্যারিসে ফিরেছি। গতকাল ঘোড়-দৌড়ের মাঠে কাউন্ট আর কাউন্টেস দ্য কুদের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁরা দু'জনেই বারবার তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। দুজনেই তোমার প্রশংসা করলেন।

কাউন্টেস অল্গা তোমাকে জানাতে বললেন যে নিকোলাস রোকফ্ ফ্রান্স ছেড়ে চলে গিয়েছে। এর জন্য কাউন্টেস তাকে কুড়ি হাজার ফ্রাঙ্ক ঘুষ দিয়েছেন। কাউন্টেস তাকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন কারণ রোকফ্ বলেছিল যে প্রথম সুযোগেই সে তোমাকে মেরে ফেলবে। কাউন্টও তাতে সায় দিলেন।

আমার জাহাজে ফিরে যাবার আদেশ এসে গেছে। হাভর বন্দর থেকে গুপ্ত অভিযানে দু'দিনের মধ্যে জাহাজ ছাড়বে। এরপর থেকে তুমি আমাকে জাহাজের ঠিকানাতে চিঠি লিখো। আমি সুযোগ পেলেই আবার লিখব।

ইতি—তোমার বন্ধু পল্ ডার্গো'

চিঠি পড়া হলে টারজান বলল, 'আমার মনে হচ্ছে কাউন্টেস অল্গা দ্য কুদের কুড়ি হাজার ফ্রাঙ্কের ঘুষ বৃথা হয়েছে।' তারপর সাগ্রহে জেন পার্টার বিষয় বারবার করে পড়তে লাগল। তাতেই যেন তার ব্যথিত মন শান্তি পেল।

পরপর তিন সপ্তাহ বেশ নির্বিঘ্নে কেটে গেল। এর মধ্যে বহুবার টারজান সেই অজ্ঞাত আরবকে দেখতে পেয়েছিল। একবার তাকে জেরনোয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও দেখেছিল, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও আরব সে কোথায় থাকে তা জানতে পারেনি।

অমেল্-এ ডাইনিংরুমে টারজানকে দেখে অবধি জেরনোয়া তার সঙ্গে আর মেলামেশা করেনি। যে ক'বার দেখা হয়েছে তাতে তার অপ্রসন্নভাব দেখা দিয়েছে।

টারজান এদিকে তার শিকারীর পরিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অনেক সময় বু-সা'দার আশপাশে শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াত। আসলে শিকারে তার ঘোর আপত্তি ছিল। শখের জন্য শিকার করাকে ঘৃণা করত। তাই শিকারের ভাণ করত, কাউকে সঙ্গে না নিয়ে একা একাই ঘুরে বেড়াত, কিন্তু একাকীত্ব একদিন তার প্রায় মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। একদিন একটা গভীর খাদের মধ্যে দিয়ে একা ফিরবার সময় একটা গুলি এসে তার শোলার টুপি ভেদ করে বেরিয়ে গেল। যদিও অনেক খুঁজে দেখেছিল, কোনো আততায়ীর সন্ধান পায়নি

সে আবার নিজের মনে বলল, 'হ্যাঁ, সত্যিই কাউন্টেস তাঁর কুড়ি হাজার ফ্রাঙ্ক জলে ফেলে দিয়েছেন।'

সে রাত্রে টারজান ক্যাপটেন জেরার্ডের ডিনারে অতিথি হয়ে গিয়েছিল।

তিনি প্রসঙ্গক্রমে বললেন, 'আপনার শিকারে এখানে খুব সুবিধা হল না দেখছি।'

টারজান বলল, 'হ্যাঁ, এখানকার শিকার খুবই নিরীহ। আমার পছন্দসই নয়। তাই ভাবছি আরো দক্ষিণ দিকে গিয়ে আলজিরিয়ান সিংহের খোঁজ করব।'

ক্যাপটেন বললেন, 'ভালোই হল। কাল আমরা জেল্ফার দিকে যাব। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।

জেরনোয়া আর আমাকে একশো জন লোক নিয়ে দক্ষিণে পরিভ্রমণে যেতে হবে। সেখানে ডাকাতদের বড় উপদ্রব শুরু হয়েছে। হয়ত এই সঙ্গে আমাদের সিংহ দেখাও হবে—কি বলেন ?

টারজান খুশি হয়ে রাজি হল। শুধু জেরনোয়াকে দেখে মনে হল না সে তার ক্যাপটেনের নিমন্ত্রণে খুশি হয়েছে।

পরদিন সকালবেলা সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী যখন রওনা হল তখন দেখা গেল তাদের পিছন পিছন ছজন আরব ঘোড়সওয়ারও চলেছে।

ক্যাপটেন জেরার্ড বললেন, 'ওরা আমাদের সঙ্গের সুযোগ নিয়ে যাওয়া-আসা করে।'

কিন্তু টারজান আরব-প্রকৃতি জানত বলে কথাটা মেনে নিল না। আরবরা কারোর প্রতি অহেতুক ভাব দেখাত না, বিশেষতঃ ফরাসী সৈন্যদের প্রতি তো নয়ই। তাই তার সন্দেহ বেড়ে চলল আর পিছনে আসা ঘোড়সওয়ারদের ওপর কড়া নজর রাখতে লাগল।

সে বুঝতেই পেরেছিল যে এরা আসলে ভাড়া করা আততায়ীর দল আর এদের পিছনে রয়েছে চক্রান্তকারী নিকোলাস রকোফ। রকোফ এখন টারজানের প্রতিহিংসা নিতে চায়, নাকি জেরনোয়ার বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে, সেটা টারজান ঠিক বুঝতে পারছে না। যদি শেষেরটা হয় তাহলে টারজানকে এখন দুজন চক্রান্তকারীর সঙ্গে যুঝতে হবে আর আলজিরিয়ার বন্য প্রান্তরে অনেক নির্জন জায়গা আছে যা আততায়ীদের কাজে সাহায্য করতে পারবে।

সৈন্যবাহিনী জেল্‌ফাতে তাঁবু খাটিয়ে দুদিন বিশ্রাম নিল। তারপর আবার দক্ষিণ-পশ্চিমমুখো চলতে লাগল। এই দিকেই ডাকতরা হানা দিয়েছে।

যাত্রার আগের দিন রাত্রে হঠাৎ সেই ছ'জন আরব ঘোড়সওয়ার অদৃশ্য হয়ে গেল। টারজান সকলকে জিজ্ঞাসা করেও জানতে পারল না তারা কোথায় বা কখন গেছে। এতে টারজানের আরও চিন্তার কারণ হল, কারণ কিছুক্ষণ আগেই সে জেরনোয়াকে দেখেছিল আরবদের সঙ্গে কথা বলতে। এখন জানা দরকার যে জেরনোয়া তাদের সৈন্যবাহিনীর গন্তব্যস্থান বলে দিয়েছে কি না।

ভোরবেলা রওনা হয়ে সৈন্যবাহিনী বিকেলবেলা একটা ছোট মরূদ্যানে এসে পৌঁছল। এখানকার কর্তা একজন শেখ, যার ভেড়ার পাল ডাকতরা চুরি করছে আর সেই সঙ্গে মেষপালকদেরও আক্রমণ করছে। কিন্তু এখানেও টারজান শুনল যে কেউ সেই ছ'জন আরব ঘোড়সওয়ারকে দেখেনি। মরুভূমির বুকে লুকিয়ে থাকবার তো কত জায়গাই আছে।

পরের দিন সকালে ক্যাপটেন জেরার্ড হুকুম দিলেন যে তাঁর সৈন্যবাহিনী দুটো দলে ভাগ হবে। ল্যাফটেনান্ট জেরনোয়ার ওপর একদলের ভার পড়ল। অন্য দলটি ক্যাপটেনের নিজের অধীনে থাকবে। এই দুই দল কাছের পাহাড়ের দুই দিকে তল্লাসি করবে ডাকাতদের খোঁজে।

ক্যাপটেন টারজানকে একটা দল বেছে নেবার জন্য অনুরোধ করতে সে কিছু বলবার আগেই জেরনোয়া নিজের থেকেই বলল, 'আমার সঙ্গে যদি মিঃ টারজান যেতে রাজি হন তাহলে নিজেকে অনুগ্রীহিত বলে মনে করব।' টারজান সানন্দে মেনে নিল।

জেরনোয়ার সহৃদয়তা কিন্তু বেশিক্ষণ টিঁকল না। একদল সৈন্যবাহিনীর মাথায় জেরনোয়া আর টারজান তাদের গন্তব্যস্থানের দিকে এগিয়ে চলল। জেরনোয়া সেই আগের মতোই একটা কঠিন গম্ভীর ভাব ধরল। একটা জায়গায় ঘণ্টা খানেকের জন্য বিশ্রাম করে তারা আবার চলতে লাগল। ক্রমে একটা অপরিসর উপত্যকার কাছে এসে পড়ে জেরনোয়া হুকুম করল যে এখান থেকে তারা ছোট ছোট দল বেঁধে একেক দিকে সন্ধানে যাবে। তারপর সৈন্যদের ডেকে সেই মতো নানা রকম আদেশ দিতে লাগল। শেষে টারজানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর আপনি এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।' তারপর টারজানের কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'খুব সম্ভব আমার সৈন্যদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। আপনার মতো একজন অসামরিক লোককে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতে তারা অস্বীকারও করতে পারে।'

তারপর টারজানের কোনো যুক্তিতেই কান না দিয়ে তাকে সেখানে অপেক্ষা করবার হুকুম দিয়ে জেরনোয়া সৈন্যদের নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। টারজান একা একটা নির্জন পাহাড়ে উপত্যকায় পড়ে রইল।

সূর্যের তাপ বেড়ে চলল, তখন টারজান একটা গাছে নিজের ঘোড়াটাকে বেঁধে ঘাসের ওপর বসে জেরনোয়ার ফাঁদে পড়ার জন্য নিজের ওপর রাগ করতে লাগল। কিন্তু জেরনোয়ার কি অন্য কোনো উদ্দেশ্যও আছে? কারণ টারজানকে এভাবে জব্দ করবার পাত্র তো সে নয়। তখন টারজান উঠে নিজের রাইফ্‌ল আর রিভলবার দুটোই পরীক্ষা করে দেখে নিল গুলি ভরা আছে কিনা। তারপর সে দুটোকে হাতের কাছে রেখে সৈন্যদের ফেরার অপেক্ষায় বসে রইল।

সূর্য অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়ল। পাহাড়ে উপত্যকায় সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল, কিন্তু সৈন্যগুলি তখনও ফিরে এল না। ক্রমে সে জায়গা অন্ধকারে ভরে গেল তবুও টারজান নিজে থেকে ক্যাম্পে ফিরে গেল না। তার আত্মমর্যাদাতে আঘাত দিল। এখানে তাকে থাকতে বলা হয়েছে, এখানেই সে থাকবে। তাছাড়া অন্ধকারকে সে ভালোবাসে। তার সমস্ত স্নায়ুগুলো অন্ধকারেই সজাগ হয়ে ওঠে, বিপদের আশঙ্কাও কমে যায়।

এর পর কখন জানি সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙলো তার ঘোড়ার ভয়-পাওয়া দাপানিতে। চোখ খুলে দেখল উপত্যকাটা চাঁদের আলোয় ভরে রয়েছে আর সেই সঙ্গে চোখ পড়ল ঘোড়ার ভয়ের কারণের ওপর।

সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে পরম শক্তির প্রতীক আগুন-ভরা চোখে কালো কেশরের সিংহ নুমা। মুহূর্তের জন্য আফ্রিকার জঙ্গলের পরিচিত স্বাদ পেল টারজান। সে যেন অনেকদিন পর এক পুরনো বন্ধুর দেখা পেয়েছে।

কিন্তু নুমা লাফাবার জন্য তৈরি হয়েছিল, তাই টারজান বন্দুক তুলে নিল। উঠে দাঁড়িয়ে সে তাক করে যে মুহূর্তে সিংহটা ঝাঁপ দিল সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়লো। আর সেই সঙ্গে ঘোড়াটা প্রাণপণে টান দিয়ে দড়ি ছিঁড়ে নিমেষের মধ্যে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টারজান আরো দুবার গুলি ছুঁড়ে সিংহর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল। তখন যেন সে আর সভ্যজগতের লোক রইল না। সিংহের বুকে এক পা রেখে আফ্রিকার জঙ্গলের আদিম বনমানুষের জয়ধ্বনি করে উঠল। সে ডাক মরুভূমির বুকের মানুষদের কানেও পৌঁছল আর তারা সভয়ে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল বুঝি বা সেখানে আরেক নতুন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

টারজান যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার আধ মাইল দূরে সাদা পোষাক পরা কয়েকজন লোকও সেই ডাক শুনেছিল। তাদের হাতে বন্দুক। আর কোনো আওয়াজ না পেয়ে, তারা আবার উপত্যকার দিকে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল।

এতক্ষণে টারজান বুঝতে পারল যে জেরনোয়ার সেখানে ফিরে আসার কোনোই ইচ্ছা নেই, তাই সে কাল-বিলম্ব না করে পায়ে হেঁটেই ক্যাম্পের দিকে রওনা দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকগুলোও উপত্যকায় এসে পৌঁছল। বড় বড় পাথরের আড়াল থেকে তারা চারদিক তাকিয়ে দেখে এগিয়ে চলল। গাছের তলায় মৃত সিংহকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। তারপর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যে রাস্তা দিয়ে টারজান গেছে সেখান দিয়ে নিঃশব্দে চলতে লাগল।

চাঁদের আলোয় ভরা পাহাড়ে উপত্যকা দিয়ে ক্যাম্পের দিকে ফিরে যেতে যেতে টারজান আবার সেই আদিম আফ্রিকার দিনগুলোকে যেন ফিরে পেল। চতুর্দিক তার যেন অতি পরিচিত। ঐ তো তার চেনা চিতাবাঘের কাশি! গভীর পাহাড়ী জঙ্গলের ছোটখাট আওয়াজ-গুলোও তার মনের মধ্যে গাথা হয়ে রয়েছে। কিন্তু এ সব ছাড়া, আরো একটা আওয়াজ টারজানের অতি তীক্ষ্ণ কর্ণ-কুহরে এসে পৌঁছল।

সে আওয়াজ হল অনেকগুলো মানুষের সন্তর্পণে হেঁটে আসার অস্পষ্ট শব্দ। নিমেষের মধ্যে টারজান জেরনোয়ার কারসাজি বুঝতে পারল। অমনি সে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আলো-ছায়ায় অস্পষ্ট মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে ডেকে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। উত্তর এল গুলি-বর্ষণে। প্রথম গুলিতেই টারজান ধরাশায়ী হল।

আরবরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আড়াল থেকে বেরিয়ে টারজানের চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর নিরীক্ষণ করে দেখল যে সে মরে যায়নি। এতে তাদের উপকারই হল কারণ জীবিত টারজান মৃত টারজানের থেকে অনেক ভাল, এতে তাদের অনেক বেশী টাকা আদায় হবে।

আরবরা টারজানের হাত-পা বেঁধে চ্যাংদোলা করে যেখানে তাদের ঘোড়াগুলো অপেক্ষা করছিল সেখানে নিয়ে এলো। তারপর তাকে একটা ঘোড়ার

পিঠে বেঁধে অতি দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করল। বেলা বারোটা নাগাদ তারা এক জায়গায় এসে থামল। সেখানে প্রায় কুড়িটা তাঁবু খাটানো আর অনেক লোকজনের সমাগম। ততক্ষণে টারজানের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। চোট খুব বেশি লাগেনি, শুধু রগের কাছে গুলি ঘেঁষটে যাওয়ার দাগ। কিন্তু আরবরা তাকে ঘিরে নানা রকম অপমানকর কথা বলছিল। কতক্ষণ এভাবে চলত জানা নেই, যদি না এক প্রৌঢ় শেখ, যাকে দেখেই বোঝা যায় যে সে এ জায়গার কর্তা, তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে সকলকে ধমকে থামিয়ে দিয়ে বলতেন, 'আলি-বেন আহমেদ আমাকে সব কথা বলেছে। কিন্তু এই বন্দীর পিছনে যে লোক লেগেছে তার কি অভিসন্ধী আমি জানি না, একে তার কি প্রয়োজন তাও জানি না আর জানতেও চাই না। আমি শুধু জানি যে, পাহাড়ে যে লোক একা অপেক্ষা করে বসে থেকে দুর্দান্ত সিংহ নুমাকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে সে একজন বীরপুরুষ। আর আমার কাছে সে যতদিন থাকবে তাকে একজন বীরের মতোই শ্রদ্ধা করা হবে আর তার আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হতে দেওয়া হবে না।'

টারজান শুনে বুঝল যে আরবরা সত্যি সত্যি সিংহ শিকারীদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। এ কথা সে আগেও শুনেছিল।

এর পর টারজানকে একটা তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁবুটা অন্যগুলো থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল। সেখানে তাকে খাবার দেওয়া হল। তারপর আবার তাকে বেঁধে একটা কারপেটের ওপর শুইয়ে রেখে সকলে চলে গেল। টারজান দেখল বাইরে একজন রক্ষী পাহারায় রয়েছে। সে অনেক চেষ্টা করেও মজবুত বাঁধন ছিঁড়তে পারল না।

সন্ধ্যের একটু আগে অনেকগুলো আরববেশী লোক এসে তার তাঁবুতে ঢুকল। তাদের মধ্যে একজন মুখের ঢাকনা খুলে ফেলতেই টারজান দেখল সে নিকোলাস রকোফ্।

সে নিষ্ঠুর হেসে বলল, 'এই যে, আমাদের আবার দেখা হল, কিন্তু এবার উঠে তোমার অতিথিকে সমাদর করছ না কেন?' বলে বার বার লাথি মেরে চিৎকার করতে লাগল, 'কুত্তা, এই নে। যতবার আমার ক্ষতি করেছিস প্রত্যেক বারের জন্য একটা করে—।'

টারজান একটাও আওয়াজ করল না। কিন্তু সেই বৃদ্ধ শেখ রেগে বলে উঠলেন, 'থাম। একে মেরে ফেলতে চাও সে অন্য কথা কিন্তু আমার সামনে এভাবে একজন বীরের অপমান আমি সহ্য করব না। আমার ইচ্ছা হচ্ছে এই বীরকে মুক্তি দিয়ে দেখি, তারপর কতক্ষণ তুমি একে লাথি মারতে পার।'

এতে রকোফের খানিকটা ভয় হল। সে তখন রাগে মুখ কালো করে নিচু গলায় বলল, 'বেশ। আমি নিজের সময়মত একে মেরে ফেলব।'

—'কিন্তু আমার এলাকায় নয়। এখান থেকে বন্দী জীবিত অবস্থায় যাবে। তারপর তোমার কি ইচ্ছা তাতে আমার কিছু বলবার থাকবে না। কিন্তু এখানে একজন ফরাসীর মৃত্যু হলে সৈন্যদল এসে আমার লোকদের মেরে ফেলবে, তাদের তাঁবু পুড়িয়ে ফেলবে। তা আমি হতে দেবো না।'

রকোফ বলল, 'আমি এখান থেকে একে সরিয়ে নিয়ে যাব।'

শেখ গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি এখান থেকে এক-দিনের রাস্তা অতিক্রম করবে। আমার লোকেদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার সঙ্গে যাবে—তা না হলে মরুভূমির বুকে দুজন ফরাসীর মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যাবে।'

রকোফ তাতে রাজি হল। শেখ আরো বলল, 'কাল সূর্যোদয়ের কিছু পরেই তোমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমি বিধর্মীদের পছন্দ করি না আর তার থেকেও ঘৃণা করি কাপুরুষদের।'

আর উপায় না দেখে আরক্ত মুখে রকোফ শেখের সঙ্গে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল আর যাবার সময় টারজানের দিকে তাকিয়ে ক্রুর হাসি হেসে বলল, 'শুতে যাবার আগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে ভুলে যেও না কারণ কাল তোমার শেষ দিন আর এমন যন্ত্রণায় ভুগে তোমায় মরতে হবে যে তোমার মুখ থেকে প্রার্থনাও বের হবে না।'

সেই দুপুরের পর থেকে কেউ টারজানের জন্য খাবার বা জল নিয়ে এল না। তেষ্টায় কাতর হয়ে দু'একবার তাঁবুর বাইরের রক্ষীর কাছে আবেদন জানিয়ে কোনো ফল হল না।

রাত গভীর হয়ে এল। দূরে পাহাড়ের ওপর থেকে

সিংহের গর্জন ভেসে আসতে লাগল। টারজান একা একা চিন্তা করতে লাগল যে জঙ্গলে কোনো দিন এরকম নির্মম ভাবে তার পিছনে কেউ লাগে নি। কোনো দিনও সে মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে পৌঁছায়নি।

আবার সেই সিংহটার গর্জন শুনতে পেল, এবার যেন বেশ কাছেই মনে হল। বুনো জানোয়ারের সামনে নির্ভীক ভাবে দাঁড়াবার যে একটা বিপুল আনন্দ সেটা টারজান আবার অনুভব করল। কিন্তু তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে এমন ভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে যে সেগুলো খোলা তার মতো শক্তিশালী লোকের পক্ষেও অসম্ভব। চরম ব্যর্থতায় টারজান ছটফট করতে লাগল।

সিংহের ডাক ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে। সে নিশ্চয় তার পাহাড়ী ডেরা ছেড়ে মরুভূমিতে খাবারের খোঁজে নেমে এসেছে। বন্দী টারজান তার এই অবাধ স্বাধীনতাকে হিংসা করতে লাগল।

এমন সময় তার কানে এল একটা অস্পষ্ট চলার আওয়াজ। তাঁবুর পিছন দিকটা পাহাড়ের দিকে আর আওয়াজটা সেইখান থেকেই এল। কিন্তু জানোয়ারটার নিশ্বাসের আওয়াজ তো এখনও শোনা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে তাঁবুর পিছনের কাপড় একটু একটু করে ওপরে উঠল। তারপর একটা দেহ পলকের মধ্যে তাঁবুতে ঢুকে গেল। হাত-পা বাঁধা টারজান একটা বুনো পশুর থাবার মারাত্মক আঘাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু একি? কার যেন হাতের কোমল ছোঁয়া তার মুখে লাগল? কে যেন প্রায় অস্পষ্ট গলায় তার নাম ধরে ডাকল?

টারজানও চাপা গলায় উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমি টারজান, কিন্তু তুমি কে?'

উত্তর এলো, 'আমি সেই সিদি-এস্‌সার নর্তকী।'

সঙ্গে সঙ্গে হাতের ধারালো ছুরি দিয়ে সে টারজানের বাঁধন কেটে দিয়ে চুপি চুপি বলল, 'আমার সঙ্গে এসো।'

হামাগুড়ি দিয়ে অতি সাবধানে দুজনে তাঁবুর পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে সেইভাবেই একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে থামল।

টারজান আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি এখানে কি করে এলে? আর আমি যে এখানে বন্দী তাই-বা কি করে জানলে?'

মেয়েটি উত্তর দিল, 'আজ রাত্রে আমি অনেক দূর থেকে এসেছি আর আমাদের এখন অনেক দূরে যেতেও হবে। যেতে যেতে সব কথা বলব।'

এই বলে তারা দুজনে পাহাড়ের দিকে যেতে লাগল মেয়েটি বলল, 'আজ সিংহ তার শিকারে বেরিয়েছে। আমি ঘোড়াগুলোকে লুকিয়ে রেখে আসবার সময় সে আমাকে তাড়া করেছিল। আমার ভীষণ ভয় করছিল।'

টারজান তার সাহসিকতার প্রশংসা করে বলল, 'কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি এতটা পথ দৌড়ে আমাকে বাঁচাতে এলে?'

মেয়েটি মাথা উঁচু করে বলল, 'আমি কাদুর বেন সাদেনের মেয়ে। যে একদিন সামান্য নর্তকী জেনেও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল এখন তার বিপদের সময় রক্ষা যদি না করি তো আমার বাবার নামে অপমান হবে।'

টারজান বলল, 'কিন্তু তা হলেও তুমি যে অত্যন্ত সাহসী মেয়ে তাতে সন্দেহ নেই। এখন বলো কি করে আমার খবর পেলে?'

তখন সে বলল, যখন টারজানকে বন্দী করে আরবরা শেখের আড্ডায় নিয়ে আসে, সেই সময় তার এক আত্মীয়, আহ্‌মেদ দিন তায়েব, সেখানে কারোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সে সব খবর শুনে কাদুরের ডেরায় গিয়ে বলে, শেখ কাদুর তখন ডেরায় ছিলেন না। মেয়েটি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসবে ঠিক করাতে কেউ রাজি হয় নি। তাই যখন সন্ধ্যে হয়ে এল তখন সে একাই একটা ঘোড়ায় চড়ে আরেকটি ঘোড়াকে সঙ্গে নিয়ে তার সাহায্যে এসেছে। ঘোড়াগুলো কাছেই বেঁধে রেখেছে।

কিন্তু বিপদের ওপর বিপদ! সেখানে ঘোড়ার কোনো চিহ্ন মাত্র নেই। টারজান চারদিক পরীক্ষা করে বুঝতে পারল এখানে পশুরাজ হানা দিয়েছিল তাতে ঘোড়াগুলো ভয়ে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে

অগত্যা পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। মেয়েটি রাস্তা চিনত তাই খুব একটা অসুবিধা হল না। দুজনে গল্প করতে করতে চলতে লাগল। মেয়েটির নির্ভীক মনের পরিচয় পেয়ে টারজান ভাবতে লাগল তার যদি একটা বোন থাকত আর সে যদি এই মেয়েটির মতো হত! কি মজার খেলার সাথী-ই না সে হত!

ক্রমে তারা চড়াই উঠতে লাগল আর রাস্তাও সেই সঙ্গে দুর্গম হয়ে এলো। চলতে চলতে একটা বাঁক ঘুরতেই সামনাসামনি দেখা হল পশুরাজ সিংহের সঙ্গে। মূর্তিমান করালের মতো সে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে [illegible]

আছড়াচ্ছে আর তাদের দেখে প্রচণ্ড এক গর্জন করে তার শক্তির উদাহরণ দিচ্ছে।

টারজান হাত বাড়িয়ে মেয়েটির কাছ থেকে তার ধারালো ছুরিটা চেয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি আস্তে আস্তে ফিরে যাও। আমার ডাক শুনলে বুঝতে পারবে বিপদ কেটে গেছে, তখন ফিরে এসো।'

মেয়েটি কিছুটা হটে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তার চোখের সামনে আজ এক অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যাবে দুই দুর্জয় শক্তির।

টারজান একটু নিচু হয়ে হাতে লম্বা আরব ছুরি নিয়ে ক্রমশঃ ধাবমান সিংহটার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

সিংহটা এবার কাছে পৌঁছে নিজেকে মাটিতে নামিয়ে তারপর প্রচণ্ড গর্জন করে টারজানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সিংহ ধরেই নিয়েছিল যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের শক্তি তার কাছে নগণ্য। কিন্তু তার সে ভুল এবার ভাঙল।

আরব মেয়েটি দূর থেকে আশ্চর্য হয়ে দেখল টারজান কি ভাবে শুধু শক্তি নয় তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে সিংহের সঙ্গে লড়াই করে, ঠিক জায়গায় ছুরি বসিয়ে অনায়াসেই তাকে মেরে ফেলল। তারপর তার বুকে পা দিয়ে সেই বিজয়নাদ! ভয়ে মেয়েটার প্রাণ কেঁপে উঠল। তার মনে হল হয়ত টারজান তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, খুব সম্ভব গত কয়েক দিনের অত্যাচারের ফলে।

তার ভয়ার্ত মুখের দিকে চোখ পড়তেই টারজানের স্বাভাবিক ভাব ফিরে এল। মেয়েটির ধড়েও প্রাণ এল, সে-ও হাসল।

সে বলল, 'তুমি কি রকম ধরনের লোক? এইমাত্র যা করলে তা কেউ কখনো শোনেও নি।'

টারজান একটু লজ্জা পেয়ে সংক্ষেপে বলল, 'মাঝে মাঝে ভুলেই যাই যে আমি একজন সভ্য মানুষ! যখন আমি কাউকে মেরে ফেলি তখন আমি অন্য জগতের হয়ে যাই।'

সকালবেলা তারা পাহাড়ে জায়গা পার হয়ে আবার মরুভূমিতে এসে পৌঁছল। একটা ছোট নদীর ধারে তারা ঘোড়াগুলোকে চরতে দেখে, খুব সহজেই তাদের ধরে ফেলে পিঠে চড়ে নির্বিঘ্নে কাদুর বেন সাদেনের ডেরায় পৌঁছে গেল।

তাদের দেখে শেখ কাদুর নিশ্চিন্ত হলেন আর টারজানকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। টারজানের বাহাদুরির কথা শুনে শেখ কাদুরের দলের লোকেরা তাকে ঘিরে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল। শেখ কাদুর টারজানকে যতদিন ইচ্ছা তাঁদের কাছে থাকতে বলেছিলেন। টারজান মাত্র এক সপ্তাহ তাঁর সঙ্গে থেকে আবার বু-সা'দার দিকে এগিয়ে গেল। তার সঙ্গে শেখ কাদুর নিজে পঞ্চাশ জন রক্ষী নিয়ে রাস্তা দেখিয়ে গেলেন।

বু-সা'দা পৌঁছবার কিছু আগেই টারজান তার সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিল কারণ সে কাউকে না জানিয়ে শহরে ঢুকতে চাইছিল। শেখ তার সঙ্গীদের নিয়ে আগে চলে গেলেন, তারপর সন্ধ্যের পর যখন টারজান একা শহরে ঢুকে তার হোটেলের দিকে গেল, কেউ জানতেও পারল না।

হোটেলের মালিক তাকে জীবিত দেখে অবাক হয়ে গেল আর টারজানের প্রশ্নের উত্তরে এক তাড়া চিঠি তার হাতে দিল। কথাও দিল যে টারজানের ফিরে আসার খবর সে কাউকে বলবে না।

চিঠিগুলোর মধ্যে একটা ছিল টারজানের উপরওয়ালার কাছ থেকে। তাতে লেখা, টারজান যেন অতি অবশ্য প্রথম স্টিমারে করে কেপ টাউনের দিকে রওনা হয়ে যায়। সেখানে তার কাজের অর্ডার অপেক্ষা করবে। এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

চিঠি পড়ে পরের দিনই রওনা হবার বন্দোবস্ত করে

টারজান ক্যাপটেন জেরার্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

তাকে দেখে ক্যাপটেন জেরার্ডের মুখ খুশিতে ভরে গেল। তিনি বললেন, 'জেরনোয়া ফিরে এসে খবর দিয়েছিল যে আপনাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমি তখন সারা এলাকাটা তল্লাস করবার হুকুম দিলাম। খবরে জানলাম আপনাকে সিংহ মেরে ফেলেছে। প্রমাণ স্বরূপ আমার বন্দুক ফিরিয়ে আনা হয়েছে, আপনার ঘোড়াও ক্যাম্পে ফিরে এসেছে। জেরনোয়া এতে খুবই ভেঙে পড়েছিল। সে-ই সব খোঁজখবর করেছিল। এখন আপনার ফিরে আসায় সে খুব খুশি হবে। আমি এক্ষুণি তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

টারজান আর কিছু না বলে হোটেলে ফিরে গেল। সেখানে শুনল একজন ইউরোপিয়ান যে এতদিন ধরে আরব বেশ পরে ঘুরে বেড়াত, সে আবার বু-সাদাতে ফিরে এসেছে। তার দাড়ি কালো আর হাত ভাঙা।

তার ঠিকানা নিয়ে টারজান রওনা দিল। অনেকগুলো অন্ধকার সরু গলি পার হয়ে একটা নোংরা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে একটা জানালা দিয়ে টারজান দেখল ঘরের ভিতর একটা টেবিল ঘিরে বসে রয়েছে রকোফ্ আর জেরনোয়া।

জেরনোয়া বলছে, 'রকোফ তুমি একটা পিশাচ। নির্মমভাবে আমাকে তাড়না করে যাচ্ছ। তোমার জন্যে আমাকে খুন পর্যন্ত করতে হয়েছে। টারজানের রক্তের দাগ আমার হাতে লেগে রয়েছে। যদি ঐ শয়তানের বাচ্চা পল্‌ভিচ্ আমার গুপ্ত কথা না জানত, তাহলে আজ রাত্রেই আমি তোমাকে শুধু হাতে খুন করতাম।'

রকোফ হেসে বলল, 'সে তুমি পারবে না। আমার মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্র পলভিচ্ সামরিক বিভাগের মন্ত্রীর কাছে তোমার সব গোপন কথা ফাঁস করে দেবে।'

তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'আরও কিছু টাকা দিয়ে আরো একটু খবর এনে দাও ব্যাস্, তারপর আর তোমাকে আমি বিরক্ত করব না। কথা দিচ্ছি।'

জেরনোয়া একটুক্ষণ চিন্তা করে পকেট থেকে দুটো কাগজ বের করে দিয়ে বলল, 'আমি তৈরি হয়েই এসেছিলাম।"

রকোফ উৎফুল্ল হয়ে কাগজগুলো নিয়ে বলল, 'বাঃ এর পর আর তোমাকে কিছু বলব না।'

জেরনোয়া উঠে পড়ে বলল, 'আর কিছু জানতে চাইলে মনে রেখো, তোমার আর নিস্তার নেই।'

জেরনোয়া চলে গেলে রকোফ্ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

টারজান এতক্ষণ নিজেকে যথাসম্ভব অন্ধকারে লুকিয়ে রেখেছিল। জেরনোয়া চলে যেতে সে ঘরের দরজা খুলে রকোফের কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল।

টারজানের দিকে চোখ পড়তেই রকোফ চমকে উঠে বলল, 'তুমি! কি চাও এখানে? আমাকে মেরে ফেলতে তোমার সাহস হবে না। তাহলে তোমার ফাঁসি হবে।

কঠিন গলায় টারজান বলল, 'তোমাকে মেরে ফেলবার সাহস আমার যথেষ্ট আছে কারণ কেউ জানে না যে আমি এখানে এসেছি। পল্‌ভিচ্ ভাববে সে কাজ জেরনোয়া করেছে, তোমাকেই তো সে-কথা বলতে শুনলাম। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না, তোমাকে মেরে ফেলবার আনন্দটাই যথেষ্ট। তোমার মতো ছোটলোক কাপুরুষ আমি আর দেখিনি। তোমাকে মেরে ফেলতে হবে।'

রকোফ্ উঠে পালাতে গেল, টারজান তার টুঁটি চেপে ধরল। তারপর সেই ভাবে তাকে টানতে টানতে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন বুঝতে পারছ, নির্মম ভাবে হত্যা করতে কি রকম লাগে? কিন্তু এখন-ও তোমাকে মারব না, তার সময় আসবে। এই শেষ বারের মতো তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি যে ভবিষ্যতে তুমি যদি আর একবারও তোমার বোনকে বা তাঁর স্বামীকে বা আমাকে বিরক্ত করো, কিম্বা যদি শুনি তুমি ফ্রান্স বা ফ্রান্সের অধীনে অন্য কোনো জায়গায় ফিরে গেছ, তাহলে আমি সব কাজ ফেলে তোমাকে খুঁজে বের করে তোমার প্রাণনাশ করব। করব। এই আমার শেষ কথা।'

তারপর টারজান টেবিল থেকে কাগজগুলো তুলে তাতে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারল সেগুলো অত্যন্ত জরুরী সব খবরে ভরা। সেগুলোকে পকেটে ভরে নিল। রকোফ্ হতাশায় ভরে গেল, কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস পেল না।

পরদিন সকালে টারজান বুইরা হয়ে আবার আলজিয়ারস-এর দিকে রওনা হয়ে গেল। সে যখন হোটেলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন জেরনোয়া তাকে দেখতে পেয়ে ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। টারজানের ইচ্ছা ছিল না যে এখন তাদের দেখা হয় কিন্তু তাই হল। সে হাত তুলে অভিবাদন জানালো। জেরনোয়াও পাল্টা অভিবাদন জানালো বটে কিন্তু তাকে দেখে মনে হল সে

যেন ভূত দেখেছে।

সিদি এস.সাতে পৌঁছে টারজানের সঙ্গে এক পূর্ব পরিচিত ফরাসী অফিসারের দেখা হল। সে বলল, 'আপনি বোধহয় খুব ভোরেই বু-সা'দা থেকে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন তাই জেরনোয়ার খবর পাননি। সে বেচারা আজ সকাল আট্‌টা নাগাদ আত্মহত্যা করেছে।'

এর দু'দিন পর টারজান আলজিরিয়াতে এসে শুনল যে কেপ টাউনের জাহাজ আরো দুদিন পরে ছাড়বে। সে এই সময়টুকু নিজের কাজের পুরো রিপোর্ট লিখে কাটাল। কিন্তু জেরনোয়ার কাগজগুলোর কথা কিছু লিখল না। এর কারণ কাগজগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সেগুলো হাতছাড়া করা যায় না। টারজান নিজেই সেগুলো প্যারিসে যথাস্থানে পৌঁছে দেবে।

নির্দিষ্ট দিনে টারজান যখন জাহাজে উঠল তখন ওপরের ডেক থেকে দুজন লোক তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। তাদের শৌখিন বেশভূষা আর গোঁপদাড়ি বর্জিত চেহারা। টারজানকে দেখে তারা কিন্তু নিজেদের মুখ আড়াল করতে লাগল। টারজান তাদের লক্ষ্যই করল না।

টারজান তার অধিকর্তার আদেশ অনুসারে নিজের নাম বদলে এখন লণ্ডনের জন কল্ডওয়েল রেখেছিল। সে এর প্রয়োজনীয়তা ঠিক বুঝতে পারেনি। ভাবছিল কেপ টাউনে পৌঁছে এবার তাকে কি কাজে নামতে হবে। রকোফের সঙ্গ থেকে যে রেহাই পেয়েছে তার জন্য সে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল।

সে রাত্রে ডিনার খেতে গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল, তার নাম হেজেল স্ট্রং। নামটা কোথায় শুনেছে মনে করতে গিয়ে সে বুঝল এ হল জেন পোর্টারের প্রিয় বন্ধু। বহুদিন আগে আফ্রিকার জঙ্গল থেকে জেন তার এই বন্ধুকে চিঠি লিখেছিল। টারজান নামটা পড়েছিল।

এ ঘটনার সূচনা হয়েছিল কয়েক মাস আগে আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিন শহরের একটি ছোট্ট রেল স্টেশনে।

চতুর্দিকের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছিল শুকনো পাতা পোড়ার কড়া গন্ধ। ঐ স্টেশনে ছ'জন যাত্রী দক্ষিণগামী কোনো ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল।

প্রোফেসর আর্কিমেডিস পোর্টার প্লাটফর্মে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন, তার ওপর কড়া নজর রাখছিল বিশ্বস্ত সেক্রেটারি মিঃ স্যামুয়েল ফিলাণ্ডার। পোর্টার যদিও উইলিয়ম সেসিল ক্লেটন আর টারজানের সঙ্গে কথা বলছিল, তার স্বরে প্রাণ ছিল না, ঠিক যেন যন্ত্রচালিতের মতো। আর ছিল এস্‌থরেলডা, জেন পোর্টারের পরিচারিকা।

অদূরে ট্রেন আসার আওয়াজ শুনে যে যার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগল, এমন সময় ক্লেটন বলে উঠল, 'ঐ যাঃ আমার ওভার কোটটা ওয়েটিং রুমে ফেলে এসেছি।' বলেই দৌড়ে চলে গেল।

টারজান হাত বাড়িয়ে জেনকে বলল, 'গুড বাই জেন, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

ধরা গলায় জেন বলল, 'গুডবাই। আমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করো কিন্তু। কিন্তু—আমার খুব কষ্ট হবে যদি তুমি সত্যি সত্যি ভুলে যাও।'

—'তার কোনো ভয় নেই জেন, ইচ্ছা করলেও পারব না। তুমি সুখী হবে—তোমাকে সুখী হতেই হবে। আচ্ছা বাকি সকলকে জানিয়ে দিও আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি না। আমার নিজের গাড়ি নিয়ে আমি নিউইয়র্ক চলে যাচ্ছি। কারণ এ সময় ক্লেটনের সঙ্গ সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ওর ওপর আমার কোনো রাগ নেই, কিন্তু সে যে আমার আর পৃথিবীতে আমার সব থেকে বেশি যা কাম্য তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে!'

এদিকে ক্লেটন তার কোট নিতে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম দেখতে পেল। কারোর জরুরী খবর ভেবে সেটাকে হাতে নিয়ে দেখল তাতে সংক্ষেপে লেখা আছে—

'আঙ্গুলের ছাপ থেকে বোঝা গেছে যে তুমি গ্রেস্টোক। অভিনন্দন—ডার্নো।'

মুহূর্তের মধ্যে ক্লেটন সব ভুলে গেল। স্টেশনের ব্যস্ততা, ট্রেন আসার শব্দ—তাকে যেন কেউ মরণ-আঘাত হানল। দূর থেকে শুনতে পেল সকলে ডাকাডাকি করছে। তখন অভিভূতের মতো সে কোট হাতে নিয়ে ট্রেনের দিকে এগিয়ে গেল। টেলিগ্রাম পাবার আগে সে নিজেকে এক জমিদার বলে জানত আর এখন সে একজন কপর্দক-শূন্য ভিখিরি মাত্র। সে ঠিক করল ট্রেনে সকলকে এই খবরটা জানাবে, কিন্তু গুছিয়ে বসার পর কোথাও টারজানকে দেখতে পেল না। খোঁজ নিয়ে শুনল যে সে আলাদা ভাবে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছে আর সেখান থেকে ফ্রান্সে ফিরে যাবে।

ক্লেটনের মাথায় নাগরদোলার মতো নানা ভাবনা চিন্তা ঘুরতে লাগল। কেন টারজান টেলিগ্রামের কথা জেনেও কাউকে কিছু বলেনি? সে কি নিজের সম্পত্তি দখল করতে চায় না? তা কি অস্বীকার করতে চায়? জেনের প্রতি তার ভালোবাসাই কি এই সিদ্ধান্তের মূলে? জেন কি শুধু মিসেস্ ক্লেটন হিসাবে সুখী হবে? লেডি গ্রেস্টোকের পদমর্যদা তো অনেক বেশি।

তারপর অনেক ভেবে সে এই সিদ্ধান্তে এল যে যখন টারজান টেলিগ্রামে ঐ খবর পেয়েও নিজে কাউকে কিছু বলেনি তখন ক্লেটন বলবার কে? এতে খানিকটা মানসিক শান্তি পেল বটে, কিন্তু বাকি পথটা তাকে উদ্বিগ্ন আর চিন্তামগ্ন থাকতে দেখা গেল। হয়তো একদিন টারজান সকলের সামনে তার আসল পরিচয় দিয়ে নিজের সব সম্পত্তি দাবি করবে। এই কথা বারবার ক্লেটনের মনে সাপের ফনার মতো জেগে উঠতে লাগল।

কিছুদিন পর সকলে বল্টিমোর শহরে পৌঁছলে ক্লেটন জেনকে বলল তাদের বিয়ে যত শিগগীর সম্ভব হওয়া উচিত। কিন্তু জেন তাতে রাজি হল না। তখন ক্লেটন ঠিক করল তাকে একমাস পরে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে হবে, তার আগেই বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার।

কিন্তু একমাস পার হবার পরেও জেন মন ঠিক করে উঠতে পারল না। অগত্যা ক্লেটন একাই ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেল। এর পর অনেক চিঠি লিখেও জেনকে মনস্থির করাতে না পেরে শেষে ক্লেটন প্রোফেসার পোর্টারকে সোজাসুজি লিখে পাঠাল। চিঠিতে তাঁকে আর তাঁর পরিবারকে লণ্ডনে আসবার নিমন্ত্রণ জানাল।

প্রোফেসর প্রথম থেকে ক্লেটনকে স্নেহ করতেন। তার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েই লণ্ডন যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু লণ্ডন পৌঁছেও জেন একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে ক্রমাগত বিয়ে পিছিয়ে দিতে লাগল। শেষে যখন লর্ড টেনিংটন সকলকে তাঁর সঙ্গে জাহাজে আফ্রিকা পরিক্রমা করবার আমন্ত্রণ জানালেন, জেন উৎসাহের সঙ্গে সায় দিল। এর কারণ, পরিক্রমা করতে অন্তত এক বছর তো লাগবেই। ক্লেটনের এতে রাগ হলেও, মুখে কিছু বলতে পারল না।

এই ভাবে একদিন জিব্রলটার প্রণালীতে দুটো ভিন্ন-মুখী জাহাজ পরস্পরের পাশ কাটিয়ে গেল। একটি ছোট, কিন্তু অত্যন্ত দ্রুতগামী 'ইয়ট্', যার মধ্যে কোন এক তরুণী বেদনাভরা চোখে অন্যমনস্ক হয়ে গলার হীরের লকেট নিয়ে খেলা করছিল। তার মন চলে গিয়েছিল সেই লকেটের দান-কর্তার কাছে, আফ্রিকার সেই ছায়ায়-ঘেরা দিনগুলির কাছে।

বড় জাহাজটিতে এক দীর্ঘদেহী যুবক এক তরুণীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার সময় অলস চোখে ছোট জাহাজটিকে দেখেছিল। তারপর আবার নিজেদের কথার জের ফিরিয়ে এনে টারজান প্রোফেসর আর তাঁর কন্যার কথা পাড়ল।

হেজেল স্ট্রং খুবই আশ্চর্য হয়ে বলল 'জেন পোর্টার আর আমি ছোটবেলাকার বন্ধু। প্রায় বোনের মতো, কিন্তু এখন সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে বলে আমার মন খুব খারপ।'

টারজান কারণ জানতে চাইলে মিস্ স্ট্রং বলল, সে বিয়ে করছে বটে কিন্তু যাকে সত্যি করে ভালবাসে, তাকে নয়। সে এ বিয়েতে রাজি হয়েছে কর্তব্যের দায়ে। আমি অনেক বুঝিয়েছি, রাগও করেছি কিন্তু সে অটল।

'আমার দুঃখ যাকে সে ভালবাসে তার জন্য। আমি তাকে দেখিনি বটে কিন্তু জেনের কথায় বুঝতে পেরেছি সে একজন অসাধারণ লোক। আফ্রিকার জঙ্গলে তার জন্ম, তাকে পালন করেছিল বনমানুষরা।' এই পর্যন্ত বলার পর মেয়েটির মা এসে পড়াতে আর কোনো কথা হল না আর টারজানও রেহাই পেল।

কিছুদিন পর একদিন টারজান দেখল মিস স্ট্রং এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে। টারজান কাছে আসতেই সে আলাপ করিয়ে দিল মিঃ থুবানের সঙ্গে।

টারজান বলল, 'আপনাকে আগেও যেন কোথাও দেখেছি, তবে কোথায় ঠিক মনে পড়ছে না।'

ভদ্রলোকের যেন অস্বস্তি হচ্ছিল, তিনি বললেন, 'তা হতে পারে, প্রথমবার দেখা হলে আমারও ওরকম মনে হয়েছে।'

এর পর আর টারজান তাদের কথাবার্তায় যোগ দেয়নি, শুধু মনে করবার চেষ্টা করেছিল কোথায় তাকে দেখেছে। সে সুযোগ এসেও গেল।

তাপমাত্রা বেড়ে উঠলে, মিস স্ট্রং ভদ্রলোককে ডেক চেয়ারগুলো ছায়ায় টেনে আনতে অনুরোধ করল। টারজান লক্ষ্য করল লোকটির বাঁ হাতের কব্জিতে যেন জোর কম। ব্যস্ আর কোন পরিচয়ের প্রয়োজন হল না।

ভদ্রলোক যেন সেখান থেকে সরে পড়বার সুযোগ খুঁজছিল, এবার মিস স্ট্রং-এর কাছে বিদায় নিতে টারজান বলল, 'চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাব। আমি আবার এক্ষুণি ফিরে আসব মিস স্ট্রং।'

মেয়েটির চোখের আড়াল হতেই টারজান লোকটার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এবার কি নতুন চাল চালছ, রকোফ্?'

রকোফ রূঢ় ভাবে বলল, 'আমি তো তোমাকে কথা দিয়েছি ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাব।'

—'তা ঠিক, সে কথা আমি বিশ্বাসও করতাম যদি তুমি ছদ্মবেশ না ধরতে।'

'এটা একটা ইংলিস জাহাজ, এখানে তুমি কিছুই করতে পার না। এখানে আমার যথেষ্ট অধিকার আছে। তাছাড়া তুমিও তো ছদ্মনামে রয়েছ।'

'সে ব্যাপারে তোমার জানার কিছু নেই। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে মিস্ স্ট্রং-এর মতো একজন ভদ্র মহিলার কাছ থেকে দূরে থেকো, তা না হলে আমি তোমাকে জলে ফেলে দেবো।'

রকোফ্ নিষ্ফল আক্রোশে নিজের কামরায় বসে পলভিচ্‌কে বকাবকি করতে লাগল, 'তুমি যদি একটা কাপুরুষ না হতে, তাহলে টারজানের কামরা থেকে ঐ কাগজগুলো উদ্ধার করে আনতে পারতে। আমি জানি ওগুলোকে টারজান এক মুহূর্তের জন্যও হাতছাড়া করবে না।'

পল্‌ভিচ্ হেসে বলল, 'তুমিই তো আসল ষড়যন্ত্রকারী। তুমি নিজেই কাগজগুলো উদ্ধার কর না কেন?'

ঘণ্টা দুই পরে ভাগ্যদেবী তাদের সহায় হলেন। টারজান তালা না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রকোফ্ পল্‌ভিচ্‌কে কামরায় ঢুকিয়ে নিজে দরজার বাইরে পাহারায় রইল।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুজির পর কোটের পকেট থেকে কাগজগুলো বেরোল। দুই রাশিয়ান এত সহজে কার্যসিদ্ধি হতে উৎফুল্ল হয়ে ঘরে এসে নিজেদের বাহবা দিতে লাগল।

তারপর পল্‌ভিচ্ শান্ত হয়ে বলল, 'কিন্তু যখন টারজান টের পাবে যে কাগজগুলো চুরি গেছে তখন রক্ষে থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে তোমার ওপর সন্দেহ হবে।'

রকোফ্ তার সেই ক্রূর হাসি হেসে বলল 'আজ রাত্রের পর আর কিছু যাবে আসবে না।'

প্রতিদিনের মতো সে রাত্রেও মিস স্ট্রং শুতে গেলে টারজান ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের শোভা দেখতে লাগল। অন্ধকারের আড়াল থেকে প্রতিদিনের মতো আরও দু জোড়া চোখ তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

ক্রমে ডেক খালি হয়ে গেল। চাঁদের আলো না থাকাতে রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হল। জাহাজের গায়ে জলের আওয়াজ, প্রপেলরের ঘরঘরানি আর এঞ্জিনের আওয়াজ দুজোড়া পায়ের শব্দকে ডুবিয়ে দিল। অতি সজাগ টারজানও কিছু বুঝবার আগে দুজোড়া হাত তার পা দুটো ধরে এক ধাক্কায় রেলিঙ টপ্‌কে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল।

মিস স্ট্রং তার অন্ধকার কামরার জানালা দিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ দেখতে পেল একটা দেহ যেন ছিটকে জলে পড়ে গেল। কিন্তু কারোর কোনো চিৎকার শুনল না, তাই ভাবল বোধ হয় কেউ কোনো বাজে জিনিষ ছুঁড়ে ফেলেছে। এই ভেবে সে আর কিছু না করে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে মিঃ কল্‌ড ওয়েলের জায়গা খালি দেখে হেজেল স্ট্রং একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ডেকে মিঃ থুবানের সঙ্গে দেখা হল। আজ যেন তাকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে।

বেলা ক্রমশঃ বেড়ে চলল কিন্তু টারজানের দেখা নেই। মিস স্ট্রং-এর মনে কাল রাত্রের ঘটনাটা উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। সে আর থাকতে না পেরে একজন স্টুয়ার্ডকে ডেকে মিঃ কল্‌ডওয়েলকে ডেকে আনতে বলল। লোকটি ফিরে এসে জানালো মিঃ কলডওয়েলের ঘরে কেউ নেই। এমন কি তাঁর বিছানায় রাত্রে কেউ শোয়নি। সে ক্যাপ্টেনকে খবরটি দিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে মিস স্ট্রংও ক্যাপটেনকে সব কথা খুলে বলল।

ক্যাপটেন সারা জাহাজ তোলপাড় করে খুঁজে দেখবার হুকুম দিলেন। নিজে মিস স্ট্রংকে টারজান সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলেন। হেজেল স্ট্রং যথাসম্ভব তার উত্তর দিল কিন্তু আসল খবর কিছুই দিতে পারল না। তার কোনো শত্রু আছে কি না? অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে কি রকম পরিচয় ছিল ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে প্রথম অফিসার এসে জানাল যে সারা

জাহাজ তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে কিন্তু মিঃ কলডওয়েলকে কোথাও পাওয়া যায় নি। ক্যাপটেন তখন মত প্রকাশ করে বললেন যে মিঃ কল্‌ডওয়েল সম্পর্কে তিনি যতটুকু জানতে পেরেছিলেন তাতে তিনি স্বেচ্ছায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার লোক নন বলে বুঝেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ধরে নিতে হচ্ছে যে তাঁকে কেউ খুন করে জলে ফেলে দিয়েছে।

মিস স্ট্রং দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ল। সে কেবলই চোখের সামনে দেখতে লাগল একটা দেহ সমুদ্রের অতল জলে ছিটকে পড়েছে। তার চোখের তলায় কালি পড়ে আর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যেতে লাগল।

মিঃ থুরান এ ক'দিন হেজেল স্ট্রংকে প্রচুর সান্ত্বনা দিতে লাগল। তার সুন্দর ব্যবহার ও সমবেদনায় হেজেল সত্যি সত্যি কৃতার্থ বোধ করতে লাগল। আর এই ফাঁকে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে মিঃ থুরান জানতে পারল যে হেজেল স্ট্রং আমেরিকার বল্‌টিমোর শহরের এক অতি ধনী পরিবারের মেয়ে।

মিঃ থুরানের ইচ্ছা ছিল, কাগজগুলো পাওয়া গেছে যখন পরের বন্দরেই নেমে পড়ে, সোজা পিটারসবার্গে ফিরে যাবে। কিন্তু এখন আমেরিকান ধনসম্পত্তির স্বপ্ন দেখে সে ঠিক করল কেপ টাউন অবধি যাবে। এ খবরে হেজেল স্ট্রং খুশি হয়ে জানাল তারাও সেখানে যাচ্ছে, তার মামার বাড়ি। আর বেশ কয়েক মাস সেখানে কাটাবে।

হেজেল স্ট্রং-এর মা কিন্তু মিঃ থুরানের সঙ্গে আলাপে খুব একটা প্রভাবিত হন নি। তিনি নিভৃতে কন্যাকে বললেন, 'মিঃ থুরানকে সন্দেহ করবার আমার কোনো কারণ নেই, তবু কেন যেন তার চোখের চাহনি দেখে আমার মনে সন্দেহ জাগে। মিঃ কল্‌ড্‌ওয়েলকে আমার সত্যিই ভাল লেগেছিল।

গভীর নিশ্বাস ছেড়ে কন্যা সে কথায় সায় দিল।

কেপ টাউনে হেজেল স্ট্রং এর মামার বাড়িতে মিঃ থুরান প্রায়ই যাতায়াত করত। ক্রমশঃ পরিচয় যখন বেশ ঘন হয়ে গেল, সে একদিন হেজেল স্ট্রংকে বিবাহের প্রস্তাব জানাল।

হেজেল কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে বলল, 'আমি এ কথা কখনো ভাবিনি তাই এখনি উত্তর দিতে পারলাম না। নিজের মনকে আরো যাচাই করে নিয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।'

এতে মিঃ থুরান রাজি হল। পরে সে সুন্দর একটা বাড়ি আর সমুদ্রগামী 'ইয়ট' কিনে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল।

এরই মধ্যে একদিন কেপটাউনের বাজারে জেন পোর্টারের সঙ্গে হেজেল স্ট্রং-এর দেখা হয়ে গেল।

প্রথম সাক্ষাতের আনন্দ কেটে যাবার পর দুই বন্ধুর মধ্যে খবরের আদান প্রদান চলল। জেন বলল, 'এবার তারা আফ্রিকার পশ্চিম পাড় ধরে ঘুরে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবে আর সেখানে তার বিয়ে হবে। তারপর নিজের থেকেই বলে উঠল, 'ইল্যাণ্ড যদি এখান থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে হতো তাহলে খুব ভালো হত।'

এর পর থেকে দুই দলের মধ্যে যাতায়াত, ডিনার, পার্টি, পিকনিক ইত্যাদির আয়োজন হল। মিঃ থুরানও সেই দলে যোগ দিল।

একদিন মিসেস স্ট্রং অতি দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে তাঁদের শিগ্‌গীরই আমেরিকা ফিরে যেতে হবে, কারণ তার উকিলের কাছ থেকে বিশেষ জরুরী এক তার এসেছে। এতে সকলের আগে মিঃ থুরান জানালেন যে তিনিও তাঁদের সঙ্গে আমেরিকা ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত যদি তাঁরা রাজি থাকেন। লর্ড টেনিংটন তাঁর ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে বললেন যে সকলে একসঙ্গেই পরের সপ্তাহে তাঁরই জাহাজে করে ইংল্যাণ্ডে রওনা হয়ে যাবেন। সেখান থেকে মিসেস স্ট্রং হেজেল আর মিঃ থুরান অনায়াসেই আমেরিকা যাবার বন্দোবস্ত করতে পারবেন।

পরের সপ্তাহে জাহাজ ছাড়ার দুদিন পর, এক সকাল-বেলা হেজেলের কামরায় জেন আর হেজেল অনেকগুলো ছবি দেখছিল। ছবিগুলো হেজেল আমেরিকা ছাড়ার পর থেকে নানান জায়গায় তুলেছিল। কেপটাউনে সেগুলো প্রিণ্ট করিয়ে নিয়েছিল। একটি ছবি হাতে নিয়ে হেজেল জেনকে বলল, 'এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় আমেরিকাতে হয়েছিল। এর নাম জন কলডওয়েল। ইনি আসলে ইংরেজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জাহাজে আসার সময় সমুদ্রে হারিয়ে যান।'

জেন ছবিটি হাতে নিয়ে অভিভূতের মতো বলে উঠল, 'কি বললে? সমুদ্রে হারিয়ে যান! মানে মারা যান, ডুবে যান! হেজেল, তুমি ঠাট্টা করছ?' এই বলে হেজেল কিছু করবার আগে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

হেজেল তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার পর অনেকক্ষণ

দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে হেজেল বলল, 'আমি জানতাম না যে জন কল্‌ডওয়েলের সঙ্গে তোমার এতটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল যে তার মৃত্যুতে এত কষ্ট পাবে।'

—'জন কল্‌ডওয়েল? তুমি সত্যি এই লোকটিকে জানো না?'

—'হ্যা, এর নাম জন কলডওয়েল আর লণ্ডনে থাকেন।'

—'হায়রে তাই যদি হত! কিন্তু ও মুখ আমি কোনো দিনও ভুলতে পারব না—হাজার লোকের মধ্যেও একে আমি সহজেই চিনে নেবো। হেজেল, এ ছবি টারজানের।'

হেজেল চমকে উঠল। বেচারা জেন মিনতি করে বলল, 'তুমি সত্যি করে জানো যে ইনি মারা গেছেন? এতে ভুল হতে পারে না?'

—'আমার মনে হয় না। এখন বুঝতে পারছি তুমি ঠিকই বলছ। ছোটখাট জিনিস যা আগে মনে হয়নি এখন প্রমাণ দিচ্ছে যে সে সত্যিই টারজান। সে নিজেই বলেছিল যে তার জন্ম আফ্রিকায় কিন্তু লেখাপড়া করেছে ফ্রান্সে। তাছাড়া যখন তার কামরায় জিনিসপত্র তল্লাসি হচ্ছিল, তখন সব জিনিসে 'জে, সি, টি,' বা শুধু 'টি' লেখা ছিল। আমরা ভেবেছিলাম তিনি ছদ্মবেশে ভ্রমণ করছেন।'

জেন আর কিছু না বলে কেঁদে ভাসিয়ে দিল। বেশ কিছুদিন ধরে সে অসুস্থ হয়েছিল। এই সময় হেজেল আর এসমারেলডা ছাড়া কারোর সঙ্গে দেখা করল না। পরে আবার সকলের সঙ্গে যোগ দিলে তার চেহারার অবনতি দেখে সবাই চিন্তিত হল।

জেন পোর্টারের অসুখের পর থেকে ঐ জাহাজে একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। প্রথমে একটা এঞ্জিন বিকল হল। দুদিন লাগল সেটা সারাতে। তারপর প্রচণ্ড ঝড়ে জাহাজের ডেকে যা ছিল সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। দুজন নাবিক নিজেদের মধ্যে ছোরাছুরি নিয়ে ঝগড়া করার ফলে একজন জখম হল। আরেকজনকে বন্দী করে রাখা হল। চূড়ান্তে জাহাজের এক বিশিষ্ট অফিসার রাত্রে জলে পড়ে গেল।

দশ ঘণ্টা ধরে সে জায়গায় খোঁজাখুজি করেও তার কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না।

জাহাজের যাত্রী ও নাবিকদের মধ্যে আতঙ্কের ছায়া নেমে এল। বিশেষ করে নাবিকরা যখন বলতে শুরু করল যে আরো বিপদ আসছে সামনে।

তাদের ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলতে সময় লাগল না। দুদিন পরেই রাত্রে প্রচণ্ড এক ধাক্কার ফলে 'ইয়ট টা জখম হল। সকলে ছুটে ডেকে উঠে এল। ধাক্কার কারণও দেখতে পেল, একটা পরিত্যক্ত পুরনো জাহাজ।

কিন্তু লর্ড টেনিংটনের জাহাজেরো সময় ঘনিয়ে এসেছে। ডুবে যেতে আর বেশি দেরি ছিল না। তিনি সকলকে সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বললেন। তাঁর শান্ত গলার স্বরে সকলেই খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। জাহাজের মধ্যে চারটে ছোট ছোট নৌকো মজুদ ছিল। এখন সেগুলোতে খাবার জল ও অন্যান্য দরকারি জিনিস তুলে দেওয়া হল। তারপর জাহাজ ডুবতে শুরু করলে, সকলে সেখান থেকে সরে গেল। বিকট আর্তনাদ করে জাহাজটা জলের তলায় তলিয়ে গেল। বেচারা লর্ড টেনিংটনের মনে হল তিনি যেন বহুদিনের এক পুরনো বন্ধুকে হারালেন।

সকাল হলে জেন চোখ মেলে দেখল যে নৌকোতে সে চড়েছে, তাতে তিনজন নাবিক ছাড়া ক্লেটন আর মিঃ থুবান রয়েছেন। বাকি নৌকোগুলোকে কোথাও দেখতে পেল না। বিশাল অ্যাটলান্টিক সমুদ্রে তাদের ছোট্ট নৌকোটি ভেসে চলেছে।

অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলে পড়বামাত্র টারজানের প্রথম চিন্তা হল জাহাজের প্রপেলার থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা। সে বুঝতেই পেরেছিল তার এই দুর্দশার জন্য কে বা কারা দায়ী। কিন্তু রকোফ যে তাকে এ ভাবে ঘায়েল করতে পারবে সেটা ভাবতেই তার আশ্চর্য লাগছিল।

অনেকক্ষণ ধরে সে তাকিয়ে দেখল জাহাজের আলো ক্রমশঃ দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, তবুও তার একবারও মনে

হল না যে চেঁচিয়ে সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকে। জীবনে কোনো দিন সে কারো সাহায্য নেয়নি তাই আজও তার সে কথা মনে পড়ল না।

তার শুধু মনে হতে লাগল, হয়ত সে ডাঙা থেকে খুব একটা দূরে নেই। সে ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে চলল। তার শরীর খুব সহজে ক্লান্ত হবার নয়। আকাশের তারা দেখে সে পূর্বমুখী চলল। ক্রমশঃ নিজের জুতো জামা খুলে ফেলে দিয়ে হালকা শরীরে সাঁতার কাটতে লাগল। কোট খুলতে গিয়ে কাগজগুলোর কথা মনে পড়াতে পকেটে হাত দিয়ে হতাশ হয়ে দেখল সেগুলো নেই।

এবার সে বুঝতে পারল যে প্রতিশোধ ছাড়াও তার প্রাণনাশের চেষ্টার রকোফের আরেকটা কারণও ছিল।

ভোরের আবছা আলোয় আকাশের তারাগুলো যখন মিলিয়ে যেতে লাগল তখন টারজানের চোখে পড়ল সামনেই কালো রঙের কি একটা ভাসছে। সেটা সেই পরিত্যক্ত পুরনো জাহাজটা। টারজান ঠিক করল এটার ওপর শুয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নেবে। সমুদ্রের শান্ত ঢেউয়ে জাহাজটা দুলছে আর কুড়ি ঘণ্টা না ঘুমাবার পর ক্লান্ত টারজান শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

সূর্যের কড়া তাপে তার ঘুম ভাঙল। প্রথমে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় শরীর মন ভরে গেল কিন্তু পরমুহূর্তেই দুটো জিনিস দেখে সে খুশি হয়ে উঠল। পরিত্যক্ত জাহাজের চারিদিকে নানা রকম জিনিসের ধ্বংসাবশেষ আর তার মধ্যে ভাসছে একটা উলটানো রবারের ডিঙি। আনন্দের অন্য কারণটা হল পুবের দিগন্তে দেখা যাচ্ছে লম্বা ডাঙার রেখা।

টারজান আর সময় নষ্ট না করে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে সেই ডিঙিটা সোজা করে, ভাঙাচোরা জিনিসগুলোর মধ্যে কয়েকটা মজবুত লাঠিগোছের দ্রব্য জোগাড় করে, সেগুলোকে দাঁড় হিসাবে ব্যবহার করে দ্বিগুণ উৎসাহে পাড়ের দিকে বেয়ে চলল।

বিকেলবেলা অক্লান্ত দাঁড় টানার পর সে ডাঙার কাছে পৌঁছে দেখল সেখানে একটা ছোট উপসাগরের মতো রয়েছে। উত্তর দিকের জঙ্গলে ঘেরা জায়গাটাকে টারজানের কেমন যেন পরিচিত মনে হল।

ছোট্ট ডিঙিটা বন্দরে ঢুকতেই টারজানের চোখে ভেসে উঠল জঙ্গলের ছায়ায় তার নিজের ক্যাবিন। সে জন্মাবার আগেই তার বাবা নিজের হাতে এই ঘরটি তৈরি করেছিলেন। তিনি ছিলেন জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক।

ভাগ্যদেবী তাঁর অদ্ভুত চাল চেলে টারজানকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তার জন্মস্থানে—আফ্রিকার আদিম জঙ্গলে। খুশিতে টারজানের মনপ্রাণ ভরে উঠল। সে প্রাণপণে ডিঙি বেয়ে ডাঙার কাছে এসে এক লাফে নেমে ছুটে ক্যাবিনের দিকে গেল। চতুর্দিকে তার অতি পরিচিত সব জিনিস। তার ক্যাবিন, সমুদ্রের ধার, ছোট্ট নদীটা অগণিত পাখির রঙিন পালকের ছটা, জঙ্গলী ফুলের আর লতাপাতার বাহার, বিশাল গাছের সারি।

টারজান তার নিজের ডেরায় ফিরে এল আর সেই সঙ্গে বন্য জগতের জয়ধ্বনি দিয়ে সকলকে তার আগমন-বার্তা জানিয়ে দিল। তার হুংকারে প্রথমটা সব চুপচাপ হয়ে গেল। তারপরেই ডাক এলো পশুরাজ সিংহের, বিশালকায় বনমানুষের। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি! তার ফেরার কথা সকলে জেনেছে!

টারজান প্রথমে নদী থেকে প্রাণভরে ঠাণ্ডা জল খেয়ে তৃষ্ণা মিটাল। তারপর কেবিনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখল সব কিছু যেমনটি রেখে গিয়েছিল তেমনটি আছে। দু বছর আগে সে আর ডার্নো যে ভাবে বন্ধ করে রেখে গিয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই রয়েছে।

এবার টারজানের চিন্তা হল, কি খাবে। কেবিনে কিছু দড়ি ছাড়া আর কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। সেটাই কাঁধে ফেলে টারজান খাবারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। বাকি অস্ত্রশস্ত্র সময় মত জোগাড় হয়ে যাবে।

ক্যাবিনের কিছুটা দূরেই ঘন জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। টারজান প্রথমে পায়ে হেঁটে চলল, তারপর গাছে উঠে এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে ঝুলে যেতে লাগল। পুরনো অভ্যাস সহজেই ফিরে এলো। সে এখন আফ্রিকার জঙ্গলের বন্য অধিবাসী। এই তো জীবন! বেঁচে থাকার অগাধ আনন্দ! সভ্য জগতের টুঁটি-চেপে-ধরা আইন-কানুন তার জন্য নয়।

সন্ধ্যে হবার ঠিক আগে সে জঙ্গলের মধ্যে একটা জলাশয়ের ধারে পৌঁছল। এখানে রোজ জানোয়াররা জল খেতে আসে। টারজানকে বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হল না। শিকারের আশায় সিংহ নুমা এসে পৌঁছল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা বুনো শূয়োরের আগমন হল। তাকে দেখে টারজানের খিদে যেন বেড়ে গেল। কিন্তু এ খাদ্যের

ভাগীদার নুমা অপেক্ষা করে রয়েছে একটু দূরে। যেই সে হতভাগ্য শূয়োরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তৈরি হল,অমনি শূন্য থেকে সাপের মতো একটা দড়ির ফাঁশ নেমে এসে শূয়োরটাকে তুলে নিল। আর গাছের মাঝখান থেকে একটা মুখ তার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গহাসি হাসতে লাগল। নিষ্ফল আক্রোশে নুমা গর্জন করে জঙ্গল মাত করতে লাগল।

বুনো শূয়োরের অতি সুস্বাদু মাংস খেয়ে পেট ভরাতে টারজানের বেশি সময় লাগল না। তারপর বাকি মাংস সঙ্গে করে সে নিজের ক্যাবিনে ফিরে এল।

পর দিন টারজানের ঘুম ভাঙতে বেশ দেরিই হয়ে গেল। সমুদ্রে আরাম করে স্নান করে, গতরাত্রের মাংস খেয়ে সে প্রাতঃরাশ সারল। তারপর আবার দড়ি কাঁধে জঙ্গলে ঢুকল। তার আজকের শিকার মানুষ। অন্য কিছুর জন্য নয়, শুধু অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করবার জন্য।

তার আগেকার পরিচিত আদিবাসীদের গ্রামে এসে দেখল সেখানে কেউ নেই, সেটা এখন একটা পরিত্যক্ত গ্রাম। লতা-গুল্মে চারদিক ঢেকে গিয়েছে। টারজান অনেক খুঁজেও কোনো হাতিয়ার জোগাড় করতে পারল না।

তখন সে ঠিক করল যে জঙ্গলের আরো ভিতরে যেখানে পরিষ্কার জলের উৎস আছে তার কাছাকাছি মানুষের বসতি আছে, সেখানে যাবে। পথে যেতে যেতে শিকার করতে লাগল। পাখির বাসা থেকে ডিম চুরি করে, ছোট জানোয়ার মেরে তখনকার মতো ক্ষিদে মিটিয়ে নিল। রাত কাটালো একটা বিশাল গাছের ডালে শুয়ে।

পরদিন সকালে আবার রওনা হল। এই ভাবে তিন দিন ধরে সে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছল যেখানে আগে কখনও আসেনি। জায়গাটা এবড়ো-খেবড়ো। উপত্যকায় গভীর জঙ্গল, তারপর ঢালু হয়ে উঠে দূরে পাহাড়ের দিকে ক্রমশঃ জঙ্গল ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কাছেপিঠে প্রচুর শিকার পাওয়া যাবে—জেব্রা, হরিণ ইত্যাদি। টারজান ঠিক করল এই নতুন জায়গাতেই কিছু দিন কাটাবে।

চতুর্থ দিন সকালে তার নাকে মানুষের গন্ধ ভেসে এল। খুব সাবধানে অনুসরণ করে এসে দেখল একটি কালো যোদ্ধা সন্তর্পণে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে চলেছে। হাতে দড়ি নিয়ে তার পিছু নেবার সময় হঠাৎ টারজানের মনে হল যে সভ্য জগতের লোকেরা কদাচিৎ বিনা কারণে আরেকজনের প্রাণ-নাশ করে। এখন যদিও তার হাতিয়ারের প্রয়োজন, কিন্তু তার জন্য কি লোকটার প্রাণনাশ করা উচিত?

যতই সে ভাবতে লাগল ততই তার অহেতুক প্রাণনাশের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মাতে লাগল। এই ভাবে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ সে এসে পড়ল একটা গ্রামের কাছে।

গাছের গুঁড়ির উঁচু বেড়া দেওয়া মৌচাকের আকারের কয়েকটা কুঁড়েঘর। সেই যোদ্ধা ঐ দিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ টারজানের চোখে পড়ল সে ছাড়া আরেকটি প্রাণীও ঐ যোদ্ধাকে অনুসরণ করছে শিকারের আশায়। লম্বা লম্বা ঘাসের ভিতর যথাসম্ভব নিজেকে লুকিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে সোনালী রঙের একটা সিংহ। টারজান এবার স্বজাতির পক্ষ নিয়ে সিংহের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য তৈরি হল।

তারপর মুহূর্তের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেল। প্রথমে যেই সিংহটা কালো লোকটার ওপর ঝাঁপালো, টারজান চিৎকার করে তাকে সাবধান করে দিয়ে দড়ির ফাঁস ঝুলিয়ে সিংহের গলায় পরিয়ে টেনে ধরল। কিন্তু পশুরাজের গায়ের জোর ঠাহর করতে না পেরে, সে নিজেই টাল সামলাতে না পেরে গাছ থেকে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে সিংহটা টারজানকে আক্রমণ করল। এই পরম বিপদে ঐ আফ্রিকান তার প্রাণ বাঁচালো। সে টারজানকে তার ত্রাণকর্তা বুঝতে পেরে নিজের হাতের বর্শাটা গায়ের জোরে সিংহের দিকে ছুঁড়ে মারল। জঙ্গলের বুকে সে মানুষ, শিকার তার রক্তের মধ্যে মিশে আছে, তার বর্শার লক্ষ্য অব্যর্থ। তারপর টারজান আর বীর যোদ্ধা দুজনে একসঙ্গে মিলে হতভাগ্য পশুরাজের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল।

সিংহের সঙ্গে ওদের লড়াইয়ের আওয়াজে কাছের গ্রাম থেকে লোকজনরা ছুটে সেখানে পৌঁছে গেল। তাদের পিছনে এল মেয়েরা আর শিশুরা। সকলে একসঙ্গে নিজেদের ভাষায় চেঁচামেচি করতে লাগল।

শেষটা অনেক কষ্টে টারজানের যোদ্ধা-বন্ধু সকলকে থামিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। তখন সকলে আবার, বিশেষ করে মেয়েরা, পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টারজানের অভ্যর্থনার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

তাদের যত্নে টারজান মুগ্ধ। প্রথমে যে সামান্য হাতিয়ারের জন্য ঐ আফ্রিকান যোদ্ধাকে মেরে ফেলার কথা

মনে হয়েছিল ভেবে সে সত্যিই লজ্জিত। এবার থেকে সে আর কখনও ভালো করে না জেনে কারো প্রাণনাশ করবে না। তখন রোকফের কথা মনে পড়ল। একবার যদি তাকে এই জঙ্গলের মধ্যে পেত! তা-ও তো তার জানা ছিল না যে রোকফ্ এখন কোমল-স্বভাবা মিস্ স্ট্রংকে বিয়ে করার কথা ভাবছে।

আদিবাসীদের গ্রামে সে রাত্রে টারজানের জন্য ভোজের আয়োজন হয়েছিল। সারা রাত ধরে খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গানের পালা চলল। একসময় টারজান লক্ষ্য করল যে, যারা নাচছে তাদের মধ্যে অনেকের গায়ে প্রচুর পরিমাণে সোনার গহনা রয়েছে। একটি মেয়ের কাছ থেকে তার পায়ের গহনা চেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল যে সেটা একদম খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি। টারজান অবাক হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করল, এইসব গহনা কোথা থেকে এসেছে। কিন্তু তারা কিছু বুঝতে পারল না।

নাচগান শেষ হলে টারজান যখন বিদায় নিতে চাইল তখন গ্রামের লোকরা তাকে বোঝাল যে তার জন্য সব থেকে বড় আর ভালো কুঁড়ে ঘরটি রাখা হয়েছে। কিন্তু জঙ্গলে মানুষ-হওয়া টারজান জানত যে ঐ সব ঘরে অগণিত পোকামাকড়ের বাস। তার থেকে খোলা আকাশের নিচে গাছের ডাল অনেক ভাল।

টারজান একটা বড় গাছের নিচু ডাল ধরে ঝুলে তরতর করে ওপরে উঠে পাতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। গ্রামবাসীরা প্রথমটা তার এই বাঁদুরে কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে হাততালি দিয়ে বাহবা দিতে লাগল। পরে আধঘণ্টা ধরে টারজানকে ডাকার পরও কোনো সাড়া না পেয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেল। টারজানও এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে কাছেই একটা পছন্দমতো গাছ খুঁজে সেখানে বেশ আরামেই রাত কাটিয়ে দিল।

পরদিন সকালে আবার আগেকার মতন গাছ বেয়ে ঝুপ করে গ্রামের মাঝখানে নেমে পড়ল। প্রথমটা গ্রামবাসীরা তাকে দেখে চমকে গিয়েছিল, পরে চিনতে পেরে আবার সেই হাসি-ঠাট্টার সাড়া পড়ে গেল।

সেদিন টারজান গ্রামের পুরুষদের সঙ্গে কাছাকাছি একটা সমতল জায়গায় শিকার করতে গেল। সকলে এই সাদা-চামড়া লোকটির নিপুণ কলা-কৌশল দেখে অবাক হয়ে গেল। বিশেষ করে সে যখন তাদেরই তৈরি অত্যন্ত সাধারণ সব হাতিয়ার দিয়ে অতি দক্ষভাবে শিকার করতে লাগল। তখন তাদের মন শ্রদ্ধায় ভরে গেল। সেইদিন থেকে টারজান আর বুনো আদিবাসীদের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হল।

অনেকদিন টারজান তার এই নতুন-পাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে কাটাল। সহজেই সে তাদের ভাষা শিখে নিল, তাদের আচার-ব্যবহার শিখল। তাদের সঙ্গে মিশে বুঝল যে এরা মোটেই নরখাদক নয়, বরঞ্চ ঐ জাতকে এরা অত্যন্ত ঘৃণা করে।

যে আফ্রিকান যোদ্ধাটির সঙ্গে টারজানের প্রথম পরিচয় হয় তার নাম ছিল বাসুলি। সে টারজানকে তাদের জাতের গোড়াপত্তন কবে হয়েছিল, কিভাবে তারা বহুদিন ধরে হাঁটার পর এই জায়গায় পৌঁছেছিল, তাদের বিষয় যে-সব গল্প, লোক-কথা ইত্যাদি রয়েছে—সবই শোনাল। আর বলল, ক্রীতদাস হিসাবে তাদের দলের বহু লোককে নির্মমভাবে ব্যবসাদাররা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের বন্দুকের সঙ্গে সামান্য গ্রামবাসীরা যুঝে উঠতে পারেনি। বন্যজন্তুর মতো আফ্রিকাবাসীদের এই সব বাইরের লোকরা শিকার করেছিল। এক ফোঁটা দয়ামায়া পর্যন্ত দেখায়নি। বহু বছর ধরে এদের লড়াই চলেছিল, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। তারপর বাসুলির বাবার সময় আরবরা এসে যখন হানা দিল তখন তাদের দলকর্তা চৌয়াম্বী সকলকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে পালিয় গেল।

চৌয়াম্বী খুব দূরদর্শী ছিল। সে হুকুম দিয়েছিল তাদের সমস্ত জিনিসপত্র আর অনেকগুলো গচ্ছিত বহু মূল্যবান হাতির দাঁতও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। বহু কষ্ট সহ্য করে, বহু মাঠ-ঘাট, জলাভূমি, গভীর জঙ্গল পার হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা এই সুন্দর জায়গাটিতে এসে পৌঁছেছিল।

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'এর পরে আর তোমরা হানাদারদের মুখোমুখি হও নি?'

বাসুলি বলল, 'বছরখানেক আগে আরব আর মানুষে-মাদের একটা ছোট দল এসেছিল বটে, কিন্তু তাদের আমরা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

বাসুলি যখন হাত নেড়ে গল্প বলছিল তখন তার হাতের সোনার কড়ার ওপর টারজানের চোখ পড়ছিল।

এবার সে বাসুলিকে জিজ্ঞাসা করল, 'এত সোনা কোথা থেকে এল?'

বাসুলি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হাত দেখিয়ে জানাল, ঐ দিকে পাওয়া যায়, তবে এখান থেকে অনেক দূরে। সে নিজে

কোনদিন যায় নি। তার বাবার যখন বয়স কম ছিল তখন দলের অনেকে সেখানে গিয়েছিল। সেই জায়গার লোকদের তীরের ফলাগুলোও এই সোনালী ধাতু দিয়ে গড়া। তাদের বর্শার ফলক, এমন কি তাদের রান্নার বাসনও এই ধাতুতে তৈরি। তাদের সারা গা সোনার গহনায় ভরা।

বাসুলি বলল, 'সেখানকার বাসিন্দারা বড় বড় গ্রামে থাকত। বাড়িঘর পাথরের তৈরি আর চারদিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। আমাদের দল দেখে তারা কিছু না জেনেই যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। আমাদের দল ছোট ছিল কিন্তু সকলেই যোদ্ধা, সুতরাং যুদ্ধ খুবই ঘোরতর হয়েছিল। সন্ধ্যের সময় যখন ওরা নিজেদের গ্রামে ফিরে গেল, তখন আমাদের লোকরা মৃতদের গা থেকে সব গহনা খুলে নিয়ে চলে আসে। তার পরে আর কেউ কখনো ও জায়গায় যায় নি। ওখানকার লোকরা অত্যন্ত বদ্। তাদের গায়ে গোরিলার মতো লোম আছে।'

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'চৌয়াম্বীর সময়কার কোনো লোকই কি এখন আর বেঁচে নেই?'

বাসুলি বলল, 'আমাদের এখনকার দলকর্তা ওয়াজিরি সেই সময়কার লোক। তখন তার খুবই অল্প বয়স ছিল, সে চৌয়াম্বীর ছেলে।'

সে-রাত্রে বুড়ো ওয়াজিরিকে জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলল, 'আমার মনে পড়ছে প্রায় দশদিন ধরে গ্রামের পাশে এই নদী ধরে বরাবর গিয়েছিলাম। নদীর উৎস হল পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট ঝরনা। দশ দিনের দিন সেখানে আমরা পৌঁছলাম। পরদিন পাহাড় টপকে অন্যদিকে নেমে আরেকটা ছোট্ট নদী ধরে এক গভীর জঙ্গলে এসে পড়লাম। তারপর আবার আমরা পথ চলে এক বিরাট নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। এই নদীতে আমাদের ছোট নদীটা এসে মিশেছিল। আবার আমরা বড় নদী ধরে চললাম। প্রথম পহাড় পেরিয়ে প্রায় কুড়িদিন পর আমরা আরেকটা পাহাড়ের সামনে এলাম। এই পাহাড়ে চড়তে গিয়ে দেখলাম বড় নদীর ধারা ক্রমশঃ সরু হয়ে আসছে। পাহাড়ের চুড়োর নিচে একটা অন্ধকার গুহার কাছে এসে দেখলাম সেটাই হল উপত্যকার বড় নদীর উৎস। সে-রাত আমরা পাহাড়ে কাটালাম। পরের দিন আমরা চুড়োয় উঠে অন্য দিকে তাকিয়ে দেখলাম কাছেই একটা সরু উপত্যকার মধ্যে পাথরের বাড়ি সমেত একটা বড় গ্রাম। কিন্তু বাড়িগুলো সব ভেঙে পড়েছে।'

ওয়াজিরির গল্পের বাকি অংশটুকু বাসুলি আগে টারজানকে যে রকম বলেছিল, ঠিক সে রকম ঘটেছিল।

সব শুনে টারজান বলল, 'আমি সেই জায়গায় গিয়ে ওখানকার বুনো অধিবাসীদের কাছ থেকে সোনা নিয়ে আসতে চাই।'

ওয়াজিরি বলল, 'বহুদিনের যাত্রাপথ। আমার এখন বয়স হয়ে গেছে। তবে তুমি বর্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তখন কয়েকজন বাছা বাছা যোদ্ধা নিয়ে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।'

কয়েক দিন পর একদল শিকারী এসে খবর দিল যে গ্রামের কিছু দক্ষিণে কয়েক মাইল দূরে তারা বুনো হাতির দল দেখতে পেয়েছে। অনেক দাঁতাল হাতি রয়েছে দলে, তাদের দাঁতের অনেক দাম।

খবর পাওয়া মাত্র সারা গ্রামে একটা সাড়া পড়ে গেল। যোদ্ধারা উত্তেজিত হয়ে নিজেদের হাতিয়ার পরিষ্কার করতে লেগে গেল। উইচ-ডক্টর তাদের নানারকম বিপদ-তারণ মাদুলি দিল, যাতে এই শিকার শুভ হয়।

পরদিন ভোরে শিকারীরা বেরিয়ে পড়ল। পঞ্চাশজন বীর যোদ্ধার মাঝখানে হেঁটে চলল টারজান। তাকে দেখে মনে হতে লাগল সে যেন অনুচর-বেষ্টিত জঙ্গলের কোনো দেবতা। গাঁয়ের বউ ছাড়া বাকিদের সঙ্গে তার কোনো তফাত ছিল না। যেতে যেতে টারজানের পল ডার্নোর কথা মনে পড়াতে নিজের মনে সে হাসল। আজ যদি সে তাকে দেখতে পেত তাহলে অতি সুসভ্য অভিজাত ফরাসী ডার্নোর কি অবস্থা হতো?

দু ঘণ্টা হাঁটার পর তারা সেই জায়গায় এসে পড়ল যেখানে আগের দিন শিকারীরা হাতির দল দেখেছিল। তারপর টারজানই হাতির গন্ধ পেয়ে সকলকে সাবধান করে দিয়ে নিজে একজন যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে গাছের ওপরে উঠে গেল। সেখান থেকে দেখল মাত্র কয়েক শ'গজ দূরে লম্বা ঘাসের মাঝখানে অনেকগুলো হাতি।

যোদ্ধাদের ইঙ্গিত করে জানালে তারাও সাবধানে এগিয়ে চলল। টারজানের সঙ্গী গাছ থেকে নেমে গেলেও টারজান সে-ভাবেই এগিয়ে চলল।

বুনো হাতি ধরা, বিশেষ করে আদিম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, মোটেই ছেলেখেলা নয়। যোদ্ধারা অর্ধচন্দ্রাকারে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেতে লাগল আর ওপরে পাতার আড়ালে টারজানও এগোতে লাগল। তারা দুটো বিরাট দাঁতালকে

লক্ষ্য করে এক সঙ্গে বর্শা ছুঁড়ল। অব্যর্থ লক্ষ্য, পঁচিশটা বর্শা একে একে একটা হাতির গায়ে লাগল। একটা তো সেইখানেই গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু অন্যটা রাগে ও যন্ত্রণায় মত্ত হয়ে পালিয়ে যাওয়া যোদ্ধাদের আওয়াজ অনুসরণ করে তাড়া করল।

দুর্ভাগ্যক্রমে তার রাস্তায় বাসুলি ছিল। তাকে দেখে বিকট চিৎকার করতে করতে বিরাট দাঁতাল হাতিটা ধাওয়া করল।

গাছের ওপর থেকে টারজান বন্ধুর সমূহ বিপদ দেখে নিজের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, সেই মত্ত হাতির সামনে লাফিয়ে পড়ল। হাতে শুধুমাত্র একটা বর্শা। কিন্তু

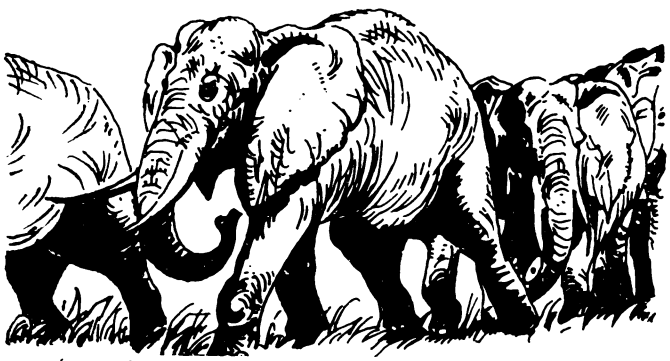

সে-ই যথেষ্ট। উন্মত্ত হাতি হাতের কাছে আসামাত্র সে তার অসামান্য শক্তি দিয়ে বর্শাটা ছুঁড়ে দিল হৃদযন্ত্রের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে বিশালকায় জানোয়ারটা টারজানের প্রায় পায়ের কাছে পড়ে গেল।

বাসুলি এসব দেখতে পায়নি কিন্তু প্রবীণ বিচক্ষণ দলকর্তা ওয়াজিরি আর অন্যান্য যোদ্ধারা টারজানের এই অসামান্য যুদ্ধনৈপুণ্য আর সাহস দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা খুশিতে চেঁচাতে চেঁচাতে তাকে ঘিরে ধরল। কিন্তু তারপর টারজান যখন বনমানুষের জয়ধ্বনি দিল তখন তারা ভয়ে পেয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল। এ চিৎকার তো তারা বোলপানি গোরিলার মুখে শুনেছে!

টারজানের যুদ্ধের নেশা কেটে আবার যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল আর সে যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে হাসল, সকলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

এরপর আবার তারা হাতির দলের পিছন পিছন শিকারের জন্য চলল। কিন্তু মাত্র কয়েক হাত বোধহয় এগিয়েছে, দূর থেকে বন্দুকের গুলির আওয়াজ তাদের কানে এল। সকলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তারপর টারজান বলে উঠল, 'বন্দুক! গ্রাম আক্রমণ করা হয়েছে।'

বৃদ্ধ ওয়াজিরি বলল, 'চলো, আরবরা তাদের বন্দী নরখাদক ক্রীতদাসদের নিয়ে আমাদের মেয়েদের আর হাতির দাঁত নেবার জন্য আবার হানা দিয়েছে।'

ওয়াজিরির যোদ্ধারা দ্রুতগতিতে নিজেদের গ্রামের দিকে ফিরে চলল। তাদের কানে বন্দুকের গুলির আওয়াজ আসছিল কিন্তু সে আওয়াজ ক্রমশঃ কমতে কমতে শেষে থেমে গেল! এতে ভয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। এর মানে যে অরক্ষিত গ্রামটি দস্যুদের কবলে পড়েছে!

যোদ্ধারা পাঁচ মাইলের তিন মাইল পথ প্রায় এসে গেছে, তখন একদল গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হল। তাদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ডজন খানেক হবে। তারা ভয়ে এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছে সে প্রথমটা কিছুই বোঝাতে পারল না। পরে ধাতস্থ হয়ে একটি মেয়ে বলল, 'বহু আরব আর মানুষেমারা এসে হানা দিয়েছে আর তাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দুক আছে। তারা এসেই বন্দুকের গুলিতে সকলকে মেরে ফেলতে থাকল আর বলতে লাগল, গত বছর তাদের সঙ্গীদের মেরে ফেলার এই প্রতিশোধ। আমরা যে যেখানে পারলাম পালাতে লাগলাম কিন্তু আমাদের অনেকেই মারা পড়েছে।'

এই কথা শুনে এবার সকলে গ্রামের দিকে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল। আরো এক মাইলের মধ্যে আবার প্রায় একশ জন গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হল। এইভাবে যোদ্ধাদের দলও ভারি হতে লাগল।

এবার দলকর্তা ওয়াজিরি বারো জন যোদ্ধাকে ব্যাপারটা দেখে আসবার জন্য পাঠাল। সে নিজে রয়ে গেল পেছনে, তার সঙ্গে রইল টারজান।

কিছুক্ষণ পরে একজন ফিরে এসে খবর দিল হানাদাররা গ্রামের ভিতরেই রয়েছে। তাতে ওয়াজিরি খুশি হয়ে বলল, 'বেশ তাহলে আমরা বাইরে থেকে আক্রমণ করে সকলকে মেরে ফেলব।'

সেই মতো ব্যবস্থা করবার হুকুম দিতে গেলে টারজান বলে উঠল, 'দাঁড়াও। গ্রামের মধ্যে যদি পঞ্চাশটা বন্দুকও থাকে তাহাল তারাই আমাদের মুহূর্তের মধ্যে মেরে ফেলবে। আগে আমাকে একা যেতে দাও। আমি গাছের ওপর থেকে ভালো করে দেখতে পাব কতজন আছে আর আমাদের আক্রমণের সব থেকে ভালো ব্যবস্থা কিভাবে

করা যায়। আমার মনে হচ্ছে এদের জব্দ করতে হলে বলের থেকে বুদ্ধির প্রয়োজন বেশী।

এই বলে এক লাফে গাছে উঠে সে গ্রামের দিকে চলে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গ্রামের ওপর ঝুঁকে-পড়া একটা গাছে এসে পৌঁছে গেল। পাতার আড়ালে লুকিয়ে সে গুণে দেখল যে গ্রামে এখন প্রায় পঞ্চাশ জন আরব। নর-খাদক ক্রীতদাসদের সংখ্যা তার পাঁচগুণ। এখন সেই অতি নিকৃষ্ট, অতি ঘৃণ্য আহার্যে সকলে ব্যস্ত। তাদের অধিকর্তারা সে বীভৎস ব্যাপার সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করছে!

টারজান বুঝতে পারল এদের আক্রমণ করা বুদ্ধিহীনের কাজ হবে। তখন সে আবার সন্তর্পণে ওয়াজিরির কাছে ফিরে গিয়ে, নিজের এক ফন্দীর কথা বলল। কিন্তু তার ঠিক আগেই একজন খবর দিয়েছিল যে হানাদাররা তার প্রিয় পত্নীকে মেরে ফেলেছে। এ খবরে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে দুঃখে, রাগে অন্ধ হয়ে ওয়াজিরি তার যোদ্ধাদের আদেশ দিল গ্রাম আক্রমণ করতে।

মাত্র এক'শ জন লোক নিয়ে যেই গ্রামের ফটকের কাছে ওরা পৌঁছল, ভিতর থেকে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

প্রথম গুলিতেই ওয়াজিরি প্রাণ হারাল। তারপর ক্রমাগত গুলিবর্ষণে বাকিদের অনেকেই মারা পড়ল। তখন বেগতিক দেখে অন্যরা পালিয়ে আবার জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

এদিকে গ্রামের ফটক খুলে আততায়ীরা বেরিয়ে এল। ফলে এগিয়ে-আসা দলের সকলেই মারা গেল। টারজান সব থেকে পিছনে আসছিল তাই সে একটা একটা করে তীর ছুঁড়ে যতগুলো দুষ্কৃতিকারী সম্ভব মারতে মারতে জঙ্গলের ভিতরে বাকিদের সাবধাত করে দিল যাতে তারা অন্ততঃ জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচায়। তারাও মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু টারজান বোঝালো যে তারা ছড়িয়ে পড়লে শত্রুরাও ছড়িয়ে পড়বে। তাতে সুবিধাই হবে কারণ তখন লুকিয়ে থেকে শত্রুদের এক এক করে মারা যাবে।

এই ভাবে সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে টারজান নিজে আবার গাছে চড়ে গ্রামে ফিরে এসে দেখল সেটা একদম খালি। শত্রুরা সকলে তাদের পিছনে তাড়া করে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে।

ফটকের পাহারাদারও জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ছিল, তাই টারজানের আগমন লক্ষ্য করল না। এই ভুলের জন্য তাকে টারজানের তীরে প্রাণ হারাতে হল। এরপর টারজান দেখল প্রায় পঞ্চাশ জন গ্রামবাসীকে গলায় চেন্ লাগিয়ে বেঁধে ক্রীতদাসদের মতো বেঁধে রাখা হয়েছে। শিকলের

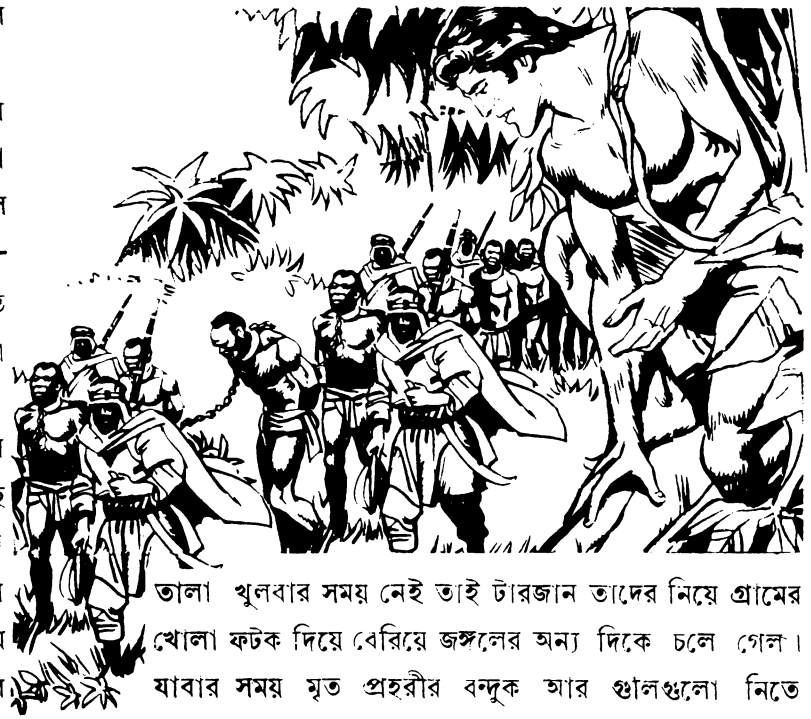

তালা খুলবার সময় নেই তাই টারজান তাদের নিয়ে গ্রামের খোলা ফটক দিয়ে বেরিয়ে জঙ্গলের অন্য দিকে চলে গেল। যাবার সময় মৃত প্রহরীর বন্দুক আর গুলগুলো নিতে ভুলল না।

তাদের যাত্রা অত্যন্ত ধীরগামী হল কারণ গলায় শিকল বাঁধা থাকাতে বেচারা গ্রামবাসীদের বিপত্তির অন্ত ছিল না যাই হোক, টারজান অতি সাবধানে তাদের সরিয়ে নিয়ে গেল। পরে যখন জঙ্গলে ভেসে আসা বন্দুকের আওয়াজ থেমে গেল তখন সে বুঝতে পারল যে শত্রুরা আবার গ্রামে ফিরে গেছে। সেখানে ফিরে তাদের রাগের আর ক্ষোভের কথা ভেবে টারজান একটা চাপা হাসি হাসল।

গ্রামে গচ্ছিত হাতির দাঁতগুলো যাতে আততায়ীরা একটাও না নিতে পারে তার জন্য টারজান একটা ফন্দী করেছিল। তার আগে শেকল বাঁধা লোকগুলোকে হাতি শিকারের জায়গায় পৌঁছে দিল। তখন প্রায় মাঝ রাত, তবুও সেখানে আগুণ জ্বালিয়ে অনেক পলাতক গ্রামবাসীরা পাহারা দিচ্ছিল। টারজানদের দেখে সকলে আনন্দে কোলাহল করে উঠল। অনেকে পুরনো বন্ধু বা আত্মীয়দের আবার খুঁজে পেল। মৃতদের জন্য সকলে শোক প্রকাশ করতে লাগল।

এবার টারজান তাদের সাবধান করে দিল। বেশি আওয়াজ করলে শত্রুরা বুঝতে পেরে যাবে তারা এখন কোথায় আছে। তার চেয়ে এখন বিশ্রাম করে কাল সকালে কি করা কর্তব্য সে বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

পর দিন সকালে টারজান প্রত্যেকের সম্মতি নিয়ে ঠিক করল যে দলের মেয়েরা আর শিশুরা কয়েকজন বুড়ো যোদ্ধা

আর ছোকরাদের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে বিপদ-সীমার বাইরে গিয়ে একটা অস্থায়ী ডেরা তৈরি করে বাস করবে। কারণ বাকিদের শত্রু তাড়িয়ে ফিরতে ফিরতে হয়ত অনেক দিন লেগে যাবে।

দু ঘন্টা পরে দেখা গেল যে গ্রামের চারপাশ ঘিরে একদল যোদ্ধা লুকিয়ে অপেক্ষা করছে। তাছাড়া জায়গায় জায়গায় গাছের মধ্যে বাদ-বাকিরা লুকিয়ে রয়েছে। আরো কিছুক্ষণ পরে গ্রামের ভিতরে হঠাৎ একজন ক্রীতদাস তীর খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আক্রমণের কোথাও কোনো আওয়াজ নেই, বুনো অধিবাসীদের চিৎকার চেঁচামেচি নেই। আরবরা আর তাদের সঙ্গীরা এই অভাবনীয় ঘটনায় অত্যন্ত রেগে গেল। ছুটে ফটকের দিকে গিয়ে বুঝতে পারল শত্রু কোথায় সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

তারা যখন গ্রামের মাঝখানের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি করছে তখন একজন আরবও নিঃশব্দে মাটিতে পড়ে গেল—তার বুকে বেঁধা একটা তীর। এর পর যতবার আরবরা যে দিক থেকে তীর আসছে ভাবে, সেদিকে যায়, তখনি আরেকটা তীর অন্য কোথা থেকে এসে আরেকজনের প্রাণনাশ করে।

টারজান যোদ্ধাদের এমন ভাবে সাজিয়েছিল যে তাদের কখনও দেখা যাচ্ছিল না। কিম্বা একবার তীর ছুঁড়ে আবার না মেরে, হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল। শত্রুরা গ্রামের আশপাশের জঙ্গলে হানা দিয়েও কাউকে দেখতে পায় না। কারণ ততক্ষণে গ্রামবাসীরা পরিচিত জঙ্গলে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে।

ক্রমশঃ গ্রামের ভিতরকার লোকদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হতে লাগল। যদি কেউ পিছিয়ে পড়ে সে মরে যায়, যদি কেউ এগিয়ে যায় সে-ও মরে যায়! আর সব থেকে ভয়াবহ ব্যাপার যে, সারা সকাল ধরে সেই তীরগুলো ছাড়া আর কিছু বা কাউকে দেখাই যায় নি।

সকলে গ্রামে ফিরে এলে ক্রীতদাসরা তাদের প্রভুদের ঐ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার জন্য আবেদন জানাল। কিন্তু আরবরা শত্রুপূর্ণ ঐ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অতগুলো মূল্যবান হাতির দাঁত নিয়ে যেতে সাহস পেল না।

সকলে কুঁড়ে ঘরের ভিতরে আশ্রয় নিল, এই মনে করে যে এখানে অন্ততঃ শত্রুর তীর থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। টারজান গাছের ওপর থেকে লক্ষ্য করেছিল কোন কুঁড়ে ঘরটাতে আরব নেতারা রয়েছে। তারপর গাছের ডাল ধরে ঝুঁকে পড়ে তার লম্বা বর্শাটা কুঁড়ে ঘরের ছাদ ফুটো করে ঢুকিয়ে দিল। ভিতর থেকে যন্ত্রণার চিৎকার শুনে বুঝতে পারল যে লক্ষ্য বিদ্ধ হয়েছে।

এইভাবে শত্রুদের জানান দিয়ে টারজান তার যোদ্ধাদের নিয়ে মাইল খানেক দক্ষিণে গিয়ে, বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে লাগল। সরল-মন যোদ্ধাদের ইচ্ছা ছিল শত্রুদের সরাসরি আক্রমণ করে একেবারে তাদের নিঃশেষ করে দেয়। টারজান আবার বাধা দিয়ে বলল, 'তোমরা কি পাগল হয়েছ? আগের বার ওভাবে আক্রমণ করে প্রায় বারো জনকে হারিয়েছ আর আজ আমার কথা শুনলে বলে একজনেরও ক্ষতি হল না। কিন্তু কুড়িজন শত্রুকে মেরে ফেলতে পারলে। ওদের সঙ্গে এ ভাবে যুদ্ধ না করলে পেরে উঠবে না। তা যদি তোমরা না চাও, তাহলে আমি তোমাদের ছেড়ে আবার নিজের দেশে চলে যাচ্ছি।'

এতে গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে তার কথামতো চলতে রাজি হল। পরে তারা গত রাত্রের আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে রাত কাটালো। মাঝরাতে উঠে টারজান অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গ্রামের ধারে পৌঁছল। ফটকের ফাঁক দিয়ে দেখল ভিতরে ধুনী জ্বলছে আর তার পাশে একজন সান্ত্রী পাহারায় রয়েছে। তখন সে নিঃশব্দে তার প্রিয় গাছটির ওপর উঠে তীর-ধনুক নিয়ে লোকটিকে মারবার জন্য তাক করতে লাগল। কিন্তু হাওয়ায় দোলা গাছের পাতা আর ধুনীর কাঁপা আলোতে তার তাক ঠিক হল না। তখন সে বাকি সব অস্ত্র গাছের মধ্যে রেখে শুধুমাত্র একটা লম্বা ছোরা হাতে লোকটার দিকে এগিয়ে চলল, ঠিক যেন একটা শিকারী বেড়াল। ঠিক যে মুহূর্তে টারজান তার বুকে ছোরা বিদ্ধ করতে যাবে, লোকটি কিছু একটা সন্দেহ করে লাফিয়ে উঠে টারজানের মুখোমুখি দাঁড়াল।

মানুয়েমা পাহারাদারের চোখ যখন টারজানের ওপর পড়ল, তখন সে ভয়ে এমন কাঠ হয়ে গেল যে হাতের বন্দুকের কথা, এমন কি চিৎকার করাও ভুলে গেল। তার একমাত্র চিন্তা তখন এই অতিকায় জঙ্গলী মানুষটার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু সে ফিরে দাঁড়াতেই টারজান এক লাফে তার টুঁটি টিপে ধরল। হতভাগ্য লোকটি অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়াতে পারল না। নিমেষের মধ্যে তার প্রাণহীন দেহটা মাটিতে পড়ে গেল

টারজান নিঃশব্দে দেহটা কাঁধে ফেলে, বন্দুকটা কুড়িয়ে

নিয়ে, ঘুমন্ত গ্রামের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে আবার সেই গাছে উঠে পড়ল। তারপর মৃত সৈনিকের দেহ থেকে বন্দুকের কার্তুজ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে রাখল। আর বন্দুক হাতে একটা ডাল বেয়ে এগিয়ে গিয়ে আরবরা যে কুঁড়েঘরে শুয়েছিল সে-দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ল। কানে একটা আর্তনাদ আসতে বুঝল গুলি ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে। প্রথমটা কিছুই হল না, তারপরেই ক্রুদ্ধ মৌমাছির মতো দলে দলে আরব আর মানুয়েমারা নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। আসলে তারা রাগের থেকে ভয় বেশি পেয়েছিল। গতকালের অভাবনীয় ঘটনার পর আজ রাত্রের এই গুলিবর্ষণ তাদের নাজেহাল করে তুলল।

বাইরে বেরিয়ে এসে যখন দেখল, তাদের পাহারাদার উধাও হয়ে গেছে তখন তাদের ভয় আরো বেড়ে গেল। কিন্তু নিজেদের ভয় ঢাকবার জন্য তারা গ্রামে ঢুকবার ফটক লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি বন্দুক চালাতে লাগল।

টারজান সেই গোলমালের সুযোগ নিয়ে একজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। তার সঙ্গীরা বিশেষ কোনো আওয়াজও পেল না অথচ দেখল তাদের পাশের লোকটি মরে পড়ে গেল। তাই দেখে মানুয়েমারা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। আরবরা তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাদের নিরস্ত করলো। কিছুক্ষণ পরে তারা খানিকটা শান্ত হয়ে ফিরে এল।

কিছুক্ষণ পরে একটা চাপা গোঙানির শব্দ শুনে মুখ তুলে সকলে দেখল মাথার ওপর তাদেরই পাহারাদারের মৃতদেহ ঝুলতে ঝুলতে ধপাস করে সামনে এসে পড়ল। তখন কেউ কিছু বিবেচনা না করেই যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল।

টারজান জানত আরবরা বেশীদূর পালাবে না। হলও তাই। একজন আরব ফিরে এসে দেখল মৃতদেহটা আসলে একটা মানুষের আর তাদেরই দলের লোক, তখন সে হাঁকডাক করে বাকীদের ফিরিয়ে আনল।

সকলে জড় হয়ে, টারজান যেমন আশা করেছিল, সেই গাছের দিকে লক্ষ্য করে একটার পর একটা গুলি চালিয়ে যেতে লাগল। যদি টারজান সেখানে থাকত তাহলে তার দেহ ততক্ষণে গুলিতে ফুটো হয়ে যেত।

এদিকে আরব আর তাদের সঙ্গীরা যখন দেখল যে মৃতদেহে কোনো ক্ষত চিহ্ন নেই, শুধু গলায় বিরাট আঙুলের দাগ, তখন তাদের মন আবার ভয় ও আতঙ্কে ভরে গেল। গ্রামের নিরাপত্তার মধ্যেও যে একজন কেউ এসে তাদের অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে, বিশেষ করে খালি হাতে, এই চিন্তা করে তারা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে বলতে লাগল যে এ নিশ্চয় ভৌতিক ব্যাপার

এর পর প্রায় পঞ্চাশ জন মানুয়েমা ক্রীতদাস উর্দ্ধশ্বাসে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে, বাকিরা গ্রামের ভিতরেই সারারাত ধরে ভয়ে জেগে ভোরের অপেক্ষা করতে লাগল। এরাও পালিয়ে যেত যদি না আরবরা প্রতিজ্ঞা করত যে সকলে মিলে পরদিন ঐ গ্রাম ছেড়ে নিজেদের এলাকায় ফিরে যাবে। ক্রীতদাসরা এতই ভয় পেয়েছিল যে তাদের প্রভুদের নির্মম প্রহারের হুমকিও অগ্রাহ্য করেছিল।

পরদিন সকালে আবার যখন টারজান তার যোদ্ধাদের নিয়ে গ্রামের কাছে এল তখন দেখল সকলে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত। আর ক্রীতদাসদের পিঠে বোঝাই করা হাতির দাঁত। তাই দেখে টারজানের হাসি পেল কারণ সে জানত ঐ বোঝা তারা বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে না। তারপরেই তার চোখ পড়ল যে কয়েকজন মানুয়েমা ক্রীতদাস মশাল জ্বালিয়ে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

তখন টারজান গ্রামের পাঁচিলের ঠিক বাইরে একটা উঁচু গাছে চড়ে মুখের ওপর হাত রেখে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমরা যদি গ্রামে আগুন লাগাও তাহলে তোমাদের প্রত্যেককে আমরা মেরে ফেলব।'

চেঁচিয়ে সে এই কথা বারবার বলতে লাগল।

ক্রীতদাসরা তাই শুনে মশাল মাটিতে ফেলে দেওয়াতে একজন আরব হাতের ছড়ি দিয়ে মারতে মারতে তাদের আবার আগুন লাগাবার জন্য এগিয়ে নিয়ে গেল। তখন টারজান এক গুলিতে সেই আরবটাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে যে-সব ক্রীতদাস আগুন লাগাচ্ছিল তারা একজোটে দৌড়ে ফটক দিয়ে বেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। তাদের আরব-প্রভুরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল।

ক্রীতদাসদের এই অবাধ্যতায় আরবরা যার-পর-নাই রুষ্ট হলেও, মনে মনে তাদেরও এই গ্রামে আর এক মুহূর্ত থাকবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ঐ হাতির দাঁতগুলোর

লোভও কিছুতেই সামলাতে পারছিল না। তাই তারা প্রতিজ্ঞা করল যে আরও অনেক সেপাইসান্ত্রী নিয়ে শিগ্‌গীরই ফিরে এসে এই গ্রামে আর তার আশপাশের জায়গা তছনছ করে দিয়ে যাবে।

অনেক চেষ্টা করেও কেউ টারজান বা তার সঙ্গীদের দেখতে পেল না। কারণ টারজান অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সে কখনই এক জায়গায় থাকত না—এ-গাছ থেকে ও-গাছে, এ-গুঁড়ি বা খোপের পিছন থেকে অন্য আর একটার পিছনে এইভাবে দলবল নিয়ে সরে সরে যেত। এখন সে আবার একটা গাছে চড়ে, নিচের লোকজনদের কাণ্ড দেখতে লাগল।

বাকি কয়েকজন মানুয়েমা ক্রীতদাস যখন হাতির দাঁতগুলো তুলে নেবার চেষ্টা করল তখন টারজান আবার ডেকে বলল, 'নিও না, নিও না! মরা মানুষের হাতির দাঁতের কোনো প্রয়োজন হতে পারে না।'

এবার কিন্তু আরবরা তৈরি ছিল। হাতির দাঁতের লোভ তাদের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল, তাই তারা রুখে দাঁড়িয়ে মানুয়েমাদের শাসালো যে যদি তারা হাতির দাঁত না নেয় তাহলে ঐখানে তাদের সকলকে মেরে ফেলা হবে।

তারপর তারা উত্তরমুখী হয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। তাদের ডেরা কঙ্গো দেশ ছাড়িয়ে গভীর জঙ্গলের ভিতর। কিন্তু পথ ঘিরে রয়েছে নির্মম অথচ অদৃশ্য শত্রুর দল।

টারজান আরবদের যাত্রাপথের কিছু দূর দূর ওয়াজিরি যোদ্ধাদের আড়ালে-আড়ালে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। শত্রুরা সেখান দিয়ে যাবার সময় ঠিক তাক করে হয় বন্দুকের গুলিতে কিম্বা বর্শা দিয়ে তারা একজন একজন করে আরব বা মানুয়েমা খতম করতে লাগল। নিজেদের কাজ শেষ করেই যোদ্ধারা সেখান থেকে সরে যাচ্ছিল যার ফলে শত্রুরা তাদের কিছুতেই খুঁজে পেল না।

মালবাহী মানুষেরা ক্রমশঃই দিশেহারা হয়ে উঠল, কিন্তু আরবদের বন্দুকের শাসানিতে কিছুই করতে পারল না। সারাদিন এ রকম আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে কাটবার পর সন্ধ্যে-বেলায় আরবরা নদীর ধার বেছে নিয়ে একটা সাধারণ ক্যাম্প তৈরি করল। এখানেও সারারাত ধরে থেকে থেকে অন্ধকার ভেদ করে এক একটা গুলি এসে পাহারাদারদের প্রাণনাশ করতে লাগল।

তিনদিন ধরে আরবরা পথ চলেছিল, আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় অদৃশ্য আততায়ীদের হাতে এক এক করে প্রাণ হারিয়েছিল।

চতুর্থ দিনে আরবরা নমুনা স্বরূপ দুজন মানুয়েমাকে গুলি করে মেরে ফেলতে বাধ্য হল। কারণ তারা আবার হাতির দাঁতের বোঝা নিয়ে যেতে অস্বীকার করেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে জঙ্গল থেকে টারজানের গলা ভেসে এল, 'মানুয়েমারা, আজ যদি হাতির দাঁত নেবার চেষ্টা করো তাহলে আজই তোমাদের শেষ দিন। তোমাদের এই নিষ্ঠুর প্রভুদের মেরে ফেলো। তোমাদের কাছে বন্দুক আছে, কাজে লাগাও। আরবদের মেরে ফেল। তাহলে তোমাদের আমরা কোনো ক্ষতি করব না। আমাদের গ্রামে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে সেখান থেকে তোমাদের দেশে নিরাপদে পাঠিয়ে দেব। এখন হাতির দাঁত নামিয়ে রেখে, আরবদের আক্রমণ করো, আমরা তোমাদের সাহায্য করব। তা না করলে, নিশ্চিত মৃত্যু।'

এই কথা শুনে মানুমেয়া ক্রীতদাসরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এখন মাত্র ত্রিশজন আরব বাকি। তারা নিজেরা একশো পঞ্চাশ জন আর প্রত্যেকের কাছেই বন্দুক।

আরবরা সন্দেহ করে দলবদ্ধ হয়ে তাদের আবার এগোবার হুকুম দিল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিগ্রোরা তাদের বোঝা নামিয়ে দিয়ে আরবদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করল। নিমেষের মধ্যে সে জায়গা একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। আরবরা একজোট হয়ে প্রাণপণে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের নিজেদের ক্রীতদাসদের গুলিবর্ষণ আর জঙ্গল থেকে তীর আর বর্শার আক্রমণ ঠেকানো অসম্ভব হয়ে উঠল। দশ মিনিটের মধ্যে প্রত্যেকটি আরব প্রাণ হারাল।

গুলিবর্ষণ থেমে গেলে টারজান আবার বলল, 'এবার হাতির দাঁতগুলো তুলে যেখান থেকে তোমরা চুরি করেছিলে, ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমরা তোমাদের কোনো অনিষ্ট করব না।'

মানুয়েমারা ইতস্ততঃ করতে লাগল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে শেষে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু কি করে জানব যে তোমাদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে আমাদের মেরে ফেলবে না?'

টারজান উত্তর দিল, 'আমাদের প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই জানবে না। কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো যদি আমাদের

কথামতো ফিরে না যাও, তাহলে এখানেই তোমাদের মেরে ফেলব।'

তখন মানুয়েমাদের একজন প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে? আমাদের সামনে দেখা দিলে পর আমরা কি করব তা জানাব।'

টারজান কিছু দূরে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

মানুয়েমারা টারজানের গায়ের রঙ, তার অমানুষিক মাংসপেশী, অতিকায় চেহারা দেখে বিস্ময় আর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল।

এবার টারজান বলল, 'আমাকে বিশ্বাস করো। যতক্ষণ তোমরা আমি যা বলি তাই করো, আর আমার লোকদের ক্ষতি না করো, তোমাদেরও কোনো অনিষ্ট হবে না। তোমরা আমাদের সঙ্গে ফিরে যাবে, না যেভাবে এ কদিন এসেছ সেইভাবেই এগিয়ে যাবে?'

গত কয়েকদিনের আতঙ্কের কথা মনে করে মানুয়েমারা ঠিক করল ওয়াজিরি গ্রামেই ফিরে যাওয়া শ্রেয়।

তৃতীয় দিনের শেষে তারা গ্রামে ফিরে দেখল সেখানে ওয়াজিরি গ্রামবাসীরা অনেকেই ফিরে এসেছে। কারণ টারজান আগেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এবার টারজান তার সমস্ত শক্তি আর বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে গ্রামের লোকদের মানুয়েমাদের টুকরো টুকরো করে মেরে ফেলা থেকে নিরস্ত করল। সে বুঝিয়ে বলল যে মানুয়েমারা যেখান থেকে হাতির দাঁত পেয়েছিল, সেগুলো আবার সেখানে ফিরিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছে। তাছাড়া আরব আর মানুয়েমাদের বিরুদ্ধে এতদিন ধরে লড়াই করে বিজয়ী হওয়া তো শুধু টারজানের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

তাই শুনে ওয়াজিরি গ্রামবাসীরা টারজানের কথা মেনে নিল আর মানুয়েমাদের সেখানে থাকবার অনুমতি দিল।

সে-রাত্রে ওয়াজিরি গ্রামে একটা ভোজের আয়োজন হল। এর দুটি কারণ ছিল। প্রথম, তাদের বিজয়ের আনন্দ-উৎসব করা, আর দ্বিতীয়টি, তাদের নতুন দলকর্তা ঠিক করা।

এতদিন ধরে তাদের নতুন দলকর্তা বেছে নেওয়ার সময় ছিল না। তাছাড়া তারা টারজানের অধীনে কাজ করে এত সুফল পেয়েছে যে আরেকজনের হাতে এখন ক্ষমতা দিলে যদি তাদের আবার ক্ষতি হয়, সে বিষয়ও সকলে চিন্তিত ছিল।

প্রধান যোদ্ধারা এবার এক সঙ্গে বসে ঠিক করতে লাগল, মৃত দলকর্তা ওয়াজিরির উপযুক্ত উত্তরাধিকারী কে হতে পারে?

বাসুলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের মৃত দলকর্তা ওয়াজিরির কোনো পুত্র সন্তান নেই। কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন প্রমাণ করেছে যে সে দলকর্তা হবার উপযোগী। একজনই শুধু শ্বেতকায়দের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের বিজয়ী করেছে। সেই একজন হল আমাদের মধ্যে যে নিজে শ্বেতকায় সে।'

তারপর বাসুলি বর্শা হাতে নিচু হয়ে টারজানের চারদিকে ঘিরে নাচতে লাগল আর গাইল, 'ওয়াজিরিদের রাজা ওয়াজিরি, আরবদের প্রাণনাশক ওয়াজিরিদের রাজা ওয়াজিরি।'

ক্রমে একে একে বাকিরা উঠে সেই নাচে যোগ দিয়ে প্রমাণ করল যে তারা টারজানকে আজ থেকে তাদের দলকর্তা বলে মেনে নিয়েছে। টারজান সেদিন থেকে আফ্রিকার অধিবাসীদের নাম দিল—ওয়াজিরি।

রাত যত গভীর হল, নাচের তালও ততই বাড়তে লাগল। আফ্রিকার জঙ্গল ওয়াজিরি অধিবাসীদের উল্লাসে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল আর উন্মত্ত ওয়াজিরিদের মাঝখানে সমান ভাবে উদ্দাম নাচ নাচতে লাগল তাদের নতুন রাজা।

এই সময় যদি কাউন্টেস অলগা দ্য কুদ তাকে দেখতেন তাহলে কি পূর্ব পরিচিত অতি ভদ্র, সুবেশধারী, সুদর্শন যুবককে চিনতে পারতেন? আর জেন পোর্টার? সে কি এখনও এই ওয়াজিরিদের রাজা, যে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় উন্মত্ত নাচ নেচে চলেছে, তাকে ভালোবাসতে পারত? আর ডার্নো? যাকে সে প্যারিসের কয়েকটি সেরা ক্লাবের সদস্য করেছিল, তাকে এখন চিনতে পারবে? ইংল্যাণ্ডের হাউস অফ লর্ডের কেউ যদি এই আদিম সভ্যতার প্রতীক, এই অদ্ভুত বেশধারী লোকটার দিকে হাত দেখিয়ে বলে, এই হল জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক—তাহলে কেউ কি বিশ্বাস করবে?

লর্ড টেনিংটনের জাহাজ লেডি অ্যালিস একটি পরিত্যক্ত জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার ফলে অতল আটলান্টিক সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে একটা ছোট নৌকোয় জেন পোর্টারের ঘুম ভাঙল। বাকিরা তখনও ঠেসাঠেসি করে গভীর ঘুমে

আচ্ছন্ন। চোখ মেলেই জেন বুঝতে পারল যে তাদের নৌকো অন্য নৌকোগুলো থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। জেনের মন বিষাদে ভরে গেল। এই বিশাল সমুদ্রে তারা যেন একেবারে হারিয়ে গেছে।

ক্রমে ক্লেটনের ঘুম ভাঙল। কিন্তু তার সচেতনা ফিরে আসতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। জেনকে দেখে নিশ্চিন্ত হল। একে একে বাকিদের ঘুম ভাঙতে লাগল। সকলেই অন্য নৌকোগুলো সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়ল। ক্লেটন বলল প্রত্যেকটা নৌকো ঠিক ছিল আর জাহাজ ডোবার পরেও সেগুলোকে ভেসে থাকতে দেখেছিল।

তখন একজন নাবিক বলল, 'এভাবে ছড়িয়ে থাকাই ভালো কারণ যদি ঝড় ওঠে তাহলে সকলে একসঙ্গে বিপদে পড়ব না। দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত থাকলে উদ্ধারের সম্ভাবনাও বেশী হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি নৌকোতে খাবার, পানীয় জল আর অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে।'

এই কথা শুনে সকলে খানিকটা আশ্বস্ত হল। কিন্তু পরেই আবার মহা বিপদে পড়ল যখন বুঝল যে, যে-নাবিক রাত্রেবেলা দাঁড় বাইছিল, সে ঘুমিয়ে পড়াতে তার হাত থেকে দুটো দাঁড় জলে পড়ে গিয়েছে।

বকাবকি, চেঁচামেচিতে মিঃ থুরানও যোগ দিয়ে সমস্ত ইংরেজজাতের বুদ্ধিহীনতা সম্বন্ধে কয়েকটা কড়া মন্তব্য প্রকাশ করল। সকলে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠতে ক্লেটনই তাদের শান্ত করল।

কিন্তু খাবার সময়ও মতভেদ দেখা দিল। ক্লান্ত, ভীত নাবিক তিনজন ক্লেটন আর থুবানকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। তাদের ধারণা হল যে খাবারের বেশির ভাগ নিজেদের জন্য রেখে ক্লেটন আর থুবান নাবিকদের কম কম খেতে দিচ্ছে। এতে আবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেল।

জেন পোর্টার সমস্ত ব্যাপারটাতে বিরক্ত হয়ে বলল যে, অতল সমুদ্রের মাঝখানে একটা ছোট নৌকোয় ভেসে চলা সমূহ বিপদ। কিন্তু তার ওপর যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয় তাহলে নাকালের আর অন্ত থাকবে না। কেউ একজন দলকর্তা হিসাবে খাবার আর জল যা আছে তা মাথা পিছু বেঁটে দিক।

তখন ঠিক হল যে দুই পিপে জল আর চার টিন খাবার সমান ভাগে ভাগ হবে। এতে দুটো দল হয়ে গেল। নাবিকরা তিনজন এক দিকে আর ক্লেটন, থুবান আর জেন অন্যদিকে।

নাবিকরা যখন তাদের খাবারের একটা টিন খুলল তখন দেখা গেল তার মধ্যে রয়েছে কয়লার তেল। তখন সব টিনগুলো খুলতে ঐ একই জিনিস বের হল। সকলে এই নতুন বিপদে আতঙ্কিত হয়ে গেল। সবাই তখন বলল জল তো আছে। জলের পিপে খুলতেই তার থেকে কি সব গুঁড়ো বের হল, গন্ধ শুঁকে বোঝা গেল সেগুলো বারুদ।

এরপর হতভাগ্য যাত্রীদের আর দুর্দশার সীমা রইল না। যত দিন যেতে লাগল তাদের অবস্থার অবনতি হতে লাগল। নাবিকরা খিদের জ্বালায় নিজেদের বেল্ট, জুতো ইত্যাদি খেতে আরম্ভ করল। ক্লেটন আর থুবান এর কুফলের ভয় দেখালেও কোনো লাভ হল না।

'লেডি অ্যালিস' জাহাজ ডোবার ঠিক এক সপ্তাহ পরে প্রথম নাবিক প্রাণ হারালো। ক্লেটন যখন তার দেহ সমুদ্রে ফেলে দেবার জোগাড় করল তখন অন্য এক নাবিক বাধা দিয়ে বলল, কাল হয়ত মৃতদেহের প্রয়োজন হতে পারে। সে মরে গেলেও বাকিদের তো বাঁচতে হবে।

ক্লেটনের সারা শরীর ঘৃণায় আর ভয়ে শিউরে উঠল। সে নিচু গলায় থুবানকে ডেকে বলল, এ কাজে রাজি হলে তাদের ভোগান্তির সীমা থাকবে না। উইলসন নামে নাবিক শুনতে পেয়ে ক্লেটনের দিকে ছুটে এলে, বাকি তিনজনে তাকে ধরে ফেলল।

এরপর থেকে উইলসন ক্লেটনের ওপর তাকিয়ে নজর রাখতে লাগল। রাতের অন্ধকারেও ক্লেটন উইলসনের দৃষ্টি অনুভব করতে লাগল। কিন্তু অসম্ভব শারীরিক ও মানসিক কষ্টের জন্য সে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ একটা আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে যাওয়াতে চোখের সামনে দেখতে পেল বুভুক্ষু নাবিকটি তার দিকে এগিয়ে আসছে আর তার হাঁ-করা মুখ থেকে লাল জিব ঝুলছে।

জেন পোর্টারেরও ঐ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। চোখ মেলে এই নারকীয় দৃশ্য দেখতে পেয়ে সে চিৎকার করে উঠল আর সেই মুহূর্তে নাবিকও ক্লেটনের ওপর ঝাঁপিয় পড়ল। জেনের চিৎকারে থুবান আর অন্য নাবিকের ঘুম ভেঙে যাওয়াতে ক্লেটন সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু খ্যাপা উইলসন এক লাফ দিয়ে উঠে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নৌকোতে রইল চারজন হতভম্ব যাত্রী।

পরদিন সকালে মিঃ থুবান বলল, 'আর কদিনের মধ্যে

যদি আমাদের কেউ বাঁচাতে না আসে তাহলে মৃত্যু নিশ্চিত। এতদিনেও আমরা একবারও ডাঙার চিহ্ন বা জাহাজের ধোঁয়া দেখতে পেলাম না। এখন আমাদের সামনে দুটি পথ আছে। প্রথম, সকলকে এইভাবে মরার জন্য প্রস্তুত থাকা। আর দ্বিতীয়টি, একজনকে নিজের জীবন বলিদান করতে হবে যাতে অন্যরা বাঁচে। আশা করি আমার কথার অর্থ আপনারা বুঝতে পারছেন?'

জেন পোর্টারের শরীর কেঁপে উঠল। একজন সামান্য নাবিকের কাছ থেকে এ প্রস্তাব এলে হয়ত অতটা ভয়াবহ শোনাত না কিন্তু সভ্যজগতের একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে এ কথা শোনা একটা অভাবনীয় ব্যাপার।

ক্লেটন বলল, 'আমরা সকলে এক সঙ্গেই মরব।'

থুবান উত্তর দিল, 'সেটা সংখ্যার গুরুত্বে বিচার করে ঠিক করা হবে। মিস পোর্টারকে এর মধ্যে ধরা হচ্ছে না সুতরাং আমারা তিনজনে কি করা উচিত ঠিক করব।'

নাবিকটি জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কে প্রথম হবে সেটা কি করে ঠিক করা হবে?'

থুবান বলল, 'আমার কাছে কতকগুলো পয়সা আছে। সেগুলো থেকে একটার তারিখ ঠিক করে নেওয়া হবে। তারপর সবগুলো একটা কাপড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেওয়া হবে। যে প্রথমে ঐ তারিখ-লেখা পয়সাটা তুলবে সে-ই হবে প্রথম।'

ক্লেটন বলল, 'এ রকম নারকীয় প্রস্তাবে আমি রাজি নই। কয়েকদিনেই হয়ত আমাদের কেউ বাঁচাতে আসবে।'

থুবান গম্ভীর গলায় বলল, 'সকলে যা স্থির করে তাই তোমাকেও করতে হবে আর তা না করলে, লটারি ছাড়াই তোমার প্রাণ বিসর্জন দেওয়া হবে।'

সে আর অন্য নাবিক এই পন্থাতে রাজি হওয়াতে ক্লেটনের রাজি হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না।

থুবান পকেট থেকে এক রকমের পয়সা বের করে সকলকে দেখালো। তারপর বলল, 'ভালো করে দেখে নাও যে এই পয়সাগুলোর মধ্যে সব থেকে পুরনোটার তারিখ হল ১৮৭৫।'

ক্লেটন আর নাবিক ভালো করে দেখল যে তারিখ ছাড়া সব পয়সাগুলো হুবহু এক রকমের। তারা সন্তুষ্ট হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরা দুজনে কেউ-ই থুবানের আসল পরিচয় জানত না, জানত না যে সে একজন অতি ধূর্ত তাস-চোর। সে জানত যে ১৮৭৫ সালের পয়সাটা অন্যগুলো থেকে এক চুল পাতলা। আর জানলেও যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া ক্লেটন বা নাবিক সেই প্রভেদ বুঝতেও পারত না।

এবার লটারির পালা। থুবান প্রথমে পয়সা টানতে রাজি হয়ে কাপড়ের তলায় হাত ঢুকিয়ে চিহ্নওয়ালা পয়সা সরিয়ে যে পয়সাটা বের করল সেটার তারিখ ১৮৮৮। তারপর ক্লেটন পয়সা টানলে সেটাও অন্য একটা উঠল, নাবিকও আরেকটা টানল।

তখন সকলে আবার প্রথম থেকে শুরু করল। আবার থুবান একটা অন্য পয়সা টানল। তারপর ক্লেটনের পালা। সে যখন কাপড়ের তলায় হাত দিয়ে পয়সা তুলল তখন নাবিকটার মন একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ভরে গেল। সে জানত যে যদি এবার ক্লেটন ১৮৭৫ সালের পয়সা না টানে তাহলে পরের বার সে নিজেই সেটা পাবে। তাই ক্লেটনের হাতে কি উঠেছে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

যখন ক্লেটন হাতের মুঠিখুলল তখন নাবিকটি তারিখ না দেখে আর কিছু না বলে নৌকো থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পয়সাটা ১৮৭৫-এর ছিল না।

প্রত্যেকের শরীর এই উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তখন থুবান বলল, 'আমাদের আবার পয়সা তুলে ঠিক করতেই হবে।'

ক্লেটনের তখন সঙ্গীন অবস্থা। জেন পোর্টারও তিনদিন কথা বলেনি, তার যে অন্তিম অবস্থা উপস্থিত ক্লেটন তা বুঝতে পেরেছিল। তাই এই বলিদানে যদি জেনের শক্তি জোগানো যায় তাই করতে ক্লেটন রাজি।

এবার যখন সে পয়সা টানল স্বভাবতঃই সেটা ১৮৭৫-এর উঠল। থুবানের দিকে তাকিয়ে শুধু প্রশ্ন করল, 'কখন?'

থুবান লোলুপ দৃষ্টিতে বলল, 'এখনই।'

ক্লেটন বলল, 'রাত্রি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো যাতে মিস পোর্টার এই দৃশ্য দেখতে না পান। আমাদের বিয়ে হবার কথা ছিল, সে কথা তো জানো।'

এতে থুবান খুশী না হলেও বলল, 'বেশ, এতদিন যখন অপেক্ষা করেছি তখন আরো কয়েক ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে পারব।'

ক্লেটন তখন জেনের কাছে গিয়ে দেখল সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। ক্লেটন ভাবল, এক বিষয়ে ভালোই হল যে তাকে ভগবান এই দৃশ্য দেখা থেকে বাঁচিয়েছেন।

যখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল, সে শুনল থুবান তাকে ডাকছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে তার অবসন্ন দুর্বল শরীর তুলতে পারল না। তখন সে থুবানকে তার কাছে আসতে বলল।

থুবানেরও তথৈবচ অবস্থা। সে রাগে চিৎকার করে বলল, 'তুমি আমায় ঠকিয়েছ সময় নষ্ট করে। এখন আমিও দুর্বল হয়ে পড়েছি, উঠতে পারছ না।'

তখন ক্লেটন ফিসফিস করে বলল, 'আমরা দুজনে মাঝখান অবধি যদি হামাগুড়ি দিয়ে আসতে পারি তাহলে তো তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।'

বহু কষ্টে দুজনে দুজনের দিকে এগোতে লাগল। প্রত্যেকটি মুহূর্ত কষ্টকর হয়ে উঠল। এমন সময় ক্লেটন টের পেল থুবান তার কাছে এসে পড়েছে। একটা হাসির শব্দ শুনতে পেল আর মুখে কিছুর স্পর্শ পাওয়াতে ক্লেটন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

যে রাত্রে টারজান ওয়াজিরি আদিবাসীদের রাজা বলে ভূষিত হল, সেই রাত্রেই বিশাল আটলান্টিক মহাসমুদ্রের বুকে একটা ছোট্ট নৌকোয় তার প্রিয়তমা জেন পোর্টার মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়াল। জিন্তু টারজান সে-কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না, এমনই দৈবের রহস্য!

টারজান ওয়াজিরিদের রাজা হবার এক সপ্তাহ পরে তার কথামতো মানুয়েমাদের তাদের দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করল। ওয়াজিরিদের দেশের উত্তর সীমা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে টারজান তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিল যে ভবিষ্যতে মানুয়েমারা আর কোনো দিনও ওয়াজিরিদের ওপর হানা দেবে না, তাহলে তাদের চরম পরিণাম ভোগ করতে হবে। মানুয়েমারা টারজানের সাহস ও যুদ্ধবিদ্যার প্রমাণ পেয়েছিল। তাই তারা একস্বরে সায় দিল, অন্যথা করবার কথা মনেও এল না।

গ্রামে ফিরে এসে টারজান এবার সেই যেখানে সোনা পাওয়া যায়, সেই দেশে যাবার তোড়জোড় করতে লাগল। ওয়াজিরিদের মধ্যে থেকে পঞ্চাশজন যোদ্ধা বেছে নিল যারা শুধু যুদ্ধে নিপুণ নয়, তারা এই অজ্ঞাত দেশে যেতে প্রস্তুত আর যে কোনো রকম বিপদের সম্মুখীন হতেও পিছপা হবে না।

অজ্ঞাত জায়গায় যাবার একটা বিপুল উত্তেজনা ছাড়াও টারজান সোনার লোভেও এই যাত্রার ব্যবস্থা করেছিল। সভ্য জগতে কিছুকাল বাস করার পরই সে বুঝতে পেরেছিল এই ধাতুর কত বড় শক্তি। এই ধাতু দিয়ে মানুষ কি না করতে পারে। সে নিজে সোনা নিয়ে কি করবে সেটা এখনো ঠিক না জানলেও সেটা যে নিজের কবলে থাকলে সুবিধা হবে সেটা প্রত্যক্ষ জানত।

একটি সুন্দর সকালে ওয়াজিরিদের রাজা তার পঞ্চাশ জন বীর যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার ও ধনের আশায় বেরিয়ে পড়ল। মৃত দলকর্তা ওয়াজিরি যে রাস্তা বলেছিল, সেটা দিয়ে বহুদিন ধরে তারা পথ চলতে লাগল। পঁচিশ দিন পর তারা একটা পাহাড়ের ওপরে তাঁবু ফেলল।

পরের দিন সকালে পাহাড়ের চুড়োয় উঠে দেখল, যেদিক থেকে তারা এসেছে সেদিকে ঘন জঙ্গল, দুই পাশে উঁচু পাহাড়ের সারি, কিন্তু সামনে একটি অপরিসর উপত্যকার সুদূর প্রান্তে একটা বিরাট শহরের ধ্বংসাবশেষ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এক সময় সেটা নিশ্চয় অতি সুন্দর এক শহর ছিল, আজও তার মিনার, গম্বুজ, খোদাই করা প্রাচীর সবই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

পাহাড়ের ওপর ওয়াজিরিরা প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রাম করল, তারপর তাদের নিয়ে টারজান নিচের উপত্যকায় নেমে এল। রাস্তা না থাকলেও, নামাটা খুব একটা দুর্গম হল না। দ্রুতগতিতে উপত্যকা পার হয়ে সকলে পুরনো শহরের উঁচু প্রাচীরের সামনে এসে থামল। এই প্রাচীর প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু, আর ওপর থেকে জায়গায় জায়গায় দশ-বারো ফুট ধসে পড়লেও সেটা পার হওয়া একটা দুরূহ ব্যাপার।

শহরের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাতে টারজানের মনে হতে লাগল যে কারা যেন ইঁট-পাটকেলের স্তূপের আড়াল থেকে বা ভেঙে-পড়া দেওয়ালের পিছন থেকে তাদের লক্ষ্য করছে। দূর থেকে কাদের যেন অস্পষ্ট আনাগোনাও দেখতে পেল।

সে-রাত্রে টারজানের দল প্রাচীরের বাইরে কাটাল। মাঝরাতে তাদের হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চীৎকারে ঘুম ভেঙে যায়। আওয়াজটা প্রাচীরের ওপাশ থেকে এসেছিল। চিৎকার প্রথমে খুব তীক্ষ্ণ, তারপর কমে এসে শেষে কেবল একটা গোঙানি শোনা গেল। ওয়াজিরি যোদ্ধাদের ওপর এই চিৎকারের প্রভাব অভাবনীয়। তারা ভয়ে কাঠ হয়ে

থরথর করে কাঁপতে লাগল। অনেকক্ষণ সময় লাগল তাদের শান্ত হয়ে ঘুমোতে।

পরদিন সকালেও ওয়াজিরিরা গতকাল রাত্রের ঐ অদ্ভুত চিৎকারে আতঙ্কিত হয়ে ছিল। বহু কষ্টে টারজান তাদের পালিয়ে যাওয়া বন্ধ করল। শেষে যখন টারজান শাসাল যে তারা সঙ্গে না গেলে সে একাই শহরের মধ্যে যাবে, তখন তারা যেতে রাজি হল।

প্রায় পনেরো মিনিট প্রাচীর ধরে হাঁটার পর তারা ভিতরে ঢোকার একটা পথ পেল। ভিতরে কুড়ি ইঞ্চি একটা কার্নিশ থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে। সিঁড়ির ধাপগুলো বহুকালের ব্যবহারের ফলে ক্ষয়ে গেছে। সিঁড়িটা একটু দূর গিয়ে বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

টারজান ওয়াজিরিদের নিয়ে সেইখান দিয়ে গিয়ে দেখল যে সিঁড়ির বাঁকটা ঘুরে একটা সরু গলির মত হয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে শেষটা একটা চত্বরে গিয়ে পড়েছে। এখানেও একটা প্রাচীর, যেটা বাইরেরটার মতোই উঁচু। কিন্তু এই ভিতরের প্রাচীরটার কিছু দূর দূর একটা করে চুড়ো দেওয়া কুঠরী আর এটার অবস্থা অন্যটার মতো অতটা জীর্ণ নয়। এই প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে। রাস্তাটা একটা বিশাল প্রাসাদের সামনে এসে শেষ হয়ে গেছে। প্রাসাদটা এখন প্রায় একটা পাথরের ভগ্ন স্তূপ, কিন্তু টারজান লক্ষ্য করল চতুর্দিকে গাছপালা, আগাছা লতাগুল্ম যেখানে সেখানে গজিয়ে গেলেও, তাদের ঠিক সামনের মন্দিরের মতো বাড়িটার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। মন্দিরের চুড়ো গম্বুজাকার আর দুধারে সারি দেওয়া পাথরের উঁচু উঁচু থাম। আর প্রত্যেকটি থামের মাথায় খোদাই করা রয়েছে বিশালাকারের বীভৎস দেখতে পাখির মুখ।

টারজান আর তার সঙ্গীরা যখন অবাক হয়ে এই অতি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখছিল তখন তারা টের পেলো যে মন্দিরের ভিতর ত্বরিত পায়ে আবছা অন্ধকারে কারা যেন ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ টারজানের মনে পড়ে গেল প্যারিসের লাইব্রেরীতে বসে যখন সে পড়াশোনা করত তখন এক জায়গায় সে পড়েছিল যে আফ্রিকার আদিবাসীদের কাছ থেকে শোনা গেছে, একদল শ্বেতকায় বহুদিন আগে আফ্রিকার ঘোর জঙ্গলে হারিয়ে যায়। তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায় নি।

তাহলে, এই কি সেই শ্বেতকায়দের তৈরী প্রাচীন শহর আর ভিতরে যারা রয়েছে তারা কি সেই হারিয়ে-যাওয়াদের বংশধর?

সে সকলকে ডেকে ভিতরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। ওয়াজিরিরা প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের রাজার পিছন পিছন চলল।

প্রাসাদে ঢুকেই টারজান টের পেল যে অনেক জোড়া চোখ তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে, এমন কি চট্ করে সরিয়ে নেওয়া একটা হাত যেন সে দেখতে পেল। একটা উঁচু ছাদের গোল ঘরে এসে পৌঁছে দেখল ঘরের মেঝেয় কংক্রিটের তৈরি আর দেয়ালগুলো মসৃণ গ্র্যানাইট পাথরের আর দেওয়ালে গাঁথা রয়েছে সোনালী ধাতুর বড় বড় ফলক। কাছে গিয়ে দেখল সেগুলো আসল সোনার। তাতে কি সব লেখা রয়েছে! এই ঘরের পরে অনেকগুলো ঘর। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে ঘুরতে টারজান অনেক সোনার জিনিস দেখতে পেল। বিশেষ করে একটা ঘরে এসে দেখল তার সাতটা স্তম্ভ খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি। আরেকটি ঘরের মেঝেয় সোনায় মোড়া। যতক্ষণ টারজান এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে দেখছিল, ওয়াজিরি যোদ্ধারা তার কাছ ঘেঁষে ছিল আর আনাচে-কানাচে সেই সব ছায়ামূর্তি ঘোরাফেরা করছিল।

ওয়াজিরিদের আর সেখানে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না, তারা বারবার টারজানকে বাইরের আলোয় চলে আসতে অনুরোধ করছিল। কিন্তু সে কথায় টারজান হেসে বলল, 'বেশ তো তোমরা ফিরে গিয়ে বাইরে অপেক্ষা করো, আমি এই ধ্বংসাবশেষ আগাগোড়া দেখে, সোনা আবিষ্কার করে তোমাদের কাছে ফিরে যাবো। আমার মনে হচ্ছে, এখানে কোথাও অনেক সোনা গচ্ছিত আছে, যেগুলো আমরা সহজেই নিয়ে যেতে পারব। আর যদি কিছু না পাওয়া যায় তাহলে দেওয়ালে গাঁথা এই ফলকগুলো তো নিশ্চয় নিয়ে যাওয়া যাবে।'

বাসুলি আর অন্য কয়েকজন ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না কি করা উচিত, এমন সময় গত রাত্রের সেই অস্বাভাবিক আর্তনাদ শুরু হতেই সমস্ত ওয়াজিরিরা ঊর্ধশ্বাসে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

টারজান একা সেখানে দাঁড়িয়ে অজ্ঞাত শত্রুর অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু এর পর শুধু খালি পায়ের অস্পষ্ট শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ কানে এলো না। টারজান দ্রুত পায়ে এ-ঘর থেকে অন্য ঘরে গিয়ে শেষে একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে থেমে গেল। যেই সে দরজা ভাঙার চেষ্টা করল, ভিতর থেকে সেই আওয়াজ এলো।

টারজান বুঝল হয় কেউ ঐ বন্ধ ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করবার জন্য সাবধান করছে কিম্বা ঐ ঘরেই সোনা গচ্ছিত আছে।

নির্ভীক টারজনেকে পায় কে? সে কাঁধের এক ধাক্কা দিয়ে বহুদিনের পুরনো দরজা ভেঙে ভিতরে দেখল সেখানে সুচীভেদ্য অন্ধকার। কোনো জানলা বা ছিদ্র নেই যেখান দিয়ে এক চিলতে আলো ঢোকে। যে সরু পথ দিয়ে টারজান এসেছিল সেটাও আবছা অন্ধকারে, সুতরাং কোনো দিক দিয়েই ভিতরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করা গেল না। টারজান হাতের বর্শার লাঠি দিয়ে পথ বেছে নিতে লাগল। হঠাৎ পিছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে অনেকগুলো হাত তাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল।

টারজান তার অসীম শক্তি দিয়ে নিঃশব্দে একটা বন্য জানোয়ারের মত লড়াই করতে লাগল। কিন্তু অদৃশ্য শত্রুরা সংখ্যার জোরে টারজানকে ক্রমশঃ নিস্তেজ করে এনে তারপর হাত-পা বেঁধে ফেলল।

টারজান এ অবধি কাউকে চোখে দেখতে পেল না, তবে যেভাবে তারা তাকে বেঁধে ফেলল, তাতে বোঝা গেল এরা এক রকমের মানুষ।

সকলে মিলে টারজানকে পিছনের একটা দরজা দিয়ে বের করে একটা চত্বরে নিয়ে এল। এবার টারজান তাদের দেখতে পেল। সংখ্যায় তারা প্রায় একশ জনেরও বেশি, চেহারায় বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা, আর তাদের সারা মুখ-ভরা দাড়ি নেমে এসে বুকের লোমের সঙ্গে মিশে গেছে। তাদের লম্বা জটাভরা চুল কাঁধ বেয়ে পিঠ ছেয়ে গেছে। পাগুলো বেঁটে আর বাঁকা কিন্তু হাতগুলো লম্বা আর পেশীবহুল। তাদের পরনে চিতাবাঘ বা সিংহের ছাল আর গলার চারদিকে বন্যজন্তুর নখের মালা। কিন্তু হাতে আর পায়ে রয়েছে ভারি ভারি খাঁটি সোনার গহনা। হাতে ধরা রয়েছে মুগুর আর কোমরবন্ধে একটা করে ছুরি গোঁজা।

সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার হল তাদের মুখের চেহারায়। তাদের রঙ ফর্সা আর মুখের কোথাও নিগ্রোদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তবুও তাদের প্রশস্ত ললাট, নাকের কাছে চোখজোড়া আর হলদে দাঁতে একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণের ইঙ্গিত।

এতক্ষণ ধরে তারা কোনো কথা বলেনি। শুধু নিজেদের মধ্যে একটা ঘোঁতঘোঁত শব্দ করছিল। এটা নিশ্চয় তাদের ভাষা কিন্তু সেটা টারজানের সম্পূর্ণ অচেনা। সকলে টারজানকে বাঁধা অবস্থায় সেখানে ফেলে রেখে দিয়ে কোথায় জানি চলে গেল।

টারজান চোখ মেলে দেখতে লাগল, জায়গাটা মন্দিরের ভিতরকার এক নিভৃত চত্বর, চারপাশ উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। তার ওপরে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে আর দেওয়ালের পিছনে সবুজ গাছপালা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেটা মন্দিরের বাইরে না ভিতরে সেটা টারজান ঠিক ঠাহর করতে পারল না। চত্বরের চারদিকে নিচে থেকে ওপরে উঠে গেছে সারি সারি বারান্দা আর সেখান থেকে মাঝে একটা করে মুখ বেরিয়ে টারজানকে দেখছে।

একবার অতি সাবধানে টারজান তার দড়ির বাঁধন পরীক্ষা করে দেখল। মনে হল দরকার হলে বোধ হয় দড়ি ছিঁড়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু এখন কিছুই করল না। উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল।

এইভাবে টারজান সেখানে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল। সূর্যদেব তখন মধ্য আকাশে। হঠাৎ বহু পায়ের আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখল চত্বরে অনেক লোকের সমাগম হয়েছে।

সকলে টারজানকে ঘিরে নিচু স্বরে কিছু মন্ত্র আওড়াতে লাগল আর নাচতে লাগল। কিন্তু তাদের দৃষ্টি ছিল সূর্যদেবতার দিকে। দশ মিনিট ধরে এই ভাবে তারা নাচল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে, মুগুর উঠিয়ে তারা টারজানের দিকে ছুটে এল।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি মেয়ে হাতে সোনার মুগুর নিয়ে দৌড়ে এসে পুরুষদের বাধা দিয়ে দাঁড়াল।

টারজানের মনে হল যে ভাগ্যদেবী বোধহয় নারীরূপে তাকে রক্ষার জন্য কাউকে পাঠিয়েছেন। তারপর সোনার মুগুর হাতে মেয়েটি অন্যদের নীচু গলায় কি যেন বলল আর অন্যরা আবার সেই গান ধরল। তখন টারজান বুঝল এটা কোনো অনুষ্ঠানের অংশ আর তার প্রধান নায়ক হল টারজান নিজে।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি একটা তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে টারজানের বাঁধন কেটে দিয়ে তাকে উঠতে বলল। পরে তার গলায় একটা বেড়ি পরিয়ে তাকে নিয়ে মন্দিরের ভিতরের একটি বিরাট ঘরে এসে দাঁড়াল। ঘরের মাঝখানে একটি বেদী।

তখন টারজান বুঝতে পারল যে এরা সকলে সূর্যের উপাসক আর তাকে সেই দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান করা হবে।

বেদীর ওপরে রক্তের শুকনো দাগ আর ঘরের চারদিকের দেয়ালের কুলুঙ্গিতে মাথার খুলির সারি টারজানের বোধশক্তির সততা প্রমাণ করে দিচ্ছে। পূজারিণী এবার টারজানকে বেদীর সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেল। মন্দিরের চতুর্দিকের অলিন্দ, বারান্দায় ভিড় জমে গেল আর পুব দিকের দরজা দিয়ে একদল মেয়ের আগমন হল। প্রত্যেকের পরনে পুরুষদের মতো জানোয়ারের ছাল আর কোমরে সোনার বেলট্। কুচকুচে কালো রঙের খোলা চুলে সোনার টুপি পরা। তার থেকে সোনার ঝালর নেমে প্রায় কোমর অবধি ঝুলছে।

চেহারায় মেয়েরা পুরুষদের থেকে অনেক সুন্দর। প্রত্যেকটি পূজারিণীর হাতে দুটি করে সোনার পেয়ালা। বেদীর একধারে তারা এসে দাঁড়ালে অন্যধারে পুরুষরা সার বেঁধে এসে তাদের কাছ থেকে প্রত্যেকে একে একে পেয়ালাগুলো নিয়ে নিল। তারপর আবার মন্ত্রোচ্চারণ শুরু হল।

বেদীর অন্যদিকের একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে আরেকটি তরুণীর আগমন হল। ইনিই হলেন প্রধানা পূজারিণী। অন্যান্যদের মতো এঁরও বেশভূষা, শুধু এঁর সোনার গহনায় হীরে বসানো। এঁর সারা অঙ্গ গহনা ঢাকা। পরনে চিতাবাঘের ছাল আর সোনার কোমরবন্ধে কি সব যেন খোদাই করা রয়েছে। সমস্তটা অসংখ্য হীরেতে ভরা। কোমরে রত্নখচিত ছোরা আর হাতে মুগুরের বদলে সরু একটা ডাণ্ডা।

এই মেয়ে বেদীর কাছে আসতেই মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ হল। সকলে হাঁটু গেড়ে তাঁর সামনে প্রণত হল আর তিনি সকলের মাথার ওপর ডাণ্ডা ঘুরিয়ে লম্বা এক প্রার্থনা করলেন। তাঁর সুন্দর চেহারা, কম বয়স আর কোমল স্বর শুনে টারজান বিশ্বাস করতে পারছিল না তিনি এই নিষ্ঠুর ধর্মাচারের অংশ নিতে পারেন আর ঐ সোনার পেয়ালা থেকে মানুষের রক্ত পান করতে পারেন।

প্রার্থনা শেষ হলে প্রধানা পূজারিণী টারজানের আপাদমস্তক পরীক্ষা করে কি যেন বলে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

টারজান বলল, 'আমি আপনার কথা বুঝতে পারলাম না। হয়ত এমন কোনো ভাষা আছে যেটা আমরা দুজনেই জানি।' এই বলে সে ফরাসী, ইংরাজি, আরব ওয়াজিরি এমন কি পশ্চিম উপকূলের এক সংমিশ্রিত ভাষাও চেষ্টা করল কিন্তু কোনোই ফল হল না।

তখন মহিলার ইঙ্গিতে পুরোহিতরা এসে টারজানকে বেদীর ওপর শুইয়ে দিল। তারপর তারা সারি দিয়ে পেয়ালা হাতে দাঁড়াল যাতে বলিদানের রক্ত ধরে পান করতে পারে।

এই সময় একটা গোলযোগ শুরু হল। এক বিকটাকার লোক আরেকজনকে ঠেলে সরিয়ে সামনে আসতে চাইলে প্রধানা পূজারিণী কঠোর আদেশে তাকে লাইনের একেবারে শেষে পাঠিয়ে দিলেন। সে রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল।

পূজারিণীর তীক্ষ্ণ ছুরি টারজানের বুকের ওপর নেমে আসতে লাগল। পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণও সেই সঙ্গে আরও জোরদার হতে লাগল। সব থেকে জোর গলা ছিল সেই বুনো লোকটার। তাই শুনে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুজারিণী তাকে বকতে লাগল। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে হুলুস্থুল ব্যাপার ঘটে গেল। সেই লোকটা তার হাতের মুগুরের এক বাড়ি মেরে মেয়েটির খুলি ফাটিয়ে দিল।

এই ব্যাপারে টারজানের বুকের কাছে নেমে আসা ছুরি থেমে গেল। প্রধানা পূজারিণী মুখ তুলে তাকালেন।

এদিকে সেই বিকট লোকটি রাগে মত্ত হয়ে মুগুর দিয়ে যাকে সামনে পেল পেটাতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে পালিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে রইল মৃত বা অর্ধমৃত বেদীর ওপর শোয়া টারজান, প্রধানা পূজারিণী আর সেই উন্মত্ত লোকটি।

টারজান দেখল লোকটির দৃষ্টি পূজারিণীর ওপর এবং সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে পূজারিণীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

কি আশ্চর্য! এ ভাষা তো টারজানের অতি পরিচিত, কিন্তু সে কল্পনাও করতে পারেনি যে এখানে কেউ বলতে জানে। এ ভাষা তাঁর মায়ের ভাষা—আফ্রিকার জঙ্গলের বিশাল বনমানুষদের এই ভাষা। অবাক হয়ে শুনতে শুনতে টারজান টের পেল যে লোকটি পুজারিণীকে শাসাচ্ছে। মেয়েটিও সেই ভাষায় উত্তর দিচ্ছে।

বেদীর ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বুনো লোকটা সেই

মেয়েটিকে ধরতে যাবে, টারজান টান মেরে নিজের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে ঘরের মধ্যে সে একা।

কিন্তু সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের দিক থেকে চিৎকার আসাতে টারজান দৌড়ে সেই দিকে গেল। সেখানে সিঁড়ি বেয়ে নেমে মাটির তলায় একটি গুহার মতো ঘরে গিয়ে দেখল, বুনো লোকটি মেয়েটিকে মাটিতে ফেলে তার গলা টিপে ধরেছে।

টারজানের হাত তার কাঁধে পড়তেই সে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে টারজানকেই আক্রমণ করল। এবার সে খ্যাপা বনমানুষের মতো লড়াই শুরু করল। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে যার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তার-ও জন্ম আর পালন বনমানুষদের মধ্যেই হয়েছিল। নিমেষের মধ্যে দুজন অতিকায় শক্তিশালী বনমানুষ আদিম যুদ্ধে মেতে গেল!

ভীত ত্রস্ত পূজারিণী দেখল সেই অজ্ঞাত যুবক জয়ী হয়ে মৃতের বুকের ওপর পা রেখে বিজয়নাদ দিচ্ছে। তখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে সেখান থেকে সে পালাবার চেষ্টা করাতে টারজান বনমানুষদের ভাষায় বলল, 'দাঁড়াও।'

মেয়েটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে? কি করে এই আদিম ভাষা শিখল?'

—'আমার নাম টারজান।'

—'তুমি থা-কে মেরে ফেলেছ। কিন্তু এবার আমাকে কি করবে?'

—'কিছু না। বরং তুমি আমার জন্য কিছু করতে পার। আমাকে এখান থেকে পালাবার রাস্তা দেখাতে পার।'

টারজান জানত যে ইচ্ছা করলে মেয়েটি আবার সেই জঘন্য বলিদানের ব্যবস্থা করতে পারে। তবে এখন টারজান মুক্ত ও তার হাতে ছুরি। অত সহজে ধরা পড়বে না।

মেয়েটি অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি এক আশ্চর্য পুরুষ। ছোটবেলা থেকে তোমার মতো একজনের স্বপ্ন দেখে এসেছি, আমার পূর্ব-পুরুষেরা, যাঁরা এই বিরাট শহর তৈরি করেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় তোমার মতোই ছিলেন। তাঁরা এই শহর তৈরি করেছিলেন নিজেদের দেশের সভ্যতার মায়া কাটিয়ে এসে। তাঁদের একমাত্র স্বপ্ন ছিল এখানকার মাটি থেকে সেই অমূল্য ধন আহরণ করা। কিন্তু তুমি কেন আমার সাহায্যে এলে তা বুঝতে পারলাম না। তোমাকে প্রায় মেরে ফেলার জন্য প্রতিশোধই বা নিচ্ছ না কেন?'

—'তুমি নিজের ধর্ম পালন করছিলে মাত্র। তার জন্য তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তুমি কে? এ জায়গাটা কোথায়?'

—'আমার নাম লা। ওপার শহরের সূর্য মন্দিরের আমি প্রধানা পূজারিণী। দশ হাজার বছর আগে সোনার খোঁজে যাঁরা এদেশে এসেছিলেন তাঁদেরই আমরা বংশধর। তাঁরা অসীম শক্তিশালী আর অতি ধনী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এখানে বছরের মধ্যে কয়েক মাস কাটাতেন। অন্য সময় এখান থেকে বহু দূরে উত্তর দিকে নিজেদের দেশে থাকতেন। বর্ষাকালে এখানে শুধু তারাই থাকত যারা সোনার খনির তদারক করত। তাছাড়া থাকত বণিকরা আর প্রহরীরা।

'সেই সময় একটা প্রকাণ্ড বিপর্যয় ঘটে। যখন সকলের ফিরে আসার সময় হল তখন কেউ-ই এল না। বহু সপ্তাহ ধরে সকলে অপেক্ষা করল কিন্তু কোনো ফল হল না। তখন এখানে প্রকাণ্ড নৌকো করে একদল লোককে মাতৃভূমির দিকে পাঠানো হল এই না-আসার কারণ জানতে। নৌকোটি বহুদিন ধরে খুঁজে বেড়াল কিন্তু তাদের সেই দেশ খুঁজে পেল না—তাদের দেশ জলের তলায় ডুবে গেছে।

'সেই দিন থেকে আমাদের লোকদের অধঃপতন শুরু হল। হতাশায় ভরে গিয়ে তারা ক্রমশঃ এখানকার অধিবাসীদের কাছে হার মানতে লাগল। এক এক করে শহরগুলো হারাতে শুরু করল। শেষে যে ক'জন বেঁচে রইল তারা পালিয়ে এই দুর্গম পাহাড়ী দুর্গে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করল। ক্রমশঃ এই ভাবে আমাদের শক্তি, সভ্যতা, বুদ্ধি আর সংখ্যা লোপ পেতে লাগল। আমরা আজকের এই বনমানুষদের মতো হয়ে গেলাম।

—'সত্যি সত্যি এই বনমানুষের মতো আদিম মানুষরা আমাদের সঙ্গে বহু যুগ ধরে বাস করেছে। আমরা তাদের ভাষা শিখলাম। তারপর আমাদের জাতের সঙ্গে আদিম মানুষদের বিয়ে-থা হল। এর পর বোধ হয় তারা একেবারে বনমানুষদের মতোই হয়ে যাবে, যেখান থেকে তাদের আদিম উৎস।'

টারজান বলল, 'কিন্তু তুমি নিজে তো অন্য রকম।'

—'কোনো কারণে মেয়েরা অত তাড়াতাড়ি বনমানুষের মতো দেখতে হয় নি। তার একটা কারণ হতে পারে যে এখানে যারা বেঁচে ছিল, তারা নিচু জাতের হলেও মন্দিরের

মধ্যে শুধু উচ্চ বংশীয় মেয়েরা ছিল। আমার পবিত্র রক্তের কারণ আমার মা, দিদিমা, তাঁর মা সকলেই প্রধানা পূজারিণী ছিলেন। আমাদের স্বামীরা আমাদের জাতের সেরা পুরুষ ছিলেন।'

—'কিন্তু আমি যে সব পুরুষদের দেখলাম তাদের মধ্যে থেকে সেরা পুরুষ বাছাই করা মুস্কিল হবে মনে হয়।'

মেয়েটি বলল, 'ওসব বলাও পাপ। ওঁরা সকলে মন্দিরের পুরোহিত।'

তখন সুন্দর মেয়েটির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে টারজান শিউরে উঠল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এবার কি তুমি আমাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবে?'

—'তোমাকে সূর্যদেব পছন্দ করেছেন। যদি এখানকার লোকরা খুঁজে পায়, তাহলে আমার পক্ষেও তোমাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। কিন্তু তুমি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তাই আমি তোমাকে সাহায্য করব। তাতে সময় লাগলেও, তোমাকে প্রাচীরের বাইরে নিয়ে যেতে পারব। আমার সঙ্গে এসো, তোমাকে এখানে দেখতে পেলে, আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে।'

এই বলে টারজানকে নিয়ে সে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে অনেক ঘুরে একটা ছোট ঘরে নিয়ে এল। ঘরের ছাদে পাথরের জাফ্‌রীর মধ্যে দিয়ে খানিকটা আলো আসছিল।

মেয়েটি বলল, 'এখানে কেউ আসবে না ভয়ের চোটে, কারণ এটা মৃতের ঘর। আমি সন্ধ্যের পর আবার আসব। হয়ত তোমার পালাবার একটা উপায় ঠিক করতে পারব।'

মেয়েটি চলে গেল, আর টারজান একা সেই ওপার শহরের তলার এক কুঠরিতে রইল।

ক্লেটনের মনে হচ্ছিল সে যেন স্বপ্নে প্রাণ ভরে ঠাণ্ডা জল পান করছে। মুহূর্তের মধ্যে তার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখল সর্বাঙ্গ জলে ভেজা, মুখের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। মুখ হাঁ করে সে বৃষ্টির জল পান করতে লাগল। তাতেই তার এতখানি শক্তি ফিরে এল যে উঠে বসতে পারল। দেখল তার পায়ের ওপর মিঃ থুবান অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর নৌকোর ভিতরে জেন পোর্টার ভাঙা পুতুলের মতো শুয়ে আছে। তার কোনো সাড়া নেই।

প্রাণপণে থুবানকে ঠেলে সরিয়ে জেনের কাছে গিয়ে তাকে তুলে ধরে জোর করে মুখের মধ্যে ফোঁটা করে জল ঢেলে দিতে লাগল। তারপর তার শীর্ণ হাত মালিশ করে রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও করল। আবার একটু জল খাওয়াতেই জেন চোখ খুলে তাকিয়ে বলল, 'জল? তাহলে কি আমরা বেঁচে গেছি মিঃ থুবান? তাহলে তোমাকে মেরে ফেলে নি! সে কি মারা গেছে? সে কোথায়?'

থুবানের দিকে তাকিয়ে ক্লেটন বলল, 'দেখি চেষ্টা করে, তাকে বাঁচানো যায় কি না।'

জেন তাকে হাত বাড়িয়ে থামিয়ে বলল, 'থাক। জল খেয়ে শক্তি ফিরে এলে ও তোমাকে মেরে ফেলবে। ও যদি মৃতপ্রায় হয়ে থাকে তাই হোক। আমাকে ওরকম পাশবিক লোকের সঙ্গে এক নৌকোয় থাকতে দিও না।'

ক্লেটনের মনে সাংঘাতিক দ্বিধা জন্মাল। তার মনুষ্যত্ব-বোধ বলতে লাগল যে থুবানকে বাঁচানো উচিত, তবে এ-ও হতে পারে যে সে এখন মানুষের সাহায্যের বাইরে চলে গিয়েছে। ভাবতে ভাবতে সে মাথা তুলেই আনন্দে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

—'জেন, জেন! ভগবান আমাদের রক্ষা করেছেন। ঐ দেখ ডাঙা।'

জেন মুখ তুলে দেখল, একশ গজ দূরে সোনালী রঙের তীর আর তার পিছনে ঘন সবুজ বনরাজি।

জেন বলল, 'এবার থুরানের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কর।' তারও বিবেক দংশন করছিল, ক্লেটনকে বাধা দেবার পর থেকেই।

প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর শুশ্রূষা করার পর থুবানের অল্প অল্প করে জ্ঞান ফিরে আসতে লাগল। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তাদের নৌকো পাড়ে এসে ধাক্কা খেল। ক্লেটন হাঁটু জলে নেমে গিয়ে কোন রকমে নৌকোটাকে ঠেলে ডাঙার কাছে এনে কাছি দিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল। ডাঙায় নেমেই সে খাবারের সন্ধান করতে লাগল। আগের বারের অভিজ্ঞতায় টারজান ক্লেটনকে শিখিয়েছিল কি করে গভীর জঙ্গলে খাবার জিনিস জোগাড় করা যায়। অন্যদের নৌকোয় রেখে সে প্রায় এক ঘণ্টা পর হাত ভরে আহার্য নিয়ে এল।

ততক্ষণে সূর্যের তাপ বেড়েছে। তাই আর দেরী না করে তিন জনে কোনরকমে একটা গাছের ছায়ায় এসে বসল। সেখানে খাবার খেয়ে ক্লান্ত শরীরে বিশ্রাম করতে লাগল।

ঐ জায়গায় তিন জনে প্রায় একমাস কাটালো। গায়ের

শক্তি ফিরে এলে ক্লেটন আর থুবান একটা উঁচু গাছের ওপর মাচানের মতো বেঁধে থাকবার আশ্রয় তৈরি করে নিল। দিনের বেলায় তারা ফল পাড়ত আর ছোটখাটো জন্তু শিকার করত। গাছের ওপরে দুটো ঘর বানানো হয়েছিল, একটাতে জেন শুত আর অন্যটাতে ক্লেটন আর থুবান। গাছের ওপর থাকাতে নিচের হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকেও রক্ষা পেয়েছিল।

প্রথম থেকেই থুবান তার আসল স্বভাবের পরিচয় দিতে লাগল। জেনের প্রতি অশোভন ব্যবহারের জন্য তো ক্লেটনের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতিই লেগে গিয়েছিল। এই সময় জেন প্রায়ই টারজানের কথা ভাবত। আজ যদি সে কাছে থাকত তাহলে তাদের এই কষ্ট সহ্য করতে হত না।

একবার যখন ক্লেটন নদীতে খাবার জল আনতে গিয়েছিল তখন থুবানের অভদ্র ব্যবহারে রাগ করে জেন বলে উঠল, 'আপনার ভাগ্য ভালো যে মিঃ টারজান আজ উপস্থিত নেই।'

—'আপনি সেই বন্য জন্তুটাকে চেনেন নাকি?'

—'আমি তাকে চিনি, সে হল পুরুষ-শ্রেষ্ঠ।'

তার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যেটা থুবানের হিংসার দাবানলে ঘি ঢালবার মতো হল। সে নির্মমভাবে বলতে লাগল, 'সে শুধু একটা বুনো শূওর নয়, একটা কাপুরুষ। সে একজন মহিলার জীবনে কলঙ্ক এনে ধরা পড়ে গিয়ে তার স্বামীর কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিল তার কোনো দোষ নেই। তাতে ফল হয় নি বলে সে ফ্রান্স ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, পাছে মহিলার স্বামীর সঙ্গে ডুয়েল লড়তে হয়। যে জাহাজে মিস্ স্ট্রং আর আমি ছিলাম, সেই জাহাজে সে-ও একজন যাত্রী ছিল। আমার খবর ভুল নয় কারণ যে মহিলার কথা আমি বললাম সে আমার নিজের ভগ্নী।

'এ ছাড়া আরো একটা খবর আমি জানি সেটা কাউকে আমি এতদিন বলিনি। সেটা হল টারজান নিজেই ভয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েছিল কারণ আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম। আর আমার বোনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলাম।'

সব শুনে জেন হেসে বলল, 'আমি টারজানকে যে-রকম ভাবে চিনি আর আপনাকে এক'দিনে যে রকম চিনেছি, তাতে একবারও ভাববেন না, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করেছি।'

থুবান জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কেন সে একটা ছদ্মনামে ভ্রমণ করছিল?'

—'আমি তা-ও বিশ্বাস করি না।' জেন পোর্টার যদিও মুখে এ কথা বলল, তবুও তার মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগল, কারণ তার বন্ধুও টারজানকে জন কলড্-ওয়েল নামে জানত।

জেন পোর্টারদের এই সামান্য জংলী আবাসের মাত্র পাঁচ মাইল উত্তরে কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখের অগোচরে টারজানের সেই ক্যাবিনটা ছিল। আর তার থেকেও কয়েক মাইল দূরে সমুদ্রের তীর ধরে গেলে দেখতে পাওয়া যেত একটা মজবুত গোছের আস্তানা। এই আস্তানায় 'লেডি অ্যালিস্' জাহাজের বাকি আঠারো জন যাত্রী বাস করছিল।

এদের প্রতি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না ছিলেন কারণ জাহাজ-ডুবির মাত্র তিন দিন পরেই এরা সকলে ডাঙা খুঁজে পেয়েছিল। পথে কোন রকম কষ্টই তাদের হয়নি। তাছাড়া জাহাজ থেকে সব রকম হাতিয়ার নামিয়ে লর্ড টেনিংটনের নৌকোয় রাখা হয়েছিল বলে তাদের নিজেদের নিরাপত্তার ভাবনা ভাবতে হয়নি। সকলে ধরেই নিয়েছিল যে তাদের মতো ক্লেটনের নৌকোটাও নিরাপদে ডাঙায় এসে পৌঁছতে পেরেছে।

শুধু প্রোফেসর পোর্টারকে নিয়েই হয়েছিল মুস্কিল। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে জেন, ক্লেটন আর থুবান কোথাও নিরাপদে রয়েছে। তাই মন থেকে সব দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়ে, এখন নানা গভীর অথচ দুর্বোধ্য সব বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে ডুবে থাকতেন। বহির্জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতেন না। তার সেক্রেটারি মিঃ ফিনাণ্ডার ক্লান্ত হয়ে একদিন লর্ড টেনিংটনকে বললেন, 'এর আগে প্রোফেসর কখনো এত সমস্যা উপস্থিত করেন নি। এই তো, আজ সকালেই আমি মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য অন্য কাজে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি তিনি উধাও। কোথায় পেলাম জানেন? সমুদ্রের বুকে, ডাঙা থেকে প্রায় এক মাইল দূরে একটা ছোট্ট ডিঙিতে করে ভেসে চলেছেন। আরেকটি নৌকো করে গিয়ে দেখি একই জায়গায় তিনি বারবার ঘুরছেন, কিন্তু আমাকে দেখে রাগ করে বললেন যে তিনি কোনো জটিল সমস্যার সমাধানের সুবিধার জন্য নিউ ইয়র্কের একটা বিশেষ জায়গা থেকে কাগজপত্র আনতে যাচ্ছেন। আমার এই বাধা দেওয়ার ফলে নাকি তাঁর অনেক ক্ষতি হয়ে গেল।'

মিস হেজেল স্ট্রং আর তার মা কিন্তু জেনদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এঁরা দুজনে অত সহজে মেনে

নিতে পারছিলেন না যে তাদের কোনো জাহাজ তুলে নিয়েছে, কিম্বা সহজেই ডাঙার সন্ধান তারা পেয়ে গেছে। জেনের বুড়ি দাসী এসথরেল্ডা প্রায়ই তার কথা ভেবে কান্নাকাটি করত।

জাহাজের মালিক লর্ড টেনিংটন এখানেও আগের মতোই সদা-প্রফুল্ল কর্তা হয়ে রইলেন। তিনি দৃঢ় হাতে সকলের ভালো-মন্দর ভার তুলে নিলেন।

কিন্তু এই সুরক্ষিত দল যদি জেনদের এখন দেখতে পেত তাহলে কি সহজে চিনতে পারত? ক্লেটন আর থুবানের এখন অর্ধউলঙ্গ অবস্থা আর জেনের কাপড়-চোপড়ও শতছিন্ন।

হাতে অনেক সময় থাকাতে ক্লেটন মৃত জন্তুজানোয়ারের চামড়া দিয়ে এক রকম লজ্জা নিবারণী পোষাক তৈরি করতে পেরেছে। সেটা পরলে হাঁটু অবধি লম্বা হাতকাটা কামিজের মতো দেখাত। পোষাকের রঙটা এক অদ্ভুত রকমের, কারণ ছোট বড় নানা জন্তুর চামড়া দিয়ে সেটা তৈরি। তার দেখাদেখি থুবানও সেই রকম একটা পোষাক তৈরি করেছিল, ফলে তাদের দুজনকে আফ্রিকার জঙ্গলের দুটি আদিম অধিবাসীর মতো দেখাচ্ছিল। থুবানের ব্যবহারও প্রায় সেই রকমই হয়ে এসেছিল।

এই ভাবে দুমাস কেটে যাবার পর একদিন তাদের মহা সংকটে পড়তে হল।

থুবানের জ্বর হওয়াতে সে গাছের ওপরের আশ্রয়ে শুয়ে ছিল আর ক্লেটন খাবারের খোঁজে জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূর গিয়েছিল। সে ফিরে আসছে দেখে জেন এগিয়ে গেল। কিন্তু ক্লেটন একা ফেরেনি। তার পিছনে গুড়ি মেরে আসছিল এক বৃদ্ধ অথচ ধূর্ত সিংহ। শরীরের জরার জন্য সে আর সহজে শিকার করতে পারে না। এতদিন পর সে দুর্বল মানুষের সন্ধান পেয়েছে। আজ তার পেট ভরে আহার করবার দিন।

ক্লেটন এসব কিছুই জানত না, তাই সে নির্ভয়ে জেনের দিকে এগিয়ে এল। তার কাঁধের ওপর দিয়ে জেন সিংহের লালচে মাথা আর নিষ্ঠুর হলদে চোখ দেখতে পেল। পর মুহূর্তে সিংহটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল।

ভয়ে জেনের গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না, কিন্তু তার আতঙ্কিত দৃষ্টির ওপর চোখ পড়াতে, ক্লেটন পিছন ফিরে তার কারণ বুঝতে পারল। তার থেকে মাত্র ত্রিশ পা দূরে সিংহটা আসছে। সে-ও ঐ সমান দূরে রয়েছে তাদের গাছের ওপরের আশ্রয় থেকে। তার হাতে শুধু একটা মজবুত লাঠি। যেটা সিংহের শক্তির কাছে কিছুই নয়।

সিংহটা এবার শিকারের নেশায় গগনভেদী গর্জন করে উঠল আর ক্লেটন জেনকে ডেকে বলল, 'জেন, পালাও! গাছের ওপরে উঠে আশ্রয় নাও।'

কিন্তু জেন এক পা-ও নড়তে পারল না। তার চলবার শক্তি চলে গিয়েছিল, সে পলকহীন চোখে আসন্ন মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে রইল।

সিংহের গর্জনে গাছের ওপর থুবানের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে নিচে তাকিয়ে সব ব্যাপরটা বুঝতে পেরে রাশিয়ান ভাষায় চিৎকার করতে লাগল, 'পালাও, পালাও, তা না হলে আমাকে এই জায়গায় একা থাকতে হবে।' বলে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগল।

এই নতুন গলার স্বরে সিংহটা মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হল। কিন্তু ক্লেটন তার দিকে পিঠ করে মুখ ঢেকে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগল। তার এই কাপুরুষতার পরিচয়ে জেন আশ্চর্য হয়ে গেল। আর যে-কেউ হলে যথাসাধ্য নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করত।

সিংহটা এবার শিকারের ওপর ঝাঁপ দেবার জন্য তৈরি হল। জেন হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে ভগবানকে অন্তিম প্রার্থনা জানাতে লাগল। গাছের ওপরে জ্বরে দুর্বল থুবান অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তারপর এক মিনিট দু-মিনিট করে সময় কাটতে লাগল, কিন্তু কই সিংহ তো লাফাচ্ছে না? ক্লেটনও প্রায় অজ্ঞান। জেন আর সহ্য করতে না পেরে চোখ তুলে তাকাতে অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেল।

সে ফিসফিস করে ডাকল, 'উইলিয়ম, তাকিয়ে দেখ।'

তারা দুজনে সিংহের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেটা মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে আর তার গায়ে বিঁধে রয়েছে বিরাট এক বর্শা।

জেন পোর্টারের পা কাঁপছিল। ক্লেটন আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে একটা অদ্ভুত উন্মাদনার বশে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে গেল। কিন্তু জেন তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ও রকম কোরো না উইলিয়ম। এই কয়েক মুহূর্তে আমি যেন হাজার বছর কাটালাম! মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে বাঁচতে শিখলাম। কিন্তু এখন আমি আর একটা ভুলের মাধ্য থাকতে চাই না। গত কয়েক মুহূর্তে আমি বুঝলাম যে নিজেকে ঠকানো আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। তোমাকে বিয়ে করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। সভ্য জগতে ফিরে গেলেও নয়।'

ক্লেটন বলে উঠল, 'জেন, তুমি কি বলছ তা নিজেই জানো না। আজ তুমি অপ্রকৃতিস্থ—কাল আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

জেন বলল, 'বহুদিন পরে আজ আমি প্রকৃতিস্থ। আজকের এই ঘটনা আমাকে মনে করিয়ে দিল যে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে যে বীর সে আমাকে ভালোবেসে আমার জীবন সার্থক করেছে। আজ সে মৃত, তাই আমি আর কাউকে বিবাহ করতে পারব না। আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছ।'

—'হ্যাঁ।' আরক্ত মুখে ক্লেটন উত্তর দিল।

এর পরদিনই তাদের সামনে মহা দুর্যোগ উপস্থিত হল।

প্রধানা পূজারিণী লা যখন টারজানের জন্য আহার আর পানীয় নিয়ে এল, তখন রাত বেশ গভীর হয়েছে। সে সঙ্গে কোনো আলো আনেনি তাই অন্ধকারে হাতড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সেখানে ছাদের জাফরী দিয়ে খানিকটা চাঁদের আলো এসে পড়েছিল।

লা বলল, 'সকলে অত্যন্ত রেগে আছে কারণ এই প্রথম তাদের বলিদানের বেদী থেকে কেউ পালিয়ে গেল। অন্ততঃ পঞ্চাশজন তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। শুধু এই ঘর ছাড়া তারা সমস্ত মন্দির তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।'

—'এখানে কেন তারা আসে না?' টারজন প্রশ্ন করল।

—'এই ঘরের নাম মৃতদের ঘর। এখানে বিদেহীরা দেহীদের বলিদান করে। এই যে বেদী দেখছ, এর ওপর কাউকে পেলে তাকে মেরে ফেলে। এখানে কেউ এলেই বিদেহীরা তাকে বলিদান দেয়।'

—'কিন্তু তুমি?'

—'আমি প্রধানা পূজারিণী। আমার কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। আমিই মাঝে মাঝে একজনকে এখানে বলিদানের জন্য নিয়ে আসি, তাই আমার কোনো ভয় নেই।'

—'কিন্তু আমাকে কেন তারা ধরেনি?'

তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে লা বলল, 'প্রধানা পূজারিণীর কর্তব্য হল সকলকে শিক্ষা দেওয়া, বোঝানো। যে সব লেখা আছে তার মানে বুঝিয়ে দেওয়া। কিন্তু কোথাও লেখা নেই যে পূজারিণীকেও সে-সব বিশ্বাস করতে হবে। যে যত গভীরভাবে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে তার মন ততই অবিশ্বাস করে। এখানে আমার মতো লেখাপড়া জানা আর কেউ নেই।'

—'তাহলে তোমার ভয় শুধু স্বজাতিকে? তারা যদি টের পেয়ে যায় তুমি আমাকে পালাতে সাহায্য করেছ, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না, এই তো?'

—'ঠিক তাই। যারা মৃত তারা কখনও ফিরে আসে না—তারা কারো ক্ষতিও করে না, সাহায্যও করে না। তাই এখন আমাদের নিজের বুদ্ধির ওপর ভরসা করে কাজ করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তোমার জন্য খাবার আনতেই কত অসুবিধা। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে রোজ আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমার সঙ্গে এসো। দেখি কতদূর নিয়ে যেতে পারি আজ রাত্রেই।'

লা টারজানকে নিয়ে অনেক অলিগলি ঘুরে চাবি দিয়ে একটা দরজা খুলে বলল, 'কাল রাত পর্যন্ত এখানে নিরাপদে থাকতে পারবে।'

তারপর সে চলে গিয়ে দরজার বাইরে থেকে চাবি দিয়ে দিল।

ঘরের ভিতর পুঞ্জীভূত অন্ধকার, কিচ্ছু দেখা যায় না। অতি সাবধানে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে টারজান একটা দেয়াল পেল। তারপর সেটা ধরে চারদিকে হেঁটে অনুমান করল ঘরের আয়তন কুড়ি ফুট চৌকোণা। মাটি কংক্রিটের তৈরি আর দেয়াল ছোট বড় গ্র্যানাইট পাথর দিয়ে তৈরি। কোথাও চূণসুরকির ব্যবহার হয় নি। খাঁজে খাঁজে পাথর বসিয়ে নিপুণভাবে সে যুগের কারিগররা এই মন্দির তৈরি করেছিল।

ঘরের চারদিকে ঘুরে দেখবার সময় টারজান একটা আশ্চর্য ব্যাপার আবিষ্কার করল। ঘরের যে দিকের দেয়ালে দরজা তার উল্টো দিকের দেয়ালের মাঝখানে দাঁড়ালে বাইরে থেকে আসা তাজা হাওয়া পাওয়া যায়। হাত দিয়ে দেয়ালের পাথরগুলো দেখতে গিয়ে একটা পাথর খুলে এলো। তখন টারজান একেক করে কয়েকটা পাথর সরিয়ে হাত ঢুকিয়ে ভিতরে কি আছে দেখবার চেষ্টা করতে কিছুরই নাগাল পেল না। বুঝল এর পর কিছুই নেই।

উৎসাহিত হয়ে টারজান অনেকগুলো পাথর সরিয়ে একটা যাবার রাস্তা তৈরি করে নিল। সামনের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল বোধহয় অন্ধকারটা আগের থেকে একটু কম। অতি সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় পনেরো ফুট পর জমি হঠাৎ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সেখানে মেঝের কার্নিশ ধরে নিজেকে লম্বা করে নামিয়েও মাটিতে পা

পৌঁছল না। তখন সে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল একটা গোলাকৃতি খোলা জায়গা দিয়ে তারায় ভরা আকাশ দেখা যাচ্ছে। এবার সে বুঝতে পারল যে চারদিকের দেয়াল একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে মাথার ওপর ঐ খোলার দিকটায় উঠে গেছে। কিন্তু সেখান দিয়ে কি করে পালানো যাবে তাই টারজান ভাবতে লাগল।

এমন সময় মাথার ওপরে চাঁদের মুখ দেখা দিল। আর সেই আলোতে নিচের দিকে তাকিয়ে টারজান জল দেখতে পেলো আর বুঝতে পারল সে একটা অতি প্রাচীন কুয়োর মধ্যে এসে পড়েছে। কিন্তু এই কুয়োর সঙ্গে নিচের সেই চোরা কুঠরির কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

চাঁদের আলোয় আরো দেখল যে যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার উল্টো দিকে আরেকটি সুড়ঙ্গের মুখ। এটাই বোধহয় তার পালাবার আসল পথ। তখন সে তাড়াতাড়ি কুঠরির যে দেয়াল ভেঙে এদিকে এসেছিল সেই দেয়ালে আবার পাথর বসিয়ে বন্ধ করে দিল। চতুর্দিকে ধুলো দেখে বুঝল যে সেখানকার লোকেরা এই গুপ্ত রাস্তার কথা জানে না বা জানলেও ব্যবহার করে না।

টারজান আবার কুয়োর গহ্বরে ফিরে এসে এক লাফে কুয়োটা পার হয়ে গেল। প্রায় পনেরো ফুট মতো তফাৎ। এ গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে যেতে সে অভ্যস্ত, তার পক্ষে এই ব্যবধান পার হওয়া একেবারেই কঠিন নয়।

এবার ওদিকের সুড়ঙ্গ দিয়ে একশ' ফুট যাবার পর সে একটা সিঁড়ি দেখতে পেল, যেটা নিচে নেমে ঘোর অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। অতি সাবধানে বোধ হয় কুড়ি ফুট নামার পর আবার সমান রাস্তা পাওয়া গেল। এই পথ ধরে খানিকটা গিয়ে সামনে একটা ভারি কাঠের দরজা পেল।

টারজানের মনে হল এর পরেই নিশ্চয় বহির্জগৎ। দরজাটা ভিতর থেকে হুড়কো দিয়ে বন্ধ। সেটা খুলে একটু ঠেলা দিতেই একটা বিকট আর্তনাদ করে দরজা খুলে গেল। টারজান অন্ধকারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যদি কেউ সেই আওয়াজ শুনে আসে। কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। চতুর্দিকে ধুলোর প্রলেপ দেখে বুঝল যে এখানেও কেউ আসে না।

টারজান তখন দরজা পেরিয়ে এসে দেখল সেটা একটা বড় হলঘর। আর আবছা অন্ধকারে বুঝল যে ঘরটা সোনার বাট-এ ভর্তি। বাটগুলো অদ্ভুত আকৃতির কিন্তু বেশ ভারি। এত মূল্যবান ধাতু এখানে এভাবে গচ্ছিত আছে দেখে টারজানের একবার সন্দেহ হল যে এগুলো সত্যি সোনা কি না!

ঘরের অন্যদিকে একটা গরাদ দেওয়া দরজা। দরজার পিছনে একটা সরু পথ বরাবর সোজা চলে গেছে। তাই দেখে টারজানের মনে হল সে হয়ত ইতিমধ্যে মন্দিরের বাইরে এসে গেছে। নতুন আশা নিয়ে সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে আধ ঘণ্টা পর একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। এখানকার মেঝে কংক্রিটের নয়, গ্র্যানাইট পাথরের আর সিঁড়িটাও পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা।

দুটো পাথরের দেয়ালের মাঝখানে একটা কার্নিশের মতো জায়গা। মাথার ওপর খোলা আকাশ আর সামনে সিঁড়ির বদলে জমি ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। এইখান দিয়ে ওপরে উঠে টারজান একটা মস্ত বড় গ্র্যানাইট পাথরের ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখল প্রায় এক মাইল দূরে 'ওপার' শহরের ধ্বংসাবশেষ চাঁদের আলোয় ভরে রয়েছে। তারপর হাতের মুঠোয় ধরা সেই একটা বাট-এর ওপর চোখ পড়াতে দেখল চাঁদের আলোয় সেটা ঝলমল করছে। একেবারে খাঁটি সোনা।

যে ঢিপিটার ওপর টারজান দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা ওপার শহর আর যে পাহাড় পেরিয়ে টারজান ওয়াজিরিদের সঙ্গে এসেছিল, তার মাঝখানকার উপত্যকার ঠিক মধ্যিখানে। টারজান আর পিছন দিকে না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

ভোরের আলো যখন চারদিক ছুঁইয়ে সকলের ঘুম ভাঙাতে লাগল, তখন টারজান পাহাড়ের মাথার ওপরকার চ্যাপটা জায়গাটাতে এসে পৌঁছল। তারপর নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল জঙ্গলের গাছের মাথার ওপর দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে।

টারজান চিন্তা করতে লাগল, মানুষের চিহ্ন, কিন্তু এরা কি সেই পঞ্চাশ জন ওপার শহরের যোদ্ধা যারা তার খোঁজে বেরিয়েছিল। পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে সে জঙ্গলের দিকে চলল ধোঁয়া লক্ষ্য করে। তারপর ধোঁয়ার কাছাকাছি এসে সে নিরাপত্তার জন্য একটা গাছে উঠে পড়ল। তারপর অতি সাবধানে কাছে গিয়ে দেখল ধুনী জ্বালিয়ে তার চারপাশে বসে আছে পঞ্চাশ জন ওয়াজিরি যোদ্ধা।

টারজানের ডাক শুনে তারা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর রক্তমাংসে গড়া তাদেরই রাজাকে দেখতে পেয়ে

আনন্দে মুখর হয়ে উঠল।

বাসুলি লজ্জায় অভিভূত হয়ে বলল, 'আমরা কাপুরুষ তাই তোমাকে ভাগ্যের হাতে ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তারপর নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ঠিক করলাম যে তোমার সাহায্যে আবার ফিরে যাবো আর তোমাকে যদি জীবন্ত না পাই তাহলে তোমার খুনীদের ওপর প্রতিশোধ নেবো। আজ আমরা পাহাড় চড়ে ওপারে যাবার তোড়জোড় করছিলাম।'

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি পঞ্চাশ জন অতি কুৎসিত চেহারার লোক এদিকে আসতে দেখেছ?'

—'হ্যাঁ, গতকাল সন্ধ্যের দিকে তারা এদিক দিয়ে গেল। তাদের সত্যিই কুৎসিত চেহারা আর মাঝে মাঝে গোরিলার মতো চারপায়ে হেঁটে যাচ্ছিল।'

এবার টারজান তার অভিজ্ঞতার কথা ওয়াজিরিদের বলল। শেষে সোনার কথা বলাতে, সকলেই রাজি হল সেখানে গিয়ে যতগুলো সম্ভব সোনার বাট নিয়ে আসবে।

সেইদিনই সন্ধ্যের পর টারজান আবার ওয়াজিরি যোদ্ধাদের নিয়ে ওপার শহরের দিকে চলল। তারপর অতি সাবধানে আর প্রচুর সাহসের সঙ্গে সেই গুপ্তপথ দিয়ে তারা যেখানে সোনা রাখা হয়েছিল সেখানে গিয়ে প্রত্যেকে প্রায় আশী পাউণ্ড ওজনের এক একটি বোঝা পিঠে নিয়ে ফিরে এল।

পরদিন দুপুরবেলা তারা পাহাড়ের মাথায় উঠে নিজেদের দেশের দিকে চলল। প্রত্যেকের পিঠে অত ভারি বোঝা থাকাতে পথ অতিক্রম করতে সময় লাগছিল। প্রায় ত্রিশ দিন পর তাদের নিজের এলাকায় পৌঁছল, কিন্তু এখানে টারজান একটু ব্যতিক্রম করল। সে ওয়াজিরিদের নিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে তাদের গ্রামে না গিয়ে বরাবর পশ্চিমমুখী হয়ে চলতে লাগল। তারপর তেত্রিশ দিনের দিন এক জায়গায় ঐ সোনার বোঝা লুকিয়ে রেখে টারজান ওয়াজিরিদের নিজেদের গ্রামে ফিরে যাবার হুকুম দিল। সে নিজে এই জায়গায় কিছুদিন কাটাবে।

তারা চলে যাবার পর টারজান দুই তাল সোনা নিয়ে গাছে চড়ে যেতে যেতে একটা পরিষ্কার জায়গায় এসে পৌঁছল। জায়গাটা গোলাকৃতি, চারিদিক ঘিরে গাছের সারি আর মধ্যিখানে উঁচু একটা মাটির ঢিপি যার মাথাটা সমতল।

জায়গাটা এত গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন যে কেউ-ই প্রায় সেই মজবুত লতাপাতা ভেদ করে আসতে পারে না। টারজান নিজে বহুবার এই গুপ্ত জায়গাটিতে সময় কাটিয়েছে —এখানে জঙ্গলের অতিকায় বনমানুষদের সভা হয়।

সেখানে বহুকাল আগে গাছের ফোকরে লুকিয়ে রাখা একটা কোদাল নিয়ে টারজান একটা পরিখা কেটে, একে একে সমস্ত সোনা এনে সেখানে রেখে গর্ত বুজিয়ে দিল। তারপর সে রাতটা টারজান সেখানেই কাটাল।

পর দিন সকালবেলা অনেক দিন পর সে সমুদ্রের ধারে নিজের ক্যাবিন দেখতে গেল। সেখানে সব ঠিক আছে দেখে, শিকারের জন্য জঙ্গলে ঢুকল। মাইল পাঁচেক এদিক-ওদিক ঘোরার পর হঠাৎ তার নাকে এল মানুষের গন্ধ।

সমুদ্রের দিক থেকে হাওয়া আসছিল তাই মানুষের গন্ধ আসছে পশ্চিম দিকে। আর সেই গন্ধের সঙ্গে মিলে আছে সিংহের গন্ধ।

সময় নষ্ট না করে যখন সে জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছল, চোখের সামনে আশ্চর্য এক দৃশ্য দেখতে পেল। একটি মেয়ে মুখ ঢেকে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে প্রার্থনা করছে, তার সামনে আদিম চেহারার এক শ্বেতকায় পুরুষ হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে আর সকলের পিছনে এক বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত সিংহ গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে। কারো মুখ টারজান এত দূর থেকে দেখতে পেল না।

বিষাক্ত তীর মেরে সিংহকে মারার সময় নেই দেখে গায়ের জোরে সে হাতের বর্শা ছুঁড়ে মারল। অব্যর্থ লক্ষ্য। কোনো আওয়াজ না করে সিংহটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

তখন মেয়েটি মুখ তুলে তাকাতেই টারজানের মাথা ঘুরে গেল। এ যে তার প্রিয়তমা জেন পোর্টার! মেয়েটি উঠে দাঁড়াতে লোকটি এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে গেল। টারজানের চোখ লাল হয়ে উঠল। সে ধনুকে বিষাক্ত তীর লাগিয়ে টান দিল কিন্তু পরক্ষণেই সেটা নামিয়ে নিয়ে মাথা নিচু করে, ধীর পায়ে, ভগ্ন হৃদয়ে জঙ্গলে ঢুকে ওয়াজিরি গ্রামের দিকে চলে গেল।

মৃত সিংহটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর জেন পোর্টার জিজ্ঞাসা করল, 'কে হতে পারে?'

—'ভগবান জানেন।' ক্লেটন উত্তর দিল।

—'যদি বন্ধু হয়ে থাকে তাহলে দেখা দিচ্ছে না কেন? তাকে ডেকে অন্ততঃ ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

ক্লেটন অনেকবার ডাকল, কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। তখন তারা নিজেদের আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া ঠিক করল।

ক্লেটন নিজের কাপুরুষতার জন্য মর্মাহত, জেন তাকে সান্ত্বনা দিল, তবে এ-ও বলল তাদের বিবাহ এখন অসম্ভব ব্যাপার। ক্লেটন সায় দিয়ে বলল যে এ বিষয়ে যতদিন না তারা সভ্য জগতে ফিরে যাচ্ছে ততদিন আর কিছু উত্থাপন করা হবে না।

পরের দিন থুবানের অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল। সে ক্রমাগত ভুল বকতে লাগল। ক্লেটন আর জেন তার কষ্ট লাঘব করার কোনো উপায় পেল না।

ক্লেটন মৃত সিংহের দেহ থেকে বর্শাটা টেনে নিয়ে জঙ্গলে শিকারের আশায় গেল আর জেন একা মুমূর্ষু থুবানের পাশে বসে না থেকে, গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চিন্তায় মগ্ন হল।

এমন সময় জঙ্গলের গাছপালা সরিয়ে কয়েকটা বিকট কদাকার মূর্তির আবির্ভাব হল। তাদের দিকে জেন পিঠ ফিরিয়ে বসে ছিল বলে সে কিছুই দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ পরে একটা আওয়াজে ফিরে তাকাতে ঐ অদ্ভুত মূর্তিগুলো দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গোরিলার মতো লোমশ হাত এসে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলল। তার মুখের ওপর একটা নোংরা থাবা চেপে ছিল। বেচারা জেন মানুষের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছিল, তাই সে এবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

যখন তার আবার জ্ঞান হল, দেখল, সে গভীর জঙ্গলের ভিতর একটি খোলা জায়গায় শুয়ে আছে। রাত হয়ে গেছে আর আগুন জ্বালিয়ে তার চারিদিক ঘিরে বসে আছে পঞ্চাশটি অতি ভয়াবহ মূর্তি। তাদের মাথা মুখ চুলে ভরা, লম্বা হাতগুলো বেঁটে বেঁটে পায়ের ওপর ভর দিয়ে আছে। বুনো জন্তুর মতো তারা কি যেন চিবিয়ে খাচ্ছে।

তার জ্ঞান ফিরেছে দেখে ঐ বুনো লোকরা তার দিকে মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিল, কিন্তু জেনের সর্বাঙ্গ ঘেন্নায় কেঁপে ওঠাতে সে আবার চোখ বন্ধ করল।

বহুদিন ধরে তারা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল। ক্লান্ত দেহে ব্যথা-ভরা পায়ে কোনো রকমে হেঁচড়ে হেঁচড়ে জেন পথ চলছিল। পড়ে গেলে বুনো জন্তুর মতো প্রাণীগুলো তাকে থাপ্পড় মেরে বা লাথি মেরে ওঠাতো।

তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার বহু আগেই জেনের জুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল আর তার পোষাক জীর্ণ চীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পর এমন সময় এল হাজার বার মার খাওয়া সত্ত্বেও জেন আর উঠতে পারল না। তখন সেই জীবগুলো নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে তাকে কাঁধে নিয়ে চলল।

একদিন বিকেলবেলা জেন দেখল তারা একটা শহরের ধ্বংসাবশেষের কাছে পৌঁছেছে। ভেঙে-পড়া বাড়িগুলোর ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে কয়েকজন মেয়েকে দেখে জেনের মনে আশার সঞ্চার হলো, কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী কারণ এরা তাকে কোনো ভাবে সাহায্য তো করলই না, উল্টে গালাগালি দিতে লাগল।

সকলের তাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করা হয়ে যাবার পর তাকে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে একটা খাবারের আর একটা জলের পাত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

এক সপ্তাহ ধরে তাকে এই ঘরে রেখে, আহার-পানীয় দিয়ে শক্তি বাড়ানো হল। শিগ্‌গীরই সে সূর্যদেবের বলিদানের উপযুক্ত পাত্রী হয়ে উঠবে। সৌভাগ্যবশতঃ জেন নিজে তার এই পরিণামের কথা কিছুই জানত না।

এদিকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরে যেতে যেতে টারজানের মন পুরনো ব্যথায় ভরে উঠল। তার সেই মুহূর্তের পাগলামিকে যে দমন করতে পেরেছিল তার জন্য সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে যে তার প্রিয়তমা, তার জেনকে অন্য পুরুষের হাতে দেখল এ কষ্ট ভোলা অত্যন্ত মুস্কিল।

হঠাৎ তার মানুষের সান্নিধ্য অসহ্য লাগল। জঙ্গলের বন্যজন্তুদের মতো নিজের দুঃখ-কষ্ট একা নিভৃতে সহ্য করতে চাইল। এই জন্য সে-রাত টারজান সেই বনমানুষদের সভাস্থানে কাটাল। সেখান থেকেই সে শিকার করত আর সেখানেই আবার ফিরে আসত।

তৃতীয় দিন শিকার থেকে আগে ফিরে সে নরম ঘাসের ওপর শুয়ে ছিল এমন সময় তার কানে এলো একদল বনমানুষ জঙ্গল ভেদ করে এই দিকেই আসছে। তারা কাছে আসতেই টারজান অন্যদিকের গাছে লুকিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

বনমানুষের দল অতি সন্তর্পণে সেখানে এসে নিরাপদ দেখে সভা আরম্ভ করল। আজ তারা নতুন দলপতি

নির্বাচন করবে কারণ আগের দলপতি গাছ থেকে পড়ে মরে গেছে। দলের অনেককে টারজান চিনতে পারল কারণ এদের কাছেই সে শিশু বয়সে এসেছিল। এদের মধ্যেই সে মানুষ হয়েছিল।

টারজান তখন একটা গাছের ডালে গিয়ে বসল যেখানে তাকে সকলে দেখতে পায়। প্রথমে একটা মেয়ে-বনমানুষী তাকে দেখতে পেয়ে বাকিদের ডেকে দেখাল। দলের পুরুষ বনমানুষরা তাকে দেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল।

টারজান ডেকে বলল, 'কারনাথ, আমি টারজান। আমাকে চিনতে পেরেছ? আমরা একসঙ্গে খেলা করতাম, সিংহদের জ্বালাতন করতাম।'

তারপর আরেকজনকে বলল, 'আর মাগোর, তোমার আগের নেতাকে চিনতে পারছ না, যে কেরচাককে মেরেছিল। আমিই সেই টারজান।'

বনমানুষরা সকলে এবার এগিয়ে এল। তারপর কারনাথ নামের বনমানুষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি চাও?'

—'শুধু শান্তি।'

—'বেশ, শান্তিতে আমাদের কাছে এসো, টারজান।'

বনমানুষরা তাকে উচ্ছ্বসিত ভাবে আলিঙ্গন বা অভিনন্দন জানাল না—সেটা তাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। দু-একটা জোয়ান বনমানুষ বরং তার দিকে তেড়ে এলো। টারজান তাতে এতটুকু না ঘাবড়ে আচ্ছা করে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে মারপিট, কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে গেল। ক্রমশঃ জোয়ান বনমানুষটা টারজানের অসীম শক্তির কাছে হার মেনে গেল।

এরপর বেশ কিছুদিন শান্তিতে টারজান এই বনমানুষের দলের সঙ্গে কাটালো। কিন্তু তার মনের পিছনে সব সময় জেনের কথা আর উপস্থিতি উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। যতই জেনের কথা মনে হতে লাগল ততই তার বিবেক দংশন করতে লাগল, কারণ জেনের পরনে ছিল ছেঁড়া কাপড় আর চেহারা একেবারে দুর্বল। তবুও টারজান তাকে সাহায্য না করে চলে এসেছে। সে ঠিক করল ফিরে গিয়ে জেন আর ক্লেটনকে সাহায্য করবে। কিন্তু বাধা পড়ল।

একদিন একটি জোয়ান বনমানুষ এসে খবর দিল যে সে জঙ্গলের মধ্যে একদল অদ্ভুত রকমের বনমানুষকে দেখতে পেয়েছে আর তারা একটি সাদা চামড়ার মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। টারজান তাকে প্রশ্ন করে সব বুঝতে পেরে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে হাওয়ার গতিতে ওপার শহরের দিকে এগিয়ে চলল।

ক্লেটন আশ্রয়ে ফিরে এসে জেনকে দেখতে না পেয়ে ভয়ে আর দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেল। থুবানের জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কিছু বলতে পারল না। যদি থুবান সত্যি সত্যি এত দুর্বল না হত, তাহলে ক্লেটন হয়তো তার কথা বিশ্বাসই করত না।

সন্ধ্যে পর্যন্ত ক্লেটন আশপাশের জঙ্গল খুঁজে বেড়াতে লাগল কিন্তু শেষ অবধি তাকে আশ্রয়ে ফিরে আসতেই হল। কারণ তার ডাকাডাকিতে একটা সিংহ তার পাছু নিয়েছিল। এভাবে অনেক খুঁজেও জেনকে পাওয়া গেল না।

এদিকে থুবানের শরীর যত ভালো হতে লাগল, ক্লেটনের শরীর ততই ভেঙে গেল। সে জ্বরে পড়ল, ভুল বকতে লাগল, কিন্তু থুবান একবারও তাকে সাহায্য বা সেবা করতে এল না। খাবার সে খেতে পারত না, জল-তেষ্টায় তার ছাতি ফেটে যেতে লাগল। একদিন থাকতে না পেরে থুবানের কাছে জল চাইলে সে নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলল, 'তুমি আমাকে জেনের সামনে অপমান করেছ। আমার কাছ থেকে তাকে সব সময় সরিয়ে নিয়ে গেছ! এখন জল চাইছ আমার কাছ থেকে? এই নাও জল—' বলে পাত্র থেকে খানিকটা জল নিজে খেয়ে বাকিটা মাটিতে ফেলে দিয়ে অসুস্থ ক্লেটনকে একা ফেলে রেখে সেখান থেকে চলে গেল।

পরদিন থুবান ক্লেটনের বর্শা চুরি করে সমুদ্রের ধার ধরে উত্তর দিকে চলতে লাগল। তারপর সে টারজানের ক্যাবিনে পৌঁছে কয়েকদিন সেখানে আরামে কাটালো।

ক্যাবিনের মালিক কে তা যদি জানতে পারত আর টের পেত যে সে এই জঙ্গলেই রয়েছে তাহলে থুবান নিঃসন্দেহে সেখান থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করত!

অন্যদিকে লর্ড টেনিংটনের ক্যাম্পে সকলে আরো মজবুত আরো পাকা করে থাকার জায়গার বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত। জেনের কথা সকলেরই মনে হত কিন্তু প্রোফেসরের সামনে কেউ কিছু বলাবলিও করত না। অবশ্য তিনি যেরকম আপনভোলা লোক, দিনক্ষণের অত খেয়ালও রাখতেন না। মাঝে মাঝে সকলকে ডেকে বলতেন যে শিগ্‌গীরই একটা জাহাজ তাদের ঘাটে এসে লাগবে, কিম্বা

ট্রেনের আসার দেরি হচ্ছে, কারণ কোথাও নিশ্চয় একটা বরফের ঝড় চলছে।

লর্ড টেনিংটন একদিন মিস স্ট্রংকে বললেন, 'আমি যদি প্রোফেসরকে ভালো করে না চিনতাম, তাহলে মনে করতাম তিনি ঠিক প্রকৃতিস্থ নন।'

দুঃখিত হয়ে হেজেল স্ট্রং বলল, 'ব্যাপারটা সত্যিই অত্যন্ত করুণ। আমি জানি প্রোফেসর তাঁর মেয়েকে অত্যন্ত ভালবাসেন, কিন্তু তাঁর হাবভাবে অন্যান্যরা তাকে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবতে পারে। তিনি নিজে এত খেয়ালী যে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সেটাকে কিছুতেই মেনে নিতে চান না।'

যত দিন যেতে লাগল লর্ড টেনিংটন হেজেল স্ট্রং-এর বুদ্ধি-বিবেচনায়, আচার ব্যবহারে, বহু বিপত্তির সামনে পড়েও তার শান্ত স্থির রূপ দেখে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন। এতে অবশ্য নিজের ওপরে রাগই হত, কারণ মিঃ থুবান বলেই ফেলেছিলেন যে তাঁর সঙ্গে মিস স্ট্রং-এর বিবাহ প্রায় স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর মনে হত যে থুবানের কথা ঠিক না-ও হতে পারে কারণ হেজেল স্ট্রং-এর ভাবভঙ্গীতে সে-বিষয়ে কিছু বুঝতে পারা যেত না।

একদিন আর থাকতে না পেরে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করাতে মিস স্ট্রং বলল, 'মিঃ থুবানের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল তবে খুবই কম সময়ের জন্য।'

—'আপনি কি তাকে বিবাহ করবেন?'

—'মোটেই না। আমি তাকে সে-চোখে কখনও দেখিনি।'

লর্ড টেনিংটনের আরো কিছু বলার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাধো-বাধো ঠেকতে আর কিছু বললেন না। আর সেই মুহূর্তে তাদের সামনে এক অদ্ভুত প্রাণীর আবির্ভাব হওয়াতে আর কোনো কথাও হল না।

একটি অর্ধনগ্ন, মুখ ভর্তি দাড়ি, লম্বা চুলের লোক দেখতে পেয়ে লর্ড টেনিংটন পিস্তলের ওপর হাত দিলেন, তারপর শুনতে পেলেন লোকটা তাঁরই নাম ধরে ডাকছে। তাকে চিনতে পেরে অন্যরা আসার আগে টেনিংটন আর হেজেল স্ট্রং বাকি দুজনের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

থুবান বলল, 'বাকী সকলে মরে গেছে। তিনজন নাবিক ডাঙায় পৌঁছবার আগেই মারা গিয়েছিল। আমার যখন ভীষণ জ্বর হয়েছিল তখন মিস পোর্টারকে জঙ্গলের হিংস্র জানোয়াররা ধরে নিয়ে গিয়েছে আর কিছুদিন আগে ক্লেটন ঐ জ্বরেই মারা গিয়েছে।'

এবার দেখা যাক, ওপার শহরের সেই অন্ধকার কুঠরিতে জেন পোর্টারের কি অবস্থা হল।

রোজ একটি মেয়ে জেনের জন্য খাবার দিতে এসে তাকে উঠে দাঁড়াতে বলত, কিন্তু জেন মাথা নেড়ে জানাতো যে সে এখনও খুব দুর্বল। ক্রমশঃ তার জ্বর ছেড়ে যাওয়াতে শারীরিক শক্তিও ফিরে আসতে লাগল। তারপর যখন সে দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারল তখন তারা আশান্বিত হয়ে উঠল! দিন ঘনিয়ে আসছে।

সেই দিনটি সত্যিই ঘনিয়ে এল। একটি অচেনা মেয়ে এসে অন্যদের সঙ্গে সেই ঘরে এক ধর্ম-অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। তারপর সেই ঘর থেকে জেনকে বের করে নিয়ে একটা লম্বা অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে আলোয় উজ্জ্বল চত্বরে এসে থামল। এতক্ষণ জেনের মনে অন্য ধারণা ছিল, কিন্তু এখন চত্বরের মাঝখানে একটি বেদীতে কালো কালো দাগ দেখতে পেয়ে তার মনে ঘোরতর সন্দেহ জন্মাল। সঙ্গে সঙ্গে যখন তাকে সেই বেদীতে শুইয়ে দেওয়া হল তখন সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল, আর প্রধানা পূজারিণীর হাতের তীক্ষ্ণ ছুরি যখন ওপর দিকে উঠে ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগল তখন জেন চোখ বুজে নিঃশব্দে ভগবানের কাছে তার শেষ প্রার্থনা জানাতে লাগল।

এদিকে সমস্ত দিন ও সারা রাত ধরে ঝড়ের বেগে পথ চলে টারজান ওপার শহরে এসে পৌঁছল। জেন পোর্টারের আক্রমণকারীদের যে পথ যেতে প্রায় এক সপ্তাহ লেগেছিল, টারজানের মাত্র এক দিন আর এক রাত লাগল। কারণ সে একবারও মাটিতে না নেমে গাছের মাথায় মাথায় লাফিয়ে চলে গেছিল।

বনমানুষটার কাছে খবর পাওয়ার পর থেকে সে বুঝতে পেরেছিল যে সাদা চামড়ার মেয়ে জেন ছাড়া আর কেউ হতে পারে না, আর 'অন্য রকমের বনমানুষ' সেই ওপার শহরের অধিবাসীরা ছাড়া আর কেউ-ই নয়। জেন পোর্টারের কি শোচনীয় অবস্থা হবে ঐ জায়গায় পৌঁছবার পর, সে-কথা টারজান চিন্তাও করতে পারছিল না।

শেষে টারজান সেই বড় পাথরের ঢিপিটায় পৌঁছে, সেখান থেকে দ্রুত পায়ে শহরের মধ্যে গুপ্ত পথ দিয়ে ঢুকে পড়ল। তার মনে শুধু এখন একটিমাত্র চিন্তা। সেটা হল সময়মত জেনের কাছে পৌঁছতে পারবে কিনা? তবে এ-ও

জানত যে যদি জেনের মৃতদেহ পায় তাহলে সে পাগল হয়ে ওপারের সমস্ত লোককে ধ্বংস করে ফেলবে এটা নিশ্চিত।

একটা ধূর্ত বেড়ালের মতো অতি সাবধানে অথচ দ্রুত গতিতে সে সেই পুরনো কুয়োর ধারে এসে পৌঁছে গেল। পৌঁছতেই তার কানে ভেসে এল পরিচিত মন্ত্রোচ্চারণের আওয়াজ।

জেনের প্রাণের ভয় বোধ করি টারজানকে দ্বিগুণ শক্তি দিল। এক লাফে কুয়ো পার হয়ে সে অন্ধকার কুঠরির কৃত্রিম দেয়াল কাঁধের ধাক্কায় এবার ধ্বংসই করে ফেলল! কিন্তু মাটির তলার কুঠরির অন্য দিকের গরাদ দেওয়া দরজাটা এত মজবুত যে টারজানের অসীম শক্তিও তার কাছে হার মানল।

এ ছাড়া আর একটা পথই আছে চত্বরে পৌঁছবার। সেটা একমাইল দূরে, মন্দিরের বাইরে থেকে, যেখান দিয়ে টারজান প্রথম এ শহরে এসেছিল। কিন্তু সেখানে যাবার সময় নেই।

খানিকক্ষণ চিন্তা করবার পর টারজানের মাথায় একটা উপায় এলো। সে ভাঙা দেওয়াল থেকে একটা বড় দেখে পাথর তুলে নিয়ে আবার কুয়োটার কাছে ফিরে এলো। সেখানে আসতেই ওপর থেকে মন্ত্রোচ্চারণের আওয়াজ আরও স্পষ্টভাবে শুনতে পেলো। এবার সময় নষ্ট না করে, কাঁধে জড়ানো দড়ির মুখে ঐ ভারি পাথরটা বেঁধে সে দড়িটাকে ওপর দিকে কুয়োর মুখে একটু টেরচা করে ছুঁড়ে দিল। পাথরসুদ্ধ দড়িটা কুয়োর বাইরে চলে গেল।

টারজান যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে কুয়োর মুখ প্রায় কুড়ি ফিট ওপরে, এটা সে আগের বারেই ঠাহর করেছিল। পাথরটা বাইরে কোথাও নিশ্চয় আটকে যাবে, এই মনে করে সে দড়িতে টান দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল। কিন্তু হায়! দড়িটা সড়সড় করে ক্রমাগত নেমে আসতে লাগল আর টারজান কুয়োর কালো গহ্বরের ওপর ঝুলতে লাগল। দড়ি অল্প অল্প করে নামতে লাগল—টারজান কি তাহলে কুয়োর নিচের অজ্ঞাত অন্ধকারে হারিয়ে যাবে?

কয়েক মুহূর্তের জন্য টারজানের মনে ভয় হয়েছিল, যখন সে টের পেল যে দড়ি ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে আসছে। তারপর হঠাৎ দড়ি সোজা হয়ে আটকে গেল—কুয়োর মুখে কিছুর সঙ্গে আটকিয়ে গিয়েছে। খুব সাবধানে দড়ি বেয়ে টারজান ওপরে উঠে দেখে সেই জায়গাটা খালি। কিন্তু বলিদানের চত্বর থেকে মন্ত্রোচ্চারণের আওয়াজ আসছে। সকলে সেখানে জমায়েত হয়েছে, তাদের নাচও শেষ হয়েছে। এবার প্রধানা পূজারিণীর তীক্ষ্ণ ছুরি অভাগা বলির ওপর নেমে আসার পালা।

ভাগ্যদেবী টারজানের পায়ে বোধ হয় বিদ্যুতের গতি এনে দিলেন। সে বলিদানের বেদীর কাছে পৌঁছে জীর্ণ-শীর্ণ জেনের করুণ মুখখানি দেখতে পেয়ে রাগে অন্ধ হয়ে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজনের কাছ থেকে মুগুর কেড়ে নিয়ে তাই দিয়ে যাবার পথ তৈরি করে নিতে লাগল।

লা-র কাছে পৌঁছতে, লা-র মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কি ভাবে টারজান সেই চোরা কুঠরি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তা সে বুঝতে পারেনি, কারণ আসলে তার নিজের কোনো ইচ্ছাই ছিল না টারজানকে মুক্তি দেবার। টারজানের অত সুন্দর সুঠাম চেহারাকে পূজারিণীর চোখে সে দেখেনি, দেখেছিল টারজানকে বিবাহ করে, নিজের লোকদের কাছে তাকে সূর্যদেবের বরপুত্র বলে পরিচয় দেবে। তাতে সে-দেশের লোকেরা সন্তুষ্ট হবে। এ কথা জানাবার জন্য যখন সে চোরা কুঠরিতে গেছিল, দেখল সেটা শূন্য। বন্দী পালিয়েছে।

এখন সেই লোকই তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'একদিকে সরে দাঁড়াও। একদিন তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, তাই তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাই না, কিন্তু এখন যদি আমাকে বাধা দাও তাহলে তোমাকেও মেরে ফেলতে দ্বিধা করব না।'

লা তাকিয়ে দেখল, যে মেয়েটি এতক্ষণ বলিদানের বেদীতে শুয়ে ছিল, টারজান তাকে তুলে নিয়েছে।

জেনের দিকে আঙুল দেখিয়ে লা জিজ্ঞাসা করল, 'এ কে?'

—'ও আমার নিজস্ব সম্পদ।'

বিস্ফারিত চোখে লা টারজানের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মাটিতে বসে পড়ল। তার চোখে হতাশার ছাপ।

সেই মুহূর্তে একদল বুনো টারজানের দিকে ছুটে এল। কিন্তু টারজান তখন সেখানে আর নেই। তারপর যখন দেখল যে টারজান সুড়ঙ্গ দিয়ে গহ্বরের মুখের দিকে গেছে তখন তারা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে লাগল, কারণ তারা জানে ওদিকে রাস্তা নেই। টারজানকে আবার

এদিকে ফিরে আসতেই হবে।

এই ভাবে টারজান নির্বিঘ্নে গুপ্ত পথ দিয়ে নেমে যেতে পারল। পরে যখন ওপারের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল তখন তাদের হঠাৎ মনে হল যে এই লোকটাই তো আগেও একবার আশ্চর্য ভাবে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। তাছাড়া আজকেও সে হঠাৎ তাদের মাঝখানে কি করেই বা এসে পড়ল? তখন সকলে ঠিক করল তাকে ধরবার জন্য আরও পঞ্চাশ জন লোক পাঠানো হবে।

টারজান জেনকে নিয়ে গুপ্ত পথ দিয়ে নেমে সেই কুঠরিতে পৌঁছে ভাঙা দেয়াল আবার ভালো করে পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিল। কারণ তার ইচ্ছা নয় যে কেউ এ গুপ্ত পথ খুঁজে পায়। তারপর আগের মতো রাস্তা ধরে সে ওপার শহরের বাইরে এসে পৌঁছল। উঁচু ঢিপিটার ওপরে পৌঁছে ওপারের দিকে তাকাতেই দেখল সেখান থেকে একদল বিকটাকার লোক তাদের দিকেই তেড়ে আসছে।

প্রথমটা টারজান ভাবল যে সেখানেই লুকিয়ে রাত অবধি থাকবে কি না? তারপর ভাবল সেটা ঠিক হবে না কারণ জেনের যেরকম দুর্বল অবস্থা তাতে শত্রুদের আগে যেতে দেওয়া উচিত হবে না।

তখন সে অতি কষ্টে জ্ঞানহীন জেনকে কাঁধে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে, সেই ঢিপির ওপর থেকে নেমে বড় পাহাড়ের দিকে চলল। দূর থেকে শিকার দেখতে পেয়ে শত্রুরাও চিৎকার করে সেই দিকে ছুটল। কিন্তু টারজানের অমানুষিক শক্তির সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না আর নিজেদের বেঁটে পায়ের অক্ষমতার কথাও ভুলে গিয়েছিল।

এই দুই ভুলের ফলে তারা অনেক পিছিয়ে পড়তে লাগল আর টারজান একবারও নিজের গতি না কমিয়ে পাহাড়ে উঠে আবার অন্য দিক দিয়ে নেমে গেল। সে যখন অর্ধেক পথ নেমে গেছে, তখন ওপারের অধিবাসীরা হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড়ের ওপরে পৌঁছেছে। নিচের দিকে তাকিয়ে যখন দেখল আর শিকার ধরার সম্ভাবনা নেই, তখন নিষ্ফল আক্রোশে মাথার ওপর মুগুর ঘুরিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে রাগ প্রকাশ করতে লাগল। তারপর হতাশ হয়ে আবার ওপারের দিকে চলে গেল।

টারজান জঙ্গলের ধারে পৌঁছে একটা জায়গায় জেনকে শুইয়ে দিয়ে, কাছের নদী থেকে জল আনতে গেল। কিন্তু সেই জলের ছিটে মুখ-চোখে দিয়েও জেনের জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারল না। তখন অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে আবার তাকে তুলে নিয়ে পশ্চিমে চলতে লাগল।

বিকেলের দিকে জেনের জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু সে তক্ষুণি চোখ না মেলে জ্ঞান হারাবার আগের দৃশ্যগুলোর কথা চিন্তা করতে লাগল। সেই বেদী, সেই নির্মম পূজারিণী, ক্রমশঃ নিচে নেমে আসা সেই তীক্ষ্ণ ছুরি—এ সব কথা মনে পড়াতে সে ভাবতে লাগল হয়ত সে সত্যিই মরে গেছে। কিম্বা মরার ঠিক আগের মুহূর্তে ভুল দেখেছ। তারপর চোখ মেলে যা দেখতে পেল তাতে বুঝল সে যা ভাবছে, তাই ঠিক। এখন সে একটা ছায়ায় ঘেরা বনপথ দিয়ে তার মৃত প্রিয়জনের কোলে শুয়ে চলেছে। সে প্রায় আপন মনেই বলে উঠল, 'এই যদি মৃত্যু হয়, তাহলে ভগবানের অসীম দয়া যে আমার মৃত্যু হয়েছে।'

টারজান বলল, 'জেন, তুমি কথা বললে? তোমার জ্ঞান তাহলে ফিরে এসেছে!'

—'হ্যাঁ, টারজান।' বলে বহুদিন পর এই প্রথম সে হাসল।

তাই শুনে টারজান ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'তাহলে আমি সময়মত পৌঁছে তোমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি?'

—'মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে? তবে কি আমরা মরে যাইনি?

—'মরে গেছি? মোটেই না। দুজনেই বেঁচে আছি।'

—'কিন্তু হেজেল আর মিঃ থুবান দুজনেই যে বলল তুমি সমুদ্রের জলে পড়ে গেছ। তোমার বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই?'

টারজান হেসে বলল, 'কি করে তোমাকে বোঝাই যে আমি ভুত নই? মিঃ থুবান আমাকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আমি ডুবে যাইনি। সে অনেক কথা, পরে বলব। আমি সেই তোমার পূর্ব পরিচিত টারজান, জেন।'

জেন উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অভিভূতের মতো বলল, 'এত দুঃখকষ্টের পর এ রকম আনন্দ আমি কল্পনাও করতে পারছি না। এ কি সত্যি, না স্বপ্ন?'

কিছুক্ষণ পর জেন তাদের গন্তব্যস্থান কোথায় জানতে চাইল।

টারজান তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় তুমি যেতে চাও? তোমার স্বামীর কথা ভুলে গেলে চলবে না।'

তখন জেন হাসিমুখে জানাল যে তার সঙ্গে ক্লেটনের বিয়ে হয়নি আর ভবিষ্যতে হবেও না। তাকে ধরে নিয়ে যাবার আগের দিনই সে ক্লেটনকে টারজানের প্রতি তার গভীর ভালোবাসার কথা জানিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছিল। সেদিন তারা সেই সিংহের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিল। এই বলে সে টারজানের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল সে-ই তাদের ত্রাণকর্তা ছিল কি না।

টারজান তা স্বীকার করলে জেন আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তার পরেও কি করে আমাকে ছেড়ে চলে গেলে?'

তখন টারজান প্রথম থেকে সব বলল। জেন আরও জানতে চাইল বিশেষ করে মিঃ থুবানের ব্যাপার।

এবার টারজান কিছু বাদ না দিয়ে প্যারিসের ঘটনাগুলো থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছিল সমস্ত তাকে বলল।

সে রাত তারা গাছের ওপর কাটালো। তারপর অনেক দিনের পথ অতিক্রম করে আবার সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছল।

পৌঁছবার ঠিক আগের দিন মানুষের গন্ধ পেয়ে টারজান জেনকে সাবধান করে দিল। তারপর আধঘণ্টা সন্তর্পণে চলার পর তারা একদল যোদ্ধা দেখতে পেল। তাদের মধ্যে বাসুলিকে চিনতে পেরে, টারজান আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। ওয়াজিরিরাও টারজানকে খুঁজে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হল। তারা বহুদিন ধরে সারা জঙ্গল ঘুরে বেড়িয়েছিল টারজানের খোঁজে। তারপর জেনের পরিচয় পেয়ে তাদের আর আনন্দের সীমা রইল না।

এইভাবে ওয়াজিরি যোদ্ধা পরিবৃত হয়ে টারজান জেনকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে তাদের সেই জীর্ণ আশ্রয়ে পৌঁছল।

সেখানে কাউকে দেখতে পেল না। তখন টারজান গাছের ওপর উঠে কিছুক্ষণ পরে একটা খালি টিন হাতে নেমে এসে বাসুলিকে জল আনতে বলল। তারপর জেনকে ওপরে নিয়ে গেল। এক সময় বহুদিন আগের সজাগ সবল ক্লেটন এখন একটি অস্থি-চর্মসার খোলস মাত্র। তার কোটরাগত চোখে, বসে যাওয়া গালে অভিজাত ইংরেজ রক্তের নাম মাত্র নেই। তাকে দেখে জেনের চোখ জলে ভরে এলো।

বাসুলি জল আনলে টারজান তার মুখে অল্প অল্প করে জল ঢালতে লাগল, তারপর উত্তপ্ত কপাল আর হাত-পা ধুইয়ে দিল।

ক্রমে ক্লেটন ক্লান্ত চোখ মেলে জেনকে দেখতে পেয়ে ক্ষীণ হাসি হাসবার চেষ্টা করল। পরে টারজানকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

টারজান তাকে আশ্বাস দিতে গেলে সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'বড় দেরী হয়ে গেছে। তবে ভালোই হয়েছে, আমি মরতেই চাই।'

থুবান কোথায় জেন জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তেজিত হয়ে তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলে, হঠাৎ যথাসম্ভব শক্তি এনে উঠে বসে বলল, 'আমি বাঁচতে চাই শুধু তাকে নিজের হাতে মেরে ফেলবার জন্য।' বলেই তার ক্লান্ত শরীর আবার নেতিয়ে পড়ল।

টারজান তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'ভয় নেই। একদিন আমি তাকে খুঁজে পাবোই আর তখন তার আর নিস্তার থাকবে না।'

অনেকক্ষণ ধরে ক্লেটন নির্জীবের মতো পড়ে রইল। সন্ধ্যের দিকে একবার জ্ঞান ফিরে আসতে সে জেনের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা চাইল। তারপর পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে জেনের হাতে দিল। পরের মুহূর্তে একটা নিশ্বাসের সঙ্গে তার দেহ চিরদিনের জন্য নিশ্চল হয়ে গেল।

জেন তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করল। তারপর জলভরা চোখে জেন ক্লেটনের দেওয়া কাগজের টুকরোটা পড়ে দেখল তাতে লেখা রয়েছে—

'আঙুলের ছাপে প্রমাণিত হয়েছে তুমি-ই গ্রেস্টোক। অভিনন্দন। ডার্নো।'

পড়া শেষ হলে কাগজটা টারজানকে দিয়ে জেন বলল, 'প্রথম থেকেই ক্লেটন এ কথা জানত কিন্তু তোমাকে বলেনি।'

—'আমিই সবার আগে খবরটা পাই। তারপর কাগজটা হারিয়ে ফেলি। বোধ হয় সেই স্টেশনের ওয়েটিংরুমে। কিন্তু আমার ধারণা ছিল না যে ক্লেটন এ কথা জানতে পেরেছিল।'

—'এর পরেও সে আমাদের বলে বেড়িয়েছে যে তোমার মা এক বনমানুষী আর তোমার বাবা কে তা জানা যায়নি।' আশ্চর্য হয়ে জেন বলল।

টারজান বলল, 'নাম আর সম্পত্তি আমার কাছে

অর্থহীন, যদি তার সঙ্গে তোমাকেও না পেতাম। আর আমি যদি আমার সম্পত্তি দখল করতাম, তাহলে তোমার কাছ থেকে চুরি করা হত। তুমি কি বুঝতে পারছ না, জেন?'

পরদিন সকলে টারজানের ক্যাবিনের দিকে চলল। চারজন ওয়াজিরি যোদ্ধা ক্লেটনের নশ্বর দেহ বয়ে নিয়ে গেল। টারজানের ইচ্ছা অনুসারে জঙ্গলের ধারে লর্ড গ্রেস্টোকের কবরের পাশে ক্লেটনের কবর দেওয়া ঠিক হয়েছিল। টারজানের চরিত্রের এই উদারতা জেনকে মুগ্ধ করে দিল।

প্রায় তিন মাইল রাস্তা যাবার পর, হঠাৎ ওয়াজিরিরা থেমে সামনের দিকে আঙুল দিয়ে কি দেখাল। সকলে অবাক হয়ে দেখল, একটি লোক মাথায় কালো সিল্কের টুপি পরে, কোটের পিছনে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে।

দেখবামাত্র জেন পোর্টার চিৎকার করে ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। ইনি আর কেউ নন, জেন পোর্টারের বাবা প্রোফেসর আর্কিমেডিস পোর্টার। কন্যাকে দেখে তিনি সাদরে তাকে আলিঙ্গন করলেন, দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। তারপর টারজানকে দেখে প্রথমে ভাবলেন বোধ হয় তাঁর নিজের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তারপর সে ভুল ভাঙাতে আর টারজানকে জীবিত দেখে যার-পর-নাই খুসি হলেন। কিন্তু ক্লেটনের মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হলেন।

প্রোফেসর বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কারণ, মিঃ থুবান বললেন ক্লেটন অনেকদিন আগেই মারা গেছে।'

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'থুবান আপনাদের সঙ্গে আছে?'

—'হ্যাঁ, সে-ই তো আমাদের তোমার ক্যাবিনে নিয়ে গেল। এখন ভাবতেই অদ্ভুত লাগছে যে আমরা মাত্র কয়েক মাইল উত্তরে এতদিন ছিলাম। থুবান তোমাকে দেখে খুব খুশী হবে।'

কিছুক্ষণ পরেই তারা ক্যাবিনে এসে পৌঁছল। প্রথমেই যাকে টারজান দেখতে পেল সে হল পল ডার্নো। অবাক হয়ে টারজান তার এখানে উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করে শুনল যে, ডার্নোর জাহাজ আফ্রিকার এই উপকূল দিয়ে যাচ্ছিল। তারই অনুরোধে এখানে নোঙর ফেলা হয়েছে। ডার্নোর ইচ্ছা ছিল একবার টারজানের ক্যাবিনে গিয়ে সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে আসবে। সেখানে পৌঁছে লর্ড টেনিংটনের দলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আর এখন সকলে তার জাহাজে করে আসছে, কাল সকালে সভ্যজগতে ফিরে যাবার আয়োজন করছে।

জেন পোর্টারের অক্ষত দেহে ফিরে আসতে সকলে ভগবানের কাছে অসীম কৃতজ্ঞতা জানাল। এ যেন দৈব-শক্তির পরিচয়। তারপর তারা বারবার টারজানের বাহু-বলের আর উদারতার প্রশংসা করাতে বেচারা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

ওয়াজিরি যোদ্ধারাও ছাড়া পেল না। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাদের সকলে অনেক উপহার দিল। কিন্তু তারা যখন শুনল যে পরের দিন তাদের রাজাও তাদের ছেড়ে চলে যাবে, তখন বেচারাদের মন বিষাদে ভরে গেল।

এখন পর্যন্ত টারজানের দল লর্ড টেনিংটন বা থুবানের কোনো চিহ্ন দেখতে পায়নি। পরে শুনল, তারা শিকার করে এখনো ফিরে আসে নি!

জেন টারজানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাকে তুমি রকোফ বলে চেনো, সে তোমাকে দেখে নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে।'

গম্ভীর গলায় টারজান বলল, 'আর সেটাও ক্ষণস্থায়ী হবে।'

তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে জেন বলে উঠল, 'এই আদিম জঙ্গলে যেখানে কোনোরকম ধরাবাঁধা নিয়মকানুন নেই, সেখানে শারীরিক শক্তির জোর খাটে। কিন্তু সভ্য-জগতের ন্যায়পরায়ণতার কঠিন হাত যখন তোমার পক্ষে, তখন এই লোকটাকে মেরে ফেলা খুন করার সামিল হবে। তখন আবার তোমাকে বন্দী হতে হবে। অযাচিত দুঃখের মধ্যে পড়তে হবে। আর আমিও তোমাকে ছেড়ে বাঁচব না, টারজান! তুমি আমাকে কথা দাও যে রকোফ্‌কে তুমি জাহাজের ক্যাপটেন ডুফ্রান-এর হাতে তুলে দেবে। আমাদের আনন্দের মাঝখানে ঐ জানোয়ারকে আমি কিছুতেই আসতে দেব না।

জেনের কথার মধ্যে যুক্তি ছিল, সেটা টারজান মেনে নিল।

আধ ঘণ্টা পরে লর্ড টেনিংটন থুবানের সঙ্গে ফিরে আসার সময় ক্যাবিনের কাছে ওয়াজিরিদের দেখতে পেলেন। তারা জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর টারজানের ওপর চোখ পড়াতে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'এই লোকটা কে?'

তাই শুনে মুখ তুলে টারজানকে দেখেই, থুবান আর কিচ্ছু না বলে কাঁধে বন্দুক তুলে সোজা টারজানের দিকে

লর্ড টেনিংটন হাত বাড়িয়ে তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট করে দিলেন। গুলি টারজানের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টারজান ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল।

ক্যাপটেন ডুফ্রান, ডার্নো আর অনেকগুলো নাবিক আওয়াজ শুনে ছুটে এলো। টারজান এর আগেই ক্যাপটেনকে সব খুলে বলেছিল তাই এখন নিঃশব্দে তার হাতে রকোফকে তুলে দিল। ক্যাপটেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাহাজে নিয়ে গিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেললেন।

নিয়ে যাবার ঠিক আগে অনুমতি নিয়ে টারজান রকোফকে সার্চ করে তার কাছ থেকে সেই জরুরী কাগজগুলো সরিয়ে ফেলল।

বন্দুকের আওয়াজে জেন আর অন্যরাও ছুটে এসেছিল। লর্ড টেনিংটনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জেন টারজানের পরিচয় দিল, 'জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক।'

এরপর অবাক-হয়ে-যাওয়া লর্ড টেনিংটনকে সব খুলে বলা হল।

সূর্যাস্তের সময় টারজানের বাবা লর্ড গ্রেস্টোকের কবরের পাশে ক্লেটনকে কবর দেওয়া হল। এখানে টারজানের মায়ের কবরও ছিল। টারজানের অনুরোধে ক্লেটনের স্মৃতির উদ্দেশে তিনবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজও করা হল। প্রোফেসর পোর্টার সেখানে সংক্ষেপে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলেন।

সেখানে এক অদ্ভুত সর্ব জাতির সমন্বয় হয়েছিল—ফরাসী অফিসার ও নাবিকরা, দুজন ইংরেজ লর্ড, আমেরিকানরা আর সবশেষে সে দেশের প্রকৃত অধিবাসী ওয়াজিরি যোদ্ধারা। এর পর টারজান দুদিন সময় চাইল তার জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্য। ক্যাপটেন ডুফ্রান তাতে রাজি হলেন। টারজার ওয়াজিরিদের নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল।

পরদিন বিকেলে যখন সে ফিরে এল তখন সকলে হতভম্ব হয়ে দেখল তার জিনিসপত্র হল তাল তাল খাঁটি সোনার বাট। সকলে প্রশ্ন করলে টারজান সোনার উৎসের সন্ধান বলতে রাজি হল না। শুধু বলল, এগুলো যেখান থেকে পাওয়া গেছে সেখানে আরো অনেক আছে। এগুলো শেষ হলে সে আবার এসে আরো নিয়ে যাবে।

টারজানের গচ্ছিত সোনা জাহাজে তোলা হলে জেনের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'বন্য পশুর কোনো রকম অনুভূতি বা দুর্বলতা থাকার কথা নয়। কিন্তু আমার ইচ্ছা, যে ক্যাবিনে আমি জন্মেছিলাম, আমার বাবা আর মায়ের কবরের পাশে, আমাদের বিয়ে হোক। চারদিকে ঘিরে থাকবে আমার চির প্রিয় আদিম জঙ্গল।'

জেন রাজি হয়ে গেল আর অন্যরাও শুনে খুশী হয়ে সায় দিল।

প্রোফেসর পোর্টার, আইনমতে ধর্মযাজকের কাজ করতে পারতেন। তিনি বিয়ে দিতে রাজি হলেন। তিন দিন পর বিয়ের দিন ঠিক হল।

এমন সময় গণ্ডগোল বাঁধালেন লর্ড টেনিংটন। তিনি মিসেস্ স্ট্রং-এর অনুমতি নিয়ে আরেকটা বিয়ের প্রস্তাব আনলেন। টারজান আর জেনের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আর হেজেল স্ট্রং-এর বিয়েও সম্পন্ন হোক। আর হলোও তাই।

তারপর? আরপর আর কি!

যথাসময়ে ক্যাপটেন ডুফ্রান জাহাজ ছেড়ে দিলেন। ডেকের ওপর সাদা ইউরোপীয় পোষাক পরা টারজান তার নববধূর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, ডাঙায় ওয়াজিরি যোদ্ধারা মাথার ওপর বর্শা ঘুরিয়ে নাচছে, তারা তাদের দলের রাজাকে এই ভাবে বিদায় জানাল।

টারজানের বন্য বন্ধুরা

দি বিস্টস অফ টারজান

ডার্নো বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যে মোড়া। নিকোলাস রোকফ্ যে কি করে জেল থেকে পালাল তা পুলিস বা স্পেশ্যাল এজেন্টরা কেউ-ই বুঝে উঠতে পারছে না।' গ্রেস্টোক তাঁর জুতোর দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর সাক্ষ্যের ফলেই ফরাসী সামরিক কারাগারে রোকফের যাবজ্জীবন দণ্ড হয়েছিল।

এর আগে তাঁর সর্বনাশ ঘটাবার জন্য রোকফ্ কি না করেছিল। এখন গ্রেস্টোকের স্ত্রী আছে, ছোট ছেলে আছে, সে তো আরো শতগুণ ক্ষতি করতে পারে। সবেমাত্র বর্ষার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার আশায় উজিরিতে তাঁর বিশাল জমিজমা ছেড়ে লণ্ডনের বাড়িতে এসেছেন।

এঁরা যখন প্যারিসে বসে এই সব কথা বলছেন, লণ্ডনের উপকণ্ঠে ছোট একটা বাড়িতে বসে দু'জন পাপিষ্ঠ শলা-পরামর্শ করছিল। একজনের প্রচুর দাড়ি গোঁপ, অন্যজনের ফ্যাকাশে মুখ, অল্প দিনের দাড়ি। সে-ই বলছিল, 'তোমার দাড়ি কামিয়ে না ফেললে, সে ব্যাটা দেখলেই চিনে ফেলবে। এক ঘণ্টার মধ্যে দু'জনে দুই পথ ধরব। তারপর যখন কিনক্যাড জাহাজের

ডেকে আবার দেখা হবে, সঙ্গে দু'জন সম্মানিত অতিথি থাকবে। দু'ঘণ্টার মধ্যে একজনকে নিয়ে আমি ডোভার যাত্রা করব। আর আমার পরামর্শ মতো চললে কাল অন্য জনকে নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে মিলবে। ওঃ! এই ব্যাপার থেকে শুধু যথেষ্ট অর্থলাভ হবে না, প্রচুর আনন্দও পাবো।'

এর তিন ঘণ্টা পরে প্যারিসে ডার্ণোর বাড়িতে গ্রেস্টোকের নামে তার এলো। সেটি পড়েই গ্রেস্টোক বললেন, 'এই আরম্ভ হয়ে গেল, পল।'

তারে লেখা ছিল, 'বাগান থেকে জ্যাক্ চুরি গেছে নতুন চাকরটার সহযোগিতায়। এক্ষুণি এসো।—জেন।'

গ্রেস্টোক বাড়ি পৌঁছে শুনলেন, খোকার নার্স তাকে ঠেলাগাড়ি করে বাগানে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় গেটের বাইরে একটা ট্যাক্সি থামল। সে তো কত থামে। ঠিক সেই সময় কার্ল বলে নতুন চাকরটা ছুটে এসে বলল, লেডি গ্রেস্টোক এক্ষুণি তোমাকে ডেকেছেন। আমি খোকাকে দেখছি।'

দোরগোড়ায় পৌঁছে নার্সের মনে হলো কার্লকে বলে দিই খোকার চোখে যেন রোদ না পড়ে।

এই ভেবে ঘুরেই দেখে ঠেলাগাড়ি নিয়ে কার্ল খিড়কির দিকে ছুটে চলেছে আর একটা কালচে মুখ লোক ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরেছে! ট্যাক্সি ঘোরাতে যেটুকু সময় লেগেছিল তার মধ্যে নার্স সেখানে পৌঁছে রানিং-বোর্ড ধরে ঝুলে পড়েছিল। কিন্তু কার্ল তার মুখে সজোরে এক বাড়ি দিয়ে, তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে, ট্যাক্সিতে করে অদৃশ্য হয়ে গেল!

চ্যাঁচামেচি শুনে ছেলের মা-ও এসে পড়েছিলেন, সবই দেখেছিলেন, কিন্তু কিছু করতে পারেন নি। গ্রেস্টোক এসে পৌঁছলে রোকফের জেল পালানোর খবর শুনে সকলেই বুঝেছিল এ তারই কাজ।

একটু পরেই একটা ফোন এলো। কে একজন বলল, 'যদি ছেলেকে উদ্ধার করতে চান তাহলে যথেষ্ট টাকাকড়ি নিয়ে ডোভারের একটা সরাইখানায় একলা আসুন। আমি ছেলে পাঠিয়ে দেবো, কারণ এরা আমাকে ফাঁকি দিতে চায়। কিন্তু এ-সব কথা কাউকে বললে সর্বনাশ হবে।'

গ্রেস্টোক সব কথাতেই রাজি হলেন। জেন সঙ্গে যেতে চাইলে, রাজি হলেন না। স্বামী রওনা হয়ে গেলে জেনের মনে হলো এটা তাঁকে বিপদে ফেলার ফন্দি নয় তো?

রোকফ্ সব পারে। অমনি মন ঠিক করে ফেলে লেডি গ্রেস্টোকও ট্যাক্সি করে রওনা হয়ে গেলেন। আগের ট্রেন ছেড়ে গেছে, কিন্তু পরে আরেকটা গাড়িও ছিল।

এদিকে ডোভারের সেই নোংরা সরাইখানার সামনে পৌঁছতেই একটা লোক তাঁকে ডেকে নিয়ে অন্ধকার গলি দিয়ে চলল। সামনেই গাঁটরি, পিপে, প্যাকিংকেস বোঝাই জাহাজঘাট। সেখানে কিনক্যাড জাহাজ বাঁধা। গ্রেস্টোক বললেন, 'আমার ছেলে কোথায়'?

লোকটা বলল, 'ঐ জাহাজে। দুর্বৃত্তরা কেউ নেই, খালি মাঝি-মাল্লারা। তাদের কষে জিন্ খাইয়ে প্রায় বেহুঁশ করে রেখেছি। এই হলো সুযোগ।'

লোকটাকে যদি পলভিচ্ বলে গ্রেস্টোক চিনতে পারতেন, তাহলে কখনই জাহাজে উঠতেন না। দুঃখের বিষয়, পারেন নি। ডেকে জনমানুষ নেই। জাহাজ ছাড়বার জন্য তৈরি। লোকটা বলল, 'নিচে নেমে ছেলে নিয়ে আসুন। অচেনা কেউ গেলে কান্নাকাটি করবে আর জানাজানি হয়ে যাবে।'

ব্যগ্রতার জন্য অসাবধান হয়ে পড়েছিলেন, তাই নিশ্চিন্তে নিচে নামার হ্যাচ্‌টা খুলে যেই না নামতে শুরু করেছেন, অমনি দরাম করে হ্যাচ বন্ধ হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চক্রান্তটা পরিষ্কার হয়ে গেল। অনেক ঠেলাঠেলি করেও হ্যাচ্ খোলা গেল না। দেশলাই জ্বেলে দেখলেন তিনি ছোট একটা কুঠরিতে বন্দী। সেখানে আর কেউ বা কিছু ছিল না। ছেলে যদি সত্যিই এ জাহাজে থেকে থাকে, তাহলে সে অন্য ঘরে। ঘোর জঙ্গলে বন্য জন্তুদের সঙ্গে জীবনের কুড়ি বছরের বেশি কেটেছিল। সুখ-দুঃখ তিনি নির্বিকারভাবে গ্রহণ করতে শিখেছিলেন! এখন এই নিদারুণ বিপদেও ভেঙে না পড়ে কুঠরিটাকে ভালো করে পরখ করতে লাগলেন। তারই মধ্যে টের পেলেন জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। কে জানে ভাগ্য তাঁকে কোথায় নিয়ে চলল। হঠাৎ জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে আরেকটা শব্দ কানে এলো, যা শুনে তাঁর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। ডেকের উপর থেকে কানে এলো নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার!!

এদিকে টারজানও সেই লোকটার সঙ্গে অন্ধকার জাহাজঘাটায় পৌঁছেছে, অমনি সরাইখানার সদর দরজা ঠেলে ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে এক মহিলা ভিতরে

ঢুকলেন। দামী পোশাক পরা ভদ্রমহিলা দেখে আধা-মাতাল নাবিকরা অবাক। একজন নোংরা আনাড়ি দাসীকে মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কি একজন লম্বা ভদ্রলোক আরেকটি লোকের সঙ্গে কথা বলে, দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে গেছেন?'

একজন নাবিক বলল, 'দেখেছি। ঐ যে ওদের নৌকো এক্ষুণি কিনক্যাড জাহাজের গায়ে লাগল।'

দশ পাউণ্ড লোভ দেখিয়ে তার সঙ্গে অন্য একটা নৌকো করে তিনি জাহাজের কাছে পৌঁছে গেলেন। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লোকটি সাহায্য করল। তার প্রাপ্য চুকিয়ে দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে নোঙর তোলার ঘড়ঘড় শব্দ আর জাহাজটা আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল।

তার পরেই ডেক থেকে সেই চিৎকার নাবিকের কানেও গেল। এ সব চিৎকারে সে অভ্যস্ত। মনে মনে বলল, বাকি টাকাগুলোও নিয়ে নিলে হতো।

এদিকে জেন ক্লেটনের জাহাজে উঠে প্রথমে মনে হলো জনমনিষ্যি নেই। যাদের খুঁজছেন তারাও নেই, অন্য কেউ-নেই। তিনি নিজেই তখন স্বামী ছেলেকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। ছোট একটা সিঁড়ি বেয়ে নিচের বড় কেবিনে পৌঁছলেন। তার দু-পাশে দু-সারি ছোট কেবিন। এগুলো জাহাজের অফিসারদের জন্য। একটা একটা করে দরজা খুলে ভিতরে দেখতে ব্যস্ত থাকায় একটা একটা ঘরের দরজা যে বন্ধ হয়ে গেল সেটা তিনি লক্ষ্য করলেন না। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ জাহাজের এঞ্জিন চলার শব্দ কানে এলো। ততক্ষণে শেষ দরজায় পৌঁছেছেন। সেটা ঠেলবামাত্র ভিতর থেকে একজন কালো দাড়িমুখো বলিষ্ঠ চেহারার লোক ওকে টেনে নিয়ে মুখ চেপে ধরল। লোকটা বলল, 'তীর থেকে আরেকটু দূরে গেলেই প্রাণভরে চ্যাঁচাতে পারবেন।' তার দিকে তাকিয়ে লেডি গ্রেস্টোক ভয়ে কাঠ! নিকোলাস রোকফ্! মঁসিয়ে থুরাঁ!

রুশ লোকটি বাও করে বলল, 'আমি আপনার বিশ্বাসী ভক্ত!'

লেডি গ্রেস্টোক বললেন, 'আমার ছেলে কোথায়? সে কি এই জাহাজেই আছে?'

রোকফ্ বলল, 'আমি যেমন বলব সে রকম করলে, আপনার ছেলের কোনো অনিষ্ট হবে না। আপনি স্বেচ্ছায় এ জাহাজে উঠেছেন, তার জন্যে একটু ভুগতে হবে বৈ-কি।'

এই বলে বাইরে থেকে ঘরে চাবি দিয়ে চলে গেল। তারপর বেশ কিছু দিন তার দেখা নেই। তার কারণ সী-সিক্‌নেস্। এ-ক'দিন কেউ ঘরে এলো না, খালি স্বেন অ্যাণ্ডারসেন বলে জাহাজের আনাড়ি রাঁধুনে, তিন বেলা তাঁর জন্যে অখাদ্য খাবার দিয়ে যেত। লম্বা, হট্‌কা, হলদে ঝুলো গোঁপ, খুদে খুদে নীল চোখ, জঘন্য নোংরা হাত এবং কাপড়চোপড়। দেখলে খাবার সব ইচ্ছা চলে যায়। কোমরে আবার একটা লম্বা লিকলিকে ছোরা গোঁজা।

কিন্তু তাঁর মানসিক উদ্বেগ আর কষ্টের কাছে এ-সব তুচ্ছ মনে হতো। তাঁর বিশ্বাস ছিল ছেলে নিশ্চয় বেঁচে আছে এবং এই জাহাজেই আছে। টারজানকে রোকফ্ দু-চক্ষে দেখতে পারত না, তাকে কি আর রোকফ্ বাঁচতে দিয়েছে?

এদিকে টারজান তার অন্ধকার কুঠরিতে পড়েছিল। ঐ নোংরা রাঁধুনে ওর-ও খাবার এনে দিত, কিন্তু জেন যে ওর মাথার ওপরের কেবিনে বন্দিনী তা সে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। রাঁধুনেকে ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করেও কোনো উত্তর পায়নি।

কত সপ্তাহ যে এ ভাবে কেটে গেল কে জানে। তত দিনে রোকফ্ অনেকটা সুস্থ হয়ে জেনের কেবিনে এসে বলল, ওকে একটা বড় চেক্ দিলে জেনকে নিরাপদে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়ে দেবে।

জেনে বলল, 'আগে আমার স্বামী আর ছেলে সুদ্ধু কোনো নিরাপদ বন্দরে আমাকে নামিয়ে দিন, তাহলে ওর ডবল টাকা দেবো। এমনিতে কিচ্ছু দেবো না।'

রোকফ্ বলল, 'না দিলে ওদের দু'জনের কেউ নিরাপদে কোথাও পৌঁছবে না।' শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে জেন চেক্ লিখে দিয়েছিল। পর দিন পলভিচ্ টারজানের কুঠরির হ্যাচ্ খুলে তাকে ডেকে নিয়ে এলো। রোকফের দেখা পাওয়া গেল না। পলভিচ্ বলল, 'রোকফের সঙ্গে আপনার নির্দয় ব্যবহারের জন্যেই আপনার এই বিপদ হয়েছে। একটা বড় চেক লিখেদিলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আপনার স্ত্রী-পুত্রওনিরাপদে থাকবে।'

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'আমার ছেলে কি এই জাহাজে আছে?'

—'না, না, সে অন্য নিরাপদ স্থানেই আছে। তবে

আপনি টাকা না দিলে আর নিরাপদে থাকবে না।'

শেষ পর্যন্ত টারজান অনেক টাকার একটা চেক লিখে দিল। অত টাকা ওর ব্যাংকে ছিলও না, এরাও চায়নি। চেকটা দেবার পর বাইরে তাকিয়ে টারজান অবাক হয়ে দেখল ঘন জঙ্গলে ঢাকা তীরের কাছে জাহাজ নোঙ্গর ফেলেছে। ঘন বন প্রায় তীর অবধি নেমে এসেছে, পিছনে মালভূমি। টারজান ভাবল আফ্রিকার তীরেরই কোথাও হবে এ জায়গা। পলভিচ্ বলল, 'আপনাকে এখানে নামিয়ে দেওয়া হবে।' টারজান কিছু বলল না। এখান থেকে সভ্য জগতে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে খুব শক্ত হবে না।

পলভিচ্ বলল, 'কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলুন। এখানে ওসবের দরকার নেই। সশস্ত্র নাবিকরা নৌকো করে নিরস্ত্র টারজানকে নামিয়ে জাহাজে ফিরে গেল। হঠাৎ বিদ্রূপের হাসি শুনে ডেকের দিকে চেয়ে দেখল, একটা কালো দাড়ি লোক ছোট্ট একটা বাচ্চাকে তুলে দেখাচ্ছে। টারজানের একমাত্র সান্ত্বনা জেন অন্ততঃ নিরাপদে লণ্ডনে আছে।

মনটা এতই উদভ্রান্ত হয়ে ছিল যে বনে লালিত ওর সদা-সতর্ক অনুভূতিগুলো একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল তাই ঝোপের পিছন থেকে এক জোড়া দুষ্ট চোখ যে ওকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে, তা সে লক্ষ্যই করল না।

চলে যাবার সময় একজন নাবিক ওর হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিয়েছিল। তাতে লেখা—'তুমি বনমানুষ হয়েই জন্মেছ, বনেই তুমি খালি গায়ে দিন কাটিয়েছ। তোমাকে নিজের জায়গায় ফিরিয়ে দিলাম। তোমার ছেলে বনমানুষের চেয়ে একটু উপরে উঠবে। নেংটি পরে, তামার গয়না পরে, নাকে রিং ঝুলিয়ে, অসভ্যদের কাছে মানুষ হবে। তোমার স্ত্রীর কি অবস্থা হবে সেটা কল্পনা করে দেখো। এন্—আর।'

পড়া শেষ হলেই খস করে একটা শব্দ শুনে এক নিমেষে লর্ড গ্রেস্টোক আবার বনমানুষের ছেলে টারজান হয়ে গেলেন।

চকিতে ফিরে টারজান দেখল বিশাল এক বনমানুষ তার দিকে তেড়ে আসছে। বন ছেড়ে যাবার পর মাত্র দুই বছর কেটেছে। বনের শিক্ষা তখনো বিশেষ ম্লান হয়নি। আফ্রিকার উজিরি প্রদেশে টারজান অনেক জমিজমা করেছিল। সেখানেও বুনো জন্তুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বোঝাপড়া করতে হতো। আজ খানিকটা বে-কায়দায় পড়ে গিয়েছিল। বনমানুষের বিশাল দাঁতের বদলে তার পৈত্রিক ছোরাটি ছিল, সেটিও সঙ্গে নেই। অস্ত্রশস্ত্রও কিছু নেই। প্রকৃতি যে বুদ্ধি আর কৌশল দিয়েছে তাই দিয়েই এই বিভীষিকার সম্মুখীন হতে হবে।

পালের গোদার ঘাড়ের উপর দিয়ে আরো গোটা বারো বনমানুষ দেখা যাচ্ছিল। তবে টারজান ভালো করেই জানত এদের কারো গোদার সাহায্যে আসার সম্ভাবনা কম। এদের মধ্যে একতা বলে কিছু নেই।

ততক্ষণে গোদা বিকটভাবে দাঁত খিঁচিয়ে টারজানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এরা খালি গায়ের জোর দিয়ে লড়ে, আগে টারজানও যেমন লড়ত। কায়দা কৌশল

বুদ্ধি এদের নেই। টারজান খালি একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে, দৈত্যটার পেটে ডান হাতের এক প্রচণ্ড ঘুঁষি বসিয়ে দিল। রাগে, বেদনায় কুঁকড়ে গেল গোদা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু দাঁড়াবার আগেই সাদা শত্রু ঘুরে দাঁড়াল। এখন আর সে লর্ড গ্রেস্টোক নেই। তার গা থেকেসভ্যতার পল্‌কা খোলস খসে পড়েছে। সে আবার কালার দুর্ধর্ষ ছেলে হয়ে গেছে।

গোদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, টুঁটি চেপে ধরে তার গলার বড় শিরার উপর দাঁত বসাবার চেষ্টা করতে লাগল। এদিকে দলের সদস্যরা গোদার সঙ্গে সাদা শত্রুর মরণ-পণ লড়াইটা ভারি উপভোগ করছিল। পরস্পরের গা থেকে যোদ্ধারা ক্যায়সা ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছিল! তারপর সাদা বনমানুষ পালের গোদার পিঠে আঁকড়েধরে, বগলের তলা দিয়ে, কাঁধের উপর দিয়ে, ঘাড়ের ওপর চাপ দিতে লাগল। এমন তারা দেখেনি কখনো। কয়েক বছর আগে দৈবাৎ এই কায়দায় টেরকজকে মরতে হয়েছিল। আজ এই

নতুন দর্শকরাও খট করে গোদার ঘাড় মটকানোর শব্দ শুনতে পেল।

তারপর নবাগত মরা গোদার ঘাড়ে পা রেখে বিকট জয়ধ্বনি দিল। সকলে বুঝল পালের গোদার জীবন শেষ হয়েছে।

সেই জয়ধ্বনি শুনে বাঁদররা কিচির-মিচির থামাল। পাখিরা চুপ করল। দূর থেকে চিতাবাঘ আর সিংহের আর্তনাদ শোনা গেল। সেই পুরানো টারজান বনমানুষদের ছোট দলটির দিকে তাকাল। ওকে আক্রমণ করা এদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। গোদার পরেই যার স্থান, সে এগিয়ে আসতে পারে। লড়াই দিতে পারে। কিম্বা সবাই মিলে চলে যেতেও পারে। ইচ্ছা করলেই টারজান এদের দলপতি হতে পারত। কিন্তু সে ইচ্ছা তার ছিল না। তবু কেউ যদি লড়াই চায়, নিজের মান রক্ষার জন্য তাও দিতে হবে। কমবয়সী বনমানুষদের একজন ভয়াবহ ভাবে ক্রমে কাছে এগোচ্ছিল। চমৎকার শরীর তার, বড় বড় দাঁত বের করে, চাপা গর্জন করতে করতে সে এগোচ্ছিল। খোলা জায়গাটুকুর মধ্যিখানে তীরের মতো সোজা দাঁড়িয়ে টারজান অপেক্ষা করতে লাগল। পেছিয়ে গেলে সে নির্ঘাৎ তেড়ে আসবে। যদি এগিয়ে যায় তাহলে হয় পালাবে, নয়তো সাহস থাকলে লড়াই করবে। মধ্যপথ অবলম্বন করে টারজান দাঁড়িয়ে রইল। এদের নিয়মই হলো শত্রুর চারদিকে ঘোরা। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। খেয়াল হলো তো হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তেও পারে। ওর সঙ্গে সঙ্গে টারজানও ঘুরতে লাগল, যাতে সর্বদা ওর চোখের ওপর চোখ থাকে।

ওকে টারজান যাচাই করে নিয়েছিল। বয়স কম, অনভিজ্ঞ, কিন্তু এতটা শক্তি আছে যে একদিন দলপতির আসন নেবে। তবে এখনি পালের গোদাকে উৎখাত করবার ক্ষমতা হয়নি। এরই মধ্যে মাথায় সাত ফুট উঁচু। সোজা হয়ে দাঁড়ালেও লম্বা লম্বা লোমশ হাত প্রায় মাটি ছোঁয়। জোরালো বেঁটে পা জোড়া। টারজানের বাল্যবন্ধুদের চেয়ে সামান্য তফাৎ আছে। প্রথমটা আশা হয়েছিল হয়তো এরাও সেই একই জাতের কেউ। পরে বুঝল তা নয়। তবে ভাষা একই হতেও পারে।

টারজান বলল, 'বনমানুষের ছেলে টারজানের সঙ্গে লড়তে চাও, তুমি কে?'

সে বলল, 'আমি আকুট। মোলক মরেছে, এখন আমি রাজা। এখান থেকে চলে যাও, নইলে তোমাকে মেরে ফেলব।'

টারজান বলল, 'দেখলেই তো কত সহজে মোলককে মেরে ফেললাম। রাজা হবার ইচ্ছা থাকলে, তোমাকেও মারতে পারতাম। কিন্তু তা আমি চাই না। টারজান তোমাদের বন্ধু হতে চায়। তাতে দু'জনেরই সুবিধা হবে।'

আকুট বলল, 'আকুটকে তুমি মারতে পারবে না। মোলককে তুমি না মারলে, আকুটই মেরে ফেলত। সে রাজা হবার জন্য তৈরি।'

এর উত্তরে টারজান আকুটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কথা বলতে গিয়ে আকুট অসতর্ক হয়ে পড়েছিল। তার হাতের কব্জা ধরে এক পাক দিয়ে, টারজান তার পিঠে লাফিয়ে পড়ল। তারপর তাকে ডবল নেলসনের প্যাঁচ দিয়ে ধরে, ক্রমে ঘাড়ে চাপ দিতে লাগল।

কিন্তু আকুটকে টারজান মেরে ফেলল না। তাকে বন্ধু ভাবে পেতে চাইছিল। তাই তার কানে কানে বলল, 'কা-গোদা?' অর্থাৎ, হার মানছ? একটু ইতস্ততঃ করেছিল আকুট। তার সাহসের অভাব ছিল না। কিন্তু একটু আগেই এই ভাবেই মোলককে মরতে দেখেছিল, তাই বেহিসাবী কিছু করার ইচ্ছা ছিল না। আকুট হার মানল।

টারজান হাতটা একটু আলগা করে বলল, 'তুমি তো এখনো রাজা হতে পার। টারজান তো বলেইছে সে রাজা হতে চায় না। কেউ যদি তোমার অধিকার নিয়ে আপত্তি করে, টারজান তোমার হয়ে লড়বে।' এই বলে

ওকে ছেড়ে দিল। আকুট রাগে গরগর করতে করতে দলের লোকদের পালোয়ানদের দিকে তাকাতে লাগল। কেউ লড়াই দিতে এগিয়ে এলো না। তারপর আস্তে আস্তে বনমানুষের দলটা বনের মধ্যে সরে পড়ল। টারজান সাগরতীরে একা দাঁড়িয়ে রইল।

মোলকের সঙ্গে যুদ্ধে শরীর ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু সব বন্য জন্তুর মতো সেও নিঃশব্দে ব্যথা-বেদনা সইতে শিখেছিল। এখন ওর প্রথম প্রয়োজন হলো অস্ত্রশস্ত্র। বনমানুষদের সঙ্গে মোকাবিলা করে আর দূরে নুমা সিংহ আর শীতা প্যান্থারের গর্জন শুনে বুঝতে পারছিল, আবার ঐ সব বিপদের জন্য ওকে সদা-সর্বদা তৈরি থাকতে হবে। কি দিনে, কি নির্মম রাতে। হাতের কাছে যে উপকরণ পাবে, তাই দিয়ে এখনি কিছু হাতিয়ার বানিয়ে নিতে হবে।

সমুদ্রের ধারে ইগ্‌নিয়াস পাথরের চাঁই পড়েছিল। সেগুলো ভাঙা খুব শক্ত নয়। অনেক কষ্টে তার থেকে এক ফুট লম্বা আধ ইঞ্চি চওড়া একটা ফালা বের করে দেখল, আগার দিকে কয়েক ইঞ্চির একটা দিক বেশ ধারালো মতো। তাই দিয়ে ছুরির কাজ চলতে পারে।

সেটা হাতে নিয়ে বনে গিয়ে খুঁজে দেখল একটা গাছ ভেঙে পড়ে আছে। এ-কাঠ টারজানের খুব চেনা, ভারি শক্ত হয়। গাছটা থেকে একটা ছোট সোজা টুকরো কেটে নিয়ে, তার এক মাথা ছুঁচলো করে নিল। তারপর গুঁড়িটার গায়ে একটা ছোট গোল গর্ত কুরে, তার মধ্যে খানিকটা শুকনো গাছের ছাল গুঁড়ো করে পুরে দিল। তারপর ঐ গর্তে কাঠিটার ছুঁচলো মাথাটা গুঁজে দিয়ে, গুঁড়ির ওপর ঘোড়ায় চাপার মতো করে বসে, কাঠি ধরে খুব তাড়াতাড়ি পাক দিতে লাগল। একটু পরেই গর্তের মধ্যে থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল, তারপরেই আগুন জ্বলে উঠল।

সেই আগুনে আরো কিছু শুকনো ডালপালা দিয়ে দেখতে দেখতে টারজান গর্তের মধ্যে দিব্যি গনগনে ধরাতে পারল। সেই আগুনে পাথরের ছোরার ফলাটা টস্‌টসে গরম করে নিল। তারপর একবার ভিজিয়ে নিয়ে আবার আগুনে দেবার পর, এক চিলতে পাথর খসে গিয়ে, ধারালো কিনারাটা আরো ধারালো হয়ে উঠতে লাগল।

এক বারেই সব হয়নি। ক্রমে ধনুক হলো, ছোরার হাতল হলো, মোটা একটা গদা হলো। একটা ছোট নদীর ধারে উঁচু গাছের উপরে অস্ত্রশস্ত্র লুকোবার জায়গা হলো। বাস করবার জন্য একটা মাচান হলো। তার তালপাতার ছাদও হলো।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল; টারজানের খুব খিদেও পেয়েছিল। কাঠকুটো সংগ্রহ করার সময় সেলক্ষ্য করেছিল যে নদীটার আরেকটু উজানে একটা জায়গায় জন্তুরা জল খেতে আসে, তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। গাছের ডালে ডালে ঝুলে এবার সেখানে চলল টারজান। স্ত্রী-পুত্রের জন্য মনটা ভারি হয়ে না থাকলে, শৈশবের সেই জীবনে আবার ফিরে আসাটাকে সে খুবই উপভোগ করত। আসলে এই তার আসল জীবন, সভ্যতা হলো ওপরকার একটা খোলস মাত্র।

বিশাল বনের একটা নিচু ডালে শিকারের জন্য ওঁৎ পেতে বসে রইল টারজান। এই পথেই জানোয়াররা জল খেতে যাবে। একটু পরেই বারা হরিণ এলো ঐ পথে। কিন্তু একা এলো না। টারজানের তীক্ষ্ণ কান বলে দিল ওর পিছন পিছন আসছে নুমা কিম্বা শীতা। হরিণটা আরেকটু কাছে না এলে হবে না। তার আগে অন্য জানোয়ারটা তাকে ধরলেই তো টারজানের সান্ধ্য-ভোজটি সারা!

শেষ মুহূর্তে বারাও টের পেয়ে নদীর দিকে এক লাফ দিল। নুমা তার একশো গজ পিছনে। পারবে কি? এ-কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে টারজান বারার পিঠে ঝাঁপ দিল। এক মিনিটের মধ্যেই নুমাও লাফ দিত। কিন্তু ততক্ষণে বারার ঘাড় মটকে, তাকে নিয়ে টারজান আবার গাছের ডালে! লাফ দিয়েছিল নুমা, কিন্তু লোভনীয় শিকার নিয়ে টারজান আরো উঁচু ডালে চড়ে বসে ওকে টিটকিরি দিতে লাগল। নুমার কি রাগ! ব্যর্থভাবে নিচে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। এদিকে টারজান একটা বড় রসালো টুকরো কেটে, পেট ভরে খেয়ে, বাকিটা আরো উঁচুতে নিরাপদ জায়গায় রেখে, মাচানে শুয়ে সকাল অবধি একটানা ঘুম দিল।

এর পরের ক'টা দিন কাটল অস্ত্রশস্ত্রগুলোকে ভালো করে তৈরি করে নিতে। হরিণের স্নায়ু দিয়ে ধনুকের ছিলা হলো। শীতার অন্ত্র দিয়ে করতে পারলে আরো ভালো হতো। মজবুত এবং লম্বা একটা দড়ি পাকাল। কৈশোরে এই রকম দড়ি দিয়ে কত হিংস্র

জানোয়ার শিকার করেছে, ছোরাটার একটা খাপ তৈরি হলো। তীরের তূণ তৈরি হলো। একটা চামড়ার বেল্ট আর নেংটি হলো।

তারপর দেশটাকে পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়ে পড়ল টারজান। এ যে ওর চেনা পশ্চিম তীর নয়, তা পুব দিকে সমুদ্র দেখেই বুঝতে পেরেছিল। পুব তীরও নয়। তাহলে কিনকাড জাহাজকে ভূমধ্যসাগর দিয়ে, সুয়েজ খাল দিয়ে আসতে হতো। তবে কি আটলান্টিকের অন্য পারে দক্ষিণ আমেরিকার কোনো জনহীন প্রদেশ? কিন্তু সেখানে তো সিংহ নেই!

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সঙ্গীর অভাবে বড়ই মন খারাপ হতো। আকুটের দলের সঙ্গে থাকলেই হতো। তাদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। এখন ও জানত যে ও অন্য জগতের বাসিন্দা, তবু ওরাও সঙ্গী তো বটে! ফলমূল, রসালো পোকামাকড় খুঁজতে খুঁজতে নাকে এলো শীতার গন্ধ। শীতার চামড়া পেলে ভালো একটা তূণ আর আরেকটা নেংটি বানানো যেত।

আরেকটু কাছে গেলে বনমানুষের গন্ধও নাকে এলো। শীতা একটা বড় গাছের নিচের দিকের ডালে চড়েছে। গাছতলায় আকুটের দল রোদ পোয়াচ্ছে, কেউ কেউ খাবার খুঁজছে। শীতার সবচেয়ে কাছাকাছি আকুট ঘোরাঘুরি করছে। ঘন পাতার আড়ালে শীতা ওঁৎ পেতে আছে সে টের পায়নি। আকুট আরেকটু কাছে এলেই শীতা ঝাঁপ দেবে বোঝা যাচ্ছে। নিঃশব্দে টারজান ঐ গাছেরই একটা ডালে, শীতার মাথার ঠিক উপরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। দুঃখের বিষয় এত ডালপালার মধ্যে দিয়ে দড়ির ফাঁস ছোঁড়া যাবে না।

ততক্ষণে আকুট খুবই কাছে এসে পড়েছিল। শীতাও আস্তে আস্তে পেছনের পা দুটো গুটিয়ে এনে একটা বিকট চিৎকার দিয়ে লাফ দিল। তার ঠিক এক সেকেণ্ড আগে আরেকটা আরো বিকট চিৎকার শোনা গেল। চমকে উপর দিকে তাকিয়ে আকুট দেখে মাথার উপর শীতা! আর শীতার পিঠে সেই সাদা বনমানুষটা! শীতার ঘাড়ে তার দাঁত বসেছে। ডান হাত দিয়ে সে শীতার গলা জড়িয়ে ধরে, বাঁ হাত দিয়ে শীতার বাঁ পাশে বাঁ কাঁধের তলায় একটা সরু পাথরের টুকরো দিয়ে বারবার কোপ দিচ্ছে।

আকুট বুদ্ধি করে একটু সরে যেতে না যেতে হিংস্র

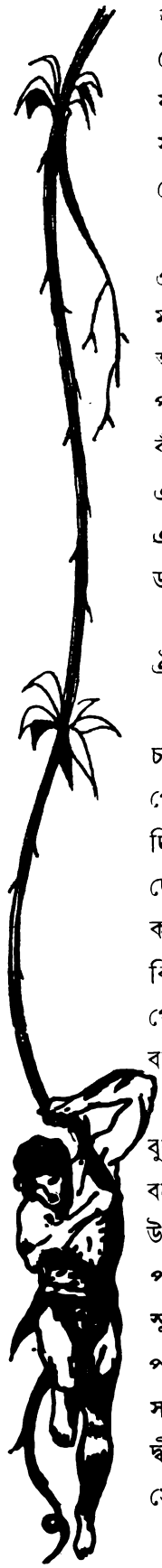

জানোয়ার দুটো ঐ ভাবে গাছ থেকে নিচে পড়ল। আর সে কি বীভৎস চিৎকার! তখনো সমানে কোপ পড়ছে, যতক্ষণ না শীতার শরীরটা মাটিতে এলিয়ে পড়ল। তখন সাদা বনমানুষটা আবার সেদিনের মতো ওর ঘাড়ে পা রেখে জয়ধ্বনি দিল!

আকুট আর তার দলের মুখে কথা সরে না। টারজান প্রথম কথা বলল, 'আমি বনমানুষদের ছেলে টারজান। মস্ত শিকারী। মস্ত যোদ্ধা। বড় জলের ধারে আমি আকুটের প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম। তাকে মেরে রাজা হতে পারতাম। আজ আবার তাকে শীতার কাছ থেকে বাঁচালাম। আকুট, কিম্বা তার দলের কেউ বিপদে পড়লে, এই রকম করে ডাক দিও, আমি অমনি ছুটে আসব।' এই বলে কেরচাকের দল যে ভাবে সঙ্গীদের ডাকত, সেই ডাক ওদের শিখিয়ে দিল।

তারপর বলল, 'টারজান বিপদে পড়লে, সে-ও তোমাদের ঐ ভাবে ডাকবে। তোমরা আসবে তো?'

তারা সকলে বলল, 'হুঁ!' তারপর সকলে একসঙ্গে চরতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয় একবার একটা রসাল পোকা পেয়ে, নিজে না খেয়ে সেটি আকুট টারজানকে দিল। কোনো বনমানুষকে টারজান এমন করতে কখনো দেখেনি। তাছাড়া সর্বদা সে কাছে কাছে থাকত। এমনি করে টারজান ওদের দলের একজন হয়ে গেল। প্রায় সব বিষয়ে এরাও কেরচাকের দলের মতো ছিল। ভালো খাবার পেলে, কেউ কাছে এলে দাঁত খিঁচোত। বাচ্চা কোলে বনমানুষীদের ধারে কাছে গেলে তারা মারমুখী হয়ে উঠত।

প্রায় সাতদিন সব সময় ওদের সঙ্গে কাটিয়ে টারজান বুঝল সে সকলের চেনা হয়ে গেছে, তাকে তারা দলের লোক বলে মেনে নিয়েছে। তারপর এক দিন সকালে আবার উত্তর দিকে যাত্রা করল। তীর বরাবর সারাদিন চলল। পরদিন সকালে লক্ষ্য করল আগের মতো সোজা সামনে সূর্যোদয় না হয়ে, হলো খানিকটা ডাইনে। তীর রেখাটা পশ্চিমে বেঁকে গিয়েছে। তার পরদিন দেখল সূর্য আবার সামনে থেকে উঠছে। অর্থাৎ জায়গাটা একটা জনহীন দ্বীপ। এখান থেকে চলে যাবার উপায় কি হতে পারে, সে ভেবে পেল না।

মনটা ভেঙে পড়ল। এখানেই কি জীবন কাটবে? রোকফ্ যে কতখানি নিষ্ঠুর তা ভাবা যায় না। ছোট ছেলেটাকে কি সত্যি অসভ্যদের কাছে দিয়ে দেবে?

হয়তো তারা ভালোই ব্যবহার করবে, কিন্তু তাকে কচি মুখে বীভৎস উল্কি পরিয়ে, তামার গয়না দিয়ে ঠোঁট বিকৃত করে দেবে! হয়তো তাকেও নরখাদক হতে শেখাবে। এই কি ছিল কপালে! আর জেন? তার কি হবে ভাবা যায় না। তবু এ-ও ভালো যে সে লণ্ডনে নিরাপদে আছে।

এই সব দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে বনের মধ্যে দিয়ে টারজান এগোচ্ছে, এমন সময় কানে এলো একটা অদ্ভুত খচর-খচর শব্দ। সন্তর্পণে সেদিকে ঝোপঝাপের মধ্যে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে দেখে মস্ত একটা গাছ ভেঙে পড়েছে একটা প্রকাণ্ড প্যান্থারের গায়ের উপর। সে বেচারা প্রাণপণে ছাড়া পেতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ছাড়ানো অত সহজ নয়। একটা মোটা ডাল পিঠের ওপর চেপে ধরেছে আর অন্যান্য একটু ছোট ডালপালা জট বেঁধে চারটে পা এমন করে বেঁধে ফেলেছে যে কোনো দিকে কয়েক ইঞ্চির বেশি নড়াচড়া করার জো নেই।

ধনুকে তীর পরিয়ে, অসহায় জানোয়ারটার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল টারজান। মেরে না ফেললেও তো বেচারা না খেয়ে মরে যাবে। তবু কিছুতেই টারজানের হাত সরল না। কেন বেচারাকে মুক্ত জীবন থেকে বঞ্চিত করা? কত সহজেই তো ওকে মুক্তি আর জীবন দান করা যায়। ওর হাঁচড়-পাঁচড় দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে কোথাও হাড়গোড় ভাঙেনি।

তীরটাকে আবার তূণে ভরে, ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে, টারজান ফাঁদে পড়া জানোয়ারটার আরো কাছে গেল। বেড়াল জাতীয় বড় বড় জানোয়াররাও খুশি হলে যেমন গলার মধ্যে মৃদু ঘর-র-র ঘর-র-র শব্দ করে, সেই রকম আওয়াজ করতে লাগল টারজান। অমনি প্যান্থার তার হাঁচড়-পাচড় বন্ধ করে, দাঁতখিচুনি থামিয়ে, জুলজুল চোখে চেয়ে রইল।

ভয়-ডর বলে টারজানের মনে কিছু ছিল না। মন যখন ঠিক করে ফেলেছে, তখন বৃথা সময় নষ্ট না করে সেই রকম শব্দ করতে করতে, ওর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল। প্যান্থারটা এক দৃষ্টে চেয়ে রইল, শ্বাদন্তগুলো বেরিয়ে ছিল কিন্তু ভয় দেখাবার ভঙ্গীতে নয়।

গাছের গুঁড়ির নিচে টারজান তার বিশাল কাঁধ রেখে, জোরালো মাংসপেশীর সমস্ত শক্তি দিয়ে চাড় দিল। ধীরে ধীরে ডালপালা সুদ্ধ গাছটা প্যান্থারের গা থেকে উঠে এলো। সে-ও তলা থেকে খচর্মচ করে বেরিয়ে এলো। টারজান তখন গাছটাকে আবার ছেড়ে দিল। তারপর দু'জনে দুজনার দিকে চেয়ে রইল। তক্ষুণি যদি জানোয়ারটা ওকে আক্রমণ করত, টারজান এতটুকু অবাক হতো না।

কিন্তু সে তা না করে, কয়েক পা সরে গিয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছা করলেই টারজান পাশের গাছটাতে উঠে, অনেকটা উঁচুতে প্যান্থারের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। কিন্তু কি এক অসমসাহসিক খেয়ালে ওর পরখ করে দেখার ইচ্ছা হলো এ-সব হিংস্র জন্তুদের মনেও কৃতজ্ঞতা বলে কিছু আছে কি না।

ওর দিকে একটু এগিয়ে গেল টারজান, সে-ও একটু সতর্ক ভাবে পাশে সরে গেল। ওর গা ঘেঁষে টারজান পথ ধরে এগিয়ে চলল। সে-ও কুকুরের মতো পিছন পিছন চলল। তা সে কৃতজ্ঞতার কারণে, নাকি ভবিষ্যৎ ভোজের আশায়, তা বোঝা গেল না।

আরেকটু বেলা হলে হরিণের গন্ধ পেয়ে টারজান গাছে উঠে পড়ল। সেখান থেকে ফাঁস দিয়ে সে হরিণ ধরল। তারপর প্যান্থাররা যখন জোড় বেঁধে শিকার করে, যে ভাবে সঙ্গীকে ডাকে, ঠিক তেমনি করে ডাক দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ-ঝাপ ভেঙে ওর বেঘো সঙ্গীর ছিপছিপে ক্ষিপ্র শরীরটা দেখা দিল। হরিণ দেখে প্যান্থারটা একবার ডেকে উঠল। তারপর দুই জানোয়ার পাশাপাশি বসে হরিণের নরম মাংসে পেট ভরাতে লাগল।

এর পর বেশ কিছুদিন দু'জনে একসঙ্গে ঘুরতে লাগল। একজন শিকার পেলে অন্য জনকে ডাক দিত। দু'জনেই পেট ভরে নিয়মিত খেত।

একবার ভোজের মধ্যিখানে নুমা সিংহ ওদের শিকার থেকে ভাগাবার জন্য বিকট গর্জন করে মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শীতা এক লাফে ঝোপে লুকোল। টারজান গাছের ডাল ধরে ঝুলে উঠে পড়ল। নুমা সগর্বে মাথা তুলে শিকারের উপরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গলায় ফাঁস পড়ল। দড়িতে টান দিয়ে টারজান তাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখল। খালি পিছনের পা দুটো মাটি পাচ্ছিল। তারপর দড়িটাকে গাছের ডালে শক্ত করে বেঁধে, টারজান শীতাকে ডাক দিল। দু'জনে মিলে নুমার নিধন সাধন করতে বেশি সময় লাগল না।

তারপর তাদের মিলিত কণ্ঠের বিকট জয়ধ্বনি অনেক দূর অবধি শোনা গেল। ঠিক সেই সময় লম্বা একটা রণ-ক্যেনু এসে তীরে লেগেছিল। তার মধ্যে থেকে জনা কুড়ি রংচঙে সাজ করা যোদ্ধা নেমে, বনের দিকে চেয়ে ঐ ডাক শুনে স্তম্ভিত হলো।

সমস্ত সমুদ্রতীরটা ঘুরে এসে, কয়েক বার বনের ভিতরটাও পর্যবেক্ষণ করে, টারজানের মনে কোনোই সন্দেহ ছিল না যে এটা একটা দ্বীপ এবং এই দ্বীপে সে ছাড়া অন্য মানুষ নেই।

নুমাকে মারার পরদিন শীতার আর টারজানের সঙ্গে আকুটের দলের আবার দেখা হলো। শীতাকে দেখেই তারা পালাবার তালে ছিল। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টারজান তাদের ফিরিয়ে আনল। ওর মনে হলো এই দুই জাতশত্রুর মধ্যে বন্ধুত্ব পাতাতে পারলে বেশ হয়। সময়-ও কাটে আর মন খারাপ করার-ও অবকাশ থাকে না।

বনমানুষদের অনেক বেশি বুদ্ধি। তারা সহজেই বুঝল যে সঙ্গে শীতা থাকলে অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু শীতাকে বনমানুষদের বন্ধুভাবে দেখতে শেখানো ঢের বেশি শক্ত কাজ। মাঝেমাঝেই শীতার পিঠে মুগুর লাগাতে হতো। তবু কেন যে সে রেগেমেগে টারজানকে আক্রমণ করেনি সেটাই আশ্চর্য। বার দুই দাঁত খিঁচিয়ে, নাকের উপর জোরে টোকা খেয়েছিল। মুগুরটাকে ভয় করতেই শিখেছিল, নাকি নিজেরই অজান্তে মানুষের উন্নত বুদ্ধির কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল! সেই প্রথম কৃতজ্ঞতা বোধের সঙ্গে একটা আনুগত্য মিশে ঐ ফল হয়েছিল কিনা কে জানে। অনেক হিংস্র বুনো জানোয়ারও তো মানুষের বশ হয়।

যে কারণেই হোক এর পর কিছুদিন টারজান, প্যান্থার আর আকুটের বনমানুষরা পাশাপাশি এক সঙ্গে খাবার খুঁজত, শিকার করত, শিকার ভাগ করে খেত। এই সময়ে একবার গাছে গাছে একলা ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রতীরে পৌঁছে বালির উপর শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল টারজান, এমন সময় পাশের টিলার অনুচ্চ চূড়ো থেকে একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ ওকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল। তারপর পিছন ফিরে ইশারা করে কাকে যেন ডাকল। ফলে আরেক জোড়া চোখ-ও সাদা বনবাসীটাকে আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল। ক্রমে আরো লোক এসে জুটল। দেখতে দেখতে জনা কুড়ি বিকট সাজ করা অসভ্য লোক উপুড় হয়ে শুয়ে অচেনা বনবাসীকে দেখতে লাগল। বাতাস উল্টো দিক থেকে বইছিল, তাই টারজান ওদের গন্ধ পায়নি। তার উপর ওদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শোয়াতে ওদের সাবধানে অগ্রসর হওয়াও টের পায়নি।

লম্বা চওড়া লোকগুলো মুখে বিকট রং মাখা, গায়ে তামা পেতলের গয়নায় পালক গোঁজা, মাথায় রংচঙে সাজ। আস্তে আস্তে টিলা বেয়ে নেমে এসে, নিচু হয়ে, হাতে যুদ্ধের গদা ঘোরাতে ঘোরাতে ও কিছু টের পাবার আগেই প্রায় ওকে ধরেই ফেলেছিল। টারজান আসলে নিজের মনের দুঃখে ডুবে ছিল, তাই কোনো দিকে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ টের পেল কারা এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাসমতো শরীর মন যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তৈরি। যে মুহূর্তে টের পেয়েছে পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে, অমনি টারজান উঠে পড়েছে আর অসভ্য যোদ্ধারাও বিকট চিৎকার করে গদা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সামনের লোকটা টারজানের হাতের

লম্বা মোটা লাঠির এক ঘায়ে মরে পড়ে গেল।

টারজানও ওদের দলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে অব্যর্থ লাঠির ঘায়ে একজনের পর একজনকে পেড়ে ফেলতে লাগল। ঘাবড়ে গিয়ে বাকিরা প্রথমে একটু পিছু হটে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, অর্ধচন্দ্রাকারে লম্বা লম্বা বর্শা নিয়ে আক্রমণ করল। তাতে বনে পালাবার পথ বন্ধ হলো। পিছনে শুধু সমুদ্র। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসতেই টারজানের মুখে হাসি দেখা দিল।

এদিকে অসভ্যগুলো বিকট চিৎকার করতে করতে বর্শা তুলে লাফ-ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে। তাদের ফুর্তি দেখে কে! শত্রুকে খুব বাগে পাওয়া গেছে! ঠিক সেই সময় মুখ তুলে টারজান অদ্ভুত ভাবে ডাক ছাড়তে লাগল। অসভ্যগুলো অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে, এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। মানুষের গলা থেকে যে এমন জন্তুর মতো ডাক বেরোতে পারে, এ তাদের ধারণা ছিল না।

এক মুহূর্ত থমকে থেমে আবার তারা যেই এগোতে শুরু করেছে, বন থেকে একটা মড়মড় হুড়মুড় শব্দ শুনে আবার তারা থেমে গেল। তারপর বনের দিকে একবার তাকিয়ে যা দেখল, তাতে শুধু ওয়াগাম্বিদের কেন, ওদের চেয়ে ঢের বড় বীরদেরও রক্ত হিম হয়ে যেত!

ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে লাফাতে লাফাতে বড় বড় দাঁত বের করে, জ্বলজ্বল চোখ করে বেরিয়ে এলো প্রকাণ্ড একটা প্যান্থার। তার পিছন পিছন গোটা কুড়ি হিংস্র বড় বড় বনমানুষ, হাতে ভর দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। টারজানের ডাকে তার জন্তুরা সাড়া দিয়েছে।

ওয়াগাম্বিরা কিছু করবার আগেই এক দিক থেকে টারজান, অন্যদিক থেকে জন্তুরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারাও প্রাণপণে লড়াই করেছিল, বর্শা ছুঁড়েছিল, গদা মেরেছিল, কয়েকজন বনমানুষকে প্রাণও দিতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শীতার, আকুটের, বনমানুষদের আর টারজানের হাত থেকে মাত্র একজন যোদ্ধা পালিয়ে বেঁচেছিল। বাকি উনিশজনকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। টিলার আড়ালে আর যারা ছিল, তারা অনেক আগেই ভেগেছিল।

যে লোকটা বেঁচে গিয়েছিল, তার নাম মুগাম্বি, ঐ ওয়াগাম্বিদের দলপতি ছিল সে। আর কেউ না দেখলেও টারজান তার পলায়নের পথটা ঠিক লক্ষ্য করেছিল। সমুদ্রতীরে শীতা আর আকুটের দল তখন এক বীভৎস ভোজসভায় মত্ত ছিল। টারজান ও-সব খাদ্য ছুঁতো না, সে মুগাম্বির পিছু নিল। একটু পরেই দেখতে পেল জোয়ারের সীমা-রেখার উপরে বালির তীরে ওয়াগাম্বিদের যুদ্ধ-ক্যেনু টেনে তুলে রাখা হয়েছে। লম্বা লম্বা লম্ফ দিয়ে মুগাম্বি সেই দিকে ছুটেছে।

নিঃশব্দে টারজান তার পিছু নিল। তার মাথায় একটা নতুন মতলবের উদয় হয়েছিল। এরা যখন ঐ নৌকোয় চেপে এখানে এসেছে, তখন টারজানই বা কেন ঐ নৌকোয় চেপে ওদের দেশে যেতে পারবে না? তাদের সঙ্গে হয়তো আফ্রিকার যোগাযোগ আছে। কে জানে দেশটা হয়তো আফ্রিকারই উপকূলে।

কিচ্ছু টের পায়নি মুগাম্বি। কাঁধে একটা ভারি হাত পড়াতে চমকে ফিরে লড়াই দিতে তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু তার সময় হলো না। দু'হাতের কব্জি ধরে টারজান তাকে মাটিতে ফেলে, তার দু'পাশে দুই পা রেখে দাঁড়াল। তারপর পশ্চিম আফ্রিকার প্রচলিত ভাষায় বলল, 'তুমি কে?'

—'আমি ওয়াগাম্বিদের দলপতি মুগাম্বি।'

টারজান বলল, 'আমাকে যদি এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে সাহায্য কর, তাহলে তোমার প্রাণ রক্ষা করব।'

মুগাম্বি বলল, 'আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু আমার যোদ্ধারা সবাই মারা পড়েছে, অত বড় নৌকোর দাঁড় বাইবার লোক কোথায় পাব?'

টারজান সরে দাঁড়াল। লোকটাও উঠে দাঁড়াল। চমৎকার চেহারা তার। লম্বা চওড়া, নিখুঁৎ গড়ন, কালো রং বটে, কিন্তু অন্য সব কিছুতে কোনো অংশে টারজানের চেয়ে কম যায় না। টারজান বলল, 'এসো।'

সেখান থেকে ভোজে লিপ্ত জানোয়ারগুলোর তর্জন-গর্জন শোনা যাচ্ছিল। লোকটা ভয় খাচ্ছিল, 'ওরা আমাদের মেরে ফেলবে।'

টারজান বলল, 'তা মনে হয় না। ওরা আমার লোক।' তবু সে সাহস পাচ্ছে না দেখে টারজান তাকে এক রকম ধর-পাকড় করে সঙ্গে নিয়ে গেল।

তারপর ঠিক যে ভাবে বনমানুষরা শীতাকে মেনে নিতে শিখেছিল, সেই ভাবে মুগাম্বিকেও গ্রহণ করল এবং আরো সহজে! শীতা গোড়ায় বুঝতে পারছিল না যে মুগাম্বির দলবলকে চিবিয়ে খাওয়া যদি দোষের না হয়, তা হলে মুগাম্বিকেই বা খাবে না কেন? শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি শীতাকে পোষ মানতেই হলো। এদিকে মুগাম্বি বেচারা ভয়েই আধমরা। বাঘটা ওর দিকে জুলজুল করে চাইছে, চাপা গর্জন করছে, এই বুঝি খেল! টারজানকে সে আঁকড়ে ধরে থর থর করে কাঁপছিল। টারজানের একটু হাসিও পাচ্ছিল।

শীতাটাতো বড় বাড়াবাড়ি করছে! তার ঘাড় ধরে মুগাম্বির কাছে এনে, যতবার গলা থেকে এতটুকু চাপা আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে নাকের উপর ঠকাস্ করে লাঠির বাড়ি! সে দৃশ্য দেখে মুগাম্বির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে আর কি! নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সাদা লোকটার প্রতি ওর মনে শ্রদ্ধা জন্মাল।

অল্পদিনের মধ্যেই দু'জনে দু'জনকে মেনে নিতে পারল, যদিও শীতা কাছে এলে মুগাম্বি যে খুব একটা আরাম পেতো, তা নয়।

কতবার টারজান মুগাম্বি শীতা আর আকুট, চারজনে হরিণের জল খেতে যাবার পথে অপেক্ষা করেছে। শিকার এলেই চারজনে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ত। শিকারও ভাগ করে খাওয়া হতো, কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি হতো না। মুগাম্বি কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বেলে মাংস রান্না করে খেত। বাকিরা কাঁচা মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেত। কেউ অন্যের অংশে ভাগ বসাবার চেষ্টা করলে গলায় গর-গর শব্দ করত, জানোয়াররা যেমন করে থাকে। মুগাম্বি জন্মে কখনো কাঁচা মাংস খায়নি। টারজান কুড়ি বছর বয়স অবধি কাঁচা মাংস ছাড়া কিছু খায়নি। রান্না মাংস খাওয়া মাত্র ক-বছর ধরে অভ্যাস করেছে। এখনো ওর মুখে তাজা কাঁচা মাংসের স্বাদই ভালো লাগে। রেঁধে নষ্ট করা হয় কেন সে ভেবে পায় না।

এমন কি সভ্য সমাজের লোকরা শিউরে উঠত যদি জানত যে আজ পর্যন্ত তাজা মাংস কয়েক সপ্তাহ মাটিতে পুঁতে রেখে তারপর খুঁড়ে বের করে খেতে বেড়ে লাগে টারজানের। কোনো কোনো তাজা পুরুষ্টু পোকা-মাকড়ও খাসা খেতে। তা পছন্দের কি আর কোনো মাথামুণ্ডু আছে! রুডল্‌ফ হ্রদের কাছে এক জাতের লোকরা ভেড়ার মাংস আর গরুর মাংস খায় না, আর সব খায়। আরেক জাত গাধার মাংস ভালোবাসে। কে বলবে কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ? অতি সুসভ্য সমাজের লোকরা তো গুগলী, ব্যাঙের ঠ্যাং, কাঁচা অয়স্টার ভারি উপভোগ করে। রসালো পোকা-মাকড় কি দোষ করল, তাজা কাঁচা হরিণের মাংসটা মন্দ হবে কেন?

এর পর কিছু দিন ধরে টারজান গাছের ছালের তৈরি শক্ত কাপড় দিয়ে নৌকোর পাল তৈরি করল। বনমানুষদের দাঁড় বাইতে শেখানো বড়ই কষ্টকর। কিন্তু নৌকো চেপে জলে ভাসার ভয়টা ক্রমে দূর হলো। দ্বীপের উপকূলে খানিকটা স্থির জলে নৌকো ভাসিয়ে কয়েকজন বনমানুষকে তাতে চড়িয়ে, মুগাম্বি আর টারজান ওদের দাঁড় বাওয়া অভ্যাস করার অনেক চেষ্টা করেছিল। মুস্কিল হলো বনমানুষরা কোনো কাজে বেশিক্ষণ মন দিতে পারে না। তবু চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই।

আকুটের কথা আলাদা। তার ভারি বুদ্ধি। দাঁড় ব্যবহারের উদ্দেশ্য আর কায়দা বুঝে নিতে তার খুব দেরি হয়নি।

মুগাম্বি বলেছিল, মহাদেশটা ঐ দ্বীপ খুব বেশি দূরে নয়। আসলে মুগাম্বি তার যোদ্ধাদের নিয়ে একটু বেশি দূরে গিয়ে পড়েছিল। সেখানে ঝোড়ো বাতাস আর উত্তাল জোয়ারের টানে ঐ দ্বীপটাতে পৌঁছে ভেবেছিল বুঝি বাড়ি পৌঁছে গেছে। ওটা যে একটা দ্বীপ সে-কথা টারজানের কাছেই প্রথম শুনেছিল। পালটার উপর মুগাম্বির খুব আস্থা ছিল না। ওরা উগাম্বি নদীর অনেকটা উজানে থাকে। পাল ব্যবহার করে না। এই প্রথম সমুদ্র দেখল।

কিন্তু টারজানের বিশ্বাস পশ্চিম থেকে বাতাস বইলে মহাদেশে পৌঁছনো খুব শক্ত কাজ হবে না। এখানে পড়ে থাকার চেয়ে যে-কোনো বিপদও ভালো।

তারপর একদিন পশ্চিম থেকে যেই পালে বাতাস লাগল, ওরা ভেসে পড়ল। টারজান, মুগাম্বি, আকুট, শীতা আর জনা বারো ষণ্ডা বনমানুষ।

দ্বীপটি আসলে প্রবাল দ্বীপ, মধ্যিখানের স্থির জলের প্রায় চার দিক ঘেরা। মুখটি খালি খোলা। তাই দিয়ে বাইরের সাগরে যেতে হয়। যেখানে হাওয়া বয়, বড় বড় ঢেউ ওঠে। মাঝি-মাল্লাদের দু'জন মাত্র মানুষ। বাকি সব হিংস্র জানোয়ার। নৌকোর মাথায় টারজানের পায়ের কাছে শীতা বসে। অন্যদের কাছ থেকে তফাতে থাকাই ভালো। ভয় খেলে কি করে বসে তার ঠিক কি! পিছনে মুগাম্বি, তার সামনে বসে আকুট। এদের মাঝখানে বারোজন বনমানুষ। তারা সন্দেহের সঙ্গে এপাশে-ওপাশে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে লুব্ধ চোখে সবুজ তীর-রেখার দিকে তাকাচ্ছে।

শান্ত জলে ওরা কেউ তেমন ঘাবড়ায় নি। কিন্তু একবার বহিঃ-সাগরে বেরিয়ে ঢেউয়ের দোলা লাগতেই সবাই ভয়ে আধমরা। টারজান আর আকুট অনেক কষ্টে

তাদের সামলে রেখেছিল। পথে কোনো দুর্ঘটনা হয়নি। পাল তুলে দশ ঘণ্টা যাত্রা করার পর তীরের কালো ছায়া দেখা গেল। ততক্ষণে অন্ধকার নেমেছে, উগাম্বি নদীর মুখের কাছে এসে পৌঁছল, না অন্য কোথাও বোঝার উপায় নেই। যতটা সম্ভব তীরের কাছে গিয়ে, ভোরের জন্য অপেক্ষা করাই ভালো মনে হলো।

বালির তটভূমি ছোঁয়ামাত্র আরোহীদের অধিকাংশ খচমচ করে নেমে পড়ল। ঐখানেই ঢেউ ভাঙছিল; তার সঙ্গে গড়াতে গড়াতে নৌকোসুদ্ধ সকলে নিরাপদে কিন্তু ভিজে চুপ্পুড় হয়ে শুকনো ডাঙায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে পড়ল। তাতে যদি একটু গা গরম হয়। মুগাম্বি কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালল। টারজানের আর শীতার প্রাণে অন্ধকারের বা অজানা বনের ভয় ছিল না। ওরা দু'জনে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। সকলেরই খিদে পেয়েছিল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। এমনি ঘন গাছপালা যে কোথাও অনেক কষ্টে দু'জনে পাশাপাশি, নয়তো একজন আগে একজন পেছনে হাঁটছিল। নাকে এলো বুনো মোষের গন্ধ। নদীর ধারে নল খাগড়ার মধ্যে ঘুমোচ্ছে। দু'জনে একসঙ্গে অনেক বড় শিকার করেছে। আজও টারজানের ইঙ্গিতে শীতা ঘুমন্ত জানোয়ারটার পিঠে লাফিয়ে পড়ে ঘাড় কামড়ে ধরল। টারজান বাঁ দিক থেকে ছুটে এসে বার বার বাঁ কাঁধের তলায় পাথরের ছুরির কোপ দিতে লাগল।

বুনো মহিষের ভয়ঙ্কর তেজ। পিঠে দুই শত্রু ঝুলছে, মর্মান্তিক ভাবে আহত হয়েও, উঠে পড়ে কয়েক শো গজ ছুটে গিয়ে তবে মাটি নিল। পেট ভরে খেল দুই শিকারী। তারপর একটা ঝোপে ঢুকে শীতার গায়ে মাথা রেখে দু'জনায় ঘুম দিল। ভোরে আরেকবার খাওয়া-দাওয়া করে, সাগরতীরে গিয়ে সকলকে ডেকে নিয়ে এলো। সকলেরই খিদে পেয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর তীর বরাবর একশো গজ এগোতেই যে নদী দেখতে পেল, মুগাম্বি সেটাকে চিনতে পারল। এই নদী বেয়েই ওরা যাত্রা করেছিল। নদীটা যেখানে উপসাগরে পড়েছে, তার দূরত্ব ওদের নৌকোটা থেকে এক মাইলও নয়।

টারজান মহা খুশি। বড় নদী থাকা মানে স্থানীয় লোকদের গ্রামও আছে। সেখানে রোকফের আর ছোট্ট ছেলেটার খবর পাওয়া যেতে পারে। রোকফ নিশ্চয় যত তাড়াতাড়ি পারে ছেলেটাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করবে। মুগাম্বি আর টারজান অনেক কষ্টে নৌকোটাকে সোজা করে, তীর ধরে উগাম্বি নদীতে ঢুকে পড়ল। তখন ভাঁটা; স্রোতের উল্টো দিকে নৌকো চালানো বড়ই শক্ত। মাঝি বলতে ওরা দু'জন।

এই নদীর ধারেই বুনো মহিষ শিকার করেছিল ওরা। নদীর ধারে একটা গাছে নৌকো বেঁধে ওরা দেখল বনমানুষরা আশেপাশে চরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু শীতার দেখা নেই। তবে কি সে স্বজাতির খোঁজে বেরিয়েছে নাকি? সারারাত সে ফিরল না। পরদিন ভোরে সবাইকে নিয়ে নদীর ধারে যাবার পথে টারজান একবার ডাক দিল। অমনি দূর থেকে উত্তর এলো। একটু পরেই বন থেকে লাফাতে লাফাতে শীতা এসে হাজির হলো।

টারজান তার অভাবনীয় মাঝিমাল্লাদের নৌকোতে তুলবার সময় দেখল দু'জন বনমানুষ কম আছে। সেই দু'জনেরই গোড়া থেকেই নৌকোতে চড়বার সব চেয়ে অনিচ্ছা ছিল। ভয়ও পেয়েছিল সবচেয়ে বেশি। মনে হলো তারা ইচ্ছা করেই সরে পড়েছে।

দুপুরে নৌকো বেঁধে খাবারের খোঁজে ওরা যখন নামছে, গাছের আড়াল থেকে রোগা একজন উলঙ্গ অসভ্য একবার তাকিয়েই, নদীর তীর বরাবর ছুট দিল নিজেদের গাঁয়ে এই চাঞ্চল্যকর খবর দিতে। গোল ছাউনির দোর-গোড়ায় সরদার বসেছিল। তার কাছে উঠিপড়ি করে পৌঁছে লোকটা বলল, 'সরদার, আরেকটা সাদা মানুষ দলবল নিয়ে রণ-ক্যেনু চেপে এসেছে। ঐ যে কালো দাড়ি সাদা লোকটা সবে চলে গেল, এ-ও তারই মতো আমাদের মেরে ধরে লুটপাট করবে!

সরদারের নাম কাবিরি। কালো-দাড়ির কাছে ঐ রকম খারাপ ব্যবহার পেয়ে তার মনটা তিক্ততা আর বিদ্বেষে ভরে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে রণ-দামামা বেজে উঠল।

লম্বা বর্শা হাতে একদল পালক-পরা, রং-মাখা যোদ্ধা সাতটা রণ-তরী চেপে নিঃশব্দে রওনা হয়ে গেল। সবার আগে চলল কাবিরির নিজের ক্যেনু। দেখতে দেখতে স্রোতের টানে সেটি টারজানের নৌকোর মুখোমুখি হলো।

কাবিরি শুধু টারজানের সাদা মুখটাই দেখতে পেয়েছিল! তার যোদ্ধারা বিকট চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বর্শা বাগিয়ে ধরেছিল। মুহূর্তের মধ্যে টারজানের বিকট-দেহী মাঝি-মাল্লারা উঠে দাঁড়াতেই, তাদের চেহারা দেখে যোদ্ধাদের চক্ষুস্থির। বনমানুষেরা অতি সহজে তাদের বর্শা কেড়ে নিল। ততক্ষণে অন্য রণ-তরীগুলোও এসে পড়েছিল। তারা কিন্তু শত্রুদের ঐ বিকট চেহারা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে পালাল। খালি একটা ক্যেনু বড় বেশি কাছে এসে গিয়েছিল, তাদের যুদ্ধ না করে উপায় রইল না।

তখন টারজানের মুখের একটি কথায় এক দিক থেকে আকুট, অন্য দিক থেকে শীতা ওদের নৌকোয় চড়ে সে যা বীভৎস কাণ্ড শুরু করে দিল সে ভাবা যায় না। কাবিরি নিজে এত ব্যস্ত ছিল যে কাউকে এতটুকু সাহায্য করতে পারল না। বিশালদেহ সাদা মানুষটার দানবের মতো শক্তি। সে ওর বর্শাটা কেড়ে ফেলে দিয়ে, ওর গলা টিপে ধরে ওর শরীরটা পিছন দিকে বেঁকিয়ে ধরল। কাবিরির মাথা ঘুরতে লাগল, সে চোখে ঝাপসা দেখতে লাগল; বুকে দারুণ বেদনা; তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

আবার যখন চোখ খুলল, অবাক হয়ে বুঝতে পারল সে মরেনি। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নিজের নৌকোতেই শুয়ে আছে। পাশে একটা প্রকাণ্ড প্যান্থার বসে আছে, কিন্তু কিছু বলছে না। তার ওপাশে সাদা দানবটা হাঁটু গেড়ে বসে আছে। সে দাঁড় বাইছিল। তার পিছনে কাবিরির নিজের যোদ্ধারা দাঁড় বাইছিল। তাদের পিছনে অনেকগুলো বনমানুষ বসে ছিল।

টারজান বলল, 'তোমার যোদ্ধারা বলেছে তোমার নাম কাবিরি। তুমি ওদের সরদার। আমি শান্তি নিয়ে এসেছি, আমাকে আক্রমণ করলে কেন?'

কাবিরি বলল, 'আরেকটা সাদা লোকও কিছুকাল আগে এসে ঠিক ঐ কথা বলেছিল। আমরা তাকে ছাগল, ভেড়া, দুধ, খাবার জিনিস উপহার দিয়েছিলাম। সে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে আমাদের অনেককে মেরে ফেলে, আমাদের ছাগল ভেড়া আর কমবয়সী ছেলে মেয়ে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।'

টারজান বলল, 'আমি তার মতো খারাপ লোক নই। সে কেমন দেখতে?'

কাবিরি বলল, 'মুখ ভরা তার কালো দাড়ি। খুব খারাপ দেখতে। খুব খারাপ লোক!'

টারজান বলল, 'আমিও তো তাকেই খুঁজছি। তার সঙ্গে কি একটা ছোট্ট সাদা ছেলে ছিল?'

—'না, বোয়ানা, ছোট্ট ছেলেটা তো প্রথম দলে ছিল, তাদেরই এরা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সেই দলে একজন ছিল সাদা পুরুষ, একজন সাদা মেয়ে আর ছেলেটা।'

শুনে টারজানের ধাঁধা লাগল। ছেলেটা না হয় তার। বাকি দু'জন তাহলে কারা? তাদের ধাওয়া করে দাড়িওয়ালা রোকফ্ যখন এতদূর এসেছে, এতদিনে নিশ্চয় ধরেও ফেলেছে। এদিকে অনেক নরখাদকের গ্রাম আছে। তাদের কাছেই বোধ হয় ছেলেটাকে বেচতে চায় রোকফ্। নরখাদকদের হাতে পড়লে তো অন্যদেরও তারা খেয়ে ফেলবে।

খানিক পরেই তারা কাবিরির গ্রামে পৌঁছে গেল। সেখানে খাওয়া দাওয়া সেরে, দাঁড় টানার লোক তুলে নিয়ে, তখনি রওনা হয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল টারজানের। কিন্তু ঐ সব হিস্র জন্তুদের সঙ্গে যাবার কথা শুনেই গ্রামের লোকরা বনে পালাল। লোক নইলে চলবে না। টারজান, শীতা আর আকুট ছাড়া মাত্র সাতজন বনমানুষ বাকি ছিল।

টারজান মুগাম্বিকে বলল, কাবিরির কাছে থাকতে, যাতে সে-ও না পালায়। তারপর কাবিরিকে বলল, 'যাই, তোমার লোকজনদের ফিরিয়ে আনি।' এই বলে শীতা, আকুট আর বনমানুষদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

একটু পরেই বন থেকে নানা রকম রক্ত-জমানো হাঁক হুংকার শোনা যেতে লাগল। কাবিরি ভয় পেলেও মুগাম্বি টারজানের আর শীতার গলা চিনতে পারছিল।

কাবিরি তো ভয়েই মরে। জন্মে কখনো এমন বিকট শব্দ সে শোনেনি। মুগাম্বি বলল, 'ও তো টারজানের আর তার প্যান্থারের ডাক।' বিকট গোলমালটা ক্রমে কাছে আসতে লাগল। মানুষের ভয়ার্ত গলাও কানে এলো। মিনিট কুড়ি চলল সে সব, তারপর বন থেকে ছুটতে ছুটতে ভয়ে আধমরা গ্রামবাসীরা ফিরে এলো। তাদের গোরু

ছাগলের মতো তাড়িয়ে আনল টারজান আর তার জন্তুরা।

টারজান কাবিরির সামনে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'তোমার লোকজনরা সবাই ফিরে এসেছে, ভাই, এবার কয়েকজন দাঁড়-টানার লোক দাও, আমরা রওনা হই।' কাবিরির ডাকে কেউ সাড়া দিল না। টারজান বলল, 'ওদের বল এমনিতে না এলে, ওদের নিয়ে আসবার জন্য আমার লোকদের পাঠাব। বলার সঙ্গে সঙ্গে গাঁ সুদ্ধু সবাই এলো। কাবিরি জনা বারোকে বেছে দিল। সরদার বুঝিয়ে দিল ওদের না গিয়ে উপায় নেই, টারজানের জন্তুরা গিয়ে ধরে আনবে।

শেষ পর্যন্ত টারজানের নৌকো আবার ছাড়ল। তিন দিন ধরে উগাম্বি প্রদেশের প্রায় অজ্ঞাত অন্তঃস্থলে নৌকো চলল। তিন জন গ্রামবাসী পালিয়ে গেল। কিন্তু তত দিনে বনমানুষদের কয়েকজন দাঁড়ের কাজ শিখে নিয়েছিল, তাই অসুবিধা হলো না। ডাঙায় হেঁটে গেলে আরো তাড়াতাড়ি এগোনো যেত, কিন্তু জন্তুদের দলটার উপর চোখ রাখার পক্ষে নৌকোই ভালো।

দিনে দু'বার থেমে, শিকার করে খাওয়া-দাওয়া করা হতো। রাতে হয় নদীর তীরে, নয়তো নদীর বুকে কোনো ছোট দ্বীপে সকলে ঘুমোত। তীরের গ্রামের লোকদের কানে নৌকোভরা হিংস্র জন্তুর খবর পৌঁছবামাত্র, তারা গ্রাম খালি করে পালাত। কাজেই সংবাদ সংগ্রহ করা অসম্ভব হলো। শেষ পর্যন্ত টারজান আকুটকে বলল যে মুগাম্বি পথ বলে দেবে, ওরা সেই ভাবে নৌকোয় যাক। টারজান একা তীরপথে এগোচ্ছে কালোদাড়ি খারাপ লোকটার সন্ধানে। কয়েক দিনের মধ্যেই সে আবার দলের সঙ্গে মিলবে। এই বলে ডাঙায় নেমে সে হাঁটতে লাগল আর দেখতে দেখতে অন্যদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

প্রথম কয়েকটা গ্রামে কেউ ছিল না, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে এক জায়গায় দেখল কয়েকটা খড়ের ঘরের চারদিকে আনাড়ি হাতের বেড়া দেওয়া, ভিতরে শ-দুই স্থানীয় লোক। টারজান গাছের উপর থেকে দেখল মেয়েরা রাতের রান্না চড়িয়েছে। আড়াল থেকে টারজান প্যান্থারের ডাকের নকল করল। সকলে উপরের দিকে তাকাল। টারজান গলা তুলে ভীষণ জোরে বিকট ভাবে আবার প্যান্থারের মতো ডাকল। তারপর নিঃশব্দে বেড়ার বাইরে নেমে পড়ে, স্থানীয় ভাষায় বলতে লাগল, 'আমি বন্ধুভাবে এসেছি, রাতের মতো একটু আশ্রয় আর খাবার চাই।'

ওরা যে দরজা খুলবে না এটা টারজান জানত। প্যান্থারের ডাকে একে ভয় পেয়েছে, তার উপর অন্ধকার থেকে রাতে কেউ ডাকলে, ওরা ভাবে বুঝি ভূত-টূত হবে। তবু টারজান বলে চলল, 'আমি একজন সাদা মানুষ, একটা দুষ্টু সাদা মানুষকে খুঁজছি। কয়েক দিন আগে সে এই পথে গিয়েছে। আমি তাকে শাস্তি দিতে চাই, তোমাদের আর আমার সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করেছে তার জন্য। যদি আমাকে সন্দেহ কর, তাহলে আমি গাছে চড়ে ঐ প্যান্থারটাকে তাড়িয়ে দিতে পারি। যদি আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার না কর তা হলে....। থাক গে, প্যান্থার তোমাদের খেয়ে ফেলুক।'

একটু পরে কাঁপা গলায় উত্তর এলো, 'আগে ওটাকে তাড়াও, তারপর দেখা যাবে।' টারজান তখন গাছে চড়ে পাতার আড়ালে শীতার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির নকল করতে লাগল। তারপর গাছটার উল্টো দিকের ডাল বেয়ে নেমে প্যান্থারের চিৎকারের নকল করতে করতে বনের দিকে দৌড়ল। আওয়াজ ক্রমে কমে থেমে গেল। একটু পরে ফিরে এসে ডেকে বলল, 'তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, এবার দরজা খোল।'

উত্তেজিত কণ্ঠে তর্কাতর্কির পর, কয়েকজন সশস্ত্র যোদ্ধা দরজাটা একটু ফাঁক করে, বিশাল দেহ আধা-উলঙ্গ সাদা মানুষটাকে দেখে খুব বেশি আশ্বস্ত না হলেও, ওকে ঢুকতে দিল। টারজান তখন সরদারের কুঁড়েঘরের দিকে চলল। ওকে ঘিরে চলল এক পাল মেয়েমানুষ আর ছেলেপুলে।

সরদার বলল, এক হপ্তা আগে নদী পথে রোকফ্ গিয়েছে। তার কপালে দুটো শিং আর সঙ্গে এক হাজার ভূতপ্রেত। পরে সরদার আবার বলল সেই ভয়ংকর খারাপ লোকটা এখানে এক মাস ছিল। কাবিরি কিন্তু বলেছিল রোকফ্ তিন দিন আগে গিয়েছে আর সঙ্গে একটা ছোট দল ছিল। এ-সব অসভ্য জাতের লোকদের ঐ রকম কথা। তবে এটুকু মনে হলো যে অল্প দিন আগে রোকফ্ এ-দিক দিয়ে গিয়েছে।

আরো কয়েক ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল তার কয়েক দিন আগে একজন সাদা পুরুষ, একজন সাদা মেয়েমানুষ আর একটি ছোট ছেলে এ-পথে গিয়েছে। তাদের সঙ্গে কয়েকজন মসুলা জাতি কালো মানুষও ছিল। টারজান সরদারকে বলল পর দিনই হয়তো ওর লোকরা নৌকো করে এই পথে যাবে। তাদের সঙ্গে ভালো

ব্যবহার করলে, তারাও কিছু বলবে না।

এরপর গাছতলায় শুয়ে টারজান ঘুমোতে চাইল। কারণ প্যান্থারটা আবার এলে তাকে তাড়াতে হবে। কিছু পরে গ্রাম সে রাতের মতো চুপচাপ হয়ে গেলে, এক লাফে গাছে উঠে, বনের মধ্যে সে মিলিয়ে গেল। সারা রাত গাছের উঁচু দিকের ডাল ধরে ঝুলে খুব অল্প সময়ে অনেক দূর এগিয়ে গেল। ভোরে গাছ থেকে নেমে কিছু খাওয়া-দাওয়া সেরে, একটা নিরাপদ জায়গায় কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে দুপুরের দিকে আবার তার লক্ষ্যবস্তুর সন্ধানে চলল। দু'বার স্থানীয় অসভ্যদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, অনেক কষ্টে তাদের মনের ভয় আর শত্রুভাব ঠাণ্ডা করে, শুনল সেই রুশ লোকটা এই দিকেই গিয়েছে।

আরো দু'দিন বাদে উগাম্বি নদীর ধারে বড় একটা গ্রামে পৌঁছল টারজান। সেখানকার দলপতির ছুঁচলো দাঁত দেখেই তাকে নরখাদক বলে চেনা গেল। দেখে খুব সুবিধার মনে হলো না। টারজানের ইচ্ছা কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করে শরীরটাকে রোকফের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট চাঙা করে তোলে। সরদার বাইরে থেকে তো বন্ধু-ভাব দেখাতে লাগল। সে বলল, দাড়িওলা সাদা মানুষটা আগের দিন চলে গিয়েছে, তাকে ধরে ফেলতে দেরি হবে না! অন্য দলটা সে দেখেও-নি, তার কথা জানেও না।

সরদারের আচরণে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। এ কেমন সাদা লোক, একা এসেছে, কোনো উপহার আনেনি। টারজান সবই বুঝল, কিন্তু তার খাবার আর বিশ্রামের বড়ই দরকার। এখানে দুই-ই পাওয়া যাবে। তাছাড়া ভয়-ডর বলে কিছু তার প্রাণে ছিল না। কাজেই একটা কুটিরের ছায়াতে নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সরদার দুটো যোদ্ধা ডেকে কানে কানে কি বলে দিল। তারাও সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধার দিয়ে ছুটল। আর সরদার গাঁয়ের সকলকে সাবধান করে দিল যেন টুঁ শব্দটি করে অতিথির ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায়। তিন ঘণ্টা বাদে গোটা কতক নৌকো দেখা গেল, নিঃশব্দে কিন্তু তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। তাদের দাঁড় টানছে কয়েকজন বলিষ্ঠ কালো মানুষ। সরদার মাথার ওপর আড়ভাবে বর্শা ধরে তীরে দাঁড়িয়েছিল। নৌকোর মাথায় তার পাঠানো সেই দুই যোদ্ধা! বোঝা গেল সবই পূর্ব পরিকল্পনা মতো হচ্ছে।

নৌকো তীরে লাগতেই কয়েকজন কালো যোদ্ধার সঙ্গে জনা ছয় কুৎসিৎ এবং বদমাইসের মতো দেখতে সাদা মানুষও নামল। তাদের পাণ্ডা হলো সেই কদাকার কালো দাড়ি লোকটা। সে বলল, 'কোথায় সে লোকটা?'

—'এদিকে আসুন, বোয়ানা, সে এখনো ঘুমোচ্ছে। এ লোকটাই আপনার শত্রু কিনা জানি না। তবে সেই রকমই দেখতে আর আপনার খোঁজও করছিল। ও-ই যদি আপনার শত্রু হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে একটা রাইফেল আর গুলি-বারুদ দিতে হবে।'

তারপর সকলে দল বেঁধে বাড়িটার কোণ ঘুরে ঘুমন্ত টারজানের কাছে গেল। তাকে দেখেই রোকফের মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল। সরদার তার দিকে তাকাতেই সে মাথা নেড়ে জানাল সেই লোকই বটে! সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-ছ'টা পাষণ্ড টারজানের গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল আর সে বেচারার ভালো করে ঘুম ছুটবার আগেই তার হাত-পা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল।

সেই অবস্থায় ওকে চিৎ করে ফেলতেই ভিড়ের মধ্যে রোকফের হিংসায় ভরা মুখের উপর চোখ পড়ল। রোকফ্ বলল, 'নিকোলাস রোকফের কাছ থেকে তফাতে থাকার বুদ্ধি কি তোর আজও হলো না?' এই বলে অসহায় মানুষটার মুখে লাথি মারল। তারপর আরো বলল, 'আজ রাতে আমার কালো বন্ধুরা তোকে খাবার আগে তোকে জানিয়ে যাব তোর বৌ-ছেলের কি দশা হয়েছে আর ভবিষ্যতে আরো কি হবে।'

এদিকে সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রাতে ছিপছিপে পাৎলা বিশাল এক শ্বাপদ নিঃশব্দে ঘন বন ভেদ করে এগিয়ে আসছিল। মাঝে মাঝে অন্ধকারে একজোড়া সবুজ চোখ জ্বলজ্বল করে উঠছিল। মাঝে মাঝে নাক তুলে কি যেন শুঁকছিল আর ক্রমাগত পূর্ব দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। খুব খিদে পেয়েছিল; ঝোপেঝাড়ে অনেক ছোট জানোয়ারের গন্ধও পেয়েছিল, তবু থামেনি। সারা রাত ঐ ভাবে চলে, পরদিন একবার মাত্র থেমে, একটা শিকার মেরে, সেটাকে এমন করে ছিঁড়ে খেল যেন অনেকক্ষণ পেটে কিছু পড়েনি। সন্ধ্যার সময় জানোয়ারটা, বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা বড় গ্রামের সামনে পৌঁছে, মাটিতে নাক ঠেকিয়ে শুঁকে শুঁকে একবার সারা গাঁ-টার চারদিকে ঘুরে এলো। তারপর যেখানে কয়েকটা কুঁড়েঘর প্রায় বেড়ার গায়ে ঠেকেছে, সেখানে মাথা কাৎ করে, কান খাড়া করে, কি

যেন শুনল।

মানুষের কান কিছু শুনতে পেতো না, ও কি শুনল কে জানে! সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এক লাফে সে বেড়া টপকে, বাড়িগুলোর পিছনে আড়াল হলো।

গ্রামে একটা ভোজের আয়োজন চলেছে। অনেকগুলো উনুন ধরেছে, বড় বড় হাঁড়ি বেরিয়েছে। উনুনগুলোর মধ্যিখানে একটা মোটা খুঁটি ঘিরে একদল কালো যোদ্ধা গায়ে মুখে সাদা হলদে নীল রং মেখে কিম্ভূত কিমাকার সেজে অপেক্ষা করছে। টারজানও হাত পা বাঁধা অবস্থায় অতি শোচনীয় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল। ভয়-ডর কাকে বলে সে জানত না। মরতে হয় তো পুরুষের মতোই মরবে তা সে যত বীভৎস ভাবেই হোক। জেন তো আর কিছু জানতে পারবে না। কিন্তু ছেলেটার কথা ভেবে বেদনায় বুক ভেঙে যাচ্ছিল।

বাঁধনগুলো এতই শক্ত যে অনেক চেষ্টা করেও ছিঁড়তে পারল না। মরতে দুঃখ নেই, কিন্তু ও মরলে ছেলেটার উদ্ধারের কোনো আশাই থাকবে না। রোকফ্ কয়েকবার এসে যাচ্ছেতাই অপমান করে, লাথি মেরে গেল। কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে রাগে গা জ্বলে গেল। যাক গে, বুনোরা ওকে মেরে ফেলার আগের মুহূর্তে জেনের দূরবস্থার কথা বলে মন ভালো করা যাবে।

তবু নিরাশ হয়নি টারজান, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যতই অমানুষিক অত্যাচার করুক এরা, পালাবার আশা ও ছাড়বে না। হঠাৎ ওর বনে প্রশিক্ষিত কানে কুটিরের পেছনে ভারি দেহের নিঃশব্দে নড়াচড়া টের পেল। নাকে এলো মৃদু একটা চেনা গন্ধ। সে যে কার গায়ের গন্ধ তা বুঝতেও দেরি লাগল না। একটু পরেই খচর-মচর করে ঘরের দেয়ালের খুঁটিতে কে গর্ত করে ভিতরে ঢুকে, টারজানের ঘাড়ে ঠাণ্ডা নাক ঠেকাল। শীতা এসেছে!

শীতা ওর চারদিক শুঁকল; টারজান যে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে তাও দেখল; কিন্তু সেটা যে কত মর্মান্তিক তা বুঝল কিনা কে জানে! কিন্তু ওকে এখানে আনল কে? শীতা টারজানের সারা গা চাটল, কিন্তু কি করে তাকে বোঝানো যায় যে দাঁত দিয়ে বাঁধন কাটা দরকার! কারো পায়ের শব্দ শুনে শীতা ঘরের কোণায় অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। একজন যোদ্ধা ঢুকে টারজানের গায়ে বর্শার খোঁচা দিল। টারজান একটা অদ্ভুত শব্দ করতেই, ঘরের কোণা থেকে সাক্ষাৎ শমন লোকটার বুকের উপর লাফিয়ে পড়ে তার গলায় দাঁত বসিয়ে দিল। লোকটা ভয়ে যন্ত্রণায় একটা মাত্র চিৎকার দিল। তারপর সব চুপ। তার মধ্যে মাংস ছেঁড়ার, হাড় চিবনোর শব্দ আর তার আগে প্যান্থারের ভয়াবহ জয়ধ্বনি।

একটু পরে বাইরে থেকে ভয়ার্ত গলার শব্দ, সরদারের গম্ভীর হুকুমজারি। তারপর টারজান অবাক হয়ে দেখল শীতা তার শিকার ফেলে দেওয়ালের গর্ত দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। তারপর বেড়া ডিঙোবার মৃদু শব্দ।

শীতা চলে যাওয়াতে টারজান একটু মুষড়ে পড়লেও, কি-ই বা করতে পারত সে? বাঁধন খোলার বুদ্ধি থাকলে তো ভাবনাই ছিল না। বাইরে যারা জড়ো হয়েছিল ভিতরে ঢুকবার সাহস না পেয়ে, একটা জ্বলন্ত মশাল দরজা দিয়ে ছুঁড়ে দিল। সেটা মাটিতে পড়ে নিবে যাবার আগে সেই এক মিনিটে, সবাই দেখল এক কোণে হাত পা বাঁধা অবস্থায় সাদা মানুষটা তেমনি পড়ে আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যিখানে তাদের সঙ্গীর বীভৎস আধ-খাওয়া মৃতদেহ। শীতাকে যখন তারা দেখেনি, তখন সমস্তটাকেই পৈশাচিক ব্যাপার মনে করে চিৎকার করতে করতে দে দৌড়।

ঘণ্টাখানেক বাইরে হট্টগোল চলার পর সাদা পাষণ্ড-গুলোর দু'জন টর্চ আর বন্দুক নিয়ে আগে ঢুকল। বলাই বাহুল্য রোকফ্ তাদের মধ্যে ছিল না। অসভ্যরা যখন দেখল এরা অক্ষত দেহেই আছে, তারাও সাহস করে ঢুকে পড়ল। সব প্রশ্নের উত্তরে টারজান খালি মুচকি হেসে মাথা নাড়ল।

অবশেষে রোকফ্ এসে মৃতদেহ দেখে আঁৎকে উঠল। তারপর সরদারকে বলল, 'কাজ শুরু কর, এই পিশাচটা আরো ক্ষতি করার আগে, ওকে শেষ করব।' শেষ পর্যন্ত কমবয়সী চারজন যোদ্ধা টারজানকে টেনে বড় খুঁটিটার সঙ্গে বাঁধল। ভালো করে বাঁধাছাঁদা হলে পর রোকফের বীরত্ব দেখে কে! একজনের হাত থেকে একটা বর্শা নিয়ে টারজানের বুকে এক খোঁচা মারল। দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। টারজান একটা টুঁ শব্দ করল না। তার মুখে একটা ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছে দেখে, রাগে অন্ধ হয়ে রোকফ্ তাকে ক্রমাগত লাথি ঘুঁষি মারতে লাগল। তখন সরদার বাধা দিয়ে বলল, 'তা হবে না! আমাদের মৃত্যুনাচের আগে ওকে মেরে ফেললে চলবে না।'

রোকফ্ থামল বটে, কিন্তু বলল, 'কি হে, তুমি কি

ভাবছ তোমার স্ত্রী লণ্ডনে নিরাপদে আছে ? মোটেই তা নয়, সে একটা ছোট জাতের বদমায়েসের খপ্পরে পড়েছে। তোমার এই বীভৎস মৃত্যুর আগে খবরটা তোমাকে দিলাম।'

তারপর টারজানের চারদিকে সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুনাচ শুরু হয়ে গেল। টারজানের মনে পড়ল ডার্ণোকে সে কিভাবে একদিন রক্ষা করেছিল। কিন্তু তাকে রক্ষা করার কেউ নেই এ-জগতে। অধীর আগ্রহে সে মৃত্যুকামনা করতে লাগল।

ঠিক তখনি দূর বন থেকে একটা বিকট চিৎকার শোনা গেল! নাচিয়েরা থমকে দাঁড়াল। সেই মুহূর্তে টারজানের গলা থেকেও সেই রকম বিকট ডাক সে চিৎকারের উত্তর দিল। রোকফ্ আর সরদারের উস্কানিতে তারা এবার নাচ এবং বলিদান শেষ করার জন্য তৈরি হলো। এমন সময় যে ঘরে টারজান বন্দী ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে এলো যেন সবুজ চোখবিশিষ্ট হিংস্রতা আর বিদ্বেষের বিদ্যুতের একটা ঝলক! শীতা দাঁত বের করে টারজানের পাশে দাঁড়াল!

দর্শকদের আতঙ্কে ভরা চোখ তার উপরে নিবদ্ধ। একা টারজান লক্ষ্য করেছিল ঘর থেকে আরো কি কি বেরিয়ে আসছে।

কিনক্যাড জাহাজের কেবিনের পর্টহোল থেকে জেন ক্লেটন জঙ্গল দ্বীপের সবুজ তীরে টারজানকে নামিয়ে দেবার দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ আবার রওনা হয়ে গেল। তারপর বেশ কিছুদিন জাহাজের হাঁড়ি-মুখো রাঁধুনে ছাড়া কারো সঙ্গে জেনের দেখা হলো না। তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে বিকৃত উচ্চারণে একটি মাত্র উত্তর দিত—'মনে হচ্ছে একটু বাদেই জোর হাওয়া দেবে।' বোধ হলো ওর বেশি ইংরিজি ওর জানা নেই। ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করাই জেন ছেড়ে দিল।

টারজানকে নামাবার তিন দিন পরে একটা বড় নদীর মুখে জাহাজ নোঙর ফেলল। রোকফ্ এসে নকল সহানুভূতি দেখাল, 'তোমার দুঃখ-কষ্ট দেখে আমার মন গলে গেছে। তাই তোমাকে তার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করতে চাই। তোমার স্বামীটা যে একটা বনমানুষ, সে তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছ। কোনো শিক্ষাদীক্ষা বংশগৌরব নেই। তার চেয়ে আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে সুখ স্বাধীনতা সব দেবো। তোমার ছেলে ফিরিয়ে দেবো। আমি তোমাকে কত ভালোবাসি।'

রাঁধুনে স্বেন অ্যাণ্ডারসেন জেনের খাবার নিয়ে এসে দরজার বাইরে থেকে সব দেখতে ও শুনতে পাচ্ছিল। ওর কান কেন, গোঁপ সুদ্ধ খাড়া হয়ে উঠল। এদিকে রোকফের কথা শুনে জেনের মুখে প্রথমে চমকে ওঠার এবং তার পরেই দারুণ ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল। লোকটার চোখের সামনেই সে শিউরে উঠল।

জেন বলল, 'মিঃ রোকফ্, আপনি আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলে, আমি কিছু অবাক হতাম না। কিন্তু প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমি জন ক্লেটনের স্ত্রী হয়ে স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে যাব, এ-কথা আপনি কি করে ভাবতে পারলেন, তাতেই আমি অবাক হচ্ছি। আপনি এত মূঢ়, তা জানতাম না।

রাগে ব্যর্থতায় রোকফের সাদা মুখ লাল হলো। সে বলল, 'কে মূঢ় তা দেখাই যাবে। তোমার এই একগুঁয়েমির জন্য তোমার আর তোমার ছেলের প্রাণ বিপন্ন হলো। আমাকে অপমান করার ফল টের পাবে।'

তাতে জেন বাগ মানছে না দেখে, রাগে অন্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জেনের গলা টিপে ধরল। ঠিক সেই মুহূর্তে কেবিনের দরজা খুলে সুইডিশ রাঁধুনে ঢুকে, ছোট টেবিল-টাতে জেনের খাবার সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার মুখে সেই স্বাভাবিক ধূর্ত ভাবের জায়গায় এমন একটা বোকামির ভাব, যেন সে কিছুই বোঝে না।

রোকফের রাগ দেখে কে!—'অনুমতি না নিয়ে কেন ঢুকেছ? বেরিয়ে যাও।'

স্বেন বোকার মতো হাসি হাসি মুখ করে বাসনপত্রগুলো নতুন করে সাজাতে লাগল। খালি বলল, 'মনে হচ্ছে একটু বাদেই জোরে হাওয়া দেবে।'

রোকফ্ বলল, 'বেরো বলছি! নইলে বের করে দেবো।' স্বেন অ্যাণ্ডারসেন হাসি মুখে ওর দিকে চেয়ে নিঃশব্দে একটা হাত কোমরে গোঁজা লম্বা লিকলিকে ছোরাটার হাতলে রাখল। তাই দেখে রোকফ্ জেনের দিকে ফিরে বলল, 'কাল পর্যন্ত মন ঠিক করার সময় দিলাম। তারপর জাহাজ থেকে কোনো অজুহাতে সবাইকে নামিয়ে দিয়ে, পলভিচ আর আমি তোমার সামনেই তোমার ছেলেকে মেরে ফেলব।' রোকফ্ ফরাসীতে এই কথাগুলো বলল, যাতে রাঁধুনে না বুঝতে পারে। বলেই বেরিয়ে গেল। অমনি অ্যাণ্ডারসেনের মুখ থেকে নির্বোধের মুখোশ খসে পড়ে, তার স্বাভাবিক ধূর্ত চেহারা ফিরে এলো। সে বলল, 'ও ভাবছে

আমি একটা বোকা, আসলে বোকা সে নিজে। আমি ফরাসী বুঝি।'

জেন অবাক হয়ে বলল, 'ওর সব কথাই বুঝেছ তা হলে?'

—'সে আর বলতে!'

—'তাই আমাকে রক্ষা করতে এসেছিলে?'

সে বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। ও এমন করে যেন আমি একটা নেড়ি কুত্তা! আমি আপনাকে সাহায্য করব। একটু সবুর করুন, আমি সাহায্য করব। এ দিকটা আমার চেনা।'

—'কি করে সাহায্য করবে, স্বেন? এরা সবাই যে শত্রু?'

সে বলল, 'মনে হচ্ছে একটু বাদেই জোর হাওয়া দেবে।'

গরীব বেচারি কতখানি করে উঠতে পারবে সে বিষয়ে জেনের সন্দেহ থাকলেও, এই নির্বান্ধব পুরীতে তার যে অন্ততঃ একজনও বন্ধু আছে, এ-কথা ভেবেও সে মনে বল পেল।

রোকফ্ বা আর কেউ সেদিন জেনের ঘরে এলো না। রাতের খাবার নিয়ে স্বেন এলে, তাকে একটু বাজিয়ে দেখতে গিয়ে সেই একই উত্তর পেল, 'মনে হচ্ছে একটু বাদেই জোর হাওয়া দেবে।'

কিন্তু একটু পরেই বাসনপত্রগুলো আবার নিতে এসে স্বেন বলল, 'কাপড়-চোপড় ছাড়বেন না। কম্বলটাও গুটিয়ে ফেলুন। আমি একটু পরেই আসছি।'

জেন তার আস্তিনে হাত রেখে কাতরভাবে বলল, 'কিন্তু, আমার ছেলে ফেলে তো যেতে পারব না।'

ভ্রূকুটি করে স্বেন বলল, 'যা বলছি, তাই করুন। মেলা ঝামেলা করবেন না। আমি তো আপনাকে সাহায্যই করছি।'

রাত বারোটা নাগাদ দরজায় কেউ আঁচড়াতে লাগল। ছিটকিনি খুলতেই দেখে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে, এক হাতে কম্বল জড়ানো একটা বাণ্ডিল নিয়ে অ্যাণ্ডারসেন দাঁড়িয়ে আছে নিজের ঠোঁটে নোংরা আঙুল চেপে জেনকে নিঃশব্দে চলাফেরার ইঙ্গিত করে, কাছে এসে বলল, 'বাণ্ডিলটা ধরুন। আপনার ছেলে।'

জেনের দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। অ্যাণ্ডারসেন বলল, 'চলুন, সময় নষ্ট করলে চলবে না।' এই বলে জেনের কম্বল, তারপর দরজার বাইরে থেকে নিজের কম্বল তুলে নিয়ে নিঃশব্দে জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে, জাহাজের সঙ্গে বাঁধা নৌকোয় দু'জনে উঠে, নৌকোর দড়ি কেটে, ন্যাকড়া জড়ানো দাঁড় বেয়ে ছায়াময় উগাম্বি নদীর দিকে এগিয়ে চলল।

আধ ঘণ্টা পরে চাঁদ উঠলে দেখা গেল বাঁ হাতে ছোট একটা শাখানদী উগাম্বিতে পড়েছে। সেটা ধরে নৌকো চলল। আসলে জাহাজের রাঁধুনের কাজের অছিলায় দিনের বেলায় অ্যাণ্ডারসেন এসে এই ছোট নদীর ধারের ছোট গাঁ থেকে রসদ কিনেছে আর সেই সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থাও করে এসেছে।

দুই তীরের বড় বড় গাছের ডালপালা মাথার ওপর এসে মিলেছে, নদী যেন সুড়ঙ্গপথ হয়েছে। নদীতে কুমীর আছে, হিপ্পো আছে। পাশের বন থেকে হিংস্র জানোয়ারের বিকট ডাক শোনা যাচ্ছে। সেই সব ভয়ের ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে বাচ্চাটাকে বুকে করে জেনের মনে হচ্ছে অনেক দিন এত সুখ তার হয়নি। কখন সকাল হবে, খোকার মুখ আবার দেখতে পাবে।

রাত তিনটে নাগাদ কাঁটার বেড়ায় ঘেরা দীনহীন গাঁয়ের কাছে নৌকো বেঁধে, অ্যাণ্ডারসেন ডাকাডাকি করতে লাগল। ভাগ্যিস আগে বলা ছিল, নইলে রাতে এদের বড় ভূতের ভয়, কিছুতেই দরজা খোলে না।

মোড়লের স্ত্রী ওদের মোড়লের কুঁড়েতেই নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু অ্যাণ্ডারসেন বলল, বাইরে শোয়াই ভালো। আসলে ঘর বড় নোংরা। শক্ত মাটিতে শুতে খুব আরাম না হলেও এক ঘুমে জেন রাত কাবার করে দিল।

চোখ খুলেই দেখল গাঁয়ের লোক ভিড় করে দেখছে। তবে বোঝাই গেল তাদের মনে কোনো শত্রুভাব নেই। একজন পুরানো লাউয়ের খোলা ভরে দুধ এনে দিল। খোলাটার ধারে ধারে পুরানো সরের দাগ আর মুখের কাছে তুলতেই এমনি দুর্গন্ধ নাকে এলো যে গা গুলিয়ে উঠল। অ্যাণ্ডারসেন ব্যাপার বুঝে তাড়াতাড়ি ভাঁড়টা নিয়ে, এক চুমুক খেয়ে আবার দাতাকে ফিরিয়ে দিল। সঙ্গে দিল একছড়া নীল পুঁতির মালা।

অ্যাণ্ডারসেন কিছু দূরে গিয়ে, মোড়লের সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে লাগল। ওর ছোট ছোট ধূর্ত চোখ আর বিশ্রী চেহারা দেখে বিশ্বাস করা শক্ত যে ঐ চেহারার পিছনে কোনো মহৎ চরিত্র থাকতে পারে।

এদিকে কোলের ছেলেটা জেগে গিয়ে নড়তে চড়তে আর মিষ্টি গলায় হাসতে লাগল। অমনি তার গায়ে মাথায় জড়ানো কম্বলটা টেনে ফেলে দিল জেন। দূর থেকে অ্যাণ্ডারসেন লক্ষ্য করল কম্পিত পদে জেন উঠে দাঁড়িয়ে, বাচ্চাটাকে তুলে ধরে তার গোলগাল মুখখানির আর মিটমিটে চোখের দিকে বজ্রাহতের মতো চেয়ে আছে। তার পরেই একটা কাতর শব্দ করে অচেতন হয়ে জেন পড়ে গেল।

এদিকে টারজান আর শীতাকে ঘিরে যে বীভৎস যোদ্ধারা দাঁড়িয়েছিল, সত্যিকার জানোয়ার দেখে তাদের ভয় খানিকটা ভেঙে গেল। রোকফ্ সরদারকে উস্কানি দিচ্ছিল, এবার শেষ আক্রমণটা হয়ে যাক, বাঁচা যাক। সরদারও সেই হুকুম দিতেই এগিয়ে এসেছিল, হঠাৎ তার চোখদুটো টারজানের দৃষ্টি অনুসরণ করে যা দেখল, তার ফলে বিকট চিৎকার করে সে গ্রামের ফটকের দিকে দৌড়ল! মোড়ল কি দেখে এত ভয় পেল তাই দেখবার জন্যে সেদিকে তাকিয়ে, তারাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগল। কারণ ঐ দিক থেকে আকুটের বিকটাকার বনমানুষরা

হুড়মুড় করে ওদের দিকে এগিয়ে আসছিল। চাঁদের আলোয় আর ধূনির আগুনে তাদের বিশাল শরীরগুলোকে দ্বিগুণ বড় দেখাচ্ছিল।

অমনি টারজানের ভয়ংকর ডাক ওদের চ্যাঁচামেচি ছাপিয়ে চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলল। তার উত্তরে শীতা আর বনমানুষরা তাদের পিছনে তাড়া করে গেল। দু-চারজন একটু লড়াই দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দেখতে দেখতে তাদের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অনেককে পিছন থেকে ধরে পেড়ে ফেলা হলো। দেখতে দেখতে গাঁয়ে একটা লোকও বাকি রইল না। যারা মরেনি, তারা সবাই বনে ভেগেছে।

কিন্তু মুস্কিল হলো জানোয়ারদের কিছুতেই বোঝানো গেল না যে টারজানের বাঁধনগুলো কেটে ফেলা দরকার। আকুটের এমনি এত বুদ্ধি এটা সে-ও বুঝল না। একটু দেরি করে ব্যাপারটা হয়তো তাদের মোটা বুদ্ধিতে ধরা দেবে, কিন্তু তার আগে গাঁয়ের লোকরা দলেবলে না ফিরে আসে এবং বন্দুকধারী সহ। শীতা যে ওকে ভালোবাসে তাতে সন্দেহ নেই, এখনো ওর গা ঘেঁষে ঘুরছে।

কিন্তু মুগাম্বি এলো না কেন? বেচারিকে একা পেয়ে জানোয়াররা ওকে মেরে ফেলেনি তো? বিষাক্ত তীর, লম্বা বর্শা ইত্যাদি, ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে এ বেচারিরা কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে? অসভ্যরা যে আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে দূর থেকে তাদের হাঁকডাক, যুদ্ধের আহ্বান, আস্ফালন, ইত্যাদি শুনেই বোঝা যাচ্ছিল। টারজান জানত এই রকম লাফঝাঁপ করে করে ওদের কেমন হিষ্টিরিয়ার মতো হয়, তখন ভয়-ডর চিন্তা করবার ক্ষমতা সব লোপ পায়। বাস্তবিকই তাই হলো-ও, কিন্তু টারজানের একটা অদ্ভুত ডাক শুনেই সব এক নিমেষে হাওয়া!

আধঘণ্টা বাদে আরেকবার এসেছিল, এবার একেবার ফটক অবধি। টারজানের ডাকে জন্তুরা তেড়ে গেলেই তারা ভয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পালাল! তারপর আবার যখন হাঁকডাক নাচ চিৎকার শোনা গেল, টারজানের মনে হলো এবার সাদা মানুষগুলো বন্দুক নিয়ে যে দুষ্কর্ম প্রথমবারেই শেষ করে দিত, সে কাজ সম্পন্ন না করে এরা ছাড়বে না। মুগাম্বি এসে যদি এখনো বাঁধন কেটে দেয়, তাহলেও কোনো ভাবনা ছিল না। নইলে ওর নিজের বীভৎস মৃত্যুতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু জেন আর ছেলেটার উদ্ধারের কোনো আশাই থাকবে না।

অসভ্যগুলো ফটকের অনেকটা কাছে এসে পড়লে পর টারজান লক্ষ্য করল একটা বনমানুষ চোখ পাকিয়ে একটা কুঁড়েঘরের দিকে তাকাচ্ছে! সে দিকে চোখ ফেরাতেই দেখা গেল মুগাম্বির বলিষ্ঠ দেহ তীরবেগে তার দিকে ছুটে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুরি বের করে সে টারজানের বাঁধন কেটে দিল। ততক্ষণে গ্রামবাসীর দল ফটকের কাছে পৌঁছে গেছে।

গাঁয়ের পথে অনেক মৃতদেহ পড়েছিল। সেখান থেকে একটা বর্শা আর একটা মুগুর হাতে তুলে নিয়ে, মুগাম্বিকে পাশে নিয়ে, জন্তুগুলোসহ ফটকের কাছে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মোকাবিলা হলো। সে কি নিদারুণ মরণপণ যুদ্ধ! এরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন, গ্রামবাসীরা অগুন্তি। কিন্তু হয়তো তারা আগের থেকেই আতঙ্কে আধমরা হয়ে ছিল বলে শেষ পর্যন্ত তারা হেরে গেল। একজন লোক টারজানের হাতে বন্দী হয়েছিল। তার কাছে খবর পাওয়া গেল যে রোকফ্ তার দলবল নিয়ে সেই যে পালিয়েছিল, কিছুতেই আর গ্রামে ফিরতে রাজি হয়নি। টারজানকে তার ভয় গ্রামবাসীদের চেয়েও বেশি। গ্রামবাসীদের কয়েকটা নৌকো চুরি করে সে দলবল নিয়ে উজান স্রোতে পালিয়েছিল। কাবিরির গ্রাম থেকে দাঁড় টানবার লোক এনেছিল ওরা।

আবার টারজান দলবল নিয়ে ছেলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে এখন মুগাম্বি, আকুট, শীতা আর বাকি পাঁচজন বনমানুষ। আরো তিনজন টারজানের জন্য প্রাণ দিয়েছিল। দিনের পর দিন চলল তারা। এখন আর রোকফের আগে আগে পলায়মান তিনজনের কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে, টারজান বুঝেছিল রোকফ্ও যখন তাদের খোঁজে আছে, রোকফের পিছু নিলেই, তাদের সন্ধান পাওয়া যাবে। আশ্চর্যের কথা যেখানেই জিজ্ঞাসা করে, রোকফ্কে অনেকেই দেখেছে, কিন্তু অন্যদের বিষয়ে কিছুই জানে না। মুস্কিল হয়েছিল, ওর জানোয়ারদের দেখলেই গ্রামবাসীরা উত্তর না দিয়ে পালাত!

শেষ পর্যন্ত ওদের পিছনে ফেলে টারজান একা আগে আগে যেতে লাগল। কাউকে দেখলে তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করত। একদিন একটা স্থানীয় অসভ্য লোকের পায়ের চিহ্ন দেখে তার পিছু নিয়েছে। হঠাৎ দেখে লোকটা একজন আহত সাদা মানুষকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়তে যাচ্ছে। সাদা লোক-টাকে টারজান চিনতে পারল। এই তো কিনক্যাড জাহাজের রাঁধুনে। সেই বিশ্রী চেহারা, ধূর্ত চোখ, ঝুলো হলদে গোঁপ! এর সঙ্গেই তাহলে জেন ছেলে নিয়ে জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এই বদমাইসটাকে সাজা দিতে হয় তো টারজান দেবে, ঐ কালো লোকটা দেবে কেন? টারজান তার হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নিল। অমনি দু'জনের হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মরণপণ যুদ্ধ। লোকটা কিছুতেই হার মানল না বলে, তাকে শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলতে হলো।

ততক্ষণে আহত অ্যাণ্ডারসেন তাকে চিনতে পেরেছিল। এই আধা বনমানুষটিই কিনক্যাড জাহাজের যাত্রী সেই উচ্চ-বংশীয় লর্ড গ্রেস্টোক ছাড়া কেউ নয়। মৃত শত্রুর ঘাড়ে পা রেখে টারজান তার বিকট জয়ধ্বনি ছেড়ে, অ্যাণ্ডারসেনের দিকে ফিরে বলল, 'আমার স্ত্রী আর ছেলে কোথায়?'

সে বেচারা উত্তর দেবার চেষ্টা করতেই ভীষণ কাশি এলো। তখন দেখা গেল ওর বুকে একটা তীর বিঁধে আছে। কাশতে কাশতে নাক মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল। কিন্তু টারজানের মুখে এতটুকু দয়ার চিহ্ন দেখা গেল না। আবার বলল, 'কোথায় তারা?'

অ্যাণ্ডারসেন সামনের পথ দেখিয়ে বলল, 'রোকফ্ তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

—'তা তুমি রোকফের দলে নেই কেন?'

নিচু গলায় অ্যাণ্ডারসেন বলল, 'ওরা আমাদের ধরে ফেলল। আমার লোকেরা সব পালিয়ে গেল। আমি লড়াই করে আহত হলাম। রোকফ্ বলল, ও থাক পড়ে, হায়নাতে খাক্। এই বলে আপনার স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে চলে গেল।'

টারজান হিংস্রভাবে বলল, 'কিন্তু তুমি তাদের নিয়ে এসেছিলে কেন? তাদের কি অনিষ্ট করেছিলে বল। নইলে তোমাকে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলব।'

অ্যাণ্ডারসেনের মুখ বিস্ময়ে ভরে গেল, 'আমি তো তাদের কোনো অনিষ্ট করিনি। রোকফের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম। আপনার স্ত্রী আমার সঙ্গে বড় ভালো ব্যবহার করতেন। ছেলেটা মাঝে মাঝে কাঁদত। আমারও খৃষ্টীয়ানিয়া শহরের কাছে বৌ-ছেলে আছে। তাই আমার বড় কষ্ট হতো। আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি ওদের অনিষ্ট করার জন্য নিয়ে এসেছিলাম?'

টারজান নিজের মন থেকে বুঝল সে সত্যি কথাই বলছে অমনি পাশে বসে পড়ে বলল, 'ভাই আমাকে ক্ষমা কর। রোকফের দলে যারা আছে তারা সব বদমাইস, আমার এ ধারণা দেখছি ভুল। যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। তোমাকে এখন একটা ভালো জায়গায় নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে তুলতে হবে।'

অ্যাণ্ডারসেন একটু হেসে মাথা নাড়ল, 'আমার জীবন

শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু হায়নারা আমাকে ছিঁড়ে খাবে ভাবতে খারাপ লাগে। আপনিই আমাকে মেরে ফেলুন না।'

টারজান তার মাথাটা বুকে তুলে ধরল, আবার কাশির সঙ্গে খানিকটা রক্তপাত হলো। তার চোখ বোজাই ছিল। টারজান ভাবল, 'আহা তবে কি লোকটা এই ভাবেই চলে গেল?'

এমন সময় চোখ খুলে সে ফিসফিস করে বলল, 'মনে হচ্ছে একটু বাদেই জোর হাওয়া দেবে।' এই বলে সে মরে গেল।

টারজান নিজের হাতে কবর খুঁড়ে কিনক্যাড জাহাজের রাঁধুনের দেহ সমাধি দিল। এমন একটা কুশ্রী চেহারার মধ্যে এমন এক মহাপ্রাণ বাস করতে পারে, ভাবা যায় না। ওরই স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাবার চেষ্টায় লোকটি প্রাণ দিল।

তারপর আবার রোকফের সন্ধানে চলল। ঐ মেয়েটি যে জেনই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে আবার রোকফের খপ্পরে পড়েছে!! লোকটার পায়ের চিহ্ন ধরে যাওয়া বড়ই শক্ত; তার উপর দিয়ে কত বনবাসী জন্তু-জানোয়ার গিয়ে দাগগুলো প্রায় মুছে গিয়েছে।

টারজান জানত ওর জন্তুরাও ওর চিহ্ন ধরে পিছন পিছন আসছে। ইচ্ছা করে এখানে একটা ঝোপ মারিয়ে, ওখানে একটা ডাল ভেঙে, সেখানে একটা মাটির ঢিপি মাড়িয়ে সে নানা চিহ্ন রেখে চলেছিল। তারপর আকাশে ঘন মেঘ জমল। তারপর সাতদিন ধরে সে কি ঝড় বৃষ্টি! মনে হলো, হায়! হায়! সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে গেল।

অ্যাণ্ডারসেনের বোধ হয় আফ্রিকা এপার-ওপার করে, পায়ে হেঁটে জাঞ্জিবার পৌঁছবার ইচ্ছা ছিল। সে যে অসম্ভব কাজ। এদিকে বৃষ্টি যদি বা থামল, সব পদচিহ্ন ধুয়ে মুছে একাকার! রোকফ্ হয়তো বনপথ ছেড়ে আবার উগাম্বিতে নৌকো নিয়েছে। তাহলে তো কোনো চিহ্নই পাওয়াযাবে না।

ওরা চলেছিল উজানে। নদী ক্রমে সরু আর স্রোত ক্রমে দ্রুত হচ্ছিল। বেশি দূর নৌকো যাবেও না। কিন্তু রোকফ্-ও যে অ্যাণ্ডারসেনের মতো জাঞ্জিবার অবধি হেঁটে যাবে, তা মনে হলো না। তবে ভয়ের চোটে মানুষ কিনা করে!

শেষ পর্যন্ত টারজান স্থির করল উত্তর-পূর্বে জর্মান ইস্ট আফ্রিকার দিকে এগোনোই ভালো। পথে স্থানীয় অসভ্যদের কাছে খোঁজখবর নেওয়া যাবে। দু'দিন বাদেই একটা গ্রামে পৌঁছবামাত্র গাঁয়ের লোকরা যে যেদিকে পারল পালাল। এক ছোকরা যোদ্ধা ভয়ের চোটে প্রায় চলৎশক্তি হারিয়েছিল। তাকে ধরে জানা গেল কয়েক দিন আগে একদল সাদা মানুষ কিছু কালো লোকজন নিয়ে এই দিক দিয়ে গিয়েছে। তারা বলে গিয়েছে হয়তো কয়েক দিনের মধ্যেই একটা সাদা পিশাচ এ-পথে আসতেও পারে। তাকে যেন কোনো সাহায্য দেওয়া না হয় আর যে তাকে মেরে ফেলতে পারবে সে অনেক পুরস্কার পাবে।

টারজানের কথায় আশ্বাস পেয়ে ছোকরা শুধু গাঁয়ে ফিরেই এলো না, অন্যান্যদেরও ডেকে আনল। মোড়লই আগে এলো। মোটা, বেঁটে, ধূর্ত বদমাইস চেহারা। তক্ষুনি যে সে তার দলবলসহ টারজানের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল না, তার একমাত্র কারণ হলো, আগের-দলের কথায় সে বড়ই ভড়কে গিয়েছিল। নইলে ছুঁচল দাঁত দেখে তাকে নরখাদক বলে চেনা যাচ্ছিল। কিন্তু সে ভাবছিল বনে হয়তো লোকটার ভৌতিক সাঙ্গোপাঙ্গরা অপেক্ষা করছে। ডাকলেই হাজির হবে।

মোড়ল বলল, আগের দলটা সুদূর পূর্ব তীরের দিকেই চলেছে। রোকফের বড়ই দুরবস্থা। কুলীদের অনেকে পালিয়েছে। বাকিদের মধ্যেও পালাবার চেষ্টা করার জন্য, পাঁচজনকে রোকফ্ নিজেই ফাঁসি দিয়েছে। এ গ্রামের নাম ওয়াগান ওয়াজান। মোড়ল এমগান-ওয়াজান বলল, 'এখন ভয়ের চোটে না পালালেও সুযোগ পেলেই, ঘোর বনে সাদা মানুষগুলোকে একলা ফেলে সবাই ভাগবে।' কিন্তু মোড়ল আগাগোড়া বলতে লাগল, 'ওদের দলে কোনো মেয়ে বা ছোট ছেলে ছিল না।'

মোড়লের ভয়ে গ্রামবাসীরা সবাই বোবা সেজে থাকল। টারজান স্থির করল রাতটা এখানে থেকে যাবে, যদি আরো খবর পাওয়া যায়। তাছাড়া খাবার-দাবার-দরকার।

মোড়লের ইচ্ছা টারজান তার কুঁড়েতে থাকে। কিন্তু রাতে শীত পড়ে, মোড়লের বুড়ি স্ত্রীকে নিজের ঘর থেকে বের করে দিতে টারজান রাজি হলো না। আসলে মোড়লের মতলব সাদা পিশাচটা আরামে ঘুমিয়ে পড়ুক, তারপর ওর গোপন ঘাতকরা ওকে চুপিচুপি এসে মেরে ফেলতে পারবে। পুরস্কার এবং মাংস দুই-ই পাওয়া যাবে।

শেষ পর্যন্ত টারজান অন্য একটা ঘরে শুতে রাজি হলো। ভাবল, ছোকরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে গল্প জমিয়ে খবর বের করতে হবে। সে রাত্রে গ্রামের শিকারীরা ভালো ভালো শিকার নিয়ে ফেরা উপলক্ষ্যে নাচ-গান হচ্ছিল। বাইরে ধূনির আগুনের পাশে মোড়লের ঘাতকদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ হচ্ছে, তার বুড়ি স্ত্রী কাঠকুটো সংগ্রহের নাম করে, আড়ি পেতে সব শুনে, দৌড়ে এসে সব কথা টারজানকে বলে দিল। সাদা মানুষটার দয়া দেখে তার মন গলে গিয়েছিল।

বুড়ির নাম তম্বুজা। সে বলল, 'ঐ যারা তোমার সঙ্গে রাতে থাকবে, তারাই তোমাকে মেরে ফেলবে। মোড়লের বড় পুরস্কারের লোভ।'

টারজান বলল, 'সাদা মানুষরা চলে গেছে, কে ওকে পুরস্কার দেবে?'

বুড়ি বলল, 'বেশি দূর যায়নি। মোড়ল জানে ওরা কোথায় তাঁবু ফেলবে।'

—'কোথায়?'

—'সে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না, তবে নিয়ে যেতে পারি।'

দু'জনার কেউ-লক্ষ্য করল না বুলাও বলে তম্বুজার সতীনের ছোট ছেলে নিঃশব্দে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনে অমনি রিপোর্ট দিতে চলল বাপের কাছে। তাই শেষটুকু শোনা হলো না।

টারজান তম্বুজাকে বলেছিল, 'তাহলে এক্ষুণি চল।'

সঙ্গে সঙ্গে ওরা রওনা হয়ে গেল। ওদিকে মোড়লের দু'জন চর অন্য পথে ক্যাম্পে খবর দিতে ছুটল।

টারজান যেতে যেতে বলল, 'ওদের দলে একজন মেয়ে আর একটা ছোট্ট ছেলে ছিল না?'

—'ছিল। ছেলেটা জঙ্গল-জ্বর হয়ে আমাদের গাঁয়েই মারা গেল। তাকে কবর দেওয়া হয়েছে।'

আরেকটু আগের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। জেনের জ্ঞান ফিরলে, অ্যাণ্ডারসেন বলল, 'কি হলো? আপনার কি শরীর খারাপ?

জেন বলল, 'আমার ছেলে কোথায়?'

অ্যাণ্ডারসেন ওর কোলের গোলগাল মিষ্টি ছেলেটাকে তুলে ধরল। জেন বলল, 'ও আমার ছেলে নয়। তুমিও কি ঐ রোকফদের মতোই পাষণ্ড?'

অ্যাণ্ডারসেন চমকে উঠল, 'আপনার ছেলে নয়? জাহাজে তো আর ছেলে ছিল না। আমি ভাবলাম এ নিশ্চয় আপনারই ছেলে।' তার মুখ দেখে তার কথা বিশ্বাস করল জেন। খোকাটা কলকল করে হেসে উঠে, অ্যাণ্ডারসেনের কোল থেকে জেনের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। জেনের মনে সে যে কি মায়া হলো! অমনি উঠে পড়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

একটু কেঁদেও নিল। সঙ্গে সঙ্গে এই ভেবে ভগবানকে ধন্যবাদও দিল, কে জানে তাঁর দয়ায় নিজের ছেলেটা হয়তো এই পিশাচের হাত থেকে বেঁচে গেছে!

আহা, এ কার বাছা গো! অ্যাণ্ডারসেন কিছুই বলতে পারল না। খালি বলল, 'রোকফেরও ধারণা এ আপনারই ছেলে।'

অ্যাণ্ডারসেন আরো বলল, 'তাহলে কি আপনাকে আবার জাহাজে পৌঁছে দেবো? আমি গেলে তো আমাকে গুলি করে মেরে ফেলার কথা।'

জেন বলল, 'মরে গেলেও আর যাব না। এই বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়েই ঘুরব, যা থাকে কপালে।'

আবার ওরা বনপথ ধরল। সঙ্গে জনা ছয়েক মশুলা কুলীর মাথায় তাঁবু, খাবার-দাবার। এ সবই ওদের ছোট নৌকোয় ছিল। দিন রাত সে যে কি কষ্টে চলা সে বলবার নয়। একমাত্র সান্ত্বনা ছোট ছেলেটা। সেটাকে এতদিনে জেন বড়ই ভালোবেসে ফেলেছিল। বুকের শূন্যতা সে অনেকখানি পূর্ণ করে রেখেছিল।

আস্তে আস্তে চলা। মাঝে মাঝে খবর পেতো রোকফ্ ভুল জায়গায় ওদের খুঁজছে। রাতে কুলীরা তাঁবু দুটোর চারদিকে কাঁটার বেড়া করে দিত। সবচেয়ে আরামের জায়গায় অ্যাণ্ডারসেন জেনের তাঁবুটি খাটাত। তার মতো দয়ালু লোক কম হয়। সবচেয়ে ভালো খাবার ওকে দেওয়া হতো। যাতে ওর একটু আরাম হয়, সর্বদা সেই ব্যবস্থা করা হতো। এই সময় খবর এলো রোকফ্ বড় বেশি কাছাকাছি এসে পড়েছে। অমনি তাঁবু তুলে, অ্যাণ্ডারসেনের নৌকোয় ওঠাই বাঞ্ছনীয় মনে হলো। এমন সময় বাচ্চাটার খুব জ্বর হলো। এ যে সেই ভয়াবহ জঙ্গল-জ্বর তাতে সন্দেহ নেই।

ততদিনে নৌকো ছেড়ে আবার পায়ে চলা শুরু হয়েছিল। ছেলেটার অবস্থা দিনে দিনে খারাপের দিকে যেতে লাগল। আর এগোনো সম্ভব নয়। ক্যাম্প ফেলে

তার যেটুকু সেবা-যত্ন করা যায়, সেই চেষ্টা চলতে লাগল।

এমন সময় একজন কুলী খবর আনল রোকফ্ খুব কাছেই তাঁবু ফেলেছে। তখন এগোনো ছাড়া আর উপায় রইল না, জ্বরের ভয়ে কুলীরাও একে একে পালাতে লাগল।

তারপর এক দুঃখের দিনে পিছনে একটা বড় দলের পদশব্দ শোনা যেতে লাগল। তারা এসে পড়ল বলে। তখন জেনকে আর বাচ্চাটাকে একটা বড় গাছের পেছনে ঘাসপাতা দিয়ে ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রেখে অ্যাণ্ডারসেন বলল, 'আমি ওদের অন্য পথে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি ছেলেটাকে নিয়ে কাছেই একটা গাঁ আছে, সেখানে চলে যান। সেখানকার মোড়ল নাকি সাদা মানুষদের ভালো-বাসে। সে আপনাদের নৌকো করে নদীমুখে কোনো বড় জাহাজে তুলে দেবার ব্যবস্থা করবে।'

—'তুমি কোথায় যাবে? এদের সঙ্গে গোলমাল মিটে গেলে, তুমিও সেখানে এসো।'

অ্যাণ্ডারসেন হাসল, 'তখন আর আমার কোথাও যাবার দরকার হবে না।' এই বলে জেনের আপত্তিতে কান না দিয়ে ওর হাতে বন্দুক আর গুলি দিয়ে গাছের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

জেন বাচ্চাটাকে নিয়ে প্রথমে নিজেদের ক্যাম্পে গেল। বাচ্চাটার মুখটা টকটকে লাল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ওকে বাঁচাতে হলে গ্রামে গিয়ে সাহায্য নিতে হবে। গাছের মধ্যে দিয়ে অ্যাণ্ডারসেন যে পথ দেখিয়েছিল, সেই পথ ধরে আধ ঘণ্টার মধ্যে জেন সেই আমাদের চেনা মোড়ল এমগান ওয়াজানের গাঁয়ে পৌঁছল। ওর কথা কেউ বুঝল না। কিন্তু ছেলেটার অবস্থা দেখে কাউকে কিছু বলতে হলো না। ওরা যা ওষুধপত্র জানত, সব করল। ওদের উইচ্‌ডক্টর তার জাদুবিদ্যা দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জেন নিজের মনকে প্রস্তুত করতে লাগল।

এই সময় মোড়লের সঙ্গে আরেকজন কালো লোক ঢুকল। তার চেহারা একটু ভদ্রগোছের। সে দো-ভাষী, ইংরিজি জানে। তার মাধ্যমে মোড়লের যা জানবার সবই জেন বলল।

দো-ভাষী বলল, 'আপনি কি আশা করছেন এর পর স্বামীর সঙ্গে আবার মিলিত হবেন?'

জেন বলল, 'না।'

দো-ভাষী বলল, 'আমি স্থানীয় লোকদের কাছে শুনে এসেছি তিনি আপনার খোঁজে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে ছিলেন, কিন্তু তারপর স্থানীয় লোকদের হাতে প্রাণ হারান।'

জেনের মনটা পাথর হয়ে গিয়েছিল। একজন বুড়ি আগুনে কিছু শুকনো ডালপালা ফেলতেই আগুনটা জ্বলে উঠল। সেই আলোতে জেন দেখল বুকের মধ্যে অসহায় শিশুটির দেহে প্রাণ নেই। মনে হলো দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঘরের মেয়েগুলোও ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে দরজা থেকে একটা কাশি শোনা গেল। চোখ তুলে জেন দেখল রোকফ্।

রোকফ্ শ্লেষের সঙ্গে বলল, 'তুমি এত কষ্ট করে যা করলে, আমিই তো সে কাজটা করে দিতাম। এই গ্রামের মোড়লের কাছেই তো তাকে মানুষ করার ভার দেবার কথা আছে। কেমন খাসা নরখাদক তৈরি হবে দেখো। এত কষ্ট করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এবার ওকে আমার কাছে দিয়ে দাও দিকিনি।'

সঙ্গে সঙ্গে কম্বল মোড়া বাচ্চাটাকে জেন রোকফের হাতে তুলে দিল। সে তো অবাক!

জেন বলল, 'এই নাও। সে এখন তোমার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।' তখন রাগে অন্ধ হয়ে রোকফ্ চ্যাঁচাতে লাগল, 'তোমরা আমার সব আশা ব্যর্থ করেছ! এই শেষ। তোমার ছেলেকে নরখাদক বানাতে না পারলেও, তোমাকে অন্ততঃ নরখাদকের বৌ বানাতে পারব!' ভেবেছিল এ-কথা শুনে জেন ভয়ে কুঁকড়ে যাবে। কিন্তু জেন তখন সুখ-দুঃখ ভয়-ভাবনার বাইরে। অন্য দিক দিয়ে মনটা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। রোকফ্ ভাবছে জেনের ছেলেটা মরে গেছে! তাহলে সে যেখানেই থাক, নিরাপদে আছে। জেনের যা হয় হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। ওর স্বামীই যদি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে ওরই বা বেঁচে কি হবে? এক যদি ছেলের কাছে ফিরে যেতে পারে। নইলে আত্মহত্যাই ভালো ছিল।

রোকফ্‌কে বলল, 'যাও, এখান থেকে। যা হয় হবে। আমাকে একটু শোক করতে দাও। আমি তোমার কখনো কোনো ক্ষতি করিনি, তবু কেন এত কষ্ট দিচ্ছ?'

রোকফ্ বলল, 'অন্যের দোষে তোমাকে ভুগতে হচ্ছে। দাও, ছেলেটাকে আমি ভালো ভাবেই কবর দেবো। তারপর তোমাকে আমার ক্যাম্পে নিয়ে যাব। কাল তোমার নরখাদক নতুন স্বামীর কাছে দিয়ে যাব।'

জেন খালি বলল, 'আমি তাকে সমাধি দেবো। গ্রামের

বাইরে কবর খুঁড়বার জন্য কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দাও।' সেই ব্যবস্থাই করা হলো। ছোট শরীরটাকে কম্বলে জড়িয়ে, গ্রামের বাইরে সুন্দর এক গাছতলায় খোঁড়া গভীর কবরে পরম স্নেহে শুইয়ে দিল জেন। তাকে বড় ভালবেসে-ছিল। এখন জীবনটা শূন্যময় হয়ে গেল। দয়াময় ভগবানের কাছে ছোট একটি প্রার্থনা করে ফিরে এলো।

সেই রাতেই জেনকে রোকফ্ নিজের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। সঙ্গে মশাল নিয়ে তার লোকজন থাকা সত্ত্বেও তার কি ভয়! আশেপাশে হিংস্র নিশাচরদের হুংকার আর চলাফেরার শব্দ। যে মানুষটি তার মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করত, সে কি সত্যি নেই? তাই কখনো হয়? কিন্তু ঐ দোভাষী কেন মিথ্যা কথা বলবে? জেন জানত না দো-ভাষীকে রোকফই ঐ কথা বলেছিল। ক্যাম্পের চারদিকে কাঁটাগাছের বেড়া। হাঁকডাক শুনে কয়েকজন লোক বেরিয়ে এলো, কিন্তু রোকফ্ মহা রাগমাগ করতে লাগল। নাকি এর মধ্যে আরো ক-জন লোক ভেগেছে। তারা অনেক খাবার-দাবার গুলি-বারুদও নিয়ে গেছে। বাকিদের উপর খুব চোটপাট করে, ফিরে এসে জেনকে নিয়ে পড়ল।

জেন ক্লান্তিতে মাটিতে বসে পড়েছিল। রোকফ্ তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে গেল। জেন চকিত দৃষ্টিতে দেখে নিল সেখানে কোথায় কি আছে। রোকফের কোমরে একটা ভারি রিভলবার ঝুলছিল। ঠিক সেই সময়ে দরজার কাছ থেকে একটু শব্দ হতেই, রোকফ্ সেদিকে ফিরল। অমনি বিদ্যুৎ বেগে জেন সেটি টেনে বের করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করতে পারত। কিন্তু শব্দ শুনে অন্য সাদা পিশাচগুলো হাজির হবে। তাদের চিত্তেও এতটুকু দয়ামায়া নেই, পাপিষ্ঠের এক শেষ!

রাগে ভয়ে কাপুরুষ রোকফ্ ওর দিকে ফিরতেই, জেন রিভলবার তুলে, তার বাঁট দিয়ে রোকফের মাথায় গায়ের জোরে এক বাড়ি দিল। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে রোকফ্ পড়ে গেল। আবার বাইরে একটু শব্দ হতেই বুদ্ধি করে জেন ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিল। তাঁবুর পিছন দিক দিয়ে পালাতে হবে। সেখানে আবার দরজা নেই। কিন্তু রোকফের কোমরে গোঁজা ওর শিকারের ছোরা। সেটি টেনে নিয়ে, পিছনের দেয়াল চিরে বাইরে এলো জেন। মনে হলো সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। একজন পাহারায় বসেছিল। সে ব্যাটাও ঘুমোচ্ছে।

তাঁবুর আড়াল দিয়ে কাঁটাগাছের বেড়া কেটে বেরোতে একটু সময় লাগল; কোমল হাত দু-খানি রক্তাক্ত হলো, কিন্তু বাইরে বেরিয়েই একবার বুক ভরে স্বাধীনতার নিশ্বাস নিয়ে, জেন ঘন বনের মধ্যে দিয়ে নির্ভয়ে ছুটল। ভয়ংকর হিংস্র জানোয়ারদের হাতে মরাতে কোনো অসম্মান নেই। পাষণ্ড দুরাচারদের হাতে পড়ে অপমানে অত্যাচারে মরার চেয়ে সে শতগুণে ভালো। ভয়-ডর বলে আর কিছু নেই জেনের মনে।

এদিকে তম্বুজার সঙ্গে টারজান রোকফের ক্যাম্পের দিকে খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। তম্বুজা একে বুড়ি, তায় বেতো রুগী। তারা পৌঁছবার অনেক আগেই খবর পৌঁছে গিয়েছিল যে টারজানকে ঐ রাতেই মেরে ফেলা হবে। চররা সেখানে পৌঁছে দেখে ক্যাম্পে বড়ই অশান্তি, হট্টগোল। সকালে রোকফ্‌কে তার তাঁবুতে রক্তাক্ত দেহে, আধা-অচেতন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। সে যখন বুঝতে পারল জেন ক্লেটন পালিয়ে গিয়েছিল রাগে অন্ধ হয়ে কালো পাহারাদারদের আরেকটু হলে মেরেই ফেলত, অন্য শ্বেতাঙ্গরা ধমক দিয়ে থামাল। তারা বলল, রোকফের দুর্ব্যবহারেই কুলীরা পালাচ্ছে। রাতে আরো ক-জন গিয়েছে। সবাই চলে গেলে মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ এই ঘোর জঙ্গলে নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়বে।

এই সময় এমগান ওয়াজানের চররা এসে খবর দিল সাদা দানবটা ওদের গাঁয়ে রাত কাটাচ্ছে এবং রাতেই তাকে যমের বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এদের কথা শেষ হতে না হতে, আরো কয়েকজন চড় দৌড়ে এলো। সাদা দানবটা রাতারাতি পালিয়েছে। সম্ভবতঃ এদিকে আসছে। এ খবর পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে এমগান-ওয়াজানের চরদের সঙ্গে রোকফের যে-ক'জন কালো কুলী বাকি ছিল, তারা সকলেও বনে গা-ঢাকা দিল। ঐ সাদা দানবের অনুচররা হলো বাঘ আর বিকটাকার বনমানুষ। এর মধ্যে তারা থাকছে না। জিনিসপত্রও অনেক খোয়া গিয়েছিল।

বনের গভীর ঐ ক্যাম্পে রোকফ্ আর ওর সাতজন পাপিষ্ঠ নাবিক ছাড়া কেউ ছিল না। রোকফ্ উল্টে তাদের যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করতে লাগল। তারাই বা কত সহ্য করবে? একজন রিভলবার বের করে সরাসরি রোকফের দিকে গুলি ছুঁড়ল। ব্যাটার লক্ষ্য বড় মন্দ, গায়ে

লাগল না। কিন্তু রোকফ্ এমনি ভয় পেল যে পিছু ফিরে নিজের তাঁবুর দিকে ছুটল।

এমন সময় হঠাৎ বনের ধারে চোখ পড়তেই যা দেখল, তাতে ওর পিলে চমকে গেল। একটা বিশাল দেহ প্রায় উলঙ্গ সাদা মানুষ বন থেকে বেরোচ্ছে !! ধাঁ করে তাঁবুতে ঢুকে গেল রোকফ্। তারপর জেন যে পথে পালিয়েছিল, সেই পথই ধরল। এদিকে কাঁটাঝোপের বেড়া পাড় হয়ে তম্বুজার সঙ্গে যেই টারজান ক্যাম্পে ঢুকেছে তাকে দেখবামাত্র চিনতে পেরে, সপ্ত বীরপুরুষ উল্টোদিকে দৌড় দিল। ক্যাম্পে জনমানুষ রইল না।

তম্বুজা বলল, রোকফ্ নিশ্চয় মোড়লের গ্রামে গিয়েছে। টারজানও সেদিকে তীরবেগে চলল। তম্বুজা ধীরে সুস্থে পিছন পিছন এলো। গাঁয়ে পৌঁছে জেনের বা রোকফের কোনো কিছুই পাওয়া গেল না। মোড়লের কোনো কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয় জেনে, টারজান সেখানে বৃথা সময় নষ্ট করল না। মোড়ল ব্যাপারটার কিছু বুঝতেই পারল না যে বাধা দেবার চেষ্টা করবে।

গাছে থেকে গাছে ঝুলে অল্প সময়ের মধ্যেই টারজান আবার রোকফের ক্যাম্প ফিরে, সেখান থেকে পদচিহ্ন মিলিয়ে আবার পথ ধরল। আরো চিহ্ন পাওয়াও গেল।

তার অনেকটা পথ আগে আগে ভয়ে কাতর একজন অসহায় মেয়ে ছুটছে আর ভাবছে এই বুঝি কোনো হিংস্র জন্তু, কিম্বা তার চেয়েও হিংস্র মানুষের পাল্লায় পড়ল ! হঠাৎ একটা চেনা জায়গায় পৌঁছল। এই তো সেই গাছ। এরই গোড়ায় ঘাস-পাতা চাপা দিয়ে অ্যাণ্ডারসেন ওদের লুকিয়ে রেখেছিল। ওদের জন্য সে প্রাণও দিয়েছিল। বেদনায় বুকটা টনটন করে উঠল। হঠাৎ মনে পড়ল অ্যাণ্ডারসেন তো এইখানেই তার রিভলবার আর গুলির বেল্টটা ওকে দিয়ে গিয়েছিল। এখানেই সেটাকে জেন ফেলে গিয়েছিল।

একটু খুঁজতেই পাওয়াও গেল। কাঁধে ব্যাণ্ডোলিয়ার বেল্টটা ঝুলিয়ে হাতে রিভলবার নিয়ে মনে অনেকটা জোর পেল জেন। সে রাতটা কাটাল একটা বড় গাছের উঁচু ডালের ফ্যাকড়ায় শুয়ে। পরদিন সন্ধ্যার আগে খানিকটা খোলা জায়গা পার হতে গিয়ে চমকে দেখে বিশাল এক বনমানুষ উল্টোদিকের বন থেকে বেরিয়ে আসছে।

ভাগ্যিস সেই দিক থেকেই বাতাস বইছিল, তাই জেনের উপস্থিতি সে টের পেল না। জেন একটা ঝোপে গা-ঢাকা দিল। বনমানুষটা কি যেন শুঁকতে শুঁকতে চলেছিল। ওর

পিছন পিছন পর পর আরো চারজন এলো। সেখানে একটু খোলা জায়গা ছিল, তার মধ্যিখানে ওরা বসে যেন কিসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে প্রকাণ্ড এক প্যান্থার এসে উপস্থিত হলো। আশ্চর্যের বিষয় বনমানুষরা এতটুকু ঘাবড়াল না।

খানিক বাদে লম্বা চওড়া সুদর্শন একজন কালো মানুষও এলো। সে এদের দেখে পালিয়ে না গিয়ে, ওদের সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা বলতে লাগল। জেন দেখে অবাক হলো। তারপর সারি বেঁধে ওরা অন্য দিকের বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জেনের আধ মাইল পিছনে আরেকটা লোকও ওদের দেখে ভয়ে আধমরা হয়ে একটা উইঢিপির পিছনে শুয়ে পড়েছিল। সেই লোকটি রোকফ্। সে কিন্তু জানোয়ারদের চিনতে পেরেছিল। তাদের কাছ থেকে পালাবার তাগাদা তার আরো বেড়ে গেল।

তারপর জেন উগাম্বি নদীর তীরে পৌঁছল। এই নদী ধরে বন্দরে গিয়ে জাহাজ পাওয়া যাবে। নদীর ধারে একটা ছোট কেন্যু দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধা। বাঁধন খুলে দুর্বল শরীরে নৌকো ঠেলে জেন কিছুতেই জলে নামাতে পারছিল না। হঠাৎ মনে পড়ল নৌকোর পিছন দিকে পাথর চাপিয়ে, সামনের থেকে দোল দিলে হয়তো ভাসানো যেতে পারে ! কিন্তু পাথর তো নেই। তবে কাঠকুটো যথেষ্ট ছিল। তাই চাপিয়ে দিতেই নৌকোটা একটু নড়ে উঠল।

জেন এত ব্যস্ত ছিল যে বন থেকে যে আরেকটা লোক বেরিয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে বিদ্বেষ ভরা চোখে ওকে দেখছে, তা খেয়ালই করেনি। সে লোকটা রোকফ্। নৌকো তো অনেক কষ্টে ভাসানো গেল। এবার দাঁড়ের সাহায্যে একটু গভীর জলে পৌঁছলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ঠিক সেই সময়ে চোখ তুলে জেন রোকফকে দেখে আঁৎকে উঠল। সে তীর বরাবর নৌকোর সঙ্গে ছুটছে আর শাসাচ্ছে, 'তুলে না নিলে গুলি করব।' অথচ আসলে সে নিরস্ত্র।

জেন ভাবল আর যাই হোক, এর হাতে আর পড়া নয়। একবার স্রোতোর টানে পড়ে গেলে আর কোনো ভয় নেই। ঐ কুমীর ভরা নদীতে নামার সাহস রোকফের নেই। রোকফের মন কিন্তু যত না জেনকে সাজা দেওয়ার, তার চেয়ে ঢের বেশি পালাবার দিকে। আরেকটু হলেই সে

কথা দিচ্ছিল ওকে তুলে নিলে আর কখনো সে জেনের কোনো অনিষ্ট করবে না।

প্রায় বেঁচেই গিয়েছিল জেন। হঠাৎ নৌকোতে টান পড়ল। কাদার মধ্যে নৌকা-বাঁধা দড়িটার অন্য মাথাটা সাপের মতো কিলবিল করে জলের দিকে নেমে যাচ্ছিল। সেইটাকে চেপে ধরেছে রোকফ্!

এদিকে উগাম্বি নদী আর মোড়লের গাঁয়ের পথের মাঝামাঝি জায়গায় টারজানের সঙ্গে তার জন্তুদের দেখা হলো। মুগাম্বি শুনে অবাক হলো যে রোকফের আর ওর প্রভুর স্ত্রীর পদচিহ্ন ওদের দলের এতটা কাছাকাছি দিয়ে গিয়েছে, কেউ তাদের দেখতে পায়নি কেন? ওরা হয়তো ভয়ে লুকিয়েছিল। ওরা দু'জন যে আলাদা ভাবে যাচ্ছিল তাও বোঝা গেল। জেন আগে আগে যাচ্ছিল, কিন্তু রোকফ্ তাকে ধরে ফেলছিল। নদীর কাছে এসে মনে হলো রোকফ্ মাত্র একশো গজ পিছনে ছিল।

এবার মনে হলো একটু এগোলেই দু'জনকে দেখতে পাওয়া যাবে। দল ছেড়ে টারজান গাছে গাছে এগিয়ে গেল। যেখানে জেন নৌকো ভাসাবার জন্য অত কষ্ট করেছিল, সেখানে গাছ থেকে নেমেএসে, কাদার ওপর দু'জনার পায়ের ছাপ দেখতে পেল। তাহলে ওরা গেল কোথায়?

ওরা এখানে একটা দিশী কেন্যু চড়েছিল মনে হচ্ছে। তারপর নদীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে পেল দূরে বাঁকের মুখে একটা কেন্যু, তার পিছন দিকে একটামাত্র লোক বসে আছে।

সেই সময়ে টারজানের দলবল নদীর তীরে পৌঁছে দেখে তাদের গুরু সেখানকার জলা জমির ওপর ছোট ছোট নল খাগড়ার ঢিপি টপকে নদীর বাঁকের দিকে ছুটছে। ও-পথে ওদের যাওয়া অসম্ভব, তাই একটু ঘুরে যেতে হলো। মুগাম্বিও সঙ্গে গেল। এদিকে শর্ট-কাট পথ দিয়ে বাঁকে পৌঁছে টারজান দেখতে পেল নৌকোতে জেন নেই, খালি রোকফ্।

তাকে দেখেই টারজানের কপালের সাদা দাগটা লাল হয়ে উঠল, গলা থেকে বেরুল সেই বিকট যুদ্ধের ডাক। দেখে রোকফের রক্ত জল! পৃথিবীতে যাকে সে সবচেয়ে ভয় করে সেই লোকটা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে!! রোকফ্ ভাবল, তার আসলে কোনো ভয় নেই, এই কুমির-ভরা নদীতে কেউ সাঁতার দিতে পারে না। ঠিক সেই সময় টারজান সেই ভয়ংকর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে নৌকোর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একটা দাঁড় তুলে নিল রোকফ্। টারজান ততক্ষণে নৌকোর পিছন দিকটা চেপে ধরেছে।

খানিক আগেই যে উল্টো তীর থেকে জলের ওপর একটা চলন্ত আলোড়ন দেখা গিয়েছিল সেটা এতক্ষণ দুজনার কেউ লক্ষ্য করেনি। যেই নৌকোর কিনারা ধরেছে টারজান, কুমিরটাও জলের তলায় তার উরু কামড়ে ধরেছে আর রোকফ্ দাঁড় দিয়ে মাথায় সজোরে বাড়ি মেরেছে! সঙ্গে সঙ্গে আলোড়নটা একটু বাড়ল, কয়েকটা বুদ্বুদ উঠল, তারপর জঙ্গলদেবতা টারজান কালো জলের নিচে তলিয়ে গেল।

রোকফ্ প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি। কাঁপতে কাঁপতে নৌকোর মধ্যে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। তারপর ঐ আলোড়ন, ঐ বুদ্বুদ, ঐ হঠাৎ তলিয়ে যাওয়ার কারণ ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল। নিষ্ঠুর উল্লাসে ওর মন নেচে উঠল কিন্তু সে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। নদীর তীরে ভীষণ হট্টগোল শুনে চেয়ে দেখে টারজানের ভয়াবহ অনুচরেরা এতক্ষণ পরে তাকে ধরে ফেলেছে। সবার সামনে একজন বিশাল-দেহ আফ্রিকান ওকে ঘুঁষি দেখাচ্ছে। এদের কি কিছুতেই ঝেড়ে ফেলা গেল না! কতবার বনের মধ্যে কত ছল-চাতুরি করে এড়িয়ে এসেছে, কিন্তু শুঁকে শুঁকে ঠিক এসে হাজির হয়েছে!

রোকফ্ সারা পথে জেনের দেখা একবারও পায় নি। খালি ঐ একবার, যখন জেনের কেন্যুর দড়িটা ও হাতে পেয়েছিল। কিন্তু জেন একটা প্রকাণ্ড বন্দুক তুলে ওর বুকের দিকে লক্ষ্য করতেই, তাড়াতাড়ি সে দড়ি ছেড়েও দিয়েছিল আর জেনও স্রোতের টানে দেখতে দেখতে বহু দূরে চলে গেছিল। কে জানে তার কি হল। নিশ্চয় কোনো অসভ্য জাতের খপ্পরে পড়েছে। যাক্, মানুষ শত্রুদের তো একে একে সরানো গেছে। কিন্তু এরা যে আরো শতগুণে ভয়ংকর। ওর দেখা পেলেই যে-রকম হিংস্র চিৎকার ছাড়ে, নাগাল পেলে যে ছিঁড়ে খাবে তাতে সন্দেহ নেই।

ভাগ্যিস্, শাখা-নদীর মুখে নিজেদের এই কেন্যুটা বাঁধা ছিল। তাই তাতে করে এতটা এগোতে পেরেছে। এখনো বিকট জন্তুগুলো ওর নাগাল পায়নি।

এইসব ভাবতে ভাবতে চমকে উঠে রোকফ্ দেখল উগাম্বি নদীর মুখে পৌঁছে গেছে! ঐ তো উপসাগরের জলে কিনক্যাড্ জাহাজ ভাসছে। নৌকো থেকে হাঁকডাক করেও জাহাজ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। এদিকে তীর ধরে টারজানের বিকট অনুচরেরা সমানে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে এগিয়ে আসছে! কিনক্যাডের ক্রু কোথায় গেল? পল্‌ভিচের কি হ'ল? জাহাজে কি তবে কেউ নেই! কয়েকজন বন্দুকধারী তো অল্প সময়ের মধ্যেই জন্তুগুলোকে শেষ করে দিতে পারত।

তবে জাহাজের পাশে মস্কি-ল্যাডার ঝুলছে। সেটা ধরে রোকফ্ উঠতে যাবে, এমন সময় ওপর থেকে চ্যালেঞ্জ শুনে, তাকিয়ে দেখে রাইফেলের অব্যর্থ নল তার দিকে টিপ করে আছে।

ঐ রাইফেল দিয়ে রোকফ্‌কে ঠেকিয়ে মাঝ-নদীর দুরন্ত স্রোতের মাথায় ভেসে, মাঝে মাঝে দাঁড় টেনে, রোকফের অনেক আগেই জেন নদী-মুখে পৌঁছে দেখে একটা জাহাজ। কিন্তু কাছে গিয়ে যখন দেখল জাহাজটা সেই কিনক্যাড্ তখন বড় ভাবনা হল।

একবার মনে হলো, কি দরকার, তার চেয়ে আবার ডাঙায় পালাই। কিন্তু ডাঙায় একলা যে তাকে বাঁচতে হবে না, তা সে ভালো করেই জানত! তাছাড়া রোকফ্ যখন নেই, তখন অন্য পাপিষ্ঠগুলোকে হয়তো ঘুষ দিয়ে বশ করা যেতে পারে। সাত পাঁচ ভেবে জেন নৌকোটাকে ভাসিয়ে মস্কি-ল্যাডারের তলায় নিয়ে এলো। তারপর কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে সাবধানে ডেকে উঠে এল।

কেউ কোথাও নেই। যাদের জাহাজ পাহারা দেবার কথা তারা মদ খেয়ে চুর হয়ে ফোক্‌স'লে ঘুমোচ্ছিল। জেন নিঃশব্দে ওপরের ডেকে উঠে হ্যাচ্ বন্ধ করে দিল। যাতে পাহারাদাররা উঠে আসতে না পারে। মনে মনে স্থির করল ওর শর্ত মেনে না নিলে কাউকে এ জাহাজে চড়তে দেবে না।

ঘণ্টাখানেক বাদে একটা কেন্যু, নদীর বুকে ঘুরে জাহাজের দিকে এগোতে লাগল। তাতে একজন মাত্র আরোহী। সে হলো রোকফ্। রোকফ্‌কে চ্যালেঞ্জ করতেই সে যখন বন্দুকধারীকে চিনতে পারল, সে তো প্রথমে রেগে চতুর্ভুজ হয়ে বিকট গালাগালি দিতে আর ভয় দেখাতে লাগল। তাতেও কিছু ফল দিচ্ছে না দেখে খোসামোদ করতে আর ফুস্‌লোতে লাগল। জেনের এক উত্তর। ও যে-জাহাজে আছে, তাতে কোনো মতেই রোকফ্‌কে উঠতে দেওয়া যায় না। দরকার হলে গুলি করতেও সে পিছপাও হবে না।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে যে-তীরে জন্তুরা গর্জে বেড়াচ্ছিল, তার উল্টো দিকে রোকফ্ নৌকো লাগাল। জেন জানোয়ারদের দেখে অবাক হলো। এদেরি না বনের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখেছিল?

সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ উল্টো তীর থেকে রোকফের হাঁকডাক শুনে জেন চমকে উঠল। তারপর লক্ষ্য করল জাহাজের নৌকো করে কারা আসছে। এরাই নিশ্চয় কিনক্যাডের ক্রু, এতক্ষণে ফিরেছে। সব কটা নিষ্ঠুর নরাধম। বড় ভয় হলো জেনের।

টারজান যখন বুঝতে পারল তাকে বিশাল এক কুমিরে ধরেছে, অন্য লোকের মতো সে অমনি দুর্ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণও করল না, আশাও ছাড়ল না। দানোটা ওকে জলের তলায় টেনে নামাবার আগেই বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিল। প্রাণপণে প্রথমটা লড়াই করল, তারপর যখন দম ফুরিয়ে এল, তখন কুমিরের শরীরে গায়ের জোরে পাথরের ছোরাটা বসিয়ে দিল। তাতে কুমিরের গতি যেন বেড়ে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার জল কেটে সে টারজানকে একটা কাদার ডাঙায় ফেলল। সেখানে টারজানের নাকটা জলের ওপর ভেসে উঠল, সে আবার নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচল। খুব কাছেই কুমিরটাও ওকে ছেড়ে দিয়ে পড়ে পড়ে হাঁসফাঁস করছিল যেন কত কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তারপরেই তার সমস্ত শরীরটা কেমন কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। টারজান বুঝল ছোরা তার কাজ করেছে, কুমির মরে গেছে।

এখন এই দুর্গন্ধময় কাদায় পিছল অন্ধকার জলের তলাকার বাসা থেকে বেরোতে হবে। অর্থাৎ আবার সেই বায়ুহীন সুড়ঙ্গ দিয়ে সাঁতরে খোলা জলে পড়ে, তবে ভেসে উঠে আকাশ দেখতে পাওয়া। ভাবলেও গা শিউরে ওঠে, কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। তাই বুক ভরে সেই দুর্গন্ধভরা বাতাস নিয়ে, পা দিয়ে ঢালু সুড়ঙ্গের মুখটা ঠিক করে তার মধ্যে দিয়ে কতক হামাগুড়ি দিয়ে, কতক সাঁতরে, অল্প সময়ের মধ্যেই খোলা নদীর জলে, তীরের কাছেই ভেসে উঠল। সেখানে একটা বড় গাছের ডাল ঝুঁকে পড়েছিল। টারজান

সময় নষ্ট না করে সাঁতরে সেই ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। ভাগ্যিস কুমিরের কামড়ে পা-টা খুবই কেটে-ছড়ে গেলেও, হাড় ভাঙেনি, পেশী ছেঁড়েনি। জলের ওপরে মাথা তুলেই টারজান লক্ষ্য করেছিল দুটো প্রকাণ্ড বড় কুমির তীরবেগে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সবে সে নিরাপদে গাছের ডালে পা গুটিয়ে বসেছে, সঙ্গে সঙ্গে কুমির দুটো সেখানে পৌঁছেই এই বড় বড় দুটো হাঁ করে তাকে ধরবার বৃথা চেষ্টা করেছিল।

একটুক্ষণ গাছে বসে জিরিয়ে নিল টারজান। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও রোকফ্‌কে কি তার নৌকো দেখতে পেল না। পা-টা যন্ত্রণা দিচ্ছিল। ক্ষতগুলো টাটিয়ে উঠেছিল। জামা ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিয়ে কিছুটা আরাম পেল। গাছ থেকে ডাঙায় নেমেই বুঝতে পারল এটা হলো উল্টো তীর। তা হক। ওর শিকার তো নদীর বুকে। পায়ের ব্যথার চোটে ছুটে চলা অসম্ভব হলো। নানা চিন্তা মনকে ভারি করে তুলতে লাগল। তম্বুজা বলেছিল মোড়লের বাড়িতে, ঐ সাদা মেয়েটি ওকে বলেছিল মরা ছেলেটা ওর নিজের নয়, তবু ওর জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে।

তবে কি ও মেয়ে জেন নয়? কারণ ছেলেটা তো টারজানের। অন্ততঃ তার সেই রকম বিশ্বাস। কি শোচনীয়ভাবে নিষ্পাপ বেচারীকে মরতে হলো!

পথে কয়েকবার অসভ্য গ্রামবাসীরা ওকে আক্রমণ করার মৎলব নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ওর একটা হুংকার শুনেই তারা পালাবার পথ পায় না! যত আস্তেই হাঁটুক, সন্ধ্যার দিকে হাঁটাপথে টারজান আর অন্ধকারের আড়ালে রোকফ্‌ প্রায় একই সঙ্গে যেখানে পৌঁছেছিল তার একশো গজ দূরে কিন্‌ক্যাড্‌ জাহাজও অন্ধকারে অদৃশ্যভাবে ভাসছিল। একটিও আলো দেখা যাচ্ছিল না।

টারজান ভাবছিল নদীর ধারের বনে ঐ শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে আর রোকফ্‌কে খুঁজে দেখতে হবে। হঠাৎ দাঁড়ের শব্দ শুনে থমকে থামল সে। নদীর ওপর থেকে কানে এল গুলির শব্দের সঙ্গে কোনো মেয়ের আর্ত চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে সেই কুমিরভরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে টারজান ওপারের দিকে সাঁতরে চলল।

যে নৌকোটা জেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেটাকে এক তীর থেকে রোকফ্‌ আর অপর তীর থেকে মুগাম্বি আর জানোয়াররাও দেখতে পেয়েছিল। নৌকোটা আগে রোকফের কাছে গেল, কি সব কথাবার্তা হলে, কিনক্যাডের দিকে ফিরল। অর্ধেক পথ যেতেই ডেক থেকে ছোঁড়া রাইফেলের গুলিতে একজন নাবিকের সলিল-সমাধি হলো। তারপর ওরা আরো ধীরে এগোতে লাগল। কিন্তু যখন আরেকজন নাবিক গুলি খেয়ে পড়ে গেল, নৌকোটা পথ ছেড়ে দিয়ে আবার অপর তীরে ফিরে গেল। আলো থাকতে এগোনো নিরাপদ নয়।

এদিকে এ-পারে জানোয়ারেরা মহা দাপাদাপি লাগিয়েছিল। মুগাম্বি ছাড়া কেউ জানত না কে তাদের প্রভুর বন্ধু আর কে বা শত্রু। একবার ঐ নৌকোটার কিম্বা কিনক্যাড্‌ জাহাজের নাগাল পেলে কাউকে তারা আস্ত রাখত না।

মুগাম্বি টারজানের জীবনের কথা কিছু কিছু জানত। কি কি ঘটনার ফলে টারজানকে জঙ্গল-দ্বীপে ছেড়ে আসা হয়েছিল, কিভাবে ওর বৌ আর ছেলে চুরি করেছে ঐ দুরাচার সাদা লোকটা, প্রভু তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তারপর ঐ দুরাচার বোধহয় তাকেও মেরে ফেলেছে। ঐ সাদা দানবটাকে কি ভয়ংকর ভালোবাসে মুগাম্বি, দুনিয়াতে এতটা আর কাউকে কখনো ভালোবাসেনি। যে তাকে মেরেছে, মুগাম্বিও তাকে চরম সাজা দেবেই।

যখন মুগাম্বি দেখল নৌকোটা রোকফ্‌কে তুলে কিনক্যাডের দিকে চলেছে, তখনি সে বুঝল যেমন করে হক একটা নৌকো তাকে জোগাড় করতেই হবে। কাজেই জেন রোকফের নৌকোয় গুলি ছুঁড়বার আগেই টারজানের জন্তুরা বনে অদৃশ্য হয়ে গেছিল।

রোকফ্‌কে নিয়ে নাবিকরা যেতেই জেন বুঝতে পেরেছিল ওরা নিশ্চয় ফিরে আসবে, যেই আরেকটু অন্ধকার হবে। এদিকে নিজের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা দরকার। ঐ পাহারাওয়ালা দুটোর ম'দো ঘুম নিশ্চয় ভেঙেছে। ওদের সঙ্গে রফা করে, ওদের দিয়ে জাহাজের নোঙরের শিকল কাটিয়ে, স্রোতে ভাসিয়ে জাহাজটাকে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া যাক। হয়তো অন্য জাহাজের চোখে পড়ে যেতে পারে। তারা ওদের উদ্ধার করবে। নয়তো বড় জোর সমুদ্রে ঝড় হবে, ঢেউ উঠবে, জাহাজ ডুববে। এই পাপিষ্ঠদের হাতে পড়ার চেয়ে সে-ও ভালো।

দুরাচার নরাধমদের বিবেক বলে কিছু না থাকলেও, গার্ডরা দুজন নিরস্ত্র আর জেনের হাতে বন্দুক এবং সে বন্দুক জেন ভালোভাবেই ব্যবহার করতে জানে। কাজেই বন্ধ

হ্যাচের ভিতর দিয়ে রফা হয়ে গেল। জেন বন্দুক বাগিয়ে ধরে হ্যাচ্ তুলে দিল, তারা দুজন মাথার ওপর দু-হাত তুলে উঠে এলে, জেন দক্ষ হাতে তাদের সার্চ করে দেখে নিল যে কোনো অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে আনেনি। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে—অবিশ্যি বন্দুকের প্রহরায়, তাদের নোঙরের কেব্‌ল্ কাটতে লাগিয়ে দিল।

অন্ধকার রাত, আকাশে ঘন মেঘ জমেছে, নদী আর নদীর দুই তীরের জঙ্গল অন্ধকারে মোড়া। খালি পশ্চিমে যেখানে নদীর চওড়া মুখ সমুদ্রে মিশেছে, সেখানে একটু যেন আলোর আভাস। এইরকম কাজের যোগ্য রাতই বটে।

কেব্‌লের দড়ি কাটা হয়ে গেলেই জাহাজ উগাম্বি নদীর কবল থেকে ছাড়া পেয়ে, স্রোত ধরল। তখন জেন তার প্রথম ভুলটা করল। লোকদুটোর কাকুতি-মিনতিতে ভুলে, তাদের আবার নিচে পাঠিয়ে হ্যাচ্ বন্ধ না করে, ডেকেই থাকতে দিল।

এদিকে স্রোতের মাথায় কিছু দূর ছুটে চলে, কিনক্যাড্ সাগরমুখের সরু বালির চরায় আটকাল। মহাসাগর আরো সিকি মাইল দূরে। এক মুহূর্ত আটকে থেকে, জাহাজের মুখটা একটু ঘুরে যেতেই চরার কবল থেকে আবার ছাড়া পেল।

ঠিক সেই সময় কানে এল বন্দুকের গুলির শব্দ আর নারী-কণ্ঠের ভীত চিৎকার। তাই শুনে মুহূর্তেকের জন্য জেনের নজর তার বন্দীদের ছেড়ে সেই দিকে গেছে আর সেই এক মুহূর্তেই নাবিক দুটো এক সঙ্গে ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, ওকে ডেকে পেড়ে ফেলল। পড়ে যাবার আগে জেন দেখতে পেল আরেকটা লোক-ও বাইরে থেকে বেয়ে ডেকে উঠে আসছে।

এতক্ষণ ধরে এমন অমানুষিক সাহসের সঙ্গে লড়াই করেও, শেষ পর্যন্ত কপালে কি এই ছিল! জেন এবার ভেঙে পড়ল।

একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে মুগাম্বি জঙ্গলে ঢুকেছিল। সেটি হল একটা নৌকো জোগাড় করা। সন্ধ্যার সময়ে উগাম্বির একটা শাখানদীর ধারে গাছে বাঁধা একটাকে পেয়েও গেল। ও জানত এই রকম জায়গায় নৌকো পাওয়া যায়। আর সময় নষ্ট না করে ঐ নৌকোতে ভয়াবহ অনুচরদের গাদাগাদি করে তুলে, রওনা হয়ে পড়ল।

নৌকোতে যে একটি কালো মেয়ে ঘুমোচ্ছে, সেটা মুগাম্বি লক্ষ্যই করেনি। এমন সময় বনমানুষদের একজন ভয়ে আড়ষ্ট মেয়েটির দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অনেক কষ্টে রুষ্ট বনমানুষদের ঠাণ্ডা করে মুগাম্বি তাকেও আশ্বস্ত করতে পারল। বুড়ো বরের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হচ্ছিল, তাই সে পালিয়ে এসেছে। মুগাম্বি ভাবল, থাক্ না নৌকোতে। আবার তীরে লাগাতে গেলে খানিকটা সময় নষ্ট হবে।

একটু পরেই মুগাম্বি আর তার আনাড়ি সঙ্গীরা দাঁড় বেয়ে শাখানদী থেকে উগাম্বিতে পড়ল। কিনক্যাড্ জাহাজটাকে এখান থেকে আরো স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল। মুগাম্বি অবাক হল লক্ষ্য করে যে কিনক্যাড্ সমুদ্রের দিকে ভেসে চলেছে। সবে সঙ্গীদের আরেকটু তাড়াতাড়ি এগোতে বলতে যাচ্ছে, এমন সময় আরেকটা নৌকো ওদের তিন গজ সামনে দেখা দিল। তার আরোহীরা ওদের দেখলেও, মাঝিদের স্বরূপটি তখনো বুঝতে পারেনি।

দুই নৌকো প্রায় যখন গায়ে গায়ে, তখন অন্যটা থেকে চ্যালেঞ্জ এল। তাই শুনে শীতা গোঁ-গোঁ করে উঠল! শীতা থাবায় ভর দিয়ে ওদের ওপর লাফিয়ে পড়ার জোগাড় করছিল। সবুজ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল। রোকফ্ বিপদ বুঝে গুলি করার হুকুম দিল। সেই গুলির শব্দই জেন আর টারজান দুজনেই শুনেছিল। কালো মেয়েটিই ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল।

জলে ঝাঁপ দেবার সময় টারজানের কোনো ধারণাই ছিল না কিনক্যাড জাহাজ এত কাছে। ওর খালি গত বারের সেই বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা মনে হচ্ছিল। এবার কিন্তু দু-দুবার পায়ে পিছল কিছু ঠেকলেও ওকে কুমিরে ধরল না। হঠাৎ হাত বাড়াতেই জাহাজের গায়ে হাত ঠেকল। ওর স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ও জাহাজের গা-বেয়ে, ডেকের রেলিং টপকানোর সঙ্গে সঙ্গে কানে এল ডেকের অন্য দিক থেকে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ।

নিঃশব্দে সেদিকে ছুটল টারজান। মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। দুটো লোক একটি মেয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিল। সে যে কোন্ মেয়ে অত ভাববার সময় বা দরকার ছিল না। একজন মেয়ে বিপদে পড়েছে, এই যথেষ্ট। নাবিক দুটো কিছু টের পায়নি। হঠাৎ ঘাড়ে বজ্রমুষ্ঠি নেমে দুজনকে দুদিকে তুলে ধরল। কানে কানে কে বলল, 'এর মানে কি'?

সেই গলার আওয়াজ মেয়েটির কানে পৌঁছবামাত্র, সে আনন্দে লাফিয়ে উঠে 'টারজান!' বলে তার দিকে ছুটে গেল। দানবটাও নাবিক দুটোকে ডেকের ওপর অনেকটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, তার হারানো ধন বুকে জড়িয়ে ধরল। কথাবার্তার সময় ছিল না তখন। জনা ছয় লোক রেলিং টপকে ডেকে উঠে এসেছে!

সবার আগে রোকফ্! তাকে দেখেই টারজান জেনকে পিছনের ক্যাবিনে ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়ে, রোকফের দিকে তেড়ে গেল। রোকফের লোকদের দুজন টারজানের দিকে গুলি ছুঁড়লেও তার গায়ে লাগল না। তাদের পিছনে আর যারা ছিল তারা ততক্ষণে অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। কারণ মংকি-ল্যাডার বেয়ে একের পর এক উঠে এল প্রথমেই শ্বা-দন্ত বের করে পাঁচজন বিকটাকার বনমানুষ। তাদের পেছনে দৈত্যের মতো লম্বা-চওড়া, ঝকঝকে লম্বা বর্শা হাতে একজন কালো যোদ্ধা। তারো পিছনে যে উঠে এল, তাকে সকলে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। সে হল শীতা, নিদারুণ রাগে আর বিদ্বেষে তার দাঁত বেরিয়ে আছে, চোখ জ্বলছে।

টারজান রোকফ্‌কে ধরবার আগেই সে ব্যাটা কাপুরুষ দুজন নাবিকের মধ্যিখান দিয়ে গলে ফোকস্‌লের দিকে দৌড় দিল। বাকি দুটো নাবিককে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় টারজান তাকে ধাওয়া করতে পারল না। মুগাম্বি আর বনমানুষদের সঙ্গে বাকিদের ততক্ষণে মরণপণ লড়াই বেধে গেছে।

বনমানুষদের বাহুবল আর তেজের সঙ্গে ওরা পারবে কেন? মাত্র চারজন ফোক্‌স্‌লেতে ঢুকে দরজা এঁটে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। সেখানে রোকফ্‌কে দেখে, তার ওপর ওদের জমানো রাগ ফেটে পড়ল। তার হাতে সকলেই বহু নির্যাতন সহ্য করেছিল। এখন তাকে তুলে ধরে ছুঁড়ে ডেকে ফেলে দিয়ে, ওরা দরজা বন্ধ করে দিল।

টারজান তার জাতশত্রুকে তখনি দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু তার আগেই আরেকজনও তাকে দেখে নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। রোকফ সেই চলন্ত শমনকে দেখে ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। টারজান এক পা এগিয়েছিল। ওর ছেলের হত্যাকারীকে বধ করবার অধিকার ওর। কিন্তু তার আগেই যে শীতা সে কাজ সারছে! উচ্চস্বরে শীতাকে ডাক দিল টারজান। তাতে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রোকফ্ ব্রিজের দিকে ছুটল। এই একবারের মতো প্রভুর আদেশ অমান্য করে শীতাও সে দিকে ঝাঁপ দিল।

টারজানও ওদের পিছু নিতে যাচ্ছিল, এমন সময় হাতে একটা মৃদু স্পর্শ পেল, ফিরে দেখে জেন। সে বলল, 'যেও না। আমার ভয় করছে।' টারজান চেয়ে দেখল চারদিকে আকুটের বিকট অনুচররা ঘুরছে। দু-একজন দাঁত খিঁচিয়ে জেনের দিকেও তাকাচ্ছে। বনের পশু, কে বন্ধু, কে শত্রু বুঝিয়ে না দিলে, তারা জানবে কি করে? নিজেদের দলের বাইরে সকলকেই এই মুহূর্তে খাদ্যদ্রব্য মনে হলে আশ্চর্য কি?

টারজান ভাবল শীতার হাতেই রোকফকে ছেড়ে দেওয়া যাক। কোনো রকমে যদি ফস্কে যায়, তখন না হয় দেখা যাবে। সে আশা বৃথা। শীতা তাকে কোণঠাসা করে, গুঁড়ি মেরে তার দিকে নির্মম চোখে এগোচ্ছে। রোকফের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, কপালে ঘাম ঝরছে। ডেকে নামার চেষ্টাও করা যায় না। সেখানে বনমানুষরা ঘুরছে।

বিকট চিৎকার করে রোকফ হুমড়ি খেয়ে পড়তেই, শীতা তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল।....জেনের কথায় মৃতদেহটা উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছিল টারজান। জেন বলেছিল জীবনকালে সে যা-ই করে থাকুক, এ-রকম বিকট মৃত্যুতে সব শোধবোধ হয়ে গেছে। দেহটাকে ভদ্রভাবে সমাধি দিতে পারলে ভালো লাগতো। চেষ্টা করে ছিল টারজান। কিন্তু শীতা তার প্রাণপ্রিয় প্রভুর দিকে খেঁকিয়ে উঠেছিল। তাকে মেরে না ফেলে কাজটা হত না। কিন্তু তা তো হয় না।

সারা রাত বনের জানোয়ারদের বীভৎস ভোজসভা চলেছিল। রোকফের দলের মধ্যে চারজন ফোক্‌স্‌লে বন্দী, পলভিচ্ নিখোঁজ, বাকিরা সকলেই মরে গেছিল। টারজানের ইচ্ছা ছিল সবার আগে জঙ্গল-দ্বীপে ফিরে গিয়ে, বনের বন্ধুদের বনে নামিয়ে দেয়। কিন্তু পশ্চিম থেকে ঝোড়ো বাতাস ওঠাতে, জাহাজের মেট বলল এই আবহাওয়াতে জাহাজ ছাড়া নিরাপদ নয়। সুখের বিষয়, ঐ চারজন নাবিকের মধ্যে মেটও ছিল। তার সাহায্যে জাহাজ নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

সারাদিন অপেক্ষা করতে হল। রাতে হাওয়া একটু কমলেও, জঙ্গল দ্বীপে যাবার চেষ্টা করা উচিত দিনের আলোয়। নদীপথ বড়ই আঁকা-বাঁকা। সারাদিন জন্তুরা ডেকে বেড়িয়েছে, রাতে হ্যাচের নিচে। টারজান আর

মুগাম্বি ওদের ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে, জাহাজে এখন যারা আছে, তারা সকলে বন্ধুজন।

টারজান এতক্ষণে শুনল মোড়লের গ্রামে যে শিশুটি মারা যায়, সে ওদের ছেলে জ্যাক্ নয়। তার পরিচয় জানা যায় নি। অন্য কোনো ছোট ছেলে জাহাজে ছিলও না। মনে হচ্ছিল তাহলে জ্যাক্ নিশ্চয় দেশেই আছে।

কিন্তু ঐখানেই শত্রুদের শেষ হয়নি। জেন আর টারজান যখন কিনক্যাডের ডেকে দাঁড়িয়ে গত কয়েক মাসের দুঃখের কথা পরস্পরকে জানাচ্ছিল, সেই সময়ে তীরের ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে গুঁড়িমেরে একটা লোক বিষদৃষ্টিতে ওদের দেখছিল। সে লোকটা অ্যালেক্-জ্যাণ্ডার পলভিচ্। সে যতদিন বেঁচে আছে, যে ভাবে পারবে, টারজানের আর জেনের সর্বনাশ ঘটাবার চেষ্টা করবে। ওরা দুজন এ-সব কিছুই বুঝতে পারেনি।

লুকিয়ে বসে সে নানা মৎলব আটছিল অথচ এ-সমস্ত অশুভ ঘটনার মূলে যে টারজান বা জেন নয়, বরং রোকফ্ আর সে নিজে—একথা তার একবারও মনে হল না। তার বদলে মনে হল যে ওদের অনিষ্ট করতে হলে মাঝ-নদীতে নোঙর করা কিনক্যাডে চড়া দরকার। অথচ নদীতে কুমির কিলবিল করছে। এক যদি মলা গ্রামে গিয়ে একটা নৌকো আনা যায়। তাতে কিছু সময় লাগবে বটে, কিন্তু অন্য উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে পলভিচ্ বনের ভিতর দিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হয়ে গেল।

রাতে ফিরে এসে পুরনো নাবিকদের খুঁজে বের করে, নিজের দলে টানতে হবে। এ কাজে সে দক্ষ। রাশিয়ার নৈরাজ্যবাদীদের হয়ে এক সময় সে অনেক কাজ করেছিল! পরে অবিশ্যি তাদের ধরিয়ে দিয়ে নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করেছিল। ফাঁসিকাঠে ঝুলবার আগে পুরনো সঙ্গীদের একজন ওর নামে কি না বলেছিল!

সে যাক গে। এখন যে জিনিসটা ওর দরকার, সেটা হলো ছোট এক বাক্স শক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্য, যার সাহায্যে এক মুহূর্তে কিনক্যাড্ জাহাজের ওই শত্রুগুলোর সবাইকে একসঙ্গে নিচিহ্ন করে দেওয়া যায়। দিনের আলোয় জাহাজে পা দেবার জো নেই। অমনি ধরা পড়ে যেতে হবে। যা করবার, রাতে করতে হবে। ততক্ষণ জাহাজটা থাকলে হয়। কিন্তু জাহাজেই দরকারি জিনিস-গুলো আছে।

এদিকে দুপুরে মাশুলা গ্রামে পৌঁছে নৌকো চাইতেই, তাকে মোড়ল খেদিয়ে দিল। রোকফ্ আর পলভিচ্ তো কম দুর্ব্যবহার করেনি! অগত্যা নৌকো চুরি করা ছাড়া উপায় ছিল না। গাঁ থেকে কিছু দূরে গিয়ে ওঁৎ পেতে রইল। অনেকক্ষণ পরে একটা নৌকো এসে তীরে লাগল। সেটাকে গাছে বেঁধে সুন্দর দেখতে এক কালো ছোকরা নামল। পলভিচ্ অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। বেশি দেরি করে ফেললে কিনক্যাড্ স্রোতের মাথায় ছেড়ে দেবে।

ছোকরার কেমন খুশি খুশি ভাব। ধীরে সুস্থে হাত-মুখ ধুলো, নিজের তীর-ধনুক, কোমরে গোঁজা ছোরা পরীক্ষা করল। তারপর শিকার ধরতে বনে যাবার আগে, একটু বিশ্রাম করতে নৌকোর মধ্যে শুয়ে পড়ল। যেই না একটু ঘুম এসেছে, পলভিচ্ রিভলবার বের করে তার বুকের মধ্যিখানে গুলি করল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। ছেলেটার মুখে তখনো একটু হাসি লেগেছিল। পলভিচ দেহটাকে তুলে জলে ফেলে দিল। অমনি জলের আলোড়ন দেখে বোঝা গেল, তাকে কুমিরে টেনে নিয়ে গেল।

এবার নৌকোর বাঁধন খুলে, প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে, বড় নদীতে নোঙর করা কিনক্যাড্ জাহাজের দিকে যাত্রা। কিনক্যাড্ তখনো সেইখানেই রয়েছে দেখে বুকটা কেমন ধ্বক করে উঠল। বোস্প্রিটের তক্তার নিচে নৌকো বেঁধে, নিঃশব্দে ডেকের রেলিং অবধি বেয়ে উঠল পলভিচ্। তারপরেই রেলিং টপকে ডেকে। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভয়টা দূর হলো। নিঃশব্দে হ্যাচ্ তুলে পলভিচ্ উঁকি মেরে নিচে তাকিয়ে দেখল একজন নাবিক কি একটা বই পড়ছে। নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে পলভিচ্ ফোকস্'লে নেমে এল। তারপর লোকটার নাম ধরে ডাকল। সে তার খুব চেনা। খুনে ডাকাত। সে তো রোকফের সহকারীকে দেখেই আঁৎকে উঠল, 'তুমি কোত্থেকে এলে? আমরা ভাবলাম অনেক কাল আগেই যে চুলোয় তোমার যাওয়া উচিত ছিল, এতদিন পরে সেখানেই গেছ বোধ হয়। আহা, তোমায় দেখে লর্ড গ্রেস্টোকের বড় আহ্লাদ হবে গো।'

পলভিচ্ এসব উপেক্ষা করে, ওর কাছে গিয়ে বলল, 'ঐ লর্ডটা আর তার জন্তুগুলোকে নিশ্চিহ্ন করতে তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। লর্ড সাহেব আর তার স্ত্রী আর

মুগাম্বি নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে। আগে তাদের গুলি করে, তারপর জন্তুদের সাবাড় করা যাবে। তাহলে সভ্য জগতে ফিরে গেলে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার কেউ থাকবে না। জন্তুগুলো কোথায়?'

—'নিচের তলায়। আমাদের খ্যাপাবার চেষ্টা কর না। লর্ড সাহেবের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়া নেই। তোমরা তো আমাদের কুত্তার মতো দেখতে। কেটে পড় এখান থেকে।'

—'তবে কি তুমি আমার বিপক্ষে গিয়েছ বুঝতে হবে?'

—'ঠিক তাই। এক যদি না লর্ড সাহেব দেখে ফেলার আগেই কিছুমিছু দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে যাও।'

পলভিচ্ বলল, 'বনে ফিরে গেলে সাত দিনও টিঁকব না।'

'—এখানে তাও টিঁকবে না। ভাগ্যিস অন্যরা কেউ জেগে নেই। তারা তোমার ওপর আরো চটা'।

পলভিচ্ বলল, 'দেশে ফিরে গিয়ে তোমার লর্ড সাহেব তোমাদের ফাঁসির ব্যবস্থা করবে।'

এ কথা বলতেই সে বলল, 'না, তিনি বলেছেন আমাদের কোনো ভয় নেই। আমার ঐ এক কথা। হয় এখনি তোমাকে তাঁর কাছে ধরে নিয়ে যাব, নয়তো তোমার কেবিনে আর তোমার গায়ে যা কিছু দামী জিনিস আছে, সব আমাকে দান করে, নিরাপদে জাহাজ থেকে নেমে যাবে।'

লোকটার কথার নড়চড় হবে না দেখে পলভিচ্ বলল, 'আমার কেবিনে কেউ নেই তো?'

—'না, নেই।'

—'তাহলে যাই, গিয়ে যা-কিছু দামী জিনিস আছে নিয়ে এসে, তোমাকে দিয়ে যাই।'

—'আমিও তোমার সঙ্গে যাব। যাতে কোনো চালাকি না কর।'

দরজার বাইরে লোকটা দাঁড়িয়ে রইল। পলভিচ্ ভিতরে গিয়ে তার যৎসামান্য দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করল। তারপর টেবিলের সেই গুপ্ত স্থান থেকে একটা ছোট কালো বাক্স বের করে, ছাদে ঝোলানো আলোর কাছে ধরে ভিতর-কার যন্ত্রপাতি দেখে নিল। ভিতরে দুটি খোপ। একটাতে ঘড়ির মতো একটা যন্ত্র আর একটা ছোট্ট ব্যাটারি। দুটো তারও দেখা যাচ্ছিল। অন্য খোপটা সীল করা। বাক্সে একটা খুদে চাবিও ছিল। সেটাকে ঘড়িটার পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় ঢুকিয়ে ঘোরাল। একটা কাঁটাও ঘুরিয়ে, বাক্স যেমন ছিল সেই ভাবে বন্ধ করে, যথাস্থানে রেখে দিল। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা গেল না। সেই নাবিক দরজার বাইরে থাকাতে দেখতেও পেল না।

এবার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে, আলো নিবিয়ে, বাইরে এসে নাবিককে বলল, 'এই নাও সব জিনিস। এবার আমাকে ছেড়ে দাও।'

নাবিক বলল, 'আগে পকেট দেখি। যদি কিছু দিতে ভুলে গিয়ে থাক আবার। গরীব নাবিকের কাজে দিতে পারে। এ্যাঁ! ঠিক যা ভয় করেছিলাম....' এই বলে ভিতরের পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করে নিল। একটু পরে এদের সকলের কপালে কি সর্বনাশ লেখা আছে, তাই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়ে, পলভিচ্ জাহাজ ছেড়ে আবার তীরের দিকে নৌকো বেয়ে চলল। ও যদি জানত ওর কপালেও বছরের পর বছর ধরে কত দুঃখ লেখা আছে, তাহলে বরং খোলা সমুদ্রের দিকে পাড়ি দিয়ে মৃত্যুবরণ করত।

পলভিচকে রওনা করে দিয়ে, নাবিক আবার তার আগের জায়গায় ফিরে গেল। এদিকে পলভিচের পরিত্যক্ত কেবিনে টিক্ টিক্ করে সেই ঘড়ির কাঁটা ক্রমে সর্বনাশকে ডেকে আনতে লাগল।

পরদিন সকালে ডেকে এসে টারজান দেখল ঝোড়ো হাওয়া কমে গেছে, আকাশে মেঘ নেই, জঙ্গলদ্বীপে ফেরার পক্ষে আদর্শ আবহাওয়া। মেট্‌কে ডেকে বলে দিল যত শীঘ্র সম্ভব রওনা হয়ে পড়তে। ক্রু-র যে ক'জন সঙ্গে ছিল, টারজান তাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে তাদের নামে কোনো অভিযোগ আনা হবে না। কাজেই তারাও খুশিমনে কাজে লেগে গেল।

জন্তুগুলো সারারাত হোল্ডে আটক থেকে, এতক্ষণ পর ডেকে ছাড়া পেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অবিশ্যি তাতে ক্রু কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করেছিল। তবে টারজান আর মুগাম্বির কড়া প্রহরায় শীতা এবং বনমানুষরা কেউই এতটুকু বেয়াড়ামি করেনি।

উগাম্বি নদীর মুখ ছেড়ে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের ঝিকমিকে জল কেটে জাহাজ এগিয়ে চলল। এই একবার জন্মভূমি ছেড়ে যেতে টারজানের একটুও মন খারাপ হলো না। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে হারানো

ছেলের সন্ধান করতে হবে।

জাহাজ ক্রমে আরো খানিকটা অগ্রসর হলো। এবার পশ্চিম দিগন্তে জঙ্গল-দ্বীপের গাছপালা দেখা গেল।

এদিকে পলভিচের পরিত্যক্ত কেবিনের টেবিলে লুকোনো যন্ত্রটার ঘড়ির কাঁটা টিক্‌টিক্ করে ক্রমাগত অন্য কাঁটাটির দিকে এগোতে লাগল। দুটিতে যেই মিলবে, অমনি হবে বিস্ফোরণ!

জেন, টারজান, মুগাম্বি আর বাকি সকলে জাহাজের নানা জায়গা থেকে তীররেখার দিকে তাকিয়ে ছিল। জানোয়ারেরা রান্নাঘরের সামনে একটু ছায়া মতো জায়গা পেয়ে যে যার ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময় বিনা নোটিশে কেবিনের ছাদটা আকাশে উড়ে গেল, জাহাজের মাথার ওপরে ঘন কালো ধোঁয়া জমতে লাগল এবং তার পরেই সে কি কান-ফাটানো বিস্ফোরণ! সমস্ত জাহাজটা কেঁপে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ডেক জুড়ে হট্টগোল লেগে গেল। জানোয়ারেরা ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। আর সেকি গর্জানি? মুগাম্বিও ভয়ে কাঁপছিল। খালি টারজান আর জেনের ভয়-ডর ছিল না। অনেক কষ্টে তারা সকলকে ঠাণ্ডা করতে পারল। সবাইকে বলা হলো, এখন আর কোনো ভয় নেই।

ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে বোঝা গেল যে আর কিছু নয়, একমাত্র বিপদ হচ্ছে আগুন লেগে যাবার। কেবিনটার দেয়ালের আর ছাদের ভাঙা কাঠে ইতিমধ্যেই আগুন ধরে গিয়েছিল। আগুনটা ছড়াবার যথেষ্ট ভয়ও ছিল। জল ঢেলেও কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। ওদিকে হোল্ড আর এদিকে এঞ্জিনরুমের কাছাকাছি আগুনটা এগিয়ে এলে, টারজান বলল, 'আমাদের নৌকো দুটো জলে নামিয়ে, এইটুকু পথ তাতে করে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না।'

নাবিকরা নিজেদের ছোট ছোট বোঁচকা নিরাপদে বের করে আনল, বাকিরা খালি হাতে, শুধু পৈত্রিক প্রাণটুকু নিয়ে, জন্তু-জানোয়ারসহ নৌকোতে উঠল। সুখের বিষয়, কেউ হতাহত হয়নি, খালি জাহাজটিকে খরচের খাতায় লিখে রাখতে হলো।

অতি সহজেই ঐটুকু জলপথ পার হয়ে, সকলে নিরাপদে জঙ্গল-দ্বীপে নামল। জানোয়াররা স্বদেশে ফিরে এসে এত খুশি হলো যে বিদায় না নিয়েই সবাই বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টারজান করুণ হেসে বলল, 'বিদায়, আমার বিশ্বাসী বন্ধুরা সব।'

জেন বলল, 'ওরা আবার আসবে। তাই না?'

—'তা কিছু বলা যায় না।'

দু-ঘণ্টা ধরে তীরে দাঁড়িয়ে ওরা কিনক্যাড জাহাজের অগ্নিকাণ্ড দেখতে লাগল। তারপর আরেকটা ছোট বিস্ফোরণ শোনা গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটা সমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেল।

মেট্ বলল যে ঐ দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা বয়লার ফাটার শব্দ ছাড়া কিছু নয়।

এবার সকলে মিলে একটা পরিষ্কার জলের ঝরনা খুঁজে নিয়ে, তার কাছাকাছি ক্যাম্প করার ব্যবস্থা করতে হবে।

জায়গাটা টারজানের চেনা। ভালো জলের সন্ধানও তার জানা ছিল, সেখানে সে দলবল নিয়ে গেল। কে জানে কতকাল এখানে থাকতে হবে। ভালো করে একটা আস্তানা তৈরি করা দরকার। পুরুষরা সবাই মিলে তখুনি ছাউনি তৈরি করার কাজে লেগে গেল। কিছু কাজ-চালানো গোছের আসবাবও হলো। টারজান শিকার করে তাজা মাংস জোগাবার ব্যবস্থা করল। বিশ্বাসী বন্ধু মুগাম্বি মেয়েদের রক্ষার্থে রইল। কিনক্যাডের নাবিকরা মূলে খুনে ডাকাত, কখন কি করে বসে, তার ঠিক কি?

জেনেরই সবচেয়ে কষ্ট, কারণ দেশে ফেরার আগ্রহ তারই ছিল সবচেয়ে বেশি। ছেলেটার জন্য ভেবে ভেবে সে সারা হচ্ছিল।

টারজান সকলের মধ্যে ন্যায্যভাবে কাজ ভাগ করে দিয়েছিল। দুই সপ্তাহ ধরে যে যার কর্তব্য করে গিয়েছিল। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি একটা টিলার ওপর ধূনি জ্বেলে সংকেত দেবার ব্যবস্থা হলো। এক গাদা শুকনো কাঠ-কুটো জমা করা হলো, যাতে দেশলাই দিলেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠে ও-পথে যে-কোনো জাহাজ যাবে, তাকেই জানান দেওয়া হবে। তাছাড়া লম্বা একটা বাঁশ পুঁতে তার আগায় মেটের লাল শার্টও সংকেত-স্বরূপ ঝোলানো হলো।

কিন্তু কোথায় কি! ও-পথে কোনো জাহাজ যায় না। চোখ ক্লান্ত হয়ে উঠল। তখন টারজান বলল, 'একটা বড় গোছের নৌকো বানিয়ে আফ্রিকার তীরে ফিরে যাওয়া যাক। খুব বেশি দূরে তো নয়।'

একমাত্র সে-ই জানত কেমন করে নৌকো তৈরি

হবে, তার আগে তার যন্ত্রপাতি তৈরি করতে হবে। বেশির ভাগ খাটুনি অন্যদের ওপরেই পড়ত, কারণ টারজানকে শিকারে বেরোতে হতো। ঐ অনিশ্চয়তা আর খাটুনির ফলে আধা-ডাকু লোকগুলোর মেজাজ সর্বদা খিঁচড়ে থাকতে লাগল। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও লেগেই থাকত। একমাত্র মুগাম্বির ভরসায় ক্যাম্প ছেড়ে যেতে টারজানের ভয় করতে লাগল। মাঝে মাঝে ওর বদলে মুগাম্বি শিকারে যেত, কিন্তু সে তেমন দক্ষ ছিল না।

এর পর নানা বাজে অছিলায় লোকগুলো কাজে ফাঁকি দিতে লাগল।

এদিকে দ্বীপের উল্টো তীরে আরেকটা ক্যাম্পের পত্তন হয়েছিল। সেখানে ছোট্ট একটা উপসাগরে কৌরি বলে ছোট্ট একটা পাল-তোলা জাহাজ নোঙর করা হয়েছিল। সেই জাহাজে গাস্ট বলে একটা লোক, মোমুলা বলে এক মাওরি আর পাপিষ্ঠদের শিরোমণি ফাচান দেশের কৈ-শাঙ, ষড়যন্ত্র করে অফিসারদের আর বিশ্বাসী নাবিকদের খুন করে এখানে এসে লুকিয়ে ছিল। দলে আরো দশজন ঐ রকম খুনে-গুণ্ডাও ছিল। সমস্ত ব্যাপারটার উদ্দেশ্য সমুদ্র থেকে সদ্য-তোলা মূল্যবান মুক্তোগুলো হস্তগত করা।

এদের মধ্যে গাস্ট কখনো রক্তপাতে জড়িত থাকত না। কোনো ধর্মবোধে নয়, নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে। এখন খুনোখুনির পালা চুকে গেছে, গাস্টের এবার ক্যাপ্টেন হবার বাসনা। নিহত ক্যাপ্টেনের পোশাকও সে পরতে শুরু করেছে। তাতে কৈ-শাঙ ভারি চটেছিল। দলের অনেকেই ভারি অসন্তুষ্ট হয়ে ছিল, কিন্তু গাস্টকে ছাড়া ওদের চলবেও না। একমাত্র সে-ই জাহাজ চালাতে জানে, যাকে নেভিগেশন বলে।

দ্বীপে আশ্রয় নেবার আগের দিনই দূরে একটা যুদ্ধ-জাহাজের চোঙা দেখা গিয়েছিল। সেখান থেকে ভয়ে তারা পালিয়ে এসেছিল। এখনি তদন্ত হলেই তো সর্বনাশ! সবাই ঝুলবে। হৈ-চৈ থেমে যাক, লোকে ভুলে যাক, ততদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। গাস্টের এখনি দ্বীপ ছেড়ে যেতে অন্য আপত্তিও ছিল। মুক্তোগুলো সমান ভাগ হলে যতটা পাবে, গাস্টের তার ডবল পাবার ইচ্ছে।

তাহলে অর্ধেক লোককে দল থেকে ভাঙিয়ে এনে, মুক্তোর থলিটি সহ জাহাজ নিয়ে ভেগে পড়তে হবে। ওকে বাদ দিয়ে তো অন্য দলও কোথাও জাহাজ নিয়ে যেতে পারবে না, তাই ভরসা। ঐ কৈ-সাঙটাকে, মোমুলাটাকে, আরো গোটা পাঁচেককে ফেলে সরে পড়লেই হলো। কিন্তু এরা আবার একসঙ্গে সকলে জাহাজের কাছ থেকে নড়ে না।

আসলে কৈ-সাঙের হাতে কোনো প্রমাণ না থাকলেও এ বিষয়ে মনে গভীর সন্দেহ ছিল। ভারি ধূর্ত সে। মোমুলাকে কথাটা বলেওছিল। তাই বলে গাস্টকে মেরে ফেললেও চলবে না। দ্বীপ ছেড়ে যাবার একমাত্র উপায় সে। গাস্টকে মোমুলা বলতো, 'চল বেরিয়ে পড়ি। খুদে একটা জাহাজের বিদ্রোহের খবর কি করে যুদ্ধজাহাজের কানে পৌছবে এত তাড়াতাড়ি?'

গাস্ট বলেছিল, 'তোর মতো অসভ্য মুখ্যুর মুখেই ও-কথা সাজে। বেতারের কথাও জানিস্ না।'

অসভ্য মুখ্যু বলাতে মোমুলা চটে লাল। গাস্ট তাড়াতাড়ি বলল, 'ওরে, ঠাট্টাও বুঝলি না নাকি?'

—'কিন্তু ঐ বেতারের কথাটা কি যেন বললে?'

তখন তাও বুঝিয়ে বলতে হলো। সব শুনে, মোমুলা বলল, 'তুমি বড় মিথ্যাবাদী, বাপু। কালকেই যদি রওনা হবার ব্যবস্থা না কর, তো দলের দু'জনকে বলতে শুনেছি তোমার পিঠে ছোরা বসাবে।' কৈ-শাঙ আপসোস করে বলতে লাগল, 'আহা! জাহাজ চালাতে জানে এমন আরেকটা লোক যদি পেতাম'!

সেদিন দুপুরবেলা দু'জন মাওরি মাঝি নিয়ে মোমুলা শিকারে গিয়েছিল। জঙ্গলে অচেনা লোকের গলার আওয়াজ শুনে তারা চমকে উঠল। সঙ্গীরা তো ভয়েই মরে! এই রে অফিসারদের ভূত নয়তো? মোমুলার তার চেয়ে বেশি সাহস। এগিয়ে গিয়ে দেখে একটা মরা গাছের গুঁড়িতে বসে দুটো সাদা লোক কথা বলছে। একজন হলো কিনক্যাডের মেট্ শ্লাইডার, অন্যজন শ্মিট্ বলে নাবিক।

মেট বলছিল, 'ছোট একটা কেন্যু খুব সহজেই বানানো যায়। তিন জন লোক নিয়ে সেটা এক দিনেই আমাদের আফ্রিকার তীরে নামিয়ে দেবে। বড় নৌকো নিয়ে খাটতে খাটতে সবাই হাঁপিয়ে উঠেছে। বাপু, আমাদের বড় নৌকোর কি দরকার? বলছে নাকি নাহলে সকলকে ধরবে না। তোদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের কি? চল, আমরা ছোট নৌকো বানিয়ে চলে যাই। ওদের দায়

ওরা বুঝুক। তবে মেয়েটা বড় সুন্দরী, ওকে নিয়ে গেলেও হয়।'

শ্লিট্ বলল, 'আমি তোমাকে সাহায্য করলে, আমাকে কি দেবে?'

—'আরে, সভ্য জগতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে ঐ মেয়েই আমাদের অনেক বখশিশ দেবে। আমি তার অর্ধেক নেবো। তুমি আর আরেকজন যে দলে আসবে, তোমরা অর্ধেকটা ভাগ করে নিও।'

শ্লিট বলল, 'বেশ। তুমি কিন্তু নৌকো চালাবার ভার নেবে। আমি পারব না। তুমি ছাড়া কেউ ও-কাজ জানেও না।'

এ-কথা শুনেই মোমুলার কান খাড়া। অমনি সে বনের আড়াল ছেড়ে ডান হাত তুলে ওদের সামনে দাঁড়াল। শ্লাইডার রিভলবার বের করতে যাচ্ছিল, বন্ধুত্বের সংকেত দেখে থেমে গেল।

মোমুলা বলল, 'তুমি জাহাজ চালাতে জান, কিন্তু তোমার জাহাজ নেই। আমাদের জাহাজ আছে, চালাবার লোক নেই। চল আমার সঙ্গে। সব দেখতে পাবে।'

তাদের বনের মধ্যে এক জায়গায় বসিয়ে, মোমুলা কৈ-শাঙকে ডেকে নিয়ে এলো। আগেই তাকে সংক্ষেপে সব কথা জানিয়ে, তবে আনল। একটুক্ষণ আলাপ করে ওরা বুঝল শ্লাইডার আর শ্লিট্ও ওদেরই মতো বজ্জাত এবং দ্বীপ ছেড়ে যেতে তাদেরও বড়ই আগ্রহ।

তাহলে কৌরি জাহাজ চালাবার ভার নিতে তার আপত্তি হবে না নিশ্চয়। এবং একবার জাহাজে তুললে তাকে অন্য সব শর্তেও রাজি হতে বাধ্য করা যেতে পারে। মেয়ে দুটোকে ধরে আনাতেও ওদের সহযোগিতা দরকার হবে।

ক্যাম্পে ফিরবার আগে মোমুলারা জেনে গেল যে গাস্টকে দিয়ে ওদের আর দরকার নেই। নিরাপত্তার জন্যে ওরা সকলে ডাঙায় শুত। সটাং গেল দু-জন গাস্টের তাঁবুতে। মোমুলার হাতে লম্বা ছোরা।

সুখের বিষয় গাস্ট ঠিক সেই সময় রসুই তাঁবুতে ছিল। সেখান থেকে ওদের দেখতে পেল। গোড়ায় কিছু সন্দেহ করেনি, কিন্তু অমন চুপিসাড়ে এগোনো দেখে খটকা লাগল। তারপরেই মোমুলার হাতের ছোরাটার ওপর চোখ পড়ল।

দেখেই তো ওর চক্ষুস্থির! ওরা কেন এসেছে আর বুঝতে বাকি রইল না। এত দিন ও ভাবত ও নিজে বুঝি নিরাপদ, কারণ আর কেউ জাহাজ চালাতে জানে না! সে যাই হোক, এখন আর বৃথা সময় নষ্ট না করে, গাস্ট রসুই তাঁবু থেকে বেরিয়ে সটাং বনের গহনে! কারণ ওর মন বলে দিল ওরা নিশ্চয় আরেকজন নৌ-চালক পেয়ে গেছে। এখন থেকে হিংস্র জন্তুর নিবাস বনও ঐ দুটো খুনের জগতের চেয়ে নিরাপদ।

এদিকে ধমক-ধামক করে আর পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে টারজান লোকগুলোর কাজে উৎসাহ একটু বাড়িয়ে দেওয়াতে, নৌকোর খোলটা প্রায় শেষ। অবিশ্যি বেশির ভাগ কাজই ওর আর মুগাম্বির করা। তার ওপর শিকারও করত।

শ্লাইডার আর শ্লিট্ ক'দিন ধরে কাজে ফাঁকি দিচ্ছিল, আগের দিন তারা শিকার করতে বনে গেল। কিছু বলা বৃথা জেনে টারজান দেখেও দেখল না। সেদিন কিন্তু শ্লাইডার ভাবদেখাল যেন সে কতই অনুতপ্ত আর ফুর্তির সঙ্গে কাজে লেগে গেল। শ্লিট্ও হাসিমুখে খাটতে লাগল।

দুপুরে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে টারজান হরিণ শিকারে বেরোল। শ্লাইডার নাকি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হরিণের পাল দেখেছে।

টারজান রওনা হয়ে গেলে গোটা ছয় পাপিষ্ঠ চেহারার লোক কেমন যেন চুপিসাড়ে উত্তর দিক থেকে এগিয়ে এলো। তারা ভেবেছিল কেউ বুঝি লক্ষ্য করেনি, কিন্তু তারা নিজেদের ক্যাম্প ছাড়া অবধি একজন লম্বা মানুষ আড়ালে থেকে তাদের পিছু নিয়েছিল। গাস্ট আসলে ওদের দেখে চমকে উঠেছিল, কৈ-শাঙ আর মোমুলা তাঁদের বদমাইসের দল নিয়ে চলল কোথায়? ওদের পিছু নিয়ে, উদ্দেশ্য জেনে, সম্ভব হলে বাধা দিতে হবে।

গোড়ায় ভেবেছিল ওকেই বুঝি খুঁজতে বেরিয়েছে। পরে মনে হলো, ওর তো টাকাকড়ি নেই, ওকে মেরে ওদের কি লাভ হবে? একটু বাদেই সামনের দলটা থেমে গিয়ে ঝোপে-ঝাড়ে গা-ঢাকা দিল। গাস্টও একটা উঁচু গাছে চড়ে, ওপর থেকে সব দেখতে লাগল। কিছু পরেই একজন শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ থেকে এগিয়ে এলো। মোমুলা আর কৈ-শাঙ বেরিয়ে এলে তাদের সঙ্গে কি কথাবার্তা বলে লোকটা

আবার ফিরে গেল।

সে লোকটা হলো শ্লাইডার। ক্যাম্পের কাছিকাছি এসে সে দৌড়তে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে মুগাম্বিকে গিয়ে বলল, 'শিগ্‌গির এসো, তোমাদের বনবাসীরা শ্মিট্‌কে ধরেছে। তুমি গিয়ে না থামালে, মেরেই ফেলবে। দক্ষিণ দিকের পথ ধরে যাও। আমি আর দৌড়তে পারছি না।' এই বলে সে মাটিতে শুয়ে পড়ল। মুগাম্বিকে ইতস্ততঃ করতে দেখে জেন বলল, 'যাও, যাও, দেরি কর না। মিঃ শ্লাইডার তো রইলেন। ও বেচারাকেও তো বাঁচাতে হবে।'

তখন ঘোর অনিচ্ছায় মুগাম্বি সেদিকে ছুটল। জোন্স আর সালিভান সঙ্গে গেল। যেই না ওরা চোখের আড়াল হলো, শ্মিট উঠে বনে ছুটল। কৈ-শাঙ বেড়ার ধার দিয়ে উঁকি মারতেই শ্লাইডার ইশারায় জানাল যে পথ পরিষ্কার।

জেন আর মশুলা মেয়েটি দরজার দিকে পিঠ করে তাঁবুতে বসেছিল। হঠাৎ ক্যাম্পে ছয়-সাতজন ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরা লোক দেখে তারা অবাক হলো। কৈ-শাঙ জেনকে বলল, 'চল।'

জেন ফিরে দেখল তরে পাশে শ্লাইডার দাঁড়িয়ে। অমনি বুঝে নিল সবটাই তাহলে এদের একটা ষড়যন্ত্র। মাওরিদের একজন মশুলা মেয়ের হাত ধরে টানতেই সে চেঁচিয়ে উঠল। অমনি তার মুখে এক চড়!

এদিকে মুগাম্বিও মাইল খানেক ছুটে শ্মিট্ বা আকুটের দলের কাউকে না দেখে, টারজানের শেখানো গলায় বনমানুষদের ডাক দিয়েও কোনো সাড়া পেল না। জোন্স আর সালিভানও ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছিল। অনেকবার ডেকেও কোনো উত্তর না পেয়ে মুগাম্বি হঠাৎ বিকট সত্যি কথাটা টের পেল!

সঙ্গে সঙ্গে আবার ক্যাম্পের দিকে দৌড়! সেখানে পৌঁছে দেখল যা ভয় করেছিল ঠিক তাই! তাঁবুতে কেউ নেই। জোন্স আর সালিভান পৌঁছলে প্রথমটা তাদেরই মারে আর কি! সন্দেহ হল ওরাও নিশ্চয় ষড়যন্ত্রে জড়িত। শেষে বুঝল যে তারা নির্দোষ।

ঠিক সেই সময় গাছ থেকে টারজান নেমে এলো। ক্যাম্পে পা দিয়েই সেও বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে। সব শুনে রাগে মুখের চেহারা বদলে গেল। এই ছোট দ্বীপে মেয়েদের চুরি করে কোথায় নিয়ে যেতে পারে শ্লাইডার! তাহলে নিশ্চয় কোনো জাহাজ বা নৌকোর খবর পেয়েছে। কালো মেয়েটিকেই বা নিল কেন? দলে নিশ্চয় আরো লোক আছে।

টারজান বলল, 'এসো, মুগাম্বি। চিহ্ন দেখে পিছু নেওয়া যাক।'

এমন সময় একজন লম্বা শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ক্যাম্পে এসে ঢুকল। সে হলো গাস্ট। গাস্ট বলল, 'যদি মেয়েদের উদ্ধার করতে চাও, আমার সঙ্গে এসো। নয়তো 'কৌরি' জাহাজে চেপে ওরা রওনা দেবে।'

টারজান বলল, 'তুমি কে? এ বিষয়ে কি জান?'

—'আমি কৌরি জাহাজের চালক। আমার নাম গাস্ট। ওরা আমাকে ক্যাম্প থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এতদিন মারেনি, আর চালক ছিল না বলে। এখন নতুন লোক পেয়েছে, আমাকে মারবার চেষ্টাও করছে। আমি প্রতিশোধ চাই। এসো।'

বনের মধ্যে দিয়ে সারা পথ ছুটে গিয়েও তীরে পৌঁছে ওরা দেখল 'কৌরি' জাহাজ রওনা হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে বাঁক ঘুরে জাহাজ দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। টারজান প্রায় ভেঙে পড়েছিল। এমন সময় বন থেকে প্যান্থারের অদ্ভুত ডাক শোনা গেল। টারজান অমনি তার জবাব দিল। অন্ধকার রাতে শীতা বন থেকে বেরিয়ে টারজানের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আনন্দে গর্‌র্‌-গর্‌র্‌ করতে লাগল। সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে টারজান ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

হঠাৎ কানে একটা শব্দ এলো। ও কি? লোকজনদের ডাক দিতেই, তারা ছুটে এলো।

—'দেখ, দেখ, জাহাজের আলো, জাহাজ ফিরে এসেছে। কৌরি হলো পাল-তোলা জাহাজ। হাওয়া পড়ে গেছে। জাহাজও অচল। এখানে যে নৌকোটা আছে, ওটা করেই জাহাজে ওঠা যাবে। চল।'

গাস্ট বলল, 'ওদের যে অস্ত্রশস্ত্র আছে, ওরা অনেক লোকজন। আমরা মোটে পাঁচজন।'

টারজান বলল, 'আমার দলবলও ডাকছি। শীতা একাই কুড়িজন, বাকিদের একশো যোদ্ধার বল।' এই বলে বনের দিকে ফিরে বনমানুষদের ডাক দিল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও পেল। গাস্টের কি ভয়!

কয়েক মিনিটের মধ্যে আকুটের দল এসে হাজির। ততক্ষণে এরা পাঁচজনে নৌকোটাকে জলে নামাবার জন্য ঠেলাঠেলি করে নামিয়েও ফেলেছিল। আবার সেই ভয়ংকর চেহারার বন্ধুদের নিয়ে নৌ-যাত্রা। গাস্ট কিছুতেই তাদের সঙ্গে

নৌকো চাপতে রাজি হলো না। তাকে ছেড়েই এরা রওনা হয়ে গেল। জাহাজের ওয়াচ্‌ম্যানের আধ-ঘুমনো অবস্থা। জেনকে যে কেবিনে বন্দী করা হয়েছিল তার দেরাজে একটা রিভলবার ছিল। সেটা হাতে নিয়ে জেন খাড়া। তার পিছনে মশুলা মেয়ে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। ঘরের বাইরে শ্লাইডার পায়চারী করছিল। হঠাৎ গুলির শব্দ!

ততক্ষণে একটা লোককে ডেকের রেলিং টপকাতে দেখে, পাহারাদার জেগে গিয়ে আন্দাজে গুলি ছুঁড়েছিল।

এদিকে ডেকে সব পাপিষ্ঠগুলো নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। তাদের মধ্যিখানে টারজানের জন্তুরা উঠে এসে সে কি নারকীয় কাণ্ড শুরু করল তা কল্পনা করা যায় না। তাদের সঙ্গে টারজান, জোন্স, সালিভান আর মুগাম্বি ছিল।

কেউ কেউ গুলি ছুঁড়েছিল বটে, কিন্তু আকুটের দলের সঙ্গে পারবে কেন! কৈ-শাঙকে শীতা তাড়া করেছিল। সে কেবিনের দরজা এঁটে নিরাপদ হবার চেষ্টা করেছিল। শীতা এক ঝাঁপে দরজা ভেঙে তাকে শেষ করেছিল।

এদিকে প্রথম গুলির শব্দে জেন একটু অন্যমনস্ক হতেই শ্লাইডার ঘরে ঢুকে রিভলবারটা কেড়ে নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন আধা-উলঙ্গ সাদা দানবও ঘরে ঢুকে শ্লাইডারের টুঁটি টিপে ধরেছিল এবং যতক্ষণ প্রাণ ছিল ততক্ষণ ছাড়েনি। জেনের কাকুতি-মিনতি শুনে বলেছিল, 'আর নয়। এর আগে পাপিষ্ঠদের বাঁচতে দিয়ে আমি বহু লোকের দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়েছি। আর নয়।'

তারপর ডেকে বেরিয়ে দেখল সব শত্রু নিহত। খালি মোমুলা আর শ্মিট্‌ ফোক্‌স্‌'লে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে বেঁচেছিল। টারজান তাদের সেখান থেকে বের করে এনে, ডেক ধুয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। পরে আবার বন্দী করে রেখেছিল। যথাস্থানে বিচারের জন্য।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার বাতাস বইতে লাগল। দেখতে দেখতে কৌরি জাহাজ আবার জঙ্গল-দ্বীপে পৌঁছল। সেখানে বিশ্বাসী জানোয়ার বন্ধুরা নেমে গেল। গাস্টকেও তুলে নেওয়া হলো। আবার দেখা গেল জন্তুরা নেমেই বনে চলে গেল। খালি আকুট, যার বুদ্ধি প্রায় মানুষের মতোই, সে হয়তো বুঝেছিল জাহাজটা আর এখানে ফিরবে না। যতক্ষণ দৃষ্টি চলে ডেক থেকে জেন আর টারজান দেখেছিল সেই একই ভাবে জাহাজের দিকে তাকিয়ে আকুট দাঁড়িয়ে আছে।

এর তিন দিন পরে যুদ্ধ-জাহাজ 'শোর-ওয়াটার' ওদের দেখতে পেয়ে তুলে নেয়। সেই জাহাজ থেকে লণ্ডনের সঙ্গে বেতারে লর্ড গ্রেস্টোক যোগাযোগ করেন এবং যে খবর শোনেন তাতে তিনি আর লেডি গ্রেস্টোক আনন্দ রাখার জায়গা পান না। তাঁদের ছেলে অক্ষত দেহে তাঁদের লণ্ডনের বাড়িতেই আছে!

লণ্ডনে গিয়ে বাকিটা শুনেছিলেন। রোকফ্‌ বুদ্ধি করে কিনক্যাডে ছেলেটাকে না রেখে, একটা বস্তিতে অনাথ ছেলেদের রাখত এক বুড়ি, তার কাছে জমা রেখেছিল। যাবার সময় নিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পলভিচ্‌ বুড়িকে ঘুষ দিয়ে অন্য ছেলে পাচার করেছিল। রোকফ্‌ টের পায়নি। বুড়ি এদিকে ছেলে হারানোর বিজ্ঞাপন দেখে, কতক পুলিসের ভয়ে, কতক বখশিশের লোভে ছেলেটিকে গ্রেস্টোকদের উকিলের কাছে পৌঁছে দিয়ে বখশিশ পেয়েছিল।

ছোট্ট জ্যাক এতকাল খুব যত্নেই এস্‌মারেল্ডার কাছে ছিল। জ্যাকের মা বাবা ফিরে এলে সে কি আনন্দের ধূম পড়ে গেল গ্রেস্টোক হাউসে। মুগাম্বি আর সেই মশুলা মেয়েও সঙ্গে ছিল। টারজান স্থির করেছিল ওদের বিয়ের পর আফ্রিকার ওয়াজিরি প্রদেশে গ্রেস্টোকদের যে বিশাল সম্পত্তি ছিল, সেখানে জমি-জমা কাজ-কর্ম দিয়ে বসিয়ে দেবে।

একমাত্র পলভিচের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না।

★

টারজানের ছেলে

দি সন অফ টারজান

মার্জরি ডব্লু জাহাজের লংবোট উগাম্বি নদীর ভাঁটার জলে ভেসে চলেছিল, হঠাৎ নাবিকদের চোখে পড়ল তীর থেকে একজন দুর্ভিক্ষপীড়িতের মতো কংকালসার শ্বেতাঙ্গ তাকে তুলে নেবার জন্য ব্যাকুল ভাবে ইশারা করছে। পাকা চুল, গাল বসা, তাতে বসন্তের দাগ। বলা বাহুল্য তাকে উদ্ধার করে মার্জরি ডব্লুতে তোলা হলো।

জাহাজে উঠে সে তার গত দশ বছরের অমানুষিক কষ্টের কথা বলেছিল। দুঃখে যন্ত্রণায় তার আগের ইতিহাস মনে নেই। জাতে রুশ, ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলে। সঠিক নামও বলতে পারল না। নাবিকরা ওকে মাইকেল সাব্রভ বলে চিনে রাখল। দশ বছর আগেকার দুর্ধর্ষ দুষ্কৃতকারী অ্যালেক্সিস পলভিচ বলে তাকে চিনবার জো ছিল না।

সেই সময় যেই টারজান তার পশু সৈন্য নিয়ে কিনকেড্ জাহাজ ঘেরাও করেছিল, অমনি ভয়ের চোটে সে ঘোর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। তাতেও নিস্তার পায়নি। সেখানকার নরখাদক গ্রামবাসীদের ওপর ওর বন্ধু ও গুরু রোকফ্ অমানুষিক অত্যাচার করত। পলভিচ্ তাদের হাতে বন্দী হয়ে, দশ বছর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছিল।

রোকফ্ মৃত্যু বরণ করেছিল বলে পলভিচের হিংসা হতো। এত কাল পরে পালাবার সুযোগ এসেছিল। মুখে একটাও দাঁত ছিল না, দেখাত যেন আশি বছর বয়স! আসলে মাত্র ত্রিশ। মনে একটিমাত্র বাসনা, যেমন করে হোক, তার সব ব্যর্থতার কারণ ঐ টারজান, তার সর্বনাশ করতে হবে।

মার্জরি ডল্ জাহাজে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন, আর একটা ভালো ল্যাবরেটরি ছিল। কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ীর উদ্যোগে তাঁরা কিছু মূল্যবান প্রাকৃতিক সামগ্রীর সন্ধানে এসেছিলেন। নদীমুখে একটা দ্বীপের কাছে জাহাজ নোঙর করা থাকত। তাঁরা চারিদিকে অনুসন্ধানের কাজ করতেন। ভগ্ন-স্বাস্থ্য পলভিচকে কোনো কাজের ভার দেওয়া হতো না। সে নিজেই যেচে তীরে নেমে ঘোরাঘুরি করত।

নাবিকরা একদিন একটা প্যান্থার মেরে খুব হৈ-চৈ করছিল, পলভিচ্ গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময় ওর কাঁধে কেউ হাত রাখতেই চেয়ে দেখে, ও বাবা! একটা বনমানুষ উবু হয়ে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে ওর মুখ দেখছে। প্রথমটা খুব ভয় পেলেও, সঙ্গে সঙ্গে পলভিচ্ বুঝতে পারল জানোয়ারটা বন্ধুভাবেই এসেছে। কিচির মিচির করে কি যেন বলছিল সে। পলভিচ উঠে দাঁড়ালে, সেও উঠল।

পলভিচ নাবিকদের দিকে এগোলে ওর কনুই ধরে সেও চলল। মনে হলো মানুষের সঙ্গে থেকে সে অভ্যস্ত। অমনি পলভিচের এ-ও মনে হলো সভ্য জগতে ফিরে গিয়ে, এর খেলা দেখিয়ে বেশ দু-পয়সা রোজগার করা যায়। নাবিকরা কাছে এলে প্রত্যেকের কাঁধে হাত দিয়ে বনমানুষটা তাদের মুখ দেখতে লাগল, যেন কাকে খুঁজছে। নাবিকরা তো মহাখুশি। পলভিচ্ বারবার বলতে লাগল, 'ওটা কিন্তু আমার।'

একজন মজা করে বনমানুষের পিঠে একটা পিন ফুটিয়ে দিতেই, জানোয়ারটা মহা বেগে ওদের দিকে তেড়ে গেল! ঠিক সেই সময় ক্যাপ্টেন আর মেট জাহাজ থেকে নেমেই ঐ ব্যাপার দেখে রিভলবার বের করে আরেকটু হলেই বেচারাকে মেরেই ফেলতেন, ভাগ্যিস পলভিচ সাহস করে বনমানুষের হাত ধরে বলল, 'এসো!' সঙ্গে সঙ্গে তার রাগ পড়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে ক্যাপ্টেন বুঝলেন দোষটা নাবিকদের। পলভিচের সঙ্গে বনমানুষটা যখন জাহাজে উঠল তখনো কেউ আপত্তি করল না। প্রত্যেকটি নবাগতর কাঁধে হাত দিয়ে তার মুখ দেখে জানোয়ারটা তারপর ঠিক মনে হয় যাকে খুঁজছে তাকে না পেয়ে মানুষের মতো একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলে।

যাত্রাপথে সে কোনো গোলমাল করেনি। পলভিচ্ তার দেখাশুনো করত। লণ্ডনের ডকে নেমেও তার চেনা মানুষকে না পেয়ে সে কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল। পলভিচ্ তাকে নিয়ে একজন বিখ্যাত পশু ট্রেনারের সঙ্গে কথা বলল। বনমানুষের নাম দেওয়া হয়েছিল এজ্যাক্স। তার বুদ্ধিশুদ্ধি দেখে ট্রেনার মহা খুশি হয়ে তাকে প্রশিক্ষণ দিতে রাজি হলো। তার দেখাশুনো করবে পলভিচ্। তাদের খাওয়া-থাকার খরচ দেবে ট্রেনার। তার বদলে লাভের টাকার সিংহভাগ ট্রেনার নেবে। এতে পলভিচের রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। এইভাবে দু'জনার নতুন জীবন শুরু হলো।

লণ্ডন শহরের এক অভিজাত পাড়ায় এক প্রাসাদের মতো বাড়িতে লর্ড আর লেডি গ্রেস্টোক থাকতেন। তাঁদের একটিমাত্র ছেলে জ্যাক্। ছুটির সময় বাড়িতেই তার গৃহশিক্ষক মিঃ হ্যারল্ড মূরের কাছে পড়াশুনো করে। ক্ষীণদেহী মিঃ মূর খেলাধূলো বা শারীরিক কৌশলে পারদর্শী না হলেও, ভারি বিদ্বান।

এর মধ্যে একদিন তিনি নিজের থেকেই গিয়ে ছেলের মায়ের কাছে দুঃখ করতে লাগলেন যে ছেলের এত বুদ্ধি-শুদ্ধি, কিন্তু পড়াশুনোয় এতটুকু মন নেই। সমস্তক্ষণ খালি খেলাধূলো, শরীর চর্চার দিকে দৃষ্টি। পড়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে ফেলে, তারপর যে-সব বই নিয়ে বসবে, সব ভ্রমণ কাহিনী, দুঃসাহসিক অভিযান, বুনো জন্তু, অসভ্য জাতিদের জীবনযাত্রার কথা, আফ্রিকার নানা অনাবিষ্কৃত জায়গার কথা।

—'আমি জানি ওসব আপনি ভালোবাসেন না। তাই কেড়ে নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কি আর বলব, বয়সে ঐ তো স্কুলের ছাত্র, কিন্তু কি লম্বা-চওড়া আর গায়ে কি অসম্ভব জোর! বলল, সে নাকি গোরিলা আর আমি একটা শিম্পাঞ্জি, ওর খাবার কেড়ে নিতে চাচ্ছি! এই বলে দু-হাতে আমাকে ওর মাথার ওপর তুলে ধেইধেই করে খানিক নেচে দড়াম করে খাটের ওপর ফেলে দিল। তারপর আমার গায়ে একটা পা রেখে সে যে কি বিকট অমানুষিক হুংকার দিল, সে আর কি বলব।'

ছেলের মায়ের মুখে কথা সরে না! 'না, না, এগুলো বন্ধ করা দরকার!' এই সময় জানলার বাইরে গাছের ডাল থেকে হুপ্ করে একটা ডাক শোনা গেল আর ওঁদের আলোচ্য পাত্রটি একলাফে ঘরে ঢুকে মায়ের গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ল।

—'মাগো, ঐখানকার একটা শো-হাউসে এজ্যাক্স বলে একটা শিক্ষিত বনমানুষের খেলা দেখাচ্ছে। বন্ধুরা দেখে এসেছে। সে সাইকেল চালায়, ছুরি-কাঁটা দিয়ে খায়, দশ অবধি গুণতে পারে, আরো কত কি—আমিও যাব।'

—'না, জ্যাক্, ও-সব আমি ভালোবাসি না।' এই স য়ে ছেলের বাপ ঘরে ঢুকে বললেন, 'এজ্যাক্সের কথা হচ্ছে বুঝি? চলো না, জেন, সবাই মিলে দেখে আসি।' কিন্তু ছেলের মা কিছুতেই রাজি হলেন না। ছেলেকে মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে পড়তে পাঠিয়ে দিলেন।

বাপ বললেন, 'একটু বাড়াবাড়ি করছ না কি, জেন? যেতে চাওয়া তো স্বাভাবিক। না দিলে উল্টো ফল হতে পারে। তাছাড়া বন্যজীবনের টান কখনো বাপের কাছ থেকে ছেলে পায় না। ওকে আমার প্রথম জীবনের কথা বলতে না দিয়েও ভুল করেছ।'

আরেকটু পরে জ্যাক্ বিদ্রোহ ঘোষণা করল, 'বাবা, আমি কিন্তু যাব-ই। তোমার তো আপত্তি ছিল না!'

—'তা হোক। বারণ করেছে। তবু গেলে শাস্তি পাবে।'

—'বেশ, ফিরে এসে তোমাকে বলব।'

মিঃ মূরের শোবার ঘরটা জ্যাকের ঘরের পাশেই। ওঁকে ছেলে আগলানোর ভার দেওয়া হয়েছিল। রাত সাড়ে ন'টায় তিনি জ্যাকের ঘরে ঢুকে দেখলেন সে কাপড়-চোপড় পরে জানালা দিয়ে নেমে যাবার জোগাড় করছে।

—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'কেন, এজ্যাক্সকে দেখতে!'

—'আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি—!'

—জ্যাক তাঁকে পেছন থেকে বিছানার ওপর পেড়ে ফেলে মুখে বালিশ চেপে বলল, 'চুপ, নইলে মেরে ফেলব।' তারপর ফালা ফালা করে বিছানার চাদর ছিঁড়ে হাত-পা বেঁধে, মুখে গ্যাগ্ পরিয়ে বলল, 'আমি হলাম ওয়াজিদের দলপতি ওয়াজা। তুমি আরব শেখ মহম্মদ দুবিনা, আমার হাতির দাঁত চুরি করতে এসেছ।' তারপর বেচারির হাঁটু মুড়ে হাতের কব্জির সঙ্গে পায়ের কব্জি পেছন দিকে বেঁধে বলল, 'পাপিষ্ঠ, এতকাল পরে তোমাকে বাগে পেয়েছি। আমি চললাম। আবার ফিরে আসব।' এই বলে জানলা দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। ছেলে জলের পাইপ বেয়ে দিব্যি সুন্দর নেমে গেলে পর, ক্ষীণদেহ কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ গৃহশিক্ষকের দুর্গতির কথা ভাবা যায় না। মুখে গ্যাগ্ পোরা, চ্যাঁচাতে পারেন না। হাত-পা পিছ-মোড়া করে বাঁধা। ঐ অবস্থায় খাটের ওপর নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকা তাঁর স্বভাব নয়। অনেক কষ্টে গড়াতে গড়াতে খাট থেকে মাটিতে পড়লেন। নিচের ঘরে কিছুক্ষণ আগেও ছেলের মা-বাবা গল্প করছিলেন। কোনো শব্দ করে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলেই কাজ হয়। অনেক কষ্টে কসরৎ করে জুতোর আগা দিয়ে মেঝেতে একটু ঠুক-ঠুক করতেও পারলেন।

এই ভাবে অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর, কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজায় টোকা দিল। গড়িয়ে গড়িয়ে দরজার কাছে গিয়ে আরো জোরে ঠুক-ঠুক করলেন। বাইরে থেকে আবার টোকার শব্দ এলো। দুঃখের বিষয়, কথা বলার উপায় ছিল না। তারপর দরজা খোলার চেষ্টা হলো। দরজা খুলল না; কারণ মিস্টার মূর নিজেই চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

বাইরে থেকে বেয়ারাদের একজনের ডাক শোনা গেল, 'মিঃ জ্যাক্!' কোনো উত্তর না পেয়ে, খুব খানিকটা হাতল ঘোরানো আর ঠেলাঠেলি চলল। তারপর বেয়ারা হাল ছেড়ে চলে গেল আর মিঃ মূর মূর্ছা গেলেন।

বাড়িতে যতক্ষণ এইসব চাঞ্চল্যকর ব্যাপার চলছে জ্যাক্ ততক্ষণে শো-হাউসে ঢুকে দেখে এক্ষুণি এজ্যাক্সের খেলা শুরু হবে। একেবারে রিং-এর ধারে একটা বক্স সীট নিয়ে মুগ্ধ হয়ে সে দেখতে লাগল। বনমানুষের একটা বিশেষ খেলা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। রোজ রিং ছেড়ে সে দু-একটা বক্সে ঢুকে কাকে যেন খুঁজত। ট্রেনার বলতো, ওর হারানো বন্ধুকে খুঁজছে। দর্শকরা কেউ কেউ ঘাবড়ে যেত, কিন্তু সে কারো কোনো ক্ষতি করত না। ভারি উপভোগ্য হতো খেলাটা।

আজ জ্যাকের সুন্দর চেহারা আর অতিশয় আগ্রহ দেখে, ট্রেনার-ই এজ্যাক্সকে একটু উস্কে দিল। অমনি সে এক লাফে রিং থেকে জ্যাকের বক্সে ঢুকে ওর পাশে বসল। ট্রেনার ভেবেছিল জ্যাক ভয় পাবে। হলো তার উল্টো। এক গাল হেসে জ্যাক তার গলা জড়িয়ে বসে রইল আর বনমানুষটা ওর দুই কাঁধে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে নিচু গলায় কি সব বলতে লাগল।

এদিকে খেলা এখানে থেমে থাকল। ট্রেনার ভারি বিরক্ত, কিন্তু দর্শকরা মহাখুশি। কিছুতেই এজ্যাক্স নড়ছে না দেখে, ট্রেনার মস্ত এক বেত নিয়ে এলো। বেত দেখে জ্যাকের আর এজ্যাক্সের কি রাগ! ঠিক এ-সময় বাইরে থেকে বাধা না পড়লে কি হতো কে জানে!

লর্ড গ্রেস্টোকের বাড়িতে সেই চাকরটি উর্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিল, মাষ্টারমশাই ঘরে নেই। মাষ্টার জ্যাকের দরজা বন্ধ। কেউ উত্তর দিচ্ছে না, কিন্তু কেমন একটা ঠুক-ঠুক শব্দ হচ্ছে। একেক লাফে চারটে ধাপ পার হয়ে দরজার বাইরে পৌঁছে, ছেলেকে ডেকে উত্তর না পেয়ে, দরজার ওপর ঐ বিশাল শরীর নিয়ে লর্ড গ্রেস্টোক, অর্থাৎ টারজান ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মড়মড় করে দরজা ভেঙে, অচেতন মিঃ মূরের গায়ে পড়ল।

আলো জ্বেলে, তাঁর বাঁধন খুলে, তাঁকে সুস্থ করে, মিঃ গ্রেস্টোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'জ্যাক কোথায়?'

মিঃ মূর বললেন, 'এজ্যাক্সকে দেখতে গেছে। আমি এই মুহূর্ত থেকে পদত্যাগ করছি। আপনার ছেলের জন্য মাষ্টার মশায়ের দরকার নেই, দরকার বুনো জানোয়ারের ট্রেনার।'

অনেক কষ্টে হাসি চেপে ছেলের বাপও সেই শো-হাউসে ছুটলেন।

তখনো বেত তুলে ট্রেনার ছেলেটা আর জানোয়ারটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, এমন সময় একজন লম্বা বলিষ্ঠ পুরুষ ভিড় ঠেলে সামনে এলেন। ছেলের মুখটা কিঞ্চিৎ রাঙা হয়ে উঠল। সে বলল, 'বাবা!' আর বনমানুষটা এক লাফে তাঁর কাছে গিয়ে উত্তেজিতভাবে কি যে কিচির-মিচির করে বলতে লাগল তার ঠিক নেই।

সে মানুষটিও বিস্ময়ে বিস্ফারিত লোচনে পাথরের মূর্তির মতো চারদিকে চেয়ে খালি বললেন, 'আকুট্!' তারপর যা হলো তাতে উপস্থিত সকলেই তাজ্জব বনে গেল। মানুষটি আর বনমানুষটি দুর্বোধ্য ভাষায় কথাবার্তা বলতে লাগল। বনমানুষ তাঁকে আঁকড়ে ধরে রইল। আর পরদার আড়াল থেকে একটা কুঁজো বুড়ো ভয়ে আর উল্লাসে উঁকি মেরে ব্যাপার দেখতে লাগল।

আকুট বলছিল, 'কতকাল ধরে তোমাকে খুঁজেছি, টারজান। একবার যখন দেখা পেয়েছি, আর ছাড়ব না। তোমার সঙ্গে এখানে তোমার জঙ্গলে থাকব।'

আকুটের মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন গ্রেস্টোক। মনের মধ্যে স্রোতের মতো স্মৃতির ধারা বয়ে যেতে লাগল। আফ্রিকার ঘন বনে হিংস্র অসভ্য মুগাম্বির আক্রমণ, সঙ্গে তার বিকট প্যান্থার! কিন্তু আকুট আর তার দুর্ধর্ষ বনমানুষরা সর্বদা তার সহায়। আরেকবার যদি সেখানে যেতে পারত! কি প্রবল তার আকর্ষণ! আবার অন্য দিকে সুন্দরী লক্ষ্মী স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব, ছেলে, সামাজিক কর্তব্য। শেষ পর্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হলো, 'তা আর হয় না আকুট। তুমিও এখানে সুখী হবে না। তার চেয়ে তোমার ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিই।'

ট্রেনারকে এগিয়ে আসতে দেখে, আকুট দাঁত খিঁচোল। টারজান বলল, 'এখন ওর সঙ্গে যাও। কাল আবার দেখা করব।' তারপরে ট্রেনারের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে, ছেলেকে সঙ্গে করে, লর্ড গ্রেস্টোক বাড়ির দিকে চললেন।

গাড়িতে বসে জ্যাক বলল, 'ও তোমাকে চিনল কি করে? তুমি ওর ভাষা জানলে কি করে?'

তখন যে কথা এত দিন সযত্নে গোপন করেছিলেন, সে সমস্তই তাকে বলতে হলো। বাপ-মার শোচনীয় মৃত্যু; কালার কোলে পরম স্নেহে মানুষ হওয়া; জঙ্গল থেকে বিদায়; সব বললেন বাপ। জঙ্গলের জীবনে প্রতি মুহূর্তে নানা বিপদ বিভীষিকা; বিকট হিংস্র জানোয়ারদের শত্রুতা; খাবারের অভাব, আশ্রয় নেই; শীতে বর্ষায় নিদারুণ কষ্ট; গ্রীষ্মে অসহ্য গরম; গায়ে দেবার কাপড় নেই; রোগ হলে ওষুধ নেই। সব দুঃখ-কষ্টের কথা বললেন বাপ, যাতে ছেলের আগ্রহ দূর হয়। খালি বললেন না ঐ কষ্ট বিপদগুলোই দিন-রাত বাপের মনকে কি প্রবল আকর্ষণে টানে।

ছেলেকে শাসন করা হলো না। সে শুয়ে পড়লে, স্ত্রীর কাছে সব কথা খুলে বলতে হলো। পরদিন আকুটের সঙ্গে আবার দেখা হলো। জ্যাকের হাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও তাকে টারজান নিয়ে গেল না। আকুটের মালিকের সঙ্গেও কথা হলো। তাকে সেই পাষণ্ড পামর পলভিচ বলে টারজান চিনতেই পারল না। আকুটকে কিনে নেওয়ার কথা বলতেই ধূর্ত পলভিচ পষ্টাপষ্টি কিছু বলল না। খালি বলল, ব্যাপারটা ভেবে দেখবে।

বাপ বাড়ি ফিরলে জ্যাক্ বারবার বলতে লাগল আকুটকে কিনে বাড়ি নিয়ে আসতে, কিন্তু ওর মা একেবারে নারাজ। শেষটা গ্রেস্টোক যখন বললেন, ওকে কিনে আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন, তাতে মা রাজি

হলেন। জ্যাক একবার গিয়ে আকুটের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পর্যন্ত পেল না। তবে ঠিকানাটা তার জানা ছিল, কারণ ট্রেনার গ্রেস্টোককে বলেছিল।

তত দিনে মিঃ মূরের জায়গায় নতুন গৃহশিক্ষক এসেছেন এবং এত শীগ্‌গির ছেলের হালচাল বুঝে ওঠেন নি। কাজেই তাঁকে এড়িয়ে দু-দিন বাদে পলভিচের ঘরে হাজির হতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। বুড়ো নিজেই দরজা খুলে দিল। একটাই ঘর। তাতে আকুট আর বুড়ো থাকে। দশ বছরের অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগের পর, তার আর আগেকার সেই শৌখীন স্বভাবের কিছুই বাকি ছিল না। ময়লা কাপড়-চোপড়, হাত-পা চুল সব জঘন্য নোংরা। ঘরের অবস্থাও তথৈবচ।

আকুট খাটে বসেছিল, ওকে দেখেই নেমে এলো। ঠিক চিনতে পেরেছিল। বুড়ো ঘাবড়ে গিয়েছিল। জ্যাক বলল, 'আমি লর্ড গ্রেস্টোকের ছেলে। ও এক সময় বাবার বন্ধু ছিল। আমাকে কিছু বলবে না।' দুর্বৃত্ত পলভিচের মনে হলো, এই তো প্রতিশোধের উপায় পাওয়া গেল। এই ছেলের মধ্যে দিয়ে বাপকে মোক্ষম আঘাত করা যাবে। ছেলে যখন বলল যে সে এখানে এসেছে বাড়ির কেউ জানে না, তখন বুড়োকে পায় কে!

জ্যাকও খুব আস্কারা পেয়ে গেল। আকুটের সঙ্গে দেখা করাতে বুড়ো তাকে খুব উৎসাহ দিত। বাড়িয়ে বাড়িয়ে বনের জীবনের অতি লোভনীয় রঙীন ছবি তুলে ধরত। জ্যাককে আকুটের কাছে রেখে বুড়ো বেরিয়ে যেত। দেখতে দেখতে তারা মোটামুটি পরস্পরের কথা বুঝতে শিখে গেল।

এদিকে গ্রেস্টোকও অনেকবার অন্য সময়ে এসে অনেক কথাই বলে ফেললেন। ওঁর স্ত্রীর বড় ভয় ছেলের যদি বনের প্রতি বড় বেশি আকর্ষণ হয়ে পড়ে! গ্রেস্টোক তো আর বুড়োকে পলভিচ বলে চিনতে পারেন নি!

এদিকে বুড়ো এক নিষ্ঠুর মতলব পাকিয়ে ফেলেছিল। বহুগুণ বেশি টাকা নিয়ে সে আকুটকে গ্রেস্টোকের কাছে বেচে দিল। দু-দিন বাদে ডোভার থেকে একটা জাহাজ আফ্রিকা যাচ্ছিল, তাতে আকুটকে পাঠাবার বন্দোবস্তও হয়ে গেল। ট্রেনার কোনো আপত্তিই করেনি, কারণ গ্রেস্টোক আর তাঁর ছেলেকে পাবার পর আকুট আর খেলা দেখাতে রাজি হয়নি।

পলভিচের মনে টাকার লোভ খুব বেশি থাকলেও, টারজানের উপর প্রতিশোধ নেবার লোভ তার চেয়ে কিছু কম ছিল না। এইবার সে সুযোগ পাওয়া গেল। গ্রেস্টোকই আকুটের যাওয়ার সমস্ত খরচ দিয়েছিলেন। ডোভার অবধি কেউ গিয়ে তাকে তুলে দিয়ে আসবে, সে ব্যবস্থাও হয়েছিল।

জ্যাক গোপনে প্রস্তাব করল সে-ই আকুটকে জাহাজে তুলে দেবে। বাড়ির লোকে কিছু জানতেও পারবে না। ঠিক ঐ সময় ওর বোর্ডিং-এ ফিরে যাবার কথা। বাড়ির লোকে জানবে তাই গিয়েছে। আসলে ডোভার হয়ে এক দিন দেরি করে স্কুলে পৌঁছবে। তাতে কারো কোনো ক্ষতি হবে না। জ্যাকের আসল মতলব অন্য রকম। আকুটের সঙ্গে তার আফ্রিকা ঘুরে আসার ইচ্ছা। পয়সা কড়ি তার হাতে যথেষ্ট থাকত। তাই দিয়ে গোপনে অনেক রকম দরকারি জিনিস লুকিয়ে কিনে, নিজের কাছে গোপন করে রেখেছিল। এ মতলবটা অবিশ্যি বুড়োর কাছে বলবার নয়। শেষটা বাবাকে বলে-টলে একাকার করবে। ওকে কিছু টাকা দিলেই জ্যাককে ডোভার অবধি নিশ্চয় যেতে দেবে।

এ মতলবটাতে পলভিচের কোনো আপত্তি থাকার কথাই নয়, কারণ তার নিজের মনেও একটা জঘন্য মতলব ছিল। জ্যাকের ইচ্ছা জানলে খুশিই হতো সে।

সেদিন বিকেলের দিকে জ্যাকের মা-বাবা তাকে স্কুলে ফিরবার জন্য ট্রেনে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে এলেন। বাবা! একটা ফাঁড়া কেটে গেল। বাপ-মা বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই বাক্স-প্যাঁটরা সহ ছেলেও নেমে পড়ে একটা ট্যাক্সি করে সটাং বুড়োর বাড়ি।

গিয়ে অবাক হয়ে দেখল আকুটকে একটা মোটা দড়ি দিয়ে খাটের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে আর বুড়ো অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। আকুটকে কখনো বাঁধা অবস্থায় দেখেনি জ্যাক। বুড়ো বলল, 'ও বোধ হয় টের পেয়েছে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাই পাছে পালিয়ে যায় বলে বেঁধে রেখেছি। কাছে এসো, ও বেশি দুষ্টুমি করলে কি করে বাঁধতে হবে শিখিয়ে দিই।'

জ্যাক হাসল, 'বাঁধতে হবে না। আমি যা বলব, ও তাই করবে।' বুড়ো রেগে পা ঠুকে বলল, 'এদিকে এসো বলছি। নইলে তোমার ডোভার যাওয়া বন্ধ করব।' হাসতে হাসতে জ্যাক বুড়োর সামনে দাঁড়াল।

বুড়ো বলল, 'পেছন ফের।' পেছন ফেরামাত্র একটা দড়ির ফাঁস পরিয়ে তার হাত দুটো বুড়ো পেছন দিকে

বেঁধে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়োও যেন ক্ষেপে গেল। ওকে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে গলা টিপে ধরল।

খাটের ওপর আকুট প্রাণপণে বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করতে লাগল। চাপা গলায় বুড়ো বলে চলল, 'তোর বাবা আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে, তাই আমি তোর জীবন শেষ করে দেবো। সকলে ভাববে বনমানুষটা মেরেছে!' এই বলে টুঁটিতে আরো চাপ দিল। টারজানের ছেলে বটে! মুখ দিয়ে একটা কাতর শব্দ বেরোল না।

এদিকে আকুটের প্রচণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে দড়ি ছিঁড়ল না বটে, কিন্তু খাটের বাজু সুদ্ধ ভেঙে খুলে এলো। একটানে জ্যাকের বুক থেকে বুড়োকে তুলে আকুট তার গলা টিপে ধরে টুঁটিতে দাঁত বসিয়ে দিল। ঐখানেই তার ভবলীলা শেষ হলো।

ছেলেটাকে উঠে দাঁড়াতে আকুট সাহায্য করল। তারপর তার পরামর্শমতো হাতের দড়িদড়া খুলে দিল। তারপর জ্যাক আকুটের গায়ের দড়িগুলো খুলে দিয়ে, নিজের একটা সুটকেস খুলে কিছু কাপড়-চোপড় বের করল। সেগুলো আকুটকে পরানো হলো। জ্যাক যা বলল, আকুট কোনো কিছুতেই আপত্তি করল না। তারপর নিঃশব্দে দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। দেখে কারো বুঝবার জো ছিল না যে দু'জনার মধ্যে একজন মানুষ নয়, বনমানুষ।

মাইকেল সাব্রভ নামের বুড়ো রাশিয়ানকে তার পোষা বনমানুষ মেরে ফেলে পালিয়ে গেছে, এ-খবর নিয়ে যখন বেশ কিছু দিন ধরে কাগজে লেখালেখি চলছিল, জনসাধারণের মতো লর্ড গ্রেস্টোকও বিশেষ কৌতূহল সহ পুলিস তদন্তের খবরাখবর পড়তেন, কিন্তু নিজের নাম সে-সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে দিতেন না।

এ ঘটনার বেশ কয়েকদিন পরে খবর এলো যে জ্যাক তার বিখ্যাত স্কুলে পৌঁছয়নি। যদিও তাকে তাঁরা ট্রেনে চড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন। আরো এক মাস বাদে খবর পেলেন যে স্টেশনেই সে নেমে ঠিকে গাড়ি নিয়ে সেই বুড়ো রাশিয়ানের বাড়ি গিয়েছিল। তখুনি টারজানের বুঝতে বাকি রইল না যে ছেলের অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে আকুটের সম্বন্ধ আছে।

কিন্তু সেই যে গাড়ির চালক ওকে ঐ বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তারপর আর কেউ তাদের চোখে দেখেনি। বাড়ির মালিক ফটো দেখে বলল, এই ছেলে প্রায়ই বুড়োর কাছে আসত।

বুড়ো মারা যাবার পরদিন ডোভার বন্দর থেকে এক ছোকরা তার রুগ্ন দিদিমার সঙ্গে জাহাজে চড়েছিল। বুড়িকে আপাদমস্তক শাল মুড়ি দিকে ঠেলা চেয়ারে করে তুলতে হয়েছিল। তারপর ধরে ধরে কেবিনের মধ্যে নিয়ে যেতে হলো। ছেলেটিই সব করল। ভুগে ভুগে বুড়ির মেজাজ এতই খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল যে ধারে কাছে কোনো অচেনা লোককে সইতে পারতেন না। কেবিনেও কেউ ঢুকত না, যা করবার ছেলেই করত। কেবিনের বাইরে এলে আর পাঁচটা ছেলের মতোই সে হাসি খুশি মিশুকে।

জাহাজে কনডন বলে এক বদমাইস ছিল। সে ছেলেটার কাছে নোটের গোছা দেখে, তার সঙ্গে ভাব পাকিয়ে, শুনল ওরা আফ্রিকার পশ্চিম তীরে একটা ছোট বন্দরে নামবে। ওদের নাম বিলিংস্। অবশেষে একদিন জাহাজ খুদে এক বন্দরে লাগল। কয়েকটা করুগেটের ঘরবাড়ি, দোকান। কয়েকটি স্থানীয় লোকদের খোড়ো ঘর। তার পিছনে দুর্ভেদ্য আদিম বন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবার স্নেহমাখা মুখ দুটি মনে পড়াতে মনটা কেমন করে উঠল। ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, 'ইংল্যাণ্ড ফেরার জাহাজ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে।'

তারপর দিদিমাকে ডাঙায় নামাবার হাঙ্গামা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো। শেষ পর্যন্ত জ্যাক্ও লাফিয়ে নেমে পড়ল। সেই মুহূর্তে সর্বনাশ ঘটে গেল, কিন্তু জ্যাক কিছু লক্ষ্যই করল না। পকেট থেকে নোটের তাড়া জলে পড়ে টুপ করে ডুবে গেল!!

বন্দরের হোটেলটি একটা দোতলা বাড়ি। তারই উপর তলায় ঘর পাওয়া গেল। জ্যাক তার দিদিমাকে নিয়ে ঘরেই খাওয়া-দাওয়া করে, শোয়ার যোগাড় করতে লাগল। আকুটকে অনেক কষ্টে বোঝাবার চেষ্টা করল যে ও চলে এলে মা-বাবার বড় কষ্ট হবে, তাই ওকে ফিরে যেতে হবে, কিন্তু আকুট তার নিজের দেশে থেকে যাক। একবার মন ঠিক করে ফেলে, শুয়ে পড়ে ঘুমিয়েও পড়তে দেরি লাগল না।

রাতে বিচিত্র উপায়ে দরজা খুলে দাগী চোর কন্‌ডন ওদের ঘরে ঢুকল। নোটের গোছা তার চাই। কিন্তু কাপড়চোপড় জিনিসপত্র ঘেঁটেও কিছু পেল না। তবে নিশ্চয় বালিশের তলায় আছে। খাটের আরেকটু কাছে এগোতেই, চাঁদের উপর থেকে মেঘ সরে যাওয়াতে ঘর আলোয় ভরে গেল। কন্‌ডন দেখল, ছেলেটা চোখ খুলে ওর দিকে চেয়ে আছে। অমনি সে জ্যাকের গলা টিপে ধরল আর পিছন থেকে চাপা গর্জন শোনা গেল। এদিকে জ্যাকও তার হাতের কব্জি চেপে ধরল। ছিপছিপে ছেলেটার হাতের জোর কম নয়। তার উপর আরেক জোড়া কোমল হাত কনডনের গলা টিপে ধরেছিল। ফিরে দেখে একটা প্রকাণ্ড বনমানুষ! কনডনের চক্ষুস্থির! কোনোমতে একটা হাত ছাড়িয়ে জ্যাকের মুখে প্রচণ্ড এক চাপড় মারল। আর যাবে কোথায়! বনমানুষটা তাকে আছড়ে মাটিতে ফেলে, গলায় তার বড় বড় দাঁত বসিয়ে দিল। ঐখানেই কনডনের শেষ হলো!

জ্যাকের হাত-পা ঠাণ্ডা! এই নিয়ে দু-দু'বার ওকে বাঁচাতে গিয়ে আকুট দু-দুটো লোক মারল। খুনের সাজা প্রাণদণ্ড, এটা জ্যাক ভালো করেই জানত। কিন্তু এও জানত যে টাকা দিয়ে সব হয়। তার সঙ্গে নোটের তাড়া ছিল।

দুঃখের বিষয় নোট যে খোয়া গেছে সেটা এতক্ষণ পরে জ্যাক আবিষ্কার করল। নিজেদের জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় হাতড়ে কোথাও একটা পয়সা পাওয়া গেল না। হায়, হায়, আর তাহলে দেশে ফেরা হবে না। এখন আকুটকে নিয়ে ঘন বনে গা ঢাকা দেওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই।

রইল পড়ে দু'জনার বাক্স-প্যাঁটরা কাপড়-চোপড়, দোতলার জানলা দিয়ে বেরিয়ে, বিশাল এক গাছের ডাল ধরে ঝুলে, খালি গায়ে আকুট আর রাতের পাজামা-স্যুট পরা জ্যাক খালি হাতে বনে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরদিন সকালে মিসেস্ বিলিংস্ আর তাঁর নাতির ঘর অনেক বেলা অবধি বন্ধ দেখে বেয়ারা গিয়ে মালিককে ডেকে আনল। তাঁর বলিষ্ঠ শরীরের এক ধাক্কায় দরজা ভেঙে পড়ল। ভিতরে যা দেখা গেল, তাতে সকলে তাজ্জব বনে গেল। মিসেস্ বিলিংস আর তাঁর নাতির কোনো চিহ্ন নেই। ছাড়া কাপড়-চোপড় জুতো সব পড়ে আছে। রাত-কাপড় পরে খালি হাতে তাঁরা অদৃশ্য হয়েছেন। তাঁদের লটবহর সব ফেলে গেছেন। ঘরে একটা অচেনা মরা মানুষ! তাকে কোনো বুনো জানোয়ারে হত্যা করেছে। ঘরের নিচের মাটিতেও কোনো পায়ের চিহ্ন নেই।

কোনো জাহাজ বা নৌকো বন্দর ছাড়েনি। দুশো মাইলের মধ্যে রেলের লাইনও নেই। স্থানীয় লোকদের কাছে এই অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা আজ পর্যন্ত একটা দুর্ভেদ্য রহস্য হয়ে আছে।

এর তিন বছর আগের ঘটনা। আফ্রিকার পশ্চিম তীরের ঐ অঞ্চল সেকালে ফরাসী সরকারের এলাকা ছিল। ওদিকে অনেকখানি মরুভূমির বিস্তার। তারই মধ্যে এক মরুদ্যানে ফরেন লীজিয়নের ক্যাপ্টেন আরমাঁ জাকো একটা খড়খড়ে তালগাছে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে কিঞ্চিৎ জিরোচ্ছিলেন। মুখে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। চাকরটা রাতের খানা পাকাচ্ছিল। জাকোর মন ভারি প্রসন্ন।

ডান দিকে কিছু দূরে তাঁর ক্লান্ত সৈনিকরাও কর্তব্য সেরে কিঞ্চিৎ আমোদ করছিল। তাদেরও রান্নাবান্না হচ্ছিল। খালি ওদের কাছেই পাঁচজন সাদা পোশাক পরা আরব বন্দী হাঁড়িমুখে বসেছিল। তাদের দিকে চেয়েই ক্যাপ্টেনের মন খুশি হয়ে উঠছিল। এক মাস কঠোর পরিশ্রমের ফলে ঐ ক'টা খুনে ডাকাত ধরা গেছে! এর আগে মাসের পর মাস এরা মরু অঞ্চলের নানা জায়গা থেকে উট, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি বোঝাই করে নানা জিনিস চুরি করে নিয়ে গেছে, যথেচ্ছ লোক খুন করেছে। ব্যাটাদের বার বার গিলোটিনে জবাই করলে তবে উচিত সাজা হয়। গোটা ছয় পালিয়েছে, কিন্তু সর্দার পাপিষ্ঠ আমেদ বেন হুদিন ধরা পড়েছে।

এবার ক্যাপ্টেনের নিজেদের সামরিক ঘাঁটির কথা মনে পড়ল। সেখানে তাঁর স্ত্রী আর ছোট মেয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। দু'জনেই দেখতে বড় সুন্দর। এমন সময় পাহারাদারের ডাকে দূরে তাকিয়ে দেখলেন উঁচুনিচু বালুপ্রান্তরের উপর দিয়ে জনা বারো ঘোড়সোয়ার এদিকে ছুটে আসছে। হয়তো বন্দীদের উদ্ধারের চেষ্টায়। তারা প্রকাশ্যভাবে বন্ধু সেজে এলেও ওদের দিয়ে বিশ্বাস নেই। সঙ্গীসাথী নিয়ে সার্জেণ্ট দুশো গজ এগিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

সার্জেণ্টের সঙ্গে আগন্তুকদের দলপতি এগিয়ে এসে শেখ আমর বেন খাটুর বলে নিজের পরিচয় দিল। সে

বলল, 'বেন হুদিন আমার ভাগ্নে, আপনি যদি অনুগ্রহ করে ওকে ছেড়ে দেন, আমি জামিন হয়ে ওর ভবিষ্যৎ ভালো ব্যবহারের জন্য দায়ী হবো।'

জাকো বললেন, 'তা হয় না। আইন মতো ওর বিচার হবে। নির্দোষ হলে ছাড়া পাবে।'

লোকটা এক থলি মোহর বের করে বলল, 'তবে আজ রাতে ও তো পালিয়েও যেতে পারে, কি বলেন?'

ক্যাপ্টেনের চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল। 'সার্জেন্ট, এদের বিদায় করে দাও। ফের যদি ক্যাম্পের কাছে কেউ আসে, তাকে গুলি করে মেরে ফেলো।'

খাটুর ভয়ানক রেগে গেল। টাকার থলি তুলে ধরে বলল, 'আমার ভাগ্নের প্রাণ গেলে, এর চেয়ে ঢের বেশি দাম দিতে হবে।'

এ-সব শাসানিতে কোনো ফল হয়নি। যথা সময়ে বেন হুদিনের যথাযোগ্য প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

তার এক মাস পরে জাকোর সাত বছরের মেয়ে জীন রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেক তদন্ত-তল্লাসি, বড় বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি, কোনো কিছুতেই ফল হলো না। জেনসেন আর মালবিন বলে দু'জন সুইড ঐ পুরস্কারের লোভে তিন বছর ধরে নানা সূত্র ধরে বহু সন্ধান করেও যখন ফল পেল না, তখন ও পথ ছেড়ে হাতির দাঁতের চোরা চালানিতে মন দিয়েছিল। এতে লাভ বেশি। আফ্রিকানরা ওদের দুর্ব্যবহারের জন্য ওদের দেখতে পারত না। ইউরোপীয় সরকারগুলোও ওদের খুঁজে বেড়াত। কিন্তু যে সব গলি ঘুঁজি ও চোরা পথ দিয়ে ওরা গলে বেরিয়ে যেত, সে সব কারো জানা না থাকাতে, কেউ কোনো সুবিধা করতে পারত না। শতখানেক আরব আর নিগ্রো দুরাচার নিয়ে তারা দিব্যি একটা দল পাকিয়ে ফেলেছিল। ঐ বিশাল দেহ সোনালী দাড়ি দৈত্য দু'টোকে সকলে ভয় পেতো।

বিষুবরেখার কাছাকাছি একটা বড় নদীর ছোট প্রশাখার ধারে মজবুত বেড়া দেওয়া ছোট এক গ্রাম। বড় নদীটা আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে। গাঁ-টার কথা কম লোকই জানত। গোটা কুড়ি মৌচাক আকারের কুঁড়ে ঘরে নিগ্রো গ্রামবাসীরা থাকে। মধ্যিখানে গোটা ছয় ছাগলের চামড়ার তাঁবুতে আরব মালিকরা থাকে। এইখানেই তাদের ডাকাতি করে আনা জন্তু-জানোয়ার দ্রব্যসামগ্রী জমা করা হতো। বছরে দু'বার উটের মিছিল সেগুলোকে টিম্বাকটুর বাজারে নিয়ে যেত।

একটা তাঁবুর সামনে বছর দশেকের কালো চোখ কালো চুল সুন্দর একটি মেয়ে বসে একটা পুতুল নিয়ে খেলা করত। বিশ্রী দেখতে পুতুলটা, হাতির দাঁতের মাথা, ইঁদুরের চামড়ার গা, কাঠি দিয়ে তৈরি হাত-পা। পুতুলের নাম গীকা। সে তার খুদে মায়ের প্রাণের প্রাণ, তাকে সাজায়-গোজায়, আদর করে। তার ভালোবাসার মানুষ কেউ নেউ। মাবুনু বলে ফোকলা বুড়ি তার দেখাশুনো করত, অর্থাৎ মারধোর করত, খুন্তির ছ্যাঁকা দিত। মা-টা তার ছিল না। শেখ নাকি তার বাপ। তার হাতেও মেয়ের নির্যাতনের শেষ ছিল না। কেঁদেকেঁদে দিন কাটত। বাপ যে সময় বাইরে থাকত, সেই সময়টুকুই যা পুতুল নিয়ে সুখে কাটত। বাপের ভয়ে মেয়ে জুজু।

সেদিন বাপ বাড়ি এসেই, মেরিয়মকে বাইরে বসে থাকতে দেখে সে কি মার! তাই দেখে বুড়ির কি হাসি। বাপ বেরিয়ে গেলে, পুতুল নিয়ে আবার মেরিয়ম তাঁবুর আড়ালে বসল। অন্য কোনো সুখের জীবন তার মনে পড়ত না। খালি মনে হতো কে যেন এক সময় তাকে ভালোবাসত। এখন কেউ ভালবাসে না।

হঠাৎ শেখের তাঁবুর দিক থেকে তর্কাতর্কির শব্দ শোনা গেল। গাঁয়ের লোকরা সবাই সেদিকে চলল, মেরিয়মের সাহস হলো না। বাপ পিটিয়ে ছাতু করবে। উঁকি মেরে সে দু'জন সাদা লোককে দেখতে পেল। তারা শেখের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। হঠাৎ ওদের একজন মেরিয়মকে দেখতে পেয়ে যেন চমকে উঠল। ওরা হাতির দাঁত কিনতে চায়। শেখ বলল, 'ওসব আমার নেই।' অথচ তাঁবু বোঝাই ছিল। রেগেমেগে শেখ তাদের একরকম ঠেলে বের করে দিল। তারপর ফিরে মেরিয়মের কাছে এসে কি মার! 'খবরদার, যদি ফের বাইরের লোকের সামনে বেরোতে দেখি!'

এদিকে সুইডদের তাঁবুতে জেনসন বলছিল, 'ও যে জাকোর হারানো মেয়ে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ লোভী শেখ এত দিনেও পুরস্কার দাবি করেনি কেন?'

—'প্রতিশোধের ব্যাপার আছে।'

—'আচ্ছা, ওকে টাকা দিয়ে বশ করা যায় না?'

কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। যদি-বা এমবিকা বলে শেখের একটা লোককে ঘুষ দিয়ে হাত করেছিল ওরা, যেদিন মেয়ে পৌঁছে দেবার কথা, সেদিন অন্য লোক এসে এমবিদার

মৃতদেহ দিয়ে গেল। তাই দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সুইডরা সেখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়ল।

বনের মধ্যে প্রথম রাত কাটানোর কথা টারজানের ছেলের বহু দিন মনে ছিল। কোনো বিকট জানোয়ার বা বীভৎস অসভ্যর দেখা মেলেনি। অন্ততঃ জ্যাকের চোখে পড়েনি। তার মন বড়ই খারাপ হয়ে ছিল। মা-বাবা না জানি কত কষ্ট পাচ্ছেন। আকুট যে দুটো পাপিষ্ঠকে মেরেছিল তাদের জন্য কোনো দুঃখ ছিল না, কিন্তু দেশে ফেরার পথটা কত দিনের জন্য বন্ধ হলো কে জানে! একটা বড় গাছের উঁচু ডালের ফ্যাকড়ায় শীতে খিদেয় বড় কষ্টে রাতটা কেটেছিল। সকালে মনটা অনেক হাল্‌কা হয়ে গেল।

আকুটকে ঠেলে জাগিয়ে জ্যাক বলল, 'শীত করছে, খিদে পাচ্ছে। চল, রোদ্দুরে গিয়ে খাবার খোঁজা যাক।' এই বলে সে নেমে পড়ল। আকুট কিন্তু চারদিকে চেয়ে, শুঁকে, তবে নামল। নেমেই সে বলল, 'নুমা আর তার স্ত্রী শাবর যারা আগে নামে পরে তাকিয়ে দেখে, তাদের ঘাড় মটকে খায়।' এই হলো টারজানের ছেলের বন্য জীবনের প্রথম পাঠ। খোলা মাঠের উপর দিয়ে চলল ওরা। আগে গা গরম হোক। আকুট দেখাল, কোথায় ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর বাসা, কোথায় খুঁড়লে পোকা-মাকড় বেরোয়। কিন্তু জ্যাকের পক্ষে ওসব খাওয়া অসম্ভব। ডিম পাওয়া গেল এবং কাঁচাই খাওয়া হলো। শিকড়, মূল, কন্দ খাওয়া হলো। খানিকটা নোনা মতো জল পাওয়া গেল। তেষ্টার চোটে জ্যাক তাই খেল।

আকুট জল খাবার জন্য মাথা নিচু করার আগে চারদিকে চেয়ে দেখল। তারপর বলল, 'আশেপাশে কোনো বিপদের কারণ নেই?'

—'না তো। তুমি জল খাবার সময় আমি চারদিক দেখছিলাম।'

—'তোমার ঐ চোখ দেখছি বনে কোনো কাজে লাগবে না। চোখের চেয়েও নাক বেশি কাজে লাগাতে হয়। কান কাজে লাগাতে হয়। জেব্‌রারা এদিক দিয়ে গেল, অর্থাৎ এদিকটা নিরাপদ, নয়তো ওরা আগেই পালাত। কিন্তু ও-দিকটা তত নয়। নুমা লম্বা ঘাসে লুকিয়ে আছে। ঐ দেখ ওর নিশ্বাস লেগে ঘাস নড়ছে।'

জ্যাক বলল, 'ঠিক বলেছ। দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ওপর নজর নাকি?'

—'না, শিকার মেরে, একটু খেয়ে, তার ওপর বসে আছে। খাওয়া হলে উঠে জল খাবে। এখন কিছু বলবে না। বনে বাঁচতে চাও তো নুমার হালচাল শিখে নাও। বনমানুষরা দল বেঁধে থাকলে ওরা কিছু বলে না। একা পেলে আক্রমণ করতে পারে। যাই হোক, এবার শাবরের হাতে পড় না।'

হঠাৎ কেমন একটা ফুর্তিতে জ্যাককে পেয়ে বসল। এর আগে সে সিংহ চোখে দেখেনি। ওর মায়ের অতিরিক্ত সাবধানিতে। হঠাৎ নাকে সিংহের গন্ধ এলো। সারা গা শিরশির করে উঠল। মনে দারুণ উত্তেজনা। নুমার গন্ধে জ্যাক বুনো জানোয়ার বনে গেল। হঠাৎ আকুট চিৎকার করে ওকে সাবধান করে দিল। দশ পা দূরেই শাবর! আকুট শাবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেও, সে ভুলবার নয়। জ্যাকের দিকে এক পা এগোতেই আকুট বলল, 'গাছ দেখ!'

অমনি ফিরে জ্যাক দৌড় দিল। সিংহীও সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিল। গাছটা কাছেই ছিল। দশ ফুট উপরে একটা ডাল ঝুলছিল। এক লাফে সেটা ধরে জ্যাক ঝুলে পড়ল। শাবরও লাফিয়ে ওর পাজামাটা ছিঁড়ে নিয়েছিল। ওকে ধরতে পারেনি। আকুট অন্য গাছ থেকে শাবরকে কষে গাল দিচ্ছিল। ওর দেখাদেখি জ্যাকও তাই করতে লাগল।

এইভাবে টারজানের ছেলের বনের পাঠ চলতে লাগল। এক মুহূর্তের জন্য অসতর্ক হলে চলবে না। সর্বদা চোখ, কান, নাক সজাগ থাকবে। সে রাতেও জ্যাক শীতে কষ্ট পেল, এত কষ্ট সে আগে কখনো পায়নি। পরদিন আবার চড়া রোদে বৃক্ষহীন প্রান্তরে হাঁটা। জ্যাকের ইচ্ছে দক্ষিণমুখো চলে। অন্য একটা সভ্য শহরের খোঁজে। আকুটকে কিছু বলা যায় না। সে ওকে ছাড়তে চাইবে না। এক মাস ধরে এইভাবে কেবলি এগোনো। গাছের ডাল ধরে মাইলের পর মাইল তাড়াতাড়ি ঝুলে চলা। সমস্ত পেশীগুলো শক্ত সমর্থ হয়ে উঠল। বাপের বিশাল শক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। শরীরটাকে গড়ে পিটে তোলা বাকি ছিল। গায়ের চামড়া শক্ত হয়ে উঠল, রোদ লেগে পাকা রং ধরল। একদিন একটা বাঁদর ওর একমাত্র গায়ের জামাটি নিয়ে পালাল। প্রথমটা রাগ হয়েছিল। পরে মনে হলো এই তো ভালো, হাত-পা ঝাড়া, মুক্ত।

এক দিন দেখে একটা নদীর ধারে গ্রাম। গ্রামের ছেলেপিলেগুলো জলে খেলা করছে। জ্যাক মহাখুশি। এক মাসের উপর মানুষ দেখেনি। আনন্দে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ওদের দিকে ছুটল। আকুটের বাধা মানল না। ছেলেগুলো ভয়ে দৌড় দিল। ওদের মা-রাও পালাল আর গাঁ থেকে বর্শা নিয়ে বাপরাও তেড়ে এলো। এক মুহূর্তে জ্যাকের সব আনন্দ দূর হয়ে গেল। বন্ধুত্বের বদলে একটা বিদ্বেষ জন্মাল। কালো মানুষরা তাহলে ওর শত্রু!

ডালে ঝুলে পালাতে হলো। ওরাও কিছু দূর অবধি ধাওয়া করেছিল, খুঁজে পেল না। ডালপালার দিকে তাকায় নি। তারপর ওরা ফেরার পথ ধরল। অমনি জ্যাক ওদের পিছু নিল। একজন অনেকটা পেছিয়ে পড়েছিল, তার ঘাড়ে জ্যাক লাফিয়ে পড়ে, গলা টিপে ধরল। যতক্ষণ না প্রাণটা বেরোল, ছাড়ল না। তারপর একটা অদ্ভুত ইচ্ছা হলো। শিকারের গায়ে পা রেখে বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে, আকাশের দিকে মুখ তুলে নিঃশব্দে একটা জয়ধ্বনি দিল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।

এদিকে আকুট তার খোঁজে এসে প্রথমটা চিনতে পারেনি। হাতে লম্বা বর্শা, পিঠে চৌকো ঢাল, পরনে নেংটি। কোমরে ছোরা গোঁজা। হাতে পায়ে লোহার আর পেতলের বালা। একটা লোক মেরেছে বলে সে কি গর্ব! জ্যাক্ বলল, 'কালোরা আমার শত্রু। খালি সাদারা আর বনমানুষরা বন্ধু।'

এদিকে জঙ্গলটাকে জ্যাক্ এখন একটা বইয়ের পাতার মতো পড়তে পারে। সব গন্ধ তার চেনা, সব চিহ্ন তার জানা। আকুট অনেক শিখিয়েছে, বাকিটা উত্তরাধিকার সূত্রে জানা। বনের জীবনটাকে বড্ড ভালোও লেগে গেছে। সেই সঙ্গে বিবেক আর দংশন করছিল না, কারণ ও তো মা-বাবার কাছে ফেরার চেষ্টাই করেছে।

জ্যাক্ আকুটের কাছে বাবার পূর্ব জীবনের অনেক কথা শুনেছিল। বাবা শুনলে খুশি হবেন। শরীরটাতেও দিনে দিনে প্রচণ্ড শক্তি জমতে লাগল। কেমন একটু অসাবধানও হয়ে পড়ছিল। আকুটকে বলতো, 'গাছে ওঠ, আমি নুমার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাব।' এই গর্বের ফলেই বিপদেও পড়তে হয়েছিল।

সে সিংহটা সাধারণের চেয়ে বড় এবং হিংস্র। ওর বর্শাটা

পল্‌কা। আকুট বার বার বলছিল 'গাছে চড়!' জ্যাকের বাহাদুরি দেখাবার বড় লোভ। শেষটা যখন নিজের বিপদ বুঝল, চকিতে বুদ্ধি খেলে গেল। বর্শা বাগিয়ে সিংহের দিকে তেড়ে গিয়ে পোল-ভল্ট করে সিংহ ডিঙিয়ে কাঁটাঝোপের মধ্যিখানে পড়ল। সিংহ তার নাগাল পেল না। কিন্তু অনেক কষ্টে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে, ঘা শুকোতে অনেক সময় লেগেছিল। আকুট মায়ের মতো সেবা করেছিল।

জ্যাক্ ভাবে কালোরা ঐ রকম হয়, কবে আবার শ্বেতাঙ্গ দেখে চোখ জুড়োবে। দেখলও একদিন। বনের মধ্যে জেনসেনদের সাফারি চলেছে। আনন্দে অধীর হয়ে আড়াল রেখে এগিয়ে দেখে কি সর্বনাশ! এরা কেমনধারা শ্বেতাঙ্গ! জানোয়ারের চামড়ার বেত দিয়ে হতভাগ্য কুলিদের নিষ্ঠুর ভাবে পেটাচ্ছে। বাধা দিতে হবে মনে করে এগিয়ে যেতেই, মনে হলো চটিয়ে কাজ নেই। বরং সভ্য জগতের পথ জেনে নেওয়া যাক। এদিকে মালবিন আর জেনসেন শেখের ভয়ে পালাচ্ছিল। পিছন ফিরে ওকে দেখেই ভাবল নিশ্চয় শেখের চর! অমনি বন্দুক তুলে গুলি! ভাগ্যিস লাগেনি!

কিন্তু জ্যাকের মন ভেঙে গেল। তবে কি টারজানের ছেলের বনমানুষ ছাড়া বন্ধু নেই? শেষপর্যন্ত আকুটের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার কথাই রইল, আকুট, তোমাদের দলে নিয়ে চল।' আকুট আহ্লাদে আটখানা।

এর পর এক বছর কেটে গেছে। সুইড দুটো ঐ অঞ্চল থেকে ভেগেছে। শেখ অনেক দিন বিদেশে, মেরিয়ম একটু শান্তিতে আছে। সে বেচারা জানেও না শেখ বাড়ি ফিরছে।

এই এক বছরে টারজানের ছেলেও লম্বায়, চওড়ায়, কৌশলে, বুদ্ধিতে, শক্তিতে অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছে। আকুট বুড়ো হয়ে গেলেও তাকে সর্বদা আগলে বেড়ায়। অবিরাম দু'জনে আকুটের জাতের অতিকায় বনমানুষদের দলকে খুঁজে বেড়িয়েছে। তারা ক্রমে সংখ্যায় খুব কমে এসেছে। তাদেরই মধ্যে টারজান একদিন বড় হয়েছিল। ওরাও তাদের ভাষাই বলে।

ঘন বনের সবচেয়ে নিভৃত অঞ্চলে ওদের বাস। মানুষ যেখানে পদার্পণ করে না। এই এক বছরে টারজানের ছেলের চেহারা খুলেছে। আর সে খালি গায়ে ঘোরে না। তার পরনে থাকে চিতাবাঘের ছাল। অবলীলাক্রমে সে হিংস্র চিতা আর চিরশত্রু কালো মানুষ হত্যা করে। তার নাম হয়েছে কোরাক, অর্থাৎ যে শত্রু মারে। সবাই তাকে সমীহ করে, ভয় করে।

একদিন ঘোর রাতে ওদের কানে এলো দুম-দুম উৎসবের ঢোলের শব্দ। এসে গেছি! এসে গেছি! দুমদুমের কথা আকুট তাকে সব বলেছে। সেদিন উন্মত্ত নাচের পর নতুন রাজা নির্বাচন হয়। একদিন টারজান রাজা হয়েছিল, আকুটও হয়েছিল। কোরাকের বিশ্বাস সে-ও রাজা হবার যোগ্য। দরকার হলে সবাইকে পরাজিত করে। হোক না ছোকরা বয়স।

উঁচু গাছের উপর থেকে দু'জনে লুকিয়ে খ্যাপা নাচন দেখল। খেলা করে একটু আগে আকুটের সঙ্গে কুস্তি লড়েছে কোরাক। আকুট সব পারে, মুষ্টিযুদ্ধ জানে না! যাই হোক, দুম-দুমের শব্দ ধরে ক্রমে ওরা অকুস্থলের কাছে এলো। সেই বুড়ো ধাড়িদের নাচ, সেই বুড়িদের ঢোল বাজানো, এর কোনো বদল নেই।

পারলে কোরাকও নেমে পড়ে, আকুট তাকে আটকাল। এখন সকলের মাথায় খুন চড়ে আছে। এখন নয়। ঠাণ্ডা হোক। বলি হয়ে যাক। খাওয়া-দাওয়া মিটুক। নতুন রাজা নির্বাচন হলো। যে যার শুতে যাবার কথা ভাবতে শুরু করল। আকুট বলল, 'আমার সঙ্গে এসো। আমি যা করি, তাই করবে।'

আস্তে আস্তে এগিয়ে খোলা জায়গাটার উপরে, নিচু ডালে পৌঁছে, আকুট চাপা গর্জন দিল। সবার চোখ সেদিকে ফিরল। রাজার লোম খাড়া, চোখ লাল, শ্বাদন্ত বিকশিত, ক্রমে গর্জনের সুর চড়তে লাগল।

আকুট নরম গলায় বলল, 'আমি আকুট, এ কোরাক, টারজানের ছেলে। টারজান একদিন রাজা ছিল। তোমাদের বন্ধু হতে চাই। একসঙ্গে থাকব, শিকার করব।'

রাজা কিন্তু বড় বেয়াড়া। চ্যাঁচাতে লাগল, 'যাও! চলে যাও। নয়তো মেরে ফেলব!' কোরাক আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিল, এমন সম্ভাষণ আশা করেনি। সে ভীষণ রেগে গেল। চিৎকার করে বলল, 'যাব নিশ্চয়। তার আগে দেখিয়ে যাব কে বড় রাজা!' এই বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজার পেটে প্রচণ্ড ঘুঁষি! সে কোঁৎ শব্দ করে বসে পড়ল। দলবল ছুটে এলো আর আকুট কোরাককে টপ করে তুলে নিয়ে গাছ বরাবর লম্বা দৌড় দিল।

কোরাক তখনো চটে ছিল। 'কেন নিয়ে এলে? ওরা ভাবল বুঝি ভয় পেয়েছি?'

আকুট বলল, 'আরেকটা পাঠ নাও। একটা বনমানুষের সঙ্গে লড়া যায়। এক দলের সঙ্গে কখনো নয়। তখন ওরা পাগল হয়ে যায়।'

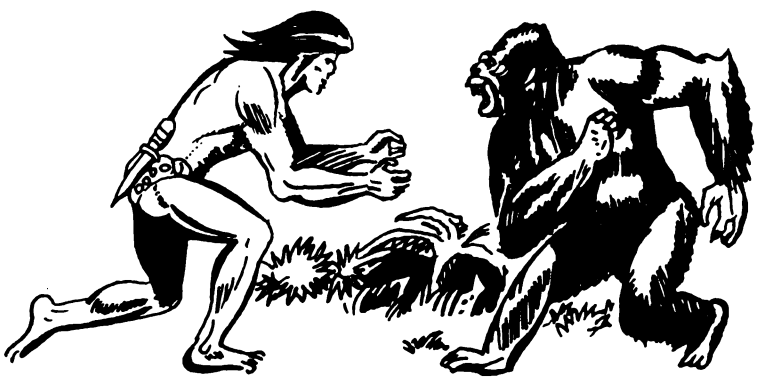

এর পরদিন মনের দুঃখে দু'জনে সেখান থেকে অনেকটা দূরে ঘুরছে, হঠাৎ নাকে এলো অপ্রত্যাশিত গন্ধ! কিছু দূরে মজবুত বেড়ায় ঘেরা গ্রামের খড়ো ঘর আর তাঁবু দেখা যাচ্ছে। ওরা শেখের আস্তানায় পৌঁছে গেছে। কালো মানুষ দেখলেই কোরাক তাদের মেরে ফেলত, তারা সব শত্রু। গাছের ওপর থেকে একটা মানুষের পিঠও দেখতে পেল। সবে বর্শা তুলেছে, এমন সময় চোখে পড়ল এ যে একটা ছোট্ট সুন্দর মেয়ে। সে একটা হাতির দাঁতের মুণ্ডু আর ইঁদুরের চামড়ার গা-ওয়ালা কদাকার পুতুল নিয়ে খেলা করছে। ভারি মজা লাগল। মেয়েটা গুনগুন করে গান গেয়ে পুতুলকে ঘুম পাড়াচ্ছে। কোরাকের মনটা নরম হয়ে গেল। এক ঘণ্টা ধরে সে তাকে দেখতে লাগল। তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু কোরাক তো আরবি ভাষা জানে না। যাই হোক, এমনি ভাব করা যাক।

হঠাৎ গাঁয়ে একটা সোরগোল উঠল। এক দল ক্রীতদাস, কুলি ইত্যাদি সহ জিনিসপত্র বোঝাই উট, গাধা ইত্যাদি নিয়ে মালিক এসেছেন! গাছে লুকিয়ে বসে কোরাক অবাক হয়ে দেখল বুড়ো মালিক মেয়েটার কাছে এলো। নিশ্চয় ওকে খুব আদর করবে। তার বদলে লাথি, চড়, মারের ওপর মার! আর সইতে না পেরে টপ করে নেমে এসে শেখের মুখে প্রচণ্ড বর্শার বাড়ি। সে অমনি অজ্ঞান!

মেয়েটার কি ভয়! এবার তাকে বুড়ো মেরেই ফেলবে। কোরাক তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এসো, মানুষের চেয়ে বনের দয়ামায়া বেশি।' সঙ্গে সঙ্গে পুতুল সুদ্ধু তাকে কোলে তুলে নিয়ে, এক লাফে গাছের ডালে কোরাক অদৃশ্য হয়ে গেল।

আকুট ততক্ষণে কোরাকের খোঁজে ফিরে আসছিল। ওর সঙ্গে একটা অচেনা মানুষ দেখে সে তো দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। কোরাক বলল, 'আমি ওকে এনেছি। আমাদের সঙ্গে থাকবে। ওর, ক্ষতি কর না। দু'জনে ওকে রক্ষা করব।' আকুট কোনো আপত্তি করল না, যদিও আবার একটা মানুষের ছানার ভার নিতে একটুও ইচ্ছা করছিল না। তারপর ভাবল এটাকে তার গায়ের জোর আর চেহারার বাহার দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে।

এদিকে মেরিয়ম বনের জীবন দেখে ভয়ে আধমরা। একবার ওকে গাছে বসিয়ে রেখে, ওরা একটা হরিণ তাড়া করে শিকার করল। রক্তমাখা শরীরে কোরাক ফিরে এসে, তাকে বড় এক টুকরো কাঁচা তাজা মাংস দিতেই, সে শিউরে উঠেছিল। তাই দেখে কোরাক ছুটে গিয়ে, মাংসের বদলে তাজা মিষ্টি ফল এনে দিল। ভারি খুশি হয়ে হেসে ফলগুলো মেরিয়ম নিল। তাতেই কোরাকও খুশি। রাতে আকুট আর কোরাকের মাঝখানে সে আরামে ঘুমোত।

একবার কোরাক আকুটকে গাছ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, অমনি একটা চিতা বাঘ এক লাফে বুড়োর পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোরাকও আর অপেক্ষা করেনি। শীতা সবে আকুটের ঘাড়ে দাঁত বসাতে যাচ্ছে, এমন সময় কোরাক তার ঘাড়ে লাফিয়ে নামল। আকুট সেই ফাঁকে গাছে উঠে পড়েছিল, কিন্তু কোরাককে নিচে দেখে আবার নেমে এলো তারপর তিন যোদ্ধায় সে কি কামড়া-কামড়ি, খামচা-খামচি। কোরাকের ছোরার সঙ্গে শীতা পারবে কেন?

শীতা মরে গেলে আকুট তার পিঠে পা রেখে জয়ধ্বনি দিল। মেরিয়ম ভয়ে জড়োসড়! এইভাবে জঙ্গলের জীবনের নিয়ম শিখতে আর ভয় ভাঙতে মেরিয়মের অনেক সময় লেগেছিল। দেখতে দেখতে সে-ও শিকারে পটু হয়ে উঠল। তার শীতে কষ্ট হয় বলে, তার জন্য মগডালে ছাদওয়ালা মাচা তৈরি করেছিল কোরাক। নিজেরা ডালের ফাঁকে ঘুমোত। ঘর তৈরি হলে, ওরা আর বেশি দূরে দূরে ঘুরত না। ক্রমে বনমানুষদের ভাষা শিখল মেরিয়ম। অন্য জানোয়ারদের বিশেষ করে বাঁদরদের সঙ্গে ভাব হলো।

বাঁদরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব খুব তুচ্ছ জিনিস ছিল না। আকুট আর কোরাক নানা কাজে আর শিকারে অনেক সময় কাছে থাকত না। তখন এরাই হতো ওর নিত্যসঙ্গী। উঁচু সরু ডাল থেকে পাকা ফল পেড়ে আনত। নুমা কি শীতা আশেপাশে এলে ওরাই খবর আনত। ওদের ভাষা মেরিয়ম শিখে নিলে, ওরা নানা রকম মজাও করত। বাঁদরের নাম মানু। মানুর মনটা চঞ্চল ছেলেমানুষের মতো। খুব একটা বুদ্ধিশুদ্ধি নেই তার, পেট ভরে খেতে পেলেই হলো।

গীকা পুতুলটা আজকাল চিতাবাঘের ছালের সুন্দর পোশাক পরে; মাথায় পালক গোঁজে; ঘাস দিয়ে পাকানো গয়না পরে। পুতুলের সঙ্গে কথাবার্তার মাঝখানে একটা বাঁদর ছুটে এসে বলল, 'গাছে চড়, মানগানিরা আসছে।'

মেরিয়ম বলল, 'এখানে কোরাক আর আকুট ছাড়া অন্য মানগানি নেই। গাছে তুমি চড়।' মানগানি মানে বড়

বনমানুষ। টারমানগানি হলো সাদা মানুষ। কোরাককে ওরা সে দলে ফেলত না। গোমানগানি হলো নিগ্রোরা।

মজা করবার জন্য মেরিয়ম চোখ বুজে বসে রইল। কোরাক আসছে না দেখে চোখ খুলেই দেখে প্রকাণ্ড এক বনমানুষ! সঙ্গে সঙ্গে গাছে চড়ে গেল মেরিয়ম। খুব উঁচু ডালেই উঠে গেল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সরু ডালটা ভেঙে একটু নিচের ডালে গিয়ে পড়ল। প্রকাণ্ড বনমানুষটাও পাশে নেমে ওকে জ্যাপ্টে ধরল। একটা নয়, তার পেছনে আরেকটাও ছিল। দু'টোতে এবার বুঝি ঝগড়া লাগল। মেরিয়ম আগেরটাকে চড়-চাপড় মারল, কামড়েও দিল। কিন্তু তার সঙ্গে পারবে কেন?

এদিকে অন্য বনমানুষ দুটোর বেজায় মারামারি লেগে গিয়েছিল। মাঝখানে পড়ে মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে মেরিয়ম মাটিতে পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বড় জানোয়ারটারই জয় হলো। অন্যটার প্রাণ বেরিয়ে গেলে সে মেরিয়মের কাছে ফিরে এসে তাকে তুলে নিল। বাঁদরের দল হল্লা করতে করতে সঙ্গে চলল।

সেই হট্টগোল শিকার নিয়ে ফেরার পথে কোরাকের কানে গেল। অমনি সে বুঝল একটা কিছু ঘটেছে। বাঁদররা মেরিয়মের বন্ধু, তাদের সাহায্য করতে হবে। আগে মেরিয়মের ঘরের কাছে শিকার, ফল ইত্যাদি রেখে, তাকে ডাকাডাকি করতে লাগল। হঠাৎ চোখে পড়ল গীকা পুতুলটা একা পড়ে আছে। চমকে উঠল কোরাক। তবে কি বাঁদরদের হল্লা মেরিয়মের জন্য? হল্লা আরো দূরে চলে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে রওনা। বাঁদররা ওকে দেখেই সামনের দিকে দেখিয়ে দিল। একটা বিশাল বনমানুষের কাঁধে মেরিয়মের অচেতন দেহ! কোরাক আড়ষ্ট! তারপর বিকট গর্জন করে আক্রমণ। এ সেই নতুন রাজা। মেরিয়মকে নামিয়ে রেখে, সে-ও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো।

সে কি সাংঘাতিক মরণ-পণ যুদ্ধ। কোরক তার অব্যর্থ ছোরার কথা ভুলে গিয়ে, হাত দিয়ে, নখ দিয়ে, দাঁত দিয়ে লড়ছিল। কি একটা প্রচণ্ড শক্তি তাকে পেয়ে বসল। সেই যে রাজার টুঁটি টিপে, শিরা কামড়ে ধরল, আর ছাড়ল না।

এর মধ্যে চোখ খুলে সেই দৃশ্য দেখে মেরিয়মও চ্যাঁচাতে লাগল, 'কোরাক! কোরাক! ওকে মেরে ফেল! ওকে শেষ কর!' ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল না মেরিয়ম, অন্য বনমানুষী হলে যেমন পালাত। তার বদলে কোরাকের বর্শা তুলে রাজার বুকে বসিয়ে দিল! কোরাকই তাকে শেষ করে এনেছিল, কোনো সাহায্যের তার দরকার ছিল না। তবু খুশি না হয়ে পারল না।

এর মধ্যে আকুট এসে হাজির। মরা রাজাকে দেখে তার কি তড়পানি! যেন সে-ই তাকে মেরেছে। এদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিল না। তার মাথায় একটা অন্য রকম অনুভূতি এসেছিল। সেটা হলো নিজের জাতির মধ্যে ফিরে যাবার ডাক।

এমন সময় বনমানুষদের দলটা এসে উপস্থিত হলো। কোরাক আকুটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আকুট রাজার মৃতদেহ দেখিয়ে, দলটাকে বলল, 'কোরাক রাজাকে মেরে ফেলেছে। এখন সে-ই রাজা। তার মতো শক্তিশালী কেউ নেই। তাকে তোমরা মেনে নাও।'

একটা প্রকাণ্ড জোয়ান যুদ্ধ দিতে এগিয়ে এলো। হাত বাড়িয়ে, মুখ হাঁ করে সে কোরাকের দিকে ছুটে এলো। কোরাক তার ডান চোয়ালের নিচে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি দিয়ে তাকে পেড়ে ফেলল। হকচকিয়ে গিয়েছিল জোয়ান, মুখ দিয়ে ফেনা উঠেছিল, বিকট গর্জে উঠেছিল। আরেক ঘুঁষি খেয়ে ঘুরপাক খেয়ে পড়ল। যতবার উঠতে চেষ্টা করে, আবার ঘুঁষি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। সমস্ত দল এবার তাকে ছেড়ে কোরাকের পক্ষ নিয়েছে।

আরেকবার জোয়ানকে মাটিতে ফেলে, কোরাক বলল, 'কা-গোদা? হার মানছ?' শেষ পর্যন্ত তাকে হার মানতেই হলো।

তখন একজন বুড়ো বনমানুষ সকলের হয়ে বলল, 'আমাদের রাজাকে মেরেছ। আরেকজন রাজা হতে চেয়েছিল, তাকে কাগোদা বলিয়েছ এবার কে রাজা হবে?'

কোরাক আকুটকে দেখিয়ে বলল 'ঐ যে তোমাদের

রাজা!' রাজা হতে আকুটের আপত্তি নেই, কিন্তু সে কোরাককে ছাড়তে চাইছিল না।'

শেষে কোরাক বলল, 'তুমি রাজা হও, আকুট। আমি তোমাকে ছেড়ে দূরে যাব না। মেরিয়ম আর আমি কাছাকাছিই থাকব।' অনেক বুঝিয়ে তাকে রাজি করা গেল। মৃত রাজার স্ত্রী ছিল। তার সঙ্গে আকুটের বুড়ো বয়সটা একটু আরামেই কাটবে। শেষ পর্যন্ত তার আদরের কোরাকের কাছে বিদায় নিয়ে, দলের সঙ্গে আকুট রাজা বনের মধ্যে চলে গেল।

তবে ছাড়াছাড়িটা বেশিক্ষণের জন্য হয়নি। এই যে শেষবার কোরাক আর আকুট কালোদের গ্রাম থেকে জিনিসপত্র লুট করে এনেছিল, তারা বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ক্রমে ধৈর্য হারিয়ে কিছু তফাৎ রেখে, ওদের পেছনে ধাওয়া করেছিল। দলের পাণ্ডা ছিল গ্রামের মোড়ল কোবুদ্দু। ওরা দূর থেকে স্তম্ভিত হয়ে বনমানুষদের রাজার সঙ্গে কোরাকের মারামারি আগাগোড়া দেখেছিল। গা ঢাকা দিয়ে ছিল ওরা, যতক্ষণ না বনমানুষরা চলে গেল। তারপরেই অপ্রত্যাশিত আক্রমণ। কোরাক ফিরে দাঁড়াল। মেরিয়ম তার পাশে। ওরা মেরিয়মকে কিছু বলেনি। তার কারণ কালোদের একজন তার হাতের পুতুলটাকে চিনতে পেরেছিল। তারই ভাই শেখের আস্তানায় থাকতে, ওটি বানিয়ে দিয়েছিল। অক্ষতদেহে মেয়ে ফেরত পেলে শেখ অনেক বকশিশ দেবে, এই তাদের আশা। এর মধ্যে লড়াইয়ের শব্দ আকুটের দলের কানে গিয়েছিল। তারাও অমনি ফিরে এসেছিল। কালোদের সঙ্গে লড়েও গিয়েছিল। সেই ফাঁকে মেরিয়মকে তুলে নিয়ে, কোবুদ্দু আর তার কয়েকজন অনুচর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে সর্বাঙ্গে তীর আর বর্শায় বিদ্ধ হয়ে কোরাক অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। আকুট নিজের হাতে তার গা থেকে তীরের ফলা আর বর্শা তুলে ফেলে, তাকে কোলে করে মেরিয়মের জন্য তৈরি গাছঘরে নিয়ে গিয়ে, তার বন্য বুদ্ধিতে যতখানি কুলোয় আপ্রাণ সেবা করেছিল। বলা যেতে পারে প্রকৃতিই তাকে সারিয়ে তোলার কাজ করেছিল। অনেক দিন মনে হয়েছিল বাঁচার কোনো আশা নেই। তারপর ঐ প্রচণ্ড পেশী, স্নায়ু আর প্রাণশক্তি ক্রমে ক্রমে জয়লাভ করল।

সমস্ত মনটা ওর হতাশায় আর দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। কিন্তু হার মানলে তো চলবে না। মেরিয়মকে উদ্ধার করতে হলে, ওকেও বাঁচতে হবে। পুরানো শক্তি ফিরে পেতে হবে। ও ছাড়া মেরিয়মের আর কেউ নেই। ক্রমে গায়ে জোর ফিরে আসতে লাগল। শরীরটাকে টেনে ঘরের বাইরে এসে রোদে বসতে লাগল। আকুট কাঁচা মাংস এনে খাওয়াত। শক্তি ফিরে পেতে, তার মতো কি আছে?

ক্রমে গায়ের জোর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা দিন এলো, যখন ওর মনে হলো, এবার কালোদের গ্রামের দিকে রওনা হওয়া যায়।

সোনালী দাড়িওয়ালা সেই দুই অসাধু হাতির দাঁতের ব্যবসাদাররা প্রতি বছরই সাফারি নিয়ে আসত। সকলের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত, সকলের অভিশাপ কুড়োত। তবে শেখের এলাকায় সেই ইস্তক আর কখনো পা দেয়নি। নানা রকম ব্যবসা তাদের। এ-বছর এসেছিল ইউরোপের একটা বড় চিড়িয়াখানার জন্য বন থেকে জানোয়ার ধরে দিতে। তার মধ্যে বেবুন ধরা একটা কাজ। কাজটি খুব সহজ ছিল না। যতই ফাঁদ পাতুক, দলে দলে বেবুন এসে, ফাঁদ ভেঙে বন্ধুদের উদ্ধার করে নিয়ে যেত। রেগে গেলে কম হিংস্র হয়ে উঠত না তারা।

এবার সুইডরা নতুন বুদ্ধি করেছিল। ফাঁদের মধ্যে ইস্পাতের জালের খাঁচা বসিয়ে রেখেছিল। বেবুন রাজা তাতে পড়েছিল। সে নিজেও বেরোতে পারছিল না, বন্ধুরাও ঐ ইস্পাতের জাল কাটতে পারছিল না। শত শত বেবুন আশেপাশে জড়ো হয়েছিল।

এর মধ্যে সুইড দুটো এসে হাজির। কেউই লক্ষ্য করেনি, গাছের ডালে লুকিয়ে নেংটি পরা একটা ফরসা ছোকরা সব দেখছে। সে হলো কোরাক। মেরিয়মের সন্ধানে চলেছে। সাধারণতঃ বেবুনদের সঙ্গে তার ঝগড়া না থাকলেও, খুব একটা সদ্ভাবও ছিল না। তবে দু'জনের ভাষা প্রায় একই। পরস্পরকে বুঝতে অসুবিধা ছিল না।

কোরাক ভাবছিল, সাদা শিকারী দুটো কে? হঠাৎ তাদের চিনতে পারল। এরাই না অনেক বছর আগে, মিছিমিছি ওকে গুলি করতে চেয়েছিল? বেবুনরা তো কখনো ওর ক্ষতি করেনি। ওর সমস্ত সহানুভূতি বেবুনদের দিকে। গলা তুলে কোরাক বেবুনদের বলল, 'আমি কোরাক, ঐ লোকগুলো আমারও শত্রু। তোমাদের রাজাকে ছাড়িয়ে আনতে আমি সাহায্য করব। আমি নেমে ওদের দিকে

গেলে, তোমরাও সঙ্গে এসো।'

এই বলে গাছ থেকে নেমে যেই না সুইডদের দিকে এগিয়েছে কোরাক, তিনশো বেবুনও সঙ্গে ছুটেছে। সুইডরা বন্দুক তুলে গুলি ছুঁড়লেও কোরাকের গায়ে লাগল না। আর উপায় না দেখে লোক দুটো বনে ছুটল। বেবুনরা ওদের মেরেই ফেলত, ভাগ্যিস সাফারির লোকরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। ততক্ষণে ইস্পাতের খাঁচার দরজা খুলে কোরাক বেবুন রাজাকে মুক্তি দিয়েছিল। এবার বেবুনরা সাফারির সঙ্গে লড়াই করুক, কোরাক কোবুদ্দুর গ্রামের দিকে এগোল।

পথে এক পাল হাতির সঙ্গে দেখা। বিশাল দেহ এই হাতিদের সঙ্গে তার বড় ভাব। তারা চোখে কম দেখে, কিন্তু গন্ধ পায়। তান্তর শুঁড় তুলে দলকে সাবধান করে দিল। কোরাক ডেকে বলল, 'ও কি হলো, তান্তর? আমি কোরাক টারমানগানি।' অমনি তাদের মেজাজ মিষ্টি হয়ে গেল। কেউ শুঁড় দিয়ে আদর করল; একটা বাচ্চা হাতি ল্যাং মেরে ফেলে দিতেও চেষ্টা করল। বাচ্চারা ভারি ফুর্তিবাজ হয়। কোরাক ওদের পিঠ চাপড়ে, দুটো নরম কথা বলে, এগিয়ে চলল।

কোবুদ্দুর গ্রামে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। আলো থাকতে কিছু করার উপায় ছিল না। অন্ধকার নামলে কোরাকও গাছ থেকে নেমে বেড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সমস্ত গ্রামটাকে ঘুরে দেখতে হবে, মেরিয়মের গন্ধ পায় কি না। পেলও তাই। একটা কুঁড়েঘরে সে বন্দী। একটা বিশালদেহ সশস্ত্র যোদ্ধা দোর আগলাচ্ছে। কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মাঝে মাঝে ঢুল আসছে। পিছন থেকে এসে কোরাক নিঃশব্দে তার গলা টিপে ধরল। প্রাণটা না বেরোনো অবধি ছাড়ল না।

তারপর অন্ধকার কুটিরে ঢুকে ডাকল, 'মেরিয়ম!'

—'কোরাক! এসেছ কোরাক!'

নিচু হয়ে তার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে তখনি তাকে নিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করেছিল কোরাক। দুঃখের বিষয় কুকুরগুলো জানান দিল। আরেকটু সময় পেলেই দু'জনে গাছের ডালে অদৃশ্য হতো, তা আর হলো না। যোদ্ধারা মেরিয়মের চারদিকে এক দুর্ভেদ্য বেড়া তৈরি করে রাখল। বার বার সেই বেড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, রক্তাক্ত দেহে শেষ পর্যন্ত কোরাককে তখনকার মতো রণে ভঙ্গ দিতে হলো।

চিৎকার করে মেরিয়মকে বলল, 'কোরাক এখন চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে, মেরিয়ম। কিন্তু সে আবার আসবে।'

মেরিয়ম বলল, 'আমি তার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।'

তারপর কেউ কিছু বুঝবার আগেই এক ঝলকে বিদ্যুতের মতো, গ্রামের পথ দিয়ে ছুটে কোরাক গাছের ডালে ঝুলে পড়ল। যোদ্ধারা ওর পিছন পিছন এক ঝাঁক বর্শা পাঠাল। তার কোনো ফল হলো না। দূর থেকে একটা বিদ্রূপের হাসি কানে এলো।

শত্রুদের হাতে বন্দী মেরিয়ম কোরাকের জন্য অপেক্ষা করবে। সে যে তাকে উদ্ধার করবে, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না ওর মনে। শেখের ঘরে কত না দুঃখে কষ্টে দিন কাটত। কোরাক তাকে এতদিন পরম যত্নে রেখেছিল। তার মতো কে বা আছে? এখানকার কালো মানুষরাও তার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করত না। সে তো জানত না যে শেখের কাছে কোবুদ্দু চর পাঠিয়েছে, মেয়ের মুক্তিপণ দাবি করে। কিন্তু এ-কথাও কেউ জানত না যে সেই চরের সঙ্গে সুইডদের সাফারির দেখা হয়েছিল। সে বোকার মতো তাদের সব কথা বলে দিয়েছিল। ফলে পিঠে একটি গুলি খেয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল।

এরপর জেনসেন আর মালবিনের কোরাক বিষয়ে কৌতূহল বেড়েছিল। তাকে দেখে বুদ্ধিমান ইউরোপীয় বলেই মনে হয়েছিল। বুনো জানোয়ারদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেও খ্যাপা-ট্যাপা মনে হয়নি। সে যদি কর্তৃপক্ষকে ওদের বে-আইনী কীর্তিকলাপের কথা জানিয়ে দেয়, তাহলেই তো এমন লাভের ব্যবসায় ইতি!

সকলেই প্রায় ওদের উপর খাপ্পা ছিল, তবে কোবুদ্দু বিশেষ কিছু জানত না। ওকে চটালে চলবে না। এইসব ভেবে সুইডরা কোবুদ্দুর সঙ্গে ভাব করতে চলল। বুড়োকে নানা উপহার দিল, কিন্তু ভুলেও শ্বেতাঙ্গী বন্দিনীর কথা উত্থাপন করল না। জাকোর মেয়েকে ওরা বহু বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মোটা লাভ হবে তাকে পেলে। শেষটা কি সত্যি পাওয়া গেল?

নানা আলাপের পর মালবিন বলে বসল, 'ঘোড়া থেকে পড়ে বুড়ো শেখের মৃত্যু হয়েছে। কেন, তুমি জানতে না?'

কোবুদ্দু জানত, সাদা ব্যবসাদাররা অনেক সময় মেয়ে ক্রীতদাসী কেনে। সে হঠাৎ বলল, 'আমি একজন সাদা

মেয়ের খবর জানি। সস্তায় পাওয়া যেতে পারে।'

মালবিন বলল, 'বেশ আছি আমরা। আবার একটা বুড়ি কিনে ঝামেলা বাড়ানো কেন!'

—'না, না, বুড়ি না। ছেলেমানুষ। দেখতে ভালো। চল, দেখাচ্ছি।'

একটা অন্ধকার ঘরে হাত-পা বাঁধা হয়ে একজন মেয়ে পড়েছিল। কোবুদ্দু তার লোকদের বলল, ওর পায়ের দড়ি খুলে, আলোতে নিয়ে আসতে। তাকে দেখেই ওরা চমকে উঠেছিল। তবু মনের ভাব গোপন করে বলল, 'না, বাপু, ঝামেলা বাড়াব না।'

মেরিয়ম ওদের দিকে চেয়ে রইল। এরা সব শত্রু। আরবি ভাষায় মালবিন বলল, 'আমরা বন্ধুজন। এখান থেকে আমাদের সঙ্গে যাবে?'

সে বলল, 'আমি চাই আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। কোরাকের কাছে ফিরে যাই।'

—'আমাদের সঙ্গে যাবে?'

—'না।'

—মালবিন কোবুদ্দুকে বলল, 'আমাদের সঙ্গে যেতে চায় না যে।'

—'জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পার না?'

মালবিন বলল, 'সে রকম ইচ্ছা ছিল না। তবে তুমি বন্ধুলোক। তোমার কথায় না হয় নিয়েই যাব।' শেষ পর্যন্ত দরদাম চুকল। ছ'গজ মার্কিন, তিনটে বন্দুকের গুলির খোল, একটা চকচকে নতুন ছবির বদলে মেরিয়ম সুইডদের কাছে বিক্রি হয়ে গেল। এখন যত তাড়াতাড়ি মেয়ে নিয়ে ওরা বিদায় হয়, কোবুদ্দু ততই খুশি। ওরাও তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচে। অক্ষত দেহে মেয়েটাকে পৌঁছে দিতে পারলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। এখান থেকে যতটা সম্ভব দূরে যেতে হবে। তারপর কেবলি চলা; সারা দিন অবিরাম হাঁটা। এমনি করে অনেকটা পথ এগোনো গেল। কিন্তু কোরাকের দেখা পাওয়া গেল না। এদিকে জেনসেন মেরিয়মকে সর্বদা চোখে চোখে রাখলেও, মালবিন লোকটা সুবিধার ছিল না। সুযোগ পেলেই মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে যাবার মতলব তার। জেনসেন মেরিয়মকে কেবলই সাবধান করে দেয়।

একদিন জেনসেন শিকারে বেরিয়েছে, দূর থেকে মেরিয়মের ভীত চিৎকার শুনে ছুটতে ছুটতে এসে দেখে, ওর তাঁবুতে ঢুকে মালবিন ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে। দু'জনেই রিভলবার বের করেছিল। দুঃখের বিষয়, মালবিনের গুলি জেনসেনের বুকে আগে লাগল। সে তখুনি পড়ে গেল। ঠিক সেই সময় তাঁবুর দরজা দিয়ে এক-জন লম্বা শ্বেতাঙ্গকে দেখা গেল। মালবিনের কাঁধে একটা ভারি হাত পড়ল। চমকে ঘুরে সে দেখল একজন খাকি পোশাক পরা দীর্ঘদেহী অচেনা লোক। তার কালো চুল, ছাই রঙের চোখ। তাকে দেখেই মালবিন বন্দুকের দিকে হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু সে ছুঁড়ে বন্দুকটা দূরে ফেলে দিল।

তারপর মেরিয়মের দিকে ফিরে বলল, 'এর মানে কি?'

আরবি ভাষায় বলাতে মেরিয়ম বুঝল, 'এরা আমাকে কোরাকের কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছিল। কোরাক থাকলে ওদের মেরে ফেলত। তুমি বোধ হয় ওদেরই মতো, তাই ওকে মারবে না?'

লোকটি হাসল, 'মেরে ফেলাই উচিত, বটে। যাই হোক, তোমাকে ও আর জ্বালাবে না।' শেষ পর্যন্ত মালবিনকে ঐ অঞ্চল থেকে দূর করে দেওয়া হলো।

মালবিন বিদায় হলে লোকটি মেরিয়মকে বলল, 'তোমার গলার ওটার চাবি কোথায়?' মেরিয়ম জেনসেনের মৃতদেহ দেখিয়ে দিল। চাবি পাওয়া গেলে মেরিয়মের শিকল খুলে দেওয়া হলো।

মেরিয়ম বলল, 'এবার আমাকে কোরাকের কাছে ফিরিয়ে দেবে তো?'

—'তোমার আত্মীয়দের কাছে ফিরিয়ে দেবো। তারা কোন্ গ্রামে থাকে? কোরাক কে?'

—'কোরাক? সে একজন বনমানুষ। আমার কেউ নেই। আকুট রাজা হবার পর, কোরাক আর আমি বনের মধ্যে থাকি।'

লোকটি বলল, 'কোরাক তাহলে একজন বনমানুষ? আর তুমি কি?'

—'কেন, আমিও তাই। আমার নাম মেরিয়ম।'

—'কবে থেকে বনমানুষ হলে?'

—'ছোটবেলা থেকে। বাবা আমাকে বড্ড মারত, তাই কোরাক আমাকে নিয়ে এসেছিল।'

—'কোরাক কোথায় থাকে?'

মেরিয়ম হাত বাড়িয়ে সমস্ত আকাশ দেখিয়ে দিল।

লোকটি বলল, 'তার চেয়ে আমাদের গ্রামে চল। আমরা কাছেই থাকি। আমার স্ত্রী তোমার দেখাশুনো করবেন। যত দিন না কোরাককে আমরা পাই, কিম্বা সে আমাদের পায়। কি বল?'

বাইরে মালবিন তাঁবু তুলে ফেলছিল। তার লোকরা বলল, মেয়েটিকে কোবুদ্দুর কাছ থেকে সুইডরা কিনেছিল। বাস্তবিক লোকটাকে মেরে ফেললেই ল্যাঠা চুকত। কিন্তু আজকাল আইন করে ও-সব বন্ধ হয়েছে।

সেই চমৎকার লম্বা লোকটি মনে মনে স্থির করেছিলেন মেরিয়মকে আর এ-রকম বিপদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হবে না। তেমন হলে জোর করেও নিয়ে যেতে হবে। যাই হোক, তার দরকার হলো না। ইচ্ছা করে একটু ঘোরা পথে তাকে নিজের আস্তানার দিকে নিয়ে চললেন। ক্রমে মেরিয়মের মনের ভয় আর অবিশ্বাসও কমে যেতে লাগল।

পঞ্চম দিনে দেখে খোলা খেত মাঠ, তার পিছনে সুন্দর বাড়িঘর। 'এ আমরা কোথায় এলাম?'

মানুষটি বললেন, 'এটা আমার বাড়ি। এখনো তো কোরাককে দেখতে পেলাম না, এখানে আমার স্ত্রী আছেন। তাঁর কাছে অপেক্ষা করা যাক। তুমি এখানে নিরাপদে থাকবে। এখনো তো তুমি ছেলেমানুষ, বনে কত বিপদ, কত মন্দ লোক।'

মেরিয়ম বলল, 'আমার বাবার বাড়িতে যে রকম মার খেতাম, এখানেও তা হবে না তো? আমি সিংহ চিতাকে ভয় পাই না। সবাইকে একদিন মরতেই হবে। বন খুব ভালো জায়গা। কিন্তু তুমিও বড় ভালো লোক। তাই আমি তোমার সঙ্গে যাব। তুমি যা বল, তাই করব। আমার কোরাকের জন্য এখানেই অপেক্ষা করব।'

সুন্দর মানুষটি খুশি হয়ে ওকে নিয়ে সেই ফুলে ঢাকা খামার বাড়ির কাছে এগিয়ে গেলেন। অমনি গোটা বারো পোষা কুকুর ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এলো, হিংস্র রোগা উল্‌ফ্‌ হাউণ্ড, বিশাল গ্রেট-ডেন, কলি, ফক্সটেরিয়ার। সুন্দর মানুষটিকে দেখে তারা আহ্লাদে আটখানা। তাঁর সঙ্গে মেরিয়মকে দেখে, শুঁকে-টুকে তাকেও আদর করে ডেকে নিল। মেরিয়মের এতটুকু ভয় নেই, দু'হাতে দু'টি উল্‌ফ্‌-হাউণ্ডের কলার ধরে সে এগিয়ে গেল। বাংলোর বারান্দায় সাদা পোশাক পরা একজন সুন্দরী মহিলা ওদের অভ্যর্থনা করলেন। মানুষটি বললেন, 'ইনি আমার স্ত্রী। তুমি এসেছ বলে খুশি হয়েছেন।'

সংক্ষেপে ইংরেজিতে মেরিয়মের পরিচয় দিলেন। মেরিয়ম দেখল, ঐ সুন্দর মুখে কত স্নেহ, কত দয়ামায়া। ওকে বুকে জড়িয়ে বললেন, 'এসো, মা আমার!' অমনি ভুলে যাওয়া পুরানো ভালোবাসা বুকের মধ্যে উথলে উঠল। মেরিয়ম তাঁর বুকে মুখ গুঁজে যে কান্না কাঁদল তেমন সে জন্মে কাঁদেনি। তাতে আরাম, আনন্দ, সুখ, সব ছিল।

এদিকে হতাশ মনে ক্ষত-বিক্ষত দেহে কোরাক বেবুন-দের খুঁজে বেড়াতে লাগল। যখন পেল, তারা ওকে সাহায্য করতে রাজি মনে হলো, কিন্তু দলে ওরা আরো ভারি না হলে সাহস পাচ্ছিল না। রাজাকে কোরাক খাঁচা থেকে মুক্তি দিয়েছিল, সে-কথা তারা ভোলেনি। রাজা বলল, 'পাহাড়ে আমাদের বড় দল আছে। তাদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা নিশ্চয় আসবে। তখন কালো মানুষদের সঙ্গে লড়াই করে তোমার মেরিয়মকে উদ্ধার করা যাবে।'

সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল। কোরাকও সঙ্গে গিয়েছিল। ওর ব্যবহারে আর কথায় খুশি হয়ে হাজার হাজার পাহাড়ি বেবুন নিচে নেমে এলো। যেন একটা হাজার হাজার বেবুনের ব্যূহ। সবার আগে কোরাক আর দুই রাজা। দু'দিন পরে ওরা কোবুদ্দুর গ্রামে পৌঁছল। আর সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ। সে বিকট যুদ্ধ ভাবা যায় না। কোবুদ্দু আর তার যোদ্ধারা বর্শা নিয়ে প্রাণপণে লড়েছিল। হাজার হাজার বেবুনে গাঁ ছেয়ে গেল। মেয়েরা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বনে পালাল। পুরুষরা অনেকে প্রাণ দিল। কিন্তু মেরিয়মকে কোথাও পাওয়া গেল না। তাঁর সংবাদ যারা দিতে পারত, তারা সকলে হয় মরেছিল, নয় কোরাকের ভয়ে দূরে পালিয়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত বেবুনদের ছেড়ে বুকভরা দুঃখ নিয়ে কোরাক বনে চলে গেল। মেরিয়ম নিশ্চয় বেঁচে নেই, তাঁকে খুঁজে কি হবে? ঘন বনের মধ্যে এক বছর ঘুরে বেড়াল কোরাক। এই সময় তার নিত্য সঙ্গী ছিল তান্তর আর তার হাতির দল। অথচ মাত্র একশো মাইল দূরে মেরিয়ম সেই সুন্দর খামারে নিরাপদে দিন কাটাচ্ছিল।

নতুন পরিবেশে মেরিয়মের ঠিক বাপ-মার সমান আদর-যত্নে দিনগুলো তাড়াতাড়ি কেটে গেল। ঐ এক

বছরে সে সভ্য জীবনের নিয়মকানুন সব শিখে নিল। সাজতে-গুজতে, চলতে-ফিরতে, লোকের সাথে মিশতে শিখল। তাকে দেখলে আর চেনা যায় না। ইংরিজি বলতে, লিখতে, পড়তে এত তাড়াতাড়ি শিখে গেল যে সকলে অবাক হলো। খামারের ওয়াজিরি অনুচরদের মতো সে-ও মালিককে বোয়ানা বলে ডাকত। বোয়ানা তাঁর স্ত্রীকে বলতেন মাই ডিয়ার। মেরিয়মও তাই বলত। তাঁদের সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। মাই ডিয়ারের পুত্রহারা মনটাকে সে ক্রমে জুড়ে বসেছিল। একদিন মজা করে ওর সঙ্গে ফরাসীতে কথা বলতেই ও যখন টপাটপ ফরাসীতে উত্তর দিল, তিনি তো অবাক! 'কোথায় শিখলে মা?' এমন সুন্দর উচ্চারণ, এত ভালো ভাষা কোথায় শিখল সে নিজেও জানে না। শিক্ষিত বংশের ভাষা। এ তো এক রহস্য!

মেরিয়মের বয়স হয়েছে ষোল-সতেরো। দেখে আরো বছর দুই বেশিই মনে হয়। দেখতে পরমা সুন্দরী। এ যে কোনো আরব মেয়ে নয় তাতে সন্দেহ নেই। কোরাককে সে ভোলেনি সত্যি, কিন্তু দীর্ঘদিন না দেখে, অন্য পরিবেশে পড়ে, তার অভাবটা আর অত বোধ করে না। আদব-কায়দা দুরস্ত অভিজাত একজন ইংরেজ তরুণীর মতো তার চাল-চলন। কোরাক যে আর ফিরবে সে আশা কম। অনুচররা কোবুদ্দুর গ্রাম থেকে ফিরে এসে বলেছিল তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে। মাই ডিয়ার তাকে বলতেন, বেঁচে থাকলে কোরাক নিশ্চয় ফিরে আসবে।

এই সময় খামারবাড়িতে অতিথি সমাগম হয়েছিল। দু'টি বয়স্ক স্বামী-স্ত্রী আর মরিসন বেন্‌স্ বলে একজন ধনী যুবক, সে নতুন দেশ দেখতে এসেছে। চমৎকার চেহারা তার, চমৎকার স্বাস্থ্য। মেরিয়মকে দেখে সকলে মুগ্ধ। কি সুন্দর ব্যবহার, কি মজার মজার কথা বলে, বন-জঙ্গল বিষয়ে কি অপ্রত্যাশিত সব কথা।

বিশেষ করে বেন্‌স্ সুবিধে পেলেই ওর সঙ্গে বেড়াত। চমৎকার ঘোড়া চড়তে শিখেছিল মেরিয়ম। দু'জনে বেড়াতে যেত। বোয়ানা মিছিমিছি জানোয়ার মারতে দিতেন না। ক্রমে মেরিয়মের মনে কোরাকের ছবি ফিকে হয়ে এলো, তার জায়গায় বেন্‌সের সুন্দর চেহারা ফুটে উঠতে লাগল।

একদিন মেরিয়ম বনের ধারে ঘোড়া বেঁধে, একা একা ঘুরছে, এমন সময় কানে এলো কোথায় ছাগলছানা ভয় পেয়ে ডাকছে। সেকালে মেয়েরা স্কার্ট পরে ঘোড়ায় চড়ত। মেরিয়ম স্কার্ট, রাইডিং বুট ছেড়ে ফেলে, কোমরে ছোরা গুঁজে ছাগলছানা উদ্ধারে গাছে গাছে ঝুলে চলল, সোজা জানোয়ারদের জল খাবার জায়গায়। ছানাটা পালায় না কেন? এমন সময় দেখল ছাগলছানা দড়ি দিয়ে বাঁধা। বোয়ানা তো এভাবে টোপ পেতে শিকার করতে পছন্দ করেন না!

নুমা কাছেই ঝোপে ওঁৎ পেতে ছিল, মেরিয়ম তাও দেখল। তবু এক দৌড়ে ছাগলের বাঁধন কেটে দিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া। আর নুমা দিল লাফ! কিন্তু মেরিয়মও ততক্ষণে গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়েছিল।

এই ব্যাপারের আরেকজন দর্শকও ছিল। লম্বা দাড়ি শ্বেতাঙ্গ এক শিকারী। তার হাতে বন্দুকও ছিল। তবু মেরিয়মকে বাঁচাবার এতটুকু চেষ্টা করেনি। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল বটে। তারপর কাঁটার বেড়ার পিছনে নিজের ক্যাম্পে ঢুকে পড়েছিল। সে লোকটি হলো মালবিন। এ বছর আবার সে সাফারি এনেছে।

এদিকে মেরিয়ম ফিরে এসে দেখে গাছে লুকানো ওর স্কার্ট, রাইডিং-বুট ইত্যাদি নিয়ে কয়েকটা বেবুন মহা আনন্দ করছে। ওকে দেখে ওদের এতটুকু ভয় দেখা গেল না।

বোয়ানার বাড়ির শিকারীর দল ফিরবার পথে মরিসন বেন্‌সের চোখে পড়ল মেরিয়েমের ঘোড়াটা বনের ধারে গাছে বাঁধা রয়েছে। তার পিঠে জিন রয়েছে, কিন্তু মেরিয়মকে দেখতে পেল না। তবে কি সিংহ নিল মেয়েটাকে? ভয়ের চোটে নাম ধরে ডাকতে যাবে, এমন সময় চোখে পড়ল গাছের ওপর মেরিয়ম, তাকে ঘিরে কয়েকটা বেবুন। সবে বন্দুক তুলেছে বেন্‌স্, হঠাৎ কানে এলো বেবুনদের ভাষায় মেরিয়ম তাদের সঙ্গে কথা বলছে! বেন্‌স্ তাজ্জব বনে গেল!

খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর, বেবুনরা মেরিয়মকে তার জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিল। সেগুলি মেরিয়ম পরবার সময় তারা ওকে ঘিরে কৌতূহলের সঙ্গে মজা দেখতে লাগল। বেন্‌স্ আর সইতে না পেরে, একটা গাছের গোড়ায় ধপ করে বসে পড়ে, কপালের ঘাম মুছতে লাগল।

একটু পরে মেরিয়ম ঘোড়ায় চড়ে বন থেকে বেরিয়ে এলে, ও বিষয়ে কোনো কথাই বেন্‌স্ বলতে পারল না। এই আশ্চর্য মেয়ের বিষয়ে সে কতটুকুই বা জানে?

মেরিয়ম এমন ভাবে কথা বলছিল যেন কিছুই হয়নি। শেষটা বেন্‌স্ বেবুনদের কথা না তুলে পারল না। 'ঐ বিকট

চেহারার জানোয়ারগুলোর সঙ্গে তোমাকে কথাবার্তা বলতে দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম!'

শুনে মেরিয়মও অবাক হলো, 'বিকট কোথায় দেখলে? ওরা আমার বন্ধু। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলব না?'

—'কিন্তু তোমরা পরস্পরের কথা বোঝ?'

—'নিশ্চয় বুঝি। আর দেখ, ওরা বিকটও নয়, নিকৃষ্টও নয়। বোয়ানা আমাকে নিয়ে আসার আগে, আমি তো ছোটবেলা থেকে ওদের মধ্যেই বড় হয়েছি। এখনি না হয় মানুষদের কাছে থাকি। তাই বলে বন্ধুদের ভুলে যাব? এক সময় কোরাক আর আকুটের সঙ্গে ওদের মতোই বনে থাকতাম, শিকার করতাম। বোয়ানা আর মাই ডিয়ারের কাছে আসবার আগে অবধি কোরাক আর বনের জানোয়ার ছাড়া আমার কোনো বন্ধু ছিল না। কোরাক আমার জন্যে গাছের মগডালে ঘর করে দিয়েছিল।'

অনেকক্ষণ দু'জনে কোনো কথা বলল না। মেরিয়মের হঠাৎ কোরাকের কথা বড় বেশি করে মনে পড়ে যেতে লাগল। আর বেন্‌সের এই সুন্দরী কায়দাদুরস্ত মেয়েটি সম্বন্ধে পুরানো ধারণাগুলো কেমন গুলিয়ে যেতে লাগলো।

বেন্‌স জিজ্ঞাসা করল, 'কোরাক আর আকুট কে?'

মেরিয়ম বলল, 'আকুট একজন মানগানি আর কোরাক একজন টারমানগানি।'

—'সে আবার কি?'

মেরিয়ম হাসতে লাগল, 'তুমি একজন টারমানগানি আর মানগানিদের গায়ে লোম থাকে। তোমরা তাদের বনমানুষ বলো।'

—'কোরাকে তাহলে একজন শ্বেতাঙ্গ? সে কি তোমার ভাই?'

—'না, মোটেই না।'

—'তবে তোমার স্বামী নাকি?'

শুনে মেরিয়ম হেসেই কুটোপাটি, 'স্বামী? কি যে বলো! আমার বিয়ে-টিয়ে করার বয়স হয়নি। কোরাক হলো কোরাক।'

এর মধ্যে একদিন বেন্‌স্ একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিয়ের কথাও পেড়েছিল। মেয়েটিকে তার ভারি পছন্দ ছিল। কিন্তু তার মতো উচ্চবংশীয় স্বামীর স্ত্রী হবার যোগ্য কি না বুঝতে পারছিল না।

এর কিছুদিন পরে বোয়ানার কাছে মেরিয়ম বারান্দায় বসেছিল, এমন সময় বছর ত্রিশ বয়সের একজন অচেনা শ্বেতাঙ্গ এসে উপস্থিত হলো। নাম বলল হ্যান্‌সন। নাকি ব্যবসা করে। দক্ষিণ থেকে এসেছে। বহু দিন বনে বনে ঘুরেছে, কোনো সুবিধাও করতে পারেনি, পথও হারিয়েছে। অনেক দিন একটা গ্রাম বা গ্রামবাসী দেখেনি যে পথ শুধিয়ে নেবে। বোয়ানা একটু অবাক হলেন। তাঁর ওয়াজিরি অনুচররা খবর আনতে দক্ষ। এর কথা কেন আগে থেকে তারাও জানতে পারেনি? তাছাড়া, সম্পূর্ণ অচেনা হলেও, কেমন চেনা চেনা লাগছে কেন?

সে যাই হোক, অতিথি হয়ে এসেছে যখন, তখন মাই ডিয়ার আর মেরিয়মের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। লোকটা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে দেখে, বোয়ানা তাকে নিজের পড়ার ঘরে নিয়ে গেলেন। তখন মেরিয়ম মাই ডিয়ারকে বলল, 'কি জানি কেন মনে হচ্ছে ওকে আগে কোথাও দেখেছি?' তবে কথাটাকে সে আদৌ গুরুত্ব দিল না।

লোকটা বোয়ানার কথামতো ওয়াজিরিদের ঘরের কাছে ক্যাম্প করল। সেখানেই থাকত, তবে বাংলোতেও নিত্য যাওয়া আসা করত। তিন সপ্তাহ ছিল সে, অতি ভদ্র অতিথির মতো। বাইরে যাই সেজে থাকুক, ভিতরে তার অন্য মতলব ছিল। সেটা কাজে লাগাতে পারলে অনেক লাভ হবে।

গোপনে নিজের অনুচরদের দুই ভাগ করে, এক ভাগকে পশ্চিমে বড় নদীর ধারে আস্তানা করতে বলে দিল। অন্য দল নিয়ে সে উত্তর দিকে ব্যবসার চেষ্টায় এগোবে। অন্ততঃ এই কথাই সে বোয়ানাকে বলেছিল। অন্য দলটার কথা তিনি জানতেও পারেননি। হ্যানসেন তাঁকে বলেছিল তার অর্ধেক লোক নাকি পালিয়ে গেছে।

এদিকে বেনসও ক্রমাগত মেরিয়মকে পেড়াপিড়ি করত, তার সঙ্গে চলে গেলে, দেশে ফিরে তাকে বিয়ে করে মস্ত বড় সম্মানের অধিকারিনী করে দেবে—এই সব। লোকটিকে মেরিয়মের ভালোই লাগত। আর কোরাকই যখন বেঁচে নেই, কার জন্যে অপেক্ষা করা? মেরিয়মের মনে বড় অশান্তি। মাই ডিয়ার আর বোয়ানাকে ছেড়ে যায়ই বা কি করে? বেনস বলত, তাঁরা কখনো মত দেবেন না। মেরিয়ম বড়ই ছেলেমানুষ ছিল।

একে গ্রীষ্মকাল, তায় মনে অশান্তি। মেরিয়ম মাঝে মাঝে রাতে উঠে বাগানে বেড়িয়ে, নিজের মনকে শান্ত করার চেষ্টা করত। বাগানটিকে সে বড় ভালোবাসত। সে জানত না যে একটা ঝোপের পিছনে লুকিয়ে বসে হ্যান্‌সন প্রায়ই তার উপর নজর রাখে। তার টাট্টু ঘোড়াও কাছেই ঝোপে বাঁধা থাকে।

সে দিনও তাই ছিল। মেরিয়ম হাঁটতে হাঁটতে তার খুব কাছে এসে পড়েছিল, এমন সময় টাট্টু ঘোড়া ডেকে উঠল। দূরে একটা সিংহের গর্জনও শোনা গেল। টাট্টু-ঘোড়া আরো কাছে থেকে ডাকল। হ্যান্‌সন তাকিয়ে দেখে বেন্‌স্ দুটো টাট্টু নিয়ে এসেছে!

বেন্‌স্ মেরিয়মকে বলল, 'আমিও ঘুমোতে পারছি না, চল না একটু ঘুরে আসা যাক। হ্যানসনের ঘোড়াও দেখছি এখানে বাঁধা। ও বোধহয় ওর ফোরম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছে। এত রাত করা ঠিক হয়নি। সিংহ বেরিয়েছে ওকে ফিরতে হবে তো বনের মধ্যে ক্যাম্পে, তাও একা একা।' মেরিয়ম আসলে সংসারের ধারা কিছুই বুঝত না। বেড়ানোর প্রস্তাবে খুব রাজি। ঘোড়ায় চড়ল দু'জনে। সিংহটা আরেকবার ডাকল। বেন্‌স্ একটু ঘাবড়াল। 'ওটাকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো হবে না কি?'

মেরিয়ম হাসতে লাগল, 'কেন? চল না ওর সঙ্গে দেখা করে আসি। কোনো ভয় নেই, বোয়ানা বলেন এ বনে মানুষখেকো জানোয়ার নেই।'

তা না হতে পারে, কিন্তু এটা একটা বুড়ো সিংহ। দু দিন খাওয়া হয়নি। যা পাবে তাই খাবে। এ-কথা ওরা টের পায়নি। বেন্‌স্ সিংহের কথা ভুলে বারবার পীড়াপিড়ি করতে লাগল, 'আমার সঙ্গে লণ্ডনে চল। সেখানে আমাদের বিয়ে হবে'—এই সব। এদিকে হ্যান্‌সনও কিছু দূর ওদের পিছন পিছন এসেছিল। আগের দিন ঐ বুড়ো সিংহটাই ওর ক্যাম্প থেকে একজন লোককে নেবার চেষ্টা করেছিল। অনেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে পড়াতে সে বেঁচে গিয়েছিল। এ-কথাটা বেন্‌স্‌দের বলা দরকার। অথচ ওরই মতো বেন্‌সেরও মতলব সুন্দর মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া। আসলে ঐ লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা স্রেফ ধাপ্পা! অবিশ্যি এত কথা হ্যান্‌সনও জানত না।

মেরিয়ম আর বেন্‌সের কাছ থেকে একশো গজ দূরে ঝোপের মধ্যে সিংহটা অপেক্ষা করছিল, একটু সুবিধা পেলেই ঝাঁপ দেবে। আরেকজনের নাকেও নুমার গন্ধের সঙ্গে মানুষের গন্ধ গিয়েছিল। সে একটা বড় ডালে শোওয়ার বন্দোবস্ত করছিল। নিচে তান্তর দাঁড়িয়ে ছিল। নুমার আর টারমানগানির গন্ধ! আর দেরি নয়। সেই দর্শক সঙ্গে সঙ্গে তান্তরের পিঠে চেপে সেই দিকে রওনা দিল। মেরিয়মকে আর বেন্‌স্‌কে দেখতেও পেল, কিন্তু কোরাক ঐ কায়দাদুরস্ত টারমানগানি মেয়েকে মেরিয়ম বলে চিনতে পারল না।

ঠিক সেই সময় নুমা ঝাঁপ দিল। কোরাক শিকারের সম্ভাবনা দেখে মহা খুশি! কিন্তু বেন্‌স্ তার ঘোড়া নিয়ে অকুস্থল থেকে হাওয়া হয়ে গেল। মেরিয়মের ঘোড়াও পালাবার জন্য লাফঝাঁপ করতে লাগল। কেবল মেরিয়মের এতটুকু ভয় নেই আর কোরাক উল্লসিত। হাত তুলে ভারি বর্শাটা সে ছুঁড়ে দিল। সে বর্শার অব্যর্থ লক্ষ্য। ততক্ষণে মেরিয়ম গাছের ডালে। তারপর কোরাক তান্তরের পিঠে চড়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। কারো সামনে দেখা দেবার তার ইচ্ছা ছিল না। মেরিয়মকে সে চিনতে পারেনি। পারলে, অনেক দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পেত।

হ্যান্‌সন বনের দিকেই ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছিল। গর্জন শুনে সে বুঝেছিল এবার সিংহ ঝাঁপ দিয়েছে। এমন সময় বেন্‌সের ঘোড়া বন থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এলো। বেন্‌স্ তার গলা জড়িয়ে পিঠের ওপর শুয়ে। থেকে থেকে পা দিয়ে বেগ বাড়াচ্ছে। তার পরেই দ্বিতীয় ঘোড়াও ছুটে বেরিয়ে এলো। তার পিঠে সওয়ার নেই। হ্যান্‌সন তখন অকুস্থলে ছুটল, যদি কিছু করতে পারে। সিংহটা সেই মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে গড়িয়ে পড়েছে। হ্যান্‌সন মেরিয়মের নাম ধরে ডাকতেই সে গাছ থেকে উত্তর দিল, 'এই যে আমি এখানে! তুমিই ওকে মারলে বুঝি?' আসলে কোরাককে কেউ দেখতে পায়নি।

হ্যান্‌সন ভারি চালাক। সে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি কোথায় ছিলে? খুব বাঁচান বেঁচেছ আজ। আশা করি এর থেকে তোমার এই শিক্ষা হলো যে রাতে বনে যেতে নেই।'

খামারের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। পথে বেন্‌সের সঙ্গে দেখা। কাঁচুমাচু মুখ করে সে ফিরছে। ওদের দেখেই বলল, 'ঘোড়াটা আমাকে নিয়ে পালাল। কিছুতেই সামলাতে পারলাম না।'

হ্যান্‌সন সবই বুঝেছিল, মুখে কিছু বলল না। মেরিয়মকে পিছনে বসিয়ে, তিনজনে খামারে ফিরে এলো।

ওরা বন থেকে বেরিয়ে গেলে, কোরাকও হাসি মুখে আড়াল থেকে বেরিয়ে নুমার গা থেকে তার বর্শাটি উদ্ধার

করল। বাঃ, টারমানগানি মেয়েটা ক্যায়সা এক লাফে গাছে চড়ে প্রাণ বাঁচাল! ঠিক ওর হারিয়ে যাওয়া মেরিয়মের মতো। তার সঙ্গে আরো সাদৃশ্য আছে কি না কে জানে। দেখলে হয়। এক সময় কোরাকও সভ্য জগতে ফেরার কথা ভাবত। মেরিয়মের মৃত্যুর সঙ্গে সে সব স্বপ্ন ত্যাগ করেছিল। বাকি জীবনটা বনে বনে কাটাবার ওর একমাত্র ইচ্ছা।

এদিকে বোয়ানা বারান্দায় বেরিয়ে এসে তিন শিকারীকে গম্ভীর মুখে অভ্যর্থনা করলেন। মেরিয়মকে কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না। কেবল বললেন, 'ঘরে যাও, মেরিয়ম। বেন্‌স্‌, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আমার পড়ার ঘরে চল।' তারপর হ্যান্‌সনকে বললেন, 'তুমি ওদের সঙ্গে কি করে জুটলে?'

হ্যান্‌সন বলল, 'ম্যাডাম জানেন আমি মাঝে মাঝে রাতে এই সুন্দর বাগানে বেড়াই। আজ একটা ঝোপের আড়ালে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওদের গলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বেন্‌স্‌ দুটো ঘোড়া এনেছিল, তাতে চেপে ওরা বনে বেড়াতে চলল। কাজটা ভালো হলো না জেনে আমিও পিছু নিলাম। ভাগ্যিস্‌ নিয়েছিলাম। সিংহ দেখা দিতেই মেয়েটাকে ফেলে বেন্‌স্‌ ঘোড়া হাঁকিয়ে পালাল। আমি এক গুলিতে সিংহটাকে শেষ করে দিলাম। আরেকটা কথা, স্যার। বেন্‌স্‌ লোকটা কিন্তু সুবিধার নয়। মেরিয়ম বড়ই সরল। ও কেবলই ওর কানে মন্ত্র দেয় ওর সঙ্গে লণ্ডন গেলে, ওকে সেখানে বিয়ে করে খুব সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত করবে। আপনি বলেন তো কাল ওকে আমার সঙ্গে উত্তর দিকে সাফারি করতে নিয়ে যেতে পারি।'

বোয়ানা বললেন, 'দেখি, কি করা যায়।' পরে বেন্‌স্‌কে বললেন, 'কাল হ্যান্‌সন উত্তরে সাফারি নিয়ে যাচ্ছে, তুমিও ওর সঙ্গে গেলে ভালো হয়।'

পরদিন মেরিয়ম ঘর থেকে বেরোবার আগেই ওদের রওনা করে দিয়ে তবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এবার বোয়ানা একটা ভুল করলেন। বেন্‌সের আসল চরিত্রটা মেয়েকে বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল। বেচারি ভাবছিল, বেন্‌স্‌ বড় ভালো লোক। ওকে সম্মানের সঙ্গে বিয়ে করবে, কিন্তু অত বড় বংশের ছেলে একজন পরিচয়হীন মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে নানা রকম বাধা উঠবে, তাই বোয়ানাকে খোলাখুলি কিছু বলছে না।

এদিকে হ্যান্‌সন আর বেন্‌স্‌ হ্যান্‌সনের ক্যাম্পের দিকে চলেছে। হঠাৎ হ্যান্‌সন বলল, 'তোমার সঙ্গে বোয়ানা একটু কড়া ব্যবহারই করলেন। আসলে মেয়েটাকে ওঁরা বড় ভালো-বাসেন, সে বিয়ে করে চলে যাবে, এটা ওদের ইচ্ছা নয়।'

একটু সহানুভূতি পেয়ে বেন্‌স্‌ও মুখ খুলল, 'মধ্য আফ্রিকাতে উনি ভারি একটা কেউকেটা হয়েছেন, নিজেকে রাজাগজা মনে করেন। লণ্ডনে আমার সম্মান ওঁর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।'

হ্যান্‌সন খুব সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, 'মেয়েটি যদি সত্যি তোমাকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে তুমি প্রকাশ্যভাবে আমার সাফারি নিয়ে উত্তর দিকে এগোও। আমি ওকে সঙ্গে করে গোপন পথে তোমাকে ধরে ফেলব। দশ বছর এ অঞ্চলে চোরা কারবার করছি। সব গলি-ঘুঁজি আমার মুখস্থ। ঐ বোয়ানার চরদের সাধ্য নেই আমাকে ধরে।'

ওদের যাওয়াটা ডালপালার আড়াল থেকে কোরাকের চোখে ঠিকই পড়েছিল। তার মনে ভারি একটা কৌতূহল জেগেছিল। ঐ মেয়েটিকে আরেকটু ভালো করে দেখতে হবে। এত বেশি মেরিয়মের কথা মনে হচ্ছিল কেন?

এদিকে বেন্‌স্‌ লুকিয়ে চিঠি পাঠিয়ে মেরিয়মের সঙ্গে শেষ একবার দেখা করতে চাইল। বনের একটা খোলা জায়গায়; পরদিন ভোরে।

পরদিন ভোরে একজন কালো অনুচর নিয়ে বেন্‌স্‌ বনের নির্দিষ্ট জায়গাতে উপস্থিত হলো। একা যাবার সাহস তার ছিল না। কোরাকও গাছের ডালপালার আড়ালে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। ব্যাপারটা দেখতে হবে। বেন্‌স্‌ ঘোড়ার পিঠেই অপেক্ষা করছিল। কিছু পরে মেরিয়মও ঘোড়ায় চড়ে এসে পৌঁছল। কোরাক অসহ্য কৌতূহলের সঙ্গে তার মুখ দেখার চেষ্টা করতে লাগল। টুপির আড়ালে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তবে দুজনার যে ভারি ভাব বোঝা যাচ্ছিল। পুরুষটি কিছু বলছিল, মেয়েটি আপত্তি করছিল। শেষটা বোধ হয় রাজি হয়ে গেল। তারপর বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় মুখ তুলে মেয়েটি বলল, 'তাহলে আজ রাতে!'

কোরাক এবার তার মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল। এ যে তার সেই হারানো মেরিয়ম! বড় হয়েছে, সাজতে-গুজতে, কথা বলতে, লোকের সঙ্গে মিশতে শিখেছে। ওর সেই আগেকার ছোট মেরিয়ম আর নেই। এখন আর তার মতো একটা বুনো জানোয়ারকে তার কি করে পছন্দ হবে? কিন্তু

কোরাক তাকে চিরকাল প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবে। সে বেঁচে আছে বলে যেমন আনন্দ, কোরাকের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না বলে তেমনি দুঃখ! মনে হলো বুকটা ফেটে যাচ্ছে। কোরাক তো ইচ্ছা করেই জানোয়ারের জীবন বেছে নিয়েছিল, এখন দুঃখ করে লাভ নেই। এখন বড় বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে।

মেরিয়ম আর সেই লোকটি চলে গেলে এসব কথা মনে হচ্ছিল কোরাকের। হঠাৎ একটা হরিণ দেখে খেয়াল হলো খিদে পেয়েছে। হাতে শুধু একটা দড়ির ফাঁস। অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদ জায়গায় লুকোনো থাকত। ফাঁস দিয়ে হরিণ মারা কিছু নয়। তারপর টেনে এনে কয়েক ফালা তাজা মাংস কেটে নিয়ে আবার গাছের ডালে।

মেরিয়মের পিছু নেয়নি কোরাক। সে বুঝেছিল যেখানেই আশ্রয় পেয়ে থাকুক, সে ভালোই আছে। সামনে গেলে মেরিয়ম তাকে চিনে ফেলবে। তার চেয়ে ঐ লোকটার পিছু নিলে ভালো হয়। কাজেই হ্যান্‌সনের ডেরায় বেন্‌স্ আর তার অনুচর পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাছ-পথে কোরাকও সেখানে পৌঁছল।

এর কিছু পরেই একজন কালো লোক সঙ্গে নিয়ে হ্যান্‌সন ঘোড়ায় করে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বেন্‌স্ থেকে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এলো। বেন্‌সের রাতের খাওয়া সারা হলো। তাঁবুর সামনে সে পায়চারি করতে লাগল। ধুনিতে প্রচুর কাঠ জ্বালানো হলো। কোথায় একটা সিংহ কাশল। বেন্‌স্ বন্দুক বের করে আনল। কোরাকের মনে হলো সে ভয় পেয়েছে। এই রকম একটা কাপুরুষ মেরিয়মকে নানা বিপদ থেকে কি করে রক্ষা করবে? তবে তার দরকার হবে না। ওরা সভ্য জগতে বাস করবে।

এদিকে হ্যান্‌সন আর ছোকরাটি মেরিয়মের সেই নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। রাত ন-টায় মেরিয়ম এলো। কেমন যেন ঘাবড়াচ্ছিল। হ্যান্‌সনকে দেখে সে চমকে উঠল। হ্যান্‌সন বলল, 'বেন্‌সের ঘোড়াটা ওর পায়ের ওপর পড়ে যাওয়াতে সে খুব চোট পেয়েছে। তাই আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। একটু তাড়াতাড়ি এগোতে হবে, নয়তো শেষটা ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে।'

—'ওর কি খুব লেগেছে?'

—'না, বেশি নয়, তবে আজ রাতটা বিশ্রাম নিলে ভালো। সামনে লম্বা যাত্রা।'

হ্যান্‌সনের পিছন পিছন মাইলখানেক উত্তরে যাবার পর, ওরা পশ্চিম দিকে ফিরল। এই দিক বদলের কথা মেরিয়ম বেচারি টেরও পেল না। সারা রাত পশ্চিম দিকে চলল ওরা, সকালে জলখাবারের জন্য একটু থামল। তারপর দুপুর অবধি চলা। এবার হ্যান্‌সন বলল, 'এখানে একটু ঘুমানো যাক। অনেক পরিশ্রম হয়েছে।'

মেরিয়ম বলল, 'ক্যাম্পটা কত দূরে?'

—'আমি ওদের ভোরে রওনা হয়ে যেতে বলেছি। কালকের মধ্যে নিশ্চয় ধরে ফেলব।'

কিন্তু সে রাতের অর্ধেকটা, পরদিন সারাদিন গেল, তবু সাফারির দেখা নেই। তখন মেরিয়মের সন্দেহ হলো। হ্যান্‌সনও যেন আগের মতো ভদ্র ব্যবহার করছিল না। মেরিয়ম তার মনের সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, 'এ-সব সাফারির চিহ্ন তো বহুকালের পুরানো।'

হ্যান্‌সন হাসল, 'ও মা, বলিনি বুঝি, আমরা অন্যপথে চলেছি। এতে তাড়াতাড়ি হবে।'

ওর কোনো কথাই আর বিশ্বাস হচ্ছিল না। হঠাৎ তাকে চিনে ফেলল মেরিয়ম। এই লোকটাই তো সেকালে শেখের ডেরায় আসা-যাওয়া করত! এই তো সেই পাষণ্ড মালবিন! দাড়ি কামানোতে তাকে কেউ চিনতে পারেনি।

ক্যাম্পে সারারাত বেন্‌স্ অনিদ্রায় কাটিয়েছিল। সকালে কুলি সরদার বলল এবার রওনা হয়ে না গেলে, বড় বোয়ানার হাতে পড়ার ভয় আছে। শুনে বেন্‌সের নাড়ি ছেড়ে যায় আর কি! তখনি রওনা হয়ে গেল ওরা সাফারি নিয়ে। যে ছোকরা হ্যান্‌সনের সঙ্গে গিয়েছিল, দুপুরে সে ছুটতে ছুটতে এসে ওদের ধরে ফেলল। তাকে ফেলে হ্যান্‌সন মেরিয়মকে নিয়ে চলে গেছে।

তার কথা শুনে বেন্‌সের চক্ষু স্থির! হ্যান্‌সন তাহলে তাকে বোকা বানিয়ে মেরিয়মকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। কোথায় অনেক টাকা দিয়ে বিক্রি করে দেবে কে জানে! বেন্‌সের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, অনুতাপে তার মন ভরে গেল। এ কি সাংঘাতিক বিপদে নির্দোষ মেয়েটাকে সে ফেলল!

ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় গেছে তুমি জান?'

—'জানি।'

—'আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে?'

ছেলেটা তখুনি রাজি। হ্যান্‌সনের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধও নেওয়া হবে আর বড় বোয়ানার হাত থেকেও রেহাই

পাওয়া যাবে। তাঁকে সকলে সিংহের চেয়েও ভয় করত।

বেন্‌স্‌ বলল, 'আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে? দু'জনে একা যেতে পারব?'

—'হ্যাঁ, হুজুর।'

এবার একটু চালাকি করল বেন্‌স্‌। সরদারকে বলল, 'সাফারি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো, উত্তর দিকে এগোও। আমি বড় বোয়ানাকে ভুলিয়ে পশ্চিমে নিয়ে যাই।'

এতে সরদারের কোনোই আপত্তি হলো না। ওর আর এই ভীতু লোকটা, বা অত্যাচারী হ্যান্‌সনের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা ছিল না। উত্তর দিকে নিজের দেশে ফিরে যাবার সহজ পথ ওর জানা ছিল। এভাবে বড় বোয়ানাকেও এড়িয়ে যেতে পারবে।

এদিকে কোরাক সাফারির উত্তর দিকে যাত্রা করা দেখেছিল। তারপর ছোকরার সঙ্গে বেন্‌সের যাওয়াও দেখেছিল। মনে হয়েছিল ব্যাটা ভুল পথ ধরেছে। এর মধ্যে অনেক চিন্তা করার সময় পেয়েছিল কোরাক। শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছিল মেরিয়মের পক্ষে এই ভালো।

গাছে বসে বসে কোরাক খাকি পোশাক পরা একজন গম্ভীর মুখ লম্বা লোককে একদল কালো অনুচর নিয়ে মাটি পরীক্ষা করতে করতে উত্তর দিকে যেতে দেখল। আরো ঘণ্টাখানেক পরে কোরাক পশ্চিমের বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বেন্‌স্‌কে ছোকরা সবচেয়ে ছোট পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একদিন পরে সে পথে ঘোড়া চলে না। তখন বেন্‌স্‌ হেঁটেই চলল। তার মনের দুঃখের কথা ভাবা যায় না। তারই জন্যে মেরিয়ম আজ এমন বিপদে পড়েছে। মেরিয়মকে সে যে কত ভালোবাসে এবার সেটা সে বুঝতে পারছিল। চিরকাল সুখে আরামে লালিত; যখন যা চেয়েছে, তাই পেয়েছে। এবার কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ ধনটিকে বাঁচাতে পারবে না। তার জন্যেই মেরিয়মের এমন সর্বনাশ হলো।

যখন চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, তখন তার প্রথম বিশ্রামের কথা মনে হলো। এতক্ষণ ছেলেটাকেও পাঁচ মিনিট জিরোতে দেয়নি। পাছে সে পালিয়ে যায়, তাই রাতেও তার গা ঘেঁষে শুয়ে রইল। সকালে আবার যাত্রা। একটা হরিণ মেরে একবার খাওয়া হলো। আবার চলা। এদিকে কোরাক পশ্চিমে যেতে যেতে তাস্তরকে দেখে বড় খুশি হলো। বড় বোয়ানা তাঁর দলবল নিয়ে উত্তরে চললেন। মাই ডিয়ার মনের দুঃখ অশান্তি নিয়ে, মেয়ে নিয়ে তাঁর ফেরার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হ্যান্‌সন অর্থাৎ পাপিষ্ঠ মালবিনের ডেরায় পৌঁছে, তার হাতে পড়েও সহজে দমে যাবার পাত্রী ছিল না মেরিয়ম। যেই তাকে চিনতে পারল অমনি রুখে দাঁড়াল। কিন্তু গায়ের জোরে তার সঙ্গে পারবে কেন? সৌভাগ্যের বিষয় ধস্তাধস্তির খাঝখানে মালবিনের কোমরের রিভলভারের উপর তার হাত পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সেটি টেনে বের করে, মালবিনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল বটে, কিন্তু অনভিজ্ঞ হাতের গুলি যথাস্থানে লাগল না। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে রিভলবারের নল ধরে ঘুরিয়ে বাঁটটা গায়ের জোরে মালবিনের মাথায় মারল। অমনি সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল আর রিভলবার হাতে মেরিয়ম ছুটে বনে পালালো।

সোজা গাছে চড়ে পড়ল সে। স্কার্ট জুতো মোজা খুলে জ্যাকেট আর ব্রিচেস পরে ডালে ডালে এগিয়ে যেতে লাগল। নিজের মনে সে জানত একলা এই ঘন বনে বাঁচার আশা কম। খাবে কি? বন্দুক এনেছে, গুলি আনার কথা মনে হয়নি। এবার ফিরে গিয়ে সেগুলি আনতে হবে। ফিরেই গেল মেরিয়ম। তবে নিচে নামল না। যখন বুঝল ক্যাম্পসুদ্ধ সকলে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে, তখন আস্তে আস্তে নেমে তাঁবুতে ঢুকল। অনেক খুঁজেও গুলি পেল না। কিন্তু একটা ছোট বাক্সে কিছু হলদে হয়ে যাওয়া খবরের কাগজের টুকরো আর একটা ছবি পেল। সে ছবি যে ওর নিজের ছোটবেলাকার সে আর বলে দিতে হলো না। ঐ বাক্সেই কিছু গুলিও পেল।

হঠাৎ কানে মানুষের গলার শব্দ এলো, ওরা ফিরে এসেছে। পালাতে হবে। মালবিন বাইরে দাঁড়িয়ে কাউকে হুকুম দিচ্ছিল, সেই সুযোগে তাঁবুর অন্য দিকের পর্দার তলা দিয়ে মেরিয়ম বেরিয়ে পড়ল। তাঁবুর পিছনে কুঁড়েঘরের আড়াল দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে সরে যেতে যেতে মেরিয়ম বুঝতে পারল ততক্ষণে তাঁবুতে ঢুকে বাক্সের অবস্থা দেখে মালবিন মহা চ্যাঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছে। ছোটবেলার ছবিটি কোমরে গুঁজে মেরিয়ম আবার গাছের ঘন ডালপালার আড়ালে লুকোল। সেখান থেকে খানিক বাদে মালবিনকে আবার বেরিয়ে যেতে দেখল। এবার ক্যাম্পে কয়েকজন পাহারাদার রইল। দক্ষিণ মুখে চলে গেল মালবিন। তারপর মেরিয়ম সাবধানে ক্যাম্পের এলাকা এড়িয়ে নদীর পথ ধরল। নদীর ধারে কেন্যু বাঁধা থাকে। মেরিয়ম ও-পারে যেতে চায়। নৌকো ঘাটটি ক্যাম্প থেকে দেখা যায়, কাজেই রাত অবধি অপেক্ষা করা দরকার।

একটু বাদেই মালবিন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে কেন্যুগুলোকে গুণল। ওর বোধ হয় সন্দেহ হয়েছিল মেরিয়ম না নৌকো নিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকে। সব নৌকো আছে দেখে মালবিন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো। তারপর একটা ছাড়া বাকি সব নৌকোয় দলবল নিয়ে উঠে, ওরা উজানে চলল। একটা নৌকো আর একটা দাঁড় পড়ে রইল। এই তো সুযোগ, এই ভেবে মেরিয়ম সেই নৌকোটিতে উঠে নৌকো খুলে দিল। এইটাই মালবিন চেয়েছিল। কিন্তু সে যে এত শীঘ্র এসে পড়বে তা ভাবেনি। ওর তখন খেয়াল হলো, মেরিয়ম তখন অর্ধেক পথ পার হয়ে মাঝনদীতে।

রেগেমেগে সবাইকে গাল দিতে লাগল মালবিন। আবার ওরা গাদাগাদি করে নৌকোয় উঠে মেরিয়মের পিছু নিল। শিকার বুঝি পালাল ভেবে মালবিন একবার গুলি ছুঁড়ল। ভাগ্যিস্ একটা ডুবন্ত গাছে মেরিয়মের নৌকোর মাথাটা গিয়ে আটকে ছিল। তার ডালপালায় গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। মেরিয়ম এক লাফে গাছে আশ্রয় নিয়ে, অদৃশ্য হয়ে গেল।

খানিক বাদে একটু খোলা জায়গা আর কয়েকটা পুরানো কুঁড়েঘরের ধ্বংসাবশেষ অনেক দিন আগের এক গ্রামের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছিল। সেই খোলা জায়গাটা পার হলেই নিরাপদ হওয়া যায়। তার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে থেকে অনেক জোড়া চোখ যে ওকে নজর করছে, তা সে টেরও পেল না।

ঐ জায়গার এক মাইল পূর্বে ছেঁড়া খাকি পোশাক পরা একটা লোক ক্লান্ত, অবসন্ন, মলিন দেহে অতি কষ্টে এগোচ্ছিল। মালবিনের গুলির শব্দে সে থমকে দাঁড়াল। ছোকরাও বলল, 'আমরা প্রায় এসে গেছি হুজুর।' তার গলার স্বরে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল। ঐ অবসন্ন লোকটি হলো বেন্‌স্। সব মানুষের মনের গভীরে খানিকটা মহত্ত্ব থাকে, বাইরে সে যতই জঘন্য কাজ করুক। অমানুষিক কষ্ট সয়ে শৌখীন বেন্‌সের অন্তরের মহত্ত্ব ফুটে বেরিয়েছিল।

ওরা হোঁচট খেতে খেতে সেই গুলির শব্দের দিকে চলল। ছোকরার হাতে অস্ত্র ছিল না। কিন্তু বুক ভরা মালবিনের প্রতি যে কত ঘৃণা আর বিদ্বেষ, একথা বেন্‌স্ সন্দেহও করেনি। এবার লড়াই আসন্ন বুঝে বেন্‌স্ তার হাতে বন্দুকটা দিল। নিজের জন্য রিভলবারই যথেষ্ট।

আরো কিছু গোলাগুলির শব্দ, অসভ্যদের গলার কিছু চিৎকার, তারপর চুপ। বেন্‌স্ এগিয়ে চলেছিল। কখনো আছাড় খাচ্ছে, আবার উঠে হাঁটছে। কখনো ভুল পথে গিয়ে ফিরতে হচ্ছে। তারপর একটা পরিত্যক্ত গ্রাম। তার মধ্যিখানের পথে একটা কালো মানুষের সদ্য-নিহত দেহ। আর কোথাও জনমানুষের চিহ্ন নেই। ছুটে গেল বেন্‌স্ নদীর ধারে, ছোকরাও সঙ্গে গেল। দাঁড়ের শব্দ কানে এলো। ঝোপঝাপের ফাঁক দিয়ে ছোকরা চিনতে পারল ওপারে মালবিনের ক্যাম্প পাতা হচ্ছে। মালবিনের নৌকোগুলো সেই দিকে চলেছে।

বেন্‌স্ বলল, 'কি করে পার হওয়া যায়?'

ছোকরা মাথা নাড়ল। নৌকো-টৌকো এপারে নেই। নদীতে কুমিরের আস্তানা। হঠাৎ চোখে পড়ল ডুবন্ত গাছের ডালপালায় একটা নৌকো আটকে আছে। মেরিয়মের সেই নৌকো! তাতেই উঠে পড়ল দু'জনে। ঠেলে জলে ভাসাল নৌকো। ওপারে মালবিনের দল তাদের কেন্যু থেকে নামছে। প্রথম নৌকো থেকে মালবিন নেমে নদীর দিকে ফিরে তাকাল। অন্য নৌকোটা দেখে সে চমকে উঠল। অনুচরদের ডেকে জানান দিল।

তারপর অপেক্ষা করে রইল। একটা নৌকো আর দুটো মানুষ, ওর ঐ দলবলের সঙ্গে কি করবে? একজন অনুচর বেন্‌সের ছোকরাকে চিনতে পারল। তখন মালবিনের খেয়াল হলো অন্য লোকটা তাহলে বেন্‌স্! নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। একটি মাত্র সঙ্গী নিয়ে ঐ বিপদসঙ্কুল পথ দিয়ে ওর পিছন পিছন এতদূর এসেছে বেন্‌স্! কেন্যু আরেকটু কাছে এলে মালবিন বন্দুক তুলে বলল, 'তুমি কি চাও?'

—'তোমাকেই চাই, পাপিষ্ঠ!' এই বলেই বেন্‌স্ গুলি চালাল। মালবিনও গুলি করল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে নৌকোয় পড়ে গেল। বেন্‌স্ও প্রায় একই সময় নৌকোয় ঢলে পড়ল। ছোকরা দোমনায় পড়ল। মালবিন মরে গিয়ে থাকলে, নিরাপদে সঙ্গীদের সঙ্গে মেলা যায়। কিন্তু যদি শুধু আহত হয়ে থাকে, তাহলেই মুশ্‌কিল। বেন্‌সের প্রতি তার মনে ভারি শ্রদ্ধা জন্মেছিল। হঠাৎ দেখল বেন্‌সের দেহে প্রাণ আছে, সে নড়ে বসতে চেষ্টা করছে। ছোকরা তার কাছে যাবে বলে উঠে দাঁড়াতেই, বেচারির কপালে একটা গুলি লাগল আর তার প্রাণহীন দেহটা জলে পড়ে গেল। এদিকে অনেক কষ্টে বেন্‌স্ একটু মাথা তুলে দেখল মালবিন খুবই আহত হলেও, আবার তাক্ করছে। বেন্‌স্ অমনি শুয়ে পড়ল। গুলিটা মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। বেন্‌স্ বুঝতে পারছিল তার নৌকোটা স্রোতের মাথায় ভেসে

যাচ্ছে, তবু আরেকবার গুলি করল, অনেক যত্নে তাক্ করে। সে গুলিটা মালবিনের গায়ে লেগেছে, তাও বোঝা গেল। কিন্তু সে মরেনি। আবার সে গুলি করল এবং তার প্রতিদানও পেল। এই ভাবে চলতে লাগল, যতক্ষণ না স্রোতে ভেসে, বেন্‌সের নৌকো বাঁক ঘুরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

মেরিয়ম সেই গাঁয়ের পরিত্যক্ত পথটার অর্ধেকটাও পার হয়নি, এমন সময় জনাকুড়ি সাদা পোশাক পরা নিগ্রো তাকে ঘিরে ফেলল। মাথা ঘুরিয়ে যার মুখের উপর চোখ পড়ল, সে হলো সেই বুড়ো শেখ, যাকে ছোটবেলা থেকে ও বাবা বলে জানত। কাষ্ঠ হেসে শেখ বলল, 'শেষ পর্যন্ত ভিখিরির মতো নিজের লোকদের কাছে ফিরে এসেছ?'

মেরিয়ম বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কিছু চাই না, খালি বড় বোয়ানার কাছে ফিরে যেতে চাই।'

শেখ রাগে অন্ধের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'তার কাছে ফিরে যেতে চাও বুঝি? এখানে তোমার পিছন পিছন কে ধাওয়া করেছে?'

—'সেই সুইড যে আমাকে একদিন এম্‌বিডার সাহায্যে তোমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।'

শেখের দু-চোখ জ্বলে উঠল। তখুনি তার লোকজন ছুটল নৌকোগুলোকে ধরতে। শেখের অবস্থা আগের মতো নেই। বড় বোয়ানার কড়া শাসনে, তাঁর এলাকায় পা দেবার জো ছিল না। হাতির দাঁতের চোরাই ব্যবসা আর তেমন চলছিল না। ততক্ষণে আহত দেহ নিয়ে মালবিন নৌকো থেকে সবে নেমেছিল, শেখের উপর চোখ পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে নৌকায় চড়ে রওনা দিল।

এদিকে মেরিয়মকে ধরার চেষ্টায় ছিল না শেখ। একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়ে একলা পড়েছে দেখে তাকে বন্দী করেছিল। তারপর চেয়ে দেখে এ তো তারই পালিত কন্যা! প্রথমটা মেয়েটাকে ধরে খুব খানিকটা পিটল শেখ। তারপর তাকে নিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে গেল। মাবুনু তখনো বেঁচে ছিল। ওকে দেখে ফোকলা মুখের হাসি দেখে কে!

আবার সেই পুরানো জীবনে ফিরে গেল মেরিয়ম। চারদিকে উঁচু বেড়া, ফটক সর্বদা বন্ধ। তার মধ্যে মেরিয়ম ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে পারত। একদিন একলা বসে মালবিনের বাক্স থেকে নেওয়া পুরানো ছবিটা বের করে, অবাক হয়ে ভাবছিল এ তারই ছোটবেলার ছবি! কোথায় কে তুলেছিল কে জানে? হঠাৎ কাঁধে একটা হাত পড়ল। মেরিয়ম ভাবল এ নিশ্চয় শেখের হাত! এক্ষুণি মেরে পাট করবে। কিন্তু ছবিটা লুকিয়ে ফেললেও, কেউ তাকে মারল না।

ফিরে দেখে এ তো শেখ নয়, এ যে শেখের আত্মীয় এবং অনুচর আবদুল কামাক! তাকে ছবিটা দেখাতেই সে বলল, 'এ তো তোমার ছবি। লেখাগুলো পড়েছ?'

মেরিয়ম বলল, 'আমি ফরাসী পড়তে পারি না।'

আবদুল কামাক তখন বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি শেখকে দেখতে পারি না।'

পিছন থেকে কে বলল, 'তুমি শেখকে দেখতে পারো না, না?'

কামাক এক ধাক্কা দিয়ে বুড়োকে মাটিতে ফেলে, লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে, বন্দুক তুলে সব বাধা সরিয়ে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শেখ মেরিয়মকে বলল, 'কি ছবি, দেখি।'

—'ও যে নিয়ে চলে গেল।'

—'কি লেখা ছিল?'

—'আমি জানি না। ফরাসী লেখা পড়তে পারি না।'

শেখ খালি বলল, 'মাবুনু আর আমার সঙ্গে ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলবে না।' এই বলে চলে গেল।

এদিকে আহত বেন্‌স্‌কে নিয়ে স্রোতে ভেসে চলেছিল কেন্যুটা। অনেকক্ষণ সে প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে ছিল, তারপর আস্তে আস্তে একটু সুস্থ বোধ করলে উঠে বসল। মনে হলো রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে, আঘাতগুলো হয়তো তেমন গুরুতর নয়। মেরিয়মের কথা মনে হতেই দুঃখে মন ভরে যাচ্ছিল। হ্যান্‌সন যদি মরে যায়, তাহলে তার দলের ঐ সব দুরাচারগুলোর হাতে সে বেচারিকে পড়তে হবে! এখন বেন্‌সের একমাত্র চিন্তা হলো নিরাপদ আশ্রয় থেকে মেরিয়মকে তুলে এনে সে যে বিষম অন্যায় করেছে, কি করে তার প্রতিকার করা যায়।

মনের অদ্ভুত অবস্থা। ভীতু মানুষ, কিন্তু এখন তার ভয়-ডর বলে কিছু নেই। তীরে উঠতে হবে তাকে, যেমন করে হোক। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছিল, তারই মধ্যে হঠাৎ মনে হলো নৌকোটা স্রোতের টানে তীরের কাছে এসে গিয়েছে। সেখানে একটা বড় গাছ যেন জলের উপর ঝুঁকে আছে মনে হলো। বহু কষ্টে শরীরের শক্তি একত্রিত করে বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে, গাছের একটা ডাল ধরে নিজেকে

টেনে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল বেন্‌স্‌। ছেড়ে দিলেই জলে পড়ে যাবে, কিন্তু এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে অমানুষিক চেষ্টায় কতক্ষণে উঠতে পারবে? নিচে কুমির আনাগোনা করছে। সিংহ ঘোরাঘুরি করছে। হঠাৎ মনে হলো মাথার উপরের ডালে কিছু একটা বা কেউ নড়াচড়া করছে। তারপর একটা নরম গরম হাত ওর হাতের উপর পড়ল। কে ওকে টেনে নিরাপদে গাছের ডালে তুলে নিল।

ঐ বনের মধ্যে তান্তরের পিঠে চড়ে কোরাক ক্রমাগত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসছিল। এভাবে যেতে যেতে শেখের দলের পায়ের চিহ্ন ওর চোখে পড়ল। কাছেই নদী, সেখানে মাছ পাওয়া যেতে পারে। সন্ধ্যাবেলায় নদীর কিনারায় গাছের ডালে কোরাক শুয়ে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ নিচে স্পষ্ট শুনল কে ইংরিজিতে বলে উঠল, 'ইশ্‌, আরেকটু হলেই ব্যাটা ধরেছিল আমাকে!'

গলাটা চেনা মনে হলো। অমনি হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিরাপদে তুলে আনল। নিচে নুমা হাঁক-ডাক করছিল, বেন্‌স্‌কে আরেকটু নিরাপদে তুলে নিল কোরাক। তারপর পরিষ্কার ইংরিজিতে বলল, 'তুমি কে?'

বেন্‌স্‌ চমকে উঠল। 'সে কি! তুমি মানুষ নাকি?'

—'কেন? কি ভেবেছিলে?'

—'বোধহয় গোরিলা।'

কোরাক হাসল, 'তুমি কে?'

—'আমি বেন্‌স্‌, একজন ইংরেজ। তুমি কে?'

—'সবাই আমাকে বলে কোরাক। তোমাকে একজন মেয়ের সঙ্গে দেখেছিলাম। এখানে কি করছ?'

—'তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। হ্যানসন বলে সুইড ব্যবসাদার তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।'

সব কথা শুনে কোরাক বেন্‌সের জন্য কিছু ফলমূল, টিনে জল ভরে রেখে বলল, 'এখানে নিরাপদে থাক। আমি তাকে নিয়ে আসছি।'

বেন্‌স্‌ বলল, 'গায়ে একটু জোর পেলেই আমিও আসছি।'

কোরাক তাড়াতাড়ি উত্তর দিকের পথ ধরল। পরে ওর অনেক পিছনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেন্‌স্‌ও চলল। সে দু-মাইল যাবার আগেই কোরাক নদীর তীরে মালবিনের ক্যাম্পের উল্টো পারে পৌঁছে গিয়েছিল। সেদিকে সন্ধ্যার আগে বেন্‌স্‌ দেখল ঘোড়ায় চেপে একজন আরব ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছে। বেন্‌স্‌ গা-ঢাকা দিয়ে রইল। সে লোকটা আবদুল কামাক।

আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই আরেক দল আরব তাকে ঘিরে ফেলল। তারপর তাকে বন্দী করে দক্ষিণ মুখে ফিরে চলল, এক দল এগিয়ে গেল।

এদিকে কোরাক ভাবছিল কি করে নদী পার হবে, হঠাৎ তান্তরের ডাক কানে এলো। কোরাক নিশ্চিন্ত হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তান্তর তাকে ঘাড়ে তুলে নিল। কোরাক বলল, 'তাড়াতাড়ি কর, তান্তর।'

মালবিনের ক্যাম্প থেকে এক মাইল দূরে হাতিরা নদী পার হয়, এটা কোরাক জানত। কুমির কিলবিল করলেও ওরা পার হয়ে গেল। তারপর মালবিনের ক্যাম্পে পৌঁছতেও দেরি হলো না। তান্তর কোরাককে নিয়ে বেড়া ভেঙে ঢুকে পড়ল। মালবিনের লোকরা যে যেদিকে পারে পালাল।

মালবিন তার তাঁবুর সামনে দোলনায় শুয়েছিল। শোরগোল শুনে অবাক হয়ে তাকাল সে। হাতিটা কয়েক পা দূরে থামল। মালবিন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দেখল, তার মাথা থেকে সেই সাদা বুনো মানুষটা নেমে এলো, যে একবার বেবুনরাজাকে ছেড়ে দিয়েছিল।

কোরাক বলল, 'মেয়েটা কোথায়?'

মালবিন বলল, 'তা আমি জানি না। এখানে কেউ নেই। তাকে চুরি করে আনবার জন্য বেন্‌স্‌ আমাকে ভাড়া করেছিল। তাকে যদি চাও তো শেখের ডেরায় যাও। ছোটবেলা থেকে শেখ বলে ও নাকি ওরই মেয়ে।'

—'ওর মেয়ে নয়?'

—'না।'

—'কার মেয়ে?'

—'ওকে খুঁজে আনলে, তবে বলব। কিন্তু আমার প্রাণ বাঁচাতে হবে, পুরস্কারের ভাগ দিতে হবে।'

—'তাই দেবো। কিন্তু যদি মিথ্যে কথা বলে থাক তবে তুমি বাঁচবে না।'

মালবিনের তাঁবু দেখতে কোরাক যেই ভিতরে ঢুকেছে, তান্তরের একটা অনেক দিনের পুরানো কথা মনে পড়তেই, শুঁড়টাকে কাছে এনে সে মালবিনকে আগাগোড়া শুঁকল। এই তো সেই! হ্যাঁ, এ-ই তো তান্তরের স্ত্রীকে মেরে ফেলেছিল।

তান্তরের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। মালবিন কোরাককে ডেকে বলল, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' কিন্তু কোরাক এসে পৌঁছবার অনেক আগেই মালবিনকে শুঁড়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলে, পায়ে দলে শেষ করে দিয়েছিল তান্তর। তারপর আবার শান্তশিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে ছিল তান্তর। কোরাকের একমাত্র দুঃখ মেরিয়মের পরিচয়টা জানা হলো না। দূর থেকে ভয়ে আধমরা মালবিনের লোকরা দেখল সাদা দৈত্যটা আবার হাতির মাথায় বসে বনে চলে গেল।

শেখের লোকরা যখন আবদুল কামাকের বদলে একটা অবসন্ন আহত ইংরেজকে ধরে আনল শেখ ভারি বিরক্ত হলো। 'কে তুমি?'

—'আমি লণ্ডনের অনরেব্‌ল্ মরিসন বেন্‌স্।'

—'আমার দেশে চোরা কারবার করছ কেন?'

—'আপনি যে গোটা আফ্রিকার মালিক, তা তো আমার জানা ছিল না। এক বন্ধুর বাড়ি থেকে একটি মেয়ে চুরি গিয়েছে, আমি তার খোঁজে বেরিয়েছি।'

শেখ বলল, 'ঐ মেয়েটি নাকি?'

বেন্‌স্ চেয়ে দেখে অবাক হলো, 'মেরিয়ম!'

শেখ বলল, 'তুমিই আমার মেয়ে চুরি করেছিলে?'

—'তোমার মেয়ে?'

—'হ্যাঁ। কোনো কাফেরের সঙ্গে ওর বিয়ে হতে পারে না। তোমার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত। তবে যথেষ্ট মূল্য দিলে ছেড়ে দিতে পারি।'

বেন্‌স্ বলল, 'কত দিতে হবে?'

শেখ যা বলল, বেন্‌স্ তাতে রাজি ছিল। শেখ তখন অ্যাল্‌জিয়ার্সে ব্রিটিশ কন্‌সালকে টাকা পাঠানোর জন্য বেন্‌স্‌কে দিয়ে এক চিঠি লেখাল। চিঠির ভাষা থেকে বোঝা গেল এ-কাজে সে বেশ দক্ষ।

তারপর শেখের হুকুমে বেন্‌সের হাত পা বেঁধে একটা কুঁড়ে ঘরে ফেলে রাখা হলো, কোনো আপত্তি কেউ শুনল না। জঘন্য নোংরা ঘরটা, পোকার কামড় খেয়ে বেচারা অস্থির।

পাশের ঘরে একজন মেয়ের গলা শোনা গেল। মেরিয়ম নাকি? তাকে শুনিয়ে বেন্‌স্ 'গড সেভ-দ্য কিং' এর এক ছত্র গাইল। উত্তরে মেরিয়ম বলল, 'বিদায়, মরিসন। ভগবানের দয়া হলে কাল সকালের আগেই আমার মরণ হবে। যদি না হয়, তাহলে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু হবে।'

তাড়াতাড়ি এগোনো দরকার হলে কোরাক নিজের বাহুবল ছাড়া আর কিছুর উপর নির্ভর করত না। তান্তর ওকে শেখের ডেরার কাছে নদী পার করিয়ে দেওয়ামাত্র, কোরাক একাই সেখানে চলল। একটা ফাঁসের সাহায্যে বেড়া টপকানো ওর কাছে কিছু নয়। এতটুকু টের পেল না কেউ। বেন্‌সের 'গড সেভ দ্য কিং' শুনতে পেল সে। উত্তরটাও শুনল। রাতের খাবার পর মাবুন্ধু আর মেরিয়ম শুতে গেল। এর মধ্যে শেখ ডাকল, 'মেরিয়ম, এদিকে এসো।' মেরিয়ম বেরিয়ে এসে দেখল শেখের সৎভাই একটা গালচেতে বসে আলবোলা টানছে।

শেখ বলল, 'আমার বয়স হয়েছে, বেশি দিন বাঁচব না। তোমাকে আমার ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি।' ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। আলি বেন কাদিম মেরিয়মকে হিড়হিড় করে টেনে নিজের ঘরে নিয়ে চলল। এই সময় বেন্‌স্ বেন কাদিনের পাহারাওয়ালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার হাত-পায়ের বাঁধন সে খুলে ফেলতে পেরেছিল। পাহারাদারের টুঁটি চেপে ধরল বেন্‌স্, সে লোকটা ওকে বারবার ছোরা মারতে লাগল। শেষটা হাতের কাছে একটা পাথর পেয়ে তাই দিয়ে লোকটার মাথায় আঘাত করতেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

তারপর বেন্‌স্ বেন কাদিমের তাঁবুর দিকে চলল। কিন্তু তার আগেই দেয়ালের পিছন দিকটা কেটে সেখানে কোরাক পৌঁছেছিল। তাকে দেখে মেরিয়ম বিস্ময়ে আনন্দে আট-খানা! 'কোরাক!'

কোরাক বলল, 'মেরিয়ম!' এই বলেই আলি বেন কাদিমের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। ঘরে তিনজন নিগ্রো দাসী ছিল, তারা ভয়ে পালাল। এক মুহূর্তে বেন কাদিমের গলা টিপে ধরে, কোরাক তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিল।

এদিকে বাইরে শোরগোল শুরু হয়েছিল। ফাঁসটা বেন্‌সের হাতে দিয়ে, কোরাক বলল, 'মেরিয়মকে নিয়ে বেড়া টপকে পালাও। আমি শেখের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি।'

ওরা পালিয়ে গেল, কিন্তু দলে দলে শেখের লোকরা কোরাককে ঘিরে বেঁধে ফেলল। শেখ-ও এসে হাজির

হলো। আলি বেন কাদিম মরেছে বলে তার কোনো দুঃখ ছিল না। কিন্তু এই লোকটাকে ক্ষমা করা যায় না। একে কিভাবে সাজা দেবে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

বাইরে হাতির আওয়াজ শোনা গেল। সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে অদ্ভুত এক ডাক দিল কোরাক। তাই শুনে তান্তরের দু কান খাড়া। কাঁধের ঠেলা দিয়ে বেড়া ভাঙা সহজ নয়। দু-একবার চেষ্টা করে, শেষটা দূর থেকে ছুটে এসে মাথা দিয়ে ঢুঁ মেরে বেড়া ভেঙে ফেলল।

ততক্ষণে কোরাককে পুড়িয়ে মারা ঠিক হয়েছিল। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে, চারদিকে আগুনও জ্বালা হয়েছিল। আগুনের ছ্যাঁকা লাগছিল কোরাকের গায়ে। শেখ মজা দেখছিল। আর যারা ছিল, তাদের একজন হঠাৎ ফিরে দেখে তান্তরের বিশাল দেহ চলন্ত শমনের মতো এগিয়ে আসছে! লোকটা চিৎকার করে দৌড় দিল। মত্ত গজের মতো তান্তর ধেয়ে এলো, পথে যাকে পেল শুঁড়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। শেখ বন্দুক আনতে তাঁবুর দিকে দৌড়েছিল, তান্তর কোরাকের শরীরটাকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে খুঁটি সুদ্ধ তুলে নিল। তারপর যে পথে এসেছিল, সেই দিকে চলল। পথে শেখ বন্দুক এনে একটা গুলি ছুঁড়েছিল, তান্তরের গায়ে লাগেনি। সে তাকে মাড়িয়ে পিষে মেরে ফেলে কোরাককে নিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

মেরিয়েম আর বেন্‌স্‌ও শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে পালাতে পেরেছিল। শেখের দুটি ঘোড়ায় চড়ে, সকলের সামনে দিয়ে তারাও চলে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটার শেষ না দেখে যায়নি। গ্রামের লোকরা গুলি ছুঁড়েছিল, কিন্তু ওরা ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে বনে পৌঁছে উত্তর দিকের চেনা পথ ধরেছিল।

তান্তর কোরাককে ঘন বনে নিরাপদে নামালেও তার বাঁধন খুলতে পারেনি। সারা রাত চেষ্টা করেও কোরাক নিজে কিছু করতে পারেনি, ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছিল।

ততক্ষণে বেন্‌স্‌ আর মেরিয়ম ঘোড়ায় চড়ে উত্তর মুখে চলেছিল। মেরিয়ম বলছিল, 'তারপর বোয়ানাকে নিয়ে আমি ফিরে এসে কোরাককে খুঁজে বের করব।' সারা রাত এগোবার পর খানিকটা বেলা হলে পর স্বয়ং বোয়ানা আর তাঁর ওয়াজিরিদের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন, 'সত্যি দেখেছ কোরাককে, মেরিয়ম?'

—'স্পষ্ট দেখেছি। আমার সঙ্গে চল, ওকে খুঁজে বের করি।'

বেন্‌সের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমিও দেখেছ তাকে?'

—'স্পষ্ট দেখেছি।'

—'কেমন দেখতে? বয়স কত হবে?'

—'ইংরেজ নিঃসন্দেহে। হয়তো আমার বয়সী। চমৎকার বলিষ্ঠ শরীর, রোদে পোড়া রং।'

—'ওর চুল, ওর চোখ কেমন লক্ষ্য করেছিলে?'

মেরিয়ম বলল, 'কালো চুল, ছাই রঙের চোখ।'

বোয়ানা তাঁর ওয়াজিরি সর্দারকে বললেন, 'এঁদের বাড়ি নিয়ে যাও। আমি একটু বনে যাচ্ছি।'

মেরিয়ম বলল, 'আমিও যাই, আমিও যাই।'

—'না, তুমি যাকে ভালোবাস, তোমার জায়গা তার কাছে।'

ওরা রওনা হয়ে গেল। বোয়ানা চেয়ে রইলেন, এই মেয়েটিকে উনি সন্তানের মতোই স্নেহ করতেন আর বেন্‌সের আগে যত দোষই থাকুক, তার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত ও করেছে। তবু কেন মনে হচ্ছিল এ ছেলে মেরিয়মের যোগ্য নয়।

ওরা চলে গেলে বোয়ানা এক লাফে গাছে উঠে গেলেন। কাপড়-চোপড় জুতো টুপি সব ছাড়লেন। হরিণের চামড়া পরলেন, একটা দড়ির ফাঁস আর চিরকালের ছোরাটি নিলেন। এ-সব সঙ্গেই থাকত। গাছে গাছে পূর্ব-দক্ষিণে চললেন। থেকে থেকে বনমানুষের সেই অদ্ভুত ডাক দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে একটা ক্ষীণ উত্তরও পেলেন।

কোরাক সেই খুঁটিতে বাঁধা অবস্থাতেই পড়েছিল। এই ভাবেই মরবে নাকি? শেষটা তান্তরকে বুঝিয়ে দিল ওকে তুলে উত্তর-পুবে চলতে। হয়তো আকুটের দলের কেউ কাছাকাছি থাকতে পারে। সে হয়তো খুঁটির বাঁধন খুলে দিতে পারে। তাই থেকে থেকে দলের ডাক দিতে লাগল কোরাক।

এদিকে মেরিয়ম ওয়াজিরি অনুচরকে বলেছিল, 'আমি বোয়ানার সঙ্গে যাচ্ছি।' সে কিছুতেই ছাড়বে না, বোয়ানা বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছেন। তখন উপায় না দেখে, এক লাফে গাছে চড়ে মেরিয়ম পালাল। তাকে অনুচররা খুঁজে খুঁজে পেল না। এদিকে বেন্‌সের শরীর আর কত সইবে? তার আঘাতগুলো টাটিয়ে উঠেছিল। জ্বরের ঘোরে সে ভুল বকতে শুরু করেছিল। তাকে এখনি বাংলোতে নিয়ে যাওয়া দরকার।

কয়েক ঘণ্টা গাছে গাছে এগোবার পর মেরিয়ম বনমানুষের ডাক শুনতে পেল। এবার সে যেন উড়ে চলল।

নাকে এলো হাতির গন্ধ। হঠাৎ তান্তরকে দেখতেও পেল। তার মাথার উপর খুঁটিতে বাঁধা কোরাক!

'কোরাক!' বলে মেরিয়ম ডাক দিল। তান্তর অমনি মাথা থেকে খুঁটিসুদ্ধ কোরাককে নামিয়ে, তাকে রক্ষা করতে তৈরি হলো।

কোরাক বলল 'মেরিয়ম!'

মেরিয়ম অমনি গাছ থেকে নেমে খুঁটির বাঁধন খুলতে ছুটল। কিন্তু তান্তর মাথা নিচু করে ফিরে দাঁড়াল। কোরাক ডেকে বলল, 'ফিরে যাও মেরিয়ম, নইলে ও তোমাকে মেরে ফেলবে!'

মেরিয়ম বলল, 'তান্তর, আমাকে ভুলে গেলে? কতবার তোমার পিঠে উঠেছি।' কিন্তু তান্তর অবুঝ।

কোরাক কত বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু সব বৃথা। শেষটা মেরিয়মকে বলল, 'তুমি চলে যাবার ভান কর, যেদিকে বাতাস বইছে সেদিকে যেও। তাহলে ও গন্ধ পাবে না। আমি ওকে যা হয় কিছু বলে একটু দূরে পাঠাই, তুমি সেই ফাঁকে এসে দড়ি কেটে দিও।'

মেরিয়ম বলল, 'চেষ্টা করা যাক। কিন্তু ও বেজায় ধূর্ত।'

কোরাকের কথা মতো মেরিয়ম সরে গেল। কোরাক তান্তরকে বলল আবার তাকে তুলে নিয়ে এগোতে। তাই করল তান্তর। এমন সময় দূর থেকে আবার বনমানুষের ডাক শোনা গেল। আকুট আসছে! তান্তর তাকে ভালো করেই চেনে। খানিক বাদে একটা ঝরনার কাছে ওকে নামাতে বলল কোরাক। আকুটের ডাকে সে উত্তর দিয়েছিল। কোরাক তান্তরকে শুঁড়ে করে জল আনতে বলল। ঝরনাটা দু-তিন শো গজ দূরে ছিল। তান্তর জল আনতে গেল। মেরিয়মও ছোরা হাতে গাছ থেকে নেমে কোরাকের কাছে ছুটল।

তান্তর কিন্তু কাছেই ছিল, ওর মনে বড় সন্দেহ। মেরিয়মকে দেখে বিকট ডাক ছেড়ে ওর দিকে তেড়ে এলো। কোরাকের গায়ে ঘাম ছুটল। কত ডাকল তান্তরকে, কত বোঝাল, কোনো ফল হলো না। আর কয়েক পা এগোলেই মেরিয়মকে ধরে ফেলবে! ঠিক সেই মুহূর্তে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখে কোরাকের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার যোগাড় করল! গাছ থেকে তান্তরের সামনে লাফিয়ে নামল বিশাল-দেহ সাদা একজন দৈত্য। হাতে দড়ির ফাঁস, কোমরে ছোরা গোঁজা, প্রায় খালি গা। তার মুখ থেকে তীক্ষ্ণ এক হুকুম বেরোল আর তান্তর থমকে দাঁড়াল। মেরিয়ম অমনি গাছের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেল। কোরাক সেই মানুষটির মুখ চিনতে পেরে বিস্ময়ে অভিভূত হলো। তান্তরের সব রাগ কোথায় উপে গেল।

তারপর দৈত্য কোরাকের দিকে এগোলেন, তান্তর ভালোমানুষের মতো তাঁর পায়ে পায়ে চলল। তিনি উপর দিকে চেয়ে বললেন, 'এসো, মেরিয়ম।' মেরিয়ম অমনি নেমে এলো। কোরাক তাঁদের দিকে চেয়ে রইল। তার চোখ ভরা বিস্ময়, অনুতাপ আর কৃতজ্ঞতা।

সাদা দৈত্য ডাকলেন, 'জ্যাক্!' বলে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। কোরাক বলল, 'বাবা! ভাগ্যিস তুমি এলে। নইলে অন্য কেউ তো তান্তরকে থামাতে পারত না।'

তিনি ওর বাঁধনগুলো কেটে দিলেন: ছেলে উঠে বাপকে জড়িয়ে ধরল। তখন মেরিয়মের দিকে চেয়ে বোয়ানা বললেন, 'তোমাকে না খামারে ফিরে যেতে বলেছিলাম?'

মেরিয়ম গলা টাকে ছোট করে বলল, 'তুমিই তো বলেছিলে আমি যাকে ভালোবাসি, তার কাছে আমার জায়গা!'

হঠাৎ তান্তরের গলায় গুড় গুড় শব্দ শুনে তিনজন জঙ্গুলে মানুষই সেদিকে ফিরল। ডালপালার ফাঁক দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বনমানুষের ঘাড় আর মাথা দেখা গেল। এক মিনিট সে তাকিয়ে রইল, তারপরেই আনন্দে চিৎকার করে থপ্ থপ্ করে ছুটে এলো। 'টারজান ফিরে এসেছে! বনের রাজা টারজান এসেছে!'

ঐ বনমানুষটি আকুট ছাড়া আবার কে! কি তার ফূর্তির লাফঝাঁপ আনন্দ উল্লাস! তার চেয়েও বড় রাজা এসেছে! খুশি রাখার সে জায়গা পাচ্ছে না। ওর পিছন পিছন ওর বন-মানুষের দলও নেমে এলো। তারপর সে কি ধেই ধেই নাচন, সে কি বিকট হৈ-চৈ। যারা জানে না, তারা দেখলে হয়তো ভাবত ওরা খুব রেগেছে, আসলে ঐ হলো ওদের আনন্দ জানাবার নিয়ম। কোরাক আদর করে বাপের পিঠে হাত রেখে বলল, 'টারজান শুধু একজনই আছে। তার মতো কেউ হতে পারে না!'

এর দুদিন বাদে ওরা তিনজন খামারের কাছে গাছ থেকে নামল। টারজান এর আগেই তার গাছে লুকোনো ভদ্রবেশ ধারণ করেছিল, কিন্তু কোরাক বলল, 'এরকম খালি গায়ে মা'র কাছে কি করে যাব?'

মেরিয়ম তার কাছে রইল, টারজান কাপড়চোপড় আনতে বাংলোতে গেল।

দু'চোখ ভরা বেদনা আর দুশ্চিন্তা নিয়ে মাই ডিয়ার ছুটে এলেন। 'কোথায় সে? ওকেও হারালে আমি সইতে পারব না।'

লর্ড গ্রেস্টোক হাসতে লাগলেন। মাই ডিয়ার ব্যাকুল ভাবে বললেন, 'বল, বল, কি হয়েছে!'

—'ভাবছি, এ জীবনের সবচেয়ে আনন্দের খবরটা দু'জনে সইব কি করে!'

—'কি খবর, জন? মেয়েটাকে পেয়েছ তো?'

—'পেয়েছি। ছেলেটাকেও।'

মাই ডিয়ার স্তম্ভিত, 'কোথায় সে? কোথায় তারা?'

—'বনের ধারে। খালি বাঘছাল পরে ছেলে মায়ের সামনে আসতে চাইছে না।'

—'নিয়ে যাও, ওর সব কাপড়-চোপড় যত্ন করে রেখে দিয়েছি। এনে দিচ্ছি।'

লর্ড গ্রেস্টোক খুব হাসলেন, 'ওসবে আর চলবে না জেন, বরং আমার কাপড়-চোপড় কিছু দাও। তা-ও ছোট না হলে বাঁচা যায়। তোমার ছোট্ট ছেলে মস্ত হয়ে গেছে যে!'

এক ঘণ্টা পরে বাপের পোশাক পরে কোরাক মায়ের কাছে এলো। সেই মায়ের চোখে মুখে গভীর ভালোবাসা আর এত দুঃখ দেওয়ার জন্য অসীম ক্ষমা ছাড়া কিছু ছিল না।

এই সুখের মিলনের মাঝখানে একটু দুঃখের কথাও ছিল। বেন্‌স্‌ তার আঘাতের কুফল কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে মারা গেছে। মেরিয়ম শুনে দুঃখিত হলো বৈ-কি, কিন্তু বোঝা গেল সে-রকম গভীর টান ছিল না।

লেডি গ্রেস্টোকের কাছে, মেরিয়ম যারই মেয়ে হোক না কেন, তার তুলনা হয় না। এখন তাঁদের ছেলে জ্যাকের সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয়, তার চেয়ে সুখের কারণ আর কিছু হতে পারে না। জ্যাকেরও যে সেই মত, সেটা বুঝতে দেরি হলো না।

এর কিছুদিন পরে স্থানীয় পাদ্রী ওদের বিয়ে দিলেন! তারপর ছেলে-বৌ নিয়ে লর্ড আর লেডি গ্রেস্টোক ইংল্যাণ্ডের জাহাজ ধরলেন। জ্যাকের কাছে চেনা হলেও, মেরিয়ম লণ্ডন শহর, পথের যানবাহন, হট্টগোল আর গ্রেস্টোকদের চমৎকার বাড়ি দেখে তাজ্জব বনে গেল। এই ক-বছরে মাই ডিয়ারের সযত্ন শিক্ষায় সামাজিক ব্যবহার সে ভালোই শিখেছিল, কাজেই তার জন্য কারো কোনো অসুবিধাও হল না। তাছাড়া অমন সুন্দরী মেয়েও কম দেখা যায়, বন্ধু-বান্ধবরা তাকে আদর করে নিল।

বাড়ি পৌঁছবার কয়েকদিন পরে টারজানের কাছে তার পুরনো বন্ধু ডার্ণো-র একটা চিঠি হাতে করে আনলেন বিখ্যাত জেনারেল জাকো। উচ্চ বংশজাত, কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে প্রিন্স উপাধি কবে ত্যাগ করেছেন। জাকো বললেন, 'আপনার কাছে এলাম, কারণ আমাদের অ্যাডমিরাল বললেন, আপনার মতো মধ্য আফ্রিকা অঞ্চলটা কেউ চেনে না। দশ বছরের বেশি হলো আফ্রিকায় আমার সাত বছরের মেয়ে চুরি হয়ে গিয়েছে। কত খোঁজ-তল্লাস, সামরিক তদন্ত, পুরস্কার ঘোষণা—সব করা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন থেকে তার আর খোঁজ পাইনি।

এক সপ্তাহ আগে একজন আরব যুবক আমার সঙ্গে

প্যারিসে—দেখা করল। তার নাম আবদুল কামাক। সে বলছে আমার মেয়ের খোঁজ পেয়েছে, তার কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারে। আপনি কি এ বিষয়ে কিছু শুনেছেন?'

—'কামাক কি কোনো প্রমাণ দেখিয়েছে?'

—'প্রমাণ বলতে একটা পুরানো ফটো, তার পিছনে একটা খবরের কাগজের কাটিং, সেই আমার পুরানো বিজ্ঞাপন। হয়তো কোথাও খুঁজে পেয়েছে।'

লর্ড গ্রেস্টোক বললেন, 'ফটোটা এনেছেন?'

জাকো একটা হলদে-হয়ে-যাওয়া ফটো বের করে দিলেন। লর্ড গ্রেস্টোকের মুখের ভাবটা যেন কেমন হয়ে গেল। তিনি একজন চাকরকে ডেকে বললেন, 'আমার ছেলের স্ত্রীকে একবার আসতে বলো তো!'

সঙ্গে সঙ্গে মেরিয়ম এলো। দু'জনে উঠে দাঁড়ালেন। গ্রেস্টোক পুত্রবধূর পরিচয় দিলেন না। অতিথির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ঐ ফটোটাতে ছিল মেরিয়মের শিশু-মুখ। তাই ঝপ করে একটা অভাবনীয় কথা মনে জেগেছিল।

জাকো একটিবার মাত্র মেরিয়মের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি কতদিন হলো এ-কথা জেনেছেন?'

—'এক্ষুণি। আপনার ফটো দেখে।'

বাপ আবেগ সহকারে জাকো বললেন, 'এ যে আমার সেই মেয়ে। ও কি করে আমাকে চিনবে? মা, আমি তোমার—'

আর বলতে হলো না। আহ্লাদে আটখানা হয়ে দু-হাত বাড়িয়ে মেরিয়ম তার বাপের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'চিনেছি, চিনেছি, সব মনে পড়ছে!'

বাপ তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তখনি লেডি গ্রেস্টোককে আর জ্যাক্‌কে ডাকা হলো। মেরিয়মের নিজের মা-বাবা আছেন শুনে সকলের কি আনন্দ! মেরিয়ম জ্যাক্‌কে বলল, 'তা হলে তুমি একজন অনাথা আরব মেয়ে বিয়ে করনি, বল!'

জ্যাক্ বলল, 'তা সে অনাথা আরবই হোক, কিম্বা টারমানগানিই হোক, আমার মেরিয়মকেই বিয়ে করেছি।'

জেনারেল জাকো বললেন, 'ওসব কিছুই বিয়ে করনি, বাবা। ও তো নিজের অধিকারেই রাজকন্যে!'

টারজান আর ওপারের রত্নগুহা

টারজান অ্যান্ড দি জুয়েলস অফ ওপার

টারজানের বিষয়ে চব্বিশখানা বই লেখা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথম চারটিতে মোটামুটি লর্ড গ্রেস্টোকের—যাঁকে সকলে বলতো বনমানুষের ছেলে টারজান—সংক্ষিপ্ত জীবনী পাওয়া যায়। বাকি কুড়িটি বইতে টারজানের জীবনের নানা অভাবনীয় ও চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা আছে। লেখক গোড়াতেই বলেছেন এ-সবের মধ্যে সামান্য ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া গেলেও, কাহিনীগুলি কাল্পনিক। পঞ্চম বই, 'টারজান এবং ওপারের রত্নগুহা'-ও সেই রকম একটি গল্প।

সদ্বংশজাত লেফটেনান্ট অ্যালবার্ট ওয়ার্পার কতকগুলি এমন অন্যায় কাজ করেছিল যে আর কেউ হলে সঙ্গে সঙ্গে তার সামরিক পদ থেকে বরখাস্ত হতো। নেহাৎ পারিবারিক সুনামের গুণেই তাকে ব্রাসেল্‌সের শৌখীন পরিবেশ থেকে সরিয়ে বেল্‌জিয়াম কঙ্গোর এক অখ্যাত নির্জন অঞ্চলে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল।

সেখানে তার ক্যাপ্টেন ছিলেন একজন স্বল্পভাষী

গম্ভীর প্রকৃতির কর্তব্যপরায়ণ ভদ্রলোক, যাঁর সঙ্গে ওয়ার্পারের আদৌ কোনো মিল ছিল না। অথচ চারদিকে বনজঙ্গল বেষ্টিত ছোট উপনিবেশটিতে তাদের একই বাড়িতে বাস, একই টেবিলে খাওয়া-দাওয়া। বলা বাহুল্য হাসি-ঠাট্টা গাল-গল্প বলে কিছু তার ত্রিসীমানায় ঠাঁই পেতো না।

কিছুকাল সেখানে বাস করবার পর ওয়ার্পারের একটা মানসিক বিকৃতি ঘটে থাকবে: কথায় কথায় রাগ; মনগড়া নানা বিদ্বেষ। শেষটা এক দিন সামান্য কারণে রিভলবার বের করে ক্যাপ্টেনকে হত্যা করে, রিভলবার হাতে নিয়েই সেই এলাকা ছেড়ে ওয়ার্পার পালাল। যারা বাধা দিতে এসেছিল, তাদের সকলেই গুলি খেয়েছিল।

সারা রাত বনের মধ্যে দিয়ে পলায়ন, ভোর হয়ে গেল, তখনো সে চলেছে তো চলেইছে। অবশেষে সেই যে অবসন্ন হয়ে পড়ে গেল আর উঠে দাঁড়াবার জোর পেল না। এই অবস্থায় কুখ্যাত খুনে দস্যু আহমেদ জেকের লোকরা তাকে খুঁজে পেয়ে, বন্দী করে সরদারের কাছে নিয়ে গেল। মোট কথা ব্যাপারটার নিষ্পত্তি স্বরূপ ওয়ার্পার আহমেদ জেকের দস্যুদলের একজন দুর্ধর্ষ কর্মী হয়ে উঠল। এক দিনে হয় নি। অনেক দিন ধরে সরদার বাজিয়ে দেখে, তার যোগ্যতার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে, তবে তাকে দলে ভরতি করেছিল। যেমন সরদার, তার যোগ্য সাকরেদ হলো।

জেক একদিন ওয়ার্পারকে বলল, 'টারজান বলে একটা লোকের নাম শুনেছ?'

—'শুনেছি, তবে দেখিনি।'

—'সে আমাদের বড্ড জ্বালাচ্ছে। তার কাজই হলো এই এলাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। তবে কি আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যও তুলে দেবো? ব্যাটার নাকি অনেক টাকা। কোনো উপায়ে যদি তার কিছুটা আদায় করা যেত, আমাদের লাভও হতো, গায়ের জ্বালাও কমতো।'

একটা দামী পাথর বসানো কেস্ থেকে সিগারেট বের করে, ওয়ার্পার বলল, 'কিছু ভেবেছেন নাকি?'

জেক বলল, 'ওর বৌ নাকি ভারি সুন্দরী। উত্তর দেশে তাকে বেচে মেলা টাকা পাওয়া যায়। নয়তো মোটা একটা মুক্তিপণ ঐ টারজানের কাছ থেকেই আদায় করা যায়।'

ওয়ার্পার মাটির দিকে চেয়ে রইল। একজন ভালো ঘরের শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে বিক্রি করার প্রস্তাব তার মোটেই পছন্দ হয়নি। কিন্তু কিছু বললে জেক্ এক্ষুণি ওকে মেরে ফেলবে। শেষটা বলল, 'আমি ইউরোপের লোক, ওদের বাড়িতে আতিথ্য পেতেও পারি। তবে আমাকে মোটা পুরস্কার দিতে হবে। এর অনেক ঝুঁকি।' তারপর দুজনে বসে অনেক রাত অবধি পরামর্শ করে অতি জঘন্য এক মতলব আঁটল।

এর দু-সপ্তাহ পরে লর্ড গ্রেস্টোক তাঁর অধীনস্থ বিশাল এলাকা পরিদর্শন করে ফেরার পথে দেখেন এক সারি লোক বন থেকে বেরিয়ে তাঁর বাংলোর দিকে চলেছে। তাদের সামনে সাদা শোলার টুপি পরা একজন ইউরোপীয় ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। এরকম অনাহূত অতিথি তাঁদের অনেক আসত।

সে বলল তার নাম জুল ফ্রেকো, শিকার করতে বেরিয়ে এই অচেনা এলাকায় পথ হারিয়েছে। ভাগ্যিস্ বাংলোটা চোখে পড়ল। বলা বাহুল্য লর্ড আর লেডি গ্রেস্টোকের কাছে সে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল। কিন্তু সাত দিন কেটে গেলেও নিজের কুকার্য সাধনের কোনো উপায় দেখল না।

এর পর দিন ওঁদের হরকরা চিঠিপত্র এনে দিল। সেগুলি পড়ে লর্ড গ্রেস্টোককে বড়ই চিন্তিত মনে হলো। ওয়ার্পারের যেমন স্বভাব, ডিনারের পর যখন ওঁরা স্বামী-স্ত্রীতে নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন, জানলার বাইরে থেকে আড়ি পেতে শুনল যে লণ্ডনে কোনো বড় কোম্পানির অসাধুতার ফলে তাঁদের বড়ই লোকসান হয়ে গেছে। সর্বস্বান্ত না হলেও, অবস্থা খুবই খারাপ। তারপর গ্রেস্টোক বললেন, 'তাই বলে ভেবো না। আরেকবার ওপারের রত্নগুহা থেকে কিছু ধনরত্ন নিয়ে এলেই হবে। কেন ভাবছ, জেন? ও ধন মান্ধাতার আমল থেকে ঐখানে লুকানো আছে। ওপারের বাসিন্দারা ওর কথা জানেও না। যে আনতে পারবে, ও-সব তারই। যাব আর আসব।'

ওয়ার্পারকে এবার পায় কে! বাঃ, এই তো চমৎকার সুযোগ পাওয়া গেল। পরদিন সকালেই ধন্যবাদ জানিয়ে দলবলসহ ওয়ার্পার বিদায় নিল।

গ্রেস্টোক সঙ্গে পথ প্রদর্শক দিয়েছিলেন, দু-তিন দিন পরে তাকে বিদায় দিয়ে, ওয়ার্পার তার অনুচরদের প্রধানের হাতে জেকের নামে লম্বা এক চিঠি দিয়ে বলল, 'চর দিয়ে এক্ষুনি এটা মালিককে পাঠাও। তোমরা এইখানেই অপেক্ষা করবে। গ্রেস্টোকের বাড়ি থেকে এর মধ্যে কেউ খোঁজ করতে এলে বলবে আমি অসুস্থ, কারো সঙ্গে দেখা করতে পারছি না। আমি আসলে তাঁর পিছন পিছন গিয়ে দেখে আসব কোথায় যান। তিনি দু-এক দিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়বেন।'

এদিকে টারজান অভ্যাস মতো বাঘছাল পরে দড়ির ফাঁস আর ছোরা নিয়ে, বিশ্বাসী কয়েকজন ওয়াজিরির সঙ্গে ওপারের বিস্মৃত পুরীর দিকে এগিয়ে চলল। ওর পিছু ধরে গোপনে ওয়ার্পার-ও চলল। ওদিকে দুর্বৃত্ত আহমেদ জেক্‌ও গ্রেস্টোকদের খামার-বাড়িতে লোকজন নিয়ে চড়াও হতে চলল।

টারজানের কাছে এই বন্য বেশে জঙ্গলে অভিযান বড়ই আমোদের ব্যাপার। জীবনের প্রথম কুড়ি-একুশ বছর যে-পরিবেশে কেটেছিল, সেটাই ওর সবচেয়ে পছন্দ ছিল। সভ্য সমাজের কৃত্তিমতা আসলে ওর কাছে অসহ্য লাগত। তাজা কাঁচা মাংস লোকে কেন রেঁধে নষ্ট করে খায়, আজ-ও সে বুঝে উঠতে পারে নি।

এক এক সময় পুরানো জীবনের প্রবল আকর্ষণটা দমন করা যেত না। সারাদিনের পরিশ্রমের পরেও, চারদিকে কাঁটার বেড়ায় ঘেরা ক্যাম্পে শুয়ে থাকা দায় হতো। উঠে পড়ত টারজান। বনমানুষের ডাক ছাড়তে ইচ্ছা করত। পাছে ক্লান্ত ওয়াজিরিদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় তাই শব্দ করত না।

এবারও ঐ রকম এক রাতে উঠে পড়ে কাঁটাগাছের বেড়ার—ওরা বলে 'বোমা'—বাইরে গাছে ঝুলে পড়ল টারজান। রাতে বনের আলাদা শব্দ, আলাদা গন্ধ। বারার গন্ধ নাকে এলো। বারা হলো হরিণ। গায়ের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল টারজানের। প্যান্থারের আর সিংহের কড়া গন্ধ থেকে এ গন্ধ অন্য রকম। গন্ধ অনুসরণ করে গাছ থেকে গাছে চলল টারজান। শিকারীদের ভাষায় যাকে বলে গন্ধ গরম হয়ে উঠল, অর্থাৎ শিকার খুব কাছেই।

এবার হরিণটার ঠিক মাথার উপর গাছের ডালে পৌঁছেছে শিকারী, ডান হাতে বাপের সম্পত্তি সেই পুরানো ছোরাটা। বুকে রক্ত-পিপাসা।

লাফিয়ে পড়ল সে হরিণের ওপরে। হরিণ বসে পড়ল। সেই মুহূর্তে ছোরাটা তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে দিল। যেই টারজান উঠে দাঁড়িয়েছে জয়ধ্বনি দেবে বলে, নাকে এলো কড়াগন্ধ। অমনি সে পাথরের মতো নিঃশব্দ, অচল। নুমার গন্ধ। চাঁদের মুখ থেকে মেঘ সরে গেল, নুমা লুব্ধ চোখে টারজানের শিকারের দিকে চেয়ে রইল। আজ তার খাওয়া হয়নি। ওর চোখের সামনে রাং থেকে বড় টুকরো কেটে শিকারী খেতে বসল। নুমা এতটুকু শব্দ করলে বা এগোলে তার গলা থেকে চাপা গর্জন বেরোয়।

টারজানের চোখ ওর উপর। কিন্তু সে আর কতক্ষণ খিদের জ্বালা সইতে পারে? শেষটা দিল ঝাঁপ। চকিতে রাংটি নিয়ে টারজান গাছের ডালে। তবে শান্তিতে খেতে পারেনি নুমা। কাছেই একটা গাছে বড় বড় শক্ত ফল ঝুলছিল, সেগুলো গায়ের জোরে নুমার মাথায় ছুঁড়ছিল টারজান। বনের জানোয়ারদের মনে অনেকটা ছেলেমানুষী থাকে। শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে নুমা হঠাৎ চলে গেল। কি ব্যাপার দেখবার জন্য টারজান তার সঙ্গ নিল। নিচের পথে হাতিরা যায়, সে-পথেই নুমা চলল। টারজান চলল গাছে গাছে। যে গন্ধ পেয়ে নুমা এগিয়ে এসেছিল, সে গন্ধ টারজানের চেনা কোনো বুড়ো পুরুষ মানুষের গন্ধ। কালো মানুষের। নুমা যে পিছু নিয়েছে সে টের পায়নি। নুমা তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তেই বেচারা আঁতকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে টারজান লাফ দিল নুমার পিঠে। তারপর বারবার সেই সাংঘাতিক ছোরার কোপ! নুমার সে কি গর্জন আর পিঠ থেকে মানুষটাকে ঝেড়ে ফেলার সে কি নিষ্ফল চেষ্টা।

রক্ত আর কাদায় মাখামাখি হয়েও টারজান তাকে ছাড়েনি। ছাড়লেই নুমা তাকে ছিঁড়ে ফেলত। নুমা মরে গেলে, সেই আহত কালো লোকটার কাছে গিয়ে টারজান দেখল তারও শেষ সময় উপস্থিত। থুত্থুরে বুড়ো, চোখ বসা, ফোকলা মাড়ি, উইচ্-ডক্টরের সাজ। প্রথমে বুড়ো ভেবেছিল তাকে বাঁচাতে গিয়ে এ লোকটা প্রাণ দেবে। হঠাৎ সে তাকে চিনতে পারল। অনেক বছর আগেকার এক সাদা ছোকরা বনমানুষের

স্মৃতি মনে এলো। আর সন্দেহ রইল না কে জিতবে।

যদিও তাকে বাঁচাবার জন্যেই নুমাকে মারে নি টারজান, এখন সে কাছে এসে তার যথাসাধ্য সেবা করতে লাগল। বুড়ো বলল, 'তুমি কে?'

—'আমি টারজান। বনমানুষদের ছেলে টারজান।'

—'আমাকে মেরে ফেলছো না কেন?'

—'মারব কেন?'

—'মারবে না?'

—'না। পারলে বাঁচাতাম। কিন্তু তা হবার নয়।'

বুড়ো বলল, 'বহুকাল আগে তুমি এম্বঙ্গার ছেলে কুলঙ্গাকে মেরেছিলে, তখনো আমি জাদুকর ছিলাম। শোন, তোমার সামনে বড় দুঃসময়। আমার হাতেমাখা এই রক্তে লেখা আছে, তোমার চেয়েও একজন বড় দেবতা তোমার সর্বনাশ করবে। তোমার সামনে বিপদ, পিছনে বিপদ। ফিরে যাও, কারণ সামনের বিপদটাই বেশি।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

অনেক রাতে টারজান বোমায় ফিরল। তার রাতের অভিযানের কথা কেউ জানতে পারল না। ঘুম ভাঙলে আরেকবার বুড়োর ভবিষ্যৎ-বাণীর কথা মনে হলো। তবু টারজান এগিয়ে চলল। ভয় কাকে বলে সে জানত না। তখনো কিছুটা তফাৎ রেখে ওয়ার্পার তার পিছু পিছু চলেছিল।

তারপর এক সময় প্রাণহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওধারে ওপারের সোনালী গম্বুজ আর মিনার দেখা দিল। সেইখানে থামা হলো। রাতে সে একবার একলা গিয়ে দেখে আসবে পথ পরিষ্কার কি না। মনে হচ্ছিল খুব সাবধানে কাজ করা দরকার।

রাতে টারজান রওনা হতেই ওয়ার্পার-ও শেয়ালের মতো গোপনে পিছু নিল। প্রান্তর পার হলে গ্র্যানাইটের খাড়া দেয়াল, তার ওপারে এখনকার বাসিন্দাদের বাস। দেয়ালের গায়ে গুহার প্রবেশ-পথ। পাহাড়ের পাথুরে গা বেয়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। টারজান তার বিশাল শক্তিশালী শরীর নিয়ে সচ্ছন্দে উঠে গেল। তার খানিকটা পিছনে অতি কষ্টে, খচমচ করে, ভয়ে ভয়ে ওয়ার্পারও উঠল। উপরে উঠে টারজানকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করতেই গুহার সরু প্রবেশ পথ দেখতে পেল। একটা খাঁজের মতো; তার মধ্যে সিঁড়ি নেমে গেছে। তার নিচেই সুড়ঙ্গ পথ। সেই পথেই টারজান গেছে। আর এগোবার সাহস হলো না, টারজান যদি ফিরে এসে দেখে ফেলে!

এ দিকে টারজান অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সেই প্রাচীন কাঠের দরজার সামনে এলো। তারপর রত্নগুহার মধ্যে। দেয়ালে ছাদ পর্যন্ত সারি সারি তাকে সোনার তালগুলো সাজানো। ঠিক যেভাবে হাজার হাজার বছর আগে অ্যাটলান্টিকের তলায় ডুবে যাওয়া হারানো অ্যাটলান্টিস্ মহাদেশের কারিগররা রেখে গিয়েছিল। টারজানের শেষ বার এখানে আসার পর আর কেউ এসেছে বলে মনে হয় না।

লুকিয়ে বসে ওয়ার্পার টারজানকে বেরিয়ে আসতে দেখল। টারজান পাহাড়ের কিনারার দিকে চলল, তারই নিচে ওয়াজিরি অনুচররা সংকেতের অপেক্ষায় ছিল। এই সুযোগে ওয়ার্পার খাঁজের ভিতর ঢুকে পড়ল।

টারজান সিংহের গর্জনের মতো তিন বার ডাক দিল। উত্তরে একটু বাদেই ওয়াজিরি সরদার বাসুলি তিনবার সিংহের ডাক দিল। টারজান বুঝল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা এসে ধনরত্নগুলো বয়ে নিয়ে যেতে পারবে। পাঁচ ঘণ্টায় ছয়বারে আটচল্লিশটা তাল তুলে এনে পাথরের আড়ালে রাখল টারজান। এখান থেকে বাসুলিরা কাঁধে করে নিয়ে যাবে।

বাসুলিরা পঞ্চাশ জন এলে, শেষবারের মতো বাহান্নটি তাল নিয়ে তারা বেরিয়ে আসার পথ ধরলে, টারজানও শেষবারের মতো রত্নগুহাটির দিকে চাইল। দৈবাৎ এটিকে খুঁজে পেয়েছিল সে, অনেক দিন আগে যখন ওপারের প্রধানা পূজারিণী লা এখানে তাকে লুকিয়ে রেখে তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। আরেকটু হলেই এরা তাকে তাদের হিংস্র দেবতার সামনে বলি দিত। শেষ পর্যন্ত রক্ত-পিপাসু থা-য়ের আক্রমণের কথা, লা-কে কেমন করে সে বাঁচিয়েছিল, সব কথা মনে পড়ল। কে জানে রত্নগুহার মাথার উপর লা এখনো তার রাজ্য শাসন করে কিনা! ওদের পুরুষরা বড় কদাকার, মেয়েরা ভারি সুন্দরী। শেষ পর্যন্ত লা হত-কুচ্ছিৎ প্রধান পুরোহিতকেই বিয়ে করতে বাধ্য হলো কি না, তাই বা কে জানে!

এই সব চিন্তা করতে করতে মোমবাতিটা নিবিয়ে বেরোবার পথ ধরল টারজান। ওর পিছনে থামের আড়ালে লুকিয়ে ছিল ওয়ার্পার। ও বেরোলে, সে-ও বেরোবে। তার রত্নগুহার পথ জানা হয়ে গেছে।

টারজান সুড়ঙ্গের এ মাথায়, ওয়াজিরিরা প্রায় শেষ অবধি পৌঁছে গেছে। টারজান কাঠের দরজাটা বন্ধ করে দিতেই, দরজার ওপাশে ওয়ার্পার-ও উঠে দাঁড়িয়ে একবার একটা তালের গায়ে হাত না বুলিয়ে পারল না।

হঠাৎ টারজানের সেই বুড়ো উইচ্-ডক্টরের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দু'জনারই সব আশা ভরসা ভস্মে পরিণত হলো। কল্পনাতীত ভয় একজনকে গ্রাস করল। আর মাথায় একটা ধারালো পাথরের প্রচণ্ড আঘাত লেগে অন্যজন তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলল।

কোনো জানান না দিয়ে বিপদটা এলো মনে হলো বুঝি প্রলয় এলো। জগৎ কেঁপে উঠল; সুড়ঙ্গের দেয়াল থেকে বড় বড় পাথরের চাংড়া ভেঙে পড়ল; দেয়ালগুলো ভিতর দিকে ঝুঁকে এলো। ছাদের একটা বড় চাংড়ার বাড়ি খেয়ে টারজান দরজার উপর আছড়ে পড়ল। দরজা খুলে গেল। ওর শরীরটা গড়িয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেল। কিন্তু যে কামরায় সোনার তালগুলো সাজানো ছিল, তার খুব বেশি ক্ষতি হলো না। উপরের তাক থেকে দু-একটা খসে পড়ল; খানিকটা ছাদ ভেঙে পড়ল; দেয়ালে ফাটল দেখা দিলেও, ধ্বসে পড়ল না।

সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পও থেমে গেল। ওয়ার্পার আছাড় খেয়ে পড়েছিল; এবার সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। মনে হলো ঝাঁকুনি খেলেও হাড়গোড় ভাঙেনি। কয়েকটা দেশলাই জ্বেলে চারদিক দেখে নিল ওয়ার্পার। দেখল টারজান আহত হয়ে পড়ে আছে। বেঁচে আছে কিনা এবং সাহায্য দরকার কিনা, তা পর্যন্ত দেখল না। অমনি ওকে ডিঙিয়ে সুড়ঙ্গের দিকে ছুটল। কিন্তু সে গুড়ে বালি। সুড়ঙ্গের পথটা ভাঙা পাথরের স্তূপে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

ওয়ার্পার তখন ঘুরে আবার রত্নগুহায় ঢুকল। মোমবাতি তুলে নিয়ে ঘরটাকে বেশ করে পর্যবেক্ষণ করল। ঘরের অন্য দিকে আরেকটা কাঠের দরজা ছিল। গায়ের জোরে ঠেলা দিতেই ক্যাঁচ কোঁচ করে মরচে ধরা কব্জাগুলো ঘুরল, দরজাও খুলে গেল। দরজার পিছনে সরু একটা সুড়ঙ্গ। তাই ধরে ছুটল ওয়ার্পার। সামনে অনেকগুলো সিঁড়ির ধাপ। কুড়ি ফুট উপরে আরেকটা সুড়ঙ্গ। সেটা ধরে এগোতে লাগল ওয়ার্পার।

ভাগ্যিস্ মোমবাতি ছিল, কারণ হঠাৎ দেখে সুড়ঙ্গটা জুড়ে একটা কুয়োর মুখ! আলো তুলে ধরতেই অনেক নিচে জল চিকচিক করে উঠল। কুয়োর ওপারে সুড়ঙ্গ আরো এগিয়ে গেছে। কিন্তু লাফিয়ে পার হতে পারবে কি? হঠাৎ কানে এলো বিশ্রী একটা চিৎকার। চিৎকার কমে কেমন যেন কাৎরানির মতো শোনাতে লাগল। ও কি মানুষের গলা? বরং কোনো অভিশপ্ত আত্মা যেন নরকের কুণ্ডে জ্বলছে!

শিউরে উঠে ওপর দিকে তাকাল ওয়ার্পার। মাথার উপরে অনেক দূরে খানিকটা রাতের আকাশ দেখতে পেল। তারা ঝিকমিক করছে। আগে ভেবেছিল চিৎকার করে সাহায্য চাইবে। কিন্তু ঐ চিৎকার শুনে অবধি সে ইচ্ছা ত্যাগ করেছিল। এ জায়গার চেয়ে আহমেদ জেকের আস্তানা শতগুণে ভালো।

আর কোনো চিৎকার না শুনে খানিকটা সাহস হলো ওয়ার্পারের। কুড়ি পা পেছিয়ে গিয়ে সে এক লাফ দিল। হাতে ধরা মোমবাতিটা এক ঝটকা হাওয়া লেগে নিবে গেল। উল্টোদিকের কিনারা অবধি ঐ লাফটা ওকে পৌঁছে দিল। আঁকড়ে-মাকড়ে কিনারায় ঝুলে রইল ওয়ার্পার। তবে শরীরের উপর দিকটা ওপারের ডাঙায় পৌঁছে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে অনেক কষ্টে শরীরের বাকি অংশটাকেও সে কিনারার উপর তুলে ফেলতে পারল। তারপর ওপারের মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে দম নিতে লাগল। মোমবাতিটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। হামাগুড়ি দিয়ে সেটি খুঁজতে লাগল ওয়ার্পার। আহা, ওর দাম যে ওপারের সমস্ত সোনার তালের চেয়েও বেশি! পেলও শেষ পর্যন্ত। বুকে জাপ্টে ধরে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁপাল। তারপর বাতিটা জ্বালল।

এবার সাবধানে এগোনো। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই আঁৎকে উঠছিল। কিছুদূর গিয়েই দেখে একটা পাথরের দেয়ালের সামনে এসে সুড়ঙ্গ শেষ। কিন্তু আলো

নিয়ে ভালো করে দেখে বুঝল এ দেয়ালে চূণ-সুরকি নেই; খালি পাথরের টুকরোর উপর টুকরো বসিয়ে তৈরি। একটা গর্ত করে নেওয়া খুব শক্ত হবে না।

একটা পাথর টেনে বের করতেও খুব অসুবিধে হলো না। ক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে ওদিকে যাবার মতো একটা পথও করে নিতে পারল। ওদিকে দেখে একটা মস্ত নিচু ঘর। অন্ধকার। এদিকে মোমবাতিটাও জ্বলে জ্বলে ফুরিয়ে গেল। ততক্ষণে ঘর পার হয়ে, ওদিকে আরেকটা দরজা খুলে লম্বা আরেকটা সুড়ঙ্গে পৌঁছে গেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিষম ভয় করতে লাগল। হাতড়ে হাতড়ে কত দূর যে এগোল তার ঠিক নেই। ক্লান্তির চোটে মাঝে একটু ঘুমিয়েও নিয়েছিল।

ঘুমটাতে শরীরের শ্রান্তি দূর হলো। ঘুম ভাঙলে, আরো কিছু দূর হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে একটা ঘরে পৌঁছল। তার মেঝে থেকে ছাদ অবধি সিঁড়ি উঠে গেছে। সেখান দিয়ে আলো আসছে। উপরে তাকিয়ে সূর্যের আলো দেখতে পেল. পাখির কর্কশ ডাক শুনতে পেল, বাঁদরের কিচিরমিচির কানে এলো। কেমন একটা সাহস এলো ওয়ার্পারের মনে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে সে একটা গোল উঠোনে পৌঁছল। ওর সামনেই দেখল একটা পাথরের বেদী, তাতে কি রকম মরচে পড়ার মতো দাগ। সে দাগের বীভৎস অর্থ ওয়ার্পার বুঝতেই পারল না। বেদীর পিছনে অনেকগুলো দরজা। মাথার উপর কতকগুলো খোলা ঝোলা বারান্দা। বাঁদররা ঘুরে বেড়াচ্ছে, রং-চঙে পাখিরা উড়ছে। কিন্তু লোকজনের চিহ্ন নেই। ওয়ার্পার ভারি নিশ্চিন্ত হলো। কয়েকটা বেরোবার পথ দেখে সেদিকে যেই এগোতে যাবে, অমনি গোটা বারো দরজা খুলে অনেকগুলো বিকটাকার মানুষ ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এরা সব ওপারের আগুন-দেবতার পূজারী। বেঁটে, লোমশ, কেমন যেন সমস্ত শরীরটা গিঁট পাকিয়ে গেছে। এরাই এক সময় জেন ক্লেটনকে ধরে বলি দেবার চেষ্টা করেছিল। ভয়ে চিৎকার করলেও ওরা ওকে ঘিরে ফেলল। হাঁটু গেড়ে প্রাণ ভিক্ষা করতে লাগল ওয়ার্পার। পূজারীরা ওকে ধরে বেঁধে মন্দিরের মেঝেতে পেড়ে ফেলল।

তারপর পূজারিণীরা এলো, প্রধানা পূজারিণী লা-ও এলো। তার হাতে বলির খাঁড়া। মরণ সঙ্গীত শুরু হলো। ওয়ার্পার প্রার্থনা করছিল, 'আমাকে অজ্ঞান করে দাও, ভগবান! যেন খাঁড়ার আঘাত সইতে না হয়!'

হঠাৎ কানের কাছে সিংহের গর্জন। পূজারীরা পূজারিণীরা যে যেদিকে পারল, পালাল। বাঁদরদের সে কি কিচির-মিচির। লা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থেকে বেদীর উপর বাঁধা ওয়ার্পারের গায়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। চোখ খুলে বিশাল এক সিংহকে দেখতেও পেল ওয়ার্পার। তার থাবার তলায় একটা লোক মারা পড়েছে।

ওদিকে ভূমিকম্প থামতেই এবং ওদের ভয় কাটতেই বাসুলি তার লোকজন নিয়ে সুড়ঙ্গে ফিরে গিয়েছিল, টারজানের আর দু'জন ওয়াজিরির খোঁজে। সুড়ঙ্গের পথ বন্ধ দেখে, দু'দিন ধরে অনেক চেষ্টা করেছিল একটা পথ করে নেওয়া যদি যায়। কয়েক গজ খুঁড়ে একজন ওয়াজিরির মৃতদেহ পেয়েছিল। তার বেশি খোঁড়া গেল না। অনেক ডাকাডাকি করেও কোনো উত্তর না পেয়ে, শেষ পর্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে টারজান আর অন্য সঙ্গীটি মানুষের সাহায্যের বাইরে চলে গেছে। তখন মনের দুঃখে সোনার তালগুলো কাঁধে করে তারা খামারের পথ ধরেছিল।

এদিকে সাকরেদের চিঠি পেয়ে আহমেদ জেক তার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে খামার বাড়ি চড়াও করেছিল। তাদের মধ্যে একজনও সত্যিকার যোদ্ধা ছিল না। সব খুনে গুণ্ডা।

জঙ্গলদীপ থেকে তার বোয়ানার নিত্যসঙ্গী মুগাম্বির হাতে খামার বাড়ি তদারকির ভার ছিল। দূর থেকে পাপিষ্ঠদের দলটাকে দেখে মুগাম্বি তার ওয়াজিরিদের সতর্ক করে দিয়েছিল। খেতে আর ঘাসজমিতে যারা কাজ করছিল সকলকে ডাক দেওয়া হলো।

এত দূর থেকে আগন্তুকদের উদ্দেশ্যটা বোঝা যাচ্ছিল না, তবু সাবধানের মার নেই। লেডি গ্রেস্টোক বললেন, 'কি হলো, মুগাম্বি?'

—'আরবের দল আসছে। বড় বোয়ানা নেই, এ-সময়ে ওদের আশাটা ভালো বুঝি না। আপনি ঘরের মধ্যেই থাকুন।'

ছুটে এলো আরব দস্যুর দল, বিনা বাক্যব্যয়ে গুলি চালাতে চালাতে। ওয়াজিরিরা ভয়-ডর জানত না,

তারাও প্রাণপণে তীর ধনুক ঢালের সাহায্যে যুদ্ধ করল। কিন্তু এতগুলো সশস্ত্র আরবের সঙ্গে পারবে কেন? মুগাম্বি সকলকে বাড়ির ভিতরে ডেকে, সেখান থেকে প্রতিরোধ চালাবার চেষ্টা করল।

বার বার আরব আক্রমণের ফলে অনেক বীর ওয়াজিরি মাটি নিল। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ল দস্যুরা। জেন নিজেও শেষ পর্যন্ত গুলি চালিয়েছিল। তার চারদিকে প্রভুভক্ত অনুচরদের অকাতরে প্রাণ দিতে দেখে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মুগাম্বি জেনকে আগলে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় আহমেদ জেক হুকুম দিল, 'ঐ মেয়ের দিকে যে গুলি ছুঁড়বে সে মরবে। ওর কোনো ক্ষতি না করে, বন্দী কর।'

মুগাম্বি বর্শা নিয়ে শেষ অবধি লড়েছিল। শেষ পর্যন্ত জেকের রত্নখচিত বন্দুকের গুলি খেয়ে যখন সে পড়ে গেল, জেনকে বন্দী করে, ঘোড়ায় চড়িয়ে সেখান থেকে নিয়ে যেতে জেকের কোনো অসুবিধাই হলো না। গ্রেস্টোকদের খামারের যা কিছু মূল্যবান জিনিস ছিল, তাঁদের গোরু ছাগল ঘোড়া যা কিছু ছিল, সমস্তই দস্যুরা লুট করে নিয়ে গেল। যাবার সময় খামারবাড়ির চারদিকের সব কুটিরে আর বড় বাংলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল। মুগাম্বি কিন্তু মরেনি। মেয়েরা কেউ বন্দী হয়েছিল, কেউ পালিয়ে বেঁচেছিল। সেই জ্বলন্ত বাড়ি থেকে মুগাম্বি শুধু মনের জোরে নিজের আহত শরীরটাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এসেছিল। প্রতিশোধ নেবার জন্য তাকে বাঁচতেই হবে।

পারের দুর্ঘটনার অকুস্থলে ফিরে যাওয়া যাক। কিছুক্ষণ টারজান ঐ এক জায়গায় মড়ার মতো পড়েছিল। কিন্তু সে মরে নি। মাথায় হাত দিয়ে, হাতে মাখা রক্তের দিকে তাকিয়ে, সেটাকে প্রথমে শুঁকে দেখল; বনের পশুরা যেমন করে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসল। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল; ঐ কবরের ভিতরে শব্দ পৌঁছয় না। উঠে দাঁড়িয়ে, থরে থরে সাজানো সোনার তালে ভরা ঘরের মধ্যে টলতে টলতে একটু হাঁটল। একটু ভাবল, ও কে? ও কোথায়? মাথায় ব্যথা করছিল। আর কোনো কষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু দুর্ঘটনাটা, বা তার আগেকার কোনো ঘটনাই মনে করতে পারছিল না।

নিজের সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে কেমন অচেনা মনে হতে লাগল। পিঠে তূণ, কোমরে ছোরা গোঁজা। কিন্তু কি যেন নেই। মাটিতে হাতড়ে বর্শাটাকে পেল। আ! এই যে পাওয়া গেছে। একটা কালো লোকের মৃতদেহ থেকে কবে প্রথম এক দিন এটাকে পেয়েছিল।

টারজানের মনে হচ্ছিল এই অন্ধকারে ভরা চারটে দেয়ালের বাইরে আরেকটা সুন্দর জগৎ আছে। শেষটা অন্য দরজাটাকেও পেল। তারপর সুড়ঙ্গ। কোনো সাবধানতা অবলম্বন না করেই এগিয়ে গেল; তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠল; তারপর আরেকটা সুড়ঙ্গ; তারপর কুয়ো। এসব যে সে আগেও দেখেছে সে-কথা একবারও মনে পড়ল না। সোজা কুয়োর মধ্যে পড়ল। তখনো বর্শা হাতে ধরা। উপর থেকে কুয়োর জলে আলো পড়ছিল। জলের কাণায় শ্যাওলা ঢাকা দেয়ালে একটা মস্ত গর্ত। তাই দিয়ে একটা সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। খুব সাবধানে, ওকে কিছু দু'বার শেখবার দরকার হতো না।

সুড়ঙ্গের মেঝেটা পিছল। হয়তো কুয়োর জল বাড়লে, এখানে জল ঢোকে। আস্তে আস্তে এগোতে হচ্ছিল। সুড়ঙ্গের মাথায় সিঁড়ি। অনেকবার পাক খেয়ে একটা ছোট গোল ঘরে পৌঁছল। ঘরের মধ্যিখানে একটা চোঙার মতো জিনিস। তার মধ্যে দিয়ে তাকালে হয়তো একশো ফুট উপরে রোদে ভরা নীল আকাশ দেখা যাচ্ছিল। গোল ঘরে কয়েকটা ধাতু দিয়ে বাঁধানো, তামার ঘুঁটি দেওয়া সিন্দুক। আর কিছু নেই। একটা সিন্দুকের ডালা খোলা গেল। টারজান আনন্দে একটা চাপা আওয়াজ করল। ঝকঝকে নানা রঙের পাথর! চমৎকার দেখতে পাথরগুলো।

মাথায় চোট খেয়ে সব ভুলে গিয়েছিল টারজান। পাথর-গুলোর মূল্যও বুঝতে পারেনি, কিন্তু বড় সুন্দর দেখতে ওগুলো। আরো কয়েকটা সিন্দুক খুলে দেখল। তাতেও ঐ রকম চকচকে পাথর। দেখতে বড় ভালো লাগল। কোমরের থলিটা ভরে নিল সে।

তারপর ও-ঘর ছেড়ে ঢালু সুড়ঙ্গ ধরে আরো এগিয়ে চলল। ঘুরে ফিরে সুড়ঙ্গটা একটা নিচু ছাদের ঘরে শেষ হলো। সেখানে কত আলো! খালি মনে হচ্ছিল কি যেন একটা ওর জানা উচিত ছিল, কিন্তু সে যে কি তা বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ সে কি বিকট সিংহের গর্জন আর তার সঙ্গে অনেক লোকের ভয়পাওয়া চিৎকার। বর্শা বাগিয়ে সিঁড়ির শেষ ধাপ ক'টা পার হয়ে টারজান উপরে উঠে এলো।

সামনে দেখে এক পাল পুরুষ মেয়ে আর একটা সিংহ। মন্দিরের মধ্যিখানে এসে উঠেছে সে। সামনেই একটা পাথর। তার পিছনে একজন মেয়ে আর পাথরের উপরে হাত-পা বাঁধা একটা লোক। সিংহটা কয়েক পা এগিয়ে, গুঁড়ি মেরে রইল, লেজের ডগাটা নড়তে লাগল। মন্দির

থেকে ঐ দু'জন ছাড়া সবাই ভয়ে পালিয়েছে। আরেকবার গর্জন করে সিংহ লাফ দেবার জন্য তৈরি হতেই, টারজানের উপর তার চোখ পড়ল।

ওয়ার্পার এবার চোখ খুলে তাকিয়ে সিংহটাকে দেখতে পেল। একটা কেউ ছুটে এলো, একটা বিশাল বাহু উঁচুতে উঠল, একটা বর্শা গিয়ে সিংহের বুকে বিঁধল। সিংহ সেটাকে বের করে ফেলার চেষ্টায় কামড়া-কামড়ি করতে লাগল। সেই দৈত্যটা লম্বা ছোরা হাতে সিংহের গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ে বার বার তার গায়ে ছোরাটা বসিয়ে দিতে লাগল।

ততক্ষণে প্রধানা পূজারিণী লা-য়ের জ্ঞান ফিরেছিল, সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দৈত্যটার দিকে তাকিয়েছিল। অবশেষে সিংহ মরে গড়িয়ে পড়ল। দৈত্যটা তার গায়ে পা রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে সে কি রক্ত হিম করে দেওয়া চিৎকার দিল! তাই শুনে লার আর ওয়ার্পারের সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। এতক্ষণ পরে ওয়ার্পার দৈত্যকে চিনতে পারল।

চিনে সে স্তম্ভিত হলো। এই দৈত্যের আধুনিক সজ্জায় সাজানো বাড়িতে কি সে অতিথি হয়েছিল? টারজানও ওদের দু'জনের দিকে চেয়েছিল; একজনকেও চিনতে পারছিল না।

লা কিন্তু তাকে ঠিক-ই চিনেছিল—'টারজান! তুমি লায়ের কাছেই ফিরে এসেছ তাহলে? তাই সে আজ পর্যন্ত বিয়ে করেনি।'

টারজান অবাক হয়ে চেয়ে রইল। 'টারজান কে? নামটা কেন চেনা মনে হচ্ছে?'

ওয়ার্পার লা-য়ের মুখের আদিম ভাষার এক বর্ণ বুঝতে পারেনি। টারজানকেও ঐ ভাষায় উত্তর দিতে দেখে সে অবাক হলো।

লা বলল, 'তুমিই তো টারজান! তোমারই নাম টারজান।'

—'আমি টারজান? বাঃ, বেশ নাম। ঐ নামই নেবো। আমি কিছু মনে করতে পারছি না; কে আমি, কেন এসেছি, কিছুই জানি না। তবে তোমার জন্যে আসিনি। তুমি কিছু বলতে পার?'

লা মাথা নাড়ল, 'তোমার বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।'

ওয়ার্পারকেও ও-কথা জিজ্ঞাসা করেছিল টারজান, কিন্তু ঐ আদিম ভাষায়। তার সঙ্গে বনমানুষদের ভাষার বিশেষ তফাৎ ছিল না। ওয়ার্পার খালি মাথা নেড়ে ফরাসী ভাষায় বলেছিল, 'ও ভাষা আমি জানি না।'

অমনি যেন নিজেরই অজান্তে টারজানও ফরাসী ভাষায় বলতে আরম্ভ করল।

এতক্ষণ পরে ওয়ার্পার টারজানের মাথায় আঘাতের গুরুত্বটা বুঝতে পারল। লোকটার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এ ব্যাপার থেকে নিজের কিছু সুবিধা হতে পারে ভেবে ওয়ার্পার বলল, 'কোথা থেকে এসেছ বলতে পারছি না, তবে এটা বলতে পারি এখনি দু'জনে এখান থেকে না পালালে আমাদের এরা মেরে ফেলবে। আমাকে তো আরেকটু হলেই বলি দিত।'

টারজান লা-কে বলল, 'কেন ওকে মারতে চাইছিলে? তোমার কি খিদে পেয়েছে?'

লা বলল, 'এ রাম! ছিঃ!'

—'তবে ও কি তোমাকে মারতে চাইছিল?'

—'না।'

—'তবে কেন মারতে চেয়েছিলে?'

—'ওর আত্মাটাকে আমাদের দেবতাকে উৎসর্গ করবার জন্য।'

টারজান এখন বনমানুষ বনে গেছে, অত-শত বুঝল না। ওয়ার্পারকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি মরতে চাও নাকি?'

ওয়ার্পার কেঁদে বলল, 'না, না, কখনো না।'

—'বেশ তাহলে মরতে হবে না।'

লা-কে বলল, 'আমরা চলে যাচ্ছি।'

লা ওর হাত চেপে ধরে বলল, 'যেও না। লা তোমাকে ভালোবাসে। তুমি এখানকার রাজা হবে। ধনরত্ন দাসদাসী থাকবে তোমার। আমাকে ছেড়ে যেও না।'

টারজান ওকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'টারজান তো তোমাকে চায় না।'

লা রেগে গেল, 'না তোমার যাওয়া হবে না। আমার কাছে না থাকলে তোমাকে মরতে হবে।' এই বলে একটা ডাক দিল, 'কোথায় গেলে পূজারীরা? এই অবিশ্বাসীরা মন্দির অপবিত্র করেছে। এদের মেরে ফেল।'

টারজান লা-র হাত থেকে পবিত্র খাঁড়াটি টেনে নিয়ে ওয়ার্পারকে দিয়ে বলল, 'এটা তোমার কাজে দেবে।'

তারপর হতকুচ্ছিৎ পূজারীর দল ওদের ঘিরে ফেলল। কিন্তু টারজানের সঙ্গে পারবে কেন? ঐ বিশাল হাতের বর্শার বাড়ি খেয়ে চারদিকে তারা ধপাধপ পড়ে যেতে লাগল। ওয়ার্পারকে কেউ ছোঁয় নি, ওর হাতে যে পবিত্র খাঁড়া। তার ধারেকাছে কোনো ওপার-বাসী ঘেঁষতে রাজি ছিল না।

মন্দির থেকে দু'জনে বেরিয়ে পড়লে, পবিত্র খাড়া দেখে সবাই পালাল। ধনরত্নে ভরা, সোনার থাম দেওয়া মন্দিরের বাইরে বড় বড় বনমানুষ এগিয়ে এসেছিল। টারজানের মুখে তাদের নিজেদের ভাষা শুনে কোনো ক্ষতি করেনি। দু-একটা তেড়ে এলেও, শেষ পর্যন্ত পোকামাকড়ের খোঁজে সরে পড়েছিল।

বাইরে যাবার সরু পথটা খুঁজে বের করতে একটু সময় লেগেছিল। টারজানের কোনো খেয়ালই ছিল না। অন্য বনমানুষদের মতোই সেও পোকামাকড়, ছোট জানোয়ার ধরে খেতে আরম্ভ করেছিল, ছোটবেলায় যেমন করত। শেষ পর্যন্ত পাথরের দেয়াল থেকে নেমে, বিস্তীর্ণ অনুর্বর প্রান্তর পার হয়ে ওয়ার্পার টারজানকে নিয়ে বাংলোর পথ ধরেছিল।

ওয়ার্পার কেন যে টারজানের সংসারের সর্বনাশ করে আবার কেন তাকেই পথ দেখিয়ে বাড়ির দিকে নিয়ে গেল, সে এক রহস্য। অবশ্য একটা কারণ হতে পারে, স্ত্রীর মুক্তিপণ যখন তার কাছ থেকেই আদায় করতে হবে, সে মরে গেলে তো চলবে না।

পাহাড়ের ওপারে আগুন জ্বেলে ওরা একটা বুনো শুওর ঝলসে খেয়ে, রাতটা কাটাল। শুওরটাকে টারজানই শিকার করে এনেছিল। সব সময় ও যেন নিজের মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। কি যেন ধরি ধরি করেও ধরতে পারছিল না। একবার টারজান থলি খুলে রত্নগুলো হাতে ঢেলে কিছুক্ষণ খেলা করেছিল। এবার টারজানের সঙ্গে থাকার আরেকটা উদ্দেশ্যও পাওয়া গেল। ঐ পাথরের মূল্য ও কিছুই বোঝে না। ওয়ার্পার বোঝে।

ওয়ার্পারের সঙ্গে জেক্ যে ছোট দলটিকে দিয়েছিল, দু'দিন ধরে তাদের খুঁজে খুঁজে কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিনে তিনজন আরবের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া গেল। বাকিরা ছিল নিগ্রো ক্রীতদাস। জেকের আর তার দস্যুদের অত্যাচারে তারা জর্জরিত। এই সুযোগেই যে প্রতিশোধ নিয়ে তারা পালিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ রইল না। ওয়ার্পার সে সময় কাছে থাকলে

ওরও ঐ দশাই হতো।

টারজান ঐ দৃশ্য দেখে এতটুকু বিচলিত হলো না। বনের জানোয়াররা সর্বদা মৃত্যুকে মেনে নেয়। আজকাল কালার প্রথম শিক্ষা, তারপর কেরচাক, টুবলাট আর টেরকজের প্রশিক্ষণ ছাড়া তার আর কিছু মনে পড়ে না। কিন্তু ওয়ার্পার ফরাসী বললে নিজেরই অজান্তে টারজান সেই ভাষায় উত্তর দিত। মনের পিছনে সব-ই ছিল, খালি তার নাগাল পাচ্ছিল না।

সে রাতে আবার টারজানকে রঙীন পাথর নিয়ে খেলা করতে দেখে ওয়ার্পার বলল, 'ওগুলো কি?'

—'রঙীন পাথর। আগুন-দেবতার মন্দিরের তলায় পেয়েছি।'

ফাঁকি দিয়ে নিয়ে নেওয়া হয়তো অসম্ভব হবে না, অবিশ্যি কেড়ে নিতে কোনো জন্মে পারবে না, তবে চাইলে দিয়ে দিতেও পারে, দাম তো বোঝে না।

হাত পেতে ওয়ার্পার বলল, 'দেখি, পাথরগুলো।' অমনি পাথরে হাত চাপা দিয়ে, দাঁত বের করে গরগর করে উঠল টারজান। ওয়ার্পার হাত সরালেই আবার পাথর নিয়ে খেলতে লাগল, যেন কিছুই হয়নি। শিকার করলে সর্বদা টারজান ওর সঙ্গে সমান ভাগ করে খেত। কিন্তু টারজানের ভাগে হাত দিলে, রেগে যেত। ক্রমে সঙ্গীর বিষয়ে ওয়ার্পারের মনে বড়ই ভয় জমতে লাগল। টারজানের স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার কথাটা সে বুঝত, কিন্তু টারজানের শৈশব সম্বন্ধে কিছু না জানার দরুণ তার বন-মানুষ বনে যাবার রহস্যটা জানত না। ওকে ভাবত ভয়ংকর একটা উন্মাদ, চটালে আক্রমণ করে বসতে পারে। ওর সঙ্গে ওয়ার্পার পেরে উঠবে না। কোনোমতে ওর হাত এড়িয়ে জেকের ডেরায় ফিরে যেতে পারলে হয়। কিন্তু হাতে অস্ত্র তো শুধু ঐ ওপারের খাঁড়া, একা বন পার হতেও সাহসে কুলোয় না। টারজান তাকে বড় বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেবে। তাছাড়া রত্নগুলো চালাকি করে হাতিয়ে নিতে হবে। ওগুলোর বিষয় জেককে কিছু বলা হবে না। একবার রত্নগুলো হস্তগত করতে পারলে, নাম ভাঁড়িয়ে সভ্য জগতে ফিরে গিয়ে বাকি জীবনটা আরামে কাটানো যাবে। এ অনিশ্চয়তার দস্যুগিরি আর করবে না।

তৃতীয় দিনে টারজান পিছন থেকে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ওয়ার্পার শুনল খালি পতঙ্গের গুনগুন, পাখির ডাক, বাঁদরের কিচির মিচির। একটুক্ষণ টারজান কান পেতে শুনল, বাতাসে নাক তুলে শুঁকল। তারপর ওয়ার্পারকে টেনে ঝোপে গা-ঢাকা দিল ওদের সামনে দিয়ে সোনার তালগুলো পিঠে নিয়ে, টারজানের ওয়াজিরিরা জন পঞ্চাশ সারি বেঁধে খামারের দিকে চলে গেল। তাদের নেতা বাসুলি সবার আগে। হায় রে, টারজান তাদের চিনতে পারল না। বলল, 'কালোরা আমার শত্রু। ওরা কালাকে মেরেছিল। এসো, ওদের মেরে ফেলি।'

অনেক কষ্টে টারজানকে ঠেকাল ওয়ার্পার। এদের মেরে ফেললে চলবে কি করে? ওয়ার্পার তো পথ চিনবে না। এদের পিছন পিছন যেতে হবে। ঐ সোনার তালগুলো এরাই বয়ে নিয়ে যাক না। তাহলে জেককে কম কষ্ট করতে হবে। টারজানকে বোঝাল ওয়ার্পার, ওদের ক্ষতি করে কি হবে? ওরা নিশ্চয় ভালো শিকারের জায়গাগুলো চেনে। বরং ওদের পিছন পিছন যাওয়া যাক। রাজি হয়ে গেল টারজান।

ওপার থেকে ওয়াজিরি এলাকা অনেক দিনের পথ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওয়াজিরিদের পায়ের চিহ্ন দেখে, শেষ টিলা পার হয়ে দেখতে পেল সামনে বিস্তীর্ণ ওয়াজিরি উপত্যকা, চওড়া নদী, দূরে বনরেখা। এক মাইল আগে আগে ওয়াজিরিরা চলেছে। জেব্‌রা আর নানা জাতের হরিণ চরছে। একটা বুনো মোষ কালোদের খানিক দেখে, আবার তার জলাজমিতে ফিরে গেল।

নিজের এই বহু পরিচিত এলাকা দেখেও টারজানের মনে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তারপর তার নিজের বাসস্থানের আগুনে-পোড়া ধ্বংসস্তূপ দেখেও এতটুকু বিচলিত হলো না সে। এ-সবের সঙ্গে যেন তার কোনো সম্বন্ধ নেই। তার মানসিক জীবন এখন সেই বন্য শৈশবে বাঁধা পড়ে আছে। ওয়ার্পার কিন্তু স্তম্ভিত হলো। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সেই সুন্দর বাংলো, বাগান, খামার, খেত, জন্তু-জানোয়ার, লোক-জন সব কোথায় গেল? আস্তে আস্তে মনে হলো আহমেদ্‌ জেক্‌ এই সর্বনাশ করে গেছে!

এদিকে বাসুলি তার দলবল নিয়ে এই সর্বনাশ দেখে নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। বাংলো, খেত, খামার সব জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। সব জায়গায় মৃতদেহের ধ্বংসাবশেষ। জন্তু-জানোয়ার তাদের হাড়গুলি

মাত্র বাকি রেখেছে! কিছু কাপড়-চোপড়, কিছু গয়না-গাঁটি দেখে কাউকে কাউকে চেনাও যাচ্ছিল। স্তম্ভিত বাসুলি বলল, 'এ সেই আরবদের কাজ!' কিছুক্ষণ রাগে তারা বাক্যহারা হয়ে রইল।

তারপর একজন বলল, 'মাই লেডির কি হলো?'

বাসুলি বলল, 'নিশ্চয় ধরে নিয়ে গেছে। আমাদের ঘরের মেয়েদের আর ওঁকেও।'

বিশালদেহ একজন ওয়াজিরি বর্শা তুলে যুদ্ধের ডাক দিল। বাকিরাও তাই করল। বাসুলি তাদের থামাল, 'এটা হাঁকডাকের সময় নয়। বড় বোয়ানা আমাদের না শিখিয়েছেন কাজ দিয়ে ফল হয়, কথা দিয়ে নয়। আরবদের পিছনে ধাওয়া করে, ওদের মেরে ফেলতে হবে। যদি মাই লেডিকে আর আমাদের মেয়েদের নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আরো তাড়াতাড়ি করার দরকার।'

এদিকে নদীর ধারের নলখাগড়ার আড়াল থেকে ওয়ার্পার আর টারজান মন দিয়ে সব দেখছিল। কালোরা ঐখানে পিঠের হলদে বোঝাগুলোকে পুঁতে রাখল। ওয়ার্পারের মনে কি আফসোস! ওর নিজের লোকজন সঙ্গে থাকলে কালোরা চলে গেলেই সোনাগুলো খুঁড়ে তুলে পথ দেখত!

সোনাগুলো পোঁতা হলো, হাড়গোড়গুলো পড়ে রইল। সেখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে তখনকার মতো ওয়াজিরিরা আস্তানা গাড়ল। একটু বিশ্রাম নিতে হবে। তারপর আরবদের পিছনে ধাওয়া।

অন্ধকার হলে টারজান আর ওয়ার্পার সঙ্গে আনা মাংস দিয়ে রাতের খাওয়া সারছিল। ওয়ার্পার ভাবছিল জেক্‌কে জানানো দরকার যে বীর ওয়াজিরি যোদ্ধারা তাকে সহজে ছাড়বে না। অবিলম্বে পিছনে ধাওয়া করবে। তাছাড়া সোনাগুলোর জায়গাটাও জানানো দরকার। কাজেই এখানে বসে থাকলে চলবে না। অবিশ্যি এর চেয়েও বড় কথা হলো টারজানের কোমরে ঝোলা চামড়ার থলি ভরা অমূল্য রত্নগুলো যে করেই হোক, হস্তগত করতে হবে। তাহলে লোভী জেক্‌ যদি শেষ পর্যন্ত সোনার ভাগ নাও দেয়, তাহলেও ওয়ার্পার অসীম ধনের অধিকারী হবে।

টারজানের বিশাল মাংসপেশীর দিকে চেয়ে ওয়ার্পার মনে মনে বলল, 'কেড়ে নিতে তো কোনোকালেও পারব না, মাঝখান থেকে পৈত্রিক প্রাণটি যাবে! খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে ঘুমের ভান করে, ওয়ার্পার নানা মতলব ভাঁজছিল।

এদিকে টারজান ভালো করেই বুঝেছিল ওর চকচকে পাথরগুলোর উপর ওয়ার্পারের নজর আছে। ওগুলোকেও ঐ কালোরা যেভাবে সোনা পুঁতে রেখেছিল, পাছে কেউ নিয়ে যায়, সেইভাবে পুঁতে রাখলে হয়। অনেকক্ষণ ওয়ার্পারকে নজর করে যখন মনে হলো সে সত্যি ঘুমোচ্ছে, তখন টারজান তার ছোরা দিয়ে সামনের মাটিতে একটা পাঁচ-ছয় ইঞ্চি গভীর ছোট গর্ত খুঁড়ে, তার মধ্যে থলিটি পুঁতে রাখল। ওয়ার্পার কাঠ হয়ে সব দেখল।

টারজান হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল। ওয়ার্পারের নিশ্বাস ফেলার তাল বদলাল মনে হলো না? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল টারজান। যেন ঘুমের মধ্যে ওর দিকে পিঠ ফিরে শুলো ওয়ার্পার। তারপর যেন কতই ঘুমোচ্ছে, সেই ভান করে একটু বিড়বিড়ও করল। নিশ্চিন্ত হয়ে টারজান গর্তে মাটি চাপা দিয়ে, থাবড়ে থাবড়ে ওপরটা সমান করে দিল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। হাত বাড়ালেই ওয়ার্পার গর্তটা নাগালে পায়। ইচ্ছা করে নড়াচড়া করতে লাগল সে। নাঃ, টারজান সত্যি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তখন কোমর থেকে মন্দিরের খাঁড়াটা বের করে, তাই দিয়ে মাটি সরিয়ে, থলিটি বের করে শার্টের মধ্যে গুঁজে ফেলে, মনে মনে বলল, 'ওকে মেরে ফেলব না-ই বা কেন? তাহলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়।' এই ভেবে খাঁড়া হাতে টারজানের উপর ঝুঁকে পড়ল।

এর কিছুদিন আগে থেকেই নিজের আহত ভগ্ন শরীর-মনটাকে টানতে টানতে কেবলমাত্র চরিত্র-বলে আর প্রতিশোধের ইচ্ছায় দস্যুদের পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে মুগাম্বি বড় কষ্টে, বড় ধৈর্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছিল। ক্রমে শরীরের ক্ষত-আঘাতগুলো সেরে গেল। আরো পরে ওর বিশাল শরীর তার পুরানো শক্তিও ফিরে পেল। এখন তার গতির বেগ অনেকটা বাড়ল। কিন্তু আহত শরীর টেনে বেড়াতে অনেক সময় গিয়েছিল আর ততদিনে আরবরাও অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল।

তারা তাদের সযত্ন রক্ষিত ডেরায় পৌঁছে, ওয়ার্পারের জন্য অপেক্ষা করছিল। এতদিন পথকষ্ট ছাড়া জেনকে অন্য কষ্ট সইতে হয় নি। সে ভাবছিল যদি মুক্তিপণের

আশায় ওকে চুরি করে এনে থাকে, তবে বিশেষ ভয় নেই। যে ভাবেই হোক, টারজান ওকে উদ্ধার করবে। কিন্তু যদি ক্রীতদাসী করে অনেক দামে দূরে উত্তরে কোথাও বেচে দেয়! এই কথা ভেবে জেনের মনে বড় অশান্তি।

এদিকে ঘুমন্ত টারজানকে ফেলে ভয়ে আধমরা ওয়ার্পার অনেক কষ্টে, গাছে গাছে রাত কাটিয়ে, না খেয়ে, না ঘুমিয়ে যখন জেকের শক্ত বেড়ায় ঘেরা ডেরার কাছে এসে পৌঁছল, ঠিক তখনি মুগাম্বিও বন থেকে বেরিয়ে বেড়া দেওয়া গ্রামটার সামনে পৌঁছল। সেই উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার অবসন্ন শীর্ণ লোকটাকে দেখেই সে চিনতে পারল। এই না বড় বোয়ানার বাড়িতে অতিথি হয়ে ঢুকেছিল! তাকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল মুগাম্বি। লোকটা দিব্যি সপ্রতিভ ভাবে গাঁয়ের দিকে এগোচ্ছে দেখে তার মনটা সন্দেহে ভরে গেল।

ওয়ার্পারের হাঁকে ফটক খুলে গেল, মুগাম্বি দেখে অবাক হলো বোয়ানার প্রাক্তন অতিথি এখানে কেমন সাদর অভ্যর্থনা পেল। এই লোকটা তাহলে বিশ্বাসঘাতক এবং আরবদের চর। মনটা ঘৃণায় ভরে গেল। ওয়ার্পার তাড়াতাড়ি জেকের তাঁবুতে হাজির হলো। জেক্ তো তার দুরবস্থা দেখে অবাক! 'কি ব্যাপার? তোমার এ হাল কেন?'

তখন রত্নের থলির কথাটুকু ছাড়া আর সব কথাই সংক্ষেপে বলল ওয়ার্পার। সব শুনে জেক বলল, 'তাহলে আমাদের শুধু সেখানে গিয়ে সোনাটা তুলে আনলেই হলো? তার আগে ঐ নির্বোধ ওয়াজিরিগুলোর আসার জন্য অপেক্ষা করা যাক। ওগুলোকে মেরে, নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া যাবে। সবাইকে মেরে ফেললে সোনার কথা কেউ জানবেও না।'

ওয়ার্পার বলল, 'ঐ মহিলার কি করবে?'

—'কেন উত্তর দেশে বেচে দেবো। ওরা শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসী অনেক দাম দিয়ে কেনে।'

—'ওকে নিয়ে উত্তরে কে যাবে? সেই সময়ে সোনাগুলো নিয়ে আসা যায়।'

জেক্ একটু ভেবে বলল, 'সোনা আনতে দু'জনের যাবার দরকার নেই। তুমি বরং ওকে নিয়ে উত্তরে যাও, আমি সোনা আনি।' শুনে ওয়ার্পার মহা খুশি, তবে খুশিটা গোপন করল। জেক্ দেখলে যদি কিছু সন্দেহ করে!

এবার জেকের অনুমতি নিয়ে ওয়ার্পার নিজের তাঁবুতে গেল। কতকাল ভালো করে স্নান করা বা দাড়ি কামানো হয়নি। যে কোনো পুরুষ মানুষ জানে তার কত আরাম। স্নান সেরে, দেয়ালে একটা আয়না ঝুলিয়ে, টেবিলে বসে ওয়ার্পার দাড়ি কামাতে লাগল। বেল্টে হাত দিতেই চামড়ার থলিটার ওপর হাত পড়ল। ইশ্, জেক্ দেখলে কি বলত! কিছুতেই লোভ সামলাতে পারল না ওয়ার্পার। থলি বের করে, রত্নগুলো টেবিলে ঢালল। ইশ্! এই দিয়ে ইউরোপের সব সুখের সামগ্রী হস্তগত করা যাবে! হঠাৎ আয়নাটার উপর চোখ পড়তেই ওয়ার্পার আঁৎকে উঠল। তাঁবুর দরজার ফাঁক থেকে একটা মুখ আর দুটো জ্বলজ্বলে চোখ সরে গেল। সর্বনাশ হয়েছে! জেক্ রত্নগুলো দেখে ফেলেছে! ওয়ার্পারের জীবনের দাম এখন এক কানাকড়িও নয়। কারণ লোভী জেক্ এ-ধন এমনি এমনি ছেড়ে দেবে না। সাকরেদ এ-ব্যাপার গোপন করেছে বলে তাকে ক্ষমাও করবে না।

চিন্তিত ভাবে কাপড়-চোপড় ছেড়ে শোবার জোগাড় করতে লাগল ওয়ার্পার। এ তো মহা গেরো! এর ঘণ্টা দুই বাদে, নিঃশব্দে ওয়ার্পারের তাঁবুর দরজা দিয়ে ছোরা হাতে একটা ছায়ামূর্তি ঢুকে, ওর কম্বল ঢাকা শরীরটা কোথায় দেখে নিয়ে, একটা লম্বা ছোরা দিয়ে বারবার কোপ দিতে লাগল। কোনো রকম সাড়া না পেয়ে কম্বল সরিয়ে জেক্ দেখল মানুষ তো নয়, কতকগুলো ছাড়া কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র মানুষের আকারে সাজানো। ওয়ার্পার পালিয়ে গেছে।

হাঁকডাক করে লোকজনদের তুলে সারা গ্রাম খুঁজেও পলাতককে যখন পাওয়া গেল না, তখন ফটক খুলে ঐ অন্ধকার রাত্রেই বন পেটাতে ঘোড়ায় চড়ে জনা কুড়ি অনুচর নিয়ে জেক্ বেরিয়ে পড়ল। সেই ফাঁকে মুগাম্বিও গ্রামে ঢুকে পড়ল। এমন কি অন্ধকারে অন্য কালোদের সঙ্গে ফটক বন্ধ করতেও সাহায্য করল।

এদিকে মুগাম্বি গ্রামের ভিতরকার ঘুটঘুটে অন্ধকারে কুঁড়েগুলোর আর তাঁবুর চারদিকে ঘুরে দেখল একটার সামনেই সশস্ত্র পাহারা বসেছে। ঠিক তখুনি পাহারাদার বদল হলো, 'বন্দী ভিতরে নিরাপদে আছে তো?'

—'আছে। এদিকে কেউ আসেনি।'

নতুন পাহারা বসলে পর একটা মোটা মুগুর তুলে

নিঃশব্দে মুগাম্বি এগোল। এক বাড়িতেই পাহারাদারের ইহলীলা শেষ। তারপর মুগাম্বি ঘরের ভিতর খুঁজে দেখল। সেখানে কেউ নেই।

শেষ পর্যন্ত ঘুমন্ত টারজানের বুকে খাঁড়া বসাতে ভয় করেছিল ওয়ার্পারের। নলখাগড়ার বনে পায়ের শব্দ কানে এলো। থাক, রত্নগুলো নিয়ে পালানোই যাক। এই ভেবে সেখান থেকে সরে পড়েছিল ওয়ার্পার এবং জেকের ডেরায় তার পৌঁছনোর কথাও আমরা জানি।

সিংহের হুংকারে টারজানের ঘুম ভেঙেছিল। ওয়ার্পার কোথায় গেল! সিংহ নেয়নি তো? তা মনে হলো না। সিংহের ডাক শুনে ব্যাটা বন্ধুকে ফেলেই পালিয়েছে। ভারি নীচ মন তো! টারজান কোনো বিষয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করত না। একশো গজ দূরে এক মস্ত গাছ দেখতে পেয়ে, তাতে উঠে, একটা আরামের জায়গা খুঁজে নিয়ে সারারাত ঘুমোল টারজান। সকালে ওঠার কোনো দরকার ছিল না তার। কোনো বিপদ না এলে, বা খিদে না পেলে, যতক্ষণ খুশি ঘুমোয় বনের বাসিন্দারা।

এতক্ষণ পরে উঠে গা মোড়ামুড়ি দিল সে। চারদিকে লর্ড গ্রেস্টোকের বিধ্বস্ত খামার দেখেও কিছু মনে হলো না। বাসুলিরা খাওয়া-দাওয়া সেরে আরবদের পিছনে ধাওয়া করবে। তার তোড়জোড় হচ্ছিল। টারজান কৌতূহলের সঙ্গে দেখছিল। কি যেন একটা জানা কথা মনের পিছনে ঘুরছিল; কেমন যেন চেনা চেনা লাগছিল এদের। কেন কে জানে! ওপার থেকে বেরিয়ে অবধি কোনো জিনিস দেখে আগের কিছু তার স্মরণে আসেনি, শৈশবের বন্য জীবনের কথা ছাড়া।

একটি বিশালদেহী লোমশ চেহারা মনে পড়ছিল। ভারি হিংস্র, বিশ্রী দেখতে। তার কথা মনে অস্পষ্টভাবে আসতেই মনটা নরম হয়ে যাচ্ছিল। সে যে কালা! তাকেও ভালো করে চিনতে পারছিল না। আরো বনমানুষদের অস্পষ্ট ভাবে মনে হচ্ছিল—টেরকজ, টুবলাট, কেরচাক, ছোট্ট নীতা। ভাবতে ভাবতে ছোটবেলাটা মনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে এলো। তাদের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছিল।

কালোরা উনুন নিবিয়ে ছাই ছড়িয়ে, রওনা হয়ে গেলে পর, টারজান নেমে এলো। খুব খিদে পাচ্ছিল। কত জানোয়ার চরছে। একটা মোটাসোটা জেবরার উপর নজর পড়ল। সেটাকে দক্ষভাবে প্রথমে বর্শা দিয়ে, তারপর তার পিঠে চড়ে ছোরার আঘাতে মেরে ফেলল টারজান। কেউ বেচারিকে সাহায্য করতে এলো না। গোটা জেবরার দলটা প্রাণ দিয়ে পালাল। ঐ জেবরার জোড়াটাও। জীবজগতের তাই নিয়ম।

শিকার মেরে টারজান বনমানুষদের জয়ধ্বনি দিল। দূর থেকে বাসুলিরা সে ডাক শুনে বলাবলি করতে লাগল যে অনেক দিন পরে এ-অঞ্চলে বড় বনমানুষের ডাক শোনা গেল। টারজান তার শিকারটাকে টেনে ঝোপের আড়ালে নিয়ে প্রথমে মস্ত এক চাকলা রাং কেটে নিজের খিদে মেটাতে বসল। জেবরার হাঁকডাক শুনে এক জোড়া হায়না এসে একটু দূরে থাবা গেড়ে বসেছিল। বেশি এগোতে সাহস পাচ্ছিল না। নড়েছে কি বনমানুষটা দাঁত খিচিয়ে চাপা হুংকার দিচ্ছে। পেট ভরে তাজা মাংস খেয়ে ভবিষ্যতের জন্য কয়েক চাকলা মাংস কেটে নিল টারজান, যা বনের জানোয়াররা কখনো করে না। এবার জল খেতে হবে। হায়নারা বসেই ছিল, তাদের পাশ দিয়ে নদীর ধারে গেল টারজান। জল খেল, স্নান করল। এদিকে হায়নারা জেবরার মাংস খেয়ে পেট ভরাতে লেগে গেল। তাতে টারজানের কোনো আপত্তি ছিল না। এই হলো বনের নিয়ম।

নদীতে এক পাল মোষ একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেও কেউ কাকেও কিছু বলেনি। দুপুরে বড় বেশি গরম। টারজান তার নিজের গোলাবাড়ির ধ্বংসাবশেষের কাছে একটা গাছের পাতার আড়ালে বিশ্রাম নিল। দূরের নীল ঘন বন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। সেখানে কত ভবিষ্যৎ দিন কত শিকার, খাওয়া-দাওয়ার, খেয়াল-খুশির মধ্যে কাটানো যায়। এক্ষুণি ছুটে যাবার তাড়া নেই। যা হারিয়েছে তার জন্যে কোনো আক্ষেপ নেই, কোনো

স্মৃতির আবেগও নেই, খালি একটা অস্পষ্ট অশান্তি মনকে নাড়া দেয়। 'সুখেই ছিল বনমানুষের ছেলে টারজান। লর্ড গ্রেস্টোক বলে কারো অস্তিত্বই ছিল না।

বেশ কয়েক ঘণ্টা আলসেমিতে কাটিয়ে যে পথে বনের জানোয়াররা জল খেতে যায়, ধীরে সুস্থে টারজান সেই পথে চলল। প্রায় নদীর ধারে পৌঁছে গেছে, এমন সময় এক বিশাল সিংহ পরিবারের সঙ্গে দেখা হলো। একটা সিংহ, দুটো সিংহী আর চারটি বাচ্চা, তারাও মাপে ও তেজে প্রায় বাপ-মাদের ধরে ফেলেছে। চাপা গর্জন দিয়ে টারজান দাঁড়াল। সিংহরাও দাঁড়াল। বড় পুরুষটা দাঁত বের করে গুড়গুড় করে সাবধানি ডাক ছাড়ল। টারজানের হাতে বর্শা থাকলেও, মারামারি করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। সিংহরা কিছু আগে পেট ভরে খেয়েছে। টারজান তৃণভাজী ছাড়া কারো মাংস খেত না। তবু পরস্পরকে একটু তেজ দেখানো তো চাই, তাই উভয়পক্ষ এমনি হাঁকডাক করেছিল যে পিছন থেকে যে বিপদ আসতে পারে সে

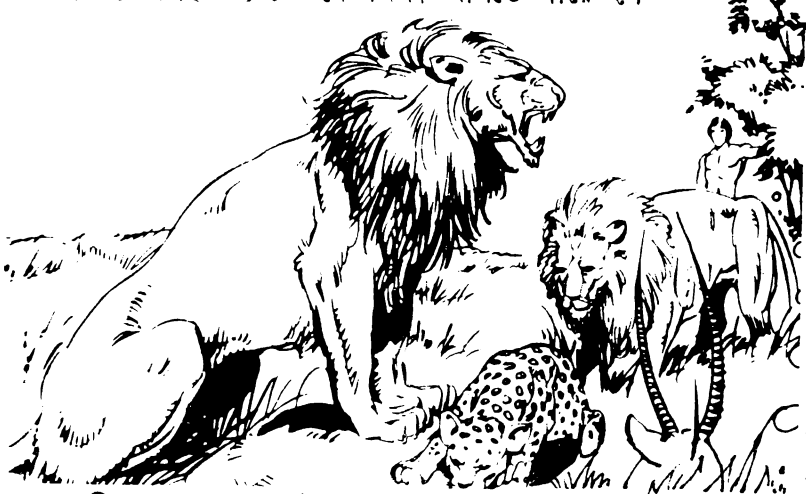

খেয়াল ছিল না। এলো বুটো নামক গণ্ডার। তার শুয়োর চোখ থেকে আগুন ঝরছিল। সটাং টারজানের দিকে তেড়ে এলো। কিন্তু আদিম বনবাসীদের বাঁচতে হলে সদাই প্রস্তুত থাকতে হয়। মুহূর্তের মধ্যে টারজান বুটোর বুকে বর্শা ছুঁড়ে দিল। বর্শাটা বেশ ভারি, ফলা লোহা বাঁধানো। বুটো উল্টোদিক থেকে বিষম বেগে তেড়ে আসছিল। বর্শা ছুঁড়ে দিয়েই টারজান দেখে হাতের কাছে বুটোর শিংটা! বর্শাটা বুটোর গলা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করেছিল। টারজান এক লাফে শিং ডিঙিয়ে বুটোর পিঠে চড়াও হলো আর বুটোর চোখ পড়ল সিংহদের উপর। সেই সুযোগে টারজানও এক লাফে ঝোপের ওপাশে। তারপর গাছে চড়ে গণ্ডার-সিংহের লড়াই দেখা।

বনের জানোয়ারদের কাছে ঐ সবই হলো সার্কাস-থিয়েটারের সামিল।

প্রথমটা মনে হয়েছিল বুটোই বুঝি জিতবে। প্রথমটা সিংহকে সে গুঁতিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অমনি বাকি ছয়টা ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে-কামড়ে একাকার করল। তারপর এক সময় বুটোর বিশাল শরীরটা ঢলে পড়ল। টারজানের বর্শা তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করেছিল। তাই নিয়ে কতক্ষণ লড়বে! ঐখানেই ঘটনার শেষ। যে যার পথ ধরল। মানুষদের মতো খেলা নিয়ে সাত-পাঁচ আলোচনা করল না।

সেখান থেকে টারজান ঘন বনে ঢুকে ছোটবেলার মতো গাছ থেকে গাছে ঝুলে, শিকার করে, ফলমূল পোকামাকড় খেয়ে সময় কাটাতে লাগল।

এ দিকে তারই খোঁজে এক বিকট মিছিল বেরিয়েছিল। গোটা পঞ্চাশ লোমশ কদাকার জীব, না বাঁদর—না মানুষ, বাঁকা পা, গিঁট পাকানো শরীর। সঙ্গে ছোরা, মুগুর ইত্যাদি অস্ত্র। দলের আগে আগে তাদের নেত্রী,, ওপারের প্রধানা পূজারিণী লা। পবিত্র খাঁড়া যে চুরি করেছে, তাকে তারা খুঁজছে। এর আগে লা কখনো ওপারের দেয়ালের বাইরে আসেনি। আসার দরকারও হয়নি। আবহমান কাল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রভুত্বের চিহ্ন ঐ খাঁড়া, পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার চিহ্ন। লুপ্ত অ্যাটলান্টিসের প্রাচীন ধর্মের যতই দুর্গতি আর অধঃপতন হয়ে থাক, ঐ পবিত্র খাঁড়া তেমনি পবিত্র ছিল। তাকে উদ্ধার করতেই হবে।

লা-য়ের মনে শুধু ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়, টারজান তাকে উপেক্ষা করে চলে গিয়েছিল, তাই তাকে সে ক্ষমা করতে পারছিল না। তার সর্বনাশ সাধন লা-য়ের কাম্য। এই রকম মনের ভাব নিয়ে লা বেরিয়ে এসেছিল। যার হাতে খাঁড়াটা ছিল, সেই ওয়ার্পারকে ও এতটুকু গুরুত্ব দেয়নি। তাকে মেরে লা-য়ের কোনো তৃপ্তি হবে না, যেমন হবে অসীম যন্ত্রণায় টারজানের মৃত্যু দেখলে।

বনমানুষদের সঙ্গে ওপারীয়দের রক্ত সম্পর্ক ছিল। দু'জনেই আদিম নর-বানরদের বংশধর। কোন্ আদিম কালে মানুষের আর বনমানুষের বংশ আলাদা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওপার দেশে তা হয়নি। তাই ওদের মেয়েরা সুন্দরী

মানবীর মতো, পুরুষরা কদাকার বনমানুষের মতো। কথাও বলে সবাই বনমানুষদের মতো ভাষায়।

লা-য়ের দলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনজন বিশালদেহী বনমানুষও ছিল। অনুচরদের সঙ্গে লা বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করত। কিন্তু তারা ওকে দেবীর মতো ভক্তি করত। ক্লান্তি বোধ করলে ওরা ওকে পালকি করে বয়ে নিয়ে যেত।

টারজানদের চিহ্ন দেখে দেখে বনমানুষরা আগে আগে যাচ্ছিল। এক দিন দুপুরে সকলে বিশ্রাম করছে, এমন সময় একজন বনমানুষ উঠে বাতাসে কি যেন শুঁকল। তারপর অন্যদের সাবধানে থাকতে বলে, এক লাফে গাছে উঠে কি যেন দেখতে চলল। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এসে বলল, 'বড় টারমানগানি ওদিকের গাছে ঘুমিয়ে আছে। চল, তাকে গিয়ে মেরে ফেলি।'

লা বলল, 'না, মেরো না। আমার কাছে ধরে আনো। প্রতিশোধ যা নেবার, লা নেবে।'

অমনি তিন বনমানুষের সঙ্গে লা-য়ের পূজারীরা ছুটে গেল। বনমানুষরা গাছে চড়ে ঘুমন্ত টারজানের উপর লাফিয়ে পড়তেই, চারজনে মাটিতে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে লা-য়ের অনুচররা সবাই মিলে টারজানকে আক্রমণ করল।

ভয়ংকর লড়াই দিয়েছিল টারজান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছিল। অতজনের সঙ্গে পারবে কেন? তবে প্রত্যেকের গায়ে ক্ষত চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল, টারজানের উপহার। লা ওদের কাছে এগিয়ে এসে হুকুম দিল যেন টারজানকে এখনি ওরা মেরে না ফেলে। মন্দিরের পবিত্রতা যে নষ্ট করেছে, তার সাজা দেবে লা নিজে। নির্যাতন আর আগুন-দেবতার কাছে বলিদান।

একটা ছাউনি তৈরি হলো। দেবতার নামে একটা বেদীও হলো। টারজানের হাত-পা বাঁধা। লা-র মুখের দিকে চেয়ে সে হাসল।

—'খাঁড়া কোথায়?' লা জিজ্ঞাসা করল।

—'সে লোকটা নিয়ে গেছে। আমাকে ছেড়ে দিলে শুঁকে শুঁকে তাকে বের করে খাঁড়া এনে দিতে পারি। না ছাড়লে খাঁড়া পাবে না।'

এই কথা শুনে আর ওর ঐ সুন্দর নির্ভীক চেহারা দেখে লা-র গা জ্বলে গেল। মনে মনে বলল, 'আমাকে উপেক্ষা করে চলে যায়, এত বড় আস্পর্ধা। সারা রাত ওকে কষ্ট দেবো। সকালে হৃৎপিণ্ড কেটে বের করে দেবতাকে দেবো। দেবতা খুশি হবেন।'

সারাদিন ওরা ছাউনির কাজ করল। সারাদিন মন্ত্র আওড়াল। তার এক বর্ণ মানে কেউ জানত না। লা-ও না। যখনি লা কাছে আসে, টারজান হাসে। কি সুন্দর দেবতুল্য চেহারা ওর। বুকটা কেমন করে লা-র।

অন্ধকার নেমে এলো। ধূনি জ্বালা হলো। চারদিকে মাংসাশী জানোয়ার। টারজান চুপ করে পড়ে রইল। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। হাতে পায়ে বাঁধুনির বড় যন্ত্রণা। তবু মুখে হাসি। টারজানের সমস্ত শরীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো। ভোরে আরেকবার লা বলেছিল, 'আমার সঙ্গে চল, টারজান, সুখে থাকবে।' টারজান পিঠ ফিরিয়ে শুয়েছিল। লা তখন পূজারীদের ডেকে বলির আয়োজন করতে বলল। অন্য একটা ছোরা দিয়ে কাজ চালাতে হবে।

হঠাৎ টারজানের কানে এলো তান্তরের উন্মত্ত ডাক। এই রে! হাতিটা খেপে গেছে। হাতিরা খেপে গেলে সাংঘাতিক রূপ নেয়। তখন তারা কাউকে মানে না, চেনে না। সামনে যাকে পায়, সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে, পিষে মেরে ফেলে। আবার উন্মত্ত অবস্থা কেটে গেলে, যে কে সেই। তান্তরকে এখন তার প্রিয় বন্ধু টারজান ডাকলেও সাড়া দেবে না। মেরে ফেলবে টারজানকেও পেলে। এখন কাউকে চিনবে না তান্তর। পালানো ছাড়া বাঁচার উপায় নেই।

টারজান লা-কে বলল, 'তান্তর খেপে গেছে। ডাক শুনে ভেবেছিলাম আমাকে বাঁচাতে আসছে। কিন্তু খ্যাপা হাতি কাউকে চেনে না। পারলে আমাকেও মেরে ফেলবে। সবাই এখন ওর সামনে থেকে পালাচ্ছে। বড় বেশি দেরি হয়ে যাবার আগে আমার বাঁধন কেটে দাও। আমি তোমাকে বাঁচাব। পূজারীদের পালাতে বল।'

লা ভালো করেই জানত খ্যাপা হাতি কি সাংঘাতিক হয়। ততক্ষণে টারজানের চারদিকে সাজানো চিতায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। তান্তরও এসে পড়ল বলে। পুরোহিতরা অস্বস্তি বোধ করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

লা বলল, 'কি দেখছ? বাঁচতে চাও তো পালাও সবাই।' বন থেকে মড় মড় করে গাছ ভেঙে তান্তরের আগমন ঘোষণা করছিল। লা টারজানের বাঁধন কেটে দিল। প্রধান পুরোহিতের কি রাগ! লা-কে বিয়ে করার তার

বড় ইচ্ছা। টারজান না মরলে সে যে কাউকে বিয়ে করবে না, সেটা সকলে জানত।

লা-কে বুড়ো বলল, 'বিশ্বাসঘাতক। বাঁধন কেটে দিলে! তাহলে তুমিও মর।' এই বলে মুগুর তুলে লা-র দিকে ছুটে গেল। টারজান মুগুরটা কেড়ে ফেলে দিয়ে, বুড়োকে তুলে তার সঙ্গীদের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এই দৃশ্যের মধ্যিখানে খ্যাপা হাতিটা হুড়মুড় করে এসে পড়ল। অযথা রাগে খুদে চোখ দুটো লাল। পূজারী স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গে লা-কে কোলে নিয়ে টারজান ঐ বিকট শুঁড়ের নাগালের বাইরে গাছের মগডালে। নিরাপদে। শিকার ফস্কে যাওয়াতে রাগের চোটে তান্তর হতভাগ্য পূজারীদের উপর হামলে পড়ল। তারা যে যেদিকে পারল ছিট্‌কে পালাল। এক হতভাগ্যকে শুঁড়ে পাকিয়ে ধরে, গাছের গায়ে আছড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, আরেক জনকে তাড়া করল। দু'জনকে মাড়িয়ে থেঁতো করল। ততক্ষণে বাকিরা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে আবার তান্তর টারজানের গাছের কাছে ফিরে এসে দু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে, শুঁড় বাড়িয়েও ধরতে না পেরে, গায়ের জোরে গাছটার গুঁড়ি ঠেলে পেড়ে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগল। টারজান জানত, তান্তর সুস্থ হলেই এ সব ভুলে আবার তার প্রিয় আশৈশবের বন্ধু হয়ে যাবে। এখন কিন্তু ধরতে পারলেই মেরে ফেলবে।

এদিকে ঠেলাঠেলির চোটে ঐ বিশাল গাছও নড়বড় করতে লাগল। তারপর এক পাশে কাৎ হতে আরম্ভ করল। তখন লা-কে পিঠে নিয়ে, পাশের আরেকটু ছোট একটা গাছের ডালে অভাবনীয় এক লাফ দিল টারজান। তার-পর সে গাছ থেকে আরেকটাতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাছটা তার ছোটখাটো সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মড়মড় করে মাটি নিল। এতক্ষণ পরে তান্তর বুঝল তার শিকার পালিয়েছে। অমনি বিকট ডাক ছাড়তে ছাড়তে তাদের খোঁজে ছুট দিল।

আরেক বেচারা পূজারীকে মেরে তান্তর হঠাৎ ঘুরে ডাকতে ডাকতে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। ততক্ষণে লা মনে মনে বুঝেছে টারজান তার কাছে থাকতে না চাইলেও, তার মতো কেউ হয় না। তার অনিষ্ট লা কখনো করতে পারবে না। চারদিক চুপচাপ হয়ে গেলে, গাছ থেকে নেমে, লা-কে নামিয়ে টারজান বলল, 'তোমার লোকজনদের ডাকো।'

লা বলল, 'ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।'

—'না, টারজান থাকতে কেউ তোমার ক্ষতি করবে না।'

বাঁশির মতো সুরে লা ডাক দিতেই ভক্তরা উত্তর দিল, 'আসছি, আসছি।,

সবাই এসে জড়ো হলে, টারজান বলল, 'তোমাদের লা নিরাপদ আছে। টারজানকে মেরে ফেললে, তাকেও কেউ বাঁচাতে পারত না। তাকে নিয়ে ওপারে ফিরে যাও। টারজানের সঙ্গে লা-য়ের চিরকালের মতো সদ্ভাব থাক। তোমরা কি বল?'

খানিক তর্কাতর্কি হলো নিজেদের মধ্যে। প্রস্তাবটা সকলের পছন্দ হচ্ছিল না। শেষটা টারজান বলল, 'লা-কে নিয়ে ওপারে ফিরে গিয়ে, লা-র কথা মতো চলবে তোমরা। তা না হলে বনের জন্তুদের নিয়ে টারজান ওপারে গিয়ে সবাইকে মেরে ফেলবে।'

শেষ পর্যন্ত প্রধান পূজারী কাডিজ ছাড়া সকলে রাজি হয়ে গেল। টারজান বলল, 'ওকেও রাজি করাও, নয়তো মেরে ফেল! দেখ কাডিজ, ভালোয় ভালোয় ফিরে গিয়ে রানীর আদেশ মতো চলবে। নইলে টারজান এসে সাজা দেবে।

লা বলল, 'আবার আসবে তো, টারজান?'

টারজান বলল, 'কে জানে!' এই বলে একটা গাছের ডালে ঝুলে পড়ে পুব দিকে রওনা দিল। ওপারের অধিবাসীরাও বাড়ির পথ ধরল।

ঐ জায়গার উত্তর দিকে কয়েক দিনের পথ দূরে, লেডি গ্রেস্টোক তখনো অপেক্ষা করছিলেন, কবে তাঁর স্বামী ফিরে এসে তাঁকে উদ্ধার করবেন আর এই পাপিষ্ঠকে সাজা দেবেন।

এদিকে বনে ঘুরতে ঘুরতে টারজানের হঠাৎ তার রঙীন পাথরগুলোর কথা মনে পড়ল। সেই জায়গা খুঁজে বের করে ছোরা দিয়ে মাটি খুঁড়েও যখন বস্ত্রের থলিটা পাওয়া গেল না, তখনি টারজান বুঝে নিল কে তার পাথর চুরি করেছে। আর অপেক্ষা করা নয়, অমনি চোরের পিছু নিল সে। সাধারণ মানুষ হলে এতদিন পরে কোনো পায়ের চিহ্নই খুঁজে পেতো না। কিন্তু টারজান তার বনমানুষী মায়ের দুধের সঙ্গে কয়েকটা বাড়তি গুণের অধিকারী হয়েছিল। সে জানত পায়ের ছাপ মুছে গেলেও, তার গন্ধটুকু থেকে যায়। সেই গন্ধ শুঁকে সে ওয়ার্পারের সন্ধানে চলল।

গন্ধটা এতদিনে খুব ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। একটু বেশি সময় নিলেও, ঠিক জায়গাতেই যে নিয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সারাদিন চলা ; শিকার ধরা এবং খাওয়ার জন্য একটু থামা। রাতে ঘুমিয়ে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করা। মাঝে মাঝে কালো যোদ্ধার দল দেখে, তাদের এড়িয়ে যাওয়া। এরা হলো বাসুলীর ওয়াজিরির দল। কিন্তু টারজান তাদের ভুলে গিয়েছিল। তারাও জেকের ডেরা আক্রমণ করতে চলেছিল। টারজান কিন্তু তাদেরও শত্রু বলে ধরে নিয়েছিল।

অবশেষে এক রাতে আরব দস্যুর বেড়ায় ঘেরা গ্রামের বাইরে টারজান পৌঁছল। গাছের উপর থেকে বেড়ার মধ্যে উঁকি মেরে দেখল এরা দলে খুব ভারি। একা পারা যাবে না, চালাকি করতে হবে। গাছে বসে সঙ্গে আনা বুনো শুয়োরের মাংস চিবোতে চিবোতে টারজান একবার গ্রামে ঢুকবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। গ্রামে দেখতে পাচ্ছিল সাদা পোশাক পরা আরব আর প্রায় ন্যাংটো কালো মানুষ, কিন্তু ওয়ার্পারের টিকিও দেখতে পেল না।

আরো রাতে গাঁয়ের পথঘাট খালি হলো, খালি ফটকের পাহারাদাররা জেগে রইল। তখন টারজান ঘুরে ফটকের উল্টোদিকে চলে গেল। কোমরে একটা লম্বা কাঁচা চামড়ার দড়ি। ছোটবেলাকার ঘাসের দড়ির চেয়ে অনেক মজবুত। প্রথমে ফাঁসটাকে মাটিতে পাতল, তারপর বেড়ার একটা খুঁটির ছুঁচলো মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল। ফাঁসটা ঠিক জায়গায় পড়ল, দড়ি ধরে টানতেই বেশ এঁটেও বসল। তার সাহায্যে বেড়ার উপড় চড়ে দড়ির প্যাঁচ খুলে আবার কোমরে জড়িয়ে নিল। তারপর চারদিকে চকিতে চেয়ে টুপ করে এক লাফে বেড়ার মধ্যে নেমে পড়ল।

এবার ঘরে ঘরে খোঁজা। ঢুকে দেখার কোনো দরকার ছিল না, নাক আছে কিসের জন্য! বাইরে থেকে শুঁকে শুঁকে একটা তাঁবুতে চোরের গায়ের কড়া গন্ধ পেল। কান পেতেও কোনো শব্দ পেল না। তখন বাইরে থেকে তাঁবুর একটা খুঁটির দড়ি কেটে পাশটা তুলে, টারজান ভিতরে ঢুকল। কিন্তু গন্ধটা তাজা নয়। টারজান বুঝল ঘরে কেউ নেই। এক কোণে কাপড় চোপড় কম্বল ছড়ানো। পাথরের থলিটা কোথাও খুঁজে পেল না। তাঁবুর এক দিকের দেয়ালের তলাটা আলগা। চোর এই পথেই বেরিয়ে গেছে

গন্ধ শুঁকে শুঁকে একটা ছোট ঘরের পিছনে দেখল দেয়ালে গর্ত কাটা। সে ঘরে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ। মেয়েদের ঘরে যেমন থাকে। কি যেন মনে পড়তে পড়তেও পড়ল না। ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। তারপর আবার বেড়া টপকিয়ে বনে ফিরে গেল।

এর আগে ওয়ার্পার তার বিছানায় বালিশ কম্বল ইত্যাদি সাজিয়ে রেখে জেনের কুঁড়েঘরে গিয়েছিল। শেখের পেয়ারের সাকরেদকে সান্ত্রী বাধা দেয়নি। কিন্তু জেনের নাম ধরে ডেকে নিজের নাম ফ্রেকো তা জানিয়েও যখন কোনো উত্তর পাওয়া গেল না, তখন অন্ধকারে হাতড়ে ওয়ার্পার বুঝল কেউ সে ঘরে নেই। তারপর দেয়ালের গর্ত দেখে বুঝল জেন এই পথে চলে গেছে। ওয়ার্পার ভেবেছিল লেডি গ্রেস্টোককে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারলে সে ব্রিটিশ সরকারের কৃতজ্ঞতা ও সাহচর্য পেতে পারে। ওর পালাবার অনেকগুলো পথ তো বন্ধ। দক্ষিণে গেলে যদি টারজানের হাতে পড়ে! পশ্চিমে বেলজিয়ান এলাকা। সেখানে গেলেই প্রাণদণ্ড। এক যদি পুব দিকে গেলে কিছু সুবিধা হয়।

ফটকের উল্টোদিকে ঘর তৈরির জন্য এক গাদা বাঁশ পড়েছিল। তারই কয়েকটা দিয়ে একটা নড়বড়ে সিঁড়ির মতো করে লেডি গ্রেস্টোক নিঃসন্দেহে পালিয়েছেন।

বাঁশগুলো তখনো দেয়ালে ঠেকানো রয়েছে। ওয়ার্পারও ঐ পথেই পালাল। ওয়ার্পার পূর্ব দিকের পথ ধরল। ওর দক্ষিণে কয়েক মাইল দূরে জেন ক্লেটন একটা ক্ষুধার্ত সিংহীর হাত থেকে গাছে আশ্রয় নিয়েছিল। এত সহজে গ্রাম থেকে বেরোতে পারবে ভাবেনি। ঘরের দেয়ালে একটা ছোরা গোঁজা ছিল। তাই দিয়ে দেয়াল কেটে বেরোতে পেরেছিল। ঘরগুলোর পিছন দিয়ে ঘুরে, সহজেই বাঁশের সাহায্যে দেয়াল টপকে ছিল। এক ঘণ্টা ধরে জানোয়ারদের হাঁটা পথে চলে, সিংহীর সাড়া পেয়ে গাছে উঠেছিল।

ওয়ার্পারের কপাল আরেকটু ভালো। ভোর অবধি হাঁটার পর সে টের পেল তার পিছনে একটা ঘোড়ায় চড়া আরব ধাওয়া করেছে। এ লোকটা জেকের চর। ওয়ার্পারের খোঁজে লোক পাঠাবার সময়ে জেনের অনুপস্থিতির কথা জেক্ টের পায়নি।

ওয়ার্পারকে যে সে বন্দিনীর ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল এ কথা সান্ত্রীও ভয়ে স্বীকার করেনি। অন্য সান্ত্রীর দেহটাকে একটা খালি ঘরে লুকিয়ে রেখে, নিজে পাহারায় বসেছিল।

পিছনে লোক লেগেছে বুঝেই ওয়ার্পার একটা ঝোপে লুকিয়েছিল। লোকটা আরেকটু কাছে এলে ওয়ার্পার আবিষ্কার করল একটা হলুদপানা শরীর আর এক জোড়া সবুজ চোখ। ভয়ে আড়ষ্ট হলো সে। এমন সময় ঘোড়ার শব্দ শুনে সিংহের দৃষ্টি সেদিকে গেল। ঘোড়াটা ভয়ে ডেকে উঠল, সিংহ আরোহীকে টেনে নামিয়ে মেরে ফেলে, এক ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে খেতে বসল।

ওয়ার্পার সেই ফাঁকে এক লাফে ঐ ঘোড়ায় চড়ে চম্পট দিল।

আধ ঘণ্টা বাদে একটা খালিগা সাদা দৈত্য গাছ থেকে গাছে ঝুলে অকুস্থলে উপস্থিত হলো। সিংহরাজ তখনো ভোজন করছে। টারজান থমকে দাঁড়াল, তার নাকে চোরের গন্ধ পৌঁছেছে। তাকেই খাচ্ছে না তো? তাহলে রঙীন পাথরের থলি কোথায় গেল দেখতে হবে।

তারপর সিংহকে পার হয়ে নিচু ডালে নামল টারজান। একটু এগিয়ে মাটিতেও নামল। হতভাগ্য মানুষটার এখন কয়েকটা হাড়গোড় ছাড়া কিছু বাকি নেই। তীক্ষ্ণ চোখে টারজান চারপাশে খুঁজে দেখল, মাটি শুঁকল। থলির

চিহ্নও পেল না আর ঐ জায়গার পর মাটিতে চোরের গন্ধও পেল না। তবে কি তাকেই খাচ্ছে? কিছুতেই ভোজন ছেড়ে নুমা উঠছে না দেখে, শেষ পর্যন্ত ধনুকে তীর পরিয়ে টং করে মেরে দিল। তীরটা ওর পাশে বিঁধল। রাগে, বেদনায় লাফিয়ে তেড়ে গেল নুমা। টারজানও এক লাফে গাছের উপরে। সেখান থেকে আরেকটা তীর। সেটা বিঁধল নুমার শিরদাঁড়ায়। নুমার বিশাল দেহটা থমকে দাঁড়াল, তারপর আড়ষ্ট হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল

গাছ থেকে নেমে টারজান ছুটে কাছে গেল। তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাথরগুলো কিম্বা থলিটা পাওয়া গেল না। তখন টারজান ভাবল আরেকবার গাঁয়ে ফিরে গিয়ে ভালো করে দেখতে হবে। এই মনে করে ফের সেখানকার পথ ধরল। ও চলে গেলেই মুগাম্বি ছুটতে ছুটতে ঐ পথে এলো। ও তখনো মাই লেডিকে খুঁজছিল। থেকে থেকে তাঁকে ডাকছিল, যদি উত্তর পায়। সেজন্য তাকে বিপদেও পড়তে হয়েছিল।

গত কয়েক মাস ধরে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এক দল অ্যাবিসিনিয়ার হাবসি সৈনিকের সেনাপতি আবদুল মৌরাক আরব দস্যু আহমেদ জেক্‌কে খুঁজতে খুঁজতে এই দিকেই এগোচ্ছিল। জেক্ অ্যাবিসিনিয়ার সম্রাট মেনেসেকের এলাকা থেকে ক্রীতদাস ধরে নিয়ে এসেছিল। মৌরাকের ক্লান্ত অনুচররা ঐখানে ঘোড়া থেকে নেমে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় তাদের মাঝখানে ক্লান্তদেহে ওয়ার্পার এসে পৌঁছল। অমনি সৈনিকরা তাকে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে সেনাপতির কাছে নিয়ে গেল। ওয়ার্পার তাকে বোঝাল, সে একজন ফরাসী শিকারী, সাফারি নিয়ে বেরিয়েছিল, বিদেশীরা তাদের আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে, সে নিজে অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

ওদের কথায় ওয়ার্পার বুঝেছিল এরা জেকের শত্রু, তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অমনি সে নিজের দুরবস্থার দায়িত্ব জেকের ঘাড়ে চাপিয়ে বলল, এভাবে সামান্য কয়েকজন লোক নিয়ে জেকের ডেরায় গেলে পেরে উঠবে না। ওরা দলে ভারি, সব খুনে ডাকাত। এই মুহূর্তে তারা উত্তর দিকে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত মৌরাক জেকের ডেরায় না গিয়ে অ্যাবিসিনিয়ায় ফেরাই ঠিক করল। সে রাতের মতো ঐখানেই

ক্যাম্প হলো। দলের কয়েকজন চারদিক ঘুরে দেখতে বেরিয়েছিল। ফিরল তারা সঙ্গে করে একজন লম্বা বলিষ্ঠ ওয়াজিরি বন্দী নিয়ে। সেই বন্দী হলো মুগাম্বি। সে ওয়ার্পারকে দেখেই চিনতে পারল এবং মনটা সন্দেহে ভরে গেল। ওয়ার্পার তাকে চিনতে পারেনি।

মুগাম্বি অনেক করে বলেছিল সে একজন নিরীহ শিকারী, দক্ষিণে বাড়ি। কিন্তু তার চমৎকার চেহারা দেখে মৌরাক তাকে দেশে নিয়ে গিয়ে, সম্রাটকে উপহার দেবে স্থির করেছিল।

কাজেই মুগাম্বিকে আর ওয়ার্পারকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হলো। ওয়ার্পার খুব বিচলিত হলেও, মুগাম্বিকে তেমন চিন্তিত বলে মনে হলো না। সে জানত, এদের কাছ থেকে পালানো খুবই সহজ ব্যাপার। বুদ্ধি করে সে সৈনিকদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে, তাদের দেশের কথা, সম্রাটের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তাদের ধারণা হলো লোকটা আডিস আবেবা শহর দেখার জন্য বড়ই আগ্রহী। ওকে ওরা এতটুকু সন্দেহের চোখে দেখত না; ক্রমে ওর উপর তেমন কড়া নজরও রাখত না।

ওয়ার্পারের কাছ থেকে মুগাম্বি টারজানের কথা জানবার চেষ্টা করত। তাছাড়া বাংলো আক্রমণের মূলে কে ছিল, লেডি গ্রেস্টোকই বা কোথায় গেলেন, এসবও তার জিজ্ঞাস্য ছিল। ওয়ার্পার কিছুই ভেঙে বলত না। কিন্তু একদিন দৈবক্রমে একটা আশ্চর্য ব্যাপার মুগাম্বি জেনে ফেলেছিল।

সারা দিন গরমে ঘেমে হাঁটার পর, বিকেলে একটা নদীর ধারে ক্যাম্প পড়েছিল। হাবসিরা অনেক দিন পরে ভালো করে স্নান করতে পারল। ওয়ার্পার মুগাম্বিও স্নান করার অনুমতি পেয়েছিল। কাপড় ছাড়ার সময় মুগাম্বি লক্ষ্য করল যে ওয়ার্পার কোমরে ঝোলানো কি একটা খুলে সাবধানে শার্ট জড়িয়ে রাখতে গিয়ে সেটা পড়ে গেল। তার মধ্যে থেকে কয়েকটা জিনিস ছড়িয়ে পড়ল।

মুগাম্বি নিতান্ত অশিক্ষিত ছিল না। লর্ড গ্রেস্টোকের সঙ্গে সে লণ্ডনেও গিয়েছিল। ধনরত্ন সে ভালো করেই চিনত। যে জিনিসগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল সেগুলো যে ওপারের রত্নগুহার মণি-মাণিক্য, তাতে তার সন্দেহ রইল না।

ঐ থলিটাকেও সে টারজানের কোমরে ঝুলে থাকতে দেখেছিল। এদিকে মুগাম্বির চোখ পড়েছে দেখে ওয়ার্পার তাড়াতাড়ি মণিগুলো কুড়িয়ে আবার থলিতে ভরে ফেলল মুগাম্বি এমন ভাব দেখাল যেন কিছুই হয়নি, ধীরে সুস্থে সে জলে নামল।

পরদিন সকালে মৌরাকের কি রাগ আর দুঃখ। চমৎকার কালো লোকটা রাতারাতি পালিয়ে গেছে। ওয়ার্পারও আঁৎকে উঠেছিল, তারপর শার্টের ভিতরে পাথর ভরা থলিটাতে হাত পড়াতে আবার নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

আহমেদ জেক্ অনুচরদের নিয়ে দক্ষিণে অনেক দূর অবধি তার পলাতক সাকরেদের সন্ধানে চক্কর দিয়েছিল। আরো লোকজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে খোঁজাখুঁজি করছিল। কেন তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে? আল্লা কি তাঁর সেবকের উপর বিরক্ত হয়েছেন?

সামান্য একটু আওয়াজ শুনে জেক্ আর তার দুই অনুচর ঝোপের পিছনে লুকিয়ে পড়ল। এমন সময় বন থেকে ভয়ে ভয়ে জেন ক্লেটনকে বেরিয়ে আসতে দেখে জেক্ অবাক হলো। একেই না নিরাপদে নিজের ডেরায় বন্দিনী করে রেখেছিল? এবার আর ওর রক্ষা নেই।

আরেক জোড়া চোখও পাশের একটা গাছ থেকে ওকে দেখছিল। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তাগ্রস্ত চোখ, ছাই রঙের। মেয়েটাকে কেন এত চেনা চেনা লাগছে?

এই ঝোপেঝাড়ে একটা আলোড়ন শুনে সকলের চোখ সে দিকে ফিরল। জেন ফিরে দেখল, বিশাল একটা বনমানুষ বন থেকে বেরিয়ে আসছে, তার পিছনে আরো দু'টো। অমনি জেন সামনের দিকে ছুটল। জেক আর তার অনুচররাও ওকে ধরে ফেলল।

ঠিক সেই সময় একটা দৈত্যও গাছ থেকে নেমে, বনমানুষদের কি যেন বলল। তারপর আরবদের দিকে তেড়ে এলো। আনন্দে জেনের মুখ উদ্ভাসিত হলো, 'জন! তুমি ঠিক সময়েই এসেছ।'

এদিকে অন্য বনমানুষ দুটোকেও এগোতে দেখে জেক্ বুঝল আর অপেক্ষা করলে বিপদ। এই সুযোগে সাদা দৈত্যটাকে শেষ করতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। লোকদের ডাক দিয়ে তার দিকে বন্দুক তুলে তাগ করল। টারজান আর তার বন্ধুদের মধ্যে দু'জন অমনি ঘাসের উপর উল্টে পড়ল। বাকিরা থমকে দাঁড়াল। জেক্ আর তার অনুচররা শোকাচ্ছন্ন জেনকে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

আবার সেই বেড়ায় ঘেরা গ্রামের নোংরা কুটিরে বন্দিনী অবস্থা। এবার হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। অন্য যারা ওয়ার্পারকে খুঁজতে বেরিয়েছিল তারাও একজন দু'জন করে খালি হাতে ফিরে এলো। জেক্ তাতে রেগে অন্ধ হলো। হায় রে! ওয়ার্পার তো পালিয়েইছে, অমন চমৎকার রত্নগুলোও হাতছাড়া হয়ে গেল!

আরবরা চলে গেলে বনমানুষরা তাদের আহত সঙ্গীদের সেবায় লাগল। এক বেচারার জন্য কিছু করার ছিল না। সে মারা গিয়েছে। কিন্তু অন্যজন আর সাদা বনমানুষটার নিশ্বাস পড়ছিল। টারজানের আগে জ্ঞান হলো। চোখ খুলেই সে বলল, 'সেই মেয়েটি কোথায়?'

একজন বনমানুষ বলল, 'মানুষগুলো তাকে নিয়ে চলে গেছে। তুমি মানগানিদের ভাষা জানলে কি করে?'

টারজান বলল, 'আমি তো বনমানুষদের ছেলে টারজান। অনেক দিন অন্য জায়গায় ছিলাম। আবার নিজের লোকদের কাছে ফিরে এসেছি।'

একজন বুড়ো বনমানুষও বলল, 'হ্যাঁ, আমি ওকে চিনি। ও টারজান। ভালোই হলো, এবার ভালো শিকার হবে।' অন্য বনমানুষরা এগিয়ে এসে টারজানকে ভালো করে শুঁকে চিনে নিল। তারপর অন্য আহত বনমানুষের দিকে নজর দিল। তারও সামান্যই লেগেছিল, একটু পরেই সুস্থ হয়ে উঠল।

বনমানুষদের কোনো কাজে তাড়া থাকে না। টারজান গোড়ায় তখনি মেয়েটিকে উদ্ধার করতে যাবার কথা বলেছিল বটে, কিন্তু অন্যরা যখন তার আগে কয়েক দিন প্রাণভরে শিকার করার প্রস্তাব করল, সে আপত্তি করে নি। পরে গেলেই হবে।

টারজানের মনের মধ্যে কেমন গোলমাল লাগছিল। যদিও মাথায় চোট খেয়ে সে আবার বনমানুষ বনে গিয়েছিল, তবু খালি খালি মনে হচ্ছিল এটা তার ঠিক জায়গা নয়, অন্য কোথাও তার কি যেন কাজ আছে, কি যেন মনে পড়ি-পড়ি করেও পড়ছে না। ঐ মেয়েটিকে কিন্তু টারজানের ভারি পছন্দ। ওকে উদ্ধার করতেই হবে। কয়েক দিন পরে কথাটা আবার তুলতে মাত্র দু'জন সঙ্গী পাওয়া গেল, বাকিদের আগ্রহ দেখা গেল না। বুড়ো টাগলাট আর কমবয়সী চুল্ক সঙ্গে যেতে রাজি। চুল্ক বেশ বুদ্ধিমান আর নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় আগ্রহী। টাগলাটের কিন্তু আসল মতলব সুন্দর মেয়েটাকে নিয়ে সরে পড়ে। জানতে পারলে টারজান ওকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। বয়স হলেও টাগলাট তখনো বেশ শক্ত সমর্থ আর চালাক ছিল।

শেষ পর্যন্ত তিনজনে রওনা হয়ে দুপুর বেলায় আরব ডেরার বাইরে পৌঁছল। সাবধানে ঝোপেঝাড়ে গা ঢাকা দিয়ে, সকলের নজর এড়িয়ে এগোতে হচ্ছিল। সবার আগে টারজান, তার পিছনে চুল্ক, তার পিছনে টাগলাট। বেড়ার কাছে গাছে উঠে পড়ল ওরা। সাদা পোশাক-পরা একজন আরব ঘোড়ায় চেপে ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্যদের থাকতে বলে, টারজান গাছ থেকে গাছে ঝুলে তার সঙ্গে চলল। এক জায়গায় লোকটা যখন গাছের তলা দিয়ে চলেছে, উপর থেকে একটা সাদা দৈত্য ওর পিছনে ঘোড়ার পিঠে পড়ে ওকে জাপটে ধরল। দশ মিনিট বাদে ঐ হতভাগ্যর সাদা পোশাকটি নিয়ে টারজান বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল। তারা তো পোশাক দেখে মহা খুশি।

এর পর টারজান ওদের আবার বনের মধ্যে নিয়ে গেল। খানিক বাদে ঐ আরবের দুই অনুচর ঐ পথ ধরতেই তাদেরও একই দশা হলো। কিছু পরে দেখা গেল সাদা পোশাক পরে তিনজন আরব বনের মধ্যে বসে আছে। চুল্ক আবার ঠাট্টা-তামাশা ভালোবাসত। সে টাগলাটের পোশাকের মাথার হুড্‌টা টেনে বুড়োর চোখ-মুখ ঢেকে দিল। বিকট টারমানগানি গন্ধ মাখা হুড্ পরিয়ে দেওয়াতে টাগলাট মহা খাপ্পা। দু'জনে মারামারি লেগে গেল। টারজান অনেক কষ্টে থামাল।

সন্ধ্যার অনেক পর অবধি ওরা গাছে বসে রইল। তারপর টারজান ওদের উল্টোদিকের বেড়ার কাছে নিয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই। টারজানের বর্শার সাহায্য নিয়ে ওরা বেড়া টপকে, শুঁকে বেড়াতে লাগল। চুল্কের মন শুধু খাওয়ার দিকে। মানুষরা বড় ভালো খায়-দায়। টারজান বলেছিল ওটাই হবে ওর পুরস্কার, পেট পুরে ভালো খাওয়া। মেয়ে-টেয়ের দিকে ওর দৃষ্টি ছিল না।

টারজান ওদের জেকের তাঁবুর কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু তিনটে সাদা পোশাক-পরা আরব এক জায়গায় বসে গল্প করছে, তাতে আর আশ্চর্য কি। অন্ধকার রাতে কার গায়ে লোম আছে, কার নেই, তা দেখাও যাচ্ছিল না। ওরা তাঁবুর পিছন দিকে গেল। ভিতরে জেক তার সাকরেদদের সঙ্গে পরামর্শ করছিল। বাইরে টারজান

কান পেতে শুনছিল।

এ দিকে আডিস আবেবা পৌঁছে তার কপালে কি আছে ভেবেও ওয়ার্পারের হাত পা ঠাণ্ডা! হঠাৎ মনে হলো আবদুল মৌরাককে ঘুষ দিয়ে হাত করা যায় না? থলি থেকে কিছু রত্ন দিলে কেমন হয়? না, বাবা, শেষটা সবগুলো হয় তো চেয়ে বসবে। অনেক ভেবে মুগাম্বি পালাবার পর দিন ওয়ার্পার মৌরাকের সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

মৌরাক চোখ পাকিয়ে বলল, 'কি চাও তুমি?'

—'মুক্তি।'

নাক সিঁটকে মৌরাক বলল, 'সে তো সব মুখ্যুরাও জানে।

ওয়ার্পার বলল, 'দাম দেবো।'

মৌরাকের কি হাসি! 'দাম দেবে? তোমার পরনে ঐ ন্যাকড়াগুলো দিয়ে? ফের বিরক্ত করলে বেত খাবে।'

ওয়ার্পার বলল, 'আমার কথা শুনুন। যদি এত সোনা দিতে পারি যে দশটা-বিশটা লোক কষ্ট করে বইতে পারবে, তাহলে মুক্তি পাব?

—'খেপেছ নাকি? অত সোনা কোথায় পাবে?'

—'কোথায় লুকানো আছে তা আমি জানি। বলুন তাতে হবে?'

—'আচ্ছা ধর ছেড়ে দেবো কথা দিলাম। কত দূরে যেতে হবে?'

—'দক্ষিণে এক হপ্তার পথ।'

—'সেখানে সোনা না পেলে তোমার কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছ?'

—'না পেলে প্রাণ দেবো। নিজের চোখে দেখেছি কোথায় পুঁতে রাখা হলো। আমাকে ইংরেজদের হাতে নিরাপদে পৌঁছে দিলে, সব সোনা নিয়ে যেতে পারবেন।'

মৌরাক বলল, 'বেশ তাই হবে। কিন্তু সোনা না পাওয়া পর্যন্ত তুমি আমার বন্দী।'

ওয়ার্পার তাতেই রাজি, 'তাহলে কালই রওনা হওয়া যাক।'

এরা দু'জন নিজের নিজের সুখস্বপ্ন দেখছে, ওদিকে জেকও পরদিন রওনা হবার সিদ্ধান্ত নিল আর তাঁবুর বাইরে সাদা দৈত্য অপেক্ষা করে রইল, একটু সুবিধা পেলেই পাথরগুলো খুঁজবে। জেকের মিটিং শেষ হলে সকলে বেরিয়ে পড়ল অন্য একজনের তাঁবুতে একটু আড্ডা জমাতে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর দেয়াল কেটে টারজান আর চুল্ক ঢুকল। টাগলাট অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যে ঘরে মেয়েটি বন্দী ছিল, সে দিকে চলল। ঘরের দরজায় কয়েক-জন পাহারাদার বসে। টাগলাট তার আরব পোশাক পরে খোলাখুলি ওঘরে ঢুকলেও কেউ কিছু বলত না। তার বদলে ঘরের পিছন দিয়ে ঘুরে এলো। কাছে গাছ-টাছ থাকলে তার উপর থেকে ওদের ঘাড়ে লাফানো যেত। একটার ঘাড় মটকে অন্যটাকে নখ দাঁত দিয়ে শেষ করা যেত।

তা না করে টাগলাট ছাদের উপর বেয়ে উঠে, প্রচণ্ড এক লাফ দিতেই, ছাদের বাঁশ ভেঙে, ছাদের ছাউনি সরে, পড়ল নিচে। শব্দ শুনে পাহারাদাররা ছুটে ঘরে এলো, কিন্তু অন্ধকারে কিছু বুঝতেই পারছিল না। টাগলাট জেনকে তুলে নিয়ে ওদের ঢুঁ মেরে চিৎপাৎ করে ফেলে, দরজা দিয়ে বেরিয়ে উল্টোদিকের বেড়ার দিকে ছুটল। সব ছায়া ছায়া অন্ধকার, কারো চোখে কিছু মালুম দিল না। জেন ভাবল, টারজান ছাড়া কার গায়ে এত জোর? সে কোনো শব্দ করল না। এক লাফে টাগলাট বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে বনপথে। এক মাইল গিয়ে তবে জেনকে নামাল। তারপর গা-মাথা ঢাকা আরব পোশাক খুলে ফেলতেই জেন মূর্ছা গেল।

এদিকে অনেক খুঁজেও যখন পাথর পাওয়া গেল না, তখন টারজান খোলাখুলিভাবে বন্দিনীর ঘরের দিকে চলল। টাগলাটকে কোথাও দেখতে না পেয়ে একটু অবাক হলো। কিন্তু বন্দিনীর ঘরের বাইরে ভিড় কেন? সবাইকে কেমন উত্তেজিত মনে হলো, তার মধ্যে আনাড়ি চুল্ক ঢুকলে ধরা পড়ে যেতে পারে ভেবে টারজান তাকে গ্রামের উল্টোদিকে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। চুল্ক চলে গেলে ভিড়ের সঙ্গে টারজান মিশে গেল বটে, কিন্তু একমাত্র ওর সঙ্গে বর্শা, তীর-ধনুক ছিল বলে কারো নজরে পড়তে পারে এ খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ একজন আরব ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'এ আবার কে?' অমনি তাকে তুলে ধরে, তাকে দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার করে ঘরে ঢুকে গেল। যারা বাধা দিতে গিয়েছিল, ওর গলা থেকে জানোয়ারের মতো চাপা গর্জন শুনে তারা ঘাবড়ে গেল। ঘরে ঢুকেই ছাদে ফুটো দেখে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে টারজানের এক মিনিটও লাগল

না। ঘরে টাগলাটের গায়ের গন্ধ। অমনি টারজানও ছাদের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে গাঁয়ের অন্য ধারে চুল্লের সন্ধানে গেল। কিন্তু তাকেও দেখতে পেল না। মেয়েটিকেও পেল না, বন্ধুরাও কোথায় কে জানে, রাগে দুঃখে টারজান বুঝল এটা পাথরের থলি খোঁজার সময় নয়। চুল্ল আসলে স্রেফ ভয়ের চোটে বেড়া টপকে বনে পালিয়েছিল।

এদিকে টাগলাট একটুখানি খোলা জায়গা পেয়ে, চাঁদের আলোয় জেনের হাত পায়ের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছিল। টারজান ওদের পঞ্চাশ গজের মধ্যে পার হয়ে গেল। বাতাস উল্টো দিকে বইছিল, তাই টেরও পেল না।

টারজান নিজের বিফলতা সহজে মানতে চাইছিল না। ভাবছিল, কাজটাতে একটু বেশি সময় লাগবে এই পর্যন্ত, টাগলাটকে ও ঠিক খুঁজে বের করবে। ততদিন শিকার করা যাক, খাওয়া-দাওয়া যাক। একটা হরিণ দৌড়ে আসছিল, টারজান নিচু ডালে তার অপেক্ষাতেই বসেছিল। হঠাৎ হরিণটা ঘুরে পালাল কেন? নুমার না শীতার ভয়ে? পালাল টারজানের গাছতলা দিয়েই। টারজান তার পিঠে লাফিয়ে পড়ল। ঘাড় মটকে এক মুহূর্তে শিকার মারল। তারপর হরিণটাকে কাঁধে নিয়ে আবার গাছের ডালে রাং থেকে রসালো মাংস কেটে খেতে খেতেও নিচের পথের উপর চোখ রেখেছিল।

ঘোড়ায় চড়ে এক দল লোক এলো। তার মধ্যে একটা চেনামুখ দেখেও টারজান বোকার মতো কিছু করল না। গাছে গাছে সঙ্গে চলল। দু'দিন চলার পর ওরা একটা উপত্যকায় পৌছল। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। কি যেন ভুলে যাওয়া কথা মনকে নাড়া দিচ্ছিল। কতকগুলো পোড়া বাড়ি-ঘরের কাছে ওরা মাটি খুঁড়তে লাগল। এ কিরে বাবা? মাংস-টাংস পুঁতে রেখেছিল নাকি? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল পাথরগুলো ও নিজে পুঁতেছিল। কালোরা হলদে জিনিস পুঁতছে দেখে ও-কথা মাথায় এসেছিল। এরা সেগুলোকে খুঁড়ে বের করছে। একরকম দেখতে মাটিমাখা হলুদ রঙের চারকোণা কি যেন। ওয়ার্পার যেমন ওর পাথর চুরি করেছিল, এখন কালোদের হলদে চৌকাও চুরি করছে। তাদের ডেকে আনতে পারলে হতো। কোথায় থাকে কে জানে!

এমন সময় বন থেকে ঘোড়ায় চড়ে এক দল আরব এদিকে এগিয়ে এলো। ওয়ার্পার ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'এই রে! জেক তার দস্যুদের নিয়ে সোনা চুরি করতে এসেছে।' ততক্ষণে সোনার ঢিপি জেকের চোখেও পড়েছিল। রাগে তার গা জ্বলে গেল। কিছুদিন থেকে তার কপালে খালি ব্যর্থতা! সব হারাচ্ছে সে! রত্নগুলো, সাকরেদ, সেই বন্দিনী আর এখন এই সোনা পর্যন্ত।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তুলে জেক্ আর তার দস্যুরা ছুটে এলো। মৌরাকের লোকরাও গুলি চালাল। কয়েকটা লোক মাটি নিল। তারপর দুই দলের ছোরা, বন্দুক, তলোয়ার, বর্শা নিয়ে সে কি তুমুল হাতাহাতি যুদ্ধ!

ওয়ার্পারের উপর চোখ পড়তেই আহমেদ জেক্ জ্বলে উঠল। ওর সাকরেদকে যুদ্ধ চালাতে বলে, ও ওয়ার্পারের পিছনে ধাওয়া করল। ওয়ার্পার আগেই পালিয়েছিল। সে তো জানত তার কত অন্যায় হয়েছে। একটা ঝোপের আড়াল থেকে টারজান সব দেখছিল।

মৌরাকের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। দস্যুরা দলে অনেক ভারি। ক্রমে হাবসিরা হয় বনে পালাল, নয়

প্রাণ দিল। এক দল লোকের সঙ্গে মৌরাক প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলো। দস্যুরা জয়ী হয়ে সোনার তালগুলো নিয়ে জেকের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। টারজান কিন্তু

একজন মৃত হাবসির ঘোড়া নিয়ে এর অনেক আগেই বনের দিকে চলে গিয়েছিল। জেকের জন্য যারা অপেক্ষা করছিল তাদের মনে বেজায় ভয়। তাদের মধ্যে অনেকে সেই মরা সাদা দৈত্যের আত্মাকে স্পষ্ট দেখেছিল। জীবনকালে সে এদিকে কোনো দস্যুকে ঢুকতে দেয় নি। কোনো অন্যায়কারীকে ছেড়ে দেয় নি। এখন তার আত্মা আবার ফিরে এসে যদি ওদের কাছে সোনার তালগুলো দেখতে পায়, তাহলে কি হবে? যতই সময় যায়, ততই ভয় বাড়ে।

আধঘণ্টা বসেছিল ওরা। আর পারেনি। একজন বলল, 'থাক না সোনাগুলো, কে আর নিয়ে যাচ্ছে? হাবসিরা তো সব মরে গেছে। চল, জেকের খোঁজে যাওয়া যাক।' আর কথা নয়। সোনা রইল পড়ে। ঘোড়ায় চেপে, ধুলো উড়িয়ে, তারা সব হাওয়া।

এদিকে ওয়ার্পার আগে বনে পৌঁছেছিল, কিন্তু জেকের ঘোড়াটা অনেক তাজা, অনেক ভালো। সে ক্রমে তাকে ধরে ফেলে আর কি! ওয়ার্পারের মনের হতাশা থেকে কেমন একটা সাহস জন্মেছিল। পিছন থেকে জেক্ তাকে থামতে বলছিল। সে কি আর থামে? পথের মধ্যে একটা গাছের ভাঙা ডাল পড়েছিল। অন্য সময় হলে ঘোড়াটা সেটাকে সহজেই ডিঙিয়ে যেত, আজ ক্লান্ত শরীরে তা পারল না। পড়ে গেল। ওয়ার্পারও ডিগবাজি খেয়ে পড়েছিল। উঠে আবার তার কাছে ফিরে এলো। কিন্তু ঘোড়াটা উঠতে পারছিল না। মার খেয়েও না। ততক্ষণে জেক্ দেখা দিয়েছিল।

ওয়ার্পার নিজের ঘোড়ার পাশে গুঁড়ি মেরে বসে, জেকের দিকে গুলি ছুঁড়তেই জেকের ঘোড়াটাও পড়ে গেল জেক্ও তার পিছনে আশ্রয় নিল। দু'জন দু'জনার দিকে ঐভাবে গুলি চালাতে লাগল। ততক্ষণে গাছে গাছে টারজানও অকুস্থলে পৌঁছে গাছের ডালের নিরাপদ আসনে আগ্রহী দর্শক হয়ে বসল।

ওয়ার্পারের সঙ্গে বেশি গোলাগুলি ছিল না। সে জেক্কে ডেকে বলল, 'মিছিমিছি গুলি ছুঁড়ে কি হবে? তুমি আমার রত্নের থলি চাও, আমি আমার প্রাণটি শুধু চাই। এইখানে থলি রেখে আমি চলে যাচ্ছি, তুমি নিয়ে যেও। আমি প্রাণ নিয়ে চলে যাই।'

এদিকে জেক্ও তার শেষ গুলি ছুঁড়েছিল, সে অমনি রাজি হয়ে গেল। বড়ই দুঃখে থলিটা রেখে ওয়ার্পার এগিয়ে গেল। জেক্ অপেক্ষা করে রইল যতক্ষণ-না একটা বাঁক ঘুরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখনো জেক্ নড়ল না, তার মনে বড় সন্দেহ। সন্দেহটা অমূলকও নয়। কারণ বাঁক ঘুরে একটা গাছের গুঁড়ির পিছনে ওয়ার্পার অপেক্ষা করছিল, বন্দুক তাগ করে। থলি নিতে জেক্ উঠে এলে তার শেষ গুলিটা ওয়ার্পার ছুড়বে।

জেক্ সোজা পথে এগোল না। গুঁড়ি মেরে ঝোপ-ঝাপের আড়াল দিয়ে, পথটার ধার দিয়ে থলিটার কাছে পৌঁছে, থলি খুলে, তার ভিতরকার জিনিসগুলো মাটিতে ঢালল। থলি খালি হয়ে গেলে রাগে অন্ধ হয়ে তার উপর নাচতে লাগল জেক্। তারপর থলিটাকে ফেলে দিয়ে বন্দুকটাকে মুগুরের মতো করে ধরে ওয়ার্পারের খোঁজে গেল। টারজান ভেবেছিল জেকের কাছ থেকে থলি সুদ্ধ পাথরগুলো কেড়ে নেবে। এখন নেমে কাছে গিয়ে দেখল রঙীন পাথর তো নয়, খালি কতকগুলো নুড়ি!

মোরাকের কাছে বন্দীদশা থেকে পালিয়ে মুগাম্বি বড়ই দুঃসময়ে পড়েছিল। এ অঞ্চলটা ওর অচেনা। ঘোর জঙ্গল, জলের অভাব, ফলপাকুড় নেই, হিংস্র জানোয়ারের বাস। শরীর ক্রমে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে রাতে শোবার একটা নিরাপদ আস্তানা তৈরি করে নিতেও কষ্ট হতো। অবশেষে সে জায়গা পার হয়ে আরো ভালো পরিবেশে পৌঁছল। সেখানে ছোটখাটো জানোয়ার শিকার করত, যথেষ্ট ফলগাছ, একটা বড় নদী দেখতে পেল। তবে ওয়াজিরি দেশে পৌঁছতে আরো অনেক হাঁটতে হবে। আত্মরক্ষার জন্য একটা মুগুর তৈরি করে নিল মুগাম্বি, দুর্বল শরীরে এগোতে পারবে না। ক-দিন বিশ্রাম না করলেই নয়। অগত্যা কাঁটাঝোপের বেড়া তৈরি করতে হলো। ওরা যাকে বলে বোমা। তার মাঝখানে পাতার ছাউনি দেওয়া কুঁড়েঘর। সেখান থেকে বেরিয়ে রোজ ছোট জানোয়ার শিকার করে আনত। মাংস না খেলে শরীরে শক্তি ফিরে আসতে দেরি হবে।

এক দিন একটা গাছের উপর থেকে এক জোড়া হিংস্র লাল চোখ ওর গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। হিংস্র চোখের মালিক হলো চুল্ক। মুগাম্বির উপর তার রাগ ছিল না, ওর বিষয় কৌতূহল ছিল। চুল্কের সাজগোজের বড় শখ, তবে ঐ আরব পোশাকে চলাফেরার অসুবিধা আছে। তার চেয়ে এই গোমানগানির বেশ ভালো। কোমরে একটা

নেংটি, হাতে পায়ে ক'টা তামার গয়না, মাথায় পালকের পোশাক। কাঁধের ওপর একটা পালক দেওয়া থলিও ঝুলছে। ভারি চমৎকার পোশাক। এর একটা কিছু জিনিস সরাতে হবে। সে সুযোগও একদিন পাওয়া গেল। দুপুরে খেয়েদেয়ে মুগাম্বি বিকেল অবধি ঘরের মধ্যে ঘুমোত। সে সময়টা বড় গরম। মুগাম্বিকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে একদিন, গাছের একটা লম্বা ডাল থেকে নিঃশব্দে চুল্ক নামল। বুদ্ধি তার বেশি ছিল না। সাহসও কম। এ-সব জানোয়ার সহজে মানুষদের ঘাঁটায় না। তাই চুল্ক মুগাম্বির গায়ে হাত দিল না। মুগুরটা আর থলিটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে চম্পট দিল। একবারে সে বন ছেড়ে চলে গেল।

ঘুম থেকে উঠেই মুগাম্বি লক্ষ্য করল পাশে থলি নেই অথচ শোবার সময় পাশেই রেখেছিল, স্পষ্ট মনে আছে। কে নিল? মুগুরটাও তো নেই! প্রথমেই ভূত-প্রেতের কথা মনে হলেও, পারে মাটির উপর প্রকাণ্ড কিন্তু মানুষের মতো পায়ের ছাপ দেখেই আসল ব্যাপার বুঝতে দেরি হলো না। বোমার বাইরে মাটিতে কোনো ছাপ নেই। গাছে চড়েও দেখল মুগাম্বি, কিন্তু সেখানে কোনো ক্ষীণ চিহ্ন থেকে থাকলেও, সেগুলো লক্ষ্য করা মুগাম্বির সাধ্য ছিল না। টারজান হয়তো পারত।

এবার মুগাম্বি শরীরে মনে এতটা জোর পেল যে আরেকটা মুগুর তৈরি করে নিয়ে, নদীর ধার ছেড়ে ওয়াজিরি দেশের দিকে রওনা দিল।

এদিকে বনের সেই খোলা জায়গায় টাগলাট তো জেনের হাত-পায়ের বাঁধন নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছিল। এমন সময় নুমা বিকট গর্জন করে ওর পিছন দিক থেকে বড় বড় লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে টাগলাট পালাবার চেষ্টা করেছিল। সিংহ যখন তার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল, টাগলাট তার সমস্ত শক্তি দিয়ে অভাবনীয় লড়াইও দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নুমা তার বুক থেকে পেট অবধি চিরে দিয়ে মেরে ফেলল।

এতক্ষণ জেন অচেতন হয়ে পড়েছিল। সিংহটা ওর কাছে গিয়ে শুঁকল, নেড়েচেড়ে দেখল, তারপর হয়তো মরা মনে করে, ফিরে গিয়ে হতভাগ্য টাগলাটকে খেতে বসল। চোখ খুলেই জেন এই দৃশ্য দেখতে পেল। কিন্তু কি করবে? সে যে অসহায়। হঠাৎ খেয়াল হলো হাত দু'টো তো বাঁধা নেই, শরীরের দু'পাশে দু'টো ছড়িয়ে আছে। পা নেড়ে দেখল, পা-ও খোলা। জেন তো অবাক! সে আর কি করে জানবে যে হতভাগ্যের শেষ কাজ ওকে মুক্তি দেওয়া।

প্রথমটা আনন্দ হলেও, তারপরেই মনে হলো এ মুক্তির কতটুকু দাম! ঐ হিংস্র জানোয়ারটা তো এর পর ওকে ধরবে। ঐ গাছটার কাছে যেতে পারলে হতো। এ কথা মনে হতেই সে দিকে একটু গড়িয়ে গেল। তারপর আরেকটু। তারপর সিংহটা হঠাৎ চোখ তুলে ওর দিকে চাইল। ওর তো হাত-পা ঠাণ্ডা! চুপ করে পড়ে রইল। সিংহটা আবার ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে খেতে লাগল।

হঠাৎ মন শক্ত করে এক লাফে জেন গাছটার গোড়ায় পৌঁছে ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। সিংহটাও একটা লাফ দিয়ে ওকে ধরবার চেষ্টা করেছিল। এমন কি থাবা বাড়িয়ে জেনের বুটে আঁচড়ও দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জেন আরো অনেক উপরে উঠে গিয়েছিল। সিংহটা গাছের চারদিকে অনেকক্ষণ হাঁক-ডাক করে, সন্ধ্যার সময় বিরক্ত হয়ে বনে চলে গেল। অমনি দু'টো হায়না এসে তার ভোজের ধ্বংসাবশেষ খেতে বসল। ভয়ের চোটে রাতে আর নিচে নামা বুদ্ধির কাজ হবে না ভেবে একটা ভালো জায়গা বেছে নিয়ে গুটিশুটি হয়ে সারারাত জেন ঘুমিয়ে রইল।

ওয়াজিরি দেশ অবধি যেতে হলে তাকে বহু দূর হাঁটতে হবে। যখন সকালে ঘুম ভাঙল, তখন রোদ উঠে গেছে। সিংহ, হায়না, কেউ নেই। গাছতলায় বনমানুষের শুধু হাড়গুলো বাকি আছে। কি শান্তিপূর্ণ চারদিক। কে বলবে কাল এখানে কি ঘটে গেছে!

খিদে তেষ্টাও পেয়েছিল। গাছ থেকে নেমেই জেন দক্ষিণে হাঁটতে লাগল। ওর ধারণা ঐ দিকে ওয়াজিরি দেশ। অর্ধেক দিন পার হয়ে গেল, এমন সময় কানে এলো একটা গুলির শব্দ। তারপর পর পর আরো অনেক গুলি। তবে কি ওয়াজিরিরা আরব দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করছে? কান পেতে শুনে মনে হলো, মাত্র দুই বা তিনজন গুলি ছুঁড়ছে। শেষ পর্যন্ত সাবধানের মার নেই ভেবে একটা গাছে উঠে ভয়ে ভয়ে বসে রইল।

গোলাগুলি থামলে, দু'জন লোকের গলা শোনা গেল। তারপর একজনের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। একজন লোক বন্দুক হাতে পিছু হেঁটে, এ দিকেই আসছে। জেন তাকে দেখে চমকে উঠল। এ তো ওদের সেই অতিথি জুল ফ্রেকো! ওকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না জেন। মনে হলো ও কোনো শত্রুর কাছ থেকে সরে আসছে। ফ্রেকো

ঝোপের মধ্যে লুকোল। তার পরেই যে আরবটি গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এলো, তাকেও জেন চিনল। সে হলো সেই নরাধম আহমেদ জেক্, দস্যুদের সরদার, যে ওকে বন্দী করেছিল। পথের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে জেক্ চারদিকে চেয়ে দেখছিল। একটা বন্দুকের শব্দ হলো। একটা ঝোপের পিছন থেকে একটু ধোঁয়া দেখা গেল। আহমেদ জেক্ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। গাছ থেকে নেমে জেন খুশির চোটে ফ্রেকোর দিকে ছুটে গেল।

ওয়ার্পারের একটু ভয় ছিল লেডি গ্রেস্টোক হয়তো ওর বিশ্বাসঘাতকতার কথা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর সরল ব্যবহার দেখে সে ভুল ভাঙল। তিনি ওকে সব ঘটনার কথা বললেন। স্বামীর মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে দু চোখ জলে ভরে গেল। জেকের মৃতদেহ দেখিয়ে ওয়ার্পার বলল, 'ঐ পাপিষ্ঠ যে কত লোকের সর্বনাশ করেছে তার ঠিক নেই। আপনাদের ওয়াজিরিরা হয় মারা পড়েছে, নয় দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। ঐ সব জায়গা এখন জেকের আরবদের দখলে। জেকের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছবার আগে ওর ডেরায় গেলে কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। ওর লোকরা তো আর জানে না জেকের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। একটু দাঁড়ান, ও আমার কিছু জিনিস চুরি করেছিল, সেগুলো উদ্ধার করি।'

আশ্চর্যের বিষয়, অনেক খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে ওয়ার্পার বলল, 'কিছু পেলাম না। চলুন, দস্যুরা ফেরার আগে আমাদের সেখানে পৌঁছতে হবে।'

ওয়ার্পার বলল, 'ওদের বলব, আমি আপনাকে বনে বন্দী করেছিলাম। জেক হাবসিদের সঙ্গে লড়াই করতে ব্যস্ত থাকায় আমার সঙ্গে আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ওর চালাকি লেডি গ্রেস্টোক বুঝতে পারলেন না। দু'দিন পরে ওরা ডেরায় পৌঁছল। ওয়ার্পার গিয়ে জেকের সহকারী মহম্মদ বেইদকে বলল, 'বন্দিনীকে বন থেকে ধরে এনেছি।'

এবার বেইদ ওর কথা বিশ্বাস করে লেডি গ্রেস্টোককে হাত-পা বেঁধে ঘরে বন্ধ করে রাখল। এক মুহূর্তে তাঁর মোহ ভেঙে গেল। বিশ্বাসঘাতক ওয়ার্পারকে তিনি চিনে ফেললেন।

ওয়ার্পার কিন্তু দো-মনায় পড়েছিল। দস্যুরা ফিরে এসে যদি সব কথা ফাঁস করে দেয়, তবেই তো মুস্কিল হবে! সাত-পাঁচ ভেবে সে বেইদের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

বেইদ তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'আমার মালিক, আহমেদ জেক ভালো আছেন তো?'

—'জগতের বিপদ-আপদ থেকে এত নিরাপদ তিনি আগে কখনো ছিলেন না।'

—'ভালো কথা।'

—ওয়ার্পার বলল, আর যদি তিনি মারা গিয়ে থাকেন?

এবার বেইদ মুখ খুলল, 'নিশ্চয় তিনি মারা গিয়েছেন, নইলে এখানে আসার সাহস তুমি পেতে না। যাবার সময় তোমার প্রাণদণ্ড মনে মনে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁকে আমি ভালো করেই চিনি। কখনো তোমাকে ক্ষমা করতে পারেন না। তিনি মারা গেছেন, তা যুদ্ধেই হোক, বা তোমার হাতেই হোক। তাহলে তোমার ঐ রত্নের থলির জিনিসগুলো দু-ভাগ করা যাক। তারপর ঐ মেয়েটিকে নিয়ে চল উত্তর দিকে যাই। কি বল?'

শুনে ওয়ার্পারের মনে ভরসাও হলো, ভয়ও হলো। থলি নেই শুনলে বেইদ কি বলবে? ওগুলো খোয়া যাবার কথা তাকে বলা মানেই মৃত্যু। তার চেয়ে যদি ও কথা চেপে গিয়ে, ওর তাঁবুতে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে এই আপদটাকে চিরকালের মতো বিদায় করা যায়।

মুখে বলল, 'হ্যাঁ। হাবসিদের হাতে তিনি মারা গেছেন। ওরা আমাকে বন্দী করেছিল। মেনেলেক ওদের জেক্‌কে ধরে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন। জেক্ হাবসিদের গ্রামে হামলা করেছিল, তার সাজাস্বরূপ। ওরা সংখ্যায় বড় বেশি। আমরা এখনি বেরিয়ে পড়তে পারলে ভালো হয়।'

বেইদ বলল, 'তাহলে অর্ধেক রত্ন আর ঐ মেয়ের মুক্তি-পণের অর্ধেক আমার প্রাপ্য।' ওয়ার্পার সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

বেইদ বলল, 'তাহলে কাল সকালে রওনা হবার হুকুম দিয়ে আসি।'

—'দাঁড়ান। সবাই একসঙ্গে না গিয়ে, ছেলেপুলে আর মেয়েদের সঙ্গে কিছু লোক রেখে, আপনার সবচেয়ে সাহসী একটা দল নিয়ে আমরা রওনা দিই। এখানে বলে যাই আমরা পশ্চিমে যাচ্ছি। তাহলে হাবসিরা এলে, ওদের ভুল পথে আমাদের খুঁজতে পাঠানো হবে।

সেই ব্যবস্থাই স্থির হলো। পরদিন ভোরে দু-জন আরবের সঙ্গে ফ্রেকো লেডি গ্রেস্টোকের ঘরে এলো।

আরবরা তাঁর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে, কিছু শুকনো রুটি দিয়ে, বাইরে নিয়ে এলো। লেডি গ্রেস্টোক জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাতেই ফ্রেকো আস্তে আস্তে বলল, 'সব পরিকল্পনা মতোই চলছে।' কিছু পরে ওকে ঘোড়ার পিঠে তোলা হলো, তারপর দলবলসহ ওরা বেরিয়ে পশ্চিম দিকে চলল। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে আবার উত্তরমুখো চলল।

দ্বিতীয় দিন বেইদ লেডি গ্রেস্টোকের ঘোড়ার পাশে নিজের ঘোড়া নিয়ে গেল। যত দিন জেক বেঁচে ছিল ওর মনে কোনো আশাই ছিল না। এখন ভাবছিল, রত্নের অর্ধেকের বদলে মেয়েটির অর্ধেক ভাগ কিনে নিতে পারবে কিম্বা আরো ভালো ওয়ার্পারকে খুন করে, সব রত্ন এবং মেয়েটিকে পাওয়া যেতে পারে। হঠাৎ বেইদ বলল, 'তুমি জান, ঐ লোকটা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

জেন বলল, 'জানি।'

—সে কি? তুমি একটা কালো সুলতনের বেগম হতে রাজি আছ?'

জেন ঘোড়ার উপর সোজা হয়ে বসল, কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। দিলে যদি বেইদ টের পায় ফ্রেকোর চালাকি ও ধরে ফেলেছে!

বেইদ বলল, 'আমি তোমাকে বাঁচাতে পারি।'

জেন রেগে গেল, 'এখান থেকে চলে যাও, নয়তো মঁসিয়ে ফ্রেকোকে বলে দেবো।'

বেইদ পিছু হটে গিয়ে বলল, 'ফ্রেকো বলে কোনো লোকই নেই। ওর নাম ওয়ার্পার। মিথ্যাবাদী, চোর, খুনে। কঙ্গোতে নিজের ক্যাপ্টেনকে খুন করে জেকের দলে জুটেছে। জেককে ও-ই তোমার স্বামীর খামার লুট করতে নিয়ে গিয়েছিল। ও আমাকে বলেছে যে তুমি ভাবো ও তোমার রক্ষক। আসলে তোমাকে উত্তরদেশে নিয়ে গিয়ে কোনো কালো সুলতানের কাছে অনেক টাকা দিয়ে বিক্রি করার মতলব ওর। আমি তোমার একমাত্র বাঁচার উপায়।' এই বলে বেইদ ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে গেল। কে জানে ওর কথার কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যা। কিন্তু মনটা মুষড়ে গেল।

রাতে ওয়ার্পারের আর বেইদের তাঁবুর মাঝখানে জেনের তাঁবু পড়ল। জেন শুয়ে শুয়ে খামার বাড়িতে কত সুখের দিনের কথা ভেবে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে লাগল। তারপর ঘুমিয়েও পড়ল। অনেক রাতে ওর ডান পাশের তাঁবু থেকে একজন লোক বেরিয়ে জেনের তাঁবুর পাহারাদারকে বিদায় করে দিয়ে, নিজে ঐ তাঁবুতে ঢুকল। এদিকে ওয়ার্পারের মনেও বড় অশান্তি। সে-ও তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখে জেনের দরজায় পাহারাওয়ালা নেই। তাঁবুর পিছন দিকেও পাহারাওয়ালা নেই। ওয়ার্পারের সঙ্গে রিভলবার আর কার্তুজের বেল্ট ছিল। এবার সে সোজাসুজি জেনের তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। দেখল সেখানে আরেকটা লোক। সে লোকটা কি যেন বলতেই ঘুমন্ত মানুষটা উঠে বসল। আস্তে তাঁবুর অন্ধকার চোখ-সওয়া হয়ে এলো। ঐ লোকটা বেইদ। সে জেনের গলা টিপে ধরেছে। আর দেরি না করে ওয়ার্পার তার উপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর নিঃশব্দে সে কি মারামারি! ওয়ার্পারের রিভলবার কি করে খাপে আটকে গিয়েছিল, কিছুতেই টেনে বের করতে পারছিল না। এই বুঝি বেইদের হাতেই মরতে হয়! হঠাৎ বুদ্ধি খুলে গেল, ল্যাং মেরে বেইদকে ফেলে দিতেই বেইদ উঠে তেড়ে এলো। সেই ফাঁকে রিভলবারটা টেনে বের করে ওয়ার্পার তাকে গুলি করল। দেহটা গড়িয়ে তাঁবুর দেয়ালের কাছে পড়ে রইল।

জেন উঠে পড়ে বলল, 'এর জন্য কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো মঁসিয়ে ফ্রেকো! ঐ লোকটা আপনার নামে যা-তা বলেছিল। আমার বোঝা উচিত ছিল আপনার মতো ভদ্রঘরের বেলজিয়ানের পক্ষে কোনো জঘন্য কাজ করা সম্ভব নয়।' ব্যস্ ঐ পর্যন্ত। ওয়ার্পারের মনের মধ্যে এক মুহূর্তে কি একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। সে সঙ্কল্প করল যেমন করে হোক লেডি গ্রেস্টোককে বাঁচাবে।

ততক্ষণে বাইরে হৈ-চৈ দৌড়োদৌড়ি শোনা যাচ্ছিল। ওয়ার্পার নির্ভয়ে তাঁবুর দরজা সরিয়ে হাত তুলে তাদের থামতে বলল, 'ব্যস্ত হয়ো না। কিছু ভুল বোঝাবুঝির ফলে বেইদ্ রাগের মাথায় মেয়েটিকে গুলি করেছে। সে-রকম গুরুতর আঘাত মনে হচ্ছে না, আমরাই তার শুশ্রূষা করছি, তোমরা যে যার তাঁবুতে যাও।' এই বলে দরজা টেনে ভিতরে এলো। তার জন্যেই জেনের এই দুরবস্থা। অনুতাপে তার মন ভরে যাচ্ছিল।

জেন বলল, 'এখন কি হবে? ওকে দেখলে তো এরা আপনাকে আস্ত রাখবে না।'

এক মিনিট ভেবে ওয়ার্পার বলল, 'একটা উপায়

ঠাউরেছি। কিন্তু আপনাকেও অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করতে হবে। আমি ওদের বলব, গুলি খেয়ে আপনি মারা গেছেন, বেইদ অনুতাপে ভেঙে পড়েছেন। আমাকে ভার দিয়েছেন বনে কোনো গাছতলায় আপনাকে সমাধি দিতে। আপনি মৃত সেজে থাকবেন। আমি কাঁধে করে আপনাকে বনে নিয়ে যাব।'

জেন, তো শুনে অবাক! 'ওরা কি, বিশ্বাস করবে?'

—'এ ধরনের ব্যাপার ওরা সর্বদা বিশ্বাসকরে। আপনার সাহসে কুলোলে, এ বুদ্ধি খাটবে মনে হয়। আপনাকে বনে কোনো নিরাপদ জায়গায় রেখে আমি ক্যাম্পে ফিরে আসব। সকালে ঘোড়া নিয়ে যাব। বেইদের মৃতদেহ বিষয়ে আমাদের কিছু বলতে হবে না।'

কয়েক মিনিট পরে জেনের অনড় শরীরটা কাঁধে করে তাঁবু থেকে ওয়ার্পার বেরিয়ে এলো। সকলে যে যার তাঁবুতে ফিরে গিয়েছিল, খালি দু-জন সান্ত্রী ছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ দিল। ওয়ার্পার ওদের দিকে ফিরে বলল, 'শেষ পর্যন্ত ওকে বাঁচানো গেল না। মহম্মদ বেইদ অনুতাপে ভেঙে পড়েছেন। আমাকে ওর সমাধির ব্যবস্থা করতে বলেছেন। তিনি বড়ই শোকগ্রস্ত।'

সান্ত্রী বলল, 'আমাদের কারো সঙ্গে যাবার দরকার আছে?'

—'না, আমি একাই পারব।' এই বলে কাঁটাবেড়ার বাইরে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিছু দূরে গিয়ে, জেনকে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'গাছে লুকিয়ে থাকুন। সকালে আসব। আমরা বেঁচে যেতেও পারি।' তারপর সে আবার ক্যাম্পে ফিরে গেল। সান্ত্রী তাকে নিজের তাঁবুতে ঢুকে যেতে দেখল বটে, কিন্তু একটু পরেই পিছন দিয়ে বেরিয়ে জেনের তাঁবু থেকে মৃতদেহটি তুলে বেইদের তাঁবুতে নিয়ে যেতে দেখল না। তারপর তার হাতে তারই রিভলবার ধরিয়ে এক গাদা লেপ-কম্বলের ভিতরে একটা গুলি ছুঁড়ল, সঙ্গে সঙ্গে কাশল। সামান্য শব্দ হলো। কেউ শুনল কি না বোঝা গেল না। এবার নিজের তাঁবুতে ফিরে গিয়ে বাকি রাতটা শুয়ে কাটাল। তার আগেই একবার জেনের তাঁবুতে কোনো সন্দেহজনক চিহ্ন পড়ে আছে কি না দেখে এসেছিল।

পরদিন সকালে হাঁক ডাক শুনে ওয়ার্পারের ঘুম ভাঙল। বেইদের ক্রীতদাস ছুটে এসে বলল, 'শীগ্‌গির আসুন। মালিক কাল রাতে আত্মহত্যা করেছেন।'

যেন কতই চমকে উঠেছে, সেই রকম ভাব করে ওয়ার্পার বলে উঠল, 'এক্ষুনি আসছি।'

বেইদের তাঁবুতে গিয়ে সে-ই চ্যাঁচামেচি করতে লাগল, 'এ জঘন্য কাজ কে করেছে? কে মালিককে খুন করেছে?' সকলে মিলে বোঝাল কেউ খুন করেনি, মনের দুঃখে উনি আত্মহত্যা করেছেন।

তারপর সমাধির ব্যবস্থাও করতে হলো। মৃতদেহ তার নিজের কম্বল দিয়ে মুড়ে দিল ওয়ার্পার, এমন ভাবে যাতে গুলির দাগ ভিতর দিকে থাকে। তারপর ছয়জন বলিষ্ঠ অনুচর কাঁধে করে বেইদকে শেষবারের মতো বনে নিয়ে গেল। সকলে সঙ্গে গেল। কবর খোঁড়া হলো। মালিক সমাধিস্থ হলেন। এতক্ষণে ওয়ার্পার অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো। অনুচররা নিজের নিজের গ্রামে ফিরে যেতে চাইল, কেউ বাধা দিল না। ওয়ার্পার বলল, সে পূর্বদিকের সমুদ্রের উপকূলে যাবে।

সবাই রওনা হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে ওয়ার্পার সাবধানে যে গাছের উপর জেনের রাত কাটাবার ব্যবস্থা করেছিল, সেখানে গেল। কিন্তু জেন সেখানে ছিল না।

খুঁজে পাওয়া থলি থেকে নুড়িগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে টারজানের খালি মনে হচ্ছিল, আগে থলিতে যে চকচকে পাথর ছিল তার সঙ্গে আর ঐ হলুদ চৌকোণাগুলো যা নিয়ে হাবসিরা আর ঐ আবররা অত লড়াই করল, তার একটা সম্বন্ধ আছে। ও-সব এলোই বা কোত্থেকে? কেন মনে হচ্ছে ওগুলো ওর ছিল?

ওর অতীত জীবনটা কেমন ছিল? ছোটবেলাকার বনের জীবনটা তো মনে পড়ছে। তারপর অনেকগুলো জায়গা আর মানুষের মুখ কেন এত চেনা লাগছে, অথচ গুলিয়ে যাচ্ছে? আসলে আস্তে আস্তে স্মৃতিশক্তি ফিরে আসছিল। লোপ পাবার কারণটা ক্রমে দূর হয়ে যাচ্ছিল। টারজান সেরে উঠছিল। সম্প্রতি যাদের দেখছে তাদের চেনা মনে হচ্ছে। ঐ সুন্দর মেয়েটির কথা বার বার মনে আসছে; সে-ই বা কে? তার মুখটাই সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে। সে টারজানের কে হয়? হাবসিরা যেখানে মাটি খুঁড়ে হলদে জিনিসগুলো বের করেছিল ঐ জায়গার সঙ্গে মেয়েটির কি সম্বন্ধ? আগে কিন্তু জায়গাটা অন্য রকম ছিল।

একটা বাড়ি ছিল। অনেক বাড়ি ছিল। বেড়া ছিল,

ফুলগাছ ছিল। রহস্যটাকে ধরি ধরি করে এনেছে যে মুহূর্তে, অমনি মনে এলো যেন একদল লোমশ বুনোদের সঙ্গে ও নিজে লাফ-ঝাঁপ করছে।

ঐ যেখানে সোনার গাদাগুলো পোঁতা ছিল ঐখানেই মেয়েটি ছিল। ঐখানেই তাকে খুঁজতে হবে। শূন্য থলিটা কাঁধে ঝুলিয়ে টারজান বনের মধ্যে দিয়ে উপত্যকার দিকে চলল। মাঝপথে দেখল আরবরা জেকের খোঁজে ফিরে আসছে। একটা হরিণ শিকার করে, খাওয়া-দাওয়া করল টারজান। তখন বেলা শেষ হয়ে এসেছে। তেষ্টাও পেয়েছিল। নদীর ধারে গিয়ে তেষ্টা মেটাল। এখান থেকে সেই জায়গাটা আরো আধ মাইল উজানে। সেখানে মেয়েটিকে হয় দেখতে পাবে, নয় তার সন্ধান পাবে। এদিকে রাত হয়ে এসেছে। এখন ঘুমের সময়। কাল সেখানে যাবে। ভোরে উঠে আবার খিদে তেষ্টা পেল। গাছ থেকে নেমে তাই নদীর ধারে গেল। সেখানে নুমা জল খাচ্ছিল। ওকে দেখে একটু গুড়গুড় শব্দ করল, কিছু বলল না। নিশ্চয় পেট ভরা আছে। জল খেয়ে উঠে কিছুক্ষণ নুমা নদীর ওপারে চেয়ে রইল। জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল। তারপর টারজানের দিকে চেয়ে দাঁত খিঁচল, একটু গুড়গুড় করল। তারপর বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

নদীতে একটা ডুব দিল টারজান। কয়েকটা ডিম পেয়েছিল, তাই খেয়ে প্রাতরাশ করল, তারপর নদীর ধার দিয়ে সেই সোনা লুকানোর জায়গাটাতে গেল। গিয়ে দেখে সেগুলো নেই। কোনো পায়ের চিহ্নও নেই। সোনাই যখন নেই তখন এখানে মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করে কি হবে? তার চেয়ে বনে গিয়ে চুক্কের খোঁজ করা যাক। দু'দিন বনে বনে ঘুরল সে। তৃতীয় দিন মানুষের আর ঘোড়ার গন্ধ পেয়ে গাছের ডালে তৈরি হয়ে বসল টারজান। পাথর চোরের গন্ধ। ওয়ার্পার ঘোড়ায় চড়ে গাছতলাতে এলেই, ঝুপ করে তার পিছনে ঘোড়ার পিঠে নামল টারজান। জিজ্ঞাসা করল, 'টারজানের সুন্দর পাথরগুলো নিয়ে কি করেছ?'

ওয়ার্পার বলল, 'আহমেদ জেক্ সেগুলো আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে।'

টারজান বলল, 'সে তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু থলিতে শুধু নদীর ধারের নুড়ি ছিল। তুমি কি চকচকে পাথরগুলো লুকিয়ে রেখেছ? না বললে তোমাকে মেরে ফেলব।' এই বলে টারজান তার গলা টিপে ধরল।

ওয়ার্পার তো অবাক! 'সে কি লর্ড গ্রেস্টোক, আপনি কি একমুঠো মণির জন্য মানুষ খুন করবেন?'

টারজান হাত সরিয়ে নিল, তার চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এলো, 'লর্ড গ্রেস্টোক? তিনি কে? ও-নাম কোথায় শুনেছি?'

ওয়ার্পার বলল, 'আপনি নিজেই তো লর্ড গ্রেস্টোক। সেই যে গুহা থেকে সোনা আনতে গিয়েছিলেন, সেখানে ভূমিকম্পে আপনার মাথায় পাথর পড়ে স্মৃতিশক্তি নষ্ট করে দিয়েছিল? আপনি জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক। মনে নেই!'

টারজান বলল, 'জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক।' তারপর কপালে হাত বুলোতে লাগল, চোখে ঘোর বিস্ময়। ঐ নামটি শুনেই অতীতটা হঠাৎ ধরা দিল। লাফিয়ে উঠল টারজান, 'হায় ভগবান! তাহলে জেনের কি হলো? খামার বাড়ি পুড়ে ছাই। তুমি তো সবই জান। তুমি একটা জোচ্চোর। না, অস্বীকার কর না।'

পিছন থেকে গম্ভীর গলায় কে বলল, 'তার চেয়েও খারাপ, ও একটা খুনে। নিজের অফিসারকে খুন করে পালিয়ে ছিল। বহুদিন ধরে আমি ওর পিছনে ঘুরছি। ওকে বিচারালয়ে দাঁড়াতে হবে।' বক্তা হলেন বেলজিয়ান ইউনিফর্ম পরা মিলিটারি অফিসার, সঙ্গে কঙ্গো ফ্রি স্টেটের কয়েকজন সৈনিক।

টারজান বলল, 'আগে আমি ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করি, তারপর আপনারা ওকে নিয়ে যেতে পারেন। এই খালি গা শ্বেতাঙ্গ যার মুখ দিয়ে চোস্ত ফরাসী ভাষা ঝরছে, তাকে বুঝে উঠতে পারছিলেন না ঐ অফিসার। ওঁর লোকজনরা ততক্ষণে টারজানকে আর ওয়ার্পারকে ঘিরে ফেলেছিল। অনেক বচসার পর দু'জনকে বন্দী করে তারা আবার বনপথ ধরে রওনা দিল।

সন্ধ্যার দিকে একটা ছোট নদীর ধারে ওরা থেমে ক্যাম্প করেছিল। টারজান আর ওয়ার্পার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল। রাতের রান্না হলে ওদের আগুনের ধারে ডেকে হাতের বাঁধন খুলে খেতে দেওয়া হলো। পাশের ঘন ঝোপ-জঙ্গল থেকে একটা লোমশ মুখে একজোড়া কুৎকুতে চোখ টারজানকে দেখে চমকে উঠে বনমানুষদের ভাষায় কি একটা বলল। টারজানও উত্তর দিতে গিয়েও চেপে গেল। এরা কিছু সন্দেহ করলে চলবে না।

হঠাৎ ওয়ার্পারকে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় বকে যাব, তুমি এমন ভাব দেখিও যেন বুঝতে পারছ, সেই রকম করে উত্তরও দিও।' ওদের কথাবার্তা শুনে কঙ্গোর পাহারাওয়ালারা অবাক। এ আবার কোন্ ভাষা! জিজ্ঞাসা করাতে টারজান বলল, 'গ্রীক।' সে ভাবল, হবেও বা। কালোদের একজন কিন্তু বলল, 'বনমানুষরা ঐ রকম করে কথাবার্তা বলে।'

তারপর ম্যাজিক, জাদুকর আর ভূতপ্রেতের গল্পে সকলে ডুবে গেল। কেউ লক্ষ্য করল না যে একটা বনমানুষ গাছ থেকে নেমে দক্ষিণ দিকে চলেছে।

জেন ক্লেটন তো গাছে বসে ওয়ার্পারের জন্য অপেক্ষা করছিল। ভোরে আরব পোশাক পরা একজন লোককে দেখেই ফ্রেকো ভেবে জেন তাকে ডাক দিল। লোকটা ওপর দিকে তাকাতেই দেখা গেল সে আবদুল মৌরাক। যুদ্ধে হেরে, ক্ষুব্ধ মনে এদিকে চলেছে। নিচে নেমে এসে জেন তার দুঃখের কথা বলতে আরম্ভ করতেই মৌরাকের মনে হলো এই সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়ে যদি মেনেলেককে উপহার দিই, সম্রাট হয় তো আমার সব বিফলতা ক্ষমা করবেন। জেনের কথা শেষ হলেই মৌরাক বলল, নিশ্চয় জেনকে সে সাহায্য করবে, কিন্তু তার আগে তাকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যেতে হবে। জেনের মনের সব আশা নিবে গেল। একজন সিপাইয়ের পিছনে তাকে ঘোড়ায় তুলে ওরা আবার যাত্রা শুরু করল। আসলে ওরা পথ হারিয়েছিল। গাইডরা যুদ্ধের সময় পালিয়েছিল বা মরেছিল, এখন আন্দাজে উত্তর দিকে যাচ্ছিল ওরা। একটা গ্রাম পেলে, সেখানে গাইড পাওয়া যেতে পারে।

রাতে ঘোর জঙ্গলে কাঁটাঝোপের বেড়ার মধ্যে ক্যাম্প করা হলো। সকলের মন খারাপ। চারদিকে সিংহের ডাক, ডবল প্রহরীর ব্যবস্থা করা হলো। মাঝরাত পার হয়ে গেছে, কিন্তু জেনের চোখে ঘুম নেই, কালও ঘুমোয়নি। মৌরাক বার বার বিছানা ছেড়ে চারদিকে ঘুরে দেখছিল। সিংহের ডাক ভয়ঙ্কর বেড়ে গিয়েছিল। ঘোড়াগুলোও ভয় পেয়ে ডাকতে লাগল আর দড়ি ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। একজন সিপাই তাদের শান্ত করবার বৃথা চেষ্টা করছিল। একটা প্রকাণ্ড সিংহ লাফ দিয়ে আরেকটু হলেই বোমার বেড়া টপকাচ্ছিল, প্রহরী তার দিকে একটা গুলি ছুঁড়ল।

আর যাবে কোথায়! গুলিটা লাগল, কিন্তু সিংহ মরল না, ক্ষেপে গিয়ে এক লাফে বোমা ডিঙিয়ে একটা ঘোড়াকে ধরল। সে ঘোড়াটা চ্যাঁচাতে লাগল। আরো কয়েকটা দড়ি ছিঁড়ে লাফ-ঝাঁপ শুরু করল। লোকজনরা বিছানা ছেড়ে বন্দুক তুলে নিল। আরো ডজনখানেক সিংহ হাজির হলো। গোলমালের শুরুতেই জেন বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছিল। ঘোড়ার লাথি খেয়ে পড়েও গিয়েছিল। একটা সিংহ ওর গা ঘেঁষে ছুটে গেল। চারদিকে চিৎকার, গোঙানি, সিংহের ডাক, মৃত্যুর ডামাডোল। হঠাৎ জেনের দিকে একটা সিংহের নজর পড়ল। সে গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল।

এ দিকে সেই বেলজিয়ান ক্যাম্পে সবাই সকাল সকাল শুতে গিয়েছিল। টারজান আর ওয়ার্পারের হাত-পা বাঁধা। টারজান তার বিশাল মাংসপেশী ফুলিয়ে বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করছিল। বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেও ছিল শেষ পর্যন্ত। এমন সময় ঝোপঝাপের পিছন থেকে নিচু গলায় বনমানুষের কথা কানে এলো। টারজান যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেল। প্রহরীও থমকে থামল। সঙ্গীকে ডেকে বলল, 'শুনতে পেলে? আবার সেই রকম কথা শোনা গেল। কে যেন তার উত্তরও দিল।' প্রহরীরা ভয়ে কাঠ হয়ে যে অন্ধকার জায়গা থেকে কথাগুলো আসছিল, সেদিকে চেয়ে রইল। সেখানে কতকগুলো বড় বড় গাছের ডাল বোমার উপর ঝুলে ছিল। প্রথমে ভয়ে তারা টুঁ শব্দটি করেনি। তারপর যখন প্রকাণ্ড একটা শরীর ঝুপ করে গাছ থেকে নামল তখন ভয়ে বিস্ময়ে আধমরা হয়ে চিৎকার করে উঠল। ততক্ষণে গোটা বারো বিশাল বনমানুষ ক্যাম্পে নেমে পড়েছিল। তারা টারজান আর ওয়ার্পারের দিকে এগোল। তাদের মধ্যে চুক্কও ছিল।

বেলজিয়ান অফিসার চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'গুলি কর! গুলি কর! ভয়ে কেউ কথা শুনল না। তখন তিনি নিজেই গুলি করলেন। গোটা দুই বনমানুষ বনে ভাগল। চুক্ক আর বাকিরা টারজানকে আর ওয়ার্পারকে কাঁধে তুলে বনের দিকে রওনা দিল। অফিসারের বকুনির ফলে সিপাইরা এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়েছিল। চুক্কের কাঁধে ওয়ার্পার ছিল। চুক্ক বেচারি পড়ে গেল। তখুনি আবার উঠেও ছিল, কিন্তু ওয়ার্পার টের পেল তার গুরুতর আঘাত লেগেছে। তবু সে এগিয়ে চলেছিল। তারপর টারজানের হুকুমে যখন সকলে থামল, চুক্ক শুয়ে পড়ল। ওর গায়ের নিচে ওয়ার্পার আধা

চাপা পড়ল। হঠাৎ ওয়ার্পারের হাত পড়ল নরম একটা থলির উপর। অনেক চেষ্টা করে থলিটিকে ওয়ার্পার নিজের কোমরে গুঁজে নিল। টারজান ততক্ষণে নিজের বাঁধন খুলে ওয়ার্পারের পায়ের দড়িও খুলে দিয়েছিল। কিন্তু চুকের দেহে প্রাণ ছিল না। টারজানের কি দুঃখ! এদিকে ওয়ার্পার এখন সরে পড়তে চায়, কারণ মণি ভরা থলি সে পেয়ে গেছে। তার সব শুভ সঙ্কল্পও উবে গেছে।

তখন টারজান বলে, 'এবার আমার স্ত্রীর কাছে আমাকে নিয়ে চল।' এদিকে বনমানুষরা কিছু দূর ওদের পিছন পিছন এলেও, একে একে ঝোপেঝাড়ে শুয়ে পড়েছিল। এমন সময় কানে এলো সিংহের ডাক। তারপর গুলির শব্দ। টারজান ওয়ার্পারের দিকে ফিরে বলল, 'কেউ বিপদে পড়েছে, হয়তো সাহায্য দরকার। আমি যাই।'

ওয়ার্পার বলল, তোমার স্ত্রীও হয়তো সেখানে আছে।

টারজান চমকে উঠল, 'সত্যিই তো! হায় ভগবান! সিংহরা ক্যাম্প আক্রমণ করেছে আর জেন হয়তো সেখানে! এক মিনিটও অপেক্ষা নয়, সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডালে ঝুলে টারজান রওনা হলো। আর ওয়ার্পারও কি সেখানে থাকে? চুরি করা রত্নের থলি নিয়ে সে-ও পালাল।

যতই এগোয় সিংহের গর্জন আর বন্দুকের শব্দ ততই স্পষ্ট হয়। সেখানে পৌঁছে দেখে এই বুঝি সিংহটা জেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে!

তার মুখে ভয় নেই, ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে সে! তার মধ্যে জেন দেখতে পেল বিশাল দেহ এক সুন্দর মানুষকে গাছ থেকে লাফিয়ে নামতে সিংহটার ঘাড়ে! নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না! টারজান ছাড়া কার এত শক্তি, এত সাহস! ছুঁড়ে ফেলে দিল সিংহটাকে টারজান। জানোয়ারটা আবার ঘুরে দাঁড়াল। পায়ের কাছে একটা বন্দুক পড়েছিল, সেইটে তুলে নিল টারজান। সিংহটা রাগে অন্ধ হয়ে আবার ঝাঁপ দেবার আগেই বন্দুকের হাতল দিয়ে মাথায় বসাল প্রচণ্ড এক বাড়ি। মাথাটা চৌচির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জেনকে কাঁধে তুলে টারজান এক লাফে গাছের ডালে উঠে পড়ল। পিছনে দুই দলে লড়াই চলতে লাগল। জেনকে নিয়ে টারজান যেখানে ওয়ার্পারকে ছেড়ে এসেছিল, সেখানে ফিরে গেল। গিয়ে তার কোনো চিহ্ন দেখতে না পেয়ে টারজান বলল, 'এই ভাবে নিজের অপরাধ স্বীকার করে গেল!'

তারপর বাড়ি দিকে রওনা। সে বাড়ি এখন ধ্বংস-

স্তূপ। প্রভুভক্ত ওয়াজিরি কতজন প্রাণ দিয়েছে। তাদের মধ্যে মুগাম্বিও আছে। জেনের তার জন্যেই সবচেয়ে বেশি দুঃখ। এইভাবে আনন্দে বেদনায় ওরা ঘরে ফিরে ছিল। হঠাৎ টারজান বলল, 'ওয়াজিরিদের গলা শুনতে পাচ্ছি, ওরা রাতের জন্য ক্যাম্প করছে।' আধঘণ্টা বাদে একদল কালো যোদ্ধার সঙ্গে দেখা। বাসুলি তাদের সংগ্রহ করেছে। আরবদের উপর প্রতিশোধ নেবে। তাদের সঙ্গে জেকের ডেরা থেকে উদ্ধার করা ছেলেপুলে আর মেয়েরাও ছিল। আর বাসুলির পাশে দাঁড়িয়েছিল সেই মুগাম্বি, জেন যার জন্য এত দুঃখ করছিল।

তারপর কত আনন্দ, কত কথা। বাসুলিরা কেমন করে নল খাগড়ার ঝোপে লুকিয়ে হাবসিদের সঙ্গে আরবদের সোনা নিয়ে লড়াই দেখেছিল। তারপর ওরা চলে গেলে বেরিয়ে এসে কেমন করে সোনাগুলো তুলে নিয়ে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল যে কারো খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাদের কথা থেকে ওয়ার্পারের বিশ্বাসঘাতকতা

প্রকট হয়ে পড়ল।

খালি জেন বলল, 'তবু শেষ পর্যন্ত আমাকে বাঁচানোর চেষ্টায় নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছিল।'

টারজানও বলল, 'যতই পাপিষ্ঠ হোক না কেন মানুষের ভিতরে খানিকটা মহৎ গুণও থাকে। ভগবানের কাছে হয়তো তারও অনেক দাম।'

অনেক রাত অবধি নাচ গান ফুর্তি চলেছিল। বন-ভূমিও যেন তাতে আনন্দিত।

এর অনেক মাস পরে যখন বাংলো, বাগান, খামার-বাড়ি ঐ সোনার সাহায্যে আর ওয়াজিরিদের আপ্রাণ পরিশ্রমে আবার প্রায় আগের রূপ ফিরে পেয়েছিল, ওরা সকলে মিলে বনে গিয়ে শিকার আর চড়িভাতি করেছিল।

ততদিনে খামারের জীবনযাত্রা আবার আগের মতো শান্তিপূর্ণভাবে চলেছিল। এত দিন সকলের অনেক খাটুনি গিয়েছে, তাই এই আনন্দ করা। ফিরবার সময় জেনের ঘোড়াটা কি দেখে চমকে উঠল।

অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেরোল একটা মানুষের মাথার খুলি আর এক ঢিপি সাদা পরিষ্কার হাড়গোড়। তার মাঝখানে টারজান একটা চামড়ার থলিও পেয়ে অবাক হয়ে বলল, 'এই তো আমার সেই হারানো মণি-মাণিক্য ভরা থলিটা আর ঐ হাড়গুলো হলো ওয়ার্পারের দেহের ধ্বংসাবশেষ।'

মুগাম্বি হাসতে লাগল, 'খুলে দেখুন বোয়ানা, কিসের জন্য ওয়ার্পার তার প্রাণ দিয়েছে। ওতে খালি নদীর ধারের নুড়ি আছে। স্নান করতে গিয়ে আমি বদলে দিয়েছিলাম। তারপর ঘোরবনে আমার কাছ থেকে কে চুরি করে নিয়ে গেল বুঝতে পারলাম না।

টারজান থলির মুখ খুলে নিজের হাতের তেলোয় ভিতরকার জিনিসের খানিকটা ঢালতেই সকলের চক্ষু চড়ক-গাছ! হীরে-চুনী-পান্নার স্রোত ঝিকমিক করে উঠল! কিছুতেই বোঝা গেল না ওয়ার্পারের কাছে মণিগুলো কি করে আবার ফিরে এলো। যে দু'জন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত, তারা কেউ বেঁচে ছিল না—ওয়ার্পার আর চুঙ্ক।

টারজান বলল, 'মরে গিয়েও বেচারি ক্ষতিপূরণ দিল। ওর পাপের ক্ষমা হোক।

টারজানের বনজঙ্গলের গল্প

জাঙ্গল টেলস অফ টারজান

টারজানের কৈশোর যৌবন জঙ্গলে কেটেছিল। সে সময়কার অনেক গল্প আছে। কয়েকটা বেশ মজার। ওর পনরো-ষোল বছর বয়সের চমৎকার চেহারা একটা দেখবার জিনিস ছিল। শরীরের যেমন গড়ন, তেমনি সুন্দর মুখ, কালো চুল, ছাই রঙের চোখ। দুঃখের বিষয়, গায়ে লোম-টোমের বালাই নেই। গোড়ায় মনে আশা ছিল, ওর গায়েও সুন্দর লোমে ঢেকে যাবে, কিন্তু সে গুড়ে বালি। কালা বলে যে বনমানুষী ওকে বড় করেছিল, তার গায়ে কি চমৎকার লোম ছিল, কি সুন্দর মস্ত মস্ত দাঁত ছিল। টিকা

বলে যে বনমানুষের মেয়ের সঙ্গে ছোটবেলা থেকে কত খেলা করেছে, তার পর্যন্ত সারা গায়ে চকচকে লালচে লোম, অথচ ওর ন্যাড়া গা। তাই টিকা ওকে ভারি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। ওর চেয়ে টাউগকে পছন্দ করে।

একদিন টাউগ হতভাগা টিকার কাছে বসে, তার কাঁধে লোমশ থাবা বুলিয়ে দিচ্ছিল, এমনি আস্পর্ধা। দেখে গা জ্বলে গেল। আজকাল টাউগটা আর খেলাধুলোয় যোগ দেয় না। টারজানের চেয়ে সামান্য বড় হলেও এরই মধ্যে কেমন ভোঁতা মেরে গেছে। হেঁড়ে গলা, হাঁড়ি মুখ, ধীরে

সুস্থে নড়াচড়া। খুব খানিকটা তর্জন-গর্জন করে নিল টারজান আবার টাউগ বলে কিনা টিকা নাকি ওর বৌ হবে। মোটেই হবে না। টিকা টারজানের বৌ হবে। এমনি কথা কাটাকাটি চলছে। তাকে নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে দেখে টিকা মহা খুশি। অন্য বনমানুষরা যে যার জায়গায় বসে মজা দেখছিল, ভাবছিল মারামারিটা শুরু হচ্ছে না কেন? টিকার আর তর সইছিল না। দুই ভক্তকেই সে নিরপেক্ষ ভাবে তাতিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। বলছিল, 'তোরা বড় ভীতু! তোরা হিস্তার মতো! তোরা ডাঙোর মতো।' হিস্তা হলো সাপ, ডাঙো হলো হায়না। তাই শুনে অন্য বনমানুষদের কি হাসি! টাউগ মহা রেগেমেগে হঠাৎ টারজানকে আক্রমণ করল। টারজান ডিগবাজি খেয়ে সরে গিয়ে, ওর চিরসঙ্গী ছোরা বের করে তেড়ে গেল। টাউগের কাঁধ থেকে একটু রক্তও পড়ল। টিকা তাতে এতই খুশি যে মাথার উপরের ডালে যে শীতা নামধারী প্যান্থার ওর দিকে তাগ করেই গুঁড়ি মেরে বসে আছে, তাও খেয়াল করেনি।

এদিকে ছোরা খেয়ে টাউগ একটু পিছু হটেছে, টারজান একটু এগিয়েছে। দু-হাত বাড়িয়ে এবার টাউগ টারজানের উপর ঝাঁপ দেবে বলে তৈরি হয়েছে। টারজান তার নাগালের ঠিক বাইরে তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে আর মাঝে মাঝে ছোরার একটু আধটু খোঁচা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে থেমে দুই পক্ষ দম নিচ্ছে। হঠাৎ টারজানের মাথার উপরে তাকিয়ে দেখে, টাউগের সব রাগ উপে গিয়ে, বেজায় ভয় হলো। চেঁচিয়ে একটা ডাক দিয়েই সে পড়িমরি করে ভাগল।

ও ডাকের মানে সকলের জানা। প্যান্থার এসেছে! সব বনমানুষ অমনি গাছের মগডালে। শত্রুর নাগালের বাইরে। একটা কাতর শব্দ শুনে টারজান ফিরে দেখে টিকা সামনে সামনে একটা গাছের দিকে দৌড়চ্ছে, আর পিছন পিছন বড় বড় লাফ দিয়ে প্যান্থারটা ছুটেছে। এই ধরল বলে!

সে কি! টিকা কি এই ভাবে মরবে? টাউগকে আর অন্যদের ডাকলেও তারা সাড়া দিল না। তখন টারজান শীতার পিছন পিছন ছুটতে লাগল। দৌড়য় আর যাচ্ছেতাই করে তাকে গাল দেয়। যাতে সে রেগে টিকাকে ছেড়ে, ওর পিছু নেয়। ততক্ষণে টিকা গাছে উঠে যেতে পারবে। টারজানের হাতে ঘাসের দড়ির ফাঁস। তখনো সে খুব শক্ত দড়ি পাকাতে শেখেনি। হঠাৎ মনে হলো শীতা বড় বেশি এগিয়ে আছে, ধরা যাবে না। যেই মনে হওয়া, অমনি ফাঁসটা ছুঁড়ে দিল টারজান। ততক্ষণে টিকা একটা বড় গাছের নিচু ডাল ধরবার জন্য লাফ দিয়েছে, শীতাও লাফিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে কিলবিল করে ফাঁসটা তার গলায় পড়েছে এবং অন্য মাথা ধরে টারজান একটা টান দিতেই এঁটে বসেছে! এতটুকুর জন্য সেবার টিকার প্রাণটা বেঁচে গিয়েছিল।

কিন্তু টারজান তখনো গাছ থেকে অনেকটা দূরে, কাজেই শীতার সঙ্গে লড়াই অবশ্যম্ভাবী। দু'জনেই মাটিতে, দড়িটা টারজানের হাত থেকে ছুটে গেছে। এখন একটা মাথা শীতার গলায় জড়ানো, অন্যটা মাটিতে গড়াচ্ছে। গায়ের জোরে পারবে না ছেলেমানুষ টারজান ঐ ধাড়ি জানোয়ারের সঙ্গে। কিন্তু বুদ্ধি তার অনেক বেশি। কিছুতেই শীতা তার নাগাল পায় না, কেবলি সরে সরে যায় ছেলেটা। টারজান একটা কাঁটাঝোপের চারদিকে পাক দিয়ে ঘুরে এলো। শীতাও তাই করল। সুখের বিষয় গলার দড়িটা গেল ঝোপের চারদিকে জড়িয়ে, প্যান্থার পড়ল আটকা। ততক্ষণে টারজান নিরাপদে গাছের উপর থেকে শীতাকে গাল দিচ্ছে।

অন্য বনমানুষরা একজনও টিকাকে বা টারজানকে সাহায্য করতে নামেনি। কেন নামবে? টারজান তো আর সত্যিকার মানগানি নয়। শেষ পর্যন্ত শীতা দড়ি চিবিয়ে ছিঁড়ে ছাড়া পেয়েছিল। এতক্ষণ অন্য বনমানুষরা নিরাপদ জায়গায় বসে টারজানকে ভালো ভালো পরামর্শ দিচ্ছিল, কিন্তু নড়ছিল না। এখন তারা সবাই মিলে শীতাকে টিটকিরি দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রেগে চিৎকার করে, শীতা সরে পড়ল।

অমনি বনমানুষরা গাছ থেকে নেমে যে যার পোকা-মাকড় ইঁদুর-ছুঁচো খুঁজতে লেগে গেল। টারজান একটা নতুন দড়ি পাকাতে বসল। টিকা গিয়ে তার পাশে বসল। টাউগ হাঁড়িমুখে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

দড়ি পাকানো হলে, টারজান শিকারের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ল। এদের মতো পোকা-মাকড় ফল-মূল খেয়ে তার পেট ভরত না। সে চাইত বেশি করে তাজা মাংস। শরীরে শক্তি জমাতে হলে তার মতো কিছু নেই। টারজান চলে গেলেই, টাউগ আবার টিকার কাছে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। টিকাও যে তার উপর বিরক্ত হয়েছে, তা মনে হলো না। আসলে টাউগের ঐ গাঁট্টাগোট্টা জোরালো লোমশ চেহারাটি তার ভালোই লাগত। টারজান তো একটা পাংলা ছিপছিপে লোমহীন ছোকরা ছাড়া কিছু নয়। খুব সাহসী আর গুণী, কিন্তু কিসের সঙ্গে কি!

টারজানেরও বিরক্তি এসে গিয়েছিল। এই বনমানুষ-গুলোর সঙ্গে তার মনের কোনো মিল ছিল না। আসলে সে ছিল স্নেহের কাঙাল। কালা যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন ওকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার একজন ছিল। ওর চোখে কালার ঐ হিংস্র বিকট চেহারা সুন্দর লাগত। টিকার কাছ থেকেও স্নেহ পাবে আশা ছিল, কিন্তু টিকা টাউগকেই বেশি পছন্দ করে। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। যাক্ গে, ও নিজের পথ দেখবে।

মনে মনে ঠিক করেছিল, বনমানুষদের দলে আর থাকবে না। দু-দিন দূরে দূরে ঘুরল। শিকার করে খেল। মন বড়ই বিমর্ষ। একা একা কেউ থাকে নাকি? নুমা সিংহের জুড়ি শাবর আছে। গাছতলা দিয়ে যাবার সময় শাবর কেমন আদর করে নুমার গাল কামড়ে দিচ্ছিল!

এক সময় এমবঙ্গার কয়েকজন কালো যোদ্ধাকে দেখতে পেল। ওরা জন্তু-জানোয়ার যাবার পথের মধ্যিখানে খানিকটা খুঁড়ে একটা খাঁচার মতো জিনিস সেখানে বসিয়ে, লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। টারজান ভেবে পেল না তার কি মানে হতে পারে। এই লোকরাই বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে কালাকে মেরে ফেলেছিল। এরা ওর শত্রু। তবু ওদের জীবনযাত্রা দেখতে ওর ভালো লাগত। গাছের পাতার আড়ালে বসে সন্ধ্যাবেলায় দেখত উনুন ধরেছে, রান্না চড়েছে। গ্রামবাসীরা হাসছে, গল্প করছে। অদ্ভুত লাগত দেখতে।

এদিকে টাউগ একা শিকারের চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে দেখে জানোয়ার যাবার পথের মধ্যিখানে লতায়-পাতায় ঢাকা এ আবার কি? লতাপাতা টানাটানি করতে গিয়ে ঝুপ করে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল টাউগ! এ সেই জানোয়ার ধরা ফাঁদ ছাড়া কিছু নয়। মহা রেগে খাঁচার দেয়ালে আছাড়ি-পিছাড়ি করে, অনেক ঠেলে, ধাক্কা দিয়েও কিছু করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল।

সকালে এমবঙ্গার গাঁয়ের লোকরা দেখতে এলো ফাঁদে কিছু পড়েছে কি না। গাছের পাতার আড়াল থেকে লম্বা, চওড়া, খালি গা এক সাদা দৈত্যও কৌতূহলের সঙ্গে ব্যাপার দেখছিল। খাঁচার কাছে গ্রামবাসীরা পৌঁছলে, টাউগ মহা চ্যাঁচামেচি লাগিয়ে দিল। গ্রামবাসীরা মহা খুশি। যদিও বনমানুষ ধরবার জন্য ফাঁদ পাতা হয়নি, তবু একটা পড়েছে দেখে তারা আহ্লাদে আটখানা। টারজান যেখানে ছিল, সেখান থেকে টাউগকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু বাতাসে তার গন্ধ পেয়ে টারজানের বন্দীকে চিনতে বাকি ছিল না। গ্রামবাসীরা খাঁচায় দড়ি বেঁধে সেটাকে টেনে নিয়ে চলল। টাউগ তখনো খাঁচার শিকে ধাক্কাধাক্কি করছে আর চ্যাঁচাচ্ছে। তখন টারজান ঘুরে টিকার আর বনমানুষদের দলের খোঁজে চলল।

এক জায়গায় দেখল শীতা আর তার জুড়ি পাশাপাশি বসে আছে। প্রায় উড়ে চলল টারজান দলের খোঁজে। তারা ওকে দেখে খুব খুশি হলো না। শুঁকেটুঁকে তবে মেনে নিল। টারজান টিকাকে বলল, 'টিকা, গোমানগানিরা টাউগকে ধরে নিয়ে গেছে। বোধ হয় মেরে ফেলবে। তুমি তাহলে আমার বৌ হবে?' তাতে টিকার যে খুব আপত্তি ছিল তা মনে হলো না। কিন্তু টারজানের হঠাৎ খেয়াল হলো নুমা আর শাবর এক রকম দেখতে। শীতা আর তার জুড়িও এক রকম। ছোট্ট মাম্বু বাঁদরের বৌটাও ওরই মতো দেখতে। কিন্তু টিকা তো টারজানের মতো দেখতে নয়। হঠাৎ উঠে পড়ে টারজান আকাশের দিকে মুখ তুলে বনমানুষদের জয়ধ্বনি দিল! কেন দিল টিকা বা দলের অন্য কেউ বুঝল না। তারপর টারজান একটা ডালে ঝুলে পড়ে তখুনি রওনা দিল।

ওদিকে এমবঙ্গার যোদ্ধারা ঐ ভারি খাঁচা টানতে গিয়ে হয়রান। একটু টানে, একটু বিশ্রাম নেয়। আর খানিকটা গেলেই বনের বাইরে পৌঁছে যাবে। যোদ্ধারা বড়ই ক্লান্ত; অনেকে ঘুমিয়েও পড়েছিল! দু'জন জেগেছিল। তাদের মধ্যেও একজন ঢুলছিল। যে সজাগ ছিল সে খাঁচার দরজাটা ভালো করে বন্ধ আছে কিনা দেখতে উঠেছিল। টাউগ গলার মধ্যে গুড়গুড় শব্দ করতেই, নিচু গলায় টারজান তাকে চুপ করতে বলল। নইলে সকলে জেগে যাবে।

গাছ থেকে নিঃশব্দে লোকটার ঘাড়ে নেমে টারজান তার গলা টিপে ধরল! অল্পক্ষণের মধ্যেই তার ইহলীলা শেষ হলো। তখন তেমনি নিঃশব্দে তাকে ফেলে টারজান খাঁচার দরজার চামড়ার বাঁধন খুলে দিল। ব্যাপার দেখে টাউগ তাজ্জব বনে গিয়েছিল। সাহায্য করবার এতটুকু চেষ্টাও করল না। শেষটা টারজান দরজাটা উপরে তুলে দিতে, হামাগুড়ি দিয়ে টাউগ বেরিয়ে এলো। টাউগের ইচ্ছা ছিল কালোদের উপর হামলা করে। টারজান বাধা দিল। মরা যোদ্ধাকে খাঁচায় পুরে, খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিল।

তারপর দু'জনে একসঙ্গে গাছে ঝুলে পড়ল। কিছু দূর গিয়ে টারজান বলল, 'টিকার কাছে ফিরে যাও। আমি তাকে চাই না।'

টাউগ বলল, 'আরেকজন জুড়ি পেয়েছ বুঝি?'

টারজান বলল, 'দেখ সিংহের বৌ সিংহী, প্যান্থারের বৌ প্যান্থার, বাঁদরের বৌ বাঁদর। টাউগ একজন বনমানুষ, টিকাও তাই। দু'জনকে ভালো মানাবে। টারজান একটা মানুষ। সে একা পথে চলবে।'

●

কালো যোদ্ধারা বনের গুমোট গরমে খাটছিল। বর্শার ফলা দিয়ে কালো চটচটে মাটি গাছ-গাছড়ার স্তর তুলে ফেলছিল। নখ দিয়ে জানোয়ার যাবার পুরানো পথ থেকে নরম মাটি সরাচ্ছিল। মাঝে মাঝে হাসছিল, গল্প করছিল, বিশ্রাম নিচ্ছিল। কালো মসৃণ গায়ে মাংসপেশী-গুলো ঢেউ খেলে যাচ্ছিল; কি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ওদের।

গাছের গুঁড়িতে মোষের চামড়ায় তৈরি লম্বাটে ডিমের মতো আকারের ঢালগুলো ঠেকানো ছিল। জল খেতে যাবার পথে একটা হরিণ থমকে দাঁড়াল; ওরা হেসে উঠল; হরিণ অমনি ঘুরে মানুষের অশুভ সান্নিধ্য থেকে পালাল। একশো গজ দূরে দুর্গম জঙ্গলে নুমা সিংহ তার বিশাল মাথা তুলে বাতাসে মানুষের কড়া গন্ধের সঙ্গে হরিণের গন্ধ পেল। কিন্তু তার পেট ভরা ছিল। আস্তে আস্তে উঠে সে সরে পড়ল। মাথার উপর রংচঙে পাখি উড়ছিল, ছোট ছোট বাঁদর কিচির মিচির করছিল। বনটা একটা জনবহুল শহুরে রাস্তার মতোই নির্জন। তবে একেবারে নির্জন নয়।

মাথার উপর থেকে একটা ছাই রঙের চোখওয়ালা ছোকরা ওদের দেখছিল। সে ওদের দেখতে পারত না, কারণ এদেরই একজন ওর বনমানুষ মা কালাকে মেরে ফেলেছিল। মস্ত গর্ত হলো, তাতে ছ'টা মানুষ ধরে যায়। তারপর অনেকগুলো খুঁটির এক মাথা ছুঁচলো করে, সেগুলোকে গর্তের তলায় পোঁতা হলো। তার উপর ডালপালা চাপানো হলো, তারপর তার উপর ঘাসপাতা ঢেকে এমন করে ফেলা হলো যে তলায় যে গর্ত আছে তা মালুম দিচ্ছিল না।

সাদা ছোকরা ভেবেই পেল না এর উদ্দেশ্যটা কি? লোকগুলো তো এমবঙ্গার গ্রামে ফিরে গেল। এই কালো লোকগুলো আসবার আগে এখানকার জানোয়াররা কখনো মানুষ দেখেনি। ক্রমে ক্রমে অনেক দুঃখ পেয়ে নুমা থেকে তান্তর হাতি সবাই মানুষদের হালচাল শিখছিল।

গর্তে ঘাসচাপা দিয়ে কালোরা বিদায় নিলে, টারজানও নিচে নেমে গর্তটাকে ভালো করে পরীক্ষা করল। তারপর কেরচাকের বনমানুষদের সন্ধানে সরে পড়ল। পথে যেতে আরেকবার নুমাকে দেখল। তারপর কালচে রঙের বিশাল দেহ, বড় বড় চ্যাপ্টা কানওয়ালা তান্তরের সঙ্গেও দেখা হলো। তার হাঁকডাক শুনেও তান্তর তার গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করতে লাগল। হাতিরা চোখে কম দেখে, একটু সন্দেহবাতিকও আছে ওদের। টারজান জোরে জোরে হেসে উঠল। তান্তরের সঙ্গে তার বড় ভাব। 'ছি তান্তর! বারা হরিণের তোমার চেয়ে সাহস বেশি।' এই বলে এক লাফে তান্তরের পিঠে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, তার সঙ্গে অনর্গল বকে যেতে লাগল। তার অর্ধেকটা নিশ্চয় হাতির বোঝার ক্ষমতার বাইরে। তবু সে খুশি হয়ে সব কথা শুনছিল।

ছোটবেলা থেকে টারজান লক্ষ্য করেছিল তান্তর তার খুব বাধ্য। ডাক দিলে দূর থেকে ছুটে আসত। তাকে মাথায় বসিয়ে বনের মধ্যে ঘুরেও বেড়াত। যে দিকে টারজান বলত, সেদিকে যেত। বনের জন্তুদের একমাত্র কাজ পেট ভরানো। সময়ের কোনো মূল্য নেই! তার উপর তান্তরের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড় বাছাবাছি! কোনো গাছের ছাল খাবে, কোনোটার বা ডাল, আবার কোনোটার শুধু পাতা খাবে; তাও বছরের একটা বিশেষ সময়ে। এ সব কারণে হাতিরা বড় আস্তে এগোয়। তাতে টারজানের কোনো আপত্তি ছিল না। একটা ভালোবাসার কাউকে পেয়েই সে খুশি। ছোটবেলাকার খেলার সাথীরা সব ধেড়ে বনমানুষ হয়ে গেছে, টারজান ছোকরাকে তারা আমলই দেয় না। মোট কথা কালাকে হারিয়ে অবধি, তান্তরকেই টারজান সবচেয়ে ভালবাসে। তবে তান্তর তাকে কতটা বাসে তা বোঝা যায় না।

তারপর টারজানের খিদে পাওয়াতে তান্তরকে ছেড়ে সে গাছে উঠল। তান্তর হেলেদুলে নিজের মনে এগিয়ে চলল। ঘুরতে ঘুরতে টারজানের বারবার ঐ গর্তটার কথা মনে পড়ছিল। ওটাকে দিয়ে কি হবে? হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই আঁৎকে উঠল সে। তান্তর তো হেলেদুলে ঐ পথেই চলেছে। চোখেও দেখে না ছাই! গর্ত দেখলেও নিজের বিপদ বুঝবে না। ওটা যে হাতি ধরার ফাঁদ, টারজান তা হঠাৎ বুঝতে পারল।

আর দেরি নয়। ডাল থেকে ডালে ঝুলে যত তাড়াতাড়ি পারে এগিয়ে যাওয়া। অন্য বিপদের কথা ভুলে গিয়েছিল টারজান। একটা খোলা জায়গায় পৌঁছতেই কয়েকটা পাখি কিচিরমিচির করে উড়ে পড়ল। তার মানে ওখানে বুটো গণ্ডার রয়েছে। আর বলা-কওয়া নেই, সঙ্গে সঙ্গে সোজা টারজানের দিকে তেড়ে এলো। বাঁদররা সব পালাল।

টারজান পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। বুটোও ভালো দেখে না। টারজান তাকে খুব চেনে। যখন অনেকটা কাছে এসে পড়েছে। বুটোর শিং ধরে এক লাফে টারজান তার পিঠে চড়ে গেল। আরেক লাফে বুটোর পিছনে মাটিতে নেমে পড়ে, গাছের দিকে দৌড়। বুটো মহা খাপ্পা! শিকারটা সামনে থেকে উপে গেল নাকি? রাগে গজরাতে গজরাতে সে আরেক দিকে ছুটল, সে দিকে টারজান যায়ও নি।

টারজান আবার জানোয়ারদের চলার পথ ধরল। তার খানিক আশা তান্তরও ঐ পথেই চলেছিল। তারও খানিকটা আগে একজন কালো যোদ্ধা কান পেতে ছিল, হাতি চলার মট মট শব্দ শোনার জন্য। আশেপাশে আরো কিছু যোদ্ধা গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। প্রথম লোকটি আস্তে জানান দিতেই, ওরা সব পথের ধারের গাছে উঠে পড়ল। একটু বাদেই এই বড় বড় দাঁতওয়ালা হাতি দেখে, সকলের কি ফুর্তি।

হাতি ওদের পার হয়ে যেতেই ওরা গাছ থেকে নেমে পড়ে, হাততালি আর বিকট চিৎকার দিয়ে হাতিটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। হাতিটা একবার তেজ আর শুঁড় তুলে, কান উঠিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর প্রায় ছুটে চলল, সোজা মরণ ফাঁদের দিকে। ওর পিছনে হল্লা করতে করতে কালোরা ছুটেছে। তাদের পিছনে প্রাণপণ বেগে টারজান গাছে গাছে ঝুলে এগিয়ে আসছে। ঐ হাততালি আর চিৎকারের মানে সে বুঝেছে।

গর্ত থেকে তান্তর তখন মাত্র কয়েক গজ দূরে, টারজান তাকে প্রায় ধরে ফেলেছে। তার হাঁকডাক তান্তর বেচারির কানে যাচ্ছে না। আর কয়েক পা এগোলেই গর্তে পড়বে। এমন সময় গাছ থেকে লাফিয়ে টারজান ওর সামনে নামল। তাকে দেখেই তান্তরও ব্যাপারটা বুঝে নিল!

টারজান বলল, 'লড়াই দাও। ওরা তোমার ঠিক পেছনে।' তান্তর লড়াই দেবে কি! সে তো ভয়েই আধমরা। সামনে গর্ত, দু-পাশে দুর্ভেদ্য ঝোপ-জঙ্গল। ভীষণ ডাক ছেড়ে তারই মধ্যে দিয়ে তান্তর পালিয়ে গেল। হাতিছাড়া এমন কাজ আর কেউ করতে পারত না।

এ দিকে টারজান ওকে থামাবার চেষ্টায় একেবারে গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওর পায়ের চাপে হঠাৎ কিনারার মাটি ধ্বসে ঘাস পাতার ঢাকনি ফুঁড়ে টারজান অদৃশ্য হয়ে গেল। কালো যোদ্ধারা পৌঁছে অবাক! কেউ কোথাও নেই। হাতি পালিয়েছে। গর্তের মুখের ঢাকনিতে একটা ছোট মতো গর্ত। প্রথমে ওরা ভাবল হয়তো ওখানে হাতির একটা গোদা পা পড়েছিল। তারপর পাতা সরিয়ে দেখে গর্তের নিচে সাদা দৈত্যটা চুপচাপ পড়ে আছে। ভয়ে কয়েকজন পিছিয়ে গিয়েছিল। ও বাবা! ও না বন-দেবতা! তার চেয়ে সাহসী কয়েকজন গর্তে নেমে টারজানকে তুলে আনল।

শরীরে কোনো ক্ষত চিহ্ন নেই। খালি ঘাড়ের কাছে মাথার নিচে চোট লেগে খানিকটা ফুলে আছে। জ্ঞান ফিরবার আগেই ওরা চটপট ওর হাত-পা বেঁধে ফেলল। এই সব গেছো মানুষদের দিয়ে বিশ্বাস নেই। অজ্ঞান অবস্থায় ওকে তুলে কাঁধে করে তো ওরা রওনা দিল। মাঝপথে টারজানের জ্ঞান ফিরতেই নিজের বিপদ বুঝতে পেরে, পালাবার নানা মৎলব ভাঁজতে লাগল। ওদের কাঁধে চেপে তো আর বাঁধনের জোর পরখ করা যায় না, ওরাও তাহলে সতর্ক হয়ে যাবে।

একটু বাদেই বাহকরা যেই বুঝল লোকটার জ্ঞান ফিরেছে ওকে মাটিতে নামিতে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। মাঝে মাঝে একটু বর্শার খোঁচা খেয়েও লোকটা শব্দ করছে না দেখে ওদের বিস্ময় বাড়ল, শেষটা ঘাবড়ে গিয়ে থেমে গেল। ফটকের বাইরে থেকেই এমনি জয়ধ্বনি দিতে লাগল লোকগুলো যে গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। এক পাল পুরুষ, স্ত্রী, ছেলেপুলে বর্শা নাড়তে নাড়তে, নাচতে নাচতে, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটে এলো। সাদা দৈত্য বন্দী হয়েছে দেখে তারা তো হাঁ। কত ভয় দেখিয়েছে ওদের, কত ক্ষতি করেছে, লোক মেরেছে; এখন ওদের হাতে পড়েছে, এবার টের পাবে। এমন সময় এম্‌বঙ্গা এসে বর্শার বাঁট দিয়ে ঠেলে ওদের সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আহা, রাত পর্যন্ত জিইয়ে রাখা যাক।'

এদিকে দূর বনে তান্তরের ততক্ষণে ভয় কেটে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে, শুঁড় নেড়ে

কি যেন ভাবছিল। দূর থেকে গাঁয়ের লোকদের উন্মত্ত চিৎকার শুনে, পালাতে গিয়েও সে পালাল না। শুঁড় তুলে একটা তীক্ষ্ণ ডাক দিল। তারপর কান খাড়া করে শুনতে লাগল। গ্রামের লোকরা সে ডাক শুনতে না পেলেও, টারজানের কানে ঠিকই পৌঁছেছিল, তার মানেও সে বুঝেছিল। গ্রামবাসীরা তখন ওকে একটা ঘরে পুরছিল, সেখানে রাত অবধি বন্দী থাকবে। তারই মধ্যে তান্তরের ডাকে পাড়া দিলি টারজান। চমকে গিয়ে বর্শা তুলে যোদ্ধারা ওকে ঘিরে ফেলল। দূর থেকে আবার তান্তরের গলা শোনা গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে টারজান ঘরে ঢুকল।

ক্রমে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা এগিয়ে এলো। সারা দিন ধরে ঘষে ঘষে টারজান হাতের বাঁধন ছিঁড়বার চেষ্টা করেছিল। দড়িগুলো আলগা হয়ে আসছিল। হয় তো ওকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে, তখন দড়ি ছিঁড়ে যাবে। তারপর দেখা যাবে। মরবার আগে ওদের একবার আচ্ছা শিক্ষা দেবে। আরো সন্ধ্যা হলে, রং মেখে, পালক পরে যোদ্ধারা ওকে খুঁটির কাছে নিয়ে চলল। টারজান তখন হাতের বাঁধন খুলে ফেলে, এক ঘুঁষিতে একজন যোদ্ধাকে মাটিতে ফেলে, বিকট হুংকার দিয়ে আরেকজনের বুকে চড়ে গলার শিরা কামড়ে ধরল। কিন্তু তারপর পঞ্চাশ জন যোদ্ধা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে পেড়ে ফেলল। তবু টারজান এমনি লড়াই দিতে লাগল যে এমবঙ্গা বুঝল ওকে বাঁধা যাবে না। সব ভালো নেতাদের মতো এমবঙ্গাও এতক্ষণ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হুকুম দিচ্ছিল। সেখান থেকে একজন যোদ্ধাকে বলল, ভিড়ের মধ্যে ঢুকে, বর্শা দিয়ে দৈত্যটাকে মেরে ফেলতে। লোকটা টারজানের গজরানি শুনতে পাচ্ছিল, তাই ভয়ে ভয়ে সাবধানে এগোচ্ছিল। বাবা! ঐ দাঁতের, ঐ জোরালো হাতের নাগালে কে যাবে! একবার একটু ফাঁক পেয়ে বর্শা আরো উঁচু করে ধরেছে, এমন সময় বেড়ার বাইরে থেকে ভীষণ হুড়মুড় শব্দ শুনে সে দিকে তাকাল। পিছনে যারা ছিল তারাও তাকাল। উনুনের আলোতে সবাই দেখতে পেল, বেড়ার বাইরে কি রকম একটা কালো ঢিপি। তারপরেই বেড়াটা ভিতর দিকে ঝুলে খড়ের দেয়ালের মতো ভেঙে পড়ল। তারপরেই তান্তর ঝড়ের মতো ছুটে এলো।

যে দেখতে পেল, সে-ই ভয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পালাল। যে ক-জনের মাথায় খুন চেপেছিল, তারা তান্তরের আগমনের কথা বুঝতেও পারেনি। তাদের দিকেই তান্তর তেড়ে গেল। তারপর নেমে গিয়ে শুঁড় তুলিয়ে দেখতে লাগল, ওদের তলায় রক্তাক্ত শরীরে টারজান কোথায় চাপা পড়ে আছে। তখনো সে লড়ে যাচ্ছিল। একজন যোদ্ধা মুখ তুলেই দেখতে পেল রক্তবর্ণ চোখে তান্তর তার পাশে দাঁড়িয়ে। লোকটা ভয়ে চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তান্তর শুঁড় দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে দূরে ভীড়ের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। সবাই পালাচ্ছিল।

তান্তর টারজানের উপর থেকে একটা একটা করে সব ক'টাকে তুলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। যে যেখানে পড়ল সেখানেই হয় একেবারে চুপ করে পড়ে রইল, নয়তো গোঙাতে লাগল। কেউ বাঁচল না। দূর থেকে এমবঙ্গার লুব্ধ চোখ তান্তরের প্রকাণ্ড সুন্দর দাঁতদুটোকে লক্ষ্য করে লোকজনদের বলছিল হাতি-মারা বর্শা নিয়ে আসতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তান্তর টারজানের শরীরটাকে মাথায় তুলে ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে সোজা বনে চলে গেল। অনেকে বলে, হাতিরা কখনো মানুষের জন্য কিছু করে না। তাই যদি হয়, তান্তর বোধ হয় টারজানকে মানুষ বলে মানত না। ওর কাছে সে ছিল ওরই মতো আরেকটা বনের জানোয়ার।

●

টিকার যখন একটা বাচ্চা হলো, টিকার স্বামী টাউগের চেয়েও টারজানের বেশি উৎসাহ দেখা গেল। যে বয়সে অন্য বনমানুষরা গম্ভীর গিন্নি হয়ে ওঠে, টিকা তখনো টারজানদের সঙ্গে চোর-চোর খেলত। বাচ্চাটা হবার পর টিকা একটু বদলে গেল। একদিন ওর কোলে ছোট একটা কি জানোয়ারকে কিলবিল করতে দেখে, টারজান ওর কাছে যেতেই, টিকা রেগে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। টারজান তো অবাক! ওকে দেখে টিকা কখনো রেগে উঠত না, খুদে জিনিসটাকে ভালো করে দেখতে হচ্ছে। কিন্তু হাত বাড়াতেই টিকা ওকে কামড়ে দিল। দুঃখও হলো, হাসিও পেল। বাচ্চাদের মা-দের ধারণা ওদের ছেলে-মেয়ের মতো ভালো কিছু হয় না, তাই সবাই তাদের নিয়ে যেতে চায়। অবশ্যি কয়েক দিন পরে মা-দেরও একটু বুদ্ধি খোলে! ওরা বাচ্চাকে বলে বালু!

টারজানের বড়ই কৌতূহল। টিকাকে বলল, 'দেখিই না বালুটাকে।'

টিকা বলল, 'ভাগো এখান থেকে, নইলে তোমাকে মেরেই ফেলব।'

—'আহা, একটু দেখি না।'

—'না, ঐ যে টাউগ আসছে। ও তোমাকে পেটাবে।

টাউগেরও কেমন রাগ-রাগ ভাব। অথচ একদিন ওরা একসঙ্গে খেলা করত। টাউগের সঙ্গে টারজানের কোনো ঝগড়া ছিল না, রাগও হলো না। বালুদের বাবারা ও-রকম করেই থাকে। তবু টাউগ তেড়ে এলো। এখন কি করা যায়? টারজান এক লাফে সরে গেল। টাউগ আবার তেড়ে এলে, ঘাসের দড়ি দিয়ে তার গলায় একটা ঢিলে ফাঁস পরিয়ে গাছে চড়ে গেল। সেখান থেকে ফাঁস খুলে নিল।

টাউগও গাছে চড়ল। টারজান মগডালে উঠল। সেখানে ঐ ভারি শরীর নিয়ে চড়তে টাউগ সাহস পেল না। নিচে থেকে রাগ দেখাতে লাগল। টারজান ফাঁসটা দিয়ে এবার টাউগের পাদুটো বেঁধে ফেলে, এক হ্যাঁচকা টানে তাকে ঠ্যাং উপরে, মাথা নিচে করে ঝুলিয়ে দিল। মাটি থেকে তিরিশ ফুট উপরে বেচারা ঐভাবে ঝুলে রইল। টারজান দড়ির অন্য মাথাটা গাছের ডালে বেঁধে, ওর কাছে নেমে বসে, টাউগকে বলল, 'তুই বুটো গণ্ডারের চেয়েও বোকা। যতক্ষণ না মগজে কিছু বুদ্ধি গজায়, ঐ ভাবে ঝুলে থাক। আমি টিকার বালু দেখে আসি।'

কিন্তু টাউগকে ঝুলোলে কি হবে, টিকা ওকে বালুটার কাছে ঘেঁষতেই দিল না। পাছে টেনে নেয়, তাই ছুটে অন্য বনমানুষদের কাছে চলে গেল। টারজানের বড় ইচ্ছা ছিল বালুটাকে একটু আদর করে, সে আর হলো না। এদিকে গাছে ঝোলা টাউগ রাগমাগ ভুলে, এখন কান্নাকাটি লাগিয়ে দিয়েছে। অন্য বনমানুষদের অনেকেই টাউগের কাছে মার-ধোর খেয়েছে। তারা সবাই বসে মজা দেখছিল! টাউগ বেচারির পায়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে সে খুব কষ্ট পাচ্ছিল।

টিকার সে দিকে দৃষ্টি নেই। সে সকলের কাছ থেকে তার বালুকে রক্ষা করতেই ব্যস্ত। এমন কি বুড়ি মুমগা, যার মুখে একটাও দাঁত নেই, সে-ও পারলে ওর বালু চিবিয়ে খায়, টিকার এই ভয়। বালু নিয়ে সে এতই ব্যস্ত যে পিছন থেকে কখন শীতা প্যান্থার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে ওদের দু'জনার উপর ঝাঁপ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে, সে খেয়ালও নেই। অন্যরাও কিছু লক্ষ্য করেনি, সবাই টাউগকে টিট্‌কিরি দিতে মশগুল।

হঠাৎ টারজান দেখল একটা গোদা বনমানুষ অসহায় টাউগের দিকে লোমশ হাত বাড়াচ্ছে। তার মতলব বুঝতে টারজানের এতটুকু দেরি হলো না। এক থাপ্পড়ে গোদাটাকে ডাল থেকে ফেলে দিল। খচমচ করে কোনো রকমে নিচের ডাল ধরে নিজেকে গোদা বাঁচাল। টারজান এতক্ষণ টাউগকে তার বোকামি বিষয়ে লেকচার দিচ্ছিল। তারপর ওকে ছেড়ে দেবে ভেবেছিল। কিন্তু গোদা রেগেমেগে ওকে আক্রমণ করাতে, তার সঙ্গে লড়ে যেতে হলো। সবে তার গলায় টারজান দাঁত বসিয়েছে, এমন সময় টাল সামলাতে না পেরে দু'জনে জড়াজড়ি করে পনরো ফুট নিচের আরেকটা ডালে আটকাল। গোদার পিঠে জোরে চোট লাগল, সেখান থেকে ধপাস্ করে মাটিতে পড়ল। টারজান একটা ডাল ধরে কোনোমতে নিজেকে বাঁচাল। তারপরেই নিচের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে, বুক চাপড়ে জয়নাদ দিল। সবাই সেই বিকট ডাকে চমকে উঠল। তারপর টারজান টাউগকে মুক্তি দিতে চলল।

টিকা কিন্তু বালুটাকে ঘাসের উপর শুইয়ে রেখে, মজা দেখতে এগিয়ে গিয়েছিল। টারজান টাউগের পায়ের দড়ি আস্তে আস্তে ঢিলা করে দিচ্ছিল, যাতে সে হাত দিয়ে একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়তে পারে। টাউগ মহা রেগে ছিল। গায়ে একটু জোর পেলেই টারজানটাকে উচিত শিক্ষা দেবে ভাবছিল। এই সময়ে সকলের চোখ অন্য দিকে, সেই সুযোগে শীতা সন্তর্পণে বালুটার দিকে এগোচ্ছিল।

হঠাৎ গাছের উপর থেকেই শীতার উপর টারজানের চোখ পড়ল। কি সর্বনাশ! ও যে বালুটার দিকে এগোচ্ছে। আর দেরি নয়। সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে মাটিতে নেমে, টারজানও সেই দিকে ছুটল, টিকা ভাবল, 'এই রে! ঐ বুঝি আমার বালু নিল!' এই ভেবে ক্যাঁও-ম্যাও করে উঠতেই টাউগ আর এক দল বনমানুষও সেদিকে ছুটল। টারজান আর শীতা প্রায় একসঙ্গে বালুটার কাছে পৌঁছল। শীতার ভয় ছিল বাচ্চাটাকে নিতে গেলে টারজান ওকে আক্রমণ করবে। টারজানের চিন্তা, নিচু হয়ে বালুটাকে তুলতে গেলেই শীতা ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। এই সময় টিকা এসে পৌঁছল, শীতার যত কাছে আসে ততই আস্তে হাঁটে। একদিকে মাতৃস্নেহ, অন্যদিকে ভয়। ওর পিছনে টাউগ। তার পিছনে অন্য বনমানুষরা। শীতা বুঝতে পেরেছিল সরে পড়াই উচিত, কিন্তু নরম তুলতুলে বালুটার লোভও ছাড়তে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত যেই না বাচ্চাটার দিকে একটা থাবা বাড়িয়েছে, অমনি টারজান ওর উপর লাফিয়ে পড়েছে। দু'পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে শীতা এক চাপড়ে টারজানের মাথার অর্ধেকটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু টারজান সেখানে থাকলে তবে তো!

ওর বগলের তলা দিয়ে গলে, পৈত্রিক ছোরা হাতে

নিয়ে টারজান লেগে পড়ল। শীতার একমাত্র চিন্তা, দাঁত দিয়ে, নখ দিয়ে ওকে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। টারজানও ভয় পাবার ছেলে নয়। বয়স কম হলেও, এর মধ্যেই সে অনেক নখ-দাঁতওয়ালা জানোয়ারের সঙ্গে লড়েছে, তার মাশুলও দিয়েছে। শীতার বগলের তলা দিয়ে গলেই, প্যান্থারটার পিঠে চড়ে এক হাতে লোম টেনে ধরে তার গলায় দাঁত বসিয়ে দিল, অন্য হাতে শীতার গায়ে ছোরাটা বসিয়ে দিল।

ঘাসের উপর শীতা গড়াতে লাগল, যদি টারজানকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে। এদিকে টারজান যে মুহূর্তে শীতাকে আক্রমণ করেছিল, টিকাও সেই মুহূর্তে তার বালু তুলে নিয়ে, একেবারে গাছের উপর নিরাপদ জায়গায়! সেখান থেকে চেঁচিয়ে অন্য বনমানুষদের লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়তে উস্কানি দিচ্ছিল।

তাই শুনে মহা হল্লা করতে করতে বনমানুষরা এগিয়ে এলো। কিন্তু শীতার সেদিকে খেয়াল নেই। একবার টারজানকে বাগে পেয়ে তার কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত নখ দিয়ে চিরে দিল। টাউগের জন্যই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হলো। এক দিকে তার টারজানের উপর রাগ ছিল, অন্য দিকে তার বালুকে বাঁচাবার জন্য টারজান প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, এটা টাউগ নিজের চোখে দেখেছিল। শেষ পর্যন্ত সেই দিকটারই জয় হলো। টারজানের পা থেকে রক্ত ঝরতে দেখে, শীতার উপর টাউগ লাফিয়ে পড়ল। পড়েই তার সাদা লোমে ঢাকা গলায় দাঁত বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য বনমানুষরাও লড়াইতে যোগ দিল। শীতার সঙ্গে সে যুদ্ধ মনে রাখার মতো ব্যাপার।

গাছের ডালে বসে টিকা, থাকা, মুমগা, কাম্মা আর কেরচাকের দলের অন্য মেয়েরা চিৎকার করে যোদ্ধাদের উৎসাহ দিতে লাগল। আধ মাইল দূরে নুমা সে যুদ্ধের শব্দ শুনে আরো ঘন বনের ভিতর ঢুকে গেল।

এতগুলো বলিষ্ঠ শত্রুর সঙ্গে সাংঘাতিক লড়াই দিয়েছিল শীতা একা। শেষ পর্যন্ত তার সব চেষ্টা থেমে গেল, সে স্থির হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বনমানুষরা এতই উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল যে তখনো থামতে পারছিল না। মরা শীতার সুন্দর চামড়া নখ দিয়ে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে দিচ্ছিল। অবশেষে রক্তাক্ত শরীরে এক যোদ্ধা মৃতদেহে পা রেখে, আকাশে মুখ তুলে জয়ধ্বনি দিল। তার দেখাদেখি অন্যরাও তাই করল। বালু-কোলে টিকা দাঁড়িয়েছিল;

টারজান বাচ্চাটাকে কোলে নেবার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দিল। ভেবেছিল টিকা তেড়ে আসবে। কিন্তু টিকা ওর কোলে বালুকে দিয়ে, টারজানের গায়ের ক্ষতগুলো চেটে পরিষ্কার করে দিতে লাগল। খানিক বাদে টাউগও পাশে বসে টারজানের সেবায় যোগ দিল।

●

উপসাগরের ধারে টারজানের বাবার তৈরি খুদে কেবিনে অনেক ছবির বই ছিল। জন্মের অল্প দিন পর থেকেই বনমানুষীর কোলে মানুষ টারজান, তার মৃত মা-বাবার কথা কিছুই জানত না। কিন্তু দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, তার জন্মগত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রবল ইচ্ছা আর অসাধারণ ধৈর্যের ফলে ছবির নিচেকার কালো কালো গুবরে পোকার মতো দাগগুলোর শেষ পর্যন্ত মোটামুটি মানে বুঝতে পেরেছিল। এ-ও বুঝেছিল যে এই বনের বাইরে কোথাও সুন্দর এক জগৎ আছে, সেখানে ওর মতো লোমশূন্য মানুষরা আর তাদের চারিদিকে নানারকম আশ্চর্য জিনিস থাকে। সে বিষয়ে আরো জানবার, বুঝবার ইচ্ছা টারজানের।

একটা ছবিওয়ালা অভিধান অনেক কাজে এলেও, কয়েকটা কথার মানে বুঝতে বড়ই অসুবিধা হচ্ছিল। একটা কথা হল God, তিনটি গুবরে পোকা দিয়ে লেখা ছোট্ট একটা কথা। গোড়ার G গুবরেটাকে আবার বড় করে লেখা হয়। ওটা বোধ হয় পুরুষ গুবরে। অভিধান দেখেও God-এর মানেটা ঠিক বোঝা গেল না। মনে হলো মস্ত বড় সরদার গোছের কেউ হবে। হয়তো সব মানগানিদের, অর্থাৎ বনমানুষদের রাজা হতে পারে। কোথাও God-এর একটা ছবি খুঁজে পেল না। তবে সুন্দর করে সাজানো কয়েকটা জায়গার ছবি দেখল। সেখানে তার পুজো হয়। শেষ পর্যন্ত টারজান ঠিক করল গড্‌কে খুঁজতে যাবে।

তার আগে বুড়ি মুম্‌বাকে একটু জিজ্ঞাসা করে দেখল। সে তো অনেক কিছু দেখেছে, অনেক কথা তার মনেও আছে। কিন্তু সেও কিছু বলতে পারল না। নুমগো উকুন বাছা বন্ধ করে বলল, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বাজ—এসব গোরোর কাছ থেকে এসেছে। গোরো হলো চাঁদ। এ-কথা শুনেও কিন্তু টারজানের মন উঠল না। চাঁদের বিষয় আরো জানতে হবে।

সে দিন পূর্ণিমা। রাতে গোল রূপোলী চাঁদ উঠেছে। টারজান বনের সবচেয়ে উঁচু গাছের মগডালে উঠেও, অবাক হয়ে দেখল গোরো তেমনি দূরেই আছে। ওকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে নাকি? হাঁক দিয়ে টারজান বলল,

'কাছে এসো, গোরো। বনমানুষের ছেলে টারজান তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।' কিন্তু গোরো নড়ল-চড়ল না।

তখন টারজান বলল, 'তাহলে এটুকু বল, তুমিই যদি আরা বিদ্যুৎকে পাঠাও, যদি ঝড় আর বাজ বানাও আর জঙ্গলের বাসিন্দাদের মাথায় জল ঢেলে দিনগুলোকে ঠাণ্ডা অন্ধকার করে দাও, তাহলে কি তুমিই [illegible] ?'

অবিশ্যি God কথাটার চেহারা জানলেও, তার উচ্চারণ শেখেনি টারজান, তাই মনে মনে একটা নামও দিয়েছিল। নামটা হলো বুলা-মুটু-মুমো। ও-সব কঠিন ব্যাপারে এখন যাবার কোনো দরকার নেই। মোট কথা, টারজান গোরোকে লম্বা এক বক্তৃতা দিল। তবু যখন গোরো কোনো উত্তর দিল না, টারজান চটে গেল। বুক ফুলিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে চাঁদকে বলল, 'মোটেই তুমি বুলা-মুটু-মুমো নও। তুমি বনবাসীদের রাজা নও। টারজানের সমান বড় যোদ্ধা আর শিকারীও নও, টারজানের সমান কেউ নেই। সাহস থাকলে নেমে এসে টারজানের সঙ্গে লড়ে যাও না। টারজান-ই তোমাকে মেরে ফেলবে।' এই সময় এক টুকরো মেঘ এসে চাঁদটাকে ঢেকে ফেলল। টারজান ভাবল গোরো নিশ্চয় ভয় পেয়েছে। গাছ থেকে নেমে এসে বললও সে কথা নুমগোকে।

নুমগোর ঘুম পাচ্ছিল, তাই সে বলল, 'পালা এখান থেকে। বড়দের জ্বালাস্ কেন ?'

টারজান কিন্তু নাছোড়বান্দা, 'বলই না কোথায় গেলে তাকে পাবো। তোমার এত বয়স হলো, তুমি নিশ্চয় তাকে দেখেছ। কি রকম দেখতে, থাকে কোথায় ?'

নুমগো বলল, 'কি জ্বালা! আরে বোকা, আমিই বুলা-মুটু-মুমো। এবার ঘুমোতে দে।'

টারজান কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে বেচারার কাঁধে কামড়ে দিল, তারপর গলা টিপে ধরে দুবার ঝাঁকিয়ে, ছেড়ে দিয়ে বলল, 'তুমি বুলা-মুটু-মুমো ?'

নুমাগা আরেকটু হলেই কেঁদে ফেলত, 'না রে না। আমি একটা বুড়ো বনমানুষ। যা না গোমানগানিদের জিজ্ঞাসা করে আয় সে কোথায় থাকে। মানুষদের গায়ে লোম নেই, তোরই মতো। মাথায় অনেক বুদ্ধিও ধরে। ওদের জানা উচিত।'

তাই করল টারজান শেষ পর্যন্ত। বুলা-মুটু-মুমোকে খুঁজে বের করে তাকে ক'টা কথা জিজ্ঞাসা করতেই হবে। চায় তো না হয় যুদ্ধই করবে টারজান। যুদ্ধের ফল কি হবে God না জানুক, টারজান ঠিক জানে। এম্বঙ্গার গ্রামে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। বেড়ার বাইরে সেই মস্ত গাছের ডালে লুকিয়ে টারজান দেখল গ্রামে আজ কিছু একটা হচ্ছে। যোদ্ধারা বিকট রং-চং মেখেছে। তাদের মধ্যে ঘুরছে বীভৎস একটা লোক, মানুষের মতো ঠ্যাং, মোষের মতো মুণ্ডু, পিছনে পায়ের কব্জি অবধি লম্বা লেজ ঝুলছে; এক হাতে ধরা জেব্রার লেজ, অন্য হাতে এক গোছা তীর।

টারজান চমকে উঠল। এ তো না-মানুষ, না-জানোয়ার, তবে এই কি সে নাকি, যে ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করেছে ? ওকে দেখে

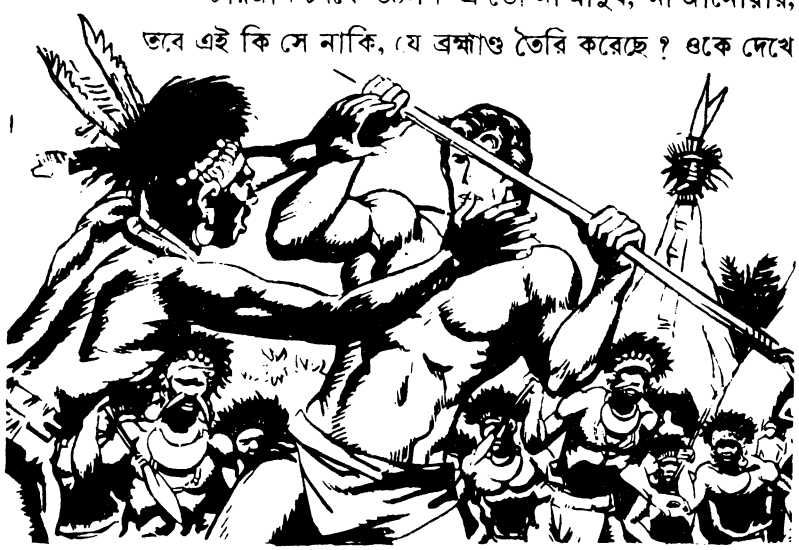

ভয়ে সবাই সরে যাচ্ছে। দেবতাই হবে হয়তো। এবার সে বক্তৃতা শুরু করল। সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে লাগল। বাবা! তীর নয়, বর্শা নয়, শুধু কথা বলেই সব ক'টাকে চুপ করিয়ে রেখেছে! বাঁদররা কথা বলে বেশি, শত্রু দেখলে পালিয়ে যায়। কেরচাকের বনমানুষরা কথা বলে কম, যুদ্ধে তাদের জুড়ি মেলা দায়।

অদ্ভুত সব অনুষ্ঠান দেখল টারজান। জাদুকরের পৌরোহিত্যে তিনটে ছেলেকে তাদের প্রথম যুদ্ধের বর্শা দেওয়া হলো। শিরা চিরে তাদের রক্ত এম্বঙ্গার শিরার রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে তাদের রক্ত-সম্পর্ক দেওয়া হলো। জেব্রার লেজ মন্ত্রপূত জলে চুবিয়ে ওদের বুকে কপালে ছোঁয়ানো হলো। টারজান যদি জানত যে ওরা বলে এতে সাহস বাড়ে, শত্রুরা কোনো ক্ষতি করতে পারে না, তাহলে নিশ্চয় এক লাফে জেব্রার লেজ আর খানিকটা জল আত্মসাৎ করত।

কেমন যেন জাদু ছিল ঐ জাদুকরের ক্রিয়াকর্মে। যতই দেখে ততই মনে হয় এই তবে God, এরই সঙ্গে দুটো কথা বলতে হবে। গাঁয়ের লোকরা ভয়ে তটস্থ। কোথায় একটা সিংহ ডাকল, তারা সব আঁৎকে উঠল। জাদুকর নিজেও কি একটা ক্রিয়া করতে গিয়ে একটু থমকে থামল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো, এর থেকেও কিছু লাভ হয় কিনা। তিন ছেলের অনুষ্ঠানের জন্য তিনটে পাঁঠা তো পাবেই। তাছাড়া

কিছু শস্য, পুঁতির মালা, খানিকটা তামার তার ভক্তরা আগেই দিয়েছে।

ঠিক এই সময় টারজান গাছ থেকে টুপ করে গ্রামের পথে নেমে পড়ল। নেমেই তীরের মতো সোজা দাঁড়িয়ে জাদুকরের দিকে তাকিয়ে রইল। সকলের চোখ তার উপর, ভয়ে কেউ নড়ছে না। ভয় তো করবেই। এই সাদা অপ-দেবতাই না ওদের বিষাক্ত তীর চুরি করেছে, বিষের হাঁড়ি উল্টেছে, যোদ্ধা মেরে গাছের উপর থেকে ফেলেছে। টারজানের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে মহিষ-মুণ্ড জাদুকরের দিকে এগোল। দিনের বেলা হলে, কিম্বা অন্য সময় হলে হয়তো কয়েকজন লড়াই দিত। আজ জাদুকরের কারচুপিতে আগের থেকেই তারা ভয়ে তটস্থ, এখন আর সইতে না পেরে যে যার ঘরের দিকে ছুটল। খালি জাদুকর তখনকার মতো নড়ল না, নিজের বুজরুকিতে সে নিজেই মুগ্ধ। টারজান বলল, 'তুমিই কি বুলা-মুট্-মুমো?'

কথাগুলোর মানেই বুঝল না বুড়ো। তবু, তিড়িং-বিড়িং করে দু'পাক ঘুরে, পা ফাঁক করে, টারজানের দিকে মাথা বাড়িয়ে দিল। তারপর বোধ হয় ভয় দেখাবার জন্য চেঁচিয়ে বলল- বু-উ!' টারজান একটুও ভয় পেল না। ভগবানের সঙ্গে সে ফয়সালা করতে এসেছে, না করে ছাড়বে না। স্বয়ং God এর সাধ্য ছিল না যে ওকে থামায়। জাদুকর দেখল ছোকরা তো কিছুতেই ভয় পাচ্ছে না। জেব্রার লেজে থুথু দিয়ে, তীর ঘুরিয়ে, সে একটু একটু করে পিছোতে লাগল।

তারপর জেব্রার লেজ দিয়ে শূন্যে একটা কাল্পনিক দাগ কেটে বলল, 'এই দাগ পেরোলেই মরে পড়ে যাবে। আমার মা ডাইনী, বাবা একটা সাপ। আমি সিংহের হৃৎপিণ্ড খাই, প্যান্থারের কলজে চিবোই, ছোট শিশু খেয়ে উপোস ভাঙি। আমি কোনো কিছুকে ডরাই না। আমার মরণ নেই—আমি-আমি!' এই অবধি বলে ঘুরে দে দৌড়!

নির্বিঘ্নে কাল্পনিক দাগ পেরিয়ে টারজান চ্যাঁচাতে লাগল, 'আহা ফিরে এসো, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না।' কিন্তু কে কার কথা শোনে! সোজা নিজের ঘরের দিকে দৌড়। দরজার কাছে টারজান তাকে ধরে ফেলল। এক টানে মোষের চামড়া খুলে দিল। কোথায় বুলা-মুট্-মুমো! টারজান দেখল একটা উলঙ্গ কালো মানুষ ঘরে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। বেজায় রাগ হলো। ঘর থেকে তাকে টেনে চাঁদের আলোয় নিয়ে এলো। প্রথমটা আঁচড়ে-কামড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল। মাথায় দুটো চাঁটি খেয়ে সে পন্থা ছাড়ল ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল বেচারা।

টারজান বলল, 'তুমি নাকি God! তাহলে আমি তার চেয়েও বড়। বনে, আকাশে, পুকুরে, নদীতে, সাগরে, আমার মতো কেউ নেই।' এই সব বলে আস্ফালন করতে লাগল ছেলেটা। জাদুকর ততক্ষণে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। তার ঘাড়ে পা রেখে জয়ধ্বনি দিয়ে, হাত থেকে জেব্রার লেজটি নিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে চলল টারজান। এম্বঙ্গা সব দেখেছিল। জাদুকরের উপর তার খুব আস্থা না থাকলেও, প্রজা শাসনে তার সহযোগিতা কাজে দিত। তাছাড়া যা পাওয়া যেত দু'জনে ভাগ করে নিত। এই অপ-দেবতার কাণ্ড দেখে গাঁয়ের লোকরা যদি বিশ্বাস হারায়, তবে তো মুশকিল! তার চেয়ে লুকিয়ে ওর পিছু নিয়ে ওকে ঘায়েল করলেই আপদ চোকে।

তাই করল এম্বঙ্গা। ভাবল অপদেবতা বুঝি টের পায়নি, তাই দাপটের সঙ্গে চলেছে। কিন্তু টারজানের নাক কান বনের জানোয়ারদের চেয়ে কোনো দিক দিয়ে কম ছিল না। সে ঠিক টের পেয়েছিল কে তার পিছু নিয়েছে এবং কেন নিয়েছে। এম্বঙ্গা যখন এতটা কাছে এসে গেল যে বর্শা ছোঁড়া যায়, এবং বর্শাটি তুলে ধরল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে মাথা নিচু করে টারজানও ঘুরে দাঁড়াল। মাথার উপর দিয়ে বর্শাটা চলে গেল। এম্বঙ্গাও ঘুরে দৌড় মারল। তারস্বরে যোদ্ধাদের ডাকলেও, কেউ সাড়া দিল না। মানুষের সঙ্গে লড়াই হলে সবাই ছুটে আসত, কিন্তু অপদেবতাকে ঘাঁটাতে কেউ রাজি ছিল না। যে যার ঘর থেকে দেখল সাদা অপদেবতা এম্বঙ্গার পিঠে লাফিয়ে পড়ল। ভয়ে চিৎকার করে বুড়ো পড়ে গেল। আত্মরক্ষার এতটুকু চেষ্টা করল না, ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সমানে চ্যাঁচাতে লাগল। টারজান ওকে চিৎ করে ফেলে, ছোরা বের করে গলার কাছে তুলে ধরল। বুড়ো হু-হু করে কেঁদে উঠল।

এই প্রথম টারজান ভালো করে ওর মুখ দেখতে পেল। দেখল সে বড্ড বুড়ো, সুঁটকো গলা, কোঁচকানো গাল, বাঁদরের মতো শুকনো মুখ। বুড়োর চোখে ভয়। এত ভয় টারজান কোন জন্তুর চোখে কখনো দেখেনি। দেখে ওকে এত অসহায়, দুর্বল, ভীতু মনে হচ্ছিল, যে কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব জন্মাচ্ছিল আর সেই সঙ্গে একটা নতুন ভাব। সেটি হলো করুণা। বুড়োর অবস্থা দেখে টারজানের দয়া হচ্ছিল। এম্বঙ্গার কোনো ক্ষতি না করেই সে উঠে

পড়ে গ্রাম পার হয়ে বেড়ার পাশে গাছের ডাল ধরে ঝুলে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বনমানুষদের সভার জায়গায় যাবার পথে নিজের মনের এই নতুন দিকটার কথা কেবলই ভাবছিল। কে যেন ওকে বলে দিয়েছিল বুড়োকে মেরো না। এ এক রহস্য! কার এত ক্ষমতা যে টারজানকে হুকুম করে—এটা কর, কিম্বা কর না? অনেক রাতে বনমানুষদের ডেরায় পৌঁছে গাছের ডালে শুয়েও ঐ কথাই ভাবতে ভাবতে টারজান ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল তখন রোদ উঠে গেছে। বনমানুষরা আগেই উঠে পোকা-মাকড়, পাখির ডিম, ছোট জানোয়ার ধরে খেতে ব্যস্ত। টারজানের মাথার কাছে একটা সুন্দর অর্কিড ফুলের গায়ে রোদ লেগে পাপড়িগুলো একে একে খুলে যাচ্ছিল। এ দৃশ্য টারজান বহুবার দেখেছে, কিন্তু আজ বড় কৌতূহল হলো। এতদিন যা দেখে দেখে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, আজকাল সে-সবকে বড়ই আশ্চর্য লাগে।

কে ফুলটাকে খুলে দিল? কিসের জোরে কুঁড়িটা বড় হয়ে ফুল হলো? কেন এমন হয়? ও নিজেই বা কেন হয়েছে? নুমা কোত্থেকে এলো? প্রথম গাছ কে লাগাল? গোরো কি করে অন্ধকার রাতে আকাশে চড়ে চারদিক আলো করে, বনের ভয়গুলোকে তাড়িয়ে দেয়? কুদ্দুও কি আপনা থেকেই হয়েছে, বনবাসীরা সবাই কেন গাছ নয়? টাউগ, বারা, শীতা, নুমা সবাই আলাদা রকম কেন? এতসব এলো কোথা থেকে?

হঠাৎ মনে পড়ল অভিধানটাতে আছে God সব তৈরি করে, কিছু-না থেকে কিছু বানায়। এই সব ভাবছে, এমন সময় ছোট বাচ্চার কান্না কানে এলো। গলাটা টিকার বালু গাজানের। গাজান মানে লাল-চুল। বালুটার লালচে রং। সঙ্গে সঙ্গে গাজান ভয়ে চিৎকার করে উঠল। টিকার গলাও শোনা গেল। নিশ্চয় বালুটার কোনো বিপদ হয়েছে টিকার স্বরে ভয় আর রাগ।

চারদিক থেকে দলের বনমানুষরা ছুটে আসতে লাগল। ডাল থেকে ডালে ঝুলে সবার আগে গাজানের কাছে পৌঁছে টারজান দেখল, কি সর্বনাশ, গাছে জড়িয়ে আছে হিস্তা সাপ। তার মস্ত শরীরের পাকের মধ্যে খুদে গাজান। সাপকে বনের সকলে বড় ভয় করে, বিশেষ করে টিকা। আজ কিন্তু টারজান অবাক হয়ে দেখল, টিকা এসেই সাপের গায়ে লাফিয়ে পড়ল। সাপটা অমনি ওকে সুদ্ধ জড়িয়ে নিল। পালাবার কোনো চেষ্টা না করেই, টিকা তার বালুকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। টারজান তো অবাক! সে নিজে কখনো সাপের গায়ে হাত দেয়নি। তবু আর সময় নষ্ট না করে, সেও সাপটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাপ তাকেও পাক দিয়ে ধরে, চাপ দিতে লাগল। টারজান ততক্ষণে ছোরা বের করে বারবার সাপটাকে কোপ দিতে আরম্ভ করেছিল। নিজের প্রাণ বাঁচানোর কথা ওর একবারও

মনে হয়নি। ওর একমাত্র চিন্তা ছিল টিকাকে আর তার বালুকে বাঁচাতে হবে। হিস্তা এত বড় হাঁ করে টারজানকে গিলতে চেষ্টা করছিল। তাতে ওর মাথাটা টারজানের নাগালের মধ্যে এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সাপের গলা চেপে ধরে টারজান তার ছোরাটার হাতল পর্যন্ত সাপের খুদে মগজে বসিয়ে দিল।

সাপের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল, পাক ঢিলা হলো, আবার এঁটে গেল, আবার ঢিলা হলো। সাপটা মরে গিয়েছিল, কিন্তু গায়ের মাংসপেশীগুলো মোচড় খাচ্ছিল। ঢিল দিতেই টারজান টিকাকে পাক থেকে টেনে বের করে মাটিতে ফেলল, তারপর বালুটাকে ওর কোলে দিল, শেষে অনেক চেষ্টা করে নিজেও ছাড়া পেয়ে নেমে পড়ল। মরা শরীরটা তখনো পাক খাচ্ছিল।

একদল বনমানুষ সমস্ত ব্যাপারটা দেখে, নিশ্চিন্ত মনে আবার খাবারের চেষ্টায় মন দিল। আশ্চর্যের বিষয় এবার আর টারজান জয়ধ্বনি দিল না। পুকুর পাড়ে

গিয়ে অনেকখানি জল খেয়ে, ঘাসের উপর শুয়ে ভাবতে লাগল যে এই বড় আশ্চর্য ব্যাপার, টিকা কেন বিশ্রী সাপটার কাছে ধরা দিল। ও নিজেই বা কেন দিল ? টিকার কিম্বা তার বালুর সঙ্গে ওর কি ? ওরা তো টাউগের পরিবার। ও নিজে তো আর সাপ খায় না যে মারবে। তবু কেন মারল ? হঠাৎ মনে হল যে-জন্য এম্বঙ্গাকে কাল ছেড়ে দিয়েছিল, সে-জন্যই আজ সে সাপ মেরেছে। মনে হলো ওর চেয়েও জোরালো কেউ ওকে এই সব কাজ করায়। বইতে আছে God এত শক্তিশালী যে সে সব করতে পারে। এ তার-ই কাজ। তাকে দেখতে পাই না, কিন্তু সে ছাড়া কে এ-সব করবে ? কোনো মানগানি, গোমানগানি, কি টারমান-গানির সে সাধ্য নেই।

সব কিছু এবার বোঝা গেল। ফুলকে কে ফোটায় ? সব কিছু বুলা-মুট্-মুমো কিচ্ছু-না থেকে তৈরি করেছে। সে কি, সে কেমন দেখতে, তা না জানলেও, এটুকু বোঝা গেল যে যা কিছু ভালো, সে সবই সে দিয়েছে। অসহায় বুড়োটাকে বাঁচতে দেওয়া, টিকার নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে তার ভালোবাসার বালুটাকে বাঁচাবার চেষ্টা—সবই তার কাজ। কি সুন্দর সব ফুল আর গাছপালা। গড্ তাদের বানিয়েছে। সব জন্তু-জানোয়ারও তার তৈরি।

এবার টারজান বুলা-মুট্-মুমোকে সত্যি খুঁজে পেল। সারা দিন ধরে, যা কিছু সুন্দর আর ভালো, সব তার দেওয়া বলে চিনল। খালি মনে একটা খট্‌কা লেগে রইল। ঐ হিস্তা সাপটাকে কে বানাল ?

●

গাছতলায় বসে টারজান একটা মোটা ঘাসের দড়ি পাকাচ্ছিল। আগেরটা শীতা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। এ দড়িটা এমনি মজবুত হবে যে নুমা পর্যন্ত ছিঁড়তে পারবে না। হাত আর মাথা দুই-ই কাজ করছিল, তাই টারজান মহা খুশি। দলের অন্যরাও খুশি মনে পোকা-মাকড় খুঁজে খাচ্ছিল। ওরা কোনো জিনিস বেশিক্ষণ মনে রাখতে পারত না, পেট ভরা থাকলেই খুশি।

টারজানের কাছে টিকার বালু গাজান খেলে বেড়াচ্ছিল। টিকা একটু দূরে খাবার খুঁজছিল। ঐ সাপের ব্যাপারের পর ওরা আর টারজানকে সন্দেহের চোখে দেখত না। টারজানেরও টিকার বালুর মজার কাণ্ড দেখতে ভালো লাগত। এখন বালুটা গাছে চড়া অভ্যাস করছিল। এ বিদ্যাটি ভালো ভাবে রপ্ত না করলে, বনের হিংস্র জানোয়ারদের মাঝখানে বনমানুষের ছানার বাঁচার উপায় থাকে না। মাঝে মাঝে পোকা-মাকড় দেখলে গাজান তাও ধরবার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ টারজানের নতুন দড়িটার উপর চোখ পড়ল। অমনি দড়ির অন্য মাথাটা তুলে নিয়ে সটাং তার মায়ের দিকে দে দৌড়! টারজানও ধর-ধর করে তাড়া করে এলো। টিকা মুখ তুলে দেখে কে যেন তার আদরের বালুকে তাড়া করেছে। কিন্তু যেই দেখল সে টারজান, অমনি নিশ্চিন্ত হয়ে পোকা ধরতে লাগল। গাজানের হাত থেকে দড়ি উদ্ধার করে, শেষ পর্যন্ত সেটাকে তৈরি করা গেল। খুদে গাজান পুরানো দড়িটা নিয়ে নেচে বেড়াতে লাগল।

টারজান গাজানকে সত্যি ভালোবাসত আর গাজানও টাউগের চেয়ে টারজানকে বেশি পছন্দ করত। তবু ভয় পেলে, কিম্বা কিছু দরকার হলে, আগে টিকাকে খুঁজত। তাতে টারজানের ভারি দুঃখ হতো ; সে ভাবত তার নিজের একটা বালু থাকলে বেশ হতো। কিন্তু কতক্ষণ আর মন খারাপ করা যায়। শিকারের গন্ধ পেলে টারজান সব দুঃখ ভুলে যেত। আজ দেখল বদ্‌মেজাজি বুনো শুয়োর হর্টা এগিয়ে আসছে। অন্য জন্তুরা পারলে ওকে এড়িয়ে যেত। কিন্তু টারজানের কাছে খাবার জিনিস হলো খাবার জিনিস এবং হর্টার মাংস বড়ই সুস্বাদু। অতএব নতুন দড়ির ফাঁসটা হর্টার গলায় পড়ল। দড়ির জোর পরখ করবার এমন সুযোগই বা সে কোথায় পাবে ?

ফাঁস লাগাতে শুয়োরটা ছুটোছুটি করতে লাগল। দড়ির অন্য মাথা গাছের ডালে বেঁধে, ছোরা হাতে টারজান গাছ থেকে নেমে এলো। অমনি চোখ লাল করে হর্টাও ঘুরে দাঁড়াল। তারপর তেড়ে এলো। টারজান সামান্য একটু সরে গিয়ে নিচু হয়ে বাপের ছোরাটা গায়ের জোরে হর্টার বুকে বসিয়ে দিল। পরে পেট ভরে মাংস খেয়ে, আজ কিন্তু একটা আরামের জায়গা খুঁজে নিয়ে, সেখানে ঘুম লাগাল না। এম্বঙ্গার গ্রামের দিকে চলল।

তার কাছেই একটা নদী। তারই পাশে নিগ্রোদের ছোট ছোট কুঁড়ে। নদীর জীবনযাত্রা দেখতে ওর মজা লাগত। ডুরো হিপ্পো গিমলা কুমিরকে কেমন জ্বালাতন করত। কালোদের বৌরা কাপড় কাচতে আসত, সঙ্গে থাকত তাদের বালুরা। আজ গাছে বসে বসে এক অল্পবয়সী বৌকে দেখতে পেল। তার ছুঁচল দাঁত দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ওরা নরখাদক। ঠোঁট চিরে তামার গয়না পরেছে ; নাক বিঁধিয়ে একটা কাঠি পরেছে। বিকট

দেখাচ্ছে। সঙ্গে তার দশ বছরের ছেলে। কালো হলেও ছেলেটা দেখতে ভালো। এই তো বেশ বালু পাওয়া গেল। এটাকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দাইয়ে, আদর-যত্ন করে, নানা রকম শিক্ষা দিয়ে, মানুষ করা যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসটাকে ছুঁড়ে দিল টারজান। সেটা ছেলেটার গায়ের চারদিকে এঁটে বসল, হাত দুটোও বাঁধা পড়ল। দড়ি টেনে ছেলেটাকে কাছে আনতে লাগল টারজান। সে তো ভয়ে বিকট চেঁচিয়ে উঠল। ওর মা দেখল সাদা দৈত্য তার ছেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, অমনি রাগে ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে সে তেড়ে এলো। মনে হলো মৃত্যুকেও সে তুচ্ছ জ্ঞান করে। টপ করে ছেলেটাকে গাছের ডালে তুলে বগলে পুরে, টারজান বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছু দূর এগোলেই মায়ের চ্যাঁচামেচি আর শোনা গেল না। ছেলেটা আগে খুব ছটফট কান্নাকাটি করছিল। এখন ভয়ে একেবারে চুপ। টারজান তাকে বারবার সাহস দিতে লাগল, 'তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি টারজানের বালু। সে তোমাকে খাওয়াবে, রক্ষা করবে।' ছেলেটা বনমানুষের ভাষা বুঝল না, আর সাদা দৈত্যটার বিষয় এত ভয়াবহ সব গল্প শুনেছিল যে এতটুকু ভরসাও পেল না। ভয়ে বেচারা ঠকঠক করে কাঁপছিল। তার নাম টিবো। টারজান ডাকছিল গো-বু-বালু বলে। তার মানে ছেলে-বালু। ওর কাঁপুনি দেখে টারজান বলল, 'রোদটা এত গরম, তবু কি তোমার শীত করছে?' টিবো কিছুই বুঝল না, খালি মায়ের জন্য কাঁদতে লাগল আর বলতে লাগল ওকে ছেড়ে দিতে, ও লক্ষ্মী ছেলে হবে। টারজানও ওর কথা না বুঝে, ওকে বনমানুষদের ডেরায় নিয়ে গেল। ঐ সব হোঁৎকা হোঁৎকা বিকটাকার জানোয়ার দেখে টিবো তো আধমরা! বনমানুষরাও তাদের জাতশত্রুর ছানা দেখে কিচ্ছু খুশি হলো না। গুমটো হল টারজানের বন্ধু; তারই সবচেয়ে বেশি কৌতূহল, 'এটা তো গোমানগানি। দাও, মেরে ফেলি।'

টারজান দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'ভাগো বলছি, ওটা টারজানের বালু।'

টিকা এলো, তার সঙ্গে লাফাতে লাফাতে গাজান এলো। টারজান বলল, 'এ হলো টারজানের বালু। ও গাজানের সঙ্গে খেলা করতে পারবে।'

টিকা বলল, 'গোমানগানি যে! যদি গাজানকে মেরে ফেলে?'

টারজান বলল, 'বলছি ও আমার বালু। কাউকে কিছু বলবে না।'

টিবোরও গাজানের সঙ্গে ভাব করবার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না।

মহা অসুবিধায় এক সপ্তাহ কাটল। সারাক্ষণ নতুন বালুটাকে আগলে বেড়াতে হতো। তবে সুখের বিষয় টিবো ওদের ভাষা একটু একটু শিখে ফেলল। কিন্তু সে কখনো হাসত না। তাই দেখে টারজানেরও মহা ভাবনা। খেতও না কিছু। দিনে দিনে রোগা হয়ে যেতে লাগল। কত আদর করে সাহস দেবার চেষ্টা করত টারজান, কালা যেমন ওকে করত। আর কি যে করবে ভেবে পেতো না। তাছাড়া ছেলেটার কালো মা ওকে যত ভালোবাসে, টিকা যেমন গাজানকে বাসে, টারজান তো ততটা পারত না। টিবো এখন আর টারজানকে ভয় করত না। ওর গায়ের জোর আর শিকারে দক্ষতা দেখে বরং ভারি শ্রদ্ধা করত। এই সময়ে সমস্যাটা আপনা থেকেই মিটে গেল।

টিবোর মা মোমায়া গাঁয়ের জাদুকরকে দুটো পাঁঠা দিলেও, সে ছেলে ফিরিয়ে এনে নিতে পারল না। তারপর যখন আরো দুটো পাঁঠা চেয়ে বসল, মোমায়া এমনি গাল দিল যে বুড়ো তার বিষের ভাঁড় আর জেব্রার লেজ নিয়ে পালাল। তারপর মোমায়ার মনে হলো সাদা দৈত্য তো মানুষ খায় না। যাদের মেরে ফেলে তাদের মৃতদেহ গ্রামে ফেলে দিয়ে যায়। তাহলে নিশ্চয় টিবো বেঁচে আছে। তাকে খুঁজে আনতে হবে। এ গ্রামের জাদুকর কোনো কম্মের না হলেও, উত্তর দিকে বনের গুহায় অপবিত্র বুকাওয়াই থাকে। সে অনেক মন্ত্র জানে। তার সাহায্য নিলে কাজ দিতে পারে। তার তো ভূত আর দেবতাদের সঙ্গে সমান ভাব। কিন্তু এই ঘন জঙ্গল পার হয়ে একা দূরে পাহাড়ের গুহায় যেতে হবে।

গাঁয়ের এক যোদ্ধা গুহাটা কোথায় তা জানত। সে বলল, দুটো পাহাড়ের মধ্যিখানে একটা পাথুরে জায়গা; সেখানে একটা জলের উৎস। পাহাড় চেনা শক্ত নয়। একটার উপরে মস্ত এক গ্র্যানাইটের চাংড়া। অন্য পাহাড়টা একেবারে ন্যাড়া, তার চূড়োর নিচে একটিমাত্র মিমজা গাছ। দূর থেকে পাহাড় দুটো দেখেই চেনা যায়। ওরই কাছে গুহাটা। তবে বুকাওয়াই যদি বা ওর অনিষ্ট না করে, বনের জন্তুদের বিশ্বাস নেই।

ঐ যোদ্ধা গিয়ে মোমায়ার স্বামীকে বলল যে কাজটা ভালো হচ্ছে না। স্বামী বড় ভালো মানুষ, মোমায়া তার কথা শোনে না। সে গেল এম্বঙ্গার কাছে। এম্বঙ্গা মোমায়াকে

ডেকে বলল—'খবরদার যাবে না গেলে ভয়ংকর সাজা দেব।' গাঁয়ের জাদুকরকে চটাবার ইচ্ছা তার ছিল না। তাছাড়া ওর সাহায্যে ছেলে ফিরে পেলে মোমায়া যা দেবে, তার ভাগও পাওয়া যাবে না।

অত সহজে মোমায়ার মত বদলায়নি। দিনে না বেরিয়ে সে রাতে বেরোল। ফটক বন্ধ হবার একটু আগে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ল, সঙ্গে একটা অস্ত্র, কিছু খাবার-দাবার নিয়ে গেল। ভয়ে প্রাণ উড়ে যাচ্ছিল, তবু বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ ডান পাশ থেকে একটা চাপা গোঙানি আর থাবার শব্দ শুনে থমকে থেমে, চারদিকে লতাজড়ানো বড় বড় গাছের একটাতে এক লাফে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট গর্জন, একটা ভারি শরীরের ঝাঁপ। ভাগ্যিস গাছে উঠে গেছিল। আর ওর বাপের গাঁয়ের জাদুকরের দেওয়া মানুষের শুকনো কানটা গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিল, তাই এযাত্রা রক্ষা পেল। তবে সারারাত আর নামবার সাহস পেল না। ভোরে নেমে আবার হাঁটা দিল।

এদিকে টারজান যখন দেখল বালুটা বনমানুষদের বড্ড ভয় করে, তখন তাকে নিয়ে দূরে দূরে শিকার করা ধরল। ক্রমে আরো দূরে যেতে লাগল, আরো উত্তরে। সেখানে জল, ফল, ভালো শিকার পাওয়া যায়। বনমানুষদের ডেরায় রোজ ফেরার দরকার নেই। টিবো এখনো বিমর্ষ হয়ে থাকলেও, আগের মতো মনমরা নয়। কিন্তু বড়ই রোগা হয়ে যাচ্ছিল। গাল বসা, চোখ দুটোকে এই বড় বড় মনে হত। টারজান হতাশ হয়ে উঠেছিল। তবে আজকাল টিবো বনমানুষদের অনেক কথা শিখে গেছিল। টারজানের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা চালাতে পারত। কিন্তু অনেক সময়ই চুপ করে থাকত।

একবার একটা সিংহীকে দেখেছিল ওরা। তার চার

পাশে দুটো বাচ্চা খেলে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু সেদিকে তার চোখ নেই। সে বিষণ্ণভাবে একটা মরা বাচ্চার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। তাহলে টিবোর মায়েরও না জানি কেমন লাগছে। কেউ যদি টিকার কাছ থেকে গাজানকে কেড়ে নিয়ে যায়, তার কেমন লাগবে?

এদিকে তৃতীয় দিন দুপুরে মোমায়া বুকাওয়াইর গুহা দেখতে পেল। সামনে গাছের ডাল দিয়ে তৈরি একটা দরজার মতো, যাতে বুনো জানোয়ার ঢুকতে না পারে। কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। মোমায়া শিউরে উঠল। মনে হল অদৃশ্য চোখ ওকে দেখছে। একটা বিশ্রী হাসিও কানে এল। মোমায়া পিছন ফিরে দৌড় দিল। একশো গজ দৌড়ে গিয়ে, থেমে ভয় দূর করবার চেষ্টা করল। এরই জন্য কি এত কষ্ট করে এত দূরে এসেছে? বার দুই চেষ্টা করে মনমরা হয়ে আবার সে গাঁয়ের পথ ধরল। মনে হচ্ছিল যেন তার বয়সটা কত বেড়ে গেছে। হঠাৎ টিবোর ছোট-বেলার কথা মনে পড়াতে, কোথা থেকে সাহস সঞ্চয় করে, ফিরে গিয়ে বুকাওয়াইয়ের গুহার সামনে দাঁড়াল, আবার সেই বিশ্রী হাসি কানে এল। এতো হায়নার হাসি।

বর্শা কাঁধে তুলে মোমায়া ডাকল, 'বুকাওয়াই, বেরিয়ে এসো।'

উত্তর এল, 'কে বুকাওয়াইকে ডাকে?'

—'আমি এমবঙ্গার গাঁয়ের মোমায়া।'

— কি চাও?'

—'সাদা দৈত্য আমার ছেলে টিবোকে চুরি করে নিয়ে গেছে। মন্ত্র পড়ে তাকে ফিরিয়ে আনো। নয়তো বলে দাও কোথায় গেলে তাকে পাব।'

'বুকাওয়াইয়ের ওষুধ খুব কড়া। পাঁচটা পাঁঠা আর একটা মাদুর দিতে হবে।'

মোমায়া বলল 'দুটো পাঁঠাই যথেষ্ট।'

দরদস্তুর করার আনন্দে বুকাওয়াই গুহার মুখের কাছে বেরিয়ে এল। কি বিকট চেহারা। মুখে কুষ্ঠ, সঙ্গে দুটো হায়না, পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য জানোয়ার। এরা ভিতরে থাকলেই ভালো হত।

বুকাওয়াই বিড়বিড় করে বলল, 'পাঁচটা পাঁঠা, একটা নতুন মাদুর।'

মোমায়া বলল 'দুটো পুরুষ্টু পাঁঠা, একটা নতুন মাদুর।'

অনেক দরাদরি করে তিনটে পাঁঠা আর একটা নতুন মাদুরে রফা হল। বুকাওয়াই বলল, 'আজ রাতে চাঁদ উঠবার দু ঘণ্টা পরে এসো। টিবোকে ফিরিয়ে আনার ওষুধ করে দেব। সঙ্গে তিনটে পুরুষ্টু পাঁঠা, একটা নতুন মাদুর, একটু

তামার তার এনো।'

মোমায়া বলল, 'আমি কি করে আনব? তুমি এসে নিয়ে যেও। টিবোকে ফিরিয়ে আনলে, সব পাবে।' বুকাওয়াই মাথা নাড়ল, 'ওসব আগে দাও, তারপর ওষুধ করব।'

কিছুতেই তার কথার নড়চড় হল না। মোমায়া আবার বাড়ির পথ ধরল। যেমন করেই হোক, জিনিসগুলো যোগাড় করতে হবে। টিবোকে ফিরে পেতেই হবে।

এদিকে বনের মধ্যে দিয়ে টিবোকে নিয়ে টারজান শিকারে চলেছিল। নাকে এল বারা হরিণের গন্ধ। তার মাংস বড় মিষ্টি। কিন্তু বালুকে নিয়ে শিকার করা যায় না। তাই টিবোকে একটা গাছের ফ্যাকড়া ডালে বসিয়ে, টারজান শিকারের পিছু নিল। একা একা টিবোর ভয় করতে লাগল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কি একটা আসছিল। যদি চিতাবাঘ হয়? টিবোর বড় বড় চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ঝোপঝাড় সরিয়ে ও কে এগিয়ে আসছে? ঝোপঝাড় সরে গেল, একজন মেয়ে দেখা দিল। অস্পষ্ট শব্দ করে গাছ থেকে নেমে টিবো তার দিকে ছুটল। 'মা, মা।' মোমায়া বর্শা তুলেছিল, ওকে দেখেই সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টিবোর রোগা শরীরটা বুকে জড়িয়ে ধরল। দুজনার চোখের জলে বুক ভেসে গেল।

নুমা কাছেই ঘুমোচ্ছিল। শব্দ শুনে জেগেই দেখে বাঃ! দুটো মানুষ! নুমার জিবে জল এল। একটু দৌড়ে একটা লাফ দিলেই হল! নুমার গন্ধ টারজানের নাকেও গিয়েছিল। সে অমনি চমকে উঠল। সেই সুযোগে বারা পালাল। নিঃশব্দে বালুটার কাছে ফিরে চলল টারজান। কিছু দেখার আগেই কানে এল কোন মেয়ে একসঙ্গে হাসছে কাঁদছে, সেই সঙ্গে ছোট ছেলের কান্না।

টারজান বাতাসের বেগে ছুটে চলল, বর্শা বাগিয়ে ধরে। ধীরে সুস্থে নুমা এগোচ্ছিল। হঠাৎ ওর ওপর মোমায়ার চোখ পড়তেই, টিবোকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করল। তারপর বর্শা তুলে ছুঁড়ে দিল। নুমার গা ঘষটে চলে গেল বর্শাটা। নুমা রেগে লাফ দিতেই, মোমায়া চোখ বুজবার চেষ্টা করল, পারল না। ঠিক সেই সময়, গাছ থেকে নুমার সামনে সাদা দৈত্যটা নামল। তার হাতে শিকারীর ভারি বর্শা। অমনি সেটাকে ছুঁড়ে দিল। লাফের মধ্যিখানে সেটা নুমার গায়ে বিঁধে গেল। নুমা বসে পড়ে থাবার বাড়ি দিয়ে বর্শাটাকে বেঁকিয়ে ফেলল। সাদা দৈত্য ছোরা হাতে গুঁড়ি মেরে নুমার চারদিকে ঘুরছিল। নুমা দৈত্যটার দিকে তেড়ে গেল, দুবার ছোরার কোপ খেল। শেষ পর্যন্ত নুমার শিরদাঁড়ায় কোপ লাগাতে, অবশ হয়ে সে এলিয়ে পড়ল। প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

বুকাওয়াইও মোমায়ার পিছন পিছন আসছিল। শেষ পর্যন্ত জিনিসগুলো যদি আদায় করতে না পারে। অন্ততঃ মোমায়ার নিজের গায়ের কিছু গয়না তো পাওয়া যেতে পারে। সিংহের সঙ্গে টারজানের লড়াই বুকাওয়াই দেখেছিল। এই তাহলে সেই সাদা দৈত্য। এদিকে মোমায়ার বড় ভয়, দৈত্যটা আবার যদি টিবোকে নিয়ে যায়! তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। টারজান ওদের দিকে চেয়ে ভাবছিল, ওকে এত ভালোবাসবার কেউ নেই। সেই এক কালা ছিল।

টিবো মুখ তুলে টারজানকে দেখে একটুও ঘাবড়াল না। বনমানুষদের ভাষায় বলল, 'টারজান, মায়ের কাছ থেকে আমাকে আবার নিয়ে যেও না। ঐ লোমশ লোকগুলোকে আমি বড় ভয় পাই। তুমি জঙ্গলের দেবতা, আমাকে মায়ের কাছে থাকতে দাও। তোমার জন্য রোজ আমরা খাবার রাখব।'

টারজান বলল, 'যাও, নিজেদের গ্রামে ফিরে যাও। আমি কাছে কাছেই আছি, যাতে তোমাদের কোন বিপদ না হয়।'

বুকাওয়াইও ওদের যেতে দেখে, বিড়বিড় করে বলল, 'যেমন করে হোক ঐ তিনটে পুরুষ্টু পাঁঠা, নতুন মাদুর আর তামার তার আদায় করবই।'

●

ইংল্যাণ্ডে সেদিন যাঁকে লোকে লর্ড গ্রেস্টোক বলে জানত, তিনি ফেজাণ্ট শিকার করছিলেন। খুব যে দক্ষ শিকারী ছিলেন, তাও নয়। সেই জন্য সামনের দিকে থাকতেন। দক্ষতার অভাব সাজসজ্জায় পুষিয়ে নিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল দুটো বন্দুক, একটি ভালো লোডার। বলা বাহুল্য, বহু পাখি পড়েছিল। খুব যদি খিদে পেত, তবু অত পাখি তিনি এক বছরেও খেয়ে শেষ করতে পারতেন না।

তাছাড়া ছিল তেইশজন বীটার, সাদা পোষাক পরে তারা পাখি ওড়াত। পাখি মারায় দারুণ উত্তেজনা তাতে সন্দেহ নেই। লর্ড গ্রেস্টোকের মনে হত তিনি এ-সময় টের পান যে তাঁর শিরায় আদিম মানুষদের রক্ত বইছে।

আসল লর্ড গ্রেস্টোকও অনেক দূরে আফ্রিকার ঘন বনে শিকার করছিলেন। দিনটা বড় গরম বলে পরণের হরিণের চামড়াটাও খুলে রেখেছিলেন। দুটো কেন, একটাও বন্দুক

ছিল না, তেইশজন সাদা পোষাক পরা বীটারও ছিল না। তার বদলে ছিল প্রচণ্ড খিদে, বন-জঙ্গল বিষয়ে এন্তার জ্ঞান, আর শরীরে স্টীলের স্প্রিং-এর মতো মাংসপেশী।

শিকারের পর ইংল্যাণ্ডের লর্ড গ্রেস্টোক পেট ভরে যা খেলেন, তার একটাও নিজে মারেননি। পানও করলেন প্রচুর। শেষে ধবধবে সাদা ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে ফেললেন। আফ্রিকার আসল লর্ড গ্রেস্টোক সদ্য-মারা হরিণের কাঁচা মাংস খেয়ে, নিজের উরুতে হাত মুছে, বনের মাঝখানের জলাশয়ে গেলেন তেষ্টা মেটাতে। জল খেতে খেতে নুমার গর্জন কানে এল। নুমা হল বিরাট সিংহ, তার কালো মাথা, সোনালী গা। সে হল বনের রাজা। জল খেতে এসে দেখে তার জল খাবার জায়গায় একটা মানুষ! নুমা একটা চাপা গর্জন দিয়ে আস্তে আস্তে এগোল। মানুষটাও উল্টে চাপা গর্জন দিয়ে, জল খাওয়া শেষ করে, নুমার ল্যাজের দিকে চেয়ে পিছন দিকে সরে গেল। ল্যাজ যদি এ-ধার ও-ধার করে, তাহলে একটু সাবধান হলেই চলবে। যদি খাড়া হয়ে ওঠে, হয় লড়াই দিতে হবে, নয় ভাগতে হবে।

কিন্তু আজ আর লড়াই হল না। নুমা একটু দূরে জল খেতে বসল। টারজান এম্বঙ্গার গ্রামের দিকে চলল।

সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌঁছে গাছের ডালে নিজের জায়গা নিল। টিবো ফিরে আসার পর সে আর এদিকে আসেনি। গ্রামের একটা ঘর থেকে কান্নাকাটি শোনা যাচ্ছিল। টারজানের খুব খারাপ লাগল। ঘণ্টা দুই চলল কান্না। তার মধ্যে টারজান একবার বনে ঘুরেও এল। তব কান্না থামেনি দেখে নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে অন্য ঘরের আড়াল দিয়ে সেই ঘরটার কাছে গিয়ে দেখল ঘরের সামনে আগুন জ্বলছে, যেমন অন্য সব ঘরের সামনেই জ্বলছে। ঘরের মধ্যে এক নম্বর কাঁদিয়ের গলার সঙ্গে বাইরে বসে দু-চারজন মেয়ে গলা মেলাচ্ছে

টারজান ভাবল ঝপ করে ভিতরে ঢুকে, গলা টিপে ঐ কাঁদুনের কান্না বন্ধ করে, কেউ কিছু করবার আগেই বনে কেটে পড়লে হয়। সবে ভাবছে এবার ঘরে ঢুকবে এমন সময় আগুনের আলোয় দেখতে পেল যে কাঁদছে সে তো মোমায়া। ওকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে মোমায়া ওর পায়ে পড়ল। হাত জোড় করে কি যে কাকুতি করতে লাগল, টারজান তার এক বর্ণ বুঝল না! কি আর করে? সেখান থেকে বনে সরে পড়ল। সকালে বনে হরটার পায়ের চিহ্ন দেখে খানিকটা এগোতেই, আরো দু-জোড়া পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। এক জোড়া বড়, এক জোড়া ছোট। সঙ্গে সঙ্গে দুটো জানোয়ারের থাবার দাগ। যার ছোট পা সে জানোয়ার দুটোর ভয়ে সরে সরে থাকার চেষ্টা করছিল। যার বড় পা সে বুড়ো আর তার মনে ভয়টয় ছিল না। এরা আগের দিন এ-পথে গেছে। বুড়ো, ছোট ছেলে দুটো হায়না

টারজান থমকে দাঁড়াল, গো-বু-বালু! হঠাৎ সব পরিষ্কার হয়ে গেল। গো-বু-বালুকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে নিশ্চয়। ওর মা ভাবছে টারজান নিয়েছে। তাই পায়ে ধরে বলছিল ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু হায়না দুটো এর মধ্যে কি করে এল? দেখতে হবে তো। উত্তর দিকে গেছে ওরা পাথুরে মাটিতে স্পষ্ট করে পায়ের ছাপ চেনা যায়। তার ওপর অনেক জন্তুর চিহ্নও পড়েছে।

আসল ব্যাপার হল, বুকাওয়াই এসে নদীর ধারে লুকিয়ে ছিল। ওখানে মোমায়া রোজ ছেলে নিয়ে স্নান করতে আসত। সেদিন বুকাওয়াই ঝোপ থেকে বেরিয়ে বলল, 'আমার তিনটে পুরুষ্টু পাঁঠা, একটা নতুন মাদুর আর এক হাত তামার তার নিতে এসেছি।'

মোমায়া বলেছিল, 'কিচ্ছু দেব না। তুমি মোটেই আমার ছেলে ফিরিয়ে আনো নি। এনেছে সাদা বনদেবতা।'

বুকাওয়াই বলল, 'আমিই তাকে পাঠিয়েছিলাম।'

মোমায়া বলল, 'মিথ্যাবাদী! কিচ্ছু পাবে না। চলে যাও।' এই বলে তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফিরে গেছিল। পরদিন মোমায়া কলার ক্ষেতে কাজ করছিল, টিবো জঙ্গলের ধারে খেলা করছিল একটা ছোট্ট বর্শা নিয়ে। বর্শাটা ঝোপের পিছনে পড়েছিল টিবো সেটা কুড়িয়ে আনতে যেতেই দেখে বুকাওয়াই আর তার হায়না দুটো। অমনি বুড়ো ওর মুখ চেপে ধরে, অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। দুপাশে দুই হায়না চলেছিল। ওর সঙ্গে কোনো কথা বলেনি বুড়ো। বিড়বিড় করে বারবার বলছিল, 'দশটা পুরুষ্টু পাঁঠা।' টিবো বুঝতে পারল তাই দিলে সে ওকে ছেড়ে দেবে! কোথায় পাবে অত পাঁঠা মা বেচারি! হাঁটতে হাঁটতে টিবো আর পারছিল না। খালি খালি আছাড় খাচ্ছিল। বুড়ো টেনে তুলে কীল চড় মেরে, আবার হাঁটাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পরে ওরা একটা গুহার মুখে পৌঁছল। সরু একটা খাঁজ। কয়েকটা ডালপালা বেঁধে দরজা তৈরি হয়েছে। টিবোকে সুড়ঙ্গের মধ্যে হেঁচড়ে নিয়ে চলল বুড়ো। আঁকাবাঁকা অন্ধকার পথ। দূরে একটু আলো দেখা গেল। পাহাড়ের ভিতরে একটা গোল গুহা, তার ছাদে একটা ফাটল

দিয়ে আলো ঢুকছে। হায়না দুটো কখনো টিবোর দিকে, কখনো বুড়োর দিকে তেড়ে আসছিল। বুড়ো লাঠিপেটা করে তাদের ঠেকাচ্ছিল।

খানিক বাদে বুকাওয়াই টিবোকে বলল, 'তুমি এখানে থাকো। হায়না দুটো সুড়ঙ্গে থাকবে। তুমি পালাবার চেষ্টা করলে, ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। আমি তোমার মায়ের কাছ থেকে আগে আমার পাওনা জিনিস আদায় করে আনি।'

বুড়ো চলে গেল। হায়নারা সুড়ঙ্গে ছাড়া রইল! সুড়ঙ্গের মুখে ভারি শিক বসানো দরজা বুড়ো বন্ধ করে দিয়ে গেল। হায়নারা যাতে ভিতরে ঢুকতে না পারে। টিবো মাটিতে শুয়ে কেঁদে ভাসাতে লাগল। ঘরে আরেকটা সুড়ঙ্গের মুখও দেখা যাচ্ছিল। খুব সরু, ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভয়ে টিবো তাতে ঢুকল না। সারা রাত হায়নারা দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করল। ভোরে দরজাটা নড়বড় করতে লাগল।

এদিকে বুকাওয়াই মোমায়াকে গিয়ে বলল, 'কি যে বল! আমি তোমার ছেলে নেব কেন? ঐ সাদা দৈত্য আগেও নিয়েছিল, এবারো নিশ্চয় নিয়েছে। আমাকে দশটা মোটা পাঁঠা দিলে ওষুধ করে, ছেলে ফিরিয়ে দিতে পারি।'

মোমায়া তো হাঁ! দশটা পাঁঠা সে কোথায় পাবে? সে বলল, 'দশটা কোনো জন্মে দিতে পারব না। দেখি টিবোর বাবা কি বলে, তার তিনটে পাঁঠা আছে।'

বুকাওয়াই একটা গাছতালায় বসে রইল। তার মুখভরা কুষ্ঠ, কেউ তাকে ছোঁবে না জানত। তাছাড়া ওর জাদুবিদ্যাকেও এরা ভয় করে। মোমায়ার সঙ্গে এম্‌বঙ্গা, গাঁয়ের জাদুকর রাবা কেগা আর টিবোর বাপ ইবেটো এসে গোল হয়ে বসল।

এম্‌বঙ্গা বলল, 'ইবেটোর ছেলেটা কোথায়?'

বুকাওয়াই যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'সে আমি কি জানি! নিশ্চয় সাদা অপদেবতা ওকে নিয়েছে। যথেষ্ট দাম দিলে আমি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি, গতবার যেমন ওষুধ করে এনেছিলাম।'

এম্‌বঙ্গা বলল, 'আমাদের নিজেদের জাদুকরই তো ওষুধ করতে জানে।'

বুকাওয়াই উঠে দাঁড়াল, 'বেশ তো। তাই আনুক। তবে জ্যান্ত আনতে পারবে না। আমার পিসির ভূত এইমাত্র বলে গেছে। একটু ঘাবড়ে গেলেও এম্‌বঙ্গা বলল, 'বেশ তো, আগে তোমার জাদুর কিছু নমুনা দেখি, তারপর দামের কথা হবে। রাবা কেগাও কিছু দেখাবে। তবেই বুঝব কে বেশি ওস্তাদ।'

বুকাওয়াই বলল, 'দশটা মোটা পাঁঠা, একটা নতুন মাদুর আর একটা লম্বা লোকের আঙুলের আগা থেকে কাঁধ অবধি লম্বা তামার তার আগাম দিলে, তবে ওষুধ করব, তবে ছেলে ফিরবে।

এম্‌বঙ্গা বলল, 'এখন কিছু নমুনা দেখাও তো, তবেই বুঝব।'

বুকাওয়াই বলল, 'একটু আগুন আনো।' মোমায়া আগুন আনতে গেলে, এম্‌বঙ্গা দর কষাকষি শুরু করল। ওরা গরীব মানুষ, অত দিতে পারবে না, দুটো পাঁঠাই যথেষ্ট। কিন্তু বুকাওয়াই নাছোড়বান্দা। আগুন এনে মাটিতে অল্প আগুন রেখে বুকাওয়াই তার ওপর কিসের গুঁড়ো ছড়াল। অমনি ধোঁয়া উঠতে লাগল। বুকাওয়াইও মূর্ছা গেল—অবিশ্যি নকল মূর্ছা, তখন রাবা কেগা আগুনের পাত্রটা নিয়ে সবার অলক্ষ্যে তাতে কয়েকটা শুকনো পাতা ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠল। তারপর পাত্রের ওপরটা আড়াল করে একটু ফুঁ দিতেই পাত্রের নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে লাগল।

বুকাওয়াই বুঝল একটা কিছু চাল দিতে হবে। হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়ে, তারপর শরীরটা কাঠ করে চিৎকার করে বলল, 'তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। সাদা দৈত্য নেয়নি ওকে। তাড়াতাড়ি দামটা দিয়ে না দিলে ওর সমূহ বিপদ! একা পড়ে আছে বেচারা, অনেক দূরে। এখনো সময় আছে!'

রাবা কেগা বলল, 'আমিও তাকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ও মরে গিয়ে একটা নদীর জলের নিচে পড়ে আছে!' তাই শুনে মোমায়ার কি কান্না।

এদিকে টারজান পায়ের দাগ দেখে দেখে দুই পাহাড়ের মধ্যিখানে গুহার মুখে হাজির হল। গাছের ডালের দরজা খুলে ফেলে যেই অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকল, কানে এল গুহার ওপার থেকে হায়নার ডাক আর ছোট ছেলের কান্না। এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সে ছুটে চলল। ছোটবেলার অভ্যাসের ফলে অন্ধকারে ও বেশ দেখতে পেত। আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ দিয়ে ছুটতে খুব অসুবিধা হল না। হায়নার ডাক এখন আরো জোরে শোনাচ্ছিল। কাঠের ওপর নখের আঁচড়ও কানে আসছিল। ছেলেটার কান্নাও বেড়ে গেছিল। এ তো তার সেই বালুর গলা!

পাহাড়ের ভিতরে পাথরের ঘরের দেয়াল ঘেঁষে টিবো হায়নাদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করছিল। এই সময়ে দরজা ভেঙে হায়না দুটো লাফিয়ে ঘরে ঢুকে

পড়ল। টিবো ভয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

হায়নাদুটো এক মিনিট থেমে, তারপর গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল। টারজান যে ঘরে ঢুকেছে গোড়ায় সে খেয়ালও তাদের ছিল না। তারপরেই তার দিকে ফিরে দাঁড়াল। ছোরাটাও বের করল না টারজান। একটার পর একটার ঘাড় ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই তারা পালাবার পথ খুঁজতে লাগল।

টিবোকে বুকে তুলে নিতেই, সে চোখ মেলে তাকে দেখতে পেয়ে, দুহাতে জড়িয়ে ধরল। গ্রামের সবাই যার ভয়ে তটস্থ, টিবো তাকে পেয়ে আশ্বস্ত হল।

টিবোকে কোলে নিয়ে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল টারজান। কাছেই একটা ঝরনা। সেখানে টিবোকে প্রাণভরে জল খাওয়াল। তারপর তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে, বনপথ ধরে ছুটে চলল। মোমায়ার কান্না থামাতে হবে। সে যে তার বালুর জন্যই কাঁদছে টারজানকে তা বলে দিতে হবে না।

গ্রামের বাইরে বুকাওয়াই তখন রাবা কেগার কথার উত্তর দিচ্ছিল, 'মোটেই সে মরে যায়নি, ডুবে যায় নি। ঐসব জিনিস পেলে আমি তাকে এনে দেব। তবে তাড়াতাড়ি করতে হবে নইলে পারব না। দশটা পুরুষ্টু'—

আর বলা হল না, কারণ ঠিক সেই সময় ওরা যে গাছতলায় বসেছিল তার ডালপালায় সড়সড় শব্দ হল। গাঁয়ের পাঁচজন ওপরে তাকিয়ে দেখল সাদা অপদেবতা সেখান থেকে তাকিয়ে দেখছে আর তার পাশেই হাসি মুখে বসে আছে ওদের হারানো টিবো!

সঙ্গে সঙ্গে টিবোকে পিঠে নিয়ে টারজান মাটিতে নেমে, টিবোকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিল। সবাই তাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। তারই মধ্যে টারজান নিঃশব্দে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছিল আর বলাই বাহুল্য, বুকাওয়াই আগেই পালিয়েছিল।

তখন রাবা কেগার দিকে ফিরে মোমায়া বলল, 'আমার ছেলে মরে গেছে, না? এবার তোমরা মোমায়ার কিছু জাদু দেখ!' এই বলে একটা ভাঙা ডাল তুলে তার মাথায় কষে এক বাড়ি মারল। সে তো ফিরে দৌড়, পিছন পিছন মোমায়াও ছুটল। গাঁয়ের সকলের কি হাসি! সেদিন টারজানের দুজন শত্রু বাড়ল। বুকাওয়াই আর রাবা কেগা।

●

যেদিন মোমায়ার ছেলে টিবোকে টারজান বুকাওয়াইয়ের গুহা থেকে উদ্ধার করে এনেছিল, তার আগে অবধি ওর বিষয়ে নানা গল্প শুনলেও, এই প্রথম বুকাওয়াই তাকে চোখে দেখেছিল। সেদিন টারজান একে ওর খ্যাতি নষ্ট করেছিল, তার ওপর একটা মোটা পাওনা থেকেও বঞ্চিত করেছিল। এ ক্ষমা করা যায় না।

সেই সময় উত্তরে অনেক দূরে টারজান শিকার করতে যেত। আজকাল বনমানুষদের চেয়ে মানুষদের সঙ্গ তার বেশি ভালো লাগত। বনমানুষদের বাচ্চাবেলায় ছাড়া এতটুকু রসবোধ থাকে না। বুদ্ধিশুদ্ধি বড্ড কম। মন ওঠে না।

সেদিন শিকার করতে করতে টারজান লক্ষ্য করল ঝড় আসছে। গাছের মাথার ওপর দিয়ে হাল্কা মেঘ ছুটে যাচ্ছে, ঠিক যেন সিংহের তাড়ায় হরিণ ছুটেছে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না, এতটুকু শব্দ নেই। চারদিকে বিশ্রী একটা হলদে আলো। হঠাৎ একটা গোঙানি শোনা গেল, ঝড়ের গোঙানি। গাছগুলো পাগলের মতো দুলতে লাগল। তারপর সে কি মুষলধারে বৃষ্টি, দম বন্ধ হয়ে আসে। টারজান একটা বড় গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়াল।

জায়গাটা জঙ্গলের কিনারায়। দুটো পাহাড় দেখা যাচ্ছিল, এখন সব লেপে পুঁছে গেছে। ভাবতে মজা লাগছিল যে পাহাড় দুটো হয়তো বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছে। অবিশ্যি একটু বাদেই বৃষ্টি থামবে, রোদ উঠবে, আবার দেখবে যে পাহাড় সেই পাহাড়। চারদিকে ঝড়ের দাপটে গাছের ডাল ভেঙে উড়ছিল। দু-একটা গাছ ভেঙেও পড়ল। কিন্তু ও যে বলিষ্ঠ গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ছিল সে জায়গা একেবারে নিরাপদ। একটাই ভয়, যদি বাজ পড়ে। ঠিক তাই হল। ঐ গাছেই বাজ পড়ল। বৃষ্টি থামলে দেখা গেল গাছটাও ভেঙে পড়েছে আর তার ধ্বংসাবশেষের ওপর টারজান অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

বুকাওয়াই তার গুহার মুখে এসে বাইরে তাকিয়ে ছিল। কুষ্ঠ রোগে একটা চোখ গেছে। কিন্তু দশটা চোখ থাকলেও ঐ জলেভেজা রোদেভরা বনভূমির দৃশ্যে ও কোন সৌন্দর্য খুঁজে পেলো না। দু পাশে দুটো হায়না দাঁড়াল। হঠাৎ একটা হায়না গোঁ গোঁ করে বনের দিকে ছুটল। তার পিছন পিছন অন্যটাও ছুটল। বুকাওয়াইও ব্যাপার দেখতে চলল। হাতে একটা মোটা মুগুর!

ভাঙা গাছের ডালপালার ওপর টারজান তখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। বুকাওয়াই ওর বুকে কান দিয়ে ধুক-পুকি শুনতে পেল। তাহলে বেঁচে আছে। পাশেই ওর ঘাসের দড়িটাও পড়ে আছে। বুড়ো তাড়াতাড়ি ওর হাত দুটো

পিছনে বেঁধে ফেলে, ওকে কাঁধে করে গুহায় নিয়ে চলল। বুড়োই হক আর যাই হক, গায়ে যথেষ্ট জোর ছিল ওর। অসাড় শরীরটা নিয়ে গুহার ভিতরকার আঁকা-বাঁকা সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা গুহার পর আরেকটা গুহা পার হয়ে, পাহাড়ের বুকে একটা বাটির মতো আকারের খোলা জায়গায় পৌঁছল। সেটা হয়তো বহুদিন নিবে যাওয়া আগ্নেয়গিরির মুখ। চার-দিকে ১০০ ফুট উঁচু খাড়া দেয়াল। যাওয়া আসার ঐ একটা ছাড়া পথ নেই। মাটিতে পাথর ছড়ানো, কয়েকটা চিমড়ে গাছ।

টারজানকে একটা গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে বসিয়ে গাছের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে এমন করে বাঁধল বুড়ো যে, যদিও হাত দুটোকে খুলে দিয়েছিল, তবু যাতে কোনোমতেই গিঁটের নাগাল না পায়। হায়নাগুলো খ্যাঁক খ্যাঁক করে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু অসহায় মানুষটাকে আক্রমণ করার সাহস পাচ্ছিল না। বুড়োর হাতে মুগুর। বুড়োকেও ওরা দুচক্ষে দেখতে পারত না। খালি মুগুরের ভয়ে, ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত না। বুকাওয়াই নিজেও হায়নাগুলোকে ভয় পেত, তাই সব সময় কড়া শাসনে রাখত। বাচ্চা অবস্থা থেকে ওদের ও পেলেছিল। ছাড়া থাকলেও, গুহায় ফিরে আসত। এমন অভ্যাস।

টারজানকে বাঁধা হয়ে গেলে, হায়না দুটোকে তাড়িয়ে নিয়ে সুড়ঙ্গপথ দিয়ে বুকাওয়াই বেরিয়ে গেল। মধ্যিখানের শক্ত কাঠের দরজাটা বন্ধ করে যেতে ভুলল না। এর আগেও হায়নাদের ঐভাবে ঐ জায়গায় বন্ধ করেছে বুকাওয়াই, যাতে ও ঘুমোলে তারা ওকে আক্রমণ না করে। খানিকটা জল নিয়ে বুড়ো আবার টারজানের কাছে ফিরে এসে ওর মুখে খানিকটা ছিটিয়ে দিতেই টারজান চোখ মেলে চাইল। তখন বুড়ো বলল, 'আমার ওষুধই বেশি কড়া দেখতে পাচ্ছি। নইলে এখানে পাঁঠার মতো বাঁধা থাকতে না।' টারজান কিছুই বুঝল না, তাই কিছুই বলল না। ভয়ও পেল না।

এদিকে হায়নারা তখন শিকারের আশায় ঘোরাঘুরি করছিল। কিন্তু এখনি টারজানকে তাদের হাতে সঁপে দেবার ইচ্ছা ছিল না বুড়োর। কাজেই মুগুর পিটে তাদের বারে বারে তাড়াতে হচ্ছিল। টারজান সহজেই বুঝল যে বুড়োকে ওরা দেখতে পারে না।

টারজানকে গাল-অপমান করলেও সে বোঝে না, তাই শেষ পর্যন্ত দরজাটা বন্ধ করে সুড়ঙ্গের মুখে বিছানা পেতে শোবার ব্যবস্থা করল। দরজাটাতে শিক বসানো, তার ফাঁক দিয়ে আরাম করে টারজানের কষ্ট দেখতে পাবে। হায়নাগুলো টারজানের চারপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

এ দড়িটা সেই নুমাকে বাঁধার দড়ি। টেনে ছেঁড়া যাবে না। কিন্তু গাছের গায়ে ঘষে ছেঁড়া যায়। ছোটবেলার ঘটনা মনে পড়ল। লম্বা দড়ি ধরে দোল খেত, অন্য বনমানুষরা অবাক হয়ে দেখত। তারপর গাছের গায়ে ঘষা খেয়ে দড়ি গেল ছিঁড়ে, ছেলে গেল পড়ে। মনে পড়তেই, দড়িটাকে সে ঘষতে আরম্ভ করে দিল।

এদিকে বুকাওয়াই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে ভেবেছিল হায়নাগুলোর যথেষ্ট খিদে পেলে তবে তো অসহায় মানুষটাকে ছিঁড়ে খাবে। তখন চ্যাঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যাবে, মজা দেখতে পাবে। সন্ধ্যা নাগাদ হায়নাদের খিদে বাড়ল, তারা গোঁ গোঁ করে টারজানের দিকে তেড়ে গেল। বুড়োর ঘুমও ভেঙে গেল। মজা দেখতে সে উঠে বসল। দেখল একটা হায়না মানুষটার গলা কামড়াবার জন্যে একটা লাফ দিতেই, টারজান হাত বাড়িয়ে তাকে চেপে ধরল। তখন অন্য হায়নাটা ওর পিঠে লাফিয়ে পড়ল। টারজানের গায়ের সমস্ত মাংসপেশী ফুলে উঠল, দড়ি ছিঁড়ে গেল, তিনজনে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

বুড়ো লাফিয়ে উঠল, তবে কি অপদেবতাটা ওর সেবকদের হারিয়ে দেবে? কিন্তু ওর তো কোনো অস্ত্র নেই। ও-ই নিচে পড়েছে, হায়না দুটো ওর গায়ের ওপর চড়েছে। এবার একটা হায়নার গলা এক হাতে টিপে ধরে টারজান উঠে দাঁড়াল। তারপর অন্য হাত দিয়ে অন্যটাকেও চেপে ধরল। ততক্ষণে ক্ষেপে গিয়ে বুড়ো মুগুর তুলে দরজা খুলে ছুটে এল। টারজান একটা হায়নাকে সোজা তার মাথায় ছুঁড়ে দিল। অমনি বুড়ো পড়ে গেল। হায়নাটা তার মুখ কামড়াতে লাগল। টারজান অন্য হায়নাটাকে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিয়ে, আগেরটাকেও তুলে তার দিকে ছুঁড়ে দিল।

তারপর বুড়োকে টেনে তুলল। তার বীভৎস মুখ দেখে ওর গা শিউরে উঠল। হায়নাদুটো ছাড়া পেয়েই গুহার দিকে পালিয়েছিল। তারপর বুকাওয়াইকে ধরে টারজান সেই গাছটাতেই ভালো করে বাঁধল, যাতে কোনো-মতেই ছাড়া না পায়। তারপর সেখান থেকে চলে গেল। সুড়ঙ্গে কিম্বা গুহায় কোথাও হায়নাদের দেখা গেল না। টারজান মনে মনে বলল, 'ওরা ফিরে আসবে।'

বুকাওয়াইও পাহাড়ের সেই গর্তে চিৎকার করে বলল, 'ওরা ফিরে আসবে।'

তাই এসেও ছিল ওরা।

বাঁক নিয়েই বড় নদীর জল পাক খেতে থাকে। তারি কাছে জানোয়াররা নদী পার হয়, জল খায়। সবাই এখানে আসে, মাংসভোজীরা সদর্পে, নিরামিষাশীরা ভয়ে ভয়ে। নুমা সিংহের কাল রাতে খাওয়া হয়নি। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল তার। নিঃশব্দে ঝোপের আড়ালে, সবুজ লোলুপ চোখে বসেছিল। বারা হরিণের কিম্বা হরটা শূওরের মাংস বড় মিষ্টি। তার চেয়েও ভালো উপত্যকাবাসী পাক্কো জেব্‌রার মাংস। কিন্তু তাকে ধরা বড় শক্ত। একেকটা পুরুষ একপাল বৌ-বাচ্চা নিয়ে জল খেতে আসে। পুরুষটা থাকে সামনে। সবচেয়ে সাবধানী সে। এতটুকু শব্দ হল কি দলবল নিয়ে হাওয়া। ধরে কার সাধ্যি। আসবে নিশ্চয় পাক্কোর দল জল খেতে।

এল বটে, কিন্তু সন্দেহে চোখ কান খাড়া রেখে। কোথায় এতটুকু পাতা নড়ার শব্দে ঘুরে খটাখট্ দৌড়। যেমন রূপ, তেমনি জোর আর সেই রকম মোটাসোটা। বার দুই তিন পালাবার পর পাক্কো জলে নাকটা ডোবাল। তাকে ছেড়ে নুমার চোখ পড়ল একটা মোটাসোটা জেব্‌রা-মেয়ের ওপর। তার ঘাড়ে লাফাবার জন্য সবে পিছনের পা গুটিয়ে এনেছে, অমনি কুট্ করে একটা কাঠি ভাঙল আর জেব্‌রার দল অদৃশ্য হল। ওদের আশা ছেড়ে দিয়ে মেজাজ খারাপ করে, শেষ পর্যন্ত নুমা বনে চলে গেল। খালি পেট, হায়না পেলেও ছাড়বে না।

এই রকম মনোভাব নিয়ে, নুমা কেরচাকের বনমানুষদের কাছে এসে পড়ল। এত বেলায় তার খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করার কথা। বনমানুষরা তাদের নিত্যকার জায়গায় আয়েস করছিল। সকালে কিছু খাওয়া গেছে, আবার বিকেলে দেখা যাবে। অন্য দিন হলে নুমা ওদের ঘাঁটাত না। যা গায়ের জোর আর দাঁতের ধার! আজ ওদের দেখবামাত্র নুমা তেড়ে গেল। গাছতলায় ওরা জনা দশ-বারো ছিল আর এক ধারে গাছের ডালে একটা ফরসামতো ছোকরা। সে নুমাকে তেড়ে আসতে দেখল। বনমানুষরা ভারি ভীতু। ধাড়িগুলো বালুদের মাড়িয়ে যে যেদিকে পারল পালাল। একজন মাত্র ওদের মুখোমুখি দাঁড়াল। সে এক কম বয়সী বনমানুষী। তার একটা ছোট্ট বালু। মরতে তার ভয় নেই।

টারজান এক লাফে নিচে নেমে ধাড়িদের মধ্যে যারা পালাচ্ছিল আর যারা গাছে আশ্রয় নিয়েছিল, সবাইকে ডাক দিল। লড়তে হবে, পালালে চলবে না। তখন অনেকে নেমে এল।

ততক্ষণে নুমা সেই মেয়েটাকে ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছিল। রক্তচিহ্ন দেখে রেগে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে তারা ওর পিছু নিল। কিন্তু তখন বড় বেশি দেরি হয়ে গেছিল, বনমানুষীকে বাঁচাবার কোনো আশাই ছিল না। তবু রক্ত-চিহ্ন দেখে ওরা দলবলে বনে ঢুকল।

সামনে থেকে সিংহের রাগত গর্জন শুনে টারজান সকলকে গাছে চড়বার পরামর্শ দিল। দেখতে দেখতে তারা গাছে চড়েই নুমাকে ঘিরে ফেলল। টারজানের মনে হল মৃতদেহটা উদ্ধার করা দরকার এবং নুমাকেও সাজা দিতে হবে। ওরা সকলে মিলে নুমার গাছে গাছের ডাল ছুঁড়তে আর গাল দিতে লাগল। টারজান না থাকলে অন্যর হয়তো মৃতদেহ ছেড়ে চলে যেত, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হল না। নুমাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার যে মানগানি মেরে খাওয়া যায় না। তা না হলে পরে আরো বনমানুষ মারবে ও।

ডালপালায় কাজ হবে না বুঝে টারজান গাছ থেকে নেমে গ্র্যানাইট পাথরের কতকগুলো টুকরো তুলে আবার গাছে চড়ল। ওর দেখাদেখি অন্যরাও তাই করল। তারপর সবাই মিলে পাথর ছুঁড়ে নুমাকে প্রায় পাগল করে তুলল। মানুষের গন্ধওয়ালা বনমানুষটার ওপর ওর সবচেয়ে রাগ বেশি। থেকে থেকেই তার দিকে তেড়ে যাচ্ছিল নুমা, কারণ তার এমনি আস্পর্ধা যে মাটিতে নেমে ঢিল ছুঁড়ছিল! বেশ ব্যথা লাগছিল নুমার, কিন্তু শিকার ছেড়ে চলেও যাচ্ছিল না। এখন মৃতদেহটা সরানো যায় কি করে?

একটা বুদ্ধি এলেও সেটা কাজে লাগাতে হলে একজন সাহায্য করবার লোক চাই। ছোটবেলার বন্ধু টাউগ বেশ সাহসী, বলিষ্ঠ ও তৎপর। টারজান তাকে ডেকে বলল, 'ওর কাছে গিয়ে এমনি জ্বালাতন কর, যাতে তোমার দিকে তেড়ে যায়। তাহলে মামকার শরীরটা ছেড়ে ওকে উঠে আসতে হবে। আমিও সেই ফাঁকে সেটাকে তুলে নিয়ে আসব।'

ঠিক তাই হল। অন্য বনমানুষরা দেখে তাজ্জব বনে গেছিল। তবে তারাও ঢিল ছুঁড়ে, গাল দিয়ে, কিছু সাহায্য করেছিল। টাউগকে তেড়ে যেতেই টাউগ এক দৌড়ে গাছে উঠে পড়ল। নুমা তখন শিকারের দিকে ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে দেখল সেই ফরসা বনমানুষটা তার শিকার কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছে! অমনি বড় বড় লাফ দিয়ে তাকে তাড়া করল নুমা। টারজান দেখল গুণ্টো একটা ডাল থেকে ঝুলে নানা রকম পরামর্শ দিচ্ছে। টারজান বলল, 'গুণ্টো, আমাকে ধর।'

বলেই কাঁধে ঐ ভারি বোঝা নিয়েই এক লাফ দিল। গুণ্টোও দুজনকে একসঙ্গে টেনে তুলে নিল।

রাগে অন্ধ হয়ে নুমা নিচে তর্জন-গর্জন করতে লাগল। কিন্তু টারজান মামকার দেহাবশেষ গাছের উঁচু ডালের ফ্যাকড়ায় তুলে রাখল। সেখানে কোনো হিংস্র জানোয়ার তার নাগাল পাবে না। কিছুক্ষণ হাঁকডাক করে নুমাও বনে চলে গেল।

এই ব্যাপারের পর টারজানের একটু ভাবনা হল। কেরচাকের দলের বনমানুষরা তো বিপদ দেখলেই পালায়। হিংস্র জানোয়ার আক্রমণ করলে অসহায়। তাছাড়া এরা এতটুকু মজা বোঝে না। ছোটবেলায় যদি বা কিছু বোঝে বড় হলেই হুম্ মেরে যায়। বনের নানা বিপদ আর কষ্টের মধ্যে একটু সাহস, একটু রসবোধ না থাকলে চলে কখনো? মামকা যাবার কয়েকদিন পরে শীতা একটা ছোট বালুকে গাছের নীচু ডাল থেকে তুলে নিয়ে গেল।

এবার টারজান সত্যি রেগে দলের পুরুষদের ডেকে বলল, 'ঐ সব হিংস্র জানোয়াররা কি আমাদের জলখাবার বানাবে? ওদের ঠেকাবার জন্য আমরা কিছু করি না। মানু বাঁদরের দল পর্যন্ত দু-একজনকে পাহারায় রাখে। পাক্কো জেবরার ওয়াপি হরিণের দু-একজন সর্বদা হুঁশিয়ার থাকে শত্রু আসছে কি না।

টাউগ বলল, 'কিন্তু আমরা কি করতে পারি?'

টারজান বলল, 'আমরাও দু-চারজন পাহারায় থাকব। ভয়ের মধ্যে নুমা, শাবর, শীতা আর হিস্তা।'

ওর কথা শুনে এর পর থেকে বনমানুষরাও দু-তিনজন পাহারায় বসত, বাকিরা চরে বেড়াত। দলটাও অতটা ছড়িয়ে না পড়ে, কাছাকাছি থাকত। খালি টারজান একা একা ঘুরত, ও যে মানুষদের মতো। ওর একটু মজা চাই, একটু চাঞ্চল্য চাই। সে মজাটাও অবিশ্যি একটু বুনো ধরনের, বনে বাস করলে অমন হতে বাধ্য।

একদিন এম্বঙ্গার গ্রামের পাশে গাছে বসে দেখল জাদুকর রাবা কেগা মোষের মাথাশুদ্ধ চামড়া জড়িয়ে মোষ সেজে বেড়াচ্ছে। এম্বঙ্গার কুঁড়েব পাশে একটা মুণ্ডুসুদ্ধ সিংহের ছাল শুকোচ্ছিল। তাই দেখে ওর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। গায়ের জোর আর পিতৃদত্ত বুদ্ধি দিয়েই তো টারজান বনে চরে খেত।

অন্ধকার হলে আবার ফিরে এসে গাছের ঐ জায়গাটায় বসল। ওর গায়ের ঘষা লেগে জায়গাটাকে মনে হত পালিশ করা। আজ গাঁয়ে কোনো ভোজটোজ হচ্ছিল না। বড়রা উনুনের ধারে বসে গল্প করছিল, ছেলে-ছোকরারাও কুঁড়ে ঘরের ছায়ায় যে যার আড্ডা দিচ্ছিল। হেনকালে নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে সিংহের ছালটি তুলে নিয়ে টারজান আবার বনে চলে গেল। কেউ কিছু লক্ষ্যও করল না।

ডেরায় ফিরে গিয়ে টারজান শুয়ে শুয়ে ভাবছিল বনমানুষরা তো আসলে খুব সাহসী। কিন্তু হঠাৎ বিপদ এলে কেমন ঘাবড়ে গিয়ে, পালায়। আসলে চমকে গেলে ওদের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়। টারজান আগে এটা বুঝত না, এবার শিখল।

সকালে ওর মুখে শিমের খোলা ছুঁড়ে মানু ওকে জাগাল। তার সঙ্গে ওর ভারী ভাব! সে ওকে শিকারের খোঁজ দিত। ও মানুর জন্য শক্ত বাদাম ভেঙে দিত, ওর কাছ থেকে হিস্তা সাপকে কিম্বা শীতাকে তাড়িয়ে দিত।

দলের সবাই কোন দিকে চরতে গেছে, মানু দেখিয়ে দিল। টারজান বলল 'সঙ্গে আয়, মজা দেখতে পাবি।' এই বলে রওনা হয়ে গেল। কাঁধে করে নিল এম্বঙ্গার সিংহের ছালটা।

যে খোলা জায়গাটাতে গুণ্টো, টাউগ, আর টারজানের সঙ্গে নুমার মোলাকাৎ হয়েছিল, সেইখানে বনমানুষরা নিশ্চিন্তে চরছিল, কারণ তিন দিকে তিনজন পাহারা দিচ্ছিল। উত্তর দিকে একটা গাছের ফ্যাকড়ায় বসে গুণ্টো চারদিকে নজর রাখছিল। নিচের ঝোপে একটু খচ্‌মচ্ শুনে চেয়ে দেখে খানিকটা ঝাঁকড়া লোম আর হল্‌দে গা। অমনি সে বিপদের জানান দিল, 'ক্রী-ই-গ্—আঃ'। সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখে সেই বিপদের সংকেত। সবাই গাছের ডালে, ধেড়েরা গুণ্টোর কাছে এগিয়ে গেল। এমন সময় ফাঁকা জায়গাটাতে নুমা রাজার মতো চালে ঢুকল। গলা দিয়ে একটা খক্ করে কাশি আর কান ফাটানো গর্জন। শুনে গায়ে কাঁটা দিল।

ফাঁকা জায়গার মধ্যিখানে নুমা থামতেই চারদিক থেকে নুড়ি পাথর ডালপালা ওর গায়ে এসে সজোরে পড়তে লাগল। নুমা ঘুরে পালাবার চেষ্টা করতেই, বিশাল এক পাথর নিয়ে টাউগ পথ আগলাল। পাথর খেয়ে পশুরাজ ধরাশায়ী! সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। তখন বনমানুষরা মোটামোটা লাঠি আর পাথর নিয়ে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দাঁত বের করে, লাঠিসোটা উঁচিয়ে নুমাকে ওরা আরেকটু হলেই দিচ্ছিল শেষ করে, এমন সময়ে মাথার ওপর থেকে টুপ

করে নুমার গায়ের ওপর পড়ল মানু বাঁদর! পড়েই সে কি আস্ফালন আর যুদ্ধে আহ্বান! মানু ওদের সঙ্গে লড়বে নাকি? বনমানুষরা তাজ্জব বনে গেল! এ কি হল? ভীতু মানু নুমার গায়ে চড়ে লাফাচ্ছে কেন? কেন বলছে, 'আর মেরো না, মেরো না!'

বনমানুষরা থেমে যেতেই, নুমার একটা হলদে কান ধরে মানু প্রাণপণে টানতে লাগল। হ্যাঁচকা টানে মুণ্ডুসুদ্ধ ছালটা খুলে এল আর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল বনমানুষদের ছেলে টারজান। ধেড়েদের কেউ কেউ, যারা কোনোদিনই টারজানকে বরদাস্ত করতে পারত না, তাদের তখনো ইচ্ছা ছিল ব্যাটাকে শেষ করে দিতে। কিন্তু টাউগ, টিকা আর কমবয়সীরা টারজানের পক্ষ নিয়ে লড়তে প্রস্তুত ছিল। কয়েক মিনিট পরে চোখ খুলে ব্যাপার দেখে টারজান খুব লজ্জা পেল।

ব্যাপারটা বোধগম্য হলে, ক্রমে ওর মুখে এক গাল হাসিও দেখা দিল। সারা গা ক্ষত-বিক্ষত হলেও, সেদিন তার কয়েকটা ভালো শিক্ষা লাভ হয়েছিল। প্রথম শিক্ষা হল, ওর পরামর্শ কাজে লেগেছে। দ্বিতীয়, বনমানুষদের দলে ওর কয়েকজন প্রকৃত বন্ধু আছে। এমন কি মানু বাঁদর পর্যন্ত টারজানের জন্য নিজের প্রাণকে বিপন্ন করতে রাজি।

আরেকটা শিক্ষাও হয়েছিল অবশ্য। সেটি হল, এই দলে আর কারো এতটুকু রসবোধ না থাকলেও ভবিষ্যতে এরকম চালাকি আর কখনো করবে না। অন্ততঃ কখনো না হলেও, বেশি করবে না।

●

এম্বঙ্গার গ্রামের কালোরা হাতির মাংস খেয়ে উৎসব করছিল। টারজানের সেদিন শিকার জোটেনি। বনবাসীদের কপালে মাঝে মাঝে উপোস কি আধপেটা খাওয়া থাকে। কি আর করা। কালোদের খাওয়া দেখে কষ্টটা আরো বেড়ে যাচ্ছিল, যদিও বাসি মাংস। বন থেকে মরা হাতি টেনে এনেছিল। মনে হয় খুব একটা ভালো ছিল না মাংসটা। তবু, খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। খেতে খেতে যখন আর পেটে ধরছে না, তখন অনেকে টলতে টলতে ঘরে যাচ্ছিল শুতে। সকলেরই অল্পবিস্তর পেটব্যথা করছিল মনে হচ্ছিল। পারছে না, তবু লোভের চোটে গিলে খাচ্ছে। অত খেলে কি আর টারজানের জন্য হাঁড়িতে কিছু বাকি থাকবে?

শেষটা সকলে যখন রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে গেছে, এক বুড়ো তখনো চালিয়ে যাচ্ছিল। পেটটা ভরে গিয়ে টইটম্বুর করছে, উঠে বসতে পারছে না, তবু কনুইতে ভর দিয়ে আরেকটা বড় টুকরো মাংস তুলে নিল। তখন টারজান আর সইতে না পেরে, নেমে এসে বুড়োর গলা টিপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো অক্কা পেল। তখন টারজান মস্ত মস্ত কয়েক টুকরো মাংস তুলে নিয়ে, খালি হাঁড়িতে বুড়োকে পুরে, পাশ থেকে মদের ভাঁড় তুলে আস্তে এক চুমুক দিয়েই থু থু করে ফেলে দিল। তার যে কি বিশ্রী স্বাদ আর গন্ধ যে ডাঙো হায়নাও খেতে পারত কি না সন্দেহ!

যাই হক মাংস নিয়ে আধ মাইলটাক বন পার হয়ে, শেষটা খেতে বসল। কেমন একটা বদ্ গন্ধ নাকে এল। হয়তো জল দিয়ে আগুনের ওপর বসানোর জন্য ঐ রকম হয়েছে। অত ভাবলে চলে না, তাই খিদের মুখে ঐ আধ-পচা মাংসই বেশ খানিকটা খেয়ে নিল। কেমন বমি আসতে লাগল তাই বাকিটা মাটিতে ফেলে দিয়ে, গাছের একটা ফ্যাকড়ায় শুয়ে পড়ল।

একটু ঘুম আসতেই সিংহের ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল। বেজায় রাগ ধরল, কিন্তু যেই না তাকে একটু মুখ ভেংচেছে, অমনি সিংহটা গাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল।

ই কিরে বাবা! টারজান যতই ওপরে ওঠে, সিংহও পিছন পিছন উঠতে থাকে। সরু সরু ডালে পৌঁছে গেল টারজান, এত সরু ডালের কোনো সিংহের ওজন বইবার কথা নয়, তবু সে দিব্যি উঠে এল। গাছের আগা দুলতে লাগল। এখানে লড়াইটড়াইও করা যাবে না, কি করা যায়? এই সব ভাবছে টারজান, হঠাৎ ডানার শব্দ শুনে চেয়ে দেখে বিশাল এক পাখি মাথার ওপরে চক্কর দিচ্ছে। এত বড় পাখি জন্মে না দেখলেও, একেবারে অচেনাও নয়। বাবার ছোট ক্যাবিনে টারজান একটা বইতে এর ছবি দেখেছে। পাখিটা নখে করে একটা ছোট্ট ছেলেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

এ পাখিটাও আচমকা ছোঁ মেরে টারজানকে সিংহের নাগালের বাইরে তুলে নিয়ে, আকাশে এত উঁচুতে উঠে গেল যে নিচে তাকালে মাথা ঘোরে। নিচের বনটাকে অস্পষ্ট সবুজের মতো দেখাতে লাগল। বাসায় নিয়ে গিয়ে খেয়ে-টেয়ে ফেলবে না তো? যেমনি মনে হওয়া, অমনি কোমর থেকে ছোরা বের করে পাখির বুকে তিনটে কোপ বসিয়ে দিল। পাখিও তখুনি ওকে ছেড়ে দিল আর ঐ ওপর থেকে সটাং নিচের দিকে টারজান পড়ছে তো পড়ছেই, মনে হল কত সময় না কেটে গেল! তারপর ঝপাৎ করে একটা

গাছের মাথায় পড়ল। মাথার ডালপালা ভেঙে আরেকটু নিচেও পড়ল। তবে মাটি পৌঁছবার আগেই টারজান একটা ডাল ধরে ফেলে দেখল, আরে! এই গাছ থেকেই না পাখিটা তাকে তুলে নিয়েছিল। নিচে একটা সিংহের ডাকও শোনা গেল।

খানিকক্ষণ টারজান অপেক্ষাও করল, সিংহটা এবার নিশ্চয় উঠে আসবে। সারা গায়ে ঘাম ছুটল। এবার কিন্তু সিংহটিংহ উঠে এল না। টারজান বুঝতে পারল সব স্বপ্ন। হাতির পচা মাংস, সিংহের ডাক, বইতে দেখা ছবি, সব মিলিয়ে স্বপ্নটা তৈরি! কোনটা সত্যি কোনটা স্বপ্ন সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল টারজান।

তারপরেই যেন স্পষ্ট দেখতে পেল হিস্তা সাপ গাছের ডাল বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে। ভালো করে চেয়ে দেখল সত্যিই তো, হিস্তাই তো, কিন্তু ওর মুণ্ডুটা কেন সেই পেটুক বুড়োর মতো? ওটাকে তো হাঁড়িতে পুরে দেওয়া হয়েছিল। কাছে এসে মুণ্ডুটা ওকে কামড়াবার জন্য যেই হাঁ করেছে, টারজান রেগে এক চাপড় কষিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডু অদৃশ্য! চমকে উঠে বসে কিছুই দেখতে পেল না সে, খালি একটা শুঁয়োপোকা ওপরের ডাল থেকে ওর গায়ে পড়ল। সেটাকে ফেলে দিয়ে, আবার ঘুমের চেষ্টা।...

এই ভাবে স্বপ্নের পর স্বপ্ন দেখে রাত কাটাল টারজান।

অনেক পরে সকাল হল। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল সারা গায়ে আগুন জ্বলছে, বমি আসছে। কাছেই একটা দুর্ভেদ্য ঝোপ ছিল, তার মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়ল টারজান। তাহলে মাংসাশী জানোয়াররা ওর নাগাল পাবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই খুব খানিকটা বমিটমি হয়ে, শরীরটা হাল্কা হয়ে গেল। তারপর আরেকবার জল খেয়ে, উপসাগরের ধারে ক্যাবিনটাতে চলল। সেখানে গেলে মনটা ভালো হয়ে যায়। আজ সমস্ত মন অন্য রকম হয়ে ছিল কিছুতেই বুঝতে পারছিল না কোনটা সত্যি, কোনটা স্বপ্ন। জাগা অবস্থায় ওর কোনো ভয়-ডর থাকে না। কিন্তু স্বপ্নে এত ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে

বই দেখতে দেখতে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল, হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে ঘুম ছুটে গেল। এতক্ষণ বইতে বোল্‌গানির ছবি দেখছিল, এবার দরজা খুলে বোল্‌গানি ঢুকল। নিশ্চয় স্বপ্নের বোলগানি। তা সে যাই হক, লড়াই করতে টারজান প্রস্তুত। কিন্তু এর আগে স্বপ্নের জানোয়ারদের দেখে মনে যে ভয় হয়েছিল, এবার তা হল না। যাক্ গে, ওটার তো এতক্ষণে মিলিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এর আগের স্বপ্নগুলো কিন্তু এত স্পষ্ট ছিল না।

ঠিক এই সময় গোরিলা ওর দিকে তেড়ে এসে, কড়া-পড়া দুই বিশাল বাহু দিয়ে চেপে ধরে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। নিশ্চয় সত্যি গোরিলা নয়, কারণ আজ পর্যন্ত তারা কেউ দরজার খিল খুলতে শেখেনি। এবার কি হয় দেখা যাক।

বোলগানি টারজানকে কাঁধে করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে বনের দিকে ছুটল। টারজান ভাবছিল, যাক না নিয়ে, এক্ষুনি ঘুম ভেঙে দেখব ক্যাবিনেই রয়েছি। ফিরে দেখে ক্যাবিনের দরজা হাঁ করে খোলা। ও তো সর্বদা দরজা বন্ধ করে রাখে, নইলে মানু সমস্ত তচ্‌নচ্ করে দেবে। একবার দেখা দরকার দরজাটা সত্যি খোলা কি না।

এই ভেবে বোলগানির কাঁধ থেকে নেমে পড়ার চেষ্টা করল। বোল্‌গানি চেপে ধরে রাখল। টারজান জোর করে নেমে পড়ল আর বোল্‌গানি রেগে ওর কাঁধে দাঁত বসিয়ে দিল। এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, তা স্বপ্নই হক আর যাই হক। সঙ্গে সঙ্গে লড়াই লেগে গেল। বোলগানি ওর গলার শিরা কামড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগল আর টারজান ওর গলা টিপে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। শেষটা এক হাতে বোলগানির গলা চেপে ধরে, অন্য হাতে টারজান তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিল। একটা বিকট চিৎকার দিয়ে, বোল্‌গানি টারজানের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে, মাটিতে পড়ে গেল।

টারজান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগল। স্বপ্ন হলে মরল কি করে? তারপর একবার জয়ধ্বনি দিয়ে, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে, বনের দিকে ফিরে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যে, আর কখনো টানটরের মাংস খাবে না।

●

বেশি দিন নিশ্চিন্ত সুখে কাটানো কারো পক্ষে ভালো নয়, আধুনিক সভ্য মানুষেরো নয়, আফ্রিকার ঘন বনের বাসিন্দাদের পক্ষেও নয়। তিন জন পাহারাদার রাখার যে নিয়ম টারজান ওদের দলের বনমানুষদের শিখিয়েছিল, তার ফলে কোনো হিংস্র জানোয়ার ওদের ধারকাছে ঘেঁষত না, ওরাও নিশ্চিন্ত সুখে অনেক দিন কাটিয়েছিল। কিন্তু দিনে ওরা অসাবধান হয়ে পড়েছিল, ক্রমে পাহারা রাখার নিয়মটিও ভুলে যেতে বসেছিল। টারজান অনেক সময়ই ওর বাবার ক্যাবিনে বই নিয়ে কাটাত, তাই এতটা লক্ষ্য করেনি।

এর মধ্যে একটা সুন্দর সকালে কেরচাকের দলের বনমানুষরা আবার চারদিকে ছড়িয়ে গিয়ে খাবার খুঁজছিল। পাহারা-টাহারার বালাই ছিল না। টিকা তার ছেলে গাজানকে নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে চরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় টুগ নামে অন্য এক দলের বিশালদেহ পুরুষ সেখানে হাজির হল। নিজেদের দলের রাজার সঙ্গে ঝগড়া করে সে দলছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মেজাজ-টেজাজ খুব খারাপ। হঠাৎ দেখে একটা সুন্দর বনমানুষদের মেয়ে তার বালু নিয়ে একলা চরে বেড়াচ্ছে। অমনি মাথায় বদবুদ্ধি এল। বালুটাকে তো এক কামড়ে এক্ষুনি শেষ করে দেওয়া যায়। মেয়েটা যদি নিজের থেকে না আসে, তাহলে ধরে নিয়ে যাওয়া যায়। দলের লোকরা খুশি হবে, রাজাও হয়তো ওর অপরাধ ক্ষমা করে ফেলবে।

এই মনে করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে টিকার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করতে লাগল। ফল হল উল্টো। টিকা দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এল। গাজান মায়ের কাছে ছুটে আসছিল, টিকা তাকে 'ক্রী-ই-গ-আঃ' বলে সাবধান করে, গাছে চড়তে বলে দিল। গাজানও চটপট গাছের ডাল বেয়ে ওপরে উঠে যেতে লাগল। এদিকে টুগ বুক ফুলিয়ে খুব আস্ফালন করে নিজের গুণগান করতে লাগল আর টিকা ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দৌড় দিল। কিন্তু টুগ জানত বালু ছেড়ে সে বেশি দূরে যাবে না। টিকার সঙ্গে দৌড়েও টুগ পারবে না। এদিকে গাজান গাছ থেকে ওকে নানা রকম অপমানকর গাল দিচ্ছিল। রেগেমেগে শেষটা টুগ-ও গাছে চড়তে আরম্ভ করল। টিকার চক্ষুস্থির।

—'সরু ডালে উঠে যা, গাজান। ও সেখানে চড়তে পারবে না!'

গাজান ঘাবড়ে গিয়ে গালাগালি বন্ধ করে, সরু ডালে চড়তে লাগল। টুগ যতটা পারে উঠে, তারপর সরু ডালটা ধরে ঝাঁকাতে লাগল। চার হাত পায়ে আঁকড়ে ঝুলে থাকবার অনেক চেষ্টা করেছিল গাজান, কিন্তু শেষটা টুগ এমনি জোরে ঝাঁকি দিতে লাগল যে হাত ফস্কে ঝুপ করে একেবারে মাটিতে ওর মায়ের পায়ের কাছে পড়ে গেল। টিকা কেঁদে উঠে ওকে কোলে তুলবার জন্য নিচু হতেই, টুগ ওকে ধরে ফেলল।

ভীষণ লড়াই দিয়েছিল টিকা। টুগকে আঁচড়ে কামড়ে একশেষ করেছিল। কিন্তু ঐ বিশালদেহ শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে পারবে কেন? গলা টিপে আধমরা করে, ওকে কাঁধে ফেলে টুগ দক্ষিণ দিকে, নিজেদের ডেরার পথ ধরল। গাজান ঘাসের ওপর চুপ করে পড়ে রইল। সূর্য তখন মাঝ-আকাশে। একটা হায়না ঝোপ থেকে বেরিয়ে ক্রমে গাজানের দিকে এগোতে লাগল।

এদিকে টারজান সকাল থেকে ক্যাবিনে বসে নানা জিনিস নেড়েচেড়ে, আবার গুছিয়ে যার যেখানে জায়গা রেখে দিচ্ছিল। এটা তার স্বভাব। বনমানুষরা কোনো জিনিস গুছিয়ে রাখত না। দরকার ফুরোলে ফেলাছড়া করে রেখে চলে যেত।

আজ বইতে মন বসছিল না। আলমারি খুলে একটা থলি বের করল। থলিতে অনেকগুলো চ্যাপ্টা গোল জিনিস ছিল। চাকতিগুলোর দু-পিঠেই ছবি খোদাই করা ছিল। হলদে চকচকে জিনিসগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বেশ লাগত। তারপর আবার থলিতে ভরে রেখে দিত। একটা গড়িয়ে খাটের তলায় চলে যেতেই, হামা দিয়ে সেটি বের করতে হল। খাটের তলায় একটা কাঠের বাক্স চোখে পড়ল। এর আগে সেটা লক্ষ্যই করেনি। বাক্সটাতে অনেকগুলো অদ্ভুত জিনিস। গোল গোল লম্বাটে, এক দিকটা একটু ছুঁচলো। পড়ে থেকে থেকে কেমন সবুজ হয়ে গেছে। একটু ঘষতেই সবুজ রংটা উঠে ভিতরকার চকচকে চেহারা বেরিয়ে পড়ল। ছুঁচলো দিকটা কিন্তু ছাই রঙের।

টারজানের কোমরে একটা কালো মানুষের কাছ থেকে নেওয়া থলি ঝুলত। তার মধ্যে এক মুঠো লম্বা জিনিস ভরে নিল। সময় পেলে কাঠি দিয়ে ঘষে চকচকে করা যাবে। লম্বা বাক্সটাকে খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে, ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে টারজান বেরিয়ে এল। দলের ডেরায় পৌঁছবার আগেই বালুদের আর তাদের মায়েদের চিৎকার, পুরুষদের গর্জন আর ক্রী-ই-ই-গ্-আঃ ডাক শুনেই বুঝল একটা কিছু ঘটেছে।

টারজান যখন ক্যাবিনে নিজের কাজে ডুবে ছিল টাউগ পেট ভরে খেয়ে দলের কাছে ফিরে এল, এখন টিকা একটু পিঠ চুলকে দিলে আরাম হত। কিন্তু এখানে ওখানে দলের আর সকলকেই দেখতে পেল, বাদে টিকা আর গাজান। প্রথমটা ভাবেইনি ওদের কোনো বিপদ হয়েছে, দেখতে পাচ্ছে না বলে বিরক্ত লাগছিল। হঠাৎ দেখল একটা হায়না কি একটা জিনিসের দিকে একটু একটু করে এগোচ্ছে। আরেকটু লক্ষ্য করতেই বুঝল জিনিসটা গাজানের অচেতন শরীর। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, কারণ টাউগ তার স্ত্রীকে আর ছেলেকে ভালবাসত। অমনি ছুটে গেল হায়নাটার দিকে।

সেটাও খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠল। টাউগ তার ঘাড় মটকে শরীরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, টিকাকে ডাকতে লাগল। কোনো উত্তর পেল না। নিচু হয়ে গাজানের গা শুঁকতে লাগল, তার সর্বাঙ্গ চেটে আদর করতে লাগল। গাজান কোনো সাড়া দিল না।

তখন টাউগ দলকে ডাক দিল, 'ক্রী-ই-ই-গ্-আঃ! ক্রী-ই-ই-গ্-আঃ!'

চারদিক থেকে বনমানুষরা সাড়া দিতে দিতে ছুটে এল। সেই রাগের আর দুঃখের গর্জন টারজানেরও কানে গেছিল। সে-ও যত তাড়াতাড়ি পারে অন্যদের সঙ্গে এসে জুটল। পৌঁছে দেখল টাউগ আর অন্যরা চুপ করে মাটিতে শোয়া একটা কিসের চারদিকে জড়ো হয়েছে। ওকে দেখেই টাউগ চ্যাঁচামেচি থামিয়ে, নিচু হয়ে গাজানকে কোলে তুলে টারজানের দিকে বাড়িয়ে ধরল। সমস্ত দলের মধ্যে টাউগ টারজানকে সবচেয়ে ভালোবাসত। টারজানও টাউগ, টিকা আর গাজানকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। টাউগ জানত টারজানের মতো বুদ্ধি আর কারো নেই।

টারজান আঁৎকে উঠল। 'কে এমন করেছে? টিকা কোথায়?'

কেউ কিছু জানে না। টাউগ বলল, 'আমি এসে দেখলাম ডাঙ্গো ওকে খাবার তালে আছে। কিন্তু ডাঙ্গো ওর কিছু করেনি, গায়ে দাঁতের দাগ নেই।

টারজান বাচ্চাটাকে তুলে বুকে কান লাগিয়ে ধুকপুকি শুনে বলল, 'বেঁচে যাবে। প্রাণ আছে।' তারপর চারদিক শুঁকে বলল, 'কোনো বাইরের বনমানুষ এসেছিল। সে-ই গাজানকে মার দিয়ে, টিকাকে ধরে নিয়ে গেছে। পাহারাদাররা যদি তাদের কাজ করত, আজ এমন বিপদ হত না। জঙ্গলটা শত্রুতে ভরতি, অথচ তোমরা বাচ্চাদের আর মেয়েদের রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থাই করনি। এখন আমি যাচ্ছি টিকাকে উদ্ধার করে আনতে।'

অন্যরা বলল, 'আমরা সবাই যাব।' এই রকমই ওদের নিয়ম। কিন্তু টারজান বলল, 'একটা ধাড়ি বনমানুষ তাকে ধরে নিয়ে গেছে। এখন তাকে ফিরিয়ে আনতে সবাই চলে গেলে, বালুদের আর তাদের মায়েদের কে দেখবে? আমার সঙ্গে আর একজন গেলেই হবে।' এই বলে টাউগকে বলল, 'মুমগার কাছে গাজানকে দাও। বুড়ি হলেও ও অনেক কিছু জানে। তুমি আমার সঙ্গে চল। আর দেখ মুমগা, বালুটার কোনো অনিষ্ট হলে আমি তোমাকে মেরে ফেলব।'

তারপর দু-জন রওনা হয়ে গেল। টারজানের দক্ষ চোখে অন্য বনমানুষটার চিহ্নগুলো স্পষ্ট ধরা পড়ছিল। ওদের দলে এ বিদ্যায় ওর মতো ওস্তাদ কেউ ছিল না। পাষণ্ড টুগের পদচিহ্ন টারজান দেখতে দেখতে চলল। গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল, টিকার গায়ের গন্ধও। অতি সহজেই মাটিতে ছাপ দেখে তাড়াতাড়ি এগোচ্ছিল, এমন সময় বৃষ্টি নামল। পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সমস্ত পথ টিকাকে কাঁধে নিয়ে এসেছে টুগ। কোথাও গাছে উঠেছে, সেখানেও ডালেতে আঁচড়, পাতায় গায়ের গন্ধ রেখে গেছে।

টারজানের ভাবনা হচ্ছিল এমন ভারি বৃষ্টিতে না চিহ্নগুলো সব মুছে যায়। বৃষ্টি যেমন হঠাৎ এল, তেমনি হঠাৎ থামলও, ও-সব অঞ্চলে যেমন হয়ে থাকে। এবার চিহ্নগুলো ততটা স্পষ্ট না হলেও, টারজানের নাক চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত! যেখানে চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছিল না, সেখানে নানা দিকে খুঁজে, শুঁকে শুঁকে বের করছিল। কোথাও গাছ থেকে নেমে হাঁটতে হচ্ছিল, সেখানে দেখা যাচ্ছিল টুগের পায়ের এই বড় ছাপ। এখনো টিকা তার কাঁধে, এ কথাও বোঝা গেল, নইলে ছাপটা অত গভীর হয়ে পড়ত না। গাছের ওপরে দেখা গেল একটা পাকা-দাড়ি ছোট্ট বাঁদর কিচির মিচির করে সরে পড়ছে। আসলে বাঁদরটা টুগদের দলকে সব খবর দেয়, মানুষের কাছ থেকে টারজান যেমন সাহায্য পায়।

ততক্ষণে টুগ আর টিকার দুজনেরি শরীর রক্তাক্ত এবং আঁচড়ে কামড়ে ভরা। তাতেই ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল। টুগ ভাবছিল, একে নিয়ে মহামুস্কিল হল। রাজাকে উপহার দিয়ে দিলে কেমন হয়? ক্রমে ওরা টুগের দলের বিচরণভূমির কাছে এসে পৌঁছল। এই সর্বনেশে মেয়েটাকে একা কতক্ষণ সামলাবে টুগ? ঝোপের মধ্যে দুই বন্ধুকে দেখে টিকাকে নামিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল টুগ। টুগের বন্ধুদের দেখেই টিকা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। তারা ভাবল বাবা! কি বদ মেজাজি! তবু ভালো করে দেখে বোঝা যাচ্ছিল মেয়েটা আসলে ভালোই দেখতে, রাগে ভয়ে রক্তাক্ত শরীরে ওরকম দেখাচ্ছে।

এদিকে পাকা-দাড়ি বাঁদরটা খবর দিল, 'দুটো পুরুষ আসছে। একজন মানগানি, অন্যজন বিকট দেখতে, গা একদম ন্যাড়া! দেখলাম ওরা টুগের পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে এদিকে আসছে।'

একথা শুনে টুগ টিকা আর দুই বন্ধু পথের দিকে তাকাল। যে বন্ধু বেশি ষণ্ডা, সে বলল, 'এসো ঝোপে লুকিয়ে

ওদের জন্যে অপেক্ষা করি।'

টিকার কি উত্তেজনা! ন্যাড়া বনমানুষ মানে যে টারজান, তাতে সন্দেহ নেই। অন্যটা নিশ্চয় টাউগ। টিকা ভাবেনি ওকে কেউ উদ্ধার করতে আসবে। মনে করেছিল যেমন করে হক, পালিয়ে যাবে। নিজে পথ খুঁজে ফিরে যাবে।

এদিকে টারজানরা পাকা-দাড়ির কথা জানত না, খোলা জায়গাটাতে ঢুকবা মাত্র—ক্রী-ই-ই-গ-আঃ। ক্রী-ই-ই গ্-আঃ! শুনে অবাক হল। এ যে টিকার গলা! টুগ টিকার মাথায় এক চাঁটি মেরে, দুই বন্ধুকে নিয়ে শত্রুদের দিকে তেড়ে গেল। পাকা-দাড়ি রক্তপাত বড়ই ভালোবাসত, অবিশ্যি নিজের রক্তপাত নয়। মারপিট দেখে তার ভারি আনন্দ। এখন পাঁচটা বনমানুষের জড়াজড়ি করে কামড়া-কামড়ি, মাটিতে গড়াগড়ি দেখে সে আহ্লাদে নাচতে লাগল।

টুগ্ আর আরেকটা বনমানুষ টাউগকে নিয়ে লেগে পড়েছিল, টারজান তৃতীয়টার সঙ্গে লড়ছিল। সেটাই সবচেয়ে ষণ্ডা। এমন প্রতিপক্ষ সে-ব্যাটা জন্মে দেখেনি। লোম নেই, ধরতে গেলে পিছলে যায়, গা-ভরা খালি ঘাম আর রক্ত। একটা সুযোগ পেয়েই ছোরা বের করে তিনবার কোপ দিল টারজান। প্রতিপক্ষ গোঙাতে গোঙাতে মাটিতে শুয়ে পড়ল, আর উঠল না।

এবার টারজান টাউগের সাহায্যে গেল। কিন্তু এক ঝটকা লেগে ছোরাটা হাত থেকে ছিটকে পড়ল। ততক্ষণে টিকা টুগের চাঁটি থেকে সামলে উঠেছিল। সে বসে থাকবার মেয়েই নয়। টপ করে ছোরাটা তুলে নিল বটে, কিন্তু রক্তাক্ত ক্লান্ত দেহে ব্যবহার করবার শক্তি ছিল না। টাউগদের সাহায্য করবে কি করে, তাই ভাবছিল টিকা। এদিকে টারজানের প্রতিপক্ষের বিকট ক্রী-ই-ই-গ-আঃ ডাক শুনে দূর থেকে টুগদের দলের লোকরা ছুটতে ছুটতে হাজির হয়েছিল। এদের ঠেকাতে না পারলে সর্বনাশ হবে। ছোরা চালাতে পারবে না টিকা, কিন্তু একটা কিছু ছুঁড়ে মারতে তো পারবে। কি ছুঁড়বে? শক্ত জিনিস কি আছে এখানে? টারজানের থলিটা খসে মাটিতে পড়েছিল। তাতে হাত লাগতেই, টিকা টের পেল ভিতরে শক্ত কিছু আছে।

থলির মুখটা টেনে খুলে হাত ঢুকিয়ে টিকা কয়েকটা ছুঁচলো মুখ লম্বাটে জিনিস বের করে আনল। বেশ ভারিও। জিনিসগুলোকে গায়ের জোরে টুগের দলের দিকে ছুঁড়ে মারল টিকা।

তার ফলটা যা হল, তাতে টিকা নিজেও কিছু কম চমকাল না। বাজ পড়ার চেয়েও জোরে একটা শব্দ। খানিকটা ধোঁয়া আর কড়া গন্ধ। এমন ভয়ংকর শব্দ এরা কেউ জন্মে শোনেনি। ভয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে টুগের দল আর টুগ নিজে তাদের নিজেদের আস্তানার দিকে দৌড় মারল। টারজান আর টাউগও হয়তো পালাত যদি না টিকা ছোরা আর থলি হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াত।

টারজান বলল, 'কি ওগুলো?'

'—তা তো জানি না। এখানে পেলাম।'

আরেক মুঠো লম্বাটে জিনিস বের করে দেখাল টিকা।

টাউগ বলল, 'ওগুলো কি?'

টারজান বলল, 'কি জানি। খুঁজে পেয়েছিলাম।'

এদিকে পাকা-দাড়ি খুদে বাঁদরটা ভয়ের চোটে মাইল খানেক গাছ থেকে গাছে পালিয়ে, শেষটা জড়োসড়ো হয়ে একটা ডালে বসেছিল। এইভাবে টারজানের বাবা কুড়ি বছরের ব্যবধান পার হয়ে ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।

●

জন্তুজানোয়ারদের বড় একট রসবোধ থাকে না। অবিশ্যি একথা থেকে ছোট বাঁদরদের বাদ দিচ্ছি। তাদের শুধু থাকে দুষ্টুমি। বড় বনমানুষদের ছেলেবেলাতেও যেমন থাকে। তবে ওরা বড় তাড়াতাড়ি ধেড়ে হয়ে যায় আর মজা করতে ভুলে যায়। টারজানের সমবয়সী বন্ধুদের বেলাও তাই হল। টারজানের হল মুস্কিল। নিজেকে বনমানুষীর ছেলেই ভাবুক আর যাই করুক, আসলে তো সে একটা মানুষ এবং অসভ্য আদিম ভাবাপন্ন মানুষের ছেলেও নয়। তার মা-বাপের অতি-সভ্যদেশের অভিজাত বংশে জন্ম হয়েছিল। ভাগ্যদোষে টারজান বনমানুষদের কাছে বড় হয়েছিল। তাদের হাবভাব ধরনধারণ আচার-আচরণই ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছিল। তবু তার শিরার সভ্য মানুষের রক্ত যাবে কোথায়। মানুষরা বুড়ো হলেও, তাদের রসবোধ শুকিয়ে যায় না, অবিশ্যি অনেক সময় কমে যায়। এই দুটো ধারা মিশে যাবার ফলে, টারজানের রসবোধের একটা বীভৎস দিকও তৈরি হয়েছিল। নিম্নলিখিত ঘটনা থেকেই সেটা প্রকট হবে। তবে একটা কথা হল, জন্তু-জানোয়ারদের কাছে মরে যাওয়া একটা সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা, ওতে কোনো বীভৎসতা নেই। দরকার মতো মেরে ফেলাতেও নেই। পাগল না হলে বা ভয় না পেলে মিছিমিছি কোনো জানোয়ার জীবহত্যা করতে চায় না

এবার গল্পটা বলি।

সেদিন টারজানের একটু মজা করার ইচ্ছা হল। তাহলে এম্‌বঙ্গার গ্রামের কাছে যেতে হয়। তারা শত্রু হলেও মানুষ তো, মজাও বোঝে। তাছাড়া তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা দেখে অনেক শেখা যায়। অবিশ্যি তারা বড় নিষ্ঠুর। অসহায় বন্দীদের মেরে খায় এটুকু টারজান বুঝত। কিন্তু মারবার আগে তাদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করত, সেটা সহ্য করতে পারত না। তাই ওদের দু-চক্ষে দেখতেও পারত না।

প্রথমে যত্ন করে নিজের চুল ছাঁটল টারজান। ক্ষুর কাঁচি তো নেই। কিন্তু চুলগুলো চোখের ওপর পড়লে দেখবার অসুবিধা হয়, ঘাড়ে পড়লে গরম লাগে। তাই একটা বড় ঝিনুককে একটা গোল নুড়িতে ঘষে ঘষে এমনি ধারালো করে ফেলেছিল যে তাই দিয়ে স্বচ্ছন্দে চুল কেটে ফেলত।

ভেবেছিল প্রথমে ক্যাবিনে যাবে, কিন্তু বনের মধ্যে কালোমানুষদের গন্ধ পেয়ে তার কারণটা অনুসন্ধান করতে গেল। মহা হৈ-চৈ করে তারা যা করছিল, একবার দেখেই টারজান তার মানে বুঝেছিল। নুমাকে ধরবার জন্য চার-কোণা একটা শক্ত খাঁচা তৈরি হয়েছিল। তাতে চারটে চাকা লাগানো। খাঁচায় একটা পাঁঠা বাঁধা। খাঁচার দরজাটা উঠিয়ে রাখা। খাঁচায় ঢুকে পাঁঠা ধরে টান দিলেই দরজাটা ঝুপ করে পড়ে বন্ধ হয়ে যাবে। পাঁঠার সঙ্গে নুমাও বন্দী হবে। তখন খাঁচা টেনে গাঁয়ে নিয়ে গেলেই হল। কোনো ইউরোপীয় কোম্পানির কাছে সিংহ বিক্রি করা এদের উদ্দেশ্য নয়। এক সময় বেলজিয়ান কঙ্গোর প্রজা ছিল এরা। তাদের অত্যাচারে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তাদের সঙ্গে কোনো কারবার করে না আজ অবধি। তবে সিংহের ছাল কাজে লাগে, মাংসটাও মন্দ নয়।

দেখতে দেখতে টারজানের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। কালোরা গ্রামে ফিরে গেলে, গাছ থেকে নেমে এসে, টারজান প্রথমে পাঁঠাটাকে কেটে, পরিষ্কার করে, মাটিতে পুঁতে রাখল যাতে অন্য জানোয়ারে নাগাল না পায়।

এদিকে গাঁয়ের পথে যেতে জাদুকর রাবা কেগা সব চেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। বয়সও হয়েছে, তার ওপর খায়দায় থাকে ভালো, একটু কুঁড়েও হয়ে গেছিল। গাঁয়ে পৌঁছবার একটু আগে কেগা বিশ্রাম করতে বসল। অন্যরা এগিয়ে গেল।

এই হল সুযোগ। এই সময় একটা বিষাক্ত পোকা রাবা কেগার গালে বসে হুল ফুটিয়ে দিল। ঐ পোকার হুলেই মানুষ মরে। কেগা পোকাটাকে মেরে ফেলে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কে একটা গাছের ডাল থেকে ওর পিঠে নেমে এল। ভয়ে আধমরা হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বুড়ো। অমনি পাঁঠাবাঁধা দড়ি দিয়ে তার হাত দুটোকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে টেনে তুলে, সামনে সামনে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। এতক্ষণে সাদা দৈত্যকে চিনতে পেরে হতাস হল জাদুকর।

খাঁচার কাছে পৌঁছে ঠিক পাঁঠাটার মতো করে বুড়োকে বেঁধে রাখল টারজান। সে তো মহা ক্যাওম্যাও কান্নাকাটি জুড়ে দিল। পাছে গাঁয়ের লোকরা শুনতে পায়, তাই তার মুখে এক মুঠো লম্বা ঘাস আর একটা কাঠের টুকরো পুরে আচ্ছা করে বেঁধে, টারজান বিদায় নিল। পাঁঠাটাকে খুঁড়ে তুলে, যতটা পারে খেয়ে, বাকিটা আবার পুঁতে রেখে, ঝরনার উৎস থেকে মিষ্টি জল খেয়ে, হাতমুখ ধুয়ে, একটা ভালো জায়গা দেখে শুয়ে ঘুমিয়েও পড়ল।

এদিকে কালোরা গাঁয়ে পৌঁছে দেখে রাবা কেগা তো সঙ্গে নেই। তাকে কেউ পছন্দ করত না, কারো তেমন ভাবনা হল না। খানিক বাদে এমবঙ্গাই একদল জোয়ান পাঠাল খুঁজে দেখতে। তারা কিছুদূর গিয়ে মস্ত এক মৌচাকের সন্ধান পেয়ে সেইটেকে কেটে নিয়ে এল। সকলে এত খুশি হল যে রাবা কেগার কথা কারো মনে পড়ল না।

জীবনই বল আর খ্যাতিই বল, বা ক্ষমতাই বল, কি সভ্য জগতে কি আদিম পরিবেশে, সবই ক্ষণস্থায়ী, দুদিনেই লোক ভুলে যায়। অন্য কাউকে নিয়ে মেতে ওঠে। রাবা কেগাকে না নিয়েই যখন জোয়ানরা ফিরে এল, এম্‌বঙ্গা প্রথমটা রেগে গেল, তারপর মধু দেখে গলে গেল। ধূর্ত টুবুটো ছোকরা জাদুকরের সাকরেদি করত সে গদী পাবার জন্য তৈরি।

পরদিন সকালে দলবল নিয়ে এম্‌বঙ্গা খাঁচা দেখতে গেল। দূর থেকে সিংহের গর্জন শুনে তারা মহাখুশি হল। কাছে গিয়ে দেখে কালো চুল সোনালী গা বিশাল এক সিংহ খাঁচার মধ্যে লাফালাফি করছে। পাঁঠার চিহ্ন নেই। তার জায়গায় রাবা কেগার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ, হাতবাঁধা, মুখে কাঠ গোঁজা অবস্থায় পড়ে আছে। সবাই এ ওর মুখের দিকে চাইল। খালি টুবুটো বলল, 'সাদা অপদেবতা ছাড়া আর কারো কাজ নয় এটা।'

কেউ প্রতিবাদ করল না। টারজান লুকিয়ে গাছে বসে নিজের তামাসার সাফল্য দেখে আহ্লাদে আটখানা। যদিও রাবা কেগা মরেছে বলে কারো দুঃখ ছিল না, তবু তার একটা পদমর্যাদা ছিল, তাই যা যা করনীয় সবই করা হবে

সন্দেহ নেই।

শেষটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে খাঁচা ঠেলে গ্রামে এনে ফটক বন্ধ করা হল। বেড়ার পাশের গাছের পাতার আড়াল থেকে টারজান সবই দেখতে পাচ্ছিল। খানিক বাদে যখন বর্শার খোঁচা দিয়ে আর ঢিল মেরে নুমাকে নির্যাতন করা শুরু হল, তখন তার অসহ্য মনে হল। নুমার সঙ্গে তার আজন্ম শত্রুতা, তবু তারা সর্বদা লড়েছে সমানে সমানে। এ কি জঘন্য নীচতা! নুমাকে ছেড়ে দিয়ে এদের কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার। কিছুক্ষণ পরে দেখল খাঁচার কাছে দুজন পাহারা বসল, যাতে মেয়েরা আর ছোটরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়েই সিংহটাকে শেষ করে না দেয়। মজা আরম্ভ হবে সন্ধ্যায়। নাচ, মন্ত্রপড়া দিয়ে। চটপট নিজেদের ডেরায় ফিরে গেল টারজান। একটা ফোঁপরা গাছে ওর ধনসম্পদ লুকোনো থাকত। সেখানে ঐ গ্রাম থেকে চুরি করা সিংহের ছালটাও ছিল। সেটা নিয়ে আবার বনের মধ্যে দিয়ে গাঁয়ে ফিরে গেল টারজান।

সেখানে উৎসব শুরু হয়ে গেছে। নাচের মধ্যে দিয়ে সিংহ-শিকার দেখাচ্ছিল যোদ্ধারা। পাহারাদাররাও দর্শক-দের মধ্যে গিয়ে বসেছিল। খাঁচার আড়ালে দাঁড়িয়ে টারজান ছালটা গায়ে জড়িয়ে নিল। এদের নিয়ম ওর জানা ছিল। নাচ থামলে এম্বঙ্গার ইঙ্গিতে বর্শা নিয়ে এরা বন্দী সিংহকে আক্রমণ করবে। তাই দর্শকদের সরিয়ে একটা চওড়া রাস্তা মতো করে নেওয়া হল। হঠাৎ টারজান অবিকল সিংহের ডাক ছেড়ে গুঁড়ি মেরে ঐ পথটাতে দেখা দিল। সবাই স্তম্ভিত। আরেকটা গর্জন দিতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে সবাই পালাল।

যোদ্ধারা অবিশ্যি শিকারের বড় বর্শা নিয়ে ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এল। তখন উৎসবক্ষেত্র জনশূন্য। প্রকাশ্য ভাবে সিংহবেশী টারজান খোলা পথে বেরিয়ে এসে দু-পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে, সিংহের ছাল গা থেকে খসিয়ে ফেলল। তলা থেকে সাদা অপদেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখে প্রথমটা সকলে স্তম্ভিত, তারপর যুদ্ধের ডাক দিয়ে তেড়ে এল। টারজান চকিতে গাঁয়ের উল্টো দিকে গাছের ডালে। তারপর গাছের অন্য ধার দিয়ে টুপ করে আবার একটা কুঁড়ে ঘরের আড়ালে নেমে এক দৌড়ে দড়ি টেনে, খাঁচার দরজা খুলে দিল। অমনি সিংহটাও লাফিয়ে বাইরে এল।

যোদ্ধারা টারজানকে বৃথা খুঁজে ফিরে খাঁচার কাছে এসে সিংহ দেখে রেগে চতুর্ভুজ হল। যত সব চালাকি। ও কি ভেবেছে আমাদের। বর্শা দিয়ে এক্ষুণি দেবত্ব দেখাচ্ছি!

একসঙ্গে সবাই সিংহের দিকে তেড়ে গেল। মেয়েরাও ছেলে-পুলে নিয়ে মজা দেখতে বেরিয়ে এল। বাবা! অবিকল সিংহ সেজে এসেছে! কে বলবে সত্যিকার সিংহ নয়। কিন্তু তার পরেই নুমা যখন ডাইনে বাঁয়ে একেক থাবার বাড়িতে খুলি ফাটাতে আরম্ভ করল, তখন ওদের চক্ষুস্থির। কে কোন দিক দিয়ে পালাবে ভেবে পায় না!

একজন গ্রামবাসী বুদ্ধি করে ফটক খুলে দিতেই যত জন পারল ছেলেপুলে নিয়ে হুড়মুড় করে বনে পালিয়ে গাছে আশ্রয় নিল। আর যারা পারল না তারা সকলে তাদের সম্ভাব্য শিকার নুমার শিকার হল। দেখতে দেখতে গ্রাম খালি হয়ে গেল। মৃতদেহের স্তূপের মধ্যিখানে নুমা একা দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটিমাত্র মরা মানুষকে মুখে করে ধীরে সুস্থে সে-ও বনে চলে গেল।

আরো অনেক পরে গ্রামবাসীরা সাহস করে ঘরে ফিরল। তারা বলাবলি করছিল এ গ্রামে আর নয়। সকালে অবিশ্যি সঙ্কল্পটা অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল।

এই হল বনের একটা বুনো তামাসার গল্প, যার অনেক-খানি অতি বীভৎস।

●

আকাশে মস্ত গোল চাঁদ, মনে হচ্ছে যেন অনেকটা কাছে এসেছে। সেদিন রাতে টারজান একা বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মতো যোদ্ধা, তার মতো শিকারী কে আছে! দিনের বেলা বনের দেবতা কুদ্দুর জঙ্গল—আর রাতের দেবতা গোরো,—তার জঙ্গল একেবারে আলাদা। আলো অন্ধকার, জানোয়ার, ফুল, পাখি, সব দুজনার দু-রকম।

আজ রাতে টারজান একটা মস্ত চক্কর দিচ্ছিল, পুব থেকে দক্ষিণে, এখন আবার ঘুরে উত্তরমুখো চলেছে। দিনের বেলার চেনা শব্দের সঙ্গে এখন নতুন সব শব্দ মিশেছে। বড় জলের তলায় কুদ্দু তার বাসায় যাবার আগে এ-সব শোনা যায় না। এগুলো গোরোর শব্দ।

হঠাৎ গোমানগানিদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে, নাকে এল কাঠপোড়া ধোঁয়ার কড়া গন্ধ। আরেকটু এগোলেই দেখল মস্ত বড় ধুনি জ্বালানো হয়েছে। তার চারদিকে জনা বারো কালো যোদ্ধা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। তাদের ঘিরে একটা কাঁটার বেড়া বা বোমা তৈরি করা হয়েছে, যাতে বুনো জানোয়াররা কোনো ক্ষতি করতে না পারে। বেড়ার বাইরে জোড়া জোড়া চোখ অন্ধকারে জ্বলছিল। যোদ্ধাদের একজন উঠে একটা জ্বলন্ত কাঠ খুঁড়ে মাঝে মাঝে তাদের তাড়িয়ে

দিচ্ছিল। আবার একটু পরেই চোখগুলো দেখা দিচ্ছিল। ওগুলো নুমা আর সাবরের চোখ। খিদের চোটে ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

যোদ্ধাদের অবস্থা কাহিল। সবাই ভয়ে শুয়ে পড়েছিল। ঐ একজনই সিংহ তাড়াবার চেষ্টা করছিল। শেষটা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারলেও, পালানো দূরে থাক, নুমা এক লাফে বোমা ডিঙিয়ে এক বেচারাকে মুখে করে আবার বাইরে গেল। খানিক বাদে ফিরে এসে আরেকটা লোককেও তুলে নিয়ে গেল। টারজান গাছে বসে সব দেখল। এখন আর তার মজা লাগছিল না। হাই তুলে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে, সে দলের ডেরায় ফিরে, নিজের প্রিয় গাছটার ফ্যাকড়ায় শুল। তবু ঘুম এল না। সর্বদা ওর এক ইচ্ছা, যা কিছু দেখবে, শুনবে, তাকে জানবে, বুঝবে। লোকে কেন বাঁচে, মরে, তাও জানতে চাইত। হৃৎপিণ্ড জখম হলে, ধুকপুক থেমে গেলে, সবাই মরে যায়, এটা দেখেছিল। কিন্তু প্রকৃতির নানা ব্যাপারের কারণ কে ওকে বলে দেবে? গুণ্টোকে জিজ্ঞাসা করেছিল বৃষ্টি কেন পড়ে। সে বুড়ো তো হাঁ করে খানিক তাকিয়ে থেকে আবার উকুন বাছায় মন দিয়েছিল। কোনো ফুল দিনে ফোটে, কোনো ফুল রাতে। মুমগা তাই শুনে অবাক, ব্যাপারটা ওর চোখেই পড়েনি।

টারজান দেখেছিল কোনো কোনো ফুল সর্বদা সূর্যের দিকে মুখ ফেরায়, বাতাস নেই তবু কোনো কোনো পাতা নড়ে-চড়ে। লতারা গাছ বেয়ে ওঠে। এরাও তবে জ্যান্ত প্রাণী! যেমন কুদ্দু গারোর সঙ্গে, তেমনি ওদের সঙ্গেও টারজান কথা বলত। কেউ উত্তর দিত না এই দুঃখ। ওর কথার জবাব না দিলেও, পাতারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে নিজেদের ভাষায় কথা বলে, এটা সে নিজের কানে শুনেছিল।

আজ রাতে গোল চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে, হঠাৎ একটা কথা মনে হল! অমনি টাউগকে ঠেলে তুলল। এক মুহূর্তে টাউগ সজাগ, কোনো বিপদ হল বুঝি! টারজান তারাগুলোকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ দেখ আকাশের নুমা-শাবর-শীতা-ডাঙ্গোর চোখ জ্বলছে। ওরা খাপ পেতে আছে, গোরোর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্য। দেখতে পাচ্ছ গোরোর চোখ মুখ নাক? ওগুলো থেকে আলো বেরোচ্ছে। ও কিসের আলো বলব? গোরো মস্ত ধুনি জ্বেলেছে, ওদের তাড়াবার জন্য। এক দিন ওরা মরিয়া হয়ে গোরোর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। গোরোকে মেরে ফেললে রাতে আর আলো থাকবে না। বন পাহাড় ঘুটঘুটে অন্ধকার হবে। যেদিন গোরো উঠতে দেরি করে, সেদিন যেমন হয়।'

এসব কথা শুনে টাউগ হাঁদার মতো আকাশের দিকে চেয়ে রইল। এমন সময় একটা উল্কা ছুটে গেল। টারজান বলল, 'ঐ দেখ, গোরো নুমার দিকে জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়েছে।' টাউগ ভয় পেল। বলল, 'কি যে বল! নুমা তো মাটিতে থাকে, সে আকাশে যাবে কেন?' কিন্তু তবু সে তারাদের দিকে তাকিয়ে রইল যেন নতুন কিছু দেখছে।

টারজানের ঐ রকম সব অদ্ভুত কথা শুনে বনমানুষরা ঘাবড়ে যেত। টারজানের ওপর রেগে যেত। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, 'ওর জন্য না আমাদের বিপদ হয়। আকাশের নুমাকে একদিন না নামায়!'

গুণ্টো বড় বোকা। সে বলল, 'তাহলে টারজানকে মেরে ফেলাই উচিত। ও তো আর সত্যি বনমানুষ নয়।'

কিন্তু তাই শুনে টাউগ ক্ষেপে গেল। 'কি! টারজানকে মারবে? আগে টাউগকে মেরো, তারপর।' টারজানের সঙ্গে সে যে কত রকম কৃতজ্ঞতার সূত্রে বাঁধা সে বিষয়ে আর কি বলবে। টিকাকে বাঁচিয়েছে, গাজানকে বাঁচিয়েছে, ছোটবেলার বন্ধু ওর। ওকে কখনো ছাড়তে পারবে না টাউগ।

কিন্তু অন্যরা কেউ কেউ গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল, টারজান গোরোকে মারতে চায়। ওকেই মারা উচিত। একথা টিকার কানে যেতেই, সে গিয়ে টাউগকে বলল। টাউগ রেগে লাফিয়ে উঠল। এরা সব কি? এমন সময় একটা মোটা-সোটা ইঁদুর দেখে সেটা শিকার করার দিকে মন গেল, টারজানের বিষয়ে কিছু করা হল না। বনমানুষরা ঐ রকম।

এদের কাছ থেকে কয়েক মাইল দূরে, টানটরের চওড়া মাথায় শুয়ে, একটা ছুঁচলো কাঠি দিয়ে ওর প্রকাণ্ড কানের তলায় চুলকে দিতে দিতে, যা মনে আসছিল তাই বকে যাচ্ছিল টারজান। টানটরের মতো শ্রোতা পাওয়া দায়, যদিও টারজানের কথার প্রায় কিছুই সে বুঝছিল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টানটর তার গা দোলাচ্ছিল আর তার এই ভালোবাসার মানুষটির কথা আর কান চুলকুনি উপভোগ করছিল।

নুমা একবার ঘুরে গেল। টানটর তার গন্ধ পেয়ে ডাক ছাড়ল। টারজান বলছিল, 'দেখ টানটর, জীবনটা বড় ভালো। কেমন ছায়ায় শুয়ে সবুজ গাছপালা, কত রঙের ফুল দেখা যায়। বুলামুটুমুমো বড় ভালো। সে তোমার জন্য কেমন কচি পাতা আর গাছের ছাল আর কচি ঘাস দিয়েছে। আমার জন্য বারা হরটা আর অন্য জানোয়ার দিয়েছে,

ফলমূল বাদাম দিয়েছে। সে খালি চায় যে আমরা গায়ের জোর আর বুদ্ধি খাটিয়ে ও-সব জোগাড় করে আনি।' তাই শুনে টানটর গলায় একটু নরম আওয়াজ করে, টারজানের গালে শুঁড়ের ডগা বুলিয়ে দিল।

টারজানের কথায় টানটর এটা ওটা মুখে দিতে দিতে বনমানুষদের ডেরার দিকে চলল। টারজান ওর মাথায় আর পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে, হাতের ওপর মাথা রেখে বকে যেতে লাগল। ওরা ডেরায় পৌঁছবার আগে একজন কালো যোদ্ধাও ঐ পথে গেল। প্রথম পাহারাদার ওকে একা আসতে দেখে কিছু বলল না। কিন্তু খোলা জায়গাটাতে পৌঁছতেই পিছন থেকে শোনা গেল ক্রী-ই-ই-গ-আঃ! অমনি ধেড়ে বনমানুষরা উত্তর দিতে দিতে ছুটে এল। যোদ্ধার নাম বুলাবানটু। সে বড় সাহসী, এম্‌বঙ্গার পরেই তার স্থান। সে বুঝল এদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া প্রায় অসম্ভব, তবু, বর্শা তুলে সে প্রস্তুত হয়ে রইল। মরতে হলে লড়াই করে মরবে।

ততক্ষণে টারজান আর টানটরও এসে পড়েছিল। ঐ ডাক শুনে টানটরের মাথা থেকে টারজান গাছের ডাল ধরে ঝুলে, দেখতে দেখতে অকুস্থলে পৌঁছে, বিকট চিৎকার দিয়ে বনমানুষদের পাশে দাঁড়াল। তারপর একজনকে জিজ্ঞাসা করল গোমানগানিটা কি করেছে? না, কিছুই করেনি। গোজান পাহারা দিচ্ছিল, সে জানান দেওয়াতে সবাই ছুটে এসেছে। এবার লোকটাকে চিনতে পারল টারজান। কাল রাতে একমাত্র এ-ই সিংহের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। এমন সাহসী লোককে মেরে ফেলা উচিত নয়। ও তো কাউকে আক্রমণ করেনি।'

তবু কয়েকজন চ্যাঁচাতে লাগল, 'গোমানগানি আর টারমানগানি, দুটোকেই মেরে ফেল!'

গোজান বলল, 'সাদা বনমানুষটাকে মেরে ফেল! ও তো একটা ছাল-ছাড়ানো গোমানগানি!'

গুণ্টো চেঁচিয়ে উঠল, 'টারজানকে মারো!'

একটা বিশাল দেহ তেড়ে এল ওদের দিকে, সামনে যারা পড়েছিল হাত দিয়ে তাদের সরিয়ে দিয়ে। সে টাউগ ছাড়া কেউ নয়। কে বলছে টারজানকে মার? আগে টাউগকে মারুক সে। এসো, কে টাউগকে মারতে চাও। তার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বের করে ডাঙ্গোকে খাওয়াব! এসো!

গুণ্টো বলল, 'আমরা তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারি। আমরা দলে ভারি।' টারজান টাউগ দুজনেই জানত যে কথাটা সত্যি।

টারজান বলল 'আমি টারজান। আমার মত বড় যোদ্ধা, বড় শিকারী আর নেই। তার পরে একে একে দুই পক্ষের পুরুষরা নিজেদের বীরত্বের কথা বলতে বলতে, ক্রমে কাছাকাছি আসতে লাগল। লড়াইয়ের আগে ওরা এই রকম করে। গুণ্টো টারজানের কাছে এসে দাঁত খিঁচোল। টারজান চাপা গর্জন করল।

এদিকে বুলাবাণ্টু সব দেখে অবাক হচ্ছিল। ওদের কথা না বুঝলেও, ওর মনে হল এক দল ওকে রক্ষা করতে চায়, একদল মারতে চায়। সাদা বনদেবতা বোধ হয় ওকে বাঁচাতে চায়! এর আগেও সে এম্‌বঙ্গার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, টিবো আর টিবোর মায়ের প্রাণ বাঁচিয়েছিল, বুলাবাণ্টুকেও সাহায্য করা তার পক্ষে আশ্চর্য নয়। কিন্তু কি করে বাঁচাবে তা বুলাবাণ্ট ভেবে পাচ্ছিল না।

গুণ্টো ক্রমে টারজানকে আর টাউগকে ঠেলে বুলাবাণ্টুর কাছে নিয়ে যাচ্ছিল! এবার গুণ্টো আক্রমণ করবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য পুরুষগুলো। তখন টারজান অদ্ভুত সুরে একটা ডাক দিয়ে, টাউগের সঙ্গে আক্রমণের জন্য তৈরি হল আর বীর বুলাবাণ্টু দুই দলের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় আক্রমণকারী পুরুষদের পিছন থেকে বিশাল একটা পাহাড়ের মতো টানটর তেড়ে এল, তার বন্ধুকে সাহায্য করতে। টানটরের বিকট বৃংহনে চারদিক কাঁপতে লাগল।

ঐখানেই লড়াইয়ের শেষ। কেউ কারো গায়ে একটা দাঁত-ও বসাল না। টানটরের ডাকে বীর বনমানুষরা পালিয়ে একেকটা গাছে উঠে পড়ল। টাউগও তাদের সঙ্গ নিল। খালি টারজান আর বুলাবাণ্টু দাঁড়িয়ে থাকল। কালো মানুষটি পালায়নি, কারণ সাদা দেবতা পালায়নি। সে ভাবছিল হাতিটা দুজনকেই মেরে ফেলবে। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল হাতিটা সাদা দেবতার সামনে এসে শুঁড় দিয়ে তাকে আদর করতে লাগল। টারজান বুলাবাণ্টুকে পথ দেখিয়ে বলল, 'এবার তুমি যাও! সেও আর দেরি না করে রওনা হয়ে গেল। তাকে যতক্ষণ দেখা যায়, টারজান টানটরের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর টানটরকে বলল, 'আমাকে তুলে নাও।' টানটর ওকে মাথায় তুলে নিল।

টারজান বনমানুষদের ডেকে বলল, 'টারজান চলে যাচ্ছে, জলের ধারে তার নিজের বাসায়। টাউগ আর টিকা ছাড়া তোমরা সকলে বড়ই বোকা। ওরা দুজন আমাকে দেখতে আসতে পারে। বাকিদের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখব

না।' এই বলে হাতির মাথায় চেপে টারজান বিদায় নিল। বনমানুষরা হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

সেদিন সন্ধ্যার আগে টারজানকে আক্রমণ করার জন্য গুণ্টোর সঙ্গে টাউগের মারামারি হল। ফলে গুণ্টো মারা গেল।

এরপর এক মাস দলের কারো সঙ্গে টারজানের দেখা হয়নি। অনেকের তার জন্য মন কেমন করত, শুনলে টারজান অবাক হত। টাউগ টিকা যাব-যাব করেও গিয়ে উঠতে পারেনি। একদিন রাত্রে টাউগ শুয়ে শুয়ে গোল চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবছিল, টারজান বলেছিল তারাগুলো হিংস্র জানোয়ারের চোখ। তারা গোরোকে খেয়ে ফেলতে চায়।

হঠাৎ একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটল। গোরোর একটা ধার অদৃশ্য হয়ে গেল, যেন কিছুতে কামড়ে নিল। ক্রমে আরো খানিকটা অদৃশ্য হল। তখন টাউগ ক্রী-ই-ই-গ-আঃ বলে ডাক দিল। টাউগ বলল, 'দেখ, দেখ, আকাশের নুমা গোরোকে খেয়ে ফেলছে! টারজান যখন এ-কথা বলেছিল, তোমরা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে। এখন সে ছাড়া গোরোকে কে বাঁচাবে? তুম-তুম নাচ কি বন্ধ হয়ে যাবে গোরোর অভাবে? টারজানের ক্ষতি করতে যারা চেয়েছিলে তাদের একজন যাও, তাকে ডেকে নিয়ে এসো। তোমরাই তাকে তাড়িয়েছ।'

বনমানুষরা তো ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করেছিল। কারো এত সাহস নেই যে একা গিয়ে টারজানকে ডেকে আনে। শেষে টাউগ বলল, 'বেশ, আমিই যাচ্ছি।' এই বলে সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে রওনা দিল। ততক্ষণে নুমা গোরোর আধখানা গিলে বসে আছে! কুদ্দু আসবার অনেক আগেই যদি সবটা খেয়ে ফেলে!!

যখন টাউগ টারজানকে নিয়ে ফিরল, গোরোর সামান্যই বাকি ছিল। টারজান কথা বলে সময় নষ্ট না করে সবচেয়ে উঁচু গাছটাতে উঠে পড়ল। তার পিঠে তূণ ভরা বিষমাখা তীর, কাঁধে ধনুক ঝুলছে। ওর পিছন পিছন টাউগও গাছটাতে চড়ল। একেবারে মগডালের কাছে উঠে গিয়ে, গোরোকে ওরা ভালো করে দেখতে পেল। প্রায় সবটাই গেছে। আকাশ কাঁপিয়ে টারজান যুদ্ধের ডাক দিল। আর সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে দূর থেকে সিংহের গর্জন শোনা গেল! নুমা ডাকে সাড়া দিয়েছে!

তখন ধনুকে তীর পরিয়ে একটার পর একটা তীর গোরোর শত্রুর বুকে হানল টারজান। তার টংকারে চারদিকে প্রতিধ্বনি উঠল। বনমানুষরা ভয়ে গাদাগাদি করে বসে পড়ল।

হঠাৎ টাউগের গলা শোনা গেল, 'দেখ! দেখ! টারজান নুমাকে মেরে ফেলেছে। তার পেট থেকে গোরো বেরিয়ে আসছে!'

বনমানুষরা তাকিয়ে দেখে সত্যিই তাই, নুমা মরে গেছে। গোরোকে আবার দেখা যাচ্ছে! টারজান গোরোকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এরপর কেরচাকের দলের বনমানুষরা টারজানের পরম ভক্ত হয়ে উঠল। টারজান ছাড়া আর কেউ যে গোরোকে রক্ষা করতে পারত, এ-কথা তারা ভাবতেই পারে না। এই ভাবে টারজান আবার কেরচাকের দলে ফিরে এসেছিল। সব বনমানুষরা তাকে শ্রদ্ধা করত আর ভালোবাসত। আরো পরে টারজান দলের রাজাও হয়েছিল।

খালি একজনের মনে টারজানের গোরোকে বাঁচাবার বাহাদুরি সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। তার নাম টারজান।

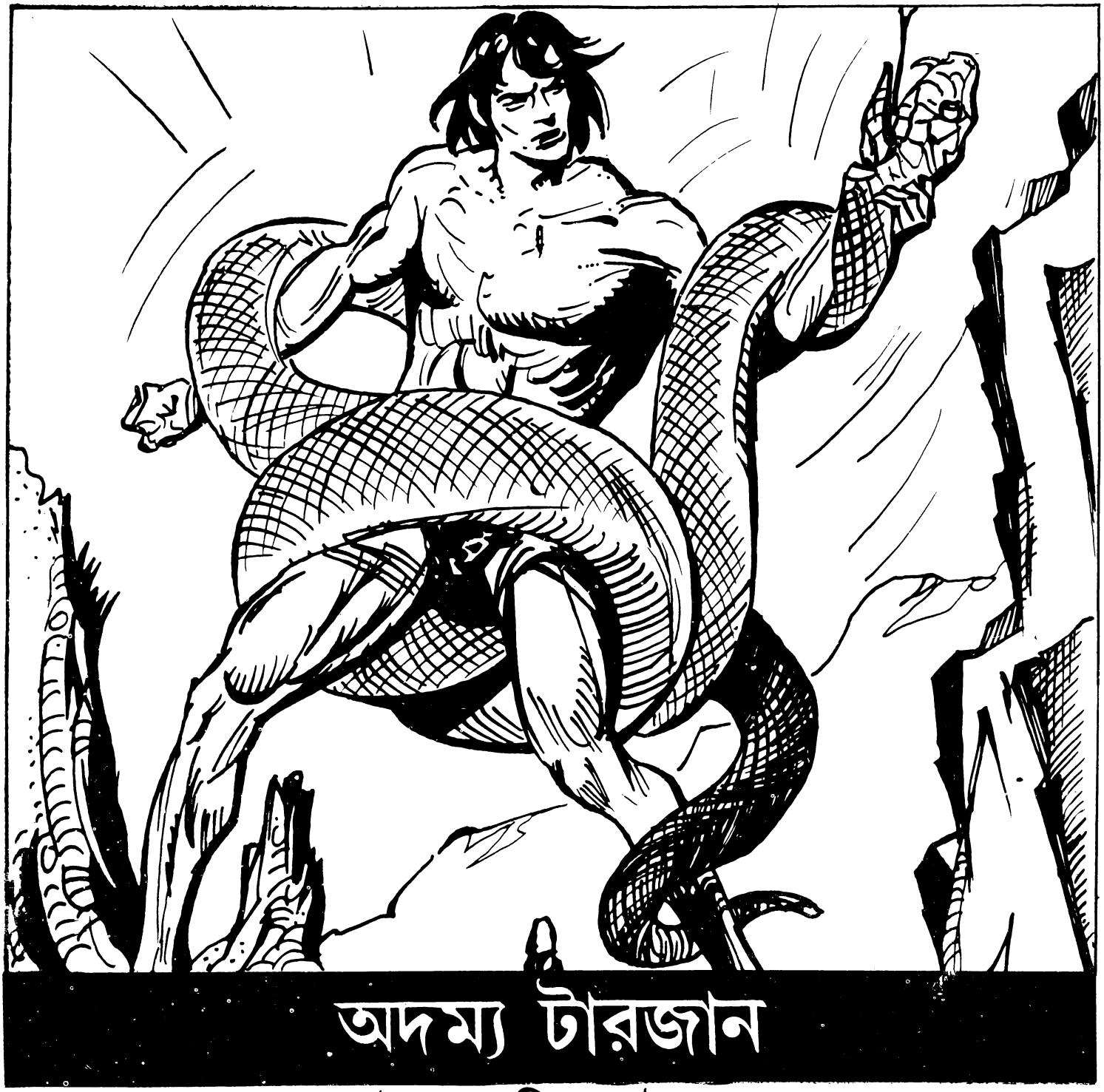

অদম্য টারজান

টারজান দি আনটেমড

এ গল্পের শুরু ১৯১৪ সালে, প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে। সে সময় আফ্রিকা মহাদেশকে ভাগ ভাগ করে নিয়ে শক্তিশালী ইংরেজ, ফরাসী, বেলজিয়ান, জার্মান ইত্যাদি ক্ষমতাশালী দেশগুলো নির্দ্বিধায় আফ্রিকাকে শোষণ করে নিজেদের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করত। ঘটনাক্রমে

আফ্রিকান প্রদেশগুলোর স্থানীয় বাসিন্দারা বিদেশী শাসকদের প্রসাদ বা আক্রোশ লাভ করত। তখন স্বেচ্ছায় আফ্রিকানরা কদাচিৎ ইউরোপীয় সভ্যতার আলোক গ্রহণ করত। নিজেদের আদিম জীবনধারা রক্ষা করার জন্যে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করত। বিশ্বযুদ্ধ বাধলে পর ইংরেজ-ফরাসী মিত্রপক্ষ,

জার্মানদের সঙ্গে আফ্রিকার নানা জায়গায় যুদ্ধ করেছিল। সে যুদ্ধের বর্বরতা আদিম অসভ্য আফ্রিকানদের বর্বরতাকেও হার মানায়। এ গল্পের মূলেও সেই বর্বরতার ঘটনা।

১৯১৪ সালের শরৎকাল। আফ্রিকাবাসী ইংরেজরা সকলে তখনো প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরুর কথা শোনেনি। তারা অনেকেই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না। জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোককে আমরা টারজান বলে জানি। ওয়াজিরি দেশের বলিষ্ঠ অধিবাসীরা টারজানকে বলত তাদের রাজা। সেখানে টারজানের বিশাল সম্পত্তি, জমিজমা ক্ষেত খামার। টারজান নিজে নাইরোবি গিয়েছিল কাজে। সেখানে যুদ্ধ আরম্ভ হবার খবর পেয়ে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিল। কারণ বাড়িতে জেন একা ছিল। অবিশ্যি ওয়াজিরি যোদ্ধারা যে প্রাণ দিয়েও তাকে রক্ষা করবে টারজান সে কথা জানত।

যুদ্ধের আবহাওয়ায় যানবাহনের অনিশ্চয়তার জন্যে টারজান সভ্য জগতের কাপড় চোপড় খুলে রেখে আগেকার মতো গাছের ডালে ঝুলে ঝুলে ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। বনের জীবজন্তুরা সকলে ওকে চিনত। আবার সেই পুরানো বেশে টারজানকে দেখে মানু বাঁদর থেকে নুমা সিংহ সকলেই চমকে উঠেছিল। দিনের পর দিন ঐ ভাবে টারজান চলেছিল, পুরানো বন্ধু কিম্বা শত্রুদের দেখেও দেখছিল না। রাতে কোনো গাছের ডালে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে আবার চলা। বেশি খিদে পেলে বারা হরিণ কি হর্টা বুনো শূয়োর সামনে পেলে, মেরে খাওয়া। তারপর আবার চলা। নাইরোবির খবর হলো জার্মানরা ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকা দিয়ে অভিযান শুরু করবে। টারজানের মন বলছিল খামারে গিয়ে না জানি কি সর্বনাশের দৃশ্য দেখতে হবে।

তারপর একদিন বনের সীমানায় দাঁড়িয়ে, চেয়ে দেখল সর্বনাশই বটে। বাংলোর চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না; কোনো সাড়াশব্দই নেই। কিন্তু যেখানে গোলাবাড়ি-গুলো ছিল, সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে, গোলাবাড়ি নিশ্চিহ্ন। বলিষ্ঠ ওয়াজিরি অনুচরদের বাড়িঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়েছে। ক্ষেতগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোয়ালে গোরু ভেড়া নেই; আস্তাবলে ঘোড়া নেই। চারদিকে মানুষ জন্তুর মৃতদেহের স্তূপের উপর শকুনরা চক্কর দিচ্ছে।

বুকের ভিতরটা পাথর হয়ে গেল। বাংলোতে ঢুকল টারজান। দেখল বসবার ঘরের দেয়ালে বিশ্বাসী অনুচর মুবিরোর ছেলে বিশাল দেহ ওয়াসিম্বুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। দেয়ালের যেখানে সেখানে রক্তমাখা হাতের ছাপ; ভাঙাচোরা উল্টে ফেলা আসবাব; পিয়ানোর উপর একজন অনুচরের আর জেনের ঘরের দরজার সামনে তিনজন বিশ্বস্ত অনুচরের মৃতদেহ ঐ ঘরে সংঘটিত নারকীয় কাণ্ডের সাক্ষ্য দিচ্ছে। জেনের ঘরের বন্ধ দরজা খুলে যখন টারজান ঢুকল তখন তার শরীরের রক্ত হিম, হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। দেখল জেনের খাটে হাল্কা একটা পোড়া দেহ। তাকে চিনতে পারা দায়, কিন্তু আঙুলের আংটিগুলি নিঃসন্দেহে জেনের। মাটিতে একটা ছেঁড়া, রক্তমাখা জার্মান সামরিক টুপি এই বীভৎস কাণ্ডের নায়কের পরিচয় দিচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে টারজানের পাষাণ হৃদয়ে শক্তি ফিরে এলো। সে আবার বেঁচে উঠল। জীবনের সব সুখের আশা ত্যাগ করে, এই জঘন্য অবিচারের জন্য যারা যারা দায়ী তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করে, নির্দোষ অসহায়দের উপর এই অত্যাচারের মাশুল আদায় করতে হবে। সেই জন্য টারজানকে বেঁচে থাকতে হবে; সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে হবে। চোখে তার এক ফোঁটা জল ছিল না।

তখন টারজান জেনের বড় শখের গোলাপ বাগানে তার আর তার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছিল, সেই সব ওয়াজিরি বীরদের সমাধি দিল। ততক্ষণে আকাশে চাঁদ উঠেছিল। টারজানের মন থেকে সভ্যতার মূল্যহীন খোলস খসে পড়ল। গোরোর দিকে দু'হাত তুলে সে প্রতিজ্ঞা করল, এ রকম জঘন্য অন্যায়ের এবং অন্যায়কারীদের সঙ্গে আজীবন সে লড়াই করবে। কোনো জার্মানকে সে আর ক্ষমা করতে পারবে না।

আবার সে সেই বনমানুষের ছেলে টারজান হয়ে গেল। ঐ ভাবেই সে লড়বে। সভ্য জগতের নিয়ম মানে স্বাধীন চলাফেরায় বাধা বিঘ্ন। সে সব তার পোষাবে না। তার মূল্য টারজানের জানা হয়ে গেছে। বাইরে চটক আর ভিতরে অন্তঃসারশূন্যতা। জার্মানরাও তো নিজেদের সভ্যতার চরম নিদর্শন বলে মনে করে। তাদের সংস্কৃতিই নাকি জগতে শ্রেষ্ঠ। সে গর্ব খর্ব করা দরকার। সভ্য জগতে কি-ই বা আছে? খালি লোভ, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা। তার চেয়ে বনবাসীরা শতগুণে ভালো।

তাই সিংহের ছাল পরে, কোমরে বাপের ছোরা, পিঠে তীর-ধনুক, গায়ে জড়ানো লম্বা মজবুত ঘাসের দড়ি, আর কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে ঝোলানো ভারি যুদ্ধের বর্শা —এ ছাড়া সে কোনো অস্ত্রশস্ত্রও সঙ্গে নিল না। মনেও শোক আর প্রতিশোধের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো ভাবের জায়গা ছিল না। টারজান এখন অন্য রকম মানুষ হয়ে

গিয়েছিল। জানোয়ারদের মতো সে ভবিষ্যতের চিন্তাও দূর করে দিয়েছিল। জানোয়াররা শুধু বর্তমানের কথা ভাবে।

এতক্ষণ পরে ক্লান্ত লাগছিল। গোরোর মুখও মেঘে ঢাকা। হয়তো এখনি ঝড় উঠবে। গাছের মাঝামাঝি জায়গায় ডালপালা সবচেয়ে বেশি ঘন, সেখান দিয়ে টারজান এগোচ্ছিল। নিচে থেকে শব্দ গন্ধ অন্য জন্তু-জানোয়ারের জানান দিচ্ছিল। এক সময় টারজান নিচের ডালে নেমে এলো। টের পেল নিচে নুমা তার শিকারের উপর বসে আছে। বুটো গণ্ডারও এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু আজ কারো সঙ্গে ঝগড়া করার ইচ্ছা ছিল না টারজানের।

অবশেষে এক জায়গায় পৌঁছে সে থামল। সেখানে গাছের উপরে একটা মাচা বাঁধা ছিল। তাতে শীতা প্যান্থার আরাম করে শুয়েছিল। ওর সাড়া পেয়ে শীতা গুড়-গুড় করে উঠল। টারজানের বুকের ভিতর থেকেও একটা চাপা গর্জন বেরিয়ে এলো। ছোরা হাতে টারজান ঠিক তার মাথার উপর পৌঁছে বলল, 'ছ্যাঃ! বালু-চোর! আমি টারজান। এটা টারজানের বাসা। কেটে পড়। নয়তো মেরে ফেলব।' বন-মানুষের ভাষা শীতা বুঝল কি না কে জানে। সে দু-পায়ে উঠে এক থাবার বাড়ি মারল। লাগলে টারজানের আধ-খানা মুখ উড়ে যেত। তা হলো না। সরে গিয়ে টারজান তাকে বর্শার খোঁচা মারল। শীতা ভাবল এ তো মহা জ্বালাল! এর একটা ব্যবস্থা করতে পারলে, শান্তি এবং উৎকৃষ্ট জলযোগ দুই-ই পাওয়া যাবে।

মাচা ছেড়ে শীতা ডালে নেমে এলো। দু'জনার ভারের চোটে ডাল ঝুলে পড়ল। এমন সময় ঝড়টা উঠল। গোঁ-গোঁ করে গাছপালা দুলিয়ে ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল। গোরো একে-বারে, ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

টারজান শীতাকে বর্শার খোঁচা দিতে দিতে একটু করে পিছু হটছিল। ডালটাও ক্রমে সরু হয়ে আসছিল। প্যান্থারটা রাগের চোটে একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিল। ঠিক তখনি টারজান বাঘের গর্জনের সঙ্গে গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শীতা দাঁত দিয়ে, নখ দিয়ে ওর নাগাল পেল না। টারজান ওর পিঠে লাফিয়ে পড়ে বুকে ছোরাটা আমূল বসিয়ে দিল। দু'জনে জড়াজড়ি করে, ডালপালা ভেঙে, মাটিতে পড়ল। শীতা বেড়ালদের যেমন নিয়ম, চারপায়ের উপর পড়ল। টারজান তখনো তার পিঠ আঁকড়ে রয়েছে। কিছুতেই তাকে ঝেড়ে ফেলা যায়নি। আরেকবার ছোরা খেয়ে, শীতা এলিয়ে পড়ল। টারজান তার গায়ে পা রেখে বনমানুষদের জয়ধ্বনি দিল।

যাক্, বাসা থেকে শত্রুকে তাড়ানো গেছে। টারজান এবার বড়বড় পাতাওয়ালা কিছু লতা এনে, বিছানা পেতে, গা-ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল। তখনো বৃষ্টি পড়ছিল, মেঘ ডাকছিল, কিন্তু টারজান শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

*

ঐ বৃষ্টি চব্বিশ ঘণ্টা ধরে পড়েছিল। যে সব পুরানো পদচিহ্ন দেখে টারজান এগোচ্ছিল সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। এমন একটা মেজাজ নিয়ে সে পথ চলেছিল যে মানু বাঁদর থেকে নুমা সকলে ওকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিল। তৃতীয় দিনে টারজান জার্মান ইস্ট আফ্রিকার এলাকায় পৌঁছল। ওর ইচ্ছা ছিল কিলিমাঞ্জারো আর তার পশ্চিমের পাহাড়গুলোকে এড়িয়ে, পাহাড়ের দক্ষিণে টাঙ্গার রেলপথে পৌঁছয়। ওর বিশ্বাস ছিল জার্মান বাহিনীও এদিকেই আসবে। দূরে গোলাগুলির শব্দ শুনে মনে হলো, ঐখানে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের মোকাবিলা হবে। যদিও সে এখন নিজেকে পুরোপুরি বনমানুষের ছেলে বলে ভাবছিল, তবু ইংরেজদের দিকে মন টানছিল, কারণ তারা জার্মানদের সঙ্গে লড়ছে। মনে মনে স্থির করল, পরে জার্মানদের খুঁজে বের করবে। আজ ঝড় ঝড়-বৃষ্টি, একটু আশ্রয় দেখে নিতে হবে। দুটো পাহাড়ের মাঝে সরু উপত্যকা। একটা পাহাড়ের খাড়া গায়ে একটা গুহা দেখা গেল। এখানে একটু বিশ্রাম করে গা শুকিয়ে নেওয়া যেতে পারে। গুহার মুখে নুমার গন্ধ পেল। তবে সে হয়তো বাড়ি নেই। হামাগুড়ি দিয়ে সাবধানে ঢুকল। সরু এক সুড়ঙ্গ, তার ও-মাথায় আলো দেখা যাচ্ছে। গুহায় এখন কেউ নেই। নুমা এই সময় এলে কি হবে, তা টারজানের জানা ছিল। কিন্তু নুমা এলো না। সুড়ঙ্গটা পাহাড়ের মধ্যে চারদিক ঘেরা একটা খোলা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছিল। জায়গাটা হয়তো একশ ফুট লম্বা, পঞ্চাশ ফুট চওড়া। হয়তো যুগ যুগ ধরে বৃষ্টি পড়ার ফলে পাথর ক্ষয়ে ঐ রকম গর্ত তৈরি হয়েছে। উপর থেকে একটা ছোট ঝরনা নেমে এসেছে। মধ্যিখানে একটিমাত্র বিশাল গাছ। চার-দিকে খোঁচা খোঁচা ঘাস।

ছোট বড় জন্তুর হাড়ের সঙ্গে মানুষের কংকালও ছড়িয়ে আছে। নুমা অনেক দিন এখানে খাওয়া-দাওয়া করেছে। সবে টারজান ভাবছিল সুড়ঙ্গের বাইরের মুখটা পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিলে নুমা ঢুকতে পারবে না। ঠিক সেই সময়

কালো কেশর নুমা সুড়ঙ্গের এ-মুখে দেখা দিল। টারজানকে দেখেই সে খাপ্পা। টারজানেরও রাগ হলো। ব্যাটা রাতের আরামটি নষ্ট করতে এসেছে। সে বনমানুষদের ভাষায় বলল, 'ভাগো। আজ আমি এখানে রাত কাটাব।' হাওয়া দূরে থাকুক, চাপা গর্জন দিয়ে সে এগিয়ে এলো। টারজান একটা পাথর তুলে সোজা তার নাকে মারল। নুমা বেজায় রেগে, লেজ খাড়া করে, বিকট গর্জন করতে করতে ভীষণ বেগে তেড়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে টারজান গাছে উঠে পড়ল। নুমাও গাছের চারদিকে ঘুরতে লাগল। এদিকে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নেমেছিল, তাতে টারজানের মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল। অথচ একটু আরামের জন্য প্রাণ বিপন্ন করে ঐ সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে লড়াই করাও বোকামি।

নুমা হঠাৎ ফিরে সুড়ঙ্গের দিকে চলল। সঙ্গে সঙ্গে টারজানও নেমে পাহাড়ের দিকে ছুটল। নুমা তাই দেখে ঘুরে সুড়ঙ্গ থেকে আবার বেরিয়ে এসে ওর পিছু নিল। বেড়ালের দক্ষতার সঙ্গে টারজান পাহাড়ের গা বেয়ে ত্রিশ ফুট উঠে একটু পা রাখার জায়গা পেয়ে, ফিরে দেখল নুমা পনরো-কুড়ি ফুট উঁচু লাফ দিচ্ছে, আবার পড়ে যাচ্ছে। এদিকে বহু কষ্টে আঁকড়ে-পাকড়ে টারজান উপরে উঠে, নুমার দিকে বড় একটা পাথর ছুঁড়ে হাঁটতে শুরু করল। নামা খুব সহজ। দূরে গোলাগুলির শব্দের দিকে রওনা দিয়েই, একটা কথা মনে হওয়াতে আবার ফিরে এসে, বাইরে থেকে বড় বড় পাথর দিয়ে নুমার গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়ে মনে মনে বলল, 'এই মানুষখেকো আর মানুষ খাবে না।'

সে রাতটা কাটল একটা পাথরের খাঁজের নিচে। পর দিন উঠে আবার যাত্রা শুরু। একবার থেমে ছোট একটা শিকার করে খাওয়া, তারপর আবার চলা। সারা দিন গোলাগুলির শব্দ কখনো বাড়ল, কখনো কমল। দ্বিতীয় দিন দেখল গোরু ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে জার্মানা ইউনিফর্ম পরা কালো সৈনিকরা চলেছে, সঙ্গে মাথায় শস্য ইত্যাদি খাবার জিনিস নিয়ে বাহকরা। অফিসাররা জার্মান। ওদের কাছাকাছি ঘণ্টা দুই ঘুরলেও ওরা কেউ টারজানকে দেখতে পায়নি। ওদের ইউনিফর্মের চিহ্নগুলো বাংলোতে পাওয়া টুপির চিহ্ন থেকে আলাদা। এরা অন্য দল। তাই এরা প্রাণে বেঁচে গেল। সব জার্মান নিধন করা টারজানের উদ্দেশ্য নয়। খালি যারা বাংলোতে গিয়েছিল তারা নিস্তার পাবে না।

যতই যুদ্ধের ফ্রন্টের কাছে যায়, ততই বেশি করে সৈনিক চোখে পড়ে। ট্রাক্, গোরুর গাড়ি, আহত সৈনিক কেউ হেঁটেই যাচ্ছে, কাউকে স্ট্রেচারে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হয়তো কোনো হাসপাতালে। সন্ধ্যায় পাহাড়ের পায়ের কাছে আড়াল করা একটা বড় ক্যাম্প দেখা গেল। টারজান পিছন দিক থেকে লক্ষ্য করল যে সেদিকে ভালো পাহারার বন্দোবস্ত নেই। কাজেই অন্ধকার হলে, সেদিক দিয়ে এগিয়ে তাঁবুগুলোর পিছনে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনবার চেষ্টা করতে লাগল, যদি দুষ্কৃতকারীদের কোনো সন্ধান পায়।

একটা তাঁবুতে কয়েকজন কালো সৈনিক কথা বলছিল। একজন বলল, 'ওয়াজিরিরা বেজায় লড়েছিল, কিন্তু আমরা সব্বাইকে মেরে ফেললাম। সব লোকগুলো মরলে ক্যাপ্টেন গিয়ে মেয়েটাকে মেরে ফেলল। আমাদের বলল, একটা আহত ওয়াজিরিকে দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ করতে। তার কষ্ট দেখে আমরা সকলেই একচোট হেসেছিলাম।'

হিংস্র শিকারী-জানোয়ারের মতো টারজান সব শুনল। তারপর যে লোকটা প্রথম কথা বলেছিল সে বেরিয়ে এসে টারজানের কাছ থেকে দশ ফুট দূরত্বে ক্যাম্পের পিছন দিকে চলল। একটা ঝোপের আড়ালে টারজান তাকে ধরে ফেলল। তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে গলা টিপে ধরল, যাতে টুঁ শব্দটি করতে না পারে। ঝোপের পিছনে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার গ্রামীণ ভাষায় বলল, 'এতটুকু শব্দ করবে না।' বলে গলা থেকে হাত তুলে নিল।

লোকটা হাঁপাতে লাগল। টারজান বলল, 'যে বাংলোতে তোমরা ওয়াজিরিদের সঙ্গে লড়েছিলে, সেখানে যে অফিসার মেয়েটিকে মেরেছিল, তার নাম কি?'

—'হপ্টম্যান শ্নাইডার।'

—'কোথায় সে?'

—'এই ক্যাম্পেই আছে। আবার হেড-কোয়ার্টারেও গিয়ে থাকতে পারে।'

—'আমাকে সেখানে নিয়ে চল। কেউ আমাকে দেখতে পেলে, তোমাকে মেরে ফেলব। ওঠ।'

ক্যাম্পের পিছন দিয়ে ঘোরা পথ ধরে একটা প্রকাণ্ড খড়ের গাদার পিছনে পৌঁছে, লোকটা একটা দোতলা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'হেড-কোয়ার্টার। আর এগোলে ওরা দেখতে পাবে। ওখানে অনেক সিপাই-সান্ত্রী।'

সেটা টারজানও বুঝেছিল। লোকটাকে বলল, 'তুমি ঐ ওয়াজিরিকে ক্রুশে ঝুলোতে সাহায্য করেছিলে?'

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বলল, উনি হুকুম দিলেন।'

—'কে হুকুম দিলেন?'

—'আণ্ডার লেফটেনাণ্ট ফন্ গস্। তিনিও এখানে আছেন।'

টারজান তখন লোকটার গলা ধরে শূন্যে চারবার ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, জেনারেল ক্রাউটের হেড-কোয়ার্টারের দিকে চলল। বাড়ির পিছনে একজন মাত্র প্রহরী।

হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে গিয়ে নিঃশব্দে তারও ভব-লীলা শেষ করে দিয়ে, মৃতদেহটাকে তুলে নিয়ে বাড়িটার দিকে এগোল। একতলায় আলো জ্বলছিল, দোতলা অন্ধকার। জানালা দিয়ে সামনে একটা বড় ঘর, তার পিছনে একটা ছোট ঘর দেখা যাচ্ছিল। বড় ঘরে অনেকজন অফিসার তাদের আফ্রিকা বিজয়ের গল্প করছিল। ভাবছিল কবে জার্মান সৈন্যদল প্যারিস পৌঁছবে। জেনারেলের সামনে একটা তেলের বাতি। দরজায় টোকা পড়ল; একজন আর্দালি এসে বলল, 'শ্রীমতী কিরচের এসেছেন।'

—'ভিতরে আসতে বল।'

এলেন তিনি, সুন্দরী, যুবতী, বছর উনিশ বয়স। গায়ের মুখের ধুলো কাদাতেও রূপ ঢাকা পড়ছে না। পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে জেনারেলকে দিলেন। তিনি সেটা খুলে পড়তে লাগলেন। মেয়েটিকে বললেন, 'বসুন।

ঘরে দু'জন ক্যাপ্টেন ছিল; তাদের একজন শ্লাইডার হতে পারে। মেয়েটি নিশ্চয় গুপ্তচর। জেনারেল কাগজ পড়া শেষ করে বললেন, 'খুব ভালো। মেজর শ্লাইডারকে ডাকো।'

টারজান চমকে উঠল। নারীহত্যার জন্যই পদোন্নতি নাকি! বাইরে থেকে সব দেখা এবং শোনা যাচ্ছিল। বোঝা গেল ঐ অঞ্চলে জার্মানরা ব্রিটিশদের চেয়ে দলে ভারি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারাই জিতছে।

আর্দালি ফিরে এলো, সঙ্গে মাঝারি লম্বা, উপর দিকে পাকানো গোঁপ একজন অফিসার। জেনারেল বললেন, 'ফ্রলাইন কিরচের, আপনার সঙ্গে মেজর শ্লাইডারের আলাপ করিয়ে দিই—' এই অবধি শুনেই একলাফে ঘরে ঢুকে টার-জান আলোটাকে ঠেলে জেনারেলের গায়ে ফেলে দিল। দু-জন অনুচর ছুটে এলো। টারজান একটাকে তুলে গায়ের জোরে তাকে অন্যটার মুখের উপর ফেলে দিল। ভদ্রমহিলা একটা চেয়ারে উঠে পড়লেন। গোলমালের মধ্যে শ্লাইডারকে কাঁধে তুলে কেউ কিছু বুঝবার আগেই টারজান জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। গলা টিপে ধরার দরুণ শ্লাইডার কোনো শব্দ করেনি। বাইরে প্রহরীর অনুপস্থিতিও কেউ লক্ষ্য করেনি।

ক্যাম্পের এলাকা পার হয়ে টারজান লোকটার গলার চাপটা একটু কমিয়ে বলল, 'টুঁ শব্দ করলে, আবার গলা টিপে ধরব।' তারপর সে কি নির্মম প্রতিশোধ। লোকটাকে সামনে সামনে সারারাত হাঁটাল।

টারজান অযথা কাউকে কষ্ট দিত না, কিন্তু এর কথা আলাদা। মরতে তো হবেই ওকে, যেমন জেনকে হয়েছে। তার আগে কষ্টও পেতে হবে, যেমন জেনকে কষ্ট দিয়েছিল। জেনের দেহে তার চিহ্ন ছিল।

জার্মান বন্দী টারজানকে বুঝে উঠতে পারছিল না। বুনোদের মতো বেশ। চমৎকার জার্মান ভাষায় কথা বলছে। এবার চোখের সামনে একটা হরিণের উপর লাফিয়ে পড়ে, দাঁত দিয়ে তার গলার শিরা কেটে, লোকটা হরিণটাকে মেরে, সেকি বিকট জয়ধ্বনি দিল? দর্শকের গা শিউরে উঠল। টারজান কাঁচা মাংস খেল, কিন্তু বন্দীকে কাঠ জ্বালিয়ে ঝলসে খেতে দিল। মাঝে মাঝে বিশ্রাম, তারপর আবার চলা। তৃতীয় দিনে সেই সিংহের গুহার উপরে পৌঁছলে, টারজান লোকটাকে নামতে ইশারা করল। সে পিছিয়ে আসতে, টারজান তাকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'নামো!'

'তারপর তাকে বলল, 'আমি লর্ড গ্রেস্টোক, ওয়াজিরিদের দেশে আমার স্ত্রীকে তুমি হত্যা করেছ। এবার বুঝলে তো আমি কেন তোমাকে নিয়ে এসেছি। নামো!'

জার্মানটি হাঁটু গেড়ে বসে বলতে লাগল, 'আমি তাকে মারিনি। দয়া কর। আমি ও-বিষয়ে কিছুই জানি না।'

টারজান বর্শা তুলে বলল, 'নামো!' তারপর তাকে নামতে সাহায্যও করল। প্রায় নিচে পর্যন্ত সঙ্গে গেল। তারপর গুহার মুখটা দেখিয়ে বলল, 'ওর মধ্যে একটা ক্ষুধার্ত সিংহ আছে। দৌড়ে ঐ গাছটায় চড়। ওর আগে পৌঁছলে এখনকার মতো বেঁচে যাবে।' তারপর লোকটাকে ঠেলে

দিয়ে বলল, 'দৌড়ও।'

প্রায় গাছের গোড়ায় পৌঁছে গেছে, এমন সময় বিকট গর্জন করে সিংহটাও ছুটে এলো। শ্লাইডার আগে পৌঁছল। সিংহ গাছের নিচে অপেক্ষা করতে লাগল। টারজান উপরে উঠে এসে, কুদ্দুর দিকে চেয়ে বনমানুষদের জয়ধ্বনি দিল।

*

শ্লাইডারের ব্যবস্থা করে টারজান কিছু দিন কিলিমাঞ্জারোর পাদদেশে শিকার করে বেড়াল। কেবলই মনে হচ্ছিল এ অঞ্চলে জার্মানরা সংখ্যায় বেশি, তাই ইংরেজরা সুবিধা করতে পারছে না। আরো মনে হলো ও নিজে এখানে শিকার করে বেড়াচ্ছে আর অল্প দূরেই ইংরেজরা প্রাণ বিপন্ন করে জার্মানদের সঙ্গে লড়ছে। ওদের সাহায্য করা উচিত।

এর কিছু আগেই হরিণ মেরে তার খানিকটা মাংস খেয়েছিল টারজান। একটা বড় হায়না খ্যাঁক খ্যাঁক করে ঘুরছিল। শেষটা আর থাকতে না পেরে যেই তেড়ে এসেছে, নিমেষের মধ্যে বর্শা দিয়ে টারজান তাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিল। তারপর হরিণের বাকিটুকু আর হায়েনাটাকে কাঁধে ফেলে, সেই সিংহের গর্তের উপরে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক করতেই সিংহটা ছুটে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলো। বেচারার মসৃণ চেহারা এখন কংকালসার। মাংসগুলো ছুঁড়ে নিচে ফেলে দিয়ে টারজান বলল, 'এখন এই খেয়ে থাক। পরে জার্মান দেবো।'

পরদিন টারজান সন্তর্পণে জার্মানদের এলাকায় ঢুকে পড়ল। কেউ টের পেল না। ঝোপের কিনারা দিয়ে হঠাৎ দেখল পনরো ফুট নিচে, পাহাড়ের গায়ে একটা ধাপে, পাথর আর গাছের ডালপালা দিয়ে একটু আড়াল মতো তৈরি করে একজন জার্মান স্নাইপার লম্বা হয়ে শুয়ে বন্দুকের টেলিস্কোপ সাইট্ দিয়ে চারদিকে নজর করছে। একটু দেখেই টারজান বুঝল, ওর চোখ ব্রিটিশ লাইনের উপর। এতটা উঁচু থেকে উভয় পক্ষের সৈন্য সমাবেশ কেমন ধারা হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল।

জার্মান স্নাইপারটি বাইনোকুলার নামিয়ে যেই রাইফেল তুলতে গেছে, সেই তার পিঠে কি একটা ভারি জিনিস পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবন শেষ।

এবার সেই লোকটির জায়গায় শুয়ে টারজান দেখল, প্রথমেই নিচে জার্মান ট্রেঞ্চগুলো পড়ছে। অফিসার আর সৈনিকরা যাওয়া আসা করছে। ঠিক টারজানের তলাতেই একটা মেশিনগান ঢাকা চাপা তো রয়েছেই, তার উপর এমন কোণাকুণি ভাবে মুখ করা যে ব্রিটিশ লাইন থেকে নজরে পড়া মুশকিল। মৃত জার্মানের বন্দুকটার কার্যকৌশল ভালো করে দেখে নিল টারজান। সাইট্ বদলে নিয়ে, লক্ষ্য স্থির করল। সভ্য জগতে থাকার সময়ে বন্দুক সম্বন্ধে দক্ষ হয়ে উঠেছিল সে। অব্যর্থ টিপ তার। কিন্তু আত্মরক্ষা বা খাবার জন্য ছাড়া সে জীবহত্যা করত না। কখনো বুনো জন্তু শিকার করত না। টিপ ঠিক হলে, মুচকি হেসে আজ সে ঘোড়া টিপল। সামনের একজন জার্মান মেশিনগানার উল্টে পড়ল। তিন মিনিটে সব গানার-রা শেষ। একজন অফিসার আর তিনজন সৈনিকও সেখানে ছিল। তারাও গেল। সাক্ষী-টাক্ষী থাকা কাজের কথা নয়।

তারপর লক্ষ্য স্থির করল দূরের আরেকটা মেশিনগানের উপর। সেখানকার লোকরাও মুছে গেল। দুটো মেশিনগান নীরব হলো। ট্রেঞ্চের লোকরা ছুটোছুটি লাগিয়েছিল। তাদের ক-জনকে শুট্ করা গেল। ততক্ষণে জার্মানরা বুঝতে পেরেছিল কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। বোধ হয় দুই পক্ষের মধ্যিখানের নো-ম্যান্স্ল্যাণ্ড থেকে কেউ গুলি চালাচ্ছে। তারপর যখন একজন অফিসার সেদিকে পেরিস্কোপের সাহায্যে দেখবার চেষ্টা করছিলেন, তার মাথার পিছনে গুলি লাগল। একজন সৈনিক একটা গুলি তুলে দেখে জার্মানিতে তৈরি। তবে কি এ সমস্ত কোনো জার্মান বিশ্বাসঘাতকের কাজ? এবার পেরিস্কোপগুলোকে কাজে লাগানো হলো। টারজান দেখল, ওর দিকে মেশিনগান ফেরানো হচ্ছে। মেশিনগান কাজ শুরু করবার আগেই অবিশ্যি তার ক্রু স্বর্গে গেল। কিন্তু আবার নতুন লোক এগিয়ে এলো, সম্ভবতঃ অনিচ্ছুক ভাবে। কাজেই এখানকার খেলা শেষ করে টারজান শেষ একটা গুলি ছুঁড়ে, রাইফেল্ ফেলে রেখে, পিছন দিকের পাহাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল ওয়াসিম্বু আর অন্য ওয়াজিরিদের দাম দিয়েছে ওরা। কিন্তু সবাইকে মেরে ফেললেও জেনের দাম উঠবে না।

সেদিন রাতে জার্মান এলাকা পেরিয়ে, ব্রিটিশ লাইনে ঢুকল টারজান। কোনো পক্ষের কেউ ওকে দেখতে পেল না। অনেকটা পিছন দিকে অপেক্ষাকৃত আড়ালে ব্রিটিশদের হেড-কোয়ার্টার। কর্ণেল ক্যাপেল একটা গাছতলায় ম্যাপ নিয়ে কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। একটা লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় কাজ হচ্ছিল। পাশে কিছু কাঠ জ্বালানো হয়েছিল। অফিসাররা বলাবলি করছিল, আজ দুপুরের পর

কোনো কারণে বেশ কিছুক্ষণ শত্রুদের গোলাগুলি বন্ধ ছিল। মনে হচ্ছিল পিছন থেকে কেউ আক্রমণ করেছিল। পরে সেদিকে ওরা গুলি চালাচ্ছিল।

এই সময় গাছটার পাতায় একটু শর-শর শব্দ হলো আর একজন বলিষ্ঠ খালি-গা ফরসা মানুষ ওদের সামনে নেমে পড়ল। ওদের হাত পিস্তলের-বাঁটের দিকে গেলেও, কেউ কিছু না বলে তাকিয়ে রইল। কর্ণেল বললেন, 'তুমি কে বল তো!'

সে বলল, 'আমি টারজান।'

একজন মেজর হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন, 'আরে, লর্ড গ্রেস্টোক!'

তাঁর হাত ধরে টারজান বলল, 'প্রেস্‌উইক্ যে!'

—'হঠাৎ তোমাকে এ বেশে চিনতে পারিনি। কোথা থেকে এলে?'

—'জার্মান লাইন থেকে।'

—'কে নিয়ে এলো?' কর্ণেল জানতে চাইলেন।

—'আমি জানোয়ারদের মধ্যে মানুষ হয়েছি, একাই পথ চিনে চলি। আমার সঙ্গে যদি একশো জন বড় বনমানুষ থাকত, তো সব ক'টা জার্মান ভাগিয়ে, ট্রেঞ্চ খালি করে দিতাম। আপাততঃ ওরা কোন্ কোন্ জায়গায় মেশিনগান বসিয়েছে, কি ভাবে ক্যাম্প সাজিয়েছে শুনতে চান?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

টারজান ওদের ম্যাপটা দেখে সমস্ত পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিল। বলল, 'এইখানে একটা দুর্বল জায়গা, কালো মানুষরা আগলাচ্ছে। ঐ দিকটাকে আপনারা দখল করে নিজেদের লোক দিয়ে ট্রেঞ্চ ভরাতে পারেন।'

কর্ণেল হেসে মাথা নাড়লেন, 'খুব সহজ কাজ বলতে চান?'

—'আমার পক্ষে সহজ কাজ বৈ-কি। একটাও গুলি না ছুঁড়ে, ঐ ট্রেঞ্চ খালি করে দেবো আমি। পরশু রাতে আবার দেখা হবে।'

—'দাঁড়ান। সঙ্গে লোক দিই, লাইন পার করে দিক।'

টারজান হাত নেড়ে রওনা দিল। একটা ছোট দলের কাছ দিয়ে যেতে একটা ছোটখাটো মানুষের পাশ দিয়ে যাবার সময়, তার মুখটা কেমনচেনা চেনা মনেহলো। সবার অলক্ষ্যে টারজান যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়ে, কিলিমাঞ্জারোর পায়ের কাছে প্রায়-অচেনা এলাকার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। শেষ রাতে নাকে এলো চেনা গন্ধ। তখন একটা উঁচু গাছে চড়ে, কয়েক ঘণ্টা সে ঘুমিয়ে নিল।

*

পরদিন রোদ উঠলে পর টারজানের ঘুম ভাঙল। মনের মধ্যে একটা মৎলব দানা বেঁধেছিল। প্রথম কাজ খিদে মেটানো। এক পাল বুনো শূয়োরের সঙ্গে দেখা। তীর ধনুক দিয়ে গোটা ছয় মারল। তারপর যত্ন করে সেগুলোর ছাল ছাড়াতে বসল। দূর থেকে শাবরের গর্জন কানে আসছিল। শূয়োরগুলোর ছাল ছাড়ানোও শেষহলো শাবরও দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে টারজান ছালগুলো আর একটা শূয়োর নিয়ে টপ করে গাছে উঠে পড়ল। শাবর একটু হাঁকডাক করলেও এতখানি তাজা মাংস পেয়ে তার রাগ পড়ে গেল। অনেকের ধারণা সিংহরা নিজেরা মেরে খায়, অন্যের মারা জানোয়ার ছোঁয় না। ধারণাটা ভুল। খিদে পেলে ওরা সব মাংসই খায়।

ছালগুলোকে গাছের ডালে পেতে শুকোতে দিয়ে, খানিকটা মাংস কেটে নিল খাবার জন্য। বাকিটা উঁচু ডালে তুলে রাখল। এবার ছালের ধার থেকে ছুরি দিয়ে আধ ইঞ্চি চওড়া লম্বা লম্বা দড়ি কাটা হলো। অনেক সময় লাগল। সেখানেই কাজের শেষ নয়। দুটো ছাল জুড়ে একটা বড় থলি হলো আর বাকি চারটে দিয়ে চারটে ছোট থলি হলো। থলির মুখে একসারি ছ্যাঁদা করা হলো; যাতে তার মধ্যে দড়ি পরিয়ে টেনে শক্ত করে বাঁধা যায়। কিছু দড়ি বাড়তি রইল। তারও দরকার ছিল।

সব কাজ সারা হলে পাঁচটি থলি, দড়িগুলো আর তীর ধনুক বর্শা ছোরা এবং ঘাসের দড়ি নিয়ে টারজান রওনা হয়ে গেল। সিংহের গর্তের কিনারায় এসে তাকে দেখতে পেল না। হয়তো সুড়ঙ্গের মধ্যে আছে; যদি না কোনো উপায়ে সুড়ঙ্গের অন্য মুখের পাথর সরিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকে। তবে তার সম্ভাবনা কম। সাবধানে টারজান খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গর্তের নিচে এলো। গাছের কাছাকাছি এসে একটা চাপা গর্জন দিতেই নুমা তার হাড্ডিসার শরীর নিয়ে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলো। টারজান দৌড়ে গাছে চড়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নুমাও এসে পৌঁছল।

টারজানকে দেখে তার রাগ দেখে কে। লাফ দিয়ে খামচে-খুমচে গাছের গুঁড়ি বেয়ে বৃথাই উঠবার চেষ্টা করতে লাগল। তাতে নিজেই আরো দুর্বল হয়ে পড়ল। তখন

টারজান গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দুটো ডালে দুটো পা রেখে উঠে দাঁড়াল, অনেক কসরৎ করে দড়ির ফাঁসটা নুমার গলায় পরিয়ে, টেনে ধরে তাকে এতটা তুলে আনল যাতে খালি পিছনের পা দুটো মাটি পায়। ঐ ভাবে ওকে ঝুলিয়ে রেখে অন্য দিকের ডাল দিয়ে নেমে এলো। নিচে নেমে তার পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করতে লাগল। চোখে দেখলেও সে দৃশ্য বিশ্বাস করা কঠিন হতো। বড় থলিটা নুমার মাথা গলিয়ে পরিয়ে দিল। তারপর চারটে ঠ্যাং একসঙ্গে বাঁধল। প্রথমে খুব ছটফট করলেও শেষে নুমা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল। টারজান ওর গলা থেকে ফাঁসটা খুলে নিল। মাথার থলিটাতে চোখের আর নাকের জায়গায় ছোরা দিয়ে ফুটো কেটে দিল, যাতে দেখতে আর নিশ্বাস নিতে পারে। মরে গেলে তো চলবে না। নুমার সঙ্গে তো ওর ঝগড়া নেই। গাছের সঙ্গে ওকে বেঁধে চারটে পায়ে চারটে থলি পরিয়ে, ওকে রেখে টারজান সুড়ঙ্গে ঢুকে, ও-মাথার পাথর-গুলো সরিয়ে ফেলল। নুমা ততক্ষণ থলিগুলো খুলবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগল।

ফিরে এসে গলার দড়ি ধরে টেনে আর পিছনে বর্শার খোঁচা মেরে নুমাকে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে টারজান বাইরে বের করে আনল। এতটুকু এদিক-ওদিক করলেই নাকে বর্শার বাড়ি। পিছনে বর্শার খোঁচা দিয়ে তাকে তাড়িয়ে বনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলল। টারজানের মতো অতিমানব না হলে এ কর্ম সম্ভব হতো না।

খাওয়া হলো না নুমার দু'দিন, মুখের থলিটা খুলে ফেলতে সাহস পেল না টারজান। তবে মুখের কাছে আরেকটা ছ্যাঁদা কেটে দেওয়াতে জল খেতে পারল। রাতে শক্ত করে বাঁধা রইল বেচারা। টারজান এক ফাঁকে নিজের জন্য খাবার জোগাড় করে খেয়ে নিল। এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ওরা এগিয়ে চলল। নুমার গন্ধ পেয়ে অন্য জানোয়াররা পালিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে একবার একটা কম-বয়সী সিংহী আর চারটে সিংহর সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছিল। নুমা টারজানকে সুদ্ধ টেনে নিয়ে তাদের দিকে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ অদ্ভুত চেহারা দেখে তারা ভাগল। নুমাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে শায়েস্তা করতে হয়েছিল। সে যাই হোক, এর পর ওরা যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে কাছে এসে পড়েছিল। তখন রাত নেমেছে, বনের ধারে নুমাকে গাছে বেঁধে, টারজান তার বিচিত্র নিয়মে প্রহরী এড়িয়ে কর্ণেল ক্যাপেলের হেড-কোয়ার্টারে পৌঁছল।

ওকে দেখে অফিসাররা একটু না হেসে পারেনি। খালি কর্ণেল মাথা চুলকে বললেন, 'এর জন্য কাউকে গুলি করা উচিত।'

টারজান হেসে বলল, 'ওদের কোন দোষ নেই। আমি তো আর মানুষ নই, আমি টারমানগানি। যে-কোনো মানগানি ইচ্ছামতো এখানে আসতে পারে। তাদের যদি পাহারা দিতে বসান, তাহলে অন্য কেউ এখানে ঢুকতে পারবে না।' ওরা জিজ্ঞাসা করাতে, টারজান বলল, মানগানি হলো বড় বনমানুষ, যাদের মধ্যে ও মানুষ হয়েছিল। টার-মানখানি মানে সাদা বনমানুষ। অর্থাৎ ওরা সবাই।

পরে ক্যাপেল বললেন, 'তারপর আপনি কি এখনো বলছেন আমাদের সামনের ঐ ট্রেঞ্চগুলো খালি করে দিতে পারেন?'

টারজান বলল, ও ট্রেঞ্চ কি এখনো গোমান-গানিদের দখলে?'

—'কালো মানুষদের দখলে। তারাই বোধহয় গোমান-গানি! আপনি তাহলে কি করতে চান? আমরাই বা কি করব?'

টারজান ম্যাপটা দেখিয়ে বলল, 'এখানে ওদের একটা মেশিনগানের পোস্ট। এখান থেকে সুড়ঙ্গ বেরিয়ে, এই ট্রেঞ্চ অবধি গিয়েছে। আমাকে একটা হাত-বোমা দিন। সেটাকে ফাটতে শুনলে, আপনাদের লোকেরা যেন নো-ম্যান্স ল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে এগোয়। একটু পরেই শত্রুদের ট্রেঞ্চ থেকে একটা হট্টগোল শোনা যাবে। কিন্তু এরা যেন নিঃশব্দে কাজ করে। ওদের বলে দেবেন আমিও জার্মান ট্রেঞ্চে থাকতে পারি, আমাকে যেন আবার গুলি-টুলি বা বেয়নেট না করে।'

হাত-বোমার ফরমায়েস দিয়ে, কর্ণেল বললেন, 'ব্যস্ এই? আপনি কি একলা একলা ট্রেঞ্চ খালি করে দেবেন?'

টারজান কাষ্ঠ হাসল, 'না, ঠিক একা থাকব না। সে যাই হোক, ট্রেঞ্চ খালি করে দেবো। আপনার লোকরাও ঐ সুড়ঙ্গ দিয়েই ট্রেঞ্চে ঢুকতে পারবে। ধরুন, এই আধ ঘণ্টার মধ্যে।'

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল সেই ছোটখাটো সৈনিকটির কথা, যার মুখটা চেনা লাগছিল। এখন মনে হলো সে হলো ফ্লাইন কিরচের, সেই জার্মান স্পাই! টারজান তাড়াতাড়ি নুমার কাছে গেল। সে গাছতলাতেই শুয়ে ছিল। মুখ বাঁধা, তারই ভিতর দিয়ে কুঁই-কুঁই করে উঠল; যেন পোষা কুকুরের খিদে পেয়েছে।

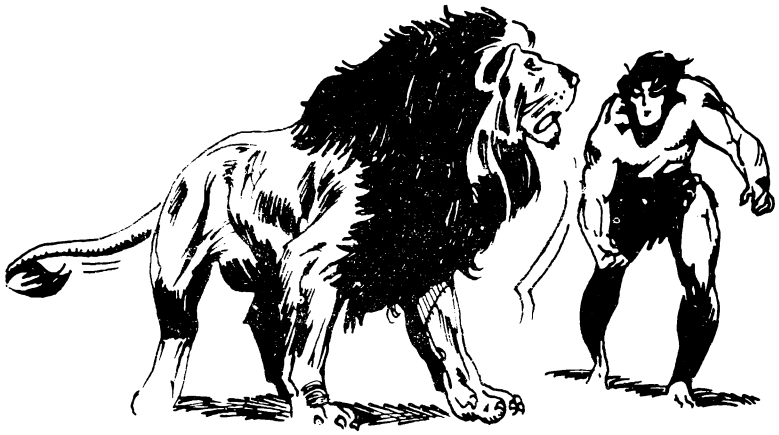

বনমানুষদের ভাষায় টারজান বলল, 'একটু পরেই মারবি আর খাবি।'

গাছ থেকে দড়ি খুলে নুমাকে নিয়ে সে নো-ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ড পার হয়ে চলল। রাতে কেউ কিছু দেখতে পেল না। মাঝে মাঝে দু-একটা গোলাগুলির শব্দ হচ্ছিল, তবে কাছে পিঠে পড়ছিল না। অবশেষে ওরা মেশিনগানের পোস্টের কাছাকাছি এসে পড়ল। একজন সান্ত্রীকে দেখা যাচ্ছিল। ডান হাতে বোমা তুলে, দূরত্বটা আন্দাজ করে, টারজান বোমাটা দিল ছুঁড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটল। নুমা ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল, টারজান ওকে জোর করে ধরে রাখল। তারপর লাফিয়ে উঠে নুমাকে টেনে নিয়ে মেশিনগান পোস্টে উঁকি মেরে দেখল, বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা মেশিনগানটা ছাড়া কেউ বা কিছু নেই।

এক মুহূর্তও দেরি করার সময় নেই, এখনি হয়তো আরো জার্মান সৈনিক এসে পড়বে। নুমা একটু আপত্তি করলেও তাকে টেনে সুড়ঙ্গের কাছে গেল। তাতে ঢুকবার আগে মেশিনগানটাকে নামিয়ে, একটা গর্তে পুরে দিল। তারপর নুমার মুণ্ডুটা সুড়ঙ্গে ঢুকিয়ে পায়ের থলি খুলে, হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি মাথার থলিও খুলে দিয়ে, ওকে ঠেলে আর বর্শার খোঁচা দিয়ে সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকতে বাধ্য করল। সে কি সহজে ঢোকে! প্রথমটা ঠেলেঠুলে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোচ্ছিল। তারপর বোধহয় টের পেল মাংস পাওয়া যাবে। অমনি দৌড় দিল। মেশিন-গানটাকে টানতে টানতে ধীরে সুস্থে টারজানও এগোতে লাগল। ট্রেঞ্চে পৌঁছে দেখল সেখানে কেউ নেই। তার পাশের খোপেও কেউ নেই; তার পাশেরটাতেও না। কিন্তু সিংহের গর্জন আর মানুষের ভীত চিৎকার কানে আসছিল।

টারজান মনে মনে বলল, 'এরাই আমার ওয়াজিরিদের খুন করেছিল। ওয়াসিম্বুকে ক্রুশে ঝুলিয়েছিল।'

চতুর্থ খোপে জনা বারো লোকের মধ্যিখানে নুমা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দাঁত চালিয়ে নখ চালিয়ে এক নারকীয় কাণ্ড করছিল। যারা পারছিল তারাই ট্রেঞ্চের ধার বেয়ে টপকে পালাচ্ছিল। এমন কি অনেকে নো-ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ড দিয়েও ছুটেছিল। ঐ যমদূতের চেয়ে সে-ও ঢের ভালো।

ব্রিটিশ সৈনিকরা প্রথমে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল। ভয়ে আধমরা কালো জার্মান সোলজাররা ছুটতে ছুটতে যেন খুশি হয়েই আত্মসমর্পণ করছিল। ট্রেঞ্চ থেকে মানুষের আর জানোয়ারের যে রকম বিকট চ্যাঁচামেচি কানে আসছিল, তাতেই সেখানকার অবস্থা আন্দাজ করা যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা মেশিনগানের শব্দ শোনা গেল। প্রকাণ্ড একটা সিংহ এক হতভাগ্য জার্মান সৈনিককে মুখে নিয়ে সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। বাঁ ধারে দেখা গেল টারজান একটা মেশিনগান চালাচ্ছে, জার্মান লাইনের উপর। একজন বিশাল-দেহ জার্মান অফিসার ওর পিছন থেকে চুপিসাড়ে বেয়নেট বাগিয়ে এগোচ্ছিল। ব্রিটিশরা তাই দেখে চেঁচিয়ে ছুটে গেল। তার কোনো দরকার ছিল না। শেষ মুহূর্তে, টারজান হঠাৎ ওদের চোখের সামনে বিদ্যুৎবেগে ফিরে, জার্মান আততায়ীকে জাপ্টে ধরে তার ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে দিয়ে, গলা টিপে ধরে শূন্যে তুলে কয়েকটা পাক দিল। পরে হাঁটুর উপর ফেলে স্বচ্ছন্দে ঘাড় মটকে দিল। লোকটার ইউনিফর্মের চিহ্ন দেখেই বোঝা গেল এ-ও সেই রেজিমেন্টের অফিসার, যারা টারজানের বাড়িতে হামলা করেছিল।

রোডেসিয়ানরা ওকে বাহবা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে, টারজান মৃতদেহের উপর পা রেখে বনমানুষদের জয়ধ্বনি দিল আণ্ডার লেফ্‌টেনাণ্ট ফন্‌ গস্‌-ও মরল। তারপর কারো দিকে না তাকিয়ে, এক লাফে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে টারজান অদৃশ্য হয়ে গেল।

*

গোড়ায় ব্রিটিশরা তেমন সুবিধা করতে না পারলেও; টারজানের আর নুমার ঐ ধ্বংসকারী কাণ্ডের পর ঐ অঞ্চলে জার্মানদের ক্রমে হটতে হয়েছিল। আর শুধু ঐ অঞ্চলেই নয়, সব ক্ষেত্রেই ওদের পরাজয় হতে আরম্ভ করল, যদিও ওরা সহজে ছাড়বার পাত্র ছিল না।

ঐ ব্যাপারের পর টারজানকে কেউ আর দেখেনি।

অনেকের ধারণা হলো যে সে মারা গেছে, সম্ভবতঃ ঐ যুদ্ধেই। আদৌ তা নয়। ঐ কয়েক সপ্তাহকে টারজান খুব কাজে লাগিয়েছিল। জার্মান সৈন্যের বিস্তার, ব্যবস্থা, পরিকল্পনা বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিল। আপাততঃ তার ইচ্ছা একজন বিশেষ জার্মান গুপ্তচরকে বন্দী করে ব্রিটিশদের কাছে নিয়ে যায়। তাই তার সঙ্গে যদি আবার দেখা হয়ে যায়, এই আশায় টারজান গোপনে জার্মান ক্যাম্পে ঘোরাঘুরি করত। এই সময় একদিন আড়াল থেকে জার্মান অফিসারদের কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল যে মেজর শ্লাইডার সিংহের হাতে প্রাণ দিয়েছিল, সে টারজানের খামারে হামলা করেনি। করেছিল তার ভাই ক্যাপ্টেন শ্লাইডার। এ-কথা শুনে টারজানের মুখ থেকে একটা চাপা গর্জন বেরিয়ে পড়েছিল। তাই শুনে অফিসাররা চমকে উঠেছিল। কিন্তু পিস্তল হাতে যখন তারা ঝোপঝাড়ে অনুসন্ধান করল সেখানে কাউকে পেল না।

ততক্ষণে টারজান ক্যাম্পের বাইরের দিকে, যেখানে কালো সিপাইদের আস্তানা সেখানে পৌঁছে গেছে। এদের অধিকর্তা ক্যাপ্টেন শ্লাইডার। জার্মান অফিসারদের তাঁবু থাকলেও, কালো সিপাইরা কম্বল জড়িয়ে মাটিতে শুয়ে ছিল। টারজান নিঃশব্দে তাঁবুগুলোর দিকে এগোল। প্রথম তাঁবুর বাইরে কান পেতে মাত্র একজনের নিশ্বাস শুনতে পেল। ছুরি দিয়ে পিছনের ফ্ল্যাগের দড়ি কেটে ভিতরে ঢুকে, ঘুমন্ত লোকটার উপর ঝুঁকল। লোকটা বিড়বিড় করে কি যেন বলল। টারজান চাপা গলায় বলল, 'চুপ। নয়তো মেরে ফেলব।' লোকটা চোখ খুলল, টারজান ওর গলা টিপে ধরে বলল, 'চেঁচও না। আস্তে নাম বল।'

—'লুবার্গ।' লোকটা ভয়ে কাঁপছিল।

—'শ্লাইডার কোথায়?'

—'তাকে কাল উইলহেল্‌ম্‌স্টালে পাঠিয়েছে।'

টারজান বলল, 'এখন কিছু করলাম না। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে থাক, বিকট ভাবে মরবে। চোখ বুজে শুয়ে থাক।'

তাই করল লোকটা। টারজান উইলহেল্‌ম্‌স্টালের দিকে রওনা হলো। ওটি ছিল জার্মান ইস্ট আফ্রিকার সরকারী গ্রীষ্মাবাস।

এদিকে বার্থা কিরচের পথ হারিয়ে ফেলেছিল। কথাটা স্বীকার করতেও আত্মসম্মানে বাধছিল। উইলহেল্‌ম্‌স্টালের সোজা পথই ধরেছিল সে। তারপর ওকে সতর্ক করে দেওয়া হলো ঐ পথে ব্রিটিশ বাহিনী এগোচ্ছে। গন্তব্যস্থল মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে, এখন সোজা পথ ছেড়ে বনের মধ্যে পথ খুঁজে মরছিল! বনটা যেন বড় বেশি চুপচাপ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ঘোড়াটা সারাদিন খায়নি, জল পর্যন্ত পায়নি। রাত নামবার আগে একটু খোলামতো জায়গা পেয়ে, সেখানে ক্যাম্প করা স্থির করল। মধ্যিখানে বেশ কয়েকটা বড় গাছও ছিল। চার দিকে শুকনো কাঠকুটো ছড়ানো। তাই দিয়ে ধুনি জ্বালানো যাবে। ঘোড়াটা লম্বা ঘাসগুলো খেতে পারবে। তার জিন লাগাম খুলে একটু আরাম করতে দিয়ে, অনেক কাঠ জড়ো করে চমৎকার এক ধুনি জ্বালল। মনে হলো সারারাত জ্বলবে।

থলে থেকে ঠাণ্ডা খাবার বের করে খেল। জলের বোতল থেকে দু-চুমুকের বেশি খেতে সাহস পেল না। ঘোড়া বেচারা জলটল পেল না। ঘুটঘুটে অন্ধকার, চাঁদ বা তারা কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। দূরে কামানের গর্জন শোনা যাচ্ছিল, আর সব নিস্তব্ধ। তারই মধ্যে একটা আওয়াজ শুনে বার্থা চমকে উঠল। সকাল হলে বাঁচা যায়। সকাল অবধি বাঁচলে হয়। তারপরেই হয়তো এক মাইল দূরে সিংহ গর্জন করল। তারপর আবার চুপচাপ। বার্থা ভয়ে কাঠ!

হঠাৎ ঘোড়াটা মাথা তুলে একটা শব্দ করল। বার্থা ভয়ে লাফিয়ে উঠল। ঘোড়াটাও অমনি কাছে এসে দাঁড়াল। কান খাড়া করে কি যেন শুনতে লাগল। আরেক ঘণ্টা কাটল। মাঝে মাঝে ধুনিতে কাঠ দিতে হচ্ছিল। বড্ড ঘুম পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ঘোড়ার কাছে গিয়ে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আবার এসে জিনটাতে ঠেস দিয়ে বসছিল। হঠাৎ চমকে উঠে দেখে সকাল হয়ে গেছে!

অমনি ঘোড়ার পিঠে জিন বসিয়ে, চড়ে বসল। ভাবল আর ভয় নেই। ঝোপের মধ্যে সিংহটাকে লক্ষ্যও করল না। তার পরেই এক লাফে নুমা ঘোড়ার ডান কাঁধে থাবা বসাল। ঘোড়াটা অমনি পড়ে গেল, বার্থার একটা পায়ের উপর। সিংহটা ঘোড়ার ঘাড় ধরে এক ঝাঁকুনি দিতেই বেচারার ঘাড় মটকে গেল। জীবনে কখনো বার্থা এত ভয় পায়নি। কোমরে পিস্তল ছিল বটে কিন্তু ঐটুকু অস্ত্র এত বড় জানোয়ারের কি করতে পারে? আস্তে আস্তে পা সরাবার চেষ্টা করল বার্থা, পারল না। পিস্তল বের করবার জন্য যেই একটু উঁচু হয়েছে, অমনি ঘোড়ার মৃতদেহের উপর দিয়ে একটা থাবা বাড়িয়ে সিংহ ওর বুকের উপর রাখল।

হঠাৎ পিছন থেকে শোনা গেল মানুষের কণ্ঠে জানোয়ারের মতো শব্দ। নুমা মুখ তুলে চেয়ে, থাবা তুলে নিল। জামাটা অনেকখানি ছিঁড়ে গেল, কিন্তু গায়ে আঁচড় লাগল না।

টারজান সবই দেখেছিল। একবার মনে হয়েছিল থাক গে নুমা ওকে, একে জার্মান, তার উপর স্পাই। সিংহটাকেও টারজান চিনতে পেরেছিল। শুধু চেহারা দিয়ে নয়, গন্ধ দিয়েও। টারজানের শুধু মানুষের গুণ নয়, জানোয়ারদেরও অনেক গুণ ছিল। নুমাও যে ওকে চিনতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এখন ওর কথা শুনলে হয়! এগিয়ে এসে টারজান বলল, 'চলে যাও নুমা, নইলে আবার থলিতে বাঁধব।' এই বলে বর্শা তুলল। কথা বুঝল কিনা কে জানে, কিন্তু বর্শা বুঝল। নুমা খুব খানিকটা হাঁক-ডাক করল, বর্শাটার দিকে থাবাও বাড়াল, কিন্তু সত্যি সত্যি ঘোড়া ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

টারজান বিশুদ্ধ জার্মান ভাষায় বলল, 'পা বের করতে পারবে?

—'না বোধ হয়।'

—'আরেকবার দেখ। নুমাকে কতক্ষণ ঠেকাব?'

আরেকবার চেষ্টা করে বার্থা বলল, 'না অসম্ভব।'

একহাতে ঘোড়ার জিনের তলার বেল্ট ধরে তাকে একটু তুলে ধরতেই পা-টা বেরিয়ে এলো।

—'হাঁটতে পারবে তো?'

—'পারব।'

—'তা হলে আস্তে আস্তে পিছু হটে যাও। হঠাৎ কিছু কর না, তবে মনে হয় না তেড়ে আসবে।'

আস্তে আস্তে দু'জনে ঝোপের দিকে পিছিয়ে গেল। নুমাও কিছু দূর সঙ্গে গেল। তারপর মরা ঘোড়াটাকে খেতে বসল। অনেকখানি সরে এসেছিল ওরা, হঠাৎ টারজানের চোখ পড়ল বার্থার গলায় টারজানের সেই হীরে বসানো লকেটটা, যেটা জেনের গলা থেকে শ্লাইডার চুরি করেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুলে নিয়ে টারজান বলল, 'এটা কোথায় পেলে? জার্মান স্পাই তুমি তা জানি।'

—'শ্লাইডার দিয়েছিল। কে বলেছে আমি একজন স্পাই?'

—'আমি তোমাকে জার্মান হেডকোয়ার্টারেও দেখেছি, ব্রিটিশ লাইনেও দেখেছি। এখন তোমাকে ব্রিটিশ হেড-কোয়ার্টারে নিয়ে যাব।'

বার্থা আঁৎকে উঠল। তাতো হয় না। এর কপালে পিস্তলের একটা গুলি মারলেই চুকে যায়। কিন্তু তা তো সে পারবে না। অথচ লকেটটা ছাড়াও চলবে না। হঠাৎ পিস্তলের বাট দিয়ে টারজানের মাথার পিছনে সজোরে একটা বাড়ি মারল বার্থা। টারজান অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

*

আরো এক ঘণ্টা বাদে শীতা ঐদিকে শিকার করতে এসে দেখল স্কা শকুন বেশ নিচে নেমে আকাশে চক্কর দিচ্ছে। একবার নেমে কি দেখে, আবার একটু উপরে উঠে যাচ্ছে। অর্থাৎ তার শিকার এখনো মরেনি। বাতাসে গন্ধ শুঁকে শীতা বুঝল শিকারটি হলো মানুষ, সাদা মানুষ। ওর-ও খিদে পেয়েছিল। খানিকটা এগোতেই দেখতে পেল চলার পথের উপরেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা প্রায় খালি-গা সাদা মানুষ।

এদিকে নুমা ঘোড়ার খানিকটা খেয়ে, বাকিটা ঝোপে লুকিয়ে, হেলেদুলে ঐ পথেই আসছিল। ওর নাকেও সাদা মানুষের গন্ধ পৌঁছল। তার পরেই দেখে শীতা মানুষটার দিকে এগোচ্ছে! এ মানুষটা তো নুমার চেনা। শুধু চেনা নয়, এ মানুষটা নুমাকে শাসন করেছে, বশ করেছে, খিদের সময় খেতেও দিয়েছে! এখন ওর ঘৃণার পাত্র ঐ শীতা বোধ হয় মানুষটার ক্ষতি করবার তালে আছে। নুমা গোঁ-গোঁ করে এগিয়ে গেল। তারপরে গর্জন করে তেড়ে গেল। শীতা পালাতে পারল না। যদিও তারপর যে ভীষণ লড়াই হলো তাতেই তার প্রাণটা গেল।

নুমা তখন থাবা দিয়ে টারজানকে সোজা করে, ওর সারা গা শুঁকে, ওর মুখ চাটতে লাগল। তাতেই হয়তো টার-জানের জ্ঞান ফিরে এলো। সিংহের মুখ ওর মুখের কাছে, ওর গালে তার নিশ্বাস পড়ছে; ওর দু-পাশে সিংহের দু-পা। মৃত্যুর এত কাছে টারজান কখনো আসেনি। তারপরেই সে নুমাকে চিনতে পারল। এদিকে যত সময় চলে যাচ্ছে, ওর মাথায় বাড়ি মেরে স্পাইটিও তত দূরে চলে যাচ্ছে। তাই টারজান নুমার দিকে তাকাল। সিংহের মুখে রাগও নেই, হিংসাও নেই। এক পাশে মাথাটা ঝুলিয়ে সে কুঁই কুঁই করে উঠল। টারজান বলল, 'সর, নুমা।' বলে ওকে একটু ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই শীতার মৃতদেহের উপর চোখ পড়ল। নুমা ওর প্রাণ বাঁচাবার জন্য শীতাকে মেরেছে!

তখন টারজান নুমার গায়ে মাথায়, শরীরের ক্ষতে হাত বুলিয়ে আদর করে, বর্শা তুলে আবার রওনা দিল। বার্থার পায়ের চিহ্ন ধরে এগোনো খুব শক্ত ছিল না। উইল-হেল্‌মস্টাল পৌঁছবার আগেই তাকে ধরে ফেলা উচিত। এখান থেকে তিরিশ মাইল পথ। মেয়েটার হেঁটে যেতে প্রায় দু-দিন লাগবে। এমন সময় ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ কানে এলো। তাহলে আবার এ-লাইনে গাড়ি চলাচল শুরু হয়েছে। মেয়েটার সাহস আর মনের জোরের প্রশংসা করতে হবে। জঘন্য জার্মান স্পাই হলেও। ট্রেনটা যদি দক্ষিণে যায়, মেয়েটা তাহলে সংকেত করে গাড়ি থামিয়ে, তাতে উঠে পড়তেও পারে। তাহলে আরো আগে পৌঁছবে। ঠিক যা মনে করেছিল; পায়ের দাগ রেলের লাইনে পৌঁছে থেমে গেছে। তার মানে ও ট্রেনটাতে উঠে পড়েছে।

তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে নিজের তিনটি লক্ষ্যের কাছে পৌঁছতে হবে, যথা—শ্লাইডার, মেয়েটা আর লকেট। যখন পাহাড়ে শহরটাতে টারজান পৌঁছল, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। খুব সন্তর্পনে, প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে একটা বড় বাংলোর কাছে পৌঁছতেই মস্ত একটা কুকুর গরগর করতে করতে এগিয়ে এসে টারজানের গলা লক্ষ্য করে লাফ দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টারজানের বজ্র মুষ্টি তার গলা টিপে ধরল। ঐখানেই শেষ।

একটা লোক দরজা থেকে ডাকল, 'সিম্বা!' কোনো জবাব না পেয়ে সে বেরিয়ে এলো। টারজানের কাছ থেকে যখন দশ ফুট দূরে, টারজান তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরল। সে ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করেছিল। তার মৃতদেহ কুকুরটার পাশে পড়ে রইল। টারজান তার ইউনিফর্ম পরে স্থানীয় হোটেলটা খুঁজতে লাগল। সেখানেই নিশ্চয় বার্থা কিরচের আর শ্লাইডার, দু'জনার দেখা পাওয়া যাবে।

হোটেলটা পাওয়া গেল। নিচু একটা দোতলা বাড়ি, সামনে বারান্দা। বাড়ির চারদিক ঘুরে টারজান দেখল অনেক জার্মান অফিসার। তাদের মধ্যে বার্থা এবং শ্লাইডার নেই। টপ করে বাড়ির ছাদে উঠে পড়ে, টারজান সেখানকার জানলা দিয়ে উঁকি মারল। এক কোণে, পিছন দিকের একটা ঘরের পরদা টানা ছিল। ঘরে একজন মেয়ে একজন পুরুষ নিচু গলায় কথা বলছিল। পাশের ঘরটা অন্ধকার। জানলায় ছিটকিনি দেওয়া নেই। সব চুপচাপ। জানলাটা খুলে টারজান সেই ঘরে ঢুকল। খালি ঘর। দরজা খুলে বাইরের হলঘরেও তাকিয়ে দেখল। সেখানেও কেউ নেই। হলঘরে ঢুকে, পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে শুনল, মেয়েটা বলছে, 'জেনারেল ক্রাউট যেমন বলেছিলেন, লকেটটা নিয়ে এসেছি। ঐটাই আমার একমাত্র পরিচয়-পত্র। এবার আমাকে কাগজগুলো দিয়ে, ছেড়ে দিন।'

অন্য লোকটা কি বলল শোনা গেল না। মেয়েটা ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠল, 'সরে যান বলছি!' এই সময় দরজা ঠেলে টারজান ঢুকল। ওকে দেখেই শ্লাইডার চটে গেল, 'এ ঘরে এভাবে ঢুকবার মানে কি, লেফ্‌টেনান্ট!'

টারজান দরজা ঠেস দিয়ে গায়ের কোটটা খুলে ফেলল। গলা থেকে একটা চাপা গর্জন শুনে মেয়েটা শিউরে উঠল। শ্লাইডার পিস্তল বের করতেই, টারজান সেটা কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

টারজান বলল, 'তুমিই ক্যাপ্টেন শ্লাইডার?'

—'তাতে কি হয়েছে?'

—'আমি বনমানুষের ছেলে টারজান। কেন এসেছি বুঝতেই পারছ?'

ততক্ষণে বার্থাও ওকে চিনতে পেরে পিস্তল বের করেছিল। টারজান ওকে বলল, 'পিস্তল নামিয়ে এদিকে এসো।'

কাছে আসতেই টারজান সে পিস্তলটাও বাইরে ফেলে দিল। এতক্ষণে আসল লোক পাওয়া গেছে। এবার জেনের মৃত্যুর খানিকটা প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। সব তো আর যাবে না। জীবন কতদিনেরই-বা আর জার্মান তো অগুন্তি!

শ্লাইডার বলল, 'আমার কাছ থেকে কি চাও?'

—'ওয়াজিরিদের দেশে সেই ছোট বাংলোতে যা করেছিলে, তার দাম চাই।' মেয়েটাকে বলল, 'সরে যাও। রক্তপাত হবে।'

শ্লাইডার বলল, 'আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে আছে। আমি কোনো দোষ করিনি।'

টারজান বলল, 'হাতে রক্ত, মুখে মিথ্যা কথা নিয়েই তোমাকে মরতে হবে।' বলেই তাকে আক্রমণ করল। ভীষণ ধস্তাধস্তি হলো। জানলা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল শ্লাইডার। টারজান তাকে চেপে ধরে ছোরা বের করে তার মুখটা শ্লাইডারের পেটে ছোঁয়াল। বার্থা বলল, 'না, না, ওভাবে নয়। তুমি বীরপুরুষ, ওভাবে কর না।' তখন টারজান ছোরাটা শ্লাইডারের বুকে বসিয়ে সমস্যার নিস্পত্তি করে দিল। মরবার আগে শ্লাইডার বলেছিল, 'আমি ওকে মারিনি। ও—।' আর বলতে পারেনি।

টারজান বার্থাকে বলল, 'লকেটটা দাও।'

শ্লাইডারকে দেখিয়ে বার্থা বলল, 'ওর কাছে আছে।'

লকেটটা খুঁজে নিয়ে টারজান বলল, 'কাগজগুলো দাও।' বার্থা এক তাড়া কাগজ দিল। টারজান বলল, 'তোমাকেও নিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল। তা যখন হবে না, মেরে ফেলাও যেত। কিন্তু তুমি ঠিক বলেছ, ও আমার স্ত্রীকে মেরে ফেললেও, আমি কোনো নারীকে মারতে পারব না।' এই বলে জানলা দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর বার্থা তাড়াতাড়ি গিয়ে শ্লাইডারের ভিতরের পকেট থেকে ছোট এক গোছা কাগজ নিয়ে, নিজের কোমরে গুঁজে, জানলার কাছে গিয়ে লোকজনদের ডাকতে লাগল।

*

এই ভাবে শ্লাইডার মরল, ফন্ গস্ মরল; অনেকগুলো জার্মান অফিসার আর সৈনিক মরল; বলা যেতে পারে ওয়াজিরিদের দেশে জঘন্য ব্যাপারের পরিশোধ হয়েছে। যদিও তখনো লেফ্টেনান্ট ওবারগাট্স্ বাকি ছিল। কিন্তু তাকে নাকি অন্য কোথাও পাঠানো হয়েছে। আফ্রিকাতেই, নাকি ইউরোপে সেটা জানা গেল না। সে জন্য তত ক্ষোভ ছিল না। আসলে ক্ষোভ হলো নিজের দুর্বলতার কারণে একটা স্পাইকে সাজা দেওয়া হলো না। নিজের উপর আরো রাগ হচ্ছিল কারণ আবার যদি সুযোগ পায়, আবার তাকে ছেড়ে দেবে, এ-ও তার জানা ছিল। টারজান নারী হত্যা করত না।

ততদিনে আফ্রিকায় জার্মানরা আর পেরে উঠছিল না। টারজান ভাবছিল, সে তো আর ব্রিটিশদের খাতায় নাম লেখানো সৈনিক নয়, এখন তার সরে পড়াই ভালো। জেনের জন্য সে সভ্য জগতের বাসিন্দা হয়েছিল। সভ্য মানুষের নীচতা, নিষ্ঠুরতা, কপটতা, স্বার্থপরতা দেখে দেখে তার ঘৃণা ধরে গিয়েছিল। এখন তার মনে হচ্ছিল তার পক্ষে বনে গিয়ে শৈশবের পরিবেশে বন্য জানোয়ারদের মধ্যে বাকি জীবনটা কাটানোই ভালো।

শৈশবের সেই পরিবেশে ফিরে যেতে হলে, মাঝখানকার এই জনহীন, পথহীন বনরাজ্য পার হতে হবে। এখানে কখনো মানুষের পা পড়েনি। খাওয়া-দাওয়ার ভাবনা ছিল না। দূর থেকে ও জলের গন্ধ পেত। অনেক দিন ধরে সেই বনভূমির মধ্যে দিয়ে টারজান ক্রমাগত এগিয়ে চলল। সেখানে শিকারের অভাব ছিল না, তাছাড়া অজস্র নদী-নালা। জঙ্গলের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে ভাব করে, মাছ ধরে, শিকার করে দিন কাটতে লাগল। এখানেও মানু বাঁদর খবর সরবরাহ করত। সে-ই বলল, এ বনে মানগানি অর্থাৎ বড় জাতের বনমানুষ বেশি নেই। সামান্য যে কয়-জন আছে, তারাও এই সময়ে শিকার করতে উত্তর দিকে যায়। মানু আরো বলল, মানগানিরা এদিকে-ওদিকে যায়, কিন্তু মধ্যিখানের ঐ বিশাল জায়গাটাতে বৃষ্টি হয় না, তাই বড়ই জলের আর গাছপালার অভাব। উত্তরে যেতে হলে ওরা এ জায়গা এড়িয়ে, ঘোরা পথে যায়।

টারজান জানত মানগানিরা ধীরে এগোয়, তাই ঐ জল-শূন্য জায়গাটাকে এড়িয়ে যায়। ওর যেতে সময় নেবে তার তিনভাগের এক ভাগ। ঐ পথেই ও যাবে, তাড়াতাড়ি হবে।

জমিটা সত্যি ভারি বিশ্রী। উবড়ো-খেবড়ো, শুকনো, পাথুরে, গাছ নেই, ছায়া নেই, জল নেই। দূরে নীল পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সারা দিন হেঁটেও মনে হলো এখনো সমান দূরেই আছে। সাহারাতেও মরূদ্যান আছে; এখানে সে-সব বালাই নেই। এ রকম বিশ্রী জায়গা যে আফ্রিকাতে থাকতে পারে, টারজানের কোনো ধারণাই ছিল না। থেকে থেকে পাথুরে খাদ। পার হতে হলে একবার প্রায় খাড়া গা বেয়ে নেমে আবার খাড়া উঠতে হয়। ক্লান্তি এসে যায়। বিশ্রামের জায়গাও নেই। সব রোদে খাঁ-খাঁ করছে।

সাতটা খাদ পার হয়ে অষ্টমটার ধারে পৌঁছে বড়ই নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল সে। মাথার উপর দিয়ে একটা শকুন উড়ে গেল। ওর গায়ে তার ছায়া পড়ল। কেমন যেন আত্মরক্ষার তাগিদে খাদটাতে নেমে পড়ল টারজান। সেখানে একটু ছায়া পেয়ে বিশ্রাম করে নিল! অদ্ভুত জায়গাটা, কোনো জীবন্ত প্রাণীর চিহ্ন নেই। কিন্তু উল্টো দিকের দেয়ালের কাছে মাটির উপর একটা নরকংকাল দেখতে পেল। তার পাশে পড়ে আছে পেটানো পিতলের তৈরি সেকালের একটা হেল্মেট আর মরচে ধরা বর্ম, খাপসুদ্ধ একটা তলোয়ার, একটা ঢাল। সে যে-ই হোক, তার উপর ভারি শ্রদ্ধা হলো টারজানের। কত অসীম সাহস দেখিয়ে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দিতে এই দুর্গম জায়গায় এসে প্রাণ দিয়েছিল! চামড়ার পোশাক পরা ছিল হয়তো। সেগুলো স্কা খেয়েছে! খালি কতকগুলো বক্লস পড়ে আছে। একটা হাতের হাড়ের নিচে আট ইঞ্চি লম্বা, গোল একটা চোঙা পড়ে ছিল। খানিকটা ঘষতেই তার একটা মুখ খুলে গেল। ভিতরে হলদে হয়ে যাওয়া কাগজে সম্ভবতঃ স্প্যানিশ ভাষায়

কি সব লেখা। টারজান পড়তে পারল না। কাগজসুদ্ধ চোঙাটা নিজের তূণে ভরে নিল। কাগজে একটা ম্যাপও আঁকা ছিল।

তারপর অনেক কষ্টে অবসন্ন শরীরটাকে কোনো রকমে টেনে সামনের দেয়ালটা বেয়ে উপরে উঠল। পাহাড়টাকে এখন অনেক কাছে মনে হচ্ছিল। তারই ওপারে হয়তো মানগানিদের বিচরণভূমি। শুধু মনের জোরে, হোঁচট খেতে খেতে মাইলের পর মাইল পার হলো সে। পাহাড় যেন আরো কাছে। দুর্বলতার কারণে মাঝে মাঝে বাস্তব আর কল্পনা গুলিয়ে যাচ্ছিল। শেষটা একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে আর কিছুতেই উঠতে পারল না। যদি-বা হামা দিয়ে একটু এগোয় তো আবার পড়ে।

এই সময় স্কা শকুন নেমে এসে কাছাকাছি ঘুরতে লাগল। টারজান চালাকি করে মড়া সেজে থাকল। হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে রাখল, কি জানি যদি ঠোকর দেয়! বার দুই খুব কাছে এসে তৃতীয়বার যেই স্কার পায়ের নখ টারজানের বুক ছুঁয়েছে, খপ্ করে টারজান ওর দুটো ডানা চেপে ধরেছে! আর কি স্কা পারে? ওর গলায় দাঁত বসিয়ে দিল টারজান। শক্ত ছিবড়ে মাংস, তাতে বিশ্রী স্বাদ আর গন্ধ। তবু খাবার তো বটে, রক্তটাও পানীয়। জোর করে একটু মাংস আর রক্ত খেল টারজান। তারপর পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আঁজলা করে জল ধরে, পান করল টারজান। গায়ে নতুন শক্তি ফিরে এলো। জোর করে আরেকটু মাংস খেয়ে, টারজান উঠে আবার হাঁটতে লাগল। শরীরে মনে বল পেয়েছিল সে। চোখে পরিষ্কার দেখতে পেল পাহাড়টা এখন খুব কাছে। পাহাড়ের ওপারেই মানগানিরা চরছে হয়তো। যখন পায়ের তলার মাটি ঢালু হয়ে ওঠাতে বোঝা গেল পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছনো গেছে, তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আবার একটুখানি সঙ্গে আনা শকুনের মাংস খেয়ে, টারজান ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন রোদ উঠে গিয়েছিল।

এইভাবে ঐ মরণভূমি পার হয়ে পাহাড়ে পৌঁছল সে। পাহাড়ে উঠে দেখল ওপারে সবুজ উপবন। সেখানে জন্তু-জানোয়ার চরছে। নিচে গভীর অধিত্যকা, তার মধ্যিখানের ঘন গাছপালা দেখে বোঝা যায় একটা বড় নদী বয়ে চলেছে। তারপর ওপারে আদিম বন আর তার পরে বরফের মুকুট পরা পাহাড়ের সারি।

তিনদিন বিশ্রাম করল টারজান। ফলমূল, বাদাম, ছোটখাটো জানোয়ার—খাবারের অভাব ছিল না। চতুর্থ দিনে আবার মানগানিদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। দক্ষিণ-দিকে কিছু দূর এগোতেই নাকে এলো কালো মানুষদের গন্ধের সঙ্গে একটা সাদা-চামড়া মেয়ের গন্ধ।

গাছে ঝুলে এগিয়ে গেল টারজান, একটু অনুসন্ধান করতে হবে। জানোয়ারদের পিছু নিলে সাবধানে এগোতে হয়, কিন্তু মানুষরা বড় বোকা, তারা কিছু টের পায় না। একটা গাছের ঘন পাতার আড়াল থেকে টারজান অবাক হয়ে দেখল বেশ বড় এক দল জার্মান মিলিটারি পোশাক পরা—হোক তা ছেঁড়া-খোঁড়া, অসম্পূর্ণ, কালো পুরুষ-মেয়ে হাসতে হাসতে, গল্প করতে করতে যত তাড়াতাড়ি পারে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের সকলের হাতে জার্মান অস্ত্রশস্ত্র। আর মেয়েদের সঙ্গে চলেছে ছেঁড়া ইউনিফর্ম পরা বার্থা কিরচের। কালো মেয়েগুলো তাকে মারছে ধরছে, যা খুশি তাই করছে।

মনে হলো এরা নিশ্চয় জার্মান সৈন্যের একটা বিদ্রোহী অংশ। মেয়েগুলো হয়তো ওদের পরিবার, নয়তো গ্রাম থেকে জোগাড় করে নিয়েছে; আর বার্থা ওদের বন্দী। ওর কপালে দুঃখ আছে। তখন মেরে ফেললেই বরং ভালো ছিল।

শেষের লোকটা অনেকখানি পিছিয়ে ছিল। সে যখন টারজানের গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল, টুপ করে একটা দড়ির ফাঁস তার গলায় নামল। ভয়ে সে বিকট চেঁচিয়ে উঠল। দূর থেকে সঙ্গীরা শুনতে পেয়ে ফিরে দেখে আশ্চর্য হলো যে লোকটা আপনা থেকেই শূন্যে উঠে গাছের পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওদের দলপতি হলো উসাঙ্গা, তার হুকুমে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জনা পঞ্চাশ গাছটাকে ঘিরে ফেলল। ডাকাডাকির কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। তখন একটু বেশি সাহসী একজন ঐ গাছটাতে চড়ল। দু-তিন মিনিট পরেই সে নেমে পড়ে বলল, 'না, গাছে কেউ নেই।'

ওরা সে জায়গা ছেড়ে এগিয়ে গেল। হাসি গল্পও কমে গেল। মাইলখানেক দূরে দেখে ঝোপের মধ্যে থেকে সেই লোকটা উঁকি মারছে! কাছে গিয়ে দেখল ঠিক লোকটা নয়, খুঁটিতে গাঁথা তার মুণ্ডুটা ঝোপে কে সাজিয়ে রেখেছে। ঐখান থেকেই কেউ কেউ ভয়ের চোটে ফিরে যেতে চাইছিল। বলছিল, কোনো বনদেবতা নিশ্চয় চটেছেন। কিন্তু উসাঙ্গা কারো কথা শুনল না। সে বলল, ফিরে গেলে

জার্মান প্রভুরা তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে মেরে ফেলবে। এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ক্রমে চলতে চলতে ওদের ভয় কমে এলো, আবার গালগল্প শুরু করল। মাইলখানেক গিয়ে দেখে ঝোপের মধ্যে সেই লোকটার মুণ্ডহীন শরীর ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে! সকলে ভয়ে আড়ষ্ট! বার্থা বাদে। ঐ দলে উসাঙ্গার বদমেজাজী স্ত্রী ওর নিরাপত্তার একমাত্র ভরসা। যদিও তার স্বভাব এত কর্কশ যে উসাঙ্গাও ওকে ভয় করত।

সন্ধ্যার আগে ওরা একটা শক্ত বেড়া দিয়ে ঘেরা গ্রামে এসে পৌঁছল। তার পাশেই একটা নদী। মোড়লের সঙ্গে গাঁয়ের লোকরা বেরিয়ে এলো। দু'জন লোক নিয়ে উসাঙ্গা তার সঙ্গে কথা বলতে গেল। অবিশ্যি অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে ছিল, জোর করেও ওরা গ্রাম দখল করতে পারত। কিন্তু ভয়ে ক্লান্তিতে কারো সেরকম মর্জি-ই ছিল না। সে যাই হোক, মোড়ল ওদের থাকতে খেতে দিতে রাজি ছিল, তবে তার বদলে কিছু অস্ত্রশস্ত্র কাপড়-চোপড় আশা করছিল। উসাঙ্গা ভাবল, তবে কি জোর করেই নিতে হবে নাকি? কিন্তু একজন সঙ্গীর সৎপরামর্শে দুই দলে রফা হলো। ওরা খাবে দাবে, বিশ্রাম করবে। তার বদলে আগন্তুকরা কাল শিকারে বেরিয়ে যা কিছু পাবে, মোড়লকে দেবে। তাতে মোড়ল ও খুশি।

বার্থা কিরচেরকে ছোট একটা কুঁড়েতে একা থাকতে দেওয়া হলো। হাত-পা বাঁধাও হলো না। উসাঙ্গা ওকে বলল, পালিয়ে গেলেও সুবিধা হবে না, কারণ চারদিকে হিংস্র জানোয়ারের বাস। তারা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। তবে উসাঙ্গার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে ওর কোনো ভয় নেই। পরে আবার দেখা হবে।

রাতে গ্রামের লোকদের সঙ্গে অতিথিরা আগুনের ধারে খাওয়া-দাওয়া হৈ-হল্লা করছিল। বার্থাকে কেউ কিছু এনে দিল না। উসাঙ্গার স্ত্রী নারাটু কাছে থাকলে তার এত ভয় করত না। শেষ পর্যন্ত নারাটুর খোঁজে বার্থা ভোজসভার কাছে গেল। তাকে দেখে একটা বিকট চেহারার কালো মেয়ে তেড়ে এলো। কিন্তু উসাঙ্গা বলল, 'কি হলো? খাবার-দাবার দেয়নি বোধ হয়? না খাবার নয়, নারাটুকে চায় বার্থা। ওসাঙ্গা ওকে আবার সেই ঘরে পাঠিয়ে দোর গোড়ায় পাহারা বসিয়ে রাখল। নিদারুণ বিপদের মধ্যে বার্থার সময় কাটতে লাগল। প্রহরীটাও লোক সুবিধার ছিল না।

এদিকে টারজান একটা হরিণ মেরে পেট ভরে খেয়ে, শোয়ার জন্যে একটা আরামের জায়গা খুঁজছিল বটে, কিন্তু মনে কোন শান্তি ছিল না। খালি মনে হচ্ছিল ঐ কালো সিপাইগুলো আর তাদের নিষ্ঠুর মেয়েগুলোর হাতে পড়ে বার্থার না জানি কি কষ্টে সময় কাটছে! শেষ পর্যন্ত বাতাসে গন্ধ শুঁকে ঐ গ্রামের ঐ ঘর পর্যন্ত ধাওয়া করল। ঘরে মেয়েটার গায়ের গন্ধ, কিন্তু সে নেই। গাঁয়ের অন্য কোথায়-ও নেই। সে তাহলে পালিয়েছে! ঘরে খালি বুকে বেঁটে বর্শা বেঁধা একটা কালো যোদ্ধার মৃতদেহ পড়ে আছে। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গাছের ডালে ঝুলে সবে টারজান বনের আড়ালে পৌঁছেছে, এমন সময় দূর থেকে বন-মানুষদের দুম দুম উৎসবের ঢাকের শব্দ কানে এলো।

এদিকে বার্থা কিরচের একলা বনপথ ধরে একরকম ছুটে চলেছিল। তার একমাত্র চিন্তা গাঁ থেকে যত দূরে সম্ভব পালাতে হবে। জন্তু-জানোয়ারদের কথা সে-ও ভুলে গিয়েছিল জন্তুরাও কেউ দেখা দেয়নি। ঘণ্টা দুই যাওয়ার পর বেশ কাছেই ভারি জানোয়ারদের চলাফেরার শব্দ আর চাপা গর্জন কানে এলো। বার্থা তখুনি গাছে উঠে পড়ল।

একটা আরাম করে বসার মতো ডাল খুঁজে পেয়ে সেখানে বসামাত্র লক্ষ্য করল যে গাছটা একটা খোলা জায়গার ধারে আর চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জনা কুড়ি সর্বাঙ্গ লোমে ঢাকা বিরাট আকারের বনমানুষ, মাঝে মাঝে হাতে ভর দিলেও মানুষের মতোই দু-পায়ে উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে। বিকট হলেও ওদের চমৎকার চেহারা। দেখতে দেখতে জনা পঞ্চাশ জমা হলো। তাদের মধ্যে মায়ের কাঁধে বসা বাচ্চারাও ছিল। তিনজন বুড়ি বনমানুষী বেঁটে মুগুর হাতে একটা চ্যাপ্টা মতো মাটির ঢিপিতে পিটতে লাগল। অমনি একটা গুম-গুম শব্দ উঠল। বনমানুষরা দুটো দল হয়ে গোল হয়ে বসল। বাইরে মেয়েরা আর বাচ্চারা, ভিতর দিকে পুরুষরা। হঠাৎ দূর থেকে অদ্ভুত একটা ডাক শোনা গেল। পালের গোদা বিশাল দেহ এক বনমানুষ সেই ডাকের উত্তরও দিল।

গোড়ায় আস্তে ঢাক পিটছিল, ক্রমে তাল দ্রুত হয়ে উঠল। পালের গোদা খোলা জায়গাটার মধ্যিখানে লাফিয়ে এসে একলাই তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিল। তারপর চাঁদের দিকে চেয়ে বিকট হুংকার দিল। তার পরেই অদ্ভুত ব্যাপার, সে হুংকারের উত্তর দিয়ে সাদা চামড়ার একটা মানুষ গাছ থেকে নেমে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষগুলো যেন

ক্ষেপে উঠল! লোকটার সাহস দেখে বার্থা স্তম্ভিত হলো। তার পরেই তাকে চিনতে পারল। এ-ই তো ক্রাউটের ঘর থেকে মেজর শ্লাইডারকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। এ-ই তো ওকে মুমার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। এর মাথাতেই পিস্তলের বাড়ি মেরেছিল বার্থা। এ-ই ক্যাপ্টেন শ্লাইডারকে মেরেছিল, কিন্তু বার্থার প্রাণ রক্ষাও করেছিল।

টারজান গোল জায়গার ধারে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি টারজান। টারজান তার ভাইদের সঙ্গে দুম-দুম নাচতে এসেছে। তোমাদের রাজা কোথায়?'

তারপর রাজার সামনে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ দিল, 'টারজান তার ভাইদের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে এসেছে। ভালো ভাবে তাকে নাও তো ভালো। আর যদি তা না নাও তো টারজানও মারতে জানে। কি বল? দুম-দুম নাচতে দেবে, নাকি টারজানই আগে মারবে?'

পালের গোদা অবুঝের মতো চ্যাঁচাতে লাগল, 'আমি বনমানুষদের রাজা গোলাট। আমি মেরে ফেলব! মেরে ফেলব!' বলেই তেড়ে এলো। বার্থা ভাবল টারজান বোধ হয় এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। গোদা দু-হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে ফেলে আর কি! হঠাৎ সাপের ছোবলের মতো খপ করে বাঁ হাত দিয়ে গোলাটের বাঁ হাতের কব্জি ধরে ফেলে এক পাক দিয়ে জুজুৎসু কায়দায় ওর ডান হাতটাও চেপে ধরল। এ কায়দা সভ্য জগতে শেখা। অতি সহজেই মোটা মোটা হাড় ভেঙে যেতে পারে।

টারজান চেঁচিয়ে বলল, 'টারজান শান্তিতে নাচে যোগ দেবে, নাকি মারবে?'

গোদা চ্যাঁচাতে লাগল, 'আমি মারব! আমি মারব!'

এক প্যাঁচ দিয়ে টারজান তাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'আমি বনমানুষদের রাজা টারজান! শান্তি হবে না-কি?'

ব্যাটা তবু বলে, 'মারব! মারব! মারব!' টারজান তখন বিচিত্র কায়দায় তাকে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল। সব বনমানুষগুলো বাহবা দিতে লাগল। বার্থার মনে হলো এরা টারজানের কোনো ক্ষতি করবে না। তারপর টারজান গোলাটকে পিঠে তুলে নিজের কাঁধ ডিঙিয়ে আবার ফেলল। গোদার মুণ্ডুটা আগে মাটি ছুঁল। গোদা অচেতন, অজ্ঞান!

তখন টারজান সবাইকে ডেকে বলল, 'আমি বনমানুষের ছেলে টারজান। ভাইদের সঙ্গে দুম-দুম নাচতে এসেছি!' ইশারা করতেই বুড়িরা আবার ঢাক পেটাতে শুরু করল। মূর্চ্ছা ভেঙে গোলাটও উঠে, 'কাগোদা' বলে পরাজয় স্বীকার করল। বলল, 'টারজান তার ভাইদের সঙ্গে দুম-দুম নাচবে। গোলাটও তার সঙ্গে নাচবে!'

তারপর সে কি উন্মত্ত নাচ! তাণ্ডব নাচ আর কাকে বলে! চোখের সামনে টারজান একটা বনমানুষ বনে গিয়ে, তাদের দলে মিশে গেল। স্তম্ভিত হয়ে এত মন দিয়ে বার্থা নাচ দেখছিল যে কখন যে শীতা প্যান্থার উপরের ডালে উঠে বসেছে তা টের পায়নি। হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে, ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে, ডাল থেকে একেবারে মাটিতে নেমে পড়ল।

এমনিতেই ঐ উন্মত্ত নাচ বনমানুষদের মাথায় চড়েছিল, তার উপর হঠাৎ ওদের নাচের জায়গায় একটা সাদা চামড়া মেয়ে দেখে, ক্ষেপে গিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এলো। মেয়েগুলোও উঠে পড়ল। তখন টারজান ডাইনে-বাঁয়ে ঘুঁষি মেরে তাদের সরিয়ে, এক হাতে বার্থাকে জড়িয়ে ধরে, বনমানুষদের ভাষায় বলল, 'এ আমার জুড়ি। এর অনিষ্ট কর না।' অমনি তারা সরে গেল। যদিও বার্থা এর এক বর্ণ বোঝেনি, তবু টারজান মনে মনে লজ্জা বোধ করছিল যে নিজের বৌ বলে একটা জঘন্য জার্মান মেয়ের পরিচয় দিতে হলো। কিন্তু সে তো আর জার্মান নয় যে নারী হত্যা হতে দেবে!

*

জার্মানদের সঙ্গে আফ্রিকাতে যুদ্ধরত ব্রিটিশ এয়ার ফোর্সের ব্রিটিশ ঈস্ট আফ্রিকার ঘাঁটিতে একটা গুজব এসে পৌঁছেছিল যে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে জার্মানরা একটা বিরাট বাহিনী নামিয়েছে। তারা নাকি পুব দিকে এগিয়ে এখন মাত্র দশ-বারো দিনের যাত্রা-পথ দূরে পৌঁছে গেছে। এই কারণে লেফটেনাণ্ট হ্যারোল্ড পার্সি ওল্ডউইক্‌কে আকাশ থেকে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করতে পাঠানো হয়েছিল।

মাইলের পর মাইল ঘন বনের উপর দিয়ে একা ওল্ডউইক্ তার ছোট প্লেন থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কোনো সৈন্য, ট্রাক্, ঘোড়া, কিম্বা পরিত্যক্ত ক্যাম্প খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বন, পাহাড়, প্রান্তর, অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে দেখে বিকেল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে তরুণ বৈমানিক সবে ভাবছে এবার ঘাঁটিতে ফিরবে। যথেষ্ট পেট্রল আছে, রাতের আগেই পৌঁছে যাবে। এমন সময় এঞ্জিনটা বিকল হলো। ওল্ডউইক্ ভাবল, নিচে প্রান্তর গাছপালা, বড় একটা নদী দেখা যাচ্ছে, বনের উপর ভেঙে পড়ার চেয়ে এখানে

নামাই ভালো।

নদীটার কাছে মাঠের উপর নিরাপদে নেমে সে এঞ্জিনের প্রতিকারে মন দিল। বয়স কম, নীল চোখ, সোনালী চুল, হাসি খুশি মানুষটার মনেও যথেষ্ট সাহস ছিল। এখানে যে কোনো বিপদ ঘটতে পারে এ-কথা তার একবারও মনে হয়নি। নিশ্চিন্ত মনে মেরামতির কাজ শেষ করে, এঞ্জিনটা একবার পরখ করে, ভাবল ফিরবার আগে একটু হাত পায়ের আড়ষ্টতা ভেঙে, একটা সিগারেট খাওয়া যাক। এ জায়গাটা যেন ইংল্যাণ্ডের একটা পার্ক!

হঠাৎ পিছনের বন থেকে বিকট চিৎকার করে জনা কুড়ি ন্যাংটো কালো যোদ্ধা এমন ভাবে ছুটে এলো যে দৌড়ে এরোপ্লেনে উঠে রওনা দেওয়ার পথ বন্ধ হলো। যোদ্ধাদের হাতে তীর-ধনুক, বর্শা। ওদের দলপতি নুমাবো অন্যদের চেয়ে লম্বা-চওড়া, আগেভাগে সে-ই ছিল। তার বুকে একটা পিস্তলের গুলি মেরে পেড়ে ফেলতে পারলে, নিসন্দেহে বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাত। দুঃখের বিষয় গুলিটা মোক্ষম স্থানে লাগল না। একবার পিছিয়ে গেলেও তারা আবার তেড়ে এলো।

পিস্তলের গুলিতে গোটা দুই ঘায়েল হলেও, বাকি রইল আঠারোজন যোদ্ধা আর পাঁচটা গুলি। শেষ পর্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করেও আধা অচেতন অবস্থায় ওল্ডউইক্ বন্দী হলো।

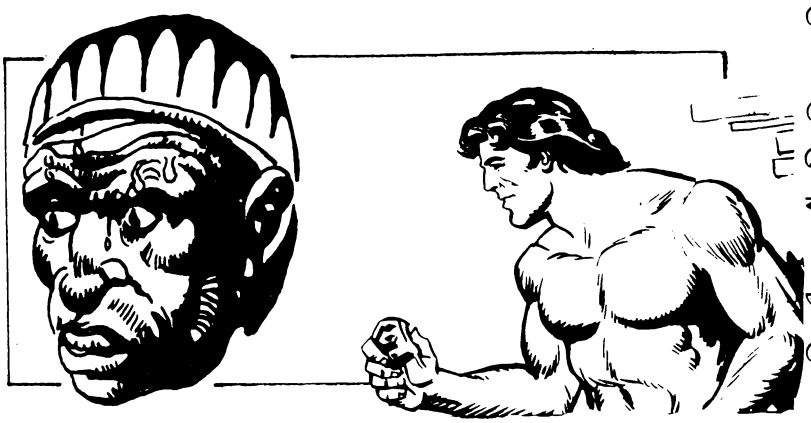

তারপর ওকে আধ ঘণ্টা হাঁটিয়ে, নদীর ধারে শক্ত বেড়ায় ঘেরা ছোট একটা গ্রামে নিয়ে গেল। অমনি গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ বণিতা হল্লা করতে করতে ওকে ঘিরে ফেলল। নুমাবো তাদের ভাগিয়ে দিল। এমন সময় গ্রামের উল্টো দিক থেকে এক দল নিগ্রো এগিয়ে এলো। তাদের পরণে জার্মান ইউনি-ফর্মের ধ্বংসাবশেষ। একবার মনে হলো এইবার বোধ হয় জার্মান অনুপ্রবেশের প্রমাণ পাওয়া গেল। তবে বড় বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে, আর কখনো এরোপ্লেনে পৌঁছবার সুযোগ পাবে কিনা সন্দেহ!

উসাঙ্গা মোড়লকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে কোথায় পেলে?'

—'আরে আকাশ থেকে নেমে এলো। একটা পাখির মতো জিনিস চেপে। আমরা ওকে আক্রমণ করলে, আমাদের দু'জনকে মেরে ফেলল। তবু ওকে বন্দী করেছি। ওয়ামা-বোদের মতো বীর কোথাও নেই।'

উসাঙ্গা চোখ বড় করে বলল, 'আকাশ থেকে উড়ে এলো?'

—'হ্যাঁ, নদীর ধারে নামল, মস্ত পাখির মতো একটা জিনিস চেপে। সেটা যদি আবার উড়ে না গিয়ে থাকে তো এখনো আছে।'

—'ও না চাপলে ও পাখি উড়তে পারবে না। ওর মধ্যে থেকে বোমা পড়ে সবাইকে মেরে ফেলে। ভাগ্যিস্ লোকটাকে বন্দী করেছ, নয়তো এ গ্রামেও হয়তো বোমা ফেলত। ঐ ইংরেজগুলো ভারি খারাপ।'

নুমাবো বলল, 'সে ভয় নেই। ওকে আর উড়তে হবে না।' এই বলে ওল্ডউইক্‌কে একটা ঘরে বন্দী করে, বাইরে দু'জন পাহারা বসাল।

কিছুক্ষণ বাদে উসাঙ্গা ওর কাছে গেল। ওল্ডউইক্ বলল, 'আমাকে বন্দী করেছে কেন? ইংরেজদের সঙ্গে ওদের তো ঝগড়া নেই!'

উসাঙ্গা বলল, 'কে ইংরেজ কে জার্মান তা ওরা বোঝে না। কেন বন্দী করেছে ঐ দেখ।'

ওল্ডউইক্ দেখল, গ্রামের অন্য ধারে একটা বড় খুঁটি পোঁতা, তার চারদিকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা হয়েছে, মেয়েরা হাঁড়ি বের করেছে। ওল্ডউইক্ নির্বিকারভাবে বলল, 'তোমরা আমাকে খাবে নাকি?'

—'আমরা খাব না, ওয়ামাবোরা খাবে। তবে আমরা মেরে দিতে পারি। আর আকাশে উড়ে আমাদের দেশের লোকের মাথায় বোমা ফেলতে হবে না।'

গ্রামের উত্তরে বেশ কয়েক মাইল দূরে একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে একটা খড়ের চালের কুঁড়েঘর তৈরি করে, তার চারদিকে কাঁটাঝোপের বেড়া দিচ্ছিল। ঐ মেয়েটি হলো বার্থা কিরচের আর পুরুষটি টারজান। বনমানুষদের হাত থেকে ওকে উদ্ধার করে টারজান এখানে এনেছে। বার্থা ভালো করেই জানত টারজান ওকে জার্মান স্পাই বলে ঘৃণা করে, তবু বারেবারে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে। ও নিজে টারজানকে ভারি শ্রদ্ধা করে। বেশি কথা বলত না টারজান ওর সঙ্গে। টারজানের অতীত জীবন সম্বন্ধে ও কিছুই জানত

না। বনমানুষদের সঙ্গে ওর এত অন্তরঙ্গতা দেখেও অবাক হতো।

টারজান সম্বন্ধে প্রথম ভয়টা কেটে গেলে বার্থা জিজ্ঞাসা করল, তার এবার কি করার ইচ্ছা। টারজান বলল, 'পশ্চিমে আমার জন্মস্থান। সেখানে যাব। তার আগে তোমার থাকার জন্য একটা নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা করে দেবো।'

শুনে বার্থার কি ভয়! 'আমাকে এখানে একা ফেলে চলে যাবে?'

—'কেন যাব না? আমি তো তোমাকে এখানে নিয়ে আসিনি। তোমার নিজের লোকরা কি শত্রুদের মেয়ের জন্য এর বেশি করত?'

—'হ্যাঁ, করত। আমার দেশের কোনো পুরুষ একজন অসহায় মেয়েকে এই রকম বিকট জায়গায় একা ফেলে রেখে যেত না।'

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ইংরিজি বলতে পার?'

—'নিশ্চয় পারি। তবে তুমিও যে পার তা জানতাম না।'

জামান হলেও মনে মনে মেয়েটার সহ্যশক্তি আর কর্মক্ষমতার প্রশংসা না করে টারজান পারল না। রক্তাক্ত হাতে সমানে কাঁটাঝোপের বেড়া তৈরিতে সাহায্য করে যাচ্ছে। শেষটা টারজান বলল, 'থামো। আর করো না।'

—'কেন করব না। আমার জন্যেই তো ঘর হচ্ছে। তোমারও কি কম কষ্ট হচ্ছে?'

টারজান বলল, 'তুমি যে মেয়ে। কাজ যদি করতেই হয়, তাহলে ঐ লাউখোলাগুলোতে নদী থেকে জল এনে ভরে রাখো। আমার অনুপস্থিতিতে দরকার হতে পারে।'

—'তুমি সত্যি চলে যাবে?'

—'বোমা তৈরি হলে, শিকার করতে যাব। কাল তোমাকে নিজের খাবার জোগাড় করতে শিখিয়ে দেবো। আমি চলে গেলে, কাজে দেবে।'

বিষণ্ণ মনে জল আনতে গিয়ে ফেরার পথে গোলাটের সঙ্গে দেখা। গোলাটের ধারণা মেয়েরা আসলে তাকেই ন্যাড়া-গা টারজানের চেয়ে বেশি পছন্দ করবে। সে কাছে আসতেই বার্থা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। টারজান সে চিৎকার শুনে কাছে আসতেই গোলাট বলল, 'আমি ওর কোনো ক্ষতি করছি না।'

টারজান বলল, 'তা আমি জানি, কিন্তু ও তো জানে না। ও তোমার কথা বোঝে না, তাই ভয় পাচ্ছে।'

বার্থাকে টারজান বলল, 'ও তোমার কোনো অনিষ্ট করবে না। ওর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।'

—'কিন্তু আমার যে ভয় করে!'

—'ওরা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। এ বনে ওরাই তোমার বন্ধু হবে। কোনো একজন কিছু বললে, কি করতে হবে আমি শিখিয়ে দেবো।'

ততক্ষণে অন্য বনমানুষরাও এসে পড়েছিল। টারজান তাদের বলল, 'আমি শিকার করতে যাচ্ছি। এ মেয়ে এখানে রইল। দেখো যেন ওর কোনো কষ্ট না হয়।'

তারপর বার্থাকে বলল, ওরা তোমার কোনো অনিষ্ট করবে না। তবু আমার বর্শাটা রেখে গেলাম, দরকার হলে ব্যবহার করো। আমি শিগগিরই ফিরে আসব।' টারজান চলে গেলে, কুঁড়েঘরে ঢুকে মাটিতে শুয়ে বার্থা খুব খানিকটা কেঁদে নিল।

*

এদিকে টারজান শিকারের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে নুমাবোর গ্রামের খুব কাছে এসে পড়েছিল। ভাবল একটু মজা করা যাক। কালোদের ভয় দেখিয়ে সে ভারি মজা পেতো। এই ভেবে বেড়ার বাইরে একটা বড়গাছের ডালে চড়ে, তার একটা লম্বা ডাল ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। ডালটা বেড়ার উপর দিয়ে গ্রামের মধ্যে ঝুলে পড়েছিল। যাওয়া-আসার ভারি সুবিধা। দুঃখের বিষয় ডালটার মধ্যে ঘুণ ধরেছিল, তাই মাঝপথে টারজানের ওজনে ভেঙে পড়ল। টারজানও বেড়ার মধ্যে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। শব্দ শুনে গাঁয়ের লোক ছুটে এলো। দু-একজন তখনি ওকে বর্শা দিয়ে মেরে ফেলতে চাইছিল, নুমাবো বাধা দিয়ে বলল, 'রসো, রাতে ভালো ভোজ হবে।'

শেষ পর্যন্ত অচেতন অবস্থাতেই তাকে তুলে ওল্ডউইকের ঘরে নিয়ে রাখা হলো। ওল্ডউইকও টারজানের পতনের শব্দ শুনেছিল গ্রামের লোকদের হৈ-হল্লাও ওর কানে গিয়েছিল। টারজানকে ফেলে রেখে সবাই চলে গেলে, তাকে দেখে ওল্ডউইকের বড় মায়া হলো, বিস্ময়ও হলো। কি চমৎকার শরীর মানুষটার। অসভ্যদের মতো সাজ হলেও সে যে ইউরোপের লোক তাতে সন্দেহ ছিল না।

আস্তে আস্তে লোকটা চোখ খুলল। ছাই রঙের, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, পা-ও বাঁধা। ওল্ডউইক মুচকি হেসে বলল, 'আজ রাতে ওরা খাবে-দাবে ভালো। তোমাকে ধরল কি করে?'

—'নিজের বোকামির জন্য। গাছের পোকা-খাওয়া

ডালে চড়েছিলাম। পড়েই অজ্ঞান।'

ওল্ডউইক্ বলল, 'পালাবার উপায় নেই?'

—'তা থাকতেও পারে। খুঁটির চারধারে আগুন জ্বালার পরেও লোককে পালাতে দেখা গেছে।'

টারজান একটু পরে বলল, 'এদিকে গড়িয়ে এসো, দাঁত দিয়ে তোমার বাঁধন কেটে দিই।' তাই করা গেল। তারপর ওল্ডউইক্ টারজানের দড়ি খুলে দিল। ঠিক সেই সময় একজন প্রহরী ঢুকে দেখতে পেয়ে, খুব মারধোর করে, আবার বেঁধে রেখে চলে গেল।

এদিকে জু-টাগ বলে একজন কমবয়সী বনমানুষ একা শিকার করতে বেরিয়ে নদীর ধারে কালোদের গাঁয়ের কাছে এসে পড়েছিল। কৌতূহল বশে গাঁয়ে কি হচ্ছে দেখার জন্যে কাছাকাছি একটা গাছে চড়েই, টারজানের পতন দেখতে পেল। তারপর নিগ্রোরা যখন ওকে তুলে ঘরে নিয়ে গেল জু-টাগ রাগের চোটে আকাশে মুখ তুলে ডাক দিল। গোলাটকে অত সহজে পরাজিত করে টারজান দলের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিল। জু-টাগের বয়স কম, কিন্তু গায়ের জোর আর বুদ্ধি অন্যদের চেয়ে বেশি। গোড়ায় ভেবেছিল একাই টারজানকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে। তারপর সুবুদ্ধি হওয়াতে দলকে ডেকে আনতে চলল।

অন্যরা তখনো বার্থার বোমার চারদিকে খাবার খুঁজছিল, কিম্বা বিশ্রাম করছিল। তাদের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে রাগে ফোঁসফোঁস করতে করতে, জু-টাগ এসে উপস্থিত হলো। ওর উত্তেজনা দেখে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। এ আবার লড়াই-টড়াই করতে চায় নাকি! জু-টাগ উত্তেজিত ভাবে যা যা দেখেছে সব বলে বলল, 'চল, আমরা গিয়ে ওকে উদ্ধার করে আনি।'

বলা বাহুল্য সকলের সামনে পরাজিত হয়ে, গোলাট টারজানের উপর কিছু খুশি ছিল না। সে বলল, 'আমরা কেন বিপদের মধ্যে মাথা গলাব? ও তো আমাদের দলের কেউ নয়। ইচ্ছা হয় তুমি যাও আর ওর ঐ বৌটাকেও নিয়ে যাও।'

জু-টাগেরও রক্ত গরম হয়ে উঠল। সে বলল, 'যাবই তো। ওকেও নিয়ে যাব আর আমাদের দলের যারা কাপুরুষ নয়, তাদেরও নিয়ে যাব।' আটজন জোয়ান এগিয়ে এলো।

জু-টাগ বোমা ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকলে বার্থা প্রথমে ভয়ও পেয়েছিল। কিন্তু ওর হাব-ভাব দেখে বুঝল ও কোনো ক্ষতি করতে চায় না, খালি সঙ্গে যেতে বলছে। নিশ্চয় একটা কিছু হয়েছে। কথা তো আর বার্থা বুঝল না। শেষ পর্যন্ত বোমার দরজা ফাঁক করতে বার্থা সাহায্যও করল। তারপর জু-টাগ খুশি হয়ে ওকে পিঠে তুলে গাছে ঝুলে রওনা দিল। সঙ্গে আট জোয়ান। বার্থার খুব সাহস, তবু মাঝে মাঝে শূন্যপথে ও-ভাবে যেতে চোখ বুজতে হচ্ছিল।

গাঁয়ের কাছে পৌঁছবার আগে জু-টাগরা একবারও থামেনি। তখন সন্ধ্যা নেমেছে। গাঁয়ের বীভৎস ফুর্তির সময় হয়ে এসেছে। বেড়ার ধারে গাছের ডালে বার্থাকে নামিয়ে, জু-টাগ একটা কুঁড়েঘরের দিকে দেখাল। বার্থা বুঝল ওখানে তাকে যেতে হবে। হঠাৎ চোখে পড়ল গ্রামের অন্য দিকে খুঁটি পোঁতা হচ্ছে। বার্থা তার মানে বুঝতে পারল। যেমন করেই হোক টারজানকে বাঁচাতে হবে। সে নিশ্চয় ওখানে আছে। আরেকটু রাত হোক। জু-টাগও রাতের জন্য অপেক্ষা করছিল।

এর মধ্যে গাঁয়ে একটা সোরগোল উঠল। জনা কুড়ি গাঁয়ের জোয়ান মোড়লকে ঘিরে মহা তর্কাতর্কি লাগিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আরেকটা খুঁটিও এনে পোঁতা হলো। বার্থা ভাবছিল, জু-টাগ কেন ওকে এনেছে। আরেকটু অন্ধকার হলে বনমানুষরা নিঃশব্দে গাছে গাছে এগিয়ে এমন জায়গা দখল করল, যেখান থেকে গাঁয়ের ভিতরটা পরিষ্কার দেখা যায়। এতক্ষণে বার্থা বুঝল জু-টাগ যে ঘর দেখিয়েছে, তার মধ্যে টারজান আছে।

একটু পরেই দু-জন সাদা-চামড়া বন্দীকে টানতে টানতে যোদ্ধারা বেরিয়ে এলো। একজন টারজান, অন্যজনের বৈমানিকের ইউনিফর্ম পরা। জু-টাগের কাঁধে হাত রেখে বার্থা বলল, 'এসো।'

দু'জনে নিঃশব্দে অন্ধকারের আড়ালে বেড়ার ভিতরে নেমে পড়ল। জু-টাগের পিছন পিছন অন্যরাও নামল। ততক্ষণে খুঁটির সঙ্গে ওদের বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। তাহলে দড়ি কাটার জন্য একটা কিছু দরকার। সকলে খুঁটির চারদিকে ব্যস্ত। এরা দশজন পথের ধারেই যে ঘর, তার মধ্যে ঢুকল। একটা বর্শাও পাওয়া গেল। সেটা হাতে নিয়ে, দরজার কাছে এলো বার্থা।

খুঁটিতে বাঁধা দু'জনার মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। ওদের চারদিকে যোদ্ধারা গোল হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছিল।

বৃত্তটা ক্রমে ছোট হয়ে আসছিল। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এলে মোড়লই প্রথম বর্শা বিঁধিয়ে রক্তপাত করবে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে নুমাবো টারজানের বুকে বর্শার খোঁচা দিল, খানিকটা রক্ত গড়িয়ে এলো। তাই দেখে সে কি উন্মত্ত উল্লাস!

তারই মাঝে গ্রামের লোকদের মধ্যে চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। মুখ তুলে নুমাবো চেয়ে দেখল যেন বিশাল দেহ লোমশ বনমানুষের একটা গোটা দল আসছে! টারজান আর ওল্ডউইক্ ওদের দেখতে না পেলেও, ওদের হাঁকডাক থেকে চিনতে পেরেছিল। নুমাবোরা নাচ থামিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখল সেই যে মেয়েটা পালিয়ে গিয়েছিল, বনমানুষরা তাকেই ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে। গ্রামের লোকরা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে যে যেদিকে পারে পালাতে লাগল। সামনে যারা পড়ল জু-টাগ ঘুঁষি মেরে, আঁচড়ে কামড়ে তাদের সরিয়ে দিতে লাগল।

টারজান তাকে বলল, 'তোমরা কালো গোদাগুলোকে ঠেকাও, এ আমার বাঁধন কেটে দিক।' বর্শার সাহায্যে একটু কষ্ট করে দড়ি আলগা করতেই টারজান নিজেই নিজেকে মুক্ত করে বলল, 'ওর বাঁধনও কেটে দাও।' এই বলে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গ্রামবাসীরা দলে অনেক ভারি। এরই মধ্যে তিনজন বনবাসী ধরাশায়ী হয়েছে। অস্ত্র কোথায় পাবে? হঠাৎ টারজানের চোখে পড়ল হাঁড়িগুলোর জল টগবগ করে ফুটছে। সঙ্গে সঙ্গে একটাকে তুলে কালো যোদ্ধাদের গায়ে ঢেলে দিল। তারপর আরেকটা। তারপর আরেকটা। এবার ছত্রভঙ্গ হয়ে সব দৌড়তে লাগল। ততক্ষণে টারজান নিজের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে। ওল্ডউইক্ কার একটা বর্শা তুলে নিয়েছে। তারপর যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ওরা তিনজন আর ছয়জন বনমানুষ ফটক দিয়ে বেরিয়ে বনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

*

সেই বোমার মধ্যেই তিনজন আশ্রয় নিল।

এর মধ্যে এক দিন টারজান হরিণ শিকার করে ফিরছে। দেখতে পেল বার্থা আর ওল্ডউইক্ও নদীর দিক থেকে ফিরে আসছে। টারজানের মনে বড় দুশ্চিন্তা। জেন্ গিয়ে তক ওর একমাত্র ইচ্ছা শৈশবের সেই পরিবেশে, বাপের তৈরি সেই কেবিনে ফিরে যায়। কিন্তু এদের দু'জনকে নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এরা শিশুর মতো, বনে দু-দিনও টিঁকবে না। অথচ কি সাহস আর দৃঢ়তা ঐ মেয়েটার, তা সে জার্মান স্পাই হোক কি যা-ই হোক। ওল্ডউইক্ও অসম্ভব সাহসী। এদের ঝেড়ে ফেলে কি করে?

ওর আগে আগে গাছতলা দিয়ে যাচ্ছিল যে দু'জন, তারা লক্ষ্য না করলেও, টারজান দেখতে পেল ওদের মাথার ওপর গাছের পাতা নড়ে উঠল। তার মানে শীতা প্যান্থার! তখনো বোমা পৌঁছতে অর্ধেকটা পথ বাকি ছিল। টারজান গাছ থেকে ঝুপ করে নেমে, ডেকে বলল, 'আমার দিকে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকো। দৌড়লেই শীতা পিছু নেবে।'

ওরা তো অবাক! আর শীতার কি রাগ! এ নিশ্চয় ওর শিকার ভাগাচ্ছে। তা হবে না। সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে এলো। টারজান একটু দূরে থাকলেও বাতাসের বেগে ছুটে এসে এক লাফে শীতার পিঠে। লেফটেনান্ট ওল্ডউইক্ জীবনে কখনো এমন লড়াই দেখেনি। কেউ কাউকে ছাড়ে না। টারজানও যেন একটা হিংস্র পশু বনে গিয়েছে। গলা থেকে অদ্ভুত শব্দ বের করছে। মাটিতে দু'জনে জড়াজড়ি করে গড়াচ্ছে। শীতা কিছুতেই ওকে ঝেড়ে ফেলতেও পারছে না, থাবা দিয়ে নাগালও পাচ্ছে না। টারজান শীতার ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। তবু শীতা হার মানছে না! দম নেবার জন্য দু'জনেই যখন একটু ঢিল দিয়েছে, বার্থা এক কাণ্ড করে বসল। এর মধ্যে ছুটে গিয়ে বোমার ভিতর থেকে টারজানের দেওয়া সেই বেঁটে বর্শাটা নিয়ে এসেছিল। সেটাকে ওল্ডউইকের হাতে না দিয়ে, নিজেই শীতার বুকে বসিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শীতার মৃত্যু। টারজান একবার ওর দিকে তাকিয়ে শিকার করা হরিণটা ওকে দিয়ে বলল, 'তোমাদের ভাগটা রান্না কর। আমি ও-ভাবে মাংস নষ্ট করি না।' আশ্চর্য মেয়ে বটে, সব গুণ আছে! তবু ঘৃণ্য জার্মান স্পাই।

পরে ওল্ডউইক্ বার্থার প্রশংসা করলে তাকেও বলেছিল ও-কথা। সে তো বিশ্বাসই করতে চায় না! 'কি ভালো মেয়ে, কি মিষ্টি স্বভাব!'

টারজান বলল, 'তবু আমি ওকে ঘৃণা করি। তোমারও করা উচিত।'

ওল্ডউইক্ বলল, 'সে আমি পারব না।'

এর কিছু পরে টারজান বলল, 'আমি আবার দু'দিনের জন্য শিকারে যাচ্ছি। ঘরে যথেষ্ট খাবার আছে।'

ও চলে গেলে ওল্ডউইক্ বার্থাকে বলেছিল, 'টারজানের অন্য কাজ আছে। আমরা থাকাতে ও আটকে পড়েছে।

আমরা বাধা স্বরূপ। আমরা চলে গেলেই ও খুশি হয়। কর্তব্যজ্ঞানের জন্য কিছু বলছে না। আমার এরোপ্লেনটা নিশ্চয় সেইখানেই আছে। এরা তো ওড়াতে জানে না! তাতে করে আমরা স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারি।'

বার্থা বলল, 'ও না ফিরলে যাওয়া যায় না। ধন্যবাদ না দিয়ে কি করে যাব? এত করেছে আমাদের জন্যে!'

—'আমার বিশ্বাস ও যদি ফিরে এসে দেখে আমরা চলে গিয়েছি, ও খুব খুশি হবে। বিশেষ করে তোমার আর থাকা উচিত নয়। ও যেমন তোমার জন্য করেছে, তুমিও তেমনি ওর জন্য কম করনি।'

—'আর কি বলেছে?'

—'বলেছে তুমি জার্মান স্পাই বলে ও তোমাকে ঘৃণা করে। তোমার জন্য যা করে কর্তব্য বলেই করে।'

তখন বার্থা বলল, 'চল তবে। খানিকটা মাংস নিয়ে গেলে ভালো। কোথায় কি পাবো বলা যায় না।'

তারপর দু'জনে নদীর ধার দিয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা দিল। ওল্ডউইকের হাতে সেই বেঁটে বর্শাটি আর বার্থার হাতে একটা গাছের ডাল। যাবার আগে টারজানকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চিঠি লিখে, ওল্ডউইক্ ঘরের দেয়ালে আটকে রেখে গেল। খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছিল, হিংস্র জানোয়ারের অভাব নেই, তাছাড়া নুমাবোর কালো যোদ্ধাদের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে, গ্রামটার কাছেই তো পথ!

বার্থা বলল, 'নুমাবোর চেয়েও উসাঙ্গাকে আমার বেশি ভয়। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে, মিলিটারি শিক্ষাও পেয়েছে। কে জানে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণ চেয়ে না বসে, কিম্বা কোনো নিগ্রো সুলতানের কাছে বেচে না দেয়!'

গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরে ওরা বাঁ দিকের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগল। দক্ষিণে খানিক খোলা জায়গায় এরোপ্লেনটা ছিল। তার চারদিক ঘিরে এক দল কালো যোদ্ধা। তাদের পরনে জার্মান ইউনিফর্মের ধ্বংসাবশেষ। তাদের পাণ্ডা হলো দুরাচার উসাঙ্গা। এর আগেও সে অনেক-বার প্লেনটাকে দেখে গিয়েছে। তার বড় ইচ্ছা ওটাকে চালাতে শেখে। তার থেকে অনেক লাভ হতে পারে। ওটা উড়িয়ে নিজের এলাকায় নিয়ে যেতে পারলে, চারদিকের সব গ্রামের লোকরা ওকে দেবতার মতো ভক্তি করবে। টাকাকড়ি প্রণামী দেবে। উসাঙ্গা বড়লোক হয়ে যাবে। দু' ডজন বৌ রাখবে।

ওর কপাল ভালো যে ঠিক সেদিনই দেখল ব্রিটিশ বৈমানিক সেই মেয়েটাকে নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। তারা কিন্তু কাউকে দেখতে পায়নি। কারণ উসাঙ্গা দলবল নিয়ে ঝোপের পিছনে লুকিয়ে ছিল। এরো-প্লেনটাকে দেখে ওরা দু'জন মহাখুশি। ঠিক সেই মুহূর্তে উসাঙ্গা আর তার অনুচররা ওদের ঘিরে ফেলল।

*

ওদের দেখে বার্থার কি ভয়! ওল্ডউইকও হতাশ হলো। উসাঙ্গাদের গায়ে জার্মান ইউনিফর্ম দেখে সে ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করল ওদের অফিসাররা কোথায়। ওরা কিছুই বুঝল না। বার্থা যখন ওদিকে প্রচলিত জগাখিচুড়ি ভাষায় ও-কথাই জানতে চাইল, উসাঙ্গা হেসে বলল, 'কোথায় গেছে তা তো জানোই, সাদা মেয়ে। মরে গেছে। আর এই সাদা মানুষটা যদি আমার কথা না শোনে ও-ও মরে যাবে।'

বার্থা তো অবাক! বলল, 'ওর কাছ থেকে কি চাও তোমরা?'

—'উড়তে শিখতে চাই।'

ওল্ডউইক্ সব কথা শুনে বলল, 'তা এরোপ্লেন চালাতে শেখালেই যদি আমাদের মুক্তি দেয়, তাহলে মন্দ কি?'

উসাঙ্গা ধূর্তের একশেষ। নিজের সুবিধার জন্য সব কিছু প্রতিজ্ঞা করতে সে রাজি। ওদের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়। তোমাদের কোনো উপনিবেশের কাছে নামিয়ে দেবো। পাখিটা কিন্তু আমাকে দিয়ে দিতে হবে।'

কথাটা পছন্দ না হলেও, ওল্ডউইক্ রাজি হলো। কারণ অন্য উপায় ছিল না। ওর কথা থেকে বার্থা বুঝল ওল্ডউইকের কাছে প্লেনটার চেয়ে বার্থার নিরাপত্তার মূল্য বেশি।

উসাঙ্গার ইচ্ছা এখনি প্লেন ওড়ানোর প্রথম পাঠ দেওয়া হোক। ওল্ডউইক্ বলল, 'তাহলে তিনজনেই প্লেনে চড়ে প্রথম পাঠটা হয়ে যাক!'

উসাঙ্গার বড় ভয়, এরা দু'জন যদি ওকে একা পেয়ে জার্মান অঞ্চলে নামায়, ওর তাহলে প্রাণদণ্ড নিশ্চিত। কাজেই সে বলল, 'সাদা মেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না আমরা ফিরি।'

ওল্ডউইক্ বার্থাকে বলল, 'তাহলে ওকে বলো, যদি ফিরে এসে ওপর থেকে তোমাকে দেখতে না পাই, আমি কিন্তু নামব না। ওকে সটাং ক্যাম্পে নিয়ে যাব। সেখানে ওর ফাঁসি হবে।' উসাঙ্গা এতে রাজি হলো।

উঠল দু'জনে প্লেনে। দলের লোকরা ঐখানে বার্থার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল। উসাঙ্গার কোমরে স্ট্র্যাপ বেঁধে ওল্ডউইক্ এঞ্জিন চালিয়ে দিল। প্রপেলার ঘুরতে শুরু করতেই উসাঙ্গার কি ভয়! পারলে লাফিয়ে পড়ে! নেহাৎ স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা। ভীষণ চ্যাঁচামেচি করতে লাগল, কিন্তু প্রপেলার আর মোটরের শব্দ ছাপিয়ে ওল্ডউইক্ হয়তো শুনতেই পেল না। মোট কথা প্লেনটা একটু দৌড়েই মাটি ছেড়ে আকাশ নিল। উসাঙ্গা চেয়ে দেখল নিচে গাছপালা, মাঠ, নদী, নুমাবোর গ্রামের কুঁড়েঘর। প্রথমটা বেজায় ভয় পেলেও, ক্রমে ভয়টা কমে গেল। তখন সে এরোপ্লেন চালাবার কায়দা-কানুন লক্ষ্য করতে লাগল। আধঘণ্টা পরে ওল্ডউইক্ এরো-প্লেনটাকে লুপ্ খাওয়াল, উল্টো করে ওড়াল। সে সময় উসাঙ্গা ভয়েই আধমরা! তারপর আস্তে আস্তে নিচে এলো, কিন্তু বার্থাকে দেখতে না পাওয়া অবধি মাটিতে নামাল না।

খুব ঘাবড়ে গেলেও মাটিতে পা দিয়েই উসাঙ্গার আস্ফালন দেখে কে! সে ধরেই নিয়েছিল প্লেনটা এক রকম ওর। পাছে কেউ কেড়ে নেয়, কিম্বা কোনো ক্ষতি করে, তাই গাঁয়ে না ফিরে, প্লেনের কাছেই ক্যাম্প করে রাত কাটাবার ব্যবস্থা হলো। দুটো দিন ধরে প্রায় সমস্তক্ষণ উসাঙ্গার প্রশিক্ষণ চলল। দু'দিন পরে উসাঙ্গার ধারণা হলো যে ও এখন একাই প্লেন চালাতে পারবে। ওর বিশ্বাস ওল্ডউইকের আসল মতলব রাতারাতি প্লেন নিয়ে সরে পড়া, তাই বলছে আরো শিক্ষা দরকার।

উসাঙ্গার নিজের মনেও একটা বদ মৎলব ছিল। বদ্-মেজাজী নারাটুর সঙ্গে আর ঘর করা যায় না। তার চেয়ে এরোপ্লেনটা আর ঐ সুন্দর সাদা মেয়েটাকে নিয়ে দেশে গিয়ে সুখে থাকা যাবে। দ্বিতীয় রাতে সে একটা ফন্দী আঁটল। ভোরবেলা উঠে অনুচরদের কয়েকজনকে ডেকে কি সব পরামর্শ করতে বসল। ওল্ডউইক্ সেটা লক্ষ্য করেছিল। উসাঙ্গার সাবভাব থেকে মনে হচ্ছিল, ওর আর বার্থার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

পরামর্শ শেষ হলেই উসাঙ্গার তিন সাগরেদ হঠাৎ এসে ওল্ডউইক্‌কে মাটিতে পেড়ে, হাত-পা বেঁধে ফেলল। জনা দুই মিলে বার্থাকেও ঐ ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল। তারপর উসাঙ্গা এসে বার্থাকে কি সব বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু বার্থা মাথা নাড়তে লাগল। পরে ওল্ডউইক্ জিজ্ঞাসা করলে বলল যে উসাঙ্গা বলছে প্লেনে করে বার্থাকে তার দেশে নিয়ে যাবে। সেখানে সে হবে রাজা আর বার্থা তার রানীদের একজন।

বলেই হেসে ওল্ডউইকের দিকে ফিরে বলল, 'কোনো ভয় নেই। দু-মিনিটেই দু'জনে স্বর্গে যাব! মাটি থেকে একশো ফুট-ও ওকে উঠতে হবে না।'

উসাঙ্গাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিল বার্থা। শেষটা বলেছিল, 'বেশ, আমি তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু তোমার লোকদের বলে দাও লেফটেনাণ্ট ওল্ডউইক্‌কে যেন ছেড়ে দেয়।'

উসাঙ্গা সে-কথায় কান-ই দিল না। ঐ বাঁধা অবস্থায়ই ওকে প্লেনে তুলে, সীটে বসিয়ে স্ট্র্যাপ বেঁধে, ওর হাতের বাঁধন খুলে দিল।

এদিকে বাঁধা অবস্থায় মাটিতে শুয়ে ওল্ডউইক্ দেখল উসাঙ্গা প্লেনটাতে স্টার্ট দিয়ে, মাঠের ওপর দিয়ে, কিছুদূর দৌড়ে, কাৎ হয়ে মাটি ছেড়ে উঠে পড়ল। লেফটেনাণ্টের বড় ভয়, গাছের ওপরে যদি বা তুলতে পারে, নামাবার সময় ভেঙে পড়বে। কিন্তু ও কি?

*

দুদিন ধরে শিকার করে ফিরে আসবার আগে টারজান নদীর ধারে মাছ ধরছিল। সেখানে জু-টাগ জল খেতে এসে, মাছ তো তাড়ালই উপরন্তু একটা অশান্তিকর খবরও দিল। দু-দিন হলো সাদা-চামড়া লোকটা আর মেয়েটা কোথায় চলে গেছে।

—'তোমরা ওদের তাড়ালে নাকি?'

—'মোটেই না। আমরা কিছু জানতেই পারিনি।'

তাড়াতাড়ি ফিরে এসে টারজান দেখল, ঘর আর বোমা যেমনকে তেমনি আছে, কিন্তু ঘরে লোক নেই। তারপর চিঠিটার ওপর চোখ পড়তেই, সেটা পড়ে সব বুঝতে পারল।

একবার ভাবল, যাক গে, হাত পা-ঝাড়া হওয়া গেল। এবার গন্তব্যপথ ধরা যাবে। তার পরেই মনে হলো ওল্ড-উইক্ ভারি বীরপুরুষ এবং ইংরেজ আর বার্থা একজন অসহায়া মেয়ে। বনের মধ্যে ওরা বিপদে পড়তে বাধ্য।

মানু বাঁদর খবর দিল ওরা গোমানগানিদের গাঁয়ের দিকে গিয়েছে। এ নাকি ওর নিজের চোখে দেখা।

টারজানও চলল সেই পথে। চিহ্ন দেখে ওদের পিছু নেওয়া কিছুই শক্ত নয়। হঠাৎ এরোপ্লেনের শব্দ শুনে চমকে উঠে টারজান আরো তাড়াতাড়ি এগোতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত মাঠের ধারে যেখানে ওল্ডউইক্ প্লেনটা নামিয়েছিল, সেখানে পৌঁছে টারজান তাজ্জব বনে গেল। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওল্ডউইক্ মাটিতে পড়ে আছে।

তাকে ঘিরে রয়েছে উসাঙ্গার সশস্ত্র অনুচররা আর উসাঙ্গা বার্থাকে নিয়ে এরোপ্লেন চালাচ্ছে! মুখ্যুটা কি করে প্লেন চালাতে শিখল কে জানে! ব্যাটা নিশ্চয় মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তা তো হতে দেওয়া যায় না। একটা তীর ছুঁড়ে এক্ষুণি উসাঙ্গার ভবলীলা শেষ করে দেওয়া যায়। কিন্তু তাহলে প্লেন ভেঙে পড়বে। মেয়েটাও মরবে।

একটা মাত্র উপায়ের কথা মনে হলো। অমনি গাছ থেকে নেমে এলো টারজান। সেটা ব্যর্থ হলে অবিশ্যি টারজানও তক্ষুণি মরবে। সে যাক্ গে। ছুটল প্লেনটার দিকে টারজান। অনুচররাও চ্যাঁচামেচি করে এগিয়ে এলো। উসাঙ্গা প্লেন চালাতে ব্যস্ত, সে ওকে না দেখলেও, বার্থা জানলা দিয়ে ঠিকই দেখতে পেয়েছিল। নিগ্রোরা অবাক হয়ে দেখল সাদা-চামড়া লোকটা নিজের কাঁধ থেকে একটা লম্বা দড়ি নিয়ে প্লেনের দিকে ছুটছে। উসাঙ্গা ওদের বুঝিয়েছিল মেয়েটাকে একজন কালো সুলতানের কাছে বিক্রি করে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। ফিরে এসে সেটা সমান ভাবে ভাগ করা হবে। সেই আনন্দেই ছিল ওরা। এ লোকটা আবার বাধা দিতে এসেছে নাকি?

ততক্ষণে দড়িটা এঁকে বেঁকে উঁচুতে উঠে গিয়েছে। প্লেনটা মাত্র কুড়ি-বাইশ ফুট ওপরে। বার্থা হাত বাড়িয়ে দড়ির মাথা ধরে ফেলল। অন্য মাথার ফাঁস টারজানের গায়ে বাঁধা। প্লেনটা ততক্ষণে আরো উঁচুতে উঠেছে। দর্শকরা দেখল সাদা লোকটাও দড়ির আগায় ঝুলতে ঝুলতে সঙ্গে উঠে যাচ্ছে। টারজান দড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল। তাতে বার্থার হাতে দড়ির মাথা প্রায় কেটে বসছিল।

টারজান বার্থার কাছে উঠে এলো। সামনের সীটে উসাঙ্গা কন্‌ট্রোল নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল। কিছুই টের পায়নি। প্লেনটা কাৎ হয়ে যাচ্ছে বলে সে বড় উদ্বিগ্ন। সে কেবলই প্লেনটাকে আরো উঁচুতে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল।

টারজান বার্থার কানে কানে বলল, 'প্লেন চালিয়েছ কখনো?'

—'চালিয়েছি।'

—'সামনে উঠে গিয়ে ওর কাছ থেকে কন্‌ট্রোলটা নিয়ে নিতে যদি পার, আমি ওর ব্যবস্থা করছি। পারবে?'

—'পারব। কিন্তু আমার পা যে বাঁধা।'

টারজান তার ছুরি দিয়ে বাঁধন কেটে দিল।

একটা বিপর্যয় ঘটেছে সে কথা উসাঙ্গা প্রথম বুঝল যখন বার্থা সামনে এসে ওর হাত থেকে কন্‌ট্রোল নিয়ে নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন ইস্পাতের তৈরি কটা আঙুল ওর গলা টিপে ধরল। নিচে যারা ছিল, তারা দেখল প্লেনটা আকাশে উথাল-পাথাল করছে। তারপর হঠাৎ অনেকখানি নেমে এলো আর একটা মানুষ পাক খেতে খেতে নিচে পড়তে লাগল।

ওল্ডউইক্‌ও অসহায় অবস্থায় পড়ে পড়ে সব দেখছিল। তবে কি এইভাবে তাদের বীর রক্ষাকর্তার মৃত্যু লেখা ছিল! ঠিক সেই সময় মানুষটা মাটিতে পড়ল। তার কালো রং দেখে সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

প্লেনটা নামবার উপক্রম করছিল। উসাঙ্গার অনুচররা মৃতদেহটাকে দেখে অবধি ক্ষেপে গিয়েছিল। রাইফেল বাগিয়ে তারা সে দিকে ছুটল। প্লেনটা নেমেও কিন্তু থামল না, ভীষণ বেগে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে এলো। ওরাও দৌড়ে এলো একেবারে প্লেনের সামনে। তারপর যা হবার তাই হলো। প্লেন থেকে নেমে বার্থা দেখল পঞ্চাশ ফুট জায়গা জুড়ে মরণাপন্ন মানুষ আর মৃতদেহ পড়ে আছে।

ওল্ডউইক্‌কে প্রথমেই মুক্ত করা হলো। কারো কিছু বলার ছিল না। সে সব-ই দেখেছিল। টারজান বলল, 'যথেষ্ট তেল আছে তো প্লেনে?'

ওল্ডউইক বলল, 'তা আছে।'

—'তাহলে তোমরা এখুনি রওনা হয়ে যাও।'

—তুমি যাবে না?'

—'না, বনই আমার ঘর বাড়ি। বনেই জন্মেছি, বড় হয়েছি। আমার জন্য ভেবো না।'

শেষ পর্যন্ত বিদায় নিয়ে ওরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে ফেলে রওনা হয়ে গেল।

মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে টারজান মনে মনে বলছিল, 'বড়ই দুঃখের বিষয়, বার্থা একজন জার্মান স্পাই। কিন্তু ওকে ঘৃণা করা বড় শক্ত।'

*

দুদিন নুমার খাবার জোটেনি। জোয়ান বয়স, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, কিন্তু শিকারের নামগন্ধ নেই। অথচ আশপাশের বনে প্রচুর জীবজন্তুর বাস। মোটা মোটা হরিণ, সুস্বাদু জেব্রা। তবে এখানকার জানোয়াররা বড় বেশি চালাক। হঠাৎ বারা হরিণের গন্ধ নাকে এলো। নুমা সাবধানে তার পিছু নিল। একটা গাছের গোড়ায় তার দেখাও পেল। আরেকটু বেগ বাড়াল নুমা। একে হাতছাড়া করা চলবে না। সবে ঝাঁপ দেবার জন্য তৈরি হয়েছে, এমন সময় হুড়মুড় করে শীতা প্যান্থার দু'জনার মাঝখানে এসে

পৌঁছল। বারা হাওয়া।

এত রাগ হলো যে নুমা শীতাকেই তেড়ে গেল। অমনি সে ব্যাটাও এক লাফে গাছের ডালে। আরো আধ ঘণ্টা বাদে নাকে এলো মানুষের গন্ধ। সাধারণতঃ জোয়ান সুস্থ সিংহরা এ-সব বাজে মাংস খায় না। ও হলো অথর্বদের খাদ্য। কিন্তু আজ নুমা মরিয়া হয়ে উঠে সেই গন্ধের দিকেই তেড়ে গেল। আরেকটু সাবধান হলে ভালো হতো, কারণ তাহলে ডালপালায় ঢাকা ফাঁদটা চোখে পড়ত। ওভাবে ছুটে আসাতে, ডালপালা ভেঙে হুড়মুড় করে ফাঁদে পড়ল। ওয়ামাবোরা অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে ফাঁদটা পেতেছিল।

এদিকে টারজান সেই খোলা জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে দেখছিল প্লেনটা পুব আকাশে ছোট থেকে আরো ছোট হয়ে যাচ্ছে। কেন জানি মন কেমন করতে লাগল! প্লেনটাও অদৃশ্য হয়ে গেল, টারজানও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাল। খোলা জায়গাটার কিনারায় মস্ত একটা গাছ ছিল। কি মনে করে টারজান সেটার মগডালের কাছাকাছি উঠতেই, প্লেনটাকে আবার দেখতে পেল! অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েছে। হঠাৎ তেমনি অনেকখানি নেমেও গেল সেটা, যেন পড়ে গেল। তারপর দূরের পাহাড়ের পিছনে অদৃশ্য হলো। টারজানের চক্ষু স্থির! এরা নিশ্চয় নতুন কোনো বিপদে পড়েছে! আন্দাজে মনে হলো, ওরা সেই বৃক্ষহীন জলহীন অধিত্যকার মধ্যেই হয়তো নেমেছে। ওখানে সেই বীর যোদ্ধার কংকাল দেখেছিল টারজান। সে বাঁচেনি। এই দু'জন ক্ষীণদেহ নিরস্ত্র মানুষই বা কি করে বাঁচবে? হয়তো আহত হয়েছে, কিম্বা মরে গেছে। তবু যদি কিছু করা সম্ভব হয়, এই ভেবে টারজান রওনা দিল।

মাইলখানেক ছুটে সিংহের গর্জন কানে এলো। তারপর বারা হরিণের পায়ের শব্দ আর গায়ের গন্ধ। বন-মানুষের ছেলে টারজানকে খিদের সময় খেতে হতো; মনের ভাবনা সে ভুলতে পারত। কাজেই হরিণ শিকার করতে বেশ সময় লাগল না। তারপর তার গায়ে পা রেখে টারজান জয়ধ্বনি দিল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো সিংহের গলা থেকে। গর্জনটা একটু অন্য রকম শোনাল। বড় কৌতূহল হলো। হরিণটাকে কাঁধে ফেলে, গাছে ঝুলে পড়ল টারজান। ডাকের জোর যেমন বাড়তে লাগল, মনে হলো সিংহও ক্রমে বেশি রেগে যাচ্ছে। তার পরেই চোখে পড়ল, জানোয়ারদের চলার পথে মস্ত এক ফাঁদ পাতা হয়েছে। তার মধ্যে সিংহ পড়েছে। বেরোবার জন্য সে উন্মাদের মতো লাফালাফি করছে। সাধারণ সিংহ সে নয়। মাথা ভরা কালো কেশর, বিশাল শক্তিশালী দেহ, রংটা সাধারণের চেয়ে গাঢ়। বয়স বেশি নয়। ওপর থেকে মনে হচ্ছিল বুঝি কালো রঙের গা।

এমন চমৎকার জানোয়ারের এই দুরবস্থা দেখে টারজানের বড়ই করুণা হলো। করুণা? জানোয়ারদের তো করুণা হয় না। টারজান যে মানুষ! ওদিকে খিদের চোটে সিংহের প্রাণ যায়। তার গলা দিয়ে কান্নার মতো স্বর বেরোল। টারজান নিজের জন্য একটু মাংস কেটে রেখে, বাকিটা ফাঁদের নিচে ফেলে দিল। নিজের দুর্বলতা দেখে নিজেরই হাসি পেল, কিন্তু আপসোস হলো না।

ফাঁদটাও অন্য রকম। ধারালো খুঁটিগুলো তলায় পোঁতা থাকলে পড়বামাত্র বন্দীর গায়ে ফুটে যায়। এই ফাঁদের তলায় কিছু নেই। ওপরে মুখের চারদিকে এক ফুট দূরে দূরে একটা করে বড় এবং খুব ধারালো খুঁটি পোঁতা। সেগুলোর আগা আবার নিচের দিকে মুখ করা। নিচে থেকে লাফিয়ে বেরোবার চেষ্টা করলেই বন্দী জখম হবে।

নুমাকে খাইয়ে দাইয়ে তাকে তো আর ঐ নিগ্রোদের হাতে সঁপে দেওয়া যায় না। ওপর থেকে গোটা দুই খুঁটি তুলে দিলেই নুমা বেরিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু বেরিয়েই যদি ওকেই খেতে চায়? তবু ওকে ছাড়াতেই হবে। একটা কৌশল করতেই হবে। সাবধানে কাজ করতে হবে।

টারজানের কৌশলটি বড়ই ভালো। গোটা দুই খুঁটির গোড়া খুঁড়ে ঢলঢলে করে, দুটো খুঁটিকেই দড়ি দিয়ে বেঁধে একলাফে সে গাছে উঠে পড়ল। নুমা বাধা দেবার, কিম্বা রাগ দেখাবার চেষ্টাও করল না। চুপ করে বারার মাংস খেতে লাগল। তারপর যখন গাছের নিরাপত্তা থেকে দড়ি টেনে টারজান খুঁটি দুটো খুলে ফেলল, তখন কিন্তু নুমা হাঁক ডাক করেছিল। কিন্তু খুঁটিগুলোকে উঠে যেতে দেখে, বোধ হয় পালাবার সুবিধার কথা ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিল। খুঁটি তুলে ফেলা হলে, হরিণের বাকিটুকু মুখে করে এক লাফে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসে নুমা পুবদিকের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাটিতে চললে মানুষ জন্তু সবাই চিহ্ন রেখে যায়, কিন্তু আকাশে প্লেন উড়লে, তার চিহ্ন কোথায় পাবে? আন্দাজে কাজ করতে হবে। যেখানে প্লেন পড়েছিল বলে সন্দেহ হচ্ছিল তার আশেপাশে চিহ্ন খুঁজতে হবে। প্রথম কাজ হলো বেশ কয়েকটা শিকার করে, হাড় থেকে মাংসগুলো

ছাড়িয়ে, ওজন কমিয়ে, সঙ্গে নেওয়া। কিন্তু দু-দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করেও প্লেনের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। তা হলে ঐ সাংঘাতিক খাদগুলোতে দেখতে হবে। একটাকে পার হওয়া গেল। হাঁকডাক করেও তবু কোনো সাড়া পেল না। তারপর দিন সেই খাদে পৌঁছল, যার মধ্যে প্রাচীন যোদ্ধার কংকাল দেখেছিল। কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু স্কা কেন ঘোরাঘুরি করছে? কিছু জানে নাকি! একটা ঢিল ছুঁড়ে ওকে তাড়িয়ে এটাতেও নামল টারজান। ঠিক এখান দিয়েই গতবার সে উঠেছিল। কংকালটা তেমনি পড়ে আছে। হঠাৎ কানে এলো বন্দুকের গুলির শব্দ। ঐ সংকীর্ণ জায়গায় চারদিক থেকে তার প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল।

*

কিছু আগের ঘটনায় ফিরে যাওয়া যাক। যদিও বার্থা আর লেফটেনাণ্ট ওল্ডউইক্ নিরাপদেই প্লেনে যাত্রা করেছিল, বার্থার মনে একটু দুঃখ ছিল। টারজানকে ওভাবে ফেলে যেতে তার মন সরছিল না। ওল্ডউইকের ওসব মনে হয়নি।

প্রথমটা নিরাপদেই চলেছিল প্লেন, কিন্তু একটা শুকনো রুক্ষ খাদে ভরা জায়গা পার হবার পরেই মস্ত একটা শকুন বিপদ ঘটাল। শকুনটা হঠাৎ মাটি থেকে সোজা ওপরে উঠে প্রপেলারে ধাক্কা খেল। তার ছিন্নভিন্ন শরীরটা মাটিতে পড়ে গেল আর একটা উঁচু স্প্রুসের ডাল ভেঙে ওল্ডউইকের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগল। সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটাও এলো-পাথাড়ি নিচের দিকে পড়তে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে পাইলটের জ্ঞান ফিরে এলো। প্লেনের বেগ বড় বেশি, মাটি বড় কাছে, এখানে নামলে সর্বনাশ হবে। পাশেই গভীর খাদ, তার তলাটা অনেক সমান এবং বালিতে ঢাকা। দেখে বেশি নিরাপদ মনে হলো। সেখানেই নামাল প্লেনটাকে। যথেষ্ট ক্ষতিও হলো। যাত্রীরা দু'জনে আহত না হলেও, প্রবল ঝাঁকানি খেয়েছিল। এখন সমস্যা হলো এখান থেকে কি ভাবে বেরোনো যায়! প্লেনটাকে সারাতে পারলে কোনো ভাবনাই থাকবে না। কিন্তু দু'দিন চেষ্টা করেও ওল্ডউইক্ কোনো সুবিধা করতে পারল না। দু'জনেই সাহসী, তবু এই অবস্থায় খানিকটা হতাশ হওয়াই স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে খিটিমিটিও লাগত। বার্থার মতে সঙ্গে কিছু খাবার আর জল রয়েছে যখন, তখন একটু এগিয়ে দেখলে হয়। যদি বেরোবার পথ থাকে। এই সময় সিংহের ডাক শুনে দু'জনেই অবাক। বার্থা বলল, 'ওকে দেখে আমার মনে আশা হচ্ছে। ওরা শুনেছি জলের কাছে থাকে।'

ওল্ডউইক্ বলল, 'তোমাকে দেখে ওর-ও মনে আশা হচ্ছে। ওরা খাবারের কাছেও থাকতে ভালোবাসে।'

শেষ পর্যন্ত ওরা প্লেনে বসে থাকাই স্থির করল। কারণ নুমা নিচে নামছিল। নেমে প্লেনের কাছে এসে রাগ দেখাতে লাগল। ওকে তাড়াবার আশায় ওল্ডউইক্ পিস্তল বের করে, নুমার সামনে মাটিতে গুলি করল। পালানো দূরের কথা, নুমা মহা রেগে প্লেনে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ওল্ডউইক্ অন্য দিক দিয়ে নেমে বার্থাকেও ডাকতে লাগল। বার্থা আরো বুদ্ধির কাজ করল। প্লেনের ডানার আগায় গিয়ে বসল। ওল্ডউইক্‌কেও বলল, 'তুমি ওদিকের ডানায় গিয়ে বসলে পার।'

আশ্চর্যের বিষয়, প্লেনে চড়ে সিংহটার রাগ কেমন যেন পড়ে গেল। অদ্ভুত চমৎকার দেখতে সিংহটা। মাথাভরা কালো কেশর আর গায়ের রং এত গাঢ় যে হঠাৎ দেখলে কালো মনে হয়। খাদের মোড় ঘুরে টারজান এই দৃশ্যই দেখতে পেল। টারজানকে দেখে ওরা দু'জনেও যেন হাতে চাঁদ পেল। কিন্তু কি সর্বনাশ! সিংহটাও ওকে দেখে টপ করে প্লেন থেকে নেমে ওর দিকে এগিয়ে গেল কিন্তু তার হাব-ভাবে রাগের লেশমাত্র ছিল না। টারজান তাকে দেখেই চিনতে পারল।

বার্থা তো ভয়েই মরে! যতই দেবতাদের মতো শক্তিশালী হোক টারজান, ঐ বিশাল হিংস্র জানোয়ারের কাছে ওর ক্ষমতা কতটুকু। উভয়েই পরস্পরের দিকে এগোচ্ছিল। সিংহটার গলা থেকে চাপা গর্জন বেরোচ্ছিল, লেজটা ডাইনে থেকে বাঁয়ে নড়ছিল। এটা যে শত্রুতার চিহ্ন নয়, তা টারজান বুঝলেও, বার্থা বোঝেনি। যখন দু'জনার মাঝে এক গজ মাত্র ব্যবধান, ওরা থামল। তারপর সিংহটা আরেকটু এগিয়ে টারজানের উরুতে ওর নাকটা ঠেকাল। বার্থা চোখ বুজল, মুখ ঢাকল। তারপরেই দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ওল্ডউইক্ বলল, 'কি আশ্চর্য! এ যে ভাবা যায় না!'

চোখ খুলে বার্থা দেখল সিংহটা টারজানের কোমরের কাছে মাথা ঘষছে, টারজান তার কানের পিছনে চুলকে দিচ্ছে! সিংহের সঙ্গে মানুষের ক্বচিৎ ভাব হয়। কিন্তু নুমাকে টারজান খিদের সময় খাবার দিয়েছিল। খাঁচা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। টারজানের পাশে পাশে নুমাও প্লেনের কাছে এসে দাঁড়াল।

টারজান বলল, 'আমি তো তোমাদের খুঁজে পাবার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। যাই হোক, ঠিক সময়েই উপস্থিত হয়েছি বুঝতে পারছি।'

ওল্ডউইক্ বলল, 'কি করে টের পেলে আমরা বিপদে পড়েছি!

—'প্লেনটাকে পড়ে যেতে দেখলাম যে! ওটা কি মেরামতের বাইরে?'

ওল্ডউইক্ বলল, 'হ্যাঁ, কোনো আশাই নেই।'

বার্থাকে টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কি করতে চাও?'

— পুব উপকূলে পৌঁছনো বোধ হয় অসম্ভব?'

টারজান বলল, আগে আমিও তাই ভেবেছিলাম। এখন নুমাকে দেখে মনে হচ্ছে, জলও কাছাকাছি আছে। দু-দিন আগে ওয়ামাবো দেশে ওকে ফাঁদ থেকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। এত তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছেছে যখন, নিশ্চয় ও অন্য কোনো পথ জানে। কোন্ দিক থেকে এলো?'

— 'দক্ষিণ থেকে।'

—'তাহলে ওদিকেই দেখা যাক।'

ওল্ডউইক্ বলল, 'আর সিংহটা?'

—'সেটা দেখা যাবে। তোমরা নিচে নাম তো!'

ওল্ডউইকের নিশ্চয় ভয় হয়েছিল, তবু নেমে টারজানের পিছনে দাঁড়াল। নুমা একবার গুর-গুর করল। টারজান ওর কেশর ধরে বনমানুষের ভাষায় কি যেন বলল। নুমা চুপ করল। আর কোনো গোলমাল করল না।

অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে, বার্থাও নেমে পড়ল। নুমা খালি একবার দাঁত খিঁচোল, আর কিছু করল না।

টারজান বলল, 'আমি সঙ্গে থাকলে, তোমাদের কোনো ভয় নেই মনে হচ্ছে। তবে ওর দিকে কোনো নজর দিও না। ভয় পাচ্ছ জানতে দিও না। আর সর্বদা আমার অন্য পাশে থেকো।'

তারপর প্লেন থেকে বাকি জল আর খাবার নামিয়ে, নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে, ওরা দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগল। নুমা সঙ্গে গেল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। নুমা ঐদিক থেকেই এসেছিল, টারজানও ওর পায়ের চিহ্ন দেখে এগোতে লাগল। প্রথমে শুধু নুমার পায়ের ছাপ দেখা গেল। পরে অন্য সিংহের ছাপও চোখে পড়ল, মনে হলো আরো আগেকার। সন্ধ্যার আগে হঠাৎ টারজান থমকে দাঁড়াল। সামনে বালির ওপর সিংহের পায়ের ছাপের সঙ্গে মানুষের পায়ের দাগ!

দেখে বার্থা তো অবাক! পায়ের আঙুলের ছাপ নেই কেন?'

টারজান বলল, 'কারণ পায়ে স্যাণ্ডাল পরা, তাই।'

—'তবে কি কাছাকাছি কোনো গ্রাম আছে?'

—'ঠিক তাই। তবে এ-সব অঞ্চলের গ্রামে যে ধরনের লোক থাকে, এখানে বোধ হয় তেমন নয়। গাঁয়ের লোকরা খালি পায়ে চলাফেরা করে, এরা দেখছি স্যাণ্ডাল পরে। তাছাড়া নিগ্রোদের চ্যাপ্টা পায়ের ছাপ হয়। এগুলোর গোড়ালি আর আঙুলের দিকে ভর পড়েছে বেশি, সেটা স্যাণ্ডালের ছাপ থেকেও বোঝা যাচ্ছে।'

—'তবে কি ওরা ইউরোপের লোক?'

—হতেও পারে।' এই বলে নিচু হয়ে পায়ের ছাপের গন্ধ শুঁকল টারজান। অন্যরা তো অবাক! টারজান উঠে বলল, 'নিগ্রোও নয়, ঠিক ইউরোপিয়ানও নয়। তিনজন এদিকে এসেছিল। কোন্ জাতের বলতে পারছি না।'

খাদটা ক্রমে ঢালু হয়ে আরো নেমে যাচ্ছিল। দু'পাশে খাড়া পাথুরে দেয়াল। তাতে অনেক ফুটো ফাটল। মাটির কাছে একটা বড় গুহা দেখতে পেল। তার মুখের ওপর-দিকটা খিলানের মতো, নিচে পরিষ্কার বালি। টারজান বলল, 'আজ রাতে এখানেই ক্যাম্প করা যাক।' সামান্য খাওয়া-দাওয়ার পর টারজান বার্থাকে বলল, তুমি গুহার মধ্যে শোও। আমরা দু'জনে গুহার মুখে শোব।'

*

শুতে যাবার আগে বার্থার মনে হল বাইরের অন্ধকারে কোনো বড় জানোয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে। টারজানকে বলতেই সে বলল, 'ও একটা সিংহ। অনেকক্ষণ থেকেই আছে।'

—'আমাদেরটাই আশা করি?'

—'না, এটা অন্য সিংহ।'

—'আমাদের পিছু নিয়েছে নাকি?'

—'তা নিতে পারে। ওল্ডউইক্, বন্দুক ছুঁড়লেই নির্ঘাৎ মৃত্যু। একটা নয়, এখন কম করে তিনটে সিংহ এসেছে।'

বার্থা বলল, 'যদি তেড়ে আসে? কোথায় পালাব?'

—'তেড়ে এলে লড়তে হবে।'

—'ওদের সঙ্গে কি করে পারব?'

—'ভয় কিসের? এক দিন তো মরতেই হবে। বনে এই শিক্ষা পেয়েছি। আমরা গেলেও দুনিয়া এই ভাবেই চলবে।'

বার্থা শিউরে উঠে বলল, 'তা চলবে।' তারপর শুতে গেল। অন্যরা দু'জনে বসে রইল। আরো সিংহ এসে জুটেছিল। চারদিকে সব চুপচাপ। ওল্ডউইক্ বলল, 'বড্ড বেশি চুপচাপ না?'

টারজান বলল, 'যারা চ্যাঁচায়, তারা বড় একটা তেড়ে আসে না। শিকারের পিছু নিতে হলে ওরা নিঃশব্দে চলে।'

—'আশা করি তিনটেতে এক সঙ্গে তেড়ে আসবে না?'

—'তিনটে নয়, কম করে সাতটা। ওদের সঙ্গে একটা মানুষও আছে।'

—'কি করে বুঝলে?'

—'গন্ধ পেলাম। তবে ওরা হয়তো আমাদের ক্ষতি করতে চায় না। হয়তো এ দিকে এগোনো বন্ধ করতে চায়।'

—'ওরা কি করে জানবে আমরা কোন দিকে যেতে চাই?'

বার্থা বলল, 'বোধ হয় যেখানে জল আছে, সেদিকে যাওয়া বন্ধ করতে চায়?'

টারজান বলল, 'ঠিক তাই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর টারজান তার ছোরাটা বের করে হাতের কাছে রাখল। বার্থা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওল্ডউইক্ও ঢুলছিল। হঠাৎ বিকট গর্জন করে অনেকগুলো সিংহ একসঙ্গে তেড়ে এলো। টারজান ছোরা হাতে গুহার মুখে দাঁড়াল। সে জানত, এতগুলোর সঙ্গে একা লড়া অসম্ভব, তবু দাঁড়াল। মনে হলো একটা সিংহের বন্যা গায়ের ওপর ভেঙে পড়ল। টারজান পড়ে গেল, মাথাটা পাথরের ওপর সজোরে ঠুকে যাওয়াতে জ্ঞান হারাল। যখন জ্ঞান ফিরল তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। নাকে এলো সিংহের গায়ের কড়া গন্ধ।

চোখ খুলে দেখে দু-পাশে দু-পা রেখে একটা বিশাল, প্রায়-কালো সিংহ ওকে পাহারা দিচ্ছে আর বিকট গর্জন করছে। কেন গর্জন করছে বুঝতে না পেরে, মাথা তুলে দেখতে পেল দুটো সিংহ একটু দূরেই পায়চারি করছে। গুহার দিকে চেয়ে বার্থা আর ওল্ডউইক্কে দেখতে পেল না। টারজানের সিংহ নিচু হয়ে ওর গায়ে মাথা ঘষতে লাগল। টারজান বলল, 'আমরা দু'জন কি ও দুটোকে ঘায়েল করতে পারব না? এসো।'

নুমাকে সরিয়ে উঠে পড়ল টারজান। তারপর দু'জনে পাশাপাশি এগিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লড়াই বেঁধে গেল। ঐ অচেনা সিংহ দুটোর যেমন তেজ তেমনি শক্তি আর বুদ্ধি। দু'জন দু-দিক থেকে আক্রমণ করল।

ঐ রকম বুদ্ধি আর কৌশল টারজানেরও আছে তবু সিংহটাকে কিছুতেই কাবু করতে পারল না। টারজান না পারলেও, ওর বন্ধু কালো সিংহ তার আততায়ীকে মেরে, টারজানের সাহায্যে এলো। অল্প সময়ের মধ্যে এ-ও ঘায়েল হলো।

টারজান চেয়ে দেখল বাস্তবিক এ সিংহ দুটো একটু অন্য রকম, অনেকটা ওর বন্ধুর মতো। দেহে বিশাল, ভীষণ শক্তিশালী, কালচে রং। এবার তাহলে বার্থাদের পায়ের চিহ্ন দেখে বেরিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল। সে-কথা ওর সিংহটাকে জানাবার জন্য টারজান তাদেরই মতো কুঁইকুঁই শব্দ করে উঠল। শুনেই নুমার কান খাড়া। তারপর সে দক্ষিণ দিকে রওনা দিল। থেকে থেকে ফিরে দেখছিল মানুষটা সঙ্গে আসছে কি না। তার মানে ওকে খাবারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। বাতাস শুঁকে বুঝবার চেষ্টা করল বার্থারাও এদিকে গেছে কি না। সিংহের পায়ের ছাপের সঙ্গে অনেকগুলো স্যাণ্ডালপরা পায়ের ছাপ দেখা গেল। সিংহের গন্ধের সঙ্গে মানুষের গন্ধ পেল, যে জাতের মানুষের গন্ধ কাল রাতেও পেয়েছিল। তারপর বার্থার আর ওল্ডউইকের গন্ধও চিনতে পারল।

তারা দু'জন পাশাপাশি হেঁটে গেছে এ-পথে। ডাইনে বাঁয়ে মানুষ আর সিংহ ছিল। খাদটা এখনো খাড়া দেয়ালের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। তারপর আরো ঢালু হয়ে উঠল। এধারে ওধারে পুরানো ঝরনা আর ছোট ছোট জলপ্রপাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। পথ চলা ক্রমেই কষ্টকর হয়ে উঠল। কোনো কোনো জায়গায় মানুষের হস্তক্ষেপের চিহ্ন দেখা যেতে লাগল।

পৌনে এক মাইল যাবার পর একটা বাঁক ঘুরে, খাদটা একটা সরু লম্বা অধিত্যকায় পৌঁছে শেষ হয়ে গেল। চারদিকে উঁচু পাথরের দেয়াল। মধ্যিখানে উত্তর দক্ষিণে চার পাঁচ মাইল চওড়া ঐ সমতল জায়গাটি পুবে পশ্চিমে কত দূর অবধি বিস্তৃত তা বোঝা যাচ্ছিল না। বড় বড় গাছপালা, প্রচুর জলের সাক্ষ্য দিচ্ছিল। টারজানরা খাদের যে জায়গায় পৌঁছেছিল, সেখান থেকে মানুষের তৈরি চওড়া রাস্তা নিচেকার সবুজ মাঠ অবধি নেমে গেছে। কত পাখি, কত বাঁদর। কিন্তু গাছপালা জীব-জন্তু সমস্তই একটু অন্য রকম। গাছে কত ফল। বাঁদররা মনের সুখে পেড়ে খাচ্ছে। সেই সব গাছ থেকে টারজানও ফল পেড়ে খেল।

তবে মাংস না খাওয়া পর্যন্ত খিদেটা তার মিটবে না।

*

ফলগাছ থেকে নেমে ঐ রাস্তার মাটি শুঁকে টারজান বুঝতে পারল বার্থারাও এই পথেই গেছে। আশ্চর্যের বিষয়, বাঁদর আর পাখি সিংহ এবং প্যান্থার ছাড়া অন্য কোনো জানোয়ারের চিহ্ন পাওয়া গেল না। তবে এন্তার ছোট বড় সাপ গাছে জড়িয়ে ছিল আর পুকুরে কুমির আছে দেখতে পেল। হরিণ, কিম্বা বুনো শূয়োর, কিম্বা জেব্রার চিহ্নটুকু নেই। অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গেই ছিল, তীর-ধনুক, ছোরা, দড়ির ফাঁস, বর্শা। কিছুই নেয়নি এরা, টারজান যখন অচেতন হয়ে পড়ে ছিল।

পাখির মাংস ভালো না লাগলেও শেষ পর্যন্ত তীর ধনুক দিয়ে একটা রঙীন পাখি মারল। সঙ্গে সঙ্গে সারা বনভূমিতে যত বাঁদর আর পাখি ছিল সবাই চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিল। টারজান এক হুংকার দিতেই চারদিক অদ্ভুত চুপচাপ হয়ে গেল। পাখিটা খেল বটে, কিন্তু স্বাদ ভালো না।

তারপরেই ঝোপেঝাড়ে অদৃশ্য জানোয়ারের থাবার শব্দ শোনা গেল। চারদিক থেকে সিংহরা ওকে ঘিরে ফেলছে। হঠাৎ কেন এলো ওরা? ঐ সব বাঁদর আর পাখির ডাক শুনে কি? একটা পাখি মারার এতটা প্রতিক্রিয়া হবে টারজান ভাবতেও পারছিল না।

পথের মাঝখানে সিংহদের আক্রমণের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল টারজান। খানিক বাদে একটামাত্র বড় সিংহ ওর দিকে এগিয়ে এলো। ওর বন্ধু সেই ফাঁদে-পড়া সিংহের মতোই দেখতে, তবে অতটা বড় নয়। অতটা কালোও নয়। ক্রমে আরো সিংহ চারদিকে জড়ো হলো। কিন্তু কেউ আক্রমণ করল না। একে একে ওর দিকে মুখ করে, সবাই শুয়ে পড়ল। টারজানের পাখি খাওয়া শেষ হলে, ওদের হাবভাব দেখে কেমন বিরক্ত হয়ে উঠে বনমানুষদের ভাষায় ওদের গাল দিতে আর ছোট ছোট কাঠকুটো ছুঁড়তে লাগল। ওরা গরগর করে উঠল, দাঁতও খিঁচলো, কিন্তু এগিয়ে এলো না কেউ। খালি তাকিয়ে রইল।

আধ ঘণ্টা পরে পথে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দু-পেয়ের পায়ের শব্দ, অর্থাৎ মানুষের। একটু বাদেই একটা লোক এসে প্রথম সিংহটার পিছনে দাঁড়াল কাল রাতেও এই ধরনের মানুষের গন্ধ পেয়েছিল টারজান। অন্য মানুষের চেয়ে গন্ধটাও আলাদা, লোকটার চেহারাও আলাদা। পুরানো পাণ্ডুলিপির চামড়ার মতো চামড়া। কুচকুচে কালো

খাড়া খাড়া তিন-চার ইঞ্চি লম্বা চুল। কাছাকাছি বসানো ছোট ছোট কালো চোখ। মণিগুলো এতই ছোট যে তার চারদিকেই সাদা অংশটা দেখা যাচ্ছে। থুৎনিতে আর ওপরের ঠোঁটে পাতলা কয়েকটা চুল। নাকটা উঁচু আর সুগঠিত, কিন্তু কপালের অনেকখানি চুল দিয়ে ঢাকা বলে কেমন জানোয়ারের মতো লাগছে। ওপরের ঠোঁট পাতলা আর সুগঠিত, নিচের ঠোঁট পুরু আর একটু ঝুলে-পড়া। থুৎনি বড়ই দুর্বল। বেঁটে বেঁটে সোজা পা, লম্বা বাহু। সবটা দেখে মনে হলো, সুদর্শন একটা মানুষ অত্যাচারের কিম্বা বদ্ জীবনের ফলে বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছে। আঁটো পাজামা আর ঢিলে ফতুয়া গায়ে। পায়ে স্যাণ্ডাল. তার বাঁধনগুলো হাঁটু অবধি উঠেছে। হাতে একটা বেঁটে বর্শা আর কোমরে ঝুলছে চামড়ার খাপে তলোয়ার।

নির্ভয়ে লোকটা সিংহদের সরিয়ে, এগিয়ে এসে, টারজানের কাছ থেকে কুড়ি ফুট দূরে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভাষায় কি যে বলে গেল টারজান তার এক বর্ণ মানে বুঝল না। মাঝে মাঝে নিজের বর্শা আর তলোয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখলও বটে। লোকটার হাবভাব সুস্থ মানুষের মতো হলেও, দেখে তাকে পাগল ছাড়া কিছু মনে হলো না।

মনে হলো সে উত্তর আশা করছে। টারজান প্রথমে বনমানুষদের ভাষায় কথা বলল। সে কিছুই বুঝল না। তারপর অন্যান্য স্থানীয় ভাষা বলেও বিফল হলো। শেষ পর্যন্ত বর্শা তুলে লোকটার দিকে এগিয়ে যেতেই, সে-ও বর্শা তুলে একটা ডাক দিল। অমনি সব সিংহ ওকে ঘিরে ফেলল। লোকটা বিশ্রী করে হাসতে লাগল। টারজান লক্ষ্য করল তার ওপরের পাটির শ্বা-দন্তদুটো বেজায় লম্বা আর ধারালো। সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে টারজান একটা বড় গাছের ডালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা সব তাজ্জব বনে গেল।

সেখান থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে টারজান আবার নেমে গন্ধ শুঁকে বার্থা আর ওল্ডউইকের খোঁজ করতে লাগল। গন্ধটা ওকে বনপথ ধরে আরো কিছু দূর নিয়ে গিয়ে, যেখানে বন শেষ হয়েছে, সেখানে পৌঁছে দিল। সামনে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা সুন্দর এক শহর তার গম্বুজ মিনারের বাহার দিয়ে ওকে অবাক করে দিল।

দেয়ালে বসানো নিচু খিলান দেওয়া ফটক অবধি একটা ছোট রাস্তা গিয়েছে। বনের ধার থেকে দেয়াল পর্যন্ত সমস্ত জায়গা জুড়ে চমৎকার তরিতরকারির বাগান। শহরের চার-দিকে একটা খাল কাটা হয়েছে। খালটা জলে ভরতি। একটু দূরে বাগানে লোকজন খাটছে।

দেয়ালটা হয়তো ত্রিশ ফুট উঁচু, তাতে মাঝে মাঝে একেকটা কুলুঙ্গি ছাড়া কিছু নেই। ভিতরের গম্বুজ-মিনার-গুলো লাল নীল রং করা। মাঝখানের সবচেয়ে বড় গম্বুজটা সোনালী রঙের। দেয়ালগুলো ঘি রঙের, চারদিকে সযত্নে পালিত ঝোপঝাড়। দেয়ালের পুব দিকটা ঘন লতায় ঢাকা। এই সময় সিংহ নিয়ে সেই প্রথম লোকটা এসে পৌঁছল। টারজান আগের থেকে তাদের লক্ষ্য করে, একটা বড় গাছের ঘন পাতায় গা-ঢাকা দিল।

লোকটা দরজায় ঘা দিতেই, দরজা খুলে গেল। সিংহদের নিয়ে সে ঢুকে পড়ল। সেই ফাঁকে গাছের ওপর থেকে টারজান দেখল শহরের মধ্যে অনেক লোকজন চলাফেরা করছে। মনে হলো বার্থাকে আর ওল্ডউইককে এইখানেই আনা হয়েছে। কাজেই ওকেও ভিতরে ঢুকতে হবে এবং একবার ঢুকলে নিঃসন্দেহে ওদের খুঁজে বের করতে পারবে।

সন্ধ্যেবেলায় গাছের ছায়া লম্বা হয়ে এলে দূরের ক্ষেতে যারা কাজ করছিল তারাও ফিরে এলো। খাল থেকে নালা কেটে ক্ষেতে জল সরবরাহ করা হয়। একটা লোক আগে এসে নালাগুলোর মুখ বন্ধ করে দিল। তার পিছন পিছন কাঁধের ওপর বড় বড় ঝুড়িতে নানা রকম তরি-তরকারি নিয়ে অন্যরা এলো। তাদের সঙ্গে কাস্তে কোদাল খুরপি ইত্যাদি নিয়ে আরো লোক এলো।

টারজান গাছের আরো উঁচু ডালে চড়ে শহরের ভিতরটা ভালো করে দেখতে লাগল। ওর কাছেই দেয়ালের একটা অংশ পড়ে ছিল। শহরটা সরু লম্বা একটা চারকোণা জায়গা জুড়ে তৈরি। ভিতরের পথঘাট কিন্তু আঁকাবাঁকা। শহরের মাঝখানে একটা নিচু সাদা বাড়ি। সেটাকে ঘিরে অন্য বড় বড় বাড়ি। মাঝে মাঝে মনে হলো একটু জল চিক্‌চিক্ করছে। আগে ঐখানেই বার্থাদের খুঁজতে হবে!

সূর্য ডুবতেই শহরও অন্ধকার হলো। তবে অনেক জানলায় আলো দেখা যেতে লাগল। অধিকাংশ বাসবাড়ির ছাদ চ্যাপ্টা টারজান গাছে বসে ভাবছিল যে যদিও আফ্রিকার সব অঞ্চলে এখনো সভ্য মানুষের পা পড়েনি, এমন কি অনেক জায়গায় কোনো মানুষই বাস করে না, তবু এটা কি করে সম্ভব হলো যে ঐ মরুভূমির মতো জায়গাটার মধ্যিখানে এত বড় আর সুরক্ষিত একটা শহর তার ক্ষেতখামার মিনার গম্বুজ লোকজন সুদ্ধ বহু যুগ ধরে থাকতে পারল, অথচ বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো আদান প্রদানের চেষ্টাও করল না! বাইরের কেউও এ-সব দেখতে পেল না!

রাত বাড়লে বন থেকে সিংহের আর প্যান্থারের ডাক শোনা যেতে লাগল। শহরের মধ্যেও নিশ্চয় পোষা সিংহরা টহল দিচ্ছে। খুব সাবধানে আর বুদ্ধি খরচ করে এগোতে হবে। চাঁদ উঠল। দেয়ালের তলাকার বাগানটা আলো হয়ে গেল। গাছ থেকে গাছে ঝুলে টারজান সেই লতায়-ঢাকা দেয়ালটার উল্টো দিকে এলো। সেইখানে গাছ থেকে নেমে দেয়ালের বাইরের ফাঁকা জায়গাটার অর্ধেক পার হলে একটা টহলদার সিংহ ওকে দেখতে পেল। অমনি সে কি গর্জন! লড়াই করা চলে না, তার ফলাফল বলা যায় না। যে করেই হোক বার্থাদের উদ্ধার করতে হবে। কাজেই ফিরে না গিয়ে টারজান দেয়ালের দিকে দৌড়ল। নুমাও দৌড়ল।

সিংহদের সহজেই দম ফুরিয়ে যায়। তাই বেশি দূর কারো পিছনে দৌড়তে পারে না। একটুক্ষণ জোর কদমে ছুটতে পারলেই নুমা হাঁপিয়ে গিয়ে পিছিয়ে পড়বে। তাই প্রাণপণে ছুটল টারজান লতায়-ঢাকা দেয়ালটার দিকে। বলা বাহুল্য টারজানই আগে পৌঁছল। শক্ত কাণ্ড খোঁজার সময় ছিল না। যা পেল তাই ধরে খচমচ করে উঠতে লাগল টারজান। নুমা নিচে লাফঝাঁপ দিতে লাগল।

*

আগের রাতে খাদের মধ্যে সেই গুহায় সিংহের ডাকে বার্থার ঘুম ভেঙে গেছিল। ওর রক্ষাকর্তারা গুহামুখে সিংহগুলোর সঙ্গে লড়াই করছিল, কিন্তু ওকে যে গুহা থেকে বের করে আনল সে একটা মানুষ। ঐ হট্টগোলে টারজানদের ও দেখতেই পেল না। তবে একটু পরেই দু'জন লোক ওল্ডউইক্‌কেও ঠেলতে ঠেলতে, প্রায় অর্ধেক কোলে করে বের করল। সিংহগুলোকে বর্শা দিয়ে, তলোয়ারের খোঁচা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে হচ্ছিল। মানুষদের মধ্যে যাকে পাণ্ডা

মনে হলো, তার ধমকও কিছু ফল দিচ্ছিল। দলে অনেক লোক ছিল। তারা ওদের দু'জনকে পুরনো একটা শুকিয়ে-যাওয়া নদীপথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। পথটা ঢালু হয়ে একটা বনে ঢুকল। তখন ভোর হয়ে এলেও বনে ঘোর অন্ধকার। আরেকটু বেলা হলে, বনেও রোদ ঢুকলো। পাখিরা বাঁদররা কিচিরমিচির লাগিয়ে দিল।

একটা ছোট ঘটনা দেখে বার্থা অবাক হলো। ওর সামনের লোকটার লম্বা-চওড়া জোরালো শরীর, কিন্তু হঠাৎ একটা বড় পাখি ওর কাছে ঝুপ করে নেমে এলে, অমনি মুখ থেকে মাটিতে মাথা গুঁজে পড়ে রইলো, যতক্ষণ না পাখি উড়ে গেল।

এইখানে ওল্ডউইক্‌কে ওর পাশে পাশে হাঁটতে দেওয়া হলো। ক্ষত-বিক্ষত দেহে এতক্ষণ বেচারা জোর পাচ্ছিল না। ওল্ডউইক্ বলল, 'আচ্ছা এই লোকগুলো একটু অদ্ভুত না?'

বার্থা বলল, দেখতেও কেমন যেন।'

খানিকক্ষণ লোকগুলোকে নজর করে দেখে ওল্ডউইক্ বলল, 'পাগলা গারদে গিয়েছ কখনো?'

বার্থা চমকে উঠল, 'ঠিক বলেছ!'

—'পাগলের সব চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি এদের মধ্যে।'

বার্থা বলল, 'সিংহকে ডরায় না, কিন্তু পাখি দেখে ভয়ে আধমরা! কি ভাষা বলে বুঝতে পেরেছো?'

—'না, কোনো আফ্রিকান ভাষা এ নয়।'

বার্থা বলল, 'আফ্রিকান নয়। কিন্তু এ ভাষা কোথাও শুনেছি মনে হচ্ছে।'

ওল্ডউইক্ বলল, 'এখানে মানব সমাজের বাইরে হয়তো যুগ যুগ কাটিয়ে ওদের মূল ভাষাটা বিকৃত হয়ে গিয়েছে, কেউ হয়তো ও-ভাষা আজকাল বলে না।'

একটা ছোট নদীর ধারে সকলে জল খেল। সেই সময় সামনে থেকে সিংহের গর্জন শুনে, এদের সিংহরাও চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে তাদের সামলাতে হলো। তারপরেই মস্ত একটা সিংহ ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিংহদের আর লোকগুলোর সঙ্গে কিছুক্ষণ লড়াই করে, একটা মানুষ তুলে নিয়ে পালাল। সিংহটার গায়ে দুটো বর্শা বিঁধে রইলো, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আশ্চর্যের বিষয় এরা কেউ সেরকম বিচলিত না হয়ে, আবার এগিয়ে চলল।

বন যেখানে শেষ হলো, সেখানে দেয়াল-ঘেরা শহর দেখে এরা অবাক! দেয়ালের বাইরে সবজি-বাগান। দেয়ালের পায়ের কাছে খাল কাটা।

লোকগুলোর একজন দরজায় ঘা দিতেই দরজা খুলে গেল। ফটকের ভিতরে সরু আঁকা-বাঁকা পথ। তার দু-ধারে দোতলা সব বাড়ি। এক তলার সামনে বড় বড় থাম। দোতলাটা আরেকটু বড়, সামনের ঘরগুলো থামের ওপর ভর করে আছে। নিচে ঢাকা বারান্দার মতো জায়গাটা চমৎকার করে বাঁধানো। এত সকালে যে ক-জন লোক পথে বেরিয়েছিল, তারা ওদের দেখে অবাক।

ওল্ডউইক্ বলল, ওদের ভাষাটা বুঝতে পারলে ভালো হতো।'

বার্থা বলল, 'জিজ্ঞাসা করা যেত আমাদের নিয়ে কি করবে। শ্ব-দাঁতগুলো কি রকম ছুঁচলো দেখেছ, নর-খাদকদের মতো?'

পথে দু-একজন মেয়েকেও দেখল, ছোটখাটো, সুন্দর শরীরের গড়ন, কিন্তু মুখগুলো বিশ্রী। এদেরও পাগল বা জড়বুদ্ধি বলে মনে হলো। মেয়েদের পরণে একটা শালের মতো জিনিস পা থেকে বুক অবধি জড়িয়ে বাঁধা। এদিকের বাড়ি ছোট হলেও সামনে বড় বড় বাড়িও ছিল, দোকান হাটও। দোকানের সাইন বোর্ডের লেখাগুলো দেখে গ্রীক ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য লাগে।

ক্ষত বিক্ষত দেহ নিয়ে এত হেঁটে ওল্ডউইক্ ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়ছিল, তবু বার্থার সাহায্য নিতে ঘোর আপত্তি। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। ওর বাঁ দিকে লম্বা-চওড়া একটা লোক হাঁটছিল, সে বড় নিষ্ঠুর। ওল্ডউইক্‌কে টলতে দেখে প্রথমে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল, তারপর গলা টিপে ধরে তলোয়ার বের করল। অন্যরা নির্বিকার ভাবে দেখতে লাগল। কিন্তু বার্থার সহ্য হলো না, চোখের সামনে আহত লোকটাকে মেরে ফেলবে নাকি? এত রাগের কি হয়েছে? বার্থা তেড়ে গিয়ে তলোয়ার সুদ্ধ হাতটাকে চেপে ধরল। ধস্তাধস্তিতে লোকটা পড়েই গেল। হাত থেকে তলোয়ারটাও খসে পড়ল। বার্থাও সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে ওল্ডউইকের সামনে দাঁড়াল। তাতে রেগে না গিয়ে সেই লোকটার হো হো করে কি হাসি! অন্যরাও হেসে খুন। পাগল আবার কাকে বলে!

শেষ পর্যন্ত আবার এগিয়ে চলল সকলে। ওল্ডউইক্ বার্থার কাঁধে ভর দিয়ে চলল। পথে আরো অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো। একটা লোক একটা ছোট ছেলেকে নির্দয় ভাবে মেরে, তুলে আছাড় দিল। ছেলেটা সেইখানেই পড়ে রইল, কেউ কিছু করল না। এ-সব দেখে বার্থার কি ভয়!

অথচ ওল্ডউইক্‌কে বলল, 'দরকার হলে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলো।'

ওল্ডউইক্ মাথা নাড়ল, 'সে আমি পারব না।'

এরপর ওরা একটা চওড়া রাজপথে পড়ল। রাস্তার সামনে চমৎকার প্রকাণ্ড হ্রদ। রাস্তাটা সুন্দর মোজেইক করা। নক্সার মধ্যে টিয়া পাখির, সিংহের আর বাঁদরের চেহারা দেখা গেল। বিশেষ করে টিয়াপাখির প্রাধান্য সব জায়গায়। এখানকার বাড়িগুলোও বড় বড়, চমৎকার রং করা, অনেক জায়গায় সোনালী কাজ।

ওদের একটা প্রকাণ্ড সরকারী চেহারার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে একের পর এক অনেকগুলি অফিসারের সামনে দাঁড় করানো হলো। এক বর্ণ কথা বুঝল না কেউ। কেউ রাগ বা বিরক্তিও দেখাল না। তারপর দু'জনকে দু'জায়গায় পাঠিয়ে দিল। ওল্ডউইকের ঐ তো শরীরের হাল, বার্থা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সবই বৃথা হলো। তবে ঐ একবার পাগলের মতো আক্রমণ করা ছাড়া আর কেউ মারধোরের চেষ্টা বা ইচ্ছা প্রকাশ করেনি।

ওদের সঙ্গে সিংহরাও ঐ বাড়িতে ঢুকেছিল। তাদের ভাগিয়ে একটা দরজা দিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হলো। বার্থা চলে গেলে ওল্ডউইক্‌কেও সেই দরজা দিয়ে, তারপর একটা করিডর দিয়ে একটা খোলা উঠোনের মতো জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। জায়গাটার চারদিকে দেয়াল। কিন্তু উঠোনটা একটা বাগানের মতো। বড় বড় গাছপালা, ফুলে ভরা ঝোপঝাড়, বসবার জন্য বেঞ্চি। ঐ উঠোনেই সিংহগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। করিডরে যাবার মুখে মোটা মোটা লোহার শিক দেওয়া একটা দরজা। সেটা বন্ধ করে, তালা দিয়ে, লোকগুলো চলে গেল। ওল্ডউইকের ডাকাডাকির উত্তরে খানিকটা উন্মাদ হাসি শোনা গেল।

*

বার্থাকেও ওরা সুন্দর করে সাজানো একটার পর একটা ঘর দিয়ে নিয়ে গেল। সব জায়গায় টিয়া পাখির, সিংহের, বাঁদরের নক্সা। এদিকে অন্য পোশাক পরা অন্য অনুচর। এদের সব হলদে পোশাক। মেঝের দেয়ালের কারুকার্য যেমন প্রাচীন, তেমনি সুন্দর। দফায় দফায় অনুচর বদল। একটা বন্ধ দরজা থেকে আরেকটাতে পৌঁছলে অন্য এক দল দায়িত্ব নেয়। শেষের দিকে লোকগুলোকে আরো জড়বুদ্ধি বলে মনে হচ্ছিল। ভারি ভারি দরজা, নিগ্রো ক্রীতদাসরা খোলে বন্ধ করে। দরজার সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা তারা। এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থা দেখে বার্থার ভারি কষ্ট হলো।

দরজার ওদিকে বড় একটা হলঘর। এখানেও টিয়াপাখির, সিংহের, বাঁদরের নক্সা। অনেকগুলো সোনার মূর্তি মনে হলো। ঘরের মধ্যিখানে ছোট একটা স্বচ্ছ জলের চৌবাচ্চা। দু-পাশে ছোট ছোট ঘর। চমৎকার গালচে, কিম্বা কালো সিংহের চামড়া পাতা। এই ভাবে ঘরের পর ঘর পার হয়ে বার্থা একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে পৌঁছল। এখানে একটা লোক পায়চারি করছিল। তার পরণে লাল জোব্বা, জোব্বার বুকে আর পিঠে মস্ত টিয়া পাখির নক্সা। লোকটার মাথায় একটা মুকুটের মতো, তার ওপর একটা স্টাফ্ করা টিয়া পাখি।

দেয়ালে শত শত টিয়াপাখির নক্সা, মেঝেতে সোনার কাজ করা টিয়াপাখি। ছাদে একটা রংচঙে টিয়া ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। লোকটা মাথায় খুব লম্বা, শরীর খুব বলিষ্ঠ, গায়ের চামড়া বয়সের জন্য কুঁচকে গেছে, কিন্তু চলাফেরা বুড়োর মতো নয়। মুখটা অতি বিকট। বার্থাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল সে, পাগলের মতো খানিক হাসলও। তারপর অনুচরদের কি হুকুম দিল। তারা ওকে সরু করিডর দিয়ে হাঁটিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে, ওপর তলায় একটা ছোট দরজার সামনে নিয়ে গেল।

একজন নিগ্রো দরজা খুলে দিল। ওরা ছোট একটা ঘরে ঢুকলো। তার সাজসজ্জা অন্য ঘরেরই মতো, তবে অত জমকালো নয়। একটা নিচু কৌচে একজন বুড়ি বসেছিলেন। তাঁকে দেখেই বার্থা চমকে উঠল। তাঁকে ইউরোপীয় মনে হলো। তিনি ইংরিজিতে বললেন, 'বাইরের পৃথিবী থেকে এসেছ? ভগবান করুন যেন ইংরিজি বোঝ।'

বার্থা বলল, 'বুঝি বৈ-কি। আপনি কি ইংরেজ?'

বুড়ি বললেন, 'আমি ইংরেজ। কিন্তু ষাট বছর এ-বাড়ির বাইরে পা দিইনি। তোমাকেও এরা বেরোতে দেবে না। মেরেও ফেলবে না, কিন্তু মেরে ফেললেই ভালো হতো।'

বার্থা বলল 'এরা কে?'

তখন বুড়ি তাকে তাঁর অদ্ভুত জীবনকাহিনী বললেন। ষাট বছর আগে তাঁর মিশনারি বাবার সঙ্গে এ-অঞ্চলে এসেছিলেন। আরব দস্যুরা তাঁকে ধরে এনেছিল। এদিকের পথ না চেনাতে ঐ ভীষণ মরুভূমিতে ওরা দিনের পর দিন ঘুরে মরেছিল। ক্রীতদাস, ঘোড়া, মানুষজন, একে একে প্রায় সবাই প্রাণ হারাল। শেষ পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে তারা একটা সুন্দর সবুজ অধিত্যকায় পৌঁছেছিল। ততদিনে শুধু ঐ আরব

সরদার আর বুড়ি বেঁচেছিল। তাঁর তখন কুড়ি বছর বয়স।

তাঁকে সোজা এই প্রাসাদে নিয়ে আসা হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তখনকার রাজা তাঁকে রাণী করে নিলেন। সেই আরব সরদারের যে কি হলো আজ পর্যন্ত বুড়ি জানেন না। তখন রাজা ছিলেন এগো-২৫। তারপর অনেক রাজা দেখেছেন বুড়ি। কিন্তু ঐ প্রথম জনের মতো বিকট কেউ নয়।

এই অবধি শুনে বার্থা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এদের সকলের কি হয়েছে? এমন অদ্ভুত কেন?'

তিনি বললেন, 'বুঝতে পারনি? এরা হলো পাগলের জাত। কিন্তু কাজকর্মে দক্ষ। মরুভূমিতে এদের পিতৃ-পুরুষদের আমল থেকে সব সোনা ফলিয়েছে। শিল্পকর্মেই বল, কৃষিকাজেই বল, এদের তুলনা হয় না। প্রধানতঃ নিরামিষ খায় আর সিংহের মাংস, ছাগলের দুধ। চমৎকার করে রাঁধে সিংহের মাংস, খুব ভালো খেতে হয়। গোরু ভেড়া ছাগলের মতো এরা সিংহ পোষে। গোরু ভেড়াও আছে ওদের খোঁয়াড়ে খামারে, কিন্তু তার মাংস খালি সিংহরা খায়।'

আরো অনেক কথা বললেন বুড়ি। এরই মধ্যে সোনার আর মাটির বাসনে সাজিয়ে ওদের খাবার এলো। অতি সুস্বাদু সিংহের মাংসের স্টু, মিষ্টি ফল আর ছাগলের দুধ। খাবার পর বুড়ি বললেন, ওটা সিংহের মাংস। পুরানো সব গল্পও বললেন। বার্থাদের আগে একবার মাত্র একজন বিশাল-দেহ যোদ্ধা মরুভূমি পেরিয়ে এ-দেশে এসে সকলকে যুদ্ধে হারিয়ে এখানকার ফল, জল, তরকারি খেয়ে, আবার মরু-ভূমিতে চলে গিয়েছিল। পাছে তার কাছে খবর পেয়ে আরো লোক এখানে আসে, তাই তখনকার রাজা গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে তাকে মেরে ফেলেছিলেন। এ-সব বুড়ি আমার অনেক আগের কথা, সত্যি মিথ্যা তিনি জানেন না।

বার্থা বলল, 'গল্পটা সত্যি। আমরা তার কংকাল আর অস্ত্রশস্ত্র মরুভূমিতে পড়ে থাকতে দেখে এসেছি।'

খাওয়া-দাওয়ার পর রাজা বার্থাকে ডেকে পাঠালেন। বার্থা বুড়ির সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে স্নান করল, এখানকার মেয়েদের মতো একটা সুন্দর কাপড় গায়ে জড়াল। এ রকম পোশাক পরে কারো সামনে বেরোতে তার লজ্জা করছিল। কিন্তু এখানকার সকলে এই পোশাকই পরে।

বুড়িও সঙ্গে গেলেন। সকলে তাঁকে জ্যানিলা বলে ডাকে। একটা ছোট ঘরে অনেক লোকের সঙ্গে ওরাও রাজার হুকুমের অপেক্ষায় বসে ছিল। এমন সময় মেটাক বলে রাজার এক ছেলে সেই ঘরে এলো। মেটাকও পাগল। বিদেশী মেয়েটার রূপ দেখে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর বলা নেই কওয়া নেই মেয়েটাকে তুলে নিয়ে দে দৌড়। জ্যানিলা বাধা দিতে এলে তাঁর দিকে তলোয়ারের কোপ দিতেই তিনি বুদ্ধি করে উল্টো দিকে ভাগলেন। একজন অনুচরও বাধা দিতে এসেছিল, সে তখনি মারা পড়ল। বার্থাকে কাঁধে তুলে মেটাক ঘর থেকে চলে গেল। ও যে একেবারে উন্মাদ তাতে সন্দেহ রইল না।

এদিকে লেফ্‌টেনাণ্ট স্মিথ্‌ ওল্ডউইক এবং তার পর্যবেক্ষণ প্লেনের কোনো খবর না পেয়ে, দ্বিতীয় রোডেসিয়ান বাহিনীর কর্ণেল ক্যাপেল বিশেষ উদ্বিগ্ন। যারা যারা তার খোঁজ করতে গেছিল, বিফল হয়ে একে একে তারা প্রায় সবাই ফিরে এলো। কিন্তু সবার শেষে ক্লান্ত দেহে বৈমানিক টমসন এসে বললো যে মরুভূমির মতো একটা বিশ্রী জায়গায় একটা খাদে প্লেনটাকে দেখে এসেছে। নিচে নেমে ওল্ডউইকের সন্ধান করার ইচ্ছাও ছিল কিন্তু একটা যমদূতের মতো সিংহ প্লেন পাহারা দিচ্ছে। তবে যদ্দুর মনে হলো ওল্ডউইক্‌ বা তার দেহটেহ ওখানে নেই। প্লেন নিয়ে ঐ দুর্গম স্থানে আরেকটু পর্যবেক্ষণ করে, এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে এসেছে টমসন। প্লেনটা থেকে এক দিনের হাঁটা পথ দূরে মরুভূমির বুকে এক সবুজ উপত্যকার মধ্যিখানে ক্ষেত-খামার আর গম্বুজ মিনার সহ দেয়াল-ঘেরা এক শহর। তার মাঝ-খানে একটা হ্রদ।

কর্ণেল বললেন, 'ভুল দেখনি তো? বড়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছ। আগে একটু বিশ্রাম নাও।'

অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হলো যে টমসনের কথাগুলো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবিলম্বে ছোট একটা দল পাঠানো যাক। ঐ এরোপ্লেনের কাছে খাদের ওপরে একটা ক্যাম্প করা হবে আর একদল সশস্ত্র সৈনিক খাদে নেমে ওল্ডউইকের অনুসন্ধান আর ঐ শহরটার বিষয়ে তদন্ত করবে।

যুদ্ধের সময় কোনো কাজে বিলম্ব চলে না। সেই দিনই ট্রক্‌ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়ে গেল, রাত একটার মধ্যে দলটা রওনাও হয়ে গেল।

এদিকে ঐ অজ্ঞাত শহরের সেই দেয়াল বেয়ে-ওঠা লতা ধরে, কোনো মতে সিংহের আক্রমণ এড়িয়ে, টারজান একটা বাড়ির চ্যাপ্টা ছাদে পৌঁছল। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে পাহারার ব্যবস্থা ছিল তাই একেবারে সকলের অলক্ষ্যে টারজান উঠতে পারেনি। একজন প্রহরী ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তেই, টারজান

তার গলা টিপে ধরেছিল। নিঃশব্দে লড়াই হল। শেষ পর্যন্ত প্রহরীকে মরতে হল। টারজান তার আঁটো পাজামা, ঢিলে জোব্বা পরে, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে, জোব্বার নিচে নিজের দড়ি-গাছা জড়িয়ে ছোরাটাকে নিয়ে, অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লতাগাছের ভিতরে লুকিয়ে, বার্থা আর ওল্ডউইকের অনুসন্ধানে নামল।

ছাদ থেকে লাফিয়ে নামলে কার চোখে পড়ে যাবে ভেবে, একটা ছাদ থেকে আরেকটাতে যেতে যেতে লক্ষ্য করল, ঐ সব বাড়ির নিচের তলায় নামার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে। তারই একটা দিয়ে টারজান সরু গলিতে নেমে পড়ল। কালো চুল ওদেরই মতো পোষাকও ওদের, তাই কারো চোখে পড়ল না। পথে বেশ কিছু লোক চলাফেরা করছিল। দোকান-পাট খোলা ছিল। হয়তো সারাদিন বড় বেশি গরম বলে এই ব্যবস্থা। কারো চোখে পড়ে গেলেই সব মাটি হবে মনে করে টারজান ছায়ায় ছায়ায় হাঁটছিল। হলদে উর্দি পরা কেউ সামনা-সামনি পড়লে নিচু হয়ে স্যাণ্ডালের দড়ি বাঁধার ভান করছিল। তবে এটা যে পাগলের দেশ, অদ্ভুত কিছু করলেও কেউ লক্ষ্যও করবে না, সেটা বুঝতেও খুব দেরি হল না। একটা মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছিল। দুটো লোক একটা নিচু বাড়ির ছাদে মারামারি করছিল। একজন অন্যজনকে ঠেলে নিচে ফেলে দিল। তারপর নিজেও নিচে ঝাঁপ দিল। দুটো মরা মানুষ রাস্তায় পড়ে থাকল, কেউ ফিরেও তাকাল না। দুটো সিংহ এসে একটু শুঁকেটুকে চলে গেল। দেখেশুনে টারজান তাজ্জব বনে গেল।

আরেকটু এগিয়ে সরকারি এলাকায় পৌঁছল বলে মনে হল। সেখানে বার্থার আর ওল্ডউইকের গন্ধ নাকে এল। সেদিন সকালেই তারা এইপথ দিয়ে গেছে। পাছে টহলদারী সিংহরা গন্ধ পায়, তাই বাতাসের দিক্ লক্ষ্য করে চলতে হচ্ছিল। হঠাৎ একটা বড় বাড়ির ছাদ থেকে একজন লোককে কষ্টে সৃষ্টে নামতে দেখে টারজানের বড় কৌতূহল হলো।

*

ওল্ডউইক্‌কে সেই উঠোনে পুরে দরজা বন্ধ করে লোকগুলো চলে গেলে, সে বেচারা চেয়ে দেখে চারদিকে সিংহ। কেউ শুয়ে ঘুমোচ্ছে, কেউ বসে আছে, কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে সে একা হলেও, কেউ রাগও দেখাচ্ছে না। তবু সিংহ তো, কিছুই বলা যায় না। শরীরে কোনো শক্তি ছিল না। পথকষ্ট, নিষ্ঠুর ব্যবহার এই সবের ফলে ঐ বলিষ্ঠ সাহসী মানুষটাও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

জ্ঞান হলে দেখে একটা সিংহ ওর মুখ চাটছে। কাঠ হয়ে শুয়ে রইল সে। কিছুক্ষণ চেটে, শুঁকে, সিংহটা চলে যেতেই, ওল্ডউইক্‌ও মন ঠিক করে ফেলল, এখান থেকে যেমন করে হক পালাতে হবে। সিংহরা বাধা দিলে পিস্তলের গুলিতে যে-কটাকে সম্ভব শেষ করে, তবে মরবে। আস্তে আস্তে শিক ধরে উঠে দাঁড়াল সে। সিংহটা একটু গোঁ গোঁ করলেও, কিছুই বলল না। উঠোনের উল্টো দিকে একটা বড় গাছের ডালপালা অনেকখানি নিচে ঝুলে ছিল, আবার, ওপর দিকে একটা খোলা জানলা নাগালের মধ্যে। গাছতলায় কয়েকটা সিংহ মাটিতে আর বেঞ্চিতে ঘুমোচ্ছে। তার ওপর উঠোনটাও পার হতে হবে।

ধীরে সুস্থে উঠোন পার হল ওল্ডউইক্। একটা সিংহ উঠে এসে পথের মধ্যিখানে দাঁড়াল। ওল্ডউইক্ দেখেও দেখল না। কিছু বলল না সে, কিছু দূর সঙ্গে গিয়ে, আবার শুয়ে পড়ল। ওল্ডউইক্ গাছের গোড়ায় পৌঁছে গেল। মাথার ওপর একটা ডাল ঝুলে ছিল। শরীরের এ অবস্থা না হলে স্বচ্ছন্দে সেটাকে লাফিয়ে ধরা যেত। এখন পারবে না। তবে গুঁড়ির কাছের ডালটার নাগাল পাওয়া যায়। মুশকিল হল, ঠিক ঐখানে মস্ত একটি সিংহ, ঘুমিয়ে ছিল। গুঁড়ির কাছে যেতে হলে তাকে ডিঙোতে হবে। তাই ডিঙোল ওল্ডউইক্ নড়লও না সিংহটা।

তারপর গাছ বেয়ে উঠে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল একটা খালি ঘর। বেশ বড় ঘরটা, সুন্দর করে সাজানো। উল্টো দিকে একটি মাত্র দরজা। দেয়ালে একটা বড় খোপ, তার সামনে পরদা ঝুলছে, মনে হল ভিতরে খাট বিছানা। ওল্ডউইক্ ভাবল এখন কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। অন্ধকার হলে বেরোবার চেষ্টা করবে। জায়গাটা একটু পর্যবেক্ষণ করবার জন্য দরজার দিকে যেই এগিয়েছে, অমনি সেই খোপের পরদা সরিয়ে সুন্দর একজন মেয়ে ঢুকল। অন্ততঃ প্রথমটা সুন্দর মনে হয়েছিল, পরে দেখল মুখটা বড় কদাকার। মনে হল একেবারে জড়বুদ্ধি।

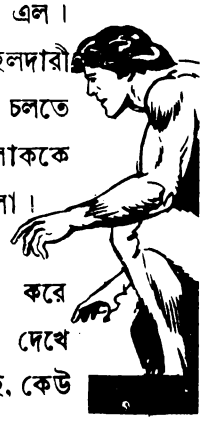

ওল্ডউইককে দেখে সে খুব খুশি হয়ে আদর করে, তাকে বসাল। ওল্ডউইক্‌তো অবাক্! কি যে বলছিল মেয়েটা মিষ্টি গলায়, তার এক বর্ণ মানে বোঝা গেল না। এরি মধ্যে দরজাটা খুলে একটা লোকও ঢুকল। ওল্ডউইক্‌কে দেখেই সে মহা রেগেমেগে একটা বাঁকা তলোয়ার নিয়ে তেড়ে এল; মেয়েটা অমনি পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। নিরুপায় হয়ে

ওল্ডউইক্ লোকটাকে গুলি করল। সঙ্গে সঙ্গে সে মরে পড়ে গেল। ভাবল ঐ শব্দ শুনে এখুনি নিশ্চয় লোকজন ছুটে আসবে। আশ্চর্যের বিষয় কেউ এল না। কিন্তু মেয়েটা বেরিয়ে এল। লোকটা মরে গেছে দেখে তার কি আহ্লাদ! মৃতদেহের গালে চড় মারতে লাগল। একবার ছুটে গিয়ে দরজাটাতে ভিতর থেকে হুড়কো দিল। তারপর কি উন্মাদ হাসি। ওল্ডউইকের গা শিউরে উঠল। এ কি বীভৎস পরিবেশে পড়া গেল!

মেয়েটি ওকে ডেকে দেখাল যে পরদা-ঢাকা খোপটা একটা ছোট ঘরের মতোই মাপের। সেখানে একটা কৌচের ঢাকনি তুলতেই তলায় একটা গর্ত বেরিয়ে পড়ল। মেয়েটি ইসারায় বোঝাল ঐ গর্তে মৃতদেহটাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। তাই করল দুজনে মিলে। মেয়েটির হৃদয়হীনতা দেখে ওল্ডউইক্ আশ্চর্য হয়ে গেল। এই সময় দরজায় টোকা পড়ল। তাই শুনে মেয়েটি ওকে খাটের মাথার কাছে দেয়ালে ঝোলানো একটা পরদা তুলে একটা ছোট ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে, পরদাটা আবার টেনে, দরজা খুলতে গেল।

দরজা খুলতেই যে লোকটি ঢুকল তাকে মেয়েটা ঐ খোপে এনে খাটে বসিয়ে হাত নেড়ে কি সব বলতে লাগল। সে যে ওল্ডউইকের ঐ লোকটাকে গুলি করার কথা বলছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খানিক বাদে লোকটা পা টিপে টিপে পরদার সামনে এসে তার বাঁকা তলোয়ারটাকে একেবারে হাতল পর্যন্ত পরদার ভিতর দিয়ে গায়ের জোরে বসিয়ে দিল।

মেটাক তো বার্থাকে কাঁধে করে একটার পর একটা ঘর পার হয়ে ছুটেই চলেছে। তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করা বৃথা। মনে হল রাজার ছেলে হলেও ধরা পড়লে তার শাস্তি পাবার যথেষ্ট ভয় আছে। তাই সরে পড়বার এত তাড়া। বারে বারে পিছন ফিরে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিল। হয়তো শাস্তিটা বেশ কড়া রকমেরি হতে পারে। আরো মনে হচ্ছিল ঐ সব অলিগলির ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে শুধু, বার্থার কেন, মেটাকেরো গোলমাল লাগছিল। হাজার হক, সে তো প্রকৃতিস্থ ছিল না। আরেকটা প্যাসেজ দিয়ে দৌড়তে লাগল মেটাক। এটা ঢালু হয়ে উঠতে উঠতে উপরতলার সমান উঁচু হয়ে গেল। হঠাৎ একটা বন্ধ দরজা খুলে দেখে একটা মস্ত ঘরে পৌঁচেছে। এখানে অনেক লোক, অনেক আলো আর একটা সিংহাসনে বসে আছেন রাজা নিজে। পাশে আরেকটা সিংহাসনে মস্ত এক সিংহী বসে। বার্থার মনে পড়ল জগনিলা বলেছিলেন রানীরা সকলে মানুষ নয়।

মেটাককে দেখে রাজার রাজ-মর্যাদা খসে পড়ল। খ্যাপা উন্মাদের মতো তার পিছনে তিনি ছুটলেন একশো সভাসদ্‌ও ছুটল। কেউ হাসছে, কেউ চ্যাঁচাচ্ছে, সবাই পাগল। তখনো মেটাক এ-গলি সে-গলি করে তাদের হাত এড়িয়ে যাচ্ছে। একটা বন্ধ ঘরের দরজা খুলতেই বার্থা দেখল ঘরে অনেক মশাল জ্বলছে। মেঝের মধ্যিখানে একটা বেশ বড় চৌবাচ্চা, সেটা প্রায় কানায় কানায় জলে ভরা। মেটাক বার্থাকে নিয়ে তারি মধ্যে ঝাঁপ দিল। অন্যরা ওপরে অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু তারা আর উঠল না।

খাটের মাথার পিছনে সেই পরদা ঢাকা ফাঁকা জায়গাটার পিছনে হাতড়াতেই একটা দরজার হুড়কোতে ওল্ডউইকের হাত পড়ল। হুড়কো খুলে নিঃশব্দে দরজা ঠেলে অন্ধকার একটা জায়গায় পৌঁছল। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে এগিয়েই একটা মই হাতে ঠেকল। সুড়ঙ্গও ঐখানে শেষ। মইয়ের ওপরে একটা গোল ট্র্যাপডোর ছিল। অন্ধকারে তাতে মাথা ঠুকে গেল। হাত দিয়ে ঠেলতেই ঢাকনির মতো সেটা খুলে গেল। বাইরে তারা-ভরা আকাশ দেখা গেল। খুব সাবধানে ওপরে উঠে আবার ঢাকনিটা বন্ধ করে দিয়ে, চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। দক্ষিণে আরেকটা উঁচু দেয়াল, পশ্চিম দিক থেকে আঁকাবাঁকা রাস্তার মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছিল। সেখান থেকে শহরের পথ-ঘাটের নৈশ চেহারা দেখা যাচ্ছিল। ওল্ডউইকের মনে হচ্ছিল এ শহরে একমাত্র সিংহরাই প্রকৃতিস্থ, আর সব স্রেফ পাগল।

নিচের ঐ রাস্তাটা দিয়েই আজ সকালে ওকে আর বার্থাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। ওল্ডউইক্ বুঝতে পারছিল একলা ঐ একটা পিস্তল আর খানকতক গুলি নিয়ে বার্থাকে উদ্ধার করা যাবে না। যেমন করেই হক, সাহায্য আনতে হবে। ছাদের ঐ জায়গাটার ঠিক নিচেই একটা মশাল জ্বলছিল। সেখান থেকে সরে একটা অন্ধকার মতো জায়গা বেছে নিয়ে, খুব সন্তর্পণে নিচে নেমেই হলদে জোব্বা পরা একটা লম্বা লোকের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল।

এদিকে যে সিংহটা টারজান লতা বেয়ে ওঠার সময় তেড়ে এসেছিল, তার নাকে হঠাৎ টারজানের গন্ধ পৌঁছতেই তার রাগ পড়ে গেল। এই মানুষটাই তো তাকে ফাঁদ থেকে উদ্ধার করেছিল! এই নুমা মানুষ খেত না। ছোটবেলায় রাজার লোকরা তাকে ধরে শহরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে

শিক্ষণ দিয়েছিল। সে জানত দেয়ালের বাইরে রাজার ছাগল ভেড়ার খোঁয়াড় আছে। সেখান থেকে সহজে শহরে ঢুকবার একটা খিড়কি দোর আছে। দোরের কাছে পৌঁছতে হলে খোঁয়াড়ের ভিতর দিয়ে যেতে হত। নুমা এখন ভিতরের ঐ মানুষটার কাছে যেতে চাইছিল। ছাগলরা ডাকাডাকি লাগাতেই ওদের রাখাল দরজাটি খুলে মাথা গলিয়ে কি ব্যাপার দেখার চেষ্টা করছিল। নুমার থাবার এক বাড়ি খেয়ে সে ধরাশায়ী হল। নুমা ঢুকে পড়ল, দরজাও খোলা রইল।

হলদে জোব্বা পরা লোকটার সঙ্গে মুখোমুখি হতেই ওল্ডউইকের প্রথমে মনে হয়েছিল, 'দিই একটা গুলি মেরে শেষ করে। কথা বললেই ধরা পড়ব।'

পকেটে হাত দিতেই সে লোকটা হাতটাকে খপ্ করে ধরে ফেলে বলল, 'এ যে আমি, লেফ্‌টেনাণ্ট, টারজান।'

ওল্ডউইক্ আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল। টারজানকে ধরে সামলে নিয়ে বলল, 'তুমি? তুমি? আমি ভাবলাম তুমি মরে গেছ।'

—'না, মরিনি। তুমিও দেখছি মরনি। মেয়েটা কোথায়?'

ওল্ডউইক্ বলল, 'এসে অবধি দুজনকে দু-জায়গায় নিয়ে গেল। অনেক কষ্টে নিজে তো বেরিয়েছি, তাকে যে কোথায় খুঁজব জানি না।'

টারজান সব কথা শুনে বলল, 'কোথায় চলেছ?'

—'ভাবছিলাম, কোনো উপায়ে শহর থেকে বেরিয়ে, পুব দিকে গিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যদি যোগাযোগ করে ওকে উদ্ধার করা যায়।'

টারজান বলল, 'ঐ মরুভূমি পার হওয়া অসম্ভব।'

—'তাহলে কি হবে?'

—'মেয়েটাকে খুঁজে বের করা হবে। হোক্ জর্মান স্পাই, তবু তো মেয়ে।'

—'কিন্তু খুঁজে পাবে কি করে?'

—'ধাওয়া করে এতদূর এসেছি। মনে হচ্ছে আরেকটুও যেতে পারব।'

—'এই পোষাকে আমি কি করে সঙ্গে যাব?'

—'অন্য পোষাক জোগাড় করতে হবে। আমি যে ভাবে এটা জোগাড় করেছি'

ওল্ডউইক্ বলল, 'ঠিক আছে, আমিও তো একটাকে মেরে ঐ ঘরের খোপে লুকিয়ে রেখে এসেছি। ঘরে শুধু মেয়েটা আর এক ছোকরা আছে। তাদের সায়েস্তা করা কিছু শক্ত হবে না।'

—'বেশ চল।'

যে পথে ওল্ডউইক পালিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই দুজনে আবার ঐ পরদা-টানা খোপে পৌঁছল। পরদার ফাঁক দিয়ে দেখল ঐ মেয়ে আর সেই যুবক একটা টেবিলে খেতে বসেছে। একজন বিশালদেহ নিগ্রো পরিবেশন করছে। তাকে দেখেই টারজান বুঝল সে ওয়ামাবো, অশ্বতল থেকে এসেছে। হয়তো ক্রীতদাস করে ধরে আনা হয়েছে।

লোকটা পরিবেশন করতে করতে কাছে আসতেই আড়াল থেকে ওয়ামাবো ভাষায় টারজান ফিসফিস করে বলল, 'যদি ওয়ামাবো দেশে ফিরে যেতে চাও, আমি যা বলব তাই কর। ভয় পেও না, আমি বন্ধুলোক।'

লোকটা নিচু গলায় বলল, 'বল দেবতা, বেচারা ওটোবু কি করতে পারে, যা বলবে তাই করব।'

—'আমরা এ ঘরে ঢুকছি। ওরা দুজন যাতে পালাতে বা চ্যাঁচামেচি করে লোক ডাকতে না পারে, সে বিষয়ে আমাদের সাহায্য করবে।'

লোকটা বলল, 'ওরা যাতে নাপালায় সে ব্যবস্থা করছি। এ বাড়ির পাথরের দেয়াল এত পুরু যে কোনো ঘরের শব্দ বাইরে থেকে শোনা যায় না। ওরা চ্যাঁচালেও কোনো অসুবিধা হবে না। আমি তোমাদের আজ্ঞা পালন করব।'

লোকটা টেবিলে আরেকটা পাত্র নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে টারজান আর ওল্ডউইক্ ঘরে ঢুকল। তাদের দেখেই যুবক উঠে দাঁড়াল। ওবোটু পিছন থেকে তাকে জাপ্টে ধরল। অমনি মেয়েটা চিৎকার করে ওদের কাছে যাচ্ছিল। টারজান ওকে ধরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তার রাগ পড়ে গেল, মুখে বোকা বোকা হাসি দেখা দিল। ওল্ডউইক্‌কে দেখেও সে কিছু বলল না। টারজান ছোকরার তলোয়ারটা খুলে নিয়ে, ওবোটুকে বলল, 'ওদের বল আমরা কারো কোনো ক্ষতি করব না। কিন্তু আমাদের কাজ সেরে শান্তিতে বিদায় দিতে হবে।'

ঘরের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার পর ওটোবু বলল, 'ওরা বলছে তোমরা কি চাও?'

—'কিছু খাবার চাই আর এ-ঘর থেকে একটা জিনিস নিতে চাই। ওর বর্শাটা নিয়ে নাও ওটোবু, লেফ্‌টেনাণ্ট ওর তলোয়ারটা ধর। আমি এদের দেখছি, ওটোবু, তুমি ঐ কৌচের তলায় যা আছে, সেটা নিয়ে এসো।'

মৃতদেহ দেখে কিন্তু যুবক বড়ই উত্তেজিত হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করা গেল। ওটোবু, মৃতদেহের

জোব্বাটা খুলে নিল।

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'ও অত রেগে উঠল কেন?'

ওটোবু বলল, 'ঐ মরা লোকটি যে ওর বাপ।'

তারপর টেবিলে বসে ওল্ডউইক্ আর টারজান কিছু খেয়ে নিল। ঐ মেয়েটি আর যুবক ওদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তাও বলল। যুবক নাকি মেটাকের বন্ধু। রাজবাড়িতে তার যাওয়া-আসা আছে।

এই সময়ে দরজায় কেউ ধাক্কা দিতে লাগল। যুবকও চেঁচিয়ে কি যেন বলতে লাগল। ওটোবুর কথায় বোঝা গেল যুবক তাদের ডেকে বলছে, 'দুজন বাইরের লোক ওদের বন্দী করেছে।'

টারজান বলল, 'ওকে বল চুপ না করলে আমি ওকে মেরে ফেলব।' ছোকরা তখন চুপ করল।

টারজন ওল্ডউইক্‌কে বলল, 'ওটোবুকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল, তা আর হল না। চল, যে পথে এসেছি, সেই পথে ফিরে যাই।'

চলে যাবার আগে একবার ফিরে তাকিয়ে ওরা আঁৎকে উঠল। ওটোবু মরে পড়ে আছে। অন্য দুজন অদৃশ্য!

*

মেটাক যখন বার্থাকে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল, বার্থা তখন মরবার জন্য প্রস্তুত ছিল। একটুক্ষণ ডুব-সাঁতার দিয়ে যখন বার্থার মাথাটাকে মেটাক তুলে ধরল, সে দম নিয়ে বাঁচল। দেখল ওরা একটা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে সাঁতরে চলেছে। সুড়ঙ্গটা বাড়ির বাইরে সেই হ্রদে গিয়ে শেষ হয়েছিল। হ্রদ থেকে ডাঙায় উঠবার সিঁড়ি ছিল। সেটা বেয়ে ওরা ওপরে উঠে, ভিজে কাপড়ে রাস্তার ধারে দাঁড়াল। ঐ পাগলের দেশে কেউ ওদের দিকে ফিরেও চাইল না। মেটাক ওকে যে বাড়িতে নিয়ে গেল, সেটাকে দেখেই বার্থা চিনতে পারল। এখানেই ওল্ডউইককে, আর ওকে প্রথমে আনা হয়েছিল।

এখন সে-সব লোক নেই। তাদের জায়গায় সোনালি সিংহের ছোট ছোট নক্সা দেওয়া সাদা উর্দি পরা যোদ্ধারা ডিউটি দিচ্ছিল। মেটাককে দেখে তারা উঠে দাঁড়াল। মেটাকের কথায় তারা ওদের দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। তাতে টোকা দিতেই ক্ষীণ স্বরে একটা উত্তর শোনা গেল। দরজা খুলল না। মেটাক আর অন্যরা বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে যখন ওরা ঢুকল, ঘরে কেউ ছিল না। কিন্তু মেঝের ওপর বাড়ির মালিকের আর নিগ্রো ক্রীতদাসের মৃতদেহ পড়ে ছিল।

চারদিকে খুঁজে আর কাউকে না দেখে, মেটাক অনুচরদের বিদায় করে দিল। তারা ভাঙা দরজাটাতে ঠেকা দিয়ে রেখে চলে গেল। হঠাৎ নিগ্রো ক্রীতদাসের পাশে তলোয়ারটাকে পড়ে থাকতে দেখে, বার্থা সেটা তুলে নিল। আত্মরক্ষার কাজে দেবে। তাই দেখে মেটাক পাগলের মতো হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ ভীষণ রেগে একটা ছোট কাঠের টুল ওর দিকে ছুঁড়ে মারল। সেটা গিয়ে বার্থার মাথায় লাগতেই, বার্থাও পড়ে গেল।

এদিকে টারজান আর ওল্ডউইক সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখতে পেল ট্র্যাপডোরটা শুধু বন্ধই নয়, ওপর থেকে তালা দেওয়া। তাহলে ঘরে ফিরে গিয়ে অন্য পথ দেখতে হয়। এই মনে করে ওরা আবার ঘরে ফিরে এসেই বার্থার গলা শুনতে পেল, 'হায় ভগবান! দয়া কর!'

অমনি হুড়মুড় করে ওরা দুজনে ঢুকে পড়ল। মেটাকের কি রাগ! ওর বাবার উর্দি পরা অনুচর এখানে কি করছে? তেড়ে বলল, 'যাও এখান থেকে!' এই বলে টারজানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারপরেই বেঁধেগেল। প্রচণ্ড শক্তিশালী ঐ পাগল রাজপুত্র। প্রায় সমানে সমানে যুদ্ধ। তার ওপর আবার টারজান আছাড় খেতেই, মেটাক ওর বুকে লাফিয়ে পড়ে, গলায় কামড় দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

এতক্ষণ তলোয়ার হাতে বার্থা আর পিস্তল হাতে ওল্ডউইক্ ওদের চারদিকে ঘুরছিল। টারজানকে আঘাত না করে, একটু সুবিধা পেলেই মেটাককে মেরে ফেলবে। তার দরকার হল না। টারজান এক সময় মেটাকের গলা টিপে ধরল আর একটু পরেই জানলা দিয়ে তার দেহটা নিচে সিংহদের উঠোনে ফেলে দিল।

এবার এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে না, সেখানে ঘর ভরতি উর্দি পরা সশস্ত্র যোদ্ধা। ঠিক এই সময় ওটোবু উঠে বসে বলল তার মাথায় সামান্য একটু চোট লেগেছিল, মোটেই সে মরেনি। সে দেশে ফিরে যেতে চায়।

—'তাহলে সব চেয়ে নিরাপদ পথ দিয়ে আমাদের শহরের বাইরে নিয়ে চল।'

ওটোবু বললো, 'একেবারে নিরাপদ কোনো পথই নয়। ফটকে মারামারি হবেই।'

টারজান বললো, 'তা না হয় হবে। চল এবার।'

ওটোবু ওদের অন্য একটা ঘরের ভিতর দিয়ে ভিন্ন পথে দরজা দিয়ে গলিতে বের করে আনলো। তারপর গেটের দিকে রওনা। সেখানে পৌঁছবার অল্প আগে শহর থেকে হৈ-চৈ শুনে মনে হলো যে-বাড়ি থেকে ওরা পালিয়ে এসেছে, তার মালিকের মৃতদেহ বোধ হয় কেউ দেখতে পেয়েছে। দূর থেকে শিঙার শব্দ শোনা গেল। ওটোবু বলল, 'এই রে! রাজার রক্ষীদের আর সিংহদের ডাক পড়েছে।'

মাথার ওপরে টিয়া পাখির ডানা ঝাপটানি শুনে ওটোবু বললো, 'ঐ পাখি ফটকের রক্ষীদের সাবধান করে দিতে যাচ্ছে।'

তাজ্জব ব্যাপার! ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল ফটকের কাছে। রক্ষীরা আর সিংহরা একদিকে, টারজান, ওল্ডউইক, ওটোবু আর বার্থা অন্য দিকে। শেষে যদি টারজানের বন্ধু সেই ফাঁদে-পড়া সিংহ এসে ওদের পক্ষ না নিত, তাহলে এ যুদ্ধের ফল কেমন দাঁড়াত বলা শক্ত। যাই হোক, যুদ্ধে জয়ী হয়ে ওরা ফটকের কাছে গেল। ওটোবু ফটক খুলে দিতেই, ওরা সকলে বেরিয়ে এলো। শহর থেকে কেউ ওদের পিছনে ধাওয়া করলো না। ওটোবু বললো, 'এরা রাতে দেয়ালের বাইরে আসে না। কাল ভোরে নিশ্চয় রওনা হবে।'

সারা রাত হাঁটল ওরা। ভোরের দিকে ওল্ডউইক্ আর পারছিল না। তার আহত রুগ্ন ক্লান্ত শরীর কতটা ধকল সইবে? টারজান তাকে কাঁধে তুলে খাদে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে সকাল হয়ে গেল। তবু ওদের মনে হতে লাগল যে যতক্ষণ না খাদ থেকে ওপরে ওঠার জায়গাটাতে পৌঁছনো যায়, ততক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া যাবে না।

ওল্ডউইককে একরকম কাঁধে করে আনতে হয়েছে. এখন টারজান লক্ষ্য করলো বার্থাও একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। বালি আর নুড়ির ওপর দিয়ে চলতে পারছে না, তবু মুখ বুজে চেষ্টা করছে। এরা দুজন বারবার টারজানকে বলছিল, 'তুমি এগিয়ে যাও। ওরা কখন এসে পড়ে তার ঠিক কি! মিছিমিছি মরবে কেন?'

টারজান হাসছিল, 'মরিনি তো এখনও পর্যন্ত কেউ। একটু বিশ্রাম তোমাদের করতেই হবে।'

একটা পাথরের ছায়ায় বালির ওপর ঘণ্টাখানেক শুয়ে রইল ওরা। তারপর টারজান বলল, 'ওরা আসছে ঠিকই। খুব বেশি দূরেও নেই।'

ওল্ডউইক্ আর বার্থা উঠে পড়ল। তাদের নাকি যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে, এবার গায়ে জোর পাচ্ছে। টারজান জানত কথাটা সত্যি নয়। ওটোবুর দিকে ফিরে সে বলল, 'তুমি লেফ্‌টেনাণ্টকে তুলে নাও, আমি একে নিয়ে যাচ্ছি।'

ঐভাবে আরো কিছু দূর এগোলে পিছন থেকে হাঁকডাক, সিংহের গর্জন শোনা যেতে লাগল। একটু পরেই তাদের মোকাবিলা অনিবার্য।

সামনেই খাদের গা ঘেঁষে দশ ফুট উঁচু একটা পাথর পড়ে ছিল। ওরা তার পিছনে আশ্রয় নিল। জায়গাটার দু-মাথা খোলা হলেও, সামনে আর পিছন দিকটা নিরাপদ। ঐ দুটো দিক রক্ষা করতে হবে। একটা বাঁদর এসে ওদের ব্যবস্থাপনা দেখে পালাল। ওটোবু বলল. 'ও গিয়ে টিয়াদের বলবে, টিয়ারা পাগলদের বলে দেবে।'

টারজান বলল, 'তাতে কি এসে যায়? সিংহরা তো সহজেই আমাদের খুঁজে বের করবে।'

এক মাথায় ওল্ডউইক্ আর ওটোবু পিস্তল আর বর্শা নিয়ে দাঁড়াল। অন্য মাথায় টারজান। বার্থাকে জোর করে বালির ওপর শোয়ানো হলো।

একটু পরেই পাগলদের চিৎকার আর সিংহের গর্জন সহ তারা এসে পড়ল। ওল্ডউইক মানুষদের ওপর গুলি চালাতে লাগল। ওটোবুর বর্শায় বেশ কটা সিংহ মরল। টারজানের কাছে যে-ই এলো তাকে আর ফিরতে হলো না। সেই অসম যুদ্ধ বর্ণনার বাইরে। অবিশ্বাস্য বীরত্বের সঙ্গে এরা তিনজন এবং বার্থা লড়েছিল। আততায়ীরাও কম যায় না। শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল একদিকে এরা ক'জন, অন্য পক্ষে ছয় জন মানুষ, ছ-টা সিংহ। তারপর টারজানের কাঁধে একটা বর্শা বিঁধল আর ওল্ডউইকের উরুতে একটা। ওটোবু একা লড়ে যেতে লাগল। একটা বর্শা খেয়ে টারজান পড়ে গেছিল। শত্রুদের একজন বর্শা তুলে তার বুকে বসায় আর কি। ওল্ডউইকের পিস্তল তুলে বার্থা তাকে গুলি করে মেরে ফেলল।

হঠাৎ দুই পক্ষকে চমকে দিয়ে খাদের মধ্যে থেকে এক গুলি এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল ব্রিটিশ অফিসারের গলা। এমন মধুর স্বর ওরা জন্মে শোনেনি। একটু আগেই টারজান পর্যন্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিল। মোট কথা বেশির ভাগ সিংহ পালালেও, পাগলরা সবাই মরল। টারজানের হলদে উর্দি দেখে একজন সৈনিক বন্দুক তুলেছিল, বার্থা চেঁচিয়ে বাধা দিল। ব্রিটিশ সৈনিকদের সঙ্গে একজন সার্জেণ্টও ছিল। তার কাছে সংক্ষেপে সব কথা বলা হলো। দ্বিতীয় রোডিসিয়ান বাহিনীর কর্ণেল ক্যাপেলের লোক এরা।

ওল্ডউইককে উদ্ধার করতে এদের পাঠানো হয়েছে। এরা খাদের ওপরে ক্যাম্প করে আছে।

অল্পক্ষণ পরেই বাহিনীর বড় দলটাও এসে পৌঁছল। তাদের সঙ্গে ওষুধপত্র ছিল। ঐখানেই ওল্ডউইকের ক্ষতগুলো পরিষ্কার করে, ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা হলো। টারজানের আঘাতগুলোতেও ওষুধপত্র পড়ল। কিছু পরেই সকলে মিলে ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে গেল।

সে রাতটা ক্যাম্পে সকলে বিশ্রাম করল। স্থির হল পরদিন ওল্ডউইক আর বার্থা কিরচের এরোপ্লেনে ব্রিটিশ হেড-কোয়ার্টারে যাবে। বাহিনীর বড় দলটা ট্রাক সহ মার্চ করে ফিরবে। তাদের সঙ্গে যেতে টারজানকে সাদর নিমন্ত্রণ জানানো হলে, সে বলল তার আর ওটোবুর গন্তব্যস্থান পশ্চিমে ওয়ামাবোদের দেশের দিকে। ওদের সঙ্গে ফিরবে না শুনে বার্থার আর ওল্ডউইকের কি দুঃখ! বার্থা বলল, 'ঐ ভয়ংকর বনে ফিরে যাবে? আর দেখা হবে না?'

—'আর দেখা হবে না।'

শেষ পর্যন্ত বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ওরা প্লেনে উঠল।

উদ্ধার কার্যের জন্য যে বিমান এসেছিল, তার একটিতে কর্ণেল ক্যাপেল এসে পৌঁছলেন। তাঁকে বার্থার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলতে দেখে টারজান ভারি বিরক্ত। কর্ণেল ক্যাপেল্-ও প্লেনে না ফিরে মার্চ করে ফিরবেন। দেশটা দেখবার বড় শখ তাঁর। তিনি বললেন, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে এলে বেশ হতো, গ্রেস্টোক ওরাও তাই বলছিল।'

—'ওল্ডউইক আর মিস্ কিরচের আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যই ও-কথা বলেছে।'

ক্যাপেল অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি এখনো ওকে জার্মান স্পাই, বার্থা কিরচের বলেই মনে কর নাকি? তার বেশি কিছু জান না?'

টারজান বলল, 'না তো।'

ক্যাপেল্ বললেন, 'ও আসলে প্যাট্রিশিয়া ক্যান্‌বি, ব্রিটিশ গুপ্ত গোয়েন্দা বিভাগের উজ্জ্বল রত্ন। ওর বাবা আমার বন্ধু। আমি ওকে জন্ম থেকে জানি। এই দেখ, জার্মান ক্যাম্প থেকে আমাদের এই সব কাগজপত্র এনে দিয়েছে। এই দেখ ক্যাপ্টেন শ্লাইডারের ডাইরি!'

টারজান যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'দেখি ডাইরিটা।'

পাতা উল্টে একটা বিশেষ সর্বনাশা তারিখের জায়গাটা বের করে তাড়াতাড়ি করে পড়ে, টারজান বলল, 'ভগবান! এ কি সত্যি! শোন কি লিখেছে।—'ইংরেজ শূওরটার ওপর একটু চালাকি করা গেল। একটা মরা নিগ্রো মেয়ের পোড়া শরীরে লেডি গ্রেস্টোকের আংটি পরিয়ে, তার খাটে শুইয়ে রেখে গেলাম। ব্যাটা এসে ভাববে সে মরেছে। মরবে কেন? জীবিত লেডি জি-র মূল্য হাই কমাণ্ডের কাছে ঢের বেশি'।'

—তাহলে সে বেঁচে আছে!!'

ক্যাপেল বললেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। তাহলে এবার কি করবে?'

—'তোমাদের সঙ্গেই ফিরে যাব নিশ্চয়। কিন্তু মিস্ ক্যান্‌বির ওপর তো ভীষণ অন্যায় করেছি। ওল্ডউইক্ ওকে ভালোবাসে, তাকে পর্যন্ত বলেছি ও একটা ঘৃণ্য জার্মান স্পাই! শুধু যে আমার স্ত্রীকে খুঁজে আনতে হবে তা নয়, এ অন্যায়টারো প্রতিকার করতে হবে।'

ক্যাপেল বললেন, 'তাই নিয়ে মন খারাপ কর না। ঐ মেয়েই নিশ্চয় ওল্ডউইকের ভুল ধারনা ঘুচিয়ে দিয়েছে, কারণ যাবার আগে ওল্ডউইক্ আমাকে বলেছে ওদের দুজনার বিয়ে হবে।'

ভয়ঙ্কর টারজান

টারজান দি টেরিবল

ক্যাপ্টেন শ্লাইডারের ডায়েরীতে টারজান পড়েছিল তার স্ত্রী জীবিত আছে। তারপর আশা-নিরাশায় দুই মাস কেটেছে। বৃটিশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যে টারজান জেনেছিল যে জার্মানরা তাকে লুকিয়ে রেখেছিল। কেন, তা কেবল তারাই জানে। জার্মান আর্মির একটা ছোট অংশ ও এক জার্মান অফিসার তাকে কঙ্গো ফ্রি স্টেটে নিয়ে গিয়েছিল।

টারজান একাই তার সন্ধানে বেরিয়ে জেনেছিল কোন গ্রামে সে আটক ছিল, বহুদিন আগেই যে সে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে এ খবরও পেয়েছিল। সেই জার্মান অফিসারও ঐ সময় অন্তর্ধান হয়। অনেককে জিজ্ঞাসা করে, টারজান আন্দাজ করেছিল কোন্ দিকে তাদের পালানো সম্ভব। এদিককার বাসিন্দারা যে মানুষ-খেকো তাও টারজান জানত, তার ওপর ঐ গ্রামে জার্মান আর্মির দিশী

সেপাইদের কাপড়-চোপড় দেখে তার মনের উদ্বেগ বেড়েই চলেছিল, যদিও কোনো বাড়িতে তার স্ত্রীর কোনো জিনিস সে খুঁজে পায়নি।

গ্রাম ছেড়ে চলল সে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। কাঁটা গাছ ভরা, জলহীন তৃণভূমি ছাড়িয়ে, অশেষ কষ্ট সহ্য করে যে অঞ্চলে পৌঁছল, সেখানে সে-ই বোধহয় প্রথম সাদা-চামড়া। খাড়া পাহাড়, বিস্তীর্ণ সমতলভূমি, বিরাট জলাভূমি যেটা পার হতে তার অনেক সপ্তাহের ধকল সহ্য করতে হয়। সে অঞ্চল দৈত্যের মতো বড় আকারের কুমির জাতীয় জন্তু, বিষাক্ত সাপে ভরা। দূর থেকে বিরাট আকারের হাতি, গণ্ডার, হিপ্পো দেখতে পায়। এই ভয়াবহ জলাভূমি পার হয়ে সে বুঝেছিল কেন বাইরের জগতের মানুষরা এদিকে অগ্রসর হয় নি।

মানুষের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এখানকার জীব-জন্তুদের প্রাচুর্য ছিল। পরিচিত সব রকমের পাখি, জন্তু-জানোয়ার ছাড়াও এখানে ছিল বর্ণ-সঙ্কর দু এক রকমের জন্তু। বাইরের জগতের সিংহের থেকে আকারে ছোট, কাল ডোরাকাটা হলদে রং-এর বেজায় বদমেজাজী, ধারাল দাঁত-ওয়ালা সিংহও ছিল। এই জাতে যে বাঘ-সিংহের মেশানো রক্ত আছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সাধারণ সিংহের গায়ে আবার চিতাবাঘের বুটি।

দু'মাস ঘুরেও যখন স্ত্রীর হদিস্ পেল না টারজান, তখন সে অনুমান করল যে যদি জেন বেঁচে থাকে, তাকে খুঁজতে হবে এই দিকেই। কিন্তু কি করে যে সে এই ভীষণ জলাভূমি পার হলো তা আন্দাজ করা অসম্ভব। তবু মন বলছে, 'না সে জীবিত আছে—তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। রাস্তার সব প্রাকৃতিক বাধা শারীরিক ও মানসিক শক্তি দিয়ে পরাস্ত করতেই হবে। তাকে হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে লড়াই করে খাবার যোগাড় করে বাঁচতে হবে।' হলোও তাই। কতবার পশুরাজ ও সে একই শিকারের পিছনে ছুটেছে। কখনো সে জিতল, কখনো সে হারল। তাছাড়া ফল মূল মাছ ইত্যাদি তো আছেই সে তো জঙ্গলেই বড় হয়েছে। প্রকৃতিদেবী এই অঞ্চলের ওপর প্রসন্না, তাই তিনি তাকে, কাঁটা ভরা তৃণ-ভূমি ও জলাভূমি দান করে আধুনিক মানুষের হাত থেকে রক্ষা করে এসেছেন।

অনেক খুঁজে টারজান এক গিরিপথের সন্ধান পেয়ে, পাহাড়ের ওদিকে পৌঁছে দেখে পাহাড়ের দু'দিক প্রায় একই রকম। যেখানে পাহাড় কেটে জল এসে নিচের উপত্যকায় পড়েছে হরিণ সেখানে বিচরণ করে। তাকে ধরা টারজানের পক্ষে খুবই সহজ।

এক সন্ধ্যার অন্ধকারে, কাঁধে মরা হরিণ চাপিয়ে টারজান ওপারের জঙ্গলের দিকে চলল। কিন্তু তার আগেই বিরাট এক গাছ একা দাঁড়িয়ে আছে দেখে, টারজান তাতেই সে রাতের জন্য আশ্রয় নিয়ে হরিণটার মাংস কাঁচাই খেল। পেট ভরলে বাকি মাংসটা গাছের একটা জায়গায় রেখে, নিমেষের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ ঘুম গেল ভেঙে, সজাগ হলো সঙ্গে সঙ্গেই। দেখল ফরসা একটা লোক, প্রায় উলঙ্গ, ঠিক ঐ গাছের দিকেই ছুটে আসছে পিছনে তার লম্বা লেজ ঝুলছে। টারজানের চির-শত্রু পশুরাজ লোকটিকে তাড়া করে প্রায় ধরে ফেলেছে। চিন্তা করার সময় ছিল না, এক ঝাঁপে ডান হাতে খোলা ছুরি ধরে টারজান পড়ল সিংহটার ওপরে। অগ্রাহ্য করল সে সিংহটার তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়। বার বার ছোরাটা সিংহের গায়ে কোপ দিতে শুরু করল। প্রায়-মানুষ জীবটি যেই বুঝল সে রক্ষা পেয়েছে, না পালিয়ে সেও নেমে পড়ল। তার মোটা লাঠি সজোরে সিংহের খুলির ওপর পড়াতে, পশুরাজ অজ্ঞান, আর টারজানের ছোরা বিঁধল গিয়ে সিংহের বুকে—তার শরীর কেঁপে উঠে নেতিয়ে পড়ে গেল।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে, টারজান তার বিকট জয়ধ্বনি করে উঠল। প্রায়-মানুষ জীবটা পিছু হটে গেল। কিন্তু টারজানের সুন্দর ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা দেখে তার ভয় দূর হলো। দু'জনে পরস্পরকে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগল। প্রায়-মানুষ জীবটি, টারজানের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। কিন্তু তার ভাষা টারজানের কাছে একেবারে নতুন। যদিও তার লেজ আছে, আর হাত ও পায়ের আঙুল মানুষের হাত পায়ের আঙুল থেকে একেবারে আলাদা, তবু তার বিচারশক্তি ও বুদ্ধি মানুষেরই মতো।

এবার তার নজর গেল সিংহের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত টারজানের রক্তাক্ত দেহের দিকে। সে একটা থলি বার করে, টারজানকে ইশারায় শুয়ে পড়তে বলল। কাটা জায়গাটা ফাঁক করে যেই না সে থলির ভিতরকার গুঁড়ো ওষুধ দিয়েছে অমনি টারজানের যন্ত্রণা সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য! একটু বাদেই রক্ত-ঝরা তো বন্ধ হলোই ব্যথাও গেল চলে।

এবার শুরু হলো দু'জনের কথা বলার চেষ্টা—কিন্তু কেউ কারো ভাষা বোঝে না। টারজান ভাষাবিদ—শিক্ষিত দেশের ভাষা ছাড়াও সে অসভ্য জাতিদের বহু ভাষা আয়ত্ত করেছিল,

কিন্তু কিছুই বুঝল না সে প্রায়-মানুষ জীবটির ভাষা। সে এগিয়ে এলো টারজানের দিকে। এবার সে তার বাঁ-হাত নিজের বুকের ওপর রেখে, ডান হাতের চেটো রাখল টারজানের বুকের ওপর। টারজান বুঝল এটাই বন্ধুত্ব জানাবার একমাত্র উপায়, তাই সেও তাই করল।

বেচারির দারুণ ক্ষিদে পেয়েছিল, গাছে টারজানের রাখা হরিণের কাঁচা মাংসের গন্ধ পেয়ে। ঐ দিকে দেখাতেই টারজান তাকে ইশারায় ঐ মাংসের সদ্ব্যবহার করতে বলল। বাঁদরের মতো এক লাফে গাছে উঠে নিঃশব্দে খেতে শুরু করল সে। টারজানও এই সুযোগে তাকে ভাল করে দেখতে লাগল। মানুষের মতোই কিন্তু লেজ আছে। হাতের বুড়ো আঙুল বড্ড লম্বা, পায়ের বুড়ো আঙুল বাইরের দিকে। এর কি কোনো অনাবিষ্কৃত জাতি থেকে জন্ম, না প্রকৃতির নিয়মের বিচ্যুতি? তার গায়ে চওড়া সোনার বেল্ট, তার ওপরে রয়েছে সূক্ষ্ম কাজ, মণি বসানো, ওসব তৈরি করা সম্ভব শুধু সভ্য জাতের মানুষের। তা হলে? টারজান কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারল না।

খাওয়া হলে সে তার আঙুল ও ঠোঁট গাছের পাতায় মুছল। এবার সে টারজানের দিকে চেয়ে বন্ধুত্বের হাসি হাসল। টারজান দেখল, তার দাঁতগুলো মানুষের দাঁতের মতোই, কোন তফাৎ নেই। এরপর দুজনেই গাছের ডালের মধ্যে শোবার জায়গা বেছে নিয়েই লাগাল ঘুম। কিন্তু ভোরের অন্ধকার ঘুচবার আগেই, তাদের গাছটাকে কে যেন সাংঘাতিক ভাবে নাড়াতে লাগল—ঘুমও গেল ছুটে। অবাক হয়ে টারজান দেখল অতিকায় এক জন্তু—পিঠ ঘষছে গাছে। এত বড় জন্তু টারজান কখনো দেখে নি। মাটি থেকে বিশ-ফুট ওপরে তার খাঁজ-কাটা পিঠ,—প্রত্যেকটা খাঁজে রয়েছে মোটা শক্ত একটা শিং। শুধু পিছনের দিকটাই টারজান দেখতে পেয়েছিল, শরীরের বাকি অংশ অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে আসছিল হাড় চিবনোর আওয়াজ। গন্ধে টারজান বুঝল সে-জন্তুটা মরা সিংহটার মাংস খাচ্ছে।

ভাল করে দেখতে যাবে, এমন সময় তার নতুন বন্ধু আলতোভাবে তার ঘাড় ছুঁয়ে ইশারায় সেখান থেকে পালাবার কথা জানাল। প্রায়-মানুষের দেশের জন্তু-জানোয়ার টারজান তো চেনে না—কাজেই সেই ইশারা অগ্রাহ্য করল না। খুব সাবধানে তারা জন্তুটার দৃষ্টি এড়িয়ে নেমে পড়ে চলল সমতলভূমি পার হয়ে।

টারজানের মনে কিন্তু রয়ে গেল অদম্য কৌতূহল—এর আগে সে কখনও এমন জন্তু দেখেনি। কিন্তু বিপদ যাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান সঙ্গী তাদের স্বেচ্ছায় অজানা বিপদের সম্মুখীন হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সুতরাং পালানোই ভাল। আবার গাছে উঠল তারা, প্রায়-মানুষ তার লেজের, হাতের ও পায়ের বুড়ো আঙুলের সাহায্যে যে গতিতে চলল, টারজানও চলল সেই রকম বেগেই।

যেতে যেতে টারজানের চোখ গেল নিজের ক্ষতের দিকে, আরে, একি অবাক কাণ্ড! ব্যথার কথা দূরে থাকুক একটু ফোলাও নেই। তার নতুন বন্ধুর সেই গুঁড়ো ওষুধ তো অদ্ভুত ভাবে কাজ দিয়েছে!

মাইল দুয়েক গাছ থেকে গাছে যাওয়ার পর প্রায়-মানুষ নামল যেখানে সেখানে গাছের ডাল ঝুঁকে পড়েছে টলটলে এক নদীর ওপর। এবার দু'জনে শুধু তাদের তেষ্টাই মেটাল না, তাদের যৎসামান্য পোশাক ছেড়ে নদীর পরিষ্কার জলে নেমে স্নান সেরে নিল। টারজানের খালি গা দেখে, প্রায়-মানুষ লক্ষ্য করল তার মতো এর লেজ নেই। অবাক দৃষ্টিতে সে টারজানের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ঘুরে টারজানকে নিজের লেজ দেখাল। টারজান তখন, তাদের দুজনের হাতের ও পায়ের বুড়ো আঙুলে তফাৎ তার নজরে আনল। এই প্রভেদ তার বোঝার বাইরে, কাজেই সে বিষয়ে অযথা চিন্তা করা ছেড়ে দিল।

স্নান তো হল, কিন্তু পেট যে খিদেয় জ্বলছে। টারজানের নতুন বন্ধুর তাতে ভাবনা নেই। গাছের তলায় বসে, টারজানকে ইঙ্গিতে সে পাশে বসাল। তার ডান দিকের থলি থেকে শুকনো মাংসের টুকরো আর দু মুঠো বাদাম বার করল। শুক্‌নো মাংস, বাদামের শাঁসটা বেশ ভালই খেতে—কাজেই খিদে মেটাতে দেরি হলো না।

এবার প্রায়-মানুষ টারজানকে, তার নিজের ভাষায় শুধু মাংস আর বাদামের নয়, আশপাশের জিনিসের নাম শেখাতে শুরু করল। এমনি করেই তো পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলা সম্ভব হবে, টারজানও তাই মন দিয়ে শিখতে শুরু করল। দু'জনের মধ্যে কারো খেয়াল হলো না যে গাছের ওপর থেকে এক জোড়া কুতকুতে চোখ তাদের লক্ষ্য করছে। নিমেষের মধ্যে প্রায়-মানুষের ঘাড়ের ওপর লোমশ এক শরীর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঠিক, সেই মুহূর্তেই টারজান লক্ষ্য করল, এই জীবটিও তার নতুন বন্ধুর মতোই, শুধু তার সর্বাঙ্গে এত ঘন কাল লোম যে তার চোখ দুটো প্রায় দেখাই যায় না। তার পোশাক

অস্ত্র-শস্ত্র সবই নতুন বন্ধুর মতো। সাদৃশ্য থাকলে কি হবে, সে যে বন্ধু নয় তার আচরণেই বোঝা গেল। টারজান কিছু করার আগেই, মোটা লাঠির এক ঘায়ে সে প্রায়-মানুষকে অজ্ঞান করে ফেলল। টারজান এবার রণক্ষেত্রে পা বাড়াল। সেই বিকট জীবটির সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হলো। তার শক্তি যে অমানুষিক তাও টের পেতে টারজানের সময় লাগল না। এ ওকে বেকায়দায় ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করল—দু'জনের শক্তি সমান, তায় আবার, লেজ দিয়ে সে টারজানের শ্বাস-রোধ করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু হলে কি হবে, টারজান আচমকা ওকে ধরাশায়ী করে বুকে চেপে বসল। —কিন্তু লেজটা তবু খালি টারজানের গলার কাছাকাছি ঘুরছে, আর লেজের সঙ্গে লড়তে টারজান তো জানে না। দু'জনে, গড়াতে গড়াতে এসে পড়েছে নদীর কিনারায়—টারজান সবে স্থির করেছে, ওকে টেনে নিয়ে নদীর মধ্যে পড়বে, এবং নিজে থাকবে ওপরে। কিন্তু তা হলো না, কারণ টারজানের পুরানো শত্রু, সেই বর্ণ-শঙ্কর সিংহটা এসে উপস্থিত হলো। টারজানের সংজ্ঞাহীন বন্ধুর দিকে তার হিংস্র দৃষ্টি নিবদ্ধ। লোমশ জীবটির চোখও পড়েছে ঐ সিংহের দিকে।

টারজান, তার অসহায় অজ্ঞান বন্ধুকে রক্ষা করবার জন্য ছেড়ে দিল ঐ জীবটিকে। আশ্চর্যের বিষয়, পালিয়ে না গিয়ে, সে তার সেই মোটা লাঠি নিয়ে, সিংহের দিকে এগিয়ে চলল। টারজানও তার সাহায্য নিতে পিছু-পা হলো না। দু'জনে মিলে, সিংহটাকে অনায়াসেই মেরে ফেলল। এর মধ্যে টারজানের পুরানো বন্ধুর জ্ঞান এসে গিয়েছে।

সিংহ তো মরল—এবার লোমশ জীবটি আর টারজান পরস্পরের দিকে চাইল। টারজান যুদ্ধ বা বন্ধুত্ব, দুটোর জন্যই প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করত লাগল। একটু বাদেই সে প্রথমে তার দু'হাত তুলে ধরে বাঁ হাত তার নিজের বুকের ওপর রাখল আর ডান হাত এগিয়ে দিয়ে টারজানের বুকের ওপর রাখল। আরে! প্রায়-মানুষ যে ভাবে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, এ-ও যে হুবহু তাই। টারজান খুশিই হলো, বিপদ-সঙ্কুল বিদেশ-বিভূঁয়ে যত বন্ধু লাভ করা যায়, ততই ভালো।

এতক্ষণে নতুন বন্ধু প্রায়-মানুষের দিকে তাকাবার সময় পেল। সে-ও সোজা হয়ে উঠে বসে, এক দৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এবার সে, ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে লোমশ জীবটি কি যেন বলল ওকে। প্রায়-মানুষ জবাবও দিল বোঝা গেল, এদের ভাষাও এক। ধীরে ধীরে পরস্পরের দিকে এগিয়ে গিয়ে, অল্প ব্যবধান রেখে কথাবার্তা শুরু করে দিল—দু'জনেই মাঝে মাঝে টারজানকে দেখছিল—বুঝতে অসুবিধা হলো না যে তার বিষয়ই কথাবার্তা বলছে। এগিয়ে এসে দু'জনে, বন্ধুত্ব স্থাপনের সেই নিয়ম পালন করল। তারা দু'জনে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারে, কিন্তু টারজান তো তাদের ভাষা জানে না—তাই তারা ইশারায় টারজানকে তাদের সঙ্গে যেতে বলল।

তারা যে পথে যাবে, টারজান সেই দিকে আগে যায় নি, কাজেই সে খুশি হয়েই রাজী হয়ে গেল। সব অজানা অঞ্চল না খুঁজে, কি করে জেনের অনুসন্ধান বন্ধ করে?

অনেক দিন তারা পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে চলেছিল। অনেক সময় এখানকার হিংস্র অধিবাসীরা তাদের ভয় দেখিয়েছে। অনেক সময় দূর থেকে বিরাট আকারের জীব-জন্তু নজরে পড়েছে।

তিন দিন এই ভাবে চলবার পর তারা পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গুহা দেখতে পেল—তলা দিয়ে বয়ে চলেছে একটা পাহাড়ী নদী। এখানে তারা কিছুদিন থেকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চলল টারজানের নতুন ভাষা শেখা। স্থির হয়ে বসে, বেশ তাড়াতাড়িই টারজান ভাষাটা শিখে ফেলতে লাগল।

গুহার ভিতরটা দেখে বোঝা যায় যে এখানে যুগ-যুগ ধরে নানা মানুষ বাস করেছে। দেয়ালের গায়ে রয়েছে পুরানো চুল্লি। তার ধোঁয়ায় গুহার ভিতরটা কালো হয়ে গিয়েছে, দেয়ালে অদ্ভুত, অদ্ভুত জন্তু-জানোয়ার ও নানান পাখির ছবি—এ গুলো যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষরা এঁকেছে তাতে সন্দেহ নেই। ছবি ছাড়া, দেয়ালে ছিল কি সব লেখা, খোদাই করা। টারজানের দুই বন্ধু সেগুলো পড়ে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, তার নিচে ঐ-রকম খোদাই করা অক্ষরেই কি যেন লিখল।

টারজানের কৌতূহল আর মেটে না—এদের দু'জনেরই লেজ আছে, একজনের সর্বাঙ্গ ঘন কালো লোমে ঢাকা, কিন্তু তা হলে কি হয়? এরা নিজেদের ভাষায় শুধু কথাবার্তা চালাতে না, লিখতেও পারে। টারজান এবার প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল, অন্তত এদের কথ্য-ভাষা সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ব করতে। এরই মধ্যে সে ঐ দু'জনের নাম শিখে ফেলেছে, আশপাশের জীব-জন্তু, গাছপালার নামও শিখতে পেরেছে।

লোমহীন, ফর্সা, প্রায়-মানুষটির নাম 'টা-ডেন', কালো লোমশ প্রায়-মানুষটির নাম 'ওম-অট'। এরা দু'জনে পালা করে টারজানকে তাদের ভাষা শেখাতে লাগল, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই টারজান তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে

শুরু করল।

এবার টারজান তাদের জানাল, কি কারণে সে এই অজানা জায়গায় এসেছে। কিন্তু কেউই তাকে আশা দিতে পারল না। টা-ডেন বলল, সে প্রায় সাত মাস তার জন্মভূমি আলুর ছাড়া, উপরন্তু এই রকম দুর্গম পথ অতিক্রম যদি-বা টারজানের স্ত্রী করেও থাকে - কিন্তু তার পরের বিপদগুলো?

আলুর কোথায় কার শহর—টা-ডেন ও ওম-অটের দুজনেরই না কি?

এই প্রশ্নের জবাব এলো টা-ডেনের কাছ থেকে। 'ওটা আমার শহর, ওম-অটের নয়, ওর জাত-ভাইরা শহরে থাকে না, হয় জঙ্গলে থাকে, নয় পাহাড়ের গুহায়—এই কালা আদমি, তাই না?'

ওম-অট বলল, 'আমরা স্বাধীন, নিজেদের শহরের মধ্যে আটক করে রাখি না। ধলা আদমি আমি হতেই চাই না।'

এখানেও সাদা-কালোর বিভেদ! হো-ডনরা ফর্সা, ওয়াজ-ডনরা কালো—তাছাড়া না বুদ্ধিতে, শক্তিতে, কোনো তফাৎ নেই, তা সত্ত্বেও, খুব সহজেই বোঝা গেল যে ফর্সা জীবটি, কালো জীবের থেকে নিজেকে উন্নত শ্রেণীর মনে করে!

টারজান আবার জিজ্ঞেস করল, 'আলুর কোথায়? তোমরা কি সেখানে ফিরে যাচ্ছ?'

টা-ডেন জানাল যে সে সেখানে যাবেই কিন্তু যতদিন আলুরে 'কোটান' রাজত্ব করছে ততদিন নয়। কোটানের মেয়ে 'ওলোয়া'কে সে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু কোটান চায় ওলোয়ার সঙ্গে আরেকজনের বিয়ে দিতে। তাই কোটান ফন্দি করে তাকে পাঠিয়েছিল দুর্ধর্ষ জা-কাট-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। কোটানকে নিরাশ করে টা-ডেন ফিরে এলো বন্দী জা-কাট ও নজরানা নিয়ে। ওলোয়াও এখন প্রকাশ্যে বলল যে, সে টা-ডেনকে তার জীবনসঙ্গী করতে চায়। এবার, আরেক চাল চালল কোটান। টা-ডেনের বিরুদ্ধে এখন আর যুদ্ধ করা যায় না। কিন্তু এই রকম সাহসিকতার স্বীকৃতি দেওয়া তো প্রয়োজন। এই মারাত্মক ফন্দির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আজ টা-ডেন গৃহহারা। আলুরে পুরোহিতদের স্থান সবার ওপরে। মন্দিরের ভিতরে রাজাকে পর্যন্ত তাদের সামনে মাথা নত করতে হয়। এখন ক্ষমতাসীন যে শ্রেণী, সেই শ্রেণীভুক্ত হবার সুযোগ টা-ডেনকে দিল কোটান। কিন্তু টা-ডেন কি করে এতে রাজী হয়? প্রধান পুরোহিত ছাড়া, পুরোহিতরা কেউ বিয়ে করতে পারে না। গোপনে ওলোয়া সব জানাল টা-ডেনকে আর সে-ও কোটানের হুকুম-নামা পাওয়ার আগেই পালাল সেখান থেকে।

নগরের দেয়াল টপকে পালাল টা-ডেন—মনে রয়ে গেল অদম্য ইচ্ছা—তার নিজের বাবা-মা, তার গ্রাম, ওলোয়া সবাইকে আবার দেখতে।

সব শুনে টারজানের মনে হলো যে টা-ডেন স্বেচ্ছায় সাংঘাতিক বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে। টা-ডেন কিন্তু যাবেই। টারজানও যেতে চায় আলুরে তার হারানো স্ত্রীর সন্ধানে। ওম-অটও যেতে চায় একই পথে। আলুরের পাহাড়ী গুহায় তার জাত-ভাইরা সবাই থাকে যদিও তাদের দলের নেতা 'এস-মাট' তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সেখান থেকে। তারও একজন বিশেষ মেয়ের প্রতি দুর্বলতা রয়েছে, তাছাড়া দলের নেতা হবার সাধ—কিন্তু সবার আগে তার 'পান-আট্-লি'কে দেখার ইচ্ছে।

টারজানের ইচ্ছা তিনজনে একসঙ্গে যাবে। তাদের এই তিনজনের দল প্রয়োজন হলে মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করবে শত্রুর সঙ্গে। রাস্তা কিন্তু বড়ই দুর্গম—সাধারণ মানুষের অগম্য। বন-জঙ্গল, লতা-ঝাড়, পিছল পাহাড়ী পথ। নিচে তাকালে মাথা ঘুরতে শুরু করে, কিন্তু ওম-অট্ নিয়ে চলল সেই পথেই যতক্ষণ না তারা মোটামুটি সমতল জায়গায় পৌঁছল। ওম অট্, এবারে পিছন ফিরে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল যে তারা দু'জনেই ওম অটের যোগ্য বন্ধু—কারণ এই রাস্তা ওম-অটের জাত-ভাইদের পক্ষেও দুরূহ। টা-ডেনও জানাল যে এই পথে নিচে যেতে ইচ্ছুক নয়। ওম-অট্ এই পথ বেছে নিয়েছিল তাদের যাত্রা-পথের সময় কমাতে। তারা ঐ খাড়া পাহাড়ের পথ ধরে চলল, যতক্ষণ না, খড়ির মতো সাদা পাহাড়ে ঘেরা সবুজ সমতলভূমি তাদের চোখে পড়ল। ঠিক তার মাঝখানে শ্বেত পাথরের মতো সাদা শহর আলুর, যার বাড়ির গঠন-প্রণালী শিল্প-চাতুর্যের নিদর্শনে ভরা। শহরের বাইরে এখানে ওখানে একই ধরনের বাড়ি দেখা গেল। এই সৌন্দর্যে মুগ্ধ টারজানের মুখ দিয়ে ঐ প্রায়-মানুষদের ভাষায় খালি একটি শব্দই বেরোল, 'এখানে ভগবানের বাস।'

এবার শুরু হলো দুই বন্ধুর মধ্যে তর্ক ও রাগারাগি। টা-ডেনের মতে আলুর-রাজ কোটান এখানকার সার্বভৌম রাজা। কিন্তু ওম-অটের অন্য মত, কারণ তার জাত-ভাই 'ওয়াজ-ডন'রা কোটানকে সার্বভৌম রাজা বলে স্বীকার করে না। টা-ডেন নানান যুক্তি দেখিয়ে যতই প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে তারা ওম-অটের গোষ্ঠীর থেকে হাজার গুণে উন্নত, ওম-অটও নিমেষে সেই যুক্তি খণ্ডন করে, কারণ কে

না জানে ওয়াজ-ডনরাই শ্রেষ্ঠ।

টারজান তাড়াতাড়ি এই তর্ক থামাতে গেল। বন্ধুত্ব বজায় না রাখতে পারলে তো তাদের কারো চলবে না। তাই সে শুরু করল ধর্ম নিয়ে আলোচনা। কিন্তু ধর্ম-সম্বন্ধেও বিরোধ দেখা দিল। ঝগড়ার পর্যায়ে পৌঁছবার অনেক আগেই টারজান তাদের অনুরোধ করল বন্ধুত্বের খাতিরে এ-সব তর্ক থাক। রাজী হলো দু'জনেই—নিজেদের মনের মধ্যে যাই থাক না কেন।

ওম অট জিজ্ঞেস করল, সমতল ভূমির দিকে এবার তারা যাবে কিনা? গেলে পর, সে নিজে পান-আট-লিকে দেখতে পাবে। টা-ডেনও তার মা-বাবার কাছে যেতে পারবে।

রাজী হলো তারা। টা-ডেনের ইচ্ছা যতদূর সম্ভব তারা একসঙ্গে থাক। ওম-অট রাতে লুকিয়ে চুরিয়ে পান-আট-লির সঙ্গে দেখা করবে, টা-ডেন নিজে যে কোনো সময় তার বাবা জা-ডনের কাছে যেতে পারবে। কিন্তু টারজানের পক্ষে আলুরে প্রবেশ করা খুবই বিপজ্জনক। তবে টারজানের সাহসের অভাব নেই কাজেই সে যেতে পারবে। পাছে কেউ শুনতে পায় তাই তাদের দুজনকে খুব কাছে ডেকে টা-ডেন কানে কানে কি উপায়ে আলুরে ঢোকা যেতে পারে তা বলে দিল।

কোর-উল-জা পাহাড়ের সাদা গা থেকে মনে হয় যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে। এইখানেই থাকে এস্-মাট, কোর-উল-জা গোষ্ঠীর একচ্ছত্র নেতা। এধার ওধার ভাল করে পরীক্ষা করে এস—মাটের লোমশ শরীর পাহাড়ের এক ফাঁক থেকে বের হলো।

ডান-বাঁ, ওপর-নিচ ভাল করে দেখে এস-মাট নিশ্চিন্ত হলো সে ছাড়া কেউ বের হয় নি! খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে, ওপর-নীচের গুহাগুলো এড়িয়ে সে অনায়াসেই এগিয়ে চলল পাহাড়ের দেওয়ালে পোঁতা মোটা মোটা খুঁটির সাহায্যে। তাদের জাতের হাত-পা-লেজ এরই জন্যই তৈরি।

বাইরে থেকে একই ধরনের দেখতে এই গুহাগুলো। সামনে বারান্দা মতো জায়গা, তারপরে ভিতরের ঘরে ঢুকবার পথ। দু'ধারের জানলা দিয়ে ভিতরে আলো ও হাওয়া ঢোকে। পাহাড়ের গা এই রকম দরজা-জানলায় ভরা, প্রত্যেকটাতেই এই গোষ্ঠীর কেউ না কেউ থাকে।

এস্-মাট একটা দরজার ভিতরে ঢুকল পুরু পর্দা সরিয়ে। দূরে একটু আলো দেখা যাচ্ছিল—সেইদিকে চলল সে, বাঁ হাতে একটা গদা। সেখানে পৌঁছে দেখে ঘরের কোণায় নরম চামড়া দিয়ে ঢাকা পাথরের তৈরি একটা খাট। তার এক ধারে এক ওয়াজ-ডন যুবতী ব্যস্ত রয়েছে নিজ প্রসাধনে। সোনার চিরুনি ও শক্ত বুরুশের সাহায্যে নিজের গা আঁচড়াচ্ছে। যদিও তার রং গাঢ় কালো, শরীরটা ঘন-লোমে ঢাকা,-তবুও সে যে সত্যি সুন্দরী তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি মুখ তুলে এস্-মাটকে দেখল। চট করে পরে নিল তার চামড়ার পোশাক। দম্ভ করে এস-মাট তাকে জানাল যে তার গোষ্ঠী-কর্তা তাকে নিতে এসেছে। মেয়েটি বুঝতে পারল যে এস-মাট তাকে চুরি করে নিয়ে যাবার অভিপ্রায়ে তার বাবা-দাদাদের কোর-উল-উলে ছল করে পাঠিয়েছে। তীব্র প্রতিবাদ করে সে এস-মাটকে তাদের গুহা থেকে চলে যেতে বলল, কিন্তু এস-মাট পান-আট-লির কথা শুনতে নারাজ। নানান ভাবে, তাকে প্রলোভন দেখাতে শুরু করল।

কিন্তু পান-আট-লি যখন কিছুতেই রাজী হলো না, তখন এস-মাট তাকে বন্দী করতে গেল। অমনি হলো প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। পান-আট-লির শক্তি ও সাহস কম না—সে প্রথমে হাতের কাছে যা পেল, তাই দিয়ে এমনি জোরে এস-মাটকে আঘাত করল যে সে জ্ঞান হারাল। এই সুযোগে পান-আট-লি এস-মাটেরই তীক্ষ্ণ ছোরা খুলে নিয়ে, কাপড়-চোপড় পরে সেখান থেকে পালাল। সঙ্গে নিল, আরো পাঁচটি শক্ত মোটা খুঁটি। সে-ও দেখে নিল, বাইরে কেউ বেরিয়েছে কিনা। কেউ নেই দেখে, এই খুঁটিগুলোর সাহায্যে খাদের সীমানার দিকে তরতরিয়ে চলল। লেজ-হাত-পায়ের বাঁদুরে বুড়ো আঙুল যে তার দ্রুত গতির সহায়ক ছিল—তা বলা বাহুল্য।

এবারে সে চুড়োয় পৌঁছল। ঘোর বিপদের সময় এটাই তাদের পালাবার পথ। আজ তার দুর্দিন, কাজেই তাকেও এই দুর্গম পথের শরণ নিতে হলো।

অন্ধকার ভেদ করে সে কোর-উল-উলের দিকে চলেছে—এই দিকে যে তার বাবা আর দাদাদের থাকার কথা। যদি তাদের দেখা না মেলে, তা হলে পান্-আট-লির পরিত্যক্ত সেই কোর-উল-গ্রিফে গিয়ে লুকোতে হবে। সেখানে গ্রিফরা থাকে, তাদের নাম থেকে এই খাদের নাম হয়েছে। তাকে এড়াতে পারলে তবে বাঁচা।

পান-আট-লি কোর-উল-উলের সীমানা দিয়ে অতি সাবধানে এগিয়ে চলল। মনের জোর প্রায় শেষ, নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ হচ্ছে তার— নানান আওয়াজ, নানা জন্তু-জানোয়ারের ডাক। সে তো ভয়ে কাঠ।

হঠাৎ কানে এলো নতুন শব্দ, কি যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। এমন সময় অন্ধকার রাতে জ্বল-জ্বল করে উঠল সবুজে-হলুদ দুই আলোর স্ফুলিঙ্গ। পান-আট-লি আর পারল না, চিৎকার করে প্রাণপণে ছুটল।

তার পিছনে ধাওয়া করেছিল, পাল-উল-ডন— পাহাড়ের হিংস্র সিংহ। মৃত্যু অনিবার্য ভেবে সে হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিল আর তাকে দেখা গেল না। সিংহটা অবাক হয়ে, রেগে গর গর করতে লাগল।

ঐ অন্ধকারে কোর-উল-জার নিচে ওম-আট, টারজান ও টা-ডেনকে নিয়ে নিজেদের গুহায় চলেছে। তার উদ্দেশ্য প্রথমে পান-এট-লির খোঁজ নেওয়া, তারপর আত্মীয়-স্বজনের। ততক্ষণ টারজান ও টা-ডেন নিচে অপেক্ষা করবে। টারজান প্রথমে বুঝতেই পারছিল না ওম-আট কি করে ঐ খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে তরতরিয়ে উঠছে। টা-ডেন ওপরে ওঠার কায়দা বুঝিয়ে দিল। টারজানও যে সহজেই ঐ ভাবে ওপরে উঠতে পারবে, তাও বলল। এমন সময় ওম-আট পড়ল ধরা! নিমেষের মধ্যে তার পিছু নিল, তারই মতো একজন। টারজানরাও ছুটে চলল তার সাহায্যে ঐ খাড়া পাহাড় বেয়ে, টা-ডেন আগে টারজান পিছনে। জীবটি নিচের দিকে হঠাৎ তাকিয়েছে আর এদের দু'জনকে দেখে তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠাতে কাতারে কাতারে ওয়াজ-ডনরা যে যার গুহা থেকে বেরিয়ে এল। প্রথম ওয়াজ-ডন টা-ডেনের সামনে দাঁড়াল, বাকিরা চলল পিছন থেকে। অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল তাকে টারজান—গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে, শত্রুকে ধরাশায়ী করল, তাকে মৃত্যু বরণ করে নিতে হলো।

কিন্তু বাকিরা? তারা তেড়ে ওপরে আসতে শুরু করল। টারজান মৃতদেহ তুলে নিয়ে ওপর থেকে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারল। অব্যর্থ টারজানের লক্ষ্য—প্রথম ওয়াজ-ডনের হাত-পা খুঁটি থেকে ফস্‌কে গেল, দুটো খুঁটি গোড়া থেকে ভেঙে গেল—সে ওপর থেকে খাদের নিচে পড়ল। চীৎকার উঠল নিচের দর্শকদের কাছ থেকে—'মেরে ফেল, মেরে ফেল ঐ সাংঘাতিক লোকটাকে।'

টা-ডেন বলল, 'ওরা তোমায় মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু ভুলতে পারবে না!'

এমন সময়, একটা গুহা থেকে ওম্-আট্ ও তারই এক জাত-ভাই বেরিয়ে এলো মারপিট করতে করতে। নিঃশব্দে চলল তাদের যুদ্ধ। টারজান ঘুরে ওম-আটকে সাহায্য করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওম-আটেরই ধমকে বিরত হলো। টা-ডেন বুঝিয়ে দিল টারজানকে যে এই যুদ্ধ, দলের নেতা হওয়ার যুদ্ধ, যে জিতবে সেই হবে নেতা।

এস্-মাটের এক যোদ্ধা সবে এগিয়ে আসছিল, তাকে জানাল যে এই যুদ্ধ হলো নেতা হওয়ার যুদ্ধ। সেও নিরস্ত হয়ে তার দলের সবাইকে ঠেকাল। এবার সে টারজান ও টা-ডেনকে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করল, তারা কারা? এরাও জানাল যে তারা ওম-আটের বন্ধু।

যুদ্ধ চলেছে দুই সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে, কিন্তু এস্-মাটের বয়স অনেক বেশি, সে ক্রমশঃই শ্রান্ত হয়ে পড়ছিল। এস্-মাট বুঝতে পারছিল—মৃত্যু এগিয়ে আসছে তার দিকে, সে খাদের নিচে পড়ে যাবেই। ভুলে গেল সে এই বিশেষ যুদ্ধের নিয়ম-কানুন। সে যে সত্যিকারের বীর নয়, তা টের পাওয়া গেল সে যখন ওম-আটের ছোরাটা তার লেজের সাহায্যে টেনে নিয়ে ওম-আটকে মারতে গেল। কিন্তু টারজান ধরে ফেলল তার লেজ আর ওম-আট তাকে সজোরে সরিয়ে দিল। তখন চিৎকার করতে করতে সে মৃত্যুর কবলে পড়ল। দলের অনেকেই তার বিশ্বাসঘাতকতা দেখে তার স্বরূপ বুঝে নিয়েছিল।

টারজান আর ওম-আট পান-আট্-লির বারান্দায় টা-ডেনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল—যাই ঘটুক না কেন তারা প্রস্তুত। সূর্যের আলো তখন পুব দিকের

পাহাড়ে পড়েছে। কাঁটা ঝাড়ে ভরা সুদূর তৃণভূমি—সেখানে ঘুমিয়ে ছিল এক তরুণ। সূর্যের আলো তার মুখে পড়াতে জেগে উঠল সে—আবার শুরু হল তার অক্লান্ত খোঁজা, যদিও রাস্তা প্রায় নিশ্চিহ্ন।

সাময়িক নিস্তব্ধতা ভেঙে ওম-আট কোর-উল-জার গোষ্ঠীর উদ্দেশে বলল, এস্-সাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে-ই এখন ওদের নেতার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও কেউ কেউ এতে চাঞ্চল্য প্রকাশ করল, আপত্তি করল না কেউ। এবার সে তাদের পান-এট্-লির কোথায় জিজ্ঞেস করাতে, এক বৃদ্ধ তাকে বলল যে পান-এট-লির বাবা ও দাদারা গিয়েছে কোর-উল-উলে। আর তার তো নিজের গুহায় থাকার কথা। কিন্তু ওম-আট কি করে ঐ সাংঘাতিক মানুষটার আর একজন হো-ডনের সাহায্য নিয়ে এ-ভাবে তাদের সামনা-সামনি হয়েছে! প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী কোন বিদেশী বা অন্য জাতের জীব এখানে থাকতে পারে না, এ কথা তো সবাই জানে। ওম-আট বীরোচিত জবাব দিল এ কথার—'প্রকৃতি যেখানে পরিবর্তনশীল, আমরাও যখন দিনে দিনে পালটাই, তখন আগের নিয়মাবলীও পালটাবে। আমাদের ঈশ্বর, আমাদের জাড্-বেন-ওথোর এই বিধান। আমি বলছি এখন থেকে যে বিদেশীরা বীর, যারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু, তাদের কোর-উল-জারের ওয়াজডনেরা হত্যা করবে না। কারো যদি আপত্তি থাকে সে বলুক, তার আয়ু কিন্তু সীমিত।'

টারজান বুঝল যে সত্যিই তার মতো ওম-আটেরো যেমন কথা, তেমনি, কাজ। কেউ আপত্তি করল না। ওম-আট সমস্ত দলের, বিশেষত মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, তারা পান-আট-লির সন্ধানে বের হবার আগে গোষ্ঠীর রক্ষণাবেক্ষণের তার এব-নকে দিল যতদিন না সে ফিরে আসে। সে যে একা গেল না তা বলা বাহুল্য। তারা হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীর সন্ধানে যাবে, পান-আট-লিকে খুঁজে পাবার পর। কিন্তু যাবে কোন দিকে? তার নির্দেশ কোথায়? পান-আট-লি তার পৈতৃক গুহায় নেই—তা হলে? টারজান এবার তার বিশেষ গুণের পরিচয় দেবার জন্য, পান্-আট্-লির ব্যবহার করা কোন জিনিসের সন্ধানে গুহায় ঢুকল। তার অদ্ভুত ঘ্রা শক্তি পান্-আট-লি কোন পথে গেছে তা খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। এর মধ্যে দুজন অল্প বয়সী যোদ্ধা—ইন-সাড ও ও-ডান এগিয়ে এসে তাদের দলভুক্ত হয়েছে। টারজানকে ওম-আট, পান-আট-লি যেখানে শুত, সেখানে নিয়ে গেল।

চারদিকে শুঁকে শুঁকে টারজান পান্-আট-লির পায়ের গন্ধ চিনে নিল। এবার পাঁচজনে পাহাড়ের চুড়োর দিকে ওদের সেই খুঁটি-রাস্তা ধরে চলল। খুঁটিগুলোর শেষ হয়ে যাওয়াতে তারা নিজেদের খুঁটির সাহায্য নিল। টারজানও চলল পিছনে পিছনে। শত্রুরা যাতে তাদের পিছু নিতে না পারে তার ব্যবস্থাও রয়েছে—পাহাড়ের গায়ে যে সব নকল গর্ত ওরা খুঁড়ে রেখেছে, সেগুলো শুধু তারাই জানে। শত্রুদের খুঁটি তাতে ঢুকবে না কিন্তু নিজেরা তো পথ চেনে, কাজেই তাদের কোনো অসুবিধা নেই।

ওপরে উঠে টারজান কর-উল-উলের দিকে চলতে চলতে ওম-আটকে বলল যে পান-এট-লি ঊর্ধ্বশ্বাসে ওখান থেকে পালিয়েছে, কিন্তু সিংহের কবলে সে পড়েনি। প্রমাণ স্বরূপ সে আঙ্গুল দিয়ে একটা ঝোপের দিকে দেখাল—ঝোপের ভিতর কে বা কি যেন নড়ছে। টারজান গন্ধ শুঁকে বুঝেছে যে ঝোপের মধ্যে রয়েছে তার আজন্ম শত্রু এক সিংহ। ক্ষুধার্ত পশুরাজ এক শিকারকে হারিয়েছে, সে এদের ছাড়বে কেন? বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে। এক লাফে সে টারজানের ঘাড়ের কাছে পৌঁছলে কি হয়, টারজান তার ধারালো তলোয়ার নিয়ে তৈরি। আসলে টারজান তার লক্ষ্য নয়। সে চায় ওম-আটকে, কিন্তু ওম-আট মুগুরের এক ঘায়ে তাকে ধরাশায়ী করে দিল।

সিংহটার অসম্ভব শক্তি। উঠে পড়ে ভীষণভাবে তেড়ে এল। টারজান তার ঘাড়ে চেপে, পা দিয়ে তার গলা জাপটে ধরে, দিল তার দাঁত বসিয়ে সিংহের ঘাড়ে। আর হাত দিয়ে চালাল তার সেই ধারাল ছোরা। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করল। সিংহটা ও টারজান মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগল, কেউ কম নয়।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিংহটা আঁচড়াতে কামড়াতে লাগল, তবু মৃত্যুকে সে ঠেকাতে পারল না। টারজানও উঠে, খাড়া হয়ে দাঁড়াল। পল-উল-ডনের লোকেরা এরকম সাহস, এরকম বীরত্ব কখনো দেখেনি। ও-ডান ও ইন-সাডের সঙ্গে তারা স্বীকার করল এ রকম বীরকে হত্যা করা অন্যায় হত। তারা ওম-আটকে ধন্যবাদ জানাল এই বীরকে রক্ষা করার জন্য। ও-ডান এগিয়ে এসে, তাদের নিয়মে টারজানকে বন্ধুত্বে বরণ করল। টারজান তাদের জানাল যে ওম-আটের বন্ধুরা তারো বন্ধু।

ওম-আটের ভয় সিংহ হয়তো পান-আট-লিকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু টারজান সে ভাবনা দূর করে দিল এক কথায়। সিংহটা তাহলে এরকম ক্ষুধার্ত থাকত না। তাহলে পান-আট-লি কোথায়? টারজানই আবার পথ-প্রদর্শক হিসেবে

এগিয়ে গেল।

এবার চুড়ো ছেড়ে, বাঁয়ে মোড় নিল। পাহাড়ের চুড়ো এবার কর উল উলের কাছে এসে গেছে। টারজান খাদের দিকে দেখাল।

খাদের গভীরতা দেখে ওম-আট শিউরে উঠল - পান-আট-লি সিংহের কবল থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে ওখানে—তা হলে টারজান ঠিক সেই মুহূর্তে দূর থেকে আওয়াজ শুনতে পেল, কারা যেন ছুটে সেদিকে আসছে। শুয়ে পড়ল টারজানরা। ও-ডান বলল, পান আট-লির বাবা আন-উল আর তার দুই ছেলে এদিকে পালিয়ে আসছে, আর তাদের তাড়া করেছে জনা চল্লিশ-পঞ্চাশ যুবক। ওদের উপস্থিতি না জানালে, আন-উলরা তো চলে যাবে, এই ভেবে ওম-আট চীৎকার করে আন-উলকে জানাল যে তারা পাঁচ মিত্র সেখানে রয়েছে। টারজানও টা-ডেনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে, দৌড়তে দৌড়তে বলতে লাগল যে কর-উল উলদের কথা এম-আট কে জানাতে হবে। তখন ইন-সাড তাদের এস-সাটের মৃত্যুর কথা আর ওম-আটই যে এখন দলের নেতা এ কথা জানাল। ওম-আট ও তার নিজ গোষ্ঠীর লোকদের, কর-উল-উলরা যে এদিকে আসছে, এই খবর দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ততক্ষণে শত্রুদের দেখা যাচ্ছিল। টারজান চায় তাদের তাড়া করতে, কারণ সে জানে যে শত্রুপক্ষেরা জানে না তারা কেবল আটজন! এই সুযোগে ওম-আট পাঠিয়ে দিল ইড-আনকে কর উল-যাতে। ইড-আনের গতি খুবই দ্রুত, সে তাড়াতাড়ি আপন গোষ্ঠীকে জানাতে পারবে এই বিপদের কথা আর এব-অনকে বলবে, তখুনি একটা যোদ্ধা পাঠাতে।

ইড-আন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই, এরা প্রতিপক্ষের ওপর এমনই বেপরোয়া ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে তারা থেমে গেল। কোর-উল-উল দলের নেতারা, এদের ক'জনকে দেখে মনে করেছিল এরা দলের নেতা। এদের চেলারা তখনো এসে পৌঁছয়নি। ততক্ষণে বাকী কোর-উল-উল যোদ্ধা হাজির হয়েছে। এরা ভয়ের চোটে হটতে সুরু করেছে। তাই না দেখে তারাও পালাতে সুরু করল। ওম-আটরা উৎসাহিত হয়ে ধাওয়া করল। কিন্তু ঝোপঝাড় এত ঘন যে কেউ কাউকে ঠিক মত দেখতে পারছিল না। একটু ব্যবধান এসে গেল তাদের মধ্যে। চিরাচরিত মত টারজান সবাইকে ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গেল। তাতেই তার কাল হল। কোর-উল উলের যোদ্ধারা, কোর-উল জাদের মতই বীর ও বিচক্ষণ। যেই তারা বুঝতে পেরেছে যে টারজানদের দলটি নেহাৎই ছোট, তারা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে। টারজানকে ধরার ফাঁদ ব্যর্থ হল না। কোর-উল উলের এক যোদ্ধা একটু পিছিয়ে পড়েছিল - তাকেই টারজান তাড়া করে যেই ধরতে গেছে, সেও মুগুর ও ছোরা নিয়ে টারজানের সামনাসামনি হয়েছে আর তার জনা কুড়ি সঙ্গী আশেপাশের ঝোপঝাড় থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এতক্ষণে টারজান বুঝল যে সে কি সাংঘাতিক বোকামো করেছে—যদি তার স্ত্রী বেঁচেও থাকে সে জানতেও পারবে না তার স্বামী মরেছে, তার আর উদ্ধারের আশা নেই।

রাগে দুঃখে সে সাংঘাতিক ভাবে একাই লড়ে চলল। বিপক্ষে জনা কুড়ি, কিন্তু তাতে কি? শত্রুদের পিটিয়ে, যেমন করে পারে ঘায়েল করতে লাগল সে। এমন সময় এক ওয়াজ-ডনের মুগুর দূর থেকে তার মাথার পিছনে সজোরে পড়াতে, সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। বাকি কোর-ডল উল যোদ্ধারা এবার ওম-আটদের দিকে নজর দিল, তারাও পিছু হটতে বাধ্য হল। টারজানকে দেখতে না পেয়ে, ওম-আট, 'টারজান জাড-গুরু, টারজান জাড-গুরু' বলে ডাকতে লাগল।

টারজানের মুগুরের ঘায়ে ধরাশায়ী এক কোর-উল-উল সৈন্য উঠে দাঁড়াল, এবার সেও বলল, 'জাড-গুরু তো নিশ্চয়ই, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর এই শত্রু।'

টারজান যখন ওয়াজ-ডনদের সঙ্গে লড়ছে, বহু দূরে সশস্ত্র একজন মানুষ বন্দুক, কার্তুজ, লম্বা ছুরি, তীরধনুক নিয়ে সেই জলাভূমির ধারে এসে পৌঁছেছে। বিপদ-সংকুল দেশ ভেদ করে সে এদিকে এসেছে—কিন্তু একটিও গুলি সে ব্যবহার করেনি। প্রয়োজন যখন হয়েছে, সে তীর-ধনুক চালিয়েছে—যেখানে একটা গুলিতেই সে ঐ বীভৎস জানোয়ারগুলোকে ঘায়েল করতে পারত। কিন্তু কেন?—সারা দুনিয়াতে কেবলমাত্র সেই জানে কেন।

পান-আট-লি যখন সিংহের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে পাহাড়ের চুড়োর নিচের খাদের পথ বেছে নিল, সে জানত নিশ্চিৎ মৃত্যু বরণ করেছে—কিন্তু ভাগ্যক্রমে এখন পাহাড়ের পাদ-দেশে যে নদী বইছিল, সে তার একটা গভীর জায়গায় পড়ল—নদীর জল সেখানে শান্ত। তলা থেকে, সাঁতরে সে ওপরে উঠে এল। ক্লান্তিতে তার শরীর অবসন্ন তবু সে সাঁতরে উল্টো পাড়ে পৌঁছল। ভোর হওয়া পর্যন্ত সেখানেই শুয়ে রইল।

যতক্ষণ অন্ধকার ততক্ষণ নিরাপদ। কিন্তু এ তো শত্রুর দেশ, তাকে লুকিয়ে থাকতেই হবে। সে বেছে নিল কাছেই একটা গাছপালা, ঝোপ ঝাড়-ঢাকা জায়গা। সেখানে সে থাকতেও পারবে, খাবারও জোগাড় করতে পারবে এস্-সাটের সেই ছুরির সাহায্যে। বেচারি যদি জানতো যে এস্-সাট জীবিত নেই, তাহলে কর-উল-জাতেই ফিরতে পারত, তার বাবা-দাদাদের জন্য অপেক্ষা না করেই। সে তো এসব কিছুই জানে না, কাজেই এখনি ফেরা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। তাকে আশ্রয়ের খোঁজে এখান থেকে চলে যেতে হবেই। এটা শত্রুদের জায়গা, আবার এমন জায়গায় গেলেও চলবে না, যেখানে সেই মাংস-খেকো বীভৎস জানোয়ারগুলো বিচরণ করে বেড়ায়। এই সব সমস্যার কথা ভাবছে, এমন সময় শুনতে পেল কোর-উল-দের রণধ্বনি, তারই দিকে শত্রুরা এগিয়ে আসছে। ঝোপের আড়াল থেকে সে দেখতে পেল তিন জন প্রাণপণে দৌড়ে পালাচ্ছে ঐ জংলি-রাস্তা ধরে, তাদের ধাওয়া করেছে জনা চল্লিশ-পঞ্চাশ কোর-উল-উল যোদ্ধা। আবার তার সেই তিন জন ওয়াজ-ডনের ওপর নজর গেল— তারা পাহাড়ের গা বেয়ে একেবারে চুড়োয় গিয়ে উঠল। হঠাৎ মনে হল এরা তারই প্রিয়জনেরা। এক মুহূর্ত আগেও যদি টের পেত তা হলে তাদেরই সঙ্গ নিতে পারত। এখন দূর থেকে ভয়ে ভয়ে সে দেখতে লাগল তাদের ওপরের দিকে ওঠা– পিছনে এখনও তাড়া করে আসছে কোর-উল-উল যোদ্ধারা। একজন মুগুর ছুঁড়ল তাদের দিকে, কিন্তু মুগুর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গড়িয়ে গিয়ে সেই যোদ্ধার ওপরেই পড়ল, সে-ও ধাক্কা সামলাতে না পেরে, সেই গভীর খাদে পড়ে গেল।

পান-আট-লি এবার দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল কিভাবে তার বাবা ও ভাইরা তাদের ল্যাজের ওপর নির্ভর করে এ ওকে সাহায্য করছে। দেখতে দেখতে তারা চুড়োয় পৌঁছে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, কোর-উল-উলরা তাদের ধরতে পারার আগেই। কোর-উল-উলরা কিন্তু তাদের পিছন পিছন তখনও ধাওয়া করছে, তারাও চোখের আড়াল হয়ে গেল।

পান্-আট-লির আর সময় নেই হাতে—ওখানে থাকলে সমূহ বিপদ। সামনেই কোর-উল-গ্রিফদের এলাকা, পিছনে কোর-উল-উল। নিচের উপত্যকা হো-ডনদের। চতুর্দিকে তার শত্রু। সে এখন যাবে কোথায়? অল্প সময়ের মধ্যে সে স্থির করল এমন কোথাও যাবে যেখানে কোন পুরুষ নেই। তাদের হাতে পড়লে, সে নিস্তার পাবে না এ কথা সে ভাল ভাবেই জানে, কাজেই সে কোর-উল-গ্রিফদের এলাকাই বেছে নিল।

শুয়ে পড়ে পাহাড়ের গা পরীক্ষা করতে গিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত গুহাগুলোকে আর সেখানে যাবার জন্য পাথুরে খুঁটি দেখতে পেল। কত যুগ আগে এখানে তাদের জাত-ভাইরা থাকত। জলাভূমি পেরিয়ে, নর-খাদক, বীভৎস গ্রীফরা যখন এখানে আসতে সুরু করল, এখানকার অধি-বাসীরা তাদের ঘরদোর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হল। এখন সেই পরিত্যক্ত গুহাগুলিই তাকে আশ্রয় দেবে— কেউ এখানে আসতে পারবে না। পান-আট্-লি খুঁটিগুলোর সাহায্যে নেমে গেল, সব চেয়ে ওপরের সারির বস্তিতে। দেখল গুহাবাড়িগুলো ঠিক তাদের গুহা বাড়ির মতোই। নিশ্চিন্ত মনে নেমে, একটা গুহা পরিষ্কার করে বাসোপযোগী করে নিতে তার বিশেষ সময় লাগল না। তার চোখ তখন রয়েছে ঐ বিভীষিকাময় খাদের দিকে, যেখানে সেই ভয়ঙ্কর জন্তুরা থাকে। সেই সময় একজোড়া চোখের লোলুপ দৃষ্টি তার দিকেই নিবদ্ধ। পান-আট-লি তা জানতেই পারল না। এ শুধু লোভী চোখ নয়, লোভের সঙ্গে চোখ জোড়াতে রয়েছে নিষ্ঠুরতা, রয়েছে ধূর্তামি। যার এই চোখ, সে তার ঠোঁট চাটছে আর তার মাথায় ঘুরছে জঘন্য এক মতলব।

পান-আট-লির এখন খালি একটি সমস্যা—খাবার জোগাড় করা। জল ওপরেই মিলবে, কিন্তু খাবারের জন্য তো নিচে, দুদিনে অন্তত একবার, তাকে নামতেই হবে পাহাড়ের তলায়। নইলে সে স্বচ্ছন্দে এখানে নিরাপদে থাকতে পারবে, কেউ এখানে আসতে পারবে না। প্রত্যেকটা গুহার বাইরের দেয়ালে, ভিতরের দেয়ালে, আঁচড়-কেটে ছবি আঁকা। এ সবই তার চেনা—এধরনের ছবি, তার দেশের গুহাতেও দেখা যায়—এই পরিচিত ঘরোয়া পরিবেশে সে অনায়াসেই থাকতে পারবে। পান-আট-লি মাটিতে, ধুলোর বিছানায় শুয়ে পড়ল। দু-রাত সে ঘুমোয়নি, তাই তার ঘুমিয়ে পড়তে সময় লাগল না। এই সুযোগে খাদ থেকে এল বিশ্রী এক আওয়াজ, গাছগুলো যেন একটু নড়ে উঠল—আধা-ভালুকের আর আধা-মানুষের মত বীভৎস এক জীব, পান-আট লির গুহার দিকে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল।

টারজানের জ্ঞান ফিরেছে, মাথার যন্ত্রণা ছাড়া তার আর কিছু মনে হচ্ছে না, সবই ঝাপসা ঠেকছে। ক্রমশঃ সম্পূর্ণ জ্ঞান হলে সে দেখল, ওয়াজ-ডন যোদ্ধারা তাকে এক গুহায় এনেছে। তাদেরই একজন অবাক্ হয়ে তাদের নেতাকে টারজানের যে

ল্যাজ নেই হাত-পা যে সম্পূর্ণ অন্যরকম সে বিষয় বলছে—আর বলছে টারজানের অসীম শক্তির কথা। তাকে মেরে ফেলবার আগে, তাদের নেতাকে একবার দেখাবার জন্য টারজানকে তারা এখানে এনেছে। টারজানকে ভাল করে পরীক্ষা করার পর, তাদের গুন্‌ড্‌ (নেতা) অবাক হয়ে বল্লেন, 'এতো হো-ডনও নয়, ওয়াজ-ডনও নয়, তা হলে এ কি?'

উত্তর এল, 'কোর-উল-জারা একে টারজান—জাড গুরু বলে ডাকছিল।'

দলপতি তাদের নিষেধ করলেন যেন তারা টারজানকে তখুনি হত্যা না করে, কারণ তাকে তার অনেক প্রশ্ন করার আছে। ইন-টানকে পাহারায় রেখে তারা সবাই চলে গেল। দলপতি ইন্‌-টানকে বলে গেলেন এর জ্ঞান হলেই, সে যেন তাদের ডাকে। তারা টেরই পায়নি যে টারজান সম্পূর্ণ সচেতন, চুপ করে সে তাদের কথাবার্তা শুনছে, ও জেনেছে যে কোর-উল জার যোদ্ধারা হটে যেতে বাধ্য হয়েছে।

টারজান সহজেই নিজের বাঁধন খুলে ফেলে, অসাড় ভাবে শুয়ে রইল। ইন-টান যেই কাছে এসে ঢিলা বাঁধনগুলো পরীক্ষা করতে গেছে, টারজান সহজেই তাকে ধরাশায়ী করে-ফেলল। সুরু হল দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি এতেও টারজান জয়লাভ করল, ইন-টানকে সে হত্যা করল। দাঁড়িয়ে উঠে সে দেখল তার তীর ধনুক, তার ছুরি, ফাঁস দেবার দড়ি সবই রয়েছে। গুহার দরজার কাছে এসে খাদের দূরত্ব পরখ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে। সে এখনি কি নিচে নামতে পারবে। ইন-টানের মাথা কেটে খাদের দিকে গড়িয়ে দিয়েই, সে খুঁটি ধরে নামতে লাগল। নেমে, ইন-টানের কাটা মাথাটা তুলে নিয়ে চলল। এটা নিছক পাগলামি নয়, টারজান খুব ভালই জানে, ইন-টানের শুধু ধড়টা দেখে কোর-উল-উলদের কি ভীষণ রাগ হবে, কিন্তু সেই রাগের সঙ্গে মেশানো থাকবে ভয়। যে ভয়ের সাহায্যে টারজান বহু বনজঙ্গলে আধিপত্য করে।

টারজান স্থির করেছিল যে পাহাড়ের পাদদেশে নেমে ওম-আটের বস্তিতে যাবে। সে পায় হেঁটে চলল। কিন্তু যখন পথ দিয়ে আর হাঁটা গেল না, টারজান সাঁতরে নদী পার হয়ে উল্টো দিকে পথ খুঁজতে গিয়েই, যেখানে পান্‌-আট্‌-লি নদী ছেড়ে, ডাঙায় উঠেছিল, সেখানে তার গন্ধ পেল। তক্ষুণি সে স্থির করল আগে পান্‌-আট্‌-লির খবর নেবে, পরে যাবে ওম-আটের কাছে। শুঁকে শুঁকে টারজান, পান্‌-আট-লি যেখানে পাহাড়ে-উঠেছিল, সেখানে পৌঁছল। এবারে-তাকে খাড়া পাহাড়ে উঠতে হবে, কাজেই কাটা মুণ্ডুটা নেওয়া চলবে না। বাঁদরের মত সে ঐ পাহাড়ে চড়তে সুরু করল, পান্‌-আট-লির গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে।

টারজান কোর-উল-গ্রীফদের বিষয় কিছুই জানে না, যদিও রাতের অন্ধকারে ঝাপসা ঝাপসা অতীকায় জানোয়ার দূর থেকে দেখেছে। কিন্তু ভয়ের সঙ্গে লড়াই করেই যে মানুষ হয়েছে তার আবার ভাবনা কি!

পান্‌-আট্‌-লির চিহ্ন একটা চুড়োর ধারে এসে শেষ। সে লাফিয়ে নামেনি টারজান জানে। ঝুঁকে দেখতে গিয়ে টারজানের চোখে পড়ল যে ঠিক তারি নীচে থেকে, ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে একটা জীব আর তার ল্যাজ সত্ত্বেও সে বানর নয়। তার থেকে উন্নত শ্রেণীর সে। দূর থেকে টারজান দেখল ঐ জীবটি ওপরের একটা গুহায় ঢুকল।

টারজান পান্‌-আট্‌-লির চিহ্ন ধরে নামতে সুরু করল সেই পাথুরে খুঁটির সাহায্যে। তখুনি তার খেয়াল হল কোন গুহায় ঐ জীবটি ঢুকেছিল। টারজান তার গতি বাড়াল, পান্‌-আট্‌-লির চিহ্নও তো ঐ দিকেই। টারজান যখন প্রায় পৌঁছে গেছে, তখন একটা কাতর আর্তনাদ, চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল।

শ্রান্ত, ক্লান্ত পান্‌-আট্‌-লি স্বপ্ন দেখছিল কোর-উল-গ্রীফের সেই বীভৎস, অতীকায় জীব তার গা হাত স্পর্শ করছে, তার গলাও ছুঁচ্ছে। জন্তুটা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—এমন সময় স্বপ্ন গেল ছুটে, চোখ খুলে সে অল্প আলোতে আব্‌ছা ভাবে একটা জীবকে তার পাশে দেখতে পেল। তারই রোমশ আঙ্গুলগুলো তাকে স্পর্শ করছে। তাকে টেনে কাছে নিয়ে যাবে বলে। চীৎকার করে উঠে পান্‌-আট্‌-লি সেই জন্তুটাকে যেই ঠেলে দিয়েছে অমনি আরেকটা রোমশ হাত চুলের মুঠি ধরে তাকে গুহার সামনের খোলা জায়গায় টেনে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পান্‌-আট্‌-লি দেখতে পেল বাইরে আরো একজন উঠে এসেছে। তাকে দেখে পান্‌-আট-লির মনে হল সে একজন হো-ডন। তাকে দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও, পান-আট-লিকে বিকট জানোয়ারটা ছাড়ল না। সে গরগর করতে করতে, লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে রইল। ক্রমে, গরগরানি গর্জনে পরিণত হলো আর বেড়েই চলল। নবাগত জীবটিও কম যায়—না। সেও বিকট আওয়াজ করে চলল।

ওপরের আওয়াজে বিচলিত হয়ে, নীচে প্রতিপক্ষের দলও এতক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে। কিন্তু এই জীবের তো ল্যাজও নেই।

হাত-পাও অন্যরকম। সে তো হো-ডন নয়, আরো ভয়াবহ কিছু। তার কোন আশা নেই আর, তার গতি একমাত্র— ঝাঁপিয়ে কোর-উল-গ্রীফে পড়া। এতক্ষণে পান-আট-লি বুঝতে পারল যে তাকে যে বন্দী করেছে সে একজন টর-ও-ডন।

কিন্তু হঠাৎ সব পালটিয়ে গেল। টর-ও-ডনের প্রতিপক্ষ লড়তে লড়তে পান-আট-লিকে বলল যে সে এই যুদ্ধে জিতবেই আর টর-ও-ডন যখন পান-আট-লিকে ছাড়তে বাধ্য হবে, সেই সুযোগে সে যেন খুঁটির সাহায্যে ওপরের সেই গুহার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখে। এও জানাল যে সে ওম-আট ও পান-আট-লির বন্ধু। যদি দৈবাৎ সে ঐ টর-ও-ডনের কাছে হেরে যায়, তাহলে পান-আট-লিকে একাই পালাতে হবে। এই জীবটি কে, সে কেনই বা এখানে? টারজান এবার নিজের পরিচয় দিয়ে বলল যে সে কোর-উল-জার, ওম-আটের কাছ থেকে, তার খোঁজেই এসেছে।

পান্-আট-লি, লড়াই-এর মাঝে আর প্রশ্ন করল না। সভয়ে লড়াই-এর গতি দেখতে লাগল টর-ও-ডন তার চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে টারজানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিকট ভাবে যুদ্ধ চলতে লাগল—নখ, দাঁত সবই ব্যবহার করছে দুজনেই। পান্-আট-লি ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছে। টারজান যখন ওম-আটের বন্ধু, সুতরাং সে নির্ভরযোগ্য। টর-ও-ডনকে হারানো টারজানের পক্ষে সম্ভব নয় তা টারজান না জানলেও সে তো জানে। শৈশব থেকেই পল-উল-ডনে ওয়াজ-ডন আর হো-ডনের মেয়েরা জানে টর-ও-ডনরা কি সাংঘাতিক ভাবে, তাদের ওপর অত্যাচার করে এসেছে, তাদের শক্তি অপরিসীম, তাদের হারানো অসম্ভ। তাই সে খোলা ছুরি নিয়ে টারজানকে সাহায্য করার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু টারজান শারীরিক শক্তিতে, টর-ও-ডনের প্রায় সমকক্ষ হলেও, তার তো ল্যাজ নেই। আর এই ল্যাজই তাকে বেকাদায় ফেলল। ধস্তাধস্তির মধ্যে, ল্যাজ দিয়ে তার শ্বাসরোধ করতে চেষ্টা করছিল টর-ও-ডনটা। টারজানের ছোরাটাও হাতছাড়া, পান-আট-লিও ঠিক সুবিধা করতে পারছিল না টারজানের সাহায্যে আসতে। এত কাছাকাছি দুজনে যে ছোরা চালানো সম্ভব নয়—বিপদ তাতে বাড়তেই পারে। প্রায় পরাস্ত হয়ে আসছে বুঝতে পেরে টারজান শেষ চেষ্টায় টর-ও-ডনের দুই হাত ফাঁক করে দিয়ে, গলায় যখন মরণ কামড় দিল তখন টর-ও-ডনের ল্যাজও তার গলায় ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে। টারজান তারই মধ্যে গুহার সীমানায় পৌঁছেছে আর তার ছোরাটাও হাতে তুলে নিয়েছে।

টারজানের শক্তি প্রায় নিঃশেষ, তা সত্ত্বেও, সে ছোরাটা দিয়ে একবার নয়, তিনবার কোপ বসাতে পারল। কিন্তু আর নয়, সে একেবারে অচেতন। দুজনেই গড়িয়ে পাহাড়ের তলায় পড়ে যেত— ভাগ্যিস পান-আট-লি টারজানের কথা মত, ওদের ফেলে পালিয়ে যায়নি। সে গুহার সামনের জমিতে শুয়ে পড়ে, টারজানের একটা পা আঁকড়ে ধরে তাকে বাঁচাল। কিন্তু কতক্ষণ সে এই ভাবে টারজানকে ধরে রাখবে! ততক্ষণে টর-ও-ডনের মৃতদেহ টারজানের হাত থেকে ফসকে নিচে পড়েছে। পান্-আট-লি বুঝতে পারছে না, টারজানও জীবিত না মৃত। জীবিত হলে কখন তার জ্ঞান ফিরবে? কারণ তার আঙ্গুলের শক্তি ক্রমশঃ কমে আসছে।

টারজানের জ্ঞান ফিরেছে, সে বুঝতেও পারছে তারও পতন অবশ্যম্ভাবী, কারণ যে তার পা ধরে এভাবে তাকে রক্ষা করেছে তার শক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তবে টারজানের নাগালের মধ্যেই রয়েছে দুটি খুঁটি। দু'হাত দিয়ে সে দুটিকে শক্ত করে যেই ধরে ফেলেছে পান-আট-লির প্রায় অসাড় আঙ্গুলও তার পা থেকে খুলে গেছে। টারজান বেঁচে গেল শুধু তার অসীম শক্তির জন্য। সে তখনও জানে না তার শত্রুর কি পরিণাম ঘটেছে। তার প্রথম চিন্তা, শত্রু তাকে হত্যা করার জন্য কোথায় লুকিয়েছে। মাথা তুলতেই পান-আট-লির ভীত-ত্রস্ত চেহারা দেখতে পেল। সে যে বেঁচে আছে এ যেন পান-আট-লি বিশ্বাসই করতে পারছে না। টারজান তাকে ঐ টর-ও-ডন কোথায় জিজ্ঞেস করাতে, পান-আট-লি খাদের দিকে দেখিয়ে বলল যে সে মরে গেছে। তার কোন অনিষ্ট করতে পারার আগেই মরেছে। টারজান ঠিক সময়ই সেখানে হাজির হয়েছিল। পান-আট-লির দারুণ কৌতূহল—টারজান জানল কি করে যে সে এখানে আছে আর কেনই বা টারজান ওম-আটকে দলের নেতা বলে অভিহিত করল, তাকে চিনলই বা কি করে টারজান।

টারজান ধীরে ধীরে তার সব প্রশ্নের জবাব দিল। তারা চারজনে ওম-আটের সঙ্গে কোর-উল-জা থেকে রওয়ানা হয়েছিল পান-আট-লির খোঁজে। কিন্তু পথে কোর-উল-উলেরা তাদের আক্রমণ করে আর টারজান তার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াতে, কোর-উল-উলদের হাতে বন্দী। সেখান থেকে সে পালায়, পথে পান-আট-লির চিহ্নই অনুসরণ করে সে ঐ গুহার সামনে উপস্থিত হয়। পান-আট-লির চীৎকারও সে শুনতে পায়। ওম-আটের হাতে এস-মাটের মৃত্যুর খবর পান-আট-লি এতদিনে জানল, বুঝলও ওম-আট কি করে

দলপতি হয়েছে। ওম-আট-লির খোঁজে তার গুহায় ঢুকে এস-মাটকে দেখে, সেখানেই তাকে মেরে ফেলে। পান-আট-লি কি করে সিংহের হাত থেকেও রক্ষা পেয়েছে, কোর-উল-উলে ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করেছে, সব কিছুই টারজানের জানা—পান্-আট-লি তো অবাক্—এটা কি করে সম্ভব হল? এবার টারজানই তাকে প্রশ্ন করে জানল টর-ও-ডনদের নাম, এও শুনল যে তারা সংখ্যালঘু হলে কি হয়—তাদের বুদ্ধি প্রায় মানুষের মতো, হিংস্রতায় তারা জানোয়ারের সমকক্ষ। তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা প্রায় অসম্ভব। টারজান ঐ টর-ও-ডনকে একাই পরাস্ত করতে পেরেছে দেখে, পান্-আট-লির মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ল।

এবারে দুজনের ক্লান্তি দূর করার সময়। টারজান দুদিন ঘুমোতে পারেনি, পান্-আট-লির-ও একই অবস্থা। তাই টারজান গুহার ঠিক বাইরে শুয়ে রাতটা কাটাল আর পান-আট-লি নিশ্চিন্ত মনে গুহার ভিতরে ঘুমিয়ে রইল। পরের দিন তাদের ফিরে যেতে হবে ওম-আটের কাছে, কোর-উল-জায়।

ঘুম যখন ভাঙ্গল, সূর্যদেব তখন আকাশে অনেক ওপরে। ঐ একই প্রখর আলোতে দু'ঘণ্টা ধরে আরেক জন পাল-উল-ডনের সেই বিশ্রী জলাভূমির ভিতর দিয়ে অতিকষ্টে এগিয়ে চলেছিল। তার বন্দুক এখন কাদামাখা, চতুর্দিকে তার নানা বিপদ। জলাভূমির মাঝে খানিকটা খোলা জায়গা—সবুজ জলে ভরা সেই দিকে সে এগিয়ে চলেছে। তার পরে আরো ঘণ্টা দুই কেটে গেলে পর, শক্ত জমিতে পৌঁছতে পারবে—এমন সময় জলের তলা থেকে ভয়ঙ্কর এক জলজ প্রাণী হাঁ করে তার দিকে ধেয়ে এল।

এদিকে, ঘুম থেকে উঠে টারজান তার তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে চারদিক দেখতে লাগল, নিচে রয়েছে তার কোর-উল-গ্রীফের ঘন জঙ্গল। ডান দিকে জাড্-বেন-ওমোর নদী ভরা উপত্যকা আর নীল রঙের জলাশয়। দূরে সূর্যের ঝকঝকে সাদা আলো পড়েছে কতগুলো ছড়ানো বসতির ওপর, কিন্তু আলোর নগরী আলুরকে আড়াল করে রেখেছে পাহাড়ের গা। মনোরম সব দৃশ্য, টারজানের মন প্রায় কেড়ে নিচ্ছিল, কিন্তু খিদের তাড়া ক্রমে বাড়ছে। খাবার তাকে জোগাড় করতেই হবে। তবে চিন্তার কোন কারণ নেই, কোর-উল-গ্রীফের জঙ্গল থেকে সবই পাওয়া যাবে—নামতে সুরু করল সে। সেখানে জানা-অজানা বিপদ থাকা সম্ভব—তাতে কি হয়েছে? সে তার মানুষের বুদ্ধি ও পশুর শক্তি দিয়ে অনায়াসেই বিপদের মোকাবিলা করতে পারবে এ বিষয় সে নিশ্চিত। কিন্তু গ্রীফ দেখেনি সে কখনো। যদিও তার বিকট আওয়াজ রাতে টারজানের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে তীর-ধনুক নিয়ে ক্রমে সে গভীর জঙ্গলে ঢুকেছে। নানান জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ পাচ্ছে সে, তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্ধ অনুসরণ করে টারজান এক হরিণের পিছনে চলল। খুব দূরে ছিল না হরিণটা, নিঃশব্দে টারজান ঘন গাছের আড়ালে আড়ালে গিয়ে যেখানে হরিণটা জল খাচ্ছিল সেখানে পৌঁছল। তার নাকে কুমীরজাতীয় জলজ প্রাণীর একটা ক্ষীণ গন্ধ আসছিল। তবু টারজান নিশ্চিন্ত ছিল কারণ তার ধারণা জন্তুটা নিশ্চয় বহুদূরে আছে।

চুপি, চুপি খানিকটা এগিয়ে টারজান তার তীর-ধনুকের শরণ নিল। প্রথম তীরই হরিণটার বুক ভেদ করল, টারজানও এগিয়ে যেই তাকে কাঁধে তুলতে গেছে অমনি কানে এল বাজ পড়ার মতো আওয়াজ আর চোখে পড়ল একটা বিরাট জীব রেগে অন্ধ হয়ে চীৎকার করতে করতে তাকেই তেড়ে আসছে। পৃথিবীর শৈশবে এদের দেখা যেত বটে, কিন্তু আধুনিক জগতে?

এদিকে পান-আট্-লির ঘুম ভাঙ্গতে, বাইরে তাকিয়ে টারজানকে দেখতে না পেয়ে, ছুটে গুহা থেকে বেরিয়ে কোর-উল-গ্রীফের দিকে ঝুঁকে দেখতে লাগল। টারজান যে খাবারের খোঁজে নেমেছে তা সহজেই আন্দাজ করল। তাকে নিমেষের জন্য দেখতেও পেল সে। টারজান গ্রীফদের স্বভাব ও শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলেই, অমন নিশ্চিন্ত ভাবে কোর-উল-গ্রীফ-এর জঙ্গলে ঢুকেছিল। তাদের দৃষ্টি খুব ক্ষীণ, কিন্তু শ্রবণ-শক্তি প্রখর, তাই টারজানকে না ডেকে, সে তরতরিয়ে নেমে চলল। গ্রীফদের সম্বন্ধে তাকে সাবধান করে দিতে হবে। টারজান কোন দিকে গেছে তার নিশানা পেতে তার অসুবিধা হল না। কিন্তু টারজান কোথায় গাছের আড়ালে লুকিয়েছে, তার অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়, তার তো আর টারজানের মত ঘ্রাণ-শক্তি নেই। তবু সে আন্দাজে এগিয়ে চলল। একটা খোলা জায়গায় পৌঁছেই দেখল টারজান ঝুঁকে পড়ে সেই মরা হরিণটাকে দেখছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার পাশ থেকে কানে এল বীভৎস এক আওয়াজ।

ভয়ার্ত পান-আট্-লি সবচেয়ে কাছের গাছটার সবচেয়ে উঁচু ডালে আশ্রয় নিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

ঐ আওয়াজেই টারজান মুখ তুলে সেই অতিকায় জন্তুটাকে

দেখতে পেয়ে অবাক হল। তার দিকেই তাড়া করে আসছে সে। টারজান নিমেশেই বুঝতে পারল যে পালানই তার একমাত্র পন্থা। তার পক্ষে একে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। উঁচু গাছের একেবারে ওপরের ডালে চড়তে পারলে তার প্রাণরক্ষা হয়তো সম্ভব। গ্রীফটা খুবই দ্রুতগামী কিন্তু টারজান তো কম যায় না, সে তার শত্রু, ওখানে পৌঁছবার আগেই ওপরের ডালে চড়ে পড়েছে। গ্রীফ্‌টা গলা বাড়িয়ে গাছের ডাল থেকে তার শিকার ধরতে চেষ্টা করল বটে—কিন্তু এতেও সফল হল না। টারজান গ্রীফ্‌টার নাগালের বাইরে পৌঁছে ওপরের দিকে তাকাতেই পান-আট্‌-লিকে দেখতে পেয়ে সে জিজ্ঞেস করে জানল যে তাকে গ্রীফ্‌ সম্বন্ধে সাবধান করতেই সে এসেছে। টারজান কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে গ্রীফ্‌ আসছে, সে কেন টের পায়নি, তার ঘ্রাণশক্তির কি হয়েছিল? কিন্তু পর মুহূর্তেই বুঝল কারণটা—গ্রীফের কোন গন্ধ নেই। এই জীব, বহুযুগ আগেই আধুনিক জগতে লুপ্ত হয়ে গেছে। টারজান লণ্ডন শহরের জাদুঘরে এদের পাথর হওয়া কঙ্কাল দেখেছিল বটে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি নিজের চোখকে। আজ তার সেই দ্বন্দ্ব ঘুচেছে।

টারজান হাসতে হাসতে একটা শুকনো ডাল জন্তুটার মুখে ছুঁড়ে মারল। গ্রীফটা অমনি গলা খাড়া করে পাগলের মত গর্জন করতে শুরু করে দিল। গ্রীফের চেহারা দেখবার মতো—ঘাড় অবধি প্রায় বিশফুট লম্বা সে, সম্পূর্ণ শরীরটা কালচে নীল, মুখটা হলদে। চোখের চারদিকে নীল রং, মাথার ওপরে লাল হুড্‌, পেটের রং হলদে। পিঠের ওপরে তিন সারি শক্ত হাড্ডি। পায়ে ধারালো নখ। দুই চোখের ওপরে বড় বড় দুটো শিং, নাকের ওপর মাঝারি মত আরেকটা শিং—লম্বায় পঁচাত্তর ফুট, ল্যাজের শক্তি হাতির সমান। সব দিক দিয়ে শক্তির প্রতীক্‌ সে—এই শক্তিই টারজানের মনকে অভিভূত করে দিল। তার দাঁতগুলো দেখে টারজানের বুঝতে অসুবিধা হল না যে সে আমিষাশী।

পান-আট্‌-লিকে নিয়ে টারজান এবার ওম-আটের কাছে যেতে চায়। কিন্তু পান-আট্‌-লি রাজি নয় তাতে, তারা কি করে যাবে? গ্রীফ্‌ তো তাদের ছাড়বে না। টারজান এক গাছ থেকে আরেক গাছে গিয়ে ঐ গ্রীফের হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়। কিন্তু পান-আট্‌-লি জানে গ্রীফ সঙ্গে যাবে—কিছুতেই ছাড়বে না। টোর-ও-ডনদের বন্ধু এই গ্রীফ্‌রা। টোর-ও-ডনেরা এসে তাদের দুজনকে মেরে ফেলে, নিজেদের ক্ষিদে মিটিয়ে বাকীটা ঐ গ্রীফ্‌দের খেতে দেবে। টারজান কিন্তু পালাবার আশা ছাড়ল না, পান্‌-আট্‌-লিই হয়তো ঠিক কথা বলেছে তবু চেষ্টা তারা করবেই। এক গাছ থেকে আরেক গাছের ওপর দিয়ে গিয়ে তারা জঙ্গলের সীমানায় পৌঁছল। এবার তাদের গাছের সারি ছাড়তে হবে। ঐদিকের পাহাড়ের তলায় পৌঁছতে হলে গাছ থেকে নেমে পঞ্চাশ ফুট মত খোলা জায়গা পার হতেই হবে। নিচের দিকে তাকিয়ে টারজান দেখল—পান্‌-আট্‌-লির কথাই ঠিক, একটা গাছের তলায় তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

টারজান এবার অন্যভাবে পালাবার কথা ভাবতে আরম্ভ করল। সে আর পান্‌-আট্‌-লি গাছের উঁচু ডালের সাহায্যে একবার এগোবে আবার পিছোব আঁকাবাঁকা ভাবে যাবে, যাতে গ্রীফ্‌টার মাথা যায় ঘুরে। কিন্তু যে ভাবেই তারা যায়, ঐ গ্রীফ্‌টা ঠিক সঙ্গে চলে। এবার আবার আরেকটা গ্রীফ্‌ জুটল। দুটোতে মিলে গাছের তলায় টারজানদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কোর-উল-গ্রীফের পাহাড়টা দূরে নয়, কিন্তু তাতে তাদের লাভ কি? হঠাৎ খাদের মধ্যে সেই টোর-ও-ডনের মত দেহটা একটা গ্রীফের নজরে পড়তে সে সেদিকে গেল বটে, কিন্তু সেটা দিয়ে তার খিদে মেটাবার কোন চেষ্টা করল না। টারজান সকালবেলা ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় মৃতদেহটাকে দেখেছিল। তার মনে হয়েছিল যে বাঁদরের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, এরাই মানব-জাতির আদি পুরুষ।

মনে মনে টারজান যখন পান্‌-আট-লির ওখান থেকে পালাবার উপায় ঠিক করছে, এমন সময় একটা অদ্ভুত 'ভি—উ! ভি উ' আওয়াজ শুনতে পেল, আওয়াজটা ক্রমে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। গ্রীফ্‌ দুটোও মাথা তুলে সেইদিকে তাকাল—একটা গ্রীফ্‌ যেন নিম্নস্বরে উত্তরও দিল। আবার এল 'ভি—উ' ডাক। পান্‌-আট-লিও জানে না, এ কার ডাক,—কোন পাখীর না অন্য জন্তুর? ততক্ষণে টারজানের চোখে পড়েছে কে অমন করে ডাকছে।' পান্‌-আট্‌-লিকে দেখাতেই, ভয়ার্তস্বরে বলে উঠল, 'টোর-ও-ডন।' এই নতুন জীবটি, হাতে লাঠি নিয়ে সোজা হয়ে, একটু টলে টলে গ্রীফ্‌ দুটোর দিকে এগিয়ে যেতে তারা যেন ভয় পেয়ে একটু সরে গেল। কাছের গ্রীফটা মাথা ঘুরিয়ে তাকে যেই কামড়াতে গেছে, টোর-ও-ডনটা লাঠি দিয়ে তার মাথায় বেদম পিটতে শুরু করল। টারজান অবাক্‌ হয়ে দেখল যে গ্রীফটা

প্রতিবাদ তো করলই না, ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে তার দিকে এগিয়ে এল। তার শিং-এর ওপর এবার লাঠির ঘা পড়তে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। টোর-ও-ডনটাও তার ল্যাজ বেয়ে পিঠে উঠে দুদিকে পা ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে চালাতে শুরু করল, ঐ ছুঁচলো লাঠিটার সাহায্যে।

টারজান এই দৃশ্য দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে পড়ে পালাবার কথা ভুলে গিয়েছিল। টনক নড়ল তার, যখন অন্য গ্রীফটা ওপরে তাদের দিকে তাকিয়ে গর্জন করতে শুরু করল। টোর-ও-ডন বুঝল তার গর্জনের ইঙ্গিত। তারা, দুজনে টারজানের গাছের ঠিক নীচে এগিয়ে এল। টোর-ও-ডনটা লাফিয়ে গ্রীফের পিঠে দাঁড়িয়ে টারজানকে টেনে নামাবার চেষ্টা করতে লাগল—কিন্তু টারজানের তীর-ধনুকের কাছে তার শারীরিক শক্তি পেরে উঠল না। সে মারা পড়ল।

টারজান বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারল যে তারা দুজনে একসঙ্গে পালাতে পারবে না—কিন্তু পান্-আট্-লিকে বাঁচাবার দায়িত্ব তার। সে তাই পান-আট-লিকে ঐ গাছের ডালে লুকিয়ে থাকতে বলল যতক্ষণ না সে নিজে ঐ গ্রীফদের ওখান থেকে তাড়াতে পারে। খালি একটাই পণ তার সামনে, সে চীৎকার করতে করতে তাদের অন্যদিকে নিয়ে যাবে—গ্রীফ-দুটোর শক্তি আছে কিন্তু বুদ্ধি নেই। সে ঠিক মৃত লোকটার গলার স্বর অনুসরণ করবে। তারা সেখান থেকে চলে গেলে, পান্-আট-লি ঐ পাহাড়ী গুহায় গিয়ে, টারজানের জন্য পরের দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। টারজান যদি সময় মতো সেখানে পৌঁছতে না পারে তাকে, একাই কোর-উল জাতে ফিরতে হবে। পান-আট-লির যাবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু টারজানের নির্দেশ অবহেলা করতেও সে পারল না। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা নিজ নিজ পথে চলতে সুরু করল।

টারজান ঠিকই ধরেছিল, গ্রীফ দুটো তাকেই ধাওয়া করল। সে তো দারুণ খুসি এতে—যত দূরে তাদের নিয়ে যাওয়া যায়, ততই সুবিধা পান-আট-লির। এই সুযোগে তার পালানো সম্ভব, যদিও সামনে থাকবে আরেক বিপদ। কোর-উল-গ্রীফ আর কোর-উল-জার মাঝে হয়তো তাকে টোর-ও-ডন আর কোর-উল-উলের দলের শত্রুতার সম্মুখীন হতে হবে। পারবে তো সে? কিন্তু বিপদে সে অভ্যস্ত, নিজের ওপর আস্থা রাখা ছাড়া এখন উপায় তো নেই।

এবার টারজান গাছের ওপর দিয়ে চলেছে, তলা দিয়ে গ্রীফ দুটো—কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছে না। সারা রাত যে দিকেই টারজান যায়, তলা দিয়ে তারাও চলে সেই দিকে। গাছের সাহায্যে পাহাড়ের গায় ওঠা যে সম্ভব নয় বুঝতে পেরে, মগ ডালে উঠে একটু জিরোবে স্থির করল সে। সঙ্গে সেই হরিণটা তখনও রয়েছে।

যখন তার ঘুম ভাঙ্গল, তখন বেশ বেলা হয়েছে। তার পাহারাওয়ালারা কোথায় বার করতে চেষ্টা না করেই সে চুপি চুপি, খুব সাবধানে গাছের পাতার আড়ালে যেই না যেতে চেষ্টা করেছে, অমনি তলা থেকে গ্রীফদের গর্জন সুরু হয়ে গেল।

আবার আশাভঙ্গ—রাগে টারজান তখন কাছের ডাল থেকে বেশ বড় মাপের একটা ফল তুলে সজোরে কুৎসিত গ্রীফটার শিং-ওয়ালা নাক তাক করে ছুঁড়ল। সেটা পড়ল গিয়ে ঐ জন্তুটার চোখের ওপর। কিন্তু কি আশ্চর্য! প্রত্যুত্তরে রাগ তো সে দেখালই না—মুখ হাঁ করে ফলটা মাথা থেকে ফেলে, বিরক্ত হয়ে ফিরে কয়েক পা চলে যাওয়াতে টারজানের মনে পড়ে গেল তার আগের দিনের কথা। টোর-ও-ডনটাও তো একটা গ্রীফের মাথায় তার লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করেছিল। আর যায় কোথায়? পালাবার পথ সে ঠিক করে ফেলল, সে-ও গ্রীফটাকে, টোর-ও-ডনটার মত বশ করে ফেলবে।

গাছ থেকে লম্বা একটা ডাল কেটে, তার ছুরির সাহায্যে আশপাশ কেটে সাফ করে ফেলল প্রথমে। প্রায় দশ ফুট লম্বা লাঠির একটা দিক ছুঁচলো করে ওপর থেকে গ্রীফ দুটোকে দেখল—আর তার মুখ থেকে টোর-ও-ডনের সেই 'ভি হু' আওয়াজ যেই বেরোল, গ্রীফ দুটো মাথা তুলে তাকে দেখতে লাগল।

টারজান এরই অপেক্ষায় ছিল, আবার 'ভি—হু' আওয়াজ করে সেই হরিণটার বাকি অংশটুকু ছুঁড়ে তাদের দিকে দিল ফেলে। অমনি, গর্জন করতে করতে গ্রীফ দুটোর সেদিকে নজর পড়ল—এবার সুরু হল তাদে মধ্যে রেষা-রেষি। তাদের একটা অন্যটার হাত থেকে মাংস কেড়ে নিয়ে, নিমেষে শেষ করে দিল।

টারজান ততক্ষণে গাছ থেকে নেমে পড়েছে দেখতে পেয়ে, একটা গ্রীফ এগিয়ে আসতে সুরু করতেই টারজান সেই 'ভি—হু' ডাক ছাড়ল, গ্রিফটাও থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। টারজান তার লাঠি উঁচিয়ে, ঐ ডাক দিতে দিতে তার দিকে এগিয়ে চলল বটে কিন্তু তার মনে প্রশ্ন রয়ে গেল—গ্রীফটা কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে? পোষা জন্তুর

মত, না নরখাদক প্রাণীর মত ?

টারজানকে অনুসরণ করে, গ্রীফ দুটো দূরে চলে যাচ্ছে বুঝে, পান্-আট-লি গাছ থেক নেমে পড়ে এক ছুটে পরিত্যক্ত সেই পাহাড়ী গুহায় পৌঁছল। সঙ্গে রয়েছে টারজানের দেওয়া হরিণের মাংসের টুকরো। সে গুহার সামনের বারান্দায় বসে রান্নাবান্না সেরে নিল! ঝরনার জলে তেষ্টা মেটাল খাওয়ার পর।

এবার তার অপেক্ষার পালা। সারাদিন ধরে ঐ গ্রীফ দুটোর গজন শুনতে লাগল—কখনও কাছে কখনও বা দূরে —যেমন ভাবে টারজান তাদের ভুলিয়ে নিয়ে চলেছে।

পান-আট-লি, এই অচেনা লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ—কেই বা সে, কোথা থেকেই বা এমন ভাবে এসে তাকে উদ্ধার করল ? কিন্তু যে এমন বীর, তায় ওম-আটের বন্ধু। তার প্রতি স্বার্থহীন ভক্তি, সরল প্রাণ পান-আট-লির পক্ষে অতি স্বাভাবিক।

দিন কেটে গেল, রাত পার হল, টারজান কিন্তু এসে পৌঁছাল না। অগত্যা পান-আট-লি কোর-উল-জা অভিমুখে রওয়ানা দিল। সঙ্গে টারজান থাকলে তার অনেক সুবিধা হত, কিন্তু কোথায় টারজান ? একাই চলতে হল তাকে সব বিপদ অগ্রাহ্য করে। কিন্তু কোর উল-জা, তার সেদিন কেন, বহুদিন পৌঁছন হল না। জন্তু-জানোয়ার বা ওয়াজ-ডন কিন্তু তার জন্য দায়ী নয়।

কোর-উল উলের পাথুরে গা দিয়ে নামতে কোন বাধা পড়ল না। এমন কি তাদের চিরশত্রু ওয়াজ-ডনদের চেহারাও তার চোখে পড়ল না দেখে; তার মনে আশা জেগে উঠল নিরাপদে বাড়ি পৌঁছতে পারবে। বহু কাল পরে ওম-আটের সঙ্গে তার দেখা হবে। খুব সাবধানে এগিয়ে চলেছে কোর-উল-উলের পাশের রাস্তার দিকে, যে রাস্তা জাড-বেন-ওথোর উর্বর উপত্যকায় গিয়ে পড়েছে।

সবে মাত্র পা দিয়েছে ঐ রাস্তায়, এমন সময় দুপাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল লম্বা, ফর্সা হো-ডন সেনার দল। ভয় পেয়ে পান-আট-লি ঝোপঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে গেল, কিন্তু হো-ডন সেনারা তাকে ঘেরাও করে ফেলেছে দেখে, হিংস্র বাঘিনীর মত তাদের সঙ্গে সে বিফল লড়াই সুরু করে দিল। নখ, দাঁত, ছোরা সব কটাই ব্যবহার করা সত্ত্বেও এতজন শত্রুর সঙ্গে সে একা কি করে পারবে ? তারা তাকে ধরে ফেলে, তার হাত দুটো পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেলল, দাঁতের সারির ফাঁকে কাঠের টুকরো ঢুকিয়ে চামড়ার দড়ি দিয়ে মাথার পিছনে বেঁধে দিল। পান-আট-লি এখন সত্যিকার নিরস্ত্র।

এবার সে অসহযোগ সুরু করে দিল—এক পা-ও হাঁটল না। হো-ডনরা তার চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। পান্-আট-লি অগত্যা তার অসহযোগ আন্দোলন ছেড়ে তাদের সঙ্গে হাঁটাই শ্রেয় মনে করল।

কোর-উল-উলের মুখে তারা আরেক দল হো-ডন সেনা ও তাদের বন্দী ওয়াজ-ডনদের দেখা পেল। এদের হো-ডনরা ক্রীতদাস করবার জন্য, তাদের সহর থেকে ধরে এনেছে —হামেশাই যে রকম করে থাকে।

পান্ আট-লি এসব দেখেও একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েনি, কারণ অনেক সময়েই বন্দী ওয়াজ-ডনেরা পালিয়ে যায়।

দুটো দল এবার একই সঙ্গে চলতে সুরু করল। তাদের কথাবার্তা শুনে পান-আট-লি বুঝল সবার গন্তব্যস্থল সেই আলোর নগরী আ-লুর।

ঐ একই সময়, কোর-উল-জাতে, পিতৃ-পুরুষের গুহায় বসেছিল ওম-আট। সে তার বন্ধুর ও ভাবী স্ত্রীর অভাবে বড়ই বিচলিত।

●

পাল-উল-ডনের প্রান্তে এসে, জলাভূমির মধ্যখানে খোল জলে পৌঁছেও, সেই ভীষণাকার কুমীরটা তাকে যে ভাবে তাড়া করে আসছিল—অচেনা যুবকটির মনে হল সব কষ্ট, সব ভয় অতিক্রম করে এই দুরূহ জায়গায় পৌঁছেও—সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। তার সযত্নে রক্ষিত বন্দুক ব্যবহার করার সুযোগ সে পাবে না। তবুও না লড়ে মরবে না। ছোরা বার করে সে আদ্যিকালের কুমীরটার অপেক্ষায় রইল। তার মন বলছিল ছোরা এটার শক্ত চামড়ার ভেতরে

কিছুতেই ঢুকতে পারে না। মুখ হাঁ করে জানোয়ারটা যখন ওকে প্রায় ধরে ফেলেছে, তখন মানুষটা ডুব-সাঁতার দিয়ে কুমীরটার তলপেটে সেটাকে বসিয়ে দিল। কুমীর নিজের গতি থামাতে পারেনি, তাতেই তার কাল হল। যুবক ডুব সাঁতার দিয়ে ওপরে উঠল প্রায় গজ বারো পরে।

তাকে এবার ঐ পেঁকো জলাভূমির শেষ অংশটুকু পার হতে হবে।

দু'ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের পর, ক্লান্ত, অবসন্ন কাদামাখা শরীর নিয়ে পৌঁছল সে অপর পারে—ঘাস-ঢাকা জমিতে। একটু দূরেই এক পাহাড়ী নদী এঁকেবেঁকে গিয়ে জলাভূমিতে তার জল ঢেলে দিচ্ছে। সেদিকে চলল সে। শান্ত এক জলাশয়ে পৌঁছে, পরিধেয় সব কিছু ছেড়ে স্নান সমাপন করে—সব কিছু পরিষ্কার করতে শুরু করল। এক ঘণ্টা ধরে বন্দুকটাকে সাফ করল। সূর্যের প্রখর আলোতে শুকোল। পরিষ্কার করার জন্য ঘাসের অভাব ছিল না— তার বন্দুকের কোন ক্ষতি হল না। তেল মাখিয়ে আগের মতোই হল সেটা।

তারপর আবার সুরু হল সেই পুরনো চিহ্ন খুঁজে বার করার চেষ্টা। যদি বিফল হয়, তবে তাকে ধরে নিতেই হবে যে তার সব আশা ব্যর্থ হয়েছে।

এদিকে টারজান এগিয়ে চলেছে গ্রীফদের দিকে টোর-ও-ডনদের অনুকরণ করতে করতে। মন তার দোদুল্যমান। যখন সে গ্রীফদের একটার পাশে পৌঁছল, জন্তুটা তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল—ডাণ্ডা তুলে টারজান 'হুই—উ' হাঁক ছেড়েই জোরে মারল তার মুখে ঐ ডাণ্ডাটা।

জন্তুটা পাশের দাঁত দিয়ে কামড়াতে গেল কিন্তু পারল না। তখন বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরল। টোর-ও-ডনের ঘা খেয়েও হুবহু ঐ করেছিল।

টারজান দৌড়ে তার পিছনে গিয়ে লেজ বেয়ে উঠে চড়ে বসল। তারপর টোর-ও-ডনের অনুকরণে, তার ছুঁচলো ডাণ্ডার সাহায্যে তাকে চালাতে লাগল। দরকার মত বা দিকে বা ডান দিকে মারতে মারতে খাদের ভেতর দিয়ে উপত্যকার দিকে যেতে লাগল।

টারজান প্রথমে ভেবেছিল গ্রীফে চেপে সেখান থেকে পালাবে। কিন্তু গ্রীফটার ঘাড়ে চেপে তাকে যখন বশ করতে পেরেছে তখন মনে জেগে উঠল নতুন এক বাসনা। এটাকে কাজে লাগাবে। পান্-আট-লির জন্য আর চিন্তা করে লাভ নেই—সে হয় নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছে, নয়তো বেঁচে নেই। টারজানকে তার আর প্রয়োজন নেই। নীচে কোর-উল-গ্রীফ, আর রয়েছে উর্বর, সবুজ উপত্যকায় আলোর নগরী আ-লুর, সেটাই তো তার গন্তব্য স্থল। সেখানেই হয়তো তার হারানো সঙ্গিনী আছে। পাল-উল-ডন এলাকায় একমাত্র হো-ডনদের মধ্যে তাকে পাওয়া সম্ভব, যদি সে জীবিত থাকে। কারণ ওয়াজ-ডনরা বন্দী করে না কাউকে কখনো। কাজেই আ-লুরেই সে যাবে ঐ গ্রীফটার পিঠে চেপেই। গ্রীফদের পাল-উল-ডনের অধিবাসীরা বড় সমীহ করে।

কোর-উল-গ্রীফের ছোট এক নদী সেখানে পাহাড়ের পাদদেশে আরেকটা নদীর সঙ্গে মিশেছে। তারই জল গিয়ে আ-লুরের বৃহত্তম হ্রদে পড়ে, শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। তারই পাশের বহু যুগের পুরনো রাস্তা ধরে টারজান গ্রীফটাকে চালিয়ে, বন-জঙ্গলের বাইরে এসে যখন পড়ল তখন দূরে নিচে মাঝে মাঝে জ্বলজ্বলে আ-লুর দেখতে পাচ্ছিল সে। এখানে গ্রীফটাকে সামলাতে বেগ পেতে হয়েছিল।

বেলা হলে আরেকটা নদীর সঙ্গম স্থলের পাশ দিয়ে জঙ্গলের বাইরে এসে দেখে, নদীর অন্য পারে বেশ বড় একটা হো-ডনদের দল। একই সময় হো-ডনরাও তাকে ও তার অতিকায় বাহককে দেখতে পেল। এক মুহূর্তের জন্য তারা অবাক হয়ে, তাদের দেখল, পর মুহূর্তেই দলপতির নির্দেশে পাশের জঙ্গলে গা ঢাকা দিল।

সেই অল্প সময়ের মধ্যে টারজান দেখতে পেয়েছিল তাদের সঙ্গে কিছু ওয়াজ-ডনও রয়েছে। ওম-আট আর টা-ডেন যে বলেছিল হো-ডনরা ওয়াজ-ডনদের গ্রামে গিয়ে তাদের বন্দী করে আনে, এরাও সেরকম বন্দী। তাদের আওয়াজ শুনে গ্রীফটা ক্ষেপে উঠে তেড়ে গেল। অনেক লাঠির বাড়ি দিয়ে টারজান তাকে পুরনো রাস্তায় আনতে পারল, কিন্তু তার মেজাজ গেল বিগড়ে।

সূর্য যখন পশ্চিম দিকে হেলতে শুরু করেছে টারজান বুঝতে পারল গ্রীফের পিঠে চেপে আ-লুরে প্রবেশ করা হবে না। খিদের চোটে গ্রীফ্‌টার ঠেঁটামো বেড়েই চলেছে। তাকে বশে রাখতে বড় কষ্ট হচ্ছে। ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে নেমে তো পড়ল সে তার গ্রীফ্‌টার পিঠ থেকে—তার আগে কায়দা করে লাঠির সাহায্যে তাকে থামাতে হল। মনে মনে টারজানের দ্বন্দ্ব চলেছে গ্রীফটা কি এখন তার ওপর চটে যাবে, না, আগের মতই থাকবে? সব চেয়ে বড় কথা সকালে তাকে পাওয়া যাবে তো? অনায়াসেই সে উঁচু গাছের ডালে আশ্রয় নিতে পারত। কিন্তু নিল না, যদি গ্রীফ্ মনে করে টারজান

ভয় পেয়েছ

কাজেই গ্রীফ থামতেই টারজান নেমে পড়ে তার গায়ে আলতো এক ঘা দিল, যেন তাকে সে তখনকার মত ছেড়ে দিচ্ছে। এরপর তাকে অগ্রাহ্য করে টারজান চলে গেল। জন্তুটার গলার ভিতর থেকে গম্ভীর একটা আওয়াজ বেরোল। টারজানের দিকে না চেয়ে সে নদীতে নেমে অনেকক্ষণ ধরে জল খেল।

টারজান এখন নিশ্চিন্ত—গ্রীফ্‌কে ভয় করার কারণ নেই। নিজেরো দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে। এক গোছা তীর আর ধনুক নিয়ে সে শিকারের সন্ধানে চলল। শিকার যে কাছেই তা হাওয়ায় বয়ে আনা গন্ধেই বুঝেছিল। মিনিট দশেক বাদে, পাল-উল-ডনের একটা হরিণ মেরে, তার একটা রাং কেটে, গাছে লুকিয়ে রেখে, বাকি অংশটা নিয়ে যেখানে গ্রীফ্‌টাকে সে রেখে এসেছিল, সেখানে পৌঁছাল। গ্রীফটা তখন নদী থেকে উঠে আসছে। টারজান টোর-ও-ডনদের সেই অদ্ভুত ডাক ছাড়াতে সে টারজানের দিকে তাকিয়ে গলার ভিতর থেকে সাড়া দিল। টারজান দুবার ডাকতেই এগিয়েও এল। কাছে আসতেই টারজান তার দিকে হরিণের বাকি অংশটা ছুঁড়ে দিল। জন্তুটাও ছিল খিদেয় কাতর, সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে খেতে শুরু করে দিল।

টারজান এবার ফিরে চলল। তার মনে হচ্ছিল এই খাবার দিয়েই গ্রীফ্‌টাকে কাছেপিঠে রাখা যাবে। কারণ ও যদি জানে যে টারজান তাকে খাওয়াবে, ও কখনই সেখান থেকে চলে যাবে না। ভাবল বটে এই কথা, তবু খাওয়া শেষ করে গাছের দোদুল্যমান ডালে শুয়ে শুয়ে আস্থা পাচ্ছিল না। পরদিন ঐ আদিমকালের জন্তু চেপে আ-লুরে যেতে পারবে কিনা।

পরদিন খুব সকালে গাছ থেকে নেমে নদীর দিকে গেল সে। কাপড় ছেড়ে অস্ত্র খুলে, নদীর ঠাণ্ডা জলে স্নান করে নিল। তারপর গাছে ফিরে গিয়ে তার প্রাতঃরাশ সারল হরিণের মাংস ফলমূল দিয়ে। এবার গ্রীফ্‌টাকে ডাকার পালা। কিন্তু তার আর হদিস্‌ মিলল না। তাই পায়ে হেঁটেই আ-লুরের দিকে রওনা হল সে। তার সম্বল ও ভরসা হো-ডনদের ভাষা সে জানে। আর প্রকৃতি-দত্ত বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি।

খাওয়া ও বিশ্রামের পর শরীরে বল পেয়ে নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল। শুধু শারীরিক ও মানসিক গুণই তার নেই, সঙ্গে রয়েছে তার আধ্যাত্মিক শক্তিও, যার প্রভাবে গড়ে উঠেছে তার বন-জঙ্গলের প্রতি ভালবাসা। অন্য জন্তু-জানোয়ারের কাছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মূল্য নেই, মূল্য আছে খালি ক্ষিদের সময় খাবারের। আ-লুরের কাছে এসে তার লক্ষ্য গেল বাড়িঘরের গঠনশৈলীর দিকে। প্রকৃতির সাহায্য নিয়ে, ছোট ছোট পাহাড়গুলো খোদাই করে বাড়িঘর তৈরি হয়েছে। সেগুলো যে চুণাপাথরের পাহাড় কেটে তৈরি তা না জানলে কেউ বলতে পারবে না।

ঘরবাড়ির আকৃতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে পাহাড়ের আকারের ওপর। অনেক যুগ কেটে গেছে পাহাড় কেটে কেটে এসব তৈরি করতে। ভেতরকার ঘরগুলোও একই ভাবে তৈরি। প্রয়োজন মতো তা-ও ঐ পাহাড়ের আকারেই করা হয়েছে। এতে জায়গাও বেঁচেছে; পরিশ্রমও কম করতে হয়েছে। বাড়ি করে যে মালমশলা বেঁচেছিল, টারজান কাছে এসে দেখল, সেগুলো দিয়ে এক একটা বা একাধিক বাড়ীর বাইরের বেড়া তৈরী করা হয়েছে।

চারধারে লোকজন হেঁটে বেড়াচ্ছে—কেউ বা রাস্তা দিয়ে কেউ বা বাড়ীর সামনের বারান্দা দিয়ে। ঐ সব বারন্দা দেখে বোঝা যায় যে আধুনিক হো-ডনদের শিরায় আদি গুহাবাসী হো-ডনদের রক্ত এখনও বইছে।

দূর থেকে টারজানকে দেখে কারো কোন কৌতূহল যে জাগেনি, টারজান তাতে অবাক হয়নি। কারণ কাছে থেকে না দেখলে সে যে হো-ডন নয় তা বুঝবার উপায় নেই। মনে মনে সে ঠিক করে রেখেছে কি ভাবে কি করবে।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই সে আ-লুরে ঢুকে পড়ল। সে যে হো-ডন নয় তা ধরে ফেলল একটা ছোট ছেলে। যেই সে টের পেল এ'তো কোন ল্যাজ-কাটা হো-ডন নয়—এর ল্যাজ নেই, ছিলও না কখন। ভয়ে চীৎকার করতে করতে নিজের বাড়িতে পালাল সে।

টারজান এগিয়ে চলল—স্পষ্ট ভাবেই সে বুঝতে পারছিল সে যা করবে স্থির করেছে, সেটা সফল না বিফল হবে তাই এবার বোঝা যাবে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতেও হল না। পথের মোড়েই এক হো-ডন যোদ্ধার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। টারজান তার চোখের মধ্যে সন্দিগ্ধ ভাব দেখতে পেয়ে, সে কিছু বলার আগেই তাকে জানাল যে সে বিদেশী, হো-ডন-রাজ কো-টনের দর্শনাভিলাষী। তাঁর সঙ্গে তার কিছু কথা আছে।

যোদ্ধা একটু পিছিয়ে, ছোরার ওপর হাত রেখে টারজানকে বলল যে আ-লুরের দরজা পেরিয়ে ক্রীতদাস বা বন্দী ছাড়া

কোনো বিদেশী ঢোকে না। উত্তরে টারজান তাকে জানাল যে সে বন্দীও নয়, ক্রীতদাসও নয়। সে স্বয়ং জাড-বেন-ওথোর কাছ থেকে এসেছে। প্রমাণ স্বরূপ সে প্রথম তার হাত-পা হো-ডন সৈন্যের দিকে এগিয়ে দিয়ে তাকে দেখাল যে সে হো-ডন নয়। তারপর ঘুরে দেখাল তাকে, যে ল্যাজও নেই তার। এটার ওপরই সব কিছু নির্ভর করছিল। তার মনে ছিল টা-ডেন আর ওম-আটের ঝগড়ার কথা। ওয়াজ-ডনদের মতে, জাড-বেন-ওথোর ল্যাজ আছে, কিন্তু হো-ডনরা বলে তাঁর ল্যাজ নেই।

এইবারে যোদ্ধার টনক নড়ল, চোখে এল শ্রদ্ধার ভাব। সে বলে উঠল যে সত্যি সত্যি টারজান হো-ডনও নয়, ওয়াজ-ডনও নয়। আর জাড-বেন-ওথোরও ল্যাজ নেই। সে সাধারণ সৈনিক। এ অবস্থায় কি করণীয় তা উপরিওয়ালারাই বলতে পারে। সে টারজানকে আ-লুরের রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলল।

শহরটা বেশ বড়—বাড়ি ঘর মাঝে মাঝে এক অপর থেকে বেশ দূরে। মাঝে মাঝে এক একটি বাড়ির ভিত একশো ফুটেরও বেশী। অনেক লোকের সঙ্গে পথে দেখা হল। রাজার কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুনে কেউ টারজানকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করল না।

শেষে তারা দুজনে বিরাট এক স্তূপের সামনে পৌঁছল। পশ্চিম দিকে তার টলটলে জলের প্রকাণ্ড হ্রদ। সব কটা বাড়িকে ঘিরে রয়েছে খুব উঁচু এক দেয়াল—এত উঁচু দেয়াল টারজান কোনো দিন দেখেনি। পথ-প্রদর্শক তাকে সদর দরজার সামনে নিয়ে গেলে, যে জন: বারো প্রহরী সেখানে ছিল, তারা সবাই পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, টারজানের সঙ্গে বড় একদল কৌতূহলী নাগরিকও জুটে গিয়েছিল।

টারজানের পথ-প্রদর্শক হো-ডন সৈনিক সব বৃত্তান্ত বলতে তাকে তারা নিয়ে গেল ঐ প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে। একজন প্রহরী ভিতরে গেল কো-টানকে খবর দিতে। প্রায় পনেরো মিনিট বাদে, বিরাট আকারের এক সৈনিক সেখানে এল, পিছনে তার এল আরও অনেক সৈনিক। প্রত্যেকেই টারজানকে কৌতূহল ভরে দেখছিল। তাদের দলপতি এবার জিজ্ঞেস করল যে সে কে ও রাজা কো-টানের সঙ্গে কেনই বা দেখা করতে চায়?

জবাবে টারজান তাকে জানাল যে সে বন্ধু, আর এসেছে জাড-বেন-ওথোর দেশ থেকে।

পাল-উল-ডনের কো-টানের কাছে এই জবাবে তাদের সমীহ যেন বেড়ে উঠল ও তারা নিজেদের মধ্যে খুব আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলতে সুরু করে দিল। তাদের দলপতি টারজানকে প্রশ্ন করল সে কি ভাবে সেখানে এসেছে আর কো-টানের সঙ্গে তার কি প্রয়োজন?

টারজান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে থামতে বলল, জিজ্ঞেস করল যে জাড়-বেন-ওথোর দূতের সঙ্গে কি তারা যাযাবর ওয়াজ-ডনদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে তাই করবে? সে যদি জাড্-বেন-ওথোর কোপ থেকে বাঁচতে চায় তাহলে সময় নষ্ট না করে টারজানকে যেন রাজার কাছে নিয়ে যায়।

এই রকম আচরণ কত দূর চালিয়ে যেতে পারবে সে বিষয়ে যে ভাবনা ছিল, প্রশ্নকর্তার হাব-ভাবে তা দূর হল। ভয়ে ভয়ে পুব দিকে তাকাতে তাকাতে টারজানের দিকে সে তার ডান হাত এগিয়ে দিয়ে, বাঁ হাত নিজের বুকের ওপর রাখল। টারজান তার নাগালের বাইরে সরে গিয়ে বলল কেউ-ই জাড-বেন-ওথোর দূতের পবিত্র শরীর স্পর্শ করতে পারে না। জাড-বেন-ওথোর বিশেষ কৃপার নিদর্শন স্বরূপ কেবল কো-টান তার ব্যতিক্রম হতে পারে। আর দেরি নয়, জাড-বেন-ওথোর ছেলেকে আ-লুরের হো-ডনদের এ কি রকম অভ্যর্থনা?

টারজান প্রথমে স্থির করেছিল যে সে স্বয়ং জাড-বেন-ওথো সাজবে, কিন্তু তাতে অনেক অসুবিধা। আবার জাড-বেন-ওথোর সাধারণ দূত হলে তেমন খাতির পাবে না – যেমন পাবে সে জাড-বেন-ওথোর ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিলে। ছেলের সাজে সে অনায়াসেই চলাফেরা করতে পারবে, বাপের সাজে সেটা অসম্ভব।

তার কথা শুনে, আশেপাশের সবাই একসঙ্গে পিছু হটে গেল প্রশ্নকর্তা তো ভয়ে প্রায় অজ্ঞান। সম্বিৎ ফিরলে সে অতি বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করল, বলল, ডাক-লটকে যেন ডোর-উল-ওথো দয়া দেখায়, সে তার অনুগামী হয়ে ডোর-উল-ওথোকে কো-টানের কাছে নিয়ে যাবে। অনুচরদের দুধারে হটিয়ে দিয়ে টারজানের পথ করে দিল সে।

টারজান এবার তাকে সামনে গিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ করল। অনুচরেরা কিন্তু থাকবে পিছনে। ত্রস্ত ডাক-লট টারজানকে পাল-উল-ডন-রাজ কো-টানের প্রাসাদে নিয়ে গেল।

●

যে প্রবেশ-পথ দিয়ে টারজান ঢুকল, তার গঠনশৈলী জ্যামিতি-ভিত্তিক ও সুন্দর। ভিতরের দেয়ালও তাই। যতই এক থেকে আরেক ঘরে যায় সেখানেও সেই একই জিনিস। কিন্তু তার মাঝে মাঝে রয়েছে জন্তু-জানোয়ার ও পাখির প্রতিকৃতি। পাথরের তৈরি বাসন, সোনার গয়না আর জন্তুর চামড়ার ছড়াছড়ি চারদিকে। কিন্তু কোথাও বোনা কাপড় চোখে পড়ল না।

বহু ঘর বারান্দা পার হয়ে, তিন প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙ্গে তারা এল পশ্চিমের বাইরের বারান্দায়। তার নীচে রয়েছে নীল হ্রদ। ঐ পথ ধরে একশো গজ মত হেঁটে তারা পৌঁছল প্রাসাদের আরেকটা ঘরের দ্বারে। বিরাট সেই ঘরে বহু সৈনিক জমায়েত ছিল। ঘরটার ছাদ জমি থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট ওপরে। প্রায় সমস্ত ঘর জুড়ে রয়েছে তিন-কোণা এক বিরাট পিরামিড। চওড়া ধাপে পিরামিডটা ঘরের গম্বুজের কাছে পৌঁছেছে। ঠিক তার ওপরে কয়েকটা গোলাকার ঘুলঘুলি। প্রত্যেকটা ধাপে সৈনিক, সবচেয়ে ওপরের ধাপে বসে রয়েছেন শক্তিশালী এক ব্যক্তি। সূর্যের আলোয় তার সোনার কাজ-করা পোষাক ঝলমল করছে।

ডাক-লট তাঁকে টারজানের পরিচয় দিল। সে জাড-বেন-ওথোর ছেলে এবং তাঁর দূত। এ কথাও বলল যে জান-বেন-ওথো তাঁর নিজের ছেলেকে পাঠিয়েছেন তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ।

সবাই আগন্তুককে ভাল করে দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। পিরামিডের পিছনের দিকে যারা ছিল তারাও সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। মুখে-চোখে তাদের অবিশ্বাসের ছাপ। কিন্তু সেই সঙ্গে সতর্কতাও রয়েছে, হাওয়ার গতি যে দিকে যায়, তারাও সেই দিকেই যাবে।

কো-টানের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল সবাই। কো-টান যে ভাবে ব্যাপারটাকে নেবেন—তারাও তাই নেবে। কিন্তু কো-টানও যে তাদের মতো মনস্থির করতে পারছেন না, তা-ও তাঁর হাব-ভাবেই বোঝা যাচ্ছিল।

টারজান তার প্রশস্ত বুকের ওপর দুই হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—মুখে অবজ্ঞার ভাব। ডাক-লটের মনে হচ্ছিল সেই সঙ্গে রয়েছে রাগ।

কো-টান এবার জানতে চাইলেন কে বলেছে যে আগন্তুক ডর-উল-ওথো?

পিরামিডে থেকে ভীত দর্শকরা চীৎকার করে ডাক-লট-এর নাম বলল।

ব্যঙ্গের সঙ্গে কো-টান প্রশ্ন করলেন, 'তাহলেই কথাটা সত্যি হয়ে গেল?'

ডাক-লট টারজানের হাত-পা যে তাদের হাত-পা থেকে কত আলাদা এবং তার বাবার মতোই যে তারও ল্যাজ নেই সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল প্রমাণ স্বরূপ। কো-টান এই সব পার্থক্য এতক্ষণে লক্ষ্য করলেন।

এমন সময় পিরামিডের পিছন দিক থেকে এক সৈনিক বেশ জোরে ডাক-লটের যুক্তির সমর্থন করে বলল যে তার আগের দিন তারা যখন কোর-উল-উল বন্দীদের নিয়ে ফিরছিল, সকলেই এঁকে গ্রিফের ওপর বসা অবস্থায় দেখেছিল। ভয়ে তারা বনের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়েছিল বটে, কিন্তু যেটুকু তারা দেখেছিল তাতেই সে নির্ভয়ে এ কথাই বলতে পারে যে এই ব্যক্তি দেবতার দূত।

এসব শুনে, বেশির ভাগ সৈনিক আগন্তুক যে ডর-উল-ওথো এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হল। তাদের মধ্যে এখন তাড়াহুড়া লেগে গেল ডর-উল-ওথোর সামনে থেকে সরে যাবার। সবাই এ-ওর পিছনে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

নিমেষে পিরামিডের সামনেটা একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়ল। একমাত্র কো-টান তখনও তাঁর সামনে বসে রইলেন, যদিও অনুচরবর্গের আচরণে তিনি যথেষ্ট বিচলিত, ঐ সৈনিকের কথা ছেড়ে দিলেও। আগন্তুক যদি সত্যি সত্যিই ডর-উল-ওথো, তার সঙ্গে যে ভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন সে ভাবেই করতে হবে। কিন্তু সে যদি তা না হয়? কো-টানের আচরণ তাই এমন হতে হবে, যে প্রয়োজনে তা পালটানো যায়। কো-টান তাঁর দ্বিধা কোথায় সে কথা বললেন। জাড-বেন-ওথোর কাছ থেকে কোনো নির্দেশ আসে নি যে তিনি এই ভাবে তাকে সম্মান দেখাবেন। এমন কি তাঁর যে ছেলে আছে, তা-ও জানান নি।

টারজান বলে উঠল, কো-টান ধর্মভীরু রাজার মতোই কথা বলেছেন। কারণ একথা ঠিক যে তাকে নিশ্চিন্ত হতে হবে আগন্তুকই ডর-উল-ওথো। ছেলেকে তিনি এই ভার দিয়েছেন—কো-টান তার প্রজাদের শাসক হবার উপযুক্ত কি না সেটা দেখতে হবে। তাঁর প্রথম আচরণ থেকে এই প্রমাণিত হল যে কো-টান যখন দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন জাড-বেন-ওথো তখনি তার মধ্যে রাজকীয় গুণ আরোপ করেছেন।

টারজানের এই ধীর স্থির উক্তিতে সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হল। এই ভাবেই তা হলে রাজা নির্বাচিত হয়! শিশু যখন মায়ের দুধ খায় তখনি জাড-বেন-ওথো সব ঠিক করে দেন!

দেব-শক্তি সম্পন্ন আগন্তুক! তাদের উপাস্য দেবতার

সঙ্গে সম্ভবতই রোজ, সব বিষয় আলোচনাও করেন! তাদের মধ্যে নাস্তিক যদি থেকে থাকে, এখন স্বচক্ষে দেবতার ছেলেকে দেখে আর তারা নাস্তিক রইল না।

টারজান তাদের এই দ্বিধাকে তারিফ করতে কসুর করল না। সে যে নকল দেবতা নয়, সে-বিষয়ে তাদের নিশ্চিন্ত হতেই হবে। সে যে সাধারণ মানুষের মতো নয়, কাছে এসে সেটা তারা দেখুক। কি বলে তারা দেবতার পুত্রের থেকেও উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আছে?

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পিরামিডের উঁচু ধাপ থেকে হুড়হুড়, হুড়হুড় করে সবাই নেমে পড়ল। কো-টানও নামলেন, কিন্তু নিজের মর্যাদা রক্ষা করে ধীর স্থির পদক্ষেপে।

টারজান তখন সবার উদ্দেশ্যে আরেকবার বলল যে তাদের সন্দেহ করার এখন আর কোন কারণ থাকতে পারে না। পুরোহিতরা তো তাদের বলেছে যে জাড-বেন-ওথো ল্যাজহীন—সুতরাং তাঁর সংশোদ্ভব দেবতারাও ল্যাজহীন। কিন্তু এই ধরনের প্রমাণের আর প্রয়োজন নেই। সবাই জাড-বেন-ওথোর শক্তির কথা জানে—তাঁরই ইচ্ছায় আকাশ থেকে বিদ্যুৎ-ঝলক মৃত্যু নিয়ে আসে। তাঁরই আজ্ঞায় বৃষ্টি পড়ে, গাছপালা ফলমূল, বিভিন্ন শস্য এমন কি ঘাস পর্যন্ত জন্মায়, জন্ম-মৃত্যু সবই তাঁর শাসনাধীন। যারা তাকে সম্মান করে, এই কারণেই করে। আর তাই যদি হয়, তাহলে যে মিছা-মিছি নিজেকে তার ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছে, কি তার অবস্থা হবে? এটাই যথেষ্ট প্রমাণ—তোমরা যদি আমার দৈব-জন্ম অস্বীকার কর তোমাদের যে অবস্থা হবে, যে অন্যায় ভাবে নিজেকে তাঁর আত্মীয় বলে পরিচয় দিচ্ছে তারও ঐ একই অবস্থা হবে—নিস্তার পাবে না কেউ।

অকাট্য এ যুক্তি—তাই বিশ্বাস্য। এর ওপর প্রশ্ন করতে গেলে, শুধু এই প্রমাণই হবে যে জাড-বেন-ওথোর শক্তির ওপর তাদের আস্থা নেই। কো-টানের মনে আর কোনো সন্দেহ নেই—কিন্তু এই মাননীয় অতিথিকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করতে হবে?

আদি কাল থেকে, রাজা ছাড়া আর কারো পা স্পর্শ করেনি আ-লুরের রাজসভার পিরামিডের শীর্ষে। কো-টান তাই মনে করলেন, সেখানে তাঁর পাশে বসার থেকে, অধিক কি সম্মান তিনি ডর-উল-ওথোকে দেখাতে পারেন? তিনি টারজানকে তাই শীর্ষস্থিত, পাথরের তৈরি আসনে বসার জন্য ওপরে নিয়ে গেলেন। একেবারে ওপরে গিয়ে, কো-টান ঐ আসনে বসার জন্য এগিয়ে যেতেই টারজান হাত বাড়িয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে দেবতার সঙ্গে একই আসনে বসার কারো অধিকার নেই বললেন। কো-টান শুধু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন না, সেটা প্রকাশ করতেও ভীত হলেন—যদি তাতে দেবতা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু দেবতারূপী টারজান তাঁকে বিশেষ সম্মান দেখাতে চান—সেই জন্য তাঁকে, তাঁর পাশে বসার জন্য আহ্বান করলেন। কারণ এমন নিমন্ত্রণ করার অধিকার দেবতাদের আছে।

টারজানের এই ব্যবহারের মূলে ছিল দুটো উদ্দেশ্য—প্রথম, কো-টানের মনে ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগানো, অথচ এমন ভাবে যাতে সে মনে মনে তার শত্রু না হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, টারজান ঠিক জানে না হো-ডনদের ধর্মের প্রভাব তাদের ওপর কত গভীর! কারণ টারজানের কথায়, যখন থেকে ওম-আট আর টা-ডেনের ধর্মমতের পার্থক্য নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হল তখন থেকেই ধর্ম-আলোচনা একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে। তার এই আচরণে উপস্থিত সৈনিকদের শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দিল, কো-টানের মনে বৈরী-ভাবও জাগল না।

এবার টারজানের নির্দেশে রাজসভার কাজ আবার আরম্ভ হল। তার বেশির ভাগই সৈনিকদের ঝগড়া মেটানো। সিংহাসনের নিচের ধাপে দাঁড়াবার অধিকার কেবল মাত্র কো-টানের রাজত্বের বিভিন্ন মিত্র-গোষ্ঠীর নেতাদের। তাদের মধ্যে টারজানের দৃষ্টি গেল বলশালী, পুরুষোচিত সুন্দর একজনের ওপর। কো-টানের দরবারে তার আসার উদ্দেশ্য চির পুরাতন এক ব্যাপারে—এক প্রতিবেশীর সঙ্গে জমির সীমানা নিয়ে বিবাদ। এতে টারজানের কোন কৌতূহল ছিল না—বক্তার সুন্দর চেহারা প্রথম থেকেই তার নজরে পড়েছিল। কো-টান যখন তাকে জা-ডন বলে ডাকলেন, টারজানের মনে তখনি গভীর কৌতূহল জেগে উঠল, কারণ টা-ডেনের বাবার নাম জা-ডন। এই জ্ঞান যে তার কোনো কাজে লাগবে তার আশা খুবই সঙ্কীর্ণ, সে তো তার ছলনার কথা কিছুতেই এখন স্বীকার করতে পারে না—সুতরাং টা-ডেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের কথা প্রকাশও করা যায় না।

রাজসভার কাজ শেষ হয়ে গেলে, কো-টান জাড-বেন-ওথোর ছেলেকে নিয়ে জাড-বেন-ওথোর পূজা যে মন্দিরে হয় সেখানে যাবার প্রস্তাব করলেন। রাজা নিজে তার সঙ্গে তার অনুচর সৈনিকদের নিয়ে রাজপ্রাসাদের বারান্দা দিয়ে উত্তর দিকে চললেন, শেষের দিকের বাড়ির দিকে।

প্রধান পুরোহিতকে দেখেই টারজান বুঝতে পারল,

এখানেই তার সব চেয়ে বড় বিপদ। পাল-উল-ডনের সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে এরই জাড-বেন-ওথোর বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান ছিল, সুতরাং যে নিজেকে দেবতা-প্রধানের পুত্র বলে পরিচয় দিচ্ছে, তার বিষয় এর-ই সন্দেহ-ও বেশি। মনে যত সন্দেহই থাকুক না কেন, আ-লুরের প্রধান পুরোহিত লু-ডন প্রকাশ্যে টারজানের ডোর-উল-ওথো নাম ব্যবহারের অধিকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলল না। হয়তো বা তার মনও দ্বিধায় ভরা— সুতরাং সাময়িক ভাবে অন্ততঃ লু-ডন কিছুই করল না। তবু টারজান টের পেল প্রধান পুরোহিতের অন্তরের বাসনা—তার ছলনার বেশ খুলে দেওয়া।

মন্দিরের প্রবেশদ্বার থেকে, কো-টান লু-ডনের ওপর ছেড়ে দিলেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার ভার।

টারজানকে লু-ডন নিয়ে গেল বিরাট এক ঘরে— এখানে স্তূপীকৃত রয়েছে বিভিন্ন দলপতিদের দেওয়া পূজার অর্ঘ্য সকল—শুক্‌নো ফল থেকে সুরু করে পিটোন সোনার বাসন-পত্র। আশপাশের ঘর ও বারান্দা ভরে গেছে তাতে। এত ঐশ্বর্য ওপারের খাজাঞ্চীখানার অধিকারীর চোখেও কখনও পড়েনি। মন্দিরের ভিতরে কালো ওয়াজ-ডন ক্রীতদাসরা ঘুরে বেড়াচ্ছে—এদের নিশ্চয় হো-ডনরা ওদের গ্রাম থেকে, ক্রীতদাস বানাবার জন্যেই বন্দী করে এনেছিল।

দরজায় গরাদ লাগান এক অন্ধকার বারান্দার পাশ দিয়ে যেতেই টারজানের চোখে পড়ল ভিতরে বহু হো-ডন ও ওয়াজ-ডন ছেলে ও মেয়ে রয়েছে—সবারই বিষণ্ণ ভাব, মুখে হতাশার ছাপ। তারা কে, লু-ডনকে জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গেই টারজান বুঝতে পারল সে ভুল করেছে। লু-ডনের মুখে সন্দেহের ভাব প্রায় ফুটে উঠল। সে ফিরে টারজানকে বলল যে জাড-বেন-ওথোর ছেলের তো এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জানার কথা। টারজান গম্ভীরভাবে তাকে জবাব দিল যে ডোর-উল-ওথোর প্রশ্নের উত্তর পাল্টা প্রশ্ন হলে শাস্তির ভয় আছে। এ-ও বলল টারজান যে জাড-বেন-ওথো খুশীই হবেন যদি তাঁর মন্দিরের বেদী প্রতারক প্রধান পুরোহিতের রক্তে রঞ্জিত হয়।

ফ্যাকাশে মুখে লু-ডন টারজানকে জানাল যে ওরাই হচ্ছে পূজার অর্ঘ্য—সারাদিনের পর সূর্য যখন জাড-বেন-ওথোর কাছে ফিরে যাবে, তখন ওদের রক্ত পুব দিকের বেদীগুলোকে সতেজ করে তুলবে।

টারজান তখন তাকে জিজ্ঞেস করল কে বলেছে যে জাড-বেন-ওথো তাঁর প্রজাদের, তাঁর বেদীতে উৎসর্গ করলে খুশী হন? এই বিশ্বাস যদি ভুল হয়, তখন কি হবে?

লু-ডন জবাবে স্বীকার করল যে তাহলে অগুন্তি মানুষ বৃথাই প্রাণ হারিয়েছে।

কো-টান ও তাঁর যোদ্ধারা মন দিয়ে এই কথাবার্তা শুনছিলেন। গরাদ লাগানো দরজার পিছন থেকে অসহায় কয়েকজন বন্দীও এসব কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল দরজার কাছে ঘেঁষে। তার ভিতর দিয়ে সূর্যাস্তের পূর্বে যাদের যেতে হয়—কোন দিন তারা আর ফেরে না।

কু-সংস্কারের অন্ধ বিশ্বাসের জন্য এই হতভাগ্য বন্দীদের হাত দিয়ে দেখিয়ে টারজান তাদের মুক্তির আদেশ দিয়ে শুধু এই বলল যে জাড-বেন-ওথোর হয়ে সে তাদের জানাতে চায় যে তারা ভুল করছে।

●

লু-ডন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। যুগ-যুগান্তর ধরে দেবরাজের পুরোহিতরা জাড-বেনের উদ্দেশ্যে সূর্য যখন পশ্চিম দিকে হেলেছে, সেই সময় একটি করে বলি দেয়—কই দেবরাজ তো তাতে কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন-নি কখনো? টারজান বাধা দিয়ে বলল পুরোহিতদের অন্ধ মূঢ়তা জাড-বেন-ওথোর ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়ে এসেছে এতকাল—তা না হলে হো-ডনদের এতজন সৈনিক ওয়াজ-ডন-দের ছোরা ও মুগুরের শিকার কেন হয়? কেন এতজন সিংহ ও বাঘের কাছে প্রাণ হারায়? এমন কোনো দিন যায় না যেদিন হো-ডনদের গ্রামের এক বা একাধিক অধিবাসী প্রাণ না হারায়। তাঁর বেদীতে পূজার বলি হিসাবে যারা প্রাণ হারায় তাদের মৃত্যুর মূল্য হিসাবেই জাড-বেন-ওথো ঐ সব দুর্ঘটনা ঘটান। জাড-বেন-ওথোর বিরক্তির প্রমাণ এর থেকে কি হতে পারে?

লু-ডন নিরুত্তর, তার মনে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব। তার ভয়, যদি আগন্তুক যথার্থই দেবতার পুত্র হয়! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই আশাও করছে সে যে না, তা নয়। শেষ পর্যন্ত ভয়ই জয়ী হল। অধীন এক পুরোহিতকে বন্দীদের মুক্ত করে যার যার গ্রামে ফেরত পাঠাবার আদেশ দিল—কারণ জাড-বেন-ওথো তাই বলেছেন।

তার আজ্ঞানুযায়ী ঐ পুরোহিত কারাগারের দরজা খুলে দিলে, মুক্ত বন্দীরা সবাই এই দৈব ঘটনার বিষয় সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে টারজানের সামনে হাঁটু গেড়ে গলা ছেড়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল। প্রধান পুরোহিতের মতো কো-টানও পুরোনো প্রথা রদ করায় অভিভূত হয়ে, জানতে চাইলেন কি

করলে জাড-বেন-ওথো সন্তুষ্ট হবেন ?

টারজান মত প্রকাশ করে বলল যে জাড বেন-ওথোর বেদীতে পূজার অর্ঘ্যস্বরূপ, যে খাবার ও অন্য জিনিসের চল আছে সে দেশে, তা দিতে হবে—ও তা বিলিয়ে দিতে হবে শহরের দরিদ্রদের মধ্যে। ঐ সব জিনিস মন্দিরে জমা রয়েছে তা টারজান স্বচক্ষে দেখেছে। পুরোহিত যখন সবাইকে জানিয়ে দেবে যে তাদের জাড-বেন-ওথোর কৃপা পেতে হলে, এইসব জিনিস উৎসর্গ করতে হবে—তখন তার আর অভাব থাকবে না।

মন্দিরের এলাকা ছেড়ে বেরোতে গিয়ে টারজানের চোখে পড়ল কারুকার্যভূষিত, সুন্দর একটা ছোট বাড়ি—অন্যান্য বাড়ি থেকে একেবারে আলাদা। দেখে মনে হয়, চূণা পাথরের ছোট এক ঢিপি থেকে তৈরি। কিন্তু তার দরজা জানালাগুলো খোলা নয়, গরাদ দিয়ে বন্ধ। লু-ডনকে, ঐ আলাদা বাড়িটা কার উদ্দেশ্যে তৈরি ও কে সেখানে কারারুদ্ধ জিজ্ঞেস করাতে ভয়-ভয় উত্তর এল যে কেউ এখানে বন্দী নেই, বাড়িটির কোনো বিশেষ তাৎপর্যও নেই, যদিও এককালে সেটার ব্যবহার ছিল।

লু-ডন এবার টারজানকে নিয়ে প্রাসাদের দিকে ফিরে, তার প্রবেশ-দ্বার পর্যন্ত এসে অন্যান্য পুরোহিতদের সঙ্গে সেখানেই থেমে গেল। কো-টান ও তার সৈনিকদের সঙ্গে টারজানও মন্দিরের পবিত্র-এলাকার বাইরে চলে গেল।

টারজানের মনে কেবল একটা মাত্র প্রশ্ন যে তার মতো দেখতে বিদেশী কোন স্ত্রীলোক আ-লুর নগরীতে এসেছিল কিনা। কিন্তু পাছে এই প্রশ্নে অবিশ্বাসীদের সন্দেহ বেড়ে যায় তাই তখন কিছু জিজ্ঞেস না করে, সে স্থির করল যে শুতে যাবার আগে কো-টানকে হয় সরাসরি কিম্বা ঘুরিয়ে এই প্রশ্ন করবে।

রাত্রে খেতে বসার সময় টারজান লক্ষ্য করল, যেসব কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস তাদের খাবার পরিবেশন করছে, তাদের একজন হঠাৎ তাকে চিনতে পেরে আরেকজন ক্রীতদাসকে মাথার ইশারায় টারজানকে দেখিয়ে দিল। টারজান ঐ ওয়াজ-ডনকে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে না পেরে ঐ ইঙ্গিতের তাৎপর্য বুঝতে পারল না। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে তা ভুলেই গেল প্রায়।

এদিকে কো-টান অবাক ও বিরক্ত হয়ে দেখল, টারজান উপাদেয় সব খাবার তাদের মত পরিমাণে তো খাচ্ছেই না আর হো-ডনদের সেই পানীয় মুখেই দিচ্ছে না।

এদিকে টারজান এদের খাদ্য ও পানীয়র প্রতি আসক্তি দেখে অবাক। কোন কথাবার্তার সময় নেই অতিথিদের, চারদিকে খালি খাওয়ার আওয়াজ।

একে একে সবাই মদের নেশায় বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, টারজান আর ক্রীতদাসরা বাদে। দাঁড়িয়ে উঠে টারজান তার পিছনের কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসকে বলল তাকে তার ঘরে নিয়ে যেতে তার ঘুম পেয়েছে।

যখন টারজানকে নিয়ে ঐ ক্রীতদাসটি খাবার ঘর থেকে বার হয়ে গেল, তখন আগে যে ক্রীতদাস টারজানকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল সে তারই মতো আরেকজন ক্রীতদাসের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল। সে টারজানের দিকে তাকিয়ে ভয়-ভয় ভাবে মতামত প্রকাশ করে বলল যে প্রথম জনের কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে কর্তৃপক্ষ তাদের মুক্তি দেবেন নিশ্চয়, কিন্তু ভুল হলে, তাদেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু প্রথম জন নিশ্চিত সে ভুল করেনি। শুনে দ্বিতীয় জন দৃঢ় ভাবে বলল যে একথা পুরোহিত-প্রধান লু-ডনকে জানানো দরকার—কারণ মন্দিরে এর আচরণে লু-ডন বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ—ভীতও বটে। এ-ও বলল সে, যে সে-মন্দিরে কাজ করেছে, লু-ডনকে তাই চেনে। তাহলে সময় নষ্ট না করে তাকে এ কথা জানাতে হবে ও মূল্য স্বরূপ লু-ডনের কাছ থেকে তাদের মুক্তির কথা পাকাপাকি করে নিতে হবে।

দেরি না করে কৃষ্ণকায়টি এক ওয়াজ-ডন মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে এসে, প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করতে চাইল অতি প্রয়োজনীয় এক ব্যাপারে। যদিও বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল, লু-ডন তার সঙ্গে দেখা তো করলই, উপরন্তু কথা দিল যে তার অনুমান সত্যি বলে প্রমাণিত করতে পারলে সে ও তার বন্ধু মুক্তি তো পাবেই, সঙ্গে পাবে প্রচুর উপহারও।

এই কথাবার্তা যখন হচ্ছে, ঠিক সেই সময় পাস্টার-উল ভেডের পাশ দিয়ে একজন অতি সাবধানে এগিয়ে চলেছে, চাঁদের আলোতে তার কাঁধ থেকে ঝোলান বুকে-বাঁধা এন-ফিলড্ বন্দুকের নল ও কার্তুজের তামার আবরণ ঝিক্‌মিক্ করছিল।

টারজানের পথপ্রদর্শক তাকে নিয়ে গেল নীল হ্রদের দিকে তার শোবার ঘরে। ওয়াজ-জন গ্রামের মতো এখানেও সেই একই রকম বিছানা—উঁচু পাথরের বেদীর ওপর অনেক প্রস্থ লোমওয়ালা জন্তুর ছাল। শুতে গিয়ে টারজানের খালি মনে হতে লাগল, যে প্রশ্নের উত্তরের জন্য সে ব্যাকুল, সে প্রশ্ন তখনও করা হয়নি, উত্তরও মেলেনি তাই।

ভোরে উঠে টারজান প্রাসাদের ও তার বাগানের চার-দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ক্রীতদাস ছাড়া অন্য কেউ জাগার আগে—অন্ততঃ আর কাউকে তার চোখে পড়েনি।

ঘুরতে ঘুরতে টারজান প্রাসাদের মাঝখানে দেয়াল দেওয়া এক বাগানের কাছে এসে পড়ল। সব জায়গা সে খুঁজে দেখতে বদ্ধপরিকর, সুতরাং এর ভিতরে তার ঢোকা দরকার। কিন্তু ঢুকবে কেমন করে? কোনো দরজা বা জানালা দেখতে পেল না। কিন্তু তাতে খুব অসুবিধা হবে না তার।

বাগানের খানিকটা অংশের ছাদ ছিল না। ভিতরের গাছ-পালার শাখা-প্রশাখা দেখা যাচ্ছিল। তার সেই মোটা দড়ি বার করে, ছুঁড়ে দিল সে, কাছের একটা ডালে। তার-পর বাঁদরের মতো, তরতরিয়ে ওপরে চড়ে ভিতরকার গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড় ও ফুলে সাজানো সুন্দর এক বাগান তার চোখে পড়ল। কেউ নেই সেখানে। না হো-ডন বা ওয়াজ-ডন, না হিংস্র জন্তু-জানোয়ার।

টারজান হাল্কা লাফে ভিতরে নেমে, আবার অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করল।

এখানে কেউ নেই—এটাই টারজানের কৌতূহলের কারণ। সাধারণের ব্যবহারের জন্য এ বাগানটা নয়, এমন কি প্রাসাদের অন্য বাগানেও যাদের অবাধগতির অধিকার আছে তারাও নেই। এই জনশূন্যতা দেখে টারজানের মনে হল, হয়তো এখানেই তার অনুসন্ধানের শেষ।

বাগানের ভিতরে একাধিক কৃত্রিম জলাশয়, দুধারে তাদের ফুলের ঝাড়—মনে হয় কোনো বিশেষজ্ঞের সুনিপুণ হাতে তা তৈরি। প্রকৃতিকে তা না হলে এমন সুন্দর ভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হতো না। দেয়ালের ভিতর দিকটার কারুকার্য পাল-উল-ডনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। সেই চুনা পাহাড়, মাঝে মাঝে তার সবুজ গাছপালা ভরা জায়গা।

বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে টারজান তার অভ্যাস মতো নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ছোট এক উপবনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এক ক্ষুদ্রাকারের ফুল বাগানে হাজির হয়ে প্রাসাদে আসার পর এই প্রথম একজন হো-ডন মেয়েকে দেখতে পেল। অল্প বয়সী, খুব সুন্দরী সে—খোলা জায়গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা পাখিকে বুকের কাছে ধরে তার মাথায় হাত বোলাচ্ছে। তার পায়ের কাছে, টারজানের দিকে পিঠ করে এক হো-ডন ক্রীতদাসী বসে আছে—দুজনের মধ্যে কেউই তার হারান স্ত্রী নয়।

টারজানের দুশ্চিন্তা, তাকে দেখতে পেলে এরা যদি চেঁচামেচি করে! কিন্তু গাছের আড়ালে লুকোবার আগেই হো-ডন মেয়েটা তাকে দেখতে পেয়ে ও কে এবং কেন এখানে এসেছে প্রশ্ন করল। স্বরে তার ভয়ের রেশ মাত্র নেই।

তার গলার স্বর শুনে, ওয়াজ-ডন ক্রীতদাসী ঘুরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে টারজানকে তার 'জাড-গুরু' উপাধি দিয়ে সম্বোধন করাতে, তার মালিক জিজ্ঞেস করল সে একে চেনে কিনা। এই সুযোগে টারজান পান-আট-লি যাতে তার পরিচয় না দেয় তাই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় তাকে কিছু বলতে বারণ করল।

টারজানকে দেখে পান-আট-লি যে রকম অবাক, পান-আট-লিকে দেখে টারজানও সে-রকম অবাক। একদিকে তার মালিক তাকে প্রশ্ন করছে, একই সময় টারজান তাকে জবাব দিতে নিষেধ করছে। সাময়িক ভাবে পান-আট-লি চুপ করে গেল—তারপরে আমতা আমতা করে জবাব দিল যে সে ভুল করেছে তার মনে হয়েছিল যে একে, কোর-উল-গ্রিফের কাছে আগে যেন দেখেছিল।

হো-ডন মহিলা একবার একে দেখল, আরেকবার টারজানকে দেখল—তারপর টারজানকে মনে করিয়ে দিল যে সে তার প্রথম প্রশ্নের উত্তর তখনও দেয়নি।

টারজানের পাল্টা প্রশ্ন হল সে কি শোনেনি তার রাজার কাছে কে এসেছে আগের দিন!

হো-ডন মহিলার চোখের সন্দিগ্ধ ভাব এবার দূর হল—নবাগত তাহলে ডর-উল-ওথো!

টারজান তার পরিচয় জানতে চাইলে মেয়েটি বলল যে সে কো-টান-কন্যা ও-লো-য়া।

এই তা হলে সেই ও-লো-য়া—যার ভালবাসার জন্য টা-ডেন দেশত্যাগী হয়েছে? টারজান এগিয়ে এসে তাকে

বলল যে জাড-বেন-ওথো তার ওপর সন্তুষ্ট। তাই তিনি তার প্রিয়তমকে বহু বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

মেয়েটি বলল বু-লটের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির, আর বু-লটকে কোন বিপদের সামনা সামনি হতে হয়েছে এমন কথা তো সে জানে না।

টারজান বলল বু-লটকে তো সে ভালবাসে না।

এবার ও-লো-য়া প্রশ্ন করল যে সে কি দেবরাজের বিরাগ ভাজন হয়ে পড়েছে কোন কারণে?

টারজান তাকে আশ্বাস দিয়ে জানাল যে তা নয়, জাড-বেন-ওথো তার ওপর সন্তুষ্ট ও সেই কারণেই টা-ডেনকে তার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন।

জাড-বেন-ওথো সবই জানেন, তাঁর ছেলেও তার সকল জ্ঞানের অধিকারী। ও-লো-য়া এ কথা বলতে টারজান তাতে প্রতিবাদ করে বলল যে তা নয়, তিনি যেটুকু জানাতে চান, তার পুত্র শুধু সেটুকুই জানে।

ও-লো-য়া তখন জানতে চাইল ভবিষ্যতে টা ডেনের সঙ্গে তার মিলন হবে কিনা। উত্তরে সে শুনল যে ভবিষ্যতের কথা জাড-বেন-ওথো যদি তাকে জানান, তবে সে তা জানবে।

ও-লো-য়া তখন জিজ্ঞাসা করল টা-ডেন কোথায় আছে, তার সঙ্গে টারজানের দেখা হয়েছে কিনা। টারজান কিছু কথা রেখে-ঢেকে তাকে তখন টা-ডেনের কুশল জানাল।

আরো কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই টারজান তাকে অপেক্ষা করতে বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল যে তার বাবা জাড-বেন-ওথো তাকে বিশেষ কোনো খবর পাঠাচ্ছেন। এ কথা শুনে, ও-লো-য়া আর পান-আট-লি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁটু গেড়ে সেখানেই বসে পড়ল – দেবরাজের নৈকট্য তাদের অভিভূত করে ফেলেছে। তাদের উঠতে বলে, টারজান জানাল যে জাড বেন-ওথোর যা বলার তা বলা হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন যে ক্রীতদাসীটি কোর-উল-জা গোষ্ঠীর। সেখানে টা-ডেন আছে। ওখানকার দলপতি ওম-আটের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

ও-লো-য়া টারজানের পায়ের ধুলো নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়। টারজান এইবার পান-আট-লিকে নিরাপদে তার দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বলল— তা করলে জাড-বেন-ওথো যথার্থই সন্তুষ্ট হবেন।

ও-লো-য়া তো হতবাক—জাড-বেন-ওথো পান আট-লির মতো অতি সাধারণ মেয়ের জন্যও চিন্তা করেন? টারজান তখন সবিস্তারে তাকে বুঝিয়ে বলল যে জাড-বেন-ওথো অদ্বিতীয়, তিনি ওয়াজ-ডন ও হো-ডন দুজনেরই উপাস্য। তিনি সবার দেবতা—পশু-পাখি পাছ-পালা ফুল-ফল সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা।

তিনি যে অদ্বিতীয় এ কথা ও-লো-য়া জানে, কিন্তু যে কথা আজ সে শুনল তা তাদের পুরোহিতরা তো বলেন না। বলল ও-লো-য়া।

টারজান জানতে চাইল বহু ক্রীতদাসী আসে কিনা সেখানে। তা আসে শুনে, টারজান আবার জিজ্ঞাসা করল বিদেশীরা আসে কি না। উত্তরে ও-লো-য়া বলল যে, জাড-বেন-ওথো উপত্যকার অন্য দিক থেকে হো-ডনরা আসে, তবে তাদের তো আর বিদেশী বলা যায় না! টারজান তখন তাকে সে-ই প্রথম বিদেশী কিনা প্রশ্ন করাতে ও-লো-য়া বিস্ময় প্রকাশ করল যে জাড-বেন-ওথোর পুত্রের একজন সামান্য মেয়েকে এই প্রশ্ন কেন করতে হচ্ছে? জাড-বেন-ওথো যদি চাইতেন, তা হলে এ কথা তাকে বলতেন নিশ্চয়।

মনে মনে ও-লো-য়ার বুদ্ধির তারিফ করল টারজান। ওর এই ঘোরানো জবাবে কিন্তু একটা ইঙ্গিতের আভাস আছে মনে হল।

টা-ডেনের ভাগ্য-নিয়ন্তা জাড-বেন-ওথোর নামে, টারজান তাকে জবাব দিতে আদেশ করাতে ভয়ার্ত স্বরে সব কিছু জানাতে স্বীকার করল ও-লো-য়া। এমন সময় কঠোর স্বরে ঝোপের পিছন থেকে প্রশ্ন এল কি বিষয়ের জবাব সে দিতে যাচ্ছে!

কো-টান পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। রাগে তার ভুরু কুঁচকে গেছে। টারজানকে দেখে নিমেষে সেই ভাব চলে গেল, তার বদলে এল সম্ভ্রম আর বিস্ময়। কিন্তু কঠোর গলায় কোটান যা বলল, তার মর্মকথা, ডর-উল-ওথো প্রশ্নকর্তা বটে, তাঁরও কিন্তু ঐ নিষিদ্ধ উদ্যানে প্রবেশের অধিকার নেই।

কঠোর নির্দেশ, সদর্পে বলা, কিন্তু তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে রয়েছে ভগবান সম্বন্ধে মানুষের সেই আদি ভয়। তাই তিনি ডর-উল-ওথোকে, স্বয়ং সব কথা জানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও-লো-য়াকে তার নিজের ঘরে ফিরে যেতে বললেন। পান-আট-লিকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমারী তখন চলে গেল।

কো-টান নিজে আগে গেলেন, টারজান তাঁর পিছনে। তাদের পথ অন্য দিকে। সেদিকের দেওয়ালের কাছে পৌঁছে টারজানকে নিয়ে কৃত্রিম এক গুহার ভিতরে ঢুকলেন। ভিতরে পাথরে-কাটা সিঁড়ি বেয়ে, অন্ধকার এক বারান্দা পার হয়ে তারা প্রাসাদে পৌঁছলেন। অস্ত্র-সস্ত্র সজ্জিত দুজন সৈনিক

প্রবেশ-পথে দাঁড়িয়ে ছিল যাতে কেউ নিষিদ্ধ-উদ্যানে যেতে না পারে।

নিঃশব্দে কো-টান প্রাসাদের যে অংশ তার নিজের, সেদিকে অতিথিকে নিয়ে চললেন। বাইরে বিরাট এক ঘর সৈন্য-সামন্তে ভরা। তারা কো-টানের যদি কোনো প্রয়োজন হয়, তার অপেক্ষায় রয়েছে। কো-টানরা দুজনে ঐ ঘরে ঢুকলে, তারা দুদিকে সরে পথ করে দিতে কো-টানরা মাঝখান দিয়ে চলে গেলেন। দূরের দরজার কাছে, সৈনিকদের পিছনে দাঁড়ানো লু-ডনকে টারজান নিমেষের জন্য দেখতে পেল। তার নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখে টারজানের অবচেতন মন শঙ্কিত হল।

ঠিক ঐ সময়েই বীভৎস শিরস্ত্রাণ পরা এক পুরোহিত বাইরের দরজায় উপস্থিত হল। লু-ডনকে দেখতে পেয়ে সে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে লাগল। লু-ডন তাকে থামিয়ে দিয়ে রাজকুমারীর কাছে গিয়ে ঐ ক্রীত দাসীকে তখুনি তার কাছে মন্দিরে পাঠাতে আদেশ দিল।

আধঘণ্টা বাদে কো-টানের কাছে এক সৈনিক এল—লু-ডন তাঁকে একা তার কাছে যেতে বলেছে। মাথা নেড়ে কো-টান যাবে বললেন। টারজনকে জানালেন যে খানিক বাদেই তিনি ফিরে আসবেন। ইতিমধ্যে যদি তার কোন প্রয়োজন হয়, তার সৈনিক ও ক্রীতদাসরা তো আছেই—তারাই সব করতে পারবে।

●

এক ঘণ্টা বাদে কো-টান ফিরলেন। টারজান ঐ সময়টা, ঘরের কারুকার্য ও পল-উল-ডনের শিল্পীদের হাতের কাজ দেখছিল। তাদের তৈরী ফুলদানি ও বাসনপত্র সোনার পাত দিয়ে মোড়া। অদ্ভুত তাদের সৌন্দর্য! আধুনিক শিল্পীদের হাতের কাজ তার ধার-পাশেও যায় না। এমন সময় কো-টান ঘরে ঢুকলেন। টারজান তার উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখে ব্যস্ত হয়ে তিনি কোনো দুঃসংবাদ পেয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করল। কো-টান অস্ফুট স্বরে কি যেন বললেন। তাঁর পিছনে খুব বড় একদল যোদ্ধাও ঢুকল। যাওয়া-আসার পথ রইল না আর। কো-টান ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে টারজানের দিকে তাকিয়ে জাড-বেন-ওথোর নাম নিয়ে বললেন তিনি যা করতে যাচ্ছেন তা তাঁর নিজের ইচ্ছায় নয়। এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে কো-টান সৈনিকদের আদেশ করলেন টারজানকে ধরতে, কারণ পুরোহিত-প্রধান লু-ডনের মতে, সে ভণ্ড।

রাজপ্রাসাদের ভিতরে রাজার যোদ্ধাদের সঙ্গে বিরোধিতা করা, মৃত্যুকে আহ্বান করা শুধু নয়, তার থেকেও ভয়াবহ। কারণ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়তো ভিত্তিহীন নয় এমন একটা আভাস ও-লো-য়ার কাছ থেকে সে পেয়েছে। সুতরাং নিজের জীবন উৎসর্গ করার সময় নয় এটা।

সৈন্যদের বাধা দিয়ে, এই আচরণের অর্থ কি টারজান জানতে চাইলে কো-টান বললেন, লু-ডন বলেছেন সে জাড-বেন-ওথোর ছেলে নয়, তাকে সভাগৃহে যেতে হবে ও অভি-যোগকারীদের সম্মুখীন হতে হবে। সে যদি যথার্থই জাড-বেন-ওথোর ছেলে হয়, তাহলে তার একথা মেনে নিতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। তিনি কেবল লু-ডনের আজ্ঞা নিয়ে এসেছেন, নিজে আজ্ঞা দেন নি। এসব ব্যাপারে প্রধান পুরোহিত রাজার ঊর্ধ্বে, রাজাকেও তাঁর আদেশ শুনতে হয়।

তাঁর কথাবার্তার ধরণে, টারজানের বুঝতে অসুবিধা হল না যে তিনি টারজানের শঠতা সম্বন্ধে নিশ্চিত নন, তাই নিজেকে বাঁচিয়ে, এ কথা বলছেন। টারজান তাকে বলল যে তাঁর সৈন্যসামন্তরা যেন তাকে না ধরে, পাছে জাড-বেন-ওথো তাদের আচরণ বুঝতে না পেরে, তাদের হত্যা করেন। এই কথা শুনে, প্রত্যেক যোদ্ধা এ-ওর পিছনে যেতে সুরু করাতে, টারজান তাদের আশ্বাস দিয়ে বলল, তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, যেহেতু স্বেচ্ছায় সভায় গিয়ে অভিযোগকারীদের সঙ্গে সে দেখা করবে।

রাজসভায় পৌঁছে, কে পিরামিডের চুড়োয় বসবে তাই নিয়ে একটু গণ্ডগোল বাধল। লু-ডন, প্রধান-পুরোহিত হিসাবে সেই স্থান অধিকার করতে চায়। কো-টান তাতে রাজি নন। আবার টারজান দেবপুত্রের অধিকারে সে স্থান চায়। জা-ডন এই সমস্যা সমাধান করার জন্য তিনজনকেই সেইস্থানে বসার কথা বললেন, কিন্তু স্থানাভাব।

সে যাই হোক, টারজান এবার জিজ্ঞেস করল কে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে আর কে-ই বা তার বিচার করবে। দুটি প্রশ্নেরই জবাবে উত্তর এল, 'লু-ডন'। তাহলে বিচারের প্রয়োজন কি? লু-ডন তো সরাসরি ওখানেই তার শাস্তি স্থির করতে পারে।

নানা কথার পর ঠিক হল, ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার যখন, তখন মন্দিরই এই বিচারের উপযুক্ত স্থান। এই মত নিজে কো-টান, ও লু-ডন সাদরে গ্রহণ করল। কিন্তু কো-টান এই বিচারের দায়িত্ব নিতে রাজি নন কারণ তাঁর

মনে তখনো ভয়, অতিথি জাড-বেন-ওথোর ছেলে হতেও তো পারেন। লু-ডন খুব খুশি। তার নিজের এলাকায় বিচার হলেই তার সুবিধা।

কিছুই যেন হয়নি, এইভাব দেখিয়ে টারজান নামতে নামতে বলল যে লু-ডন কিভাবে দেবতাকে বিক্ষুব্ধ করবে, তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ, জাড-বেন-ওথো রাজ-সভায় যেমন সহজে প্রবেশ করতে পারেন, মন্দিরেও সেভাবে পারেন।

টারজানের কথায় সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। লু-ডন সবাইকে সঙ্গে করে টারজানকে নিয়ে মন্দিরের সবচেয়ে বড় বেদীর কাছে গেল। পশ্চিমের বেদীর পিছনে নিজে দাঁড়িয়ে কো-টানকে বাঁদিকে ও টারজানকে ডানদিকে ইশারায় দাঁড়াতে বলল।

ওপরে ওঠার সময় টারজান দেখতে পেল বেদীর জলে এক সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ ভাসছে। তার অর্থ কি জিজ্ঞেস করাতে লু-ডন ক্রূর হাসি হেসে বলল যে এটা না জানা তার শঠতার আরেকটা প্রমাণ বিশেষ। যে নিজেকে দেবতা-পুত্র বলে দাবী করে সে জানে না যে অস্তগামী সূর্যের আলো যখন পুবের বেদীতে পড়ে, তখন সেই বেদী রঞ্জিত হয় কোন বয়ঃপ্রাপ্তের রক্তে আর সূর্যোদয়ের সময় পশ্চিমের বেদীতে কোন সদ্যজাত শিশুর জীবন উৎসর্গ করা হয়—সবই জাড-বেন-ওথোর চরিতার্থে। হো-ডনদের শিশুরাও এ কথা জানে আর যে জাড-বেন-ওথোর ছেলে বলে নিজের পরিচয় দেয়, সে জানে না? এটাও যদি যথেষ্ট প্রমাণ না হয়, তা হলে অন্য প্রমাণও আছে।

বেদীর বাঁদিকে কয়েকজন কৃষ্ণকায় ওয়াজ-ডন ক্রীতদাস ও পুরোহিত দাঁড়িয়ে ছিল। একজন ক্রীতদাসকে ডেকে সে টারজান সম্বন্ধে যা জানে তা বলতে হুকুম দিল লু-ডন। সে বলল যে টারজানকে সে আগে দেখেছে। কোর-উল-লুল গোত্রীয় সে। কিছুকাল আগে, তার দলের সঙ্গে যেতে গিয়ে, পথে তাদের কয়েকজন কোর-উল-জা সৈনিকের সঙ্গে দেখা হয়। টারজান সেই দলভুক্ত ছিল আর তাদের হয়েই সে যুদ্ধও করেছিল। তবে দেবতারা যেভাবে লড়াই করেন, সেভাবে সে লড়াই করেনি, করেছিল অসীম শক্তিশালী মানুষের-মতো। মুগুরের ঘায়ে অচেতনও হয়ে পড়েছিল। তাকে বন্দী করাও হয়েছিল কিন্তু প্রহরীকে হত্যা করে তার মাথা কেটে ও সেই কাটা মাথাটা খাদের উল্টো দিকের একটা গাছের ডালে বেঁধে রেখে সে পালিয়ে যায়।

আপত্তি করলেন জা-ডন। দেবতার কথা বিশ্বাসযোগ্য না ক্রীতদাসের? লু-ডন তখন বলল তাকে যে কো-টানের একমাত্র কন্যার কথা সে নিশ্চয় অগ্রাহ্য করবে না? কিন্তু রাজবংশের কন্যা তো জনসাধারণের সামনে আসতে পারে না, তাই তাঁর মুখপাত্র হিসাবে তাঁর ক্রীতদাসীকে সেখানে নিয়ে আসবার জন্য লু-ডন হুকুম দিল। সে পান্-আট-লিকে হাত ধরে টেনে সেখানে উপস্থিত করে বলল যে রাজকুমারী ও-লো-য়া, তাঁর এই ক্রীতদাসীকে নিয়ে যখন নিষিদ্ধ-উদ্যানে ছিলেন আর কেউ সেখানে ছিল না। সেই সময় গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এই ব্যক্তি, যে ডর-উল-ওথো বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। তাকে ক্রীতদাসীটি তখন টারজান-জাড-গুরু বলে ডেকে ওঠে—সে নামে কোর-উল-জার ক্রীতদাস তাকে চেনে। রাজকুমারীর ক্রীতদাসী কোর-উল-জা গোষ্ঠীর, কোর-উল-লুলের না। কিন্তু দুজনেই একই নাম ব্যবহার করেছে। ক্রীতদাসী টারজান-জাড-গুরু সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেছে তাকে।

এবারে লু-ডন পান্-আট-লিকে জেরা করতে সুরু করল টারজানের বিষয়। কখনও কি সে বলেছে যে সে দেবতাপুত্র?

না, এমন কথা কখনও সে বলেনি। জা-ডন, আবার আপত্তি করলেন। কিন্তু লু-ডন তা অগ্রাহ্য করে, টারজানের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত করল।

জাড-বেন-ওথোর নামে তাদের দুজনের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হল। যোদ্ধা, পুরোহিতরা, ক্রীতদাসরা মন্দিরের বিচারালয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দেবতার বজ্রাগ্নি কখন এই ভণ্ডকে দগ্ধ করবে তার আশায়। কিন্তু কোথায় সেই বজ্রাগ্নি? টারজান লু-ডনকে বাক্যবাণে জর্জরিত করতে সুরু করল। কই, তার প্রার্থনা, জাড-বেন-ওথো তো শুনলেন না, তাকে তো তিনি অগ্রাহ্য করলেন। ভণ্ড হলে, তিনি নিশ্চয় তার উদ্দেশ্যে বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করতেন। তার জন্য কি তবে অন্য পন্থা নেবেন?

জা-ডন বাদে উপস্থিত সবাই নিস্তব্ধ। জা-ডনের মতে টারজান উপযুক্ত কথাই বলেছে। লু-ডন, জাড-বেন-ওথোকে অনুরোধ করুক তাঁর বজ্রাগ্নি টারজানের দিকে নিক্ষেপ করতে—যার ফলাফলে সকলেই বুঝবে টারজান ভণ্ড না আর কিছু। কিন্তু লু-ডন প্রধান-পুরোহিত, ধর্মীয় ব্যাপারে আর কেউ নেই যে হস্তক্ষেপ করতে পারে—

পরদিন টারজানের মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত।

পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁষে বেদী—মাত্র একজনই সেখানে

দাঁড়াতে পারে। টারজানের পেছনে লু-ডন দাঁড়িয়ে, সামনে প্রায় শ দুই যোদ্ধা ও পুরোহিত।

প্রথম পুরোহিত টারজানকে ধরবার আগেই, টারজানের লোহার মত শক্ত হাত, তাকে ও তার একটা পা ও পিঠের কাপড় ধরে, বেদীর অনেক ওপরে তুলে ধরল। তার পিছনেই অন্য পুরোহিতরা।

লু-ডন ও খোলা ছোরা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছিল। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে, টারজান তার বন্দীকে, লু-ডনের মুখের ওপর সজোরে ছুঁড়ে দিয়েই, নিজে বেদীর ওপরে লাফ দিয়ে চড়ল। সেখান থেকে মন্দিরের দেয়ালের মাথায়। সাময়িক নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে একটা কথাই সে বলল যে এর পরেও কে বিশ্বাস করবে যে জাড-বেন-ওথো তার নিজের ছেলেকে পরিত্যাগ করেছেন? বলেই দেয়ালের বাইরের দিকে লাফ দিল।

ঐ সভায় অন্ততঃ দুজন ছিল, যারা মনে মনে খুশি না হয়ে পারল না—জা-ডন আর পান আট-লি। জা-ডনের তো হাসিই পেয়ে গিয়েছিল সব কিছু দেখে।

যে পুরোহিতকে, টারজান, লু-ডনের মুখে ছুঁড়ে মেরেছিল, মন্দিরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে তার মাথা গেল ফেটে। মৃত্যু তাকে গ্রাস করল। লু-ডন বেঁচে গেল, কয়েকটা চোট লাগা ছাড়া তার আর কিছু হয় নি। দাঁড়িয়ে উঠে, চারদিক খুঁজে টারজানকে দেখতে না পেয়ে প্রথমে ভীত, পরে বিস্মিত হল লু-ডন। কারণ টারজান যে পালিয়ে গেছে তা তো সে জানে না। সবার ওপর আদেশ হল টারজানকে ধরার জন্য। কিন্তু কোথাও টারজানকে দেখতে না পেয়ে লু-ডন হতভম্ব হয়ে পড়ল।

পুরোহিতরা চারদিকে পাগলের মতো ঘুরতে লাগল। যোদ্ধারা তাদের আদেশ উপেক্ষা করে, হয় কো-টানের নয় লু-ডনের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। যতক্ষণ লু-ডনকে তার এক অনুচর পুরোহিত সব কথা বলছিল, কো-টান দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রধান পুরোহিতের নির্দেশের জন্য। সেটা এলও সঙ্গে সঙ্গে। চারদিকের পুরোহিতরা ও যোদ্ধারা মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের দিকে গেল, টারজানকে খোঁজার জন্য। টারজানের দেবত্ব সম্বন্ধে তাদের মনে দ্বন্দ্ব নেই—লু-ডনের অভিযোগ টারজান খণ্ডন করতে পারেনি। কিন্তু তাতে কি যায় আসে? সৈনিকরা টারজানের বীরত্বে মুগ্ধ, আর লু-ডন অপদস্থ হওয়াতে, অনেকেই খুব খুশি।

তন্ন তন্ন করে মন্দিরের বাগান খোঁজা হল, কিন্তু টারজানের চিহ্নও দেখতে পাওয়া গেল না। মন্দিরের ভূ-গর্ভস্থ সব ঘরগুলোতে পুরোহিতরা খুঁজে দেখল, সৈনিকরা দেখল প্রাসাদের সব ঘর, আর মন্দিরের বাইরের বাগান—টারজান কোথাও নেই।

তাড়াতাড়ি লোক গেল সহরে টারজানের পালানোর খবর নিয়ে। সহরবাসীরা যাতে লক্ষ্য রাখে। নিমেষে সহরে ছড়িয়ে পড়ল টারজানের এই পালানোর কথা আর সে যে এতকাল ছলনা করে এসেছে সে কথা। ওয়াজ-ডন ক্রীতদাসরা, তার সম্বন্ধে যা যা বলেছিল, একঘণ্টার মধ্যে সহরে তা ছড়াল। মেয়েরা ও শিশুরা ভয়ে, ঘরে আগল দিয়ে রইল, যোদ্ধারা রাস্তাঘাটে ভয়ে ভয়ে টহল দিতে লাগল।

যোদ্ধারা আর পুরোহিতরা যখন টারজানকে মন্দিরে, প্রাসাদের বাগানে আর সহরে খুঁজছে, সেই সময়, পাহাড়ের খাড়া পথ বেয়ে, কোর-উল-জার কাছে নগ্নদেহে, পিঠে একটা এনফিল্ড রাইফল নিয়ে অজানা একজন এসে পৌঁছল। নিঃশব্দে খাদের নিচের দিকে এগিয়ে চলল সে—সামনে তার সেই পুরনো পথ খুব সাবধানে চলল কারণ বিপদের আশঙ্কা তো সব সময়েই আছে। খাদের ছোট নদীটার পাশ দিয়ে সেই পথ চলছে, মাঝেসাঝে এঁকেবেঁকে গেছে।

একজায়গায় পাহাড়ের পাশে এসে, হঠাৎ মোড় নিয়েছে সেই রাস্তা, সেখানে যেই সে গেছে, অমনি আরেকজনের সঙ্গে মুখোমুখি হল। দুজনেই থেমে গেল। অজানা আগন্তুক দেখল সামনে তার ফর্সা, লম্বা এক সৈনিক, পরণে তার খালি একটা নেংটি যদিও তার কোমরবন্ধের এক দিক থেকে খাপে-ভরা ছোরা ঝুলছে, অন্যদিকে রয়েছে চামড়ার থলে, হাতে রয়েছে মুগুর। ইনি আর কেউ না। টা-ডন শিকারে বেরিয়েছেন। টা-ডন অবাক হলেন তাকে দেখে, কিন্তু ভয় পেলেন না কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আগন্তুক টারজানেরই জাত-ভাই কাজেই শত্রু নয়।

আগন্তুকই প্রথমে হাত তুলে বন্ধুত্বের ভাব প্রকাশ করে সামনে এগিয়ে এসে থামল। টারজানের সঙ্গে এর সাদৃশ্য এতো বেশী যে এ টারজানের সমগোত্রীয় হতে বাধ্য ধরে নিয়ে টা-ডেন তাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। আগন্তুক যে তার কথা বুঝতে পারল না, ঘাড় নেড়ে তা সে জানাল। ইঙ্গিতে এ-ও জানাল যে টারজান-জাড-গুরুকে সে-ও খুঁজছে। কিন্তু কি মনোভাব নিয়ে টা-ডেন তা জানতে চায়। টা-ডেনের লম্বা

ল্যাজ, ও অদ্ভুত হাত-পা দেখে আগন্তুক স্তম্ভিত, কিন্তু তার বন্ধুত্বের ভাবে নিশ্চিন্তও বটে—অচেনা, অজানা দেশে এটাই তো সহায় ও সম্বল।

টা-ডেন তার শিকারের কথা ভুলে গিয়ে স্থির করল আগন্তুককে নিয়ে সে ওম-আটের কাছে যাবে। তারা দুজনে মিলে হয়তো বুঝতে পারবে টারজানের সন্ধান এ কেন করছে। ইশারায় আগন্তুককে তার সঙ্গে যেতে বলে ওরা ওম-আটের গোষ্ঠী যে পাহাড়ের গুহায় থাকে সেই দিকে চলল।

গুহার কাছেই মেয়েদের ও শিশুদের তারা বুনো ফলমূল কুড়োতে দেখতে পেল, তাদের পাহারা দিচ্ছে অল্প-বয়সী জোয়ান ও বৃদ্ধরা। ছোট ছোট চাষ-জমি—তাতে তাদের শস্য হয়। জঙ্গল কেটে, ঝোপ-ঝাড় কেটে এই ক্ষেত-গুলো তৈরী করেছে তারা। সেখানেও তারাই চাষ করছে। তাদের কাস্তে ও কুড়ুল দেখে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রই মনে হয়। তাদের লোমশ, কালো চেহারা দেখে, আগন্তুক দাঁড়িয়ে পড়ে তার তীর-ধনুক বার করতে গেলে, টা-ডেন তার দুশ্চিন্তা বুঝে ইশারায় তাকে নিরস্ত করল। তাকে ঘিরে নানান প্রশ্ন করতে লাগল ঐ ওয়াজ-ডনরা। আগন্তুক তার কিছুই বুঝতে পারল না, যদিও তার নতুন বন্ধুটি যে তাদের ভাষা জানে সেটা বোঝা গেল। এরা যে শান্তিপ্রিয় জাতি, তাদের আচার ব্যবহার তা প্রমাণ করল।

গুহাগুলো কাছেই, সেখানে পৌঁছে টা-ডেন সেই কাঠের খুঁটির সাহায্যে ওপরে উঠতে শুরু করল, সে নিশ্চিন্ত যে, আগন্তুক টারজানের মতোই ঐ খুঁটি বেয়ে ওপরে উঠতে পারবে। হলও তাই, অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা ওম-আটের গুহায় হাজির হল।

ওম-আট তখন সেখানে ছিল না। তার ফিরতে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। এই অবসরে, বহু যোদ্ধা আগন্তুককে দেখতে এল। তাদের সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহারে আগন্তুক টেরই পেল না যে এরা দুর্ধর্ষ যুদ্ধপ্রিয় জাতি। টারজান ও টা-ডেন ছাড়া আর কোনো বিদেশীকে এরা তাদের এলাকায় আসতে দেয়নি কখনো।

ওম-আট যখন ফিরল, তার চেহারা দেখে আগন্তুকের বুঝতে অসুবিধা হল না যে সে নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি—সম্ভবতঃ দলপতি বা রাজা। শুধু সৈনিকদের আচরণেই তা মনে হল না, ওর চেহারায়, আচার ব্যবহারে তার প্রমাণ ছিল। টা-ডেন তাকে সবিস্তারে সব কথা জানিয়ে, ওম-আটকে বললেন যে তার বিশ্বাস এই আগন্তুক টারজানের খোঁজে এসেছে। টারজানের নামের উল্লেখে সে ইশারায় জানাতে চেষ্টা করল যে সে টারজানকেই খুঁজছে।

টা-ডেনরা তার ইশারা বুঝতে পারল আর তার মুখের ভাব দেখে আন্দাজ করল যে সে স্নেহ পরবশ হয়েই তাকে খুঁজছে। কিন্তু ওম-আট নিশ্চিত হতে চায় তাই আগন্তুকের ছোরার দিকে দেখিয়ে টারজানের নাম আবার উচ্চারণ করল; তারপরেই টা-ডেনকে ধরে তাকে ছোরা মারার ভান করে, আগন্তুকের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতে সে সজোরে মাথা নেড়ে, নিজের বুকে একটা হাত দিয়ে অন্য হাত তুলে ধরল যা চিরন্তন মৈত্রীর সঙ্কেত। টা-ডেন এবার নিঃসন্দেহে বলল যে আগন্তুক টারজানের বন্ধু, ওম-আট তার জবাবে বলল যে হয় সে বন্ধু, নয় তো সে ঘোর মিথ্যুক।

টারজানকে তারা চেনে কিনা, সে কি বেঁচে আছে তাদের জিজ্ঞেস করল ও। তাদের ভাষা জানে না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করল। আবার ইশারায় টারজান কোথায় আছে বার করতে চেষ্টা করল। টারজানের নাম উচ্চারণ করে ভিন্ন দিকে দেখায়, আর জবাবে ওম-আট মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে না বলে। এর পর, ওম-আট তার যথসাধ্য চেষ্টা করল টারজান কোথায় তাকে বোঝাতে। ওম-আটদের ভাষায়, বিদেশীকে 'জার-ডন' বলে, তাই সে আগন্তুককে জার-ডন বলে ডাকতে আরম্ভ করল।

তার ইঙ্গিত ও অনুকরণ-বিদ্যা যতদূর সম্ভব খাটিয়ে জার-ডনকে বোঝাতে সক্ষম হল যে টারজান পাঁচদিন আগে তাদের গুহা থেকে বেরিয়ে যায় ও ঐ কাঠের খুঁটির সাহায্যে ওপরের দিকে ওঠে—এর বেশী বোঝাবার শক্তি তার ছিল না। জার-ডনও ইঙ্গিতে জবাব দিল যে সে বুঝতে পেরেছে ওম-আট কি বলছে, সে নিজেও টারজানকে অনুসরণ করবে।

ওম-আট ওর সঙ্গে যেতে চাইলে টা-ডেন তাকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার যোদ্ধাদের নিয়ে যেতে বলল। সকাল অবধি অপেক্ষা করার কথাটা জার-ডনকে বলতে অনুরোধ করল। ওম-আট তাতে রাজি কারণ এই সুযোগে সে কোর-উল-লুলদের সাজা দেবে—তারা তার বন্ধু ও মিত্রকে হত্যা করেছে বলে। টা-ডেন তাকে পরাজিত শত্রু-দের বন্দী করতে বলল—হত্যা করতে নিষেধ করল। কারণ ঐ বন্দীদের কাছ থেকেই টারজানের কথা জানা যেতে পারে।

ওম-আটের বিশ্বাস এই সংঘর্ষে সব কোর-উল-লুলকে সে বন্দী করতে পারবে আর তাদের কাছ থেকে বার করে ফেলবে তারা দুজনে যা জানতে চায়। তারপরে তাদের

কোর-উল-গ্রিফের চুড়ো থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। টা-ডেন এ সব শুনে মুচকি হাসতে বাধ্য হল কারণ সে জানে একজনকেও যদি তারা বন্দী করতে পারে তো ভাগ্য তাদের ভালো।

জার-ডনকে তারা কি করতে চায় বোঝাতে কষ্ট হল না। তাদের শত্রু-অধ্যুষিত এলাকার ভিতর দিয়ে যেতে হবে, সঙ্গে যোদ্ধারা থাকলে তাদের পক্ষে মঙ্গল। তার উদ্দেশ্য সাধনে, যে কোন সাহায্য নিতে সে প্রস্তুত।

সে রাত্রে, জার-ডন, ওম-আটের পৈতৃক গুহার লোমশ-চামড়ার বিছানায় ঘুমোল। পরের দিন, সকালের খাওয়া শেষ করে তারা রওনা হল, সঙ্গে তাদের একশো জন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। আধুনিক যুদ্ধপদ্ধতির মতো, সৈন্যদলের আগে চলল দুজন যোদ্ধা যারা হঠাৎ শত্রুদলের সম্মুখীন হওয়া থেকে, এদের বাঁচাতে পারবে।

কোর-উল-লুলে নেমেই, একলা এক নিরস্ত্র ওয়াজ-ডনের সঙ্গে দেখা। সে ভয়ে ভয়ে খাদ বেয়ে তার গোষ্ঠীর গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। তাকে বন্দী করে ফেলে, ওম-আট তার এক যোদ্ধাকে বললো তাকে সে যেন মারধোর না করে নিয়ে যায় আর তাদের ফেরার জন্য অপেক্ষা করে। বন্দী কোর-উল-লুল তাদের এই আচরণে অবাক।

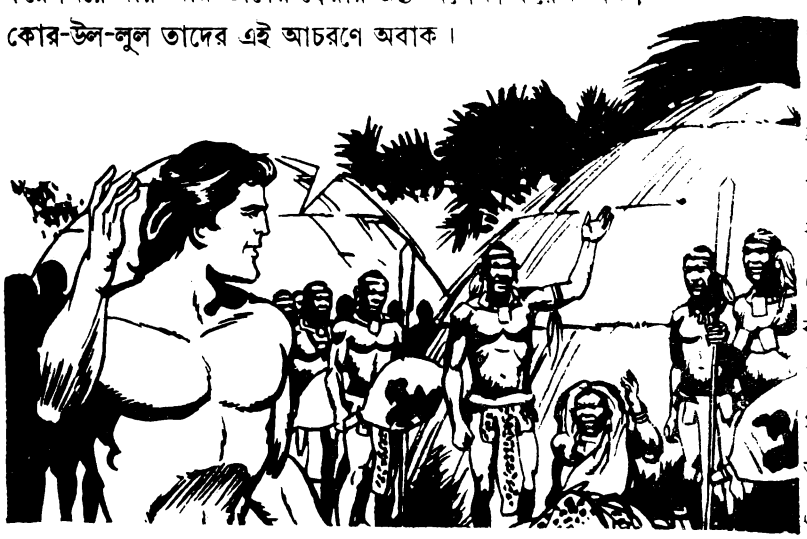

একটু এগোতেই, ওম-আটের ইচ্ছা পূর্ণ হল—বেশ বড় একদল কোর-উল-জা যোদ্ধার সঙ্গে তাদের দেখা। এই কোর-উল-জারা তাদের কোন কাজে, ওপর থেকে নামছিল। নিমেষে তারা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল। কোর-উল-জা তাদের উপস্থিতি টের না পেয়ে ফাঁদে পড়ে গেলে। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল বিকট গর্জনে ও মুগুরের ঘায়ে এক কোর-উল-লুল ধরাশায়ী হয়ে গেল। সুরু হল দুই পক্ষের যুদ্ধ। একসঙ্গে তারা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ না করে একেক জন বেছে নিল অপরপক্ষের একজন যোদ্ধাকে তারপর তাদের মাঝে লড়াই সুরু হল। সূর্যের আলোয় তাদের তলোয়ার ঝকমক করে উঠল, মসৃণ কালো গায়, রক্তের চিহ্ন দেখা গেল। তারই মাঝে আগন্তুকের হাল্কা তামাটে রং-এর শরীর দেখা যাচ্ছিল—সে নিমেষে কোর-উল-জার প্রভেদ বুঝে নিয়েছে—চেহারায় তারা এক বটে, প্রভেদ শুধু তাদের নেংটীতে।

ওম-আট তার প্রথম প্রতিপক্ষকে মেরে জার ডনের দিকে তাকিয়ে তার যুদ্ধ করার ক্ষমতা দেখে তাকে শ্রদ্ধা না করে পারল না। মনে মনে ভাবতে লাগল—যে হাত থেকে টারজান ও জার-ডন এসেছে, কি শক্তিশালী সে হাত। আবার তার মন চলে গেল, নতুন এক প্রতিপক্ষের দিকে।

যোদ্ধারা জঙ্গলের মধ্যে, কখনো সামনে কখনো পিছনে গিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল ও যে কজন বেঁচে রইল ক্লান্তিতে তারা অবসন্ন। কিন্তু জার-ডনের ক্লান্তি নেই। সে বন্ধুদের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তার পিঠ থেকে ঝোলানো অস্ত্রটি সে কিন্তু ব্যবহারই করল না, ওম্-আটও বুঝতে পারল না ঐ অস্ত্রটির তাৎপর্য। তীর-ধনুক কখন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু তার ঐ হাতিয়ারটি তার পিঠেই ঝুলছে হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও।

কোর-উল-জার যে সৈনিকেরা ক্লান্তিতে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েছিল, তারা জার-ডনকে দেখে, লজ্জায় আবার যুদ্ধে নেমে পড়ল। আর কোর-উল-লুলরা তার অক্লান্ত শক্তি দেখে যখন রণক্ষেত্র থেকে পালাতে চেষ্টা করল, ওম-আটের আদেশে তার যোদ্ধারা সবচেয়ে পরিশ্রান্ত ছয়জনকে ঘিরে ফেলে তাদের বন্দী করল। উল্লসিত মনে, ক্লান্ত দেহে এই দলটি কোর-উল-জা ফিরে গেল দলের কুড়িজনকে বয়ে নিয়ে যেতে হল, তাদের মধ্যে ছয়জন মৃতও ছিল। শ্রেষ্ঠ দলপতি হিসাবে ওম-আটের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ওম-আট জানত এই জয়ের পিছনে ছিল তার এই অজানা মিত্রটি। সেকথা প্রকাশ করতে দ্বিধা করল না সে একটুও। ফলে জার-ডনের নাম কীর্তি সবার মুখে। আর যে জাত তার ও টারজানের মত বীরের জন্ম দিতে পারে তার নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। যে কয়েকজন কোর-উল-লুল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরতে পেরেছিল তারাও সে বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল।

গুহায় ফিরে, এক এক করে কোর-উল-লুল বন্দীদের টারজানের কথা জিজ্ঞেস করে প্রত্যেকের কাছ থেকে একই উত্তর এল যে টারজানকে তারা পাঁচদিন আগে বন্দী করেছিল

কিন্তু ওর প্রহরীকে হত্যা করে তার কাটা মাথা সঙ্গে নিয়ে টারজান পালিয়ে যায়। যাবার সময় কোর-উল-লুলের উল্টো দিকে হতভাগ্য প্রহরীর মাথাটা একটা গাছের ডাল থেকে, তারই চুল দিয়ে ঝুলিয়ে গেছে টারজান,—তার পরের ঘটনা তারা কেউ জানে না।

সেই নিরস্ত্র কোর-উল-লুল যাকে ওম-আটেরা প্রথমে বন্দী করেছিল একমাত্র সে-ই অন্য কথা বলল।

সে টারজানের বিষয় যা জানে সবই বলতে রাজি ছিল কিন্তু এক সর্তে। ওম—আটদের কথা দিতে হবে যে তার বদলে তাকে ও অন্য ছয়জন বন্দীকে মুক্তি দেবে তারা। টারজান কোথায় আছে সে জানে। আগের দিনও তাদের দুজনের দেখা হয়েছিল কিন্তু তাদের পূর্ব পুরুষদের গুহায় নিরাপদে ফিরতে দেবার বিষয়ে, ওম-আটদের শপথ গ্রহণ করতে হবে। শপথ গ্রহণ না করলে সে কিছুই বলবে না—মৃত্যু যদি তাদের অনিবার্যই হয় টারজানের বিষয় এরা কিছুই জানতে পারবে না।

টা-ডেন তার কথার যথার্থতা বুঝতে পেরে ওম-আটকে সর্ত গ্রহণ করতে অনুরোধ করল। অনুরোধ ব্যর্থ হল না। ওম-আট কথা দিল। আশ্বস্ত হয়ে সে বলতে সুরু করল যে তিনদিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে সে কোর-উল-লুলের মুখের কাছে শিকার করছিল। হঠাৎ একদল হো-ডন আচমকা এসে তাদের বন্দী করে আ-লুরে নিয়ে যায়। সেখানে কয়েকজন ক্রীতদাস হিসাবে নির্বাচিত হয় ও বন্দীদের মন্দিরের ভূ-গর্ভস্থিত একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হয়, জাড়-বেন-ওথোর কাছে বলি দেবার জন্য। ক্রীতদাসরা তবু পালাবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু ঐ ভূ-গর্ভস্থিত ঘর থেকে কারোর পালাবার আশা থাকে না।

সে বলে চলল, আগের দিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল সেখানে। মন্দির পরিদর্শন করতে একজন এলেন, সঙ্গে তার রাজা ও পুরোহিতরা, সবাই তাঁকে সমীহ করে চলছিল। বন্দীদের আগল দেওয়া দরজার পাশ দিয়ে তাঁরা যখন গেলেন, সে অবাক হয়ে দেখল যে এই ব্যক্তিই কিছুদিন আগে কোর-উল-লুল গ্রামে বন্দী হয়েছিল ও ওম-আটরা যাকে টারজান হাড-গুরু বলেন সেই একই ব্যক্তিকে তারা ডোর-ওল-উথো বলে। বন্দীদের কেন ঐ ভাবে আটক রাখা হয়েছে প্রধান পুরোহিতের মুখে শুনে, রেগে তিনি বলেন যে জাড-বেন-ওথো মোটেই তাঁর লোকদের বলি দেওয়া হোক তা চান না ও প্রধান পুরোহিত তাদের মুক্তি দিতে আদেশ করেন। তার কথায় সব বন্দী মুক্তি পায় ও তাদের আ-লুর ছেড়ে কোর-উল-লুলের দিকে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়। তারা সংখ্যায় খালি তিনজন ছিল ও আ-লুর ও কোর উল-লুলের মাঝের বিপদসঙ্কুল এলাকা পার হতে পারেনি কেউ। খালি সে বেঁচে আছে।

টারজানের বিষয় এর বেশি কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করাতে, বন্দী জবাব দিল যে, এছাড়া সে জানে যে আ-লুরের প্রধান পুরোহিত লু-ডন যে এতে বিশেষ ক্রুদ্ধ। যে দুজন পুরোহিত তাদের সহরের সীমানার বাইরে নিয়ে যায়, তাদের একজন অন্য পুরোহিতকে বলে যে আগন্তুক সেই ডর-উল-ওথো নয়। লু-ডন তাই, এই পাপের জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। বন্দী আর কিছু জানে না এবার সে ও তার সঙ্গীরা ফিরে যেতে চায়।

ওম-আট মাথা নেড়ে স্বীকৃতি দিলেন। জার-ডনকে নিয়ে এবার সে পাহাড়ের চূড়ায় গেল। সেখান থেকে আ-লুর দেখা যাচ্ছিল—অস্তগামী সূর্যের আলোতে সহরটা জ্বল-জ্বল করছিল। ওম-আট পাহাড়ের ওপর থেকে সহরটাকে দেখিয়ে জার-ডনকে জানাল যে টারজান ঐখানে আছে।

তার কথা জার-ডন বুঝতে পারল।

মন্দিরের দেয়াল টপকিয়ে বাইরে নেমেও টারজানের আ-লুর সহর ছাড়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না। তার স্ত্রী যে সেখানে বন্দিনী নয় এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে চায়। এমন সময় একটি মাত্র জায়গার কথা তার মনে এল যেখানে সে সাময়িক ভাবে আশ্রয় পেতে পারে। সেটা হল রাজার নিষিদ্ধ উদ্যান। সেখানকার ঘন ঝোপে সে অনায়াসেই লুকোতে পারে, ফলমূল ও জলেরও অভাব নেই সেখানে। পৌঁছতে পারলে বেশ কয়েকদিন সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে সে। কিন্তু মন্দিরের এলাকা থেকে ঐ নিষিদ্ধ উদ্যান অবধি সে যাবে কি করে? খোলা বাগানের মধ্যে দিয়ে গেলে ধরা পড়তে বাধ্য। কিন্তু মন্দিরের তলার ভূগর্ভস্থ বারান্দাগুলো কিভাবে গেছে, তার বেশ মনে আছে। আগের দিনই তো, তাকে সেই পথ দিয়ে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেগুলো দিয়ে গেলে, কেউ তাকে ধরতে পারবে না এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

মন্দিরের দেয়াল থেকে কিছু দূরেই নীচে নামবার সিঁড়ি ধরে টারজান চলল নিশ্চিন্ত মনে। সব পুরোহিতরাই তো তার বিচার দেখবার জন্য মন্দিরের বিচারালয়ে উপস্থিত, ভয়

কিসের তার। কিন্তু মোড় ঘুরতেই, বিকট মুখোশপরা এক পুরোহিতের সঙ্গে দেখা! দ্বিধা করার লোক নয় টারজান, নিমেষে ছোরা বসিয়ে দিল তার বুকে। মৃতদেহটা মাটিতে পড়ার আগেই সেটা ধরে ফেলে তার মুখোশটা সাবধানে খুলে নিল। সেটা পরে সবার চোখে সে ধূলো দেবে। মৃত পুরোহিতের ল্যাজটাও গোড়া থেকে কেটে নিয়ে, দেহটা ডান দিকের একটা ঘরে নিয়ে গেল, সেই সঙ্গে মুখোশ ও ল্যাজটা।

তাড়াতাড়ি পুরোহিতের চামড়ার নেংটি থেকে সরু একটা টুকরো কেটে নিয়ে ল্যাজের ওপর দিকে বেঁধে ফেলে টারজান সেটা তার নেংটির তলায় পিছনের দিকে আটকে ফেলল। মাথায় পরে নিল সেই মুখোশটা। ব্যস্ ঘাড় অবধি সব ঢাকা। খুব ভাল করে তার হাত ও পায়ের বুড়ো আঙ্গুল না দেখলে কেউ টের পাবে না যে সে আসলে পুরোহিত নয়। বহু ওয়াজ-ডন ও হো-ডনকে, তাদের লেজের আগাটা ধরে নিয়ে যেতে সে দেখেছে, সে-ও সেই পন্থা অবলম্বন করল। বারান্দা দিয়ে, অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে টারজান মন্দিরের বাইরে, রাজপ্রাসাদের বাগানে পৌঁছল। যে সৈনিক ও ক্রীতদাসদের সঙ্গে ওর দেখা হয়, তারা ওর দিকে চেয়েও দেখল না—কোনো পুরোহিত একা একা চলেছে, এ তারা দেখে অভ্যস্ত।

ঠিক হলও তাই, কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করল না—সে নিরাপদে নিষিদ্ধ উদ্যানের ভিতরের দরজায় পৌঁছে গেল। সামনের সুন্দর বাগানের চারদিক ভালভাবে পরখ করে মনে হল কেউ সেখানে নেই। তাড়াতাড়ি বাগানের উল্টো দিকে লুকিয়ে থাকার উপযোগী বিরাট এক ফুলের ঝাড় দেখল। সেখানে অনায়াসেই জনা বারো মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে। নীচু হয়ে হামা দিয়ে সে তার বেশ ভিতরে ঢুকে মুখোশটা খুলে বসে পড়ল। ভাগ্যে তার যা লেখাই থাকুক, আপাততঃ চিন্তা করে স্থির করতে হবে ভবিষ্যতে কি করণীয়।

যে-একটা রাত টারজান আ-লুরে কাটিয়েছিল তাতেই সে বুঝতে পেরেছিল যে রাতে মন্দিরের বাগানে বিশেষ লোকজন থাকে না। সে তার পুরোহিতের পোষাকে বেরোলে কারো নজরে সে পড়বে না। পুরোহিতরা বিশেষ অধিকার পায়। তারা যখন খুসি প্রাসাদে বা মন্দিরে ঘোরাফেরা করতে পারে। সুতরাং রাতই, তার অন্বেষণের পক্ষে উপযুক্ত সময়। দিনে সে নিষিদ্ধ উদ্যানের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে, ধরা পড়ার ভয় মোটামুটি কম সেখানে।

বাগানের বাইরে লোকজনের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছিল। তখনও তাকে চারধারে খোঁজা হচ্ছে বোঝা গেল। টারজান ভাবতে লাগল ঐ ল্যাজটা কি কায়দায় আটকালে পরতে খুলতে সুবিধা হবে। সমাধানও পেয়ে গেল। এবার সে ঐ অদ্ভুত মুখোশটা পরীক্ষা করে দেখল, সেটা খালি একটা গাছের টুকরো থেকে তৈরি। একদিকে চোখ, মুখ, কান ইত্যাদি খোদাই করা, ভিতরটা কুরে কুরে এমন ভাবে পাতলা করা হয়েছে, যাতে সেটায়ও অনায়াসে মাথা ঢোকান যায়। তলার দিকে দুধারে দুই কাঁধে মুখোশটাকে বসাবার জন্য কাটা হয়েছে। বুকের আর পিঠের ওপর কাঠের পাতলা টুকরো এসে পড়েছে আর তা থেকে চুলের গোছা ঝুলছে। সেগুলো যে মানুষের চুল বুঝতে কষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ মন্দিরে যাদের বলি দেওয়া হয়েছে তাদের মাথা থেকে নেওয়া। মুখোশটা সত্যিই বীভৎস—দেখে মানুষের চেহারারও মনে হয়, গ্রিফেরও। মাথায় তিনটে সাদা রং-এর শিং, মুখের রং হলদে, চোখের চার দিকটা নীল। লাল শিরস্ত্রাণ।

মুখোশটা হাতে নিয়ে টারজান সেটার কথাই ভাবছিল—হঠাৎ টের পেল যে দ্বিতীয় কেউ সেখানে এসেছে। তার পায়ের আওয়াজ সে শুনতে পাচ্ছে। প্রথমে সন্দেহ হল তাকেই কেউ খুঁজছে, তারপরেই সে রাজকুমারী ও-লো-য়াকে দেখতে পেল। মাথা নীচু করে কি যেন ভাবছেন, চোখের পাতায় জলের চিহ্ন।

একটু বাদেই আবার ভারী পায়ের আওয়াজ টারজান শুনতে পেল। এবার সেখানে এল দুজন পুরোহিত। তারা ও-লো-য়াকে জানাল, যে লোকটা জাড বেন-ওথোর ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, লু-ডন তার শঠতা প্রমাণ করে দেওয়াতে, সে প্রাণভয়ে সেখান থেকে পালিয়েছে। সর্বত্র তাকে খোঁজা হচ্ছে। তারাও নিষিদ্ধ উদ্যানে তার সন্ধানেই এসেছে। সেদিন সকালেই কো-টান তাকে সেখানে দেখেছিলেন। কি করে যে সে প্রহরীদের এড়িয়ে, উদ্যানে ঢুকেছিল কো-টান তা জানেন না।

কিন্তু ও-লো-য়া তো বাগানেই ছিলেন, তিনি কাউকে দেখেন নি বলাতে পুরোহিতরা নিশ্চিন্ত হল কারণ তাদের আগেই যে পুরোহিতকে তারা বাগানে ঢুকতে দেখেছিল সেই তো তাকে বাধা দিত। ও-লো-য়া তাকেও দেখেনি বলা সত্ত্বেও পুরোহিতরা নিশ্চিন্ত। টারজান নিশ্চয় অন্য কোনো দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তারাও সেখান থেকে চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পান-আট-লি হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে

সেদিকে এল। তার ভীত ত্রস্ত চেহারা দেখে ও-লো-য়া কি হয়েছে জানতে চাইলে, এই প্রথম তার মুখ থেকে শুনলেন টারজান কি করে মন্দির থেকে পালাতে পেরেছে। আর তার জন্য চারদিকে তল্লাসি চলেছে। পান-আট-লির একমাত্র প্রার্থনা যে সে যেন ধরা না পড়ে।

কেন তার এই প্রার্থনা জিজ্ঞেস করাতে, পান-আট-লি তাঁকে বলল যে তিনি টারজানকে চেনেন না বলেই এ কথা বলছেন। এই উত্তর পান-আট-লির স্বীকৃতির সমান। ও-লো-য়া তাকে তিরস্কার না করে পারলেন না। ক্রীতদাসী হয়ে মিথ্যা কথা? তাহলে এই লোকই টারজান জাড-গুরু! ও-লো-য়া তাকে টারজান সম্বন্ধে সব কথা বলতে আদেশ করলেন। পান-আট লিও সবিস্তারে তাঁকে সব কথা বলল— কেমনকরে টোর-ও-ডন ও গ্রিফদের হাত থেকে টারজান তাকে রক্ষা করেছে। তার সাহস ও বিক্রম অতি-মানবের। তার দয়া অসীম, অসহায় মেয়ের ওপর কোনো অত্যাচার করেনি, নিজেকে বাঁচাতে পারত যেখানে সেখানে পান-আট-লির কথাই চিন্তা করেছে। সে যে জাড-বেন-ওথোর ছেলে নয়, এর পর পান-আট-লি সেকথা কেমন করে জানবে? আর এ সবই সে করেছে কোর-উল-জার দলপতি, ওম-আটের বন্ধুত্বের জন্য। হো-ডনরা তাকে বন্দী না করলে, পান-আট-লির সঙ্গে যার এতদিনে বিয়ে হয়ে যেত।

ও-লো-য়া স্বীকার করলেন যে টারজান যে অন্যান্যদের মতো নয়, সে যে অসাধারণ গুণী, তা তাকে দেখেই বোঝা যায়। পান-আট-লি তাঁকে মনে করিয়ে দিল যে সে টা-ডেনের বিষয় শুধু জানে না, টা-ডেন কোথায় তা-ও জানে। কিন্তু ও-লো য়া এখনও পুরোপুরি সব কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না, কারণ টারজানের হয়তো টা-ডেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। শুধু তাই যদি হয়, তাহলে টা-ডেনের প্রতি ও-লো-য়ার ভালবাসার কথা কেমন করে জানল সে? কেমন করে সে, কোর-উল-জার, এস-সাটের গুহা থেকে নানা বিপদ বাধা অতিক্রম করে, কোর-উল-গ্রিফে যে গুহায় সে লুকিয়ে ছিল সেখানে আসে—কি দেখেই বা আসে, খালি পায়ের ছাপ তো পড়েনি কোথাও? সমস্ত পাল-উল-ডনে কোনো অবিবাহিত যুবতী কি তার মত বন্ধু বা রক্ষাকর্তা পাবে?

ও-লো-য়া তার মুখে সমস্ত কথা শুনে বললেন যে লু-ডন ভুল করে থাকতে পারে, হয়তো সত্যিই দেবতাই সে। পান-আট-লি তাকে বাঁচাতে চায়, সে দেবতাই হোক আর যাই হোক। বাঁচলে, সে টা-ডেনকে ও-লো-য়ার কাছে এনেও দিতে পারত। কিন্তু তাতে ও-লো-য়ার কি লাভ? পর দিনই যে তার বিকট মোটা ভুঁড়িওয়ালা কুড়ের হদ্দ বু-লটের সঙ্গে বিয়ে হবে। এখন তিনি পান-আট-লিকে নিয়ে বাগানে যে সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে সেগুলো তুলতে চান, রাতে তাঁর খাটের চারদিকে সেগুলো ছড়িয়ে রাখলে, তার মধুর সুগন্ধের স্মৃতি তিনি মো-সারের গ্রামে নিয়ে যেতে পারবেন। সেখানে সে ফুল পাওয়া যায় না। পান-আট-লির সঙ্গে তিনি নিজের হাতে ফুল তুলতে চান, টা-ডেনেরও এগুলো সব চেয়ে প্রিয় ফুল ছিল।

টারজান সেই ফুলের ঝাড়ের ভিতরে লুকিয়ে ছিল। তারা সেদিকেই আসছে দেখেও তার মনে ধরা পড়ার ভয় ছিল না। সে অনেক ভিতরে লুকিয়েছে।

ফুল তুলতে তুলতে তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে যেতে হঠাৎ একটা অনিন্দ্য সুন্দর ফুল ও-লো-য়ার চোখে পড়ল। তিনি পান-আট-লিকে বললেন ঐ ফুলটা তিনি নিজে তুলবেন।

টারজান যেখানে লুকিয়েছিল, ঠিক তার মাথার ওপরের ঝাড়ে ফুলটা ফুটে ছিল। ছুরি দিয়ে ফুলের লম্বা ডাঁটাটা যেই কাটতে গেছেন তিনি, অমনি তাঁর চোখ পড়ে গেল টারজানের স্মিত হাসিভরা মুখের ওপর। ও-লো-য়ার মুখ দিয়ে চাপা ভয়ার্ত আওয়াজ বেরোতেই, টারজান লাফিয়ে পড়ে তাকে বলল, ভয়ের কোনো কারণ নেই। টা-ডেনের বন্ধু হিসাবে তাঁকে সে অভিনন্দন জানাল। পান-আট-লিও এগিয়ে এসে জাড-বেন-ওথোকে স্মরণ করে বলল টারজানই তাদের সেই আলোচ্য মানুষ।

টারজান এবার প্রশ্ন করল, তাকে কি লু-ডনের কাছে সমর্পণ করা হবে? পান-আট-লি রাজকুমারীর পায়ে পড়ে অনুরোধ করল, শত্রুদের কাছে যেন তাকে ধরিয়ে না দেওয়া হয়।

রাজকুমারী দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তাঁর বাবা কো-টান তাঁর এই ছলনার কথা জানলে রাগে অন্ধ হয়ে পড়বেন আর লু-ডন ও জাড-বেন-ওথোকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁকে বলি দিতে চাইতে পারেন। এই দুই বিপদের মাঝে পড়ে তিনি দিশেহারা হলেন।

পান-আট্-লি সহজেই এই সমস্যার সমাধান করে দিল। বলল, ও-লো-য়া তাঁদের এ কথা না বললে, কেউ জানবে না, সে নিজেও কখনোই ও-লো-য়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

ও-লো-য়া টারজানকে জিজ্ঞাসা করল সে দেবতা কিনা। সে বলল জাড-বেন-ওথোর চেয়ে সে কম নয়। কিন্তু দেবতা হলে, মানুষের হাত থেকে পালাবার প্রয়োজন কি? সুন্দর উত্তর এল টারজানের, মানুষের সঙ্গে দেবতারা যখন মেলামেশা করেন, মানুষের মতোই তাঁদের প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকে। জাড-বেন-ওথো পর্যন্ত মানুষের বেশে এলে তাঁরও মৃত্যু ঘটতে পারে।

ও-লো-য়ার প্রশ্ন এবার অন্য মোড় নিল। তিনি টারজানকে জিজ্ঞেস করলেন যে টা-ডেনের সঙ্গে তার দেখা ও কথা হয়েছে কিনা? দু-সপ্তাহ তার কাছে টারজান ছিল শুনে, জানতে চাইলেন যে টা-ডেনের কি এখনও তাঁর ওপর টান আছে?

এ প্রশ্নে টারজান আশ্বস্ত হলো, ও-লো-য়ার কাছ থেকে কোন ভয় নেই। টা-ডেন তো খালি রাজকুমারীর কথাই বলেন। তিনি তাঁদের দুজনের মিলনের দিনের আশায় আছেন। এ কথা টারজান বলাতে, বিষণ্ণ স্বরে ও-লো-য়া ঐ ইচ্ছার অসারতার কথা বললেন, কারণ পর দিনই বু-লটের সঙ্গে তাঁর বিয়ে। কিন্তু পরের দিনটা চিরকাল পরের দিনই থেকে যেতে পারে— না-ও আসতে পারে, টারজান এই মত প্রকাশ করাতে, ও-লো-য়া বললেন যে তাঁর কপালে দুঃখ লেখা আছে। টা-ডেনকে কখনোই তিনি পাবেন না। লু-ডন না থাকলে, টারজান তাঁকে নিশ্চয় রক্ষা করতে পারত। জানে, এখনও হয়তো পারে।

ও-লো-য়া বললেন যে তিনি জানেন সম্ভব হলে ডোর-উল্-ওথো তা করবেন। পান-আট্-লির কাছ থেকে তিনি, তাঁর দয়ার কথা, অসীম শক্তির কথা সবই শুনেছেন। টারজান বলল যে শুধু জাড-বেন-ওথোই ভবিষ্যতে কি হবে জানেন। এখন তাঁদের দু-জনের সেখান থেকে চলে যাওয়াই মঙ্গল— তা না হ'লে লোকের সন্দেহ হতে পারে। তাঁরা চলে যাবেন, কিন্তু পরে পান-আট-লি টারজানের খাবার নিয়ে ফিরে আসবে বলে তাঁরা চলে গেলেন। টারজানও আবার লুকিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যাবেলা, পান-আট্-লি তার খাবার নিয়ে একা এল। টারজানের এতে সুবিধাই হল। যে অচেনার বিষয়ে চারদিকে গুজব রটেছে যে সে আ-লুরে কোথাও লুকিয়ে আছে, ও-লো-য়াও যার বিষয় উল্লেখ করেছিলেন, তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা গেল।

পান-আট-লি বলল যে অন্য ক্রীতদাসরাও তার বিষয় নিচু গলায় আলোচনা করে। তারা বলে যে এক অচেনা স্ত্রীলোক মন্দিরে লুকনো আছে। লু-ডন চায় যে সে মন্দিরের স্ত্রী-পুরোহিত হয়। কিন্তু কো-টান তাকে স্ত্রী হিসাবে চান। পরস্পরের ভয়ে কেউ এগোতে পারছে না। কিন্তু মন্দিরে কোথায় তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে সে তা জানে না। এখন কি এটা নিছক গুজব, না তার পিছনে সত্য আছে, এ বিষয়েও সে কিছুই বলতে পারে না।

খালি একজনকে নিয়েই কি এই গুজব, টারজান জানতে চাইলে, পান-আট্-লি বলল যে, সবাই আরেক জনেরও কথা বলে। অচেনা বন্দিনীর সঙ্গে সে এসেছিল, কিন্তু এখন কোথায় সে, কেউ বলতে পারে না।

টারজান সব শুনে পান-আট্-লিকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল হয়তো তাদের দুজনের অজান্তে তার সুবিধাই হয়েছে এই খবরে। পান-আট্-লিও সেই আশা রাখে যে টারজানের এতে সাহায্য হয়েছে। এই বলেই প্রাসাদের দিকে সে ফিরে গেল।

টারজানও জোর গলায় বলল যে সে-ও সেই আশাই পোষণ করে।

রাত হলে টারজান মন্দিরের নিচে যে পুরোহিতকে সে হত্যা করেছিল, তার মুখোশ পরে ল্যাজটা আটকে নিল। আবার যদি সে প্রহরীদের সামনে দিয়ে বেরোয় তাদের সন্দেহ হতে পারে, তাই লাফ দিয়ে মন্দিরের দেয়ালের কাছে একটা গাছে চড়ে, তার ডাল বেয়ে এগিয়ে গিয়ে, লাফিয়ে বাইরে পড়ল।

পালাবার সময় যে দিক দিয়ে সে গিয়েছিল, ইচ্ছে করেই এবার সে, তার উল্টো দিক দিয়ে মন্দিরের দিকে চলল। এই দিকটা সে চেনে না, তাতে সে দমল না, নিজের ওপর তার সম্পূর্ণ আস্থা। গন্তব্য স্থলে সে ঠিক পৌঁছতে পারবে।

দেয়াল ঘেঁষে চলল সে, পথে তো গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড়ের অভাব নেই। নিরাপদেই সে কারুকার্য খচিত যে ইমারতের প্রয়োজনীয়তার কথা লু-ডনকে জিজ্ঞেস করেছিল আর যার বিষয় লু-ডন বলেছিল যে তার মনে নেই, সেখানে পৌঁছাল। লু-ডনের মধ্যে একটু ইতস্তত করার ভাব দেখে তখন তার মনে হয়েছিল যে লু-ডন মিথ্যা কথা বলেছে।

একা সামনে দাঁড়িয়ে তিন তলা সেই ইমারতকে ভাল করে পরীক্ষা করবার এই প্রথম সুযোগ পেল সে। অন্যান্য সব ইমারত থেকে দূরে অবস্থিত এটা। খালি একটাই

দরজা। সেটাও বন্ধ। দরজাটির গঠন-প্রণালীর বিশেষত্ব আছে। একটা বড় পাথর কেটে গ্রিফের হাঁ-করা মুখের মধ্যে গরাদ দেওয়া সে দরজা। তার দুদিকে জানালা—সে-গুলোতেও গরাদ দেওয়া। আশেপাশে কেউ নেই দেখে টারজান গরাদ দেওয়া দরজাটা খুলবার চেষ্টা করে বিফল হল। এরকম গরাদ সে আগে কখনও দেখেনি আর সেগুলো এতই শক্ত যে ভাঙ্গাও যাবে না। জানালাগুলোও গরাদ দিয়ে বন্ধ, যেমন সে আশঙ্কা করেছিল। বুদ্ধি দিয়ে যদি সেগুলো খুলতে না পারে। তা হলে শেষ অবধি তার বাহুবলের সাহায্য নিতে সে বাধ্য হবে।

চারদিক ঘুরে দেখল টারজান, অন্য জানালাগুলোও একই ভাবে বন্ধ। আশেপাশেও কেউ নেই তাই সে নিশ্চিন্তে সব পরীক্ষা করছিল।

ইমারতটির দেয়াল, ওদেশের সেই চিরাচরিত প্রথায় তৈরি। নানান কারুকার্য তাতে, তা ছাড়া আঁকা-বাঁকা অদ্ভুত খাঁজ-কাটা। টারজানের পক্ষে এই খাঁজের সাহায্যে ওপরে ওঠা একটুও অসুবিধা নয়। কিন্তু মাথায় ভারী ও বড় মুখোশ থাকলে ওপরে ওঠার সময় অসুবিধা হবে ভেবে সেটাকে খুলে দেয়ালের কাছে মাটিতে রেখে তাড়াতাড়ি তিন তলায় গিয়ে দেখে সেখানকার জানালাগুলোতে শুধু যে গরাদ নেই তা নয়, উপরন্তু ভিতরে তাদের পর্দাও ঝুলছে। তিন তলায় না দাঁড়িয়ে গম্বুজ আকারের ছাদের দিকে চলল সে—মনে মনে আশা যে সেখান দিয়ে ঢোকা সহজ।

কো-টানের রাজসভার মত, এর ছাদেও ছোট ছোট গর্ত আর তাতে নিশ্চয় গরাদ নেই। কিন্তু সমস্যা হল তার চওড়া কাঁধ নিয়ে সেখান দিয়ে ঢুকতে পারবে তো? চার-তলায় পৌঁছে আবার দেখল পর্দার পিছনে আলো রয়েছে। ঠিক সেই সময় একটা বিশেষ গন্ধ পাওয়াতে এক নিমেষে তার রূপ পালটে গেল। সভ্য জগতের বাসিন্দা আর সে রইল না। লু-ডনের গলার স্বর শুনতে পেল—কি জানি চাইছে সে। দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর এল তার। সে-কণ্ঠস্বর যদিও বিষাদ ও হতাশায় ভরা—টারজান সেই স্বর শুনে ক্ষেপে উঠল।

সব সতর্কতা ভুলে তার বজ্র-মুষ্টির প্রচণ্ড এক ঘায়ে জানালার গরাদ ভেঙ্গে ভিতরে পড়ল, আর সে সাঁতারুর ভঙ্গীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হরিণের চামড়ার পর্দা খুলে নিয়ে। তারপর চামড়ার পর্দা সরাতে দেখল ঘোর অন্ধকারে ঢাকা চারদিক, সব চুপচাপ। অনেক মাস বাদে আবার জেনকে সে ডেকে জিজ্ঞেস করল সে কোথায়? কিন্তু নিস্তব্ধতা ছাড়া তার প্রশ্নের কোন জবাব এল না। বার বার তাকে ডাকল, অন্ধকারে চারদিক হাতড়ে দেখল, কিন্তু কোথায় সে? অথচ একটু আগেই এই ঘর থেকেই তার স্ত্রীর গলার স্বর সে শুনেছে লু-ডনকে বাধা দিচ্ছে।

যদি একটু বিবেচনার সঙ্গে কাজ করত, তা হলে তার স্ত্রীকে পেয়ে যেত এরি মধ্যে, লু-ডনকেও সাজা দিতে পারত। কিন্তু আক্ষেপ করার সময় ছিল না। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে পায়ের তলার জমিটা কাৎ হয়ে গেল আর মসৃণ একটা গর্ত দিয়ে সে পড়তে আরম্ভ করল। ওপর থেকে লু-ডনের ব্যঙ্গের হাসি শুনতে পেল। লু-ডন চিৎকার করে বলল, 'ডর-উল-ওথো তোমাকে বাপের কাছে ফিরে যেতে বলেছেন।'

পাথুরে জমিতে সজোরে ধাক্কা খেয়ে পতন শেষ হল। সামনে গরাদ দেওয়া জানালা দিয়ে নিচে হ্রদের নীল জলে চাঁদের আলো পড়েছে দেখা যাচ্ছিল। ঘরটা বেশ বড়।

আবার টারজান সেই পরিচিত দুর্গন্ধ পেল। হাল্কা হলেও, পেয়ে গ্রিফের গন্ধ নিঃসন্দেহে তা বলা যায়। টারজানের কান খাড়া, খানিক বাদে ভারি পায়ের আওয়াজ পেল—আওয়াজটা তারই দিকে আসছে। ক্রমে, জন্তুটার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও পাওয়া গেল। সে টারজানের নিচে পড়ার আওয়াজ শুনে তার কারণ অনুসন্ধান করতে আসছিল। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু সে যে দূরে নেই তা বোঝা যাচ্ছিল। তারপরই গ্রিফের বিকট গর্জন সেই অন্ধকার বারান্দা ভেদ করে প্রতিধ্বনিত হল।

টারজান বুঝল তাকে এড়ানো ছাড়া, নিজেকে রক্ষা করার আর কোনো উপায় নেই। এর আগে সে দিনের আলোয় খোলা জায়গায়, টোর-ও-ডনদের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। কিন্তু এখানে সে পদ্ধতি খাটতে পারে না। সেই গ্রিফ পোষা ছিল, কিন্তু এটা তো একেবারে বুনো! মনে হয় জন্ম থেকেই ঐ গর্তে বন্ধ ছিল, আর গর্তটার প্রয়োজনীয়তা তো একটু আগের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা গেছে। সামনা সামনি তার সঙ্গে যখন সে পেরে উঠবে না, তখন তাকে এড়িয়ে যাবার উপায় টারজানকে বার করতেই হবে, যদি সে জেনের জীবন রক্ষা করতে চায়। সে যে বেঁচে আছে, এই জ্ঞানটুকু উপস্থিত বিপদের মধ্যেও মনে কৃতজ্ঞতার আলো জ্বেলে দিয়েছিল।

অশরীরী আত্মার মতো, নিঃশব্দে টারজান ঘরের উল্টো দিকে দৈত্যাকার জন্তুটার পথ থেকে সরে গেল। গ্রিফের শ্রবণ-শক্তি প্রখর। যে জায়গায় টারজান ঐ গর্তে ঢুকেছিল,

সেদিকে সে তেড়ে গেল। উল্টো দিকের দেয়াল ঘেঁষে টারজান তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল যে পথ দিয়ে জন্তুটা ঐ ঘরে ঢুকেছিল সে দিকে। তারপর তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল—

ভেতরে এত অন্ধকার যে কয়েক ফুট দূরের দেয়াল, পায়ের নিচের মেঝে পর্যন্ত তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও আবছা বোধ হচ্ছিল। কিন্তু অতলে পড়ে যাওয়া, কিম্বা পাথরে ধাক্কা খাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার পক্ষে তাই যথেষ্ট। জায়গাটি যথেষ্ট চওড়া আর উঁচু, তা না হলে ঐ অতিকায় জন্তুটা সেখানে থাকতে পারে না।

সেই ঘোরানো পথ দিয়ে যেতে যেতে টারজান বুঝতে পারছিল যে সেটা ক্রমশঃ নীচের দিকে চলেছে—মনে তার প্রশ্ন, কোন অতলে চলেছে সে? হয়তো বড় ঘরটাতে থেকে গেলেই তার পক্ষে ভাল হত।

জন্তুটা গর্জন করতে করতে তার দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল, এই সরু জায়গায়। টোর-ও-ডনদের সেই ডাক নিষ্ফল হবে। একটু বাদেই অন্ধকার কমতে লাগল। শেষ বাঁক নিতেই সামনে চাঁদের আলো দেখা গেল। আবার মনে আশা জেগে উঠল। তাড়াতাড়ি পথের মুখের দিকে এগিয়ে, বেরিয়ে পড়ল সেখান থেকে গোলাকার উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায়।

দেয়ালের মসৃণ গা বেয়ে ওপরে ওঠার উপায় ছিল না। জায়গাটার বাঁদিকে পুকুরের জল দেয়ালের গায়ে এসে ঠেকেছে। এটা যে গ্রিফটার জল খাওয়ার আর গড়াগড়ি দেবার জায়গা তাতে সন্দেহ নেই।

এতক্ষণে গ্রিফটা পথের মুখ পার হয়ে বেরুল। টারজানও পুকুরটার পাড়ে এসে তার শেষ চেষ্টার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। গ্রিফটা এবার দাঁড়িয়ে পড়ে, তার ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে শিকারটাকে খুঁজতে শুরু করে দিল। টারজান এই সুযোগে তার শেষ অস্ত্র—টোর-ও-ডনদের সেই অদ্ভুত হুই-উ ডাক যেই ছেড়েছে, গ্রিফটা প্রচণ্ড গর্জন করে, মাথা নীচু করে সেদিকে ছুটে এল। কোন দিকেই পালাবার পথ নেই টারজানের। সামনে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু! নিরুপায় হয়ে সে পুকুরের কালো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জেন ক্লেটনের সব আশা মুছে গেছে। প্রধান পুরোহিত লু-ডনের সঙ্গে সে আর পেরে উঠছে না। কো-টানও তাকে চেয়েছিল স্ত্রী হিসাবে তাই এতদিন সে নিরাপদ ছিল। কো-টান আর লু-ডন দুজনেই দুজনকে ভয় পায়।

সেদিন সব কিছু অগ্রাহ্য করে লু-ডন এসেছিল তাকে নিয়ে যেতে। জেন একেবারে অসহায়! কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটল, কিসের আঘাতে জানালার গরাদগুলো ভেঙ্গে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিমেষের জন্য লু-ডন থতমত খেল বটে, তারপরেই ঘরের ছাদ থেকে ঝোলান একটা চামড়ার দড়ি ধরে টান দিল যার ফলে ওপর থেকে পাতলা একটা দেয়াল নেমে, তাদের ও যে ঢুকেছে তাকে আলাদা করে দিল। ঘরের একমাত্র আলোটা তাদের দিকে রয়ে গেল।

আগন্তুককে দেয়ালটার অন্য দিকে, অন্ধকারে হাতড়াতে শোনা গেল। কে যেন কাকে ডাকছে সেখান থেকে, কিন্তু ভালো করে শোনা গেল না। ঠিক এই সময় লু-ডন আরেকটা চামড়ার দড়ি ধরে হেঁচকা টেনে কিসের জন্য অপেক্ষা করছিল। একটু বাদেই সেটা হঠাৎ নড়ে উঠল, যেন ওপর থেকে কেউ তাতে টান মেরেছে, লু-ডন এবার আরেকটা টানে সেই পাতলা দেয়ালটা ওপরে উঠিয়ে ফেলে, এগিয়ে গিয়ে মেঝের একটা অংশকে কাৎ করে দিতেই একটা অন্ধকার গর্তের মুখ দেখা গেল। সজোরে হেসে কাকে জানি তার বাবা ডর-উল-ওথোর কাছে ফিরে যেতে বলে।

লু-ডন চোরা-গর্তটা বন্ধ করল। ফিরে সবে জেনকে কি বলতে গেছে এমন সময় জা-ডন সেখানে হাজির। লু-ডন বিরক্ত হয়ে তাকে ওখানে হাজির হবার কি কারণ জিজ্ঞেস করল। জেন ফিরে দেখে দরজায় বলিষ্ঠ এক যোদ্ধা দাঁড়িয়ে। মুখে তার কঠোর কর্তৃত্বের ছাপ। সে এই প্রশ্নের উত্তরে লু-ডনকে জানাল যে সে কো-টানের কাছ থেকে এসেছে, অপরিচিতাকে নিষিদ্ধ উদ্যানে নিয়ে যেতে। প্রধান পুরোহিতকেও অগ্রাহ্য করতে সে দ্বিধা করবে না—কারণ রাজা বলেছেন নিয়ে যেতে। জা-ডনের মুখে ভয়ের রেশ বা পুরোহিতের প্রতি শ্রদ্ধার চিহ্ন কোনোটাই ছিল না।

লু-ডন জানত রাজা কেন এই নির্ভীক দূতকে ঐ কাজে পাঠিয়েছেন। তাকে কব্জা করতে সে বহুবার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। জা-ডনকে থামাবার একমাত্র উপায় তাকেও সেই অতল গহ্বরে পাঠানো। কায়দা করে তাকে সেই চোরাগর্তের দিকে নিয়ে যেতে যেই সে চেষ্টা করেছে, বাধা এল জেনের কাছ থেকে। সে লু-ডনের মনের ভাব টের পেয়েছিল। তাই সে জা-ডনকে ডেকে বলল যে তার যদি বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকে, তা হলে সে যেন ঐ দিকে না যায়। কিন্তু কোথা থেকে বিপদ আসতে পারে জিজ্ঞেস করাতে,

সে সেই চামড়ার দড়িতে হেঁচকা টান দিতেই ওপর থেকে নেমে এল সেই পাতলা দেয়াল। লু-ডন রয়ে গেল দেয়ালের অন্য দিকে

জা-ডন এবার লু-ডনের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারল। লু-ডন তাকে দেয়ালের অন্য দিকে আলাদা করে দিতে চেয়েছিল মংলুবের বাকি অংশটাও জেন তাকে দেখিয়ে দিল, দ্বিতীয় চামড়ার দড়িটাতে টান দিয়ে। আর কি ঘটত তার ভাগ্যে ভালভাবে তা বুঝিয়ে দিয়ে। লু-ডন তাকে অনেকবার ভয় দেখিয়েছে যে ঐ দড়িটার সাহায্যে তাকে মন্দিরের নিচেকার ঘরে পাঠিয়ে দেবে—সেখানে নাকি মন্দিরের প্রেতাত্মা গ্রিফের আকারে বাস করে। কথাটা কতদূর সত্য, তা অবশ্য জেন জানে না।

মন্দিরে যে একটা গ্রিফ আছে তা জা-ডন জানে, কারণ তার খাদ্য জোগাতে আর মন্দিরে বলিদানের জন্য তাদের সব সময়েই বন্দী জোগাড় করতে হয়। জেন তাকে ঐ বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু সে-ও তো জেনকে বন্দী রাখার অংশীদার। তা হলে জেন কেন তাকে রক্ষা করল? জেনের উত্তর এল যে তাকে দেখে নিষ্ঠাবান, বীর যোদ্ধা মনে হয়। তা ছাড়া লু-ডনের থেকে খারাপ কেউই হতে পারে না।

জা-ডনকে দেখেই বোঝা যায় যে যদিও সে ভিন্ন জাতের তবু তার কাছ থেকে কোন বিদেশী মহিলা অসম্মান পাবে না।

জা-ডন বলল কো-টান তাকে ক্রীতদাসী না করে তাঁর রানী করতে চান—এর থেকে বড় সম্মান বিদেশী কাউকে দেওয়া যায় না।

জেন বলল সে বিবাহিতা। দ্বিতীয়বার বিয়ে সে করতে পারে না, চায়ও না। জা-ডনের উত্তর হল কো-টান রাজা। যেন রাজা হলেই যথেষ্ট হল। জা-ডন কি তাহলে তাকে রক্ষা করবেন না? জেন, তাকে জিজ্ঞেস করল। জবাবে জা-ডন যা বললেন তাতে বোঝা গেল যে জা-লুরে থাকলে, রাজার অমতেও জেনকে হয়তো রক্ষা করতে পারতেন তিনি। জা-লুর তাঁর রাজধানী। তার রাজ্য জা-লুর ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

জা-লুর কত দূরে ও কোন দিকে, জেন জানতে চাইলে জা-ডন তাকে বললেন যে সেটা দূরে না, কিন্তু জেনের পক্ষে সেখানে নিরাপদে পৌঁছনো সম্ভব নয়।

যে নদী, আ-লুরের দেয়াল ঘেঁষে বয়ে যায়, তারই উজানে জা-লুর অবস্থিত। তিন দিক তার জলে ঘেরা। পাল-উল-ডনের অজেয়, অভেদ্য নগরী জা-লুর। একমাত্র এই নগরীতেই কোন শত্রু কোন দিন প্রবেশ করেনি। তাহলে জেন সেখানে নিরাপদে থাকতে পারবে? জা-ডন বললেন, তাঁর ধারণা হয়তো পারবে।

জেনের মনে যে ক্ষীণ আশা জেগে উঠেছিল তা-ও নিভে গেল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে মাথা নাড়ল। জা-ডন, তার দীর্ঘশ্বাসের মানে ঠিকই ধরতে পেরে জেনকে বললেন যে সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। জেনকে রাজকুমারী ও-লো-য়ার কাছে সেই নিষিদ্ধ-উদ্যানে নিয়ে যেতে হবে। যে বন্দীশালায় জেন এতদিন আটক ছিল, তার থেকে ঐ নিষিদ্ধ-উদ্যান অনেক ভাল জায়গা।

জেনের মনে তখন দুশ্চিন্তা কাঁপতে কাঁপতে কো-টানের কথা জিজ্ঞেস করাতে, জা-ডন বললেন যে আচার অনুষ্ঠানের পর্ব শেষ করতে বেশ সময় লাগবে। রাজার বিয়ে কেবল মাত্র প্রধান পুরোহিতই দিতে পারেন!

সময় লাগবে শুনে জেনের মনে আবার ক্ষীণ আশা জেগে উঠল।

গল্প করতে করতে জা-ডন তাকে মন্দিরের দরজা অবধি নিয়ে গিয়ে দেখেন, দরজার ভিতর দিকে দুজন পুরোহিত-প্রহরী। বাইরে দু-জন যোদ্ধা। জা-ডনের সঙ্গে জেনকে দেখে পুরোহিতরা তাদের বাধা দিতে গেল, কারণ জেনকে নিয়েই, রাজা ও প্রধান পুরোহিতের যে ঝগড়া তা সবাই জানত। লু-ডনের অনুমতি থাকলে, তবেই জেন, সেখান থেকে বেরোতে পারে। নচেৎ তাকে যেতে দেওয়া হবে না।

একজন পুরোহিত ঠিক জেনের সামনে দাঁড়িয়ে তার গতিরোধ করাতে জা-ডন রুখে দাঁড়ালেন, কি? রাজার

আদেশে জেন যাচ্ছে, স্বয়ং দলপতি জা-ডন এসেছেন তাকে নিয়ে যেতে। দরজা থেকে পুরোহিতদের সরে যেতে হবেই!

যোদ্ধারা দুজনও সেখানে এসে হাজির—প্রতিপক্ষে এখন তিনজন। পুরোহিতরা দুজন। তাদের একজন ওদের যেতে দিতে বলল, কারণ লু-ডন এমন কথা তাদের বলেনি যে জা-ডনও অপরিচিতাকে নিয়ে বাইরে যেতে পারেন না। অতএব তাদের ছাড়া যেতে পারে।

প্রাসাদে রাজকুমারী ও-লো-য়ার এলাকায় পৌঁছে জা-ডন দরজার প্রহরীদের একজনকে হুকুম করলেন রাজকুমারীর কাছে এঁকে পৌঁছে দিতে। তাকে সাবধান করে দিলেন সে যেন বন্দিনীকে পালাতে না দেয়। প্রহরী তাকে নিয়ে অনেক ঘর আর বারান্দা পেরিয়ে, বাঘ-ছালের পর্দা দিয়ে ঢাকা একটা দরজার কাছে পৌঁছে লাঠি দিয়ে দরজার পাশের দেয়ালে টোকা মেরে রাজকুমারীকে বলল, মন্দিরে যে বিদেশী বন্দিনী ছিলেন, তাঁকে নিয়ে সে হাজির হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ও-লো-য়ার সুমিষ্ট স্বর শোনা গেল, জেনকে ভিতরে ঢুকতে আহ্বান করছেন।

ঘরের এক কোণায় নিচু এক পাথুরে বেদীর ওপর লোমশ চামড়ার, পুরু বিছানায় রাজকুমারী শুয়ে ছিলেন। ঘরে একজন ওয়াজ-ডন ক্রীতদাসী ছাড়া আর কেউ ছিল না।

রাজকুমারীর আহ্বানে, জেন কাছে এলে রাজকুমারী তাকে খুব ভাল ভাবে দেখে মন্তব্য করলেন যে সে ভারী সুন্দর দেখতে। জেনও বলল যে রাজকুমারীর মত প্রকৃত সুন্দরীর মুখ থেকে শোনা এ কথা যথার্থ প্রশংসাই বটে। জেন, তাঁর দেশের ভাষায় কথা বলতে রাজকুমারী দারুণ খুশি, কারণ তিনি শুনেছিলেন যে জেন তাদের জাতের নর, বহুদূরের দেশ থেকে এসেছে। জেন বলল মন্দিরে বন্দী থাকার সময় পুরোহিতরা লু-ডনের আদেশে, তাকে ঐ ভাষা শিখিয়েছিল। সে সত্যি করেই বহুদূর দেশের মানুষ। সেখানেই সে ফিরে যেতে চায়, কারণ সে বড়ই দুঃখিনী।

ও-লো-য়া তার কথায় অবাক্। কো-টান জেনকে তাঁর রানী করতে চান। তাতে জেনের খুশি হওয়া উচিত। জেন বলল যে সে খুশি নয় কারণ সে বিবাহিতা ও স্বামীকে ভালবাসে। ও-লো-য়া যদি তার মতো অবস্থায় পড়তেন, তবেই তিনি বুঝতে পারতেন সে পরিস্থিতি কত দুঃখের আর জেনের প্রতি তাঁর মন সমবেদনায় ভরে যেত।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও-লো-য়া জেনকে বললেন যে তিনিও একই দুঃখ ভোগ করছেন, কিন্তু রাজকন্যা হয়েও যখন তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারছেন না, তখন কার সাধ্য জেনকে রক্ষা করে।

এর আগেই কো-টানের ভোজনালয়ে, মো-সার পুত্র বু-লটের সঙ্গে রাজকুমারীর বাগ্‌দান উপলক্ষ্য করে ভোজ-পর্ব হয়ে গিয়েছিল। বিরাট আয়োজন—খাদ্য-পানীয়ের অভাব নেই। যদিও মো-সার ও বু-লটকে রাজা সু-নজরে দেখতেন না। তারাও তাকে খুবই অপছন্দ করত, তবু সিংহাসন রক্ষা করার এই হল একমাত্র উপায়।

উপস্থিত সবাই মদ খেয়ে বুঁদ। কো-টান, মো-সার, বু-লট সবাই। পল-উল-ডন রাজ্যে, জা-ডনের পরেই মো-সার সবচেয়ে শক্তিশালী দলপতি—তাই তাকে ভয়। জা-ডনকে তিনিও ভয় পান। কিন্তু জা-ডন যে নিজে রাজা হতে চেষ্টা করবেন না, তা-ও তিনি জানেন। তবে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ লাগলে কার দিকে তিনি যোগ দেবেন, তা কো-টান জানেন না।

আদিম জাতিদের মধ্যে কূটনীতির চল নেই। তার ওপর সবাই নেশাগ্রস্ত। বু-লট ভীরু মানুষ, কিন্তু নেশার ঘোরে তার মাথার ঠিক ছিল না। হঠাৎ সে তার গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করে ফেলল। ভবিষ্যতে ও-লো-য়ার আর তার ছেলে ন্যায্য বংশে সিংহাসন ফিরিয়ে আনবে।

তীব্র প্রতিবাদ এল কো-টানের কাছ থেকে। তিনি এখনো জীবিত। তাঁর মেয়ের সঙ্গে তখনও বু-লটের বিয়েই হয়নি। সুতরাং বিয়ে রদ করে পল-উল-ডন রাজ্যকে ভীরু-বংশের সন্তানের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

অপমানে অধীর হয়ে বু-লট সাময়িক ভাবে তার জন্মগত ভীরুতা ভুলে গেল। উপস্থিত সকলের নেশা ছুটে গেল। তাকিয়ে রইল তারা, মো-সার আর বু-লটের দিকে। কো-টানের ঠিক উল্টো দিকে বসেছিল তারা, নিমেষে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, ডান দিকের যোদ্ধার খাপ থেকে ছোরা বার করে, বু-লট সজোরে কো-টানের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ল। তার অব্যর্থ লক্ষ্যের বলি হয়ে কো-টান পড়ে গেলেন।

বু-লটেরো নেশা গেল ছুটে। ভয়ের চোটে পিছনের দরজার দিকে যেই হটতে শুরু করেছে, অমনি কো-টানের অনুগত যোদ্ধারা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে শুধু তার পালান বন্ধ করতে নয়, তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছিল—কিন্তু মো-সার ছেলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল যে কো-টানের মৃত্যু হয়েছে। কাজেই মো-সার এখন রাজা। তার অনুগত পল-উল-ডনের যোদ্ধারা যেন

তার রক্ষার্থে এগিয়ে আসে।

যদিও মো-সারের পক্ষের যোদ্ধারা সংখ্যায় কিছু কম ছিল না, তাদের বিরুদ্ধে বহু যোদ্ধা খোলা তলোয়ার হাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।

জা-ডন ভিড় ঠেলে সামনে এসে চীৎকার করে তাদের হুকুম করলেন মো-সারদের বন্দী করতে। তিনি ঘোষণা করলেন যে বিশ্বাসঘাতক হত্যাকারীর যথোচিৎ শাস্তি হবার পর, পল-উল-ডনবাসীরা তাদের রাজাকে নির্বাচিত করবে।

জা-ডনের মত নেতা পেয়ে, কো-টানের অনুগত যোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মো-সারের দলের ওপর। দু-দলে আরম্ভ হয়ে গেল যুদ্ধ। এ ওকে হত্যা করতে যখন ব্যস্ত, মো-সার ও বু-লট যে সবার অলক্ষ্যে সেখান থেকে সরে গেছে সেটা কেউ খেয়ালই করল না। আ-লুরে থাকাকালীন প্রাসাদের যে অংশ তাদের ব্যবহারের জন্য ছিল, তারা প্রথমে সেখানে গিয়ে, তাদের বাকি অনুচর ও নিজেদের সামান্য যা জিনিস ছিল সব নিয়ে প্রাসাদের ফটকের দিকে যেতে আরম্ভ করল। মো-সার তার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে, তার নিজের মনের কথা জানাল। রাজকুমারীকে যেন সঙ্গে নিয়ে যায় তারা, তাহলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ সুগম হবে। বু-লটের ঘোর আপত্তি এতে, সে পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু মো-সারের ইচ্ছার কাছে তা টিকতে পারল না।

ভোজনালয়ে তখনও যুদ্ধ চলছে—সেই সুযোগে তারা দুজনে অনায়াসেই রাজকুমারীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে, কারণ যোদ্ধারা যুদ্ধে ব্যস্ত, রাজকুমারীর নিরাপত্তার কথা তাদের মনেই আসেনি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বু-লট রাজি হল।

মো-সার তার যোদ্ধাদের দরজার কাছে অপেক্ষা করতে বলে, প্রাসাদে রাজকুমারীর মহলের দিকে গিয়ে ধোঁকা দিয়ে প্রহরীদের সেখান থেকে সরিয়ে দিল। বলল, রাজা তাদের ডেকেছেন ও মো-সার তার ছেলেকে রাজকুমারীর দরজা পাহারা দিতে বলেছেন।

যোদ্ধারা তাকে চিনতো, তার পরের দিনই তার ছেলের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে। তারা সাধারণ সৈনিক মাত্র, উপরওয়ালাদের আদেশ বিনা প্রশ্নে পালন করতে অভ্যস্ত। সকলে তাড়াতাড়ি ভোজনালয়ের দিকে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই মো-সার ও বু-লট সোজা চলে গেল ও-লো-য়ার শোবার ঘরে। ঘরে তখন ও-লো-য়া ছাড়া জেন আর পান-আট-লি ছিল। তাদের দুজনকে এ ভাবে তার শোবার ঘরে ঢুকতে দেখে ও-লো-য়া লাফিয়ে উঠে, রাগতস্বরে এই ব্যবহারের অর্থ কি জানতে চাইলে মো-সার এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে জানাল যে তারা খুব জরুরী কাজে এসেছে, তাই এভাবে ও-লো-য়ার শোবার ঘরে তাদের ঢোকা। এমন সময় জেনের ওপর তার চোখ পড়ল। এত সুন্দর কাউকে সে এর আগে দেখেনি।

কিন্তু ও-লো-য়াকে তো সেখান থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এ কথা তাকে মনে রাখতে হবেই। তাই, কেন তারা এ ভাবে ও-লো-য়ার শোবার ঘরে ঢুকেছে তার ব্যাখ্যা করে রাজকুমারীকে জানাল যে প্রাসাদে বিদ্রোহ সুরু হয়েছে ও বিদ্রোহীরা রাজাকে হত্যা করেছে। মত্ত অবস্থায় তারা এদিকে আসছে। রাজকুমারীর নিরাপত্তার জন্য তাঁকে আ-লুরের বাইরে নিয়ে যেতে তারা দুজনে তাঁর ঘরে এ ভাবে ঢুকেছে। দেরী করার সময় নেই।

তাঁর বাবা মারা গেছেন? তাহলে তাঁর মেয়ের স্থান তো তাঁর প্রজাদের পাশে পল-উল-ডনের রানী হিসাবে, যতক্ষণ না যোদ্ধারা নতুন কাউকে রাজপদের জন্য নির্বাচন করে। আর তিনি যখন রানী, তখন তাঁর মতের বিরুদ্ধে, মো-সার তাঁকে কারো সঙ্গে বিয়েও দিতে পারে না। বু-লটের মত ভীরুকে তিনি কোনদিনই বিয়ে করতে চান নি, সুতরাং তাদের সেখান থেকে চলে যাবার আদেশ দিলেন তিনি।

মো-সার বুঝল যে ছলনায় কাজ হাসিল হবে না—সময়েরও বড়ই অভাব। বু-লটকে তাই আজ্ঞা করল যে বু-লট যেন তার ভাবী স্ত্রীকে নিজে নিয়ে যায়। আর মো-সার তার ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে নিজেই নিয়ে যাবে। এই বলেই, কেউ কিছু বুঝতে পারার আগে, জেনকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। জেনের নিজেকে রক্ষা করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হল।

কিন্তু বু-লট কিছুতেই ও-লো-য়াকে ধরতে পারল না, যতবার চেষ্টা করে, পান-আট-লি বাঘিনীর মত লাফিয়ে পড়ে তার ওপর। দুজনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে—ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছে। ও-লো-য়াকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, পান-আট-লির চুলের মুঠি ধরে যেই নিজের ছোরা বার করেছে অমনি পিছনের পর্দা হঠাৎ সরে গেল।

বু-লটের ছোরা তার লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই, দুই লাফে কে জানি ঘরে ঢুকেই বু-লটের কবজি শক্ত করে ধরে, প্রচণ্ড এক ঘুঁষিতে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে তার প্রাণহীন শরীরটা মাটিতে ফেলে দিল। কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক রাজহন্তা

বু-লট জানতেই পারল না কে সেই লোক!

আ-লুরের মন্দিরের গ্রীফটা যখন টারজানকে তাড়া করেছিল, প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে টারজান গ্রীফটার গর্তের পুকুরে লাফিয়ে পড়ে দূরে পুকুরটার ঠিক ওপরে পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটলের ভিতর দিয়ে, জ্যোৎস্না ভরা এক ফালি নীল জল দেখতে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি সাঁতরে সেই দিকে যেতে সুরু করল টারজান। গ্রীফটাও তাকে তাড়া করে তার পিছন পিছন চলল। ফাটলটা সামনে এসে গেছে, কিন্তু সেটা জলের তলা অবধি না গিয়ে থাকলে তার শরীর তো সেখান দিয়ে ঢুকবে না—দু-হাত সামনে রেখে ডুব-সাঁতার দিয়ে টারজান গর্তটার দিকে এগিয়ে গেল।

লু-ডন যখন বুঝতে পারল, বিদেশিনী কি ভাবে তারই বল তার ওপর প্রয়োগ করে তাকে বন্দী করেছে, রাগে সে প্রায় অন্ধ হয়ে পড়ল। সেখান থেকে পালাবার রাস্তা তার জানা, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে জা-ডন বিদেশিনীকে সেখান থেকে নিয়ে যাবে কো-টানের কাছে। লু-ডন কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ যে বিদেশিনী তারই বৌ হবে। কো-টানকে সিংহাসন-চ্যুত করে মো-সারকে তার জায়গায় বসাতে পারলে মো-সার নামে রাজা থাকবে, আসল রাজা হবে প্রধান পুরোহিত।

অতি সন্তর্পণে টারজান যে জানালা দিয়ে ঢুকেছিল, তা দিয়ে লু-ডন বেরিয়ে গেল। জা-ডনও বিদেশিনীর পিছন পিছন না গিয়ে ভাবল বিশ্বাসঘাতকতার ওপর নির্ভর করাটাই শ্রেয়।

মন্দিরে, নিজের এলাকায় পৌঁছে, লু-ডন তার অনুগত পুরোহিতদের ডেকে পাঠাল—সবাই তারা কো-টানের বিপক্ষে। প্রধান পুরোহিত তাদের জানালেন যে রাজশক্তির ওপরে পুরোহিতদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত করার উপযুক্ত সময় এসেছে। কো-টানকে হটিয়ে মো-সারকে তার জায়গায় বসাতে হবে কারণ কো-টান প্রধান পুরোহিতের বিরোধিতা করেছে। মো-সারকে গোপনে মন্দিরে আনার জন্য পান-আটকে তার কাছে পাঠিয়ে, অন্য পুরোহিতদের সহরে গিয়ে বিশ্বস্ত সৈনিকদের খবর দিতে, তারা যেন প্রস্তুত থাকে।

আরো একঘণ্টা ধরে চলল তাদের শলা-পরামর্শ। কে কাকে চেনে, কিভাবে এগোলে সুবিধা হবে ইত্যাদি। মো-সারকে খেলার পুতুল হিসাবে সামনে রাখলে তাদের ইচ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ হবে এই সিদ্ধান্তে এসে যে যার কাজে চলে গেল।

পান-সাট প্রাসাদ এলাকায় ঢুকেই বুঝতে পারল যে ভোজনালয়ে ভীষণ একটা গোলমাল বেধেছে—কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে, লু-ডনের কাছে ফিরে এসে খবর দিল যে তারা যখন আলোচনায় ব্যস্ত ছিল, তখনি তাদের সুযোগ এসেছিল। কিন্তু সে সুযোগ তারা হারিয়েছে। কো-টান মৃত ও মো-সার পলাতক। তার হয়ে তার অনুগত যোদ্ধারা লড়াই করছে। কিন্তু বিপক্ষ দল জা-ডনের নেতৃত্বে লড়ছে। একজন ক্রীতদাসের কাছ থেকে সে জানতে পেরেছে যে বু-লট রাজাকে হত্যা করেছে। মো-সার আর বু-লট প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেছে। সব শুনে লু-ডন পান-সাটকে তাড়াতাড়ি সহরে গিয়ে সবার কাছে প্রচার করতে বলল যে জা-ডন রাজাকে হত্যা করে, ও-লো-য়াকে সরিয়ে তার স্থান অধিকার করতে চায়। এ-ও বলতে হবে যে জা-ডন পুরোহিতদের মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছে, মন্দিরের সব বেদী ধ্বংস করেছে। যোদ্ধাদের বলতে হবে সময় নষ্ট না করে আক্রমণ চালাতে। গুপ্ত পথে তাদের আনতে হবে কিন্তু জানবার আগেই তাদের হঠাতেও হবে।

পান-সাট চলে যাবার আগে, লু-ডন তাকে প্রশ্ন করল যে সে, সেই অপরিচিতা বিদেশিনীর বিষয় কিছু বলতে পারে কিনা। পান-সাট বলল যে জা-ডন তাকে প্রাসাদে নিয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা সে জানে না। কো-টান তাকে নিষিদ্ধ উদ্যানে পাঠিয়েছেন—সেখানেই তাকে পাওয়া যাবে।

লু-ডনের ঘরের পাশের বারান্দা থেকে বীভৎস মুখোশপরা একজন তাদের কথা যে শুনছিল তা পান-সাটরা জানত না—পান-সাট যখন জাড-বেন-ওথোর মন্দির থেকে গুপ্ত পথ দিয়ে সহরে যাচ্ছিল, তাকে অনুসরণ করে যে আরেকজনও চলেছে। সে তা টের পায় নি।

●

চাঁদের আলোয় টারজানের মসৃণ শরীরটাকে জলাশয়ের দেয়ালের ফাঁকটা দিয়ে গলে বাইরের হ্রদে বেরিয়ে যেতে দেখে গ্রিফটার কি রাগত গর্জন! কি সহজে প্রধান পুরোহিতের ফন্দী ব্যর্থ হল ভেবে হাসি পেলেও, যেই গ্রিফ-মন্দিরের তিন তলায় বন্দী জেনের বিপদের কথা মনে পড়ল, অমনি টারজান মুষড়ে পড়ল। তার কাছে যেতে হলে আবার মন্দিরের হাতায় ঢুকতে হবে। সেটা কি করে সম্ভব হবে?

হ্রদের ধার থেকে খাড়াই মন্দির, প্রাসাদ সব ছাড়িয়ে অনেক দূর অবধি চলে গেছে। সে এত উঁচু যে ওপথে ফেরার

কথা ভাবা যায় না। দেয়ালের ধার ঘেঁষে টারজান সাঁতরে বেড়াতে লাগল, যদি কোথাও একটু পা রাখার জায়গা মেলে। ওর নাগালের বাইরে, অনেক উঁচুতে বেশ কিছু গর্ত, ফোকর, চোখে পড়ল। হঠাৎ দেখে জলের সমান জায়গাতেও একটা ফোকর! খুব সাবধানে পর্যবেক্ষণ করে কাউকে না দেখে, গায়ের জল ঝেড়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সামনে একটা সুড়ঙ্গ, তাতে চাঁদের আলো পড়েছে। তারপর কয়েক ধাপ সিঁড়ি, তার পর আরেকটা সুড়ঙ্গ পাহাড়ের গা বরাবর চলেছে। বেশ খানিকটা দূরে দূরে কুলুঙ্গীতে প্রদীপ জ্বলছে। সুড়ঙ্গের দুপাশে ঘর, তাদের দরজায় পুরু পরদা ঝুলছে। প্রথম দরজায় কি যেন শুঁকে সুড়ুৎ করে সে ঢুকে পড়ল। পরদা তেমনি ঝুলে রইল। একটা চাপা ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল। তার একটু পরেই পরদা সরিয়ে বিকট মুখোস আঁটা জাড-বেন-ওথোর এক পুরোহিত ভারি পদক্ষেপে বেরিয়ে এল। সে পাশের গ্যালারিতে যাবার তালে ছিল, এমন সময় বাঁয়ের ঘর থেকে গলার আওয়াজ শোনা গেল। পুরোহিত পরদায় কান পেতে একটু শুনেই, অন্য গ্যালারির অন্ধকারে গা ঢাকা দিল আর এ-ঘর থেকে অন্য একজন পুরোহিত বেরিয়ে হাঁটতে লাগল। আগের জন তার পিছু নিল।

করিডর দিয়ে একটু এগিয়ে পান-সাট দেয়াল থেকে প্রদীপ নিয়ে বাঁয়ের একটা ছোট ঘরে ঢুকল। পিছন পিছন তার অনুসরণকারীও ঢুকল। সেই ঘরের মেঝেতে নিচে নামার সিঁড়ি। সেটা ধরে আগের লোকটি নেমে যাচ্ছিল। ওয়াজ-ডনরা এই রকম সিঁড়ি দিয়েই নিজেদের ঘরে ওঠা-নামা করে। ক্রমে সুড়ঙ্গটা আরো নিচু, আরো সরু হয়ে উঠল। মাঝে মাঝেই সিঁড়ি নিচে নেমেছে। হয়তো দু-তিন ধাপ, বড় জোর ছয় ধাপ। এই ভাবে ওরা বোধ হয় পঁচাত্তর ফুট নেমেছিল। তারপর একটা ছোট ঘরে পৌঁছে সুড়ঙ্গটা শেষ হয়ে গেল। ঘরটার পাশে ছোট এক ঢিপি ভাঙা ইঁট-পাটকেল।

প্রদীপ মাটিতে নামিয়ে পান-সাট সেগুলো সরাতেই দেয়ালে একটা গর্ত দেখা গেল। গর্তের ও-পাশেও ঐ রকম একটা ঢিপি। সেগুলোকেও সরিয়ে পান-সাট আরো এগিয়ে চলল। প্রদীপটা সেখানেই ফেলে গেল।

অনুসরণকারীও ঐ গর্ত দিয়ে বেরিয়ে দেখে, হ্রদের জলের আর পাহাড়ের শিখরের মাঝপথে একটা সরু কার্নিশের মতো জায়গায় এসে পড়েছে। কার্নিশটা খুব ঢালু হয়ে উঠে গিয়ে একেবারে পাহাড়ের মাথায় একটা ঘরে পৌঁছে শেষ হয়েছে। পান সাট সেই ঘর দিয়ে শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সে একটা মোড় ঘুরতেই, অনুসরণকারীও বেরোল।

সামনে একশো গজ দূরেই প্রাসাদের সাদা দেয়াল ঝিকমিক করছিল। আসল কাজে যত দেরী হয় ততই মন্দ হলেও, অনুসরণকারীর মনে হল এ সময়টা লাভজনক ভাবেই কেটেছে। প্রধান পুরোহিতের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পান-সাটের সঙ্গে লু-ডনের কথাবার্তা শুনে, ওর মাথায় একটা বুদ্ধি গজিয়েছিল। এই শত্রুপুরীতে যদি ওর অভিযানকে সফল করতে হয়, তাহলে ওর বন্ধু-বান্ধবের দরকার হবে। নইলে ওর প্রিয়তম মানুষটির প্রাণের আর সুখের কোনো আশা থাকবে না। এখন প্রাসাদে ঢুকে তার নতুন কারাগারের খবর নিতে হবে।

ফটকে কোনো বাধা পেল না, কারণ মুখোশপরা পুরোহিতরা হামেসাই যাওয়া-আসা করছিল। তাছাড়া ঐ আধা-অন্ধকারে ওর হাত-পায়ের বিজাতীয় গড়নের দিকেও কারো চোখ পড়ল না। সোজা গেল সে দেয়াল টপকে নিষিদ্ধ বাগানে।

বাগানে কেউ ছিল না, কিন্তু লু-ডন আর পান-সাটের কথা থেকে ও বুঝেছিল যে এখান থেকে জেনকে সরাবার সময় পায়নি লু-ডন। তার জন্য কো-টানের অনুমতি দরকার। তাহলে তাকে সম্ভবতঃ ও-লো-য়ার মহলেই পাওয়া যাবে। সেটাও সম্ভবতঃ এই নিষিদ্ধ বাগানেরই কাছে।

আরেকবার দেয়াল টপকে, একটা দরজা দেখে, সেদিকে গেল টারজান। দরজায় প্রহরী নেই দেখে আশ্চর্য হল। ভিতরে কারা যেন রেগে, উত্তেজিত স্বরে তর্ক করছিল। পরদা সরিয়ে দেখে একজন হো-ডন যোদ্ধার সঙ্গে দুজন মেয়ে ধস্তাধস্তি করছে। মেয়েদের একজন কোর-উল-জার পান-আট লি, অন্যজন কো-টানের মেয়ে, ও-লো-য়া।

টারজান পরদা সরাতেই, সেই যোদ্ধা ও-লো য়াকে নির্মম ভাবে মাটিতে ফেলে দিয়ে, পান-আট-লির চুলের মুঠি ধরে, তার মাথার ওপর ছোরাটা তুলল।

মুখোশ খুলে ফেলে, এক লাফে টারজান লোকটাকে পিছন থেকে চেপে ধরে একটা ঘুঁষি মারতেই সে মরে পড়ে গেল। মেয়েরাও টারজানকে চিনতে পেরে ওকে ঘিরে কৃতজ্ঞতা জানাবার চেষ্টা করেছিল, টারজান তাতে কান না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'জা-ডন যাকে এনেছিল, সেই মেয়ে কোথায়?'

—'এই লোকটার বাপ মো-সার তাকে এইমাত্র ধরে

নিয়ে গেছে।'

—'কোন দিকে গেছে?'

পান-আট-লি বলল, 'মনে হয় টু-লুরে নিয়ে গেছে। কালো দীঘির ধারে মো-সারের সহরে।'

টারজান বলল, 'তাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি। সে আমার স্ত্রী। যদি বেঁচে থাকি ফিরে এসে, পান-আট-লি, তোমাকে ওম-আটের কাছে নিয়ে যাব।'

সঙ্গে সঙ্গে টারজান করিডর দিয়ে ছুটল। আলো কম, এঁকেবেঁকে, উঠে-নেমে, একটা উঠোনে গিয়ে পৌঁছল। উঠোন ভরা যোদ্ধা। এরা ফটকের রক্ষী দল। ছোট নেতারা কেউ ডেকে এনেছে। টারজান মুখোশ পরতে ভুলে গেছিল, তাকে দেখেই কেউ কেউ চ্যাঁচাতে লাগল, 'অবিশ্বাসী! মন্দির অপবিত্র করে দিয়েছে।'

সকলে গরম হয়ে উঠছে দেখে, টারজান বুঝল ফিরে গেলে মো-সারকে ধরতে পারবে না। হাত তুলে সে ডেকে বলল, 'শোন! আমি ডোর-উল-ওথো, জা-ডনের কাছ থেকে বার্তা এনেছি। কো-টান মারা গেছে। আমার বাবার ইচ্ছা জা-ডন রাজা হক। প্রধান পুরোহিত লু-ডন সে কথা অমান্য করে, তার হাতের পুতুল মো-সারকে রাজা করতে চায়। লু-ডনের চররা যে-কোনো সময়ে একটা গুপ্তপথ দিয়ে এখানে ঢুকে পড়বে। তারপর জা-ডন আর তার বিশ্বস্ত-অনুচরদের শেষ করবে।'

একজন নেতা বলল, 'তুমি উচিত কথাই বলেছ। পুরোহিতদের দলে অনেক যোদ্ধা আছে।'

টারজান বলল, 'মো-সার আমার ভয়ংকর ক্ষতি করেছে। আমি তার খোঁজে চললাম। জা-ডনকে বল জাড-বেন-ওথো তাকে সমর্থন করেন। ডর-উল-ওথো লু-ডনের এই প্রাসাদ দখল করার মৎলব উৎখাত করেছে। এবার বল তো টু-লুর শহর চিনব কি করে?'

—'আ-লুরের নিচে দ্বিতীয় হ্রদের দক্ষিণ তীরে টু-লুর শহর।'

বলতে বলতে ওরা বিশ্বাসঘাতকদের দলের কাছে এসে পড়েছিল। তারা এদের চিনতে পারেনি, মনে করেছে নিজেদের লোক। নেতা হঠাৎ যুদ্ধের ডাক দিয়ে দলবল নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

যুদ্ধের গতি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে টারজান টু-লুরের উদ্দেশ্যে দক্ষিণে চলল।

★

কো-টানের প্রাসাদ থেকে জেন ক্লেটনকে তুলে নেওয়া যত সহজ, তাকে হাঁটানো মো-সারের পক্ষে তত সহজ হল না। সে এক পা-ও হাঁটল না। উপরন্তু আঁচড়ে কামড়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। শেষ পর্যন্ত ওর হাত মুখ বেঁধে বলিষ্ঠ দুই অনুচরের কাছে দিল, তারা ওকে বয়ে নিয়ে চলল। যে পাহাড় কেটে আ-লুর নগর তৈরি, সেখান থেকে নেমে, মাঠ পার হয়ে ওরা হ্রদের ধারে পৌঁছল। সেখানে নৌকোর বহর অপেক্ষা করছিল। নৌকোগুলো গাছ কুঁদে বানানো, সামনে পিছনে জন্তু কিংবা পাখির চেহারা খোদাই করা, নানা রং করা।

একটা নৌকোর পিছন দিকে জেনকে ফেলে রেখে যে যার কাজে গেল। মো-সার কাছে এসে বলল, ঝগড়া-টগড়া কর না, সুন্দরী, কেউ তোমার অনিষ্ট করবে না। মো-সারের কথা মতো চললে, তার মতো প্রভু পাবে না।' এই বলে হাত মুখের বাঁধন খুলে দিল।

হ্রদের ওপর পালাবার উপায় নেই। এক শো দাঁড়ের ওঠা-পড়ার সঙ্গে ওরা এগিয়ে চলল, হ্রদ থেকে নদীতে, নদী থেকে অন্য হ্রদে। এইভাবেই জাড-বেন-ওথো উপত্যকার নদী নালা দক্ষিণের বিশাল জলাতে গিয়ে মেশে।

দুপাশে সবুজ গাছে ঢাকা পাহাড়ের সারি, তার মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে এগোনো। কখনো চাঁদের আলোয়, কখনো বা গাঢ় ছায়ায়।

অনেক মাস ধরে জেন ক্লেটন বন্দী জীবন কাটাচ্ছিল। গোড়ায় সেই যে কতকাল আগে শ্লাইডার ওকে বন্দী করেছিল তারপর আর ছাড়া পায়নি। নানা শক্তির হাতে পড়লেও, কেউ তার অনিষ্টও করেনি। গোড়ায় জার্মান হাই-কমাণ্ড ওকে হস্টেজ করে রেখেছিল। কিন্তু যখন জার্মানরা হারতে আরম্ভ করল, তখন ওদের ব্যবহারে কেমন একটা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা প্রকাশ পেতে লাগল। যাতে ব্রিটিশ বাহিনী ওকে উদ্ধার করতে না পারে, তাই লেফটেনাণ্ট ওবারগাটসের সঙ্গে আফ্রিকার অন্তঃপ্রদেশে জেনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লোকটা বেশ রূঢ় প্রকৃতির। গ্রামের লোকদের সঙ্গে বড়ই খারাপ ব্যবহার করত। বুঝত না যে দিশী সৈনিকদের সহানুভূতি গ্রামবাসীদের দিকে। একটু সুযোগ পেলেই তারা ক্ষেপে উঠবে।

এলও সুযোগ। একজন লোক জার্মান বাহিনী থেকে পালিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সন্ধ্যাবেলায় গ্রামে এসে পৌঁছল।

ওর আগমনের খবর ওবারগাটসের কানে যাবার আগেই গাঁ সুদ্ধ সকলে জেনে গেল যে আফ্রিকায় জার্মানদের রাজত্বের অবসান হয়েছে। ওরা ওদের সামান্য মাইনেটুকুও হয়তো পাবে না। ওবারগাটসের আর রক্ষা নেই। সঙ্গের ঐ সাদা-চামড়া মেয়েটাও পার পাবে না, সে যে-ই হক না কেন।

একজন নিগ্রো মেয়ে জেনকে বড় ভালবাসত, সে এসে সব কথা বলে দিল। ওবারগাটস মারা পড়বে, জেনকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। সেই রাতেই এ সব হবে। অগত্যা ওবারগাটসকে জানাতে হল। সে তো বিশ্বাসই করতে চায় না। জেন চটে গেল, 'তোমার দাম্ভিকতা আর নিষ্ঠুর ব্যবহারেরি ফল এটা। আজ রাতে এসে তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে। বরং রাইফল পিস্তল নিয়ে শিকারের অছিলায় বনে চলে যাই। তবে আগে কথা দাও যে আমার কোনো ক্ষতি করবে না।'

কি আর করে ওবারগাটস্, সেই রকম কথা দিল। যাবার সময় জেন তাকে সাবধান করে দিল 'আর দেখ তোমার দাম্ভিক ব্যবহার এতটুকু বদলে ফেললে, ওরা কিন্তু সন্দেহ করবে।'

কাজেই বন্দুক গোলাগুলি গুছিয়ে নিয়ে ওবারগাটস্ শিকারের ভান করে লোকজনসহ শিকারে বেরুল, যেন কিছুই হয়নি। তার মতলব দিনে দিনে গাঁ থেকে যতদূরে সম্ভব এগিয়ে যাবে।

সন্ধ্যা হলে নুমার ভয়ে গাঁয়ের লোক বনে পা দেবে না। লোকজনরা এক দিকে গেল, ওরা দুজন, কিছুদূর গিয়ে দক্ষিণ দিকের পথ ধরে যত তাড়াতাড়ি পারে এগোতে লাগল।

এরপর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সে কি অমানুষিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে কেবলি পথ চলা! পুবে গেলে, অল্প দিনের মধ্যেই উপকূলে পৌঁছে যেত। কিন্তু তা হলে ব্রিটিশদের হাতে বন্দীও হত। তাতে ওবারগাটস্ রাজি ছিল না।

ঐ রকম কষ্ট করে ওরা সেই জনশূন্য কাঁটাগাছে ভরা প্রান্তর পার হয়ে, বর্ষা নামবার ঠিক আগে পাল-উল-ডন পৌঁছবার আগের সেই জলাভূমিতে পৌঁছল। জলা তখন অনেকটা শুকনো। পার হতে খুব কষ্ট হল না। সেই অতিকায় জানোয়ারগুলোও এদিকে আসে নি। তারপর ওরা পাহাড়ের ওপর দিয়ে জাড-বেন-ওথোর উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছল।

এইখানে একটা ছোট নদীর উৎস দেখল! তার জল বড় হ্রদের কাছে বড় নদীর সঙ্গে মিলেছে।

পাহাড় থেকে নেমে আসবার সময় এক দল হো-ডন শিকারী ওদের দেখতে পায়। ওবারগাটস্ পালাল, জেনকে বন্দী অবস্থায় আ-লুরে আনা হল। আ-লুরে কখনো প্রাসাদে, কখনো মন্দিরে ওর দিন কাটছিল। কো-টান আর লু-ডন পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষি করলেও ওর কোনো অনিষ্ট করে নি। এখন আবার দুরাচার মো-সার ওকে বন্দী করেছে। ওকে শেষ নৌকোর একেবারে পিছনে বসতে দেওয়া হয়েছিল। সকলে ওর দিকে পিঠ করে দাঁড় টানছিল, মো-সার ওর পায়ের কাছে শুয়ে ভোঁস-ভোঁস করে নাক ডাকাচ্ছিল। নিঃশব্দে জেন ক্লেটন নৌকো থেকে জলে নেমে পড়ল।

চাঁদ অস্ত যাচ্ছিল, চারদিকে তখনো চাঁদের আলো। জেন শুধু নাকটাকে ভাসিয়ে রেখে, জলে ডুব দিয়ে বসে রইল, যতক্ষণ না চাঁদ ডুবে গেল, অন্ধকার নামল। তখন সে দক্ষিণ তীরের দিকে সাঁতরে চলল।

জল থেকে উঠে হ্রদের ধারে দাঁড়াতেই, মনটা ছাড়া পাবার আনন্দে ভরে গেল। সামনে ঘন বন; সেখান থেকে নানা হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ডাক কানে আসছে, তবু জেনের এতটুকু ভয় নেই। যদি তার স্বামী পাশে থাকত, তাহলে তার সুখের অন্ত থাকত না। কাছেই একটা সিংহ গোঙিয়ে উঠল। জেন অমনি গাছে আশ্রয় নিল। তারপর একটা ফ্যাকড়া ডাল খুঁজে নিয়ে, সারারাত ঘুমিয়ে কাটাল।

বেলা হলে ঘুম ভাঙল। খিদে পেয়েছিল; বনে যথেষ্ট ফলমূল পেল। ছোট নদী থেকে মিষ্টি জল পান করল। একটা গাছের ঝুলে-পড়া ডালের ছায়ায় স্নানও করল। ছোট নদীর তলাটা নানা চকচকে পাথরে ভরা। তার একটাতে ওর আঙুল কেটে, রক্ত পড়ল। বাঃ, এই তো বেশ একটা অস্ত্র পাওয়া গেল। নিজের ছোট থলিটা ভরে পাথর কুড়িয়ে গাছের কোটরে রেখে দিল।

একটা ছিল লম্বাটে ধারালো ছুরির মতো, তাই দিয়ে সুন্দর একটা বর্শা তৈরি করল। শক্ত ডালের মাথায় খাঁজ কেটে, লম্বা ঘাস দিয়ে পাথরের ফলাটা বেঁধে। ওয়াজিরিদের কাছে বর্শা বানাতে শিখেছিল সে।

কাজ করতে করতে গুন্-গুন্ করে গান গাইছিল। কতকাল পরে গলায় গান এল। মনে হতে লাগল জন যেন তার খুব কাছে।

*

টারজান শহরের বাইরে সব জায়গা ঢুঁড়েও জেনের কোনো চিহ্ন পেল না। শেষে হ্রদের ধারে গিয়ে বুঝল অনেক লোক নৌকো করে রওনা হয়ে গেছে। আরো কতকগুলো নৌকো বাঁধা রয়েছে দেখে, তারি একটাতে চেপে টারজানও টু-লুরের দিকে চলল। জেন যে গাছে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, তার কাছ দিয়েই নৌকো চলে গেল, কিন্তু বাতাস উল্টোদিকে বইছিল, একটু গন্ধও পেল না।

এদিকে বাঁধের কাছে পৌঁছে, নৌকো থেকে নেমে, তবে মো-সার লক্ষ্য করেছিল নৌকোতে জেন তো নেই। কখন পালাল? কি করে পালাল? ফিরে গিয়ে তাকে খুঁজবারো উপায় ছিল না। যদি জা-ডন কিম্বা প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে দেখা হয়। দুজনেই তার বিষম শত্রু। ফিরে যাবার সাহস ছিল না তার। তবে প্রাসাদের ঘাটে পৌঁছে, তিনটে নৌকোকে সে ফেরৎ পাঠিয়ে দিল। তারা খুঁজে দেখুক। একেবারে আ-লুর অবধি গিয়ে, সেই সঙ্গে বু-লটের খবরও আনুক। অবিশ্যি ছেলের জন্য সে অপেক্ষা করেনি, নিজের নিরাপত্তাটাকেই বড় মনে করেছিল।

বাঁধের কাছে নৌকোসহ দুজন পুরোহিতের সঙ্গে যোদ্ধাদের দেখা। এই সব মেয়েলী স্বভাবের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে অপমান লাগে, কাজেই তাদের শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করাই ভালো। 'তোমরা এখানে কি করছ?'

—'মো-সারের কাছে লু-ডন বার্তা পাঠিয়েছেন।'

—'যুদ্ধের বার্তা, না শান্তির বার্তা?'

—'শান্তির বার্তা।'

—'তোমাদের পিছনে যোদ্ধারা আসছে না তো?'

—'আমরা একা এসেছি।'

—'তাহলে শান্তিতে যাও।'

যেখানে জাড-বাল-লুল নদী হ্রদে পড়েছে, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে, একজন পুরোহিত বলল, 'ও আবার কে?'

সবাই চেয়ে দেখল, একজন মাত্র যোদ্ধা একটা নৌকো বেয়ে এদিকে আসছে। আরেকজন বলল, 'ওকে চিনি। ও নিজেকে ডর-উল-ওথো বলে।'

একজন যোদ্ধা বলল, 'ঠিক বলেছ। ওকে ওখানকার লোকরা টারজান-জাড-গুরু বলে।'

সে-ই দুই পুরোহিতকে বলল, 'তোমরা মাত্র দুজন, নৌকোও ছোট। তাড়াতাড়ি গিয়ে মো-সারকে খবর দাও যে এ লোকটা আসছে।'

পুরোহিতদের ঐ সাংঘাতিক লোকটার মোকাবিলা করবার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। শেষটা যোদ্ধারা ওদের ভয় দেখিয়ে, জোরজার করে, ঠেলেঠুলে রওনা করিয়ে দিল। এখন টু-লুর না পৌঁছনো অবধি ওদের কোনো আশ্রয়ের আশা রইল না। যত তাড়াতাড়ি পারে, নৌকো বেয়ে চলল ওরা।

যোদ্ধারা ঝোপেঝাড়ে লুকোল। টারজান যদি ওদের দেখতে পেয়ে, অনুসন্ধান করতে আসে, তাহলেও ওরা ত্রিশ জন, ও একা। ওরা এসেছিল ফেরারী বন্দীর খোঁজে, কোনো হিংস্র বিদেশী যোদ্ধাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নয়।

ঐ দুই পুরোহিত যদি টারজানের চোখে পড়েও থাকে, ও কোনো সাড়া দেয়নি। তারা টু-লুর পৌঁছে তক্ষুণি মো-সারের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। যোদ্ধাদের টারজান সম্বন্ধে সাবধান করেও দিল। মো-সারকে তারা বলল, 'লু-ডন আমাদের পাঠিয়েছেন। তিনি আপনার সহযোগিতা চান। জা-ডন রাজা হতে চায়, তাই যোদ্ধা সংগ্রহ করছে। হো-ডনের গ্রামে গ্রামে লু-ডনের ভক্তরা আছে। লু-ডনকে বাদ দিয়ে মো-সার রাজা হতে পারবে না। লু-ডন বলে পাঠিয়েছেন তাহলে রাজকুমারীর সেই সাদা-চামড়া সখীকে যেন মো-সার এক্ষুণি ফেরত পাঠান।

এই সময়ে একজন যোদ্ধা এসে খবর দিল, 'ডোর-উল-ওথো টু-লুরে এসে, মো-সারের সঙ্গে এখনি দেখা করতে চাইছে।'

মো-সার আকাশ থেকে পড়ল। 'বল কি। ডোর-উল-ওথো!'

—'ওকে অনেকে বলে টারজান-জাড-গুরু। বাস্তবিকই দেবতার সন্তান না হলে, অচেনা শহরে, এভাবে একা আসার সাহস পেত না।'

শুনে মো-সার ভয়েই মরে। ঐ যোদ্ধা আবার বলল, 'ওকে বন্ধুভাবে অভ্যর্থনা কর। পরে সুবিধে পেলে না হয় কিছু ক'র। তবে প্রধান পুরোহিত সবচেয়ে খুশি হবেন যদি তাঁর কাছে ওকে জ্যান্ত সঁপে দাও।'

মো-সার বলল, 'বেশ, তাহলে তাকে নিয়ে এসো।'

দুই পুরোহিতের একজন বলল, 'লু-ডনের বার্তার উত্তর পেলেই, আমরাও রওনা হই।'

—'তাঁকে বল যে আমি তাঁরি জন্য মেয়েটিকে এখানে আনছিলাম, যাতে ওখানে কোনো বিপদে না পড়ে। কিন্তু মাঝপথে সে পালিয়ে গেল! তার খোঁজে ত্রিশজন যোদ্ধা পাঠিয়েছি। কি আশ্চর্য যে তাদের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়নি।'

—'হয়েছিল বৈ কি। কিন্তু তারা তো কিছু বলল না।'

—'লু-ডনকে গিয়ে বল তাকে পেলে, এখানে নিরাপদে রেখে দেব। আর লু-ডন যখনি বলবেন, তখনি যোদ্ধা পাঠাব।'

একজন ক্রীতদাসকে ডেকে বলল, ভালো করে খাইয়ে-খাইয়ে, টু-লুরের প্রধান পুরোহিত যেন এদের আ-লুর ফেরার অনুমতি দেয়।

ওরা চলে গেলেই টারজান এসে হাজির হল। ইস্পাতের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমি ডোর-উল-ওথো। রাজকুমারী ও-লো য়ার মহল থেকে যাকে তুমি ধরে এনেছ, তাকে নিতে এসেছি।'

মো-সার তো ভয়েই আধমরা। দেবতার সন্তান ছাড়া কখনো কেউ একা শত্রুপুরীতে ঢুকে এভাবে দাবি জানাতে সাহস পেতে পারে না! ইনি হয়তো মো-সারের মনের পাপ-চিন্তাগুলোও টের পাচ্ছেন। মিথ্যা বলে লাভ হবে না। যোদ্ধাদের অবস্থাও সেই রকম।

টারজান বলল, 'বল, কোথায় সে?'

—'সে তো এখানে নেই।'

—'মিথ্যা কথা! তুমি তাকে কো-টানের প্রাসাদ থেকে নিয়ে এসেছিলে।'

—'এনেছিলাম তাকে নিরাপদে রাখার জন্য। কিন্তু মাঝরাতে সে নৌকা থেকে নেমে পালিয়ে গেছে। তাকে খুঁজতে তিনটে নৌকোও পাঠিয়েছি। তুমি যদি দেবতার সন্তান হও, তুমি তো জানই যে আমি সত্যি কথা বলছি।'

—'লু-ডনের পুরোহিতরা কেন এসেছে?'

—'ঐ একই উদ্দেশ্যে। মেয়েটিকে ফেরত চায়।'

—'তাদের ডাকো তো, একটু কথা বলি।'

মো-সার বলল, 'আমি নিজেই তাদের ডেকে আনছি।'

মন্দিরের এলাকায় গিয়ে তাদের এ কথা বলাতে তারা বলল, 'ওকে নিয়ে কি করবেন?'

—'কি আবার করব? শান্তিতে এসেছে, শান্তিতে যেতে দেব। যদি সত্যি দেবতার সন্তান হয়।'

—'লু-ডন তো বলেন তিনি নিজের প্রাণ পণ দিতে রাজি, ও যদি দেবতার সন্তান হয়। ও আসলে একজন বড় যোদ্ধা, বিদেশ থেকে এসেছে। তোমার যোদ্ধারা যে সব অস্ত্রে মরে, ও-ও তাতেই মরবে। লু-ডন মানা করেছেন, নইলে বলতাম তোমার যোদ্ধাদের সাহায্যেই ওকে মেরে ফেল।'

তবু মো-সারের মনের অনিশ্চয়তা গেল না। যদি সত্যি দেবতা হয়? তার চেয়ে দায়টা এদের ঘাড়েই চাপানো যাক। মুখে বলল, 'তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পার। আমার ওর সঙ্গে ঝগড়া নেই।'

ওরা তখন টু-লুরের প্রধান পুরোহিতের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি কোনো বুদ্ধি দিতে পার না? একে যে জ্যান্ত ধরে দেবে, লু-ডন তাকে পুরস্কৃত করবেন।'

প্রধান পুরোহিত বলল, 'সিংহের গর্তটা আছে। সিংহ সিংহীকে ধরত, একে ধরবে না? একটা গ্রিফও ধরবে। তবে সেটাকে আগে ঢোকাতে হবে।'

আ-লুরের এক পুরোহিত বলল, 'বুদ্ধি দিয়েছেন জাড-বেন-ওথো, সেটা খাটালে হবে না কেন?'

মো-সার বলল, 'লু-ডন তো বুদ্ধি খাটাতে গিয়েই হেরে গেছে। তোমরা যা ভালো বোঝ, তাই কর।'

—'তুমি যদি ওকে মন্দির দেখাবার ছল করে খুব সমাদরে সিংহের খোপটার মধ্যে নিয়ে যাও আর সেই সময়ে মশাল-গুলো নিবিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ও কিছু বুঝতে পারবার আগেই দরজা নামিয়ে ওকে বন্দী করা যায়।'

প্রধান পুরোহিত বলল, 'জানালা দিয়ে আলো আসে, দেখতে পেলে ও পাথরের দরজা নামাবার আগেই পালাতে পারে।'

—'সেগুলোকে চামড়া দিয়ে ঢেকে দিলেই হল।'

মো-সার বলল, 'তা, মন্দ বুদ্ধি নয়।'

এরপর টারজানের তাড়া খেয়ে তিনজন পুরোহিতকে তার কাছে পাঠানো হল। তারা খুব খোসামোদ করে তাকে মন্দিরে আমন্ত্রণ জানাল। টারজান ভাবল এখানেও যা, ওখানেও তাই হবে। এই ভেবে মন্দির দেখতে গেল এবং পরিকল্পনা মতো সিংহের গর্তে বন্দীও হল।

জেন ক্রমে স্বাবলম্বী বনবাসী হয়ে উঠছিল। ফলমূল তো যথেষ্টই ছিল, বর্শা দিয়ে ছোট জানোয়ার শিকার করতেও শিখল। কাঁচা খাওয়া ওর সইত না। আগুন জ্বালতে হবে। নদী থেকে কুড়িয়ে আনা পাথরের মধ্যে কাচের মতো স্বচ্ছ গোল এক টুকরো পাথর ছিল। সেটাকে রোদে ধরে, গাছের ছালের গুঁড়োর সঙ্গে শুকনো ঘাসের খুদে একটা ঢিপিতে আগুন ধরিয়ে, মাংস ঝলসে খেল। ছাল, নাড়িভুঁড়ি মাটিতে পুঁতে ফেলল। এটা টারজানের কাছে শেখা। চারদিক পরিষ্কার থাকে; মাংসাশী জানোয়াররা গন্ধ পেয়ে ধেয়ে আসে না। গোড়ায় রাইফল, পিস্তল সঙ্গে ছিল। গোলাগুলি শেষ হয়ে, সেগুলোকে বয়ে না বেড়িয়ে কবে ফেলে দিয়েছিল।

নানা কাজে দিন কাটত। ছোরা দরকার, তীর-ধনুক দরকার। প্যান্থাররা গাছে চড়ে তাই উঁচু ডালে একটা মাচাঘর করা দরকার। সব করল। ঘরের দরজা হল। জানালাতে শিক লাগানো হল। এ সবের দরকারও ছিল। তাছাড়া খুব খাটলে রাতে ভালো ঘুমও হত, নইলে ভয়াবহ শব্দে ভরা দীর্ঘ রাতগুলো অসহ্য হত।

একদিন একটু দূরে গিয়ে বর্শা দিয়ে একটা হরিণ-ও মারল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ইংরিজিতে বলে উঠল, 'সাবাস!' চেয়ে দেখে ছেঁড়া-খোঁড়া পোষাক-পরা হলেও, ওবারগাটস্‌ই বটে!

তার সব জারিজুরি ঘুচে গেছে। দীর্ঘকাল প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে, তবু জানোয়ারে কেন খায়নি কে জানে! ওর মনে হত হয়তো খেলেই ভালো হত। এখান থেকে বেরোনো কখনোই সম্ভব নয়।

লোকটা একেবারে বদলে গেছে। সে তার নানা অভিজ্ঞতার কথাও বলল। ওয়াজ-হো-ডনদের পাল্লায় পড়ে অনেকদিন কাটিয়েছে। ও-দেশের ভাষা শিখে গেছে। তবু ওর চোখে কি রকম একটা উদভ্রান্ত ভাব। দেখে জেনের ভয় করতে লাগল। ওবারগাটস্‌ বলে চলল যে ওয়াজ-হো-ডনরা ওকে মানুষ মনে করত না। ভাবত হয় দেবতা, নয় পিশাচ। ওদের কড়া পাহারা থেকে পালানো যাবে না বুঝে, ওবারগাটস্‌ বুঝিয়েছিল যে ও দেবতাই বটে। তারা তাদের বু-লুর শহরে ওকে রেখেছিল। ভালোভাবেই রেখেছিল। কিন্তু ওদের হিংসুটে পুরুত বা জাদুকর যাই বলা যাক, সে বলে বসল, ওর গায়ে ছুরি বসালে যদি রক্ত পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে ও দেবতা নয়।

মাঝে মাঝে দেবতার সম্মানে ভোজ হত, খুব পানাহার চলত। মাতাল হয়ে কি না করতে পারে ওরা! একটা মেয়ে সে কথা বলেও দিয়েছিল। অগত্যা না পালিয়ে উপায় ছিল না। ওবারগাটস্‌ তাকে বলেছিল, 'এ সব আবার কি? আমি এখনি স্বর্গে ফিরে যাচ্ছি।'

ওর কথা শুনতে শুনতে জেন হরিণের চামড়া ছাড়িয়ে, মাংসটা আলাদা করছিল। লোকটা বকেই গেল, এতটুকু সাহায্য করল না। এতখানি লম্বা জট পাকানো চুল-দাড়ি; হাতে মুখে ধুলো-কাদা; পরনে একটা ছাল। ওয়াজ-ডন থেকে একটা মুগুর আর ছোরা নিয়ে এসেছে। কিন্তু তার চেয়েও দুশ্চিন্তার কারণ হল, চোখের ঐ কি রকম একটা ভাব। তাছাড়া থেকে থেকে খ্যাক-খ্যাক করে হেসে উঠছিল। শেষ পর্যন্ত জেন তাকে স্পষ্ট করে অন্য কোথাও চলে যেতে বলল। সে একেবারেই রাজি হল না। উল্টে বলল সে একজন জার্মান অফিসার, কাজেই বনের মধ্যে একজন মেয়েকে একা ফেলে যেতে পারবে না। কেনই বা যাবে? দুজনে এখানে খুব সুখেই থাকতে পারবে। এই বলে কাছে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করতেই, বর্শা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জেন বলল, 'তুমি এখান থেকে চলে না গেলে, আমি তোমাকে মেরে ফেলব, এই আমি স্পষ্ট করে বলে দিলাম। আমি এখন বেরোচ্ছি, আমার সঙ্গে এসো না। এটা আমার এলাকা। এখান থেকে চার-দিকে এক দিনের হাঁটা পথ জুড়ে আমার এলাকা। তার মধ্যে তোমাকে দেখলে নিশ্চয়ই মেরে ফেলব।' এই বলে জেন বনের মধ্যে চলে গেল।

●

জা-লুর নগরে টারজান চলে যাবার পর পরিস্থিতি পাল্টে গেছিল। কো-টানের বিশ্বাসী অনুচররা দলে ভারি ছিল না। লু-ডনের পুরোহিতরা সংখ্যায় অনেক বেশি। তাদের দলে অনেক যোদ্ধাও ছিল। গোড়ায় কো-টানের অনুচররা জয়ী হলেও, পরে পুরোহিতের দল তাদের অনেককে মেরে ফেলে, জয়ী হয়েছিল। এখন বিবাদটা দাঁড়াল জা-ডন আর লু-ডনের মধ্যে।

টারজান নগরে নেই শুনে জা-ডন বড়ই মুষড়ে পড়ল। ও-লো-য়া আর পান-আট-লির মুখে টারজানের বীরত্বের আর দয়ার আরো কাহিনী শুনে জা-ডনের দলের মনে তার দেবত্বে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে উঠল।

জা ডন যাই মনে করুক, বারবার প্রার্থনা করা সত্ত্বেও

যখন দেবতার সন্তান তাদের সাহায্যে এল না, দলের লোকরা ক্রমে খসে পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার জন্য জা-ডন রাজকুমারী ও-লোয়াকে, পান আট লিকে আর অন্যান্য কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর নিয়ে আ-লুর ছেড়ে, নিজের জা-লুর নগরে চলে গেল। সেখান থেকে চারদিকের গ্রামবাসীদের সাহায্যে নিজের দল বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। তারা ওর প্রভুভক্ত প্রজা।

টারজান টু-লুরের সিংহের গর্তে বসে ভাবছিল কি সহজেই না এরা তার চোখে ধুলো দিয়েছে! এখান থেকে বেরোতে হবে। ঘরটা পাথরের, দরজাও পাথরের। ওপর থেকে নেমে বন্ধ হয়। দুটো জানালা থেকে চামড়ার ঢাকনা আগেই সরিয়েছিল। সেগুলোতে লোহার শিক বসানো। এই প্রথম এখানে লোহা চোখে পড়ল বড় দরজাটা মানুষের যাওয়া-আসার জন্য, ছোটটা সিংহের। আসবে নিশ্চয় কোনো হিংস্র জানোয়ার ঐ দরজা দিয়ে। অবিশ্যি টারজানের অস্ত্রশস্ত্র-গুলো কেউ নেয়নি। খাবার দিয়ে যায় দুবেলা, দরজাটা একটুখানি তুলে। না খাইয়ে মারবে না। যে উদ্দেশ্যেই বাঁচিয়ে রাখুক, সেটা সফল হবার আগেই টারজান পালাবে। তাই বলে পালানো খুব সহজ নয়। জানালাই একমাত্র ভরসা। ছুরি দিয়ে শিক আল্গা করতে হবে।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে নিচে হ্রদের নীল জল দেখা যায়। এ ঘরটা মন্দিরের মেঝের তলায় হলেও, পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায়। অন্যান্য ঘরের মতো পাথর কেটে তৈরি। কি সুন্দর দৃশ্য এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। সভ্য মানুষ একদিন এসে হয়তো এ স্বর্গ নষ্ট করে দেবে। এখানকার অধিবাসীরা কিন্তু বড় হিংস্র।

টারজানের অজান্তে এর মধ্যে পান-সাট এসেছিল মো-সারের কাছে। লু-ডন তাকে পাঠিয়েছে। মো-সারকেই সে রাজা করতে চায়, তাই তাকে আ-লুরে যেতে হবে। আসলে এটা মো-সারকে বিড়ম্বিত করার জন্য বলা। পান-সাট আসলে প্রধান পুরোহিতের কাছে এসেছিল। মো-সারের কাছ থেকে তার কাছে গিয়ে কানে কানে বলল, 'তুমি আ-লুরের প্রধান পুরোহিত হতে যদি চাও, তাহলে এখানে যে দুজন গোলমেলে ব্যক্তি আছে তাদের একজনকে মেরে ফেল, একজনকে আ-লুরে লু-ডনের কাছে পাঠাও।' এই বলে পান-সাট বিদায় নিল।

অবস্থাটা ঠিকই আঁচ করেছিল পান-সাট। আ-লুরের প্রধান পুরোহিত হবার জন্য এ লোকটা না করতে পারে এমন কাজ নেই। তবে মুশকিল হল কাকে মারতে হবে, আর কাকে আ-লুর পাঠাতে হবে তা বোঝেনি। আসলে মো-সারকে সরালে লু-ডনের রাজা হবার পথ পরিষ্কার হয়। আর টারজানকে সকলের সামনে বলি দিতে পারলে তার সম্মানও বজায় থাকে, আপদও দূর হয়। লু-ডন একাধারে রাজা আর প্রধান পুরোহিত হতে চায়। যে-মুহূর্তে টু-লুরের প্রধান পুরোহিত বড় আশা করে আ-লুর পৌঁছবে, তার এক ঘণ্টার মধ্যে গুপ্তঘাতকের হাতে তারও প্রাণ যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আপাততঃ মো-সারকে স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা না করে, সে কয়েকজন যোদ্ধাকে ঘুষ দিয়ে হাত করে, তাদের নিয়ে, মাটির তলার অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে টারজানকে হত্যা করতে চলেছিল। টারজান ছুরি দিয়ে শিকের গোড়া ঢিলা করছিল। ওদের পায়ের শব্দ কানে গেল। বড় দরজার দিকে অনেক-গুলো লোক আসছে। টারজান তখনো শিক চাঁচতে লাগল। তার শব্দ সে লোকগুলোর কানে যেতে, তারা ভয়ে থমকে দাঁড়াল। তাদের কপালে ঘাম দেখা দিল! কিন্তু যাই হক সে একা, এরা বারোজন। দরজাটা উঠে গেল! ওরা দশ জন ঘরে লাফিয়ে পড়ল। একসঙ্গে তিনটে মুগুর দেয়ালের কিনারায় কালো ছায়াটার ওপর সজোরে পড়ল। প্রধান পুরোহিতের মশালের আলোও ঘরে এসে পড়ল। ঘরে কেউ নেই। দেয়ালের কিনারায় এক টিপি জানালা-ঢাকা চামড়া। একটা জানালার প্রায় সব শিক উধাও। একটা বাকি আছে। তাতে চামড়ার ফালিতে গিঁট দিয়ে তৈরি একটা দড়ি ঝুলে আছে।

সে রাতে গাছ-ঘরে শুয়ে শুয়ে জেনের বড় অনুতাপ হচ্ছিল। লোকটাকে ও-ভাবে ভাগিয়ে দেওয়া ঠিক হয় নি। ঐ তো শরীরের হাল। নানা বিপদে ভরা এই বনে খেয়েদেয়ে বাঁচবে কি করে? এই সব ভাবছে, কানে এল একটা খচমচ শব্দ। একটা ভারি কেউ গাছে উঠছে। সে কে, তাও বলে দিতে হল না। গুঁড়ি ছেড়ে সে এই ডাল বেয়েই এগিয়ে আসছিল। জেন বর্শা নিয়ে তৈরি। যখন যথেষ্ট কাছে এসে পড়ল, তখন ডালপালার তৈরি দেয়ালের ফাঁক দিয়ে মারল এক খোঁচা। খোঁচাটা কারো গায়ে লাগল, তা ও বোঝা গেল। সে-ও চেঁচিয়ে উঠে ধপাস করে পড়ল নিচের দিকে। বর্শাটা ভাগ্যিস শক্ত করে ধরে রেখেছিল। নইলে সেটাও হাতছাড়া হত। চিৎকারের সঙ্গে গাল দিয়ে উঠেছিল লোকটা, তাতেই আরো নিঃসন্দেহ হওয়া গেল যে ওবারগাটস্‌ই বটে। নিচের

থেকে আর সাড়াশব্দ শোনা গেল না। মরেটরে গেল কি না কে জানে? তাহলে সিংহ এসে টেনে নিয়ে গেলেই ভালো হয়। ঐ বিকট চেহারা আর দেখতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু পুঁততে তো হবেই।

সারা রাত চোখে ঘুম নেই। ভোরে উঠে জেন দেখল গাছতলায় কেউ নেই, কিন্তু রক্তের দাগ গেছে নদীর ধার পর্যন্ত। সারা দিন মনে বড় অশান্তি নিয়ে কাটল। রাতে গাছ-ঘরের দরজাটাকে আরো ভালো করে ভিতর থেকে এঁটে বেঁধে রাখল। অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি। কেবলি তার অসাধারণ স্বামীর কথা মনে হয়েছে। অনেক রাতে ঘুম এল। তারপর আবার সেই একই ব্যাপার। গাছের ডালটা কারো ওজনে ঝুলে পড়তে লাগল। জেন আবার বর্শা তুলে তৈরি। এটাও পড়বার সময় চ্যাঁচাবে কি না কে জানে?

★

টারজান তো শেষ মুহূর্তে জানালা গলে নিচে নেমে পড়ল। এখন মন্দিরের হাতা থেকে বেরোতে হবে। প্রাসাদ আর মন্দির একই জায়গায়। ফটকে পাহারা তবে অন্ধকারে কাউকে চেনা মুশকিল। অনেকগুলো যোদ্ধার পাশ দিয়ে নিরাপদে পেরিয়ে, ফটকের কাছে এসে বিপদ হল। ঠিক সেই সময় একটা লোক ছুটতে ছুটতে এল, 'বন্দী পালিয়েছে! কাউকে বেরোতে দিও না!' বলা বাহুল্য সেখানে ভীষণ মারামারি হয়েছিল। একদিকে টারজান একা, অন্যদিকে এদের দলবল। কিন্তু তাদের মধ্যে টারজানের গায়ে হাত তুলতে বেশির ভাগেরই আগ্রহ ছিল না। টারজান তাদেরই গদা কেড়ে নিয়ে তাদের পিটতে লাগল। একটাকে তুলে অন্যদের ওপরে আছড়ে ফেলতে লাগল। একটা মাত্র মশাল ছিল একজনের হাতে, সেটাও কেড়ে নিয়ে নিবিয়ে দিয়ে, এক সময়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হ্রদের পাশ দিয়ে, নদীর ধার দিয়ে, বনের মাঝ দিয়ে যেতে হবে। বনের ধারে এসে গাছ ধরে ঝুলে পড়ল। শরীর খুব ক্লান্ত, কিন্তু আরো অনেকটা তফাতে না গিয়ে ঘুমোনো ঠিক হবে না। ভোর হলেই মো-সার ওর পিছনে লোক লাগাবে।

আরো পরে হঠাৎ নাকে একটা গন্ধ এল, অমনি একটা বড় গাছের নিচে সে থমকে দাঁড়াল। নিজের নাককে বিশ্বাস হচ্ছিল না। গাছ বেয়ে উঠে দেখল ছোট একটা গাছ-ঘর। তার বন্ধ দরজার বাইরে বসে ডেকে বলল, 'জেন! আমি এসেছি!' তার উত্তরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কে যেন পড়ে গেল! দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। টারজান খুলতে না পেরে সেটাকে তুলে ফেলে ঘরে ঢুকে দেখল জেন অজ্ঞান হয়ে গেছে!

তারপর দুজনে দুজনাকে কত সুখ-দুঃখের কথাই বলল। জেন বলল, 'আমি আর কিছু চাই না গো, খালি বাড়ি ফিরে যেতে চাই। বল, জ্যাক্ কোথায়?'

—'তা তো বলতে পারি না। আর্গনে যুদ্ধ হচ্ছিল, সেখানে ছিল।'

জেন বলল, 'তাকে কাছে না পেলে সম্পূর্ণ সুখী হব কি করে?'

—'যুদ্ধের সময়ে দেশের ঘরে ঘরে সকলেরি এই দুঃখ, জেন। যুদ্ধ থামলে সে ফিরে আসবে। তুমি কি লণ্ডনে চলে যেতে চাও?'

—'না, না, আফ্রিকাতে তোমাদের দুজনকে নিয়ে থাকতে চাই।'

ওবারগাট্স্ আগের দিন রাতে বর্শার খোঁচা খেয়ে রক্তাক্ত শরীরে নদীর ধারে পৌঁছল। ওর মাথার গোলমাল হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছিল জেনের কাছ থেকে যত দূরে সম্ভব পালাতে হবে। কিন্তু রাগও হয়েছিল খুব। এর জন্য জেনকে কষ্ট পেতে হবে। ক্রমাগত হ্রদের তীর ধরে এগোতে লাগল সে। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, থেকে থেকে মুখে খ্যাক-খ্যাক্ হাসি। খালি গা কাদা ময়লায় ঢাকা! জটাবাঁধা চুলদাড়ি। সে চেহারা ভাবা যায় না।

ক্রমে একটা বড় নদীর মুখে পৌঁছে দেখে, তার ওপরে একটা সাদা শহর রোদে ঝলমল করছে। এই তবে আ-লুর। অমনি বু-লুর আর ওয়াজ-হো-ডনদের কথা মনে পড়ল। তারা ওকে জাড বেন-ওথো বলত, তার মানে ভগবান। নদীর ধারে পাইচারি করতে লাগল ওবারগাট্স্, 'আমি জাড-বেন-ওথো! আমি স্বয়ং ভগবান! আ লুরে আমার মন্দির আর প্রধান পুরোহিতরা আছে। তাহলে আমি এখানে কি করছি?' জলে নেমে চ্যাঁচাতে লাগল, 'আমি ভগবান! কোথায় আমার দাস-দাসীরা? আমাকে নিয়ে যাচ্ছিস্ না কেন?'

একটা নৌকো চোখে পড়ল। অমনি মাথাটা খানিকটা সাফ হয়ে এল। ভগবানের এ কি চেহারা? রাশি রাশি বুনো ফুল তুলে চুলে, দাড়িতে গুঁজে, ভগবানের যোগ্য সাজ করে সে নৌকোয় গিয়ে উঠল। মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, 'আমি ভগবান! প্রধান পুরোহিত,

ছোট পুরোহিতরা সবাই এসে আমার সেবা করুক!'

প্রাসাদ থেকে লু-ডন আর তার পুরোহিতরা ওকে দেখতে পেল। লু-ডন দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। খবর এসেছে টারজান টু-লুর থেকে পালিয়ে গেছে। এখানে যদি জা-ডনের দলে এসে জোটে, দলে দলে যোদ্ধারাও তার কাছে চলে যাবে। এ সময়ে একটা নকল দেবতা পেলেও লু-ডনের কিছুটা সুবিধা হয়।

ভাসতে ভাসতে নৌকোটা যদি স্রোতের টানে পড়ে যায়, তাহলে জাড-বাল-লুল হ্রদের দিকে ভেসে চলে যাবে।

লু-ডন অনুচরদের হুকুম দিল 'ওকে নিয়ে এসো।'

তাকে ধরে আনা হলে লু-ডন বলল, 'তুমি কোথা থেকে এলে?'

—'আমি জাড-বেন ওথো। স্বর্গ থেকে এসেছি। আমার প্রধান পুরোহিত কোথায়?'

লু ডন বলল, 'আমিই সে।'

—'তাহলে আমার পা ধোয়ার আর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কর।'

ধূর্ত লু ডন নিচু হয়ে প্রণাম জানিয়ে দাসদের বলল, 'এঁর জন্য জল আর খাবার দাবার আনো।'

এই ভাবে সকলের সামনে লু ডন ওবারগাট্সের দেবত্বকে স্বীকৃতি দিল।

কথাটা চারদিকে রটে গেল। সবাই বলাবলি করতে লাগল স্বয়ং জাড বেন-ওথো এসে লু-ডনের সহায় হয়েছেন। মো সারও তাড়াতাড়ি লু-ডনের কাছে নতি স্বীকার করল। নইলে তার প্রাণ বাঁচানো দায় হত। লু-ডনও ভাবল একে নানা কাজে লাগিয়ে নিজের সুবিধা করে নেওয়া যাবে। কাজেই মো-সারকে খবর পাঠানো হল সে যেন দলবল নিয়ে আ-লুরে চলে আসে। কারণ জা-ডন নাকি উত্তর দিক থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে আ লুরে হানা দেবে।

দেবতা হয়ে ওবারগাট্স্ আহ্লাদে আটখানা। প্রচুর ভালো ভালো খাবার, সেবা যত্ন আর বিশ্রাম পেয়ে মাথাটা খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেও, এক বিষয়ে ওর পাগলামি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছিল। আর কখনো নিজের ভগবানত্বে নিজের গভীর বিশ্বাস কেউ টলাতে পারবে না। দাস-দাসীদের দিন রাত হুকুম করত। মনের স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতাও অসম্ভব বেড়ে গেছিল। এ সবে লু-ডনেরো পুরো সমর্থন ছিল। তার ধারণা এই উন্মাদের সাহায্যেই সারা পাল-উল ডনে নিজে চিরকাল রাজত্ব চালাতে পারবে।

জাড-বেন-ওথোর বেদীর সামনে একটা সিংহাসন তৈরি করা হল। তাতে বসে রোজ নকল দেবতা একজন বন্দী বা ক্রীতদাসকে বলি দেওয়া দেখত। এমনি তার উৎসাহ যে পরে নিজের হাতে খাঁড়া দিয়ে বলিদানও সে নিজেই করত। আ লুরের লোকরা দেবতাকে ভালো না বেসে, ভয় করতে শিখল। তাঁর নাম শুনলে ছেলেপিলেদের হাত পা ঠাণ্ডা হত। লু-ডন প্রকাশ্যেই জা ডনকে, নকল ওবার উল ওথোকে আর তাদের সমর্থকদের শাপ দিল। বলল কার কার শাপ লেগেছে টের পাওয়া যাবে যদি কারো পেট ব্যথা, কি জ্বর, কি অল্প শরীর খারাপ হয়। ঐ ভাবেই শাপের ক্রিয়া প্রথম প্রকাশ পাবে। কাজেই যাদের শরীর খারাপ হবে তারা যে শত্রুপক্ষের লোক সেটা প্রমাণ হবে। তাদের সাজা দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য কারো শরীর খারাপ হলে সে বেমালুম চেপে যেত।

●

টারজান ভেবেছিল আর কোথাও দেরি করবে না। এবার জেনকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। তবে ওম-আটের সঙ্গে একবার দেখা করে, তাকে পান-আট-লির নিরাপত্তার কথা জানাতে হবে। বনের মধ্যে ওরা একটা গ্রিফের পাল্লায় পাড়ছিল। গ্রিফ্ কারো পিছু নিলে তাকে ঝেড়ে ফেলা শক্ত। এ গ্রিফ্টাও তাই। শেষটা তাকে হুই-উ বলে ডেকে জেনের বর্শা দিয়ে বাড়ি মেরে, বশ করে, তার পিঠে চেপে, ওরা এগোতে লাগল। সামনে থেকে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার শত্রুদের যোদ্ধা, সব পালাল। চারদিকে রটে গেল ডোর-উল-ওথো গ্রিফ্ চেপে ফিরে এসেছে। ও-নামে কেউ তাকে ডাকতে সাহস পায়নি, সবাই বলছিল টারজান জাড-গুরু। লু-ডনের কাছে কথাটা যেতেই সে বুঝল ওরা জা-ডনের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে। পান-সাট্কে ডেকে লু-ডন বলল, ঐ নকল দেবতাকে মেরে, মেয়েটাকে অক্ষত দেহে আমার কাছে এনে দিতে হবে।'

ওরি হাতের পুতুল পান সাট বলল, 'বেশ, তাই হবে।' বলে পুরোহিতের সাজ খুলে, আ-লুরের সাধারণ যোদ্ধার বেশ ধরে বেরিয়ে পড়ল।

তাকে দেখে লু-ডন বলল, 'কারো সাধ্য নেই তোমাকে চিনতে পারে!' ভালো মানুষের মতো মুখ করে পান সাট জা লুরের পথ ধরল।

কোর-উল জার ওপরে একটা খাদ আছে, সেখানে কোনো বসতি নেই। সেখানেই জা-ডন বুদ্ধি করে তার

যোদ্ধাদের একত্র করেছিল। ওখান থেকে তারা আ-লুরে নামবে। তাহলে অপ্রত্যাশিতভাবে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেও পারবে, আবার পিছন থেকে আক্রমণের ভয়ও থাকবে না। এমন সময় একজন যোদ্ধা খবর দিল যে গ্রিফের পিঠে চড়ে দুজন লোক এদিকে আসছে। প্রথমে বিশ্বাস না হলেও, আরো কাছে এলে একজনকে জা-ডন চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'স্বয়ং ডোর-উল-ওথো এসেছেন।' সে ডাক টারজানদের কানেও গেল। আর গ্রিফটা তো এমনি ক্ষেপে উঠল যে তাকে ঠাণ্ডা করতে বেশ বেগ পেতে হল।

জা-ডন বলল, 'আমি জা-লুরের জা ডন, ডোর উল ওথোর বন্ধু। আমরা তাঁর পায়ে মাথা নত করে, লু ডনের সঙ্গে আমাদের ন্যায় যুদ্ধে তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করি।'

টারজান তো অবাক! 'সে কি! আমি ভাবলাম তুমি কবে লু-ডনকে পরাজিত করে পাল-উল-ডনের রাজা হয়েছ।'

—'না তা হইনি। দেশের লোক লু ডনকে বড় ভয় করে। সে আবার একজন নকল দেবতাকে এনে আ লুরে বসিয়েছে। আমার যোদ্ধারা ঘাবড়ে গেছে। তারা যেই শুনবে ডোর উল ওথো আমাদের পক্ষে, অমনি সাহস পেয়ে, যুদ্ধে জয়ী হবে।'

—'আমি আ-লুরে যুদ্ধ করতে গেলে আমার স্ত্রীকে তুমি কোনো নিরাপদ জায়গায় রাখবে?'

—'সে জা লুরে রাজকুমারী ও লোয়া আর আমার পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে আমার প্রাসাদে থাকবে। সেখানে বিশ্বাসী রক্ষীর ব্যবস্থা করেছি।'

টারজান বলল, 'বেশ, তাই হবে। আগে আমার গ্রিফের জন্য মাংসের ব্যবস্থা কর। তাহলে আর কাউকে ধরে খাবে না।'

যোদ্ধারা শিকার করে অনেক জানোয়ার এনেছিল। টারজান নিজের হাতে গ্রিফটাকে খাওয়াল। খিদে পেলে তাকে সামলানো যাবে না।

সকালের আগে রওনা হওয়া গেল না। গ্রিফটাকে রাতের খাবার দুটো বড় হরিণের আর একটা গোটা সিংহের লাশ দেওয়া হয়েছিল। সকালে শুধু গ্রিফটাকে দেখা গেল। নানা গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হল, যাতে লোকে সাহস ও বিশ্বাস ফিরে পায়। জা-লুরের পথে একজন অচেনা যোদ্ধাও ওদের দলে যোগ দিল। তাকে কেউ চেনে না। সে নাকি লু-ডনের লোকদের কাছে খারাপ ব্যবহার পেয়ে, এদের দলে যোগ দিতে চায়। জা ডন তাতে খুশিই হল।

জা-লুরে পৌঁছে গ্রিফটাকে একটা ঘেরা জায়গায় প্রচুর মাংসসহ ছেড়ে দিয়ে সকলে চলে এল।

জা-ডনের সঙ্গে টারজান আর জেন রাজবাড়িতে গেল। ও-লোয়া আর পান-আট-লি টারজান জাড-গুরুকে দেখে বড় খুশি হল। তাদের কাছে জেনকে রেখে পরদিন সকালে গ্রিফে চড়ে বাহিনীর সঙ্গে টারজান আ-লুরের দিকে রওনা হল। খাদের মুখে গ্রিফটাকে দুটো বর্শার বাড়ি দিতেই, সে নিজের মতে অন্য দিকে চলে গেল। শহরে তাকে সামলানো যাবে না, কাজেই টারজান নিশ্চিন্ত হল।

●

রাত হলে জা লুরের প্রাসাদ থেকে সেই অচেনা যোদ্ধাটি লুকিয়ে মন্দিরের এলাকায় ঢুকল। পুরোহিতরা রাতের খাওয়ার পর এক জায়গায় সমবেত হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় পুজো, বলি, সব হয়ে গেছে। মন্দিরের সঙ্গে প্রাসাদের খুব একটা অন্তরঙ্গতা ছিল না। জা-ডন কোনো ক্রিয়াকলাপে বাধা না দিলেও, এ-সবে তার সহানুভূতি ছিল না। সে কখনো মন্দিরে ঢুকত না। প্রধান পুরোহিতও প্রাসাদে যেত না। আগন্তুক এই বিষয়ে জানত আর মনে মনে স্থির করেছিল এর থেকেই নিজের কাজ হাসিল করে নেবে। পুরোহিতদের বসবার ঘরে ভদ্রভাবে ঢুকে আঙুল দিয়ে একটা সংকেত করল। সে সংকেতটা অন্যদের কাছে অর্থহীন হলেও, যাদের বুঝবার, তারা ঠিকই বুঝল। দুজন পুরোহিত উঠে ওর কাছে এসে ঐ ভাবেই সংকেত করল। একটুক্ষণ কথাবার্তার পর, অচেনা লোকটা আবার বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই একে একে সেই দুজন পুরোহিতও বেরিয়ে এল। বাইরে একজন যোদ্ধা অপেক্ষা করছিল। তিনজনে কি পরামর্শ করে, যে যার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। জা-লুরের প্রাসাদে মেয়েদের ঘরগুলো একটা লম্বা বন্ধ বারান্দার এক ধারে। প্রত্যেক ঘরের বাইরের দিকে একটা জানালা, বারান্দার দিকে একটা দরজা। জানালার নিচে বাগান। ঐ রকম একটা ঘরে জেন একলা ঘুমিয়ে ছিল। বারান্দার দু-মাথায় দুজন প্রহরী আর অন্দরমহলে বাইরের দরজার কাছে একটা ঘরে অনেক প্রহরী।

আ-লুরের মতো জা-লুরে রাতে আমোদ প্রমোদের নিয়ম ছিল না। সকলে তাড়াতাড়ি শুতে যেত। সমস্ত প্রাসাদ নিঝুম হয়ে গেলে, রাতে প্রহরী বদলের সময় হতেই, দুজন বদলি লোক এসে সংকেতের বাক্য বলে পাহারার ভার নিল।

কারো কিছু সন্দেহের কারণ ছিল না। একটু পরে আরেক জন যোদ্ধাও এল। এ হল সেই নতুন লোকটি।

ব্যাপার হল পুরোহিতরা সকলেই মুখোস পরে থাকত বলে কেউ কাউকে চিনত না। এরা তিনজন পরদা তুলে জেনের খাটের কাছে এল। সে তো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নবাগত একটা নরম ফোমের কম্বল দিয়ে ঘুমন্ত জেনের মুখ ঢেকে দিল। তারপর নিঃশব্দে তারা ওর হাত পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে শব্দ করা বন্ধ করে, কাঁধে তুলে জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে, পাঁচিলে একটা ছোট দরজা খুলে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামতেই, নদীর ঘাটে পৌঁছল। সেখানে নৌকো বাঁধাই ছিল, তাতে জেনকে তুলে দিয়ে, বিশ্বাসঘাতক সহকারীরা বিদায় নিল। বলা বাহুল্য, অচেনা লোকটি পান-সাট ছাড়া কেউ নয়। সে এবার নৌকো ছেড়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আ-লুরে চলল।

চাঁদ ডুবে গেছে, ভোর হতে তখনো দেরি আছে, সেই সময় লম্বা একসারি যোদ্ধা নিঃশব্দে আ-লুরের অন্ধকার পথ দিয়ে চলেছিল। টা-ডেন তার দলবল নিয়ে নগরের উত্তর-পশ্চিমে অপেক্ষা করছিল। টারজান বাছাই করা এক দল যোদ্ধা নিয়ে গোপন পথে মন্দিরে ঢুকবে বলে এগোচ্ছিল। ও ছাড়া কেউ সে-পথ চিনত না। ওদিকে যোদ্ধাদের অধিকাংশকে নিয়ে জা-ডনের প্রাসাদের ফটক আক্রমণ করার কথা।

টারজান গোপন পথের দরজার কাছে নিরাপদে পৌঁছে-ছিল। এখানে পাহারা থাকে না, কারণ পুরোহিতরা ছাড়া কেউ এ পথের কথা জানে না। একটা মশাল নিল টারজান, কারণ অসমান উঁচু নিচু অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে যেতে হবে। একবার মন্দিরে ঢুকলে অনেক কাজ হবে। জা-ডনের ধারণা যে-সব যোদ্ধা লু-ডনের দলে আছে, তারা আসলে ডোর-উল-ওথোর ভক্ত। ভয়ে লু ডনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ডোর-উল-ওথোকে একবার দেখতে পেলেই ওদের মন বদলে যাবে। পথটা চেনা থাকাতে আর শত্রুর সম্মুখীন হবার আগ্রহে, টারজান সঙ্গীদের থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে অন্যরা পৌঁছবার অনেক আগেই সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপরের করিডরে পৌঁছে গেছিল। এখানেই লু-ডনের আর অন্য পুরোহিতদের ঘর। একটা বাঁক ঘুরেই প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় দেখতে পেল অন্য একটা গলি দিয়ে একজন যোদ্ধা একটি মেয়েকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। মেয়েটি যে জেন তা চিনতে টারজানের এক মুহূর্তও সময় লাগল না।

সেই যোদ্ধাও ওকে দেখতে পেল। জানোয়ারের মতো একটা চাপা গর্জন করে টারজান এক লাফ দিয়ে, লোকটার হাত থেকে জেনকে ছিনিয়ে আনবার চেষ্টা করল।

পাশেই একটা ছোট ঘর, লোকটা সেখানে ঢুকে পড়ল। মশাল ফেলে, ছোরা নিয়ে টারজানও সে-ঘরে ঢুকল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে সামনে পিছনে ধড়াম্ ধড়াম্ করে পাথর পড়ার শব্দ হল। টারজান আবার বন্দী হল। সেই অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টারজান চারদিকে ওপরে নিচে তাকাল। ওপরে তিন ফুট গোল একটা ফাঁক দিয়ে আবছায়া আলো আসছিল। ঘরটা পনেরো ফুট মতো লম্বা চওড়ায়। ওপরের গর্তটার ঠিক নিচে একটা গোল ঢাকনির মতো। এই জায়গাটাতে পা দিলে চলবে না! দুদিকের বেরোবার পথে পাথরের দরজা নেমে গেছে।

যোদ্ধার বেশে পান-সাট জেনকে লু-ডনের সামনে হাজির করল। লু-ডন মহা খুশি। তারপর যখন শুনল টারজান-জাড-গুরুও বন্দী হয়েছে, তখন তার আহ্লাদ আর ধরে না!

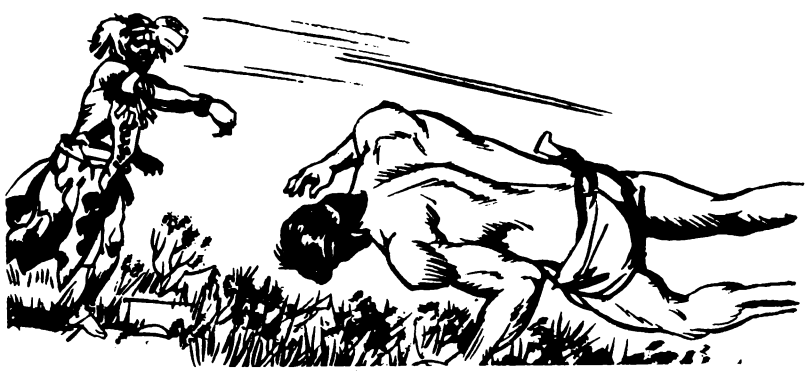

ঠিক এই সময় একজন পুরোহিত ছুটে এসে বলল, 'শিগগির আসুন প্রভু, জা-ডনের যোদ্ধারা করিডর ভরে ফেলেছে!'

লু-ডন বলল, 'পাগল হয়েছ? আমার যোদ্ধারা প্রাসাদ মন্দির সব অধিকার করে আছে।'

পুরোহিত তবু বলতে লাগল, 'এখনি এই ঘরে ঢুকে পড়বে। ওরা সুড়ঙ্গ দিয়ে এসেছে!'

পান-সাট বলল, 'টারজানও তো ঐ পথেই এসেছিল। ও-ই তাহলে যোদ্ধাদের এই পবিত্র জায়গায় নিয়ে এসেছে।'

লু-ডন দরজা খুলে যোদ্ধাদের দেখতে পেল। দলপতিকে না দেখে তারা হকচকিয়ে গেছিল। এই গোলকধাঁধায় পথ

খুঁজে পাওয়া তাদের কর্ম নয়। লু-ডনের ঘরের মধ্যে ঘণ্টার দড়ি ঝুলছিল! সেটা ধরে টানতেই গুমগুম করে পাঁচবার ঘণ্টা বেজে উঠল। একটা অন্যদিকের ছোট দরজা দিয়ে সে ঘর থেকে লু-ডন বেরিয়ে গেল। ওর কথামতো বাকিরা জেনকে তুলে নিয়ে সঙ্গে চলল।

চারদিক থেকে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ঐ ঘণ্টার মানে লু-ডনকে রক্ষা করা দরকার। দেখতে দেখতে টারজানের যোদ্ধাদের দশগুণ লোক এসে জড়ো হল। তারাও বে-গতিক দেখে যে সুড়ঙ্গ দিয়ে এসেছিল, সেই সুড়ঙ্গ দিয়েই পালাল। ভাবল সব বোধ হয় ব্যর্থ হল!

এদিকে ঘণ্টা শুনে জা-ডন ভাবল তাহলে টারজান তার দল নিয়ে প্রথম আঘাতটা হেনেছে! এবার সে-ও যোদ্ধাদের নিয়ে প্রাসাদের ফটকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মন্দিরের ভিতর-কার উঠোনে লু-ডনের কানে সে শব্দ পৌঁছল। সে বুঝল যুদ্ধ তবে লেগেছে। জেনকে পান সাট আর অন্য পুরোহিতটির জিম্মা করে দিয়ে, লু-ডন ছুটল ফটকের দিকে, যুদ্ধ পরিচালনা করতে।

ওবারগাট্‌স্ বিকট হট্টগোল শুনে রেগেমেগে উঠে বসল। 'কার এত সাহস যে দেবতার ঘুম নষ্ট করে।'

একজন দাসী বসেছিল, সে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে বলল, 'বোধ হয় শত্রুরা এসেছে, ভগবান!'

একজন পুরোহিত দৌড়ে এসে বলল, 'ভগবান, শত্রুরা প্রাসাদ আর মন্দির আক্রমণ করেছে। আপনি চলুন, আপনার যোদ্ধাদের সাহস দিন।'

অমনি ওবারগাট্‌স্ লাফিয়ে উঠল, 'চল, চল, পাপিষ্ঠদের শাপ দিয়ে দগ্ধ করি।'

দাসীর পিছনে লাথি কষিয়ে বলল, 'চল, বসে দেখছ কি? সবাই চল।'

সকলে দৌড়ল। মন্দিরের পুরোহিতরা চিৎকার করে সবাইকে জানাতে লাগল, 'সত্যি ভগবান এসেছেন! নকল দেবতার সন্তান বন্দী!'

●

পরদিন সূর্য উঠল। তখনো জা-ডন প্রাসাদের ফটকের বাইরের উঁচু মিনারটিকে দখল করে, টা-ডেনের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকে দেখা গেল লু-ডন একজন অদ্ভুত চেহারার খালি গা, মানুষকে দেখিয়ে বলছে, 'এই হল আসল ভগবান! নকল ডোর-উল ওথো আমাদের বন্দী!'

কে যেন ভিড় থেকে বলে উঠল 'তাকে দেখাও।' লু-ডন মাথা ঘুরিয়ে কাউকে কিছু হুকুম করল।

টারজান তার কারাগারে পাইচারি করতে করতে ভাবছিল জেনের সাহায্যে না এসে সে কি করতে পারত? গুম্‌গুম্ ঘণ্টা তারো কানে গেছিল। বাইরে অনেক পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পেরেছিল অনুচরেরা বিপদে পড়েছে। সময় যেন কাটতে চায় না। লড়াই শুরু হয়ে গেছে আর ও এখানে বন্ধ। দরজা দুটো, মেঝের গোল চাকতি কোনোটাই খোলা গেল না। হঠাৎ দেখে ছাদের গোল ফাঁক থেকে একটা দড়ি ঝুলছে! বারবার টেনে পরখ করে নিয়ে নিচের চাকতিতে কোনো সময়ে পা না রেখে, আস্তে আস্তে দড়ি বেয়ে উঠতে লাগল টারজান। ওপরে পৌঁছে সবে দুটো হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়তে যাবে, হেনকালে হাত দুটোকে কে যেন চেপে ধরল। বিকট মুখোস পরা একজন পুরোহিত চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে দুহাত বেঁধে, আরো কজনের সাহায্যে ওকে ওপরে তুলে ফেলল। এমনি সহজে টারজান ধরা পড়েছিল।

হাতও যেমন কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত বেঁধেছিল, পা ও গোড়ালির ওপর থেকে হাঁটু অবধি বেঁধে ফেলে, কোনো কথা না বলে, দুটো লোক ওকে তুলে আনল মন্দিরের চত্বরে। বাইরে তুমুল যুদ্ধের শব্দ হচ্ছিল। টা ডেন তখনো পৌঁছয়নি। পুরোহিতরা ঐ রকম বাঁধা অবস্থায় টারজানকে তুলে ধরল জনতার চোখের সামনে। 'এই দেখ নকল দেবতা বন্দী কিনা!'

ওবারগাট্‌সের মাথা খারাপ। এ-সব ব্যাপার সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। কিন্তু অসহায় বন্দীর দিকে তাকিয়ে, তাকে চিনতে পেরেই ভয়ে বিস্ময়ে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এই লোকটার সুখের সংসার জার্মানরা ছারখার করে দিয়েছিল। সব মনে পড়ে গেল ওবারগাট্‌সের। সেই অপরাধে এর নির্মম হাতে শ্লাইডার আর ফন গস্ প্রাণ দিয়ে ক্ষতিপূরণ করেছে! তৃতীয় অফিসার তখনো বাকি—সে নিজে! স্বপ্নের মধ্যেও এই সর্বনাশকেই এতকাল দেখেছে ওবারগাট্‌স্। এখন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেও সে ভয় দূর হল না। ওর কাছ থেকে যে কোনো ভয় নেই, সে কথাটাই ওর বোধগম্য হয় নি।

এদিকে লু-ডন দেখল, সর্বনাশ! দেবতা যদি ও-রকম মুখ করে বসে থাকে, কেউ ওকে দেবতা বলেই মানবে না! দেবতার কানে কানে বলল, 'তুমি না জাড-বেন-ওথো? ওকে পাপিষ্ঠ বলে প্রচার কর।'

অমনি দেবতার মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ঠিক বলেছে তো। সে চিৎকার করে উঠল, 'আমি জাড-বেন ওথো!'

টারজান ওর চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি জার্মান বাহিনীর লেফ্‌টেনাণ্ট ওবারগাট্‌স্‌। এতদিন যে তিনজনকে খুঁজেছি, তুমি তাদের শেষ জন। আজ ভগবান মিছিমিছি আমাদের দেখা করিয়ে দেননি!'

ওবারগাটসের এতক্ষণে চৈতন্য হল। জনতা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে আরম্ভ করেছিল। তাদের মনে বোধ হয় অনিশ্চয়তা জেগেছে। এখন যদি সে-ও অনিশ্চয়তা দেখায়, তাহলে তার কপালে নির্ঘাৎ মৃত্যু! গলা তুলে পাগলের মতো না চেঁচিয়ে, প্রাশিয়ান অফিসারদের মতো এমন তীক্ষ্ণ গম্ভীর স্বরে সে কথা বলতে লাগল যে লু-ডন পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল। 'আমি জাড-বেন-ওথো! এ মোটেই আমার পুত্র নয়। সমস্ত ধর্মবিরোধীদের শিক্ষা দেবার জন্য, যে দেবতাকে এ অপমান করেছে, তারি হাতে পুজোর বেদীতে ওকে মরতে হবে! আজ সূর্য যখন মাঝ আকাশে উঠবে।' এই বলে নিজের ডান হাত তুলে ধরল।

তারপর জা-ডনের যোদ্ধাদের ডেকে বলল, 'অস্ত্রশস্ত্র নামাও। নইলে ভস্ম করে ফেলব।'

জা-ডন, নিজের যোদ্ধাদের বলল, 'শুধু কাপুরুষরা আর দুর্বৃত্তরা অস্ত্র ফেলে প্রাসাদে ঢুকবে। জা-ডন আর তার অনুচররা কখনো তা করবে না। যোদ্ধারা মন ঠিক কর।'

কয়েকজন ছাড়া কেউ অস্ত্র নামাল না। সংঘর্ষ চলতে লাগল। কখনো জা-ডনের যোদ্ধারা জোর করে ফটক ঠেলে খানিকটা ঢুকে পড়ে। আবার কখনো বা ঠেলা খেয়ে বেরিয়ে আসে। তবু টা-ডেনের দলের দেখা নেই।

সূর্য প্রায় মাঝ আকাশে। ভোর থেকে প্রাণপণে একলা লড়াই করে অবসন্ন হয়ে, শেষ পর্যন্ত জা-ডনের দলকে আত্ম-সমর্পণ করতে হল। জা-ডন বন্দী হল। লু-ডন বলল, 'ওকেও বেঁধে পুজো বেদীর সামনে নিয়ে যাও। বন্ধুর সাজা দেখুক। নিজেও হয়তো একই সাজা ভোগও করবে।'

বেদীর সামনে টারজানকে আর জেনকে বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছিল। জা-ডনের অবস্থা দেখে জেনকে টারজান বলল, 'আমাদের শেষ ভরসাও গেল।'

জেন বলল, 'তবু শেষ কটা দিন আমরা পরস্পরকে কাছে পেয়েছি। আশা করি, তোমার সঙ্গে আমিও যাব।'

এ-কথা শুনে টারজান বাঁধন ছিঁড়বার শেষ একটা চেষ্টা দিতেই, একজন পুরোহিত তার গালে চড় মারল। জেনের কি রাগ, কি দুঃখ! টারজান হেসে বলল, 'এর আগেও কেউ কেউ আমাকে মেরেছে। তারা কেউ বাঁচেনি।'

জেন বলল, 'এখনো তোমার মনে আশা আছে?'

—'বেঁচে তো আছি।'

তারপর লু-ডনের সঙ্গে, চুল দাড়িতে ফুল গুঁজে উলঙ্গ ওবারগাটস্‌ এসে দাঁড়াল। জা-ডনের দিকে তাকিয়ে লু ডন তাকে কি যেন বলল। দেবতা বলল, 'আগে নকল দেবতা! তারপর তার নকল শিষ্য।'

লু ডন বলল, 'আর ঐ মেয়ে?'

—'সে বিষয় পরে ভাবা যাবে। সময় হল। বলি প্রস্তুত কর।'

টারজানকে বাঁধা অবস্থাতেই তুলে বেদীর ওপর রাখা হল। জেন বলল, 'বিদায়, জন।'

টারজান হেসে বলল, 'বিদায়।'

পুরোহিতরা জেনকে টেনে সরিয়ে নিল। লু-ডনের হাত থেকে ছোরা নিয়ে, ওবারগাটস্‌ চিৎকার করে বলল, 'আমি স্বয়ং ভগবান! আমার সব শত্রুরা এই ভাবে দেবতার কোপে মারা পড়ে!' ছোরা তুলে, চিৎকার করে উঠল, 'দেবতার নিন্দাকারীদের এই ভাবে মরণ হয়!'

বাক্যহীন দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে ফট্‌ করে একটা শব্দ হল বাতাসে একটা তীক্ষ্ণ শিস্‌ শোনা গেল আর জাড-বেন ওথো তার বন্দীর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

আবার সেই শব্দ, আর লু-ডন পড়ল। তারপর মো সার পড়ল।

যে দিক থেকে শব্দ আসছিল দর্শকরা সেদিকে তাকাল। মন্দিরের দেয়ালে দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। একজন হো-ডন যোদ্ধা আর টারজান-জাড-গুরুর স্বজাতি খালি গায়ে একটা বিশাল দেহ পুরুষ। তার কোমরে আর আড় ভাবে কাঁধের ওপর দিয়ে চামড়ার চওড়া পটি বাঁধা। তাতে সুন্দর ছোট ছোট চোঙামতো সাজগুলো দুপুরের রোদে ঝকমক করছে। লোকটির দু হাতে ধরা কাঠ আর ধাতুর তৈরি একটা জিনিস। সেটার মুখ থেকে একটুখানি নীল ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল।

হো-ডন যোদ্ধাটির গলা এবার শোনা গেল, 'এই ভাবে সত্যিকার জাড-বেন-ওথো কথা কন, তাঁর মৃত্যুদূতের মুখ দিয়ে। বন্দীদের বাঁধন কেটে দাও। ডোর-উল-ওথো আর পাল-উল-ডনের রাজা জা-ডনের বাঁধন কাটো। ঐ মেয়েটি

দেবতার সন্তানের স্ত্রী, ওকে মুক্ত কর।'

এদিকে পান-সাট দেখল তার সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হল এবং তার একমাত্র কারণ বেদীর ওপর পড়ে থাকা ঐ লোকটা। ক্ষেপে গিয়ে পান-সাট্ বলির খাঁড়াটাকে হঠাৎ তুলে নেবার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই অস্ত্রটা কথা বলল, পান-সাট্ তার প্রভুর মৃতদেহের ওপর মরে পড়ে গেল।

তখন যোদ্ধাদের ডেকে টা ডেন বলল, 'সব পুরোহিতদের বন্দী কর।'

দৈব-শক্তির এমন দৃষ্টান্ত দেখবার পর কারো মনে বাধা দেবার এতটুকু ইচ্ছাও বাকি ছিল না। অনেকে তো আগে থেকেই দো-মনা করছিল, এখন সকলে জা-ডনকে আর তার ডোর উল-ওথোকে সাদর সমর্থন জানাল। এবার কিন্তু পাঁচিলের ওপর আর সে-দুজনকে দেখা গেল না।

দলে দলে যোদ্ধারা মন্দিরের চত্বর, উঠোন ভরে ফেলল। সকলে অবাক হয়ে দেখল তাদের মধ্যে অনেক কালো লোমশ ওয়াজ-ডন যোদ্ধাও রয়েছে। তাদের নেতা হল জো-ডনদের টা-ডেন আর কোর উল-জার কালো গুন্দ ওম আট্। একজন যোদ্ধা বলির ছোরা দিয়ে সব বন্দীদের বাঁধন কেটে দিল।

টারজান, জেন আর জা-ডন বেদীর সামনে এসে দাঁড়াল। নবাগতরাও ভিড় ঠেলে তাদের কাছে আসতেই, জেনের দু চোখ বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে, আশায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অচেনা লোকটিও ছুটে এসে জেনকে বুকে জড়িয়ে ধরল। ভাঙা গলায় কেঁদে জেন বলল, 'জ্যাক্! বাবা, জ্যাক্!'

টারজানও তখন কাছে এসে স্ত্রী আর ছেলেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। সমবেত জনতা শ্রদ্ধায়, আনন্দে বেদীর সামনে মাটিতে মাথা ঠেকাল।

●

এই ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যেই আ-লুরের রাজ-প্রাসাদের বিশাল সভাঘরের মঞ্চে বসানো রাজ-সিংহাসনে জা-ডনকে বসিয়ে, পাল-উল-ডনের রাজা বলে ঘোষণা করা হল। তার এক পাশে দাঁড়াল টারজান, অন্য পাশে যোগ্য বাপের যোগ্য পুত্র, কোরাক। সংক্ষিপ্ত রাজ-অভিষেক শেষ হলে, যোদ্ধারা গদা উঁচু করে তাদের আনুগত্য স্বীকার করল। তারপর জা লুর থেকে ও-লো-য়া আর পান-আট-লিকে আনতে বিশ্বাসী লোক পাঠানো হল। তাদের সঙ্গে জা-ডনের পরিবারের অন্য মেয়েরাও আসবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা হলে পর, টারজানের দিকে ফিরে জা-ডন বলল, 'এবার ডোর-উল-ওথো আমাদের রাজ্য কি ভাবে চালাতে হবে, সে বিষয়ে তাঁর পিতার ইচ্ছা জানাবেন।'

টারজান সহজ ভাবেই বলল, 'এ সব কথা এর আগে আমি লু-ডনকেও বলেছিলাম। সে কান দেয়নি। পুরোহিতরা তোমাদের বলেছে ভগবানকে ভয় করে চলতে হয়। তিনি বড় নিষ্ঠুর। রোজ তাঁকে বলি দিয়ে খুশি করতে হয়। এসব কথা যে সত্যি নয়, তার প্রমাণ আজ তোমরা পেলে। জাড-বেন-ওথো দয়ার দেবতা। তিনি সকলকে ভালোবাসেন। তোমরা এবার মন্দির পরিচালনার ভার পুরুষদের হাত থেকে সরিয়ে, মেয়েদের কাছে দাও। বলি বন্ধ কর। বলির জন্য যাদের বন্দী করা হয়েছে, তাদের সবাইকে মুক্তি দাও। ফল ফুল খাবার, বা অন্য জিনিস, যার যা ইচ্ছা দেবতার নামে বেদীতে রেখো। দেবতার পূজারিণীরা গরীব দুঃখীদের মধ্যে সে সব বিলিয়ে দেবে।'

এ-সব কথা সকলের মনের মতোই হয়েছিল। পুরোহিতদের অত্যাচার ক্রমে তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। যা করত, শুধু ভয়ে করত। একজন বলল, 'পুরোহিতদের সবাইকে মেরে ফেলা হবে না?'

টারজান বলল, 'না। আর রক্তপাত নয়। ওদের ছেড়ে দাও। যার যা ইচ্ছা, সেই মতো কাজকর্ম করুক।'

সেই রাত্রে প্রাসাদে মস্ত ভোজ হল। পাল-উল-ডনের ইতিহাসে এই প্রথম সাদা আর কালো অধিবাসীরা পাশাপাশি বসে খাওয়া দাওয়া করল। তারপর জা-ডন আর ওম-আটের মধ্যে শান্তিচুক্তি হল। এখন থেকে দুজন দুজনার মিত্র এবং বন্ধু।

এতক্ষণ পরে টা-ডেনের দেরি করার কারণ শুনল টারজান। লু-ডন তাকে একটা মিথ্যা বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিল যে জা ডনের আদেশ তারা যেন দুপুরের আগে না আসে। তাই এত দেরি। চালাকিটা বুঝতে পারলে পর ওরা দেয়াল বেয়ে নেমে, শেষ মুহূর্তে যুদ্ধে যোগ দিতে পেরেছিল।

এরপর দিন লু-ডনের আত্মীয়স্বজনরা সকলে আ লুরে পৌঁছে গেলে, ও-লো-য়ার সঙ্গে টা-ডেনের আর পান আট-লির সঙ্গে ওম-আটের বিয়ে হয়ে গেল। তারপর সাত দিন আনন্দ উৎসব চলেছিল। তারপর টারজানদের বাড়ি ফেরার সময় হল। দেবতারা কি ভাবে স্বর্গে ফেরেন, সে বিষয়ে সকলের দারুণ কৌতূহল ছিল। স্বর্গ কোথায়, মর্ত্য কোথায়, সে বিষয়ে কারো কোনো ধারণা না থাকাতে, টারজান যখন

বলল ওরা পাহাড়ের ওপর দিয়ে বাড়ি ফিরবে, কেউ আশ্চর্য হল না।

ওরা কোর-উল-জা হয়ে গেল। সঙ্গে ছিল সেখানকার যোদ্ধারা আর টা-ডেনের নেতৃত্বে এক দল হো-ডন যোদ্ধা। স্বয়ং রাজা তাঁর অনুচরদের নিয়ে ওদের এগিয়ে দিলেন। যাবার আগে টারজান তাদের জন্যে ভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করল। সকলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ভক্তি জানাল। কোর উল জার গুহায় ওরা এক দিন বিশ্রাম করেছিল। দেয়াল-চিত্র দেখে জেন মুগ্ধ। দুর্গম পাহাড়ে পথ এড়িয়ে, ওপাশের ঢাল দিয়ে নেমে, ওরা সেই জলা ভূমির ধারে পৌঁছল। এই পর্যন্ত পাল উল-ডনবাসীরা ওদের এগিয়ে দিয়েছিল।

এখান থেকে দেবতার উপযুক্তভাবে যাত্রা করার একটা উপায় টারজান ভেবে রেখেছিল। একটা গ্রিফ ডেকে, সবার সামনে তার পিঠে চেপে রওনা দিলে, দেবতার যোগ্য যাত্রা হবে। কাছাকাছি একটা গ্রিফ্ থাকলে, তাকে ডেকে আনা যাবে। যাত্রার দিন ভোরে বন থেকে গ্রিফের গর্জন শুনে টারজান মহাখুশি। কয়েকবার সেই টরোডনের কাছে শেখা হুই-উ উ! ডাক দিতেই, সত্যি সত্যি গ্রিফ্টা এসে হাজির হল। তারপর জেনের হাতে তৈরি সেই বর্শার বাড়ি দিয়ে তাকে বসিয়ে, সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ওরা তার পিঠে উঠে, ঐ বিশ্রী জলাভূমি নিরাপদে পার হয়ে গেল। সেখানেই না নেমে, আরো খানিকটা উত্তরে গিয়ে তবে নামল ওরা।

ততক্ষণে বন্ধুরাও নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছে। জানোয়ারটা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

এবার গ্রিফ্টার পিঠে বেশ জোরে দুচারটে বাড়ি দিতেই সে ধড়মড় করে উঠে নিজেদের আস্তানার দিকে চলে গেল। শেষ একবার সেই সৌন্দর্যের আর বিভীষিকার অপরূপ দেশের দিকে চেয়ে, ওরা বাড়ি ফেরার দীর্ঘ পথ ধরল।

টারজান এবং সোনালী সিংহ

টারজান অ্যান্ড দি গোল্ডেন লায়ন

বনের মধ্যে যে-সব দুঃসহ বেদনার ঘটনা ঘটে যায়, কে-ই বা তার খোঁজ রাখে। শাবর সিংহীর তিনটে বাচ্চা হয়েছিল, যথেষ্ট দুধ খেতে না পেয়ে তার দুটো গেল মরে। দুম শিকার আনতে গিয়েছিল দু-দিন আগে, সে-ও ফেরেনি। বাকি আছে একটি বাচ্চা, মায়ের নয়নের মণি। ঘোর জঙ্গলের মধ্যে শাবরের নাকে এলো কালো মানুষের গায়ের গন্ধ। অমনি তার চেহারা বদলে গেল। এই শেষ সম্বলটির কোনো বিপদ ঘটতে সে দেবে না। বিপদের বস্তুকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। যে আসছে সে মানুষ অর্থাৎ শত্রু।

বাচ্চা রেখে শাবর ছুটে গেল শত্রুর দিকে।

কালো মানুষটির সিংহ মারার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, বাচ্চা নেবার কথা তার মনেও হয়নি। এখানে সিংহ আছে জানলে এর ত্রিসীমানায় সে আসত না। হঠাৎ সাক্ষাৎ যমের মতো সিংহী তেড়ে এলো! পালাবার পথ নেই। কাছাকাছি একটা গাছও নেই যে উঠে পড়ে প্রাণ বাঁচাবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক যে মুহূর্তে শাবর তার উপর ঝাঁপ দিল, সে-ও বর্শা ছুঁড়ল। বর্শা শাবরের হৃৎপিণ্ডে বিঁধল, শাবরও মরবার আগে তার মুখ মাথা কামড়ে ধরল। দু-জনেরই

ইহলীলা শেষ।

বাচ্চাটা টলতে টলতে মায়ের পিছন পিছন আসছিল। সমস্ত ব্যাপারটা সে দেখল, কিছুই বুঝল না। মায়ের কাছে যেতেও ইচ্ছা করছিল, আবার নাকে বিশ্রী মানুষ-গন্ধ আসাতে সাহস পাচ্ছিল না। কুঁই-কুঁই করে ডেকে উঠল ছোট্ট হলুদ লোমের গুলির মতো ছানাটা। ও ডাক শুনলে মা যেখানেই থাকুক ছুটে আসে। আজ কিন্তু এলো না। দুঃখে, ভয়ে সে আবার কুঁই-কুঁই করতে লাগল। ঠিক সেই সময় টারজান, জেন আর তাদের ছেলে কোরাক সেখানে পৌঁছল। ওরা পাল-উল-ডন নামের রহস্যময় দেশ থেকে ফিরছিল। বাচ্চাটা চোখ বড় বড় করে মরা মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

চারদিকে একবার তাকিয়ে বিয়োগান্তক নাটকটি টারজানের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। সে বাচ্চাটার কাছে এগিয়ে গেল, পালানো দূরে থাক বাচ্চা দাঁত খিঁচিয়ে থাবা তুলল। টারজান হেসে বলল, 'ব্যাটার কি সাহস দেখেছ!' হঠাৎ নিচু হয়ে ছানাটার ঘাড়টা আস্তে চেপে ধরল।

কোরাক বলল, 'আহা বেচারা, মরে যাবে নিশ্চয়।'

টারজান বলল, 'মরবে কেন?'

—'দুধ জোগাবে কে?'

—'কেন, আমি জোগাব।'

—'ওকে পুষ্যি নেবে নাকি?'

—'তাই নেবো।'

বাচ্চাটা প্রথমে ছটফট করছিল। টারজান ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, নরম গলায় ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সে কি বুঝল কে জানে, কিন্তু ছটফটানি থামল, আঁচড়াবার-কামড়াবার চেষ্টা বন্ধ হলো, টারজান তাকে বুকে তুলে নিল। মনে হলো ছানাটার ভয় দূর হয়েছে। চোখের সামনে বুনো জানোয়ারের বাচ্চাকে বশ হতে দেখে জেন্ তো অবাক! —'কি করে পার? আমরা তো পারি না।'

টারজান হাসল, 'ওদের মধ্যে জন্মেছি, মানুষ হয়েছি যে।'

পাল-উল-ডন থেকে অনেক দূরের পথ পার হয়ে এসেছিল ওরা। প্রথম মহাযুদ্ধের জার্মানদের সর্বনাশা হামলায় ক্ষেত-খামার বাড়ি-ঘর পুড়ে ছাই হয়েছিল। প্রভুভক্ত অনুচরদের প্রায় সকলে মরেছিল। অনেক দিন পর্যন্ত টারজানের ধারণা ছিল জেন্‌ও নেই। ওয়াজিরি অনুচরদের যারা বেঁচে ছিল তারা ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে জেন্‌কে উদ্ধার করে ওরা বাড়ি ফিরছিল বটে, কিন্তু সে-বাড়ির কতটুকু বাকি আছে কে জানে! জার্মানরা যা রেখে গিয়েছিল, আরব দস্যুরা হয়তো তাও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

মনে এই সব চিন্তা নিয়ে টারজান সিংহ-ছানার জন্য দুধ সংগ্রহের চেষ্টা করছিল। কাছেই একটা গ্রাম, সেখানে দুধের চেষ্টায় গেল ওরা। সঙ্গে বড় শিকারীর দল নেই, লাভের বিশেষ আশা নেই; গায়ের রং সাদা হলেও পুরুষ-দুটোর সাজসজ্জা ওদেরই মতো। প্রহরীরা গোড়ায় একটু তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়েছিল, কিন্তু টারজানের নাম শোনামাত্র তাদের হাবভাব বদলে গেল। শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে চোখ গোল হয়ে উঠল। বসবার জন্য মাদুর পেতে, তখুনি তারা মোড়লকে ডেকে আনল।

বুড়ো মোড়লের নাম উমাঙ্গা। তার বাড়িতে জঙ্গলের প্রভু টারজানের পায়ের ধুলো পড়েছে বলে সে কৃতার্থ। ঐ অঞ্চলে টারজানের এমনি প্রতিপত্তি আর জনপ্রিয়তা।

উমাঙ্গার নিজের ছাগলীর দুধ এলো। বাচ্চাটা খেয়ে বাঁচল। গ্রামে একটা কুকুরীকে ঘুরে বেড়াতে দেখে টারজান ওকে কিনতে চাইল। এমনি উপহার দিয়ে দিল উমাঙ্গা। বেচারির নবজাত বাচ্চাগুলোকে সাপে খেয়েছে। সিংহ-ছানাকে দুধ খাওয়াতে পেরে মা-কুকুর মহা খুশি। পরে তার হালচাল দেখে মনে হতো ওর ধারণা ওটা ওর নিজেরই ছানা। বাচ্চাটা গোড়ায় কুকুরের গন্ধ পেয়ে খানিকটা ফ্যাঁসফোঁস করলেও, পরে তাকে মা বলেই মেনে নিয়েছিল। পরদিন উমাঙ্গার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা রওনা হয়ে গেল। কুকুর হেঁটেই চলল, ছানাটাকে একটা থলিতে ভরে, কিংবা কোলে করে টারজান নিয়ে চলল। কুকুরের নাম হলো জা, পাল-উল-ডন ভাষায় তার মানে মেয়ে। বাচ্চার নাম জাদ-বাল্‌জা, অর্থাৎ সোনার সিংহ। সোনার মতো চকচকে তার হলদে গা, মাথার চুল কুচকুচে কালো।

তারপর সেই মুহূর্ত এলো যখন ওরা বন থেকে বেরিয়ে, বাড়ি-ঘর খেত-খামারের ধ্বংসাবশেষের দিকে চেয়ে দেখল। কোথায় ধ্বংসাবশেষ? সব আগে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি!

টারজান বলল, 'আমার বিশ্বাসী ওয়াজিরিরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে, সব আগে যেমন ছিল, তেমনি করে তৈরি করে রেখেছে!'

*

এইভাবে অনেক দিন পরে টারজান তার স্ত্রী আর ছেলে নিয়ে ঘরে ফিরল। সবার আগে তাদের অভ্যর্থনা

করল ওয়াসিম্বুর বাপ মুবিরো। প্রভুপত্নীকে রক্ষা করতে ওয়াসিম্বু প্রাণ দিয়েছিল। সেদিন প্রায় সারা রাত বাড়ির মালিকের ঘরে ফেরার আনন্দে নাচ গান উৎসব হয়েছিল।

দেখতে দেখতে ওরা আবার গুছিয়ে বসল। জাদ-বাল্‌জার প্রশিক্ষণও শুরু হলো। টারজানের ইচ্ছা ঐ হিংস্র সিংহের বংশধরকে নিজের নিয়মে শিক্ষিত করে তোলে। এখন যে ছোট্ট সুন্দর আমুদে বাচ্চা আহ্লাদ করে খেলে বেড়ায়, একদিন সে-ই বিশাল-দেহ পরম শক্তিশালী হিংস্র সিংহ হয়ে উঠবে। এখন থেকেই তার শিক্ষা দরকার। কুকুরের মতো টারজানের হুকুমে এটা ওটা আনা-নেওয়া করতে শিখল বাচ্চাটা। পাঠের মান আর এক ধাপ উঠল। খড়-পোরা ন্যাকড়ার মানুষের গলায় জাদ-বাল্‌জার খাবার ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। যতই খিদে পাক, যতক্ষণ না টারজান বলবে 'মারো', সিংহ ছানা নড়বে না। তারপর হুকুম পেলেই খচমচ করে পুতুলটার গা বেয়ে উঠে গলা থেকে মাংস খুলে আনতে হবে। আরেকটু বড় হলে নিচে থেকে এক লাফেই সে মাংস নামাত, কিন্তু খেত না। টারজানের কাছে এনে দিত। আরেকটা পাঠ ছিল কোনো একটা বিশেষ জিনিষ দেখিয়ে 'আনো' বললেই, সেটা এনে টারজানের পায়ের কাছে রাখত। এমন কি গলায় মাংস-বাঁধা খড়ের পুতুলটাকেও।

জেনের বড় ভাবনা ছানাটা বিরাট একটা পূর্ণবয়স্ক সিংহ হয়ে উঠলে তো যা খুশি তাই খাবে। টারজান বলতো, 'আমি যা খেতে বলব, তাছাড়া ও কিছু খাবে না।'

—'সব সময় কি মানুষ খাওয়াবে?'

—'কোন সময়ই মানুষ খাবে না। চল না, আজ বনে গিয়ে পরীক্ষা হয়ে যাক, আমার কথামতো চলে কি না!'

কোরাক একশো পাউণ্ড বাজি ধরল যে একবার তাজা রক্তের আস্বাদ পেলে ও আর টারজানের কথামতো চলবে না। টারজান বলল, 'যাকে ওরা ভালোবাসতে শেখে, যার আদর-যত্ন ভালোবাসা পায়, ওরা তার কথা অগ্রাহ্য করে না।'

সেদিন টারজান, জেন, কোরাক আর জাদ-বাল্‌জা শিকার করতে বনে গেল। নিঃশব্দে চারজন এগোচ্ছিল। একটা ঘাসজমিতে একপাল হরিণ চরছিল। তাদের মধ্যে একটা বুড়ো পুরুষ হরিণ ছিল। তাকে দেখিয়ে টারজান বলল, 'আনো!' বেশ দূরে ছিল শিকারটা। জাদ-বাল্‌জা ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে অপেক্ষা করতে লাগল। হরিণটা আরো অনেক কাছে এলে নিঃশব্দে এক লাফে তাকে ধরল। বাকি হরিণ যে যেদিকে পারে পালাল।

কোরাক বলল, 'এবার দেখা যাক ও কি করে!'

—'আমার কাছে নিয়ে আসবে।

সিংহটার গলায় চাপা গর্জন শোনা গেল। এক মুহূর্ত একটু ইতস্ততঃ করে, হরিণের পিঠে কামড়ে ধরে, তাকে টেনে টারজানের কাছে নিয়ে এলো। ছুরি দিয়ে মরা হরিণের শিরা কাটবামাত্র তাজা রক্ত বেরিয়ে এলো; তার গন্ধ জাদ-বাল্‌জার নাকে গেল। সে গন্ধ শুঁকে সিংহটা গুরগুর করে উঠল। টারজান তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতেই, সে আবার গুরগুর করে দাঁত দেখালো। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় মারল টারজান। জাদ-বাল্‌জা উল্টে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে টারজানের মুখোমুখি দাঁড়াল।

টারজান হুকুম দিল, 'ডাউন! শুয়ে পড়, জাদ-বাল্‌জা।' সিংহটা শুয়ে পড়ল।

টারজান হরিণটাকে কাঁধে তুলে বলল, 'এসো! আমার পিছন পিছন।' বলে আর না তাকিয়ে রওনা দিল।

কোরাক হেসে ফেলল, 'একশো পাউণ্ড জলে গেল! আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

জেন বলল, 'ছিলই তো!'

*

লণ্ডনের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর রেস্তোরাঁতে একটি সুশ্রী কিন্তু কেমন যেন বেশি বেশি সাজপোশাক করা মেয়ে একজন বিশালদেহ সুগঠিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলছিল। লোকটির নাম এস্টেবান মিয়্যাণ্ডা, জাতে স্প্যানিশ। মেয়েটি ইংরেজ, নাম ফ্লরা হক্‌স্‌। লোকটি বলছিল, 'ওদের ডাকবার কি দরকার ছিল? আমাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ করলেই তো হতো!'

ফ্লরা বলল, 'কাজ হাসিল করতে হলে অনেক টাকা দরকার। তোমার আমার সে টাকা নেই। ওদের আছে। ওরা আমাদের সঙ্গে কেন জুটেছে বলব? আমার কাছে সমস্ত তথ্য আছে। তোমার আছে ভালো চেহারা আর গায়ে জোর। বিশ্বাসঘাতকতা করতে গেলে স্রেফ গলায় ছুরি বসাবে। না বাপু, আমি বেঁচে থাকতে চাই।'

—'কিন্তু সব তথ্য তোমার, সব ঝুঁকি আমার, তাহলে আমরা ওদের চেয়ে বেশি পাবো না কেন?'

—'ওদের বলেই দেখনা কেন?'

দু বছর খুঁজে তবে এস্টেবানকে পাওয়া গিয়েছিল।

ফিল্ম স্টুডিওর আশেপাশে ঘুরত, যদি কোনো ছোটখাটো পার্ট পায়। ভালো বংশের ছেলে, কিন্তু ভারি অসৎ। একদিন তো ওকে গোপন তথ্যগুলো বলতেই হবে, তখন কি হবে এই নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল ফ্লরার। তার উপর এস্টেবান বড় হিংসুটে; অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করলে চটে যায়। অথচ তাদেরই ফ্লরা অনেক দিন চেনে, এস্টেবানের সঙ্গে হালে আলাপ।

এর মধ্যে অন্যরাও এসে পড়ল। দু'জন ইংরেজ—পীব্‌ল্‌স্‌ আর থ্রক্‌, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, হোঁৎকা চেহারা, মনে হয় পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা। বাস্তবিকই তাই ছিলও ওরা। আর ছিল মোটা বেঁটে জার্মান অ্যাডল্‌ফ ব্লুবার। আর বয়সে সবচেয়ে ছোট কার্ল ক্রাস্কি; জাতে রুশ, পেশাদার নর্তক। ভারি বদমায়েস।

পীব্‌ল্‌স্‌ টেবিল থাবড়ে বলল, 'সবই তো রেডি—ফ্লরার কাছে তথ্য, কাজ করবে এস্টেবান। ব্লুবার হলো ট্রেজারার।'

ফ্লরা বলল, 'অন্ততঃ দু হাজার পাউণ্ড লাগবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ব্লুবার বলল, 'অত কেন?'

ফ্লরা চটে গেল, 'আমি তো আগেই বলেছি, কিপ্টেমিতে কাজ হবে না। দু হাজার লাগবে। এরকম একটা অভিযান কি চাট্টিখানিক কথা? টাকার ব্যবস্থা না হলে আমি কোনো তথ্য বা নির্দেশ দেবো না।'

থ্রক্‌ বলল, 'আরে, টাকা রয়েছে, ও ব্যাটা মিছিমিছি খিট্‌খিট্‌ করছে।'

ক্রাস্কি বলল, 'স্বভাব!'

ফ্লরা আরো বলল, 'দু'হাজার হাতে থাকা দরকার। যদি সবটা না লাগে সেটুকু বেঁচে যাবে।'

ক্রাস্কি বলল, 'টাকাটা আছে, ফ্লরা। যে যার দেয় অংশ দিয়ে দিয়েছে। ব্লুবার হিসাবী মানুষ, ওকে ট্রেজারার করলে অযথা বেশি খরচ হবে না। আমরা মনে করেছি লণ্ডন থেকে সবাই একসঙ্গে না বেরিয়ে, দু'জন-দু'জন করে বেরোব।' তারপর পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে বলল, 'এই যে ক্রস্‌ দাগ দিয়েছি, এখানে সকলে মিলিত হয়ে, অভিযানের জন্য যা যা দরকার, কিনব। ব্লুবার আর মির‍্যাণ্ডা সবার আগে যাবে; তারপর পীব্‌ল্‌স্‌ আর থ্রক্‌; সবার শেষে আমরা দু'জন।'

অমনি এস্টেবান রেগে উঠল, 'তার মানে ফ্লরার সঙ্গে তুমি যাবে?'

ফ্লরা তাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'ও সব করলে চলবে না। তবে আমি অন্য দল তৈরি করতে বাধ্য হবো।'

পীব্‌ল্‌স্‌ বলল, চেপে যাও! নইলে ভালো হবে না।'

থ্রক্‌ বলল, 'ফের যদি এ-রকম কর, তাহলে এই দুটো কার্তিককেই পিটিয়ে ছাতু করব।'

ব্লুবারও বলল, 'মিটমাট করে ফেল। সবাই যখন রেডি, ফ্লরা আমাকে তথ্যগুলো আর পথের নির্দেশটা দিক আর আমরা এখনি বেরিয়ে পড়ি।'

ফ্লরা তখন ঐ ম্যাপটা নিয়ে × দাগ থেকে কিছু দূরে একটা O দাগ দিয়ে বলল, 'এইখানে পৌঁছলে, পরেরটুকু বলব। তার আগে নয়।'

এতে অনেকে আপত্তি করাতে ফ্লরা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'থাক তবে।' অনেক তর্কাতর্কির পর, ফ্লরার কথাতেই সকলকে রাজি হতে হলো। পীব্‌ল্‌স্‌ অবিশ্যি বলল, 'দেখো ফ্লরা, বিশ্বাসঘাতকতা করলে টের পাবে।'

*

জাদ-বাল্‌জার যখন দু বছর বয়স, তখন সব দিক দিয়ে তার জুড়ি মেলা দায়। যেমন চেহারা, তেমনি গায়ে জোর, তেমনি বুদ্ধি। ছোটবেলা থেকে টারজান তাকে এমন করে পেলেছিল, যাতে তার সমস্ত স্বাভাবিক গুণগুলো চমৎকার ফুটে ওঠে। আগে সিংহটা মালিকের খাটের পায়ের কাছে শুয়ে থাকত। এখন শক্ত লোহার খাঁচায় থাকে। কারণ সিংহ হলো সিংহ আগে ইচ্ছা মতো বাড়িময়, বাগানে, ক্ষেতে ঘুরে বেড়াত। এখন টারজানের সঙ্গে ছাড়া বেরোয় না। জেন্‌ আর কোরাককে জাদ-বাল্‌জা ভালোবাসত, ওদের কথাও শুনত, কিন্তু ওর কাছে টারজানের মতো কেউ ছিল না। যথেষ্ট খেতে পেতো, কাজেই খামারের হাঁস-মুরগি জন্তু-জানোয়ারের দিকে নজর দিত না।

টারজানের সঙ্গে সে শিকারে বেরোত। টারজানের সব কথা তো শুনতই, অনেক সময় কোনো রহস্যজনকভাবে কিছু না বললেও ওর মন বুঝে নিত। বড় বড় জানোয়ার মেরে মালিকের পায়ের কাছে ফেলত। না দিলে খেত না। এই রকম সময় টারজানের কানে নানা গুজব আসতে লাগল যে একদল দস্যু ওর এলাকার পশ্চিমে আর দক্ষিণে নানা অত্যাচার শুরু করেছে—হাতির দাঁত চুরি, গ্রামবাসীদের বন্দী করে ক্রীতদাস করা, এই সব। অনেকদিন পরে এ-রকম বে-আইনী কাজের কথা কানে আসছিল। তারপর মাস-খানেক সব চুপচাপ।

যুদ্ধের ফলে গ্রেস্টোকদের অবস্থার বেশ খানিকটা অবনতি হয়েছিল। মিত্রপক্ষকে অনেক দিয়েছিল, তাছাড়া আফ্রিকার বাড়িঘর নষ্ট হয়েছিল, সেগুলি মেরামত করতেও অনেক খরচ হয়েছিল। টারজান জেনকে বলল, 'ভাবছি আরেকবার ওপার গেলে হয়।'

জেনের মহাআপত্তি। '—দু-দু'বার অনেক কষ্টে প্রাণ হাতে করে ফিরে এসেছ। তৃতীয়বার অত সৌভাগ্য না-ও হতে পারে। আমাদের যা আছে, তাই দিয়েই বড়মানুষী না করলেও আমাদের সুখেই চলে যাবে।'

টারজান দুঃসাহসিক কাজ ভালোবাসে। সে বলল, 'গতবার ওয়ার্পার পিছু নিয়েছিল, ভূমিকম্প হয়েছিল। প্রতিবার তো আর তা হতে পারে না।'

জেন্ বলল, 'তাহলে কোরাক সঙ্গে যাক।'

—'না তা হয় না। তোমাকে রক্ষা করার জন্যে ওকে থাকতে হবে।'

—'জাদ-বাল্‌জাকে নেবে?'

—'না, ও অত হাঁটতে পারবে না, ও-ও থাক।'

শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশজন বলিষ্ঠ ওয়াজিরি যোদ্ধা নিয়ে টারজান রওনা হলো। পঁচিশ দিনের পথ যাবার সময়। কিন্তু ফেরার পথে সোনার বাটগুলো বয়ে আনতে হবে। তাতে তাড়াতাড়ি এগোনো যাবে না। যাওয়া-আসা নিয়ে মাস দুই লাগবে। পাকা অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছাড়া নিল না টারজান। ওরা সঙ্গে রসদ নিত না। পথে যেতে যেতে শিকার করে খেত। রাতে একটা কাঁটার বোমা আর বড় বড় লতা-পাতাই যথেষ্ট।

তৃতীয় সপ্তাহের একটা মেঘলা বিকেলে টারজান শিকারের খোঁজে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা বারা হরিণের মৃতদেহ দেখে অবাক হলো। তার গায়ে যে তীর বিঁধে ছিল, সেটা আফ্রিকার তৈরি নয়। তবে লণ্ডনের কি নিউইয়র্কের শিকারের সরঞ্জামের দোকানে পাওয়া যেতে পারে। তীরটা বারার গায়ে লাগলেও, যে ছুঁড়েছে তাকে আনাড়ি বলে মনে হলো। কারণ সঙ্গে সঙ্গে মরেনি বারা, অনেক দূর ছুটে এসেছিল। রক্তের দাগ দেখে এগিয়ে যেতে, টারজান কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখল। খালি পা হলেও, সেগুলো কোনো ইউরোপীয়ের পায়ের ছাপ। মানুষটা টারজানের মতোই লম্বা-চওড়া হবে। ব্যাপারটা বোঝা গেল না। অনুসন্ধান করার ইচ্ছা থাকলেও, সন্ধ্যা হয়ে এলো। শিকার নিয়ে না ফিরলে রাতে ওদের খাওয়া হবে না। ওয়াজিরিরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। শেষ পর্যন্ত নুমার নাকের ডগা থেকে একটা বড় হরিণ মেরে বোমায় ফিরল টারজান।

পরদিন সকালে আবার ওপারের দিকে যাত্রা। ওয়াজিরিদের রওনা করিয়ে দিয়ে, টারজান নিজে কালকের অনুসন্ধানে মন দিল। পরে ওদের ধরে ফেলবে। একটু পরেই দেখে পথের মধ্যে একটা বড় বনমানুষ ঐরকম একটা তীর খেয়ে পড়ে আছে। এদের মধ্যেই টারজান মানুষ হয়েছিল। কার এত আস্পর্ধা যে টারজানের জমিতে এদের মারে?

দু-দিনের পুরানো পায়ের ছাপ দেখে এগিয়ে গেল টারজান। কিছুক্ষণ পরেই বনমানুষদের দলটাকে দেখতে পেল। সাবধানে চলতে লাগল টারজান।

এরা বড় লাজুক হয়। অচেনা কাউকে দেখলে পালায়। ওর কথা সবাই মানে, ওকে দেখলে নিশ্চয় পালাবে না। দেখল জনা কুড়ি বনমানুষ গাছতলায় পোকা-মাকড় খুঁজে খাচ্ছে। নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। এরা দেখামাত্র ওকে বন্ধু বলে গ্রহণ করবে না। প্রত্যেকে ওকে শুঁকে দেখে তবে নিশ্চিন্ত হবে। টারজান এদের বন্ধু-ডাক দিয়ে বলল, 'আমি টারজান, বনমানুষদের বন্ধু—'

ওরা কিন্তু ওকে দেখেই ক্ষেপে গেল। বুড়োদের একজন বলল, 'যাও যাও, তোমাকে আমরা চিনে রেখেছি। কাল তুমি আমাদের গবুকে মেরে ফেলেছ।'

ও যতই বলে ও মারেনি, মৃতদেহ দেখে এদের খোঁজ নিতে এসেছে, ওরা কানই দিল না। ওদের সত্যি বিশ্বাস ও-ই গবুকে মেরেছে। ওরা বলল, 'আমরা দেখেছি তুমি মেরেছ। পালাও এখান থেকে।'

শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিয়ে টারজান চলে এলো। মনে মনে ঠিক করল গবুর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবে।

হত্যাকারীর চিহ্ন খুঁজে বের করে, তাই দেখে টারজান এগোতে লাগল। ছাপগুলোর সঙ্গে একটু পরে অনেক নিগ্রো পায়ের ছাপ এসে মিলেছিল। কয়েকজন বুট পরা শ্বেতাঙ্গও ছিল। ওরা এখন অর্ধেক দিনের যাত্রাপথ এগিয়ে আছে। তার মানে ওপারের প্রান্তরের কিনারায় পৌঁছেছে। কোনো শ্বেতাঙ্গকে ওপারের কথা জানায়নি টারজান, জেন আর কোরাককে ছাড়া। তবু এরাও যে ওপারের খোঁজেই এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। নইলে এই বিপদে ভরা রুক্ষ দেশে আসা কেন?

অন্ধকার নামলেও থামেনি টারজান, গন্ধ শুঁকে এগিয়ে চলেছিল। আরো কিছু পরে দূরে ওদের ক্যাম্পের আলো চোখে পড়ল।

এদিকে খামারের কাজ নিয়মিতভাবে চলছিল। জেন, কোরাক আর টারজানের ম্যানেজার জার্ভিস সমস্ত তদারক করত। জাদ-বাল্‌জাকে চেনে বেঁধে হাঁটতে নিয়ে যেত কোরাক। মনে ভয় ছিল যদি ওর কথা না শোনে! যদি বনে গিয়ে বুনো রূপ ধরে! এদিকে টারজান যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই নাইরোবি থেকে খবর এলো জেনের বাবা লণ্ডনে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। এখনি লোক পাঠালেও টারজান ফিরতে আরো পাঁচ-ছয় সপ্তাহ দেরি হবে। শেষটা ঠিক হলো কোরাক মা-কে নাইরোবি পৌঁছে ফিরে আসবে। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ড যাওয়া খুব সহজ।

কোরাক ফিরবার আগেই এক দুর্ঘটনা ঘটল। যে ওয়াজিরি ছেলেটার কাজ ছিল সিংহের খাঁচা সাফ করা, সে অসাবধানতা বশতঃ খাঁচার দরজা খোলা রেখেই কাজ করছিল। সিংহের সঙ্গে তার বড় ভাব, তাই কিছু মনেই হয়নি। জাদ-বাল্‌জা খাঁচায় পায়চারি করতে করতে, দরজায় ফাঁক দেখে থাবা দিয়ে ঠেলে খুলে এক লাফে বাইরে!

ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে ধর ধর করে ছোকরা ছুটল, কিন্তু সিংহটা এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে বনের দিকে ছুটল। ঝাড়ু হাতে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছোকরা ছুটল। খামারের অন্য যারা দেখতে পেয়েছিল, তারাও ছুটল। সবুজ উপত্যকা পার হয়ে জাদ-বাল্‌জাকে বনের দিকে যেতে দেখে তারা কত ডাকল, কত ফুসলোল। সে কান দিল না। রাত বাড়লে হতাশ হয়ে তারা ফিরে এলো। ছোকরা কিওয়াজির কি আপসোস, 'হায় হায়, আমার জন্যই সে গেল। বড় বোয়ানা এসে কি বলবেন! আমাকে কি করবেন!'

মুবিরো বলল, 'কি আবার বলবেন? বাংলোর কাজ থেকে সরিয়ে তোমাকে পুবের ঘাসজমিতে গোরু-ছাগল চরাতে পাঠাবেন। তুমি সেখানে অনেক সিংহ সঙ্গী পাবে। আর কেউ হলে বেতিয়ে তোমার প্রাণ বের করে দিত!'

কিওয়াজি বলল, 'আমি পুরুষ মানুষ, ওয়াজিরি, যোদ্ধা। তিনি যা করবেন, পুরুষের মতো আমিও মাথা পেতে নেবো।'

সেই রাতেই টারজান অচেনা দলটার ক্যাম্পের কাছে পৌঁছল। গাছের ঘন পাতার আড়াল থেকে টারজান সব লক্ষ্য করল। গাছটা ক্যাম্পের ঠিক মাঝখানে। চারদিকে উঁচু বোমা। প্রকাণ্ড এক স্তূপ শুকনো কাঠ; নিশ্চয় নিগ্রো বাহকরা সংগ্রহ করেছে। অনেকগুলো ধুনি জ্বলছে। অনেকগুলো তাঁবু; একটার সামনে চারজন সাদা-চামড়া বসে আছে। মনে হলো দু'জন হোঁৎকা ইংরেজ, একজন মোটা বেঁটে জার্মান আর একজন পাতলা ছিপছিপে সুদর্শন, হয়তো রুশ। সে লোকটি উঠে একটা তাঁবুতে ঢুকলো, সেখান থেকে মেয়েলী গলার আওয়াজ শোনা গেল। তার পরেই বন কাঁপিয়ে সিংহের গর্জন! ব্লুবার ভয়ের চোটে পড়েই গেল! তাই দেখে সকলে বকাবকি করতে লাগল। ঠিক সেই সময় গাছ থেকে টারজান ঝুপ করে ওদের সামনে নামল। ওরা তো ওকে দেখে অবাক! ব্লুবার বলল, 'ও কি এস্টেবান! এরই মধ্যে ফিরে এলে? আর আমাদের পিলে চমকে এভাবে এলে কেন?'

বিনা অনুমতিতে ওর এলাকার এরা শান্তিভঙ্গ করছে বলে টারজান খুব রেগে ছিল। সে বলল, 'তোমরা কে? বিনা অনুমতিতে টারজানের এলাকায় কেন এসেছ?'

একজন ইংরেজ চটে গিয়ে বলল, 'তামাশা রাখো, এস্টেবান। এভাবে এত শিগগির সোনা না নিয়েই ফিরে এলে কেন? নিগ্রো কুলিরা কোথায়?'

ওদের কথা শুনে তাঁবু থেকে ক্রাস্কি আর ফ্লরা উঁকি মারল। ফ্লরা তো টারজানকে দেখেই স্তম্ভিত! ক্রাস্কি বলল, 'কি হলো, ফ্লরা?'

—'এ তো এস্টেবান নয়! এ-যে টারজান নিজে!!'

—'ক্ষেপেছ, ফ্লরা?'

—'আমি চিনব না ওকে? কত বছর ওদের লণ্ডনের বাড়িতে চাকরি করেছি। কপালের কাটা দাগটা দেখেই ওকে চেনা যায়। রাগলে ওটা লাল হয়ে ওঠে, এখন যেমন হয়েছে। এদেশে ওর অসীম ক্ষমতা। মানুষদের আর জানোয়ারদের ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! আমরা কেন এসেছি ও জানতে পারলেই হয়ে গেল! এক যদি না —এক যদি না—'

—'এক যদি না—কি?'

ফ্লরা বলল, 'ওকে মেরে ফেললে, এখান থেকে জ্যান্ত ফিরতে পারবে না। তবে আমি তোমাকে একটা ওষুধ দিচ্ছি, কফির সঙ্গে ওকে খাইয়ে দিতে হবে। আগে ওর সঙ্গে ভাব কর। ও মদ-টদ খায় না, কফি খেতে বলবে। আর আমি যে এখানে আছি ও যেন টের না পায়।'

ক্রাস্কি ছোট্ট শিশিটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে গেল। টারজানকে দেখে যেন কত খুশি হয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে, তাকে বসতে বলল। টারজান কিন্তু একটুও খুশি হয়েছে মনে হলো না। সে বলল, 'তোমরা এখানে কি করছ জানতে চাইলাম। তাতে ওরা বলছে আমি অন্য একটা কে। ওরা কি পাগল না মাথা খারাপ?'

ক্রাস্কি নরম গলায় বলল, 'ওরা নিশ্চয় ভুল বুঝেছে। আপনি আসলে কে?'

—'আমি টারজান। এ অঞ্চলটা আমার অধীনে। এখানে আসতে হলে আমার অনুমতি নিতে হয়।'

—'তাই বলুন। আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন, কারণ আমাদের গাইড পালিয়ে গিয়েছে। মিঃ ব্রুবার নাম করা প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। এখানকার জীবজন্তুর নমুনা সংগ্রহ করতে এসেছেন। একটা মিউজিয়ামে দেবেন।'

অন্যরাও এ-কথার সমর্থন জানালে, টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'এস্টেবান কে?'

ব্রুবার বলল, 'আমার বন্ধু জনের সব সময় রসিকতা। ও কালোমানুষদের সবাইকে এস্টেবান বলে। আসলে আমরা হারিয়ে গিয়েছি। এ বন থেকে বেরোবার পথ দেখিয়ে দিলে, আপনি যা বলেন আমরা তাই দিতে প্রস্তুত।'

টারজানের অবিশ্যি সব কথা বিশ্বাস হলো না। তাছাড়া গবুকে কে মেরেছে সেটাও জানা দরকার। তাই শেষ পর্যন্ত কফি খেতে টারজান রাজি হলো। ক্রাস্কি তৈরি করতে গেল। এরা সকলেই একেবারে ওপারের দোরগোড়ায় পৌঁছে ধরা পড়ে যাওয়াতে ঘাবড়ে গিয়েছিল। তবে ফ্লরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেনি যে ওদের প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছে। ফ্লরা জানত, লণ্ডনের লর্ড গ্রেস্টোক আর বনের টারজান এক নয়। লণ্ডনে ওঁদের কাছে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার পেয়েও, সে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছিল। ওঁদের কথা-বার্তা থেকে ওপারের রত্নগুহার কথা শুনেছিল। আড়ি পাতা ওর স্বভাব। শুনে শুনে ওর বড় লোভ হয়েছিল। ঐ সোনার কতকগুলো বাট হস্তগত করতেই হবে। সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূলে ফ্লরা। মতলব ওই এঁটেছিল, এস্টেবানকেও ও-ই জুটিয়েছিল। তাকে টারজান সাজিয়ে কাজ হাসিল করবে ভেবেছিল। এখন শেষ মুহূর্তে সব না ভেস্তে যায়! তাঁবু থেকে উঁকি মেরে ফ্লরা দেখল পাঁচজনেই কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। আর উত্তেজনা সইতে না পেরে ও শুয়ে পড়ল। টারজানও কফির পেয়ালা নিঃশেষ করে দিল।

যেদিন টারজান ষড়যন্ত্রকারীদের তাঁবুতে গিয়েছিল, সেদিন দুপুরে ওপার শহরের বাইরের প্রাকারে বসা একজন প্রহরী একদল লোককে এদিকে আসতে দেখল। এর আগে টারজান, জেন আর ওয়াজিরিদের ছাড়া কাউকে ওরা এতদূর এগিয়ে আসতে দেখেনি। প্রহরীর চেহারাটাও ওপারের অন্য পুরুষদের মতোই কদাকার, বেঁটে, চিমড়ে, বাঁকা পা, পিটপিটে চোখ, বুনো লোম, নিষ্ঠুর ভাব।

প্রধান পুরোহিত কাদিজ একটা গাছতলায় বসে ছিল। প্রহরী তাকে খবর দিতেই সে বলল, 'টারজান বলে সাদা মানুষটি অনেকদিন আসেনি। সে বলেছিল বর্ষাকালে এসে দেখে যাবে আমরা সবাই ভালো আছি কিনা। তা আসেনি। লা বলে সে বেঁচে নেই।'

কাদিজ বলল, 'কাউকে এ-কথা বলে কাজ নেই। চল দেখি গিয়ে কারা আসছে।'

কয়েকজন অনুচর নিয়ে প্রধান পুরোহিত দেওয়ালের বাইরে পাথরের আড়াল থেকে দেখতে লাগল। হঠাৎ কমবয়সী পুরোহিতদের একজন বলল, 'এ যে সে-ই টারজান, কাদিজ। সঙ্গীরা সবাই কালো। তারা ভয় পাচ্ছে, ও তাদের জোরজবরদস্তি করে নিয়ে আসছে।'

কাদিজ বলল, 'ঠিক দেখেছ টারজান আসছে?'

—'নিশ্চিত দেখেছি।'

—'না, এখানে ওর আসা হবে না। একশো যোদ্ধা ডেকে আনো। বাইরের দেওয়ালের ভিতরকার এই সরু পথে ঢুকলেই একটা একটা করে মরবে।'

একজন পুরোহিত বলল, 'কিন্তু লা যে কথা দিয়েছে ওপারের সঙ্গে টারজানের বন্ধুত্ব থাকবে। কতবার টারজান আমাদের সাহায্য করেছে—।'

কাদিজ রেগে বলল, 'চোপ! ওকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সবাইকে মেরে ফেলা হবে। কে ঢুকছে না ঢুকছে, তার পরিচয় যখন জানা যাবে, তখন বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে। যে আমার ইচ্ছায় বাধা দেবে, আমি নিজের হাতে তাকে মেরে ফেলব।'

অন্ধকার হবার আগে কাদিজ দেখল একটা ছোট ছাই রঙের বাঁদর পাঁচিল টপকে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে তার দলবল। অন্ধকার হলে মানু নিচে নেমে দেখল সত্যিই তো টারজান ৫০ জন কালো মানুষ নিয়ে এসেছে। তারা দুটো লম্বা বাঁশ মাটিতে পাশাপাশি রেখে, তার সঙ্গে এক হাত লম্বা অনেকগুলো বাঁশের টুকরো

বেঁধে একটা লম্বা মই তৈরি করছে। মইয়ের পরিকল্পনাটা ফ্লরার নিজের। কিছুই বুঝল না মানু। ওরা যে ওপার শহরে যাবে না, মানু তাও জানত না। ও টারজানকে সাবধান করে দিতে এসেছিল। যা বলবার তা বলা হয়ে গেলেও সাদা মানুষটা উত্তর দিল না। যেন দেখেও দেখল না।

কালোদের মই তৈরি হয়ে যেতে ঘোর অন্ধকার নামল। মানু ভয়ের চোটে ওপার ফেরার চেষ্টা না করে, গাছে বসে সব দেখতে লাগল।

মই প্রস্তুত হলে সেটা পাথরের গায়ে লাগানো হল। তারপর সেটা বেয়ে কালোদের তোলা হল। তারা ভয় পাচ্ছিল বলে সাদা মানুষটি ওদের বর্শার খোঁচা দিচ্ছিল। সবার শেষে সাদা মানুষটা উঠল। তারা একটা বড় পাথরের পিছনে আড়াল হয়ে গেল। কিছু পরেই ওরা ফিরে এল। প্রত্যেকের কাঁধে দুটো করে ভারি পাথর। সবাই নেমে এলে ওরা মইটাকে খুলে ফেলে টুকরোগুলোকে পাহাড়ের পায়ের কাছে ফেলে রেখে, আবার সারি বেঁধে রওনা দিল। মানু ভাবছিল কালো লোকগুলো হাতে পায়ে গলায় ও-সব জিনিস ঝোলায় কেন? ওতে তো চলাফেরার কষ্ট হয়।

তারপর মানু বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ চোখ খুলে দেখে ভোর হয়ে গেছে। ওপারের যোদ্ধারা পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে আসছিল, বোধ হয় চারদিক ঘুরে দেখার জন্য। কিন্তু সেখানে না থেমে তারা পাথুরে প্রান্তরের ওপর দিয়ে হাঁটা দিল। মানুর মনে হলো টারজানের দলকে পিছন থেকে ধাওয়া করে বোধহয় মেরে ফেলতে চায়।

একবার ভাবল আগে আগে গিয়ে টারজানকে বলে দেয়। কিন্তু অতদূর যেতে ভয় করল। শেষ পর্যন্ত মন্দিরের যে পুকুরে লা তার সখীদের সঙ্গে স্নান করছিল, সেখানে গিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, 'লা, লা! ওরা টারজানকে মেরে ফেলতে গেছে!'

লা তো অবাক! সে বলল, 'কি বলছ, মানু? টারজান অনেক দিন আসেনি।'

—'কাল সন্ধ্যায় ওকে দেখলাম যে। সঙ্গে অনেক কালো মানুষ। ওরা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে, বড় পাথরের পিছন থেকে অনেকপাথর আনল। সেগুলো ওপর থেকে নিচে ফেলে দিল। পরে সেগুলোকে তুলে নিয়ে আবার চলে গেল।'

'—কি করে জানলে ঐ লোকটি টারজান?'

—'নিজের চোখে দেখলাম যে। আমার নিজের লোক, আমার বন্ধুকে আমি চিনব না?'

লা জিজ্ঞাসা করল, 'কে গেছে ওকে মারতে?'

—'কাদিজ গেছে।' অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে গেছে।'

শুনেই এক দৌড়ে লা মন্দিরে ঢুকে পড়ল।

*

মুগুর আর ছোরা নিয়ে কাদিজ তার লোকজন সহ অতি সহজে নকল টারজানের পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে গেল। কাদিজের ইচ্ছা দিনের বেলা গা-ঢাকা দিয়ে থেকে রাতে আক্রমণ করবে। দলবলকে নিয়ে সে তো একটা বড় কাঁটার বোমার কাছে পৌঁছল। ধুনি থেকে তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। একটা লোককে হালচাল বুঝে আসতে আগে পাঠানো হলো, সে ফিরে এসে বলল, বোমার মধ্যে কেউ নেই। তখন সকলে ঢুকে পড়ে চারদিক পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। এই সময় তারা ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকোনো একটা মানুষের প্রাণহীন দেহ দেখতে পেলো। সে টারজান ছাড়া আর কেউ নয়।

প্রধান পুরোহিত উল্লসিত হলো, 'আগুনদেবতা নিজেই প্রতিশোধ নিয়েছেন। তাঁর বেদী অপবিত্র করা কি সোজা কথা!'

আরেকজন পুরোহিত টারজানের বুকে কান দিয়ে বলল, 'মরেনি তো। বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।'

প্রধান পুরোহিত বলল, 'ধরো। বাঁধে।' অনুচরেরা তাই করল।

—'আগুনদেবতার চোখের সামনে টেনে নিয়ে এসো।'

ওরা টেনে তাকে বোমার মধ্যিখানে রোদেভরা জায়গাটাতে নিয়ে এল। সকলে ঘিরে দাঁড়ালেও, টারজানকে বলি দেবার প্রস্তাবে সকলের উৎসাহ ছিল না। তারা ভয়ও পাচ্ছিল। কিন্তু মাত্র একজন আপত্তি জানাল। কাদিজ ছোরা বের করেছিল। সে লোকটি বলল, 'তুমি বলি দেবার কে? বলি দিতে হয় লা দেবে। সে আমাদের রানী। এ অধিকার একমাত্র তার।'

কাদিজ বলল, 'ডুথ্, চুপ কর। আমি তোমাদের রানীর স্বামী। যদি বাঁচতে চাও, আমার কথা মেনে চল।'

ডুথ্ও চটে গেছিল, বলল, 'তোমার কথা ন্যায্য নয়। যদি লা-কে কিম্বা আগুনদেবতাকে চটাও, অন্যদের মতো তোমারও সাজা হবে। তারা দুজনেই এতে অসন্তুষ্ট হবে।'

ঠিক সেই সময় সূর্যের মুখের ওপর একটা ছায়া পড়ল। ডুথ্ বলল, 'ঐ দেখ, দেবতা চটেছেন।'

একটু ঘাবড়ে গেলেও, ধূর্ত কাদিজ সামলে নিয়ে বলল, 'না, চটেননি। আমার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে চান। তোমরা এখন যাও। পরে আবার ডাকব।'

ডুথ্ আর অন্য কয়েকজন তবু আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। কাদিজ চেঁচিয়ে উঠল, 'চলে যাও!'

তার আদেশ মেনে চলতে ওরা অভ্যস্ত, তাই আর সাহস পেল না। কাদিজ ভেবেছিল ওরা গেলেই কাজ সারবে, কিন্তু মেঘটা বড্ড বড়, কিছুতেই সরছিল না আর কাদিজও ছোরা তুলে ধরেও বুকে বসিয়ে দিতে সাহস পাচ্ছিল না।

তারপর এক সময় মেঘটা সরে যেতে আরম্ভ করতেই কাদিজ ছোরা তুলল। এমন সময় 'কাদিজ!' ঐ একটি কথা শোনা গেল। লা এসে সামনে দাঁড়াল। ওর পিছন পিছন ডুথ্ আর অন্য ক'জন পুরোহিত।

—'এর মানে কি?'

—'দেবতা এই অবিশ্বাসীর প্রাণ চেয়েছেন।'

'মিথ্যা কথা। তাঁর যা বলবার, তিনি তার প্রধানা পূজারিণীর মুখ দিয়ে বলান। জেনে রেখো কাদিজ, অন্যদের মতো তোমার বাঁচা-মরার অধিকার-ও তার হাতে। তোমার অহংকার আর ক্ষমতার লালসা সামলাও। নইলে সর্বনাশ হবে।'

তখনকার মতো ছোরা নামালেও ইচ্ছাটা রয়ে গেল। আসলে পুরোহিতদের দুটো দল ছিল। এক দল লা-র, এক দল কাদিজের ভক্ত। ওখানকার যে নিয়ম প্রধানা পূজারিণীর সঙ্গে প্রধান পুরোহিতদের বিয়ে হবে, সেটা লা অনেক বছর স্থগিত রেখে শেষটা একরকম বাধ্য হয়েই ওকে বিয়ে করেছিল। মনে মনে লা কাদিজকে ঘৃণা করত। কাদিজও সেটা জানত। কোনো উপায়ে লা-কে পথ থেকে সরাতে পারলে সেও খুশি হতো। তাহলে ওয়াহ্ বলে পূজারিণীকে বিয়ে করে ও রাজত্ব করতে পারত।

তবু বলি বন্ধ করার অধিকার লা-য়ের ছিল। সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল, লা এবার কি করে।

টারজানকে ওরকম নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকতে দেখে লা জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি মারা গেছে?'

ডুথ্ বলল, 'আমাদের যখন কাদিজ এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, তখনো বেঁচেছিল। তারপর যদি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে কাদিজ দায়ী।'

কাদিজ বলল, 'মোটেই মারি নি। এবার লা-ই দেবতাকে তাঁর বলি নিবেদন করুক। ওর সঙ্গে তো খাঁড়া আছেই।'

ওর কথায় কান না দিয়ে লা বলল, 'যদি বেঁচে থাকে, একটা পালকি তৈরি করে, ওকে তুলে নিয়ে ওপারে চলো।'

এভাবে টারজান আরেকবার ওপার শহরে এলো।

ফ্লরার ওষুধের ঘোর কাটতে অনেক সময় লাগল। যখন চোখ খুলে চেয়ে দেখল, তখন রাত হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়ল। কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল কে জানে। কোথাও কোনো বেদনা নেই। টারজান আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বুঝল সে একটা ছোট ঘরে, নরম লোমের বিছানায় শুয়ে ছিল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে হাতড়ে বুঝল ঘরের দু'দিকে দুটো দরজা। মনে হলো মাটির নিচের কোনো ঘরে আছে সে। নাকে এল একটা মিষ্টি চেনা গন্ধ। টারজান বুঝল ওপারের নিচে ভূগর্ভের সেই ঘরে সে আছে।

ওর মাথার ওপরে লা-র নিজের ঘরে তার চোখেও ঘুম ছিল না। ও জানত আগুনদেবতার হাতের তলা থেকে তাঁর বলি সরিয়ে নেওয়ার সর্বনাশা ফল হবে, এই বলে কাদিজ পুরোহিতদের খেপিয়ে তুলবে। টারজানকে বলি দিতে লা পারবে না। এর আগেও দু-বার লা ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিল। টারজানও একবার এক পাগল পুরোহিতের হাত থেকে, একবার উন্মত্ত টানটরের কাছ থেকে ওকে বাঁচিয়েছিল।

এই সময় একজন সখী এসে বলল, 'ডুথ্ কি বলতে চায়।'

লা বলল, 'এত রাতে পুরুষদের তো এখানে আসার কথা নয়।'

—'ও বলছে লা-য়ের সমূহ বিপদ, সেই জন্য এসেছে।'

—'নিয়ে এসো তাকে। কাউকে বলো না।'

ডুথ্ এসে জানাল লা-র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলেছে।

—'কে ষড়যন্ত্র করছে?'

—'কাদিজ আর ওয়াহ একদল পূজারিণী পুরোহিতকে দলে টেনে এনে, তোমার পিছনে গুপ্তচর লাগিয়েছে। তুমি যদি বন্দীকে মুক্তি দাও, তাহলেও ওরা তাকে বলি দেবে। ওপার থেকে বেরিয়ে যাবার পথে চররা লুকিয়ে আছে। তারপর তোমাকেও মেরে ফেলবে। তবে তুমি নিজে যদি তাকে বলি দাও কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।'

পরদিন সকালে লা সবে খেয়ে উঠেছে, এমন সময় ওয়াহের ছোট বোন তার ঘরে এসে অনেক মিষ্টি কথা বলে, শেষে বলল কাদিজ তার পুরোহিতদের সঙ্গে পরামর্শ করছিল, তাদের কিছু কিছু কথা ওর কানে গেছিল। ওর মনে হলো টারজান যদি পালিয়ে যায়, কাদিজ তাহলে খুশি হবে।

লা কিন্তু সব কথা শুনে উল্টো উত্তর দিলো। সে বলল, 'আমার কর্তব্য আমি ভালো করেই জানি। কাদিজের বলি দেবার অধিকার নেই, তাই আমি তাকে বাধা দিয়েছিলাম। বলি আমি নিজের হাতে দেব, আজ থেকে তৃতীয় দিনে।'

উত্তর শুনে মেয়েটা যে হতাশ হলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য ও-রকম কিছু করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় ছিলো না লা-র।

বোনের মুখে কথাটা শুনে লার মন রাগে ক্ষোভে ভরে গেল। সে গিয়ে কাদিজকে বলল, 'ওকে বলি দিলেও, লা যে ওকেই ভালোবাসে তাতে সন্দেহ নাই। বরং একটা কাজ করা যাক। টারজানের কাছে গোপনে কাউকে পাঠানো যাক, সে গিয়ে বলবে টারজানকে গুপ্ত পথ দিয়ে নিয়ে যাবার জন্য লা-ই ওকে পাঠিয়েছে। টারজান ওর কথা বিশ্বাস করে ওর সঙ্গে পালাবে। সেও ওকে সটাং আমাদের যোদ্ধাদের হাতে তুলে দেবে। এদিকে সে লোকটি ফিরে এসে সবাইকে বলবে লা-ই টারজানকে মুক্তি দিয়েছে। লোকরা ক্ষেপে গিয়ে লা-র প্রাণদণ্ড দেবে। এভাবে দুটো আপদই দূর হবে।'

প্রধানা পূজারিণী হবার বড় সাধ ওয়াহের। কাদিজ অত বোঝেনি। বেশ, কাল ভোরেই এ বুদ্ধিটা কাজে লাগানো যাবে। কাল রাতে অগ্নিদেবতাও ঘুমোতে যাবার আগে তাঁর নতুন প্রধানা পূজারিণীর মুখ দেখতে পাবেন।'

রাতে দরজায় একটা শব্দ শুনে টারজান জেগে গেল। মেয়েলি গলায় কেউ ওকে ডাকছিল। টারজান বলল, 'কি চাও?'

—'তোমার প্রাণ বিপন্ন। আমার সঙ্গে এসো।'

—'কে পাঠাল তোমাকে?'

—'লা পাঠিয়েছে। তোমাকে পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে যেতে। এই নাও তোমার অস্ত্রশস্ত্র।'

এই বলে হাত ধরে মেয়েটি ওকে নিয়ে চলল। তার গায়ের গন্ধ বড় মিষ্টি, কেমন যেন চেনা, ধূপধূনো সুগন্ধী-দ্রব্যের গন্ধ মেশানো।

ঘুটঘুটে অন্ধকার পথ দিয়ে কতো সুড়ঙ্গ, কতো গলি, কতো সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে, অবশেষে কয়েকটা ধাপ উঠে, টারজান মাথার ওপরে তারা দেখতে পেলো। চারিদিকে তাকিয়ে টারজান বুঝতে পারল এ জায়গাটা ওপারের পাহাড়ের পিছনে। এদিকে সে কখনো আসেনি। বড় কঠিন এবড়োখেবড়ো জমি, বেঁটে গাছ, কাঁটা ঝোপ। এখানে শিকারও পাওয়া মুস্কিল হবে। মেয়েটি একটাও কথা বলছিল না।

পুব দিকটায় যখন গোলাপী রং ধরল, ওরা একটা খাড়াই উঠে খানিকটা সমান জায়গায় পৌঁছল। আরেকটু আলো হলে নিচে একটা বনভূমি দেখা গেল আর গাছ-পালার পিছনে একটা বাড়ি ভোরের আলোয় ঝিকমিক করছে। সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে টারজান চমকে উঠল। কারণ সে হলো লা নিজে। বিস্ময়ে আর দুশ্চিন্তায় টারজানের মন ভরে গেল। বলল, 'তুমি? এবার কাদিজ তোমার প্রাণদণ্ড দেবার একটা ন্যায্য কারণ পাবে তাহলে।'

—'সে সুযোগ কাদিজ পাবে না। আমি আর ওপারে ফিরব না।'

—'তাহলে কোথায় যাবে?'

—'তুমি যেখানে নিয়ে যাবে। তোমার কাছে আমি কিছু চাই না, খালি আমাকে ওপার থেকে আর আমার শত্রুদের কাছ থেকে নিয়ে চলো। নইলে যেমন করে পারে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। কাদিজ রাজা হতে চায়। ওয়াহ, হবে প্রধানা পুরোহিত। মানু ওদের কথাবার্তা শুনে এসে আমাকে বলে গেছে।'

'—কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

—'দুটো পথই আছে যাবার। তার মধ্যে একটাই কম মন্দ। ওপারের লোকেরা এ দেশটা সম্বন্ধে নানা কথা বলে। নাকি বিকট দৈত্য আর অদ্ভুত লোকেরা এদিকে থাকে।

ওপার থেকে কেউ এদিকে এলে সে আর ফেরেনি। তুমি ছাড়া কেউ এ-দেশ পার হতে পারবে না।'

—'তাহলে এখানে আসার পথ চিনলে কি করে?

—'এই পাহাড় অবধি আরো এসেছি। আর এগোইনি। বড় বনমানুষরা আর সিংহরা এপথে ওপারে আসে। এখানকার বনমানুষরা অনেক সময় ওপার থেকে লোক ধরে নিয়ে যায়। খায় কি না জানি না। মাথায় এরা বলগানি গোরিলার চেয়েও উঁচু। আমাদের মতো না-মানুষ না-বনমানুষ।'

টারজান বলল, 'ওখান দিয়ে যেতেই হবে কেন? অন্য পথ নেই?'

—'সব পথে ওপারের গুপ্তচর।'

একা হলে ভাবনা ছিল না। এই উপত্যকায় মানুষ থাকে মনে হল না। সিংহ, কি গোরিলা, কি বনমানুষকে টারজান ভয় করত না। তাছাড়া ঐ বিশাল বাড়িটা দেখে বড় কৌতূহল হচ্ছিল। হয় তো আটলান্টিসের লোকদের কি তাদের সমসাময়িক কারো তৈরি। মনে হচ্ছে যেন চমৎকার রাজবাড়ি। মানুষ থাকে না নিশ্চয়। দেখে এলে হয়।

লা-কে টারজান বলল, 'চল'। বলে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

লা তো অবাক! 'ঐ পথে যাচ্ছ নাকি?'

—'এটাই তো সবচেয়ে সহজ পথ।'

—'আমার ভয় করে। ঐ বনে কত অভাবনীয় বিপদ আছে।'

'না, না, নুমা আর বনমানুষ ছাড়া কিছু নেই। চলই না।'

ঝোপের মধ্যে দিয়ে পায়ে-চলা পথ। যত নিচে নামে, গাছপালা ততই বড়ো হয়। শেষ পর্যন্ত ওরা বিশাল বনের ছায়ায় পৌঁছল। একটু পরে টারজান বলল, 'এখানে বোধ হয় মানুষ আছে। মনে হচ্ছে কেউ আমাদের দেখছে।'

কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। গন্ধও পাওয়া গেল না। গাছের অনেকটা ওপরে থাকলে অনেক সময় যায় না।

—'দেখেই আসি।' এই বলে গাছে উঠে পড়ল টারজান। একটু পরে নেমে এসে বলল, 'আছে কেউ সন্দেহ নেই। অচেনা গন্ধও পেলাম। ওপরে উঠলে ওরা আমাদের গন্ধ পাবে না।' এই বলে লা-কে তুলে নিয়ে গাছে উঠে পড়ল। তারপর অতি সহজে গাছ থেকে গাছে।

হঠাৎ একটা উঁচু ডালে থেমে গিয়ে বলল, 'ঐ দেখ!'

ডালপালার মধ্য দিয়ে একটা মজবুত বেড়ার ভিতরে গোটা বারো কুঁড়ে ঘর। কিন্তু ঘরগুলো দুলছিল, মনে হচ্ছিল দু'চারটে লাফাচ্ছেও। ওরা ডাল বেয়ে আরেকটু কাছে গেলো। এবার সবটা ভালো করে দেখা যাচ্ছিল। ঘরগুলোর দোলা এবং লাফানোর রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। মৌচাকের মতো আকার, ৬।৭ ফুট উঁচু, ৭ ফুট মতো এধার থেকে ওধার। প্রত্যেকটা ঘর মোটা ঘাসের দড়ি দিয়ে উঁচু গাছের মোটা ডাল থেকে ঝোলানো। বেড়ার ভেতরে অনেকগুলো বড় গাছ। প্রত্যেকটা ঘরের তলার মধ্যিখান থেকে একটা আরেকটু সরু দড়ি ঝুলছে। ওপর থেকে কোনো দরজা-জানালা চোখে পড়ল না। কিন্তু মেঝে থেকে হয়তো ৩ ফুট ওপরে, অনেকগুলো ৪।৫ ইঞ্চি মাপের গর্ত।

নিচে কয়েকটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাদের চেহারাও বাড়ির মতোই অদ্ভুত। ওরা যে নিগ্রো তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এরকম নিগ্রো টারজান জন্মে দেখেনি। লম্বা, বেশ বলিষ্ঠ, পাগুলো বেশি বেঁটে, হাতগুলো লম্বা, মুখ-গুলো জানোয়ারের মুখের মতো, ভুরু বেরিয়ে এসেছে, কপাল নেই বললেই হয়, মাথার খুলিটা চ্যাপ্টা কিন্তু ওপরটা ছুঁচলো মতো। পরণে কিছু নেই, গায়ের এখানে ওখানে রঙের ছোপ। নানা বয়সী পুরুষ মেয়ে উবু হয়ে বসে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংস খাচ্ছে। একেবারে ন্যাড়া শরীর, মাথায় কয়েক গাছা পাৎলা লালচে চুল। নিজেদের মধ্যে গোঁ গোঁ করে কথা বললেও, কারো মুখে হাসি দেখা গেল না। আর একজনও বুড়ো-বুড়ি ছিলো না। কিন্তু ওদের অস্ত্রশস্ত্র-গুলো সুন্দর আর সুগঠিত, ঘরগুলোও ভালোভাবে তৈরি. বেড়াটাও পাকা হাতের কাজ।

এমন সময় ওদেরি মতো আরেকটা লোক একটা গাছ থেকে নেমে হাত পা নেড়ে কি সব বলতে লাগল। মনে হোল বনে কাদের দেখে এসেছে, তার বর্ণনা দিচ্ছে। শ্রোতারা শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল, তবে অল্পক্ষণের জন্য। তার পরেই বন থেকে বিকট চিৎকার শোনা গেল। টারজান লা-কে বলল, 'বলগানির ডাক।'

তারপর ওরা দেখল বিশাল এক গোরিলা মানুষের মতো দু-পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে হেঁটে আসছে। কাছে এলে দেখা গেল মুখটা গোরিলার চেয়ে মানুষের সঙ্গে বেশি সাদৃশ্য। দেখে মনে হল বুদ্ধি আর অনুভূতিগুলোও মানুষেরি মতো। তার ওপর গায়ে হাতে পায়ে সোনার আর হীরের গয়না। কোমরে একটা বেল্টের মতো, তার সামনে আর

পিছন দিক দিয়ে দুটো লম্বা কাগড়ের টুকরো ঝুলছে, তাতে আগাগোড়া সোনার আর হীরের নক্সা তোলা।

তাকে দেখেই মেয়েরা আর ছেলেপিলেরা খচমচ করে হয় গাছের আড়ালে নয় কড়ি বেয়ে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিল। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে গোরিলাটা চেঁচিয়ে কথা বলতে লাগল।

*

গেট খুলে দিতে গোরিলা ভেতরে ঢুকে চেঁচাতে লাগল 'মেয়েগুলো আর বালুগুলো কোথায় ?'

সবাই কথাগুলো শুনতে পেল, কিন্তু যে যার লুকিয়ে রইল। একজন যোদ্ধা বলল, 'এই চাঁদে এ গ্রাম থেকে একজনকে নিয়েছ। এবার অন্য গ্রামের পালা।'

গোরিলা রেগে গেল, 'আমি সম্রাট নুমার মুখ দিয়ে কথা বলছি। না আসে তো ধরে আনো তাদের।'

শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা বেচারাদের চুল ধরে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল। সেই যোদ্ধা তখন বলল, 'প্রভু বোল্‌গানি, সব সময় এখান থেকে নিলে গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে।'

গোরিলা বলল, 'তাতে কি ক্ষতি ? পৃথিবীতে বড় বেশি গোমানগানি।' এই বলে ছোট বাচ্চা কোলে একটা মেয়েকে টেনে নিয়ে, বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেটা পড়ে পড়ে গোঙাতে লাগল। তার মা তার কাছে ছুটে যেতে চাইলে, তাকেও ছুঁড়ে মাটিতে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে শোনা গেল বনমানুষদের যুদ্ধের ডাক।

গোরিলাটা ওপর দিকে তাকাতেই, অন্যরাও সেদিকে চোখ তুলে দেখল একটা সাদা মানুষ ! এমন তারা জন্মে দেখেনি ! সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তার বর্শা ছুঁড়ল। বর্শাটা সোজা বোলগানির বুকে বিঁধে গেল। সে গোঁ-গোঁ করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটাও বেরিয়ে গেল।

গ্রামবাসীরা ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত ! গাছ থেকে নেমে আসতেই ভয়ে পিছু হটে গিয়ে যোদ্ধারা বর্শা তুলল। টারজান বলল, 'বর্শা নামাও। আমি তোমাদের বন্ধু। ওকে অত ভয় পাও কেন ?'

—'ও যে নুমার অনুচর। সম্রাট যেই শুনবে ও এ গ্রামে মারা গেছে, আমরাও মারা পড়ব।'

—'নুমা কে ?'

—'সে এখানকার সম্রাট। বোলগানিদের সঙ্গে চকচকে পাথরের বাড়িতে থাকে !'

ততক্ষণে ছোট্ট বাচ্চাটার মা তাকে কোলে তুলে, কান্না থামাবার চেষ্টা করছিল। টারজান দেখল ছেলেটার বেশি লাগেনি, বড় ভয় পেয়েছে।

গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বলল, 'তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে নুমার কাছে চল। তাকে বল যে তুমি বোলগানিকে মেরেছ ! নইলে আমাদেরকেই মেরে ফেলবে।'

টারজান বলল, 'আমি যে তোমাদের গ্রামে বোলগানি মেরেছি, সে কথা তোমরা আমরা ছাড়া কেই জানে না। আমি যদি ওর শরীরটাকে দূরে কোথাও রেখে আসি, তাহলে কেউ জানতেও পারবে না কোথায় মরেছে। কিন্তু ততক্ষণ আমার স্ত্রীকে এখানে নিরাপদে থাকতে দিতে হবে। যদি ফিরে এসে দেখি তার কোনো অনিষ্ট হয়েছে, তাহলে আমি নুমার বাড়ি গিয়ে জানিয়ে আসব বোলগানি এখানে মরেছে।'

গ্রামের মোড়ল তখনি কথা দিল। তারপর টারজান লা-কে ডাক দিতে, লা গাছ থেকে নেমে এল। ওকে রেখে টারজান বেরিয়ে যাবে শুনে লা-র কি ভয়। টারজান বলল, 'ভয় কিসের ? আমি এটাকে অন্য জায়গায় রেখে আসছি। এ উপত্যকা থেকে বেরোবার পথটাও একটু দেখে আসা দরকার। এরা তো কিছুই বলতে পারে না।'

এই বলে টারজান গোরিলাটাকে কাঁধে তুলে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে গাঁয়ে দুটো দল তৈরি হল। এক দল টারজানের কথামতো চলতে চায়। এক দল টারজানের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে, লা-কে নিয়ে গিয়ে নুমার কাছে সঁপে দিয়ে, মিটমাট করতে চায়। মুশকিল হলো তবু নুমার বোলগানিরা ওদের কথা না-ও বিশ্বাস করতে পারে। তাছাড়া সাদা টারমানগানি ফিরে এসে ওর স্ত্রীকে দেখতে না পেলে সব ছারখার করবে নিশ্চয়।

শেষ পর্যন্ত লা-ই এগিয়ে এসে প্রধানা পূজারিণীর স্বাভাবিক তেজের সঙ্গে যখন বলল, 'যাও, আমার ঘর ঠিক করে দাও।' তখন ঘরও ঠিক হয়ে গেল, লা-ও সেখানে উঠে নরম বিছানায় শুয়ে পাতার মর্মর আর মৌমাছির গুঞ্জন শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ওপার উপত্যকার উত্তর-পশ্চিমে একটা ক্যাম্পে শতখানেক নিগ্রো আর ছয়জন শ্বেতাঙ্গ রাতের খাবার খেতে বসেছিল। ব্যাপার হলো যে নিগ্রোরা ঐ ভারি ভারি সোনার বাঁট বয়ে আনতে পারছিল না। তাদের সব হাঁড়ি-মুখে বিদ্রোহী ভাব। ফ্লরা সব দোষ ব্লুবারের কিপ্টেমি আর

এস্টেবানের তড়পানির ওপর চাপাচ্ছিল। বেশি ক্ষেপে গেলে যে কোনো সময়ে নিগ্রোরা ওদের খুন করে সোনা নিয়ে পালাবে, এই তার ভয়। খাবার-দাবার কম পড়েছিল। রওনা হবার আগে এস্টেবান নিজের শিকারে দক্ষতা নিয়ে খুব লম্বা চওড়া কথা বলে, সাজ সরঞ্জাম কিনে এনে, কাজের বেলায় লবডঙ্কা!

ফ্লরার পরিকল্পনাই এই অভিযানের মূলে, তাই অন্যরা সকলে বলল, এখন থেকে সে যা পরামর্শ দেবে, তাই করা হবে। নইলে শেষটা সোনা তো নিয়ে যেতে পারবেই না, প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে কি না সন্দেহ।

শেষ পর্যন্ত ফ্লরা বলল, 'নিগ্রোদের কাল গোটা দিনটা বিশ্রাম করতে দিয়ে, ওরা ছয় জন শিকারে বেরিয়ে যদি অনেক মাংস নিয়ে ফেরে, তাহলে ওরা বিশ্রাম আর পেট ভরে খেতে পেয়ে নিশ্চয় খুশি হয়ে যাবে। এরপর ধীরে ধীরে একটু বেশি সময় নিয়েই না হয় এগোনো যাবে। নয়তো এখানে সোনা পুঁতে রেখে, সমুদ্রের ধারের বন্দরে গিয়ে দ্বিগুণ লোক নিয়ে এসে সোনা নিয়ে যাব। প্রচুর খাবার জিনিষ কিনে, এখানে ফেরার সময় প্রত্যেকটা ক্যাম্পে কিছু কিছু লুকিয়ে রাখা যাবে। তাহলে সোনা নিয়ে যাবার সময়ে ভাবনা থাকবে না। আমাকে ভার দিলে, আমার কথা মতো চলতে হবে।' তারপর ক্রাস্কিকে বলল, 'কুলিদের সরদার ওয়াজাকে ডেকে আনো তো।'

ওয়াজা এলে ফ্লরা বলল, 'ওয়াজা, আমরা জানি কম খেয়ে, ডবল ভার বয়ে, তোমরা সকলে কাহিল হয়ে পড়েছ। সবাইকে বল আমরা এবার একটু বিশ্রাম নেবো। কাল শিকারে গিয়ে মাংসের চেষ্টা করব। আমাদের সঙ্গে বন-পেটাবার জন্য কয়েকজন লোক দিও। যেখানেই যথেষ্ট শিকার পাওয়া যাবে, সেখানেই একটু বিশ্রাম করব। সবাই যদি বোঝা নিয়ে নিরাপদে পৌঁছই, তাহলে ডবল মজুরি পাবে।'

এ ব্যবস্থায় নিগ্রোরা খুশি হলেও, ব্লুবার চটে গেল। যাই হোক, একমাত্র এস্টেবানই ফ্লরার কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছিল না। কিছুই শিকার করতে পারে না, তবু পরদিনি জোর-জার করে তীর-ধনুক নিয়ে টারজানের মতো শিকারে চলল। অল্প পরেই সে দলছাড়া হয়ে গেল। বনের মধ্যে তার টারজানের ওয়াজিরিদের সঙ্গে দেখা। এরা ওপার যাবে বলে টারজানের আগেই রওনা হয়েছিল। বহুদিন কেটে গেছে, টারজানের দেখা না পেয়ে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। এত চমৎকার ছদ্মবেশ এস্টেবানের যে এরা পর্যন্ত ওকে আসল টারজান ভেবে 'বোয়ানা! বোয়ানা!' করে ছুটে এল।

উস্থলা হল ওদের সরদার। সে টারজানের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়েছে, ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলে। এস্টেবান ধূর্তের একশেষ, সে উস্থলাকে ডেকে নিয়ে বলল, 'আরেক-বার ওপার গিয়ে মাথায় চোট লেগে সব ভুলে গেছিলাম জান তো? এবারো মাথায় গাছের ডাল ভেঙে পড়ে এদেশের ভাষা আগেকার অনেক কথা ভুলে গেছি। তোমার লোকজনদের বুঝিয়ে বল।'

তারপর এস্টেবান বলল, 'এই বনে একদল বে-আইনী শিকারী ক্যাম্প করে আছে। তারা ওপার থেকে সোনা লুঠ করে এনেছে। ওদের ক্যাম্প থেকে ঐ বে-আইনী সোনা আমি নিয়ে আসতে চাই। আমার সঙ্গে চলো।'

কিছুক্ষণ পরে ওরা ক্যাম্পের কাছে পৌঁছল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে এস্টেবান বলল, 'আমরা দলে ভারি, ওরা আমাদের সঙ্গে পারবে না। চেষ্টাও করবে না। তোমার লোকদের এখানে ঝোপের আড়ালে সাজিয়ে রাখো। আমি আগে গিয়ে কথা বলি। হাত তুললেই তোমরা এসে ওদের বলবে টারজান ওদের লুঠ করা সোনা নিয়ে যেতে এসেছে। যদি ওরা এখনি এ দেশ ছেড়ে চলে যায়, তাহলেই ওরা প্রাণে বাঁচবে।'

ওরাজিরিরা যে-যার গা-ঢাকা দিলে, এস্টেবান এগিয়ে গেল। ক্যাম্পের নিগ্রোরা ওকে এস্টেবান বলে চিনতে পারল। ও তাদের ডেকে বলল, 'আমি টারজান। আমার যোদ্ধারা তোমাদের ক্যাম্প ঘিরে ফেলেছে। তোমরা যদি কিছু না কর, তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না।'

আস্কারিরা রাইফ্‌লে ভয়ে ভয়ে হাত দিতেই, এস্টেবান বলল, 'শুট করলে মেরে ফেলব। উস্থলা, ওদের সঙ্গে কথা বল।'

উস্থলাও এগিয়ে এসে বলল, 'আমরা টারজানের ওয়াজিরি যোদ্ধা আর এই হলো টারজান। আমরা তোমাদের কাছ থেকে টারজানের সোনা নিতে এসেছি। যদি তোমরা রাইফ্‌ল নামিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাও আর কখনো না ফেরো, তাহলে তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না।'

নিগ্রোরা তৎক্ষণাৎ তাই করল। ওয়াজিরিরা সোনার বাট কাঁধে তুলে নিতে লাগল। যে লোকটি একটু ইংরিজি বলত, তাকে ডেকে এস্টেবান বলল, 'তোমাদের মালিকদের বল যে লোকটা এতদিন টারজান সেজে বেড়াচ্ছিল, আমি

তাকে মেরে তার শরীরটা সিংহদের খেতে দিচ্ছি। চারদিকে আমাদের চোখ আছে।'

এই বলে ওয়াজিরিদের নিয়ে এস্টেবান রওনা দিল। তখনো আস্কারিদের স্তম্ভিত ভাব কাটেনি।

সেদিনকার সার্থক শিকারের ফল কাঁধে নিগ্রোদের সঙ্গে পাঁচ শ্বেতাঙ্গকে ফিরতে দেখে নিগ্রোরা উত্তেজিত ভাবে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল। পীব্‌ল্‌স্‌ বলল, 'আবার কি হয়েছে?'

ওরা বলল, 'টারজান এসে সোনা নিয়ে গেছে। সঙ্গে ছিল এক হাজার ওয়াজিরি, আমরা খুব লড়াই দিলাম, কিন্তু হেরে গেলাম। তোমাদের একজনকে ও আগেই মেরে ফেলেছে। আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। লোকটা শিকার করতে গেল, আবার ফিরে এসে বলল, আমি টারজান। আমার সোনা আমি নিয়ে যাচ্ছি, আরো বলল তোমরা কিম্বা আমরা ফের যদি এদিকে আসি সব্বাইকে মেরে ফেলবে।'

ফ্লরা আরেকবার সব কথা শুনে বলল, 'তাহলে টারজান নিশ্চয় ওষুধের ঘোর কাটিয়ে আমাদের পিছন পিছন আসছিল। এস্টেবানকে একা পেয়ে তাকে মেরে ফেলে, ক্যাম্পে এসে সোনা নিয়ে চলে গেছে। আমরাও যদি প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারি তবেই ঢের।'

ব্লুবার চ্যাঁচাতে লাগল, 'সোনাও পাওয়া গেল না, দু-হাজার পাউণ্ডও জলে গেল।' তারপর নিজেদের মধ্যে খ্যাঁচাখেঁচি লেগে যায় আর কি!

পীব্‌ল্‌স্‌ শেষে বলল, 'আরে বাপু, থামো, কারো কোনো দোষ নেই। এখন টারজানের পিছন পিছন গিয়ে, সোনাগুলো কেড়ে আনতে হবে।'

ফ্লরা কাষ্ঠ হাসল, 'অসম্ভব। আমি টারজানকে ভালো করেই চিনি। ওর ওয়াজিরিরাও সাংঘাতিক যোদ্ধা। আমাদের লোকজনরাও কেউ রাজি হবে না। বলেই দেখ না কি হয়। ওর নাম শুনলেই এরা ভয়ে কাঠ! আর কোনোদিন আমাদের ওপারের রত্নগুহাতেও ও যেতে দেবে না!'

এবার ক্রাস্কি একটা বুদ্ধির কথা বলল, 'যা গেছে, তাই নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। আমি ওয়াজার সঙ্গে কথা বলতাম, ওদের ভাষাও খানিকটা শিখেছি। ব্যাটা মহা পাজি, কিন্তু ভারি চালাক। খালি হাতে দেশে ফেরার আমার ইচ্ছা নয়। পরে আরেকবার ওপার যাব, তাও ভেবেছি। আপাততঃ এ অঞ্চল থেকে একদল আরব দস্যু গ্রামবাসীদের ধরে ক্রীতদাস করে নিচ্ছে আর হাতির দাঁত চুরি করছে। ওদের ক্রীতদাসদের ক্ষেপিয়ে তোলা শক্ত হবে না। তাদের সাহায্যে অনেক হাতির দাঁত বাগানো যাবে। ওয়াজাকে একটা ভাগ দিলে আর ক্রীতদাসদের মুক্তি দিলেই হবে।'

ফ্লরা জিজ্ঞাসা করল, 'ওয়াজা কি রাজি হবে?'

ক্রাস্কি হাসল, 'হবে না মানে? এ মৎলবটাই তো তার।'

এদিকে এস্টেবান পড়েছিল অসুবিধায়। বীর ওয়াজিরিদের সামনে টারজান সাজা সহজ কাজ নয়, তা মাথায় চোট দেখে সব ভুলে গেছেই বলুক, কি যাই বলুক। ওয়াজিরিরা যোদ্ধা, তাদের প্রভু টারজান-ও বীরপুরুষ। সে যে এমন অন্যের ক্যাম্প থেকে সোনা সরিয়ে কারো সঙ্গে যুদ্ধ না করেই সরে পড়বে, এটা তারা ভাবতেই পারছিল না। তার ওপর জলা জায়গায় একটা গণ্ডার ওদের তাড়া করেছিল। তাকে মারার বা তাড়াবার এতটুকু চেষ্টা না করেই প্রাণের ভয়ে এস্টেবানকে একটা বড় গাছের দিকে দৌড়ে গিয়ে ডাল ধরে ঝুলে না পড়ে, গুঁড়ি পাকড়ে খচমচ করে বৃথা উঠবার চেষ্টা করতে দেখে তারা অবাক হল। বিশেষ করে গণ্ডারটা ততক্ষণে তার ক্ষীণদৃষ্টি-চোখে কিছু ঠাওর করতে না পেরে অন্য দিকে চলে গেল। এস্টেবান বুঝল চালটা ভুল হল। দু-হাতে রগ ধরে বলল, 'মাঝে মাঝে সব গুলিয়ে যায়!

উস্থলা বলল, 'রগে লাগেনি বোয়ানা, মাথায় লেগেছিল।'

তখন এস্টেবান বুঝতে পারল এদের সঙ্গে থাকলে বিপদে পড়তে হবে। সময় বুঝে সে উস্থলাকে বলল, 'দেখ, ভেবে দেখলাম ঐ ক্যাম্পের লোকগুলোকে সাজা দেওয়া দরকার। ঐ ঝরনার কাছে সোনাটা পুঁতে রেখে, আমি একা যাব। তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। পরে সোনা নিয়ে যাওয়া যাবে।' উস্থলা কি সহজে এ প্রস্তাবে রাজি হয়। তারাও সাজা দিতে সঙ্গে যাবে। তখন এস্টেবান বেগতিক বুঝে রাগ দেখিয়ে বলল, 'আমার আদেশ, তোমরা ফিরে যাও।'

উস্থলা বলল, 'তোমাকে এই ঘন বনে একা অসুস্থ অবস্থায় ফেলে গেলে মাই লেডি কি বলবেন?'

এস্টেবান বলল, 'না, না, এখন আমি খুব সুস্থ বোধ করছি।'

তাদের যেতে একরকম বাধ্য করে, এস্টেবান নিজেদের দলের ক্যাম্পে ফিরে গেল।

ওকে দেখেই নিগ্রোরা রাইফ্‌ল তুলল। একজন বলল, 'এই রে! টারজান এসেছে! সবাইকে মেরে ফেলবে।'

এস্টেবান ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, না, আমি এস্টেবান। ফ্লরা কোথায় গেলে, এদের বল আমি টারজান নই।'

ফ্লরা ওকে দেখেই চিনতে পেরে, নিগ্রোদের ঠেকাল।

ক্রাস্কি বলল, 'আমরা ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ। টারজান নাকি এদের বলে গেছে তোমাকে মেরে ফেলেছে।'

—'মারেনি, তবে আমাকে বন্দী করে, শেষে ঘন বনে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছিল। হয়তো ভেবেছিল আমাকে হিংস্র জন্তুরা খাবে।'

দলের কেউই ওকে দেখে খুশি হল না।

ফ্লরা পর্যন্ত বলল, 'খুশি-অখুশিতে কি এসে যায়? আমাদের অভিযানটাই ব্যর্থ হল। অনেকের ধারণা, তুমিই তার কারণ।' ওতো আর জানে না যে সোনাগুলো এস্টেবানই লুকিয়ে রেখেছে। এরা সবাই দেশে ফিরে গেলেও একাই সোনাটা নেবে। একমাত্র অসুবিধা হল ওয়াজিরিরাও জানে সোনা কোথায় পোঁতা আছে। ওটা এখান থেকে তুলে অন্য কোথাও লুকোতে হবে। তার জন্য সাহায্য দরকার হবে। কাকে বলা যায়, একটু ভাবতে হবে। কিন্তু এরা কেন ওকে দেখে এত বিরক্ত হচ্ছে? এস্টেবান-ও জানে না ওদের হাতির দাঁত লুঠ করার মৎলবের কথা।

শেষ পর্যন্ত ক্রাস্কি বলল, 'এস্টেবান, সকলের বিশ্বাস তোমার জন্যে সোনা হারিয়েছে। আমাদের আরেকটা পরিকল্পনা আছে, তার থেকে কিন্তু তোমাকে বাদ দেওয়া হবে। এটা গোড়া থেকেই বুঝে নাও।'

এস্টেবান বলল, 'ঠিক আছে। আমি তোমাদের কারো কাছ থেকে কিছু চাই না।' মনে মনে বলল, সোনাটার ভাগও তোমরা কেউ পাবে না।

রাতে শুয়ে শুয়ে এস্টেবান ভাবছিল, যদি সোনাগুলো একাই কোনোমতে আর কোথাও লুকিয়ে রাখে, তাহলে অন্য কেউ জানতে না পারলেও, পরে ও নিজেও জায়গাটা খুঁজে পাবে না। নিজের বুদ্ধির দৌড় নিজের জানা ছিল। তার চেয়ে ওয়াজাকে দলে নেওয়া যাক। দুজনে মিলে কাজ হাসিল করে, পরে ওয়াজাকে খানিকটা দিলেই হবে।

এই মনে করে পরদিন সকালে এস্টেবান আবার শিকারে বেরোবে বলে ঘোষণা করল। ওয়াজাকে আর ওয়াজার পছন্দ করা কয়েকটা লোক সঙ্গে নেবে।

ওয়াজার কিন্তু মহা আপত্তি। আবার শিকার কেন? দুদিন পেট পুরে খাবার মতো মাংস আছে। তখন তাকে আলাদা করে ডেকে বলল, 'শুধু হরিণ নয়, তার চেয়ে বড় দাঁও মারব। চলতো।'

তাই শুনে ওয়াজার মত বদলে গেল। 'নিশ্চয় যাব বোয়ানা। পাঁচজন বাছাই করা লোক নেব।'

অন্যদের যাত্রার ব্যবস্থা করে দিয়ে, ওয়াজা আর তার লোকেরা এস্টেবানের সঙ্গে শিকারে বেরোল। একটু দূর গিয়েই ওয়াজিরিদের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়ে ওয়াজা বলল, 'কাল সন্ধ্যায় এ পথে অনেক লোক গেছে।'

এস্টেবান বলল, 'কি জানি, আমি তো কাউকে দেখিনি।'

ওয়াজার রূপ বদলে গেল। সে বলল, 'তুমি আমার সামনে সামনে যাও, বোয়ানা, যদি আমাকে কোনো বিপদে ফেল, তাহলে আগে তোমাকে মারব।'

তখন সব কথা খুলে বলতে হল। 'অন্যরা হাতির দাঁত নিয়ে দেশে চলে গেলেই, সোনাটা তুলে নেওয়া যাবে।'

ওয়াজা বলল, 'তাই বল! যেদিন আমরা ওপারের কাছের ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসি, আমার লোকদের একজন বলেছিল সে নিজের চোখে দেখেছে তোমার দেশের লোকরা তোমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলল। তোমার শরীরটাকে ঝোপের মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেল। অথচ পরে দেখলাম তুমিও দলের সঙ্গে চলেছ। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তবে কি দুটো টারজান আছে নাকি?'

এস্টেবান তখন বলল, 'না, আমি সুবিধার জন্য টারজান সেজে থাকলেও, টারজান নই। ঐ লোকটাই টারজান। ওকে বিষ খাইয়ে মারে নি কেউ। কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সবাই চলে গেছিল। হয়তো ভেবেছিল সিংহে খাবে। কাজেই ওয়াজিরিদের কাছে তোমাদের ধরিয়ে দেওয়া দূরে থাকুক, আমি নিজেও তাদের সামনে পড়তে চাই না।'

যেখানে সোনা পোঁতা ছিল তার এক মাইল আগে ঐ পাঁচজন লোককে বসিয়ে, ওয়াজা আর এস্টেবান এগিয়ে গেল। যত কম লোকে জানে ততই ভালো। ঝরনার ধারে জায়গাটাকে ওয়াজি চিনে রাখল। ওরা সোনা খুঁড়ে তুলে একটু দূরে ঘন ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে রাখল। এখানেই সবচেয়ে নিরাপদে থাকবে। ওয়াজিরিরাও যদি

খুঁজতে আসে, ওগুলো যে এত কাছেই আছে, সে-কথা স্বপ্নেও ভাববে না।

সব কুকর্ম সারা হলে ওয়াজি সূর্যের দিকে চেয়ে বলল, 'আজ রাতে ক্যাম্পে ফেরা যাবে না।'

এস্টেবান বলল, 'সেটা আমি আগেই জানি। ওদের সঙ্গে আর দেখা না হলেও, আমার কোনো দুঃখ নেই।'

ওয়াজিও হাসতে লাগল। মনে মনে ভাবল, সামান্য কটা হাতির দাঁত নিয়ে কি হবে, এতগুলো সোনা পাওয়া তার চেয়ে ঢের ভালো।

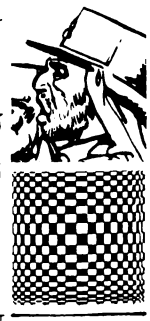

নিগ্রোদের গ্রাম থেকে মরা গোরিলা কাঁধে নিয়ে টারজান অনেকটা দূরে চলে এসেছিল। হঠাৎ নাকে এল গোরিলার গন্ধের সঙ্গে রান্না খাবারের আর মিষ্টি ধূপ-ধুনোর গন্ধ। এ গন্ধ গোরিলাদের বাসা থেকে বেরোবার কথা নয়। নিগ্রোদের গন্ধও পেল, কিন্তু সাদা মানুষের গন্ধ ছিল না। মরা গোরিলা কাঁধে নিয়েই টারজান গাছে উঠে পড়ল। দেখল একটা পাঁচিল, তার ওপাশে একটা প্রকাণ্ড বাড়ি। তার এক-একটা অংশ মনে হল এক-এক সময় তৈরি, ঘর, চুড়ো, মিনার। অদ্ভুত হলেও দেখতে ভালো। উঁচু পাথরের ভিত, একটা প্রকাণ্ড চ্যাপ্‌টা মিনার, প্রায় আগাগোড়া লতায় ঢাকা। গ্র্যানাইট পাথরের তৈরি। তাতে সোনা, হীরে, অন্য পাথর বসানো। সবটা ঝকমক করছে। চারদিকে সুন্দর ফুলের বাগান, নীচু ধাপে তরিতরকারির ক্ষেত। নিগ্রোরা কাজ করছে, সেই রকম গোরিলারা দেখাশুনো করছে। তাদের গায়ে দামী গয়না।

সদর দরজাটা বিশাল, তার দুধারে দুজন গোরিলা এসে দাঁড়াল, তাদের মাথার ফেট্টিতে লম্বা সাদা পালক গোঁজা। হঠাৎ শিঙার মতো শব্দ কানে এল। যে যার কাজ ফেলে সদর দরজা থেকে বাগানে নামার পথের দুধারে দাঁড়িয়ে গেল। একটা মিছিল বেরিয়ে এল। আগে আগে মুগুর হাতে প্রকাণ্ড দুই গোরিলা, কি তাদের সাজের বাহার! তারপর শিঙা-বাদকরা, তার পিছনে প্রকাণ্ড এক সিংহ, তার সোনালী গা, কালো চুল। চারজন ষণ্ডা নিগ্রো তাকে অনেকগুলো মোটা মোটা সোনার শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে এল। সিংহের গলায় হীরের হার। পিছনে বর্শা নিয়ে কুড়িজন যোদ্ধা।

সিংহ যাবার সময় দর্শকরা নিচু হয়ে নমস্কার করল। সিংহর হাবভাব বদ্‌খদ্‌, খিট্‌খিটে। বিকট গর্জনও করল একবার, চোখ পাকাল, দাঁত খিঁচলো। ও পার হয়ে গেলে শ্রমিকরা আবার যে যার কাজে ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার ঐ ভাবে মিছিলটা ফিরে এসে, সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। টারজান দেখেশুনে তাজ্জব বনে গেল। মৃতদেহটা গাছে লুকিয়ে রেখে, প্রাসাদটার চারদিক ঘুরে দেখল। মনে হলো ঐ পাঁচিল, ঐ ফটক, ঐ প্রাসাদ সম্ভবতঃ সেই বিস্মৃত যুগে তৈরি, যখন অ্যাটলাণ্টিকবাসীরা আফ্রিকায় সোনার হীরের খনির কাজ করাত।

পুব দিকের ফটকের কাছে টারজান একটা গাছ থেকে সেদিকটা পরিদর্শন করছিল, এমন সময় একদল বলিষ্ঠ নিগ্রো কাঁধে বড় বড় গ্র্যানাইটের টুকরো ঝুলিয়ে ঢুকল। পরে আরেকটা দলও এল। এ দলে পঞ্চাশ জন সশস্ত্র গোরিলা একটা পালকি করে একটা সোনা আর দামী দামী পাথরেরর কাজ করা কালো কাঠের সিন্দুক এনে উত্তরপুব দিকের ফটক দিয়ে ঢুকে গেল।

এবার মরা গোরিলাটাকে গাছ থেকে ঠেলে ফটকের সামনে ফেলে টারজান বনের মধ্যে ঢুকে এদিক দিয়ে বেরোবার কোনো পথ আছে কিনা অনুসন্ধান করতে লাগল। খাড়াইয়ের ওপর দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে খাড়াইয়ের মাথা থেকে ওদিকে একটা উপত্যকা দেখতে পেল। সেখানে খাড়া দেয়ালে অনেক ফোকর। তার নিচে মই লাগানো। মনে হল পাহাড়টা সুড়ঙ্গ দিয়ে ভরতি। কয়েকজন নিগ্রোকে দেখতেও পেল থলি ভরা মাটি না কি জিনিস নিয়ে, সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে মই দিয়ে নিচে নামছে। গোরিলারা সব কাজের তদারকি করছে।

মোট কথা এদিকে বেরোবার পথ নেই। শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের চুড়ো বেয়ে অনেক কষ্টে আবার সেই গাঁয়ে ফিরে এল টারজান, যেখানে লা-কে রেখে গেছিল। তখন সকাল

হয়ে গেছে। গাঁয়ে সাড়াশব্দ নেই। অনেক ডাকাডাকি করেও লা-য়ের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে, টারজানের বড় ভাবনা হল। গাঁয়ে কোনো লোক নেই মনে হল। খালি একটা ঝুলন্ত ঘরে যেন নড়াচড়ার শব্দ পেল। টারজান ডেকে বলল, 'গোমানগানি নেমে এসো বলছি। নইলে আমি গিয়ে ধরে আনব।'

শেষ পর্যন্ত ছোরা হাতে নিয়ে তাই করতে হল। এক কোণায় ঘাসপাতার বিছানায় একটা মেয়ে লুকিয়ে ছিল। তাকে টেনে তুলে টারজান বলল, 'সকলে কোথায় গেল? আমার স্ত্রী কোথায়?'

মেয়েটা তো ভয়েই মরে, 'আমি কিছু করিনি! আমার কোনো দোষ নেই!'

—'তোমার ক্ষতি করবার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। তারা কোথায় বল।'

—'ওদের ফটকের বাইরে মরা বোল্‌গানিকে দেখে ওরা সদলবলে এখানে এসে ভয় দেখিয়ে মারপিট করে সব কথা জেনে নিল। তারপর সকলকে ধরে নিয়ে গেল।'

—'মেরে ফেলবে নাকি?'

—'ওরা যাদের ওপর রাগ করে তাদের মেরে ফেলে।'

তাহলে তো লা-কে বাঁচাতে হলে, এখনি সেখানে যেতে হয়। অন্যদেরো তো টারজানের কাজের জন্য মরতে দেওয়া যায় না। আবার সেই চকচকে বাড়িতে ফিরে গিয়ে চারদিকে ঘুরে দেখল টারজান। বাইরে যারা কাজ করছিল, তাদের নজর এড়িয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করা বিপজ্জনক।

সন্ধ্যার পর পুবের বড় ফটক বন্ধ হল। ভিতরে যারা কাজ করছিল তারা ঘরে গেল। বাইরে যারা ছিল, তারাও বাড়ি গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল এরা বাইরে থেকে কোনো আক্রমণ আশা করছে না।

যখন সব অন্ধকার হয়ে গেল, তখন টারজান তার দড়ির ফাঁস খুলে, গেট টপকে, নিচের বাগানে পেঁছে গেল। আগে ফটকের ছিটকিনি খুলে, ফটকটাকে ফাঁক করে রাখল। এবার লতা বেয়ে পুবের মিনারে উঠতে হবে। তার ওপরে একটা খোলা জানলা দেখা যাচ্ছিল। অন্য জানলার ভেতরে মিটমিট আলো জ্বলছিলো। এটা অন্ধকার। লতা বেয়ে সেই জানলায় পেঁছিল টারজান। ভিতরের ঘরটাও অন্ধকার। কি আছে না আছে না বুঝলেও, নিঃশব্দে সে-ঘরে ঢুকে পড়ল টারজান। হাতড়ে দেখল ঘরে একটা কারুকার্য করা খাটে কাপড়ের আর লোমের নরম বিছানা, একটা টেবিল, গোটা দুই বেঞ্চি।

জানলার উল্টো দিকে একটা বন্ধ দরজা। নিঃশব্দে সেটা একটু ফাঁক করে বাইরে তাকিয়ে একটা গোল হল্‌ঘরের মতো দেখতে পেলো। তার মধ্যিখানে একটা চার ফুট চওড়া গোল ফাঁক। তার মধ্য দিয়ে আর ছাদ ফুঁড়ে ঠিক ঐ রকম একটা ফাঁক দিয়ে সোজা একটা ডাণ্ডা উঠে গেছে। তাতে একফুট দূরে আড় ভাবে একটা টুকরো বসানো। মনে হলো এটা একটা আদিমকালের সিঁড়ি। এটা বেয়ে মিনারের সমস্ত তলাগুলোতে যাওয়া-আসা করা যায়। গোল হলঘরের চারদিকে আরো ঘর আছে, সেগুলোর দরজা দেখা যাচ্ছিল।

কারো কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে টারজান দরজা খুলে হলঘরে বেরিয়ে এল। নাকে আবার এল কড়া ধূপধুনোর গন্ধ। কাউকে না দেখে টারজান সবগুলো ঘর পর্যবেক্ষণ করে দেখল। একই ধরনের সোনা আর হীরে বসানো আস-বাব, সাজসজ্জা। একটা ঘরে একটা গোরিলা খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। টারজানের নিঃশব্দ চলাফেরায় তার ঘুমের ব্যাঘাত হল না। কিন্তু লা-র কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

অদ্ভুত সিঁড়িটা বেয়ে টারজান সব চেয়ে ওপরের তলায় উঠল। মাঝখানে তিনটে তলা পার হয়ে গেল। সলগুলোতে অনেকগুলো দরজা, সব বন্ধ। প্রত্যেক তলায় একটা করে চ্যাপ্টা প্রদীপে মোমের মতো কিছুতে বসানো সলতে জ্বলছে।

সবচেয়ে ওপর তলায় তিনটি বন্ধ দরজা। ওপরে গম্বুজের মতো ছাদ। ছাদ ফুঁড়ে সিঁড়িটা উঠে গেছে। রাতের আকাশ দেখা যাচ্ছে। প্রথম দরজাটা খুলতেই ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো। মনে হলো পিছনে কিছু নড়াচড়া করে উঠল।

বিদ্যুৎবেগে ছোরা হাতে ফিরে দাঁড়াল সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাতটা নেমেও পড়ল। সামনে যাকে দেখল, সে গোরিলাও নয়, নিগ্রোও নয়। সে একজন শ্বেতাঙ্গ, বুড়ো, মাথায় টাক, চামড়া কুঁচকে গেছে, লম্বা সাদা দাড়ি। ঐ গোরিলাদের মতো সাজসজ্জা। লোকটা বলল, 'গড্‌!' ঐ একটা কথা শুনে টারজানের মন সম্ভাবনায় তোলপাড়।

বুড়ো বনমানুষদের ভাষায় বলল, 'তুমি কি? তুমি কে?'

টারজান ইংরিজিতে বলল, 'এক্ষুনি ইংরিজি কথা

বললে, ইংরিজি জান ?'

সে বলল, 'দয়াময় ভগবান ! আবার কানে ঐ মধুর ভাষা শুনতে পেলাম।'

—'তুমি কে ? এখানে কি করছ ?'

—'আমিও তোমাকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম। তুমি ইংরেজি নির্ভয়ে বল।'

টারজান বলল, 'গোরিলারা একজন মেয়েকে ধরে এনেছে, তাকে খুঁজছি।'

—'হ্যাঁ, বুঝেছি। সে এখানেই আছে।'

—'নিরাপদে আছে তো ?'

—'কাল পরশু অবধি নিরাপদেই থাকবে। এখানে কি করে এলে ?'

টারজান বলল, 'আমি টারজান। ওপর থেকে একটা বেরোবার পথ খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়েছি। ওপারে ঐ মেয়ের বড় বিপদ। আর তুমি ?'

—'আমি বহুকাল আগে স্ট্যানলির জাহাজে লুকিয়ে চলে এসেছিলাম। তাঁর সঙ্গেই বনাঞ্চলেও এসেছিলাম। একদিন একা শিকার করতে গিয়ে নিগ্রোদের হাতে বন্দী হই। তাদের কাছ থেকে পালিয়ে, সমুদ্রের ধারে যাবার পথ খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়েছিলাম। এরা আমাকে তখনি মেরে ফেলেনি কেন জানি না। যখন দেখল আমি নানা কাজ জানি, তখন থেকেই আমাকে কাজে লাগাচ্ছে। ওদের আমি শক্ত-মুখ লোহার ড্রিলের কাজ শিখিয়েছি। ড্রিলের আগায় হীরে বসিয়ে কাজ করতে শিখিয়েছি। এখন আমি ওদেরি একজন হয়ে গেছি। তবু মনে আশা রাখি একদিন পালিয়ে দেশে ফিরে যাব। জানি বৃথা আশা।'

—'কেন, বেরোবার পথ নেই ?'

—'আছে, কিন্তু সারাক্ষণ সেখানে পাহারাওয়ালা থাকে। খনির সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আদিকাল থেকে ওখানে খনির কাজ। নানা রকম খনিজ জিনিস আছে। সোনার স্তরের পিছনে, হীরের আকর। তার সুড়ঙ্গ এত দূর ভিতরে চলে গেছে যে সম্ভবতঃ হাওয়া চলাচলের জন্যও ওদিক দিয়ে খুঁড়ে বেরিয়েছে। আদ্যিকাল থেকে ২৪ ঘণ্টা পাহারা বসে সেখানে। শত্রু আসবে সে ভয় নেই ওদের। ওদের ভয় ক্রীতদাসরা যদি ঐ পথে পালায়, তাই এত সতর্কতা। খালি ওপার দিয়ে যাওয়া-আসা করা যায়।'

—'কারা পাহারা দেয় ?'

—'দুজন গোরিলা আর গোটা বারো নিগ্রো যোদ্ধা।'

—'কত নিগ্রো আছে এখানে ?'

—'হাজার পাঁচেক।'

—'কত গোরিলা ?'

—'এগারো কি বারো শো।'

—'তবু ক্রীতদাস হয়ে থাকে। কি আশ্চর্য !'

—'বোলগানিদের যে বুদ্ধি বেশি। এই নিগ্রোরা প্রায় নির্বোধ।'

—'ভীতু নিশ্চয় ?'

—'মোটেই না। সিংহের সামনে নির্ভয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু গোরিলাদের ভয় পায়। বহু পুরুষের অভ্যাস। ঐ মেয়েটিকে নিয়ে তুমিও এখান থেকে বেরোতে পারবে না। পালানো গেলে, আমি কবে পালাতাম।'

—'নিগ্রোদের মতো তোমারো মন পরাজয় স্বীকার করেছে। আমি চেষ্টা করে দেখব। তুমি আমাকে ধরিয়ে দেবে না আশা করি।'

—'কোনো ভয় নেই। আমি ওদের দেখতে পারি না।'

টারজান বলল, 'মেয়েটিকে কোথায় রেখেছে ?'

জানলার কাছে গিয়ে একটা চ্যাপ্টা মতো মিনার দেখিয়ে বুড়ো বলল, 'ঐখানে সম্ভবতঃ।'

টারজান ছাদের ওপর দিয়ে সেদিকে চলল। চ্যাপ্টা ছাদে পৌঁছে দেখল অনেকগুলো যাতায়াতের পথ আছে। মোটা পরদা ঝুলছে সব দরজায়। একটা পরদা সরাতেই সেই রকম একটা সিঁড়ির নীচে তাকিয়ে দেখে ধাপে ধাপে নেমে গেছে, মনে হল মাটির তলায় অনেক দূর পর্যন্ত। নাকে এল মিষ্টি একটা ধূপের গন্ধ। চাপা অস্পষ্ট আওয়াজও কানে এল। কিন্তু ঐ কড়া গন্ধটাতেই সর্বনাশ হল। তা না হলে একটা পরদার পিছনে শুয়ে থাকা নিগ্রোটার গায়ের গন্ধ টের পেত। সে লোকটা ওকে দেখে ভয়ে কাঠ। ও নিচের তলায় নেমে যাবার পর, লাফিয়ে উঠে ছাদের ওপর দিয়ে ছুটে গেল পশ্চিম দিকের বড় একটা মিনারে তার প্রভুদের খবর দিতে।

প্রত্যেকটা দরজা বাইরে থেকে পরীক্ষা করে চারটে তলা নেমে টারজান সামনে একজন নিগ্রোকে দেখতে পেল। লোকটার যেমনি ভয়, তেমনি উত্তেজনা। সে বলল, 'তুমি কি তোমার স্ত্রীকে খুঁজছ ? তবে আমার সঙ্গে এসো।'

—'খুঁজছি তো। তুমি এ বিষয়ে কি জান ?'

—'তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, তা আমি জানি।

আমার সঙ্গে এলে তার কাছে পৌঁছে দেব।'

—'কেন আমার জন্য এ-কাজ করতে চাইছ? মালিকদের কাছে গিয়ে আমার কথা বলে দিচ্ছ না কেন?'

—'মালিকরাই তো আমাকে পাঠিয়েছে।'

—'কোথায় নিয়ে যেতে বলেছে?'

—'একটা কুঠরিতে। আমরা ঢুকলেই তার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আমাকে তুমি মেরে ফেললেও ওদের তেমন কিছুই এসে যাবে না।

'যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর তো সত্যি মেরে ফেলব। যদি ঐ মেয়ের কাছে নিয়ে যাও, হয়তো সকলের পালাবার ব্যবস্থা করতে পারব। তুমি পালাতে চাও না?'

—'চাই তো, কিন্তু পারি না। চল, তোমাকে মেয়েটির কাছেই নিয়ে যাই।'

তারপর টারজান লোকটির সঙ্গে নিচের তলায় নেমে একটা দরজা খুলে, লম্বা একটা সুড়ঙ্গে ঢুকল। টারজানের মনে হল বুড়োই নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নইলে মালিকরা জানল কি করে? একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে লোকটা বলল, 'সে এখানে আছে।'

—'একা আছে?'

—'না।'

এই বলে দরজাটা খুলে, ভিতরের পরদা একটু ফাঁক করে দিল।

টারজান তাতে চোখ লাগিয়ে দেখল মস্ত একটা ঘরের এক মাথায় একটা মঞ্চ। তার নিচেটা কালো কাঠের তৈরি। মঞ্চে বসে আছে সেই কালো-চুল বিশাল সিংহ, টারজান যাকে হাওয়া খেতে যেতে দেখেছিল। সোনার শিকলগুলো মেঝের সঙ্গে আংটা দিয়ে আটকানো। সিংহের পিছনে তিনটে চমৎকার সাজ পরে, সোনার সিংহাসনে তিনজন বোল্‌গানি বসে। সিংহের দুপাশে সেই চারজন বিশালদেহ সশস্ত্র প্রহরী। মঞ্চের সিঁড়ির নিচে দুজন নিগ্রো প্রহরী লা-কে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে সারি সারি বেঞ্চে জনা পঞ্চাশ গোরিলা বসে। তাদের মধ্যে সেই বুড়ো। তাহলে সত্যিই ও-ই বিশ্বাসঘাতক!

ঘরে শত শত সোনার প্রদীপ জ্বলছে, তার থেকেই ঐ ধূপের গন্ধটা বেরোচ্ছে। ঘরের এক দিকে গির্জার মতো উঁচু লম্বা জানলা! বাইরে প্রাসাদের বাগান দেখা যাচ্ছে। এ ঘরটা এক তলায়। জানলার বাইরে খোলা ফটক, তার বাইরে বন এবং মুক্তি। মধ্যিখানে পঞ্চাশ জন সশস্ত্র বোল্‌গানি। তাহলে চালাকি করে লা-কে উদ্ধার করতে হবে। তবু মনে হচ্ছিল এক্ষেত্রে শুধু বুদ্ধি দিয়ে হবে না। গায়ের জোরও লাগাতে হবে।

নিগ্রো সঙ্গীটাকে টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'সম্ভব হলে, সিংহের পাশের ঐ গোমানগানিরা কি পালাতে রাজি হবে?'

—'পারলে সব্বাই পালাবে।'

—'তাহলে এ ঘরে ঢুকতে হবে। তার আগে আমার সঙ্গে গিয়ে, অন্য গোমানগানিদের বলা যাক, আমার হয়ে লড়লে, ওদের সবাইকে এই জায়গা থেকে বাইরে নিয়ে যাব।'

—'বলব। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না।'

—'তাহলে বল আমাকে সাহায্য না করলে আমি ওদের মেরে ফেলব।'

—'বেশ তাই বলব।'

টারজান আবার ঘরের দিকে চোখ ফেরাল। মধ্যিখানের সিংহাসনে বসা বোল্‌গানি বলছিল, 'এই মেয়ের কথা নুমা শুনে বলেছেন ওকে মরতে হবে। তাঁর খিদে পেয়েছে। সকলের সামনে বসে তিনি ওকে খাবেন। এই তাঁর ইচ্ছা।'

সকলে একবাক্যে এ-কথার সমর্থন করল। সিংহটাও গর্জন করেত লাগল। মনে হল এ ব্যাপার এখানে প্রায়ই সংঘটিত হয়।

বক্তা বলে চলল, 'এর জোড়াও বন্দী হয়ে আছে। পরশু তাকেও বিচারের জন্য এখানে আনা হবে। দাস, এবার বন্দীকে সম্রাটের সামনে নিয়ে এসো।'

ততক্ষণে সিংহটা ল্যাজ আছড়ে, শিকল টেনে, দাঁত খিঁচিয়ে, গর্জন করে, যেন ক্ষেপে উঠেছিল। লা-কে টেনে তার সামনে আনা হল। সে ভয়ে কান্নাকাটি করেনি, যদিও বৃথাই রক্ষীদের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছিল। তাকে সবে ঠেলে ওরা সিঁড়ির ওপরে তুলে, সিংহের থাবার তলায় সঁপে দিতে যাচ্ছে, এমন সময় ঘরের এক পাশ থেকে একটা ভীষণ চিৎকার শোনা গেল। রক্ষীরা থেমে গেল, সমস্ত গোরিলারা রেগে, অবাক্ হয়ে, উঠে দাঁড়াল। একটা প্রায়-উলঙ্গ সাদা মানুষ বর্শা তুলে সভাঘরে লাফিয়ে ঢুকল। অনেকে এর কথা শুনলেও, কেউ একে চোখে দেখেনি। ওরা উঠে দাঁড়াবার সময় পাবার আগেই লোকটা তার সাংঘাতিক বর্শা ছুঁড়ে মারল।

রাতের অন্ধকারে একটা প্রকাণ্ড কালো-চুল সিংহ ঘন বনের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে চলেছিল। থেকে থেকে নাক তুলে বাতাস শুঁকলেও, শিকারে তার মন ছিল না। কিছুক্ষণ পরে দেখল একটা উঁচু দেওয়াল, তাতে একটা আধ-খোলা ফটক। সিংহ ভিতরে ঢুকে গেল। সামনে বিরাট একটা বাড়ি। তার সামনে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন দেখল, কান খাড়া করে কি যেন শুনল। ভিতর থেকে একটা সিংহ গর্জে উঠল। বাইরের সিংহও মাথা কাত করে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল।

এদিকে টারজানের বর্শা অব্যর্থ সন্ধানে সম্রাট নুমার বুকে বসে গেল। টারজান ছুটে গেল লা-র দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার নিগ্রো বন্ধু তার স্বজাতিদের ডাক দিল, 'মুক্তি যদি চাও তো এই হল লড়বার সময়।'

নুমার হতভাগ্য রক্ষীকে সে বলল, 'তোমার জিম্মায় সম্রাট মরল, বোলগানিরা তোমাকে আস্ত রাখবে না। বাঁচতে চাও তো আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।'

টারজান মঞ্চে উঠে লা-কে তুলে ধরছিল। ভাবছিল পঞ্চাশটা গোরিলার সঙ্গে কিছুক্ষণ অন্ততঃ লড়তে পারবে। রক্ষীদের দিকে ফিরে সে বলল, 'বাঁচতে চাও তো ঐ তিন বোলগানিকে মেরে ফেল। যদি মুক্তি চাও তো মারো।'

সঙ্গে সঙ্গে তাদের বর্শা অত্যাচারী তিন বোল্‌গানির বুকে গেঁথে গেল। সেই মুহূর্ত থেকেই তারা টারজানের বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে গেল। এ দেশে তাদের কোনো আশা-ভরসা নেই। লা-কে জড়িয়ে ধরে, নুমার বুক থেকে বর্শা খুলে নিল টারজান। তার গায়ে পা রেখে কেরচাকের দলের জয়ধ্বনি দিল।

টারজান হাত তুলে বলল, 'থামো! আমি বনমানুষের ছেলে টারজান। তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই। তোমাদের সঙ্গে লড়াই করতে আসিনি। আমি শুধু নিরাপদে এই মেয়েকে আর এই গোমানগানিদের নিয়ে চলে যেতে চাই।'

এর উত্তরে আরো রেগে গোরিলারা তেড়ে এল। তাদের দল থেকে বেরিয়ে, টারজানের কাছে বুড়ো ছুটে এল। টারজান বলল, 'বিশ্বাসঘাতক!'

সে তো অবাক্। 'বিশ্বাসঘাতক?'

—'তুমি বোল্‌গানিদের বলে দাও নি আমি এখানে ঢুকেছি?'

—'কখনোই না। আমি এ-ঘরে এসেছিলাম যদি মেয়েটাকে সাহায্য করতে পারি, এই ভেবে। এখনো এসেছি তোমার পাশে লড়াই করে মরতে চাই বলে।'

টারজান বলল, 'তবে এসো, প্রমাণ দাও। চিরকাল দাসত্ব করার চেয়ে লড়ে মরা ভালো।'

এর পর টারজানরা নয় জন মঞ্চে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। শত্রুরা পঞ্চাশ জন। তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল, এরাও তাদের ঠেকাচ্ছিল। এমন সময় সভাঘর সিংহের গর্জনে কেঁপে উঠল।

টারজান একবার তাকিয়েই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'জাদবালজা! মারো! মারো!'

বলতে না বলতে সাক্ষাৎ যমের মতো সিংহটা গোরিলা-দের ওপর লাফিয়ে পড়ল।

অমনি টারজানের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে গোমানগানিদের বলল, 'বোলগানিদের মারো। এবার সত্যিকার পশুরাজ নুমা এসেছে। সে শত্রু মারে। কিন্তু টারজানকে আর তার দলের সবাইকে বাঁচায়।'

তারপর টারজান জাদ্‌বালজাকে শত্রু মিত্র চিনিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাকে কাছে ডেকে নিয়ে, গোমান-গানিদের বলল, 'ঐ মরা সিংহটাকে সরাও, আসল পশুরাজ এসে গেছে।'

বুড়ো টারজানকে বলল, 'তুমি কে? যে এমন অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন? তোমার এখন কি করার ইচ্ছা?'

টারজান বলল, 'সেটা দেখই না। আর বোধ হয় কোনো ভয় নেই। গোমানগানিরা এরপর থেকে এখানে নিরাপদে বাস করবে।'

তারপর জাদবালজাকে নুমার জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এই সম্রাটকে শিকল দিয়ে বাঁধতে হবে না। তোমরা কয়েকজন প্রাসাদের পিছনে তোমাদের ঘরে গিয়ে সবাইকে ডেকে আনো। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা যেন তাড়াতাড়ি আসে। এরা নিশ্চয় দলেবলে আরেকবার চেষ্টা দেবে।'

লা কাছে এসে বলল, 'তুমি আমাকে বাঁচাতে এসেছ, তা আমি জানি। তার জন্যে কি ভাবে তোমাকে ধন্যবাদ দেব! এ-ও জানি তুমি বীর বলেই এসেছ, আমাকে ভালোবাসো বলে নয়। কিন্তু যতদূর শুনেছি, এখান থেকে বেরোনো সম্ভব নয়।'

টারজান বলল, 'আমি সে-কথা মানি না। আমরাও পালাতে পারব, এই গোমানগানিদেরও মুক্তি দিতে পারব।'

তাছাড়া ওপারে গিয়ে সেখানকার দুষ্কৃতকারীদের সাজা দিয়ে, তোমাকে সুখে শান্তিতে রাজত্ব করার ব্যবস্থাও করব।'

বুড়ো তো অবাক। 'তুমি সত্যিকার বীর। এখন এই নির্বোধ গোমানগানিদের মন থেকে যদি পুরনো ভয়টা দূর করতে পার, তবে কোনো ভাবনা থাকে না। বোলগানিরা ফিরে আসার আগেই যদি পালাতে পারি, তবেই আমরা বাঁচব। নয়তো পারব না।'

লা আঙুল দিয়ে দেখাল, 'এখনি বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। ঐ যে ওরা এসে গেছে।'

টারজান বলল, 'অন্য দিকটাও দেখ।'

গোরিলাদের পিছনে দেখা গেল দলে দলে শত শত গোমানগানি এগিয়ে আসছে। গোরিলারা দরজা দিয়ে ঢুকল আর নিগ্রোরাও জানলা দিয়ে হুড়মুড় করে এসে পড়ল। তাদের দেখে একজন এসে বোলগানি হুকুম দিল, 'মঞ্চের লোকগুলোকে মারো।'

উত্তরে তার বুকেই একটা বর্শা এসে বিঁধল। ব্যস, লড়াই শুরু হয়ে গেল। তখনো প্রাসাদে বোলগানিরা সংখ্যায় বেশি ছিল, কিন্তু সভাঘরের ভিতরটা টারজানদের দখলে। টারজান বুড়োকে বলল, 'আমি পুবের ফটক খুলে রেখেছি। সেই পথে কয়েকজন বাইরে গিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে খবর দিয়ে, লোক জড়ো করে আনতে পারবে না?'

বুড়োও এ প্রস্তাব সমর্থন করল। বলল, 'গাঁয়ের মোড়লদের পাঠালে, লোকরা ওদের কথা শুনবে।'

তাই পাঠানো হল। যাবার সময় ফটকের তালা ভেঙে দিতে বলা হল। যাতে বোলগানিরা তালা-বন্ধ করে ওদের ঢোকার অসুবিধা না করে। ঠিক হলো বাইরের সাহায্যকারীরা একসঙ্গে দল বেঁধে আসবে।

এরপর সংখ্যাগুরু বোলগানিরা একসঙ্গে আক্রমণ করে সভাঘর দখল করার চেষ্টা করেছিল। দাসত্ব করে করে গোমানগানিদের পৌরুষ বলে বিশেষ কিছু বাকি ছিল না। তারা অমনি ঘাবড়ে গেছিল। টারজান আর জাদবালজা সে বিপদ ঠেকাল। বোলগানিদের মধ্যে যারা ঘরে ঢুকেছিল তাদের মাত্র পনেরো জন বেঁচে রইল। টারজান সিংহটাকে ডেকে নিয়ে, একজন বোলগানিকে বলল, 'যাও, তোমার বন্ধুদের আত্মসমর্পণ করতে বল।'

বুড়ো বলল, 'সে ওরা কখনোই করবে না। কোনো চালাকি করবে।'

টারজান বলল, 'তা জানি। একটু সময় নেবার চেষ্টা করছি। যেগুলো এ ঘরে আছে, তাদের কোথাও বন্ধ করে রাখা যায় না?'

একটা দরজা দেখিয়ে বুড়ো বলল, 'ঐ তো একটা ছোটো ঘর। আরো অনেক আছে।'

ঐ ঘরে তাদের বন্ধ করা হল। বাইরের করিডরে অন্য বোলগানিরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছে শোনা যাচ্ছিল। একটু পরেই সেই বোলগানি ফিরে এল। ওরা আত্মসমর্পণ করবে না।

তাকে আরেকবার পাঠানো হল। সত্যিকার সম্রাট এসেছে, এখন মিছিমিছি শত্রুতা করলে, ওদেরি সর্বনাশ হবে। আত্মসমর্পণ করাই ভালো। খানিকটা খুব তর্কবিতর্ক শোনা গেল।

বুড়ো বলল, 'কি ফন্দী আঁটছে কে জানে। যেমনি ধূর্ত, তেমনি নিষ্ঠুর ওরা।'

এদিকে ঘরের মধ্যেকার গোমানগানিরা ক্রমে ঘাবড়ে যাচ্ছিল। লা-ও বলতে শুরু করেছিল, 'গাঁয়ে খবর দিতে ত্রিশজন যদি নিরাপদে চলে যেতে পারে, আমরাই বা যেতে পারব না কেন?'

বুড়ো বলল, 'এই সময়ে আমাদের দলবল এসে গেলে বাঁচা যেত।'

লা চলে যাবার কথা বলতেই টারজান বলল, 'তা হয় না। প্রথমতঃ আমরা বেরোলেই এরা আমাদের ঘিরে ফেলবে। দ্বিতীয় কারণ, এদের শিক্ষা না দিলে, এখানে কেউ নিরাপদে বাস করতে পারবে না। শেষ কারণ, চেয়ে দেখো চারদিকের বাগানের ঝোপঝাপের পিছনে ওরা লুকিয়ে আছে। ওরা চায় যে আমরা এই আশ্রয় থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

বুড়ো পরদার ফাঁক দিয়ে দেখল ঘর থেকে বেরোবার প্রত্যেকটা পথ বোলগানিরা আগলাচ্ছে। 'ওরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে।'

টারজান বলল, 'সে যাই হোক, একটা জোর লড়াই দেওয়া যাবে।'

ঠিক এই সময়, ছাদের ছোটো ছোটো ঘুলঘুলির ঢাকনি তুলে বোলগানিরা তেলে ডোবানো ন্যাকড়াতে আগুন ধরিয়ে ছাগলের চামড়ায় জড়িয়ে ঘরে ফেলতে লাগল। সে কি ধোঁয়া আর দুর্গন্ধ!

এদিকে ফ্লরা আর তার দুষ্কৃতকারীদের দল ছেড়ে পাপিষ্ঠ এস্টেবান ওয়াজার সঙ্গে ঝরনার ধারে গিয়ে সোনা তুলে,

নিয়ে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রেখে, ঠিক করল, আর দলে ফিরে গিয়ে কাজ নেই, অন্য পথে সমুদ্রতীরে গিয়ে লোকজন জোগাড় করে, সোনাগুলোকে নিয়ে পালাবে। এই ভেবে ওদের ঐ পাঁচজন লোক নিয়ে সে রাতের মতো নদীর ধারেই ক্যাম্প করল।

এস্টেবান বলেছিল অতদূর থেকে লোক না এনে, এখানকার গাঁ থেকেই নেওয়া যাক না। ওয়াজা আপত্তি করল, কারণ এরা কুলি নয়, অতটা নিয়ে যেতে পারবে না। বড় জোর এর পরের গাঁ অবধি পারবে।

এস্টেবান বলল, 'সেখান থেকে আরেক দল নেব।'

ওয়াজা বলল, 'প্রত্যেককে টাকা দিয়ে বিদায় করতে হবে। আমরা টাকা কোথায় পাব?'

তখন এস্টেবানের মনে পড়ল, ফ্লরার দল দেশে ফেরার পথে রওনা হবার আগে, কিছু করা নিরাপদ নয়। বরং একটা বাট বেচে, সেই টাকা দিয়ে দফায় দফায় কুলি ভাড়া করা যাবে।

ওয়াজা বলল, 'সেই ভালো। কাল সকালে তাহলে ঝোপের ভিতর থেকে একটা বাট খুঁড়ে আনা যাবে।'

তাই করা হল। সেখান থেকে চলে আসার আগে এস্টেবান ওর পরণে চিতা বাঘের ছালের ভিতরে ইঁদুরের রক্ত দিয়ে জায়গাটার একটা নক্সা এঁকে নিল। যাতে ওয়াজাকে বাদ দিয়ে, সোনাটা নিজেই খুঁজে পায়।

বাপের অসুখের খবর পেয়ে জেন ক্লেটন লণ্ডনে যাবে বলে বন্দরে পৌঁছে, নতুন খবর পেল বাবা ভালো আছেন, ওর যাবার দরকার নেই। জেন তখনি ফিরে এসে শুনল টারজান ওপার থেকে তখনো ফেরেনি। কোরাক মহা উদ্বিগ্ন, যদিও মুখে কিছু বলছে না। জেনের বড় ভয় টারজান যদি আবার কোনো দুর্ঘটনায় স্মৃতিশক্তি হারিয়ে থাকে। দুদিন পরে ওয়াজিরিরা ফিরে এসে বলল যে ঠিক তাই হয়েছে। জেন তখন ঠিক করল ঐ ওয়াজিরিদের নিয়ে ও যাবে তাকে খুঁজে আনতে। কোরাক অনেক বোঝাল, জেন কোন কথাই শুনল না। এ সময়ে মেরিয়েম কাছে থাকলেও হত।

জেন বলল, 'সকলে একসঙ্গে চলে গেলে তো হবে না, বাবা, তুমি থাক। আমি এদের সঙ্গে নিরাপদেই যাব আর আসব।'

অগত্যা কি আর করা, সেই ব্যবস্থাই হল।

যখন এস্টেবান আর ওয়াজা দলের কাছে ফিরল না, অন্যরা গোড়ায় চটে গেছিল, পরে তাদের ভাবনা হল ওয়াজির যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে হাতির দাঁতের ব্যবসার কি হবে? অন্য বাহকরা বলল, 'কিছু হয়নি, স্রেফ ভেগেছে।'

ওয়াজার জায়গায় লুবিনি কাজ করছিল। সে বলল, 'ওরা নিশ্চয় আর সকলকে বাদ দিয়ে হাতির দাঁতের চেষ্টায় গেছে।'

এরা বলল 'শুধু দুজনে কি করে আরব দস্যুদের ঠেকাবে?'

লুবিনি বলল, 'আরবদের কালো ক্রীতদাসদের ক্ষেপিয়ে দেবে। তারপর দস্যুরাও যখন দেখবে এ দলে স্বয়ং টারজান আছে, তারা ভয়ে পালাবে।

ক্রাস্কি বলল, 'তা হতে পারে। কিন্তু তুমি আমাদের আরবদের ক্যাম্পে নিয়ে যেতে পার না?'

লুবিনি বলল, 'তা পারি।'

তখন ক্রাস্কি একটা মৎলব ভাঁজল। দস্যুদের কাছে একজন চর পাঠানো যাক। সে ওদের জানিয়ে দিক যে এস্টেবান মোটেই টারজান নয়। ওরা যেন ওদের বন্দী করে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। তারপর আমরা পৌঁছলে আরবদের সঙ্গে কারবার করা যাবে।'

এরপর খুব তর্কাতর্কি লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত ফ্লরা বলল, 'বেশ আমরা সবাই খুব ভালো। তাই নিয়ে কথা নয়। আরবদের কাছে যাওয়া হবে কি হবে না, বল।'

ক্রাস্কি বলল, 'নিগ্রোরা সঙ্গে যাবে তো?'

লুবিনি জানাল, হাতির দাঁতের ভাগ পেলে সবাই যাবে। শেষ পর্যন্ত যাওয়াই স্থির হল।

সাত দিন পরে ওরা আরব ক্যাম্পে পৌঁছল। চরের মুখে শুনে আরবরাও ওদের আশায় বসে ছিল। ওয়াজা বা এস্টেবান সেখানেও যায়নি, ধারে কাছেও কেউ তাদের দেখেনি। আরবদের মনে ঘোর সন্দেহ, এরা চালাকি করে ওদের আস্তানায় ঢোকেনি তো?

ওয়াজিরিদের সঙ্গে জেন ক্লেটনও তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছিল। ওয়াজিরিরা তখনো এস্টেবানকেই টারজান মনে করছিল। তার পায়ের চিহ্ন দেখে এগিয়ে যাওয়া খুব শক্ত ছিল না। ফলে ফ্লরারা আরব ঘাঁটিতে পৌঁছবার পর সাত দিনের মধ্যেই জেনরাও সেখানে পৌঁছল। ফ্লরারা তখনো ওয়াজা আর এস্টেবানের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা না এলেও, যদি একটা ভালো সুযোগ মেলে তাহলে

আরবদের মেরে ফেলাও যেতে পারে।

লুবিনিরা ক্রীতদাসদের ক্রমে ক্ষেপিয়ে তুলছিল। লুবিনি বড়ই বিশ্বাসঘাতক। তার গোপন মতলব হলো শুধু আরবদের নয়, শ্বেতাঙ্গগুলোকেও মেরে ফেলতে হবে। খালি ফ্লরাকে হয় নিজের কাছে রাখবে, নয় তো অনেক দামে বেচে দেবে।

একটা ফ্যাকড়া না উঠলে এ মতলব হয় তো কাজেও পরিণত হত। কিন্তু যে-ছোকরা ফ্লরার কাজ করত, সে ফ্লরাকে বড়ো ভালোবাসত। তাকে বলা হয়েছিল সাদা-চামড়াদের অস্ত্রশস্ত্র চুরি করে আনতে। সেই রাত্রেই। ফ্লরা যতই লোভী হোক, মনটা ছিল দয়ালু। ছেলেটার সঙ্গে বড়ো ভালো ব্যবহার করত। তাই সে এসে সব কথা ওকে বলে দিল। ফ্লরা হয়তো চ্যাঁচামেচি করে একটা কাণ্ড বাধাত, ছেলেটা বাধা দিল। 'অমন করলে এক্ষুণি তোমাদের লুবিনিরা মেরে ফেলবে। এই ক্যাম্পের সব নিগ্রো তোমাদের শত্রু।'

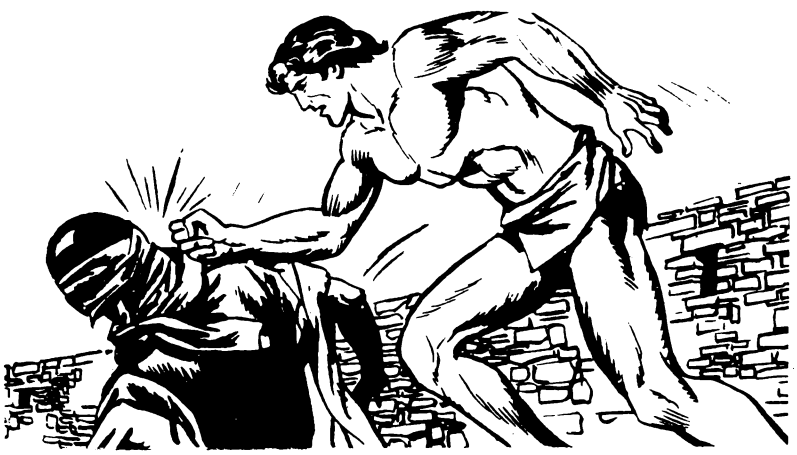

—'তা হলে কি করব?'

—'এক্ষুণি পালিয়ে যাও। আমিও সঙ্গে যাব না, তাহলে ওরা সন্দেহ করবে।'

ছেলেটা তাঁবুর পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলে, ফ্লরা ক্রাস্কির তাঁবুতে গিয়ে সব কথা বলল। বাকিদের ডেকে ব্যাপারটা জানানো হল।

দলের সকলে ক্ষেপে গেল। 'কালোগুলোকে এক্ষুণি নিশ্চিহ্ন করে দেবো!'

ফ্লরা বলল, 'নিজেরাও তাই হবে। আরবরা আমাদের কিচ্ছু ভালোবাসে না। সবাই আমাদের শত্রু। তবে আমরা আরবদের আগে মেরে ফেলব। কালোরা তারপর আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে, আমাদের মেরে ফেলবে। এই হলো ওদের মতলব।'

ঠিক এই সময়ে লুবিনি এসে বলল, 'সব ঠিক, বোয়ানা। খাবার পরেই তৈরি থেকো। তারপর একটা গুলির শব্দ শুনলেই আরবদের ওপর গুলি চালিও।'

ক্রাস্কি বলল, 'বেশ। তবে আমরা গেটের কাছে দাঁড়াব। যাতে ওরা পালাতে না পারে।'

—'ঠিক আছে। কিন্তু তুমি এখানেই থেকো, মিসি। ওখানে বড়ো বিপদ। আমরা অন্য দিক থেকে লড়াই করব।'

ফ্লরা বলল, 'বেশ, আমি নিরাপদ জায়গাতে থাকব।'

অন্ধকার হয়ে গেছিল। কয়েকজন নিগ্রোর আর আরবের খাওয়া তখনো শেষ হয়নি, এমন সময় একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। একজন আরব পড়ে গেল। ক্রাস্কি ফ্লরার হাত চেপে ধরে বলল, 'চলো।'

ব্লুবার সবার আগে, তারপর ওরা, শেষে পীবল্‌স আর থ্রক্, সবাই গেটের দিকে চলল। গেটে পৌঁছে, সেখানে না থেমে, সটাং বনে।

ভীষণ যুদ্ধ হলো। মাত্র জনা বারো আরব, পাকা-পোক্ত যোদ্ধা হলেও, তারা হেরে যেতে বাধ্য। সবাই মারা পড়ল। তখন গেটের কাছে গিয়ে লুবিনি দেখল সাদা চামড়ারা পালিয়ে গেছে। কেউ নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অমনি দুশো যোদ্ধা বনে ঢুকে পড়ল। অন্য গাঁয়ে খবর পৌঁছবার আগেই এদের ধরতে হবে।

হলঘর তো ধোঁয়ায় আর দুর্গন্ধে ভরে গেল। নিগ্রোদের কি ভয়। টারজানকে খালি বলে 'আমাদের বাঁচাও।'

টারজান বলল, 'আরেকটু ধোঁয়া হক। তাহলে আমাদের চলাফেরা ওরা দেখতে পাবে না। তখন দেখা যাবে।'

বুড়ো বলল, 'আমার একটা ভালো প্রস্তাব আছে। ধোঁয়া বাড়লে, আমার সঙ্গে এসো। মঞ্চের পিছনে একটা দরজা আছে। সেখানে কোনো বোল্‌গানি পাহারা দিচ্ছে না। সেই পথে আমরা চলে যাব।'

—'কোথায় যায় ও পথ?'

—'যেখানে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম, সেই হীরক মিনারের তলায়। সেখান থেকে পুবের ফটক খুব কাছে। ওরা টের পাবার আগেই হয়তো বেরিয়ে যেতে পারব।'

ততক্ষণে ধোঁয়া এত ঘন হয়ে উঠেছিল যে নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু ওরা একেবারে আড়াল হয়ে যায়নি। শেষটা যখন টারজান আর লা দুজনেই বলল 'আর পারা যায় না, এবার যাওয়া যাক ; তখন বুড়োও বলল, 'চল।'

দরজার পিছনে সুড়ঙ্গ। প্রথমে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। দরজা বন্ধ করে ওরা এগিয়ে চলল। বড় অন্ধকার। সুড়ঙ্গের শেষে একটা ভারি দরজা। বুড়ো সেটাও খুলে ফেলল। সবাই ঢুকলে বুড়ো সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে, একটা প্রদীপ নিয়ে জ্বালাল। ওরা দেখল সবাই একটা বড় চারকোণা ঘরে পৌঁছেছে।

বুড়ো বলল, 'সবাই এসেছে তো? দরজাটা ভালো করে বন্ধ করা যাক। এবার একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাব।' বলে ঘরের উল্টো দিকে সারি সারি তাক দেখাল, একটার ওপর একটা। তাতে চামড়ার থলি সাজানো। একটা থলি খুলতেই দেখা গেল হীরে দিয়ে ভরতি।

বুড়ো বলল, 'যুগ যুগ ধরে এগুলো জমা হয়েছে। এদের ধারণা অ্যাটলান্টিসের লোকরা আবার আসবে। ওদের কাছে এগুলো অনেক টাকায় বিক্রি হবে। তোমরা এই থলিগুলো নাও।'

একটা লা-কে, একটা টারজানকে দিয়ে দিল বুড়ো।

তারপর নিজেও একটা নিয়ে বলল, 'এখান থেকে জ্যান্ত বেরোব মনে হয় না। তবু বলা তো যায় না।'

ঐ ঘর থেকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে, দুটো ভারি দরজা খুললেই ওরা বাইরে বেরোতে পারবে।

বুড়োকে টারজান বলল, 'সবাই আসুক। গোমানগানি-দের সিঁড়ি উঠতে সময় লাগে। তারপর তুমি আর লা জনা বারো লোক নিয়ে গেটের দিকে দৌড়ও। আমরা পিছন পিছন আসছি। যদি বোল্‌গানিরা পিছু নেয়, তাদের ঠেকাতে হবে।'

কিন্তু দেখা গেল তারা তখনো কিছু টের পায় নি। সবাই পুবের ফটকের বাইরে এল, সবার শেষে জাদবালজা আর টারজান।

এই সময় গোরিলাদের চিৎকার শোনা গেলো। তারা এতক্ষণে টের পেয়েছে। টারজান অন্যদের বলল, 'এবার তোমরা দৌড়ে যাও। সোজা ওপারের দিকে, লা। আমি গোমানগানিদের নিয়ে একটু পরে যাবো। এদের আগে সাজা দিতে হবে।' লা যেতে রাজি হলো না।

টারজান বলল, 'ওরা এসে পড়েছে।'

গেটের কাছে পঞ্চাশ জন যোদ্ধা নিয়ে টারজান দাঁড়াল। গোরিলারা কয়েক শো। বুড়ো বলল, 'পালানই ভালো। ওরা তেড়ে এলেই গোমানগানিরা ভাগবে।'

—'পালিয়ে কোন লাভ হবে না। গোমানগানিদের কাছে যেটুকু সুবিধা করেছি, তাও হারাবো। আমাদের দিকে কেউ থাকবে না।'

এ-কথা বলতে না বলতেই, একজন গোমানগানি চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখ! দেখ! ওরা এসে পড়েছে!'

টারজান চেয়ে দেখল বন থেকে পিলপিল করে দলে দলে গোমানগানি পুবের ফটকের দিকে ছুটে আসছে।

—'এসো! এসো! বোলগানিরা আমাদের ওপর এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। এসো, প্রতিশোধ নাও!' এই বলে দলবল ডেকে বোলগানিদের ওপর টারজান ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঢেউয়ের মতো তারা এসে বোলগানিদের সারির ওপর ভেঙে পড়ল। এই হট্টগোলে জাদবালজা এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, পারলে নির্বিচারে শত্রু-মিত্রকে ছিঁড়ে ফেলে! তাকে আগলাতেই টারজানকে এত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল যে লড়াইতে খুব একটা যোগ দিতে পারছিল না। গোমানগানিরাও কম যায় না। বহু যুগের বহু অত্যাচারের স্মৃতি নিয়ে তারাও জাদবালজার মতোই হিংস্রভাবে লড়ছিল যতক্ষণ না সমস্ত বোল্‌গানি মরল, তার আগে থামল না।

লড়াই থামলে টারজান, লা আর বুড়ো সভাঘরে ফিরে গেল। সেখানকার ধোঁয়া ততক্ষণে উবে গেছিল। সেইঘরে সমস্ত গ্রামের মোড়লদের ডাকল টারজান। তাদের বলল, 'বন্ধুরা, আজ রাতে বীরের মতো লড়াই করে তোমাদের অত্যাচারী প্রভুদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছ। যুগ যুগ ধরে তোমরা দাসত্ব করেছ, তাই গোমানগানিদের মধ্যে দলপতি হবার যোগ্য কেউ এখন নেই। একজন ভালো বিদেশী কাউকে দলপতি করে, সুখে শান্তিতে থাকো।'

সঙ্গে সঙ্গে মোড়লরা একবাক্যে বলল, 'তোমাকে, তোমাকে চাই।'

টারজান হাত তুলে ওদের থামিয়ে দিল, 'না তা হবার নয়। এখানেই আরেকজন বিদেশী আছে। সে তোমাদের খুব ভাল করে চেনে, কখন কি দরকার সব বোঝে। সে-ই তোমাদের যোগ্য রাজা।' এই বলে বুড়োকে দেখিয়ে দিল।

বুড়ো তো অবাক! 'কিন্তু আমি যে সভ্য জগতে ফিরে যেতে চাই। কতদিনের ছাড়াছাড়ি!'

টারজান বুঝিয়ে বলল, 'এত দিন পরে সেখানে তুমি খালি দুঃখ পাবে। কেউ তোমাকে চিনবে না, তুমিও কাউকে চিনবে না। সব বদলে গেছে। কপটতা, লোভ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা—এই সবের দিন এসেছে। আমি তো টিকতে না পেরে, এই বনজঙ্গলে চলে এসেছি। বরং এদের সাহস দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, মানুষ করে তুলতে পারলে, এরা একটা সৎ, সদয়, পরিশ্রমী জাত হয়ে উঠতে পারবে। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, যুদ্ধবিদ্যা সব শেখাতে হবে।'

বুড়ো বলল, 'সেই ভালো। তুমি ঠিকই বলেছ, টারজান।'

মোড়লরাও বলল, টারজানকে না পেলে এই জ্ঞানী আর দয়ালু লোকটিকেই চায় তারা। এ কখনো কারো সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে না।

যে ক'জন বোলগানি প্রাসাদের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে প্রাণে বেঁচেছিল, তাদের খুঁজে বের করে এনে টারজান বলল, 'তোমরা এখানে ক্রীতদাস হয়েও থাকতে পার, নয়তো বিদেশে চলে যাও।'

একজন বোলগানি বলল, 'কোথায় যাব? এদেশের বাইরে ওপার ছাড়া কিছু আছে বলেও জানি না। আর ওপারের বাসিন্দারা তো আমাদের শত্রু মনে করে।

টারজান বলল, 'তোমরা মোট শ-খানেক আছ। তোমাদের শরীরে ভীষণ শক্তি, নিশ্চয় সাংঘাতিক যোদ্ধাও হয়ে উঠতে পার। আমার পাশে যাকে দেখছ, সে হল ওপারের প্রধানা পূজারিণী, লা। কয়েকজন পুরোহিত চক্রান্ত করে ওকে দেশ থেকে তাড়িয়ে, নিজেরা ক্ষমতা দখল করেছে। কাল আমি সবচেয়ে সাহসী গোমানগানিদের নিয়ে ঐ দেশ উদ্ধার করতে যাব। প্রধান পুরোহিত কাদিজকে সাজা দেব। যারা বিশ্বসঘাতকতা করে রানীকে একবার তাড়িয়েছে, তারা পরে সুবিধা পেলে আবার তাড়াতে চেষ্টা করতে পারে। তাই লা-র একদল বিশ্বাসী রক্ষী দরকার। সেখানে গেলে থাকবার জায়গা, কাজের সুযোগ, সবই পাবে। প্রথমে যুদ্ধ হবেই। তারপর লা-র দেহরক্ষী হয়ে তোমরা ভিতরের আর বাইরের শত্রুদের কাছ থেকে তাকে রক্ষা করবে। রাজি আছ?'

তারা রাজি ছিল। লা-ও খুশি হয়ে তাদের গ্রহণ করল। পরদিন সকালে তিন হাজার গোমানগানি আর একশো বোলগানি নিয়ে লা আর টারজান, কাদিজকে শিক্ষা দিতে চলল। মানু বাঁদর দূর থেকে ওদের দেখে বেজায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। কাদিজ মন্দিরের অন্দরে বলিদান সেরেছিল। ওয়াজের কি রাগ! 'ও কাজ করার অধিকার প্রধানা পূজারিণী ছাড়া আর কারো নেই।'

কাদিজও রেগে গেল, 'চুপ কর। আমি হলাম ওপারের রাজা এবং প্রধান পুরোহিত। তুমি প্রধানা পূজারিণী হয়েছ আমারই দয়ায়। বেশি বাড়াবাড়ি কর না। নয়তো পবিত্র খাঁড়ার ধার টের পাবে।'

সাধারণ লোকদের কাদিজ বুঝিয়েছিল যে লা মারা গেছে, ওয়াজকে তার জায়গায় রানী করা হল। রানীকে অসম্মান করাতে, তারা কেউ খুশি হল না।

একজন পুরোহিত বলল, 'সাবধান, কাদিজ। তুমিও সীমা ছাড়িয়ে যেতে পার না।'

—'কি! আমাকে ভয় দেখাচ্ছ নাকি? আস্পর্ধা তো কম নয়!'

এর মধ্যে মানু এসে চ্যাঁচাতে লাগল, 'বোলগানি! বোলগানিরা আসছে!'

—'কজন আসছে? কত কাছে তারা?'

—'গাছের যত পাতা তত জন। পাঁচিলের কাছে এসে পড়ল বলে! সঙ্গে অনেক গোমানগানি!'

এ-কথা শুনে তিনবার বিশ্রী যুদ্ধের ডাক দিয়ে কাদিজ সামনের দিকে এগোল। মোটা মোটা মুগুর আর ছোরা নিয়ে মন্দিরের সব দরজা দিয়ে পুরোহিতরাও বেরিয়ে এল।

বাঁদররা বলতে লাগল, 'এদিক দিয়ে নয়। ঐ দিক থেকে আসছে ওরা।'

বলে দক্ষিণ দিক দেখিয়ে দিল। ছত্রভঙ্গ হয়ে হুড়মুড় করে সকলে কাদিজের সঙ্গে আবার প্রাসাদের উল্টো দিকে চলল। সেখানকার উঁচু উঁচু দেয়ালে সবাই চড়ে বসল। সেই সময় টারজান তার সৈন্য নিয়ে সেখানে পৌঁছল।

কাদিজ চ্যাঁচাতে লাগল, 'ঢিল চাই! ঢিল চাই!'

নিচের উঠোন থেকে মেয়েরা ভাঙা দেওয়ালের টুকরো ছুঁড়ে দিতে লাগল।

কাদিজ আক্রমণকারীদের চেঁচিয়ে বলল, 'চলে যাও! আমি কাদিজ, আগুনদেবতার প্রধান পুরোহিত। এ জায়গা অপবিত্র কর না। নয়তো উনি রেগে যাবেন।'

টারজান এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তোমাদের প্রধানা পূজারিণী লা এসেছেন। কাদিজ বিশ্বাসঘাতক, ওর কোনো অধিকার নেই। ফটক খুলে রানীকে অভ্যর্থনা জানাও। বিশ্বাসঘাতকদের ন্যায্য সাজা হোক। তাহলে তোমাদের

কোনো বিপদ হবে না। নইলে জোর করে ঢুকে আমরা লা-র ন্যায্য অধিকার আদায় করব।'

এই সময় লা এগিয়ে এল। কিছু লোক ওর পক্ষে, কিছু বিরুদ্ধে হাঁক দিল। কাদিজ ভাবল দেরি করলে সব পণ্ড হবে! এই ভেবে আক্রমণের আদেশ দিয়ে নিজে টারজানের দিকে একটা পাথর ছুঁড়ল। টারজান সরে যাওয়াতে, পাথরটা একজন গোমানগানির বুকে লাগল। সে পড়ে গেল।

এবার টারজান আক্রমণের আদেশ দিল। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে গোরিলা আর গোমানগানি পাঁচিলের দিকে ছুটে গেল। টারজান সবার আগে পাঁচিলের ওপর চড়ল, ওর লক্ষ্য কাদিজের দিকে। একজন লোমশ পুরোহিত ওর দিকে মুগুর বাগাতেই, টারজান সেটা কেড়ে নিয়ে দেখল কাদিজ পাঁচিল থেকে নেমে উঠোনের দিকে ছুটছে। টারজানকে দুজন পুরোহিত বাধা দিতেই, মুগুরের বাড়ি দিয়ে তাদের হটিয়ে, এক লাফে কাদিজের পিছনে ছুটল। কাদিজ উল্টো দিকের একটা খিলানের তলা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল। ওকে ছাড়া নয়, ও-ই নষ্টের গোড়া।

কয়েকজন পুরোহিত আর পূজারিণী পথ আগলাল। একজনকে তুলে নিয়ে, তাকে দিয়ে ঝেঁটিয়ে বাকিদের সরিয়ে দিল টারজান। আবার ছুটল কাদিজের পিছনে। কাদিজ সব গলিঘুঁজি চেনে, তাকে চোখের আড়াল করা যায় না। সে মন্দিরের ভিতর দিকে ছুটেছিল। মাটির নিচের ঘরগুলোতে নামতে পারলে, তাকে খুঁজে পাওয়া দায় হবে। কিন্তু যেখানে বলিদান হত, তার কাছে পৌঁছতেই টারজানের পা একটা দড়ির ফাঁদে পড়াতে, সে আছাড় খেয়ে প্রায় অজ্ঞান। সেই সুযোগে ওরা ওকে বেঁধে ফেলল।

আহ্লাদে গদগদ হয়ে কাদিজ এগিয়ে এল। জ্ঞান ফিরতেই টারজান দেখল সে বলির বেদীতে শুয়ে আছে।

কাদিজ বলল, 'এবার, তোমার রক্ষা নেই! কেউ বাধা দিতে পারবে না।' এই বলে যেমনি খাঁড়া তুলেছে, উঠোনের দেয়ালের ওপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড কালো মাথাও দেখা দিয়েছে!

টারজান চিৎকার করে বলল, 'জাদবালজা! মারো! মারো!' একলাফে সোনার সিংহবেদীর কাছে পৌঁছে কাদিজের মুণ্ডু কামড়ে ধরল। ঐখানেই শেষ! পুরোহিতরা মজা দেখতে এসেছিল। তারা যে যেদিকে পারে পালাল!

টারজান জাদবালজাকে ডাকল, 'দেখো কেউ যেন টারজানের ক্ষতি না করে।'

এক ঘণ্টার মধ্যে লা-র বিজয়ী সৈন্যদল সমস্ত প্রাসাদ আর মন্দির দখল করে ফেলল। যারা বেঁচে ছিল, তারা লা-কে রানী বলে অভিনন্দন করল। তারপর সকলে টারজানের আর কাদিজের খোঁজে ঐখানে পৌঁছে ঐ দৃশ্য দেখতে পেল। লা সবটা লক্ষ্য করেনি।

টারজানকে বলির বেদীতে পড়ে থাকতে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'হায়! হায়! তাহলে শেষ পর্যন্ত কাদিজ যা চায় তাই হোল। টারজান মরল!'

টারজান বলল, 'না মোটেই মরিনি। তবে জাদবালজা না এলে, মরতাম। তুমি আমার বাঁধন কেটে দাও।'

লা দেবতাকে ধন্যবাদ দিয়ে, খাঁড়া হাতে এগোতেই সোনালী সিংহ গুরগুর করে উঠল।

টারজান বলল, 'বস! ওকে আসতে দাও!'

জাদবালজা বসল। লা বাঁধন কেটে দিল।

টারজান বলল, 'তোমার শত্রু নিধন হয়েছে। এবার সুখে-শান্তিতে রাজত্ব কর। হীরের দেশের সঙ্গে সদ্ভাব রেখো।'

সে রাতে সকলে মিলে ভোজসভায় যোগ দিয়ে পরদিন টারজান আর সিংহ রওনা হলো।

*

ফ্লরা হক্‌স্ আর তার চার সাঙাৎ আরবদের ক্যাম্প থেকে পালিয়ে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে চলেছিল। ঘুটঘুটে অন্ধকার, পথ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এতদিন গাইডদের ওপর নির্ভর করে এসেছে। পিছন থেকে শব্দ শুনলেই মনে হচ্ছিল লুবিনির লোকরা ধাওয়া করেছে! কোনো মতে সামনের দিকে লক্ষ্যহীন ভাবে ছুটেছিল। এমন সময় দেখে একটা ছোট কাঁটার বোমা, তার মধ্যে ধুনি জ্বলছে আর একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিছন থেকে ধাওয়াকারীদের হাঁকডাক আরো স্পষ্ট হল। ক্যাম্পের মেয়েটির সঙ্গে কালো অনুচরও ছিল।

ওরা আরেকটু এগোতেই ওয়াজিরিরা ওদের দেখতে পেয়ে ডাকল, 'দাঁড়াও, আমরা টারজানের ওয়াজিরি। তোমরা কে?'

ফ্লরা বলল, 'আমি ইংরেজ। এরা আমার সাফারির লোক, গাইডরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ঐ শোন তাদের পাণ্ডা আমাদের পিছু নিয়েছে!'

তখন ওয়াজিরিরা ওদের ডেকে নিল। ফ্লরাকে দেখেই

জেন বলল, 'এ কি ফ্লরা !'

সে-ও অবাক, 'লেডি গ্রেস্টোক !'

—'ফ্লরা, তুমি এদেশে এসেছ তা তো জানতাম না।

ফ্লরা বলল, 'মিঃ ব্লুবাররা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে এসেছেন। আমি সঙ্গে এলাম, কারণ আপনাদের সঙ্গে আগেও এসেছি, এখানকার হালচাল বুঝি। তবে লোকজনরা বিশ্বাসঘাতকতা করাতে আমরা অকূল পাথারে পড়েছি।

জেন বলল, 'শত্রুরা যদি পশ্চিম উপকূলের লোক হয়, আমার ওয়াজিরিরা ওদের সামলাতে পারবে। ক'জন আছে ?

—'তা শ-দুই হবে।'

ওদের সে-কথা বলতেই উস্থলা বলল, 'আমরা ওয়াজিরি !'

লুবিনির দল কাছে এসে যেই দেখল দলে এরা ওদের মতো ভারি নয়, অমনি সে কি লাফঝাঁপ, তড়পানি, বোলচাল, টিটকিরি। অধিকাংশ আফ্রিকান যোদ্ধারা তাই করে। ওয়াজিরিদের টারজানের কাছে অন্য রকম শিক্ষা।

জেন বলল, 'ওদের কাছে অনেকগুলো বন্দুক আছে।'

ক্রাস্কি বলল, 'তা থাকলেও, জনা ছয়ের বেশি ঠিক জায়গায় গুলি মারতে পারে না।'

জেন বলল, 'পুরুষদের সকলের বন্দুক আছে, তোমরা ওয়াজিরিদের সঙ্গে দাঁড়াও। যেই ওরা লড়াই শুরু করবে, সবাই গুলি ছুঁড়বে। থামবে না, ছুঁড়েই যাবে। ওরা সেটাকে বড় ভয় করে। ফ্লরা আর আমি তাঁবুতে থাকব।'

লুবিনি সব দেখতে পেল। বুঝলও। দলের লোকদের বলল, 'আমরা কারো সঙ্গে লড়াই করতে আসিনি। খালি ঐ মেয়েটাকে নিয়ে যেতে চাই। তোমরা এদিকে খুব হাঁক-ডাক কর। আমি পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে পিছন দিক দিয়ে ঢুকে, মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যাই।'

গাছের ওপর থেকে আরেকজন ওসব দেখল ! লুবিনির মৎলবটা সকলেরি পছন্দ, যুদ্ধে তাদের রুচি নেই। লুবিনি তো ঝোপের আড়াল দিয়ে ঘুরে চলল। এমন সময় গাছ থেকে মেয়েদের দুজনের সামনে ঝুপ্ করে একটা বিশাল দেহ প্রায়-উলঙ্গ লোক নামল। জেন তো অবাক !

—'জন ! ভাগ্যিস তুমি এলে !'

সে-লোকটা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'শ্ শ্', তারপর ফ্লরাকে বলল, 'তোমাকে নিতে এসেছি।' এই বলে তাকে কাঁধে ফেলে, এক লাফে বোমা ডিঙিয়ে বনে পালাল। জেন কান্নায় ভেঙে পড়ল। একটু পরেই লুবিনি আর তার যোদ্ধারা ওকে দেখে, নোংরা হাতে মুখ চেপে ধরে টানতে টানতে টানতে জঙ্গলে নিয়ে গেল।

সাদা মেয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই তো সাদা মেয়ে। তাকে ওরা আরবদের শূন্য আস্তানায় নিয়ে চলল। আরো দশ মিনিট পরে, একটাও গুলি বা বর্শা না ছুঁড়েই আক্রমণকারীরাও জঙ্গলে সরে পড়ল। সাদা চামড়ারা আর ওয়াজিরিরা এর মানে বুঝতে পারল না। হঠাৎ ক্রাস্কি বলল, 'ফ্লরা আর লেডি গ্রেস্টোক কোথায় ?'

এতক্ষণে বোঝা গেল, তারা উধাও ! ওয়াজিরিরা পাগলের মতো হয়ে উঠল। বৃথাই তাদের মাই লেডিকে ডাকাডাকি করতে লাগল। তারপর উস্থলা বলল, 'চল। ওয়াজিরিদের শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই করতে হবে।'

পঞ্চাশ জন যোদ্ধা নিয়ে লুবিনির দলকে তারা তাড়া করল। লুবিনি খানিকটা আগে রওনা হওয়াতে সেখানে আগেই পৌঁছেছিল। এরাও এসে পড়ল। সবাই জানত জিতে গেলে ওয়াজিরিরা একজনকেও আস্ত রাখবে না, তাই ক্ষ্যাপার মতো লড়তে লাগল। ফটক বন্ধ হল। উস্থলাও বুঝল পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে এই দুর্গের মতো সুরক্ষিত ঘাঁটিতে ঢোকা অসম্ভব। উস্থলা নানা রকম ভাবতে লাগল।

সঙ্গীদের বলল, 'আমরা শুধু মাই লেডিকে চাই। যুদ্ধ পরে করলেও চলবে।'

একজন বলল, 'এখানেই আছেন, তাই বা কে বলল ?'

—'আর কোথায় থাকতে পারেন ?'

উস্থলা একটা বুদ্ধি করল। 'জনা দশেককে নিয়ে আমি ঘাঁটির পিছন দিক দিয়ে ঢুকে, মাই লেডিকে খুঁজব। বাকিরা ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক দিয়ে এদের বিব্রত রাখবে। যতদূর মনে হয় কিছুক্ষণ বাদে ওরা গেট খুলে পালাবে। তা পালাক, ওদের সঙ্গে আমাদের কি ! আমরা মাই লেডিকে চাই। তাঁকে দেখলেই উদ্ধার করবে, বুঝলে তো ?'

এদিকে লুবিনি জেনকে নিয়ে গেটের কাছেই একটা ঘরের মধ্যে একটা খুঁটিতে আচ্ছা করে বেঁধে রেখে, তাড়াতাড়ি ফটকের কাছে ফিরে গেছিল। জেন দুঃখে ভেঙে পড়েছিল। টারজান তাকে ফেলে ফ্লরাকে নিয়ে গেল ! এ ভাবা যায় না !

ততক্ষণে উস্থলা তার দশজন সঙ্গী নিয়ে পিছনে গিয়ে অনেক শুকনো কাঠ দেখতে পেল। সেগুলোকে তুলে বেড়ার বাইরে ঢিপি করে প্রায় বেড়ার সমান উঁচু করে তুলল।

তখন একটা লোককে ফটকের কাছে পাঠাল, ওখানকার ওয়াজিরিদের খুব হট্টগোল করতে বলতে। তাহলে এদিকে কি কাণ্ড হচ্ছে কেউ শুনতে পাবে না।

ঘণ্টাখানেক লাগল উস্মুলার। ততক্ষণে রাত বেড়েছে, চাঁদ উঠেছে। লুবিনি ওয়াজিরিদের গতিবিধি দেখে ভাবল আজ রাতে কখনো ওরা আক্রমণ করবে না। তাহলে ওরাও একটু ঢিল দিতে পারবে। লোকজনদের সতর্ক থাকতে বলে, সে গেল জেনের কুঁড়ে ঘরটাতে।

এতক্ষণ তার ধারণা ছিল ফ্লরাকেই ধরে এনেছে। এখন অন্য মেয়ে দেখে বলল, 'তুমি কে?'

—'আমি টারজানের স্ত্রী, জেন ক্লেটন। তোমার সুবুদ্ধি থাকলে আমাকে ছেড়ে দেবে।'

অনেকক্ষণ লুবিনি কি ভাবল। তারপর জেনের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিতে লাগল।

গোড়ায় জেনের বড় আশা হয়েছিল। কিন্তু লুবিনির ইচ্ছা যে তাকে নিজের কাছে বন্দী করে রাখে, এটা বুঝতেও দেরি হলো না।

অমনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঘিনীর মতো সে লড়তে লাগল। ফটকের কাছে হট্টগোল হচ্ছিল। অন্য দিক থেকেও একটা সোরগোল শোনা যাচ্ছিল। তার কিছুই জেনের কানে গেল না।

ওদিকে উস্মুলা সেই শুকনো কাঠের ঢিপিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বন থেকে বাতাস বইছিল; সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। সে আগুন ভিতরকার ঘরগুলোর খড়ের চালে ধরে গেল। তারপর উস্মুলা যা বলেছিল ঠিক তাই হল, গেট খুলে কালোরা দলে দলে পালাতে লাগল। কেউ বাধা দিল না।

উস্মুলা যেমন বলেছিল, ওরা মাই লেডিকে খুঁজছিল। তিনি ওদের সঙ্গে ছিলেন না। জ্বলন্ত গাঁয়ে কারো থাকা সম্ভব ছিল না। উস্মুলা পলাতকদের কয়েকজনকে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'লুবিনি কোথায়?'

লুবিনিকে কেউ দেখেনি। গাঁ ছেড়ে অবধি তাকে কেউ দেখেনি। উস্মুলা বলল, 'কাল রাতে ওর সঙ্গে দু-জন সাদা-চামড়া মেয়ে ক্যাম্পে আসেনি?'

—'মাত্র একজন এসেছিল।'

—'সে কোথায়?'

—'হাত-পা বেঁধে ফটকের কাছে ওর ঘরে তাকে রেখেছিল।'

গাঁয়ে ফিরে গিয়ে ভালো করে খুঁজে দেখল উস্মুলা। কতকগুলো ধূমায়মান ছাইগাদা ছাড়া গ্রামের কিছু বাকি ছিল না। লুবিনির ঘরের ধ্বংসাবশেষে একটা পোড়া দেহের চিহ্ন পাওয়া গেল। তাই দেখে উস্মুলা কেঁদে ভাসাল। জেনকে সবাই ভালোবাসত।

একজন ওয়াজিরি বলল, 'সে নয় বোধ হয়। সে হলে তার আংটিগুলো পড়ে থাকত।'

উস্মুলা বলল, 'লুবিনি আংটি নিয়ে চলে গেছে।'

শ্রদ্ধাভরে ওরা ছাইগুলো জড়ো করে সমাধি দিল। ওপরে পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে রাখল।

জাদবালজাকে নিয়ে টারজান ধীরেসুস্থে বাড়ির দিকে চলেছিল। সোনা না পেলেও, হীরেগুলোর তার চেয়েও বেশি দাম। যে বদমায়েসরা ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিল, তাদেরো সাজা দেওয়া হলো না। যাকগে। কোনোদিন বুনো শূওর, কোনো দিন হরিণ মেরে খায় ওরা। বাড়ি পৌঁছতে হয়তো মাত্র এক দিনের পথ বাকি; এমন সময় অনেকগুলো বড় পায়ের ছাপের সঙ্গে একটা ছোটো পায়ের ছাপও দেখতে পেল। সে যে তার জেনের, তা আর বলে দিতে হলো না। টারজান মনে মনে বলল, 'ওয়াজিরিরা আমাকে না পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। তাই শুনে জেন নিশ্চয় আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।'

আবার পায়ের এই নতুন চিহ্ন দেখে চলা। এগুলো ওপারের দিকে না গিয়ে, একটু দক্ষিণ দিকে গিয়েছে। সেদিকে ছয় দিন এগোবার পর পায়ের শব্দ শুনে আর নিগ্রোদের গন্ধ পেয়ে টারজান গাছে চড়ল। একটু পরেই বুঝল এ তার ওয়াজিরিদের গন্ধ! কিন্তু তাদের সঙ্গে জেন নেই। টারজানের সঙ্গে দেখা হতেই উস্মুলা অবাক! টারজান বলল, 'লেডি গ্রেস্টোক কোথায়?'

উস্মুলার মুখে কথা সরে না।

—'কি বলতে চাও? না, না, তা হতেই পারে না। আমার ওয়াজিরিরা থাকতে তার কোনো বিপদ হতে পারে না।'

ওরা ঢাল বর্শা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। উস্মুলা বলল, 'আমাদের মেরে ফেলুন, বোয়ানা!'

—'কি করে এমন হলো?'

সব কথা বলল উস্মুলা।

—'লুবিনি কোথায়?'

—'তা জানি না।'

'কিন্তু আমি জানব। তোমরা ঘরে যাও। আবার যখন দেখা হবে, তোমরা জানবে লুবিনি মরেছে!'

এই বলে লম্বা একটা শিস্ দিতেই জাদবালজা এসে হাজির হলো।

উম্বুলা বলল, 'ও তাহলে এখান থেকে পালিয়ে, তোমার কাছেই গিয়েছিল!'

'হ্যাঁ, অচেনা অজানা জায়গায় গিয়ে খুঁজে বের করেছিল।'

এদিকে পীব্‌ল্‌স্, থ্রক আর ক্রাস্কি সে রাতটা গাছের ওপর বড় কষ্টে কাটিয়েছিল। সকালে মাটিতে নেমে নিজের দামী স্যুটের দুরবস্থা দেখে ব্লুবারের কি দুঃখ! 'ইস্ কুড়ি গিনির জিনিসটাকে এখন বেচলে এক গিনিও পাব না।'

দিক জ্ঞান কারো ছিল না। অনেকক্ষণ পুব দিক মনে করে যেদিকে চলেছিল, সেদিকটা হয়তো পুবই নয়।

ক্রাস্কি বলল, 'এটা পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ। এখানে দিক্ ঠিক করাই শক্ত।' যাই হোক অনেক ভেবেচিন্তে ওরা এগোতে লাগল।

দুপুরে খানিকটা খোলা জায়গা পার হচ্ছে, এমন সময় কোথা থেকে পিং করে একটা তীর ব্লুবারের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। সে ভয়ের চোটে শুয়ে পড়ল। ক্রাস্কি রাইফ্‌ল্ তুলে গুলি করতেই, একটা তীর এসে ওর হাতে বিঁধল। ওরা ঘাসের মধ্যে শুয়ে পড়ে এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়তেই জনা কুড়ি বেঁটে বামুন পিগ্‌মি শিকারী ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। জনা দুই মাটিও নিল। এমন সময় বিশাল এক গাছের ওপর থেকে ইংরেজিতে কে বলল, 'আমি না বললে, গুলি করো না। তাহলে তোমাদের বাঁচাতে পারব।'

ব্লুবার বলল, 'না, না, আর গুলি ছুঁড়বো না।'

তখন একটা শিসের শব্দ শোনা গেল। বেঁটেরা তীর ছোঁড়া বন্ধ করে ছিল বটে, কিন্তু এরা কিছু করছে না দেখে আবার এক ঝাঁক ছুঁড়ল। এমন সময় কালোকেশর বিশাল এক সিংহ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল।

—'ওরে বাবারে!' বলে ব্লুবার চোখমুখ ঢাকল।

বেঁটেরা এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। তারপরেই 'টারজান এসেছে!' বলে বনে পালাল।

তখন এরা চারজন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

টারজান বলল, 'তোমরা কে? এখানে কি করছ? তোমরা আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে, একলা অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে গেছিলে। হিংস্র জানোয়ার কি অসভ্য শত্রুর শিকার হবার জন্য।'

ব্লুবার কাতরভাবে বলল, 'চিনতে পারলে কখনোই অমন করতাম না। আমাদের বাঁচাও, তাহলে তোমাকে টাকা দেবো।'

টারজান অন্যদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমাদের একজন অনুচরকে খুঁজছি। তার নাম লুবিনি। সে আমার স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে।'

—'তা তো আমরা জানি না। আমরা শত্রুদের মোকাবিলা করতে ফটকের কাছে ছিলাম। ঐ সময় লেডি গ্রেস্টোক আর একজন মহিলা ক্যাম্পে ছিলেন। তাঁরা যে কোথায় গেলেন ভেবেই পেলাম না। তোমার ওয়াজিরিরাও এ-কথা জানে।'

—'তা জানি। কিন্তু লুবিনিকে কেউ দেখেছে?'

কেউ দেখেনি। ক্রাস্কি বলল, 'আমরা মিঃ ব্লুবারের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছিলাম। নানা বিপর্যয়ে পড়েছি। লোকজনরা পালিয়ে গেছে।'

—'তোমরা কোথায় যেতে চাও?'

—'বন্দরে গিয়ে লণ্ডনের জাহাজ ধরতে চাই।'

—'এসো আমার সঙ্গে। আমি সম্ভবতঃ ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তোমরা তার কোনো মতেই যোগ্য নও, কিন্তু সাদা-চামড়া হয়ে, বনে পচে মরবে, তা তো হয় না।'

পশ্চিম দিকে চলল ওরা। রাতে নদীর ধারে ক্যাম্প করল। ক্রাস্কি বোমা তৈরির কথা বলেছিল।

টারজান বলল 'তার কোনো দরকার নেই। জাদবালজা তোমাদের পাহারা দেবে।'

রাতে হঠাৎ ক্রাস্কির চোখে পড়ল টারজানের কোমর থেকে কি একটা জিনিস খসে পড়েছে। টারজান সেটা লক্ষ্য করেনি। সবাই ঘুমোলে নিঃশব্দে সেটাকে ক্রাস্কি তার শার্টে ভরে রাখল। কৌতূহলবশতঃ থলি ফাঁক করে ভিতরকার জিনিসগুলো একফাঁকে দেখেও নিয়েছিল। হীরে দেখে সে তো অবাক।

পরদিন সকালে টারজানরা একটা গ্রামে পৌঁছল। সেখানকার মোড়ল মহা সম্মান দেখিয়ে টারজানকে অভ্যর্থনা জানাল। টারজান-ও তার প্রীতি জানিয়ে, বলল, 'এরা আমার বন্ধু। বন্দর থেকে বিলেতের জাহাজ ধরবে। ওরা যাতে নিরাপদে সেখানে পৌঁছায়, তার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?'

লোকটি তার বিশ্বাসী বন্ধু। সে খুসি হয়ে কথা দিল।

আর কোনো কথা না বলে জাদবালজাকে নিয়ে টারজান চলে গেল।

*

ভোরে একটু আলো হতেই ক্রাস্কি উঠে পা টিপে টিপে গাঁয়ের পথে বেরিয়ে পড়ল। মনে যথেষ্ট ভয়, এই রাজার সম্পদ নিয়ে লণ্ডনে ফিরতে পারলে হয়। কিন্তু একবার ফিরলে আর দেখতে হবে না। গ্রাম থেকে বেরিয়ে একেবারে বনে। ওর অনুপস্থিতি ব্লুবারের চোখে সবার আগে পড়েছিল। সে অন্যদের বলতেই, থ্রক বলল, 'যাক গে, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে।'

ব্লুবারের ভয় এ গাঁয়ে ক্রাস্কির কোনো বিপদ হয়ে থাকলে, এর পর তো অন্যদেরও হতে পারে। সে যাই হোক মোড়লকে কোন রকমে বোঝানো গেল যে ক্রাস্কিকে পাওয়া যাচ্ছে না। মোড়ল ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি লাগাল। তারপর দেখা গেল তার পায়ের দাগ গাঁ থেকে বেরিয়ে বনে গিয়ে ঢুকেছে।

ক্রাস্কি চলে গেছে বলে কারো দুঃখ না হলেও, সে কেন গেছে, তাই নিয়ে সকলের ভাবনা। এদিকে কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে, হাতে পিস্তল নিয়ে সে তো চলেছে। যতই যায় মনের মধ্যে বনের ভয় ততই বাড়ে, হীরের দাম কমে। বন্দরে পৌঁছবার আগে কপালে না জানি কি আছে! একটা সাপ দেখে কাঁটা ঝোপে লুকোল, কাপড়চোপড় ছিঁড়ে একাকার। বিষাক্ত লাল পিঁপড়ে গায়ে উঠে কামড়াতে লাগল। হাজার হাজার পিঁপড়ে সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলেছিল। ছেঁড়া শোষাক ছেড়ে জিনিসপত্র ঝেড়ে, খালি গায়ে ছুটতে ছুটতে এক সময় দম ফুরিয়ে গিয়ে ক্রাস্কি শুয়ে পড়ল। খালি গায়ে চলতে হলে সভ্য মানুষের সব সাহস উপে যায়। সে-রাতে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত ক্রাস্কি যখন গাছের ডালে আশ্রয় নিল, তার নিজের ওপর কোনো আস্থা ছিল না। ভোরে আবার হোঁচট খেতে খেতে চলা।

দুপুরে মনে হলো একটু দূর থেকে মানুষের গলা শুনছে। ইউরোপীয় গলা। তারপর দেখে একটা নদী। নদীর ধারে কুঁড়ে ঘর। তার চারদিকে একটা যেমন তেমন করে তৈরি বেড়া। কান খাড়া করে ক্রাস্কি ফ্লরার আর এস্টেবানের গলা চিনতে পারল। খালি গায়ে কি করে ফ্লরার সামনে বেরোয়? বড়ো বড়ো ঘাস হয়েছিল সেখানে, চওড়া পাতা। তাই দিয়ে একটা ঘাঘরা মতো বানিয়ে ক্রাস্কি এস্টেবানের নাম ধরে ডাকল। তারা দুজনে বাইরে এসে ওকে চিনতে পারে না!

—'আমি কার্ল ক্রাস্কি, তুমি আমাকে চেনো ফ্লরা?'

—'এ্যাঁ! কার্ল!'

ফ্লরা এগিয়ে আসছিল, এস্টেবান বাধা দিল।

—'এখানে কি করছ?'

—'বন্দরে যাবার চেষ্টা করছি। না খেয়ে ঠাণ্ডা লেগে মরি আরকি!'

এস্টেবান বলল, 'ঐ দিকে বন্দরের পথ। এখানে সুবিধা হবে না।'

ক্রাস্কি তো অবাক! 'খাবার কিম্বা জল না দিয়েই তাড়িয়ে দেবে?'

—'নদীতে প্রচুর জল পাবে, বনেও প্রচুর খাবার।'

ফ্লরা বলল, 'এ ভাবে কখনো ওকে তাড়িয়ে দিতে হয়? তুমি যেও না, কার্ল। ও কার্ল, এই জানোয়ারটার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।'

ক্রাস্কি বলল, 'তাহলে সরে দাঁড়াও।'

ফ্লরা জোর করে এস্টেবানের হাত ছাড়িয়ে সরে গেল। ক্রাস্কি গুলি করল। এস্টেবানের গায়ে লাগল না। এস্টেবানও আর অপেক্ষা না করে, বর্শা ছুঁড়ল। সে বর্শাটা গিয়ে ক্রাস্কির বুকে বিঁধল। সে মরে পড়ে গেল আর ফ্লরা হায় হায় করে উঠল।

তারপর এস্টেবানকে বলল, 'তুমি একটা বুনো জানোয়ার।'

এস্টেবান বিকটভাবে হেসে উঠল, 'বুনো জানেয়ারই তো! আমি টারজান! ঐ হতভাগা আমাকে এস্টেবান বলে ডাকল কেন? আমি বনমানুষের ছেলে টারজান। যে আমাকে অন্য নামে ডাকবে, আমি তাকেই মেরে ফেলব।'

ফ্লরা স্তম্ভিত। এ যে উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে। বাস্তবিকই, ক্ষেপে গিয়ে এস্টেবানের সত্যি মনে হয়েছিল সে,

টারজান। সেই রকমই দেবতার মতো সুন্দর শরীর, কিন্তু মনটা নীচ, ভীতু।

ফ্লরা বলল, 'সত্যিই তুমি একটা জানোয়ার হয়ে গেছ। আমি তোমাকে ঘৃণা করি!'

এস্টেবান বলল, 'তা করতে পার। তবু তোমাকে ছাড়ছি না। ও ব্যাটার থলিতে কি, সেটা একবার দেখতে হচ্ছে। নিশ্চয় গুলিগোলা।'

এই বলে মৃতদেহের পাশ থেকে টারজানের কাছ থেকে চুরি করা চামড়ার থলিটা খুলে কুঁড়ে ঘরের মেঝেতে ঢালল। বোকা বনে গেল দুজনে। 'হীরে! এত হীরে পেল কোথায়?'

এস্টেবান বলল, 'যেখানেই পাক, এখন এ-সব আমার। যদি লক্ষ্মীমেয়ে হও, তুমিও ভাগ পাবে!'

অমনি ফ্লরার মন বদলে গেল। বড় লোভী সে। এত দিন তার বড় ভয় ছিল এস্টেবান যদি পালায়, তাহলে বনে সে একলা পড়বে। বনকে তার বড় ভয়। এখন মনে হতে লাগল ঘুমন্ত অবস্থায়, কি করে এস্টেবানকে মেরে হীরেগুলো বাগানো যায়।

টারজান সমানে লুবিনিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। যেখানেই পায়ের চিহ্ন দেখে, লুবিনির ছাপ খোঁজে। এতই ব্যস্ত সে যে হীরের থলি কখন কোমর থেকে খসে পড়েছে সে খেয়ালও নেই। পরে দৈবাৎ মনে পড়তে খেয়াল হলো, কোমরে তো থলিটা ঝুলছে না। কে নিল? নিশ্চয় ঐ পাজি সাদা-চামড়াগুলো। অমনি জাদবালজাকে বলল, 'চল লুবিনির সঙ্গে ওদেরো খোঁজা যাক।'

কাজেই পীব্‌ল্‌স্‌, থ্রক আর ব্লুবার কিছুদূর এগিয়ে, দুপুরের খাওয়ার আয়োজন করছে, এমন সময় টারজান এসে হাজির। সঙ্গে সিংহটা। টারজানের অপ্রসন্ন মুখ দেখেই ওদের ভয় হলো। 'কি হলো?'

—'তোমরা আমার পাথরভরা থলি নিয়েছ, সেটা নিতে এসেছি।'

বলা বাহুল্য তারা সকলেই অস্বীকার করল। বলল তাদের খুঁজে দেখতে পারে টারজান।

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'আরেকজন কোথায়?'

—'সে তো সেই প্রথম রাত্রেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেন চলে গেছে এতক্ষণ ভেবে পাইনি, এবার মনে হচ্ছে নিশ্চয় ও-ই তোমার থলি নিয়ে পালিয়েছে!'

টারজান বলল, 'তা হতে পারে। তবু তোমাদের তিন জনকে সার্চ না করে ছাড়ছি না!'

তাই করা হলো। ওদের জিনিসপত্রও ভালো করে দেখা হলো। কিছু পাওয়া গেল না।

আর একটা কথাও না বলে, টারজান রওনা দিল।

পীব্‌ল্‌স্‌ বলল, 'এবার ভগবান ক্রাস্কির সহায় হলে হয়।'

থ্রক বলল, 'এক থলি পাথর নিয়ে এত কি?'

অন্যরা হাসল, 'পাথর না হাতি! ওগুলো হীরে।'

সেই গ্রামে ফিরে গিয়ে, সেখানেও খুঁজে, ক্রাস্কির পায়ের চিহ্ন পেল টারজান। তাই ধরে এগোতে লাগল। সন্ধার একটু আগে নদীর ধারে পৌঁছে দেখে একটা কুঁড়ে ঘর, তার চারদিকে বেড়া, বেড়ার বাইরে ক্রাস্কির মৃতদেহ। হীরের থলির চিহ্নও নেই।

কুঁড়ে ঘর সার্চ করে হীরে না পেলেও একজন মেয়ের একজন পুরুষের পায়ের চিহ্ন পেল। পুরুষের চিহ্নের সঙ্গে গোবুর হত্যাকারীর পায়ের ছাপ মিলে গেল। মেয়েটা আবার কে? জুতোর বদলে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

দু-জনার চিহ্ন দেখে টারজানও বনে ঢুকল। মেয়েটা ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পিছিয়ে পড়ছিল। পুরুষটা তাকে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল।

বাস্তবিকই তাই হয়েছিল। ফ্লরা কাতর স্বরে বলেছিল, 'একটু অপেক্ষা কর, এস্টেবান, এই ভয়ঙ্কর বনে আমাকে একা ফেলে যেও না।'

এস্টেবান বলেছিল, 'তাহলে আমার সঙ্গে এসো। এই বনে এমন রাজার সম্পদ নিয়ে আমি কারো জন্যে অপেক্ষা করতে পারব না।'

কোনো কথাই শোনেনি সে। থলি তুলে বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে আমার কি? এই টাকা দিয়ে পৃথিবীর বড় বড় শহরে কত মজা করতে পারব।' এই বলে সত্যি সত্যি তাকে ফেলে চলে গেল। হতাশায় আর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে ফ্লরা আর দাঁড়াতে পারল না।

সে রাত্রে এস্টেবান একটা মরা নদীর খাতে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে শোবার ব্যবস্থা করল। পাশেই নদীর একটা ক্ষীণ ধারা বয়ে যাচ্ছিল। তার মনে ক্রমশঃ এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে উঠছিল যে সে সত্যি টারজান! অবিশ্যি কাঁচা মাংস খাওয়া অবধি পৌঁছয়নি। তাই ছোট একটা জানোয়ার মেরে, আগুন জ্বেলে, সেটাকে ঝলসে নিল। সুখস্বপ্ন দেখছিল সে। কত সুখে থাকবে, কি সুন্দরী বৌ পাবে। হঠাৎ চোখ খুলে দেখতে পেল, সত্যিই একজন সুন্দর মেয়ে সাদা ধবধবে মিহি কাপড় পরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! এস্টেবান

আঁৎকে উঠল, কি সর্বনাশ ! এ যে ফ্লরার প্রেতাত্মা ! উঠে দাঁড়াল এস্টেবান।

মূর্তিটা মধুর গলায় বলল, 'ওগো সত্যি তুমি ফিরে এসেছ ?'

এস্টেবান দেখল এ ফ্লরাও নয়, ভূত-ও নয়। তবে কে এ ?

মূর্তিটা দু হাত বাড়িয়ে পরম স্নেহে বলল, 'বল না যে আমাকে চিনতে পারছ না ?'

এদিকে টারজানও সেই পুরুষ আর মেয়ের পায়ের চিহ্ন ধরে ঐ বনে এসে পড়েছিল। একজন মেয়েকে মাটিতে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে থাকতে দেখে, টারজান তার কাঁধে হাত রাখল। মেয়েটা আঁতকে উঠল ! টারজান বলল, 'তোমার কোনো ভয় নেই। আমি কোনো ক্ষতি করব না।'

ফ্লরা বলল, 'তবে কি আমাকে বাঁচাতে ফিরে এসেছ, এস্টেবান ?'

—'এস্টেবান ? আমি তো এস্টেবান নই।'

এবার ফ্লরা তাকে চিনতে পারল, 'লর্ড গ্রেস্টোক ! এ কি সত্যি আপনি ?'

—'আমিই গ্রেস্টোক। কিন্তু তুমি কে ?'

—'আমি ফ্লরা হক্‌স্। লেডি গ্রেস্টোকের দাসী ছিলাম।'

—'মনে পড়ছে বটে। এখানে কি করছ ?'

—'বলতে ভয় করছে।'

—'বল ফ্লরা। জানই তো আমি মেয়েদের কিছু বলি না।'

তখন সাহস পেয়ে সব কথা বলল ফ্লরা। ওরা কিভাবে ওপার থেকে সোনা এনেছিল বলে, আরো বলল, 'সে সোনা আপনি আর আপনার ওয়াজিরিরা তো নিয়ে গেছেন।'

টারজান বলল, 'না, আমরা কোনো সোনা নিইনি। তারপর কি হলো ?'

—'আমাদের লোকজন বিদ্রোহ করাতে, আমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলো। এরপর এস্টেবান আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিল। ক্রাস্কিও খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হলে, এস্টেবান তাকে মেরে ফেলল। তার সঙ্গে এক থলি হীরে ছিল। এস্টেবান সেগুলো নিয়ে, আমাকে একা ফেলে চলে গেছে।'

টারজান বলল, 'এসো, তাকে খুঁজে বের করা যাক।'

ফ্লরা বলল, 'আমি যে হাঁটতে পারছি না।'

—'তাতে কি হয়েছে ?'

টপ করে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে টারজান বলল, 'কাছেই জল পাওয়া যাবে। ওটাই তোমার সবচেয়ে দরকার। তারপর খাবার দাবারের ব্যবস্থাও হবে।'

নিদারুণ অনুশোচনায় ফ্লরার মন ভরে গেল।

দূর থেকে শুকনো নদীর খাতে আগুন জ্বলতে দেখে, ফ্লরাকে নামাল টারজান। জাদবালজাও এসে হাজির। ফ্লরাকে সাহস দিয়ে, ওরা নদীর পাড়িতে এসে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময়ে, জেন্ এস্টেবানকে টারজান ভেবে তার দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল।

টারজান ডাক দিল, 'জেন্ !'

জেন ওপর দিকে তাকাল আর এস্টেবান নিমেষের মধ্যে নদীর উলটো তীরে হাওয়া হয়ে গেল !

টারজান বলল, 'জেন্, একি তুমি ? সত্যি তুমি ?'

জেনের কেমন গোলমাল লাগছিল, টারজানের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এস্টেবানের দিকে তাকাতে গেল। কিন্তু কোথায় এস্টেবান ?

—'হায় ভগবান তুমি যদি টারজান হও, তাহলে ঐ লোকটা কে ?'

টারজান বলল, 'আমিই টারজান, জেন্।'

—'তুমিই টারজান বটে ! ফ্লরার সঙ্গে বনে পালিয়ে গিয়েছিলে। আমি দেখেছিলাম।'

টরাজান তো অবাক !

তখন ফ্লরা বলল, 'না, উনি আমার সঙ্গে যাননি। গিয়েছিল এস্টেবান। সে টারজান সেজে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে আমাকে ফেলে চলে গেছে। লর্ড গ্রেস্টোক আমাকে না বাঁচালে এতক্ষণে মরেই যেতাম।'

শুনে জেন্ আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'কিন্তু তাহলে ওকে ধরে সাজা দেওয়া দরকার। শীগ্‌গির যাও, জন।'

—'না আর তোমাকে বনে একা ফেলে রেখে কোথাও যাব না আমি।'

—'জাদবালজাকে পাঠালে হয় না ?'

—'ঠিক বলেছ। জাদবালজা, ওকে ধরে আনো !'

সঙ্গে সঙ্গে সিংহ রওনা দিল।

ফ্লরা বলল, 'মেরে ফেলবে না তো ?'

—'না না, মারবে না। একটু আঁচড়ে-টাঁচড়ে দিতে পারে, কিন্তু মারবে না।'

তারপর জেনকে বলল, 'উস্লা বলেছে তুমি আরবদের গ্রামে পুড়ে মরেছ, তাহলে এখানে তুমি জলজ্যান্ত হয়ে ফিরে এলে কি করে ? ওরা তো তোমার ছাই পুঁতে দিয়েছে। আমি লুবিনিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, সাজা

নেবো। ভাগ্যিস্ পাইনি।'

জেন্ বলল, 'লুবিনি আমার হাত পা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল বটে, কিন্তু পরে খুলেও দিয়েছিল। আমাকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টায় ছিল। খুব মারপিট হয়েছিল, শেষটা ওকেই ছোরা দিয়ে ওকে মেরেও ফেললাম। ততক্ষণে খেয়াল হল বাড়ির চালে আগুন ধরে গেছে। তখন এই চাদরটা গায়ে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছাদটাও ভেঙে পড়ল। গাঁয়ের এধারের বেড়া জ্বলে গেছিল, আমিও সেই পথে বনে পালিয়েছিলাম। উস্থলারা লুবিনির ছাই পুঁতেছে।'

টারজান বলল, 'সব বুঝলাম, কিন্তু এস্টেবান যখন আমার মতো সেজে ওয়াজিরিদের দলে জুটল. উস্থলা ওকে দিনের আলোতেও চিনতে পারে নি কেন?'

জেন তার কারণ জানত, 'ও যে বলেছিল মাথায় চোট খেয়ে আবার স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে।'

এক ঘণ্টা বাদে মুখে একটা ছেঁড়া রক্তমাখা চিতাবাঘের ছাল এনে সোনালী সিংহ টারজানের পায়ের কাছে রাখল। টারজান ভুরু কোঁচকাল, 'তবে কি শেষ পর্যন্ত মেরেই ফেলল?'

জেন বলল, 'সে হয়তো লড়াই দিয়েছিল। না মেরে উপায় ছিল না।'

সে রাতে টারজান ওদের হীরে লাভের সেই অবিশ্বাস্য গল্প বলল। সকালে টারজান এস্টেবানের মৃতদেহের অনেক সন্ধান করল, কিন্তু পেল না। পায়ের চিহ্ন ধরে খুঁজেছিল সব জায়গায়, রক্তের দাগও পেয়েছিল। নদীর কিনারায় এসে সে দাগ মিলিয়ে গেল। ফিরে এসে জেনকে টারজান বলল, 'জাদবালজার আঁচড় লেগে রক্ত পড়তেই পারে। মনে হয় শেষটা নদীতে পড়ে গেছিল। কুমীরেও নিয়ে থাকতে পারে।'

এস্টেবানের এমন শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভেবে ফ্লরার কি অনুতাপ! 'আমার জন্যেই এদের এই সর্বনাশ হলো। আমিই ওদের সোনার লোভ দেখিয়ে, এখানে এনেছিলাম। যতই খারাপ লোক হোক, তার এমনভাবে মৃত্যু হওয়ার জন্য আমিই দায়ী।'

জেন তাকে অনেক সান্ত্বনা দিল। টারজান বলল, 'যা করেছ, তার জন্য অনেক কষ্টও পেয়েছ। সব শোধবোধ হয়ে গেছে।'

টারজান জিজ্ঞাসা করল ফ্লরার দেশে ফিরবার ব্যবস্থা করে দেবে কি না। সে তো কেঁদেকেটে বলল, দেশে সে যেতে চায় না, আফ্রিকাতে টারজানের কাছে থেকে, লেডি গ্রেস্টোকের সেবাযত্ন করে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। প্রমাণ করতে চায় সে-ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। এতে জেন আর টারজান রাজি হওয়াতে, সকলে বাড়ির পথ ধরল।

জাদবালজা আর ওরা তিন জন তিন দিন পথ চললে পর, টারজান বাতাস শুঁকে বলল, 'আমার ওয়াজিরিরা দেখছি ভারি অবাধ্য হয়ে উঠেছে। বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম, অথচ উল্টো দিকে হাঁটছে।'

আগে আগে যারা ছিল তাদের সঙ্গে কয়েক মিনিট পরেই দেখা হল। এদের দুজনকেই জীবিত অবস্থায় দেখে তারা তো মহা খুশি! একটু পরে টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'সাদা-চামড়াদের ক্যাম্প থেকে সোনাগুলো নিয়ে কোথায় রেখেছিলে?'

উস্থলা বলল, 'কেন, তুমি যেখানে বলেছিলে সেখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম।'

টারজান বলল, 'আমি কিছু বলিনি উস্থলা. একটা দুষ্টু লোক আমার মতো সেজে ও-কথা বলেছিল। তুমি কেন, মাই লেডিও তাকে দেখে আমি ভেবেছিলেন।'

—'তাহলে তোমার মাথায় চোট লেগে তুমি আবার সব কথা ভুলে যাওনি? তুমি বুটো গণ্ডারকে দেখে ভয়ে পালাও নি?'

টারজানের কি হাসি! 'সে লোকটা ঐ সব করেছিল বুঝি? কিন্তু যে-ই সোনা লুকিয়ে থাকুক, তুমি তো মাটিতে গর্তটা খুঁড়েছিলে, উস্থলা? সেখানে আমাদের নিয়ে চল।'

দলবলে হাসতে হাসতে গেল সেখানে, কিন্তু মাটি খুঁড়ে সোনা পাওয়া গেল না। বোঝা গেল কেউ তুলে নিয়ে গেছে।

টারজান বলল, 'ঠিক জায়গায় খুঁড়ছ তো? তাহলে ঐ লোকটাই নিয়ে গেছে।'

উস্থলা বলল, 'অত সোনা একা নিতে পারে না। লোক দরকার হয়েছে।'

তখন টারজান চারদিকের গ্রামে গ্রামে চর পাঠিয়ে সব মোড়লদের জানাল, সোনা নিয়ে কাউকে যেন যেতে না দেয়। মোড়লরা সকলে তার বিশ্বাসী বন্ধু।

সে রাতে ক্যাম্পের আগুনের ধারে সেই রক্তমাখা চিতবাঘের ছালটা নিয়ে বসে জেনের দিকে ফিরে টারজান বলছিল, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, জেন্। ওপারের রত্নগুহা আমাদের জন্যে নয়। সোনা তো পেলামই না, হীরেগুলোও

হারালাম আর তোমাকেও প্রায় হারিয়েছিলাম !'

জেন্ বলল, 'যাকগে ও-সব সোনা হীরে ! আমরা দুজনে দুজনার জন্যে আছি। আমাদের কোরাক আছে।'

টারজান হাসল, 'তাছাড়া আছে একটা রক্তমাখা চিতাবাঘের ছাল। তাতে আবার এক রহস্যময় ম্যাপ আঁকা।'

তাই শুনে জাদবালজা একবার চামড়াটা শুঁকে ঠোঁট চাটতে লাগল। কে জানে কেন।

সত্যিকার টারজান দেখা দেবা মাত্র এস্টেবান তো ভয়ের চোটে বনে পালিয়েছিল। তার একমাত্র ইচ্ছা যত দূরে সম্ভব তত দূরে যাওয়া।

কাঁটা ঝোপে গা ছড়ে রক্ত ঝরতে লাগল। নদীর ধারে যখন পৌঁছল, তখনো চিতাবাঘের ছালটা আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। এবারে কিন্তু কাঁটাঝোপ থেকে কিছুতেই ছালটাকে ছাড়ানো গেলো না। তারপর একটা ভারি জানোয়ারের শব্দ শুনে চেয়ে দেখে বিশাল এক সিংহ ! অমনি ছালটা ছেড়ে, দিল নদীতে ঝাঁপ !

ডুব সাঁতার দিয়ে একেবারে অনেকটা এগিয়ে গেল। সিংহটা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে ছালটাকে নিয়ে চলে গেল। তখন মাথা তুলে এস্টেবান দেখে মাঝ নদীতে একটা গাছ ভেসে যাচ্ছে। খচমচ করে তাতেই চড়ে বসল। মনে বড় ভাবনা, ওয়াজা না সোনাটা তুলে নিয়ে যায় !

সকাল হলে নদীর তীরে একটা গ্রাম দেখতে পেল। নরখাদকদের গ্রাম। ওদের মোড়লের নাম ওবিবি। গ্রামময় রটে গেল একটা সাদা দৈত্য গাছে চড়ে নদী দিয়ে ভেসে চলেছে। কেউ কেউ বলল বন-দেবতা। জাদুকর বলল নদীর পিশাচ।

ওবিবি বলল, 'মোটেই পিশাচ নয়, জাদুকর, তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ। ও হল টারজান। তাকে ওবিবি ভালো করেই চেনে।'

আসলে সব নরখাদকরাই টারজানকে চিনত আর দেখতে পারত না। টারজান ওদের কার্যকলাপের বিরোধী ছিল।

ওবিবি বলল, 'টারজান বিপদে পড়েছে। এবার ওকে বন্দী করা যাবে।'

ওবিবির একশত যোদ্ধা নদীর তীর ধরে ভাসন্ত গাছের সঙ্গে ছুটে চলল। তরপর একটা বাঁকের কাছে গাছ তীরে ভিড়লে, এস্টেবান গাছ ছেড়ে তীরে উঠে, গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। হাত দিয়ে একবার দেখেও নিল হীরেগুলো নিরাপদেই আছে। 'উঃফ্ ! বাঁচা গেল !'

ঠিক সেই সময় একসঙ্গে পঞ্চাশ জন কালো যোদ্ধা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চোখের নিমেষে হাত-পা বেঁধে ফেলল।

ওবিবি বলল, 'আহা ! এদ্দিন পর তোমাকে হাতে পেলাম, টারজান !'

এক বর্ণ বুঝল না এস্টেবান। ওর ইংরিজি কথাও ওরা বুঝল না। তবে এটুকু বুঝল এদের হাতে ও বন্দী।

জাদুকর মাথা নাড়ল, 'নদীর পিশাচ ধরে ঘরে আনলে ? দেখো এবার কত অমঙ্গল হয়।'

শুনে ওবিবি হাসতে লাগল।

জাদুকর বলল, 'এখন হাসছ, পরে কাঁদতে হবে দেখো।'

ওবিবি উত্তর দিল, 'নিজের হাতে টারজানকে বধ করে, তারপর প্রাণ ভরে হাসব।'

এস্টেবানকে ঐ রকম হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই ওরা একটা কুঠরিতে বন্ধ করে রাখল। ওদিকে রাত্রে ভোজের আয়োজন চলতে লাগল। কিন্তু বিকেলে গ্রামের মেয়েরা নদীতে গেলে একজনকে কুমীরে নিল।

জাদুকর বলল, 'ঐ শুরু হল !'

গ্রামের লোকদের কি ভয় ! ওবিবি বলল, 'পিশাচ হলে বাঁধন কেটে পালাবে। টারজান হলে পালাবে না। যদি নদীর পিশাচ হয় তাহলে ও চিরকাল বেঁচে থাকবে। যদি টারজান হয় তাহলে একদিন মরে যাবেই। তখনি বোঝা যাবে ও সত্যি টারজান।'

জাদুকর বলল, 'যদি না মরে ?'

—'তাহলে বুঝব তোমার কথাই ঠিক।'

এরপর ওবিবি গ্রামের মেয়েদের বলে দিল বন্দীকে যেন খেতে দেওয়া হয়। এই ভাবে এক থলি অমূল্য হীরের মালিক এস্টেবানের যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা হল। কেউ হীরের কথা জানতেও পারল না। নদীর পিশাচের ভয়ে মারল-ও না।

নদীর অপর পারে ওর বিশ্বাসঘাতক স্যাঙাৎ ওয়াজা লুকিয়ে বসে, টারজান আর তার ওয়াজিরিদের এসে ভুল জায়গায় সোনা খুঁজতে দেখেছিল। পরদিন সকালে ওয়াজা পঞ্চাশ জন লোক এনে সোনা খুঁড়ে তুলে বন্দরের দিকে রওনা দিল। সে-রাতে ওরা একটা ছোট গাঁয়ের বাইরে ক্যাম্প করেছিল। গ্রামের বুড়ো মোড়লের লোকবল ছিল না। সন্ধ্যাবেলায় সে ওদের নিজের

বেড়ার ভিতরে ডেকে খাবার দাবারের সঙ্গে দিশী কড়া মদও খাওয়াল। ফলে ওয়াজার লোকদের মুখ খুলে গেল। বুড়ো মোড়ল সোনার কথা শুনল। ওয়াজাকে বলল, 'এরা কি অত সোনা অত দূর নিতে পারবে?'

—'তা সত্যি, তবে বেশী করে টাকা দিলে নিয়ে যাবে।'

—'এখানে বিক্রি করলে তো সেটাও বেঁচে যাবে, ঝুঁকিও কম হবে। আমি এমন খদ্দের এনে দিতে পারি যে সবটা কিনে নিয়ে পুরো দামটা কাগজে লিখে তোমাকে দেবে। তুমি বন্দরে গিয়ে কাগজটা ভাঙাতে পারবে।'

—'কে এই খদ্দের?'

—'আমারি এক সাদা-চামড়া বন্ধু। বল তো তার কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। হাতে হাতে দামের কাগজটা পেয়ে যাবে।'

ওয়াজা খুব রাজি। এতে কুলিদের সামান্য টাকা দিলেই হবে। ন্যায্য দামে জিনিসও বিক্রি হবে। ওর কোনো ঝামেলা থাকবে না।'

পর দিনই তারা রওনা হয়ে গেল। সকলেই এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট। দু-দিন হাঁটার পর, মোড়ল আগে আগে একজন চর পাঠিয়ে সব জানিয়ে রাখল। তারপর কয়েক ঘণ্টা পরেই ওরা বন থেকে বেরিয়ে একটা খোলা প্রান্তরে এল। ওদের দিকে একদল যোদ্ধাকে এগিয়ে আসতে দেখে, ওয়াজা থমকে দাঁড়াল, 'ওরা কে?'

—'ওরা আমার বন্ধুর লোক। ঐ দেখ বন্ধুও সঙ্গে আছে।'

—'ওরা কি লড়াই করতে আসছে, না শান্তিতে আসছে?'

—'সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে। তোমার সম্পত্তি কেউ কেড়ে নেবে না। যদি ন্যায্য হয়।'

—'তার মানে?'

—'ঐ সোনা তো ঐ লোকটার নয়। ও চুরি করে এনেছিল।'

এই সময় টারজান দলবল সহ এসে পৌঁছে, মোড়লকে বলল, 'আমরা এলাম। পুরনো বন্ধুর জন্য কি করতে পারি বল।'

মোড়ল বলল, 'তোমার হরকরার খবর পেয়েছিলাম চার দিন আগে। তার দুদিন পরে এ সোনা নিয়ে এল। ওকে বলেছি তুমি সোনাটা কিনবে। একটা কাগজে লিখে দাম দেবে। অবিশ্যি ও যদি সত্যি মালিক হয়।'

টারজান হাসল, 'ভালো করেছ, বন্ধু। ও সোনা ওয়াজার সম্পত্তি নয়।'

ওয়াজা বলল, 'তোমারো নয়, টারজান। তুমি চার জন সাদা-চামড়া আর একটা মেয়ের সঙ্গে সোনাটা টারজানের এলাকা থেকে পাচার করতে এসেছিলে। তারপর বন্ধুদের কাছ থেকে ওটা চুরি করে পালিয়েছিলে।'

এমন গোলমেলে কথা শুনে সকলে হাসতে লাগল।

টারজান বলল, 'না ওয়াজা, সে লোকটা টারজান সাজলেও সে আসলে টারজান নয়। আমিই আসল টারজান। তুমি আমার সোনাগুলো কষ্ট করে নিয়ে এসেছ বলে ধন্যবাদ। চল আমার সঙ্গে।'

ওয়াজার লোকেরা বাধ্য হয়ে টারজানের বাংলোতে সোনা পৌঁছে দিল। সেখানে তাদের ভালো করে খাইয়ে-দাইয়ে, টাকাকড়ি দিয়ে খুশি করে, পরদিন নিজেদের গ্রামে ফেরত পাঠানো হল। ওয়াজাও ওদের সঙ্গে গেল। তাকে টারজান কিছু মূল্যবান বখশিস্ দিয়ে সন্তুষ্ট করে বলল 'এ দিকে যেন আর না আসে।

সবাই বিদায় নিলে, জেন, টারজান আর কোরাক এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। পায়ের কাছে জাদবালজা শুয়ে পড়ল।

টারজান বলল, 'জেন, ওপারের সোনার কথা ভুল বলেছিলাম। ভাগ্যদেবী নিজেই সোনা পৌঁছে দিলেন। হীরেগুলো নিশ্চয় উগোগো নদীর তলায়।

টারজান এবং পিঁপড়ে মানুষ

টারজান অ্যান্ড দি অ্যান্ট মেন

পারের রত্নগুহা থেকে সোনার বাঁট সরাবার ষড়যন্ত্রে যে ক'জন জড়িত ছিল, তাদের মধ্যে পীব্‌ল্‌স্‌ থ্‌ক্‌ আর ওদের কিপ্টে জার্মান কোষাধ্যক্ষ দেশে ফিরে গেছিল। ফ্লরা হক্‌সের মন বদলে গেছিল, সে টারজানের স্ত্রী জেনের বিশ্বাসী দাসীর পদ যেচে চেয়ে নিয়েছিল। ক্রাস্কি শোচনীয় ভাবে মরেছিল। তার ঘাতক, ঐ পাপিষ্ঠদের দলের মধ্যে যার স্বভাব সব চাইতে জঘন্য, কিন্তু যার চেহারার সঙ্গে টারজানের এতটা সাদৃশ্য ছিল যে সে নিজেকে বহু জায়গায় টারজান বলে চালিয়েছিল, সেই এস্টেবান্‌ মিরাণ্ডা নরখাদক ওবিবির গ্রামের একটা নোংরা কুঁড়েঘরে এক বছর ধরে বন্দী ছিল। ক্রীতদাসদের মতো গলায় লোহার কলার পরানো, চাবি দিয়ে সেটা খুলতে হয়। কলারটা একটা খুঁটির সঙ্গে চেন করা।

গ্রামের জাদুকর খামিস বলেছিল সে উগোগো নদীর পিশাচ, ওবিবি বলে ও টারজান, ওকে মেরে খেতে হবে। আবার জাদুকরের ভয়ে, খেতেও পারছে না। স্বাভাবিক ভাবে তার মরার অপেক্ষা করছে ওবিবি। এইভাবে এক

বছর কেটে গেছে। এস্টেবানের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার নিজেরো ধারণা সে সত্যি টারজান। স্নান নেই, ঘর সাফ হয় না, ভালো করে খেতে পায় না, অথচ সঙ্গে তার টারজানের থলি ভরা হীরে। ক্রাস্কি চুরি করেছিল, ক্রাস্কির কাছ থেকে ও নিয়েছে। ওবিবি সে থলি খুলেও দেখেনি। দেখলেও মূল্য বুঝত না।

খামিসের চোদ্দ বছরের মেয়ে উ-হার-এর ওর বিষয়ে বড়ই কৌতূহল। দূর থেকে নদীর পিশাচকে সে দেখে। অনেক সময় কাছেও আসে। সুযোগ বুঝে একদিন এস্টেবান তাকে একা পেয়ে বলল, যদি সে ওবিবির কাছ থেকে চাবি এনে কলার খুলে না দেয়, তাহলে গাঁসুদ্ধ সবাই মরবে। নদী থেকে মাছ পালাবে, বৃষ্টি পড়বে না, শস্য শুকোবে, জানোয়াররা অন্য বনে চলে যাবে। নদীর পিশাচকে ধরলে, কেউ পার পায় না। তবে উ-হা ওর কলার খুলে দিলে, ও বুঝবে সে সত্যি ওর ভক্ত। তাহলে কারো কোনো অনিষ্ট হবে না। তখন অনেক কষ্টে প্রাণ হাতে করে, ঘুমন্ত ওবিবির ঘরে ঢুকে, তার থলি থেকে চাবিটি বের করে উ-হা এস্টেবানকে দিল। ভাগ্যিস্ বুড়োর ঘুম ভাঙেনি। এস্টেবানকে চাবি দিয়ে উ-হা সেখান থেকে পালাবার তালে ছিল, কিন্তু এস্টেবান বলল, 'আমাকে অস্ত্রশস্ত্র এনে দাও।' তীর-ধনুক আর একটা ছোরা এনে দিলে, খপ্ করে তাকে ধরে কাঁধে ফেলে এস্টেবান বনে পালাল। একা একা বনে ঘুরতে তার ভয় করে।

*

গ্রেস্টোকদের খামার বাড়িতে কোরাকের কাছে টারজান কোরাকের ছোট প্লেনটা চালাতে শিখেছে। কোরাক জনা দুই ওয়াজিরিকেও এরোপ্লেনের যন্ত্রপাতির রহস্য শিখিয়ে নিয়েছিল। তারা প্লেন চালাতে ও সারাতে পারত। আজ টারজান এই প্রথম একা প্লেন নিয়ে উড়তে চাইছে। কোরাক, কিম্বা মেরিয়েমের মত ছিল না। নিদেন একজন মেকানিককে সঙ্গে নিক। টারজানেরো রোখ চেপে গেল। কারো কথা শুনল না, প্লেন নিয়ে উড়ে পড়ল। ছেলে, বৌ, ছোট্ট নাতি, মেকানিকরা সবাই নিরুপায় হয়ে দেখতে লাগল। জেন দেশে গেছিল। সে থাকলে কখনোই টারজানকে এ ভাবে যেতে দিত না।

ফুর্তির চোটে দেড় ঘণ্টা প্লেন চালাবার পর টারজানের খেয়াল হল সে অনেক দূরে চলে এসেছে। আঁকাবাঁকা উগোগো নদী দেখা গেল। তার ডান দিকে পর-পর কয়েকটা অববাহিকার মতো। তাদের চারদিকে ঘন বন। খামার থেকে একশো মাইলের বেশি চলে এসেছে, এবার ফেরা উচিত। তবু ফিরতেও ইচ্ছা করছিল না। এত কাছে, অথচ এসবের কথা এতকাল শোনেওনি কেন? প্লেনটাকে আরেকটু নামাতে বুঝল কেন জায়গাটার কথা কেউ জানে না। এর চারদিক ঘিরে সেই কুখ্যাত কাঁটাবন, যাকে ভেদ করে ঢোকা মানুষ বা জন্তুর অসাধ্য! এখন দেখতে পেল সবটা কাঁটাবনে ঢাকা নয়। কাঁটাঝোপের একটা চওড়া ফালি জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে। মধ্যিখানটা সবুজ সুন্দর!

আরেকটু ভালো করে দেখবার জন্য আরো নিচে নামলো টারজান। অনভ্যাসের কারণে একটু বেশি নিচে নেমেছিল। তার ফলে উঁচু গাছের ডালে লেগে প্লেনটা ভেঙে পড়ল।

বনের পথ দিয়ে প্রায় ছয় ফুট লম্বা একটা মানুষের মতো দুপেয়ে জীব হেঁটে যাচ্ছিল। কোমরে নেংটি পরা, তার ওপর একটা ঝালর, তাতে পাথর গাঁথা, রংচঙে পালক বসানো। ফরসা রং, বড় বড় খালি পা, কালো লম্বা চুল, গায়ে বেশি লোম নেই। চ্যাপ্টা নাক, পুরু ঠোঁট, মানুষেরি মতো চোখ। কিন্তু কপালটা কেমন বেরিয়ে এসেছে। চলছে আর মশা মাছি তাড়াবার জন্য কান লটপট করছে, ঘোড়ার মতো চামড়া নাচাচ্ছে। জীবটি পুরুষ নয়, মেয়ে। হঠাৎ থমকে থেমে নাকের ফুটো বড় করে বাতাসে কি যেন শুঁকল সে। তারপর সাবধানে পায়ে-চলা পথ ধরে এগোতে লাগল। বাঁকের কাছে এসে দেখে টারজান হুমড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। বিশাল গাছটার ডালপালার মধ্যে ভাঙা প্লেনটা ঝুলে ছিল। অদ্ভুত মেয়েমানুষটা হাতের মুগুর শক্ত করে ধরে কাছে এসে ওকে দেখে অবাক হল। তারপর ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে দুহাতে কাঁধ ধরে চিৎ করে শুইয়ে দিল। কান পেতে বুকের ধুকপুকি শুনে বুঝল সে বেঁচে আছে। কাপড়চোপড়গুলোকে পছন্দ হল না। টেনেটুনে ছিঁড়ে সব খুলে ফেলে, অচেতন মানুষটাকে অনায়াসে কাঁধে তুলে আঁকাবাঁকা বনপথ দিয়ে কিছুদূর যাবার পর, একটা উপবনের মতো জায়গায় এল। তারপর তারি ধারে খাড়া পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দীর্ঘকাল ধরে বেলেপাথরের ওপর বৃষ্টির ধারা পড়ে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভিতরে স্বাভাবিক একটা গোল অধিত্যকার মতো তৈরি হয়েছে। পাহাড়ের দেয়ালে অনেকগুলো গুহার মুখ দেখা যাচ্ছিল। তার সামনে এরি মতো আরো অনেকে বসে আছে।

বড় বড় কান খাড়া করে সবাই ওর দিকে তাকাল। সবাই মেয়েমানুষ, সকলেরি লম্বা, পেশীবহুল ষণ্ডা চেহারা, সকলেরি এক সাজ। কেউ কোনো কথা বলল না, বা শব্দ করল না। অনেকে উঠে কাছে এল। প্রথম মেয়েমানুষটিও কাউকে কিছু না বলে সোজা একটা গুহার দিকে এগিয়ে গেল। ওরা হয়তো বাধা দিত, কিন্তু সে গদা দোলাতে আরম্ভ করতেই সবাই সরে গেল। প্রায় গুহায় পৌঁছে গেছে, এমন সময় পিছন থেকে একজন টারজানের হাত ধরে টানল। অমনি টারজানকে নামিয়ে রেখে, গদার এক বাড়িতে তাকে প্রথম জন মাটিতে শুইয়ে দিল। তারপর আবার টারজানকে তুলে গুহায় ঢুকে গেল। অন্যরা পালাল। মেয়েমানুষটা টারজানের গা থেকে জামা জুতো টেনে খুলে তাকে আবার কাঁধে তুলে নিয়ে গোল জায়গাটার মধ্যিখানে কতকগুলো পাথরের ঘরের দিকে চলল।

সেখানে পাথরের চাংড়া দিয়ে তৈরি অনেকগুলো লম্বাটে ঘর একটা ডিম্বাকার উঠোনকে ঘিরে আছে। ঘরগুলো গায়ে গায়ে লাগানো। বাইরের দিকে একটা করে দরজা। দরজায় কব্জা পাল্লা নেই। একটা বড় চ্যাপ্টা পাথর দিয়ে ঢুকবার পথটা বন্ধ করে, বাইরে থেকে আরেকটা ঠেকো দেওয়া। ভিতর থেকে খোলা যায় না। টারজানকে নিয়ে একটা ঘরে নামাল সে। গলায়, তখনো সোনার লকেটটা ঝুলছে, কাপড়-চোপড়ের বালাই নেই। তারপর তিনবার জোরে হাত তালি দিতেই, ছয়-সাতটা ছেলে-মেয়ে ঘরে এসে ঢুকল। তাদের বয়স এক থেকে ষোল হবে। সবাই বেশ স্বাবলম্বী মনে হল। সবকটা মেয়ের হাতে ছোট-বড় মুগুর, ছেলেগুলোর খালি হাত। এবার হাত-মুখ নেড়ে ইশারায় ইঙ্গিতে কি যেন বলে, সে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে, দরজাটা ঐ ভাবে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। যাকে মুগুরের ঘায়ে পেড়ে ফেলেছিল, সে এতক্ষণে উঠে টলতে টলতে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল।

সেই প্রথম মেয়েমানুষের চেয়েও লম্বা চওড়া, আরেকজন এক কাঁধে একটা মরা হরিণ, অন্য কাঁধে রোগা-পটকা একটা পুরুষমানুষকে নিয়ে উপস্থিত হল। সকলে দেখতে এলো। পুরুষমানুষটা মাঝে মাঝে কিলবিল করছিল, হাত-পা ছুঁড়ছিল। এই সময়ে প্রথম আর দ্বিতীয় মেয়েমানুষ এক-জোট হয়ে তৃতীয় জনের দিকে তেড়ে গেল। সেও শিকার নামিয়ে রেখে লড়াই দিতে তৈরি হলো। অন্য যারা ছিল, তারা মজা দেখতে লাগল। কেউ কাউকে সাহায্য করতে এলো না। ওরা দুজনে মিলেও এঁটে উঠতে পারল না। প্রথমজনের মাথা গদার ঘায়ে ফেটে গেল, সে মরে গেল। তার দশা দেখে দ্বিতীয়জন ভেগে পড়ল। ততক্ষণে পুরুষ-মানুষটার আড়ষ্ট ভাব একটু কেটে যাওয়াতে, সে হামা দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টায় ছিল। যেই না তৃতীয় মেয়েমানুষ দেখতে পেয়েছে, সে হরিণ ফেলে তার পিছনে ছুটেছে আর দ্বিতীয় জন সেই ফাঁকে হরিণের দিকে হাত বাড়িয়েছে। তৃতীয় জন হরিণ রক্ষা করতে যেই ফিরেছে, পুরুষমানুষটাও অমনি বনের দিকে ছুটেছে! তৃতীয় জন অত সহজ পাত্রী ছিল না। কোমর থেকে পাথরবাঁধা একটা ফালি তার মাথায় গুল্‌তির মতো ছুঁড়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পেড়ে ফেলল। আরেকবার হরিণ নেবার চেষ্টা করতে গিয়ে দ্বিতীয় জনও প্রাণ হারাল। তারপর তৃতীয় জন বিজয়গর্বে দুই শিকার সহ নিজের গুহায় ঢুকে, শিকার নামাল। গুহার মুখে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বেলে, সে হরিণের গা থেকে ফালা ফালা মাংস কেটে ঝল্‌সে নিয়ে নিজে খেল। কিছু কাঁচা মাংস পুরুষটাকেও দিল। সেও সেটাকে ঝল্‌সে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খেয়ে ফেলল। লোকটার চেহারা এমন কিছু না হলেও, গয়নাগাঁটি পরে সাজবার চেষ্টা হয়েছে!

*

পরে টারজানের জ্ঞান হলে, এখানকার ব্যাপার দেখে সে তাজ্জব বনে গেছিল। এরা ঠিক মানুষের স্তরে পৌঁছোয়নি, অথচ জানোয়ারদের মতো প্রাণবন্তও নয়। এদের মুখে ভাষা নেই। এতটুকু শব্দও করতে পারে না, স্বরযন্ত্রই নেই। ইশারায় ইঙ্গিতে মনের ভাব জানায়। বুদ্ধিও খুব নিম্নস্তরের, খাওয়াদাওয়া, আরাম করা, বাচ্চা পালা ছাড়া কিছু জানে না। এটা হল মাতৃপ্রধান দেশ। মেয়েদের বিশাল বলিষ্ঠ শরীর, নির্মম আর সাহসী মন। বিয়ে-থার নিয়ম নেই। ঘর করবার মানুষ পাবে কোথায়? পুরুষদের সতের-আঠার বয়স হলেই, তাদের বনে ভাগিয়ে দেয়। সেখান থেকে একেকজন খাণ্ডার মেয়েমানুষ বছরে দু-একবার একটা করে পুরুষ ধরে এনে, কয়েক মাস সংসার করে। এক-আধটা ছেলেপুলে হলে আবার ভাগায়। তারাও সর্বদাই পালাবার তালে থাকে। অনেক সময় নিজেরাই চলেও যায়। তারা সভ্য জগতের মেয়েদের মতো বনে গেছে। সাজগোজের বড় শখ। দুর্বল, ভীতু। খেতে দিলে অনেক অত্যাচার সইতে রাজি। তবে সুযোগ পেলেই বনে পালায়।

আশ্চর্যের বিষয়, ঐ সব ভীমা মেয়েমানুষরা ছেলেপিলেদের কষ্ট দেয় না। তবে খোঁয়াড়ে বন্ধ করে রাখে। খেতে দেয়। পিছনের উঠোনে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে দেয়। বাচ্চাদের মধ্যে মেয়েগুলো ঢের বেশি জোরালো। ছেলেগুলোর ওপর সর্দারি করে। এই সব ব্যাপার টারজান ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে বোঝেনি। ওর জ্ঞান হবার আগে ছেলেপুলেগুলো ওকে নেড়েচেড়ে উল্টেপাল্টে দেখেছিল। একটা ছেলে ওর গলার হারটা খুলে, নিজে পরেছিল। এ-সবের কিছুই ও টের পায়নি। যখন মাথাটা পরিষ্কার হয়ে এল, মাথার পিছন দিকে একটা বেদনা ছাড়া আর কোনো অস্বস্তি টের পাচ্ছিল না।

সে কোথায় এল, এরা কে, কে তাকে আনল, কেন আনল, কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। বুঝেছিল যে অন্ধকারের আগে পালাবার চেষ্টা করাও ভুল হবে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলে ছেলেমেয়েগুলো কেন জানি চঞ্চল হয়ে উঠল। মাটিতে পা ঠুকতে লাগল, দেয়ালে মুগুর দিয়ে পিটতে লাগল। ভাষা নেই, তাই শব্দ করছিল না, ঐ ভাবে কি জানাতে চাইছিল? হঠাৎ খেয়াল হল টারজানের, ওর নিজেরি মতো ওদেরো নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। সেটাই জানাতে চাইছে। এমন সময় টারজানের ওপর এদের চোখ পড়ল। এরা নর-খাদক ছিল না, কিন্তু এটাকে তো ওদের মা শিকার করে এনেছে। এটাকে বোধহয় খাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের কিছু ভেবে মেয়েগুলো মুগুর দেখিয়ে ইশারায় জানাল, টারজানকে মেরে ওরা খেতে চায়। এমন কি দেখতে দেখতে কাঠ-কুটো দিয়ে একট আগুনও জ্বেলে ফেলল। খিদে বড় জ্বালা।

খালি পনের বছরের একটা ছেলের এ প্রস্তাবে বড় আপত্তি দেখা গেল। হাত মুখ নেড়ে মেয়েগুলোকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করে, বিফল হয়ে শেষটা টারজানকে রক্ষা করবার জন্য, তার সামনে এসে ছেলেটা দাঁড়াল। অমনি মারামারি লেগে গেল। মেয়েগুলো কোমর থেকে পাথর খুলে তার দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল। তার গায়ে না লেগে, একটা লাগল অন্য একটা ছেলের মাথায়। সে তক্ষুণি মরে গেল। এই ছেলেটার কাছেই টারজানের লকেটটা ছিল। এদিকে টারজানের রক্ষককে সবচেয়ে বড় মেয়েটা আক্রমণ করে আর কি। মেয়েটাকে মেরে ফেলতেও ইচ্ছা করে না। কিন্তু না মেরেও হয়তো উপায় থাকবে না। এমন সময় সবাই বেঁচে গেল।

ব্যাপার হল, তৃতীয় মেয়েমানুষ তার নতুন বন্দীকে খোঁয়াড়ে পুরতে এসে, ছেলেমেয়েগুলোর মুগুর পেটানি আর পা ঠোকা শুনে, ব্যাপারটা আঁচ করে, বাইরে থেকে পাথর সরিয়ে দরজাটা খুলে দিল। তাকেও ছেলেমেয়েরা কখনো দেখেনি। মা-কে ছাড়া কাউকেই দেখেনি। এরা যত নিকৃষ্টই হোক, ছেলেমেয়েদের না খেয়ে মরতে দিতে মন সরত না। এই সময় টারজানের ওপর চোখ পড়তেই সে অবাক! এটাকেও তাহলে অন্যটার সঙ্গে নিজের খোয়াড়ে বন্ধ করা দরকার। এই মনে করে, আর সবাইকে ভুলে গিয়ে ঐ ভীমা মেয়েমানুষ মুগুর নিয়ে টারজানের দিকে এগোল। এখান থেকে সরে পড়াই বাঞ্ছনীয়। এই ভেবে পিছন ফিরে টারজান প্রথমেই সেই ছেলেটাকে দেখতে পেল। তারপর তার পিছনে দেখল পাঁচিলের একটা পাথর কেমন ভিতর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আর দেখতে হল না। নিমেষের মধ্যে টারজান আর সেই ছেলেটা পাঁচিলের ওপর দিয়ে পগার পার। একেবারে পাহাড়ের গায়ের ফাটল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে, উপবন পার হয়ে, ঘন বনে ঢুকে পড়ল দুজনে। তৃতীয় মেয়েমানুষ ছাড়াও অন্য গুহা থেকে আরো অনেক-গুলো মেয়েমানুষ বেরিয়ে এসে ওদের তাড়া করল। ছেলে-টাকে কেউ চায় না, তার বিয়ের বয়স হয়নি। ইচ্ছা হয় তো সে বনে গিয়ে চরে খেলেও কারো আপত্তি হবে না।

এদিকে অন্ধকার বনে ঢুকে অবধি ছেলেটা টারজানকে দেখতে পাচ্ছিল না। হিংস্র জানোয়াররা ঘুরছিল আশে-পাশে। ছেলেটার মন একসঙ্গে ভয়ে আর উল্লাসে ভরে উঠল। কাছেই একটা সিংহ গর্জন করে উঠল। ছেলের মন বলল এ তাকে ধরে খেয়ে ফেলবে! বড় ভয় হল। এমন সময় গাছের ওপর থেকে একটা বলিষ্ঠ হাত নেমে তাকে ওপরে তুলে নিল।

*

ওদিকে এস্টেবান মিরাণ্ডা উ-হাকে জোর করে ধরে নিয়ে উত্তরমুখো চলেছে। ওবিবির যোদ্ধারা যদি আবার তাকে ধরে, এই তার ভয় আর উ-হার একমাত্র ভরসা। সিংহের ডাক শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উ-হার পিছন পিছন সে-ও গাছে চড়ে বসল। উ-হা বলল 'তুমি মোটেই নদীর পিশাচ নও। সে কিছুকে ভয় করে না। টারজানও নও, সে-ও কিছুকে ভয় পায় না।'

এস্টেবান বলল 'চোপ। সিংহরা শুনতে পাবে।'

সকালে ওরা গাছ থেকে নেমে বনে বনে ঘুরতে লাগল,

কোন দিকে যাবে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। কেবলি উত্তরে যাবার চেষ্টা। শেষটা তারাও সেই দুর্ভেদ্য কাঁটাবনের কাছে এসে পৌঁছল।

ততক্ষণে সেই অজ্ঞাত উপত্যকায় প্রথম মেয়েমানুষের খোঁয়াড় থেকে সবাই চলে গেছিল। খাল সেই মরা ছেলে-টাকে দেখে একটা শকুন নেমে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরো শকুন নামল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কয়েকটা হাড় ছাড়া কিছু বাকি রইল না। কিন্তু একটা শকুনের গলার চারদিকে কি জানি কেমন করে সোনার চেনটা জড়িয়ে গেছিল। পাখিটা কিছুতেই সেটা ঝেড়ে ফেলতে না পেরে, গলায় পরেই উড়ে গেল।

বাকি রাতটা গাছে কাটিয়ে টারজান আর ছেলেটাও পরদিন নিচে নেমে খাবার সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগল। ফলমূল, বাদাম, পাখির ডিম যথেষ্ট পাওয়া গেল। কিন্তু মাংস না পেয়ে পেটও ভরবে না, তাছাড়া চামড়া আর নাড়ি-ভুঁড়িগুলো না পেলে অস্ত্রশস্ত্র বানাবে কি করে? খুঁজে খুঁজে বর্শা আর তীর-ধনুকের উপযুক্ত কাঠ অবিশ্যি পাওয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যা নামল, এমন সময় নাকে বারা হরিণের গন্ধ এল। কাঠ ইত্যাদি একটা গাছের ওপর ছেলেটার কাছে জিম্মা করে, ডালপালার ভিতর দিয়ে বারার চেষ্টায় চলল টারজান।

তীর ধনুক পর্যন্ত ছিল না সঙ্গে। খালি হাতেই শিকার করতে হবে। একটা গাছের ডালে একেবারে নিশ্চল হয়ে শুয়ে টারজান দেখছিল এক পাল হরিণ কেমন চরছে। নাকে এল সিংহের গন্ধ। নুমাও হরিণের চেষ্টায় আছে তাহলে! শিকারটা হয়তো ফস্কে যাবে। ঠিক সেই সময়ে আরেকটা কমবয়সী সিংহ গর্জন করতে করতে হরিণের পালের দিকে ছুটে এল। এই রে! সব বুঝি পণ্ড হল! হরিণগুলো ছত্র-ভঙ্গ হয়ে বায়ুবেগে চারদিকে ছুটল। একটার বুদ্ধিভ্রম হওয়াতে, সোজা টারজানের গাছের দিকে দৌড়ে এল। নিমেষের মধ্যে লাফিয়ে নেমে, তার ঘাড় মটকে, শরীরটকে কাঁধে ফেলে, আবার গাছের ডালে উঠে পড়ল টারজান! ভাগ্যিস্ ছেলেটার কাছে একটা পাথরের ছোরা ছিল। তাই দিয়ে তার জন্যে এক টুকরো মাংস কেটে দিয়ে, টারজান নিজেও খানিকটা নিল এবং কাঁচা কাঁচা খেল। ছেলেটা কিন্তু গাছের ডালে বিচিত্র উপায়ে আগুন জ্বেলে মাংসটাকে ঝলসে খেল। টারজান মনে মনে না হেসে পারল না।

তারপর দিনটা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতেই কাটল। টারজান ভাবছিল ছেলেটা ভীতু হয়েও তাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল। ওকে অস্ত্র ব্যবহার শেখাতে হবে। বন্দী ছিল এতকাল, কিছুই শেখেনি। ওকে কোন কাজেই বা লাগানো যায়? এমন সময়. মাটিতে কান পেতে কি যেন শুনে, ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠে টারজানকে ইশারা করতে লাগল। শুনে, টারজানও বুঝল কারা আসছে। অমনি জিনিসপত্র কুড়িয়ে নিয়ে গাছে চড়ল দুজনে। একটু বাদেই একজনের পিছনে একজন এক সারি ভীমা মেয়েমানুষ ইদিক-উদিক তাকাতে তাকাতে বনের গভীরে চলে গেল। বাবা! ঐ বিশাল দেহ, ঐ গদা আর পাথরের সঙ্গে টারজান কখনো পেরে উঠবে!!

কয়েক দিন কেটে গেল। অস্ত্রশস্ত্র, ঘাসের দড়ি সব তৈরি হল ছেলেটাও ক্রমে বদলে যেতে লাগল। অস্ত্র চালাতে শিখেই, তার মন থেকে যেন সব ভয় ডর দূর হয়ে গেল। শিকারে সে দক্ষ হয়ে উঠল। দূর থেকে বর্শা ছুঁড়ে সিংহী মারল একদিন। আরেকদিন একটা যমের মতো বুনো শূওর মারার পর, ছেলেটার শেষ ভয়ের জিনিস, ঐ মেয়েমানুষগুলোকে দেখে আর তার ভয় হত না। দেখে মনে হত এড়িয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, তাদেরও খুঁজে বেড়াচ্ছে, পরাজিত করবে বলে। এই ভাবে এ-দেশের মেয়েলী পুরুষদের মনের মধ্যে প্রথম পৌরুষের ভাব জাগতে দেখেছিল টারজান। প্রথম যে মেয়ের সঙ্গে ছেলেটার এবার দেখা হবে, তার কপালে দুঃখ আছে, ভাবল টারজান।

এদিকে ওরাও যেমন কাঁটাবনের ভিতর দিক থেকে বাইরে যাবার পথ খুঁজছিল, তেমনি উ-হাকে সঙ্গে নিয়ে এস্টেবান নিজের পথের হদিস্ পাবার আশায় বাইরে থেকে এদিকে আসবার উপায় খুঁজছিল।

*

ঐ ছেলেটা টারজানের যোগ্য সাকরেদ হয়ে উঠেছিল। দেখতে দেখতে শিকারে এমন দক্ষ হল যে দু-জনে দুদিকে গিয়ে দু-গুণ শিকার জোগাড় করে আনতে লাগল। তার ইশারার ভাষাও টারজান অল্প দিনেই শিখে নিল।

এর মধ্যে একদিন শিকারে বেরিয়ে টারজানের নাকে এল বারা হরিণের গন্ধ, তার পিছনে কিছু দূর ধাওয়া করার পর ঐ রকম ভীমা মেয়েমানুষের গন্ধও পেল। টারজান ভাবল, এই রে! আমার শিকার ছিনিয়ে নিতে এসেছে! অমনি গাছে ঝুলে পড়ল। আরো খানিকটা এগোতেই অন্য এক-রকম গন্ধও পেল, মানুষেরি গন্ধ, কিন্তু একটু ভিন্ন। তারপর

মৃদু মিষ্টি গলার শব্দও কানে এল। যেন অনেকে কথা বলছে।

এবার বন থেকে বেরিয়ে টারজান বিশাল এক প্রান্তরে পৌঁছল। তারপর যা দেখল তাতে সে তাজ্জব বনে গেল। দৈত্যাকার এক ভীমা মেয়েমানুষ এক হাতে একটা পুতুলের মতো ছোট শ্বেতাঙ্গ মানুষকে তুলে ধরে, অন্য হাতে প্রকাণ্ড গদা চালিয়ে হাতখানেক লম্বা অসম্ভব সাহসী প্রায় একশো জন যোদ্ধাকে পেড়ে ফেলতে চেষ্টা করছে। সব আরোহী যোদ্ধা অর্থাৎ খুদে হরিণের পিঠে চড়া। হরিণগুলো যোদ্ধাদেরি মতো যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ। প্রাণ হাতে করে খুদেরা বারে বারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর গদার একেকটা ঘায়ে বারো-চোদ্দজন ছিট্‌কে পড়ছে। কত যে প্রাণ হারাচ্ছে তার ঠিক নেই। একেকবার মেয়েমানুষটা ঠ্যাং ছুঁড়ছে, দশ-জনের হাত-পা জখম হচ্ছে।

টারজান আর থাকতে না পেরে, এগিয়ে এল। মেয়ে-মানুষটা মহাখুশি, ভাবল একজন সাকরেদ পাওয়া গেল। যোদ্ধাদের তেমনি বিরক্তি, তারা ভাবল শত্রু বাড়ল। একটু পরেই দুজনারি ভুল ভাঙল। ইশারা করে টারজান মেয়ে-মানুষটাকে বলল যোদ্ধাটিকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু সে রেগে উঠল। শেষ পর্যন্ত গোটা তিনেক তীর ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেলা ছাড়া উপায় রইল না।

ঝুপ করে ঐ বিশাল দেহ যখন মাটি নিল, টারজান বুদ্ধি করে খুদে বন্দীকে লুফে নিয়েছিল। তাকে মাটিতে নামিয়ে দেবামাত্র, অন্যরা হাঁটু গেড়ে তার কাছে নতি জানাল। মনে হল গণ্যমান্য কারো ছেলে হবে, তবে নিতান্ত ছেলেমানুষ। প্রত্যেকের সাহস দেখে টারজান মুগ্ধ হয়েছিল। ওর কাছেও তারা সম্ভবতঃ কৃতজ্ঞতা জানাল, ভাষা বুঝবার তো উপায় ছিল না। মুক্ত করা বন্দীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, তার ছোট্ট হাতখানা ধরে টারজানও অভিবাদন জানাল। সে-ও সেই ভাবে মাথা নিচু করে অভিবাদন করল। তারপর সকলের হয়ে ইশারায় ওকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাল। কৌতূহলের চোটে টারজান ওদের সঙ্গে চলল। ওরা হরিণের পিঠে, ও হেঁটে। তবে রওনা হবার আগে মৃতদেহগুলির সমাধি দেওয়া হল। গুরুতর ভাবে আহত হরিণ-ঘোড়া-গুলোকে তলোয়ারের এক কোপে মেরে, পুঁতে ফেলা হল। আর আহতদের হরিণ-ঘোড়ার পিঠে তুলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল।

ছয় ঘণ্টা ধরে ওরা খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে চলল। মাঝে একবার থেমে একটা হিংস্র বনবেড়াল মেরে, তার মুণ্ডু কেটে আর সুন্দর চামড়া খুলে সঙ্গে নিল ওরা। এদিকে আগের দিন থেকে টারজানের পেটে কিছু পড়েনি। এমন সময় নাকে এল বারা হরিণের গন্ধ। যোদ্ধাদের ইশারা করে থামতে বলে, তীরধনুক দিয়ে তাকে মারল টারজান। তারপর রাং থেকে এক টুকরো মাংস কেটে, সেটাকে কাঁচা কাঁচা খেতে দেখে, নতুন বন্ধুদের বড়ই ভাবনা হল। এর পর ওদের ধরে খাবে না তো?

বেলা পড়ে এলে দূরে কয়েকটা মৌচাকের মতো টিপি দেখা গেল। একজন অফিসারের সঙ্গে এক দল যোদ্ধা এগিয়ে এল। তখনো তারা ওকে লক্ষ্য করেনি। করলে কি হবে ভেবে, টারজান নিচু হয়ে আস্তে আস্তে ওর সঙ্গী খুদে সেনাপতিকে ঘোড়াসুদ্ধ তুলে, ইশারায় জানাল নবা-গতদের যেন ওর কথা বুঝিয়ে বলে। তাই করা হল, তার ফলে টারজানও সাদর অভ্যর্থনা পেল।

অভ্যর্থনা করতে যারা এসেছিল তাদের সঙ্গে টারজানের সঙ্গীদের কি সব আলোচনা হল, সম্ভবতঃ ওরি বিষয়, কারণ সবাই ওর দিকে তাকাচ্ছিল। সঙ্গীদের দলপতি আসলে ওর কাঁচা মাংস খাওয়া বিষয়ে সকলকে সাবধান করে দিচ্ছিল। কিন্তু যাকে টারজান উদ্ধার করেছিল, সে বলল যে কাঁচা হরিণের মাংস খেলেও, এতটা পথ একসঙ্গে এসেছে, কই, আর তো কাউকে ধরে খাবার চেষ্টা করেনি। ওর কাছ থেকে তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই।

টিপিগুলোর আরো কাছে গেলেই টারজান বুঝতে পারল ছোট ছোট পাথর দিয়ে সেগুলো তৈরি। ওগুলোর নিচে ভিতরে ঢুকবার গর্ত দেখা যাচ্ছিল। একটা টিপি তখনো অসম্পূর্ণ। অন্য একটা গর্ত থেকে একদিকে সারি সারি কর্মী পাথর নিয়ে বেরুচ্ছে, টিপিতে পৌঁছে দিয়ে, অন্য দিক দিয়ে আবার সেই গর্তেই ঢুকে যাচ্ছে। তাদের কাজের তদারক করছে এক দল রক্ষী। দেখেই টারজানের পিঁপড়েদের বাসা বানানোর কথা মনে পড়ল।

*

এদিকে টারজানের হার গলায় নিয়ে সেই শকুনটা উগোগো নদীর তীরে একটা মরা মোষ খেতে নেমে-ছিল। উগোগো থেকে অনেক দূরে খামিসের মেয়ে উ-হাকে নিয়ে, এস্টেবান কাদের পায়ের শব্দ শুনে ঘন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। হাত দিয়ে উ হার মুখ চেপে, বেচারির বুকের কাছে ছোরা ঠেকিয়ে, পাছে শব্দ করে, সামনে দিয়ে ওবিবির

দুজন চেনা যোদ্ধা চলে গেল, উ-হা তাদের ডাকতে পারল না।

পিঁপড়ে-মানুষদের গাঁয়ে টারজান দিব্যি আরামে ছিল। খুশি হয়েই সে একটা গাছতলায় শুত। একশো দাস-দাসী তার খাবারদাবার এনে দিত। দেশের রাজার নাম আডেগ্রো-হাকিস্। তাঁর ছেলে কমডোফ্লরেন্সলকে টারজান বাঁচিয়েছিল বলে তিনি ওকে বড়ই ভালোবাসেন। ও দেশের ভাষা শেখাবার জন্য কয়েকজন পণ্ডিতকে ঠিক করে দিলেন। টারজানের খুব তাড়াতাড়ি নতুন ভাষা শেখার ক্ষমতা ছিল। দেখতে দেখতে সে কাজ চালাবার মতো শিখেও নিল। কৌতূহলের সঙ্গে ওদের হালচাল দেখত সে। আগে আগে এক দল আরোহী যোদ্ধা পথ থেকে লোক সরিয়ে দিতে দিতে চলত, পাছে কাউকে টারজান না দেখে মাড়িয়ে দেয়।

ওদের বাড়ি করা দেখে টারজান অবাক হল। রাজবাড়ি-টাও ঐ রকম গোল মৌচাকের মতো। তার ভিতের ব্যাস দু'শ কুড়ি ফুট, বাড়িটা একশ দশ ফুট উঁচু, তাতে ছত্রিশটা তলা, সেখানে আশি হাজার লোক থাকতে পারে। অন্য বাড়িগুলোও এরি কাছাকাছি হবে। সব বাড়ি এই ভাবেই তৈরি, তবে একটু ছোট। সবগুলোর আগাগোড়া শক্ত পাথরের গাঁথুনি। অন্য কিছু ব্যবহার করা হয় না। নিচে চারদিকে চারটে যাতায়াতের পথ। ভিতরে অনেকগুলো তলা। চুণসুরকির বদলে অ্যাস্ফল্ট বা শিলাযতু দিয়ে জোড়াগুলো পাকা করা হয়েছে। এই রকম দশটা বাড়ি ছিল গ্রামে। তাতে পাঁচ লক্ষ লোক বাস করত। তাদের মধ্যে দু-ভাগ হল দাসদাসী আর এক ভাগ নাগরিক। আরো পঞ্চাশ লক্ষ বন্দী বাস করত, যেখানে মাটির তলা থেকে পাথর কেটে আনা হত, তার তলায় মাটির নিচেকার ঘরে। সে ঘরগুলোও শুকনো ঝরঝরে কারণ মাটির তলাকার জল ঝরে যাবার স্বাভাবিক ব্যবস্থা ছিল। বাড়িগুলোর গোল ছাদের ঠিক মধ্যিখানে বাতাস চলাচলের জন্য একটা বেশ বড় চোঙার মতো ফাঁক একেবারে মাটির তলা পর্যন্ত চলে গেছিল। খুব আরামেই থাকত ওখানকার অধিবাসীরা।

ভাষার সঙ্গে ওখানকার হালচাল নিয়ম-কানুনও শিখে নিল টারজান। দাসদাসী সকলে হয় যুদ্ধবন্দী, নয়তো বন্দীদের বংশধর। তাদের সঙ্গে মোটের ওপর ভালো ব্যবহারই করা হয়। অনেকে এত পুরুষ ধরে এখানে দাসত্ব করেছে যে তারা এখানকার নাগরিকদের মতোই হয়ে গেছে। কিন্তু সদ্য যারা বন্দী হয়েছে, তাদের ভয়ানক খাটানো হয়।

খনিতে পাথরের খাতে, বাড়ি তৈরির ভারি কাজে, তাদেরি লাগানো হয়। তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলা হয়। যাদের মধ্যে এতটুকু শিল্পগুণ দেখা যায়, তাদের অমনি খনি থেকে মৌচাকে থাকবার জায়গা দেওয়া হয়। দাস থেকে তারা ভদ্র নাগরিক হয়ে যায়। তাছাড়া কোনো দাস বা দাসীর সঙ্গে যদি তাদের চেয়ে উঁচু শ্রেণীর নাগরিকের বিয়ে হয়, তারাও সেই নাগরিকের শ্রেণীতে উঠে যায়।

এই উদার নিয়মের কারণও বলেছিল কমডোফ্লরেন্সল। অনেক কাল আগে শত্রুরা এই ট্রোহানাদলমাকুস নগর আক্রমণ করে তচনচ করে দিয়েছিল। বহু যোদ্ধা মরেছিল। তার চেয়েও বেশি বন্দী হয়েছিল।. কিছু বেঁচে ছিল, তার একমাত্র কারণ হল যে এখানকার নতুন বন্দীরা বীরের মতো তাদের জন্য লড়েছিল। উঁচু বংশের যোদ্ধাদের চাইতে দাসরা ঢের বেশি বলিষ্ঠ। যুদ্ধের পর এখানকার রাজা এর কারণ জানতে চাইলে, তাঁর সব চাইতে কম-বয়সী সেনাপতি বলেছিল, 'আমাদের এই মিনুয়ান গোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে নিজেদের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়েছে। তাজা রক্ত না মিশলে গোটা জাতিটাই দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য। কাজেই রাজার উচিত অন্ততঃ সব যোদ্ধাদের বন্দিনী বা দাস-কন্যা বিয়ে করতে বাধ্য করা। তাছাড়া উচ্চ বংশীয় কেউ যদি দাসের মেয়ে কি ছেলে বিয়ে করে, সেই মেয়ে কি ছেলেকেও উচ্চ বংশে নিয়ে নিতে হবে।

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার স্ত্রীও কি যুদ্ধে বন্দী হয়ে এসেছিলেন?'

রাজকুমার বলল, 'আমার বিয়েই হয়নি। আমরা ভেল্টোপিসমাকুসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। ওখানকার রাজকুমারী জান্‌জারা সব দিক দিয়ে আডেগ্রো-হাকিসের ছেলের স্ত্রী হবার যোগ্যা।'

শুনে টারজান তো অবাক, কিন্তু তোমাদের যদি পরস্পরকে পছন্দ না হয়?'

রাজকুমার বলল 'তাতে কি এসে যায়।' শুনে টারজান অবাক হল।

যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগল। টারজান লক্ষ্য করল সদ্য এক পুরুষের বন্দীদের সর্বদা চোখে চোখে রাখা হয়, পাছে পালায়। তাদের পোষাক দেখলেই চেনা যায়। হাঁটু অবধি লম্বা সবুজ একটা জোব্বা। তার বুকে আর পিঠে কালো হরফে লেখা বন্দীর আদি বাসের আর বর্তমান

মালিকের নাম। ঘরামি মিস্ত্রিরা সবাই রাজার সম্পত্তি।

সাদা জোব্বায় লাল অক্ষরে নামধাম লেখা দাস-দাসীও ছিল। তারা বোধহয় আরেকটু উঁচু স্তরের নয়তো দ্বিতীয় পুরুষের বন্দী। এদের কাজ নিম্নস্তরের কাজের তদারকি করা। মালিকদের হরিণ ঘোড়া হাঁটানো, কিম্বা স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করা। অনেকটা স্বাধীন নাগরিকদেরি মতো তারা। অনেকের বুকে কি কাঁধে ছোট একটা চিহ্নও ছিল। তা দেখে বোঝা যেত ওরা কে কি কাজ করে।

যোদ্ধাদেরো নিপুণ স্যাকরা বা ঐরকম কিছু হতে বাধা ছিল না। ব্যবসা করে অনেকে বেশ ধনী হয়ে উঠেছিল। কারো হয়তো ক্ষেত-খামার ছিল। মাঝে মাঝে টারজান ওর বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করত ঐ কাঁটাবন ভেদ করে যাওয়া যায় কি করে? ওরা তাতে বলত, ও আর এমন কি শক্ত কাজ? কিন্তু ভেদ করেই বা কি হবে? কাঁটাবনের বাইরে তো কিছুই নেই। এখানে নদী বন মাঠ পাহাড় ক্ষেত-খামার সব আছে। যাবার দরকারই বা কি? টারজান ভাবত ওরা খুদে মানুষ, ওরা হয়তো কাঁটাবনের ফাঁক ফোকর দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ও তো আর তা পারবে না।

এই ভাবেই দিন কাটছিল। হঠাৎ এক দিন সকালে সব পাল্টে গেল।

*

এদিকে শকুনটা মোষ খেতে খেতে দেখে একটা সিংহী আসছে। তাড়াতাড়ি উড়ে পালাতে যাবে, কিসে যেন বাধা পেল। গলার হারটা মোষের শিং-এ জড়িয়ে গেছে! সিংহীটাও ওকে লাফঝাঁপ করতে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে পালাল।

টারজান চলে আসবার পর সেই ছেলেটা ওকে অনেক খুঁজেছিল। ওকে না পেয়ে অন্য দুজন ভীতু পুরুষের সঙ্গে সে দিন কাটাতে লাগল। তারা ওর বর্শা আর তীরধনুক দিয়ে শিকার করা দেখল, কিন্তু উচ্চবাচ্য করল না। তারপর এক দিন এক ভীমা মেয়েমানুষ এসে হাজির। অন্য পুরুষ দুটো তো ভয়েই মরে। এবার একজনকে নিশ্চয় ধরে নিয়ে যাবে! ভাববামাত্র যে যেদিকে পারল গা-ঢাকা দিল। ছেলেটা ধনুকে তীর লাগিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল। তার সব ভয় কেটে গেছিল। মেয়েমানুষটা পুরুষের এমন আস্পর্ধা দেখে ভীষণ রেগে কোমর থেকে একটা ঢিল খুলতে গেল। তাই দেখে ছেলেটা ওর বুকে একটি মাত্র তীর ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেলল। আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখে অন্য লোক দুটো যেমনি অবাক, তেমনি খুশি। তাদের মনেও কেমন একটা সাহস এল। এই অত্যাচারীদের তাহলে মেরে ফেলা যায়। তারাও বর্শা আর তীর ছোঁড়া অভ্যাস করতে লাগল।

সেদিন সূর্য উঠবার আগে টারজান গাছতলায় নরম ঘাসের বিছানায় আরাম করে শুয়েছিল। এখুনি ভোর হবে, এমন সময় মনে হল মাটি কাঁপছে। এ ভূমিকম্পের মাটির তলা থেকে কাঁপা নয়, এ হল অনেক মানুষ আর ঘোড়ার ভারে মাটি কাঁপা। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে রাতের প্রহরীদের দলপতিকে জানান দিল টারজান। অমনি সাজ সাজ রব উঠল। রাজা, রাজকুমার, তাঁদের পারিষদ্‌বর্গ সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। কারো মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না যে এরা সেই ভেল্টোপিসমাকুশিয়ানরা ছাড়া কেউ হতে পারে না। এদের রাজকুমারীকেই বিয়ে করার কথা কমডোফ্লরেন্সল বলেছিল।

দেখতে দেখতে ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। দু'পক্ষকেই এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়তে দেখে টারজান আশ্চর্য হয়ে গেল। আক্রমণকারীরা দলে অনেক বেশি ভারি। ক্রমে আডেগো-হাকিসের যোদ্ধারা হটে যাচ্ছে দেখে, টারজানও লড়াইয়ে নেমে পড়ল। একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়েছিল সে, তাই দিয়ে শত্রুদের ঝেঁটিয়ে সরাবে ভেবেছিল। তারা যে এত বড় বীর যোদ্ধা, অস্ত্র চালনায় অশ্ব চালনায় এত দক্ষ, সে কথা টারজান স্বপ্নেও ভাবেনি।

একেবারে সামনের সারিতে এগিয়ে গেছিল টারজান। খালি হাতে খুদে মানুষগুলোর সঙ্গে দারুণ লড়েছিল, কিন্তু হলে হবে কি বার কতক পেটে কিসের আঘাত লাগল, তলোয়ার আর বর্শার খোঁচায় সারা গা থেকে এত রক্ত ঝরল যে শেষে আরেকবার পেটে লাগার পরেই চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। তারপর কখন বেহুঁস হয়ে পড়েও গেল।

সেখান থেকে অনেক দূরে উ-হা একটা কাঁটার বোমার মধ্যে শুয়ে শুয়ে ঘুমন্ত এস্টেবানের দিকে মনের সমস্ত ঘৃণা আর আক্রোশের সঙ্গে তাকিয়ে দেখছিল। ধুনির আলোয় ছায়াগুলো নড়ছিল, একটা সিংহ মানুষের লোভনীয় গন্ধ ছেড়ে যেতেও পারছিল না আবার আগুনের আভায় ছায়াগুলোকে নড়তে দেখে এগোতেও সাহস পাচ্ছিল না। যখন লোকটার নিশ্বাস শুনে বোঝা গেল সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, উ-হা তখন নিঃশব্দে উঠে তার মাথার পিছনে সজোরে মারল একটা মুগুরের বাড়ি। ঘুমের মধ্যেই এস্টেবান জ্ঞান হারাল আর উ-হা আস্তে আস্তে উঠে তার কোমর থেকে পাথরে ভরা থলিটা খুলে নিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে রওনা হয়ে গেল। এখন আর তার বনের মধ্যে একা চলতে তত ভয় করে না, যতটা করে এই নিষ্ঠুর লোকটার সঙ্গে থাকতে। যদিও সে এত দিনে বুঝে নিয়েছিল ও নদীর পিশাচও নয়, টারজানও নয়। তারা হল অসমসাহসী। এর মতো ভীতু নয়।

জানোয়ার-চলা পথ ধরে উ-হা এগিয়ে চলল। টেরও পেল না যে একটা সিংহ তার পিছু নিয়েছে।

*

জ্ঞান হতেই টারজান দেখল সে একটা বড় ঘরের মাটির মেঝের ওপর শুয়ে আছে। ঘরে আরো অনেক লোক আছে। মাপে তারা ওরি সমান। ঘরের দু'মাথায় দুটো প্রকাণ্ড মোমবাতি জ্বলছে। সেগুলোকে দেখে মনে হল ছ ফুট মতো লম্বা। এত দিন পর্যন্ত প্রোহানাদলমাকুস আর ভেল্টোপিসমাকুসের খুদে মানুষ দেখে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছিল। এরা আবার কারা? এবার টারজান টের পেল তার হাত দুটো পাছমোড়া করে বাঁধা এবং খুব টাটিয়ে আছে। তবে পা খোলা। অনেক কষ্টে উঠে বসে, চারদিকে তাকিয়ে দেখল। শরীরটা বড়ই দুর্বল। ঘরে কতকগুলো টেবিল আর বেঞ্চি। তার ওপর কেউ কেউ শুয়েছিল, মাটিতেও অনেকে শুয়েছিল। সকলেরি খুদে যোদ্ধাদের মতো পোষাক, কিন্তু সকলেই প্রমাণ-মাপের।

টারজানকে উঠে বসতে দেখে, একজন বলল, 'কি হে, বিশাল শরীর নিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারলে না আর এখন তো আমরাও তোমার সমান হয়ে গেছি।'

ইচ্ছা করে টারজান হাঁড়িমুখ করে বসেও ছিল। উত্তর না পেয়ে, ওরা ভাবল বোধ হয় সে বুঝতে পারেনি। একজন বলল, 'লোকটা ঐ গুহাবাসী জানোয়ার মেয়েগুলোর মতো বোবা নাকি?'

আরেকজন বলল, 'ও-ও হয়তো তাই।'

—'না। তাদের পুরুষরা বেজায় ভীতু হয়। এ তো সিংহের মতো খালি হাতে লড়েছিল। একবারো পিছপাও হয়নি। যোদ্ধা আর ঘোড়া দু হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল, যতক্ষণ না নিজে অচেতন হয়ে পড়ে গেল। বীর বটে।'

ওরা ওর ক্ষতগুলোতে ওষুধের গুঁড়ো লাগিয়ে দিয়ে, খাবারদাবার, হরিণের দুধ আর পানীয় জল এনে দিল। একজন বলল, 'সাত দিনেই সেরে উঠে পাথরের খাতে কাজ করতে পারবে।'

টারজানের হাতের বাঁধন খুলে, কোমরে একটা খেলো চেন আর তালার ব্যবস্থা হল। তারপর ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। তার থেকে বোঝা গেল যুদ্ধের ফলাফল এদের পক্ষেও সুবিধার হয়নি। হতাহতের সংখ্যা বড় বেশি, বন্দীও হয়েছে অনেকে। টারজান যেটা বুঝতে পারছিল না, সেটা হল—ওরা কি করে ওর সমান বড় হয়ে গেল? আরো অবাক হল, টারজান যখন ঘরের বাইরে তাকিয়ে অনেকগুলি আরোহী যোদ্ধাকে দেখল, যাদের নিজেদের আর হরিণ-ঘোড়াদের আকার প্রমাণ মাপের।

বাস্তবিকই দিন সাতেকের মধ্যে ঘা-গুলো শুকিয়ে গেল। তারপর জনা সাতেক যোদ্ধা এসে ওকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজার নাম এস্কোমোয়েলহেগো। করিডরে, সভাঘরে অনেক সাদা আর সবুজ জোব্বা পরা বন্দীও ছিল। সকলেই স্বাভাবিক মাপের। ওপরে উঠবার সিঁড়ি দেখল কয়েকটা, কিন্তু নিচে নামার সিঁড়ি না দেখে মনে হল এটা তাহলে একতলা হবে। একটা ঘর পেরিয়ে গেল ওরা, তার দেয়ালে সারি সারি তাক। সেই তাকে নানা রকম কারিগরি জিনিস, মোমবাতি, শিরস্ত্রাণ, বেল্ট, চটি, কাপড়চোপড়, বাসনপত্র। এ-সব টারজান মনুয়ানদের ঘরেও দেখেছিল। ঐ ঘরে টারজানকে একটা সবুজ জোব্বা দেওয়া হল। ওর সামনেই কর্মীরা জামাটার বুকে পিঠে ছাপ মেরে দিল। তখনো পড়তে শেখেনি, তাই নিজের মালিকের নাম বুঝতে পারল না। সঙ্গে যে যোদ্ধারা ছিল, তাদের একজন বলল, 'মালিকের নাম জোনথোহেগো।'

জামাটা টারজানকে পরানো হল। পায়ে স্যাণ্ডাল পরানো হল।

যতই এগোয় টারজান দেখে ঘরদোরের সাজসজ্জা ততই বেশি। দেয়ালে যুদ্ধের নানা দৃশ্য আঁকা, শিকারের দৃশ্যও

ছিল। ছবিগুলো খুব রংচঙে, মোমবাতিগুলোও তাই। এদিকে সবুজ উর্দিপরা দাস আর চোখে পড়ছিল না। যোদ্ধাদেরো খুব সাজের ঘটা। এমন কি সাদা পোষাকের বন্দীদের গায়ে পর্যন্ত দামী গয়নাগাঁটি। চারদিকে উজ্জ্বল আলো।

অবশেষে একটা সোনাবাঁধানো দরজার সামনে ওরা পৌঁছল। যোদ্ধাদের দলপতি দ্বাররক্ষীকে বলল, 'রাজার আদেশ মতো জোনথ্রোহেগোর বন্দীকে উপস্থিত করা হল।'

একটু পরেই মস্ত দরজা খুলে গেল, ওরা সকলে ভিতরে ঢুকল। ঘরের এক মাথায় মঞ্চের ওপর রাজার সিংহাসন। বড় বড় কারুকার্য করা থাম, দেয়ালে আর ছাদেও রংচঙে কারুকার্য। সিংহাসনের দু-পাশে দুটো দরজার সামনে দুজন যোদ্ধা দাঁড়িয়ে ছিল; ঘরে লোক ছিল না। ওরা একটু এগোলে, পাশের একটা দরজা খুলে দেওয়া হল। ভিতরে ছোট ছোট কারিকুরি করা বেঞ্চিতে ছ জন যোদ্ধা সেজেগুজে বসে ছিল। সপ্তম জন একটা চেয়ারে আলাদা বসেছিল। তার মেজাজ খুব ভালো মনে হল না। ঘরে ঢুকেই টারজানের রক্ষীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, যতক্ষণ না ঐ লোকটি ওদের দিকে চোখ ফেরাল। তারপর ওদের দলপতি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, 'হে সর্বশক্তিমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, আপনার আদেশ মতো জোনথ্রোহেগোর বন্দীকে উপস্থিত করা হল।'

রাজা বললেন, 'উঠে, ওকে আমার কাছে আনো।' রক্ষীদের বললেন, 'এই দৈত্যকে জোনথ্রোহেগো বন্দী করে এনেছে। জোনথ্রোহেগোর বাজির কথা শুনেছ তো?'

—'শুনেছি, হুজুর।'

—'তোমাদের কি মত?'

—'আপনার যা মত, আমাদেরো তাই।'

—'তার মানে?'

সব চেয়ে তফাতে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে তার পাশের লোকটিকে বলল, 'তা ওঁর মতটা কি?'

রাজা বললেন, 'কি বললে, গোফোনোসো?'

—'আমরা বলছিলাম কি জোনথ্রোহেগো যদি মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ না করে থাকেন, তিনি বাজি হারতে বাধ্য।'

রাজা বললেন, 'তা অবিশ্যি ঠিক। জোনথ্রোহেগো আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিল। আমিই ঐ ভাইব্রেটরি নিয়মটা আবিষ্কার করেছিলাম, যার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। তবে স্থায়ী ফল পাওয়া যায়নি এতকাল। এবার মনে হচ্ছে অন্ততঃ উনচল্লিশটা চান্দ্রমাস প্রভাবটা টিকবে। তাই নিয়েই বাজি। জোনথ্রোহেগো হারলে দলফাস্টোমা-লোকে এক হাজার দাস দিতে হবে।'

গোফোলোসো বলল, 'আমাদের কত সৌভাগ্য যে এমন বিদ্বান বুদ্ধিমান রাজা পেয়েছি।'

রাজা বললেন, 'এর উল্টোটাকে যখন সম্ভব করা যাবে, সেটা আরো বড় সাফল্য হবে। একদিন জোনথ্রোহেগোকে তার ফরমূলাও দিতে পারব। তখন আমরা মাত্র একশত যোদ্ধা নিয়ে বিশ্ব জয় করে আসব।'

হঠাৎ টারজানের ওপর রাজার চোখ পড়ল, 'কোন শহর থেকে এসেছ তুমি?'

রক্ষীদের প্রধান বলল, 'হুজুর, ও কথা বলে না।'

—'শব্দও করে না?'

—'শুনিনি তো, হুজুর।'

—'তাহলে ও ঐ বোবাদের বংশেরি হবে। তা একে নিয়ে এত হৈ-চৈ করা কেন?'

অমনি খোশামুদে সভাসদ্‌রা বলতে লাগল, 'তা তো বটেই।'

— দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে।'

—'আমাদের রাজামশাই কি কখনো ভুল বলেন!'

রাজা এতক্ষণ টারজানকে নজর করে দেখছিলেন। এবার বললেন, 'না, মোটেই সেরকম চেহারা নয়। কান দেখ, মাথা শরীরের গড়ন দেখ। বুদ্ধিমানের অনেক লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।'

এই সময় অন্য একটা দরজা খুলে একজন যোদ্ধা এসে বলল, 'হুজুর, রাজকুমারী এই অদ্ভুত বন্দীকে দেখতে চাইছেন।'

রাজা বললেন, 'তাকে আসতে বল।'

এলেন রাজকুমারী। কুমারী মেয়েরা এদেশে যেমন পরে থাকে, তেমনি ধবধবে সাদা পোষাক পরা। দেখতে অত্যন্ত সুন্দরী। একেই কমডোফ্রেরেন্সল বিয়ে করতে চায়! মেয়েটা কিন্তু ভুরু কুঁচকে বলল, 'জানোয়ারটার হল কি? কাঠের তৈরি নাকি?'

রাজা বললেন, 'ও আমাদের ভাষা জানে না। এসে অবধি কোনো শব্দই করেনি।'

রাজকুমারী চটে গেলেন, 'বদমেজাজি কদাকার জানোয়ার একটা! আওয়াজ করে কি না দেখাচ্ছি!'

এই বলে কোমর থেকে একটা পাতলা ছোরা বের করে দিলেন টারজানের হাতে বসিয়ে। টুঁ শব্দ করল না টারজান।

আরেকবার ছোরা তুলতেই রাজা কড়া গলায় বললেন, 'ঢের হয়েছে, জানজারা। একে নিয়ে আমরা গবেষণা করছি। ওর কোনো ক্ষতি হতে দেব না।'

—'ওর আস্পর্ধা কম নয়। আমার দিকে তাকিয়েছিল। ওকে মেরে ফেলা উচিত।'

রাজা বললেন, 'ও তোমার সম্পত্তি নয়। ওর মালিক জোনথ্রোহেগো।'

রাজকুমারী বললেন, 'তাহলে তাকে ডাকা হক। আমি একে কিনব।

*

এস্টেবানের মাথায় উ-হা যে বাড়িটা মেরেছিল সেটা এমন জায়গায় পড়ে ওর মস্তিষ্কটা জখম করেছিল যে জ্ঞান হলে সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। তার বোধ-শক্তি নষ্ট হয়ে, সে একেবারে জড়বুদ্ধি হয়ে, যন্ত্রচালিতের মতো অস্ত্র-শস্ত্রগুলোকে নিয়ে বনে চলে গেল। পাথর কোথায় গেল, উ-হার কি হল, সে-সব কথা মনেও হল না। কিছু মনে করবার ক্ষমতাই ছিল না তার।

উ-হার ইচ্ছা ছিল এস্টেবান যেন না মরে, অনেক দিন ধরে কষ্ট পায়। কিন্তু তার কষ্ট পাবার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেছিল।

একটা সিংহ একটা জানোয়ার মেরে খাচ্ছিল। তাই দেখে এস্টেবান কিছু না বুঝেই গাছে উঠল।

এদিকে জানজারার টারজানকে কেনা হল না। বাপ কড়া ভাবে মানা করে দিয়ে, টারজানকে পাথরের খাতে পাটিয়ে দিলেন। টারজানকে এক দরজা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, রাজাও অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মন্ত্রীরা ছ'জন তাঁকে নিচু হয়ে নমস্কার করে বিদায় দিল। তারপর নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা করতে লাগল। কেউ কোথাও নেই দেখে একজন বলল, 'আহাম্মুকটা গেছে তা হলে?'

আরেকজন বলল, 'এমন দাম্ভিক লোক কেউ কখনো দেখেছে?'

অন্য একজন বলল, 'ভাবে বুঝি ওর ছাড়া কারো বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই! মাঝে মাঝে মনে হয় আর সহ্য করা যায় না!'

এ-কথা শুনে গোফোলোসো বলল, 'তবু সহ্য করবে, গেফাস্টো, ভেন্টো পিসমাকুসদের যোদ্ধাদের প্রধানের পদ কি এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া যায়?'

খনিমন্ত্রী টর্ণডালি বলল, 'বিশেষতঃ সেই সঙ্গে যদি পৈত্রিক প্রাণটাও ছেড়ে যায়।'

স্থাপত্যমন্ত্রী মাকাহেগো বলল, 'কিন্তু কি আস্পর্ধা ওর! গবেষণা করে সফল হল জোনথ্রোহেগো আর এ বলে কি না কৃতিত্বগুলো সব ওর আর বিফলতাগুলো জোনথ্রোহেগোর!'

চাষমন্ত্রী থ্রোওয়াল্ডো বলল, 'ওর ঐ দম্ভের কারণে দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। ওর মন্ত্রী নির্বাচন দেখেই বুদ্ধির দৌড় বোঝা যায়। প্রজারা কি বলে কে জানে!'

—'তারা বলে আমরা কতখানি জানি তাই দেখে পদ পাইনি, বরং কতখানি জানি না দেখে পদ পেয়েছি। আমাকে দেখ না, আমি ঘোড়া ট্রেন করি, দশ হাজার বন্দী পরিচালনা করি, এই শহরের যত খাদ্যশস্য দরকার তার অর্ধেক আমি ফলাই, আমাকে করা হয়েছে প্রধান মন্ত্রী। থ্রোওয়াল্ডো একটা গাজরের কোন দিকে পাতা, কোন দিকে শেকড় তাই চেনে না, ও হল চাষমন্ত্রী। মাকাহেগো একশো মাস খনির দাসদের চালিয়েছে, ও হল স্থাপত্যমন্ত্রী। কিন্তু টর্ণডালির মতো স্থপতি এ যুগে জন্মায়নি, সে হল খনিমন্ত্রী। খালি গেফাস্টো আর ভেস্টাকো ঠিক আসন পেয়েছে। ভেস্টাকো হল রাজবাড়ির ব্যবস্থাপনার মন্ত্রী, তার মানে রাজা সুখে থাকবেন। আর গেফাস্টো ছিল সুখের পায়রা, তাকে করলেন সামরিক মন্ত্রী। তবে ঐখানেই ভুল করলেন, কারণ তার মধ্যে যে এতবড় সামরিক প্রতিভা লুকিয়ে ছিল, তাই বা কে জানত!'

গোফোলোসো আরো বলল, 'ও না থাকলে যুদ্ধে সেদিন হয়ে গেছিল!'

গেফাস্টো বলল, 'যেই দেখলাম ওরা খবর পেয়ে গেছে, তখনি আমি এগোতে বারণ করেছিলাম। উনি শুনলেন না। পরে যখন দেখলাম বড়ই ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, তখন দলবল নিয়ে হটে এসেছিলাম। তাই হতাহতের সংখ্যা খুব বেশি হয়নি।'

গোফোলোসো বলল, 'যোদ্ধারা তোমার মতো রাজা চায়, যে যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব করতে পারে।'

মাকাহেগো বলল, 'এবং আগের মতো আবার মদ খেতে দেয়।'

খালি ভেস্টাকো বলল, 'এ-রকম কথা বিশ্বাসঘাতকতার মতো শোনাচ্ছে।'

একজন বলল, 'আরে আমরা তামাসা করছিলাম। তোমার কি রসবোধও নেই?'

—'রাজার তো আছে। তাঁকে বলে দেখব কি বলেন।'

এবার সকলে ঘাবড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকে সাদা উর্দি পরা একশো বন্দী ঘুষ দিতে রাজি হলে, তবে ভেস্টাকো ঠাণ্ডা হল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গেফাস্টো আর গোফোলোসো নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। গেফাস্টো বলল, 'দেশটার কি অবনতি হয়েছে দেখ। অনেক দিন সুখ শান্তি ভোগ করলে মানুষে বিলাসী আর ভোগসর্বস্ব হয়ে পড়ে। তাদের পৌরুষ নষ্ট হয়। এই জন্যেই মাঝে মাঝে যুদ্ধ দরকার হয়। আমরা এত বিলাসী হয়ে গেছি যে তার জন্য টাকা জোগাতে পারি না, তাই বেশি করে ট্যাক্স বসাতে হয়। গরীবরা কষ্ট পায়।'

গোফোলোসো বলল, 'কিন্তু বেশি ট্যাক্স তো ধনীরাই দেয়।'

—'তারা গরীবদের কাছ থেকে আদায় করে। এদিক থেকেও মদ বন্ধ করা ভুল হয়েছে। মদ বিক্রির কর আদায় হয় না। উল্টে চোলাই মদ বন্ধ করার খরচা আছে, বে-আইনী বিক্রি বন্ধ করতে টাকা লাগে। এ সব টাকা বেঁচে গিয়ে, অর্থকোষে জমা হলে, ট্যাক্সও কমে যেতে বাধ্য। এবার যাও ভেস্টাকোর একশো দাস তাকে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

গেফাস্টো নিজে কিছু দিতে রাজি হয়নি। উল্টে বলেছিল, 'সাবধান, আমার যোদ্ধারা আমাকে ভালোবাসে। আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করতে এলে, পাঁজরায় ছোরা ঢুকে যেতে পারে।'

ঘাবড়ে গিয়ে ভেস্টাকো ওকে আর ঘাঁটায়নি।

*

আটটি মৌচাক-বাড়ির সিকি মাইল দূরে একটা খাত থেকে নবম বাড়ির জন্য পাথর কাটা হচ্ছিল। সেই খাতে টারজানকে নিয়ে যাওয়া হলো। কর্মাধ্যক্ষ যখন শুনল লোকটা বোবা, নামটাম বলতে পারে না, ভাষাও জানে না, তখন খাতায় লিখল, নাম—জুয়ানথ্‌ল, অর্থাৎ দৈত্য। মালিক—জোনথ্রোহেগো। রাজার হুকুম ওকে হাল্কা কাজ দিতে হবে আর দেখতে হবে শরীরের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। একটা বিশেষ নম্বরও টারজানকে দেওয়া হলো। এ সব একটা গোল কাপড়ের টুকরোতে ছেপে ওর জোব্বার বাঁ কাঁধে পিন্ করে দেওয়া হলো।

তারপর রক্ষী ওকে ছোট একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে হাঁটিয়ে একটা চওড়া আর আলোকিত সুড়ঙ্গে পেঁছিল। অনেক সবুজ পোষাক পরা কর্মী ঐ দিকেই যাচ্ছিল। সকলেরি খালি হাত। মেঝেটা ঢালু হয়ে ক্রমে নেমে যাচ্ছিল, তারপর বাঁ দিকে ঘুরে সাপের মতো বড় বড় পাক খেয়ে আরো নিচে নামতে লাগল। ছাদ আর দেয়াল কাঠের তৈরি, মেঝেটা বহু দিন ধরে বহু লোকের চলার ফলে মোলায়েম মসৃণ। একটু দূরে দূরে কুলুঙ্গিতে মোমবাতি বসানো। সমান দূরে দূরে এটা থেকে অন্য সুড়ঙ্গও বেরিয়ে গেছে। মোড়ের মাথায় সাইনবোর্ডের মতো বোধ হয় মিনুনি ভাষায় গলির নম্বর-টম্বর দেওয়া আছে। পরে শুনেছিল ওগুলো সুড়ঙ্গটা কোন তলায় তার সংখ্যা। সবগুলো গিয়ে মধ্যিখানের গোল সিঁড়িতে শেষ হয়েছে। সুড়ঙ্গ দিয়ে সোজা খাতের মধ্যে নামা যায়, খাতের সেই স্তরেরো ঐ একই সংখ্যা। কিছু দূরে দূরে বাতাস চলাচলের চোঙা আর বিপদ হলে বেরোবার পথ আছে, একেবারে সবচেয়ে নিচের স্তর থেকে ছাদ পর্যন্ত।

প্রত্যেক স্তরে কয়েকজন কর্মী এক-একটা গলিতে ঢুকে পড়ছিল। সে সব গলির আলো গোল সিঁড়ির মতো উজ্জ্বল নয়। ওরা যখন টারজানের হিসাব মতো পনেরো ফুটে এক স্তর ধরলে, ভূগর্ভে পাঁচ শ চল্লিশ ফুট নেমেছে, রক্ষী তখন ওকে নিয়ে একটা গলিতে ঢুকে একটা গোল করিডরে পেঁছিল। সেখানে পাথর নিয়ে একদল কর্মী এক দিকে চলেছে, কাঠের তক্তা নিয়ে অন্য দল উল্টো দিকে চলেছে। দু দলের সঙ্গেই খালি হাতে অনেক কর্মী ছিল। এখানে পেঁছে আরেকজনের কাছে টারজানের ভার দিল রক্ষী। এই লোকটাকে ভেন্টাল বলে। এর দলে দশজন কর্মী থাকে। এই ভেস্টালের নাম কালফাস্টোবান।

ভেন্টাল বলল, 'এই নাকি সেই দৈত্য! একেই বেশি খাটানো চলবে না! এ আবার কি রকম দৈত্য বাপু? মাথায় তো আমারি সমান! দেখ, যে যাই বলুক, না খাটলে বেত খাবে।' কেমন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের সুরে কথাগুলো বলল।

চলে যাবার সময় রক্ষী বিরক্ত হয়ে বলল, 'ভালো চাও তো ভালো ব্যবহার করবে। রাজার হুকুম।'

—'আমি রাজাগজাকে ভয় পাই না, বিশেষতঃ ঐ ব্যাটাকে যে এখন সিংহাসনে চেপে আছে।'

—'যাই হক, হুকুম মানলে ভালো হবে। এ বোবা হতে পারে, কিন্তু এ-ই এখন সকলের আলোচ্য পাত্র। এরি জন্য রাজা জোনথ্রোহেগোকে এতই হিংসে করেন যে পারলে তার পাঁজরার ফাঁকে ছুরি চালান, নেহাৎ তাহলে তাঁকে বাহবা দেবার কেউ থাকবে না, তাই দিচ্ছেন না। সে যাই হক,

জুয়ানথ্রোসের যত্ন কর।'

রক্ষী চলে গেলে ভেন্টাল টারজানকে একটা নতুন সুড়ঙ্গের দেয়ালে কাঠ বসানোর কাজে লাগিয়ে দিল। কাজটা একটুও কঠিন নয়। টারজান চারদিকে চেয়ে দেখবার সময় পাচ্ছিল। ভেন্টাল লোকটার সব তেজ মুখেই, কাজ করে গেলে সে কিছু বলত না। যে প্রশ্নটা টারজানকে ভাবিয়ে তুলেছিল সেটা হল সাজে চেহারায় এরা তো সেই খুদে মানুষদের মতোই আছে। আকারে হঠাৎ এত বড় হয়ে গেল কি করে? এরা ওকে যুদ্ধে বন্দী করার কথাও বলছিল। এদিকে বাড়িঘর, আসবাব ইত্যাদি সবই বড় বড়। টারজান জানত একটু ধৈর্য ধরে থাকলে পালাবার সুযোগও পাওয়া যাবে। এখানকার সকলেই রাজার ওপর বিরক্ত। এর ফলে শাসনকার্যেও অব্যবস্থা থাকতে বাধ্য। তারি সুবিধা নিতে হবে। একটু চোখকান খুলে রাখা দরকার।

কাজে ঠাসা দীর্ঘ দিনটা এক সময় শেষ হল। কর্মীদের বাসস্থানগুলো তাদের কর্মস্থলেরি কাছাকাছি। অন্য কয়েকজনের সঙ্গে ওকেও পঁয়ত্রিশতম স্তরের সুড়ঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল, তার অন্য মাথায় একটা বড় ঘরের মতো। তাতে পথ এত নিচু যে হামা দিয়ে ঢুকতে হয়। সবাই ঢুকলে, ভারি ঢুকবার দরজাটা বন্ধ করে, বাইরে সারারাত দুজন যোদ্ধা পাহারা দেয়। এই ঘরটা এতই বিশাল যে পুরুষ মেয়ে সব নিয়ে পাঁচ হাজার কর্মীর জায়গা হয়েছে। মেয়েরা ছোট ছোট উনুন জ্বেলে রান্না করছিল। তার ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ছাদের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এতগুলো উনুনের এত কম ধোঁয়ার কারণ খুব ভালো কাঠকয়লা ব্যবহার করা হচ্ছিল। সবাই কেন দম বন্ধ হয়ে মরছে না আর মাটির এতটা নিচের ঘরে বাতাসটাই বা কি করে এত তাজা থাকে, এ সব বোঝা টারজানের বুদ্ধির বাইরে। তার ওপর মেঝেতে বিশাল ছয়টা মোমবাতি জ্বলছিল আর দেয়ালের কুলুঙ্গিতে ছোট ছোট আরো অনেকগুলো।

কর্মীদের মধ্যে শিশু থেকে আধাবয়সী সব ছিল, তবে একজনও বুড়ো ছিল না। মেয়েদের আর ছোটদের রং খুব ফর্সা তার কারণ অনেকেই জীবনে কখনো দিনের আলো দেখেনি। ছোটরা একটু বড় হলে অবিশ্যি কাজকর্ম শিখবার জন্য বাইরে আসত। কিন্তু বন্দী মেয়েরা মাটির নিচেই জীবন কাটাত। যদি না কোনো ভেল্টোপিসমাকুসিয়ান যোদ্ধা কাউকে বিয়ে করে ওপরে নিয়ে যায়। তবে সেটা কদাচিৎ হত, কারণ যোদ্ধারা বড় একটা মাটির নিচে আসত না।

মেয়েগুলোর মুখ বড়ই করুণ। এমন হতাশার ছাপ টারজান কখনো কারো মুখে দেখেনি।

ওর দিকে সকলেই তাকাচ্ছিল, ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে সদ্য ওপর থেকে এসেছে। তাছাড়া এই ভূ-গর্ভেও ওর কথা অনেকে শুনেছিল। একটু পরেই একটা মেয়ে ওকে ডাকল। সে উনুনের কাছে বসে মাংস রান্না করছিল। ভারি সুন্দর মেয়েটি, কি সুন্দর গায়ের রং, চুলগুলো চকচকে, ঘোর নীল।

—'তুমি কি সেই দৈত্য?'

—'আমি জুয়ানথ্রল।'

—'ও আমাকে তোমার কথা বলেছে। আমি ওর জন্যে রান্না করি। নাকি আর কেউ রাঁধছে?'

—'না, কেউ রাঁধছে না। কিন্তু তুমি কে আর সে-ই বা কে?'

—'আমি তালাস্কার। ওর নাম তো জানি না, শুধু নম্বরটা জানি। ওরটা হল আটশ'র ঘন ফল যোগ উনিশ। তোমার নাম নেই?'

'এরা আমাকে জুয়ানথ্রল বলে।'

—'সে কি! তুমি লম্বা-চওড়া হতে পার, তাই বলে দৈত্য হবে কেন। জার্টাকোললরা ছাড়া মিনুনিতে কোনো দৈত্য আছে বলে জানতাম না।'

টারজানের কানের কাছে কে যেন বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমিও জার্টাকোলল।'

টারজান ফিরে দেখে ওর সহকর্মীদেরি একজন। টারজান বলল, 'মালিকদের কাছে আমি তাই-ই।'

—'সেটাই বুদ্ধির কাজ। আমি কাউকে কিছু বলব না।' এই বলে লোকটা চলে গেল।

মেয়েটি বলল, 'তার মানে?'

—'আমি বোবা সেজে আছি। ওরা ভাবে আমি সত্যি বোবা। অনেকের ধারণা আমি ঐ গুহাবাসী জার্টাকোলল-ই, যদিও আমার চেহারাটা অন্য রকম।'

—'আমি জার্টাকোলল দেখিনি। এখানকার বন্দী কর্মী ছাড়া কাউকে দেখিনি। এই ঘরেই জন্মেছি, এখান থেকে কখনো বেরোইনি।'

—'কিন্তু এখানে যারা জন্মেছে, তাদের তো সাদা পোষাক পরে ওপরে কাজ করতে দেওয়া হয়।'

মেয়েটি বলল, 'আমার মা কিছুতেই তা হতে দেবে না। বলে, এখানকার কোনো যোদ্ধার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার চেয়ে

মরণ ভালো।'

—'কিন্তু মালিকরা কিছু বলে না?'

—আমার জন্মের কথা মা রিপোর্ট করেনি। এক বুড়ি এখানে মারা যায়, তার নম্বরটা আমার জামায় এঁটে দিয়েছে মা। আমি বুড়ি সেজে থাকি। মা শিখিয়েছে।' এই বলে নিমেষের মধ্যে মুখে আর চুলে হাত দিয়ে কি করল, অমনি বুড়ির মতো দেখতে হয়ে গেল।'

টারজান অবাক্ হল। সে বলল, 'কিন্তু এখানে থাকার চেয়ে এদের একজন যোদ্ধাকে বিয়ে করাই ভালো হত না? এরাও নিশ্চয় তোমাদের দেশের যোদ্ধাদেরি মতো।'

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, 'আমার কাছে তা নয়। আমার বাপের বাড়ি মাণ্ডালা মাকুসে। আমার জন্মের দু' মাস আগে এরা মা-কে বন্দী করে এনেছিল।

—'তোমার মা কোথায়?'

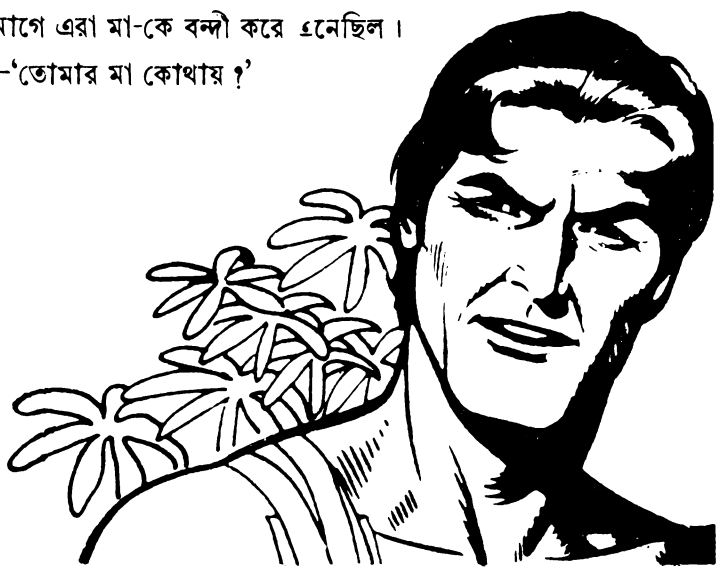

—'কি জানি। কুড়ি মাস আগে তাকে ওরা এখান থেকে নিয়ে গেল, আর সে ফিরল না।'

কি করুণ দেখাচ্ছিল মেয়ের মুখখানি। টারজান বলল, 'অন্যরা কেউ তোমাকে ধরিয়ে দেয়নি?'

—'কেউ দেবে না। দিলে বাকিরা তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।' এই বলে মেয়েটি টারজানকে খানিকটা মাংস খেতে দিল। টারজান কাঁচা খেতে ভালোবাসত, কিন্তু ওর মনে দুঃখ হবে বলে কিছু বলল না।

—'কিন্তু আওপোনাটো আসছে না কেন?' অর্থাৎ মিনুয়ান ভাষায় আট শ'র ঘন ফল যোগ উনিশ।

একজন ষণ্ডা কর্মী পিছনে এসে দাঁড়তেই টারজান বলল, 'ঐ সে নাকি?'

—'না। সে নয়।'

লোকটা রেগে বলল, 'আমার জন্য রাঁধলে না আর এর জন্য রাঁধছ? কতবার বিয়ের কথা বললাম, তাও কানে তুলছ না। যদি আর কাউকে বিয়ে করার কথা ভেবে থাক, আমি ভেণ্টালকে বলে দেব। সে তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে নেবে। তাকে দেখেছ তো?'

মেয়েটি শিউরে উঠল। 'তবু তোমার চেয়ে সে ভালো। আমি তোমাদের কাউকেই বিয়ে করব না।'

লোকটা ক্ষেপে গেল, 'অত নিশ্চিন্ত হয়ো না, মেয়ে!'

এই বলে তাকে ধরতে গেল। টারজানের ইস্পাতের মতো শক্ত আঙুলে ওর ঘাড় ধরে তুলে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রেগে অন্ধ হয়ে লোকটা তেড়ে এল, 'এর জন্য তোমাকে মরতে হবে!'

*

এদিকে প্রথম মেয়েমানুষের সেই ছেলে বীরদর্পে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছিল। ওর পিছনে ওর দলের দশজন পুরুষ। সকলের হাতে অস্ত্রশস্ত্র, মনে সাহস। এই সময় বনে একজন বিশালদেহ মেয়েমানুষ এসে হাজির হল। অনেক দিন সে পুরুষমানুষ দেখেনি আর আজ একসঙ্গে এতগুলো! তারাও ওকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কেউ পালাবার চেষ্টা করল না। তাতে মেয়েমানুষটি খুশিই হল। দু-একটাকে ধরে নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু এরা ভয় পাচ্ছে না কেন? মুখে কেমন একটা রাগ আর ভয় দেখানোর ভাব আর হাতে ওগুলো কি? ওদের মধ্যে একজন একটা লম্বা ছুঁচলো লাঠি ছুঁড়ে মারল। ওর কাঁধ ঘেঁষে সেটা বেরিয়ে গেল। খানিকটা রক্ত পড়ল। আরেকজন একটা বাঁকা লাঠিতে কাঠি বসিয়ে ছেড়ে দিল। কাঠিটা ওর বগলের নিচে বিঁধে গেল। খুব লাগল। হঠাৎ মনে পড়ল বেশ কয়েকজন মেয়ে বনে গিয়ে আর ফেরে নি। দু-তিনটে মৃতদেহও তার চোখে পড়েছে। কাজ কি বাবা? এই ভেবে সে দৌড়ে পালাল। গুহায় পৌঁছে তবে থামল।

পুরুষরা তাড়া করল না। এদিকে সেই মেয়েমানুষের অবস্থা দেখে তার সঙ্গিনীরা অবাক্ হল। সে তো শুয়ে পড়ে খালি হাঁপাচ্ছিল।

—'পালিয়ে এলে কিসের কাছ থেকে?'

—'পুরুষদের।'

—'এ্যাঁ বলে কি!'

সব কথা শুনে মেয়েমানুষদের রাগ দেখে কে! পুরুষগুলোর ভারি আস্পর্ধা হয়েছে তো? ওদের প্রধানা বলল, 'চল, ধরে নিয়ে এসে, সাজা দিই।'

এই বলে মাথার ওপর গদা ঘুরিয়ে, বিকট মুখভঙ্গী করে উঠল। অন্যরা তাই দেখে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, ভেংচি কাটতে লাগল। তারপর দলের পাণ্ডা আগে আগে, এরা তার পিছন পিছন বনের দিকে রওনা দিল। খালি আগের মেয়ে মানুষটা শুয়েই রইল। তার যথেষ্ট হয়েছে।

ওদিকে খাটের তলায় কর্মীদের ঘরে, সেই লোকটাকে টারজান মাটিতে ফেলে দেবার পর, সে উঠবার আগে উনুনটার দিকে তাকাতেই, অন্যরা আপত্তি করল, 'অস্ত্রশস্ত্র চলবে না। লড়তে হলে, খালি হাতে লড়তে হবে।'

কিন্তু হিংসায় বিদ্বেষে লোকটার মতিভ্রম হয়েছিল, কাজেই সে উনুনটা তুলে নিয়ে টারজানের দিকে তেড়ে গেল। আরেকজন দর্শক ওকে পেড়ে ফেলল। একজন কর্মী হাত থেকে উনুনটা সরিয়ে নিয়ে, ওকে বলল, 'ন্যায় যুদ্ধ কর।'

টারজান হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই দেখে প্রতিপক্ষের গা জ্বলে গেল। তাকে ছুটে আসতে দেখে, টারজান ঘুঁষি পাকিয়ে নিজের হাতটা সোজা করে বাড়িয়ে দিল। ঘুঁষিটা সোজা তার থুতনিতে লেগে তাকে শুইয়ে দিল। সকলে বাহবা দিতে লাগল। তাই শুনে কারাফ্‌টাপ আরেকবার ছুটে আসতেই টারজান তাকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঠিক সেই সময় কয়েকটা লোকের সঙ্গে ভেণ্টাল ঘরে ঢুকে ঐ দৃশ্য দেখে মহা চটে গেল। কারাফ্‌টাপ তার প্রিয়পাত্র ছিল। অমনি, ভেণ্টাল অনুচরদের বলল, 'একে একশো বেত মারো।'

ব্যাকুল হয়ে মেয়েটি বলল, 'ওকে মিছিমিছি সাজা দিও না। দোষটা কারাফ্‌টাপের। সে-ই আগে আক্রমণ করেছিল।'

ওর দিকে চেয়ে ভেণ্টালের সব রাগ পড়ে গেল। সে বলল, 'তোমার বয়স কত?'

বয়স শুনে বলল, 'আমি তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমাকে কিনে নেব। আপাততঃ ঐ বোবা জানোয়ারটার শাস্তি রদ হল। কিন্তু আবার করলে সাজা পাবে।'

দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই, টারজানের কাঁধে কে হাত রেখে ডাক দিল 'টারজান!'

ফিরে দেখে টারজানের মুখে হাসি ধরে না। 'কম—'

সে ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, 'চুপ! এখানে আমি আওপোনাটো।'

—'কিন্তু তুমি কি করে আমার সমান লম্বা হলে? এরা সবাই কি করে এত বড় হয়ে গেল বুঝলাম না।'

কমডোফ্লরেন্সেল বলল, 'তুমি দেখছি সবটাই উল্টো বুঝেছ, ভাই!'

—'তার মানে আমি ছোট হয়ে তোমাদের সমান হয়ে গেছি?'

—'একটা গোটা জাতের সবাই বড় হয়ে যাওয়ার চেয়ে একটা মানুষের পক্ষে ছোট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি নয় কি?'

টারজান বলল, 'কিন্তু সেটা তো অসম্ভব।'

রাজকুমার বলল, 'আগে আমারো তাই মনে হয়েছিল। এখানে এসে যখন শুনলাম তোমার ওপর এই রকম গবেষণা চলছে, আমার খুব আস্থা হয়নি। তাই আজ তোমাকে দেখে তাজ্জব বনে গেছি!'

টারজান বলল, 'কি করে এমন হল?'

—'সমস্ত মিনুনিদেশে সব চেয়ে প্রতিভাশালী জ্ঞানী হলেন জোনথ্রোহেগো, এ কথা সকলেই স্বীকার করে। ওঁকে বিজ্ঞানের জাদুকর বলা চলে। উনিই তোমাকে বন্দী করেছিলেন। তুমি জ্ঞান হারালে ওঁর বুদ্ধিতেই গাছের ডালের পাল্‌কির মতো একটা জিনিস বানিয়ে তাতে তোমাকে তুলে, হরিণ-ঘোড়া দিয়ে টেনে শহরের মধ্যে নিয়ে আসেন। ওঁর গবেষণার আসল উদ্দেশ্য ছিল ছোট মানুষদের বড় করা। ঐ ভাবে ভেণ্টোপিসমাকুসের লোকদের বড় বানিয়ে ফেলতে পারলে, তারা অপরাজেয় হয়ে সমস্ত জগতের ওপর রাজত্ব করবে। কিন্তু ফলটা হয়েছে উল্টো। বড়কে ছোট করা যাচ্ছে, কিন্তু ছোটকে বড় করতে পারছেন না।'

টারজান কাতরভাবে বলল, 'তার চেয়ে নিজেদের জগতে ফিরে গিয়ে শত্রুর হাতে পড়াও ভালো।'

—'সে ভেবে লাভ নেই। তোমার সেখানে পৌঁছনোর সম্ভাবনা খুব কম। এখানেই আমাদের জীবন কাটবে। সবুজ-পোষাকদের এরা ওপরে উঠতে দেয় না।'

—'টারজান বলল, 'দেয় কি না দেখাই যাবে।'

টালাস্কারের বড় ভাবনা কারাফটাপ আবার না অশান্তি করে। বলল, 'দোষটা আমার।'

রাজকুমার তো অবাক্, 'তোমার দোষ?'

—'হ্যাঁ, আমাকে ওর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়েই তো আওপোনটান্‌ডো ওকে সাজা দিয়েছিল।'

—'আওপোনটান্‌ডো কি?'

টারজান বলল, 'আমার নম্বর। এই তাহলে তোমার

আওপোনাটো, টালাস্কার, ওকে পেয়ে আমি খুব খুশি। কিন্তু ও-ও বন্দী হল বলে দুঃখ হচ্ছে।'

এখানে কাউকে বিছানাপত্র দেওয়া হয় না। যে যেখানে পারে মাটিতেই শুয়ে পড়ে। তাতে টারজানের আপত্তি নেই। তবে আলোতে টারজানের ভালো ঘুম হয় না। কমডো-ফ্লরেন্সল বলল, 'ও আলো কখনো নেবানো হয় না। নেবালেই, আমরা সকলে দমবন্ধ হয়ে মরে যাব। ওগুলো বৈজ্ঞানিক নিয়মে তৈরি। দূষিত বাতাসকে বিশুদ্ধ অক্সিজেনে পরিণত করে দেয়। এ-ও এখানকার বৈজ্ঞানিকরা অনেক দিন আগে আবিষ্কার করেছেন।'

টারজান বলল, 'তাহলে আলো জ্বলুক। আমার অন্ধকারের দরকার নেই।' এই বলে মাটিতে লম্বা হল।

*

পরদিন সকালে টালাস্কার রান্না করছিল, এমন সময় কমডোফ্লরেন্সল টারজানকে বলল, 'আমাদের দুজনকে একই জায়গায় কাজ করতে দিলে বেশ হয়। তুমি তো বলবে পালানোর সুযোগ পাওয়া অসম্ভব নয়। তাহলে একসঙ্গে থাকলে আরো সুবিধা হবে।'

টারজান বলল, 'হ্যাঁ, টালাস্কারকেও নিয়ে যেতে হবে।'

শুনে সে তো আহ্লাদে আটখানা, 'সত্যি নেবে? সেখানে গিয়ে আমি তোমাদের বন্দীদাসী হয়ে থাকতে পারলে, কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু আমার মালিক আমাকে ঐ পাষণ্ডের কাছে বেচে দিলে, কিছুই করা যাবে না।'

টারজান বলল, 'দেখি কি করা যায়।'

রাজকুমার বলল, 'একটা কাজ করা যায়। তুমি তো বোবা সেজে আছ। আমি যদি মালিকদের বলি আমি তোমার সঙ্গে অন্য ভাবে কথা বলতে পারি, তাহলে হয়তো একসঙ্গে দিতেও পারে। বোবা কর্মী দিয়ে কাজ করা যায় না।'

যেমন কথা তেমনি কাজ। পরদিন রাজকুমার ভেন্টালের কাছে কথাটা পেশ করে সে বলল, 'ওর ভাষাতেই কথা বলছি। বোঝে কিনা দেখ।'

এই বলে টারজানের দিকে ফিরে একটুখানি যা-তা বলে গেল, তাই শুনে টারজান মাথা নাড়তে লাগল। ভেন্টাল তো অবাক্, 'তাহলে জার্টাকোললদেরো একটা ভাষা আছে!'

টারজান হাসি চেপে রইল। বুঝল একটু সাবধানে থাকলে এ চালাকি কেউ ধরতে পারবে না।

এই সময় একজন যোদ্ধা বলল, 'ওকে বল ওর হর্তাকর্তা-বিধাতা জোনথ্রোহেগো ওকে ডেকে পাঠিয়েছে। বাধ্য ছেলের মতো কাজ করলে, কেউ ওকে কিছু বলবে না, কিন্তু কোনো রকম বেয়াড়ামি করলে স্বাধীন নাগরিকের তলোয়ারের খোঁচা খাবে।'

রাজকুমারের আবোল-তাবোলের উত্তরে টারজান ইংরিজিতে বলল, 'সুযোগ পেলেই আগে মুনিবের ঘাড় ভাঙব। তারপর কড়িকাঠ দিয়ে এদের সব কটার মুণ্ডু ফাটাব। আর সুবিধা পেলেই তোমাদের নিয়ে ভাগব।'

কমডোফ্লরেন্সল মনোযোগ দিয়ে টারজানের কথা শুনল, যদিও এক বর্ণ বুঝল না, তারপর ওদের বলল, 'জুয়ানথ্রল বলছে ও মালিকদের কাজ করতে পারলে খুশি হবে। ওর খালি একটাই অনুরোধ, আমাকে যেন ওর কাছে রাখা হয়, তাহলে হুকুম তামিল করার খুব সুবিধা হয়।'

সেই যোদ্ধাটি বলল, 'এ-কথা আমারো আগেই মনে হয়েছিল। তাহলে দুজনেই জোনথ্রোহেগোর কাছে চল। তিনি যেমন বলেন, সেইভাবে ব্যবস্থা হবে।'

যোদ্ধারা চলল পিছনে, ওরা সামনে সামনে, কারণ জুয়ানথ্রলের পালোয়ানির কথা ওদের কানেও গেছিল। কি দরকার রে বাবা, বাড়তি ঝুঁকি নিয়ে!

একেবারে ওপরে দিনের আলোতে ওদের নিয়ে যাওয়া হল। আকাশ দেখে টারজানের প্রায় কান্না পেল। বাইরে সবুজ-পোষাক দাসরা ভারি ভারি পাথরের বোঝা নিয়ে চলেছিল, সাজগোজ করা বহু উচ্চবংশীয় নাগরিকরা পথে বেরিয়েছিল আর সাদা উর্দি পরা উঁচু শ্রেণীর কর্মীরাও নানা কাজে স্বাধীনভাবে ছুটে বেড়াচ্ছিল। এদের সকলেরি একজন করে মালিক থাকলেও, তাদের প্রতি এদের একমাত্র কর্তব্য হল স্বাধীন ভাবে উপার্জন করে যা ঘরে আনবে, তার একটা অংশ মালিককে দিতে হবে। এই সাদা পোষাকপরা লোকরাই এখানকার মধ্যবিত্ত সমাজ। এরা কখনো পালাবার চেষ্টাও করে না, কারণ বড় শহর বলতে এই একটাই। অন্য কোথাও গেলেই ওদের আবার আজীবন সবুজ উর্দি পরতে হবে।

এখানকার মৌচাক-বাড়িগুলোও ট্রোহানাদলমাকুসের বাড়ির মতোই চোখে লাগা। তবে রাজার বাড়ি ছাড়া সব জায়গায় ভিড় বেশি। রাজবাড়ির সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে ওরা যোদ্ধাদের প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকল। এ শহরটা ট্রোহানা-দলমাকুসের চেয়ে দেখতে সুন্দর। বাড়িগুলোর মধ্যখানের

জায়গাগুলোতে সুন্দর ফুলের বাগান, ঝোপ, গাছপালা। তারি মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে কাঁকর বিছানো পথ চলে গেছে। রাজবাড়ির সামনের মাঠে কুচকাওয়াজ হয়। সেই সময়ও ঐখানে হাজারখানেক লোক ড্রিল্ করছিল। তাদের দক্ষতা দেখে টারজান আশ্চর্য হল। নিচু গলায় এদের কুচকাওয়াজের প্রশংসা করতেই, রাজকুমার বলল, 'ঐ নিখুঁৎ অভ্যাস করা আর এই চমৎকার পরিবেশের জন্যেই ওদের কাল হয়েছে। আমাদের যোদ্ধারা যখন দূরে গিয়ে সত্যিকার যুদ্ধের মক্স করে, এরা তখন সেজেগুজে মেয়েদের সামনে সুন্দর খেল্ দেখায়, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে হক্‌চকিয়ে যায়।'

এবার ওরা ঢালু পথ বেয়ে কেবলি ওপরে উঠতে লাগল। শেষের দিকে বেশি লোকজন দেখল না, ঘরের সাজসজ্জা কমে গেল, গলিগুলো আরো সরু হয়ে এল। এখানকার ঘরের দু-একটাতে লোক থাকলেও বেশির ভাগকেই মনে হল নানা জিনিসের ভাণ্ডারের মতো ব্যবহার করা হয়। তারপর অনেকগুলো সুন্দর করে সাজানো ঘরের পাশ দিয়েও গেল। সেখানে সোনা রুপোর কাজ আর অন্য সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম হচ্ছে। অনেক পুরুষ-মেয়ে খাটছে। ঘরকন্নার কাজও হচ্ছে।

অবশেষে সবার পরতলায় ওরা চমৎকার করে সাজানো, মোমবাতি জ্বালা বড় বড় ঘরে পৌঁছল। জোনথোহেগো ওদের আগমনের খবর পেয়েই, ডেকে পাঠালেন। ওরা কয়েকটা সুন্দর ঘর পেরিয়ে জোনথোহেগোর সমীপে পৌঁছল। চমৎকার সাজপোষাক পরে, তিনি একটা বড় ডেস্কের পিছনে বসেছিলেন। সামনে অনেক যন্ত্রপাতি সাজানো। তাছাড়া মোটা মোটা বই, কাগজ, কলম ইত্যাদি।

ওদের সঙ্গে যে এসেছিল সে টারজানকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে জুয়ানথল এসেছে।'

—'অন্য জন কে?'

—'ও ছাড়া কেউ জুয়ানথলের ভাষা বোঝে না। দোভাষীর কাজ করবে বলে এসেছে।'

বৈজ্ঞানিক তখন রাজকুমারকে বললেন, 'ওকে জিজ্ঞাসা কর, ছোট করে দেওয়াতে ওর মনের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না।'

রাজকুমারের বিড়বিড়ের উত্তরে টারজান মাথা নেড়ে কয়েকটা ইংরিজি কথা বলল। রাজকুমার বলল, 'ও বলছে মনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আপনাকে অনুরোধ করছে ওকে আবার বড় করে দিতে, ও দেশে ফিরে যেতে চায়।'

—'মিনুয়ান হয়ে তো ওর জানা উচিত যে ওকে আর দেশে ফিরতে দেওয়া হবে না।'

—'কিন্তু ও তো মিনুয়ান নয়। বহু দূর দেশ থেকে আমাদের কাছে এসেছিল। আমরা ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করেছি। ওর দেশের সঙ্গে তো আমাদের কখনো যুদ্ধ হয়নি।'

—'সে দেশটা আবার কোথায়? কে না জানে মিনুনির সীমানার বাইরে কোনো সৃষ্ট জীব থাকে না।'

এই অবধি কথা হবার পর ঢং ঢং করে পাঁচবার ঘণ্টা বাজল। তার মানে রাজা এসেছেন। বৈজ্ঞানিক বললেন, 'এদের ওদিকের ঘরে নিয়ে যাও। রাজা চলে গেলে, আবার কথা বলব।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে টারজান চোখের কোণা দিয়ে দেখল রাজার নাম ঘোষণা করতেই, ঘরের সকলে, এমন কি বৈজ্ঞানিকও, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে মাথার ওপর দু-হাত তুলে ধরল। রাজার সঙ্গে ঝকমকে পোষাক পরে বারোজন যোদ্ধা ঢুকল। টারজানের মনে হল এই রাজার চেয়ে কমডোফ্লরেন্সলের বাবা কত বেশি সম্মানের যোগ্য। এর যত লোকদেখানি জমকালো ব্যাপার, তিনি সাধারণ যোদ্ধার মতো যোদ্ধাদের সঙ্গে মেশেন। সঙ্গে থাকে একজন মাত্র বন্দী-দাস। অথচ সকলে তাঁকে কি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে।

রাজা বললেন, 'ঘর থেকে কারা বেরিয়ে গেল?'

—'জুয়ানথল আর তার দোভাষী।'

—'ওদের ডাকো। জুয়ানথলের বিষয়ে কথা আছে।'

ওদের ডাকা হল। মিনুয়ানদের নিয়ম অনুসারে টারজান ছাড়া আর সকলে হাঁটু গাড়ল। বৈজ্ঞানিক বললেন, 'এই ব্যাটা, হাঁটু গাড়!'

টারজান তবু দাঁড়িয়ে রইল। রাজকুমার কি যেন বলল। টারজান মাথা নাড়ল। রাজা বললেন, 'থাক, এবারের মতো ওকে ক্ষমা করা গেল। আবার আমার সামনে আনার আগে ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিও।'

*

হাতে গদা, কোমরে পাথর ঝোলানো, মহা রেগে পঞ্চাশজন ভীমা মেয়েমানুষ বীরদর্পে বনে চলল, বেয়াড়া পুরুষগুলোকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে। সকলের মেজাজ বিগড়ে ছিল। মেয়েরা কথা বলতে না পারলে তা তো হবেই।

বনের মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় আগুন জ্বেলে

পুরুষরা হরিণের মাংস ঝলসাচ্ছিল। অনেকগুলো হরিণ মেরে এনেছিল তারা। মেয়েমানুষরা অবাক হয়ে তাদের দেখছিল। আগে তো এদের এমন সুন্দর চেকনাই চেহারা ছিল না। চিরকাল এরা রোগাপটকা, হাড়-জিরজিরে। আসলে টারজান সেই প্রথম মেয়েমানুষের ছেলেকে অস্ত্র ব্যবহার করতে শেখাবার পর থেকে, এই পরিবর্তন শুরু হয়েছে। আর তারা ভয়েও পালায় না। পোকামাকড়ও খেয়ে থাকে না।

কিন্তু প্রথমটা মেয়েমানুষরা এত সব লক্ষ্য করেনি। তারা গদা হাতে গুঁড়ি মেরে ক্রমে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ একজন পুরুষ ওদের দেখে ফেলল। অমনি অভ্যাসের বশ হয়ে সে এক দৌড়ে গাছের দিকে গেল। মেয়েরা ভাবল ওদের ব্যাপার জানা আছে, এবার গাছের পিছনে লুকিয়ে উঁকি মেরে দেখবে কেউ তাড়া করছে কিনা। এর ফলেই ওদের ধরা এত সহজ।

সকলে কিন্তু পালায়নি। প্রথম মেয়েমানুষের ছেলে সটাং দাঁড়িয়ে ধনুকে তীর বসাচ্ছিল। অন্য পুরুষরা থমকে তাকাল। মেয়েমানুষরাও তাকাল, কিন্তু কিছুই বুঝতে না পেরে, হৈহৈ করে তেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীর সবার আগে যে ছুটেছিল তার বুকে বিঁধে, তাকে পেড়ে ফেলল। অন্যরা ব্যাপারটা তখনো ঠাওর করতে না পেরে, তবু এগিয়ে এল। টং করে আরেকবার শব্দ হল, আরেকজন পড়ল। এতক্ষণ পরে বাকি দশজন পুরুষ বর্শা আর তীরধনুক হাতে ছুটে এল। পালকবাঁধা পাথরের চেয়েও পালক লাগানো তীর বেশি অব্যর্থ। মেয়েমানুষরা হুড়মুড় করে এসে পড়ল এবং একটু পরেই বুঝতে পারল গদার চেয়েও বর্শা বেশি ভয়ংকর। যে ক-জন বাকি ছিল, তারা তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে চম্পট দিল।

এবার প্রথম মেয়েমানুষের ছেলের সেনানায়কত্বের যথার্থ পরিচয় পাওয়া গেল। দলবল ডেকে নিয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করল। এর একটা চরম নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। প্রথমে অন্যরা ভেবেছিল সবাইকে বুঝি মেরে ফেলতে হবে। কাজেই ওরা যখন দেখল দলপতি একজন দেখতে-ভালো মেয়েমানুষের চুলের মুঠি ধরে হাতের গদা আর পাথর কেড়ে নিচ্ছে, তারা তো অবাক্!

—'ওকে মেরে ফেলবে না?'

ইঙ্গিতের ভাষায় দলপতি বলল, 'না। রাঁধাবাড়া করতে আমার ভালো লাগে না। এ আমার রাঁধাবাড়া কাজকর্ম করে দেবে কেমন, দেবে কি না?'

প্রথমটা সে গোঁ হয়ে। ছিল। কিঞ্চিৎ মারধোরের পর বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিরকাল দেব।'

তাই শুনে বাকি দশজনও ছুটল মেয়েগুলোর পিছন পিছন। একটা করে ধরে এনে, তাদের দিয়ে বেশ কাজ করানো যাবে। সেই থেকে ওদের দেশের আবহাওয়া ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল।

ঘর থেকে চলে যাবার একটু বাদেই বৈজ্ঞানিক আবার টারজানকে ডাকলেন। ঘরে আর কেউ রইল না।

রাজা বললেন, 'তুমি ঠিক জান এই বন্দী আমাদের কথা বুঝতে পারছে না?'

—'এসে অবধি তো একটা কথাও বলে নি। পরে জানলাম ট্রোহানাদলমাকুসের অন্য বন্দীটি ওর সঙ্গে কি একটা ভাষায় কথা বললে, উত্তর দেয়। আমরা ওর সামনে স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারি, হুজুর।'

রাজা বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত পরীক্ষাটার বিষয়ে আমাদের খোলাখুলি আলোচনা হয়নি এখন গবেষণার পাত্রটিকেও যখন সামনে পাওয়া গেছে, এর পর কি করা হবে, সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক।'

অর্থাৎ রাজা তো ছাই জানেন, আলোচনা করা মানেই বৈজ্ঞানিক বলবেন রাজা শুনবেন। বৈজ্ঞানিক বললেন, 'হ্যাঁ, মহারাজ, তার আগে আমার একটা বাসনা পূর্ণ করুন। আমি মন্ত্রীসভায় একটা আসন চাই।'

রাজা ওকে ভয়ও করতেন, দেখতেও পারতেন না। পারলে প্রাণদণ্ড দিতেন, কিন্তু তাহলে তাঁর নিজের খ্যাতির উৎসটিও যে নষ্ট হবে জোনথোহেগোর সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব রাজা নিজে নিতেন। বলতেন—'আমিই ওকে শিখিয়ে দিয়েছি!'

ওকে চটানোও যায় না তাই বললেন, 'কি করব, আসন খালি নেই যে।'

—'সর্বশক্তিমান ইচ্ছা করলেই আসন খালি করে দিতে পারেন। কিংবা একটা নতুন পদ সৃষ্টি করতে পারেন, যেমন ধরুন যুগ্ম প্রধান মন্ত্রী, কি ঐরকম কিছু।'

—'বেশ আজই নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেব।'

বৈজ্ঞানিক বললেন, 'এবার আমাদের নতুন গবেষণার কথা হক। এই আবিষ্কারের সাহায্যে যুদ্ধের আগে যোদ্ধাদের আকার বাড়াতে, আর যুদ্ধের পর আবার কমিয়ে নিতে পারা যাবে।'

রাজা বললেন, 'যুদ্ধের কথা শুনতে আমার খুব খারাপ লাগে।'

বৈজ্ঞানিক বললেন, 'আহা, বাধ্য হয়েও তো কত সময় যুদ্ধ করতে হয়। তখনো তো জিততে হবে।'

রাজা বললেন, 'তা বোধ হয় সত্যি। আরেকটা সুবিধা হল যে যুদ্ধ করতে কম যোদ্ধা নিয়ে কাজ সারা যাবে। বাকিদের অন্য অর্থকরী কাজে লাগানো যাবে। আচ্ছা, তারপর বল।'

জোনথোহেগো উঠে টারজানের মাথার খুলির নিচের দিকে আঙুল রেখে বললেন, 'জানেন নিশ্চয় এইখানে একটা ছোট্ট ডিম্বাকার লালচে ছাই রঙের জিনিস আছে, তার মধ্যে একটু তরল পদার্থ থাকে। ঐ তরল পদার্থই শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাড় নিয়ন্ত্রিত করে। ওটাকে প্রভাবিত করলে ঐ ব্যক্তির শরীরের বাড়া-কমাও প্রভাবিত হবে।

'ইঁদুরের ওপর অনেক পরীক্ষা করেছি, ভালো ফলও পেয়েছি। বড় মানুষকেও ছোট করতে পেরেছি, কিন্তু কিছুতেই আজ পর্যন্ত ছোট মানুষকে বড় করতে পারিনি। বড়কেও ছোট করলে তার ফলটা স্থায়ী হয় না। সাত দিন থেকে সাত মাসের মধ্যে আবার যে-কে সেই।'

রাজা বলেছিলেন, 'তুমি না বলেছিলে এই লোকটার খুলির নিচে তোমার সেই পাথরটা দিয়ে একটা বাড়ি মেরেছিলে আর তারি এই ফল। তাহলে একে বড় করতে হলে, কপালে একটা বাড়ি মেরে দেখা যাক না।'

—'তাই হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো হল না। দেখি তো আরেকবার চেষ্টা করে। এবার হয়তো হবে আর আমিও বুঝতে পারব, আগে কেন হয়নি।'

এই বলে তাড়াতাড়ি একটা বড় আলমারি খুলে খাঁচা থেকে একটা জ্যান্ত ইঁদুর বের করে আনলেন। টেবিলের ওপরকার নানা যন্ত্রের মধ্যে নানা চাকা, হ্যাণ্ডেল, কাঁটা ইত্যাদি সম্বলিত জটিল এক যন্ত্রের তলাকার বোর্ডে ইঁদুরের চার পা ছড়িয়ে আটকে রেখে, তার গলায় একটা কলারের মতো জিনিস পরিয়ে দিলেন। তারপর আস্তে আস্তে যন্ত্রটা চালাতে লাগলেন।

রাজা তন্ময় কিন্তু বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। জুয়ানথল নামক বন্দী-দাস আরো কাছে এসে মন দিয়ে দেখতে লাগল। তার কাছে এই পরীক্ষার একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল। পরীক্ষার শেষ পর্যায়ে যন্ত্রটার বেগ খুব বাড়ানো হল আর ওদের স্তম্ভিত চোখের সামনে ইঁদুরটা ছোট হয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ বন্দীর কৌতূহল লক্ষ্য করলেন রাজা। অমনি তাকে সরিয়ে দিতে বললেন।

বৈজ্ঞানিক একজন অনুচরকে ডেকে বললেন বন্দী দুজনকে আপাততঃ অন্য একটা ঘরে রাখা হোক। আবার দরকার হলে, ডাকা হবে। ততক্ষণে কিন্তু ছোট করার কৌশল টারজানের শেখা হয়ে গেছিল।

*

রাজা চলে যেতে বলার পর টারজান আর রাজকুমারকে ঐ বাড়িরই ঐ তলাতে ছোট্ট একটা অন্ধকার ঘরে পুরে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। ঘরে মোমবাতি না থাকলেও, সরু একটা জানালা দিয়ে সামান্য আলো আসছিল। জানালায় অনেকগুলো গরাদ দেওয়া। এ ছাড়া ঘরে ছিল একটা বেঞ্চি আর একটা টেবিল। ব্যস আর কিছু নয়। রাজকুমার বলল, 'এটা হল রাজবাড়ির সবচেয়ে উঁচু তলায়। জানালা দিয়ে হাওয়া আসে বলে মোমবাতি দেয়নি। এ-ঘরটার পাশেই বাড়ির মধ্যিখানের চোঙার মতো ফাঁকা জায়গাটা ছাদ থেকে মাটির তলা অবধি চলে গেছে। এবার বল রাজা কি বললেন।'

টারজান বলল, 'কি করে বড় জানোয়ার ছোট হয় দেখলাম। আরো শুনলাম আপনা থেকেই যে যার নিজের মাপ ফিরে পায় তিন দিনে, কি তিন মাসে বা তিন বছরে, তার ঠিক নেই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও হয়।'

—'এ ঘরে তুমি তোমার স্বাভাবিক আকার ফিরে পেলে আর বেরোতে হবে না!'

—'তাহলে তো যত শীঘ্র সম্ভব বেরিয়ে পড়তেই হবে।'

রাজকুমারের মনে অত আশা ছিল না। জানালার শিক দেখিয়ে বলল, 'এগুলো কব্জা করতে পারবে?'

—'কি জানি, চেষ্টা করি নি।'

এই বলে অতি সহজে টারজান শিকগুলোকে একে একে বাঁকিয়ে খুলে আনল। তারপর আবার চেপে সোজা করে দিল। একটা রাজকুমারকে দিল, একটা নিজে নিয়ে বলল, 'যদি মুক্তির জন্য লড়তে হয়, এই তো বেশ অস্ত্র পাওয়া গেল।'

—দুটো শিক দিয়ে তুমি শহরের চার লক্ষ আশী হাজার লোকের সঙ্গে লড়বে?'

—'হ্যাঁ, দুটো শিক আর মগজের বুদ্ধি দিয়ে।'

—'কখন আরম্ভ করবে?'

—'সুবিধা পেলেই করব। সেই অর্থে যে মুহূর্তে টের

পেলাম আমি বন্দী, সেই মুহূর্ত থেকেই লড়তে আরম্ভ করে দিয়েছি। আপাততঃ শিকগুলোকে আবার যেমন ছিল তেমন করে সাজিয়ে রাখি।'

একটু পরেই হাতে মোমবাতি আর খাবার নিয়ে একটা লোক এসে বলল, 'কাল তোমরা পাথর কাটার কাজে ফিরে যাবে। এখানে জোনথোহেগোর আর তোমাকে দিয়ে দরকার নেই।'

লোকটা কিছুতেই মোমবাতি রেখে গেল না। ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। রাজকুমার বলল, 'কাল আমাদের আবার মাটির তলায় চলে যেতে হবে, সেখান থেকে পালানো কি খুব সহজ হবে?'

টারজান বলল, 'আমরা তো যাব না।'

—'কেন?'

—'আমরা যে আজ রাতেই পালাব।'

রাজকুমার তাজ্জব বনে গেল।

খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে, টারজান বলল, 'জানালা দিয়ে বেরোলে, ছাদটা কাছে পড়বে, কিন্তু বাইরে দিয়ে নামলে ধরা পড়ার ভয় আছে। ভিতরের চোঙা-পথ দিয়েই নামতে হবে।'

—'সে ও তো অনেকটা নামা। পড়লে মরতে হবে।'

টারজান ততক্ষণে জানালার শিকগুলো নিয়ে অন্ধকারেই কাজে লেগে গেছিল। খানিক বাদে বলল, 'টালাস্কারের ঘর চিনতে পারবে?'

—'পারব।'

—'আচ্ছা, তোমাদের নিজের রাজবাড়ির প্রত্যেকটা লোককে কি তুমি দেখলেই চিনতে পারবে?'

—'রাজবংশীয়দের আর বড় যোদ্ধাদের পারব। নিজের অনুচরদের পারব। সবাইকে পারা অসম্ভব। কেউ পারবে না।'

—'যোদ্ধারা কি নিজেদের শহরে যেখানে খুশি যেতে পারে?'

—'দিনের বেলায় পারে, রাতে নয়।'

—'আর পাথর খাদানে?'

—'যদি কাজের ভান করতে পারে, কেউ কিছু বলবে না।'

—'সাদা পোষাক-পরা বন্দীরা কি পাথর খাদানে যায়?'

—'না, তাদের সেখানে দেখা যায় না।'

—'লোহার শিকটা হাতে নিয়েছ?'

—'নিয়েছি।'

—'আমার সঙ্গে এসো, বাকি শিক নিয়ে।'

টারজান শিকগুলোর দু'মাথা বাঁকিয়ে একটার সঙ্গে একটাকে আটকিয়ে একটা ঝোলানো সিঁড়ির বা দড়ির মতো করে নিয়েছিল। একটা জানালার খোঁদল থেকে তার নিচেরটাতে পৌঁছে, কায়দা করে সিঁড়ি খুলে সেখানে লাগিয়ে প্রাণ হাতে করে নামা।

এইভাবে একটা অন্ধকার জানালার কাছে পৌঁছে বোঝা গেল এ ঘরে লোক নেই। এবার ঐ জানালা দিয়ে ঐ ঘরে ঢুকে, অন্য দিকের দরজা খুলে, ওদিককার গলিতে পড়লেই মধ্যিখানের চোঙটাকে পাওয়া যাবে। জানালায় শিক ছিল না, ঘরে ঢুকতে অসুবিধা হল না। ঘরে কেউ নেই, কিন্তু ঘরটা ভরতি মদের পিপে, বোতল, এইসবে। রাজকুমার বলল 'বেআইনি মদ সংগ্রহ করে এনে এখানে জমা রাখা হয়েছে।'

পাশে একটা গলির মতো জায়গা দিয়ে একটা দরজার কাছে পৌঁছল ওরা। দরজার তলা দিয়ে দেখা গেল ওপাশে আলো জ্বলছে।

ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। অনেকগুলো লোকের দেহ মাটিতে পড়ে আছে। কমডোফ্লরেন্সলও শিউরে উঠে বলল, 'এটার মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে।'

টারজান হাসল, 'কেউ মরেটরেনি, মদ খেয়ে পাঁড় হয়ে আছে। ওটা লাল ওয়াইন।'

*

ঠিক সেই সময় দুজন যোদ্ধা এসে ঢুকল। অন্যদের দিকে একবার তাকিয়ে ওদের বলল, 'তোমরা এখানে কি করছ?'

টারজান বলল, 'শ্-শ্-শ্ চুপ! কে কোথায় শুনতে পাবে। ভিতরে এসো।'

ওরা ভিতরে ঢুকতেই টারজান দরজাটা বন্ধ করে দিল।

—'এর মানে কি?'

—'এর মানে তোমরা আমাদের বন্দী।'

সশস্ত্র যোদ্ধাদের হাসি পেল। তারপরেই তারা তলোয়ার বের করে তেড়ে গেল। অমনি ভীষণ লড়াই বেঁধে গেল। বলা বাহুল্য যোদ্ধারা দুজনেই প্রাণ হারাল। তখন টারজান আর কমডোফ্লরেন্সল তাড়াতাড়ি তাদের সঙ্গে পোষাক বদল করে নিল। তারপর মৃতদেহ দুটোকে তুলে নিয়ে টারজান জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিল। তাদের সঙ্গে কয়েকটা ভাঙা শিক-ও ফেলল। যাতে লোকে ভাবে পালাতে গিয়ে ওরা পড়ে গেছে।

কমডোফ্লরেন্সল মাতালগুলোর পকেট থেকে বেশ কিছু সোনার মুদ্রা বের করে নিয়ে বলল, 'যোদ্ধাদের সর্বদা টাকা-কড়ির দরকার হয়। একে ওকে দিলে কাজের সুবিধা হয়।'

টারজান বলল, 'খরচপত্রের ভার তুমি নাও। আমি ওসব বুঝি না।'

তারপর ওরা পাশের গলিতে বেরিয়ে পড়ে হাঁটতে লাগল। দুদিকে কত ঘর। কোথাও লোকে ঘুমোচ্ছে, মোমবাতি জ্বলছে। কোথাও কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তির বাসস্থান, দরজার বাইরে পাহারাওয়ালা ঘুমিয়ে পড়েছে। উল্টো দিক থেকে দুটো সাদা পোষাক পরা লোক ওদের পেরিয়ে গেল। কিছু বলল না। পরদিন সকালে মৃতদেহ আবিষ্কার হবার পর হয়তো হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। এখনো কিছুটা নিরাপদ।

মৌচাক-বাড়ির ভিতরটা বাস্তবিক একটা শহরেরি মতো। একটা দরজার ওপর সাইন বোর্ডে কি যেন লেখা ছিল। রাজকুমার বলল, 'যাক, ঠিক জায়গায় পৌঁছনো গেল।'

ঘর ভরা লোক। এখানে পয়সা দিয়ে রাতের মতো ঘুমোবার জায়গা পাওয়া যায়। বাইরের লোকরাও এখানে শোয়। একটা সাদা পোষাক পরা অনুচরকে একটা সোনার মুদ্রা দিয়ে দুটো মোমবাতি চেয়ে নিল রাজকুমার। তারপর দেওয়াল ঘেঁসে দুজনে অন্য সবার মতো মাটিতে শুয়ে পড়ল।

সকালে উঠে দেখে ঘরের আর সকলে উঠে গেছে। ওরা হাত মুখ ধুয়ে নিল ঐ ঘরেই। ঘরের পাশে নালা দিয়ে ময়লা জল বাগানে পড়ে। এখানে জল নষ্ট করার নিয়ম নেই। সমস্ত জল নিচে থেকে তুলে বালতি করে গণ্যমান্যদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়। কর্মীরা নিচে গিয়ে নদীতে স্নানাদি সারে। ঘরের বাইরে গলিটা বেশ চওড়া। তার মধ্যে দিয়ে দুদিকে দু-সারি লোক চলেছে। মোমবাতির ছড়াছড়ি, বাতাস খুব তাজা। কত দোকানপাটের সামনে দিয়ে গেল ওরা। সব জায়গায় বিক্রি করছে সাদা পোষাকের কর্মীরা কিনছে সব রকম লোক। সবুজ-পোষাকরা অবিশ্যি এদিকে আসতে পারে না। দোকানে অনেক মেয়ে খরিদ্দার, তাদের বিচিত্র সাজসজ্জা। দোকানগুলোর দরজার ওপর দোকানদারের নাম রয়েছে।

ওরা একটা খাবারের দোকানে ঢুকল। এখানে বড়-লোকরা খায় না, এটা সাধারণের জন্য। দোকানদার বড়-লোকদের অত্যাচারের গল্প করল। খাওয়াদাওয়ার পর ওরা করিডর দিয়ে ক্রমে আরো নেমে একতলার দিকে চলল। যেখানে বেশি লোক চলাচল, ওরা সেই সব পথ বেছে নিচ্ছিল তাহলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম।

ওরা এক তলায় পৌঁছে বাইরে যাবার একটা পথ খুঁজছিল, এমন সময় দেখে এক জায়গায় ভীষণ ভিড়। কি হল? না, দুটো বন্দী-দাসকে জোনথ্রোহেগো বন্ধ করে রেখেছিল, তারা পালাতে গিয়ে পড়ে মরেছে। তাদের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সে দুটোকে হরিণ-ঘোড়ার পিঠে বেঁধে বনের ধারে ফেলে দিয়ে আসা হবে। বুড়ো সিংহরা খাবে। এখানকার এই নিয়ম। বেচারি সিংহরাও খেয়ে বাঁচে, পরিবেশও পরিষ্কার থাকে।

*

বাইরে বেরিয়েই টারজান রাজকুমারকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'আমাদের সেই আগের বাসস্থানে নিয়ে চল। টালাস্কারকে নিয়ে আসতে হবে।'

কমডোফ্লরেন্সল আকাশ থেকে পড়ল, 'সেটা যে অসম্ভব। আজ পর্যন্ত কোনো সবুজ-পোষাক পরা বন্দী ওভাবে বেরোতে পারেনি।'

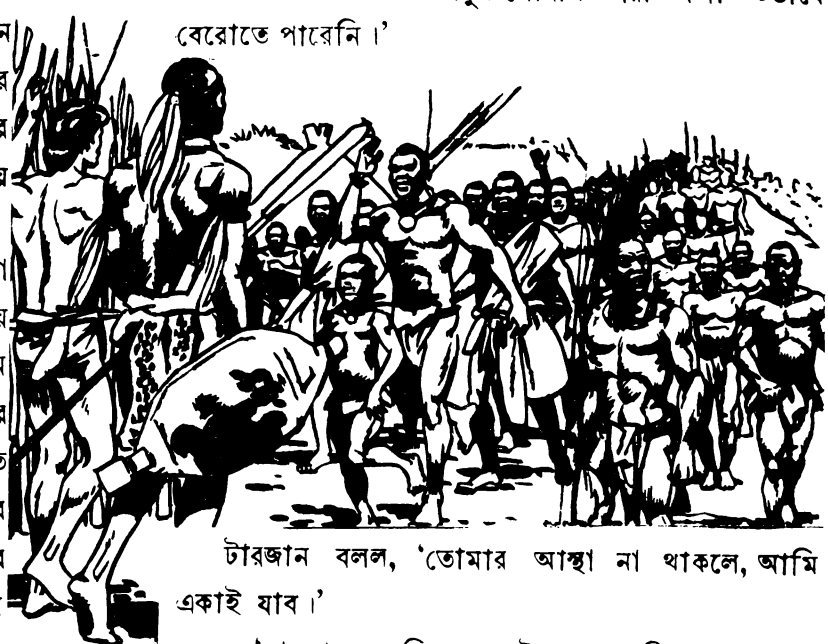

টারজান বলল, 'তোমার আস্থা না থাকলে, আমি একাই যাব।'

—'না, না। তুমি যেখানেই যাও, আমিও যাব।'

—'ভালো কথা। তাহলে সেখানে গিয়ে তোমার এদেশের অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমাদের ঢুকবার ব্যবস্থা কর।'

খনির মুখে যোদ্ধাদের কেউ কোনো প্রশ্ন করে না। ওদেরো করল না। ভিতরের দরজায় যে যোদ্ধা ছিল তাকে রাজকুমার বলল, 'জোনথ্রোহেগো তাঁর বন্দী-দাসী টালা-স্কারকে ডেকেছেন।'

সে বলল, 'ভিতরে গিয়ে তাকে নিয়ে এসো।'

রাজকুমার হামা দিয়ে ঢুকে গেল। টারজান বাইরে রইল। প্রহরী বলল, 'তুমিও যাও।'

—'একটা দাসীকে আনতে দুটো লোকের দরকার করে না।'

হঠাৎ লোকটা ঘুরে দরজার ভারি ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে তলোয়ার বের করল, 'আত্মসমর্পণ কর। তোমাদের দুজনকেই চিনতে পেরেছি।'

জুয়ানথ্রল বলল, 'তাই ভেবেছিলাম। তোমার আর সব চালাক-চালাক, চোখদুটো বোকার মতো!'

সে বলল, 'কিন্তু তলোয়ারটা তো আর বোকার মতো নয়।'

লোকটা দক্ষ তলোয়ার খেলোয়াড়, অবিশ্যি ডার্নোর হাতে তৈরি টারজানও সে বিদ্যায় কম যায় না। শেষ মুহূর্তে টারজানের তলোয়ার তার হৃদপিণ্ডে বিঁধে তার খেলা শেষ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে টারজান দরজার ছিটকিনি খুলে দিল। ভিতরে ফ্যাকাশে মুখে রাজকুমার অপেক্ষা করছিল। কিন্তু প্রহরীর মৃতদেহ দেখে তার মুখে হাসি ফুটল। 'কি করে হল?'

—'আমাদের চিনতে পেরেছিল। টালাস্কার কোথায়?'

—'জোনথ্রোহেগো ওকে ভেণ্টালের কাছে বেচে দিয়েছে। সে ওকে নিয়ে গেছে।'

টারজান ঘুরে বলল, 'দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে চল ভেণ্টালের আস্তানায়।'

ওরা তাড়াহুড়ো করে পাথর খাতের দিকে চলল। পথে ভিড়ের মধ্যে সেই কারাফটাপ লোকটাকে দেখতে পেল। মনে হল চিনতে পেরেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি কাজ সারা যায় ততই ভালো।

ভেণ্টালের বাড়ি ওরা চেনে না। একজন যোদ্ধা বলে দিল রক্ষীদের ঘরে জিজ্ঞাসা করলেই তারা বলে দেবে।

ওরা নামতে লাগল একটা দলের সঙ্গে। তাদের মধ্যে দুজন যোদ্ধাও ছিল। হঠাৎ প্রহরী বলল, 'ক-জন কর্মী ঢুকছে?'

—'একশো জন।'

—'তাহলে চারজন গার্ড কেন?' টারজানদের বলল, 'পাস্ দেখি।' পাস্ নেই শুনে বলল, 'এ ঘরে এসো।' ছোট একটা ঘরে নিয়ে গেল ওদের। 'পাস্ নেই কেন বুঝলাম না।'

রাজকুমার বলল, 'তোমার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তির তো বোঝা উচিত।'

কয়েকটা টাকার ঝন্‌ঝনানি শোনা গেল। 'আমরা ভেণ্টাল কালফাস্টোবানকে খুঁজছি। ওর কাছ থেকে একজন বন্দী-দাসী কিনব। কোন দিকে যাব বলতে পার?'

—'হ্যাঁ নিশ্চয়। রাজবাড়ির পাঁচতলার মধ্যিখানের করিডরের মাঝামাঝি। খাতের কাজ থেকে ওর আজ সকালে ছুটি হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ বাড়িতেই আছে।'

তাকে টাকা দিতেই সে বলল, 'এটা গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দেব। না নিলে তো আপনাদের অসম্মান করা হবে।'

এবার ওরা রাজবাড়ির দিকে পা বাড়াল। টারজান বলল 'বনের জানোয়াররা ছাড়া পৃথিবীর সব লোক সমান অসৎ।'

রাজবাড়িতে কর্মীদের ঢুকবার পথটা উত্তর দিকে। সে-দিক দিয়ে ঢুকে গার্ড যেমন যেমন বলেছিল, ওরাও সেইভাবে এগোতে লাগল। মাঝপথে একজন অল্পবয়সী বন্দী-দাসীকে পথ জিজ্ঞাসা করতে, সে বলল 'সেখানে যেতে হামাদলবানের কোয়ার্টারের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। এ দিকের তৃতীয় দরজা।'

টারজান বলল, 'সেখানে পৌঁছতে বিশেষ অসুবিধা হবে না মনে হয়।'

রাজকুমার বলল 'যা বলেছ। অসুবিধাটা শুরু হবে ওখানে পৌঁছে কি করব, তাই নিয়ে।'

—'কি আবার করব? যা করতে এসেছি, তাই করব, সব বাধাবন্ধ সরিয়ে। এতদূর তো বিনা বাধায় এসেছি। হয়তো শেষ অবধি তাই হবে, নয়তো এমন-ও হতে পারে এই অবধি এসে চিরকালের মতো থেমে যাব।'

তৃতীয় দরজায় উঁকি মেরে দেখল কয়েকজন যোদ্ধাদের বাড়ির মেয়ে আর ক'জন সাদা পোষাক পরা কর্মী মাটিতে বসে গল্প করছে। রাজকুমার বলল, 'এটা কি হামাদলবানের বাড়ি?'

—'হ্যাঁ, তাই!'

—'এর পিছনে ভেণ্টাল কালফাস্টোবানের বাড়ি তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর তার পিছনে?'

—'বেরোবার রাস্তা পর্যন্ত লম্বা গলি, সেখানে মেলা লোক অনেকগুলো ঘরে থাকে। সবাইকে চিনিও না। কাকে খুঁজছেন?'

—'পালস্টোকারকে।'

বলাবাহুল্য ! ও নামে কেউ ছিল না ।

—'তা তো বলতে পারলাম না ।'

—'সে যাই হক । আমাদের বলা হয়েছে হামাদলবান আর ভেন্টালের বাড়ির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে । দেখি ভেন্টাল হয়তো জানে ।'

—'সে তো হামাদলবানের সঙ্গে বেরিয়েছে । এখনি ফিরবে । এখানে অপেক্ষা করতে পারেন ।'

—'না, থাক । নিশ্চয় খুঁজে নিতে পারব ।'

এই বলে হামাদলবানের ঘর পেরিয়ে ভেন্টালের বাড়িতে ঢুকে পড়ল ওরা । রাজকুমার বলল, 'তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে মনে হচ্ছে ।'

প্রথম ঘরটা খালি । চারদিকে অনেকগুলো দরজা । তার একটা খুলে দেখে ভিতরটা অন্ধকার । মোমবাতি এনে ভালো করে দেখল খাবার জিনিস, মোমবাতি, কাপড়-চোপড়ে ঠাসা ঘরটা । তাহলে ট্যাক্স দিয়ে ফতুর হয়নি লোকটা !

হঠাৎ হামাদলবানের ঘর থেকে গলার আওয়াজ পেল ওরা । ভেন্টাল বলছে, 'আমার কোয়ার্টারে এসো । আমার নতুন দাসী দেখাব ।'

দুজনে গুদোমঘরটাতে ঢুকে, দরজা ভেজিয়ে দিল । এ-ঘর থেকে পাশের ঘরটা দেখা যায় । মধ্যিখানের দেয়ালে শুধু পরদা ঢাকা একটা জানালা । সেই ঘরে ঢুকে, চাবি দিয়ে ভেন্টাল একটা বন্ধ দরজা খুলে ফেলে ডাকল, 'বেরিয়ে এসো ।'

ভিতর থেকে মাথা উঁচু করে সাদা পোষাক পরা টালাস্কার বেরিয়ে এল । তার রূপে ঘর আলো হয়ে গেল । হামাদলবান বলল, 'ওকে বিয়ে করে, আমাদের শ্রেণীতে তুলে নেবে বোধ হয় ?'

—'না, তাহলে বড় বেশি স্বাধীনতা পেয়ে যাবে । কিছুদিন পরে ওকে অনেক টাকায় বেচে দেব । এমন রূপসী মেয়ে ।'

এই সময় পাথর খাতের দুজন গার্ডের সঙ্গে, সবুজ পোষাক পরে কারাফটাপ এল । কারাফটাপ ছিল ভেন্টালের প্রিয়পাত্র । গার্ড বলল, 'এ বলছে কি জরুরি খবর আছে ।'

কারাফটাপ বিনীত ভাবে বলল, 'সে খবর দিয়ে আবার যদি আমাকে পাথর খাদানিতে ফিরতে হয়, সঙ্গীরা আমাকে ফালাফালা করে ফেলবে । আপনি সর্বদা আমার ওপর দয়া করেছেন । এ খবরটাকে যদি জরুরি মনে করেন, তাহলে আমাকে সাদা-পোষাকের অধিকার দিন ।'

—'আমি তো তা পারি না তবে রাজাকে বলতে পারি ।

—'তাহলেই হল । তবে শুনুন । আমরা সকলেই শুনেছি আওপোনাটো আর জুয়ানথল পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে নিচে পড়ে মরে গেছে এবং তাদের শরীর সিংহে খেয়েছে । অথচ নিজের চোখে দেখলাম তারা দুজনে জ্যান্ত হয়ে যোদ্ধার সাজে এবাড়ির ওপর তলায় উঠে আসছে । ওদের দুজনকেই আমি ভালো করে চিনি ।'

ওদের বর্ণনা শুনে কারাফটাপের সঙ্গে যে যোদ্ধারা এসেছিল, তাদের একজন বলল, 'আমিও তাদের দেখেছি ।'

সেই অল্প বয়সী দাসীটিও সেই কথা বলল । হামাদল-বানের ঘরের একজন মেয়ে বলল, কি সর্বনাশ ! তারা যে আমাদের ঘরের মধ্যে দিয়ে এখানে এল । পালস্টোকার বলে কাউকে খুঁজছে ।'

একজন গার্ড বলল 'ও নামে কেউ নেই । ছলনা করে ওরা এখানে ঢুকেছিল । তাহলে তুমি আর কারাফটাপ এ বাড়িটা আর চারদিকের জায়গাগুলো খুঁজে দেখ, আমরা গলিগুলো দেখছি ।' এই বলে তারা বেরিয়ে গেল ।

ওরা চলে গেলে কারাফটাপ বলল, তল্লাসি করার আগে, এখান থেকে বাইরে বেরোবার পথগুলো বন্ধ করা যাক ।'

এখান থেকে হামাদলবানের কোয়ার্টারে যাবার দুটো দরজা আর গলিতে বেরোবার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা হল । তারপর কারাফটাপ বলল, 'ওদের দুজনের সঙ্গে লড়তে হলে, আমারো একটা অস্ত্র দরকার ।'

ভেন্টাল বলল, 'ও দুটোর মতো দশটাকে আমি একাই কব্জা করতে পারি । তবে তোমরা আত্মরক্ষার্থে ঐ ঘরটা থেকে একটা তলোয়ার নিয়ে এসো । আমি আমার বনবেড়ালটাকে ততক্ষণে চাবি-বন্ধ করি ।'

কারাফটাপ ভাণ্ডারের দিকে যেতেই ভেন্টাল টালাস্কারের কাঁধে হাত দিল । সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও ওর মুখে এক চড় কষিয়ে দিল । তবু ওকে ছাড়ল না ভেন্টাল, ওর সঙ্গে ভিতরের ঘরে ঢুকল ।

এদিকে যেই না কারাফটাপ ভাণ্ডারে ঢুকেছে, লোহার মত শক্ত দশটা আঙুল ওর গলা টিপে ধরল । সে যে মানুষ নয়, তাতে সন্দেহ নেই । মানুষের গায়ে অত জোর হয় না । কানে কানে বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় কে বলল, যার প্রতি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, তারি হাতে মর ।'

মৃতদেহটাকে ফেলে দিয়ে টারজান বড় ঘরের ভিতর দিয়ে টালাস্কারের ছোট ঘরে ছুটে গেল ।

ততক্ষণে টালাস্কারের বিরুদ্ধ মেজাজ দেখে ভেন্টাল তাকে পেটাতে শুরু করেছিল। ভেন্টালের কাঁধে একটা ভারি হাত পড়ল। নিচু গলায় কানে কানে কে বলল, 'আমাদের খুঁজছিলে? এই যে আমরা এসেছি!'

মাথা ঘুরিয়ে ভেন্টাল ওদের দেখতে পেল। আওপোনাটোর হাতে তলোয়ার, জুয়ানথল খালি হাতে ওকে ধরে রেখেছিল। টারজান বলল, 'তুমি না আমাদের মতো দশটাকে কব্জা করতে পার? যদি এই মেয়েটিকে আক্রমণ না করতে, তোমাকে মেরে ফেলতাম না। ঘরে চাবি দিয়ে চলে যেতাম। এখন তোমার মৃত্যু ছাড়া গতি নেই।'

ভয়ের চোটে ভেন্টাল চেঁচিয়ে উঠল 'কারাফটাপ!'

টারজান বলল, 'বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তাই সে মরেছে। একজন অসহায় মেয়েকে তুমি আঘাত করেছ বলে তুমিও মরলে।'

কমডোফ্লরেন্সলের তলোয়ার তার বুকে বসে, জীবনলীলা শেষ করে দিল।

এবার এখান থেকে পালাবার পথ খুঁজে বের করতে হবে। টারজান বলল, 'ছাদে তো একটা ফাঁক দেখেছি। ওখান দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?'

বাইরে থেকে কেউ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। একজন মেয়ের গলা শোনা গেল, 'কারাফটাপের খোঁজে লোক এসেছে। খনির কর্মীদের কোয়ার্টারের গার্ডকে কেউ মেরে ফেলেছে। তাই কারাফটাপকে জেরা করতে চাইছে।'

টারজান বলল, 'চল, গলির পথ দিয়ে বেরিয়ে যাই।'

সেদিক থেকেও ডাক এল, 'দরজা খোল কালফাস্টোবান ওরা গলি দিয়ে কোথাও যায়নি।'

তার মানে গলি দিয়ে যাওয়া হবে না, অন্য পথ দেখতে হবে। এক লাফে সেই খাদের ফাঁকটার কিনারা ধরার চেষ্টা করল টারজান। একেবারে কিনারা পার হয়ে একটা অন্ধকার ঘরে গিয়ে পড়ল।

এদিকে বাইরে যারা ছিল, দুদিক থেকে তারা এমন দরজা পেটাতে শুরু করেছিল যে দরজা দুটো ভাঙে আর কি। পরস্পরের সঙ্গে তারা ঝগড়া করছিল। দু দলই ভাবছিল বুঝি কালফাস্টোবানের সঙ্গে কথা হচ্ছে। সেই সুযোগে টারজান ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়ে এদের দুজনকে টেনে ওপরে তুলে ফেলল। তারপর অন্ধকারে বসে ফাঁকটা দিয়ে দেখল গলির দরজা ভেঙে পড়াতে এক দল যোদ্ধা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। একটা বন্ধ দরজার পিছন থেকে চ্যাঁচামেচি শুনে, সে দরজা খুলে ফেলে, তারা তো অবাক! মৃতদেহ দুটো আবিষ্কার করতেও তাদের দেরি হল না।

এবার কেউ কেউ সমস্তটাকে ভৌতিক ব্যাপার ভেবে ঘাবড়ে গেল। টারজানও ফিসফিস করে বলল, 'এবার এদিকে কারো চোখ পড়ার আগে, ভেগে পড়াই ভালো।'

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ওরা ঘরটাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। বহু যুগের ধুলো জমে প্রমাণ করে দিচ্ছে, এঘর কেউ ব্যবহার করে না। একটু পরেই টারজান আস্তে আস্তে ডাকল, 'এদিকে এসো। একটা জিনিস পেয়েছি!'

পেয়েছিল দেয়ালের নিচের দিকে একটা ফাঁক! তার ভিতরে একটা মানুষ হামা দিয়ে ঢুকতে পারে। রাজকুমার মোমবাতি জ্বালতে মানা করল। এদিকে টারজান সুড়ঙ্গে ঢুকে আর ফেরে না।

টালাস্কার বলল, 'কি হবে? এরা যদি কোন হদিস না পেয়ে, এখানে উঠে আসে?'

কিন্তু সে ভয় অমূলক। অনুসন্ধানকারীরা নীচে বসে থাকাই ঠিক করেছিল। ভৌতিক কিছু হলে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই আর তা না হলে খুনেরা আপনি নেমে আসতে বাধ্য হবে। একটু বাদেই টারজান ওদের ডেকে নিয়ে গেল।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ এঁকে বেঁকে এগিয়ে একটা মাঝারি ঘরে পৌঁছল। সেখানে আলো জ্বালা যেতে পারে, কিন্তু এত নিচু যে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাবে না। টারজান বলল, 'এখানে একটু বিশ্রাম করবে?'

কিন্তু রাজকুমার এগিয়ে যেতে চাইল। শেষপর্যন্ত যোদ্ধারা সুড়ঙ্গে ঢুকবেই। তার আগে নিরাপদ স্থানে যাওয়া চাই।

একটু পরে সুড়ঙ্গটা আরো চওড়া হয়ে, ঢালু হয়ে একটা ছোট ঘরে শেষ হল। সে ঘরের দেওয়ালে কয়েকটা বহু কালের পুরনো মানুষের কংকাল শিকল দিয়ে দেয়ালের আংটার সঙ্গে আটকানো ছিল। কংকালগুলোকে ছোঁবা-মাত্র ধুলো হয়ে ঝরে পড়ল। কত যুগ আগেকার কোন হতভাগ্যদের কংকাল কে জানে!

টারজান বলল, 'এই সুড়ঙ্গটা সম্ভবতঃ সেকালের কোনো ক্ষমতাশালী ব্যক্তির বাসস্থান থেকে বেরিয়েছে।'

এর পর সুড়ঙ্গটা আরো ঢালু হয়ে একটা বড় ঘরে পৌঁছে শেষ হল। সে ঘরেও বহু কংকাল। তাদের হাতে তলোয়ার আর শরীরের ভঙ্গী দেখে মনে হল এরা যুদ্ধ করে মরেছে।

হঠাৎ কানে মানুষের গলার শব্দ এল।

*

এদিকে ওয়াজিরিদের দেশে টারজান প্লেন নিয়ে বেরোবার পর দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল, অথচ তার কোনো খবর নেই। ক্রমে কোরাক বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। নানা জায়গায় খোঁজ করেও কিছু জানা গেল না। কেউ তাকে দেখেনি। শেষ পর্যন্ত টারজানের মতোই নেংটি পরে আর তীর ধনুক ছোরা এবং কয়েকজন দুর্দম এবং অভিজ্ঞ ওয়াজিরিকে সঙ্গে নিয়ে, কোরাক বাপকে খুঁজতে বেরোল। কিন্তু চারদিকে বহু দূর পর্যন্ত সমস্ত জায়গা সরু চিরুণী দিয়ে আচড়ে ফেলার মত করেও যখন কোনো চিহ্ন দেখা গেল না, তখন তার মন বড়ই মুষড়ে পড়ল। তবু সে হার মানার ছেলে নয়, কাজেই সন্ধান চালিয়ে গেল।

ভেস্টোপিসমাকুসের রাজবাড়ির অনেক নিচে টারজান, কমডোফ্লরেন্সল আর টালাস্কার মানুষের স্বর শুনে চমকে উঠল। রাজকুমার বলল, 'মেয়েমানুষের স্বর।'

স্বরটা এসেছিল দেওয়ালের অন্য পাশ থেকে। মাথার ওপর একটা ফোকর ছিল। এক লাফে ফোকরের কিনারায় ঝুলে ভিতরটা দেখে টারজান আবার নেমে পড়ল। 'ওদিকে আলো নেই। আওয়াজটা তারও পরের ঘর থেকে আসছে। এ ঘরে কেউ থাকলে, তার গন্ধ পেতাম। তবে স্বরটা এত স্পষ্ট যে ঐ ঘরের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে সন্দেহ নেই। আমি খোঁজ করতে যাচ্ছি।' অন্যরা বলল আর ছাড়াছাড়িতে কাজ নেই। সবাই যাবে।

তখন টারজান বলল, 'আমি আগের ফোকর দিয়ে ওধারে যাই। তুমি টালাস্কারকে আমার কাছে তুলে দিয়ে, নিজেও এসো।'

তাই করা হল। ওধারেও একটা সরু সুড়ঙ্গ, কিন্তু এ সুড়ঙ্গ খুব বেশি দিনের নয়। এতক্ষণ দেয়ালগুলো ছিল পাথরের, এখন মাটির আর তক্তার। কাঠের দেয়ালের অন্য দিকটাতে মনে হল খুব শৌখিন আর পালিশ করা প্যানেল বসানো আছে। কারো বাড়ির একটা বড় ঘরে দেয়াল তুলে এ জায়গাটা আলাদা করা হয়েছে। একটা দরজাও নিশ্চয় আছে। কমডোফ্লরেন্সল বলল, 'কব্জা দেওয়া দরজা নয়, বোধ হয় চোরা দরজা, পাশ দিকে ঠেলে খুলতে হয়।'

ওপাশে একজন মেয়ের গলা শোনা গেল, 'আমার কাছে যদি তাকে দিত—'

আরেকজন বলল, 'তাহলে এমন হত না।'

প্রথম জন বলল, 'জোনথোহেগোর কোনো বুদ্ধি নেই। আমার বাবারো নেই। এখন তিনি বৈজ্ঞানিককে প্রাণদণ্ড দেবেন। তাহলে আমাদের যোদ্ধাদের বিশাল দেহ আর অপরাজেয় হবার আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। ওরা ভাবছিল আমি তাকে মেরে ফেলতে চাই। কিন্তু আমার আদৌ সেরকম কোনো ইচ্ছা ছিল না।'

টারজান ফিসফিস করে বলল, 'এ হল রাজকুমারী জানজারার গলার আওয়াজ। ওকেই তোমার বিয়ে করার শখ হয়েছিল। করলে টের পেতে।'

রাজকুমার বলল, 'সত্যি খুব সুন্দরী নাকি?'

—'সুন্দরী বটে, পিশাচীও বৈকি!'

রাজকুমারীর গলা আবার শোনা গেল, 'অমন আশ্চর্য মানুষ আমাদের যোদ্ধাদের মধ্যে একটিও নেই। তুমি এখন যেতে পার। সূর্য মাঝপথে আসার আগে আমাকে বিরক্ত কর না।'

এর পর একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল। টারজান চোরা দরজা খুঁজতে লাগল। টালাস্কার ফিস ফিস করে বলল, 'এই যে!'

টারজান দেখল দরজাটা দুদিক থেকেই খোলা যায়। সে বলল, 'দাঁড়াও, ওকে ধরে আনি। তাহলে এদের সঙ্গে রফা করার সুবিধা হবে।'

নিঃশব্দে চোরা দরজা খুলে টারজান ঘরে ঢুকল। এরা সাধারণতঃ মাটিতে সামান্য উঁচু মঞ্চে বিছানা পেতে শোয়। জানজারাও সেইরকম নিচু বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে ছি।। দরজাটা খুলে রেখে নিঃশব্দে টারজান এগিয়ে গেল। দমকা বাতাস লেগে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হল। অমনি জানজারাও টপ করে উঠে দাঁড়াল। 'তুমি আমাকে নিতে এসেছ, জুয়ানথ্রল?'

টারজান বলল, 'হ্যাঁ, তোমাকে নিতে এসেছি। চেঁচিও না। তোমার কোনো অনিষ্ট করব না।'

—'না, আমি চ্যাঁচাব না।'

এই বলে কাছে এসে দাঁড়াল। টারজান বলল, 'আমার কথার মানে বুঝতে পারনি? তুমি আমার বন্দিনী।'

রাজকুমারী বলল, 'আমি খুশি হয়ে তোমার বন্দিনী হব। আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

—'না, মোটেই বাসো না। আমিও তোমাকে ভালোবাসি না। আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তোমাকে নিতে এসেছি। চল।'

প্রথমটা চটে গেছিল জানজারা। পরে বলল, 'না, তোমার ক্ষতি করব না। তোমাকে পালাতে সাহায্য

করব। এসো আমার সঙ্গে।'

—'আমার সঙ্গীদের ছেড়ে তো আমি যেতে পারি না। আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। আমি ওদের নিয়ে যাব।'

—'এসো, পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।'

এই বলে ঘরের অন্য পাশে যে দরজা দিয়ে দাসী বেরিয়ে গেছিল, তার পাশের দরজার কাছে দাঁড়াল। টারজান যেই সেই দরজার সামনে পৌঁছল, অমনি পায়ের তলার মেঝে কাৎ হয়ে গেল আর টারজান কোন অতলে পড়ে গেল। জানজারা কাষ্ঠ হাসল, চেঁচিয়ে বলল, 'আমাকে যারা ভালোবাসে না, তাদের এই রকমই হয়!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে জানজারা দেখল রাজকুমার আর টালাস্কার ওর দিকে ছুটে আসছে।

টারজান তো পিছলে নিচেকার একটা ঘরের মধ্যে পড়ল। ঘরে কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছিল। সামনে একটা লোহার শিক দিয়ে তৈরি দরজা। সেখানেও আলো জ্বলছিল। একটা নিচু বেঞ্চিতে অতি বিমর্ষভাবে মাথা ঝুলিয়ে একটা লোক বসেছিল। সে অমনি বলে উঠল, 'শিগগির বাঁ দিকে সরে যাও!'

টারজান ফিরে চেয়ে দেখে দুটো প্রকাণ্ড সবুজ-চোখ জানোয়ার ঝাঁপ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। আসলে সে দুটো ছিল দুটো আফ্রিকান বনবেড়াল ছাড়া কিছু নয়। এখন তারাই ওর কাছে সিংহের সমান!

সে লোকটা বলল 'একটুক্ষণ যদি ঠেকিয়ে রাখতে পার, আমি এই দরজাটা খুলে দিচ্ছি।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা জানোয়ার লাফ দিল।

এদিকে ওপরের ঘরে রাজকুমার এক লাফে ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়াতেই তার পায়ের নিচেও মেঝেটা একই ভাবে কাৎ হয়ে গেল। সে-ও নিচে পড়ল।

তখন জানজারা ছোরা বের করে টালাস্কারের দিকে দৌড়ে এল, 'তোমাকেই বুঝি সে ভালোবাসে? মর তাহলে!'

কিন্তু টালাস্কার সামান্য মেয়ে ছিল না। সে খপ করে রাজকুমারীর হাতের কব্জি ধরে ফেলল। শেষ পর্যন্ত তারা দু-জনেও জড়াজড়ি করে নিচে পড়ল। রাজকুমারী টালাস্কারের বুকে ছোরা বসাবার চেষ্টা করছিল, টালাস্কার তার গলা টিপে ধরবার চেষ্টা করছিল।

ততক্ষণে ক্ষুধার্ত জানোয়ার দুটোর একটার সঙ্গে টারজান লড়ছে আর রাজকুমার নিচে পড়েই, অন্যটার সামনে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়েছে! সেটা ঘাবড়ে গিয়ে দেয়ালের কাছে আশ্রয় নিল। রাজকুমার তাকে ছেড়ে টারজানের সাহায্যে এল। তারপর দুজনে মিলে তাদের একেকবার ভাগিয়ে দেয় আর ক্রমে ফটকটার কাছে সরে আসে। ওরা আবার তেড়ে আসে, আবার ভাগাতে হয়। শেষ পর্যন্ত সেই অন্য লোকটা ফটক খুলে যেই ডাক দিয়েছে, 'তাড়াতাড়ি।' ঠিক সেই সময়ে জানজারা আর টালাস্কার মারমুখো বনবেড়াল দুটোর একেবারে সামনে পড়ল।

*

পুরুষরা দুজন তখন নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভুলে মেয়েদের রক্ষার জন্য অস্ত্র নিয়ে তৈরি হল। জানোয়ার দুটো আরেকবার অন্য দিকের দেয়ালের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল আর এরা দুজন মেয়েদের ভিতরের ঘরের দিকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। জানজারার হাত থেকে ছোরা পড়ে গেছিল, টালাস্কার সেটি তুলে বেড়ালদের সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত। এমন সময় ভিতরের ঘরের লোকটির চোখ জানজারার ওপর পড়ল। অমনি সে লাফিয়ে উঠল, 'জানজারা! আমি আসছি।'

এই বলে আর কোনো অস্ত্র না পেয়ে বেঞ্চিটাকেই তুলে বেড়ালদের সম্মুখীন হল।

ক-দিন খেতে পায়নি, খিদের জ্বালা সইতে না পেরে বারে বারে তারা তেড়ে আসছিল, কিন্তু বেঞ্চিতে বাধা পাচ্ছিল। একে তলোয়ারের আর ছোরার ঘায়ে গা রক্তাক্ত তার ওপর খিদের জ্বালা! একেবারে ক্ষেপে গিয়ে দুটোতে এমনি লাফ দিল যে সবাইকে ডিঙিয়ে ওদিকের ঘরটাতে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীকে টেনে বাইরে এনে, দরজাটা দুম করে বন্ধ করে চাবি এঁটে দিল সেই লোকটা।

এতক্ষণ পরে সে ওদের চারজনের মুখোমুখি দাঁড়াল। রাজকুমারী অবাক হয়ে বলে উঠল, 'জোনথো হেগো! তোমাকে কত অবজ্ঞা অপমান করেছি আর আজ তুমি আমাদের প্রাণ বাঁচালে!'

বৈজ্ঞানিক বললেন, 'তুমি তো জানই যে আমি অনেক দিন থেকে তোমাকে ভালোবাসি। এখন কিছু বলে লাভ নেই। কারণ রাজার হুকুমে কাল আমাকে মরতে হবে। তোমার বাবা এমনি মুখ্যু যে একবার কিছু বললে, কিছুতেই তাঁর মত বদলায় না।'

জানজারা বলল 'ওঁকে আমিও চিনি। হিংসার চোটে আমার মাকে উনি মেরে ফেলেছিলেন। এমন নির্বোধ আর

কেউ হয় না।' তারপর আবার বলল, 'এই বন্দীরা পালাতে চায়। আমার সাহায্যে পালাতেও পারে। ওদের সঙ্গে আমরা দুজনেও ওদের দেশের আশ্রয় নিই না কেন?'

বৈজ্ঞানিক বললেন, 'নিজেদের দেশে ওদের কারো কি কোনো প্রতিপত্তি আছে?'

টারজান তখন রাজকুমারকে দেখিয়ে বলল, 'এ হল ট্রোহানাদলমাকুসের রাজা আভেণ্ড্রোহাকিসের বড় ছেলে এবং যুবরাজ।'

জানজারা এবার টারজানকে বলল, 'আমি অন্যায় করেছি, জুয়ানথ্রল। কেন জানি মনে হচ্ছিল তোমাকে ভালোবাসি আর তাই তুমি আমাকে চাও না বলে মাথাটার ঠিক ছিল না। তুমি এই মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হয়ো।'

টালাস্কার বলল, 'তুমি ভুল করছ রাজকুমারী, আমরা ও-ভাবে পরস্পরকে ভালোবাসি না, বন্ধুর মতো স্নেহ করি।'

টারজান বলল, 'তাছাড়া দেশে আমার স্ত্রী আছেন।'

এ-সব কথা শুনে রাজকুমার তো মহা খুশি। কিন্তু রাজার ছেলে হয়ে, নিজের দেশে ফিরে গিয়ে বন্দীর মেয়েকে বিয়ে করায় বাধা আছে। সে-কথা মনে পড়াতে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু এখন ও-সব ভাবলে চলবে না।

জোনথ্রোহেগো বললেন 'যেখানে জানোয়ার দুটো বন্ধ, তার উল্টো দিকের ঐ দরজাটা দিয়ে রক্ষীরা ওদের খাবার আনে।'

জানজারা বলল, 'ওটাতেও বোধ হয় তালা নেই। কারণ বন্দী থাকে ঐ ছোট ঘরে আর মধ্যিখানে জানোয়ার দুটো ছাড়া থাকে। কাজেই বন্দীর বেরোবার কোনো উপায় নেই।'

বাস্তবিকই একটু টানতেই সে দরজা খুলে গেল। বাইরে আরেকটা সুড়ঙ্গ। তাতে হামা দিতে হয়। সেটা দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে একটা দরজা পার হয়ে, বড় গলিতে পৌঁছল ওরা। একটু দূরেই একজন যোদ্ধা একটা দরজার বাইরে পাহারা দিচ্ছিল।

তাই দেখে জানজারা মহা খুশি। 'এ যে আমারি দরজা, আমারি গলি। ও লোকটাও আমার অনুগত। আমি ওর ত্রিশ মাসের ট্যাক্স মাপ করিয়ে দিয়েছি। ও আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে।'

বাস্তবিকই তাই। জানজারা তাকে বলল, 'দেখ, তুমি অন্ধ হয়েছ।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজকুমারী, আপনি যা বলেন।'

রাজকুমারী বলল, 'তাহলে আমি বলি পাঁচটা হরিণ-ঘোড়া আর কয়েকটা যোদ্ধাদের ভারি চাদর।'

যোদ্ধা এক নজর দেখে সব বুঝে নিয়ে বলল, 'শুধু অন্ধ হব না, কাল গত-ও হব।'

রাজকুমারী বলল, 'পাঁচটা নয়, ছয়টা ঘোড়া আনো।'

যাবার আগে রাজকুমারী কমডোফ্লরেন্সলকে জিজ্ঞাসা করল, 'সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাদের বন্দী করবে না তো?'

রাজকুমার হাসল, 'ঠিক তার উল্টো। বন্দী বলে পরিচয় দিয়ে দেশের ভিতরে ঢুকে তোমাদের মুক্তি দেব।'

—'এরকম তো কখনো কেউ করে না। তোমার বাবা অমত করবেন না তো?'

—'এমন আরো ঘটেছে আমাদের দেশে আর জোনথ্রো-হেগো সেখানে তাঁর উপযুক্ত সম্মান আর সংগতি পাবেন।'

বেশ দেরি করে ছয়টা ঘোড়া নিয়ে এল সেই যোদ্ধা। এমনিতে পাচ্ছিল না, লড়াই করে আনতে হয়েছিল। জোনথ্রোহেগোর রাজবংশে জন্ম। তার যোগ্য অস্ত্রশস্ত্রও সে নিয়ে এসেছিল। ঐ রক্ষী বলল, 'হয়তো রাজার ফটক দিয়ে বেরোলে কারো চোখে পড়ে যাব। বরং অন্য পথে বেরোনোই ভালো।'

শেষ পর্যন্ত ওরা যোদ্ধাদের ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল। জানজারা আর রক্ষী আগে আগে গেল, বাকিরা তার অনুচর-বর্গের মতো পিছনে পিছনে চলল।

শেষ গার্ডের কাছে পৌঁছবার সময় পিছনে একটা হট্টগোল শুনে বোঝা গেল যে পলাতকদের পিছনে লোক লেগেছে। রাজকুমারীর চেনা মুখ দেখে গার্ড ছেড়েই দিচ্ছিল, কিন্তু পিছন দিক থেকে যারা আসছিল তারা প্রহরীদের প্রধানকে খবর দিতে গেল। রাজকুমারী আর

অপেক্ষা না করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। অন্যরাও কেউ পিছ-পাও হল না। অমনি পিছন পিছন ধর ধর করে একদল যোদ্ধাও ছুটল। মাঝে একটু ভুল বোঝার ফলে দ্বাররক্ষীর দলের সঙ্গে প্রধানের দলের সংঘর্ষ হওয়াতে, অনুসরণকারীদের একটু দেরিও হয়ে গেল। ততক্ষণে এরা অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

পলাতকরা বনপথ ধরল। গার্ডটি সে জায়গা চেনে। তার নাম ওরাথার্ক। সে অসম্ভব তৎপর।

উঁচুনিচু ডাঙা, কোথাও খাড়া উঠেছে, কোথাও নেমে সরু খাদ দিয়ে পথ যেন সুড়ঙ্গের মতো চলেছে। এই ভাবে সারারাত ওরা চলল, শত্রুদের সাড়াশব্দ পেল না। ভোর হলে ওরা স্থির করল সরু একটা সবুজ উপত্যকায় নামলে ঘোড়াগুলো ঘাস আর বিশ্রাম দুই-ই পাবে। সুবিধামতো একটা জায়গা পাওয়াও গেল, সকলে নামল।

ওরাথার্ক পাখি মেরে আনল, টারজান ছোট নদীটাতে বর্শা দিয়ে কয়েকটা মাছ-ও ধরল। সেগুলোর সদ্ব্যবহারও হল। তারপর দুপুরের পর পর্যন্ত ঘুম, সে সময় একজন করে পাহারায় রইল। কিন্তু এ-সব দুর্গম স্থানে কোনো মানুষ আসে বলে মনে হল না।

উঠে আবার চলা। সন্ধ্যা হলে জোনথোহেগো আর কমডোফ্লরেন্সল এক জায়গায় রাতের আবাস ঠিক করল। টারজান একটু আশ্চর্য হল, কারণ জায়গাটা যেন বড় বেশি খোলা। কিন্তু কিছু পরেই বুঝতে পারল একটা জানোয়ারের গর্ত থেকে মালিককে তাড়ানো হচ্ছে। সে বেচারা তলোয়ারের ভয়ে পালাবে। টারজানের মনে হল একটা বেজি জাতীয় কিছুর বাসা হবে। সুখের বিষয়, বাসায় ঢুকে রাজকুমার বুঝল মালিক আগেই বাসা ছেড়ে চলে গেছে। একটা সাপ ছিল, তাকে মেরে ফেলতে কোনো অসুবিধা হল না। অন্ধকার হলে সকলেই একে একে ভিতরে ঢুকে পড়ল, খালি টারজান অল্পক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় একটা সত্যিকার প্রমাণ মাপের সিংহ, ওকে দেখেই লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে টারজানও গর্তে ঢুকে, আল্গা মাটি দিয়ে বাসার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে!

*

তিন দিন ওরা ক্রমাগত পুবমুখো চলেছিল, চতুর্থ দিনে দক্ষিণ দিকে ফিরল। সেখান থেকে রাজধানী ট্রোহানাদলমুকোস আরো দুদিনের পথ। সব চেয়ে বেশি কষ্ট হরিণ-ঘোড়াগুলোর। রাতে ছেড়ে দিলে কি হবে? চারদিকে হিংস্র জানোয়াররা ঘোরাঘুরি করছে, সর্বদা ওদের সতর্ক থাকতে হচ্ছিল। পোষা বলেই পালাচ্ছিল না। ঐ চতুর্থ দিনে দূরে দেখা গেল একটা বড় দল অশ্বারোহী ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে। তাহলে ওরা এল শেষ পর্যন্ত! এখানে পৌঁছবার আগেই বনে আশ্রয় নিতে পারলে হয়!

কিন্তু সে বুঝি আর হল না। অনুসরণকারীরা হল বারোজন দক্ষ ঘোড়সোয়ার। তাদের সঙ্গে এরা চারজন লড়াই করে পারবে কেন? পালানো ছাড়া উপায় নেই। অন্যরা এগিয়ে গেল, সবার পিছনে টারজান আর বৈজ্ঞানিক। শত্রুদের দলপতি ডেকে বলল, 'রাজকুমারী! আত্মসমর্পণ করলে আর আমাদের বন্দী-দাসদের ফিরিয়ে দিলে, আপনাদের ক্ষমা করা হবে।'

জানজারা আর জোনথোহেগো চিৎকার করে বলল, 'কখনো না', শুনে টারজান মহা খুশি। জানজারার অন্য একটা দিক ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছিল। সেটা বড় ভালো দিক।

ওরা ছয়জন আর সময় নষ্ট না করে প্রাণপণে বনের দিকে ছুটল এবং পৌঁছেও গেল! কিন্তু ঠিক সেই সুখের মুহূর্তে একদল বিশালদেহ গুহাবাসীর হাতেও পড়ল। এরা টারজানের সেই চেনা গুহাবাসীই বটে, তবে একটা বড় তফাৎ দেখা গেল। এই দলে পুরুষ আর মেয়েমানুষ দুই-ই ছিল আর পুরুষরাই প্রভুত্ব করছিল। গুহাবাসীরা ওদের দেখে মহাখুশি। অমনি নিচু হয়ে টপাটপ একেকটাকে হাতে তুলে নিল! এক হাতে ঘোড়া, এক হাতে সোয়ার! সে বেচারিরা শূন্যে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। টালাস্কার আর রাজকুমার পরস্পরের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিল।

এদিকে টারজান যার হাতে পড়েছিল, তার কাছে গদার বদলে সুন্দর বর্শা আর তীর-ধনুক দেখে সে চমকে উঠল। অন্য পুরুষদের হাতেও তাই। দৈত্যটা ওকে মুখের কাছে তুলে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখেই, চিনতে পারল! সে হল প্রথম মেয়েমানুষের ছেলে, টারজানের সেই পুরনো পোষ্য! টারজান তাকে ইশারায় বলল, 'আমাকে নামিয়ে দাও। তোমার সঙ্গীদেরো বল আমার বন্ধুদের নামিয়ে দিতে।'

তক্ষুণি দৈত্যটা পরম স্নেহে ওকে নামিয়ে দিল। বন্ধুদের ইশারা করতে, তারাও সকলকে নামিয়ে দিল। একটা মেয়ে একটু গুঁইগাঁই করেছিল, কিন্তু সেই ছেলেটা বর্শা উঁচিয়ে এমনি তেড়ে গেল যে সে তাড়াতাড়ি টালাস্কারকে নামিয়ে দিল।

তারপর প্রথম মেয়েমানুষের ছেলে ইঙ্গিতের ভাষায় যতটা

স্পষ্ট করে পারে, টারজানকে বুঝিয়ে দিল ও চলে যাবার পর ওদের দেশে কি কি হয়েছে। টারজানের জন্যেই ওদের পুরুষরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পেরেছে। এখন প্রত্যেকের একটি করে স্ত্রী আছে; এমন কি, কারো কারো তার বেশিও আছে। এরা সকলেই টারজানের কাছে কৃতজ্ঞ।

ওরা টারজানদের দলটাকে সারা রাত পাহারা দিয়েছিল। পরদিনও কিছু দূর সঙ্গে গেছিল।

দুদিন পরে ওরা ট্রোহানাদলমুকুসের মৌচাক বাড়িগুলো দূর থেকে দেখতে পেল। সান্ত্রীরাও ওদের দেখেছিল। এক-দল এগিয়ে এল। ওদেশের নিয়ম হল নবাগতদের এইভাবে অভ্যর্থনা করে, তাদের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করা। এবার কাছে এসে তারা যেই দেখল আগন্তুকদের মধ্যে কমডোক্লরেন্সল আর টারজান রয়েছে, অমনি সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠল। কয়েকজন ছুটল রাজধানীতে খবর দিতে।

সেখানে পৌঁছে ওদের সকলকে রাজসভায় নিয়ে যাওয়া হল। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে রাজা কেঁদে ফেললেন। টারজানকে তিনি জেরটল বা রাজপুত্রের সম্মান দিলেন। তাকে ঘোড়া, বাসস্থান, টাকাকড়ি সব দিয়ে বললেন, 'তুমি চিরকাল আমাদের কাছে থেকো।'

জানজারা, জোনথোহেগো আর ওরাথার্ককে মুক্তি দিয়ে, স্বাধীন নাগরিকের সম্মান দিলেন। তারপর রাজকুমার টালাস্কারকে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, 'বাবা, আমি এই বন্দী-দাসীকে বিয়ে করতে চাই। আমাদের রাজ্যে তো রাজকুমারদের সে অধিকার নেই, তাই আমাকে রাজকুমারের সম্মান থেকে মুক্তি দাও। আমি ওকে বিয়ে করে সুখী হতে চাই।'

রাজা বললেন, 'সাধারণতঃ এমন বিয়ে হয় না বটে, তবে এতে কোনো বাধাও নেই। এর আগেও এমন বিয়ে হয়েছে। আমার কোনো আপত্তি নেই। তোমরা সুখী হও।'

এতদিন পরে টালাস্কার তার নিজের পরিচয় দিল। সে বলল 'আমিও রাজকুমারী, মহারাজ, আমার বাবা হলেন মান্ডালামাকুসের রাজা টালাসহেগো। আমি জন্মাবার দু-মাস আগে ভেল্টোপিসমাকুসের যোদ্ধারা আমার মাকে বন্দী করেছিল। আমি ওখানকার বন্দীদের ঘরেই জন্মেছি, বড় হয়েছি। আমিও অবিশ্যি জানতাম না যে ইনি রাজার ছেলে।'

ঐখানেই থেকে গেলেন বৈজ্ঞানিক, জানজারাকে বিয়ে করে। যথেষ্ট সম্মান আর সুবিধা তাঁদের দেওয়া হল। রাজ-কুমারের সঙ্গে টালাস্কারের বিয়ে হল।

টারজানের কিন্তু বাড়ির জন্য মন বড়ই খারাপ। প্রথমে ভেবেছিল স্বাভাবিক আকার ফিরে পেলে তবে দেশে ফিরে যাবে। এখন আর তর সইছিল না। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, এক দিন সে রওনা হয়ে গেল।

এক হাজার দেহরক্ষী যোদ্ধা সঙ্গে চলল, তারপর বনের ধারে কয়েক দিন অপেক্ষা করার পর, প্রথম মেয়েমানুষের ছেলে তার দলবল নিয়ে তাকে আদর করে নিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে টারজান কাঁটাবনের কিনারা পর্যন্ত গেল। আর এগোবার সাধ্য ছিল না তাদের। সেখানেই বিদায় নিয়ে টারজান একাই এগোল। ছোট্ট শরীর নিয়ে কাঁটাঝোপের ডালপালার ফাঁক দিয়ে সাবধানে এগোয়, পাখি আর পাখির ডিম খায়, ছোট খাটো জানোয়ারের বাসায় রাতে ঘুমোয়। দ্বিতীয় রাতে খুব গা বমি করাতে, মনে পড়ে গেল বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন কবে, কখন ছোট শরীর আবার তার স্বাভাবিক আকার নেবে, তা বলা যায় না। কিন্তু তার আগে খুব গা-বমি করে। পরে রুগী অজ্ঞান হয়ে যায়। এই ছোট্ট বাসায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে, সেই অবস্থাতেই দেহ বাড়লে তো হয়ে গেল! হাঁচড়ে পাঁচড়ে টারজান গর্ত থেকে যখন বেরিয়ে এল, তখন মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে এখুনি জ্ঞান হারাবে। তলোয়ার নিয়ে ঝোপ কেটে, মরিয়া হয়ে এগোতে লাগল সে। কোন দিকে যাচ্ছে কতখানি এল, কিছুই বুঝতে পারছে না। তারপরে এক সময় অচেতন হয়ে পড়েও গেল।

*

টারজানের ওয়াজিরি যোদ্ধা উম্বুলা নরখাদক ওবিবির গ্রাম থেকে ফিরছিল, এমন সময়, জন্তু চলার পথের ধারে একটা ছোট ছেলে কি মেয়ের হাড়গোড়ের সঙ্গে একটা চামড়ার থলি খুঁজে পেল। ওবিবি বলেছিল সে টারজানকে বহু কাল দেখেনি। কিন্তু গাঁয়ের লোকরা বলেছিল ওবিবি একজন সাদা মানুষকে এক বছর বন্দী করে রেখেছিল। কয়েক মাস আগে সে পালিয়েছে। কাজেই সে টারজান হতে পারে না। তার সঙ্গে খামিসের মেয়ে উ-হাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। উম্বুলা বুঝল এটা তার হার আর থলির মধ্যেকার হীরেগুলো টারজানের। এগুলো মাই লেডিকে দিতে হবে।

তিন দিন পরে কাঁটাবনের ধারে উম্বুলা একজন অবসন্ন শ্বেতাঙ্গকে পড়ে থাকতে দেখল। তার পাশে একটা মরা

মোষ। ঐ লোকটা তার চামড়া চুষছে। উম্বুলার সাড়া পেয়ে সে মুখ তুলল। এ যে বড় বোয়ানা!

পাশেই মরা মোষের শিং-এ তার হীরের লকেটটা ঝুলছিল। উম্বুলা তাড়াতাড়ি সেটি খুলে বড় বোয়ানার গলায় পরিয়ে তাকে তুলে ধরল। বড় বোয়ানার মাথায় চোট লেগেছে। তিনি নির্বোধের মতো হাসছেন।

একটা মজবুত ছাউনি তৈরি করে উম্বুলা বেশ কিছু দিন তাঁর সেবা যত্ন করল। শরীর সারলেও, মন ফিরল না। ঐ অবস্থাতেই প্রভুভক্ত উম্বুলা তাঁকে বাড়ি নিয়ে গেল।

চিকিৎসা শুরু হল সঙ্গে সঙ্গে। সারা গা ক্ষত-বিক্ষত। সেগুলো সারল, কিন্তু জড় বুদ্ধির উন্নতি হল না। বিলেত থেকে একজন বড় সার্জনকে আফ্রিকায় আনার ব্যবস্থা হল। কোরাক পাগলের মতো পায়চারি করতে লাগল। যে কোনো সময়ে মা এসে কি এই দৃশ্য দেখবেন?

এদিকে খামিস তার মেয়ে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ফিরছিল, এমন সময় কাঁটাবনের ধারে নদী-পিশাচটাকে পড়ে থাকতে দেখল। হয় ঘুমোচ্ছে, নয় মরেছে। কিন্তু বুক ধুকধুক করছে, তার মানে মরেনি। হাত দুটোকে তার পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে, খামিস তার পাশে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘণ্টাখানেক বাদে লোকটা চোখ খুলল। চোখ খুললেও, কোনো কথার উত্তর দিল না। শেষ পর্যন্ত ঐ অবস্থাতেই তাকে হাঁটিয়ে ওবিবির গ্রামে নিয়ে গেল। ওবিবি বলল, 'কথা বলে না আবার কি? আমি এক্ষুণি কথা বলাচ্ছি।'

খামিস বলল, 'মেরে ফেললে তো উ-হার কথা জানতে পারব না।'

তখন তাকে খুঁটিতে বেঁধে সে কি অত্যাচার শুরু করে দিল। তবু কথা বলে না। শেষ পর্যন্ত খামিস রেগে মেগে একটা গনগনে গরম লোহার শিক তুলে বলল, 'এবার কথা বলবে নিশ্চয়!'

ওবিবি বলল, 'আগে ডান চোখটা!'

জেন লণ্ডন থেকে একজন বিখ্যাত সার্জনকে নিয়ে এসেছিল আর ছিল ফ্লরা হক্‌স্। রুগী তার ঘরে একটা চাকা-ওয়ালা চেয়ারে বসেছিল। ওদের দিকে অর্থশূন্য চোখে সে তাকিয়ে রইল। জেন বলল, 'আমাকে চিনতে পারছ না, জন?'

বলেই কেঁদে ফেলল। কোরাক তাকে অন্য ঘরে নিয়ে গেল।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন সম্প্রতি চোট লেগে মস্তিষ্কের ওপর হাড়ের চাপ পড়ছে। তার ফলেই এমন হয়েছে। একটা অপারেশন করে হাড়ের চাপটা কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাহলেই সম্ভবতঃ রুগী তার স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিরে পাবে। চেষ্টা করে দেখা উচিত।

পরদিন নাইরোবি থেকে ক'জন নার্সের সঙ্গে দু'জন ডাক্তার এলেন। তার পর দিন অপারেশন হল। বাড়ির লোকরা সকলে পাশের ঘরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে বসে রইল। ঘণ্টা খানেক পরে দরজা খুলে ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললেন, 'অস্ত্রোপচারটা তো ভালো ভাবেই হয়ে গেল। ফলাফলের জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। দশ দিন নার্সরা ছাড়া কেউ ও-ঘরে যাবেন না। তারাও ওর সঙ্গে কথা বলবে না; ওকেও কথা বলতে দেওয়া হবে না। ঘুমের ওষুধ দিয়ে রাখব ওঁকে। তবে সুফলই আশা করতে বাধা নেই।'

ওদিকে ওবিবির গ্রামে যেই না ওবিবি আরেকবার বলেছে, 'ডান চোখটা আগে!'

অমনি টারজানের পিঠের আর কাঁধের মাংসপেশীতে ঢেউ খেলে গেল আর ফট্ করে হাতের বাঁধন খসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রমুষ্টিতে খামিসের ডান কব্জি সে চেপে ধরল। খামিসের হাত থেকে গনগনে গরম লোহার শিকটা খসে পড়ল, আঙুলগুলো অবশ হয়ে গেল। ভয়ে খামিস চিৎকার করে উঠল। দেবতার অপ্রসন্ন মুখে দেখল তার মৃত্যুর ছাপ! ওবিবি আর তার যোদ্ধারা লাফিয়ে উঠলেও নদীর-পিশাচের নাগালের মধ্যে কেউ এল না। দেবতা চটানো চাট্টিখানিক কথা নয়। সবাই পিছোতে লাগল, তারপর পিঠ ফিরিয়ে দৌড় দিল। ওবিবিও ঘুরে পালাচ্ছিল। নদীর পিশাচ খামিসকে নিজের মাথার ওপর ধরে তার পিছন পিছন ছুটল।

নিজের ঘরে সবে ঢুকে ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়েছে, অমনি ছাদ ভেঙে একটা ভারি জিনিস তার ঘাড়ে পড়ল। ওবিবি তার হাতের ছোরা দিয়ে বারে বারে সেটার ওপর কোপ দিতে লাগল, যতক্ষণ না টের পেল সেটা মরেছে তারপর সেটাকে টেনে নিয়ে এসে, গ্রামবাসীদের ডেকে বলল, 'আর কোনো ভয় নেই। আমি নদীর-পিশাচকে মেরে ফেলেছি!' চাঁদের আর ধুনির আলোয় সবাই চেয়ে দেখে স্তম্ভিত। মৃতদেহটা নদীর পিশাচের নয়, খামিসের!

তখন ওবিবি সমস্ত গাঁ খুঁজে কাউকে পেল না, ফটকও বন্ধ। কিন্তু ফটকের সামনে মাটিতে একটা খালি পায়ের ছাপ। মোড়ল বলল, 'ওবিবি ঠিকই বলেছিল। ওটা নদীর পিশাচ নয়। ও হল টারজান। ও ছাড়া কেউ খামিসকে

ছাদের ওপর ছুঁড়ে ফেলতে পারত না। বিনা সাহায্যে ফটক ডিঙোতে পারত না।'

দশদিন কেটে গেলে খুব আস্তে আস্তে গ্রেস্টোক খামার বাড়িতে রুগীর জ্ঞান ফিরে আসছিল। ঘরের দরজা বন্ধ, ডাক্তার ভিতরে, আত্মীয়রা বাইরে। সারা দিন কেটে গেল। সন্ধ্যা হল, আলো জ্বলল। তারপর রুগীর ঘরের দরজা খুলে গেল, একজন নার্সকে দেখা গেল। তার পিছনে ডাক্তারের কাঁধে ভর করে রুগী বেরিয়ে এল। তার পিছনে হাসি মুখে আরেকজন নার্স।

ডাক্তার বললেন, 'লর্ড গ্রেস্টোক এবার খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। অনেক কিছু ওঁকে মনে করিয়ে দিতে হবে। জ্ঞান হলে প্রথমটা নিজের নামও মনে করতে পারছিলেন না। এ রকম প্রায়ই হয়।'

রুগী আস্তে আস্তে কয়েক পা এগোল। ডাক্তার বললেন, 'এই দেখুন আপনার স্ত্রী।' জেন হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল আর রুগীর মুখেও হাসি দেখা দিল। কিন্তু

ফ্লরা এসে দুজনার মাঝে দাঁড়াল। 'না, না লেডি গ্রেস্টোক! এ আপনার স্বামী নয়। এ তো এস্টেবান মিরাণ্ডা। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।'

ব্যাকুল ভাবে জেন বলল, 'ফ্লরা, ঠিক বলছ তো? ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর? জন্, বল তুমি আমার স্বামী!

রুগীর সমস্ত শরীর দুলতে লাগল, যেন বড় বেশি দুর্বলতায়। ডাক্তার তাকে ধরে ফেললেন। রুগী বলল, 'বড় ভুগেছি, তাই হয়তো অন্য রকম লাগছে। এ মেয়েকে তো আমার মনে পড়ছে না।'

ফ্লরা বলল, 'মিথ্যা কথা।'

পিছন দিকের খোলা জানলা থেকে শান্ত কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল, 'ঠিকই বলেছ। ও মিথ্যা কথা বলছে।'

সকলে চমকে ফিরে, খোলা জানলার সামনে টারজানকে দেখতে পেল। জেন তার কাছে ছুটে গেল, 'জন্! এই তো তুমি। কি করে আমি এমন ভুল করতে যাচ্ছিলাম।'

অনেক দিন পরে টারজান তার স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

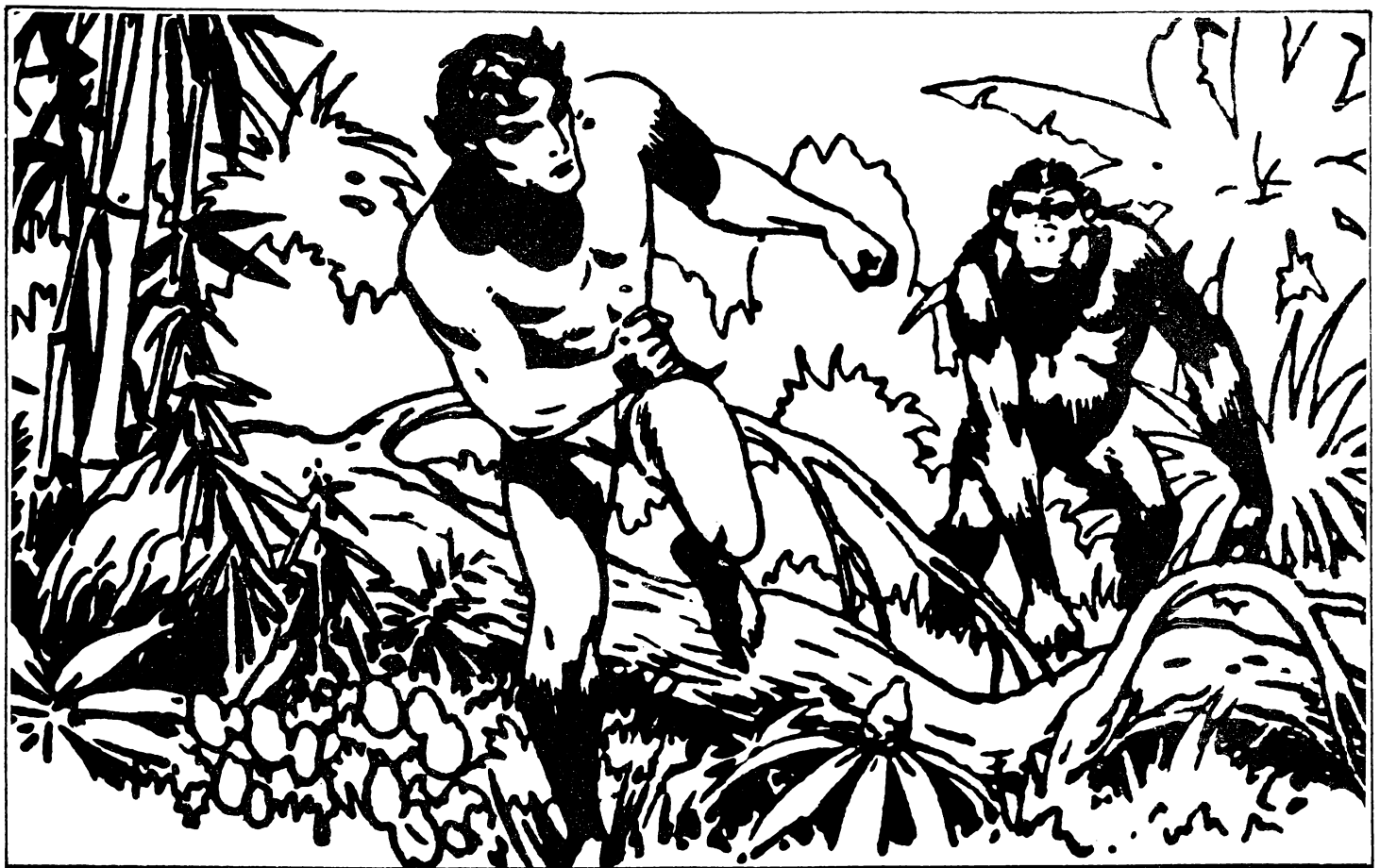

বনের প্রভু টারজান

টারজান লর্ড অফ দি জাঙ্গল

তান্তর হাতির একশো বছর বয়স। সারা জীবনে সে একজন মাত্র ভালো মানুষ দেখেছে। আর সকলেই —তা সে বেঁটে কি লম্বা কালো মানুষই হোক, আর সেকেলে বন্দুক হাতে আরবই হোক, বা প্রকাণ্ড হাতি-মারা বন্দুক কি এক্সপ্রেস্ রাইফেলধারী সাদা মানুষই হোক—সকলেই অতি জঘন্য, বিশেষতঃ সাদা রঙের মানুষগুলো। এই মুহূর্তে ঘন বনে সেই একটি মাত্র মানুষটি ওর পিঠের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে, প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল। তার নাম টারজান।

ঐ বনে সেই সময়ে ফাহ্‌ড আর মৎলগ বলে দু'জন আরব বেশ কিছু নিগ্রো ক্রীতদাস নিয়ে, হাতির দাঁতের সন্ধানে এসেছিল। ওরা ছিল শেখ ইব্‌ন জাডের লোক। নিগ্রোরা সব সময় তাজা মাংস খেতে চাইত, তাই হাতির দাঁতের চেয়ে তার মাংসের উপরেই তাদের বেশি লোভ। ওদের পাণ্ডা হলো ফেজ্জুয়ান বলে গালা জাতীয় দাস। এল-হাবাশে তার মা-বাবার নির্জন কুটির ছিল। সেখান থেকে ওকে এরা কোন্ কালে ধরে এনেছিল। সেখানে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখত ফেজ্জুয়ান। এ জায়গাটা বোধ হয় এল-হাবাশ থেকে বেশি দূরে নয়।

এই সময় থমকে দাঁড়িয়ে ফেজ্জুয়ান ঝোপের পিছনে একটা মস্ত হাতির কালচে গায়ের দিকে আঙুল দেখাল। অমনি ফাহ্‌ড নিঃশব্দে তার পাশে এসে পুরানো বন্দুকটা তুলে গুলি করল। খানিকটা ধোঁয়া, বিকট শব্দ—আর তান্তর এলোপাথাড়ি এমনি ছুট দিল যে পিঠে-শোয়া মানুষটা মাথায় গাছের ডালের বাড়ি লেগে, অচেতন হয়ে পিঠ থেকে খসে পড়ল।

আসলে ভয়ের চোটে তান্তরের টারজানের কথা মনেই

ছিল না। গুলি কারো গায়ে লাগেনি। ফেজ্জুয়ান বলল, 'ই-আল্লা, ফস্কে গেল!' তবু যদি গায়ে ঘষটেও গিয়ে থাকে, তাহলে রক্তের দাগ দেখা যাবে। তার বদলে যা দেখল, তাতে ওরা তাজ্জব বনে গেল। মারল একটা হাতিকে, মরল একটা নাজরানি, অর্থাৎ খৃষ্টান! কিন্তু তাকে উল্টে দেখে, তার গায়ে গুলিও নেই, সে মরেওনি। মাথায় চোট লেগে জ্ঞান হারিয়েছে। ফাহ্‌ড ছোরা বের করে বলল, 'সাবাড় করে দিই, তাহলে!'

মৎলগ চটে গেল, 'মোটেই না। শেখ যা বলেন, তাই হবে।'

'তবে ওকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাবে নাকি?'

ফেজ্জুয়ান বলল, 'না, ওর জ্ঞান ফিরেছে। একটু পরেই হাঁটতেও পারবে। কিন্তু হয়তো আমাদের সঙ্গে যেতে চাইবে না। কি রকম দৈত্যের মতো বলিষ্ঠ শরীর দেখেছ?'

ফাহ্‌ডের হুকুমে উটের শুকনো চামড়ার দড়ি দিয়ে টারজানের হাত দুটো একসঙ্গে বাঁধা হলো। জ্ঞান ফিরতেই সে বলল, 'হাত বেঁধেছ কেন? খুলে দাও।'

ফাহ্‌ড হাসল, 'ওহে নাজরানি, তুমি যে কেউ কেটার মতো হুকুম পাড়ছ, যেন কত বড় শেখ।'

—'আমার নাম টারজান। আমি শেখদের শেখ।'

মৎলগ ফাহ্‌ডের কানে কানে বলল, 'দোহাই, ওকে চটিও না। যেখানে গিয়েছি সেখানেই সকলে বলেছে 'এখান থেকে লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছ তোমরা! টারজান এলে টেরটা পাবে!'

ফাহ্‌ড আবার ছোরায় হাত দিয়ে বলল, 'নাঃ, তখনি মেরে ফেলা উচিত ছিল!'

মৎলগ বলল, 'কি যে বল! ওকে মারলে এই বন্দীদেরই কেউ পালিয়ে ওর ফাঁড়িতে খবর দেবে। তাহলে আমরা একজনও জান নিয়ে ফিরতে পারব না।'

টারজান আবার বলল, 'কি ঠিক করলে? দড়ি কেটে দিয়েআমাকে তোমাদের শেখের কাছে নিয়ে চল। তার সঙ্গে কথা আছে।'

শেখ ইব্‌ন জাড তার ফাঁড়িতে পুরুষদের বৈঠকখানায় বসে ছিল! সঙ্গে ছিল তার ভাই টলগ আর জায়দ বলে একজন যুবক।

পুরুষরা কথা বলছিল। একটা পরদার আড়ালে শেখের মেয়ে আতেজা আর স্ত্রী হির্ফা ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল। হির্ফা রাঁধছিল, আতেজা থলি সেলাই করছিল আর দু'জনেই পুরুষদের কথা শুনছিল।

ইব্‌ন জাড বলল, 'দেশ থেকে তো অনেকটা দূরে আসা গেল। এল-হাবাশ জায়গাটা এড়িয়ে যাবার জন্য একটু ঘুর-পথে এসেছিলাম। এবার ফিরবার পথে এল-হাবাশ হয়ে যাব। সেই জাদুকর যে জায়গায় নিম্মরের রত্ন-নগর পাওয়া যাবে বলেছিল, তারই কাছ দিয়ে যাব।'

টলগ বলল, 'তুমি কি ভাব যে ও-জায়গা খুব সহজেই পাওয়া যাবে? একবার এল-হাবাশে ঢুকলেই হলো?

'হ্যাঁ, সবাই তো তাই বলে। আমাদের ফেজ্জুয়ানের বাড়ি সেখানে, সে-ও ছোটবেলায় সে-গল্প শুনেছে। ওখানকার কয়েকজনকে বন্দী করে, জোর করে সেখানকার গুপ্তপথ জেনে নেবো।'

জায়দ বলল, 'আশা করি এ-ও সেই ময়দান সালির এল-হাওয়ারা টিলার রত্নের মতো নয়। একটা আফ্রিৎ সেগুলোকে পাহারা দেয়। কেউ যদি সরায় তো গোটা মানুষ জাতের সর্বনাশ হবে।'

টলগ বলল, 'আমিও শুনেছি একজন পরম জ্ঞানী মৌলবী ঘুরতে ঘুরতে ওখানে পৌঁছে, তাঁর জাদুর বই দেখে পাথরের গায়ের লিপির মানে উদ্ধার করে বলেছেন, বাস্তবিকই ওখানে রত্ন আছে।

ইব্‌ন জাড বিরক্ত হয়ে বলল, 'নিম্মরের ধন কেউ পাহারা দিচ্ছে না।'

জায়দ বলল, 'গেরিয়ার ধনের মতো সহজে পাওয়া গেলে বাঁচা যায়। প্রতি শুক্রবার সেখানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাটি থেকে মোহর উঠে মরুভূমির বালিতে গড়ায়!'

ইব্‌ন জাড বলল, 'নিম্মরেও কোনো অসুবিধে হবে না, একমাত্র অসুবিধে হবে, ঐ ধন আর ওখানে একজন সুন্দরী মেয়ে আছে, সব নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে।'

এই সময় টারজানকে নিয়ে ফাহ্‌ডরা পৌঁছল। হাত বাঁধা থাকা সত্ত্বেও টারজান তেজের সঙ্গে বলল, 'আমি শেখের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

মুখের কাপড় সরিয়ে জাড বলল, 'আমিই শেখ, তোমার নাম কি?'

—'আমি টারজান।'

—'নাম শুনেছি।'

—'তা তো শুনবেই। সব দস্যুরাই শুনেছে। আমার এলাকায় ক্রীতদাস সংগ্রহ করতে কেন এসেছ? আমি কাউকে সে অনুমতি দিই না।'

—'আমরা সে জন্য আসিনি। হাতির দাঁতের ব্যবসা করতে এসেছি!'

—'মিছে কথা। তোমার মঞ্জিলে, মানুয়েমা আর গালা ক্রীতদাস দেখছি। তারা নিশ্চয় শখ করে আসেনি। তাছাড়া আমার চোখের সামনে হাতি মারার চেষ্টা হয়েছে।'

—'ভুলে মেরেছে, বনের মধ্যে ভেবেছে অন্য জানোয়ার।'

—'আর কথায় কাজ নেই। এখনি ফিরে যাবার ব্যবস্থা কর।'

ইব্‌ন জাড বলল, 'অনেক দূর থেকে হাতির দাঁতের জন্য এসেছি। কাউকে বন্দী করব না। সকলকে মাইনে দেবো। হাতিও মারব না। ফিরবার আগে তোমাকে যথেষ্ট টাকাকড়িও দেবো। এখন বাধা দিও না।'

টারজান বলল, 'না, এখনি যাও।'

ইব্‌ন জাড রেগে গেল, 'বেশ যুদ্ধই যদি চাও তবে তাই দেবো। তুমি আমাদের বন্দী। মরা মানুষরা তো আর সাক্ষী দেয় না। ভেবে দেখ। ফাহ্‌ড এখন একে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখো।'

ফাহ্‌ড বলল, 'আমি ওকে তখনি মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম, তা মৎলগ দিল না। দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত।'

মৎগল বলল, 'তা তো বটেই। তারপরে এক দিনের মধ্যে ওর লোকরা আমাদের ঘেরাও করেও ফেলত।'

টলগ বলল, 'তবু মেরে ফেললেই হতো। হাত-পা বাঁধা হয়ে পড়ে আছে। রাতারাতি সাবাড় করে, শরীরটা লুকিয়ে ফেলে বললেই হবে ও পালিয়ে গিয়েছে। তাহলে কেউ কিছু বলতেও পারবে না, অথচ ঝামেলাও দূর হবে।' একথা শুনে ইব্‌ন জাড মহা খুশি।

*

শেখের মঞ্জিলে অন্ধকার নেমেছিল। বাইরে জায়দ আর আতেজা কথা বলছিল। তারা পরস্পরকে ভালোবাসে, কিন্তু শেখের ফাহ্‌ডকে বেশি পছন্দ। টলগকেও ফাহ্‌ড হাত করেছিল। এই সব নিয়ে দু'জনে দুঃখ করছিল। ভাইয়ের ওপর শেখের অগাধ বিশ্বাস, অথচ সুবিধা পেলেই টলগ বড় ভাইকে মেরে, নিজে শেখ হতে চায়, তাতে সন্দেহ নেই।

টারজান একটা তাঁবুর নিচে হাত-পা বাঁধা হয়ে শুয়ে শুয়ে, হাজার চেষ্টা করেও উটের চামড়ার দড়ি ছিঁড়তে পারছিল না।

হাঠৎ রাতের অন্ধকার একটা জানোয়ারের তীক্ষ্ণ ডাকে খান-খান হয়ে গেল। সকলে আঁৎকে উঠল। শব্দটা কি ঐ নাজরানির তাঁবু থেকেই এলো? হতেও পারে। খৃষ্টানরা শয়তানের জাতভাই। জানোয়ারের মতো ডাকা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাঁবুতে উঁকি মেরে দেখা গেল, সে চুপ করে বসে আছে। শেখ টারজানকে বলল, 'একটা ডাক শুনেছ?'

—'শুনেছি। এই সামান্য কারণে উঠে এলে, নাকি আমাকে ছেড়ে দেবে বলে এসেছ?'

—'ওটা কিসের ডাক?'

—'একটা পশু আরেকটাকে কাছে ডাকছে। ভয় পেলে নাকি?'

—'আমরা অত ভয় পাই না। যদি কোনো পশু তোমার ক্ষতি করতে এসে থাকে তাই ভেবে দেখতে এলাম। কাল তোমাকে ছেড়ে দেবো।'

—'আজ-ই দেবে না কেন?'

—'আমার লোকরা তোমাকে ভয় করে। ওরা বলছে ছাড়া পেয়েই তোমাকে চলে যেতে হবে।'

—'তাইতো যাব। এখানে বড্ড উকুন।'

আরো দু-একটা বাজে কথা বলে শেখ সরে পড়ল। তারপর মাটিতে কান পেতে টারজান কি যেন শুনতে লাগল।

মঞ্জিলের বাসিন্দারা ডাকটা শুনে একটু অস্বস্তি বোধ করলেও, সেটাকে কোনো গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু তান্তর সে ডাক শুনেই তার মানে বুঝেছিল।

শুঁড় তুলে, জোরে জোরে বার দুই ডাক ছেড়ে এক-রকম দৌড়ে শব্দটার দিকে সে এগোতে লাগল।

এদিকে শেখের ঘরে দুই ভাইতে গোপন কথা হচ্ছিল। শেখ বলল, 'বন্দীরা যেন নাজরানি হত্যা দেখতে না পায়। আগে কাজ সার, তারপর দু'জন ক্রীতদাসকে ডেকে নাও। ফেজ্জুয়ান তাদের একজন। ছোটবেলা থেকেই আছে, ওকে বিশ্বাস করা যায়।'

টলগ বলল, 'আর আব্বাসকে নেবো।'

—'কিন্তু ওদেরও বলো না নাজরানিকে কে হত্যা করল। বলো তাঁবুতে একটা শব্দ শুনে উঠে গিয়ে ঐ ব্যাপার দেখেছ। ওরাও যেন কাউকে না বলে। সবাই জানুক সে পালিয়েছে'।

এই বলে শেখ শুতে গেল। টলগ চলল টারজানের তাঁবুর দিকে। টারজান কিন্তু তার পায়ের শব্দ ঠিক শুনতে পেয়ে, তার উদ্দেশ্যটাও টের পেয়েছিল। তাঁবুতে যেই টলগ ঢুকেছে অমনি আবার সেই বিকট ডাক শোনা গেল। এবং তাঁবুর মধ্যে থেকেই।

টলগ পিছু হটল, 'নাজরানি! তোমাকে কেউ আক্রমণ করেছে নাকি?' কোনো উত্তর নেই। ছোরা হাতে টলগ বেরিয়ে এসে আবার ডাকল। কোনো সাড়াশব্দ পেল না। ছুটে গেল নিজের ঘরে। একটা কাগজের লণ্ঠন জ্বেলে নিল, বন্দুকটাও নিল। তারপর আবার সেখানে গিয়ে আলোটা তুলে দেখল টারজান ছাড়া কেউ নেই।

—'তাহলে তুমিই ঐ অমানুষিক চিৎকার করলে?'

—'তুমি আমাকে মারতে এসেছ বুঝি?'

টারজান জানত মঞ্জিলের অন্য কেউ কেউও জেগে গিয়েছিল, কিন্তু ঘর থেকে কেউ বেরোয়নি। বাইরে সিংহ ডাকল। হাতি ডাকল। টলগ নিশ্চিন্ত ছিল, অত উঁচু কাঁটার বেড়া ডিঙিয়ে কেউ আসবে না। কোনো কথা না বলে সে ছোরা বের করে এগিয়ে এলো। মঞ্জিলের অন্য দিক থেকে কানে কি রকম শব্দ পৌঁছল। বাঁধা হাতের ঝটকা লেগে টলগের হাত সরে গেল। এবার টলগ বন্দীর পিছন দিক দিয়ে ঘুরে এলো! টারজানও বাঁধা পা নিয়ে ঘুরতে গিয়ে, আছাড় খেয়ে টলগের পায়ের কাছে পড়ল। টলগের ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি দেখা দিল, 'এবার মর নাজরানি!' এই বলে যেই ছোরা তুলেছে, অমনি মাথার ওপর থেকে গোটা তাঁবুটাকেই কে উঠিয়ে নিল! মাথা ঘুরিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল টলগ। কে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, শুঁড় দিয়ে টলগের কোমর জড়িয়ে ধরে, তাকেও অনেকখানি উঁচু করে দূরে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর রাগত ভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখে, টারজানকে তুলে নিয়ে, মঞ্জিল পার হয়ে বনের দিকে চলল। একজন প্রহরী মরে পড়ে ছিল, অন্যজন এলোপাথাড়ি একটা গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে গেল। টারজানকে নিয়ে তান্তর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মঞ্জিলে সে কি হৈ-চৈ। টারজানের তাঁবুও নেই, সে-ও নেই। পাশের তাঁবুটাও পড়ে গেছে। তার নিচে চাপা পড়ে একজন মেয়ে চ্যাঁচাচ্ছে, একজন পুরুষ গাল দিচ্ছে। তাঁবুর ওপরে টলগও পড়ে পড়ে বিশ্রী গালাগালি দিচ্ছে। ঐখানে পড়াতে প্রাণে বেঁচেছে বলে কোথায় আল্লাকে ধন্যবাদ দেবে, তা নয়।

শেখ ভাইয়ের দিকে ফিরে বলল, 'কি হয়েছে?'

টলগ বলল, 'নাজরানির বন্ধু শয়তান হাতি সেজে এসে, আমাকে ছুঁড়ে এই তাঁবুটার কাছে ফেলে নাজরানিকে নিয়ে বনে চলে গিয়েছে।'

শেখ বলল, 'পাহারাওয়ালারা কি করছিল?'

মৎলগ বলল, 'তারা পাহারা দিচ্ছিল। হাতি এসে ইয়েমেনিকে মেরে, নাজরানির তাঁবুটা তুলে ফেলে দিয়ে, তাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। আমি গুলি ছুঁড়েছিলাম। কিন্তু—'

শেখ বলল, 'ওর গায়ে লাগেনি!'

শেখ সকলকে বলে দিল, এখানে আর নয়; পরদিন সকালেই তাঁবু তুলে যাত্রা করা হবে।

অনেক দূরে বনের গভীরে পৌঁছে হাতিটা টারজানকে নামিয়ে দিল। টারজান বলল, 'আজ রাতটা ঘুমনো যাক। কাল বাঁধন খোলা যাবে।' সারারাত বুনো জন্তুরা আশেপাশে ঘুরলেও, তান্তরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, কাছে যেতে সাহস পেল না।

ভোরে শেখের তাঁবুগুলো নামানো হলো, সামান্য জলযোগ সারা হলো তারপর শুরু হয়ে গেল এল-হাবাশের উদ্দেশ্যে উত্তর দিকে রহল্লা। আরবরা সপরিবারে টাট্টু চেপে চলল। যে সব ক্রীতদাস উত্তর দেশ থেকে ওরা নিয়ে এসেছিল, তারা সকলেও আস্কারি হয়ে সঙ্গে চলল, বন্দুক হাতে। কেউ সামনে, কেউ পিছনে। যে সব স্থানীয় লোককে বহাল করা হয়েছিল, তারা জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে চলল। সঙ্গে যত ছাগল ভেড়া গেল, তাদের আগলানোও এদের কাজ।

জায়দ আতেজার পাশে ঘোড়ায় চলেছিল। ফাহ্‌ড ইব্‌ন জাডের কাছে কাছে ছিল। ওদের দু'জনের দিকে সে বিষদৃষ্টি হানছিল।

টলগ ওর কানে কানে বলল, 'তোমার চেয়ে ঐ ছোকরার সাহস বেশি।'

ফাহ্‌ড বলল, 'মিথ্যা খোশামোদ করে ছোকরা। আমি ও-সব পারি না।'

—'শেখ বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

—'বলেন না যে!'

—'তা বটে! শেখ বলেছে মেয়ে নিজে বর পছন্দ করবে। এখন আমি যদি শেখ হতাম, আমার ভাইঝির সঙ্গে আমার পছন্দ করা পাত্রের বিয়ে হতো।'

ফাহ্‌ড বলল, 'কিন্তু তা তো তুমি নও।'

তখন টলগ তার কানে কানে বলল, 'জায়দের মতো সাহসী প্রার্থী হলে, আমাকে শেখ করে দেবার উপায়ও হয়ে যেত।'

ফাহ্‌ড কোনো উত্তর দিল না।

*

তিন দিন ধরে আরবরা এল-হাবাশের দিকে এগোচ্ছে আর ঐ তিন দিন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় টারজান পড়ে আছে, তান্তর তাকে পাহারা দিচ্ছে। কাছাকাছি গাছপালা ঝোপঝাড় যতটা সম্ভব সে খেয়ে শেষ করেছে, এখন উপোস করছে। শেষ পর্যন্ত টারজান তাকে অন্য জায়গায় চরতে পাঠিয়ে দিল। নিজের কপালে যা থাকে হবে। এমন সময় মানু বাঁদরের দল কিচির মিচির করতে করতে সেখানে হাজির। তাদের অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভয় ভাঙিয়ে কাছাকাছি যে বনমানুষের দল ছিল, তাদের কাউকে ডেকে দিতে বলল।

বাঁদররা বলল, 'আসছে! তারা এদিকেই আসছে।'

—'তাদের বল আমার বাঁধন খুলে দিয়ে যেতে।'

—'ওদের কাছে যেতে ভয় করে।'

—'দূর থেকে চেঁচিয়ে বল।'

মানুর দল চলে গেলে খানিক বাদে বনমানুষরা এলো। তাদের যেমন স্বভাব, আগে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে ওকে ভালো করে দেখে নিল। ওদের বড় সন্দেহ বাতিক। যদি মাথায় ঢোকে এ টারমানগানিটা শত্রু, তাই টারজান ডেকে বলল, 'আমি তোমাদের বন্ধু। কাছে এসে আমাকে খুলে দাও। টারমানগানিরা আমাকে বেঁধে রেখেছে। আমি খেতে পাচ্ছি না, জল পাচ্ছি না।'

ঝোপের পিছন থেকে একজন বলল, 'তুমিও তো টারমানগানি!'

'আমি বনমানুষদের ছেলে টারজান।'

মানুও চ্যাঁচাতে লাগল, 'হ্যাঁ, ও টারজান। তান্তর ওকে নিয়ে এসেছে।'

আরেকটা বনমানুষ বলল, 'আমি টারজানকে চিনি।' এই বলে কাছে এলো।

টারজান তাকিয়ে দেখল। 'আরে মোয়ালাট্ যে!'

মোয়ালাট্ বাকিদের বলল, 'ও সত্যই টারজান।'

টারজান জানতে চাইল, এ দলের রাজা কে।

সে বলল, 'টয়াট'।

—'তাহলে এখনি আমার পরিচয় দিয়ো না। টয়াট আমাকে দেখতে পারে না। আগে আমার দড়ি কেটে দাও।'

মোয়ালাট্ বলল, 'আমি তোমার বন্ধু। তুমি যা বলবে, তাই করব।' এই বলে দাঁত দিয়ে বাঁধনগুলো কেটে দিল।

টারজান ওকে কিছু বলছে না দেখে, বাকিরাও কাছে এলো। একটু পরেই টয়াটের সঙ্গে দলের বাকি সকলেও এলো। আরো আটজন গোদা, ছয়-সাতজন মেয়ে আর বেশ কিছু কাচ্চাবাচ্চা। টারজানকে দেখেই টয়াটের সে কি তড়পানি আর লাফঝাঁপ। 'এটা টারমানগানি!'

মোয়ালট্ তাড়াতাড়ি বলল, 'ও তো মানগানিদের বন্ধু টারজান।

—'ও টারমানগানি, ওরা আগুনলাঠি দিয়ে মানগানি মারে! মেরে ফেল ওকে।'

গায়াট বলে ওর আরেক সঙ্গী বলল, 'না, ও টারজান। আমি যখন বালু ছিলাম, ও আমাকে নুমার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। ও আমাদের বন্ধু।'

টায়াট তবু বলে, 'মারো। মারো!' আর লাফায়!

এ দলে অনেকেই টারজানের চেনা, কিন্তু তারাও ওর হয়ে কিছু বলছিল না। তখন টারজান চেঁচিয়ে বলল, 'টয়াটকে গোড়ায় রাজা হতে দিইনি ব'লে ওর রাগ। কিন্তু ও যদি ভালোভাবে কাজ করে থাকে, তাহলে ও রাজা হলে, আমিও খুব খুশি হবো। কিন্তু এখন ও ভালো রাজার মতো ব্যবহার করছে না।'

তারপর একটা হোঁৎকা গোদার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'জুথো, এখন তো ভারি তেজ দেখাচ্ছ। মনে আছে সেবার তোমার অসুখ করেছিল বলে দলের সবাই তোমাকে ফেলে চলে গিয়েছিল। এখন যে আমার গায়ে দাঁত বসাতে চাইছ, তখন কে তোমার কাছে থাকত? খাবার আর জল এনে দিত কে? রাতে কে নুমাকে শীতাকে তাড়াত?' এতক্ষণে জুথোর সব মনে পড়ল। সে টারজানের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'জুথো টারজানের বন্ধু।'

ততক্ষণ অন্য গোদাগুলো যে যার খাবার খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। টয়াটের রাগটা তখনো একেবারে না পড়লেও একটু পরেই সেও মোটা মোটা পোকা খুঁজতে আরম্ভ করে দিল।

এই ভাবে টারজান আবার ওদের দলের সঙ্গে মিলিত হলো। মাঝখানের অনেকগুলো বছর যেন কোথায় খসে গেল। কেবলই ছোটবেলার কথা মনে হতে লাগল। ততদিনে ইব্‌ন জাড তার দলবল নিয়ে উত্তরে নিম্মরের দিকে আরো অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল।

*

ঐ একই সময়ে জেম্‌স্‌ হাণ্টার ব্লেক বলে একজন ধনী আমেরিকান, তার বন্ধু উইলবার স্টিম্বলের সঙ্গে সাফারি নিয়ে ঐখানে এসেছিল। স্টিম্বলের বয়স হয়েছে, কিছু অভিজ্ঞতাও ছিল, তাই সে সব ব্যবস্থা করছিল।

ব্লেকের বয়স পঁচিশ, খরচপত্র তার। প্রাণীহত্যা সে ভালোবাসত না। তার ইচ্ছা ছিল বনের পরিবেশে বনের জানোয়ারদের চলচ্চিত্র তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু স্টিম্বলের দুর্ব্যবহারে অভিযানের শুরুতেই ক্যামেরাম্যান চলে যাওয়াতে ব্যাপারটা একটা সাফারিতে দাঁড়িয়েছিল। তার ওপর নিগ্রোদের সঙ্গে স্টিম্বলের নিষ্ঠুর ব্যবহার ব্লেকের কাছে ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠছিল। শেষে স্টিম্বল লোকজন পরিচালনার ভার ব্লেকের হাতেই তুলে দিতে রাজি হলে, একটা রফা হয়েছিল।

এর মধ্যে মালবাহক হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়াতে, রেগেমেগে স্টিম্বল তাকে নির্মমভাবে মার দিল। এবার ব্লেক পিস্তল বের করে বলল, 'থেমে যাও। যথেষ্ট হয়েছে। এই-খানে আমাদের ছাড়াছাড়ি হোক। কাল সকালে অর্ধেক জিনিসপত্র আর যে ক-জন নিগ্রো তোমার সঙ্গে যেতে চায়, তাদের নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে।'

সেদিন দুপুরেই ক্যাম্প করে জিনিসপত্র ভাগাভাগি করতে লাগল ব্লেক। স্টিম্বল কোনো কথা না বলে, দুটো লোককে সঙ্গে নিয়ে শিকার করতে বেরোল।

মাইলখানেক না যেতেই সামনে দেখে একটা গোরিলা চলেছে। বাঃ, এটা তো খাসা স্পেসিমেন হবে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি। সুখের বিষয় গুলিটা গোরিলার গায়ে লাগল না। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও, তাকে মারতে পারল না স্টিম্বল। দূর থেকে গুলির শব্দ শুনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাছের ডালে ঝুলে টারজান সেদিকে চলল। এ তো আরবদের সেকেলে বন্দুকের শব্দ নয়, এ হলো দামী আধুনিক রাইফেলের আওয়াজ!

এদিকে বোলগানি বেচারা ঘাবড়ে গিয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতে এত ব্যস্ত ছিল যে একটা মস্ত অজগর যে গাছ থেকে ঝুলে আছে তা সে দেখতে পায়নি।

অজগরটা দেখতে দেখতে তাকে পাক দিয়ে ধরল। এক দিক থেকে টারজান, অন্য দিক থেকে স্টিম্বল এসে এই দৃশ্য দেখতে পেল। বোল্‌গানি বৃথাই প্যাঁচ ছাড়াবার জন্য লড়ছে, ফলে প্যাঁচ আরো কষে বসছে।

টারজান চেয়ে দেখে সর্বনাশ! স্টিম্বল এক গুলিতে দুটো জানোয়ারকেই মারবার তালে আছে। টারজান নিজে কিছু বোল্‌গানিকে ভালোবাসত না, কিন্তু তার এই মর্মান্তিক অবস্থা দেখে মনে বড় সহানুভূতি হলো। সে ডাল ধরে স্টিম্বলের মাথার ওপর পৌঁছল। স্টিম্বল বন্দুকটা সবে তুলেছে, এমন সময় টারজান তার পিঠে লাফিয়ে পড়ে তাকে পেড়ে ফেলল। তারপর খাপ থেকে ওর শিকারের ছোরাটা টেনে বের করে নিল।

রেগেমেগে উঠে দাঁড়িয়ে স্টিম্বল মারামারি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু যা দেখল তাতে সে-কথা ভুলেই গেল। বিশাল-দেহ নেংটি-পরা এক শ্বেতাঙ্গ, খালি একটা ছোরা নিয়ে প্রকাণ্ড অজগরের সঙ্গে লড়ছে!

ছোরা খেয়ে ব্যথায়, রাগে, অজগরটা বোলগানিকে ছেড়ে টারজানকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। বোলগানি মাটিতে পড়ে হাঁপাচ্ছিল। অজগরটা টারজানের একটা পা আর কোমরের ওপরে জড়িয়ে ধরেছিল। তবে বারে বারে কোপ খেয়ে সে-ও দুর্বল হয়ে পড়ছিল আর টারজানও ঐ অবস্থাতেও একই জায়গায় বারবার ছোরা বসিয়ে যাচ্ছিল। এক সময় সাপের মেরুদণ্ড দু-টুকরো হয়ে যাওয়াতে মাথার দিকটা ঝুলে গেল, কিন্তু ল্যাজের দিকটা এমনি পাক খেতে লাগল যে তার প্যাঁচ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে টারজানকে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো।

তারপর বোলগানিকে জিজ্ঞাসা করল, 'খুব লেগেছে?'

—'না। তুমি কি আমাকে মারতে এসেছ?'

—'মোটেই না। আমি বনমানুষদের ছেলে টারজান।'

—'তোমার পিছনের টারমানগানিটা কিন্তু পারলে আমাদের দু'জনকেই মেরে ফেলবে। তার আগেই ওকে মেরে ফেলা যাক।'

টারজান বলল, 'তার কোনো দরকার হবে না। আমি ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছি।'

স্টিম্বল এ-সব কিছুই বোঝেনি। সে টারজানকে বলল, ,একটু সরে যাও তো দেখি। গোরিলটাকে সাবাড় করি। সাপের সঙ্গে লড়ে, আবার ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না।'

টারজান দু'জনার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে বলল, 'মোটেই ওকে মারবে না।'

—'ওর পিছন পিছন এতক্ষণ কেন ধাওয়া করছিলাম তা জান?'

—'একটু ভুল বুঝে।'

—'কি বুঝে ?'

—'যে ওকে মারতে পারবে। পারবে না।'

স্টিম্বল তো অবাক ! 'জান আমি কে ?'

—'জানবার ইচ্ছাও নেই।'

—'আমি নিউইয়র্কের বিখ্যাত দালাল স্টিম্বল কোং-এর স্টিম্বল।'

—'তাহলে আমার দেশে কি করছ ?'

—'তোমার দেশ ? তুমি আবার কে ?'

তার কথার জবাব না দিয়ে, টারজান তার অনুচরদের গ্রাম্য ভাষায় বলল, 'আমি টারজান। এ এদেশে কি করছে ? এদের সঙ্গে ক-জন লোক ? ক-জন সাদা মানুষ ?'

তখন তারা বলল, 'সাদা বোয়ানা দু'জন। এ লোকটা বড় খারাপ ব্যবহার করে। অন্যজন খুব দয়ালু। ওরা বড় জানোয়ার শিকার করতে এসেছে। কিছু পায়নি। কাল ফিরে যাচ্ছে।'

—'ওদের ক্যাম্প কোথায় ?'

—'কাছেই।'

টারজান স্টিম্বলকে এবার বলল, 'ক্যাম্পে যাও, আমি পরে দেখা করব। টারজানের দেশে খাবার জন্য ছাড়া জানোয়ার মারার অনুমতি নেই।'

ওর গলার স্বরে এমন একটা ধন-মান-মর্যাদার প্রতিধ্বনি ছিল যে স্টিম্বল কিছু বলতে পারল না। টারজান আর গোরিলাকে পাশাপাশি বন্ধুর মতো চলে যেতে দেখে অবাক হলো।

তারা অদৃশ্য হয়ে গেলে স্টিম্বল তার অনুচরদের বলল, 'টারজান আবার কে ? ওর নামও কখনো শুনিনি। আমার যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা জানোয়ার মারব।' এই বলে সে ক্যাম্পের পথ ধরল। পথে একটিও শিকার চোখে পড়ল না। অনুচররা কিছু দেখতে পেয়েছিল কি না, সেটা অবিশ্যি বোঝা গেল না।

*

ক্যাম্পে ফিরে স্টিম্বল দেখল ব্লেক ইতিমধ্যে জিনিসপত্র দুটি সমান ভাগ করে ফেলেছে। স্টিম্বল তাতেই সন্তুষ্ট। সে বলল, 'তুমি ভাবছ বাহকরা কেউ আমার সঙ্গে আসতে চাইবে না। সেটা তোমার ভুল ধারণা। ওরা কড়া মালিক ভালবাসে। যারা তোমার সঙ্গে যেতে চায়, তুমি তাদের সবাইকে নিতে পার। আমি বাকিদের নেবো।'

তারপর বাহকদের পাণ্ডাকে ডেকে বলল, 'সবাইকে এক্ষুণি ডেকে আনো।' এরপর ব্লেককে বলল, 'কেউ ক্যাম্পে এসেছিল নাকি ? আধাপাগল বোকা মতো একটা শ্বেতাঙ্গ, খালি গা, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নেই !'

ব্লেক বলল, 'টারজানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি ?'

স্টিম্বল সমস্ত ঘটনা তাকে বিস্তারিত বলল।

ব্লেক বলল, 'ও যদি আমাকে চলে যেতে বলত, আমি তাহলে চলেই যেতাম। এ বনে ওর কথামতো সবাই চলে। গাছপালা পশুপাখির মতো ও-ও এ বনের একটা অঙ্গবিশেষ।'

—'তা তুমি যেতে পার। আমি যাব না। ব্যাটা বুদ্ধিহীন।'

—'স্টিম্বল, ও যে তা নয়, সেটা তুমি শিগগির টের পাবে। আর গোলমাল বাড়িও না। বলেছে যখন, চলেই যাও। ওকে চটানো ভুল।'

—'আসুক না বাঁদরটা এখানে, বুঝিয়ে দেবো স্টিম্বলের ব্যাপারে নাক গলানো কত ভুল।'

—'তাই আসছে বুঝি ? ওর বিষয় এত শুনেছি, ওকে দেখার বড়ই ইচ্ছা আছে।'

—'কি আশ্চর্য আমি কখনো ওর নামও শুনিনি।'

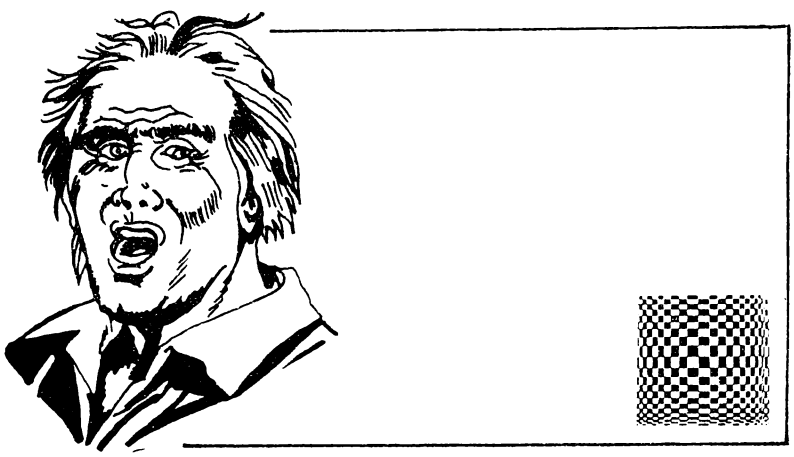

বাহকরা সকলে জড়ো হলে, স্টিম্বল বলল, 'যারা ব্লেকের সঙ্গে যেতে চায় তারা যেন ব্লেকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। অমনি গুটি গুটি সবাই গিয়ে ব্লেকের পাশে দাঁড়াল। তাই দেখে স্টিম্বল নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। প্রথমটা ভাবল, ওরা নিশ্চয় ওর কথা বোঝেনি, আধা জানোয়ার তো সব ! তারপর ব্যাপার দেখে বেজায় চটে গেল, 'এ তো বিদ্রোহ ছাড়া কিছু নয় ! ব্লেক তুমিই নিশ্চয় ওদের শিখিয়ে দিয়েছ ?'

ব্লেক বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাজে কথা বলো না। একটু বেশি করে মজুরি দেবে বললেই কয়েকজন নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাবে।'

হাঁড়িমুখে স্টিম্বল বলল, 'যা বলবার বলে তুমিই ঠিক করে নাও।' তখন অর্ধেক বাহককে ডবল মজুরিতে স্টিম্বলের সঙ্গে যেতে বলল ব্লেক।

ওরা তবু বলতে লাগল, 'তোমার সঙ্গে যাব, ওর সঙ্গে নয়।'

মরিয়া হয়ে ব্লেক বলল, 'আমাদের সঙ্গে আসবে যাবে, এই রকমই তো কথা হয়েছিল।'

—'দুজনার সঙ্গে, বোয়ানা, একজনের নয়।'

ব্লেক হতাশ হলো, 'আচ্ছা, এখন একটু ভেবে দেখ। কাল সকালে যা হয় ঠিক করা যাবে।'

এই সময় টারজান এসে উপস্থিত। ব্লেক নিজের পরিচয় দিলে, টারজান বলল, 'শিকার করতে এসেছ বোধ হয়!'

—'ক্যামেরার সাহায্যে।'

—'তোমার বন্ধুর হাতে যে বন্দুক দেখলাম?'

—'ও কি করে, তার ওপর আমার কোনো হাত নেই।'

স্টিম্বল বলল, 'অন্য কারো-ও হাত নেই।'

তার কথায় কান না দিয়ে, টারজান ব্লেকের দিকে ফিরল, 'যদ্দূর মনে হচ্ছে, তোমাদের বলছে না বলে আলাদা হচ্ছ?'

—'ঠিক তাই।'

—'আলাদা হয়ে তুমি কি করবে?'

স্টিম্বল বলল, 'ভাবলাম আরেকটু পশ্চিমে গিয়ে, তারপর বেঁকে—।'

—'আমি ব্লেককে জিজ্ঞাসা করছিলাম। তোমার বিষয়, আগেই মন ঠিক করেছি।'

—'কোথাকার তুমি—'

টারজান বলল, 'চোপ! ব্লেক বল।'

—'আমি তো উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে সিংহের ছবির চেষ্টা করব ভাবছিলাম। আজ পর্যন্ত কোনো জানোয়ারেরই ভালো ছবি নিতে পারিনি। এত সময় আর টাকা খরচ করে, খালি হাতে ফিরতেও ইচ্ছা করে না।'

স্টিম্বল তবু বলল, 'শিকার করতে এসেছি, শিকার না করে ফিরব না। তা তুমি যাই বল, আধা-বাঁদর কি আধা-মানুষ যাই হও।'

টারজান ব্লেককে বলল, 'ভোরে রওনা হবার জন্য তৈরি হয়ো। আমি আসব।'

ভোর হবার আগেই দুই বোয়ানার বাঁধাছাঁদা সারা। ঠিক সেই সময় একটা গাছ থেকে টারজান নামল। ওকে দেখে নিগ্রো বাহকরা বেশ ঘাবড়ে গেল। টারজান তাদের বলল, 'তোমরা এখানে সাফারি এনে অন্যায় করেছ। কারণ তোমরা ভালো করেই জান যে আমার এলাকায় প্রাণের দায়ে আর খাবার জন্য ছাড়া বিনা অনুমতিতে জানোয়ার মারা বারণ। এবার আমার হুকুম ভালো করে শোন।' তারপর বড় মোড়লকে বলল, 'তুমি অর্ধেক লোক নিয়ে কম বয়সী বোয়ানার সঙ্গে যাবে। ওঁর যেখানে খুশি ছবি তুলতে পারবেন।' তারপর আরেকজন মোড়লকে বলল, 'তুমি বাকিদের নিয়ে বুড়ো বোয়ানার সঙ্গে যে পথে সব চেয়ে তাড়াতাড়ি রেল স্টেশনে যাওয়া যায়, সেই পথে যাবে। শিকারটিকার করা হবে না। ব্লেক, তুমি যখন খুশি রওনা হয়ে যাও, দরকার মতো শিকার করতেও পার। আর স্টিম্বল, তুমি সবচেয়ে সোজা পথে রেলের লাইনের দিকে যাবে। প্রাণের দায়ে ছাড়া গুলি চালাবে না। খাবার জন্যেও শিকার করবে না। মাংস দরকার হলে, মোড়ল তার ব্যবস্থা করবে।'

রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে স্টিম্বল বসে রইল। সে জানত লোকজনরা টারজানের ছাড়া কারো কথা শুনবে না। তারপর ব্লেকও বেরিয়ে পড়ল। টারজানও গাছের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিকটা এগিয়ে পথের ধারে একটা বড় গাছের ডালের ফ্যাকড়ায় সে বসে রইল। ওদের যাওয়াটা দেখতে হবে। ঐ পথেই সেই বলগানিও আসছে দেখে টারজান তাকে ডেকে বলল, 'সেই টারমানগানি আসছে।'

—'মারব ওকে?'

—'না, না, ওকে যেতে দাও। ও গোমানগানিদের চেয়েও বোকা। ওকে মেরে কি হবে? দেখছ, পাণ্ড বাজ আকাশে শিকার করতে বেরিয়েছে। ঐ দেখ কালো মেঘের ঘনঘটা।' কিছু পরেই আকাশ কালো করে তুমুল ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত শুরু হয়ে গেল। সব জানোয়ার এই জিনিসটাকে বড় ভয় করে। টারজান আর বলগানি অন্য জন্তুদের মতোই ভিজে চুপ্‌ড় হয়ে গেল।

টারজান ছিল গাছের ডালে। ডাল ভেঙে পড়ল নিচে। মাথায় চোট লাগল আর ভাঙা ডালটা পড়ল গায়ের ওপর। অজ্ঞান হয়ে টারজান পড়ে রইল। খানিক বাদে ঐ পথে স্টিম্বল এলো। তার দলবল অনেকটা পেছিয়ে পড়েছিল। টারজানের ঐ অবস্থা তার চোখে পড়তেই, মনটা নেচে উঠল। এই তো সুযোগ। ধারে কাছে কেউ নেই। এখন আপদটার পাঁজরার ফাঁকে একটা ধারালো ছুরির ফলা গুঁজে দিলেই ল্যাঠা চোকে। কেউ জানবে না

এই দুর্ঘটনার সঙ্গে স্টিম্বলের কোনো সম্বন্ধ আছে।

ছুরিটা বেরও করেছিল, এমন সময় একটা মস্ত লোমশ হাত ঝোপ থেকে বেরিয়ে ওর কাঁধে পড়ল। চিৎকার করে ফিরে দেখে বলগানির বিকট মুখ! বল্‌গানি ওর হাত থেকে ছুরি কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। স্টিম্বলের গলার কাছে বল্‌গানির শ্ব-দন্ত এগিয়ে এলো! এমন সময় নড়ে উঠে, চোখ খুলে, ঐ দেখেই টারজান চেঁচিয়ে উঠল 'ক্রি-ই-গা!' অর্থাৎ 'সাবধান!' বল্‌গানি চমকে ওর দিকে চাইল।—'ওকে ছেড়ে দাও।'

—'ও যে টারজানকে মারতে যাচ্ছিল। বল্‌গানি ওকে মারবে!'

—'না। ওকে ছেড়ে দাও।'

বল্‌গানি ওকে ছেড়ে দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাহকরাও এসে পড়ল। বল্‌গানিকে একটু ঘাবড়ে যেতে দেখে টারজান বলল, 'তুমি যাও। আমি এদের সামলাচ্ছি।' সঙ্গে সঙ্গে বল্‌গানি ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

টারজান বলল, 'কোনোমতে এ-যাত্রা বেঁচে গেলে, স্টিম্বল। ভাগ্যিস আমাকে মারতে পারনি। এবার আমি চললাম। একটা কথা বলে যাচ্ছি তোমাকে। এদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করলে, প্রাণে বাঁচবে না। কেউ তোমাকে দেখতে পারে না।'

বাহকদেরো বলে দিল, 'দেখো যেন এই বেয়াড়া বোয়ানা শিকার না করে। কিন্তু ওকে প্রাণে মেরো না। যথাস্থানে পৌঁছে দিও। তবে আমার কথামতো চলে যেন।'

বাস্তবিকই স্টিম্বল বড়ই নির্বোধ ছিল। সে ভাবল টারজানের কথা অমান্য করলে, এরা আমার পৌরুষ দেখে আমাকে সমীহ করবে। এই ভেবে দুম্ করে একটা হরিণ মারল। সে-রাত্রে বাহকরা হাঁড়িমুখে যে যার কাজ করতে লাগল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'টারজান শুনলে রাগ করবে।'

—'লোকটা ভারি খারাপ। ও মলে খুব খুশি হব।'

—'না মারা হবে না। টারজান মানা করেছে।'

—'তবে ছেড়ে পালাই।'

—'তাহলে তো মরে যাবে। নিরাপদে পৌঁছে দিতে বলেছে যে।'

—'সে তো ও যদি টারজানের কথা মেনে চলে। তা তো চলছে না।'

বেলা করে ঘুম থেকে উঠে স্টিম্বল দেখল লোকজনরা রাতারাতি ওকে ফেলে পালিয়ে গেছে। একবার ভাবল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বন্দুকের সাহায্যে আচ্ছা করে শিক্ষা দেয়। কিন্তু তা হলে আর বাঁচতে হবে না। বনে একা বাঁচা সম্ভব নয়। একমাত্র উপায় হলো, ব্লেককে খুঁজে বের করে তার সাহায্য নেওয়া। সে কখনোই ওকে বনে একা পচে মরতে দেবে না। যথেষ্ট খাবার দাবার ছিল, গুলি বন্দুক ছিল। কিন্তু সেগুলো তো একটা মানুষ বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত স্থির করল যে ব্লেক নিশ্চয় অন্য দিকে দুদিনের পথ এগিয়ে আছে। সামান্য জিনিস নিয়ে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। হয় তো বেশি দূরে যায়নি। কাছেই জন্তু জানোয়ারে ভরা ভালো জায়গা পেয়ে গেছে।

এই মনে করে সাত দিনের খাবার দাবার একটা ব্যাগে ভরে, বন্দুকটা কাঁধে আর সব পকেট ভরে গুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বিকেলের মধ্যে আগেকার ক্যাম্পে পৌঁছেও গেল। একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে সিগারেট ধরিয়ে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। তারপর ব্লেক যে পথে এগিয়েছিল সেই পথ ধরল। হঠাৎ ঝোপ থেকে একটা চাপা গর্জন শুনে চমকে উঠল স্টিম্বল। তার পরেই ডালপালা সরিয়ে একটা প্রকাণ্ড সিংহের কালো মাথা বেরোল। অমনি পুঁটলি ফেলে, বন্দুক ফেলে, এতক্ষণ যে গাছে ঠেস দিয়ে বসেছিল, দৌড়ে তাতেই কোনোমতে উঠে পড়ল। সিংহটাও একটা লাফ দিয়েছিল, তার নখগুলো বুড়োর বুটে আঁচড় কেটেছিল মাত্র। আর কিছু করতে পারেনি।

নুমাও সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। পুঁটলিটাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে, খাবারদাবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, টিনগুলো তুবড়ে ভেঙে একাকার কাণ্ড করল! সারা দিন তর্জন গর্জন করে, যাবার সময় বন্দুকটা মুখে তুলে নিয়ে নুমা চলে গেল। খাবারের গন্ধ পেয়ে, সারারাত গাছতলায় নানা বুনো জন্তু উৎসব, চ্যাঁচামেচি করল। আর স্টিম্বল গাছের ওপর বসে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

সকালে চারদিক নিঝুম হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে স্টিম্বল যখন গাছ থেকে নেমে এল, তখন আর তাকে, নিউইয়র্কের নাম করা দালাল কোম্পানির সেই স্টিম্বল বলে চেনা যাচ্ছিল না। দেখে মনে হচ্ছিল ভগ্নদেহ কে এক বুড়ো, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে।

ঝড়টার ফলে স্টিম্বলের সাফারির চেয়েও ব্লেকের পরিকল্পনা বেশি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছিল। লোকজনদের সোজা পথে এগিয়ে বিকেলে ক্যাম্প করতে বলে, একটিমাত্র দক্ষ ও

বিশ্বাসী নিগ্রো ছোকরার কাছে ছবি তোলার সরঞ্জাম আর একটা বাড়তি রাইফ্‌ল দিয়ে, তার ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সামান্য ঘোরা পথে ব্লেক এগোচ্ছিল। কতকগুলো চিহ্ন থেকে মনে হয়েছিল এদিকে বড় জানোয়ারের দেখা পাওয়া যাবে।

হলোও তাই। একটু পরেই এক পাল সিংহের সঙ্গে দেখা। চমৎকার একটা ধাড়ি সিংহ, সুন্দর একটা সিংহী আর তাদের সঙ্গে গোটা ছয় কমবয়সী সিংহ। কয়েকটা তখনো ছেলেমানুষ, কয়েকটা সাবালক। ওদের দেখেই তারা বনের পথ ধরল। ওরাও পিছন পিছন চলল। এদিকে গাছপালা কম, আলোটা উপযুক্ত, একটু সুবিধা মতো দাঁড়ালে বসলেই, অপূর্ব এক ছবি হবে। ছোকরার মনে বনটা একটা বইয়ের খোলা পাতার মতো। যেখানে ক্যাম্প হচ্ছে, সেখানে ফিরতে কোনো অসুবিধাই নেই। ব্লেকের নিজে দু-ঘণ্টা হাঁটার পর দিকটিক সব গুলিয়ে গেছিল। ছেলেটার ওপর নির্ভর করে সে নিশ্চিন্ত ছিল।

তারপরেই সেই ঝড় উঠল। চারদিক লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল! হঠাৎ বিদ্যুতের চমকে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ওর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান হল তখন সাতটা সিংহ ওকে ঘিরে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে ছিল। আসলে সে রকম কোনো ভয়ের কারণ ছিল না। ওদের পেট ভরা ছিল। মানুষটানুষ দেখেনি আগে, কৌতূহলবশতঃ কি চিজ তাই দেখতে এসেছিল। চমৎকার ফটো হতো। কিন্তু ক্যামেরার আগে বন্দুকের কথাই মনে হলো। সন্তর্পণে তাকিয়ে না বন্দুক, না ক্যামেরা, না বাড়তি বন্দুকসহ পথপ্রদর্শক ছোকরা —কিছুই দেখতে পেল না। তাহলে একটা উঁচু গাছে চড়া দরকার! গাছে চড়তে হলে যেদিকে যেতে হবে, সেদিকেই সিংহরা দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ মনে পড়ল কে যেন বলেছিল, 'কখনো দৌড়িও না। তাহলেই তাড়া করবে।' ধীরেসুস্থে হেঁটে গাছে চড়তে হবে। সবচেয়ে কাছের গাছটা মাত্র ৫০ ফুট দূরে। সিংহদের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। তাই হাঁটতে লাগল ব্লেক। ওদের মধ্যে সামান্য একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। দু-একজন দু-এক পা এগোল। দু-একজন অল্প দাঁত খিঁচোল।

ব্লেক প্রায় গাছটার কাছে পৌঁছে গেছে, এমন সময় কুঁই-কুঁই শব্দ করে বড় সিংহীটা বনের দিকে দৌড় দিল। অমনি বাকিরাও তার পিছন পিছন দৌড়ল।

ব্লেক্ গাছটাতে ঠেস দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'আরি বাপ! এর পরের সিংহটাকে যেন দেখি সেন্ট্রাল পার্কের চিড়িয়াখানায়।' অন্য সমস্যাও দেখা দিল। ডেকে ডেকেও ছেলেটার সাড়া পাওয়া গেল না। অগত্যা তাকে খুঁজতে বেরিয়ে একটা গাছতলায় দেখে খানিকটা পোড়া মাংসের ধ্বংসাবশেষ, একটা পোড়া গলে যাওয়া রাইফ্‌লের নল। ক্যামেরার কোনো চিহ্নই বাকি নেই। হতভাগ্য ছেলেটার মাথার ওপরেই বাজটা পড়ে থাকবে।

ওসব তো গেলই, ওর নিজের হাতের বন্দুকটাও কোথাও খুঁজে পেল না। তখন সে আন্দাজে উত্তরমুখো চলল। ওর সাফারি চলেছিল উত্তর-পূর্ব দিকে। দু-দিন ধরে বনের মধ্যে ঘুরল সে। ফলমূল যথেষ্ট পেল। খাবার জলেরো অভাব ছিল না। রাতে গাছের ডালে ঘুমোবার চেষ্টা করত। ভালো ঘুম হত না। তৃতীয় দিনে একটা উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছল। মাথার ওপর ঘন নীল আকাশ দেখে, কেমন একটা অপূর্ব আনন্দে মনটা ভরে গেল। ঘাসজমি, নদী নালা, সবুজ গাছপালা। মনে হল যেখানে এত খাবার, এত জল তার ওপর এমন সুন্দর জায়গা, সেখানে নিশ্চয় গ্রামও আছে।

খুশি মনে পাহাড় চড়তে লাগল সে। একটা চুড়োর কাছে পৌঁছে নিচে দেখে সরু একটা উপত্যকা। তার মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। এই রকম জায়গাতেই লোকের বসতি দেখতে পাওয়া যায়।

ঐ নদীর ধার দিয়ে গেলে নিশ্চয় গ্রামে পৌঁছনো যাবে। এই মনে করে উপত্যকায় নেমে নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল ব্লেক। তিন মাইল হেঁটেও গ্রামটাম পেল না বটে, কিন্তু দেখল একটা ৬০ ফুট উঁচু বিশাল ক্রস্। চূণা পাথর কেটে সেটিকে তৈরি করা হয়েছে। তার গায়ে খোদাই করে কি সব লেখা। লেখাটার প্রাচীন ইংরিজি হরফের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল। তবে তা তো হতে পারে না। এ জায়গাটা বোধ হয় অ্যাবিসিনিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত ঘেঁষে হবে। তারা তো খৃশ্চান। তবে কেন ক্রস্‌টাকে দেখে মনে একটু আতঙ্ক হচ্ছিল? যেন বলছে—ফিরে যাও! ফিরে যাও! ক্রসে কোথায় আশ্বাসের আর ভালোবাসার বাণী থাকবে, এতে যেন একটা বিদ্বেষ আর ভয় দেখানোর ভাব মনে হল।

মন থেকে ও-সব মিথ্যা ভয় ঝেড়ে ফেলে ব্লেক এগিয়ে গেল এবং যদিও সে ক্যাথলিক নয়, তবু ডান হাত দিয়ে ভক্তদের মতো বুকে ক্রস্ চিহ্ন না এঁকে পারল না। আরেকটু এগোতেই পথটা খুব সরু হয়ে এল। দু-পাশে খাড়া পাহাড়।

সামনেও মস্ত একটা পাথর বোধ হয় ভেঙে পড়েছে, তার মধ্যে দিয়ে যাবার রাস্তা। যেই সেই জায়গাটা পার হয়েছে, অমনি সামনে পিছনে দুদিকে দুটি বলিষ্ঠ সুশ্রী নিগ্রো এসো দাঁড়াল। ব্লেক তাজ্জব বনে গেল। এ আবার কি? এদের যে চতুর্দশ শতকের ক্রুসেডারদের মতো সামরিক পোষাক আর অস্ত্রশস্ত্র।

কথাও বলল সেইরকম সেকেলে ইংরিজিতে, 'তুমি কে হও?' এমনি চমকে গেল যে কিছুক্ষণ মুখে উত্তর যোগাল না।

পিছনের লোকটি বলল, 'লোকটা বোধ হয় মুসলমান স্যারাসেন। তোমার কথা বুঝতে পারেনি।'

—'না, না, পিটার উইগ্‌স্‌, আমার নাম যদি, পল বডকিন হয়, এ-ও কখনোই বিধর্মী অনাচারী নয়।'

—'ও যাই হোক। গোটের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চল ওকে।'

—'আহা, তার আগে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতে কি দোষ?'

পিটার বলে, 'নিয়ে যাও তো ওকে। আমি এখানে পাহারায় রইলাম।'

সামনে একটা সুড়ঙ্গ। তার মধ্যে দিয়ে পথ। তাতে ঢুকবার আগে একটা কুলুঙ্গি থেকে একটা মশাল তুলে নিল পল। মশালটা শুকনো ডাল আর ঘাস জড়িয়ে আলকাতরায় ডুবিয়ে তৈরি হয়েছে। সেটি জ্বালিয়ে ব্লেককে ঠেলতে ঠেলতে সুড়ঙ্গ দিয়ে নিয়ে চলল সে। ঘুটঘুটে অন্ধকার মশালের আলোয় একটু কমল। পায়ের নিচের মাটি বহু যুগের ব্যবহারে মোলায়েম হয়ে গেছে। পথটা এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। কোথায় শেষ হয়েছে কে জানে।

*

স্টিম্বল এতদিন ব্লেকের সাফারির পায়ের চিহ্ন মনে করে একটা বহু জন্তু-জানোয়ারের ব্যবহার করা পথ ধরে খেতে খেতে চলেছিল। ছেঁড়া কাপড়চোপড়, সারা গায়ে কাদামাটি, মুখময় চার পাঁচ দিনের দাড়ি-গোঁপ, চুলগুলো ধবধবে সাদা—কারো সাধ্য নয় তাকে চেনে। ঐ ভাবে সে যখন ইব্‌ন জাডের মঞ্জিলে গিয়ে পৌঁছল, গাল্লা বন্দী-দাস ফেজ্জুয়ান তাকে দেখতে পেয়ে, শেখের কাছে নিয়ে গেল। শেখ তো অবাক, 'এ আবার কে?'

ফেজ্জুয়ান বলল, 'বেজায় গরীব, সঙ্গে একটা অস্ত্র নেই আর এমনি জঘন্য নোংরা দেখে ভাবলাম কোনো সাধুপুরুষ হবে নিশ্চয়।'

শেখ বলল, 'কে তুমি?'

—'আমি পথ হারিয়ে, না খেতে পেয়ে, মরে যাচ্ছি। কিছু খেতে দাও।'

তার ইংরিজি কথার মানে কেউ বুঝল না। শেখ বলল, আরেকটা নাজরানি মনে হচ্ছে। ফ্রেঞ্জি বোধ হয়।"

টলগ বলল, 'দেখে ইংরেজ মনে হচ্ছে?'

ফাহ্‌ড ফ্রেঞ্চে বলল, 'তুমি কে?'

চেনা ভাষা শুনে স্টিম্বল বড় খুশি, 'আমি আমেরিকান। জঙ্গলে পথ হারিয়েছে। খেতে পাচ্ছি না।'

শেখ ওকে খাবার দিতে বলল। খাবার সময় ফাহ্‌ড ওর কাছে সব শুনে বলল, 'ওর লোকজন পালিয়েছে, ও সমুদ্রের ধারে যেতে চায়।' শেখের কোনো সহানুভূতি ছিল না। এ বুড়োটাকে মেরে ফেললেই আপদ চোকে। ওকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। কিন্তু ফাহ্‌ড ভাবছিল মুক্তিপণের কথা। সে স্টিম্বলকে বলল, 'শেখ তোমাকে মেরে ফেলতে চায়। আমি তোমার প্রাণ বাঁচাচ্ছি। এর জন্য আমাকে কি দেবে?'

—'তোমাকে বড়লোক করে দেব।'

তারপর নিজের ধনদৌলত ক্ষমতা প্রতিপত্তির এমন সব গল্প বলতে লাগল যে ফাহ্‌ড টাকার থলির ওপর পায়ের ওপর পা তুলে আজীবন বসে থাকার স্বপ্ন দেখতে লাগল। পাছে শেখ তার ভাগ চায়, তাই মাঝেমাঝেই স্টিম্বলকে বলতো, 'আমি অনেক কষ্টে ওকে ঠাণ্ডা করে রেখেছি।'

আসলে স্টিম্বল যদিও সেই থেকেই ওর মিছিলের একজন হয়ে গেছিল, শেখ ওর কথা একরকম ভুলেই গেছিল। ফাহ্‌ডের কাছ থেকে স্টিম্বল শুনেছিল শেখের দলের মধ্যে বিভেদ আছে!

এমনি করে এ মিছিলটা আস্তে আস্তে চিতা-শহর নিম্মরের কাছে পৌঁছল। সারা পথ জায়দ আতেজার মন আরো বেশি করে পেতে চাইছিল। আর ফাহ্‌ড টলগ মারফৎ শেখকে খুশি করবার চেষ্টা করছিল। এটা অবিশ্যি ফাহ্‌ডকে শুনিয়ে শুনিয়ে করত, ভাবত একবার তার সাহায্যে শেখের গদী পেলে তাকে কাঁচকলা দেখানো যাবে।

এর মধ্যে ফাহ্‌ড একটা জঘন্য মৎলব আঁটল। রোজ সন্ধ্যায় আতেমা আর জায়দ তাঁবুর বাইরে অনেকক্ষণ গল্প করত। তাই দেখে ফাহ্‌ড হিংসায় জ্বলে যেত। এর মধ্যে এক দিন ঐ সময় চুপি চুপি জায়দের তাঁবু থেকে তার সেকেলে বন্দুকটি চুরি করে নিয়ে এল সে। রাতে শেখ তাঁবুর সামনে

অন্যদের সঙ্গে গল্প করছে, ফাহ্‌ড এই সময় আড়ালে দাঁড়িয়ে বন্দুকটা তুলে শেখের মাথার ওপরে তাঁবুর আমদানের দিকে টিপ করে গুলি করল। শেখের মাথার ওপরে খুঁটির যে অংশটা ছিল সেটা ভেঙে পড়ে গেল। অমনি বন্দুক ফেলে, জায়দের ওপর লাফিয়ে পড়ে, 'কে আছ, এদিকে এসো!' বলে ফাহ্‌ড চ্যাচাতে লাগল।

ও যে কত বড় ধূর্ত পামর, এই কাজ থেকেই বোঝা যায়। জায়দকে মারলে, আতেজা তার খুনীকে কখনো বিয়ে করবে না। শেখকে মারলে নিম্মরের গুপ্তধন উদ্ধার হবে না। দুটির ওপরেই ফাহ্‌ডের লোভ, তাই এই ষড়যন্ত্র! টলগ বন্দুকটা মাটি থেকে কুড়িয়ে বলল, 'এই তো খুনের অস্ত্র?'

অস্ত্রটা নিঃসন্দেহে জায়দের। অকুস্থলে জায়দ ছিল। আজ পর্যন্ত হতাশ হলো। জায়দ যত বলে 'এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমি কখনোই এ-কাজ করিনি।' কেউ বিশ্বাস করল না।

শেখ বলল, 'ওকে ভালো করে বেঁধে রাখো।'

আতেজা কেঁদে বলল, 'বাবা, আমি জানি ও এ-কাজ করেনি!'

কঠিন গলায় শেখ বলল, 'এখুনি ঘরে যাও।'

জায়দকে তার নিজের তাঁবুতে বেঁধে রাখা হল। শেখের তাঁবুর বারান্দায় বিচারসভা বসল। আতেজা শুনল তারা রায় দিয়েছে পরদিন ভোরে জায়দকে গুলি করে মারা হবে।

গভীর রাতে সবাই ঘুমোলে, আতেজা নিঃশব্দে উঠে জায়দের বন্দুকটি আর কিছু শুকনো খাবার একটা পুঁটলিতে বেঁধে, তার তাঁবুতে গিয়ে বাঁধনগুলো কেটে বলল, 'এগুলো নিয়ে, তাঁবুর পিছন থেকে তোমার ঘোড়া নিয়ে পালাও। আল্লার কাছে আতেজা নিয়ত তোমার নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করবে।' বিদায় নিয়ে জায়দ রওনা হয়ে গেল।

*

যে সুড়ঙ্গ পথে পল বড্‌কিন্ ব্লেককে নিয়ে চলেছিল, সেটা ক্রমে উঁচুতে উঠতে লাগল। একটু পরে পরেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তারপর সামনে এক টুকরো দিনের আলো দেখা গেল। ওরা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে একটা পাথুরে থাকের ওপর দাঁড়াল! সামনে খাড়া খাদ নেমেছে। ডাইনে থাকটা শেষ হয়ে গেছে। বাঁয়ে দুটো প্রকাণ্ড পাথরের মাঝখানে উঁচু ফটক। তার দু'পাশে দুটি গোল মিনার, তাতে সরু লম্বা ফোকর কাটা। গেটটা বিশাল এবং কারুকার্য করা। দুজন লম্বা চওড়া নিগ্রো গেট পাহারা দিচ্ছে।

বড্‌কিন্ তার সেকেলে ইংরিজিতে হাঁক দিল, 'গেট খোল! বাইরের প্রহরী বন্দী নিয়ে এসেছি।'

গেট ওপরে উঠে গেল। ফটকেও প্রহরীদের মতোই প্রাচীন ইংলিশ সামরিক পোষাক পরা জনা কুড়ি সৈনিক। প্রত্যেকের বুকে ক্রুসেডারদের মস্ত লাল ক্রস্ আঁকা। প্রহরীদের ঘর থেকে একজন চমৎকার চেহারার শ্বেতাঙ্গ যুবক বেরিয়ে এলো। গাঢ় বেগুনি পোষাকের ওপর চেনের বর্ম পরা, মাথায় চিতাবাঘের চামড়ার হেল্‌মেট।

যুবক বলল, 'কি হল রে ব্যাটা?'

—'বন্দী এনেছি, হুজুর।'

—'মুসলমান নিশ্চয়?'

—'তা তো মনে হলো না। ক্রসের সামনে বুকে ক্রুস্ চিহ্ন দিল।'

যুবকটি দাম্ভিক ভাবে বলল, 'সমাধি উপত্যকায় কেন এসেছ?' তার স্বরে তাচ্ছিল্য।

ব্লেক বলল, 'তোমাদের পরিচালকমশাই কোথায়? ভাড়ামো রাখো।'

—'পরিচালকমশাই? তার মানে বুঝলাম না।'

—'বোঝনি আবার! পাও তো দিনে সাড়ে সাত ডলার। তাতে অত চালবাজি কিসের।'

—'কি যে বলছ, তার মানে বুঝতে পারছি না। কথাগুলো রিচার্ড মণ্টমরেন্সির কানে যেন অপমানের মতো শোনাচ্ছে।'

—'নিজের রূপ ধর বাপু। পরিচালক না হয়ে, ক্যামেরা-ম্যান, কি সহকারী পরিচালক, কি সংলাপ লেখক, যাকে হয় ডেকে দাও।' লোকটি সত্যি অবাক হলো।

—'নিজের রূপ ধর! তা নিম্মরের সম্মানিত নাইট রিচার্ড মণ্টমরেন্সি হয়ে, আবার কার রূপ ধরব?'

সৈনিকদের তো একটু হাসা উচিত ছিল। তা না, সকলের গম্ভীর মুখ। শেষটা বড্‌কিন বলল, 'নিম্মরে তো ডিরেক্টর বলে কেউ নেই। সমাধি উপত্যকার কোথাও ওনামে কেউ নেই।'

তখন ব্লেক বলল, 'মাপ কর, ভাই, আমারি ভুল হয়েছে পরিচালক না থাকুক, একজন রক্ষী তো আছে?'

বড্‌কিন বলল, 'আছেই তো। স্যার রিচার্ড নিজেই রক্ষী।'

—'তাই বুঝি, আমি ভাবলাম উনি একজন বাসিন্দা, ইন্‌মেট।'

যুবক গম্ভীর মুখে বলল, 'ইংরিজি ভাষাই তো বলছ।

তবু কেমন অদ্ভুত লাগছে। আজ আমিই দ্বাররক্ষী।'

এতক্ষণে ব্লেকের চৈতন্য হলো। সে ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল, 'ক্ষমা কর, আমি বড়ই অভদ্র ব্যবহার করে ফেলেছি। অনেক দিন পথ হারিয়ে বনে বনে ঘুরে আমার মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম তোমরা বুঝি আমার সঙ্গে তামাসা করছ। তা, এ জায়গাটার নাম কি?'

যুবক বলল, 'তুমি নিম্মর নগরের কাছে পৌঁছে গেছ।'

—'আজ কি তোমাদের কোনো জাতীয় উৎসব? তোমরা কি শোভাযাত্রা করবে? তাই ঐ সব পোষাক পরেছ?'

—'ইংরিজিই বলছ, যদিও একটু বিকৃত করে, কিন্তু তোমার অর্ধেক কথার মানে বুঝতে পারছি না। এ তো আমাদের নিত্যকার পোষাক। সে যাই হোক, এখানে দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটির কোনো মানে হয় না। বডকিন, তুমি নিজের জায়গায় ফিরে যাও। আর তোমরা দু-একজন একে ভিতরে নিয়ে এসো।'

গার্ড-ঘরের উঁচু ছাদ, তাতে মোটা মোটা পুরনো কাঠের কড়ি-বরগা, পাথরের দেওয়াল, মেঝে। সব কিছুতে প্রাচীনতার ছাপ। একটা কাঠের টেবিলের পিছনে কাঠের বেঞ্চিতে মণ্টমরেন্সি বসল। ব্লেক তার সামনে দাঁড়াল। তার দু-পাশে দুজন সৈনিক।

—'তোমার নাম কি?'

—'জেম্‌স্ হাণ্টার ব্লেক।'

—'তোমার উপাধি কি?'

—'উপাধি নেই।'

—'কেন, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে নও?'

—'তাই তো জানি।'

—'তোমার দেশের নাম কি?'

—'অ্যামেরিকা।'

—'কি যে বল! ঐ নামে কোনো দেশ নেই।'

—'কেন থাকবে না?'

—'আছে বলে তো শুনিনি। কিন্তু তুমি সমাধি-উপত্যকার এত কাছে কেন এসেছিলে? তুমি কি জানতে না এখানে প্রবেশ নিষেধ?'

—'বলেছি তো আমি পথ হারিয়ে এসেছি। কোথায় এসেছি তাই জানি না। আমি আমার সাফারির দলের কাছে কিম্বা সমুদ্রতীরে ফিরে যেতে চাই।'

—'সে তো অসম্ভব। ৭৩৫ বছর ধরে স্যারাসেনরা আমাদের অবরোধ করে রেখেছে। তুমি কি করে যুদ্ধের লাইন আর ওদের ঐ লক্ষ লক্ষ সেনাদল ভেদ করে এলো?'

—'যুদ্ধের লাইন, বা সেনাদল কিছুই নেই।'

—'তোমার এত বড় আস্পর্ধা, স্যার রিচার্ড মণ্টমরেন্সিকে মিথ্যা কথা বল! ভাগ্যিস সব কথা খুলে বলেছ, নইলে যদি রাজকুমারের সামনে পড়তে, অতি বেদনাদায়ক উপায়ে তিনি সত্যি কথা টেনে বের করতেন।'

—'আমার তো কবুল করার মতো কিছু নেই। রাজকুমারের কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পার। তিনি আমাকে কিছু খেতে দিলেই হলো।'

—'সে কি! খাবার-দাবার এখানেই পাবে। কেউ যেন বলতে না পারে রিচার্ড মণ্টমরেন্সি কোনো ক্ষুধার্ত মানুষকে ফিরিয়ে দিয়েছে! কোথায় গেলে মাইকেল! মাইকেল!'

খানিক বাদে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সবুজ আঁটো পেণ্টুলুন পরে, মাথার টুপিতে একটা পালক গুঁজে একটা ছেলে এলো।

—'ফের ঘুমোচ্ছিস? এই বেচারা পথচারীর জন্য রুটি মাংস নিয়ে আয়।'

ছেলেটা বলল, 'এঁ্যা! স্যারাসেন নাকি?'

—'তা হলই বা স্যারাসেন, ক্ষুধার্ত তো? যীশু এক দল ক্ষুধার্ত লোককে খাওয়ান নি? যাও, শীগ্‌গির নিয়ে এসো।'

ছেলেটা চলে গেলে স্যার রিচার্ড ব্লেকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখতে তো ভালোই আছ। ছোটলোকের ছেলে তো মনে হয় না।'

—'আমিও তো নিজেকে তা মনে করি না।'

—'তোমার বাবা অন্ততঃ একজন নাইট্‌ও ছিলেন না কি?'

—'তা ছিলেন। তিনি ফ্রী-মেসনদের সভ্য এবং নাইট্‌ টেম্পলার।'

স্যার রিচার্ড মহাখুশি, 'ঠিক জানতাম।'

ব্লেক বলল, 'আমিও তাই।'

—'সে আমি আগেই বুঝেছিলাম। তোমার চেহারা আর ব্যবহার-ই তার পরিচয় দিচ্ছে। তুমি তাহলে যীশুর নিজের নাইট। তোমার কাজ সলোমনের মন্দিরে যাবার পথের নিরাপত্তা রক্ষা করা। সেই জন্য তোমার এই দরিদ্র বেশ। ঐ দরিদ্র বেশের কত মহিমা!'

এই সময় মাইকেল রুটি মাংস আর আঙুরের রস থেকে তৈরি ওয়াইন নিয়ে এলো। স্যার রিচার্ড একটা আলমারি থেকে দুটো গেলাস বের করে, একটু করে পানীয় ঢেলে,

গেলাসটা তুলে বলল, 'স্বাগত, স্যার জেম্‌স! নিম্মর নগরে আর সমাধি উপত্যকায় তোমার আগমন শুভ হোক।'

ব্লেক বলল, 'তোমাকে যেন দেখতে পাই!'

স্যার রিচার্ড বলল, 'রিচার্ড দি লায়ন হার্টেডের' আমলের পর এত বছরে ইংল্যাণ্ডের ভাষার নিশ্চয় অনেক অদলবদল হয়েছে। বেশ কথাগুলো। এবার আমার বন্ধু-বান্ধবদের ঐ বলে চমকে দেব—তোমায় যেন দেখতে পাই! এবার খেতে আরম্ভ কর।'

টুল টেনে বসে হাত দিয়ে খেল ব্লেক। ৭৩৫ বছর আগে ইংল্যাণ্ডেও কাঁটা-চামচের বালাই ছিল না। সকলের কোমরে একটা ছুরি গোঁজা থাকত।

খাওয়া হলে স্যার রিচার্ড মাইকেলকে ঘোড়া ঠিক করতে বলল।

—'তুমি আর আমার বন্দী নও, স্যার জেম্‌স, তুমি আমার বন্ধু এবং অতিথি। তোমার সঙ্গে গোড়ায় খারাপ ব্যবহার করেছিলাম বলে লজ্জা পাচ্ছি।'

তারপর দুজন দুটো ঘোড়ায় চড়ে শহরের দিকে চলল। মাইকেলও চলল পিছন পিছন। স্যার রিচার্ডকে দেখে ব্লেকের মনে হচ্ছিল যেন ছবির বই থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাকে বড় ভালো লাগছিল। পথটা একটা টিলাকে বেড় দিয়ে আরেকটা ফটকের কাছে এল। ফটকের পিছনে দেখা গেল একটা প্রাচীন দুর্গ। তার চারদিকে দুটো পাঁচিল। প্রথমটা পার হয়ে একটা খাল, তারপর দ্বিতীয় পাঁচিল, লোকজন পাহারা দিচ্ছে। পাঁচিলের গায়ে লতা উঠেছে। খাল পার হবার পুল আছে। সেটা তুলে ফেলা যায়। তখন দুর্গটা একটা দ্বীপের মতো হয়ে যায়।

ভিতরের ফটক দিয়ে ঢুকে ব্লেকের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বিশাল পাথরের প্রাসাদ, তার চারদিকে ফলফুলের গাছপালা, বাগান। সেখানে অনেক পুরুষ আর মহিলা জমায়েত হয়েছেন। যেন কিং আর্থারের রাজসভা বসেছে। ওরা ঘোড়া থেকে নামতেই, একজন ডেকে বলল, 'ও কাকে আনলে রিচার্ড? স্যারাসেন নাকি?'

—'মোটেই না। একজন নাইটকে এনেছি, রাজকুমারকে উনি শ্রদ্ধা জানাবেন।'

—'ঐ যে তিনি এখানেই আছেন।'

ব্লেককে নিয়ে রিচার্ড এগিয়ে গেল। অমনি মহিলারা তার সুন্দর চেহারার প্রশংসা আর পুরুষরা তার অপরিচ্ছন্ন পোষাকের নিন্দা করতে লাগল।

প্রাঙ্গণের এক ধারে লম্বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেহারার একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

স্যার রিচার্ড আর ব্লেক তার সামনে গেলে আর সকলে চুপ করে গেল। রিচার্ড বাও করে বলল, 'রাজকুমার, আমি আপনার সমীপে স্যার জেম্‌স্‌কে নিয়ে এসেছি। ইনি একজন নাইট্‌ টেম্পলার। শত্রু-বূহ্য ভেদ করে নিম্মরে এসেছেন।'

লম্বা মানুষটি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ব্লেকের দিকে চেয়ে রইলেন। কথাটাতে যে খুব আস্থা হল তা মনে হল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি জেরুসালেম রাজ্যের সলোমনের মন্দির থেকে এসেছ?'

—'স্যার রিচার্ড আমার কথা ঠিক বোঝেননি।'

—'তবে কি তুমি নাইট টেম্পলার নও?'

—'নাইট টেম্পলার বৈকি। তবে আমি জেরুসালেম থেকে আসিনি।'

একজন আয়তলোচনা সুন্দরী মেয়ে সলজ্জ ভাবে বলল, 'যে বীর যোদ্ধারা জেরুসালেমের তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করেন, ইনি হয়তো তাঁদের একজন।'

একজন কালো-চুল লোক মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'বরং সুলতানের পাঠানো গুপ্তচর হবার সম্ভাবনা বেশি।'

মেয়েটি বলল, 'না বাবা, ওকে দেখে স্যারাসেন মনে হয় না।'

রাজকুমার বললেন, 'কটা স্যারাসেন দেখেছিস্‌ মা?'

সকলে হেসে ওঠাতে মেয়েটি বলল, 'বাবা, আপনি কিম্বা স্যার ম্যালুড যত দেখেছেন, আমিও ততই দেখেছি।'

রাজকুমার বললেন, 'তাহলে তুমি কোথা থেকে এসেছ?'

—'নিউ ইয়র্ক থেকে।'

ম্যালুড মেয়েটির কানে কানে বলল, 'বলি নি? ও জায়গা নিশ্চয় বিধর্মীদের দুর্গটুর্গ হবে।'

ব্লেক বলল, 'অনেকে নিউ ইয়র্ককে নিউ জেরুসালেমও বলে।'

রাজকুমার বললেন, 'তুমি ওদের ব্যূহ ভেদ করে এসেছ তাহলে! ওরা কি শীগ্‌গিরই আমাদের আক্রমণ করবে?'

ব্লেক বলল, 'আমি চার দিন চার রাত বনের মধ্যে দিয়ে এসেছি। কোথাও কোনো শত্রুসৈন্যের চিহ্ন দেখিনি। কোনো শত্রুসৈন্যও আপনাদের ঘেরাও করে নেই, রাজকুমার।'

ম্যালুড তাড়াতাড়ি বলল, 'বুঝলেন না রাজকুমার, ঐ সব ভাঁওতা দিয়ে আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় শত্রুদের হাতে সঁপে দিতে চায়!'

রাজকুমার বললেন, 'স্যার ম্যালুড হয়তো ঠিকই বলছে। শত্রুসৈন্য নেই তো সাড়ে সাতশো বছর ধরে আমরা এখানে বন্ধ হয়ে আছি কেন?'

রিচার্ড বলল, 'রাজকুমার, আমি কথা দিচ্ছি এ নাইট্ কখনো ইংল্যাণ্ডের শত্রুতা করবে না। একে আপনি অনুচর করে নিলে ভালোই হবে।'

রাজকুমার ব্লেককে বললেন, 'কি বল, আমার অনুচর হবে?'

ব্লেক একবার ম্যালুডের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্ততঃ করলেও, তখুনি মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

জায়েদ শেখের তাঁবু থেকে নিরাপদে বেরিয়ে প্রাণপণ বেগে যে পথে ওরা এসেছিল, সেই পথে ফিরে চলেছিল। এই ভাবে তিন দিন কেটে গেল। এত দূর যে নিরাপদে আসতে পেরেছে, তাই সে ভাগ্যকে মনে মনে ধন্যবাদ দিচ্ছিল। এদিকে একটা তিনদিন উপবাসী সিংহ যে ওর পিছু নিয়েছিল, তা ওর ধারণার বাইরে ছিল।

মানুষের গন্ধ শুধু সিংহের নাকে যায়নি, আরেকজনের নাকেও গেছিল! সিংহটার আর তর সইছিল না, অমনি সে জায়েদের ঘোড়ার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভীষণ ভয় পেয়ে দু-পায়ে উঠে ঘুরে পালাতে গিয়ে, ঘোড়াটা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বাতাসের বেগে পালাল। সোয়ারী পড়ল সিংহের সামনে। সিংহের বিকট মুখটাকে কাছে নেমে আসতে দেখে, তার নাড়ি ছেড়ে যায় আর কি! হঠাৎ গাছের ওপর থেকে সিংহের পিঠে একটা প্রায়-খালি গা সাদা দৈত্যকে লাফিয়ে পড়তে দেখে জায়দ তাজ্জব বনে গেল। পিঠে চড়ে সে সিংহের গায়ে বারে বারে লম্বা ছোরার কোপ বসাতে লাগল। কিছুতেই সিংহটা তাকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ছোরার ঘায়ে হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে, সে এলিয়ে পড়ল।

অমনি তার রক্ষাকর্তাকে চিনতে পারল জায়েদ। এ যে টারজান! টারজানও তাকে চিনল।

জায়েদ কাতর ভাবে বলল, 'আমি শেখের কথামতো কাজ করে অন্যায় করেছি।'

টারজান বলল, 'আমার কাছ থেকে তোমার কোনো ভয় নেই। তারা কাছাকাছি কোথাও আছে নাকি?'

—'না, অনেক দিনের পথ দূরে আছে।'

—'মিথ্যা কথা বলবার আগে, ভালো করে ভেবে দেখ, বেদ্দুই।'

—'সত্যিই বলছি, আমি তাদের ছেড়ে চলে এসেছি।'

—'কেন?'

সংক্ষেপে কারণ বলল সে।

—'তোমার নাম কি?'

—'জায়েদ'।

—'দেশে ফিরতে চাও?'

—'হ্যাঁ। এল-হারবের বেনি-সালেম ফেঁড়িতে। বেলেদ-এস্-গ্যাডে।

—'বিপদ পাবে পথে, একা যেতে পারবে না।'

—'ফিরে গেলেও মরব।'

—'আমি তোমাকে একটা গ্রামে পৌঁছে দিচ্ছি। সেখান থেকে মোড়ল তোমার সঙ্গে পরের গ্রাম অবধি যোদ্ধা দেবে। সেখান থেকে আবার যোদ্ধা পাবে। এভাবে সুদানে যেতে পারবে।'

জায়েদ তাকে অনেক আশীর্বাদ করলে পর, টারজান বলল, 'খালি এইটুকু বল ইব্‌ন জাড এদেশে কেন এসেছে? কক্ষনো শুধু হাতির দাঁতের জন্য আসেনি।'

—'সে-কথা সত্যি। শেখ হাতির দাঁতের জন্য আসেনি। এসেছে গুপ্তধনের আশায়। সোনা, রত্ন আর এক সুন্দরী মেয়ে।'

—'একজন মেয়ে?'

—'হ্যাঁ। সে নাকি এত সুন্দরী যে উত্তর দেশে অনেক দামে বিকোবে। ধন আছে এল-হাবাশের নিম্মর নগরে। এক হাজার উট নাকি তা বইতে পারবে না। একজন ফকির শেখকে ঐ গুপ্তধনের কথা বলেছে। জ্ঞানী ফকিররা যা বলেন, তার চেয়ে বেশি আর কে বলতে পারে?'

ঐ গ্রামে পৌঁছতে দুদিন লেগেছিল। পথে জায়েদ

বলেছিল একজন শ্রান্ত ক্লান্ত শ্বেতাঙ্গ নাকি শেখের ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। তার বর্ণনা থেকে বোঝা গেল না সে ব্লেক, না স্টিম্বল।

টারজান যেমন জায়েদের সঙ্গে দক্ষিণে চলেছে, শেখ চলেছে উত্তরে। ফাহ্‌ড টলগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। স্টিম্বল ফাহ্‌ডের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। আতেজা জায়েদের জন্য দুঃখ করছে আর গাল্লা বন্দী-দাস ফেজ্জুয়ান মুক্তির স্বপ্ন দেখছে। তাকে আতেজা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো এ-দিককার ছেলে। তোমার কি মনে হয় জায়েদ একা এল-গ্যাডে পৌঁছতে পারবে?'

সে বলল, 'ও বাবা! কক্ষণো পারবে না।'

তার কাছেই আতেজা শুনল যে সেদিন জায়েদের তাঁবু থেকে তার বন্দুক নিয়ে ফাহ্‌ডকে বেরুতে ও নিজের চোখে দেখেছে। কিন্তু এ-কথা জানাজানি হলে ফেজ্জুয়ানের প্রাণের এক কাণা-কড়িও দাম থাকবে না। আতেজা শুনে লাফিয়ে উঠেছিল, 'আমি জানতাম! ঠিক জানতাম।'

ফেজ্জুয়ান বলল, 'কিন্তু শেখকে বললেও বিশ্বাস করবেন না।'

—'তাও জানি। আমি নিজে কিন্তু জায়েদের রক্তের বদলে ফাহ্‌ডের রক্ত নেব!'

অনেক দিন ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরল শেখ, নিম্মরের প্রবেশ-পথের সন্ধানে। স্থানীয় অধিবাসীরা পাছে বাধা দেয়, তাই সাবধানে তাদের এড়িয়ে যেতে হচ্ছিল। বেশি লোকজনের বাসও ছিল না এদিকে, কিন্তু গাল্লারা যে ওদের উপস্থিতি টের পায়নি, এমন হতেই পারে না। তবু ওদের চটিয়ে লাভ নেই। কে জানে শেষ পর্যন্ত ওদের সাহায্যও দরকার হতে পারে।

অবশেষে কোথাও কিছু না পেয়ে একদিন শেখ তার তাঁবুতে নিজের গাল্লা বন্দী-দাসদের ডেকে পাঠাল। তারাও কিছু বলতে পারল না।

—'তাহলে স্থানীয় হাব্‌সিদেরি ডাকো।'

টলগ বলল, 'তারা কিন্তু অতি বড় যোদ্ধা। ওদের চটালে আমাদের মুস্কিল হবে।'

শেখ দাম্ভিক ভাবে বলল, 'আমরাও বেদুইন। আমাদের বন্দুক আছে। বর্শা আর তীর দিয়ে ওরা আর এমন কি করবে?'

টলগ বলল, 'আমরা কজনা, ওরা অনেকে।'

—'নিতান্ত দরকার না হলে তো আর লড়াই করব না। বন্ধুভাবে কথা বলতে চাই।'

তারপর লম্বা চওড়া ফেজ্জুয়ানের দিকে ফিরে বলল, 'তুমিও তো হাব্‌সি। তুমি তো বল ছোটবেলাকার কথা তোমার মনে আছে। ছোটবেলায় তুমি নিম্মরের গল্প শুনেছ। যাও, নিজের লোকদের খুঁজে বের করে, তাদের সঙ্গে ভাব কর। তাদের বল শেখ ইব্‌ন জাড তাদের জন্য অনেক উপহার এনেছে, সে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। শেখ নিম্মরের পথ খুঁজছে। ওদের সাহায্য পেলে, যথেষ্ট বখশিস দেবে।'

এমন সুযোগ ফেজ্জুয়ান স্বপ্নেও আশা করেনি। সে বলল, 'আমি সর্বদা আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছি। যখনি বলবেন, তখনি রওনা হব।'

—'আজ রাতে তৈরি হও, ভোরেই রওনা হয়ে যাও।'

পরদিন ভোরে ফেজ্জুয়ান তার পৈত্রিক গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। দুপুরের আগে সে একটা চওড়া পথ পেয়ে সেইটা ধরল। লুকিয়ে চুরিয়ে এলে সন্দেহের পাত্র হওয়া সম্ভব, খোলাখুলি যাওয়াই ভালো।

ফেজ্জুয়ানের যথেষ্ট বুদ্ধি ছিল। গাঁয়ের লোকদের ওর কথা বিশ্বাস করানো শক্ত হবে না। আরব পোষাক, আরব অস্ত্রশস্ত্র, গাল্লা ভাষাটা পর্যন্ত ভালো করে বলতে পারে না। কিন্তু ফেজ্জুয়ান ভারি সাহসী ছিল। কখন গাঁয়ের কাছে এসে গেছে, তা টের পায়নি। হঠাৎ দেখে সামনে তিন জন বলিষ্ঠ গাল্লা যোদ্ধা, পিছনে আরো তিন জন।

ফেজ্জুয়ান মৃদু হেসে, শান্তির ইঙ্গিত করল। তারা বলল, 'তুমি এ দেশে কি করছ?'

—'আমার বাবার বাড়ি খুঁজছি।'

—'তোমার বাবার বাড়ি এখানে নয়। যারা গাল্লাদের ছেলেমেয়ে ধরে নিয়ে যায়, তুমি তো তাদের দেশের লোক।'

—'না, আমি গাল্লাদেশী। ছোটবেলায় বেদুইনরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এতকাল তাদের মধ্যে থেকেছি, তাদের ভাষা বলেছি।'

—'তোমার নাম কি?'

—'বেদুইনরা বলে ফেজ্জুয়ান, কিন্তু আমার গাল্লা নাম উলালা।'

হঠাৎ একজন যোদ্ধা বলল, 'সত্যি কথাই বলছে হয় তো। উলালা বলে আমার এক ভাই ছিল।'

—'সে এখন কোথায়?'

—'কেউ জানে না। তাকে সিংহেই নিল, কি বেদুইনরা বন্দী করল।'

—'এ হয়তো সেই ভাই। বাপের নাম জিজ্ঞাসা কর তো।'

—'তোমার বাবার নাম কি?'

—'নলিনি।'

—'ভাই ছিল?'

—'ছিল।'

—'তার নাম কি?'

—'টাবো।'

সেই যোদ্ধা আনন্দে নেচে উঠল, 'ও যে সত্যি আমার ভাই উলালা! আমিই টাবো! আমাকে তোমার মনে আছে?'

ফেজ্জুয়ান বলল, 'তুমি টাবো! কি করে চিনব, তখন কত ছোটটি ছিলে। মা-বাবা বেঁচে আছেন?'

—'আছেন। ভালো আছেন। আজ সরকারের বাড়িতে বড় সভা হচ্ছে। মরুভূমিবাসীদের এক দল এসেছে, সেই বিষয়ে। তুমিও কি তাদের সঙ্গে এসেছ?'

—'হ্যাঁ, আমি ওদের শেখের বন্দী-দাস। সরদারের গ্রাম কি অনেক দূরে? মা-বাবাকে দেখতে ইচ্ছা করছে। তাছাড়া ঐ মরুভূমিবাসীদের সম্বন্ধেও কথা আছে।'

টাবো বলল, 'না ভাই, সে গ্রাম কাছেই। চল, ভাই। যে মরে গেছে ভেবে দুঃখ করতাম, তাকে আবার দেখতে পাচ্ছি! মা-বাবার কত আনন্দ হবে। কিন্তু ভাই, তুমি নিজের দেশের লোকদের আর সুনজরে দেখ না? এত দিন ওদের সঙ্গে ছিলে, ওদের মেয়ে বিয়ে করেছ কি?'

—'না, না, বিয়ে করিনি। ওদের প্রতি আমার কোনো ভালোবাসা নেই। মনে মনে সর্বদা নিজের দেশে, নিজের বাপের বাড়িতে ফেরার স্বপ্ন দেখেছি। আমার দেশের লোকদের ছাড়া কাউকে ভালোবাসি না। আর কখনো তাদের ছেড়ে যাব না।'

টাবো বলল, 'ওরা কি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে?'

—'না, বরং ভালোই ব্যবহার করেছে। ওদের ওপর আমার কোনো রাগ নেই, কিন্তু ওদের ভালোওবাসি না। ওরা যে আমার দেশের লোক নয়। আমাকে ধরে নিয়ে গেছিল!'

ওরা সরদারের গ্রামের দিকে এগোল। দুজন দৌড়ে গেল খবর দিতে। তার ফলে ওরা পৌঁছে দেখে গাঁ সুদ্ধ লোক হাসতে হাসতে ওদের অভ্যর্থনা করবার জন্য ছুটে আসছে। সবার আগে উলালার মা-বাবা। তাদের চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু ঝরছে। সকলে ওকে ঘিরে দাঁড়াল, ওর গায়ে হাত দিয়ে আদর করল। তারপর ওরা বুড়ো সরদার বাটাণ্ডোর কাছে গেল। সে উলালাকে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করল, গাঁয়ের নাম, বাড়ির বর্ণনা, ছোটবেলাকার বন্ধুদের বিবরণী আরো কতশত কথা, যা বাইরের লোক জানতে পারে না। তারপর ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সত্যিই তুমি আমাদের উলালা।' পরে বলল, 'একথা সত্য মরুবাসীরা হাতির দাঁত চায়, এ দেশের ছেলেমেয়েদের বন্দী দাস করতে চায় না?'

উলালা বলল, 'ওরা সর্বদা ছেলেমেয়েদের বন্দী-দাস করতে চায়। তবে এবার সেজন্য আসেনি, এসেছে নিম্মরের ধনের খোঁজে?'

—'সত্যিই তাই?'

—'ওদের দাড়িতে সত্যের এতটুকু জায়গা নেই,

'বাটাণ্ডো বলল, 'আর বোধ হয় সেখানে ধন না পেলে, গাল্লা দেশে ধনআর বন্দী-দাসের খোঁজে আসবে?'

উলালা বলল, 'বহু দিনের বহু জ্ঞানের কথা শুনছি। বাটাণ্ডোর মুখে।'

সরদার বলল, 'ধনের কথা শেখ কি জানে?'

—'কিছুই না। কে এক ফকির ওকে বলেছে নিম্মরের বিশাল গুপ্তধনের রাশির কথা আর এক সুন্দরীর কথা। তাকে বেচলে আরো ধন পাওয়া যাবে।'

—'এ কথা বলেনি যে ওটা হল নিষিদ্ধ উপত্যকা? ওখানে প্রবেশ করা বড় শক্ত।'

—'না, তা বলেনি।'

চতুর হেসে বাটাণ্ডো বলল, 'তাহলে উপত্যকার প্রবেশ-পথটা দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে।'

*

টারজানের সঙ্গে সেই গ্রামে যাবার পথে দুজনার পরিচয় আরো বিস্তৃত হলো আর টারজানের প্রতি জায়েদের শ্রদ্ধা আরো গভীর হলো। এক দিন সে মনের কথা খুলে বলল। শেখের মেয়ে আতেজাকে সে ভালোবাসে, কিন্তু এখনি ফিরে গিয়ে বিয়ের কথা বললে, তার নিশ্চিত মৃত্যু তবে জায়েদ আশা করে আরো কিছু দিন গেলে শেখের মনের পরিবর্তন হবে। টারজান যদি দয়া করে সামনের গ্রামে জায়েদের কিছু দিন থাকার ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে সে চিরকৃতজ্ঞ হবে। অভিযান থেকে ফেরার পথে জায়েদ আবার শেখের দলে মিলতে পারবে, এই রকম তার আশা। একবার সুদানে ফিরে গিয়ে, আবার একলা এত দূর আসা তার পক্ষে অসম্ভব।

এ বিষয়ে টারজানও একমত। বলল, 'তুমি এই গ্রামে

ছয় মাস থেকো। তার মধ্যে সে না ফিরলে এরা তোমার সুদান যাবার বন্দোবস্ত করে দেবে।'

গ্রামে পৌঁছে মোড়লের সঙ্গে সেই রকম ব্যবস্থাই করে দিল টারজান।

তারপর টারজান আবার উত্তরে চলল। শেখের ক্যাম্পে কোন্ শ্বেতাঙ্গ আশ্রয় নিয়েছে জানা দরকার। স্টিম্বলের কি বে-পথে এত দূর আসা সম্ভব? বরং ব্লেক-ই হতে পারে। তাকে টারজানের ভাল লাগত। অবিশ্যি স্টিম্বল হলেও সাহায্য করা কর্তব্য। জায়েদ বলেছিল তার জন্য মুক্তিপণ চাওয়া হবে, কাজেই এক্ষুণি কোনো ভয় নেই। ধীরে সুস্থে এগোল টারজান। ব্লেকদের পুরনো ক্যাম্পটাও দেখে যাবে। তারপর আরবদের চিহ্ন ধরে চলবে। মাঝে দুদিন টয়াটের দলে গয়াট আর জুথোর সঙ্গে একটু সময় কাটিয়ে গেল সে; ওদের বালুদের সঙ্গে খেলা করল।

তারপর গাছে গাছে ক্রমাগত উত্তরদিকে চলা। মাঝে মাঝে হরিণ মেরে খাওয়া, নুমাকে চটানো। এক সময় তান্তর এল, তার পিঠে কিছুদূর গেল; মানুর বকবকানি শুনল, তারপর আবার উত্তরে এগোতে লাগল। দু-দিন পরে মস্ত এক দল বাঁদরের সঙ্গে দেখা। তারা বলল, 'অদ্ভুত সব গোমানগানিরা আসছে। তাদের হাতে আগুন-লাঠি।'

টারজান বলল, 'কত দূরে? অনেকবার ঘুমিয়ে ওঠার পর?'

—'না, না, কাছে।'

—'ওদের সঙ্গে একজন টারমানগানি আছে?'

—'না, খালি গোমানগানিরা। ওরা মানু মেরে খায়!'

—'টারজান ওদের সঙ্গে কথা বলবে।'

—'ওরা টারজানকে মেরে ফেলবে।'

টারজান হেসে এগিয়ে গেল। কিছু পরেই তাদের সঙ্গে দেখা। দেখেই তাদের ব্লেকের সাফারি বলে চিনতে পারল। ওরাও ছুটে এলো। কি ব্যাপার? না, 'একজন মাত্র শিকারী নিয়ে সে বেরিয়েছিল, তারপর ভীষণ ঝড় উঠল। দুজনের কেউ ফিরল না। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। ছোট বোয়ানা বড় ভালো লোক, তার কি যে হলো ভেবে পাচ্ছি না। অনেক খুঁজেও ওদের পাইনি।'

—'ভালো কাজ করেছ। খুঁজবার সময় কি একদল আরবকে উত্তর দিকে যেতে দেখলে?'

—'তাদের দেখিনি, কিন্তু তাদের ক্যাম্পের চিহ্ন দেখেছি। অল্পদিন আগের ক্যাম্প। ওরা উত্তরে গাল্লাদেশের দিকে যাচ্ছিল।'

—'তোমরা এবার নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যাও। তার আগে ছোট বোয়ানার জিনিসপত্র তার বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিও আর টারজানের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দাও, তারা যেন একশো ওয়াজিরি যোদ্ধা পাঠায় গাল্লাদের দেশে। গোল পাথরে ঘেরা জলাধার থেকে আরবদের চিহ্ন দেখে এগোতে হবে। আর দেখ মানু আমার আর তোমাদের ভাই হয়। নিতান্ত অসুবিধায় না পড়লে মানু মেরো না।'

—'বুঝেছি, বড় বোয়ানা।'

এদিকে নিম্মরের রাজকুমার গোব্রেডের প্রাসাদে, ব্লেককে নিম্মরের নাইটের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। রিচার্ড তার সমস্ত ভার নিয়েছিল। যদিও ব্লেকের নাইটের যোগ্য হালচাল আদৌ জানা নেই দেখে রাজকুমারের খুব একটা আস্থা হচ্ছিল না; আর ম্যালুড তো প্রকাশ্যেই বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন, তবু রাজকুমার রিচার্ডকে বড় ভালোবাসতেন বলে এ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া হয়তো রাজকুমারী গুইনাণ্ডার আগ্রহ দেখেও তার স্নেহশীল বাবা ঐ ব্যবস্থায় রাজি হয়েছিলেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে ব্লেকের জন্য নিম্মরের নাইটের উপযুক্ত সাজ-পোষাক তৈরী হলো। ব্লেক মহা অপ্রস্তুত। কি করে এ-সবের দাম দেবে? তারপর শুনল এখানে টাকা-কড়ির বিশেষ চল নেই। শ্রম দিয়ে দাম দেওয়া হয়।

রাজকুমার তাঁর পারিষদদের, পারিষদরা তাদের অনুচরদের, তারা শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস সরবরাহ করে থাকে। তার বদলে শ্রমিকরা, অনুচররা, পারিষদরা তাদের শ্রম দেয়। মাঝে মাঝে দু-চারটে পৈত্রিক সুবর্ণ মুদ্রা কি গয়নাগাটির হাত বদল হয়।

ধন-সম্পদ বিষয়ে এরা কেউ আগ্রহী নয়। তার চেয়ে এদের কাছে ধর্মের, আত্মসম্মানের, কর্মক্ষমতার আদর বেশি। প্রচুর খাবারদাবার, ফল, শস্য। যোদ্ধারা অতি কায়দা-দুরস্ত, দক্ষ আর সাহসী।

দিনে দিনে নাইটদের উপযুক্ত বিদ্যাগুলো ব্লেক আয়ত্ত করে ফেলছিল। ঢাল-তলোয়ারের ব্যবহার শিখতে একটু কষ্ট করতে হয়েছিল, যদিও কলেজে সে দক্ষ তলোয়ার খেলোয়াড় বলে নাম করেছিল। ক্রমে তার মনে হলো ঐ ভারি ঢালের বদলে দক্ষভাবে আত্মরক্ষা করতে শিখলে ঢের কাজে দেয়। আধুনিক তলোয়ার খেলার চমৎকার সব নিয়ম আছে। বর্শা চালানো অনেক সহজ। পোলো খেলত ব্লেক, তাই

দক্ষ ঘোড়সওয়ার ছিল।

প্রাসাদের ভিতরের আর বাইরের পাঁচিলের মধ্যিখানে চওড়া জায়গাটাতে অস্ত্র খেলার প্রাঙ্গণ। দর্শকদের জন্য কাঠের গ্যালারি ছিল। সেগুলোকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরানো যায়। প্রত্যেক সপ্তাহে ওখানে নানা সামরিক খেলাধূলো, প্রতিযোগিতা হয়। মহিলারাও দেখতে আসেন, ঠাট্টা রসিকতা হয়; কে জিতবে তাই নিয়ে নানারকম বাজি ধরা হয়। অভ্যাস করার সময় কাউকে যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে দেওয়া যায়, টিটকিরিতে তাকে ব্যতিব্যস্ত করা হয়। তবে এ হলো অভ্যাসের সময়ে। আসল ক্রীড়ার দিন একটা গাম্ভীর্য দেখা যায়।

এই রকম দর্শকের সামনে ব্লেককে খেলা অভ্যাস করতে হতো। ম্যালুডের আর রিচার্ডের দলের লোকরা কেউ বাহবা, কেউ টিটকিরি দিত। স্বয়ং রাজকুমার প্রায়ই দেখতে আসতেন; গুইনাণ্ডা তো রোজ উপস্থিত থাকত। নাইটদের সঙ্গে তাদের ছোকরা স্কোয়াররা থাকত। তারাও বড় হয়ে নাইট হবে। সকালে চলত তাদের প্রশিক্ষণ আর বিকেলে নাইটদের। এই সময়ে সকলেই ব্লেকের দক্ষভাবে অশ্ব-পরিচালনা লক্ষ্য করেছিল। স্বয়ং রাজকুমার একদিন বলে উঠলেন, 'আরি বাপ! লোকটা যে তার ঘোড়ারই একটা অঙ্গের মতো!'

একদিন হিংসায় জ্বলে গিয়ে ম্যালুড ওর ঢাল-তলোয়ার খেলার খুব নিন্দামান্দা করে রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি এখনো চাষাটাকে নাইট বলে মনে কর?'

—'কেন, আমি তো কোনো কথাই বলিনি।'

—'তুমি তো ওর খেলা দেখে হাসও নি।'

রাজকুমারী বলল, 'বিদেশ থেকে একজন নাইট এসেছে, তাকে টিটকিরি দেওয়াটা তো ভদ্রতা নয়। তাই আমার মজাও লাগেনি, হাসিওনি।'

ভিড়ের মধ্যে অনেকবার ম্যালুড আর তার বন্ধুদের সঙ্গে ব্লেকের দেখা হোত। তাদের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ব্লেক শুনেও শুনত না। তারা চটে যেত, কিন্তু অন্যরা এর প্রশংসা করত। নিম্মরের প্রাসাদের অধিকাংশ বাসিন্দাই ব্লেককে পছন্দ করত। খালি ম্যালুডের দল সর্বদা অশান্তি করার তালে থাকত।

ব্লেক এসে অবধি প্রাসাদের পুরনো নিরানন্দ, অতি গম্ভীর আবহাওয়াটার অনেকখানি কেটে গেছিল। ওর স্বাভাবিক ব্যবহার, হাসি-তামাসা আর প্রসন্ন মুখ সকলের মনে আনন্দ দিত। অবিশ্যি ম্যালুড আর তার মোসায়েবরা ছাড়া।

একদিন সে ব্লেকের অপট ঢাল-তলোয়ার খেলা দেখে বলে বসল, 'ওর হাতে একটা থালা আর একটা মাংস-কাটা ছুরি দিলে সবচেয়ে মানাত।'

ওর রাগের কারণ হলো রাজকুমারী ব্লেকের ঘোড়ার খেলার প্রশংসা করেছিল। ম্যালুডের কথায় তার দলের লোকরা হেসে গড়াল।

ব্লেক বলল, 'পরিবেশনের ব্যাপারে যখন স্যার ম্যালুডের এতই আগ্রহ, এখানে কেউ কি বলতে পারে তাজা শূওর পরিবেশন করতে কি কি লাগে?'

ম্যালুড বলল, 'তুমিই বল না, তোমারি তো জানা উচিত।'

ব্লেক বলল, 'কেন, একটা থালা, একটা মাংস-কাটা ছুরি আর তুমি!'

ঠাট্টাটা সকলের বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিল, তারপর রাজকুমারী সহ সকলে হাসিতে ফেটে পড়ল। বলা বাহুল্য, এর ফলে ম্যালুড ব্লেককে ডুয়েল লড়তে চ্যালেঞ্জ করল তার আগে যাচ্ছেতাই বলে গালাগালিও দিল। ব্লেকও উল্টে তাকে বেশ দু-কথা স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিল। মাথা নিচু করবার বা ঘাবড়াবার ছেলে সে ছিল না।

ম্যালুডের ব্যবহারটা জঘন্য হলেও, তার প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। তাছাড়া সে রাজকুমারের প্রিয়পাত্র। দুজনের মধ্যে সত্যিকার বিরোধ দেখে, অনেকে তফাতে সরে দাঁড়াল। কিন্তু রাজকুমারী প্রকাশ্যেই ব্লেককে সমর্থন করে বলল, 'চল, বাগানে একটু বেড়ানো যাক।' বাগানে গিয়ে সে বারবার ব্লেককে সাবধান করে দিল, 'আর যাই কর, ডুয়েলটা ঢাল তলোয়ার নিয়ে লড়তে রাজি হয়ো না। ঐ একটা বিষয়ে ম্যালুড অপরাজেয়। নির্ঘাৎ তোমাকে মেরে ফেলবে।'

কিন্তু এর আগেই ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ডুয়েলের কথা স্থির হয়ে গিয়েছিল। ব্লেক বলল, 'এখন আর কথার নড়চড় হতে পারে না।' তবু রাজকুমারী যে তার জন্য এতটা ভাবে তাই দেখে ব্লেক মুগ্ধ। এ-কথা শোনার পর, রাজকুমারী রেগেমেগে চলে গেল।

সে রাতে উলালা ফিরে এসেছে বলে বাটণ্ডোর গ্রামে প্রায় ভোর অবধি উৎসব হলো। নাচ-গান, পাঁঠার মাংস, মুরগি, ফল, হাঁড়িয়া। তার ফলে বেলা অবধি সকলে ঘুমোল। সব চুকে গেলে তবে উলালা বাটণ্ডোর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথাবার্তার সময় পেল।

উলালা বলল, 'তুমি যে বললে আরবদের নিষিদ্ধ উপত্যকার ফটক দেখিয়ে দেবে। তার মানে কি তুমি ওদের সঙ্গে লড়বে না?'

—'তার দরকার-ই হবে না।'

—'তার মানে?'

—'শোন বাছা, ছোটবেলায় তোমাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছিল, তাই অনেক কথা ভুলে গেছ, অনেক কথা জানতেও না। উত্তর দিক ঘুরে উপত্যকায় ঢোকা যে শক্ত নয়, সে-কথা সব গাল্লারাই জানে। দক্ষিণে ক্রসের পরে সুড়ঙ্গ-পথের কথাও জানে। কিন্তু সকলে এ-ও জানে ওখান থেকে বেরোবার পথ নেই।'

—'সে কি, সরদার। ঢুকবার দুটো পথ আছে যখন, তখন বেরোবারো দুটো পথ আছে!'

সরদার বলল, 'যুগ যুগ ধরে আমরা জানি যে যারা ঢোকে, তারা আর বেরোয় না।'

—'কেন?'

—'তা কি করে বলব?'

—'উপত্যকায় কারা থাকে?'

—'তাও জানি না। আরব শেখকে বল গিয়ে, তিন দিন পরে আমাদের লোকজন গিয়ে ওদের সে-পথ দেখিয়ে দেবে। তাহলে এবারো ওদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে না; এর পরেও আর কখনো হবে না।' এই বলে সরদার কাষ্ঠ হাসল।

—'গিয়ে আর কি কি বলব?'

—'বলবে এর বদলে এবারো কোনো গাল্লাকে বন্দী করতে পারবে না আর আগে যাদের বন্দী করেছে, উপত্যকায় যাবার আগে তাদেরও মুক্তি দিতে হবে।'

তাই বলল গিয়ে ফেজ্জুয়ান। প্রথমটা শেখ আগেকার বন্দীদের তখনি মুক্তি দিতে রাজি হচ্ছিল না। তারপর মনে হলো এদের চটানো কোনো কাজের কথা হবে না, তাই কথা দিল। মনে মনে ভাবল তখন না হয় দেখা যাবে।

আরবদের শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিতে ফেজ্জুয়ানের কোনো আপত্তি ছিল না। একমাত্র খেদ আতেজার জন্য; সে বড় ভালো মেয়ে। শেখ অপেক্ষা করতে লাগল।

বাটাণ্ডো তার জাত-ভাইদের সংগ্রহ করতে লাগল। এমন সময় টারজান সেই জলাধারে পৌঁছে, আরবদের পিছু নিল। তার মনে হচ্ছিল ব্লেকের বাহকদের কাছে যা শুনেছিল আর স্টিম্বলকে যখন এদিকে কেউ দেখেনি, তখন আরবদের বন্দীটি নিশ্চয় ব্লেক। তবে আরবরা যদি মুক্তিপণ আশা করে থাকে, কেউ ওর ক্ষতি করবে না।

এদিকে নিষিদ্ধ উপত্যকার গার্ড-ঘরে ব্লেক আর রিচার্ড পাশা খেলছিল। রিচার্ডের মন বড় খারাপ। তার বিশ্বাস কাল ম্যালুডের হাতে জেম্‌সের নির্ঘাৎ মৃত্যু। অথচ লোকটা কি নিশ্চিন্তে পাশা খেলছে!

ব্লেক বলল, 'সামান্য একটু টিটকিরির জন্য আমাকে মারতে চায়? ব্যাটা তো ভারি পিটপিটে।'

—'সেটাই আসল কারণ নয়। হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে লোকটা। রাজকুমারী মনে হয় তোমাকেই বেশি পছন্দ করেন। এদিকে গোব্রেডের প্রিয়পাত্র ম্যালুড। সবাই ভাবছে ওকেই জামাই করবেন। তাকে মেরে ফেললে রাজকুমারী কি আর কখনো তোমার দিকে ফিরে তাকাবেন। অবিশ্যি ম্যালুড-ই তোমাকে মেরে ফেলবে। সে মন্দ পাত্র নয়। নিজের প্রাসাদ, সেনাদল, উচ্চ বংশ।'

—'ও-রকম আর কেউ নেই?'

—'আছে, জনা কুড়ি। তবে ওকেই রাজকুমারের পছন্দ।'

—'ক্ষমতাশালী আর কেউ নেই?'

—'কেন, বোহানের নাম শোননি? সে নিজেকে রাজা বলে। আমরা সেটা মানি না। ওরা উপত্যকার উল্টো দিকে থাকে। সংখ্যায় আমাদেরি সমান হবে। আমরা ক্রুসেডারদের মতো লাল ক্রস্ বুকে পরি। ওরা ক্রুসেড ফেরতদের মতো পিঠের দিকে পরে। বছরে একবার একটা বড় টুর্নামেন্ট হয়, তখন দু দলে প্রতিযোগিতা হয়। এক বছর এখানে এক বছর ওখানে। শীগ্‌গিরই এখানেই হবে সে খেলা। নিম্মরের নাইট তুমি, আমাদের অতীতের কথা তোমার আরো জানা উচিত। শোন তবে।

১১৯১ সালে ইংল্যাণ্ডের প্রথম রিচার্ড সিসিলি থেকে একরের দিকে জাহাজ নিয়ে রওনা হলেন। সেখানে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাঁরা স্যারা-সেনদের কবল থেকে জেরুসালেম উদ্ধার করবেন। দুঃখের বিষয়, রিচার্ডকে সাইপ্রাসে থামতে হল। সেখানকার অত্যাচারী শাসক রিচার্ডের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী নাভারের রাজকুমারী বেরে জারিয়ার বিষয় অপমানকর মন্তব্য করেছিলেন। তাঁকে পরাজিত করে আবার যখন নোঙর তুললেন রিচার্ড, নাবিকরা লুকিয়ে অনেকগুলি সুন্দরী সাইপ্রাসী মেয়ে সঙ্গে তুলে নিল। তার ফলে কাজে অমনোযোগী হয়ে, ঝড়ে পড়ে, আফ্রিকার তীরে দুটি জাহাজ আছড়ে ভাঙল। তার একটির সেনাপতির নাম বোহান, অন্যটির গোব্রেড। একসঙ্গে লড়তে

গেলেও, অন্য সময়ে তাদের মুখ দেখাদেখি ছিল না।

জেরুসালেম যাবার পথ খুঁজতে খুঁজতে, তারা এই উপত্যকায় এসে পৌঁছল। বোহানের দল বলল, 'এই তো ঈশ্বর সমাধি-উপত্যকায় পৌঁছেছি, অতএব আমাদের যাত্রা শেষ। সমাধি উদ্ধার হয়েছে।' এই বলে তারা পিঠের দিকে ক্রস্ লাগাল।

গোব্রেডের দল সে-কথা মানেনি। তারা এখনো বুকের ওপর ক্রস্ লাগায়। ফটক আর দুর্গ তৈরি করে তারা বোহানের দেশে ফেরার পথ বন্ধ করে রেখেছে। ওদিকে বোহানরাও উল্টো দিকে নগর পত্তন আর দুর্গ তৈরী করেছে। যাতে গোব্রেডের দল ও-পথে জেরুসালেম গিয়ে ওদের গর্ব খর্ব না করে। ওটাই হলো জেরুসালেমের রাস্তা। প্রথমে বোহান নিজেকে রাজা বলে বলতেন। প্রথম গোব্রেড নিজেকে রাজকুমার বলতেন। সেই ইস্তক ঐ অবস্থাই চলে আসছে। তোমার কি মনে হয় না আমাদের এভাবে এখানে থাকাই আপততঃ ভালো?'

সব শুনে ব্লেক তাজ্জব বনে গেছিল। সে বলল, 'তোমরা এখন জেরুসালেম বা লণ্ডনে গেলে আঁৎকে উঠবে। হ্যাঁ, এখানে থাকাই ভালো। এই সাত শ পঁয়ত্রিশ বছরে ইংলণ্ডের লোকরা আর স্যারাসেনদের বংশধররা ঐ বিরোধের কারণটা পর্যন্ত ভুলে যেতে বসেছে। তোমরা গেলে, কোনো পক্ষই তোমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না।'

রিচার্ড বলল, 'আমারো মনে হয় আমাদের পক্ষে এই জায়গাটাই সবচেয়ে ভালো!'

হঠাৎ ব্লেক বলে বসল, 'আচ্ছা, আমি তোমাদের পক্ষ নিয়ে টুর্নামেন্টে যোগ দিতে পারব না?'

রিচার্ড অবাক হলো, 'কি জ্বালা! আজকের পর তুমি বাঁচলে তবে তো। আমি সেটা আশা করি না। তবে তুমি বীরের মতো মরবে বলে মনে করি। এ-কথা শুনলে রাজকুমারীও খুশি হবেন।

—'আর না মরলে কি দুঃখিত হবেন?'

—'অতটা বলব না। তবে তুমি তার বাগদত্তকে পরাজিত করে, মেরে ফেললে কোন মেয়ে খুশি হয়?'

ব্লেক হাই তুলে বলল, 'যাই, শুয়ে পড়ি। কাল যদি মরতেই হয়, তাহলে আজ একটু ঘুমনো দরকার।'

*

তিন দিন অপেক্ষা করেও যখন গাল্লা গাইডরা এল না, তখন শেখ ফেজ্জুয়ানকে আরেকবার পাঠাল। শেখের বড়ই ভয় টারজান না শেষ মুহূর্তে এসে সব ভেস্তে দেয়। এ জায়গাটা সম্ভবতঃ টারজানের এলাকার বাইরে, তবু বিশ্বাস নেই। ফিরবার সময় খানিকটা ঘুরে ঐ এলাকা এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা ওর মনে। পর্দার পিছনে ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকলেও আতেজার চোখ সর্বদা পর্দার ওপরে সরু ফাঁকটার দিকে। যদি জায়েদের কোনো খবর আসে।

একবার হঠাৎ তাকিয়ে দেখল, ফাহ্‌ড চমকে উঠে বলছে, 'ইব্‌ন জাড্, চেয়ে দেখ!'

সেদিকে তাকিয়ে আতেজাও চমকে উঠল। পিঠে লম্বাটে ঢাল, সঙ্গে তীর ধনুক, বর্শা আর ঘাসের দড়ি, লম্বা-চওড়া বিশালদেহ একটা দৈত্য শেখের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে।

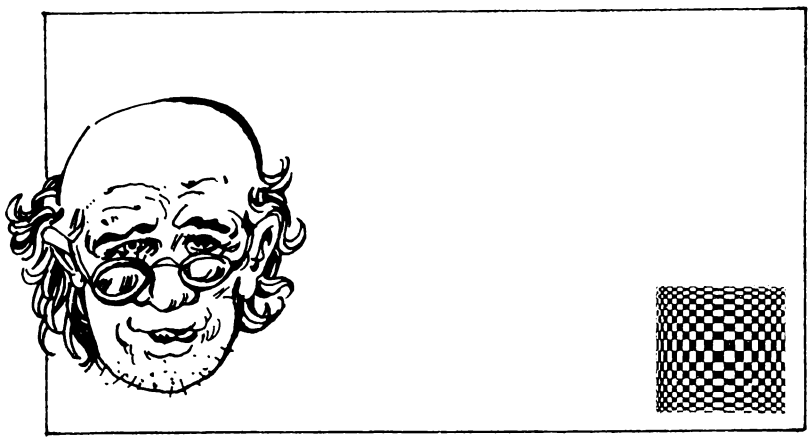

টারজানকে দেখে শেখও স্তম্ভিত।

টলগ বলল, 'সাবধান! সঙ্গে হয়তো ওয়াজিরি যোদ্ধারা এসেছে।'

ইব্‌ন জাড়ের মনের অবস্থা কাহিল। টারজানের চোখ স্তম্ভের ওপর পড়তেই, সে বলল, 'ব্লেক কোথায়?'

—'সে তো তোমারি জানা উচিত।'

—'তাকে তুমি দেখনি?'

—'না।'

তখন শেখের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি মোটেই হাতির দাঁতের ব্যবসা করতে আসনি। তুমি একটা প্রাচীন শহরের খোঁজে এসেছ। ধনরত্ন লুঠবে, মেয়েদের বন্দী করবে।'

—'যে এ কথা বলেছে, সে মিথ্যাবাদী।'

—'তাকে দেখে তো তা মনে হলো না।'

—'কে সে?'

—'তার নাম জায়েদ! আরো অনেক কথা বলেছে সে।'

—'কি কথা ?'

—'সে বলেছে অন্য লোকে তার বন্দুক চুরি করে শেখকে মারার চেষ্টা করে, এখন ওর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।'

ফাহ্‌ড রেগে উঠল, 'মিথ্যা কথা !'

শেখ ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ বসে থাকার পর বলল, 'ওর হয়তো ধারণা ও সত্যি কথাই বলছে। ওর মাথাটা সর্বদা একটু খারাপ। তবে আর কোনো বিপদের কারণ দেখিনি। মিথ্যা কথা বলেছে। আমার লোকজনরা আর এই নাজরানি সাক্ষী যে আমি তোমার কথা মতো দেশে ফিরবারই চেষ্টা করছি।'

—'তাহলে আমাকে কেন বন্দী করেছিলে ? তোমার ভাইকে কেন আমাকে খুন করতে পাঠিয়েছিলে ?'

—'না, না, ও তো তোমার বাঁধন কাটতে গিয়েছিল।'

—'তবে কেন বলেছিল—নাজরানি, এবার মর !'

—'ঠাট্টা করেছিলাম।'

—'তা হতে পারে। আমি কিন্তু ঠাট্টা করতে আসিনি। আমার ওয়াজিরিরাও আসছে। আমরা তোমাদের রওনা হওয়া দেখতে চাই।'

—'আমরাও তাই চাই। তুমি যদি আমাদের পথ খুলে দাও, আমরা খুশি হয়ে চলে যাই। ঠিক কিনা, নাজরানি ?'

স্টিম্বল বলল, 'হ্যাঁ ঠিক।'

—'বেশ তোমারা কাল রওনা হবে। আমি আজ রাতটা এখানে থাকব। একটা তাঁবু দিও।'

শেখ তখুনি জায়েদের তাঁবুটা ঠিক করবার ফরমায়েস দিল। একটু পরেই হিরফা আর আতেজা তাঁবুটা খাটিয়ে দিল। হিরফার কাজ ছিল, আতেজা কাজটা শেষ করতে লাগল। হিরফা চলে গেলেই, সে টারজানকে বলল, 'বল আমার জায়েদ ভালো আছে তো ? তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?'

—'তাকে আমি একটা গ্রামের মোড়লের অতিথি করে দিয়ে এসেছি। সে খুব ভালো আছে। তোমাদের রহল্লা ওদিক দিয়ে কবে যাবে সেই অপেক্ষাতেই আছে।'

তারপর তাকে সব কথা খুঁটিয়ে বলল টারজান। শুনে তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। 'আমি তোমার কাছে ঋণী টারজান, তোমার জন্যেই সে প্রাণে বেঁচেছে।'

আরো রাতে ফেজ্জুয়ান আড়াল থেকে দেখতে পেল শেখের সঙ্গে টলগের কোনো গোপন পরামর্শ হচ্ছে। আতেজাও শুয়ে শুয়ে শুনতে পেল, শেখ বলছে, 'না, ওকে সরাতেই হবে।'

—'কিন্তু ওয়াজিরিরা আসছে, তারা আমাদের কচুকাটা করে দেবে।'

শেখ বলল, 'ও এখানে থাকলে আমাদের সর্বনাশ হবে।'

টলগ বলল, 'আমি আর ঐ কাজ করতে পারব না বলে রাখলাম।'

—'তুমি না। অন্য উপায় ভাবতে হবে।'

—'অন্য নাজরানিটাকে দিয়ে করালে কেমন হয় ? সে তো টারজানের ওপর হাড়ে চটা।'

—'ঠিক বলেছ, ভাই।'

—'তবু আমাদের ঘাড়েই দোষ পড়বে কিন্তু।'

—'সেটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে। কাল যদি গাইড নিয়ে বাটাণ্ডো এসে হাজির হয়, তখনি তো সব ফাঁস হয়ে যাবে।'

টলগ বলল, 'তাহলে তুমি বুড়োকে পাঠাবে টারজানকে মারতে ?'

—'ঠিক পাঠাব না। অবস্থাটা ওর কানে তুলে দেব। তারপর যেই না সত্যি মেরে ফেলবে, তখন উল্টে মহা হৈ চৈ লাগাব। ঐ অপরাধে এর-ও প্রাণদণ্ড দেব। ব্যস্, কথা বলার কেউ থাকবে না। ওয়াজিরিরা এসে শুনবে আমরা টারজানের হত্যার জন্য বিলাপ করছি।'

আরো রাতে স্টিম্বলকে ডেকে এনে বলা হল যে টারজানের ধারণা স্টিম্বল ব্লেককে মেরে ফেলেছে। তাই টারজান স্টিম্বলকে বাঁচতে দেবে না। স্টিম্বলের বাঁচার একমাত্র উপায় ঘোর রাতে জায়েদের তাঁবুতে গিয়ে ঘুমন্ত টারজানকে শেষ করে দেওয়া। এই সব বলে শেখ শুতে গেল। স্টিম্বল খানিক ভাবল, তারপর ছোরা নিয়ে গুড়ি মেরে জায়েদের তাঁবুর দিকে চলল।

তার আগেই আতেজা ছুটে টারজানকে সব ষড়যন্ত্রের কথা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মাঝ পথে টলগ তাকে ধরে ফেলল। 'ও-সব চলবে না। তোমার বাবা শুনলে তোমাকে মেরেই ফেলবে। যাও, ঘরে যাও।' এই বলে এক ধাক্কা দিয়ে তাকে রওনা করে দিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শক্ত শক্ত আঙুল টলগের গলা টিপে ধরে, তাকে টেনে সরিয়ে নিল।

এ দিকে ঘেমে নেয়ে, ছোরা হাতে কম্পিত পদে স্টিম্বল অল্প পরেই অন্ধকার তাঁবুটাতে ঢুকে, আবছায়ায় দেখল পুরনো জোব্বা জড়িয়ে মানুষটা শুয়ে আছে।

*

ভোর হতেই রিচার্ডের অনুচর ছোকরা মাইকেল, জেমসের অনুচর এডওয়ার্ডকে ঠেলে তুলে দিল, 'ঘুমোচ্ছিস কিরে, কুঁড়ের বাদশা! তোর প্রভু না আজ ভোরে হত হতে যাচ্ছেন!' এডওয়ার্ড মহা চটে গেল।

মাইকেল বলল, 'আহা রাগিস্ কেন? আমরা সবাই চাই উনি জিতে যান। কিন্তু ঐ ঢাল-তলোয়ারঢাতেই যে উনি কিঞ্চিৎ কাচা, সেই হল মুস্কিল!'

এডওয়ার্ড বলল, 'কাল রাতে আমি প্রার্থনা করেছি যেন যীশু আমার প্রভুর হাত ধরে স্যার ম্যালুডের হেল্‌মেট ফুঁড়ে দেন।'

—'বাঃ! খুব ভালো।'

ফেব্রুয়ারি মাস। বেলা এগারোটায় নিম্মরের বিশাল উত্তর প্রাঙ্গণে লোকে লোকারণ্য। সকলের সুন্দর সাজ-পোষাক পরা। পুরুষ ও মহিলারা দল বেঁধে ডুয়েল দেখতে এসেছে। স্বয়ং রাজকুমার গোব্রেড সপরিবারে উপস্থিত। দুদিকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর পতাকা লাগানো দুটি ছোট তাঁবু। স্যার ম্যালুডের রং সবুজ আর সোনালি; স্যার জেমসের রং নীল আর রুপোলি। তাদের ঘোড়ার আর অনুচরের সাজ-সজ্জাতেও ঐ রং।

সেই ডুয়েলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া আমাদের অভিপ্রায় নয়। ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ব্লেকের যেমন অসুবিধা, শুধু তলোয়ার খেলায় সে তেমনি অপরাজেয়। খেলার গোড়ার দিকেই সে ঢাল ফেলে দিয়ে, আত্মরক্ষার আধুনিক ও অনেক বেশি উন্নত কৌশল অবলম্বন করে, অনেক বিপর্যয়ের পরে শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করে, ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিল। তারপর তার গলার কাছে তলোয়ার ছুঁয়ে, রাজকুমার গোব্রেডকে উদ্দেশ করে বলল, 'রাজকুমার, ইনি একজন অতি বীর আর দক্ষ যোদ্ধা। মিছিমিছি এঁর প্রাণহানি না করে, আপনার যোদ্ধা আপনাকে ফিরিয়ে দিলাম।' চারদিকে স্যার জেমসের জয় জয়কার পড়ে গেল। সকলে ভারি খুশি, সকলের মুখে হাসি ধরে না।

পরে ঘরে গিয়ে রিচার্ড বলেছিল, 'কাজটা মহৎ হলেও, খুব বুদ্ধির হল কি না জানি না।'

—'সে কি! মাটিতে পড়ে গেছে লোকটা, সেই সময়ে তার গলায় তলোয়ার বসানোটা কি খুব ভালো হত?'

—'তা না হতে পারে, কিন্তু ও হলে তাই করত। আসলে তোমাদের বিরোধের কারণটা আরো গভীর। তার মূলে ঈর্ষা। এতে ওকে মনে হচ্ছে যেন তোমার কৃপার পাত্র। সে-ও ক্ষমা করতে পারবে না।'

সে-রাত্রে গোব্রেডের হল-ঘরে সকলে সভায় যোগ দিল। সকলেই তাদের পদানুসারে আসন নিল। ব্লেক তার সমবয়সীদের সঙ্গে বসেছিল, তায় আবার অনভিজ্ঞ নাইট। তারপর ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন নিয়ম অনুসারে একে একে কয়েকটি গণ্যমান্য ব্যক্তির শুভকামনায় সকলে উঠে দাঁড়িয়ে এক চুমুক পানীয় মুখে দিলেন। প্রথমেই নাম করা হল সাত শ আটাশ বছর আগে মৃত প্রথম রিচার্ডের। তারপর গোব্রেড আর তাঁর স্ত্রী ব্রিনহিল্ডার এবং মেয়ে গুইনাল্ডার। তার পরেই গোব্রেড উঠে নাইট টেম্পলার এবং সদ্য নিম্মরের নাইট স্যার জেমসের নাম করলেন। এবার সবচেয়ে বেশি জয়ধ্বনি শোনা গেল। তার পর ব্লেক উঠে দাঁড়িয়ে স্যার ম্যালুডের নাম করল। সকলে উঠে দাঁড়াল বটে, কিন্তু তেমন আনন্দ প্রকাশ করল না। গোব্রেড নিজে অবাক হয়ে বললেন, 'তোমাদের দেশের লোকেরা এভাবে শত্রুকে সম্মান দেখায় নাকি?'

ব্লেক বলল, 'না দেখালে ঠেলা বুঝবে!'

আরো বলল ব্লেক, 'বুঝলেন না, রাজকুমার, আমাদের চৌকো-বৃত্তের আর হীরক নাইটরা আর কিছু বুঝবেও না। তাছাড়া আমাদের স্যার ডেম্পসি তো দেখিয়েই দিয়েছেন জয়ী হয়ে সম্মানিত নাইট্ হওয়ার চেয়ে, পরাজিত হয়েও সম্মানিত নাইট্ থাকা কত বেশি কঠিন কাজ।

—'তোমাদের বুঝি নানা অর্ডারের নাইট্ আছে?'

—'নেই আবার! থিক্‌থিক্ করছে!'

—'তাদের মধ্যে বিরোধ হয় না?'

—'হয়ই তো। খ্যাঁচাখেঁচি লেগেই আছে।'

*

অন্ধকার তাঁবুতে ঢুকে চোখে বিশেষ কিছু দেখতে পেল না স্টিম্বল, কিন্তু নিশ্বাসের শব্দ শুনে ঠাওর করল লোকটা কি ভাবে শুয়েছে। অমনি ছোরা তুলে যথাস্থানে দিল বসিয়ে! ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। কেমন যেন মরিয়া হয়ে। কোপের পর কোপ দিয়ে তারপর কাঁপতে কাঁপতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো শেখের তাঁবুর বারান্দায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শেখ ছুটে এল, 'কি হলো? কি হলো?'

—'কাজ সেরেছি।'

—'কি কাজ?'

—'টারজানকে মেরে ফেলেছি!'

সঙ্গে সঙ্গে শেখ চিৎকার করে বিলাপ জুড়ে দিল, 'হায়! হায়! এ কি করলে! টলগ, হিরফা, আতেজা! কি বলছে শোন একবার!'

টলগ বাদে অন্যরা সবাই ছুটে এল, 'কি? কি?'

—'শুনছ না এই পাষণ্ড আমার প্রাণের বন্ধু টারজানকে মেরে ফেলেছে। মৎলগ, ফাহ্‌ডি, শীগ্‌গির এসো!'

চারদিক থেকে ক্যাম্পের লোকজন দৌড়ে এল।

স্টিম্বল একে অনভ্যস্ত দুষ্কর্ম করে ভয়ে আধমরা হয়ে ছিল, তার ওপর শেখের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল।

শেখ বলল, 'ওকে কোথাও ধরে বেঁধে রাখো। কাল সকালে ঠিক করা যাবে কি কর্তব্য।'

তাই করা হলো। ফাহ্‌ড পাহারায় রইল। একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি তাকে মেরে ফেলেছ নাকি?'

স্টিম্বল বলল, 'শেখ-ই আমাকে জোর করে করাল আর এখন উল্টো কথা বলছে!'

ফাহ্‌ড বলল, 'তারপর কাল তোমাকে হত্যা করে বলে বেড়াবে টারজানের হত্যাকারীকে সাজা দিয়েছি।'

ব্যাকুল ভাবে স্টিম্বল বলল, 'তুমি আমাকে বাঁচাও, ফাহ্‌ড। তোমাকে কুড়ি মিলিয়ন ডলার দেব। একবার সবচেয়ে কাছের ইউরোপীয় উপনিবেশে পৌঁছলেই, কুড়ি মিলিয়ন পাবে।'

ফাহ্‌ড বলল, 'তাই কেউ দেয় নাকি? পৃথিবীতে অত টাকাই নেই!'

—'আছে, আছে। আমার ওর বিশগুণ আছে। আমাকে বাঁচাও।'

—'হয়তো সত্যি কথাই বলছ। বাঁচাতে পারব কি না জানি না, তবে চেষ্টা করব। না দিলে কিন্তু মেরে ফেলব।'

ওদিকে শেখ দুজন মুখ্য বন্দী-দাসকে ডেকে বলল, 'ঐ তাঁবুতে গিয়ে মৃতদেহটা যেমন আছে, সেইভাবে জোববায় জড়িয়ে ক্যাম্পের বাইরে নিয়ে গিয়ে গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে, তার মধ্যে ভালো করে পুঁতে ফেল।'

তারা একটা অগভীর গর্ত খুঁড়ে মৃতদেহটা পুঁতে এল। পরদিন ভোরে শেখ তার দলের পাণ্ডাদের ডেকে পাঠাল। তারা এলে দেখা গেল তাদের মধ্যে টলগ নেই। ফাহ্‌ড বলল, 'সম্ভবতঃ ভোরে উঠে শিকার করতে গেছে।'

শেখ সবাইকে বলল, 'এই নাজরানি তো টারজানকে মেরে ফেলেছে। এখন শাস্তিস্বরূপ একে না মারলে তো টারজানের দলের লোকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।'

সকলেরি সেই মত। খালি ফাহ্‌ড বলল, 'তা কর না। তাহলে টারজানের লোকরা ভাববে আমরাই ওদের দুজনকে খুন করেছি। তার চেয়ে ভালো হয় যদি এ লোকটার কাছ থেকে মোট মুক্তিপণ আদায় করা যায়। আর যদি তার আগে টারজানের লোকরা এসে পড়ে, তাদের হাতেই ওকে সঁপে দেওয়া যাবে।' আপাততঃ তাই স্থির করা হলো।

এবার শেখ আবার নিষিদ্ধ-উপত্যকায় ঢুকবার কথা ভাবতে বসল। শেষ পর্যন্ত দলবল নিয়ে বাটাণ্ডোর সঙ্গে দেখা করতে গেল। পথে দেখে হাজার হাজার গাল্লা যোদ্ধা তাঁবু ফেলেছে। বাটাণ্ডো তাকে ভদ্রভাবেই অভ্যর্থনা করল, কিন্তু এ-ও বলল, 'আগে গাল্লা বন্দীরা মুক্তি পাক, তার পর নিশ্চয় প্রবেশপথ দেখিয়ে দেব।'

শেখ বলল, 'ওদের এখনি ছেড়ে দিলে আমি যে বাহকের আর অনুচরের অভাবে অসুবিধায় পড়ব।'

সরদার বলল, 'তার আর আমি কি করতে পারি?'

'তবে ওরা এখানেই অপেক্ষা করুক।'

বাটাণ্ডো বলল, 'তোমার সঙ্গে কেউ কোথাও যাবে না।'

পরদিন সকালে ইব্‌ন জাড রওনা হলো। তাদের ঘিরে গাল্লা যোদ্ধারা পথ দেখিয়ে চলল। উলালাও তার দেশ-বাসীদের সঙ্গে সানন্দে চলল। স্টিম্বল দুজন প্রহরীর মাঝখানে হোঁচট খেতে খেতে চলল। সমাধি উপত্যকাকে ঘিরে আছে উঁচু পাহাড়ের দেয়াল। ওরা সেই দেয়াল চড়তে লাগল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় ওরা একটা ছোট পাহাড়ে নদীর ধারে তাঁবু ফেললে, বাটাণ্ডো পাশের খাড়া পাথরের দেয়ালে একটা ফাটল দেখিয়ে দিল। ঐখানে প্রবেশপথ। পরদিন ভোরে শেখ দেখল গাল্লারা সকলে রাতারাতি চলে গেছে। তখন ঐখানে মজবুত ক্যাম্প করে মেয়েদের আর ছোটদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, কয়েকজন বুড়োর আর ছোকরার হেপাজতে তাঁবু রেখে, যোদ্ধারা রওনা হয়ে গেল।

প্রতি বছর ঈস্টারের আগে ধার্মিক খৃশ্চানরা লেণ্ট পালন করেন। সে সময়ে নানা রকম সংযম পালনে ওঁদের দিন কাটে। লেণ্টের প্রথম রবিবার সমাধি-উপত্যকায় বছরের বৃহত্তম সামরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। সে বছর ঐ উৎসব হবে নিম্মরে। রাজা বোহান তার দুদিন আগেই সমাধি-নগর থেকে দলবল নিয়ে নিম্মরের দিকে শোভাযাত্রা করেছেন। যেমন চমৎকার ঘোড়া, তেমনি সুন্দর তাদের আর আরোহীদের সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র। বর্শার আগায় পর্যন্ত রঙীন পতাকা উড়ছে। এদের সকলের পিঠে লাল ক্রস লাগানো।

তার মানে সকলে জেরুসালেমে তীর্থ করে ফিরছে। সাজগোজেও নিম্মরের নাইটদের থেকে কিছু তফাৎ চোখে পড়ে।

দুই দলের মধ্যে প্রায় সাড়ে সাতশো বছরের শত্রুতা টুর্নামেন্টের ক-দিন বন্ধ থাকে। বন্ধুর মতো খেলা ও ব্যবহার করা হয়। তবে ন্যায্য খেলাতেও উভয় পক্ষেরি জনাকতকের মৃত্যু হতে বাধ্য। প্রতিযোগিতার পুরস্কারও কিঞ্চিত অদ্ভুত ও আদিম ভাবাপন্ন। বিজয়ী দল পরাজিতদের পাঁচজন কুমারী কন্যাকে লাভ করে। তাদের আর কখনো আত্মীয়-স্বজনরা দেখতে পায় না। বলা বাহুল্য, তাদের সঙ্গে সেখানে কখনো মন্দ ব্যবহারও করা হয় না। এই টুর্নামেন্ট ছাড়া দুই রাজ্যের মধ্যে কোনো আদান-প্রদান ছিল না। এই নিষ্ঠুর নিয়মের উদ্দেশ্যটা হয়তো ভালো। বংশে যদি মাঝে মাঝে বিদেশী রক্তের সংমিশ্রণ না হয়, খালি নিজেদের মধ্যেই বিয়ে করে করে ক্রমে বংশের রক্ত দুর্বল হয়ে যায়।

এ-সব বিয়ে যে অনেক সময় সুখের হয়, তার প্রমাণ হলো নিম্মর নগরেই সমাধি-নগরের বহু মেয়ে স্বামীর সঙ্গে সুখে ঘরকন্না করছে। এ বছরও যে পাঁচজন মেয়ে পুরস্কার-স্বরূপ নির্বাচিত হয়েছে, রূপে গুণে তারা অতুলনীয়। দামী গয়না পোষাকে সেজে তারাও ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত থাকবে।

নিম্মর-শহরের বাইরে সমতল জায়গায় খেলা হবে। বেশ কিছু দিন ধরে সে-জায়গাকে নিখুঁত ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। ব্লেকেরো মহা উৎসাহ। গোব্রেড তাকে খেলায় যোগ দিতে অনুমতি দিয়েছেন। দুটি প্রতিযোগিতায় সে যোগ দেবে। একটিতে দুই পক্ষের পাঁচজন করে নাইট তলোয়ার খেলবে। অন্যটিতে উভয় পক্ষ থেকে একজন মাত্র খেলবে। একেবারে শেষে গ্র্যাণ্ড ফাইনালেও সে খেলবে। তাতে একশো জন করে যোদ্ধা বর্শা নিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হবে। আজকাল গোব্রেড বলেন স্যার জেমসের তলোয়ার খেলা, তার বর্শা খেলার চেয়েও ঢের ভালো!

ব্লেকের এবং তার ঘোড়ার আগাগোড়া কালো সাজ। তার সঙ্গে নীল-রুপোলি নিশানের বাহার খুব খুলেছিল। তার বুকেও লাল ক্রস্, ঘোড়ার সাজেও তাই। এই অল্প সময়ে ও যে নিম্মরের নাইটদের আর মহিলাদের কাছে কত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, সেটা তাদের আগ্রহ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। খালি গুইনাল্ডার ব্যবহারে বোঝা গেল কোনো কারণেই সে ব্লেকের ওপর বিরক্ত হয়েছে। কারণটা একটু প্রকাশও করে ফেলল। কেউ তাকে বলেছে ব্লেক নাকি তার বিষয়ে কোনো অযোগ্য মন্তব্য করেছে। এ-কথা ব্লেক বেচারি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও, রাজকুমারী কতখানি বিশ্বাস করল, বোঝা গেল না। এইসময় রিচার্ড এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল। খেলা অরম্ভ হবে।

গোড়ায় কিছু অনিয়মের পর, সুষ্ঠু ভাবে শোভাযাত্রা করে গোব্রেড তাঁর অনুচরবর্গ নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। সবার আগে গোব্রেড, তারপর কিছু নাইট, তারপর মহিলারা, তারপর আরো নাইট, সবার শেষে অনুচররা। শতখানেক যোদ্ধা প্রাসাদের নিরাপত্তার জন্য রয়ে গেল। এদের পালা করে ডিউটি দিতে হবে। যাতে সকলে খেলাও দেখতে পায়।

বোহানের শোভাযাত্রাও একই সময়ে ক্রীড়াঙ্গনে পৌঁছল। নিম্মরের মহিলারা মিছিল থেকে বেরিয়ে সুসজ্জিত গ্যালারিতে বসল। উভয় পক্ষের পাঁচজন কুমারীকন্যা, রূপে আর সাজে চারদিক আলো করে আলাদা মঞ্চে আসন নিল। গোব্রেড আর বোহান প্রাঙ্গণের মধ্যিখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রাচীন প্রথা অনুসারে চ্যালেঞ্জ দেওয়া-নেওয়ার ক্রিয়া সারলেই, খেলা শুরু হয়ে গেল।

ঐ খেলায় সুন্দরী কুমারী ছাড়াও আরো নানা পুরস্কার ছিল, দামী দামী রত্ন, অলংকার, বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া। প্রত্যেক দিন খেলার আগে প্রতিদ্বন্দ্বীরা একজন নেতার সঙ্গে প্রাঙ্গণের চারদিকে প্রদক্ষিণ করার রীতি ছিল। প্রথম দিনই বোহানের চোখ পড়েছিল দর্শকদের মধ্যে উচ্চাসনে আসীনা রাজকুমারীর ওপরে। সকলেই সেটা লক্ষ্য করেছিল। অন্য দুই দিনও বোহানই নেতৃত্ব করল, অথচ সাধারণতঃ একেক দিন একেক জন গণ্যমান্য নেতা থাকে।

খেলার হারজিৎ কিছুই বলা যায় না। এখানেও গুণের দিক থেকে দুই দল সমান সমান হলেও, প্রথম দিন বোহানের খেলোয়াড়রা দু'শ সাতাশ পয়েন্ট পেল আর নিম্মরের নাইটরা পেল এক শ ছয়। দ্বিতীয় দিনে নিম্মর একটু উন্নতি করল। তাদের দুদিনের স্কোর দাঁড়াল দু'শ উনসত্তর আর সেপালকারের নাইটদের হল তিন শ সাতানব্বই। মনে হতে লাগল এবছর নিম্মর জয়ী হতে পারবে না। তৃতীয় দিন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল। তার আগে বলা উচিত যে রাজা বোহান ছিলেন যুবা বয়সী, দাম্ভিক আর উগ্রস্বভাব। প্রজাদের ওপর যথেষ্ট অত্যাচারও করতেন। কিন্তু সেদিন তিনি যা করে বসলেন, সেটা ক্ষমার বাইরে। গোব্রেডের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার একটা বক্তব্য ছিল, রাজকুমার। আমরা তো

একরকম এ বছর জয়ীই হয়ে গেছি। আমার একটা প্রস্তাব আছে, অনুমতি পেলে বলি।'

গোব্রেড বললেন, 'হার-জিতের কোনো নিশ্চয়তা নেই, বোহান। তবু প্রস্তাবটি শুনি।'

বোহান বলল, 'আমি বলছিলাম আমাদের পাঁচ কন্যা তো আমরা একরকম জিতেই গেছি। তার ওপর যদি রাজকুমারী গুইনাল্ডাকে আমার রানী রূপে দান করেন, তাহলে আমরাও টুর্নামেন্টের বিজয়ীর আসন ছেড়ে দেব।'

রাগে অপমানে রাজকুমারের মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমার এ প্রস্তাব শোনা যে কোনো আত্মসম্মানযুক্ত পুরুষের কানের অপমান। এখনি তোমার লাইনে ফিরে যাও। খেলার ফলাফল যা হবার হবে।'

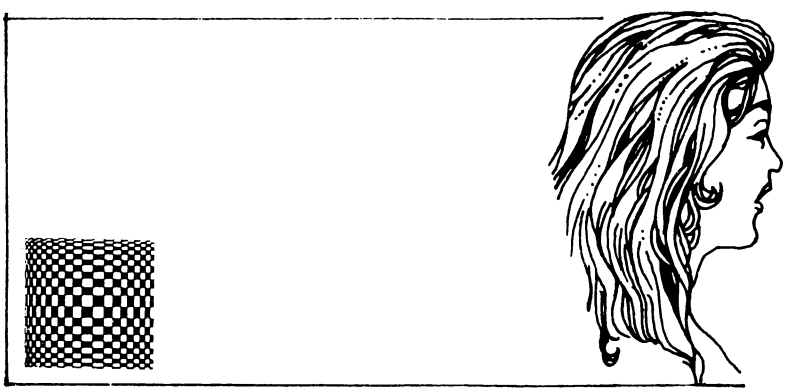

বোহান মহা রেগে বলল, 'বেশ! এই যদি আপনার উত্তর হয়, তাহলে ঐ পাঁচ কন্যাকে আমরা তো জিতে নেবই, আর রাজকুমারীকেও বাহুবলে ধরে নিয়ে যাব।' এই বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সে স্বস্থানে ফিরে গেল।

এই ব্যাপারে নিম্মরের নাইটদের আত্মসম্মান আর উৎসাহ তিনগুণ বেড়ে গেছিল। সকলে মন ঠিক করে ছিল তারা প্রাণপণে লড়বে। তার ওপর গত দুদিনের পরাজয়ের গ্লানিও মুছে ফেলতে হবে।

শেষ দিনের প্রথম ক্রীড়া ব্লেকের সঙ্গে বিপক্ষ দলের একজন নাইটের, ঢাল-তলোয়ারের প্রতিযোগিতা।

গোব্রেড তাকে বললেন, 'আজ তুমি নিম্মরের নাইটের উপযুক্ত আচরণ করে নিম্মরের সম্মান রক্ষা করবে। স্বয়ং যীশু তোমার সহায় হবেন, প্রিয় স্যার জেম্‌স্।'

ব্লেক এ কথার যোগ্য উত্তর দিল, 'আমার তলোয়ার আর প্রাণ আমি নিম্মরের সম্মানে আর আমার রাজকুমারীর রক্ষায় নিবেদন করলাম।'

মুখ দেখে মনে হলো এ উত্তরে গোব্রেড খুশি হলেন। রাজকুমারী নিজের পোষাক থেকে একটি রিবন খুলে স্যার জেম্‌সের বিজয় কামনা করলেন। রিবনটি কাঁধে পিন্ করে, ব্লেক ক্রীড়াঙ্গনে নেমে গেল।

ঢাল ফেলে দিয়ে ব্লেক খেলায় নামল। নিম্মরের দর্শকরা এ দৃশ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছিল। তারা আকাশ ফাটিয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

সেপালকারের দলের অনেকে অবাক হয়ে বলতে লাগল, 'কে এই কালো ঘোড়সোয়ার? আমাদের স্যার গাই যে ওকে খেলার শুরুতেই দুফালা করে চিরে ফেলবে!'

*

নিম্মরের দ্বিতীয় দিনের খেলা যখন শুরু হয়েছিল, সেই সময় একদল বাদামী রঙের যোদ্ধা, ছেঁড়া ময়লা জাব্বা-জোব্বা পরে আর লম্বা লম্বা সেকেলে বন্দুক হাতে নিয়ে উপত্যকার উত্তর দিকের পাহাড়ে চড়ে সমাধি-নগরের আর প্রাসাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। ওরা একটা প্রায় নিশ্চিহ্ন পথ ধরে উঠে এসেছিল। ওপর থেকে শেখ লক্ষ্য করল আরেকটা একটু ভালো পথ নিচে নেমে গেছে। তারপর উত্তরের ফটকও দেখা যাচ্ছে। এটি অনেকটা গোব্রেডের সুরক্ষিত ফটকেরি মতো। কিন্তু সুরক্ষিত বলা চলে না। একজন মাত্র বুড়ো নাইট আর কয়েকজন সৈনিক আল্‌গোছে প্রহরা দিচ্ছে।

ঝোপেঝাড়ে গা-ঢাকা দিয়ে শেখের দল নামতে শুরু করল। ওরা লক্ষ্য করল দুজন অদ্ভুত পোষাক পরা কালো মানুষও ফটকের কাছে খরগোশ শিকার করতে ব্যস্ত। বহু যুগ ধরে এরা এখানে নিরাপদে খরগোশ মেরেছে, কারণ বহু যুগ এ পথ দিয়ে জনমানুষ নেমে আসেনি। কালো মানুষ-গুলোর কিন্তু ধারণা যে তারা বুঝি ইংরেজ আর এ জায়গা ছেড়ে বেশি দূর এগোলে, স্যারাসেনরা তাদের মেরে ফেলবে।

শেখ দেখল গেট খোলা। বুড়ো নাইট আর কুঁড়ে রক্ষীদের এতটুকু কর্তব্যজ্ঞান ছিল না। বোহানের সঙ্গে অন্য নাইটরা নিম্মর গেছে, তাদের শাসন করতে কেউ নেই। বুড়ো বেলা করে প্রাতরাশ করছিল, সৈনিকরা তখনো শয্যাত্যাগ করেনি।

গেটের কয়েক গজ বাইরে দাঁড়িয়ে শেখ একটু অপেক্ষা করল, যাতে দলবল পৌঁছে যায়। তারা সকলে মিলে ভিতরে ঢুকে পড়লে পর স্যারাসেন সৈনিকদের টনক নড়ল। তারা তখন 'স্যারাসেনরা এসেছে! স্যারাসেনরা এসেছে।' বলে চ্যাঁচাতে

লাগল। বুড়ো নাইট আর খরগোশ শিকারীরা দৌড়ে এল।

রাজা বোহানের প্রাসাদ রক্ষা করবার জন্য যে ক'জন নাইট ছিল, তাদের কানেও একটা গণ্ডগোলের শব্দ গেল। তারা প্রাসাদের প্রবেশ-পথে জড়ো হয়ে, পরামর্শ করতে লাগল এবার কি করা যায়। বীরত্বে কেউ কম যায় না। তাদের মনে হলো ফটকের রক্ষীরা যদি বিপদে পড়ে থাকে, তাহলে তাদের সাহায্যে যাওয়া উচিত। মাত্র চারজন নাইটকে প্রাসাদ রক্ষার কাজে রেখে, বাকি সকলকে নিয়ে মার্শাল ফটকের দিকে ঘোড়া ছোটাল।

মাঝপথে শেখের দল ওদের লক্ষ্য করেছিল। তারা ফটকের রক্ষীদের অতি সহজে পরাস্ত করে, প্রাসাদ লুঠ করতে চলেছিল। দূর থেকে ওদের দেখে আরবরা ঝটপট পথের ধারের ঘন ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে পড়ল। মার্শাল তার লোকজন নিয়ে বড় ফটকের দিকে চলল আর ইব্‌ন জাডও নির্বিঘ্নে প্রাসাদ লুঠ করতে গেল।

প্রাসাদের রক্ষীরা গেটটাকে খুলেই রেখেছিল। যাতে মার্শালের দল সহজে ঢুকে পড়তে পারে। ওরা ঢুকলেই পশ্চাদ্ধাবনকারী স্যারাসেনদের মুখের ওপর গেট বন্ধ করতে হবে। ইব্‌ন জাড ঝোপের আড়াল থেকে সবই দেখতে পেল। মনে মনে একটা মৎলবও ফেঁদে ফেলল। তার পরামর্শে বাইরে থেকে গুলি করে ঐ চারটি দ্বাররক্ষীকে ধরাশরী করে ফেলা হলো।

ইব্‌ন জাড সদলবলে প্রাসাদের সামনে পৌঁছে দেখল সে-গেটও খোলা, ড্র ব্রিজ নামানো।

মার্শাল বাইরের ফটকে পৌঁছে দেখল বুড়ো নাইট থেকে আরম্ভ করে তার ছোকরা অনুচরের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। একজন সৈনিকের দেহে তখনো একটু প্রাণ ছিল। তার কাছে নির্মম সত্যকথা শুনে সে স্তম্ভিত হলো। মরণাপন্ন লোকটি বলল, 'তাদের দেখা পাননি? তারা তো ঘোড়া হাঁকিয়ে প্রাসাদের দিকে গেল।'

—'অনেকজন নাকি?'

—'না, সামান্য কয়েকজন। এরা বোধহয় সুলতানের সৈন্যের পূর্বগামীরা।'

এই সময়ে প্রাসাদের দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ শুনে মার্শালের চক্ষুস্থির! 'কি সর্বনাশ! আমি যে গেট খুলে রেখে এসেছি। আমিই সব নষ্টের কারণ! আমাকে মেরে ফেল স্যার মর্লি।'

মর্লি বলল, 'যীশুর জন্য প্রাণ দিও। এমনি মরবে কেন?'

—'তা বটে।'

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেল ওরা। এবার ফটক বন্ধ পেল। একটা দাড়িওয়ালা মুসলমান পাহারা দিচ্ছে। মার্শাল তার তীরন্দাজদের বলল, 'ওকে পেড়ে ফেল।'

ওরা ধনুক তুলবার আগেই গুলি খেয়ে একজনের প্রাণ গেল এবং বাকিরা ভাগল। এ-রকম যুদ্ধে তাদের অভ্যাস ছিল না।

কিন্তু মার্শাল স্যার বুলাণ্ড হলো সমাধির নাইট। সে ওদের যুদ্ধে ডাক দিল। ওরা ওর কথা বুঝল না। বৃথা কালক্ষেপ না করে গুলি করে বীরপুরুষটিকেও শুইয়ে দিল।

এদিকে প্রাসাদে ঢুকে শেখ ভাবল, এই তো সেই ধনরত্ন, যার কথা ফকির বলেছিল।

প্রাসাদের শিশুদের, মেয়েদের আর তাদের দু-চারজন রক্ষী যারা ছিল সকলকে ঘরে বন্ধ করে রেখে, ইচ্ছা মতো সাড়ে সাতশো বছর ধরে জমানো সোনা রুপো হীরে জহরত নিয়ে মস্ত বড় ছালায় ভরে, অভাবনীয় ঐশ্বর্যের মালিক হয়েও লোভ তার গেল না। চেয়ে দেখে দূরে আরেকটা প্রাসাদ। সেখানে হয়তো আরো বেশি ধন আছে। কাল সেখানে যেতে হবে। এই সঙ্কল্প করল শেখ।

*

ঐ সব মর্মান্তিক খবর কিন্তু তৃতীয় দিনেও নিম্মরে পৌঁছয়নি। সমাধি নগরের স্যার গাই নিম্মরের স্যার জেম্‌সের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখল প্রতিপক্ষের হাতে ঢাল নেই। তবে তাতে যদি নিম্মরের আপত্তি না থাকে, ওরি বা কি? ওদের নাইট্‌ই বুঝবে।

বুঝল কিন্তু নিজেই। ঠিক যে-ভাবে স্যার ম্যালুড পরাজিত হয়েছিল, এরো তাই হলো। স্যার জেমসের তলোয়ারের ওপর বৃথাই আঘাত করল, জেম্‌সকে ছুঁতে পারল না। তারপর ঢাল তুলে স্যার গাই নিজের মুখ মাথা রক্ষা করতে গেলে, স্যার জেম্‌সের তলোয়ার তার গলার বর্ম ভেদ করে, গলায় ফুটে গেল। স্যার গাই ঘোড়া থেকে পড়ে গেল।

গ্র্যাণ্ড টুর্নির নিয়মানুসারে কাউকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিলেই, ধরে নেওয়া হয় সেটা বিপক্ষ নিধনের সমান। তাই কাউকে মেরে ফেলা হয় না। বিজয়ী ঘোড়া হাঁকিয়ে বিজিতের দিক থেকে একবার ঘুরে আসে। হেরাল্ড তারপর তাকে পুরস্কার এনে দেয়।

ব্লেককে তলোয়ার হাতে ধরাশায়ী স্যার গাইয়ের কাছে এগোতে দেখে সমাধি-নগরীয়রা হাঁ-হাঁ করে দৌড়ে এল।

পাছে ওরা স্যার জেম্‌সকে মারে, সেই ভয়ে নিম্মরের সকলেও ছুটে এল। ব্লেক কিন্তু নিজের তলোয়ার ফেলে দিয়ে, ভূপতিত প্রতিপক্ষকে তুলে ধরেছিল। তার গলার বর্ম আর হেল্‌মেট খুলে ফেলে, গলা থেকে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করতে করতে বলছিল 'তাড়াতাড়ি একজন সার্জন আনো। রক্ত বন্ধ করা দরকার।'

রিচার্ড এসে বলল, 'স্যার গাইয়ের বন্ধুরাই তার ব্যবস্থা করবে। তুমি উঠে এসো।'

সমাধি-নগরের লোকরাও আশ্চর্য হয়ে গেছিল। তাদের একজন মার্শাল বলল, 'তুমি বাস্তবিকই মহাপ্রাণ। তোমার সাহসও আছে, তাই এত কালের পুরনো নিয়ম উপেক্ষা করতে পারলে।'

ব্লেক বলল, 'পুরনো নিয়মের আমি ধার ধারি না। আমাদের দেশে একটা কুকুরও যদি আঘাত পায়, আমরা তার রক্ত পড়া বন্ধ করার চেষ্টা করি। আর এ তো একজন বীরপুরুষ।'

ঐ প্রথম বিজয়লাভের পর ক্রমাগত অনেকগুলো পরীক্ষাতেই নিম্মরের জয় হলো। শেষ খেলা শুরু হবার সময় দেখা গেল নিম্মর পেয়েছে চার শ বাহান্ন পয়েন্ট, সামধি-নগর চার শ আটচল্লিশ পয়েন্ট।

এই শেষ খেলাটাই সব থেকে জমজমাট হয়। উভয় পক্ষের একশো জন করে নাইট দুদিকে দাঁড়ায়। শিঙার সংকেত পেলেই বর্শা হাতে পরস্পরের দিকে ধাবিত হয়। এই প্রতিযোগীরা সকলেই যুবক। তাদের ঘোড়াগুলোকেও বিশেষ যত্ন নিয়ে বাছা হয়েছিল। ওদের মধ্যে দু-চারজন বয়স্ক খেলোয়াড়-ও ছিল, কারণ ছেলে-ছোকরাদের মাথা সহজেই গরম হয়ে ওঠে। তখন তাদের ঠাণ্ডা করার দরকার হয়।

এই শেষ খেলাটাতে ব্লেকের খুব আগ্রহ ছিল না। তবু তাকে যখন লাইনের মাঝখানে স্থান দেওয়া হলো, সে-ও উৎসাহে অধীর হয়ে সংকেতের অপেক্ষা করছিল সে-রকম যুদ্ধ আজকাল আর দেখা যায় না। দু-পক্ষের বাছাই করা যোদ্ধার একমাত্র উদ্দেশ্য বিপক্ষ দলকে নিপাত করা। ক্ষেপে ক্ষেপে আক্রমণ চলে। মাঝে মাঝে লড়াই স্তিমিত হয়, ক্রীড়াঙ্গন থেকে আহতদের সরানো হয়, ভাঙ্গা অস্ত্র বদলে দেওয়া হয়। তারপর আবার প্রাণপণ শক্তি-পরীক্ষা। ব্লেকের অস্ত্র ভাঙলেও সে অপরাজিত। অস্ত্র বদলে সে আবার নামল। শেষে স্যার উইল্ড্রেড বলে একজন নাইটের সঙ্গে রেষারেষি হলো। পরে ব্লেক শুনেছিল উইল্ড্রেডের মতো বর্শা খেলোয়াড় এ উপত্যকায় আর ছিল না।

কিন্তু ব্লেকের আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিয়মের খেলার কাছে শেষ পর্যন্ত সে দাঁড়াতে পারল না। ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। ব্লেকও তক্ষুণি নেমে তাকে উঠতে সাহায্য করল। তার আচরণে উইল্ড্রেড মুগ্ধ, 'তোমার মতো নাইট দেখিনি আমি! স্যার গাইকেও এভাবে সাহায্য করেছিলে। এত উদারতা আমি ভাবতে পারি না।' বন্ধু ভাবে তারা যে-যার লাইনে ফিরে গেল।

যদিও এই খেলায় নিম্মর দুই পয়েন্টে হেরে ছিল, তবু মোটের ওপর সব নিয়ে তারা দুই পয়েন্টে জয়ী হলো। সব-সুদ্ধ জনা পাঁচেক লোক মরেছিল, কুড়ি জন আহত হয়েছিল। উভয় পক্ষের সমান সমান ক্ষতি।

খেলার শেষে নিম্মরের যে নাইটরা খেলায় যোগ দিয়েছিল, তারা মিছিল করে পুরস্কার আনতে চলল। এদিকে বোহান তার নাইটদের ডেকে এক জায়গায় সংগ্রহ করল। সবাই ভাবল এবার তারা রওনা হয়ে যাবে। এই সময়ে এক-জন সমাধি-নগরের নাইট, মাথায় নিম্মরের চিতাবাঘের চামড়ার শিরস্ত্রাণ পরে, গোব্রেডের গ্যালারির দিকে এগিয়ে গেল।

বোহান সব লক্ষ্য করছিল। নিম্মরের নাইটরা প্রাচীন রীতি অনুসারে পুরস্কার গ্রহণ করতে ব্যস্ত ছিল। বোহানের পিছনে তার দুজন অল্পবয়সী নাইট ঘোড়ার পিঠে বসেছিল। তাদের সঙ্গে আরেকটা আরোহী বিহীন ঘোড়াও ছিল।

হঠাৎ বোহান ঐ নাইটদের নিয়ে এমন ভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল, যাতে তারা গ্যালারির আর গোব্রেডের নাইটদের মাঝখানে একটা বাধা সৃষ্টি করে। তারা গ্যালারির কাছে পৌঁছল। একজন নাইট রাজকুমারীকে জাপ্টে ধরে তাদের দিকে ছুঁড়ে দিল। শূন্য ঘোড়া নিয়ে যারা ছিল, তারা তাকে লুফে নিয়ে অমনি প্রাণপণে ঘোড়া হাঁকিয়ে ক্রীড়াঙ্গন ছাড়িয়ে নিজেদের শিবিরের দিকে ছুটে গেল।

গোব্রেডের নাইটরা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার আগেই তারা রওনা হয়ে গেছিল। তখনি একটা সোরগোল পড়ে গেল নাগরিকরা কিছুই বুঝতে পারছিল না। গোব্রেড ঘোষণা করলেন, 'বোহান রাজকুমারীকে ধরে নিয়ে গেছে। নিম্মরের নাইটরা—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই একজন কালো ঘোড়ায় চড়া কালো পোষাক পরা অশ্বারোহী সমাধি-নগরের নাইটদের পিছনে বায়ুবেগে ছুটে চলল।

জায়েদের তাঁবুতে স্টিম্বল যাকে হত্যা করেছিল সে আসলে টলগ। টলগকে টারজান হাত-পা বেঁধে নিজের বিছানায় ফেলে রেখেছিল। সে জানত এই রকম একটা কিছু ঘটবে। তারপর টারজান আবার ব্লেকের খোঁজে চলেছিল।

টারজানের অদ্ভুত ঘ্রাণশক্তি তাকে ব্লেকের ক্ষীণ পায়ের গন্ধ ধরে বাজপড়ার জায়গাটাতে নিয়ে গেল। সেখান থেকে ব্লেক ঘন বনে ঢুকেছিল। তারপর গাল্লাদের দেশ। বনে জানোয়ারের ভয়, সেখানে বর্শার ভয়। দুদিন ধরে ব্লেকের চিহ্ন অনুসরণ করে টারজান একটা পাথর দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড ক্রস্ দেখতে পেল। নিজে ঝোপে-ঝাড়ে গা-ঢাকা দিয়ে শিকারী জানোয়ারদের মতো এগিয়ে যেতে লাগল। দ্বার-রক্ষীদের গলার স্বর তাদের দেখার আগে কানে গেল। এরা সেকেলে ইংরেজী ভাষায় কথা বলছিল, সেই রকম অস্ত্রশস্ত্রও হাতে ছিল। লোক দুটো কিন্তু কালো।

টারজান ভাবল খোলাখুলি গেলে হয়তো এরা ওকে মেরেই ফেলবে। তাই ঝোপের পিছন থেকে একজনের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্যজন একবার তাকিয়ে, দৌড়ে পালাল।

যাকে ধরেছিল সে মহা ছটফট করতে লাগল। টারজান বলল, 'চুপ কর। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না।'

লোকটা বলল, 'তুমি কেমন ধারা মানুষ?'

—'এমন মানুষ, যে সত্যি কথা শুনলে, তোমার অনিষ্ট করবে না।'

—'কি জানতে চাও?'

—'অনেক দিন আগে একজন সাদা মানুষ এ-পথে এসেছিল, সে কোথায়?'

—'তুমি কি স্যার জেম্‌সের কথা বলছ?'

—'তার নাম জেম্‌স্ ব্লেক। তাকে দেখেছ? কোথায় সে?'

—'সে এখন নিচের উপত্যকায় নিম্মরের সম্মান রক্ষার জন্য অস্ত্র-খেলায় লড়ছে। তুমি যদি তার ক্ষতি করতে চেষ্টা কর, তার হয়ে অনেকে লড়বে, বলে দিচ্ছি।'

—'না, আমি তার বন্ধু।'

—'তাহলে আমার ঘাড়ে লাফালে কেন?'

—'আমি তো তখন জানতাম না, ওর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছ।'

—'স্যার জেম্‌সের বন্ধুরাও নিম্মরের আদর পাবে।'

টারজান লোকটার হাত থেকে তার তলোয়ারটা নিয়ে বলল, 'এবার তোমার দলপতির কাছে আমাকে নিয়ে চল।'

—'তাহলে গেট অরক্ষিত থাকবে। একটু অপেক্ষা কর। আমার সঙ্গীটি এক্ষুণি ফিরে আসবে। সে-ই নিয়ে যাবে।'

একটু পরেই টারজান অবাক্ হয়ে দেখল বর্মপরা এক-জন শ্বেতাঙ্গ ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসছে। তার পিছনে জনা বারো অস্ত্রধারী অনুচর।'

টারজান বলল, 'ওদের থামতে বলে, জানিয়ে দাও আমি স্যার জেম্‌সের বন্ধু। ওদের সঙ্গে দূর থেকেই কথা বলতে চাই।'

দ্বার রক্ষী নবাগতকে ডেকে বলল, 'ওখানেই দাঁড়াও, ইনি স্যার জেম্‌সের বন্ধু। তোমরা বেশি কাছে এলে আমার তলোয়ার দিয়ে আমার গায়ে খোঁচাবেন। ওঁর সঙ্গে কথা বল। আমি টুর্নামেন্টের শেষ ফল না জেনে মরতে চাই না।'

তারা ঐখানেই দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি সত্যি তার বন্ধু?'

—'সত্যিই বন্ধু। অনেক দিন ধরে তাকে খুঁজছি।'

—'বিপদে পড়ে বুঝি পোষাক-পরিচ্ছদ হারিয়েছ?'

—'বনে গেলে আমি এই ভাবেই যাই।'

—'তুমিও কি স্যার জেম্‌সের দেশের একজন নাইট?'

—'আমি ইংরেজ।'

—'ইংরেজ। তাহলে নিম্মরে তুমি দ্বিগুণ আদর পাবে। আমিও স্যার জেম্‌সের বন্ধু। আমার নাম স্যার বার্ট্রাম।'

—'আমার নাম টারজান।'

—'তোমার পদ কি?'

পাঁচ সাত ভেবে টারজান বলল, 'ভাইকাউন্ট!'

—'তাহলে লর্ড টারজান, আপনাকে স্যার অভ্যর্থনা জানাই রাজকুমার গোব্রেড শুনে বড় খুশি হবেন।'

রক্ষীদের ঘরে টারজানকে বসিয়ে বার্ট্রাম একজন লোক পাঠিয়ে দিল উপযুক্ত কাপড়-চোপড় আনবার জন্য। তারপর তাকে ব্লেকের বিষয় সব কথা জানাল। কিছু পরেই পোষাক এসে গেল। মাপেও ঠিক হলো। টারজান চেনের বর্ম পরে বার্ট্রামের সঙ্গে নিম্মর নগরে পৌঁছল। তারপর ক্রীড়াঙ্গনের দিকে রওনা হলো।

ঠিক সেই সময় বোহান রাজকুমারীকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল। টারজান পৌঁছে দেখে চারদিকে হৈ চৈ গণ্ডগোল। মেয়েদের তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় তুলে, রক্ষী দিয়ে নিম্মরে পাঠানো হচ্ছে।

একজন নাইট ওদের সর্বনাশের কথা বলল। শুনে বার্ট্রাম চমকে ফিরে টারজানকে বলল, 'আমার সঙ্গে যাবে রাজকুমারীকে উদ্ধার করতে?'

আর কথা নয়, দুজনে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ওদের অনেক আগেই ব্লেক সমাধি-নগরের নাইটদের প্রায় ধরে ফেলেছিল। ওর সঙ্গে ঢাল বর্শা ছিল না। ছিল একটা তলোয়ার আর কোমরে ঝোলানো পিস্তল। এটা সর্বদা তার সঙ্গে থাকত। বন্ধুদের বলত ওটা আমার রক্ষা-কবচ। মনে মনে ভাবত নিতান্ত আতান্তরে না পড়লে ওটার দরকার হবে না। আজ মনে হলো হয়তো কাজে লাগতে পারে।

ততক্ষণে ব্লেকের সারা গায়ে ধুলোর আস্তরণ পড়ে ওকে ছাই রঙের পোষাক পরা মনে হচ্ছিল। ঘোড়াটাকেও ছাই রং দেখাচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো, এদের দলে আরো ছাই রঙের নাইট রয়েছে। তাদের মধ্যে ওকে আলাদা করে চেনা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারটাকে খাপে ভরে ও এগিয়ে গেল। কে একজন ওকে পার্সিভল বলে সম্বোধনও করেছিল।

ভিড় ঠেলে আরেকটু এগিয়ে ব্লেক দেখল একজন নাইটের সামনে ঘোড়ার পিঠে একটি মেয়ে বসে আছে। এবার তলোয়ার বের করে তার পিছনে দুজন নাইটের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাবার সময়, ব্লেকের তলোয়ারের কোপে দুপাশের দুজনেই গড়িয়ে পড়ল। তারপর আরেকটু এগিয়ে এক হাতে গুইনাল্ডাকে জড়িয়ে ধরে, অন্য হাতে তার সঙ্গীকে ধরাশায়ী করে, রাজকুমারীকে নিজের ঘোড়ায় টেনে নিল। তলোয়ারটাও খোয়া গেল। এই অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখে ব্লেকের দুপাশ থেকে দুজন নাইট চেপে এলো।

নিরুপায় হয়ে পিস্তল বের করে পর পর দুজনকেই গুলি করা ছাড়া উপায় রইল না। শব্দ শুনে কাছাকাছি সব ঘোড়া ক্ষেপে উঠল।

ব্লেকের ঘোড়াও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ব্লেকের ইচ্ছা ছিল সমাধির নাইটদের লাইনের সামনে দিয়ে ঘুরে নিম্মরের দিকে ফিরে যায়।

গোব্রেডের দলও নিশ্চয় কাছেপিঠেই পৌঁছে গেছে। তাহলে আর ভয় নেই।

দুঃখের বিষয়, সমাধির নাইটরা অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঁ দিক দিয়েও তারা ক্রমে কাছে এগিয়ে এসেছিল, তখন আরেকবার পিস্তল ছোঁড়া ছাড়া উপায় রইল না। চারপাশের সব ঘোড়া ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটল। নিজের ঘোড়াকে বাগ মানাতেও ব্লেকের যথেষ্ট কষ্ট হলো। যখন ঘোড়া আবার সংযত হলো, ওরা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে আর পাশেই দেখে একটা ঘন বন। সেখানে নিশ্চয় আশ্রয় পাওয়া যাবে।

বনে ঢুকে ব্লেক ঘোড়া থামিয়ে আস্তে আস্তে রাজকুমারীকে মাটিতে নামিয়ে দিল। তারপর ঘোড়াটার গা থেকে তার ভারি সাজসজ্জা, জিন, চেন, মুখের রিট খুলে, একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল।

ভোর বেলায় খেলা শুরু হয়েছিল, তখন থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত দুজনার কেউ এক দণ্ড বিশ্রাম পায়নি। দুজনেই একেবারে হয়রান হয়ে গেছিল।

ঘোড়ার সেবা শেষ করে ফিরে দেখে রাজকুমারী একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। গুইনাল্ডা বলল, 'তুমি মস্ত বড় বীর, স্যার নাইট। কিন্তু তবু চাষাড়ে!'

ব্লেক ম্লান হাসল। ক্লান্তিতে তার শরীর অবসন্ন। সে বলল, 'তোমাকে বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু আমার স্যার গ্যালাহ্যাডকে একটু না হাঁটালে ও ঠাণ্ডা হবে না। আমি বড় ক্লান্ত।'

শুনে রাজকুমারী স্তম্ভিত, 'বল কি! আমি রাজকুমারী হয়ে ঘোড়া হাঁটাব।'

—'আমি যে পারছি না। তোমাকেই করতে হবে।'

—'করতে হবে! হুকুম পাড়ছ?'

ব্লেক চটে গেল, 'ও-সব রাখো, মেয়ে। তোমার নিরাপত্তার জন্য আমি দায়ী। সব নির্ভর করছে এই ঘোড়ার ওপর। যা বলছি, শোন। ওকে আস্তে আস্তে হাঁটাও।'

রাগের চোটে রাজকুমারীর কান্না এসেছিল। কিন্তু ব্লেকের চোখের দিকে চেয়ে, আর কিছু না বলে, সে ঘোড়া হাঁটাতে লাগল। ব্লেক গাছে ঠেস দিয়ে বসে, শত্রুদের অপেক্ষা করতে লাগল।

তারা এলো না। কারণ নিম্মরের যোদ্ধারা তাদের ধরে ফেলেছিল। যুদ্ধের গতি এবার উত্তর দিকে ফিরে যাচ্ছিল।

আধ ঘণ্টা পরে ব্লেক উঠে পড়ে রাজকুমারীকে বলল, 'ওতেই হবে। এবার শুকনো ঘাস দিয়ে ওর গা শুকিয়ে দিচ্ছি, তাহলেই হবে।'

ঘোড়ার গা শুকনো হলে, ব্লেক রাজকুমারীর পাশে বসে ভাবতে লাগল, এত সুন্দর মেয়ে কি করে এত স্বার্থপর, অহংকারী আর নিষ্ঠুর হতে পারে?

হঠাৎ গুইনাণ্ডা বলল, 'বনে কিছু নড়ছে। এ জায়গাটা ভালো না। চল যাই।'

ব্লেক বলল, 'আরেকটু অন্ধকার হলেই নিরাপদে নিম্মরে

ফের যাবে। এখনো এরা হয়তো তোমাকে খুঁজছে।'

—'আরো অন্ধকার হলে? কি বলছ! এটা যে চিতা-বাঘের বন, তাও জান না? ক্যাম্প করে, তার চারদিকে ধুনি জ্বেলেও নিরাপদ হওয়া যায় না। প্রকাণ্ড বড় চিতাবাঘ সব।'

—'তাহলে চল।'

ঠিক সেই সময়ে কোনো অজানা কারণে ভয় পেয়ে মাথা তুলে, কান খাড়া করে, নাক ফুলিয়ে, দড়ি ছিঁড়ে ঘোড়াটা পালিয়ে গেল। পিস্তল বের করে ব্লেক বনের দিকে চেয়ে রইল, চিতাবাঘের চিহ্ন দেখতে পেল না।

*

টারজান আর বার্ট্রাম যখন নিম্মরের নাইটদের ধরে ফেলল, তার আগেই ব্লেক রাজকুমারীকে উদ্ধার করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। টারজানরা সমাধি-নগরের নাইটদের যে কজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তাদের সঙ্গে মর্মান্তিক যুদ্ধে মেতে উঠল। শেষে বার্ট্রাম একদিকে, টারজান অন্যদিকে শত্রুদের মোকাবিলা করতে লাগল।

নিজের নিয়মে লড়ছিল টারজান। যুদ্ধে বর্শা হারাল। এখন তলোয়ার নিয়ে লড়ছিল।

এই দুই দলের মধ্যে যেমন যুদ্ধের উন্মাদনা দেখল, তেমন আর কোথাও দেখেনি টারজান। এমন হিংস্র বেপরোয়া যোদ্ধাও দেখেনি। চারদিকে চেয়ে দেখল একজন মাত্র সমাধি-নগরের নাইট ছাড়া ধারে কাছে কেউ নেই। সেই যোদ্ধা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল লড়াই বেঁধে গেল। তার তলোয়ার একবার টারজানের ঢালে লেগে, ঘোড়ার মাথায় চোট লাগল। কিন্তু টারজানের তলোয়ার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। শত্রু মরে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল।

চারদিকে চেয়ে দেখল সে, কেউ কোথাও নেই। দূরে পুবে আর উত্তরে ধুলো উড়ছে, সেখানে লড়াই তখনো চলেছে। কিন্তু টারজান নিম্মরে গিয়ে ব্লেককে খুঁজে বের করতে চায়। ব্লেকেরো তো নিম্মরে ফেরা উচিত। চেনের বর্ম বড়ই ভারি, বড় গরম লাগে, বড় অস্বস্তিকর। এবার সে-সব খুলে রেখে, তার ওপর তলোয়ার রেখে, তার চিরকালের বন্ধু দড়িগাছা আর ছোরা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

শেখ ইব্‌ন জাড দূর থেকে যুদ্ধের ধুলো উড়তে দেখে, নিম্মরের দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। পাশে একটা বন দেখে, তার শীতল ছায়ায় একটু আশ্রয় নেওয়া বুদ্ধির কাজ হবে মনে হলো। আবদেল আজিজ বলল, 'সন্ধ্যা হলে এগোনোই ভালো।'

দূর থেকে ওরা দেখতে পেল একজন ঘোড়সোয়ার একটা বড় পোঁটলা না কি যেন নিয়ে বনে ঢুকল।

তা একটা লোক ঢুকলে আর কি এসে যায়। আবদেল আজিজ বলল, 'হয়তো দক্ষিণ দিকের শহরটাতে আরো বেশি ধনরত্ন আছে।'

শেখ বলল, 'সেই অপূর্ব সুন্দরীকে তো এই শহরটাতে দেখলাম না। ওটাতে থাকতে পারে।'

ফাহ্‌ড বলল, 'সুন্দরী মেয়ে এখানেও ছিল।'

শেখ বলল, 'যার কথা শুনেছি সে স্বর্গের হুরীদের চেয়েও সুন্দরী।'

সন্ধ্যার অল্প আগে খুব সন্তর্পণে ওরা এগোতে লাগল। মাইলখানেক যাবার পর গলার আওয়াজ শুনে, শেখ একজন লোককে দেখতে পাঠাল। সে ফিরে এসে বলল, 'শেখ, আর এগোবার দরকার নেই। হুরী এইখানেই আছে।'

চুপিসারে এগিয়ে শেখ তার সঙ্গীদের নিয়ে একটু ঘোরা-পথে গিয়ে, পশ্চিম দিক থেকে ব্লেক আর গুইনাল্ডার কাছে এলো। ঘোড়াটা পালালে, শেখ বুঝল তারা আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না। ফাহ্‌ডকে বলল, 'তুমি তো নাজরানিদের কি একটা ভাষা জান। সেই ভাষায় একে বল আমরা বন্ধু-লোক, পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

ফাহ্‌ডের তো গুইনাল্ডার রূপ দেখে মনে হলো এমন রূপসী মেয়ে স্বপ্নরাজ্যেও হয় না। সে ডেকে ব্লেককে ফ্রেঞ্চে বলল, 'মেরো না। আমরা বন্ধু লোক। পথ হারিয়েছি।'

ফ্রেঞ্চ শুনে অবাক হয়ে, ব্লেক বলল, 'কে তোমরা?'

—'আমরা মরুভূমির লোক, গরীব মানুষ। আমাদের পথ খুঁজে দিলে আল্লা আশীর্বাদ করবেন।'

—'বেরিয়ে এসো তো, তোমাদের দেখি। বন্ধু হলে, ভয় নেই। আমার যথেষ্ট ঝামেলা গেছে।'

ওদের দেখেই রাজকুমারীর কি ভয়, 'স্যারাসেন ওরা।'

—'তা হলেও ওরা আমাদের কিছু বলবে না।'

—'ক্রুসেডার দেখেও কিছু বলবে না?'

—'ক্রুসেডার কাকে বলে, এরা তাই জানে না।'

—'কি বিশ্রী করে তাকাচ্ছে দেখ। ভালো লাগছে না।'

—'আমারো না। দেখাই যাক।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। চারজন বলিষ্ঠ আরব ব্লেকের ওপর লাফিয়ে পড়ে তার হাত-পা বেঁধে ফেলল। দু-একজন ওর গলা চিরে দেবার কথাও বলেছিল!

শেখ বলল, 'না, এ জায়গা ওর বন্ধুবান্ধবে ভরা। যুদ্ধের গতি কিছুই বলা যায় না। এক দিন হয়তো আমরা কেউ ওর বন্ধুদের হাতে পড়তে পারি, একে বাঁচতে দিলে তখন তার সুফল পাব।'

ব্লেক অনেক কাকুতি-মিনতি, রাগারাগি করল রাজকুমারীকে যেন মুক্তি দেয়, ওর যা হয় হোক। কিন্তু ফাহ্‌ড তাতে হেসে উঠল।

হঠাৎ ওদের হাত ছাড়িয়ে গুইনাল্ডা ছুটে এসে দু-হাত ছড়িয়ে ব্লেকের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'খৃশ্চান মারতে হয় তো আমাকে মারো, ওকে মেরো না।'

ব্লেক বলল, 'ওরা তোমার কথা বুঝতে পারছে না, গুইনাল্ডা।'

—'না, না, তোমাকে কেউ মারতে পারবে না। কত নিষ্ঠুর কথা বলেছি তোমাকে আর তুমি আমার জন্য মরতে যাচ্ছ! আমাকে ক্ষমা কর।'

ব্লেক মুখ ফুটে বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, গুইনাল্ডা!'

গুইনাল্ডাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল ওরা। যাবার আগে সে বলে গেল, 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি জেম্‌স।'

সেখান থেকে কিছু দূরে গিয়ে ইবন্‌ জাড আবদেল আজিজকে বলল, 'আমি ধনরত্ন আর মেয়েটিকে নিয়ে উত্তর দিকে চললাম। তুমি অন্য শহরটাতে কি পাও দেখ। বেশি সৈন্য থাকলে লুঠপাটের চেষ্টা না করেই চলে এসো।' তারপর দুজন দুদিকে চলে গেল।

ব্লেক হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গাছতলায় পড়ে রইল। কিছুক্ষণ বাঁধন খুলবার বৃথা চেষ্টা করল। তারপর চুপচাপ পড়ে রইল। চাঁদ উঠল। বনভূমির গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল। ভারি থাবার শব্দ কানে এলো। চিতা-বনের চিতাবাঘ আসছে।

ব্লেক চিতাবাঘের জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। দাঁত খিঁচিয়ে, গুঁড়ি মেরে, চিতাটা এগোতে লাগল। ক্রমে আরো কাছে এসে গেল সে, ল্যাজটা এ-পাশ ও-পাশ করছিল। হঠাৎ লাফ দিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! লাফটা শূন্যেই থেমে গেল। চিতাবাঘটাকে কে টেনে ওপরে তুলে নিল! এর আগেও একটা ছায়ামূর্তি দেখেছিল ব্লেক, আবার দেখল। সে চিতাবাঘকে ওপরে টেনে নিয়ে, তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিল। তারপর মরা চিতাটাকে ধুপ করে নিচে ফেলে, নিজেও নেমে এলো।

ব্লেক নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আনন্দের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'টারজান!'

টারজান বলল, 'ব্লেক, সময় মতো এসে পড়েছি বল।' টারজান ওর বাঁধন কেটে দিল।

—'তুমি আমাকে খুঁজছিলে?'

—'যখনি শুনলাম সাফারি থেকে আলাদা হয়েছ, তখন থেকেই খুঁজছি। কে তোমার এ অবস্থা করল?'

—'এক দল আরব।'

—'ইবন্‌ জাড বদমায়েসটা এখানেও এসেছে?

—'আমার সঙ্গে একজন মেয়ে ছিল। তাকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি জানি তাকে বাঁচাবার কথা তোমাকে আর বলতে হবে না।'

—'কোন দিকে গেছে তারা?'

ব্লেক দক্ষিণ দিকে দেখিয়ে দিল।

—'কখন গেছে?'

—'ঘণ্টাখানেক হলো।'

—'বর্মটা ছাড়লে আরাম পাবে।'

টারজানের সাহায্যে বর্ম ছাড়ল ব্লেক।

যেখানে শেখ উত্তর দিকে আর আবদেল আজিজ উল্টো দিকে গেছিল, তার আগে পর্যন্ত রাজকুমারীর পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছিল, তারপর আর কিছু নেই।

টারজান বলল, 'আমার মনে হয় মেয়েটিকে নিয়ে শেখ উত্তর দিকে তার ক্যাম্পে গেছে আর দলের কিছু লোককে নিম্মরে পাঠিয়েছে হয়তো মুক্তিপণের কথা বলতে। তাদের সঙ্গে নিশ্চয় রাজকুমারী নেই। তুমি বরং উত্তরে এগোও। আমি নিম্মর ঘুরে খবর নিয়ে, উত্তরে আসব। তুমি কিন্তু ওদের দলে তাকে দেখলেও একা কিছু করতে যেও না। ফিরে এসো, দুজনে গিয়ে যা হয় করব।' এর পর দুজনে দুদিকে এগিয়ে চলল।

*

সারা রাত ইবন্‌ জাড্‌ দলবল নিয়ে উত্তরে চলল। রাজকুমারী এক পা ও হাঁটতে রাজি নয় বলে, শেখকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হলো। সে যত তাড়াতাড়ি পারে লুঠের মাল আর বন্দিনীকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। তার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ প্রাসাদের যোদ্ধারা ফিরে এসে ব্যাপার দেখে নিশ্চয়ই তার পিছু নেবে। শহরের প্রবেশপথ এড়িয়ে, পাহাড় বেয়ে উপত্যকার বাইরে আসা স্থির করেছিল সে। সে পথ বড় কঠিন, কিন্তু গরজ বড় বালাই। লোভের চোটে

সে অসাধ্যকেও সাধন করে ফেলে এক সময় ওরা প্রাসাদ, ফটক, রক্ষীদল, সব এড়িয়ে ওপরের পথে এসে উঠল। সেখান থেকে ক্যাম্পের দিকে!

সমাধি-নগরের রক্ষীরা কিন্তু ওদের দেখতে পেয়ে, পিছু নিয়েছিল। তাদের দলপতি গুইনাল্ডাকে দেখে চিনতেও পেরেছিল। কিন্তু একটা আরবের গুলিতে তার ঘোড়া ধরাশায়ী হলো, আরোহী ঘোড়ার তলায় চাপা পড়ল। ততক্ষণে শেখের দল অনেকটা এগিয়ে গেছে। বিকেলে ওরা যখন শেখের ক্যাম্পে পৌঁছল, অনুচররা সব ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল। কিন্তু শেখের ঘাড়ে তখন ভূত চেপেছিল। মাত্র এক ঘণ্টা ঘুমোবার পর সকলকে তুলে আবার রহল্লায় বেরোবার হুকুম দিল। তার বড় ভয় এত ধনরত্ন আর সুন্দরী মেয়েটা বুঝি শেষ মুহূর্তে হাতছাড়া হয়ে যায়। মরুভূমিতে না পৌঁছনো অবধি সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। লুঠের মাল ভাগ করে অনেকগুলি বিশ্বাসী বাহকের ঘাড়ে চাপিয়ে রওনা হলো তারা।

ফাহ্‌ড বন্দিনীর ভার নিয়েছিল। স্টিম্বল এতকাল ধন-রত্ন আর সুন্দরী মেয়ের গল্প শুনে মনে মনে হাসত। সত্যি সত্যি ঐ সব নিয়ে শেখকে ফিরতে দেখে সে স্তম্ভিত! স্টিম্বল ফাহ্‌ডের সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খেতে খেতে চলেছিল। ফাহ্‌ড তার কাছ থেকে মুক্তিপণ আশা করে, সে ওর কোনো বিপদ হতে দেবে না, এটা সে জানত। দুরাচার ফাহ্‌ড স্বপ্ন দেখছিল এই সুন্দরী বিবিকে আর স্টিম্বলের টাকা নিয়ে তার বাকী জীবনটা কি সুখেই না কাটাবে। অবিশ্যি শেখের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

সমাধি-পর্বতের তলা দিয়ে পুব দিকে ঘুরে বাটাণ্ডোর দেশ এড়িয়ে চলেছিল শেখ। পুবে যেখানে পাহাড় শেষ হয়ে গেছে, সেখানে পৌঁছে খানিকটা দক্ষিণে ঘুরে, টারজানের এলাকা এড়িয়ে পশ্চিমে ফিরে, নিজের পথ ধরবে। টারজান মরে গেলেও, ওর ওয়াজিরিদের বড় ভয় করত শেখ।

বেশ রাত করে সেদিন ক্যাম্প করা হয়েছিল। মিট-মিটে আলোয় তাড়াতাড়ি করে রাতের রান্নাবান্না হলো। সেই মিটমিটে আলোতে আতেজা হঠাৎ লক্ষ্য করল শেখের খাবারের বাটিতে ফাহ্‌ড কি যেন মিশিয়ে দিচ্ছে। বাটির দিকে যেই শেখ হাত বাড়িছে, আতেজা ঝট করে বাটিটা উল্টে ফেলে দিল। ফাহ্‌ড আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না। বন্দুকটা তুলে সবার অলক্ষ্যে সোজা মেয়েদের তাঁবুতে গিয়ে গুইনাল্ডার হাত ধরে টানতে টানতে তাঁবুর পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে আতেজার কথা শুনে শেখ মহা চ্যাঁচামেচি লাগিয়েছিল। আতেজা যখন বলল সে নিজের চোখে ফাহ্‌ডকে ঐ খাবারে কিছু মেশাতে দেখেছে, সম্ভবত বিষ; শেখ ক্ষেপে গেল, 'ওকে ধরে বেঁধে এখানে নিয়ে এসো।'

হিরফার কাছে শোনা গেল ফাহ্‌ড খৃশ্চান মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। তার তাঁবুতে লোকজন ছুটে গেলে গুলি ছুঁড়ে সে ওদের ঠেকাল। তারপর স্টিম্বলকে ডেকে নিয়ে মেয়েটিকে সুদ্ধ নিঃশব্দে তাঁবুর পিছন দিক দিয়ে পশ্চিম দিকে ছুটল।

সন্ধ্যার সময় ব্রেক শেখের দলের স্পষ্ট চিহ্ন দেখে সমাধি উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাবার পথের ওপর দাঁড়াল। ওর ডানে কয়েক শো গজ দূরে বোহানের দ্বার-রক্ষীদের মিনার। চারদিক থেকে ওকে যে রাজা বোহানের লোকরা ঘিরে ফেলেছিল, সে খেয়াল ওর ছিল না। কাজেই জনা বারো মিলে যখন ওকে বন্দী করে ফেলল, সারাদিন খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, তার ওপর নিরস্ত্র অবস্থায় ওর কিছু করবার রইল না।

ওকে যখন রাজা বোহানের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো, সে পাপিষ্ঠ ওকে দেখেই চিনতে পারল—এই তো সেই কালো নাইট যে ওর সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছিল! রাজার হুকুমে তাকে একটা ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে চেন করে তালা দিয়ে রাখা হল। সেখানে ঐ রকম চেনে বাঁধা দুজন কংকালসার মানুষ আর একটা কংকাল ঝুলছিল। হতাশায় তার মন ভরে গেল।

এদিকে টারজান নিম্মরের পথে এগিয়ে আবদেল-আজিজের দলটিকে পর্যবেক্ষণ করে যখন দেখল তাদের সঙ্গে গুইনাল্ডা নেই, তখন সে শেখের পিছু নিল। চিতাবনে একটা

বুনো শূওর মেরে খিদে মিটিয়ে, একটা উঁচু গাছের ডালে শুয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঘুম দিল।

কিছুক্ষণ আগেই ব্লেকের চিহ্নগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছিল। কিন্তু শেখের ক্যাম্প থেকে যারা রওনা হয়েছিল তাদের মধ্যে রাজকুমারীর পায়ের ছাপ কেন দেখা যাচ্ছিল না, সেটা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না।

তবু শেখের দলের পিছনেই চলল টারজান। দল থেকে তিনজন যে খসে পড়ে পশ্চিম দিকে গেছে তা লক্ষ্য করল না।

টারজান যেমন শেখের পিছু নিয়েছিল, একশো বলিষ্ঠ ওয়াজিরির সঙ্গে জায়েদও সেই গোল পাথরের মাঝখানের জলাধার থেকে উত্তরমুখো চলেছিল।

এদিকে টারজান শেখের দলকে ধরে ফেলল। গাছে গাছে চলা তার। দেখতে পেল পাঁচজন বাহক ধন-রত্ন বয়ে নিয়ে গেলেও, চেষ্টা করলে একজন লোকই বইতে পারত। কেউ বড় একটা কথা বলছিল না। সকলেই ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন, ভার বইতে অনভ্যস্ত। হঠাৎ কোথা থেকে একটা তীর এসে শেখের পাশে যে আরবটা হাঁটছিল, তার গলায় বিঁধল। সে পড়ে গেল। মুহূর্তে সব চুপ। তারপর মৃতদেহটাকে ফেলে বাকিরা এগিয়ে চলল।

হঠাৎ একটা ফোঁপরা গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'প্রত্যেকটা রত্নের বদলে এক ফোঁটা রক্ত!'

এই অভিশপ্ত বন ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি পারে ওরা এগোতে লাগল। বনে নিশ্চয় আফ্রিৎ আছে। কিন্তু বন কিছুতেই শেষ হয় না। শেষটা সূর্যাস্তের একটু আগে বনেই ক্যাম্প করা হলো। আগুন জ্বলল, রান্না চড়ল। নিজের তাঁবুতে পাঁচ থলি ধন-রত্ন নিয়ে শেখ বসে, একটা থলি খুলে রত্নগুলো হাতড়াতে লাগল। এমন সময় ধুপ করে কি একটা বাইরে পড়ে, গড়িয়ে ভিতরে এলো। শিউরে উঠে সবাই দেখল—সেই মৃত আরবের কাটা মুণ্ডু!

আবার সেই ফোঁপরা শব্দ 'প্রত্যেকটা রত্নের বদলে এক ফোঁটা রক্ত!'

ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল শেখ। বন্দুক নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসল সকলে। এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতে জিন্-তাড়ানো কবচ!

মেয়েদের অন্ধকার ঘরে আতেজা চুপ করে শুয়েছিল। নিঃশব্দে সেখানে কে ঢুকে ওর মুখ চেপে ধরে কানে কানে বলল, 'চেঁচিও না। আমি জায়েদের বন্ধু। সেই বন্দী মেয়ে কোথায়?'

—'কাল রাতে ফাহ্‌ড তাকে নিয়ে মঞ্জিল থেকে পালিয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে যে এসেছিল সে চলে গেল। একটু পরে হিরফা সেই ঘরে ঢুকে দেখল আতেজা অচেতন হয়ে পড়ে আছে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে ব্লেক কুঠরিটার মেঝেতে বসেছিল। সঙ্গীদের একজন কথা বলে না, অন্যজন উন্মাদ হয়ে গেছে। বাইরে একটু শব্দ হলো। পায়ের আওয়াজ ক্রমে কাছে এলো। একটা সরল কাঠের মশাল নিয়ে কেউ কুঠরিতে এলো। ব্লেকের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তারপর দেখল সামনে দুজন নাইট দাঁড়িয়ে। একজন বলল, 'হ্যাঁ, এই তো সে।'

অন্যজন বলল, 'স্যার কালো নাইট, আমাদের চিনতে পারছ না?'

ভালো করে দেখল ব্লেক। একজনের গলায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখে ব্লেকের মুখে হাসি ফুটল। সে বলল, 'এবার বোধ হয় আমার পাওনা মিটল!'

—'পাওনা মিটল? ও আবার কেমন কথা? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি। রাজা যাতে তার জঘন্য ইচ্ছা পালন করে সমাধি-নগরের নাইটদের মুখে চুনকালি দিতে না পারে। যেই স্যার গাই আর আমি শুনলাম যে তোমার মতো বীর যোদ্ধাকে রাজা পুড়িয়ে মারতে চায়, আমরা ঠিক করলাম এত বড় অবিচার ঘটতে দেব না।'

এই বলে উঁকো দিয়ে তারা ওর পায়ের বেড়ি কাটতে আরম্ভ করে দিল।

স্যার গাই বলল, 'একটা কথা বল, তুমি রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে, অথচ পরে তাকে স্যারাসেনরা নিয়ে গেল কি করে?'

তখন ব্লেক তাদের সব কথা বিস্তারিত ভাবে বলল, বেড়ি কাটাও ততক্ষণে শেষ। ব্লেক বলল, 'আমার জন্য তোমরা বিপদে পড়বে না তো?'

—'কেউ জানতে পারবে না। জানতে পারলেও তোমার মতো বীরের জন্য এ-কাজ আমরা করতাম। স্যার গাই আজ রাতে বাইরের ফটকের রক্ষীদের নেতৃত্ব করছে। ঐ পর্যন্ত তোমাকে নিয়ে গেলে, তুমি পাহাড় বেয়ে নিম্নরেও নেমে যেতে পারবে, কিম্বা যেদিকে চাও।'

তাই হলো শেষ পর্যন্ত। ব্লেক অবশ্য নিম্নরে না গিয়ে পাহাড়ের ওপারে যাবে শুনে ওরা ওকে ঘোড়া, বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র

সব এনে দিল। সেই সব পরে বীরদর্পে ব্লেক বেরিয়ে এলো।

ঐ বনের মধ্যে টয়াটের বনমানুষের দল চরে বেড়াচ্ছিল। মোটা মোটা পোকামাকড় যথেষ্ট ছিল। ওদের দিকে তিন-জন শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষ হেঁটে আসছিল, ফাহ্‌ড, রাজকুমারী, স্টিম্বল। এদিক থেকে বাতাস বইছিল তাই বনমানুষরা ওদের গন্ধ পায়নি। ক্লান্তিতে, খিদেয় ওরা কাতর। হঠাৎ ফাহ্‌ড সামনে একটা মোটাসোটা বনমানুষের ছানা দেখে তার দিকে গুলি ছুঁড়ল। ভীষণ আওয়াজ শুনে সকলে তটস্থ। যদিও তার গায়ে গুলি লাগেনি, একটু ঘষে গেছিল, তবু বালুটা ভয়ে বেদনায় চ্যাঁচাতে লাগল। অমনি গোদারা ছুটে এলো। একে সাজা দিতে হবে।

তাদের দেখেই ফাহ্‌ড আর স্টিম্বল মাংস খাবার আশা ছেড়ে হাওয়া হয়ে গেল। যাবার তাড়ায় ফাহ্‌ড গুইনাল্ডাকে এমনি ধাক্কা দিয়ে গেল যে সে বেচারা পড়েই গেল। সামনের গোদাটা ওকেই ধরে টুঁটি কামড়ায় আর কি। টয়াট বাধা দিল। মেয়েটাকে তার ভারি পছন্দ।

টয়াট বলল, 'এটা আমার।'

গোইয়াদ-ই বা ছাড়বে কেন? 'না, ওটা আমার!' এই বলে ছুটে এলো।

গুইনাল্ডাকে তুলে নিয়ে টয়াট দৌড়ল। গোইয়াদ রাজার প্রতি কর্তব্য ভুলে, এমনি তাড়া করল যে মেয়েটাকে নামিয়ে দিয়ে, টয়াট লড়াই দিতে বাধ্য হলো। গুইনাল্ডাও আর সইতে না পেরে শুয়ে পড়ল। ওর গায়ে একটু জোর থাকলে, এই সময় পালাতে পারত। কিন্তু শরীরে এতটুকু শক্তি ছিল না। টয়াট আর গোইয়াদ সব ভুলে লড়াই করবার আগে খুব তড়পাচ্ছিল। এমন সময় একটা কালো-চুল, সোনালি গা সিংহ এসে উপস্থিত। তাকে দেখামাত্র টয়াট পালাল। গোইয়াদ সিংহটাকে দেখতে পায়নি। সে ফুর্তির চোটে খানিকটা নেচেকুঁদে যেই না গুইনাল্ডার দিকে ফিরেছে, অমনি সিংহটাকে দেখতে পেয়ে, প্রথমে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। তারপর পিছন ফিরে দে দৌড়!

সিংহটা গুইনাল্ডার কাছে এলো। সে চোখ বন্ধ করল। সিংহটা কাছে এসে তাকে শুঁকতেই গুইনাল্ডা অজ্ঞান হয়ে গেল।

*

ইব্‌ন জাডের রহল্লার মাজা ভেঙে গেছিল। কোনোমতে তারা ঐ জিন্‌-উপদ্রুত বন ছেড়ে চলে যেতে পারলে বাঁচে। আবদেল আজিজ নিম্মর দেখে ফিরে আসেনি। তার কারণ নিম্মর পৌঁছবার অনেক আগেই গোব্রেডের নাইটরা ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে গিয়েছিল আর সেইখানেই দুই পক্ষে বিষম লড়াই হয়েছিল। সাত শো বছর পরে ঐ অঞ্চলে আবার ক্রুসেডারে মুসলমানে যুদ্ধ হলো।

উত্তর দিক থেকে বর্মপরা একজন নাইট বর্শায় নীল-রুপোলি পতাকা উড়িয়ে গাল্লাদেশের বনের ভিতর দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে এলো। তার ঘোড়ার সাজে সোনা-রুপোর কারু-কার্য। সে-সব আসলে সমাধি-নগরের নাইট উইলড্রেডের দান। কিন্তু গালা যোদ্ধারা দূর থেকে ঐ মূর্তি দেখে, ভয়ে চম্পট দিল।

এদিকে টারজান ফাহ্‌ড, স্টিম্বল আর গুইনাল্ডার পায়ের চিহ্ন দেখে দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছিল। আর উত্তর দিকে এগোচ্ছিল একশো কালো দৈত্যাকার যোদ্ধা। তারা টারজানের বিখ্যাত ওয়াজিরির দল, তাদের সঙ্গে জায়েদও ছিল। একদিন সে মাটিতে আতেজার ছোট ছোট পায়ের সেই চেনা ছাপ দেখে আকুল হয়ে ওয়াজিরিদের অনুরোধ করল, যেন একটু ঘুরে তাকে উদ্ধার করতে সাহায্য করে।

ওরা কি করবে ভাবছে, এমন সময় বন থেকে ফাহ্‌ড আর স্টিম্বল বেরিয়ে এলো।

—'আতেজা কোথায়?'

—'তা কি করে বলব। অনেক দিন তাকে দেখিনি।'

জায়েদ বলল, 'মিথ্যা কথা। তোমাদের সঙ্গে ওর পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। কোথায় সে?'

—'নিতান্তই যখন না শুনে ছাড়বে না, তাহলে বলতেই হলো সে মরে গেছে।'

—'মরে গেছে!' শুনে বুক ভেঙে গেল জায়েদের।

—'আমি তাকে শেখের ক্যাম্প থেকে নিয়ে এসেছিলাম। বনমানুষরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। এত দিন কি আর বেঁচে আছে সে!'

আর কোনো কথা বলল না জায়েদ।

ফাহ্‌ড বড় বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। রাগে দুঃখে ক্ষেপে উঠে ছোরা বের করে জায়েদ নিষ্ঠুর মিথ্যাবাদী ফাহ্‌ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক নিমেষে তার বুকে বসিয়ে দিয়ে তার কুকর্ম চিরকালের মতো বন্ধ করে দিল। তারপর নিষ্প্রভ চোখে, নিরাশায় ভরা বুকে ওয়াজিরিদের সঙ্গে উত্তর দিকে চলল। ওদের এক মাইল পিছনে ভগ্নস্বাস্থ্য বুড়ো স্টিম্বল হোঁচট খেতে খেতে এগোতে লাগল। তারপর একবার পড়ে, অবসন্নের মতো পড়েই রইল।

টারজান ওদের তিনজনকে খুঁজছিল। এ সব জায়গা তার চেনা, তাই মাঝে মাঝে পথ ছেড়ে শর্টকাটের সাহায্য নিচ্ছিল। তার ফলে যেখানে ফাহ্‌ডের সঙ্গে জায়েদের দেখা হয়েছিল, সে জায়গাটা ছাড়িয়ে চলে গেছিল। সে চলেছিল বনমানুষদের খোঁজে। তাদের বিচরণভূমিতে গিয়ে দেখে টয়াট গোইয়াদ ইত্যাদি নিশ্চিন্তে পোকামাকড় খুঁজছে। দলে মোয়ালাটও ছিল।

টারজান বলল, 'মেয়েটাকে দেখেছ?'

মোয়ালাট টয়াটকে দেখিয়ে দিল। টারজান তাকে বলল, 'কোথায় সে?'

সে সংক্ষেপে বলল, 'নুমা?'

—'কোথায়?'

টয়াট সে দিকটা দেখিয়ে দিল।

টারজানের মন হতাশায় ভরে গেল। অন্ততঃ দেহাবশেষটুকুকে ভালো করে সমাধি তো দিতে পারবে। এদিকে গুইনাল্ডার জ্ঞান ফিরলেই বুঝতে পারে একটা জানোয়ার ওর গা ঘেঁষে শুয়ে আছে। ওর দিকে পিঠ ফিরে, মুখ তুলে সে কি দেখছে। কালো কেশর গুইনাল্ডার মুখের কাছে। কিছু একটা আসছে। সিংহের গলা থেকে চাপা গরগর শব্দ হলো। ঝোপঝাপে একটু শব্দ হলো। একজন দেবতুল্য মানুষ গাছ থেকে ওদের সামনে নামল।

সিংহ উঠে তার সামনে দাঁড়াল। মানুষটি বলল, 'জাড-বাল-জা! হীল্।'

প্রকাণ্ড সোনালী সিংহটা কুঁই কুঁই করে মানুষটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে আদর করে ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগল। গুইনাল্ডাকে অক্ষতদেহে দেখে, টারজানের মনে সে কি শান্তি। 'তুমি রাজকুমারী গুইনাল্ডা? কোথাও লাগে নি তো?' সে মাথা নাড়ল। টারজান হেসে বলল, 'ভয় নেই। আমি তোমার বন্ধু।'

রাজকুমারী সরল ভাবে বলল, 'আর ভয় পাচ্ছি না।'

তারপর টারজানকে সে সব কথা খুলে বলল। শুনে টারজান বলল, 'যাক্‌গে, ও দুটোকে খুঁজে কাজ নেই।'

—'তুমি কে?'

—'আমি টারজান। তোমাদের স্যার জেম্‌সের বন্ধু। দুজনে মিলে তোমাকে খুঁজেছিলাম।'

—'তাহলে তুমি আমারো বন্ধু।'

—'নিশ্চয়। চিরকাল।'

তারপর জাদবালজার রহস্যও খুলে বলতে হলো।

—'কোথায় থাক?'

—'সে অনেক দূর। কিন্তু আমার লোকজনরা নিশ্চয় এসেছে। নইলে সিংহটা এল কি করে?'

তারপর সিংহের জিম্মায় রাজকুমারীকে রেখে, টারজান ফলমূল নিয়ে এল। গুইনাল্ডা খেয়ে একটু জোর পেল। এবার তাকে কোলে তুলে নিয়ে দুদিন হেঁটে ওরা সেই ক্রসের কাছে নিরাপদে পৌঁছল। টারজান রক্ষীদের ডেকে তাদের সঙ্গে রাজকুমারীকে তার মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দিল। নিজে সঙ্গে গেল না, কারণ অবিলম্বে তাকে স্যার জেম্‌সের সন্ধানে যেতে হবে। রাজকুমারী বলল, 'তার দেখা পেলে বল এখানকার দ্বার তার জন্যে খোলা থাকবে আর গুইনাল্ডা অপেক্ষা করবে।

*

ব্লেক বনের মধ্যে আরবদের পায়ের চিহ্ন খুঁজছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় দেখে একটু খোলা জায়গায় একটা মানুষ পড়ে আছে, তার পাশে একটা চিতাবাঘ বসে আছে। মানুষটা হামা দিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করতেই চিতাটার চাপা গর্জন শোনা গেল।

আর কথা নয়, ব্লেক ঘোড়া হাঁকিয়ে বর্শা তুলে চিতাটার দিকে তেড়ে গেল। শিক্ষিত ঘোড়া চিতা শিকারে অভ্যস্ত, এতটুকু ভয় না পেয়ে ছুটে গেল সে। বর্শা দিয়ে চিতা মারা ব্লেকের পক্ষে এতটুকু কঠিন কাজ ছিল না। তারপর চেয়ে দেখে লোকটা স্টিম্বল!

স্টিম্বল বলল, 'আমি মরে যাচ্ছি, ব্লেক। তোমাদের ওপর অনেক অন্যায় করেছি, তার উপযুক্ত সাজা পাচ্ছি।'

ব্লেক বলল, 'ওসব কথা থাক। একটু আগে একটা গ্রাম দেখেছি। সেখানে তোমাকে খাবার দাবার আর জল দিয়ে সুস্থ করে তোলা যাবে।'

—'তুমি এখানে কি করছ?'

—'একটি মেয়েকে খুঁজছি। তাকে আরবরা বন্দী করেছে।'

—'সে বেঁচে নেই, ব্লেক। বনমানুষরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।'

ব্লেকের মুখে কথা নেই। গ্রামে পৌঁছলে ওদের দেখেই গ্রামবাসীরা পালিয়ে গেল। কিন্তু খাবার-দাবার, পানীয় জল, সবই ছিল। স্টিম্বল একটু সুস্থ হলো। তারপর ওয়াজিরিরাও ঐ গ্রামে পৌঁছল। তারা টারজানের কথা জিজ্ঞাসা করল। তাদের দেখে ব্লেক বুঝল এবার স্টিম্বলকে সভ্য জগতে পাচার করার অসুবিধা হবে না। টারজানের জন্য

ওয়াজিরিরা উদ্বিগ্ন ছিল না। সে ঠিক ফিরে আসবেই, এটা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শেখের দল ধনরত্ন নিয়ে তখনো চলেছিল। ক্লান্তিতে হতাশায় তাদের শরীর মন ভেঙে পড়ছিল। সকলেই বোমা বইছিল, বিশেষতঃ মেয়েরা। থেকে থেকে অদৃশ্য হাত থেকে একটা তীর খেয়ে একজন লোক মরে পড়ে যাচ্ছিল।

আবার অদৃশ্য কণ্ঠে শোনা যায়, 'প্রত্যেকটা রত্নের বদলে এক ফোঁটা রক্ত!'

তার ওপর পিছন পিছন অনেক দূরে একটা সিংহও চলেছে।

শেষ পর্যন্ত বাহকরা সকলে বোঝা ফেলে বেঁকে বসল। তারা কেউ বোঝা বইবে না। যা থাকে কপালে।

আবার সেই কণ্ঠ শোনা গেল, 'ইব্‌ন জাড সব বোঝা একা বইবে। চোর, খুনে, বদমায়েস তুলে নাও।'

আরবরা পোঁটলাগুলো একসঙ্গে বেঁধে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। পা কাঁপতে লাগল বুড়োর, ক্রমে সে পিছিয়ে পড়তে লাগল। সিংহটাও কাছে এসে গেল।

এই সময়ে বন্দুক হাতে আতেজা এসে বুড়ো বাপের পাশে দাঁড়াল। 'ছেলে চেয়েছিলে, ছেলে পাও নি। কিন্তু আমি তোমাকে ছেলের মতো রক্ষা করব।'

এইভাবে দলের সকলে পৌঁছবার অনেক পরে, ওরা দুজনে সেই গ্রামে পৌঁছল। আতেজাকে দেখে জায়েদ বিস্ময়ে আনন্দে বাক্যহারা। শেখ গ্রামে পৌঁছেই বসে পড়ল, ধন-রত্নের বোঝাও গড়িয়ে পড়ল। তার পরেই সিংহটার সঙ্গে টারজান এসে উপস্থিত হলো। ব্লেক তার হাত ধরে বিপন্ন মুখে বলল, 'বড় দেরি হয়ে গেছিল। সে মারা গেছে।'

টারজান বলল, 'বাজে বক না। আজ সকালেই আমি তাকে নিম্মর নগরের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে এসেছি। সে বলেছে দরজা তোমার জন্যে খোলা রইল আর সে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

স্টিম্বল টারজানের কাছে ক্ষমা চাইল। টারজান তার দেশে ফিরবার বন্দোবস্ত করে দেবে বলল। কিন্তু বন্ধুত্ব করা আর সম্ভব নয়। জায়েদ আর আতেজা টারজানের অনুচর হতে চাইল। টারজানও রাজি হলো।

পরদিন ওয়াজিরিরা অন্য আরবদের সঙ্গে শেখকে গাল্লাদেশে পৌঁছে দিয়ে গেল। সেখানে তাদের কপালে যা থাকে হবে। বাকি ওয়াজিরিদের আর জায়েদ আতেজাকে নিয়ে টারজান বাড়ি ফিরবার জন্যে তৈরি হলো। ব্লেক ওদের সঙ্গে গেল না। সে তার রাজকুমারীকে বিয়ে করে নিম্মরে আর মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। স্টিম্বলকে একটা পাল্‌কি করে চারজন ওয়াজিরি বয়ে নিয়ে চলল। আরো চারজন রত্নের বোঝা তুলে নিল। এই ভাবে অনেক সুখদুঃখের ব্যাপারের পর ওরা নিরাপদে বাড়ি ফিরল।

লুপ্ত সাম্রাজ্যে টারজান

টারজান অ্যান্ড দি লস্ট এম্পায়ার

ছোট্ট বাঁদর নিকিমা হঠাৎ টারজানের কাঁধের ওপর নেচে বেড়িয়ে কিচির-মিচির করে বলতে লাগল, 'পালাও, পালাও, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কারা যেন আসছে। নিশ্চয় দুষ্টু লোক, নিকিমাকে মেরে ফেলবে।' তার সবটাতেই ভয়!

ওয়াজিরি যোদ্ধা মুবিরো তার রকম-সকম দেখে বলল, 'নিকিমা ঠিক শুনতে পেয়েছে যে জঙ্গলের মধ্যে অচেনা লোক আসছে।'

টারজানও শুনতে পেয়েছিল। সে বলল, 'একদল লোক আসছে তবে শত্রু নয়, তাহলে এত আওয়াজ করে আসত না।'

আগন্তুকরা কাছে এলে দেখা গেল, সকলের আগে আসছে একজন লম্বা নিগ্রো যোদ্ধা আর তার পাশে মধ্যবয়স্ক একমুখ দাড়ি এক শ্বেতকায়। তাদের পিছনে ডজনখানেক আফ্রিকান।

শ্বেতকায় ভদ্রলোক হাত তুলে শান্তির সংকেত দিতে টারজান বলল, 'ডক্টর ভন্ হারবেন! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।'

ভন্ হারবেন এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক্ করে বলল, 'ভগবানের দয়ায় আপনার সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি দেখা হয়ে গেল, কারণ আপনারই খোঁজে বেরিয়েছি।' তারপর অত্যন্ত চিন্তিতভাবে বলল, 'আমি বেশ বিপদে পড়েছি, তবে সেটা একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার একমাত্র পুত্র এরিক সম্বন্ধে।'

ভন্ হারবেনের পরিশ্রান্ত চেহারা দেখে টারজান আগে তার খাওয়া আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করল। ওয়াজিরিদের ক্যাম্পে টারজানের তাঁবুতে একটু জিরিয়ে নিয়ে ভন্ হারবেন তাঁর কাহিনী শোনালো।

তাঁর অত্যন্ত মেধাবী একমাত্র ছেলে এরিক, মাত্র উনিশ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি পরীক্ষায় পাশ করার পর ঝোঁক চেপেছিল আরো দুটি জিনিষের ওপর—প্রত্নবিদ্যা আর প্রাচীন, অপ্রচলিত ভাষা শিক্ষা। স্বাভাবিক মেধার

জন্য এ দুটি জিনিষ সে সহজেই আয়ত্ত করল। তাছাড়া ছুটি-ছাটাতে অবসর মতো সে পাহাড়ে চড়াও অভ্যাস করেছিল।

কিছুদিন আগে সে বাবার কাছে এসেছিল আফ্রিকার বানটু ভাষার উৎপত্তি ও প্রচলন ইত্যাদি নিয়ে একটু অনুসন্ধান করবার জন্য। এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সে কতক-গুলো আদিবাসী গ্রামে যাতায়াত শুরু করেছিল। সে সময় সে শুনল যে উইরামওয়াজি পাহাড়ে সেকালে এক সময় একদল শ্বেতকায় লোক হারিয়ে গিয়েছিল। তাদের আর কোনো দিন খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তাই শুনে এরিকের মনে ধারণা হলো যে খবরটা হয়তো সত্যি আর সে জায়গায় হয়তো সেই হারিয়ে যাওয়া লোকদের বংশধররা এখনো পর্যন্ত বসবাস করছে। শোনা যায়, এই হারিয়ে যাওয়া লোকদের বংশ পরিচয় শুরু হয়েছে একেবারে বাইবেলের পৃষ্ঠায়।

এই পর্যন্ত শোনার পর টারজান বলল যে সে-ও এদের কথা বহুবার শুনেছে আর বহুদিন ধরে তার-ও ইচ্ছা এদের খুঁজে বার করার, কিন্তু সুযোগের অভাবে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

ভন্ হারবেনও বলল যে তার শুধু ইচ্ছা ছিল তাই নয়, সে দুবার উইরামওয়াজি পাহাড়ের গায়ে বাগেগো উপজাতিদের গ্রামেও গিয়েছিল আর এ বিষয়ে কথা-বার্তাও বলেছিল। আর সব থেকে আশ্চর্যের কথা যে বাগেগোরা স্বীকার করেছে যে ঐ পাহাড়ের কোথাও একদল শ্বেতকায় বাস করে। শুধু তাই নয়, তারা বাগেগোদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও করে আবার মাঝে মাঝে ক্রীতদাস হিসাবে তাদের গ্রামের লোককে ধরেও নিয়ে যায়।

এই সব কথা শোনার পর এরিক ভন্ হারবেন ঠিক করল যে উইরামওয়াজি পাহাড়ে হারিয়ে যাওয়া লোকদের বংশধররা কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করতেই হবে। তাই সে তার বাবার অনুমতি নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ল।

এই পর্যন্ত কোনো দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এরিক-এর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের গ্রামে ফিরে এসেছে, অথচ কি কারণে সেটা তারা কিছুতেই খুলে বলছে না। ডক্টর ভন হারবেন নিজে যখন তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেল তখন তারা তার সঙ্গে দেখাই করল না। কিন্তু জঙ্গলের কাণাঘুষোতে তার কাছে খবর এসেছে যে এরিক বিপদগ্রস্ত। সে কথা শোনার পর পুত্রের সন্ধানে ডক্টর ভন হারবেন তার নিজের মিশনের কাজ বন্ধ রেখে বেরিয়ে পড়েছে। সঙ্গে এই কটি নিগ্রো আদিবাসী ছাড়া আর কেউ আসতে রাজি হয়নি কারণ সকলের ধারণা যে উইরামওয়াজি পাহাড়ে প্রেতাত্মাদের বসবাস। সেখানে কোনো মানুষ গেলে সে আর ফিরে আসে না। নিরুপায় হয়ে সে এখন টারজানের শরণাপন্ন হয়েছে যদি সে কিছু সাহায্য করতে পারে।

পরোপকারী টারজান এ কথা শোনার পর সাহায্য করতে শুধু রাজি হল তা নয়, যখন ভন হারবেন তার সঙ্গে নিজের দলের লোকদের পাঠাবার কথা বলল তখন সে বাধা দিয়ে বলল যে তার একা যাওয়াই ঠিক হবে। কারণ জঙ্গলের আদিবাসীরা তাকে আপনজন মনে করে তাই তাদের কাছ থেকে খবর বের করা সহজ হবে। ডন হারবেনকে নিজের মিশনে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল।

সেই রাত্রেই টারজান উইরামওয়াজি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল। সঙ্গী রইল শুধু নিকিমা। যাবার আগে ওয়াজিরি যোদ্ধাদের বলে গেল যে তারা যেন নিজেদের গ্রামে গিয়ে টারজানের খবরের জন্য অপেক্ষা করে। দরকার হলে নিকিমার মারফত খবর আসবে। তখন যোদ্ধারা সকলে টারজানের সাহায্যে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

এরপর পিঠে তীরধনুক, কাঁধে দড়িগাছা আর কোমরে তীক্ষ্ণ ছোরা গুঁজে নির্ভীক চিত্তে বীরদর্পে টারজান অন্ধকারে গভীর জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। কাঁধের ওপর গুটিসুটি হয়ে রইল নিকিমা।

*

এরিক ভন হারবেন সকালবেলা তাঁবু থেকে বাইরে এসে দেখে সব ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই। এমন কি সব রকমের হাতিয়ার খাবার দাবার, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও একেবারে উধাও!

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দলের আদিবাসীরা দুজন-তিনজন করে চলে যেতে শুরু করেছিল আর বাকিরা ভয় পেলেও রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন এই কুখ্যাত উইরাম-ওয়াজি পাহাড়ে পৌঁছে তাদের আর সাহসে কুলালো না। সকলে, এমন কি, এরিক-এর বিশ্বস্ত অনুচর গাবুলা পর্যন্ত পালিয়ে গিয়েছে। চারদিকে শুধু উইরামওয়াজি পাহাড়ের ঘন নিস্তব্ধতা!

এরিক এই দেশের লোকেদের সঙ্গে ভাল ভাবেই পরিচিত ছিল বলে বুঝতে পারল যে এ রকম ব্যবহার এদের মূর্খতারই পরিচয়, দুষ্কৃতির নয়। এদের অবোধ মনে ঘোর

ধারণা যে উইরামওয়াজি পাহাড়ের অশরীরী বাসিন্দাদের হাত থেকে কোনো মতেই নিস্তার নেই, তাই মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র, খাবার, প্রয়োজনীয় দ্রব্য নষ্ট করেও কোনো লাভ নেই। বরং এগুলো তাদের গ্রামের কাজে আসবে। সেই জন্য এরিক এদের ওপর খুব একটা দোষারোপ করতে পারল না।

এখন সে ভাবতে লাগল তার কি কর্তব্য? অনুচরদের ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবে না, একাই এগিয়ে যাবে সেই হারিয়ে যাওয়া শ্বেতকায়দের সন্ধানে? এতদূর পথ আসার পর আবার ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না, তাই এগিয়ে যাওয়াই ঠিক করল।

ভাগ্যক্রমে তার তাঁবুতে একটা লুগার পিস্তল আর অনেকগুলো গুলি ছিল। এখন সেটাকে কোমরে গুঁজে, ছোট একটা ব্যাগে সামান্য কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস ভরে, সেটা পিঠে বেঁধে নিল। এছাড়া তার একটা শিকারী ছোরাও ছিল। সেটা দিয়ে একটা ছোট গাছ কেটে বেশ মজবুত একখানা লাঠি তৈরি করে নিল। তারপর মনে পড়ল যে প্রাতঃরাশের বন্দোবস্ত নিজেকেই করে নিতে হবে। ক্যাম্পে থেকে অভ্যস্ত এরিক-এর অবশ্যি এতে কোনো অসুবিধা হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ছোট খরগোশ মেরে, সেটাকে পুড়িয়ে খিদে বেশ ভালভাবেই মিটিয়ে নিল। তারপর ঝরনার জলে তেষ্টা মিটিয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে সে যাত্রা শুরু করে দিল।

সারাদিন পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে সন্ধ্যের সময় একটা সুবিধা মতো জায়গায় সঙ্গে-আনা কম্বল বিছিয়ে রাত কাটিয়ে দিল। শুতে যাবার আগে একটা ছোট্ট আগুন জ্বালিয়ে রাখল কারণ ক্রমাগত কাছে-পিঠে বন্যজন্তুর ডাক শোনা যাচ্ছিল।

পরদিন সকালে খালি পেটেই সে আবার চলতে শুরু করল। যত পাহাড়ের চুড়োর দিকে পথ ততই দুর্গম হয়। কিন্তু এরিকের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, কারণ প্রত্যেক পর্বত আরোহণকারীর মনেই একটা অদ্ভুত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছে ওদিকে না জানি কি দেখতে পাওয়া যাবে। এরিকের মনেও সেই উত্তেজনা!

সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় যে একটা পাহাড় শেষ হলে সামনে আরেকটা পাহাড়, তারপর আরেকটা। কিন্তু এরিক যখন ঐ পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছে তাকাল, দেখল তার সামনে দিগন্তবিস্তৃত উপত্যকা। তার পিছনে আবছা দেখা যাচ্ছে আরেকটা পাহাড়। এই দুই পাহাড়ের মাঝখানের উপত্যকায় কি আছে? এখন তো ইতস্ততঃ কয়েকটা বেঁটে গাছ চোখে পড়ছে। তাছাড়া আর কি আছে?

উত্তেজনায় ভরপুর মনে এরিক পা চালিয়ে উত্তরমুখী চলতে লাগল। উপত্যকাটাতে এবড়ো-খেবড়ো, পাথর ছড়ানো, অত্যন্ত নীরস। খানিকক্ষণ হাঁটবার পর এরিকের মনে হতে লাগল যে দূরের পাহাড় আর তার মাঝখানে একটা অদ্ভুত ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়গুলো যেন শূন্যগর্ভ থেকে উঠে গেছে, তাদের মাঝখানে যেন একটা জলহীন সমুদ্র। চিন্তা করতে করতে হঠাৎ সে একটা জায়গায় এসে থেমে গেল। তার সামনে উপত্যকা শেষ হয়ে গিয়ে এক বিরাট খাদ দেখা যাচ্ছে। অনেকটা আমেরিকার বিখ্যাত কলোরাডো গিরিখাতের মতো।

অনেক নিচে থেকে গ্রানাইট পাথরের উঁচু উঁচু চুড়োগুলো মিনারের মতো এসে পৌঁছেছে। কিন্তু বোঝা যায় যে এ সমস্ত আকার বৃষ্টি বা জলপ্রপাতের ফলে হয়েছে। প্রায় এক মাইল নিচে খাদের ভূমি দেখা যাচ্ছে। যার বিস্তার শেষ হয়েছে প্রায় পনেরো-কুড়ি মাইল উত্তরে। আর পূর্ব-পশ্চিমের বিস্তার বোধ হয় পঁচিশ-ত্রিশ মাইলেরও বেশি হবে। ঝুঁকে পড়ে এরিক দেখল যে ঠিক নিচে একটা বড় জলাজমি, যেটা পুব দিকের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে আছে। এই জলাজমি লম্বা লম্বা নলখাগড়ার ঝোপে ঢাকা আর জলার উত্তর সীমায় একটা বড় দ্বীপ। ওপর থেকে আরো দেখা গেল যে তিনটে নদী এসে এই জলা জায়গায় পড়েছে। খাদের পশ্চিম দিকে গভীর জঙ্গল আর এই জঙ্গল আর জলাভূমির মাঝখানের জায়গায় কেউ বা কিছু ঘোরাফেরা করছে।

এরিক ভন্ হারবেন-এর সমস্ত শরীরে উত্তেজনার শিহরণ খেলে গেল। এই তো সেই জায়গা, যেখানে সেই কবেকার হারিয়ে যাওয়া লোকের বংশধররা বাস করছে। কি নিখুঁতভাবে প্রকৃতিদেবী এদের লুকিয়ে রেখেছেন!

কিন্তু যতদূর দেখা যাচ্ছে খাদের মুখ থেকে নিচে নামার কোনো উপায় নেই। পাহাড়ের গা একেবারে খাড়া নেমে গিয়েছে। এরিকের সে দিনটা পুরো লেগে গেল ঘুরে ঘুরে নিচে নামবার একটা পথ খুঁজতে।

সূর্যাস্তের সময় হঠাৎ দেখল একটা জায়গায় পাহাড়ের গায়ে চিড় ধরেছে। কিছু পাথর ধসে যাওয়ার ফলে নিচের একটা ধাপে পৌঁছবার সরু রাস্তা হয়েছে। কিন্তু চারদিক

অন্ধকার হয়ে আসাতে রাস্তাটা কেমন তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সে রাতটা এরিক ওপরেই কাটালো। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা দুটো করে বাতি জ্বলে উঠছে। হ্রদের মধ্যেও আলো দেখা যাচ্ছে। সে সব জায়গায় যে মানুষের বসতি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তারপর চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেদ করে অস্পষ্ট মানুষের গলার আওয়াজও ভেসে আসতে লাগল।

পরদিন সকালবেলা এরিক কাঠ-খড় জোগাড় করে এনে আগুন জ্বালিয়ে নিজের শরীর গরম করবার চেষ্টা করতে লাগল। সারারাত তার খাওয়া হয় নি, কিন্তু এখন শিকার খোঁজবারও ইচ্ছা ছিল না। এখন শুধু এক চিন্তা, কিভাবে নীচে নামা যায়!

আগের দিনের দেখতে পাওয়া রাস্তাটা আরেকবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল যে সেটা কয়েক শো ফুট নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবে তার পরেও নিশ্চয় নামবার আরও রাস্তা পাওয়া যাবে, এই ভেবে সে যেই প্রস্তুত হলো পিছন থেকে পায়ের আওয়াজ শুনে, চট্ করে হাতে লুগার পিস্তল নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

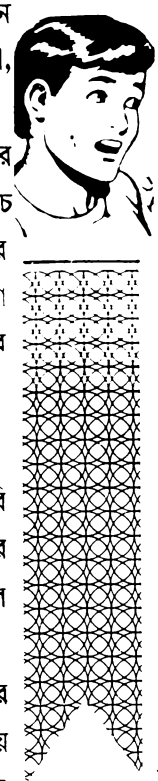

টারজান ডক্টর ভন হারবেন আর তার ওয়াজিরি যোদ্ধাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সারা রাত ধরে অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসেছিল। তারপর একটা বিশাল গাছের মগডালে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তার ঘুম ভাঙালো নিকিমা। ছোট্ট বাঁদরটা খবর দিল যে অনেকগুলো আদিবাসী জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে আসছে। টারজান দেখল যে আদিবাসীরা শুধু আসছে তা নয়, তাদের সঙ্গে যে-সব জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলো একমাত্র শ্বেতকায় পর্যটকরাই ব্যবহার করে থাকে। টারজান বুঝলো যে এরাই এরিক ভন হারবেন-এর দলের লোক।

আদিবাসীদের প্রশ্ন করে খুব একটা সঠিক উত্তর না পেলেও টারজান এটুকু বুঝল যে এরিক এখন একা উইরাম-ওয়াজি পাহাড়ে রয়েছে আর হয়ত সে এ-দিকেই ফিরে আসছে।

আর সময় নষ্ট না করে টারজান পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে বহু কষ্টে এরিক যেখানে তাঁবু ফেলেছিল, পৌঁছে দেখল, কেউ নেই আর তাঁবুটাও গত রাত্রের ঝড়বৃষ্টিতে পড়ে গেছে। টারজানের মনে হল যে ভন হারবেন খুব সম্ভবতঃ জখম হয়ে এই পাহাড়ের কোথাও পড়ে আছে। নিচে নামেনি, তাহলে দেখা হত, তাহলে নিশ্চয় ওপর দিকেই গিয়েছে।

সে পশ্চিম দিক ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল আর কাঁধে বসে নিকিমা বকাবকি করতে করতে চলল।

তারা দুজনে পাহাড় চড়তে এত মগ্ন ছিল যে খানিকটা নিচে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে-থাকা কয়েকজন আদিবাসী যোদ্ধাদের দেখতেই পেল না।

রাস্তা ক্রমশঃ এত খারাপ হয়ে এল যে এখন খালি পা-দানিতে এসে দাঁড়াল। তার ওপর জমি কাঁকরে ভর্তি। টারজান একটা জায়গায় পা দিতে গেলে শুকনো ঢিলে জমি হড়হড় করে নিচে নেমে গেল। ফলে টাল সামলাতে না পেরে টারজানও পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে পড়ে গেল। ভগবানের দয়ায় তার শরীর কিছুটা নেমে গিয়ে কয়েকটা বেঁটে গাছের ঝোপে আটকে গেল। তার রগের ক্ষত থেকে লাল রক্ত বেয়ে কালো চুলে মিশতে লাগল। বেচারা নিকিমা ভয়ে দুঃখে তার হাত-পা ধরে টানাটানি করে তুলবার বৃথা চেষ্টা শুরু করে দিল।

এমন সময় সেই নিচে দাঁড়িয়ে থাকা যোদ্ধারা তাড়াতাড়ি পাহাড় বেয়ে উঠে সেখানে পৌঁছল।

এরিক ভন্ হারবেন পিস্তল হাতে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল হাতে একটা রাইফ্‌ল নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে তার বিশ্বস্ত নিগ্রো পরিচারক গাবুলা।

আশ্চর্য হয়ে এরিক তার ফিরে আসার কারণ জানতে চাইলে অনুতপ্ত গাবুলা বলল যে সে এরিক আর তার বাবার কাছ থেকে প্রচুর স্নেহ-যত্ন পেয়েছে তাই সে নেমকহারামি করতে পারবে না। প্রথমটা অন্যান্যদের মতো সে-ও উই-রামওয়াজি পাহাড়ের অশরীরী আত্মাদের ভয় পেয়েছিল, কিন্তু এখন আর ফিরে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ সে অন্যদের মতো কাপুরুষ নয়, সে বাটোরো যোদ্ধা।

এরিক তাকে ফিরে যাবার জন্য অনেক বোঝাল কিন্তু গাবুলা যখন শুনল যে তার প্রভু একা নিচে নেমে সেখানে কি বা কারা বাস করে, তাই দেখতে যাবে, তখন সে দৃঢ়কণ্ঠে জানাল যে এখন থেকে তার প্রভুর সঙ্গ আর ছাড়বে না।

এরিক গাবুলার সাহসে খুশি হয়ে তাকে আলিঙ্গন করল। গাবুলা তখন একটা ঝুলি থেকে অনেকগুলো চকোলেট আর কিছু প্যাকেট খাবার বের করল। অনেকক্ষণ অভুক্ত

থাকার পর এরিকের কাছে সে সব অমৃতের মতো মনে হলো।

এরপর দু'জনে নিচে নামবার জন্য তৈরি হলো। নিচের ধাপ পর্যন্ত নামতে তাদের খুব একটা কষ্ট হলো না, যদিও একা নামা কারোর পক্ষে সম্ভব হতো না, সেই জন্য এরিক গাবুলার ফিরে আসাটা দৈব বলে মনে করল। কিন্তু এবার এখান থেকে পরের ধাপে নামবার রাস্তা একটা বিরাট পাথর দিয়ে বন্ধ। তারপরে নামবার রাস্তা আবার শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অত বড় পাথর কি করে টপকানো যায়?

বড় পাথরটার ওপর বসে এরিক অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করতে লাগল। তারপর আশপাশের ছোট বড় পাথরের টুকরোগুলো দেখতে দেখতে তার মাথায় এক ফন্দী এল। সে গাবুলাকে ডেকে ঐ সব পাথরগুলো সরাতে আরম্ভ করল, আর ঠিক যা আশা করছিল তাই হলো। একটা বড় গোছের পাথর সরাবার পর তারা আবার নামবার রাস্তাটা দেখতে পেল। রাস্তাটা বড় করবার জন্য দু'জনে পাথরগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল আর সেগুলো পাহাড়ের গায়ে ঠোকা খেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সেই আওয়াজ নিচের অধিবাসীদের কানে গেল। একটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ডোঙা নৌকোতে দু'জন জলার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা আওয়াজ শুনে ভাবল হয়তো বা পাহাড়ের গায়ে ধস নামছে। তারা ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

অতি কষ্টে এক পা করে এগিয়ে, পাহাড়ের গা শক্ত করে আঁকড়িয়ে ধরে এরিক আর প্রভুভক্ত গাবুলা নিচের দিকে নামতে লাগল। হাজার ফুটের ওপর নামা সোজা কথা নয়, কিন্তু এরিকের মনের উত্তেজনা কিছুতেই শারীরিক কষ্টকে গ্রাহ্য করতে দিল না। তারা ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে চলল।

আর সেই দুজন আদিবাসীও তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

যত নিচে নামা গেল, তত গাছ-গাছড়া দেখা দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এরিক আর গাবুলা যেখানে এসে পৌঁছল সেখানে এত বেশি সবুজ গাছের ছড়াছড়ি যে বেশি দূর পর্যন্ত দেখা গেল না। কিন্তু ওপর থেকে যা সবুজ তৃণভূমি মনে হচ্ছিল, এখন সেখানে পা দিয়ে বোঝা গেল যে আসলে তা এক বিপজ্জনক জলাভূমি। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে এল, কিন্তু চারদিকে এখন জল ছাড়া আর কোনো যাবার জায়গা নেই।

অনেক ভেবে চিন্তে দুজনে জলের মধ্যে নেমে পড়ে উঁচু উঁচু নলখাগড়ার ঝোপের দিকে যেই এগিয়েছে, সে-গুলোর পিছন থেকে তীরের মতো একটা নৌকো বেরিয়ে তাদের রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়াল। নৌকো ভরা সশস্ত্র যোদ্ধা!

*

টারজানের যখন জ্ঞান এল তখন তার হাত-পা বাঁধা, একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে সে একা শুয়ে রয়েছে। নিকিমার কোনো পাত্তা নেই।

এখন কি করা যায় তাই ভাবতে লাগল, এমন সময় খাবারের পাত্র হাতে নিয়ে এক আদিবাসী ঘরে এসে ঢুকল। কিন্তু হাত-পা বাঁধা অবস্থায় খাওয়া সম্ভব নয় তাই সে একটা ক্রীতদাসদের বাঁধবার শিকল আর তালা এনে টারজানের গলায় পরিয়ে শিকলটা ঘরের মাঝখানের কাঠের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখল।

তার কাছ থেকে খবর নিয়ে টারজান বুঝল যে সে উইরামওয়াজি পাহাড়ের বাগেগো উপজাতিদের গ্রামে বন্দী। এই আদিবাসীর নাম লুকেদি। আর বাগেগোদের ধারণা টারজান তাদের শত্রু সেই হারিয়ে-যাওয়া লোকদের দলের লোক। এখানে বনমানুষের ছেলে টারজানের নাম কেউ শোনেনি।

টারজান আরও শুনল যে যদিও সেই হারিয়ে-যাওয়া লোকরা বাগেগোদের সঙ্গে বছরে একবার ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসে, অন্য সময় তারাই আবার এদের গ্রাম থেকে মেয়ে-পুরুষ-শিশু সকলকে ক্রীতদাস হিসাবে ধরে নিয়ে যায়। তাদের আর কেউ কোনো দিন দেখতে পায় না, এমন কি তাদের খবরও আর পাওয়া যায় না।

লুকেদি জানালো যে টারজানের ভবিষ্যত সম্বন্ধে কি করা উচিত তাই নিয়ে গ্রামের কর্তাদের এক জরুরী বৈঠক বসেছে। তার ফলাফল শিগ্‌গিরই জানানো হবে।

লুকেদি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে টারজান চিন্তা করতে লাগল। তারপর অন্ধকার হয়ে এলে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুম ভেঙে গেল কোনো একটা আওয়াজে। তারপর তার মনে হল যে কুঁড়েঘরের খড়ের ছাদে কোনো জন্তু ঘোরাফেরা করছে বা ছাদ ফুটো করে ঢুকবার চেষ্টা করছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে দেখল যে ফুটো ক্রমশঃ বড় হচ্ছে আর সেখান থেকে এক রশ্মি চাঁদের আলো কুঁড়েঘরে এসে পড়েছে। সেই সঙ্গে যা এসে ঘরে পৌঁছল তাতে টারজানের মুখ খুশিতে ভরে গেল।

ছোট্ট নিকিমা টারজানের গলা জড়িয়ে নিজের ভাষায় তার বন্দী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে টারজান তাকে যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে তাকে জঙ্গলে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল।

পরদিন সকালবেলা লুকেদি খাবার নিয়ে এসে জানালো যে গ্রামের প্রধান নিউটো রায় দিয়েছে যে টারজানকে পুড়িয়ে মারা হবে। তার তোড়জোড় চলেছে গ্রামের আঙিনায়। টারজান অকে কষ্টে লুকেদিকে রাজি করালো তার হয়ে নিউটোর কাছে প্রাণ ভিক্ষা করতে।

এমন সময় সারা গ্রামের মধ্যে একটা আলোড়ন পড়ে গেল। সকলে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল আর যোদ্ধারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। লুকেদির মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, সে দৌড়ে কুঁড়ে ঘরের কোণায় লুকোবার চেষ্টা করতে করতে বলতে লাগল, 'তারা এসেছে! তারা এসেছে!'

এরিক ভন হারবেন অবাক হয়ে তার গ্রেপ্তারকারীদের দেখতে লাগল। তারা সকলে ঠিক যেন ইতিহাস বইয়ের পাতা থেকে জীবন্ত নেমে এসেছে। তা-ও সেই রোমান সাম্রাজ্যের যুগে। আর তাদের ভাষা! এরিক ভাষাতত্ত্ববিদ, বিশেষ করে পুরনো অপ্রচলিত ভাষার। আজ সে আশ্চর্য হয়ে শুনতে লাগল সেই ভাষা যার প্রচলন প্রায় দু হাজার বছর আগে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এরা সকলে যে ভাষায় কথা বলছে সেটা হল লাটিন ভাষা, যদিও তার মধ্যে কিছুটা বানটু ভাষার প্রভাব এসে পড়েছে।

লাটিন ভাষায় তৎপর এরিক কিছুটা উতস্ততঃ করে তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল আর জানাল যে সে আর গাবুলা তাদের দেশে বন্ধু হিসাবেই এসেছে। গ্রেপ্তারকারীরা নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলতে শুনে তাকে আর গাবুলাকে কাসট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াস থেকে আসা গুপ্তচর বলে ধরে নিল। এরিক যত বোঝাতে লাগল যে তার জন্মভূমি জারমানিয়া, তারা কিছুতেই শুনল না। জোরজার করে তাদের দুজনকে নৌকোতে তুলে নিজেদের দলপতির কাছে নিয়ে চলল।

নলখাগড়ার বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এরিক গ্রেপ্তারকারীদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা বলল যে তাদের বাস মেয়ার ওরিয়েন্টিস-এ আর তারা পূর্বরাজ্যের রাজা ভ্যালিডাস অগাস্টাস-এর প্রজা।

এর পর প্রায় আধঘণ্টা নৌকো বেয়ে যাবার পর একটা ভাসমান গ্রামে এসে পৌঁছলে, তাদের দলপতির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ভন হারবেন দেখল কিছুটা নলখাগড়ার বন সাফ্ করে মৌচাকের মতো দেখতে গোটা ছয়েক কুঁড়ে ঘর নিয়ে গ্রাম তৈরি হয়েছে।

এখানেও অন্যান্যদের মতো গ্রামের দলপতি তাদের শত্রুপক্ষের গুপ্তচর মনে করে সে রাত্রের মতো আটক করে রাখল। পরদিন সকালে তাদের দুজনকে কাস্ট্রাথ মেয়ার রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানে রাজার কাছে তাদের বিচারের ব্যবস্থা হবে।

পরের দিন সকালবেলা ছটি নৌকো ভর্তি নিগ্রো যোদ্ধাদের সঙ্গে এরিক আর গাবুলা রাজদর্শনে চলল। সঙ্গে রইল গ্রামের দলপতি।

এরিকের এই নতুন অভিজ্ঞতা খুবই উপভোগ্য মনে হতে লাগল। জলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে অনেকগুলো ছোট-বড় গ্রামের পাশ কাটাতে হল। প্রত্যেকটি জলে ভাসমান আর সে সব জায়গার বাসিন্দারা ভিড় করে এসে দেখতে লাগল।

রোদের তাপে অনেকক্ষণ একটানা চলার পর একটা বাঁক ঘুরতেই এরিক দেখল সামনে খানিকটা খোলা জলের পিছনে নিচু জমি আর তার ওপর ঘিরে রয়েছে মাটির প্রাচীর। প্রাচীরের ওপর খুঁটির মজবুত বেড়া। প্রাচীরের একটা জায়গায় দুটো উঁচু দুর্গের মতো তোরণ রয়েছে। নৌকোগুলো সেই দিকে বেয়ে চলল।

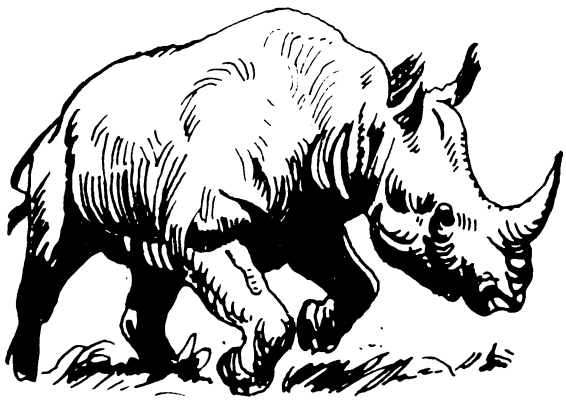

তারা কাছে যেতেই ভিতর থেকে তুরী বেজে উঠল আর তোরণের ভিতর দিয়ে একদল সৈনিক বেরিয়ে এসে জলের ধারে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর শুধু মাত্র দলপতির নৌকোকে ডাঙায় আসবার অনুমতি দেওয়া হল।

দলপতি নিজেদের পরিচয় দিলে সৈনিকদের একজন বলল যে তাদের অধিনায়ক সেঞ্চুরিয়ানকে খবর দেওয়া হয়েছে, ততক্ষণ সেখানেই অপেক্ষা করতে হবে।

এখানেও ভন হারবেন অবাক হয়ে দেখল যে সৈনিক-দের বেশভূষা সেই রোমান সিজারদের আমলের। সেই হেলমেট, প্রাচীন ঢাল, বুক-পিঠ ঢাকা চামড়ার বর্ম, স্পেন দেশে তৈরি সেই তলোয়ার, পায়ে চামড়ার দাড় বাঁধা রোমান চপ্পল। একমাত্র প্রভেদ গায়ের রঙ-এ। এরা কালো, রোমের সৈনিকদের মতো শ্বেতকায় নয়।

অল্পক্ষণ পরে তোরণের মধ্যে দিয়ে দুজন সৈনিক উপস্থিত হল। এদের একজনকে দেখে বোঝাই গেল যে সে সেঞ্চুরিয়ান কারণ তার চেহারা, বেশভূষা সবই উন্নতমানের। আর সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার যে এই সেঞ্চুরিয়ান একজন শ্বেতকায়।

এরিক আর গাবুলাকে নৌকো থেকে নেমে ডাঙায় আসবার অনুমতি দিয়ে সেঞ্চুরিয়ান তাদের পরিচয় জানতে চাইল। এরিক-এর পোষাক দেখে সে কোথাকার লোক জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কিছুতেই মানতে চাইল না যে তারা কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনেরিয়াস-এর গুপ্তচর বা রোম থেকে সদ্য আগত রোমান নয়। তারপর এরিক-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য সেঞ্চুরিয়ান আদেশ দিল যে সে রাত্রের মতো গাবুলাকে রক্ষীগৃহে কাটাতে হবে আর এরিককে তার সঙ্গে কোয়ার্টারে যেতে হবে।

সেঞ্চুরিয়ান যেখানে থাকে সেটা একটা সৈন্যনিবাস। সেখানে পৌঁছে এরিককে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করল যদি সে ক্যাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনেরিয়াস-এর লোক না হয়ে থাকে তাহলে তার দেশ কোথায়। তারপর যখন শুনল সে জারমানিয়ার লোক তখন তো সে হেসেই কুটোপাটি হয়ে গেল। পরে বলল, 'অসম্ভব। জারমানিয়ার লোকরা অসভ্য ও বর্বর। তারা রোমান ভাষা কিছুতেই জানতে পারে না।'

ভন হারবেন জানতে চাইল সে কবেকার জারমানিয়ার কথা বলছে। সেঞ্চুরিয়ান বলল, তাদের ঐতিহাসিক স্যাঙ্গুইনেরিয়াস তার জীবনীতে লিখে গেছেন যে রোমের তারিখ হিসাবে ৮৩৯ বছরে সে জারমানিয়ার সঙ্গে রোমের হয়ে যুদ্ধ করেছে।

তাই শুনে এরিক বলল, যে তারপর আঠার শ' সাঁইত্রিশ বছর কেটে গেছে আর এর মধ্যে জারমানিয়ারও অনেক অদলবদল হয়ে গেছে।

তাই শুনে সেঞ্চুরিয়ান অবাক হয়ে বলল, 'তা কি করে হবে? আমাদের এ দেশে কোনো বদল হয়নি যদিও স্যাঙ্গুইনেরিয়াস আজ আঠারো শো বছরেরও আগে মারা গেছেন। রোমের যদি কোনো বদল না হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য বর্বর দেশেও কোনো বদল হতে পারে না। তবে তোমার পোষাক রোমানদের মতো নয়। আমার মনে হয় তোমাকে জারমানিয়া থেকে বন্দী করে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যাইহোক, তোমার গল্প বলে যাও।'

তখন এরিক ভন হারবেন গোড়া থেকে সব কথা বলে শেষে বলল যে সে উইরামওয়াজি পাহাড়ে হারিয়ে-যাওয়া সেই শ্বেতকায় লোকদের বংশধরদের খোঁজে এসেছে। একমাত্র গাবুলা ছাড়া বাকি সকলে ভয়ে পালিয়ে গেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে পৌঁছলে সেখানকার লোকেরা তাদের বন্দী করে এখানে নিয়ে আসে।

সব শুনে সেঞ্চুরিয়ান, যার নাম মালিয়াস লেপাস, বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তুমি সত্যি কথাই বলছ কারণ তোমার পোষাক অন্যরকম আর যদিও তুমি আমাদের ভাষা বলছ, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে সেটা তোমার মাতৃভাষা নয়। আমাকে অবশ্য সম্রাটের কাছে তোমার বিষয় খবর পাঠাতে হবে। তবে এখন তোমাকে আমার আত্মীয় সেপ্‌টিমাস ফেবোনিয়াস-এর বাড়ি নিয়ে যাব। সে যদি তোমার কথা বিশ্বাস করে তো তোমার ভালো হবে কারণ সম্রাটের সঙ্গে তার খুব খাতির আছে।'

এরিক ভন হারবেন সেঞ্চুরিয়ানকে অনেক ধন্যবাদ জানাবার পর দুজনে সেপটিমাস ফেবোনিয়াস-এর বাড়ির দিকে রওনা দিল।

*

টারজান প্রথমটা লুকেদির ব্যবহারে অবাক হয়ে গেল। তারপর দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল যে বাগেগোরা দিশাহারা হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে, ঠিক যেন তাদের কেউ তাড় করে বেড়াচ্ছে।

সেই মুহূর্তে তিনজন শত্রু যোদ্ধা কুঁড়ে ঘরে ঢুকে এসে থমকে দাঁড়াল। বন্দী টারজানকে দেখে তারা প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে গেল তারপর নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করতে লাগল। কিন্তু টারজানকে প্রশ্ন করাতে সে উত্তর দিতে পারল না, কারণ যদিও সে-ভাষা তার জানা নেই, তবু মনে হল কোথাও যেন এ ভাষা সে শুনছে।

যোদ্ধারা লুকেদিকে হিড়হিড় করে সামনে টেনে

এনে টারজানকে ইশারায় বাইরে যেতে বলল। টারজান নিজের গলার শিকলের দিকে দেখাতে তারা তালার চাবি দেখতে না পেয়ে টারজানকে মাটিতে শুতে বলে একটা পাথরের ওপর তালাটা রেখে অন্য একটা পাথর দিয়ে বার কয়েক ঘা দিতেই অতি প্রাচীন তালা সহজেই ভেঙ্গে গেল।

বাইরে এসে টারজান দেখল পঞ্চাশ জন গ্রামবাসীকে ঘিরে প্রায় একশো জন যোদ্ধা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের রঙ ঘোর কৃষ্ণ নয় বরং অনেকখানি ফিকে আর তাদের পরণে যে সব বর্ম, হেলমেট, জুতো রয়েছে সেগুলোও তাদের ভাষার মতনই কেমন যেন পরিচিত মনে হতে লাগল। তাদের বল্লম, তলোয়ার সবগুলোই যেন আগে কোথাও সে দেখেছে। কিন্তু কোথায় সেটা টারজান কিছুতেই মনে করতে পারল না। সবটাই একটা কুহেলিকা মনে হতে লাগল।

তারপর তার হঠাৎ চোখে পড়ল যে গ্রামের অন্যদিক থেকে একজন শ্বেতকায় ঠিক অন্যদের মতনই পোষাক-আষাক পরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। আর সেই মুহূর্তে টারজানের কাছে সব কিছু জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। এরা সকলে রোমান। রোমের শাসন লুপ্ত হয়ে যাবার হাজার বছর পরে আজ সে রোমানদের হাতে বন্দী। তাদের ভাষা সে এক সময় শিখেছিল কিন্তু কোন দিন ব্যবহার করতে না পারায় ভুলেও গিয়েছে।

শ্বেতকায় যোদ্ধা টারজানকে প্রশ্ন করাতে সে কোনো উত্তর দিতে পারল না। তখন রোমান লোকটি তার যোদ্ধাদের কি যেন আদেশ দিল যার ফলে টারজানকে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে শুধুমাত্র গলায় শিকল বেঁধে রাখা হল।

তারপর সকলে মিলে যাত্রা শুরু করল। সে এক বিরাট ব্যাপার! প্রথমে চলল এক শ্বেতকায় যোদ্ধা, সঙ্গে ডজন খানেক কৃষ্ণকায় সান্ত্রী। তাদের পিছনে লম্বা সারি দিয়ে বন্দীরা, তাদের পিছনে গ্রাম থেকে লুঠে আনা ছাগল মুর্গী, গরু ইত্যাদি তাড়াতে তাড়াতে চলল একদল সেপাই। আর সকলের পিছনে রইল শত্রুদের আসল সেনানী—এক-জন শ্বেতকায় যোদ্ধার অধীনে।

উইরামওয়াজি পাহাড়ের পশ্চিম ধার বেয়ে এই বিশাল দল চলতে লাগল। টারজান আর লুকেদি বন্দীদের সারির সব থেকে পিছনে ছিল। লুকেদিকে প্রশ্ন করে টারজান বুঝতে পারল যে এরাই বাগেগো উপজাতির শত্রু—উইরামওয়াজি পাহাড়ের হারিয়ে-যাওয়া মানুষরা।

দু-ঘণ্টা চলবার পর ডান দিকের বাঁক ঘুরে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একটা সরু রাস্তা দিয়ে সকলে চলতে লাগল। জায়গাটা পাথুরে হলেও এত বেশি আগাছায় ভরা যে সহজে চোখে পড়ে না। টারজান টের পেল যে চলতে চলতে রাস্তা ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। দু-ধারে পাহাড়ের গা বিরাট দেওয়ালের মতো হয়ে দাঁড়াতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সকলে একটা উঁচু প্রাচীরের সামনে এসে থামল। মজবুত ইঁটের তৈরী প্রাচীরের দেওয়াল প্রায় একশো ফুটেরও বেশি উঁচু হবে। প্রাচীরের গায়ে একটা ফটক পার হয়ে আরেকটা কাঠের ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হল। দুটো জায়গাতেই টারজান লক্ষ্য করল যে প্রহরীদের বেশভূষা অন্যদেরই মতো।

ফটক পার হতেই চওড়া একটা রাস্তা চোখে পড়ল। তার দুধারে বিশাল গাছে ভরা ঘন বন। একটু পরে একটা গ্রামে পৌঁছন গেল। সেখানে বিশ্রামের তোড়জোড় লেগে গেল। গ্রামের কুঁড়ে ঘরগুলো দেখতে মৌচাকের মতো আর সেগুলোতে শুধু উচ্চপদস্থ অফিসাররা আশ্রয় নিল। আর বন্দীদের থাকবার জায়গা হল খোলা আকাশের নিচে, যদিও দয়া করে আগুন জ্বালাবার হুকুম দেওয়া হল।

টারজান চারদিকে তাকিয়ে জায়গাটাকে ভালো করে দেখতে লাগল। মাথার ওপর গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে কত রকমের অজানা পাখির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছিল, কত বাঁদরের দল এ-ডাল ও-ডাল লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল!

হঠাৎ একটা বাদাম এসে টারজানের মাথায় পড়ল। প্রথমে তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ করল না টারজান। কিন্তু পর পর আরও দু-তিনটে পড়াতে সে চোখ তুলে দেখল মাথার ওপরেই একটা নিচু ডালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসে আছে নিকিমা!

এতক্ষণ সমানে টারজানের পিছু পিছু এসেছে। এখন সে তার প্রভুকে কাছে পেয়ে মহা খুশী। কিচির মিচির করে তাকে কত কি সে বলতে লাগল। তারপর টারজানের বন্দী অবস্থা দেখে ওয়াজিরি যোদ্ধাদের ডেকে আনবে কি না জানতে চাইলে টারজান বাধা দিয়ে বলল, 'না নিকিমা, এখনও নয়। আগে যাকে খুঁজতে এসেছি তার সন্ধান পাই, তারপর তুমি ওয়াজিরিদের গিয়ে খবর দিও!'

পরদিন সকালে সামান্য কিছু খাবার খেয়ে আবার

সকলে চলতে শুরু করল। দুপুর পর্যন্ত তারা ধূসর রাস্তা ধরে দক্ষিণমুখী হয়ে চলতে লাগল। রাস্তায় অনেকগুলো গ্রাম পড়ল যে-গুলোর আকার আকৃতি ঠিক আগেরটার মতো। চলতে চলতে হঠাৎ পুব দিক ঘুরে একটা রাজপথে এসে পড়ল। এই রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর টারজান দেখলো সামনে একটি বিরাট প্রাচীর যার ওপরে খুঁটির বেড়া। রাস্তা ঘুরে দুর্গের মতো উঁচু তোরণের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। প্রাচীরের নিচে জল-ভরা পরিখা আর একটা সেতু দিয়ে পরিখা পার হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তোরণ পার হয়ে ওপারে পৌঁছে টারজান দেখল সেখানে গ্রাম নেই, বরং একটা শহর রয়েছে। শহরে রয়েছে বড় বড় পাকা বাড়ি, দোকান-পাট আর রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে দূরে চোখে পড়ছে সম্ভ্রান্ত বাসিন্দাদের ভিলা বা প্রাসাদ। শহরের বাসিন্দাদের গায়ের রঙ পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ। তাদের পরণে আজানুলম্বিত জামা আর ক্লোক্, যদিও অনেক নিগ্রো অধিবাসী আধা-নগ্ন দেহে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাস্তা ক্রমশঃ ভালো হতে লাগল আর ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল। এখানকার ঘরবাড়ি অনেক উন্নত আকারের আর শ্বেতকায়ের সংখ্যাও এখানে অনেক বেশি। টারজান বুঝলে যে এদেশে নিগ্রোরা হল ক্রীতদাস ; পিঙ্গল বর্ণরা হল যোদ্ধা বা ব্যবসায়ী আর শ্বেতকায়রা হল ধনী অভিজাত বংশ।

ক্রমে তারা এসে পৌঁছল একটা বাড়ির সামনে। সেটা দেখতে রোম শহরের কলোসিয়াম-এর মতো। কিন্তু বন্দীদের সারিবদ্ধ করে নিয়ে যাওয়া হল মাটির তলায় ভিজা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার কারাগারে। সেগুলো পাথর দিয়ে তৈরি। সেখানে বাইরের যথেষ্ট আলো-বাতাস কখনও ঢুকতে পারে না।

*

মালিয়াস লেপাস নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এরিক ভন হারবেন আর তার বিশ্বস্ত অনুচর গাবুলাকে সঙ্গে নিয়ে তার আত্মীয় সেপ্টিমাস ফাবোনিয়াসের বাড়ি চলল পালকি করে। চারজন বাহক এই পালকি বয়ে নিয়ে চলল। যেতে যেতে মালিয়াস লেপাস এখনকার রোমের যান-বাহন সম্বন্ধে জানতে চাইলে শুনল যে সেখানকার পালকি এখন চাকার ওপর চলে। সে তো হাঁ! 'বল কি! গোরুর গাড়ির চাকায় বসানো পালকি ঐ সব এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে যায় কি করে?'

—'আজকালকার পথও যে মোলায়েম চকচকে, চওড়া। তার ওপর গাড়ির চাকায় নরম টায়ার পরানো থাকে।'

—'কিন্তু এর চেয়ে তাড়াতাড়ি চলে না নিশ্চয়।'

আজকালকার গাড়ির বেগের কথা শুনে সে তো আকাশ থেকে পড়ল! তারপর বলল, 'সেপ্টিমাস ফাবোনিয়াসের বাড়িতে অনেক অতিথি আসে। খাওয়াদাওয়াও ভালোই হয় কিন্তু গল্প বলার একটা লোক থাকে না ; বড়ই বিরক্তিকর ব্যাপার হয়। তোমাকে পেলে লুফে নেবে।'

সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি একেবারে রাস্তা ঘেঁষে তৈরি। দুটোর মধ্যিখানের ফাঁকে উঁচু পাঁচিল। ভন হারবেন বলল, 'এখানে খুব চোরের উপদ্রব নাকি?'

—'না, না, এখানে খুব কম দুষ্কৃতকারী। তবে ক্রীতদাসরা যদি কখনো ক্ষেপে ওঠে, তাই ঐ সব রক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু দরজাগুলো প্রায় খোলাই থাকে।'

ভন হারবেন বলল, 'এত বড় শহরে কোনো দুষ্কৃতকারী নেই, সেটা কি করে সম্ভব হল?'

—'রোমাব্দ ৯৫৩-এ অনাস হাস্তা বিদ্রোহ করে এই নগর পত্তন করেন। তখন চোর-ছ্যাঁচড়ের জ্বালায় এখানে টেকা দায় ছিল। শেষটা তিনি এমনি কড়া সব আইন করলেন যে চোরেরা নির্বংশ হয়ে গেল। অনেকে তাঁকে নিষ্ঠুর বলত, কিন্তু শহরের তিনি এই উপকারটা করে গেছেন। এখনো চোরদের চরম সাজা দেওয়া হয়।'

এই সব আলাপ করতে করতে ওরা বিশাল এক ফটক দেওয়া চমৎকার বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। সেপ্টিমাস নিজে ওদের বাড়িতে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলন বটে, তবু ভাবখানা যেন অভ্যাগত ঠিক তার মতো রোমান নাগরিকের সমপদস্থ নয়।

ভন হারবেনের ঘরের পাশেই সেপ্টিমাস ফাভনিয়াসের বাসস্থান। স্নান করে, উচ্চপদস্থ রোমান নাগরিকের পোষাক পরে, ভন হারবেন নিচের বাগানে বেড়াতে লাগল। ঘর-দোরের সাজ-সজ্জায় গ্রীসের আর আফ্রিকার প্রভাব। বাগানেও রোমান কায়দার সঙ্গে আফ্রিকার সমাবেশ। কয়েকটা বড় গাছের অনেক বয়স। হঠাৎ একটি মেয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। ভন হারবেনের মনে হলো এমন সুন্দর মেয়ে সে কখনো দেখেনি। অতিথি তার পরিচয় দিতেই মেয়েটি অবাক হল। 'জারমেনিয়া থেকে এসেছ? সে তো অনেক দূরে।'

সে দূরত্ব যে আজকাল কিছুই নয়, সে আর এরা কি

করে বুঝবে !

মেয়েটির নাম ফাবোনিয়া। এই সময় একজন কালো চুল, বেঁটে তেলতেলা চেহারার লোক এসে হাজির হল। সে যে এই অতিথি দেখে খুব খুশি হল, তা মনে হল না। ফাবোনিয়া দুজনের আলাপ করিয়ে দিল। সে লোকটা হল ফালবাস ফুপাস। তারপর ফাবোনিয়া বলল, 'ও এতবার এখানে অতিথি হয়েছে যে আমাদের অন্য অতিথিদের খাতির করে না।'

ফালবাস লজ্জা পেয়ে বলল, 'কিছু মনে কর না। এখানে একবার একটা বনমানুষও অতিথি হয়ে ছিল। কাকে কি বলব বুঝতে পারি না।'

পরে সেপ্টিমাস ওদের রোমান স্নানাগারে নিয়ে গেলেন। লেপাস বলল, 'বন্ধুদের কাছে বিদেশী অতিথি দেখাবার ইচ্ছা !'

চমৎকার বাড়িতে স্নানাগারটি। সবাই খাতির দেখাতে ছুটে এল। চমৎকার ব্যবস্থা স্নানের। অনুচররা সুগন্ধী তেল মালিশ করে দিল। মস্ত মস্ত গরম জলের জলাধারে সবাই মিলে স্নানের আনন্দ। ভন হারবেনের ডাইভ্ দেওয়া দেখে সকলে অবাক। এরা সে কায়দা জানত না। অতিথিকে প্রাধান্য পেতে দেখে ফুপাস খুব বিরক্ত হল। তাড়াতাড়ি চলেও গেল। যাবার আগে বন্ধুদের কানে কানে বলে গেল, 'বলছে বটে জারমানিয়া থেকে এসেছে। আমার বিশ্বাস লোকটা কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনেরিয়াস থেকে এসেছে। আমি পুবের সম্রাট ভ্যালিডান অ্যাগস্টাসের কানে কথাটা তুলছি।'

*

এদিকে কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনেরিয়াসের সিংহ খেলার যে কলোসিয়াম, তার মাটির তলার বন্দীশালায় বন্ধ থেকে টারজান যে কত কষ্ট পাচ্ছিল সে আর বলা যায় না। লুকেদি আর অন্য বন্দীরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে একা বসে দেখছিল যে ক্রীড়াঙ্গনের মেঝেটা ঐ ঘরের জানালার সমান নিচু। কি একটা সেখানে চলে বেড়াচ্ছিল। তারপর জানালায় নিকিমাকে দেখা গেল। নিকিমা বলল, 'এখানে কেন ? চলে এসো।'

—'দেখেছিস তো জাদবালজাকে খাঁচায় বন্ধ করলে, সে বেরোতে পারে না। আমিও তেমনি বন্ধ আছি। দরজা খুলে না দিলে বেরোতে পারব না।'

—'তাহলে মুবিরো আর ওয়াজিরিদের ডেকে আনব কি ?'

—'না, না, তাদেরো অনেককে এরা মেরে ফেলবে।'

নিকিমা ঘরে ঢুকে ওর কোলে শুয়ে রইল। টারজানও একটু ঘুমোল। ভোরে উঠে দেখল নিকিমা কখন চলে গেছে।

সেদিন দুপুরে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ অফিসার এসে টারজানকে জেরা করল। ল্যাটিন ভাষা ভুলে গেছিল টারজান, তাই বাগেগো ভাষায় কথাবার্তা হল। অফিসার বলল, 'তুকি যে কাস্ট্রাম মেয়ারের গুপ্তচর নও, তার কি প্রমাণ ?'

টারজান বলল, 'ও জায়গার নামও কখনো শুনিনি। আশা করি এবার আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে ?'

—'তা কেন ? তুমি কি রোমান নাগরিক ?'

টারজান বলল, 'না আমি একজনকে খুঁজছি। এর মধ্যে কি কোনো সাদা মানুষ বিদেশ থেকে এখানে এসেছে ?'

—'না কেউ আসেনি। সে যাক গে। আমি তোমাকে আরো উঁচু পদের একজনের কাছে নিয়ে যেতে এসেছি।'

এর পর টারজানকে মাটির নিচের ঘর থেকে বের করে স্বয়ং পশ্চিমের সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সাদা পোষাক আর সোনার সাজ পরে তিনি কারিকুরি করা সিংহাসনে বসে ছিলেন। গরীব, ধনী কত প্রজা তার কাছে তাদের আরজি পেশ করছিল। ঘরের চারদিকে পতাকা, ঢাল, অস্ত্রশস্ত্র সাজানো। খানিক বাদে যে অফিসারের সঙ্গে টারজান এখানে এসেছিল, তাকে ডাকা হল বন্দীকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যেতে। টারজানের খালি গা, লম্বা-চওড়া চমৎকার ফরসা চেহারা, কালো চুল, ছাই রঙের চোখ যে কোনো সভায় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য। সম্রাট সাবলাটাস ছিলেন ভারি দাম্ভিক, কিন্তু তারও মনে হলো এ মানুষটি সিংহের মতো মহান।

টারজান দো-ভাষীকে বলল, 'সম্রাটকে জিজ্ঞাসা কর আমাকে কেন বন্দী করা হয়েছে। এখনি ছেড়ে দেওয়া হোক।'

লোকটা সে কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না দেখে, সম্রাট নিজেই বললেন, 'ও কি বলছে ?'

কিন্তু সে কথা যখন বলা হলো আর তার পরেও টারজান বড় বেশি তেজের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল তখন সম্রাট রেগে বললেন—'নিয়ে যাও ওকে। যে

অফিসাররা এমন বেয়াদব বন্দী আমার কাছে আনে, তাদেরো বন্দী কর।'

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন সৈনিক দু'দিক থেকে টারজানকে ধরবা মাত্র, সে তাদের দু'জনের মাথা এমন জোরে ঠুকে দিল যে তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তারপর এক লাফে মঞ্চে উঠে সম্রাটকে বেড়ালছানার মাতা ঘাড়ে ধরে উঁচু করে তুলে দো-ভাষীকে বলল, 'সবাইকে বল কেউ আমাকে বাধা দিতে এলে, সম্রাটের ঘাড় মটকে দেব। সবাই সরে দাঁড়াক। আমি রাস্তায় বেরিয়ে সম্রাটকে ছেড়ে দেব।'

এ কথা শুনে সাবলাটান চুপ করলেন। টারজানের কথায় আগে আগে গেল দোভাষী, তার পিছনে সম্রাটকে নিয়ে টারজান; তিনি আবার এমনি চ্যাচাচ্ছিলেন যে দো-ভাষীকে কিছু বলতে হচ্ছিল না। রক্ষীরা টারজানের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে চেয়েছিল। তিনিই বললেন বড় রাস্তায় পড়ে টারজান তাকে ছেড়ে না দিলে, তখন দেখা যাবে।

বন কেটে ঐ শহর তৈরি হয়েছিল। এখনো বহু প্রাচীন মহীরূহ পথের ধারে ডালপালা মেলে দাঁড়িয়েছিল। অনেক জায়গায় গাছের ডাল বাড়ির ছাদের ওপর ঝুলে ছিল।

বেশ কিছু দূর গিয়ে টারজান দো-ভাষীকে বলল, 'তোরণের রক্ষীদের বল ভিতরে চলে যেতে। তারা গেলে আমি সম্রাটকে নামিয়ে দেব।'

সে কথা শুনে রক্ষীরা ভিতরে চলে গেল বটে, কিন্তু সম্রাটকে ছেড়ে দেবামাত্র আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে দেখল, তাদের বন্দী একটা বড় গাছের ডাল ধরে ঝুলে, পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রক্ষীদের একজন এদিকে দেখায়, একজন ওদিকে দেখায়, সকলেরি গোলমাল লেগে গেল। টারজান নিঃশব্দে গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে, একটা বাড়ির নিচু ছাদে নেমে, সেই বাড়ির ওঠোনের মধ্যিখানের গাছে চরে পাতার আড়ালে চুপ করে বসে রইল। গাছতলায় যে-দুটি মানুষ ছিল তারাও কিছু টের পেল না।

গাছের নিচে একজন ইঁদুরমুখো যুবক একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে চেষ্টা করছিল। মেয়েটির ভীষণ আপত্তি দেখে, চটে গিয়ে যুবক যেই তার হাত ধরে টেনেছে, অমনি গাছ থেকে একটা আধা-উলঙ্গ দৈত্য নেমে তার ঘাড় ধরে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিল। লোকটা যখন দেখল টারজান নিরস্ত্র, অমনি তার তলোয়ার বের করল। মেয়েটা ভয় পেয়ে বাড়ির লোকদের ডাকাডাকি করতে লাগল।

ঐ লোকটা তিনবার চেষ্টা করেও তলোয়ারটা শত্রুর গায়ে লাগাতে পারল না। তারপর দৈত্যটা এমনি জোরে ওর কব্জি চেপে ধরল যে হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল।

এই সময় দুজন শ্বেতকায় আর একজন নিগ্রো ছুটে এল। তারা প্রথমে ভেবেছিল টারজানই বুঝি মেয়েটিকে আক্রমণ করেছে। আর ফাস্টাস ছোকরা তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। তারপর মেয়েটি আসল ব্যাপার বুঝিয়ে বলল। মুস্কিল হল টারজান এবং ওরা কেউ কারো কথা বোঝে না।

হঠাৎ টারজানের খেয়াল হল নিগ্রোটি বাগেগো জাতের হলে, সে ভাষা ওর জানা। তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, বহুদিন সে এখানে বন্দী, তাই দুটো ভাষাই জানে। তখন তার মাধ্যমে টারজান ওদের জানাল যে সে এক বন্ধুর খোঁজে দূরদেশ থেকে এসেছে। তার নাম টারজান। বন্ধু ভাবে এসেছে সে।

এই সময়ে বাইরের দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুনে, নিগ্রোটি গিয়ে একজন রোমান অফিসারকে নিয়ে এল। এই লোকটিই টারজানকে সম্রাটের কাছে নিয়ে গেছিল। ওকে দেখেই সে তলোয়ারে হাত রাখল। তাই দেখে মেয়েটি বলল, 'থামো, ম্যাক্সিমাস প্রিক্লারাস, এ শত্রু নয়।'

—'ঠিক জান, ডিলেক্টা? ওর বিষয়ে কি জান?'

—'এইটুকু জানি যে ও আমাকে ঐ পাষণ্ড ফাস্টাসের হাত থেকে রক্ষা করেছে।'

প্রিক্লারাস বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। কাস্ট্রাম মেয়ারের গুপ্তচর সন্দেহ করে ওকে বন্দী করা হয়েছিল। তারপর ওকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ও তাকে আক্রমণ করে, প্রাসাদ থেকে পালায়। সর্বত্র ওকে খোঁজা হচ্ছে। আমি এখানে তাই এসেছি। ভাবলাম যদি তোমাদের অনিষ্ট করে।'

ডিলেক্টা বলল, 'অনিষ্ট করতে যাচ্ছিল ঐ উচ্চ বংশীয় ফাকটাস, স্বয়ং সীজারের ছেলে। বুনো লোকটিই আমাকে বাঁচাল।'

ফাস্টাস চ্যাচাতে লাগল, 'ওকে গ্রেপ্তার কর!'

ডিলেক্টা বলল, 'আমাকে যে বাঁচাল তাকে তুমি গ্রেপ্তার করবে?'

—'কি করব? সেই তো আমার কর্তব্য।'

ফাস্টাস বলল, 'তাহলে ওকে ধরছো না কেন ?'

মেয়েটি মহা চটে গেল, 'এমপিঙ্গু, ফাস্টাসকে বাইরে পৌঁছে দাও।'

ফাস্টাস বলল, 'আমি সব কথা আমার বাবাকে জানাচ্ছি। তিনি তোমার বাবাকে খুব পছন্দ করেন না, ডিলেক্টা।'—

ডিলেক্টা বলল, 'ভাগো !'

ফাস্টাস রাগ দেখিয়ে চলে গেল, প্রিক্লারাস এমপিঙ্গুর সাহায্যে টারজানকে বলল, 'আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করার ভান করে নিয়ে যাব। তারপর আমার বাড়ির কাছে এসে ইশারায় বাড়িটা দেখিয়ে দেব। তুমি তার একটু পরেই গাছে চড়ে পালাবে। আমি খুব হৈ চৈ লাগাব, কিন্তু তুমি আমার বাড়ি গিয়ে চুপ করে লুকিয়ে থাকবে। পরে তোমার এ শহর থেকে বেরিয়ে, পাহাড়ের ওপারে যাবার ব্যবস্থা করে দেব।'

পূব রাজ্যের সম্রাট ভ্যালিডাস অগাস্টাসের খুব বেশি রাজকার্য ছিল না। ক্যাস্ট্রাম মেয়ারের জনসংখ্যা বাইশ হাজারের চেয়ে সামান্য বেশি। তার মাত্র তিন হাজার শ্বেতাঙ্গ। দ্বীপ-শহরটার বাইরে হ্রদবাসীদের গ্রামে ছাব্বিশ হাজার নিগ্রো থাকত।

সেদিন সন্ধ্যায় সম্রাট কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাগানে গান-বাজনা শুনছে এমন সময় এক অনুচর খবর আনল ফালবাস ফুপাস দেখা করতে চান, কি জরুরি কাজ আছে।

কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট তাকে ডাকলে, সে এসে বলল, 'কাস্ট্রাম মেয়ারে একজন বিদেশী এসেছে। সে বলছে জারমানিয়াতে তার বাড়ি, কিন্তু আমার মনে হয় ও পশ্চিম রাজ্যের চর। আছে ক্যাপিয়াস হাস্তার আত্মীয় ফাবোনিয়াসের সঙ্গে। সে আপনার আত্মীয় হলেও, একবার পশ্চিমরাজ্যে দৌত্য করতে আপনি ক্যাপিয়াসকে পাঠিয়েছিলেন। তখন কোনো ষড়যন্ত্র করে থাকতে পারে।'

এই খবর শুনে সম্রাট বড় বিচলিত হলেন, 'বিদেশী কি রকম দেখতে।'

—'ফরসা রং, কিন্তু আমাদের অভিজাত বংশের লোকদের চেয়ে একটু অন্য রকম। হয়তো ইচ্ছা করেই বিকৃত করে আমাদের ভাষা বলে।'

—'এখানে এল কি করে ? অফিসাররা কেউ রিপোর্ট করে নি কেন ?'

—'ম্যালিয়াস লেপাসকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। হ্রদের গাঁয়ের অসভ্যরা লোকটিকে বন্দী করে ওর কাছেই এনেছিল।'

সম্রাট হুকুম দিলেন, 'সেপ্টিমাস ফবোনিয়াস, ম্যালিকাস লেপাস আর বিদেশীকে বন্দী কর।'

ঠিক সেই তিনজন ব্যক্তিই ঐ সময় সম্রাট সন্দর্শনে এসে উপস্থিত হল। ফাবোনিয়াস আর লেপিডাস ভন হারবেনের পরিচয় দিয়ে বলল, 'এ জারমেনিয়ার এক অসভ্য জাতির প্রধান।'

সম্রাট বললেন, 'ওর কথা শুনেছি। ম্যালিয়াস লেপাস, ওর কথা আমাকে আগে জানাওনি কেন ?'

লেপাস বলল, 'আজকেই এসেছে। স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরে আপনার কাছে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।'

—'ওকে এখানে আনার দরকার ছিল না। কাস্ট্রা স্যাঙ্গুনেরিয়াসে চরদের জন্য মাটির তলায় বন্দীশালা আছে।

—'এ তো সেখান থেকে আসেনি। জারমেনিয়া থেকে এসেছে। ওখানে যায়ওনি কখনো।'

—'সম্প্রতি রোমে গিয়েছে ?'

—'আজ্ঞে হ্যা।'

—'এখন সেখানে কে সম্রাট ?'

—'কোন সম্রাট নেই।'

—'সম্রাট নেই ? তুমি গুপ্তচর না হলে, নিশ্চয় স্রেফ পাগল। সম্রাট নেই তা হয় কখনো ?'

—'সম্রাট নেই, কারণ সাম্রাজ্যও নেই। গত আঠারো'শ বছর সেখানকার খবর পাননি আপনারা। হাজার বছর আগে রোমের পতন হয়েছে। সেখানকার ভাষাও পণ্ডিতরা ছাড়া কেউ বলে না। আজকাল জারমেনিয়া, গ্যালিয়া, ব্রিট্যানিয়া বড় বড় সাম্রাজ্য গড়েছে আর রোম হল ইট্যালিয়ার একটা শহরমাত্র।'

ভন্ হারবেনের কথায় এমন একটা গাম্ভীর্য আর স্পষ্টতা ছিল যে ভ্যালিডাস পর্যন্ত প্রভাবিত হলেন। তিনি ফুপাসকে বললেন, 'একে কেন কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনেরিয়াসের চর বলছিলে ?'

—'এখানকার লোক নয় যখন, তখন আর কোথাকার হবে ?'

—'আর কোন প্রমাণ নেই ? যাও, এখান থেকে।'

রাগে গজগজ করতে করতে, এদের ওপর বিষদৃষ্টি

হানতে হানতে সে বিদায় নিল।

সম্রাট খানিকটা মনে মনে বললেন, 'যখন স্যাঙ্গুইনেরিয়াস ইজিপ্টাস ছেড়ে গেছিল, নার্ভা সম্রাট ছিলেন। রোমাব্দের সেটা ৮৪৮ তম বছর। ফেব্রুয়ারি শেষের ছয় দিন আগে। তারপর সেখানকার কোনো খবর আমরা জানি না।'

ভন্ হারবেন মনে মনে হিসাব করে বলল, 'অর্থাৎ আজকালকার হিসাবে সেটা হলো ২৭ জানুয়ারী, '৯৮ খৃস্টাব্দ। সেই দিনই নার্ভার মৃত্যু হয়।'

—'আহা, স্যাঙ্গুইনাস যদি খবর পেত তার শত্রু মরেছে, সব অন্য রকম হোত। নার্ভার পর কে সম্রাট হয়েছিল?'

—'ট্রেজান।'

—'তুমি অসভ্য দেশের লোক হয়েও এত কথা জানলে কি করে?'

—'আমি যে ঐ সব নিয়ে পড়াশুনা করেছি, সম্রাট।'

—'ঐ সব তুমি আমার জন্য সঠিকভাবে লিখে দিতে পারবে?'

—যতটা মনে করতে পারি, সবই লিখে দিতে পারব। তবে সময় নেবে।'

—'লিখে দাও। সময় পাবে।'

—'খুব বেশি দিন এখানে থাকব ভেবে আমি আসিনি, সম্রাট।'

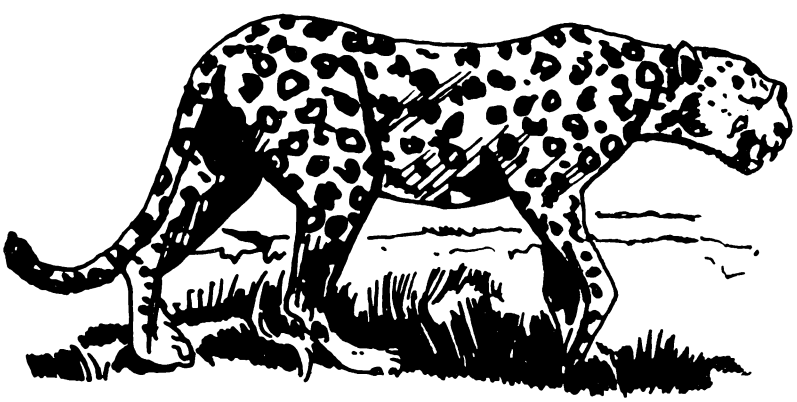

কিন্তু সম্রাট কোন আপত্তির কথাই শুনলেন না। বললেন, 'আমার আদেশ। চল, লাইব্রেরিটা দেখিয়ে দিই। সেখানে তোমাকে কাজ করতে হবে। তুমি সেপ্টিমাস ফাবোনিয়াসের বাড়িতেই থাকবে। সে আর ফালবাস ফুপাস তোমার নিরাপত্তার জন্য দায়ী হবে। তুমি এতে রাজি না হলে প্রাণদণ্ড দেব।'

ফাবোনিয়ার সুন্দর মুখটা মনে পড়াতে ভন্ হারবেন আর বেশি আপত্তি করল না। সেখানে ফিরে সম্রাটের দেওয়া স্যাঙ্গুইনেরিয়াসের লেখা প্রাচীন প্যাপাইরাসের পুঁথিটার দড়ি খুলে পড়তে বসে গেল।

এর আগে যত প্রাচীন পুঁথি দেখেছিল ভন্ হারবেন, সে সবই ছিল দক্ষ লেখকদের রচনা। তাতে অনেক কিছু বাদ ছিল। এ পুঁথিটি হোল একজন সামরিক নেতার প্রত্যক্ষ করা রোজনামচার মতো। এতে কত যে সাধারণ মানুষের আর সাধারণ জায়গার বর্ণনা ছিল, কত ছোটখাটো কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার কথা ছিল যে পাঠকের চোখের সামনে অতীতটা জীবন্ত হয়ে উঠছিল। কোথায় একজন লোক স্যাঙ্গুইনেরিয়াসের প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তার কথা কে বা জানত! এমন কি মার্কাস কৃস্বাস স্যাঙ্গুইনেরিয়াসের নাম পর্যন্ত রোমক ইতিহাসে লেখা নেই। পুঁথিটার মধ্যে ডুবে গেল ভন্ হারবেন।

আশ্চর্য সে ইতিহাস। বিদ্রোহী সেনাপতিকে হত্যা করবার জন্য নার্ভা ভাড়াটে খুনী পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সে ধরা পড়ে নিহত হয়েছিল। এদের ধ্বংস করবার জন্য নাকি বাহিনীও পাঠাচ্ছিলেন। তাই রোমে না ফিরে, এই সুন্দর জায়গাতে স্যাঙ্গুইনেরিয়াস উপনিবেশ স্থাপন করলেন। সৌভাগ্যবশতঃ লম্বা এক পণ্যদ্রব্যের মিছিল ঐ পথে রোম যাচ্ছিল। তার মধ্যে ছিল রেশম, সোনা, মনিমুক্তা, সুগন্ধী-দ্রব্য, ভারত আর চীন থেকে বন্দী করা বহু তরুণ-তরুণী। এই মিছিলকে আটক করে স্যাঙ্গুইনেরিয়াসের লোকাভাব আর অর্থাভাব দূর হয়েছিল।

লেপাস অবিশ্যি বলেছিল এর অর্ধেকগুলো বানানো কথা। ক্যাস্ট্রাম মেয়ারের লোকদের ওতে খুব আস্থা নেই।

এরিক ভন্ হারবেন অন্য শহরটারও কথা জিজ্ঞাসা করাতে লেপাস বলল, 'এটাই হোল আদি শহর। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর একশো বছর ধরে চোর আর খুনের জ্বালায় লোকে অস্থির হয়ে উঠেছিল। তখন অনাস হাস্তা বিদ্রোহ করে, কয়েক শো পরিবার সঙ্গে নিয়ে এই পুব দিকের শহরের আর সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিল। এইখানে আজ সতেরো'শ বছর ধরে তাদের বংশধররা কতকটা সুখে-শান্তিতে বাস করে। তবে ক্যাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনেরিয়াসের সঙ্গে লড়াই লেগেই আছে। দুজনার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে, আবার লুঠপাটও হয়। সম্রাটরাই দু'দিকের নাগরিকদের মধ্যে সন্দেহ, বিদ্বেষ, হিংসা জাগিয়ে রাখেন। তাতে জীবনযাত্রা

চাঞ্চল্যময় হয়।'

অনেক গোপন কথাও বলল লেপাস। এখানকার সম্রাট বড়ই দাম্ভিক আর নিষ্ঠুর। এর আগে ওঁর বড় ভাই সম্রাট ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর একমাত্র ছেলের বয়স ছিল এক বছর। যে কারণেই হোক, তাঁর ভাই এই ভ্যালিডাস অগাস্টাস সম্রাট নির্বাচিত হয়েছিলেন। আগের সম্রাটের ছেলের নাম ক্যাসিয়াস হাস্তা। সবাই তাকে ভালোবাসে বলে সম্রাটের ভারি হিংসে। তাকে তিনি নানা বিপজ্জনক কাজে এদিক ওদিক পাঠান। গুজব হোল সম্প্রতি স্যাঙ্গুইনেরিয়াসে তাকে গুপ্তচর করে পাঠিয়েছেন, এই আশায় যে তারা ওকে ধরে মেরে ফেলবে। এখানে কিছু চেষ্টা করলে নাগরিকরা ক্ষেপে উঠবে।

গাছতলায় শুয়ে শুয়ে এরিক ভাবছিল, চারদিকে গবেষণার সামগ্রী ছড়িয়ে আছে, তাই নিয়ে কাজ করে সে অনেক দিন কাটাতে পারে। তবে লাইব্রেরিতে সব সময় বন্ধ থাকতে ভালো লাগবে না। ঠিক সেই সময়ে ফাবোনিয়া বাগানে আসাতে, সে ক্ষোভটাও দূর হয়ে গেল।

প্রিক্লারাস যখন টারজানকে নিয়ে ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাসের বাড়ি থেকে বেরোলো, সমবেত সৈনিক আর জনতার কি উল্লাস! তাদের থামিয়ে দিয়ে কলোসিয়ামের দিকে যাত্রা শুরু হল। মাঝে একটা বাড়ির সামনে একটু থেমেছিল প্রিক্লারাস, তারপর যেন মত বদলে আবার হাঁটা ধরল। আরো কিছুদূর গিয়ে বড় বড় কয়েকটা গাছের তলায় একটা ফোয়ারার কাছে থেমে প্রিক্লারাস জল খেল। ফিরে এসে ইশারায় জানতে চাইল টারজানও জল খাবে কি না। টারজান পথটা পার হয়ে জল পান করতে লাগল। তার পাশেই একটা গাছের গুঁড়ি। টারজান তার আড়ালে সরে যেতেই সৈনিকদের একজন প্রিক্লারাসকে সতর্ক করে দিল। সকলে মিলে রাস্তা পার হয়ে গিয়ে টারজানের কোনো চিহ্ন দেখতে পেল না। কয়েকজন সৈনিক গাছে চড়েও কিছু পেল না। হঠাৎ প্রিক্লারাস 'ঐ যে! ঐ যে!' বলে নিজের বাড়ির উল্টো দিকে ছুটল। আর সকলেও ওর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ল।

টারজান এদিকে নিঃশব্দে গাছ থেকে গাছে গিয়ে একটা বাড়ির পাশের গাছে পৌঁছল। সেটাই প্রিক্লারাসের বাড়ি। নিচে উঠোনে দেখল এমপিঙ্গু একজন সুন্দরী আধাবয়সী অভিজাত চেহারার মহিলাকে কি যেন বলছে। চারদিকে কয়েকজন কালো দাস-দাসী। মহিলার মুখ দেখে তাকে বড় দয়ালু মনে হল। এই সময় টারজান চুপ করে তাদের মধ্যিখানে নামল। এমপিঙ্গু তাদের পরিচয় করিয়ে দিল। এমপিঙ্গুই দো-ভাষীর কাজ করতে লাগল।

অতিথির জন্য ঘর ঠিক ছিল, টারজান সেখানে গেল। সন্ধ্যার আগে প্রিক্লারাস এল। সে বলল তার এত কৃতজ্ঞতার কারণ হল ডিলেক্টার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক! এবং সেই জন্যেই তার ওপর সম্রাটের ছেলে ফুপাসের রাগ। 'ঐ একটা কারণেই সাবলোটাস আমাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করবেন।'

—'আমি হয়তো কিছু কাজে আসতে পারি।'

—'কি করবে, ভাই? সবাই তোমাকে সব কাজ ফেলে খুঁজছে।'

—'দুবার তো দেখেছ যে আমাকে খুঁজলেও আমি তাদের এড়িয়ে যেতে পারি।'

—'তাহলে এখানে আছ কেন?'

—'আমার এক বন্ধুর পণ্ডিত ছেলে নিখোঁজ হয়েছে। তার সন্ধানে এসেছি।'

—'সে যদি উপত্যকার এদিকটায় আসে, তাহলে বন্দী করে আমার কাছেই তাকে আনা হবে। কলোসিয়ামের ভার আমার হাতে।'

—'অন্য জায়গাও আছে নাকি?'

—'যদি বুনোরা ওকে বনের মধ্যে ধরে থাকে, তাহলে সাবলোটাসের কাছে নিয়ে গেছে। তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে থাকতে পার।'

তিন সপ্তাহ পরম আরামে সেখানে ছিল টারজান। ততদিনে ল্যাটিন ভাষাটাও ভালো করে ঝালিয়ে নিয়েছিল।

ওদিকে যাকে সে খুঁজছিল সে পুব দিকের সম্রাটের পেয়ারের লেখক হয়ে, পরম আরামে একজন অভিজাত রোমানের মতো দিন কাটাচ্ছিল আর লাইব্রেরির প্রাচীন পুঁথিগুলি ঘাঁটছিল।

অন্য একটা জগতে, ভয়ে আধমরা খুদে একটা বাঁদর টারজানকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল!

*

এমপিঙ্গু বড় বেশি বাজে বকত। এখানে ওখানে ঘরের কথা দু-একটা বলে ফেলাতে ওকে প্রাসাদের রক্ষীরা ধরে নিয়ে গেল। তারপর তাকে সটাং প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে

জেরা করা হোল, টারজান নামক ফেরারি আসামীকে সে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। লোহার চিমটে গরম করে তার জিব ছিঁড়ে ফেলার আর চোখ গেলে দেবার ভয় দেখাতে সে বলে ফেলল যে টারজান ম্যাক্সিমাস প্রিক্লারাসের বাড়িতে লুকিয়ে আছে।

এর কয়েক মিনিট পরে ঐ রক্ষী গিয়ে সম্রাট সাবলাটাসের কাছে সব কথা বলল। সেখানে তাঁর ছেলে ফাস্টাস-ও ছিল।

রক্ষী বলল, 'ঐ বুনোকে পালাতে সাহায্য করেছে শুধু প্রিক্লারাস।'

ফাস্টাস বলল, 'এমপিঙ্গু তো স্পেণ্ডিডাডের দাস, কাজেই তাঁকে বাঁচিয়ে বলেছে।'

সম্রাট বললেন, 'ঐ তিনজনকে আর স্পেণ্ডিডাসের এবং প্রিক্লারাসের বাড়ি সুদ্ধ সবাইকে গ্রেপ্তার করা হোক।'

ফাস্টাস বলল, 'খোলাখুলি ধরলে টারজান আবার পালাবে। একটু চালাকি করতে হবে, বলি শুনুন।' এই বলে সে খানিকটা কূটবুদ্ধি দিল।

এর এক ঘণ্টা পরে রাজসভার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির বাড়িতে স্পেণ্ডিডাসের সস্ত্রীক সেই রাতেই ভোজে নিমন্ত্রণ হোল। প্রিক্লারাসের একজন অভিজাত ধনী যুবকের বাড়িতে নেমন্তন্ন হোল। নিমন্ত্রিতদের মনে কোন সন্দেহই হয়নি। ডিলেক্টা তার বাপের বাড়িতে দাসীদের মধ্যে বসে আফ্রিকার জঙ্গলের গল্প শুনছিল। টারজান আর ফেস্টিভিটাস প্রিক্লারাসের বাড়িতে বসে গল্প করছিল। এমন সময় এমপিঙ্গু এসে টারজানকে বলল, 'তোমাকে একবার ডায়ান স্পেণ্ডিডাস ডেকেছেন।'

কেন ডেকেছেন তা সে বলতে পারল না।

টারজান নিশ্চিন্ত হয়ে তার সঙ্গে অন্ধকার রাতে বেরিয়ে পড়ল। একটু পরেই একটা গলির মধ্যে একটা ছোট ফটকের কাছে এসে এমপিঙ্গু বলল, 'এই যে এখানে।'

অমনি টারজানের সন্দেহ হোল। 'এটা তো তাঁর বাড়ি নয়।'

—'এটা পিছনের ফটক। চল।'

ভিতরে ঢুকবামাত্র অনেকগুলে লোক টারজানকে পেড়ে ফেলে, দেখতে দেখতে হাতে শিকল বেঁধে ফেলল। এতে টারজানের যেমন কষ্ট হয়, তেমন আর কিছুতে নয়।

*

সেপ্টিমাস ফাবোনিয়াসের বাগানে বসে যখন এরিক ভন্ হারবেন ফাবোনিয়ার সঙ্গে মনের সুখে গল্প করছিল, সেই সময়ে ক্যাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনেরিয়াসে সম্রাটের এক দল সৈনিক টারজান আর এমপিঙ্গুকে কলোসিয়ামের মাটির তলায় বন্দীশালায় টেনে নিয়ে ফেলল।

আরো দক্ষিণে খুদে এক বাঁদর ভয়ে আর শীতে গাছে বসে ঠকঠক করে কাঁপছিল।

যে ভোজে প্রিক্লারাস গিয়েছিল, সেখানে প্রধান অতিথিরূপে সম্রাটের ছেলে ফাস্টাস উপস্থিত ছিল। আজ সে বড় বেশি সৌজন্য দেখাচ্ছিল। সে বলল, 'সেদিন আমার হাত থেকে টারজান পালাতে পারত না।'

প্রিক্লারাস বলল, 'স্পেণ্ডিডাসের বাড়িতে তাকে ধরলে না কেন?'

—'এবার ঠিক ধরে রাখবো।'

প্রিক্লারাস বলল, 'তাকে আবার ধরেছ নাকি?'

ফাস্টাস একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'মানে আবার ধরলে, আর ছাড়ব না।'

অনেকক্ষণ ধরে ভোজসভা চলেছিল। প্রিক্লারাসের মন ভরা অমঙ্গল আশংকা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় নিয়ে সে এই শহরের চোর-ডাকাতে ভরা পথে নেমে পড়ল। বাড়ি পৌঁছে দেখে সদর দরজাটা আধখোলা, কেউ কোথাও আছে মনে হল না। প্রিক্লারাস বাড়িতে ঢুকল।

ওদিকে অন্য একটা অভিজাত ভোজের শেষে সম্রাট একটা বার্তা পেয়ে, খুশি হয়ে গৃহস্বামীকে বললেন, 'ডায়ন স্পেণ্ডিডাস আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার কিছু গোপন কথা আছে। আর কেউ যেন উপস্থিত না থাকে।'

অন্য অতিথিরা খুশি হয়ে বিদায় নিলে, স্পেণ্ডিডাসকে সাবলোটাস বললেন, 'তুমি নাকি সম্রাট হতে চাও, শুনেছি?'

স্পেণ্ডিডাস বললেন, 'আপনি তো জানেন কথাটা মিথ্যা। তবে আপনি যদি আমাকে ধ্বংস করতে চান, কেউ বাধা দিতে পারবে না।'

—'আমার ইচ্ছাটা তাহলে শোন। আমার ছেলে তোমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। আমারো সেই ইচ্ছা। আমাদের দুই ক্ষমতাশালী পরিবারের মিলন হলে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক হয়।'

—'কিন্তু সে যে ম্যাক্সিমাস প্রিক্লারাসকে বিয়ে করতে চায়।'

—'তা তো হতে পারে না। কারণ প্রিক্লারাসের রাজ-দ্রোহিতার জন্য প্রাণদণ্ড হবে। সে টারজানকে পালাতে সাহায্যে করেছে। তোমাদের সহযোগিতায়। তবে এ

বিয়েটা হলে তোমাদের ক্ষমা করা হবে।'

ডায়ন স্প্লেণ্ডিডাস সগর্বে বললেন, 'আমাদের মেয়েরা চিরকাল নিজেদের পছন্দমতো স্বামীকে বিয়ে করেছে। সম্রাটের ছেলে তাকে রাজি করাতে পারলে, আমরা আপত্তি করব না।'

—'বেশ। কথাটা ভেবে দেখো।'

টারজান তো বন্দীশালায় ঢুকে মশালের আলোতে যা দেখল, তাতে অবাক হল। লুকেদি সহ আরো অনেক নিগ্রোর সঙ্গে একজন শ্বেতাঙ্গও দেওয়ালে শিকল-বাঁধা হয়ে রয়েছে। সাদা মানুষটির পাশে টারজানকে চেন করা হল। রক্ষী মশাল নিয়ে চলে গেল। বন্দী হবার ধকলে টারজান তার পরনের জোব্বাটি হারিয়ে, শুধু বাঘছালটি পরে ছিল। সঙ্গী তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তবে কি তুমিই সেই সাদা বুনো, যার খ্যাতি এই বন্দীশালাতেও পৌঁছেছে?'

—'আমি বনমানুষদের ছেলে টারজান।'

—'তুমিই তাহলে সম্রাটকে বেড়ালছানার মতো তুলে ধরে প্রাসাদের বাইরে এনেছিলে! সাবলাটাস তোমার প্রাণদণ্ড দেবে। বাঁদরের মতো গাছে বিচরণ কর, তো ধরা পড়লে কি করে?'

—'বিশ্বাসঘাতকতার ফলে। কিন্তু তুমি সীজারের বন্দীশালায় এলে কি করে?'

—'আমি মোটেই সীজারের বন্দীশালায় নেই। ঐ যে ব্যাটা সিংহাসনে বসে আছে, সে আদৌ সীজার নয়।'

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কে সীজার?'

—'খালি পুবের সম্রাটদের সে অধিকার আছে।'

—'তাহলে তুমি এখানকার কেউ নও?'

—'না, আমি ক্যাস্ট্রাম মেয়ার থেকে এসেছি। তাই বন্দী হয়েছি।'

—'এখানে সেটাই বুঝি অপরাধ?'

—'আমরা চিরশত্রু। থেকে থেকে যুদ্ধবিরতি করে, পরস্পরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য হয়। লুঠপাটও হয়। আমাদের আছে লোহার খনি, প্যাপাইরাস ঘাস, লিখবার কালি, নানা রকম মাছ, মণিমাণিক্য ইত্যাদি। এদের সোনার খনি আছে। তাছাড়া বাইরের জগতে যাওয়া-আসার পথ এদের দখলে। আমরা এদের কাছ থেকে ক্রীতদাস, গোরু ভেড়াও কিনি। এখানখার লোকরা বড় মুখ্যু, শিল্পবিদ্যা নেই বললেও হয়।'

টারজান বলল, 'জেনেশুনে এখানে এসে বন্দী হলে কেন?'

সে বলল, 'আমার নাম ক্যাসিয়াস হাস্তা। আমি পুবের সম্রাট ভ্যালিডাস অগাস্টাসের বড় ভাইয়ের ছেলে। অগাস্টাসের বড় ভয় যদি আমি সিংহাসন দাবি করে বসি। তাই দৌত্য করার ছলে ইচ্ছা করে আমাকে সাবলাটাসের হাতে সঁপে দিয়েছে।'

—'সাবলাটাস তোমাকে নিয়ে কি করবে?'

—'তোমাকে নিয়ে যা করবে, তাই। বাৎসরিক শোভাযাত্রায় মার্চ করাবে, তারপর ক্রীড়াঙ্গনের বলি হব।'

—'কবে হবে ঐ শোভাযাত্রা?'

—'আর দেরি নেই। অনেক বন্দী জমেছে।'

টারজান লুকেদিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ, ভাই?'

—'আর কেমন থাকব? মরবার জন্য তৈরি হচ্ছি। টারজানকে যেদিন আমরা বন্দী করেছিলাম, সে বড়ই অশুভ দিন ছিল।'

—'এরা সকলেই তোমার গাঁয়ের লোক?'

—'না, অনেকেই ক্যাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনাসের প্রাচীরের বাইরে থাকে।'

আরেকজন নিগ্রোও বলে উঠল, 'এরা আমাদের মেরে আনন্দ করে!'

—'তা তোমরা এতজন আর ওরা সংখ্যায় এত কম, ওদের অত্যাচার সহ্য কর কেন? তোমরা কাপুরুষ, না বোকা?'

—'কাপুরুষ নই আমরা।'

—'তাহলে বোকা আছ।'

এমপিঙ্গু বলল, 'এই শহরের নিগ্রোরাও সম্রাটকে দেখতে পারে না।'

টারজান আশ্চর্য হোল। এই শহরে আর গ্রামে হাজার হাজার নিগ্রো আছে। তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়, তবু তারা বিদ্রোহ করে না কেন? আসলে ওদের একজন নেতা দরকার।'

ক্যাসিয়াস হাস্তাকে কথাটা বলতেই সে বলল, 'শত শত বছর ধরে ওদের ওপর আমরা প্রভুত্ব করেছি। ওদের মধ্যে থেকে নেতা বেরোনো অসম্ভব।

—'তাহলে একজন সাদা নেতাকে কাজটা করতে হবে।'

এই সময় রক্ষীরা ম্যাক্সিমাস প্রিক্লারাসকে বন্দী করে

এনে দেওয়ালে চেন করে রেখে গেল। টারজানের কি দুঃখ। 'আমার জন্য তোমার এই বিপদ হোল!'

প্রিক্লারাস বলল, 'সেটা আসল কারণ নয় বন্ধু। আসল কারণ হোল আমাকে সরিয়ে সম্রাট নিজের ছেলের সঙ্গে ডিলেক্টার বিয়ে দেবেন।'

পরদিন ভোরে ওদের শুকনো রুটি আর জল খেতে দেওয়া হোল। টারজান নজর করে দেখল ওরা তিনজন শ্বেতাঙ্গ ছাড়া ঐ ছোট ঘরটাতে ছিল লুকেদি, এমপিঙ্গো, ওগোনিও বলে আরেকজন বাগেগো আর পাঁচজন বলিষ্ঠ গ্রামবাসী যোদ্ধা। ক্রীড়াঙ্গনে এদের খেলা দেখালে, অনুষ্ঠানের শোভা বাড়বে।

এর পর তিন দিন কাটল। টারজান সে-কদিন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি। সকলের কাছ থেকে তাদের কতখানি ও কি ধরনের যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত আছে জেনে নিয়েছে। ক্রীড়াঙ্গনের নিয়মকানুন শুনেছে আর মনে মনে একটা পরিকল্পনা করেছে। তৃতীয় দিনে সিসিলিয়াস মেটেলা বলে আরেকজন অভিজাত রোমান ওদের দলবৃদ্ধি করল। তাকে দেখেই ক্যাসিয়াস হাস্তা তার নিজের বন্ধু বলে অভ্যর্থনা করল।

মেটেলাস বলল, 'তুমি চলে যাবার পর ফালবাস ফুপাস সম্রাটের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে, তোমার সব বন্ধুদের কারাবাসী করেছে। ম্যালিয়াস লেপাস তাদের একজন। সেপ্টিমাস ফাবোনিয়াসের ওপর সম্রাট বিরক্ত। ফুপাস তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। সবচেয়ে জবর খবর হোল অগাস্টাস ফুপাসকে পুষ্যি নিয়ে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন!'

হাস্তা তো হেসেই মরে, 'ঐ ব্যাটা সীজার হবে! আর সুন্দরী ফাবোনিয়া কি বলে?'

—'সেখানেই তে মুস্কিল। সে জারমেনিয়া থেকে আগত একজন বুনোকে ভালোবাসে!'

ক্যাসিয়াস হাস্তা বলল, 'তার নাম কি?'

—'তার নাম এরিক ভন্ হারবেন।'

টারজান বলল, 'আমি তাকে চিনি।'

মেটেলা বলল, 'তবে কি সে সত্যি এখানকার গুপ্তচর?'

প্রিক্লারাস বলল, 'না মোটেই না। এরিক কখনো এখানে আসেনি। আমার এই বন্ধুও বাইরের জগৎ থেকে ঐ এরিকের খোঁজেই এসেছে।'

মেটেলাস বলল, 'ম্যালিয়াস লেপাসের সঙ্গে সে-ও এখন বন্দী। দুজনকেই অগাস্টাসের জন্মদিনে খেলায় নামাবে।'

টারজান বলল, 'কবে সে খেলা শুরু হবে?'

—'পনেরোই অগাস্ট। সাত দিন ধরে চলবে।'

টারজান বলল, 'ক্যাস্ট্রাম মেয়ার কত দূরে?'

—'তাজা সৈনিকরা আট ঘণ্টায় মার্চ করে যেতে পারে। কেন? তুমি যাবার কথা ভাবছ নাকি?'

—'আমি যাবই।'

মেটেলাস বলল, 'আমাকে নিয়ে যাবে?'

—'তুমি কি তার বন্ধু?'

—'তার বন্ধু না হলেও, তার বন্ধুদের বন্ধু, আর শত্রুদের শত্রু। ভালো করে চিনি না।'

—'অগাস্টাসকে তুমি ভালোবাসো?'

—'মোটেই না।'

—'হাস্তা, তুমিও বোধ হয় তার ভক্ত নও?'

—'ঠিক বলেছ।'

—'তাহলে দুজনকেই নিয়ে যাব।'

ওরা বলল, 'তুমি বললেই যাব।'

প্রিক্লারাস বলল, 'আমিও।'

মেটেলাস বলল, 'তাহলে কখন যাওয়া হচ্ছে?'

টারজান উত্তর দিল, 'এই চেন খুলে দিলেই যাওয়া যায়। খেলার আগে খুলে দিতেই হবে।'

ক্যাসিয়াস হাস্তা বলল, 'বাধা দেবার জন্য মেলা সৈনিক থাকবে কিন্তু।'

—'ওদের হাত থেকে দুবার পালিয়েছি।'

প্রিক্লারাস বলল, 'তা পালিয়েছে সত্যি। সীজারকে মাথায় তুলে পালিয়েছিল!'

*

খেলার দিন এল। ক্রীড়াঙ্গনের বালি ঝেঁটিয়ে সাফ। ক্যাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনেরিয়াসের রাজপথে লোকেলোকারণ্য। কালো ক্রীতদাস, মেটে রঙের কারিগর আর সাদা অভিজাত বংশীয়রা, কেউ বাদ যায় নি। পথের ধারের সব বাড়ির ছাদে দর্শকের ভিড়। সবাই হাসছে, গল্প করছে; ফেরিওয়ালা সওদা হাঁকছে; কিছু দূরে দূরে সৈনিকরা দাঁড়িয়ে, যাতে পথে কেউ না নামে। আগের রাত থেকে লোক জমতে শুরু করেছিল।

বেলা বাড়লে প্রাসাদের দিক থেকে শিঙার শব্দ শোনা যেতে লাগল। সবাই উদ্‌গ্রীব। ঐ মিছিল এল। প্রথমে জনা কুড়ি শিঙা-বাদক। তারপর এক দল সৈনিক।

তাদের কি সাজের ঘটা! তারপর জনতার জয়ধ্বনিতে আকাশ ফাটে। সিংহ-টানা রথে চড়ে একলা সম্রাট। সিংহের সোনার লাগাম বলিষ্ঠ নিগ্রোরা টেনে ধরে রেখেছে। রথের পিছনে বাঁধা বন্দীদের দেখেই আসলে ঐ আনন্দধ্বনি। এরা আজ খেলা দেখাবে। কি সব গণ্যমান্য খেলোয়াড়। বাগেগোদের প্রধান নিউটো, পুবের সেনাপতি সিসিলিয়াস মেটেলাস, সেখানকার সম্রাটের ভাইপো ক্যাসিয়াস হাস্তা। কিন্তু সব চেয়ে জয়ধ্বনি পেল বাঘছাল পরা লম্বাটে চওড়া চমৎকার চেহারার বিদেশী বুনো বন্দী। কেমন মাথা তুলে হাঁটছে। গলায় সোনার কলার। সিংহের সঙ্গে যেন সিংহ চলেছে! তাদের পিছনে বলিষ্ঠদেহ নিগ্রো খেলোয়াড়রা। সবসুদ্ধ হয়তো, শ দুই হবে।

শোভাযাত্রায় প্রিক্লারাসকে না দেখে ডিলেকটার বড় ভাবনা হোল। কেউ কাছে নেই যে বলে দেবে সে এখনো বেঁচে আছে কিনা। ম্যাক্সিমাস প্রিক্লারাসকে সকলে ভালোবাসত। আসলে, তাই ওকে চেন করে নিয়ে যাবার সাহস হয়নি সাবলাটাসের।

এর আগে কোনো সীজার এমন ঘটা করে শোভাযাত্রা করেনি। কত রকমের তামাসার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু ডিলেক্টার কখনো খেলা দেখতে এসে এত ঘৃণা, এত ভয় হয়নি। এতাবৎ খেলার ব্যক্তিগত দিকটা অনুভব করেনি ডিলেক্টা। কত মানুষকে মরতে দেখেছে, কখনো কিছু মনে হয়নি। সংস্কৃতির এমনি প্রভাব। এবার সব পাল্টে গেছিল। একজন লোক এসে ওর পাশের বেঞ্চে বসে বলল, 'সে নেই ওখানে।'

—'কি করে জানলে?'

—'আমার আদেশেই সে নেই।'

ডিলেক্টা বলল, 'তা হলে সে মরে গেছে। তুমি তার মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছ!'

ফাস্টাস বলল, 'না, সে নিরাপদে বন্দীশালায় আছে। যদি তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হও তাকে অ্যারিনাতে আনাই হবে না।'

—'সে তা চাইবে না।'

—'তোমার উত্তরের ওপর শুধু ওর ভাগ্যই নয়, ওর মায়ের, তোমার মা-বাবার আর তোমার ভাগ্য নির্ভর করছে।' এই বলে সে চলে গেল।

আগে ছোটোখাটো খেলা হল। কিছু লোক মারা গেল। বাদাম চিবোতে চিবোতে সকলে মজা দেখল।

আসল খেলা হবে হাস্তা, মেটেলাস আর সাদা দৈত্যকে নিয়ে। সেগুলো শেষের দিনে করলে জমবে ভালো।

প্রথম দিন টারজানকে একটা খুনীর সঙ্গে লড়ানো হল। তাকে টারজানের মতো পোষাকও পরানো হল। ক্রীড়াঙ্গন থেকে বন্দীশালায় যাবার দরজা খোলা রইল। যাতে ভয় পেলে খেলোয়াড় পালাতে পারে। তাহলে ধরে নেওয়া হয়, সে হেরে গেছে।

টারজানের প্রতিদ্বন্দ্বী কম পালোয়ান ছিল না। খুনে গুণ্ডা সে। টারজানকে নানাভাবে টিটকিরি দিতে লাগল। খেলার শুরুতেই টারজান তাকে তুলে আছাড় ছিল। লোকটা আধা অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল একটুক্ষণ। দর্শকরা বুড়ো আঙুল নামিয়ে তার মৃত্যু দাবি করতে লাগল। সে লোকটা কোনো মতে উঠে দাঁড়াতেই আরেকটা আছাড় খেল। দর্শকরা আবার বুড়ো আঙুল নামাল। খেলার বিচারককে টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'যথেষ্ট হয়নি কি?'

সে বলল, 'ও যতক্ষণ ক্রীড়াঙ্গনে বেঁচে থাকবে, ততক্ষণ তুমি জয়ী নও।'

তখন টারজান লোকটাকে মাথার ওপর তুলে বলল, 'এই রকম করে তোমাদের সম্রাটকেও সভাঘর থেকে নিয়ে গেছিলাম।' এই বলে লোকটাকে সটাং সম্রাটের আসনের দিকে ছুঁড়ে দিল। তিনিও ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন।

টারজান বলল, 'এখন আমি ক্রীড়াঙ্গনে একলা এবং জীবিত, কাজেই আমি জয়ী!'

চারদিক থেকে সে কি কান-ফাটানো উল্লাস। স্বয়ং সম্রাট কিছু বলতে সাহস পেলেন না।

*

রক্তমাখা দিনের পর নিদ্রাহীন রাত কাটতে লাগল। ঐ ঘরের তিনজন বন্দী প্রাণ হারাল। টারজান তখনো পালাবার ব্যবস্থা করেনি। কেউ অবিশ্যি তা আশাও করেনি, ভেবেছিল ওটাও তামাসা। টারজান বলল, 'আমি যতদূর বুঝেছি, পালাবার সময় আসছে এবং আমরা পালাব।'

হাস্তা বলল, 'সম্রাটের অর্ধেক সেনাবাহিনী যদি কলোসিয়ামে ভিড় করে থাকে, তখন কি তা করা সম্ভব হবে?'

টারজান বলল, 'যখন সব জয়ীরা ক্রীড়াঙ্গনে সমবেত হবে, তখন সম্রাটকে টেনে নিচে নামাব।'

—'কি করে?'

—'মানুষের ওপর মানুষ চড়ে সিঁড়ি বানিয়ে। কয়েক-

জন হয়তো প্রাণ হারাবে, কিন্তু নামাতে পারব ঠিকই।'

প্রিক্লারাস বলল, 'আমিও থাকতে পারলে বেশ হত।'

—'দাঁড়াও তার একটা উপায় ভাবি। তোমার কাছে বন্দীশালার চাবি ছিল, সেগুলো কি নিয়ে নিয়েছে?'

—'না, চেয়েছিল। আমি বলেছি সৈনিকরা নিয়ে গেছে। আসলে আমার কিছু দামী জিনিসের সঙ্গে লুকিয়ে রেখেছি।'

—'ওগুলো পেলেই কেল্লা ফতে।'

—'কি করে পাবে?'

—'দেখি কি করা যায়।'

কিছু পরে প্রাসাদের একদল রক্ষীর সঙ্গে ফাস্টাস এসে বলল, 'প্রিক্লারাস কোথায়?'

কোনো উত্তর নেই।

—'উঠে দাঁড়া, দাস। সীজারের সামনে বসে আছিস যে!'

—'সীজারের চেয়ে শূওর বললে বেশি মানাত।'

ফাস্টাস সৈনিকদের বলল, 'ওদের টেনে তোল। মার দাও!'

রক্ষীদের অধ্যক্ষ সামনে এসে সৈনিকদের বলল, 'সরে যাও। শুধু সীজারের আর আমার হুকুম এখানে চলে। ফাস্টাস এখনও সীজার হয়নি।'

—'হব তো একদিন। তখন তোমাকে দেখে নেবো।'

—'আপাতত সরে দাঁড়াও। তুমি যেদিন সীজার হবে সেটা নগরের পক্ষে বড় দুর্দিন হবে। যা বলার বলে, এখন চল।'

—'আমি প্রিক্লারাসকে আমার বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এসেছি। ডিলেক্টার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে।'

প্রিক্লারাস কিছু বলল না দেখে, এগিয়ে গিয়ে ফাস্টাস তার গালে এক চড় মেরে মুখে থুথু দিল। অমনি টারজান তার ঠ্যাং ধরে টেনে মাটিতে শুইয়ে দিল। রেগে সে ছোরা আর তলোয়ার বের করার চেষ্টা করতেই, টারজান সে দুটো কেড়ে নিয়ে, ওকে সৈনিকদের দিকে ছুঁড়ে দিল।

অধ্যক্ষ বলল, 'এবার ভালোয় ভালোয় চলে যাও, ফাস্টাস। বড় বেশি বাড়াবাড়ি করেছ।'

ফাস্টাসের লজ্জা নেই। সে বলতে লাগল, 'এর জন্য সবাইকে দেখে নেব!'

সবাই চলে গেলে পরেও ক্যাসিয়াস হাস্তা হাসি চাপতে পারছিল না, 'সীজার না শূওর!'

একটু পরেই করিডরে অল্প আলো দেখা গেল। রক্ষীদের অধ্যক্ষ অ্যাপিয়াস অ্যাপ্লোসাস ফিরে এসেছিল।

প্রিক্লারাস বলল, 'ও বড় ভালো লোক, ও খুনী নয়।'

—'খুনী নই ভাই, কিন্তু বড় দুঃসংবাদ দিয়ে গেল ফাস্টাস। ডিলেক্টা তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে শুধু তোমাকে নয়, তোমার মা-কে আর ওর মা-বাবাকে বাঁচাতে।'

—'তাই তো। সেটা তো বন্ধ করতেই হবে।'

অধ্যক্ষ বলল, 'এ হোল সীজারের ছেলে, আর সময় বড় কম।'

তখন টারজান বলল, 'এ কি তোমার বন্ধু, প্রিক্লারাস? একে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়?'

—'আমার প্রাণ দিয়েও।'

—'তাহলে ওকে বলে দাও চাবিগুলো কোথায়, ও এনে দেবে।'

অধ্যক্ষ বলল, 'নিশ্চয় দেব।'

—'শোন ভাই, আমাদের বাড়িতে আমার ঘরের বইয়ের তৃতীয় তাকের পিছনটা ঠেলে দিলেই সরে যায়। সেই খোপে আমার চাবি আছে।'

—'বেশ আমি এনে দিচ্ছি।'

খেলার শেষ দিন আগত। শেষ বারের মতো খেলোয়াড়দের ক্রীড়াঙ্গনের দরজার কাছের কুঠরিতে নিয়ে যাওয়া হোল। বারোজনের মধ্যে আটজন বাকি ছিল। প্রিক্লারাস সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল। অধ্যক্ষ চাবি এনে দেয়নি। কিছু করা যায় নি।

যে ঘরে বন্দীদের এখন রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে ক্রীড়াঙ্গনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিছু দেখা যাচ্ছিল না। মস্ত ঘর, জানালায় মোটা মোটা শিক লাগান। একমাত্র দরজা। যত জনকে একেকবার খেলতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ফিরছিল তার অর্ধেক। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। মেটেলাসকে একজন গ্ল্যাডিয়েটরের সঙ্গে লড়তে নিয়ে গেছিল। শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছিল খেলা খুব জমেছে। তারপর সব চুপ। তারপর চিৎকার। হাস্তা আস্তে আস্তে বলল, 'সব শেষ!'

টারজান চুপ। এ লোকগুলোকে তার বড় ভালো লেগেছিল। কি সাহসী, সরল, বিশ্বাসী। হাস্তা অস্থির ভাবে পাইচারী করছিল, টারজান চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। একটু পরেই মেটেলাস এল। হাস্তা ছুটে গিয়ে বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

দরজাটা আবার খুলে গেল, 'চল সকলে। এই শেষ খেলা।'

বাইরে গেলে প্রত্যেককে একটা তলোয়ার, ছোরা, বর্শা, ঢাল আর জাল দেওয়া হোল।

এই খেলায় সপ্তাহব্যাপী ক্রীড়ার শেষে, যে ক'জন জীবিত ছিল, সকলে যোগ দেবে। মোট একশো জন লোক। তাদের দুই দলে ভাগ করে, এক দলের কাঁধে লাল রিবন, এক দলের সাদা রিবন বেঁধে দেওয়া হোল। লড়াই চলতে থাকবে যতক্ষণ না একটা দলের সকলে নিহত হয়। সুখের বিষয়, টারজান, হাস্তা, মেটেলাস, লুকেদি, এমপিঙ্গু, ওগোনিও সকলেই লাল ফিতের দলে পড়েছিল।

টারজান বর্শা আর ছোরা খেলায় ওস্তাদ ছিল। কিন্তু ঢাল, তলোয়ার আর জাল নিয়ে অসুবিধা লাগছিল। যে যার সামনের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়তে শুরু করবে, এই হোল নিয়ম! টারজান আর একজন দক্ষ কালো যোদ্ধা বর্শা নিয়ে লড়ল। সে বেচারার প্রাণ গেল। তারপর দুই দলে ঘোর যুদ্ধ লেগে গেল। রক্তের মর্মান্তিক নেশায় সেই উন্মত্ত হানাহানি আমরা ভাবতে পারি না।

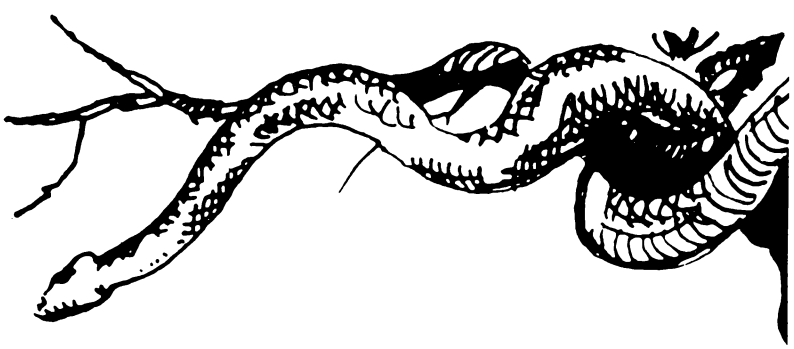

তারি মধ্যে পিছন থেকে একজন শ্বেতাঙ্গ শত্রু টারজানের মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে জাল ফেলল। মাছের দশা হোল টারজানের।

*

ওদের বিপক্ষে যারা লড়ছিল তাদের মধ্যে অনেক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত পেশাদার খুনেও ছিল। মানুষ মারার সব কৌশল তাদের নখাগ্রে। ক্যাসিয়াস হাস্তা টারজানের দুর্দশা লক্ষ্য করে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করে সেদিকে ছুটে এল।

টারজান যখন জাল-ফেলিয়ের মোকাবিলা করছিল, হাস্তা তার পিছন দিকের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছিল। সে এক দক্ষ গ্ল্যাডিয়েটর। হাস্তার অত অভিজ্ঞতা না থাকলেও, তার মতো তলোয়ার খেলোয়াড় কম।

দর্শকরা কখনো এক খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানায় কখনো তাকেই টিটকিরি দেয়। জাল-ঢাকা পড়ে টারজান শত্রুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে টেনে জাল ছিঁড়ে ফেলে, তাকে ধরে সিংহ যেমন শিকার ধরে ঝাঁকি দেয়, তেমনি করে ঘাড় মটকে মেরে ফেলল। তারপর আরেক-জনেরো সেই দশা হল।

এদিকে ক্যাসিয়াস হাস্তা পড়ে গেছিল সাদা শত্রুর আঘাতে। সে তাকে শেষ করবার জন্য তলোয়ার তুলেছিল, কিন্তু টারজান তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকেও শেষ করে দিল। হাস্তা মরেনি, ক্রমে জ্ঞানও ফিরে এসেছিল। তখন পনের জন লাল ফিতে আর দশজন সাদা ফিতে বাকি ছিল। বাকিটা বলে কি হবে? টারজানের পরিচালনায় ঐ পনের-জন লাল ফিতে শেষ অবধি দাঁড়িয়ে রইল। সাদারা সকলে প্রাণ দিল। সম্রাটের মুখ রাগের চোটে সাদা হোল।

জয়ীদের মুক্তি দেবার নিয়ম। তা না করে অন্যদের আবার বন্দী করে, টারজানকে একা ক্রীড়াঙ্গনে দাঁড়াতে বলা হোল। জনতা ভেবেছিল তাকে সম্রাট পুরস্কার দেবেন। তার বদলে তিনি ঘোষণা করলেন, টারজান একটা শেষ খেলা দেখিয়ে সকলকে আনন্দ দেবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষুধার্ত সিংহকে সেখানে ছেড়ে দেওয়া হোল। বলা বাহুল্য সিংহ মারতে টারজানের বেশি সময় লাগেনি। দর্শকরা ততক্ষণে সম্রাটের নিচ ব্যবহারে রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল। তারপর যখন সম্রাট বললেন টারজান আরো একটা খেলা দেখাবে, তখন তারা মারমূর্তি হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে ক্রীড়াঙ্গন সাফ করে সকলে চলে গেছিল। আবার টারজান একা। সিংহ মেরে সে একটা বিকট জয়-ধ্বনি দিয়েছিল।

*

এবার দরজাটা খুলে ছয়টা গোদা বনমানুষ হিংস্র মূর্তি ধরে বেরিয়ে এল। মজা হোল, তাদের টারজান চিনতে পারল, গায়াট, জুথো, গোইয়াদের দল এরা। তাদের ভীষণ মূর্তি দেখে দর্শকরা চ্যাঁচাতে লাগল 'সীজারের পতন হোক! সাবলাটাসের মরণ হোক!'

হয়তো অত সৈন্যসামন্ত বর্শা হাতে নিয়ে সামনে না থাকলে একটা কিছু হোত। কিন্তু যারা সীজারের দিকে ক্ষিপ্তের মতো তেড়ে গেছিল, রক্ষীদের বর্শায় তাদের অনেকের প্রাণ গেল। বাকিরা বসে পড়ল।

বনমানুষরা যেমনি বোকা হয়, তেমনি তাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়। টারজান নিজের পরিচয় দিলেও, ঐ সব পুরনো সঙ্গীদের তাকে চিনতে একটু সময় লাগল। শেষটা তাকে শুঁকেটুঁকে তবে নিশ্চিন্ত হোল। সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত। অমন হিংস্র প্রাণী, অথচ টারজানকে কিছু বলছে না। তার বদলে ওর সঙ্গে বুনো ভাষায় কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছে!

টারজান এগিয়ে গিয়ে সম্রাটকে বলল, 'তোমার মৎলব ব্যর্থ হয়েছে, সীজার। এরা আমার জাতভাই। আর কাউকে যদি আমার পিছনে লেলিয়ে দিতে চাও, তা হলে দেরি করো না। আমার ধৈর্য ফুরিয়ে আসছে। আমি বললেই, এরা তোমার কাছে গিয়ে তোমাকে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলবে।'

টারজান বুঝতে পারে নি যে ঐ ছিল বিদ্রোহের উচিত সময়। জনতা সম্রাটের ওপর এমনি ক্ষেপে উঠেছিল যে রক্ষীরা কিছু করতে পারত না। তাদের অনেকেই জনতার সঙ্গে যোগ দিত। টারজান ভাবল এরিককে, ক্যাসিয়াস হাস্তা আর মেটেলাসকে উদ্ধার না করে মরা ঠিক হবে না। তাই ক্রীড়াঙ্গন থেকে ফিরে গেল সে। জুথোদেরো তো মুক্তি দিতে হবে।

ঘরে শুধু প্রিক্লারাস ছিল। জেলার বলল, 'তোমার বন্ধুরা অন্য ঘরে চেন-বাঁধা হয়ে আছে।'

টারজান অবাক হোল, 'জয়ীদের তো মুক্তি পাবার কথা। এই কি সীজারের ন্যায় বিচার?'

জেলার বলল, 'মুক্তি তো তোমারও পাওয়া উচিত। পেয়েছ কি?'

প্রিক্লারাস বলল, 'দেবতারা বিমুখ হয়েছেন। তাই আমার বন্ধুও আমাকে ত্যাগ করেছে।'

—'অ্যাপ্লোসাসের কথা বলছ কি?'

—'হ্যাঁ, চাবি পেলে এখনো পালানো যায়।'

সেই রাতে চাবি খুলে অ্যাপ্লোসাস এসে দু'জনার মাঝখানে বসার আগে মশাল নিবিয়ে ফেলল। 'তোমরা নিশ্চয় ভাবছ আমি বিশ্বাসঘাতকতা করে চাবি আনিনি? ব্যাপার হোল, আসতে পারিনি। আমার ঐ পদ গেছে। সম্রাট বোধহয় আমাকে সন্দেহ করেন। অন্য পদে বসিয়েছেন। পোর্টা প্রিটোরিয়াতে আমার ডিউটি থেকে ছুটিই পাচ্ছিলাম না। সম্রাটের বড় ভয় নাগরিকরা বিদ্রোহ করবে। সে যাই হোক, একজন তরুণ বন্ধুর কাছে শুনে এলাম রক্ষীদের একজনকে হুকুম দেওয়া হয়েছে আজ রাতে তোমাদের সকলকে খুন করা হবে। এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে, প্রিক্লারাস, তোমার মায়ের সাহায্যে চাবি নিয়ে এসেছি। এই নাও, ধর। আর কি করতে হবে বল।'

প্রিক্লারাস বলল, 'কিছু না। তুমি শীগ্‌গির যাও।'

—'যাচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো পোর্টা প্রিটোরিয়ার দরজায় আমি আছি।'

কিন্তু সে চলে যাবার আগেই আলো দেখে, অ্যাপ্লোসাস দরজার অন্য পাশে লুকিয়ে পড়ল। একটা লম্বা কালো ক্লোক পরা লোক এসে ডাকল, 'ম্যাক্সিমাস প্রিক্লারাস, সীজার চিঠি দিয়েছেন?'

প্রিক্লারাস বলল, 'ধারাল চিঠি?'

—'খুব ধারাল। ভগবানের নাম কর।' এই বলে তলোয়ার বের করে দরজা ঠেলে ঘরে যেই ঢুকেছে, অ্যাপিয়াস অ্যাপ্লোসাসের তলোয়ার বজ্রের মতো মাথায় পড়ে, হেলমেট ভেঙে তার মগজে পৌঁছল। তার হাতের মশালটাও নিবে গেল।

—'এবার যাও, অ্যাপ্লোসাস, নিজের ডিউটিতে। যা করেছ তার তুলনা হয় না।'

সে বলল, 'চাবি রইল। এবার কেউ কিছু টের পাবার আগে সরে পড়।'

সে চলে গেলে ঐ চাবি দিয়ে আগে নিজেদের হাতের তালা খুলল প্রিক্লারাস। তারপর ঘরে ঘরে গিয়ে সব বন্দী-দের মুক্তি দিল। লুকেদি, এমপিঙ্গু, ওগোনিও। ক্রীড়াঙ্গনের কাছে মেটেলাস আর হাস্তা ছিল। সকলে ছাড়া পেল। সবাই টারজানের কাছে বশ্যতা স্বীকার করল। একজন গ্ল্যাডিয়েটর বলল, 'ন্যায়, অন্যায় বুঝি না। লড়াই করতে হলেই আমি তৈরি।'

প্রিক্লারাস বলল, 'চল তাহলে। সকলকে মুক্ত করা হয়েছে।'

টারজান বলল, 'দাঁড়াও, আমার বনমানুষ বন্ধুদেরো ছেড়ে দিই আগে।'

*

ক্যাস্ট্রাম মেয়ারের সম্রাট ভ্যালিডাস অগাস্টাসের ভূ-গর্ভস্থ বন্দীশালায় এরিক ভন হারবেন আর ম্যালিয়াস লেপাস সম্রাটের শোভাযাত্রা আর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য অপেক্ষা করছিল। লেপাস বলছিল, 'আমাদের মরণ হবেই। বন্ধুরা হয় কারাবাসী, নয় নির্বাসিত। অগাস্টাসের নিজের ভাইপো ক্যাসিয়াস হাস্তার ওপর বিরাগ ফালবাস ফুপাস আরো উস্কিয়ে দিয়েছে।'

এরিক বলল, 'সব দোষ আমার।'

—'তা বল না, ফাবোনিয়া তোমাকে ভালোবাসে, সেটা তো অপরাধ নয়। অপরাধী হল ঐ হিংসুটে চক্রান্তবাজ ফুপাস।'

—'আমিই ফাবোনিয়ার আর তার আত্মীয়দের দুঃখের কারণ। অথচ এখানে বাঁধা আছি, কিছুই করতে পারছি না!'

লেপাস বলল, ক্যাসিয়াস হাস্তা এখানে থাকলে, গোটা নগর অগাস্টাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত।'

ঠিক ঐ সময় ক্যাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনেরিয়াসের সভাঘরে নগরের সব গণ্যমান্যরা সেজেগুজে জমায়েত হয়েছিল। সম্রাটের ছেলে ফাস্টাসের সঙ্গে ডায়ন স্পেণ্ডিডাসের সুন্দরী মেয়ের বিয়ে। তারপর মস্ত ভোজ হবে। ভিতরে যতই উৎসব আনন্দ হক না কেন, বাইরের রাজপথে শহরের আর চারদিকের সাধারণ লোকরা ক্ষেপে উঠে মহা গোলমাল করছিল।

—'অত্যাচারী সম্রাট নিপাত যাক!'

—'সাবলাটাস তুমি মর।'

সে চিৎকার সভাঘরেও পৌঁছচ্ছিল, কিন্তু সকলেই নিশ্চিন্তে বসেছিল, কারণ জনতাকে ঠেকাবার জন্য সৈনিক-দের অনেক টাকাকড়ি দেওয়া হয়েছিল। ঘুষ পেলে রাজার সৈনিকরা সব করতে পারে।

এই সমস্ত জাঁকজমকের পিছনে কিন্তু একটা সমস্যা ছিল। বিয়ের কনের মত পাওয়া যায় নি। তা না পেলে রোমান বিয়ে হয় না। কন্যা তার জামার বুকে ছোট একটা ছোরা নিয়ে এসেছিল। সম্রাটের কাছে সে মুক্তির জন্য আরজি করবে। না পেলে, নিজের মুক্তির ব্যবস্থা নিজে করবে।

ফাস্টাসকে কখনোই বিয়ে করবে না।

কলোসিয়ামের নিচে টারজান তার সৈন্য-সামন্তকে সমঝাচ্ছিল। লুকেদি আর একজন গ্রাম্য প্রধানকে ডেকে বলল, 'তোমরা পোর্টা প্রিটোরিয়ার ফটকে গিয়ে অ্যাপ্লো-সাসকে বল তোমরা প্রিক্লারাসের লোক, তোমাদের যেন বেরোতে দেওয়া হয়। তারপর গ্রাম থেকে গ্রামে গিয়ে যোদ্ধার দলকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে পড়তে বল। এই সময় লড়াই করে মুক্তি আদায় করতে হবে।

এদিকে টারজান, প্রিক্লারাস, চলল গার্ড-ঘরে, সেখানকার সবাই প্রিক্লারাসের ভক্ত।

নিঃশব্দে সকলে এগিয়ে চলল, গ্রামের নেংটিপরা নিগ্রো, শহরের ক্রীতদাস, মেটে রঙের দো-আঁশলার দল, তাদের মধ্যে অগুন্তি খুনে, গুণ্ডা, চোর, পেশাদার ঠ্যাঙ্গাড়ে। সামনে চলেছে প্রিক্লারাস মেটেলাস, হাস্তা, টারজান আর টারজানের গা ঘেঁষে ছ'জন বিশাল বনমানুষ।

ওগোনিওর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে টারজান বনদেবতা, মানুষ নয়। রক্ষীরা সকলেই প্রিক্লারাসের পক্ষে, এতকাল সে-ই ওদের সামনে রেখেছিল, নইলে আগেই গণ্ডগোল হত। একদল গেল পোর্টা প্রিটোরিয়াতে, অ্যাপ্লোসিয়াসকে বলে, কিম্বা বাহুবলে সেটাকে খুলে রাখতে হবে, যাতে গ্রাম থেকে যোদ্ধারা ঢুকতে পারে!

টারজানের দলবলকে মশাল জ্বেলে রাজপথ ধরে এগোতে দেখে, প্রাসাদের বাইরের জনতা ভেবেছিল সম্রাট বুঝি আরো সৈনিক আনাচ্ছেন। রেগেমেগে কয়েকজন এগিয়েও এসেছিল, 'কে যায়?'

টারজান বলল, 'আমি টারজান!' অমনি সে কি জয়ধ্বনি!

এদিকে ফ্যাকাশে মুখে একজন চর গিয়ে সম্রাটকে জানাল, 'নাগরিকরা বিদ্রোহ করেছে।'

সম্রাট বললেন, 'সৈনিক ডাকো, রক্ষীদের ডাকো। পথে যারা বেরিয়েছে সবাইকে কচুকাটা করুক। একজনও যেন না বাঁচে।'

এ-কথাও জনতার মধ্যে ছড়িয়ে গেল। তাদের দলেও অনেক সৈনিক আর রক্ষী ছিল। টারজানও নতুন এক মৎলবে দুর্ধর্ষ গ্ল্যাডিয়েটর আর বনমানুষদের, প্রিক্লারাস, হাস্তা, মেটেলাস, এমপিঙ্গু সকলকে নিয়ে অন্ধকার বীথিকা দিয়ে নিঃশব্দে এগোল।

সম্রাটের সিংহাসনের সিঁড়ির ওপর বিয়ে হবার কথা। কন্যা তখনো মত দেয়নি। সম্রাটের কাছে রোমান মেয়েদের জন্মগত অধিকার দাবি করেছে। মত না থাকলে কোনো মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। পুরুত অপেক্ষা করে আছেন। সম্রাট আগে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, পরে

রেগে গেলেন।

ডিলেক্টা বলল, 'আমাকে কথা দিয়েছিলেন, ম্যাক্সিমাস প্রিলেক্টাকে জীবিত এবং মুক্ত অবস্থায় দেখে, তবে কথা দিতে হবে।'

সম্রাট বললেন, 'সেটা হতে পারে না। একেবারে অসম্ভব।'

ব্যালকনি থেকে কে যেন বলল, 'খুব সম্ভব। এই যে ম্যাক্সিমাস প্রিক্লারাস এখানে।'

সবাই ওপরে তাকিয়ে স্তম্ভিত হোল! টারজান আর প্রিক্লারাস সেখানে দাঁড়িয়ে! সম্রাট চ্যাঁচাতে লাগলেন 'রক্ষীদের ডাকো! গার্ড! গার্ড!'

টারজান আর বনমানুষরা থাম বেয়ে নিচে নেমে এল। একজন রাজপুরুষ তলোয়ার খুলে গায়াটের দিকে তেড়ে এল। সে তার ঘাড় কামড়ে মেরে ফেলল। তারপর জয়ধ্বনি দিল। মহিলারা অনেকে অজ্ঞান। ফাস্টাস চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দৌড় দিল। টারজানও ডিলেক্টার কাছে পৌঁছল।

বনমানুষরা মঞ্চে উঠতেই সীজারের দাঁত-কপাটি লেগে গেল। তিনি সিংহাসনের পিছনে লুকোলেন।

ততক্ষণে অন্য রাজপুরুষদের সম্বিৎ ফিরে এসেছিল। তারা সব এগিয়ে এল। ঠিক সেই সময় ব্যালকনির নিচেকার ছোট দরজা খুলে প্রিক্লারাস, হাস্তা, মেটেলাস, এমপিঙ্গু তাদের দলবল নিয়ে ঢুকে পড়ল। অমনি সভাঘরে ভীষণ লড়াই শুরু হয়ে গেল।

বাইরের রাজপথেও তাই। দূর থেকে শিঙা শুনে বোঝা গেল সম্রাটের আরো সৈনিক আসছে। ভিড়ের লোকরা গোড়ায় ভেবেছিল হয়তো ওদেরি দলের লোক। পরে বুঝল এরা সম্রাটের লোক, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে যাকে পারছে তাকেই মারছে। তখন পালানো ছাড়া উপায় রইল না।

টারজানরা একটা ছোট ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। সম্রাটের বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলেছিল। তবু ডিলেক্টা আর প্রিক্লারাস একটু সময় পরস্পরকে দেখতে পেল। দুজনেই সে আশা ছেড়ে দিয়েছিল। টারজান বলল, 'এখনি আশা ছাড়লে চলে নাকি?'

বাইরে পাথর ছুঁড়বার প্রাচীন যন্ত্র দিয়ে বড় বড় পাথর ছুঁড়ে দেওয়াল ভাঙার চেষ্টা চলছিল। র‍্যাম-রড দিয়ে দরজায় বাড়ি মারছিল। এক সময় জানালার কাছের দেয়াল আর দরজাটা, দুই-ই ভেঙে পড়ল। তখন টারজান তার বনমানুষদের লেলিয়ে দিল। যারা ঢুকবার চেষ্টা করছিল, তাদের কতক মরল, কতক ভাগল। ঘরের বন্দীরা বাগানে বেরিয়ে এল। সম্রাটের সৈনিকরা পাথর ছোঁড়ার ব্যালিস্টা ফেলে পালিয়েছিল। প্রিক্লারাস শত্রু নিধনের কাজে সেটি এবার লাগাল। কিন্তু তারা সংখ্যায় অনেক বেশি, অনেক ভালো অস্ত্রশস্ত্র তাদের। শেষ পর্যন্ত মরবার জন্য এরা সকলে তৈরি হোল।

*

হঠাৎ কানে এল বড় চেনা একটা সুর। টারজান চমকে উঠল। ওর মুখে আস্থা, আশা, বিস্ময়, অবিশ্বাস একসঙ্গে প্রকাশ পেল। যুদ্ধের ডাক দিতে দিতে দৈত্যের মতো মাথায় উঁচু, তার ওপর সাদা পালকের সাজ পরে তার ওয়াজিরি যোদ্ধারা এসে পৌঁছেছে! সবার আগে মুবিরো, তার সঙ্গে লুকেদি। যে দৃশ্য বাগানের ঐ ছোট দলটি দেখতে পায় নি, সেটা হোল গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে যে যা পারে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, বহু যুগের অত্যাচারিত হাজার হাজার গ্রামবাসী সমস্ত প্রাসাদ ছেয়ে ফেলে, এত দিনের জমানো প্রতিশোধের বাসনা চরিতার্থ করছিল। যখন সম্রাটের শেষ সৈনিক অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করল, ঠিক তখন একটা গাছ থেকে টুপ করে একটা ছোট বাঁদর টারজানের কাঁধে নেমে, তার গলা জড়িয়ে ধরল।

টারজান মুবিরোকে বলল, 'এতক্ষণে বুঝলাম তোমরা কি করে আমাকে খুঁজে পেলে!'

মুবিরো বলল, 'নিকিমা একেবারে ওয়াজিরি দেশ থেকে আমাদের নিয়ে এল। কিছুতেই ছাড়ল না। কত বার হতাশ হয়ে ফিরে যেতে চেয়েছি, ও যেতে দেয়নি। এখানে এনে তবে ছেড়েছে। এবার তাহলে বড় বোয়ানা, সকলে মিলে বাড়ি ফেরা যাক।'

টারজান বলল, 'এখুনি নয়, মুবিরো। আমার বন্ধুর ছেলে কাছেই বন্দী হয়ে আছে। তোমরা ঠিক সময়ে এসেছ। চল, তাকে ছাড়ানো যাক। এখনি যেতে হবে।'

এর পর প্রথম কাজ হল খ্যাপা গ্রামবাসীদের ঠাণ্ডা করা। বহু দিনের সঞ্চিত রাগ ছাড়া পেয়েছিল, তারা এক মরণযজ্ঞ শুরু করেছিল। তাদেরি প্রধানদের সাহায্যে তাদের থামানো গেল। টারজান কথা দিল আর তাদের গোরু-ভেড়ার মতো বিক্রি করা হবে না, মিছিমিছি মজা

দেখবার জন্য খেলা করে মরতে হবে না। এ অধিকার থেকে কেউ তাদের বঞ্চিত করলে, নিজেদের হাতে তার প্রতিকারেরো ক্ষমতা থাকবে। খবর এসেছিল সাবলাটান আর ফাস্টাস দুজনেই জনতার হাতে মারা পড়েছে। একটা ঘরে বেশ কয়েকজন রাজবাড়ির লোক নিরাপদে আছে। সে-ঘরের দরজা খুলতেই তারা সব ফ্যাকাশে মুখে বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে ছিলেন ডায়ন স্পেণ্ডিডাস। ডিলেক্টা ছুটে তাঁকে জড়িয়ে ধরল।

সব মিটে গেলে গ্ল্যাডিয়েটাররা প্রস্তাব করল টারজান যেন নতুন সীজার হয়। টারজান তার অক্ষমতা জানিয়ে, ডায়ন স্পেণ্ডিডাসের নাম করাতে সকলেই সেটা সমর্থন করল। টারজান তাঁকে বলল, 'দেখবেন যেন গ্রামের ছেলে-মেয়েদের আর কখনো ক্রীতদাস করে কেউ ধরে নিয়ে না যায়। তাদের যোদ্ধাদের ধরে এনে যেন ক্রীড়াঙ্গনে নামানো না হয়। তারা যেন চিরকাল স্বাধীনভাবে থাকতে পারে।'

ডায়ন স্পেণ্ডিডাসও এই সব কিছুতেই সম্মত হলেন।

পুবের সম্রাটের বার্ষিক শোভাযাত্রা পশ্চিমের সম্রাটের অনুষ্ঠানের মতো জমকালো হয়নি। তবে তাঁর রথের সঙ্গে বাঁধা বর্বর প্রধান যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। এরিক ভন হারবেন যদি নিজের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন না থাকত, তাহলে সে পরিস্থিতিটা খুব উপভোগ করত। আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে তার অনেক কিছু জানা ছিল। তার সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই খেলনা সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়, তা-ও জানত। কিন্তু তাতে তার উপস্থিত বিপদে কোনো সুবিধা হচ্ছিল না। শোভাযাত্রা হয়ে গেলে ওকে আবার বন্দীশালার কুঠরিতে নিয়ে যাওয়া হল। সে ঘরে লেপাসও ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন হল?'

—'তেমন কিছু নয়।'

—'সম্রাট যে বড্ড কিপ্টে।'

ভন হারবেন বলল, 'খেলা কেমন হবে?'

—'তাও তেমন কিছু হবে না। এখানে অপরাধীর সংখ্যা বড় কম। ক্রীতদাসদের টাকা দিয়ে কিনতে হয়। তাই তাদের এ-ভাবে নষ্ট করা যায় না। খেলার জন্য আনা দু'চারটে ছ্যাঁচড়া চোর-ছ্যাচোঁড় কয়েকটা জন্তু, দু একজন বিদেশী, কিম্বা তোমার আমার মতো ক্ষমতাশালী মতলবী ব্যক্তির শিকার।'

—'জিতলে আমাদের ছেড়ে দেবে?'

—'জিতব না। ফুপাস সে ব্যবস্থা করে রেখেছে।'

ভন হারবেন বলল, 'নিজেকে একটা অপদার্থ মনে হয়। ফাবোনিয়ার জন্য কিছুই করতে পারলাম না। আমার ছোকরা গাবুলা পর্যন্ত কাছে নেই।'

—'তাকে তো খুঁজতে এসেছিল সকালে।'

—'কেন, সে-ও তো বন্দী।'

—'ছিল এখানে। কিন্তু ক্রীড়াঙ্গন সাফ করতে যারা গেছিল, ও-ও তাদের সঙ্গে ছিল। তারপর থেকে সে নিখোঁজ।'

—'সে যদি পালিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারত, বেশ হোত।'

লেপাস বলল, 'তুমি যে-ভাবে নেমেছিলে, সে-ভাবে ওঠা যায় না। অন্য পথে গেলে পশ্চিমের রক্ষীরা কিম্বা গ্রামবাসীরা ওকে বন্দী করবে।'

দেখতে দেখতে খেলার সময় হয়ে গেল। রক্ষীরা ওদের ক্রীড়াঙ্গনে নিয়ে গেল। সেখানে লোকে লোকারণ্য। পুবের দাম্ভিক সম্রাট জমকালো এক সিংহাসনে বসেছিলেন। সেপ্টিমাস ফাবোনিয়াস, তাঁর স্ত্রী আর ফাবোনিয়া নিজেদের জায়গায়। মাথা নিচু করে বৃদ্ধ বসে ছিলেন। লেপাস আর এরিক ভন হারবেনকে ক্রীড়াঙ্গনে ঢুকতে দেখে, ফাবোনিয়া চোখ বুজল। তারা দুজন ছিল কুড়িজন রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে। টরাস বলে একজন গ্ল্যাডিয়েটর ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। এরিক রোমের খেলা সম্বন্ধে অনেক পড়াশুনো করেছিল। মনে মনে তার যে ছবি এঁকেছিল, এর সঙ্গে তার কত তফাৎ!

ঐ টরাসের ছেঁড়া পোষাক, জঘন্য ময়লা পা। সর্বাঙ্গে দুর্গন্ধ! এতে কোনো মহিমা নেই। ওপরে আসীন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা পর্যন্ত ঘেমো, বিশ্রী। ফাবোনিয়ার ওপর চোখ পড়ল। কি দুঃখ, হতাশা তার সুন্দর মুখে। বড় লোকদের আসনের পিছনে হঠাৎ গাবুলাকে দেখে এরিক হতভম্ব! সে চুপ করে সীজারের পিছনের পরদার আড়ালে চলে গেল। তার পরেই ওদের বন্দীশালায় ফেরার হুকুম এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট চিৎকার। এরিক তাকিয়ে ভাবল একি স্বপ্ন? গাবুলা সীজারের গলা টিপে ধরে তাঁর বুকে ছোরা বসিয়ে দিচ্ছে!

এক লাফে নিচে নেমে গাবুলা দৌড়ে এল এরিকের

কাছে। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'সীজারের মৃত্যু হয়েছে!'

কেউ আর্তনাদ করে উঠল, কেউ জয়ধ্বনি। গাবুলা বলল, 'তোমার কষ্টের প্রতিশোধ নিয়েছি, বোয়ানা!'

এরিক বলল, 'এই হল পালাবার সুযোগ। গোলমালের মধ্যে পালাই চল। সারাদিন লুকিয়ে থাকব, রাতে ফাবোনিয়াকে নিয়ে চলে যাব।'

সবাই জানত ফুপাস এবার সীজার হলে, এখানে আর টেকা যাবে না। সব বন্দীরা বন্দীশালার দিকে ছুটল। পেশাদার গ্ল্যাডিয়েটাররা রইল, কিন্তু বাধা দিল না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বন্দীরা বড় রাস্তায় বেরিয়ে এল। কয়েকটা রক্ষী ছিল, কিছুই করতে পারল না। লেপাস বলল, 'একসঙ্গে থাকলে ধরা পড়ব। এসো, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ি!'

এরিক বলল, 'কিন্তু আমরা ক'জন একসঙ্গে। গাবুলা, তুমি সঙ্গে থাকবে।'

সামনে একটা নিচু দেয়াল, তার পিছনে গাছপালা। ওরা পাঁচিল টপকে সেখানে ঢুকল। আগাছায় ভরা, অযত্নে পড়ে থাকা জায়গা। এগিয়ে দেখে একটা পরিত্যক্ত, ভাঙাচোরা বাড়ি।

এরিক ভন হারবেন বলল, 'এখানে রাত অবধি লুকিয়ে থাকা যাবে। তারপর ফাবোনিয়াসের বাড়িতে একবার যেতে হবে।'

*

এদিকে ক্যাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনেরিয়াস থেকে বড় রাস্তা ধরে পাঁচ হাজার লোক এগিয়ে আসছিল। টারজানের পিছনে, সাদা পালক উড়িয়ে ওয়াজিরিরা, প্রিক্লারাসের পিছনে বলিষ্ঠ সৈনিকরা, তার পিছনে হাজার হাজার গ্রাম্য যোদ্ধা। পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র, ব্যাটারিং-র‍্যাম ইত্যাদি নানা যুদ্ধ সরঞ্জাম ঠেলে নিয়ে আসছিল দাসরা। ওয়াজিরিরা যুদ্ধের গান গাইছিল। সৈনিকরা অভ্যাস মতো গজগজ করছিল! গ্রাম্য যোদ্ধারা ফুর্তির চোটে হাসছিল, গাইছিল।

ওরা যখন কেল্লার কাছে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময় বাহকরা অগাস্টাসের মৃতদেহ বয়ে প্রাসাদের দিকে চলেছিল। ফুপাস নিজেকে সীজার ঘোষণা করতে ব্যস্ত ছিল, যদিও মনে বড় ভয় ছিল ভবিষ্যতে না জানি কি হবে। সঙ্গে ছিল খোশামুদে মোসায়েবরা। শহরময় বিদ্রোহী বন্দীদের আর সীজারের হত্যাকারীকে খোঁজা হচ্ছিল। একটা অসুবিধা ছিল ঐ হত্যাকারীকে চিনত না।

যে কজন বন্দী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়নি, তারা ছিল দণ্ডিত অপরাধী আর বদমায়েস গ্ল্যাডিয়েটর। তারা মনে মনে মৎলব আঁটছিল এই ফাঁকে যদি ফাবোনিয়াসের মেয়েটাকে চুরি করে আনা যায়, তাহলে নিশ্চয় নতুন সীজার তার ভাবী স্ত্রীর মুক্তির জন্য অনেক টাকাকড়ি দেবে। একজন বলল, 'আমাদের মেরেও ফেলবে।'

—'আমাদের তো প্রাণদণ্ড দিয়েইছে, তবে আবার কিসের ভাবনা?'

তাই ঠিক হোল। মুক্তিপণের টাকাটা সমান ভাগ হবে।

ক্যাস্ট্রাম মেয়ারের তোরণের কেল্লায় পৌঁছতে টারজানদের রাত হয়ে গেল। কেল্লা অধিকার করার ভার ছিল ক্যাসিয়াস হাস্তার ওপর। সে তার যুদ্ধযন্ত্রগুলো সাজাতে লাগল। ঐ পোড়োবাড়িতে বসে এরিক আর লেপাস ঠিক করেছিল মাঝরাতের আগে কেউ বেরোবে না। এটা এরিকের খুব পছন্দ হচ্ছিল না।

লেপাস বলল, 'তখন ফুপাস নতুন সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হতে ব্যস্ত থাকবে, তাই ফাবোনিয়া কয়েক ঘণ্টা রেহাই পাবে। পথের রক্ষী কম থাকবে। দূর থেকে তাদের মশাল দেখা যাবে। মামার বাড়ীর বাগানের চাবি আমার কাছে। ঢুকবার অসুবিধা হবে না।'

এরা যখন এই সব আলোচনা করছে, সেই সময় এক ছোকরা গিয়ে ফাবোনিয়াসের দরজায় টোকা দিল। এক দাস দরজার খোপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করল কি দরকার!

ছোকরা বলল, 'আমি ট্যাবার্নেরিয়াসের দোকান থেকে কিছু কাপড় দেখাতে এনেছি। এঁরা আমাকে চেনেন। আমি ট্যাবার্নেরিয়াসের ছেলে। এ-সব দামী জিনিস নিয়ে

পথে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছি না। বাইরের ঘরে একটু বসি, তুমি খবর দাও।'

লোকটা দরজা খুলে যেই ভিতরে গেছে, অমনি বাইরের ঝোপঝাপ থেকে একদল লোক ঢুকে পড়ল। কিন্তু দ্বাররক্ষী ফিরে এসে বলল, 'ওঁদের কাপড় চোপড় দরকার নেই।'

তখন ছোকরা বলল, 'আসলে ফাবোনিয়ার জন্য একটা গোপন বার্তা এনেছি। বললেই তিনি বুঝবেন কার কাছ থেকে।'

এই কথা শুনে ফাবোনিয়া তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, 'বল, বল, কি খবর।'

—'চাকরটাকে যেতে বলুন।'

তাকে বিদায় করে দেওয়া হোল। সে গেলেই ফাবোনিয়া বলল, 'তার কাছ থেকে এসেছ? কোথায় সে?'

—'ঐ তো পাশের ঘরে।'

এই বলে তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়েই মুখ চেপে ধরল। দেখতে দেখতে অন্যরা ওকে ধরে বেঁধে ফেলল। দলের পাণ্ডা বলল, 'একজন এই মুক্তিপণ দাবির চিঠিটা এমন জায়গায় রেখে এসো যাতে প্রাসাদের গার্ডরা সহজেই দেখতে পায়। দুজনে এই মেয়েকে ক্রীড়াঙ্গনের পিছনের সেই পোড়োবাড়িতে লুকিয়ে রাখবে। বাকিরা নানা জায়গায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। পোড়োবাড়ি চেনো তোমরা?'

—'তা চিনি না? সেখানে কত রাত কাটিয়েছি।'

ট্যাবার্নেরিয়াসের ছেলে বলল, 'দাঁড়াও। আমাকে ছাড়া এ কাজ হত না, কাজেই অর্ধেক আমার প্রাপ্য, বাকি পণ তেমোদের।'

দলের পাণ্ডা বলল, 'চোপ, নইলে কিছু পাবে না।'

—'পাঁজরায় একটা ছোরা ছাড়া।'

এই সব বকতে বকতে ফাবোনিয়াকে একটা নোংরা চাদরে জড়িয়ে ওরা রওনা দিল। দোকানদারের ছেলে উল্টো দিকে চলল।

একজন ছেঁড়া পোষাক পরা ছোকরা সম্রাটের প্রাসাদে একটা চিঠি নিয়ে, দ্বাররক্ষীদের বলল, 'সীজারের জন্য খবর আছে।'

তাদের কি হাসি! 'তাঁকে ডেকে আনতে হবে নাকি?'

—'তাঁকে বলে এসো ফাবোনিয়াসের মেয়েকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে ক্রীড়াঙ্গনের উল্টোদিকে পোড়োবাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে।'

—'তুমি কে?'

—'সে থাক না। কাল এসে পুরস্কার নিয়ে যাব।'

সেই পোড়োবাড়িতে ভন্ হারবেন বসে বসে অস্থির হয়ে উঠেছিল। এমন সময় কানে একটা শব্দ এল। যেন কেউ গেট খুলল। তিনজনে তলোয়ার নিয়ে ছাদে উঠে গেল। এরিক শুনতে পেল কারা কথা বলছে, 'যাক্! কেউ দেখতে পায়নি।'

—'বেঁচে আছে তো? নিশ্বাসের শব্দ শুনছি না কেন?'

—'গ্যাগটা খুলে দাও।'

—'অমনি চ্যাঁচাবে।'

—'না, না, যাতে না চ্যাঁচায় তার ব্যবস্থা করছি। শোন, যদি না চ্যাঁচাও তো গ্যাগ খুলে দেব।'

—'চ্যাঁচাব না।'

সেই প্রিয় কণ্ঠস্বর শুনে এরিক চমকে উঠল। হয়তো ওর কল্পনা। সে-কণ্ঠ নয়।

প্রথম লোকটা বলছিল, 'চুপ করে থাকলে, সীজার মুক্তিপণ দিলেই ছেড়ে দেব।'

—'আর যদি না দেয়?'

—'তোমার বাবা নিশ্চই দেবেন।'

আরেকটু অপেক্ষা না করেই, এরা তিনজনে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। দুষ্কৃতকারীরা ভাবল বুঝি সম্রাটের সৈনিকরা এসে পড়ছে। অমনি চোঁ-চাঁ দৌড়। একটা লোককে ওরা ঘায়েল করল। এরিক ফাবোনিয়ার বাঁধন কেটে দিল।

লেপাশ বলল, 'বদমায়েসগুলো আমাদের কাজ এগিয়ে দিল দেখছি।'

নিশ্চিন্ত হবার সময় ছিল না। রাজপথে আলো দেখে গাবুলা জানিয়ে দিল অনেক সৈনিক আসছে।

ওরা ভেবেছিল তারা সামনে দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু তারা বাগানে ঢুকে খোঁজাখুঁজি লাগাল। বাড়ির ছাদে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফাবোনিয়া সর্বাঙ্গ ন্যাকড়া-চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

সৈন্য সাজিয়ে হাস্তা দেখল বড় বেশি রাত হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত পতাকা উড়িয়ে শান্তি-মিছিল করে ওরা রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চলল। কেল্লার সকলে ভাবছিল সাবলাটাস সেনাদল পাঠিয়েছে। ফুপাসের কাছে খবর গেছিল। কেল্লার অধ্যক্ষ শান্তি পতাকা দেখে জিজ্ঞাসা করল তারা কি চায়।

ক্যাসিয়াস হাস্তা এগিয়ে এসে বলল, 'অগাস্টাসের কাছে আমাদের দুটি দাবি আছে। এখনি ম্যালিয়াস লেপাসকে আর এরিক ভন্ হারবেনকে মুক্তি দিক। আর দ্বিতীয় দাবি হোল আমাকে ক্যাস্ট্রাম মেয়ারে ফিরে এসে আমার ন্যায্য পদ অধিকার করতে দিক।'

অফিসার বলল, 'কে তুমি?'

—'আমি ক্যাসিয়াস হাস্তা।'

সে বলল, 'দেবতাদের কত দয়া। ঠিক সময়ে এসেছেন আপনি। অগাস্টাস নিহত হয়েছেন। ফালবিয়াস ফুপাস সীজারের পদ অধিকার করেছে। ক্যাস্ট্রাম মেয়ারের সমস্ত নাগরিকরা আপনাকে স্বাগত জানাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে গেল। দলে দলে নাগরিকরা, সৈনিকরা, উল্লাস করতে লাগল। নতুন সম্রাটের শোভাযাত্রা রাজপথ ধরে এগোতে লাগল।

এদিকে সেই পোড়োবাড়িতে সৈনিকরা ঢুকতেই লেপাস বলল, 'আমরা নির্বিবাদে বন্দীশালায় যাচ্ছি।'

—'মেয়েটি কোথায়?'

—'কোন মেয়ে?'

—'যাকে তোমরা চুরি করে এনেছ।'

এরিক বলল, 'তাকে পেলে তার বাপের কাছে পৌঁছে দেবে তো?'

—'আমাদের হুকুম ওকে সীজারের কাছে নিয়ে যেতে হবে আর চোরদের মেরে ফেলতে হবে।' তাই শুনে এরা তিন জন এমনি হিংস্রভাবে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যে অফিসারটি রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল। নিচে গিয়ে সৈনিকদের বলল, 'ও ঘরে তিনটে লোক আছে, তাদের মেরে ফেল। কিন্তু মেয়েটির যেন আঘাত না লাগে।'

তখনো হুকুম দেওয়া শেষ হয়নি, এমন সময় একটা হৈ-চৈ উঠল, লোকজন ছুটতে লাগল। অফিসারটি বলল, 'কি হয়েছে? ছুটছ কেন?'

—'ভালো ব্যাপারই হয়েছে। বিশাল সৈন্য নিয়ে ক্যাসিয়াস হাস্তা দেশে ফিরেছে।'

এদের কথাবার্তা লেপাসের কানেও গেছিল। 'ক্যাসিয়াস হাস্তা এসেছে। সে সেপ্টিমাস ফাবোনিয়াসের কোনো বন্ধুর অনিষ্ট হতে দেবে না।' সৈনিকদের বলল, 'শুনলে তো? তবে সরে যাও, যদি ভালো চাও।'

অফিসারটিও বলতে লাগল, 'সরে যাও, সরে যাও। ম্যালিয়াস লেপাস আর ক্যাসিয়াস হাস্তার অন্য বন্ধুদের গায়ে যেন আঁচড় না পড়ে।'

এরিক হেসে বলল, 'ব্যাটা নিজের ভালোটা বেশ বোঝে!'

ফাবোনিয়া, এরিক লেপাস, গাবুলা রাজপথে বেরিয়ে দেখে মস্ত শোভাযাত্রা আসছে। মশালে মশালে যেন দিনের বেলার মতো চারদিকে আলো।

লেপাস বলল, 'ঐ তো ক্যাসিয়াস হাস্তা। কিন্তু ওর সঙ্গে ওরা কারা?'

—'ওরা নিশ্চয় স্যাঙ্গুইনেরিয়ার লোক। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ লম্বা চওড়া বর্বর বেশে ও কে? আর সাদা পালক মাথায় অদ্ভুত যোদ্ধাদের দেখেছ?'

লেপাস বলল, 'এমন মানুষ জন্মে দেখিনি।'

এরিক ভন হারবেন বলল, 'আমিও দেখিনি। তবে ওদের এমনি খ্যাতি যে দেখেই চিনতে পারছি। সাদা বর্বর হল বনমানুষদের ছেলে টারজান আর যোদ্ধারা ওর ওয়াজিরি সৈনিক।'

পথের ধারে সৈনিকদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ক্যাসিয়াস হাস্তা বলল, 'তোমাদের সেনাপতি কোথায়?'

অফিসারটিকে বলল, 'তোমাদের কি ফালবাস ফুপাস পাঠিয়েছিল ম্যালিয়াস লেপাসকে আর বর্বর দেশের এরিক ভন হারবেনকে খুঁজে আনতে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, সীজার।'

ম্যালিয়াস লেপাস তখন বলল, 'এই যে আমরা এখানেই আছি।'

ফ্যাবোনিয়া ভন হারবেন আর গাবুলাও এগিয়ে এল। ক্যাসিয়াস হাস্তা তার পুরনো বন্ধু লেপাসকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু জারমেনিয়ার সেই বর্বর প্রধান কোথায় গেল? তার নাম আমি স্যাঙ্গুইনেরিয়াসেও শুনেছি।'

—'এই তো সে।'

টারজান একটু কাছে এসে ইংরিজিতে বলল, 'তুমি এরিক ভন হারবেন?'

—'হ্যাঁ আর তুমি টারজান।'

—'তোমাকে খাঁটি রোমানের মতোই দেখাচ্ছে।'

—'কিন্তু ভিতরে ভিতরে বর্বর ভাব টের পাচ্ছি।'

—'তুমি যাই হও, তোমার বাবার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে তিনি বড় খুশি হবেন।'

—'তুমি আমাকে খুঁজতে এসেছিলে?'

—'হ্যাঁ, তা-ও এসেছি ঠিক সময় বুঝে।'

—'কি বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেব?'

—'আমাকে দিও না। আমার ছোট নিকিমাকে ধন্যবাদ দিও।'

ভূগর্ভে টারজান

টারজান অ্যাট দি আর্থস কোর

টারজানের নাক বড় তীক্ষ্ণ ছিল। গভীর বনের নানা গাছপালা জীবজন্তুর গন্ধ ছাপিয়ে বহু দূর থেকে আরেকটা গন্ধও পেয়ে সে বুঝেছিল সাফারি নিয়ে একজন কমবয়সী শ্বেতাঙ্গ আসছে। তার সঙ্গে দেখা হতেই পরিচয় পাওয়া গেল। সে একজন অ্যামেরিকান, নাম জেসন গ্রিড্‌লি, এসেছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। টারজানের সঙ্গে দেখা করাই তার উদ্দেশ্য। সন্ধ্যায় ক্যাম্পে কফি খেতে খেতে গ্রিড্‌লি বলল, 'আমার কথা শুনলে আমাকে

হয় তো পাগল ঠাওরাবেন। কারণ আমি একটা অভূতপূর্ব অভিযানে যাবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমার আরো টাকাকড়ি আর নির্ভীক দক্ষ সাহায্যকারী দরকার। এবং অভিযানের ফলে কারো এক কানাকড়ি লাভও হবে না।'

টারজান বলল, 'অ্যামেরিকানের মুখে এ কেমন কথা! সব খুলে বল।'

গ্রিড্‌লি বলল, 'কখনো শুনেছেন কি যে এ পৃথিবীটা নীরেট গোল নয়? ওপরে একটা খোল, ভিতরটা ফোঁপরা।

সেখানে এমন বিশাল আরেকটা জগৎ আছে যে মানুষ আর অন্যান্য প্রাণী বাস করতে পারে?'

টারজান বলল, 'ও ধারণা তো বৈজ্ঞানিকরা ভুল বলে প্রমাণ করে দিয়েছেন।'

—'এতকাল আমিও তাই বিশ্বাস করতাম, কিন্তু সম্প্রতি সেই অন্তঃজগৎ পেলুসিডার থেকে অ্যাবনার পেরি এক আশ্চর্য বেতারবার্তা পাঠিয়েছে। আমি তার কপিও এনেছি। সবটা পড়ে শোনাবার সময় নেই, খানিকটা শুনলেই বুঝতে পারবেন।' তারপর চিঠি থেকে এতটা শোনাল জেসন যাতে টারজার ব্যাপারটা বোঝে। শেষে বলল, 'এই জন্য পেলুসিডারে গিয়ে হতভাগ্য ডেভিড ইন্টাকে করসারদের কারাগার থেকে উদ্ধার করতে চাই।'

টারজান বলল, 'তুমি ঠিক জান যে দুই মেরু থেকেই ঐ অন্তঃজগতে যাবার পথ আছে?'

সে বলল, 'ঠিক জানব কি করে? তবে ১৮৩০ সালে এ বিষয়ে বই লেখা হয়েছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে মেরু থেকে গরম বাতাস বয়; মেরুসাগরে কোনো অজানা জায়গা থেকে সবুজ ডালপালা ভেসে আসে। আকাশে যে মেরু-জ্যোতি দেখা যায়, তারো সঠিক কারণ জানা যায়নি। রাশি রাশি ফুলের রেণু পড়ে থাকে কি করে, যেখানে ফুল নেই? আমার বন্ধু পেরি বলেছে ও হল পেলুসিডারের ফুলের রেণু আর পেলুসিডারের চব্বিশ ঘণ্টা দৃশ্যমান সূর্যের আলো।'

—'তাহলে অ্যামাণ্ডসন ইত্যাদি বিমানযাত্রীরা পথটা দেখতে পায়নি কেন?'

গ্রিডলি বলল, 'হয়তো খোঁকলটা এতই বড় যে তার মধ্যে দিয়ে একটু নেমে চারদিকে ঘুরে আবার উড়ে গেছে প্লেন, ব্যাপারটা কারো বোধগম্যই হয়নি। আমার বিশ্বাস অন্তঃজগৎ একটা আছেই, তবে তার মধ্যে যাবার পথটা কোথায় তা জানি না।'

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে সেখানে কিসে করে যাবার কথা ভেবেছ?'

এখানে মনে রাখতে হবে এ গল্পের সময়ে বিমানযাত্রা এখনকার মতো অগ্রসর হয়নি। গ্রিডলি বলল, 'আমার মনে হয় এক রকম বিশেষ মজবুত ধাতু দিয়ে তৈরি লম্বাটে জেপেলিন ধরনের রিজিড্ প্লেনে গেলে সবচেয়ে সুবিধা হবে। ওতে হেলিয়াম গ্যাস থাকলে, অগ্নিকাণ্ডের ভয় কমে যাবে। তবে ঝুঁকি অনেক। ওখানে উড়োজাহাজ নোঙর করার একটা নিরাপদ ঘাঁটি পেতে হবে। ঢুকবার বেরোবার একশো রকম বিপত্তি। তারপর গ্যাস ফুরোবার ভয়। একটা উপায় হয় যদি সব রকম গ্যাস বাদ দিয়ে শুধু ভ্যাকুয়াম ট্যাংকের সাহায্যে উড়োজাহাজ আকাশে তোলা ভাসিয়ে রাখা আর নামানো যায়।

টারজান গ্রিড্লির প্রস্তাবে ক্রমে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। সে বলল, 'সেটা কিন্তু নিতান্ত অসম্ভব না-ও হতে পারে।'

গ্রিড্লি মাথা নাড়ল, 'এক দিন হয়তো হতে পারে। এখন হবে না।'

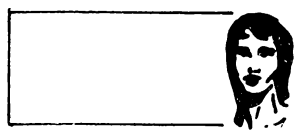

'—তা বলা যায় না।'

'—তার মানে?'

'—তার মানে, আমার বন্ধু এরিক ফন হারবেন একাধারে বৈজ্ঞানিক আর পর্যটক। সম্প্রতি সে উইরামওয়াজি পাহাড়ে হ্রদবাসী এক জাতের দেখা পেয়েছে, তারা এক রকম অজানা ধাতু দিয়ে কেন্যু তৈরি করে। সে ধাতু যেমনি হাল্কা, তেমনি মজবুত। ঠিক আমাদের যেমন দরকার। ফন হারবেন উরাম্বিদেশে আছে। সে এখান থেকে চার দিনের পথ।'

এই বাক্যালাপের ফলে টারজান আর গ্রিড্লি উরাম্বি-দেশে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। আর বৃথা সময় নষ্ট না করে, টারজান আর ফন হারবেন ঐ ধাতু ফ্রেড্রিকশা-ফেনে গ্রিড্লির কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও করেছিল। গ্রিড্লি সেখানে একটা কোম্পানি গড়ে তুলে কারখানার কাজ শুরু করে ফেলল। নতুন ধাতুর নাম হল হারবেনাইট।

মোট কথা এঞ্জিনিয়ার, কারিগর, বিশেষজ্ঞ সবাই মিলে ছয় মাসের মধ্যে 0—220 নামক উড়োজাহাজটি তৈরি করল। ন'শ সাতানব্বই ফুট লম্বা, একশ পঞ্চাশ ফুট ব্যাস। বিচিত্র নিয়মে বাতাস ভরা ও খালি করে ভ্যাকুয়াম তৈরি করে ওঠা-নামা আর ভেসে থাকার কৌশল, থাকার জায়গা, রসদ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা—সমস্তই যথাসম্ভব নিখুঁৎ ভাবে পরিকল্পিত আর তৈরি হয়েছিল। সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হবে। তাই এখানে বিশদ ভাবে বিবরণ দেওয়া হল না। এটি চলতে আটটা মোটর চালিত আটটি প্রপেলারের সাহায্যে।

—উড়োজাহাজের ওজন পঁচাত্তর টন। সেই ওজন আর লোকজন জিনিসপত্রের ভার নিয়ে মোট দু'শ পঁচিশ টন পর্যন্ত ভ্যাকুয়াম ট্যাংক ওড়বার শক্তি রাখত।

এই উড়োজাহাজটি নিয়ে টারজান আর গ্রিড্লি এবং তাদের সহকারীরা পেলুসিডারের সম্রাট ডেভিড ইন্সকে

কারসারদের ভূগর্ভস্থ কারাগার থেকে উদ্ধার করবার পরিকল্পনা করেছিল।

★

সব যখন প্রস্তুত, তখন পরীক্ষামূলক ভাবে 0—220-কে একবার ওড়ান হল। উড়োজাহাজে সব অভিযাত্রী এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র বোঝাই করা হল। জুপ্‌নার জাহাজ তৈরির দায়িত্বের অনেকখানি বহন করেছিলেন, তাঁকেই ক্যাপ্টেনের পদ দেওয়া হল। ফন হর্স্ট আর ডর্ফ বলে দুজন বৈজ্ঞানিক হল মেট। লেফ্‌টেনাণ্ট হাইন্স্‌ হলো নেভিগেটর। তাছাড়া বারোজন এঞ্জিনিয়ার, আটজন মেকানিক, একজন নিগ্রো পাচক আর দুজন ফিলিপিনো ক্যাবিন বয়। অভিযাত্রীদের প্রধান টারজান, তার সহকারী হল গ্রিড্‌লি। টারজানের বিশ্বাসী ওয়াজিরি মুবিরো আর নয়জন ওয়াজিরি যোদ্ধা। এরাই হল উড়োজাহাজের ক্রু।

তারপর একটা মজা হল। এত সাফল্যের সঙ্গে উড়োজাহাজ তার পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু করে দিল যে কর্তাব্যক্তি সকলেরি এক মত হল যে আবার ফিরে গিয়ে কি হবে? যাত্রাপথ ধরেই যখন ফ্রেড্‌রিকশাফেন থেকে হ্যাম্বুর্গ অবধি এগোনো গেল, তখন মিছিমিছি যাওয়া-আসার সময় নষ্ট না করে, পরিকল্পনা মতো পূর্ব দিকের দশম দ্রাঘিমা ধরে উত্তরে গন্তব্য স্থানের দিকেই এগোনো যাক। অন্যরাও একথার সমর্থন করাতে, ঘণ্টায় গড়ে পঁচাত্তর মাইল বেগে ওরা উত্তর দিকে উড়ে চলল।

দ্বিতীয় দিন দুপুর রাতে মেরু-বিন্দুর ঠিক ওপরে পৌঁছনো উচিত, কিন্তু সেটা চিনবে কি করে? জুপনার বললেন ইটালিয়ানরা মেরুবিজয় করে সেখানে পতাকা পুঁতে রেখে এসেছিল, সেগুলো চোখে পড়া উচিত। কিন্তু তার ওপর অনেক দিনের বরফ পড়াতে কিছুই মালুম দিল না। মেরু বৃত্তের ওপর একবার ঘুরে ওরা কিছুটা দক্ষিণে এল, একশ সত্তর পূর্ব দ্রাঘিমা ধরেই। গ্রিড্‌লির হিসাবে প্রবেশপথটা হবে পাঁচাশি উত্তর অক্ষাংশ আর একশ সত্তর পূর্ব দ্রাঘিমার কাছাকাছি।

পাঁচ ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর উড়োজাহাজ আপনা থেকেই একটু পশ্চিমে হেলে যেতে লাগল। গ্রিড্‌লি বলল, 'সাবধান, ক্যাপ্টেন! বোধ হয় প্রবেশপথের মুখটা পার হলাম।'

ঐ পশ্চিমে হেলে যাওয়া কম্পাসে দেখা গেলেও, বাস্তবিক তা হচ্ছে না। তার বিশ্বাস উড়োজাহাজ স্পাইরেল গতিতে পেলুসিডারে নামবে আর চারশ থেকে ছয়শ মাইল ধরে কম্পাস্‌ কোন কাজ করবে না।

হঠাৎ সামনে খোলা জল দেখা গেল। গ্রিড্‌লি বলল, 'এখনো মধ্যরাতের সূর্য একটু দেখা যাচ্ছে, কিন্তু একটু বাদেই সেটা ডুবে যাবে এবং তার একটু পরেই পেলুসিডারের চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী সূর্যের আলো দেখা যাবে। অর্থাৎ কোন প্রবেশপথ বলে কিছুই নেই, পৃথিবীর উপরিভাগটাই গভীর ভাবে টোল খেয়ে পেলুসিডারে ঢুকে গেছে।

তার পরেই তীর দেখা গেল। এটাই হয়তো পেলুসিডারের উত্তর সীমান্ত। সেই তীরভূমিতে সামন্য বরফ। তাপমাত্রা কুড়ি ডিগ্রি ফারেনহাইট।

0—220 ক্রমে দক্ষিণমুখো চলল। পেলুসিডারের সূর্যের আলো আরো স্পষ্ট হল। রুক্ষ প্রান্তরের বদলে দেখা গেল গাছে-ঢাকা পাহাড়, তার পর তৃণভূমি। তার মাঝে বড় বড় গাছ, ছোট ছোট নদী বয়ে গিয়ে একটা বড় নদীতে পড়েছে। প্রান্তরে নানা জাতের জন্তু জানোয়ার চরছে। মানুষের চিহ্ন মাত্র নেই। টারজান, বলল 'এ যে সাক্ষাৎ স্বর্গ। এখানেই নামা যাক।'

ওপরের বাতাসের ট্যাংক খালি করে, নিচের খালি ট্যাংক ভরতি হতেই, আস্তে আস্তে 0—220 নামল। তলাটা মাটি থেকে মাত্র ছয় ফুট ওপরে রইল। ছোট ছোট মই বেয়ে একজন অফিসার আর দুজন কর্মী ছাড় সকলেই নেমে পড়ল।

উড়োজাহাজ দেখে সব জন্তু ভেগেছিল। তবে তারা সংখ্যায় এত বেশি যে শিকার ধরতে অসুবিধা হবে মনে হল না। আপাততঃ সকলের সবার আগে যা দরকার, সেটা হল বিশ্রাম এবং ঘুম। গ্রিড্‌লির অনুরোধে ক্যাপ্টেন নিয়ম করে দিলেন যে বিনা অনুমতিতে এবং একলা কেউ উড়োজাহাজ থেকে নামবে না। টারজান বলল, 'আমি কিন্তু একবার একা বনে ঘুরে আসব।'

সবার আগে টারজানের ঘুম ভেঙেছিল। সে তার অভ্যাসমতো খালি গায়ে, ছোরা, বর্শা, তীরধনুক আর দড়ি-গাছা নিয়ে বনে ঢুকে পড়ল। লেফটেনাণ্ট ডর্ফের ডিউটি ছিল। সে ছাড়া কেউ টারজানের যাওয়া দেখেনি।

বনে গিয়ে বহু চেনা গাছ যেমন দেখল টারজান, তেমনি বহু অচেনা গাছও দেখল। কত প্রাচীন বৃদ্ধ মহীরূহ। ওর পায়ের শব্দে অদ্ভুত সব জানোয়াররা গা-ঢাকা দিতে লাগল। আগে টারজান ডালে ডালে ঘুরছিল, তারপর নিচে নেমে ঘাস লতা ফুলের বাহার দেখতে দেখতে

এগোতে লাগল।

হঠাৎ একটা দড়ির ফাঁসে বন্দী হল। যতই ছাড়াবার চেষ্টা করে বাঁধন ততই কষে এঁটে যায়। হাত দুটো পর্যন্ত গায়ের সঙ্গে আঁটা। পা দুটো মাটি থেকে ছয় ফুট ওপরে। ওকে নিয়ে জানোয়ারের চামড়ার দড়ি পাক খেতে লাগল। এত অসহায় সে কখনো হয়নি। ছোরাটা বের করারো উপায় রইল না।

এমন সময় বিশাল এক মোষ আস্তে আস্তে দেখা দিল। প্রাগঐতিহাসিক গুহার দেয়ালে এদের ছবি দেখা যায়। লোমশ শরীর, প্রকাণ্ড শিং, ভারি খিটখিটে, বদ্ মেজাজী। ওকে দেখেই ল্যাজ তুলে, শিং নিচু করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল জানোয়ারটা।

ছোটবেলা থেকে বহুবার টারজান মৃত্যুর এই রকম কাছাকাছি এসেও বেঁচেগেছিল। এবারও তাই হল। বিশাল মোষটার পিঠে অতিকায় এক দাঁতাল বাঘ বিকট হুংকার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল। এই বাঘের নাম সভ্য মানুষ দিয়েছে সেবার-টুথ টাইগার। মুখের দু পাশ দিয়ে শ্ব-দন্ত দুটি আট ইঞ্চি ঝুলে রয়েছে। এরা ওপরের জগৎ থেকে কবে লোপ পেয়েছে। বলা বাহুল্য, বাঘটা মোষের ঘাড় ভেঙে ভোজন করতে বসল।

এতক্ষণ শূন্যে-ঝোলা টারজানকে সে দেখেনি। এবার চোখ পড়তে, উঠে দাঁড়াল।

0—220-এর কর্মীদের মধ্যে ছিল ক্যাপ্টেন জুপনারের নিজের বাছাই করা রবার্ট জোন্স্। সে আসলে কালো অ্যামেরিকান, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে জার্মানিতে বন্দী হয়ে ছিল। তারপর যে কারণেই হক তার ছাড়পত্র এসে পৌঁছয়নি, তাই সে ঐ দেশেই থেকে গেছিল এবং বেশ সুখেই ছিল। জার্মান ভাষা এবং এখান থেকে ওখান থেকে রান্নার কাজ শিখে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। উড়োজাহাজের পাচক সে।

ঘুম ভেঙে উঠে চারদিকে ঝক্‌ঝকে রোদ দেখে সে তো অবাক! কত বেলা হয়ে গেছে, অথচ রান্নাঘরের দেওয়াল-ঘড়ি বলছে ছ'টা! গ্রিড্‌লি এসে বলল, 'কিহে, ব্রেকফাস্ট জুটবে তো?'

রবার্ট নিশ্চিন্ত হল। ঘড়ি তাহলে ঠিক, ভুল করেছে সূর্যটা।

'—কি খাবেন?'

'—যা হয়, টোস্ট, ডিম, কফি।'

'—তুমি তৈরি কর, আমি পনেরো মিনিট হেঁটে আসি। লর্ড গ্রেস্টোককে দেখেছ নাকি?'

'—না তো।'

পনেরো মিনিট একটু হেঁটে ব্রেকফাস্ট খেতে বসল জুপনার, ডর্ফ, গ্রিড্‌লি। ডর্ফ বলল, 'টারজানকে তিন ঘণ্টা আগে বনের দিকে যেতে দেখেছি। এখনো ফেরেনি।' তখন সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সঙ্গে বন্দুকও নেয়নি সে। ঘণ্টাখানেক আগে উড়োজাহাজের পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড ভালুক যেতে দেখেছ ডর্ফ। গোটা বারো লম্বা-দাঁত বাঘও দেখেছে। আরো ভয়ংকর একটা জন্তু দেখেছে। কুমিরের মাতা শরীর আর দাঁত, কিন্তু পাখির মতো উড়ে যাচ্ছিল। আবার ছোঁ মেরে মাটি থেকে প্রায় মানুষের সমান বড় একটা ভেড়া তুলে নিয়ে গেল।

জুপনার বলল, 'ওটা নিশ্চয় টেরোড্যাক্টিল!'

এবার টারজানকে খুঁজতে একটা সার্চ-পার্টি পাঠাবার কথা হল। জাহাজটাকে এখান থেকে সরানোর কথাই উঠছে না। সার্চ-পার্টি ওপথে চিহ্ন রেখে যাবে, যাতে ফিরবার পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

গ্রিড্‌লি বলল, 'ফন হর্স্ট, আমি, মুবিরো আর ওয়াজিরিরা যাই তবে।'

তাই ঠিক হল। ওয়াজিরিরা বন্দুক নিতে রাজি হচ্ছিল না। ডর্ফ বলল, 'আমি যা দেখেছি, তাতে মনে হল এক্সপ্রেস্ রাইফ্‌লের কমে কোনো কাজ হবে না।' স্থির হল ওয়াজিরিরাও রাইফ্‌ল্ নেবে। তার ব্যবহার তারা ভালো করেই জানে।

উড়োজাহাজ থেকে নেমেই গ্রিড্‌লি মুবিরোকে সামনে সামনে যেতে বলল। বন-বিজ্ঞানে তারা দক্ষ। ক্ষীণতম পায়ের দাগ বা অন্য চিহ্ন দেখে কে কোন দিকে গেল বুঝতে পারে। টারজানের চিহ্ন ধরে একটা বড় গাছ অবধি নিয়ে গেল সে। বলল, এখানে বড় বোয়ানা গাছ নিয়েছেন। ওঁর নিয়ম সিধা পথে চলা। খালি শিকার করার সময় শিকারের পিছু নেন। জানোয়ার চলার পথ পেলে সেইটে ধরেন।'

ওরাও সোজা চলল। পাছে পথ হারায় তাই গাছে দাগ কেটে, ঝোপ-ঝাপ ছেঁটে চিহ্ন রেখে। সূর্য নেই আকাশে যে তার গতি দেখে দিক্ স্থির করবে। কম্পাসের সাহায্যে এগোল। মাঝে মাঝে পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে জানান দিতে লাগল যে তারা আসছে কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না।

বনের চেহারা বদলাল। এখানে গাছগুলো এত ঘেঁষাঘেঁষি নয়, ঝোপঝাড় তত দুর্ভেদ্য নয়। জানোয়ারদের ক্ষুরের আর

পায়ের ছাপ দেখা গেল। গ্রিড্‌লি বলল, 'এই ছাপ দেখেই এগোনা যাবে। দাগ কাটার দরকার নেই।'

এইখানেই গ্রিড্‌লি ভুল করল। অবিশ্যি গাছগুলোও বেশ দূরে দূরে, দাগ দেখে চলাও মুশকিল। ক্রমে আরো তাড়াতাড়ি এগোনো সম্ভব হল।

অনেকটা মানুষের মতো দেখতে বড় বড় বাঁদর, নানা রঙের পাখিও দেখা গেল। তাছাড়া ক্রমে ডানে, বাঁয়ে, পিছনে, সবদিকেই যেন অনেক তৃণভোজী আর মাংসাশী জানোয়ারের উপস্থিতি বোঝা যেতে লাগল। তখনো তাদের চোখে দেখা যায়নি। তারপর মনে হচ্ছিল তৃণভোজীরা বাঁয়ে আর সামনে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, হিংস্র জানোয়ারেরা তাদের ধাওয়া করছে। এর পর প্রথম অতিকায় দাঁতাল বাঘ দেখে ওরা আঁৎকে উঠল। আগে একটা, তারপর অনেকগুলো একসঙ্গে।

ওয়াজিরিদের একজন বলল, 'গুলি করব, বোয়ানা?'

'এখনো নয়। তবে তৈরি থাকো। ওরা পিছন পিছন এলেও, আক্রমণ তো করেনি।'

মুবিরোর লোকরা বাঘদের দিকে মুখ করে পিছু হাঁটতে লাগল। বাঘগুলোও তফাৎ রেখে চলল। মনে হল তারা অন্য কিছুর খোঁজে আছে।

অন্য কিছুর সাড়া পেলও মুবিরো একটু পরেই। বেশ বড় একটা খোলা জায়গা, তার বাইরে গাছের আড়ালে মনে হল বিশাল হাতির মতো কোনো জানোয়ার দেখা যাচ্ছে।

খোলা জায়গাতে অদ্ভুত একটা মিছিল এগিয়ে এল। বিশাল শিংওয়ালা, বুনো লোমে গা-ঢাকা অতিকায় মোষের মতো জানোয়ার, অতিকায় হরিণ, প্রকাণ্ড স্লথ। তাছাড়া হাতি। সে-সব হাতিকে আমরা বলি ম্যাস্টোডন আর ম্যামথ। ওপরের পৃথিবী থেকে তারা লোপ পেয়েছে কোন কালে। এখানে দলে দলে এসেছে, মাথাগুলোই তিন ফুট চওড়া, চার ফুট লম্বা। জোরালো বেঁটে পা। বিশাল বাঁকা দাঁত। তার আগাগুলো ভিতর দিকে ফেরানো। কুড়ি ফুট লম্বা, অন্ততঃ আট ফুট উঁচু। কিন্তু কানগুলো ছোট ছোট, শূওরের কানের মতো দেখতে।

মুবিরো বলল, 'বাঁচতে হলে এইবেলা সরে পড়তে হয়। এরা দুটো দল হয়েছে। নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, শতে শতে মারা পড়বে। আমরা কেন মাঝে পড়ে প্রাণ হারাই?'

আসলে লড়াই হচ্ছিল বাঘেতে হাতিতে, কিন্তু ধারেকাছে কেউ নিরাপদ নয়। বনে ঢুকে পড়তে পারলে কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। তাহলে আবার ক্ষ্যাপা জানোয়ারে ভরা খোলা জায়গাটা পার হয়ে যেতে হয়। গ্রিড্‌লি সেটা বুঝতে পেরেছিল।

সে হুকুম দিল এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে জানোয়ারগুলোকে কিঞ্চিৎ ভড়কে দিয়ে চাচা আপনা বাঁচা! গাছে উঠলে অনেকটা নিরাপদ।

গুলি ছোঁড়ার পর গণ্ডগোলটা আরো বাড়ল। তৃণভোজীরাও ভয় পেয়ে ওদের দিকেই ছুটে এল। তখন দৌড়নো ছাড়া উপায় রইল না। ওয়াজিরিরা পর্যন্ত বন্দুক নামিয়ে ছুটল।

গ্রিড্‌লি আর ফন হর্স্ট কিছুক্ষণ গুলি ছুঁড়ে ওদের যাবার পথ করে দিল, তারপর নিজেদের বাঁচাতে দুজনকে দুদিকে দৌড়তে হল।

গ্রিড্‌লিকে একটা অতিকায় স্লথ নাক দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল। কোনো মতে উঠে পড়ে মস্ত এক গাছে চড়ে সে প্রাণ বাঁচাল। বাকিরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছিল, কাউকে দেখতে পেল না।

জন্তুগুলো এদিকে এক মারণযজ্ঞ শুরু করে দিল। শত শত মৃতদেহে জায়গাটা ছেয়ে গেল। হাতিগুলোর মর্মান্তিক পরিণাম দেখে গ্রিড্‌লির মন খারাপ হয়ে গেল। এত শক্তি, এত সাহস, সমস্তই নির্মম শত্রুর হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। তারপর বাঘরা মহা ভোজ লাগাল। তাকে বিনি পয়সার ভোজও বলা যায় না, কারণ চারদিকে মরা বাঘের ক্ষতবিক্ষত শরীর পড়ে ছিল।

✶

মরতে টারজানের ভয় ছিল না। একমাত্র খেদ হল শেষটা কি এই রকম অসহায় ভাবে বিনা যুদ্ধে মরতে হবে? এমন সময় গাছের ডালপালায় নড়াচড়ার শব্দ হল। টারজান চেয়ে দেখে একটা মস্ত গোরিলা ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখছে। ওপরের ডালে আরো দুটো গোরিলা আর চারদিকের গাছেও অনেকগুলো। সকলের হাতে গদা। এরা যত না গোরিলার মতো তার চেয়ে বেশি মানুষের মতো দেখতে। নিচের বাঘটাও একটু ঘাবড়ে গেছিল। সেই ফাঁকে একটা গোরিলা ফাঁসের দড়ি ধরে টারজানকে টেনে ওপরে তুলে নিল। বাঘটা হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠবার চেষ্টা করলে মুগুর পিটে তাকে ঠেকাল।

এদের হাতে পড়ে টারজানের অবস্থার যে খুব উন্নতি হবে তা মনে হচ্ছিল না। দু-পাশে দুটো গোদা ওকে দুদিক থেকে হাত চেপে ধরে রইল আর তৃতীয় একটা ওর

গলা চেপে ধরে মাথার ওপর মুগুর উঠিয়ে বলল, 'কা-গোদা ?'

চেনা ভাষা শুনে আশ্চর্য হয়ে টারজানও বলল, 'কা-গোদা !'

ওর মুখে বনমানুষী ভাষা শুনে গোরিলাটাও কম চমকে গেল না। 'তুমি কে ?'

'—আমি টারজান।'

'—মোয়ালটের দেশে কেন এসেছ ?'

'—বন্ধুর মতো এসেছি। তোমাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই।'

—'সাগথদের ভাষা জানলে কি করে ? এর আগেও গিলাক ধরেছি, তারা তো জানে না।'

'—আমার লোকদের কাছ থেকে ছোটবেলায় শিখেছি।'

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ওকে নিয়ে মোয়ালট যা বলে তাই করা হবে।

এদিকে দাঁতাল বাঘটা তখনো খামচাখামচি করছিল। শেষটা সবাই মিলে তাকে পিটিয়ে তাড়াল। বাঘ চলে যেতেই গোরিলা মরা মোষটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাংস ছিঁড়ে খেতে লাগল। পেট ভরে গেলে উঠেও পড়ল। ছোট জানোয়ারেরা এসে তখন খেতে বসল। জন্তুরা মানুষের মতো হ্যাংলা হয় না।

এবার টারজানের হাত বেঁধে ওরা মোয়ালটের খোঁজে চলল। টারজান লক্ষ্য করল এরা প্রায় মানুষের মতোই উন্নত; আমাদের গোরিলার চেয়ে ঢের বেশি দক্ষ আর বুদ্ধিমান। যাবার আগে দড়ির ফাঁদটাকে আবার পেতে রেখে গেল ওরা। মানুষের মতো সোজা হয়ে হাঁটে এরা, হাতে ভর দেয় না। চারদিকে চোখ কান নাক সজাগ রাখে। মানুষেরা হয়তো ওদের দেখে কদাকার বলবে, কিন্তু টারজানের চোখে ওদের চেহারায় ভারি একটি গাম্ভীর্য আর আত্মসম্মান প্রকাশ পাচ্ছিল।

দু-একবার থেমে একটা পড়ে থাকা ফাঁপা গুঁড়িতে টোকা দিয়ে কি যেন সংকেত করল এরা। তারপর মাটিতে কান পেতে শুনল। মনে হল তার উত্তরও আসছে, একই রকম তালে।

গোরিলারা টারজানকে নিয়ে গাছে চড়ল। টারজান একবার বলল, 'হাত খুলে দাও। আমি তো শত্রু নই।'

সে গোরিলাটা আরেকটা মস্ত গোদাকে বলল, 'টারগাশ, হাত খুলে দিতে বলছে।'

টারগাশ, টারজানের দিকে খানিক তাকিয়ে বলল, 'তাই দাও।'

কিন্তু মোয়ালটের হুকুম ছাড়া তারা বাঁধন খুলতে রাজি হল না। টোইয়াড ছিল নষ্টের গোড়া। সঙ্গে সঙ্গে টারগাশ গাছের ডালে বসা টোইয়াডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরা ওপরের জগতের বনমানুষদের মতো লোকদেখানি তড়পানি নিয়ে সময় নষ্ট করে না। মানুষের মতো সটাং কাজে নেমে যায়।

ঐ মারামারিটা এক হাতে গাছের ডাল ধরে ঝুলে অন্য হাতে সারা হল। টারগাশের লক্ষ্য শত্রুর গলায় দাঁত বসাবে। শেষ পর্যন্ত টোইয়াড পালাবার চেষ্টা করেছিল। টারগাশ তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। কিন্তু দাঁত না বসিয়ে বলল, 'কা-গোদা ?'

টোইয়াড বলল, 'কা-গোদা !'

অমনি টারগাশ উঠে পড়ল। তারপর বাঁধন খুলে দেওয়া হল। টারগাশ বলল, 'যদি পালায় তখন মেরো।'

বাঁধন খোলা হলে, টারজান ভেবেছিল এরা হয়তো ছুরিটা নিয়ে নেবে। বর্শা, তীরধনুক তো সকলের চোখের সামনেই সেই গাছতলায় পড়ে ছিল, কিন্তু কেউ চেয়েও দেখেনি। হয় বোঝেনি বলে, নয় তো তাচ্ছিল্য করে।

কিছু পরেই মোয়ালট দলের বাকি গোদাদের নিয়ে হাজির হল। প্রকাণ্ড শরীর, চুলে পাক ধরেছে। টারজানকে দেখেই সে বলল, 'ওটা কি ?'

টারগাশ বলল, এই গিলাকটা ফাঁদে পড়েছিল।'

'—এই জন্যে আমাদের ডেকে পাঠালে নাকি ? ওকে নিয়ে এলেই তো হতো।'

'—না, এর জন্যে নয়। একটা টারাগ মস্ত থাগ মেরেছে, তার জন্যে।'

মোয়ালট বলল, 'বেশ, এটাকে তারপর খাওয়া যাবে।'

সবাই এগিয়ে চলল। সবার আগে মোয়ালট। টোইয়াড তার কানে কানে কি বিষ ঢালতে লাগল কে জানে! মোয়ালট তাই শুনে ভয়ানক রেগে উঠে, হঠাৎ মুগুর তুলে টারগাশের দিকে তেড়ে গেল।

টারজান বুঝেছিল এদের মধ্যে টারগাশ ছাড়া তার বন্ধু নেই, আর টারগাশও ওর পক্ষ নিয়েছে বলে মোয়ালটের বিদ্বেষের পাত্র হয়েছে! টারজান হঠাৎ, 'ক্রী-ই-গ্-আ টারগাশ!' বলে তাকে সাবধান করে দিতেই সে মাথা ঘুরিয়ে মোয়ালটের মুগুর দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে টারজান মোয়ালট্ রাজার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের কোঁকে

তুলে গায়ের জোরে ডিগবাজি খাইয়ে, তার হতভম্ব যোদ্ধাদের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর টারগাশের পাশে দাঁড়িয়ে দলের সম্মুখীন হল।

'—লড়াই দেব নাকি, টারগাশ?'

'—না, ওরা আমাদের মেরে ফেলবে।'

'—তাহলে কোথায় যাবে চল। আমিও আছি।'

সঙ্গে সঙ্গে তিন লাফে গাছের ডালে! টারজানও তাই। মোয়ালটের লোমশ দল কিছু দূর ধাওয়া করে, ছেড়ে দিল। ওদের নিয়ম অবাধ্য গোদাদের এইভাবে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। সে যদি আবার ফিরে আসার চেষ্টা না করে, এরাও ওকে কিছু বলে না।

টারগাশ জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের দেশে কেন এসেছিলে?'

'—শিকারের খোঁজে।'

'—এখন কি করবে?'

'—নিজের দলের কাছে ফিরব।'

বললো বটে কিন্তু কি করে ফিরবে? টারজান যে পথ হারিয়ে ফেলেছে!

★

গ্রিড্‌লি তার গাছের আশ্রয় থেকে দাঁতাল বাঘদের বীভৎস ভোজ দেখে ভাবছিল যে ওপরের জগতে তৃণভোজী বড় জনোয়ারদের লোপ পাওয়ার এ-ও একটা কারণ হতে পারে। অবিশ্যি আমাদের জগতে আজ পর্যন্ত হিংস্র জানোয়ারদের এতটা বুদ্ধি হয়নি যে তৃণভোজীদের তাড়িয়ে এক জায়গায় এনে নিধন করবে। প্রকৃতির নিয়মে হয়তো একেকটা জাত এইভাবে বুদ্ধিবলে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে, তারপর আরো বুদ্ধিমান জাতির কবলে পড়েছে। এখন মানুষ রাজত্ব করছে। এরপর আর কারো পালা আসবে কি না কে জানে।

থাক গে ওসব কথা, আপাততঃ দেখা যাক সঙ্গী-সাথীরা সব গেল কোথায়? কিছুক্ষণ হাঁকডাক করল গ্রিড্‌লি, কিন্তু কারো সাড়া পেল না। হয়তো ভোজনরত হিংস্র জন্তুগুলোর খ্যাঁচাখেঁচির শব্দ ছাপিয়ে, তার গলা বন্ধুদের কানেই পৌঁছয়নি। উড়োজাহাজ ছেড়ে আসবার পর কতটা সময় কেটেছে কে জানে? এখানকার সূর্যের আলোর কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই ঘড়ি দেখেও বোঝা যায় না কাঁটাটা একবার ঘুরে এল, না দুবার? এখন বিকেল, না পরদিন ভোরবেলা?

বড্ড খিদেও পেয়েছিল। গাছতলায় একটা মরা থাগ্‌ পড়ে ছিল। খুব কাছাকাছি দাঁতাল বাঘ না থাকলেও প্রকাণ্ড সব হায়নোডন মাংস খাচ্ছিল। খিদের চোটে মরিয়া হয়ে, টুপ করে একবার নেমে, মরা মোষটার গা থেকে কয়েকটা বড় বড় ফালা মাংস কেটে, আবার টুপ করে গাছে উঠে বসল সে। বুড়ো গাছের গায়ে শুকনো ডালের অভাব ছিল না। ফাকড়ার ওপর একটু আগুন করে, মাংস ঝল্‌সে পেট ভরে খেয়ে বড় আরাম পেল, তা পোড়াই হক আর যা-ই হক। ততক্ষণ দাঁতালরা খাওয়া শেষ করে, ভরা-পেটে এদিকে ওদিকে সরে যাচ্ছিল। তাদের জায়গায় হায়নোডন, বুনো কুকুর আর শেয়ালরা এগিয়ে এসেছিল।

এরি মধ্যে নাকে একটা বাসি মাংসের দুর্গন্ধ আসছিল। এরপর কি অবস্থা হবে, তাই ভেবে গ্রিড্‌লি গাছ থেকে নেমে খোলাজায়গাটার ধার দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল, যদি কারো পায়ের চিহ্ন পায়। কিন্তু চিহ্ন থাকলেও, সেগুলো জন্তুদের থাবার দাগে চাপা পড়ে গেছিল। শেষ পর্যন্ত আন্দাজে এক দিকে এগোতে লাগল। মনে হল হয়তো সেদিকেই উড়ো-জাহাজটা আছে।

নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল এই ভেবে যে আগের গাছে দাগ কাটলেও, শেষের দিকে কাটেনি কেন। বড় তেষ্টা পেয়েছিল। একটা নদীতে প্রাণ ভরে জল খেয়ে, আরেকবার মাংস ঝল্‌সে খেয়ে, খানিক বিশ্রাম করে, তারপর আবার চলতে লাগল।

গ্রিড্‌লি ভারি জববদস্ত মানুষ ছিল, সহজে সে হাল ছেড়ে দিত না। কিন্তু ক্রমে তার বাঁচবার আশা কমে আসছিল। গাছপালাগুলো চেনা চেনা লাগলেও, তাতে পথ চেনা যায় না। এদিকে বাহাত্তর ঘণ্টা কেটে গেছে সার্চ পার্টির কোনো চিহ্ন নেই। উড়েজাহাজে যারা ছিল তারা ক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। জুপনার, হাইন্স আর ডর্ফ প্রায় সারাক্ষণই ওপরের ক্যাবিন থেকে চারদিক পর্যবেক্ষণ করছিল। উড়োজাহাজটাকে সরানোও উচিত হবে না। তাহলে ওরা ফিরে এলেও কাউকে খুঁজে পাবে না। হঠাৎ হাইন্সের উত্তেজিত স্বর শোনা গেল। বন থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে আসছে। হয় ফনহর্স্ট নয় গ্রিড্‌লি।

জুপনার বলল, 'এখনি দশজন লোক নিয়ে বেরিয়ে পড়, ডর্ফ। অস্ত্রশস্ত্র নিও।' তখনি তারা বেরিয়ে পড়ল।

শ্রান্ত ক্লান্ত গ্রিড্‌লি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, 'আর

কে-কে ফিরেছে ?' কেউ ফেরেনি শুনে সে হতাশ হল।

সে যাই হক স্নান করে পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরে, খেতে বসে, গ্রিড্‌লি ওদের কাছে তার সব লোমহর্ষণ অভিজ্ঞতার কথা বলল।

সব শুনে জুপনার বলল, 'গ্রিড্‌লি, তুমি কি নতুন একদল লোক নিয়ে আবার ঐ খোলা জায়গায় পৌঁছতে পারবে ?'

'—নিশ্চয়। ঐ পর্যন্ত তো গাছে গাছে দাগ কেটেছিলাম আমরা। আমি না গেলেও এরা যেতে পারবে। ওদের সঙ্গে আমি যাব না। লেফ্‌টেনাণ্ট ডর্ফ যাক। আমি একা স্কাউট প্লেনটা নিয়ে আরেকটু ব্যাপক ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে চাই। আমি জানি প্লেন চালাতে আমার চেয়ে হাইন্স বা ডর্ফ বেশি দক্ষ, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমারি ঝুঁকিটা নেওয়া উচিত।'

একথা শুনে সবাই চুপ। শেষ পর্যন্ত জুপনার বললেন, 'যাবে তো যেও। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা লম্বা ঘুম দিতে হবে।'

গ্রিড্‌লি ঘুমোতে গেলে পর, স্কাউট প্লেনটাকে মাটিতে নামিয়ে বাকিরা সেটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল, কোথাও কোনো খুঁৎ আছে কি না। এ-সব কাজ শেষ হবার আগেই গ্রিড্‌লিও ঘুম থেকে উঠে, তৈরি হয়ে, নিচে নেমে এল।

জুপনার বললেন, 'বেশিক্ষণ তো ঘুমোলে না ?'

—'বেশি ঘুম হল না। খালি মনে হচ্ছে ওরা না জানি কি বিপদে পড়েছে।'

জুপনার বললেন, 'এবার বল কিভাবে তোমার উড়বার ইচ্ছা, যাতে ফের O-220কে খুঁজে পাও ?'

গ্রিড্‌লি বলল, 'স্কাউট প্লেনে যতখানি তেল ধরে, তাই দিয়ে দু'শ পঞ্চাশ মাইল গিয়ে, আবার ফিরে আসা যায়। ধরে নিচ্ছি ওরা দিক ঠিক করতে না পেরে, উড়োজাহাজের উল্টো দিকেই হাঁটা দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ওদের যতটা এগোনো সম্ভব মনে হয়, সবটা ঘুরে দেখব। যাবার সময়ই কোথায় ঝিল, কোথায় টিলা, দেখে দেখে যাব। ল্যাণ্ডমার্ক জানা থাকলে হারিয়ে যাব না। দরকার না হলে নামব না। সঙ্গে রাইফ্‌ল্‌ নিয়ে নেব। এখানকার জন্তুজানোয়াররা মোটেই সুবিধার নয়।'

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, গ্রিড্‌লি স্কাউট-প্লেনের খোলা কক্‌পিটে উঠে বসল। মাথার ওপরে দুবার চক্কর দিয়ে, প্লেনটা বনের ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

ইচ্ছা করেই খুব আওয়াজ তুলে প্লেন চালাচ্ছিল। যাতে দলের কেউ নিচে থাকলে টের পায়। আরেকবার পাক দেবার জন্য যেই ঘুরেছে, অমনি প্রায় প্লেনটার সমান বড়, দাঁতালো কুমীরের মতো মুখ আর লম্বা গলা বিশিষ্ট বিকট এক পাখি ওকে আক্রমণ করল। প্লেন তখন তিন হাজার ফুট উঁচুতে উড়ছিল। গ্রিড্‌লি ভাবল একটা ডাইভ দিয়ে পাখিটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার আগেই পাখিটা সোজা প্রপেলারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্লেন উল্টে গেল। গ্রিড্‌লি প্যারাশুট নিয়ে লাফ দিয়ে তার দড়ি টানল। মাথায় কিসের আঘাত লাগল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

★

এদিকে টারগাশ কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না, টারজান কেন তার নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। টারগাশকে তো ঐ অন্তঃ-জগতের যে-কোন জায়গায় ছেড়ে দিলে, সে নিঃসন্দেহে বাসার পথ খুঁজে পাবে। শেষটা হতাশ হয়ে সে বলল, 'একদল মানুষ কোথায় থাকে, তা কিন্তু আমি জানি। তারাই হয়তো তোমার লোক।'

তার সঙ্গে যেতে যেতে টারজান বলল, 'ওরা কদ্দিন আছে এখানে ?'

কিন্তু দিনের হিসাব বলে কিছু টারগাশের জানা ছিল না। সে যাই হক, ধীরে-সুস্থে ওরা এগোতে লাগল। একসঙ্গে শিকার করত, শত্রুদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়ত। ক্রমে দুজনার মধ্যে ভারি একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেল। টারগাশ দেখল লোকটার শরীর ওর চেয়ে ছোট হলেও সে ভারি চতুর, দক্ষ, সাহসী আর জোরালো।

টারজান নিজের আর টারগাশের জন্য নতুন তীর-ধনুক, মজবুত বর্শা তৈরি করল। গোড়ায় টারগাশ জিনিসগুলোকে একটু অশ্রদ্ধার চোখে দেখলেও, ওর ব্যবহার দেখে, অল্প সময়ের মধ্যে টারজানের কাছ থেকে কায়দা-কানুনও শিখে নিল। এদিক থেকে ওপরের জগতের বনমানুষদের চেয়ে এরা ঢের বেশি বুদ্ধিমান আর দক্ষ।

এতকাল টারজান ভাবত আফ্রিকার জগতের মতো জগৎ নেই, বনের মতো বন নেই। কিন্তু এখানকার বিশাল প্রাচীন গাছপালা ফুলফল আর বিরাট শক্তিশালী জীবজন্তু দেখে সে নিত্য তাজ্জব বনে যাচ্ছিল। কম কথা বলত দুই বন্ধুতে। পৃথিবীর সভ্য মানুষরাও যদি তাই করত, তাহলে

তাদের মস্তিষ্কের আরো অনেক উন্নতি হত।

O-202-র সঙ্গী-সাথীদের বিপদ-আপদের কথা না জানাতে টারজানের মনে কোনো শান্তি ছিল না। তাদের কাছে ফিরে যাবার কোনো তাড়াও ছিল না। তবে মনের পিছনে এই চিন্তাটা ছিল যে স্বজাতিদের কাছে গিয়ে, কর্তব্য সম্পন্ন করে, আবার নিজেদের জগতে ফিরে যেতে হবে। তবু কোনো তাড়াতাড়ির কারণ নেই।

একটা খোলা জায়গা দিয়ে দুজনে পার হচ্ছিল, এমন সময় মাথার ওপর অদ্ভুত শব্দ শুনে, টারগাশ ওকে ডেকে তাড়াতাড়ি একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিয়ে বলল, 'শীগগির কর। ওটা একটা থিপদার।'

'—সে আবার কি? জ্যান্ত কিছু নাকি?'

'—হ্যাঁ নিশ্চয়, ভীষণ হিস্র।'

টারজান বলল, 'তাহলে ওটা থিপদার নয়। জ্যান্ত নয়। ওটাকে এরোপ্লেন বলে।'

নিশ্চয় ওর-ই খোঁজেই বেরিয়েছে প্লেনটা। খোলা জায়গায় বেরিয়ে অনেক হাত নাড়ল, দৌড়াদৌড়ি করল টারজান। কিন্তু বৈমানিক ওকে দেখতে পেল না। ক্রমে প্লেনের শব্দটাও মিলিয়ে গেল।

থিপদারটা চলে গেল দেখে টারগাশ নিশ্চিন্ত হল। সে বলল, 'ওটা থিপদারের চেয়েও বড় আর হিস্র! কি রকম গর্জন করছিল শোন নি? ভাগ্যিস নামেনি।'

টারজান বলল, 'না ওটা কোনো জানোয়ারই নয়। ওটাকে আমার জাতভাইরা বানিয়েছে। ওতে বসে আমার এক বন্ধু আমাকে খুঁজছে।'

টারগাশ তাতে একটুও আশ্বস্ত না হয়ে বলল, 'না নেমে ভালোই করেছে।'

কি আর করা। টারগাশের সঙ্গে পাহাড়ের মধ্যে সরু একটা খাদ দিয়ে ওরা চলল।

খাদটা বেশি গভীর নয়। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গুহা-গহ্বর। শুকনো রুক্ষ মাটিতে সবুজ গাছগাছড়া কম। এসময় একটা বিশ্রী চিৎকার শোনা গেল। টারগাশ বলল, 'ঐ শোন ডিয়াল!'

'—সে আবার কি?'

'—এক রকম পাখি। খুব হিংস্র, কিন্তু খেতে বড্ড ভালো। আমার খিদে পেয়েছে।'

তারপর নাকে উট পাখির মতো একটা গন্ধ এল আর হাঁচড়-পাঁচড় শব্দ শুনে মনে হল পাখিটা খুব বড়।

একটা পাথরের আড়াল থেকে টারগাশ ইশারা করে ওকে ডাকল।

টারজান নিঃশব্দে তার কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখল অতিকায় একটা পাখি পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটলের বাইরে দাঁড়িয়ে কেন জানি ফাটলের মুখে খামচাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকরা দেখলে বলতেন এ হল মায়োসিনি যুগের ফররহাকস্। তবে টারজানের আর টারগাশের কাছে ওর নাম অজানা। তারা দেখছিল ঘোড়ার সমান বড়, মাথায় ঝুঁটিওয়ালা এক পাখি তার প্রকাণ্ড বাঁকানো ঠোঁট দিয়ে ফাটলে টোকরাচ্ছে, ছোট ছোট অকেজো ডানা রাগের চোটে ঝাপটাচ্ছে আর বিশ্রী করে চ্যাঁচাচ্ছে। ডানায় তিনটি করে নখর।

আরেকটু লক্ষ্য করে টারজান দেখল পাখিটা ঠোকরাচ্ছে কোনো মানুষের হাতে-ধরা একটা বল্লমের ওপর। এদিকে মুগুর হাতে টারগাশ এগিয়ে যাচ্ছিল। ওই পাখিকে কব্জা করা ঐ বল্লম বা মুগুরের কর্ম নয়। টারগাশ আরো কাছে আরেকটা পাথরের আড়ালে দাঁড়াল। টারজানও তাই করল। পাখিটা এখন পঞ্চাশ ফুট দূরে। হঠাৎ মুগুর তুলে তার দিকে ছুটে গেল টারগাশ। টারজান ধনুকে তীর পরাল। অর্ধেক পথ এগোবার পর পাখিটা ওদের লক্ষ্য করল।

অমনি বিকট চিৎকার দিয়ে এতবড় হাঁ করে তেড়ে এল। টারগাশ বাঁই-বাঁই করে নিজের মাথার চারদিকে মুগুর ঘোরাতে ঘোরাতে, হঠাৎ পাখির পায়ের দিকে ছুঁড়ে দিল। লাগলে ঠ্যাং ভেঙে যাবে নিশ্চয়, পাখিটাও অসহায় হয়ে পড়বে। কিন্তু না লাগলে টারগাশের রক্ষা নেই।

দুঃখের বিষয়, ঠিক তাই হল। টারজানও সঙ্গে সঙ্গে তীর ছুঁড়ল। তীরটা টং করে একেবারে পাখির বুকে গিয়ে বিঁধল। পাখি তবু তেড়ে এল। টারজানের আরেকটা তীরও ওর গায়ে লাগল। তবু সে থামল না। টারগাশ একটা বড় ঢিল মারল, সেটা মাথার পাশে লাগল। টারজানের আরো দুটো তীর লাগল পাখির গায়ে। তারপর কে যেন টারজানের কাঁধের ওপর দিয়ে মস্ত একটা বল্লম ছুঁড়তে, সেটাও পাখির বুকে বসে গেল। সে আর পারল না। টারজানের পায়ের কাছে এলিয়ে পড়ল। টারজান সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠনালী কেটে দিল। এ পাখিকে দিয়ে বিশ্বাস নেই।

এবারে টারজান বল্লমের মালিকের দিকে চেয়ে দেখল। লম্বা বলিষ্ঠ একজন লোক, রোদ লেগে গায়ের রঙে তামাটে

আভা, মাথাভরা ঝাঁকড়া চুল হরিণের চামড়ার ফেট্টি দিয়ে বাঁধা। নেংটি পরা, কোমরে একটা পাথরের ছোরা গোঁজা, সুন্দর, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, নাক মুখ সুগঠিত। বাস্তবিক পৌরুষের প্রতিমূর্তি।

টারগাশ মুগুর তুলে বলল, 'আমি টারগাশ, তোমাকে মারব।' অচেনা লোকটি তার পাথরের ছোরা বের করল, কিছু বলল না। টারজান টারগাশের সামনে গিয়ে বলল, 'কেন মারবে?'

'—ওযে গিলাক!'

'—ও তো বল্লম দিয়ে পাখি মেরে, তোমাকে আমাকে বাঁচিয়েছে।'

'—কিন্তু—কিন্তু—তা না হলে ও যে আমাকে মারবে!'

টারজান অচেনা লোকটিকে বলল, 'আমি টারজান, এর নাম টারগাশ।'

সে বলল, 'আমি থর।'

টারজান বলল, 'তোমার সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই। আমরা বন্ধু হব।'

কথা শুনে সে যেন একটু হকচকিয়ে গেল।

টারজান বলল, 'তুমি সাগথদের ভাষা বোঝ?'

'—খানিকটা। কিন্তু কেন বন্ধু হব?'

'—কেন শত্রুই বা হব?'

'—তা জানি না। তাই তো সর্বদা হতে দেখি।'

টারজান বলল, 'আমরা না এলে ডিয়ালটা তোমাকে মেরে ফেলত। তুমি বল্লম না ছুঁড়লে আমাদের মেরে ফেলত। কাজেই আমরা বন্ধু। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'—নিজের দেশে।'

'—আমরাও সে দিকে যাচ্ছি। চল, একসঙ্গে যাই। দুটো হাতের চেয়ে ছ-টা হাত ভালো।'

থর টারগাশের দিকে চাইল।

'—বন্ধুর মতো একসঙ্গে যাব তো, টারগাশ?' টারজান জিজ্ঞাসা করল।

'—যায় না তো কেউ।'

'—আমরা যাই। চল।'

যাবার আগে ছোরাটা বের করে, টারজান পাখির গা থেকে বড় বড় টুকরো মাংস কেটে নিল।

তাই দেখে থর-ও তার পাথরের ছোরা দিয়ে কয়েক টুকরো কুপিয়ে কাটল। টারজানের ইস্পাতের ছোরা দেখে থর অবাক হল। টারগাশ ও-সবের ধার ধারে না। সে দাঁত দিয়ে বড় বড় চাকলা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে কাঁচা কাঁচাই খেল। অন্য সময়ে হলে টারজানও তাই করত, কিন্তু থর যখন কাঠি ঘষে আগুন জ্বেলে মাংস ঝলসে খেল টারজানও তাই করল।

খাওয়াদাওয়ার পর ওরা পাহাড়ের ওপরকার পথ ধরে এগোতে লাগল। থরের দেশ সম্বন্ধে টারজানের অদম্য কৌতূহল হলেও, সাগথদের ভাষা বড়ই সীমিত, ভালো করে কিছু জানাই গেল না। কাজেই চলতে চলতে থরের কাছে টারজান তাদের ভাষার পাঠ নিতে লাগল। এ বিষয়ে তার জন্মগত প্রতিভার সঙ্গে অনড় সংকল্প মিলে অল্প দিনেই কাজ চালাবার মতো ভাষাটা শেখা হয়ে গেল।

নিচু পাহাড়ের মাথা থেকে দূরে উঁচু পাহাড়ের সারির দিকে দেখিয়ে থর বলল, 'ঐখানে জোরাম!'

'—জোরাম কি?'

'—আমার দেশ। থিপদারদের পাহাড়ে আমার দেশ।'

টারজান বলল, 'থিপদার কাকে বলে?'

থর অবাক হল, 'তুমি কোথাকার মানুষ যে গিলাকদের ভাষা জান না; থিপদার কাকে বলে, তাও জান না!'

'—আমি যে পেলুসিডারের লোক নই।'

থর বলল, 'কিন্তু পেলুসিডার ছাড়া আবার জায়গা কোথায়? এক যদি মলপ আজ বলে অগ্নি-হ্রদ থেকে এসে থাক। কিন্তু সেখানে তো শুধু খুদে মানুষদের বাস। যে-সব মরা মানুষদের আমরা পুঁতি, ওরা তাদের নামিয়ে সেখানে নিয়ে যায়। তুমি তো তাদের মত নও।'

'—না, না, আমি সেখান থেকেও আসিনি।' মনে মনে ভাবছিল সে, টারগাশ হল আদিম যুগের মানুষ। তার থেকে থরের অবস্থায় পৌঁছতে মানবজাতির লেগেছিল বহু হাজার বছর। তারপর থর থেকে টারজানের যুগের মানুষদের অবস্থায় উপনীত হতে আরো কত হাজার বছর! তবু তিন জনের মধ্যে কত মিল রয়ে গেছে!

আরো দু-এক দিন পরে টারজান অবাক হয়ে দেখল নিচু পাহাড়টার নিচের উপত্যকায় যেন একটা এরোপ্লেন ভেঙে পড়ে আছে! এটা কি তবে আগে যেটাকে উড়তে দেখেছিল, তারি ধ্বংসাবশেষ? টারজান সেদিকে এগোল।

★

জোরামদেশের বাইরে, থিপদার পাহাড়ের পাদদেশে ফেলি থেকে চারজন বিকট লোক জোরামের লাল ফুল, সুন্দরী জানার পেছু নিয়েছিল। বিশ্রাম নেই,

খাওয়া নেই, কতদিন ধরে বেচারি পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। যেখানে থেমে জানা একটু দম নিচ্ছিল তার পিছনে আর নিচে পাথুরে পাহাড়চুড়ো দেখা যাচ্ছিল। মুহূর্তকাল সোজা দাঁড়িয়ে, একটা পাথরের আড়ালে, পাথরের ওপরে সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে যে পথ ধরে এসেছিল, সেই পথটাকে পর্যবেক্ষণ করল। সারাজীবন কেটেছে তার এই প্রস্তরময় থিপদার পাহাড়ের শিখরে। সমতলের লোকদের সে ঘৃণার চোখে দেখে। হয়তো তারা যদি এই পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করত, তাহলে তাদের ওপর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা হত। অবিশ্যি তবুও পালাবার চেষ্টা সে নিশ্চয় করত।

ফেলির লোকদের ওপর ঘৃণা তার হাড়ে হাড়ে ছিল। তাদের কিন্তু থিপদার পাহাড়ের বিখ্যাত সুন্দরী মেয়েদের ওপর বড়ই আগ্রহ। মাঝে মাঝেই ঐ গ্র্যানাইট পাথরের বাধাকেও তুচ্ছ করে ওরা এখানকার মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। জানার বোন লানাকেও ঐ ভাবে নিয়ে গেছিল। আরো জনা দুই চেনা মেয়েকেও। তাই ওর মনে সদাই ভয়। জানা ভাবত জোরামের কোনো ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়াই সব চেয়ে ভালো। পাহাড়ের ছেলেরা কখনো সমতলের মেয়ে বিয়ে করে না। ফেলির লোকদের হাতে পড়ার চেয়ে মরা ভালো।

অনেকদিন ধরেই এই চারটে লোকের কাছ থেকে জানা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। পাহাড়ের একটা নির্জন জায়গায় থিপদারের ডিমের খোঁজে গিয়েই, ওর এই বিপদ। কিছুতেই আর নিজেদের গাঁয়ে ফিরতে পারছিল না। ওরা আসলে গুহাবাসী।

এদিকে ওর চেয়ে খানিকটা নিচে সেই চারটে লোমশ লোক হয়রান হয়ে বসে পড়েছিল। ওদের সরদার হল স্ক্রুক, সে-ই জানার পাণিপ্রার্থী। জানা বুঝল খানিকটা চালাকি না করলে এদের ঠেকানো যাবে না। তাই পাহাড়ের কিনারায় একবার দেখা দিয়েই, খাড়া পাথর বেয়ে অনেক কষ্টে নামতে শুরু করে দিল। ঐ ভারি লোমশ মানুষগুলোর এ পথে নামা সম্ভব নয়। ওর পক্ষেও এ পথ বড় কঠিন। একবার হাত কি পা ফস্কালেই নিশ্চিৎ মৃত্যু। স্ক্রুক তা চায় না। তাই ওকে ভুলোবার জন্য শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, আজ যাও মেয়ে, কিন্তু স্ক্রুক্ সহজে ছাড়বে না। এখন ফেলিতে ফিরে যাচ্ছি বটে, কিন্তু আবার এসে তোমাকে বৌ করে নিয়ে যাব।'

এই বলে পিঠ ফিরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে চলে গেল। তবে বেশি দূরে গেল না। একটা সুবিধা মতো জায়গা পেয়ে সেই পথ ধরে জানার আগেই নিচে গিয়ে ও কিছু টের পাবার আগেই ওর কাছাকাছি পৌঁছেও গেল।

জানাও এক সময় নিরাপদে নিচে নেমে এল। এমন জায়গার এত কাছাকাছি সে কখনো আসেনি। তার জীবন কেটেছে পর্বতশিখরে। হঠাৎ একটা অচেনা শব্দ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে বিশাল একটা থিপদারের সঙ্গে, তার চেয়েও বড় একটা পাখির লড়াই হচ্ছে। তারপর অবাক হয়ে দেখল ব্যাঙের ছাতার মতো একটা কি পাখিদের কাছ থেকে নিচে নেমে আসছে। ভয়ে বিস্ময়ে, জানা দেখল একটা মানুষ ব্যাঙের ছাতায় ঝুলে আছে! তাই দেখেই জানা উল্টো দিকে দৌড় দিল। একটু পরেই স্ক্রুক্ আর তার বন্ধুদের সামনে পড়ে গেল।

তার আগেই জেসন গ্রিড্‌লির প্যারাসুট মাটিতে পৌঁছে ছিল। ভাঙা প্রপেলারের একটা টুকরো ওর মাথায় পড়াতে, কিছুক্ষণের জন্য সে জ্ঞানও হারিয়েছিল। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে দেখল সে একটা উপত্যকার নরম ঘাসের ওপর শুয়ে আছে! উঠেই বুঝল কোথাও কোনো চোট লাগেনি। চেয়ে দেখল পাশেই খাড়া পাহাড়, কাছেই একটা খাদের মুখ। সেদিক থেকে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে ছুটে আসছে আর তার ডান দিক থেকে চারটে হিংস্র ধরণের লোমশ লোক আর বাঁ দিক থেকে চারটে সমান হিংস্র হায়নোডন বা জালক ছুটে আসছে! বুদ্ধি করে মেয়েটি সোজা জেসন গ্রিড্‌লির কাছে ছুটে এল। সে-ও খাপ থেকে তার ৪৫ ক্যালিবারের কোল্ট রিভলবার বের করে তৈরি হল! প্রথম জালকটা মেয়েটাকে ধরে আর কি! এমন সময় গুলি খেয়ে মাটি নিল। জানাও আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়াতে গুলি করার সুবিধা হয়েছিল।

বন্দুকের শব্দ শুনে বাকি তিনটে জালক আর লোকগুলো থমকে দাঁড়াল। জানার ধারণা জোরামের ছেলেরা ছাড়া আর সব পুরুষমানুষ অতি মন্দ, এই মনে করে কোমরের খাপ থেকে তার পাথরের ছোরা বের করেছিল, কিন্তু জেসনের কোমল হাসি দেখে আবার ভরেও রাখল। ততক্ষণে শত্রুদের ভয় ভেঙে গেছিল। একটা জালক জেসন আর জানার দিকে দাঁত খিঁচিয়ে এগোচ্ছিল। বাকি দুটো স্ক্রকদের দিকে তেড়ে গেল। ওরাও বল্লম নিয়ে প্রাণপণে লড়তে লাগল। অন্যটি গুলি খেয়ে মরল। পুরুষরা যখন লড়াইয়ে মত্ত, জানা তখন হয়তো পালাতে পারত। কিন্তু যে সুন্দর মানুষটি তাকে রক্ষা করেছিল, তার আশ্রয় ছেড়ে যেতে ইচ্ছাও করল না, বুদ্ধির কাজ হবে বলেও মনে হল না জানার কাছে ফেলির লোকগুলো কোনো অংশে জালকদের চেয়ে ভালো ছিল না।

ততক্ষণে জালক দুটোকে মেরে, একজন ফেলির যোদ্ধা খানিকটা এগিয়ে এসেছে। তার নাম গ্লুফ্। অন্য দুজনও পিছন দিয়ে ঘুরে আসার তালে আছে। একটা কিছু না করলেই নয়। কিন্তু একেবারে মেরে ফেলতেও মন সরছিল না, তাই ওদের মাথার ওপর দিয়ে একবার গুলি ছুঁড়ল। ওরা থমকে দাঁড়াল বটে, কিন্তু যেই দেখল কারো আঘাত লাগেনি, অমনি তিনজনেই তেড়ে এল। তখন গ্লুফ্‌কে গুলি করে মারা ছাড়া উপায় রইল না। বাকিদের মুগুর ছুঁড়বার প্রস্তুতি দেখে, আরেকটাকেও গুলি করতে হল। তখন স্ক্রক্ আর অন্য লোকটি রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। তার ফলে জেসন আর জানা দুজনেই সঙ্গীহারা অবস্থায় সেই রুক্ষ উপত্যকায় দাঁড়িয়ে রইল। ছোটবেলা থেকেই জানা জানত যে স্বজাতিরা ছাড়া, সব পুরুষই শত্রু, কিন্তু একে দেখে পরম বন্ধু বলে মনে হল।

জেসন গ্রিড্‌লিও মহা সমস্যায় পড়ে গেল, সেই নির্বান্ধব বিপদসঙ্কুল অচেনা উপত্যকায় এই সুন্দরী তরুণীকে সে কিভাবে রক্ষা করবে! এর ভাষা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না।

★

টারগাশ আর টারজান কিছুক্ষণ প্লেনটার ধ্বংসাবশেষের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর টারজান খুঁজে দেখে নিশ্চিন্ত হল যে প্লেনে কোনো মৃতদেহের চিহ্ন নেই। কিন্তু অন্য পাশে দুজনার পায়ের চিহ্ন দেখতে পেল। একটা যে জেসন গ্রিড্‌লির পদচিহ্ন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যটা স্যাণ্ডাল পরা ছোট ছোট পায়ের দাগ। হয় কোনো মেয়ের, নয় ছোট ছেলের। পায়ের চিহ্ন দেখে তারা কোন দিকে গেছে, তাও বোঝা যাচ্ছে। টারজানও সেই দিকে চলল। প্লেনটা তাহলে ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু জেসন প্যারাসুটে করে নিরাপদে নেমেছিল। সঙ্গীকে কোথায় পেল, তা বোঝা গেল না।

প্লেন দেখে থরের এত আগ্রহ যে তাকে সহজে সেখান থেকে সরানো যাচ্ছিল না। টারগাশ অবিশ্যি কিছুই বোঝেনি। টারজান তাকে বলল, 'এটাকে উড়তে দেখেই তুমি পাখি বলে ভুল করেছিলে।'

আরেকটু এগোতেই টারজান প্লেনের ভাঙা প্রপেলার আর বিশাল পাখি টেরানোডনের মৃতদেহ দেখেই প্লেন ভেঙে পড়ার কারণ বুঝতে পারল। আরো আধমাইল গিয়ে একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছল। সেখানে চারটে জালক আর দুটো লোমশ মানুষের মৃতদেহ পড়ে ছিল। একটু দূরে প্যারাসুটটাকেও পড়ে থাকতে দেখা গেল। দুটো জালক আর দুটো মানুষ গুলি খেয়ে মরেছে। পায়ের ছাপ দেখে মনে হল বাকি দুজন মানুষ পাহাড়ের খাদ দিয়ে পালিয়ে গেছিল আর জেসন আর সেই অন্যজন ভাঙা প্লেনটা পরীক্ষা করতে ফিরে গেছিল। থরও মন দিয়ে পায়ের ছাপগুলো দেখে বলল, 'চারজন ফেলির লোক আর একজন জোরামের মেয়ের পায়ের ছাপ চিনতে পারছি।

টারজান বলল, 'তবে কি আমরা জোরামের কাছে পৌঁছে গেছি?'

'—না। ঐ যে পাহাড় দেখছ, ওর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু যেটা, তার ওপর জোরাম।'

'—তবে কি এই স্যাণ্ডালটাকে তুমি চিনতে পারছ?'

'—ওটা আমার বোনের পায়ের ছাপ। আমাদের মেয়েরা নিজের হাতে স্যাণ্ডাল সেলাই করে। ওর কারিগরি, নক্সা আর সেলাইয়ের কায়দা দেখেই চেনা যায়, কোথাকার মেয়ের হাতের কাজ। আমার বোনের কাজ আমি খুব চিনি।'

'—তাহলে এতদূরে সে কি করছিল?'

'—কারণটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ফেলির ছেলেরা আমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। ঐ চারটে লোক নিশ্চয় আমার বোনকে তাড়া করে এতদূরে এনেছিল। তোমার বন্ধু তাকে জালকদের আর ঐ লোকদের হাত থেকে রক্ষা করে, নিজে তাকে বন্দী করেছে।'

টারজান হেসে বলল, 'মেয়েটি তো পালাবার কোনো চেষ্টা করেছিল বলে মনে হচ্ছে না।'

থর মাথা চুলকে বলল, 'সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। আমাদের মেয়েরা ভিন-জাতের পুরুষ দেখলেই পালায়।'

টারজান বলল, 'আমার বন্ধু কাউকে ধরে নিয়ে যাবে না। ওর সঙ্গে গেলে সে নিজের ইচ্ছাতেই গেছে। সম্ভবতঃ ওকে জোরামে পৌঁছে দিচ্ছে, আর কিছু নয়।'

থর বলল, 'দেখাই যাক। জোর করে থাকলে ওকে মরতে হবে।'

এদিকে,টারজানরা যখন জেসনদের পায়ের চিহ্ন দেখে থিপদার পাহাড়ে চড়ছিল, তখন ওদের পঞ্চাশ মাইল পুবে একজন শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে দশজন কালো যোদ্ধা থিপদার পাহাড়ের সীমানা ঘুরে গিয়র উপত্যকায় ঢুকল। এরা হল ফন হর্স্ট, মুবিরো আর তার যোদ্ধারা। ওস্তাদ ট্র্যাকার ঐ ওয়াজিরিরাও পথের খেই পাচ্ছিল না। ফন হর্স্ট খালি বলছিল, 'বনের মধ্যে ঢুকো না, খোলা জায়গায় থাকো। O-220 থেকে নিশ্চয় আমাদের খুঁজতে বেরোবে, তারা যেন দেখতে পায়।'

এদিকে জেসন গ্রিড্‌লিও যখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরল না, জুপনার ডর্ফের নেতৃত্বে আরেকটা সার্চ-পার্টি পাঠাল। তারা গাছের দাগ দেখে দেখে সেই খোলা জায়গা অবধি গিয়ে দেখল, তারপর আর কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। জায়গাটা জানোয়ারদের পচা দেহে ভরা। সেগুলোকে শেয়ালে টেনে খাচ্ছে। সত্তর ঘণ্টা পরে হতাশ হয়ে তারা ফিরে এল। ডর্ফ বলল, 'যে-রকম হিংস্র অতিকায় বাঘ দেখে এলাম, বন্ধুদের যে তারাই খেয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

জুপনার বললেন, 'তার প্রমাণ না পাওয়া অবধি খোঁজ চালিয়ে যেতে হবে। এখানে থেকে কোনো লাভ হবে না। একটু ঘুরে দেখতে হবে।'

শেষ পর্যন্ত তাই স্থির করা হল। পাচক রবার্ট তার ডাইরিতে লিখল, 'আজ বেলা বারোটায় এ জায়গা ছেড়ে গেলাম।'

জেসন কিন্তু সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়ে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়েছিল। মেয়েটি বারবার থিপদার পাহাড়চুড়োয় নিজেদের দেশের দিকে দেখায় আর জেসন উল্টো দিকে, যেখানে O-220 আছে বলে তার ধারণা, সেদিকে দেখায়। শেষ পর্যন্ত তার কোমল মিষ্টি হাসি দেখে মেয়েটি আর আপত্তি করল না। কিছু পরেই বোঝা গেল মেয়েটির ভাষা জেসনকে শিখতেই হবে। মেয়েটি নিজের দিকে দেখিয়ে বলল, 'জানা!'

জেসন নিজের দিকে দেখিয়ে বলল, 'জেসন!'

দুজনে ক্রমাগত পাহাড় চড়ছে আর ভাষার পাঠ চলছে। খাওয়ার কষ্ট ছিল না। স্বচ্ছ ঝরনার জল। জানা যত সব ফলমূল বাদাম সংগ্রহ করে আনে। জেসন ছোট ছোট জানোয়ার শিকার করে। আর অবাক হয়ে ভাবে এমন সুন্দর মেয়ে সে কোথাও দেখেনি। আর শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, তার ওপর যেমন পরিশ্রমী, তেমনি কাজে পটু। চারদিকে নানা বুনো জন্তুর উৎপাত। জানা ঘুমোলে জেসন পাহারা দেয়, জেসন ঘুমোলে জানা পাহারা দেয়।

জেসনের সব হিসাব গুলিয়ে গেছিল। কতদিন ধরে ওরা হাঁটছে, কত দূর হেঁটেছে, সেসব বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ভাষা শিক্ষা চলছিল। এই ভাবে ওরা একটা গভীর খাদের কাছে পৌঁছল। সেটা পার হওয়াই একটা সমস্যা। জেসনের মনে হচ্ছিল এ যেন পাহাড়ের গায়ে লম্বালম্বি একটা ফাটল। বাঁ দিকে গেলে আবার ফেলিদেশের লোকদের সঙ্গে দেখা হতে পারে, এই ভয়ে জানা ডান দিকের পথ ধরল।

এই পথ-খোঁজার ব্যাপারে অনেকটা সময় চলে গেল। এখানে সময়ের কোনো মানে নেই। অথচ সারা জীবন জেসন সময় ধরে কাজ করে এসেছে। তাছাড়া অন্যদের জন্য অতিরিক্ত ভাবনাচিন্তা করাও যেন কেমন অবান্তর মনে হচ্ছিল। যা হয়েছে, তার জন্য ভেবে কি হবে? এই রকম মনে হচ্ছিল। জানোয়ারদের মধ্যে মানুষ হওয়াতে টারজানেরো অনেকটা ঐ রকম মনোভাব ছিল। জানা হঠাৎ বলল, 'আমার দিকে অত তাকিয়ে কি দেখ?'

শুনে জেসন বড় লজ্জা পেল, তাই কিছু বলল না।

জানা চটে গেল, 'বল না কেন?'

'—কি বলব?'

'—মনে যা থাকে, সেটা বল না কেন?'

ভারি বিরক্ত হয়ে জানা অন্য পথ ধরল, 'তোমার পথে তুমি যাও, আমার পথ আমি ধরি।'

●

থিপদার পাহাড়ের ওপর ঘন কালো মেঘ জমেছিল। থর বলল, 'আবার জল এল। জোরামে বৃষ্টি পড়ছে, এখানেও পড়বে।' এত ঘোর ঘনঘটা যে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। থর আর টারগাশ যেন বড় বেশি ঘাবড়ে গেল। জীবজন্তুরাও এমনি ভয় পাচ্ছিল যে খাদক

এবং খাদ্য পাশাপাশি ছুটছিল, কেউ কারো ক্ষতি করছিল না। যেই রোদ ঢাকা পড়ে গেল, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল। ওরা তিনজন শীতে কাঁপছিল।

তারপর বৃষ্টি এল। ফোঁটা ফোঁটা করে নয়, বন্যার ধারার মতো যেন সব ভাসিয়ে নিতে চাইছিল। জানোয়াররা অন্ধকারে পাগলের মতো দাপাদাপি লাগাল। বড় বড় উড়ুক্কু কুমিরের মতো পাখিরা মাটিতে পড়ে, অনভ্যস্ত পায়ে চলতে চেষ্টা করছিল। যেখানে ওরা ধুনি জ্বেলেছিল, সে এখন এক গাদা ছাইয়ে পরিণত হল। তাকে ঘিরেই ওরা জড়োসড়ো হয়ে বসে রইল। টারজানের মনে হল অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টি থামল। থর আর টারগাশের মতো সে-ও এ-ধরনের কষ্ট সইতে জানত।

ওরা না থাকলে টারগাশও হয়তো অন্য জন্তুদের মতোই আলোর খোঁজে ছুটে বেড়াত। কিন্তু ওদের কাছে থাকতে পারলেই ও নিশ্চিন্ত, কাজেই এতটুকু নড়ল না। তারপর বৃষ্টি থামল, বাতাস বন্ধ হল, আবার রোদ ঝকঝক করে উঠল। ওরা তিনজন উঠে পড়ল।

টারজান বলল, 'খিদে পাচ্ছে।'

আশেপাশে বড় বড় জানোয়ারের পায়ের চাপে মরা অনেক ছোট জানোয়ারও পড়ে ছিল। থর সে দিকে দেখাল এবং আজ তিনজনেই কাঁচা মাংস খেল।

পেট ভরে খাবার পর, ওদের খেয়াল হল জেসন আর জানার পায়ের দাগ মুছে গেছে। তারা অন্য পথে গেছে কি না কে জানে।

টারজান বলল, 'ওরা হয়তো জোরাম পৌঁছে গেছে।'

থর বলল, 'চল, আমরাও যাই। ওরা না পৌঁছে থাকলে, লোকজন জড়ো করে খুঁজতে হবে।'

কোথাও জানোয়ার-চলা পথ, কোথাও বা ন্যাড়া গ্র্যানাইটের ওপর দিয়ে হাঁটা। সে সব খাড়া পাথর চড়তে মাথা ঘোরে। টারজান নিজেই অবাক হল, কি করে পারল তাই ভেবে। একটা থিপদারের বাসা থেকে ডিম চুরি করে খাওয়া হল। তারপর দূরে ডানার শব্দ শোনা গেল। কি হবে? থিপদার আসছে, অথচ গা-ঢাকা দেবার উপায় নেই।

টারজান বলল, 'তাতে কি? আমরা তিনজন আর ও তো একা।'

থর বলল, 'একা হলেও, ওদের ভয়-ডর নেই। মাথা কেটে আমরা দেখেছি মগজ নেই বললেও চলে। মগজ নেই, তাই ভয়ও নেই। মৃত্যুকেও ভয় পায় না।'

টারজান বল, 'হয়তো আমাদের আক্রমণ করবে না।'

'—জ্যান্ত কিছু দেখলেই ওরা আক্রমণ করে। জোরামের বীররাও ওদের ভয় করে।'

টারগাশ বলল, 'ঐ যে আসছে!'

ওদের দেখেই পাখিটা বিকট চিৎকার করে উঠল। থর বল্লম বাগিয়ে ধরল, টারগাশ মুগুর দোলাতে লাগল, টারজান ধনুকে তীর পরাল।

বিশাল টেরানোডনটা সোজা ওদের দিকে তেড়ে এল। তারপর নখ দিয়ে স্বচ্ছন্দে টারজানকে তুলে নিয়ে, উড়ে চলে গেল। থর বল্লম ছুঁড়তে পারল না, টারগাশ মুগুর ছাড়ল না, পাছে টারজানের লাগে। টেরানোডনটা পাহাড়ের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টারগাশ বলল, 'টারজান মরে গেছে।'

বড় দুঃখে থর মাথা নাড়ল। আর একটিও কথা না বলে টারগাশ পাহাড় থেকে নেমে নিজেদের বিচরণ-ভূমির দিকে চলে গেল। আর থর জোরামের পথ ধরল।

টারজান কিন্তু জ্ঞান হারায়নি। সে জানত কোনো কোনো পাখি উঁচু থেকে শিকার মাটিতে ফেলে মেরে খায়। টারজানের আশা ছিল এ তা করবে না। নিচে তাকিয়ে মনে হল অনেক দূরে চলে এসেছে তারা, হয়তো কুড়ি মাইল।

একটা পাথুরে খাদ পার হয়ে একটা উঁচু গ্র্যানাইট শিখরে থিপদারের বাসা। বাসায় কয়েকটা খুদে থিপদার খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিল। উঁচু একটা চুড়োমতো পাথরে বাসাটা। ওপরটা হয়তো কয়েক বর্গ-গজ। চুড়োটা খাড়া উঠে এসেছে কয়েক শো ফুট। যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে খুব সুবিধার জায়গা নয়।

আস্তে আস্তে ছোরাটা বের করল টারজান। তারপর বাঁ হাতটা বাড়িয়ে থিপদারটার একটা পায়ের কব্জি এঁটে ধরল।

জানোয়ারটা ধীরে ধীরে বাসায় নামছিল, বাচ্চাগুলো বিশ্রীভাবে ক্যাঁওম্যাও করছিল। টারজানের পা তাদের মুখের কাছাকাছি পৌঁছল। ঠিক সেই সময় টারজান ওপর দিকে ডান হাত তুলে ধেড়েটার বুকে তার ছোরা বসিয়ে দিল।

ঠিক জায়গা দেখেই ছোরা বসিয়েছিল সে। বিকট চিৎকার করে জানোয়ারটা টারজানকে ছেড়ে দিল। বাচ্চাগুলোর মধ্যিখানে পড়ল টারজান। তিনটি মাত্র বাচ্চা, কিন্তু তাদের চোয়ালে জোর আর দাঁতে ধার ছিল।

ডাইনে বাঁয়ে কয়েকটা কোপ দিয়ে টারজান বাসা থেকে নেমে পড়ল। পড়েই মরা থিপদারটাকে ঠেলে তিনশো ফুট নিচে ফেলে দিল।

তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে চুড়োটার গা পর্যবেক্ষণ করে দেখল কিভাবে নামা যায়। যতদূর মনে হল কোথাও কোথাও খাঁজে হাত-পা রাখা যেতে পারে। কোমরে জড়ানো পঞ্চাশ ফুট লম্বা দড়িটা এবার কাজে লাগবে। মাথা দুটোকে একসঙ্গে করে ডান হাতে ধরে, দড়ির মাঝখানটাকে সযত্নে একটা খোঁচা পাথরে পরিয়ে খুব সাবধানে কুড়ি ফুট মতো নামল। তারপর আরেকটা খাঁজ, আরেকটা খোঁচা—এই ভাবে এক সময়ে চুড়োর নিচে পৌঁছে দেখল, হাত-পা ছড়ে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি।

নিচে নেমেই তার সমস্যার সমাধান হল না। কারণ যে বিশাল পাথুরে খোঁদলের ওপর দিয়ে থিপদারটা ওকে নিয়ে উড়ে গেছিল, সেটা পার হয়ে, ওদিকের খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে থর আর টারগাশকে খুঁজে পাবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তাছাড়া যে মানুষদের কাছে ওকে নিয়ে যাবার কথা টারগাশ বলেছিল, তারা যে 0-220-র লোকরা নয়, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই এই সব পাথর আর পাহাড়ের দেশ ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি বনজঙ্গলে ভরা সমতলে পৌঁছনো যায়, ততই মঙ্গল।

আরো খানিকটা নামলেই বনের সীমানায় পৌঁছনো যাবে। অবিশ্যি পথে কিছু অসুবিধাও ছিল; মাঝে মাঝে দড়ির সাহায্য নিয়ে নামতে হচ্ছিল। কিন্তু যতই নামে পথ ততই সহজ হয়ে আসে।

বড় সুন্দর জায়গা, খানিক দূর পথ গেছে গাছপালার মধ্যে এঁকেবেঁকে। তারপর হয়তো বড় বড় পাথরের খাঁজ বেয়ে উঠতে হল। একটা পথও দেখা যাচ্ছিল, উঁচুনিচু জায়গার ওপর দিয়ে চলে গেছে। নিঃশব্দে চলতে চলতে মনে হল পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু যেন মানুষের পদশব্দ নয়!

সরু পথ, এখানে হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে দেখা হলেই মুস্কিল। তবে একটা সুবিধাও ছিল। জীবটা যাচ্ছিল আগে আগে, টারজান তার পিছন পিছন। জীবটা ওর কথা জানে না, ও তার কথা জানে। চলার বেগ একটু বাড়াল টারজান। পায়ের শব্দ আরো স্পষ্ট হল। মনে হল কোনো ভারি চারপেয়ে জানোয়ার।

তারপরেই কানে এল কোনো ক্রুদ্ধ জন্তুর ফ্যাঁশ-ফোঁশানি আর চাপা গর্জানি। মনে হল কোনো প্রকাণ্ড জানোয়ার কাউকে আক্রমণ করবার জন্য তৈরি হচ্ছে। তাই শুনে টারজান ছুটে চলল। একটা বাঁক ঘুরেই যা দেখল তাতে ওর চক্ষুস্থির! একটা বড় গুহার মুখে দশ বারো বছরের সুন্দর একটা ছেলে বিশাল এক ভালুকের সামনে বল্লম আর পাথরের ছোরা হাতে রুখে দাঁড়িয়েছে। ভালুকটা রেগে তার দিকে এগোচ্ছে! মনে হল গুহাটাতে ভালুকের বাসা, তাই ছেলেটাকে বেরোতে দেখে সে রেগে উঠেছে।

টারজানকে দেখে ছেলেটার মুখ প্রথমে আশায় ভরে উঠেছিল। তারপর ভিন্-জাতির লোক দেখে মুষড়ে পড়ল।

টারজান কিন্তু সাহায্য করতেই প্রস্তুত ছিল। চেনা-অচেনা নির্বিচারে সে দুর্বলের পক্ষ নিত। হাতে দড়িগাছা ঝোলানো, বর্শা, তীর-ধনুক সব তৈরি। ঐ বিশালদেহ জানোয়ারের পক্ষে এ-সব হয়তো যথেষ্ট জোরালো অস্ত্র নয়। কিন্তু গুহার সামনে থেকে জানোয়ারটাকে একটু সরাতে পারলে, ছেলেটা সেই ফাঁকে পালাতে পারবে। একথা মনে হবামাত্র প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভালুকের পিঠে একটা তীর গিয়ে বিঁধল।

অমনি জানোয়ারটা ঘুরে দাঁড়াল। গর্জন করতে করতে টারজানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই আরো তিনটে তীর তার বুকে বিঁধে গেল। তার পরেই বর্শাটাকে তুলে ধরে গায়ের জোরে ছুঁড়ে দিল। দিয়েই পথের ওপর দিয়ে তীরবেগে দৌড়ল। ওকে ধরার সাধ্য বিদ্যুৎ ছাড়া কারো ছিল না। তবে ওর জোড়াটা আবার গুহা থেকে না বেরিয়ে আসে! ও তো এতগুলো অস্ত্র খেয়ে কাবু হয়ে পড়তে বাধ্য, হয়তো এর পর মারাও যাবে।

তবু তেড়ে আসতে লাগল জানোয়ারটা। টারজান চেয়ে দেখল ওর মাথার অনেকটা ওপরে একটা পাথরের মাথা বেরিয়ে রয়েছে। তার ওপর দিয়ে দড়ির ফাঁস পরাতে ওর বেশি দেরি লাগল না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও দড়ি বেয়ে সেখানে উঠতে লাগল।

★

জানা যে কেন অকারণে অত চটে গেল, সেটা জেসন খানিকটা আঁচ করতে পেরেছিল। সুন্দরী মেয়ে, সারা জীবন রূপগুণের প্রশংসা শুনে এসেছে। জোরামের যুবকরা সবাই তাকে বিয়ে করতে চায়। নিজের বিষয়ে খানিকটা গর্ব থাকাই স্বাভাবিক। অথচ জেসনকে তার এত

ভালো লাগে, কিন্তু জেসন কখনো মুখ ফুটে তার প্রশস্তি করে না। এটাই যে রাগের আসল কারণ, বুদ্ধিমান জেসনের সেটুকু বুঝতে দেরি লাগেনি। কিন্তু এক্ষেত্রে কি করা যায়? কাছে গিয়ে কিছু বলতে গেলে ফোঁস করে ওঠে।

একা একা গহ্বরের কিনারা দিয়ে জানা একরকম ছুটে চলে যাচ্ছে! কত রকম বিপদ ঘটতে পারে। জেসনের সঙ্গে রিভলবার আছে। আর কিছু না পারুক, শত্রু বা হিংস্র জন্তু তো মারতে পারবে। তাই পিছন পিছন চলল জেসন। কাছাকাছি গেলে মেয়েটা পাথরের ছোরা বের করে বলল, 'অন্যদিকে যেতে বলেছি না? আমার সঙ্গে এলে মেরে ফেলব!'

জেসন ভাবল, বাবা! যা বুনো এরা, তাও খুব পারে করতে! তাই অনেকটা তফাৎ রেখে পিছন পিছন চলল। জানা ফিরে দাঁড়াতেই বলল, 'তা কি করব? একা যেতে তো দিতে পারি না। না হয় মেরেই ফেল!' মেয়েটা তখন পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে নামতে লাগল।

জেসনের পায়ে বুট, সঙ্গে রিভলবার, গোলাগুলি। সে-সব নিয়ে অত তাড়াতাড়ি পারবে কেন? তবু যতটা পারে সেই ভাবে নামতে লাগল। রাগ দুঃখ দুই-ই হচ্ছিল। এ কি রকম ব্যবহার! একেবারে বাঁদর নাচিয়ে ছাড়ছে। তবু মনে বড় ভাবনা যদি ওর কোনো বিপদ হয়!

তার ওপর খিদেয়, ক্লান্তিতে জেসনের শরীর অবসন্ন। এরকম তো তার অভ্যাস নেই। মনে হল অনেকটা নেমেছে, এমন সময় দেখে একটা বড় ফাটলের কিনারায় জানা দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় কিভাবে ফাটলে নামবে তাই ভাবছে। জেসনকে দেখে ক্ষেপে গেল। 'খবরদার এগিয়ো না। তাহলে লাফ দেব!'

জেসন মিনতি করে বলল, 'লক্ষ্মীটি অমন করে না। আর কিছু না পারি, জানোয়ারদের হাত থেকে রক্ষা করতে তো পারব।'

নাক সিঁটকে জানা বলল, 'তুমি করবে রক্ষা! আর হাসিও না! যথেষ্ট মনুষ্যত্ব থাকলে তবে তো আমার পথে আসতে পারবে!'

জেসন বলল, 'তোমার কথায় মনে হচ্ছে আমি একটা শুঁয়োপোকা, কিন্তু তারাও তো কাজে লাগে।'

জানা আর কিছু না বলে ফাটলের কিনারা ধরে নেমে পড়ল।

জেসন ঝুঁকে দেখল খাড়া পাহাড় বেয়ে একটু একটু করে সে নামছে। প্রাণ হাতে করে শেষ পর্যন্ত জানা নিচে নেমে গেল। কাঁপতে কাঁপতে জেসন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল! বাবা! কি অমানুষিক সাহস আর দক্ষতা!

নিচের খাদটা ডান দিকে ঘুরে গেছে। জানা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হলে পর, জেসনও ধীরে ধীরে নামতে লাগল। নইলে তার মনুষ্যত্বের অভাব প্রমাণ হয়ে যাবে। আর কোনো দিন জানার কাছে দাঁড়াতে পারবে না। তাই নিচে না তাকিয়ে পাথরের খাঁজ আঁকড়ে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে সে-ও নামতে লাগল। তবে তার মনে শেষ রক্ষা করতে পারার আশা বিশেষ ছিল না। অনেকক্ষণ কেটেছিল, আরো কতটা বাকি তাও বুঝতে পারছিল না।

হাত পা ছড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল, দম বন্ধ হয়ে এল শেষটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছল, যার নিচে আর পা রাখার স্থান পায় না! আঙুল দিয়ে পাথর ধরে কতক্ষণ ঝুলে থাকা যায়? এক সময়, চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল; আঙুল অবশ হয়ে হাত আপনা থেকেই খুলে গেল, জেসনও খসে পড়ল। কিন্তু পড়ল মাত্র এক হাত! তার পরেই পায়ের তলায় মাটি পেল।

খাড়াইয়ের নিচে কখন পৌঁছে গেছে, জেসন তা টেরও পায়নি। সেই খানেই অবসন্ন হয়ে মাটিতে পড়ল। কিছু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে, মেয়েটা তাই দেখে কেঁদে ভাসাল।

অবসন্ন ভাবটা কেটে গেলে, আস্তে আস্তে উঠে জেসন একটু নিচেই একটা জলের উৎস দেখতে পেল। জুতো খুলে, হাত পা মুখ ধুয়ে, রুমাল ছিঁড়ে পায়ের ক্ষতগুলো বেঁধে আবার জেসন জানার পিছু নিল।

মাথার ওপর ঘন মেঘ জমে ছিল, তারপর চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল। সেরকম বৃষ্টি ওপরের জগতে হয় না। ওর অনেকটা সামনে, মেঘ দেখেই জানা উপত্যকা ছেড়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। নিঃসন্দেহে এবার ফাটলটা জলে ভরে যাবে। তার মধ্যকার মানুষ, জানোয়ার পালাতে না পারলে, ভেসে মরে যাবে। হঠাৎ মনে হল জেসন তো ভিনদেশের লোক, সে নিশ্চয় আসন্ন বন্যার কথা জানে না। অমনি জানা আবার নামতে শুরু করল। বেশি জল হবার আগে জেসনকে সাবধান করা দরকার। দুঃখের বিষয়, আরেকটু নেমেই জানা বুঝতে পারল ফাটল জলে ভরে যাচ্ছে, সেখানে কারো বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। হায়, হায়! জেসনও তাহলে মারা গেছে। জানার মনে হল, জেসন মরলে, তারি বা বেঁচে কি হবে?

জেসন কিন্তু মরেনি। ক্যালিফর্নিয়া আর অ্যারিজোনাতেও এই ধরনের ফাটল আছে। বেশি বৃষ্টি পড়লেই সেখানেও বান ডাকে। যেমন করে হক, পাহাড়ে উঠে পড়া দরকার।

একটু সুবিধামতো জায়গা পেয়ে, রাইফ্‌ল্‌টা হারিয়ে, পা ভিজিয়ে, শেষ পর্যন্ত একটা পাথরের থাকে এবং আরেকটার তলায় কোনোমতে খানিকটা আশ্রয় পেল। মনে মনে সে নিশ্চিন্ত ছিল যে জানার মতো বুদ্ধিমতী মেয়েও নিশ্চয় কোনো নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে।

ঐ সময়ে ঐ পর্বতের অন্য একটা জায়গায় টারজান, টারগাশ আব থরও পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে বসে ভাবছিল এরপর জানাকে আবার খুঁজে পাবার কতটুকু সম্ভাবনা থাকতে পারে? তার পায়ের চিহ্নও সব ধুয়ে গেছে। জোরাম কোন দিকে, 0-220-র অন্য সঙ্গীরাই বা কোথায় কে বলতে পারে?

বৃষ্টি থামল, মেঘ সরল, রোদ উঠল। এতক্ষণ খিদে তেষ্টা ক্লান্তি কিছুই টের পাচ্ছিল না সে। এবার পেল। জন্তু-জানোয়ার সব কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিল, কিন্তু পাথরের খাঁজে পাঁচটা বড় বড় ডিম পেয়ে, তার দুটোকে তখুনি খেয়ে ফেলে দেখল পেট ভরে গেছে। বাকি তিনটেকে তখন সঙ্গে নিয়ে নিল। তারপর রোদে একটা সুবিধামতো গাছ পেয়ে, কাপড়-চোপড় ছেড়ে শুকোতে দিল। জুতো খুলে রিভলবার আর গুলির বেল্ট পাশে রেখে, রোদে হাত-পা মেলে সে কি আরামে ঘুম দিল সে আর কি বলব।

ঘুম ভাঙলে মনে হল শরীরেব সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। কিন্তু কি সর্বনাশ! গাছে ঝোলানো কাপড়-চোপড় কোনো চোরে নিয়ে গেছে। খালি শার্টটা মাটিতে পড়ে আছে! আর আছে রিভলবার, আর আছে গুলির বেল্ট! তাহলে জানার খোঁজে যাবে কি করে? লোকের সামনে বেরোবেই বা কি করে? অবিশ্যি জানার পরনেও খালি একটা জানোয়ারের ছাল, আর পায়ে স্যাণ্ডাল, গায়ে জানোয়ারের দাঁতের আর হাড়ের গয়না। তবু সে-সব ওকে মানায়। জেসনের কথা আলাদা।

কিন্তু কি আর করা? শেষ পর্যন্ত শার্ট ছিঁড়ে নেংটি বানিয়ে একটু সভ্যভব্য হয়ে জেসন কোমরে বেল্ট বেঁধে, দুপাশে দুটো রিভলবার ঝুলিয়ে আদি মানব আদমের মতো সেজে আন্দাজে জোরামের দিকে হাঁটা দিল।

বুট-জোড়া যাওয়াতেই সবচেয়ে কষ্ট। পায়ের তলার ছাল উঠে, কেটে ছড়ে একাকার হল। শেষ পর্যন্ত দুটো গিরগিটি মেরে, তাদের চামড়া দিয়ে স্যাণ্ডালের মতো বানিয়ে পায়ে দিয়ে একটু আরাম পেল।

এ দেশের আবহাওয়াটা এমনি যে কাপড়-চোপড় গায়ে না থাকলেই বরং আরাম হয়। আসলে গা-টা এত ফ্যাক্‌-ফ্যাকে সাদা ছিল যে তাতেই লজ্জা হত। দু-চারদিনের রোদ লেগে চামড়ায় যখন তামাটে রং ধরল, তখন আর খারাপ লাগত না।

সময়ের হিসাব থাকা সম্ভব নয়। অনেকবার খেয়েছিল আর ঘুমিয়েছিল আর অক্লান্তভাবে খুঁজেছিল, তবু জানার কোনো চিহ্ন দেখতে পায়নি। পাছে রিভলবারের গুলি ফুরিয়ে যায়, তাই বল্লম ছোঁড়া অভ্যাস করেছিল। পাহাড়টাকে ডিঙিয়ে দেখল ওধারের জমি এবড়ো-খেবড়ো হলেও, সুন্দর ঝোপঝাড় গাছপালায় ঢাকা। ছোট ছোট নদী আর খাবার উপযুক্ত বহু ছোট জানোয়ার। পাহাড়ের গা বড় বড় গাছে ঢাকা।

ক্রমে মনে একটা হতাশা জমতে লাগল। বোধ হয় 0-220-কে আর সঙ্গীদের কখনো ফিরে পাবে না বাকি জীবনটা এইভাবেই বনে বনে কাটাতে হবে জোরাম যে কোন দিকে তা ভেবেই পাচ্ছিল না।

হঠাৎ দেখে একটা নিচু উপত্যকা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ওপর থেকে উঁকি মেরে জেসন দেখল উপত্যকার তলাটা ঘাসে ঢাকা, চারদিকে গাছপালা, তাতে সুন্দর ফুল ফুটে আছে। ঝরনার ধারে আগুন জ্বেলে, একজন তামাটে যোদ্ধা পাখি রোস্ট করছে। জেসন ভাবতে বসল ওর কাছে বন্ধু ভাবে এগোতে হলে কি করতে হবে। এখানে সবাই সবাইকে শত্রু ঠাওরায়! হঠাৎ উল্টো দিকের পাহাড়ের কিনারায় চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠল জেসন।

প্রকাণ্ড একটা কচ্ছপের মতো খোলা-ওয়ালা ডাই-নোসর জাতীয় জানোয়ার নিচের লোকটাকে খুব নজর করে দেখছে। জানোয়ারটা প্রায় ষাট ফুট লম্বা, পঁচিশ ফুট উঁচু, গিরগিটির মতো ঠ্যাং, পিঠে তিন ফুট উঁচু উঁচু চ্যাপ্টা কাঁটা। হঠাৎ সেটা ঐ ওপর থেকেই ঝাঁপ দিল। জেসন ভাবল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে না তে! অবাক হয়ে দেখে শিরদাঁড়ার দু-পাশের খোলাগুলো খুলে গিয়ে গ্লাইডারের মতো গতিতে জন্তুটা নিচে নামছে। জেসনও অপেক্ষা না করে দুটো রিভলবার দু-হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে নিচে নামতে লাগল।

★

টারজান দড়ি বেয়ে উঠছে, ভালুক তলায় ওঁৎ পেতে বসে আছে, ঠিক তখনি পাথরের একটা ধারালো কোণায় ঘষা লেগে, দড়ি ছিঁড়ে পড়বি তো পড়, বনের প্রভু টারজান পড়ল একেবারে ভালুকের পিঠে। আঁৎকে উঠে, গা ঝেড়ে, নেচেকুঁদে, কিছুতেই পিঠ থেকে আপদটাকে সে ঝেড়ে ফেলতে পারে না!

একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্য দিকে গভীর খাদ, বেশি লাফঝাঁপ করবার জায়গাও নেই। টারজান ক্রমাগত ভালুকের শিরদাঁড়ায় ছোরার কোপ দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক ভাবে আহত হয়ে তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। টারজানও এক লাফে পিঠ থেকে নেমে পড়ল, ভালুকটার মৃতদেহও খাদে গড়িয়ে পড়ল।

টারজান দড়ি গুটিয়ে নিয়ে, ধনুক কোথায় খসে পড়েছিল তার আর ছেলেটার খোঁজে, গুহার দিকে এগিয়ে এল। মোড় নিতেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা। বল্লম বাগিয়ে, ছোরা বের করে সে প্রস্তুত হয়ে ছিল, টারজান যদি শত্রুতা করে। যে কোনো অচেনা লোক দেখলেই এখানকার লোকদের ঐ একই প্রতিক্রিয়া। টারজান বলল, 'আমি টারজান। মারতে আসিনি, বন্ধুভাবে এসেছি।'

ছেলেটা বলল, 'আমি ওবান। যদি মারতে না এসে থাক, তবে নিশ্চয় বৌ চুরি করতে এসেছ? তাহলে তোমাকে মারাই ক্লোবি যোদ্ধাদের কর্তব্য।'

টাজান বলল, 'বৌ-ও চাই না।'

'—তাহলে কেন এসেছ?'

'—পথ হারিয়ে এসেছি। আমার বাড়ি পেলুসিডারের বাইরে, অনেক দূরে। ক্লোবির লোকদের সঙ্গে ভাব করতে চাই।'

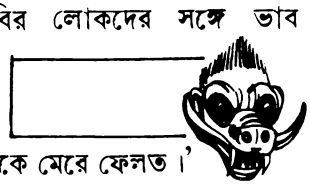

'—ভালুক মারলে কেন?'

'—না মারলে, সে-ই তোমাকে মেরে ফেলত।'

'—আমার স্বজাতিরা ছাড়া কেউ তো এমন করে না। এখানে যারা আসে, আমরা তাদেরি শত্রু মনে করি। তা জেনেও আমার প্রাণ বাঁচাতে?'

'—নিশ্চয়।'

'—তাহলে এমন কথা এই প্রথম শুনলাম। এ-সব আমার জাতভাইদের বললেও ওরা তোমাকে মেরে ফেলতে চাইতে পারে।'

'—তোমাদের গ্রাম কোথায়?'

'—কাছেই।'

'—তাহলে চল, তোমাদের প্রধানের সঙ্গে কথা বলি।'

যেতে যেতে ছেলেটা বলল, 'আমার বাবা আবানের সঙ্গে তুমি কথা বলতে পার। উনিই গ্রামের প্রধান। ভেবেছিলাম একা গিয়ে একটা ভালুক মারতে পারলে, আমার প্রতিষ্ঠা খুব বেড়ে যাবে। কিন্তু ভালুক দেখে ভাবলাম আর আমার গ্রামে ফেরা হবে না। তুমি যদি না আসতে, তা হতও না। ভালুকের পায়ের দাগ দেখে এসেছিলে নাকি?'

'—না, আমার কোনো ধারণাই ছিল না, কোথায় যাচ্ছি।'

'—আমরা খুব বড় যোদ্ধা। আমাদের জাতে বেশি মেয়ে জন্মায় না, তাই আমরা জোরামে গিয়ে বৌ ধরে আনি। ওরা খুব সুন্দরী হয়। আমি বড় হলে আমিও তাই করব।

টারজান বলল, 'ক্লোবি থেকে জোরাম কত দূরে?'

'—কেউ বলে কাছে, কেউ বলে দূরে। অনেকের মতে যাবার পথটার চেয়ে, ফেরার পথটা অনেক ছোট।'

টারজান অবাক হল, 'তা কি করে হবে? একটাই তো পথ।'

'—হ্যাঁ, কিন্তু ফেরার সময়, ওরা যে পিছন পিছন তাড়া করে, তাই বাড়ি পৌঁছতে অনেক কম সময় লাগে।'

শুনে মনে মনে হাসল টারজন। হঠাৎ টারজানের কাঁধে পিঠে থিপদারের নখের দাগ দেখে এবং তার কারণ শুনে, টারজানের সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি দেখে ছেলেটা অবাক হয়ে গেল। দাগগুলো ততক্ষণে লাল হয়ে টাটিয়ে উঠেছিল। ছেলেটা ঘাগুলো পরিষ্কার করে, তাতে একরকম পাতার রস লাগিয়ে দিল। পাতাগুলো পাশেই হয়েছিল। খুব জ্বালা করল গোড়ায়। তারপর ভারি আরাম হল। টারজানের ইস্পাতের ছোরা আর তীর-ধনুক দেখেও তার বড়ই কৌতূহল। খালি বলতে লাগল, 'ওগুলোর ব্যবহার আর কি করে বানায় শিখিয়ে দাও!' ছেলেটাকে ভারি পছন্দ হল টারজানের।

একটা খাদের ধারে পৌঁছে ওবান বলল, 'এর নিচেই আমাদের গুহাবাড়ি। ওখানে না গিয়ে, তোমার এগিয়ে যাওয়াই ভালো। এরা যদি তোমাকে মেরে ফেলতে চায়?'

টারজান বলল, 'কেউ আমাকে মারবে না। আমি বন্ধু ভাবে এসেছি।'

পাহাড়ের গায়ে ওদের গুহাবাড়ি, তার সামনে চওড়া চত্বরের মতো পাথরের থাক। তার ওপরে পাথর ঝুঁকে ছাদের

মতো হয়ে আছে। পাথরের চত্বরে শ' খানেক মেয়ে, পুরুষ, ছেলেপুলে। মস্ত বড় জায়গা, হয়তো চার-পাঁচ বিঘে হবে।

ওবানের সঙ্গে অচেনা লোককে দেখে ছোরা হাতে যোদ্ধারা লাফিয়ে উঠল। ওবান বলল, 'ভয় পেও না। এ আমাদের বন্ধু।'

তবু কেউ কেউ বলল, 'ওকে মেরে ফেলব।'

ছেলেটা বলল, 'আমাদের প্রধান, আবান কোথায়?'

আবান এগিয়ে এল, 'যুদ্ধ করে বন্দী এনেছ বুঝি? ওর অস্ত্র নিয়ে নাওনি কেন?'

'—ও যে বন্ধু, শত্রু নয়।'

'—তবু মেরে ফেলাই উচিত। নয়তো এখানকার পথ জেনে, জাতভাইদের নিয়ে আক্রমণ করতে আসবে।'

ওবান বলল, 'ওর জাতভাই নেই। ও দেশে ফেরার পথ খুজেঁ পাচ্ছে না।'

ওর বাবা বলল, 'সব মিছে কথা। নিজের বাড়ির পথ পায় না, এমন কেউ থাকতেই পারে না। সর! আমি ওকে নিজেই মেরে ফেলি।'

ওবান টারজানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আগে আমাকে মেরে, তারপর ওকে মেরো।'

তখন দলের সকলের হয়ে উ-লান বলে একজন বলল, 'ওবান বড় ভালো ছেলে। ওর কথাটা রাখা যাক। আগে সকলে মিলে পরামর্শ করা যাক।'

আবান বলল, 'বেশ. তাই হবে। বল ওবান, ওকে কেন মারা হবে না।'

'—কারণ নিজের প্রাণ বিপন্ন করে, ও আমাকে ভালুকের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কারও কোনো ক্ষতি করেনি। তাছাড়া এত ভালো শিকারী এখানে থাকলে, আমাদেরি লাভ।'

তখনকার মতো থেকে গেল টারজান। তার গতিবিধির জন্য দায়ী হল ওবান আর উ-লান। ওবানের মা মরাল আর বোন রেলা ওর খুব যত্ন করত।

উ-লান মানুষটা সাধারণ গুহাবাসীদের চেয়ে ঢের বেশী গুণী। আর বুদ্ধিমান। মরাল আসলে জোরামের মেয়ে, আবান তাকে ধরে এনেছিল। সবাই থাকত বিরাট এক গুহায়। সেখানেই ওদের শোবার ঘর, বৈঠকখানা, ভাঁড়ার।

উ-লান ওকে ডেকে গুহার আরেকটু ভিতরে নিয়ে গেল। মশালের আলোতে দেখাল দেয়ালে সে কেমন চমৎকার ছবি এঁকেছে। টারজানের চেনা বহু জন্তুর ছবি। এখানে পাল-উল-ডনে দেখা গ্রিফের ছবিও দেখতে পেল। এরা বলে গিয়র। ক্লোবি ছাড়িয়ে, থিপদার পাহাড়ের অন্য সীমান্তে গিয়র উপত্যকায় থাকে ঐ বিকট জানোয়ার।

সুন্দর আঁকা। এর আগে ক্লোবির কেউ কখনো ছবি আঁকেনি। তাই উলানের বড় সম্মান। তাছাড়া দক্ষ যোদ্ধা আর শিকারী বলেও তার খ্যাতি ছিল!

উ-লানের বন্ধুত্বের অনেক মূল্য ছিল। কিন্তু তবু ক্লোবির বেশির ভাগ বাসিন্দাই এই অচেনা আগন্তুককে বিশ্বাস করত না। এর আগে পর্যন্ত বাইরে থেকে কেউ বন্ধুভাবে এখানে আসেনি। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, টারজানের বন্ধুর দল ততই বাড়তে লাগল। ওর অমায়িক স্বভাব, সদয় ব্যবহার, শিকারের দক্ষতা, নির্ভীক পৌরুষ ক্রমে তাদের মন জয় করতে লাগল।

এমন সময় যোদ্ধার দল নিয়ে কার্ব ফিরে এল। অমনি আবহাওয়া পাল্টে গেল। কার্বের দলের সঙ্গে এল একজন তরুণী বন্দিনী। তার হাত দুখানি পিছন দিকে বাঁধা, গলায় দড়ি দিয়ে একজন যোদ্ধা তাকে গোরু ছাগলের মতো নিয়ে এল। মেয়েটি ভারি সুন্দরী।

★

লম্বা-চওড়া চমৎকার চেহারা কার্বের। মুখের গঠনও ভালো, কিন্তু পাতলা ঠোঁটে আর চোখের কড়া দৃষ্টিতে এমন একটা নিষ্ঠুরতার ছাপ যে দেখেই টারজান বুঝল এর কাছে কোনো সহানুভূতি আশা করা যাবে না। বোঝা গেল গায়ের এবং চরিত্রের জোরে গোষ্ঠীর মধ্যে তার প্রবল প্রতিপত্তি। প্রধান আবানও তাকে সমীহ করে চলে। কার্ব বলল, 'একে আগেই হত্যা করা উচিত ছিল। তোমাদের মন্ত্রণাসভা যদি তা না করে আমি নিজে করব।'

আবান বলল, 'সে অধিকার তো তোমার একার নেই। সভা ডাকা হক।'

কার্ব বলল, 'বেশ, তাই ডাকো। আগে আমরা খেয়ে দেয়ে, একটু বিশ্রাম করে নিই।'

মরালের কাছে বন্দিনীর খাওয়া-শোয়ার ভার দেওয়া হল। সে তার বাঁধন খুলে দিল। তার সঙ্গে বড়ই ভালো ব্যবহার করল। টারজানকে মরাল বলল, 'যে-কোনোদিন আমাদের মেয়েদেরও অন্য গোষ্ঠীর লোকেরা ধরে নিয়ে যেতে পারে। তাদের মেয়েদের সঙ্গে আমরা খারাপ ব্যবহার করলে, তারাও আমাদের মেয়েদের ওপর শোধ তুলবে। তাছাড়া ক্লোবির মেয়েরা কখনো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া

করে না।' বন্দিনীকে বলল, 'বস মা, এই নাও, খাও। তারপর ঘুমোবো। আমরা সবাই তোমার বন্ধু। আমিও জোরামের মেয়ে।'

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, 'তুমিও জোরামের মেয়ে? তাহলে আমার যেমন মনে হচ্ছে—এখুনি সেখানে ফিরে যাই। আর কোথাও আমি সুখী হব না—তোমারও তাই মনে হত?'

'—তা গোড়ায় হলেও, সে ভাবটা কেটে গেল। জোরামের লোকরা যেমন, এরাও তেমনি। একজন স্বামী পেলে সব অন্য রকম লাগে।'

মেয়েটি বলল, 'আমার নাম জানা, জোরামের লাল ফুল। আমার যাকে খুশি বিয়ে করব।'

মরাল বলল, 'আমিও তাই বলতাম।'

হঠাৎ টারজান বলল, 'তুমি থরের বোন জানা?'

'—তাকে চেনো?'

'—আমরা একসঙ্গে জোরাম যাচ্ছিলাম, তোমাদের পায়ের দাগ দেখে। বৃষ্টি নামল। দাগ মুছে গেল। থর তোমাকে খুঁজছিল, আমি তোমার সঙ্গীকে।'

'—তাকেও চেনো?'

'—সে যে আমার বন্ধু। তার কি হল?'

'—সে বন্যায় ভেসে গেছে। নিশ্চয়ই প্রাণ হারিয়েছে। তুমি তার দেশের লোক?'

'—হ্যাঁ।'

'—কি করে জানল ও আমার সঙ্গে ছিল?'

'—থর যেমন তোমার পায়ের দাগ চিনতে পারল, আমি ওরগুলো চিনলাম।'

'—মস্ত বড় যোদ্ধা, ভারি সাহসী ছিল সে।'

'—ঠিক জান মারা গেছে?'

'—তাই মনে হয়।'

তারপর জানা বলল, 'এদের আমি চিনি। কার্ব বড় নিষ্ঠুর। এরা নিশ্চয় তোমাকে মেরে ফেলবে। এখান থেকে বেরোতে পারল, আমি তোমাকে জোরামে নিয়ে যেতে পারব। থরের বন্ধু সেখানে আদর পাবে।'

এমন সময় আবান এসে মরালকে বলল, 'বন্দিনীকে গুহায় নিয়ে যাও। কে ওকে বিয়ে করবে, সভা থেকে সেটা ঠিক করে দেওয়া হবে। আমি গুহার মুখে যোদ্ধা বসাচ্ছি যাতে কেউ পালাতে না পারে।'

টারজান বলল, 'দেখ বিদেশী, সভার সিদ্ধান্ত না জানা অবধি তুমি গুহায় বন্দী হয়ে থাকবে।' টারজান জানত ওকে প্রাণদণ্ড দেবে। কাজেই এখনি পালানো দরকার। কিন্তু জানাকে ফেলে যাওয়া যাবে না

★

এদিকে খাদের ধার বেয়ে নামতে নামতে জেসন দেখল খুদে বল্লম আর পাথরের ছোরা হাতে, নির্ভীকভাবে সেই যোদ্ধা বিকট জানোয়ারটার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। জেসন জানত এত দূর থেকে রিভলবারের গুলি সেখানে পৌঁছলেও, ক্ষণেকের জন্য জন্তুটা নিশ্চয়ই এদিকে ফিরবে। কিম্বা হয়তো ভয়ে পালিয়ে যাবে। এই ভেবে পর পর দুটো গুলি ছুঁড়ল। অন্ততঃ একটা তার গায়ে লেগেছিল, কারণ স্টেগোসরাসটা বিশ্রী করে চেঁচিয়ে উঠল। এই সময়ে জেসন পালিয়ে যেতে পারত, কিন্তু তা না করে থরের সাহায্যে ছুটে এল। থরের চিরকালের ধারণা বিদেশী, মানেই শত্রু! তার ব্যতিক্রম ছিল একজন বিদেশী, অর্থাৎ টারজান।

এ-ও বিদেশী, এ-ও আরেকটি ব্যতিক্রম। ইতিমধ্যেই স্টেগোসরাসটা বীভৎস হাঁ করে ভয়ংকর চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে জেসনের দিকে তেড়ে এল। জেসনের দুই হাতে দুই রিভলবার গর্জন করতে লাগল বারবার। মুখের ভিতর দিয়ে একটা গুলিও যদি খুদে মগজে পৌঁছয়, তাহলেই হয়ে যায়। গুলি খেয়ে রাগে ভয়ে ক্ষেপে গিয়ে, এক লাফে জেসনের মাথা ডিঙ্গিয়ে ওপাশে পড়ল জন্তুটা।

এবার আর গ্লাইডার গতিতে নয়, মাটির ওপর চার পায়ে ছুটে এল সে।

থর বলল, 'তুমি ওদিক থেকে লড়, আরি এদিক থেকে। দেখো, ল্যাজের বাড়ি খেও না। তোমার ঐ অস্ত্রের গর্জানিতে ও ভড়কাবে না। বল্লম ধর।

কিন্তু কেউ কিছু করবার আগেই অতিকায় জন্তুটা মুখ থুবড়ে মরে পড়ে গেল।

থর তো অবাক! 'কি করে মরল? আমরা তো বল্লম ছুঁড়িনি।'

জেসন বলল, 'এই ছোট অস্ত্র শুধু গর্জায় না। ওর তালু আর মাথা দেখ। এর গুলি এপার-ওপার ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে।'

থর দেখে তাজ্জব বনে গেল! তারপর বলল, 'কিন্তু জোরামে তুমি কি করছ?'

'—এঁ্যা! এই জোরাম নাকি? তুমি কি জোরামের লোক?'

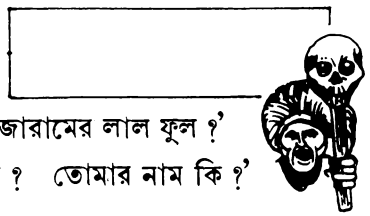

'—নিশ্চয়ই।'

'—জানাকে চেনো, জোরামের লাল ফুল?'

'—তুমি তার কি জান? তোমার নাম কি?'

'—জেমস গ্রিড্‌লি।'

'—তাহলে জানা কোথায়?'

'—আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সেই থেকে তাকে খুঁজছি।'

'—আমিও তোমার পায়ের ছাপ দেখে পিছন পিছন যচ্ছিলাম। জলে সব ধুয়ে গেল।'

'—আমার পিছনে কেন আসছিলে?'

'—জানা যে তোমার সঙ্গে ছিল।'

'—সে তো স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে এসেছিল। তারপর চলে ও গেল। আমি তার কোনো অনিষ্ট করিনি।'

'—তাহলে সেই মানুষটি ঠিকই বলেছিল? যদি করে থাক, তাহলে তোমাকে মেরে ফেলব।'

'—কে বলেছিল? এখানে আমাকে কে চেনে?'

'—কেন, টারজান?

'—তুমি টারজানকে দেখেছ? সে বেঁচে আছে?'

'—দেখেছিলাম। একসঙ্গে কত ঘুরলাম, শিকার করলাম। এখন সে মারা গেছে।'

'—মারা গেছে? ঠিক জান?'

'—হ্যাঁ, মারা গেছে। থিপদারে তাকে তুলে নিয়ে গেছে।'

তাই ভয় করেছিল জেসন। কিন্তু কানে শুনেও বিশ্বাস হল না। অমন প্রাণশক্তির কখনো শেষ হতে পারে? অমন রূপ, অমন গুণ, অমন শক্তি!

থর বলল, 'ওকে তুমি ভালোবাসতে?'

'—হ্যাঁ।'

'—আমিও। কিন্তু টারগাশ আর আমি ওকে বাঁচাবার জন্য কিছুই করতে পারলাম না।'

—টারগাশ কে?'

'—সে একজন লোমশ মানুষ। টারজান মারা গেলে, সে-ও নিজের দলে ফিরে গেল। কিন্তু তোমাকে তো আমি চিনি না। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে সত্যি, কিন্তু যদি জানার ক্ষতি করে থাক, কিম্বা তাকে মেরে ফেলে থাক?'

'—আমিও তাকে খুঁজছি। এসো, একসঙ্গে খুঁজি।'

'—কিন্তু তাকে পেলে, সে যদি বলে তুমি তার অনিষ্ট করেছ, তাহলে কিন্তু তোমাকে মেরে ফেলব।

'—বেশ তাই কর। তোমার কি নাম?'

'—থর।'

জানা তার ভাইয়ের কথা বলেছিল বটে, কিন্তু নাম বলেছিল কি না জেসনের মনে পড়ল না। তবে কি এই লোকটি জানার স্বামী? কোনো স্বামীর কথা তো সে বলেনি।

থর বলল, 'তাকে শেষ কোথায় দেখেছিলে? সেখান থেকে খোঁজা শুরু করা যায়।'

'—কি জানি সে জায়গাটাও চিনতে পারব না হয়তো!'

'—তাহলে যেখানে তোমাদের পায়ের চিহ্ন শেষ হয়েছে, সেখান থেকে দেখা যায়।'

'—তার দরকার হবে না। জানাকে প্রথম যেখানে দেখেছিলাম, সেখান থেকে পাহাড়ে ফিরবার পথের ডান দিকে গভীর একটা খাদ। যে চারজন লোমশ লোক জানাকে তাড়া করেছিল, তাদের দুজনকে আমি মেরে ফেলার পর, বাকি দুজন ঐ খাদে ঢুকে পালিয়েছিল। গুহার ডাইনে অনেকটা দূরে গিয়ে জানা পাহাড়ে ওঠার পথ খুঁজেছিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে একটা লম্বা ফাটল পাই। সেখান থেকে ফিরে, জানা আবার খাদে নেমেছিল। ঐ খাদ দিয়ে ওকে শেষ যেতে দেখি। তুমি হয়তো জায়গাটা চিনবে।'

'—চিনব! ঐ ফেলিয়ানরা হয়তো ওকে বন্দী করেছে। চল খাদের দিকটা আগে খুঁজি। না পেলে, নিচে ফেলিয়ানদের ঘাঁটিতে যেতে হবে।'

দুজনে সেই দুর্গম পার্বত্য দেশে জানাকে খুঁজতে লাগল। খিদে পেলে জন্তু মেরে খায়, ঘুম পেলে ঘুমোয়।

পাহাড়ি ছাগল মেরে তার ছাল দিয়ে জেসন গা-ঢাকার ব্যবস্থা করল। যতই দিন যায়, ততই থরের ওপর জেমসের মনে কেমন একটা বন্ধুত্বের ভাব গজাতে লাগল। তার ওপর ভারি শ্রদ্ধাও জন্মাল। ঐ রকম একজন অশিক্ষিত অসভ্যর প্রতি শ্রদ্ধা হচ্ছে বলে, মাঝে মাঝে নিজের ওপর রাগও হত।

এ-সব চিন্তা ছাড়া ফন হর্স্ট, মুবিরো আর ওয়াজিরিদের কথাও মনে হত। তাদের কি হল কে জানে! 0-220-কেও তো কখনও পেলুসিডারের ঝকঝকে আকাশে দেখতে পেল না। থরেরো মনে হত এইরকম মানুষই হল তার মনের মতো। ধীর, স্থির, সাহসী, কোমল, যার ওপর নির্ভর করা যায়। এইভাবে বড় খাদের কিনারা ধরে দুদিকে যত্ন করে খুঁজে যখন কিছু পেল না, থর বলল, 'চল, নিচে ফেলি দেশে যাই। ওকে না পেলেও, প্রতিশোধ তো নেওয়া যাবে।'

জেসনেরও সেই মত। মানুষের ইতিহাসে দুজনার মাঝখানে হয়তো লক্ষ বছরের ব্যবধান এই ভাবে নস্যাৎ হয়ে গেল। বিশাল মহীরুহের বনের মধ্যে দিয়ে, ঢেউ খেলানো তৃণভূমির ওপর দিয়ে চলল ওরা। কত জীবজন্তুর আবাস, কেউ তৃণভোজী, কেউ হিংস্র, কেউ জলচর, কেউ উভচর। তারা সর্বদাই পরস্পরকে আক্রমণ করছে, মারছে, খাচ্ছে। সে কি বিরাট হত্যাযজ্ঞ।

ফেলিরা জলাভূমিতে বাস করে। তাতে এত গাছপালা যে থর আর জেসন অনেক সময় কাদামাটি ছেড়ে, গাছে গাছে এগিয়েছে।

থর বলল, 'নিচের দিকে তাকাও।'

'—খালি একটা ছোট নদী দেখতে পাচ্ছি।'

'—ঐটাই খুঁজছিলাম। ওর তীরেই ফেলিয়ানরা থাকে। মাঝে মাঝে উঁচু জায়গা আছে, সেখানে মজবুত কাঠের বাড়ি তৈরি করে, যাতে অতিকায় গিরগিটিগুলো ঢুকতে না পারে।'

'—এমন বিশ্রী জায়গায় শখ করে থাকে কেন?'

'—যাতে কেউ কাছে না আসে, তাহলে অনেকটা সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করতে পারবে। ওরা যুদ্ধ করতে চায় না। তাছাড়া যথেষ্ট শিকার করতে পারে। শত্রুরাও আসে না। সুখেই থাকে।'

খুব সাবধানে এগোতে লাগল ওরা। একটু পরেই জেসন একটা ন্যাড়া টিলার খানিকটা দেখতে পেল। কয়েকটা ছোট বাড়ি চোখে পড়ল। তার দেওয়াল, ছাদ, সব আগাগোড়া গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। ফাঁকফোকর কাদা দিয়ে বন্ধ। জানলা নেই, একটা ছোট ঢুকবার পথ আছে। সমস্ত দেওয়াল ঘিরে, পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাৎ করে একটার পর একটা দশ ফুট লম্বা, ছয় থেকে আট হাত ব্যাসের গাছের ডাল পোঁতা। তাদের আগাগুলো খুব ছুঁচলো; একটা থেকে আর একটার দূরত্ব এক হাত মতো। সজারুর মতো সারা-গা থেকে কাঁটা বের করে হিংস্র শত্রু ঠেকাবার ব্যবস্থা। টিলার গোড়ার দিকে ঘন গাছ থাকলেও একটা ঢালে আর মাথায় সব গাছ কেটে ফেলে ঘরগুলো তৈরি হয়েছে। কেউ কাছে এলেই চোখে পড়ছে।

গ্রামবাসীদের কাউকে দেখা গেল না। হয়তো ঘরের ভিতরে বসে, ফোকর দিয়ে ওদের ওপর নজর রাখছিল।

থর বলল, 'এবার কি কববে? এতদিন তো গুলি নষ্ট হবার ভয়ে ছোট অস্ত্রটা কাজে লাগাওনি।'

জেসন বলল, 'এবার লাগবে।'

এই বলে ঘরগুলোর দিকে এগোল। গাছের ওপর থেকে যে লোমশ মুখে বসানো জোড়া জোড়া নিষ্ঠুর চোখ ওদের দেখছে, তা কেউ লক্ষ্য করল না।

●

আবানের আদেশ মতো টারজান গুহায় শুতে গেল। আবান রক্ষীদের বলে গেল গুহা থেকে কাউকে যেন বেরোতে দেওয়া না হয়। ভিতরের মিটমিট আলো চোখ-সওয়া হয়ে এলে, টারজান দেখল বিশাল গুহা। দু-পাশে আর পিছনে খানিকটা দেয়াল আবছায়া ভাবে দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ভিতরে আরো অনেক দূর অবধি গুহাটা গেছে। যতটুকু দেখা যাচ্ছিল, সেখানে দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি ঘাসের বিছানা। তাতে চামড়ার কম্বল গায়ে দিয়ে যোদ্ধারা শুয়ে ছিল। কয়েকজন মেয়ে আর ছেলেপুলেও ছিল। সবাই ঘুমে অচেতন। গুহার মুখের কাছে একটু বেশি আলো। টারজান জোরামের মেয়েটিকে খুঁজতে লাগল।

তার পাশে যেতেই সে বলল, 'পালাবার কোনো উপায় ভেবেছ?'

'—না। দেখা যাক কি হয়।'

'—পালালেই পার। তোমার সঙ্গে তো আর বন্দীর মতো ব্যবহার করে না।'

'—এখন করছে।'

এই সময়, একজন যোদ্ধা উঠে বসে অন্য যোদ্ধাদের বলল, 'ওঠ, সকলকে সভায় যেতে হবে।'

এ হল কার্ব। কার্ব এসে টারজানকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখানে কি করছ?'

'—তুমি তো আর প্রধান নও যে কৈফিয়ৎ দেব। ঐ সব মেয়েদের আর ছোটদের জিজ্ঞাসা কর। যাও!'

কার্ব চলে গেলে, জানা বলল, 'এর জন্য তোমার প্রাণ যাবে।'

'—সে তো আগেই ঠিক করে রেখেছে।'

বাইরের চত্বরে মহা তর্কাতর্কি চলেছিল। তার মধ্যে ওবান হঠাৎ ভিতরে এসে বলল, 'সভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মেয়েটিকে কার্ব বিয়ে করবে আর তোমার প্রাণদণ্ড হবে।'

টারজান উঠে পড়ে ওবানকে বলল, 'বাঁচতে হলে এখুনি পালাতে হয়। তুমি যদি আমার বন্ধু হও, আমাদের সেই সুযোগ দেবে।'

ওবান বলল, 'চত্বর দিয়ে পালাতে পারবে না। রক্ষীরা সতর্ক আছে।'

'—আর তো পথ নেই।'

'—আছে পথ। তাই তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। চল আমার সঙ্গে।' এই বলে গুহার ভিতরে ওদের নিয়ে চলল।

গুহাটা ভিতর দিকে ক্রমে সরু হয়ে গেছিল। ওবানের হাতে মশাল ছিল। তার আলোতে একটা ছোট কুঠরি দেখা গেল। কুঠরিতে একটা গর্ত ছিল।

ওবান বলল, 'প্রধান আর প্রধানের বড় ছেলে ছাড়া এ-পথ কেউ জানে না। তোমরা নিরাপদে পাহাড়ের চুড়োয় উঠে যাবে। আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, জানলে বাবা আমার প্রাণদণ্ড দেবেন। কিন্তু তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, তার প্রতিদানে তোমাদের এই পথ দেখাচ্ছি। খুব কঠিন পথ, অনেক কষ্ট করে যেতে হবে, কিন্তু নিরাপদে পৌঁছে যাবে।' এই বলে মশাল নিবিয়ে সে আবার গুহায় ফিরে গেল।

টারজান জানার হাত ধরে, তাকে নিয়ে সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ ধরল। পথটা কেবলি এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ওপর দিয়ে উঠে গেছে। মনে হল কতযুগ পরে সুড়ঙ্গের অন্ধকার পাতলা হলো, তারপর ওদের মুখে শীতল হাওয়া লাগল।

জানা বলল, 'ভীষণ খোঁজ খোঁজ পড়ে যাবে। এ পাহাড় থেকে যত শীঘ্র নেমে যাওয়া যায়, তত ভালো। হয়তো গুহার মধ্যে খুঁজে খুঁজে ঐ সুড়ঙ্গ দিয়েই ওরাও এদিকে আসতে পারে। নিচে নেমে, পাহাড়ের তলা দিয়ে হেঁটে জোরামের নিচে পৌঁছব। তারপর আবার পাহাড় চড়া। তার আগে নয়।'

সামনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখিয়ে জানা বলল, 'ঐ হল গিয়র উপত্যকা। বিরাট বিকট জানোয়ার গিয়র। কখনো চোখে দেখিনি, খালি গল্প শুনেছি। ভীষণ হিংস্র, যদিও মাংসখোর নয়। নাকের ওপর তিনটে খড়্গ।'

টারজান বলল, 'এত বড় উপত্যকায় আর কেউ থাকে না?'

'—হরিবরা থাকে।'

'—তারা কারা?'

জানা শিউরে উঠে বলল, 'সাপের জাত, ওরা গিয়রদের চেয়েও ভয়ংকর। ওদের ঠাণ্ডা রক্ত। মনে দয়ামায়া, স্নেহ ভালোবাসা কিছুই নেই। সবাই বলে হৃদয়ই নেই।'

মাইলখানেক এগোল ওরা। হাঁটু অবধি উঁচু নরম সবুজ ঘাস। তৃণভোজী ডাইনোসরদের খুব সুবিধা। জন্তু-জানোয়ারের চিহ্ন না দেখে টারজান অবাক হল। কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ নাকে আসতেই ভারি অস্বস্তি বোধ হল জোরামে উঠবার পথটা পেয়ে গেলে বাঁচা যায়। সেখানকার হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে চেনা হয়ে গেছে। হঠাৎ জানা বলল, 'ঐ দেখ গিয়র। এসো, ঘাসের মধ্যে শুয়ে পড়ি, তাহলে দেখতে পাবে না।'

টারজান চেয়ে দেখল পাল-উল-ডনের গ্রিফের সঙ্গে গিয়রের বিশেষ তফাৎ নেই। বৈজ্ঞানিকরা এগুলোকে জুরাসিক যুগের ট্রাইকাটেরপ নাম দিয়েছেন। ঘাসে শুয়ে টারজান বলল, 'একটা কিছুর গন্ধ পেয়েছে। হয়তো আমাদেরই।'

একটু পরে আবার বলল, 'না, আমাদের নয়, আমাদের বাঁ দিক থেকে কিছু আসছে, তার গন্ধ। আমাদের দিকে বাতাস বইছে, আমাদের গন্ধ ও পারে না।' তারপরেই সরু খাদের মধ্যে থেকে অদ্ভুত কয়েকটা জীব বেরিয়ে এল।

জানা বলল, 'ওরা মানুষ নয়, হরিব। ওরা যে জানোয়ার চেপে আসছে তাকে গরোবর বলে। তারাই বেশি ভয়ংকর। ওদের মতো কেউ ছুটতে পাবে না। হরিবদের দেখেই গিয়রটা ভীষণ গর্জন করে দৌড়ে এল। টারজান দেখল মুখোমুখি না গিয়ে, হরিবরা ডান দিকে একের পর এক দাঁড়িয়ে গেল। গরোবরগুলো দেখতে মস্ত

মস্ত গিরগিটির মতো।

যুদ্ধবিদ্যা বোঝে হরিবরা। ক্রমে ওরা গিয়রটাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছিল। গিয়রের মাংস নাকি খুব মিষ্টি আর চামড়া নানা কাজে লাগে। চারদিকে শত্রু দেখে গিয়রটা এলোপাথাড়ি তেড়ে আসতে লাগল। ওরাও ক্রমে বৃত্তটাকে ছোট করে আনল। হরিবদের সকলের হাতে বর্শা। তাই দিয়ে অত বড় জানোয়ারটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলছিল। খুব লড়াই দিয়েছিল হতভাগ্য গিয়র, শেষ পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডে গিয়ে বর্শা বিঁধতে, তার মৃত্যু হল।

হরিবরা হয়তো ওদের আগেই দেখেছিল, কিন্তু একটা শত্রু নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকাতে এদিকে নজর দেয়নি। এবার তারা জানাকে আর টারজানকে ঘিরে দাঁড়াল। টারজান বলল, 'না, লড়তেই হবে।' বলে উঠে দাঁড়াল। জানাও ওর পাশে দাঁড়াল।

অদ্ভুত চেহারা হরিবদের। মাথা মুখ সাপের মতো, কিন্তু খোঁচামতো কান, গা-টা মানুষের মতো, হাত-পা গিরগিটির মতো। সারা গায়ে আঁশ। গায়ে একটা গিরগিটির চামড়ার এপ্রন পরা। এপ্রনের বুকে আবার একটা নক্সা আঁকা। হাতে বর্শা, কোমরে হাড়ের ছোরা। হাতে হাড়ের বালা। গরোবর চড়ে নিজেদের ঠ্যাং দুটো গরোবরের কনুইয়ে জড়িয়ে রাখে। এই সব গরোবরের ছবি ওপরের জগতের গুহায় আঁকা আছে।

টারজান লক্ষ্য করল হরিবরদের চোখে পাতা নেই। হঠাৎ তাদের একজন পেলুসিডারের গিলাক অর্থাৎ মানুষদের ভাষায় বলল, 'অস্ত্র নামাও। তোমাদের পালাবার পথ নেই।'

★

ফেলিয়ান পৌঁছে, জেসন আর থর টিলার ওপর গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ছোট ঘরগুলোতে খুঁজে কাউকে পেল না। গ্রামে জন-মানুষ ছিল না। নিশ্চিন্ত হয়ে ওরা একটা পায়ে-চলা পথ ধরে গাছের তলা দিয়ে নিচে নামতে লাগল। চারদিকে লম্বা লম্বা ঝোপঝাড় ছিল। হঠাৎ তার ভিতর থেকে জনা বারো ষণ্ডা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিমেষের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে, দুহাত পিছন দিকে বেঁধে ফেলল।

এবার জেসন তাদের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখে অবাক হল। এ আবার কি! লোমশ গণ্ডার, দাঁতাল হাতি, টেরোডন, ডাইনোসর সব দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু ইংরিজি গল্পের বইয়ের জলদস্যুদেরো দেখা পাবে, এতটা সে আশা করেনি! থরের দিকে ফিরে বলল, 'এরা তো ফেলিয়ান নয় মনে হচ্ছে।'

'—না, এদের কখনো দেখিনি।'

লোকগুলোর ঘন দাড়ি ছিল। একজন বলল, 'তোমরা কোত্থেকে এসেছ, তা কিন্তু আমরা ভালো করেই জানি।'

থর বলল, 'আমাদের তো কারো সঙ্গে ঝগড়া নেই। আমাদের ছেড়েই দাও না।'

'—হাসিও না। তোমরা হলে সারির লোক। তাদের সঙ্গে করসারের সদাই যুদ্ধ। দেখেই চিনেছি তোমাদের। সিদু আর বুক্ষ তোমাদের পেয়ে খুব খুশি হবে।' এক সঙ্গীর দিকে ফিরে বলল, 'কে জানে এ লোকটাই হয়তো স্বয়ং টানার! সে যখন করসারে বন্দী ছিল, দেখনি তাকে?'

'—না, আমি নৌকো নিয়ে বেরিয়েছিলাম।'

প্রথম লোকটা বলল, 'ফেলিয়ানদের জন্য আর অপেক্ষা করে কি হবে? তবে শুনেছি ওরা অনেক সময় জোরাম থেকে, সুন্দর দেখে মেয়ে ধরে আনে। অপেক্ষা করলেও হয়।'

'—না, না, আর অপেক্ষা করা নয়। দেরী করলে ক্যাপ্টেন আমাদের টুঁটি চিরে ফেলবে।'

নদীর ধারে একটা গাছে লংবোট বাঁধা ছিল। তার চেহারাও জেসনের ছোটবেলায় পড়া জলদস্যু ক্যাপ্টেন কিডের গল্পের ছবির মতো। এদের চেহারা পোষাক-আশাক, প্রকাণ্ড পিস্তল, কাট্‌লাস তলোয়ার ইত্যাদিও তাই। ওরা জেসনকে আর থরকে লংবোটে তুলে তাড়াতাড়ি রওনা দিল। এখানে জলের খুব স্রোত। জেসন চেয়ে দেখল দস্যুগুলোর চেহারা যতই নোংরা বদমাইসের মতো হক, কানে মাকড়ি, কারো কারো নাকে রিং, মাথায় রংচঙে রুমাল বাঁধা, কোমরে রঙীন ফেট্টি, সব মিলে একটা রোমাঞ্চময় চিত্র বটে!

0—220-র যাত্রার মূলে জেসনের বন্ধু পেরির কাছ থেকে যে রেডিওবার্তা জেসন পেয়েছিল, তাতে করসারের বর্ণনা ছিল। তারা যে পেলুসিডারের সম্রাট ডেভিড্ ইন্সকে বন্দী করেছিল, তাও তার জানা ছিল, তবু স্বচক্ষে দেখে অবাক লাগছিল।

থর বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়লেও, জেসনের মনে হচ্ছিল যাকে উদ্ধার করতে আসা, সে যেখানে বন্দী হয়ে আছে, দৈবাৎ সেখানে পৌঁছে যাওয়াটাকে এক দিক থেকে

সৌভাগ্যও বলা যায়। একা, বন্দী অবস্থায় পৌঁছনোটা দুঃখজনক হলেও, পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে এ বরং ভালো। নদীটা গাছে ঢাকা জলাভূমির মধ্যিখান দিয়ে, ছোট বড় হ্রদের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছিল। সব জায়গায় সাপ, কুমির, গিরগিটি। মাঝে মাঝে তারা হিংস্রভাবে এগিয়ে এলে গুলি ছুঁড়ে তাদের তাড়ানো হচ্ছিল। থরকে আর জেসনকে হাত-বাঁধা অবস্থায় নৌকোর মাঝখানে বসানো হয়েছিল। তাদের পাশে লাজো নামে একজন করসার বসেছিল। ওকে দেখে একটু সভ্যভব্য মনে হয়েছিল। কথা বলছিল না, সরীসৃপ তাড়াতেই ব্যস্ত ছিল। যেটুকু বলছিল, চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমানের মতো বলছিল। সকলেই পেলুসিডারের সাধারণ ভাষা ব্যবহার করছিল। তাকে জেসন বলল, 'তোমাদের ক্যাপ্টেন কে?'

'—কেউ না। যাবার পথেই সে মারা পড়েছে। কেন বলতো?'

'—আমাদের পক্ষে পালানো অসম্ভব, কাজেই হাতের দড়ি খুলে দাও না কেন?'

লাজো ছুরি বের করতেই আর একজন বলল, 'ও কি করছ?'

'—বাঁধন কেটে দেব। এখন আর কোনো দরকার নেই।'

'—বাঁধন কাটব বলার তুমি কে?'

'—বাধা দেবার তুমি কে?'

সঙ্গে সঙ্গে ছোরা তুলে সে লোকটা লাজোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লাজোও তার হাত সরিয়ে দিয়ে নিজের ছোরা তার বুকে বসিয়ে দিল। বিকট চিৎকার করে সে মরে গেল। লাজো জেসন আর থরকে বলল, 'মৃতদেহটা জলে ফেলে দাও।' অন্যরা সেটা ঠেকিয়ে রেখে হতভাগ্য মৃত করসারের জামা জুতো অস্ত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিল। জেসন আর থর মৃতদেহটাকে জলে ফেলতেই একটা জলজন্তু সেটাকে টেনে নিয়ে গেল। ব্যাপার দেখে তারা তাজ্জব বনে গেল।

দিনের পর দিন নৌকো চলল। জলাভূমি ছেড়ে ঢেউ খেলানো পাহাড় দেখা দিল। নদীটা আরো চওড়া হল। দু-পাশে বনভূমি, বড় বড় গাছ, কিন্তু ঝোপঝাড় নেই। নানা তৃণভোজী চেনা জানোয়ার চোখে পড়ল, লালচে হরিণ, বাইসন, মোষ ইত্যাদি। নদীতে কুমির গিরগিটিও কম! জেসন আর থরের হাতে দাঁড় দেওয়া হল। সবাই যেন কেমন সন্ত্রস্ত, তটস্থ হয়ে উঠল। তার কারণটা বোঝা যাচ্ছিল না।

ওরা দুজন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল, লাজো সেটা লক্ষ্য করে, অন্য লোকের হাতে দাঁড় দিল। খাওয়া-দাওয়া নেই, থামা নেই, যেন পালাতে পারলেই বাঁচে।

হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ তো! ঐ তো ওরা!'

লাজো বলল, 'দাঁড় টানো। ওদের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে পারলে সবচেয়ে সুবিধা হয়।'

ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়লেও জেসন আর থর দেখল অনেকগুলো বিকট চেহারার আধা-মানুষ হিংস্র গিরগিটি চেপে, জল কেটে এগিয়ে আসছে। দুঃস্বপ্নের মতো চেহারা সোয়ারদের, মানুষের মতো গা, গিরগিটির মতো মুখ, মাথা, হাত, পা। জেসন স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'ওগুলো কি?'

থর বলল, 'ওরা হল হরিব! ওদের হাতে পড়ার চেয়ে মরা ভালো!'

ওরা বেশি কাছে এলে দস্যুরা গোলা ছুঁড়ল। কয়েকটা মরল। কিন্তু একটা মলে, তার জায়গায় দুটো আসে। সংখ্যায় ওরা অগুন্তি! বল্লম ছোঁড়ে অব্যর্থ সন্ধানে! দলে দলে মরছিল, তার জায়গায় পিলপিল করে আরো আসছিল। শেষ পর্যন্ত দড়ির ফাঁস পরিয়ে জাহাজ আটকাল। নিরস্ত্র অবসন্ন জেসন আর থর শুয়ে পড়ল। নৌকো টেনে ওরা তীরের একটা গাছে বাঁধল। তিনবার দস্যুরা দড়ি কেটে দিয়েছিল, ওরা আবার নতুন ফাঁস পরিয়েছিল। তারপর ওরা দলে দলে নৌকোয় চড়াও হল। অর্ধেকের বেশি দস্যু মারা গেছিল, কিম্বা আহত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনজন অক্ষত দেহে বাকি ছিল। তাদের মধ্যে লাজো হল একজন। হরিবরা ছোরা বের করে গুরুতরভাবে আহতদের তখনি মেরে ফেলল। বাকিদের তীরে নিয়ে গেল। তাদের মধ্যে জেসন আর থর ছিল। তবে পরের বীভৎস ঘটনা

আমাদের বর্ণনার বাইরে। মৃতদেহগুলো ওরা কাঁচাকাঁচাই বসে খেয়ে ফেলতে লাগল—এটুকু বললেই যথেষ্ট।

জেসন লক্ষ্য করল যে, হরিবরা মাথায় চার-পাঁচ ফুট থেকে আট-নয় ফুট অবধি উঁচু। সারা গায়ে আঁশ। পরে জেনেছিল যে সাপ কুমিরদের মতো এরাও যত দিন বাঁচে কেবলি আকারে বড় হতে থাকে। মানুষের মতো বাড়ের বয়স বন্ধ হয় না। অথচ পেলুসিডারের ভাষা বলে, নেংটি পরে, অস্ত্র ব্যবহার করে, এমন কি হাড়ের গয়নাও পরে।

বীভৎস ভোজের পর হরিবগুলো শুয়ে পড়ল। চোখের পাতা নেই, চোখ খোলাই রইল। কিন্তু গায়ের রং লালচে থেকে একেবারে সবুজ হয়ে ঘাসের সঙ্গে মিশে গেল।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে জেসন ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ বল্লমের খোঁচা খেয়ে চমকে উঠল। একজন জরিব বলল, 'অত শব্দ কোরো না।'

বোধ হয় ঘুমের ঘোরে জেসন চ্যাঁচাচ্ছিল। সবাই উঠে পড়ে ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করে শিস্ দিতে লাগল। অমনি বন থেকে তাদের গিরগিটি-ঘোড়াগুলো ছুটে এল। একজন হরিব জেসনের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, 'পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু মরবে।'

তারপর একটা গরোবরে চড়তে বলল, 'গলার দিকে এগিয়ে বস!' প্রত্যেককেই ঐভাবে গিরগিটি চাপানো হল। জেসনের চোখে সবগুলোকেই এক রকম লাগল, কিন্তু ওরা যে যার ঘোড়া চিনে নিল। খুব ঘেন্না করছিল জেসনের। ওর পিছনে একটা হরিব-ও চাপল। পাছে পালায়।

ছায়াময় বনে ওরা চলল, সরু সরু শুঁড়ি পথ ধরে। এখানে রোদ আসে না, গাছের পাতা ফিকে সবুজ। কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব, যা পেলুসিডারে আর কোথাও পায় নি।

পিছনের হরিবটাকে জিজ্ঞাসা করল জেসন, 'আমাদের নিয়ে কি করবে?'

'—ডিম খাইয়ে মোটা করব। শুধু গিয়রের মাংস খেয়ে খেয়ে মেয়েদের আর ছেলেপুলেদের অরুচি হয়ে গেছে।'

জেসনের আর কিছু বলবার রইল না। মাঝে মাঝে থরকে আর অন্য দস্যুদের দেখতে পাচ্ছিল। কথা বলার সুযোগ হয়নি। তারপর একটা বড় হ্রদের নীল জল দেখা গেল। তার চারদিকে হরিব মেয়েরা আর ছোটরা কাদাভরা মাটিতে বসে ছিল, নয়তো জলে সাঁতার কাটছিল। এখানে পৌঁছে বন্দীদের টেনে গিরগিটি-ঘোড়া থেকে নামালো হলো। তারপর হ্রদের ধারে একটা সামান্য উঁচু জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। যাবার সময় জেসন লক্ষ্য করল হ্রদের ধারে কয়েকটা হরিবনী ডিম পেড়ে, কুমিরদের মতো মাটি চাপা দিয়ে রাখছে। তার ওপর কাঠি পুঁতে জায়গাটা চিহ্ন করেও রাখছে।

উঁচু জায়গাটাতে পৌঁছেই যে হরিবটা থরের সঙ্গে ছিল, সে হঠাৎ ওর নাক-মুখ চেপে ধরে জলে ডুব দিল। জেসন ভাবল, হায় হায়, এই শত্রুপুরীতে একটা বন্ধুও গেল! একে একে সবাইকে নিয়ে ডুব দিল ওরা। জেসনের পালাও এল। ছাড়াবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। পায়ের নিচে মাটি পাচ্ছিল জেসন। তার ওপর দিয়ে ওকে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তারপর মুখ থেকে হাতটা সরে গেল। জেসন বুঝল সে কাদার ওপর পড়ে আছে আর নাকে বাতাস নিতে পারছে।

★

গিয়র উপত্যকায় চোখের সামনে অতিকায় জানোয়ারটাকে মেরে হরিবরা নিজেদের ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছিল। তাদের হাতে বন্দী হল টারজান আর জানা। ওদেরও গরোবরের পিঠে জেসন আর থরের মতো করেই চাপিয়ে, সেই বনেরই অন্য এক দিক দিয়ে নিয়ে চলল হরিবরা।

থিপদার পাহাড়ের পুব সীমান্তে যে নদীর উৎপত্তি, সেটাই পুব-দক্ষিণে বয়ে হরিবদের অন্ধকার বনে ঢুকে রেলা আম অর্থাৎ আঁধার-নদীর সঙ্গে মিলেছে। ঐ সঙ্গমের কাছে করসাররা হরিবদের কবলে পড়েছিল। আর ঐ নদীরই আরেকটু ওপর দিকে টারজান জানা বন্দী হয়েছিল। সেখান থেকে শতাধিক মাইল দূরে, মাটির তলার সেই জঘন্য গুহার কাদার ওপর উঠে বসে জেসন বলল, 'ভগবান!'

থরের গলা শোনা গেল,—'কে?'

'—আমি জেসন।'

একজন দস্যু বলল, 'এর চেয়ে মেরে ফেললেই পারত।'

'—তাই দেবে কিছুদিন পরেই।'

জেসন বলল, 'আমাদের দেশেও কুমিররা এই রকম বাসা বানায়।'

থর বলল, 'সাঁতরে বেরোনো যায় না?'

'—যায় বোধ হয়। কিন্তু আবার ধরে এনে পুরবে।'

'—তবে কি এইভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করব?'

জেসন বলল, 'না। ভেবেচিন্তে পালাবার একটা উপায় বের করতে হবে। আচ্ছা এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ আছে কি?'

সকলেরি মনে হল কেউ নেই!

তখন জেসন বলল, 'দেখ, এ হ্রদটার গা ঘেঁষেই বন। এখান থেকে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে, বনে বেরোতে পারলেই পালানো সম্ভব হবে।'

'—কোন্ দিকে বনটা?'

'—যে সুড়ঙ্গ দিয়ে আমাদের এনেছে, মনে হয় তার উল্টো দিকে। সুড়ঙ্গটা খুঁজে বের করি আগে।'

সুড়ঙ্গ পাওয়া গেল, তার উল্টো দিকে পালা করে আঙুল দিয়ে নরম মাটি খোঁড়াও সুরু হল। খোঁড়া মাটি মেঝের ওপর বিছিয়ে দেওয়া হল। একদল সুড়ঙ্গের মুখে শুয়ে বসে থাকত। হরিবরা খাবার নিয়ে আসত। কিছুই সন্দেহ করত না। জেসন একটা বড় ঝিনুক পেয়েছিল, তাতে খোঁড়ার কাজ সহজ হলো। জেসন বলল বনের তলায় পৌঁছে, তারপর ওপর দিকে বেরুবার পথ করতে হবে। বনে পৌঁছলেই গাছের শিকড় ঝুলে থাকতে দেখা যাবে। তারপর ওপর দিকে খুঁড়তে হবে।

ঐ সময় থিপদার পাহাড়ের ওপরে আকাশে একটা মস্ত উড়োজাহাজ ভেসে বেড়াচ্ছিল। জুপনার বলছিলেন, 'এদিকে আসেনি কেউ। ঐ পাহাড় ডিঙোতে শুধু পাহাড়ি ছাগলরাই পারবে।'

হাইন্স বলল, 'অন্য দিকে খোঁজা যাক।

'কিন্তু কোন্ দিকে?'

উড়োজাহাজ গিয়র উপত্যকার মাথায় এলো। আরেকটু ঘুরলেই অন্ধকার বনটার ওপরে এসে যেত। কিন্তু তা না করে ওরা আরও পুবে চলে গেল।

বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে টারজান ভাবছিল ও নিজে তো এক লাফে কোনো বিশাল গাছ ধরে ঝুলে পড়ে পালাতে পারে। কিন্তু জানা যে পারবে না। হয়তো ওর কাছে গিয়ে কিছু বুদ্ধি দিলে তা-ও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু ততক্ষণে ওরা হ্রদের অন্য মাথার কাছাকাছি এসে গেছে। হঠাৎ টারজানের নাকে একটা চেনা গন্ধ পৌঁছতেই সে চমকে উঠল। এ গন্ধ যে আর কখনো পাবে, সে আশা সে ছেড়েই দিয়েছিল। মনে জোর পেল টারজান।

মুঠোর মধ্যে সুযোগও এল। মাথার একটু ওপরে মস্ত এক গাছের লম্বা ডাল! এক লাফে টারজান সেইটে ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল। অমনি একটা ধর-ধর হৈ-চৈ পড়ে গেল। টারজান তখন অনেক দূরে। জানাও সব শুনল। ভাবল, জেসন হলে ওকে ফেলে যেত না।

বেশি দূরে যায়নি টারজান। ওপরের ঘন পাতার আড়ালে গাছে গাছে এরা হ্রদে পৌঁছবার অনেক আগেই নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে চুপ করে দশজন কালো যোদ্ধার মধ্যিখানে গাছ থেকে নামল! তারা সব স্তম্ভিত হল। এই তাদের বড় বোয়ানা! এর অভাবে এতদিন তাদের কত দুঃখে কেটেছে! ওকে দেখে ওরা হেসে কেঁদে আকুল। মুঙ্গু দেবতার কত দয়া!

টারজান বলল, 'জরুরি কাজ আছে সামনে। গুলি সব খরচ করে ফেলনি তো?'

'—না বড় বোয়ানা, সব জমিয়ে রেখেছি। তীর ধনুক, বল্লম, বর্শা ব্যবহার করেছি। তারপর সংক্ষেপে সব কথা বলল তারা! অন্যদের কথা তারা জানে না। খালি ফন হর্স্ট সঙ্গে ছিল। একদিন গভীর রাতে সে-ও কোথায় চলে গেছে।

এই সময় হরিবদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। টারজান বলল, 'বিকট চেহারার মানুষ দেখবে এবার। ভয় পেও না। গুলি মেরে পেড়ে ফেল।'

মুবিরো বলল, 'ওয়াজিরিরা ভয় পায় না, বোয়ানা।'

'—ওদের সঙ্গে একটি মেয়ে আছে। সাবধান, তাকে মেরো না।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হরিবরা এসে উপস্থিত হলো, আর অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটল। অল্প সময়ের মধ্যেই হরিবদের পরাজয় হল। বেশির ভাগ মরল, কয়েকজন পালাবার চেষ্টায় ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমটা জানাকে দেখতে পায়নি টারজান। তারপর শেষের দিকে চোখ পড়ল, একটা হরিব তাকে নিয়ে পালাচ্ছে। বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আরেকটা আরোহীশূন্য গরোবরে চেপে টারজান তাদের তাড়া করল। তারপর ওয়াজিরিদের কাছ থেকে নেওয়া বন্দুকের গুলিতে গরোবরটাকে মেরে ফেলল। জানা আর হরিবটা আছাড় খেয়ে পড়ল। টারজানও নেমে পড়ল। কিন্তু পায়ের তলার মাটি কেমন সরে গেল, একটা ঠাণ্ডা হাত তার পায়ের কব্জিটা চেপে তাকে অন্ধকার গহ্বরে টেনে নেবার চেষ্টা করল।

★

গিয়র উপত্যকার ওপর দিয়ে 0-220 আস্তে আস্তে ভেসে যাচ্ছিল, সকলের চোখ নিচেকার উপত্যকার ওপর নিবদ্ধ। নিচের অতিকায় জীবগুলো অনভ্যস্ত শব্দে উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি করছিল। ন্যাভিগেটিং অফিসারের কেমন গোলমাল লাগছিল, কারণ উড়োজাহাজটা তার অজান্তে কেমন পুব-দিক্ষিণে যাত্রা করছিল। দূরে উঁচু পাহাড় দেখা যাচ্ছিল, প্রান্তরে একটা নদী এঁকেবেঁকে চলেছিল। পথহারা যাত্রীরা নদীর ধার ধরে চলে, এটা তারা শুনেছিল। ওরাও নদী বরাবর উড়ে চলল। ওপর থেকে হাইন্স ফোন করল, 'সামনে একটা মহাসাগর দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে।'

সকলে সেই দিকে তাকাল। অনেক দিন তাজা মাংস আর মিষ্টি জল পায়নি ওরা, তাই নদীর উত্তর তীরে, আস্তে আস্তে উড়োজাহাজ নামানো হল। রবার্ট জোন্স তার খুদে খাতায় লিখল, 'দুপুর বেলায় এখানে পৌঁছলাম।'

এদিকে জেসন তার মাথার ওপর থেকে মাটি সরিয়েই যেন রাইফলের গুলির শব্দ শুনতে পেল। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। নিশ্চয় লাজো যেমন বলেছিল আঁধার-নদীতে বাঁধা তাদের জাহাজ থেকে কেউ গুলি ছুঁড়ছে। হয়তো ক্যাপ্টেন ওদের খোঁজে লোক পাঠিয়েছে। হরিবদের চেয়ে তাদের হাতে পড়াও ভালো। তারপরেই মনে হলো মাথার ওপর দিয়ে গুমগুম করে বহু লোক ছুটে যাচ্ছে। তাহলে এবার ওরাও মাটি ফুঁড়ে বেরুবে। কেউ যেন মাথার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! দুম্ করে একটা ভারি শরীর পড়ল। উপরকার মাটি ধসে কি যেন মাথায় নামল। তবে কি হরিবরা আবার ধরে ফেলল। তার চেয়ে ওটাকে টেনে নামানো ভালো! এই বলে টেনে তাকে খানিকটা নামাল। সে লোকটা আসলে টারজান। তার হাতে রাইফ্‌ল ছিল। রাইফ্‌লটা আড় ভাবে জেসনের গর্তের মুখে আটকাল আর টারজান ঝুলে রইল। কিন্তু ঝুলে থাকলে তো চলবে না। লোহার মতো মাংস-পেশী টারজানের পায়ে, জেসনকে সুদ্ধু ঠ্যাং ঠেনে সে ওপরে তুলে আনল! ততক্ষণে জেসনও টের পেয়েছিল ওটা হরিব নয়, সত্যিকার মানুষ।

এদিকে জানাকে নিয়ে যাচ্ছিল যে হরিবটা সে টারজানকে পড়ে যেতে দেখে, জানাকে টানতে টানতে সঙ্গীদের পিছনে ছুটল! অমনি টারজানও তাদের দেখতে পেয়ে, ঠিক জানোয়ারের [illegible] গর্জন করে, পা থেকে জেসনকে ঝেড়ে ফেলে, পিছু নিল। বন্ধুদের ডাক দিয়ে ওপরে উঠিয়ে, জেসন চকিতে তাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে নেচে উঠল। কিন্তু তা কি করে সম্ভব হতে পারে ভেবে পেল না। থরের চোখের সামনে ওকে খিপদারে তুলে নিয়ে গেছিল! সে-যাই হক, জেসনও তাদের পিছনে প্রাণপণে ছুটল।

আধা-অন্ধকার বনের মধ্যে জানার পিছন পিছন টারজান ছুটছিল শুধু তার নাকের সাহায্যে। টপ করে গাছে উঠে টারজান আরো তাড়াতাড়ি চলল। খানিক বাদেই তাদের দেখতে পেল। একটামাত্র হরিব জানাকে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। জানা তখনো লড়ছে। এক লাফে হরিবটার পিঠে নামল টারজান। হরিবটা মাটিতে পড়ে গেল। অমনি তার গলা ধরে শূন্যে তুলে এক আছাড় দিল। বারে বারে আছাড় দিল, যতক্ষণ না হরিবটা মরেই গেল, কিম্বা, অজ্ঞান হল। তারপর জানাকে বলল, 'এসো।' বলে কাঁধে তুলে আবার গাছে! হরিব বা গরোবর গাছে উঠতে পারে এমন মনে হয় না তার। গাছের ওপর পিঠ থেকে জানাকে নামাতেই দেখা গেল সে-ও ওরি মতো সমান তালে গাছে গাছে ছুটতে পারে।

যেখানে ওয়াজিরিরা ছিল সেই দিকে চলল ওরা। তারপর বনের মধ্যে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ওরা একটা গাছের গুঁড়ির পিছনে সরে দাঁড়াল। এমন সময় একটা নোংরা ছাগল-চামড়ার নেংটি পরা কাদামাখা মানুষ দেখা দিল। টারজান সামনে বেরিয়ে এল। কাদামাখা লোকটা ওদের দেখে অবাক হল।

'—টারজান! সত্যি টারজান তুমি! ভাগ্যিস্ তুমি মরনি!'

টারজান তাকে এক মুহূর্ত চিনতে পারছিল না, কিন্তু গলার আওয়াজ শুনেই জানা পেরেছিল।

টারজান বলল, 'জেসন গ্রিড্‌লি! জানা বলেছিল তুমি মরে গেছ!'

'—কোথায় সে?'

'—এই তো!' জানাও তখন বেরিয়ে এল। জেসন ওর দিকে এগিয়ে এল, 'জানা!

জানা মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'তফাতে থাকতে বলিনি তোমাকে?'

জেসন আর টারজান দুজনেই অবাক!

টারজান বলল, 'চল, ওয়াজিরিদের খুঁজে বের [illegible] হবে।' সঙ্গে সঙ্গে একটা হট্টগোল শুনে এগিয়ে [illegible]

এক মজার দৃশ্য দেখতে পেল। দশজন ওয়াজিরি রাইফ্‌ল হাতে থর আর তিনজন করসারকে ঘিরে ফেলেছে! প্রত্যেকে নিজের ভাষায় বকে যাচ্ছে, কেউ কারো কথা বুঝছে না! পেলুসিডারের লোকরা কখনো এমন চকচকে কালো মানুষ দেখেনি; এদের দেখে ঘাবড়ে গেছিল। এদিকে মুবিরোদের বিশ্বাস এরাই টারজানকে সরিয়েছে, দরকার হলে এদের নেই করে দিতে হবে!!

থর টারজানকে দেখে জেসনের চেয়েও বেশি আশ্চর্য হয়ে গেছিল। তারপরেই জানাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে ছোট বোনটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল। জেসনের মন দুঃখে ভরে গেল। হঠাৎ সে বুঝতে পারল জানাকে সে ভালোবাসে।

থর, লাজো আর অন্য দুজন করসার যখন দেখল কালো মানুষরা শত্রু নয়, বন্ধু—তাদেরও আনন্দ আর ধরে না। খানিক বসে সকলে বিশ্রাম করল। যে যার অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবৃতি দিল। জানাকে নিয়ে থর জোরামে ফিরতে চায়।

টারজান, জেসন আর ওয়াজিরিরা উড়োজাহাজে যেতে চায়, লাজো আর অন্য করসাররা তাদের জাহাজে ফিরতে চায়। টারজান আর জেসন তাদের পেলুসিডার আসার আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করল না। ওরা টানারের কাহিনী জানে দেখে, তাদের এই ধরনের আভাস দিল যেন ওরা টানারের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই সারি যেতে চায়।

লাজো বলল, 'সারি অনেক দূরে। একশো বার ঘুমিয়ে উঠলে তবে সেখানে পৌঁছবে। মাঝখানে কত হিংস্র জন্তুদের আর শত্রুদের দেশ, এমন কি অনেকে বলে ভয়াবহ ছায়ার দেশও পার হয়ে যেতে হয়।'

টারজান জেসনকে বলল, '0-220-কে পেলেই আমাদের সব সমস্যা ঘুচে যায়। হয়তো করসারদের দেশের কাছ দিয়েই যেতে হবে। কিন্তু সে-পথ জোরামের উল্টো দিকে। থর আর জানার সঙ্গে ওয়াজিরিদের নিয়ে আমরা না গেলে, ওরা কখনো জোরাম পৌঁছবে না। সব চেয়ে সুবিধা হয় উড়োজাহাজটাকে খুঁজে পেলে। না পেলে আমরা তোমাদের সঙ্গে জোরাম যাব।'

জানাকে থর জিজ্ঞাসা করল, 'জেসন তোমাকে কখনো অসম্মান দেখায়নি তো? দেখিয়ে থাকলে, আমি ওকে মেরে ফেলব।'

জানা বলল, 'মোটেই দেখায়নি। দেখালে আমি নিজেই ওকে মেরে ফেলতাম।'

শুনে থর বেজায় খুশি, জেসনকে সে বন্ধু বলে মনে করত।

শেষ পর্যন্ত স্থির হল রেলা আমে গিয়ে করসারদের লংবোটে চড়ে তাদের জাহাজ খুঁজবে। পথে হরিবরা কোনো উৎপাত করল না। রেলা আমে লং-বোটটিও পাওয়া গেল। সকলে তাতে চেপে করসার জাহাজের খোঁজে চলল। দুঃখের বিষয়, সেটিকে দেখা গেল না।

লাজো বলল, 'ঐ যে গাছে-ঢাকা টিলা পার হয়ে এলাম, ওরই উল্টো দিকে জাহাজ নোঙর করা ছিল।'

একজন করসার বলল, 'ব্যাটা আমাদের ফেলে চলে গেছে।'

ওরা তখন নদী বেয়ে সমুদ্রের দিকে চলল। মাঝপথে একটা দ্বীপ দেখে লাজো বলল, 'এখানে বুনো জন্তু নেই। প্রচুর মিষ্টি জল আর শিকার আছে।'

সেইখানেই নৌকো বাঁধা হল। ঠিক হল লংবোট নিয়ে ওরা করসারের দিকে এগোবে। এই তীর ধরে গেলেই করসার পড়বে। উল্টো দিকে কি আছে, লাজোতা বলতে পারল না। করসার অনেক দূরে, তাই শিকার করে, মাংস কেটে রোদে শুকিয়ে, কি ধোঁয়ায় দিয়ে নৌকোয় তোলা হল। জলাধারে জল ভরা হল। যদি ওদের তীর বরাবর যাবার ইচ্ছা, ঝড়ঝাপ্টায় কোথায় গিয়ে পড়বে তা কে বলবে?

সবই হল, খালি জানা জেসনের প্রতি তেমনি বিরূপ হয়ে রইল।

★

নিচে যে পথে লংবোট চলেছিল, আকাশে 0-220-ও সেই পথেই চলেছিল। তবে মাঝে মাঝে ভিতর দিকেও এক একটা পাক দিয়ে দেখে আসছিল। জুপনার হারানো লোকদের, কিম্বা পেলুসিডার থেকে বেরুবার পথ খুঁজে পাবার আশা ক্রমে ত্যাগ করছিলেন। জাহাজের নিচে চমৎকার দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। সমুদ্রতীর বড় সুন্দর, ছোট ছোট উপসাগর, বন, নীল নদী। মনটা আপনা থেকে উন্নত হয়ে উঠছিল। সময়ের কোনো মূল্য নেই এখানে। একদিন রেগে-মেগে রবার্ট তার ঘড়িটাকে সমুদ্রে ফেলে দিল।

নিচে লংবোটে টারজান আর জেসনেরো মনে হচ্ছিল এখানে চব্বিশ ঘণ্টা দিনের আলো একই রকম থাকে। সময়ের কোনো হিসাব নেই। কতদিন ধরে নৌকো চলেছে

বুঝবার জো নেই। অবিশ্যি স্থানীয় যারা তারা এই অবস্থাতেই অভ্যস্ত, তাদের কিছু মনে হচ্ছিল না। সময় কাকে বলে, তারা তাই জানে না।

তীররেখা ঘুরে গেল। ওরা এখন নিজেদের অজান্তে উত্তর দিকে চলেছিল। করসারদের মনে হচ্ছিল তাদের যাত্রাপথের মাত্র সিকি ভাগ বাকি আছে।

এরপর একদিন ঝড় উঠল। বৃষ্টি নেই, মেঘ নেই, খালি উদ্দাম বাতাস। লাজো একবার বলল, 'নৌকোটা বাঁধলে হয়।' কিন্তু তার আর সময় হল না, বাতাসের বেগ বড় বেশি বেড়ে গেল। এই একটি অবস্থায় মনে হল ওয়াজিরিরাও ঘাবড়ে গেছে। জেসন জানাকে বলল, 'জানা, আমাদের কারো বাঁচা সম্ভব নয়। তাই মরার আগে তোমাকে বলতে চাই, তুমি আমাকে ঘৃণা করলেও, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' এই বলে সে সেখান থেকে সরে গেল। জানা যে থরের বোন আজ পর্যন্ত জেসন তা জানত না। ভাবত হয়তো ওর সঙ্গেই জানার বিয়ে হবে। মনে হল কিছু না বললেই ভালো ছিল।

কিন্তু নৌকোটা ডোবেনি, তবে তীর থেকে অনেক দূরে ভেসে চলে এসেছিল। কোনো দিকে তীর দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ দূরে একটা জাহাজের পাল দেখা গেল। জানা বলল, 'বেঁচে গেলাম!'

জেসন বলল, 'যদি শত্রুদের জাহাজ হয়?'

লাজো বলল, 'করসার ছাড়া কেউ করসার আজে জাহাজ ভাসায় না।' তারপরেই দেখা গেল অনেকগুলো পাল আর মাস্তুল।

টারজান বলল, 'হয়তো আমাদের দেখেনি। পালালে হয়।

লাজো বলল, 'কেন?'

'—আমরা একলা, ওরা অনেকে। তোমাদের শত্রু না হলেও, হয়তো আমাদের শত্রু ওরা।'

এদিকে পালগুলো ক্রমে কাছে আসতে লাগল। লাজো বলল, 'ওগুলো করসার জাহাজ নয়। ঐ রকম জাহাজ আমি কখনো দেখিনি।' লংবোটে করে পালাবার চেষ্টা করা বৃথা। যত দূর চোখ যায় বিশাল এক নৌবাহিনীর জাহাজ ছড়িয়ে আছে। সামনের জাহাজগুলো খুব কাছে এসে পড়েছিল। অবিকল সেকালের নর্স ভিকিংদের জাহাজের মতো দেখতে। জেসন সে-কথা বলতেই, টারজান বলল, 'তা বটে, তবে কিঞ্চিৎ আধুনিক প্যাটার্নের। কামান বসানো আছে দেখেছ?'

সেই জাহাজ থেকে ডাক এল, 'কাছে এসে, থামো। নইলে কামান দাগব!'

'—তোমরা কে?'

'—আমি আনোরকের জা। এটা হল পেলুসিডারের সম্রাট প্রথম ডেভিডের নৌ-বাহিনী!'

টারজান বলল, 'আমরা বন্ধুজন।'

'—এই সাগরে সম্রাটের কোনো বন্ধু নেই।'

'—যদি অ্যাবনার পেরি তোমাদের সঙ্গে থাকে, এখনি প্রমাণ হবে তোমার কথা ভুল।'

'—সঙ্গে নেই বটে, কিন্তু তার বিষয়ে কি জান?'

ততক্ষণে লংবোটটা জাহাজের পাশে এসে লেগেছিল। টারজান দেখল জাহাজ থেকে তামাটে রঙের মেজপ যোদ্ধারা কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে আছে। টারজান জেসনকে দেখিয়ে বলল, 'এর নাম জেসন গ্রিড্‌লি। অ্যাবনার পেরির মুখে নাম শুনে থাকবে। বাইরের জগৎ থেকে জেসন করসারদের কারাগার থেকে ডেভিড্‌ ইন্সকে উদ্ধার করতে অভিযান এনেছে।'

প্রথমটা লংবোটের করসারদের দেখে জা-র মনে সন্দেহ হয়েছিল। তারপর সব কথা শুনে আর ওয়াজিরিদের বন্দুক দেখে তার আস্থা হল। অন্য জাহাজের ক্যাপ্টেনরাও যখন শুনল সম্রাটকে উদ্ধার করবার জন্য অ্যাবনার পেরির বন্ধু অভিযান নিয়ে এসেছে, তারাও অনেকে জা-র ফ্ল্যাগ্‌-শিপে উঠে এল। এই নৌ-বাহিনীও উদ্ধারকার্যেই যাচ্ছে। এরা করসার আজে যাবার একটা সংক্ষিপ্ত পথও পেয়েছে। ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে টানার ছিল। সে বলল, 'এই কজনে কি করে তাকে উদ্ধার করবে ভেবেছ?'

টারজান বলল, 'আমাদের দলে আরো অনেকে আছে। দৈব-দুর্বিপাকে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

এইসব কথাবার্তার মধ্যে একটা জাহাজ থেকে কোলাহল শুনে আকাশে চেয়ে টারজান আর জেসন দেখল মাথার ওপরে 0-220 ভাসছে! উড়োহাজও ওদের দেখতে পেয়েছিল, তাই ঘুরে ঘুরে নেমে আসছিল। জেসন বলল, 'ঐ দেখ আমাদের জাহাজ। ওর মধ্যে আমাদের বন্ধুরা আছে।' সব জাহাজের আরোহীরা শুনল সম্রাটকে উদ্ধার করতে অ্যাবনার পেরির বন্ধুরা এসেছে। আস্তে আস্তে 0-220 সমুদ্রের বুকের কাছে নামল। ওয়াজিরিদের একজনের কাছ থেকে বর্শা নিয়ে, তাতে লাজোর লাল রুমাল

বেঁধে জেসন 0-220-কে সিগন্যাল করল—'0-220 আহয়! এটা হল পেলুসিডারের সম্রাটের নৌ-বাহিনী, কম্যাণ্ডারের নাম আনরকের জা। জাহাজে আছেন লর্ড গ্রেস্টোক, দশজন ওয়াজিরি আর জেসন গ্রিড্‌লি!'

0-220 থেকে একুশটা তোপধ্বনি করে সম্ভাষণ জানানো হল। জা-ও তার তোপ ছুঁড়ে উত্তর দিল। উড়োজাহাজ এতটা নিচে নেমেছিল যে কথা বলা যাচ্ছিল। জাহাজের সকলে নিরাপদে আছে। এদেরও সকলেই তাই, খালি ফন হর্স্ট কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। তারপর স্লিং ঝুলিয়ে একে একে ওয়াজিরিরা, জানা, থর, জেসন, টারজান সকলকে তুলে নেওয়া হল। করসাররা জা-র জিম্মায় রইল। জা কথা দিল ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।

উড়োজাহাজে থর আর জানার সঙ্গে টারজান সকলের পরিচয় করিয়ে দিল। এতদিন পরে জেসন শুনল জানা হল থরের ছোট বোন। ক্রমে নৌ-বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে 0-220 করসার আজে পৌঁছল। এবার জা-কেও তুলে নেওয়া হল। ডেভিড ইন্সের উদ্ধারের ব্যবস্থা নিয়ে পরামর্শ হল। তিন করসারকেও 0-220-তে তোলা হল। তারপর উড়োজাহাজ করসার নগরের ওপরে নিঃশব্দে ভেসে রইল। তিন করসারকে সব কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়া হল। এ-ও বলা হল, 'ঐ যে দেখছ বোমা, ওর একটাকে সিদের প্রাসাদের ওপর ফেলে দিলেই সিদসুদ্ধ প্রাসাদ নেই হয়ে যাবে। সিদ্ যদি বিনা যুদ্ধে ডেভিড ইন্সকে মুক্তি দেয়, আমরা তার কোনো ক্ষতি না করে চলে যাব, বুঝলে?'

লাজো কথা দিল সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

প্যারাসুটের কায়দা শিখিয়ে দিয়ে, তাকে করসারে নামিয়ে দেওয়া হল। ঠিক হল সিদকে বলা হবে, শীঘ্রই যদি একটা জাহাজে করে সম্রাটকে জা-র ফ্ল্যাগ্‌শিপে না পাঠানো হয়, তাহলে বোমা ফেলতে শুরু করা হবে।

করসার নগরে কি হল আমরা বলতে পারি না, কিন্তু অনতি বিলম্বে একটা জাহাজে করে সম্রাটকে অক্ষতদেহে তাঁর নৌ-বাহিনীর ফ্ল্যাগশিপে পৌঁছে দেওয়া হল। তাঁর শরীর খাদ্যাভাবে শীর্ণ হলেও তিনি সুস্থই ছিলেন। 0-220 থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হল, তিনিও সুন্দর উত্তর দিলেন। নৌ-বাহিনীর সঙ্গে সারিতে যাবার তেল ছিল না 0-220-তে, তাই সেখানেই বাকি করসারদের নামানো হল।

জেসন হঠাৎ বলল, 'আমিও নামছি। ফন হর্স্ট আমার কথাতেই এসেছিল, তাকে না নিয়ে আমি ফিরব না। গুডবাই।'

হঠাৎ জানা বলল, 'আমিও নামছি। যাকে আমি ভালোবাসি, তার সঙ্গে আমিও সারি যাচ্ছি। গুড্‌বাই।'

এ গল্পের আর কি বাকি রইল? ওদের ঐখানেই জা-র জাহাজে নামিয়ে দিয়ে, তারপর থরকেও জোরাম পৌঁছে দিয়ে 0-220 সাফল্যের সঙ্গে অভিযান সম্পন্ন করে, ওপরের জগতে ফিরে এল।

অজেয় টারজান

টারজান দি ইনভিন্সিবল

খুদে নিকিমা বাঁদর টারজানের অনুপস্থিতিতে বড়ই মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছিল। টারজান তার প্রাণের প্রাণ। তার চওড়া সাদা কাঁধে বসে কত নিরাপদে নিকিমা দুনিয়া দেখত আর একটু-আধটু বাঁদরামি করত। কতদিন হয়ে গেল টারজানের দেখা পায়নি। বড়বাঁদরের সঙ্গে এতটুকু রসিকতা করতে গেলে, রেগে তারা তাড়া করে। তখন প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়।

হঠাৎ নাকে এল সবচেয়ে খারাপ জানোয়ারের গন্ধ। অর্থাৎ মানুষের। সাদা আর কালো মানুষের। অবিশ্যি টারজানের গন্ধ নয়। তারপর একটা ক্যাম্পও দেখতে পেল।

ঐ সামনের ক্যাম্পটা খুব মজবুত করে তৈরি করা হয়েছিল, যেন অভিযাত্রীদের অনেক দিন থাকার ইচ্ছা। আরবদের থাকবার জন্য সামনে-খোলা তাঁবু ছিল। সেখানে সাদা পোষাক পরে বেশ কয়েকজন আরব কফি খাচ্ছিল। একটা গাছতলায় আরেকটা তাঁবুর বাইরে চারজন শ্বেতাঙ্গ তাস খেলছিল। তাছাড়া একদল গালা যোদ্ধা আর পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার কিছু নিগ্রো বাহক ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য কথা,

যত না মাথা তার চেয়ে অনেক বেশি অস্ত্রশস্ত্র ছিল। দেখে মনে হচ্ছে শিকার ছাড়াও এদের অন্য মতলব আছে।

দলে আরো অনেকে ছিল। রঘুনাথ বলে একজন ভারতীয় একটা তাঁবুর সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছিল। জোরা বলে একটি সুন্দরী যুবতী ছিল, জাবেরি বলে রুশ চেহারার একজনকে দলের নেতা মনে হচ্ছিল। মিগুয়েল রোমেরো বলে এক মেক্সিকান গজ্‌গজ্‌ করছিল, কেন কোল্ট বলে আমেরিকানটার জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে।

অন্যদের কথা থেকে বোঝা গেল, এরা সকলেই ঘোর কমিউনিস্ট, পৃথিবীর সব দেশে কমিউনিস্ট আদর্শকে কার্যকরী করতে হলে বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র বোমাবারুদ, এক কথায় টাকাকড়ি দরকার। সেদিক থেকে টাকার কুমির ঘৃণ্য আমেরিকানরাও কিছু ফেলনা নয়।

কোল্ট লোকটিও, কমিউনিস্ট। জোরা বলল, 'এ লোকটা হয়তো নিজের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কিন্তু যে সব পুঁজিবাদী আমেরিকান টাকার লোভে রাশিয়ার কাছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বেচছে, তাদের বিশাল বিশ্বাসঘাতকতার কাছে এ কিছুই নয়।'

নিজেদের মধ্যে খিটিমিটি থাকলেও সকলেরি এক উদ্দেশ্য, যথা পার্টির কর্ম-বিস্তারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

জোরা জাবেরিকে রুশ ভাষায় বলল, 'এখানে বসে না থেকে, ওপারের রত্নভাণ্ডার থেকে সোনা নিয়ে এলেই তো হয়। কিটেম্বো বলেছে সেখানে এত ধনরত্ন আছে যে বারোটা অভিযানেও সব তুলে আনতে পারা যাবে না। আমেরিকান সাহায্যে আমাদের কি দরকার! আর নিজেদের মধ্যে খিটিমিটিও বন্ধ করতে হবে। রক্তপাত আমি সইতে পারি না।'

নিকিমা এসব কিছুই বুঝল না। তবু ওর মনে হল টারজানকে এদের কথা জানানো দরকার।

এ সময় দূরে একটা সিংহ ডেকে উঠল। সে ডাক একজন যুবকের কানেও গেল। সে সাফারি নিয়ে এদিকে আসছিল। যুবক বলল, 'বেশি দূরে ডাকছে না স্টোনি।'

'—না, স্যার, বড্ড বেশি কাছে।'

যুবক বলল, 'দেখ স্যার-টার আর চলবে না। আমরা সাবাই কম্রেড।'

'—হ্যাঁ, কম্রেড। কিন্তু ওটা যে সহজে মুখে আসে না।'

'—তবে তুমি ভালো রেড্‌ হতে পার নি।'

'—না, না, আমি খুব ভালো রেড্‌। নইলে এই বদ্‌ জায়গায় এলাম কেন? আমি ফিলিপিন স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারি।'

নিকিমা এদেরো দেখল। আবার সিংহ ডেকে উঠল। চট করে নিকিমা উঁচু ডালে উঠে গিয়ে সিংহটাকে দেখতে পেল। সোনালি গা, কালো কেশর। অমনি তার বাঁদরের সব ভয় চলে গেল। গলা থেকে মিষ্টি ডাক বেরোল। এগিয়ে এসে সিংহটাও ওপরে তাকাল। অমনি তার চোখের হিংস্র ভাব দূর হয়ে গেল। নিকিমা টুপ করে তার মাথায় নেমে পড়ল।

★

পরের দিন। সকালেই জাবেরি দলবল নিয়ে ওপারের দিকে রওনা হয়ে গেল। ক্যাম্পে রইল জোরা, রঘুনাথ আর জনা দশেক কালো যোদ্ধা। তাছাড়া জোরার নিজের ছোকরা ওয়ামালা। যেসব যোদ্ধা অভিযানের সঙ্গে গেল, তাদের নেতা হল কিটেম্বো। এককালে সে বাসেম্বোদের দলপতি ছিল। বিশাল জমিজমার মালিক। সেখানকার অধিবাসীদের হর্তাকর্তা-বিধাতা। ব্রিটিশরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে এখন নিজেরা উপনিবেশ চালাচ্ছে। সে তাদের বিষদৃষ্টিতে দেখে। অথচ নিজের যোদ্ধাদের ওপরে সে-ও বরাবর অত্যাচার করে এসেছে, কাজেই তারাও তাকে দেখতে পারে না। আপাততঃ একাধারে শাসিয়ে আর ঘুষের লোভ দেখিয়ে তাদের হাত করে রেখেছে। নিগ্রোরা স্রেফ পেট ভরে খেতে পাবার ও কাঁচা পয়সা কামাবার লোভে এসেছে। বাসেম্বোরা যোদ্ধা বলে আরামে থাকে আর ওদের ভারি মোট বইতে হয় বলে, খানিকটা অসন্তোষও ছিল তাদের মনে।

অভিযাত্রীরা রওনা হয়ে যাবার অল্পক্ষণ পর থেকেই রঘুনাথ জোরার সঙ্গে বেশি বেশি ভাব করার চেষ্টা করতে লাগল।

ঐ বনে বড় বনমানুষরাও চরছিল। তারাও সিংহের ডাক শুনেছিল। এমনিতেও বড় বনমানুষরা সিংহকে ডরাত না। ভয় শুধু তাদের বৌ-ছেলেপুলেদের। কাজেই সিংহটা আরো কাছে আসতেই ওদের রাজা টয়াটের মেজাজ বিগড়ে গেছিল। ওদের মেয়েরা তাদের বালু নিয়ে গাছে চড়ে বসেছিল। এমন সময় গাছ থেকে টারজান নামল। টয়াট রেগে বলল, 'আমি টয়াট! তোমাকে মারব!'

—'আমি টারজান! বন্ধুভাবে এসেছি!'

তবু টয়াট চ্যাচাতে লাগল, 'মারব! মারব!'

টারজান বলল, 'জুথো ! গায়াট ! আমি টারজান !'

এমন সময় সিংহটা ওদের দিকে তেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই গাছে ! সিংহটা টারজানের দিকে ধেয়ে গেল। ওর মাথা থেকে নিকিমা এক লাফে একেবারে টারজানের কাঁধে। টারজান তাকে আদর করে বলল, 'আরে ! নিকিমা যে !'

সিংহটা বড় বড় পা ফেলে কাছে গিয়ে টারজানের পা শুঁকে, গায়ে গা ঘষতে লাগল।

টারজান তার মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'কি রে জাদবালজা !'

দেখেশুনে এতক্ষণে জুথো আর গায়াটের ভোঁতা বুদ্ধি কাজ করতে লাগল। তারাও বলল, 'তাই তো ! টারজানই তো !'

সব শত্রুতা কেটে গেল। ততক্ষণে নিকিমা কিচিরমিচির করে ঐ বড় ক্যাম্পের অচেনা লোকগুলোর কথা টারজানকে বলতে শুরু করে দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত টয়াটেরো মারামারি করার ইচ্ছা চলে গেছিল। সে বলল, 'সিংহ নিয়ে চলে যাও না কেন ? আমরা শান্তিতে থাকি।'

টারজান বলল, 'তাই যাচ্ছি। তবে মনে রেখো আমরা তোমাদের বন্ধু। জাদবালজাকে বলে দিয়েছি আর তোমাদের আক্রমণ করবে না।'

টয়াট বলল, 'যদি ও ভুলে যায় ?'

টারজানের কাছে গায়াট্ আর জুথো আসতেই, তাদের সঙ্গে ও সিংহের চেনা করিয়ে দিল। তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবং অচেনা আগন্তুকদের বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে, টারজান ক্যাম্পের দিকে চলল।

দুর্বৃত্ত রঘুনাথের চোখ ছিল সুন্দরী জোরার ওপরে। জোরা তাকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দিত না। ক্যাম্পের মধ্যে থেকে গিয়েছিল জনা দশেক রক্ষী আর জোরার নিজের বিশ্বাসী রক্ষক। রঘুনাথ তাদের সকলকে ছুটি দিয়ে শিকারে পাঠাল। দলের পাণ্ডা কাহিয়াকে মোটা ঘুষ দেবে কথা দিল। কাহিয়া তখন ছোকরা ওয়ামালা বেচারির বুকে বর্শা ঠেকিয়ে, স্রেফ জোর করে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেল। ক্যাম্পে জোরাকে রক্ষা করার জন্য কেউ রইল না।

জোরা নিজের তাঁবুতেই ছিল, রঘুনাথ সেখানে গিয়ে হাজির হতেই, ভয় পেয়ে জোরা মহা চ্যাঁচামেচি করতে লাগল, ওয়ামালার নাম ধরে ডাকতে লাগল, কিন্তু ক্যাম্পে কেউ ছিল না।

নিতান্ত দৈবক্রমেই আমেরিকান কমরেড ওয়েন কোল্ট ঠিক সেই সময় শ্রান্তিতে হয়রান হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঐ ক্যাম্পে এসে পৌঁছল। ওর গাইড বলল, 'ক্যাম্পে কেউ নেই বলে যে মনে হচ্ছে !' চারদিকে তাকাতেই কোল্টের চোখ পড়ল কোথাও কেউ নেই, কিন্তু একটা তাঁবু কেন ভীষণ ভাবে দুলছে ? অমনি সেখানে ছুটে গিয়ে দেখে একজন মেয়েকে মাটিতে পেড়ে ফেলে, একটা লোক তার গলা টিপে ধরেছে। মেয়েটি প্রাণপণে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে।

দেখেই কোল্টের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। লোকটার ঘাড় ধরে তুলে তাঁবুর বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সঙ্গী টোনিকে বলল, 'আবার এখানে আসবার চেষ্টা করলে ব্যাটাকে গুলি করবে টোনি।'

বাইরে আস্কারিদের দেখে আর টোনির হাতে রিভলবার দেখে, রাগে গজগজ করতে করতে রঘুনাথ নিজের তাঁবুতে চলে গেল।

কোল্ট অচৈতন্য জোরাকে তুলে খাটে শুইয়ে, মুখে মাথায় জল ছিটিয়ে সুস্থ করে তুলতে লাগল।

ক্যাম্পের ওপরে মস্ত গাছের ছড়ানো ডালে, পাতার আড়ালে বসে টারজান এতক্ষণ মজা দেখছিল। ক্যাম্পের লোকদের ঝগড়াঝাটি সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল ছিল না। তার জ্ঞাতব্য বিষয় হল এরা কোথা থেকে এসেছে এবং কেন এসেছে।

জোরার জ্ঞান ফিরতেই কোল্ট বলল, 'আমি ওয়েন কোল্ট। ধরে নিচ্ছি এটা কমরেড জাবেরির ক্যাম্প।'

—'ঠিক সময় মতো এসে পড়েছ, কমরেড কোল্ট।'

এই ধরনের ক্যাম্পে এরকম ভদ্র শিক্ষিত মেয়ে দেখবে কোল্ট ভাবেনি। জোরা নিজের পরিচয় দিল, 'আমি জোরা ড্রিনভ, কমরেড জাবেরির সেক্রেটারি।'

—'ঐ ব্যাটা কে ?'

'—ওর নাম কমরেড রঘুনাথ। লোকটা বড় খারাপ। কমরেড জাবেরি এসে ওর উপযুক্ত শাসন করবে। দশজন আসকারি আর আমার বেয়ারা ওয়ামালাকে ওরা রেখে গেছিল ক্যাম্পের নিরাপত্তার জন্য। রঘুনাথ কোনো অছিলায় সবাইকে বাইরে পাঠিয়েছে।

কোল্ট বলল, 'ভয় নেই, ওরা ফেরা পর্যন্ত আমার দুজন আসকারি ক্যাম্প পাহারা দেবে।'

জোরার ওয়েন কোল্টকে রাতে খেতে বলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কাজের লোক নেই বলে, কোল্টই উল্টে তাকে নেমন্তন্ন করল।

কোল্ট ক্যাম্প করতে চলে গেলে জোরা ভাবছিল, এ ধরণের লোকরা বিপ্লবী হয় কেন? এদের তো সুখী জীবন!.... হয়তো আদর্শবাদের জন্য হয়। ওর নিজের দেশের কথা আলাদা। বংশানুক্রমে ধনীরা গরীবদের ওপর সেখানে অকথ্য অত্যাচার করে এসেছে।

গাছ থেকে টারজান সবই দেখছিল। কোল্ট লোকটাকে ওর ভালোই লাগছিল। কোল্ট নিজের ক্যাম্প গাড়বে বলে এখান থেকে চলে যাবামাত্র, টারজান রঘুনাকেও একটা রাইফ্‌ল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে দেখল। টারজানও গাছে গাছে সঙ্গে চলল।

পাশেই কোল্ট তার তাঁবু খাটানোর তদারক করছিল আর আড়ালে দাঁড়িয়ে রঘুনাথ তাই দেখছিল। হঠাৎ একটা গুলি কোল্টের কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। মাথা ঘুরিয়ে কোল্ট একটা ঝোপ থেকে একটু ধোঁয়া বেরুতে দেখল। আসকারিদের পাণ্ডা বলল, 'শত্রু হতে পারে। আগে গুলি ছুঁড়ে, তারপর অনুসন্ধান করা যাক।'

কোল্ট বলল, 'না, আগে অনুসন্ধান।'

আস্‌কারিরা দুই দল হয়ে দুই দিক থেকে অনুসন্ধান শুরু করল। কিন্তু চারদিক ঘুরে এসেও কোথাও কিছু পেল না। ফিরবার সময় দেখে ক্যাম্পের সীমানার ঠিক বাইরে একজন মরে পড়ে আছে, হাতে রাইফ্‌ল ধরা, বুকে তীর বিঁধে। অদ্ভুত দেখতে তীরটা।

একজন নিগ্রো বলল, 'এটা কোনো মানুষের হাতে তৈরী নয়।'

বাকিরা বলল, 'লোকটা গুলি করতে চেয়েছিল বোয়ানাকে। কাজেই বুঝতে হবে যে-প্রেত ওকে মেরে ফেলেছে, সে বোয়ানার বন্ধু। আমাদের কোনো ভয় নেই।'

লোকটার কবরের ব্যবস্থা করে, কোল্ট জোরাকে খবর দিতে গেল। তার কাছেই সে শুনল স্থানীয় বাসিন্দারা কখনো কোনো উৎপাত করেনি। ধারে কাছে কেউ আছে বলে মনে হয় না, থাকলে দেখা দেয়নি। অথচ চারদিকে শিকার করার মতো অজস্র পশু-পাখি।

কোল্ট বলল, 'হয়তো এ অঞ্চলে কোনো বিশেষ হিংস্র জাতের বাস। তারা এইভাবে বহিরাগতদের চলে যাবার নোটিস্ দেয়।'

টারজান গাছে বসে কাহিয়ার দলবল সহ ফিরে আসা দেখল। নিকিমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি যে বলেছিলে অনেক লোক। বাকিরা কোথায় গেল?'

'—তারা আগুন-লাঠি নিয়ে হয়তো আমাকেই শিকার করতে বেরিয়েছে।'

'—ওদের খুঁজে বের করে জানতে হবে কোথায় যাচ্ছে।'

'—ও বাবা! এক্ষুনি আঁধার নামবে। শাবর, শীতা, নুমা, হিস্তা সবাই নিকিমাকে খুঁজে বেড়াবে।'

টারজানের মনে দৃঢ় বিশ্বাস বড় দলটা শিকার করতে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে আসেনি। আরো গুরুত্বপূর্ণ তাদের উদ্দেশ্য।

রাতে যখন জোরা আর ওয়েন কোল্ট খেতে বসল, টারজানও একটা সুবিধামতো গাছের ডালে শুয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

কোল্ট বলল 'আমেরিকায় যখন জাবেরির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে তো এধরনের কোনো বড় অভিযানের কথা বলেনি। ওর উদ্দেশ্যটা কি, তাই বুঝতে পারছি না।'

জোরা একটু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে শেষে বলল, 'আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের দলের সবাই জানে। সেটি হল সব ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দেশগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে এমনি ঝগড়া-ঝাটিতে জড়িয়ে ফেলতে হবে, যাতে তারা এক-জোট হয়ে কমিউনিস্ট প্রচেষ্টা দমন করতে না পারে। ভারতবর্ষের লোকদের অনেক দিন থেকেই তাতানো হচ্ছে, যাতে ব্রিটিশরা তাদের সামলাতেই হিমশিম খায়। মেক্সিকোতে আমরা তেমন সুবিধা করতে পারছি না, কিন্তু ফিলিপিনে অনেক আশা রাখি। চায়নার তো একেবারে অসহায় অবস্থা। আমরা আশা করছি, আমাদের সাহায্য নিয়ে ওরা জাপানের সম্মুখীন হতে পারবে। ইটালি বড় কঠিন ঠাঁই, ওকে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে পারে অনেক সুবিধা হয়। সেটাই হল আমাদের এখানে আসার বড় কারণ।'

'—তা কি করে সম্ভব হবে এত কাণ্ড?'

—'কমরেড জাবেরি বলে, ঐ দুটো দেশের মধ্যে জলে স্থলে বিষম রেষারেষি। ওদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারলে, সমস্ত ইউরোপ জড়িয়ে পড়বে। এই মুহূর্তে রোমে ইটালি আর ফ্রান্স থেকে এক দল কমিউনিস্ট ঐ কাজই করছে। ও বেচারারা জানে না, কিন্তু আদর্শের জন্য ওদেরো মরতে হবে। ওদের কাছে যে কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে, তাতে

ফরাসী সেনাদের ইটালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড আক্রমণের নকল পরিকল্পনা লেখা আছে। একই সময়ে কম্রেড জাবেরির গুপ্তচরেরা ফ্যাসিস্ট সরকারের কাছে ঐ পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেবে। এদিকে আমাদের নিগ্রো বাহিনী ফরাসী আফ্রিকান বাহিনী সেজে, ইটালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড আক্রমণ করবে। সঙ্গে সঙ্গে সব পরাধীন দেশের প্রজারা বিদ্রোহ করবে। তার ফলে দেশে দেশে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্য ঘুচে যাবে আর সব জায়গায় স্বাধীন সোভিয়েট শাসনের প্রতিষ্ঠা হবে।'

কোল্ট বলল, 'নিসন্দেহে এ একটা বিরাট এবং প্রচণ্ড ব্যাপার। কিন্তু একে কার্যকরী করতে যে কোটি কোটি টাকার দরকার হবে, সে কোথায় পাবে?'

জোরা বলল, 'কেন, ওপারের বিখ্যাত রত্ন-গুহায়! সে তো কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। যারা জমা করে রেখেছিল, তারা হাজার বছর আগে তাদের মাতৃভূমি সহ মহাসাগরে ডুবে গেছে। এখানে তাদের বে-ওয়ারিশ রত্ন-গুহা পড়ে আছে, সেখান থেকে ধন-রত্ন নিয়ে এলেই হল। অবশ্য অনেক বিপদ আছে। কিন্তু আমরা সবাই আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এই জন্যেই আমারো এখানে আসা। কম্রেড জাবেরির কাগজপত্র রাখার, হিসাব রাখার একজন বিশ্বাসী লোক সর্বদা দরকার হয়। তার কাছে থাকতে পারাটাকেও আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি। তাকে তো তুমি দেখেছ? কেমন মনে হল?'

'—মনে হল প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব তার। সে যে কাজ ধরবে সেটা শেষ না করে ছাড়বে না। এ কাজেরই উপযুক্ত নেতা।'

তারপর তারা অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে কথা বলতে লাগল। তার মাঝখানে টারজান যেন কোথা থেকে একবার ঘুরে এল। জোরা বলছিল, 'ঐ রঘুনাথের রহস্যময় মৃত্যুতে নিগ্রোরা বেশ ঘাবড়ে গেছে। ভৌতিক ব্যাপার মনে করছে।'

ওদের কথার মাঝখানে অকস্মাৎ গাছের ওপর থেকে টেবিলের ওপর রঘুনাথের মৃতদেহটা ঝপ করে পড়ল। টেবিলটাও ভেঙে পড়ল।

●

যেখানে জাবেরি তার দলবল নিয়ে চলে জঙ্গলের ভিতর-কার ঘোরা পথে, টারজান সেখানে গাছে গাছে চলে। তাই জাবেরিরা যখন ওপারের উপত্যকার আগের খাড়া পাহাড়ের কাছে পৌঁছল, টারজান তার আগেই উপত্যকার তৃণহীন প্রান্তর প্রায় পার হয়ে গেছিল। সেই প্রাচীন নগরের লাল সোনালী গম্বুজ মিনার প্রথমবার দেখে তার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, এতকাল পরেও দেখলে আবার তাই হচ্ছে।

ভিতরকার ধ্বংসপ্রায় অবস্থা এতদূর থেকে বোঝা যায় না। পুরানো ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপগুলো বিকৃত অবস্থায় এখনো চলে আসছে। এরা লিপি পড়তে পারে না, মন্ত্রের মানে বোঝে না। এক কালের উন্নত সভ্যতায় একটা আদিম বর্বরতার ছাপ পড়ে গেছে। অথচ সেই অপূর্ব সুন্দর বাসনপত্র গয়নাগাঁটির ব্যবহার চলেছে। মেয়েরা অপূর্ব সুন্দরী, পুরুষরা আধা-বনমানুষ। টারজানের ধারণা কোনো আদিম যুগে বনমানুষের রক্ত ওদের বংশে মিশে গিয়ে থাকতে পারে।

এর আগে লা-কে প্রধানা পূজারিণীর আসনে অধিষ্ঠিতা করে দিয়ে টারজান নিশ্চিন্ত মনে ফিরে গিয়েছিল। ভেবেছিল এখনো তাই দেখবে। তাই গোপন পথ অবলম্বন না করে, খোল্লাখুলি মন্দির-নগরের প্রাচীর-পথ দিয়ে ঢুকল। নিকিমা এ-সব জায়গাকে বিশ্বাস করত না। তাই কাঁধ থেকে নেমে গেছিল।

টারজান বুঝতে পেরেছিল গোপন জায়গা থেকে প্রহরীরা ওর ওপর চোখ রাখছে। ভেবেছিল এখুনি তাকে চিনতে পেরে অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু কোথাও কারো সাড়া না পেয়ে, নিঃশব্দে চত্বর পার হয়ে, থামে ঘেরা পথ দিয়ে সে ভিতরে প্রবেশ করল। সব চেনা ঘর-দোর, তেমনি চমৎকার করে সাজানো।

সামনে একটা ভারি দরজা। সোনা-বাঁধানো থাম আর সোনা-বাঁধানো মেঝে। দরজা ঠেলে যেই ভিতরে ঢুকেছে, অমনি মাচায় মুগুরের বাড়ি লেগে, টারজান অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একদল বেঁটে পা-ওয়ালা লোমশ লোক তার হাত পা বেঁধে ফেলে, তাকে তুলে নিয়ে গেল, চমৎকার করে সাজানো পুরনো একটা ঘরে। সেখানে মঞ্চের ওপর সোনার সিংহাসনে একজন যুবতী বসে ছিল। তার পাশে সর্বাঙ্গে সোনার গয়না পরা কদাকার এক পুরুষ। মঞ্চে নিচের ধাপে পূজারিণীরা আর পুরোহিত দাঁড়িয়ে ছিল।

সিংহাসনের নিচে টারজানকে নামানোর পর তার জ্ঞান ফিরে এল। ওরা ওকে টেনে দাঁড় করাল।

সিংহাসনে বসা ওয়া বলল, 'এ কি সে-ই?'

পাশের লোকটা বলল, 'সে-ই।'

টারজান তার দিকে ফিরে বলল, 'এর মানে কি ডুথ? লা কোথায়?'

ওয়া রেগে গেল। চেঁচিয়ে বলল, 'সে মরেছে।'

তারপর হাতের রত্নখচিত খাড়াটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যেমন আগামী বলির দিন তুমি মরবে।' তারপর অনুচরদের চেঁচিয়ে বলল, 'নিয়ে যাও ওকে। বলির সময়ের আগে ওর মুখ দেখতে চাই না।'

তারপর টারজানের পায়ের বাঁধন কেটে, গলায় দড়ি বেঁধে পুরোহিতরা মশাল হাতে ওকে ওপারের মাটির তলার অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে হাঁটিয়ে, একটা কুঠরিতে ঢুকিয়ে, পা আবার বেঁধে, হাতের বাঁধন কেটে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

দশ ফুট লম্বা, আট ফুট চওরা কুঠরি। জানলা নেই। ঐ একটা দরজা। তাতে বাতাস চলাচলের জন্য একটা খোপ কাটা। খোপে লোহার শিক বসানো। দরজার বাইরে একজন করে পাহারাদার।

তিন দিন পরে পাহারাদারদের সরিয়ে দেওয়া হল। এবার এখান থেকে বেরোনার কথা ভাবা যেতে পারে। টারজানের অন্য অস্ত্র নিয়ে নিলেও, ছোরাটা কারো চোখে পড়েনি। দরজার খোপটা দশ ইঞ্চি চৌকো। এরা দরজার ভালো তালাচাবি তৈরির নিয়ম জানে না। সম্ভবতঃ বাইরে থেকে হুড়কো লাগানো আছে। খোপের দুটো শিক বাঁকিয়ে খুলে ফেলা ওর কাছে কিছুই নয়। ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে, ছোরাটার সাহায্য নিয়ে, অনেক কষ্টে কাঠের খিল তুলে, টারজান দরজা খুলে ফেলল। তারপর দুসারি ঘরের মধ্যিখানের করিডর দিয়ে এগিয়ে গেল। মনে হল নড়া-চড়ার শব্দ শুনছে, এদিকে হয়তো লোকজন আছে। তাদের এড়িয়ে যাবার জন্য, পাশের গলিতে ঢুকতেই কয়েকজন পুরোহিতের সামনে পড়ে গেল। তারাও মুগুর তুলে এগিয়ে এল। টারজান অমনি আরেকটা গলিতে ঢুকে, কয়েকটা ঘর ছেড়ে, একটা ঘরের হুড়কো তুলে সেখানে ঢুকে পড়ল। অমনি নাকে এল সিংহের কটা গন্ধ আর বিকট গর্জন।

●

ওপার উপত্যকার কিনারায় যে খাড়া পাহাড়, তার বাইরে বনের ধারে জাবেরি তার ক্যাম্প করেছিল। এখানে বাহকদের আর কয়েকজন আসকারিকে রেখে, কিটেম্বোকে আর তার যোদ্ধাদের নিয়ে সে পাহাড়ের শিখরে চড়ল। সেখান থেকে দূরে ওপারের গম্বুজ মিনার দেখে তারা হকচকিয়ে গেল। উপত্যকায় নেমে, শুকনো প্রান্তর পেরিয়ে ওরা ওপারের দিকে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন শুধু নিগ্রোদের নয়, আরবদের মনেও নানা ভয় জেগে উঠছিল।

গাছের ওপর থেকে নিকিমাও ওদের আগমন দেখে ঘাবড়ে গেল। ওর মনে হল টারজানকে এদের কথা জানানো দরকার। খানিকক্ষণ কিচিরমিচির করে নিকিমা খাড়া দেয়াল বেয়ে ওপার নগরের দিকে চলল।

কিটেম্বো কিন্তু রত্নগুহার পথ জানত না। সে বলেছিল শহর অবধি ওদের নিয়ে যাবে। ভেবেছিল সেখানকার কাউকে ধরে একটু চাপ দিলেই গুপ্তপথ জানা যাবে। তারা যদি জানত যে ওপার-নগরের কেউ রত্নগুহার অস্তিত্বের কথাই জানে না, তাহলে নিশ্চয় আশ্চর্য হয়ে যেত। সত্যি কথা বলতে কি টারজান আর তার অনুগত কয়েকজন ওয়াজিরি ছাড়া দুনিয়ার কেউ সে-পথ জানত না।

জাবেরিরা নগরের বাইরের ভাঙা প্রাচীরের কাছে পৌঁছে গেছিল। তার ভগ্নদশা দেখে ওদের চক্ষুস্থির! ভিতরের চত্বরে যাবার সরু পথটা আবু বাটুন সবার আগে দেখতে পেল। জাবেরি তাকে বলল দলের কয়েকজনকে নিয়ে একটু পর্যবেক্ষণ করে দেখতে। নিগ্রোরা খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সঙ্গে চলল। এসময় হঠাৎ কানে এল বিশ্রী একটানা একটা চিৎকার, তারপর গোঙানির শব্দ। ওরা থমকে থামল। জাবেরি রেগে বলল, 'যাও ভিতরে। চিৎকার শুনে কেউ মরে যায় না।'

একজন আরব বলল, 'কিন্তু জিনে ধরলে তো যায়!'

জাবেরি রেগে বলল, 'তাহলে সরে যাও। আমি যাচ্ছি।'

আরবরা সরে দাঁড়াল। একটা ছোট বাঁদর লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এসে, একবার ফিরে তাকিয়েই চিৎকার করতে করতে টিলা থেকে নেমে ছুটে পালাল। সঙ্গে সঙ্গে আবু বাটুন আর তার যোদ্ধারা উঠিপড়ি করে দে-দৌড়।

বাকি থাকল জাবেরি, ডর্সকি, রোমেরো আর আইভি। জাবেরি ডর্সকিকে পাঠিয়ে দিল ফেরারিদের যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনা যায়। ডর্সকি খুশি হয়েই চলে গেল। বাকি তিনজন সাহসে ভর করে সরু প্রবেশপথে পা দিল। তখন আরেকবার সেই বিকট তীক্ষ্ণ চিৎকারটা শোনা গেল। তিনজনেই থমকে দাঁড়াল। জাবেরি বলল, 'মনে হচ্ছে,

এভাবে না গিয়ে, এখন ফিরে যাই। পরে ওদের ফিরিয়ে এনে আবার সঙ্গে নিয়ে আসা যাবে।'

রোমেরোর মুখে ব্যঙ্গ হাসি দেখা দিল। ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি দেওয়ালের বাইরে চলে এসে, পিছন ফিরে দেখে রোমেরো আসেনি। জাবেরি ডেকেও সাড়া পেল না। আইভিচ্ শিউরে উঠে বলল, 'এই রে! ওকে ধরেছে বোধ হয়।'

জাবেরি বলল, 'কোনো ক্ষতি নেই। ওর টাকাকড়ি তো আর ধরেনি।'

আসলে কেউ রোমেরোকে ধরেনি। মেক্সিকান ছোকরার মনে রোমাঞ্চের তৃষ্ণা। এতদূর এসে ওপারের ঐশ্বর্য না দেখেই ফিরতে তার মন চাইল না। ভয় যদি পেয়েও থাকে, বাইরে সেটা প্রকাশ পায়নি। বড়জোর রাইফ্‌লটা আরেকটু জোরে চেপে ধরেছিল। ওপারের ভগ্নপ্রায় গৌরব দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল। তারপরেই ফিরে দেখে মুগুর নিয়ে শতখানেক বাঁদুরে মানুষ ওর দিকে এগোচ্ছে। আর কি সে থাকে সেখানে! পিছু হটে গলিতে ঢুকে সে-ও প্রস্থান করল।

দূরে পলায়মান সঙ্গীদের পায়ের ধুলো উড়ছিল, রোমেরোও সেই পথ ধরল।

নিকিমা সব দেখল, চিৎকারও শুনল।

ক্যাম্পে পৌঁছে জাবেরি আবু বাটুন, ডর্সকি আর আইভিচ্‌কে ডেকে পরামর্শ করতে বসল। এই প্রথম সে বাধার সম্মুখীন হল। বাটুন আর কিটেম্বোকে যাচ্ছেতাই করে বকাবকি করার একমাত্র ফল হল যে তারা মনে মনে ওর ওপর বিরূপ হয়ে উঠল। কিটেম্বো বলল, 'আমার লোকেরা সাদা মানুষদের সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত, ভূতদের সঙ্গে নয়। আমি ঐ অভিশপ্ত শহরে যেতে রাজি আছি, কিন্তু এরা কেউ যাবে না।'

আবু বাটুন বলল, 'আমার লোকরাও না'

জাবেরি বলল, 'তোমরা যে মস্ত বীর তা জানি। দৌড়বাজিতে তার চেয়েও বড় ওস্তাদ তাও জানি। এই তো আমরা ঘুরে এলাম। কোনো ক্ষতি হল না।'

বাটুন বলল, 'তাহলে কমরেড রোমেরো কোথায়?'

'—কি যে বল! যুদ্ধ হবে আর একটাও লোক খোয়া যাবে না।'

কিটেম্বো বলল, 'যুদ্ধটুদ্ধ হয়নি। যে ঐ নগরের একটু ভিতর দিকে গেছিল, সে ফেরেনি।'

এমন সময় রোমেরো এসে উপস্থিত! ওদের দেখেই সে বলল, 'ও কি! সবাই বেঁচে আছে যে বড়? আমি তো ভাবলাম হার্টফেল্ করে মরে গেছ!'

জাবেরি বলল, 'দেরি হল কেন?'

'—ভিতরটা একটু দেখে এলাম। অতীতের স্মৃতিঘেরা একটা মরা শহরের ধ্বংসাবশেষ।'

'—আর কি দেখলে?'

'—বেঁটেখাটো গাঁট্টাগোট্টা এক দল বাঁদুরে মানুষ, লোমশ গা, লম্বা হাতে মুগুর ধরা। একা পারব না বলে চলে এলাম।'

জাবেরি বলল, 'শুধু মুগুর হাতে? তবে তো সহজেই নগর অধিকার করা যাবে।'

কিটেম্বো কিন্তু মাথা নেড়ে বলল, 'না, ওরা মানুষ নয়, ওরা প্রেত!'

আবু বাটুনও বলল, 'আমার লোকেরাও জিন্ আর প্রেতের সঙ্গে লড়বে না।'

জাবেরির হাজার বকাবকি আর খোসামোদে কোন ফল হল না। শেষটা রোমেরো বলল, আমাদের একমাত্র ভরসা ঐ গ্রিঙ্গো (অর্থাৎ আমেরিকান) আর ফিলিপিনো এলে, ছয়জনে গিয়ে ওপার দখল করতে পারব।'

জাবেরি বলল, 'ওরা আমাদের কচুকাটা করে ফেলবে।'

রোমেরো নাক সিঁটকাল, 'অবিশ্যি, যদি ভয় পাও—'

'—ভীতু নই আমরা, নির্বোধও নই।'

ক্যাম্পে পৌঁছবার পর দিন ওয়েন কোল্ট লম্বা চিঠি লিখে এক ছোকরার হাতে বন্দরে পাঠাল। ছোকরা চিঠিটাকে একটা চেরা লাঠির আগায় গুঁজে নিয়ে রওনা হল। জোরা সবই দেখল। পরে কোল্টকে বলল, 'তুমি হয়তো জান না, কিন্তু এখান থেকে চিঠিপত্র পাঠাবার

অধিকার জাবেরি ছাড়া কারো নেই।'

'—তাই নাকি! আমার কিছু টাকাকড়ি সময় মতো পৌঁছয়নি বলে, সেটা আনতে পাঠালাম।'

তিন দিন পরে ব্যর্থ হয়ে দলবল সহ জাবেরি ফিরল। উভয় পক্ষ তাদের ক-দিনের অভিজ্ঞতার কথা বলল। জোরা আর কোল্ট ওপারের বর্ণনা শুনে যত রোমাঞ্চিত হল, জাবেরির দল রঘুনাথের মৃত্যুর কথা শুনে তার চেয়ে কম রোমাঞ্চিত হল না। দ্বিতীয় বার নিগ্রোরা কেউ মৃতদেহ ছুঁল না, টোনি আর কোল্ট তাকে সমাধিস্থ করেছিল। কোল্ট বলল, 'যে ওকে তীর মেরেছিল, সে-ই নিশ্চয় ওর মৃতদেহ তুলে ক্যাম্পে ফেলেছিল। এরা বলছে অত ভারি লাশাটকে গাছের ওপর কোনো মানুষে তুলতে পারবে না।'

জোরা বলল, 'তার ওপর এতটুকু শব্দ না করে।'

পরে এক সময় জাবেরি জোরাকে একজন কমিউনিস্টের পক্ষে ভারি অদ্ভুত এমন কথা শোনাল, 'ওপারের অতুল ঐশ্বর্যের খানিকটাও যদি আনতে পারি, মোটেই দলের কাজে সবটা দেব না। একটা বড় অংশ নিজের জন্য রাখব। আমার গোপন স্বপ্ন হচ্ছে আমি গোটা আফ্রিকার সম্রাট হব। তোমাকে আমার সম্রাজ্ঞী করব, জোরা। এই কষ্টময় জীবন আর সহ্য হচ্ছে না। তাই বলে এ-সব কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বল না। বললে তোমাকে যতই না ভালোবাসি, তবু মেরে ফেলব।'

জোরা কথা দিল কাউকে বলবে না, কিন্তু মনে মনে স্তম্ভিত হয়ে গেল, জাবেরি কি পাগল হল নাকি?

দলের প্রায় সকলেই এবার ওপার নগরের বাইরের দেয়াল পর্যন্ত যেতে রাজি হল। কিন্তু মাত্র দশজন যোদ্ধা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে নগরের ভিতরে ঢুকতে রাজি ছিল। যারা ঐ বিশ্রী চিৎকার শুনেছিল, তারা কেউ ভিতরে যাবে না বলে দিল। নতুন আয়োজন করে আবার রওনা হতে বেশ ক-দিন কেটে গেল। এবার আবু বাটুন আর তার যোদ্ধারা রইল জোরার রক্ষণাবেক্ষণে। তাকে নিয়ে গেলেই ল্যাঠা চুকে যেত, কিন্তু কয়েকটা জরুরি বার্তা এসে পৌঁছবার কথা, সেগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হবে। বাটুনের সঙ্গে জাবেরির সম্পর্কটা সেই থেকেই খুব মন্দ।

আবু বাটুন তার আরবদের সঙ্গে সব সময় কি সব শলাপরামর্শ করে আর আড়চোখে জোরাকে দেখে।

চকিতে টারজান সমস্ত পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছিল। সে দরজার পাল্লার পিছনে আশ্রয় নিল আর সিংহটাও এমনি জোরে লাফ দিল যে একেবারে দরজার বাইরে পুরোহিতদের সামনে গিয়ে পড়ল! টারজান চট করে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরের খিলটা উঁচু করা ছিল, ধাক্কা খেয়ে সেটা যথাস্থানে পড়ে গেল। টারজানও বন্দী হল। এ দরজাতে শিকের বদলে বাতাস চলাচলের জন্য কয়েকটা ছ্যাঁদা করা ছিল। তার মধ্যে দিয়ে হাত ঢোকে না। এমন সময়ে ঘরের মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল। ঘরময় এমনিতেই সিংহের গন্ধ, এ কি সেটার জোড়াটা নাকি? বাইরে অন্য সিংহটা খুনোখুনি কাণ্ড লাগিয়েছিল।

এমন সময় কে বলল, 'তুমি কে?'

টারজান বলল, 'কোথায় তুমি? অন্য সিংহটা কোথায়?'

—'আর তো নেই, ঐ একটাই!'

এবার তারা পরস্পরকে চিনতে পারল, টারজান আর লা! লা তবে বেঁচে আছে! সিংহ কেন ওকে মারেনি?

লা বলল, 'আমি পাশের ঘরে আছি। মাঝখানে খালি শিক বসানো একটা দরজা। তাতে তালাও নেই।'

সেই দরজা দিয়েই টারজান ভিতরে ঢুকল।

লা কাছে এসে বলল, 'আর আমার কোন ভয় নেই।'

—'তোমার জন্যে কিছু করার তো উপায় দেখছি না, লা।'

—'তা হক। তুমি কাছে থাকলেই আমি সাহস পাই। ওরা কিন্তু সিংহটাকে ধরে আবার এখানেই পুরবে। তখন সে আমাদের মেরে ফেলবে।'

—'ওরা তোমার খাবার আনে কি করে?'

—'সিংহের ঘরের দেয়ালে একটা ফোকর আছে, সেখান দিয়ে একটা খুপরিতে মাংস ফেলে, সিংহটা মাংস খেতে খুপরিতে ঢোকে। তখন খুপরির দরজা ফেলে দিয়ে আমার খাবার আনে।'

—'তাহলে তো এখনি ঐ খুপরিটা পরীক্ষা করতে হয়।'

খুপরির মাথায় সরু সুড়ঙ্গ, তার ওপরে লম্বা একটা চোঙা, চোঙার ওপর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। ঐখান দিয়ে খাবার ফেলা হয়। একটা মানুষ হাঁচড়ে-পাঁচড়ে চোঙার অসমান গায়ে হাত পা গুঁজে, ওপরে উঠে যেতে পারে।

এই সময় লা ডেকে বলল, 'ওরা সিংহ নিয়ে ফিরছে!'

মোটকথা লা-র কিছু কম সাহস ছিল না। টারজানের আগে আগে চোঙা বেয়ে উঠে গেল সে। ওরা মিনারের একটা ঘরে পৌঁছল।

টারজানের ইচ্ছা যত তাড়াতাড়ি পারে ঐ বিদেশীদের ষড়যন্ত্র পণ্ড করে দেবে। কিন্তু তার আগে লা-র শত্রুদের উৎখাত করে, তাকে তার ন্যায্য সিংহাসনে বসিয়ে যেতে হবে। এখানকার সব শত্রুদের নির্মূল করে যেতে হবে।

লা বলেছিল, 'রোজ সন্ধ্যায় আগুন-দেবতা শুতে যাবার আগে সব পুরোহিতরা আর পূজারিণীরা সভাঘরে জড়ো হয়। সেই সময়ে এখান থেকে বেরিয়ে শহরে পৌঁছনো যায়।'

—'তারপর?'

—'সভাঘরে গিয়ে যদি ওয়াকে আর ডুথকে মেরে ফেলা যায়, তাহলে আর ভাবনা নেই। অন্যরা ভেড়ার মতো।'

টারজান বলল, 'আমি নারী হত্যা করি না।'

হঠাৎ টারজানের মনে পড়ল, এইখানেই সিংহের খাবার এনে চোঙার মুখ দিয়ে ফেলা হয়। একটু পরেই দারুস বলে এক বুড়ো পুরোহিত সিংহের জন্য মাংস নিয়ে এল। সে লা-র ভারি অনুগত ছিল। লা তাকে দেখে বড় খুশি। এ বড় বিশ্বাসী লোক।

দারুসের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল রাতে লা-র অনুরক্ত যত জন আছে, সকলকে সেই রাতে সভাঘরে প্রস্তুত থাকতে বলা হবে। সংখ্যায় তারাই অনেক বেশী। অতি সহজেই লা সিংহাসন ফিরে পাবে।

বুড়ো চলে যাবার পর টারজানকে লা বলেছিল এই লোকটি কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না।

যেমন কথা হয়েছিল, সূর্যাস্তের ঠিক আগে লা-ই পথ দেখিয়ে টারজানকে সভাঘরে নিয়ে গিয়ে, মঞ্চের পিছন থেকে সিংহাসনের কাছে পৌঁছল। টারজানও তার সঙ্গে উঠেই বুঝতে পারল তাদের পক্ষে একজনও দাঁড়াচ্ছে না, দারুস বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এ সময় আচমকা একটা লোক লা-র হাত চেপে ধরেছিল। টারজান তাকে তুলে নিয়ে এমনি ঝাঁকানি দিল যে তার ঘাড় মটকে গেল। তারপর তার মৃতদেহটাকে তুলে ধরে ছুঁড়ে দিল পুরোহিতদের মুখের ওপর।

সেখানে একা দাঁড়িয়ে লড়াই করা অসম্ভব ছিল। লা-কে করিডরে ঠেলে দিয়ে সে বলল, 'যত তাড়তাড়ি পার বাইরের দেয়ালের বাইরে চল।'

তারপরই আর সময় নষ্ট না করে চেনা পথ দিয়ে ছুটল দুজনে। টপ করে লা-কে কাঁধে তুলে দেখতে দেখতে চত্বর পেরিয়ে বাইরের দেয়ালেরো বাইরে পৌঁছে গেল টারজান। চ্যাচাতে চ্যাচাতে ওয়ার দল পিছন পিছন তাড়া করল।

বাইরের ঘুটঘুটে অন্ধকার একেবারে নিরাপদ। অন্ধকারকে এদের বড় ভয়। কিছু দূর যেতেই অনুসরণকারী-দের চীৎকার থেমে গেল। তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। লা কেঁদে ভাসাতে লাগল।

টারজান বলল, 'কেঁদো না, লা। আবার ওপার উদ্ধার করে দেব, এবার স্থায়ী ভাবে।'

লা বলল, 'দুঃখে কাঁদছি না, অনেদ দিন পর প্রিয় বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দে কাঁদছি।'

বনের মধ্যে দিয়ে ওরা উপত্যকার সীমান্ত পাহাড়ের দিকে চলল। একটা বড় গাছের উঁচু ডালের ফ্যাকড়ায় লা-র রাতে থাকার জায়গা হল। টারজান একটু নিচুতে আরেকটা ফ্যাকড়ায় শুল।

ভোরে উঠে টারজান শিকার আর ফলমূলের সন্ধানে বেরোল। লা তখনো জাগেনি। খানিক বাদে লা জেগে টারজানকে দেখতে না পেয়ে বুঝতে পারল সে সম্ভবত কোথাও বেরিয়েছে।

কিন্তু রাণীর মর্যাদা পাওয়ায় যে অভ্যস্ত, তার পক্ষে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। খানিক পরেই মনে হল, এমনও হতে পারে যে লা-র ভার নিতে টারজানের আগ্রহ নেই। আগেকার সব সদয় ব্যবহারের স্মৃতির চেয়ে এটাই বেশি করে মনে হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আর অপেক্ষা না করে, গাছ থেকে নেমে লা হাঁটতে সুরু করল।

ওপার ছাড়া লা আর কিছুই জানে না, তাই আপনা থেকেই তার পা দুখানি তাকে সেদিকেই নিয়ে চলল। সুখী সে কোনো দিনই হয়নি, ভবিষ্যতেও সে সুখের আশা রাখে না। তারপরেই মনে হল, সুখ আশা না করলেও, মরতে সে চায় না। এখন ওপারে ফেরা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। বাইরের সাহায্য ছাড়া সিংহাসন ফিরে পাওয়াও সম্ভব নয়। তাহলে এখন অন্য পথ ধরতে হবে।

এই সব ভেবে ওপারের পথ ছেড়ে, অন্য পথ-ই ধরল সে। ওদিকে মাথার ওপরে ঝড়ের কালো মেঘ জমা হতে লাগল আর লা-র পিছন পিছন একটা ঝকঝকে-চোখ হলদে জানোয়ারও ঝোপের আড়াল দিয়ে চলতে লাগল।

●

টারজান অনেক দিন পরে একটা মস্ত দাঁতাল বুনো শূওরের পিঠে লাফিয়ে পড়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে

বিদ্যুতের চমকানি আর বাজের গর্জনের সঙ্গে মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। বুনো শূওর মারা পড়ল আর তার গায়ে পা রেখে টারজান জয়ধ্বনি দিল। সে ডাক জাবেরির আর তার দলবলের কানেও পৌঁছল। নিগ্রোরা থমকে দাঁড়াল। জাবেরি বলল, 'ও আবার কি?'

কোল্ট বলল, 'প্যান্থার বোধ হয়।'

কিটেম্বো বলল, 'না বরং বড় বনমানুষদের জয়ধ্বনি কিম্বা—' এই অবধি বলে শিউরে উঠল।

—'কি হল?'

'—এ জায়গা ছেড়ে যাওয়াই ভালো।'

ওরা আরো তাড়াতাড়ি ওপারের দিকে এগিয়ে চলল।

বৃষ্টির দাপট থেকে রক্ষা পাবার আশায় লা একটা গাছের গুঁড়ির কাছ ঘেঁষে আশ্রয় নিয়েছিল। একটু দূরেই ঝোপের আড়ালে হলদে জানোয়ারটা ওর দিকে চেয়ে চুপ করে শুয়েছিল। লা ভাবছিল টারজানের কাছাকাছি কোথাও থাকতে পারলেই সে অনেকটা সুখী হবে।

পৃথিবীটা যে কত বড় সে বিষয়ে তার কোনো ধারণাই ছিল না। ভাবত হয়তো মস্ত একটা মাঠের মতো, তার এখানে ওখানে ওপারের মতো একটা শহর। সেখানে পুরোহিতদের মতো, কালোদের মতো, বল্‌গানিদের মতো আর টারজানের মতো মানুষ থাকে।

বৃষ্টি থেমে গেলে লা আবার হাঁটা দিল। একটু পরে একটা খোলা জায়গায় পৌঁছল। তার মধ্যিখানে একটা বড় পাথর। সমস্ত জায়গাটা রোদে ভরে আছে। সেই পাথরের ওপর লা একটু বসল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, কোথা থেকে একটা মস্ত চিতাবাঘ ছুটে এসে, গুঁড়ি মেরে আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

লা উঠে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে ছোরা বের করল। পালাবার চেষ্টা বৃথা, তুই লাফে চিতাবাঘটা ওকে ধরে ফেলবে। কিন্তু এই ছোরা দিয়ে ওকে মারাও অসম্ভব, তবু বিনা লড়াইয়ে প্রাণ দেবে না লা।

কাছে এসে দু-পায়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে চিতাবাঘ। সঙ্গে সঙ্গে হলদে বিদ্যুতের ঝলকের মতো প্রকাণ্ড এক সিংহ তার পিঠে লাফিয়ে পড়ে এক নিমেষে তার শিরদাঁড়া ভেঙে দিল। লা ভাবল শিকার হাত-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে ভেবেই সিংহ চিতাবাঘকে মেরে ফেলল। কিন্তু সিংহটা তাকে কিছু বলছে না কেন?

ঐ সিংহ হল জাদবাল্‌জা। অনেক দিন আগে ওপারে টারজানের কাছে এই মেয়েকে সে দেখেছিল। টারজান বলেছিল, 'এর কখনো ক্ষতি কর না।' টারজানের বাঁধন কেটে দিয়েছিল এই মেয়ে। তাই জাদবালজা শীতাকে মারল আজ। কিন্তু লা ওকে চিনতে পারে নি।

সিংহ কিছু বলছে না দেখে, সাহস সঞ্চয় করে ওর সামনে দিয়ে হেঁটে বনপথ ধরল। এই বিশাল বিজন বনে ফল-মূলের অভাব ছিল না। নদীর মিষ্টি জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাল। রাতে আবার গাছের ডালে শুল। আজও টারজান কাছে ছিল না।

বুনো শূওর মেরে, মাংস নিয়ে টারজান গাছের কাছে ফিরে এসে লা-কে খুঁজে পায়নি। তার কিছু পায়ের দাগ দেখেছিল ওপারের দিকে চলেছে। যদিও জলে কিছু দাগ ধুয়ে গেছিল। টারজান কষ্ট করেই সেই দিকে চলল। গোড়ায় ওর ইচ্ছা ছিল ঐ বিদেশীদের মতলব ভেস্তে দিয়ে, লা-কে নিয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে যায়। তারপর সেখান থেকে ওয়াজিরি যোদ্ধা নিয়ে ওপারে গিয়ে লা-র শত্রুদের পরাস্ত করে লা-কে নিষ্কণ্টক সিংহাসনে বসায়। তাই যদি করত, তাহলে লা-র একা ফিরে যাবার কথা মনে হতো না। তবে এ নিয়ে বেশি চিন্তা করার দরকার নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই ও লা-কে ধরে ফেলতে পারবে।

কিন্তু একেবারে পর্বতের ওপর পৌঁছেও লা-র দেখা না পেয়ে ভারি দুশ্চিন্তা হল। একটা পায়ের ছাপ পর্যন্ত আর দেখতে পাচ্ছে না। অথচ আগের দিন দুজনে যখন ওপার ছেড়ে চলে এসেছিল, তখনকার ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ চোখে পড়ল এক সারি মানুষ বন থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে।

জাবেরির প্রথম ওপার অভিযানের সময় কি ঘটেছিল, সেটা টারজান জানত না। গোটা দলটার রহস্যময় অদর্শনের কথা ভেবে ও খুব আশ্চর্য হয়ে গেছিল। এখন আবার তাদের দেখা পেল। ওরা পাহাড়ে চড়তে শুরু করলে, টারজান একটা বড় পাথর গড়িয়ে দিল। পাথরটা জাবেরির গা ঘেঁষে, কোল্টকে ডিঙিয়ে কিটেম্বোর দুজন হত-ভাগ্য যোদ্ধার গায়ে লাগল। তারা পাহাড় থেকে নিচে পড়ে প্রাণ হারাল। কয়েকজন নিগ্রো তাই দেখে বিগ্‌ড়ে গিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাবার চেষ্টা করল। জাবেরি ডর্সকিকে বলল, 'ওদের থামাও।' তারপর এদিকে ফিরল, 'কে কে

পাঁচিল টপকে পর্যবেক্ষণ করে আসবে ?'

রোমেরো আর কোল্ট ছাড়া কেউ এল না। রক্ষাকারীদের ভয় দেখাবার জন্য কয়েক ঝাঁক গুলি ছোঁড়া হল।

টারজান আগেই সেখানে পৌঁছে পাথরের আড়াল থেকে সব দেখছিল। কোল্ট ছোকরাকে দেখে বেশ লাগল। এদের দুজনের সাহসেরো প্রশংসা করতে হয়, অজানা বিপদের মুখে পাঁচিলে চড়ে, বলল, 'কাউকে দেখা যাচ্ছে না।' তখন দলবল ওপারের দিকে এগোল।

টারজানের বিশ্বাস ওরা কখনোই রত্নগুহার পথ খুঁজে পাবে না। লা-ও ওপারে নেই, কাজেই ওর-ও থাকার দরকার নেই।

বিদ্রোহী ওপারিয়ানদের প্রতি ওর কোনো সহানুভূতি ছিল না। যা হয় হক ওদের। এই দল-ও এখানে কোনো সুবিধা করতে না পেরে, আবার বেস ক্যাম্পেই ফিরবে। ওদের উদ্দেশ্য তো টারজান জেনেই ফেলেছে। হয়তো ঐ বেস্ ক্যাম্পেই লা-কেও পাবে।

ঠিক যেখানে ওয়াজিরিদের নিয়ে ও নিজে এর আগে তাঁবু ফেলেছিল, এরাও সেখানে ক্যাম্প করেছে। চারদিকে কড়া নিগ্রো-গন্ধের ওপর লা-র মৃদু সুগন্ধ পাওয়া গেল না। সব যোদ্ধাদের হাতে বন্দুক। কারো কারো হাতে, তার ওপর তীর-ধনুকও ছিল। বল্লম ছিল।

দুদিনের মধ্যে একটু মাংস ছাড়া কিছু খায়নি টারজান। খুব খিদেও পেয়েছিল। একটা হরিণ শিকার করে, পেট ভরে খেয়ে, অভ্যাস মতো একটা বড় গাছ দেখে তার ফ্যাকড়া ডালে রাত কাটাতে উঠে পড়ল।

জাবেরিদের বড় ক্যাম্পে, আবু বাটুনের রাগ দেখে কে ? জাবেরির এত আস্পর্ধা ! নিজে একটা ঘৃণ্য নাজরানি আর ওকে কিনা বলে কাপুরুষ ! এখানে ক্যাম্প আর একটা মেয়ে আগলাতে রেখে গেল ! ওরা কি বুড়ো, না ছোট ছেলে ? তবে মেয়েটা দেখতে ভালো, ওকে বেচলে ভালো টাকা পাওয়া যাবে। একজন অনুচর বলেছিল যে নাজরানিটার বাক্সে মেলা টাকাকড়ি আছে।

—'কিন্তু এ কাজ করলে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।' আরেকজন বলল।

বাটুন বলল, 'কিসের উদ্দেশ্য ? ও ব্যাটা তো কেবল নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু চায় না। আমাদের খালি বলে, ওর সঙ্গে গেলে টাকাকড়ি পাব, সুন্দরী বেগম পাব, এই সব। তার চেয়ে যা হাতানো যায়, তাই নিয়ে কেটে পড়াই বুদ্ধির কাজ হবে।'

জোরার তাঁবুতে রান্না করতে করতে ওয়ামালা বলছিল, 'এই শেখাটাও ঐ আগের লোকটার মতোই বদ। বোয়ানা কোল্ট থাকলে ভালো হত।'

জোরা বলল, 'তা হত। আরবগুলোর দেখছি ফিরে এসে অবধি মেজাজ বিগ্‌ড়ে আছে।'

ওয়ামালা বলল, 'সারাদিন নিজেদের মধ্যে কি সব ফন্দী আঁটছে। মাঝে মাঝে তোমার দিকে তাকাচ্ছে।'

জোরা বলল, 'আমাকে ভয় দেখিও না, বলছি। ও কে ?'

ওয়ামালা চেয়ে দেখল ক্যাম্পের বাইরে সোনারুপোর পোষাক পরা অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে-ও ওদের দেখতে পেয়েছিল। আরবরা তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে, জোরা তাড়াতাড়ি দু-হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

লা-র প্রসন্ন হাসি দেখে জোরা বুঝেছিল সে বন্ধু ভাবে এসেছে। দুঃখের বিষয়, কেউ কারো ভাষা বুঝল না। নানা ভাষা জানত জোরা, একে একে সব চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। আরবরা আর ওয়ামালাও বৃথা চেষ্টা করে দেখল।

মেয়েটিকে নিজের কাছে রেখে দিল জোরা। তার জন্য আরেকটা ক্যাম্পখাটে ওয়ামালা বিছানা পেতে দিল। হাত-পা নেড়ে, নানা শব্দ করে লা বোঝাতে চেষ্টা করল তার কত রকম বিপদ গেছে। আশ্চর্যের বিষয়, জোরা অনেকখানি বুঝতেও পারল। একসঙ্গে খেয়ে, শুতে যাবার আগে জোরা ওয়ামালাকে বলল, 'এই বাড়তি পিস্তলটা নিয়ে তুমি তাঁবুর দরজার বাইরে শোবে।'

নিজের তাঁবুতে বসে বাটুন-ও তার সাকরেদদের বলল, 'নতুন সুন্দরী আরো বেশি দামে বিকোবে।'

সেই রাতে স্থান ত্যাগ করে যাবার আগে টারজান বেস ক্যাম্পটা ভালো করে খুঁজে দেখল। লা সত্যিই সেখানে নেই। ঘুমন্ত যোদ্ধাদের অস্ত্র থেকে তীর ধনুক বর্শা বেছে নিয়ে, চলে যাবার সময় এক বেচারা কালো যোদ্ধাকেও চুলের মুঠি ধরে বনের কিনারায় নিয়ে গিয়ে, তার ছোরা এবং অন্যান্য অস্ত্র কেড়ে নিয়ে, তাকে ছেড়ে দিয়ে, একবার বিকট যুদ্ধের ডাক ছেড়ে সেখান থেকে টারজান চলে গেল। যোদ্ধা বেচারা ভয়ে আধমরা হয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল। টারজান তাকে শুধু ভয় দেখাতেই চেয়েছিল। কারণ এদের বড় ভূতের ভয়। একবার যদি মাথায় ঢোকে এখানে প্রেতের

উপদ্রব, সঙ্গে সঙ্গে সব কটা পালাবে। অভিযান বন্ধ হবে। তারপর গাছে ফিরে আরেকটু হরিণের মাংস খেয়ে, সে রাতটাও আরামে কাটাল।

✶

এদিকে নিকিমা বাঁদর টারজানের জন্য বনে বনে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছিল। তার মাথায় ঢুকেছিল টারজানের সাহায্য দরকার। টারজানকে সে ওপারে ঢুকতে দেখেছিল, কিন্তু বেরোতে দেখেনি। রাতে নিকিমা ডুগ-ডুগ শব্দ শুনে চাঁদের আলোয় দেখে বনের মধ্যিখানে খোলা জায়গায় টয়াটের দল দুম-দুম উৎসবের জন্য জড়ো হয়েছে। এ উৎসব সে আগেও দেখেছিল। এবার একটা চিতাবাঘ মারা পড়েছে, তাই নিয়েই উৎসব।

নিকিমার জানা উচিত ছিল এ সময়ে বনমানুষদের মেজাজ গরম হয়ে থাকে, তাদের কিছু বলতে হয় না। কিন্তু কতটুকুই বা বুদ্ধি তার? ল্যাজ দিয়ে একটা গাছের ডাল পাকিয়ে ধরে ঝুলে পড়ে সে চ্যাঁচাতে লাগল, 'টয়াট্! গায়াট্! জুথো! টারজান বিপদে পড়েছে! তাকে সাহায্য কর!'

রেগেমেগে টয়াট্ একটা ছোকরা বনমানুষকে পাঠাল মানুষটাকে ধরে আনতে। কিন্তু আর কি নিকিমা সেখানে থাকে! চেঁচিয়ে বন মাথায় করে পগার পার!

লা-র ঘুম ভাঙল অচেনা পরিবেশে। তার মনে হল এই মেয়ে বোধহয় টারজানের স্বজাতি। তাই এমন দয়ালু। হয়তো টারজানের স্ত্রীও হতে পারে। এর জন্যেই টারজান লা-কে বিয়ে করতে চায় না। একে মেরে ফেললেই হয়। সঙ্গে সঙ্গে জোরার দয়ার কথা ভেবে, তখুনি সে চিন্তা মন থেকে লা দূর করে দিল। যাকে টারজান ভালোবাসে, লা কি কখনো তার অনিষ্ট করতে পারে?

সকালের জলযোগের পর রাইফ্‌ল নিয়ে জোরা ওয়ামালা আর দুজন নিগ্রো বাহক শিকার করতে বেরুল। সেই ফাঁকে আবু বাটুনের স্বজাতি এবং সাকরেদ ইবন দামুক দুজন বদমাইস সঙ্গী নিয়ে জোরার তাঁবুতে ঢুকল। লা সেখানে একা বসেছিল। দামুক অনেক মিষ্টি কথায় তাকে ফুসলাবার চেষ্টা করল। সে এক বর্ণও বোঝেনি। কাছে যেতেই লা-র চোখ দিয়ে আগুন ছুটেছিল। দামুক সরে গেল। কিন্তু সঙ্গীরা একজন যে-ই লা-র হাত ধরে টেনেছে, অমনি লা-র রত্ন-খ[illegible] ছোরা বিদ্যুৎ খেলিয়ে দু-বার তার বুকে বসে গেল। বিকট চীৎকার করে লোকটা মরে পড়ে গেল।

আগুনের মূর্তির মতো লা তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। চীৎকার শুনে আবু বাটুন দৌড়ে এল। সব কথা শুনে, দামুকের ওপর খুব রাগ করল, 'ওর এতটুকু অসম্মান কেউ না করে, এই আমি বলে দিলাম।'

দামুক বলল, 'সিংহের সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই। ওকে পোষ মানানো দরকার।'

বাটুন বলল, 'তোমাকে কিছু করতে হবে না। যে অনেক টাকা দিয়ে ওকে কিনবে, সে বুঝবে। আপাততঃ ওকে ফেলে, হাত থেকে ছোরাটি নিয়ে, পিছমোড়া করে হাতদুটো বেঁধে ফেলতে হবে। নাজরানিরা ফিরে এসে দেখবে আমরা তাঁবু তুলে হাওয়া হয়েছি। কিন্তু মেয়ের গায়ে যেন একটা আঁচড় না পড়ে।'

খুব লড়াই দিয়েছিল লা, তবে অত জনের সঙ্গে পারবে কেন? ওরা ওকে অক্ষত রেখেই ঐ ভাবে বেঁধে ফেলল। তারপর জাবেরির তাঁবু ঢুঁড়ে যতটা আশা করেছিল তত টাকা না পেলেও, মন্দ পেল না।

ওদিকে জোরার শিকার সেদিন ভালোই হয়েছিল। ওয়ামালার হাতে বন্দুক, বাহকদের মাথায় শিকার চাপিয়ে ক্যাম্পে ফেরামাত্র অনেকগুলো আরব ওর ওপর লাফিয়ে পড়ে লা-র মতো করে বেঁধে ফেলল।

ওরা ওকে ক্যাম্পের ভিতরে নিয়ে যেতেই ওর চক্ষুস্থির! সব তাঁবু নামিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রত্যেক আরবের হাতে বন্দুক, কাঁধে বোঁচকা। নিগ্রোদের মাথায় ভারি ভারি বোঝা। যা কিছু নিতে পারেনি, সে সমস্ত এক জায়গায় জড়ো করে তাতে আগুন ধরানো হচ্ছে। লা-কেও দেখল, ওরি মতো বন্দিনী। আবু বাটুনকে জোরা বলল, 'এ তুমি কি করছ, শেখ?'

সে বলল, 'নাজরানিরা এ দেশ অধিকার করে মহা পাপ-কাজ করেছে। আমরা সত্যের আলো দেখেছি। তাই সব শেষ করে দেশে ফিরে যাচ্ছি। একজন খুব ভালো লোকের কাছে তোমাদের দিয়ে যাব। তার কাছে খুব যত্ন পাবে। তবে জাবেরি যদি আমাদের এত অপমান না করত, তাহলে হয়তো কিছুই করতাম না।'

তারপর সারাদিন বনের মধ্যে চলা। দিনের পর দিন। মিছিলের গোড়ার দিকে মেয়েদের রাখা হল। চারদিকে লোকজন, পালাবার উপায় নেই। জোরা লা-কে সেই অবসরে ইংরিজি শেখাতে শুরু করে দিল। সাহসী মেয়ে

দুজনেই, ভেঙে পড়ল না কেউ।

ওরা চলেছিল উত্তর-পশ্চিম দিকে। অ্যাবিসিনিয়ার গালা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। শত্রু বোঝাই সে অঞ্চলকে শেখের দল বড়ই ভয় করে, বোঝা গেল। গালাদের ওপর আরবরা বরাবর অত্যাচার করে এসেছে। বাটুনের একজন বন্দী-দাসের বাড়িও ঐ অঞ্চলে।

এদিকে আরেক জ্বালা হল, সুবিধা পেলেই দামুক লা-র আশেপাশে ঘোরে। বাটুন কাছে থাকলে অন্য দিকে পালায়।

গালা দেশে পৌঁছবার আগে এক বড় নদী। ওরা তার ধারে এসে দেখে নদীতে বান ডেকেছে। পার হওয়া অসম্ভব।

এই সময় দামুক তার চাল চালল।

★

আগের বার যে দশজন যোদ্ধা ওপারে আসেনি, কিন্তু এবার আসতে রাজি হয়েছিল, তারাও প্রথমবার সেই বিকট আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়াল।

এবারো রোমেরো আগে যাচ্ছিল, তার পিছনেই কোল্ট। তার পিছনেই নিগ্রোদের আসার কথা। কিন্তু তারা ঐ বীভৎস চীৎকার শুনে বাইরের দেয়ালের সরু ফাঁক দিয়ে ঢুকতে রাজি হল না। জাবেরি রিভলবার তুলতেই, ওদের একজন রাইফ্‌ল তুলে বলল, 'অস্ত্র রাখো, সাদা-মানুষ, আমরা মানুষের সঙ্গে লড়াই করি, প্রেতের সঙ্গে নয়।'

ডর্সকিও ডেকে বলল, 'থেমে যাও পিটার, এখুনি ক্ষেপে গিয়ে ওরা আমাদেরি মেরে ফেলবে।'

জাবেরি তখন নিগ্রোদের নানা লোভ দেখাতে লাগল। তাতেও সুবিধা হল না দেখে শেষ পর্যন্ত ঠিক করল খালি হাতে ফিরে না গিয়ে, ডর্সকি, আইভিচ্, টোনি, রোমেরো, কোল্ট আর জাবেরি নিজেরা যা পারে করবে।

এমন সময় আবার সেই রক্ত-হিম করা চিৎকার!

মন শক্ত করে ওরা বাইরের চত্বর পেরিয়ে, ভিতরের দেওয়ালের দিকে এগোল। হঠাৎ হুড়মুড় পায়ের শব্দের সঙ্গে যেন একদল উন্মাদের চিৎকার কানে এল। তারপর উপরি উপরি দুটো গুলির শব্দ।

তাই শুনে আইভিচ্ পিঠ ফেরাল, 'চুলোয় যাক সোনা!' বলে বাইরের দিকে দৌড়ল।

জাবেরি বলল, 'ফিরে এসো, ভীতু কোথাকার!' বলে নিজেও দৌড়ল।

তারপর ডর্সকিও। টোনিও-ই বা কি করে? সে-ও [illegible] করল। একেবারে বাইরের পাঁচিল ছাড়িয়ে তবে ওরা থামল।

জাবেরি আইভিচের কাঁধ চেপে ধরে বলল, 'তোমাকে গুলি করা উচিত।'

আইভিচ্ বলল, 'তুমিও তো কম যাও না। ঢুকলে কি হত?'

—'রোমেরো আর কোল্টের মতো মারা পড়তাম। এদের দলে বড় বেশি লোক! পায়ের শব্দ শুনলে না?'

ডর্সকিও বলল, 'ঠিক বলেছো। বীরত্ব দেখানো ভালো কথা। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের স্থান সবার ওপরে। মরে গেলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। সোনা কোনো মরা মানুষের কাজে লাগে না।'

টোনি বলল, 'তবে কি কমরেডদের বাঁচাবার কোনো চেষ্টাই করব না?'

জাবেরি বলল, 'মেক্সিকানটা মরুক গে, আর আমেরিকানটা মলেও তার টাকাগুলো তো আর উপে যাবে না, যদি মৃত্যুর খবরটা চেপে যাই!'

টোনি বলল, 'কিছুই করবে না?'

—'একা কি করতে পারি?'

—'আমি সঙ্গে থাকব।'

—'দুজনেই বা কতটুকু করতে পারব? তাছাড়া তোমার মতামত কে চায়!'

এদিকে ভিতরে দেওয়াল পার হয়েও কাউকে দেখতে পায়নি কোল্ট আর রোমেরো। কোল্ট বলেছিল, 'ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে নাকি?'

রোমেরো হাসল, 'না হে কমরেড। বাহাদুরিটা আমাদেরই হোক।'

—'তাহলে এগিয়ে চল। ভয়াবহ কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না।'

রোমেরো বলল, 'নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি কিন্তু।'

'—আমিও।'

তারপর বন্দুক হাতে যেই না একটু এগিয়েছে, অমনি চারদিকের দরজা দিয়ে, খিলান দিয়ে বিকট চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বীভৎস বাঁদুরে চেহারার একপাল মানুষ ছুটে এল! কোল্ট তাদের মাথার ওপর দিয়ে একটা গুলি ছুঁড়ল। রোমেরো তাদের গায়েই ছুঁড়ল। এবার কোল্টও তাই করল। দুটো লোক আহত হল। কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রেখেওছিল ওদের। তারপর কোল্টের মাথায় মুগুরের বাড়ি পড়াতে সে

ধরাশায়ী হল। ওরা তাকে ঘিরে ফেলল। রোমেরো সেই সুযোগে পালাল।

বাইরে অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলতেই জাবেরি বলল, 'কোল্ট কোথায়?'

—'ওরা ওকে মুগুর মেরে, বন্দী করেছে। এতক্ষণে হয়তো বেঁচেও নেই।'

—'তাকে ফেলে এলে? কাপুরুষ।'

রোমেরো চটে গেল, 'এমন কথা মুখে এল? নিজেরা তো আগেই ভাগলে।'

এসময় আবার ভিতর থেকে রক্ত-হিম-করা চিৎকার এল। জাবেরি বলল, 'একা তো আর ওপার জয় করা যাবে না। চল, ক্যাম্পে ফিরি।'

এদিকে বেঁটে পুরোহিতরা অচেতন কোল্টের অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে কাঁধে করে প্রধানা পূজারিণী ওয়ার সামনে নিয়ে গেল। জ্ঞান ফিরতেই তাকে মঞ্চের সামনে দাঁড় করানো হল। ব্যাপার দেখে কোল্ট ভাবল স্বপ্ন দেখছে নাকি? এমন ঐশ্বর্য, এমন সাজসজ্জা, সোনারুপোর ছড়াছড়ি, রূপসী প্রধানা, কদাকার পুরোহিত, সব যেন স্বপ্নে দেখা! প্রধানার হাতে ছোরা, চোখ বড় নির্মম।

সিংহাসনের পাশে দাঁড়ানো না-ও বলে অপূর্ব সুন্দর একটি মেয়ে অবাক হয়ে কোল্টকে দেখছিল। যদিও ওয়ার কথার এক বর্ণ মানে বোঝেনি কোল্ট, সে আসলে তার প্রাণদণ্ড দিয়েছিল। সুন্দরী না-ও শুনে শিউরে উঠেছিল। তারপর রক্ষীরা কোল্টকে সুড়ঙ্গ-পথে একটা ভূগর্ভস্থ কুঠরিতে বন্ধ করে চলে গেল। যাবার আগে হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে গেল।

ঘরে একটি জানালা আর হাওয়া চলাচলের জন্য দরজায় একটা শিক বসানো খোপ। জানালা দিয়ে ওপারের সূর্য-মন্দিরের উঠোন দেখা যাচ্ছিল। সেখানে রোজ সন্ধ্যায় নরবলি হয়। তার বেদী দেখেই কোল্ট সব বুঝতে পারল। সেখানকার দেওয়ালের খোপে নর-কঙ্কাল সাজানো। ঐ ঘরে তার সারা দিন কেটে গেল, খাবারদাবার দিল না।

সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে কোল্ট শুয়ে পড়ল। হঠাৎ মনে হল কে যেন আসছে। উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখল। কিন্তু ভালো করে বুঝতে পারল না। তারপর সেই বিকট চিৎকার শুনতে পেল।

এদিকে জাবেরির দল হতাশ হয়ে বেস ক্যাম্পে ফিরে দেখে সেখানেও সকলে ঘাবড়ে গেছে। রাতে নাকি প্রেতে-একজন রক্ষীকে ধরে নিয়ে গেছিল। সুখের বিষয় সে কোনোমতে পালিয়ে এসেছিল।

কিছু পরেই ওরা ক্যাম্পে ফেরার পথ ধরল। আস্তে আস্তে নিগ্রোদের মনে আবার সাহস এল। কিন্তু জাবেরির আর রোমেরোর মধ্যে কথা বন্ধ। আইভিচের হাঁড়িমুখ।

একটা গাছের ফাটল থেকে নিকিমা কিন্তু সবই দেখতে পেল।

টারজানের সঙ্গে বনে টানটরের দেখা হওয়াতে সে তার পিঠে শুয়ে আরাম করছিল। দুজনার কাছে সময়ের কোনো মূল্য ছিল না। হঠাৎ খুদে এক বাঁদরের কিচির-মিচির শুনে টারজান ওপর দিকে তাকাল। নিকিমা এত দিন পরে ওকে আবার পেয়ে মহা খুশি! ওর গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ল সে।

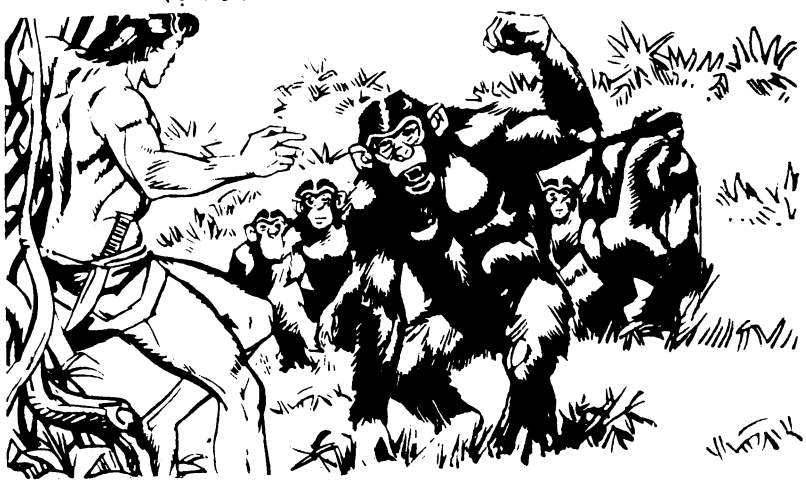

নিকিমা বলতে লাগল কোথায় কি দেখেছে, কিন্তু কোনো মেয়ের খবর দিতে পারল না। দুম-দুমের কথা শুনে টারজান ভাবল গায়াটদের খবর নিলে হয়।

গাছ থেকে গাছে, সোজা পথে যেতে যেতে জাবেরির দলকে বিরসবদনে ফিরে আসতে দেখল। তাদের সঙ্গে রত্নের বোঝা নেই দেখে টারজান একটুও অবাক হল না। হঠাৎ খেয়াল হল দলের মধ্যে কোল্ট তো নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার কি অবস্থা হয়েছে বুঝে নিল টারজান। ওপারের বিকট চিৎকার শুনেও নির্ভীক কোল্ট নিশ্চয় তাতে ভয় না পেয়ে, ভিতরে ঢুকেছিল। এখন সে হয় বন্দী, নয় মৃত। তাই নিয়ে তখন আর মাথা ঘামায়নি টারজান। কোল্টকে ভালো লাগলেও, সে-ও তো শত্রু।

টারজানের কাঁধে বসে নিকিমা একজন নিগ্রোর গায়ে পরা একটা লাল সার্টকে লুব্ধ চোখে দেখছিল। টারজান লোকটাকে মেরে ওটা এনে নিকিমাকে দিলে কি মজা হত!

তা তো দেবে না।

আরো পরে টারজান হরিণ মেরে খিদে মেটাল, নিকিমা পাখির ডিম, ফল, পোকামাকড় খুঁজে খেল। হঠাৎ টারজান উঠে বসে বিশ্রামরত অভিযাত্রীদের পিলে চমকে দিয়ে ওপারের রক্ষীদের সেই বিকট ডাকের অনুকরণে গর্জন তুলে ঐ জায়গা ছেড়ে বনে অদৃশ্য হল।

★

আরবদের দল নদীর ধারে বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। এর মধ্যে একদিন দামুকের গাঁয়ের এক যোদ্ধা মেয়েদের তাঁব পাহারা দিচ্ছিল। তাকে হাত করা খুব শক্ত কাজ ছিল না। আরো কয়েকজন কুটুম্ব স্থানীয় লোককেও দলে টেনেছিল সে। তাছাড়া বুকুলা বলে একজন নিগ্রো বন্দী-দাসকে বলেছিল ওকে সাহায্য করলে সে মুক্তি পাবে। যাই হোক, সমস্ত প্রস্তুত হলে, বুদ্ধিটা কাজে লাগানো হল।

লা-দের তাঁবুতে একটা কাগজের লণ্ঠন জ্বলছিল আর দুজনে গল্প করছিল। লা ভাঙা ভাঙা ইংরিজী শিখে গেছিল। এমন সময় বুকুলা বাইরে থেকে ফিসফিস করে ডাকল। জোরা বলল, 'কি ব্যাপার?'

—'আমরা ক'জন পালাচ্ছি। আপনাদের রক্ষীকে সরানো হয়েছে। যদি চান তো আপনাদের দু-জনেকেও সঙ্গে নিতে পারি।'

জোরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি। বুকুলা বলল, 'আগে ঐ মেমকে নিয়ে যাব, ওঁকে বুঝিয়ে দিন। ফিরে এসে একটু বাদেই আপনাকেও নিয়ে যাব। এক সঙ্গে গেলে ধরা পড়ার ভয়।'

কিছুই সন্দেহ করেনি জোরা। লা-কে নিয়ে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে বসেছিল। একবার বাইরে থেকে একজন আরব হাঁক দিয়েছিল, 'হাজেলান কোথায়?'

ঘুম জড়ানো স্বরে জোরা বলেছিল, 'তার আমি কি জানি?'

লোকটা ক্যাম্পে হৈ চৈ লাগিয়ে দিল, 'হাজেলান পাহারায় নেই!'

শেখ বলল, 'মেয়েরা আছে তো?'

—'তা আছে।'

—'কি আশ্চর্য! ইবন দামুক কোথায়?'

দামুককেও পাওয়া গেল না। তখন ক্যাম্পে খোঁজ পড়ে যাওয়াতে দেখা গেল হাজেলান, দামুক, ফোডিন, দারেয়েম আর পাঁচজন নিগ্রো নিখোঁজ!

শেখ বলল, 'যাক গে ওরা। ভালোই হল। খাবার লোক কমল।'

বলা বাহুল্য জোরা দুশ্চিন্তায় সারারাত ঘুমোল না।

লা-কে নিয়ে বুকুলা দলের কাছে পৌঁছল। আরবরা গা-ঢাকা দিয়েছিল। নেংটি পরা নিগ্রোদের দেখে, লা কিছুই সন্দেহ করেনি। সে ভেবেছিল শুধু কয়েকজন অত্যাচারিত নিগ্রো পালাচ্ছে। পরে আরবদের দেখে যখন নিজের ভুল বুঝতে পারল তখন কিছু করার উপায় ছিল না। লা-র মুখ বেঁধে, দু-হাত পিছমোড়া করে বেঁধে, গলায় দড়ি দিয়ে, ওরা তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলতে লাগল। সারা রাত কেবল হাঁটা। আবু বাটুন ওদের ধরতে পারলে কাউকে আস্ত রাখবে না, এই ভেবে কোথাও বসতে পারছিল না ওরা।

লা-র হাতের আর মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছিল। দামুক ওর আশেপাশে ঘুরছিল, কথা বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু লা তার দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। মনে মনে প্রতিশোধের সঙ্কল্প নিয়ে।

সে সুযোগ এল। দুপুরের দিকে, হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে, ওরা পথ ছেড়ে বনের মধ্যে ঢুকে ক্যাম্প করল। এই সময় দামুক একটা মারাত্মক ভুল করল। লা-কে একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে, কাছে টানবার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহীর মতো ফিরে দাঁড়িয়ে, দামুকের কোমর থেকে তারি ছোরা টেনে বের করে, দামুকেরি বুকে আমূল বসিয়ে দিয়ে, রক্তাক্ত ছোরা তার জোব্বায় মুছে, খাপসুদ্ধ সেটি সঙ্গে নিয়ে, ঝোপের মধ্যে দিয়ে নদী থেকে যত দূরে পারে লা পালাল। যখন আর হাঁটতে পারে না, তখন একটা গাছে উঠে, একটু আরামের জায়গা বেছে নিয়ে, বিশ্রামের ব্যবস্থা করল।

রাতে ওপারের সেই মরণ-কুঠরিতে কোল্টের জন্য খাবার নিয়ে এল সুন্দরী না-ও। সে ইশারায় জানিয়ে গেল আর দুদিন পরে, কোল্টকে বলি দেওয়া হবে। না ও অনেক চোখের জল ফেলল, ওকে অনেক আদরও করল। কোল্ট খাবারটুকু খেয়ে ফেলে, শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, তবে কি তার কপালে এই রকম মৃত্যু লেখা ছিল?

তা কিন্তু ছিল না! যেদিন তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বলি দেওয়া হবে, তার আগের রাতে নিঃশব্দে না-ও এসে চাবি দিয়ে কুঠরির দরজা খুলে গোপন সুড়ঙ্গপথে তাকে মন্দির-নগরের পাঁচিলের বাইরে পৌঁছে দিয়েছিল। তার

জীবনে এই প্রথম একজন মানুষ দেখেছিল না-ও, যাকে ভালোবাসা যায়। চাবি সংগ্রহ করতে গিয়ে চাবি-রক্ষককে হত্যা করতে হয়েছিল, সে-কথা কোল্ট জানতেই পারেনি। কিন্তু এই নিরানন্দ পুরীতে ঐ দুঃখিনী সুন্দর মেয়েটিকে একা রেখে চলে যেতে তার কোমল হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠছিল।

•

জাবেরির ক্যাম্পে সেই চিৎকার শুনে অবধি সকলের মনে ভয়। হয়তো ওপার থেকে কিছুতে পিছু নিয়েছে। ডবল পাহারার ব্যবস্থা হল। পর-দিন নিরুৎসাহ বিমর্ষ চিত্তে ক্যাম্প তুলে দলবল রওনা হল। অভিশপ্ত ভুতুড়ে জায়গা ছেড়ে যেতে নিগ্রোদের ভারি আগ্রহ।

সন্ধ্যার আগেই মূল ক্যাম্পে পৌঁছে জাবেরি দেখল এক টিপি ছাই ছাড়া, কিছু বাকি নেই। তাই দেখে ক্ষেপে উঠল জাবেরি। যার ঘাড়ে সব দোষ চাপানো যায়, এমন একটা লোক পর্যন্ত নেই। রেগেমেগে দাপিয়ে বেড়ানো ছাড়া কিছু করবার ছিল না।

গাছ থেকে ব্যাপার দেখে টারজান খুশি না হয়ে পারল না। নিগ্রোরা পালাতে পারলে বাঁচে। অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে সেটা বন্ধ করল জাবেরি। বন্দর থেকে ওদের অনেক অস্ত্রশস্ত্র, ইউনিফর্ম ইত্যাদি আসার কথা। এখন তার ওপর খাবার-দাবার আর অন্য জিনিসেরো দরকার পড়ল। ক্যাম্পটাকে আরেকটু বড় আর পরিষ্কার করে তৈরি করা হল। শিকারের ব্যবস্থা হল। দিন কাটল, সপ্তাহ কাটল। টারজানও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইল।

গালা-দেশের সীমানায় আবু বাটুনের গুপ্তচররা খবর আনল যে গালারা তাদের এলাকা দিয়ে ওদের যেতে দেবে না। এই সময় আর একজন গুপ্তচর অন্য একটা পথের সন্ধান দিল, সেখান দিয়ে গেলে উত্তর দিক ঘুরে, পশ্চিমে যাওয়া যাবে।

ল্যা-কে দামুক চুরি করে নিয়ে যাওয়াতে বাটুন বেজায় রেগে ছিল। জোরার ওপর এখন কড়া প্রহরা বসেছিল। বাটুনের মতলব জোরা জানত, তার চেয়ে সে আত্মহত্যা করবে স্থির করেছিল। জাবেরির তাকে উদ্ধার করার ক্ষমতা হবে না, সেটা জোরা বুঝেছিল। অবিশ্যি জাবেরিও যে কি অসুবিধায় পড়েছে তার সবটা জোরা জানত না। দল থেকে জোরার খোঁজে কাউকে পাঠানো যাবে না। নিজে গেলেও দল ভেঙে যাবে।

টারজান জাবেরির ক্যাম্পের ওপর নজর রাখছিল। নিকিমাকে পাঠিয়েছিল কিছু অন্য কাজে। নিকিমার স্বভাব সে জানত। মাঝপথে এদিকে ওদিকে তার মন চলে যায়, এন্তার সময় বৃথা নষ্ট করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্য সিদ্ধি না হলে ছাড়েও না। এর মধ্যে একদিন নিশ্চয় এসে পড়বে সে।

ওয়েন কোল্ট এদিকে বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে হয়রান হচ্ছিল। জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে, ছোট ছোট প্রাণী দিয়ে পেট ভরাতে গিয়ে বন-বিজ্ঞানে ক্রমে সে পোক্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর একটা নদীর ধারে এসে পৌঁছল। ভাবল কাছাকাছি নিশ্চয় গ্রাম আছে।

পায়ে-চলা শক্ত পথ ধরে কোল্ট এসেছিল। কানে একটা শব্দ এল। আজকাল তার চোখ কান নাক অনেক বেশি সজাগ হয়ে গেছিল। টপ করে গাছে উঠে পড়ল কোল্ট। যে-ই আসুক, ওর তলা দিয়ে যেতে হবে। কে যেন দৌড়ে আসছে মনে হল। তার পিছন পিছন কেউ তাড়া করেছে, তার ভারি পায়ের শব্দও কানে এল। তারপর পুরুষ কণ্ঠে 'থামো!' খানিকটা চাপা গোলমাল, তারপর একজন মেয়ের গলা—'ছাড় বলছি। ওখানে আমাকে জীবিত অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবে না!'

'—বেশ, তাহলে আমার ঘরেই নিয়ে যাচ্ছি।'

ততক্ষণে ওরা গাছতলায় এসে পৌঁছেছিল। ছোরা হাতে কোল্ট গাছ থেকে নেমে ওদের কাছে গিয়ে কাঁধ ধরে পুরুষটিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাল। সে হল আবু বাটুন আর মেয়েটি জোরা ড্রিনভ্!

সঙ্গে সঙ্গে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হল। বাটুন পিস্তল তুলে কোল্টকে গুলি করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গুলিটা লাগেনি। বেগতিক দেখে কোল্ট ওর গলায় ছোরা বসিয়ে দিল। এইভাবে আবু বাটুন মরল। জোরা বলল, 'শীগগির চল। গুলির শব্দে ওর দলবল এসে পড়বে।' কোল্ট তাড়াতাড়ি বাটুনের গুলি বন্দুক ইত্যাদি উদ্ধার করে, জোরার সঙ্গে দৌড় দিল।

তখনি পিছনে কোনো সাড়াশব্দ শোনা গেল না। কোল্ট বলল, 'গাছে চড়তে পার?'

'—নিশ্চয়!'

পাশের গাছটাতে দুজনে উঠে পড়ে, গাছ থেকে গাছে বনের মধ্যে একশো ফুট ঢুকে পড়ে একটা বড় গাছের ডালে আরাম করে বসল। জোরা বলল, 'আমাকে খুঁজছিলে

নাকি ?'

'—সবাইকে খুঁজছিলাম। সেই যে ওপার নগরে ঢুকলাম, তারপর আর কারো দেখা পাইনি। তোমাদের কি ব্যাপার ?' তখন জোরা ওকে সব কথা খুলে বলল।

কোল্ট শুনে বলল, 'ভাগ্যের কাণ্ড দেখ ! আমি ওপারে বন্দী হয়েছিলাম বলেই তুমি উদ্ধার পেলে।'

জোরা বলল, 'ভাগ্যিস্ তুমি জন্মেছিলে।'

কোল্টও সব কথা জোরাকে খুঁটিয়ে বলল। ওর ধারণা ছিল জোরা জাবেরিকে ভালোবাসে, তাই জাবেরির খারাপ ব্যবহারের কথা বলল না। জোরা বলল, 'রোমেরোর কি হল ?'

—'শেষ যখন ওকে দেখলাম ও বেঁটে-ঠ্যাংদের সঙ্গে লড়ছে।'

—'একা ?'

—'আমিও যে ব্যস্ত ছিলাম।'

—'অন্যরা ?'

—'তারা পৌঁছয়নি।'

—'খালি তোমরা দুজনে গেছিলে ?'

— নিগ্রোরা রাজি হচ্ছিল না।'

—'কিন্তু বাকিরা ?'

—'আমি যে জ্ঞান হারালাম। কি করে বলব ?'

—'কি জঘন্য ব্যাপার !'

তারপর জোরা বলল, 'বেস ক্যাম্পে ফিরতে হবে। অনেক কাজ আছে।'

—'তুমি বড় বেশি কর্তব্য পরায়ন।'

—'তুমি বেশ বুর্জোয়া ভাবাপন্ন !'

কোল্ট হেসে ফেলল। জোরা বলল, 'তুমি প্রোলেতারিয়াতদের ইতরজন বলে অবজ্ঞা কর। ওরা উদার হবার সুযোগ পায়নি। অনেকের মন বড় ছোট। তোমার বংশপরিচয় বিষয়ে ওদের মনে অনেক সন্দেহ। নিজেদের জাতটাকে বড় বেশি গুরুত্ব দিতে চায়।'

—'নিজেদের জাত মানে ? তোমরা সেই জাত নও ?'

জোরা ভারি চালাক। কোনোমতেই ধরা না দিয়ে বলল, 'তাই বলে নিজেদের দুর্বলতার কথা বলব না ?'

এই সময় বাটুনের দলের লোকরা এসে বলাবলি করতে লাগল, 'এর পর আর পায়ের দাগ দেখছি না।'

—'হয়তো বনের ভিতর গেছে।'

—'না, না, নদীর ধার দিয়েই গেছে নিশ্চই।'

—'সাবধান, ওদের কাছে শেখের অস্ত্রশস্ত্র আছে।'

তারা গেলে ওরা দুজন বনে বনেই এগোতে লাগল। জোরা বলল, 'ক্যাম্পটাও তো এদিকেই হবে।'

সন্ধ্যা হল। তখনো শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে, কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে, ওরা চলেইছে। রাতে গাছে দুটো মাচা বেঁধে, দুজনে বিশ্রাম নিল। সিংহের ডাকে একবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

●

এ বনে দিনের পর দিন কাটানো বড় কষ্টকর। খাবার-দাবার, ফলমূল বা শিকারের যোগ্য জানোয়ারের বড়ই অভাব। অনেক সময় জোরাকে বিশ্রাম করতে বলে কোল্ট অনেক কষ্টে একজনের মতো খাবার এনে বলত, সে খেয়ে এসেছে। এই ভাবে কত দিন উপোসী থেকেছে।

আজও তাই হয়েছিল। কোল্ট কিন্তু একটা বড় হরিণ মেরে ভাবছিল ভালোই হল, এবার দুদিন বিশ্রাম করা যাবে। হরিণটার ওজন কমাবার জন্য মাথা, খুর আর নাড়িভুঁড়ি বাদ দিয়ে, কাঁধে করে গাছের কাছে পৌঁছল। জোরার নাম ধরে ডেকে কোনো সাড়া না পেয়ে, তার বড় ভয় হল। কোথাও জোরা নেই।

শেখের বন্দুকটা আত্মরক্ষার জন্য তার কাছে রেখে যেত কোল্ট। বন্দুকটা গাছতলায় পড়ে আছে। সেখানে বনমানুষের বড় বড় পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। জোরাকে বনমানুষে ধরে নিয়ে গেছে !! সেই পায়ের দাগ ধরে কোল্ট জোরার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। মনে হল কি নিষ্ঠুর এই বন।

ওপারের প্রধানা পূজারিণী লা ধীরে ধীরে ওপারের দিকে চলেছিল। ওপার ছাড়া সে কিছু জানত না। সেখানে কেউ তাকে আদর করে নেবে না, কাজেই নগরে যাওয়া হবে না। কাছাকাছি থাকা যেতে পারে। হয়তো আবার টারজান এসে সব সমস্যা মিটিয়ে দেবে। মনে হচ্ছিল পিছন পিছন শত্রুরা আসছে। হঠাৎ দেখে সামনেই সেই সিংহ, যে আগেও ওর প্রাণে বাঁচিয়েছিল। জাদবালজা ওর সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। এখন কাছে এসে ওর পায়ে মাথা ঘষতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে বাঁক ঘুরে হাজেলান তাই দেখে স্তম্ভিত। সামনে বিরাট এক সিংহ দাঁত খিচোঁচ্ছে। তার কালো কেশরে হাত রেখে লা দাঁড়িয়ে।

লা খালি বলল, 'মারো !'

তার ভাষা বুঝল না হাজেলান। কিন্তু জাদবালজা

বুঝল। অমনি সে হাজেলানের ওপর লাফিয়ে পড়ে এক কামড়ে তার মাথা গুঁড়ো করে দিল। বাকিরা প্রাণ হাতে করে পালাল। জাদবালজা মানুষ খেত না, কিন্তু অনুমতি পেলে মারতে ভালোবাসত। মৃতদেহটা ফেলে দিয়ে, সে আবার লা-র সঙ্গে চলল।

ঐ সময়ে একটা নেংটি-পরা নিগ্রো জাবেরির চিঠি নিয়ে বন্দরে চলেছিল। সিংহের সাড়া পেয়ে সে গাছে উঠে পড়ল। এমন সময় অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল। সোনা-রুপোর সাজ পরা সুন্দর একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়ে একটা প্রকাণ্ড সিংহের কালো চুলে হাত রেখে গাছতলা দিয়ে হেঁটে গেল। নিগ্রোটি গলার মাদুলিতে হাত দিয়ে ঘোরা পথে বন্দরে চলল।

প্রায়ই সন্ধ্যার পর টারজান এসে জাবেরির ক্যাম্পের ওপরের গাছে শুয়ে ওদের সব পরামর্শ শুনত। ভাবত নিকিমার এতদিনে ফেরা উচিত ছিল। তাছাড়া আজ পর্যন্ত লা-র কোনো খোঁজ পায়নি টারজান। তাকে আবার নিরাপদে সিংহাসনে বসাবার পরিকল্পনা মনে মনে তৈরি, অথচ তার খবর পাচ্ছে না। কোল্টকে ওর ভালো লেগেছিল, শত্রু হক আর যাই হক। তার কি হল তা-ও কেউ জানে না। টারজান যদি কোল্টের দুরবস্থার কথা জানতে পারত, তখনি তার সাহায্যে ছুটে যেত।

হতাশায় ডুবে গিয়ে, একা একা বনের মধ্যে অবসন্ন দেহটা টেনে টেনে সে হোঁচট খেতে খেতে চলেছিল। কোথাও জোরা কিম্বা বনমানুষটার দেখা নেই। পায়ের চিহ্নও আর দেখা যাচ্ছিল না। ওর ডাইনে, বেশ খানিকটা দূরে পরম নিশ্চিন্তে জোরাকে কাঁধে নিয়ে টয়াট্ চলেছিল। জোরা তখন ভয়ে, ক্লান্তিতে অচেতন। টয়াটের ভয় হচ্ছিল মেয়েটা মরে-টরে গেল না তো? তবু তাকে কাঁধে নিয়ে দিব্যি চলেছিল। দলের কাছে গিয়ে, আরেকটা দুম-দুম উৎসব করতে হবে এই সব ভাবছিল সে। টারজানের নাকে টয়াটের গন্ধের সঙ্গে একটা মেয়ের গন্ধও পৌঁছেছিল। কাজেই অল্পক্ষণ পরেই টয়াটের সামনে গাছ থেকে একটা সাদা দৈত্যকে ঝুপ করে নামতে দেখে, রাগে ভয়ে টয়াট্ চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি টয়াট্! চলে যাও! নইলে মেরে ফেলব!'

টারজান বলল, 'মেয়েটাকে নামিয়ে দাও।'

টয়াট চ্যাঁচাতে লাগল, 'নামাব না। এটা আমার জিনিস।'

টারজান বলল, 'নামিয়ে রেখে, চলে যাও। নয়তো আমি তোমাকে মেরে ফেলব।'

এই বলে কোমর থেকে পৈত্রিক ছোরাটি বের করে সে এগিয়ে এল। এবার টয়াট-ও কাঁধ থেকে মেয়েটাকে ঝেড়ে ফেলে, লড়াইয়ের জন্য তৈরি হল। এমন সময় বনের মধ্যে থেকে বিকট একটা হুড়মুড় মড়মড় শব্দ শোনা গেল।

টানটোর গাছের আড়ালে শান্তিতে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ দুটো জন্তুর গজ্‌রানি তার কানে এল, আর নাকে এল টারজানের গন্ধ। টারজানের সামনে শত্রু! এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে বনজঙ্গল ভেঙে সে হাজির হল! টয়াট্ তার দিকে একটিবার তাকিয়ে তার রাগত চোখে আর ঝকঝকে দাঁতে নিজের মৃত্যুদণ্ড দেখতে পেয়ে, পিছন ফিরে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল!

●

ক্রমে জাবেরির মনোবল খানিকটা ফিরে এসেছিল। টাকা-কড়ি, জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, বিক্ষুব্ধ নিগ্রোদের একটা বড় দল এসে ক্যাম্পে পৌঁছেছিল। মনে হল অল্প দিনের মধ্যেই ইটালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড আক্রমণ করা যাবে। হুশ্ করে ঢুকে গোটা কতক গাঁ জ্বালিয়ে, কটি ছোট শহরে লুঠপাট করে, বোঁ করে চলে আসবে। কিছু ফ্রেঞ্চ ইউনিফর্ম জোগাড় করা হয়েছিল, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। গুপ্তচররা বলেছিল অ্যাবিসিনিয়াতে ভারি অসন্তোষ, অশান্তি। ওখানকার শাসনকর্তা তাফারিকে দেখতে পারে না। অ্যাবিসিনিয়া দখল করতে পারলে, সমস্ত উত্তর আফ্রিকা জাবেরির কবলে চলে আসবে।

সুদূর বোখারায় দুশো উড়োজাহাজ, বম্বার, স্কাউটপ্লেন ইত্যাদি জঙ্গীবিমান সংগ্রহ হচ্ছিল, পুঁজিবাদী মার্কিন সহযোগিতায়! সেগুলোকে অ্যাবিসিনিয়ায় আনলে, ঈজিপ্টে যত অসন্তুষ্ট দল আছে, সবাই এসে হাতে হাত মেলাবে। এইসব স্বপ্ন দেখত জাবেরি।

আরো ভাবত যে তারপর সে হবে আফ্রিকার সম্রাট প্রথম পিটার! এই সময় টোনি বলল, 'মনে হচ্ছে তোমার মন খুশি, কম্রেড।'

'—তা হবে না কেন? সামনে সাফল্য!'

টোনি বলল, 'ফিলিপিন স্বাধীন হলে, আমিও খুশি হব।'

জাবেরি বলল, 'এখানে থাকলে তোমাকে তার চেয়েও বড় পদ দেব। গ্র্যাণ্ড ডিউক হতে চাও?'

টোনি তো অবাক! 'ও সব তো আর নেই!'

'—আবার হবে।

'—ওরা বড় খারাপ ছিল। গরীবদের পিষ্ট করত!'

'—এরা বড় লোকদের পিষ্ট করে, টাকা বের করে নেবে। তুমি টাকা আর ক্ষমতা চাও না?'

'—সে তো সবাই চায়, কমরেড।'

নবাগত নিগ্রোরা ড্রিল্ করত, ভালো খেত, যুদ্ধ করবার জন্য উৎসুক ছিল তারা। ওপার-ফেরত নিগ্রোরাও ক্রমে মনের জোর ফিরে পেয়েছিল।

এই সময় কিন্তু হরকরা যে বার্তা নিয়ে এল, সেটা পড়ে জাবেরি রেগে আগুন হল। কিন্তু স্বজাতির কাছেও রাগের কারণ খুলে বলল না। তাছাড়া জাবেরির অজান্তে তার বিরুদ্ধে বিপক্ষ দলীয় একশো বণিক বীরও চিতা বাঘ কিম্বা সিংহের ছাল পরে, হাতে পায়ে তামার গয়না, গলায় দাঁতের মালা পরে মাথায় একটা করে সাদা পালক গুঁজে, ক্রমে এগিয়ে আসছিল। সঙ্গে তাদের আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। নিঃশব্দে আসছিল তারা। সবার আগে যে ছিল, তার কাঁধে একটা ছোট বাঁদর বসে ছিল।

টানটরকে দেখে টয়াট পালালে টারজান নিশ্চিন্ত হয়েছিল। বনমানুষদের সঙ্গে লড়াইয়ে তার রুচি ছিল না। তারা যে ওর জাতভাই। টারজানের ইশারায় টানটর থামল। টারজান নেমে জোরার কাছে গেল। আগে মনে হয়েছিল সে মারা গেছে, এখন পরীক্ষা করে দেখল, সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। টারজানের কথায় বন ভেঙে পথ করে টানটর আগে আগে চলল, জোরাকে কোলে তুলে টারজান তার পিছন পিছন গেল। এই ভাবে ওরা একটা বেশ বড় নদীর ধারে পৌঁছল। মেয়েটাকে চিনতে পেরেছিল টারজান। একেই সে জাবেরিদের ক্যাম্পে দেখেছিল। না খেয়ে, বিশ্রাম না পেয়ে, আকাশের নিচে পড়ে থেকে, এখন তার অবস্থা কাহিল। টানটরের পিঠে চড়ে অনেক কষ্টে দুরন্ত নদীটা পার হয়ে, ওরা অন্য তীরে, চওড়া একটা জানোয়ার-চলা পথে পৌঁছল। জোরার যখন জ্ঞান ফিরল, সে অবাক হয়ে দেখল লোমশ বনমানুষের বদলে, একজন সুদর্শন বন-দেবতা তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে!

আরেকবার চোখ খুলে দেখল ওদের পিছন পিছন মস্ত একটা হাতি হেলেদুলে চলেছে। তবে কি সবটাই স্বপ্ন? আরো পরে বনের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় জোরাকে নরম ঘাসের ওপর শুইয়ে রেখে, বড় একটা পাতা দিয়ে ঠোঙা বানিয়ে, সেটাকে জলে ভরে টারজান ওর কাছে নিয়ে এল। হাতিটা চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

জোরাকে তুলে ধরে জল খেতে দিল টারজান। গায়ে এতটুকু জোর পাচ্ছিল না জোরা। টারজানকে সে বুঝে উঠতে পারছিল না। এ তো বুনো অসভ্যও নয়, আধা-খ্যাপা শ্বেতাঙ্গও নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ব্যবহার, পরনে যদিও সিংহের ছাল কি সুন্দর চেহারা এর। বনমানুষ কি এর চাকর? তাও মনে হল না। এ তো ভদ্র, সদাশয়।

দেখতে দেখতে নদীর ধারে গাছের ডাল দিয়ে টারজান একটা ছাউনি তৈরি করে ফেলল। মেঝেতে ছোট ছোট ডাল, পাতা, শুকনো ঘাস পেতে, বিছানা তৈরি করে, জোরাকে তাতে শোয়াল। একটি কথাও সে বলেনি। একবার গিয়ে কিছু ফল এনে, অল্প অল্প খাওয়াল ওকে। বেশি দিন উপোস করলে তাই করতে হয়। এর পর অনেকক্ষণের মতো সে কোথায় চলে গেল। হাতিটা সমানে পাহারায় রইল।

একটা হরিণ মেরে আনল টারজান। আগুন জ্বেলে খানিকটা মাংস রোস্ট করল। রোস্ট হলে, নিজের ছোরা দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে খানিকটা খাওয়াল ওকে। তারপর আবার জল এনে দিল। এবার হাতিটাকে কি যেন বলতেই, সে চলে গেল। ঘরের বাইরে কাঠকুটোর আগুন জ্বলছিল। তার পাশে বসে টারজান নিজে কাঁচা মাংস খেল। তাই দেখে জোরার একটু ভয় ভয় করতে লাগল।

অন্ধকারে কি একটা জন্তু কাছে এসে চাপা গর্জন করল। জোরার রক্ষাকর্তাও সেই রকম শব্দ করতেই, জানোয়ারটা সরে গেল। এ কি রহস্য জোরা কিছুতেই বুঝতে পারল না। ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙলে দেখল রোদ উঠে গেছে। লোকটি আগুনের ধারে আবার মাংস রোস্ট করছে। কিছু ফলও এনে রেখেছে। জোরা ভাবছিল কি চমৎকার চেহারা মানুষটার, তবু কাঁচা মাংস ছিঁড়ে খায় কেন? আবার সে নিজের হাতে ওকে খাওয়াল, জল দিল। তারপর চাপা গলায় একটা ডাক দিয়ে, সরে বসে নিজে কাঁচা মাংস খেল। জোরা নানা ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করল, কোনো সাড়াই পেল না যদি সে জানত লোকটা একজন ইংরেজ লর্ড এবং ওর সব কথাই বুঝতে পারছে, জোরা নিশ্চয়ই রেগে যেত।

একটু পরেই হাতিটা এসে হাজির হলো। এইভাবে দিন কাটতে লাগল। দিনে হাতি ওকে পাহারা দেয়, রাতে

মানুষটা। কেউ কথা বলে না। কিন্তু ক্রমে জোরার গায়ে শক্তি ফিরে আসছিল।

ওয়েন কোল্টের জন্য ভাবনা হত। বাস্তবিকই কোল্টের বড়ই দুঃসময় যাচ্ছিল। শরীরের শক্তি ক্রমে শেষ হয়ে আসছিল। একটু হাঁটে, তারপর পড়ে যায়। কিছু পরে আবার উঠে হাঁটে। মনের জোরে হাঁটছিল, কারণ জোরাকে বাঁচাতে হবে। একটা জানোয়ার-হাঁটা ভালো পথ পেয়ে একটু সুবিধা হল। আর হাঁটতে পারছিল না সে। এখন হামা দিয়ে একটু এগোয়, আবার শুয়ে পড়ে। কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ মনে হল কেউ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেক কষ্টে মাথা তুলে, চোখ খুলে দেখল, মস্ত একটা সিংহ।

●

টারজান রোজ একবার করে জাবেরিদের ক্যাম্পে দেখে আসত। অভিযানের জন্য সব তৈরি। ইউনিফর্ম বিলি করা হয়ে গেছিল—ফ্রেঞ্চ কলোনিয়েল বাহিনীর পোষাক। নিকিমা যদি তার কাজ করে থাকে, এবার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নইলে অন্য উপায় ভাবতে হবে। বেশি দেরি করে ফেললে ঠেকানো মুশকিল হবে।

জোরার দেহে ক্রমে শক্তি ফিরে আসছিল। হাতির ভয় তার অনেকটা কেটে গেছিল। সেদিন মনে হল, ওর সঙ্গে ভাব করলে বেশ হয়। কিন্তু কাছে গিয়ে ওর চোখের স্থির দৃষ্টি দেখে, সাহস পেল না। হাতিটা শুঁড় দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ওকে আবার ছাউনির তলায় নামিয়ে দিয়ে, পিছু হটে, নিজের জায়গায় ফিরে গেল। একটুও ব্যথা দেয়নি, রাগ দেখায়নি। কিন্তু ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল জোরা ঐ হাতির বন্দী। এ ছিল টারজানের আদেশ। যাতে একা একা ঘুরতে গিয়ে বিপদে না পড়ে। বন্দী করবার জন্য নয়। এর পর জোরা ঠিক করেছিল এখন আর কিছু করবে না, আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুক।

এর পর একদিন টারজান একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এসে টানটরকে কি যেন বলল আর টানটর টারজানের গায়ে শুঁড় বুলিয়ে বনের মধ্যে চলে গেল। টারজান তখন টপ করে জোরাকে কাঁধে তুলে একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর গাছ থেকে গাছে ঝুলে একেবারে নদীর তীরে পৌঁছাল। টানটর সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তার পিঠে চড়ে ওরা নদী পার হয়ে গেল।

রোজই টারজান এ নদী পারাপার করে ক্যাম্প দেখতে যেত, হাতে ছোরা থাকত, পাছে গিমলা কুমির তেড়ে আসে। ওপারে পৌঁছে টানটরকে বিদায় দিয়ে, আবার জোরাকে কোলে তুলে, এক লাফে গাছে উঠে পড়ল টারজান।

কিছুক্ষণ পরে ওকে কোল থেকে ডালে নামিয়ে আঙুল দিয়ে কি দেখিয়ে দিল। জোরা অবাক হয়ে দেখল ওদের ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে। সেই দিকে ইশারা করে টারজান ওকে বিদায় দিল। জোরা ধন্যবাদ দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু টারজান সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডালে মিলিয়ে গেছিল। মনে একটু জোর নিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেল জোরা। টারজান অদৃশ্যভাবে গাছ থেকে গাছে গিয়ে ওর নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে, তবে ফিরল।

পল আইভিচ্ শিকার করে ফিরছিল। হঠাৎ গাছের ওপর চিতাবাঘের গায়ের চাকা চাকা দাগ দেখে, লোভ সামলাতে না পেরে, সেদিকে গুলি করল। জোরা ক্যাম্পে ঢুকছিল, ওর পায়ের কাছে ঝুপ করে টারজানের অচেতন দেহ গাছ থেকে পড়ল। গুলিটা মাথায় লেগেছিল, সেখান থেকে রক্ত পড়ছিল।

অনেক দূরে প্রায়-অচেতন ওয়েন কোল্ট মাথার ওপর সিংহের গর্জানি শুনে জ্ঞান না হারালেও, পায়ের কাছে দাঁড়ানো অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটিকে দেখেই অভিভূত হয়ে গেল। এই বোধ হয় মৃত্যু? নাকি উন্মাদের স্বপ্ন? কি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওদের! মেয়েটি সিংহটাকে কি যেন বলল, তারপর ওর কাছে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বলল 'তুমি কে? কি হয়েছে তোমার?'

কোল্ট বলল, 'পথ হারিয়েছি। অনেকদিন কিছু খাইনি।' এই বলে অজ্ঞান হলো।

জাদবাল্জা লা-কে ভালোবেসে ফেলেছিল। পোষা কুকুরের মতো কাছে কাছে থাকত। তবু সিংহ তো বটে। জানোয়ার মেরে খাবার সময়, গর্জায়! লোকটিকে দেখে খাওয়া ফেলে সে উঠে এসেছিল। এ লোকটির সঙ্গে টারজানের সাদৃশ্য আছে। হয়তো তারি বন্ধু হতে পারে! তাহলে একে বাঁচানো হলো লা-র কর্তব্য। কোল্টের জ্ঞান ফিরলে, লা ওকে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

একটু দূরেই জাদবালজার শিকারটা পড়েছিল। তারি কাছে লা একটু আগুন জ্বেলেছিল। কোল্টকে ধরে ধরে সেই অবধি এনে, ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল। একটু পরে খাওয়া সেরে

জাদবালজাও এল। তার কাছে কোল্টকে রেখে, একটা ফলের শক্ত খোলায় করে, লা নদী থেকে মিষ্টি জল নিয়ে এল।

মুখে একটু জল, একটু খাবার পড়তেই যেন অনেকটা আরাম হল। লা জিজ্ঞাসা করল, 'এই কি তোমার দেশ? তুমি কে?'

—'আমার নাম ওয়েন কোল্ট। আমার বাড়ি আমেরিকায়।'

—'টারজানের বন্ধু তুমি?'

—'না। ওর নাম শুনেছি, কিন্তু আলাপ হয়নি।'

—'তবে কি শত্রু?'

—'না, না। ওকে চিনিই না।'

—'জোরাকে চেন?'

—'জোরা ড্রিনভ? তার বিষয় তুমি কি জান?'

—'সে যে আমার বন্ধু।'

—'আমারো।'

লা তখন বলল, 'তাকে আরবরা ধরে নিয়ে গেছে।'

কোল্ট বলল, 'কবে?'

—'অনেক দিন আগে।'

কোল্ট বলল, 'তারপর আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

—'এখন সে কোথায়?'

—'তা জানি না। আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম। সেই সময় হয় মানুষ নয় গোরিলা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। তাকে খুঁজছিলাম। না খেয়ে, বিশ্রাম না পেয়ে শরীর ভেঙে পড়েছে।'

লা বলল, 'এখন থেকে খাবার অভাব হবে না। ঐ সিংহ শিকার করে মাংস এনে দেয়। জোরার সঙ্গীদের ক্যাম্পটা পেলেই, তারা ওকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা করবে।

—'কিন্তু তুমি কে?'

—'আমি লা, ওপারের আগুন-দেবতার প্রধান পূজারিণী।'

ওপারের পূজারিণী! তার মানে এ জগতের মেয়ে নয়!

সারারাত জাদবালজা, লা আর কোল্ট সিংহের শিকারের পাশে শুয়ে রইল। রাতে জাদবালজা বাকি মাংসটা খেয়ে ফেলল। পরদিন সে শিকার করবে না। কিন্তু তার পর দিন করবে। কোল্ট বলল, 'আমরা ফলমূল খাব আর ক্যাম্পটা খুঁজব।'

লা মাথা নাড়ল, 'না। তোমার বিশ্রাম দরকার। নুমা সারা দিন ঘুমোবে। আমরা না হয় লাঠি বানিয়ে ছোট-খাটো জন্তু শিকারের চেষ্টা করতে পারি। কাল নুমার শিকারের একটা গোটা রাং নিয়ে নেব।'

কোল্ট বলল, 'ও দিলে তো?'

—'আমি টারজানের বন্ধু বলে ও আমাকে কিছু বলে না।'

টারজানকে গুলি খেয়ে পড়তে দেখে জোরা রাগে দুঃখে ফেটে পড়ল। আইভিচ্ ছুটে আসতেই সে বলল, 'মেরে ফেললে এমন মানুষকে!'

আইভিচের তো বাক্যরোধ হবার জোগাড়! সাদা দৈত্যকে মেরে ফেলল!! জোরার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল, সে-ই বা কোথা থেকে এল!! ততক্ষণে জাবেরি দৌড়ে এসে জোরাকে দেখে অবাক! জোরা বলল, 'দেখেছ, যে আমার প্রাণ বাঁচাল, তাকে আইভিচ্ মেরে ফেলেছে!'

এই সময় টারজানকে নড়তে চড়তে দেখে বোঝা গেল সে মরেনি, গুলিটা মাথা ঘেঁষে বেরিয়ে গেছিল, বিশেষ জখম হয়নি। জাবেরি বলল, 'ও কে?'

—'তা জানি না। কথা-টথা বলেনি একবারও। কিন্তু অমন মানুষ আর হয় না।'

একজন নিগ্রো বলে উঠল, 'আমি ওকে চিনি। ও হল টারজান। যদি মরে না গিয়ে থাকে, এইবেলা মেরে ফেল। নইলে ওর হাত থেকে রেহাই পাবে না।'

জাবেরি বলল, 'ঠিক জান ও টারজান?'

লোকটা বলল, 'তাকে একবার দেখলে আর ভোলা যায় না।'

জাবেরি আইভিচ্‌কে বলল, 'তাহলে কাজটা সেরেই ফেল।'

—'কি বলছ! মেরে ফেলব? সে আমি পারব না।'

জাবেরি বলল, 'ও বেঁচে থাকলে, আমাদের কাজ আর প্রাণ দুই নস্যাৎ হবে। ভেবেছিলাম মরে গেছে। বেঁচে

আছে জানলে এ তল্লাটে আসতাম না। ওর চেয়ে বড় শত্রু আমাদের নেই। তুমি একটা কাপুরুষ, আইভিচ্। সর জোরা, আমি মারছি।'

জোরা টারজানের গায়ের ওপর আছড়ে পড়ে বলল, 'না! আমি মারতে দেব না! ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমি ওকে খুন করতে দেব না! তুমি যদি ওকে মারো, এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমিও তোমাকে মেরে ফেলব।'

জাবেরি বলল, 'এ কি বিশ্বাসঘাতকের মতো কথা, জোরা।'

জোরা তখন বলল, 'সবাইকে যেতে বল। তোমাকে একটা কথা বলব।'

সবাই সরে গেলে জোরা বলল, 'ওর গায়ে হাত দিয়েছ কি আমি সবাইকে বলে দেব তুমি আফ্রিকার সম্রাট হবার চেষ্টা করছ!'

জাবেরি চটে গেল, 'তা বলতে পারবে না তুমি। তোমাকে আমি ভালোবাসি, তবু তার আগেই তোমাকে মেরে ফেলব।'

—'নিজেও বাঁচবে না। জান না এই ক্যাম্পে কি সাদা, কি কালো, কেউ তোমাকে দেখতে পারে না। কিছু একটা করেছ কি, অমনি সবাই বেঁকে দাঁড়াবে। ওকে বন্দী করতে পার, মেরো না।'

জাবেরি বলল, 'বেশ, তাই হবে, তুমি যখন বলছ। কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না, জোরা। হরকরা দিয়ে গোপন কোডে চিঠি পাঠালাম, তা সেটা ভুল জায়গায় পড়ে, ফিরে এসেছে। দেখছি গোপন কোডের তলায় রুশ ভাষায় মানে লেখা রয়েছে! আমি রোমেরোকে সন্দেহ করি।'

জোরা বলল, 'যাই হক, কিছু করে উঠতে পারেনি তো, সে-ই যথেষ্ট। তোমার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে?'

—'সব। কাল সকালে রওনা হব। এবার বল আরবরা কেন চলে গেল আর তুমিই বা কেন সঙ্গে গেলে?'

—'আবু বাটুন আর তার আরবরা ভারি অপমান বোধ করেছিল যে তুমি ওদের তাঁবু আগলাবার জন্য রেখে গেলে, পুরুষের কাজের ভাগ দিলে না। তারপর ওপার থেকে এক রূপসী মেয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিল। তাকে দেখেই বাটুন ঠিক করল আমাদের দুজনকে অনেক দামে কোথায় যেন বিক্রি করে, মোটা টাকা নিয়ে দেশে চলে যাবে।'

জাবেরি তো অবাক! 'একজনও সৎ নেই কি এ জগতে?'

—'থাকলেও, খুব কম আছে।' তারপর জোরা লা-র শোচনীয় ব্যাপারটা আর ওর নানা অভিজ্ঞতা বিস্তারিত বলল। কিন্তু আগাগোড়া ওয়েন কোল্টের কথা চেপে গেল।

জাবেরি বলল, 'যেন রূপকথার গল্প। টারজানের বিষয় কিছুই অবিশ্বাস করবার মতো নেই। সেই জন্যেই ও বেঁচে থাকলে আমাদের বিপদ। তবে তোমাকে তো কথা দিয়েছি আমি ওকে মারব না।' মনে মনে বলল, অন্য উপায়েও তো টারজানকে সরানো যায়।

★

পরদিন ভোরে ফরাসী সামরিক সজ্জায় সেজে জাবেরির দলবল বেরিয়ে পড়ল। তাদের সঙ্গে জোরাও ছিল। সে যেতে চায়নি, কিন্তু জাবেরি অটল, 'আর তোমাকে চোখের আড়াল করছি না। টারজানকে ডর্সকি দেখবে।'

যাবার আগে ডর্সকির সঙ্গে জাবেরি কিছু গোপন পরামর্শ করেছিল। ডর্সকি আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, 'তুমি কিছু ভেবো না। তোমরা ফিরবার অনেক আগেই আগন্তুক নিশ্চিহ্ন হবে।'

জাবেরিদের সামনে লম্বা পদযাত্রা। পুব-দক্ষিণ অ্যাবিসিনিয়ার ওপর দিয়ে ইটালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড যেতে হবে। ছোঁ মেরে যাওয়া আসা, তাতেই ইটালি ফ্রান্সের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠবে। শেষ পর্যন্ত জাবেরি হবে আফ্রিকার সম্রাট আর জোরা হবে সম্রাজ্ঞী!

পরদিন সকালে টারজানের জ্ঞান ফিরল। মাথায় ব্যথা, দুর্বল শরীর, খুব খারাপ লাগছিল। তার ওপর হাত পা বাঁধা। এর মধ্যে কি ঘটে গেছে কিছুই সে বুঝতে পারছিল না। ক্যাম্পে কারো সাড়া শব্দ নেই। অন্ততঃ একটা রাত যে কেটে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। গলার আওয়াজ শুনে সে বুঝল অন্ততঃ কিছু লোক কাছাকাছি আছে। দূরে একটা হাতি ডাকল, একটা সিংহ গর্জন করল। তাঁবুর দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে টারজান নিচু গলায় টানা একটা ডাক দিল। বিপদে পড়লে জানোয়াররা এ ভাবে ডাকে। তাই শুনে ডর্সকি লাফিয়ে উঠল। নিগ্রোরা অমনি কথা বন্ধ করে যে যার অস্ত্র তুলে নিল।

নিগ্রো ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ও কিসের ডাক?'

সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'বোধ হয় সাদা লোকটা মরে গেছে। ও তো আর মানুষের ডাক নয়।'

ডর্সকি বলল, 'চল, দেখে আসি।'

ছোকরা কিছুতেই গেল না। ডর্সকি একলাই গেল।

দেখে লোকটা ওর দিকে চেয়ে আছে। ডর্সকি বলল, 'কি হে, এতক্ষণে চৈতন্য হল? কি চাও?'

সে কোনো উত্তর দিল না। ভারি অস্বস্তি লাগল। নিগ্রোদের ডেকে বলল, 'তোমরা দু-চারজন এদিকে এসো। যদি তোমাদের কথা বোঝে। ওকে বল ওর কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

একজন নিগ্রো নিজের ভাষায় সে কথা বলেও কোনো উত্তর পেল না!

ডর্সকি চটে গেল। 'পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। তার পরেও যদি জবাব না দাও তো ভালো হবে না। তুমি নিগ্রোটার ভাষাও বোঝ, ইংরিজিও বোঝ।' এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

নিকিমা অনেক দূর থেকে ঘুরে এসেছিল। ওর গলায় খুদে থলিতে চিঠি ছিল। তার ফলে মুবিরো তার যোদ্ধাদের নিয়ে অত দূর থেকে রওনা হয়ে গেছিল। কিছুদিন ওর কাঁধে চেপে এসে, নিকিমা গাছ নিয়েছিল। নানা বিপদের ভিতর দিয়ে অক্ষত দেহে, অধিকাংশ সময়ে কাউকে না কাউকে চটিয়ে, চ্যাচাতে চ্যাচাতে তার কাছ থেকে পালিয়ে, এদিকেই আসছিল।

বন্দীর মুখের ভাবটা একটু অন্য রকম মনে হল। সে যেন কান পেতে কিছু শুনছে। ডর্সকিও শুনবার চেষ্টা করল, কিন্তু তেমন কান না থাকাতে, কিছুই শুনতে পেল না। ডর্সকি বলল, 'এই তোমার শেষ সুযোগ। ওপারের রত্নগুহার পথ আমাদের বলে দেবে এইরকম কথা দিলেই, কম্রেড জাবেরি এলেই তুমি মুক্তি পাবে। সে কথা না দিলে এখনি তুমি মরবে।' এই বলে লিকলিকে এক ছোরা বের করল ডর্সকি। 'সোজা তোমার হৃৎপিণ্ডে ফুটিয়ে রেখে দেব। এক ফোঁটা রক্ত পড়বে না। পরে বের করে নেব, দাগটাও দেখা যাবে না। সবাইকে বলব বন্দুকের গুলিতেই তোমার মৃত্যু হয়েছে। তোমার বন্ধুরাও আসল কথা জানতে পারবে না। চুপ করে থেকে পার পাবে না।'

ছোরাটা টারজানের মুখের কাছে নামিয়েছিল ডর্সকি। হঠাৎ মাথা তুলে টারজান ডর্সকির হাতের কব্জি কামড়ে ধরল। চিৎকার করে উঠল সে। হাত থেকে ছোরাটা পড়ে গেল। কট্ করে কব্জির হাড় ভেঙে গেল। হাত ছেড়ে দিল টারজান। ল্যাং মেরে ডর্সকিকে মাটিতে ফেলে দিল সে। চেঁচিয়ে লোকজন ডাকতে লাগল ডর্সকি। বাঁ হাতে রিভলবার বের করবার চেষ্টা করতে লাগল।

বাইরে চ্যাচামেচি, পায়ের শব্দ, কাতরানি। ওদের মাথার ওপর থেকে তাঁবু উড়ে গেল। ডর্সকি একটা বিশাল হাতির মাথা দেখতে পেল। টারজান তাকে ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে সরে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'মারো. টানটর, মারো!'

হাতিটা ডর্সকিকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে তুলে ধরে, দূরে ছুঁড়ে ফেলল। ততক্ষণে নিগ্রোরা ভয়ের চোটে বনে পালিয়েছিল!

এদিকে টানটর ডর্সকিকে দাঁত দিয়ে ফুঁড়ে, পা দিয়ে মাড়িয়ে, তার আর কিছু রাখল না। অমনি তার রাগও পড়ে গেল। শুঁড় দিয়ে টারজানকে তুলে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে, নরম ঘাসের ওপর নামিয়ে দিল।

মাথার ক্ষতটাতে বেদনা হচ্ছিল, তেষ্টায় ছাতি ফাটছিল। কয়েকটা বাঁদর গাছে কিচিরমিচির করছিল। তাদের ডেকে টারজান বলল, 'মানু, আমার বাঁধন খুলে দাও।'

তারা বলল, 'ভয় পাই! ভয় পাই!'

—'টারজান তোমাদের কোনো ক্ষতি করে না।'

—'অন্যরা মানু মারে। টারজান কেন ওদের তাড়ায় না?'

—'টারজান ছিল না এখানে। হাত খুলে না দিলে, টারজান ওদের তাড়াতে পারবে না।'

—'কে হাত বেঁধেছে?'

—'ঐ লোকগুলো!'

ওদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা কম দেখে, টারজান বনমানুষদের ডাক দিল। এদিকে বড় শেয়ালরা আর হায়নারা সে ডাক শুনে বুঝল একটা বনমানুষ বিপদে পড়েছে, হয়তো তার মাংস পাওয়া যেতে পারে। অমনি তারা ছুটে এল।

টানটর নদী থেকে শুঁড় ভরে জল আনতে গেছিল, থাকলে এরা সাহস পেত না। সুযোগ বুঝে একটা হায়না ক্রমে কাছে এগোতে লাগল।

টারজানের ডাক দূর থেকে শুনে, নিকিমাও যত তাড়াতাড়ি পারে কাছে এসে ওর কাঁধে নামল।

—'নিকিমা, বাঁধন খুলে দাও। দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে দাও।'

হায়নাগুলো দাঁত খিঁচোচ্ছিল। তাই দেখে নিকিমা ভয় পাচ্ছিল, তবু দাঁত দিয়ে বাঁধনের দড়ি কাটার চেষ্টা করতে লাগল। হায়নাটার আর তর সইছিল না, হঠাৎ সে

তেড়ে এল। নিকিমাকে ঝেড়ে ফেলে জোরে চাড় দিয়ে দাঁতে-কাটা দড়ি ছিঁড়ে ফেলে, হায়নাটার গলা টিপে ধরল টারজান। সেটা মলে, তবে ছাড়ল।

নিকিমা গাছে পালিয়েছিল। এবার নেমে এসে, মরা হায়নাটাকে খানিকটা পিটিয়ে মন ভালো করল।

টানটরও সেই ডাক শুনে মাঝপথ থেকে ঝোপঝাড় ভেঙে পাগলের মতো দৌড়ে এল। টারজান শান্ত গলায় বলল, 'ঠিক আছে, টানটর। ডাঙো এসেছিল। সে মরে গেছে।'

তখনো টানটরের রাগ যায়নি। সে ডাঙোর শরীরটাকে পা দিয়ে থেঁৎলে ফেলল। নিকিমাও নেমে এসে, আবার টারজানের কাঁধে বসে, দু হাতে ওর গলা জড়িয়ে, গালে গাল ঠেকিয়ে আদর করল।

সূর্য ডুবল, সন্ধ্যা নামল। পরম সখ্যে তিনজনে নিঃশব্দে পরস্পরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইল। সে সখ্য মানুষ জানে না!

★

ওয়েন কোল্টের শরীরের ওপর দিয়ে বড় বেশি ধকল গেছিল। ক্লান্তিটা দূর হতে না হতে, জ্বরে ধরল। লা-র অনেক পুরনো ওষুধ জানা ছিল, নানা শিকড়ের, ফুল-পাতার গুণ তার নখাগ্রে; কবচ মাদুলী আর দৈব মন্ত্রও জানত। সে সব প্রয়োগ করেছিল, আর অহরহ কত যে যত্ন। লা-র হিংস্রতার পিছনে এত স্নেহ ছিল কে জানত। সব টারজানের জন্য। তার বন্ধুদের জন্য লা সব করতে প্রস্তুত।

জাদবালজা বরাবর সঙ্গে ছিল। নিয়মিত শিকার করে আনত। যে নিভৃত জায়গায় কোল্টকে রাখা হয়েছিল, সে জায়গা পাহারা দিত। মাঝে মাঝে ভুল বকত কোল্ট। এই ভাবে দিন কাটতে লাগল। কোল্ট অসহায়ভাবে শুয়ে রইল, জাবেরি দলবল নিয়ে ইটালিয়ান সোমালিল্যাণ্ডের দিকে চলল।

টারজানও সেরে উঠে জাবেরির অভিযানের পদচিহ্ন দেখে তাদের পিছু নিয়েছিল। তার আগে জাবেরির নিগ্রোরা তাদের ক্যাম্পে অলস দিন কাটাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন সকালে, হাতির মাথায় বসে, কাঁধে বাঁদর নিয়ে, ওদের পলাতক বন্দীকে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে যে যার বনে পালাল। টারজান ডর্সকির তাঁবুতে ঢুকে ওর দড়ি আর ছোরা উদ্ধার করল। নিগ্রোদের তাঁবু থেকে ওর তীরধনুক আর বর্শা নিল! তারপর নিঃশব্দে, দ্রুতপদে

জাবেরির দলের কিছু নিল। খানিক দূর এগিয়ে টানটরকে ছেড়ে দিল, 'আমি চললাম রে টানটর। তুইও যা। বনের সবচেয়ে কচি মিষ্টি ডালপালা, গাছের ছাল বেছে খা। আর মানুষ সম্বন্ধে সাবধান! সবচেয়ে বদ জানোয়ার মানুষ!'

এই বলে টারজান বনপথ ধরল। নিকিমা ওর গলা ধরে ঝুলেই রইল।

কোন পথে জাবেরি যাবে, সব মুখস্থ ছিল টারজানের। আড়ি পেতে শুনে কিছু জানতে বাকি ছিল না। খালি হাতে, বাঁদর-গলায়, জাবেরির তিন গুণ বেগে টারজান এগোতে লাগল। একদিন অন্ধকারের পর তাদের ধরেও ফেলল।

ক্লান্ত দলবল ক্যাম্পে বিশ্রাম নিচ্ছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে, তাদের মনে ভারি ফুর্তি। কেউ কেউ গান ধরেছিল। চমৎকার ব্যবস্থা। হঠাৎ দেখলে বাস্তবিকই ফরাসী বাহিনী বলে ভুল হয়।

সমস্তই রোমেরোর ব্যবস্থাপনা। তার সামরিক বুদ্ধি জাবেরিও মেনে নিয়েছিল। যদিও সে তার দু'চক্ষের বিষ! বেশ বড় আর প্রশিক্ষিত বাহিনী। আফ্রিকার শান্তি নষ্ট করতে এরা খুবই পারে। অনেক স্থানীয় যোদ্ধার গোষ্ঠী ছিল ওদের দলে। জাবেরির স্বপ্ন কার্যে পরিণত হবার আগেই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে হবে।

একজন টহলদারের পায়ে হঠাৎ অদৃশ্য হাত থেকে তীর এসে বিঁধল। ভয়ে, ব্যথায় সে চেঁচিয়ে উঠল। জাবেরি, রোমেরো আর অন্য নেতারা দৌড়ে এল। 'এদিকে তোমার কোনো শত্রু থাকে? ক্যাম্পে শত্রু আছে?'

লোকটা কিছুই জানে না।

রোমেরো বলল, 'ক্যাম্পের কারো কাছে তীরধনুক থাকলে তো মারবে। বাইরের কেউ মেরেছে।'

জাবেরি বলল, 'তবে কি শত্রু-এলাকায় এসে পড়েছি?'

কিটেম্বো কিন্তু বলল, 'এ তীর হল সেই যোদ্ধার, যাকে ক্যাম্পে রেখে এসেছিলে।'

জাবেরি বলল, 'সে তো অসম্ভব কথা।'

—'তা জানি। তবু তা-ও সত্যি।'

আরেকজন বলল, 'এই ভাবেই সেই হিন্দুটাও মরেছিল।'

জাবেরি চটে গেল, 'তুমি চুপ কর তো, কিটেম্বো, সবাইকে ভয় দেখিও না।'

অবিশ্যি ভয়ের আসল কারণটা তখন অনেক দূরে! তবে তার চেয়েও ঢের বেশি ভয়ের অন্য একটা কারণও ছিল।

তারা ভয় ডর জানত না। না মানুষকে, না ভূতপ্রেতকে। সকলের সঙ্গে রক্ষাকবচ ছিল। তাদের দেবতা তাদের রক্ষা করবেন। তবে তারা এ-ও জানত যে যুদ্ধের সময়ে একজন দক্ষ দলপতির নেতৃত্ব ও-সবের চেয়েও অনেক বেশি কাজে দেয়। ভারি হাসিখুশি, পরস্পরে আস্থাশীল, দক্ষ, অভিজ্ঞ ওয়াজিরি যোদ্ধা সব।

সেই রাতে টারজান একটা গাছ থেকে তাদের মাঝখানে নেমে পড়ল। ভক্তিতে আনন্দে তাদের মন ভরে গেল। মিকিমারো ফুর্তি দেখে কে! টারজান বলল, 'তাহলে মিকিমা তোমাদের সময়মতোই খবর দিয়েছিল?'

মুবিরো বলল, 'ঐ অচেনা যোদ্ধাদের এক দিনের পথ আগে আগে এসেছি আমরা। আড়ালে তাঁবু গেড়েছি। যাতে কিছু সন্দেহ না করে।'

টারজান বলল, 'কিছুই সন্দেহ করে না ওরা।'

মুবিরো বলল, 'পাছে নরম মাটিতে পায়ের ছাপ পড়ে, তাই সবার শেষে আমাদের একজন গাছের ডাল দিয়ে পথ ঝেঁটোতে ঝেঁটোতে এসেছে।'

টারজান বলল, 'কাল এইখানে ওদের সঙ্গে দেখা হবে। আজ আমার পরামর্শ শোন।'

ওদিকে জাবেরির দলের খানিকটা উৎসাহ ফিরে এসেছিল। যাক, যাত্রাপথের এক ভাগ হল, আরো দুই ভাগ মাত্র বাকি। জাবেরির বিশ্বাস কাজটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, সাফল্যের আশা তত বেশি।

আইভিচ্ অন্য লোকের কষ্ট দেখে আনন্দ পেত। সে ভাবছিল বেশ হবে, অনেকগুলো লোক কষ্ট পাবে আর সে নিজে পরম বাহাদুরের খ্যাতি আর হয়তো অজস্র টাকাকড়ি নিয়ে দেশে ফিরবে!

রোমেরো আর টোনির অন্য রকম মনোভাব। সমস্ত ব্যাপারটাতেই তারা বিশ্বাস হারিয়েছিল। জাবেরির লম্বা-চওড়া কথা শুনে তারা আঁচ করেছিল ওর আদর্শ-টাদর্শর কথা ভাঁওতা। ওর একমাত্র ইচ্ছা নিজের স্বার্থ। তাই এতগুলো লোককে বোকা বানাচ্ছে। দল ছেড়ে যে ওরা চলে যায়নি তার একমাত্র কারণ, মাঝপথে সরে পড়া ওদের স্বভাব ছিল না। বেসক্যাম্পে পৌঁছে, দুজনেই জবাব দেবে।

চলতে চলতে একজন নিগ্রো দেখে পথের মাঝখানে একটা তীর পোঁতা রয়েছে। লোকরা ঘাবড়াচ্ছে দেখে, কিটেম্বো তীরটা জাবেরিকে দেখিয়ে বলল, 'এ-ও সেই তীর।'

জাবেরি রেগে বলল, 'তুমিও বড় কাপুরুষ, কিটেম্বো।'

কিটেম্বো বলল, 'আমাকে কাপুরুষ বলে কেউ পার পায় না। আমি বোকাও নই। বনের বিপদ-সঙ্কেত আমিও চিনি। আমরা সাহসী বলেই এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু অনেকে ফিরব না, আর এ অভিযান বিফল হবে।'

জাবেরি রেগে যা-তা বলতে লাগল। অসন্তুষ্ট মনে নিগ্রোরা মার্চ করতে লাগল।

হঠাৎ একটা অশরীরী কণ্ঠ শোনা গেল, 'ফিরে যাও, মুলুঙ্গুর সন্তানরা। মারা পড়বার আগে চলে যাও।'

নিগ্রোরা বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কিটেম্বোর মনেও অশান্তি দেখা দিল। জাবেরি তাকে লোভ দেখাতে লাগল, 'তুমি না কিনিয়ার রাজা হতে চাও? তার জন্য অনেক কষ্ট করা দরকার।'

লোভে পড়ে কিটেম্বো রাজি হল।

জাবেরি বলল, 'লোকরা যেন না পালায়। দরকার হলে গুলি চালিও।'

এখনো তারা যাত্রা বন্ধ করার কথা বলেনি। তারপর আবার দূর থেকে সেই গলা—'সাদা মানুষদের ছেড়ে দাও!'

অনেক কষ্টে কিটেম্বো তার দলবল সামলাচ্ছিল।

জাবেরি জোরাকে বলল, 'কে যে এই নষ্টের গোড়া, তাকে একবার দেখতে পেলে, গুলি করব।'

জোরা বলল, 'এমন কেউ নেই, যে নিগ্রোদের মন বোঝে।'

জাবেরি বলল, 'নিগ্রো যে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে ইংরেজদের, কিম্বা ইটালীয়ানদের চর। এভাবে আমাদের ঘাবড়ে দিয়ে, হয়তো আক্রমণ করবে।'

জোরা বলল, 'নিগ্রোরা যে ঘাবড়েছে সে তো দেখাই যাচ্ছে।'

—'আমিও দেখিয়ে দেব আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না

আরেকবার সেই ডাক শোনা গেল। তারপর ওরা বনের কিনারায় পৌঁছল।

মাথার চেয়ে লম্বা ঘাসে ঢাকা প্রান্তর। ঘাসের মধ্যে থেকে এক সারি রাইফ্‌ল গর্জে উঠল। জাবেরি একজন নিগ্রোকে বলল জোরাকে পিছন দিকে নিয়ে যেতে। সব গুলি মাথার ওপর দিয়ে ছোঁড়া হয়েছিল, কারো লাগেনি। কিন্তু মিছিলটা থমকে থেমে গেছিল, ছত্রভঙ্গ হবার ভয় ছিল। জাবেরি বলল 'রোমেরো, তুমি সামনে নেতৃত্ব কর। আমি আর টোনি পিছনে যাচ্ছি, যাতে কেউ না পালায়।'

প্রথম গুলির ঝাঁকের পর চুপচাপ। তার পর শোনা গেল, 'ফিরে যাও! এই শেষ সতর্কবাণী! এর পর মৃত্যু।'

দলের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। রোমেরো ফায়ার করার হুকুম দিল। উল্টো দিক থেকে এক ঝাঁক গুলি এসে দশ-বারোটা লোককে পেড়ে ফেলল।

রোমেরো বলল, 'চার্জ!'

নিগ্রোরা দল ভেঙে পিছন দিকের নিরাপত্তায় দৌড়ল। পিছনের লোকরাও ঘুরে পালাল; রিজার্ভরা ভাগল; সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল! যুদ্ধক্ষেত্রে একা রোমেরো। মহা বিরক্ত হয়ে সে বনের পথ ধরল। সামনে দেখল জোরা একা হেঁটে চলেছে।

রোমেরো এগিয়ে গিয়ে বলল, 'জাবেরি কোথায়?'

জোরা বলল, 'জানি না।'

—'হয়তো রিজার্ভদের ডেকে সাজাবার চেষ্টা করছে!'

—'নিঃসন্দেহে।'

—'তাহলে নিশ্চয় কমরেড জাবেরি খুব দৌড়তে পারে?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে।'

—'কিছু মনে কর না, কমরেড জোরা, কিন্তু এ বনটা খুব নিরাপদ নয়। তোমার এখানে একা থাকা ঠিক নয়। জাবেরিও নিশ্চয় যা ভাবছে, আমারো তাই মনে হচ্ছে—আমাদের পিছনে শত্রু লেগেছে।'

—'তুমি ওকে পছন্দ কর না?'

—'তা করি না।'

—'অনেককেই সে চটিয়েছে।'

—'সবাইকে। তোমাকে ছাড়া।'

—'কি করে জানলে আমাকে ছাড়া?'

—'বেশি চটনি। চটলে তাকে বিয়ে করতে রাজি হতে না।'

—'কি করে জানলে যে হয়েছি?'

—'সে নিজেই বলেছে!'

জোরা বলল, 'বলেছে বুঝি!'

●

জাবেরির দল সেই যে দৌড় দিয়েছিল, আগের ক্যাম্পে না পৌঁছে থামেনি। তা-ও দেখা গেল সিকি ভাগ পৌঁছয়নি। তাদের মধ্যে জোরা আর রোমেরো। তবে আরেকটু পরে ওরাও এল। জোরাকে দেখে জাবেরি নিশ্চিন্তও হল, চটেও গেল, 'আমার সঙ্গে রইলে না কেন?'

জোরা বলল, 'তোমার মতো দৌড়তে পারি না বলে।'

আবার সেই চেনা গলা, 'সাদা মানুষদের ছেড়ে যাও! তোমাদের গাঁয়ে ফেরার পথ নিরাপদ। সাদাদের সঙ্গে থাকলেই মরবে। ফরাসী পোষাক খুলে ফেলে দাও। সাদাদের এই বনে আমার কাছে রেখে যাও!'

একজন নিগ্রো ইউনিফর্ম খুলে উনুনে ফেলে দিল। অমনি আরো অনেকেও তাই করল।

জাবেরি বলল, 'থামো!'

কিটেম্বো বলল, 'চোপ!'

একজন নেংটি পরা বাসেম্বো যোদ্ধা বলল, 'সাদাদের মেরে ফেল!'

অমনি এক দল ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল 'সাদাগুলো আমার! আমার হাতে ছেড়ে যাও!'

তবু একজন রাইফ্‌ল তুলে এগিয়ে আসতেই, তার বুকে একটা তীর বিঁধল। সে পড়ে গেল। তারপর সাদা মানুষদের আর কেউ কিছু বলল না। জাবেরি রেগে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল, 'একা কত করা যায়! একটাও যদি সাহায্য করার লোক পেতাম!'

শেষ পর্যন্ত রোমেরো তাকে থামাল। কিন্তু স্পষ্ট করে বলেও দিল যে জোরা তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, শুধু তার খাতিরে জাবেরি বেঁচে গেছে।

জোরা শান্তি স্থাপন করল, 'আমরা পাঁচজন আর নিগ্রোরা অনেকে। যে কোনো সময় ওরা আমাদের মেরে ফেলতে, কিম্বা ত্যাগ করতে পারে। আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা শোভা পায় না।'

সে রাতটা একরকম শান্তিতে কাটল। পরদিন সকালে নিগ্রোরা কাজে এল না; ওরা নিজেরাই ব্রেকফাস্ট তৈরি করে খেল। তারপর কিটেম্বো এসে বলল, 'আমরা চলে যাচ্ছি। তোমরা কাল অবধি এখানে থাকবে। তারপর যেখানে খুশি যেও। দুদিনের মতো খাবারদাবার আছে।'

কিটেম্বো কোনো আপত্তিই শুনল না, কোনো তড়পানিতেই ভয় পেল না। জাবেরি বলল, 'একজন মহিলা রয়েছে, তার জন্য কাউকে রেখে যাওয়া উচিত।'

কিটেম্বো বলল, 'ভয় নেই। তাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

এই বলে জোরার হাত ধরল। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে একটা তীর বিঁধে গেল। সেই অশরীরী কণ্ঠ বলল, 'কালো মানুষরা ওপরে তাকিও না, তাহলেই মরবে। তোমরা চলে

যাও। বলেছি তো সাদা মানুষরা আমার।'

নিঃশব্দে নিগ্রোরা যে যার বোঁচকা তুলে রওনা দিল। ওরা চলে গেলে শ্বেতাঙ্গরা বসে আকাশ-পাতাল ভেবেও ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারল না। নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি পরস্পরকে দোষারোপ শুরু হল। জোরা বলল, 'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা পাগলামি। আপাততঃ একসঙ্গে সভ্য জগতে ফেরা যাক।'

পরদিন সকালে ওরাও ফেরার পথ ধরল।

এদিকে ওয়াজিরিদের নিয়ে শর্টকাট ধরে টারজান ওপার চলল। যেতে যেতে মুবিরোকে বলল, 'লা হয়তো সেখানে নেই। তবু ও-য়া আর ডুথকে মোক্ষম সাজা দিতে হবে। যাতে লা যদি বেঁচে থাকে, সে শান্তিতে রাজত্ব করতে পারে।'

সেই সময়ে ওয়েন কোল্ট আর জাদবালজা লা-কে নিয়ে ওপারের দিকে চলেছিল। কোল্ট এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

জাবেরির পরিত্যক্ত ক্যাম্পে পৌঁছে ওরা দেখল কয়েকজন কালো লোক তখনো একধারে রয়েছে। তারা হল কোল্টের নিজের সাফারির নিগ্রোরা। সেইখানে কোল্টের কাছ থেকে লা বিদায় নিয়ে জাদবালজার সঙ্গে ওপরে চলল। কোল্ট সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। লা বলেছিল, 'বিদেশীর সঙ্গে গেলে আমার লোকেরা আরো বিরূপ হবে।'

টারজান আর মুবিরো ওপারের পাহাড়ে আগেই পৌঁছে জাদবালজার সঙ্গে লা-কে প্রান্তর পার হয়ে আসতে দেখেছিল। তখন ওয়াজিরিদের নিয়ে টারজান তাদের কাছে এগিয়ে গেল। লা প্রথমে ভয় পেয়েছিল, তারপর টারজানকে দেখে তার সব দুঃখ ভাবনা ভুলে গেল। আর জাদবালজা পোষা কুকুরের মতো দু-পায়ে দাঁড়িয়ে টারজানের কাঁধে থাবা রেখে ওর গাল চেটে দিল!

এর পর লা আর টারজান পরস্পরকে সব কথা বলল, সব ভুল বোঝার অবসান হল। লা-র কাছে ওয়েন কোল্টের নিরাপত্তার খবর পেয়ে টারজান-ও খুশি হল।

ওপারে ভাঙা প্রাকার থেকে ওপারবাসীরা ওদের আসতে দেখল। ডুথের আর ও-য়ার মনে সে কি ভয়! তাদের অত্যাচারে জর্জরিত ওপারবাসীরা আবার আশার আলো দেখল। লা আর টারজান যখন ওপারের মন্দির প্রাসাদে পৌঁছল, ভিতর থেকে চিৎকার, হট্টগোল শোনা যাচ্ছিল। তারপর সব চুপ। ওরা সভাঘরে ঢুকে ও-য়ার আর ডুথের আর তাদের সমর্থকদের মৃতদেহ দেখতে পেল। শেষ পর্যন্ত লা-র ভক্ত অনুচররা লা-র শত্রুদের নিধন করে, তাকে আবার নিষ্কণ্টক সিংহাসনে পরম সমাদরে বসিয়েছিল। টারজান সে-রাতে সকলের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করে, পরদিন ফেরার পথ ধরেছিল। সঙ্গে জাদবালজা, নিকিমা আর তার বিশ্বাসী ওয়াজিরিরা।

ক্লান্ত দেহে বিমর্ষ চিত্তে জাবেরিরা পাঁচজন ক্যাম্পে ফিরেই কোল্টকে দেখতে পেল। জাবেরি তাকে দেখেই রেগে আগুন হয়ে বলল, 'বিশ্বাসঘাতক! তোকে শেষ না করে ছাড়ব না!' এই বলে সোজা তার দিকে রিভলবার ছুঁড়ল। সে গুলি তার গায়ে লাগল না।

জাবেরি দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার সময় পায়নি। তার আগে নিজেই গুলি খেয়ে, রিভলবার ফেলে বসে পড়েছিল।

আইভিচ্ ছুটে এসে বলল, 'এ কি করলে, জোরা!'

তখন জোরা ওয়েন কোল্টের দিকে ফিরে বলল, 'তাহলে সব কথাই শোন তোমরা। এর জন্য আমি বারো বছর অপেক্ষা করেছি। আমি কোনো দিনই রেড্ ছিলাম না, এখনো নই। আমার বাবা রাজদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেননি। এই জাবেরি আমার বাবাকে, মা-কে, বড় ভাইকে, বড় বোনকে মেরে ফেলেছিল।'

রোমেরো হঠাৎ তার রিভলবার আইভিচের পাঁজরায় ঠেকিয়ে বলল, 'বন্দুক ফেল! তোমাকে দিয়ে বিশ্বাস নেই।'

এতক্ষণ পর সকলের চোখ পড়ল, খোলা জায়গাটার ওধারে চিতাবাঘের ছাল-পরা বলিষ্ঠ সুন্দর একজন সাদা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সিংহের মতো গর্বে পা ফেলে সে এগিয়ে এল।

কোল্ট বলল, 'ও কে?'

জোরা বলল, 'তা জানি না। কিন্তু ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।'

ওয়েন কোল্ট টারজানকে বলল, 'তুমি কে?'

—'আমি টারজান। এই মেয়েটি তার মনের কথা প্রকাশ করেছে। সে তোমাদের দলের কেউ নয়। তাকে আমার লোকরা নিরাপদে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবে বাকিরা যা খুশি করতে পার!'

জোরা বলল, 'তুমি যা ভাবছ, সবাই কিন্তু তা নয়, বন্ধু।'

—'তার মানে?'

—'রোমেরোর আর টোনির যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে তারা ও-পথ প্রকাশ্য ভাবে ছেড়ে দিয়েছে।'

টারজান বলল, 'আমিও শুনেছি।'

—'তুমি শুনেছ ?'

—'যা শোনা যায় সব বিশ্বাস করা যায় না।'

—'এদের বেলা যায়।'

—'বেশ, ওরাও আমাদের সঙ্গে চলুক। বাকি দুজন নিজেদের ব্যবস্থা করুক।'

জোরা বলল, 'তাই বলে আমেরিকানটি নয়।'

—'কেন নয় ?'

—'ও যে মার্কিনী সরকারের গুপ্তচর !'

কোল্ট তো অবাক ! 'তুমি কি করে জানলে ?'

—'তোমার হরকরার হাতে পাঠানো চিঠি আমরা দেখেছিলাম।'

টারজান আইভিচ্‌কে দেখিয়ে বলল, 'এ-ও নেকড়ের ছাল-পরা ভেড়া নাকি ?'

—'না, ও সত্যিই লাল। তবে একটু হলদে মেশানো।'

তখন নিগ্রোদের কয়েকজনকে ডেকে টারজান বলল, 'তোমাদের বাড়ি তো বন্দরে যাবার রেলস্টেশনের কাছে। তাহলে একে সঙ্গে নিয়ে যাও। দেখো যেন যথেষ্ট খেতে পায় আর কেউ ওর কোনো ক্ষতি না করে।'

এই ভাবে সকলের ব্যবস্থা করে ফেলেছিল টারজান। তারপর ফেরার পালা। কেমন করে জানি এক সময় সবার পিছনে জোরা আর ওয়েন কোল্ট পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল আর দুজনে দুজনের জমানো সুখ দুঃখের কথা বলছিল। কেউ যদি ওদের কথা শুনতে পেত, সে বুঝতে পারত যে অনেক দিন পরে দুটি নিঃসঙ্গ মানুষ মনের মতো জীবন-সঙ্গী পেয়েছে।

বিজয়ী টারজান

টারজান ট্রায়ামফ্যান্ট

দূরান্তের রহস্যময়ী আফ্রিকা। ঘেন্‌জি পর্বতমালার আদিম ছায়ায় আড়াল হয়ে আছে অজানা কত শত প্রান্তর আর উপত্যকা, কেউ জানে না, কেউ চেনে না তাদের। ঘণ্টাখানেক হল সূর্যোদয় হয়েছে, কিন্তু তার আলো এখনো পুরু মেঘের স্তর ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

অসীম নীরবতায় কান পাতলে এই মুহূর্তে শোনা যাবে এক তীব্র গোঙানি, যেন লক্ষকোটি বুনো ভীমরুলের গুঞ্জন পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে ঘেন্‌জির চুড়োগুলোয়। কখনও মৃদু হয়ে আসছে এ আওয়াজ, আবার পর মুহূর্তেই আর্তনাদ করে যেন আছড়ে পড়ছে। খান খান হয়ে যাচ্ছে উপত্যকাপ্রান্তরের দীর্ঘ মৌনতা। কিন্তু মেঘ আর কুয়াশায় কিছুই চোখে পড়ছে না, কোথায় কিসের এই আর্তনাদ।

সেই সুন্দরী মেয়েটির বিব্রত মুখটি কল্পনা কর। সে তার ছোট্ট এরোপ্লেনের স্টিয়ারিং হাতে, মেঘ আর কুয়াশার মধ্যে অন্ধের মত চক্কর খাচ্ছে। তেল ফুরিয়ে এসেছে। কম্পাসের কাঁটায় কোনো পথের হদিস নেই। সে জানে এমনি ভাবে ঘুরপাক খাওয়া ছাড়া গতি নেই, নামতে গেলেই পাহাড়ের চুড়োয় ধাক্কা খেয়ে সব শেষ হয়ে যাবে। কায়রো থেকে কেপ প্রদেশে একটানা উড়ে এসে, তার এরোপ্লেন আর্তনাদ করে মরছে বাঁচার আশায়। এভাবে না এলেই বোধহয় ভাল হত। বড় দুঃসাহসিক হয়েছে এ কাজ।...

একটা পাথুরে গায়ে প্লেনের ডানাটা একটু ছুঁয়ে গেল। চমকে উঠে উঁচু মুখে অনেকটা লাফিয়ে উঠল প্লেনটি। আর কয়েক ফোঁটা মাত্র তেল বাকি। অসহায় লেডি বারবারা কাঁপা ঠোঁটে উচ্চারণ করতে লাগল প্রার্থনার মন্ত্র।

একটাই উপায়, প্যারাসুটে নামতে হবে। এক্ষুণি। মাথা ঠাণ্ডা রেখে দড়ির গিঁট খুলতে লাগল বারবারা।

ঠিক এই মুহূর্তে বিধাতা বসেছেন নানা প্রান্তের ক'টা

দীর্ঘ সুতো জড়ো করতে। বাঙ্গালোর রাজা কাবারিগা, মস্কোর লিওন স্ট্যাবাচ, নিউ ইয়র্কের লাফায়েৎ স্মিথ, এমন কি বিপাকে-পড়া এই সুন্দরী মেয়েটি—সকলেই সেই নানা সুতোর এক একটি খেই। এদের ভাগ্য নিয়ে বিধাতা বসেছেন গল্প গড়তে।

লাফায়েৎ স্মিথের অনেক দিনের বাসনা ভূ-তত্ত্বের অধ্যাপক হবার। কিন্তু তার চেহারাটি তার কাল করেছে। বিশাল, তাগড়াই গড়ন। পণ্ডিত বলে মোটেই মানায় না। বয়সের গাম্ভীর্য নেই, শুধুই ছেলেমানুষী ছটফটানি। চোখের দৃষ্টি ভালই, তবু দামি চশমা নাকে ঝুলিয়ে বয়স্ক সাজবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বৃথাই। স্কুল মাস্টারির বেশি কিছু জোটেনি। তবে আর একটা চাপা বাসনা ছিল অনেক দিনের। আফ্রিকার অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে পাড়ি জমাবে ভূ-তত্ত্বের নেশায়। সে-বাসনা আজ পূরণ হতে চলেছে। সাঁতার আর টেনিস খেলায় পটু শরীর। পরিশ্রমের ভয় করে না। আর তাছাড়া বাবার অঢেল টাকা।

এই সময় মস্কোয় মহামান্য স্টালিনের সঙ্গে লিওন স্ট্যাবাচের কিছু কথাবার্তা চলছিল।

'—পিটার জাবেরি আজ আর নেই। ওর খুনের বদলা নিতেই হবে।·· আফ্রিকায় পৌঁছবই।' বলল স্ট্যাবাচ।

'—বিপদের কথাগুলো মনে রেখো,' স্ট্যালিন জানালেন, 'ভুলে যেও না সেই বনমানুষটার কথা।—ভুলে যেও না অ্যাবিসিনিয়া আর ঈজিস্টে আমাদের কি হাল করেছিল!'

স্ট্যাবাচ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ভুলিনি সে-সব। আর সেই জন্যেই অ্যাফ্রিকায় যাওয়া চাই।'

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লিওন স্ট্যাবাচ মস্কো ছেড়ে চললেন অজানা সেই দেশের উদ্দেশ্যে।

ঠিক এই সময় আদিম আফ্রিকায় সেই বুনোমানুষ টারজান কি করছে? তার পায়ের কাছে পড়ে আছে বাঙ্গালোর রাজা কাবারিগা। টারজান তাকে টেনে তুলে বলছে, 'ওঠো। কে তুমি? কি চাও তুমি আমার কাছে?'

'—বোয়ানা, আমি বাঙ্গালোর রাজা। আমার প্রজাদের রক্ষা কর। প্রতিবেশী গালারা বলে, তুমিই পার তাদের খারাপ মানুষের হাত থেকে রেহাই দিতে।'

'—কে সেই খারাপ মানুষ?' জানতে চায় টারজান।

'—চাষবাস নিয়ে সুখেই ছিলাম বোয়ানা। হঠাৎ অ্যাবিসিনিয়া থেকে এসেছে মানুষধরার দল। লুঠপাট করছে, মানুষ ধরে দাসত্বের শেকল পরিয়ে বিক্রি করছে দূর দূর দেশে। তারা ঘাঁটি গেড়েছে পাহাড়ের গায়ে। সেখানে যাওয়া যায় না বোয়ানা। তারা লুঠপাট করে ফিরে যায় সেখানে। চাষবাস করে যেই আবার আমরা সামলে উঠি, তারা সব ফের লুঠে নেয়।'

'—কিন্তু, কিন্তু আমি কি করতে পারি? আমার এলাকার বাইরে আমি নাক গলাতে চাই না। তবে আমার এলাকার কেউ ক্ষতি করলে তাকে ছেড়ে দিই না।'

'—তোমার কাছে এসেছি বোয়ানা, তুমি সাদা মানুষ বলে। আর এই মানুষধরা দলের প্রভুটিও তাই। কে না জানে খারাপ সাদা মানুষেরা তোমাকে ডরায়।'

'—আচ্ছা, যাব আমি তোমার দেশে।' টারজান বলল।

বিধাতার গল্পে আরেকটা সুতো জোড় খেল। টারজান পাড়ি জমাল উত্তরের গহনে। কেউ টের পেল না। তার অমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিকিমাও জানল না কোথায় গেল টারজান।

●

অনেক দিনের নিবে-যাওয়া আগুন-পাহাড়ের পাদ-দেশে দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম। দুধারে বিছিয়ে আছে প্রাচীন মরা আগুনের ছাই-মাটি। তার ওপর গড়ে উঠেছে বসতি। আব্রাহামকে ঘিরে ভিড় করেছে তার জাতের নারী পুরুষ আর শিশুর দল।

এমন গোঙানির শব্দ তারা কখনো শোনেনি। চোখে-মুখে তাদের গভীর ভয়ের ছায়া। তারা চেয়ে আছে পাহাড়ের দিকে, কি জানি কি ভাগ্যে আছে তাদের। চূড়ার ওধার থেকে সমানে ভেসে আসছে কর্কশ একটানা শব্দ—গোঁ গোঁ গোঁ···।

আওয়াজটা ক্রমে কাছে আসছে।···এসে পড়েছে একেবারে তাদের মাথার ওপর। কান ঝালপালা হয়ে যায় সেই উৎকট শব্দে। এ কিসের লক্ষণ? কোনো দুর্যোগ নয়তো? তারা জানে না। শুধু জড়োসড়ো হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে কি ঘটে তা দেখার জন্যে।

মূল পাহাড়ের ঠিক উল্টোদিকের উপত্যকায়ও একদল মানুষ রাজ্যের উৎকণ্ঠা আর জিজ্ঞাসা নিয়ে জড়ো হয়েছিল নোয়ার পুত্র ইলাইজাকে ঘিরে।

আব্রাহামের দলের একজন মেয়ে বলে উঠল, 'পিতা, এ কিসের শব্দ?'

'—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে থাক যদি, তবে তার ফল ভোগ করতেই হবে।' বলল আব্রাহাম।

'—না পিতা না, কখনো তা হারাইনি।' মেয়েটির কণ্ঠে

কান্না ঝরে পড়ে।

'—চুপ কর মার্থা!' আব্রাহাম বলল, 'হয়ত স্বয়ং প্রভুরই আবির্ভাব ঘটতে চলেছে। আমাদের বিচার হবে তাঁর কাছে।' তার কণ্ঠও উত্তেজনায় জড়িয়ে এল।

ভিড়ের শেষ প্রান্তে একটি ছেলে ধপ্ করে মাটিতে পড়ে মুখ দিয়ে ফেনা ওগরাতে লাগল। আর একটা মেয়েও চিৎকার করে জ্ঞান হারাল।

আব্রাহাম বলে চলে, 'হে প্রভু, হে পরম পিতা, তুমি কি সত্যিই আসছ? আমরা সদাই প্রস্তুত তোমার আদেশ পালন করতে।...আর তুমি যদি না হও, তবে এই অশুভ শক্তির হাত থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও!'

মাথার ওপর আওয়াজ উঠল—গোঁ গোঁ গোঁ। কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারাল দলের আরো কজন। তবু কেউ কাউকে তুলল না, কেউ কারো দিকে চেয়েও দেখল না। তারা চেয়ে রইল আকাশের দিকে।

আওয়াজটা তীব্র হয়ে ফেটে পড়ে যেন হঠাৎই থেমে গেল তাদের মাথার ওপর। ঠিক তারপরেই মেঘের মধ্যে থেকে নেমে এল এক অদ্ভুত মূর্তি। ধীরে ধীরে নেমে আসছে মাটির দিকে।

আরো কিছু লোক জ্ঞান হারাল তাই দেখে।

আব্রাহাম প্রার্থনার ভঙ্গিতে চেয়ে রইল স্বর্গের পানে। যারা তখনও সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখাদেখি নতজানু হল। সবাই চুপ—বড় অস্বস্তিকর এই নীরবতা।

বারবারা কোলিসের শরীরটা মাটি ছুঁতেই ভয়ার্ত চিৎকারে স্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল। আব্রাহাম তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না, মাটিতে গড়িয়ে পড়ে ফেনা ওগরাতে লাগল সে-ও। প্রায় পাঁচশো মানুষের মধ্যে ভেসে মাটিতে নেমে পড়ল বারবারা।

আশ্চর্য হয়ে বারবারা দেখল সবাই তারই মত সাদা। আফ্রিকার গহনে সাদা মানুষের আস্তানা! মানুষগুলোর ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল বারবারা। তাদের চুল-দাড়ির সঙ্গে সাবানের সংযোগ কখনো ঘটেনি। কামাতেও তারা শেখেনি। ছেঁড়াখোড়া পোষাকে কোনমতে শরীর ঢেকেছে। আরো আশ্চর্য হয়ে দেখার বিষয় ওদের নাকের গড়ন। উদ্ভট রকম লম্বা। আর সেই সঙ্গে ঢোকা থুত্নি। কয়েক জনের লম্বা নাকের আড়ালে তো থুত্নি খুঁজেই পাওয়া যায় না।

হঠাৎ দেখে, রোগগ্রস্ত মানুষগুলোর মধ্যে থেকে উঠে আসছে একটি সুন্দরী মেয়ে, কেমন দৃপ্ত ভঙ্গিমায়, সোনালী চুল দুলিয়ে। চোখে তার হাজার প্রশ্ন।

বারবারা হাসল। সে-হাসি ফিরিয়ে দিয়েই গম্ভীর হয়ে গেল মেয়েটি। ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখল, কেউ তার হাসি দেখে ফেলল কিনা! যেন তাকে এইবার চরম শাস্তি পেতে হবে। বারবারা এগিয়ে এসে দু-হাত বাড়িয়ে ধরলো মেয়েটির দিকে। মেয়েটি ধরা দিল সেই আলিঙ্গনে। ইংরেজের বাহু-বন্ধনে ধরা দিল অজানা আফ্রিকার এক সাদা মেয়ে।

বারবারা জিজ্ঞাসা করলো, 'এটা কোন জায়গা? এই মানুষরা কারা?'

না বুঝে মেয়েটি মাথা নাড়ল। তার ভাষায় বলল, 'তুমি কি দেবতা?'

বারবারার এইবার মাথা নাড়ার পালা। বুঝিয়ে দিলে, 'তোমার ভাষা একবর্ণও বুঝছি না।'

এক বুড়ো মাটি থেকে উঠে এগিয়ে এল। লম্বা সাদা তার দাড়ি। তার হয়ত একটু সাহস ফিরে এসেছে এই দেখে যে স্বর্গের আত্মার সামনেও তাদের মেয়েটি দিব্যি খাড়া রয়েছে।

সেই বুড়ো চিৎকার করে বলল, 'জেজেবেল, যা, যা, দূর হয়ে যা! স্বর্গের অতিথির সামনে তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা!

মেয়েটি পিছিয়ে এল এই আদেশে। বারবারা যদিও বুড়োর কথা বুঝল না, তবু অবস্থাটা স্পষ্ট আন্দাজ করতে পারল। কিন্তু বারবারা এই মেয়েটিকেই চায়। নোংরা বুড়োর কর্তৃত্ব ঘোচাতে হবে। সে এগিয়ে এসে মেয়েটির হাত দুটো ধরল।

—'আমার কাছে থাক তুমি।' বারবারা বলল, যদিও সে জানে তার কথা মেয়েটি বুঝবে না।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, 'জেজেবেল, কি বলছে ও?'

জেজেবেলের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। যদিও ও কিচ্ছু বুঝছে না, তবু সে ঠিক করল সে তার দলের মানুষদের কাছে ভান করবে যে সে সব কথাই বুঝছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফের একটা হাসি খেলে গেল জেজেবেলের ঠোঁটে। এটা মিডিয়ান দেশ। সে জানে আনন্দ প্রকাশের মানেই পাপের প্রশ্রয়। সে-পাপের ফল ভোগ করতে হবে। তাই শাস্তি এড়াবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'জোবাব, উনি বলছেন উনি স্বর্গ থেকে এসেছেন আমাদের জন্য বাণী নিয়ে। কিন্তু তাঁর পছন্দসই মানুষের মধ্যে দিয়েই সে-বাণী তিনি প্রচার করতে চান।'

এই কথা ওদের মধ্যে খুব একটা অবিশ্বাসের মনে হল না। নোংরা, বিকৃত, মৃগীরোগগ্রস্ত মানুষগুলো মাটি থেকে উঠে এগিয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল বারবারাকে। বারবারা সাহসী, বিপদকে সে তুচ্ছ করতে জানে। তবু তার শরীর কেঁপে উঠল ঘৃণায় আর ভয়ে। জোবাব নামে বুড়ো বোকার মত ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়েই রইল তার দিকে। তার পিছনে বাকিরা। জোবাব পিছন ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'কই, আব্রাহাম কোথায় গেল?' আব্রাহাম তখনও মাটিতে গড়াচ্ছে। আর একজন বুড়ো বারবারাকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'ইনিই সেই জীওভা। এঁকে রাগিও না। আমরা এঁকে খুশি করে বাঁচতে চাই।'

'—ঠিক কথা টিমথি।' বলল জোবাব। তারপর অন্যদের বলল, 'খুশি কর ওঁকে। যাও, যে যা দিতে পার নিয়ে এসো! শীগগির যাও!'

অজ্ঞ মানুষের দল তাদের গুহায় ফিরে চলল। বারবারার কাছে রইল শুধু কয়েকজন বুড়ো আর সোনালী-চুল জেজেবেল। বারবারা লক্ষ্য করছে বুনো মানুষের এই দল কেমন নুয়ে পড়ে, মাটিতে মুখ ঝুঁকিয়ে বিদ্‌ঘুটে ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে। কি একটা বিতৃষ্ণায় তার সারা দেহ শিউরে উঠল। আরো চোখে পড়ল কয়েকজন মানুষ, যাদের চোখে মুখে কিছুটা বুদ্ধির ছাপ, তাদের চুল অন্যদের মত কালো নয়, জেজেবেলের মতই সোনালী। এর কারণ খুঁজলে বারবারাকেও হতাশ হতে হবে। কারণ, কেউ জানে না, কোন এক কালে এই উদ্ভট গড়নের মৃগী রোগাক্রান্ত মানুষের সঙ্গে এক দাসের সুন্দরী মেয়ের গল্প জড়িয়ে আছে। সেই সুন্দরীর রক্তের স্পন্দন জেজেবেলের শরীরে।

বারবারা ভাবছে লোকগুলি ঘরে ফিরে গেল কেন। জোবাবের ভাষা তো আর সে বোঝেনি! জেজেবেলের দিকে তাকাল বারবারা। বুঝল মেয়েটির চোখে মুখে প্রকাশ পাচ্ছে তার মন বোঝবার বাসনা। কিন্তু হায়, দুজনের ভাষা দুজনের কাছেই অজানা। অন্যদের থেকে জেজেবেলের তফাৎ খুবই স্পষ্ট। সামান্য পোষাক, তবু লতাপাতার নক্সায় আর পরিচ্ছন্নতায় সে যেন অনন্যা।

উপত্যকার চারদিক ঘিরে পাহাড়ের দেয়াল। মাঝে একটা হ্রদ। কোথাও একটা ফাঁক-ফোকর পর্যন্ত চোখে পড়ে না। পালাবার কথাটাও ভেবে রাখতে হবে কারণ এরা বারবারাকে কি চোখে দেখবে বারবারা জানে না। বন্দী না অতিথি?

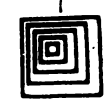

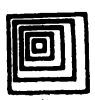

লোকগুলো ফিরে আসছে। হাতে তাদের কিছু না কিছু জিনিস। বাটিতে করে রান্না খাবার এনেছে কেউ, কেউ এনেছে আনাজ আর ফল। কেউ আবার এনেছে লতা-পাতার সুতো, যা দিয়ে জামা কাপড়ে নক্সা হয়। একে একে সেগুলো তারা নামিয়ে রাখছে লেডী বারবারার পায়ে। লজ্জায় ভয়ে কেউ কেউ এখনো কাঁপছে। ভগবানের কাছে তাদের আতিথেয়তার নিদর্শন দেখিয়ে বাঁর পায়ে তেমনি নুয়ে পড়ে তারা ফিরে চলল।

আব্রাহামের ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে। কোন রকমে সে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ কি ঘটেছে তা তার মনে করতে একটু সময় লাগল। তারপর সে এগিয়ে এল বারবারার দিকে। সবাইকে কি একটা ইশারা করতেই, সবাই নতজানু হয়ে দুর্বোধ্য মন্ত্রে প্রার্থনা আওড়াতে লাগল।

টলমল পায়ে এগিয়ে আসছে আব্রাহাম। মুখে তার তখনও লালা ঝরছে। জেজেবেলের দিকে চেয়ে সে হুঙ্কার দিল, 'এ্যাই! তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কোন সাহসে? মন্ত্র পড়ছিস না কেন?'

বারবারা বুঝতে পারল জেজেবেলকে ধমক ধামক দিয়ে সরাবার চেষ্টা হচ্ছে। তাই সে তাড়াতাড়ি ফের তাকে কাছে টেনে নিল। জেজেবেলেরও জেদ চেপে গেছে। তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় বহাল থাকতেই হবে। অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে দৃষ্টি কাড়বার এমন সুযোগ তার জীবনে আসেনি।

বারবারার আলিঙ্গনে সে ফের শক্তি ফিরে পেল। সে জানে আব্রাহাম রাগলে আর রক্ষা নেই। তবু নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

আব্রাহাম চিৎকার করে উঠল, 'কই, জবাব দিচ্ছিস না যে!'

দৃপ্তকণ্ঠে জেজেবেল বলে উঠল, 'রাগ কোর না। দেখছই তো পরম পিতার এই দূত আমাকে ভর করেছেন।'

'—ওরে নির্বোধ, জানিস না একি পাপাচরণ।'

'—পাপ নয় প্রভু, এ হল স্বয়ং জীওভার ইচ্ছা। বিশ্বাস না হয় জোবাবকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'—জোবাব।' চেঁচাল আব্রাহাম।

জোবাব এগিয়ে এল। বলল, 'হ্যাঁ প্রভু, ইনি দেবতার বাণী বহন করে এনেছেন আকাশ থেকে। আমরা যথাসাধ্য দিয়ে তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করেছি।'

'—আর আমাদের এই পাপিষ্ঠা মেয়েটি?'

'—আমি জানি এই মেয়েটির মুখেই দেবতা কথা বলতে চাইছেন।'

'—ঈশ্বরের জয় হোক!' আব্রাহাম হাঁকল, 'তাঁর ইচ্ছার অর্থ বোঝা আমাদের সাধ্য নয়।...তবে দেবদূতকে বল তিনি যেন এই পাপীদের ক্ষমার চক্ষে দেখেন।'

জেজেবেল বারবারার দিকে এই কথা জানাতে যেই মুখ ফিরিয়েছে অমনি আব্রাহাম হাঁকল, 'দাঁড়াও।' কি একটা সন্দেহ যেন তার মনে উঁকি দিয়ে গেল। সে বলল, 'কিন্তু জেজেবেল তো মিডিয়ান দেশের ভাষা ছাড়া কোনো ভাষা জানে না। কি ভাষায় ওঁর সঙ্গে কথা বলবে? আমি আব্রাহামের পুত্র, আমি স্বয়ং ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা পল! জেজেবেলের কথা উনি যদি বোঝেন তো আমার কথাও বুঝবেন।'

জেজেবেল তার চেয়ে বুদ্ধি ধরে অনেক বেশি। সে বলল, 'হে আব্রাহাম, আপনার তো মুখ আছে। জীওভার দূতের সঙ্গে আপনিই কথা বলুন না। যদি তিনি আমাদের ভাষায় কথা বলেন তাহলে আমি যেমন বুঝতে পারছি আপনিও পারবেন।'

আব্রাহাম বারবারার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'হে আলোর দূত! এই বৃদ্ধের প্রতি সদয় হোন। আমি আব্রাহামের পুত্র আব্রাহাম, ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা পল। দয়া করে এই সেবকের কথা জানান সেই পরম পিতাকে, যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন আমাদের মধ্যে।'

বারবারা মাথা নাড়তে লাগল। কোন কথাই বুঝল না। শুধু ছোট্ট একটা বাক্স থেকে সিগারেট মুখে গুঁজে আগুন ধরাল।

'—এ, এ কোন জাদু জেজেবেল?' ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা পল জানতে চাইলেন, 'ওঁর নাক দিয়ে ও কিসের ধোঁয়া বের হচ্ছে? কি এর মানে?'

যদিও জেজেবেলও এ ধোঁয়ার ব্যাপারটা জানে না, তবু বলল, 'উনি রাগ করেছেন। কারণ আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না।'

'—না না, তোমার কথা বিশ্বাস করছি। ওঁকে বল আমার কোন অবিশ্বাস নেই। তারপর শোনাও ওঁর মত।'

জেজেবেল বলল, 'উনি বললেন জীওভা তোমাদের ওপর বড়ই অসন্তুষ্ট। তোমরা জেজেবেলের অসম্মান করেছ। তাঁকে ভাল খাবার-দাবারও দাওনি।

'—ওঁকে বল, আমরা জানতাম না তোমার কথা। জানিও আমরা তোমাকে ভালবাসি। তোমায় ভাল খাদ্য দেওয়া হবে জেজেবেল! বল ওঁর কি আদেশ।'

জেজেবেল বারবারার চোখে চাইল। বারবারা বলছে, 'হায়রে মেয়ে, তোমার কথা না বুঝছি আমি, আর আমার কথা না বুঝছ তুমি!'

আব্রাহাম জানতে চাইল, 'কি বলছেন উনি?'

—'উনি বলছেন, সমস্ত খাবার-দাবার নিয়ে ওঁকে গুহায় নিয়ে চল। উনি সেখানে বিশ্রাম নেবেন। ওঁর সঙ্গে থাকব শুধু আমি, জেজেবেল।'

আব্রাহাম সঙ্গে সঙ্গে জোবাবকে বলল, 'মেয়েদের পাঠাও। আমার গুহার পাশের গুহাটি পরিষ্কার করুক। খাবার-দাবারগুলো নিয়ে চলো। নরম ঘাসের শয্যা তৈরি কর।'

'—হ্যাঁ, দুটি শয্যা।' তাড়াতাড়ি জানাল জেজেবেল।

সেই মত কাজ হল। বারবারা আর জেজেবেল সুন্দর একটি গুহায় ঠাঁই পেল। গুহার মুখে দাঁড়িয়ে বারবারা চারধার দেখতে লাগল আর ভাবল কি করে বাইরের পৃথিবীতে বিপদ-সংকেত পাঠাবে। কিন্তু প্রচুর খাবার-দাবার আর ঘাসের বিছানার দিকে তাকিয়ে তার আর উৎকণ্ঠা তেমন রইল না।

সন্ধ্যা নেমে এল। সারাদিনের তপ্ত হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এল। গুহার মুখে আগুন জ্বেলে ওরা দুজন বসল। প্রথমেই মনে হল এদের সঙ্গে কথা বলার একটা উপায় বের করতেই হবে। ওদের ভাষা শিখতেই হবে।

দুই বন্ধুর মুখ আগুনের আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দুজনেই যেন দুজনের মনের কথা বুঝল। বারবারা নানা জিনিস দেখিয়ে তার ইংরিজি শব্দ বলতে লাগল। জেজেবেল সেগুলির নাম মিডিয়ান দেশের ভাষায় উচ্চারণ করে চলল। দুজনেই সেগুলো বার বার উচ্চারণ করে রপ্ত করে নিতে লাগল।

এইভাবে একটি ঘণ্টা কেটে গেল। দূরে হ্রদের ধার থেকে ব্যাঙ ডাকার একটানা আওয়াজ। আর কোন শব্দ নেই। সারা গ্রাম নিশ্চুপ। উল্টোদিকের উপত্যকার গায়ে জায়গায় জায়গায় আলোর ফুল্‌কি দপদপ করছে। অন্য কোন দূর গ্রামের রান্নার আগুন হয়তো বা।

একটি মানুষ মশাল হাতে একটা গুহা থেকে বের হয়ে এল। নিচু গলায় একঘেয়ে সুরে কি সব আউড়ে চলেছে সে। এক এক করে আরো লোক মশাল হাতে যোগ দিল। তারপর মিছিল এগিয়ে চলল ঘুরে ঘুরে নিচে সমতল জমির দিকে।

সবার গলা চড়ল। একটা শিশুর চিৎকার। বারবারা দেখল একটা ছোট্ট ছেলেকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে একটা লোক। মিছিলটা এবার একটা পাথরের ঢিবিকে ঘিরে দাঁড়াল। মন্ত্র পড়া চলল সমানে। ছেলেটিও সমানে চেঁচাচ্ছে। ভিড়ের মাঝে একটা লম্বা মানুষকে বারবারা দেখেই চিনল। সে আব্রাহাম। হাত তুলতেই মন্ত্র পড়া থেমে গেল! ছেলেটি ভয়ে কান্না থামাল কিন্তু ফোঁপাতে লাগল সমানে। মশালের আলোয় ফুটে উঠল আব্রাহামের বীভৎস মূর্তি। বারবারা ভয়ে যেন কাঠ হয়ে গেল। সে জেজেবেলের দিকে চেয়ে দেখে গালে হাত দিয়ে চুপ করে চেয়ে আছে। মুখে তার আর হাসি নেই।

শিশুটির আকাশ-ফাটানো আর্তনাদে চমকে তাকাল বারবারা। লোকগুলোর হাত ছেড়ে পালাবার কি প্রাণান্তকর চেষ্টাই না সে করছে। হিড়হিড় করে টেনে এনে তাকে দাঁড় করানো হল ঢিবিটায়। একটা ছুরির ফলা মশালের আলোয় ঝকমক করে উঠল। বারবারা আর দেখতে পারল না। মুখ ঢেকে বসে রইল।

ড্যানি প্যাট্রিক শিকাগো শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। তার পিছনে পুলিশ লেগেছে। পকেটে পিস্তল গুঁজে জাহাজের ডেক-চেয়ারে বসে এখন একটু আরাম করছে সে। বাইরের দুনিয়ার খবর সে খুব একটা রাখে না। তার জ্ঞান-বিদ্যের বহর যেটুকু তা দিয়ে সে বুঝেছে সে ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছে। আর জানে ইংল্যাণ্ড নাকি লণ্ডন দেশটার কাছা-কাছি! মুরুব্বি পাকড়ে ছিল সে ভালই। খুব শাঁসালো। মন্ত্রী মহলে মেলামেশা আছে, কারবারও রমরমা। তার পেছনে আর এক ঘোড়েল মুরুব্বিকে লাগিয়ে তারই মদের ভাঁড়ার লুঠের কাজে লেগেছিল ড্যানি। শেষ রক্ষে হল না। প্রথম পক্ষের একজন ওকে চিনে ফেলল। পুলিশ এসে প্রথমেই বলল, 'ড্যানি প্যাট্রিক কই, সেই বন্দুকবাজটা?' কাজেই সটকে পড়তে হল।

এখন মন্দ লাগছে না। ঝাড়া হাত-পা হয়ে সমুদ্রের রোদে শুয়ে যে কি আরাম! তবে অন্য মানুষগুলো যেন কেমন। তাকে পাত্তাই দিতে চায় না। সে কি এমন খারাপ দেখতে? চেহারাটা একটু ভারি, এই যা। তার জামাকাপড়ের দিকে ভাল করে দেখেছে কেউ? শিকাগোর সবচেয়ে দামী দর্জির হাতের কাজ।

তিন দিন কেটেছে সবে। সমুদ্র বড় একঘেয়ে লাগছে। সময় আর কাটে না। একদিন একটা ছেলে তার সামনে হঠাৎ চেয়ার টেনে বসে পড়েই বলল, 'আঃ কি সুন্দর দিনটা আজ, তাই না?'

এ আবার কে? ড্যানি একটু সতর্ক চোখে তাকে দেখে নিয়ে অবজ্ঞার সুরে বলল, 'বলছেন?' তারপর চেয়ে রইল ঢেউয়ের দিকে।

ছেলেটি আর কেউ নয়, লাফায়েৎ স্মিথ, ভূ-তত্ত্ব যার নেশা। আলাপ কিন্তু তেমন জমল না।

সেদিন বিকেলে ড্যানি দেখে সেই ছেলেটি শক্ত সুঠাম দেহে সাঁতারের নানা কসরৎ দেখাচ্ছে। জাহাজ সুদ্ধ সবাই মুগ্ধ! পরদিন সকালে সেই ছেলেটিকে দেখে ড্যানি নিজেই এগিয়ে গেল। চেয়ার টেনে বসে পড়ে বলল, 'আবহাওয়াটা আজ ভালই, কি বলেন?'

স্মিথ শুধু বলল, 'বলছেন?' তারপর ডুবে গেল একটা বইয়ের পাতায়।

ড্যানি প্যাট্রিক জোরে হেসে ফেলল। বলল, 'খুব ঠকলে আমায়, হাঃ হাঃ হাঃ।'

লাফায়েৎ স্মিথ বই থেকে চোখ তুলল। এবার আলাপ একটু একটু করে জমে উঠল।

'—ইংল্যাণ্ড যাচ্ছ?' শুধাল ড্যানি।

'—লণ্ডনে কটা দিন থাকব শুধু।' বলল স্মিথ।

—'ও, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি ইংল্যাণ্ড যাচ্ছ।'

স্মিথ অবাক হয়ে চেয়ে রইল এই যাত্রীটির দিকে। মোটাসোটা খোশমেজাজী চেহারা। এ কি মজা করছে না সত্যিই এত বোকা?

স্মিথ একটু মজা করার লোভ সামলাতে পারল না। বলল, 'হ্যাঁ, জর্জ-রাজের কাছ থেকে অনুমতি পেলে লণ্ডন হয়ে ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত একটু ঘুরে আসতে পারি।'

ড্যানি বলল, 'লণ্ডন থেকে ইংল্যাণ্ড যেতে হলে জর্জরাজটাও ঘুরে যেতে হয়?'

স্মিথ বুঝল লোকটা একটা আকাট মুখ্যু। এর সঙ্গে রসিকতা চলে না। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়াই ভাল। বলল, 'শোন, লণ্ডন হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের রাজধানী। তুমি লণ্ডন যাচ্ছ তো? তাহলেই তো ইংল্যাণ্ড যাওয়া হল।'

'—ওঃ হো, তাই নাকি! আসলে ব্যাপার কি জান, আমি কখনও আমেরিকার বাইরে পা বাড়াইনি।' এই বলে বোকার মত হাসতে লাগল ড্যানি।

'—তা লণ্ডনে থাকবে কদ্দিন, কি কাজ তোমার

ওখানে ?' জিজ্ঞাসা করল স্মিথ।

'—না না, ওখানেই যে থাকতে হবে তার কোনো মানে নেই। যেখানে হোক গেলেই হল। তা তুমি যাচ্ছ কোথায় ?'

স্মিথ বলল, 'আফ্রিকা।'

একটু ভেবে স্মিথ বলল, 'উঁহু, ওখানে আমার পোষাবে না। বুনোরা মাতব্বরি করবে, সে সইবে না আমার। তাছাড়া একবার এক ব্যাটা নিগ্রো প্যায়দার পাল্লায় পড়েছিলাম শিকাগোয়, ব্যাটা মহা—, জানো পুলিশ-টুলিশে আমার আবার একটু ইয়ে—'

স্মিথ তো অবাক। মজাও লাগছে মন্দ না। ড্যানি বকেই চলল, 'হুঁ, সিনেমায় একবার আফ্রিকা দেখেছিলাম বটে। উঃ, কি জঙ্গল! হাতি, সিঙ্গী, হরিণ, বাঁদর—আচ্ছা তুমি কি ওখানে শিকারে যাচ্ছ ?'

স্মিথ বলল, 'হ্যাঁ, তবে জন্তু নয়, পাহাড়।'

ড্যানি চেঁচিয়ে উঠল, 'বুঝেছি বুঝেছি, পাহাড় খুঁড়ে হীরে, পাথর এসব বার করবে!'

'—না তা নয়। পাহাড়ের গড়ন, মাটির প্রকৃতি এইসব দেখে কিছু শিখব।'

'—তাতে তো আর টাকার আমদানি হবে না!' বলল ড্যানি।

—'না, তা হবে না। কিছু জানা, শেখা হবে, এই আর কি।' বলল স্মিথ।

ড্যানি অবাক হয়ে বলল, 'জানো, আমি একবার একটা বই পড়েছিলাম, সেটাও আফ্রিকার।'

'—কি ছিল তাতে ?' প্রশ্ন করে স্মিথ।

'—কি ছিল ঠিক মনে নেই, ইয়ে,—পড়েছি তাও ঠিক বলা চলে না, আসলে মানে, ঘেঁটে ঘেঁটে দেখলাম সেটার ভাষার কচকচি। আচ্ছা আফ্রিকা দেশটা কত বড় ?'

স্মিথ বলল, 'কেন, সে বইয়ে লেখা নেই ?'

'—ইয়ে মানে, এখন মনে হচ্ছে বইটা আফ্রিকার নয়, অন্য কিছু—সে যাক গে—।'

স্মিথ হাসি চেপে বলল, 'তোমার আমেরিকার চার গুণ।'

'—বলো কি! পুলিশ-টুলিশ আছে ?'

'—আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে মানুষই আছে কিনা সন্দেহ।' বলল স্মিথ, 'আমার দলের লোকজনের সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখাই হবে না সেখানে।'

'—তোমার দল ?'

—'হ্যাঁ, চাকরবাকর কুলি এরা সব।'

চুপ করে কি ভাবল ড্যানি। তারপর বলল, 'আমায় দলে নেবে ? খরচ-পত্র আমার।'

অবাক হল স্মিথ। লোকটিকে ভাল না লেগে উপায় ছিল না তার। কি রকম যেন মনে হল, বিপদে আপদে একে প্রয়োজন হতেও পারে। তাছাড়া দিনের পর দিন কাজের মধ্যে একটা কথা বলার লোকও তো দরকার!

—'সেই টাকা পয়সার কথা ভাবছ নিশ্চয় ?' বলল ড্যানি। তারপর ট্রাউজারের কোন একটা পকেট থেকে ইয়া মোটা একটা ব্যাগ বের করল—আকণ্ঠ টাকায় ঠাসা। 'তোমার প্রয়োজনও মেটাতে পারব আশা করি।' এই বলে সেটা ফের পকেটে চালান করে দিল।

স্মিথ কিন্তু এসব খুব একটা পছন্দ করছিল না। আমেরিকার পাপচক্রের মানুষজনের কথা সে শুনেছে অনেক। ভেবেচিন্তে বলল, 'না থাক, আমাদের দুজনের একসঙ্গে না চলাই ভাল।'

কিছুক্ষণ দুজনে চুপ। শুধু ঢেউ ভাঙ্গার আওয়াজ। ড্যানি মুখ খুলল, বলল, 'আমি কিন্তু আফ্রিকা যাচ্ছিই। তুমি আমায় চিনেছ, আমিও তোমায় চিনলাম। দুজন সাদামানুষ একই জায়গায় চলেছি। আলাদা থেকে লাভ কি ?'

স্মিথকে চুপ করে থাকতে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল শিকাগোর বন্দুকবাজ ড্যানি প্যাট্রিক।

মৃদু হেসে লাফায়েৎ স্মিথ হাত বাড়াল।

গল্পের নক্সায় এ আর-এক নতুন সুতো!

★

এরপর কেটে গেছে বেশ কয়েকটা সপ্তাহ। পৃথিবীর দূর দূরান্তের নানা প্রান্ত থেকে তিনটি দল পাড়ি দিয়েছে আফ্রিকার দিকে। তাদের পথ মিলতে চলেছে ঘেনজির অরণ্যমায়ায়। তারা একে অপরের উপস্থিতি টের পায়নি, তাদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন। পশ্চিম থেকে আসছে লাফায়েৎ স্মিথ, সঙ্গে আছে বন্দুকবাজ ড্যানি প্যাট্রিক! একজন ইংরেজ শিকারী আসছেন, নাম লর্ড পাসমোর। আর রাশিয়া থেকে পাড়ি দিয়েছে লিওন স্ট্যাবাচ।

স্ট্যাবাচ পড়েছে মহা ঝঞ্ঝাটে। তার দলের লোকজন আর অচেনা জায়গায় এগোতে চাইছে না। আশপাশের গ্রামে তারা শুনেছে এখানে নাকি মানুষধরার দল এসেছে কালো মানুষদের ধরতে। ওদের ধরে তারা বিক্রী করে দেবে দূর দূর দেশে।

ঘেনজির উপত্যকায় দক্ষিণ প্রান্তে স্ট্যাবাচ একদিন তার

দলবল নিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। উত্তরে মাথা উঁচিয়ে আছে পাহাড়ের সারি। পায়ের নিচে জঙ্গল বিছিয়ে আছে দূরান্তে। তারই ধারেপাশে উঁচু নিচু টিপি। এই সব টিপি আর জঙ্গলের মাঝে একটা ঘাসের প্রান্তর, সেখানে কিছু হরিণ আর জেব্রা চরে বেড়াচ্ছে।

স্ট্যাবাচ ভয়ানক চিন্তিত। কালই দলের তিনজন কুলি পালিয়েছে। এভাবে দল টিঁকবে কি করে? তিনি দলের মোড়লকে ডাকলেন।

—'কি ব্যাপার বল তো তোমার লোকজনের?'

—'ওরা ভয় পাচ্ছে বোয়ানা।' মোড়ল বলল।

—'কেন? কিসের এত ভয় আমাকে?' গরম হয়ে বললো স্ট্যাবাচ।

—'তোমায় নয়, ওরা ভয় পাচ্ছে মানুষধরার দলকে।' বলল মোড়ল।

—'থাম ব্যাটা! যত গাঁজাগল্প আমায় শোনাতে এসেছে।' স্ট্যাবাচ রেগে আগুন।

এমন সময় দলের একটি কুলি চমকে লাফিয়ে উঠল। ফ্যাকাশে মুখে সে তাকিয়ে আছে পশ্চিমের পাহাড়শ্রেণীর দিকে। সেখানে আকাশের গায়ে পাহাড়চুড়োয় অস্পষ্ট একসার ঘোড়সওয়ার। তারা তরতরিয়ে নেমে আসছে। তাদের সাদা উড়নি বাতাসে উড়ছে, হাতে হাতে উঁচিয়ে আছে রাইফ্‌লের নল।

অমনি স্ট্যাবাচের দলের কয়েকটা কুলি তাদের মোট-ঘাট নিয়ে ছুট লাগাল জঙ্গলের দিকে। স্ট্যাবাচ ব্যস্ত হয়ে মোড়লকে বলল, 'ব্যাপারটা কি? না বলে চলল কোথায় এরা? পালাতে দিও না!'

মোড়ল এগিয়ে এসে ওদের বাধা দিতে গেল। কিন্তু শক্ত সবল এক কুলির প্রচণ্ড ঘুঁসিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ও।

শেষে স্ট্যাবাচকে অমান্য করে সবাই পালিয়ে গেল। পড়ে রইল কিছু মোটঘাট, মালপত্তর আর একা স্ট্যাবাচ। মোড়লটিও মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছুট লাগাল।

ঘোড় সওয়ারের দল নেমে আসছে তীরবেগে। তাদের বিকট হুঙ্কার আর ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ ক্রমেই ভেসে আসছে আরো কাছে। ধুলোর ঝড় তুলে তারা স্ট্যাবাচের তাঁবুর কাছে এসে পড়ল। স্ট্যাবাচ সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে তখন দাঁড়িয়ে আছে একা। দলের একজন এগিয়ে এসে দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলল। কালো মানুষদের ভাষা স্ট্যাবাচ বোঝে না। সে ভাষায় ছিল হিংসা আর বিদ্বেষের সুর, স্ট্যাবাচের সেটুকু বুঝতে অবশ্য অসুবিধা হল না। আর একটি লোকের সঙ্গে কি সব উত্তপ্ত কথাবার্তা চলছে। স্ট্যাবাচ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে। দলের সেই লোকটি স্ট্যাবাচের দিকে বন্দুক তুলল। অন্যজন বন্দুকের মুখ এক ঝটকায় সরিয়ে দিল। তুমুল ঝগড়া বাঁধল দুজনে।

অনেক বাগবিতণ্ডার পর দুজন স্ট্যাবাচকে দুদিক থেকে পাকড়ে ধরল। ছড়ানো ছিটানো মালপত্রগুলো ঘোড়ার পিঠে তোলা হল। তারপর স্ট্যাবাচকে বন্দী করে ঘোড়ায় চাপিয়ে লুঠেরার দল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে চলল।

দূরের দর্ভেদ্য সবুজের আড়াল থেকে একটা সাদা-মানুষ সব কিছুই সারাক্ষণ ধরে নজর রাখছিল। স্ট্যাবাচ যখন ক্লান্ত হয়ে তার তাঁবু গাড়ছে তখন থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত নাটকটাই মানুষটি আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছে। তার কঠোর মুখ কিন্তু ভাবলেশহীন। আবেগ বা উদ্বেগের কোন ছায়াপাত ঘটেনি।

দলটি দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই সেই মানুষটি জঙ্গলের ডালপালা বেয়ে তার স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় ছুটে চলল উল্টো-মুখে, যেদিকে স্ট্যাবাচের কুলিরা পালিয়েছে।

কুলিদের সেই মোড়লটির নাম গোলোবা। সে গাছ-পালা ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছে, সঙ্গে গুটিকতক কালোমানুষ। বিপদের প্রথম রেশটা কেটে গেছে ভেবে তারা তখন কিছুটা আশ্বস্ত। তবু ধরা পড়ার ভয় এখনও যায়নি। গোলোবা তার বোয়ানা স্ট্যাবাচকে বিপদে ফেলে পালিয়ে এল। মনে একটা অপরাধবোধ বড় খোঁচা দিচ্ছে। এই অপরাধের মাশুল তাকে না দিতে হয়! কিন্তু না পালিয়েই বা কি করত সে? সে একা কি করতে পারত ঐ গোটা মানুষধরার দলটিকে? উল্টে নিজেও বন্দী হত।

নিজেদের মধ্যে নানা অজুহাত তৈরি করতে করতে তারা এগিয়ে চলল ডালপাতা ভেদ করে। কিন্তু হঠাৎই তাদের গতি রুদ্ধ হল। উঁচু গাছের ঘন পাতার আড়াল থেকে নেমে এল এক শ্বেতাঙ্গ মূর্তি। খোলা গা, কোমরে চিতাবাঘের ছাল জড়ানো! ব্রোঞ্জের উজ্জ্বলতা তার সারা শরীরে।

—'দলের মোড়ল কে?' গোলোবার দিকে চেয়ে সে কালোমানুষদের ভাষায় জিজ্ঞাসা করল।

—'আমি'। বলল গোলোবা।

—'তোমার প্রভুকে ছেড়ে পালিয়ে এলে কেন?'

গোলোবা তার অজুহাতগুলো আউড়ে যাবে ভাবছিল। হঠাৎ মনে হল কে এই সাদা লোকটা? এর না আছে সঙ্গী-

সাথী, না আছে বন্দুক। তাই সে বলল, 'আমি গোলোবা, এদের মোড়ল। তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। গোলোবা হাঁকল, 'পথ ছাড়।'

সাদা মানুষটি নড়ল না একটুও। শুধু বলল, 'গোলোবার জানা উচিত কি ভাবে কথা বলতে হয়।'

গোলোবা বলল, 'হতে পার তুমি সাদা মানুষ। তবু তুমি কারো প্রভু নও। বোয়ানা হলে তোমার দলবল থাকত।'

—'টারজানের দলবলের প্রয়োজন হয় না।' শান্ত গলায় জানাল সাদা মানুষটি, তেমনি করে পথ আগলে।

গোলোবা চমকে উঠল। টারজানকে সে কখনো দেখেনি। সেই মহান প্রভুর কথা সে শুধু শুনেছে।

—'তুমি, তুমি টারজান!'

সাদা মানুষটি মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।

—'তবে আমায় ক্ষমা কর', গোলোবা কোনমতে বলল, 'আমি জানতাম না।'

—'তবে এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও!' বলল টারজান। 'কেন তুমি তোমার বোয়ানাকে ছেড়ে পালালে?'

—'মানুষধরা দস্যুর দল আমাদের আক্রমণ করেছিল। তারা আমাদের তাড়া করল, বন্দুক ছুঁড়ল। তারা কয়েক শো জন মিলে আমাদের ওপর—আমরা লড়াই করলাম—'

—'চুপ কর'! টারজান ধমক দিল, 'যা ঘটেছে আমি সব দেখেছি। মানুষগুলো ভালো না মন্দ সে খবর না নিয়েই তোমরা পালিয়েছ। সত্যি কথা বলতে শেখ।'

—'আ—আমরা জানতাম ওরা খারাপ।' গোলোবা বলল, 'গ্রামবাসীরা আগেই আমাদের বলেছিল। ওরা আমাদের ধরে চালান করবে।'

—'আর কি বলেছে ঐ গ্রামবাসীরা?' টারজান জানতে চাইল।

—'ঐ দলটির নেতা একজন সাদা মানুষ।'

—'হুঁ। এটাই জানতে চাইছিলাম।' বলল টারজান।

—'এবার আমরা যেতে পারি কি?' গোলোবা বলল। 'ঐ লোকগুলো হয়ত আমাদের খোঁজে আসছে!'

—'না, ওরা এদিকে কেউ আসছে না।' অভয় দিল টারজান। 'আমি দেখেছি ওরা পশ্চিমে ফিরে গেল তোমাদের প্রভুকে বন্দী করে। এখন বল তো তোমাদের ঐ প্রভুটি কে? ও কি করতে এসেছে এখানে?'

গোলোবা বলল, 'উনি রাশিয়া থেকে এসেছেন।'

—'কেন এসেছেন?'

—'তা ঠিক জানি না। শিকার করতে নয় নিশ্চয়ই। খাবারের প্রয়োজন ছাড়া উনি বন্দুকই ছোঁড়েন না।' জানাল গোলোবা।

—'আমার নাম উচ্চারণ করতে শুনেছ ওকে?' টারজান জানতে চাইল।

—'হ্যাঁ। উনি টারজানের কথা জানতে চান। গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করেন, বলতে পার টারজান কোথায়? কেউ দেখেছ কি তাকে? কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না।'

—'ঠিক আছে, যাও তোমরা।' টারজান পথ ছেড়ে দিল।

★

জঙ্গলের কয়েক মাইল উত্তরে ছোট্ট একটা নদীর ধারে তাঁবু গেড়েছেন পাসমোর। রান্নার আগুন জ্বলছে। সেই আগুন ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে দলের লোকজন, গল্পগুজব করছে।

পাসমোর খেতে বসেছেন। এমন সময় একটি সুন্দর চেহারার নিগ্রো দেখা করতে এল। পাসমোর বললেন, 'কি, কোন খবর আছে না কি?'

—'না বোয়ানা। পুব পশ্চিমে কোথাও কিছু নেই।' বলল ছেলেটি।

পাসমোর বললেন, 'তাহলে উত্তর দিকটাই দেখতে হবে।' আরো কি বলতে চাইছিলেন, বলা হল না। রাত্রির স্তব্ধতা চিরে দূর থেকে ভেসে এল মেশিনগানের গুলির আওয়াজ।

লোকজনেরা গল্প থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল। নিগ্রো ছেলেটি বলল, 'শুনলেন বোয়ানা! এ কিসের শব্দ?'

—'মেশিনগানের', বললেন পাসমোর।

—'দক্ষিণ দিক থেকে এল। কিন্তু কে এই রাত্তিরে মেশিনগান ছুঁড়ছে?' চিন্তায় পড়লেন পাসমোর।

দলের মোড়ল উঠে এসে বলল, 'খোঁজ করব, বোয়ানা?'

পাসমোর বারন করলেন। বললেন, 'কাল সকালে দেখা যাবে। এখন শুতে যাও সবাই। আর শোন, পাহারায় যারা আছে তাদের একটু সজাগ থাকতে বলো।'

—'ঠিক আছে, বোয়ানা।'

বন্দুকবাজ স্মিথকে বলছে, 'যাক বাবা, এতদিন হয়ে গেল, পুলিশ-টুলিশ কিছু দেখিনি।'

লাফায়েৎ স্মিথ হাসল। বলল, 'ভয় পাবার মত আরো কিছু আছে হে ড্যানি।'

—'পুলিশকে ভয় পাচ্ছি না কি আমি? কে বললে?'

এই বলে ড্যানি চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার বলয় ভাসিয়ে দিতে দিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'কতদিন বন্দুক ছুঁতে হয়নি।'

—'এবার বোধহয় ছুঁতে হবে।' বলল স্মিথ, 'ওগোনিয়ো যা শোনাল!'

—'কি, কি শোনাল?' জিজ্ঞাসা করল বন্দুকবাজ।

—'আমরা নাকি সিংহের পাড়ায় ঢুকে পড়েছি। ধারে কাছেই হয়তো দেখতে পাব। অবশ্য জঙ্গলে তারা বড় একটা আসে না। তবে খোলা মাঠের থেকে আমরা কিন্তু খুব দূরে নেই!'

ঠিক এই সময় একটা মৃদু গর্জন উঠল জঙ্গলের ধারে। তারপর সে গর্জন ক্রুদ্ধ চিৎকারে ভেঙ্গে পড়ল। সারা আফ্রিকার বন প্রান্তর যেন কেঁপে উঠল সে আওয়াজে।

দলের লোকেরা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সিম্বা! সিম্বা!' তারপর কাঠকুটো ফেলে আগুন বাড়িয়ে তুলল।

বন্দুকবাজ একলাফে তাঁবুতে ঢুকে তার মেশিনগানটা নিয়ে বেরিয়ে এল।

আবার সেই গর্জন। এবার আরো কাছ থেকে।

—'নাঃ, আমাদের পিছনেই লেগেছে দেখছি।' শুকনো মুখে স্মিথ বলল।

দলের লোকজন আগুন ঘিরে জড়সড় হয়ে বসে কাঁপছে। কয়েকজন পাহরাদার রাইফ্‌ল ধরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে।

ওগোনিয়োকে স্মিথ জিজ্ঞাসা করল, 'কোন দিকে সিংহটা?'

ওগোনিয়ো আঙ্গুল তুলে অন্ধকারের দিকে দেখাল।

অন্ধকারে একটা ঝোপ নড়ার আওয়াজ শুনল ড্যানি। সেদিকে তাক করে মেশিনগানের ট্রিগার টিপল—র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট···। বিকট শব্দে এক ঝাঁক গুলি ছুটল। আকাশে দূরে দূরে প্রতিধ্বনি উঠল র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট। তারপর চারদিক নিস্তব্ধ হলে একটা মৃদু ঝুপ করে শব্দ হল। ওগোনিয়ো ছাড়া কেউ সেটা বুঝতে পারল না। তারপর আর কিছু না।

—'বোধহয় খতম করে দিয়েছি।' বলল ড্যানি।

ওগোনিও বলল, 'না বোয়ানা, ও মরেনি। মনে হচ্ছে গায়েও লাগেনি ওর। লাগলে এদিকে তেড়ে আসত।'

স্মিথ চিন্তিত হল। বলল, 'কি মনে হয়, ওটা কি ফিরে আসবে?'

—'সিম্বা কি করবে কেউ বলতে পারে না।' বলল ওগোনিও।

ড্যানির কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস সিংহ ভয়ে এদিকে আর ঘেঁসবে না।

সিংহটা ক্ষুধার্ত ছিল। বুড়োও হয়েছিল। আগের মত জোর আর শরীরে নেই। দৌড়ে শিকার ধরতে পারে না। খাওয়াও তেমন জোটে না। জঙ্গলের ধারে মানুষের গন্ধ পেয়ে তাই সে লোভে লোভে এগিয়ে এসেছিল। তাঁবুর আগুনে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি দিয়ে বুঝল ওখানে রক্তমাংসের কটা প্রাণী রয়েছে। গন্ধে তার ক্ষিধেটা আরো চনমনে হয়ে উঠল। নিচু হয়ে খুব সাবধানে মাটিতে পেট ঘসে ঘসে সে এগোচ্ছিল, এমন সময় ড্যানির এই বন্দুকের আওয়াজ। তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক গুলি। চমকে উঠে সে পিছু হটে জঙ্গলেই পালিয়ে গেল।

স্মিথের তাঁবুতে আবার ফিরে এল রাত্রির নীরবতা। পালিয়ে গেল বটে, তবে সিংহটার ক্ষিধে তো আর মেটেনি! সে দূর থেকে চেয়ে রইল তাঁবুর আগুনের দিকে।

স্মিথের লোকজন যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, জন্তুটা ফের এগিয়ে এল ঠোঁট মুখ চাটতে চাটতে। চোখ জ্বলতে লাগল ধক ধক করে।

দলের একজন বন্দুকধারী পাহারায় বসে ঢুলছিল। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখল আগুনটা কমে এসেছে। হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়ে সে পিছন ফিরে শুকনো কাঠ জড়ো করতে লাগল। এই সময় সিংহটা তার ওপর লাফিয়ে পড়ল।

ঘাড়টা মটকে নিঃশব্দে টেনে নিয়ে চলে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু বয়সের ভারে চটপটে ভাবটা নষ্ট হয়ে গেছে জন্তুটার। লাফিয়ে পড়ার সময় ঘাঁক করে একটা মৃদু গর্জন বেরিয়ে গেল

তার গলা থেকে। সেই আওয়াজে সচকিত হয়ে গড়িয়ে সরে এল পাহারাদারটা। ড্যানিও একলাফে মেশিনগান নিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে সিংহের থাবা গেঁথে গেছে পাহারাদারটার কাঁধে। বিকট মুখে সে ঘাড় ধরবে এবার।

হৈ চৈ হট্টগোলে রাতের আকাশ কেঁপে উঠল। সবাই দেখল পাহারাদারকে টানতে টানতে ঝোপের দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে সিংহটা। ড্যানি বন্দুক ছুঁড়বে কিনা ঠিক করতে পারল না প্রথমে, পাছে পাহারাদারটার গায়ে লাগে। তারপর ভাবল এভাবে লোকটাকে তো সিংহের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না! এই ভেবে সে মেশিনগানটা কাঁধের ওপর তুলে ট্রিগার টিপল।

গুলির বিকট শব্দে সিংহটা বুঝল তার বিপদ। অথচ শিকার ফেলে যেতেও মন উঠছে না। এ অবস্থায় তার শরীরে প্রতিশোধের বাসনা জেগে উঠল। সে পাহারাদারকে ছেড়ে দিয়ে ড্যানির দিকে তেড়ে এল।

তাই দেখে স্মিথও তার রিভলবার নিয়ে স্মিথের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কুলির দল জড়ামড়ি করে দূর থেকে দেখছে কি আছে তাদের ভাগ্যে।

ভাগ্য সত্যিই মন্দ। একটা ফাঁকা কার্তুজ বন্দুকের নলের মুখে বেকায়দায় আটকে গেল। ট্রিগার টিপল ড্যানি, কিন্তু খট্ করে একটা আওয়াজ হল শুধু। গুলি বের হল না।

ড্যানি বুঝল এবার নিশ্চিত মৃত্যু। অসহায় ভাবে টানাটানি করছে সে বন্দুকের ট্রিগার। এ অবস্থায় স্মিথও ভুলে গেল তার রিভলবার ছুঁড়তে। সিংহটা থাবা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর।

চোখের নিমেষে কোত্থেকে আর একজন ঝাঁপিয়ে নেমে এল সিংহের সামনে। স্মিথের পিছনে গাছটির ডালপালা দুলে উঠল শুধু। একজন বলিষ্ঠ সাদা মানুষ, ব্রোঞ্জ দিয়ে গড়া যেন তার শরীর। হাতে একটা বর্শা।

সিংহটাও লাফিয়েছে, লোকটিও বর্শার ফলা ঢুকিয়ে দিয়েছে জন্তুটার বুকে। তারপর দারুণ ক্ষিপ্রতায় লোকটা পাশে সরে গিয়ে সিংহের কাঁধে চেপে বর্শাটা আরো ঢুকিয়ে বসিয়েছে বুকের মধ্যে। লোকটির দুই পা সাঁড়াশির মত আটকে আছে সিংহটার ক্ষুধার্ত, রুগ্ন পেটে।

সিংহটা এক ঝটকায় লোকটাকে ফেলে দিতে চাইল। কিন্তু পারল না। রাগে আর যন্ত্রণায় মাটিতে শুয়ে পড়ে পিষে ফেলতে চাইল তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। শুরু হল মানুষ আর সিংহের প্রচণ্ড ঝটাপটি।

সিংহের গর্জনে শুধু নয়, সেই গা-খোলা, মত্ত বুনো মানুষটার গর্জনেও আকাশ বাতাস কাঁপতে লাগল। সেই সঙ্গে কুলিদের ভয়ার্ত চিৎকার।

স্মিথ আর ড্যানি মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইল শুধু।

লড়াই কিন্তু বেশিক্ষণ চলল না। সিংহের বুকের বর্শাটা তার ফুসফুস ছ্যাঁদা করে দিয়েছে। সে আর নড়তে পারল না। নির্জীব হয়ে ঢলে পড়ল মাটিতে।

সিংহের ঘাড় থেকে নেমে এল মানুষটি। বর্শাটা উপড়ে ফেলল জন্তুটার বুক থেকে। তারপর হাত পা ছাড়িয়ে নিয়ে রাতের আকাশে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আহত পাহারাদারকে দলবল তখন শুশ্রূষা করছে আর চেয়ে দেখছে অদ্ভুত মানুষটিকে।

আবার স্তব্ধ চারদিক। স্তব্ধ রাতের আফ্রিকা।

লোকটি স্মিথ আর ড্যানিকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কে? কি করছ এখানে?'

বুনো লোকটার মুখে ইংরিজি কথা শুনে অবাক হল ড্যানি আর স্মিথ।

স্মিথ তাড়াতাড়ি বললে, 'আমি ভূ-তাত্ত্বিক। নাম লাফায়েৎ স্মিথ। এ আমার বন্ধু ড্যানি প্যাট্রিক। আমি এসেছি এখানকার পাহাড় মাটির গবেষণার কাজে।'

বুনো লোকটি ড্যানির মেশিনগানটা দেখিয়ে বলল, 'এটাও কি গবেষণার কাজে লাগবে?'

স্মিথ বলল, 'না। আমি ওটা আনতে বারণই করেছিলাম।'

ড্যানি বলল, 'শুনলাম আফ্রিকায় মানুষখেকোরা থাকে তাই—'

লোকটি বলল, 'এটা দিয়ে হরিণ ছাড়া আর কিছু মারা যাবে বলে মনে হয় না।'

—'কি ভাবছ তুমি আমায়?' গলা চড়িয়ে বলল ড্যানি। 'নেহাৎ বন্দুকের মুখটা জ্যাম হয়ে গেল। নইলে সিংহটাকে দেখিয়ে দিতুম।'

বুনো মানুষটা মৃদু হেসে বলল, 'শিকারের কাজে এটা চলে না, বুঝেছ?' তারপর স্মিথের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার গবেষণা কোথায় চলছে?'

স্মিথ বলল, 'আমরা ঘেন্‌জি পাহাড়ের দিকেই যাব।'

ড্যানি বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি কে হে? এত সব জেনে তোমার কি হবে?'

বুনো মানুষটি ড্যানির কথায় কানই দিল না। সে স্মিথকে বলল, 'ঘেনজির দিকে যাচ্ছ, সাবধান হয়ো। একদল দাস-ব্যবসাদার ঢুকে সেখানে উৎপাত করছে। তোমার দলের লোকজন জানতে পারলে কাজ ছেড়ে পালাবে।'

স্মিথ ধন্যবাদ জানাল লোকটিকে। তারপর আশপাশ দেখে নিয়ে আরো কিছু বলতে যাবার আগেই দেখল মানুষটি নেই। মাথার ওপর ডালপাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ড্যানি আর স্মিথ হতবাক হয়ে চেয়ে রইল এ ওর মুখের দিকে। সম্বিত ফিরতে ড্যানি চেঁচাল, 'ওগোনিও!'

ওগোনিও কাঠ হয়ে বসেছিল এতক্ষণ। উঠে দাঁড়াল।

—'কে? কে এই বুনোটা?'

—'হুজুর উনি টারজান।' বলল ওগোনিয়ো।

★

মরা আগুন-পাহাড়ের পায়ে মিডিয়ান দেশের উপত্যকা। সে উপত্যকা নেমে এসেছে হ্রদের মুখে। বারবারা কোলিস নেমে আসছে সেই জলের ধারে। সঙ্গে আব্রাহাম আর জেজেবেল। পিছনে আসছে পূজারী পাদ্রীর দল একটা মেয়েকে ঘিরে। তাদেরও পেছনে মিডিয়ান গ্রামবাসীদের দীর্ঘ সারি।

বারবারা এখন এদের ভাষা বোঝে। তাছাড়া এদের হাবভাব আর আচরণে সে অনেক কিছুই টের পেয়েছে। সে বুঝতে পারছে আব্রাহাম লোকটি তাকে আর তেমন বিশ্বাস করছে না। সে বুঝেছে আদিম সংস্কার আর প্রবৃত্তি এদের গ্রাস করে আছে। ধর্মের নামে এদের নিষ্ঠুরতা বারবারার কাছে আর অজানা নেই। সে বোঝাতে চায় এসব প্রথা ভুল। আব্রাহাম তা মেনে নেবে কেন? তাহলেই তো তার কর্তৃত্ব থাকবে না।

বারবারাকে সে রোজ দেখে। লক্ষ্য করে তার চালচলন। তার স্বর্গীয় মহিমা আব্রাহাম আর মনে মনে স্বীকার করে না। বরং সে তার ক্ষমতা আর দম্ভ দেখাতে চায় আজ বারবারাকে। বোঝাতে চায় ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা আব্রাহামের রক্ততৃষা কত ভয়ানক! কোনো পাপীকে সে ক্ষমা করে না। তাই সে টেনে নিয়ে আসছে একটি মেয়েকে চিনেরেথের জলে ডুবিয়ে মারতে। এই ভাবেই নাকি স্বয়ং জিওভার ক্রোধের প্রকাশ ঘটে আব্রাহামের মধ্য দিয়ে। কি দোষ মেয়েটির? তার মুখে হাসি দেখা গিয়েছিল! এতো জিওভার অপমান। সে অপমানের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

বারবারা বোঝাতে চায় আনন্দের প্রকাশে পাপ নেই। জেজেবেল ইংরিজি শিখেছে। সে বারবারাকে ইংরিজিতে বলে, 'এসব বোল না। আব্রাহাম রেগে গেলে আর রক্ষে নেই।' আরও বলে, 'জানো, আমার ওপরেও ওর বরাবরের রাগ। আমাকেও হয়ত একদিন এই শাস্তি পেতে হবে।'

মিছিল পৌঁছে গেছে জলের ধারে। জমাটবাঁধা উঁচু নিচু লাভার মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। মন্ত্র উচ্চারণ থামিয়ে আব্রাহাম হাঁকল, 'চিনেরেথের জলে ধুয়ে যাক এর সমস্ত পাপ। মিডিয়ান দেশ পাপমুক্ত হোক!'

একটা বিশাল জাল দিয়ে মুড়ে ফেলা হল পাপী মেয়েটিকে। তারপর তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল ভারি একটা লাভা পাথর। আব্রাহাম হাত তুলতেই ফের মন্ত্রোচ্চারণে মুখর হয়ে উঠল চারদিক। সবাই হাঁটু মুড়ে বসল। শান্ত মুখে মাথা নিচু করে বসে আছে মেয়েটি জালের মধ্যে। চোখ বেয়ে নেমে আসছে জলের ধারা।

তারপর আব্রাহামের ইশারায় চারজন যুবক জালের দুই প্রান্ত ধরে দোলাতে লাগল মেয়েটিকে জলে ফেলবে বলে। আর্ত চিৎকারে জালের মধ্যে ছটফট করতে লাগল মেয়েটি। সেই চিৎকার শুনে উত্তেজনায় চারজন যুবকের একজন হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগল। মেয়েটিকে ঠিকমত ছোঁড়া হল না। জলে না পড়ে একটা পাথরে আছড়ে পড়ল সে। এই দেখে একজন পাদ্রীও ধপ করে পড়ে জ্ঞান হারাল। আব্রাহাম সেদিকে ফিরেও তাকাল না। সে তখন আর একজন যুবককে ইশারায় ডেকে জালটা কুড়োতে আদেশ করছে। তার রাগ দেখে কে!

আবার জালে মোড়া হল মেয়েটিকে। জাল দুলিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হল। মেয়েটি জলে ডুবে গেল জাল সুদ্ধ। চারদিক নিশ্চুপ। মেয়েটিরও আর্তনাদ থেমে গেছে। শুধু মিছিলের অসুস্থ মানুষগুলোর মৃদু গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

বারবারা হঠাৎ রুখে উঠল। চিৎকার করে আব্রাহামকে বলল, 'খুনী কোথাকার! শীগগির জল থেকে তোল ওকে!' পরক্ষণেই আব্রাহামের রক্তচক্ষু দেখে বারবারার শরীর হিম হয়ে এল।

—'চুপ কর পাপী! এরপর তোর পালা!' চেঁচাল আব্রাহাম।

জেজেবেল কাতর হয়ে ইংরিজিতে বলল, 'বারবারা, ওকে রাগিও না! ও তোমায় মেরে ফেলবে!'

কিছুক্ষণ পর মেয়েটিকে তোলা হল। সে তখনও নড়াচড়া করছে। তাই দেখে ফের ডুবিয়ে দেওয়া হল তাকে।

বারবারা নতজানু হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করতে বসল। করুণ মিনতিতে তাকাল আব্রাহামের দিকে। বলল, 'হে আব্রাহাম, ওকে মেরো না।'

মেয়েটির অসাড় দেহটা তুলে ফেলা হয়েছে পাথরে। আব্রাহাম বলল, যদি ওর পাপ মোচন হয়ে থাকে ও উঠে বসবে। আর ও যদি মরে গিয়ে থাকে তবে তা জিওভারই ইচ্ছা। জয় জিওভা!'

বারবারার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে বলল, 'ও মরে গেছে আব্রাহাম।'

—'বললাম তো তা জীওভারই ইচ্ছায়।' আব্রাহাম জানাল গম্ভীর স্বরে।

—'কিন্তু জিওভার ইচ্ছায় ও ফের জীবন ফিরেও তো পেতে পারে? পারে না?'

—'ইচ্ছা করলে সবই পারেন জিওভা।' বলল আব্রাহাম

—'কিন্তু এ পাপীকে তিনি মার্জনা করবেন না।'

বারবারা বলল, 'কিন্তু জিওভা আমার ওপর প্রীত। তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। এ মেয়ে জীবন ফেরত পাবে, আব্রাহাম!' এই বলে আব্রাহামকে আর কোন সুযোগ না দিয়ে বারবারা এগিয়ে এল মেয়েটির দিকে। জেজেবেলকে ডাকল। ইশারায় বলল প্রার্থনায় বসতে। জলে ডোবা মানুষকে বাঁচাবার কায়দা ভালই জানত বারবারা। সে প্রাণপণে চেষ্টা চালাল মেয়েটির শরীর থেকে জল বার করতে। সেই সঙ্গে মন্ত্র পড়ার ভান করতে লাগল তার মুখস্থ কবিতার লাইন আউড়ে। টেনিসনের কবিতা, আজব দেশে অ্যালিসের ছড়া, লিঙ্কনের ভাষণ, যা মনে পড়তে লাগল তাই সে উদাত্ত স্বরে আউড়ে গেল। ক্লান্ত হয়ে সে যখন বসল তখন মেয়েটির নিস্পন্দ শরীরে একটু একটু করে প্রাণ ফিরে আসছে। এবার বারবারা দৃপ্ত ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়িয়ে সেই যুবকদের আদেশ করল, 'জাল পাত! মেয়েটিকে শুইয়ে দাও।'

অবাক বিস্ময়ে আদেশ পালন করল যুবকেরা।

—'যাও, একে এর বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এস।' এই বলে জিজেবেলকে নিয়ে সে গম্ভীর মুখে ফিরে চলল। ফিরেও তাকাল না আব্রাহামের দিকে।

রাত নামে। মস্ত চাঁদ উঠে জ্যোৎস্নায় ভাসিয়ে দেয় মিডিয়ান দেশ। বারবারা আর জেজেবেল তাদের গুহার দরজায় চুপ করে বসে থাকে আকাশের দিকে চেয়ে। জেজেবেল বলে, 'কি সুন্দর রাত! আচ্ছা বারবারা, তোমার দেশেও এমন রাত নামে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার দেশেও এমন নিষ্ঠুর মানুষ আছে?' জানতে চায় জেজেবেল।

—'মানষ থাকলেই নিষ্ঠুরতা থাকবে।' বলল বারবারা। তবে আমার দেশের মানুষ এত ভয়ঙ্কর নয়। এখানে ধর্মের নামে একি জঘন্য অত্যাচার!'

জেজেবেল বলল, 'এরা বলে পাহাড়ের ওদিকের মানুষ-গুলো নাকি ভীষণ নিষ্ঠুর।'

—'ওদিকের মানুষদের দেখেছ তুমি?' বারবারা জানতে চাইল।

—'হ্যাঁ,' ঘাড় নাড়ল জেজেবেল। 'দারুণ সুন্দর দেখতে। মাঝে মাঝে আসে ওদের হারানো ছাগল খুঁজতে। আমাদের লোকেরা ওদের দিকে পাথর গড়িয়ে দেয়, ধরে নিয়ে মেরে ফেলে। ওরাও আমাদের লোকদের ধরলে মেরে ফেলে। আমি চাই পাহাড়পারের ঐ লোকেরা আমায় ধরুক।'

—'সে কি, মেরে ফেলে যদি?'

—'না, মারবে না। ওরা আমায় ভালবাসবে।' বলল জেজেবেল তার সোনালী চুলে হাত বোলাতে বোলাতে। 'আর তাছাড়া মারলেই বা কি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে চলে জেজেবেল, 'এখানে এইভাবে পড়ে থাকার চেয়ে মরাই ভাল। কোন দিন তো আব্রাহামের হাতেই মরতে হবে। আর নয় তো ও আমাকে ওর অন্য পাপীদের সঙ্গে গুহায় বন্দী করে রাখবে।'

—'মনে হয় এখন তোমার গায়ে হাত দেবে না আব্রাহাম। লোকেরা জেনেছে আমার ক্ষমতার পরিচয়। আমার দেশের লোক যদি আমায় কোনদিন উদ্ধার করতে আসে তুমি আমার সঙ্গে থেকো। ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাব তোমায়।'

জেজেবেলের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কার যেন পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। বারবারা তার অস্ত্র, সেই ছোট্ট ছুরিটা, পকেট থেকে বের করে উঠে পড়ল নিঃশব্দে। একটি লম্বা ছায়া পড়ল গুহার দরজায়। আব্রাহাম এসেছে।

বারবারা ওর মুখোমুখী দাঁড়াল। রাগী চোখমুখে আব্রাহাম বলল, 'জিওভার আদেশে তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় এসেছি। তুমি ভণ্ড, ছল-চাতুরিতে ভোলাতে পার তুমি। কিন্তু আমি ভুলব না তোমার জাদুতে!'

বারবারা বলল, 'জাদু বলছ কেন? তুমি শোননি

জিওভার প্রতি আমার প্রার্থনা? সেই প্রার্থনাই তো প্রাণ দিল পাপীকে!'

—'না, হতে পারে না!' কাঁপতে থাকে আব্রাহাম। 'জিওভা আমায় এইমাত্র ফিসফিস করে বললেন—নতুন মেয়েটি অসৎ, মেয়েটি পাজি।'...হাঁপাতে থাকে বুড়ো আব্রাহাম।

বারবারা হেসে বলল, 'ভুল শুনেছ এসব। নয় মিথ্যা বলছ।'

গর্জন করে উঠল আব্রাহাম, 'আমি মিথ্যুক? আচ্ছা, আচ্ছা, কালই তোমার বিচার হবে চিনেরেথের জলে। সাধ্য থাকে দেখিও তোমার ক্ষমতা। জালে মুড়ে পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দেব তোমায়, কে তোলে দেখব!'

রাগে কাঁপতে থাকে আব্রাহাম।

লিওন স্ট্যাবাচ বন্দী হয়ে চলেছে ভাগ্যের অজানা পথে। সে বুঝতে পারছে যে কোনো ছুতোয় তার প্রাণ উড়িয়ে দিতে পারে এরা। কেউ বাঁচাতে আসবে না তাকে। যদি মোটা টাকার বিনিময়ে প্রাণে না মেরে এরা তাকে ছেড়ে দেয়! কিন্তু তেমন ভরসা স্ট্যাবাচ পায় না।

কুলিদের ফেলে যাওয়া মালপত্র লুঠ করে সব চাপানো হয়েছে ঘোড়াগুলোর ঘাড়ে। তাই তেমন জোরে চলতে পারছে না তারা। একটা সরু পাথুরে রাস্তা বেয়ে পাক খেয়ে উঠছে তারা ধীরে ধীরে। স্ট্যাবাচ দেখতে পেল দূরে একটা বেড়ায়-ঘেরা ছোট্ট গ্রাম। কাছাকাছি আসতেই পাহারাদারেরা অভিবাদন জানিয়ে দলটির দিকে এগিয়ে এল।

স্ট্যাবাচের ঘোড়া এগিয়ে চলল উৎসুক জনতার মধ্যে দিয়ে। সকলেই আধা-সভ্য কালো মানুষ। চারধারে কুঁড়েঘর, মাঝে একফালি উঠোন। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে গালভরা গোঁফ-দাড়ি, বেঁটেখাটো একটি সাদা মানুষ। স্ট্যাবাচ খানিকটা আশ্বস্ত হল। সাদা মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুবিধা অনেক। প্রাণে বাঁচার চেষ্টা তাকে করতেই হবে।

সবাই ঘোড়া থেকে নামল। স্ট্যাবাচকেও নামিয়ে অবজ্ঞা ভরে একজন ঠেলে দিল সেই সাদা মানুষটির দিকে। দলটির যে মোড়ল সে ব্যাখ্যা করে সব বোঝাতে লাগল সাদা মানুষটিকে, কোথায় কি ভাবে স্ট্যাবাচকে পাওয়া গেছে। এসব ভাষা অবশ্য স্ট্যাবাচ কিছুই বুঝল না। সে শুধু বুঝল, এই দাড়িওলা সাদা লোকটিই লুঠেরাদের নেতা। লোকটি এগিয়ে এসে ইটালী ভাষায় স্ট্যাবাচকে সম্ভাষণ জানাল। এ ভাষা স্ট্যাবাচ বোঝে না। সে রুশ ভাষায় জবাব দিল। দাড়িওলা লোকটিও সে-ভাষা বুঝতে পারল না। তখন তারা ইংরিজিতে কথাবার্তা শুরু করল। লোকটি বলল, 'আমি অল্প ইংরিজি জানি, তাতেই কাজ চালাতে পারব। তুমি কোন দেশ থেকে আসছ?'

স্ট্যাবাচ বলল, 'আমি একজন বিজ্ঞানী। আমি রাশিয়া থেকে আসছি।'

—'রাশিয়া তোমার দেশ?'

—'হ্যাঁ।' বলল স্ট্যাবাচ।

লোকটি অনেকক্ষণ চেয়ে রইল স্ট্যাবাচের দিকে। যেন মনের গোপন কথা ধরার চেষ্টা করছে। স্ট্যাবাচ লক্ষ্য করল, দাড়ি-গোঁফের আড়ালে তার নির্দয় দুটি ঠোঁট আর ধূর্ত দুই চোখ।

লোকটি স্থির দৃষ্টিতে বলল, 'রাশিয়ার লোক? লাল না সাদা?'

সত্যি কথাটা বলবে কিনা ভাবতে লাগল স্ট্যাবাচ। সে জানে ইটালীর লোক লাল রাশিয়ানদের পছন্দ করে না। আবার মনে হল, এর মনে যদি টাকাকড়ি আদায়ের মতলব থাকে তবে তা প্রশ্রয় দিতে হবে প্রাণে বাঁচার জন্য। তখন লাল রাশিয়ান এই সত্যিকার পরিচয়টাই কাজে লাগবে বেশি। তাই সে সত্যি কথাটাই বলল।

একটু যেন বন্ধুত্বের হাসির আভাস দেখা গেল দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে। জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি কমরেড?'

—'লিওন স্ট্যাবাচ। তোমার?'

—'ডোমিনিক কাপিয়েত্রো।' বলল লোকটি। 'ভিতরে এসো, কথা আছে।'

প্রথমেই স্ট্যাবাচের এই কষ্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল ক্যাপিয়েত্রো। বলল, 'বড় দীন হীন আমার জীবন। তবু জেনো মাটির বুকে এভাবে ঘর বাঁধার মত সুখ আর নেই।' তারপর মদের বোতল খুলে বাড়িয়ে দিল স্ট্যাবাচের দিকে।

স্ট্যাবাচ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। মদের বোতল দেখে তার উৎসাহ দেখে কে! বড় একটা চুমুক মেরে বলল, 'বল এবার, কেন আমায় ধরে আনলে। কি করবে আমায় নিয়ে?'

—'আমার দলের মোড়লটি বলল তুমি বন্ধু না শত্রু বোঝা যাচ্ছে না বলে ওরা ধরে নিয়ে এসেছে। তবে ডোঙ্গো আজকের মোড়ল, তাই খুব বেঁচে গেছ। অন্য কেউ হলে তোমায় আগে খুন করত, পরে খোঁজ করত তুমি বন্ধু না শত্রু। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। অত্যাচার নীরবে সহ্য করে

করে ওরা মানুষের প্রতি এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। তবে ওদের শক্তি আর আমার বুদ্ধি, এই দুইয়ে মিলে আমার দলের কাজ চলছে ভালই। লাভ যা থাকে তা দু ভাগ হয়। এক ভাগ ওদের অর্থাৎ শক্তির আর এক ভাগ আমার অর্থাৎ বুদ্ধির।'

—'কি কাজ তোমাদের?' জানতে চায় স্ট্যাবাচ।

—'অত জানতে চেও না।' শান্ত গলায় জানাল কাপিয়েত্রো।

স্ট্যাবাচ বলল, 'ঠিক আছে, অত জানার দরকার নেই।' এই বলে মদের বোতলটা প্রায় খালি করে ফেলল।

কাপিয়েত্রো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বোতলে চুমুক দিয়ে বলল, 'আর তুমি দূর রাশিয়া থেকে এই আফ্রিকায় জুটেছ কেন তা তোমার ইচ্ছে না হলে বোল না।'

স্ট্যাবাচের এখন মত্ত অবস্থা। সে এক হাতে বোতল আর এক হাতে কাপিয়েত্রোর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি আমার প্রাণের বন্ধু! তোমার কাছে কিছুই লুকোব না আমি।'

—'বেশ বেশ।' বলল ক্যাপিয়েত্রো। 'তবে আগে শোন আমার কথা।'

স্ট্যাবাচ কাঁপা গলায় বলল, 'বলো বন্ধু, বলো।'

কাপিয়েত্রো বলল, 'যুদ্ধ করতাম আমি, ইটালীর যোদ্ধা। মনে আমি ঘোর সাম্যবাদী। একজন ফ্যাসিস্ট কি করে সব জেনে গেল। ফলে বন্দী হলাম। তারপর কোন রকমে পালিয়ে এলাম আবিসিনিয়ায়। সেখানে সৈন্যদল তৈরির কাজে চাকরি পেলাম। আমহারিক ভাষা, গালাদের ভাষা সব শিখে নিলাম। সৈন্যদের কানে আমার মন্ত্র দেবার চেষ্টা করতেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি হল। সেখান থেকেও পালালাম। পালাবার সময় দল ভেঙ্গে কিছু লোককে নিয়ে এলাম। সঙ্গে ছিল কিছু ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র! এসব নিয়ে ভিড়ে পড়লাম লুঠেরার এই দলটার সঙ্গে। লুঠপাট করব এমন শাঁসালো লোকটোক এধারে তেমন জোটে না। তাই লোভে লোভে ঘেনজির ধারে এসে ঘাঁটি গাড়লাম এখানে কালো মুক্তো ধরব বলে।'

—'কালো মুক্তো?' শুধালো স্ট্যাবাচ।

—'হ্যাঁগো, দুপেয়ে মুক্তো!' হাসতে থাকে কাপিয়েত্রো।

স্ট্যাবাচ বলল, 'বুঝেছি, তুমি কালো মানুষ বিক্রি করতে লাগলে!'

—'ঠিক তাই।' বলল কাপিয়েত্রো, 'আমি দলের নেতা। এখন বল বন্ধু, তোমার বিজ্ঞান-সাধনার কথা।'

—'নৃ-তত্ত্ব সাধনা বলতে পার।' মৃদু হেসে বলল স্ট্যাবাচ। 'আমি একটা মানুষকে খুঁজছি।'

—'এতদূর এসেছ মোটে একটা মানুষের জন্যে?' শুধালো কাপিয়েত্রো।

—'হ্যাঁ, একটাই মানুষ। ঘেনজির দক্ষিণে তার বাস।' বলল স্ট্যাবাচ।

মদের ঘোরে না থাকলে স্ট্যাবাচ হয়ত এত বেশি মুখ খুলত না। কিন্তু সে সব কিছুই বলে ফেলল।

—'আমি একজন ইংরেজকে খুঁজতে এসেছি। বুনো মানুষদের মধ্যে টারজান বলেই তার পরিচয়।'

কাপিয়েত্রো ভুরু কোঁচকালো। 'তোমার বন্ধু নাকি?'

—'আগে বল, তুমি জানো তাকে?' জানতে চাইল স্ট্যাবাচ।

কাপিয়েত্রো বলল, 'সে থাকে ঘেনজির সুদূর দক্ষিণে। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার কি দরকার?'

—'আমি মস্কো থেকে আসছি তাকে খুন করতে।' স্ট্যাবাচ বলল।

—'যাক বাঁচালে'। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কাপিয়েত্রো।

তাই শুনে স্ট্যাবাচ বলল, 'কেন, তোমার তাতে কি আসে যায়?'

—'আরে তার জ্বালায় আমার কারবার উঠে যাবার জোগাড়। মানুষ ধরা বড় দায় হয়ে পড়েছে ওর জন্যে।' বলল কাপিয়েত্রো।

স্ট্যাবাচ বলল, 'তাহলে তোমার সাহায্য চাই কমরেড। আমার দলের সব লোক পালিয়েছে। তাকে মারতে হলে কিছু লোকজন চাই যে।'

কাপিয়েত্রো বলল, 'তোমার জিনিসপত্র সব ফেরত দিয়ে দেব। আর লোকজন আমিই জোগাড় করে দেব। কোন চিন্তা নেই।'

ঘেনজির পশ্চিম প্রান্ত ধরে পাসমোরের দলবল এগিয়ে চলেছে উত্তরের দিকে। সুসজ্জিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ তাঁর দল। সুনিয়ন্ত্রিত যুদ্ধের সৈনিকদের মত চলেছে তারা। ইসাজা নামে একটা খুদে ছেলে আছে, সে পাসমোরের খুব প্রিয়। দলের রান্নাবান্নার কাজ চালায় সে। আর পুবদিকে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে আর একটি দল, দুজন সাদা মানুষের সঙ্গে। এই ধরনের অভিযানে ড্যানি প্যাট্রিক আর লাফায়েৎ

স্মিথ তেমন অভ্যস্ত নয়। সেই অনভ্যাসের ছাপ যেন দলের ওপর স্পষ্ট।

ড্যানি বলছে, 'কি যে হবে এত পাহাড় বেয়ে।'

স্মিথ বলল, 'পাহাড়ের স্তর পরীক্ষা করে লক্ষণগুলো বার করতে হবে। পাহাড় যখন আমাদের কাছে আসবে না, আমরাই বরং ওদের কাছে যাই!'

ড্যানি তবু গজগজ করে।

তারা একটা পাহাড়ী নদীর ধারে এসে পড়ল। তার পাশেই জঙ্গল। মাঝে খানিকটা খোলা জায়গা।

স্মিথ বলল, 'ড্যানি, এখানে তাঁবু ফেলা যাক। তুমি কদিন শিকার টিকার কর, আর আমি পাহাড়গুলোর গড়ন নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করি। তারপর ফের এগোনো যাবে।

ড্যানি বলল, 'এখনই পাহাড় দেখতে বেরোবে? একটা বন্দুকধারীকে সঙ্গে নিও।'

স্মিথ বলল, 'আমি শিকারে যাচ্ছি না ড্যানি।' এই বলে ওবাম্বি বলে দলের একজন লোককে নিয়ে এগিয়ে চলল সে।

ঘন কাঁটাঝোপের জঙ্গল ভেঙ্গে উঠতে লাগল দুজনে। যত ওঠে তত নেড়া লাগে চারদিক। তারপর শুধু পাথুরে জমি। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে স্মিথ। পাথর, মাটি পরীক্ষা করছে। ওবাম্বি রয়েছে পায়ে পায়ে।

একসময় একেবারে চুড়োয় এসে দাঁড়ায়। সেখান থেকে পর্বতমালার বিশাল বিস্তার দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় তার। সামনেই একটা গভীর গিরিখাত। ওপারে পরের পাহাড়টা। ওটার চুড়োতেও তার যাওয়া প্রয়োজন বলে মনে হল।

ওবাম্বি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল পাথুরে জমিতে। স্মিথকে বিশ্রাম নিলে চলবে না। ওবাম্বি অবাক হয়ে ভাবছে স্মিথের নিশ্চয়ই মাথার গণ্ডগোল। কি আছে এই পাথুরে পাহাড়ে? এত কষ্ট করে শুধু পাথর দেখে বেড়িয়ে লাভটা কি সে বুঝতে পারে না।

স্মিথ ওবাম্বির দিকে তাকাল। বুঝল এ বেচারাকে শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছে। কোন কাজে লাগবে না ছেলেটি। তাই বলল, 'ওবাম্বি, তুমি বরং তাঁবুতে ফিরে যাও। এখন তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই।'

তাঁবুতে ফিরতে পারলে সে বাঁচে। তবু কর্তব্যবোধ বলে তো কিছু আছে। তার প্রভুকে একা ফেলে যেতেও তার মন চাইছে না।

স্মিথ বলে, 'চিন্তা করার কিছু নেই। আমি একটু পরেই ফিরব। তুমি এখন যাও।' কিছুটা ভাষায় কিছুটা আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে তাঁবুতে পাঠাল স্মিথ। তারপর সেই গিরিখাতে নামতে লাগল।

গিরিখাত পেরিয়ে পরের পাহাড়ের চুড়োয় উঠতে উঠতে অন্ধকার নেমে এল। আরো উঠতে লাগল স্মিথ। শেষ আলোটুকুও আকাশ থেকে মুছে গেল।

ভোরের আলো ফুটছে আফ্রিকায়। পুবদিকের অন্ধকার পাহাড়গুলোয় সকালের হাসি লেগেছে। টোঙ্গানি বেবুনদের প্রহরী একমনে চেয়ে আছে সেদিকে। পাহাড়ের নিচে খোলা জায়গায় তাদের রাজা জুগাস আর নারী পুরুষ টোঙ্গানিরা ঘুরছে। বাচ্চারা খেলা করছে।

নিচের পাহাড়ে দূরে কি একটা নড়ে উঠল। প্রহরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল একটা মানুষের মাথা। সে বুঝল একজন মানুষ, তাদের ভাষায় টারমাঙ্গানি, উঠে আসছে পাহাড় বেয়ে। সে বিপদ-সঙ্কেত জানাল না কারণ টারমাঙ্গানি এখনও অনেক দূরে। শুধু লক্ষ্য রাখল তার ওপর।

টারমাঙ্গানির সম্পূর্ণ দেহটা যখন দেখা গেল অবাক হয়ে চেয়ে রইল টোঙ্গানি প্রহরী। এ কেমন টারমাঙ্গানি, প্রায় বেবুনদের মতই নগ্ন যে! তার সাদা চামড়া দেখে প্রহরী বুঝল সে গোমাঙ্গানি নয়। তবে কিছুটা আশ্বস্ত হল, এই টারমাঙ্গানির হাতে আগুন-লাঠি নেই।

টারমাঙ্গানিও অনেক আগেই টোঙ্গানি প্রহরীকে দেখেছে। তবু সে স্বচ্ছন্দ পায়ে পাহাড় বেয়ে এগিয়ে আসছে।

টোঙ্গানি প্রহরী এইবার তীক্ষ্ণ চিৎকারে তার দলকে বিপদ-সঙ্কেত জানিয়ে দিল। জুগাস তার দলবল নিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারছিল। চমকে উঠল সে-চিৎকারে। সকলে ছুটোছুটি হুটোপাটি লাগিয়ে দিল।

সকলে মিলে দল বেঁধে টারমাঙ্গানির দিকে চেয়ে চেঁচাতে লাগল। টারমাঙ্গানি কিন্তু থামল না। এগিয়ে আসতে লাগল তাদেরই দিকে। জুগাস চেঁচাল তার টোঙ্গানির ভাষায় 'আমি জুগাস বলছি। ফিরে যাও তুমি!'

অচেনা মানুষটি একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর বেবুন-দের ভাষায় জবাব দিল, 'আমি বনমানুষদের টারজান। আমি তোমাদের ক্ষতি করতে আসিনি। এসেছি বন্ধুর মত।'

জুগাসের দল বিস্ময়ে হতবাক। তারা কোন টারমাঙ্গা-

নির মুখে তাদের ভাষা শোনেনি। তাছাড়া টারজানের নামও তারা শোনেনি কোনদিন।

টারজান আরো বলল, 'টারজান টোঙ্গানিদের সঙ্গে বাস করতেও চায় না। সে চায় টোঙ্গানিরা সুখে শান্তিতে থাকুক।'

জুগাস তবু চিৎকার করে ওঠে 'ফিরে যাও, ফিরে যাও, নয়তো মেরে ফেলব তোমায়।'

টারজান তবু উঠতে থাকে পাথর বেয়ে। বেবুনের দল ভয়ে চীৎকার করে পালাতে থাকে। টারজান উঠে আসে একটি পাহাড়ের চুড়োয়। সেখানে টোঙ্গানি মায়েরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে ছুট লাগায় আর একটা পাহাড়ের দিকে। পুরুষ টোঙ্গানিরা দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসতে থাকে। সেখানে দাঁড়িয়ে টারজান জুগাসকে বলে, 'জুগাস, এখানে অন্য কোন টারমাঙ্গানি দেখেছ কি? একটা বদমাস টারমাঙ্গানি অনেক-গুলো গোমাঙ্গানি নিয়ে ঘুরছে। তারা আগুন-লাঠি দিয়ে খুন করে। তোমাদের তারা মেরে ফেলবে। টারজান তাদের তাড়াবে বলে এসেছে।'

কিন্তু এসব কথা জুগাস ভাল করে শুনছেই না। সে ক্রমাগত গর্জন করছে আর মাটিতে মাথা ঘসে টারজানকে যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে। অন্য পুরুষ টোঙ্গানিরা কাঁধ উঁচিয়ে ল্যাজ পাকিয়ে অশান্ত মনে ঘোরাফেরা করছে।

জুগাস মাটি থেকে মাথা তুলে বিকট মুখে দাঁত খিঁচোলো। টারজানের মনে তবু ভয়ের চিহ্ন মাত্র নেই। যেন কিছুই হয়নি এই ভাবে সে ফের এগোতে থাকে।

টোঙ্গানিদের চীৎকার আর গালাগালে তখন কান পাতা দায়। ওদের ভিড়ের মধ্যে না গিয়ে টারজান একটা গিরি-খাতের দিকে এগোল। তেমন গভীর নয় সেটা। ওটা পেরিয়ে সে উঠে আসবে নির্জন পথ ধরে।

ও ঢাল বেয়ে নেমে আসছে, এমন সময় দেখল একটি টোঙ্গানি মেয়ে তার বালু অর্থাৎ বাচ্চাকে পিঠে নিয়ে বিহ্বল মুখে উঠে আসছে। আর তার পেছনেই নিচের ঝোপ থেকে বের হয়ে এল একটা চিতাবাঘ। টারজান সচকিত হয়ে তার বর্শা তুলে ধরল। এই দৃশ্য দেখে জুগাসের দল গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে দূর থেকে।

চিতাবাঘ টোঙ্গানিদের জাত-শত্রু, কখন কোথায় অতর্কিতে আক্রমণ করে ঠিক নেই। চিতাটা ততক্ষণে লাফ দিয়েছে টোঙ্গানি মেয়েটির ঘাড়ে।

টোঙ্গানি আর চিতা এত কাছাকাছি যে এ সময় বর্শা ছুঁড়লে টোঙ্গানির দেহেও গিঁথে যেতে পারে। কিন্তু টারজানের লক্ষ্য অব্যর্থ। বর্শার ফলা টোঙ্গানির মাথার একচুল ওপর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে চিতাটার দেহে গেঁথে গেল।

চিতাটা পড়ে গিয়েও অত সহজে হার মানবে না। তেড়ে এল টারজানের দিকে। টারজানও রুখে দাঁড়িয়েছে। জুগাসের দলবলের কয়েকটা টোঙ্গানি ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে চিতাটার দিকে। চিতাটা তাদের মধ্যে দুজনকে ধরাশায়ী করে ফের টারজানের দিকে এগিয়ে গেল। টারজান তৈরি ছিল। একটু নিচু হয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে তার বর্শার ফলা আমূল বিঁধিয়ে দিল চিতাটার বুকে। তীব্র গর্জন করে চিতাটা ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। রক্তমাখা বর্শাটা উপড়ে ফেলে টারজান একটা পা মৃত জন্তুটার দেহে তুলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

এবার জুগাস এগিয়ে এল টারজানের দিকে। না, মাটিতে সে আর মাথা ঠুকছে না। বন্ধুর মত এগিয়ে এসে বলল, 'টারজান, টোঙ্গানি বেবুনরা তোমার বন্ধু।'

—'জুগাস, আমিও তোমাদের বন্ধু।' বলল টারজান।

জুগাস বলল, 'আমরা একটা টারমাঙ্গানিকে দেখেছি। সঙ্গে অনেক গোমাঙ্গানি। তাদের সঙ্গে অনেক আগুন-লাঠি। মনে হয় তাদেরই তুমি খুঁজছ টারজান।'

—'ঠিক তাই।' জানাল টারজান। 'তারা কোন দিকে গেছে?'

জুগাস দেখিয়ে দিল সুদূর দক্ষিণে পাহাড় সারির পাদদেশে।

*

ভোরের আলোয় চিনেরেথের জল ঝকমক করছে। বারবারা ভাবছে এই সৌন্দর্যের তলে তলে কত না পাপের পাহাড় জমা হয়ে আছে। তাকে টেনে নিয়ে আসছে আব্রাহামের দলবল। পাদ্রীরা মন্ত্র উচ্চারণ করছে। জলের দিকে এগোতে এগোতে বারবারা ভাবছে এই অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত জাতির কথা। সে জেনেছে, নিজেদের মধ্যে বংশ বিস্তারের ফলে কোন এক পূর্বপুরুষের মৃগীরোগ এদের বংশধারায় অব্যাহত রয়ে গেছে। সামান্য উত্তেজনায় তারা জ্ঞান হারিয়ে, লুটিয়ে পড়ে, স্নায়ুর চাপ সহ্য করতে পারে না। আর ধর্মের কি বীভৎস রূপ! এদের না আছে লিখিত ভাষা, না আছে কোন মতামত। একজনের উৎকট ধর্মচিন্তার বিষময় ফল এরা মুখ বুজে ভোগ করে চলেছে, ভাবছে এটাই বিধির বিধান। ধর্মের কি নির্দয়, কদর্য বিকৃতি!

হ্রদের ধারে এসে পড়েছে বারবারা। আব্রাহাম চিৎকার করে মন্ত্র আওড়াচ্ছে আর ইশারা করছে সেই যুবকদের। তারা এগিয়ে এল জাল নিয়ে। বারবারা তার জামায় লুকানো ছুরিটায় হাত বুলিয়ে নিল একবার। বাঁচবার চেষ্টা তাকে করতেই হবে। সে জোর করে মুখে হাসি টেনে রেখেছে। বেদনার কোনো চিহ্ন সে প্রকাশ করবে না যা দেখে আব্রাহাম খুশি হয়।

আব্রাহাম হাঁক পাড়ল, 'জীওভার কাছ থেকে আমি ঘুরে এসেছি। তাঁর আদেশে এই পাপীর মৃত্যু হবে।'

এই শুনে অন্যদিনের মতই উত্তেজনায় মাটিতে পড়ে গেল কয়েকজন। বারবারা কিন্তু হেসে উঠল হো হো করে।

চমকে উঠল আব্রাহাম। কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হাসি! হাসি কিসের?'

বারবারা বলল, 'আমিও জিওভার কাছ থেকে ঘুরে এসেছি। তিনি বললেন আসল পাপী হচ্ছে এই আব্রাহাম!'

চোখ রাঙিয়ে আব্রাহাম আদেশ করল, 'ফেল ওকে জলে।'

জালে মুড়ে চারজন যুবক দোলাতে লাগল বারবারাকে। তারপর ছুঁড়ে দিল চিনেরেথের জলে।

গভীর মন্ত্রধ্বনি উঠতে লাগল পাদ্রীদের কণ্ঠে।

ঠিক এই সময় লাফায়েৎ স্মিথ অজানা প্রকৃতিকে জানার আনন্দে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে মিডিয়ান দেশের আগ্নেয় পাহাড়ের ঠিক উল্টো গায়ে। কত রকমের পাথর আর পাহাড়ের কত অভিনব গড়ন। সে জানে না যে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। ভাবছে সে তার তাঁবুর কাছাকাছিই আছে, চোখ মেলে একটু খুঁজে নিলেই হবে। ক্ষিদে তেষ্টা ভুলে সে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে মেতে আছে। পকেটে কটা চকোলেট ছিল তা শেষ করে সে আরো ওপরে উঠতে লাগল। সে জানে না একটা সিংহ তার পিছু নিয়েছে অনেকক্ষণ। জন্তুটা মানুষ-খেকো নয়, তার পেটে তখন ক্ষিধেও নেই। পাহাড়ের গায়ে স্মিথের ঘোরাফেরা দেখে কৌতূহলী হয়ে সে চুপিচুপি পিছনে পিছনে আসছে।

স্মিথ এসে দাঁড়িয়েছে একটা অদ্ভুত পাথরস্তম্ভের তলায়। সে স্তম্ভের গায়ে একটা ফাটল। স্মিথ এই জায়গাটার অবস্থান ভালো করে বোঝবার জন্য পিছনে তাকাতেই চোখাচোখি হল সিংহটার সঙ্গে। থমকে দাঁড়াল সে। সিংহটাও থমকে দাঁড়িয়েছে। দুজনে চেয়ে রইল দুজনের দিকে। স্মিথের কৌতূহলী চিন্তা তখন ফাটলটা ঘিরে। সে রিভলবারটা বের করে ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সরু লম্বা রাস্তা কতদূর বিস্তৃত হয়ে রয়েছে কে জানে। কে জানে কি রহস্য লুকিয়ে আছে এই পাথরের বুকে। সাবধানে এগিয়ে চলল সে। সিংহটাও পিছু নিল তার। কিন্তু পাথরের অদ্ভুত আকার দেখে ভূ-তত্ত্বের নেশায় স্মিথ এতই মশগুল হয়ে পড়ল যে ক্ষিধেতেষ্টার মত সিংহের ভয়টাও মন থেকে মুছে গেল। প্রকৃতির খোলা বই মেলে রয়েছে তার চোখের সামনে। সে পড়ে নিতে চায় তার প্রতিটি অক্ষর। কিছুক্ষণ এগোবার পর একটা মৃদু গর্জনে তার সম্বিত ফিরল। চেয়ে দেখে পিছনে সরু পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে সিংহটা। রিভলবারটা বের করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুলি ছুঁড়ল। দুড়ুম করে কান-ফাটানো আওয়াজ। সিংহটা চমকে উঠে একলাফে পিছন ফিরে উল্টোদিকে ছুটল। যাক বাবা, বাঁচা গেছে। আর ওটা জ্বালাতন করতে আসবে না।

পাথর দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল লাফায়েৎ স্মিথ। কিছুদূর এগিয়েই দেখে সামনে পথ আগলে ফের দাঁড়িয়ে আছে সিংহটা।

ওবাম্বি স্মিথকে একা ফেলে এসেছে, তাই ওকে একচোট বকাবকি করল বন্দুকবাজ ড্যানি। তার-পর মেশিনগানটা হাতে নিয়ে ওবাম্বির সঙ্গে বের হল স্মিথের খোঁজে। দলের আরো কজনকে নানা দিকে পাঠিয়ে দিল। নিজে চলল উত্তর দিকের পাহাড়ে।

বেলা বাড়ে। ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের তলায় ড্যানি তার খাবার দাবার নিয়ে বসল। যে পাহাড়টায় সে বসেছিল তার পিছন দিকেই নিচের জমিতে সেই বেড়ায়ঘেরা গ্রাম। ড্যানির দিকে পিঠ করে বসে আড়াল থেকে সেই গ্রামের দিকে চোখ রেখে বসেছিল টারজান।

সেই গ্রামের অঙ্গনে যে দুজন সাদা মানুষ পা ছড়িয়ে বসে অলস আরামে গল্প করছে, তারাই কি সেই লোক যাদের টারজান সন্দেহ করছে? এ ব্যাপারে টারজান এখনও নিশ্চিত নয়। যদিও আমরা জানি এরাই লিওন স্ট্যাবাচ আর ডোমিনিক কাপিয়েত্রো। টারজান এদেরই খুঁজছে।

তাদের কথাবার্তা কানে এল টারজানের। মদের বোতলে চুমুক দিয়ে স্ট্যাবাচ বলল, 'আমায় এবার বেরিয়ে পড়তে হবে তার খোঁজে।'

—'এত তাড়া কিসের?' বলল কাপিয়েত্রো, 'আরাম কর না আর কটা দিন।'

স্ট্যাবাচ বলল, 'আগে কাজ, পরে আমোদ-আহ্লাদ। সাদা জংলীটাকে মেরে আসি তারপর ফুর্তিসে আরো কিছু দিন এখানে কাটাব।'

—'বেঁচে ফিরবে তো?' শুধালো কাপিয়েত্রো।

—'পিটার জাবেরির হত্যার বদলা নিতেই হবে, কাপিয়েত্রো!' বলল স্ট্যাবাচ।

'—ঐ বুনোটা জাবেরিকে মেরেছে?' জিজ্ঞাসা করল কাপিয়েত্রো।

—'ঠিক তা নয়। মেরেছে একজন মহিলা। তবে বুনো-টাই আসলে দায়ী। সে জাবেরির সব কাজ ভেস্তে দিয়েছিল।' বলল স্ট্যাবাচ।

—'দেখো, তুমিও আরেকটা জাবেরি হয়ো না যেন। এসব বলছি, ঐ বুনো টারজানকে জানি বলেই। ভয়ানক শয়তান। অমানুষিক ক্ষমতা ধরে।' বলল কাপিয়েত্রো।

স্ট্যাবাচ বলল, 'তাকে একবার পেলে হয়! দেখলেই গুলি করব। আর সামনাসামনি সে ভাবে না পেলে কায়দা করে বন্ধু সেজে কাছে ঘেঁসব। তারপর—।' দাঁতে দাঁত ঘসতে লাগল স্ট্যাবাচ।

টারজানের কানে সবই পৌঁছাল। সে শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। আর সন্দেহ নেই, এদের খোঁজই করছে সে। একজন সেই রাশিয়ান, আর একজন লুঠেরা দলের সাদা নেতা।

সেই সাদা নেতার গলা ভেসে এল, 'টারজান মরলে আমি খুশি। আমার কথা ও জানতে পারলে, আমার এ ব্যবসাও ডুববে। যাই হোক স্ট্যাবাচ, আমি তোমায় কিছু লোকজন দেব। দেখো, কাজ হাসিল করতে পার কিনা।'

—'নিশ্চিন্ত থাকো বন্ধু—'

স্ট্যাবাচের কথা শেষ হল না। হুড়মুড় করে পাহাড়ের চাঙড় ভেঙ্গে পড়ল কোত্থেকে! চমকে উঠল ওরা।

—'সরে এসো শীগগির!' হাঁকল কাপিয়েত্রো! 'ধস নেমেছে, ধস!'

ওপর দিকে তারা তাকিয়ে যা দেখল তাতে তাদের মুখ হাঁ হয়ে গেল। মরিয়া হয়ে পাহাড়ের গায়ে ছোট একটা গাছের ডাল আঁকড়ে ঝুলে আছে খালি গায়ে, শুধু কোমরে একফালি চিতার ছাল জড়ানো একটা বুনো সাদা মানুষ।

—'টারজান!' বলল কাপিয়েত্রো।

—'ঠিক বলছ?' স্ট্যাবাচ জানতে চাইল!

ততক্ষণে পাহাড় থেকে আরো পাথর খসে পড়তে আরম্ভ করেছে। টারজানও খসে পড়ল নিচের দিকে। তারপর হুড়মুড় করে একটা আওয়াজ। দস্যুদের গ্রামের একটা কুঁড়ে ঘরের চাল ফুটো করে টারজান মেঝেয় পড়েই লাফিয়ে দাঁড়াল। সরাসরি মাটিতে পড়েনি বলে চোট লেগেছে সামান্যই।

সেই দিকে লক্ষ্য করে ছুটল কাপিয়েত্রো আর স্ট্যাবাচ। স্ট্যাবাচের হাতে রিভলবার। একটুও সময় নষ্ট করবে না সে। এমন সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

টারজানের সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। টারজান বুঝল মহা বিপদ। পিছনে চেয়ে দেখল বেড়ার প্রান্ত অনেকটা দূরে। একবার ওখানে পৌঁছতে পারলে আর চিন্তা নেই, পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাবে সে। কিন্তু সামনে পড়ে গেছে দুজন শত্রু।

স্ট্যাবাচ গুলি করতে যাবে এমন সময় কাপিয়েত্রো এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিল। বলল, 'পরে মারবে, এখন নয়।' এই বলে তার দলের লোকজনকে সে ইশারা করে ডাকল। তারপর উত্তেজিত গলায় বলল, 'বন্দী কর একে শীগগির।'

স্ট্যাবাচ ফের এগিয়ে এল গুলি করতে। তাকে ঠেলে সরিয়ে চোখ লাল করে কাপিয়েত্রো বলল, 'বলছি, সরে যাও! আমি এ গ্রামের নেতা। কথা শোন, স্ট্যাবাচ, শুনেছি টারজানের ধন সম্পত্তি অনেক। আগে কিছু আদায় করি, তারপর মারব।'

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কাপিয়েত্রোর লোকজন এগিয়ে আসতেই তাদের আড়ালে গা-ঢাকা দিল টারজান। তারপর সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ল স্ট্যাবাচের ঘাড়ে, একেবারে অতর্কিতে।

স্ট্যাবাচ পড়ে গেল। কাপিয়েত্রো লাফ মেরে সরে গেল একপাশে।

তারপর শুরু হল খণ্ডযুদ্ধ! দলের এক এক জনকে ধরে ঘুরপাক খাইয়ে তাদেরই দিকে ছুঁড়তে লাগল টারজান। সেই আঘাতে অনেক লোক ধরাশায়ী হল। এই ভাবে সে পিছু হঠতে লাগল বেড়ার দিকে।

বন্দুকবাজ ড্যানী খাওয়া দাওয়া সেরে একটু ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেই পাহাড়ে। হঠাৎ দূরে পাথর ভেঙ্গে পড়তে দেখে সে সরে এসে দাঁড়াল একটু উঁচু জায়গায়। সেখান থেকে সে দেখতে পেল ভাঙ্গা পাথরের সঙ্গে গড়িয়ে পড়ছে সেই সাদা বুনো মানুষটা, যে ওদের সিংহের হাত থেকে সেদিন বাঁচিয়েছিল। এ-ই তো টারজান! কিন্তু তার পরেই সে আর দেখতে পেল না টারজানকে। হুড়মুড় করে শুধু পাথর মাটি ভেঙ্গে পড়ার শব্দ।

টারজানকে ততক্ষণে ঘিরে ফেলেছে কাপিয়েত্রোর লোক-জন। প্রাণপণে লড়ছে টারজান। তবু ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। এমন সময় পাহাড়ের ওপর থেকে একঝাঁক মেশিনগানের গুলি এসে পড়ল লুঠেরা দলের ওপর। অনেকেই পড়ে গেল মাটিতে। বাকিরা প্রাণভয়ে ছত্রভঙ্গ হল। টারজান এক লাফে গ্রামের সীমানার বেড়া টপকে পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে ফাঁকা জমিতে গিয়ে দাঁড়াল। ওপর দিকে চেয়ে দেখল, চিনতে পারল সেই বন্দুকবাজকে। ড্যানি তখন ওপর থেকে হাত নাড়ছে।

টারজান অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'দাঁড়াও বন্ধু, যাচ্ছি।'

বারবারার দেহটা চিনেরেখের জলে অদৃশ্য হতেই ভিড়ের মধ্যে থেকে জেজেবেল চিৎকার করে উঠে ছুটল। সে-ও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে মরতে চায়। আব্রাহাম নিজে ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরল। তাকে অন্য ভাবে হত্যা করার মতলব এঁটেছে সে। তাছাড়া এমনই হঠাৎ অনাড়ম্বর ভাবে তার ইচ্ছামৃত্যু হতে পারে না। তাতে মান থাকে না আব্রাহামের।

জেজেবেল বাধা পেয়ে আব্রাহামকে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে তুলল। আব্রাহাম মাটিতে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে লাগল, দলের লোকজনকে ইশারা করল। লোকেরা এগিয়ে এসে ছাড়িয়ে নিল জেজেবেলকে। জেজেবেল আব্রাহামের দিকে চেয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'খুনী। শয়তান। জিওভা তোকে অভিশাপ দিক!'

মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আব্রাহামও চেঁচাল, 'চুপ কর পাপী কোথাকার! আজ রাতেই তোকে পুড়িয়ে মারব। জিওভা তাই চান!'

তারপর দলের লোকজনকে বলল, 'ওকে গুহায় বন্দী করে রাখো। দেখো, পালায় না যেন।'

তাকে নিয়ে লোকজন চলে গেল। এই হট্টগোলের মধ্যে কয়েকজন জ্ঞান হারিয়েছিল। তারা তখনও পড়ে রইল।

জলে পড়ে বারবারা মনের জোর হারায়নি। ডুবে যেতে যেতেই সে কোনমতে পকেট থেকে ছুরিটা বের করল। বাঁধা অবস্থায় শক্ত জাল কাটা যে কি কঠিন কাজ! তাছাড়া দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু সে দক্ষ সাঁতারু। খেলা-ধুলায়ও অনেক মেডেল পেয়েছে। এক সময় মনে হচ্ছিল এই শেষ, আর সে পারছে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ বিপদেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে, জাল কেটে ভেসে উঠল।

সে সময় দলের লোক জনের সমস্ত চোখ নিবদ্ধ হয়ে আছে জেজেবেল আর আব্রাহামের দিকে।

চুপিসাড়ে সাঁতরে বারবারা পাড়ে উঠল। একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে শুয়ে পড়ল। শরীর অবসন্ন।

সব লোক চলে গেল। মৃগী রোগীরাও জ্ঞান ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে ঘরের পথে পা বাড়াল। চারদিক চুপচাপ হয়ে গেল। বেলা বাড়লে ভিজে পোষাক খুলে মেলে দিল বারবারা। রোদ্দুরে শরীর তাতিয়ে নিল। সন্ধ্যের আগে শুকনো জামা-কাপড় পরে যখন উঠে দাঁড়াল, শরীরটা তখন বেশ ঝরঝরে লাগছে। মনটা কিন্তু ভার হয়েই ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে দূরে কোথাও গা ঢাকা দিলেই সে প্রাণে হয়ত এযাত্রা বেঁচে যাবে। কিন্তু জেজেবেলকে বিপদে ফেলে সে যায় কি করে? সে স্পষ্ট শুনেছে আজ রাতেই আব্রাহাম ওকে পুড়িয়ে মারবে।

বারবারা রাতের অন্ধকারে ফিরে চলল জেজেবেলের খোঁজে। চেনা রাস্তা ধরে তার নিজের গুহার দিকে চলল। মিডিয়ানে জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই সে জানে। কিন্তু এদের শাসকদের রক্তপিপাসা সব হিংস্রতাকে হার মানায়।

তার গুহায় এসে ঘাসের নরম বিছানায় শুয়ে আগের মতই আরাম পেল দেহমনে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে উঠে এসে মনে পড়ল তার নিজের বাড়ির কথা। কোথায় সে মার্বেল পাথরের ঘরে শৌখিন পালঙ্ক, আর এই অজানা গহ্বরে অন্ধকার রাত্রি কাটাচ্ছে ধনী আর্লের মেয়ে।

জেজেবেলের কথা ভেবে মনটা হু হু করে উঠল।

কোথায় সে? তার জন্যই তো সে ফিরে এসেছে এই অভিশপ্ত গ্রামে। নাঃ, আর বিশ্রাম নয়। উঠে পড়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে, সে এগোতে লাগল চুপিসাড়ে। নিচে গ্রামের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ দূরে কারা যেন নড়াচড়া করছে দেখতে পেল। চুপিচুপি এগিয়ে গেল আরো কাছাকাছি। দেখল একটা বিরাট ক্রস হাতে দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহাম। আরো কয়েকজন লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জেজেবেল। মশালের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল এসব।

ক্রস পোঁতা হচ্ছে। দলের একজন লতাপাতা জড়ো করছে। তারপর তারা টেনে নিয়ে এল জেজেবেলকে সেই ক্রসের কাছে। তার হাত পা ক্রসের সঙ্গে বাঁধা হল। এবার পুড়িয়ে মারা হবে। কে বাঁচাবে তাকে! চিৎকার করে উঠল বারবারা।

সে-চিৎকারে চমকে উঠল সবাই। অন্ধকারে চিনতে পারল না বারবারাকে। ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সবাই পাহাড়ের দিকে চেয়ে। বারবারা পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল চিৎকারে আকাশ বাতাস মুখর করে। আতঙ্কে দলের কয়েক জন ধুপধাপ করে পড়ে গেল। আব্রাহামও হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বারবারা তার সামনে এসে দাঁড়াল। তবু যেন আব্রাহামের জ্ঞান নেই। কোন মতে বলল, 'কে, কে তুমি?'

বারবারা বলল, 'কেন, চিনতে পারছ না?'

—'তুমি বারবারা! তুমি তো মরে গেছ!'

বারবারা বলল, 'কাঁপছ কেন? জানো না আমি জীওভার দূত? আমায় মারতে চেয়েছিলে, পারলে কি? এবার জীওভা স্বয়ং আসছেন, তোমার পালাবার পথ নেই, আব্রাহাম! সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবার তোমায় করতে হবে!'

আব্রাহাম ভয়ে কাঁপতে থাকে। তার চোখকে সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। কাতর স্বরে বলল, 'না না, বাঁচাও আমায়! জিওভাকে বলো আমায় ক্ষমা করতে। না জেনে এসব করেছি। বলো, জিওভাকে বলো!'

বারবারার হাসি পেল। কোনমতে সেটা গোপন করে আদেশ করল, 'জেজেবেলকে মুক্ত কর! আর আমাদের দুজনের জন্যে খাদ্য নিয়ে এস, শীগগির!'

আব্রাহাম তার লোককে বলল, 'মুক্ত কর মেয়েটিকে!'

হঠাৎ পিছন থেকে একটা কর্কশ স্বর ভেসে এল, 'দাঁড়াও!'

সবাই দেখল এগিয়ে আসছে বুড়ো জোবাব। বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আমি জিওভার কাছ থেকে আসছি। তিনি বলেছেন চিনেরেথের জল থেকে পাপী ফের উঠে এসেছে। কিন্তু সে জাদুতে বিশ্বাস করে না। ওসব শয়তানের চাতুরি। জোবাবের প্রতি বিশ্বাস রাখো, নইলে সবাই মরবে।'

জোবারের চোখ জ্বলতে থাকে ভাঁটার মত। তাই দেখে ফের লোকজনেরা মূর্চ্ছা যায়। মুখ দিয়ে ফেনা ওগরায়। বারবারাও কি রকম ভয় পেয়ে যায়। আব্রাহামের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জোবাব কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিল।

আব্রাহামের স্বর ফুটল এবার। 'তবে তাই হোক। জোবাবের মুখে জিওভার কথা শুনলে সবাই। জয় হোক জিওভার, জয় হোক জোবাবের।'

জোবাব হাঁকল, 'আর একটা ক্রস চাই! এই, কে আছিস! নিয়ে আয় আর একটা ক্রস।'

বারবারার সমস্ত প্রতাপ ধুলোয় লুটিয়ে দিল জোবাব। মিডিয়ানের রক্ত-পিপাসা অত সহজে দমিত হয় না। রাতের বধ্যভূমিতে তাই জেজেবেল আর বারবারা দাঁড়িয়ে রইল অসহায়ের মত।

আর একটি ক্রস পোঁতা হল। জেজেবেল শুকনো মুখে মাথা তুলে তাকাল বারবারার দিকে। তার হাত পা বাঁধা কাঠের সঙ্গে। এক ফোঁটা নড়াচড়ার উপায় নেই। ইংরিজিতে বলল, 'তুমি পালালে না কেন বারবারা?'

বারবারা বলল, 'তুমিও তো ঝাঁপিয়ে ছিলে চিনেরেথের জলে।'

মৃদু হাসল জেজেবেল। বলল, 'তোমাকেই এ জীবনে বন্ধু বলে পেয়েছিলাম। বিদায়!'

আব্রাহাম মন্ত্র আওড়াতে লাগল। মশাল জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

সিংহের চেহারাটা কাছ থেকে দেখে লাফায়েৎ স্মিথ বুঝল ছোট্ট এই পিস্তলের গুলিতে ওকে ঘায়েল করা যাবে না। তবু সে গুলি ছুঁড়ল। গুলি সিংহের গায়ে লাগল না। এবারেও সিংহটা ভড়কে গিয়ে উল্টো দিকে দৌড় মারল। স্মিথও চুপ করে বসে ভয়ে ঘামতে লাগল। বহুক্ষণ কেটে গেল, সিংহের আর পাত্তা নেই। তবু স্মিথ এক পা-ও এগোতে পারে না। খালি মনে হয় সামনে কখন এসে পড়বে সিংহটা। কিন্তু এভাবে এখানে কতক্ষণ বসা চলে?

শেষ পর্যন্ত উঠেই পড়ল। মনে সাহস এনে এগিয়ে চলল, পিস্তল উঁচিয়ে। পথটা হঠাৎ ঢালু হতে শুরু করল। আর কি ভয়ানক অন্ধকার! কোন দিকে, কোন পথে চলেছে জানে না, সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ যদি পথ শেষ হয়ে যায়, সামনে যদি গভীর খাদ থাকে, তবে পড়ে মরা ছাড়া অন্য গতি নেই। তবু স্মিথ হুড়মুড়িয়ে নেমে চলল অন্ধের মত সেই অজানা ফাটল বেয়ে, দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে। ক্ষিধে-তেষ্টা বোধটা ফিরে এসে ক্লান্তি আরো বাড়িয়ে তুলল।

কতক্ষণ হেঁটেছে জানে না, হঠাৎ যেন আলোর মুখ দেখতে পেল। পথটা হঠাৎই শেষ হয়ে গেছে। স্মিথ বেরিয়ে এল উন্মুক্ত প্রান্তরে, দিনের আলোয়। ভালো করে দেখে বুঝল একটা মরা আগুন-পাহাড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। দূরে দূরে বিছিয়ে আছে বিশাল লাভার উঁচু নিচু পাথুরে জমি। সে-সরের ওপারে গাছ আর বাড়ির ছায়া। একটা গ্রাম। হঠাৎ সিংহের কথাটা মনে পড়ায় চমকে উঠে সরে এল ফাটলের মুখটা থেকে। খাবার-দাবারের খোঁজে এগিয়ে চলল গ্রামটার দিকে।

পথে পড়ল একটা গভীর হ্রদ। পা যেন আর চলছে না। জলের ধারে বসে পড়ল। তারপর আকণ্ঠ তেষ্টা মিটিয়ে একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল একটু বিশ্রাম নিতে।

একটা বিকট গর্জন আর বিশাল থাবার ঘায়ে চমকে উঠে বসল। কই কিছু না তো! ওঃ, স্বপ্ন দেখছিল সে। সিংহের চিন্তাটা মাথা থেকে যায়নি এখনো। ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসে ঘাম মুছল। চেয়ে দেখল সূর্য ডুবে গেছে। তার শেষ আলোটুকু লেগে আছে এই অজানা দেশের আকাশে।

পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল স্মিথ গ্রামের দিকে। কিন্তু পথেই সন্ধ্যা নেমে এল। দূরে, পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের আগুন জ্বলে উঠল। স্মিথ অন্ধকারে একটা টিলায় উঠে দেখতে লাগল কোন দিক দিয়ে নামলে সুবিধা হবে। এমন সময় নিচে একটু দূরে এক জায়গায় দেখতে পেল মশাল হাতে কয়েকটা বর্বর চেহারার সাদা মানুষ। আরো ভালো করে দেখল তাদের সামনে ক্রুসে বাঁধা রয়েছে দুটো সাদা মেয়ে। তাদের পায়ের নিচে কাঠকুটো জড়ো করা রয়েছে।

এ কি! এ-তো পুড়িয়ে মারার আয়োজন চলছে! একি নৃশংসতা! স্মিথ নামতে লাগল সেই বধ্যভূমির দিকে। কাছে আসতে বুঝল মেয়ে দুটি সুন্দরী, অন্য লোকগুলোর সঙ্গে চেহারায় মিল নেই।

স্মিথ আব্রাহামের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে বলল, 'সরে যাও!'

দলের লোকজন, এমন কি আব্রাহাম নিজেও প্রথমে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। পুরোহিতদের কয়েকজন মূর্চ্ছাও গেল। স্মিথ পকেট থেকে ধারালো ছুরি বের করে বারবারার বাঁধন কাটতে যেতেই চিৎকার করে উঠল আব্রাহাম, 'কোথাকার পাপী তুই? সরে যা বলছি!'

স্মিথ ভাষাও বুঝল না, গ্রাহ্যও করল না। শুনল মেয়েটি স্পষ্ট ইংরিজিতে বলছে, 'ওরা তোমায় মেরে ফেলবে, সাবধান! গুলি কর!'

স্মিথ বুঝল মেয়েটি ইংরেজ। এর পোষাকআসাকও সে রকম। জোবাবের আর আব্রাহামের ইঙ্গিতে মশাল হাতে উন্মত্ত কটা লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল স্মিথের ওপর। কিন্তু তার আগেই তাদের একজন স্মিথের গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। তাই দেখে দলের কয়েকজন ছত্রভঙ্গ হল। আব্রাহাম চোখ উল্টে মূর্চ্ছা গেল।

দড়ির বাঁধন কেটে বারবারাকে ততক্ষণে মুক্তি দিয়েছে স্মিথ। তারপর দুজনে মিলে জেজেবেলের বাঁধনও কেটে দিল। জেজেবেলের শরীর কিন্তু অসাড়। সে ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারছে না। তাকে যখন ধরাধরি করে ওরা সরাবার চেষ্টা করছে সে সময় অতর্কিতে হানা দিল আব্রাহাম। কখন যে তার জ্ঞান ফিরে এসেছে কে জানে। মুখে তখনও তার ফেনা গড়াচ্ছে। চোখে ক্রোধের আগুন, হাতে ঝকঝকে ছোরা। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে সে প্রচণ্ড উন্মাদনায় হাত তুলল বারবারার পিঠ লক্ষ্য করে। কিন্তু হঠাৎই আবার কি রকম নির্জীব হয়ে ঢলে পড়ল। গলা থেকে বার হল একটা কাতর আর্তনাদ। চমকে উঠে সরে এল বারবারা।

মাটি থেকে মুখ তুলতে পারছে না আব্রাহাম। তার স্নায়ু পঙ্গু হয়ে গেছে আজকের এইসব অস্বাভাবিক ঘটনায়। এই উত্তেজনা সহ্য করার মত শক্তি তার আর নেই।

●

টারজান আর বন্দুকবাজের দেখা হল লুঠেরাদের গ্রামের পিছনে, পাহাড়ের চূড়ায়।

টারজান হেসে বলল, 'মেশিনগানটা কাজে লাগল দেখছি।'

ড্যানি বলল 'খুব বিপদে পড়েছিলে কিন্তু!' টারজান বলল, 'হ্যাঁ, খুব বেঁচে গেছি। তুমি না থাকলে খুব মুসকিল

হত। তা তুমি এখানে কেন?'

—'আমার বন্ধুকে খুঁজছি।'

—'কোথায় গেছে তোমার বন্ধু?' জিজ্ঞাসা করল টারজান।

—'কোথায় গেছে জানলে কি আর খুঁজতে বেরোতাম? সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

টারজান জানতে চাইল সমস্ত ব্যাপারটা, যদি সে সাহায্য করতে পারে। ড্যানি বলল, 'স্মিথ কাল বিকেল থেকে উধাও। পাহাড় দেখতে বেরিয়েছিল।'

—'সঙ্গে গুলি বন্দুক আছে তো?' শুধালো টারজান।

ড্যানি বলল, 'বোধহয় আছে, তবে তেমন ভরসা নেই। বন্দুক ধরতেই শেখেনি ঠিক করে।'

টারজান ভালো করে বুঝে নিল ড্যানির তাঁবু কতটা দূরে। তারপর ওবাম্বির সঙ্গে স্থানীয় বান্টু ভাষায় কি সব আলোচনা করল।

দুপুর শেষ হয়ে আসছে। টারজান ড্যানিকে বলল, 'তুমি ওবাম্বির সঙ্গে তাঁবুতে ফিরে যাও। দেখি আমি কি করতে পারি। তবে সাবধানে থেকো। লুঠেরার দল আশ-পাশেই রয়েছে।'

ড্যানি ফিরে চলল ওবাম্বির সঙ্গে। ভাবল, একি আশ্চর্য! এই অন্ধকারময় আফ্রিকাতেও লুঠেরার দল! এখানেও ঝঞ্ঝাটের ভয়?

জোরে পা চালাল ড্যানি। আফ্রিকার রাত্রিকে তার বড় ভয়। ক্লান্ত পায়ে হোঁচট খেতে খেতে সে ছুটল তাঁবুর দিকে। সন্ধ্যা নামার আগে, যে করে হোক পৌঁছতে হবে।

দূর থেকে দেখতে পেল তার তঁবু। আফ্রিকার আকাশে তখন গোধূলির আলোছায়া। আর একটু কাছে আসতেই ওবাম্বি বলল, 'কারা যেন তাঁবু দখল করেছে বোয়ানা।'

—'সে কি! কই?' বলল ড্যানি।

—'ঐ দেখুন ওদের ঘোড়া বাঁধা রয়েছে চারদিকে।'

ড্যানির আশা, হয়তো ওরা বন্ধু, স্মিথকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। আরো এগোতে তাঁবুর কাছে দুটো সাদা মানুষ বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দলের কালো মানুষ-গুলোও উঠে দাঁড়াল। ড্যানি বুঝল স্মিথের লোকজনকেও জোর করে ভিড়িয়ে নেওয়া হয়েছে দখলকারিদের দলে। এক কথায়, তাঁবু, মালপত্র লোকজন সমেত পুরো দলটাকে হস্তগত করেছে ওরা।

কয়েকজন এগিয়ে এসে ড্যানির মেশিনগানটা দেখতে লাগল বাঁকা চাউনিতে। তারপর বলল, 'হাত তোল।'

ড্যানি হাত তুলল। এখানে বীরত্ব দেখাতে যাওয়া বোকামি।

—'বুনোটা কোথায়?' জানতে চাইল একজন।

—'কোন বুনো?' ড্যানি বলল।

—'যার কথা বলছি, বুঝতে পারছ—টারজান। কোথায় সে?' আরেকজন বলল।

ওরা তাঁবুর সামনে আগুন জ্বেলেছে। সে আগুন ঘিরে বসে আছে লোকজন, দলবল। স্মিথকে কোথাও দেখতে পেল না ড্যানি।

—'কি হল, জবাব দিচ্ছ না যে! তুমি তো তার সঙ্গে ছিলে আজকে।' দাড়িওলা একটা সাদা মানুষ এগিয়ে এসে বলল। এ-ই কাপিয়েত্রো।

ড্যানি বোকা সেজে বলল, 'আমি! বুনোর সঙ্গে? মেলা বকিও না, আমার ক্ষিধে পেয়েছে।'

কাপিয়েত্রো তার দলের একজনকে বলল, 'ওর বন্দুকটা কেড়ে নাও।'

ড্যানি দেখল রাগ দেখিয়ে লাভ নেই। বন্দুক দিয়ে দিল সে।

ওবাম্বিকেও ওরা বন্দী করল। ড্যানিকে নিয়ে স্মিথের তাঁবুর দিকে এগোল সবাই।

কাপিয়েত্রো জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বন্ধুটি কোথায়?'

—'কোন বন্ধু?' না বোঝার ভান করল ড্যানি। এসব তার খুব ভালই অভ্যেস আছে।

—'যার সঙ্গে বেড়াতে এসেছ।' কাপিয়েত্রো বলল।

ড্যানি চুপ করে রইল।

—'তোমার বন্ধু কোথায়?' চড়া গলায় বলল কাপিয়েত্রো।

—'বন্ধুটন্ধু নেই।' বলল ড্যানি।

—'বুঝেছি, তুমি কথা লুকোচ্ছ। আমার দলের মোড়ল খবর পেয়েছে তোমার সঙ্গে আর একজন আছে। তার নামও জানি। তোমার কি নাম?'

—'ব্লুম।' বলল ড্যানি।

—'তুমি ড্যানি প্যাট্রিকনও?' ভুরু কুঁচকে শুধালো কাপিয়েত্রো।

—'ওনাম জন্মে শুনিনি।' সাফ বলে দিল ড্যানি।

—'আর টারজানকেও তুমি জান না? তাকে আজ দেখনি?'

—'বলছি তো ওসব নামই শুনিনি তা দেখব কি।'

স্ট্যাবাচ এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। বলল, 'ও মিথ্যে বলছে।'

ড্যানি বলল, 'না, আমি ড্যানি নই। এবার পেটে কিছু দিতে পারি?'

স্ট্যাবাচ বলল, 'না, টারজান কোথায় না বললে তুমি খেতে পাবে না।'

—'তাহলে দেখছি না খেয়েই আমায় মরতে হবে।' দীর্ঘশ্বাস পড়ল ড্যানির।

স্ট্যাবাচ কাপিয়েত্রোকে বলল, 'একে মেরে সাফ করে দিয়ে কেটে পড়াই ভালো। এর দলের লোকজন, জিনিসপত্র তো পেলামই। সেটাই লাভ।'

কাপিয়েত্রো এগিয়ে এল তার টোপ নিয়ে। ড্যানিকে বলল, 'শুনলে তো হে! কত টাকা দিতে পারবে? প্রাণে বাঁচতে চাও তো ভেবে দেখ।'

কাপিয়েত্রো বুঝেছে এ পয়সাওলা আমেরিকান, আফ্রিকায় শিকারের শখ মেটাতে এসেছে। তাই মোটা টাকা দাঁও মারার কথা ভাবছে সে। বলল, 'কি, কত দিতে পারবে বল।'

—'আমার অত পয়সা কড়ি নেই। বিশ হাজার চাও তো দিতে পারি।'

—'আমেরিকা থেকে টাকাটা আসতে সময় লাগবে তো। ততদিন তোমাকে আগলে রাখা ঐ টাকায় পোষাবে না। পঞ্চাশ হাজার পেলে তোমায় ছাড়তে পারি।'

ড্যানি যেন গভীর চিন্তায় পড়ল। ভেবে টেবে বলল, 'ঠিক আছে, তাই হবে। এখন কিছু খেতে টেতে দাও। না খেয়ে মারলে এক পয়সাও পাবে না আমায় ভাঙ্গিয়ে।'

কাপিয়েত্রো আদেশ দিল, 'ওর হাতদুটো বাঁধো।'

একজন লোক ড্যানির হাত বেঁধে দিল।

সব লুটেপুটে স্মিথের তাঁবু ছেড়ে দলবল ফিরে চলল সেই গ্রামে। ড্যানি বন্দী হয়ে চলল লুঠেরাদের সঙ্গে। ক্ষিধেয় তেষ্টায় দেহ তার অবসন্ন।

★

আব্রাহাম মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। হাত থেকে খসে পড়েছে তার ছুরি। স্মিথ হতচকিত মুখে চেয়ে আছে। বারবারা বুঝল অল্পের জন্যে সে বেঁচে গেছে খুনীর হাত থেকে। সে বলল, 'পালাই চলো, আর এক মুহূর্ত দেরি নয়।'

স্মিথ বলল, 'কিন্তু তোমার বন্ধু যে চলতে পারছে না।'

বারবারা এগিয়ে এল জেজেবেলের দিকে। স্মিথকে বলল, 'তোমার বাঁ হাত দিয়ে ওকে ধর। ডান হাতে পিস্তল রাখ। আমিও ধরছি আর এক দিকে।'

এইভাবে জেজেবেলকে ওরা নিয়ে চলল। সে কাতর স্বরে একবার বলল, 'তোমরা পালাও, পালিয়ে বাঁচো! আমি এভাবে তোমাদের বোঝা হতে চাই না।'

বারবারা ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ। ধর ঠিক করে আমাদের কাঁধ। শরীরে রক্ত চলাচল হলেই তুমি হাঁটতে পারবে। কোনো ভয় নেই।'

ওকে টেনে নিয়ে চলল স্মিথ আর বারবারা।

এবার জোবাব এগিয়ে এল রক্ত চোখে। লোকেদের বলল, 'থামাও। থামাও ওদের!' তারপর একটা ছুরি হাতে সামনে এসে দাঁড়াল।

বারবারা মিডিয়ানের ভাষায় বলল, 'সরে যাও বলছি! জিওভার অভিশাপে তুমিও মরবে!'

জোবাব তবুও দাঁড়িয়ে রয়েছে পথ আগলে। উপায়ান্তর না দেখে স্মিথ রিভলবার তুলল। একহাতে জেজেবেলের ভার। অনভ্যস্ত টলমলে শরীরে গুলি চালাল। ঝলসে উঠল অন্ধকার, কেঁপে উঠল চারদিক। তবু জোবাব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে! গুলি লাগেনি তার শরীরে।

জোবাব মনোবল ফিরে পেল। তার বিশ্বাস দৃঢ় হল যে আগুন আর বজ্রের মত শক্তিও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এ জিওভারই আশীর্বাদ। এত কাছ থেকে গুলি লাগল না দেখে স্মিথও ঘাবড়ে গেল। ঠিক সেই সময় জোবাব লাফিয়ে পড়ল স্মিথের ঘাড়ে, ক্ষুধার্ত পশুর মত। স্মিথের হাত থেকে ছিটকে গেল বন্দুক দলের লোকজনও তার দিকে ছুটে এল। ঐ অদ্ভুত অস্ত্রে জোবাবের কোনো ক্ষতি হল না দেখে তাদের মনের জোর ফিরে এসেছে। বারবারা দেখল স্মিথকে এরা টুকরো করে ফেলবে। ঝাঁপিয়ে পড়ে সে রিভলবারটা তুলে নিয়েই জোবাবের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ল। জোবাব লুটিয়ে পড়ল। এবার সে রিভলবারটা তুলল অন্য লোকগুলোর দিকে। লোকগুলোর আক্রোশ আর নেই। আকাশ ফাটিয়ে হাহাকার করতে করতে ছুটে পালাচ্ছে তারা। ক্লান্তি আর মানসিক অবসাদে বারবারা প্রায় ঢলে পড়ে যাচ্ছিল। স্মিথ এসে ধরল তাকে।

জেজেবেল উঠে দাঁড়িয়ে কোনমতে বলল, 'ওরা আবার আসতে পারে। চল পালাই।'

স্মিথ বলল, 'এখান থেকে বার হবার রাস্তা জান তোমরা ?'

ওরা বলল, 'না'।

—'তাহলে আমার সঙ্গে এস।' বলল স্মিথ।

সোনার থালার মত চাঁদ উঠেছে আকাশে। আলোয় ভেসে যাচ্ছে মিডিয়ান। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রাম ছাড়িয়ে ওরা চিনেরেখের ধারে এসে পড়ল।

স্মিথ এতক্ষণে কথা বলল, 'তোমরা বার হবার কোন রাস্তা জান না তাহলে এখানে ঢুকলে কি করে ?'

জেজেবেল বলল, 'আমি এখানেই জন্মেছি।'

—'তাহলে তোমার বাবা মা এই গ্রামেই থাকেন ? চল না তাঁদের কাছেই যাই।'

বারবারা হেসে বলল, 'ওর বাবা-মা ঐ ভিড়ের মধ্যেই ছিল। তারাও জেজেবেলের মৃত্যু দেখতেই এসেছিল। ওকে অন্যরকম চেহারা বলে, ওর বাবা-মাও ওকে চাইত না।'

স্মিথ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বলল, 'আর তুমি ? তুমি এখানে এলে কি করে ?'

—'আমি প্যারাসুটে নেমেছি।'

স্মিথ বারবারার দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'তুমিই কি লেডী বারবারা !'

—'কি করে জানলে ?' বারবারা শুধালো।

—'এখানে আসার সময় লণ্ডনে শুনলাম। কাগজে খবর বেরিয়েছে তোমায় নিয়ে। তোমার নিখোঁজ এরোপ্লেনের কথা পড়েছি আমি।'

—'আর তুমি কোত্থেকে এলে আমাদের বাঁচাতে ? তোমার নামটাও তো বলনি ' বলল বারবারা।

মাথা চুলকে স্মিথ বলল, 'আমার নাম লাফায়েৎ স্মিথ। সত্যি বলতে কি আমিও হারিয়ে গেছি।'

—'ভাগ্যিস হারিয়ে ছিলে ! তাই আমরা মরতে বেঁচে গেলাম।' বলল বারবারা।

স্মিথ বলল, 'আচ্ছা সত্যিই ওই লোকগুলো তোমাদের পুড়িয়ে মারত ? আজকের যুগে এ-ও সম্ভব ?'

বারবারা বলল, 'এরা মিডিয়ানবাসী। এরা দু হাজার বছর পিছিয়ে আছে।'

স্মিথ এবার জেজেবেলের দিকে চাইল। চাঁদের আলো পড়েছে তার ক্লান্ত চোখে মুখে সোনালী চুলে। অপরূপ রহস্যময়ী করে তুলেছে তাকে।

বারবারা বলল, 'তবে জেজেবেল একেবারে অন্যরকম। জানি না কি করে ও এমন হল।'

স্মিথ বলল, 'ও তো ইংরিজি বলতে পারে দেখছি !'

—'সে তো আমি শিখিয়েছি। আর আমিও মিডিয়ানের ভাষা শিখেছি ওর কাছে।'

স্মিথ বলল, 'ওকি ওর বাবামাকে ছেড়ে যেতে পারবে ?'

ক্লান্ত জেজেবেল জোর গলায় বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই ! এই খুনীদের সঙ্গে আমি কক্ষনো থাকব না। কক্ষনো না। মাবাবা আমাকে ঘেন্না করে। আমি যে তাদের মত নই ! ওদের ধর্ম যে আমি মানতে পারি না !'

স্মিথ চুপ করে ভাবতে লাগল ভাগ্যের খেলা। ভূ-তত্ত্বের ঝোঁকে কোথায় এসে কিসের বোঝা চেপে গেছে তার কাঁধে।

হঠাৎ ভীষণ ক্লান্ত লাগল তার। মনে পড়ল পেটে কিছু নেই। নিজের খাবারই জোটাতে পারেনি তা এদের খাওয়াবে কি ? ফেরার পথে এখনও কত বিপদ কে জানে !

তিনজন বহুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ওদের এই অদ্ভুত যোগাযোগের কথা ভেবেই তারা হয়ত অবাক হচ্ছিল মনে মনে। মগ্ন হয়ে ভাবছিল ভাগ্যের এই অদ্ভুত খেয়ালের কথা।

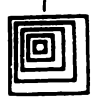

জেজেবেল উঠে দাঁড়াল। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে এসেছে তার শরীরে। অনেকটা সুস্থ লাগছে তার। স্মিথ বলল, 'চল, যাওয়া যাক।' তিনজনে এগোল সেই ফাটলের দিকে।

চিনেরেখের জল ঝকমক করছে ভরা জ্যোৎস্নায়। আগুন-পাহাড়ের গায়ে গায়ে আলো-আঁধারির খেলা। চোখে যেন নেশা লাগে।

স্মিথ হোঁচট খাচ্ছে মাঝে মাঝে। শরীর তার অনাহারে দুর্বল। বারবারা সেটা নজর করেছে। জিজ্ঞাসা করল, 'শেষ কখন খেয়েছ, স্মিথ ?'

স্মিথ ভেবে বলল, 'খেয়েছি সেই কাল দুপুরে। অবশ্য মাঝে একবার চকোলেট খেয়েছি।'

—'আর তারপর সমানে হাঁটছ ?' বলল বারবারা।

স্মিথ বলল, 'ছুটেছিও অনেকটা। একব্যাটা সিংহ পিছু নিয়েছিল। গ্রামে ঢোকার আগে কিছুটা ঘুমিয়েও নিয়েছি।'

—'শোন স্মিথ, এখন একটু বিশ্রাম নাও।' এই বলে বারবারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

—'না না, এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। দিনের আলো ফুটে গেলে ওরা আবার আসতে পারে আমাদের খোঁজে।' বলল স্মিথ।

জেজেবেল বলল, 'এদিকে ওরা আসবে না। উত্তর দিকের মানুষদের ওরা বড্ড ভয় করে। সামনের পাহাড়টায় উঠে

গেলে কোন ভয় নেই।'

—'তাহলে একটু বিশ্রাম নাও স্মিথ।' বলল বারবারা।

স্মিথ বসে পড়ল। বলল, 'ড্যানি সঙ্গে থাকলে খুব সুবিধা হত।'

—'কে ড্যানি?' বারবারা জিজ্ঞাসা করল।

—'আমার এক বন্ধু। শিকাগোর বন্দুকবাজ। আমরা একসঙ্গে এসেছি। খুব করিৎকর্মা লোক।'

—'তাই নাকি? আর তুমি? তোমার কথা একটু শোনাও।' বলল বারবারা।

স্মিথ জানাল তার পরিচয়, কি ভাবে সে এখানে এসেছে। তারপর জানতে চাইল জেজেবেলের পুরো নাম।

বারবারা বলল, 'মিডিয়ান-দেশের লোকেদের পুরো নাম হয় না। ওদের পদবী নেই।'

—'যদি সবাই বেঁচে ফিরি, তবে ওর একটা পদবী ঠিক করতে হবে।' হেসে বলল স্মিথ।

জেজেবেলের ম্লান মুখেও মিষ্টি হাসি খেলে গেল।

একথা সে-কথার পর স্মিথের চোখে কখন যেন ঘুম নেমে এল। সে নিজেও টের পেল না।

তার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে জেজেবেল বলল, 'বড় সুন্দর দেখতে ওকে। উত্তর গ্রামের লোকেদের থেকেও সুন্দর।'

●

মুখে চোখে রোদ পড়তে স্মিথের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে কোথায় রয়েছে সেটা কিছুতেই মনে করতে পারল না। তারপর দূরে বারবারা আর জেজেবেলকে শুয়ে থাকতে দেখে কালকের স্মৃতি ভিড় করে এল মাথায়।

একটা দুশ্চিন্তার বোঝা চেপে বসল হঠাৎ। নিজেই তো সে পথ হারিয়েছে। বাইরের দুনিয়ায় ঠিকমত এদের পৌঁছে দেবে কি করে?

পেটের ক্ষিধেটা চাগাড় দিচ্ছে। উঠে পড়ে হ্রদের কাছে গিয়ে আঁজলা ভরে জল খেল। মুখ তুলে দেখে জেজেবেল আর বারবারা ঘুম থেকে উঠে ওর দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছে।

স্মিথ বলল, 'এসো, ব্রেকফাষ্ট করে যাও।'

বারবারা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, স্রেফ জলের ব্রেকফাষ্ট। কেমন লাগল?'

স্মিথ বলল, 'ভালই, তবে সঙ্গে হ্যাম দুটো ডিম থাকলে আর একটু জমতো।'

—'বোঝাই যাচ্ছে তুমি আমেরিকার লোক।' বারবারা বলল।

—'আর তোমার একটু চা-মারমালেড হলে জমত ভাল, তাই না? একেবারে ইংরেজি ব্রেকফাষ্ট।' বলল স্মিথ।

বারবারা আবার হেসে উঠল।

পৃথিবীর কোন অজানা প্রান্তে পথ-হারানো মানুষগুলো হাসি-ঠাট্টা দিয়ে তাদের বিপদের কথা এই ভাবেই একটু ভুলে থাকতে চায়।

সবাই প্রাণ ভরে জল খেল। তারপর শুরু হল পথ খোঁজা। স্মিথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সেই ফাটলটা সে সহজেই খুঁজে পাবে। কিন্তু তা হল না। তার আন্দাজ মত যেখানে সে পৌঁছল সেখানে সে ফাটল নেই। ডাইনে বাঁয়ে, এদিকে সেদিকে পাথরের এবড়ো-খেবড়ো গায়ে সে উদভ্রান্তের মত খুঁজতে লাগল বেরোবার সেই রাস্তাটা। কিন্তু কোথাও পেল না। বুঝল তার আন্দাজ সম্পূর্ণ ভুল। তবু আশ্বাস দিয়ে সে বলল, 'ভয় নেই—ধারেকাছেই কোথাও আছে।'

এলোপাথাড়ি এগোতে এগোতে স্মিথ মনে তখনও আশা রাখছে সে খুঁজে পাবে বাইরের পৃথিবীর সেই রাস্তা। তারপর যে ভাবনার শেষ, তা নয়। কি খাবে সে নিজে জানে না। কোথায় ড্যানি, কোথায় তার তাঁবু। মনে পড়ে গেল সিংহটার কথাও।

হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট পাহাড়ে উঠে ওরা দেখল এক নতুন দৃশ্য। ঘন সবুজ বনের প্রান্ত এসে মিশেছে জলের ধারে। এই জঙ্গল পেরিয়ে তো এদেশে ঢোকেনি স্মিথ। সে বুঝল এধারে ফাটলটা থাকা তাহলে সম্ভব নয়। অন্য দিকে দেখতে হবে। অপরাধীর মত মুখ করে স্মিথ বলল, 'চল, এদিকে নয়—ফেরা যাক।'

বারবারা বলল, 'দাঁড়াও।' দূরে আঙ্গুল তুলে দেখাল। সবাই দেখল ভেড়ার মত কি সব চরে বেড়াচ্ছে।

জেজেবেল বলল, 'ছাগল! উত্তরের গ্রামে এসে পড়েছি আমরা!'

ক্ষিধের জ্বালায় বারবারা কিন্তু অন্য কথা ভাবছে। বলল, 'স্মিথ, আরও একবার পিস্তল চালাতে হবে তোমায়। পারবে?'

—'কেন, কেন?' ঘাবড়ে গেল স্মিথ।

—'তুমি কখনও শিকার করনি?'

স্মিথ অকপটে জানাল, 'না। সে সব সুযোগ হয়নি।'

—'এবারে সে সুযোগ এসেছে, স্মিথ। একটা ছাগলকে মারতেই হবে।'

স্মিথ বুঝল। বলল, 'মাংস হবে, তাই ত?' বারবারা

হাসল।

ওদের পায়ের নিচেই একটা দলছুট ছাগল চরছিল। স্মিথ দৌড়ে নামল পাহাড় বেয়ে। বারবারা ওকে চেঁচিয়ে থামাল। বলল, 'ঐ ভাবে যেও না, পালাবে ওরা। ওদের কাছাকাছি ঝোপে লুকিয়ে, শুয়ে পড়ে গুলি চালিও।'

স্মিথ বহুকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে একটা ছাগলের কাছাকাছি হল। ছাগলটা একমনে ঘাস খাচ্ছিল আর তার বাচ্চাটা একটু দূরে চরছিল একা একা।

দড়াম করে পিস্তল চালাল স্মিথ। পেছন থেকে কে যেন তাকে এক গুঁতোয় মাটিতে ফেলে দিল। চেয়ে দেখে ছাগলটা দিশেহারা হয়ে পালাচ্ছে, তার গায়ে গুলি লাগেনি। আর পিলে-কাঁপানো আওয়াজে বাচ্চাটা ভয় পেয়ে ছুটে এসে পিছন থেকে স্মিথের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে।

বারবারা আর জেজেবেল ছুটে এল। খাবার হাতছাড়া হয়ে গেল তবু স্মিথের শিকার দেখে ওরা হেসে লুটোপুটি।

জেজেবেল বলল, 'কিন্তু কাল তো ওর গুলি ফস্কায় নি। একজনকে মেরেছে।'

বারবারা হাসতে হাসতে বলল, 'যার গায়ে লেগেছে তাকে তো ও টিপ করে নি।'

যাই হোক। স্মিথ ধুলো মেখে উঠে এল। হাতে তার ছোট্ট ছাগলছানা। বলল, 'এটাকেই মেরে রান্নার ব্যবস্থা হোক।'

প্রাণ বাঁচাবার এমনই তাগিদ যে ছোট্ট ছাগলছানাটির চোখ দুটো দেখে ওদের মায়া-মমতা হলেও সে দুর্বলতাটুকু ওরা ঝেড়ে ফেলে দিল। কাঠকুঠো জ্বেলে ওদের রান্নার আগুন জ্বলে উঠল।

ওদিকে ছানাটির মা পড়িমরি করে বন পেরিয়ে ছুটেছে। দূর থেকে তাকে দেখতে পেল উত্তর মিডিয়ানের মেষপালক এসবাল। সে গুলির আওয়াজ শুনেছে। এই অদ্ভুত আওয়াজ আগের দিন রাতেও সে দু-একবার শুনতে পেয়েছিল অস্পষ্ট-ভাবে। দলছাড়া হয়ে বনের ধারে চলে এসেছিল ছাগলটা। এই ছাগলটাকেই সে এতক্ষণ খুঁজছিল। সঙ্গের বাচ্চাটাকে না দেখে চিন্তায় পড়ল এসবাল।

উত্তর গ্রামের মানুষ এসবাল, সাদা চামড়া, সোনালী চুল। বেঁটেখাটো চেহারা। ছাগলের চামড়ায় বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। একমুখ দাড়িগোঁফ।

আগুনে মাংস ঝলসে নিয়ে ওরা পরম তৃপ্তিতে খেতে লাগল! এসবাল গাছের আড়াল থেকে সব কিছু দেখল। বুঝতে পারল তার ছাগলছানার কি গতি করেছে এরা। সে ছুটে চলল তার গ্রামের দিকে।

ঘণ্টাখানেক পর খাওয়াদাওয়া সেরে স্মিথ, বারবারা আর জেজেবেল উঠে পড়ল পথের সন্ধানে। ফাটলটা যখন খুঁজে পাওয়া গেল না তখন দূরের উপত্যকা পেরিয়ে নতুন রাস্তায় পা বাড়াবে কি না তারা চিন্তা করতে লাগল। টের পেল না, এসবাল একদল লোক নিয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে গাছপালার আড়ালে।

জেজেবেলই প্রথম দেখল, 'আরে! পাথরের আড়ালে একটা মানুষ।' এসবাল শুনতে পেল কথাটা। বুঝল আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। ঝাঁপিয়ে সকলে নেমে এল সামনে।

জেজেবেল চিনল এদের। বলল, 'বারবারা, দেখ, উত্তর গ্রামের মানুষ!' বারবারা আর স্মিথ কি ভাবে এদের মুখোমুখি হবে ভেবে পেল না।

বারবারা বলল, 'ওরা আক্রমণ করতে চাইলে গুলি চালিও, স্মিথ।'

স্মিথ বলল, 'ওদের হাতে দেখছি গদা আছে। তবু দেখি না, ওরা কি করে। ভাব করতে চাইলে গুলি চালানোর ঝামেলায় না যাওয়াই ভাল।'

ওদের দলটা এগিয়ে আসছে। দু-একবার দাঁড়িয়ে কি সব আলোচনা করে নিল। একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কারা? এখানে কি করছ?'

বারবারা আর জেজেবেল বুঝল সে ভাষা। বারবারা এগিয়ে এসে বলল, 'আমরা পথ হারিয়ে এই মিডিয়ানে এসে পড়েছি। এখান থেকে বার হতে চাই।'

ওদের একজন বলল, 'বেরোনর পথ তোমাদের বন্ধ। কার হুকুমে তোমরা ছাগল মেরেছ? শাস্তি পেতে হবে তোমাদের। আমাদের সঙ্গে এস।' বারবারা ওদের বোঝাতে চাইল যে ক্ষিধের জ্বালায় ওরা এ কাজ করেছে। ওরা আবার কি সব কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

সেই লোকটা বলল, 'না, তোমাদের আসতে হবে। অন্ততঃ তোমাদের দুজনকে চাই-ই।' এই বলে জেবেবেল আর বারবারাকে দেখিয়ে দিল। স্মিথের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ও চলে যায় যাক, ওকে মুক্তি দিতে পারি। আমরা তোমাদের চাই।'

স্মিথকে বারবারা ইংরিজিতে ওদের কথা বুঝিয়ে দিল। স্মিথ বলল, 'বলে দাও ওসব হবে না। দরকার হলে সব কটাকে খতম করব।'

বারবারা এই কথাটাই বুঝিয়ে দিল মিডিয়ানদের। ওদের নেতা বলল, 'আমরা কুড়িজন। কি করবে তোমরা আমাদের!'

ওদের প্রত্যেকের হাতে ভারি গদা। সেই গদা ঘোরাতে ঘোরাতে ওরা ছুটে এল।

বারবারা চেঁচিয়ে উঠল, 'গুলি কর স্মিথ! একটাও যেন ফসকায় না।'

স্মিথ রিভলবার তুলল। গুলির আওয়াজে প্রথমে ওরা থমকে দাঁড়াল। গুলি লাগেনি কারও গায়ে।

একটা ভারি গদা হঠাৎ সাঁই করে উড়ে এসে পড়ল স্মিথের হাতে। রিভলবারটা ছিটকে গেল হাত থেকে মিডিয়ানরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর।

★

যারা বনে থাকে তাদের ঘ্রাণশক্তি খুব তীব্র হয়। তাদের কানও আমাদের চেয়ে অনেক সজাগ। বনের মানুষ টারজানের ক্ষমতা দেখে যে কোনো সভ্য জগতের মানুষ অবাক হয়। বাতাসে নাক তুলে সে গন্ধে গন্ধে বন-পাহাড়ের অনেক খবর অনেক দূর থেকেই পেয়ে যায়। প্রতিটি পাতা খসার শব্দের মানে সে জানে। মাটিতে কান পেতে বহু দূরের শব্দ শুনে সে সজাগ হতে শিখেছে।

এই অদ্ভুত সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে টারজান লাফায়েৎ স্মিথের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়ে সেই ছাপ ধরে অনেকটা এগিয়েছিল। তারপর অন্ধকার নেমে এসেছিল। তীর ধনুক দিয়ে জন্তু শিকার করে খেয়েদেয়ে সে ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছিল একটু। এমন সময় একটা অস্বাভাবিক শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বহু দূর থেকে ভেসে আসা শব্দ বনমানুষ ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় না।

টারজান মাটিতে কান পেতে বুঝল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। একদল ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে। সাবধানী টারজান উঠে বসল। তারপর পাহাড়ের চুড়োয় উঠে অনেক নিচে নজর রাখল কাপিয়েত্রোর গ্রামের দিকে।

খুরের আওয়াজ স্পষ্ট হল! লুঠেরার দল ফিরে আসছে গ্রামে। ড্যানির হাত পা বাঁধা। তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে একটা ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিল প্রহরীরা। তারপর স্ট্যাবাচ আর কাপিয়েত্রো বসল রাতের খাবার খেতে। প্রচুর মদ খেয়ে তারা যত আচ্ছন্ন হতে লাগল টারজান ততই খুশি হয়ে উঠল। তার নৈশ অভিযান শুরু হবে এইবার।

এক সময় সব হল্লা থেমে গেল। লুঠেরার গ্রাম ঢলে পড়ল ঘুমের কোলে। তার কিছুক্ষণ পরেই একটা দীর্ঘ ছায়া ঘোরাফেরা করতে লাগল গ্রামের পিছনে। সে আর কেউ নয়, স্বয়ং টারজান। চাঁদ উঠেছে, তবু গ্রামের একপাশ ঘন গাছের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। এতে টারজানের সুবিধাই হল। ঠিক সেইখানেই ড্যানি বন্দী। উঁচু বেড়া টপকে সামনের ফটকের প্রহরীদের অজান্তে নিঃশব্দে নেমে এল টারজান। তারপর মাটিতে পেট ঠেকিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে গেল ড্যানির ঘরের দিকে। একজন প্রহরী ঘুমে ঢুলছে, পায়ের ওপর রাখা আছে রাইফেল। অন্ধকারে ওঁৎ পেতে রইল টারজান। প্রহরীর মাথাটা নুয়ে পড়ল হাঁটুতে। বন্দুকটা কাৎ হয়ে গেল। এই সুযোগ।

চিতাবাঘের মত লাফিয়ে পড়ল টারজান। শব্দ হল না। প্রহরীটারই মুখ চেপে ধরে ঘাড় মটকে ফেলল নিমেষে। তাকে কাঁধে করে অন্ধকার ঘরের এককোণে নামিয়ে রাখল। টু শব্দ করার সময় পেল না মানুষটা।

তারপর ড্যানিকে ঠেলা দিয়ে তুলল টারজান। ড্যানি বিরক্ত হয়ে ঘুম চোখে বলল, 'ফের জ্বালাচ্ছ? বলছি তো টাকা দেব—।'

টারজান তার মুখ চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'চুপ! আমি টারজান, তোমায় নিতে এসেছি।'

—'বল কি!'

তার হাতের বাঁধন কেটে দিল টারজান। নিঃশব্দে তাকে নিয়ে এসে দাঁড়াল পিছনের বেড়ার ধারে। তারপর ড্যানির বিশাল দেহটা একটা বস্তার মত ধরে ঠেলে দিল উঁচু বেড়ার ওপর। ড্যানি বেচারা ভারি চেহারা নিয়ে মরি বাঁচি করে লাফ দিয়ে উল্টোদিকের মাটিতে পড়ে কুমড়োর মত গড়াতে লাগল। চোখের পলকে টারজানও নেমে পড়েছে

ড্যানির সঙ্গে।

তাকে টেনে তুলল সে। পাথরের অসমান রাস্তায় এবারেও তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল নিরাপদ দূরত্বে। অনেক উঁচুতে ঘাসের জমিতে এসে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল নিস্তব্ধ রাত্রির কোলে। ড্যানি তখনও হাঁপাচ্ছে আর গাল পাড়ছে লুঠেরাদের।

ভোর না হতেই উঠে বসল টারজান। কান পেতে শুনল জলের শব্দ। সেদিকে এগিয়ে গেল সে। একটা ছোট্ট গিরিখাতের পাথর কেটে জল পড়ছে। আকণ্ঠ জল খেয়ে নিল টারজান! সামনের ঝোপঝাড় হঠাৎ নড়ে উঠল। ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ শুনে বুঝল দাঁতাল শূওর। ঝোপ ঠেলে সেটা বার হয়ে আসতেই, তীর ছুঁড়ল টারজান। তীর বিঁধল জন্তুটার ঘাড়ে। প্রচণ্ড আক্রোশে টারজানের দিকে ছুটে এল সেটা। আরো দুটো তীর চকিতে ছুটে এসে বিঁধল জন্তুটার দেহে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। টারজান শূওরটার পিঠে পা তুলে দিয়ে জয়ধ্বনি করল।

ড্যানি আওয়াজ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। এই আওয়াজ সে আগেও শুনেছে। স্মিথের তাঁবুতে সিংহের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় টারজানের গলা দিয়ে এই আকাশ-কাঁপানো আওয়াজ উঠছিল। ঘুমচোখে সে যখন সবে উঠে বসেছে, সেই সময়ে একটা চিতা গন্ধে গন্ধে উঠে এসে ওঁৎ পেতে বসে ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে আশপাশ দেখতে গিয়ে চিতাটার সঙ্গে চোখা-চোখি হল ড্যানির। তার আর নড়বার ক্ষমতা রইল না। ওকে এখন দেখলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না এই সেই বন্দুক-বাজ ড্যানি যে শিকাগো শহর কাঁপিয়ে বেড়ায়। বন্দুকহীন ড্যানি এই বনপাহাড়ের আদিম অরণ্যে বড় অসহায়।

বাঘটা লাফ দেবে দেবে করছে এমন সময় আর একটা ঝোপ ঠেলে শিকার কাঁধে টারজান এসে দাঁড়াল। তার সঙ্গে চোখাচোখি হল বাঘটার। এক মুহূর্তে লাফিয়ে ঝোপের আড়ালে উধাও হল জন্তুটা।

টারজান শূওরটাকে ধপাস করে ফেলে দিয়ে বলল, 'ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়, খাও।'

ড্যানি রসিকতা করে বলল, 'হ্যাঁ, ক্ষিধের চোটে এখন কাঁচাই খেয়ে নিতে পারি।'

তারপর যখন টারজান তাকে মাংস কেটে কাঁচাই খেতে দিল তখন সে ভড়কে গিয়ে বলল, 'অ্যাঁ, সত্যি সত্যি ভাবছ আমি কাঁচা মাংস খাব?'

—'কেন? অসুবিধা কি?' এই বলে টারজান মস্ত কামড় বসাল এক ফালি মাংসয়। আরাম করে খেতে লাগল।

ঘেন্নায় কুঁকড়ে গেল ড্যানি। বলল, 'না না, আমি ওভাবে পারব না।'

টারজান হেসে বলল, 'তাহলে রইল এই মাংস। কাঠকুটো জ্বালিয়ে রান্না করে খাও। আর কাঁচা মাংস সঙ্গে রাখ কিছুটা। পরে কখন কাজে লাগবে।'

আগুন জ্বেলে মাংস ঝলসে পেট ভরে খেয়ে নিল ড্যানি। টারজান বলল, 'তোমার বন্ধুর পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছি। সে এই পথেই এসেছে। চল, যাওয়া যাক তার খোঁজে।'

ড্যানি আশ্বস্ত হল অনেকটা। স্মিথের সন্ধান পাওয়া যাবে তাহলে! সে কিন্তু কোনো ছাপই দেখতে পেল না, তবু টারজানের পিছু পিছু চলতে লাগল। টারজান সন্দিগ্ধ হয়ে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল। বলল, 'দেখছি একটা সিংহও তোমার বন্ধুর পিছনে ধাওয়া করেছে।' তারপর পায়ের ছাপ ধরে টারজান এসে দাঁড়াল সেই ফাটলের ধারে।

টারজান ফাটলের মাটিতে ঝুঁকে দেখল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, এর মধ্যেই ঢুকেছে দুজনে।'

টারজানের সঙ্গে ড্যানিও ঢুকল ফাটলের মধ্যে দুরু দুরু বক্ষে। বন্দুক নাইবা থাকল। টারজান যখন সঙ্গে আছে সে মোটেই অসহায় নয়।

কিছুটা এগিয়ে টারজান বুঝল সিংহটা স্মিথকে আক্রমণ করে নি। পাথরে তার পায়ের ছাপ স্পষ্টই প্রমাণ করছে যে সিংহটা মুখ ঘুরিয়ে এদিকেই আবার ফিরে গেছে। স্মিথের পায়ের ছাপ সামনে এগিয়ে গেছে। টারজানও এগিয়ে চলল। ড্যানি পাল্লা রাখতে পারছিল না ওর সঙ্গে। ফাটলের রাস্তাটা যে এতবড় টারজান কল্পনাও করেনি। কৌতূহল বেড়ে উঠল তার।

যখন সে ঢালু জায়গাটায় এসে পড়েছে, ড্যানি তখন অনেকটা পিছনে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। তারপর টারজান সেই ঢালু, অন্ধকার পথ বেয়ে ফাটলের বাইরে এসে দাঁড়াল। সেখানেও স্পষ্টই দেখতে পেল স্মিথের জুতোর ছাপ। সে ছাপ এগিয়ে গেছে দূরে একটা জলার ধারে। টারজান পা চালাল। ভাবল কাছাকাছি কোনো গ্রামে স্মিথ হয়ত অতিথি হয়ে বেশ নিরাপদেই আছে। তবে গ্রামটা দেখে যাওয়া দরকার মনে করল টারজান।

ওদিকে ড্যানি অনেক কষ্টে কখনও হেঁটে, কখনও হামা গুড়ি দিয়ে কোনমতে ফাটল থেকে বেরিয়ে হাঁপাতে লাগল। মাটির ওপর বড় বড় ইঁদুরের আঁচড়ের দাগকে স্মিথের জুতোর

দাগ ভেবে ভাবল টারজান নিশ্চয়ই এদিকে গেছে। এই ভেবে সে অন্যদিকে হাঁটা দিল।

★

নোয়ার পুত্র ইলাইজার দেশে বন্দী হল স্মিথ, বারবারা আর জেজেবেল। ইলাইজা নিজে কুড়িয়ে নিল স্মিথের পিস্তল। নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল কৌতূহলী চোখে। তারপর সেটা নিজের চামড়ার খোপে পুরে ফেলল।

জেজেবেলকে দেখিয়ে এসবাল বলল, 'এই মেয়েটি আমার।'

—'কেন?' ইলাইজা জানতে চাইল।

—'আমিই ওকে প্রথম দেখেছি।'

জেজেবেল ফিসফিস করে বারবারাকে বলল, 'বুঝলে কি বলল?'

বারবারা বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'হ্যাঁ'।

সে বুঝেছে এরা প্রাচীন যুগের যোদ্ধাদের বংশধর, চোখে কামনা বাসনার তীব্র আগুন। এদের চেয়ে ঐ রোগগ্রস্ত আব্রাহামের বোকাসোকা লোকেরা অনেক ভাল ছিল।

কিন্তু জেজেবেলের যেন অত ভয়-টয় নেই। সে বলল, 'ও আমাকে চাইছে! বেশ দেখতে ওকে, না?'

বারবারা বলল, 'জেজেবেল, তুমি আমায় বিশ্বাস কর তো?'

জেজেবেল বলল, 'হ্যাঁ, এ জীবনে তোমাকেই একমাত্র বিশ্বাস করি।'

—'তবে শোন। আমি ঠিক করেছি ওদের হাত থেকে পালাতে না পারলে আত্মহত্যা করব। তুমিও তাই কর।'

জেজেবেল বুঝতে পারে কেন এমন কথা বলছে বারবারা। ভোগবিলাসী উত্তর মিডিয়ানবাসীদের সে এতক্ষণে চিনতে পারে।

ইলাইজার দল এগিয়ে চলে। অনর্গল কথা বলে এরা। ওদের চলনে-বলনে যেন একটা শৃঙ্খলার অভাব লক্ষ্য করে বারবারা। কথা বলতে বলতে, নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে করতে এমনই মশগুল হয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে যে বারবারা আর জেজেবেল কখন এগিয়ে যাচ্ছে, আবার কখন অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে অত লক্ষ্যই নেই ওদের।

একটা জঙ্গল পেরোচ্ছিল ওরা। ইচ্ছে করে একটু পিছিয়ে পড়ে বারবারা ইশারা করল জেজেবেল আর স্মিথকে। ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঠিক করল তিনজন তিনদিকে পালাবে। ধরা না পড়লে পরে মূল পাহাড়ের তলায় এসে মিলবে।

—'ছোট, যা থাকে কপালে।' এই বলে বারবারা ছুট লাগাল। স্মিথ কোন দিকে যাবে ঠিক করতে না পেরে বারবারার পিছনেই ছুটল! মনে ভাবল, জেজেবেল ধরা পড়লে ওদের সঙ্গে ভালই থাকবে। কিন্তু বারবারা একা কোনো বিপদে পড়লে, তাকে বাঁচানো দরকার।

বহুক্ষণ ধরে প্রাণপণে ওরা ছুটল। তাড়া করে আসছিল অনেকে। কিন্তু ওদের দুজনের সঙ্গে তাল রাখতে পারল না।

বারবারার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের তলায় বসে পড়ে কোন রকমে বলল, 'জেজেবেলকে ফেলে এলে স্মিথ? ওর যদি বিপদ হয়?'

স্মিথ বলল, 'দক্ষিণ মিডিয়ানবাসীদের হাতে তো ও মরেই যেত। এখানে অন্ততঃ বেঁচে থাকবে।' এই বলে বারবারার পাশে বসে পড়ে ও-ও হাঁপাতে লাগল।

কিন্তু বেশিক্ষণ বসা গেল না। ফের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কয়েকটা লোক গদা হাতে ছুটে আসছে। ওরা উঠে পড়ে ছুটল, কিন্তু ক্লান্ত গায়ে তেমন জোর পেল না।

কাছাকাছি আসতে একজন স্মিথের দিকে গদা ছুঁড়ল। অল্পের জন্য বেঁচে গেল স্মিথ। হঠাৎ খুন চেপে গেল তার। সে গদাটা হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়াল। সামনে তিনজন শত্রুও থমকে দাঁড়াল।

স্মিথ বারবারাকে বলল, 'পালাও বারবারা, যত দূরে পার!' বারবারা চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। পালাল না স্মিথকে ফেলে।

তারপর শুরু হল লড়াই। তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়ল স্মিথের ওপর। তাদের একজন প্রচণ্ড গদার ঘায়ে ছিটকে পড়ে গেল। এর মধ্যে আরো কজন যোদ্ধা এসে গেছে। স্মিথের হাত থেকে ওরা গদা কেড়ে নিল। ততক্ষণে ওদের আরো একজনের খুলি ফাটিয়ে দিয়েছে স্মিথ।

স্মিথ ধরা পড়ল ওদের হাতে। বারবারা দাঁড়িয়ে আছে দূরে। স্মিথকে ও ছেড়ে যায়নি।

*

এদিকে ড্যানির তো তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। সে টারজানের কোনো চিহ্ন দেখতে না পেয়ে হ্রদের দিকেই ফিরে এল। জল না পেলে সে বাঁচবে না।

দুপুরের রোদ পড়েছে চিনেরেখের জলে। কিন্তু সৌন্দর্যে তার অবাক হবার সময় নেই। কতক্ষণে প্রাণভরে জল খেয়ে বাঁচবে, এই ভেবে ছুটে চলল সে ছোটবড় লাভার ওপর দিয়ে

'টলমল করে। আফ্রিকা দেশটাকে গালি না দিয়ে সে পারল না।

হঠাৎ একটু দূরে সে অবাক হয়ে দেখল একটা সাদা চামড়ার, সোনালী চুল মেয়ে, শরীরে সামান্য পোষাক। সে আর কেউ নয়, জেজেবেল।

জেজেবেল বলল, 'কে তুমি!'

ড্যানি কিচ্ছু বুঝল না সে ভাষা বলল, 'তুমি কে খুকি? আমি আফ্রিকায় এসে পথ হারিয়েছি।'

যদিও ড্যানির আমেরিকান কথা ঠিক বারবারার মত নয়, তবু এ ইংরিজি বুঝতে অসুবিধা হল না জেজেবেলের। বলল, 'আমার নাম খুকি নয়, জেজেবেল।'

—'কোথায় দেশ তোমার?' জিজ্ঞাসা করল ড্যানি।

—'মিডিয়ানে।'

—'জন্মে শুনিনি।' বলল ড্যানি, 'তা কি করছ এখানে খুকি? তোমাদের অন্য লোকেরা কোথায়?'

—'খুকি নয়, জেজেবেল। আমি বারবারা আর স্মিথের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

—'স্মিথ? কোন স্মিথের কথা বলছ?' উত্তেজিত হয়ে পড়ল ড্যানি।

—'কেন, সেই সুন্দর দেখতে যে স্মিথ।' বলল জেজেবেল।

ড্যানি বলল, 'অ্যাঁ, সুন্দর দেখতে? নাঃ, তাহলে সে আমাদের স্মিথ নয়। আর বারবারা মেয়েটি আবার কে?'

—'আমাদের বন্ধু। জানো, স্মিথ যদি না আসত তবে আব্রাহামের হাতে আমি আর বারবারা মারা পড়তাম। জানো, সে খুব বীর।'

—'কে বীর? স্মিথ? নাঃ তাহলে সে আমাদের স্মিথ নয়।' হতাশ হয়ে বলল ড্যানি।

—'তোমার নাম কি?' জানতে চাইল জেজেবেল।

—'ড্যানি। ড্যানি প্যাট্রিক।'

—'ও, তুমিই সেই বন্দুকবাজ!' বলল জেজেবেল।

ড্যানি তো অবাক। 'কোত্থেকে শুনলে তুমি?'

—'তুমিই তাহলে সেই স্মিথের বন্ধু, শিকাগো না কোথায় থাক? তুমি নাকি খুব কাজের লোক।'

—'এইসব বলেছে বুঝি স্মিথ!' বলল ড্যানি। 'তাহলে ঠিক স্মিথের কথাই বলছ, ও-ই আমাদের স্মিথ। তবে ও আবার বীর হল কবে? অ্যাঁ?' বলল ড্যানি।

স্মিথের সঙ্গে এখানে দেখা হবার আশায় খুব খুশি হয়ে, উঠল সে। জানতে চাইল কি হয়েছে স্মিথের।

—'উত্তর গ্রামের লোকেদের হাতে ধরা পড়েছিলাম আমরা, এখন সবাই পালিয়েছি।' বলল জেজেবেল। তারপর হাঁটতে লাগল চিনেরেখের দিকে। তারও তেষ্টা খুব।

দুজনে আকণ্ঠ জল খেল। বলল, 'চল, পাহাড়ের ধারে যাই এবার। ওখানেই আসবে স্মিথ আর বারবারা।'

পাহাড়ের দূরত্বটা আন্দাজ করে ড্যানি ধপ করে বসে পড়ল। বলল, 'একটু না জিরোলে চলতে পারব না।'

জেজেবেলও ক্লান্ত। তাই সে-ও বসে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

রোদের তাপে ধড়মড় করে স্মিথ উঠে বসল। তারপর ঠেলে তুলল জেজেবেলকে। দুজনে এগিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে, কিন্তু সেখানে কাউকে দেখল না। জেজেবেল ভাবল ওরা হয়ত চলে গেছে, ওকে খুঁজে না পেয়ে। কিংবা অন্য কোনো বিপদে পড়েছে। জেজেবেলকে তাই পালাতে হবে। ও ড্যানিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোনখান দিয়ে ঢুকেছ এ দেশে?'

ড্যানি বলল, 'একটা ফাটল দিয়ে, টারজানের সঙ্গে।'

—'কে টারজান?'

—'একটা জংলী সাদা মানুষ। তাকে এখন খুঁজে পাচ্ছি না।'

—'সে-পথটা খুঁজে পাবে?' জিজ্ঞাসা করল জেজেবেল।

—'খুব পাব, যাবে?' বলল ড্যানি।

জেজেবেল বলল, 'একটা ফাটলের কথা বলছিল স্মিথ। কিন্তু সেটা সে কিছুতেই খুঁজে পেল না। বোধহয় ওরা সেটা খুঁজে পেয়ে চলে গেছে।'

ড্যানি বলল 'তাহলে চল, আমরাও যাই।'

কিছুদূর গিয়ে নিজের পায়ের ছাপ দেখতে পেল ড্যানি। সেই ছাপ ধরে পৌঁছে গেল সেই ফাটলে। এ বিদ্যে টারজানের কাছে শেখা।

জেজেবেল সুড়ঙ্গ ধরে এগোতে এগোতে ভাবল এ কোন নতুন দেশে চলেছে সে। আব্রাহাম সব সময় শেখাত এই পাহাড়ের ওপারে আছে পাপের রাজ্য। তার চারদিকে জ্বলছে অনন্ত আগুন। হাঁটতে হাঁটতে শেষে পাপীরা ঐ আগুনে পড়ে পুড়ে মরে। জেজেবেল কিন্তু ভাবত ওপারটা ফুল ফল আর নদীর দেশ। সেখানে সুখে থাকে সব সুন্দর মানুষজন, আর আনন্দে গান গায় তারা।

সেই স্বপ্নের দেশে চলেছে আজ জেজেবেল।

এক সময় শেষ হল সেই সুড়ঙ্গ। দুজনে এসে দাঁড়াল উন্মুক্ত আলোয়। এখান থেকেই আজ সকালে ড্যানি বেরিয়েছিল টারজানের সঙ্গে স্মিথের খোঁজে। কিন্তু কোথায় স্মিথ কোথায় বা টারজান।

ক্ষিধেয় অবসন্ন দুজনে। হঠাৎ এতক্ষণে ড্যানির মনে পড়ল তার কোটের পকেটে পড়ে আছে সকালের সেই কাঁচা মাংস। সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বেলে ঝলসাতে বসল মাংস। টারজানই এ মাংস দিয়েছিল। ড্যানি বলল টারজানের কথা, —কিভাবে ও ড্যানিকে বাঁচিয়েছিল। নিজের মেসিনগান ছোঁড়ার কথাও বলল অবশ্য। জেজেবেল ভাবল এ কোন স্বপ্নের দেশ!

ওরা বুঝল না প্রায় মাইলখানেক ওপর থেকে ওদের রান্নার আগুন কয়েকটা মানুষের নজরে পড়েছে।

ওরা সবে কয়েক টুকরো মাংস মুখে তুলেছে এমন সময় ঘোড়ায় চড়ে একদল লোক ছুটে এল ওদের দিকে। জেজেবেল জীবনে ঘোড়া দেখেনি। জন্তুটাকে সুন্দর লাগল কিন্তু ওদের পিঠে ভয়ংকর কালো মানুষদের দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

ড্যানি চিৎকার করল, 'পালাও, পালাও জেজেবেল।'

কিন্তু জেজেবেল নড়লই না।

তিনজন লুঠেরা এগিয়ে এল ড্যানির দিকে। ড্যানি নিরস্ত্র। তাই গুলি খরচ না করে ওদের একজন বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারতে এল তাকে। সেটা আঁচ করতে পেরে সে লোকটাকে কাটিয়ে পাশে সরে গেল।

লোকটা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে ফের আসার আগেই ড্যানি আবার পাশে সরে ঘোড়াটার গায়ে লাফিয়ে পড়ে এক ঝটকায় লোকটাকে ফেলে দিল। তার রাইফেলটা ছিটকে পড়ে গেল। পিছনের ছুটন্ত ঘোড়াটা ওদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ড্যানি কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেলটা গদার মত তুলে নিয়ে ওদের মাথায় মারল দুই ঘা। কিন্তু আরও কয়েকজন ততক্ষণে এসে গেছে। ওরা ড্যানিকে মাটিতে শুইয়ে ফেলল।

আগের দুজন উঠে পড়েছে। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ওরা ড্যানির মাথা ফাটিয়ে দিল। তাই দেখে চিৎকার করে ছুটে এল জেজেবেল। কিন্তু ড্যানির কাছে পৌঁছতে পারল না। ওকে বন্দী করে ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে চলে গেল কালো লুঠেরার দল। ড্যানি মাটিতে পড়ে রক্তে ভাসতে লাগল।

●

টারজান যখন আব্রাহামের গ্রামে ঢুকছে, দূর থেকে তাকে একজন দেখতে পেল। সে গ্রামে গিয়ে সবাইকে সাবধান করে দিল। সবাই তড়িঘড়ি ঘর ছেড়ে দূরে উঁচু পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে ছুটল।

টারজান পাহাড় থেকে নেমে একটা সমতল ভূমিতে দাঁড়াল। হঠাৎ তার দিকে গড়িয়ে আসতে লাগল ভারি ভারি পাথর। আব্রাহামের দল নগ্নপ্রায় এই সাদা আগন্তুককে তাড়াতে চায়। টারজানের শুধু একটু কৌতূহল ছিল গ্রামটাকে দেখার। সে জানে স্মিথ এখানে নেই। তাই বাধার সম্মুখীন হয়ে আর এগোল না। ফিরে চলল চিনেরেখের দিকে। সেখানে সে স্মিথের সঙ্গে আরো দুটি পায়ের চিহ্ন দেখতে পেল।

আব্রাহাম বীর বিক্রমে সবাইকে জানিয়ে দিল, সে জিওভার আশীর্বাদে তার গ্রামবাসীকে রক্ষা করেছে।

ইলাইজার দলবল ফের বন্দী করেছে স্মিথ আর বারবারাকে। এবার আর মুক্তি নেই।

স্মিথ বল, 'আমরা কি এমন ক্ষতি করেছি ওদের? ছাগলছানা মেরেছি, তার দাম দিয়ে দিলেই হবে।'

বারবারা অত দুঃখেও হেসে ফেলল, বলল, 'টাকা দেবে? কি করবে ওরা টাকা নিয়ে? ওদের মধ্যে টাকার চল নেই।'

স্মিথ বলল, 'তবে বন্দুকটা ফেরত দিক। ওটাই নয় উপহার দিয়ে দেব।'

বারবারা হেসে বলল, 'ও ফেরত পাবে না। ওসব ভদ্রতা ওরা জানে না।'

উত্তর মিডিয়ানদের গ্রামে এসে পড়ল ওরা। সাধরণ কুঁড়ে ঘর ছাড়াও কিছু কিছু পাথরের ঘরবাড়িও রয়েছে। দক্ষিণ মিডিয়ানদের চেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন এদের ঘরদোর।

শয়ে শয়ে মেয়ে পুরুষ বাচ্চা বুড়ো দেখতে এল ওদের। স্বাস্থ্য উপছে পড়ছে ওদের শরীরে। ওদের প্রত্যেকের মাথা ভর্তি সোনালী চুল আর গভীর নীল চোখ। সত্যিই বেশ সুন্দর দেখতে। খুব কথা বলছিল ওরা, আর অবাক হয়ে দেখছিল বারবারা আর স্মিথের চেহারা আর অদ্ভুত পোষাক। ওদের ভাষা দক্ষিণ-মিডিয়ানদের মতই। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না বারবারার। বুঝল ওদের স্বভাব খুব নির্দয় নয়। তবে ধর্মের বিধান বড় কঠোর। শত্রু মনে করলে ধর্মের দোহাই দিয়ে ওরা নিষ্ঠুর হতে পিছপা হয় না।

বারবারা রয়েছে একটা মেয়ের সঙ্গে, আর স্মিথ একটা লোকের প্রহরায় অন্য ঘরে। বারবারার সঙ্গিনীটি গল্প জমায়

বারবারার সঙ্গে।

—'দক্ষিণ গ্রাম থেকে আসছ? তবে তোমায় ওদের মত দেখতে নয় কেন?'

—'আমি মিডিয়ান দেশের মেয়ে নই।' জানাল বারবারা।

—'পাহাড়ের ওপারের মানুষ তুমি?'

—'হ্যাঁ, অনেক দূর থেকে আসছি। আমরা দেশে ফিরে যেতে চাই।'

—'পাহাড়ের ওদিকের মানুষরা তো খুব খারাপ। কিন্তু তোমায় তো তা মনে হচ্ছে না। উঁহু, তুমি দক্ষিণ গ্রামেরই লোক। তবে ইলাইজা তোমায় ছাড়বে না।'

—'কেন?'

—'ধর্মবিরোধীদের শাস্তি হল মৃত্যু। তুমি যদি মিডিয়ান দেশের মেয়ে না হও, তবে তুমি শয়তান। তাহলেও তোমার মৃত্যু।'

—'না, আমি শয়তান নই।' বলল বারবারা।

—'তাহলে তুমি দেবদূত! যদি সত্যিই দেবদূত হও তাহলে অলৌকিক কিছু দেখাও। আচ্ছা তোমার সঙ্গে ঐ যে ছেলেটা, ও-ও কি দেবদূত?'

—'ও আমেরিকার লোক।'

—'সেটা আবার কি? নাঃ, শুনছিলাম ও দক্ষিণ গ্রামের। ওকেও মরতে হবে।' বলল মেয়েটি।

—'দক্ষিণ গ্রামের মানুষ হলেই মরতে হবে?' জানতে চায় বারবারা।

—'হ্যাঁ', মেয়েটি বলে, 'ওদের কালো চুল, আমাদের সোনালী। ওরা বলে পলের চুল ছিল কালো। তাই ওদের আমরা মেরে ফেলি। ওরা ধর্মবিরোধী।'

এই সময় একজন লোক এসে বারবারাকে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

বারবারা দেখল একটা পাথরের বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় ইলাইজা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে আছে অনেক লোকজন। লাফায়েৎ স্মিথ দাঁড়িয়ে আছে ইলাইজার সামনে। বারবারাকে স্মিথের পাশে দাঁড় করান হল।

বেঁটেখাটো আঁটসাঁট গড়নের চেহারা ইলাইজার। মুখভর্তি সোনালী দাড়ি গোঁফ। ছাগলের চামড়ার পোষাকের সঙ্গে গলায় চামড়ার দড়িতে অলঙ্কার করে ঝুলিয়ে রেখেছে স্মিথের রিভলবারটি।

ইলাইজা বারবারাকে বলল, 'এই লোকটা কেন কথা বলছে না? ও যা বলছে তার কোন মানে হয় না কেন?'

বারবারা বলল, 'ও তোমাদের ভাষা জানে না।'

—'তাহলে ও শয়তান।' চিৎকার করে বলল ইলাইজা।

—'হয়তো ও দেবদূত। ও বিশ্বাস করে পলের চুল সোনালী।' বুদ্ধি করে বলে ফেলল বারবারা।

ইলাইজার রাগ কিছুটা কমে এল। ও দলবল নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল আলোচনা করতে। এই ফাঁকে ওদের ধর্মবিশ্বাসের কথা বারবারা বুঝিয়ে দিল স্মিথকে, ইংরিজিতে।

ইলাইজা এক সময় বার হয়ে এল। হাত তুলে সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলল, 'না, মানুষটা দেবদূত নয়। দেবদূতের ডানা থাকে। এর ডানা নেই কেন?'

সবাই একবাক্যে কথাটা মেনে নিল।

—'তাহলে একে মেরে ফেলাই উচিত।' বলল ইলাইজা।

বারবারা শুকনো মুখে তাকাল স্মিথের দিকে। লোকজনের হট্টগোলের মধ্যে ওকে ইংরিজিতে বলল, 'স্মিথ, তোমায় যে করে হোক পালাতে হবে। অন্ধকার হয়ে আসছে, এই সুযোগ। ওরা অন্যমনস্ক, তুমি ছুট দাও।'

স্মিথ বলল, 'না, তোমায় ফেলে যাব না।'

ইলাইজা হাঁকল, 'কবর তৈরী কর। পোঁত ওকে। যদি ও দেবদূত হয় তো মৃত্যুর পর উঠে আসুক।'

স্মিথ জানতে চাইল কি বলছে ওরা।

বারবারা বলল, 'তোমায় জ্যান্ত কবর দেবে!'

—'আর তুমি?'

—'আমায় ওদের দাসী হয়ে থাকতে হবে।'

ধারালো কাঠি আর পাথরের অস্ত্র দিয়ে মাটি খোঁড়া হচ্ছে। পূজারীর দল ঘিরে আছে স্মিথকে। ইলাইজা তার গলায় ঝোলানো রিভলবার নিয়ে খেলা করছে আপন মনে।

স্মিথ বুঝল তার বিপদ। সে বারবারাকে বলল, 'আমি ছুট লাগাচ্ছি। তুমিও এসো। তারপর যা হয় হবে।'

ওদিকে ইলাইজার ঘরের পিছনের দিকের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একজন সব কিছু নজর রাখছিল, সকলের অজ্ঞাতে।

স্মিথ হঠাৎ বারবারার হাত ধরে এক ঝটকায় ওকে টেনে নিয়ে ছুট লাগাল। সবাই স্তম্ভিত। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। ইলাইজার চিৎকারে চমক ভেঙ্গে ছুটল সবাই। স্মিথ আর বারবারার পিছনে।

একবার উত্তরের অন্ধকার জঙ্গলে ঢুকে পড়লে বাঁচবার হয়তো আশা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনই, একটা লাভা পাথরে হোঁচট খেয়ে স্মিথ পড়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে আবার

দৌড়বার আগেই ধরা পড়ে গেল ওরা।

আবার ওদের টেনে আনা হল সেই পাথরের ঘরের প্রাঙ্গণে। আবার লোকজন জড়ো হল ওদের ঘিরে।

গর্ত খোঁড়া শেষ হলে টেনে আনা হল স্মিথকে। ইলাইজা মন্ত্র পড়তে লাগল চিৎকার করে। পুঁতে ফেলার আগে ইলাইজার ইচ্ছে হল তার গলায় ঝোলান জিনিসটা সম্পর্কে জেনে নেবে স্মিথের কাছে। বারবারা ইলাইজার কথা বোঝে। তাই ইলাইজা ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি?'

বারবারা বলল, 'ওটা মানুষ-মারা অস্ত্র।'

—'কি করে মারতে হয়?' জানতে চাইল ইলাইজা।

বারবারা স্মিথকে বলল ব্যাপারটা। স্মিথের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ও বলল, 'বারবারা, ওটা আমায় দিতে বল। আমি দেখিয়ে দিই কি করে মারতে হয়।'

সে কথাটা ইলাইজাকে বুঝিয়ে দিতে ইলাইজা ভেবে চিন্তে বলল, 'না ওকে দিলে ও যদি আমায় মেরে ফেলে!'

একথাটা বারবারা জানিয়ে দিল স্মিথকে। স্মিথ বলল, 'ওকে বল, আমি বুঝিয়ে দেব কি করে ওটা চালাতে হয়।'

বারবারা জানাল কথাটা। ইলাইজা বলল, 'কি করে ধরতে হয় শিখিয়ে দিতে বল।'

এইভাবে বারবারার মাধ্যমে ইলাইজার বন্দুক ছোঁড়ার শিক্ষা আরম্ভ হল।

স্মিথ বোঝাল ওটার খোলা নলের মুখে চোখ রাখতে। ইলাইজা নলটা নিজের মুখে ঘুরিয়ে চোখ রাখল। স্মিথ বোঝাল এবার ট্রিগারে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিতে। তাহলেই একটা বিদ্যুৎ চমক দেখতে পাবে ইলাইজা।

বারবারা চমকে উঠে ইংরিজিতে বলল, 'কিন্তু ও যে খুন হবে!'

—'হোক।' বলল স্মিথ। 'এছাড়া উপায় নেই। হট্টগোলের মাঝে আর একবার পালাতে চেষ্টা করব আমরা।'

ইলাইজা বন্দুকের নলটা মুখের কাছে এনে দেখতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে কৌতূহলী হাতে ট্রিগারে চাপ দিল।

কান ফাটানো একটা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ইলাইজার দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

স্মিথ আর বারবারা প্রহরীদের হাত ছাড়িয়ে ছুট দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। অত্যন্ত সতর্ক হয়েছে প্রহরীরা। জাপটে ধরে ফেলল ওদের।

চারদিক নিস্তব্ধ। পর মুহূর্তেই সকলে বুঝল ওদের নেতা আর বেঁচে নেই। অলৌকিক একটা কিছু ঘটে গেছে। এ শয়তানের খেলা। প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সবাই, এমন সময় একটি রহস্যময় দেহ ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে স্মিথ আর বারবারার পাশে দাঁড়াল। সেই মানুষটিই আড়াল থেকে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল সব কিছু।

এমন বিশাল চেহারার সাদা দৈত্য মিডিয়ানবাসীরা কেউ কখনো দেখেনি। খোলা শরীরে স্বাস্থ্যের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সে টারজান!

স্মিথ চিনল তাকে। বারবারা বুঝল এই মানুষটা তাদের রক্ষা করতে চায়। দলের লোকজনও বুঝল তা। তাদের একজন গদা তুলে টারজানের দিকে এগিয়ে এলো। আর একজন বারবারাকে টেনে সরিয়ে আনল। স্মিথ এক টানে নিজেকে মুক্ত করে নিল। আর টারজান পিস্তলের এক গুলিতে গদাধারীকে মাটিতে শুইয়ে দিলে।

আগের গুলিতে মরেছে তাদের নেতা। পরের গুলিতে আর একজন পড়ে গেল। অন্যরা আর সাহস পেল না, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

টারজান স্মিথকে বলল, 'ছোট মেয়েটিকে নিয়ে আমি আসছি।'

জেজেবেল দুঃখে ভেঙ্গে পড়ল। ভয় সে পেয়েছে ঠিকই—এমন ভীষণ চেহারার কালো মানুষ সে দেখেনি কখনো, এমন জন্তুর কথা জানতই না, পিঠেও চড়েনি কোনদিন। তবু ড্যানিকে বিপদে ফেলে আসার জন্য সে কাতর হয়ে পড়ল বেশি। সে কি বেঁচে আছে এখনও?

বেড়াঘেরা গ্রামে পৌঁছল লুঠেরার দল নতুন বন্দিনীকে নিয়ে। হৈ-হট্টগোল আর উল্লাস শুনে স্ট্যাবাচ আর কাপিয়েত্রো বেরিয়ে এল বাইরে। জেজেবেলকে দেখে ওরা অবাক।

—'আরে, কোথায় পেলে একে?' জিজ্ঞাসা করল কাপিয়েত্রো।

—'গ্রাম থেকে একটু দূরে। ওর সঙ্গে একটা লোক ছিল, যে লোকটা জংলী মানুষটার সঙ্গে পালিয়েছিল।'

দাঁত কড়মড় করে কাপিয়েত্রো বলল 'তাকেও নিয়ে এলে না কেন?'

—'তাকে মেরে ফেলেছি।' জানাল লোকটি।

কাপিয়েত্রো আশ্বস্ত হল। তারপর জেজেবেলকে দেখতে লাগল খুঁটিয়ে। 'বাঃ বেশ দেখতে তো!' বলল সে।

স্ট্যাবাচ বলল, 'ও হয়তো ইটালীর ভাষা বোঝে না। ওর সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলাই ভাল। মেয়েটিকে আমিই নেব ভাবছি।'

—'নেব বললেই তো হল না, কিনতে হবে আমার কাছ থেকে।' সাফ জানিয়ে দিল কাপিয়েত্রো।

—'কত দাম চাও?' স্ট্যাবাচ জানতে চাইল।

কাপিয়েত্রো বলল, 'দরাদরি এখন নয়।' এই বলে সে জেজেবেলকে নিয়ে ঘরে চলল। স্ট্যাবাচ চলল পিছনে পিছনে।

জেজেবেল কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন? আমায় ছেড়ে দাও। আমি ড্যানির কাছে যাব!'

স্ট্যাবাচ বলল, 'কেঁদো না, কিচ্ছু ভয় নেই। জেনো আমি তোমার বন্ধু।'

জেজেবেল চেয়ে রইল স্ট্যাবাচের দিকে। বলল, 'তাহলে আমায় ড্যানির কাছে নিয়ে চল।'

—'যাব যাব, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।'

এই বলে স্ট্যাবাচ কাপিয়েত্রোকে নিচু গলায় বলল, 'কত দর ঠিক করলে?'

কাপিয়েত্রো কিন্তু বেঁকে বসল। বলল, 'আমি ওকে বেচব না। আমি অন্য কথা ভাবছি। এসো, মদ খাওয়া যাক। তারপর বলব।'

ওরা মদ খেতে বসল। দূরে একটা ছেঁড়া কম্বলের ওপর বসে রইল জেজেবেল। সামনে খাবারদাবার, কিন্তু কিচ্ছু ছুঁল না।

একটা বোতল শেষ হতে স্ট্যাবাচ বলল, 'বল কি ভাবছ।'

কাপিয়েত্রো ছড়িয়ে থাকা তাসগুলো গুছিয়ে বলল, 'ভাবছি পাঁচ দান খেলব। যে তিন দান জিতবে, মেয়েটি হবে তার।'

স্ট্যাবাচ একটু ভেবে শেষে রাজি হয়ে গেল।

জেজেবেল খেলা-টেলা বোঝে না। শুধু এটুকু বুঝল ঐ জিনিসটার সঙ্গে তার ভাগ্য জড়িয়ে রয়েছে। সে চুপ করে বসেই রইল। এটুকুও বুঝল, বোতলের ঐ অদ্ভুত জল খেয়ে ওদের কথাবার্তা, গলার স্বর সব যেন বদলে গেছে।

প্রথম খেলায় স্ট্যাবাচ জিতল! তারপরের দুটি জিতল কাপিয়েত্রো। স্ট্যাবাচ রেগে উঠল। কোন রকমে সামলে নিল নিজেকে। চতুর্থ খেলার তাস বাঁটা হল। কাপিয়েত্রো তার হাত দেখে নিয়ে বলল, 'মেয়েটিকে আমিই পাব মনে হচ্ছে।'

স্ট্যাবাচ আরো রেগে গেল। চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখাই যাক ও কার!'

—'তার মানে?'

—'মানে এ খেলায় আমিই জিতব।' চেঁচিয়ে উঠল স্ট্যাবাচ, মাটিতে ঘুঁসি মেরে।

হো হো করে হেসে উঠল কাপিয়েত্রো। 'ভালো ভালো, তার আগে এটুকু খেয়ে নাও।' বোতল এগিয়ে দিল স্ট্যাবাচের দিকে।

স্ট্যাবাচ বোতল সরিয়ে দিল, 'না, আর খাব না। তাস ফেল।'

—'আরে তাড়া কিসের। অত তাড়াতাড়ি হারতে চাও কেন?' কাপিয়েত্রো আরো রাগিয়ে দিল স্ট্যাবাচকে।

কিন্তু স্ট্যাবাচই জিতল এই দানে। আর একটা খেলা বাকি। যে জিতবে সে নেবে জেজেবেলকে।

তাস পড়তে লাগল। জেজেবেল চেয়ে আছে অবাক হয়ে। কিচ্ছু না বুঝে ও-ও যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল একটা কিছুর জন্যে।

—'জিৎ!' চেঁচিয়ে উঠল কাপিয়েত্রো। স্ট্যাবাচ ঘোলাটে চোখে টেনে নিল মদের বোতল! ঢক ঢক করে অনেকটা গলায় ঢেলে ফিরিয়ে দিল কাপিয়েত্রোকে। কাপিয়েত্রো উঠে জেজেবেলের দিকে এগোল। জেজেবেল ভয়ে কুঁকড়ে গেল।

স্ট্যাবাচ হঠাৎ গর্জন করে উঠল, 'ও ভয় পাচ্ছে, ওকে ছোঁবে না!'

—'তোমার তাতে কি? ও ভয় পাচ্ছে কিনা পাচ্ছে তা আমি বুঝব।' বলল কাপিয়েত্রো।

কিন্তু স্ট্যাবাচ রুখে দাঁড়াল। বলল, 'সরে যাও! সরে যাও বলছি!'

কাপিয়েত্রো ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কি বলতে চাও তুমি?'

স্ট্যাবাচ বলল, 'ও আমার! তুমি জোচ্চার! খেলায় ঠকিয়েছ।'

—'চুপ, মিথ্যুক!' চিৎকার করল কাপিয়েত্রো, সেই সঙ্গে একটা ঘুঁসিও চালাল। তারপর দুই মাতালে টলমল পায়ে লড়াই শুরু হল। ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তারা। এ ওর গলা টিপে ধরে মারতে চাইল।

জেজেবেল ভাবল এই বেলা পালাই। কিন্তু বাইরে ভয়ংকর কালো মানুষের ভয়ে এগোতে পারল না। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ স্ট্যাবাচের হাত তার কোটের পকেটে ঘোরাফেরা করতে লাগল। একটু আলগা পেয়ে কাপিয়েত্রো চেপে ধরল স্ট্যাবাচকে। স্ট্যাবাচের হাতে উঠে এসেছে একটা ছোরা। সেটা আমূল বিঁধে গেল কাপিয়েত্রোর পিঠে। লুটিয়ে পড়ল লুঠেরাদের নেতা।

—'ওকি, মেরে ফেললে ওকে?' জেজেবেল বলল।

—'চুপ! ওর দলবল শুনতে পাবে। তুমিও বাঁচবে না তাহলে।'

কাপিয়েত্রোর দেহটা এককোণে সরিয়ে ফেলল স্ট্যাবাচ। তারপর জেজেবেলকে বলল, 'টুঁশব্দ না করে দাঁড়াও। আমি আসছি।'

রাইফেলটা দোরের পাশে রাখল। তারপর রিভলবারটা কোমরে গুঁজে বেরিয়ে গেল স্ট্যাবাচ। ঘোড়াগুলো যে দিকে বাঁধা ছিল সেদিকে ছুটল। দলের কয়েকজন লোক এদিক সেদিক বসেছিল।

—'তোমাদের মোড়ল কোথায়?' স্ট্যাবাচ জানতে চাইল। কেউ ইংরিজি বুঝল না, চুপ করে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ইশারা ইঙ্গিতে স্ট্যাবাচ বুঝিয়ে দিলে তার দুটো ঘোড়া চাই। কিন্তু ওরা ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিলে স্ট্যাবাচের কথায় ওরা ঘোড়া দিতে পারবে না।

কথাবার্তার আওয়াজে মোড়ল বেরিয়ে এল ওর ঘর থেকে। সে কাজ চালানোর মত ইংরিজি বোঝে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলতেও পারে। সে জানতে চাইল কে ঘোড়া চাইছে। স্ট্যাবাচ বলল, 'তোমার মনিব। ও অসুস্থ। একটু বেশি নেশা করেছে। তাই আমায় পাঠাল। একটু বের হতে হবে।'

—'দুটো কেন?' জানতে চাইল মোড়ল, স্ট্যাবাচ কি বলবে প্রথমে ঠিক করতে পারল না। পরে দেখল ইতস্ততঃ করা ঠিক নয়। বলল, মেয়েটাকে নিয়ে দেখতে যেতে হবে সাদা লোকটি সত্যিই মরেছে কিনা। কাপিয়েত্রোর আদেশ।'

—'আর লোক নেবে না সঙ্গে?' জানতে চাইল মোড়ল। স্ট্যাবাচ বুঝিয়ে দিল মেয়েটির কথায় সাদা লোকটিকে বশ করা যাবে, লোকজন দেখলে বেঁকে বসবে।'

মোড়ল রাজি হল। দুটো ঘোড়া এনে দিল জিন, লাগাম পরিয়ে। ঘোড়া দুটোকে বাগিয়ে নিয়ে স্ট্যাবাচ চলল জেজেবেলের কাছে। মোড়লটি ওর সঙ্গে সঙ্গে চলল। মহা বিপদ। স্ট্যাবাচ থেমে পড়ে বলল, 'তুমি যেও না। ও তোমাদের ভয় পায়। তোমায় দেখলে আসতে চাইবে না।'

মোড়ল কি ভেবে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে।'

স্ট্যাবাচ বলল, 'ফটক খোলা রাখতে বলো।'

রাইফেলটা তুলে নিয়ে জেজেবেলকে টেনে এনে জোর করে বসিয়ে দিলে ঘোড়ার পিঠে। হাতে ধরিয়ে দিলে লাগাম। তারপর অন্যটায় নিজে চড়ে পঞ্চাশটা খুনীর চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পাহাড়ে উঠতে উঠতে দেখল ম্লান রোদের ছায়া দীর্ঘ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে নিচে, প্রান্তরে। দিন শেষ হয়ে আসছে।

*

ড্যানি প্যাট্রিকের জ্ঞান ফিরে এল। শূন্য দৃষ্টিতে সে আফ্রিকার নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল সে কোথায়। কি হয়েছে তার! মাথাটায় চিনচিনে ব্যথা। মনে পড়ে গেল সে মার খেয়েছে। কে মারল তাকে, শিকাগোর গুণ্ডারা? কিছুতেই কিছু মনে আসছে না তার।

উঠে বসল। চোখে পড়ল পাহাড়ের সারি। মনে পড়ল স্মিথের কথা, আফ্রিকার কথা। পাহাড় থেকেই গড়িয়ে পড়ল নাকি? উঠে দাঁড়াল। হাতে পায়ে জোর পাচ্ছে, শুধু মাথাটায় ব্যথা। তাঁবুতে ফিরতেই হবে। স্মিথ হয়তো চিন্তা করছে। ওবাম্বি কোথায়? কিন্তু কোন দিকে যাবে সে?

এলোমেলো পথে হাঁটতে লাগল। উত্তর-পশ্চিম কোণে টোঙ্গানি প্রহরী ওকে দেখে কর্কশ আওয়াজ তুলে চেঁচাল। ড্যানি দেখল অদ্ভুত চেহারার না-মানুষ না-বাঁদর দূর থেকে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসছে। ওর সঙ্গে জড়ো হয়েছে আরো শ-খানেক বাঁদর।

ওদিকে ভিড়ল না ড্যানি। টোঙ্গানিরাও মুখ ভেংচে চলে গেল। একটা ছোট্ট পাথরের গা বেয়ে জল ঝরছে। এই দেখে ড্যানির মনে পড়ল ওর ক্ষিধে তেষ্টা দুটোই পেয়েছে। এটাই সেই জায়গা যেখানে টারজান শূওর শিকার করেছিল। জল খেয়ে মাথার রক্তটা ভালো করে ধুয়ে মুছে আবার চলল ড্যানি। কোন দিকে যাচ্ছে আন্দাজ নেই, তবু চলল। পাহাড় বেয়ে দক্ষিণ-পুব দিক ঘেঁসে চলতে চলতে হঠাৎ সে তার চেনা জায়গায় এসে পড়ল। ঐ তো তাদের পরিত্যক্ত তাঁবু।

তার মনে পড়ে গেল, স্মিথকে সে খুঁজতে বেরিয়েছে। সে উঁচু চূড়ায় উঠে এসে বসল। অনেক নিচের লম্বা ঘাসগুলো নড়ে উঠল। একটা চিতার মুখ বেরিয়ে আসছে। তার মনে পড়ে গেল টারজানের কথা। সে একটা বড় পাথর তুলে ছুঁড়ল জন্তুটার দিকে। লাফ দিয়ে ঘাসের ঝোপ

ভেঙ্গে পালাল জন্তুটা।

মনে পড়ে গেল কোটের পকেটে কাঁচা মাংস হয়ত কিছুটা আছে। মাংস বার করে ছুরি দিয়ে কাটল। তারপর ডালপালা জড়ো করতে লাগল ঝলসাবে বলে। তারপর তার চোখে পড়ল বেড়া-ঘেরা সেই গ্রামটি। সেই লুঠেরাদের আস্তানা! সে চুপ করে নজর করতে লাগল। হাতে মেশিন-গানটা নেই, এই যা আফসোস।

হঠাৎ দেখে স্ট্যাবাচ কয়েকটা কালো লোকের সঙ্গে কি সব বলাবলি করল। তারপর দুটো ঘোড়া নিয়ে ঘরের দিকে ফিরল। একটু পরেই দেখে স্ট্যাবাচ আর জেজেবেল বেরিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ায় চেপে। জেজেবেলকে দেখে একটা ধাক্কা খেল যেন মাথায়। সমস্ত স্মৃতি ফিরে এল তার।

সে পাহাড়ের কিনার ধরে ছুটল ওদের দিকে নজর রেখে। সন্ধ্যা নেমে এল। চারদিক অন্ধকারে ডুবে গেল। ওদের আর দেখা গেল না। শুধু ঘোড়ার খুরের আওয়াজটুকু যেন তখনও লেগে আছে বাতাসে। সেই আওয়াজে কান পেতে ছুটল ড্যানি। ওদের ধরতেই হবে।

তিনদিন ধরে শরীর ও মনের ওপর যে ধকল চলেছে তাতে এই মুহূর্তে যদি বারবারা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু দাঁড়ালে চলবে না, মিডিয়ান দেশ থেকে পালাতেই হবে। ওর অবস্থা দেখে টারজান ছুটে এসে ওকে পুতুলের মত তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল। স্মিথও কোনরকমে পা টেনে টেনে হেঁটে চলল। তারা প্রাণে বেঁচেছে, তবু উদ্বেগ কাটেনি। স্মিথ ও জেজেবেলকে খুঁজতে হবে।

টারজান আপাততঃ ওদের নিয়ে যেতে চায় পাসমোরের তাঁবুতে, বিশ্রামের জন্য। অনেকক্ষণ চলার পর একটা গভীর জঙ্গল পেরিয়ে দূরে আলোর ঝলকি দেখা গেল। ওখানেই পাসমোরের তাঁবু।

ওখানে পৌঁছে কয়েকজন প্রহরীর সঙ্গে কি সব কথাবার্তা বলল টারজান। তারপর বারবারাকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এখানে বিশ্রাম নাও তোমরা। কোন অসুবিধা হবে না। আমি চললাম তোমাদের অন্য দুজন বন্ধুর খোঁজে।

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল টারজান। স্মিথ আর বারবারা তাকে ধন্যবাদ জানাবার সময়ও পেলে না।

আলাদা তাঁবু তৈরি হল বারবারার জন্য। স্মিথ প্রহরী-দের সঙ্গে শুতে গেল। পরম নিশ্চিন্তে অনেকদিন পরে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

ঠিক এই সময় স্ট্যাবাচ আর জেজেবেল চলেছে ঘোড়ায় চড়ে। তবে কোনদিকে, কোনপথে চলেছে তারা জানে না।

তখনও পুরোপুরি সকাল হয়নি। স্ট্যাবাচ দেখল একটা গভীর বনের ধারে এসে পড়েছে তারা। ঘোড়া থামাল স্ট্যাবাচ। ও বড়ই ক্লান্ত। একটু না ঘুমোলে আর এগোতে পারবে না। জেজেবেলও ক্লান্ত, সারা শরীর অবশ হয়ে আছে। তবে ধকল সহ্য করার মত ক্ষমতা সে এখনও রেখেছে।

ঘোড়া দুটোকে জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছে বেঁধে দিল স্ট্যাবাচ। তারপর মাটিতে শুয়েই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

বনের মধ্যে বড় অন্ধকার। জেজেবেল ভাবল পালাবে। কিন্তু কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিল না। চুপ করে বসে রইল আলো ফোটার অপেক্ষায়।

পুব আকাশে তখন সবে একটু আলো ফুটেছে। ঝোপঝাড় মাতিয়ে কিসের যেন গর্জন উঠল। ধড়মড় করে উঠে বসল স্ট্যাবাচ। কিছু বোঝার আগেই দুদ্দাড় করে ছুটে পালাল, আর সেই মুহূর্তেই একটা সিংহ ওদের টপকে ঘোড়া দুটোর পিছনে মিলিয়ে গেল।

স্ট্যাবাচ বন্দুকটা তুলে নিয়ে জেজেবেলকে বলল, 'তুমি ঐ গাছটায় চড়ে বস। আমি দেখি কিছু শিকার পাই কিনা।'

জেজেবেল ভাবল লোকটা সিংহের পেটে গেলেই ভাল ছিল। সে জেনেছে স্ট্যাবাচ খারাপ লোক। গত রাত্রির ঘটনা সে কোনদিন ভুলবে না। এসব ভাবতে ভাবতে জেজেবেল এক সময় ঘুমে ঢলে পড়েছে গাছের ডালে।

স্ট্যাবাচ একটা জলের ধারে এসে দাঁড়িয়ে রইল শিকারের অপেক্ষায়। একটি প্রাণীর আবির্ভাব হল বটে, তবে তাকে মোটেই আশা করেনি স্ট্যাবাচ। ভাগ্য কি

এতই সুপ্রসন্ন! মস্কো থেকে এই দূরান্ত আফ্রিকায় যে মানুষটিকে মারার জন্য ছুটে এসেছে সে এত বিপদ আপদ তুচ্ছ করে, যার জন্য এত তোড়জোড়, সেই মানুষটি যে হাতের মুঠোয়! কেউ বাধা দেবার নেই।

ঝোপ ঠেলে তখন বেরিয়ে এসেছে টারজান স্বয়ং। সামনে, বন্দুকের আওতায়। ঝোপের আড়াল থেকে বন্দুক তুলল স্ট্যাবাচ। টারজান কিছুই টের পেল না।

কিন্তু একি হল! উত্তেজনায় স্ট্যাবাচের সারা শরীর যে কাঁপছে! কিছুতেই নিশানা স্থির রাখতে পারছে না সে। কিন্তু তাকে তো গুলি করতেই হবে। এমন সুযোগ আর কি আসবে? টারজানও বেশিক্ষণ এইভাবে বন্দুকের দিকে বিশাল বুক মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। স্ট্যাবাচ ট্রিগার টিপল। টারজান চমকে লাফিয়ে একটা নিচু ডালে ঝুলে পড়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্ট্যাবাচ ভীষণ ঘাবড়ে গেল! গুলি লাগেনি, টারজান পালিয়েছে। তাকেও তাহলে পালাতে হবে। না জেজেবেলের কাছে আর যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজে এখন প্রাণে বাঁচলে হয়।

সে উর্ধশ্বাসে ছুটল জঙ্গলের গভীরে। ছুটতে ছুটতে যখন হাঁপিয়ে পড়েছে, হঠাৎ কাঁধে একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করল। পিছন ফিরে দেখে কাঁধে একটা তীর বিঁধে আছে, তার পালকটা ছুটন্ত হাওয়ায় দুলছে। আতঙ্কে অধীর হয়ে আরও জোরে ছুটল স্ট্যাবাচ। কোন্ অশরীরী ঘাতক তাকে তাড়া করে ফিরছে সে জানে না। আরও একটা তীর এসে বিঁধল তার ঘাড়ে। সে আর্তনাদ করে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করল, অদৃশ্য কোন আত্মার প্রতি,—'ছেড়ে দাও আমায়! ছেড়ে দাও! কারোর কোন ক্ষতি করব না আর, ছেড়ে দাও!' তৃতীয় তীরটি সামনে থেকে এসে বিঁধল একেবারে গলায়। সেটাকে দুহাতে চেপে ধরে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল লিওন স্ট্যাবাচ। সে চিৎকার কানে গেল জেজেবেলের। সে আশ্বস্ত হল, নিশ্চয়ই সিংহের হাতে খুন হয়েছে স্ট্যাবাচ।

টারজান লাফ দিয়ে একটা গাছ থেকে নেমে দাঁড়াল স্ট্যাবাচের সামনে। স্ট্যাবাচের হাত চলে গেল কোমরে রিভলবারটার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে টারজানের আরেকটা তীর বিঁধে গেল তার বুকে। স্ট্যাবাচের হাত আর পৌঁছল না, নিথর হয়ে সে গড়িয়ে পড়ে গেল।

জংলী বীরের উন্মত্ত জয়োল্লাসে সারা বন কাঁপতে লাগল। সে আওয়াজে ছিল কি এক অলৌকিক শিহরণ, প্রাণী মাত্রেই ভয়চকিত হয়ে ওঠে। জেজেবেলও ভয় পেয়ে গেল। গাছ থেকে নেমে প্রাণভয়ে দৌড়ল সে।

সকাল হতে বন্দুকবাজ দেখল সে একটা জঙ্গলের ধারে এসে পড়েছে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে স্ট্যাবাচ কিংবা জেজেবেলকে কোথাও দেখতে পেল না। চোখের আড়ালে একটু বিশ্রাম নিতে হবে এই ভেবে জঙ্গলে ঢুকল ড্যানি। হঠাৎ দূরে দেখতে পেল পাহাড় বেয়ে প্রাণভয়ে দুটো ঘোড়া ছুটে পালাচ্ছে আর তাদের পিছনে ধাওয়া করেছে একটা সিংহ।

তার ভয় হল, এই দুটোই ওদের ঘোড়া, আর এই সিংহের খপ্পরে জেজেবেলের কিছু হয়নি তো? সে ঘুম, ক্লান্তি সব ভুলে গিয়ে সেদিকে ছুটল।

সিংহটা ততক্ষণে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ঘোড়াদুটোকে ছেড়ে সে উত্তর-পুবে ঘুরে তেমনি দৌড়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঠিক এই সময় স্ট্যাবাচ টারজানকে নির্জন জলের ধারে গুলি চালিয়েছিল। ড্যানি ছুটছিল জঙ্গলের কিনার ধরে। চমকে উঠল সেই আওয়াজে। সে আরো জোরে ছুটল। কিছুক্ষণ পরে স্ট্যাবাচের সেই আর্তনাদও তার কানে পৌঁছাল। আর তার পরেই টারজানের হাড়-কাঁপানো বিজয়োল্লাস।

বনের মধ্যে একটা নাটক যেন তার শেষ পরিণতির দিকে এগোচ্ছিল।

ঘোড়াগুলো যেদিক দিয়ে বেরিয়েছিল সেই দিকে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেল ড্যানি। ছুরিটা বের করে খুব সাবধানে এগোচ্ছিল সে। কে জানে স্ট্যাবাচের মুখোমুখি হয়ে যাবে। হঠাৎ এক জায়গায় ঝোপঝাড় ঠেলার শব্দ। হয়ত সেই সিংহটাই আসছে আবার। এই ভেবে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ড্যানি। দেখল সিংহ নয়, জেজেবেল স্বয়ং ছুটে বার হয়ে এল।

—'জেজেবেল।'

চমকে উঠল জেজেবেল। তারপর ড্যানিকে দেখে ক্লান্ত দেহমনে আনন্দে মাটিতে বসে পড়ে কাঁদতে লাগল। সে ভেবেছিল ড্যানি হয়ত মরেই গেছে।

ড্যানি বলল, 'সেই বদমাসটা কোথায়?'

—'কে? যে আমায় কালো মানুষদের কাছ থেকে নিয়ে চলে এসেছিল?'

—'হ্যাঁ।'

—'জানি না তার কি হয়েছে। সে তার সাদা বন্ধুটিকে মেরে আমায় নিয়ে পালিয়ে এসেছে।' বলল জেজেবেল।

ড্যানি পকেট থেকে আধপোড়া মাংস বার করে এগিয়ে দিল জেজেবেলের দিকে। খেতে খেতে দুজনে অনেক গল্প করল। জেজেবেল শোনাল মিডিয়ান দেশের কথা, বারবারার আবির্ভাব, স্মিথের সঙ্গে রোমাঞ্চকর অভিযান। ড্যানি শোনাল তার শিকাগোর কথা। তবে তার জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছুই চেপে গেল। নিষ্পাপ এই মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে অপরাধ জগতের কথা বলতে তার লজ্জা হল। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলেছিল বাড়ি ফিরে সে স্বাধীন ভাবে ছোটখাট ব্যবসায়ে নামবে। তাতে অনেক শান্তি।

টারজান এতক্ষণে বন ছেড়ে বেরিয়েছে। সে সেই স্তম্ভের ফাটলটির দিকে যেতে চায়, যদি ওখানে পায়ের ছাপ দেখে নতুন করে খোঁজা যায়।

ওদিকে লুঠেরার দল ছুটে আসছে ঘোড়া ছুটিয়ে স্ট্যাবাচের খোঁজে। তারা দেখেছে তাদের প্রভু মৃত! বুঝেছে স্ট্যাবাচ তাকে মেরে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়েছে। ফন্দীবাজ স্ট্যাবাচকে একবার ধরতে পারলে হয়!

উঁচু নিচু গিরিখাত আর উপত্যকা পেরিয়ে ছুটে আসছে ওরা। দূরের দৃষ্টি আড়াল করে দিচ্ছে পাহাড়গুলো। তবু চারদিকে লক্ষ্য রাখছে তারা। হঠাৎ দেখতে পেল তাদের দুটো ঘোড়াই গ্রামে ফিরে আসছে। তারা ভাবল স্ট্যাবাচ আর মেয়েটি ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে। এখনই তাদের পাওয়া যাবে। আরো জোরে ছুটে চলল তারা। এমন সময় দেখে দূরে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে সেই সাদা জংলীটা!

টারজান দেখল তার দিকে তাড়া করে আসছে লুঠেরা ঘোড়সওয়ারের দল বিকট হুঙ্কার করে। সে পথ বদলে ছুটল পাথুরে পাহাড়টার দিকে। ওখানে ঘোড়া ছুটতে পারবে না। কিছুক্ষণ ছুটে ও বুঝল ওরা এত জোরে আসছে যে পাহাড়ে পৌঁছানর আগেই ওকে ধরে ফেলবে।

লুঠেরাদের উল্লাস দেখে কে! অত জনে পেয়েছে একা টারজানকে। বিকট শব্দ করে ছুটে এল তারা।

ওদের মোড়ল ছিল একেবারে সামনের ঘোড়ায়। টারজানের তীর এসে বিঁধল ওরে বুকে। চিৎকার করে পড়ে গেল সে ঘোড়া থেকে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল ওরা। তারপর রাগে অন্ধ হয়ে এগিয়ে এল চারদিকে বৃত্তের মত ছড়িয়ে পড়ে, যাতে কোনোদিক দিয়ে টারজান পালাতে না পারে। টারজানও ছুটে চলল পাহাড়ের দিকে!

টারজানের দ্বিতীয় তীরটায় বিঁধে পড়ে গেল আরেকজন। এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল টারজানের দিকে। ওদের বন্দুকের হাত ভালো নয়, এই যা রক্ষে। গুলির আমদানি এখানে কম, কষ্ট করে জোগাড় করতে হয়, তাই খরচও করতে হয় বুঝে সুঝে। নিশানা অভ্যেস করার সুযোগও ওদের তেমন নেই।

টারজান দেখল আর এগিয়ে সুবিধা হবে না। ওরা চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। গুলিও ছুঁড়ল কয়েকটা, তবে সেগুলো টারজানের গায়ে না লেগে উল্টোদিকে ওদেরই দলের লোক আর ঘোড়া জখম হল। তাই ওরা গুলি না ছুঁড়ে কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

কাছাকাছি আসতে ওদের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এক মোড়ল চেঁচাল, 'মেরো না। ওকে পেয়েছি! অনেক টাকা আদায় হবে।'

হঠাৎ একটা দৈত্যাকার কালো মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজানের ঘাড়ে। টারজান তৈরি ছিল। লোকটাকে ধরে শূন্যে পাক খাইয়ে ওদের দিকেই ছুঁড়ে দিল। হুড়মুড় করে ঘোড়া থেকে কটা লুঠেরা পড়ে গেল।

কিন্তু একা বেশিক্ষণ লড়তে পারল না। ওদের হাতে শেষ পর্যন্ত বন্দী হল টারজান। ওরা মরা লোকগুলোর অস্ত্র-সস্ত্র খুলে নিয়ে, টারজানকে একটা ঘোড়ায় তুলে বেঁধে নিয়ে চলল। ওদের আর একটা দল খুঁজতে চলল স্ট্যাবাচ আর জেজেবেলকে।

●

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গল বারবারার। স্মিথের সঙ্গে চা খেতে বসল। পাসমোর শিকারে বেরিয়েছেন। অতিথিদের যত্নের কোন ত্রুটি যাতে না হয়, সে ব্যবস্থা করে গেছেন। নিরাপদে বসে এমন আরামে ওরা খাওয়া দাওয়া করেনি বহুদিন। এখন ড্যানি আর জেজেবেল ফিরে এলে তবেই শান্তি।

অনেক গল্প হল ওদের। কতদিন ওরা দেশ ছাড়া, কত আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল ওদের। আরও আশ্চর্য ওদের এই বন্ধুত্ব। কি ভীষণ বিপদের মধ্যে দিয়ে ওদের পরিচয় তা ভাবতেও এখন রোমাঞ্চ হয়। মোটে কদিনের আলাপ, কিন্তু এ বন্ধুত্ব যে নিখাদ তাতে সন্দেহ নেই। এইসব কথাই বলছিল ওরা আরাম করে চা খেতে খেতে। এমন সময় দূরে কোথায় যেন গুলির শব্দ। পাসমোরের দলের মোড়ল বন্দুক

নিয়ে উঠে দাঁড়াল। দলের লোকজনও যে যেখানে ছিল উঠে, এসে দাঁড়াল তার পাশে। ওরা ওদের ভাষায় নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করল।

স্মিথ বলল, 'কি হয়েছে কিছু বুঝছ?'

—'ঠিক বুঝছি না বোয়ানা, তবে আমরা তৈরি!'

বন্দুকবাজের হাত ধরে জেজেবেল চলেছে জলের ধারে, একটা পাহাড় পেরিয়ে। এমন সময় তারাও শুনল গুলির শব্দ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোড়ার পায়ে আওয়াজ আর হৈ হট্টগোল এগিয়ে এল ওদের দিকে। ওরা একটা ঝোপের ধারে গা ঢাকা দিল। কিন্তু ভাগ্য তাদের মন্দ। লুঠেরার পুরো দলটাই পাহাড়ের গা বেয়ে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওদের একজন দেখল নিচের ঝোপটা যেন নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে তা জানাল। ওরা ঝোপটা ঘিরে ফেলে ড্যানি আর জেজেবেলকে ধরে ফেলল।

ফের সেই লুঠেরার গ্রামে ওরা বন্দী। সেই ছেঁড়া কম্বলে জেজেবেল আর ড্যানিকে হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে গেল ওরা। একটু দূরে এককোণে এখনও পড়ে আছে কাপিয়েত্রোর মৃতদেহ।

কোথায় স্মিথ, কোথায় বারবারা। জেজেবেলের সঙ্গে ড্যানির সুখের মুহূর্তও বুঝি শেষ। কোথায় বা টারজান। সেই একমাত্র মানুষ যে ওদের বাঁচাতে পারে।

গ্রামের অপর প্রান্তে একটি কুঁড়ে ঘরে পড়েছিল টারজান। হাত পা বাঁধা। সমানে হাত পা চালিয়ে মুক্ত হতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। বহুক্ষণ পর যেন মনে হল বাঁধন কিছুটা আলগা হয়েছে।

স্ট্যাবাচকে খুঁজে না পেয়ে ওদের একটি দল ফিরে এল সন্ধ্যার সময়। তবে ওরা দূর থেকে পাসমোরের তাঁবু দেখতে পেয়েছে। তাই শুরু হয়েছে ওদের নতুন পরিকল্পনা। ওরা অবশ্য তাঁবুর খুব কাছে আসেনি। তাই পাসমোরের দল-বলকে দেখতে পায়নি। শুধু ওদের চোখে পড়েছে দুটো সাদা মানুষ—স্মিথ আর বারবারা।

ওদের নতুন নেতা ঠিক করল ড্যানিকে মেরে ফেলবে। জেজেবেল তো রইলই, আর পাসমোরের তাঁবুর মেয়েটিকে লুঠ করে আনবে। টারজান তো আছেই। এদের দৌলতে অনেক টাকা পাওয়া যাবে তাহলে।

দলের একজন বলল, মেয়েগুলোকে বেচব কেন, আমাদের সঙ্গে রেখে দিলেই হয়।'

নেতা বলল, 'কে হে তুমি পরামর্শ দিতে এসেছ? তুমিই নেতা নাকি হে!'

সে-ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তুমি কি ভাবছ তুমিই নেতা?'

যেই এই বলা অমনি দলনেতাটি তরোয়ালের এক কোপ বসিয়ে দিল লোকটির মাথায়। খুলি ফেটে রক্ত গড়াতে লাগল। লোকটা পড়ে গেল মাটিতে। রক্তে ভেজা তরোয়ালটা মৃত লোকটির জামায় মুছে নিয়ে চোখ পাকিয়ে দাঁড়াল খুনী। বলল, 'কৈ, আর কে বলতে চাও আমি নেতা নই?' কেউ টুঁ শব্দ করল না। নাতালেই এখন দলের নেতা!

টারজানের হাতের বাঁধনটা আলগা হয়েছে। হাত দুটো মুক্ত হতেই সে আস্তে আস্তে সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটা মৃদু গর্জন করে বের হয়ে এল ঘরের বাইরে। লুঠেরার দলবলের বাকি লোকেরা তখন খাওয়া-দাওয়া সারছিল।

টারজান বেরিয়ে এল বাইরে। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল বেড়ার দিকে। কিন্তু একজনের চোখে পড়ে গেল সে। চেঁচামেচি করে ছুটে এল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন। টারজান প্রথম লোকটিকে জাপটে ধরে নিজে আড়াল হয়ে পিছোতে লাগল। হৈ-চৈ শুনে নতুন দলনেতা নাতালে বেরিয়ে এল বন্দুক হাতে। অন্য লোকদের ইশারা করে নিজে ছুটল টারজানের দিকে। গুলি ছুঁড়তে যাবে এমন সময় টারজান লোকটিকে ঘুরিয়ে ছুড়ে দিল নাতালের দিকে। নাতালে উল্টে পড়ে গেল। উঠে দাঁড়াবার আগেই এক দৌড়ে বেড়া টপকে পাহাড় বেয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল টারজান।

ড্যানি আর জেজেবেল পড়ে আছে কাপিয়েত্রোর ঘরে। তাদের একটু জল পর্যন্ত খেতে দেয়নি কেউ। ড্যানি বলল, 'ইঁদুরের মত মারতে চায় আমাদের।'

জেজেবেল কিছুক্ষণ কি ভেবে বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'জানো আমাদের দেশে ইঁদুর ধরার জাল পাতা হয়। কিন্তু ইঁদুরেরা মাঝে মাঝে দাঁত দিয়ে জাল কেটে বেরিয়ে আসে।'

ড্যানি বলল, 'কি কর ইঁদুর ধরে? খাও নাকি?'

—'হ্যাঁ, ইঁদুরের মাংস খুব ভাল।'

—'এঃ ছি ছি। শিকাগোতেও ইঁদুর ধরা হয় তবে আমরা খাই না।'

জেজেবেল বলল, 'ও সব কথা থাক। আমরাও পালাতে পারি না ওদের মত?'

—'কি করে?' ড্যানি বুঝতে পারে না।

—'ওদের মত দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে।' বলল জেজেবেল।

ড্যানি এবার উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তা তো ভেবে দেখিনি! হ্যাঁ, আমার দাঁত তো বেশ শক্ত। দেখি তোমার হাতের দড়ি কাটতে পারি কিনা।'

জেজেবেল উপুড় হল। ড্যানি গড়িয়ে চলে এল। ওর হাতের কাছে মুখ নিয়ে প্রাণপণে কামড়াতে লাগল দড়িটা।

রাত বাড়ল। লুঠেরারা পরদিনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত হল। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা চলছে। পাসমোরের তাঁবু লুঠে ওরা পাড়ি দেবে আবিসিনিয়ার দিকে।

ভোরবেলা রান্নার আগুন জ্বলছে। নাতালের বৌ রান্না করছে।

নাতালে সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সারছে। বৌকে বলছে, 'তাড়াতাড়ি রান্না সার। আমার অনেক কাজ বাকি।'

বৌ বলল, 'তুমি তো এখন দলের রাজা। একটু জিরোওনা।'

—'না না, একটা কাজ আমায় নিজে করতে হবে। এখুনি।'

—'কি কাজ?' জানতে চাইল নাতালের বৌ।

—'সাদা লোকটাকে মারব। তারপর মেয়েটাকে নিয়ে যাবার জন্য তোড়জোড় করতে হবে।'

বৌ-এর চোখ জ্বলে উঠল হিংসেয়। বলল, 'তাহলে মেয়েটাকেও মারতে হবে।'

—'চুপ কর!' বলল নাতালে।

বৌ কিন্তু ভয় পাবার পাত্রী নয়। বলল, 'ও মেয়েকে সঙ্গে নেওয়া চলবে না। ওর খাবার আমি রাঁধব না'। এই বলে সরে এল আগুন থেকে।

—'যা বলছি কর! ওর রান্না যেন তৈরি থাকে। আমি চললাম লোকটাকে সাবাড় করতে।' এই বলে বার হয়ে গেল নাতালে।

★

ড্যানি অনেকক্ষণের চেষ্টায় দাঁত দিয়ে জেজেবেলের বাঁধন কেটে দিল। তার কথা বলার ক্ষমতা নেই মুখ আর চোয়ালের ব্যথায়। জেজেবেল এবার ড্যানিকে মুক্ত করল।

ছাড়া পেয়েই ড্যানির হাতটা নিসপিস করে উঠল। ঘরের জিনিসপত্র ঘাঁটতে লাগল সে। এক কোণে একটা বস্তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করে আনল তার সেই মেশিনগান। এখন সে আগেকার বন্দুকবাজ! রক্তে তার কিরকম দোলা লাগল। সমস্ত ক্লান্তি ভুলে গিয়ে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হল। ভোর হয়েছে, কিন্তু ঘরের কোণে এখনও আধা-অন্ধকার।

নাতালে ঘরে ঢুকে ড্যানি আর জেজেবেলকে খুঁজতে লাগল। এককোণে অন্ধকারে ওদের ঠিক দেখতে পেল না। ড্যানির বাঁ হাতে মেশিনগান, ডান হাতে রিভলবার। নাতালে কিছু বোঝার আগেই ড্যানির রিভলবার গর্জে উঠল। এক গুলিতে ইঁদুরের মত খতম হয়ে গেল নাতালে। কিন্তু সে রিভলবারের গর্জন ছাপিয়ে বাইরে প্রচণ্ড আওয়াজ উঠল। কারা যেন চারদিক থেকে গ্রামটির ওপর গুলি ছুঁড়ছে।

জেজেবেলকে নিয়ে নতুন দলপতির মৃতদেহ ডিঙ্গিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ড্যানি। দেখল লোকজন সব প্রাণভয়ে এদিক ওদিক দৌড়চ্ছে। বাইরে থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে লুঠেরাদের কাৎ করে ফেলছে। চারদিকে হৈ চৈ হট্টগোল, মরণ চিৎকার। জেজেবেল বুঝতে পারল না কি হচ্ছে। ড্যানি বলল, 'মনে হচ্ছে পুলিশ এসেছে। তবে আমার তো ভয় পাবার কিছু নেই। এটা তো আর শিকাগো নয়!'

তারপর বন্দুক দুটো ভালো করে বাগিয়ে ধরে বলল, 'চল জেজেবেল, পুলিশকে সাহায্য করি।'

ড্যানি পুলিশের হয়ে লড়তে যাচ্ছে এমন কথা শিকাগোয় কেউ কোনদিন শোনেনি। ড্যানি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল মনে মনে।

এর মধ্যে একদল লুঠেরা বন্দুক নিয়ে জড়ো হয়েছে গ্রামের গেটের দিকে। তাদের শত্রুদের মোকাবিলা করতে।

হঠাৎ পিছন থেকে বন্দুকবাজের মেশিনগান গর্জে উঠল র‍্যাট্-ট্যাট্-ট্যাট্-ট্যাট্-ট্যাট্! অনেকেই সাবাড় হয়ে গেল। বাকিরা প্রাণভয়ে কোনদিকে পালাবে ঠিক করতে পারল না। বন্দুকবাজের তখন খুন চেপে গেছে। হৈ হৈ করে সে ছুটে চলল। এক দিকে দেখতে পেল ওগোনিওকে। ওর সঙ্গে লুঠেরাদের বন্দী-দাসেরা একসঙ্গে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপছে। ড্যানি ওদের দলে টেনে নিল। বলল,—'ভয় নেই। হাতের কাছে যা পাও তাই নিয়ে লড়ে যাও। নিকেশ করে দাও লুঠেরাদের।'

ভাষা না বুঝলেও ওগোনিয়ো আন্দাজে বুঝল কি করতে হবে। কাপিয়েত্রোর বন্দী-দাসেরা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। তারা পাথর, লাঠি-সোটা এই সব নিয়ে ড্যানির পিছনে এসে দাঁড়াল। শুধু বন্দী মেয়েরা আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

তাদের মনেও ক্ষীণ আশা জেগেছে, হয়ত মুক্তি পাবে।

লুঠেরারা বুঝল মহা বিপদ। কেই বা তাদের নেতা, কে কার কথা শুনবে। এখন যে যার ঘোড়ায় উঠে পালাতে পারলে বাঁচে। ঘোড়া নিয়ে ওদের কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। যে পেল উঠে পড়ল। নিজের দলের লোককেই মাড়িয়ে বেগে ছুটে চলল ফটকের দিকে!

ঘোড়ায় চড়ে ওরা যখন পালাচ্ছে তখন উঁচু জমির আড়াল থেকে ওয়াজিরি যোদ্ধারা একেবারে ওদের মুখোমুখি হল। মুখে তাদের রণং-দেহি হাঁক। ওয়াজিরিদের প্রত্যেকের হাতে রাইফল। দলের সামনে রয়েছে টারজান স্বয়ং। পিছনে ড্যানি, সামনে টারজানের যোদ্ধারা—পলাতক লুঠেরাদের কেউ বাঁচল না।

টারজান এগিয়ে এল বন্দুকবাজের দিকে। বুকে জড়িয়ে ধরে অভিবাদন জানাল।

ড্যানি বলল, 'এই সব যোদ্ধারা কারা?'

—'ওরা আমার দলের লোক।'

—'উঃ, এ তো একটা পুরো সৈন্যদল।' অবাক হল ড্যানি। বলল, 'স্মিথ কোথায়?'

জেজেবেল ড্যানির আড়াল থেকে ভয়ে ভয়ে বলল, 'আর বারবারা?'

টারজান বলল, 'আর দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই ওদের দেখতে পাবে! আগে বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দিই। ওদের গ্রামের লোকেরা এসেছে আমার সঙ্গে। যে যার দেশে ফিরে যাক।'

জেজেবেল বুঝেছে ও-ই টারজান। ও নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল ওর বলিষ্ঠ চেহারার দিকে। মিডিয়ানের বধ্যভূমির বাইরে আর একটা জগৎ আছে, সে জগতে এমন সুন্দর মানুষেরা বাস করে ভেবে তার মন আনন্দে ভরে গেল। ড্যানিকে বলল, 'কি সুন্দর!'

—'কে! আমি?' বলল ড্যানি।

—'ঐ টারজান।'

—'আমিও খুব খারাপ দেখতে নই, কি বল?' জেজেবেল হাসল।

যে ক'জন লুঠেরা তখনও বেঁচে ছিল তাদের ধরে বন্দী করে গালাদের হাতে তুলে দিল টারজান। আবিসিনিয়ায় ওদের জেল কিংবা ফাঁসি হয়ে যাবে।

লুঠেরাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি বিলিয়ে দেওয়া হল সদ্যমুক্ত মানুষগুলোর মধ্যে। স্মিথের মালপত্র খুঁজে বার করা হল। ওগোনিও তার দলবল নিয়ে তাঁবুতে চলল সে সব নিয়ে।

টারজান, জেজেবেল আর ড্যানি যখন ফিরে যাচ্ছে তখন লুঠেরাদের গ্রামের আগুনে আকাশ ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার।

সে-ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে আফ্রিকার নিরীহ কালো মানুষেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

স্মিথ আর বারবারা বুঝতে পারছিল না পাসমোরের প্রহরীরা কিসের জন্য হঠাৎ এত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। যেন কোন একটা আদেশের অপেক্ষা করছে তারা। কিন্তু এর মাঝেও তাদের যত্নের ত্রুটি করেনি ওরা। হাসিমুখে সব কাজ করেছে। তবু যেন ওদের গল্পগুজব হাসি হল্লা হঠাৎই থেমে গেছে। আগের রাত্রি থেকে তারা আগুনের চারপাশে বসে আছে, যে কোনো সময় উঠে পড়ে যে কোনো অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়বে। প্রত্যেকের মাথায় গোঁজা পালক, হাতে রাইফেল। তারপর স্মিথ আর বারবারা যখন ঘুমোতে চলে গেছে তখন তারা কয়েকজনকে তাঁবু পাহারায় রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে।

সকাল হতে ঘুম ভেঙ্গে বারবারা দেখে তাঁবু ফাঁকা। রাঁধুনে ছোট্ট ছেলেটি আর গুটিকয়েক কালো প্রহরী ছাড়া কেউ নেই। তারা হাসিমুখে বারবারার কাছে এগিয়ে এল।

স্মিথও ঘুম ভেঙ্গে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মানে বুঝতে পারছিল না। দুপুর গড়িয়ে গেল তবু কারো দেখা নেই। না পাসমোর না তার দলবল। টারজানই বা কোথায়? কি আর করে, খেয়ে শুয়ে, গল্প করেই সময় কাটিয়ে দিল বারবারা আর স্মিথ।

হঠাৎ রাঁধুনে ছেলেটি ছুটে এল। ওর ভাষায় কি একটা বলল। ইশারা ইঙ্গিতে বারবারা বুঝল ও বলতে চাইছে ওরা আসছে। তারপরেই দূরে বন থেকে বেরিয়ে সার বেঁধে যোদ্ধার দল আসছে, দেখতে পেল ওরা।

—'আরে ঐ তো বন্দুকবাজ!' চেঁচিয়ে উঠল স্মিথ। 'আর জেজেবেলও রয়েছে!' দুজনেই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল।

—'ওদের সঙ্গে টারজান!' বলল স্মিথ। 'জানতাম টারজানই ওদের বাঁচাবে।'

অনেক বিপদের পর ওদের চারজনের মিলন হল। টারজান একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসছিল।

বারাবারা বলল, 'কিন্তু যিনি আমাদের এমন আরামের আশ্রয় দিলেন সেই পাসমোরের দেখা এখনো পেলাম না।'

টারজান তখনও হাসছিল। বলল, 'পাসমোর আছে।'

স্মিথ বলল, 'কোথায় ?'

—'এই তো !' বলে নিজেকে দেখিয়ে দিল টারজান। ওরা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ঠিক বুঝল না ব্যাপারটা।

টারজান বলল, 'হ্যাঁ, ঐ নামটা না বানালে দলবল নিয়ে তাঁবু গেড়েছি জানলে লুঠেরার দল সাবধান হয়ে যেত।'

ড্যানি বলল, 'অ্যাঁ, এতদিন ধরে সবাইকে খুব ঠকিয়েছ তাহলে !' বারবারা বলল, 'তাই বলি, যার তাঁবু তার দেখা পাই না কেন ?'

টারজান বলল, 'সে রাতে তোমাদের তাঁবুতে রেখে জঙ্গলে চলে যাই। তারপর অনেক রাতে পিছন দিক দিয়ে তাঁবুতে ঢুকে রাত্রিটা ঘুমিয়ে নিই। ভোর না হতে তাঁবু ছেড়ে চলে যাই এই বন্ধুদের খোঁজে। তারপর সে অনেক বিপদ, বন্দী হলাম লুঠেরাদের হাতে। তারপর অবশ্য ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেছে।' ড্যানিকে দেখিয়ে আরো বলল, 'এই বন্ধুটির সাহায্য না পেলে মুস্কিল হত। যাক, এখন বিপদ-আপদ নেই। তোমরা এখন আমার অতিথি হয়ে পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাও।'

সকলের মনে আনন্দের বান বয়ে গেল। টারজান বলল, 'স্মিথ, তুমি, তাহলে এইবার তোমার ভূ-তত্ত্বের গবেষণা ফের শুরু করতে পার।'

স্মিথ তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, ভূ-তত্ত্ব থাক, আমি আপাততঃ বারবারার সঙ্গে লণ্ডনে চললাম।'

বারবারা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, লণ্ডনে গিয়ে আগে ওকে বন্দুক ছোঁড়ায় একটু তালিম দিতে হবে।'

—'আর ড্যানি, তুমি ? তুমি কি করবে ?' টারজান জিজ্ঞাসা করল।

মাথা চুলকে ড্যানি বলল, 'আমরা ভাবছি ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাব। ওখানে পেট্রল পাম্পের দোকান খুলব।'

বারবারা বলল, 'আমরা মানে ?'

লজ্জা পেয়ে ড্যানি বলল, 'এই আমি আর জেজেবেল।'

—'সত্যি নাকি ?' উল্লসিত হয়ে বলল বারবারা।

চেয়ে দেখল জেজেবেলের মুখটাও আনন্দে উজ্জ্বল।

সুবর্ণ নগরীতে টারজান

টারজান অ্যান্ড দি সিটি অফ গোল্ড

প্রতি বছর বর্ষাকালে, অ্যাবিসিনিয়া থেকে সুদান আর ঈজিপ্ট পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে বন্যা, মৃত্যু আর সেই সঙ্গে সৌভাগ্যও দেখা যায়। একদল দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর পেশাদার শিফ্‌টা দস্যু এই অবস্থার সুবিধা নিয়ে দুর্গম কাফার পার্বত্য অঞ্চলে ঘাঁটি করেছিল। এদের দলে কাফিচো ছিল, গালা ছিল—যত সব দল-খেদানো আইন-ভঙ্গকারী খুনে। যে তাদের ধরিয়ে দিতে পারত সরকার তাকে পুরস্কার দিত।

গল্প শুরু হচ্ছে বর্ষার শেষে। বৃষ্টি নেই, কিন্তু নদীতে তখনো বানের জল। শিফ্‌টাদের ঘোড়ার পায়ে নাল বাঁধানো থাকে না, যাতে নিঃশব্দে চলতে পারে। পথে যেতে যেখানে যা পায় লুঠপাট, খুন-জখম করে নিয়ে নেয়। কেউ তাদের মোকাবিলা করবার সাহসই পায় না, সবাই এড়িয়ে চলে।

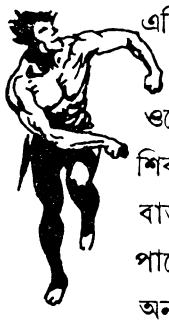

সেদিন ওরা যে পথে লুঠের সন্ধানে চলেছিল, সেই পথেই ওদের খানিকটা আগে আগে টারজান চলেছিল একটা হরিণ শিকারের আশায়। তার বড় খিদে পেয়েছিল। উল্টো দিকে বাতাস বইছিল, টারজান তাই শিফ্‌টাদের নৈকট্য বুঝতে পারে নি। আগে শিকার করতে সে এ-অঞ্চলে আসেনি, অন্য উদ্দেশ্যে এসেছিল। কত সময় বিনা উদ্দেশ্যে, শুধু দুঃসাহসিক অভিযানের নেশায় সে নানা বিপদসংকুল জায়গায় ঘুরে বেড়াত। আপাততঃ তার সমস্ত মন ছিল শিকারের ওপর।

শিফ্‌টারা পিছন থেকে ওকে দেখে অবাক হল। তারপর নিঃশব্দে ঘোড়া ছুটিয়ে টিলা থেকে নামতে লাগল। তাতে টারজানের হরিণটাও চমকে উঠে পালাল।

চমকে ফিরে টারজানও তাকাল। এক পলক দেখেই ওরা কে এবং কেন ছুটে আসছে, তা বুঝতে ওর বাকি রইল না।

হাওয়া হয়ে গেলেই সবচেয়ে ভালো ছিল, কিন্তু এখানে পালাবার জায়গা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ধনুক থেকে তীর ছুটল। সামনের লোকটা পড়ল। পরপর আরো চারটে তীর আরো চারজনের গায়ে বিঁধল। আরেকজন মরল, আর তিনজন জখম হল। যে চারজন বেঁচে ছিল, তারা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনজন তাদের আহত, একজন অক্ষত।

শেষের লোকটা বর্শা বাগিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে সোজা ধেয়ে এল। টারজান এক বাড়িতে বর্শার ফলাটা উঁচু করে দিয়ে, লোকটার হাত চেপে ধরে, তার পিছনে তারি ঘোড়ায় চড়ে বসল।

বসেই তার গলা টিপে ধরে, বাঁ কাঁধের নিচে আমূল ছোরা বসিয়ে দিল। তারপর মৃতদেহটা ঘোড়ার পিঠ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, সোজা নদীর দিকে ঘোড়াটা ছুটিয়ে চলল।

বাকি তিনজনই আহত, একজন এলোমেলো একটা গুলি ছুঁড়েছিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে ঘোড়া নিয়ে টারজান নদীর দুরন্ত স্রোতে নেমে পড়েছে।

একটা কুমির মস্ত হাঁ করে তেড়ে এসেছিল, কিন্তু নদীর ওপার থেকে একজন দস্যুর গুলি টারজানের গায়ে না লেগে, তার গায়ে লাগাতে, সেটা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হল আর টারজানের আরেকটা তীর বন্দুকধারীর পায়ে লাগল। টারজান সামনের বনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দক্ষিণে অনেক-দূরে সোনালি গা, কালো কেশর, মস্ত এক সিংহ শিকার মেরে, পেট ভরে খেয়ে, বন কাঁপিয়ে ডাক দিল। তারপর সব সিংহের মতো শুয়ে না পড়ে, মাটি শুঁকে শুঁকে, কিসের খোঁজে, উত্তর দিকে এগিয়ে চলল।

সেই উত্তরেই, তবে অনেকটা দূরে বাকি তিনজন আহত শিফ্‌টা মৃত সঙ্গীদের অস্ত্রশস্ত্র খুলে নিয়ে, সাদা দৈত্যটাকে গাল পাড়তে পাড়তে এগিয়ে চলল। মুখে বলছিল আবার দেখা হলেই সে ব্যাটা টের পাবে, মনে মনে বলছিল, হেই ভগবান দেখা যেন না হয়!

কিন্তু হল দেখা। বনে ঢুকে টারজানের খিদে আবার চাগিয়ে উঠেছিল। একটা হরিণ মেরে সে খেয়ে ফেলল। ঘোড়ার মাংস অখাদ্য লাগে, নইলে তাকেই খেত। তারপর একটু বিশ্রাম করে নিয়ে ভাবল, এখানে যখন কিছুদিন থাকতেই হবে, তখন আশেপাশে কোন শত্রু আছে, তাদের ডেরা কোথায়, তাও জানা দরকার। এ-কথা মনে হতেই, উঠে পড়ে আবার নদী পার হয়ে, শিফ্‌টাদের ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখে, গোটা দুই টিলা আর সরু একটা উপত্যকা পেরিয়ে বনে ঢুকল। ঐ নদীটাও বনের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাচ্ছিল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। টারজানের নাকে এল ক্যাম্পের আর মানুষের গন্ধ। গলা দিয়ে একটা গর্জন বেরিয়ে এল। টিলার ওপরেই দাঁড়িয়ে রইল টারজান। রাত বাড়লে, নেমে এসে মানুষের গন্ধ অনুসরণ করে এগোতে লাগল। সিংহের গর্জন কানে এল। তবে সে-দিক থেকেই বাতাস বইছিল, কাজেই সিংহ তার গন্ধ পায়নি। যাই হক, আরেকটু নিরাপত্তার আশায় টারজান গাছে গাছে এগোতে লাগল।

একটু পরেই শিফ্‌টাদের আস্তানার কাছে পৌঁছে গেল। নিচে চেয়ে দেখল যেমন-তেমন করে ডালপালা কাঁটা গাছ দিয়ে একটা বোমা তৈরি হয়েছে, মধ্যিখানে ধুনি জ্বলছে, তাকে ঘিরে আছে জনা কুড়ি লোক, ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র। একটু দূরে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা একজন শ্বেতাঙ্গ মাটিতে পড়ে আছে। তার পরণে একটি জোব্বা, সেটি আবার হাতির দাঁতের চাকতি দিয়ে তৈরি। যে করে হক, লোকগুলোকে যখন শিক্ষা দেওয়া দরকার, ওদের এই শিকারটিকে চুরি করতে পারলেই ওরা সবচেয়ে জব্দ হবে। তাছাড়া টারজানের অদম্য কৌতূহল, লোকটা কে এবং কোত্থেকে এল।

যাই করুক, ক্যাম্পবাসীরা ঘুমোলে পর করতে হবে।

শিফ্‌টারা লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। কিন্তু মনে হল কেউ কারো কথা বোঝে না। হয়তো বন্দী ইচ্ছা করেই না বোঝার ভান করছিল।

এতে শিফ্‌টারা খুব চটে যাচ্ছিল। একজন গালাদের ভাষায় বলল, 'খুব বুঝছে, ইচ্ছা করে বোকা সাজছে। কাল সকাল অবধি দেখে, ব্যাটাকে মেরে ফেলব।'

ইশারায় এ-কথা জানিয়ে, তারা নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করল। গল্পের বিষয়বস্তু হল যে এক সাদা দৈত্য ওদের দলের তিনজনকে মেরে, একটা ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছে। আহতরা

নিজেদের বীরত্বের লম্বা এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক বিবৃতি দিয়ে, যে যার শুতে গেল। একজন মাত্র প্রহরী রইল। আরো রাত হলে, প্রহরী আগুনের পাশে বসে ঢুলতে আরম্ভ করল।

তখন নিঃশব্দে পিছন দিক দিয়ে এগিয়ে, তার গলা টিপে ধরে, টারজান তার হৃদ্‌পিণ্ডে ছোরা বসিয়ে দিল। তারপর ছোরাটা তার কাপড়ে মুছে, বন্দীর দিকে এগিয়ে গেল।

তার কোনো ছাউনি জোটেনি। জিজ্ঞাসু চোখে সে চেয়ে ছিল। টারজান তার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে, তাকে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল।

হাত-পা অসাড়, যতক্ষণ না রক্ত-চলাচল ফিরে এল। তারপর পালাবার জন্য যেই না ওরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, বোমার বাইরে ভীষণ জোরে সিংহ গর্জন করল। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে, সকলে ছুটে বাইরে এসে ওদের দুজনকে দেখে স্তম্ভিত!

—'এই সেই! এ-ই সঙ্গীদের মেরেছে!'

—'মারো, মারো, দুজনকেই মেরে ফেল।' এই সব রব উঠল।

এমনি ঘেঁষে এসেছিল তারা সবাই যে নিজেদের গায়ে লাগতে পারে ভেবে গুলি ছুঁড়তেও সাহস পাচ্ছিল না। একজন শিফ্‌টার কিঞ্চিৎ বেশি সাহস এবং কম বুদ্ধি থাকাতে, সে তার বন্দুকটি মুগুরের মতো ছুঁড়ে মারল। টারজানও খপ্‌ করে সেটি ধরে ফেলে, এক বাড়ি মেরে তাকে পেড়ে ফেলল। তার পিছনে যে ছিল, সে হটে গেল।

টারজান জানত এতজনের সঙ্গে মাত্র দুজনে কখনো লড়ে জিততে পারবে না। তবে একসঙ্গে হঠাৎ দৌড় মারলে প্রাণে বাঁচতে পারে। এই ভেবেই বুড়ো আঙুল দিয়ে ইশারায় সঙ্গীকে জানাল কোন দিকে ছুটতে হবে। তারপর একটা শিফ্‌টাকে তুলে ধরে, তাকে দিয়ে বাকিগুলো ঝেঁটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল টারজান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা সবাই মিলে হতভাগ্যকে টেনে ছাড়িয়ে নিল। কাছে যাবার কারো সাহস ছিল না। দূর থেকে একজন বন্দুক তুলে টারজানের দিকে টিপ করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সিংহটা বোমা ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকল। অমনি ত্রাহি ত্রাহি করে যে যেদিকে পারল দৌড়ল। টারজান একজনকে ধরে সোজা সিংহের মাথায় ছুঁড়ে মেরে, এক লাফে বোমা ডিঙিয়ে বন্দীর সঙ্গে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ক্যাম্পের বাইরে একটু থেমে গাছ থেকে তার অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে, সিংহের আক্রমণের চমক ভাঙবার আগেই দুজনে অদৃশ্য।

টারজান উপত্যকা ছেড়ে পাহাড়ের পথ ধরল। নিঃশব্দে অচেনা সাদা মানুষটিও সঙ্গে চলল। ক্যাম্পের মোকাবিলার সময় টারজান তার বলিষ্ঠতা, ক্ষিপ্রতা আর সাহস লক্ষ্য করেছিল। এ লোকটা সঙ্গে থাকলে ভালোই লাগবে মনে হল।

পূর্ণিমা এল বলে। চাঁদের আলোয় ওরা ক্রমে আরো উঁচু পাহাড়ে উঠতে লাগল।

বনের মধ্যে শীতা প্যান্থার ওদের গন্ধ পেয়ে অপেক্ষা করছিল। তার খিদে পেয়েছিল।

বনে ঢুকে টারজান রাত কাটাবার জন্য একটা ভালো গাছ খুঁজতে লাগল। গাছ পছন্দ হলে উঁচু ডালে মাচা বেঁধে সে শোবার জোগাড় করল! নতুন বন্ধুটি নিচে ডালপালা পেতে, তার ওপর ঘাস বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। প্যান্থারটা তার ওপর লাফিয়ে পড়ল। বিদ্যুৎগতিতে লোকটি এক পাশে সরে গেল। সেই মুহূর্তে টারজান প্যান্থারের পিঠে নামল। কিছুতেই প্যান্থার তাকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না। দুজনার গলা থেকে একই রকম চাপা গর্জন বেরোচ্ছে শুনে শ্রোতার লোম খাড়া হয়ে উঠল। শিকারের গলায় পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে, চিরাচরিত নিয়মে টারজান তার হৃদ্‌পিণ্ডে ছোরা বসিয়ে দিল।

মরা জন্তুটার পিঠ থেকে উঠে পড়লে, অচেনা লোকটি টারজানের কাঁধে হাত রেখে বোধহয় কৃতজ্ঞতা জানাল। টারজান তাকে ইশারায় গাছে উঠে শুতে বলল। একটা মাচা বানাতে সাহায্যও করল। বাকি রাতটা ওরা আরামেই ঘুমোল।

সকালে উঠে জোব্বা গায়ে দেবার আগে, টারজান সঙ্গীর বলিষ্ঠ সুগঠিত শরীর দেখে খুশী হল। মুখে সৌন্দর্যের চেয়ে পৌরুষের ছাপ বেশি চোখে পড়ল। সর্বাঙ্গে হাতির দাঁতের সাজ দেখে টারজানের বড়ই কৌতূহল হচ্ছিল। তার পায়ে ছিল সম্ভবতঃ হাতির চামড়ার মজবুত স্যাণ্ডাল। মাথার, হাতের, পায়ের হাতির দাঁতের অলংকারগুলো আর হাতির দাঁতের চাকতি দিয়ে তৈরি জোব্বা যে শুধু বাহারের জন্য নয়, সেটা সহজেই বোঝা গেল। ঐ সব দিয়ে সমস্ত শরীর রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল।

খিদেও পেয়েছিল। সঙ্গে কালকের শিকারের খানিকটা

মাংস ছিল। টারজান সেটা কাঁচাই খেল, বন্ধু আগুন জ্বেলে ঝলসে নিল। টারজান স্থির করেছিল যে-কাজে এতদূর আসা, সেটা সম্পন্ন করার আগে, এই মানুষটির রহস্যের সমাধান করতে হবে। আপাততঃ ইশারায় তাকে জিজ্ঞাসা করল সে কোন দিকে যেতে চায়।

বন্ধু উত্তর-পুবের পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে দিল। সেই দিকেই চলল দুজনে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

হাঁটে আর টারজান তার ভাষা শিখে নেয়। এ বিষয়ে সে দক্ষ। লোকটির নাম ভ্যালথর। টারজান তাকে তীর-ধনুকের ব্যবহার শেখাল। তার সঙ্গে ছিল খালি বর্শা। যেতে যেতে ভাষাটা চলনসই ভাবে শেখা হয়ে গেল।

একদিন ভ্যালথর বলল, 'আমরা হারিয়ে গেছি।'

টারজান বলল, 'তা জানি। চারদিক ঘুরে, এক সপ্তাহ, আগে যেখানে ছিলাম, তার পাঁচ মাইলের মধ্যে আবার পৌঁছেছি।'

—'তা হলে এখন কি করা হবে?'

—'সেই ক্যাম্পটা থেকে তোমার দেশ কোন দিকে পড়ে?'

—'সোজা পুবে।'

—'আমরা তো তার দক্ষিণ পশ্চিমে অনেক দূরে চলে এসেছি।'

—উত্তর পুবে গেলেই তার কাছে পৌঁছনো যায়। কোনো পাহাড় টাহাড় চেনা থাকলে, তাই দেখে এগোনো সহজ হবে।'

ভ্যালথর বলল, 'থেনারের শতখানেক মাইলের মধ্যে পৌঁছলে, পাহাড়ের ওপর থেকে ক্লারাটর দেখা যাবে। সেখান থেকে থেনার যাওয়া খুব সোজা। অ্যাথ্‌নি পড়ছে তার সোজা পুবে।'

টারজান বলল, 'ও-সব কি?'

—'ক্লারাটর হল একটা আগুন-পাহাড়। অন্থার উপত্যকার উত্তর সীমান্তে ঐ পাহাড়। ওটা সোনার নগর ক্যাথ্‌নির দখলে। ওখানকার লোকরা আমাদের শত্রু।'

টারজান বলল, 'তাহলে কাল আমরা থেনার উপত্যকার অ্যাথ্‌নি শহরের দিকে রওনা হচ্ছি।'

সেদিন ওরা যে সময় খাওয়া দাওয়া শেষ করছিল, সেই সময় কালো-কেশর সোনালি সেই প্রকাণ্ড সিংহ বুনো মোষের বাচ্চা মেরে, ষাঁড়টার সঙ্গে লড়াই করতে ব্যস্ত ছিল। ষাঁড়ও মরল। সে রাতে সিংহটা পেট ভরে খেয়েও, বিশ্রাম না নিয়ে বহুদিন ধরে যে রহস্যময় সন্ধানে চলেছিল, সেই উদ্দেশ্যেই এগোতে লাগল।

পাহাড়ের ওপর বড় শীত। তার ওপর সকালে উঠে ওরা দেখল মেঘলা আকাশ, ঝড়বৃষ্টি আসন্ন। শীতে জমে যাচ্ছিল ওরা, গায়ে একটু রোদ লাগাতে আরাম পেল। টারজান বলল, 'পাহাড় চড়া যাক, গা গরম হবে। খাওয়া দাওয়া পরে হবে।'

ভ্যালথর বলল, 'যদি কিছু জোটে।'

—'জোটে তো সর্বদাই।'

পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে টারজান তরতর করে আর ভ্যাল্‌থর কষ্ট করে, উঠতে লাগল। ভ্যালথর হাঁপিয়ে যাচ্ছিল। টারজানের কিছু হয়নি।

একটুক্ষণ বিশ্রাম করে, ক্রমাগত উত্তর-পুবে চলা। বিকেলে একটা গভীর খাদের ধার বেয়ে ওপরের মালভূমিতে পৌঁছেই ভ্যালথর বলল, 'ঐ তো ক্লারাটর!'

টারজান বলল, 'তাহলে থেনার ওরি পুবে?

—'অর্থাৎ আমাদের ঠিক নিচেই। চল।'

মাইল দুই হেঁটে ওরা মালভূমিটার প্রান্তে পৌঁছল। 'ঐ দেখ, বনের এ ধারে, নদীর বাঁকে সোনার নগর ক্যাথ্‌নি। অতি ধনী শহর ক্যাথ্‌নি, কিন্তু আমাদের সঙ্গে শত্রুতা।'

বৃষ্টি পড়ছিল। তার মধ্যে দিয়ে টারজান দেখল এক দিকে বন, এক দিকে নদী, মধ্যিখানে দেয়ালঘেরা ক্যাথ্‌নি শহর। নদীর ওপর হলদে রঙের পুল; বাড়িগুলো সাদা; অনেকগুলোর হলদে গম্বুজ। উপত্যকার এ মাথা থেকে ও-মাথা অবধি একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। উপত্যকার মধ্যিখানে রাস্তাটা দু-ভাগ হয়ে গেছে। পায়ের নিচে বিস্তীর্ণ উপত্যকা; তাতে কত গাছপালা; নদীর ওপারের বনভূমি পাহাড়ের পাদমূল অবধি পৌঁছেছে। টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'সোনার নগর বলে কেন?'

ভ্যালথর বলল, 'দেখছ না সোনার গম্বুজ, সোনার পুল?'

—'কোথায় পায় এত সোনা?'

—'শহরের দক্ষিণের পাহাড়ে ওদের সোনার খনি আছে।'

—'থেনার কোথায়?'

—'ওন্থারের পুবের পাহাড়ের পিছনে।'

—'এখান থেকে কত দূর?'

—'পঁচিশ মাইল, কিম্বা একটু কম।'

—'এখনি বেরোনো যাক। বৃষ্টিতে শুয়ে থাকার চেয়ে হাঁটা ভালো।'

ভ্যালথর বলল, 'দিনের আলোতে ওস্থার পার হওয়া কিন্তু নিরাপদ নয়। ক্যাথনির গেটের প্রহরীরা আমাদের দেখতে পেলেই হয় বন্দী করবে, নয় মেরে ফেলবে। রাতেও সিংহেয় ভয় আছে। আমাদের নিচেকার উপত্যকাটার নাম-ই হল সিংহের মাঠ। সন্ধ্যার পর যাওয়াই ভালো। অ্যাথনি পৌঁছে গেলে বাঁচি। চমৎকার শহর অ্যাথ্‌নি। থেনারও বড় সুন্দর। আমরা ছাগল, ভেড়া, হাতি পুষি। সিংহ নেই ওখানে। এক-আধটা যদি ওস্থার থেকে যায়-ও, তাকে আমরা তখুনি মেরে ফেলি। চাষীরা ফলের আর সবজির চাষ করে। ছাগল ভেড়ার জন্য ঘাস বোনে। কারিগরেরা সোনা রূপোর জিনিস, চামড়ার জিনিস বানায়। শিল্পীরা কাঠে আর হাতির দাঁতে খোদাই করে। তাঁতীরা ছাগল ভেড়ার লোম থেকে পশম তৈরি করে, কাপড় বোনে। বাইরের জগতের সঙ্গে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যও করি আমরা। সোনার আর হাতির দাঁতের মুদ্রায় লেনদেন হয়। বছরে একবার ক্যাথ্‌নির সঙ্গে যুদ্ধবিরতি করা হয়। তখন দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনাকাটা চলে।'

টারজান বলল, 'পরস্পরের ওপর এতটা নির্ভর কর, তাহলে মিটমাট করে নাও না কেন? যুদ্ধ বন্ধ হলে তো ভালোই হবে।'

ভ্যালথর বলল, 'কেউ যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইবে না! তাহলে তো জীবনের রোমাঞ্চই চলে যাবে। ওরাও চাইবে না।'

রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি ভয়ঙ্কর বেড়ে গেল। কথা বলা বন্ধ হল। দৃষ্টিও চলে না। ফোঁটা করে না পড়ে, অমন চাদরের মতো বৃষ্টি নামতে টারজান কখনো দেখেনি।

বিদ্যুতের চমকানিতে ওরা পথ দেখে এগোতে লাগল। কিছু পরেই শহরের আলো দেখা গেল, বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে। ঝড় যেন বেড়েই চলল। নদীর স্রোতের মতো বৃষ্টি নামতে লাগল আর হাওয়ার দাপট যেন ওদের ঠেলে পিছু হটিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। এই ভাবে কয়েক মাইল এগোল ওরা, ঝড় কমার নাম নেই। বরং বেড়েই গেল।

হঠাৎ বৃষ্টির প্রবল তোড়ে দুজনেই পা হড়কে পড়ে গেল। উঠে দাড়াতেই মনে হল একটা দুরন্ত স্রোতের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে। স্রোতটা গিয়ে নদীর সঙ্গে মিশেছিল। এই সময় বৃষ্টিও থেমে গেল। এই নাকি এ বর্ষার শেষ বর্ষণ। যেখানে রাস্তাটা নদী পার হয়ে গেছে, সেখান থেকে ক্যাথনির সিং-দরজার দূরত্ব সাত মাইল। ঐ দরজার কাছেই সোনার পুল।

নদী অন্যরকন চেহারা ধরেছে। এমনিতে তাতে এক ফুট গভীর জল থাকে, এখন কোমর জল গর্জাতে গর্জাতে ঢেউ তুলে, পাগলের মতো ছুটে চলেছে। টারজান বলল, 'এইখানেই পার হওয়া উচিত। এর পর চারদিকের ধারা নদীতে মিশে এমনি জল বাড়বে যে পার হওয়াই যাবে না।'

সেই ভালো। ভ্যালথর পার হবার জায়গাটাকে চেনে, তাই সে আগে আগে গেল। সেই সময়ে চাঁদ মেঘে ঢেকে গেল, চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। টারজান ভ্যালথরকে দেখতে না পেলেও ঘাবড়ায়নি। তার নিজের শক্তির ওপর যথেষ্ট আস্থা ছিল। ভাবল ঠিক পার হয়ে যাবে। দুঃখের বিষয় নদীর বুকে এক গর্ত ছিল; তাতে পা পড়াতে, পা-ও পিছলে গেল আর টারজান-ও দুরন্ত নদীর দুর্বার স্রোতে ভেসে গেল।

সে-নদীর সঙ্গে লড়াই করা টারজানেরো সাধ্য ছিল না। ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে দেখে, স্রোতের ওপর সে গা ভাসিয়ে দিয়ে কোনোমতে শুধু নাকটা জলের ওপর তুলে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

ক্যাথ্‌নি ছাড়িয়ে কয়েক মাইল দূরে ঐ নদী একটা গভীর গিরি-খাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার আগে স্রোতের কবল থেকে বেরিয়ে পড়তে না পারলে নিশ্চিত মৃত্যু। তবে এর আগেও কতবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বনমানুষের ছেলে টারজান মুক্তি পেয়েছে! ভ্যালথর বেচারি প্রাণে বাঁচলে হয়।

বেঁচেছিল ভ্যালথর। নদীর অন্য তীরে পৌঁছে টারজানের নাম ধরে অনেক ডাকাডাকিও করেছিল। ভোর অবধি খোঁজাখুঁজি করেছিল। সেটাও কম সাহসের কাজ নয়, কারণ ক্যাথ্‌নির যোদ্ধারা দেখতে পেলেই ওকে মেরে ফেলত। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ভ্যালথর আবার থেনারের পথ ধরেছিল।

টারজানকে দুরন্ত স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল। কখনো এ-তীরে, কখনো বা ও-তীরে আছড়ে ফেলার ভয় ছিল। সেই সময় একটা গাছ-গাছড়া চেপে ধরতে পারলেই, টারজান বেঁচে যায়। তাই করল শেষে, একটা মজবুত ঝুলন্ত লতাগাছ ধরে কোনো মতে শরীরটাকে টেনে

নদীর তীরে তুলে ফেলল। কয়েক মিনিট বিশ্রাম করে, গা-ঝাড়া দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

অনেক রাত হয়ে গেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে মিট-মিটে আলো দেখে, নদীর গ্রাস থেকে নিজেকে টেনে তুলে হাত বাড়িয়ে টারজান একটা দেয়াল পেল। সেটাকে টপকিয়েই সান-বাঁধানো মাটি পেল পায়ের নিচে। মনে হল একটা উঠোন। বিদ্যুতের চমকানিতে দেখতে পেল সামনে নিচু বাড়ি, একটা জানালার ভিতরে আলো আর একটা দোরগোড়া। তার মধ্যে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল, দরজাটা খুলে গেল, মশাল হাতে এক দল লোক বেরিয়ে এল।

টারজান প্রথমে ভাবল পালাবে; তারপর এরা ওদের ঘিরে ফেলেছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। আক্রমণ করলে, পালাবে। ঐ উঠোনের তিন দিকে ঘর, এক দিকে দেয়ালটা। একটা লোক বলল, 'কে তুমি?'

অ্যাথ্‌নির আর ক্যাথ্‌নির লোকে একই ভাষা বলে। টারজান বলল, 'আমি বিদেশী, বানের জলে ভেসে এসেছি।'

—'চল, সেনাপতি কি বলে শোনাই যাক। সে-ও বোধ হয়, তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।'

লোকগুলোকে শত্রু ভাবাপন্নের চেয়ে বরং কৌতূহলীই মনে হল। তবে সেনাপতির কেমন মেজাজ হবে বলা যায় না।

ওরা ওকে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে অনেকগুলো বেঞ্চি আর টেবিল। দেয়ালে সারি সারি বর্শা, তলোয়ার, সোনা বাঁধানো হাতির চামড়ার ঢাল এবং মরা মানুষের শুকনো মুণ্ডু। লোকগুলোর মন্দ চেহারা নয়, তাদের বলিষ্ঠ শরীর, তবে বেশির ভাগই কেমন আকাট মুখ্যু গুণ্ডা ধরনের দেখতে। প্রত্যেকের হাতে পায়ে, অস্ত্রেশস্ত্রে, ঢালে, বর্শা তলোয়ারের হাতলে সোনার সাজ।

এই সময় দুজন যোদ্ধা ঘরে ঢুকল। দেখেই বোঝা গেল এরা অনেক উঁচু পদের। এদের সাজপোষাক আরো দামী। এদের দেখেই অন্যরা সরে দাঁড়াল। যাকে নেতা মনে হল, সে বলল, 'এখানে কেন এসেছ?'

টারজান আগের উত্তর দিল। তাতে এদের খুব আস্থা হল মনে হয় না। কম-বয়সী যোদ্ধা বলল, 'দেখতে কিন্তু অ্যাথ্‌নির লোকদের মতো নয়।'

—'তাতে কি হয়েছে? খালি গায়ে সবাইকে এক রকমই দেখায়। ওকে তো তোমার মাস্তুতো ভাই বলেও মনে হয়।'

সেনাপতি বলল, 'নিশ্চয় অ্যাথনি থেকেই এসেছে এবং রানীকে খুন করতে। আগের দলটাও যেমন এসেছিল। এ লোকটা রানীকে মেরে, নিজেও মরবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছে।'

টারজান বলল, 'আমি কখনো অ্যাথনি যাইনি। দূর দক্ষিণ দেশ থেকে এসেছি। আমি তোমাদের শত্রু নই, রানীকেও হত্যা করতে আসিনি। এ দেশের কথা জানতামই না।'

টারজান এসেছে তার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে। জেলে ঠুসে দিলে কিছুই দেখবার সুযোগ পাবে না। এদের একটু মন গলাতে পারলে হয়। বুড়োকে দাম্ভিক, সঙ্কীর্ণমনা, নিষ্ঠুর প্রকৃতির মনে হল। অন্যজন অনেক বেশি বুদ্ধিমান, সরল, সদয়। তবে এর নিশ্চয় ক্ষমতা কম। তবু এর মন পাওয়া যেতে পারে, বয়স্কর মন পাবে না।

টারজান কমবয়সী যোদ্ধাকে বলল, 'অ্যাথ্‌নির লোকেরা আমার মতো দেখতে?'

—'মোটেই না।'

—'তাদের অস্ত্রশস্ত্র এই রকম?'

—'একেবারেই না।'

—'তাহলে ঐ তো আমারগুলো ঐখানে পড়ে আছে, কাছে এনে ভালো করে দেখ।'

এবার বয়স্ক যোদ্ধাও কৌতূহলী হয়ে হুকুম করল, 'নিয়ে এসো, দেখি।'

অনুচররা টারজানের ঘাসের দড়ি, বর্শা, তীর ধনুক, তূণ, ছোরা, সব এনে টেবিলের ওপর রাখল।

যুবক বলল, 'সত্যিই তো একেবারেই সে-রকম নয়। এটা দিয়ে কি করে বল তো, টোমস?'

বয়স্ক বলল, 'ফাঁদটাদ হবে।'

টারজান বলল, 'দাও, আমি ওর কাজ দেখাচ্ছি।'

যুবক ওকে ধনুকটা দিল। টোমস বলল, 'সাবধান, গেমনন।'

—'আরে ওটা দিয়ে তো আর কেউ মরবে না। দেখাও দেখি—কি নাম তোমার?'

—'টারজান।'

—'বেশ, দেখাও। কিন্তু আমাদের আবার মেরেটেরে ফেলো না!'

উল্টো দিকের দেয়ালে একটা হাঁ-করা সিংহের মাথা ঝুলছিল। টারজান সেদিকে টিপ করে তীর ছুঁড়ল। পালক

পরানো তীর সাঁই করে সিংহের মুখের ভিতরে ফুটে গেল। সকলে স্তম্ভিত।

টোমস বেশ ঘাবড়ে গেছিল, 'ওর হাত থেকে ওটা নিয়ে নাও, গামনন। শত্রুর হাতে ওটা না থাকাই ভালো।'

টারজান ধনুকটা টেবিলে ফেলে দিয়ে বলল, 'আছে অ্যাথ্‌নির লোকদের এই জিনিস?'

—'না, না, কারো নেই।'

—'কাজেই বুঝতে পারছ, আমি সেখান থেকে আসিনি।'

টোমস তবু বলল, 'তা না হতে পারে, কিন্তু শত্রু তো বটে।'

গেমনন তার কানে কানে কি যেন বলল। টোমস বলল, 'না, তা হতে পারে না। আজ রাতের মতো বন্ধ থাকুক। কাল দেখা যাবে, কি করা উচিত।'

তারপর একজন রক্ষীর হাতে টারজানের ভার দিয়ে ওরা দুজন চলে গেল।

রক্ষী ধনুক তুলে বলল, 'এটাকে কি বলে?'

—'ধনুক।'

—'এ দিয়ে মানুষ মারা যায়?'

—'ওটা দিয়ে আমি মানুষ, সিংহ, বুনো মোষ, হাতি, সব কিছু মেরেছি। শিখতে চাও নাকি?'

লোকটা ইতস্ততঃ করছে দেখে টারজান আবার বলল, 'এক মিনিটে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখ।'

লোকটার বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, হাতেও যথেষ্ট জোর। টারজান তাকে ধনুক ধরার কায়দা আর কৌশল দেখিয়ে দিল। কিন্তু প্রথম তীরটা কয়েক ফুট দূরেই পড়ে গেল।'

টারজান বলল, 'একটু অভ্যাস দরকার।'

একজন রক্ষী বলল, 'গায়ের গতরও দরকার। নইলে ওটা বাঁকাতেই পারবে না।'

—'কেন অ্যাল্‌টাইডিসের তো গায়ে খুব জোর।'

—'তাও যথেষ্ট নয়।'

টারজান সিংহের মুখে আরেকটা তীর মেরে আরেকবার কায়দা দেখিয়ে দিল। দুঃখিত স্বরে অ্যালটাইডিস্ বলল, 'তোমাকে এবার বন্ধ করে না রাখলে, ভাই, টোমস আমাকে আস্ত রাখবে না। কিন্তু আমি অভ্যাস করে এ অস্ত্রটা রপ্ত না করে ছাড়ব না। আচ্ছা, এর মধ্যে কোনো চালাকি নেই তো?'

—'কিচ্ছু না। একটা হাল্কা ধনুক তৈরি করে, আগে অভ্যাস কর। আমি কাল গোটা দুই বানিয়ে দেব। কি কি লাগবে এনে দেবে তো?'

—'নিশ্চয়। এখন চল, ভাই বন্ধ হও।'

যে ঘরে টারজানকে তালাচাবি দেওয়া হল, তার বাইরে একজন গার্ড রইল আর টারজান ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারল, ঘরেও কেউ রয়েছে। তার নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারেই টারজান ঘরটাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। পুরু তক্তার তৈরি দরজা। চোখের সমান উঁচুতে একটা চৌকো ফোকর কাটা। ভিতরে খিল, তালা ইত্যাদির বালাই নেই, বাইরে কি আছে বোঝা যাচ্ছে না। অন্ধকারে একটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'কি করছ?'

—'ঘর পরখ করছি।'

—'যদি পালাবার কথা মনে করে থাক, ওতে কোনো সুবিধা হবে না। তুমি কিম্বা আমি কেউই এখান থেকে বেরুতে পারব না, ওরা টেনে বের না করলে।'

চারকোণা পাথরের ঘর, তার একটা দরজা, তাতে একটা ফোকর। টারজান বেঞ্চিতে বসে পড়ল। শীত করছে, সর্বাঙ্গ ভেজা, খিদে পাচ্ছে, কিন্তু ভয় করছে না। সুযোগ পেলেই পালাতে হবে।

অন্য লোকটা বলল, 'তুমি কে? মশালের আলোয় তো দেখলাম তুমি অ্যাথ্‌নির লোক নও, ক্যাথ্‌নিরও নও। তা বন্ধুত্ব পাতালেই হয়।'

—'যা বল তুমি।'

—'আমার নাম ফোবেগ, তোমার নাম কি?'

—'টারজান। অনেক দূর দেশ থেকে এসেছি।'

—'এলে কেন? সেখানে নিরাপদে থাকতে।'

—'পথ হারিয়ে, বন্যায় ভেসে এলাম। এরা বলে কিনা আমি রানীকে হত্যা করতে এসেছি।'

—'তাতে কিছু এসে যায় না। যে কারণেই এসে থাক, তোমাকে এরা মেরে ফেলবে। কি ভাবে মারবে, সেটা রানীর মর্জির ওপর নির্ভর করছে।'

—'মারবে কেন? আমি তো পথভ্রষ্ট পথিক।'

—'এরা সব সাদা বন্দীদের মেরে ফেলে, কালোদের দাস বানিয়ে রাখে আর মেয়েদের মারেটারে না। তবে বড় বেশি সুন্দরী হলেই মুশ্‌কিল। লোকে তাদের বাড়ির সুন্দরী মেয়েদের লুকিয়ে রাখে। রানীর চেয়ে কেউ দেখতে ভালো হবে, রানীর সেটা সহ্য হয় না।'

—'তিনি বুঝি খুব রূপসী ?'

—'হ্যাঁ, খুব। কিন্তু সাক্ষাৎ যম। দয়ামায়া নেই।'

—'তুমি কেন এখানে ?'

—'দেবতার ল্যাজ মাড়িয়ে ফেলেছিলাম বলে।'

টারজান সে বিষয়ে আর কিছু জানতে না চেয়ে বলল, 'তাই এই সাজা ?'

—'না, না, এটাই সাজা নয়। সাজার কথা বিবেচনা হচ্ছে। পরীক্ষায় পাস করলে, বেঁচেও যেতে পারি। ভালো তলোয়ার খেলি, বর্শা চালাই। তবে সিংহের সামনে সুবিধা করতে পারব না। আর স্কারাটরের অনির্বাণ আগুনের সামনে সবাই দোষী সাব্যস্ত হয়।'

কি যে বলে গেল লোকটা, কথার মানে বুঝলেও, ব্যাপারটা বোধগম্য হল না। রানীর মন ভালো করার সঙ্গে অপরাধীর বিচারের কি সম্পর্ক তা বোঝা গেল না। শেষটা টারজান ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সূর্যোদয়ের সময়ে, সেই যে প্রকাণ্ড সোনালি গা, কালো কেশর সিংহের কথা আগেও বলা হয়েছে, সে-ও ঝড়ের সময় যে পাথরের খাঁজে ঢুকেছিল, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে নিচের উপত্যকার দিকে তাকাল। সেখানে নানা রকম জানোয়ার চরছিল। সিংহের জলযোগ হয়নি। এ জায়গাটা ক্যাথ্‌নি থেকে অনেকটা দক্ষিণে।

টারজানদের কুঠরির বাইরেও পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফোবেগ বলল, 'হয় জলখাবার, নয় প্রাণদণ্ড।'

দরজা খুলে মাটির গামলায় খাবার আর ঘড়ায় করে জল নিয়ে একজন দাস এল। সঙ্গে দুজন যোদ্ধা। এ দুজন কাল রাতে ডিউটিতে ছিল না। 'এই সেই বুনো নাকি ?'

অন্যজন বলল, 'সাবধানে থেকো, ফোবেগ। বুনোর সঙ্গে এক ঘরে আছ।'

ওরা চলে গেলে টারজানের সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে ফোবেগ বলল, 'কতটা বুনো তুমি ? কই, কিছু বলছ না যে ?'

—'তুমি বড় বোকা। একসঙ্গে দীর্ঘকাল থাকতে হতে পারে, কাল বললে। এখন যদি পরস্পরকে অপমান করতে শুরু করা যায়, বন্ধুত্ব টিকবে কি করে ? খাবার এসেছে, বরং খাওয়া যাক। খুব খারাপ খাদ্য। আধ-সিদ্ধ মাংস, শক্ত, ছিবড়ে।'

ফোবেগ চিবুতে চিবুতে বলল, 'ইস্, এই সিংহটার মেলা বয়স হয়েছিল! সময়কালে কত সিংহ মেরেছি। মন্দিরের রক্ষী ছিলাম। আমার গায়ে সবচেয়ে বেশি জোর ছিল। থেনার থেকে দস্যু এলে, খালি হাতে কত জনের ঘাড় মটকে দিয়েছি। আমার মতো লোক দেখেছ ?'

—'কোনো কালেও না।'

—'তাহলে আমার সঙ্গে সদ্ভাব রেখো। নইলে ঘাড় ধরে মুণ্ডুতে একটা পাক দেব, ব্যস্ মটাৎ।'

—'ইস্! শত্রুদের নিশ্চয় খুব অসুবিধা লাগে ?'

—'অসুবিধা ? কি বলছ ? স্রেফ অক্কা পায়, মশাই!'

—'তাতে কিছুই আশ্চর্য হচ্ছি না।'

—'কিন্তু ওরা তোমাকে বুনো বলছে, অর্থাৎ বলতে চায় খ্যাপা। কে জানে কতদিন খ্যাপার সঙ্গে থাকতে হবে!'

—'আমাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পার।'

—'কি করে ?'

—'গলা মট্‌কে।'

—'তা পারি। কিন্তু ওরা যে তাহলে আমারো গলা পাকাবে।'

টারজানের পক্ষে বন্ধ থাকা বড়ই কষ্ট। তাই মনটাকে সে অতীতের ঘন বনে ছেড়ে দিত। বনমানুষদের সঙ্গে কত আনন্দেই না দিন কেটেছিল। তখনকার দুঃখ-কষ্টগুলোও এখন মনে হয় হাস্যকর। খালি তার বনমানুষী মা কালাকে হারানোর দুঃখ কখনো কমে না। বর্তমানের কথাও মনে হল। এই অভিযানে খুদে বাঁদর নিকিমাকে সঙ্গে নেয়নি বলে সে খুব রেগেছিল। এখনো কত জানোয়ার বন্ধু ওর। কত বনমানুষ, টানটর হাতি, পোষা সিংহ জাদবালজা। জাদবালজাকে সঙ্গে আনলে বিপদে আপদে সুবিধা হত। তবে মানুষের সমাজে মিশতে হলে, তাকে নিয়ে নানা সমস্যা ওঠে, তাই এবার আনেনি। ছোট্ট মা-বাপ মরা জাদবালজা এক দলা সোনালি পশমের মতো দেখতে ছিল। তাকে

পেলেছে টারজান। তারপর কত সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে তার সাহায্য পেয়েছে। সব মনে পড়ছিল কুঠরিতে বসে।

টারজান ভেবেছিল পরদিনই ওকে জেরা করবার জন্য কুঠরি থেকে কেউ নিয়ে যাবে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল, কেউ খোঁজ নিল না। ফোবেগ লোকটাও অসহ্য। যেমনি দেমাকী, তেমনি নির্বুদ্ধি। সময় কাটাবার জন্যই যেন ঝগড়া বাধাবার ইচ্ছা। কিন্তু টারজান কিছুতেই ঝগড়া করবে না, ঐ এক জ্বালা। এক দিন সকালে ফোবেগ বলল, 'তোমার কাছ থেকে রানী নিমোনি কোনো মজা পাবেন না।'

টারজান বলল, 'সে অভাবটা না হয় তোমার কাছ থেকে পুষিয়ে নেবেন।'

—'তা নিতে পারেন। লড়াই চান তো সিংহের সঙ্গেই লড়ব। তোমাকে বোধ হয় ক্লারাটরে সঁপে দেবেন। যা ভীতু তুমি।'

টারজান রাগছে না দেখে ফোবেগের রাগ বেড়ে গেল। এর পর কি হত বলা যায় না, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে চারজন যোদ্ধা এসে ওদের দু'জনকেই ডেকে নিয়ে গেল।

লম্বা করিডর দিয়ে হাঁটিয়ে ওদের একটা বড় ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে হাতির দাঁত আর সোনার সাজ পরে সাতজন যোদ্ধা বসেছিল। তাদের মধ্যে টোমস আর গেমননও ছিল। ফোবেগ বলল, 'এরা সবাই রাজ-পরিষদের সভ্য। টোমস হল রানীর প্রধান মন্ত্রী। ওর রানীকে বিয়ে করার ইচ্ছা। কিন্তু বুড়ো বলে নিমোনির পছন্দ নয়। ওর ডাইনে এরট। আগে ও আমারি মতো সাধারণ যোদ্ধা ছিল, কিন্তু রানীর নেক নজরে পড়ে পদোন্নতি হয়েছে। তবে রাজবংশীয় নয় বলে ওকেও নিমোনি বিয়ে করবেন না।

সব জায়গায় সোনার আর নানা রঙের কারুকার্যের ছড়াছড়ি, কিন্তু নক্সাগুলো কিঞ্চিৎ আদিম ধরনের। কারিকুরি-গুলো খুব সুন্দর। পাথরের মেঝের ওপর জানোয়ারের লোমের গালচে পাতা। দেয়ালে রংচঙে ছবি, সব যুদ্ধের দৃশ্য, সিংহের সঙ্গে হাতির লড়াই, তাতে সিংহরাই সর্বদা জয়ী।

টোমস বন্দীদের ডাকল। ফোবেগের অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করাতে, একজন অফিসার বলল, 'ও থুবস্‌কে অশুদ্ধ করে দিয়েছিল।'

ফোবেগ বলল, 'ইচ্ছা করে করিনি, আকস্মিক ভাবে হয়ে গেছিল।'

টোমস বলল, 'চোপ। অন্যজন কে?'

—'ওর নাম টারজান।'

এরট বলল, 'এই কি অ্যাথ্‌নি থেকে এসেছে, রানীকে হত্যা করতে?'

—'এ-ই সে।'

এরট বলল, 'দেখে তো অ্যাথ্‌নীয় মনে হয় না'

টারজান বলল, 'আমি অ্যাথ্‌নীয় নই।'

টোমস বলল, 'চোপ!'

টারজান আপত্তি জানাল, 'চুপ করব কেন? আমার হয়ে বলবার কেউ নেই, তাই নিজেকেই বলতে হচ্ছে। আমি তোমাদের শত্রু নই। আমাদের দেশ তোমাদের দেশের শত্রু নয়। আমি মুক্তি দাবি করছি।'

এরট বিদ্রূপ করে বলল, 'বাঃ! চমৎকার! বন্দী দাসটা মুক্তি দাবি করছে!'

টোমস রেগে গর্জে উঠল, 'আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করলে তবে কথা বলবে। আর মন্ত্রী টোমস চুপ করতে বললে চুপ করবে!'

টারজান উত্তর দিল 'আমার ইচ্ছা হলেই কথা বলব।'

গেমনন তাড়াতাড়ি বলল 'ও আমাদের আদব-কায়দা কিছুই বোঝে না, তাই ওভাবে কথা বলছে। অ্যাথ্‌নির লোকও নয়, শত্রুও নয়, ওকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত।'

টোমস বলল, 'রাতে পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকেছিল। রানীকে হত্যা করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ওর? ওর প্রাণদণ্ড হক। কি ভাবে মরবে, রানী বলে দেবেন।'

গেমননের কোনা কথাই ওরা শুনল না। এর মধ্যে রানীর প্রবেশ। টারজান ছাড়া সকলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। রানীর সেদিকে চোখ পড়াতে, তিনি জিজ্ঞাসু ভাবে তাকালেন। রানী অপূর্ব সুন্দরী, তাঁর সাজসজ্জাও মূল্যবান ও সুন্দর, কিন্তু অনেকের চেয়ে কম জমকালো। সব সাজে হাতির দাঁত, সোনা আর পান্না শোভা পাচ্ছে। টারজানের মনে হল রানীর মধ্যে সুখী মানুষের বিলাসিতার সঙ্গে কেমন একটা হিংস্র বেঘো ভাব। মনে হল রানীর মনটাতেও কখনো সম্পূর্ণ মঙ্গলের প্রভাব; কখনো সম্পূর্ণ অমঙ্গলের। রানীর কপালে ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছিল। রাগের নয়, কৌতূহলের।

টারজানের মতো মানুষ এই প্রথম চোখে পড়ল।

সকলকে উঠতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই লোকটি কে যে হাঁটু গাড়ে না?'

রাগে টোমসের চোখ লাল হয়ে উঠল, 'ও একটা অসভ্য বর্বর। তবে প্রাণদণ্ডই দেওয়া হয়েছে যখন, তাতে কিছু এসে যায় না।'

—'প্রাণদণ্ড কেন?'

--'গভীর রাতে পাঁচিল টপকে, আমাদের মহামান্য রানীকে হত্যা করতে এসেছিল বলে। অবিশ্যি শেষ কথা আপনার।'

টারজানের দিকে ফিরে নিমোনি বললেন, 'হাঁটু গাড়নি কেন?'

—'ওরা বলছে তুমি আমার প্রাণদণ্ড দেবে, তবে কেন হাঁটু গাড়ব, আমি তোমার প্রজাও নই। তাছাড়া আমি কারো কাছে হাঁটু গাড়ি না।'

তাই শুনে টোমস মহা তর্জন গর্জন করতে লাগল। রক্ষীদের বলল, 'নিয়ে যাও দুটোকে। দণ্ডের সময়ে আবার এনো।'

নিমোনি বললেন, 'দাঁড়াও। তুমি আমাকে হত্যা করতে এসেছিলে? ভালো লোক-ই পাঠিয়েছে শত্রুরা। তোমাকে দেখে মনে হয় যে কোনো শক্তিপরীক্ষাতেই তুমি দক্ষ।'

টারজান বলল, 'নারীহত্যা কিছু শক্তি-পরীক্ষা নয়।'

—'তবে আমাকে হত্যা করতে এসেছিলে কেন?'

—'সেটা ঐ বুড়োকে জিজ্ঞাসা কর। আমি বলে বলে হয়রান হয়েছি।'

টোমস তলোয়ারে হাত রেখে বলল, 'এখনি ওকে মেরে ফেলার অনুমতি দিন, রানী। এত বেয়াদবি সহ্য হয় না'

নিমোনিও চটেছিল। সে বলল, 'নিঃসন্দেহে বেয়াদব। তবে টোমসের প্রতি, রানীর প্রতি নয়। ভয় নেই, ওর বেয়াদবির সাজা দিচ্ছি। অন্য লোকটা কে?'

—'ও একজন মন্দিররক্ষী। ওর নাম ফোবেগ। ও দেবতার ল্যাজ মাড়িয়ে দিয়েছিল।'

—'বেশ ওরা দুজনে সিংহের মাঠে লড়াই দেখাবে। খুসের দেওয়া অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নিতে পারবে না। জিতলে, মুক্তি পাবে। আপেক্ষিক মুক্তি। নিয়ে যাও ওদের।'

বন্দীশালায় ফেরার পথে দুজন বর্শাধারীর যত্নের চোটে, পালাবার সুযোগ হয়নি। ফোবেগ ভাবছিল লোকটা হয় বেজায় সাহসী, নয় বেজায় বোকা। শেষেরটা হলেই ভালো। কারণ হয়তো কাল-ই ওর সঙ্গে লড়তে হবে। ফোবেগ জানত প্রতিপক্ষকে ঘাবড়ে দিতে পারলে, লড়াইয়ের অর্ধেক জেতা হয়ে যায়। তাই সে বলল, 'সম্ভবতঃ কালকেই।'

—'কি কালকে?'

—'তোমাকে মেরে ফেলব।'

—'ওমা, তাই নাকি? আমি আবার ভেবেছিলাম তুমি আমার বন্ধু!'

—'ভয় নেই, বেশিক্ষণ কষ্ট পাবে না।'

—'এমনি করে মুণ্ডু পাকিয়ে দেবে বুঝি?'

—'তা হয়তো দেব। কিন্তু তার আগে একটু ইদিক-উদিক আছড়াব। নইলে নিমোনি মজা পাবে কেন?'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু তুমি যদি পেরে না ওঠ, আমিই না হয় তোমাকে একটু ইদিক-উদিক আছড়াব। তাতেও নিমোনি মজা পাবে না? চাই কি, তুমিও পাবে না?'

ফোবেগ হাসল, 'সে কথা ভেবেও হাসি পাচ্ছে। তবে ঐ ভাবনা পর্যন্তই সার। বলিনি ক্যাথ্‌নিতে আমার মতো গায়ের জোর কারো নেই।'

—'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেমন ভুলে গেছিলাম।'

—'মনে রাখার চেষ্টা কর। নইলে লড়াই জমবে কেন?'

—'নিমোনি বুঝি তা না হলে মজা পাবে না? হ্যাঁ, বটেই তো। তা হলে তো চলবে না। তাড়াতাড়ি মেরে ফেলো না কিন্তু।'

ফুর্তির চোটে নিজের উরু থাবড়ে ফোবেগ বলল, 'যা বলেছ। তেড়ে অনেকক্ষণ ধরে লড়তে হবে। শোন। গোড়ায় কিছু বলব না। আমাকে নিয়ে একটু খেল দেখিও। তারপর আমি ইশারা করলেই, ছুটে পালিও, যেন কত ভয় পেয়েছ। শেষ পর্যন্ত নিমোনির সামনে ধরা দিও।

—'তা হলে খুব জমবে, কি বল? কিন্তু ধর যদি আমিই তোমাকে মেরে ফেললাম, তাহলে?'

—'ঐ দেখ! ফের তামাসা! তা আমিও তামাসা ভালোবাসি।'

পরদিন সকালে রক্ষীরা ওদের জন্য ভালো খাবার

দাবার নিয়ে এসে বলল, 'ভালো করে খাও, তাহলে অনেকক্ষণ লড়তে পারবে। তাছাড়া একজনের তো এই শেষ খাওয়া।'

ফোবেগ টারজানকে দেখিয়ে বলল, 'অর্থাৎ ওর।'

যোদ্ধা বলল, 'সেইরকম বাজির কথাই হচ্ছে। কিন্তু বাপু, মানুষটা বড়সড় আর দেখে মনে হয় গায়ে জোর আছে।'

ঘণ্টা খানেক পরে যোদ্ধারা এসে ওদের প্রাসাদের হাতার বাইরে, দুসারি পুরনো গাছের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেল। তার দু-ধারে রাজপরিষদের সভ্যদের সাদা সোনালী গম্বুজ দেওয়া বাড়ি আর রানীর দোতলা প্রাসাদ। মিছিল দেখতে মেলা লোকের ভিড়। তারা টারজান আর ফোবেগকে দেখে নানা মন্তব্য করতে লাগল। কেউ বা ফোবেগকে জয়ধ্বনি, কেউ বা টিটকিরি দিচ্ছিল। ওর বিষয়ও নানা জল্পনা-কল্পনা। অনেকে বাজি ধরছিল ওর পক্ষে, অনেকে বিপক্ষে। পথের শেষে সোনার পুল, আগাগোড়া খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি। শহরের দিকে দুটো প্রচণ্ড সোনার সিংহমূর্তি। উল্টো দিকেও সেই রকম আরো দুটো।

সিংহের মাঠেও ক্রমে ভিড় জমছিল। সেখানেই লড়াই হবে। মাঝখানে পঁচিশ-তিরিশ ফুট গভীর ডিম্বাকৃতি অ্যারিনা। তার মধ্যে খেলা হবে। ঐ গর্ত খোঁড়ার মাটি চারদিকে ঢালু করে ফেলে, তার ওপর চ্যাপটা পাথর ফেলে, দর্শকদের বসবার জায়গা হয়েছে। লোকে খাচ্ছে দাচ্ছে, গালগল্প করছে। ফোবেগ বলল প্রতি বছর বর্ষার শেষে এই রকম একটা আনন্দোৎসব হয়। 'আমি তোমাকে মেরে ফেলার আগে, নানা রকম খেলা দেখতে পাবে। আমাদের লড়াইটা শেষ খেলা।'

তারপর ঢাক ঢোল বাজনা শোনা গেল। ফোবেগ বলল, 'রানী আর সিংহপুরুষরা আসছে।'

---'সিংহপুরুষ কারা?'

---'বংশানুক্রমে তারাই এখানকার রাজপুরুষ। অবিশ্যি রাজপরিষদের সবাইকে আমরা সিংহপুরুষ বলি।'

যোদ্ধাদের কথা থেকে টারজান বুঝল রানীর প্রিয়পাত্র এরটের ওপর সবাই চটা। রানী তাকে উচ্চপদ দিলে কি হবে, উচ্চ বংশ তো দিতে পারেন না। ওর বাবা তো সিংহ-খামারের খাঁচা সাফ করে। ফোবেগ বলল, 'এ বেচারার সঙ্গে না লড়ে, ও ব্যাটার সঙ্গে লড়তে পারলে সুখী হতাম। এ তো এত বোকা যে আমি ওকে মেরে ফেলব বলাতেও ভয় পাচ্ছে না। তা বোকা হক আর যাই হক, মেরে ফেলতে আমার ভালোই লাগবে।'

বাদ্য-বাজনার শব্দ বাড়ল। হাজার হাজার লোকও দর্শকদের জায়গা দখল করবার জন্য হুড়োহুড়ি করতে লাগল। রঙীন পতাকা উড়িয়ে যোদ্ধারা মার্চ করে এল। তাদের পিছনে চারটে চমৎকার সিংহ-টানা মস্ত এক সোনার রথ। তার ওপর সোনার পালংকে বসে নিমোনি এলেন। ষোলজন কালো দাস সিংহের লাগাম ধরে আছে। বিশাল-দেহ এক নিগ্রো নিমোনির মাথার ওপর লাল রাজছত্র ধরে রেখেছিল। তাছাড়া সামনে, পিছনে, দুপাশে সুসজ্জিত যোদ্ধারা আর রাজন্যবর্গীয়রা তো ছিলই। কেউ কেউ সিংহ-টানা ছোট ছোট রথে চড়ে। ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে একটা চক্কর দিয়ে, নিমোনি রথ থেকে নেমে, ঢালের ওপরে তাঁর বিশেষ আসনে গিয়ে বসলেন। সব লোকে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। যে যার আসন নিল।

গোড়ায় বর্শা আর বল্লম ছোঁড়া, দৌড়বাজি, কুস্তী, ইত্যাদি ছোট প্রতিযোগিতা হল। সব খেলাতেই বাজি ধরা দেখে টারজান অবাক হল। তারপর রথের রেসে তো বাজির উন্মাদনায় দর্শকরা খ্যাপার মতো হয়ে উঠল। পরাজিত প্রতিযোগীদের বাদ দিয়ে দিয়ে, শেষ পর্যন্ত দুজনে ফাইন্যালে নামল। এই চূড়ান্ত রেসের বিজয়ীকে অশেষ সম্মান আর সোনার শিরস্ত্রাণ দেওয়া হল।

তারপর ফোবেগ আর টারজানের লড়াই। ফোবেগ বলল, 'দেবতাটেবতায় ভক্তি থাকলে, এই বেলা তাকে ডাকো, কারণ তোমার মরবার সময় হল।'

টারজান বলল, 'কেন, আমাকে একবার চারদিকে দৌড় করাবে না?'

এবার অল্পক্ষণ বিরতি। সিংহরা চলে যা ছিল, ক্রীড়াঙ্গন সাফ করা হল। চিৎকার করে সব বাজি পড়ছিল। টারজানের বিরক্ত লাগছিল। ভিড় সে পছন্দ করে না। নিমোনি সেদিন অনেক বাজি হেরেছিল, কিন্তু তার মুখে অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছিল না। পারিষদরা চাইছিল এবার তার একটা মোটা জিত হক, তাহলে মেজাজ খুশ হবে।

সকলে জানত রানী ফোবেগের ওপর বাজি ফেলবেন। এরট চায় এই খেলায় রানীর জিত হক। যাতে তার কাছে যত হেরেছেন, সব ফিরে পান। নইলে ওর নিজের ভবিষ্যতই অনিশ্চিত। অন্য পারিষদদেরো ঐ রকম ইচ্ছা, কাজেই তারা টারজানের পক্ষে বাজি রাখল। তারপর শিঙা বাজল,

ফোবেগ আর টারজান খেলায় নামল।

এদিকে একজন লোক বলল, 'আমি অচেনা লোকটার ওপর বাজি রেখেছি।'

আরেকজন বলল, 'আমিও।'

নিমোনি বললেন 'আমিও।'

এরট বলল, 'হেরে যাবেন।'

—'তাহলে তুমি কেন ওর ওপর বাজি ধরলে?'

—'জিতলে মেলা টাকা পাব বলে। ফোবেগের মতো শক্তিশালী কেউ এখানে নেই।'

নিমোনি বললেন, 'তাহলে তোমার তার পক্ষে বাজি রাখাই উচিত ছিল। আমি অচেনা লোকটির পক্ষে এক লাখ টাকা বাজি ধরলাম।' তখন সকলে বাজির পাত্র বদলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

টারজানের চমৎকার বলিষ্ঠ শরীর দেখে রানী খুশি হয়েছিলেন। এরট ভাবছিল ফোবেগের তো এবার মুশকিল হবে। প্রতিপক্ষ যদি মেরে না ফেলে, নিমোনির কোপে নিশ্চয় পড়বে। কারণ ওরি কারণে তাঁর লাখ টাকা লোকসান হয়ে গেল। লড়াই খেলার নিয়মগুলো খুব সাদাসিধা। কেউ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যেতে পাবে না আর খালি হাতে প্রতিপক্ষকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। তার জন্য হাত পা নখ দাঁত হাঁটু কনুই সব কিছুই কাজে লাগাতে পারে। যে জিতবে সে মুক্তি পাবে। যদিও আপেক্ষিক ভাবে, নিমোনি বলেছেন।

দশ পা দূরে মুখোমুখি দাঁড়াল দুজনে। টারজান একেবারে নির্বিকার। ফোবেগকে মেরে ফেলার তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, অবিশ্যি নিজে মরবার আরো কম ইচ্ছা ছিল। শিঙা বাজলেই ফোবেগ বলল, 'দেবতাকে ডাক্, ব্যাটা, এক্ষুণি মরবি!' এই বলে টারজানের দুটো কাঁধ খামচে ধরল।

টারজান নিজের দুহাত একসঙ্গে করে এমনি জোরে ফোবেগের থুত্‌নির তলায় বাড়ি দিল যে তার মুণ্ডুটা পিছনে ঘুরে গেল আর সে ছিটকে বারো হাত দূরে মাটিতে ধপ করে বসে পড়ল।

নিমোনি সামনে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোতে লাগল, 'ক্যাথ্‌নিতে কার গায়ে সবচেয়ে জোর, তাই নিয়ে আরেকটু বাজি রাখবে নাকি?'

এরট মিনমিন করে বলল, 'খেলা তো সবে শুরু হল।'

রানী বললেন, 'শুরুও হল, প্রায় শেষও হয়ে এল।'

ফোবেগ উঠে সাবধানে এগোতে লাগল। শত্রুকে একবার ধরতে পারলেই হল, পিষে মেরে ফেলা যায়। টারজান হয়তো তার মনের কথা আঁচ করে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিল। ফোবেগ ভাবল ঐটে ধরে ব্যাটাকে টেনে আনবে। এই ভেবে যেই না বাঁ হাতটি ধরেছে, টারজানের ডান হাতের মুঠি ভীষণ জোরে ওর মুখে লেগেছে। তারপর বাঁ হাত ধরে এক পাক খেয়ে ফোবেগকে নিজের কাঁধের ওপর ঘুরিয়ে দড়াম করে আবার মাটিতে বসিয়ে দিল।

এবার তার উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। টারজানের গলা থেকে গুর-গুর চাপা গর্জন বেরোতে শুনে ফোবেগের হাত পা ঠাণ্ডা। টারজান তাকে তুলে ধরে নিমোনির আসনের খানিকটা কাছে ছুঁড়ে ফেলল। আরো দুটো আছাড়ে ফোবেগ ক্রীড়া প্রাঙ্গণের সীমানার কাছে পৌঁছে গেল। তারপর তাকে তুলে দর্শকদের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও তোমাদের বলী বীর। টারজান তাকে চায় না।'

দর্শকরাও জয়ধ্বনি দিতে দিতে হতভাগ্যকে ছুঁড়ে ফিরিয়ে দিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, 'মেরে ফেল! মেরে ফেল ওকে!'

নিমোনি বললেন, 'মেরে ফেল!'

তাঁর ভক্ত পারিষদরা বলল, 'মেরে ফেল!'

টারজান বলল, 'না, মারব না।'

—'কেন মারবে না?'

—'আমি মারি আত্মরক্ষার কিম্বা খাবার জন্যে। ওকে খাবও না। ওর কাছ থেকে আমার কোনো ভয়ও নেই।'

টলতে টলতে ফোবেগও উঠে দাঁড়িয়েছিল। অস্পষ্টভাবে সব কথাই সে শুনল, কেমন যেন বুঝে উঠতে পারল না। এরট ওপর থেকে ঝুঁকে বলল, 'ওকে মেরে ফেল, রানীর হুকুম।'

টারজান এরটকে বলল, 'ইচ্ছা না থাকলে টারজান কাউকে মারে না।'

এরট বলল, 'নির্বোধ, রানীর হুকুম না মানলে, তুমিও বাঁচবে না।'

টারজান বলল, 'তোমার যখন এতই ইচ্ছা, তুমি এসে মার না।'

রানী বললেন, 'আমি দুই জনকেই প্রাণ দান করলাম। ফোবেগকে ছেড়ে দাও আর অন্যজনকে আমার প্রাসাদে নিয়ে এসো।'

যখন এই সব কাণ্ড ঘটছে, তখন ঘটনাস্থল থেকে অনেক

মাইল দক্ষিণে একটা বনের মধ্যে প্রকাণ্ড এক সোনালি সিংহ কি যেন শুঁকে শুঁকে অস্থির ভাবে ঘুরছিল। একবার সে মাথা তুলে গর্জন করল। গাছ থেকে মানু ভাগল। দূরে একটা হাতি ডাকল।

আসবার সময়, একজন দলপতি আর একদল যোদ্ধা টারজানকে ক্রীড়াঙ্গনে নিয়ে এসেছিল। যাবার সময় উচ্চপদস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সঙ্গে গেল। ওপরে উঠে আসতেই গেমনন এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলল, 'রানীর হুকুম তোমাকে আমি শহরে নিয়ে গিয়ে, অতিথি করে রাখব। সন্ধ্যায় রানীর কাছে যেতে হবে। তার আগে স্নান, খাওয়া, বিশ্রাম।'

টারজান বলল, 'স্নান খাওয়া ভালো লাগবে কিন্তু বিশ্রাম কেন? অনেক দিন ধরে খালি বিশ্রামই করেছি।'

গেমনন বলল, 'নিজের প্রাণ নিয়ে খেলা করেছ। ক্লান্ত হওনি?'

টারজন বলল, 'তাহলে বরং ফোবেগের আদর যত্ন কর। আমি ক্লান্ত হইনি।'

গেমনন হাসল, 'বেঁচে আছে বলেই সে কৃতার্থ। নিজেই নিজের যথেষ্ট যত্ন করবে।'

অন্যরা সকলে হয় এগিয়ে যাচ্ছিল, নয় পেছিয়ে পড়েছিল, ওদের কাছে কেউ ছিল না। গেমনন বলল, 'এখন তুমি কত জনপ্রিয় হয়েছ!'

—'কয়েক মিনিট আগেও ওরা ফোবেগকে বলছিল—মারো ওকে!'

গেমনন বলল, 'ওদের এত খুশি দেখে আমি অবাক হচ্ছি। ওরা মরণ-খেলা দেখতে বড়ই ভালোবাসে। সে তুমি দেখালে না। তবু তোমার প্রশংসায় সব পঞ্চমুখ। গণ্যমান্যদের অনেকের খুব ক্ষতি হয়েছে, কেউ কেউ সর্বস্বান্ত হয়েছে। নিমোনির অবিশ্যি খুব লাভ হয়েছে।'

—'নিমোনি নাকি এক কোটি জিতেছে?'

—'হ্যাঁ, হয়তো তাই তুমি এখনো বেঁচে আছ!'

—'আমি বেঁচে থাকব না কেন?'

—'বাঃ, তুমি যে ওঁর কথা অমান্য করেছ। হয়তো তোমাকে অন্যভাবে সাজা দেবেন।'

—'তোমারো লোকসান হয়ে গেল নাকি?'

—'না, আমি তোমার পক্ষে বাজি রেখেছিলাম। আমি যে তোমাকে অন্যদের চেয়ে বেশি চিনি!'

টারজান বলল, 'সন্ধ্যাবেলায় রানীর সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। আবার হয়তো চটাব।'

—'মনে রেখো বেশি চটালেই মুশকিল।'

গেমনন টারজানকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। অর্থাৎ একটা শোবার ঘর, স্নানের ঘর আর একটা বসবার ঘর। শেষেরটাতে আরেকজন অফিসারেরো ভাগ ছিল। ঘরে অস্ত্রশস্ত্র, ঢাল, শিকারের জন্তুর মাথা, চামড়ার ওপর আঁকা ছবি সাজানো ছিল। একটাও বই বা লেখার সরঞ্জাম নেই দেখে সে-বিষয়ে জানার ইচ্ছা থাকলেও, ক্যাথ্‌নির ভাষায় ওকে কি বলে তা জানা ছিল না, তাই কিছু বলতেই পারল না। স্নানের ঘরের কল ইত্যাদি খাঁটি সোনার তৈরি। নাকি পাহাড় থেকে নলে করে জল আনতে হয়।

এই সময় একজন অল্প বয়সী ব্যক্তি বসবার ঘরে ঢুকতেই গেমনন বলল, 'এ হল ক্লার্স্টল্, আমরা একসঙ্গে থাকি।'

লোকটার কেমন যেন ইঁদুরের মতো মুখ। সে বলল, 'আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে হুকুম হয়েছে।'

গেমনন বলল, 'কেন?'

—'তোমার নতুন বন্ধুর জন্য জায়গা করে দিতে।'

বিড়বিড় করে বকতে বকতে লোকটা চলে গেল।

টারজান বলল, 'মনে হচ্ছে খুব খুশি হয়নি।'

—'ও না হলেও, আমি হয়েছি। ওর সঙ্গে আমার ঠিক বনে না। ও এরটের বন্ধু এবং তার পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নতি হয়েছে। এর বাবা বড় ভালো লোক। বরং তার পদোন্নতি হলে ভালো হত। এ এরটেরি মতো। ইঁদুরে ভাব ওদের।'

—'এরটের উন্নতি হল কিসের জোরে?'

—'খোশামোদে কি না হয়!'

—'জানোয়াররা কখনো খোশামোদ করে না।'

—'এরট তো জানোয়ারেরি মতো।'

—'জানোয়ারদের মিছিমিছি নিন্দা কর না। ওদের কখনো ছোট মন হয় না।'

—'তোমার দেখছি মানুষদের বিষয়ে খুব উচ্চ ধারণা নেই।'

—'জানোয়ারদের তুলনায় মানুষরা অনেক হীন।'

সে যাই হক, কিছুক্ষণ বাদে গেমননের অন্য সঙ্গীটি তার জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে বলে গেল, ওগুলো নিতে লোক পাঠাবে।

গেমননের কাছে টারজান অনেক কথা শিখল। বংশানুক্রমে যারা অভিজাত তাদের বলা হয় সিংহপুরুষ।

তাদের বাড়িতে পোষা সিংহ রাখতে হয়। গেমননের পাঁচটা সিংহ। যুদ্ধের সময় রানীর বাহিনীতে সিংহ দিতে হয়। শান্তির সময়ে শিকারে ব্যবহার হয়, রেস্ হয়। রাজপরিবার আর সিংহপুরুষ ছাড়া কেউ সিংহ রাখতে পারে না।'

সন্ধ্যা হলে একজন দাস ছাদ থেকে ঝোলানো দীপাধারে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে গেল। গেমনন বলল, 'চল, খাবার সময় হল।'

টারজান বলল, 'আমি তো খেয়েছি।'

—'আহা চলই না! রাজবাড়ির অন্যদের সঙ্গে তো দেখা হবে।'

—'বেশ, চল।'

বেশ বড় খাবার-ঘর, সেখানে চল্লিশজনের খাবার জায়গা হয়েছে। টোমস, এরট, ক্লাস্টর্ল্ ছিল। আরো অনেককেই টারজান আগেও দেখেছে। ওরা ঢুকতেই, সবাই কেমন চুপ করে গেল। হয়তো ওদের কথাই হচ্ছিল। গেমনন টারজানের পরিচয় করিয়ে দিল।

এরট বলল, 'এই টেবিলটা উচ্চবংশীয়দের জন্য, দাসদের জন্য নয়।'

গেমনন বলল, 'রানীর দয়ায় টারজান এখানে আমার অতিথি হয়ে এসেছে।' টারজানকে বলল, 'কিছু মনে করনি আশা করি?'

টারজান বলল, 'সিংহ কখনো শেয়ালের কথায় কান দেয় না।'

খুব একটা বন্ধুত্বের আবহাওয়ায় ভোজনটা সমাধা হল না। এরা যদি জানত নিজের দেশে টারজানের কত উঁচু পদ, তাহলে হয়তো অন্যরকম ব্যবহার করত। তবে তা না-ও করতে পারত, কারণ এরা কেউ ইংল্যাণ্ডের নামও শোনেনি।

খাবার পর গেমনন টারজানকে রানীর মহলে নিয়ে গেল। তার আগে নিজের ঘরে গিয়ে আরেকটু সেজেগুজে নিল। গেমনন বলল, 'রানীর সামনে হাঁটু গেড়ে বস। তিনি আগে কথা না বললে কথা ব'ল না।'

রানীর ঘরের বাইরে একটু অপেক্ষা করতে হল। গেমনন বলল, 'তুমি দেখছি এতটুকু ঘাবড়াচ্ছ না। বড় বড় বীররাও ভয়ে কাঁপে।'

টারজান বলল, 'কি করে কাঁপতে হয়, তাই জানি না যে।'

—'নিমোনি হয়তো শিখিয়ে দেবেন।'

—'কিন্তু যেখানে শেয়াল ভয় পায় না, সেখানে আমি কেন ভয় পাব?'

—'তার মানে?'

—'এরট তো ও ঘরে গেছে। একজন পারিষদ এসে টারজানকে বলল, 'রানী তলব দিয়েছেন। গেমনন, তোমার থাকবার দরকার নেই।' তারপর টারজানকে বলল, 'হাঁটু গেড়ে থেকো, রানী যতক্ষণ না উঠতে বলেন। শুনলে?'

—'শুনেছি। দরজাটা খুলে দাও।'

শুনে গেমননের হাসি পেলেও, সে লোকটির পেল না। সে-ও এক হাত নিয়ে নিল। জোরে জোরে ঘোষণা করল, 'বন্দী দাস টারজান!'

টারজান ঘরে ঢুকে হাঁটু গাড়ল না। রানীর মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। এরট ভ্রূকুটি করে বলল, 'হাঁটু গাড়ো।'

নিমোনি উল্টে তাকে ধমক দিলেন, 'চুপ। হুকুম দেবার মালিক আমি। তুমি যেতে পার, এরট।'

এরটের মুখ প্রথমে সাদা, তারপর লাল হয়ে উঠল। কি যেন বলতে গিয়েও বলল না, নতি জানিয়ে চলে গেল।

খুব জমকালো করে সাজানো ঘরটা। মেঝের মোজেই-কের ওপর জানোয়ারের ছালের গালচে পাতা। তার মধ্যে একটা মুণ্ডুসুদ্ধ মানুষের ছালও ছিল। চমৎকার করে ট্যান্ করা। দেয়ালে রংচঙে জমকালো সাজ। ঘরের অন্য দিকে, দুটো সোনার থামের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা জ্যান্ত সিংহ চেন করা ছিল। তার মাথার ঠিক মধ্যিখানের এক গোছা কেশরের রং সাদা।

টারজানকে দেখেই সিংহটা লাফিয়ে উঠে গর্জন করল। টারজান বলল, 'ক্যাথনির লোকদের মনের কথা বলছে।'

নিমোনি বললেন, 'না, তা নয়।'

—'নয়?'

—'কেন, আমার তোমাকে ভালো লাগে। সকলের সামনে আমার কথা অমান্য করেছিলে, তবু প্রাণদণ্ড দিইনি। তুমি ছাড়া সকলে আমার সামনে হাঁটু গাড়ে, না গাড়লে মরবে। তোমাকে কিছু বলি না। তোমার মতো কাউকে দেখিনি কখনো। নিজের মন নিজেই বুঝতে পারি না। তুমি আমার কৌতূহল জাগিয়েছ।'

—'কৌতূহল মিটলে মেরে ফেলবে নাকি?'

—'তা মারতেও পারি। এখন এসো, আমার পাশে বস নিজের দেশে তুমি বন্দী-দাস নও বুঝতে পারি। রাজাও

হতে পার। তাই কি?'

টারজান মাথা নেড়ে বলল, 'আমি টারজান।'

—'কিন্তু তুমি সিংহপুরুষ হতে বাধ্য। তাই নয় কি?'

—'তাতে কি এসে যায়? তুমি এরটকে রাজা করে দিলেও সে তো এরটই থাকবে।'

রানী ভুরু কোঁচকালেন, 'তার মানে?'

—'তার মানে সম্মানের উপাধি পেলেই কেউ সম্মানের যোগ্য হয়ে যায় না। শেয়ালকে সিংহ বলে ডাকলেও সে শেয়ালই থাকে।'

—'জান, সকলে বলে আমি এরটকে খুব ভালোবাসি। দেখো, আমার ধৈর্যের সীমানা পেরিও না।'

—'বলিহারি তোমার পছন্দ।'

নিমোনি বললেন, 'মিছিমিছি ঝগড়া করে কি হবে? দেশে তুমি সিংহপুরুষ নও কি?'

টারজান বলল, 'আমি অভিজাত বংশের। তবে আমাদের দেশে যথেষ্ট ভোট পেলে, যারা নালা খোঁড়ে তারাও সম্মান পেতে পারে। মদের ব্যবসায়ী যদি ক্ষমতাশালী দলকে প্রচুর টাকা দেয়, সে-ও পারে। আমি অবিশ্যি ও-সব নই।'

—'তুমি কি করে সম্মানের আসন পেলে?'

—'আরো সহজ উপায়ে। আমার বাবার ছেলে হয়ে জন্মে। পুরনো অভিজাত বংশ আমাদের।'

রানী মহাখুশি, 'ঠিক জানতাম তুমি সিংহপুরুষ!'

—'তাতে কি হয়?'

—'ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়।' তারপর রানী বললেন, 'এক শর্তে তোমাকে মুক্তি দিতে পারি।'

—'কি শর্ত?'

—'তোমাকে কথা দিতে হবে যে এই ওস্থারে এবং আমার কাছে থাকবে। আমি তোমাকে ক্যাথ্‌নির সিংহপুরুষ করে দেব। ধন-দৌলতের অভাব থাকবে না তোমার।'

টারজান বলল, 'ওসব জিনিস তো আমি চাই না।'

ঠিক সেই সময়ে এক থুত্থুরে নিগ্রো বুড়ি ঘরে ঢুকে, লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মুণ্ডু নাড়তে লাগল। বুড়ি নিমোনিকে বলল, 'চলে এসো, চলে এসো!'

নিমোনির কি রাগ! 'মাদুজ! তোমার মরণ হক! ভাগো এখান থেকে।'

তবু বুড়ি কেবলি বলে, 'চলে এসো, চলে এসো!'

যন্ত্রচালিতের মতো নিমোনি বুড়ির সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন

তারপর যে গণ্যমান্য ব্যক্তিটি টারজানকে নিয়ে এসেছিল, সে-ই ওকে আবার ডেকে নিয়ে গেল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে টারজান তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বেলথার নামধারী মস্ত সিংহটা আবার এগিয়ে এসে গর্জন করে উঠল।

পরদিন সকালে গেমনন বলল, 'আছ তাহলে? কেমন অভ্যর্থনা পেলে? এরট বোধহয় তোমাকে দেখে আহ্লাদে আটখানা হল?'

টারজান বলল, 'আমি যেতেই ওকে ভাগিয়ে দিলেন।'

—'তুমি একা ছিলে রানীর কাছে?'

—'আমি আর বেলথার। সে-ও এরটের মতো আমাকে ভালোবাসে না।'

—'আরে বেলথার জ্যান্ত মানুষ ভালোবাসে না, নিমোনিকে ছাড়া। তবে মরা মানুষ খুব ভালোবাসে। যাকগে, নিমোনি কেমন ব্যবহার করলেন?'

—'খুব ভালো। যদিও গিয়েই চটালাম।'

—'বল কি?'

—'হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে থাকলাম, হাঁটু গাড়লাম না।'

—'তবু তোমাকে নেই করে দিলেন না? আশ্চর্য!'

—'বলল, আমাকে সিংহপুরুষ বানিয়ে দেবে। একশো সিংহ দেবে।'

—'কি জাদু করলে, বাপু?'

—'আমি না। ও-ই জাদু জানে। যেমনি ভয়ংকরী, তেমনি মিষ্টি। এই মুহূর্তে স্বেচ্ছাচারী রানী, পরের মুহূর্তে একটা দাসীর দাসী!'

—'বুঝেছি, মাদ্দুজকেও দেখেছ। সে-ও নিশ্চয় খুশি হয় নি?'

—'কি ব্যাপার বলতো?'

গেমনন বলল, 'নিমোনির ঠাকুরদার আমলে মাদ্দুজ ছিল রাজবাড়ির দাসী। কালো হলেও, দেখতে ভালো। আড়ালে লোকে বলে রাজকুমার গোপনে ওকে বিয়ে করেছিল আর নিমোনি তারি মেয়ে। নিমোনির বাবার রাজত্বকালের দশ বছর কাটলে, আসল রানীর এক ছেলে হল। সঙ্গে সঙ্গে রহস্যজনক ভাবে রানী মারাও যান। কিন্তু সেই ছেলে অ্যালক্‌স্টার এখনো বেঁচে আছে।'

টারজান অবাক হয়ে বলল, 'সে কেন রাজা হল না?'

—'ওর জন্মের এক বছরের মধ্যেই রাজাও রহস্যজনক ভাবে মারা গেলেন। অনেকে বলেছিল তাঁকে বিষ খাওয়ানো

হয়েছিল। সিংহপুরুষরা ক্ষেপে উঠেছিল। অনেক কষ্টে মাদ্দুজ আর টোমস তাদের ঠাণ্ডা করে। টোমস হল মাদ্দুজের প্রিয়পাত্র। তার সহযোগিতায় রাজাকে বিষ খাওয়ানোর জন্য এক বেচারি দাসীর প্রাণদণ্ড হল। সবাই অনেকটা ঠাণ্ডা হল। তারপর দশ বছর ধরে নাবালক অ্যালেকস্টারের অভিভাবক হয়ে টোমস রাজত্ব করেছিল। সেই সময়ে সে নিজের লোক দিয়ে প্রাসাদের উচ্চপদের বেশির ভাগ ভরে ফেলেছিল। তারপর থেকে হতভাগ্য রাজকুমারকে পাগল নাম দিয়ে মন্দিরের বন্দীশালায় বন্ধ করে রাখা হয়েছে বারো বছর বয়সের নিমোনিকে রানীর পদে বসানো হল। এরট টোমস আর মাদ্দুজের দলের লোক। টোমস রানীকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মাদ্দুজের মত নেই। তার ইচ্ছা এরটের সঙ্গেই বিয়ে হবে, যদিও সে বংশগত সিংহপুরুষ নয়। কিন্তু সে মাদ্দুজের হাতের পুতুল। সাবধানে থেকো; বুড়ির মনের সাধে যে ব্যাঘাত ঘটায়, বুড়ি তাকে না মেরে ছাড়ে না। টোমস, এরট আর স্বয়ং নিমোনি সম্বন্ধেও সাবধানে থেকো। থাক গে ওসব কথা। এখন চল, তোমাকে ক্যাথনি শহর দেখাই।'

চওড়া, শান বাঁধানো রাস্তা। চমৎকার সাদা সোনালি গম্বুজ দেওয়া বাড়ি, সুন্দর বাগান। পথচারীরাও সৌজন্য দেখাতে লাগল। তারপর একটা সুরক্ষিত ফটক, তার অন্য দিকে উঁচু দরের ব্যবসাদার, কারিগর ইত্যাদি থাকে। এদের বাড়ি বাগান কিঞ্চিৎ ছোট হলেও, বোঝা যাচ্ছিল এদেরো পয়সা আছে। এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছিল পোষা সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিম্বা শুয়ে বসে আছে। আরেকটা ফটকের পিছনে সাধারণ লোকদের বাস হলেও, কোথাও দারিদ্র্যের চিহ্ন ছিল না।

হঠাৎ দেখে পথের ধারে একটা সিংহ বসে মরা মানুষ খাচ্ছে। টারজান বলল, 'রাস্তাগুলো দেখছি খুব নিরাপদ নয়।'

গেমনন হাসল, 'আহা, সিংহদেরো তো খেয়ে বাঁচতে হবে। ও লোকটা এমনি মরে গেছিল। মৃতদেহটা রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। সিংহ ওকে মারে নি। রোগে না মরলে গরীবরা এইভাবে মৃতদেহের সৎকার করে। রোগে মরলে আর বড়লোকদের বাড়ির মৃতদেহ স্কারাটারে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু শোভাযাত্রা করে সেখানে যাবার খরচ আছে। সিংহে খেলে, সেটাকে আমরা কিছু লজ্জার বিষয় মনে করি না। ওরা শুধু মানুষ খায় না, আমরা যা কিছু শিকার করে আনি, সবটার ভাগ পায়।'

গেমনন আরো বলল রানীর তিনশো যুদ্ধের সিংহ আছে। কিছু সিংহকে রেস্ দিতে, কিম্বা শিকার করতে শেখানো হয়েছে। খুব কম সিংহ তাদের আস্তাবলের বাইরে ঘুরে বেড়ায়।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা বড় পার্কের কাছে এল। তার চারদিকে দোকানপাট, সব শ্রেণীর লোকের ভিড়। চেনে বাঁধা সিংহ নিয়ে পর্যন্ত দর কষাকষি চলেছে। তার কাছেই দাস-দাসীর বাজারে খুব কেনাকাটা চলেছে। একজন বিশাল দেহ গালা-দাসকে বিক্রির জন্য আনা হয়েছে। টারজান আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কেমন নির্বিকার ভাবে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, যেন হাটে বিকোনো ওর জীবনে রোজকার ব্যাপার।'

—'রোজ না হলেও, থেকে থেকে হয়। ও আগে আমার দাস ছিল। ভারি অবাধ্য। কেউ সামলাতে পারে না। তাই সবাই বেচে দেয়।'

টারজান বলল, 'কি চমৎকার দেখতে! কি স্বাস্থ্য!'

শেষ পর্যন্ত ক্লাস্টলের অনুচর তাকে কিনে নিয়ে গেল।

সব রকমের দোকান ছিল, বিচিত্র তাদের পসরা। কাপড়-চোপড়, বাসনপত্র, গয়নাগাঁটি, খাবার দাবার। খাবারের দোকানের সামনে শিক লাগানো, পাছে সিংহ ঢুকে পড়ে। যেখানেই যায় ওরা, নাগরিকরা ভিড় করে টারজানকে দেখতে আসে। শেষটা হাঁপিয়ে উঠে সে বলে, 'অন্য কোথাও চল।'

গেল ওরা সিংহের আস্তাবল দেখতে। রাজবাড়ির সিংহদের প্রাসাদের হাতার মধ্যেই, কিন্তু প্রাসাদ থেকে যতটা দূরে সম্ভব রাখা হয়। সাদা রং করা পরিষ্কার পাথরের ঘরে প্রত্যেক সিংহের আলাদা খাঁচা। বাইরে উঁচু পাঁচিল ঘেরা উঠোন। পাঁচিলের ওপরের দিকে ধারালো বল্লমের মতো খুঁটি, একটু নিচু দিকে মুখ করে লাগানো। যাতে সিংহরা লাফিয়ে পালাতে না পারে, কিন্তু নিচে তারা হাঁটাচলা করতে পারে। একটা বড় ক্রীড়াঙ্গনও ছিল, সেখানে সিংহদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কুকুরের মতো ওরা হুকুম মানতে শেখে।

ঢুকেই নাকে এল চেনা গন্ধ। টারজান বলল, 'বেলথার এখানে আছে।'

গেমনন বলল, 'কি করে যে টের পাও বুঝতে পারি না।'

টারজানকে দেখেই খাঁচার মধ্যে বেলথার মহা লাফ-ঝাঁপ

গর্জন শুরু করে দিল। রক্ষীরা ছুটে এল। তাদের প্রধান ব্যাপার দেখে টারজানকে বলল, 'তোমাকে পেলে ছিঁড়ে খাবে!'

গেমনন বলল, 'অতি বদ্ মেজাজি। মানুষ মারতে ওস্তাদ। নিমোনি তবু ওকে প্রাসাদে রাখেন। কারো ওপর চটলে, তার ঘরের কাছে ছেড়ে দেন। আগে ওর মতো শিক্‌রে সিংহ আর ছিল না। কিন্তু গতবার শিকারে গিয়ে চারটে লোককে মারল, তারপর পালাবার চেষ্টা করল। লোকে বলে নিমোনির ধারণা বেলথার মরলে, উনিও মরবেন আর উনি মরলে বেলথার মরবে।'

এই সময় একজন দাস এসে বলল, 'রানী টারজানকে ডেকেছেন। হাতির দাঁতের ঘরে তিনি আছেন। শ্রদ্ধেয় গেমনন পাশের ঘরে অপেক্ষা করবেন।'

হাতির দাঁতের ঘরে নিমোনির কাছে এরট বসেছিল। তার হাঁড়িমুখ। নিমোনি বললেন, 'অ্যাথনির একজন অভিজাত পুরুষ ধরা পড়েছে। আজ সকালে তাকে নিয়ে কিছু খেল হবে। যাও এরট, দেখে এসো সব প্রস্তুত কি না। কিছু তাড়াতাড়ি নেই। ধীরেসুস্থে ব্যবস্থা করুক।'

—'যো হুকুম।' বলে এরট হাঁড়িমুখে চলে গেল।

তারপর নিমোনি বললেন, 'এরট রাগ করছিল তুমি হাঁটু গাড় না বলে। আমি কেন কিছু বলি না, বল তো?'

টারজান বলল, 'একটা কারণ হয়তো বিদেশীদের আদব-কায়দা অন্য রকমের, তাই অতিথির প্রতি সৌজন্য দেখানো। অন্যটা হল আমাকে দিয়ে হাঁটু গাড়াতে পারবে না, তাই। লোকে হাঁটু না গাড়লে তুমি রাগ কর, কারণ তুমি চাও যে সবাই মনে রাখুক তুমি ক্যাথনির ক্ষমতাশালিনী রানী। রানীদের নিজেদের ওপর এতখানি আস্থা থাকা উচিত যে অন্যদের সঙ্গে সর্বদা সদয় আর ক্ষমাশীল ব্যবহার করবে।'

—'তা করলে এরা আমাকে দুর্বল ভাববে। দয়ার কথাটা বুঝবে না। তুমি এখানে থাকলে কত যে ভালো হত। তুমিও সুখী হতে।'

টারজান মাথা নাড়ল, 'বনে ছাড়া আমি কোথাও সুখী হতে পারি না।'

এরট খবর দিয়ে গেল সব প্রস্তুত। বাইরের ঘরে গেমনন অপেক্ষা করছিল। রানী তাকেও ডেকে নিলেন। ওরা অনেকগুলো ঘরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। সেখানে একটা খোলা বারান্দা ছিল। তার নিচে চারদিক ঘেরা উঠোন। তার চারদিকের পাঁচিলের ওপর ধারালো খুঁটি বসানো। নিচে একটা দরজা খুলে গেল। একটা অল্পবয়সী সিংহ চোখ মিটমিট করতে করতে বেরিয়ে এসে ওদের দিকে চেয়ে চাপা গর্জন দিল। নিমোনি বলল, 'বাচ্চা বয়স থেকে ও বেজায় হিংস্র। একটু পরেই আমাদের অ্যাথনির বন্দীর সঙ্গে খেলা দেখাবে।'

টারজান বলল, 'বন্দী ওকে মেরে ফেললে, তাকে মুক্তি দেবে তো?'

—'তা দেব। কিন্তু মেরে ফেলতে পারবে না।'

—পারতে পারে। কত লোকে সিংহ মারে।'

—'খালি হাতে মারে না।'

শুনে টারজান অবাক হল, 'তাহলে তো খুনের সঙ্গে এর কোনো তফাৎ রইল না।'

এরট বল, 'তুমি ওর হয়ে লড়ে যাও না কেন? এখানকার নিয়ম বন্দীর কোনো চ্যাম্পিয়ন থাকলে, সে তার হয়ে লড়তে পারে।'

নিমোনি বললেন, 'আমার রাজত্বকালে এ নিয়ম কখনো পালন করা হয়নি। ভারি হিংস্র সিংহটা। এরি মধ্যে দুজন ট্রেনারকে শেষ করেছে।'

এই সময় বন্দীকে সেখানে নিয়ে আসা হল। টারজান একবার তাকিয়ে দেখল। বলিষ্ঠ যুবক সে, হাতির দাঁতের পোষাক পরে বীরের মতো সিংহের জন্য অপেক্ষা করছে। এক টানে এরটের কোমর থেকে তার ছোরা তুলে নিয়ে, লাফ দিয়ে টারজান সিংহের পিঠের ওপর নেমে পড়ল। গেমনন স্তম্ভিত হল, এরট আহ্লাদে আটখানা আর রানী ভয়ে ভাবনায় ঝুঁকে দেখতে লাগলেন।

টারজান পিঠে পড়াতে সিংহটাও বসে পড়েছিল।

কিছুতেই সে পিঠ থেকে আপদটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না। সিংহের গর্জনে চারদিকে প্রতিধ্বনি উঠছিল। তার পিঠের মানুষটাও গর্জাচ্ছিল। একটা হাত সিংহের গলার চারদিকে; দুটো পা তার পেটের চারদিক বেড়ে রয়েছে; এরটের ধারালো ছোরা যে-কোনো মুহূর্তে তার বুকে বিঁধে যাবে। অ্যাথনির লোকটারো বেজায় সাহস; সে-ও ওদের কাছে ছুটে এল। নিমোনি বললেন, 'সিংহ যদি টারজানকে মারে, আমি সিংহকে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলব। যাও এরট, ওকে সাহায্য কর। গেমনন, যাও।'

গেমনন সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিল।

—'এরট, যাও।'

এরট পিছু হটে গেল, 'ও নিজেকে বাঁচাক!'

রানী রক্ষীদের বললেন, 'ওকে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দাও তো।' তার আগেই এরট-ও নেমে পড়ল।

কোনো সাহায্যের দরকার ছিল না। এরা এসে পৌঁছবার আগেই সিংহের হৃদ্‌পিণ্ডে ছোরা বিঁধে গেছিল। সিংহ এগিয়ে পড়ল আর টারজান ওকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সমস্ত পরিবেশের কথা ভুলে গিয়ে, মরা সিংহের পিঠে পা রেখে, আকাশে মাথা তুলে বনমানুষদের বিকট জয়ধ্বনি দিল।

গেমনন আর এরট শিউরে উঠল, নিমোনি ভয়ে হটে গেলেন, কিন্তু অ্যাথনির বন্দী এতটুকু ভড়কে গেল না। এ ডাক তার চেনা। সে হল ভ্যালথর! টারজান তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আবার দেখা হল, বন্ধু!'

ভ্যালথর বলল, 'আবার আমার প্রাণ বাঁচালে!'

গেমনন কথাগুলো শুনে থাকতে পারে, তাতে এসে যায় না। অন্যরা শুনলে ভাবত তাহলে টারজান সত্যিই অ্যাথনির চর।

এরট অনেক আগেই উঠোনের উল্টো দিকে থামের পিছনে লুকিয়েছিল। টারজান ভ্যালথরের কানে কানে বল, 'আমাদের চেনাজানা আছে তা যেন কেউ টের না পায়। এরা আমাকে মারবার ছল খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

নিমোনি বললেন, 'টারজান আর গেমননকে আমার কাছে নিয়ে এসো। এরট বাড়ি যাক। বন্দীকে তার কুঠরিতে নিয়ে যাও। পরে বলব তাকে কি ভাবে মারা হবে।'

এরট তো ভয়ে আধমরা। এবার মাদ্দুজ আর টোমসের কাছে ছুটতে হবে। তারাও টারজানকে দেখতে পারে না।

নিমোনির কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে টারজান বলল, 'তুমি কথা দিয়েছিলে, সিংহ মরলে বন্দীকে মুক্তি দেবে। এখন ওকে আবার বন্ধ করলে, আমিও ওর সঙ্গী হব। আমি ওকে বলেছি তুমি কথা দিয়েছ।'

নিমোনি বললেন, 'ওকে নিয়ে তোমার যা খুশি কর। তোমাকে দিয়ে দিলাম। ভাবলাম সিংহ তোমাকে মেরে ফেলবে! বড্ড ভয় পেয়েছিলাম!'

এরট আর গেমনন তো এ-কথা শুনে অবাক। ভ্যালথরকে টারজান রানীর কাছে নিয়ে গেল। রানী বললেন, 'তোমার নাম কি?'

—'জ্যান্থাসের বাড়ির ভ্যালথর!'

রানী বললেন, 'তোমার অ্যাথনি ফেরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তুমি কাল ভোরেই বাড়ি ফিরে যাবে। গেমনন, ওকে তোমার কাছে নিরাপদে রাখবে। ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়। টারজান, আমার সঙ্গে এসো। কথা আছে।' যেতে যেতে রানী বললেন, 'বেজায় ভয় পেয়েছিলাম। ভাবলাম সিংহটা তোমাকে মেরে ফেলবে। কেন অমন করলে?'

টারজান বলল, 'একটা হিংস্র সিংহের সামনে নিরস্ত্র বন্দীকে ছেড়ে দেবার মতো কাপুরুষতা দেখে সইতে পারলাম না।'

নিমোনি বললেন, 'তার জন্য আমি দায়ী, তা জান?'

—'জানি। তাতে আরো খারাপ লাগল।'

নিমোনি চটে গেল, 'তুমি কি আমার ধৈর্য পরীক্ষা করছ? তোমার কাছে তো আমি আগেই বিনয় জানিয়েছি।'

টারজান বলল, 'নিমোনি, তোমার অনেক গুণ। তার সঙ্গে যদি একটু কোমলা দয়াময়ী হতে পারতে, তাহলে তুমি অদ্বিতীয়া হয়ে উঠতে।'

নিমোনি গলে গেল। নরম গলায় বলল, 'তুমি বড় সাহসী। খুব সাহসী না হলে, কেউ অচেনা বন্দীকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে না।'

নিমোনির ঘরের দরজা খুলতেই দেখা গেল, ঘরের মধ্যিখানে মাদুজ দাঁড়িয়ে আছে। তাই দেখে নিমোনি আর ওকে ঘরে ডাকল না, আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

অবিশ্রাম ভাবে প্রকাণ্ড এক সিংহ কাফার সীমানা ধরে কেবলি উত্তর দিকে চলেছিল। শুঁকে শুঁকে

পথ ঠিক করে। বর্ষা শেষের প্রচণ্ড বৃষ্টিও তাকে থামাতে পারে নি। ওর গতিতে এতটুকু অনিশ্চয়তা ছিল না।

এরট তার বাসস্থানে রাগত আর বিমর্ষভাবে পাইচারি করছিল। ক্লাস্টর্ল বলছিল, 'নিশ্চয় তুমি একটা কিছু করতে পার।' তার উদ্বেগের কারণ হল, এরট পড়লে তার-ও পতন হবে।

এরট বলল, 'মাদ্দুজ আর টোমস যতটা পারে করবে। রানীর কিন্তু বিদেশী লোকটাকে বড় বেশি পছন্দ। মাদ্দুজ ঘাবড়ে গেছে। নিমোনির ওপর ওর যতই প্রভাব থাকুক, নিমোনি ওকে দেখতে পারে না। তেমন তেমন রেগে গেলে শেষটা বুড়িকেই কোতল করবে।'

ক্লাস্টর্ল্ বলল, 'আছে একটা উপায়। শোন ভালো করে।' এই বলে বন্ধুকে সে জঘন্য এক ফন্দীর কথা বাৎলাতে লাগল। তারি মধ্যে একজন দাসী ঘরে এসে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, সেটা কেউ লক্ষ্য করল না।

গেমনন আর টারজান সে রাতে নিজেদের ঘরেই খাওয়াদাওয়া করল। অন্যদের সঙ্গে বসবার মন-মেজাজ তাদের ছিল না। কথায় কথায় গেমনন বলল, 'এরটের বদলে তুমি যদি রানীর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠ, এরা সকলে, তোমার পা চাটবে। রাজার হালে তুমি থাকতে পারবে।'

টারজান বলল, 'আমি তা চাই না।'

গেমনন বলল, 'হয়তো ভুল করছ। সে যাই হক, আজ তোমাকে ক্যাথ্নির সেরা সুন্দরীর কাছে নিয়ে যাব।'

টারজান বলল, 'বল কি! আমি তো শুনেছি রানীর চেয়ে কেউ দেখতে ভালো হলে রানী তার প্রাণদণ্ড দেন।'

—'তা দিতে পারেন। কিন্তু একে কখনো দেখেন নি। আমি ঐ মেয়েকে ভালোবাসি।'

টারজান বলল, 'কি আশ্চর্য, নিমোনি ওর খবর পায়নি!'

—'মেয়েটির নাম ডোরিয়া। ওর বাবা থুডস্ উচ্চশ্রেণীর সিংহপুরুষ। বিশ্বস্ত বন্ধুরা সব সময় ডোরিয়াকে ঘিরে থাকে। ওর বাবা একটা গোপন দলের নেতা। তারা নিমোনির জায়গায় অ্যালেক্স্টারকে রাজা করতে চায়। থুডস্ বড় একটা রাজবাড়িতে যাওয়া আসা করেন না। তাই নিমোনি ডোরিয়ার খবর পায়নি।'

পরে গেমনন আর টারজান বেরোলে পথে ক্লাস্টর্লের সঙ্গে দেখা। লোকটা অমনি পাঁচ রকম মিষ্টি কথা বলে ভাব জমাবার চেষ্টা করল। শেষটা বলল, 'আমি একটা বড় শিকারের আয়োজন করেছি, তোমাকে কিন্তু আমার প্রধান অতিথি হতে হবে। খালি বাছাই করা কয়েকজন খাব। খুব ভালো শিকার হবে। পরে দিনক্ষণ জানাব।'

পরে টারজান গেমননকে বলল, 'ঐ লোকটাকে কিম্বা ওর মস্ত শিকার আমার কিন্তু একটুও পছন্দ নয়।'

গেমনন বলল, 'গিয়ে দেখলেও পার। ওর ওপর চোখ রাখার সুযোগ পাবে।'

—'এখানে যদি ততদিন থাকি, তাহলে যাব না হয়।'

—'যদি থাকি মানে? ক্যাথ্নি থেকে কোথাও চলে যাবার কথা ভাবছ নাকি?'

—'নিশ্চয় ভাবছি। এখানে থাকার তো কোনো কারণ নেই। কাউকে কথাও দিইনি যে থাকব।'

—'কিন্তু আমি যে দিয়েছি। তুমি গেলে আমি সমস্যায় পড়ব।'

—'তাই নিয়ে চিন্তা কর না। আমি নিমোনিকে বলব এরট কিম্বা ক্লাস্ট্র্লকে আমার ভার দিতে।'

গেমনন্ হেসে ফেলল, 'তাহলে তো খাসা এক রূপকথা হবে।'

থুডসের বাড়ি যাবার পথে গলির মোড়ে, ওক গাছের নিচে টারজান একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। টারজান অমনি তৈরি। বনের শিক্ষাই ঐ রকম। সদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। যেই ছায়ামূর্তির সামনে এসেছে, ভাঙা গলায় সে বলল, 'এরট সম্বন্ধে সাবধান। আজই রাতে।' বলেই সে গলি দিয়ে ছুটে পালাল। গলাটা কেমন চেনা মনে হল!

গেমনন বলল, 'চল, ব্যাটাকে ধরে সব কথা বের করি।'

টারজান বলল, 'না, ও আমার কোনো শুভকামী। ও যদি গোপন থাকতে চায়, আমি কেন ওকে প্রকাশ করব! ওর গন্ধ আমি চিরকালের মতো চিনে রাখলাম।'

—'তোমাকে ভয় করে কেন?'

—'আমাকে ভয় করে না, তোমাকে করে। তুমি যে সিংহপুরুষ। যদি এরটের বন্ধু হও। মনে হল ফোবেগ।'

—'সে কি! যে ওকে লাঞ্ছিত পরাজিত করেছিল, এমন কি প্রায় মেরেই ফেলেছিল, তার শুভকামনা করবে কেন?'

—'মেরে ফেলিনি বলে। বোকা হতে পারে, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়।'

থুডসের বাড়ি পৌঁছলে, ফটকের রক্ষী গেমননকে চিনত বলে দরজা খুলে দিল. একজন দাস চমৎকার একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ওদের বসাল। নিমোনির বাড়ির মতোই মূল্যবান সাজসজ্জা এ ঘরটার। সোনার হেলমেট পরা একটা শুকনো

মানুষের মাথা দরজার ওপর শোভা পাচ্ছিল। তাই দেখে টারজান অবাক হয়ে গেল। মরা মুখে কি তেজ, কি শক্তি! গেমনন বলল, 'যুদ্ধে থুডসের হাতে নিহত অ্যাথনির রাজার মাথা।'

একজন পরমাসুন্দরী মেয়ে এই সময় ঘরে ঢুকল। একে লুকিয়ে রেখে থুডস্ বুদ্ধির কাজই করেছে।

পুরনো বন্ধুর মতো সমাদরে সে গেমননকে অভ্যর্থনা করল। টারজানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে তাকেও সৌজন্যের সঙ্গে বসতে বলল। বলল, 'তোমাকে ক্রীড়াঙ্গনে দেখেছিলাম। তোমার জন্য অনেক টাকা হেরেওছিলাম।'

টারজান বলল, 'তাই নাকি? জানলে না হয় ফোবেগের হাতে নিহত হতাম।'

সারা সন্ধ্যা খোশগল্প করে আনন্দে কাটল। বিদায় নেবার আগে একজন আধাবয়সী লোক ঘরে এলেন। এই হল থুডস্। থুডস্ গেমননকে টারজানকে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করলেন। দেখা হতেই টারজানকে ওস্থার থেনারের বাইরের জগৎ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন।

চমৎকার চেহারা থুডসের; বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর মুখ। বিদায় নেবার সময় থুডস্ বললেন 'গেমনন তোমাকে এনে ভালো করেছে। রাজবাড়ির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক জানাই মনে হয়। খুব চেনাজানা না হলে কাউকে আমরা ডাকি না।'

বিদায় নিয়ে আবার বড় রাস্তায় বেরিয়ে আসার সময় গাছের আড়ালে একটা লোক এসে দাঁড়াল, সেটা ওদের চোখে পড়েনি। টারজান জিজ্ঞাসা করল ডোরিয়া কি করে ক্রীড়াঙ্গনে গেছিল। গেমনন বলল, বাইরে গেলে ও সর্বদা রূপ গোপন করে বেরোয়। তারপর গেমনন বলল, 'ওর পক্ষে এমন জীবন খুবই বিরক্তিকর। কিন্তু নিমোনি না মারা গেলে, কিম্বা অ্যালেকস্টার রাজা না হলে, এইভাবেই চলবে।'

টারজান ঘরে ফিরে দেখল ভ্যালথর তখনো ওর খাটে শুয়ে আছে। ওর এখন বিশ্রাম দরকার। তাছাড়া শরীরে কিছু ক্ষত ছিল, সেগুলো টাটিয়েছিল। পাছে ওর ঘুমের ব্যাঘাত হয় তাই টারজান আলোও জ্বালল না আর ওকে ডাকলোও না। উল্টো দিকের দেয়ালের কাছে জানোয়ারের লোমের কম্বল পেতে, নিজে শুয়ে পড়ল।

টারজানের জানালার ওপরতলার জানালায়, দুটো লোক গুঁড়ি মেরে বসেছিল। একজনের লম্বা চওড়া শরীর, অন্যটি রোগা, ছোটখাটো। তার বগলের তলা দিয়ে গায়ে একটা দড়ির ফাঁস পরানো। ডান হাতে একটা ছোরা! তারপর ষণ্ডা লোকটা দড়ির অন্য মাথাটা শক্ত করে ধরে, এ লোকটাকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিতে লাগল। সে নিচের তলার কার্নিশে পৌঁছলে ষণ্ডা দড়িটাতে ঢিল দিল। নিঃশব্দে রোগা লোকটি টারজানের ঘরে ঢুকল। ছোরা তুলে সে খাটের দিকে এগোল। খাটের কাছে পৌঁছেও, কোথায় মারবে স্থির করতে একটু সময় নিল। ঘুমন্ত লোকটা যে টারজান নয়, ভ্যালথর, সেটা তার জানা ছিল না।

খুনেটা ইতস্ততঃ করছে, এই সময় চোখ খুলে টারজান তাকে দেখতে পেল। এক মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে, ঠিক যেই ছোরাসুদ্ধ হাতটা তার নামতে শুরু করবে, সেই নিমেষে তাকে টেনে সরিয়ে আনল। শেষ পর্যন্ত খুনীই খুন হল। তার গায়ে পা রেখে জয়ধ্বনি দিতে গিয়েও টারজান থেমে গেল। গলার ভিতর চাপা গর্জনটা গুরগুর করে উঠল। ভ্যালথর তার মানে বুঝল। ওপর তলায় খুনীর স্যাঙাৎ শুনল, কিন্তু বুঝল না। সে খালি দেখতে পেল জানালা দিয়ে তার সঙ্গীর শরীরটা ছিটকে নিচে পড়ল।

পরদিন সকালে ভ্যালথরের অ্যাথনি ফেরার কথা। টারজানকে সে বলল, 'তুমি সঙ্গে গেলে বেশ হত।

—'কি করে যাই? তাহলে গেমননের মাথা যাবে।'

—'তুমি দুবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, আমার বাবার বাড়ির দরজা সর্বদা তোমার জন্য খোলা থাকবে।'

—'আমার খাটে শুয়ে আজ তুমি সে ঋণ শোধ করেছ।'

এই সময়ে গেমনন এসে সব কথা শুনে তাজ্জব বনে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তাকে চিনতে পারলে নাকি? উচ্চ বংশের কেউ?'

—'মনে হল সাধারণ যোদ্ধা। তুমিই দেখনা চিনতে পার কি না।'

—'নিমোনি শুনলে রাগ করবেন।' তারপর ভ্যালথরকে বলল, 'আমরা বিপক্ষ দলের লোক বলে আমার দুঃখ হচ্ছে। এর পর দেখা হলে, হয়তো পরস্পরের মাথা নামাতে চেষ্টা করব।'

ভ্যালথর বলল, 'তাহলে যেন আর দেখা না হয়।'

কিছু পরেই ভ্যালথরকে পৌঁছে দেবার জন্য রক্ষীদল এল; বিদায় নিয়ে সে রওনা হয়ে গেল। টারজান স্থির করল ওখান থেকে যাবার আগেও অ্যাথনি হয়ে যাবে। এদিকে রানী রাতের দুষ্কর্মের কথা শুনে, গেমননকে তার

অসতর্কতার জন্য বকাবকি করেছিলেন। গেমনন ভারি ক্ষুব্ধ হল। টারজান বলল, 'আমার জন্যেই অপদস্থ হতে হল! কি করি? দৈব দুর্বিপাকে এসে পড়েছি আর একজন আদুরে মেয়ের ঢ্যাঁটামির জন্য যেতেও পারছি না।'

গেমনন চটে গেল, 'ও-কথা মুখে এনো না।'

রানী টারজানকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাতের ব্যাপার নিয়ে তদন্ত হবে। রানীর কাছে গেলে, তিনি সব কথা জানতে চাইলেন। সব শুনে বললেন, 'তাকে চিনতে পারলে নাকি?'

—'না।'

চারজন দাস স্ট্রেচারে একটা মৃতদেহ এনে রাখল।

নিমোনি বললেন, 'দেখ তো এ-ই কি না।'

টারজান বলল, 'এ-ই সে।'

হঠাৎ এরটের দিকে ফিরে রানী বললেন, 'একে কখনো দেখেছ?'

—'দেখেছি, এতজন রক্ষীর মধ্যে মনে করতে পারছি না।'

আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি দেখেছ?'

—'প্রায়ই দেখি। প্রাসাদরক্ষীদের একজন এ। আমার কোম্পানিতে ছিল।'

—'কত দিন এখানে আছে?'

—'তা মাসখানেক হবে।'

—'তার আগে?'

—'এরটের অনুচর ছিল।'

রানী এরটের ওপর চটে গেলেন, 'তোমার অনুচর ছিল আর তাকে চিনতে পারলে না?'

—'এখন পারছি। কেমন যেন অন্য রকম লাগছিল।'

নিমোনি বললেন, 'খুব চিনতে পেরেছিলে। এর ভিতরে অন্য ব্যাপার আছে। তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ তা জানি না। তবে তুমি নিশ্চয় এর মধ্যে জড়িত আছ। অন্য লোকও আছে। সব খুঁজে বের করছি, দাঁড়াও।'

চলে যাবার আগে টারজানকে বললেন, 'আমার হুকুম, তুমি গেমননের সঙ্গে তার বাবার বাড়িতে চলে যাও। সব চুকে গেলে, আবার এসো।'

ওরা বেরিয়ে যাবার সময়, ক্লাস্ট্‌ল্ বলল, 'শিকারের জন্য সব তৈরি। চল, যাওয়া যাক।'

গেমনন দোমনা করে বলল, 'কে কে যাচ্ছে?'

—'তোমরা দুজন, পিণ্ডেজ আর আমি। ভালো শিকার হবে।'

ওরা অস্ত্র আনতে ঘরে গেলে, গেমনন বলল, 'কি জানি বুদ্ধির কাজ হচ্ছে কিনা। আবার কোনো ফাঁদে পড়বে না তো?'

—'তাই বলে কতদিন ঘরে বসে থাকা যায়? পিণ্ডেজ কে?'

—'রানীর প্রিয়পাত্র হবার আগে এরট রক্ষীদের অফিসার ছিল। সে ওর চাকরি খেয়েছিল। বোকা, দুর্বল। তবে নিশ্চয় এরটের ওপর চটা। কাজেই ভয়ের কারণ নেই। তবু খুব সতর্ক থেকো, বন্ধু।'

বাসায় গিয়ে গেমনন ওদের জিনিসপত্র ওর বাবার বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে ফেলল। তারপর যথাস্থানে গিয়ে ক্লাস্ট্‌ল্ আর পিণ্ডেজের সঙ্গে মিলল। পিণ্ডেজের বয়স ত্রিশ হবে, ভালোই চেহারা, তবে মুখে দুর্বলতার ছাপ আর সোজা তাকায় না। সে টারজানকে জিজ্ঞাসা করল, 'কখনো বড় শিকারে যাওনি?'

—'না, ব্যাপারটা কি?'

—'চল না, গিয়েই দেখবে। আরো উপভোগ করবে।'

টারজান বলল, 'আমি জানোয়ার মারি হয় খাবার জন্য, নয়, আত্মরক্ষায়।'

—'আনন্দের জন্য শিকার কর না?'

—'প্রাণী মেরে সুখ পাই না।'

—'তোমাকে আজ কিছু মারতে হবে না। সিংহরাই মারবে। খুব উপভোগ করবে।'

পুবের ফটকের বাইরে খানিকটা খোলা পার্কের মতো জায়গা, তারপর জঙ্গল। ফটকের কাছে চারজন বলিষ্ঠ দাস দুটো সিংহকে চেন দিয়ে বেঁধে ধরে রেখেছিল। ওদের সামনে একটু দূরে একটা নোংরা নেংটি পরা দাস মাটিতে বসেছিল। তাকে টারজান চিনতে পারল। একেই সেদিন বিক্রি হতে দেখেছিল। ক্লাস্ট্‌ল তাকে কি যেন বলতেই সে দৌড়তে আরম্ভ করল। টারজান বলল, 'ও ছুটছে কেন, তাতে শিকার পালাবে।'

পিণ্ডেজ হাসতে লাগল, 'ও-ই তো শিকার।'

—'তার মানে'—

—'মানুষ হল সবার বড়, তাই বড় শিকার মানেই মানুষ শিকার।'

টারজান বলল, 'ও, তোমরা তাহলে মানুষ খাও?'

—'না, কক্ষণো না।'

—'তবে মানুষ শিকার কর কেন?'

—'আনন্দের জন্য।'

—'ওকে ধরতে না পারলে, ছেড়ে দাও বুঝি?'

—'মোটেই না। ক্রীতদাসদের কত দাম!'

—'কি ভাবে শিকার হয়? বোধ হয় বেশ মজা পাব।'

—'ও যেই জঙ্গলে পৌঁছবে, সিংহগুলোকে ছেড়ে দেব। অমনি খেল শুরু হয়ে যাবে,' পিণ্ডেজ বলল, 'ও যদি গাছে চড়ে তো খুঁচিয়ে, কি ঢিল মেরে নামাই। এইভাবে খেলা চলে। তারপর সিংহরা ওকে ধরে ফেলে। তখনি হয় সবচেয়ে মজা। ছুটো সিংহকে একটা মানুষ মারতে কখনো দেখেছ?'

সিংহগুলো আগে থেকেই চেনে টানাটানি করছিল, তারা ছুটবার জন্য অস্থির! লোকটা বনের ধারে পৌঁছলে ওদের ছাড়া হল। অমনি সে কি দৌড়। অর্ধেক পথ গিয়ে তারা বেগ কমাল। ক্লার্স্টলকে আর পিণ্ডেজকে বেজায় উত্তেজিত মনে হল। গেমনন কি যেন চিন্তা করছিল। টারজান বিরক্ত। কিন্তু বনে পৌঁছবার আগেই ওর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলতে, ওর ফুর্তি বাড়ল।

বড় সুন্দর বনটা। পুরনো সব গাছপালা; মনে হল সেগুলো যত্ন পায়। নিচের ঝোপ-ঝাড় অনেক পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। বনের চেয়ে পার্কের কথাই মনে হয়। গেমনন বলল বহু কাল ধরেই এ বনের যত্ন করা হয়। সুন্দর ফুল ফুটেছে; নানা রঙের পাখি ডাকছে। বাঁদররা গাছে দুলছে। বনের জন্য টারজানের মনটা আনচান করে উঠল।

বনে ঢুকে ইচ্ছা করে টারজান পিছিয়ে পড়ল। তারপর সবার অলক্ষ্যে গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। উঁচু ডালে চড়ে তীরবেগে, সিংহ বা শিকারীরা এসে পৌঁছবার অনেক আগেই গন্ধে গন্ধে শিকারের কাছে সে গিয়ে পড়ল। ওপর থেকে গালা ভাষায় টারজান বলল, 'গাছে উঠে পড়!'

—'তুমি কে?'

—'তোমার মালিকের শত্রু আমি।'

—'গাছে চড়লে, ঢিল মেরে নামাবে।'

—'খুঁজেই পাবে না তোমাকে। আমি ব্যবস্থা করেছি।'

—'সাদা মানুষ কালোকে সাহায্য করবে কেন?'

—'শিগগির কর। ওরা এসে পড়বে।'

এক মুহূর্ত দোমনা করে, এক লাফে সে গাছে উঠে পড়ল।

লোকটাকে কাঁধে ফেলে টারজান অনায়াসে গাছের ওপর দিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'সিংহরা আর তোমার নাগাল পাবে না। পাহাড়ে উঠলেই তুমি নিরাপদ। আর দেরি নয়, এক্ষুণি যাও।'

লোকটা মাটিতে বসে পড়ে টারজানের হাত ধরে বলল, 'আমার নাম হাফিম। দরকার হলে আমি তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তোমার নাম কি?'

—'আমি টারজান।'

—'একটা প্রার্থনা আছে। এরা আমার সঙ্গে আমার ভাইকেও বন্দী করেছিল। সে দক্ষিণ ক্যাথ্‌নির সোনার খনিতে কাজ করে। তার নাম নিয়াকা। তাকে আমার কথা বল। তাহলে সে-ও হয়তো পালাতে চেষ্টা করবে।'

লোকটা চলে গেলে, টারজান আবার গাছ-পথে বিদ্যুৎ-বেগে সঙ্গীদের ছাড়িয়ে গিয়ে, গাছ থেকে নেমে তাদের পিছন থেকে এগিয়ে এল। ক্লার্স্টল বলল, 'কোথায় ছিলে? শিকারের তো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।'

—'পিছিয়ে পড়েছিলাম। তা সে গেল কোথায়?'

—'বোঝা যাচ্ছে না। নিঃসন্দেহে গাছে চড়েছিল। গাছেও নেই, অথচ সিংহরাও গন্ধ পাচ্ছে না।'

পিণ্ডেজ বলল, 'এ এক রহস্য!'

টারজান বলল, 'রহস্য বটেই তো। অন্ততঃ যারা আসল ব্যাপার জানে, তারা বাদে সবার কাছে।'

—'কে জানে?'

—'কেন, যে ব্যাটা ভেগেছে, সে তো জানে।'

ক্লার্স্টল বলল, 'ভাগতে পারে না। শিকারের মেয়াদটা খানিকটা বাড়িয়েছে মাত্র। ভালোই তো। আরো মজা।'

টারজান বলল, 'তাকে আর পাওয়া যাবে না। এই নিয়ে কে বাজি ধরতে চায়?'

ক্লার্স্টল বলল, 'আমি ধরছি হাজার মোহর বাজি, ওকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।'

টারজান বলল, 'আমার তো টাকাকড়ি নেই, তবে গেমনন ধরতে পারে।'

গেমনন বলল, 'আমি রাজি!'

ক্লার্স্টল বলল, 'তাহলে আমার নিয়মে শিকার চলুক।'

গেমনন বলল, 'নিশ্চয়।'

—'তোমাদের একজন আমার সঙ্গে থাকবে, একজন পিণ্ডেজের সঙ্গে। যাতে ন্যায্য ভাবে খেলা চলে।'

টারজান বলল, 'রাজি!'

গেমনন বলল, 'টারজানের নিরাপত্তার জন্য আমি রানীর কাছে দায়ী। ওকে চোখের আড়াল করতে চাই না।'

টারজান বলল, 'না, না, কথা দিচ্ছি পালাব না।'

শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেমনন রাজি হল।

পিণ্ডেজ আর টারজানকে বলল, 'তুমি পুবে যাও, সিংহ নিয়ে রক্ষীরা উত্তর-পুবে যাক, আমি চলি উত্তরে। যে শিকারের চিহ্ন দেখতে পাবে, সে অন্যদের জানান দেবে।'

এই পরামর্শ মতো টারজান রওনা হয়ে গেলে, পিণ্ডেজ রক্ষীদের দিকে চোখ টিপে বলল, 'কত সময় তো কত আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে যায়।' তারা একটু হকচকিয়ে গেল।

টারজান তো সোজা পুবে চলেছিল। শিকারকে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই জেনেই সে বনের শোভা উপভোগ করছিল। হঠাৎ টের পেল একটা সিংহ তার পিছু নিয়েছে। অমনি তার চোখে রাগের বা ভয়ের ভাব নয়, ঘৃণা আর একটা বুনো ভাব ফুটে উঠল। সিংহটাও বুঝল শিকার তার সন্ধান পেয়েছে। অমনি সে গর্জে উঠল। তাই শুনে পিণ্ডেজ মুচকি হাসল। রক্ষীদের দিকে ফিরে বলল, 'চল, আস্তে আস্তে এগোনো যাক। বড় বেশি তাড়াতাড়ি দেহাবশেষ খুঁজে পেলে ভালো দেখাবে না।'

দূর থেকে গেমননরাও সে গর্জন শুনেছিল। ওরা শিকারের সন্ধান পেয়েছে তাহলে। কেমন একটু ভাবনা হচ্ছিল গেমননের। ওদিকে টারজান সিংহের আগমনের অপেক্ষায় ছিল। অতি সহজেই গাছে চড়ে সে পালাতে পারত। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার সাজা দেওয়া দরকার। তীর ধনুক না থাকলেও, সঙ্গে ছিল একটা বল্লম আর সেই পৈত্রিক ছোরাখানি। সিংহটা কাছে এসে গেছিল। শিকার কেন পালাচ্ছে না, সেটা সে ভেবে পাচ্ছিল না। গোড়ায় একটু বেগ কমালেও, তার পরেই জানোয়ারটা বিদ্যুৎবেগে তেড়ে এল।

টারজান এরি অপেক্ষায় ছিল। সময় বুঝে সজোরে বল্লম ছুঁড়ল। অস্ত্রটা অব্যর্থ লক্ষ্যপথে বাঁ কাঁধের তলায় হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছল। মহা রেগে দু-পায়ে উঠে থাবা বাড়িয়ে তবু এগিয়ে এল সে। টারজান থাবার তলা দিয়ে গলে ওর পিঠে চেপে, বার বার ছোরার কোপ দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সিংহের বিশাল দেহ কেঁপে কেঁপে উঠে, এলিয়ে পড়ল। তখন টারজান তার গায়ে পা রেখে জয়ধ্বনি দিল। যে শুনল সে-ই শিউরে উঠল। পিণ্ডেজ আর রক্ষীরা দুজন ভয়ে আধমরা।

কালোরা বলল, 'ও কিসের ডাক, মালিক?'

—'বিদেশীর মরণ হুংকার।'

—'না, মালিক, ওটা জয়ধ্বনির মতো শোনাল।'

গেমননরাও সে ডাক শুনে শিউরে উঠেছিল। গেমনন বলল, 'চল, দেখি গিয়ে।'

সঙ্গী বেশ ঘাবড়েছিল, 'না, না, ওটা বাতাসের শব্দ। ওর সঙ্গে তো পিণ্ডেজ আছে।'

—'সেই জন্যেই তো ভাবনা।'

পিণ্ডেজের আর তর সইল না। সে তাড়াতাড়ি সেই অদ্ভুত শব্দ যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে চলল। রক্ষীরা আরেকটু আস্তে, আরেকটু পিছনে এগোতে লাগল। হঠাৎ থমকে থেমে পিণ্ডেজ বলল, 'ওটা আবার কি?'

কি সর্বনাশ!! সিংহটা মরে পড়ে আছে। রক্ষীদের একজন বলল, 'ছোরার ঘায়ে মরেছে।'

পিণ্ডেজ বলল, 'গালাটার তো ছোরা ছিল না।'

—'বিদেশীর ছিল।'

পিণ্ডেজ বলল, 'যে-ই মেরে থাকুক, হাতাহাতি লড়াইয়ে মেরেছে।'

—'তাহলে সে-ও আহত হয়ে কোথাও পড়ে আছে নিশ্চয়!'

—'তাকে খোঁজ।'

—'তার গায়ে বড় জোর! ফোবেগকে খেলনার পুতুলের মতো তুলে নিয়ে বেড়াচ্ছিল!'

পিণ্ডেজ চটে গেল, 'তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?'

—'না, এমনি ভাবছিলাম।'

সবাই খুঁজতে লাগল। সবার পিছনে গেমনন। হঠাৎ তার কাঁধে কে হাত রাখল। ফিরে দেখে হাসিমুখে টারজান দাঁড়িয়ে আছে! 'কোথা থেকে আসা হল?'

'—কেন, সেই যে আমরা দু-দল হয়ে শিকার খুঁজতে গেলাম, মনে নেই?'

স্কার্স্টল বলল, 'চ্যাচাল কে?'

—'চ্যাচাল নাকি? পিণ্ডেজ হতে পারে। আমার তো লাগেটাগেনি।'

খানিক পরেই পিণ্ডেজ ফিরে এল। টারজানকে দেখে তার চক্ষুস্থির! স্কার্স্টল বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি হল? সিংহ কোথায়?'

—'সে মরে গেছে। কে ওকে ছোরা মেরেছে। যে মেরেছে, তাকেও খুঁজে পাচ্ছি না। সে নিশ্চয় গুরুতর ভাবে আহত, কিম্বা মরে গেছে।'

—'পেলে নাকি তাকে?'

—'না। কোথাও নেই সে। এক বিন্দু রক্ত পর্যন্ত দেখলাম না।'

—'শিকারও পেলে না?'

—'না। সে নিশ্চয় ভেগেছে। আজ ঢের শিকার হয়েছে। এখন বাড়ি ফেরা যাক।'

গেমননের বাবার বাড়ির সামনে পৌঁছে, টারজান ক্লার্স্টলের কানে কানে বলল, 'এরটকে অভিনন্দন জানাই। পরের বার কপাল খুলতে পারে।'

সেই রাতে গেমননের মা-বাবার সঙ্গে ওরা খেতে বসেছিল। এমন সময় থুডসের বাড়ি থেকে গেম্বা বলে একজন বিশ্বাসী দাস এসে জানাল যে থুডস্ বলেছেন আজ এরট চালাকি করে ওদের বাড়িতে ঢুকে ডোরিয়াকে দেখে গেছে। গেমননের মুখটা বিবর্ণ হল। 'বল গিয়ে, কাল সকালেই আমি আসছি।' পরে হতাশভাবে সে বলল, 'এ ক্ষেত্রে কি-ই বা করবার আছে?'

টারজান বলল, 'দেখি নিমোনিকে বললে যদি কিছু হয়।'

গেমনন আশার আলো দেখল, 'তাহলে তো বাঁচা যায়। একমাত্র তোমার কথা যদি রানী শোনেন।'

পরদিন সকালে রানী টারজানকে ডেকে পাঠালেন। গেমননকেও সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে সঙ্গে যেতে হবে। গেমননের বাবা বললেন, 'রানীর হুকুমের ওপর হস্তক্ষেপ করে, এমন সাহস কার আছে?'

গেমনন বলল, 'একটা বুড়ি দাসী ছাড়া আর কারো নেই।'

টারজান বলল, 'কিন্তু নিমোনি তাকে বিষদৃষ্টিতে দেখে।'

—'তাহলে সে বেশি সাহস পাবে না। নিমোনির বিরোধীরা কেউ বাঁচে না।'

গেমনন বলল, 'ঐ টোমস আর মাদ্দুজা নাকি নিমোনির জন্মরহস্য জানে। সেটা যদি ওরা ফাঁস করে দেয়, তাহলে নাকি নিমোনিকে আর কেউ মানবে না। নিমোনির সঙ্গে দেখা করার পর, থুডসের কাছে যাব। এখন কোথায় যেতে চাও, টারজান?'

—'একবার সোনার খনি দেখতে গেলে হয়, যদি সময় থাকে।'

—'আছে সময়।'

ওরা রওনা হয়ে গেল। পথে সিংহের খামার দেখতে পেল টারজান। সেটা ঘুরে দেখার সময় ছিল না। সোনার খনিতেও সেরকম দেখবার মতো কিছু ছিল না।

টারজানের আসল উদ্দেশ্য ছিল হাফিমের ভাই নিয়াকাকে তার মুক্তি পাবার খবরটা দেওয়া। লম্বা চওড়া মানুষটা। খনিতে পরিদর্শকের পদে আছে। আলাদা ঘর পায়, খনির পাশেই। তার কাছে সংক্ষেপে টারজান সব কথা বলল। নিয়াকা বলল, 'আমি একজন গরীব দাস, তুমি ক্ষমতাশালী উঁচুপদের পুরুষ, এ উপকারের প্রতিদান দেওয়া আমার অসম্ভব। স্ত্রীকে নিয়ে নিচের ঐ কুঁড়েঘরে থাকি। যদি কখনো কোনো কাজে আসি, আমাকে জানালেই হবে।'

টারজান বলল, 'দরকার হলেই জানাব।' পরে ওদের নিমোনির প্রাসাদে যেতে হবে। তার আগে সেখানে টোমস অসময়ে গিয়ে রানীকে বলল, 'গোপন কথা আছে, সবাইকে যেতে বলুন।'

সবাই চলে গেলে, টোমস বলল, 'থুডসের এক সুন্দরী মেয়ে আছে, তাকে সে লুকিয়ে রাখে। গেমনন থুডসের সঙ্গে রানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। রানীকে সরাতে পারলে ঐ মেয়ের সঙ্গে গেমননের বিয়ে হবে। এরট সেই মেয়েকে দেখে এসেছে। গেমনন আর থুডস্ ভাবে তার মতো সুন্দরী জগতে কেউ নেই।'

—'অসম্ভব কথা। এরট কি বলে?'

—'সুন্দরী বটে। অন্যদেরো সেই মত।'

—'কে অন্যদের?'

—'একজনকে তো ডোরিয়ার রূপের টোপ ফেলে ওরা দলে টেনেছে'।

—'কাকে?'

—'টারজানকে।'

—'দেখ, মাদ্দুজ আর তুমি এসব মিথ্যা কথা ফেঁদো না।'

—'মিথ্যা নয়, রানী।'

এরট দেখেছে গেমননের সঙ্গে টারজানকে থুডসের বাড়িতে যেতে। ঐ শিকারের বিভ্রাটটিও হয়তো টারজানকে সরাবার জন্য গেমননেরি চেষ্টা।'

রানী বললেন, 'যাও।'

—'দুপুরের দিকে গেমননের সঙ্গে টারজান গেলে, গেমননকে বাইরের ঘরে বসিয়ে, রানী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

—'গেমননের সঙ্গে সোনার খনি দেখতে।'

—'কাল রাতে কোথায় ছিলে?'

—'গেমননের বাপের বাড়িতে।'

—'না। ডোরিয়ার কাছে ছিলে।'

টারজান তো অবাক! 'সে তো পরশু সন্ধ্যায়।' তখনো টারজানের খেয়াল হয়নি নিমোনি কি জানতে চান।

রানী বললেন, 'থুডসের বাড়িতে কেন গেলে?'

—'গেমনন যে আমাকে ছাড়তে চায় না। যেখানেই যায়, টেনে নিয়ে যায়। আর কাউকে আমার ভার দিলে ভালো হয়।'

—'সে কথা পরে হবে। গেমনন কেন ও-বাড়ি যায়?'

—'ও যে ডোরিয়াকে ভালোবাসে তা-ও জান না?'

—'তুমি তাকে ভালোবাস না তো?'

—'কি বোকার মতো কথা বলছ, নিমোনি?'

—'আমাকে কেউ তাই বলেছিল কি না। সে কি আমার চেয়েও সুন্দরী?'

—'সূর্যের আলোর কাছে, দূর আকাশের তারা যেমন, তোমার কাছে তার রূপ-ও তেমনি ম্লান।'

—'তাহলে তুমি মানছ আমি সুন্দরী?'

—'নিশ্চয় মানছি।'

এই সব কথার মাঝখানে ঘরের অন্য দিক থেকে চেন নেড়ে, হাঁকডাক করে বেলথার তার রাগ দেখাতে লাগল। বিরক্ত হয়ে নিমোনি বলল, 'ও ভারি হিংসুটে। আমার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক বুঝি না। তবে ও মরলেই, আমিও মরে যাব, এ-কথা আমার মনে হয়। চল আমার সঙ্গে মন্দিরে। শোনা যাক থুস্ কি বলেন।'

শোভাযাত্রা করে মন্দিরে যাওয়া হল। রানী তাঁর সোনার রথে, এক পাশে টোমস আর অন্য পাশে টারজান পায়ে হেঁটে চলেছে। যেতে যেতে টারজান আরেকবার রানীকে অনুরোধ করেছিল, গেমননকে তার পাহারাদারি থেকে মুক্তি দিতে। রানী বললেন, 'কেন, সে তো ভালো ভাবে কাজ করে।'

—'তার-ও তো ছুটি দরকার। ওর জায়গায় এরটকে দাও।'

—'সে তোমাকে খুন করবে।'

—'তাহলে যে ওকেও মরতে হবে। সাহস পাবে না।'

—'তোমার গেমননকে ভালো লাগে না?'

—'খুব ভালো লাগে।'

—'তাহলে ওরি থাকা উচিত।'

ওরা প্রায় মন্দিরে পৌঁছে গেছে, এমন সময় টারজান লক্ষ্য করল চেন দিয়ে বেঁধে পুরুতরা একজন দাসীকে নিয়ে চলেছে। তাকে রানীর রথের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল।

মন্দিরের রক্ষীদের মধ্যে ফোবেগ ছিল। তাকে দেখে রানীর দাসী মালুমা বলল, 'বাঃ, তুমি আবার পুরনো পদে বহাল হয়েছ দেখছি।'

—'হ্যাঁ, টারজানের জন্যেই সব হয়েছে। তার মতো লোক হয় না। মঠসুদ্ধ সবাই যখন চ্যাঁচাচ্ছিল ওকে মেরে ফেল! টারজান আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।'

মালুমা বলল, 'এখন টারজানেরি একজন বিশ্বাসী বন্ধু দরকার।'

ফোবেগ চমকে উঠল, 'তার মানে?'

—'তার মানে টোমস গিয়ে রানীর কানে লাগিয়েছে যে থুডস, গেমনন আর টারজান তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আর টারজান থুডসের মেয়ে ডোরিয়াকে ভালোবাসে।'

ফোবেগ বলল, 'সর্বনাশ! তাহলে ডোরিয়ারো হয়ে গেল!'

—'টারজানেরো হয়ে গেল। সে বড় ভালো লোক। পাপিষ্ঠ এরটের মতো নয়।'

মন্দিরের মধ্যে একটা মঞ্চ। তার পিছনে একটা খাঁচা। খাঁচাতে একটা বুড়ো লোম-ওঠা সিংহ। সেই বন্দী-দাসীকে মঞ্চে তোলা হতেই সিংহটাও উঠে দাঁড়াল। মেয়েটি ভয়ে ম্রিয়মান, গালে চোখের জল। নিমোনি সিংহটার দিকে ফিরে হাত তুলে প্রার্থনা করতে লাগল, 'হে থুস, নিমোনি তোমার জন্য শুভেচ্ছা আর নৈবেদ্য নিয়ে এসেছে। তার বদলে সে যাকে ভালোবাসে, তার ভালোবাসা তাকে দিও।'

তারপর খাঁচার ছাদের খানিকটা খুলে হতভাগ্য বন্দিনীকে নিচে ফেলে দেওয়া হল, একেবারে সিংহের গ্রাসের মধ্যে। একটি চিৎকার দিয়ে তার জীবন শেষ হয়ে গেল।

টারজানের গা গুলিয়ে উঠল। অমনি উঠে পড়ে সে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসার সময়ে কে যেন তার নাম ধরে ডাকল। কোনো সাড়া না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল টারজান। ফোবেগ পিছন থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'জরুরি কথা আছে। সূর্য ডোবার দু-ঘণ্টা পরে, মন্দিরের পিছনে এসো। যদি রাজি থাক, তাহলে ডান দিকে মাথা ফেরাও। কিছু বল না।'

টারজান ডান দিকে মাথা ফেরাল।

সেদিন সন্ধ্যায় বাপের বাড়িতে গেমনন অস্থিরভাবে পাইচারি করছিল। টারজান যখন মন্দিরের ঐ

নিষ্ঠুর ঘটনার কথা বলল, গেমনন উত্তর দিল, 'আহা', দেবতারো তো খিদে পায়। একজন দাসী হত্যার চেয়েও মন্দিরে ঢের বেশি নিষ্ঠুর কাজ হচ্ছে। মাটির নিচে কোথাও নিমোনির ভাই অ্যালেকস্টার বন্দী হয়ে আছে। সে ওখানে পচছে আর টোমস আর মাদ্দুজ পাগল নিমোনির সাহায্যে ক্যাথনিতে রাজত্ব করছে। এখানকার অনেক লোক অ্যালেক্স্টারকে সিংহাসনে বসতে দেখলে খুশি হয়। কিন্তু সবাই ঐ তিনজনকে ভয় পায় রানী নাকি ভাইকে সরিয়ে দিতে চান না। সে-ই হল ন্যায্য অধিকারী। নিমোনি মারা গেলে, সে নিজের স্বত্বে রাজা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত নিমোনি তাকে মেরে ফেলতে রাজি হননি। তবে যদি তাকে রাজা করার কোনো ষড়যন্ত্রের কথা ওঁর কানে যায়, তখন নিশ্চয় মেরে ফেলবেন।'

সে রাতে খাবার পর ঘুম পাবার ভান করে টারজান নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে, জানালা দিয়ে নেমে থুসের মন্দিরের পিছনে ফোবেগের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ফোবেগ বলল, 'রানীর এক দাসী নিজের কানে শুনে এসেছে টোমস তাঁকে বলছে তুমি ডোরিয়াকে ভালোবাস, তাই গেমনন আর থুডসের সঙ্গে রানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ। রানী নাকি টোমসকে বলেছেন মেয়েটিকে ধরে এনে মন্দিরে বন্দী করে রাখতে। তাকে দিয়ে কি করবেন পরে স্থির হবে। সাবধানে থাকো। রানী এখনো বিশ্বাস করেন না যে তুমি ডোরিয়াকে ভালোবাস।'

টারজান বলল, 'মন্দিরের কোন জায়গায় সে বন্দী তা জান?'

—'রাজকুমার মাটির নিচে বন্দী। কিন্তু দোতলায়, তিনতলাতেও ঘর আছে।'

—'ডোরিয়াকে যদি সত্যি বন্দী করা হয়, আমাকে জানিও।'

টারজান আবার গেমননদের বাড়ি ফিরে গেল। গেমনন ছিল না, মা-বাবা বসে ছিলেন। ওকে দেখে মা বললেন, 'ঘুম হল না বুঝি?'

—'না! গেমনন কোথায়?'

—'তাকে রানী ডেকেছেন।'

একটু পরেই ফোবেগ এসে দুঃসংবাদ দিল। গেমনন, থুডস আর তাঁদের বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব গ্রেপ্তার হয়েছে। তারা মাটির তলার ঘরে আছে। ডোরিয়া আছে ওপরের ঘরে। তুমি এক্ষুনি ক্যাথ্নি থেকে পালাও।'

—'ওদের বিপদে ফেলে পালাতে পারব না, ভাই। একটা ব্যবস্থা করে তবে যাব।'

ফোবেগের বারণ না শুনে সেই রাত্রেই টারজান রানীর কাছে দরবার করল, যদি বন্ধুদের ছেড়ে দেন।

এত রাতে রানী শুতে যাচ্ছিলেন। টারজান এসেছে শুনে তখনি বেরিয়ে এলেন। তাঁর অপূর্ব রূপ দেখে টারজান আশ্চর্য হল। বাস্তবিক এমন সুন্দর মেয়ে দেখা যায় না। কিন্তু ওর আবেদন শুনে রানী মহা চটে গেলেন। প্রথমে বললেন 'মেয়েটার কি হয় না হয় তাতে তোমার কি?'

—'আমার বন্ধু, গেমনন তাকে ভালবাসে, নিমোনি, আর কিছু নয়। আমি তাকে একবারমাত্র দেখেছি।'

এ কথা শুনে রানীর মনটা নরম হয়ে এসেছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় ঠিক সেই সময় মাদ্দুজ এসে হাজির হল। তাকে দেখেই আগুনের মতো জ্বলে উঠল নিমোনি। মাদ্দুজ চিৎকার করতে লাগল, 'ঐ লোকটাকে এখুনি বিদায় কর। নইলে তোমার চোখের সামনে ও মরবে। এক্ষুণি বিদায় কর।'

নিমোনি উঠে দাঁড়াল, রাগে তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, 'বড় বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ, মাদ্দুজ! নিজের ঘরে যাও। ভুলো না, আমি রানী।'

খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসতে লাগল মাদ্দুজ। 'রানী রানী! ওকে যদি এক্ষুণি বিদায় না কর, তাহলে আমিও এক্ষুণি ওকে জানিয়ে দেব তুমি কি এবং কে!'

এবার নিমোনি সত্যি ক্ষেপে গেল। একটা কি যেন তুলে নিয়ে, ছুটে গিয়ে বুড়ির চুলের মুঠি ধরল। বুড়ি ওর গায়ে লাঠি দিয়ে এক বাড়ি মারতেই, নিমোনি বলল, 'সারা জীবন তুমি আমাকে জ্বালিয়েছ। কখনো সুখী হতে দাওনি, তুমি আর তোমার স্যাঙাৎ টোমস! তার জন্য এই নাও!'

এই বলে হাতের ছোরাটা বার বার বুড়ির বুকে বসিয়ে দিল।

বেলথারের গর্জনে কানে তালা লাগার জোগাড় হল। প্রাণপণে সে চেন ছেঁড়ার চেষ্টা করতে লাগল। বাইরেও অনুচরদের হাঁক-ডাক শোনা গেল। নিমোনি ডেকে বলল, 'যাও। সব ঠিক আছে। একজন দাসীকে শাসন করেছি।'

বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে। টারজানকে বলল, 'কাল তোমার কথা শুনব। আজ আমার মন বিগড়ে গেছে।'

টারজান বলল, 'কাল যে বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে, নিমোনি।'

তারপর সে তার আবেদনটি খোলাখুলি পেশ করল উল্টো ফল হল। নিমোনির মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল। 'তোমার এত আস্পর্ধা যে রাজদ্রোহীদের হয়ে বলতে এসেছ। ঐ মেয়েটার টানে বোধ হয়?'

—'না নিমোনি, বলেছি তো গেমনন তাকে ভালোবাসে। আহা ওরা সুখী হক না।'

—'আমি সুখী হতে পারছি না, ওরা কেন হবে? না। অন্যদের কথা পরে ঠিক করব। মেয়েটা কাল মরবে। একমাত্র মাদ্দুজ আমাকে সত্যি ভালোবাসতো, তাকেও মেরে ফেলেছি। দরকার হলে সবাইকে মেরে ফেলব। মেয়েটাকে আজ রাতে চামড়ার থলির মধ্যে পুরে সেলাই করে রাখা হবে। কাল স্কারাটরে দেওয়া হবে।'

—'আর অন্যরা? তাদের ছেড়ে দেবে তো?'

—'সে দেখা যাবে। তুমি আমার কথা মতো চললে কি হয় বলা যায় না।'

সেই রাত্রে এরট মন্দিরের ওপরতলায় ডোরিয়ার বন্দীশালায় ঢুকে তাকে বলল যে গেমনন, থুডস আর তাদের বন্ধুরা সকলেই বন্দী। রানী হুকুম দিয়েছেন আজ ডোরিয়াকে চামড়ার থলিতে সেলাই করে, কাল স্কারাটরে ফেলে দেওয়া হবে। তারপর অসহায় বেচারি ডোরিয়াকে নানা অপমানকর কথা বলতে লাগল এরট। এমন সময় জানালার কাছ থেকে একটা চাপা গর্জন শোনা গেল। মুখ তুলে সেদিকে তাকিয়ে ভয়ের চোটে ঘরের উল্টো দিকের দরজার দিকে দৌড়ল এরট!

পরদিন ভোরে শোভাযাত্রা করে ডোরিয়াকে স্কারাটরের কাছে নৈবেদ্য দেবার জন্যে সকলে রওনা হল। বেশ দূরে আগুন-পাহাড়টা। গিয়ে, কাজ সেরে, ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তাই শত শত দাস মশাল নিয়ে সঙ্গে চলেছিল। টারজানকে দেখতে না পেয়ে রানী বিরক্ত হচ্ছিলেন। সে পৌঁছলে বললেন, 'দেরি হল তোমার? কারো জন্য অপেক্ষা করা আমার অভ্যাস নয়।

টারজান বলল, 'কি করি? বললাম এরটের জিম্মা করে দাও। সে আমাকে যথাসময়ে হাজির করে দেবে।'

মহা সমারোহে শোভাযাত্রা চলল। রানীর রথের সঙ্গে আরেকটা রথ ছিল। তাতে চামড়া দিয়ে সেলাই করা একটা বাণ্ডিল পড়ে ছিল আর পিছনে চেন দিয়ে বাঁধা ছিল গেমনন আর থুডস। ভিড় থেকে টারজানের বিষয় নানা মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল। এরা গায়ের জোরের ভারি ভক্ত। তাই টারজান খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। রোদ বাড়তে লাগল। দাসরা রানীর মাথার ওপর ছত্র ধরল।

নিমোনি আবার টারজানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি বল, দেরি হল কেন?'

—'প্রাসাদ থেকে দেরি করে ফিরে, তারপর দেরিতে শুয়েছি। কাজেই দেরিতে উঠেছি।'

—'কখনো স্কারাটর দেখেছ?,

—'না তো।'

—'থুস্ ঐ পাহাড় তৈরি করেছেন। ক্যাথনির রাজা-রানীদের শত্রুদের জন্য। এমন পাহাড় কোথাও নেই।'

দুপুরে এক জায়গায় থেমে খাওয়া-দাওয়া সারা হল। তারপর সরু গিরিখাত ধরে পাহাড়ে ওঠা। আরো পরে নাকে এল গন্ধকের গন্ধ। আরেকটু উঠতেই আগ্নেয়গিরির মুখটা দেখা গেল।

ওপরে শক্ত পাথর জমে আছে, অনেক নিচে গলন্ত পাথর টগবগ করে ফুটছে। মাঝে মাঝে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে সাদা কিম্বা হলদে বাষ্প।

ছেলেপিলে নিয়ে সব মজা দেখতে এসেছে। সঙ্গে খাবার-দাবার আছে। থুডসের আর গেমননের ভাবলেশহীন মুখ। টারজান তাদের কাছ থেকে দূরে সরে আছে। থলিতে সেলাই করা মানুষটা একবারো নড়েচড়েনি। তার প্রিয়জনরাও কান্নাকাটি করেনি। সেটা নিমোনির পছন্দ নয়। এর মধ্যে কোনো চালাকি নেই তো? এরা এত নির্বিকার কেন?

রানী হুকুম দিলেন, থলি কেটে থুসের নৈবেদ্যটিকে একবার দেখা যাক। থলি কাটা হতেই সকলে স্তম্ভিত। থলিতে এরটের মৃতদেহ ছাড়া আর কিছু ছিল না।

রানী মহা রেগে বললেন, 'এর মানে কি ?'

টোমস বলল, 'মন্দিরেও বিশ্বাসঘাতক আছে দেখছি। এরটকে পাঠিয়েছিলাম কাল রাতে, মেয়েটাকে প্রস্তুত করে রাখতে। তারপর কি হয়েছে, আমি তার কিছুই জানি না।'

রানী বললেন, 'ওটাকেই আগুনে দেওয়া হক।'

তাই হল। তারপর ক্যাথনি ফেরার পালা। রানীর মুখ পাথরের মতো। একটা কথাও বললেন না। মাঝে মাঝে টারজানের দিকে তাকালেন। আরো পরে রানী বললেন, 'তোমার দুজন শত্রু গেল। একজনকে আমি শেষ করলাম। অন্যজনকে কে করল ?'

—'হয়তো আমি করেছি।'

—'তাই ভাবছিলাম।'

টারজান বলল, 'যেই করে থাকুক, তাতে ক্যাথনির মঙ্গল হয়েছে।'

নিমোনি বললেন, 'তা হতে পারে। ওকে মেরেছি বলে আমি অসন্তুষ্ট হইনি। হয়েছি তার আস্পর্ধা দেখে, রানীর ব্যবস্থায় যে হস্তক্ষেপ করে! যে-ই করে থাকুক, সে শুধু আমার আজকের আনন্দ নষ্ট করে দেয় নি, তার কাজের জন্য থুডসকে আর গেমননকে বেশি কষ্ট পেতে হবে, আর মেয়েটাকেও খুঁজে এনে এর চেয়ে শতগুণ বেদনাময় দণ্ড দেওয়া হবে।'

টারজান কোনো কথা বলল না। রানী বললেন, 'কিছু বলছ না কেন ?'

—'বলবার কিছু নেই।'

রানী বললেন, 'এক দিন ধৈর্য হারিয়ে তোমাকে সিংহের সামনে ফেলে দেব। তখন তুমি কি করবে ?'

—'সিংহটাকে মেরে ফেলব।'

—'আমি যেটার সামনে তোমাকে ফেলব, তাকে মারতে পারবে না।'

ক্লান্ত দেহে সকলে ক্যাথনি ফিরে এল। থুডস আর গেমনন আবার তাদের বন্দীশালায় ফিরে গেল। দুজনেই খুশি, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছিল না।

সে রাতে টারজান রানীর ঘরে খেয়েছিল। আর কেউ ছিল না। নিমোনির নিষ্ঠুরতায় ভিতরে ভিতরে টারজান বিরূপ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার মিষ্টি ব্যবহারে আর অমন রূপ দেখে, মনটা একটু নরম হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত নিমোনি খোলাখুলি অনুনয় করেছিলেন যে টারজান যদি সব ছেড়েছুড়ে তাঁর কাছে চিরকাল থাকে, তাহলে তিনি তার সব অনুরোধ রাখবেন। এমন কথা দেওয়া টারজানের পক্ষে সম্ভব নয় শুনে রানী অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলেন। মনে তাঁর দয়ামায়া বলে কিছু ছিল না। যখন যা চাইতেন, তা না পেলে পাগলের মতো হয়ে উঠতেন। যে তাঁর ইচ্ছার বিপক্ষে দাঁড়াত, তাকেই তিনি বিনষ্ট করতেন। টারজানের জন্য তিনি সব করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু টারজান তাঁর কথা অস্বীকার করাতে, মনের সমস্ত আক্রোশ তার মাথায় ভেঙে পড়ল। রক্ষীদের ডেকে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বন্দীশালায় পাঠিয়ে দিলেন।

সেখানে যে অন্ধকার কুঠরিতে থুডস্ আর গেমনন বন্দী ছিল, সেখানেই টারজানকেও রাখা হল। আলো নেই, কাজেই তারা প্রথমটা ওকে চিনতে পারেনি। তারপর হৃষ্টচিত্তে টারজান বলল, 'থুডস, গেমনন্, নমস্কার!'

তারা আকাশ থেকে পড়ল। থুডস্ বললেন 'তুমি কি করে এখানে এলে ?'

—'কুড়িজন যোদ্ধা আর একজন মেয়ের খামখেয়ালের সাহায্যে!'

— তাহলে প্রিয়পাত্রের পদ গেছে!'

—'যাবেই, জানা কথা।'

—'কি সাজা হবে তোমার ?'

—'কে জানে! এখনি ভেবে কি লাভ? হক তো আগে। না-ও হতে পারে।'

থুডস বললেন, 'নিমোনির বন্দীশালায় আশার কোনো স্থান নেই।'

—'কেন, ডোরিয়াও তো নিস্তার পেয়েছে।'

গেমনন বলল, 'ঐ ব্যাপারটা বুঝলাম না।'

টারজান তাকে তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। সে যে সোনার খনির দাস নিয়াকার ঘরে লুকিয়ে আছে, তা-ও বলল। নিয়াকা বলেছে সেখানে কোনো ভয় নেই। শুনে গেমনন বলল, 'এবার আমরা নিশ্চিন্তে মরতে পারব।'

এত দিন পরে ক্লার্স্টলের সেই বড় শিকারের শিকার অদৃশ্য হওয়ার রহস্যও শুনল গেমনন। শুনে সে একেবারে তাজ্জব বনে গেল। তার একমাত্র দুঃখ এমন খাসা গল্প বন্ধুদের কাছে বলার সুযোগ হবে না!

পরদিন দুপুরে রক্ষীরা এসে টারজানকে নিয়ে গেল। থুডস্ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওকে কি আবার ফিরিয়ে আনবে এখানে ?'

রক্ষীরা মাথা নাড়ল। 'না, আজই রানীর বড় শিকার।'

গার্ড-ঘরে টারজানের গলায় সোনার কলার, হাতে পায়ে সোনার শিকল পরানো হল। তাই নাকি নিয়ম। রানীর রথের পিছনে আজ টারজান শিকল-বাঁধা হয়ে চলল। সোনার পুলের ওপারেই সিংহের মাঠ। হয়তো শহর থেকে এক মাইল দূরে। অগুন্তি লোকজন সঙ্গে চলেছে। নিমোনির মনের ভাব বোঝানো সহজ নয়। যে মানুষটার এত বড় আস্পর্ধা যে, রানীর ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান করে, তার ওপর তাঁর অসীম আক্রোশ।

টারজানের সুন্দর নির্ভীক মুখের দিকে রানী তাকাতে পারছিলেন না। পাছে মন দুর্বল হয়ে যায়। শেষ একটা সুযোগ দিয়েছিলেন টারজানকে। সবাইকে সরিয়ে দিয়ে কাছে ডেকে বলেছিলেন, 'একবার সকলের সামনে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাও, প্রাণ ভিক্ষা কর। তাহলেই সব ক্ষমা করব।'

টারজান সগর্বে উত্তর দিল, 'তোমার সিংহদের লেলিয়ে দাও। তোমার চেয়ে তারা বেশি দয়ালু।'

এর পর টারজানকে ক্ষমা করা যায় না। নিমোনি বললেন 'সিংহটাকে দেখেছো?'

টারজান চেয়ে দেখল সোনার চেনে বাঁধা প্রকাণ্ড সিংহ। আটজন লোক অতি কষ্টে তাকে সামলাচ্ছে। সিংহের মাথার মাঝখানে এক গোছা কেশরের রং সাদা। সে হল বেলথার। বেলথার টারজানকে দেখতে পারে না। টারজান এতটুকু ভড়কাচ্ছে না দেখে নিমোনির রাগ আরো চড়ে গেল।

সবাই যে যার জায়গা নিল। সবার আগে সোনার চেনে বাঁধা টারজান। তার পিছনে বেলথার। সে ছাড়া পাবার জন্য হাঁস-ফাঁস করছে। তার পিছনে রানীর রথ। তিনি খেলা দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।

গেমননের বাবা ফরডস পৈত্রিক অধিকারে রাজবংশের শিকার-খেলার অধিকর্তা। তাঁর কাজ হল চোখ রাখা যে, সব নিয়মাবলী পালন করা হচ্ছে। টারজানের কাছে নিচু গলায় ক্ষমা চেয়ে, তিনি খেলার নিয়ম ঘোষণা করলেন। দুই সারি যোদ্ধার মধ্যে দিয়ে শিকার একশো পদক্ষেপ এগোলে, সিংহ ছেড়ে দেওয়া হবে। কেউ যদি কোনো ভাবে বাধা দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে। শিকার মেরে, খেতে আরম্ভ করলে রক্ষীরা আবার সিংহের শিকল পরাবে।

টারজানকে বললেন, 'সোজা দৌড়বে, যতক্ষণ না বেলথার তোমাকে ধরে ফেলে।'

টারজান বলল, 'যদি ওকে এড়িয়ে পালাতে পারি, তবে কি মুক্তি পাব?'

বড় দুঃখে মাথা নেড়ে ফরডস বললেন, 'তা কখনো পারবে না।' পরে রানীর কাছে হাঁটু গেড়ে বললেন, 'সব প্রস্তুত। খেলা আরম্ভ হবে কি?'

রানী বললেন, 'সিংহটা আরেকবার শিকারের গন্ধ চিনে নিক। তারপর শুরু করে দিও।' নিমোনির চোখ দুটো উন্মাদিনীর চোখের মতো জ্বলছিল।

সম্মিলিত জনতা বাজি রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। টারজানের কলার খুলে নেওয়া হল।

নদীর ধারে গর্তমতো জায়গায় ঝোপের ভিতরে একটা সিংহ ঘুমোচ্ছিল। প্রকাণ্ড বড় সিংহ। তার সোনালি গা, কালো কেশর। তার কানে জনতার কোলাহল পৌঁচচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে গলায় গুর গুর শব্দ করছিল। কিন্তু ওর ঐ আধা-ঘুম ভাবটা সত্যি নয়। সম্পূর্ণ সজাগ ছিল সে। ঐ লোকগুলো আরেকটু কাছে এলে দেখতে হবে কেন এত হল্লা করছে।

খেলার মাঠে পা গুণে গুণে টারজান চলেছিল। একশো পা গেলেই বেলথার ছাড়া পাবে। পুবে নদীর ওপারের বনে পিণ্ডেজদের সেই বড় শিকার হয়েছিল। সেখানে পৌঁছতে পারলে, কেউ তাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু যত দ্রুতই টারজান ছুটুক, বেলথার তার চেয়েও জোরে ছুটবে। বনে পৌঁছতে পারবে কি না সন্দেহ।

একশো পদক্ষেপের পর টারজান পাঁইপাঁই ছুট লাগাল। তার পিছনে অবিচল গতিতে বেলথার ছুটছিল। তার পিছনে রানীর রথ।

রানীর পিছনে দর্শকরাও ছুটেছিল। টারজান হঠাৎ সোজা পথ ছেড়ে পুব দিকে দৌড়ল। ওর মৎলব বুঝে রানীর এবং জনতার কি রাগ। তাই বলে নদী পার হলেই টারজান পার পাবে, এ কথা কেউ মনে করছিল না। বেলথার কখনোই তার শিকার ছাড়বে না। কিন্তু বনের ভিতর সে দৃশ্য কেউ দেখতে পাবে না! তারপর বেলথারকে এগিয়ে যেতে দেখে সকলে অনেকটা নিশ্চিত হল। টারজানও বুঝতে পেরেছিল শেষ বোঝাপড়া সন্নিকট। নদী তখনো দুশো গজ দূরে আর সিংহ মাত্র পঞ্চাশ গজ পিছনে।

এর আগেও বহু সিংহের আক্রমণের মোকাবিলা করেছে টারজান। বেলথার যে খুব সহজে জয়ী হবে, তা বলা যায় না। কিন্তু টারজানের সঙ্গে ছোরা নেই। তার জেতা অসম্ভব। হঠাৎ জনতার কোলাহলে একটা নতুন সুর শোনা

গেল। একটা বিস্ময়ের আর উদ্বেগের সুর।

বেলথার ততক্ষণে ওকে প্রায় ধরে ফেলেছে, এমন সময় একটা সোনালি দেহ ঝড়ের মতো টারজানের গা ঘেঁষে চলে গেল। বেলথার ততক্ষণে দু পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, আগন্তুক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবাই দেখল অতি প্রকাণ্ড সোনালি এক সিংহ, তার কালো কেশর, যেন সাক্ষাৎ ক্রোধের আর সর্বনাশের প্রতিমূর্তি হয়ে বেলথারের সঙ্গে মাটিতে গড়াচ্ছে। দাঁত, নখ ; কান ফাটানো গর্জন। রানী, জনতা, স্বয়ং টারজান স্তম্ভিত হয়ে গেছিল।

নতুন সিংহটা বেলথারের চেয়ে বড়, বেশি জোরালো, হিংস্রতায় আর তেজে তাকে হার মানায়। দেখে মনে হচ্ছিল নরকের সমস্ত ধ্বংস-শক্তি তার শরীরে। শেষ পর্যন্ত বেলথারের ঘাড় কামড়ে ধরে, তাকে তুলে নিয়ে এমনি ঝাঁকানি দিল যে বেলথারের ঐখানেই ভবলীলা সাঙ্গ হল। মৃতদেহটা ফেলে দিয়ে, ক্যাথনির নাগরিকদের দিকে একবার তাকিয়ে সে টারজানের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। টারজান তার মাথায় হাত রাখল। দর্শকমণ্ডলী বিস্ময়ে বাক্যহত! ঐ সিংহের নাম জাদবালজা।

রানী রথ থেকে নেমে এলেন। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আস্তে আস্তে বেলথারের মৃতদেহের পাশে গিয়ে একটুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ফ্যাকাশে মুখে উদভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে, চিৎকার করে উঠলেন, 'বেলথার মরে গেছে!' সঙ্গে সঙ্গে নিজের রত্নখচিত ছোরা বের করে আমূল নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে, বেলথারের মৃতদেহের ওপর এলিয়ে পড়লেন।

সে রাতে চাঁদ উঠলে পর, নদীর তীরে একটি ছোট ঢিপির ওপর শেষ একটি পাথর বসিয়ে দিল টারজান।

ফরডসের সঙ্গে যোদ্ধারা আর নাগরিকরা কখন শহরে ফিরে গেছিল। ফরডসের নেতৃত্বে তারা নিমোনির ভূগর্ভস্থ বন্দীশালার সব বন্দীদের মুক্তি দেবে। অ্যালেকস্টারকে রাজা বলে ঘোষণা করা হবে। সমস্ত নাগরিকরা আর যোদ্ধারা এ বিষয়ে এক মত। নিমোনির নিষ্ঠুরতা তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

নদীর তীরে রানীর আর বেলথারের মৃতদেহ পড়ে রইল। সকলে সেখান থেকে চলে গেল। তারা যে কর্তব্যের অবহেলা করে গেল, বনমানুষের বুনো ছেলে টারজান সেই কর্তব্য পালন করল। নিমোনি আর বেলথারকে কবর দিল। এত কাল পরে নিমোনি হয়তো সুখী হয়েছে।

টারজান এবং সিংহ মানুষ

টারজান অ্যান্ড দি লায়ন ম্যান

আমেরিকার একটি বিলাসবহুল আপিস ঘরে এক ফিল্ম কোম্পানির মিটিং চলছিল। প্রোডাকশান ম্যানেজার মিল্টন স্মিথ উত্তেজিত গলায় বলল, 'দেখিয়ে দেব জঙ্গলের ছবি কাকে বলে। নকল বনের মধ্যে ফোকলা, বুড়ো সিংহ ছেড়ে দিয়ে ছবি তোলার দিন শেষ।'

ছবির পরিচালক টম ওরমান সবেমাত্র বোর্নিওয় কাজ শেষ করে ফিরেছে। জানতে চাইল, 'তা আমাদের স্যুটিং তাহলে কোথায় হচ্ছে?'

স্মিথ বলল, 'আফ্রিকায়।'

তারপর বক্তৃতার ঢঙে বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, 'ভেবে দেখ ওরমান, তুমি সত্যিকার জঙ্গলে সত্যিকার জিরাফের পিছনে ক্যামেরা নিয়ে ছুটে চলেছ! সত্যিকার জিরাফের ডাক টেপ্ করে তোলা হচ্ছে—'

—'জিরাফ বোবা, ওর ডাক টেপ করব কি করে স্মিথ?' বাধা দিল পরিচালক।

—'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা না হয়, ধর বাঘ। আদিম, বন্য

পারবেশে সত্যিকার বাঘ! দর্শকদের লোম খাড়া হয়ে উঠবে।'

—'আফ্রিকায় বাঘ নেই স্মিথ।' আবার বাধা দিল ওরমান।

বিরক্ত হল স্মিথ। বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা কুমীর। আফ্রিকার নদী নালায় কুমীর আছে জানি।'

ওরমান বলল, 'বুঝলাম তো সবই, তবে অসুবিধাও আছে। শব্দ, ছবি কি ভাবে নেওয়া যাবে ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। আমি তো আফ্রিকায় যাইনি কখনো।'

—'আহা হা, সে জন্যেই তো আমরা আলোচনায় বসেছি। ভেবে দেখতে হবে কি ভাবে কি করা যায়। মোট কথা, স্টুডিও সাজিয়ে নকল ছবি আর তুলব না।'

মিটিঙে মেজর হোয়াইট হাজির ছিল। মস্ত শিকারী, আফ্রিকা-বিশারদ বলা যায়। তার সঙ্গে ওরমানের পরিচয় করিয়ে দিল স্মিথ।

হোয়াইটের সঙ্গে আলোচনা করে দেখা গেল সাত টন ওজনের দুটো শব্দগ্রহণ যন্ত্র, ন-টনের জেনারেটর, এসব নিয়ে জঙ্গলে কাজ করা অসম্ভব।

কিন্তু এ অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। স্মিথ নাছোড়-বান্দা। সে ফিল্মের গল্পটা শোনালো সবাইকে। জো লিখেছে।

একটি মানবশিশু সিংহীর কাছে বড় হয়ে উঠল। তার বন্ধু বলতে শুধুই সিংহ। কে না জানে সিংহ বনের রাজা। ছেলেটি বড় হয়ে হল সেই সিংহদেরই রাজা। জঙ্গল-রাজ্যের খোদ নেতা। তারপর তো সে-জঙ্গলে এক নায়িকার প্রবেশ। ছেলেটি এই প্রথম অন্য মানুষ দেখছে।

—'সিংহমানবের ভূমিকায় কাকে ভেবেছেন?' ওরমান জানতে চাইল।

—'স্ট্যানলি ওবরস্কি।'

—'কে সে? কখনো নাম শুনিনি তো? অভিনয় জানে?'

—'দারুণ দেখতে, অসাধারণ চেহারা।'

—'আর কে আছে?'

—'নায়িকা হচ্ছে ম্যাডিসন।'

—'অ্যাঁ, নেওমি ম্যাডিসন? ও তো নাচ গান হৈ-হুল্লোড়ের ছবি করে। আফ্রিকার রোদে ও তো গলে যাবে!

—'আরে রণ্ডা টেরি সঙ্গে থাকছে। সব জায়গায় ম্যাডিসনকে করতে হবে কেন?' স্মিথ বলে চলল, 'আর ওর বাবার ভূমিকায় থাকছে গর্ডন মার্কাস।'

—'মার্কাস তো বেশ বুড়ো হয়ে পড়েছে।' তবু পরিচালকের আপত্তি।

কিন্তু এসব আপত্তি টিঁকল না। পরিচালক হিসাবে টম ওরমানকে থাকতে হচ্ছে, কাজ উদ্ধার করে দিতে হবে যে করে হোক। সমস্যা তো আছেই। কাজের জন্য মোটা পয়সাও তো আছে!

ঠিক হল, লোকজন লট বহর নিয়ে এরা দশ দিনের মধ্যে আফ্রিকায় পাড়ি দেবে। কুড়িটি ট্রাক, পাঁচখানি মোটর গাড়ি আর জনা চল্লিশ লোক থাকছে দলটিতে। শুধু একজন সহকারী পরিচালক জোগাড় করা বাকি।

ওরমান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ছ'মাস কাটালাম বোর্নিওতে। তারপর দশদিন হলিউডে। একটু হাঁপ ছাড়ব ভাবছি, তা নয় ছোট এখন আফ্রিকায়। ফের ছ-মাসের ধাক্কা।'

আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে একটা ছোট্ট নদীর কাদায় বেকায়দায় আটকে গেছে ফিল্মের দলের ন-টন ওজনের ট্রাক। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে শেখ আবেল ঘ্রেলেম ট্রাক তোলার কাজে তদারকি করছে।

ওদিকে নদীর ওপারে গাড়ির মধ্যে বিরক্ত মুখে বসে আছে নায়িকা নেওমি ম্যাডিসন। সঙ্গে আছে রণ্ডা টেরি। তাদের সঙ্গে গল্প করছে অভিনেতা জেরাল্ড বেন। ম্যাডিসন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝেই জ্বর হচ্ছে। ভাগ্যিস টেরি তার মতই দেখতে। এত মিল যে দলের লোকজনেরাই ওদের আলাদা করে চিনতে পারে না। তাই টেরিকে দিয়ে ম্যাডিসনের অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এমন কি মাঝে মাঝে ক্লোজ-আপ দৃশ্যেও ম্যাডিসনের জায়গায় টেরিকে নেওয়া হচ্ছে। জেরাল্ড বেন তাই ম্যাডিসনকে বলছে, 'তোমার তো অনেক কষ্ট কমে গেছে ম্যাডিসন, অত উতলা হচ্ছ কেন?'

ম্যাডিসনের বিরক্তি অসুস্থতার জন্য শুধু নয়, অন্য কারণেও। ও বলল, 'লোকে আমার অভিনয় দেখে অভ্যস্ত, টেরির চলন-বলন ওদের পছন্দ হবে কেন? মাঝখান থেকে আমার বদনাম হবে।'

টেরিও বিরক্তি প্রকাশ করল। বলল, 'আমার এত খাটুনি পোষায় না। লোকে তো আর জানছে না রণ্ডা টেরির অভিনয় দেখছি।'

ফিল্মের গল্পটিতে একটা হীরের পাহাড়ের কথা আছে।

সে জায়গার হদিস জানে একটি মেয়ের বাবা। মেয়েটির ভূমিকায় অভিনয় করছে ম্যাডিসন আর রণ্ডা টেরি। বাবার ভূমিকায় মার্কাস। গল্পে একটি ছেলে আছে যে ঐ বুড়ো বাপকে খুন করে হীরের পাহাড়ের ম্যাপটি হাতাতে চায়। সেই কুচক্রী ছেলেটির ভূমিকায় আছে জেরাল্ড বেন। গল্পে আছে মেয়েটি টের পেয়েছে ছেলেটির মতলব। তাই সে কাগজটা লুকিয়ে রেখেছে।

এখন ঘ্রেনেমের এক সহকারী সঙ্গে রয়েছে, নাম আতেয়ী। কেউই এরা অভিনয়, ফিল্ম স্যুটিং এসব জিনিস জানে না। ঘ্রেনেম আবার ইংরিজিও বোঝে না। আতেয়ী কিছুটা বোঝে। কিছুদিন অভিনয় দেখে ওর বিশ্বাস হয়েছে এই পুরো দলটি আসলে হীরের খোঁজে এত কষ্ট করে আফ্রিকায় এসেছে। দলের একটি ছেলে ঐ মেয়ে দুটির কাছ থেকে কাগজটা হাতাতে চাইছে এসব অভিনয়কে ও সত্যি বলে ভেবেছে। সে-কথা ও ফিস-ফিস করে জানিয়েও দিয়েছে শেখ ঘ্রেনেমকে। ঘ্রেনেম তো রীতিমত উত্তেজিত। সে খালি জানতে চাইছে কোন মেয়েটির কাছে কাগজটা আছে। কিন্তু আতেয়ী কিছুতেই ও মেয়ে দুটিকে আলাদা করে চিনতে পারছে না, এতই ওদের মুখের মিল।

গাড়ি তোলার কাজ চলছে। ম্যাডিসন, টেরি আর বেন গল্প করছে এখনও। শেখ ওদের দেখিয়ে বলে, 'আচ্ছা, ছেলেটা ওদের অত শত্রু অথচ কেমন গল্প করছে দেখ। বুঝি না এই খ্রীস্টানগুলোর মতিগতি।'

আতেয়ীও বোঝে না হীরের ব্যাপারে এত গোপন কথা ওরা কেন এত চেঁচিয়ে বলছে এ ক'দিন। আসলে আতেয়ী স্যুটিং-এর সময় ওদের নিখুঁত অভিনয়কে সত্যিকার জীবনের ঘটনা ভেবে বসে আছে।

দলে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরিচালক ওরমান স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে বড় দুর্ব্যবহার করছে। হাতে মদের বোতল, তিরিক্ষি মেজাজ। স্বভাব না বদলালে ওদের নিয়ে কাজ করা যাবে না। সহকারী পরিচালক প্যাট ওগ্রেডি। জাতিতে ব্রিটিশ। সে দলের মার্কস আর হোয়াইটকে এই কথাই বলছিল। এর মধ্যেই যেন কিরকম একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। স্থানীয় লোকদের হাসি ঠাট্টা গান সব বন্ধ। এটা মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। এমন সময় চলার সঙ্কেত পাওয়া গেল।

ট্রাক উঠে এসেছে কাদা থেকে। গোটা দলটি ধীরে ধীরে আবার এগোতে থাকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ম্যাডিসন।

এ জায়গা তার আর মোটে পছন্দ হচ্ছে না। হলিউডে ফিরে যেতে পারলে যেন বাঁচে।

হঠাৎ সামনের দিকে গুলি ছোঁড়ার শব্দ। চমকে উঠল সবাই! হোয়াইট আর ওগ্রেডি দৌড়লো কি হয়েছে দেখবার জন্যে।

ঐ গুলির শব্দ গভীর অরণ্যে আরো দুটো প্রাণীর কানে পৌঁছল। তাদের একজন মানুষ, আর অপরটি সিংহ। বিশাল শরীরে তার কালো কেশরের মেঘ। মানুষটি গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল সিংহের পেটে মাথা দিয়ে। ঘুমের ব্যাঘাত হতে চটে গিয়ে আপন মনে বলল, 'ফের টারমাঙ্গানিরা বনে ঢুকে উৎপাত করছে। দেখতে হবে ব্যাপারটা কি।' এই বলে পাশ ফিরে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল আবার।

প্যাট ও গ্রেডি আর হোয়াইট ছুটে এসে দেখল ওদের প্রহরীরা একটা ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে। কারা যেন ওখান থেকে এক ঝাঁক তীর ছুঁড়ে পালিয়েছে। সে-তীর গিয়ে বিঁধেছে দলের দুজন কালো মানুষের গায়ে। ওরা কুলির কাজ করত। ওরা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছে!

তীরে মারাত্মক বিষ মাখানো ছিল। চোখের সামনে মৃত্যু দেখে ম্যাডিসন মূর্ছা গেল। ক্যামেরাম্যান বিল ওয়েস্ট ভয়ে বিহ্বল হয়ে দৌড়ে এসে রণ্ডা টেরিকে আগলে রাখল। ওর বিপদ ঘটুক বিল চায় না। ওরমানকে একটু উদ্‌ভ্রান্ত মনে হল। প্যাট ওগ্রেডি ওকে কাছে টেনে বলল, 'ওরমান, মনে হচ্ছে আমরা বানস্যুটোদের দেশে ঢুকে পড়েছি। ওরা চায় না আমরা আর এগোই। এতগুলো লোকের দায়িত্ব তোমার কাঁধে। ভেবে দেখ কি করবে।'

ওরমান মদের গেলাসে চুমুক মেরে বলল, 'কি বলতে চাইছ, ফিরে যাব? ওসব আমায় বুঝিও না।' এই বলে সামনে পিছনে আরো বন্দুকধারী জুতে দিয়ে দলটাকে এগোবার হুকুম দিল।

কে যেন বলল, 'আরে, ওবরস্কি কোথায়? আমাদের সিংহমানব?'

ওবরস্কির আবার ঘুমের নেশা একটু বেশি। অবসর পেলেই যেখানে সেখানে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়। আর একজন তাই বলল, 'এই বিপদেও হয়তো দেখ কোথাও ঘুমিয়ে রয়েছে।'

বলতে বলতে একটা গাড়ির পিছনে তাকে দেখা গেল। রাইফ্‌ল হাতে হেঁটে আসছে। গোপন তীরন্দাজের

খোঁজে গিয়েছিল ও।

ওষুধপত্র দিয়ে ম্যাডিসনের জ্ঞান ফিরে এসেছে কোনরকমে। রণ্ডা টেরি ক্যামেরাম্যান বিলের দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বলল, 'আমি তো তোমাদের নায়িকা নই, নায়িকার ছায়া। আমাকে অমন যত্ন করে আগলাচ্ছ কেন, বিল?'

বিল ওয়েস্ট বলল, 'তোমাকে আমার ভালো লাগে রণ্ডা। আর কারো নয়, তুমি আমার নায়িকা।'

সন্ধ্যা নামে। বিশ্রাম নিতে তাঁবু ফেলল সবাই।

রাত হয়ে এল। চাঁদও ওঠেনি আজ। বিষুবরেখার এ অরণ্যে তাই এ রাত বড় অন্ধকার। আজকের বিষতীরের ঘটনার পর সবার উৎসাহ কেমন যেন দমে এসেছে। ঘ্রেনেমের দলের আরবেরা ঘন বনের দিকে তাকাচ্ছে, কি একটা বিপদের আশঙ্কায়। এদিক ওদিক আগুন জ্বলছে কুলি মজুরদের। সে আগুনগুলোও যেন নিবু নিবু, আশঙ্কায় ম্লান।

ওদিকে কুলি মজুরদের মোড়ল কোয়ামুদি বেঁকে বসেছে। বলছে, 'হুজুর, আমাদের ছুটি দিন। আমরা আর এগোব না। দলের লোকেরা বানস্থটোদের বড় ভয় পায়।'

ওরমান একটু মত্ত অবস্থায় ছিল। ওরা পালাতে চাইছে শুনে চাবুক নিয়ে বেরিয়ে এল। হাঁকল, 'কই কোথায় ওদের মোড়ল! বেটা কালা আদমিগুলোকে চাবকে লাল করব।' শূন্যে চাবুক আছড়াতে লাগল ওরমান।

প্যাণ্ট ওগ্রোডি আর হোয়াইট এসে ধমক দিয়ে চাবুক কেড়ে নিল। বলল, 'এরকম করলে কোনো কাজই হবে না। ওরা তোমার ওপর খেপে রয়েছে।' কড়া ধমক খেয়ে গজ গজ করতে করতে ওরমান তাঁবুতে গিয়ে বসল। ওগ্রেডি চলল দলের লোকজনকে বোঝাতে। অনেক বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের তো কোনমতে ধরে রাখা গেল।

সারা পৃথিবী যেন অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। যে যার তাঁবুতে ফিরে গেছে, শুধু অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে আছে ভীত সন্ত্রস্ত প্রহরীরা। স্ট্যানলি ওবরস্কি চুপি চুপি এসে ঢুকল ম্যাডিসনের তাঁবুতে। টিমটিমে লণ্ঠনের আলোয় ওকে দেখে চমকে উঠে বলল 'কে?'

—'আমি স্ট্যানলি। চুপ, ওরমান টের পাবে।'

—'এস স্ট্যানলি। ওরমানকে এত ভয় পাও কেন?'

স্ট্যানলি বলল, 'লোকটা সুবিধের নয়, একটু সাবধানে চলাই ভাল। রণ্ডাকে দেখছি না?'

—'দেখবে কি করে? বিল ওয়েস্টের সঙ্গে তাস পিটছে। এত কাণ্ডের পরও ওর ফুর্তির কমতি নেই। বেন আর বুড়ো মার্কাসও সঙ্গে আছে।' বলল ম্যাডিসন।

স্ট্যানলি বসল। বলল, 'আচ্ছা ম্যাডিসন, তুমি ওরমানের সঙ্গে অত হেসে কথা বল কেন? জান তো লোকটাকে।'

—'পরিচালকের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব রাখতেই হয় স্ট্যানলি। আমাদের ভবিষ্যৎ ওদের হাতে।'

রাতের স্তব্ধতা চিরে কোথা থেকে একটা সিংহের গর্জন ভেসে এল। সেই সঙ্গে একশো হায়নার অট্টহাসি। ম্যাডিসনের আর কথা বার হল না। বলল, 'স্ট্যানলি, আবার হলিউডে প্রাণ নিয়ে ফিরব তো?'

এমন সময় দৌড়ে ঘরে ঢুকল রণ্ডা টেরি। বলল, 'শীগ্‌গির পালাও স্ট্যানলি, ওরমান বেরিয়েছে।'

—'সে কি, এত রাতে?' বলল স্ট্যানলি। কিন্তু কিছু ভাববার আগেই বাইরে ওরমানের গলা পাওয়া গেল।

—'স্ট্যানলি, তুমি কি করছ এখানে?' ঘরে ঢুকল ওরমান। ওর বাঁকা দৃষ্টি স্ট্যানলি ওবরস্কির দিকে।

স্ট্যানলি বলল, 'এই রণ্ডার খোঁজে গিয়েছিলাম। ওকে তাঁবুতে না পেয়ে এখানে খোঁজ করছি।'

—'চুপ মিথ্যুক'—বলল ওরমান।

হঠাৎ রণ্ডা রুখে উঠল, বলল, 'এখানে তোমার কি চাই ওরমান? বেরিয়ে যাও বলছি!'

—'নেওমির সঙ্গে আমার কথা আছে।' ওরমান বলল কঠোর মুখে।

—'কথা যা বলার সকালে বলবে, এখন যাও।'

ওরমান হাঁকল, 'আমি জানতে চাই স্ট্যানলি কেন আসবে এখানে।'

খানিক রাগ দেখিয়ে, খানিক বুঝিয়ে সুঝিয়ে খ্যাপা ওরমানকে তো বার করে দিল রণ্ডা। এর জন্য কিন্তু ওকে একটুও ধন্যবাদ জানাল না ম্যাডিসন।

ওরমান নিজের তাঁবুতে ফিরল না। বিল ওয়েস্ট তখন শোবার জন্য তোড়জোড় করছে। সেখানে হাজির হয়ে বলল, 'এই যে বিল, স্ট্যানলি দেখছি রণ্ডার খোঁজে ঘুরছে! ওকে মেয়েদের তাঁবু থেকে দূর করে দিয়ে এলাম।'

—'সে কি!' বলল বিল। 'রণ্ডার কাছে স্ট্যানলি?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আর বলছি কি। আমাকে দেখে পালাবার পথ পায় না ব্যাটা।' বলল ওরমান।

বিল ওয়েস্ট চিন্তায় পড়ল। সারারাত প্রায় ঘুমই

হলো না।

সমস্ত দলটা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, রাত যখন গভীর, তখন একটা মানুষ ছায়ার মত নিঃশব্দে এসে হাজির হল। তার গা খোলা, কোমরে শুধু একখণ্ড কাপড়। কখনো গাছের ডালে ডালে, কখনও মাটিতে নেমে সে সবকিছু চুপি-চুপি দেখেশুনে গেল।

ভোরবেলা চায়ের টেবিলে সকলে একটু সহজ হয়ে প্রাণ খুলতে চাইল কিন্তু কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। বিল ওয়েস্ট আর রণ্ডার দিকে তাকাচ্ছেই না। রণ্ডা একটু অবাক হল। দুঃখিতও। যখন খবর এল রাতের অন্ধকারে দলের কুড়িজন কুলি পালিয়েছে তখন আবার অশান্তি নেমে এল। মেজর হোয়াইট ওরমানকে বোঝাতে চাইল ফিরে যাওয়াই ভালো। ওরমান আবার রেগে অস্থির। কোয়ামুদি বিষণ্ণ মুখে বলল, 'হুজুর কি হবে এগিয়ে? দেখছেন তো বানস্থুটোদের ভয়ে এদের ধরে রাখতে পারছি না।'

ওগ্রেডি বোঝাল, 'তোমরা একা এত দূর থেকে ফিরে যেতে চাইলে তো তোমাদেরই বিপদ। বরং আমাদের সঙ্গে থাকলে প্রাণে বাঁচবে।'

এসব বুঝিয়ে তো ফের দলটিকে চালু করা হল। কিন্তু ওগ্রেডি জানত না আর এক বিপদ সমাসন্ন।

সতর্ক প্রহরায় এগিয়ে চলেছে ফিল্মের দল, মাঝে মাঝে জঙ্গল কেটে সাফ করতে হচ্ছে। কালো মজুররা কাজের ফাঁকে একটু আমোদ-আহ্লাদ করত। সে সব বন্ধ হয়ে গেছে। তবে ওরমান ওদের ধরে আর চাবুকপেটা করছে না, এই যা রক্ষে। অভিনেতারা হতোদ্যম। ম্যাডিসন তো মনের জোর সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। তাকে সমানে ভরসা জোগাচ্ছে পরিচালক ওরমান।

বেশ চলছিল ওরা। অনেকক্ষণ পরে যেন দলটাতে অল্প অল্প করে প্রাণ ফিরে আসছিল। হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব শুরু হচ্ছিল এগোনোর ফাঁকে ফাঁকে। হঠাৎ এক বিপর্যয়। ফের সেই বিষ তীর। এবার মেজর হোয়াইটের বুকে। হোয়াইট পড়ে গেল। তার শিকারী জীবনের শেষ। সঙ্গে আরো দুটি কালো মানুষও ঢলে পড়ল তীরের আঘাতে। সমস্ত দলটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। রণ্ডা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে চেঁচাল, 'বিল কোথায়, বিল!' স্ট্যানলি তাকে জোর করে গাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও একটা

ট্রাকের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। কে জানে কখন ছুটে আসে তীর।

তবু এগোতে হবেই। এতদূর এসে ফিরে যাওয়া যায় না। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই বানস্থুটোদের গ্রাম পেরিয়ে যাওয়া যাবে, তখন বিপদের ইতি। মৃতদেহগুলো নিয়ে এগিয়ে চলল ওরা ম্লান মুখে। এত প্রহরী, এত বন্দুক, তবু এই অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে কিভাবে মোকাবিলা করবে তা এরা ভেবে পেল না।

এতক্ষণ শুধু সামনের দিকে আক্রমণ চলছিল। তাঁবু গাড়ার মত একটা জায়গায় পৌঁছেছে, এমন সময় দলের পিছন দিকের তিনজন কালো মজুর মরল। একটা তীর স্বয়ং ওরমানের টুপিতে গেঁথে গেল। কোনো রকমে বেঁচে গেল ওরমান।

দলের সাদা মানুষরাও এখন আশঙ্কায় প্রহর গুনতে লাগল, এর পর কার পালা!

ঘ্রেনেমের দলের আতেয়ী নামে আরবটি ওরমানদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে মনে হবে সে সবার কত আপনজন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য অন্য। এরই মধ্যে সে সকলের অজান্তে নজর রাখছে রণ্ডা টেরি আর নেওমি ম্যাডিসনের ওপর।

সেদিন রণ্ডা শেষ বিকেলের আলোয় বসে ডায়েরি লিখছে। গর্ডন মার্কাস এগিয়ে এল। মজা করে বলল, 'কি এত কাব্য করছ? আবার লেখকও হতে চাও?'

রণ্ডা হেসে বলল, 'ডায়েরি লিখছি, এ কাজটা ফেলে রাখি না।' এই বলে সে একটা ময়লা কাগজ মেলে দেখাল। একটা ম্যাপ। জো নাকি এই ম্যাপটা একটা পুরোন বইয়ের দোকান থেকে কেনা একটা বইয়ের পাতার মধ্যে পেয়েছে। তাতে আফ্রিকার বনে এক উপত্যকার সন্ধান দেওয়া রয়েছে। সেখানে আছে রাশি রাশি হীরে। সে ম্যাপটা দেখেই কল্পনার এই ফিল্মের গল্পটা লিখে ফেলেছে জো।

মার্কাস যখন ম্যাপটা দেখছে তখন আতেয়ী যেন কিসের গন্ধে গন্ধে ওদের কাছাকাছি ঘুর ঘুর করতে লেগেছে। ছেলেমানুষী ম্যাপটা দেখে হেসে ফেরত দিল মার্কাস। তারপর অন্য কথা বলল, 'আচ্ছা রণ্ডা, বিলের কি হলো বল তো? তোমার কাছে ঘেঁসছে না মোটে।'

রণ্ডা বলল, 'আমিও বুঝছি না ব্যাপারটা কি।' এই বলে চুপ করে রইল ও।

মৃতদেহগুলো কবর দেওয়া হবে। অন্ধকার হলে মাটি

খোঁড়া হলো। একদিকের মাটি তুলে এমন ভাবে উঁচু করে রাখা হলো যেন মনে হয় ওখানেই আছে কবরগুলো। আসল জায়গায় যেখানে মেজর হোয়াইট আর কুলি দুজনকে শোয়ান হলো সেখানে মাটি বুজিয়ে তার ওপর দিয়ে গাড়ি ও দলবলকে চালিয়ে মাটি সমান করে দেওয়া হলো। বানস্থটোরা বুঝবেই না মৃতদেহগুলো কোথায়।

ম্যাডিসন এগিয়ে এল রণ্ডার কাছে, বলল, 'রণ্ডা, আমি এখানে মরলে কিন্তু হলিউডে নিয়ে কবর দিও।' শোক সামলাতে পারছে না ম্যাডিসন।

ওরমানও মূহ্যমান। চুপচাপ শুয়ে আছে একা। ওগ্রেডি ওর পাশে গিয়ে বসল। ওরমানের চোখে জল। বলল, 'ওগ্রেডি, ফুর্তির আর প্রয়োজন নেই, আমি আর মদ ছোঁব না।' ও মদের গেলাস আছড়ে ভেঙ্গে ফেলল।

বাইরে বিকট একটা গর্জন উঠল। সিংহ ডাকছে দূর বনে। তারপর একটা অদ্ভুত আওয়াজে বন প্রান্তর কেঁপে উঠল। কাঁটা হয়ে গেল সকলে। যেন এক ভীষণ প্রেতের উল্লাস।

এ আওয়াজ টারজানের শিকার মেরে জয়ধ্বনি! বনমানুষদের ঐ নিয়ম।

পরদিন আবার এক বিপর্যয়। বিল সকালবেলা আবিষ্কার করল রান্নার লোকজন সব পালিয়েছে। দেখেশুনে ওরমান চুপ করে রইল। লোকজনকে ভরসা দেবার যেন আর ভাষা নেই। মনে মনে তবু সে উদ্যম হারাল না। ঠিক করল বানস্থটোদের গ্রামটা একবার পার হলেই হয়। অন্য গ্রাম থেকে আবার নতুন লোকজন জোগাড় করে নেবে। কিন্তু এর মধ্যে একজনকে যে রান্নার ভার নিতে হবে। কে নেবে?

রণ্ডা এগিয়ে এল। ওবরস্কিও এক কথায় রাজি। নেওমিও সাহায্য করবে ওদের। বিপদের সময় এই বন্ধুত্ব ও একতাই তো দরকার। মনোবল ভাঙলে চলবে কেন?

সবাই এগিয়ে চলল। বন ছেড়ে পুরো দলটা একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল। সবাই ভাবল এবার বুঝি মুক্তি। কিন্তু তা হবার নয়। এতক্ষণ জঙ্গলের আড়ালে ছিল শত্রুরা। এবার খোলা জায়গায় হঠাৎ তাদের আত্মপ্রকাশ। পিছনের ট্রাকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে পড়ল। হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে বানস্থটোরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভীষণদর্শন সব চেহারা, রাগে আর হিংসায় যেন ফেটে পড়ছে। ট্রাক ড্রাইভার ঢলে পড়ল তীরের ঘায়ে। প্রহরীদের রাইফেলের আওয়াজে বন কাঁপতে লাগল। রণ্ডার রিভলবারও গর্জন করল কয়েকবার। মৃত ড্রাইভারের হাতের চলন্ত ট্রাক হুড়মুড় করে বুনোদের ওপর গিয়ে পড়ল। ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল বটে তবে ওরমানের দলের অনেকেই জখম। কোন রকমে আহত মানুষগুলোকে নিয়ে এগোতে হল কারণ সামনে অনেকটা শুকনো ঘাসের জমি।

ওগ্রেডি বলল, ওতে ওরা আগুন লাগিয়ে দিলে আর এক পা-ও এগোন যাবে না। অনেকটা এগিয়ে খতিয়ে দেখা গেল বেন মারা গেছে। নয়েস বলে আর একজনও শেষ। তিনজন আরব প্রহরী সমেত মোট বারোজন মৃত। কিন্তু ওবরস্কি কোথায়?

ওগ্রেডি বলল, 'জংলীদের তাড়া খেয়ে ওকে প্রাণপণে জঙ্গলে ছুটতে দেখলাম। গণ্ডগোলের মধ্যে। তারপর তো আর জানি না কি হয়েছে।'

ওরমান তাই শুনে ব্যস্ত হয়ে চলল জঙ্গলে। স্বয়ং নায়ককে যে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। পিছনে চলল জনা বারো প্রহরী। কিন্তু ঘন অরণ্যে নায়ককে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

রাতের খাবার টেবিলে কারো মুখে কথা নেই। ম্যাডিসন নিজের হাতে ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে আজ। তবু সবাই বিমর্ষ।

স্ট্যানলি বড় ঘাসের জমি ভেদ করে অন্ধের মত ছুটেছিল। ওর পিছনে তাড়া করে আসছিল কটা জংলী বানস্থটো। হঠাৎ তার সামনে পড়ল আর এক বিকটাকার যোদ্ধা। হাতে ছোরা, মারমুখো চেহারা। স্ট্যানলিকে চেপে ধরল সে খপ্ করে। প্রাণভয়ে পালাতে হয়েছে বটে, স্ট্যানলি কিন্তু সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। লড়াইয়ের প্যাঁচ তারও জানা আছে। লোকটাকে এক ঝটকায় ধরাশায়ী করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখে পাঁচ-ছজন তাকে ঘিরে ফেলেছে। বানস্থটোরা ওকে বন্দী করে ওদের রাজার সামনে নিয়ে এল।

রাজার বিরাট চেহারা। খালি গা, কোমরে জানোয়ারের ছাল জড়ানো। এক হাতে মস্ত ঢাল, অন্য হাতে ধারালো বর্শা। সারা গায়ে নানা অলঙ্কার। মুগ্ধ চোখে স্ট্যানলিকে দেখে ও কি সব আদেশ করল। মনে হলো স্ট্যানলির এক্ষুণি কোন ক্ষতি করবে না। ওর হাত বেঁধে গলায় দড়ির ফাঁস দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল ওরা।

গলায় টান পড়ে মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসছিল

স্ট্যানলির।

ওরা একটা গ্রামে ঢুকল। অবাক হয়ে দেখছে সবাই ওকে। বাচ্চারা ধুলো, পাথর গায়ে ছুঁড়ে মারছে মজা করে। সব সহ্য করে এগিয়ে চলল স্ট্যানলি ওবরস্কি, হলিউডের নতুন তারকা।

একটা অন্ধকার ঘরে ওকে বন্ধ করে রাখা হল। ও দেখল অন্ধকারে আরো তিনজন বন্দী নড়াচড়া করছে। তাদের একজন বলল, 'হে সিংহমানব, তোমায় ওরা ধরল কখন?'

আরে, এ যে কোয়ামুদির গলা! ওরমানের দলের কোয়ামুদিও ধরা পড়েছে! সঙ্গে আরো দুজন লোক।

কোয়ামুদি ফিস-ফিস করে জানাল, 'ওরা নরখাদক। ওদের ধারণা শক্তিশালী মানুষ খেলে ওদের দেহে শক্তি বাড়ে। তবে ওঝা ডেকে দিনক্ষণ বুঝে তবে খায়।'

কোয়ামুদি যেমন ইংরিজি জানে, তেমনি বানস্থুটোদের ভাষাও বোঝে। স্ট্যানলি তাই ওকে বলল, 'ওদের বল বাঁধনগুলো খুলে দিতে। বড্ড লাগছে।'

কোয়ামুদিরও একই অবস্থা। বলল, 'বলে কোন লাভ নেই।'

গ্রামে তখন রান্নার আগুন জ্বলছে। সদ্য এই যুদ্ধের পর রাতের অরণ্যে মেয়েদের কান্নার রোল উঠেছে। ওদের অনেক যোদ্ধাই আজ ঘরে ফেরেনি। তবু যুদ্ধে তো জয় হয়েছে! তাই বিলাপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নাচও শুরু হলো। ওদের খালি গায়ে ছাই মাখা। কালো কালো দেহগুলো যেন আরো বীভৎস হয়ে উঠেছে। ক্ষিধেয় তেষ্টায় স্ট্যানলি অবসন্ন। এক ফোঁটা জলও দিল না তাকে কেউ! নাচের তালে, কান্নার সুরতরঙ্গে বানস্থুটোদের গ্রামে তখন উৎসব জমে উঠেছে।

ওদিকে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছিল স্ট্যানলি। কোয়ামুদি জানে সবল মানুষটা বাঁচল কি মরল তাতে কিছু এসে যায় না। ওরা সেই জ্যান্ত কি মরা মানুষের ফুসফুস ছিঁড়ে খায়। ওর পায়ের গোড়ালি আর হাতের পেশি খেলে ওরা সেই মানুষটির মতই শক্তিশালী হবে, এই ওদের বিশ্বাস।

দলের বিপদ এসে ম্যাডিসনের সব অহঙ্কার ভুলিয়ে দিয়েছে। সবার সঙ্গে ও হেসে কথা বলছে। সবার সুবিধা অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করছে, রেঁধে খাওয়াচ্ছে পর্যন্ত। স্ট্যানলি ওবরস্কির কোন খোঁজ নেই। ওরা ধরেই নিয়েছে স্ট্যানলি মৃত। বানস্থুটোদের দৃষ্টি এড়িয়ে ও যে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না তা সবাই জানে। কেউ কেউ মন্তব্য করল স্ট্যানলি জংলীদের ভয়ে বড় কাপুরুষের মত পালিয়ে মৃত্যু বরণ করল।

লোকবল কমে এসেছে। শব্দযন্ত্রী মৃত, নায়ক নিখোঁজ। কি করে ছবি তোলার কাজ হবে। ঘ্রেনেম জানাল সে তার দলবল নিয়ে ওরমানের সঙ্গে থাকবে; এই বিপদে ছেড়ে যাবে না। ওরমান ওর বদান্যতায় খুব খুশি। জানল না এর পিছনে ধূর্ত আরবটির স্বার্থ-বুদ্ধি ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর সেই রাত্রেই আমেরিকানদের শিবিরে একটা গোপন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঘ্রেনেমের দল। কেউ টের পেল না। সকালে উঠে মার্কাস দেখল দলের ঘোড়াগুলো নেই।

সকলকে ডেকে তুলে খবর করতে গিয়ে দেখা গেল ম্যাডিসন আর রণ্ডার খোঁজ নেই। বুঝতে কারো বাকি রইল না আরবরা ওদের চুরি করেছে। ওরমান তো হতবাক। বলল, 'আমি খুঁজতে বার হব। হয়তো কিছু টাকা আদায়ের ফিকির খুঁজছে ঘ্রেনেম। সে টাকা দিয়ে উদ্ধার করে আনব মেয়েদের।'

ওগ্রেডি আর বিলও চলল ওর সঙ্গে। ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখে ওরা এগোল। বিপদ-আপদের কথা তখন ওদের মনে নেই।

স্ট্যানলির আর অত্যাচার সইছে না। এর চেয়ে মৃত্যুই ভালো। সকাল হয়ে গেছে। হাত-পায়ের বাঁধন একটুও আলগা করেনি কেউ। কেউ দেয়নি এক ফোঁটা খাবার কিংবা জল। খিদে, তেষ্টা, যন্ত্রণা, অবজ্ঞার অপমানে কান্না পেল স্ট্যানলির। অনেক রাত অবধি উৎসব চলেছে, তাই তখনও

ঘুম ভাঙ্গেনি জংলীদের। স্ট্যানলি আর কোয়ামুদি চিৎকার করে ওদের ঘুম ভাঙ্গাতে চাইল। দরজায় একটা প্রহরী বসে ঢুলছিল। ধড়ফড় করে উঠে বসল। চোখ কচলে নিয়ে বলল, 'চেঁচালে জিব কেটে নেব, বদমাশ কোথাকার।'

কোয়ামুদি বলল, 'আমাদের কিছু খেতে দাও।'

কথাটা গ্রাহ্য না করে সে আবার ঘুমে ঢুলে পড়ল।

দুপুরের দিকে ওদের ঘুম ভাঙ্গল। কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ল গ্রামখানি। স্ট্যানলি, কোয়ামুদি আর দু'জন বন্দীকে ওদের রাজা রেঙ্গুলার কাছে নিয়ে চলল ওরা। রেঙ্গুলা বসে আছে চারদিকে যোদ্ধা নিয়ে। কোয়ামুদির মাধ্যমে রাজা স্ট্যানলির কাছে জানতে চাইল, 'তুমি এ বনে কি করতে এসেছ?'

স্ট্যানলি কোয়ামুদিকে বলল, 'ওকে বুঝিয়ে বল এমনিই এসেছি, কোনো ক্ষতি করতে নয়। আমরা মুক্তি চাই।'

কোয়ামুদি সে কথা বুঝিয়ে দিলে। রেঙ্গুলার মুখে চাপা হাসি খেলে গেল।

ও জানাল রাজার ওপর কথা বলার বা মত দেবার অধিকার কারও নেই। ও যা বলবে তাই হবে। সাদা মানুষকে ও মারবে। নেহাৎ স্ট্যানলির বড়ো সুগঠিত, সুন্দর চেহারা। তাই এতদিন মারেনি। ও এগিয়ে এসে স্ট্যানলির জামা কাপড় জুতো হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল। জানাল, এগুলো ওর চাই। স্ট্যানলির হাত দুটো মুক্ত করা হল যাতে ও এগুলো খুলে দিতে পারে। জামা-কাপড় জুতো সব খুলে দিতে হল। শুধু জংলীদেরর মতো একখণ্ড কাপড় পরতে দেওয়া হল স্ট্যানলিকে।

কিছুদিন পরে বনে ঢাক বেজে উঠল। একজন বন্দীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল ওরা। সমবেত কণ্ঠের উল্লাস আর সেই সঙ্গে আর্ত চিৎকারের শব্দ শুনে স্ট্যানলি বুঝল হত্যা-লীলা সাঙ্গ। পরের দিনও একজনকে মেরে ওদের ঢাক-ঢোল বাজিয়ে উৎসব হল। স্ট্যানলির দিন ঘনিয়ে এল। ও ভাবছে ওর দেশের কথা, ম্যাডিসনের কথা। ম্যাডিসন কি ওর কথা এখনও ভাবছে? দুঃখে চোখে জল এল স্ট্যানলির।

পরের দিন একসঙ্গে দুই বন্দীকে নিয়ে গেল ওরা। কোয়ামুদি আর স্ট্যানলি। দুজনকে মুখোমুখি বাঁধা হল গাছের সঙ্গে। স্ট্যানলির চোখের সামনে কোয়ামুদির ধড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে দিল ওরা। আর সে কি উল্লাস ওদের। স্ট্যানলি দেখল সব। প্রস্তুত করল নিজের মনকে। সেদিন কিন্তু স্ট্যানলিকে মারা হল না বিভীষিকা সৃষ্টি করে, মনে কষ্ট দিয়ে ধিকিয়ে ধিকিয়ে মারতে চায় ওকে। ওতেই ওদের আনন্দ। স্ট্যানলি মনে মনে কঠোর হল। মৃত্যুবরণ করবে তবে ভয় প্রকাশ করবে না। ও যত ভয় পাবে, হতাশা আর বেদনায় ভেঙ্গে পড়বে, ততই ওদের আনন্দ বাড়বে।

পরদিন দুপুরে খুনের দল ওকে নিতে এল। ও চলল হাসিমুখে। ও ঠিক করেছিল পালানো যখন অসম্ভব প্রতিশোধ একটা নিতেই হবে।

টারজান কদিন ধরেই বানসুটোদের টমটম বাদ্যের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। মনে মনে কৌতূহলী হয়ে উঠল ও। ব্যাপারটা কি দেখতে হবে। এর আগে ওরমানের দলের সঙ্গে বানসুটোদের যুদ্ধ ও সবই দেখেছিল। কোন পক্ষকেই ও সমর্থন করতে পারেনি। ওরমান কালো মানুষকে পেটায়, ও জানে। ওরমানের দলের প্রতি ও সদয় হবে কি করে?

সন্ধ্যের অন্ধকারে টারজান পৌঁছাল বানসুটোদের গ্রামে। দেখল একজন সাদা মানুষকে বন্দী করে আনা হচ্ছে। ওকে হত্যা করা হবে। সারা গ্রাম ভেঙ্গে পড়েছে তা দেখার জন্যে। টারজান চুপিসাড়ে গ্রামে ঢুকল। একটা গাছের আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করতে লাগল। অবাক হল, সাদা মানুষটার চেহারা ঠিক তারই মত। এ যেন আর এক টারজান! স্ট্যানলির হাতের বাঁধন সবে খোলা হয়েছে, ও হঠাৎ লড়ে গেল। একজনকে ধরে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিল ও। আরো কয়েকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেধড়ক পেটাল। হতচকিত হয়ে প্রথমটা ওরা মার খেল। সবাই তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে মাটিতে শুইয়ে ফেলল।

ওদিকে আয়াদ নামে ব্রেনেমের দলের আরবটি বলছে, 'ম্যাপ তো পেয়ে গেছি, মেয়ে দুটোকে না আনলেই হোত।'

আতেয়ী বলল, 'দূর বোকা, হীরের পাহাড় যদি শেষ পর্যন্ত না পাই তবে খালি হাতে দেশে ফিরব কেন?'

আয়াদ কিন্তু মনে মনে জানে এতে বিপদের আশঙ্কা আছে। সে চুপ করে রইল।

আতেয়ী বলল, 'তাছাড়া ম্যাপের ভাষা ভালো করে বুঝতে এদের দরকার।'

ম্যাডিসন আর রণ্ডাকে চুরি করে ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে যেতে যেতে এসব কথা হচ্ছিল।

ম্যাডিসন বলছে, 'আর পারছি না রণ্ডা।'

রণ্ডা কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি। বলছে, 'আমার কাছে ঘেঁসে

এস, তাহলে আর পড়বার ভয় থাকবে না।'

ওরা জানে না কি আছে ওদের কপালে। হয়তো কালো সুলতানের কাছে ওদের বিক্রি করবে এরা। সারাটা জীবন দাসী-বাঁদি হয়ে কাটাতে হবে।

আরব লুঠেরারা তাঁবু ফেলল সেদিনের মতো। ঘ্রেনেম জানে দলের সাদা মানুষগুলো ওদের ধাওয়া করতে পারে। তবে অনেকটা এগিয়ে এসেছে তাই নিশ্চিন্ত। সাদা মানুষ-গুলোকে আসতে হবে পায়ে হেঁটে। রাত্রিতে আর এগোনো যাবে না। ঘ্রেনেম যখন ম্যাপটির বিষয়ে উৎসাহী বেশি। ওটার পাঠোদ্ধার করা প্রয়োজন। কাজ শুরু করতে হবে। হীরের পাহাড়ে একবার পৌঁছতে পারলে হয়। তারপরেই এক স্বপ্নের বিলাসবহুল দিন—রাশি রাশি উট কিনবে, দামী দামী ঘোড়া। তাকে তখন আর পায় কে।

আলোর সামনে কাগজটা মেলে ধরল শেখ ঘ্রেনেম।

রণ্ডার ডাক পড়ে। আতেয়ীর মাধ্যমে ঘ্রেনেম জানতে চায় হীরের খোঁজ।

রণ্ডা তো অবাক। কোথায় হীরে? এ ম্যাপটার কি মূল্য আছে? এ তো খেয়ালী কল্পনা। কিন্তু কে বুঝবে সে কথা। ঘ্রেনেম বিশ্বাসই করে না। আতেয়ী বলল, 'না বললে গলা টিপে মেরে ফেলা হবে। কেউ জানবে না।'

রণ্ডা দেখল মহা বিপদ। এই গবেটগুলোর হাতে পড়ে প্রাণ যায় আর কি! ও গম্ভীর মুখে ম্যাপ খুলে বোঝাতে বসল।—এই গ্রানিট পাহাড়, এই নদী, এই দক্ষিণ পুব দিক, এইখানে জলপ্রপাত·····শঙ্কুআকৃতি আগ্নেয় পাহাড়··· হীরের উপত্যকা। রণ্ডা এত সুন্দরভাবে চটপট বুঝিয়ে দিল যে ঘ্রেনেম ঠিক করে ফেলল হীরে নিয়ে দেশে ফিরে, রণ্ডাকে ও কিনে রাখবে।

কিন্তু রণ্ডা পালাতে চায়। যে করে হোক। রাত বাড়তে ও ম্যাডিসনকে সেই কথা বলল!

ম্যাডিসন বলল, 'এই জঙ্গলে, একলা? সিংহ খাবে যে!'

রণ্ডা বলল, 'তাহলে ওদের সঙ্গেই থাক। সুলতানের কাছে বিক্রি হবে। আমি জানোয়ারের চেয়ে সুলতানকে ডরাই বেশি।'

অন্য তাঁবুতে আতেয়ী আর আয়াদের মধ্যে তখনও কথাবার্তা চলছিল। ক্রমে রাত বাড়ে। সবাই ঘুমে অচেতন হলো। রণ্ডা তখন আগুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে ঘুমন্ত প্রহরীর সামনে দাঁড়াল।

ওদিকে ওরমান বিল অনেকটা এগিয়ে ঘোড়ার পায়ের

দাগ স্পষ্ট করে আর দেখতে পেল না। একটা ছোট নদীর ধারে এসে দাগ হারিয়ে গেছে। নদীর ওপারেও দাগের কোন চিহ্ন নেই, সঙ্গের খাবার-দাবারও শেষ! কিন্তু বিল ওয়েস্ট বদ্ধপরিকর, ও রণ্ডাকে না নিয়ে ফিরবে না।

জানোয়ারদের একটা পায়ে-চলা পথের দাগ ধরে এগোল ওরা। কোথায় যাচ্ছে কিছুই জানে না। বিল যেন একটু অস্বস্তিতে পড়েছে। দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'কি রকম একটা আওয়াজ শুনছি মাঝে মাঝে! কোন জন্তু পিছু নিয়েছে মনে হচ্ছে।' আশেপাশে ছোটখাটো অথচ ঘন ঝোপ জঙ্গল। ওরা সজাগ হয়ে বন্দুক তুলে ফের চলতে লাগল। এক জায়গায় জঙ্গলের শেষ। খোলা প্রান্তরে যেই এসে পড়েছে অমনি বেরিয়ে এল একটা সিংহ। ওরা থমকে দাঁড়াল। সিংহটা ক্ষুধার্ত। একদৃষ্টে দেখছে ওদের। বিল বন্দুক ছুঁড়ল তাড়াহুড়ো করে। সিংহের গায়ে অল্পের জন্য লাগল না। প্রচণ্ড আক্রোশে লাফ দিল জন্তুটা। একটা সাদা, গা-খোলা মানুষ কোথা থেকে সেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংহের ঘাড়ে। গলা জাপটে পেট আঁকড়ে ধরল। তারপর এক হাতে ছুরির ফলা আমূল বিঁধিয়ে দিল সিংহের বুকে। শূন্যে লাফিয়ে আছড়ে পড়ল সিংহটা। প্রচণ্ড গর্জনে দিক্ বিদিক্ কাঁপিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

সাদা মানুষটা আর কেউ নয়, স্বয়ং টারজান। মরা সিংহের গায়ে একটা পা তুলে দিয়ে মুখে তীব্র জয়োল্লাস তুলল সে। হাড় হিম-করা সে আওয়াজ! এ আওয়াজ বিল আর ওরমান আগেও শুনেছে। এবার স্বচক্ষে দেখল মানুষটাকে। এ যে ওবরস্কি! টারজান ততক্ষণে চোখের নিমেষে উধাও।

স্ট্যানলি ওবরস্কি তাহলে বেঁচে আছে? ওরমান বলল, 'হ্যাঁ, প্রেত হয়ে। দেখলে না ওর চেহারা।'

এদিকে বানসুটোদের গ্রামে আর এক নাটক জমে উঠেছে। স্ট্যানলিকে বুনোরা ফের বেঁধে ফেলেছে। এখনই কুপিয়ে মারা হবে। তারই তোড়জোড় চলছে। এমন সময় এক দড়ির ফাঁস নেমে এল অন্ধকার থেকে। সেই ফাঁস শক্ত করে গেঁথে গেল ওদের রাজার গলায়। তারপর এক হ্যাঁচকা টানের সঙ্গে সঙ্গে রাজা উধাও। টারজান দড়ি দিয়ে রাজাকে টেনে এনে গাছের ডালে ঠেসে ধরল। রাজার গলা দিয়ে শুধু অস্ফুট আওয়াজ বার হল—'ওয়ালাম্বু!' অর্থাৎ মৃত্যুর দেবতা।

টারজান বলল, 'না, ওয়ালাম্বু নই, ভাল করে দেখ

আমায়। আমার এক ভাগ মাটিতে এক ভাগ গাছে।'

রাজা দেখে তো অবাক—মাটিতে দাঁড়ান বন্দী সাদা মানুষটির আরেকটি মূর্তি যেন গাছের ওপর তাকে দড়িতে বেঁধে ধরে আছে। ও থরথর করে কাঁপতে লাগল।

টারজান বলল, 'নিজের দুটো চেহারা নিয়ে আমি পরীক্ষা করছিলাম। নির্দোষ সাদা মানুষের ওপর তোমার অত্যাচার দেখলাম। তোমায় কড়া শাস্তি পেতে হবে।' তবে টারজান ওকে ছেড়ে দেবে যদি ও প্রতিজ্ঞা করে ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে না।

ঘন পাতার আড়াল থেকে নিচে হতচকিত মানুষগুলোর মাঝে ভয়জড়িত আওয়াজ ভেসে এল—'বন্দীকে মুক্ত কর। সাদা মানুষকে মেরো না।'

ওরা বুঝল এ রাজার কণ্ঠস্বর। আর স্ট্যানলি শুনল একটা স্পষ্ট কণ্ঠস্বর, ইংরেজিতে বলছে 'চলে এসো, আমি সঙ্গে আছি।'

মুক্ত হয়ে স্ট্যানলি এগিয়ে চলল। সামনে চলেছে জঙ্গলের আবছা আঁধারে আর একটি মনুষ্যমূর্তি, সে টারজান। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকে অনুসরণ করে চলল সে নরখাদকের গ্রাম ছেড়ে। কে লোকটি? কেন বাঁচাল তাকে?

অনেক দূরে গিয়ে ঘন বনে সামনের মানুষটি দাঁড়াল। একটা সিংহ আর একটা সিংহী এসে জুটেছে কোত্থেকে। স্ট্যানলি তো ভয়ে কাঠ। লোকটা সিংহটার সঙ্গে কি সব কথা বলল, সিংহটার নাম নাকি জাদবালজা। 'ইয়ো টারমাঙ্গানি, জাদবালজা, তাঁদ বাণ্ডোলো'—

জন্তুর সঙ্গে কথা! উন্মাদের প্রলাপ। ওমা, সিংহটা তাই শুনে লেজ নাড়তে লাগল!

টারজান বলল, 'ভয় নেই, আর কিছু বলবে না তোমায়। তবে সিংহীটা নতুন জুটেছে ওর সঙ্গে। একটু সাবধানে থাকতে হবে।'

*

এই প্রথম স্ট্যানলি ভালো করে দেখল লোকটিকে। একি সেই টারজান, যার কথা শুনেছে নানা গল্পে? সত্যিই টারজান আছে? তারপর অবাক হল, একি, তার চেহারার সঙ্গে ওর নিজের এত মিল! টারজান হাসছে, বলছে, 'আমরা একরকম দেখতে, তাই না? সেই জন্যেই তো বাঁচালাম তোমায়।'

ওবরস্কি বলল, 'আলাদা দেখতে হলেও তুমি বাঁচাতে, আমি জানি।'

ওরা দুজন ঘাসের ওপর শুল, পাশাপাশি। টারজান শুনল ওবরস্কি সেই ফিল্ম দলের লোক। বলল, 'তোমাদের ঐ লোকটি বড় খারাপ।'

—'কোন লোকটি?' জানতে চায় ওবরস্কি।

—'ঐ যে কথায় কথায় চাবুক মারে কালো মানুষগুলোকে।'

ওবরস্কি বুঝল ওরমানের কথা বলছে টারজান। ও চুপ করে রইল।

সিংহ দুটো শিকারে চলে গেছে। স্ট্যানলি ওবরস্কি ভাবছে তার দলের কথা, ম্যাডিসনের কথা। বড় দেমাক ম্যাডিসনের। কি জানি কোথায়, কি করছে এখন সে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল স্ট্যানলি।

রণ্ডার এক ঘায়ে আরব প্রহরী কাত। ম্যাডিসনকে জাগিয়ে, ঘোড়া খুলে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়তে সামান্য দেরি হল। অন্য ঘোড়াগুলোকেও ছেড়ে দিল যাতে স্রেনেমের দল ঘোড়ায় চড়ে তাড়া না করতে পারে। এসব কাজে অনভ্যস্ত ওরা। ঘোড়াগুলোও বিরক্তিতে একটু আধটু গণ্ডগোল করল। ওরা বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু ততক্ষণে আরবেরা টের পেয়ে ওদের পিছু নিয়েছে।

তারায় ভরা পরিষ্কার আকাশ। পিছনে আরবরা ধাওয়া করে আসছে। ওদের হুঙ্কার শুনতে পাচ্ছে রণ্ডা আর ম্যাডিসন। একটা গুলি ঘোড়া দুটোর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এত কাছে এসে পড়েছে ওরা। ভয় পেয়ে ঘোড়া দুটো ফাঁকা পথ ছেড়ে ঘন বনে ঢুকে পড়ল।

জঙ্গল ভেদ করে ছুটে চলেছে দুটি মেয়ে নিচু ডালপালায় ধাক্কা খেতে খেতে। ম্যাডিসন বেচারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। কিছুক্ষণ চলার পর আরবদের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। হয়তো ওদের হাত থেকে এ যাত্রা বাঁচা গেল। রণ্ডাকে ধন্যবাদ জানাল ম্যাডিসন। মনে আর এই মেকি অহঙ্কার পুষে রাখবে না সে। মন খুলে সবার সঙ্গে মিশবে। হলই বা সে হলিউডের বিখ্যাত তারকা।

সামনে একটা নদী পড়ল। খুব গভীর নয়। ভয় হল এই বুঝি ঘোড়া সমেত সলিল সমাধি ঘটে! না, দিব্যি ওপারে গিয়ে উঠল ওরা। আরো আশ্চর্য, দূরে একটা আগ্নেয় পাহাড়, ঠিক ম্যাপে যেমন আছে!

রণ্ডা অন্য ঘোড়াগুলোও এ পারে আনতে চায় যাতে আরবরা ঘোড়াগুলোর খোঁজ না পায়। কটা ঘোড়াকে পার করে এনেছে, এমন সময় একটা সিংহ কোত্থেকে

ঝাঁপিয়ে পড়ল। ম্যাডিসন ভাগ্যিস ঘোড়া থেকে নামে নি। ওর ঘোড়াটা ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগল। রণ্ডা সবে ঘোড়ায় উঠেছে সে-সময় ওটার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংহটা। রণ্ডা ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারাল। অন্য ঘোড়াগুলো ভয়ে দিশেহারা হয়ে জল পেরিয়ে ছুটল। সিংহটা রণ্ডার ঘোড়াটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল।

বিল ওয়েস্ট আর টম ওরমান তাদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা ভাবছে। ওদের বিশ্বাস, স্ট্যানলি বুনোদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে ভয়ে, উৎকণ্ঠায় উন্মাদ হয়ে অমন বেশ ধারণ করেছে। তার দেহে অস্বাভাবিক শক্তিও এসেছে এই উন্মত্ততা থেকে। অস্বাভাবিক ঘটনায় মানুষের মন ও শরীরের নানা বিচিত্র গতি হয়ে থাকে।

এরপর আরো দু'সপ্তাহ কেটে গেছে। রণ্ডা বা ম্যাডিসন কারো খোঁজই ওরা পায়নি। ঘুরতে ঘুরতে একদিন হঠাৎ আয়াদকে ওরা দেখতে পেল। দেখে চিনল, ও ঘ্রেনেমের দলের লোক। কিন্তু ওর অমন চেহারা হলো কি করে? উস্কোখুস্কো চুল, দুর্বল চেহারায় বসে বসে ধুঁকছে একটা নদীর ধারে। সামনে আগুন জ্বলছে। ওরা বন্দুক তুলে আচমকা হাজির হলো। আয়াদ চমকে উঠল কিন্তু বন্দুক তুলতে সময় পেল না, হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল ম্লান মুখে। আয়াদ ইংরেজি জানে না, হাত পা নেড়ে মুকাভিনয় করে কোনমতে বুঝিয়ে দিল 'বেনাত' অর্থাৎ মেয়েরা ভীষণ বিপদে পড়েছে। ওরা পিছু ধাওয়া করেছিল। শুনেছে সিংহের কবলে পড়েছে একটি মেয়ে। তবে সে মেয়েটি রণ্ডা না ম্যাডিসন তা বোঝাতে পারল না। অন্য মেয়েটিও হয়তো মরেছে। ওর কথায় আন্দাজ করা গেল ঘ্রেনেম আর তার দলবলের চরম সর্বনাশ ঘটেছে। আয়াদ কোনরকমে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে এসেছে।

স্ট্যানলি বসে আছে টারজানের সঙ্গে। রাতের বনে কত যে অভিজ্ঞতা হলো তার। সেই সিংহ দুটো একটা হরিণ মেরে ভোজ সারছিল। ক্ষুধার্ত হায়নার দল আশে-পাশে জুটেছে যদি মাংসের ভাগ পাওয়া যায়। একটা হায়না পিছন দিয়ে চুপিচুপি হরিণটার দিকে এগোতে সিংহটা ঝাঁপিয়ে পড়ে এক থাবায় ওটাকে শেষ করল। অমনি দলের একটা হায়না রেগে গিয়ে টারজানের দিকে তেড়ে এল। টারজান ক্ষিপ্রগতিতে এক পাশে সরে গিয়ে অদ্ভুত কায়দায় হায়নাটার ঘাড় পাকড়ে ধরল খপ করে। বার দুই সেটাকে শূন্যে দুলিয়ে ছুঁড়ে দিল সিংহের দিকে।

সব দেখল ওবরস্কি। ওকে চিন্তান্বিত দেখে টারজান পাশে এসে বসল, বলল বিল আর ওরমানকে ও দেখেছে ওরা উত্তর দিকে গেছে। ঐ দিকে একটা আরবকেও দেখেছে টারজান।

ওবরস্কি বুঝল ওরমানের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। তবু টারজানের কাছে ভরসা পেল। টারজান আশ্বাস দিয়ে বলল ও ওরমানের খোঁজ করবে।

রণ্ডার কি অবস্থা এবার দেখা যাক।

সিংহটা ঘোড়াটাকে মেরে রণ্ডার দিকে এগিয়ে এল রণ্ডার উপস্থিত বুদ্ধি কাজ করে খুব ভাল। ও বুঝল, পালিয়ে বাঁচার প্রশ্নই ওঠে না। ও তাই মড়ার মত পড়ে রইল।

জন্তুটার তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ল ওর চোখে মুখে। সিংহটা ওকে থাবা দিয়ে উল্টে পাল্টে শুঁকে দেখল। রণ্ডা তবু বেঁচে থাকার কোনো লক্ষণই প্রকাশ করল না।

সিংহটা ওকে ছেড়ে দিয়ে ঘোড়াটার দেহটা টানতে টানতে একটা ঝোপে ঢুকে পড়ল।

রণ্ডা শুয়ে শুয়েই পা ঘসে ঘসে একটু একটু করে একটা গাছের দিকে এগোতে লাগল। গাছের কাছাকাছি এসে যেই উঠে দাঁড়িয়েছে অমনি সিংহটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ওকে তাড়া করল। রণ্ডা একছুটে গাছের কাছে পৌঁছে গেল। তরতর করে উঠে পড়ল গাছে।

সিংহটা রাগে গর্জন করে গাছটার ওপর আছড়ে পড়ল। অল্পের জন্য ওর শিকার ফস্কে গেছে। ও গাছের নিচে বসে ফুঁসতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সিংহটা ওকে ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে গেল।

রণ্ডা গাছের ডাল আঁকড়ে বসে রইল সারা রাত। দিনের আলো ফুটলে সিংহটাকে দেখতে পেল আবার। জন্তুটা দূরে নদীর দিকে চলেছে জল খেতে। রণ্ডাও নেমে পড়ে উল্টো দিকে ছুট লাগাল প্রাণপণে।

অনেকক্ষণ ছুটে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খোলা মাঠে এসে দাঁড়াল। কোন দিকে যাবে ও? দূরে দেখতে পেল শঙ্কু আকৃতির পাহাড়। ম্যাপে ঐ পাহাড়ের কথাই আছে। আতেয়ীকে যখন রণ্ডা ম্যাপটা বোঝাচ্ছিল তখন আতেয়ী বলেছিল ম্যাপের জলপ্রপাতটার নাম নিশ্চয়ই ওমওয়ামউই। কারণ ঐ ওমওয়ামউই প্রপাতের কথাই ওরমানের দলের মুখে আতেয়ী শুনেছে। ওরমানের দল ঐ প্রপাতের দিকেই এগোবে। তাই রণ্ডাও ঐ ম্যাপ দেখে এগোতে লাগল,

যদি কোন জলপ্রপাত পাওয়া যায়, যদি ওরমানের দলের দেখা মেলে। ও উত্তর পশ্চিম দিকের পাহাড় লক্ষ্য করে চলল।

সারা দিন ধরে হেঁটে খিদেয় তেষ্টায় কাতর হয়ে পড়ল। পাহাড় তবু বহু দূরে। একটা ঢাউস অদ্ভুত ধরনের পাথর থেকে সেটার কাছাকাছি যেতেই জ্যান্ত হয়ে তেড়ে এল সেটা। ওমা এ যে গণ্ডার! ছুট ছুট ছুট! কোনরকমে একটা গাছে উঠে পড়ে প্রাণ বাঁচাল রণ্ডা। ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে গাছ পেরিয়ে বেরিয়ে গেল জন্তুটা। ওর দিকে আর এল না। অনেক হেঁটে এক সময় পাহাড়ের কোলে পৌঁছল।

সেখানে একটা নদীর স্রোত বয়ে চলেছে। সেই জলে আবার এক গাদা নাদাপেট জলহস্তীর ভিড়। রণ্ডাকে দেখে কি বিরক্তি ওদের!

পেট ভরে জল খেয়ে একটা গাছে চড়ল রণ্ডা। সন্ধ্যা নামছে, এখানেই রাত কাটাবে।

*

সারারাত ধরে দূরে পাহাড়ের গায়ের জঙ্গলে নানা হিংস্র জন্তুর হুঙ্কার শুনল বসে বসে। এত বিপদের মধ্যেও ওর একান্ত আশা ছেলেমানুষী ম্যাপটার নির্দেশ অনুযায়ী ও পৌঁছবে একটা জলপ্রপাতের ধারে! সেখানে হয়তো দেখা পাবে ওর দলের সঙ্গীদের।

সকাল হতেই গাছ থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল নদীর ধারে ধারে। বহুক্ষণ পর একটা গুম-গুম-গুম-গুম আওয়াজ যেন ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল। বুঝল জলপ্রপাতের কাছ-কাছি এসে পড়েছে। দুপুরে পৌঁছে গেল বিশাল প্রপাতটার কাছে। নদীটা এখানে এসে আছড়ে পড়েছে যেন অতল গভীরে।

পাহাড়ের অনেক ওপর থেকে দুটি অদ্ভুত প্রাণী রণ্ডাকে নজর করছিল বহুক্ষণ। এতক্ষণে ওরা নিঃশব্দে নেমে এসে ওকে ধরল। বিশাল দুটো গোরিলা। ভয়ে চিৎকার করে উঠল রণ্ডা। বিশাল লোমশ হাতে একজন ওকে তুলে নিল। আশ্চর্য হয়ে রণ্ডা শুনল কর্কশ গলায় একটা গোরিলা স্পষ্ট ইংরাজীতে বলল, 'চুপ! তোমায় ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাব আমরা।'

আরেক জন বলল, 'না না, রাজার কাছে নিয়ে যাওয়াই ভাল।'

ওদের রাজার নাম বলল অষ্টম হেনরী! রণ্ডা ভাবলো একি অবাক কাণ্ড। এটা আবার কোন দুনিয়া? ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে অবলীলায় পাহাড় চুড়োয় উঠে, উপত্যকা বেয়ে তরতর করে নামতে লাগল।

রণ্ডা যেন গোরিলার হাতের পুতুল। দেখল এক নতুন দেশে এসে পড়েছে। দুধারে ক্ষেত, খামার। গোরিলারা দিব্য কাজকর্ম করছে। বাঁশের তৈরি বাড়িঘর। গোরিলাদের গ্রাম! এখানে ওরা রণ্ডাকে নামিয়ে দিল। চারদিক থেকে দলে দলে গোরিলা এসে ভিড় করল। ওরা অদ্ভুত জীব রণ্ডাকে দেখতে এসেছে। দূরে গম্বুজ তোলা একটা বিশাল প্রাসাদ, প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের স্থাপত্যের ছাপ আছে তার গঠনে। সবকিছু দেখে রণ্ডা হতবাক হয়ে ভাবতে লাগল হয়তো সে স্বপ্ন দেখছে।

ততক্ষণে রণ্ডাকে নিয়ে ওরা সেই বাড়িটার দোরে এসে পৌঁছেছে। বিশেষ অনুমতি নিয়ে ওরা সেই বাড়িটায় বন্দিনীকে নিয়ে ঢুকল। একটা মস্ত উঁচু বেদীতে ভীষণদর্শন এক গোরিলা বসে আছে। মাটিতে ঘাসের মেঝেয় বসে আছে তার দলবল। রণ্ডাকে দেখে গোরিলাটা চেঁচাল, 'আরে আরে একে কোথায় পেলে, বাকিংহাম?'

রণ্ডা বুঝল এই স্বয়ং অষ্টম হেনরী। রাজার সঙ্গে ওদের অনেক কথাবার্তা হল। দুই গোরিলার একজন বলল, 'একে ঈশ্বরের কাছেই নিয়ে যাওয়া উচিত।'

তাই শুনে গর্জে উঠল রাজা, বলল, 'ক্র্যানমার, তোমার সাহস তো কম নয়!'

উল্‌সে নামে একটা গোরিলা বোঝাতে চাইল, 'মেয়েটিকে ঈশ্বরের কাছেই নিয়ে যাওয়া উচিত। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন।'

রাজা রাগে বিকট গর্জন করে বুক চাপড়াতে লাগল। দলের গোরিলারা ভয়ে কুঁকড়ে গেল রাজার এই উন্মত্ত চেহারা দেখে।

রাজা চিৎকার করে বলল, 'কোন কথা শুনতে চাই না। আমার কথাই আইন। একে আমার হারেমে নিয়ে যাও।'

বাকিংহাম রণ্ডাকে টানতে টানতে একটা ঘরে পুরে দিল। মেয়ে গোরিলাতে ঠাসা ঘরটি। ওরা ওদের কাচ্চা-বাচ্চাদের নিয়ে বসে আছে, গল্প করছে। ওরা রণ্ডার দিকে বিরক্ত মুখে চেয়ে রইল।

ওদের যার নাম রাণী ক্যাথরীন সে বলল, 'ঐ লোম-ওঠা জন্তুটা কোত্থেকে এল? রাণী হতে চায় নাকি? কোথায় পেলে ওকে, বাকিংহাম?'

বাকিংহাম বুঝিয়ে দিল, রাজার হুকুমে ও এখানেই

থাকবে। ক্যাথরীন রাগে গজরাতে লাগল। একটা গোরিলাছানা অবাক হয়ে এগিয়ে এসে রণ্ডার জামা ধরে টানতে লাগল। রণ্ডা দিল তাকে এক চড় কসিয়ে। অমনি আরো কটা গোরিলা এগিয়ে এসে বলল, 'তোমার এত সাহস, প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের গায়ে হাত তোল!'

রাজপুত্র তো চড় খেয়ে ছুট্টে পালাল ওর মা আরাগঁর ক্যাথরীনের কাছে। ক্যাথরীন দাঁত মুখ খিঁচোতে লাগল রণ্ডার দিকে চেয়ে।

ক্লান্তি আর বিস্ময়ে রণ্ডা মুহ্যমান। জড়োসড়ো হয়ে বসে রইল মেঝের এককোণে।

*

ম্যাডিসন জানে না কতক্ষণ সে ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটে চলেছে। জ্ঞান হলো যখন, দেখল আরবের দল তাকে ঘিরে ফেলেছে।

আতেয়ী জিজ্ঞাসা করল, 'আরেকজন কোথায়?'

ম্যাডিসন বলল, 'ওকে সিংহয় খেয়ে ফেলেছে।'

—'থাক্‌গে', বলল আতেয়ী, 'তুমি তো আছ। তুমিই দেখাও কোথায় সেই হীরের পাহাড়।'

ম্যাডিসন দেখতে পেল দূরে সেই আগ্নেয় পাহাড়। বলল 'হীরের পাহাড় দেখতে পেলেই আমায় ছেড়ে দেবে তো?'

আতেয়ী ম্রেনেমকে কথাটা বুঝিয়ে দিল ওদের ভাষায়। ম্রেনেম চোখ মটকে বলল, 'বল এখন রাজি। পরে ওর কথা কে শুনছে।'

ম্যাডিসন ম্যাপ দেখে সেই নদীর ধারে পৌঁছল। সেখানে ওদের রাতের তাঁবু পড়ল। ম্যাপে নদীর পশ্চিম পারে যাবার উল্লেখ আছে। কিন্তু অমন খরস্রোতা নদী পেরোবে কি করে সেই চিন্তায় পড়ল ওরা পরদিন সকালে। অনেক ভেবে চিন্তে, অনেক কষ্টে একটা জায়গা দিয়ে পার হল বটে, তবে দলের দুজন লোক ঘোড়া সমেত তলিয়ে গেল। ম্যাডিসনও কোনো মতে প্রাণ নিয়ে ওপারে পৌঁছল। শুধু স্রোত নয়, নদীটা আবার কুমিরে ভর্তি। সবাই প্রাণ হাতে করে পার হল। হীরের মোহে আরবরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। এইভাবে সারাটা দিন কেটে গেল। পরদিন ফের যাত্রা শুরু হল। দুপুর গড়িয়ে এসেছে, এমন সময় গ্রানাইট পাহাড়টা চোখে পড়তে ম্যাডিসন আতেয়ীকে বলল, 'ঐ দেখ সেই পাহাড়, ওর পুব দিকেই হীরের উপত্যকা। এবার আমায় ছেড়ে দাও।'

আতেয়ী বলল, 'উঁহু, এক্ষুণি নয়, আগে ওখানে পৌঁছাই, তবে তো!'

এই শুনে ম্যাডিসন ওর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল। ও পালাবে। আতেয়ী ছুটে এসে ওর ঘোড়াটার লাগাম টেনে দাঁড় করাল। তারপর এক চড় কসাল ম্যাডিসনের গালে। অসহায় ম্যাডিসনের তখন কি আর করার আছে, ও কাঁদতে লাগল।

ম্রেনেমের তাঁবু পড়ল সেদিনের মতো। পরদিন যাত্রা শুরু হবে হীরের পাহাড়ে।

ওদের অলক্ষ্যে অনেক উঁচু থেকে কয়েকটা গোরিলা ওদের কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করছিল।

স্ট্যানলি ওবরস্কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে। শরীর আর মনে কম চাপ তো পড়েনি এ কদিন। ওর সংজ্ঞাহীন দেহটা কাঁধে করেই টারজান বেরিয়ে পড়ল। ওরমান আর ওয়েস্টের খোঁজে যেতে হবে।

গ্রামে পৌঁছে পুগুর কুটিরে ওবরস্কিকে রেখে ও পেট ভরে খেয়ে নিল। পুগুকে বলল, 'জিনজায় অসুস্থ লোকটিকে নিয়ে যেও। তারপর কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।'

ওবরস্কিকে রেখে টারজান হাঁটা দিল উত্তরের দিকে। তখন সন্ধ্যা নামছে।

ঠিক এই মুহূর্তে রণ্ডা টেরি গোরিলারাজের হারেমে ঘাসের বিছানায় শুয়ে ভাবছিল আর কত দুর্ভোগ বাকি আছে। এক সপ্তাহ ধরে সে বন্দী। রাজা অষ্টম হেনরীর ছয় রাণী। এর মধ্যে ক্যাথরীন পার ওর প্রতি কিছুটা সদয়। অন্যরা দুচক্ষে দেখতে পারে না রণ্ডাকে।

রণ্ডা ওকে বলে, 'চারশো বছর আগে ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীরও ছয় রাণী ছিল। তাদেরও যা নাম, তোমাদেরও তাই। কি করে এমন সম্ভব হলো?'

পার বলে, 'রাজার সঙ্গে বিয়ের পর আমাদের এরকম নামকরণ করেছেন স্বয়ং ঈশ্বর।'

—'কে সেই ঈশ্বর?' জানতে চাইল রণ্ডা।

পার বলল, 'তিনি এই দেশ, এই ইংল্যাণ্ডের ঈশ্বর। তাঁর অনেক বয়স। সে বয়সের হিসেব নেই। সোনার তোরণ দেওয়া বড় প্রাসাদে থাকেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এখন আমাদের রাজার ঝগড়া।'

—'কেন?'

—'ঈশ্বর শাসিয়েছেন, রাজা আর বিয়ে করতে পারবে

না, রাণীর আর নাম পাওয়া যাবে না ইতিহাসে। অষ্টম হেনরীর ছজনের বেশি রাণী থাকতে পারে না।'

রণ্ডা তো অবাক। কি যে বলে এরা!

ঈশ্বরের প্রাসাদে ঢুকলে আর কেউ বার হতে পারে না। ওখানে মাঝে মাঝেই গোরিলা যুবকদের ডাক পড়ে। তারা কেউ ফেরে না। ঈশ্বরের দুয়ার স্বর্গের দুয়ার।

পরদিন সকালে রণ্ডার ঘুম ভাঙল উৎকট চিৎকার চেঁচামেচিতে। জানলা দিয়ে দেখল গোরিলাদের দুটো দলে প্রচণ্ড মারামারি বেঁধেছে। গদা, কুড়ুল আর ধারালো দাঁত নখ বার করে এ ওকে আক্রমণ করেছে।

রাণী জেন সেমুর কখন রণ্ডার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'ঐ দেখ উল্‌সে লড়াইয়ে নেমেছে, রাজা হেনরী গেল এবার!'

রাণী আরাগঁ বলল, 'এই লোম-ওঠা সুন্দরীকে রাজা যে বিয়ে করতে চায়! তাইতো ঈশ্বর ক্ষেপেছেন।'

একটু পরেই দরজার কাছে হট্টগোল শোনা গেল। ষণ্ডা মার্কা কয়েকটা গোরিলা ঘরে ঢুকে চোখ লাল করে বলল, 'কই সেই লোম-ওঠা মেয়ে? আমরা তাকে নিয়ে যেতে এসেছি।' এই বলে রণ্ডাকে তুলে নিয়ে চলল।

ম্যাডিসনকে নিয়ে ব্রেনেমের দল হীরের খোঁজে চলেছে একটা সরু পাথুরে পথ বেয়ে। খাড়াই পথে ঘোড়া নিয়ে ওঠা আর সম্ভব হল না। আয়াদ রইল ঘোড়া পাহারায়। ম্যাডিসনকে ছাড়তে চায় না ব্রেনেম। ওকে নিয়েই উঠতে লাগল ও।

হঠাৎ আয়াদ নিচে থেকে দেখল ব্রেনেমের দলের ওপর এক পাল বিশাল গোরিলা মুগুর, গদা, কুড়ুল, নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এমনই আচম্বিতে ব্যাপারটা ঘটল যে আরবরা বন্দুক চালাবার সময় পর্যন্ত পেল না। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মার খেয়ে পালাবার পথ পেল না। পাহাড়ের গায়ে জখম হয়ে মরে রইল সবাই। আয়াদ এই দেখে প্রাণপণ ছুটে পালিয়ে বাঁচল।

বাকিংহাম নামে গোরিলা ম্যাডিসনকে ভেবেছিল রণ্ডা। ও ভাবছিল রণ্ডা ঈশ্বরের প্রাসাদ থেকে পালাল কি করে? ওকে তুলে নিয়ে চলল বাকিংহাম। গোরিলার মুঠোয় বসে ম্যাডিসন ভাবল ও নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে।

বাকিংহাম জিজ্ঞাসা করল 'তুমি ঈশ্বরের হাত থেকে কি করে পালালে?'

ম্যাডিসন বুঝল না ব্যাপারটা। বলল, 'ঈশ্বরের কাছ থেকে? আমি তো ঐ আরবদের কাছ থেকে পালাতে চাইছিলাম। এখন তোমার হাতে পড়লাম।'

—'কিন্তু কিছুদিন আগে ভিক্টোরিয়া প্রপাতের কাছ থেকে আমিই তো তোমায় নিয়ে লণ্ডনে গিয়েছিলাম।'

ম্যাডিসন বুঝল, নিশ্চয়ই ও রণ্ডার কথা বলছে। সে কি আর বেঁচে আছে? ও ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল বাকিংহামকে। বাকিংহাম মহাখুশি। বলল, 'তাহলে তোমার মতো আরেকটি মেয়ে ঈশ্বরের কাছে আছে। তুমি তাহলে আমার।'

—'সে কি!' ম্যাডিসন ভয়ে কাঁটা হয়ে গেল।

—'হ্যাঁ, তোমায় নিয়ে ঘন বনে ঘর বাঁধব। কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না। না রাজা, না ঈশ্বর।'

ম্যাডিসন ছটফট করতে লাগল ওর হাতের মধ্যে। বাকিংহাম গ্রাহ্যই করল না। রণ্ডাকে নিয়ে উপত্যকার দক্ষিণ ধার দিয়ে নামতে লাগল।

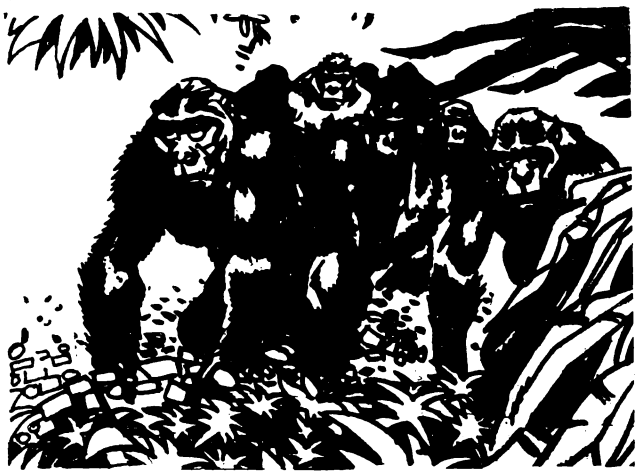

টারজান ওরমান আর বিলের খোঁজ পেয়েছিল। সঙ্গে ছিল আয়াদ। খিদে তেষ্টায় ওদের কাতর চেহারা দেখে টারজান একটা হরিণ মারল। ওর জয়ধ্বনিতে চমকে উঠল ওরা। তারপর সাদা মানুষটা এগিয়ে এসে হরিণটা ওদের দিকে ছুঁড়ে দিল। ওরা মনে করল ফের ওবরস্কি এসেছে।

টারজান সে ভুল ভাঙল না। বলল, 'মেয়ে দুটির কোন খবর জান?'

ওরমান বলল, 'মনে হয় ওদের খারাপ কিছু ঘটেছে। অন্যদের কথা জানি না। ওগ্রেডিকে বলা আছে ওমওয়ামউই প্রপাতের ধারে যেতে। এই আরবকে আমরা ধরেছি। ও হয়তো অনেক কিছু জানে, কিন্তু ওর ভাষা আমরা বুঝছি না।'

টারজান আয়াদের সঙ্গে আরবী ভাষায় কথা বলে সব

জেনে নিল। শুনল সেই অদ্ভুত গোরিলাদের কথা। ওরমান আর বিল অবাক হয়ে ভাবছিল ওবরস্কি এত আরবী ভাষা শিখল কবে?

মাটিতে দিক্‌চিহ্ন এঁকে এঁকে আয়াদ যখন টারজানকে পথ বুঝিয়ে দিচ্ছিল তখন বিল আর কৌতূহল দমন করতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল, 'কি করছে ও?'

টারজান বলল, 'গোরিলাদের দেশের পথ দেখাচ্ছে। একজন মেয়ে সিংহের হাতে মরেছে, আর একজনকে নিয়ে গেছে, গোরিলারা। আমি চললাম তার খোঁজে।'

বাকিংহাম ম্যাডিসনকে নিয়ে চলেছিল মনের আনন্দে। খিদেয় অবসন্ন হয়ে পড়েছিল ম্যাডিসন। পথে গাছ থেকে ফলমূল পেড়ে খাইয়েছিল!

উপত্যকা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় ঝোপ-ঝাড় থেকে আর একটা গোরিলা বাকিংহামকে তাড়া করল।

বাকিংহাম পাহাড়ের ধার বেয়ে বিপজ্জনকভাবে একটা নিচু গুহায় নামতে লাগল। ভয়ে চোখ বন্ধ করল ম্যাডিসন।

সেই গুহায় ওকে লুকিয়ে রেখে বাকিংহাম বলল, 'সাফোককে শেষ করে আসছি, ও আমার পিছনে ধাওয়া করেছে।' এই বলে পাহাড় বেয়ে ফের উঠে গেল। আসলে সাফোক ম্যাডিসনকে দেখে ভেবেছিল রণ্ডা।

ও ভাবছিল, রণ্ডা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়েছে। এই সুযোগ, ওকে এবার রাজা হেনরীর কাছে নিয়ে যাওয়া যায়।

বাকিংহামকে দেখে সাফোক জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় সেই মেয়েটি?'

বাকিংহাম বলল, 'পালিয়ে গেছে।'

—'তুমি আমায় দেখে ছুটলে কেন?'

বাকিংহাম বুদ্ধি করে বলে, 'বুঝতে পারি নি। দূর থেকে তোমায় ভেবেছিলাম উল্‌সের লোক, ঈশ্বরের কাছে মেয়েটিকে নিয়ে যেতে চাইছে।'

সাফোক বলল, 'চল খুঁজে দেখি কোথায় পালাল মেয়েটি। ঈশ্বরের কাছ থেকে যখন পালিয়েছে, হেনরীর কাছে নিয়ে যাবার এমন সুযোগ আর আসবে না।'

দু'দিন দু'রাত ঐ গুহায় পড়ে রইল ম্যাডিসন। পালাবার কোন উপায় নেই। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা ওর পক্ষে অসম্ভব। তৃতীয় দিনে বাকিংহাম চুপিচুপি নেমে এসে বলল, 'সাফোককে এড়িয়ে কোনরকমে চলে এসেছি। চল, আমরা পালাই।'

ম্যাডিসন বলল, 'না আমায় এখানেই রেখে যাও, আমি যাব না।'

বাকিংহাম ওকে জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ বিকট হুঙ্কার দিয়ে নেমে এল টারজান।

ম্যাডিসন চিৎকার করে উঠল, 'এ কি স্ট্যানলি!'

টারজান হাঁকল, 'ছেড়ে দাও ওকে!'

গোরিলা ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজানের ওপর। কায়দা করে সরে গেল টারজান, তারপর পিছন থেকে লাফিয়ে এসে ওর গলা টিপে ধরল, লোহার মতো দুই হাতে। শুরু হলো প্রচণ্ড লড়াই। মাটিতে গড়াতে লাগল দু'জনে। একটি সাদা ইংরেজ আর একটি বিশাল লোমশ জন্তু। এক সময় টারজানের ছুরি ঝকমক করে উঠে বিঁধে গেল গোরিলার ঘাড়ে। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে, বাকিংহাম স্তব্ধ হয়ে গেল।

ম্যাডিসন টারজানের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, 'স্ট্যানলি, তুমি!'

টারজান বুঝল, এ-ই হলো নেওমি ম্যাডিসন। ওর কথা শুনেছিল ওবরস্কির মুখে।

ম্যাডিসন খিদের জ্বালায় দাঁড়াতে পারছিল না। টারজান ওর জন্যে বন থেকে ফল আর বাদাম নিয়ে এল। শুনল, রণ্ডা গোরিলাদের লণ্ডন শহরে কে এক ঈশ্বরের প্রাসাদে বন্দী।

—'রণ্ডা তাহলে সিংহের হাতে মরেনি?'

—'না, আমিও আগে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝেছি ও বেঁচে আছে।'

তারপর দীর্ঘ চড়াই উৎরাই পেরিয়ে, খরস্রোতা নদী সাঁতরে ম্যাডিসনকে নিয়ে টারজান পৌঁছে গেল ওরমান আর বিলের কাছে। ওরা ভাবল, ওবরস্কি ফিরিয়ে এনেছে ম্যাডিসনকে। শুনল, রণ্ডা এখনও হয়তো বেঁচে আছে। ওবরস্কি ওকেও উদ্ধার করতে চায়। বিল ওয়েস্ট সঙ্গে যেতে চাইলে, ম্যাডিসন বোঝাল, 'তুমি যেও না বিল, সে বড় ভয়ানক জায়গা। ওকে একা যেতে দাও তাতে ওরই কাজের সুবিধা হবে।'

রাতের অন্ধকারে টারজান আবার হাজির হল গোরিলাদের দেশে। দূর থেকে দেখতে পেল ওদের শহরের আলো। উঁচু পাঁচিল নিঃশব্দে ডিঙ্গিয়ে দেখল শহরটা ফাঁকা। দূরে এক জায়গায় অনেক মশাল জ্বলছে। ঢাক বাজছে সেখানে। গোরিলাদের নাচ গানের উৎসব চলছে।

টারজান সেদিক থেকে চলে এসে, পাথরের সিঁড়ি বেয়ে পাহাড় চুড়োর দিকে উঠতে লাগল। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল প্রাসাদের প্রাঙ্গণে। সারি সারি দরজা। ভিতরে অন্ধকার ঘর। প্রতিটি দরজা আস্তে ঠেলে ও দেখতে লাগল। কান পেতে শুনতে লাগল। কোথাও কোন রকম শব্দ নেই। তিন নম্বর দরজাটা খোলা। পাঁচ আর ছ'নম্বর দরজা তালা দেওয়া। ও তিন নম্বর দরজায় ফিরে এল। অন্ধকার হাতড়ে এগিয়ে চলল। একটা সিঁড়ি পেল সামনে। সেটা ধরে ও নামতে লাগল। হাতে ঠেকল আর একটা দরজা। হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেলতেই, নাকে এল মানুষের গন্ধ। বুঝল কোনো মেয়ে আছে এখানে। সে কি রণ্ডা? ভিতরে ঢুকে দরজাটা ছেড়ে দিতেই খুট্ করে বন্ধ হয়ে গেল। হাতল ঘুরিয়ে টারজান বুঝল সে বন্দী, কিন্তু সামনে হঠাৎ একটা দরজা খোলার শব্দে ও থমকে দাঁড়াল। তারপর এক ঝলক আলোয় দেখল একটা সাদা মেয়ে বসে আছে খড়ের বিছানায়। ঠিক নেওমি ম্যাডিসনের মত দেখতে। নিশ্চয়ই রণ্ডা। পিছনে একটা গরাদ দেওয়া ঘর। সেই ঘরে আলো হাতে গরাদ ধরে ঝুঁকে আছে অদ্ভুত এক মূর্তি। মানুষ না গোরিলা বোঝা ভার।

মেয়েটি টারজানকে দেখে বলে উঠল, 'আরে স্ট্যানলি তুমি? তুমিও বন্দী?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল টারজান।

গরাদের ওপারে লোকটির মুখে মৃদু হাসি। মুখটা মানুষেরই, কিন্তু মুখের চামড়া গোরিলার মতো। লম্বা দাঁত। লোমশ হাতে ধারালো, বাঁকা নখ। গায়ের কালো চামড়ায় সাদা সাদা ছোপ। একটা জামা আর নেংটি পরা, কোটরে ঢোকা দুটো চোখ—বয়সের গভীর ছাপ পড়েছে সেই চোখে আর মুখে।

লোকটা বলল, 'তুমি আসছ আমি দেখেছি। হেনরী উৎসব করছে। সেই আলো পড়েছিল তোমার গায়ে। এসেছ ভালোই করেছ। তোমায় আমার খুব দরকার।'

টারজান বলল, 'আমি এই মেয়েটিকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

লোকটা বলল, 'তুমিও যে আমার বন্দী!'

—'কিন্তু আমি তো কোন অন্যায় করি নি!'

একটা চুরুট জ্বালিয়ে লোকটা বলল, 'চলবে নাকি একটা?'

টারজান বলল, 'আমি নেশা করি না।'

—'আরে ক্লান্তি দূর হবে, ধরাও একটা।'

টারজান বলল, 'আমি ক্লান্তও হই না।'

লোকটা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, 'এই তো চাই! আমি এবার নতুন প্রাণ ফিরে পাব!'

—'কি বলছ তুমি, বুঝলাম না।'

ধোঁয়া ছেড়ে লোকটা বলল, 'বলব, বলব। আগে দেখি ওরা কি করছে। ঐ হেনরীটা বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে।' এই বলে ও ভিতরে চলে গেল।

টারজান বলল, 'এদিকে এস। যাচ্ছ কোথায়? বল, কেন আমাদের আটকে রাখতে চাও।'

লোকটা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। চোখ দুটো জ্বলছে ধক ধক করে। গর্জন করে বলল, 'কি! ঈশ্বরকে আদেশ করছ!' এই বলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রণ্ডা বলল, 'কি অদ্ভুত ব্যাপার, কিছুই বুঝছি না।'

এর মধ্যে কি কি ঘটেছে সব বলল টারজান। নেওমি নিরাপদে আছে শুনে রণ্ডা যেমন খুশি, তেমনি অবাক হলো বাকিংহাম খুন হয়েছে জেনে।

—'কে মারল?'

—'আমি', বলল টারজান।

রণ্ডার বিশ্বাস হলো না। স্ট্যানলি মারবে গোরিলাকে! ও আরো অবাক হয়েছে স্ট্যানলির এই বেশভূষা দেখে।

জিজ্ঞাসা করতে টারজান শুধু বলল, 'সে কথা বানস্যুটোদের রাজা রঙ্গুলা জানে।'

পাশের ঘর থেকে এক চিলতে আলো আসছিল। সেই আলোয় টারজান লক্ষ্য করল ঘরের ছাদে একটু ফাঁক, সেখান থেকে মৃদু হাওয়া বইছে। রণ্ডার পাশে গিয়ে বসল ও। শুনল গোরিলাদের লণ্ডন শহরের কথা আর অষ্টম হেনরীর ব্যাপার। এর মধ্যে কখন বুড়োটা চেয়ার টেনে এনে বসেছে গরাদের ওপারে। সে হলল, 'হেনরীটা দেখছি হদ্দ বোকা। ভাবছে ও ঈশ্বর হয়ে বসবে। তবুও আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। তোমাদের দিয়ে কাজটা সেরে ফেলাই ভাল।'

—'কি কাজ?' জানতে চাইল ওরা ভয়ে ভয়ে।

বুড়ো বলে চলল ওর জীবনের ইতিহাস। ও ১৮৫৫ সালের অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট। মানুষের বংশধারার ওপর ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে। দেহের বিভিন্ন সেল, জিন, ক্রমোসোম এসব বিষয় নিয়েই ওর কাজ। ওর বিশ্বাস প্রাণী মরলেও জিন মরে না। কিন্তু এসব কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। ওকে পাগল বলে বন্দী করে রেখেছিল। পরে ও

লুকিয়ে গবেষণা চালায়। ওর কাজ ছিল জীবিত ও মৃত মানুষের শরীর কেটে জিন বার করে পরীক্ষা চালানো। রাজা অষ্টম হেনরীর দেহ কবর থেকে তুলে চুরি করে এনে জিন বার করার সময় কে একজন দেখে ফেলে। তাই ও পালিয়ে আসে আফ্রিকায়, এই গোরিলাদের দেশে। গোরিলাদের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে, খ্যাপা বৈজ্ঞানিক ওদের জিনের বদলে মানুষের জিন ভরে দিতে আরম্ভ করে ওদের দেহে এবং ধীরে ধীরে গোরিলাদের বংশধারায় মানুষের হাবভাব লক্ষ্য করে ও উল্লসিত হয়। গোরিলারা মানুষের মতো চিন্তা করতে শেখে, কণ্ঠস্বর পায়। ও হয়ে বসে ওদের ঈশ্বর। ওদের চাষবাস করা, বাড়িঘর গড়া সব কিছু শেখায়। ওদের নিয়ে গড়ে ওঠে লণ্ডন শহর। ওরা ইংরিজি ভাষায় কথা বলতে শেখে।

এক সময় ও নিজেও ছিল সুন্দর এক ইংরেজ যুবক। ওর বয়স হলো, দেহ অকেজো হয়ে এল। ও যুবক গোরিলাদের দেহের সেল কেটে নিজের দেহে বসিয়ে নিল। এটা আর-এক যুগান্তকারী গবেষণা। মাঝে মাঝেই গোরিলা বধ করে ও নিজের দেহে নতুন শক্তি ফিরিয়ে আনে। এইভাবে ও দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে। কিন্তু চেহারা হয়ে গেছে গোরিলার মতো।

আজকে ওর নতুন আর এক গবেষণার সুযোগ এসেছে। ওর হাতের নাগালে দুজন জোয়ান মানুষ। ওদের শরীরে আছে টাটকা সেল। ওদের শরীর খেয়ে বৃদ্ধ ঈশ্বর ফিরে পাবে মানুষের চেহারা, নতুন যৌবন।

*

ঈশ্বর ফিরে গেল ওর ঘরে। টারজান ভাবছিল যে করে হোক পালাতে হবে এখান থেকে। রণ্ডা পালাবার কোনো উপায় দেখতে পেল না। বলল, 'স্ট্যানলি, তুমি এত সাহসী, এত আশাবাদী কবে থেকে হলে? অভিনয় করছ না তো?'

টারজান বুঝেছিল ঘরের ছাদে কোথাও একটা ফাঁক আছে। সেখান দিয়ে বাইরের হাওয়া আসছে, শব্দও শুনেছিল অস্পষ্ট। সে রণ্ডাকে দুই হাতের ওপর দাঁড় করিয়ে ফাঁকটা খুঁজতে বলল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে রণ্ডা খুঁজে পেল তিনফুট চওড়া একটা ফুটো। একটা ঘাসের দড়ি তৈরি করে রণ্ডাকে দিয়ে, তাকে ফের তুলে ধরল টারজান। রণ্ডা ফুটো দিয়ে গলে বাইরে একটা কাঠের পাটাতনের সঙ্গে সেটা বাঁধল।

কোনরকমে একটা মানুষ গলে যাবার মতো ফুটো। ওরা দুজন দড়ি বেয়ে ফুটো গলে ঘরের বাইরে এল। ছাদ এখনও অনেক উঁচুতে। তারপর অনেক কাঠের পাটাতন বেয়ে, কখনও দড়ির ফাঁস বেঁধে ঝুলে রণ্ডাকে পিঠে নিয়ে টারজান ছাদে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে এক রহস্যময় হাসির শব্দে চমকে উঠল রণ্ডা। টারজান বুঝল, এ সেই ঈশ্বর। নিঃশব্দে ওরা গম্বুজের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। দূর থেকে তখনও ভেসে আসছিল ঢাকের আওয়াজ। মশালের আলো নাচছে। ঈশ্বর আর ক্র্যানমার ছাদ থেকে সজাগ দৃষ্টিতে দেখছিল। ঈশ্বর বলছিল 'লোমওঠা মেয়েটিকে আনতে পুরোহিত পাঠিয়েছি। ওকে নিয়ে এখানে দাঁড়াব। হেনরী উঠে আসুক উৎসব থেকে, তারপর—'

—'রাজাকে বধ করতে চান প্রভু?' বলল ক্র্যানমার। 'কিন্তু প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ তো এখনও নাবালক। রাজা হবে কে?'

—'উঃ এই রাজা রাজা আর রাজা! বিরক্তি ধরে গেছে রাজায়। ইতিহাসের দীর্ঘ এগারো বছরের একটি অধ্যায় মুছে যাক, ইংল্যাণ্ডের রাণী হবে এলিজাবেথ।'

—'কাকে করবেন সেই রাণী?' জানতে চায় ক্র্যানমার।

—'সেই লোমওঠা, ইংল্যাণ্ডের সাদা মেয়েটিকে। ওকে মারব না, বাঁচিয়ে রাখব ঠিক করেছি।'

ওরা দেখল পুরোহিত একা উঠে আসছে। রণ্ডাকে পাবে কি করে, ওরা তো ফুটো গলে চুপি চুপি ছাদে উঠে এসে সব শুনছে!

পুরোহিতের মুখে ঈশ্বর যেই জানতে পারল রণ্ডা পালিয়েছে, অমনি তার সে কি তর্জন গর্জন। লোকজন ডেকে পাঠিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু হল। ছাদ ভরে গেল গোরিলায়। টারজান বুঝল এবার ধরা পড়ে যাবে। তবু লুকিয়ে রইল। এমন সময় ঘরের ফুটো দিয়ে গম্বুজের মধ্যে উঠে এল তীব্র আগুনের হল্কা। চারদিকে ধোঁয়া আর আগুন। দম বন্ধ হয়ে এল ওদের।

টারজান গর্জন করে বেরিয়ে এল। ঝাঁপিয়ে পড়ল গোরিলাদের ওপর। তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা বিঁধে পড়ে যেতে লাগল তারা। রণ্ডা এই ফাঁকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। টারজানও বেশিক্ষণ লড়তে পারল না। একটা গদার ঘা খেয়ে জ্ঞান হারাল।

ওদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো প্রাসাদটাকে গ্রাস করেছে। রণ্ডার ঘরের ফুটোয় ঘাসের আগুন ধরিয়ে ওদের

ধরবার মতলব করেছিল গোরিলারা। এখন সে-আগুন সকলকে লকলকে জিবে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। ঈশ্বরকে ফেলে যে যেদিকে পারল পালাল। রণ্ডা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে অন্ধকারে শহরের দিকে ছুটতে লাগল।

একটা লোমশ হাত হঠাৎ তাকে ধরে ফেলল। তারপর হাত থেকে হাতে ঘুরে ফিরে সে পৌঁছে গেল রাজা হেনরীর সেই হারেমে, রাণীদের ঘরে।

সারারাত ধরে আগুন জ্বলল ঈশ্বরের প্রাসাদে।

রাজার দলের গোরিলারা আগুন লক্ষ্য করে এগিয়ে এসে পলাতক গোরিলাদের মেরে ফেলতে লাগল। প্রতিশোধের নেশায় তখন মেতেছে তারা। ঈশ্বর ছাদের এককোণে দাঁড়িয়ে তখন কাঁপছে। আগুনের শিখা তখন গম্বুজের মাথায় উঠে এসেছে।

টারজান চোখ মেলে বসল। যে করে হোক পালাতে হবে। নইলে আগুনে পুড়ে মরা ছাড়া গতি নেই। ও ছাদের ধার বেয়ে নামতে লাগল। ঈশ্বরের কাতর স্বর শোনা গেল, 'আমাকে বাঁচাও, ও সাদা মানুষ, বাঁচাও আমাকে।'

প্রাণের ভয়ে ও ঠক ঠক করে কাঁপছিল। টারজান কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর দিকে। ঈশ্বর বলল, 'তোমায় হীরের পাহাড়ে নিয়ে যাব, যত হীরে চাও কুড়িয়ে নিও।'

টারজান বলল, 'হীরে চাই না, মেয়েটিকে বাঁচাতে চাই।'

—'চল তোমায় পথ দেখাব। ও নিশ্চয়ই হেনরীর হাতে পড়েছে এতক্ষণে।' প্রাণে বাঁচার তার সে কি আকুলতা। টারজান ওকে কাঁধে করে আগুন আর ধোঁয়া বাঁচিয়ে নামতে লাগল। ঈশ্বর ওর বিশাল কাঁধ আঁকড়ে পড়ে রইল মরার মত।

মাটিতে নেমে ঈশ্বরের গলায় দড়ি পরিয়ে টারজান চলল, পাছে ও পালিয়ে যায়। ঈশ্বর চুপি চুপি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

শহর ফাঁকা করে গোরিলারা চলে গেছে ঈশ্বরের প্রাসাদে, ঈশ্বরের অনুচরদের দুর্ভোগ দেখতে। টারজানের তাই খুব সুবিধা হল। একটা ঘরের দরজায় ঠেলা দিতেই সেটা খুলে গেল। ভিতরে কেউ নেই। অনেক খাবার দাবার রয়েছে। ওরা সেখানে ঢুকে ফলমূল তুলে খেতে লাগল।

ঈশ্বর বলল, 'তুমি হীরের খোঁজে আসনি?'

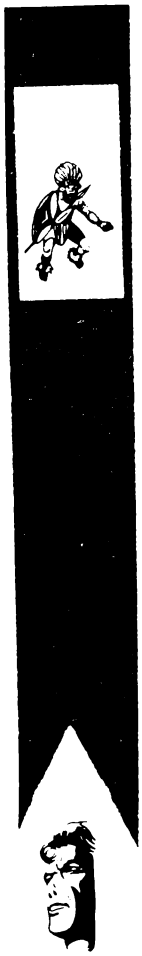

টারজান বলল, 'না, কোথায় হীরে?'

—'সেকি! আমি খবর পেয়েছি একটা ম্যাপ দেখে লোভী মানুষেরা এখানে এসে হাজির হয়েছে। সে ম্যাপ আমারই করা।'

একটু জিরিয়ে নিয়ে বলে চলল, 'দেশে থাকতে একটা মেয়েকে খুব ভালবাসতাম। এখানে পালিয়ে এসে মনে হল মেয়েটিকে নিয়ে এলে বেশ হয়। এখানে ততদিনে একটা হীরের পাহাড়ের খোঁজ পেয়েছি। মেয়েটিকে লোভ দেখিয়ে চিঠি দিলাম, সঙ্গে ম্যাপ এঁকে পথ বলে দিলাম। অনেক কষ্টে বিশ্বস্ত কয়েকটা বুনোকে বুঝিয়ে শহরে সে চিঠি পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম। চিঠির বাহক আর ফিরে আসেনি। হয়তো ওকে মেরে ম্যাপটা কেউ নিয়ে নিয়েছিল। সে আজ বহুদিন হয়ে গেল। এতদিন পরে আবার সেই ম্যাপ নিয়ে মানুষেরা এসেছে এই আফ্রিকায়।'

দরজায় মৃদু আওয়াজ। ওরা সচকিত হল। চুপিসাড়ে ঢুকল ঈশ্বরের এক অনুচর। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল গলায় দড়ি বাঁধা ঈশ্বরকে দেখে। সে বলল, 'হে প্রভু, সাদা মেয়েটি আবার হেনরীর হাতে ধরা পড়েছে।'

ঈশ্বর বলল, 'তাহলে তো ওকে আর বাঁচান যাবে না। হেনরী ওকে বিয়ে করলেই রাণী আরাগঁর হাতে ও মারা পড়বে।'

টারজান গলার দড়িতে টান মেরে বলল, 'ঈশ্বর, তুমি কথা দিয়েছ মেয়েটিকে বাঁচাবে।'

ঈশ্বর তার সেই অনুচরকে বলল, 'যাও, এখনও যারা পালিয়ে বেঁচেছে তাদের জড়ো কর।'

লোকটি নতজানু হয়ে প্রণাম জানিয়ে চলে গেল।

ঈশ্বর বলল, 'আমার গবেষণার দৌলতে এই গোরিলাদেরো কিছু কিছু মানুষের মত চেহারার শিশু জন্মায়। কিন্তু তারা বড় হিংস্র, আমার দলে নিতে পারি না! তাদের আমরা মেরে তাড়াই। শুনেছি ওরা পালিয়ে গিয়ে এই উপত্যকার শেষ প্রান্তে দল গড়ে বাস করছে।'

একটু থেমে ঈশ্বর আবার বলল, 'একটা সুন্দরী মেয়েও জন্মেছিল, ঠিক মানুষের মত, কিন্তু যেন একটা ক্ষ্যাপা সিংহী। ওর সঙ্গে ছিল একটা ছেলে, সে-ও দেখতে সুন্দর। ওদেরও মেরে তাড়াতে হলো।'

ঈশ্বর থামল। তারপর দু'জনে অন্ধকারে বসে রইল অনুচরদের অপেক্ষায়। রাজার হারেম থেকে রণ্ডাকে মুক্ত করতে হবেই।

রণ্ডা একটা হৈ-চৈ শুনে হেনরীর প্রাসাদের জানালা দিয়ে দেখল স্ট্যানলি লড়ছে। সে এই প্রাসাদে ঢুকতে চায়। তার দলে রয়েছে অনেক গোরিলা। ওরা রাজার গোরিলাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঘরের মেয়ে গোরিলারা দেখল রণ্ডাই যত নষ্টের গোড়া। ওরা দাঁত খিঁচিয়ে রণ্ডার দিকে তেড়ে এল। রাণী পার রণ্ডাকে বাঁচাতে এলে, অন্য রাণীরা রণ্ডাকে ছেড়ে পারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এমন সময় দরজা ঠেলে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঢুকল রাজা হেনরী স্বয়ং। ও রণ্ডাকে তুলে নিয়ে একটা সুড়ঙ্গ বেয়ে নেমে এসে গোপন পথ ধরে ছুটে চলল। অন্ধকারে বহুক্ষণ ছুটে, খোলা পাহাড়ে বেরিয়ে এসে পাথর দিয়ে পথের মুখটা বন্ধ করে দিল। তারপর রণ্ডাকে তুলে ধরে উপত্যকা বেয়ে নামতে লাগল।

সামনে পড়ল একটা নদী। নদী পেরিয়ে সবে ওপারে উঠেছে, এমন সময় জঙ্গল ঠেলে এক বিরাট সিংহ দৌড়ে এল। রাজা সময় পেল না, রণ্ডাকে ফেলেই দৌড় দিল। রণ্ডা চুপ করে শুয়ে পড়ল, দৌড়ল না। যে জন্তুরা শিকার ধরে তারা ছুটন্ত প্রাণীকেই ধাওয়া করে। সিংহটা তাই রণ্ডাকে ছেড়ে হেনরিকে তাড়া করল। প্রচণ্ড আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে হেনরিকে টুকরো করে ছিঁড়ে খিদে মেটাতে লাগল। সেই ফাঁকে রণ্ডা উঠে গভীর জঙ্গলে দৌড়ল। মুক্তির স্বাদ পেল যেন বহুদিন পরে।

*

সামনের নদীটা পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে এগোলেই সেই জলপ্রপাতের ধারে পৌঁছবে রণ্ডা। ওখানে হয়তো দলের লোকজনকেও দেখতে পাবে। ওবরস্কির কথা ভেবে মনটা ভার হয়ে উঠল। সে কি এখনো লড়াই করছে?

নদীর ধার ঘেঁসে রণ্ডা দক্ষিণে চলল। ভোরের সূর্য চারদিক আলোয় ভরে দিয়েছে। নদীটা হঠাৎ অনেকটা ঘুরে বাঁক নিয়েছে পুব দিকে। ও জঙ্গল ঘেঁসে চলল নদীটির দিক লক্ষ্য করে। বিপদ দেখলে যাতে গাছে উঠে বাঁচতে পারে। কিন্তু বিপদ এড়ানো গেল না। কোত্থেকে একটা অদ্ভুত প্রাণী ধপ করে নেমে এল ওর সামনে, অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক গোরিলা। এ সেই ঈশ্বরের আজব সৃষ্টি। মুখ, চোখ, হাত, পা মানুষের মতো, শরীরটা গোরিলার।

রণ্ডা নদীর দিকে ছুটল, যদি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচা যায়। কিন্তু এর মধ্যে আর একটি গোরিলা এসে আগেরটার সঙ্গে মারামারি লাগাল। দু'জনেই রণ্ডাকে চায়। তার ওপর একটা খালি গা সাদা মানুষ কোত্থেকে এসে গদার ঘায়ে দুই গোরিলাকে কাৎ করে রণ্ডাকে উদ্ধার করল।

মানুষটির অসাধারণ শক্তি। দেখতেও বড় সুন্দর। মেঘের মত ঘন সোনালী চুল, ঝকঝকে উজ্জ্বল দেহ।

এই সময় ডালপালা বেয়ে রাগে ক্ষেপে উঠে নেমে এল একটা সাদা মেয়ে। সে-ও কাপড়-জামা পরতে শেখেনি। সভ্য জগতের কোনো কিছুই স্পর্শ করেনি তার দেহ মনে। তার উত্তেজিত মুখচোখেও রূপ-লাবণ্য হারিয়ে যায় নি। সে রণ্ডার দিকে তেড়ে এল। তার আগেই সাদা মানুষটি রণ্ডাকে তুলে নিয়ে দৌড়েছিল। হিংস্র চিৎকারে দিক্-বিদিক্ কাঁপিয়ে তাড়া করে এল মেয়েটি।

টারজানের পায়ে আত্মসমর্পণ করল রাজার দলের হাওয়ার্ড আর সাফোক।

রাজা হেনরী আরাগঁকে ছেড়ে রণ্ডাকে নিয়ে পালিয়েছে, সেই রাগে রাণী আরাগঁ নিজে টারজানকে সেই গোপন সুড়ঙ্গ পথ দেখিয়ে দিল। পথের শেষে বিরাট পাথর গায়ের জোরে ঠেলে সরিয়ে টারজান বাইরে এল। পায়ের দাগ দেখে সেই নদী পার হল। তখন সবে ভোর হয়েছে। এই সময় সে সিংহের সঙ্গে রাজার যুদ্ধের গর্জন শুনতে পেল। কিন্তু মেয়েটি কোথায়? অন্য দিক দিয়ে বনের ধারে পৌঁছে রণ্ডার পায়ের ছাপ খুঁজে পেল টারজান। বাতাসে নাক তুলে অন্য প্রাণীর গন্ধও পেল। একটা বিপদের আশংকায় সে সচেতন হয়ে উঠল।

তার পরেই চোখে পড়ল রণ্ডাকে নিয়ে ছুটছে একটা সাদা মানুষ, তার পিছনে সাদা মেয়ে। ওরা দেখতে মানুষের মত, কিন্তু ভাষা বনমানুষের।

টারজান বুঝল এরা সেই ঈশ্বরের তৈরি পলাতক জীব। সে-ও ছুটল ওদের পিছনে। ততক্ষণে সাদা মানুষটা রণ্ডাকে নিয়ে পাহাড়ে চড়েছে। টারজান ছুটে পেরিয়ে গেল মেয়েটিকে। পাথুরে পাহাড়, অসংখ্য গুহা আর ফাঁক-ফোকর। খাড়াই পথ বেয়ে রণ্ডাকে নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে সাদা বুনো। টারজানও সঙ্গে আছে। তার পিছনে সামনে ধাওয়া করে আসছে সেই জংলী মেয়েটি। টারজান হঠাৎ বুদ্ধি করে ঘুরে গেল অন্য দিকে। তারপর এক দৌড়ে একটা টিপিকে বেড় দিয়ে ঘুরে মুখোমুখি হল প্রতিদ্বন্দ্বীর। তাই দেখে সাদা জংলীটা রণ্ডাকে চটপট একটা গুহায় পুরে ফেলে টারজানকে বনমানুষের ভাষায় শাসাল, 'এক পাও এগোবে না, সাবধান!'

টারজান চেঁচিয়ে রণ্ডাকে বলল, 'দক্ষিণ দিকের মুখটা খোলা। ওটা দিয়ে নেমে এস!'

রণ্ডা তাই শুনে ছুটল। রণ্ডাকে পালাতে দেখে লোকটাও ছুটল তার দিকে। কিন্তু টারজান ততক্ষণে ওকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেছে। রণ্ডা এই সুযোগে প্রাণপণে দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে গেল।

ততক্ষণে জংলীরা ভিড় করে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। টারজান সাদা মানুষটাকে মাটিতে ফেলে তার বুকে চেপে বসেছিল। সেই বুনো মেয়েটিও এসে পড়েছে। টারজান লাফিয়ে উঠে মেয়েটির চুল ধরে টানতে টানতে রণ্ডার দিকে ছুটল। চেঁচিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলল, 'এগিয়ো না, এগোলে তোমার এই মেয়েটিকে শেষ করব।'

পাহাড়ের কিনারে পৌঁছে দাঁড়াল ওরা তিনজন—টারজান, জংলী সাদা মেয়েটি আর রণ্ডা। পালাবার পথ নেই কোনদিকে। সরু পথ, খাড়াই নেমে গেছে নিচে।

মেয়েটি কিন্তু টারজানের ওপর রাগেনি, বরং ওর রূপ দেখে মুগ্ধ। বলল, 'আমি তোমার কাছে থাকব, আমাকে বাঁচাও। এই পাহাড়ের সব পথ আমি জানি। অন্যদিকে নামার পথ দেখিয়ে দেব।'

ওরা ভারি পাথর ছুঁড়ে সেই পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ শুরু করল। মেয়েটিও ওর দলের জংলীদের পাথর ছুঁড়তে লাগল। সেই পাথরের ঘায়ে জংলী গোরিলারা গড়িয়ে পড়ছে, তাই দেখে মেয়েটির কি উল্লাস!

গোরিলারা আর এগোতে পারল না। মেয়েটির নাম বালজা। সে বলল, লণ্ডনে থাকতে ও ইংরিজি শিখেছে কিছুটা। ওর সঙ্গের ছেলেটির নাম মালবিয়ট।

—'তোমার নাম কি?' ও ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করল টারজানকে।

টারজান বলল, 'আমার নাম স্ট্যানলি'

নামটা খুব পছন্দ হলো বালজার। এই ভাবে ওদের ভাব হয়ে গেল। বালজা কিন্তু রণ্ডাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না।

সারাটা দিন অসহ্য রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ওরা লক্ষ্য করছিল কোনো গোরিলা ওদের দিকে আসছে কি না। তারপর রাত নামার আগে বালজা ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। একটা বিশাল চিমনি আকারের পাথরের গুহা টারজানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওটার গা বেয়ে উঠে যদি ভিতরে নামা যায় তাহলে গোরিলাদের অতর্কিত আক্রমণ থেকে রাতে বাঁচা যাবে। টারজান আশ্চর্য দক্ষতায় চিমনির মুখে উঠে গেল। তারপর দড়ি ফেলে একে একে ওদের তুলে নিয়ে গুহার ভিতরে ঢুকল। বিশাল গুহায় অনেক আশ্চর্য পাথর ছড়িয়ে রয়েছে।

রণ্ডা চিৎকার করে উঠল, 'হীরে! হীরের পাহাড়!'

সে কয়েকটা পাথর তুলে নিয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। সত্যিই তারা হীরের পাহাড়ে পৌঁছে গেছে।

—এগুলো সব নিয়ে যাব, স্ট্যানলি!' মুঠো করে হীরে ছড়াতে ছড়াতে বলল রণ্ডা।

টারজান বলল, 'কয়েকটা নেওয়াই ভাল। ট্রাক ভর্তি করে হীরে নিয়ে গেলে আমেরিকায় হীরের আর কোন দামই থাকবে না। কাচের মতই ফালতু জিনিষ হয়ে যাবে।'

রণ্ডা কিন্তু ততক্ষণে বিভোর হয়ে স্বপ্ন দেখছে হীরে বেচে বড়লোক হয়ে প্রথমেই সে রিভিয়েরা আর পামবীচে সুন্দর দুটো বাড়ি বানাবে।

আর বালজা স্বপ্ন দেখছে নতুন এই সাদা মানুষটির সঙ্গে সে নতুন এক দুনিয়ায় পাড়ি জমাবে। সারাদিনের ক্লান্তি সে এক নিমেষে ভুলে গেল।

পরদিন ভোর না হতেই ওরা গুহা থেকে বেরিয়ে এল। টারজান রণ্ডাকে কাঁধে নিয়ে পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল। পিছনে নামছে বালজা। প্রকৃতি ওর দেহে অমানুষিক ক্ষমতা দিয়েছে। কারো সাহায্য ছাড়াই ও দিব্যি নেমে আসছে। রণ্ডা নিচের দিকে চেয়ে চোখ বন্ধ করল।

ওরা তিনজনে মাটিতে নেমে এল এক সময়। নদীর ধার দিয়ে আরো অনেক দূর এগিয়ে টারজান বাতাসে মানুষের গন্ধ পেল। তারপর কিছুদূর এগোতেই দেখা গেল ওরমানের দলটিকে। রণ্ডা তো আনন্দে আত্মহারা।

ওরাও দূর থেকে ওদের দেখতে পেল। নেওমি ম্যাডিসন দৌড়ে এসে আনন্দে, আবেগে জড়িয়ে ধরল টারজানকে। সবাই জানে এ-ই ওবরস্কি। সবাই সবাইকে আলিঙ্গন করে আনন্দে কান্নাকাটি করতে লাগল।

ওরমান তার ফিল্ম তোলার কাজ আবার শুরু করবে। মেজর হোয়াইটের জায়গায় অভিনয় করবে প্যাট ওগ্রেডি। বালজাকে কাপড় জামা পরিয়ে সভ্যভব্য করা হল। ওকেও একটা পার্ট দেওয়া হবে।

টারজান কয়েক দিনের জন্য নিজের দেশে ফিরে গিয়ে নতুন লোকজন পাঠিয়ে দিল যাতে ওরমানের কাজের কোনো অসুবিধা না হয়। কিন্তু এই সময় জঙ্গলের পিওন একটা চিঠি

নিয়ে হাজির। দূর হলিউড থেকে খবর এসেছে। ওরমানের দলকে ফিরে আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওরমান একটু ভেঙ্গে পড়ল এই নির্দেশ পেয়ে। দলের অন্য সকলে দুঃখ পেলেও সে দুঃখ কাটিয়ে উঠল। নিজের দেশে ফিরে যাবার আনন্দে সবাই তখন আত্মহারা। ওদের আনন্দ দেখে টারজান মনে মনে ভাবল হলিউডটা একবার ঘুরে এলে হোত।

টারজান ফিরে চলল জিনজার দিকে। ওখানে ওবরস্কির খবর নিতে হবে। তার আগে দলের সবাইকে নিরাপদে পার করার ব্যবস্থা করে দিল। বানস্মুটোদের গ্রামে আর কোনো বিপদ হল না।

সবাই জানাল স্ট্যানলি ওবরস্কি কিছুদিন পরেই হলিউডে ফিরবে। ও যে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে তা কেউ জানল না। টারজানকে দেখে ওরা ভাবল ওদের স্ট্যানলির নতুন পরিচয় পেল ওরা। ওরা জানত না স্ট্যানলি এত বীর।

কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, টারজান জিনজায় গিয়ে শুনল ওবরস্কি কিছুদিন আগে মারা গেছে। দুঃখে, হতাশায় ও চুপ করে বসে রইল।

এক বছর পরে লস্ এঞ্জেলিস স্টেশনে একটি দীর্ঘকায় মানুষ নামল। অসাধারণ তার ব্যক্তিত্ব আর চেহারা। গায়ের রং যেন ব্রোঞ্জের মত উজ্জ্বল। হলিউডের একটি হোটেলে উঠল সে। তার নাম বলল জন ক্লেটন। লণ্ডন থেকে নাকি সে এসেছে।

হোটেলের জানালা দিয়ে ব্যস্ত হলিউড শহরের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল মানুষটি। মুক্ত প্রকৃতির বড় অভাব। বিলাসবহুল হোটেল ঘরে যেন তার দম বন্ধ হয়ে এল।

রিস নামে একটি ছেলে এল ওর তত্ত্বাবধানে। হলিউড শহর ঘুরিয়ে দেখান হল ক্লেটনকে। তারপর নিয়ে যাওয়া হল এক বড় সিনেমায়। সেখানে সেদিন ফিল্ম জগতের তারকাদের আসবার কথা, তাই ভিড়ে ভিড়। ক্লেটন দেখল অসংখ্য গুণমুগ্ধ মানুষের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এল নেওমি ম্যাডিসন। সঙ্গে বালজাও আছে!

সিনেমা দেখে বেরিয়ে রিস জিজ্ঞাসা করল, 'ছবিটা বেশ, তাই না?'

ক্লেটন বলল, 'ছবি আরম্ভের আগে সার্কাসের ঐ দড়ির খেলাটাই সব থেকে ভাল লাগল।'

তাই শুনে রিস একটু অবাক হল। এরপর ক্লেটন গেল একটা পার্টিতে, খাওয়া দাওয়া আর নাচের আসরে। একজন মহিলা ওর নাচের সঙ্গিনী হলেন। ওকে ক্লেটন জিজ্ঞাসা করল 'রণ্ডা টেরিকে জান?'

—'হ্যাঁ'। বলল সেই মহিলা।

—'কি খবর তার?' জানতে চাইলেন ক্লেটন।

মহিলাটি বললেন, 'ও তো টম ওরমানকে বিয়ে করেছে। ফিল্মের কাজে খুব ব্যস্ত ওরা। স্ট্যানলি ওবরস্কির মৃত্যু সংবাদে খুব মুষড়ে পড়েছিল ওরা সবাই।'

সেই পার্টিতেই আলাপ হল ফিল্ম জগতের পট্‌কিনের সঙ্গে। পট্‌কিনের খুব পছন্দ হল ক্লেটনকে। টারজানের ওপর একটা ছবি করতে চায় সে। নাম-ভূমিকায় বেশ মানাবে ক্লেটনকে। সে জানতে চাইল ক্লেটন রাজি কিনা।

ক্লেটন মুখ টিপে একটু হাসল। জিজ্ঞাসা করল, 'সেই বনমানুষ টারজানের ছবি?'

—'হ্যাঁ, দারুণ জমবে, তাই না?'

ক্লেটনের খুব ইচ্ছে হলিউডের স্টুডিও দেখার। তাই এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু পরে দলের অন্য লোকেরা ক্লেটনকে দেখে আপত্তি করল। বলল, 'উঁহু, এ ঠিক টারজানের মত দেখতে নয়। তাছাড়া ফিল্ম জগতে ওকে কে চেনে? ওভাবে ছবির ব্যবসা মার খাবে।'

টারজান এবং চিতা মানুষ

টারজান অ্যান্ড দি লিওপার্ড মেন

ঝড় উঠেছে। আফ্রিকার ঘন বনে একটা ছোট ক্যাম্পে ছোট একটা তাঁবুর ওপর বাতাসের কি দাপট। তাঁবুতে শোয়া তরুণীর দীর্ঘ দিন বনে বনে ঘোরার ফলে অবসন্ন দেহ আর তার চেয়েও কষ্টকর হতাশায় ভরা অবসন্ন মন। সকলের সতর্কবাণী আর বারণ অমান্য করে, যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা তারো সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। শিকার করতে আসেনি সে, সঙ্গে আসকারি নেই। ছবি তুলতে আসেনি, ক্যামেরাও নেই। বৈজ্ঞানিক

গবেষণার জন্যেও আসেনি। এসেছে তার নিরুদ্দেশ ভাইয়ের সন্ধানে। বাইরে একজন মাত্র আসকারি অসতর্ক ভাবে পাহারা দিচ্ছে।

এই সময়ে একটা লোক তার তাঁবুতে ঢুকল। আসকারিদের প্রধান গোলাটোকে দেখে মেয়েটি চমকে উঠে বলল, 'কিছু হয়েছে নাকি? কি চাও?'

—'তোমাকে নিতে এসেছি, কালি বোয়ানা।'

এই ভয়টাই ছিল তার মনে। সঙ্গে সঙ্গে রিভলবার

বের করে সে বলল, 'বেরিয়ে যাও! নয় তো গুলি করব।'

লোকটা আরো এগিয়ে আসতেই মেয়েটি গুলি ছুঁড়ল।

বনের মধ্যে ঝড়ের প্রকোপ কে ঠেকায়। একজন লোক ছোট একটা বাঁদরকে বুকে জড়িয়ে ধরে, গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। কড়-কড়-মড়-মড় শব্দ হতে বাঁদর কোলে লোকটা লাফিয়ে উঠে একপাশে সরে গেল বটে, কিন্তু বিশাল গাছটা তার পাশের আরো দু-তিনটেকে নিয়ে ভেঙে পড়ল। খুদে বাঁদর ভয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পালাল বটে, কিন্তু লোকটা একটা মস্ত ডালের নীচে পড়ে অচেতন অজ্ঞান।

কিবু গ্রামের যুবক নিয়ামওয়েগিও বনের মধ্যে ঝড়ে আটকা পড়েছিল। সে টুম্বাই গ্রামে গেছিল, সেখানকার একটি মেয়ে তার বড় পছন্দ। কিন্তু মেয়ের বাপ বড় বেশি পণ চেয়ে বসল, তাই কথা পাকা হল না। মন খারাপ করে ঝড় মাথায় নিয়ে নিয়ামওয়েগি সন্ধ্যাবেলায় কিবুর পথ ধরেছিল। অর্ধেকটা পথ পার হয়ে গেছিল। এমন সময় পিছন থেকে বড় বড় নখ-ওয়ালা কিছুতে ওকে জাপ্টে ধরল। ছোরায় হাত রেখে চমকে ফিরে নিয়ামওয়েগি দেখতে পেল বিকট একটা মানুষের মুখ, কিন্তু চিতাবাঘের মাথা! আরো কজন ঐ রকম ভয়ংকর জীব ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিমেষের মধ্যে বেচারিকে মেরে ফেলে, শরীরের কোনো কোনো অংশ কেটে নিয়ে, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

*

ভোর বেলায় টুম্বাই গ্রামের মোড়লের ছেলে ওরান্ডো শিকার করতে যাবার আগে, তার মুজিমোকে একটু নৈবেদ্য দেবার জন্য পথে বেরিয়ে এলো। মুজিমো হলো ওরি কোনো পূর্ব পুরুষের আত্মা, তার নামেই ওর নাম হয়েছিল। মুজিমোকে ডেকে বলল, 'মিতা, তুমি আমার সঙ্গে চল, ভালো শিকার পাইয়ে দাও। সব বিপদ ঠেকিয়ে রেখো।'

তারপর কিবু গ্রামের দিকে চলল ওরান্ডো ঘন বনের মধ্যে দিয়ে। পথে দেখল, ঝড়ের দাপটে গাছ ভেঙে পড়েছে। তার তলা থেকে দেখল একটা মানুষের পা বেরিয়ে রয়েছে। পা-টার রং সাদা দেখে চলেই যাচ্ছিল ওরান্ডো, কারণ সাদারা তো আর কালোদের বন্ধু নয়। হঠাৎ ডালপালার মধ্যে দেখে একটা খুদে বাঁদর। সে ওকে দেখেই ভাগল। সাদা লোকটা মরেনি, ওর দিকে চেয়ে ছিল। ওরান্ডো ভাবল মেরে ফেলি, ভেবেই ধনুকে তীর পরাল। লোকটা বলল, 'ওদিক থেকে মারলে গাছের ডালে তীর আটকাবে। এদিক দিয়ে মারো।'

ওরান্ডো অবাক হয়ে গেল। ধনুক নামিয়ে তাকে নজর করে দেখতে লাগল।

লোকটা বলল, 'কোনো ভয় নেই। ডালপালায় চাপা পড়েছি, তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারব না।'

—'তোমার মরার ভয় নেই!'

—'না। চিরদিন বাঁচতে হলে ভয় হত।'

—'তুমি আমাদের ভাষা জানলে কি করে?'

—'কি জানি। বলতে পারছি না।'

—'তোমার নাম কি?'

—'তাও ভুলে গেছি।'

—'তোমাকে ছেড়ে দিলে কি করবে?'

—'খিদে পেয়েছে, শিকার করব। তারপর শুয়ে ঘুমোব।'

—'আমাকে মারবে না তো?'

—'তুমি আমাকে মারবার চেষ্টা না করলে আমিও করব না।'

তখন ওরান্ডো ডালপালা উঠিয়ে, তাকে ছেড়ে দিল। ভাবল কি জানি কাজটা ভালো হল কি না। বল্লমটা হাতে রাখল।

লোকটা ছাড়া পেয়ে, তার বর্শা আর ধনুক গাছ-তলা থেকে কুড়িয়ে নিল। পিঠে তীর আর দড়ি কাঁধে ঝুলছিল। ওরান্ডো বলল, 'চল, শিকার করি।'

—'কোথায়?'

—'শূওররা সকালে কোথায় চরে, আর দুপুরে কোথায় ঘুমোয়, সব জানি।'

ওরান্ডো দেখছিল অচেনা লোকটার কি বলিষ্ঠ চেহারা, সুন্দর মুখ। কপালে একটা কাটার ওপর রক্ত শুকিয়ে জমে ছিল। মাঝে মাঝে কি যেন ভাবছিল।'

হঠাৎ কানে এলো সেই ছোট বাঁদরটার সঙ্গে বাঁদুরে ভাষায় লোকটা কথা বলছে। তারপর বাঁদরটা এক লাফে তার কাঁধে এসে বসল। দুজনে বকে যেতে লাগল। লোকটা হয়তো মানুষ নয়। কত সময় প্রেতরা মানুষের চেহারা নিয়ে ভালোমন্দ কাজ করে। এইসব মনে হতে লাগল ওরান্ডোর।

এর ফলে মনে ভয়-ভাবনা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে প্রেতই হোক আর যাই হোক, ওরান্ডো তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে, কাজেই ওর ওপর চটবার তার কারণ নেই। ভয়টা একটু কমল।

এই সময় বিকট এক দৃশ্য দেখে, তার চিন্তাজাল ছিন্ন

হল। পথের বাঁকে নিয়ামওয়েগির মৃতদেহ পড়ে আছে। তার পিঠে ইস্পাতের বাঘ-নখের দাগ। তাই দেখে অচেনা লোকটি বলল, 'চিতা-মানুষদের কীর্তি এটা!'

এমন স্বরে বলল যেন কিছুই হয়নি। ওরাল্ডো কিন্তু শিউরে উঠেছিল।

চিতা-মানুষদের গোপন সমিতির বীভৎস কার্যকলাপের কথা সে শুনলেও, নরখাদকদের বিকট ক্রিয়ার সব কথা ওদের দলের বাইরে কেউ জানত না।

নিয়ামওয়েগি ওর প্রিয় বন্ধু ছিল। একসঙ্গে ওরা বড় হয়েছিল। ওরাল্ডোর অন্তরাত্মা প্রতিশোধ নেবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। ওর মুখে রাগ দুঃখের ভাব দেখে অচেনা লোকটি বলল, 'ওকে চিনতে?'

—'আমার বন্ধু ছিল।'

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিকের একটা পথ ধরে এগোতে লাগল। ওরাল্ডো বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

—'ওদের সাজা দিতে হবে না?'

—'ওরা যে অনেকজন। আমাদেরো মেরে ফেলবে।'

—'ওরা চারজন। আমি ওদের মারব।'

—'কি করে জানলে চারজন?'

—'পায়ের ছাপ দেখে। একজন বুড়ো, সে খোঁড়ায়। একজন রোগা লম্বা। বাকি দুজন কমবয়সী যোদ্ধা। তাদের একজন খুব লম্বা চওড়া।'

ওরাল্ডো আর দোমনা করল না। বলল, 'কোন দিকে গেছে দেখে আসি। তারপর টুম্বাই ফিরে, আমার বাবাকে বলি। তিনি ওখানকার মোড়ল। ওয়াটেঙা দেশ জুড়ে তাঁর চর যাবে। যুদ্ধের দামামা বাজবে, সব উটেঙা যোদ্ধা ছুটে আসবে। তারপর চিতা-মানুষদের গ্রামের সঙ্গে লড়াই হবে।'

সাদা মানুষটি কোনো কথা না বলে দৌড়ে চলল। পিছন পিছন ওরাল্ডোও চলল! এই লোকটা যদি প্রেতই হয়, তবু এর মনে শুভ ইচ্ছাই আছে। এ নিশ্চয়ই ওর মুজিমো! ওর প্রার্থনা শুনে নিজে নেমে এসেছে! অমনি তার সব ভয় ঘুচে গেল। আস্তে আস্তে ডাক দিল সে, 'মুজিমো!'

—'কাকে ডাকছ?'

—'তোমাকে?'

—'কেন ডাকছ বল।'

—'ওদের গ্রামের কাছে এসে পড়েছি কি?'

—'তা হয়তো আসিনি। কিন্তু ঐ চারটে লোকের কাছাকাছি এসেছি। আমি গন্ধ শুঁকে বলতে পারি, এসো।' এই বলে একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ল।

ওরাল্ডো বলল, 'ও তো আমি পারব না!'

—'তুমি নিচে হেঁটে চল। আমি গাছে গাছে এগিয়ে তাদের খুঁজে বের করি।'

ওরাল্ডো ভাবল আর মুজিমোর সঙ্গে দেখা হবে না। গাঁয়ে কেউ বিশ্বাস-ও করবে না।

তবু ভয়-ডর ভুলে ওরাল্ডোও এগিয়ে চলল। পায়ের ছাপ সে-ও দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু এগুলো যে কত তাজা তা লক্ষ্য করছিল না। হঠাৎ একটু খোলা জায়গায় পৌঁছলে চারজন চিতা-মানুষ ওকে ঘিরে ফেলল।

গুলি খেয়ে গোলাটো পালাল। গুলিটা হাতে লেগেছিল। কালি বোয়ানা আলো জ্বেলে সারারাত জেগে বসে থাকবে ঠিক করল। চেয়ারে বসে বসে সে ঢুলতে লাগল। ঘুম ভাঙল যখন, তখন রোদ উঠে গেছে। বাহকরা মোট গুছিয়ে নিচ্ছে। তার হাত বাঁধা। কালি বোয়ানা তার ছোকরা ইম্বাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার স্নানের জল আর খাবার আননি কেন?' আধবয়সী ছোকরা কোনো জবাব দিল না।

—'আমার কথা শুনছ না কেন?'

সে বলল, 'গোলাটো আমাদের সরদার। আমি তার কথা শুনি।'

কালি বোয়ানা তার গায়ে রিভলবার ঠেকিয়ে বলল, 'গোলাটো আর সরদার নেই। ইম্বা আমার কথা শুনবে।' ওর তেজ দেখে গোলাটো-ও ভড়কে গেল।

কিন্তু এখন কিছু করা যায় না। বড় বেশি দেরি হয়ে গেছিল। খেতে খেতে কালি বোয়ানা দেখল, ওরা ওর হুকুম ছাড়াই তাঁবু নামাচ্ছে, জিনিস বাঁধছে। গোলাটো খোলাখুলি বলে দিল ওরা দেশে যাচ্ছে। ওর কথামতো চললে কালি বোয়ানা ওদের সঙ্গে যেতে পারত। তা যখন শুনবে না, ওরা চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি ওকে ফেলে তারা সবাই চলে গেল। কালি বোয়ানা ভাবতে লাগল একা এই ঘোর বনে সে কি করে বাঁচতে পারে। তাছাড়া যে জন্য আসা, তার কিছুই না করে ফিরেই বা যায় কি করে? ভাবল এইখানেই থেকে যাবে সে।

কিছু খাবার রেখে গেছিল ওরা। ক্যাম্পটার নিরাপত্তার

ব্যবস্থা আরো ভালো করে করতে হবে। এই সব কাজে ব্যস্ত ছিল কালি, শরীর ক্লান্ত, থেকে থেকেই বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল। এমন সময় অভাবনীয় বিপদ এলো।

এদিকে সেই চারটে চিতা-মানুষ ওরাল্ডোকে ঘিরে ফেলেছিল। সে-ও ছেড়ে দেবার পাত্র ছিল না, অমনি বল্লম ছুঁড়ল। চিৎকার করে একজন পড়ে গেল। চিতা-মানুষদের নিয়ম ছিল নখ দিয়ে শত্রু মারবে। তা না হলে শিকারের মাংস ওদের বীভৎস ক্রিয়াতে কাজে লাগবে না। ঐখানে একটু আশার আলো দেখল ওরাল্ডো। কিন্তু কতক্ষণই বা ঠেকাতে পারবে? হঠাৎ কানে এল বাঁদরের চিৎকার।

দুজন শত্রু ওর সম্মুখীন। মাথা ঘোরাতেই পিছনে তৃতীয় শত্রুর ওপর চোখ পড়ল। মুজিমোর কবলে সে ছটফট করছে।

সেদিকে তাকাবার অবকাশ ছিল না। এ দুটো বিকট ইস্পাতে-নখ বাগিয়ে এগিয়ে আসছিল। পিছন থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল। একটা চাপা গর্জন দিয়ে সামনের চিতা-মানুষের ওপর মুজিমো ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারি গলা থেকে ঐ গর্জন বেরুচ্ছিল। তাই শুনে চতুর্থ লোকটা ঘুরে দৌড় মারল। ওরাল্ডো তখন মুজিমোর সাহায্যে এগিয়ে এল। সাহায্য দরকার ছিল না। একহাতে মুজিমো চিতা-মানুষটার নখ-ওয়ালা দুই হাত চেপে ধরে, অন্য হাতে তার গলা টিপে ধরেছিল। একটু পরেই তার প্রাণটা বেরিয়ে গেল। মুজিমো তার গায়ে পা রেখে বিকট জয়ধ্বনি দিল। ঐ জয়ধ্বনি ওরাল্ডো আগেও শুনেছিল, বিজয়ী বনমানুষের গলায়। ও শুনেছিল মুজিমোরা মানুষের চেহারা আর গুণ নিয়ে দেখা দেয়। তাহলে তারা জানোয়ারের গুণও ধরে!

মুজিমোর মুখ এখন শান্ত, সুন্দর। ওরাল্ডো বলল, 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, মুজিমো, আমার জীবনটা এখন তোমার।'

কি যেন ভাবল মুজিমো। তারপর বলল, 'এখন মনে পড়ছে, তুমিও অনেক দিন আগে আমার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলে।'

—'অনেক দিন আগে নয়, আজ সকালে।'

—'তা বটে। আমরা শিকারে বেরিয়েছিলাম। আমার খিদে পেয়েছে। এসো শিকার করি।'

—'ওদের চিহ্ন দেখে ওদের গাঁ খুঁজে বের করবে না?'

—'সবার আগে দেখা যাক মরা মানুষগুলি কি বলে।'

—'তুমি মরা মানুষদের সঙ্গেও কথা বল নাকি?'

—'কথা বলা যায় না। তবে অনেক কিছু জানা যায়। ঐ দেখ রোগা লম্বার শরীর। বুকে তোমার বল্লম বেঁধা বুড়োটাকেও দেখ। লম্বা চওড়াটাকে আমি শেষে মেরেছি। সবার ছোট পালিয়েছে।'

মৃতদেহগুলো, অস্ত্রশস্ত্র, গয়নাগাঁটি পরীক্ষা করল মুজিমো। একটা থলিতে মরা মানুষের শরীর থেকে কাটা টুকরো পেল। ওরাল্ডো শিউরে উঠে বলল, 'এরাই নিয়াম-ওয়েগিকে খুন করেছে। এগুলো তার শরীর থেকে কেটে এনেছে।'

মুজিমো বলল, 'আরো জানা গেছে ওদের ছুঁচলো দাঁত, মানে ওরা নরখাদক। ওদের কবচ ইত্যাদি দেখে বুঝেছি ওরা নদীর ধারে থাকে। ওদের কপালের দাগ দেখে বুঝেছি ওদের কি জাত, কোথায় থাকে। ঐ ছোকরা যোদ্ধার পিছু নেবার দরকার নেই। চল, শিকার করি।'

ওরা ঐ পথেই ফিরে চলল। আধঘণ্টা বাদে মুজিমো দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'সাবধানে এগোও। ওয়াপি হরিণের গন্ধ পাচ্ছি। আমি গাছের ডালে ডালে ওকে ছাড়িয়ে গেলেই আমার গন্ধ পেয়ে ও তোমার দিকে ফিরবে।'

নানা কথা ভাবতে ভাবতে ওরাল্ডো নিঃশব্দে এগোতে লাগল। কিছু পরে দেখতেও পেল হরিণটাকে। ঠিক সেই সময়ে কিছু দেখে শিকার ঘাবড়ে গেল। হাতে ধরা বল্লম ছোঁড়া হল না। গাছের ডাল থেকে হরিণের পিঠে নেমে পড়ল মুজিমো! অল্পক্ষণের মধ্যেই হরিণ মরল। আবার তার গায়ে পা রেখে জয়ধ্বনি দিল মুজিমো। দূরে একটা সিংহ ডাকল। কাঁচা মাংস খেল মুজিমো। ওরাল্ডোর রান্না মাংসই বেশি পছন্দ। তবু লজ্জা পেয়ে সে-ও কাঁচা মাংসই খেল।

*

দুজন ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক পরা শ্বেতাঙ্গ, প্রায় সেই রকম ছেঁড়া তাঁবুর তলায় বসে ছিল। একটু দূরে পাঁচজন নিগ্রো রান্না করছিল। আরেক জন নিগ্রো ছোট একটা উনুনে ওদের জন্য রাঁধছিল। বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ বলল, 'আর পোষাচ্ছে না আমার।'

অন্যজনের বয়স একুশ-বাইশের বেশি নয়। সে বলল, 'কেটে পড় না কেন?'

—'যাবটা কোথায়? আমেরিকায় গিয়ে একটা বেকার বাউণ্ডুলে হব? এখানে এরা আমাকে মান্যগণ্য মনে না করলেও, কাজকর্ম করে দিচ্ছে। কিন্তু তুমি কেন এদেশে

মরতে আছ তা বুঝি না। তোমার তো সারা জীবন সামনে পড়ে আছে—'

—'কি বুড়োদের মতো বাজে বকছ। তোমারো তো ত্রিশ বছর-ও হয়নি।'

—'ত্রিশ-ই যথেষ্ট বয়স। তার আগেই দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কত লোকে টাকা করে, ত্রিশ বছরে অবসর নেয়!'

বয়স্ক যে সে বলল, 'দেশে গেল দুই জনে বাউণ্ডুলে হব নাকি? এক বছর তোমার সঙ্গে ঘুরছি, কিড্, আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলে তুমি বস্তি-বাসী মাস্তান। অত বোকা নই আমি। তুমি হয় ইয়েলে, নয় প্রিন্সটনে পড়েছ। বোধ হয় ইয়েলে।'

—'তুমি কিছু জানতে চাওনি বলেই তোমাকে ভালো লেগে গেছিল।'

—'তুমিও তাই। যাই হক, এক বছর একসঙ্গে আছি, কেউ কারো বিষয়ে কিছু জানি না। একটা মেয়ের জন্যে আমাকে চলে আসতে হয়েছিল। সে যাই হক। হাতিটাতি পাওয়া যাবে না এ অঞ্চলে। এর পর খেতে পাব কি না সন্দেহ।'

—'বুড়ো ববলো বলেছিল এদিকে হাতি আছে, ব্যাটা মিথুক! কি করা যায় ওল্ড টাইমার?'

কিড্ বলল, 'আসলে আমাদের ভাগাবার জন্য বলেছিল। ওর মেয়ের যে তোমাকে ভারি পছন্দ!'

ওল্ড টাইমার বলল, 'ও-সব কথা বাদ দাও। হাতি না এলে, আমাদেরি হাতি খুঁজতে বেরোতে হয়। কিন্তু হাতির দাঁতের ব্যবসা বে-আইনী। এক যদি অনুমতিপত্র পাওয়া যায়। নইলে জেলে পচতে। এখানকার জেল কি জঘন্য তা ভাবতে পার না। আমি বলি কি দুজনে দুটি করে লোক আর কিছু খাবারদাবার নিয়ে, দুদিকে হাতি খুঁজতে বেরোনো যাক।'

—'ধরা না পড়ে কদিন চালাতে পারব?'

ওল্ড টাইমার বলল, 'দু বছর তো চালালাম।'

—'কিন্তু কি বিশ্রী কাজ বাপু!'

—'সে কি আমি জানি না। এক দিন যে ভদ্রলোকের ছেলে ছিলাম, তাই ভুলতে বসেছি। কালই দু-জন দুদিকে রওনা হওয়া যাক।'

টুম্বাই গ্রামে পৌঁছলে মুজিমোকে সবাই ঘিরে দাঁড়াল। ওরাল্ডোর মুখে তার প্রশংসা ধরে না। মুজিমোর কাঁধে বসা ছোট বাঁদরটার ওপর ততটা আস্থা হলো না। যদিও ওরাল্ডো বলল যে ওর ধারণা ও-ই হলো নিয়ামওয়েগির আত্মা, ওদের সাহায্যে এসেছে। মাত্র একজন লোকের মনেই ঘোর সন্দেহ। সে হলো গাঁয়ের ওঝা সোবিটো। ওর নিজের তৈরি অলৌকিকে ছাড়া অন্য কোনো অলৌকিকে ওর বিশ্বাস ছিল না। তাছাড়া এদের ওপর লোকের নজর পড়লে ওর নিজের প্রাধান্য কমে যায়। বড় বড় পা ফেলে সোবিটো যেই মুজিমোর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, নিয়ামওয়েগির আত্মা কিচিরমিচির করে মুজিমোর পিছনে লুকিয়েছে। সকলের চোখ সোবিটোর ওপর। সে-ও তাই চায়। সোবিটো বলল, 'তুমি বলছ তুমি ওরাল্ডোর মুজিমো আর ঐ খুদেটা নিয়ামওয়েগির?'

মুজিমো বলল, 'তুমি আবার কে যে এত কথা জিগ্‌গেস করছো?'

—'আমি সোবিটো ওঝা।'

—'সত্যি বলছ কিনা আমি কি করে বুঝব?'

—'যাকে ইচ্ছে শুধোও। সবাই আমাকে চেনে।'

—'তাহলে আমি কে তা ওরাল্ডোকে শুধোও। আমি কিছুই বলিনি।' এই বলে মুজিমো সেখান থেকে চলে গেল।

গাঁয়ের লোকের ওপর ওঝার অশেষ প্রভাব। তারা ওকে আর ওর জাদুকে বড় ভয় করত। মোড়ল লবঙ্গকে শ্রদ্ধা করত, তার অনুগত প্রজা ছিল। কিন্তু সোবিটোরি ক্ষমতা বেশি ছিল।

আরো পরে লবঙ্গর ঘরের সামনে মিটিং বসল। মোড়ল, গণ্যমান্য সকলে আর যোদ্ধারা ছিল। ওরাল্ডো আরেকবার খুঁটিয়ে সব কথা বলল। তার দাবি হল একদল যোদ্ধা সংগ্রহ করে চিতা-মানুষদের গ্রাম আক্রমণ করে, চিরকালের মতো তাদের অত্যাচার বন্ধ করে দিতে হবে।

লবঙ্গর বয়স হয়েছে, যুদ্ধ তার ভালো লাগে না। কম বয়সীরা যুদ্ধ করবার জন্য পা বাড়িয়ে ছিল। সোবিটোরও যুদ্ধে বেজায় আপত্তি। তার একটা গোপন কারণ ছিল, সে প্রকাশ করার মতো নয়।

সোবিটো বলল, 'যুদ্ধের কথা যারা বলে তারা জয়ের কথা ভাবে, পরাজয়ের দুঃখ গ্লানির কথা তাদের মনে হয় না। তারা ছেলেমানুষ। কোথায় তাদের গাঁ কেউ জানে না। নিয়ামওয়েগির জন্য সর্বনাশের পথে পা দেবার কি দরকার? তার মৃত্যুর প্রতিশোধ তো নেওয়াই হয়েছে। একজন অচেনা লোক যুদ্ধের কথা তুলেছে। সে ওদেরি চর কি না, তাই বা

কে জানে?'

ওরাল্ডো উঠে বলল, 'সোবিটো বুড়ো হয়েছে তাই যুদ্ধ চায় না। আমরা বুড়ো হইনি। যুদ্ধ করতে না গেলে চিতা-মানুষরাও আমাদের ভীতু ভাববে। মুজিমো যদি তাদের চর হত, নিজের হাতে দুটো চিতা-মানুষকে ঘায়েল করত না আর ওকে দেখে চতুর্থ জনও ভয়ে পালাত না। আমি লবঙ্গর ছেলে। একদিন দলপতি হব। মিছিমিছি যুদ্ধ করতে আমিও চাই না। কিন্তু এ যুদ্ধটা দরকার। মুজিমোও আমার সঙ্গে থাকবে।'

এর পর সব কম-বয়সী গ্রামবাসীরা যুদ্ধের নাচ শুরু করে দিল। লবঙ্গ বলল, 'মন ঠিক করবার আগে বিদেহী দলপতিদের মত নিতে হবে।'

সোবিটো বলল, 'তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করছে। সবাই চুপ কর।'

গ্রামবাসীরা গোল হয়ে বসল, মধ্যিখানে সোবিটো। থলি থেকে কয়েকটা জিনিস বের করে, সে কিছু শুকনো কাঠ আর সবুজ পাতা চাইল। সে সব এলে, শুকনো কাঠ জ্বেলে, তার ওপর পাতা চাপা দিল। ধোঁয়া উঠতে লাগল। সোবিটো তার চারদিকে ঘুরতে লাগল। এক হাতে ইঁদুরের চামড়ার একটা থলি, অন্য হাতে একটা হায়নার ল্যাজ। তার গোড়াটা তার দিয়ে বাঁধা। সেটা নিয়ে আরো তাড়াতাড়ি চক্কর দিতে লাগল। তারপর থেমে ধোঁয়ার ওপর কিসের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল আর মাটিতে একটা তিনকোণা দাগ কেটে বলল, 'অনেক বিদেহী আত্মা এসেছে। কেউ যুদ্ধ চায় না। যারা যুদ্ধ করতে যাবে, তারা সবাই মরবে। ওরাল্ডোর সত্যিকার মুজিমোও তাই বলল। সে ওরাল্ডোর ওপর রাগ করেছে।'

ওরাল্ডো মুজিমোকে বলল, 'ওর কথা সত্যি হলে, তুমি আমার মুজিমো নও।'

—'সোবিটো আবার কি জানে। একটু আগুন জ্বেলে, গুঁড়ো ছড়িয়ে, ডাঙোর ল্যাজ নাড়লেই হয়ে গেল? ও আসলে নিজের মতটা বলেছে।'

রাগে সোবিটো কাঁপতে লাগল। 'তুমি আমার পবিত্র চিহ্নকে চটিয়েছ। এখনি চলে যাও। নয়তো তুমি মরবে। তুমি মিথ্যাবাদী!'

মুজিমোর আগের কোনো কথাই মনে ছিল না। ওরাল্ডোর কথাই সে মেনে নিয়েছিল। সে বলল, 'আমি যাব না। আমি সোবিটোকে ভয় করি না!'

গাঁয়ের লোকরা স্তম্ভিত। এমন আস্পর্ধার কথা কেউ শোনেনি। মহা রেগে ওঝা হায়নার ল্যাজ নেড়ে মুজিমোর দিকে তেড়ে এল, 'মর তাহলে! কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। তিন দিনে মৃত্যু নিশ্চিত!' এই বলে মুজিমোর মুখের কাছে ল্যাজটা নাড়তে লাগল। মুজিমো ল্যাজটা কেড়ে নিয়ে আগুনে ফেলে দিল। সকলে শিউরে উঠল।

সোবিটো তখন ক্ষেপে গিয়ে ছোরা বের করে মুজিমোর ওপর লাফিয়ে পড়ল। মুজিমো তার হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিয়ে, তাকে উঁচু করে তুলে ধরে, ওরাল্ডোকে জিজ্ঞাসা করল 'মেরে ফেলব নাকি?'

ওরাল্ডো ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, না, মেরো না।'

মুজিমো ওঝাকে ঝুপ করে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'ওঝারা কেউ কোনো কর্মের নয়। তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বীর যোদ্ধা থাকে, তারা ওরাল্ডো আর মুজিমোর সঙ্গে চিতা-মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে।'

ওঝা অনেকটা দূরে সরে বলল, 'দাঁড়াও না, মুজিমোর বিরুদ্ধে এমন কড়া ওষুধ বানাব যে সে আজই মরবে।'

বুড়োরাও ক্রমে যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দেওয়া বন্ধ করল। লবঙ্গ যুদ্ধে আগ্রহ দেখাল না বটে, কিন্তু আপত্তিও তুলে নিল। যাদের ইচ্ছা যেতে পারে, তাই বলে গাঁ সুদ্ধ যাওয়া হবে না। লবঙ্গর গাঁ থেকে কুড়িজন যাবে। যুদ্ধের কথা শুনে কাছাকাছি গাঁ থেকেও দু-চারজন করে যোদ্ধা এসে জুটতে লাগল।

সে-রাতে ভোজের ব্যবস্থা হল। কিবু থেকে দশজন যোদ্ধা এল। নিয়ামওয়েগির পছন্দ করা সেই মেয়েটির ভাই ছিল তাদের মধ্যে। সবার মুখে মুজিমোর গল্প। ওঝা ওর হাতে কেমন জব্দ হয়েছিল শুনে সবাই খুশি। লুপিঙ্গু বলে কিবু থেকে একজন যোদ্ধা এসেছিল, তার আবার

সোবিটোর সঙ্গে কিছু গোপন কথা ছিল। সোবিটোর সঙ্গে গোপনে তার অনেক কথা হল। ওঝা তাকে জোরালো এক মাদুলা দিল। সেটা পরলে কোনো শত্রু তার ক্ষতি করতে পারবে না। তার মাথায় জেগে রইল জঘন্য এক মৎলব।

কালি বোয়ানা স্রেফ মনের জোরে একা একা বনে দিন কাটাচ্ছিল। আজ সে একটা শূওর মেরেছিল। গুলির শব্দ শুনে একজন শ্বেতাঙ্গ আর তার তিন কালো সঙ্গী থমকে দাঁড়িয়েছিল। কালি শূওরটার নাড়িভুঁড়ি বের করে দিয়ে, ওজন কমিয়ে, অনেক কষ্টে সেটাকে বয়ে, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে, অবশেষে ক্যাম্পের সামনে বসে পড়েছিল। সামনে তখনো অনেক খাটুনি। ছাল ছাড়ানো, টুকরো করা, ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য ধোঁয়ায় শুকিয়ে রাখা। কাজের অন্ত ছিল না, শক্তির অন্ত ছিল না।

ঐসব করতে করতে হঠাৎ চোখ তুলে দেখে চারজন লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের একজন শ্বেতাঙ্গ। এমন জঘন্য চেহারার শ্বেতাঙ্গ কালি বোয়ানা কখনো দেখেনি। ছেঁড়া নোংরা কাপড় চোপড়, এক মুখ দাড়ি গোঁপ, ঝাঁকড়া চুল, নীরস কড়া মুখের ভাব। সে বলল, 'কে তুমি? এখানে কি করছ?'

অমনি মেয়ের রাগ হয়ে গেল, 'তোমার তাতে কি যায় আসে?' এই বলে পিঠ ফিরে বসল।

লোকটার ভুরু আরো কুঁচকে গেল, মুখে কয়েকটা রাগের কথা এলেও, বলা হল না। মেয়েটা ছেলেমানুষ, দেখতে ভালো। দুবছর ওল্ড টাইমার কোনো শ্বেতাঙ্গ মেয়ে দেখেনি। নোংরা, ঘেমো, হাতে রক্ত মাখা। তবু সুন্দর। ওকে দেখেই ওল্ড টাইমারের মনের পুরনো দুঃখটা চাগিয়ে উঠেছিল, তাই মেজাজ খিঁচড়ে গেছিল।

একটু পরে সে বলল, 'আমার নিশ্চয় নাক গলানো উচিত নয়, তবু একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে এ অবস্থায় দেখে তো উদাসীন থাকতে পারি না। তোমার সঙ্গে কেউ নেই?'

—'কেউ নেই। তাই আমার ভালো লাগে।'

—'বাহক কিম্বা নিজের দেশের সঙ্গীসাথীও নেই?'

—'না।'

—'যাওয়া-আসার ব্যবস্থা আছে?'

—'তাও নেই। তারা সব পালিয়েছে। তিন দিন আগে।'

—'এ ভাবে ক'দিন থাকা সম্ভব?'

—'যদ্দিন না—'

—'থাকলে কেন? যদ্দিন না কি?'

—'জানি না।'

—'এখানে কেন এসেছ?'

—'একজন লোককে খুঁজছি। তার নাম জেরি জেরোমি। দেখেছ তাকে?'

—'না তো।'

মেয়েটার মুখে আশার আলো নিবে গেল। চোখ চিকচিক করে উঠল। লোকটা বলল, 'ঐ মাংস নিয়ে কি করছ?'

মেয়েটি রেগে গেল, 'তোমাকে নিয়ে পারা গেল না। যাবে কি না বল।'

—'না, যাব না।'

লোকগুলোকে কি যেন বলতেই তারা এগিয়ে এসে শূওরটাতে হাত দিল।

কালি বলল, 'ছেড়ে দিতে বল। নয়তো গুলি করব।'

—'ওরা খালি ওটাকে সাফ করে কেটেকুটে দেবে। তাই তো করতে চাও? নাকি ফ্রেমে বাঁধাবে?'

কালি বলল, 'তা বলনি কেন? ভাবছিলাম ধোঁয়ায় শুকিয়ে রাখব।'

—'তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব।'

—'তার মানে?'

—'মানে হল, এভাবে একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে একা ফেলে রেখে চলে যেতে তো পারি না। তুমি আমাদের ক্যাম্পে যাবে।'

—'যদি রাজি না হই?'

—'তাতে আমার কিছু এসে যায় না। মেয়েদের কাছ থেকে আমি দয়ামায়া, সুবুদ্ধি, কিছুই আশা করি না।'

—'মেয়েদের বিষয়ে তোমার দেখছি খুব উচ্চ ধারণা।'

—'যা বলেছ। তোমার জন্যে একটা নতুন সাফারির ব্যবস্থা করতে পারলে, তোমাকে আফ্রিকা থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা করে দেব।'

—'আমি তো যেতে চাই না। আমার কাজ শেষ করে তবে যাব।'

—'ঐ জেরোমি ব্যাটার খোঁজে যদি থাকতে চাও, তাহলে আমার স্বজাতির প্রতি কর্তব্যের খাতিরে ওকে পাবার আগে, তোমাকে রওনা করে দেওয়া উচিত।'

কালি বোয়ানা ভাবছিল এমন লোক সে কখনো

দেখেনি। হয়তো মাথার কিঞ্চিৎ গোলমাল আছে, নইলে কেউ অমন খোলাখুলি কথা কয় না। ওর সঙ্গে যাওয়াই ভালো। তাই বলল, 'বেশ, তাই যাব।'

—'তাহলে আমার এখানকার কাজ সেরেই রওনা হওয়া যাবে। আমার একটা লোক রাঁধাবাড়া করবে। তুমি আমি যে যার মতো থাকব। আমার তো তোমার সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছা করে না।'

কিঞ্চিৎ গরম হয়ে কালি বলল, 'তাতে আমিও খুশি।'

লোকটা বলল, 'আমার ক্যাম্প হল ববলো মোড়লের এলাকায়। আমার কিছু হলে, এদের সঙ্গে সেখানে যেও, আমার পার্টনার সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের তাঁবু থেকে কালি দেখতে পাচ্ছিল ধুনির পাশে শুয়ে শুয়ে লোকটা পাইপ খাচ্ছে। সত্যি, এমন জঘন্য মানুষ কম আছে। তবু সে আছে বলে বড় নিশ্চিন্তও লাগছে। এদেশে কি একা থাকা যায়?

পরদিন সকালে সে দুজন লোক নিয়ে কাজে বেরিয়ে গেল। এমনি অভদ্র যে কিছু বলেও গেল না।

ওল্ড টাইমারের কপালটাই মন্দ। একটা হাতি চোখে দেখল না। একটা লোক দেখল না যে হাতির খবর দেয়। এমনিতেই মনটা নৈরাশ্যে ভরে গেছিল, তার ওপর মেয়েটির বিষয়ে চিন্তা হচ্ছিল। তাঁবুতে ফিরেই চক্ষুস্থির। মেয়েটির কোনো চিহ্ন নেই। যাকে ক্যাম্পে রেখে গেছিল, তার মৃতদেহ পড়ে আছে। সর্বাঙ্গে বড় বড় নখের দাগ, কয়েকটা অঙ্গ কাটা। নিগ্রোরা শিউরে উঠে বলল, 'চিতা-মানুষদের কাজ, বোয়ানা।'

তখন বিকেল হয়ে গেছিল, কিন্তু এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে, নিগ্রোরা তাদের সঙ্গীদের কবর দিয়ে, সামান্য যা জিনিসপত্র দুর্বৃত্তরা নেয়নি, সেগুলো দুটি বোঁচকা করে বেঁধে, ওরা রওনা হয়ে গেল। চিতা-মানুষরা পায়ের ছাপ রেখে গেছিল।

*

সে রাতে ভোজ খেয়ে আর প্রচুর হাঁড়িয়া পান করে, পরদিন সকালে যোদ্ধারা রওনা হল, দেখা গেল অনেকে খসে পড়েছে, অনেকে অত মদ খেয়ে আর হাঁটতেই পারছে না। মোট কথা শত খানেক যোদ্ধা রওনা হল। তাদের মধ্যে মুজিমো আর নিয়ামওয়েগির আত্মাকে না দেখে কেউ কেউ বলছিল, 'তবে কি সোবিটো ওকে মেরে ফেলেছে নাকি?'

যাবার জন্যে যখন তোড়জোড় হচ্ছে, তখন মুজিমো এসে হাজির।

—'কোথায় গেছিলে?'

মুজিমো একটা মস্ত হরিণ মেরে এনেছিল। বলল, 'যা বদ্ খাওয়া তোমাদের, তাই শিকারে যেতে হল।' এই বলে ছুরি নিয়ে কেটে কেটে কাঁচা-কাঁচা খেতে লাগল। মাঝে মাঝে জানোয়ারের মতো গলা থেকে গুরগুর শব্দ হতে শুনে, গাঁয়ের লোকরা একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়াল।

এক বুড়ো বলল, 'সোবিটোকে মেরেটেরে ফেললে নাকি? গাঁয়ে তো তাকে দেখছি না।'

—'আমিও কালকের পর দেখিনি।'

খাওয়া-দাওয়ার পর মুজিমো যাবার জন্য তৈরি। ওরান্ডো তার দলবল সাজাল। কে কোন দলের নেতৃত্ব করবে ঠিক হল।

মুজিমো তফাতে দাঁড়িয়ে বড় ভাবনায় পড়েছিল। কি যেন ওর মনে পড়া উচিত ছিল, কি কথা যেন ও ভালো করেই জানে, অথচ সেই যে ওরান্ডো ওকে গাছের তলা থেকে উদ্ধার করেছিল, তার আগের কিছুই মনে পড়ছিল না। অথচ চেনা জিনিস দেখলেই তার নাম পর্যন্ত মনে পড়ছিল। কোনো বিপদের মোকাবিলা করতেও অসুবিধা হচ্ছিল না।

ওরান্ডোর আর মুজিমোর নেতৃত্বে ওরা তিন দিনের পথ পার হয়ে গেল। মুজিমো বলেছিল ওরা এবার চিতা-মানুষদের গ্রামের কাছে পৌঁছে গেছে।

শেষের দিনে লুপিঙ্গো অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই রাগ করতে লাগল, ব্যাটা ভয়ের চোটে ভেগেছে। এদিকে মুজিমোর কাঁধ থেকে গাছে উঠে নিয়ামওয়েগির আত্মা চিতা-মানুষদের গাঁয়ের দিকে চলেছিল।

কালি বোয়ানার বড়ই দুর্দশা। ওর চোখের সামনে বিশ্বাসী নিগ্রোটিকে বীভৎস ভাবে মেরে ফেলে ক্যাম্প লুঠপাট করে, ওর গলায় দড়ি বেঁধে সঙ্গে নিয়ে চলল। দলের পাণ্ডা এক বুড়ো, তাকে বড় নিষ্ঠুর মনে হল। অন্যরা ওর ওপর কোনো অত্যাচার না করলেও, বড়ই রূঢ় ব্যবহার করছিল। পড়ে গেলে টেনে হিঁচড়ে তুলছিল। এখন সেই অভদ্র সাদা মানুষটার জন্য মন আকুল হল। যতই অভদ্র হোক না সে, তার দয়ামায়া আছে।

হেঁটে হেঁটে দ্বিতীয় দিন ওরা একটা মজবুত গাছের গুঁড়ির বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা নদীর ধারের গ্রামে পৌঁছল।

ঐ গ্রামের মোড়ল বুড়ো গাটো এমগুঙ্গুর বিশাল ভুঁড়ি। বুড়োকে দেখে বলল, 'আমার জন্য উপহার আনলে নাকি লুলিমি?'

লুলিমি বলল, 'গাঁসুদ্ধু সকলের জন্যে এনেছি।'

অমনি সকলের কান খাড়া। লুলিমি চিতা-মানুষদের একজন ক্ষমতাশালী পুরোহিত। বলল, 'তিন রাত আগে, এখান থেকে অনেক দূরে গভীর রাতে ধুনির আগুনের পাশে পাহারা দিচ্ছিলাম। আর সকলে ঘুমোচ্ছিল। সিংহের আর চিতাবাঘের সাড়া পাচ্ছিলাম। এমন সময় এক জোড়া সবুজ চোখ দেখলাম। সবুজ চোখ কাছে এলে দেখি বিশাল এক চিতাবাঘ। ভয়ে মরেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় চিতা বলল, 'আমি চিতা-দেবতার ভাই। দেবতা বলেছেন লুলিমির মতো সাহসী আর বিদ্বান কেউ নেই। তারপর কিছু গোপন কথা বলে আরো বলল, এই বনে একটা ক্যাম্পে মাত্র একজন নিগ্রো আর একজন সাদা মেয়ে আছে। নিগ্রোকে মেরে ফেলে, মেয়েটিকে নিয়ে এসে আমার মন্দিরের প্রধান পূজারিণী করতে হবে।'

এ-কথা শুনে সবাই চুপ। এমগুঙ্গু খুব একটা খুশি না হলেও, ভাবছিল এখনকার প্রধান পুরোহিত এত বুড়ো যে আজ বাদে কাল মরবে। তখন লুলিমিই প্রধান পুরোহিত হবে। অতএব তাকে চটিয়ে কাজ নেই। অবিশ্যি মনে মনে মোড়ল জানত ঐ চিতা-ভাইয়ের কথা বুড়ো স্রেফ বানিয়ে বলছে। অতএব মোড়ল আপত্তি করল না, কালি বোয়ানাও চিতা-মন্দিরের প্রধানা পূজারিণীর পদ পেয়ে গেল।

এই সময়ে বিশ্বাসঘাতক লুপিঙ্গু এসে খবর দিয়ে গেল উটেঙার মোড়লের ছেলে ওরান্ডো একশো যোদ্ধা সহ তার বন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ নিতে আসছে।

*

কালি বোয়ানা তার চারদিকে একটা কিছু হচ্ছে শুধু এটুকুই বুঝতে পারছিল। গ্রামের যোদ্ধারা তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্র বের করছিল। তারপর তারা রওনা হয়ে গেল। কালি ভাবছিল তবে কি ওরি খোঁজে কেউ আসছে নাকি?

লুলিমি এবার নেতৃত্ব করতে লাগল। কালি বোয়ানার রক্ষী হয়ে কুড়ি জন সশস্ত্র যোদ্ধা দেখা দিল। তাদের সঙ্গে নৌকোর দাঁড়ও ছিল। গাঁয়ের মেয়েরা কিন্তু পারলে ওকে ছিঁড়ে ফেলত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কালিকে একটা বড় কেন্যুতে বসিয়ে, নিঃশব্দে দাঁড় বেয়ে চলল, তবে তীর থেকে বেশি দূরে গেল না। মেয়েটির গলার দড়ি খুলে, তাকে বেশ খাতির দেখাচ্ছিল সকলে। ওকে কোথায় এবং কেন নিয়ে যাচ্ছে, ভেবে বেচারা সারা হচ্ছিল। নিশ্চয় ওকে যারা উদ্ধার করতে আসছে, তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। ওর কথা বাইরের কে-ই বা জানে? জানে শুধু সেই তিক্ত মেজাজের ছেঁড়া-খোঁড়া পোষাক পরা লোকটা। তার ক্যাম্প কি এদিকে? যা গরীব সে, কতটুকুই বা করতে পারে সে?

কিছু দূরে গিয়ে নৌকোটা একটা শাখা-নদীতে ঢুকে পড়ল। দুধারে ঘন আগাছা আর গাছপালা। সোঁদা বিশ্রী গন্ধ নাকে এল। নদীতে কুমিরের বাস। যেখানে যাচ্ছে ওরা, এটাই তার একমাত্র পথ। দু-মাইল এগোলে, ডান পাড়ে একটা ঘাসের ছাউনি দেওয়া মস্ত ঘর দেখা গেল। এত বড় ঘর দেখে কালি বোয়ানা অবাক হলো। হয়তো দুশো ফুট লম্বা, পঞ্চাশ ফুট চওড়া। উঁচুতে পঞ্চাশ ফুট হবে নদীর তীর বরাবর দশ ফুট উঁচু খুঁটির ওপর তৈরি ঘরটা ওদের সামনেই প্রবেশ-পথ। দুদিকে লম্বা লম্বা বারান্দা দেখা যাচ্ছিল।

এদের দেখে কয়েকটা লোক বেরিয়ে এলো। লুলিমি ডেকে দলের গোপন সংকেত দিল। অদ্ভুত চেহারার কয়েকজন পুরোহিত ওকে অভ্যর্থনা করে, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে গেল। প্রবেশ-দ্বারের দুপাশে বিকট চেহারার দুই মূর্তি। ঢুকে দেখল প্রকাণ্ড ঘর, তার থামে আর কড়ি-বরগায় ভীষণ সব মুখোস, অস্ত্রশস্ত্র, মরা মানুষের খুলি, নানা মূর্তি। অনেকগুলোর মানুষের মতো গা, জানোয়ারের মতো মাথা। সব অপটু হাতে খোদাই করা। ওগুলো হয়তো সবই চিতার মাথা, তবে চেনা যাচ্ছিল না।

ঘরের এক মাথায় একটা মাটির তৈরি মঞ্চ। তার ওপর জানোয়ারের লোম দিয়ে ঢাকা একটা ছোট মঞ্চ। ছোট মঞ্চে একটা শক্ত খুঁটিতে একটা মড়ার খুলি।

মঞ্চের পিছন থেকে একটা থুত্থুরে বুড়ো বেরিয়ে এসে লুলিমিকে বলল, 'এই সাদা মেয়েকে এনেছ কেন? বলি দেবে নাকি?'

লুলিমি বলল, 'তোমার নিজের ভবিষ্যদ্বাণী মনে কর। তুমি বলেছিলে একজন সাদা পূজারিণী তোমার আর চিতা-দেবতার সঙ্গে মন্দিরের সিংহাসনে বসবে।'

বুড়ো ইমিগেগের কিছুই মনে পড়ল না। লুলিমি জানত বুড়োর কিছুই মনে থাকে না। তাই সে সুবিধা মতো নানা কথা বানিয়ে বলত।

ইমিগেগ বলল, 'দেবতাকে নরবলি দাও, তবেই ঐ সাদা

মেয়ে এখানে বসতে পাবে।'

—'তাহলে আর দেরি নেই। আমার মুজিমো বলেছে গাটো এমগুঙ্গুর গ্রামে যে যোদ্ধারা গেছে, তারা আজ সকলের জন্য খাবার নিয়ে আসবে। তাহলে সাদা মেয়েটিকে প্রস্তুত কর।'

বুড়ো হাততালি দিতেই কয়েকজন সাধারণ পুরোহিত এগিয়ে এল। ইমিগেগ বলল, 'একে পূজারিণীদের কাছে দিয়ে এসো। এ-ই আমাদের প্রধানা পূজারিণী। একে যেন ওরা প্রস্তুত করে রাখে। আর এর যেন কোনো ক্ষতি না হয়।'

তারা ওকে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে জনা বারো কম বয়সী আর একজন বুড়ি পূজারিণী ছিল। সকলের পরণে একটি করে নেংটি। মেয়েরা কালিকে দেখেই রেগে উঠল। পুরোহিতরা বলে দিল 'যে ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে, মুস্কিলে পড়বে।'

বুড়ি বলল, 'আমার কাছে রেখে যাও। মুমগার কাছে ও নিরাপদে থাকবে।'

মেয়েগুলো একটু খিমচে টিমচে দিল ওকে, কাপড় চোপড় ছিঁড়ে দিল, তার বেশি কিছু করল না। কালি বোয়ানা ব্যাপারটা বুঝল না, তবে মেয়েগুলোর নিকৃষ্ট ধরনের মুখ, ছুঁচলো হলদে দাঁত. রাগত কথা লক্ষ্য করে বেশ ঘাবড়ে গেল।

ওরা ওর কাপড় ছাড়িয়ে বিশ্রী গন্ধ কড়া কড়া তেল মাখিয়ে, চিতাবাঘের ছালের পোষাক পরাল। নানা রকম গয়না পরাল, সোনার, তামার, দাঁতের, পালকের। সবার শেষে হাতের দশ আঙ্গুলে দশটা সোনার তৈরি বীভৎস দেখতে নখ পরিয়ে দিল।

*

মুজিমোর খুদে সঙ্গী নিয়ামওয়েগির আত্মাটা বড্ড বকবক করে, বড় বেশি মানুষের মতো। দরকার হলে ধমক খেয়ে চুপ করে। সেদিন ওরা খুব ভোরে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, চিতা-মানুষদের গ্রামের খোঁজে। কিন্তু তাড়া না থাকলে মুজিমো গড়িমসি করে এগোয়। শুঁকে শুঁকে ওরা যখন সেখানে পৌঁছল, তার অনেক আগেই কালি বোয়ানাকে নিয়ে নৌকো রওনা হয়ে গিয়েছিল। যোদ্ধারাও লুপিঙ্গুর কথা শুনে, ওয়াটেঙ্গার যোদ্ধাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গেছিল। ওরা দেখল চিতা-গ্রাম চুপচাপ, জনা কয়েক ছেলে বুড়ো আর মেয়েরা নিত্যকার কাজে ব্যস্ত। তবে ফটকটা খুব মজবুত এবং সেখানে পাহারা বসে আছে।

হঠাৎ চোখ পড়ল লুপিঙ্গু চিতা-গ্রামের মোড়লের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পাহারারা গেট খুলে দিল, লুপিঙ্গু উটেঙ্গা ক্যাম্পের দিকে চলল। অমনি ব্যাপারটা বুঝে নিল মুজিমো। ব্যাটা বিশ্বাসঘাতক, উটেঙ্গাদের সব খবর দিয়ে, এখন ভালোমানুষের মতো ফিরে যাচ্ছে।

চিতা-গ্রামের যোদ্ধারা যাবার সময়ে অন্য পথ ধরেছিল, তাই মুজিমোর সঙ্গে দেখা হয়নি, কিন্তু ফেরার পথে দূর থেকে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। মনে হল যোদ্ধারা তাড়াতাড়ি মার্চ করে আসছে। ওরাল্ডোর দল নাকি? কিন্তু কাছে এলে দেখা গেল, তা নয়। একজনকেও চিনতে পারল না।

তাদের সাড়া পেয়েই লুপিঙ্গুও ঝোপের মধ্যে লুকোল। মুজিমোও গাছের ডালে পাতার আড়ালে সরে বসল। নাকে এল তাজা রক্তের গন্ধ। এরা আহত সহ যুদ্ধ-ফেরত যোদ্ধা। আরো কাছে এলে বোঝা গেল এরা উটেঙ্গা নয়, অচেনা যোদ্ধার দল মনে হল। চিতা-গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। সেই জন্যেই চিতা-গ্রামে এত কম লোক ছিল। এরা সংখ্যায় শ'তিনেক হবে। ওরাল্ডোর তো মাত্র একশো যোদ্ধা। তবু মুজিমোর মন বলল সে পরাজিত হয়নি।

ঐ যোদ্ধারা চলে গেলে, লুপিঙ্গো আবার ওরাল্ডোর ক্যাম্পের পথ ধরল। ক্যাম্পে কেউ ছিল না। তাই দেখে লুপিঙ্গু কি খুশি। কিন্তু চিতাগ্রামের লোকদের সঙ্গে বন্দী ছিল না কেউ, নিজেদের মৃত যোদ্ধাও ছিল না। তাহলে সম্ভবতঃ ওরাল্ডো ওদের ভাগিয়ে দিয়েছে। লুপিঙ্গু কিন্তু দোমনায় পড়েছিল। উটেঙ্গাদের ক্যাম্পে ফিরে না গেলে, ওরা ওকে সন্দেহ করতে পারে। নাকি সাদা প্রধানা পূজারিণীর অভিষেক অনুষ্ঠান দেখতে যাবে। শেষে আগে আগে একবার উটেঙ্গাদের কাছে যাওয়াই স্থির করল। সেখানে দ্বাররক্ষীরা ওকে দলের লোক জেনে, কিছু বলল না। দশ জন মৃত যোদ্ধার সৎকারের ব্যবস্থা হচ্ছিল।

ওকে দেখেই ওরাল্ডো বলল, 'যুদ্ধের সময় কোথায় ছিলে?'

—'কেন আমিও লড়ছিলাম।'

—'কই, দেখলাম না তো।'

—'আমি অন্ধকার থাকতে চিতা-গ্রামে গিয়েছিলাম, যাতে তোমাদের কাছে ওদের খবর আনতে পারি। তা সেখানে ধরা পড়ে গেছিলাম। প্রাণপণে লড়ে, তিনটেকে ঘায়েল করেছি। শেষ পর্যন্ত বন্দী হলাম। তাই যুদ্ধে যোগ

দেওয়া হল না। মনে হল চিতা-মানুষরা পালাচ্ছিল, তার মানে তোমরা জিতেছ। ফাঁকতালে আমিও পালিয়ে এসেছি।

ওরাল্ডো ওর কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করেনি। ভেবেছিল ব্যাটা ভয়ের চোটে গা ঢাকা দিয়েছিল। হঠাৎ মুজিমো আর নিয়ামওয়েগির আত্মা গাছ থেকে নেমে এল। 'যুদ্ধ হয়েছে বুঝলাম। ওদের পালাতে দেখেছি। কিন্তু তোমার লোকদের দেখেও মনে হচ্ছে তারা হেরে গেছে। কি ব্যাপার বলতো।'

ওরাল্ডো বলল, 'আমরা প্রস্তুত হবার আগেই ওরা আক্রমণ করে, বেশ কয়েকজনকে মেরে ফেলল, কিম্বা জখম করল। তারপর আমাদের যোদ্ধারা এমনি রুখে উঠে লড়াই দিল যে ওরা পালাতে বাধ্য হল। ওরা দলে ভারি বলে পিছু নিইনি। গ্রামের লোকরাও বলছে নিয়ামওয়েগির হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেছে, এবার তারা গাঁয়ে ফিরে যাবে।'

ওরাল্ডো আরো বলল, 'আমি ভাবছি ওরা কি করে জানল আমাদের যোদ্ধারা লড়তে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে বলছিল চিতা-দেবতা ওদের পাঠিয়েছেন, ভোজের জন্য মাংস নিয়ে যেতে।'

মুজিমো বলল, 'বলব কি করে জেনেছিল? লুপিঙ্গুর দিকে তাকাও। আবার না গুপ্তচরগিরি করে। কোনো দেবতাটেবতা মাংস নিয়ে যাবার কথা বলেনি, লুপিঙ্গু বলেছে। আমি গাছের ওপর থেকে সব দেখেছি, শুনেছি।'

অমনি উটেঙ্গারা লুপিঙ্গুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে মেরেই ফেলত, ভাগ্যিস মুজিমো তাকে টেনে নিয়ে বলেছিল, 'মেরো না ওকে। আমার কাছে দাও।'

তাই দিল ওরা। মুজিমোর আদেশে ওর হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। তারপর তাকে কাঁধে করে, এক লাফে গাছে চড়ে, মুজিমো অদৃশ্য হয়ে গেল।

*

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এমন সময় দুজন নিগ্রো সহ ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক পরা ওল্ড-টাইমার বনের ধারে, বেড়ায় ঘেরা গ্রামটার কাছে পৌঁছাল। নিগ্রোদের একজন বলল, 'যেও না, বোয়ানা, ওটা চিতা-মানুষদের গ্রাম।'

ওল্ড টাইমার বলল, 'আমি এর আগেও বুড়ো গাটো এমগুঙ্গুর সঙ্গে ব্যবসা করেছি।'

—'তখন সঙ্গে বন্দুকধারী আস্কারি ছিল আর বুড়ো মোড়ল ব্যবসা করত। এবার তারা দুটো ছোকরা নিয়ে এসেছে। গিয়ে দেখবে মোড়ল হল চিতা-মানুষ।'

—'দুর! সাদা মানুষদের কিছু বলবে না।'

—'তুমি ওদের চেনো না। ওরা মাংসের জন্যে নিজেদের মা-বাপকেও খুন করে।'

—'চিহ্ন দেখে বুঝেছি মেয়েটাকে এখানে এনেছে। আমাকেও ঢুকতে হবে।'

ওরা বলল, 'আমাদের মরবার কোনো ইচ্ছা নেই।'

—'তাহলে বনে আমার জন্যে অপেক্ষা কর। কাল রোদ ওঠা অবধি অপেক্ষা করে যে ক্যাম্পে ছোট বোয়ানা অপেক্ষা করছে, সেখানে খবর দিও আমি মরে গেছি।'

ওরা অনেক বেঝাল যে ও মেয়েটা তোমার কেউ নয়, ওর জন্যে মরবে কেন। কিন্তু বোয়ানা শুনল না। ওকে অনেক আশীর্বাদ করে ওরা চলে গেল।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে হিংস্র চোখ সবই দেখল।

মোড়লের কাছে খবর গেলে এমগুঙ্গু বলল, 'ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

ওল্ড টাইমার লক্ষ্য করল গ্রামে মেলা লোকজন। আহত লোকও ছিল তাদের মধ্যে। ওকে দেখে কেউ খুশি হল না। চেনা লোক এমগুঙ্গু এতটুকু সৌজন্য না দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করতে এসেছ?'

—'সাদা মেয়েটাকে নিতে এসেছি।'

—'এখানে কোনো সাদা মেয়ে নেই আর আমি সাদা লোকদের হুকুম মতো চলি না।'

—'আমার কথা না শুনলে, সিপাই এসে গ্রামটাকে মুছে ফেলে দেব।'

—'আমার সব জানা আছে। তোমাদের সঙ্গে পাঁচ-ছটা লোক, টাকাকড়িও নেই। হাতির দাঁতের বে-আইনি ব্যবসা কর! তুমি আনবে সেপাই! তাহলেই হয়েছে!'

—'তাই কি? আমার কি করতে পার?'

—'মেরে ফেলতে পারি!'

ওল্ড টাইমার হাসল, 'তাহলে সরকার সত্যি তোমাদের গাঁ জ্বালিয়ে দেবে!'

—'জানতে পারলে, তবে তো।'

এতক্ষণ পরে আসল মোড়ল ববলোর ওপর চোখ পড়লে, ওল্ড টাইমার বুঝল সে সত্যি বিপদে পড়েছে। সে কিছুই করল না। যোদ্ধারা ওল্ড টাইমারকে বেঁধে একটা জঘন্য নোংরা কুঁড়ে ঘরে ফেলে রাখল। বাইরে একজন পাহারা

রইল। ওল্ড টাইমারের ছুরিটাও তার পকেটে রয়ে গেল। মেয়েটার কথা মনে পড়তে আরো মন খারাপ হয়ে গেল।

রাতে ববলো এসে বলল, 'দশটা হাতির দাঁত পেলে পুরনো বন্ধুর উদ্ধারের ব্যবস্থা করবো।'

দশটা দাঁত সে কোথায় পাবে? বলল, 'দাঁত জোগাড় হলেই দিয়ে দেব। এখন ছেড়ে দাও।'

—'না, আগে দাঁত। তোমার সেই বন্ধুকে খবর দাও, আমি লোক দিয়ে পাঠাচ্ছি।'

—'হাতের বাঁধন খুলে দাও, লিখে দিচ্ছি।'

—'না লেখাটেখা চলবে না। তোমার আংটিটা দাও, মুখে মুখে খবর যাবে।'

আংটি নিয়ে যাবার সময় ববলো বলল, 'দাঁত এলেই ছাড়া পাবে।'

তার কথায় কোনো আস্থা না থাকলেও আংটি দিয়ে দিল ওল্ড টাইমার।

এমগুঙ্গুর ঘরের সামনে সভা বসেছিল, সাদা মানুষটাকে এখানেই মারা হবে, নাকি মন্দিরে পাঠানো হবে। এমন সময় ধপ করে লুপেঙ্গুর মৃতদেহ গাছের ওপর থেকে ওদের সামনে পড়ল। তাকে সবাই চিনতে পেরে ঘাবড়ে গেল। এ বড় অশুভ লক্ষণ। ওরা বিশ্বাসঘাতককে এইভাবে সাজা দিয়েছে।

—'ওরান্ডোর মুজিমো সাদা দৈত্যের রূপ নিয়ে ওদের সঙ্গে আছে।' বলল একজন 'তাছাড়া কিবুর নিয়ামওয়েগিকে চিতা-মানুষরা মেরেছিল, সে-ও আছে।'

ববলো বলল, 'তার চেয়ে লোকটাকে চিতা-মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে পাঠিয়ে দিলে, আমাদের কোনো দায় থাকবে না।'

ঠিক হল সেই রাতেই আপদ বিদায় করা হবে।

গাছ থেকে সব দেখল মুজিমো। নৌকো করে সাদা বন্দীকে রওনা করে দেওয়া হলে, গাছে গাছে মুজিমোও সঙ্গে চলল। নিয়ামওয়েগির আত্মার বড় ভয়। 'কালোগুলো আমাদের দেখলেই মেরে ফেলবে। যাবার কি দরকার?'

—'না, দেখতে হবে ওরা কোথায় যায়, কি করে। তোমার ভয় করলে গাছের ডালে ঘুমোও, আমি একাই যাব।' একা থাকতে তার আরো ভয়।

যে নৌকোয় ওল্ড টাইমার ছিল, সেটা চালাচ্ছিল ববলো। সে বলল, 'কেউ যেন জানতে না পারে, আমি তোমাকে চিনি। যেখানে যাচ্ছি, সেখানে শত্রুরা তোমাকে খুঁজে পাবে না।'

ওল্ড টাইমার বলল, 'বন্ধুরাও না।'

সরু এক শাখা-নদী দিয়ে চলল নৌকো। কেবলি মেয়েটির কথা মনে হচ্ছিল। সে বেঁচে আছে কি না, কে জানে। হঠাৎ দেখে সামনে আরো অনেক নৌকো। নদীর ধারে মস্ত একটা বাড়ি। নৌকো তীরে লাগলে, ওকে টেনে নামানো হল। অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। যোদ্ধাও ছিল, আবার চিতা-মুখোস পরা পুরোহিতও ছিল।

ওকে টেনে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানকার দৃশ্য দেখে ওল্ড টাইমার হকচকিয়ে গেল। কি বিকট জাঁকজমক। গোছা গোছা জানোয়ারের লোমের ওপর বীভৎস মুখোশ পরে চিতা-পুরোহিতরা বসে ছিল। তিন শো জোড়া হিংস্র চোখ বিদ্বেষের সঙ্গে লুব্ধ চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল। প্রধান পুরোহিত চেঁচিয়ে উঠল, 'চিতা-দেবতা, তুমি বল একে দিয়ে কি করা হবে?'

উঁচু মঞ্চে বাঁধা চিতা-বাঘটার বিকট মুখ থেকে উত্তর এল, 'ওকে মেরে ফেলা হক, যাতে চিতা-সন্তানদের খিদে মেটে। তার আগে লুলিমির আনা নতুন প্রধান পূজারিণী সকলের সামনে আসুক।'

জনা বারো প্রায় নগ্ন, কিন্তু গা ভরা গয়না পরা পূজারিণীর সঙ্গে চিতাবাঘের ছাল পরা যে মেয়েটি ঘরে ঢুকল, তাকেই যে ওল্ড টাইমার খুঁজতে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। এভাবে তাকে দেখে সে স্তম্ভিত।

*

ঘরে ঢুকে ঐ বীভৎস জাঁকজমক দেখে বেচারি কালি বোয়ানা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঘরে এত লোক যে দম বন্ধ হয়ে আসে। ইমিগেগ ওকে টেনে চিতাবাঘটার পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। তার দুর্দশার কথা ভেবে ওল্ড টাইমারের রক্ত হিম হয়ে গেল। কালিও প্রথমটা হকচকিয়ে গেছিল। ভেবেছিল ও-ও বুঝি এদের দলের লোক। তারপর বুঝতে পারল দুজনেই এই বীভৎস লোকদের হাতে বন্দী।

অনেকক্ষণ ধরে অভিষেক অনুষ্ঠান চলেছিল। ঘরের চালের ওপর থেকে মুজিমো আর খুদে বাঁদরটাও সব দেখছিল। বাঁদরটা বলল, 'নিকিমার ভয় করছে। চল, টারজানের দেশে ফিরে যাই।'

মুজিমো বলল, 'কি টারজান, টারজান কর। তাকে আমি চিনি না। সে কে?'

নিকিমা বলল, 'তুমি টারজান, আমি নিকিমা। চল

যাই।'

টারজান সব ভুলে গেছিল। সে বলল, 'আমি তো মুজিমো। শোননি ওরাল্ডো তাই বলেছে।'

—'টারজানের মাথায় গাছ পড়েছিল! তারপর থেকে সে অন্য রকম হয়ে গেছে। চল যাই।'

—'আরেকটু পরে।'

এমন সময় মুজিমো একজন পুরোহিতকে চিনতে পারল। অমনি মুজিমো ছাদের ওপর দিয়ে গিয়ে গাছে লাফিয়ে উঠে রওনা দিল।

এদিকে ঘরের মধ্যে খুব পানাহার চলেছে। বড় বড় হাঁড়িতে মাংস সিদ্ধ হচ্ছিল। সে কিসের মাংস সে বিষয়ে কিছু না বলাই ভালো। সবাই হাঁড়িয়া খাচ্ছিল, নাচছিল। ক্রমে তাদের নেশা চড়ছিল। এর মধ্যে ববলোর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সাদা মানুষটা মেয়েটাকে বাঁচাতে চায়, নিজেও পালাতে চায়। এতে ববলোর আপত্তি নেই। সে ওল্ড টাইমারকে বলল, 'তোমাকে পালাতে সাহায্য করব।'

—'মেয়েটাকে না নিয়ে যাব না।'

—'দেখ, এরা সবাই মাতাল হয়ে উঠছে, কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না। তোমাকে এখান থেকে মন্দিরের পিছনের একটা ঘরে রেখে, তারপর ফিরে এসে মেয়েটিকে নিয়ে যাব। দুজনকে একসঙ্গে নিয়ে গেলে ইমেগেগের চোখে পড়ব।'

ভাগ্যিস ববলো মাতাল হয়নি। একেবারেই যে হয়নি তা বলা যায় না। ওল্ড টাইমার বলল, 'হাতের দড়িগুলো কেটে দিয়ে যাও, বড্ড লাগছে।'

তাই দিল ববলো। তারপর মন্দিরের বড় ঘরে ফিরে গেল।

ততক্ষণে প্রধান পুরোহিত নেশা করে বুঁদ হয়ে ছিল। চিতা-দেবতা একটা মানুষের ঠ্যাং খেতে ব্যস্ত। ববলো কালি বোয়ানাকে ইশারা করে বলল, 'এসো।'

এর সঙ্গেই ওল্ড টাইমারো গিয়েছিল, তাহলে এ বোধহয় বন্ধু লোক। ববলোর যদি অন্য মৎলব থেকে থাকে, সে আর কাজে লাগল না।

ওল্ড টাইমার এগিয়ে এসে বলল, 'খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে এলে তো। আমি ভাবলাম হয়তো সাহায্য দরকার হতে পারে।'

ববলো বলল, 'তোমরা এই অন্ধকার ঘরে অপেক্ষা কর। কেউ কিছু বললে, ব'ল যে বড্ড ভয় করছিল, তাই এখানে লুকিয়ে আছ।'

—'যদি পালানো সম্ভব না হয়, তাহলে এই মেয়ের কি হবে?'

—'কে জানে। হয়তো চিতা-দেবতা পাবে ওকে, নয়তো প্রধান পুরোহিত বন্দী করে রাখবে।'

ববলো চলে গেল তো গেল। ওল্ডটাইমার কালি বোয়ানাকে বলল ববলোকে সে বছর দুই চেনে। 'মহা পাজি সে। হাতির দাঁত দিলে আমাদের চলে যাবার ব্যবস্থা করবে বলেছে।'

এদিকে দুজনার কারো কাছে হাতির দাঁত নেই। কালির নাকি রেলস্টেশনে কিছু টাকা জমা আছে।

এদিকে ববলো ভোজের ঘরে ফিরে গিয়ে পানাহারে মত্ত হলো এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বুঁদ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে অন্যদের নেশা অল্প-বিস্তর ছুটলে, তারা দেখল খাবার, মদ সব শেষ এবং সকলের দারুণ মাথাব্যথা। তখন তারা দলেবলে নদীর তীরে গিয়ে যে যার নৌকোয় চেপে রওনা দিল। তাদের দলে ববলোও ছিল। একটা মাত্র নৌকো বাঁধা রইল। কয়েকজন যোদ্ধার নেশা তখনো ছোটেনি।

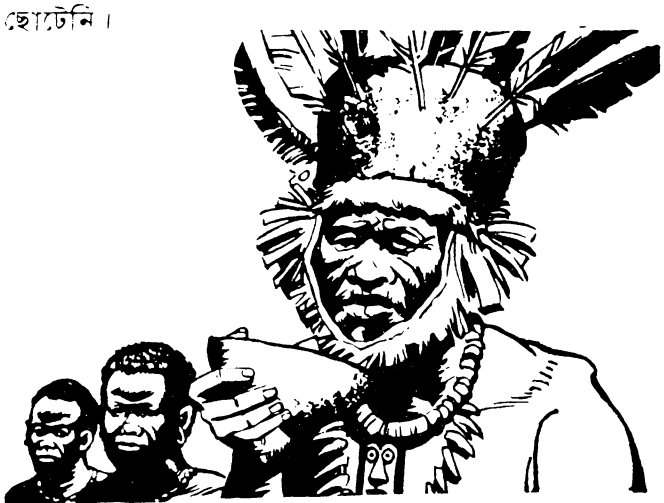

এদিকে কালি বোয়ানা আর ওল্ডটাইমার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর, ববলোর আশা ছেড়ে দিল। শব্দ শুনে তারা বুঝতে পারছিল যে নিগ্রোরা দলেবলে নৌকো করে চলে যাচ্ছে। চারদিক চুপচাপ হয়ে গেলে, তারাও অনেক কষ্টে জানালা দিয়ে বেরিয়ে, খুঁটি বেয়ে নীচে নেমে, বাকি নৌকোতে চড়ে রওনা দিল।

*

রাত একটার সময় মুজিমো আর নিয়ামওয়েগির আত্মা গাছ থেকে উটেঙ্গাদের ক্যাম্পে নামল। ওরাল্ডো ক্যাম্পের চারদিকে একবার ঘুরে এসে মুজিমোকে দেখে

জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর ?'

—'শত্রুদের ঘাঁটি দেখে এলাম। লুপিন্দুও সঙ্গে ছিল।'

—'সে কোথায় ?'

—'সে থেকে গেল।'

—'ছেড়ে দিলে ?'

—'নিয়ে এসে কি হবে ? সে যে মরে গেছিল।'

—'ওরা কি করল ?'

—'বেজায় ভয় পেয়ে চিতা-মন্দিরে প্রধান পুরোহিতের পরামর্শ নিতে দলেবলে গেল। আমরাও গেলাম। চিতাবাঘ ছাড়া সকলে মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে গেল। এই হলো ওদের গাঁ আক্রমণ করার সময়। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা যায় ; যোদ্ধারা ফিরলেই ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে।'

তারপর মুজিমো বলল, 'চিতা-মন্দিরে দেখলাম সোবিটো ওঝা চিতাবাঘের মুখোশ পরেছে। সে চিতা-মানুষদের পুরোহিত।'

ওরান্ডো শুনে স্তম্ভিত, 'ঠিক জান ?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে ওকে মরতে হবে।'

—'তাই হবে। আরো আগেই মরা উচিত ছিল।'

সেই রাতেই মুজিমো ওদের পথ দেখিয়ে এমগুন্দুর গ্রামের দিকে নিয়ে চলল। তখনো যোদ্ধারা ফেরেনি।

ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে ওরা অপেক্ষা করে রইল। আরেকটু পরে উনত্রিশটা নৌকো একে একে তীরে লাগল। কুড়িটা নৌকো লাগলে পর উটেঙ্গারা আক্রমণ করল। চিতা-মানুষরা এমনি ঘাবড়ে গেল যে লড়াই না দিয়ে পালাবার চেষ্টা করল।

গ্রামের ফটক বন্ধ। রক্ষীরা ফটক খুলতে সাহস পাচ্ছিল না। ফটকের বাইরেই তুমুল যুদ্ধ হল। ওদিকে নদীর ঘাটেও প্রচণ্ড লড়াই চলেছিল। গাঁয়ের সবাই হয় পালালে নয় মারা পড়লে, উটেঙ্গারা খড়ের চালে আগুন লাগিয়ে দিল। এমগুন্দু নৌকো থেকে সে আগুন দেখতে পেল। ববলোও দেখল। তবে তার অতটা মন খারাপ লাগল না। এখন আর এমগুন্দুকে ভয় করার কারণ ছিল না।

ওরান্ডো লক্ষ্য করল নিয়ামওয়েগির আত্মা মহা চ্যাঁচামেচি করছে, খালিখালি মুজিমোকে ডাকছে।

শেষ পর্যন্ত হতাহতদের মধ্যে তাকে পাওয়া গেল। মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ওরান্ডো দেখে অবাক হল, ওর যোদ্ধারা মহা রেগে গেল। 'এ আবার কেমন মুজিমো যে অস্ত্রে অজ্ঞান হয় ?'

ওরান্ডো বলল, 'আত্মাই হক আর মানুষই হক, সর্বদা আমাদের সাহায্য করেছে তো।'

ওরাও বলল, 'তা সত্যি।'

নিয়ামওয়েগির আত্মা গাছের ওপর বসে কেবলি চ্যাঁচাচ্ছিল, 'টারজান! টারজান! নিকিমা ভয় পাচ্ছে।'

আরেকটা নৌকোও নদীর ওপর দিয়ে আসছিল। তাতে ছিল কালি বোয়ানা আর ওল্ড টাইমার। নিশ্চিন্ত মনে ধীরে সুস্থে আসছিল ওরা। এমন সময় ববলোর নৌকো তাদের কাছে এল।

দেখতে দেখতে যোদ্ধারা ওল্ড টাইমারকে পেড় ফেলে, হাত পা বাঁধল। ববলো-র গলা শোনা গেল, 'শিগগির কর। উটেঙ্গারা আসছে।'

আবার নৌকোটাকে শাখা-নদীতে ঢুকিয়ে নেওয়া হল। ওল্ড টাইমারের মনটা হতাশায় ভরে গেল। আর কি মেয়েটাকে বাঁচাবার সুযোগ আসবে ? মেয়েটার নাম ধরে ডাকল সে, কোনো সাড়া পেল না। সঙ্গে যে যোদ্ধা ছিল সে বলল, 'চুপ কর। আমাদের সঙ্গে কোনো মেয়েটেয়ে নেই।'

ওদিকে ববলোর সঙ্গে তার নৌকায় যারা ছিল, তারা সকলেই ওর নিজের গ্রামের লোক। অন্য যোদ্ধারা যে-সময়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ওল্ড টাইমারকে পেড়ে ফেলছিল, তার সুবিধে নিয়ে ববলো মেয়েটাকে টেনে নিয়ে নিজের নৌকোয় তুলে নিয়ে, নিজের গাঁয়ের দিকে পাড়ি দিল। ক্লান্তিতে হতাশয় কালি বোয়ানা অবসন্ন।

ওল্ড টাইমারকে আবার যখন চিতা-মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হল, ইমিগেগের নেশা ছুটে গেল। ঘুম ভেঙে, চোখ রগড়ে সে উঠে দাঁড়াল। সে বলল, 'কি হয়েছে ?'

গাটো এমগুন্দু ঘরে ঢুকে বলল, 'তোমরা মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে যখন পড়ে ছিলে, এ ব্যাটা পালিয়ে ছিল। উটেঙ্গারা আমার গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। তোমার ওষুধের কোনো দাম নেই।'

বুড়ো বলল, 'মেয়েটাও পালিয়েছে ?'

এমগুন্দু বলল, 'খালি সাদা পুরুষটাকেই দেখলাম।'

একজন যোদ্ধা বলল, 'আমি দেখলাম ববলো মেয়েটাকে তার নৌকোয় তুলে নিল।'

—'তাহলে এখনি এসে পড়বে।'

ইমিগেগ বলল, 'আর পালাতে পারবে না। ওটাকে

ভালো করে বেঁধে রাখ।'

এমগুন্দু বলল, 'ওকে মেরে ফেল।'

—'সে পরে হবে।'

এমগুন্দু তবু বলে, 'না এখনি মারো।'

চিতা-দেবতা তখন কথা বলল, 'এখন মারা হবে না। ওকে বেঁধে রেখে দাও। গাটো এমগুন্দুর মনে পাপ আছে। তাই আমি ওর গ্রাম জ্বালিয়েছি। তবু যদি পাপ না যায়, তাহলে ও বিনষ্ট হবে আর চিতা-সন্তানরা পেট ভরে খেতে পাবে।' বেজায় ভয় পেয়ে এমগুন্দু চুপ করে গেল।

*

নিয়ামওয়েগির আত্মা গাছ থেকে চ্যাঁচাচ্ছিল 'টারজান! টারজান! নিকিমা ভয় পাচ্ছে।'

মাটিতে শোয়া সাদা দৈত্য চোখ খুলে ওরাল্ডো আর অন্য যোদ্ধাদের দেখে, অবাক হয়ে উঠে বসল।

—'কোথায় গেলি নিকিমা? এই যে টারজান এখানে।' এক লাফে খুদে বাঁদরটা টারজানের কাঁধে চড়ে, গলা জড়িয়ে ধরে, গালে গাল রাখল।

ওরাল্ডো বলল, 'দেখলে তো মুজিমো মরেনি।'

সাদা মানুষটা ওরাল্ডোকে বলল, 'আমি মুজিমো নই। আমি টারজান। এ-ও নিয়ামওয়েগির আত্মা নয়, এ নিকিমা। এতদিনে আমার সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। গাছ পড়ার পর, আগেকার কথা সব ভুলে গেছিলাম।'

ওখানে যারা ছিল, তারা সকলেই টারজানের নাম জানত। ওরাল্ডো হয়তো একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে, কিন্তু মোটের ওপর টারজান যে ভূত-প্রেত না হয়ে, রক্ত মাংসের মানুষ, তা জেনে সকলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

সে রাতে এমগুন্দুর পোড়া গ্রামের পাশে ক্যাম্প করা হল। টারজানের মনে পড়ে গেল কেন সে এই অঞ্চলে এসেছে। আশ্চর্যের বিষয় ওর ঐ ভুলো অবস্থাতেই কাজ আপনা থেকে অনেকখানি এগিয়ে গেছিল। আসলে কুখ্যাত চিতা-মানুষদের অত্যাচার বন্ধ করাই ওর উদ্দেশ্য। ওদের আস্তানা আর মন্দির কোথায় তা জানা দরকার ছিল। সে কাজটা হয়েছে। এই সব ভাবতে গিয়ে হঠাৎ সেই বন্দী শ্বেতাঙ্গ আর অসহায় মেয়েটার কথাও মনে হল। ওরাল্ডো তাদের কথা কিছুই বলতে পারল না। এতক্ষণে মেরে ফেলেছে কি না কে জানে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, নিকিমাকে ডেকে টারজান রওনা দিল। ওরাল্ডো বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

টারজন উত্তর দিল, 'চিতা-মন্দিরে।'

চিতা-মন্দিরের ছোট ঘরে সারা দিন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওল্ড টাইমার পড়ে ছিল। মন্দিরবাসীরা সেদিনেরো বেশির ভাগ ঘুমিয়ে কাটাচ্ছিল। মাঝে মাঝে মন্দির থেকে মন্ত্রপড়া কানে আসছিল। মেয়েটাকে উদ্ধার করার সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল সে। এমন সময় সেবিটো এসে ওর পায়ের দড়ি কাটতে লাগল।

—'আমাকে নিয়ে কি করবে?'

—'কেন, তোমার হাত পা ভেঙে, জলায় একটা গর্তে পুঁতে রাখা হবে। খালি মুণ্ডুটা ওপরে থাকবে। ঐ ভাবে তিন দিন থাকলে মাংস খুব নরম হয়।'

—'পাষাণ্ড কোথাকার! আশা করি গলায় মাংস আটকে দম বন্ধ হয়ে মরবে! মেয়েটাকেও ঐ রকম করবে?'

—'সে তো এখানে নেই। ববলো ওকে নিয়ে গেছে।'

সোবিটো ওল্ড টাইমারকে মন্দিরে নিয়ে গেলে, চিতা-দেবতা বলল, 'ওর হাড়গোড় ভেঙে ফেল। তিনদিন পরে ভোজ।'

ইমিগেগ বলল, 'আর ববলো আর সেই মেয়েটা?'

—'ওদের ধরে আনো। ববলোকে দিয়ে আরেকটা ভোজ হবে। মেয়েটা প্রধান পুরোহিতকে দিলাম।'

এইসব কথা শুনে চিতা-দেবতার ভক্তরা যেন ক্ষেপে গেল। সে যে কি বীভৎস নাচ আর নাটুকেপনা চলল তা ভাবা যায় না। তারপর ইমিগেগের ইঙ্গিতে সব থেমে গেল। মুগুর তুলে পূজারিণীরা অসহায় ওল্ড টাইমারের দিকে এগিয়ে এল।

*

কালি বোয়ানা ভয়ে আধমরা হয়ে ববলোর নৌকার তলায় পড়ে ছিল। ববলো বলল, 'ভয় পেও না। আমি তোমাকে চিতা-মানুষদের কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছ।'

—'তুমি কে?'

—'আমি গ্রাম-প্রধান ববলো।'

—'সাদা লোকটাও নৌকোয় আছে?'

—'না, নেই।'

—'বলেছিলে যে দুজনকেই বাঁচাবে?'

—'একজনের বেশি পারলাম না।'

—'তাহলে বন্দরে আমার নিজের লোকদের কাছে আমাকে নিয়ে যাবে তো?'

—'কিছুদিন পরে। এখন আমার গ্রামে পরম আদরে থাকবে।'

এবার কালি বোয়ানার মন হতাশায় এমনি ভরে গেল যে সে ভাবল কুমির-ভরা নদীতে একটা ঝাঁপ দিয়ে সব দুঃখের অবসান ঘটাবে। কিন্তু ববলো তাকে ধরে ফেলল। 'কক্ষনো অমন করবে না।'

—'এ ভাবে না করলে, অন্য ভাবে করতে পারি।'

রেগে দু-ঘা লাগিয়ে দিল ববলো। কালি চুপ করে পড়ে রইল। ববলো ওর হাত পা বেঁধে ফেলেছিল।

চার ঘণ্টা পড়ে ববলোর গ্রামে পৌঁছল ওরা।

মৌচাকের মতো দেখতে সব কুঁড়ে ঘর। প্রধানের ঘর আরো বড় এবং দোতলা। সঙ্গে সঙ্গে ববলোর অনেকগুলো স্ত্রী রেগেমেগে কালিকে ঘিরে ফেলল। পারলে ওকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। বারোটা বৌ, সবার ছোটটার চোদ্দ বছর বয়স, সবার বড়টার চুল সাদা, গাল তুবড়োনো, ফোকলা দাঁত। কিন্তু তারি দাপট সবচেয়ে বেশি। ববলো পর্যন্ত তার ভয়ে জুজু। তার নাম উবুগা। কালিকে দেখেই সে অগ্নিমূর্তি হয়ে ববলোকে বলল, 'আবার একটা সাদা মেয়ে এনেছ! অন্য বৌরা ওকে তিষ্ঠুতে দেবে না। পারেলে মেরে ফেলবে। তোমার মতো আহম্মুক জন্মে দেখিনি।'

ববলো বলল, 'চোপ! ওকে কেউ কিছু বললে, আমি তাকে মেরে ফেলব।'

উবুগা বলল, 'অন্যদের মারতে পার, কিন্তু আমাকে না। চোখ খুবলে নেব না। উনি আবার প্রধান হয়েছেন। তুমি—'

ততক্ষণে ববলো পিট্‌টান দিয়েছিল। উবুগা কালির চুলের মুঠি ধরে বলল, 'এদিকে আয়!'

কত সইবে কালি? দিল বুড়ির মাথার পিছনে কষে এক রদ্দা! বুড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আর কি! আশ্চর্যের বিষয় এতে উবুগা রাগা দূরে থাকুক, হো হো করে হেসে উঠল। একটা লাঠি তুলে অন্য বৌগুলোকে ভাগিয়ে, কালিকে বলল, 'এসো।'

উবুগা তাকে নিজের ঘরে পুরে, বাইরে পাহারা বসাল। তারপর একজন যোদ্ধার কাছে শুনল যে এই মেয়ে হলো চিতা-দেবতার নতুন প্রধানা পুজারিণী। ওকে কিভাবে ববলো ধরে এনেছে, সব শুনে বুড়ি কি খুশি। সটাং ববলোকে বলল, 'লুকিয়ে লুকিয়ে চিতা-মানুষ হয়েছ শুনছি! সবাইকে বলে দেব। এ গাঁয়ে কেমন টেকো দেখব। অনেক দিন থেকেই সন্দেহ করছিলাম, এবার নিশ্চিত জানলাম।'

মরিয়া হয়ে, ছোরা বের করে ববলো বুড়ির চুলের মুঠি ধরল, 'তবে না তোমাকে মারতে পারব না?'

—'তা মারতে পার। কিন্তু তাহলে তোমার চিতা-মানুষ হবার কথাটাও রটে যাবে, কারণ আমি একজনকে সব কথা বলে রেখেছি। তখন তোমার যোদ্ধারাই তোমাকে কচুকাটা করবে।'

তখন ববলো বার বার বলতে লাগল, 'সত্যি বলছি আমি চিতা-মানুষ নই। ওদের কাছ থেকে মেয়েটাকে চুরি করে এনেছি।'

—'বেশ, তাহলে এবার ফিরিয়ে দিয়ে এসো।'

শেষ পর্যন্ত রাজি না হয়ে উপায় রইল না। তবে সেখানে ফিরিয়ে দেবে না, অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখবে। সাদা বৌয়ের ববলোর ভারি শখ। গ্রামের ওঝা কাপোপা ছিল ওর প্রাণের বন্ধু। গেল তার সাহায্য চাইতে। কাপোপা একটা পুঁটলি খুলে কতকগুলো হাবিজাবি জিনিস নেড়ে শেষে বলল, 'হ্যাঁ, এবার একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে। কিন্তু তাহলে তোমায় একটা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে।'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমার একগাদা মেয়ে।'

—'বেশ, তাহলে বেঁটে পিগমিদের গ্রাম তো এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সেখানে আমার কিছু খাতির আছে। ওদের কাছে রেখে এলে, মেয়েটা নিরাপদেও থাকবে আর কেউ জানতেও পারবে না। তুমি একেক বার গিয়ে দেখে আসতে পারবে।' এ মতলবটা শুনে ববলো মহা খুশি।

*

চিতা-দেবতার মন্দিরের ভিতরে মশাল জ্বেলে তাদের বীভৎস ক্রিয়াকর্ম চলছিল। সেই সময় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে একটা লোক নিঃশব্দে একটা বাদে চিতা-মানুষদের সব কটা নৌকো পাড় থেকে ঠেলে স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। এ কাজ শেষ হলে, ঐ একটা নৌকোকে টেনে খানিকটা ওপরে তুলে, মন্দিরের পিছন দিকে রাখল। তারপর খুঁটি বেয়ে ওপরে উঠে, ছাদের একটা ফাঁক দিয়ে মন্দিরের ছাদের তলায় ঢুকল টারজান। তারপর কড়িকাঠ থেকে কড়িকাঠে লাফিয়ে এগিয়ে দেখে পূজারিণীরা হতভাগ্য সাদা মানুষটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। তবু অসহায় মানুষটার মুখে কেমন একট সাহসের দীপ্তি জ্বলে উঠেছে।

হঠাৎ কে ডাক দিল, 'সোবিটো! সোবিটো! সোবিটো!

আমি ওরাল্ডোর মুজিমো! তোমাকে নিতে এসেছি! সঙ্গে এনেছি নিয়ামওয়েগির আত্মাকে!'

এই না বলে বিশালদেহ একটা নেংটি পরা সাদা মানুষ মন্দিরের থাম বেয়ে নিচে নেমে, এক লাফে মঞ্চে উঠল।

সোবিটোর মুখে কথা সরে না; ভয়ে হাঁটু ঠক ঠক করে কাঁপছে; চিৎকার করে এক লাফে মঞ্চ ছেড়ে যোদ্ধাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। টারজান বন্দীকে ইংরিজিতে বলল, 'আমার সঙ্গে যেতে তৈরি থেকো।'

তারপর যোদ্ধাদের তাদের ভাষায় ডেকে বলল, 'নিয়ে এসো সোবিটোকে। যতক্ষণ না আনছ, এই সাদা লোকটা আমার বন্দী!'

এই বলে ওল্ড টাইমারের গায়ের ওপর থেকে পুরোহিতদের তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, হ্যাঁচকা টানে ওল্ড টাইমারকে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর উঁচু মঞ্চে লাফিয়ে উঠতেই ইমিগেগো কুঁকড়ে সরে গেল। টারজান পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। ওল্ড টাইমার সঙ্গে গেল। তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মেয়েটি কোথায়?'

—'তাকে আরেক প্রধান চুরি করে নিয়ে গেছে।'

সেখান থেকে বারান্দায়, তারপর খুঁটি বেয়ে নিচে নেমে নদীর ধারে। নৌকোতে ওল্ড টাইমারকে তুলে দিয়ে টারজন বলল, 'আর কোনো নৌকো নেই এখানে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও।'

—'তুমি যাবে না?'

—'না। মেয়েটাকে যে নিয়ে গেছে, তার নাম জান?'

—'ববলো।'

টারজান আবার নৌকোটা ঠেলে রওনা করিয়ে দিল। তারপর আবার সে মন্দিরে ফিরে গেল। মঞ্চের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে দেখে যোদ্ধারা সোবিটোকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে।

টারজান বলল, 'ওর হাত পা বেঁধে, আমার কাছে দাও।'

ওরা তার হাত পা বেঁধে পিছনের ঘরে পৌঁছে দিল তাকে। 'আমার কাছে রেখে যাও ওকে।'

—'অন্য বন্দীটা কোথায়?'

—'পিছনের ঘরে খুঁজে দেখ।'

তারা চলে গেলে সোবিটোকে কাঁধে তুলে বনে চলে গেল টারজান। অনেকক্ষণ ধরে তার চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। তারপর যারা বন্দীকে খুঁজছিল, তারা হতাশ হয়ে ফিরে এলো। এমগুঙ্গা বলল, 'ওরাল্ডোর মুজিমো আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। সমস্ত দ্বীপটা খুঁজে দেখ।'

একজন বলল, 'নৌকো করে গেলে সুবিধা হবে।'

নদীর ধারে পৌঁছে একটাও নৌকো না পেয়ে নিজেদের দুরবস্থাটা তারা বুঝতে পারল। নৌকো ছাড়া ওরা ওখানে বন্দী। মন্দিরে বেশি দিনের খাবার দাবার জমা থাকে না।

গাটো এমগুন্দুর গ্রামের বাইরে ওরাল্ডোর যোদ্ধারা ধুনি জ্বেলে বসে ছিল। পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, তাদের মন বড় খুশি। এমন সময় গাছ থেকে টারজান নামল। তার কাঁধে হাত-পা বাঁধা সোবিটো। টারজান বলল, 'তোমাদের ওঝাকে নিয়ে এসেছি। ইনি চিতা-দেবতারো পুরোহিত।'

সোবিটো চেঁচিয়ে উঠল, 'না, না মিথ্যা কথা!'

একজন যোদ্ধা বলল, 'চিতার ছাল পরেছে, দেখেছ।'

—'বড় বড় নখও পরেছে!'

টারজান বলল, 'চিতা-মন্দির থেকে ধরে আনলাম। ভাবলাম তোমরা হয়তো তোমাদের ওঝাকে ফেরত চাও, তোমাদের জন্য ভালো ওষুধ করে দেবে, যাতে চিতা-মানুষরা ক্ষতি করতে না পারে!'

অনেকেই চ্যাঁচাতে লাগল, 'মেরে ফেল! ওকে মেরে ফেল!'

ওরাল্ডো বলল, 'তার চেয়ে টুম্বাই নিয়ে যাই। নিয়ামওয়েগির মা-বাবা হয়তো একে মরতে দেখলে শান্তি পাবে।'

সোবিটা বলল, 'না, না, তার চেয়ে এখনি মেরে ফেল!'

—'টারজান, কি বল?'

টারজান বলল, 'তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর। কিন্তু ভবিষ্যতে সব সাদা মানুষদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে আমি খুশি হব।' এই বলে নিকিমাকে নিয়ে রওনা দিল।

*

কালি বোয়ানার গলায় দড়ি বেঁধে ববলো আর কাপোপা তাকে ঘোর বনে বেঁটে পিগমিদের গ্রামে রেখে এল। তাদের মোড়ল রেবেগার অনেক বয়স, কাপোপার সঙ্গে চেনাজানা ছিল তার। সাদা মেয়েটাকে গ্রামে লুকিয়ে রাখতে হবে শুনে সে জানতে চাইল, তার বদলে তাকে কি দেওয়া হবে! ববলো বলল, 'প্রতি মাসে এতটা গম, কলা আর মাছ দেব, যাতে গ্রামসুদ্ধ ভোজ খেতে পার।'

—'আর কি দেবে? দেখ, আমরা আসলে একটা বাড়তি মেয়ে রাখতে চাই না। নিজেদের মেয়েরাই যথেষ্ট জ্বালায়।'

এবার কাপোপা তাকে ভূত-প্রেতের এমনি ভয় দেখাতে লাগল যে সে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। খালি বলল, 'খাবারটা তাড়াতাড়ি পাঠিও। এমনিতে পেট ভরে খেতে পাই না আর সাদা মেয়ে নিশ্চয় দুজনের ভাগ খাবে!'

ববলো বলল, 'কালকেই পাঠাব। আজ রাতে চিতা-মানুষের ভয়ে কাউকে পাঠাতে পারব না।'

—'বেশ। কিন্তু খাবার না পেলে মেয়ে ফেরত পাঠাব।'

—'না, না, ঠিক খাবার পাবে।'

এই বলে ববলো আর কাপোপা চলে গেল। রেবেগা একজন মেয়েকে ডেকে বলল, 'একে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। দেখো যেন নিরাপদে থাকে।'

—'কি খেতে দেব? আমার স্বামীকে মোষে মেরে ফেলেছে। নিজেই খেতে পাই না।'

—'ও-ও খাবে না। যতক্ষণ না ববলো খাবার পাঠায়।'

পিগমি মেয়েটা কালি বোয়ানাকে হাত ধরে জঘন্য নোংরা এক কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গেল। অন্য মেয়েরাও ভিড় করে সেখানে এল। কালিকে টিপে টুপে বলল, 'খেতে না পেলে রোগা হয়ে যাবে। তখন একে খেয়ে কোনো সুখ হবে না।'

অবিশ্যি কালি ওদের সব কথা বোঝেনি। ক্লান্তিতে ওর শরীর ভেঙে পড়ছিল। কিন্তু এতটুকু বিশ্রাম করতে দিল না ওরা। লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ওকে দিয়ে গম পেষাল। পরে কিছু খেতে দিল না। খাবার চাইলে ওয়ালালা রেগে বলেছিল, 'কোত্থেকে দেব? নিজেই খেতে পাই না। তুমি ববলোর বৌ। সে তোমার খাবার জোগাবে।'

কালি বলল, 'মোটেই আমি ওর বৌ নই। ও আমাকে ধরে এনেছে। আমার বন্ধুরা তোমাদের কথা শুনলে সাজা দেবে।'

ওয়ালালা হাসতে লাগল। 'জীবনে মাত্র দুটো সাদা মেয়ে দেখেছি। দুটোকেই আমরা খেয়ে ফেলেছি। কেউ কিছু বলেনি। ববলোর অন্য বৌদের ভয়ে বুঝি তোমাকে এখানে দিয়ে গেল?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে।'

আশেপাশে কেউ নেই দেখে গম পিষতে পিষতে, কালি কয়েক মুঠো কাঁচা গম খেয়ে নিল। তারপর যখন এত অন্ধকার হল যে আর গম পেষা যায় না, তখন যে যার শুয়ে পড়ল।

তিন দিন ববলোর দেখা নেই। খাবারও এল না। ওয়ালালা সবচেয়ে রেগে গেল। তার ওপর তার সন্দেহ হল কালি গম খেয়েছে। একটা লাঠি নিয়ে সে কালিকে ঠ্যাঙাতে শুরু করল, কালি লাঠিটা কেড়ে নিয়ে আচ্ছা[illegible] ঘা কতক লাগিয়ে দিল। আর ঠ্যাঙাবার চেষ্টা [illegible] ওয়ালালা। ববলোকে গাল দিয়ে মন ভালো করার চেষ্টা করতে লাগল।

রেবেগার কাছে গিয়ে দরবার করল মেয়েরা। বলে[illegible] খাবার পাঠাচ্ছে না, এই বেলা সাদা মেয়েটাকে খেয়ে ফেললেই হয়। পরে রোগা হয়ে গেলে খেতে ভালো লাগবে না। শেষ পর্যন্ত রেবেগা বলল, 'বেশ, আজ সন্ধ্যে অবধি দেখে, ভোজের ব্যবস্থা করলেই হবে।'

সন্ধ্যা হয়ে গেলেও খাবার এল না। তখন ওরা কালি বোয়ানার হাত পা বেঁধে ফেলল। কালি চোখ বুজে ভগবানের কাছে দেশের আত্মীয়স্বজন আর জেরি বলে কারো জন্যে প্রার্থনা করতে লাগল।

*

উটেঙ্গারা সোবিটোকে বন্দী করে মহাখুশি। রাতে পানাহার করে যে যার ঘুমিয়ে পড়লে, নিঃশব্দে অনেক চেষ্টায় সোবিটো বাঁধন খুলে নদীর ধারে গেল। একটা ছোট নৌকো বেছে নিয়ে সে ববলোর গ্রামের দিকে রওনা হল। তাছাড়া কোথায় যাবে?

ওদিকে ওল্ড টাইমারো ববলোর গ্রামের দিকে নৌকো বেয়ে চলেছিল। আর দুঃখিনী মেয়েটার কথা ভাবছিল।

নদীর এদিকটা তার আগেও খুব চেনা। ববলোর সঙ্গে সে অনেক কারবার করেছে আগেও। তবে খোলাখুলি দিনের আলোয় পৌঁছনো নিরাপদ নয়। ববলো চিতা-মানুষদের সঙ্গী। তাই গ্রামে পৌঁছবার কিছু আগে বনের ধারে নৌকো বেঁধে বনের মধ্যে দিয়ে সে এগোল। রাতে গ্রামে গিয়ে মেয়েটাকে খুঁজবে। সবে নৌকো বেঁধে বনে ঢুকবে, এমন সময় দেখে আরেকটা নৌকোও আসছে, তাতে সোবিটো!

কাঠ হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল ওল্ড টাইমার। সোবিটো এখানে কি করে এল? সোবিটোর নৌকো বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হলে, ওল্ড টাইমার সাবধানে বনের মধ্যে দিয়ে ববলোর গ্রামের দিকে চলল। কাছে পৌঁছে একটা গাছে চড়ল। সেখান থেকে গ্রামের ভিতরটা দেখা যাবে। সে জানত আগে ভালো ব্যবহার পেলেও এখন তা পাবে না। কিন্তু তার বড় আশা, এখানে কালি বোয়ানা আছে। ও তো আর জানে না খেতে না পেয়ে, দুর্ব্যবহারে জর্জরিত কালি বোয়ানা এখন মৃত্যুর মুখোমুখি পড়েছে।

ববলোর গ্রামে বড় অশান্তি। সোবিটো এসেছে। প্রধান

তার অপদস্থ হবার কথা জানে না। ওর ধারণা মেয়েটা এই গ্রামেই আছে। সোবিটো আসতে ববলো রেবেগার গাঁয়ে খাবার নিয়ে যেতে পারেনি। ভেবে পাচ্ছিল না কি করে সোবিটোকে বিদায় করা যায়। বিষ খাওয়ালে কেমন হয়? কিন্তু তাহলে যদি চিতা-দেবতা চটে যান। সোবিটোর আসার কারণ ববলো জানল না। মেয়েটাকে দেখতে পেল না সোবিটো। ওল্ড টাইমার গাছে বসে সব দেখছিল। খিদে তেষ্টায় সে কাতর। কিন্তু এখন আর নামাও যায় না। মেয়েরা গাছতলায় খেতের কাজ করছিল।

তারা নানা কথা বলছিল। গাঁয়ের কোন মেয়ে নাকি আরেকটু সাবধানে চলাফেরা না করলে, স্বামীর কাছে পিটুনি খাবে। কার ছেলের পেটে ভূত ঢুকেছে, তাই পেটে বড় ব্যথা। এমন সময় একজন বলল, 'ববলো তার সাদা বৌটাকে নিয়ে কি করল?'

অমনি ওল্ড টাইমারের দুকান খাড়া। একজন বলল, 'ববলো উবুগাকে বলেছে তাকে চিতা-মানুষদের কাছে ফেরত দিয়েছে।'

আরেকজন বলল, 'দুৎ! তা নয়। কাপোপ তার বৌকে বলেছে বৌটাকে পিগমিদের গাঁয়ে রেখে এসেছে।'

—'ওরা ওকে খেয়ে ফেলবে।'

—'না, ববলো বলেছে ওকে যত্নে রাখলে মোড়লকে অনেক খাবার দেবে'

—'বাবা! ওখানে আমি থাকতে রাজি নই, তা ববলো যাই বলুক। ওরা মানুষ খায়।' ঐ অবধি শুনেই ববলোর গ্রাম সম্বন্ধে ওল্ড টাইমারের সব কৌতূহল দূর হয়ে গেল।

*

উটেঙ্গাদের ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে টারজান চিতা-মানুষদের ফেলে যাওয়া একটা নৌকো নিয়ে নদীর ওপরে ববলোর গ্রামে গেল, সাদা মেয়েটার খোঁজ নিতে। খুব একটা তাড়া আছে বলে মনে না হওয়াতে, নিকিমা আর ও দুজনেই কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল। নিকিমার উঠবার ইচ্ছা ছিল না। টারজন বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে, চল্ শিকার করি। তুই পাখির ডিম খুঁজে খাস।'

ঐ বনে শিকারের খুব সুবিধা ছিল না। সব জায়গায় চিতাবাঘের গন্ধ। হিংস্র জানোয়ারদের মাংস খুব খেতে ভালো নয়। শিকারের খোঁজে ওরা আরো গভীর বনে ঢুকল। নাকে এল হরিণের আর জেব্রার আর সিংহের গন্ধ। বনের শেষে খোলা মাঠ, তাতে লম্বা ঘাস। ঐ ঘাসে সিংহ থাকে।

নিকিমা বলল, 'যেও না। ঐ ঘাসে ভাই-বোনদের নিয়ে সিংহরা ছোট নিকিমাকে খাবার জন্যে বসে থাকে।'

—'বেশ তুই এখানে থাক্, আমি যাই।'

—'আমার ভয় করে।'

—'তুই মহা ভীতু। থাক্ এখানে, আমি চললাম।'

ঘাস জমির অর্ধেকটা পার হয়েছে, সিংহের গন্ধ, আরো কড়া। এমন সময় ঘাসের মধ্যে থেকে বিকট গর্জন শোনা গেল।

ঘাস দুলতে লাগল। অর্থাৎ সিংহ তেড়ে আসছে। একটা গাছ ছিল কাছেই, তবু কেমন রাগ ধরল টারজানের। শেষটা নুমার ভয়ে পালাবে? হাতে ছিল উটেঙ্গাদের যুদ্ধের ভারি বল্লম। গায়ের জোরে দিল সেটাকে ছুঁড়ে। তারপর ছুট। তবে যে সিংহটা প্রথম দেখা দিয়েছিল, তার কাছ থেকে নয়। তার জুড়িটার কাছ থেকে। আরেকটু হলে ধরেই ফেলেছিল, নখগুলো গোড়ালি ছুঁই ছুঁই! নিচে চেয়ে দেখে গোটা ছয় সিংহ! সিংহীটা গাছ আকড়ে উঠবার চেষ্টা করছে। এইভাবে আধঘণ্টা কাটল। প্রথম সিংহটা মরে গেছিল। বাকিগুলো তাকে পাহারা দিচ্ছিল। সারা দিন ঐ ভাবে কাটল। রাত নামল। তীর-ধনুক সঙ্গে থাকলে সিংহীটাকে মেরে ফেলা যেত। তাহলে সবাই চলে যেত। কিন্তু তা-ও ছিল না। খিদে না পেলে এরা নড়বে না। এদিকে বনের ধারে নিকিমা বেচারা ভয়ে আধমরা হয়ে গাছের ওপর টারজানকে সে দেখতে পাচ্ছিল, কেন নামছে না ভেবে পাচ্ছিল না।

সকাল হলো, তখনো সিংহী নড়ে না। দুপুর গড়াল, খিদে তেষ্টায় টারজান বড়ই কষ্ট পাচ্ছিল। কিন্তু সিংহীটা তো চিরকাল ওভাবে বসে থাকতে পারে না। এক সময় তাকে উঠে যেতেই হবে। হলও তাই। দুপুরের পর, সিংহী উঠে আগের দিনের শিকারের দিকে চলে গেল। অমনি সব কটা সিংহও পিছন পিছন চলল।

টারজান গাছ থেকে নেমে, নুমার গা থেকে বল্লম খুলে, শিকারের চেষ্টায় চলল। নিকিমাও ছুটে এলো। বাবা! বাঁচা গেল। জলও পেল, শিকারও হলো। এবার ববলোর গাঁয়ে গিয়ে খোঁজ নিলে হয়।

এর মধ্যে জুথোর দলের সঙ্গে দেখা হলো; খানিক খোশগল্পও হলো। তারপর যে যার পথ ধরল। অন্ধকার হয়ে এসেছিল, এমন সময় গোমাঙ্গানিদের গন্ধ পেয়ে টারজান

বুঝল এখানে কোনো গ্রাম আছে। এত কাছে ববলোর গ্রাম হতে পারে না। গাঁয়ের কাছে বড় গাছ, তাতে চড়ে টারজান নিচে তাকাল।

*

এদিকে ওল্ড টাইমারের বন্ধু কিড অনেক দিন হলো হতাশ হয়ে ক্যাম্পে ফিরেছিল। ওল্ড টাইমারের অদর্শনে তার বড়ই ভাবনা হচ্ছিল। সঙ্গে যে তিনজন নিগ্রো ছিল, তারাও বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিল, নেহাৎ এই দুটি শ্বেতাঙ্গর প্রতি তাদের ভারি একটা মমতা জন্মে গেছিল বলে চলেও যাচ্ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট ছিল না, যথেষ্ট শিকার পাচ্ছিল। এর মধ্যে ওল্ড টাইমারের দুই অনুচর ফিরে এলো। বড় বোয়ানা আর আণ্ড্রেয়া নাকি চিতা-মানুষদের হাতে মারা পড়েছে।

সব শুনে কিড্ ভাবল, ওল্ড টাইমার মারা না-ও গিয়ে থাকতে পারে। হয়তো এমগুঙ্গুর গাঁয়ে বন্দী হয়েছে। খানিক চিন্তা করে কিড্ বলল, 'কাল ভোরে রওনা হব।'

কিড্ নিজেও ভেবে পাচ্ছিল না সাদা মেয়েটাকে, যাকে ওল্ড টাইমার উদ্ধার করতে গেছে। মুস্কিল হলো নিগ্রোরা চিতা-মানুষদের গ্রামে যেতে রাজি ছিল না। বড় বোয়ানা ওদের বারণ না শুনে গিয়েছিল, সে-ও মরে গেছে।

কিড্ বলল, 'আমার তা মনে হয় না। গিয়ে দেখতে হবে।'

নিগ্রোরা বলল, 'তুমি যেতে পার, আমরা যাব না।'

শেষ অবধি ববলোর গ্রাম অবধি যেতে তারা রাজি হলো।

ওল্ড টাইমার মেয়েদের কথা শোনার পরেও কিছুক্ষণ গাছে বসে ছিল। তারপর ওরা সরে গেলে, নিঃশব্দে নেমে পিগমিদের গ্রামের দিকে চলল। গ্রামে ঢোকা খুব সহজ কাজ হবে না। ওরা বিষাক্ত তীর ব্যবহার করে, মানুষ খায়।

সারা সন্ধ্যা হেঁটে, অন্ধকার নামলে একটা আশ্রয় নিল সে, ভোরে আবার হাঁটা। হঠাৎ মাটিতে নিজের পায়ের ছাপ দেখে বুঝল অন্ধকারে চক্রাকারে ঘুরছে সে। তখন সরু একটা সুঁড়ি পথ ধরল ওল্ড টাইমার। ঐ পথ ধরে সন্ধ্যা অবধি হেঁটে হঠাৎ মাটিতে ছোট ছোট পায়ের ছাপ দেখে এগোতে লাগল। হঠাৎ মনে হলো কোনো মেয়ে ওকে ডাকছে।

গ্রামের কাছে পৌঁছে বুঝল ওকে না ডাকলেও মেয়েদের কণ্ঠই বটে। এই হলো পিগমিদের গ্রাম। এখানে সেই মেয়েটি আছে।

আরো কাছে গিয়ে ওল্ড টাইমার দেখল ফটকে পাহারা নেই। বনের গভীরে আবার পাহারার কি দরকার? ভয়েই কেউ আসে না। উঠোনে লোকজন জড়ো হয়েছিল। তাদের মাঝখানে যে তার ভালোবাসার মানুষটি অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে, তা সে দেখতেই পায়নি। নাচ হচ্ছিল, সবাই ব্যস্ত ছিল। এই হলো মেয়েটাকে খুঁজে বের করার সুযোগ। হঠাৎ ভিড়ের ফাঁক দিয়ে যা দেখল, তাতে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মেয়েটা হাত পা বাঁধা হয়ে পড়ে আছে আর একটা নিষ্ঠুর চেহারার মেয়েমানুষ ছোরা তুলে ধরেছে। ওর চোখের সামনে মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে ছোরাটা নামাল বলে—এমন সময় ছোট একটা ছোরা নিয়ে ওল্ড-টাইমার সেখানে ছুটে গেল। ঠিক তখনি একটা তীর কোথা থেকে এসে বুড়ির বুকে বিঁধে গেল। ওল্ড-টাইমার ব্যাপারটা আদৌ বুঝল না। এ কার কাজ? গোড়ায় গাঁয়ের লোকরা হকচকিয়ে গেছিল। তারপর দেখে সামনে একটা মাত্র লোক! আবার হয়তো তারা তেড়ে আসত, এই সময় ওল্ড টাইমারের বুদ্ধি খুলে গেল, গেটের দিকে ফিরে সে চিৎকার করে ববলোর গাঁয়ের ভাষায় বলল, 'একজনকেও বেরোতে দিও না তোমরা। কিন্তু আমাকে না মারলে, তোমরাও কাউকে মেরো না!'

তারপর পিগমিদের বলল, 'সরে দাঁড়াও! মেয়েটাকে আমি নিয়ে যাব। তোমাদের কারো কোনো ক্ষতি হবে না।'

এই বলে কালি বোয়ানাকে কোলে তুলতেই, রেবেগা লাফিয়ে উঠে বলল, 'সাদা মানুষটাকে মেরে ফেল। মোটেই ওর দলবল সঙ্গে নেই!'

বলবা মাত্র পরপর দুটো তীর রেবেগার বুকে বিঁধে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল। ওল্ড টাইমার মেয়েটাকে কাঁধে

তুলে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। একবার মনে হলো কি একটা পড়ল। সে আর দাঁড়ায়নি।

সেই পড়ার শব্দটা হল গাছের ডাল ভেঙে টারজানের পতনের শব্দ। রেবেগাকে বাধ্য হয়ে মারতে হয়েছিল; পিগমিদের সঙ্গে তার কোনো ঝগড়া ছিল না। পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেছিল আর ওরা ওর হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে, তার ওপর তামার তার জড়িয়ে, হেঁচড়ে টেনে একটা ঘরে পুরে, দরজায় দুজনকে পাহারা বসাল। এ সব দেখে নিকিমা তো ব্যাকুল হয়ে উঠল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এমন সময় বন কাঁপিয়ে ছোট ঘরটা থেকে বনমানুষদের বিপদসংকেত উঠল।

গাঁয়ের লোকরা বেজায় ভয় পেল। পাহারাদাররা ভেগে পড়ল। একজন বলল, 'ওটা মানুষ না, ওটা প্রেত! এখন একটা বনমানুষের রূপ নিয়েছে।'

সবাই বলে, 'দেখেছ?'

—'দেখিনি, শুনেছি।'

নিকিমাও ডাকটা শুনেছিল। ভয় না পেয়ে সে খুশি হল। দূর থেকে ক্ষীণ ভাবে ডাকটার উত্তরও পাওয়া গেল। নিয়ালওয়া ভারি সাহসী, আপাততঃ সে-ই হল প্রধান। সে বলল, 'চল ওকে মেরে ফেলি।'

—'যদি মানুষ না হয়, প্রেত হয়?'

এই নিয়ে মহা তর্ক শুরু হয়ে গেল। সেই ফাঁকে নিকিমা গাছ থেকে নেমে টারজানের কাছে গিয়ে বলল, 'দাঁত দিয়ে বাঁধনগুলো কেটে দিই?'

—'পারবি না রে। তামার তার জড়িয়ে রেখেছে। ওরা কিন্তু আসছে। যা, দেখগে।'

দরজা দিয়ে বেরিয়েই নিকিমা দেখে ছয়জন যোদ্ধা আসছে, অমনি সে পালাল। একজন যোদ্ধা বলল, 'ঐ দেখ, বাঁদরের রূপ ধরে পালাল!'

নিয়ালওয়ার মনে মনে যথেষ্ট ভয় ছিল, 'তবে থাক্, গিয়ে কি হবে?'

তবু প্রজাদের আগ্রহে একবার যেতে হল। না, ঐ তো সে শুয়ে আছে! হঠাৎ আবার সেই বিকট ডাকে ঘরদোর কেঁপে উঠল। নিয়ালওয়া দলবল সহ পালিয়ে এল।

অন্য গ্রামবাসীরা চায় এখনি বন্দীকে মারা হক। শেষটা নিয়ালওয়া বলল, 'চল, সবাই এক সঙ্গে যাই! এর মধ্যে এক দল বনমানুষ নিয়ে জুথো এসে তার প্রিয় বন্ধু টারজানকে তুলে নিয়ে, দলবল সহ বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। গ্রামবাসীদের মুখে কথা নেই!

*

ওল্ড টাইমার যখন কালি বোয়ানাকে তুলে নিয়ে অন্ধকার বনে ঢুকে পড়েছিল, কালি তার উদ্ধার-কর্তাকে চিনতে পারেনি। কিছু দূর গিয়ে ওল্ড টাইমার তাকে নামিয়ে দিলে সে অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কে?'

—'কে ভেবেছিলে?'

—'ববলো!'

—'না, না, যে লোকটাকে তুমি পছন্দ কর না, আমি সে।'

—'তুমি আমাকে বাঁচাবার জন্য এত বিপদের ঝুঁকি নিলে কেন?'

—'কারণ ইয়ে কি বলে—একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে অসভ্যদের হাতে পড়তে দিতে তো আর পারি না।'

—'এখন কি করব আমরা?'

—'আরেকটু দূরে গিয়ে, গাছে চড়ে, ভোর অবধি বিশ্রাম। তারপর আমার ক্যাম্পে যাবার চেষ্টা করব। নদীর ওপারে দুদিনের পথ।'

—'ববলো আমাকে নৌকো থেকে তুলে নেবার পর কি হয়েছিল?'

সব কথা বলল ওল্ড টাইমার, খালি কে যে ওকে বাঁচিয়েছিল তা বলতে পারল না। 'তোমাকেই বা কে বাঁচাল আজ, বুড়িকে সময় মতো তীর মেরে?'

আরো খানিক দূর গিয়ে, একটা বড় গাছে কালি বোয়ানার জন্য উঁচু ডালে সুন্দর মাচা করে দিল ওল্ড টাইমার। অনেক দিন পরে সে আরাম করে, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারল। ওল্ড টাইমার একটু নিচের ডালে নিজের ব্যবস্থা করল।

পরদিন সকালে ওরা পশ্চিম দিকের পথ ধরল। দুজনের শরীর দুর্বল, ধীরে সুস্থে এগোতে হচ্ছিল। অবশেষে একটা ছোট নদীর মিষ্টি জল খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে গাছে ঠেস দিয়ে দুজনে বিশ্রাম করতে লাগল। এখানে কোনো পায়ের ছাপ নেই বলে অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগছিল। মেয়েটিকে ওল্ড টাইমারের বড়ই পছন্দ। আগে সে যে খারাপ ব্যবহার পেয়ে মেয়ে জাতটার ওপর চটা ছিল, সে মনোভাবটা আর নেই। এ মেয়ে বড়ই ভালো। কিন্তু ও তো জেরি জেরোমিকে খুঁজছে, ওল্ড টাইমারের দিকে ফিরেও তাকাবে না। তাছাড়া তার চালচুলো নেই। কোনো মেয়ে তাকে

বিয়ে করবে না।

হঠাৎ ওল্ড টাইমার জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বিয়ে হয়নি, কিম্বা বিয়ে ঠিক হয়নি?'

মেয়েটি গম্ভীর হয়ে বলল, 'তাই দিয়ে কি হবে? আমি তোমার নাম পর্যন্ত জানি না।'

—'কিড্ আমাকে ওল্ড টাইমার বলে।'

—'সেটা তো একটা নাম নয়।' এরপর ওরা উঠে পড়েছিল। ওল্ড টাইমার কালিকে কোলে করে নদী পার করে দিল। তারপর দুজনের জন্য দুটো লাঠি কেটে আনল। ক্লান্ত শরীরে চলার সুবিধা হল।

এক সময় কালি বোয়ানা বলল, 'আমার ঠাকুরদার নাম ছিল অ্যাবনার।'

—'আমার ঠাকুরদার নাম ছিল হাইরাম। তার নামেই আমার নাম।'

কিছু পরে ওদের খেয়াল হল ওরা ভুলে পুব দিকে হাঁটছে। তার চেয়ে এর পরের ছোট নদীটা ধরে গেলে নিশ্চয় বড় নদীতে পড়বে। তার ওপারে ক্যাম্প। এই ভাবে চলল ওরা, কখনো বন্ধুর মতো গল্প করে, কখনো তর্কাতর্কি করে।

*

টারজানের বন্ধু জুথো আর গায়াট। দলের গোদা টয়াটের সঙ্গে তাদের বনে না। আসলে গায়ের জোরে গায়াট টয়াটকে ছাড়িয়ে যেত, কিন্তু ওর স্বভাবটা ছিল আয়েসী, অত রাজাগজা হওয়া তার পোষাত না। এদিকে জুথো আর বুড়ো টয়াট, দুজনেরি এক সুন্দরী বনমানুষীকে পছন্দ। তার জন্য টয়াটের সঙ্গে লড়াই করতে জুথো সাহস পাচ্ছিল না। তাই সুন্দরীকে নিয়ে, দল ছেড়ে আলাদা দল বেঁধেছিল। সে-দলে কমবয়সী আরো কজন বনমানুষ জুটেছিল। তারা যে যার জুড়ি নিয়ে এসেছিল। বলা বাহুল্য গায়াটও জুথোর সঙ্গে ছিল। টারজানের সঙ্গে দুজনারি ভারি ভাব। তাই টারজানের বিপদ-সংকেত শুনে মেয়েদের আর বালুগুলোকে রক্ষা করার জন্য দুজন গোদাকে রেখে, বাকিরা পিগমিদের গ্রামে ছুটেছিল। টারজানকে তারা দূরে একটা ছোট নদীর ধারে ঘাসের ওপর রেখে, হাত-পায়ের বাঁধন খুলতে বৃথাই চেষ্টা করছিল। নিকিমাও পারেনি। তখন গায়াটকে টারজান বলল, 'যাও তো একটা জ্যান্ত টারমাঙ্গানি কিম্বা গোমাঙ্গানি ধরে আনো। সে এগুলো খুলে দেবে। দেখো, তাক মেরো না, জখম কর না।' গায়াট তখনি রওনা দিল।

কিড তার পাঁচ অনুচর নিয়ে ববলোর গ্রামের উল্টো দিকে পৌঁছে, ইশারা করতেই, নৌকো এসে তাদের নিয়ে গেল। সেখানে তাদের কোনো খাতির দেখানো হল না। সামান্য গরীব ব্যবসায়ী, মাত্র পাঁচটি অনুচর। ববলো বলল, 'কি চাও?' তার হাবভাবে বন্ধুত্বের লেশমাত্র ছিল না।

—'আমার বন্ধুকে খুঁজছি। সে নাকি এমগুন্দুর গ্রামে গিয়েছিল, কিন্তু আর ফেরেনি।'

—'তাহলে সেখানে যাও, এখানে কেন?'

—'তোমাকে বন্ধু বলে মনে করেছিলাম।'

ববলো বলল, 'আমাকে কি দেবে?'

—'এখন কিছু দিতে পারব না। হাতির দাঁত পেলে, তবে দেব।'

ববলো বলল, 'যারা খালি হাতে আসে তারা কিছু আশা করে কেন? আমার লোকজন নেই।'

কিড তাতে চটে গিয়ে খানিকটা গালাগালি করে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু শুনতে পেল ববলো তার লোকদের বলছে ওকে বন্দী করতে। তখন সে আবার ফিরে এসে ববলোকে বলল, 'আমি এর মধ্যে বন্দরে খবর পাঠিয়েছি, তোমার বিষয়ে নানা গুজব শোনা যাচ্ছে।'

এই বলে বেরিয়ে গিয়ে, গ্রামের কাছেই তাঁবু গাড়ল। গ্রামের লোকরা খাবার বিক্রি করতে এলে, সামান্য পুঁজি থেকে কিছু কাপড়ের বদলে কিড সকলের জন্য খাবার কিনল। গ্রামবাসীদের সঙ্গে নেসেননেনে বলে একটি মিষ্টি চেহারার মেয়ে ছিল। তাকে কিড্ মাঝেমাঝে পুঁতির মালাটালা উপহার দিত। মেয়েটি মনে মনে তাকে বড় ভালোবাসত। সন্ধ্যেবেলায় গম্ভীর মুখে সে ফিরে এসে বলল, 'চুপ করে আমার কথা শোন। ওরা জানলে আমাকে মেরে ফেলবে। ববলোর লোকরা নৌকো করে তোমাদের এমগুন্দুর গ্রামে পৌঁছে দেবে বলে, মাঝনদীতে খুন করে জলে ভাসিয়ে দেবে। কেউ জানতেও পারবে না। কারণ এমগুন্দুর গাঁ উটেঙ্গারা জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

—'বল কি! বুড়ো কোথায়?'

—'তা জানি না। শুনেছি চিতা-মানুষরা তাকে মেরে ফেলেছে। ববলো ওদের সাদা পূজারিণীকে চুরি করেছিল বলে ওদের ভয় করে।'

—'কবে হল এসব?'

—'দিন চারেক হল।'

—'সে মেয়েকে ববলো পিগমিদের গ্রামে রেখে এসেছে। তারা মানুষ খায়।'

কিড্ বলল, 'ঐ মেয়েটি আমার নিজের বোন। তাকে আমি বাঁচাতে চাই।'

—তোমার বোন বুঝি? তাই তোমার মতো দেখতে।'

—'সে গ্রামের পথ আমাকে বলে দাও।' তাই বলে দিল মেয়েটি। পরদিন ভোরে কিড রওনা হয়ে গেল।

*

অনেকক্ষণ ধরে কোনো কথা না বলে ওল্ড টাইমার আর কালি বোয়ানা হেঁটে চলল। তারপর নদীর ধারে একটু খোলা জায়গায় পৌঁছে ওল্ড টাইমার বলল, 'এখানে একটুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক।'

কোনো কথা না বলে ওল্ড টাইমার ক্যাম্প করার ব্যবস্থা করতে লাগল। বড় বড় শুকনো ডালপালা দিয়ে একটা ছাউনি হলো, তার সঙ্গে কিছু তাজা ডালপালা কেটে শক্ত করা হলো। সবটার ওপর বড বড় ঘাস পাতা দিয়ে ঢাকা হল। কালি বোয়ানা ওকে আগাগোড়া সাহায্য করতে লাগল। ওল্ড টাইমার বলল, 'একটা তীর-ধনুক তৈরি না করা পর্যন্ত, খাবার-দাবারের কিঞ্চিৎ অভাব হবে।

তীর ধনুকের উপকরণ কাছাকাছি জায়গা থেকে সংগ্রহ করল ওল্ড টাইমার। শক্ত লতা আর কাঠ দিয়ে ধনুক হলো, এক গোছা তীরও হলো। কালি বোয়ানা বসে বসে ওর দক্ষ কাজ দেখতে লাগল। নদীর ধারে ঝোপের মধ্যে থেকে এক জোড়া হিংস্র চোখও ওদের লক্ষ্য করছিল। সেটা ওরা টের পায়নি। হঠাৎ চোখ তুলে কালি বলে উঠল, 'কি সর্বনাশ! দেখ!'

ওল্ড টাইমার বলল, 'পালাও, কালি, ঐ বনমানুষ আমাকে ধরতে আসেনি, তোমাকে নিতে এসেছে। আমি একটু ঠেকাচ্ছি, তুমি দৌড়ও!'

কালি বলল, 'তুমি তো কখনো আমাকে ফেলে পালাওনি।'

ততক্ষণে বনমানুষটা ওদের কাছে পৌঁছে গেছিল। এক হাতে কালি বোয়ানাকে সরিয়ে দিয়ে, অন্য হাতে টপ করে ওল্ড টাইমারকে তুলে, কাঁধে ফেলে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল।

এই শেষ মর্মান্তিক আঘাত সামলে উঠতে পারছিল না কালি। বোধ হয় মাথা ঘুরে পড়েও গিয়েছিল। একবার ভাবল ও-ও সঙ্গে সঙ্গে যাবে, কিন্তু কোন দিক দিয়ে যে তারা গেল ভেবে উঠতে পারল না। ওর মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল। খালি মনে হচ্ছিল, এমন দয়ালু স্নেহশীল মানুষকে আমি অনাদর করেছি, তার মনে আঘাত দিয়েছি। সে যে আমাকে ভালোবাসে তা সে নানাভাবে জানিয়েছে, আমি কি নিষ্ঠুর সব কথা বলেছি! ঐ একটা ছোট ঘটনায় কালি বোয়ানার চোখ ফুলে গেছিল।

সে-ও এই ছেঁড়া পোষাক পরা গরীব লোকটাকে ভালোবাসে!

এদিকে সারাদিন কেটে গেল। হাত-পা বাঁধা টারজান তখনো পড়ে আছে। নিকিমা মনের দুঃখে হাত-পা এলিয়ে বসে আছে। অন্য বনমানুষরাও বিমর্ষ ভাবে অপেক্ষা করছে। হেনকালে একটা মানুষ বগলে করে গায়াট ফিরে এসে মানুষটাকে নামিয়ে বলল, 'কালো মানুষ পেলাম না, তাই এটাকেই আনলাম।'

ওল্ড টাইমার হকচকিয়ে গেছিল। চারদিকে বনমানুষ, তার মধ্যিখানে যে সাদা মানুষটা হাত-পা বাঁধা পড়ে আছে, তাকে গোড়ায় সে চিনতে পারেনি। অন্য বনমানুষরা অচেনা সাদা মানুষ দেখে চাপা গর্জন করছিল। দাঁত খিঁচোচ্ছিল। টারজান বলল, 'খরবদার! সাদা মানুষটা টারজানের জিনিস। ছোঁবে না ওকে!'

তারপর ইংরিজিতে বলল, 'একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে, অমনি আরেকটাতে পড়লে দেখছি।'

এতক্ষণে তাকে চিনতে পেরে ওল্ড টাইমার বলল, 'তাই তো! তুমিই তো আমাকে মন্দির থেকে উদ্ধার করেছিলে!'

—'এখন নিজেই বিপদে পড়েছি।'

ওল্ড টাইমার বলল, 'এরা আমাদের নিয়ে কি করবে?'

—'কিছু না। ওরা আমার বন্ধু। বলেছিলাম একটা মানুষ আনতে, আমার বাঁধনগুলো খুলে দেবে। তাই তোমাকে ধরে এনেছে। এদের কারো সাধ্য নেই খুলে দেয়।'

অমনি ওল্ড টাইমার তারের প্যাঁচ খুলতে বসে গেল। অতি সহজেই সব খুলে এল। টারজান বলল, 'আমি টারজান।'

ওল্ড টাইমার তো অবাক! 'আমি ভাবতাম টারজান বলে কেউ নেই। সব বানানো গল্প।'

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'সেই সাদা মেয়েটির কি হল? বেঁটেদের গাঁ থেকে তো তাকে নিয়ে চলে গেলে। এ দিকে গাছের ডাল ভেঙে আমি নিচে পড়ে বন্দী হলাম। আমার বনমানুষ বন্ধুরা আমাকে বাঁচাল। সে কোথায়?'

—'আমরা আমার ক্যাম্পের দিকেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমাকে ধরে আনল। তার খোলা হলেই তার কাছে ফিরে যাব। কাছেই কোথাও হবে, তবে খুঁজে পেলে হয়।'

—'আমিও সঙ্গে যাব। গায়াটের পায়ের দাগ দেখে সহজেই জায়গাটা চেনা যাবে।'

এই বলে হাত পা-র অসাড় ভাব দূর হলেই সে রওনা দিল। ওল্ড টাইমার পিছিয়ে পড়তে লাগল। টারজান বলল, 'আমি এগিয়ে যাচ্ছি। নিকিমা তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

কালি বোয়ানা ছাউনিটার কাছে বসে ভাবছিল আর তার সঙ্গে দেখা হবে না। বনমানুষটা কি আর ওকে বাঁচতে দেবে। চোখ ফেটে জল এল, কালি বোয়ানা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তারপর মনকে বলল তার না হয় যা হবার তা হল, কিন্তু এখনো তো জেরিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সে জন্যেই এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে আসা। এখন একটু খেতে না পেলে তো নড়তে চড়তে পারবে না। ছাউনি থেকে তীরধনুক নিয়ে বেরিয়েই দেখে সামানে একটা চিতাবাঘ। ওকে দেখে গা নীচু করে গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল, ল্যাজটা এ-পাশ ও-পাশ দুলতে লাগল। কি আর করতে পারে কালি বোয়ানা। ছোট ধনুকটাতে তীর পরাল। লড়াই না দিয়ে কালি বোয়ানা মরবে না।

এমন সময় চিতাবাঘের পিছনে একজন লোক বন থেকে বেরিয়ে ছুটে এল। বিশাল-দেহ এক শ্বেতাঙ্গ, পরণে একটা বাঘছাল। নিঃশব্দে ছুটে এসে চিতাবাঘের পিঠে এক লাফে চড়ে বসল সে। তারপর বাঘে মানুষে আশ্চর্য লড়াই শুরু হল। দুজনেরি গলা থেকে চাপা গর্জন বেরোচ্ছিল। খালি হাতে মানুষটা লড়ছিল। দু-হাতে বাঘের গলা প্যাঁচিয়ে ধরে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি তার ঘাড় মটকে মেরে ফেলল। তারপর তার গায়ে পা রেখে অমানুষিক এক হুংকার দিল। কালি বোয়ানার হাত পা ঠাণ্ডা!

টারজান বলল, 'আমি দেখছি সময় মতোই এসে পড়েছি। তোমার বন্ধুও এক্ষুণি এসে পড়বে। তীর ধনুক নামাতে পার, আমি বন্ধু লোক।'

কালি তীর ধনুক নামিয়ে বলল, 'কার কথা বলছ?'

—'নামধাম জানি না। তোমার অনেক বন্ধু নাকি?'

—'না। শুধু একজন। তাকে বনমানুষে ধরে নিয়ে গেছে। ভাবলাম বেঁচে নেই।'

—'খুব বেঁচে আছে। এই এল বলে।'

টারজান অবাক হয়ে ভাবছিল, এই পাতলা ছোট্ট শরীর নিয়ে, ছেলেমানুষ মেয়েটা এই বনে বেঁচে আছে কি করে?

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ওল্ড টাইমার এসে পৌঁছল। মরা বাঘ দেখে ছুটে এসে সে বলল, 'তোমার কিছু হয়নি তো?'

—'না, না, ভালো আছি।'

মনের কথা কেউ প্রকাশ করল না। ভবিষ্যতের কথা হলো। কালি বলল, 'ওল্ড টাইমারের ক্যাম্পে গিয়ে নতুন সাফারি নিয়ে জেরিকে খুঁজতে বেরোবে।

*

পরদিন সকালে ওরা নদীর দিকে চলল। কিছু দূর গিয়েই টারজান বলল, 'সামনেই একটা সাদা মানুষদের ক্যাম্প আছে। গন্ধ পাচ্ছি। দাঁড়াও, দেখে আসি। মনে হয় বন্ধু লোকই হবে।'

গাছে চড়ে টারজান অদৃশ্য হয়ে গেল, ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। একটু বাদেই টারজান ফিরে এসে বলল, 'কোনো ভাবনা নেই। শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের সঙ্গে একদল সৈনিক আর একজন শ্বেতাঙ্গ নাগরিক। তোমাদের দুঃখ-কষ্টের বোধ হয় অবসান হল। এসো।'

তারা ক্যাম্প তুলে ফেলছিল। ওদের দেখে দুজন সাদা অফিসার আর অন্য লোকটি এগিয়ে এল। সে লোকটিকে দেখে ওল্ড টাইমার বলে উঠল, 'আরে কিড, যে!'

কিন্তু কালি বোয়ানা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'জেরি! জেরি!'

তাই দেখে ওল্ড টাইমার মুষড়ে পড়ল। অফিসারদের একজন বলল, 'তোমার আস্কারিদের চলে যাবার খবর পেয়ে, গ্রামে গিয়ে তাদের ধরে, সব কথা শুনলাম। আমাকে বলা হল তোমাকে খুঁজে বের করতে। কাল ববলোর গ্রামের কাছে পৌঁছে একটি মেয়ের কাছে শুনলাম তুমি পিগমিদের গ্রামে বন্দী। এবার আমরা সেখানেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা।'

ওল্ড টাইমার বলল, 'এসেছই যখন, তখন ববলোর গ্রাম থেকে দুজন চিতা-মানুষকে গ্রেপ্তার কর। ববলোকে আর তার ওঝা সোবিটোকে। আমরা তিনজনে ওদের চিতা-মন্দিরে দেখেছি।'

টারজান বলল, 'ঠিক জান সোবিটো?'

—'ঠিক জানি। তুমি তাকে মন্দির থেকে নিয়ে গেছিলে। আমি তাকে তার পরেও নৌকো করে যেতে দেখেছি।'

অফিসার বলল, 'দুজনকেই ধরব। এবার তাহলে রওনা হওয়া যাক।'

টারজান বলল, 'আমি তাহলে চলি। কালি বোয়ানা, তুমি বন থেকে চলে যেও, এখানে আর নয়। এ তোমার জায়গা নয়।'

অফিসারটি অনুরোধ করল, 'সোবিটোকে সনাক্ত করতে হবে না?'

—'না তার কোনো দরকার নেই।'

টারজান চলে গেলে, বাকিরা ববলোর গ্রামের দিকে এগোল। জেরি আর কালি গল্প করতে করতে এগিয়ে গেছিল। হঠাৎ জেরি ফিরে বলল 'এগিয়ে এসো, ওল্ড টাইমার, আমার বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ওর নাম জে-সি!'

ওল্ড টাইমার আকাশ থেকে পড়ল, 'তোমার ভাইকে খুঁজছ, তাতো কখনো আমাকে বল নি!'

—'তুমিও তো বলনি যে জেরি জেরোমকে চেনো।'

—'কি করে বলব? ওর নামই জানতাম না! ও-ও বলেনি, আমিও জানতে চাই নি।'

তখন জে-সি বুঝিয়ে বলল, 'ব্যাপার হলো, আমাদের শহরে একটা দুষ্টু লোক একজন কমবয়সী মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছিল। তাকে উদ্ধার করতে গেছিল জেরি। সেখানে মারামারি হয় আর লোকটা জেরির গুলি খেয়ে পড়ে যায়। পাছে এই নিয়ে বিশ্রী একটা গুজব রটে, সেই ভয়ে জেরি নিখোঁজ হয়ে গেছিল। কিন্তু লোকটা মোটেই মরেনি, জেরির নামে নালিশও করেনি। পরে অন্য একটা ঝগড়া-ঝাটিতে অবিশ্যি মারা পড়েছে। তা জেরিকে জানাব কি, তার খোঁজই পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে ওর এই বন্ধুর কাছে শুনি ও আফ্রিকার এক অঞ্চলে আছে। তাই আমি ওকে খুঁজতে এসেছিলাম।'

ওল্ড টাইমার বলল, 'পেয়েও গেছ।'

সন্ধ্যায় দলবল নিয়ে ববলোর গ্রামে পৌঁছলে ববলোর কি ভয়। গ্রাম থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু সোলজাররা ধরে ফেলল। ববলো জানত কেন সে গ্রেপ্তার হয়েছে, তাই কিছু বলল না। কিন্তু সোবিটোকে পাওয়া গেল না। তাকে নাকি আকাশ থেকে একটা প্রেত নেমে ধরে নিয়ে গেছে! আমাদের বলে গেছে সোবিটোকে টুম্বাইতে নিয়ে যাচ্ছে।'

সেদিন সন্ধ্যায় নদীর ধারে একজন লোক আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটি বলল, 'তোমরা কাল রওনা হয়ে যাবে। তারপর আট সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবে। তোমাদের জন্যে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।'

মেয়েটি ওর সামনে এসে বলল, 'তুমিও তো আমাদের সঙ্গে বাড়ি যাবে।'

—'এ-কথা তোমার কেন মনে হচ্ছে বল তো?'

—'কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। তাই আমাদের সঙ্গে তুমিও বাড়ি যাবে।'

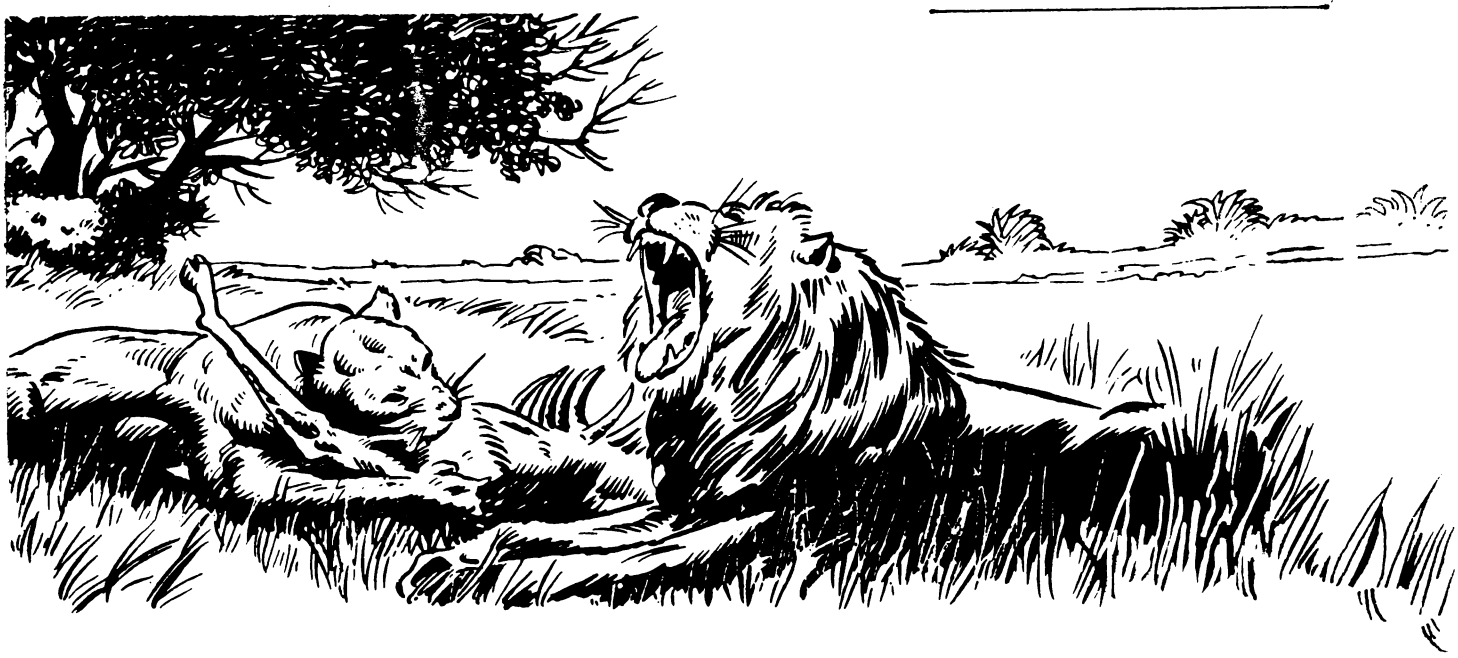

টারজানের অভিযান

টারজান কোয়েস্ট

স্যাভয় হোটেলে লেডি গ্রেস্টোক আর লেডি টেনিংটনের সঙ্গে এক পুরনো বন্ধুর দেখা। বন্ধুটি স্বীকার না করলেও সে ওদের মায়ের বয়সী। নানা উপায়ে যৌবনকে ধরে রাখার চেষ্টা করে থাকে। আগের স্বামী তার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার রেখে স্বর্গে গেছেন। আপাততঃ সন্তানের বয়সী এক নতুন স্বামী জুটেছে। কপর্দকশূন্য সুদর্শন রুশ প্রিন্স শোরভ। কথায় কথায় প্রকাশ পেল তারা আফ্রিকার অন্তঃপ্রদেশে যাচ্ছে। সেখানকার লোকরা নাকি অনন্ত জীবন-যৌবনের গোপন রহস্য জেনেছে। নিজেদের প্লেনে যাওয়া হবে। জেন,—লেডি গ্রেস্টোকও যখন তার স্বামী বিখ্যাত টারজানের কাছে ফিরে যাচ্ছে, তখন দুই বন্ধু এক-সঙ্গে গেলেই তো যাত্রাটা আরো আনন্দের ব্যাপার হবে। লেডি টেনিংটনকেও নেমন্তন্ন করেছিল কিটি শোরভ, কিন্তু তার অবসর ছিল না, তাই সেটা হল না।

জেন দোমনা করে, রাজি হয়ে গেল। টারজানকে নাইরোবিতে একটা তার পাঠালেই হবে। সেখানেই এদের প্লেনও যাচ্ছে, তারপর গন্তব্য স্থলে। বলা বাহুল্য এ যাত্রাটা হচ্ছে কিটি শোরভের আগ্রহে এবং খরচে। অ্যালেক্সিস শোরভের রাজি না হয়ে উপায় ছিল না।

টারজান তখন ঘোর জঙ্গলে, রাতে গাছের উঁচু ডালে মাচা বেঁধে ঘুমোয়। একমাত্র সঙ্গী খুদে বাঁদর নিকিমা। সে টারজানের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু তার ধারণা বনের সব হিংস্র জন্তুরা তার-ই খোঁজে আছে।

এ জায়গাটা টারজানের নিজের এলাকা থেকে অনেক দূরে। সে একটা অনুসন্ধানের কাজে এসেছে। কিছু দিন থেকে তার কানে একটা গুজব আসছিল যে ওর এলাকার সীমানার ঠিক বাইরের গ্রামগুলো থেকে অল্পবয়সী মেয়েরা রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাদের আর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না। চোদ্দ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে তাদের বয়স।

ধীরে সুস্থে এগোচ্ছিল টারজান। হঠাৎ কানে এল মানুষের পায়ের শব্দ। কালো মানুষের শব্দ। জনা কুড়ির বেশি নয়। এরপর তাদের গন্ধও নাকে এল। টারজান নিকিমাকে বলল, 'বন্ধু লোক এরা। আমার ওয়াজিরিরা আসছে।'

দেখতে দেখতে তারা এসে পড়ল। সবার আগে মুবিরো। টারজান গাছ থেকে নেমে পড়ল, 'কি হয়েছে মুবিরো? আমার সন্তানরা এদেশে কেন? কোন বিপদ হয়নি তো?'

মুবিরো বলল, 'আমার মেয়ে বুইরা অদৃশ্য হয়ে গেছে। একা নদীর দিকে যাচ্ছিল, আর ফেরেনি।'

—'কুমির নয়তো?'

—'না, নদীর ধারে অন্য মেয়েরা ছিল। তারা বলছে সে নদী পর্যন্ত পৌঁছয়নি। হয়তো কাবুরুরা ধরে নিয়ে গেছে। তাই তাদের খোঁজে চলেছি।'

টারজান বলল 'সে দেশ অনেক দূরে। আমি তার কাছাকাছি একটা গাঁ থেকে ফিরছি। তাদের মেয়েরাও প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে যায়। অথচ ভয়ের চোটে কাবুরুদের দেশের পথটা কিছুতেই বলল না।

মুবিরো বলল, 'আমি সে পথ খুঁজে বের করব। বুইরা আমার বড় লক্ষ্মী মেয়ে।'

টারজান বলল, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। পায়ের চিহ্ন কিছু পেয়েছ?'

—'কাবুরুরা কোনো চিহ্ন রেখে যায় না। তাতেই বুঝেছি ওরাই ধরে নিয়ে গেছে।'

টারজান বলল, 'বুকেনা গ্রাম কাবুরু দেশের কাছেই। ওদেরি সবচেয়ে বেশি মেয়ে হারিয়েছে। তাই মনে হয় ওদের কাছে কোথাও সে জায়গা। কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলবে না।'

এর মধ্যে ভীষণ ঝড় উঠল, ওরা এগারো জন জড়সড় হয়ে বসে রইল। মাথার ওপর একটা শব্দ শুনে আকাশের দিকে তাকাল টারজান। ঝড় অনেক কমে গেছে তখন। মনে হোল যেন প্লেনের শব্দ। কিন্তু এদিকে তো প্লেন আসার কথা নয়। মেঘের মধ্যে দিয়ে কিছু দেখা গেল না।

*

শোরভদের প্লেনের পাইলটের নাম ব্রাউন। দক্ষ বৈমানিক, কিন্তু আদব-কায়দার ধার ধারে না, তাই শোরভ তাকে দেখতে পারে না। সে-ও নিষ্কর্মা দাম্ভিক শোরভকে ঘৃণা করে।

প্লেনে প্রিন্স আর প্রিন্সেস শোরভ ছাড়া, ছিল লেডি গ্রেস্টোক, কিটির ফরাসী মেড্ অ্যানেট, অ্যালেক্সিসের ভ্যালে টিব্স্, ব্রাউন, আর মালিকদের পর্বতপ্রমাণ এবং নিঃসন্দেহে অনাবশ্যক লটবহর। ঝড় উঠলে প্লেন দোল খেতে লাগল। আরেকটু নিচে নামতে পারলে ঝড়ের স্তরের তলায় পৌঁছনো যেত। কিন্তু লোকজন, জিনিসপত্রের এত বেশি ওজন যে নিচে থেকে যথেষ্ট বাতাসের চাপ না থাকলে ভেঙে পড়ার ভয় ছিল। তেল কমে এসেছিল আর আশেপাশে কোথাও তেল পাবার সম্ভাবনাও ছিল না।

এই সব সমস্যা নিয়ে ব্রাউন যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিল। তার ওপর অ্যালেক্সিসের অনবরত খুঁৎ ধরা আর টিক টিক করা ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তখন ব্রাউনও উল্টে দু-চার কথা শুনিয়ে দেওয়া ধরল। এমন আচরণ মাইনে করা কর্মীর মুখে নিঃসন্দেহে অশোভন। সকলেই তাকে থামাবার চেষ্টা করছিল, যদিও সকলেরি যথেষ্ট সহানুভূতিও ছিল। শোরভ লোকটার বংশ যত উঁচুই হোক, ব্যবহার ছিল জঘন্য।

জেন প্লেন চালাতে জানত। তার কাছে ব্রাউন তার অসুবিধার কথা বলাতে, দুজনে স্থির করল আর মাত্র ঘণ্টা-খানেকের মতো তেল আছে, সে কথা অন্যদের বলে কাজ নেই। মেঘের মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই, যে করে হোক বিমানটা নামাতে হবে।

কিটি তো একটু ঝাঁকানি খেলেই মুচ্ছো যায়, শোরভ তখন তাকে যা-তা বলে। তবে টিব্সের আর অ্যানেটের ওপর খানিকটা নির্ভর করা যায়।

ওপাশ থেকে শোরভ বলল, 'কি বলছে কি? ভেঙে পড়ব নাকি?' তারপর স্ত্রীর দিকে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল,

'সব নষ্টের গোড়া তুমি! বয়সের গাছ পাথর নেই, আবার তরুণী হবার শখ!'

কিটি কেঁদে ফেলল।

ব্রাউন জেনকে জিজ্ঞাসা করল, 'ও দুটোকে নিচে ফেলে দিলে বেশ হয়। কিন্তু সেটা বোধ হয় বে-আইনী হবে। কোথায় যেন পড়েছিলাম।'

জেন বলল, 'হ্যাঁ, হবে।'

আর দেরি করা যায় না। মেঘের ফাঁক দিয়ে ব্রাউন ঝুপ করে প্লেনটাকে একেবারে একশো ফুট নামিয়ে ফেলল। তখনো বাতাসে বড় বড় গাছ দুলছিল। তার কতকগুলো হয়তো দুশো ফুট উঁচু। জেন বলল, 'নামালে গাছে লাগাবে না?'

—'সেই আশাই তো করছি। তাতে পড়ার বেগ আটকাবে। কম ক্ষতি হবে। সবাই সাবধান! প্লেন নামাচ্ছি।'

*

ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাতের মধ্যিখানে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দোলায়মান গাছের ওপর নাক নিচু করে প্লেন নামল। নামার ঠিক আগেই ল্যাজের দিকটাকেও নিচু করে দিল ব্রাউন। কাঠকুটো ভাঙ্গার, ক্যাম্বিস ছেঁড়ার শব্দের সঙ্গে গাছের ওপর চেপে বসল আকাশযান। কিন্তু কেউ জখম হয়নি, প্লেনের তলদেশটা ছাড়া। সকলের বেল্ট আঁটা ছিল। ব্রাউন ডেকে বলল, 'সকলে ঠিক আছ তো? তোমার কি খবর, অ্যানেট?'

অ্যানেট বলল, 'হায় ভগবান! আমি কখন মরে গেছি!'

কিটি বলল, 'আমান জন্য কেউ কিছু করছে না কেন? অ্যানেট! অ্যালেক্সিস্!'

অ্যালেক্সিস্ বলল, 'বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। ফ্রেঞ্চ পাইলট আনলে এমন হোত না!'

জেন পর্যন্ত চটে গেল, 'বোকার মতো কথা বল না। ব্রাউন চমৎকার সামলেছে!'

অ্যালেক্সিস্ তখন টিব্‌সের দিকে ফিরে বলল, 'কিছু করছ না কেন, উডিয়ট্! আমি তখনি ফ্রেঞ্চ ভ্যালে আনতে চেয়েছিলাম।'

টিব্‌স্ বলল, 'আনলে আমিও খুশি হতাম!'

জেন ততক্ষণে বেল্ট খুলে ক্যাবিনে ঢুকেছে। নাক নিচু করে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাত হয়ে প্লেন পড়েছে। জেন আর ব্রাউন সবার আগে কিটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'লেগেছে নাকি?'

—'উঃ! দু টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেছি। প্রত্যেকটা পাঁজরা ভেঙেছে!'

শোরভ ব্রাউনকে বলল, 'এই বিপদে পড়েছি তোমার দোষে। এখন তুমি সবাইকে উদ্ধার কর।'

ব্রাউন বলল, 'যতক্ষণ প্লেনে আছ, নিরাপদে আছ। মাটিতে নামলে আমি আর পাইলট থাকব না, তখন তোমার ঐ সব বেয়াড়া কথা আর সইব না!'

সঙ্গে সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত জেন কষে ধমক দিয়ে ওদের থামাল। কিটি বলল, 'আমি আর সইতে পারছি না। আমাকে নামাও।'

—'এই ঝড়ে নামার কথা বাদ দাও। প্লেনের মধ্যেই আমরা ভালো আছি।'

টিব্‌স্ বলল, 'ঝড় থামার নাম নেই!'

জেনের এ দেশ ভালো করে চেনা। সে বলল, 'হঠাৎ আসে, হঠাৎ থামে। আবার কখনো অনেকক্ষণ চলে। ব্রাউন, কয়েকটা কুশন এখানে পেতে দাও। কক্‌পিটে ঠেস দিয়ে কিটি বসুক।'

টিব্‌স্ উঠে কাজে লাগল। বাকিরাও যে যার বেল্ট খুলে ফেলল।

এদিকে টারজান আর ওয়াজিরিরা কিছুক্ষণ প্লেনের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। তারপর শব্দটা মিলিয়ে গেল। মুবিরো বলল, 'ওটাতে মানুষ আছে নাকি?'

—'অন্ততঃ চালক তো আছে।'

—'তার চেয়ে মাটিতেই ভালো। দেবতারা যদি মানুষকে ওড়াতে চাইতেন, তাহলে তাদের ডানাই দিতেন।'

নিকিমা বেচারি ভিজে চুপ্‌পুড় হয়ে, শীতে আর ভয়ে টারজানের বুকে গুঁজে ঠকঠক করে কাঁপছিল।

তারপর ঝড় থেমে গেল, মেঘ সরে গেল, রোদ উঠল। তারপর টারজান উঠে পড়ে বলল, 'উকেনার দিকে যাওয়া যাক। আমি আগে গিয়ে বুকেনার সঙ্গে কথা বলব। তোমরা পিছন পিছন এসো। ওখানে আমাকে না দেখলে জেনো যে আমি কাবুরু আর বুইরার সন্ধানে গিয়েছি। দরকার হলে নিকিমাকে তোমাদের কাছে পাঠাব।'

কাবুরুদের বিষয়ে নানা অদ্ভুত গল্প শোনা যেত। ওরা নাকি অসভ্য শ্বেতাঙ্গ জাত। কাপড়চোপড় পরে না। বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। ওদের দেশে নাকি মেয়ে জন্মায় না,

তাই মেয়ে চুরি করে। ওরা নাকি দীর্ঘ কাল বাঁচে। কখনো বুড়ো হয় না।

অনেক দূরের পথ, ভিজে স্যাঁৎসেঁতে বন। তবু ছোট-বেলা থেকেই টারজান কষ্ট সইতে অভ্যস্ত। সন্ধ্যার আগে একটা হরিণ মেরে, পেট ভরে খেল। সে রাতে ঘুমিয়ে আরাম পেল না। সকালে আরেকটু মাংস খেয়ে আবার রওনা দিল। এ রকম আবহাওয়ায় নিকিমার বড়ই কষ্ট হয়। কি আর করে।

তৃতীয় দিন সকালে বুকেনাদের প্রধান উডালোর ক্রালে পৌঁছল টারজান। ওরা ওকে চিনত, কিন্তু ওকে দেখে উডালো খুব খুশি হোল না। যখন শুনল কাবুরোদেশের পথ জানতে চায় টারজান, উডালো বলল, 'আমি জানি না।'

টারজান বলল, 'এ-কথা বিশ্বাস হয় না। এত মেয়ে চুরি যাচ্ছে, অথচ তোমরা কোন খোঁজ করনি, এমন হতে পারে না।'

—'তুমি কেন যেতে চাও? ওরা লোক ভালো না।'

—'আমার ওয়াজিরি বন্ধু মুবিরোর মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি ওয়াজিরিদের যুদ্ধ-প্রধান, কাজেই আমি তার খোঁজ করতে এসেছি।'

তবু উডালো বলে, 'আমি জানি না ওরা কোথায় থাকে।'

এর মধ্যে অনেকগুলো যোদ্ধাও এসে চারদিকে দাঁড়িয়ে গেছিল। উডালো কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। টারজান বলল, 'এ কি রকম ব্যবহার, উডালো? আমি বন্ধুর মতো এসেছি।'

উডালো বলল, 'আমার যোদ্ধারা বলে তুমিই কাবুরু-দের গুপ্তচর। এখানে মেয়েদের সন্ধানে এসেছ। অনেকটা তাদের মতোই দেখতে তুমি। ও-সব আর চলবে না বলে দিলাম।'

এই বলে হাততালি দিতেই যোদ্ধারা টারজানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

*

শোরভদের খুঁৎখুতে স্বভাব জেনের ভালো লাগছিল না। প্রিন্সের যত রাগ পাইলটের ওপর। শেষটা জেন স্পষ্ট করে বলল, 'এই লোকটার দক্ষ প্লেন চালানোর ফলে আমরা অক্ষত দেহে নেমেছি। হাজারে একজন বৈমানিক এভাবে প্লেন নামাতে পারত।'

টিব্‌স্ বলল, 'মাপ করবেন, বৃষ্টি থেমে গেছে।'

অ্যানেট্ বলল, 'রোদ উঠেছে।'

জেন দরজা খুলে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'আমরা মাটি থেকে মোটে পঞ্চাশ ফুট ওপরে আছি। তবে কাউকে কাউকে হয়তো একটু কষ্ট করে নামতে হবে।' এই বলে জুতো মোজা খুলে ফেলল।

কিটি তো অবাক, 'করছোটা কি!'

—'প্লেনের তলায় লগেজ কম্পার্টমেণ্ট, সেখানে ঢুকবার চেষ্টায় আছি। কিছু দরকারি জিনিস বের করে আনা যাবে। অনেক কিছু দরকার হবে। এখানে তো ঠাণ্ডা। নিচে তার ওপর ভিজে। গাছে ওঠা-নামা করতে খালি পা-ই ভালো।'

—'ও বাবা! আমি কোনো জন্মে নামতে পারব না।'

জেন বলল, 'আমরা সাহায্য করব। আর দেখ ব্রাউন, তুমি আর টিব্‌স্ দুজনে মিলে সেফটি বেল্টগুলো খুলে নিয়ে একসঙ্গে জুড়ে লম্বা একটা স্ট্র্যাপ বানাও দেখি। কিটিকে নামাবার সুবিধা হতে পারে।'

সবাই চ্যাঁচাত লাগল, জেন তাদের কথায় কান না দিয়ে খচমচ করে মালগুদামের দরজার কাছে পৌঁছে গেল। সেটাতে তালা ছিল না, খুলে গেল। ভিতরে সব লটবহর ওলটপালট হয়ে ছিল। একটা ডাল তলা ফুঁড়ে ভিতরে ঢুকে গেছিল। জেনও ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ওদিকে ব্রাউন অ্যালেক্সিসকে বলল, 'ওঁর মতো জুতো মোজা খুলে ফেললে, নামার সুবিধা হবে।'

—'আমি তো বাঁদর নই।'

অমনি দুজনে লেগে গেল। জেন কাপড় ছেড়ে শর্টস আর চামড়ার জার্কিন পরে এসেই দুজনকে দুই ধমক দিল। সে বলল, 'একজন কাউকে দলের নেতা হতে হবে। তার কথামতো সবাইকে চলতে হবে। পুরুষমানুষ হলেই ভালো হোত, কিন্তু—'

টিব্‌স্ বলল, 'আপনি হন ম্যাডাম, আপনার কথা সবাই শুনবে। আপনি জানেন শোনেনও সবচেয়ে বেশি।'

সেই ব্যবস্থাই হোল।

জেন নিচে নামল, ক্যাম্প করার একটা ভালো জায়গা বাছতে। সবাইকে কাজের ভার দেওয়া হোল। প্রিন্স খানিকটা গাঁইগুঁই করেছিল, তাহলে চাকরবাকর আনা কেন ইত্যাদি। জেন থামিয়ে দিয়ে প্রিন্সের কোমরে স্ট্র্যাপ বেঁধে নামানোর ব্যবস্থা করে, বেরিয়ে পড়ল। চারদিকে বনের গন্ধ, মনটা ভালো হয়ে গেল। টারজানের কথা বেশি করে মনে হতে লাগল। সে জানেও না ওদের কি অবস্থা হয়েছে।

জানোয়ার-চলা পথ ধরে কিছুদূর গিয়েই একটা ছোট নদীর ধারে, একটু খোলা জায়গা দেখে মনে হল এই তো ক্যাম্পের উপযুক্ত স্থান। অমনি ছুটল প্লেনের কাছে। জিনিসপত্র এখানে বয়ে আনতে হবে। মনে হল ঝোপের মধ্যে সর-সর করে কোনো জানোয়ার নড়াচড়া করছে সিংহ কিনা কে জানে। অ্যালেক্সিস আর ব্রাউনের তর্কাতর্কি কানে আসছিল। অ্যালেক্সিসকে ডেকে বলল, 'গাছে চড়। আমার পিছনে বোধ হয় সিংহ আসছে।'

—'গাছে চড়তে পারি না আমি। ও ব্রাউন সাহায্য কর না।'

জেন বলল, 'ব্রাউন স্ট্র্যাপটা ঝুলিয়ে দিয়ে ওকে টেনে তোল।'

ওরা দুজন অমনি খ্যাঁচাখেঁচি শুরু করে দিল।

*

বুকেনা যোদ্ধারা যখন টারজানকে ঘিরে ফেলল, সে সোজা দাঁড়িয়ে রইল। পালানো অসম্ভব। একটা মেয়েমানুষ চ্যাঁচাতে লাগল, 'আমার মেয়ে চুরি করেছে, মারো ওকে।'

আরেকজন বলল, 'আমারো।'

এক বুড়ো লাফিয়ে উঠে বলল, 'খবরদার ওকে মেরো না। ও যদি কাবুরু হয়, ওদের গাঁয়ের লোকরা এসে আমাদের কাউকে আস্ত রাখবে না।'

মহা তর্কাতর্কি শুরু হল। সেই ফাঁকে টারজান পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পিছন থেকে মাথায় প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে সে জ্ঞান হারাল। যখন জ্ঞান হল দেখল হাত-পা বাঁধা হয়ে জঘন্য নোংরা একটা ঘরে পড়ে আছে।

অনেক চেষ্টা করেও দড়ি ছিঁড়তে পারল না, বড় মজবুত দড়ি শক্ত করে বাঁধা। খানিক বাদে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে তখন জোর তর্ক চলছিল ওকে মারা হবে কি না। সেই বুড়ো তখনো জোর গলায় মানা করছিল। শেষ পর্যন্ত উডালো বলল, 'না, কাল ওকে মেরে ফেলে, ভোজ খাওয়া হবে। আজ বাঁধা থাক।'

গভীর রাতে সবাই ঘুমোলে, টারজান খালি পায়ের শব্দ শুনতে পেল। কে যেন নিঃশব্দে ওর ঘরে ঢুকল।

*

সিংহটা যেই ঝোপ থেকে বেরুল, জেন অ্যালেক্সিসকে ডেকে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু সে ঝোপের আড়ালে থরথর করে কাঁপতে লাগল। এক লাফে একটা ডালে উঠে পড়ে, জেন ব্রাউনকে ডেকে বলল, 'স্ট্র্যাপ ঝুলিয়ে ওকে তুলে ফেল। আমি সিংহটাকে ভুলিয়ে রাখছি।'

এমনিই রেগে ছিল সিংহটা, তার ওপর জেন ওর নাকের ওপর কাঠকুটো ছুঁড়ে ফেলাতে আরো রেগে, অন্য দিকে নজর না দিয়ে, জেনকে ধরবার জন্যেই লাফঝাঁপ দিতে লাগল।

এদিকে স্ট্র্যাপ নামালেও অ্যালেক্সিস ভয়ের চোটে সেটা লাগাতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত তাড়া খেয়ে অনেক কষ্টে লাগাল, টিব্‌স্ আর ব্রাউন ওকে তুলতে লাগল।

ততক্ষণে সিংহটা জেনের আশা ছেড়ে, এখানে এসে হাঁচড়-পাঁচড় লাগিয়ে দিয়েছিল। যখন শোরভ ওপরে পৌঁছল, তার হাত-পা ঠাণ্ডা, জ্ঞানগম্যি নেই বললেই হয়। তাই দেখে কিটি কান্না জুড়ে দিল!

জেন ক্যাবিনে ঢুকেই বলল, 'হল কি? ভাবলাম বুঝি সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে! সিংহটা এখনো ঘোরাঘুরি করছে। বুড়ো হয়ে গেছে, মনে হয় শিকার ধরতে পারে না। এই সময় ওরা মানুষখেকো হয়ে ওঠে। ওকে মেরে ফেলাই উচিত। রাইফ্‌ল এনেছ নিশ্চয়?'

তারপর দেখা গেল শোরভরা বন্দুক এনেছে কয়েকটা, খুব দামী বটে, কিন্তু গোলাগুলি আনেনি কেউ। শেষ পর্যন্ত প্রায় সারারাত দাপাদাপি করে, ভোরে সিংহটা চলে গেল।

আলো হতেই জেন বলল, 'তাহলে এবার ক্যাম্প তৈরি করে ফেলা যাক। জিনিসপত্রের বেশির ভাগই নেমেছে বোধ হয়, ব্রাউন?'

কয়েকটা বাকি ছিল। এবার শোরভ একা নামতে রাজি হোল না। ওপর থেকে জিনিসগুলো যে স্ট্র্যাপে বেঁধে দেবে, তা-ও ওর দ্বারা হোল না। ব্রাউন আর টিব্‌স্ জিনিস নামাতে আর জেন নিচে থেকে খুলে নিতে লাগল। তারপর বাকি যাত্রীদেরো একে একে নামানো হোল। কিটি যতদূর সম্ভব সকলের অসুবিধা ও ধৈর্য-চ্যুতি ঘটিয়ে তবে নামল। অ্যালেক্সিস শেষ পর্যন্ত ধমক দিল। তখন কিটি বলল, 'আমি মরলেই তুমি খুশি হও,না? তাই ঐ উইলটা লিখিয়ে নিয়েছিলে। দাঁড়াও না, হাতে কাগজ-কলম পেলেই ও উইল যদি না বদলাই তো কি বলেছি! এক পয়সা দিয়ে যাব না তোমাকে!'

শোরভের চোখ দুটো কেমন যেন ছোট্ট ছোট্ট হয়ে গেল। মুখে কিছু বলল না সে।

দরজায় একটা মানুষের ছায়া দেখে টারজান বলল, 'কে তুমি ?'

—'আহা, অত জোরে নয়। আমি গ্রামের ওঝা গুপিঙ্গু। তোমার গাঁয়ে ফিরে যাও, কাবুরু। সবাইকে বল, গুপিঙ্গু ওঝা তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিল। তার মেয়েদের যেন ওরা চুরি না করে।'

—'বেশ, ভালো কথা। এবার বাঁধন কেটে দাও।'

—'আরেকটা কথা, এ গ্রামের কাউকে বল না আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

টারজান বলল, 'কক্ষণো বলব না। এবার তুমি বল দেখি, আমরা কাবুরুরা কোথায় থাকি ?'

—'উত্তর দিকে, খানিকটা শুকনো জমির ওপারে; একটা উপত্যকার মধ্যিখানে মস্ত পাহাড়ের পাশে।'

—'কি করে যায় সেখানে, তা জান ? বলতো শুনি। তাহলে বুঝব সত্যি জান কি না।'

—'আমাদের গাঁয়ের উত্তরে একটা হাতি-চলা পথ উত্তর দিকে চলে গেছে। অনেকবার বেঁকে-চুরে কিন্তু গেছে ঐ কাবুরু দেশেই। তোমাদের গাঁয়ের পাশে অনেক বাঁশ গাছ। হাতিরা তার কচি কোঁড় খায়। এখন তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আমি আমার ঘরে পৌঁছবার পরে তুমি বেরিও।'

—'আমার অস্ত্রশস্ত্র কোথায় ?'

—'উডালোর ঘরে। সেখানে একজন পাহারাওয়ালা আছে।'

ওঝা চলে গেলে ঘর থেকে বেরিয়ে টারজান উডালোর তাঁবুতে উঁকি মেরে পড়ন্ত আঁচে দেখল পাহারাওয়ালা ঘুমোচ্ছে, উডালোও ঘুমোচ্ছে। কাউকে কিছু না বলে, অস্ত্রগুলো উঠিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখন প্রহরী ওর দিকে তাকাল।

—'কে ওখানে ?'

টারজান বলল, 'টু শব্দ করলেই মরবে। আমি কাবুরু।'

তারপর তাকে সঙ্গে করে ফটকের বাইরে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে, নিজে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। একটু পরেই হৈ-চৈ শুনে বুঝল ওর নেই-হওয়াটা গাঁয়ের কারো জানতে বাকি নেই, কিন্তু কাবুরুদের ভয়ে এই রাত্রে কেউ যে বাড়ির বার হবে না তা-ও ঠিক।

গুপিঙ্গুর কথামতো এক ঘণ্টা ধরে উত্তর দিকে যাবার পর নাকে এল ক্ষুধার্ত সিংহের গন্ধ, শিকারে সিংহ। একটা নিরাপদ মতো গাছ দেখে বাকি রাতটা টারজান ঘুমিয়ে কাটাল। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল নিকিমা কোথায় গেল।

ভোরে আবার এগোতে লাগল। নিকিমা কিন্তু উডালোর কুঁড়ে ঘরের পাশে, গাছের ডালেই বসে শীতে আর ভয়ে কাঁপছিল। টারজান যে ওখান থেকে চলে গেছে তা সে টের পায়নি। ভোরে একবার নেমেছিল, কিন্তু একটা বুড়ি ওকে ধরার চেষ্টা করাতে, একেবারে বাড়ির দিকে লম্বা দিল। তার মন বড় খারাপ।

টারজান আঁকাবাঁকা হাতি-চলা পথ ধরে ক্রমাগত উত্তরে চলেছিল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার আগে একটা শিকার করে, পেট ভরে খেয়ে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। ঐ দ্বিতীয় দিন থেকেই ঘন বনের বদলে পরিবেশটাকে উপবনের মতো মনে হচ্ছিল। হঠাৎ বাতাসে একটা নতুন গন্ধ পেল। সাদা মানুষের গন্ধ। কিন্তু অন্য ধরনের। আর তার সঙ্গে মৃদু কিন্তু স্পষ্ট সিংহের গন্ধ। অর্থাৎ একটা গণ্ডগোলের সম্ভাবনা আছে। মানুষ তাকায় সোজা সামনের দিকে, জানোয়াররা তাকায় ওপর দিকে। টারজানের দুদিকেই দৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে কে কাকে শিকার করছে তা জানা নেই।

এক জায়গায় গাছগুলো কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে নড়াচড়া করলে কারো চোখে পড়বে না। সেদিকে চলল টারজান। সিংহের গন্ধটা বেড়েছিল। এ সিংহটা ক্ষুধার্ত অর্থাৎ বিপজ্জনক।

প্রথমে মানুষটা চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়াল টারজান। শ্বেতাঙ্গ হলেও অন্য রকম। গোরিলার ছাল পরা, হাতে পায়ে গয়না, গলায় মানুষের দাঁতের মালা; নাকে নোলকের বদলে একটা হাড়ের কিম্বা হাতির দাঁতের কাঠি বেঁধানো। সাজ যাই হোক, শ্বেতাঙ্গ যে তাতে সন্দেহ নেই। গাছে ঠেস দিয়ে বসে একটা থলি থেকে কিছু নিয়ে খাচ্ছিল। হয়তো কাবুরু। হঠাৎ হিংস্র গর্জানির সঙ্গে ঝোপের পিছন থেকে সিংহটা তেড়ে এল।

টারজান মানুষটার ঠিক মাথার ওপরের ডালে। লোকটা গাছে চড়ার সময় পেল না। গায়ের জোরে বর্শা ছুঁড়ল। সেটা সিংহের গায়ে লাগল না। তারপর যেই সিংহটা দু-পায়ে উঠে থাবা তুলেছে, টারজান তার কাঁধে নেমেছে। কাৎ হয়ে পড়ে গেল সিংহ; বিকট গর্জন করে উঠেও দাঁড়াল।

টারজান তার গলায় দুই পা জড়িয়ে বাঁ দিকের কাঁধের নিচে, বারবার ছোরার আঘাতে, অল্পক্ষণের মধ্যেই তার ইহলীলা শেষ করে দিল। তারপর তার গায়ে পা রেখে

বনমানুষদের জয়ধ্বনি দিল।

সেই শব্দ শুনে অচেনা শ্বেতাঙ্গ তার ছোরার হাতল চেপে ধরল। তারপর টারজান ওর দিকে তাকাতেই বলল, 'তুমি কে?'

—'আমি কাবুরু, নাম ইদেনি।'

—'আমি বনমানুষদের ছেলে টারজান।'

ইদেনি বলল, 'সিংহটাকে মারলে কেন?'

—'নইলে সে-ই তোমাকে মারত।'

—'তাতে তোমার কি হত? আমাকে তো চেন না।'

টারজান বলল, 'হয়তো তুমিও সাদা মানুষ বলে।'

ইদেনি বলল, 'বুঝতে পারলাম না। তুমি কালোও নও, কাবুরুও নও। তবে তুমি কি?'

—'আমি টারজান। কাবুরুদের গাঁ খুঁজছি। নিয়ে যাবে আমাকে? প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ইদেনি মাথা নাড়ল, 'না, নিয়ে যাব না। ওখানে বাইরের কেউ গেলেই তার মৃত্যু হয়। তোমাকে নিয়ে যাব না। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। এদিকে এসো না টারজান।'

প্লেনের যাত্রীরা নিরাপদে মাটিতে নামলে, ব্রাউন শোরভদের অনাবশ্যক মালপত্রের রাশির মধ্যে একটা দরকারি জিনিস পেল। একটা ছোট কুড়ুল। সেটি দিয়ে ঐখান থেকে ক্যাম্পের নির্বাচিত জায়গা পর্যন্ত ঝোপঝাড় সাফ করে, সে একটা যাওয়া আসার পথ করতে লেগে গেল।

টিব্‌স এ-সব কাজ পারে না। শোরভের হাতে কুড়ুল ভাবাই যায় না। ব্রাউন জেনকে বলল, 'এরা কি করে সাবালক হয় আর তা হবারি বা কি দরকার, তাই ভেবে পাচ্ছি না।'

জেন হাসতে লাগল, 'চমৎকার নাচে, ভাই।'

'তা দেখেই বোঝা যায়। যাক গে, কি কি জিনিসপত্র মজুত আছে, তার একটা নমুনা করা যাক।'

এদিকে কিটির কি ভয়, 'আমি টের পাচ্ছি আমরা সবাই মরে যাব। এর চেয়ে প্লেনে থাকলেই তো বেশি নিরাপদ ছিল! কেন যে টিব্‌স্ ছোট পিস্তলটার গুলি আনেনি!'

জেন বলল, 'অত ঘাবড়িও না, কিটি। চারদিকে কাঁটাঝোপের বোমা তৈরি হচ্ছে, সারা রাত ধুনি জ্বালাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আগুন দেখলে জন্তুরা আসে না।'

তারপর জেন ডালপালা কেটে তীর-ধনুক তৈরি করছে দেখে কিটি বলল, 'ও মা! কি মিষ্টি! এই দিয়ে আর্চারি খেলা যাবে, না জেন?'

—'হ্যাঁ, খাবার-দাবারও জোগাড় করা যাবে।'

বিকেলের দিকে জেন বলল, 'দেখি, রাতের খাবারের কি ব্যবস্থা করা যায়। ব্রাউন, একটা ছুরি দিতে পার?'

কিটি তো অবাক! 'একা যাচ্ছ না, আশা করি?'

ব্রাউন বলল, 'না, না, আমিও যাব।'

জেন হাসল, 'তুমি সেখানে যেতেই পারবে না।'

ব্রাউনেরো হাসি পেল, 'তুমি গেলে আমিও পারব।'

'বেশ চল তো দেখি।' এই বলে ছুরিটা নিয়ে, এক দৌড়ে একটা গাছের ডাল ধরে জেন ঝুলে পড়ল। তার পরেই স্রেফ অদৃশ্য।

ব্রাউন ঝোপঝাড়ের মধ্যে খানিকক্ষণ হাঁচড়-পাঁচড় করে, ফিরে এসে বলল, 'না, ও আমার কম্ম নয়। দেখলে কেমন বাঁদরের মতো ঝুলে পড়ল?'

অ্যানেট বলল, 'হ্যাঁ মনে হচ্ছিল যেন গাছে গাছে জীবন কাটিয়েছেন!'

টিব্‌সের মহা ভাবনা, 'ঐ খেলনার মতো তীর-ধনুক নিয়ে বিপদে পড়বেন না তো?'

ব্রাউন বলল, 'ভয় নেই। জানেন বলেই গেছেন! এমন মহিলার হুকুম মেনে চলতে আমার আপত্তি নেই।'

এই নিয়ে শোরভ আবার এক বক্তৃতা ঝাড়ল। লেডি গ্রেস্টোক সম্বন্ধে আরো সমীহ করে কথা বলা উচিত। আমেরিকানরা ভদ্রতা জানে না।

ঝগড়াটাকে জমতে দিল না অ্যানেট্। ব্রাউনের হাতে একটা হাত রেখে বলল, 'ঝগড়া কর না, মিঃ ব্রাউন, এমনিতেই তো যথেষ্ট কষ্টের মধ্যে সবাই আছি।'

ব্রাউন বলল, 'যা বলেছ!' বলে থেমে গেল।

জেন এগিয়ে চলল নদীর ধারে কোথায় জন্তুরা জল খেতে আসে, তার খোঁজে। টারজান ওকে অনেক বিদ্যা শিখিয়েছিল। গন্ধ শুঁকতে জানত জেন, যদিও স্বামীর মতো অতটা নয়। এখন হরিণের গন্ধ নাকে এল। তারপর সামনে দেখে একটা ছোট জাতের হরিণ যাচ্ছে। সুবিধার মুহূর্তের জন্য জেন অপেক্ষা করছিল। কিন্তু হরিণটা হঠাৎ থামল, যেন কিছুর সাড়া পেয়েছে। এক্ষুণি পালাবে। টং করে অব্যর্থ লক্ষ্যে তীর ছুঁড়ল জেন আর হরিণটাও মরে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে পড়ে, হরিণের ওজন

কমাবার জন্য তার পেট চিরে, নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে দিল। পিছনে, একটু দূরেই নড়াচড়ার শব্দ হল। ছুরি বন্ধ করে, হরিণটা কাঁধে তুলল জেন। অমনি ঝোপ থেকে একটা চিতাবাঘ বেরিয়ে এল। হরিণ ফেলে তখুনি গাছে চড়তে পারত জেন। কিন্তু তাহলে ক্যাম্পের কেউ খেতে পাবে না। হরিণ নামিয়ে, ধনুকে তীর পরিয়ে টং করে আবার ছুঁড়ে দিল জেন।

তীর গায়ে লাগতেই বিকট চিৎকার করে উঠল চিতাটা। মনে হল কোনো মেয়ে চ্যাঁচাচ্ছে। তাই শুনে ক্যাম্পের সবাই ভয়ে মরে।

*

ইদেনি যখন সঙ্গে নিতে রাজি হল না, টারজান অন্য দিকে রওনা হয়ে গেল। তার আগে ইদেনির কাছে কাবুরুদের বিষয়ে অনেক কথা শুনে নিল। গত আশি বছরে ওদের জাতে মেয়ে জন্মায়নি। শেষ মেয়ে ওদের জাতির মঙ্গলের জন্য প্রাণ দেবার পর, ওদের মেয়ে ধরে আনা ছাড়া উপায় নেই। তখন টারজান বলল, 'সব বিদেশীদের মেরে ফেল, নিজেদের মেয়ে জন্মায় না, তা কি করে সম্ভব হতে পারে? তোমাকে দেখে তো যুবক মনে হয়, তোমার মা ছিলেন নিশ্চয়?'

—'আমার মা কাবুরু ছিলেন বটে, অনেক দিন হলো তিনি মারা গেছেন। আরো পরে শেষ কাবুরু মেয়েও মারা গেছে। এ বিষয়ে আলোচনা করা বারণ। এবার নিজের পথ ধর।'

টারজান একটু ঘুরে আবার ঐ জায়গায় ফিরে এসে ইদেনিকে দেখতে না পেয়ে উত্তর মুখে রওনা দিল। এক ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করার পর আবার তার গন্ধ পেল। দেখা গেল ইদেনিও ঘোরা পথে গাঁয়ে ফিরছিল। কয়েকদিন এইভাবে কাটার পর ইদেনির দেখাও পেল। গাছে গাছে তার সঙ্গ নিল টারজান। ততদিনে আবার ওরা বুকেনা গ্রামের কাছে এসে পৌঁছেছিল। হঠাৎ ইদেনিও গাছে উঠল। কোমর থেকে সে দড়িটা খুলতেই, টারজান দেখল তার মাথায় ফাঁশ দেওয়া।

দূর থেকে মেয়েদের গলা শোনা যাচ্ছিল। তারা বনের কিনারায় ক্ষেতের কাজ করছিল। ইদেনি গাছের ওপর থেকে তাদের ওপর লক্ষ্য রাখছিল। তার চোখ ছিল চোদ্দ পনর বছরের একটি মেয়ের ওপর। তার কাছাকাছি একটা গাছ থেকে চাপা শিসের মতো কেমন একটা ডাক দিতে লাগল ইদেনি। মেয়েটি একটু পরেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই ডাক শুনে বনের দিকে এগোতে লাগল। যেই ইদেনির গাছটার তলায় পৌঁছল, ইদেনি তাকে ফাঁশ পরিয়ে ওপরে তুলে নিল। একবারো ডাকটা থামল না। মেয়েও কোনো আপত্তি করল না। দড়ি খুলে, তার অচেতন শরীর কাঁধে ফেলে ইদেনি রওনা হয়ে গেল। টারজান আগাগোড়া সাক্ষী ছিল। একটা বড় রহস্যের সমাধান হোল আজ।

স্রেফ হিপনোটাইজ করে ধরে নিয়ে যায়। নিশ্চয় এর আগে কোনো মেয়ের সাহসী আত্মীয়রাও কিছু দেখেছিল। তারপর যে কারণেই হোক, ব্যাপারটা প্রকাশ পায় নি। কাবুরুরা নেয়, শুধু এইটুকু জানা গেছিল। টারজানের কিন্তু এই মেয়েটার কথা তখন কিছু মনে হয় নি। তার ইচ্ছা ইদেনির পিছন পিছন গিয়ে যদি মুবিরোর মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

টারজান যে পিছু নিয়েছে ইদেনি বোধ হয় টের পায় নি। সন্ধ্যার আগে মেয়েটাকে নামিয়ে একটা গাছে ঐ দড়ি দিয়ে বেঁধে কিছু বাদাম আর ফল খুঁজে এনে নিজেও খেল, তাকেও দিল। এবার মেয়েটার মোহ ছুটল। সে কেঁদে ফেলল। ইদেনি বলল, 'চোপ, গোলমাল কর না। তাহলে আমিও কিছু বলব না।'

মেয়েটি বলল, 'তুমি কুবেরু। আমাকে বাবার কাছে রেখে এসো। তুমি যে বলেছিলে তার মেয়েদের কিছু বলবে না।'

ইদেনি কিছু না বুঝলেও, টারজান এবার বুঝল সে ওপিঙ্গুর মেয়ে। তাহলে তাকে উদ্ধার করতেই হবে।

কুবেরু গ্রামে এখনি যাওয়া যাবে না। রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ইদেনি কি করে দেখতে হবে।

মেয়েটিকে উদ্ধার করতে হোলে কেড়ে আনাও যায়।

টারজান ভাবতেই পারত না ওর সংকল্পে কেউ বাধা দিতে পারে। কিন্তু তাহলে ইদেনিকে আর ভবিষ্যতে বন্ধুত্বের কাজে লাগানো যাবে না। তাই তাকে না জানিয়ে মেয়ে নিতে হবে।

রাত পড়লে ইদেনি মেয়েটার হাত-পা বেঁধে তক্তার মতো মাটিতে ফেলে রাখল। ভয়েই বেচারি আধমরা। ইদেনি ঘুমিয়ে পড়ার ঘণ্টা দেড়েক পরে, গাছ থেকে নেমে মেয়েটার কানে কানে টারজান বলল, 'শব্দ করো না। তোমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যেতে এসেছি।'

এই বলে টপ করে তাকে কাঁধে ফেলে রওনা দিল।

কিছু পরে বড় গাছ পেয়ে তাতে উঠে পড়ল। আরো খানিকটা এগিয়ে তার বাঁধন কেটে দিল। সে বলল, 'তুমি কে?'

—'আমাকে উড়ালো মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তোমার বাবা বাঁচিয়েছিল। আমি কাবুরু নই।'

—'তুমি যদি সত্যি আমাকে বাড়ি নিয়ে না যাও?'

—'এখানে ছেড়ে দিয়ে গেলেও তো মরেই যাবে।'

—'ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে যাব।'

সেই মেয়েলি চিৎকার শুনে টিবস্ আর ব্রাউন ছুটে বনে ঢুকে গিয়ে, ডাকাডাকি করছিল, জেন বলে উঠল, 'ঐ পথটা ধরে এগিয়ে এসো। আমি ঠিক আছি।'

আরেকটু এগিয়ে ওরা দেখে জেন চিতার মৃতদেহ থেকে তিনটে তীর বের করে নিচ্ছে। পাশেই পেট-চেরা হরিণ পড়ে। তীর-ধনুক দিয়ে জেন চিতা মেরেছে দেখে ওরা থ'!

চিতার ছাল জড়ানো, তারপর সেটাকে শুকোনোর বড় বেশি হাঙ্গাম বলে সেটাকে ওরা নিল না। ব্রাউন হরিণটাকে কাঁধে তুলে নিল। ক্যাম্পে ফিরলে তাই দেখে অ্যানেট্ মহা খুশি।

চিৎকার শুনে শোরভ দম্পতি ছাউনির ভিতরে লুকিয়ে পড়েছিল। এখন বাইরে এসে সবাই মিলে ক্যাম্প ছেড়ে যাবার জন্য অ্যালেক্সিস মহা হম্বিতম্বি লাগিয়ে দিল। ব্রাউন-ও লেগে গেল। জেন বলল, 'ঝগড়া না করে, কাজে লাগো দেখিনি। টিবস্ তুমি আর ব্রাউন ভালো করে আগুন জ্বালো। অ্যালেক্সিস, হরিণটা থেকে লম্বা করে পাঁচ ছয়টা স্টেক কাটো। অ্যানেট্ সেগুলো গ্রিল করবে। পারবে তো অ্যানেট্?'

—'দেখিয়ে দিলেই পারব।'

রান্না হলে কিটিকে ডাকা হোল। স্টেক দেখে সে শিউরে উঠল, 'ইস্, কি জঘন্য! ও কি খাওয়া যায়! কাঁচা মতো!'

ব্রাউন বলল, 'ভালোই তো। না খেলে বেশ রোগা হয়ে যাবেন।'

তখন কিটি তৃপ্তির সঙ্গে সেই আধ-কাঁচা স্টেক খেতে বসল। অ্যালেক্সিসও খানিকটা চাল মারল, 'ভবিষ্যতে এত কাঁচা রেখো না, অ্যানেট্। আজ না হয় খেলাম।' খাবার সময় কেউ কিন্তু কম গেল না!

খাওয়াদাওয়ার পর টিবস্ জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে, এখান থেকে যাবার কি ব্যবস্থা করা হবে, মিলেডি?'

জেন বলল, 'এতটা দূর সকলে হাঁটতে পারবে না, এটা ঠিক। ভাবছিলাম এই নদী ধরে খানিকটা এগোলে নিশ্চয় বড় নদী পাওয়া যাবে। সেটা ধরে গেলে, গ্রামটামও পাব। সেখান থেকে সাহায্য নিয়ে সভ্য জগতে ফেরা যাবে।'

কিটি বলল, 'আমি হাঁটতে পারব না। আমার পায়ে ব্যথা।'

অ্যালেক্সিস বলল, 'কাঠি দিয়ে একটা দোলার মতো বানিয়ে তাতে করে তোমাকে নিয়ে যাওয়া যায়।'

ব্রাউন জিজ্ঞাসা করল, 'সেটা কে বইবে?'

'ব্রাউন আর টিব্স্ পারবে নিশ্চয়।'

—'তোমাকে কে বইবে?'

কিটি বলল, 'কেন, ডবল দোলা তৈরি করলেই হবে। দুজনেই চড়ব।'

জেন বুঝিয়ে দিল, 'এই বনে কাউকে দোলায় চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দু-এক জনকে এগিয়ে গিয়ে লোক জোগাড় করে আনতে হবে। বাকিরা এখানে অপেক্ষা করবে। তুমি আর আমি গেলে সব চেয়ে কাজ হবে, ব্রাউন।'

—'দুজনেই গেলে এই ক্যাবলাগুলোর কি অবস্থা হবে ভাবুন! না হয় আমি একাই যাই।'

—'জেন বলল, 'তার চেয়ে আমি গেলে বেশি কাজে দেবে।'

অ্যালেক্সিস হঠাৎ বলল, 'একা যাওয়া ঠিক হবে না। আমি সঙ্গে যাব।'

তাই শুনে কিটি এমনি গোলমাল করতে আরম্ভ করল যে জেন শেষ কথা বলল, 'কাল সকালে আমি একাই

বেরিয়ে পড়ব। ব্রাউন, আমি না ফেরা অবধি, তুমি ক্যাম্পের জন্য খাবার-দাবার জোগাড় করে আনতে পারবে তো?'

ব্রাউন আশ্বাস দিল সে পারবে।

ধুনির চার দিকে কিছুক্ষণ সবাই বসে গল্প করল। খালি অ্যালেক্সিস হাঁড়িমুখে চুপ করে রইল।

জেনের ব্যবস্থায় সারা রাত পাহারা থাকবে। তিনজন পাহারা দেবে, চারঘণ্টা করে। কিটি বাদ। অ্যানেট্ কিন্তু রাজি ছিল। তবে মেয়েদের বাদ দেওয়াই স্থির হল।

জেন ভোরে বেরোবে, কাজেই নটা বাজতেই শুতে গেল। প্রথম পাহারায় টিবস্, তারপর ব্রাউন, শেষ রাতে অ্যালেক্সিস। আশ্চর্যের বিষয়, শোরভ এই ব্যবস্থা সমর্থন করে বলল, 'আমাকে তিনটের সময় তুলে দিও। বড্ড গভীর ঘুম আমার, হয়তো কিছু হাঁকডাক করতে হবে।'

ঘরের মধ্যে মেয়েরা শুয়েছিল। কিন্তু ব্রাউন পাহারায় বসবার পরেই অ্যানেট্ বেরিয়ে তার কাছে এল। তার ঘুম হচ্ছিল না। একটু আগে ঘরে কি যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে মনে হচ্ছিল।

ব্রাউন বলল, 'লেডি গ্রেস্টোক বোধ হয় উঠেছিলেন।'

—'না, তাঁর নিশ্বাস পড়া শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রিন্সেস্ ঘুমের ঘোরে গোঙাচ্ছিলেন, নাক ডাকছিলেন। তারপর আবার চুপ করলেন।'

ব্রাউন বলল, 'নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছ। এখন অনেক রাত বাকি। আবার শুয়ে পড়গে।'

—'না, কেমন ভয়-ভয় করছে।'

সে উঠতে চাইছে না দেখে, তারা নানা রকম গল্প করে সময় কাটাতে লাগল। হঠাৎ অ্যানেট বলে উঠল, 'দেখ, দেখ, ও কি?'

বনের মধ্যে দুটো সবুজ চোখ জ্বলছিল। ব্রাউন সেদিকে একটা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে দিতেই ফ্যাঁশ করে শব্দ করে সেটা সরে গেল।

তিনটের বেশ কিছুক্ষণ পরে ব্রাউন শোরভকে ডেকে দিল। সে এসেই বলল, 'সব ঠিক আছে তো?'

—'এক জোড়া চোখ দেখে চ্যালাকাঠ ছুঁড়েছিলাম। সেটা পালিয়ে গেল।'

—'আর ক্যাম্পের ভিতরে? যা ঘুম আমার, কিছুই টের পাই না।'

শোরভ বলল, এরা উঠে পড়ল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অ্যানেট ঘরের ভিতরে গেল। ব্রাউন-ও ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকট চিৎকার শুনে যখন তার ঘুম ভেঙে গেল, তখন ভোর হয়ে গেছে। অমনি সে মেয়েদের ছাউনির দিকে ছুটল। ফ্যাকাশে মুখে শোরভ-ও সেদিকে তাকিয়ে ছিল, ভয়ে তার চোয়াল ঝুলে পড়েছিল! এই সময় অ্যানেট ঘর থেকে বেরিয়ে, 'না, না, স্বপ্ন নয়, সত্যি ওঘরে ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে গেছে!'

ওকে ঠেলে ব্রাউন ঘরে ঢুকেই বলে উঠল, 'হায় ভগবান।'

কিটি শোরভ মরে পড়েছিল। মাথার খুলি তার চৌচির!

জেনও জেগে গিয়ে স্তম্ভিত। কে একাজ করল?'

জেন বলল, 'প্রিন্স কোথায়?'

—'তিনি পাহারা দিচ্ছিলেন। আমি আসবার সময় দেখলাম ধুনির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।'

শেষ পর্যন্ত টিব্স্ গিয়ে দুঃসংবাদটা দিল। শোরভ দাঁড়িয়েই রইল। জেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কে এমন করতে পারে?'

—'কাল রাতে ব্রাউন আর টিব্স্ মৎলব আঁটছিল। আমি শুনেছি।'

টিব্স্ লজ্জা পেয়ে বলল, 'আমরা নিজেদের মধ্যে একটু মস্করা করছিলাম, মিলেডি। যেমন করে থাকি।'

শোরভ বলল, 'কি দিয়ে মারা হয়েছে?'

জেন বলল, 'কুড়ুলটা দিয়েই নিশ্চয়।'

—'ওটাকে পেলেই, খুনীকেও পাবে।' বলল শোরভ।

জেন বলল, 'কোথাও ফেলে দিলেই হল।'

শোরভ বলল, 'আমি তিনটে থেকে এখানে দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে কেউ ফেলেনি।'

অ্যানেট বলল, 'আপনি পাহারায় যাবার আগেই হয়েছে। মিঃ ব্রাউন যখন পাহারায় এল, তখনো তিনি ঘুমের মধ্যে গোঙালেন, নাক ডাকলেন। হায় হায়! এখন মনে হচ্ছে সেই মুহূর্তেই প্রাণটা গেছিল!'

ব্রাউন বলল, 'ওঁর মৃত্যুতে যার সবচেয়ে লাভ তাকেই সন্দেহ করা উচিত।'

শোরভ বলল, 'যার বিছানায় কুড়ুল পাওয়া যাবে, সেই খুনী।'

বলা বাহুল্য ব্রাউনের বিছানার তলায় কুড়ুল ছিল।

জেন বলল, 'ব্রাউন অপরাধী এ আমার বিশ্বাস হয় না।'

শোরভ বলল, 'কিন্তু আমি অপরাধী বিশ্বাস হয় ?'

—'তা হয়।'

—'এখন তো অপরাধী কে, তা প্রমাণ হল। ওকে মেরে ফেলা উচিত।'

ব্রাউন বলল, 'কাকে ?'

—'তোমার বিছানায় কুড়ুল পাওয়া গেছে। তার মানে তুমিই খুনী।'

—'ও, আমার বিছানায় ওটা লুকিয়েছিলে বুঝি ? অত সহজে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো যায় না।'

*

ওয়াজিরিরা পশ্চিম দিকে চলেছিল, হঠাৎ কিচির-মিচির করতে করতে, ভয়ে আধমরা নিকিমা গিয়ে হাজির হল। শেষ পর্যন্ত ওরা বুঝল টারজান বিপদে পড়েছে তাই নিকিমা ডাকতে এসেছে। তখন মুবিরো দলবল নিয়ে নিকিমার নেতৃত্বে বুকেনা গ্রামের ধারে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে মেয়েরা কাজ করছিল। ওদের দেখেই ভয়ের চোটে তারা গ্রামে ছুটল। গ্রামের যোদ্ধারাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এল।

মুবিরো তার দলবলকে বাইরে দাঁড় করিয়ে উডালোর কাছে গিয়ে টারজানের খোঁজ করতে লাগল। গুপিঙ্গুর মনে বড় ক্ষোভ। টারজান তাকে অত আশ্বাস দেবার পরেও তার মেয়ে নাইকাকে কাবুরুরা ধরে নিয়ে গেছে। টারজানও নিশ্চয় কাবুরু এবং কাবুরুদের চর।

উডালোর মনের আসল ইচ্ছা মুবিরো আর তার লোকদের মেরে ফেলে, কিন্তু তাহলে কাবুরুরা এমনি প্রতিশোধ নেবে, সে আর ভাবা যায় না। তাই ভয়টাই বেশি। সে মুবিরোকে বলল, 'টারজান এখানে নেই। তোমরাও শান্তিতে এসেছ কি না, তাও জানি না।'

মুবিরো বলল, 'সত্যি কথা বলছ না। সে এখানে না থাকলে, নিকিমা আমাদের এখানে আনত না।'

—'টারজান আসেনি, তা তো বলিনি। বলেছি এখন নেই, কোথায় গেছে তা-ও জানি না। তোমাদের দশটা লোককে আমরা ভয় করি না। ওরা ভিতরে আসুক, কথা বলা যাবে। না এলে বুঝব, তোমরা শান্তিতে আসনি। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভিতরে আসতে পার। অর্থাৎ সঙ্গে যদি আর কেউ না থাকে।'

—'আর কেউ নেই।'

তখন মুবিরো তার যোদ্ধাদের ডেকে আনল, সব পুরুষরা আলোচনায় বসল। মেয়েরা ভোজের আয়োজন করতে লাগল। মদের হাঁড়িতে গুপিঙ্গু ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। ওয়াজিরিরা কিছু সন্দেহ না করে, সেটা পান করল।

তখনো খাবার দেওয়া হয়নি। উডালোও ওদের সঙ্গে পানপাত্র নিয়ে বসেছিল। যখন খাবার এল মুবিরো আর ওয়াজিরিরা কেমন ঢুলতে লাগল, কেউ কিছু খেল না। মুবিরো টের পেয়ে লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল, 'মারো! মারো! আমাদের বিষ খাইয়েছে!'

তার পরেই পড়ে গেল।

উডালো, গুপিঙ্গু আর একজন মেয়ে ছাড়া আসল ব্যাপার কেউ জানল না। অন্য বুকেনারাও অবাক। গাছে বসে নিকিমা কিছুই বুঝতে না পেরে ভেবেই অস্থির হোল।

অনেক ঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরলে ওয়াজিরিরা দেখল তাদের হাত-পা বাঁধা। মুবিরো বলল, 'ঐ মদটা খাওয়া ঠিক হয়নি।'

একজন ওয়াজিরি বলল, 'উডালোও তো খেয়েছিল।'

—'না, খায়নি। খাবার ভান করেছিল।'

—'আমাদের কি হবে ?'

—'এরা নরখাদক না হলেও বীর শত্রুদের হৃৎপিণ্ড খায়। ভাবে তাহলে ওরা-ও বীর হবে।'

—'বড় বোয়ানা জানতে পারলে, আমাদের বাঁচাত।'

মুবিরো বলল, 'সে বোধ হয় বেঁচে নেই। সে না থাকলে আমারো থাকার ইচ্ছা নেই।'

ওয়াজিরিদের মন যতই খারাপ হোক, নিকিমার মন আরো ঢের বেশি খারাপ।

*

এদিকে রাতের অন্ধকারে নাইকাকে নিয়ে টারজান বুকেনা গ্রামের দিকে ফিরছিল। প্রথমটা ভয় পেলেও ক্রমে নাইকার ভয় ভেঙে গেছিল। 'তুমি কোত্থেকে এসেছ ?'

—'ওয়াজিরিদের দেশ থেকে।'

—'তুমি তো কালো নও, সাদা মানুষ।'

—'হ্যাঁ, কিন্তু বহু কাল আগে ওরা আমাকে পুষ্যি নিয়েছিল।'

—'তুমি প্রেত নও ?'

—'না, আমি বনমানুষের ছেলে টারজান।'

—'কাবুরুও নও ?'

—'বললাম তো আমি ওয়াজিরিদের দেশ থেকে এসেছি।'

রাতে এক জায়গায় গাছের ওপর বিশ্রাম করল। ভোরে আবার চলা। 'তোমাদের গাঁয়ের লোকদের বল যে আমি টারজান, কাবুরু নই। ওয়াজিরিদের সঙ্গে ওরা যেন সর্বদা বন্ধুত্ব করে।'

সকালে যতই বাড়ির কাছে আসে, নাইকার ফুর্তি ততই বাড়ে। শেষ পর্যন্ত যখন বুকেনাদের ক্ষেতগুলোর কিনারায় পৌঁছল, টারজান বলল, 'যাও, এবার নিরাপদে বাড়ি যাও। সবাইকে বল আমি কাবুরু নই।'

এই বলে টারজান বনের দিকে ফিরতেই, খুদে নিকিমা ওকে দেখতে পেয়ে আনন্দে কিচিরমিচির করতে করতে গলা ধরে ঝুলে পড়ল। টারজানকে পেয়ে নিকিমা এমনি খুশি হোল যে ওয়াজিরিদের কথা বলতেই ভুলে গেল।

বুকেনা গ্রামে নাইকা সব কথা খুলে বলল। টারজান ওকে কাবুরুর হাত থেকে বাঁচিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেছে। বলে গেছে ওয়াজিরিদের সঙ্গে সর্বদা বন্ধুত্ব করতে। উডালো মহা ফ্যাসাদে পড়ল। গাঁয়ে গাঁয়ে চর পাঠিয়ে লোকজন ডেকেছে। তাই সে বলল, টারজান কাবুরু না হলেও প্রেত তো বটে। কাবুরুও নিশ্চয়। না হোলে ওভাবে নাইকাকে বাঁচাতে পারত না। বন্দীদের ছাড়বার দরকার নেই।

ওয়াজিরিদের কথা নিকিমার মনে পড়ল অনেক পরে, কথায় কথায় যখন টারজান বলল, 'এতদিনে মুবিরোদের বুকেনা পৌঁছনো উচিত।' অমনি সব মনে পড়ে যাওয়াতে নিকিমা চুপ!

—'কি হল, নিকিমা?'

নিকিমা হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'ওয়াজিরিরা এসেছে! ওদের দড়ি বেঁধে সেই ঘরে ফেলে রেখেছে, যেখানে তোমাকে রেখেছিল। ওদের মেরে খেয়ে ফেলবে!'

থমকে দাঁড়াল টারজান। 'কি বলছ, নিকিমা।'

তখন নিকিমা যা যা দেখেছে সব বলল। অমনি ঘুরে আবার বুকেনা গ্রামে চলল টারজান। সূর্যাস্তের একটু পরেই পৌঁছেও গেল। গ্রামের বাইরে উঁচু গাছে চড়ে টারজান দেখল গাঁয়ে মেলা বাইরের লোক এসেছে। আরো আসবে নিশ্চয়। এদের যেমন নিয়মকানুন, আজই ওয়াজিরিদের মেরে ফেলবে না। হয়তো কাল মারবে।

খোলাখুলি গ্রামে ঢুকে লাভ হবে না। যদি ওদের মেরে ফেলে থাকে, তাহলে ঢুকে কোনো লাভ নেই। তা না হলে কাল সন্ধ্যার আগে কিছু হবে না। নিকিমাকে বলল, 'টারজান গ্রামে ঢুকছে। তুমি সঙ্গে গেলে এতটুকু শব্দ করবে না, বুঝলে?'

নিকিমা বলল, 'শব্দ না, কথা না।'

অন্ধকারে, ছায়ায় ছায়ায় উডালোর ঘরের আড়ালে দাঁড়াল দুজন। সেখান থেকেই বুঝতে পারল যে এরা বড় বেশি মদ খেয়েছে, এখন যা কিছু করতে পারে। একটা হোঁৎকা নিগ্রো উডালোকে বলল, 'কাবুরুদের বের করে আনো দেখি।'

উডালো বলল, 'সবাই আসুক আগে।'

—'না, এখনি বের কর।'

নাইকা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'না, ওরা কাবুরু না। ওরা টারজানের ওয়াজিরি। টারজান আমাকে বাঁচিয়েছে। সে বলেছে ওয়াজিরিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর!'

উডালো তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে, কয়েকজন যোদ্ধাকে বলল, 'নিয়ে এসো ওদের।'

এই অবধি শুনে টারজান টুপ করে বন্দীদের ঘরে ঢুকে বলল, 'আমি টারজান। কেউ শব্দ কর না। তোমাদের বাঁধন কেটে দিচ্ছি। যেই যোদ্ধারা আসবে নিঃশব্দে তাদের পেড়ে ফেলে, এই দড়ি দিয়েই বেঁধে রাখবে। দেখো যেন না চ্যাঁচায়।'

যখন তিনজন বুকেনা যোদ্ধা ঢুকল, এরা সকলে মুক্ত এবং ওদের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে! চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

*

ক্যাম্পের সে অশান্তির কথা ভাবা যায় না। শোরভ কেবলি ব্রাউনকে দোষী সাব্যস্ত করে বলতে লাগল 'ওকে এখানে ফেলে রেখে, আমরা চলে যাই।'

জেন একবার বলেছিল যে করে হোক এদিককার কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে বিচারের জন্য ব্রাউনকে উপস্থিত করা যায়। ব্রাউন বলল, 'এদেশে কোনো আমেরিকান সুবিচার পাবে না।'

সে যাই হোক, এ-ও সত্যি যে ব্রাউনকে ছাড়া বাকিরা কখনোই সভ্য জগতে পৌঁছতে পারবে না। তার বিরুদ্ধে কোনো সত্যিকার প্রমাণও নেই। অতএব প্রথম কর্তব্য কিটির সমাধির ব্যবস্থা করা। যতই ক্লেশকর হোক, সেটা সবার আগে।

হাতিয়ার বলতে ঐ মারাত্মক কুড়ুল। তাই দিয়েই

খানিক মাটি কুপিয়ে, খানিক হাতে খুঁড়ে, শৌখিন সুখ-পিয়াসী কিটি বেচারিকে সমাধিস্থ করা হল।

তারপর জেন বলল, 'এবার যত শিগ্‌গির সম্ভব ক্যাম্প তুলে, এখান থেকে চলে যাওয়া যাক। কোন দিকে যেতে হবে কিছুই জানি না। পুবে যেতে ইচ্ছা করছে, কারণ সেদিকটা আমার চেনা।'

বাকিরাও জেনের সঙ্গে একমত হল। শোরভ বলল, 'পশ্চিমে বেলজিয়ান কঙ্গো, আমি সেদিকে যেতে চাই। আমি যখন খরচ দিচ্ছি, আমার মতটাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।'

জেন বিরক্ত হয়ে বলল, অ্যালেক্সিস গোলমাল পাকিও না। আমি যখন নেতৃত্ব করছি, তোমাকেও আমার কথা মানতে হবে। আর যদি খরচের কথাই তোল, দরকার হলে আমরাও যে যার নিজের খরচ দিতে পারব।'

শোরভের কিছু বুদ্ধি ছিল, সঙ্গে সঙ্গে জেনের কথাই মেনে নিল। বলল, 'আমার মন ভেঙ্গে গেছে। কি বলতে কি বলি। আমাকে ক্ষমা কর।'

কিছু কথাবার্তার পর যাবার তোড়জোড় শুরু হল।

যাবার আগে পেট ভরে খেয়ে নেওয়া বুদ্ধির কাজ। কালকের মাংস ছিল। অ্যানেট ব্রাউনকে বলল, 'কয়েক টুকরো মাংস কেটে দাও, রোস্ট করে নিই।' সে রাঁধতে বসল।

অন্যরা যার যেটুকু নেহাৎ না নিলে চলবে না, সেটুকুই শুধু গুছোতে লাগল। জেন নিল তার তীর-ধনুক আর একটা ছোট থলিতে টাকাকড়ি আর নিতান্ত দরকারি কিছু সামগ্রী।

সবাই এ-সব নিয়ে ব্যস্ত, হঠাৎ রাঁধতে রাঁধতে অ্যানেটের চোখে পড়ল ছাইগাদার মধ্যে খানিকটা আধ পোড়া কাপড়। একটা কোটের অংশ, সবটা পোড়েনি, তিনটে বোতাম আছে, কাপড়ের নক্সাটাও বোঝা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটাকে চিনে ফেলল অ্যানেট। অমনি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

যখন ব্রাউন এসে বলল, 'আমি রাঁধছি, তুমি গোছগাছ কর গিয়ে।'

অ্যানেট উঠে পড়ে বলল, 'যাই হাঁটার পক্ষে সুবিধা হবে এমন দু-একটা জামা-জুতো নেব। ততক্ষণ এই জিনিষ-টাকে একটু পরীক্ষা করে দেখতে পার। ছাই গাদায় পেয়েছি।'

অ্যানেট চলে গেলে জিনিসটাকে ভালো করে দেখল

ব্রাউন। সকলকে যখন খেতে ডাকল, ওর মুখটাকে বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছিল।

শোরভ আজও অভ্যাস মতো খাবার নিয়ে রাগারাগি করতে লাগল। শেষটা জেন ওদের থামাল।

তখন ব্রাউন বলল, 'বেশ, চুপ করলাম। কিন্তু গ্র্যাণ্ড ডিউক কাল রাতে যে সুন্দর কোটটা পরেছিলেন, সেটা বদলেছেন দেখছি। আমি আগেরটাকে কিনতে চাই।'

শোরভ বলল, 'আমি পুরনো পোষাক বিক্রি করি না, ওটার কাজ হয়ে গেলে, তোমাকে দান করব।'

—'বাঃ, খুব ভালো। এখন একটু গায়ে দিয়ে ফিট্‌টা দেখতে পারি?'

—'এখন না। সেটা প্যাক করা হয়ে গেছে, আমার অন্য সব জিনিসের সঙ্গে।'

—সবটা কি প্যাক হয়ে গেছে? এই টুকরোটা তো বাইরে পড়ে আছে দেখছি।'

শোরভের মুখ সাদা হয়ে গেল, 'ওটা মোটেই আমার নয়।'

কিন্তু সত্যবাদী টিব্‌সকে চেপে ধরাতে সে বিনীতভাবে বলল, 'কালকে সেটা প্রিন্স পরেছিলেন, তার মতো অনেকটা দেখতে হলেও, হলপ করে কিছু বলতে পারব না।'

জেন দৃঢ় স্বরে বলল, 'এ সব প্রসঙ্গ আদালতের জন্য তোলা থাকা। এখন তাই নিয়ে কিছু বললে আমাদের অবস্থা আরো সঙ্গীন হবে। আমি আমাদের ছাউনিতে, আমাদের নামধাম সহ আমাদের বিপদের কথা লিখে রেখে যাচ্ছি। পরে যদি কোনো শিকারী কি আমাদের দেশের পর্যটক দেখতে পায়, তাহলে আমাদের খোঁজ করতে পারবে।'

যাবার আগে নানা সমস্যা। শোরভের তিনটে বড় স্যুটকেস বয়ে নিয়ে যাওয়া টিব্‌সের সাধ্য নয়। ব্রাউন খোলাখুলি বলে দিল সে কিছু নিতে পারবে না। টিব্‌স-ও তার দেখাদেখি শোরভের তিনটে স্যুটকেস নামিয়ে রেখে বলল, 'এই মুহূর্ত থেকে আপনার চাকরি ছেড়ে দিলাম।'

শোরভ জেনকে রেগে বলল, 'ওদের বাধ্য কর আমার জিনিস নিতে।'

জেন উল্টে বলল, 'বাজে কথা বল না। নিজে বইতে পার, এমন অত্যাবশ্যক জিনিস ছাড়া কিছু নেবার দরকার নেই। আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চল রওনা দিই।'

*

যেমন যেমন বলেছিল টারজান, তেমনি কাজ হল। ঐ তিনজন যোদ্ধাকে বেঁধেছেঁদে, মুখে গ্যাগ পরিয়ে, বড় গাছটার মগডালে তুলে, টারজান বনমানুষদের জয়ধ্বনি দিল। একজনের মুখের গ্যাগ খোলার আগে তাকে বলা হল যদি তারা প্রাণে বাঁচতে চায়, তাহলে টারজান যেমন বলছে সেই মতো যেন কাজ হয়। ঠ্যাং উঁচু মাথা নিচে, সে বচারা উডালোকে ডেকে বলল, 'গেট খুলে এদের যেতে দাও, নইলে আমাকে মেরে ফেলবে।'

—'ওরা আমাদের মারবে না তো?'

টারজান কথা দিল ওর ওয়াজিরিদের আর ওকে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিরাপদে যেতে দিলে, কাউকে মারা হবে না। উডালোও কথা দিলে, গেট খোলা হল।

টারজান তার সশস্ত্র ওয়াজিরিদের নিয়ে চলে যাবার সময় বলে গেল, 'তিন যোদ্ধাকে গাছ থেকে নামাও। ভবিষ্যতে গ্রামে অতিথি এলে, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। বিশেষতঃ টারজান আর ওয়াজিরিদের সঙ্গে।'

নাইকা কি খুশি! 'ঐ তো টারজান। ও-ই আমাকে বাঁচিয়েছে!'

বনে পৌঁছলেই নিকিমা এক লাফে টারজানের কাঁধে নামল। ওরা পর দিন সকাল থেকেই উত্তরের পথ ধরল। আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল ওরা, কারণ গুপিঙ্গু বড় কড়া ওষুধ খাইয়েছিল। তখনো পা টলছিল।

সেদিন একজন ওয়াজিরি টারজানের জন্য একটা চেরা বাঁশে চিঠি গুঁজে বুকেনাদের গ্রামে নিয়ে এল। অনেক দিন বড় বোয়ানা দেশ ছাড়া। চিঠিটা এসে টারজানের বাড়িতে পড়ে ছিল। উডালো লোকটার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে বলল, টারজানরা উত্তর দিকে গেছে। তাকে যেন বলা হয় ওয়াজিরি যোদ্ধা ভালো ব্যবহার পেয়েছে। যোদ্ধাটি সেখান থেকে পরদিন রওনা হয়ে গেল।

তার পর দিন দুপুরে বার্তাবহ টারজানের কাছে পৌঁছল। তারা সকলে বিশ্রাম করছিল। পায়ের শব্দ শুনেই নিকিমা টারজানকে বলল, 'নিশ্চয় কেউ নিকিমাকে খেতে আসছে।' টারজান চেরা বাঁশ থেকে চিঠি বের করে নিলে, বাঁশ হাতে খুদে বাঁদরের কি তড়পানি!

খবর পড়ে টারজানের বড় ভাবনা হল। জেনের সেই টেলিগ্রাম। ও শোরভদের ছোট প্লেনে নাইরোবি যাচ্ছে। তার মনে হতে লাগল সেই যে ঝড়ের সময়ে পাক খাচ্ছিল, ঐ ছোট্ট প্লেনেই জেন ছিল নিশ্চয়। কে জানে সেটা ভেঙেই পড়ল, নাকি কোনো অগম্য জায়গায় নামল। নাইরোবি ফিরে লাভ নেই, কারণ জেন সেখানে পৌঁছে থাকলে, নিরাপদে আছে। আর না পৌঁছলে, এদিকেই খোঁজ করতে হবে। আগে মুবিরোর মেয়ে বুইরার খোঁজে কাবুরুদের দেশে যাওয়া যাক। তারপর দেখা যাবে, দরকার হোলে নিকিমাকে দিয়ে একটু খবর দেওয়া-নেওয়া করা যায়। এ কথা মনে করে বারবার নিকিমাকে চেরা বাঁশে চিঠি গোঁজা আর খোলা দেখাতে লাগল, যতক্ষণ না সে-ও তাই করতে শিখল।

তিন দিন বিশ্রাম করার পর আবার উত্তরে চলা। নিকিমা এদিকে কয়েকটা বাঁদরের সঙ্গে ভাব করেছিল, বিশেষ করে এক তরুণী বাঁদর-কন্যার সঙ্গে। কিন্তু চেরা বাঁশে পোরা চিঠি কাউকে ছুঁতে দিত না।

টারজানরা কখন উত্তর দিকে যাত্রা করেছে, নিকিমার সে খেয়ালই ছিল না। নতুন বন্ধুদের নিয়ে সে মশগুল!

*

ওরা পাঁচজনে ক্যাম্প ছেড়ে খানিকটা স্বস্তির সঙ্গে যাত্রা করেছিল। কিন্তু মনের মধ্যে সকলেরি দুশ্চিন্তা। শোরভের চরিত্র অতি জঘন্য। প্রথমে জেনের সঙ্গে বেশি-বেশি ভাব করতে গিয়ে তাড়া খেল। বিকেলের আগে টিবস্, অ্যানেট, শোরভ একেবারে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে দেখে জেন বিশ্রামের নির্দেশ দিল। নদীর ধারে পথ, জলের অভাব নেই। জেন আর ব্রাউন দুজন দুদিকে কিছু শিকার কিম্বা খাবারের চেষ্টায় বেরিয়ে গেল। শোরভ আর টিবস্‌কে কাঁটা গাছ দিয়ে একটা বোমা তৈরি করার কথা বলে গেল জেন। শোরভ বসেই রইল, টিবস্ বেচারি একলা কাজ শুরু করল। সেই ফাঁকে শোরভ অ্যানেটের কাছে গিয়ে এক লাখ ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে সেই পোড়া জামার টুকরোটা কিনতে চাইল। অ্যানেট যখন সে কথা কানেই তুলল না, তখন তাকে নানারকম ভয় দেখাতে লাগল, 'তুমি ভাবছ ফিরে গিয়ে ব্রাউন তোমাকে বিয়ে করবে? কোনো জন্মেও করবে না, কাঁচ কলা দেখাবে। ওকে বাঁচাবার জন্যে কাপড়টা রাখছ কিসের আশায়? ওর মতো লোকের ফাঁসি যাওয়াই উচিত।'

শেষটা কিছুতেই যখন কিছু হোল না, শোরভ অ্যানেটের গলা টিপে ধরল!

অ্যানেট অমনি এক লাফে সরে গিয়ে বিকট চেঁচিয়ে উঠল, 'টিবস্, টিবস্, এসো।'

টিবস্ ছুটে এল।

অ্যানেটের কানে কানে শোরভ বলল, 'কাউকে যদি বল, তাহলে তাকে যেভাবে মেরেছি, তোমাকেও মারব।'

টিবস্ যখন জিজ্ঞাসা করল, 'কি হোল? কি হোল?' শোরভ বলল, 'কিছু না। অ্যানেট্ ভেবেছিল সাপ দেখেছে।'

অ্যানেট বলল, 'সত্যিকার সাপ দেখেছি।'

চ্যাঁচামেচি শুনে ব্রাউন-ও ছুটে এসেছিল। তাকেও শোরভ বলল, 'অ্যানেট্ বলছে সাপ দেখেছে।'

—'কোথায় সাপ? মেরে ফেলেছ তো?'

অ্যানেট্ বলল, 'কিছু হাতে ছিল না যে মারব। আবার দেখা দিলে তুমি মেরো।'

মাংস পাওয়া যায় নি, খালি ফলমূল এনেছিল ব্রাউন। কিছু পরে জেনও ফল নিয়ে এল। বোমা তৈরির জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের কাজও এগোয় নি। সেগুলো শেষ করা হোল। তারপর বিস্বাদ ফলমূলগুলোকে রোস্ট করে একটু স্বাদ এনে, খাওয়াও হোল।

আবার পালা করে রাত জাগা। সেই রাতে অ্যানেট্ ব্রাউনকে শোরভের জঘন্য আচরণের কথা বলল। পালা করে ঘুম। চারটে থেকে পাঁচটা অ্যানেট্ পাহারা দেবার ভার নিয়েছিল। এক ঘণ্টা বাদে শোরভকে ডেকে দেবার কথা। তা সে ডাকেনি। শুধু যে ডাকেনি তা নয়, ক্যাম্পে সে নেই। হুলস্থূল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল, কিন্তু অ্যানেট্কে খুঁজে পাওয়া গেল না।

*

রাতে নিকিমার খুব মন কেমন করলেও, সকালে রোদ উঠলে, আবার বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে জুটল। চেরা বাঁশের আগায় চিঠিটা কিন্তু ও কাউকে ছুঁতে দিল না। সেদিন সুবিধা বুঝে ওর খুদে বান্ধবীটি সেটা নিয়ে দে ছুট। অনেক কষ্টে যদিও বা উদ্ধার হল ছুটোছুটিতে চিঠি কোথায় পড়ে গেছে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না।

নিকিমা চিঠি খুঁজতে খুঁজতে দেখে নদীর ধারে খুদে একটা ছাউনি। লোকজন কেউ নেই। ঢুকে দেখে কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র ছড়ানো আর দেয়ালে একটা চিঠি, কাঠি দিয়ে গাঁথা। এ হল জেনের লেখা সেই চিঠি। নিকিমা সেটিকে খুলে নিয়ে, চেরা বাঁশে গুঁজে রওনা দিল। আর দেরি করা নয়। সোজা টারজানের কাছে চলল। দুঃখের বিষয় টারজানদের ক্যাম্পে গিয়ে দেখল, তারা চলে গেছে। তবে চিহ্ন দেখে দেখে তাদের পিছু নেওয়া নিকিমার পক্ষে খুব শক্ত ছিল না। পায়ে হাঁটার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি সে চলত।

*

অ্যানেটকে খুঁজে না পেয়ে ব্রাউন অমনি শোরভের দিকে এগোল, 'বল শিগগির ও কোথায়?'

প্রিন্স ঘাবড়ে গেল, 'আমি জানি না। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।'

ব্রাউন তার গলা টিপে ধরেছে দেখে জেন আর দেরি না করে বর্শা তুলে ছুটে গেল, 'ছাড় বলছি, ব্রাউন, নইলে তোমাকেই মেরে ফেলব।'

ব্রাউন তো অবাক! 'আমাকে মেরে ফেললে, তোমাদের চলবে কি করে?'

—'এমন পাগলামি কর না, ব্রাউন। তার চেয়ে অ্যানেটের পায়ের ছাপ পাওয়া যায় কি না দেখা যাক।'

পাওয়া গেল পায়ের ছাপ। শুধু অ্যানেটের; সে একাই চলে গিয়েছিল। একটা গাছতলায় গিয়ে হঠাৎ পায়ের দাগ শেষ হয়ে গেছে। গাছের ডালেও অ্যানেটের পায়ের ছাপ ছিল না, কিন্তু মানুষ জাতীয় কোনো-য়ার ঐখানে অনেকক্ষণ বসে ছিল বোঝা গেল। মনে হল দড়ির ফাঁশ দিয়ে কি অন্য উপায়ে, অ্যানেটকে ডালের ওপর তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কি যে হয়েছিল কেউ বুঝতে পারল না। নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। টিব্স্ বলল ভৌতিক ব্যাপার।

জেন বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সভ্য জগতে ফিরে এ ব্যাপারের তদন্ত করতে হবে। ভৌতিক ব্যাপারে আমি বিশ্বাস করি না।'

ব্রাউন বলল, 'ছোট্ট পাংলা মানুষটা। কতটুকুই বা সইতে পারে। হয়তো বেঁচে নেই।'

সকলের মন খারাপ, শরীর ক্লান্ত। টিব্সের শরীরও অবসন্ন; ব্রাউনের মনে ঝড় বইছিল; সবার পিছনে জেন হাঁটছিল। অ্যালেক্সিস পেছিয়ে এসে আবার জেনকে বিরক্ত করতে শুরু করতেই, ব্রাউন রেগে উঠল। অনেক কষ্টে শান্তি স্থাপন হল। সকলের শরীরের অবস্থা দেখে জেন বলল, 'আজ এখানেই ক্যাম্প করা যাক।'

টিব্স্ বলল, 'আমি আর এক পা-ও হাঁটতে পারছি না। কালও পারব না। আমাকে ফেলে আপনারা এগিয়ে যান।'

ব্রাউন বলল, 'কি যে বল! সবাই এক সঙ্গে থাকব।'

জেন বলল, 'একটু শিকারের চেষ্টায় যাই।'

ব্রাউন সঙ্গে গেল, 'একা তাকে ছাড়া হবে না।'

টিব্‌স্‌ আর অ্যালেক্সিস রইল বোমা বানাতে, কাঠ সংগ্রহ করতে। টিব্‌স্‌ বেঁকে বসল, সে একা কাজ করতে পারবে না। শেষটা প্রিন্সকে হাত লাগাতে হল।

সূর্যাস্তের কিছু আগে একটা ছোট হরিণ মেরে ওরা ফিরে এল। টিব্‌স্‌ আজ রান্না করল। কারো মুখে কথা নেই। পালা করে আবার রাত জাগা। শোরভের পালা এল যখন ওর মানসিক অবস্থা খুব মন্দ। এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে, কুড়ুলটার ওপর চোখ পড়ল। তারপর চোখ পড়ল ঘুমন্ত ব্রাউনের ওপর। সবাই ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে কুড়ুল উঠিয়ে, ঘুমন্ত ব্রাউনের কপালের ওপর সেটি তুলল!

টারজান আর ওয়াজিরিরা কেবলি উত্তরে চলেছে। সকলেরি মন খারাপ; দেশ থেকে কত দূরে এসে পড়েছে, এখনো কার্য উদ্ধার হয়নি। ঠিক পথে চলেছে কি না, তাই বা কে জানে। কিছু গুজব ছাড়া পাথেয় তো কিছু নেই। মুবিরোদের দেশ কাবুরু গ্রাম থেকে এতটা দূরে যে এখন মনে হচ্ছিল তবে কি কাবুরুরা বুইরাকে চুরি করেনি? টারজানের সঙ্গে ইদেনির দেখা হয়েছিল এবং সে নাইকাকে উদ্ধার করেছিল, তাও সত্যি।

শুধু ওদেরি মন খারাপ ছিল না। খুদে নিকিমাও শীতে, ভয়ে, ভাবনায় কাঁপতে কাঁপতে ওদের পিছন পিছন চলেছিল।

কিন্তু যতই সূর্য ওপরে ওঠে, রোদের তেজ বাড়ে, নিকিমার ফুর্তিও ততই ফিরে আসে। তারপর যেই দেখল একসারি কালো মানুষের আগে আগে তার ভালোবাসার মানুষটাও চলেছে, তখন আর তাকে পায় কে। গাছ থেকে এক লাফে টারজানের কাঁধে নেমে পড়ল। তখনো তার হাতে লাঠির ফ্যাকড়ায় চিঠি গোঁজা। কিন্তু এটা তো সেই চিঠিটা নয়। এটাকে উদ্ধার করার জন্য টারজান হাত বাড়াতেই, একটা ছোট পাখির পিছনে নিকিমা দৌড়ল। চিঠিটা নিয়েই।

আবার যখন টারজানের কথা মনে পড়ল, তখন ভাবল চিঠিটা তাকে দেওয়া দরকার, এই মনে করে যেই ফিরতে যাবে, অমনি কানে গেল মানুষের গলা। ডালে বসে চেয়ে দেখল একটা সাদা মেয়ে আর একটা পুরুষ, সাদা হলেও কালোদের মতো পোষাক পরা: সঙ্গে দড়ি, ছোরা, বল্লম। তফাতে থাকাই ভালো!

নিকিমা না জানলেও ঐ মেয়েটি হল অ্যানেট্‌ আর পুরুষটি একজন কাবুরু। সেই রাতে ওকে সেই রকম শব্দ দিয়ে সম্মোহিত করে নিয়ে এসেছে।

নিকিমা ওদের সঙ্গে চলল। বন থেকে বেরিয়ে, ওরা একটা ছোট উপত্যকা পার হল। তার মধ্যে একটা উঁচু পাহাড়। সেটা বেশি দূরে নয়, সব দেখা যাচ্ছিল। খাড়া পাহাড়ের নিচে ছোট্ট গ্রাম। একটা ছোট্ট নদী গ্রাম থেকে বেরিয়ে উপত্যকা দিয়ে বয়ে গেছে। ঐ মানুষ দুটি ঐ গ্রামে গেল। ফটক খুলে গেল; ওরা ভিতরে ঢুকল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, চেরা বাঁশ নিয়ে নিকিমা ছুটল টারজানের সন্ধানে।

*

হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই টিব্‌স্‌ দেখে ব্রাউনের মাথার ওপর কুড়ুল তুলে ধরেছে অ্যালেক্সিস। টিবস চিৎকার করে উঠল, ঘুমের মধ্যেই ব্রাউন হঠাৎ এক পাশে সরে গেল, এক চুলের জন্য তাই বেঁচে গেল।

ধারালো ফলাটা ওর মাথা থেকে সিকি ইঞ্চি দূরে মাটিতে গেঁথে গেল। টিবসের চিৎকারে মুহূর্তের মধ্যে জেন লাফিয়ে উঠেছিল। শোরভ এক লাফে উঠে পড়ে কুড়ুল হাতেই বনের মধ্যে চলে গেল। জেন বলল, 'যেতে দাও।'

—'ওর সাজা পাওয়া দরকার।'

—'পাবে। বনের মধ্যে।'

জেনের মনে পড়ল, টারজান বলে মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে, জানোয়াররাই অনেক বেশি মহৎ।

সকলেই ঐ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে ব্যস্ত, তাই কিছু পরেই রওনা হয়ে গেল ওরা। ব্রাউন আগে আগে, তারপর টিবস, তারপর জেন এবং তাদের পিছনে, সকলের অলক্ষ্যে আরেকজন লোক!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম চলা। টিবস আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। হঠাৎ ফিরে দেখে জেন তার পিছনে নেই। কত ডাকাডাকি খোঁজাখুঁজি করল ওরা; অ্যানেটের মতোই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ব্রাউন বলল, 'শোরভকে তখনি কেন মেরে ফেললাম না? তাহলে এটা হত না।'

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছিল, দূরে সিংহ ডাকছিল। আর এই দুজন হতাশ বিভ্রান্ত মানুষ সে রাতের মতো গাছের আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হল।

পরদিন সকালে নিকিমা টারজানদের খুঁজে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ করে টারজানের কাঁধে নেমে পড়ে, চিঠিটা তাকে দিয়ে দিল। চিঠি পড়ে টারজান স্তম্ভিত। 'নিকিমা, এটা তোমাকে কে দিল?'

—'কেউ দেয় নি। একটা খালি ঘরে পেয়েছি।'

—'আমাকে সেখানে নিয়ে চল।'

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি সেই খালি ঘরে নিকিমা তাকে নিয়ে গেল। ঘরের জিনিসপত্র দেখে টারজানের মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে জেন এ-ঘরে ছিল। অমনি চিহ্ন দেখে দেখে সে জেনকে খুঁজতে বেরোল।

ওদিকে শোরভ স্থির করল পশ্চিমে বেলজিয়ান কঙ্গোর দিকে যাওয়াই ভালো। ততক্ষণে ওকে আর চেনা যায় না। এক মুখ দাড়ি-গোঁফ, চুল উস্কোখুস্কো, ছেঁড়া কাপড়-চোপড়, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, হাতে মুখে কাদা, গালে চোখের জলের দাগ। সারা দিন খাওয়া নেই, জল পর্যন্ত পায় নি।

টলতে টলতে চলেছে, এমন সময় যা ভয় করেছিল, ঠিক তাই! সামনে একটা সিংহ! শোরভ শুনেছিল দৌড়লে সিংহরা তাড়া করে, তাই আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। সিংহটাও হাঁটতে লাগল।

একটা বাঁক ঘুরেই শোরভ দৌড়তে আরম্ভ করল, সিংহটাও দৌড়তে লাগল। শোরভ ভয়ের চোটে বিকট চিৎকার দিল।

*

টারজান গাছের মধ্যে দিয়ে পুব দিকে চলেছিল। নিকিমা সঙ্গে ছিল। বনের চেনা গন্ধগুলো নাকে আসছিল। জানোয়ারের গন্ধ, জলের গন্ধ। ঐ গন্ধের সাহায্যে টারজান অচেনা ভূমিতেও আগে থেকে ক্যাম্পের জায়গা ঠিক করতে পারত। নাকে এল কড়া সিংহের গন্ধ আর তার সঙ্গে একজন মাত্র শ্বেতাঙ্গের গন্ধ। অমনি সমস্ত ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠল। শ্বেতাঙ্গটিকে মেরে ফেললে তো চলবে না। অন্ততঃ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার আগে তো নয়!

তারপরেই শোরভের চিৎকার শুনতে পেল। আসলে সিংহটার পেট ভরা ছিল, তাই শোরভকে সে তাড়া করেনি, ভবিষ্যৎ শিকারকে চোখে চোখে রাখতে চেয়েছিল মাত্র। শোরভ ভাবল ওর শেষ মুহূর্ত আসন্ন। সিংহের দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে সে বসে পড়ল।

ঠিক সেই সময় একজন বলিষ্ঠ সাদা মানুষ ঝুপ করে সিংহের সামনে গাছ থেকে নামল। ছয় ফুটের বেশি মাথায়, রোদে পুড়ে তামাটে রং, প্রায় খালি গা। মানুষ আর সিংহ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দুজনের গলাতেই চাপা গর্জন। বড় বেশি একরকম দুজনে। শোরভ শিউরে উঠল। সিংহটা দু-পা এগোল। মানুষটাও এগোল। সিংহটা ঘুরে বনের মধ্যে চলে গেল।

লোকটা ওর নাম জেনে নিয়ে, লেডি গ্রেস্টোক আর অন্যদের কথা জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, 'আমি জানি না। আমাকে বনে একা ফেলে চলে গেল।'

—'ওরা কে কে?'

—'লেডি গ্রেস্টোক, আমার ভ্যালে, আর পাইলট ব্রাউন। আমার স্ত্রীকে সে খুন করেছিল। পাছে আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে দিই, তাই ফেলে গেল।'

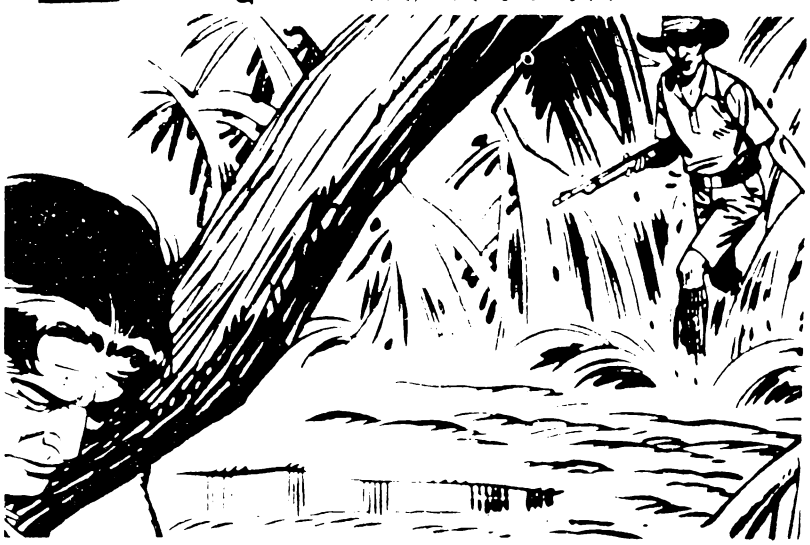

—'অ্যানেট অদৃশ্য হয়ে গেছে। টিব্‌স, ওদের সঙ্গে আছে।'

—'আমার সঙ্গে চল। ওদের ধরে ফেলি।'

আমি অত হাঁটতে পারব না। আমাকে কোনো গ্রামে পৌঁছে দিলেই হবে। না খেয়ে, শরীর দুর্বল।'

—'এখানে বস, খাবার এনে দিচ্ছি।'

*

জেন টিবসের আর ব্রাউনের পিছন পিছন চলেছিল, হঠাৎ মনে একটা অদ্ভুত ভাব এল। ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। মনে হল টিবস আর ব্রাউন অনেক দূরে চলে গেছে। কে যেন ওকে ডাকছে। অথচ কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তারপর একটা ফাঁশ নেমে এসে, ওকে টেনে গাছে তুলে নিল।

কিন্তু ও যেন কিছুই বুঝতে পারছিল না। গাছের ওপর

একটা সাদা লোক বসে ছিল। সে ওকে কাঁধে ফেলে গাছে গাছে এগিয়ে চলল। ঘণ্টাখানেক পরে মোহ ভাঙলেও নিজের দুরবস্থার কথা ভেবে জেন চিন্তায় আকুল। কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না। ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে?'

সে বান্টু ভাষায় উত্তর দিল, 'কি বলছ বুঝতে পারছি না।' অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ হলেও, এদেশী।

জেন বান্টু ভাষা জানত। সে এবার বলল, 'আমি তোমাদের শত্রু নই। আমার ক্ষতি করলে আমার লোকরা তোমাদের মেরে ফেলবে।'

—'কেউ আমাদের কাবুরু গাঁয়ে আসে না।'

—'কোথায় সে গ্রাম?'

—'দেখতেই পাবে। তোমাকে ভগবান কাবান্দাবান্দার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

—'তিনি কি চান? আমার লোকরা আমার মুক্তির জন্য অনেক টাকা দেবে।'

—'তুমি বড় বেশি কথা বল। চুপ কর।'

আরো পরে জেন বলল, 'আমার বাঁধন কেটে আমাকে কাঁধ থেকে নামাও। আমিও গাছের ওপর নিয়ে যেতে পারি।'

শেষ পর্যন্ত তাই দিল কাবারুটি। তার নাম অগ্‌ডি। কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো কথা বের করা গেল না। সে রাতে আবার দড়ি দিয়ে ওকে বেঁধে তবে শুল অগ্‌ডি। পরদিন দুপুরে বনের শেষে পৌছল। তার পর সরু উপত্যকার ওধারে বিশাল পাহাড়। তার পাদদেশে একটা বেড়া দেওয়া গ্রাম। একটা ছোট নদী সেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। অগডি বেড়ার কাছে পৌছে ডাক দিতেই ফটক খুলে গেল। ভিতরে সরু একটা পথ, তার দু-পাশে পাথর আর মাটি দিয়ে তৈরি প্রাচীন রেড ইণ্ডিয়ানদের বাড়ির মতো দু সারি ঘর। কয়েকজন যোদ্ধা ওদের কাছে এসে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল ঐ ইদেনির আর অগডির-ই কপাল ভালো। ওদের গলায় এবার চার-পাঁচ ছড়া দাঁতের মালা ঝুলবে।

জেন এসবের মানেই বুঝল না। একটা জিনিস দেখে সে অবাক হচ্ছিল। তা হল এখানে কোনো মেয়েমানুষ বা ছেলেপুলে দেখা যাচ্ছিল না। এ-সময়ে তারা কি অন্য কোথাও থাকে? কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল।

অগডি ওকে একটা সরু গলি দিয়ে একটা গোল বাড়ির সামনে নিয়ে গেল। তাতে একটাও দরজা জানালা ছিল না। একটা কাঠের মই দিয়ে তাকে ওপরে ওঠাল। সেখানে একটা চারকোণা গর্তের মুখ থেকে আরেকটা মইয়ের মাথা বেরিয়ে ছিল। সেটা দেখিয়ে অগডি বলল, 'নিচে নেমে যাও। পালাবার চেষ্টা করলেই মরবে।'

নিচেটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। এখান দিয়ে নামলে আর কেউ ফিরে আসে কিনা কে জানে?

*

টারজান আর নিকিমা চলে যাবার পর, মুবিরো তার ওয়াজিরিদের নিয়ে বনের শেষে পৌছল। সেখান থেকে ওরাও সেই সরু উপত্যকা, সেই পাহাড় আর বেড়ায় ঘেরা গ্রাম দেখতে পেল। মুবিরো বলল, 'ঐ দেখ কাবুরু গ্রাম। বুইরাকে না পেলেও, ওদের সাজা দিতে হবে।'

বড় যোদ্ধা ঐ ওয়াজিরিরা, যুদ্ধ করাই ওদের পেশা। কোনো কাজ শুরু করলে ছেড়ে দেয় না। মুবিরো বলল, 'তাহলে এসো।'

এই সময় মাথার ওপর ছোট প্লেনের শব্দ শোনা গেল। বোধ হয় পাইলট নামবার জায়গা খুঁজছে। তেল প্রায় শেষ, পথের নিশানা হারিয়ে তারা দু-ঘণ্টা ধরে ঘুরছে। ওয়াজিরিদের আর নিচেকার গ্রামের লোকদের দেখে তারা বেশ খুশিই হল। গ্রামবাসীরা শ্বেতাঙ্গ, তাই প্লেনটা উপত্যকায় নামাল। আরোহী দুজন বেরিয়ে এল।

ওদিকে মুবিরোও তার যোদ্ধাদের নিয়ে নিচে পৌছে দেখে গ্রামবাসীরা বল্লম উঁচিয়ে আগন্তুকদের দিকে ছুটে আসছে। আশ্চর্য হয়ে তারাও রিভলবার বের করে গুলি ছুঁড়ল।

বৈমানিকরা ওয়াজিরিদের যাতে শত্রু মনে না করে, তাই মুবিরো ইংরিজিতে ওদের আশ্বাস দিল। কিন্তু এরা মাত্র ক-জন; ঐ অগুন্তি হিংস্র কাবুরুদের সঙ্গে পারবে কেন। কয়েকজন গুলি খেয়ে পড়ে গেলেও, তার জায়গায় অনেক জন এগিয়ে এল। বল্লম উড়তে লাগল। দুই বৈমানিক আর তিনজন ওয়াজিরি বল্লমের আঘাতে প্রাণ দিল। এখন প্রায় হাতাহাতি লড়াই। আরো ওয়াজিরি মরল। একশোর বেশি কাবুরু এক দিকে আর যে চারজন ওয়াজিরি বাকি ছিল তারা অন্য দিকে।

একটা থামের মতো পাথর উপত্যকা থেকে উঠেছিল। অনেক কষ্টে মুবিরো আর বালান্দো তার মাথায় বেয়ে উঠল। বল্লম সেখানে পৌছয় না। ওদের দুজনের হাতে

মৃত বৈমানিকদের রিভলবার আর অ্যামিউনিশন।

সন্ধ্যা নামলেই কাবুরুরা গ্রামে গিয়ে ঢুকল। তখন মুবিরো আর বালান্দো ছাড়া একজনও ওয়াজিরি বাকি ছিল না। অন্ধকারে কাবুরুরা বেরোবে না জেনে তারা উপত্যকা ছেড়ে বনে আশ্রয় নিল। দুঃখে, ক্লান্তিতে শরীরমন অবসন্ন। বালান্দো বলল, 'বড় বোয়ানা যদি আসতেন!'

মুবিরো বলল, 'তাহলে এ সর্বনাশটা হত না।'

*

পরদিন ভোরে বিষণ্ণ মনে ব্রাউন আর টিব্‌স, তাদের গেছো শয্যা থেকে নেমে এল। নানা বিষয়ে গল্প করতে করতে টিব্‌স বলল, 'প্রিন্সেস এ জায়গায় কেন এসেছিলেন জান তো? এখানে নাকি একটা জাত আছে, তারা অনন্ত যৌবনের রহস্য জানে! সেই গোপন ফরমূলাটা জানতে পারলে, সভ্য জগতে কোটি কোটি টাকা কামানো যায়। সে সব দূরের কথা, এখন এই বন থেকে বেরোতে পারলে বাঁচা যায়। যারাই অনন্ত যৌবনের ওষুধ খুঁজেছে তারাই বিপদে পড়েছে।'

ব্রাউন বলল, 'যারা খোঁজেনি, তারাও পড়েছে। এই যেমন আমরা।'

টারজান তো পুবে চলেছে, কিন্তু শোরভকে নিয়েই হয়েছে মুশকিল। জেনকে খুঁজতে গিয়ে এক মুহূর্ত দেরিও অসহ্য, কিন্তু এটাকে তো ফেলে দেওয়া যায় না। একটা গ্রামটাম পেলে সুবিধা হয়। শেষটা শোরভকে কাঁধে তুলে গাছ-পথ নেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। শোরভ অনেক ক্যাঁওম্যাও করলেও টারজান কান দিল না। হঠাৎ একটা বড় ডালে থেমে দাঁড়িয়ে, টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'সে দুটো লোক কেমন দেখতে? ব্রাউনকে চিনে রাখতে চাই।'

টিব্‌স্ হল ইংরেজ। ছোট-খাটো শরীর, পাৎলা চুল, মুখটা শুকনো, কক্‌নি টান দিয়ে কথা বলে। ব্রাউন লম্বা চওড়া, দেখতে ভালো, আমেরিকান।'

টারজান শোরভকে জানোয়ার-চলা পথে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'এই পথ ধরে এগোও। আমি তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। তোমাকে নিতে ফিরে আসব।'

নাকে দুজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের গন্ধ আসছিল। তাদের সঙ্গে কোনো মেয়ে নেই। তাহলে জেনের কি হল? টারজানের কাছে মানুষের প্রাণের দাম খুব বেশি ছিল না। কেউ জেনের ক্ষতি করে থাকলে, তার নিস্তার নেই।

তারপর তাদের দেখতে পেল। নিঃশব্দে মাথার ওপর তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল টারজান। টিব্‌স বলছিল, 'এ যে খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো। তাঁকে কি আর পাওয়া যাবে?'

—'না, তবু খুঁজতে হবে। আমার মনে হয় না। শোরভ তাঁকেও মেরে ফেলেছে। অত সাহস নেই তার।'

—'নিজের স্ত্রীকে তো মেরেছে।'

—'ঘুমন্ত অবস্থায়। অন্ধকারে।'

—'অ্যানেট কোথায় গেল?'

—'কি জানি! শোরভের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে ওর হাতে।'

—'কিন্তু তাকে তো তুলে নিয়ে নেই করে দিতে পারে না। সে তো চ্যাঁচাবে।'

ব্রাউন বলল, 'ভয়ে চ্যাঁচায়নি।'

—'লেডি গ্রেস্টোকও অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তিনি তো ভীতু নন।'

ব্রাউন বলল, 'বাস্তবিক, মানুষের মতো মানুষ উনি।'

—'আশা করি তাকে খুঁজে পাব।'

ব্যথিত স্বরে ব্রাউন বলল, 'আর অ্যানেট্‌কেও। তার খবর পাবার জন্য আমি কি না দিতে পারি।'

এই সময় টারজান গাছ থেকে নেমে বলল, 'আমি হয় তো জানি তাদের খবর।'

প্রথম এরা দুজন ঘাবড়ে গেছিল, 'তুমি কি বন্ধু, না শত্রু?'

—'বন্ধু। আমি টারজান। আমি তোমাদের সব কথা জানি। ওরা দুজন কোথায়, তা-ও জানি। ওরা কাবুরুদের হাতে বন্দী। এটা কাবুরুদের দেশ।'

ব্রাউন বলল, 'কাবুরু কারা?'

—'তারা এদিককার এক শ্বেতাঙ্গ জাত, হিংস্র এবং বর্বর। তারা মেয়ে চুরি করে নিয়ে যায়। শোনা যায় তারা অনন্ত যৌবনের রহস্য জানে। গ্রামে কোনো পুরুষকে ঢুকতে দেয় না। মেয়েদের দিয়ে কোনো ক্রিয়া করে। তারাও আর ফেরে না। আমি সেই গ্রামের খোঁজে যাচ্ছিলাম। তোমাদের প্লেন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ফিরে এসেছি।'

ব্রাউন বলল, 'আমরাও তাদের খুঁজছি।'

এই সময়ে শোরভ এসে পৌঁছনতে ব্রাউন তার দিকে তেড়ে গেল। টারজান তাকে ধরে ফেলল। রেগেমেগে ব্রাউন তাকে এক ঘুঁষি মারল। টারজান ব্রাউনকে তুলে

কাঁটাঝোপে ফেলে দিল। নিকিমাও তার গায়ে একটা পচা ফল ছুঁড়ে মারল।

ততক্ষণে শোরভ পালিয়েছিল। টারজান ব্রাউনকে আবার ঝোপ থেকে তুলে আনল। 'দেখ তোমাদের ঝগড়ার কোনো গুরুত্ব নেই, কিন্তু লেডি গ্রেস্টোককে খুঁজে পাবার গুরুত্ব আছে।'

ব্রাউন বলল, 'আর অ্যানেট্‌কেও।'

টারজান অনেকবার শোরভকে ডেকেও কোনো সাড়া না পেয়ে বলল, 'চল, কাবুরুদের সন্ধানে যাওয়া যাক।'

*

জেন সেই অন্ধকার মই বেয়ে নিচে নামতেই একটা চেনা গলা ইংরিজিতে বলল, 'ও ম্যাডাম! আপনাকেও ধরেছে তা হলে।' সে হল অ্যানেট।

একই ভাবে দুজনকে সম্মোহিত করে দুজন কাবুরু ধরে এনেছে! গোল ঘরটার মেঝেতে শুকনো ঘাস-পাতা ছড়ানো। আর কিছু নেই। যারা ধরে এনেছে তাদের বিষয় ওরা কিছুই জানে না। অ্যানেটকে এনেছে ইদেনি আর জেনকে অগড্রি। নাকি কাবান্দাবান্দার জন্য। তিনি ভগবান। জেন বলল, 'আজ রাতে পালাতে হবে।'

এই সময় ওপর থেকে ডাক এল, 'দুজনেই ওপরে এসো।'

কোথায় গেল পালাবার মৎলব! গুটিগুটি ওপরে গিয়ে জেন অগড্রিকে চিনতে পেরে বলল, 'আমাদের ছেড়ে দেবে নাকি?'

—'চুপ! বড্ড কথা বল। কাবান্দাবান্দা ডেকেছেন।'

তারপর ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'এতক্ষণে তোমাকে ভালো করে দেখলাম।'

জেন এক গাল হেসে বলল, 'দাঁত দেখ। কি চমৎকার মালা হবে তোমার।'

অগ্‌ড্রি বলল, 'দাঁত চাই না, মেয়ে। তুমি জাদু করতে জান।'

জেন বলল, 'আজ রাতটা আমাদের লুকিয়ে রাখো। বল গিয়ে আমাদের খুঁজে পাচ্ছ না।'

অগ্‌ড্রি বলল, 'না, না, আমি একজন পুরোহিত। আমার কাজ তোমাদের কাবান্দাবান্দা-র কাছে পৌঁছে দেওয়া।'

—'কেন ভয় পাচ্ছ নাকি? আমি তো খালি একটা মেয়ে।'

—'এখানে মেয়ে নেই দেখনি? যাদের ধরে আনা হয়, তারাও বেশি দিন টেকে না। আমাকে জাদু কর না। চল।'

ঐখান থেকে নেমে ওরা গ্রামের পিছনে, খাড়া পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটলের কাছে এল। তার মুখটাতে একটা ফটক। ফটক দিয়ে ঢুকে দেখল একটা অধিত্যকা, তার চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। অধিত্যকায় চাষ হচ্ছিল। যারা কাজ করছিল তাদের কাউকে প্রকৃতিস্থ মনে হল না। হয় পাগল, নয় জড়বুদ্ধি। তারা কাজ ফেলে উঠে এসে ওদের নানা অদ্ভুত কথা বলতে লাগল। একজন বুকেনা ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি গাছ! আমাকে উল্টো করে লাগিয়েছে। সোজা করে দিলেই, চাঁদ অবধি বেড়ে যাব।'

রক্ষী এসে চড় মেরে কাজে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

অগ্‌ড্রি বলল, 'সব কটার মাথায় ভূতের বাসা। কাবান্দাবান্দা সবাইকে কাজে লাগান।'

কাবান্দাবান্দার প্রাসাদের বাইরে প্রহরী দাঁড়িয়ে। বাগানটা অযত্নে অবহেলায় পড়ে আছে। ঘরগুলো কাঁচা ইঁটের আর বাঁশের তৈরি। চারদিকে বাঁশঝাড়, অন্য গাছ, সব মিলে বেশ একটা মনোরম পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

সেখানে দুটো চিতাবাঘ ছাড়া ছিল। ওদের দেখে তারা সরে গেল। অ্যানেটের কি ভয়! 'কিছু বলবে না তো?'

অগড্রি বলল, 'দিনে কিছু বলে না। রাতে কেউ উঠোন পার হবার চেষ্টা করলে, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।'

প্রবেশ-পথ থেকেও চিতাবাঘের ফ্যাঁশফোঁশ চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছিল।

অগড্রিকে জেন বলল, 'তুমি এখানে থাক?'

—'আগে থাকতাম। এখন গ্রামে থাকি।'

—'সারা জীবন এখানে আছ নাকি?'

—'অত মনে নেই। একশো কি দুশো বর্ষা কাটিয়েছি এখানে, কিম্বা আরো বেশি। চিরকাল এখানেই থাকব, যদি না কেউ আমাকে মেরে ফেলে।'

জেন বলল, 'তাহলে কাবান্দাবান্দা নিশ্চয় তোমাকে খুব ভালোবাসেন। তাঁকে বল না তুমিও এই মন্দিরে থাকতে পার কি না।'

অগ্‌ড্রি বলল, 'কেন?'

—'কারণ তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। তুমি থাকলে আমার ভয় করবে না।'

—'ফের জাদু করতে চেষ্টা করছ?'

জেনের চোখে জল এল। অগ্‌ড্রি বলল, 'ও রকম করে তাকিও না।' মনে হোল তারো ওদের জন্য কষ্ট হচ্ছে।

বনের অন্ধকারে ছায়াতে একটা জড়-বুদ্ধি লোক আপন মনে বকছিল আর একটা গাছের মগডাল থেকে এক-জোড়া কৌতূহলী চোখ ওকে দেখছিল। হঠাৎ খ্যাপা লোকটা দৌড়তে আরম্ভ করল। মাঝেমাঝে আছাড় খায়, আবার ছোটে। গাছের ডালে ডালে সেই প্রাণীটারও সঙ্গে সঙ্গে এগোয়। পথের বাঁকে তিনটে সিংহ বসেছিল। খ্যাপা তাদের দিকে দু-হাত শূন্যে নেড়ে, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটে গেল। সিংহ তিনটে থতমত খেয়ে বনে পালাল। খ্যাপা চিৎকার করতে লাগল, 'আমাকে দেখে ভয় পায়! ভয় পায়! ভয় পায়! এই সময় গাছের ওপর থেকে সেই লোকটা নেমে এসে ওকে পেড়ে হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে, আবার দাঁড় করিয়ে দিল। খ্যাপার মুখ থেকে ভয় চলে গেল, তার বদলে হাসি দেখা দিল। সে বলল, 'এত দিন পরে একজন বন্ধু পেয়েছি! আর আমাকে একা থাকতে হবে না। আমি প্রিন্স শোরভ, বুঝলে?'

অন্য লোকটা হোল ইদেনি, সে ওর কথা বোঝেনি, কিন্তু কাবান্দাবান্দা জড়বুদ্ধি মানুষ পছন্দ করেন। খ্যাপার সঙ্গে অস্ত্র নেই, না খেয়ে শরীর দুর্বল। হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে, ইদেনি তায় গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে চলল গোপন পথ দিয়ে, যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায়। মাঝে মাঝে লোকটা পড়ে যাচ্ছিল, তখন তাকে ধরে তুলতে হচ্ছিল।

কিছু পরে ফলমূল জোগাড় হোলে ইদেনি তাকে খেতে দিল। একটু বিশ্রাম করে আবার হাঁটা। এইভাবে কাবুরু গ্রামে পৌঁছল ওরা।

টারজানও ব্রাউন আর টিব্‌স্‌কে নিয়ে ঐ গ্রামেই চলে-ছিল, কিন্তু আরো ঘোরা পথে। নিকিমাও সঙ্গে ছিল। যে যার মনের দুশ্চিন্তা নিয়ে এগোচ্ছিল।

সেই সময় কাবান্দাবান্দার মন্দিরের মাঝখানের ঘরে জেনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘরটা বেশ লম্বা, ছাদটা নিচু। সারি সারি প্রাচীন গাছের গুঁড়ি থামের কাজ করছে। তাদের শীর্ষে দন্তহীন মাথার খুলি ঝুলছে। ছাদের মধ্যিখানে একটি মাত্র ফাঁক। সেখান দিয়ে রোদ এসে পড়েছে একটা মঞ্চের ওপর। মঞ্চে চিতাবাঘের ছাল পাতা। তার ওপর প্রকাণ্ড সিংহাসনে একজন লোক বসে আছে।

জেন দেখে অবাক হোল, লোকটি অপূর্ব সুন্দর, যুবা। দেবতার মতো সুন্দর, খালি ঠোঁটের কাছে নিষ্ঠুর ভাব। তা না হোলে নিখুঁৎ গড়ন। ফরসা রং, সোনালী চুল। সিংহাসনের দু-পাশে দুটি চিতাবাঘ চেন করা। মঞ্চের চার-দিকে পুরুষ্টু সব ক্রীতদাস। জনা বারো মেয়ে নিচে বাঘ-ছালের ওপর বসে আছে। তারা কেউ দেখতে ভালো নয়, কেউ নিগ্রো, কেউ আরব। অগড্রি ওদের দুজনকে সেখানে নিয়ে গেল। অ্যানেট আর অগ্‌ড্রি হাঁটু গাড়ল, জেন দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ কাবান্দাবান্দা বললেন, 'হাঁটু গাড়ো।'

জেন বলল, 'কেন?'

—'আমি কাবান্দাবান্দা।'

—'একজন ইংরেজ মেয়ে হাঁটু গাড়বে কেন?'

—'হাঁটু গাড়তে রাজি নও?'

—'না।'

অনুচর দুজন এগিয়ে আসছিল, কাবান্দাবান্দা তাদের বারণ করলেন। অগড্রিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এদের এনেছ?'

—'একে এনেছি। অন্যটিকে ইদেনি এনেছে।'

—'ভালো করেছ। রূপের আর যৌবনের বীজ আছে এর মধ্যে।' জেনকে বললেন, 'তুমি কে? কাবুরু দেশে কি করছিলে?'

—'আমি জেন ক্লেটন। উড়োজাহাজে করে নাইরোবি যাচ্ছিলাম। জাহাজ ভেঙে পড়াতে, আমরা হেঁটে সমুদ্র-তীরে যাবার চেষ্টা করছিলাম। এরা আমাদের দুজনকে ধরে এনেছে।'

কাবান্দাবান্দা বললেন, 'আরো দুজন কাল ঐ রকম ভূত-পাখি চড়ে এসেছিল। তারা পাখির পাশে মরে পড়ে আছে। আমার লোকরা কাছে যেতে ভয় পাচ্ছে। তুমি বল, ওদের অনিষ্ট হতে পারে কি?'

জেন বলল, 'হতে পারে। দূরে থাকাই ভালো। আরো উড়োজাহাজ আমাদের সন্ধানে আসবে। আমাদের ছেড়ে দিলে, ওদের বারণ করে দেব।'

—'ওরা তো জানতে পারবে না, তোমরা এখানে আছ। এখানে কেউ এলে সে আর ফিরে যায় না।'

—'এখানে তো অনেক মেয়ে আছে। আমাকে দিয়ে কি করবে?'

কাবান্দাবান্দা ওর দিকে চেয়ে বলল, 'কি জানি। ভেবেছিলাম জানি, এখন বুঝতে পারছি না।'

অগড্রিকে বললেন, 'ওদের তিন সাপের ঘরে নিয়ে যাও। মেডেক পথ দেখিয়ে দেবে। ওদের যেন কোন ক্ষতি না হয়। সাপ শুনে অ্যানেট ভয় পাচ্ছিল। জেন বুঝিয়ে দিল প্রত্যেক ঘরের দরজায় একটা করে ছবি আছে। ঐ ঘরে নিশ্চয়-তিনটে সাপের ছবি।

মেডেক ওদের দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গেল। অগড্রিও সঙ্গে গেল। ঘরে দুটি বেঞ্চ আর কয়েকটা বাঘছাল ছাড়া কোনো আসবাব ছিল না। অগড্রি বলল, 'নিজেদের মধ্যে কি কথা বলছ জানি না, কিন্তু পালাবার কোনো আশা কর না। নিচে চিতাবাঘ ছাড়া থাকে।'

জেন বলল, 'তুমি আমাদের পাহারা দেবে শুনে খুব খুশি হয়েছি। পালাব কি করে? তোমার সাহায্য না পেলে তো পারব না। তুমি ছাড়া আমার বন্ধু কোথায়?'

—'কেন কাবান্দাবান্দা ভালো নয়?'

—'তোমার মতো নয়।'

এই সময় কাবান্দাবান্দা ঘরে ঢুকতেই অন্যরা দুজন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তিনি বললেন, 'তুমি তো হাঁটু গাড়বে না। তাই তোমাকে ভালো লাগে। দেখ, তোমরা অন্যরা বাইরে যাও, এর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

ওগড্রি বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ যাচ্ছি, প্রধান পুরোহিত মশাই। তবে কাছাকাছিই থাকব। যাতে ডাকলেই শুনতে পাই।'

ওরা চলে গেলে কাবান্দাবান্দা বললেন, 'এত সুন্দর মেয়ে তুমি। বড়ই দুঃখের বিষয়—'

জেন বলল, 'কি দুঃখের বিষয়?'

—'সে পরে বুঝবে। আমার কত বয়স মনে হয়?'

জেন বলল, 'কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে!'

কাবান্দাবান্দা বললেন, 'বয়সের হিসাব রাখি না আমি। হয়তো এক হাজার বছর, কিম্বা আরো বেশি। ভগবান বিশ্বাস কর?'

—'করি বৈকি।'

—'আর করো না। এখনো ভগবান তৈরি হয়নি। তাকে সব জানতে হবে, সব পারতে হবে, তাকে ধরতে-ছুঁতে পারা যাবে—আমি প্রায় তাই হয়ে উঠেছি। খালি প্রকৃতির কয়েকটা নিয়মকে এখনো জয় করতে পারিনি। আমরা অনন্ত জীবন-যৌবন প্রায় লাভ করেছি। মেয়েদের সাহায্যে। কম বয়সী মেয়েদের রক্ত আর গ্রন্থির সঙ্গে কিছু গাছের রস আর শিকড় আর চিতার শিরদাঁড়ার রস মিলিয়ে তার ওষুধ তৈরি হয়। আমরা চিরকুমার। এখানে যার সবচেয়ে কম বয়স, সে-ও একশোর ওপরে এবার বুঝলে?'

শিউরে উঠে জেন বলল, 'বুঝেছি।'

—'এতে ভয় পাবার কিছু নেই। আমার মধ্যে তুমিও চিরকাল বেঁচে থাকবে। কিন্তু এখন ভাবছি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব। আমি তো প্রায় ভগবানই হয়ে গেছি। ভগবান তো যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।' এই বলে জেনের হাত ধরে টান দিলেন।

*

ইদেনি শোরভকে নিয়ে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছেছিল। টারজান আরো পরে অন্যদের নিয়ে বনের কিনারায় পৌঁছে তিনবার বুনো হাঁসের ডাক দিল। ঐ হোল সংকেত। কিছু পরে ক্ষীণ সুরে তার উত্তর এল। তার পরেই মুবিরো আর বালান্দো দৌড়ে এসে সমস্ত দুঃখের কথা বলল। 'তোমার তাহলে মনে হচ্ছে গ্রামে ঢোকা সম্ভব নয়? কিন্তু সেখানে হয়তো বুইরা, তোমার মেমসাহেব আর একজন ফরাসী মেয়ে আছে।'

—'টারজান যেখানে যাবে, মুবিরোও সঙ্গে যাবে।'

—'চল উপত্যকার ধারে গিয়ে দেখা যাক, কি করা যায়।'

উপত্যকার ধারে প্লেন দেখে টারজান অবাক হোল! মুবিরো তাকে হতভাগ্য বৈমানিকদের কথা বলল। তাদের মৃতদেহ সেখানেই পড়ে ছিল।

এদিকে কাবান্দাবান্দার কবলে পড়েই জেন চিৎকার করে উঠল, 'ওগ্‌ড্রি!'

সঙ্গে সঙ্গে ওগ্‌ড্রি ছুটে এল। কাবান্দাবান্দার মুখচোখ রাগে লাল। কোন কথা না বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওগ্‌ড্রি বলল, 'এখনি পালাতে হবে। নইলে

আমাদের মেরে ফেলবেন। আমি একটি গোপন পথ চিনি।'

কাবান্দাবান্দা নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, মাঝ-পথে ইদেনির সঙ্গে দেখা। 'ও কাকে এনেছ?'

—'এর মাথায় ভূত বাসা বেঁধেছে।'

—'এখন বন্ধ করে রাখ। কাল সকালে কথা হবে।'

ইদেনি শোরভকে জেনের পাশের ঘরে বন্ধ করে রাখল।

এদিকে ওগড্রি বলছিল, 'এখন আমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকব। রাতে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

—'অন্য মেয়েটিকেও নিয়ে যেতে হবে কিন্তু। সে কোথায়?'

—'তোমার পাশের ঘরে। মনে রেখো গোপন সুড়ঙ্গ ছাড়া পালাবার পথ নেই। উঠোনে নামলেই চিতায় খাবে।' এই বলে সে বেরিয়ে দরজাটাকে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।

এ পাশের ঘরে শোরভ অন্ধকারে দুই ঘরের মাঝের দরজা হাতড়াতে লাগল। জেন ভাবল নিশ্চয় অ্যানেট্। এদিকে ছিটকিনি; সেটা খুলে জেন ডাকল, 'অ্যানেট্!'

শোরভ বলল, 'সে মরে গেছে। ব্রাউন তাকে মেরে ফেলেছে। জেনকেও মেরেছে, তুমি কে?'

জেন চমকে উঠল, 'অ্যালেক্সিস!'

অন্য দিকের দরজা থেকে পায়ের শব্দ এল, অ্যানেটের গলা শোনা গেল, 'কি হয়েছে? কি হয়েছে?'

শোরভ বলল, 'ওকেও চিনি! ও অ্যানেট্! কিটিও আছে তাহলে! আমাকে ভয় দেখাতে এসেছে!'

চ্যাঁচামেচি শুনে মেডেক দরজা খুলে ঢুকে অবাক! এই সময়ে অ্যানেট্ও অন্য দরজাটা খুলে এসে পড়তেই, শোরভ চিৎকার করে উঠল, 'সবাই এসেছে! আমি যাব না! তোমাদের সঙ্গে যাব না!' এই বলে এক দৌড়ে জানলায় উঠে ঝাঁপ দিল।

মেডেক জানলার কাছে ছুটে গিয়ে বিশ্রী সুরে ডাক দিল। নিচে শোরভের গোঙানি চিতাবাঘের গর্জানিতে চাপা পড়ে গেল। এতদিনে তার আত্মার শান্তি হল!

এই সময় করিডর থেকে ধপ করে একটা কিছু পড়ার শব্দ কানে এল। দরজা খুলে ওগড্রি বলল, 'এসো, আর সময় নেই।'

—'বাইরের প্রহরী কিছু বলবে না?

—'না, বলবে না।'

ওরা দেখল মেডেকের মৃতদেহ সেখানে পড়ে আছে।

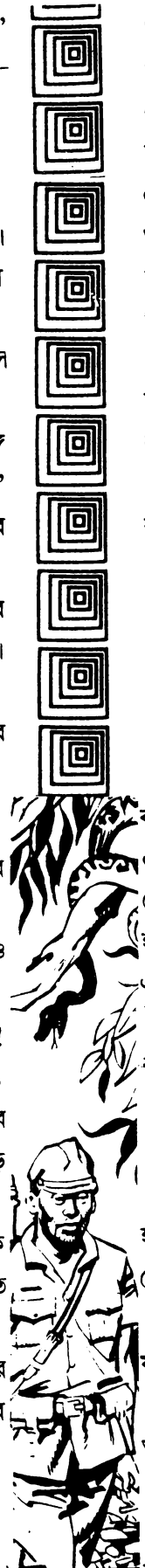

অন্ধকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকার পর, ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘর থেকে ঘরে আস্তে আস্তে এগোনো। শেষে একটা ঘরে পৌঁছে, ওগড্রি আগে ঢুকল। মেয়েরা দুজন তার পিছনে পিছনে ঢুকতেই কারা তাদের ঘিরে ফেলল। ক্ষীণ একটা মশাল জ্বালা হল। কিন্তু ওগড্রি সে ঘরে ছিল না। তারা বলল এখন আর তাকে পাওয়াও যাবে না। পিছন পিছন গেলেও সুড়ঙ্গ-পথে সে অনেক আগেই বনে পৌঁছে যাবে।

মেয়েদের দুজনকে কাবান্দাবান্দার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। অ্যানেট্কে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, কাবান্দাবান্দা জেনকে বললেন, 'তুমি ওগড্রির সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিলে?'

—'বনের ধার পর্যন্ত। তারপর যদি কোনো গোলমাল করত, আমি ওকে মেরে ফেলতাম।'

—'তুমিও কি শপথ নিয়েছ?'

—'নিয়েছি বিশ্বস্ততার শপথ।'

—সেটা কি ভাঙা যায় না?'

—'প্রাণ গেলেও না।'

—'এই দেখ আমি তোমাকে কি দিতে পারি।'

সিন্দুক খুলে, একটা বড় বাক্স বের করলেন কাবান্দাবান্দা। 'চেয়ে দেখ। বাক্স ভরা কালো বড়ি। এখানে এক হাজার জন মানুষের চিরজীবন আর চির-যৌবনের ওষুধ আছে। তুমি আমার এখানে থাকতে রাজি হলে, এ বড়ি ইচ্ছা মতো খেতে পাবে। প্রতি পূর্ণিমাতে একটা বড়ি খেতে হয়। চিরজীবন যৌবন পাবে।'

জেন মুখ ফিরিয়ে সরে যেতে চেষ্টা করল। কাবান্দাবান্দা বাধা দিলেন।

*

অনেক রাত পর্যন্ত টারজান আর ব্রাউন নানা পরামর্শ করতে লাগল। যেমন করে হ'ক কাবুরু গ্রামে ঢুকতে হবে। একটা বুদ্ধি দিল টারজান, ব্রাউন বলল, 'না হয় ঢোকা গেল। তারপর বেরোব কি করে?'

—'ঢোকার কথা হচ্ছে, বেরোনোর নয়। তুমি যদি না,'—

ব্রাউন বাধা দিয়ে বলল, 'অ্যানেট্ ওখানে আছে, আমার পক্ষে সেই ঢের। কখন রওনা হব?'

—'ঠিক ভোরের আগে। এখন বিশ্রাম করা যাক।'

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙতেই চমকে উঠল টারজান। কাবুরুর গন্ধ। একজনের। গাছতলা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল।

হাঁপাচ্ছিল, যেন দৌড়ে এসেছে। টারজান তার ঘাড়ে নামল। তারপর তার হাত দুটো বেঁধে ফেলল। টারজানের মুখ দেখে লোকটা যেন নিশ্চিন্ত হোল। 'আমাকে কাবুরু গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেও না।'

—'আমার কথার উত্তর দিলে, যাব না। তুমি কে? ঐ গ্রাম থেকে এসেছ?'

—'আমি ওগডি্। ওখান থেকেই এসেছি।'

—'কাবান্দাবান্দা কি খুব বড় যোদ্ধা?'

—'না, তাঁর অনেক ক্ষমতা। তিনি ওখানকার প্রধান পুরোহিত।'

—'মেয়েদের বন্দী করে কেন?'

—'ওদের মেরে তাদের রক্ত দিয়ে চির-যৌবনের চির-জীবনের ওষুধ বানান। তবে শেষের মেয়েটিকে বোধ হয় বিয়ে করার ইচ্ছা হয়েছে। তাই তাদের নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মেয়েদের ওরা ধরে ফেলল। আমি কোনো মতে পালিয়ে এসেছি।'

—'তাহলে ওরা বেঁচে আছে?'

—'কয়েক মিনিট আগেও তো ছিল।'

তারপর তার কাছ থেকে আরো খবর জেনে নিয়ে মুবিরোকে বলল, 'একে আমি ফেরা পর্যন্ত আটকে রাখো। ব্রাউন আর আমি যাচ্ছি। সন্ধ্যের মধ্যে না ফিরলে, তোমরা দেশে ফিরে যেও। এসো, ব্রাউন।'

প্লেনটার কাছে পৌঁছে ওরা দেখল সামান্যই তেল আছে, কিন্তু যথেষ্ট বন্দুক গোলাগুলি। যতটা সম্ভব পকেটে ভরে নিল ওরা। মৃত বৈমানিকদের প্যারাশুট দুটোও পরে নিল। তারপর দুজনে উড়োজাহাজে চড়ে বসল। ছোঁবা-মাত্র ইঞ্জিনটা গর্জে উঠল। সবে ভোর হয়েছে; সাবধানে উঁচুনিচু পাথুরে জমির ওপর দিয়ে ট্যাক্সি করে প্লেনটা উড়ে পড়ল। গ্রাম পার হয়ে, পিছনের অধিত্যকা ওদের লক্ষ্য। বনের কিনারা থেকে টিবস্, মুবিরো, বালান্দা, ওগডি্ তাকিয়ে রইল। শব্দ শুনে কাবুরু গ্রামের পুরুষরা বেরিয়ে এসে স্তম্ভিত! মরা মানুষরা ভূতপাখি উড়িয়ে আসছে!! কি সর্বনাশ!! ওরা প্রতিশোধ চায়! সঙ্গে সঙ্গে যে যার ঘরে ঢুকল। পথঘাট জনশূন্য।

ওখানে প্লেন নামানো যায় না। নির্বাচিত স্থানে পৌঁছে প্লেন ছেড়ে, প্যারাশুট পরা দুজন লোক নেমে পড়ল।

*

কাবান্দাবান্দার সঙ্গে জেন পারবে কেন। তিনি বললেন, 'তোমাকে মেরে ফেলাই উচিত। কিন্তু তা করব না।'

এই সময়ে দরজায় ধাক্কা, 'কাবান্দাবান্দা, আমাদের বাঁচাও!'

প্রধান পুরোহিত ভয়ানক রেগে গেলেন, 'কেন বিরক্ত করছ? যাও এখান থেকে!'

কিন্তু তারা গেল না, দরজা খুলে হুড়মুড় করে ভিতরে এল, 'মরা মানুষরা ভূতপাখি উড়িয়ে প্রতিশোধ নিতে এসেছে!'

অগত্যা কাবান্দাবান্দাকে বেরোতেই হল। তাঁর হুকুমে ইদেনি জেনকে ধরে নিয়ে সঙ্গে চলল। জেনও তাকিয়ে রইল। এখানে প্লেন নামা অসম্ভব।

ততক্ষণে প্লেন ছেড়ে দুটো প্যারাশুট পরা মূর্তি নামতে আরম্ভ করেছে।

প্লেনটা শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েছিল মন্দিরের সামনে। পড়েই আগুন ধরে গেল। দাউদাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। গলার স্বর অনুসরণ করে টারজান আর ব্রাউন সভাঘরের দিকে ছুটল। কাবান্দাবান্দা সিংহাসনে বসে ভয়ে কাঁপছিলেন। একজন যোদ্ধা চ্যাঁচাতে লাগল, 'তোমার পাপের জন্যেই এই সর্বনাশ ঘটেছে। ঐ সাদা মেয়েটাই নষ্টের গোড়া। ওর জন্যেই ওগডি্ চলে গেছে। তুমিও নিয়ম ভাঙতে চাইছ। ওকে মেরে ফেলা হক।'

সকলে মিলে চ্যাঁচাতে লাগল, 'মেরে ফেল!' 'মেরে ফেল!'

দুজন যোদ্ধা জেনকে ধরে মঞ্চের ওপর ফেলল। কাঁপতে কাঁপতে কাবান্দাবান্দা কোমর থেকে একটা লম্বা ছোরা বের করে, ওর চুলের মুঠি ধরে, ছোরাটা তুলল। ঠিক সেই সময়ে দরজার কাছ থেকে পিস্তলের শব্দ শোনা গেল আর একটা চিৎকার দিয়ে কাবান্দাবান্দা শুয়ে পড়ল। জেন দরজার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'টারজান!'

নির্ভয়ে দুজনে ঘরে ঢুকল। একজন যোদ্ধা বল্লম তুলেছিল। কিন্তু ছুঁড়বার আগেই পিস্তলের গুলি খেয়ে প্রাণ দিল।

টারজান এবার কথা বলল, 'আমাদের মেয়েদের নিয়ে যেতে এসেছি। শান্তিতে ওদের ছেড়ে দাও, নইলে আরো অনেকে মরবে। তোমরা জান আমরা কি ভাবে

এখানে এসেছি ; আমাদের চটিও না।'

কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল টারজান। অন্য মেয়েদের মধ্যে অ্যানেট্ দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখেই ব্রাউন তার কাছে গেল। টারজান বলল, 'মুবিরোর মেয়ে বুইরা আছে এখানে ?'

একজন ছেলেমানুষ মেয়ে ছুটে এল, 'বড় বোয়ানা এসেছেন ! আর কোনো ভয় নেই।'

টারজান বলল, 'এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে। আর কোনো মেয়ে যেতে চায় ?'

সবাই চলে যেতে চায়। তাদের নিয়ে সভাঘর থেকে বেরিয়েই বোঝা গেল উড়োজাহাজের আগুন মন্দিরে পৌঁছেছে। চারদিকে ধোঁয়া আর আগুনের শব্দ। ব্রাউন বলল, 'বেরোবার অন্য রাস্তা নেই ?'

জেন বলল, 'আছে। এসো আমার সঙ্গে।'

ওরা আবার সভাঘর পেরিয়ে কাবান্দাবান্দার ঘরের দিকে চলল। সবাই পালাতে ব্যস্ত, কেউ বাধা দিল না। ভিতরের ঘরের আলমারিতে চির যৌবনের বড়ি ছিল। তার বাক্সটি সঙ্গে নিল ওরা। এরি জন্য এত কষ্ট পেয়েছে সবাই। দুজনে প্রাণ দিয়েছে।

কিন্তু সুড়ঙ্গের মুখটা খুঁজে পাচ্ছিল না জেন। এমন সময় ইদেনির সঙ্গে দেখা। সে টারজানকে বলল, 'তুমি আমাদের প্রধান পুরোহিতকে মেরে ফেলে বলছ বেরোবার পথ বলে দিতে ? যোদ্ধারা পেলে তোমাদের আস্ত রাখবে না। কিন্তু তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, তাই আজ তোমাদের প্রাণদান করলাম। এসো।'

একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল ওদের ইদেনি। তারপর একটা দরজা খুলে, সুড়ঙ্গের মুখটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'এই সুড়ঙ্গ দিয়ে সোজা বনে চলে যাও, বনমানুষের ছেলে টারজান। আর কখনো এখানে এসো না।'

এর তিন সপ্তাহ পরে, কাবুরু দেশ থেকে অনেক দূরে টারজানের বাংলোর বসবার ঘরের চিমনির ধারে ছয়জন প্রাণী মিলিত হয়েছিল। টারজান আর জেন তো ছিলই। তা ছাড়া ব্রাউন আর অ্যানেট্। টিবস একটু পিছন দিকে বিনীতভাবে বসেছিল। আর ছিল খুদে নিকিমা, গৃহস্বামীর কাঁধের ওপর চড়ে।

ওদের আলোচ্য বিষয়ের একটি ছিল, চিরযৌবনের ওষুধের বাক্স দিয়ে কি করা হবে। ব্রাউন বলল, 'কি হবে ওগুলো দিয়ে ?'

জেন বলল, 'কেন, তুমিই তো বলেছিলে ওগুলো পেলে আমেরিকায় ফিরে বড় লোক হয়ে যাবে। নিয়ে যাও না।'

ব্রাউন বলল, 'না। প্রথমতঃ ওগুলো তুমিই এনেছ। তাছাড়া এমনিতেই বড্ড বেশি দিন বাঁচে লোকে। বেশির ভাগেরি অনেক দিন আগেই মরা উচিত ছিল। ধর কংগ্রেসের হাতে পড়ল ওষুধগুলো !'

—'তার চেয়ে ওগুলোকে পাঁচ ভাগ করা যাক। পাঁচজন চিরজীবী হবে।'

অ্যানেট বলল, 'চির সুন্দরীও হবে।'

টিবস্ গলা খাঁকরে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন তো বলি যে অনন্ত কাল ধরে আমি পেন্টেলুন ইস্তিরি করতে চাই না। আর যদি সুন্দর দেখতে হয়ে যাই তো কেউ চাকরি দেবে না।'

ব্রাউন বলল, 'যার যা ইচ্ছা নিজের ভাগ নিয়ে করবে। পাঁচ ভাগই করা যাক।'

জেন বলল, 'না, নিকিমাকে বাদ দেওয়া যায় না।'

—'বেশ তাহলে ছয় ভাগই হোক। বেশির ভাগ লোকের চেয়ে, নিকিমা ঢের বেশি কাজের ছেলে।'

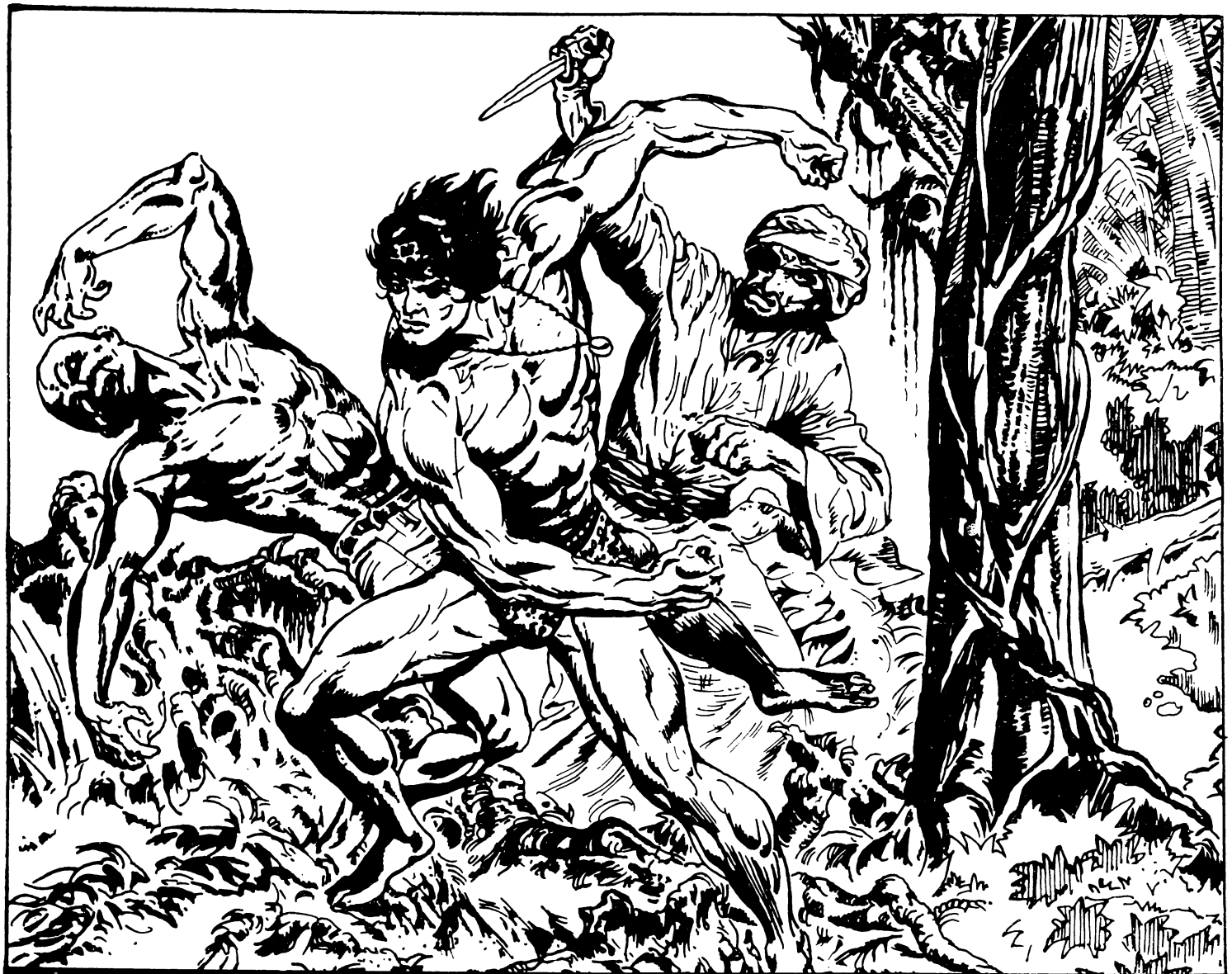

নিষিদ্ধ নগরীতে টারজান

টারজান অ্যান্ড দি ফরবিডন সিটি

সারি সারি ইঁট-কাঠের বাড়িঘর ঘেরা শহর, সে এক রকম জঙ্গল। আর এক রকম জঙ্গল আছে যেখানে বর্ষার শেষে ভিজে সবুজে তরতাজা প্রাণের ছোঁয়া লেগেছে। কত রকমের পাখি যে ওড়াউড়ি করছে তার ঠিক নেই। মৌমাছিদের একটানা গুঞ্জন, বাঁদরের হুপহাপ এইসব আওয়াজে মুখর হয়ে আছে সেই ঘন সবুজ বনানী।

জঙ্গলের প্রভু টারজান তার প্রিয় হাতি টানটরের পিঠে আলসে আরামে বসে আছে। ভরা দুপুর। এমন সময় ওর নাকে এল গোমাঙ্গানি অর্থাৎ কালো মানুষের গন্ধ। টারজান সজাগ হল। হাতিটাও ছটফট করে উঠতে টারজান কোন রকমে ওকে শান্ত করল। একটা বাঁকের মুখে কালো মানুষটিকে দেখা গেল। অন্য কেউ নয়, জঙ্গলের বাসিন্দা, নাম ওগাবি। টারজান নিশ্চিন্ত হল।

লোকটি টারজানকে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাল। বলল, গ্রেগরি নামে এক শ্বেতাঙ্গ প্রভুর শিকার-দলে যোগ দিয়েছে ও। গ্রেগরি টারজানকে লোয়াঙ্গো গ্রামে

ডেকেছেন। ওঁদের একজন লোক নিখোঁজ হয়েছে, তাই টারজানের সাহায্য প্রয়োজন।

টারজান প্রথমে রাজি হল না। যখন শুনল ক্যাপ্টেন পল ডার্নো টারজানকে ডাকছে, তখন মত বদলাল।

দারুণ গরমে লোয়াঙ্গোর হোটেলে বসে একটা দল শরীর জুড়োচ্ছিল। গেলাসে চুমুক দিয়ে হেলেন গ্রেগরি ডার্নোকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি মনে হয়, টারজান ব্রায়ানকে খুঁজে দেবে?'

হেলেনের ভাই ব্রায়ান গ্রেগরি দুবছর হল নিখোঁজ। ওদের বাবাও সঙ্গে এসেছেন। ডার্নো বলল, 'আফ্রিকাকে টারজানই সব থেকে ভাল চেনে।'

হেলেনের বিশ্বাস তার ভাই এখনও বেঁচে আছে। ওদের বাবা গ্রেগরি বললেন, 'টারজান একাজে রাজি হলে ওকে খুশি করে দেব। অনেক টাকা দেব ওকে।'

ডার্নো প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, 'অমন কাজটি করবেন না, টাকা-পয়সা ছোঁয় না টারজান। ও সব লোভ দেখালে ও জঙ্গলে পালাবে, আর এদিক মাড়াবে না।'

অন্য প্রান্তের টেবিলে লালটাস্ক নামে লম্বা রোগা মত লোকটি তার সঙ্গের মেয়েটিকে বলছিল, 'মগরা, ফ্রান্সের ওই গ্রেগরির সঙ্গে ভাব করতেই হবে, বুঝলে? আতান টমের কাজ উদ্ধার হওয়া চাই। যাও মগরা, ওর মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমাও।'

এমন সময় টারজান এসে হাজির। ওকে দেখে চমকে উঠল হেলেন, বলল, 'আরে এই তো ব্রায়ান, আমার ভাই!'

ডার্নো হেসে বলল, 'না, ও টারজান।'

ঠিক একই কথা বলল মগরা লালটাস্ককে, 'দেখ দেখ, ঐ তো ব্রায়ান!'

লালটাস্ক উল্লসিত হয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'এই তো পেয়েছি ওকে! আতান টমের কাছে এক্ষুণি নিয়ে যেতে হবে ওকে, কিন্তু কি করে—'

মগরার মাথায় একটা মতলব এসেছে। ওরা দুজনে চট করে ভিতরে পালাল।

টারজানের হাতে একটা কাগজ পাঠাল মগরা হোটেলের একটি ছেলেকে দিয়ে। টারজান তখন গ্রেগরির সঙ্গে আলাপ করছিল। কাগজটা নেড়ে চেড়ে বলল, 'এটা মনে হচ্ছে অন্য কারো। আমার নয়।'

ছেলেটি বলল, 'না বোয়ানা, এটা আপনার। আপনিই তো খালি-গা বোয়ানা। ওটা আপনাকেই দিতে বলেছে।'

একটা ঘরে টারজানকে ডেকে পাঠানো হয়েছে সেই চিঠি মারফৎ। টারজান বুঝল একটা কিছু ভুল হয়েছে। তবু দেখা করে সেটা মিটিয়ে ফেলা ভাল।

ঘরে যেতেই মুখোমুখি হল বাদামী চুল, কালো একটা মেয়ের সঙ্গে। এই মেয়েটিই মগরা। ঘরের আর একটা দরজার আড়ালে লুকিয়ে রইল লালটাস্ক। মেয়েটি বলল, 'ব্রায়ান গ্রেগরি। এই পুরনো বন্ধুকে ভুলে যাওনি তো?'

টারজান বোঝাতে চাইল, 'তুমি ভুল করছ, আমি ব্রায়ান গ্রেগরি নই।'

—'আমায় বোকা বানাতে চেও না, ব্রায়ান!' বলল মগরা।

টারজান দেখল কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ও গম্ভীর মুখে ফিরে চলল। এমন সময় চিৎকার করল মগরা, 'যাচ্ছ কোথায়, দাঁড়াও!'

টারজান দেখল দরজার আড়াল থেকে উঁকি মারছে একটা পিস্তলের নল।

—'চল আমার সঙ্গে'। মগরা বলল।

টারজান ভাবল ব্রায়ান গ্রেগরি তো পল ডার্নোর বন্ধু মিঃ গ্রেগরিরই ছেলে। দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি, কি চায় ওরা।

লালটাস্ক আর মগরা টারজানকে ওপরে নিয়ে চলল। মিঃ গ্রেগরি, ডার্নো, হেলেন সবাই দূর থেকে দেখল টারজান দোতালায় উঠছে। সঙ্গের লোকগুলির চোখের চাউনি কিন্তু মোটেই ভাল লাগল না হেলেনের।

টারজানকে দেখে আতান টম তো অবাক। বলল, 'আরে, ব্রায়ান গ্রেগরি যে!' তারপর অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে খুব খুশি হলাম ব্রায়ান। ম্যাপটা কোথায়?'

—'কিসের ম্যাপ?' টারজান কিছুই বুঝতে পারল না।

—'জানতো সবই। আশাইর দেশ, নিষিদ্ধ নগরী, সব ভুলে গেলে? তুমিই তো ম্যাপটা তৈরি করলে।'

টারজান বলল, 'আশাইর? ও নাম কখনো শুনিনি। ম্যপট্যাপও নেই। তোমরা ভুল করছ।'

আতান টমের হাতে ঝকঝকে ছুরি উঠে এল। মগরা বলল, 'ও কি করছ টম?'

আতান বলল, 'কেন, ছুরিই তো ভাল, বন্দুকে আওয়াজ হবে, বাজে ঝামেলা বাড়বে। এই নাও লালটাস্ক, শেষ

করে দাও ওকে। ম্যাপ যখন দেবে না তখন আমাদের পথের কাঁটা না রাখাই ভাল।'

★

টারজানের ফিরতে দেরি দেখে ডার্নো হেলেন আর গ্রেগরি যখন খুব চিন্তিত, টারজান তখন এক উন্মত্ত রূপ ধারণ করেছে আতান টমের ঘরে। লাল টাস্কের ছুরি সুদ্ধ হাত মুচড়ে ধরে ওকে শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলেছে মেঝেয়। তারপর হিংস্র চোখে আতান টমের দিকে তাকাতে, আতান ভয় পেয়ে বলল, 'আ-আমি তা বলে সত্যি করে তোমায় মারতে চাইনি।' এই কথা বলতে বলতে ও মগরার হাত ধরে একটু একটু পেছতে লাগল।

—'তবে কি করতে চাইছিলে?' শান্ত গলায় বলল টারজান।

—'শুধু একটু ভয় দেখাতে। ম্যাপটা দাও না!'

—'কিসের ম্যাপ আমি জানি না।' গর্জে উঠল টারজান।

—'কেন হেঁয়ালি করছ ব্রায়ান?' বলল টম।

—'আশাইরে তোমার আর আমার কি চাই সে তো ভালই জান। সেই মহান হীরে।'

—'কি বলছ এক বর্ণ বুঝছি না। কি মহান হীরে?'

যেই না বলা অমনি আতান টম প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে পিস্তল তুলে গুলি করতে গেল।

—'আতান।' চেঁচিয়ে উঠল মগরা, এক ঝটকা মারল পিস্তলে, 'খবরদার ব্রায়ানকে মারবে না!'

তথাপি গুলি ছুটল, কিন্তু টারজান বেঁচে গেল।

সেই আওয়াজে চমকে উঠল নিচে ওরা তিনজন। সবাই মিলে ছুটল ওপরে। কিন্তু কোন ঘর থেকে গুলির শব্দ হল তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডার্নো উত্তেজিত হয়ে 'টারজান, টারজান' বলে চেঁচাতে লাগল। একটা ঘর থেকে টারজানের সাড়া পাওয়া গেল। সবাই সে ঘরে গিয়ে দেখল ঘরের বাঁ দিকে, দেয়ালের একটা দরজায় প্রচণ্ড আঘাত করছে টারজান।

—'কি হয়েছে টারজান?'

—'একটা লোক গুলি করতে চেয়েছিল আমায়। একটা মেয়ে লোকটাকে টেনে নিয়ে এই ঘরে ঢুকেছে।'

টারজান এবার তার সমস্ত শরীরটা দিয়ে ঘা মারতেই মড়মড় করে দরজাটা ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু সে ঘরে কেউ নেই। পিছনের বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে ওরা নেমে গেছে।

টারজান ছুটে এল আগের ঘরে। লাল টাস্ক ওখানে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল, কিন্তু এখন নেই। তিনজনই উধাও হয়েছে দেখে টারজান হতাশ হল। বলল, 'হীরের বাগের কথা শুনেছ তোমরা?'

—'না তো।' গ্রেগরি বললেন।

—'আপনার ছেলে কোন ম্যাপ তৈরি করেছিল?'

—'হ্যাঁ, ওর শেষ চিঠির সঙ্গে একটা ম্যাপ আঁটা ছিল বটে। তবে বড্ড হিজিবিজি, কিচ্ছু বোঝা যায় না। আমার ঘরে আছে ওটা।'

মিঃ গ্রেগরি চান তাঁর ছেলেকে ফিরে পেতে। হীরে, নিষিদ্ধ নগরী কোন বিষয়েই তাঁর উৎসাহ নেই। ডার্নো টারজানকে বলল, 'টারজান, মিঃ গ্রেগরি যখন সাহায্য চাইলেন তখন তোমার কথাই মনে পড়ল। তাই তোমায় ডেকে আনলাম। তবে এখন দেখছি ব্যাপারটা গোলমেলে।'

—'গোলমেলে হোক আর যাই হোক, ঐ তিনটি দুর্বৃত্তের পিছনে আমি যাবই। মনে হচ্ছে ব্রায়ান গ্রেগরিকে খোঁজার কাজে নামলেই ওদের সঙ্গে মোলাকাত হবে।' এই বলে টারজান মিঃ গ্রেগরির দিকে তাকাল, বলল, 'বলুন আপনার ব্যবস্থা কদ্দুর।'

—'আমার দল আমি বোঙ্গোয় জড়ো করেছি। দলে একজন সাদা শিকারীকে ঠিক করেছি, ওর নাম উল্‌ফ। ওকে এখনও দেখিনি। কাল হোটেলে আসবে, কথা সেখানেই পাকা হবে।'

উয়ংফেঙের ডাক্তারখানার বাইরের ঘরে বসে আছে আতান টম আর মগরা। আতান টম দাঁতে দাঁত চেপে মগরাকে বলল, 'কেন, কেন পিস্তলটা নাড়িয়ে দিলে? ব্রায়ানের ওপর খুব দরদ, না? বিশ্বাসঘাতক! তোমায় ছেড়ে দেব ভেবেছ?'

মগরা বলল, 'রাগারাগি করে লাভ নেই। ব্রায়ানকে বাঁচিয়েছি বলে তো আর আশাইরে যাওয়া বন্ধ হচ্ছে না। গ্রেগরির দল আশাইরে যাচ্ছেই। ওদের সঙ্গে ম্যাপ আছে। একটা মতলব এসেছে মাথায়, শুনবে?'

আতান ওর দিকে ঝুঁকে এল। মগরা ফিসফিস করে কি সব বলতে ওর মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল 'ঠিক আছে, লালটাস্ক সেরে উঠলেই হয়। না হলে উল্‌ফ তো আছেই।'

ওরা পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল। সেখানে লালটাস্কের চিকিৎসা করছিল উয়ংফেঙ। মগরা বলল, 'কেমন আছে

লাল ?'

—'এখন ভালই।'

—'আচ্ছা সেদিন তুমি পালালে কি করে ?'

লালটাস্ক বলল, 'অজ্ঞানের ভান করে পড়ে রইলাম। ওরা দরজা ভেঙ্গে তোমাদের ঘরে যেতেই আলমারিতে লুকিয়ে পড়লাম। পরে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে—আচ্ছা, ব্রায়ান গ্রেগরির গায়ে কবে থেকে এত জোর হল বলত ?'

একটা বাটিতে কি সব ফুটছিল। সেটা ঘেঁটেঘুঁটে লালটাস্ককে খেতে দিল ফেঙ। লালটাস্ক মুখে ছুঁইয়ে বলল, 'এঃ, কি এটা ? বেড়ালের ঝোল নাকি ?'

ফেঙ বলল, 'খেয়ে নাও, বেড়ালের ঝোল সামান্য একটু মিশিয়েছি, সবটা নয়।'

লালটাস্ক কোঁৎ করে গিলে ফেলল ওষুধটা, দম বন্ধ কর।

●

পরদিন সকালে উলফ্ এসে হাজির হল। গ্রেগরিরা তখন প্রাতঃরাশ সারছিল। টারজানই গ্রেগরির দলের পাণ্ডা এ কথাটা উলফের মনঃপুত হল না। টারজানের খালি গা, সামান্য পোষাক আর তীরধনুক দেখে ওকে সামান্য জংলী ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারছিল না।

উলফকে শিকারী হিসাবেই রাখা হল। জানিয়ে দেওয়া হল নৌকো করে আগামীকাল বোঙ্গো যাত্রা করা হচ্ছে, তার আগে পর্যন্ত ওর কোন কাজ নেই।

উলফ্ লোকটাকে হেলেনের মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। গ্রেগরি বললেন, 'দলে শিকারীর প্রয়োজন, তাতে ভালোমন্দর বাছবিচার এখানে চলবে কি করে ?'

উলফ্ খানিক পরে ওদের কাছে এসে বলল, 'পথ ঠিক করতে হবে। গভীর জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই। দেখি, তোমাদের কোনো ম্যাপ আছে ?'

গ্রেগরি হেলেনের ঘরে ওকে নিয়ে গিয়ে আলমারি খুলে সেই ম্যাপটা দিলেন। ও দেখে শুনে বলল, 'আজ আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি, একটু বুঝে নিতে হবে।'

গ্রেগরি বললেন, 'না, তা হয় না। বোঙ্গোয় যাবার সময় নৌকোয় বসে অনেক সময় পাওয়া যাবে। তখন টারজানের সঙ্গে আলোচনা ক'র।'

উলফ আর কি করে, সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

পরদিন যাত্রা শুরু। তাই হেলেনের কিছু কেনাকাটা করা দরকার। ও লোয়াঙ্গো বাজারে যেতে চাইল। কারোর

সঙ্গে নয়, একা। খানিকটা অমান্য করেই ও বেরিয়ে গেল। ডি'আর নটকেও সঙ্গে নিল না।

একটা গয়নার দোকানে ও যখন দাঁড়িয়ে পড়েছে লালটাস্ক ওকে দেখতে পেল। হেলেন জানল না কি বিপদ ওর জন্যে ওঁৎ পেতে আছে। তারপর আপন মনে ও যখন উয়ংফেঙের দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, লাল ওকে খপ করে ধরে টেনে নিয়ে পুরে দিল দোকানের একটা অন্ধকার ঘরে। চেঁচাবার পর্যন্ত ও সুযোগ পেল না, এত জোরে ওর মুখ চাপা ছিল। লালটাস্কের জোরাল চেহারা। হেলেন দেখল জোর খাটিয়ে কোন লাভ নেই।

—'কি চাও তুমি ?' বলল হেলেন।

—'তোমায় একজন কটা কথা জিজ্ঞাসা করবে। কিছু ভয় নেই।' বলল লালটাস্ক।

ওকে ঠেলে পুরে দেওয়া হল আর একটা ঘরে। ওখানে ছিল মগরা আর নাতুসনুতুস আতান টম। হেলেন দেখেই ওদের চিনল। আতান বলল, 'তোমার ভাইয়ের একটা জিনিস আমরা চাই।'

—'আমার ভাই তো হারিয়ে গেছে, তুমি তাকে দেখলে কবে ?' বলল হেলেন।

—'বাজে কথা বল না।' চেঁচিয়ে বলল আতান টম, 'আমি তোমার ভাইকে ভালই চিনি। প্রথম অভিযানে আমি ছিলাম ওর সঙ্গে। ও আশাইরের ম্যাপ এঁকেছিল, আমাদের দেয় নি। ও একাই মহান হীরে পাবে ভেবেছিল। ও ম্যাপ এখন আমার চাই।'

হেলেন হেসে বলল, 'এর জন্য এত কাণ্ড ? বাবার কাছে সোজা চলে গেলেই তো পারতে। আমার সঙ্গে কেউ এস, আমি হোটেলে গিয়ে ম্যাপ পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আতান বলল, 'না, ও ফাঁদে আমরা পা দেব না। তুমি তোমার বাবাকে লিখে দাও ম্যাপ না পেলে তোমায় ফেরত দেওয়া হবে না।'

হেলেন হেসে বলল, 'কই কাগজ দাও, এক্ষুণি দিচ্ছি।'

সন্ধ্যে হয়ে গেছে, হেলেন এখনও ফিরল না। গ্রেগরি একটু চিন্তিত হলেন। একটা বই নিয়ে বসেছিলেন কিন্তু পড়ায় কিছুতেই মন বসছিল না।

কি আর করা, পল ডার্নো গেল বাজারের দিকে আর টারজান গেল স্থানীয় লোকদের গ্রামে খোঁজ খবর করতে। কিছুক্ষণ পরে দুজনেই ফিরে এল। 'কই, কোন দোকানেই পেলাম না' ডার্নো বলল।

টারজান বলল, 'আমিও না। ঠিক এই জঙ্গলে কোথাও হারালে এক্ষুণি খুঁজে দিতাম।'

এমন সময় জানালা গলে একটা তীর এসে পড়ল। তাতে পাথরের সঙ্গে একটুকরো চিরকুট বাঁধা আছে। টারজান ওটা তুলে আনল। গ্রেগরি পড়লেন ওতে লেখা আছে, 'বাবা যে লোকেরা আমায় ধরে রেখে দিয়েছে, ওরা ব্রায়ানের আঁকা ম্যাপটা চায়। ওটা না পেলে ওরা আমায় বিক্রি করে দেবে দূর দেশে। ম্যাপটা পাথরে বেঁধে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দাও। যে লোকটা কুড়োবে তার পিছনে লেগো না। তাহলে আমি মারা পড়ব! ম্যাপ পেলেই ওরা আমায় ফেরৎ দিয়ে দেবে।'

গ্রেগরি বললেন, 'হ্যাঁ এতো হেলেনেরই হাতের লেখা। ম্যাপটা এক্ষুণি দিয়ে দেব ওদের।

হেলেনের ঘরে গিয়ে সেই জায়গায় ম্যাপটা কিন্তু পেলেন না গ্রেগরি। ওটা হেলেনের ড্রয়ারে সেদিন রেখেছিলেন। সেখান থেকে চুরি হয়ে গেছে।

★

একটা বিশ্রী নোংরা ঘরে উলফ ম্যাপটা গভীর মনোযোগ নিয়ে দেখছিল। এদিকে উয়ংফেঙের দোকানে হেলেনকে পাহারা দিচ্ছে মগরা। আতান টম উত্তেজনায় ঘন ঘন সিগারেট টানছে। সবাই মনে মনে অস্থির, কখন আসে লালটাঙ্ক। হেলেনও ভাবছে ম্যাপটা এলে বাঁচি। বদমায়েসগুলোর হাত থেকে ছাড়া পাই।

ও মগরাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, ম্যাপ পেলে ওরা আমায় ছেড়ে দেবে ত?'

—'যতক্ষণ ওদের ধরা পড়ার ভয় আছে ততক্ষণ তোমায় আটকাবে মনে হয়।' বলল মগরা।

এক সময় লালটাঙ্ক ঢুকল। হাতে দলা পাকানো একটা কাগজ। বলল, 'দেখতো এটা কি না।'

আতান দেখেশুনে বলল, 'কোথায় ম্যাপ? এতে লেখা আছে ম্যাপ চুরি হয়ে গেছে।'

টম গজরাতে লাগল, 'মিথ্যে কথা! আমায় ঠকাতে চায়। আচ্ছা ঠিক আছে, ম্যাপ ছাড়াই আশাইরে পৌঁছব আমি। কে, কে দরজায়?'

দরজা ঠেলে উলফ ঘরে ঢুকল। বলল, 'আশাইরে যাবার ম্যাপ পেলে কত দেবে?'

—'পাঁচ হাজার।' জানাল আতান। ওকে খুব আশান্বিত মনে হল।

—'দশ হাজার হলে দিতে পারি। হীরের বখরাও চাই, আধাআধা।'

—'সত্যিই ম্যাপটা আছে?' জানতে চায় টন।

—'হ্যাঁ', বলল উলফ। 'মেয়েটার ঘর থেকে সরিয়েছি। এখন ফেল কড়ি মাখ তেল।' এই বলে দূর থেকে ম্যাপটা খুলে দেখাল।

আতান টম ওর জামার একটা চোরা পকেট থেকে করকরে সব নোট বার করে দশ হাজার টাকা তুলে দিল উলফের হাতে।

উলফ শুধু ঢোঁক গিলে বলল, 'ওঃ, এত টাকা। আমার এত টাকা থাকলে হীরের বাপের খোঁজে ছুটতামই না।'

আতান বাকি টাকা পকেটে লুকিয়ে ফেলে বলল, 'বাজে কথা রাখ। আর একটু সাহায্য দরকার। মগরাকে গ্রেগরির দলে ভিড়িয়ে দাও। ব্রায়ান গ্রেগরির সঙ্গে জমিয়ে নিক। আমাদের অনেক কাজ হাসিল হবে। আর উলফ, তুমি ওদের ভুল পথ দেখিয়ে নিয়ে যেও। ওরা পথ হারালে তখন মগরাকে নিয়ে পালিয়ে এসো আশাইরের দিকে। ম্যাপ তো তুমি জানই। ওখানে আমার সেই আগের অভিযানের তাঁবুতে অপেক্ষা কর।'

তারপর লালটাঙ্ককে বলল, 'লাল, আজকেই বেরোনো দরকার। স্টীমারের লোকটিকে ঘুস দিয়ে রাজি করাও। আজ রাতেই বোঙ্গার দিকে রওনা দেব।'

—'আর মেয়েটা?' জিজ্ঞাসা করল লালটাঙ্ক।

—'ওকে ফেরত দিচ্ছি না। আপাততঃ সঙ্গে রাখছি।'

মাঝ রাত্তিরে আতান টম হেলেন আর লালকে নিয়ে স্টীমারে চাপল। মগরাকে বিদায় জানিয়ে বলল, 'গ্রেগরির দলে ভিড়ে পড় আর উলফের ওপর নজর রেখো। ওকে তেমন বিশ্বাস করি না।'

মগরা বলল, 'মেয়েটাকে ছেড়ে দিলে হত না?'

—'না, এখন ছাড়া যায় না। তুমি আগে গ্রেগরির দল থেকে ফিরে এসো।'

হেলেনকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে গ্রেগরিরা বিমর্ষ। ওদের সারারাত ঘুম হল না। ডার্নো বলল, 'কর্তৃপক্ষকে জানানো ছাড়া কিছুই করার নেই।' এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

—'ভিতরে এসো।' বললেন গ্রেগরি।

ঘরে ঢুকল মগরা। সেই কালো চুল মেয়েটি! সবাই তো অবাক।

মগরা সোজাসুজি টারজানের দিকে তাকিয়ে বলল,

ব্রায়ান, তোমার বোনকে ফিরে চাও ?'

গ্রেগরি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কোথায় আছে হেলেন ?'

—'কাল রাতেই ওকে নিয়ে আতান টম বেঙ্গোয় বেরিয়ে পড়েছে।' বলল মগরা।

—'কিন্তু স্টীমার তো আজ সকালে ছাড়ার কথা!' ডার্নো বলল।

মগরা বলল, 'ওরা স্টীমারের লোককে হাত করেছে।'

—'মেয়েটিকে বিশ্বাস না করাই ভালো', বলল টারজান।

—'সে কি ব্রায়ান! আমায় বিশ্বাস করছ না? আমি অনেক সাহায্য করব।'

ডার্নো বলল, 'স্টীমার গিয়ে ফিরে আসবে তারপর আমরা যাব, তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ওরা ততদিনে অনেকটা এগিয়ে যাবে। ওদের হাতে ম্যাপ আছে, আমাদের নেই।'

—'তাহলে কি হবে? আমার হেলেন—' বললেন গ্রেগরি।

—'উপায় আছে, অত উতলা হবেন না।' ডার্নো বলল, 'নৌবিভাগের প্লেনে যাব আমরা। বোঙ্গায় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব। কর্তৃপক্ষ এরোপ্লেন দেবে আমাদের।

★

ডার্নোর অনুরোধে এরোপ্লেন এল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওরা নদীর ধারে এরোপ্লেনে গিয়ে উঠল। পাইলটের নাম লাভাক, ফ্রান্সের লোক। ও জানাল দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে বোঙ্গায় পৌঁছে দেবে। আতান টমের অনেক আগেই ওরা পৌঁছবে।

প্লেন জল ছেড়ে হুস্ করে ভেসে উঠল আকাশে। উলফ এই প্রথম উড়ছে, ওগাবিও তাই। উলফ অস্বস্তি চেপে রেখে বসে আছে। ওগাবি দাঁত মুখ চেপে চেয়ার আঁকড়ে আছে।

আকাশ দেখে টারজান আঁচ করল ভীষণ ঝড় উঠছে। পাইলটকে ও সে কথা জানাল। লাভাক প্লেনটাকে আরো ওপরে তুলে নিল। পরক্ষণেই তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

ডার্নো বলল, 'এ অবস্থায় ফেরাও যা এগোনও তাই। তাই এগিয়ে যাওয়াই ভাল।'

তারপর দুটি ঘণ্টা ধরে চলল ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ। এমন ঝড়ের মুখোমুখি লাভাক কখনও হয়নি। প্লেনের এঞ্জিনেও গণ্ডগোল দেখা দিল। সবাই প্রাণ হাতে করে বসে ভাবতে লাগল বাঁচার উপায়। এঞ্জিন এক সময় থেমে গেল। ঝড়ের বুকে ভেসে ভেসে উড়তে লাগল প্লেন। কোথাও এবার আছড়ে পড়ে চুরমার হবে।

উলফ প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়ে আর কি! টারজান ওকে জাপটে ধরে রাখল, বলল, 'দাঁড়াও, আমরা বাঁচব। ঐ দেখ।'

প্লেনটা ঝড় কাটিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এল একটা হ্রদের জলে। চারদিকে ঘন বন প্রচণ্ড বৃষ্টির দাপটে মাথা দোলাচ্ছে। কেউ বুঝতে পারল না এ তারা কোথায় এল। ওগাবি অনেকক্ষণ আগেই মুচ্ছো গেছিল। এবার উঠে বসল। কোথায় আতান টমের দল, কোথায় হেলেন! বৃষ্টি থামলে লাভাক প্লেনটাকে চালু করার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল পেট্রল ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে সব তেল পড়ে গেছে।

দলের সবাই হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল।

★

ওগাবি কিন্তু খুব খুশি। উড়ন্ত পাখির পেট থেকে বেঁচে ফিরে ও মহানন্দে হরিনের মাংস রান্নায় মেতেছে। চারদিন কেটে গেছে। টারজানের অনুমান, বোঙ্গা থেকে ওরা দক্ষিণ পূর্ব দিক ঘেঁষে রয়েছে। যে হরিণটা ও শিকার করে এনেছিল ঐ ধরনের হরিণ এই সব জায়গায় চরে বলে শুনেছে। হিসেব করে দেখা গেল আতান টমের আজ বোঙ্গা ছেড়ে যাবার কথা। টারজান ভরসা দিল দলবল লটবহর নিয়ে আতান বেশি দূর এগোতে পারবে না। উত্তর পূর্ব ধরে একটু তাড়াতাড়ি এগোলে ওদের ধরে ফেলা যাবে।

হঠাৎ দেখা গেল মগরা নেই। টারজান জানে এখানে আশেপাশে বেশি দূর যাওয়া নিরাপদ নয়। সিংহের উপদ্রব খুব। তাই ও চিন্তিত হল।

মগরা বন্য প্রকৃতির আকর্ষণে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিল। অজানা ফুলের গন্ধ, ঘন পল্লবের বিশাল বিস্তার ওকে মুগ্ধ করেছিল। বেশি দূর এগোয়নি, তবু তাঁবুতে ফেরার পথ কেমন গুলিয়ে গেল। একটা সিংহ বহুক্ষণ ওর পিছনে আসছিল ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে। এখন একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল। মগরা চমকে উঠল। সাক্ষাৎ মৃত্যুকে এমন সামনাসামনি দেখে।

টারজান ততক্ষণে হাওয়ায় সিংহের গন্ধ পেয়েছে। মগরার গায়ের গন্ধও ওর নাকে এল জঙ্গলে ঢুকে। গাছে-গাছে ও ছুটে চলল। সিংহটা মৃদু গর্জন করছিল। পেটটা

নিচু হয়ে মাটি ছুঁয়েছে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্ত। মগরা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে ভাবছিল ওর শেষ পরিণতির কথা। বিকট গর্জন করে সিংহের লাফিয়ে পড়ল বটে কিন্তু ততক্ষণে তার ঘাড়েও লাফিয়ে পড়েছে টারজান গাছের ওপর থেকে। পিছন থেকে সিংহটা টুঁটি টিপে ধরে ওর বুকে আমুল বিঁধিয়েছে ওর ধারালো ছুরি। পশুরাজ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। তার পরেই বন কাঁপিয়ে আর এক উন্মত্ত উল্লাস শোনা গেল। টারজান তার শিকারের পেটে একটা পা রেখে জয়ের বার্তা ঘোষণা করছে। এক অলৌকিক শিহরণে কেঁপে উঠল বন-বনান্ত।

সেই আওয়াজ শুনে কেঁপে উঠল উলফ। ডার্নো বলল, 'টারজানের উল্লাস। শিকার মেরেছে ও।'

ওগাবি বলল, 'নিশ্চই সিংহ মেরেছে টারজান।'

উলফ বলল, 'সিংহ মেরেছে? ওর হাতে তো একটা ছোট্ট ছুরি ছাড়া কিছু নেই। সিংহই ওকে মেরেছে বোধ হয়।'

পরক্ষণেই দেখা গেল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে টারজান, ভয়ে আধমরা মগরাকে নিয়ে। মগরা বুঝেছে এ ব্রায়ান গ্রেগরি নয়, যদিও ঐ রকমই দেখতে। ব্রায়ান কেন, পৃথিবীর কোনো মানুষের ক্ষমতা নেই যে ক্ষ্যাপা সিংহের সঙ্গে এমন ভাবে লড়াই করে জেতে। মগরা বলল, 'তাহলে ব্রায়ানকে কি খুঁজে পাব না?'

টারজান বলল, 'পেতেই হবে। সেই খোঁজেই তো এসেছি এতদূর।'

—'আর হীরে?'

—'হীরেতে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।' বলল টারজান।

ওদিকে আতানের দল এগিয়ে চলেছিল বোঙ্গা ছেড়ে উত্তর পুবে। আতান হেলেনকে বলছিল, 'তোমার বাবা বোঙ্গায় পৌঁছে দেখবে সব ভোঁ ভাঁ। দলবল লোকজন সব নিয়ে ভেগেছি। ততদিনে আমরা বহুদূরে চলে গেছি।'

হেলেন বলল, 'আতান, কেন মিছামিছি আমায় এমন ভোগাচ্ছ? ম্যাপ তো পেয়ে গেছ। আমায় বোঙ্গায় ফিরে যেতে দাও। আমি বাবার কাছে যাব।'

আতান হেসে বলল, 'তোমায় ছাড়ব না, হেলেন। তুমি আমার কাছে থাকবে।'

হেলেন চমকে উঠল। বলল, 'এর ফল ভালো হবে না আতান!'

তার অসহায় চোখমুখে ফুটে উঠল প্রচণ্ড রাগের আগুন। কিন্তু আতানের তাতে কোনো বিকার নেই।

লালটাস্ক দূর থেকে এসব লক্ষ্য করল। ও আতানকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সাবধান করে দিল, 'হেলেন শ্বেতাঙ্গদের দেশের মেয়ে। সে-দুনিয়ার আইনকানুন বড় কড়া। নানা বিপদে জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।'

আতান দলের প্রভু। অন্যের উপদেশ গ্রাহ্য করা তার স্বভাবে নেই। তবু শেষ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে ও বলল, 'আচ্ছা

সমস্ত তাঁবু যখন ঘুমে অচেতন, অসীম নীরবতার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা মৃদু পায়ের আওয়াজ। একজন প্রহরী ঘুমে ঢুলছিল, সজাগ হয়ে মুখ তুলল সে। দেখল আতান টম সতর্ক পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে হেলেনের তাঁবুর দিকে। হেলেন জেগেই ছিল। আতানের হাত থেকে বাঁচার কি উপায় ভেবে পাচ্ছিল না। সামান্য শব্দে সে-ও সজাগ হয়ে উঠল। বন থেকে তখন ভেসে আসছিল আকাশ-কাঁপানো গর্জন—সিংহ শিকার খুঁজছে। হেলেন উঁকি মেরে দেখল আতান টমকে। চাঁদের আলোয় সব স্পষ্ট দেখা গেল। সে হেলেনের তাঁবুর দিকেই আসছে। হেলেন মন ঠিক করে ফেলল। সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে তাঁবুর পিছন দিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল আর এক অজানার উদ্দেশ্যে।

আতান টম এসে দেখল হেলেনের তাঁবু শূন্য। সিংহের গর্জনে রাতের আফ্রিকা কেঁপে কেঁপে উঠল।

কতদূর এগিয়েছে জানে না, হেলেন সিংহের ডাক আর শুনতে পেল না। পেলেও সে ভয় পেত না। আতানের হাত থেকে সে রক্ষা পেয়েছে, এতেই তার আনন্দ। আসলে সিংহটা হেলেনের গন্ধ পেয়েই গা ঢাকা দিয়ে পিছু নিয়েছিল। হেলেন চাঁদের আলোয় বন্য জন্তুর একটা পায়ে-চলা পথ ধরে এগিয়ে চলেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে বন শেষ হয়ে গেল। সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা পাহাড়ের পাদদেশ। সেইদিক লক্ষ্য করে ও এগোল।

বুইরু গ্রামের মোড়ল মিপিঙ্গুর ছেলে চিমাঙ্গো ঢাল-বর্শা সহ তিনজন শিকারী নিয়ে গভীর রাতে বেরিয়েছিল। একটা নরখাদক ওদের গ্রামকে বড় জ্বালাচ্ছিল। ওটাকে নিকেশ করতে হবে। ওরা জানত জঙ্গলের ধারে-কাছেই জন্তুটা আছে, তাই চুপি চুপি এগোচ্ছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা শ্বেতাঙ্গ মেয়ে। চিমাঙ্গু বলল, 'ধর ওকে। বাবার কাছে নিয়ে চল।'

একজন বলল, 'সাবধান, ওর সঙ্গে বন্দুকধারী সাদা মানুষও থাকতে পারে।'

চিমাঙ্গু বলল, 'ওর হাতে বন্দুক কোথায়? তার ওপর একা। নিশ্চয়ই পথ হারিয়েছে। ওর ধারেকাছে সাদা মানুষ দেখছি না।'

ওরা রে রে করে তেড়ে এল হেলেনের দিকে। হেলেন সে আওয়াজে এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়াল। পরক্ষণেই ভয়চকিত হরিণীর মতো ছুটে চলল জঙ্গলের দিকে। বর্শা আর ভারি ভারি ঢাল হাতে বুইরু গ্রামের শিকারীরা ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারল না। কিন্তু জঙ্গলে ঢোকার আগেই এক মহা বিপত্তি। সিংহটা বেরিয়ে এল হেলেনের সামনে !!

এই সেই নরখাদক যার সন্ধানে বেরিয়েছিল চিমাঙ্গুর দল। হেলেন কোনদিকে পালাবে? তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ততক্ষণে চিমাঙ্গুর দলবল অনেকটা এগিয়ে এসেছে। নরখাদকটাকে এমন সামনা-সামনি পেয়ে ওরা আনন্দে আত্মহারা। সিংহটা হেলেনের ওপর লাফ দিতে যাবে, এমন সময় চিমাঙ্গুর বর্শা উড়ে এসে বিঁধল তার দেহে। প্রচণ্ড আক্রোশে সে হেলেনকে ছেড়ে, লাফিয়ে পড়ল চিমাঙ্গুর ওপর। চিমাঙ্গুও সময় বুঝে তার বিশাল ঢালের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। অন্য শিকারীরা বর্শা ছুঁড়ল। সেগুলো গেঁথে গেল সিংহটার দেহে। অসহায় নরখাদক বিকট গর্জন করে লুটিয়ে পড়ল মৃত্যুর কোলে। ওরা বিজয় উল্লাসে এবার এগিয়ে এল হেলেনের দিকে। ওকে মাটি থেকে তুলে দাঁড় করাল। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চলল ওদের গ্রামে।

শিকারীদের হৈচৈ শুনে বুইরু গ্রাম জেগে উঠল। সাদা মেয়ে হেলেনকে দেখে গ্রামের মেয়ে-বৌদের সে কি রাগ! ওরা থুথু ছেটাতে লাগল ওর গায়ে। হেলেন ভাবল এর চেয়ে সিংহের পেটে যাওয়াই বোধহয় ভাল ছিল।

রাজা এম্‌পিঙ্গু ওকে দেখে আদেশ দিল, 'ওকে মেরে ফেল। আজ রাত্রেই।' সেই শুনে আবার একচোট উল্লাসধ্বনি তুলল সবাই।

ঢাক বেজে উঠল। শেষ রাতে বুইরু গ্রামের নরখাদক জংলীরা নাচগানের আয়োজনে মেতে উঠল।

গ্রেগরির দল জঙ্গল থেকে বেরিয়েছে। ওদের সামনে খোলা অনেকটা সমতল ভূমি। টারজান বলল, 'ঐ পাহাড়টাকে চিনি। আমরা এবার উত্তর দিকে যাব। ঐখানে আতান টমকে ধরতে হবে।'

উলফ বলল, 'বোঙ্গোয় যাবার কি দরকার, আশাইরের পথ আমি জানি।'

টারজান বলল, 'কই সে পথ তো আগে জানতে না?'

উলফ বলল, 'এখন জানি। দশ হাজার টাকা আর হীরের আধাআধি বখরা দিলে তবেই বলব।'

টারজান বলল, 'তোমার মৎলব ভালো নয়। গ্রেগরিকে আমিই নিয়ে যাব, কুলিটুলিও লাগবে না।'

এই শুনেই ক্ষেপে উঠল উলফ। আচমকা প্রচণ্ড এক ঘুঁষি কসাল টারজানকে। 'জংলী কোথাকার! আমার সঙ্গে চালাকি!' এই বলে চিৎকার করে পিস্তল বের করল।

গুলি ছুঁড়তে যাবে এমন সময় মগরা লাফিয়ে পড়ল ওর ওপর। টারজান ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে উলফের জামা ধরে তাকে ইঁদুরের মত মাটি থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। গ্রেগরি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'টারজান ওকে প্রাণে মেরো না, ও আশাইরের পথ জানে ব্রায়ানকে খুঁজে পেতেই হবে। হেলেনকে পেতে হলেও, ওকে দরকার।'

টারজান রাগ সামলে নিল।

প্রান্তর পেরিয়ে বনের ধারে একটা ঝরনার পাশে গ্রেগরির তাঁবু পড়ল।

মগরা উলফকে আড়ালে ডেকে শাসানি দিল, 'কি হে, তুমি যে গ্রেগরির উপকারী বন্ধু হয়ে উঠলে! আশাইরের পথ দেখাচ্ছ। এমন কথা তো ছিল না? আতান জানতে পারলে—'

—'আর তোমার সঙ্গে ঐ জংলীটার ভাব তো খুব জমে উঠেছে দেখছি, সে কথা জানলেও আতান কি তোমায় ছেড়ে দেবে?'

এসব কথার মধ্যে বোঝা গেল আতানকে ওরা দুজনেই

পছন্দ করে না।

উলফ বলল, 'আচ্ছা আমি থাকতে ঐ বুনোটার সঙ্গে এত মেলামেশা কেন তোমার, মগরা? আমি কি এতই খারাপ লোক?'

এমন সময় সবাই দেখল টারজান গাছের ডাল বেয়ে কোথায় চলেছে। গ্রেগরি জানতে চাইলেন, 'কোথায় চলল টারজান?'

ডার্নো বলল, 'কাছাকাছি কোনো গ্রাম আছে মনে হয়। ও চলল ওখানে খোঁজখবর করতে।'

টারজান ভাবছিল নানা কথা। আতান টম আর লাল-টাস্কই আসল শত্রু। তাদের সঙ্গে জুটেছে উলফ। আর মগরা বলে মেয়েটিকে ও এখনও ঠিক বুঝছে না। এইসব ভাবছে এমন সময় নাকে এল হরিণের গন্ধ। ভাবল যাই একটা হরিণ শিকার করে আনি।

শিকারের খোঁজে গভীর বনে ঢুকে কানে এল সেই চেনা ঢাকের শব্দ।

সে আওয়াজ হেলেনও শুনছিল একটা জীর্ণ কুঁড়েঘরে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় থেকে। এ আওয়াজ তারই মৃত্যুবার্তা। তার সঙ্গে বর্বর উল্লাসধ্বনি। সব মিলে এ এক বিভীষিকার রাত। এ রাত যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই মঙ্গল। হেলেন আর সহ্য করতে পারছিল না।

আওয়াজটা খুব মৃদু ভেসে আসছিল আতান টমের কানেও। ও আর লালটাস্ক তখন ওদের তাঁবুতে বসে মুবুলির সঙ্গে কথা বলছিল। মুবুলি ওর শিকারী দলের মোড়ল। মুবুলি বলছিল ওটা নরখাদকদের ঢাক। লাল আর আতান তাই শুনে একটু ভয়ে ভয়েই আছে। লাল বলল, 'হেলেনের কি হল কে জানে। ওর সর্বনাশ হলে সে অভিশাপের ভাগ তোমাকেও বইতে হবে আতান!'

আতান বিরক্ত হল, 'চুপ কর, লাল।'

কিন্তু ঢাকের বাদ্যি কি একটা অশুভ সংকেতের মত যেন ওকে তাড়া করতে লাগল।

ডার্নোও ঐ আওয়াজ শুনে কি রকম বিমর্ষ হয়ে গেল। এক বিভীষিকার স্মৃতি ওর মনের পিছনেও ছিল। ওকে ঘিরেও একদিন জংলীরা হিংসার উল্লাসে মেতেছিল। সেদিনও এমনি ভয়ানক ঢাকের বোল উঠেছিল মায়াবী অরণ্যে। সেদিন ওকে বাঁচিয়েছিল টারজান।

তাই শুনে মগরা বলল, 'কিন্তু টারজান এখনও ফিরল না!'

মগরার এই টারজান প্রীতিতে উলফ মোটেই খুশি নয়। বলল, 'নাঃ, ও জংলীকে কেউ মারতে পারবে না। বেড়ালের চেয়েও কড়া জান ওর।' এই শুনে ঘৃণায় আর বিরক্তিতে গ্রেগরি আর ডার্নো উঠে গেলেন সেখান থেকে ঢাক বেজেই চলেছিল।

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে থাকতে হয় টারজানকে। সেই ঢাকের শব্দে সে তাই একটুও ভয় পেল না। অন্ধকার বনে তড়িৎ-গতিতে গাছে গাছে লাফিয়ে এগিয়ে চলল সে আওয়াজে কান রেখে। যদি কোনো অসহায় মানুষকে বাঁচানো যায়। ঐ আওয়াজ শুনে এগোলে সে এক নতুন গ্রামেরও খোঁজ পাবে, জানতে পারবে অরণ্যের আর এক জাতিকে।

আতান শেষ পর্যন্ত বলল, 'ভয় নেই, কালকেই আমরা পালাচ্ছি।'

লাল বলল, 'ফেরার সময় অন্য পথ ধরতে হবে। তাহলেই আর আমাদের খোঁজ পাবে না।'

আতান টম বলল, 'আর মগরা?'

—'ওর সঙ্গে প্যারিসে দেখা হবে।'

—'আর সেখানে যদি উলফ হীরের ভাগ চাইতে আসে?' জিজ্ঞাসা করল টম।

লালটাস্ক তার ছুরিটা বার করে দেখাল, বলল, 'এইটা আছে কি করতে?'

আতান হেসে উঠল। পরক্ষণেই ব্যাজার হয়ে বলল, 'উঃ!'

লাল বলল, 'কি হল?'

—'ঐ ঢাক—ওটা কি থামবে না কোন কালে?'

মগরাও বলছে এক কথা। 'ঐ ঢাক কি থামবে না? টারজান কোথায়? এখনও ফিরছে না কেন?'

ডার্নো বলল, 'টারজানের জন্যে ভেবো না, যে বিপদেই পড়ুক না, ও বেঁচে ফিরে আসবেই।'

এ সব কথার মধ্যে হঠাৎই থেমে গেল সেই আওয়াজ।

এক বীভৎস উন্মাদনায় একদল বুনো ঘিরে রয়েছে হেলেনকে। তার পেটে ছোঁয়ানো আছে ধারালো বর্শার ফলা। টারজান গাছের ডাল থেকে টুপ করে নেমে পড়ল গ্রামের পিছন দিকে। বেড়া টপকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল জটলা লক্ষ্য করে। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে নিল সব ব্যাপারটা। তারপর চট করে ফের একটা গাছে

উঠে পড়ল তেমনি নিঃসাড়ে।

ঢাকের তালে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে একটা বুনো যেই বর্শা তুলেছে হেলেনকে গিঁথবে বলে, অমনি একটা তীর এসে তাকে বিঁধে ফেলল। আক করে একটা আওয়াজ করে সে ঢলে পড়ল, হেলেনেরই পায়ের ওপর। তারপর রাশি রাশি তীর এসে বিঁধে ফেলতে লাগল দলের আর সব বুনোদের। ঢাক স্তব্ধ। নাচ থেমে গেল। আর্তনাদ করে ছুটে পালাতে লাগল সবাই। টারজান নেমে এসে হেলেনের পায়ের কাছে মরা বুনোটার বুকে পা তুলে দিয়ে বিকট জয়ধ্বনি তুলল বন কাঁপিয়ে। সেই আওয়াজে পিলে চমকে উঠল বুনোদের। প্রেতলোকের কোনো আত্মা বুঝি নেমে এসেছে ওদের চরম শাস্তি দিতে।

ঢাকের আওয়াজ থেমে যেতে ডার্নো বলল, 'সব শেষ!'

মগরা বলল, 'টারজান নয়ত?' এমন সময় সেই অলৌকিক জয়ধ্বনির শব্দও তাদের কানে গেল। কাঁটা হয়ে উঠল সবাই।

ডার্নো বলে উঠল, 'আরে, এ-তো টারজানের চিৎকার। ওর জয়ধ্বনি।'

লালটাক্সও এ আওয়াজটা শুনে ভয়ে কাঁটা। এ আওয়াজ সে কঙ্গোর বনেও শুনেছে। আতান টমের গলা শুকিয়ে গেছে। ও বলল, 'কাল ভোরেই তাঁবু গোটাব এখান থেকে।' ও মুবুলিকে জিজ্ঞাসা করেছে টারজান বলে সাদা মানুষকে সে চেনে কি না। মুবুলি বলেছে টারজানের কথা, ওর শিকার ধরার গল্প। আতানের বিশ্বাস হচ্ছে খালি গা সাদা জংলী মানুষটাই সেই টারজান, ব্রায়ান গ্রেগরি নয় মোটেই। ওই জংলীটার সঙ্গে আর দেখা না হওয়াই মঙ্গল।

টারজানের হুঙ্কার শুনে সব বুনোরাই পালিয়েছে। মিপিঙ্গুর ছেলে চিমাঙ্গো কিন্তু অত সহজে হারবার পাত্র নয়। টারজান হেলেনের দড়ি কেটে মুক্ত করে দিতেই ও ছুরি নিয়ে তেড়ে এল। টারজানও প্রস্তুত ছিল। নিজের ছুরিটা খাপে পুরে ফেলে খালি হাতে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল গর্জন করে। চকিতে চিমাঙ্গোর ডান হাত ধরে ফেলে হাঁটু দিয়ে ওর পেটে চাড় দিয়ে মাথার ওপর তুলে ফেলল। চিমাঙ্গোর হাত থেকে খসে পড়ল ছুরিটা। হেলেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না কেমন করে একা একটা মানুষ নরখাদকের গ্রামে ঢুকে এমন তোলপাড় কাণ্ড করে ফেলতে পারে। টারজান হেলেনকে বলল, 'আমার সঙ্গে চলে এসো।' তারপর চিমাঙ্গোকে মাথায় নিয়ে পিছোতে লাগল বেড়ার দিকে।

চিৎকার করে বলল, 'ফটকটা খোল, নইলে আছড়ে মেরে ফেলব।'

এমপিঙ্গু এতক্ষণ কাঠ হয়ে বসে সব দেখছিল। ও দেখল ছেলে বুঝি সাদা মানুষটির হাতে মরে। তাই হাঁকল, 'ফটক খুলে দাও।' বর্শা হাতে কয়েকটা বিশ্বস্ত লোক ছুটে এসে কি করবে বুঝতে পারল না—বর্শা ছুঁড়বে না ফটক খুলে টারজানকে পালাতে দেবে।

●

রাজা হাঁকল, 'ফটক খুলে দিলে আমার ছেলেকে ছেড়ে দেবে তো?'

—'নিশ্চই দেব, তবে খানিকটা দূরে গিয়ে ছাড়ব, যাতে বর্শা ছুঁড়লেও আমার গায়ে না লাগে।'

একজন বলল, 'বিশ্বাস কি তুমি ছেড়ে দেবে?'

টারজান গর্জন করে উঠল, 'আমি বনের টারজান, আমি কথা রাখি। ফটক খোল।'

এমপিঙ্গু আবার আদেশ করতে গেট খুলে গেল। টারজান আর হেলেন বেরিয়ে গেল বুনোদের গ্রাম ছেড়ে। খানিকটা গিয়ে চিমুঙ্গোকে নামিয়ে ওরা আফ্রিকার ঘন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

হেলেনের সঙ্গে ওর বাবা গ্রেগরির মিলন যে কি মধুর তা ভাষায় বোঝানো যায় না। আফ্রিকার আকাশে তখন সবে ভোরের আলো ফুটছে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে টারজানের সঙ্গে হেলেন এসে হাজির হল। ওগাবি, লাভাক সবাই খুব খুশি। শুধু উলফ কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল টারজান ফিরে এসেছে বলে।

ফের চলা শুরু। কত বন পেরিয়ে, কত মাঠ প্রান্তর মাড়িয়ে ওরা এগিয়ে চলল। সামনে চলেছে উলফ।

একদিন টারজান বলল, 'আমি দুদিন দল ছাড়া হয়ে একটু ঘুরে আসতে চাই। এগোতে থাক তোমরা, পথের মধ্যে ঠিক ধরে নেব তোমাদের।' এই বলে ও পথ ছেড়ে গাছের ডালে ডালে ঝুলে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাকিরা এগিয়ে চলল। কেউ বলতে পারল না ও কোথায় গেল, ওর সঙ্গে কোথায় আবার দেখা হবে।

লাভাকের ইচ্ছে হেলেন ওর সঙ্গে আরো গল্প করুক। হেলেনকে খুব মনে ধরেছে ওর। সে কথা শুনে হেলেন হেসেই অস্থির। ওদিকে উলফ বলছিল হীরের দেশ থেকে ফিরে ও কত বড়লোক হবে। মগরা কেন টারজানের কথাই ভাবছে, ও তো জংলী, ও কোনদিনও পয়সার মুখ দেখেছে?

সেদিন সন্ধ্যায়ই ওদের দলেম মধ্যে টারজান ঝুপ করে নেমে এল। বলল, 'আতানের দল খোঁজ করে এলাম। ওরা অন্যদিকে অনেকটা দূরে রয়েছে'। তারপর উলফের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি অন্য দিকে নিয়ে চলেছ আমাদের।'

উলফ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তা ভুল তো হতেই পারে।'

—'না ভুল নয়।' চড়া সুরে বলল টারজান। 'ইচ্ছে করেই করেছে এটা। শুনুন মিঃ গ্রেগরি, উলফকে বরখাস্ত করুন। ওকে আমাদের প্রয়োজন নেই।'

—'একা এই বনের মধ্যে আমি কোথায় যাব?' বলল উলফ।

—'ঠিক আছে'। টারজান বলল, 'থাকতে পার, তবে তুমি দলের কেউ না।'

আতান আর লালের দল একটা গভীর বন থেকে বেরিয়ে এল। এক পাশে একটা শান্ত নদী বয়ে চলেছে, সামনে খোলা প্রান্তর। দূরে ছোট ছোট পাহাড়-শ্রেণীর মাঝখান থেকে মাথা তুলছে বিশাল একটা মরা আগ্নেয়গিরির চুড়ো।

—'ঐ দেখ তুয়েন বাকা!' বলল টম। 'ওরই জ্বালামুখে রয়েছে আশাইর, নিষিদ্ধ নগরী।'

—'আর হীরের বাপ।' বলল লালটাস্ক।

—'মগরা এখন কোথায় কে জানে', বলল টম, 'ওর কাছে আমি কথা দিয়েছি।'

—'সে তো বহুকাল আগের কথা। ওর মা-ও নেই, মগরাও জানে না সে প্রতিজ্ঞার কথা।' বলল লাল।

—'না লালটাস্ক, ওর মায়ের স্মৃতি নষ্ট হবে না কখনো। শুনবেন সে গল্প?' আতান টম গল্প শুরু করল।

—'মগরার মাকে খুব ভালবাসতাম। কিন্তু ওদের দেশে নিয়মের বাঁধন ছিল বড় শক্ত। আমি কোথাকার কে তার ঠিক নেই, মহারাজের মেয়েকে পেতে চাইছি! যাই হোক ওর বাবার কাছে কাজ পেলাম। ওর বিয়ে হল একজন ইংরেজের সঙ্গে, আর ওরা যখন ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিল আমায় ওদের সঙ্গে দিল ওর বাবা। ইংরেজটির আবার শিকারের খুব শখ। আফ্রিকায় শিকারে গিয়ে এই আশাইরে এসে পড়ল। এখানে ধরা পড়ে তিন বছর বন্দী ছিল, অনেক অত্যাচার সইতে হয়েছিল। এক সময় কি করে যেন ও পালাল। তবে দেশে ফিরেই লোকটি মারা গিয়েছিল। হীরের বাপের গল্প ও-ই বলেছিল ওর স্ত্রীকে, অর্থাৎ মগরার মাকে। আর মৃত্যুর আগে কথা আদায় করেছিল যে আশাইরের অত্যাচারের প্রতিশোধ যেন নেওয়া হয়। হীরের লোভে আশাইরে যাবার লোকজন জুটেছিল সহজেই, কিন্তু ম্যাপটা পাওয়া গেল না। তারপর মগরার মা-ও আর বেঁচে রইল না। রইল মগরা। মহারাজাও মারা গেছেন, তাই দশ বছরের ছোট্ট মগরা তখন আমার হেফাজতে। ওর বাবা বিদেশী, তাই মহারাজার বংশধর হিসাবে ও ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। দু বছর আগে আমি আশাইর যাবার চেষ্টা করি। সে সময় জানতে পারি ব্রায়ান গ্রেগরি নামে একটি লোকও এ চেষ্টা করছে। সে আশাইর পৌঁছেছিল, ম্যাপও তৈরি করেছিল, কিন্তু নগরে ঢুকতে পারেনি। পরের বার ওর পিছু পিছু আমিও আসি, কিন্তু পথ হারাই। ওর দলবলের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়। ওরা আশাইর থেকে ফিরছিল। ব্রায়ানের কোনো খোঁজ নেই। ওরা ম্যাপটা আমায় কিছুতেই দিল না। এখন, এই এতদিনে আমি বোধ হয় সফল হব।'

—'তুমি ঠিক জান ব্রায়ানের কাছে ম্যাপ ছিল?'

—'হ্যাঁ', বলল আতান, 'প্রথম বারের অভিযানের সময় আমি দেখেছিলাম ও ম্যাপ আঁকছে। ঐ ম্যাপটা কিম্বা ওরই একটা খসড়া ও বাড়িতেও পাঠিয়েছিল। সেটাই এখন উলফের মারফৎ আমার হাতে। যাই হোক, এই হীরের ব্যাপারে মগরার বাবার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে, তাই মগরারও একটা অধিকার আছে। তাছাড়া মগরার চেহারায় ওর মায়ের ছবিটাই যেন এখন আমি খুঁজে পাই। ওকে বঞ্চিত করি কি করে!'

কথা শেষ করে আতান ওর দলকে এগিয়ে চলার নির্দেশ দিল, কিন্তু কেউ এগোল না। মুবুলি বলল, 'দলের কেউ যেতে চাইছে না, তুয়েন বাকা'র অভিশাপ আছে।'

খেপে গিয়ে আতান বলল, 'ওরা আমার পয়সা দিয়ে ভাড়া করা লোক, যাবে না মানে?'

—'আশাইরের কাছে এসে ওরা কেমন যেন ভয় ভয় পাচ্ছে। কিছুতেই আর এগোবে না।'

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আজ এখানেই তাঁবু ফেল। কালকে ফের সাহস ফিরে এলে এগোনো যাবে।' বলল আতান, 'আর শোন, তুমি তো ওদের মোড়ল। তোমারও দায়িত্ব আছে ওদের বোঝাবার।'

নদীর মিষ্টি কুল কুল শব্দে আতান আর লালের ঘুমটা ভালই হল। হীরের স্বপ্ন দেখল ওরা সারারাত। এক সময়

রাতের নীরবতা খানখান করে একটা অলৌকিক স্বর যেন কথা বলে গেল কোথা থেকে, বিচিত্র ভাষায়। সেটা কিন্তু স্বপ্ন নয়।

বেশ বেলায় ঘুম ভাঙ্গল আতানের। সমস্ত তাঁবু কেমন অস্বাভাবিক রকম চুপচাপ। ও উঠে হাঁক-ডাক করতে গিয়ে দেখল সব্বাই পালিয়েছে। চেঁচামেচি শুনে লালটাস্কও তাঁবুর বাইরে এল। ওরা দেখল লোকজনের সঙ্গে ওদের মালপত্রও সব হাওয়া।

আতান টম মোটেই হতাশ হল না। লালটাস্ককে উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে চলল। সরু পাহাড়ী রাস্তায় ঘণ্টা দুই ধরে ওরা এগোল। আতান টমের স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে, হীরের বাপ হাতে আসবে। ওরা সেটা বিক্রী করে পাবে অঢেল টাকা। নানা অলঙ্কারে মগরাকে সে মনের মত করে সাজিয়ে দেবে। কোন বিপদকেই এখন সে গ্রাহ্য করবে না। ছাগল-চলা সরু পথ দিয়ে, প্রাণ হাতে করে এগোলো।

পাহাড়ের এক জায়গায় বিশাল ফাটল, সেখান থেকে জলস্রোত বেরিয়ে নদীতে পড়েছে। সে দিনটাও শেষ হয়ে গেল। ওরা সেই জলের ধারে সামান্য একটু সমতল জায়গায় রাত কাটাল। শীত তাড়াবার জন্য ওরা আগুন জ্বালাল, কিন্তু জল ছাড়া ওরা খাবে কি? অনাহারে, অনিদ্রায় ছোট্ট আগুনের পাশে জড়ামড়ি করে পড়ে রইল দুজনে। গভীর রাতে গাছপালার ঘন অন্ধকার থেকে প্রতিধ্বনিত হল সেই অলৌকিক স্বর। এ কোন প্রেতলোকের ভাষা! লালটাস্ক মুচ্ছো গেল।

★

বনমানুষদের রাজা উঙ্গো তার দলবল নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিল। দুম-দুম উৎসব হবে, নাচের অনুষ্ঠানের তোড়জোর চলছে অথচ একটা বলির খোঁজ মেলেনি। তাই চিন্তায় পড়েছে গরিলা-রাজ। এমন সময় তার নাকে কিসের যেন গন্ধ এল। বলল, 'গোমাঙ্গানি, টারমাঙ্গানি!' ওর দল ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে গন্ধ শুঁকে এগোতে লাগল।

গ্রেগরির দল আতান টমের পথ অনুসরণ করে এগিয়েছিল অনেকটা। এক জায়গায় তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করছিল কখন আসবে টারজান। ও বহুক্ষণ হল শিকারে গেছে। ও শিকার করে আনে বলেই দলের লোকজন খেয়ে বাঁচে।

গ্রেগরির দলকে দেখতে পেল উঙ্গো। দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। উলফ ভয়ে পালাল। ডার্নো তাড়াহুড়োয় বন্দুক ছুঁড়ল। দুটো গোরিলা মরে পড়ে গেল।

দলের লোকজনের সঙ্গে বনমানুষরা এমন ভাবে মিশে ছিল যে আর গুলি করতে ভরসা হল না। এক ফাঁকে উঙ্গো মগরাকে বিশাল লোমশ হাতে তুলে নিয়ে ছুট দিল। গ্রেগরির দল দিশেহারা হয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। গ্রেগরি মার খেয়ে তখন মাটিতে গড়াচ্ছেন। ব্যাপারটা এমনই অতর্কিতে ঘটে গেল যে অনেকক্ষণ তারা কিছুই বুঝতে পারল না।

মগরাকে নিয়ে উঙ্গো পৌঁছে গেল ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা খোলা জায়গায়। কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগ ধরে এ জায়গায় দুমদুম উৎসবের নাচের আসর বসে। সেই জায়গায় উঙ্গো ফেলে দিল মগরাকে। পাহারায় বসিয়ে দিল দুটো বনমানুষীকে। আকাশের ঠিক মাথার ওপর চাঁদ উঠলেই উৎসব শুরু হবে।

টারজান কাঁধে শিকার নিয়ে ফিরে এল, দলের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে হতভম্ব। সব শুনল সে। মগরা উধাও হয়েছে জেনে সে শিকার রেখে ছুটল। বলে গেল, 'তোমরা এগোও, ভাল জায়গা পেলে তাঁবু ফেল।'

টারজান বনমানুষদের পথ ধরে এগোতে লাগল। আকাশে সোনার থালার মত চাঁদ উঠেছে। গরিলা রাজ্যে ঢাক বেজে উঠল। এই ঢাকের আওয়াজ থামলেই বুঝতে হবে মগরার জীবন শেষ।

মগরাকে ঘিরে নাচের আসর জমে উঠেছে বাজনার তালে তালে। শিকার করার ভঙ্গিতে বনমানুষরা নাচছে।

প্রাণের আশা ত্যাগ করে মগরা প্রহর গুনছে। চাঁদ তখন ঠিক মাথার ওপর।

এমন সময় কোত্থেকে ঝাঁপিয়ে নামল একটা সাদা জংলী মানুষ। বনমানুষরা হতচকিত। কে এল পূজার অনুষ্ঠান পণ্ড করতে? বাজনা থেমে গেল। উঙ্গো এগিয়ে এসে চিৎকার করল, 'আমি বনমানুষদের রাজা উঙ্গো।'

—'আমিও বনমানুষদের রাজা টারজান!' চেঁচিয়ে উঠল সাদা মানুষটা ওদের ভাষায়। তারপর বেঁধে গেল মানুষ আর বনমানুষের হাতাহাতি যুদ্ধ। শেষটা উঙ্গোর অতবড় দেহ টারজান কি কায়দায় মাথার ওপর তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বলল, 'কাগোদা? অর্থাৎ হার মানো, উঙ্গো!' উঙ্গো কিন্তু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তেড়ে এল নতুন বিক্রমে। হেলেন রুদ্ধনিঃশ্বাসে চেয়ে ছিল। ভাবছিল কি করে পারবে টারজান ঐ অতবড় জন্তুটার সঙ্গে। তার জন্যই মিছামিছি প্রাণটা দেবে টারজান।

লড়াই চলল। ওদের প্রচণ্ড হুংকারে কাঁপতে লাগল চারদিক। হঠাৎই এক সময় শোনা গেল উঙ্গোর গোঙানি। 'কাগোদা! হার মানছি! ছেড়ে দাও।'

ওর ঘাড় প্রায় ভেঙ্গে দিয়েছিল টারজান। চিরন্তন প্রথামতে টারজান এবার বনমানুষদের রাজা হল।

মগরা নিখোঁজ, টারজানও ফেরেনি। ঢাকের আওয়াজও থেমে গেছে। গ্রেগরির দলে চুপ করে বসে আছে সবাই। 'মগরার কি হল কে জানে।' বলল লাভাক।

উল্‌ফ বলল, 'মগরাকে খুঁজতে আমারই যাওয়া উচিত ছিল। আমার বন্দুক রয়েছে, ঐ লোকটার তো নেই!'

—'টারজানের বন্দুক দরকার হয় না।' বলল ডার্নো।

উঙ্গো ততক্ষণে মাটিতে পড়ে গেছে। টারজান এগিয়ে এসে চিৎকার করল, 'আমি টারজান, তোমাদের রাজা।'

দলের কোনো বনমানুষই এগিয়ে এল না যুদ্ধ ঘোষণা করতে। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী টারজানই এখন ওদের রাজা! ও যা বলবে তাই ওরা মানতে বাধ্য।

আতান আর লালটাস্ক খাড়াই পাহাড়ের বিপজ্জনক রাস্তা বেয়ে চলেছিল। হাত ফস্কালেই নিশ্চিত মরণ। কিন্তু পিছু ফেরবার অবকাশ নেই। এত কাছে এসে প্রাণের ভয়ে আর ফিরে যাওয়া যায় না। বোঙ্গায় ফিরে গিয়ে নতুন ভাবে দল গড়ে নতুন উদ্যমে আর এগোনো যাবে না। যা ফয়সালা হবার এখনই হয়ে যাক, এত দূর আসতে পেরেছে যখন।

একটা ছোট্ট নদীর ধারে হঠাৎ বিশাল বিশাল লাভা-খণ্ডের আড়াল থেকে জনা বারো সাদা জংলীর দল বেরিয়ে এসে ওদের দুজনকে ঘিরে ফেলল। জংলীদের বলিষ্ঠ দেহ, পরণে খাটো পোষাক, মাথায় সাদা পালক গোঁজা। কোমরের খাপে ছুরি, হাতে বর্শা। ওদের নেতা অজানা ভাষায় কি সব বলল, আতান আর লালটাস্ক এক বর্ণও বুঝল না। জংলীরা ওদের ধরে একটা নৌকোয় ঠেলে তুলে নদীর উজানে ভাসিয়ে দিলে। সে-নৌকো টানছে শৃঙ্খলিত দাস-মাঝির দল।

এত বিপদেও আতান টম হেসে উঠল। লাল বলল, 'তুমি হাসছ?'

—'হ্যাঁ, মনে রাখো, আমরা নিষিদ্ধ নগরীতে চলেছি!'

ডার্নো চুপ করে আগুনের ধারে বসে ছিল। হেলেন পাশে এসে বসল। ডার্নো বলল, 'হেলেন, তোমায় কত কষ্ট করে ফিরে পেয়েছি আমরা। তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন। টারজান ছাড়া আর এক পা-ও এগোনো উচিত নয়। বোঙ্গায় ফিরে নতুন করে দল গড়ে তবেই এগোব আমরা।'

বলতে বলতে দূর থেকে দেখা গেল সেই বনমানুষদের। ওরা দল বেঁধে নেমে আসছে। ও কি, ওদের সঙ্গে রয়েছে টারজান আর মগরা। ওরা কি ওদের বন্দী? না, ওদের নেতা হয়েই আসছে টারজান। মগরাও বেঁচে ফিরেছে। দলের সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

সেদিন রাতেও চাঁদ উঠল আকাশ আলো করে। মগরার মুখে সবাই টারজান আর উঙ্গোর লড়াইয়ের গল্প শুনল। লাভাক এসে বসল ওর পাশে। মগরা বলল, 'কি সুন্দর চাঁদ! রাতের আকাশের এই চাঁদের সঙ্গে আমার জীবনের এক অদ্ভুত গন্ধ জড়িয়ে গেল। এ স্মৃতি ভোলার নয়।'

উলফের পছন্দ নয় লাভাক মগরার পাশে বসে!

যাদের হাতে আতান আর লাল ধরা পড়েছিল তাদের মুখে সোয়াহিলির দাসেদের ভাষা শুনে আতান ভরসা পেল। ও ভাষাটা সে কিছুটা জানে। আতান জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের তোমরা বন্দী করেছ কেন?'

—'আশাইরের এত কাছে এসেছ তোমরা, এখন আর বাইরের দুনিয়ায় তোমাদের ফেরার পথ নেই। আশাইরে চল, সেখানে রানী অটকা তোমাদের বিচার করবেন।'

বিশাল তুয়েন বাকার মধ্যে দিয়ে জলধারা বেয়ে এঁকে-বেঁকে চলল ওরা। অন্ধকার সুড়ঙ্গ পার হল মশাল জ্বেলে। আবার সূর্যালোকে এসে পড়ল। তারপর চোখে পড়ল পাঁচিল তোলা নগর, তার একদিকে বনজঙ্গল। নদীর প্রান্তে আর একটা শহর দূর থেকে দেখা গেল। ওটা নাকি থোবোদের রাজ্য লালটাস্ক কিন্তু ওসব দেখছিল না। ও চেয়ে ছিল স্বচ্ছ জলের গভীরে।

অবশেষে ওরা হাজির হল সেই নিষিদ্ধ নগরীতে। একবার এখানে এলে বাইরের দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারে না কেউ। জলের গভীরে তাকিয়ে ওরা দেখতে পেল একটা মন্দির, আলোয় ঝলমল করছে। একজন বিদঘুটে মানুষ সেখান থেকে বেরিয়ে এল, হাতে একটা ত্রিশূল। আর কিছু দেখা গেল না, নৌকো সে জায়গা পেরিয়ে গেল। ওরা নগরে প্রবেশ করল। ওদের নিয়ে যাওয়া হল এক পদস্থ কর্মচারীর কাছে। আতান তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল কোন

ক্ষতি করতে আসেনি ওরা, কোনো দুর্বুদ্ধি নেই ওদের। লোকটি বলল, 'ওসব রানীকে বুঝিও, তিনি যা বলবেন তাই হবে। আশাইরে এলে ফিরে যাওয়া যায় না। তবে রানী তোমাদের এখানে রেখে দেবেন না প্রাণে মারবেন তা তিনিই জানেন।'

আতান বলল, 'একটা গোপন কথা আমাদের বলার আছে রানীকে। আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে চল।'

কর্মচারীটি বলল, 'অত সহজে রানীর দেখা মেলে না।' এই বলে ওদের বন্দী করার হুকুম দিল। ওদের হাত-পা লোহার চেনে বেঁধে একটা ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেয় ফেলে রাখা হল। পেট ভরার মত সামান্য খাবার দেওয়া হল।

কিছুদিন পর রানীর ঘরে ওদের তলব হল। বছর তিরিশের এক সুন্দরী নারীই ওদের রানী। সাদা পালক দিয়ে সাজানো মনোমুগ্ধকর কেশবিন্যাস রানীর। আতান আর লাল মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল। রানী জানতে চাইলেন ওরা কেন এসেছে এখানে। ওরা বোঝাতে চাইল, নেহাৎ দুর্ঘটনায় পড়েই এখানে এসেছে। একদল ভীষণ শত্রুর তাড়া খেয়ে ওরা পথ হারিয়েছিল। রানীর যোদ্ধারা ওদের দেখে বন্দী করে নিয়ে এসেছে। আশাইরে আসার কোন মতলবই ওদের ছিল না।

রানী বললেন, 'কি একটা নাকি গোপন কথা বলার ছিল তোমাদের?'

আতান বলল, 'একদল লোক, তারা আমাদের শত্রু, আশাইরে আসছে হীরের লোভে।'

রাণী শুনলেন সব। লোকজনদের বললেন, 'এদের দুজনের অযত্ন কর না। এদের বন্ধন মুক্ত করে দাও।'

ওদের হাত পায়ের শেকল খুলে দেওয়া হল। আশে-পাশে ঘুরে দেখতে লাগল ওরা, তবে বেশিদূর যাবার অনুমতি নেই। আকামেন নামে ওদের এক প্রহরীকে আতান বলল, 'জলের তলায় ঐ সুন্দর বাড়িগুলো দেখতে দেবে না?'

আকামেন বলল, 'অত কৌতূহল ভালো নয়।'

টারজানের নেতৃত্বে আতান টমের দলের দাগ ধরে এগিয়ে চলল গ্রেগরির দলবল। হঠাৎ তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মুবুলির লোকদের। ওরা আতান টমকে ছেড়ে পালাচ্ছিল। মুবুলির এই দলটিকে বোঙ্গো থেকে নিয়ে যাবার কথা গ্রেগরির। পথে আতান টম এই দলকে হাত করেছিল। এখন ওরা পালাচ্ছিল। টারজান

ওদের পথ আটকাল। 'কোথায় পালাচ্ছ সব? তোমাদের বোয়ানা কোথায়?'

মুবুলি বলল, 'তুমি কে? তোমার এত কথা জানার দরকার কি? পথ ছাড়।'

—'আমি টারজান। তোমাদের বোয়ানাকে ছেড়ে তোমরা কেন যাচ্ছ আমি জানতে চাই।'

মুবুলি টারজানের কথা শুনেছিল। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সব ঘটনা বলল। বলল তুয়েন বাকা'র অভিশাপের কথা।

টারজান বলল, 'যাই হোক, দোষ তোমাদের হয়েছেই। তার শাস্তি হিসাবে তোমাদের তুয়েন বাকার পথে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।'

টারজানের আদেশ অমান্য করার সাধ্য ওদের ছিল না। ওরা গ্রেগরির দলের মালপত্র কাঁধে তুলে নিল। তিনদিন ধরে ওরা চলল পাহাড়ী পথে। তার পরদিন একটা নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে উঁচু-নিচু পাহাড়ের মাঝে মাথা উঁচিয়ে আছে আগুন-পাহাড় তুয়েন বাকা। এখানেই তাঁবু পড়ল। টারজান এখানে এসে লাল আর আতানের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে একাই এগোল কিছুটা। কিছু অজানা জন্তুর পায়ের ছাপও দেখতে পেল। একটা বিশাল পায়ের ছাপ দেখে ভয়াবহ কোনো জন্তুর আনাগোনার ইঙ্গিত পেল টারজান। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতেও পেল অদ্ভুত পোষাকের এক যোদ্ধা একটা বিরাট ডাইনোসর ধরনের জন্তুর মুখোমুখি পড়ে গেছে। লড়াই করে বাঁচার চেষ্টা করছে লোকটি। টারজান সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। লোকটাকে বাঁচান দরকার। ওর কাছে এখানকার অনেক খবর পাওয়া যাবে।

বর্শা হাতে লোকটিকে ডাইনোসরের সামনে একটা সামান্য পুতুলের মত মনে হচ্ছিল। টারজান দৌড়ে এল। যোদ্ধাটি দেখল হঠাৎ যেন আকাশ থেকে সাদা এক জংলী যোদ্ধা ঝাঁপিয়ে নামল বিশাল প্রাণীটার কাঁধে।

টারজান ছুরি সহ জন্তুটার পিঠে, কিন্তু মোটা চামড়ায় তা বিঁধল না। তখন জন্তুটাকে জাপটে ধরে ওর গলার নরম জায়গায় ছুরি বসিয়ে দিল। ততক্ষণে সেই যোদ্ধার বর্শাও ঢুকে গেছে জন্তুটার বুকে। যন্ত্রণায় বিকট চেঁচাতে লাগল সে। কয়েকবার ছটফট করে ধড়াম করে মাটিতে পড়ে মরে গেল।

টারজান আর সেই যোদ্ধা মুখোমুখি হল। কিন্তু কেউ কারোর ভাষা বোঝে না। যোদ্ধাটি যখন সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলল তখন টারজানের সুবিধা হল। একবার

একদল নিগ্রো ওই যোদ্ধাদের হাতে বন্দী হয়েছিল। তাদের কাছে এ ভাষা ওরা শিখেছিল। টারজানও এ ভাষা জানে।

লোকটা বলল ওর নাম থেটান। ও থোবো জাতির মানুষ।

টারজান বলল ও আশাইরে যেতে চায়, সঙ্গে আরো লোকজন আছে। একজন বন্দীকে মুক্ত করতে হবে।

লোকটি বলল, আশাইরীরা থোবোদের পরম শত্রু। আশাইরে তাই সে টারজানকে নিয়ে যেতে পারবে না। তবে থোবোর রাজাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে টারজানকে থোবোয় নিয়ে যেতে পারে। তারপর থোবোরা যদি কোনদিন আশাইর জয় করতে পারে, তখন টারজান আশাইর যেতে পারবে। লোকটা আরো বলল ও একটা কাজে এদিকে এসেছিল। কালই দেশে ফিরে যাবে। ওদের রাজার নাম হেরাট, সম্পর্কে ওর কাকা। দেশে ফিরে যদি রাজার অনুমতি পায় তবে ও আবার এখানে এসে টারজানকে দলবল সমেত নিয়ে যাবে। যদি ও তিনদিনের মধ্যে না আসে তবে বুঝতে হবে হেরাটের অনুমতি মেলেনি। তখন টারজান যেন দলবল নিয়ে ফিরে যায়। তুয়েন বাকা'র ধারে কাছে কেউ একবার এসে সে আর ফিরে যেতে পারে না। একথা যেন টারজান মনে রাখে।

টারজান সব শুনল। ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অভয় দিয়ে সে রাত্রের মতো গ্রেগরির তাঁবুতে নিয়ে গেল। ওর মাথায় কালো পালক গোঁজা, কোমরের কাপড়ের ফালিতে ষাঁড়ের ছবি। গ্রেগরি অল্পস্বল্প সোয়াহিলি ভাষা জানেন। উনি আলাপ জমালেন থেটানের সঙ্গে। তবে হীরের কথা তুলতেই থেটান কেমন চুপ করে গেল। গ্রেগরিও ও প্রসঙ্গ আর তুললেন না।

আতান টম চায় আশাইরের রানীর বিশ্বাসভাজন হতে। তারপর হীরেটা কোন রকমে চুরি করে ও পালাবে, এই রকম একটা আকাঙ্ক্ষা তার মনে। রানী আতানের মুখে সব শুনে সতর্ক হয়েছেন—রাতের অন্ধকারে রণতরী পাঠিয়েছেন গ্রেগরির দলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। নিঃশব্দে ওদের নৌকো এসে ভিড়েছে।

গ্রেগরির দলের লোকেরা হঠাৎ ভীষণ ভয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল। ওরা পাহাড়ের গায়ে মৃত্যুর মুখ নাচানাচি করতে দেখেছে। তার সঙ্গে সেই অলৌকিক আর্তনাদ। থেটান সে আওয়াজ শুনে বলল, 'আশাইরের দল।'

গণ্ডগোলের মধ্যে ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আশাইরী যোদ্ধারা। উলফ, ডার্নো, সবাই বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এল, গ্রেগরিও। তখন যেমন আচম্বিতে ওরা এসেছিল তেমনিই আবার ওরা পালাল। হৈ হট্টগোল ছাপিয়ে সবার কানে পৌঁছল একটা নারীকণ্ঠের চীৎকার। টারজান ততক্ষণে ওদের ধাওয়া করে কটা মৃত্যুর মুখ-ওয়ালা আশাইরীকে পাকড়ে এনেছে। ওরা বিদঘুটে মুখোশ পরে ভয় দেখায় আর মুখে আওয়াজ করে। মুখোশে ফসফরাস মাখানো। দলের লোকজনকে ডেকে টারজান ওদের এই চালাকি ধরিয়ে দিল। তারপর সেই আশাইরীদের বলল, 'তোমাদের ছেড়ে দিলাম। তোমাদের দেশে গিয়ে বল আমরা কোন শত্রুতা করতে চাই না, শুধু ব্রায়ান গ্রেগরির মুক্তি চাই। ও মুক্তি পেলেই আমরা ফিরে যাব।'

ওরা বলল, 'আচ্ছা তাই বলব'। তারপর অনেক দূরে চলে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'নিষিদ্ধ নগরীতে যে একবার ঢোকে তার খোঁজ কেউ পায় না।'

এর মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে, হেলেনকে পাওয়া যাচ্ছে না। নারীকণ্ঠের সেই চিৎকারের কথা সবার মনে পড়ল, বুঝল হেলেনকে আশাইরীরা ধরে নিয়ে গেছে তাঁবু থেকে। থেটান বলল, 'এখনও হয়ত উপায় আছে। ওরা হয়ত আজ রাতের মত হোরাস হ্রদের মুখের সুড়ঙ্গের দিকে তাঁবু গাড়বে। তবে সে রাস্তা বড় দুর্গম, তোমরা কেউ যেতে পারবে কি?'

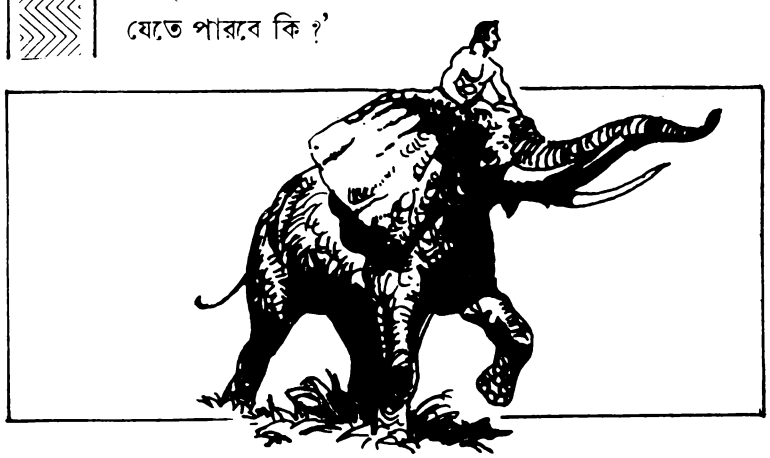

টারজান বলল, 'সে পথ আমায় দেখাও, আমি যাব।'

টারজান আকাশে মুখ তুলে কি এক অদ্ভুত ধ্বনি তুলল। দূরে দেখা গেল এক পাল বনমানুষ ঐ ডাক শুনে হাজির হয়েছে। এরা সেই উঙ্গোর দল। ওরা টারজানের আজ্ঞাবহ। থেটানের নির্দেশে তাদের নিয়ে টারজান আর ডার্নো চলল দুর্গম পথে। ভোরের আগে আশাইরীদের তাঁবুতে পৌঁছান যাবে না। যেতে যেতে থেটান বলল, 'মেয়েটিকে

এখন উদ্ধার করতে না পারলে, আর ওকে ফিরে পাবে না কোন দিন। ওকে হীরের মন্দিরে পূজারীর দাসী করে রাখবে ওরা।'

★

এমন সব অভাবনীয় কাণ্ড দেখে উলফ প্রাণে বাঁচতে চায়। চুলোয় যাক হীরের বখরা। ও মুবুলিকে আশাইরীদের ভয় দেখিয়ে দল ভাঙ্গিয়ে নিয়ে পালাল। জোর করে মগরাকেও নিয়ে যেতে ভুলল না। সমস্ত ব্যাপারটা রাতের অন্ধকারে এমনই চুপিসাড়ে ঘটল যে কেউ টের পেল না।

ছোট্ট জলস্রোতের ধারে একটা তাঁবু। সেখানে বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে হেলেন। সবে ভোর হয়েছে এমন সময় একটা অদ্ভুত হৈ-চৈ-এর শব্দ এল কানে। টারজান তার সেনা নিয়ে হেলেনকে উদ্ধার করতে এসেছে। একজন আশাইরীর ঘুম ভেঙে যেতেই সে চিৎকার করে ছুটে এসে হেলেনকে টেনে নিয়ে ছুটল নৌকোর দিকে। টারজানের দলের গোরিলারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিল ওদের।

ডার্নো দেখল হেলেনকে নিয়ে একজন জলের দিকে ছুটছে। ও বন্দুক তুলে ধাওয়া করল তাকে। লোকটি হেলেনকে কোনরকমে একবার নৌকোয় তুলে ফেলতে চায়। দাস-মাঝিরা তৈরিই আছে, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে পালাবে। ডার্নো গুলি করতে পারছিল না পাছে হেলেনের গায়ে লাগে। এর মধ্যে আবার একজন বর্শা হাতে তেড়ে এল পিছন থেকে।

থেটান আর টারজান বনমানুষদের নিয়ে ততক্ষণে প্রায় সাবাড় করে ফেলেছে সব কটা আশাইরী যোদ্ধাকে। হেলেন অবস্থা বুঝে এক ঝটকায় নিজেকে একটু সরিয়ে নিলে। আর ঠিক তখনই গুলি করে ফেলে দিল সেই লোকটাকে। আর মুহূর্তের মধ্যে টারজানের উড়ন্ত বর্শা এসে বিঁধল ডার্নোর পিছনের মারমুখো শত্রুর গায়ে।

টারজান নদীর কাছে গেল। সবাইকে নৌকোয় তুলে দাস-মাঝিদের আদেশ করল, 'চালাও।' ওরা গ্রেগরির তাঁবুর দিকে ভেসে চলল।

গ্রেগরি, লাভাক আর ওগাবি অবাক হয়ে দেখল আশাইরীদের নৌকোয় চেপে আসছে গোরিলা সমেত টারজানের পুরো বাহিনী।

হেলেনকে পেয়ে প্রাণ পেলেন গ্রেগরি। বললেন, উলফ পালিয়েছে দলবল আর মগরাকে নিয়ে। টারজান দাস-মাঝিদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছে হীরের মন্দিরে একজন সাদা মানুষ বন্দী আছে। হয়তো সে-ই ব্রায়ান গ্রেগরি।

টারজান বলল, 'আমরা এই নৌকো চেপে রাতের অন্ধকারে থোবোদের দেশে যাব। আশাইরীরা জানতে পারবে না। থোবোর রাজার সহায়তায় হয়তো ব্রায়ানকে উদ্ধার করা যাবে।'

দলের সবাই এই অভিযানে এখনই বেরিয়ে পড়তে চাইল।

লড়াইয়ের সময় এক আশাইরী যোদ্ধা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল। ও মরেনি। পরে অনেক কষ্টে ও ফিরে এল রানীর কাছে। সব কথা জানাল রানীকে। থোবো দেশের লোকের কথা, সাদা জংলী নেতার কথা, বনমানুষদের কথা সব জানাল রানীকে। ওরা নৌকো নিয়ে ওদের তাঁবুতে পালিয়েছে সে কথাও জানাল। রানী রাগে অন্ধ হয়ে আদেশ করলেন, ছটা রণতরী সাজাও। ঐ লোকগুলোকে জীবিত কি মৃত আমার সামনে এনে দাও! ক্রুলোরের অভিশাপ কত ভয়ানক তা ওরা বুঝুক।'

মগরা উলফের সঙ্গে কিছুতেই যাবে না। ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে উল্‌ফ। এই ধরনের ব্যবহার আর সহ্য করতে না পেরে খুন চেপে গেল মগরার। ও বন্দুক বার করল। উলফ কিছু বোঝার আগেই ওকে মেরে ফেলল মগরা। তারপর মুবুলির মাথায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বলল, 'মালপত্র নিয়ে দলের মুখ ঘোরাও, গ্রেগরির তাঁবুতে ফিরে যাব।'

থোবোয় যাবার প্রস্তুতি চলছে গ্রেগরির তাঁবুতে। এমন সময় দেখা গেল মগরা ফিরছে দলবল নিয়ে। ওর হাতে উঁচিয়ে আছে পিস্তল। ও সব কথা বলল। তারপর গ্রেগরির হাতে তুলে দিল দশ হাজার টাকা আর সেই ম্যাপ। উল্‌ফের পকেটে ছিল। টারজান মুবুলিকে বলল, 'তোমার অন্যায়ের ক্ষমা নেই। তবু তোমায় আমরা ছেড়ে দেব। তার আগে নৌকোয় আমাদের মালপত্র তুলতে সাহায্য কর।'

ওরা থোবোদের দেশের উদ্দেশ্যে ভেসে পড়ল। এই কদিনের উত্তেজনায় ক্লান্ত মানুষগুলো যখন নৌকোয় একটু আরাম করে বসেছে ঠিক তখনই একটা বিকট হুঙ্কারে চমকে উঠল সবাই। ন'টা নৌকো বোঝাই আশাইরী যোদ্ধারা এসে গেছে। গ্রেগরি ভয় পেয়ে বললেন, 'নৌকোর মুখ

ঘোরাও! চল পালাই।'

কিন্তু ওরা তখন শত্রুর মুখোমুখি। টারজান বলল, 'যুদ্ধ ছাড়া বাঁচার উপায় নেই।'

একটা বর্শা উড়ে এসে একটা দাস-মাঝিকে বিঁধে ফেলল। নৌকোর গতি এলোমেলো হয়ে গেল। এমনিতেই ভার বোঝাই হয়েছিল, প্রচণ্ড ঝাঁকানিতে উল্টে গেল নৌকো। আশাইরীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। ডার্নো আর হেলেনকে শত্রুরা তাদের প্রথম নৌকোতেই তুলে নিল। একটা অশরীরী আর্তনাদে রাতের সুড়ঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠল।

আতান টম আর লালটাস্ক যদিও বন্দী, তবু তারা বেশ আরামেই ছিল। আতান টম মনে মনে হীরের স্বপ্নে বিভোর। না জানি কত বড় সেটা, ওজনই বা কত! একটা ফুটবলের সাইজের হবে নিশ্চয়। এই হীরে বেচে সে কত টাকা পাবে আর কি ভাবে খরচ করবে, তার একটা পরিকল্পনা করছিল সে। আকামেন বলল, 'তোমাদের শত্রুরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে। এবার ওরা বুববে ব্রুলোরের অভিশাপ।

—'ব্রুলোর কে?' জানতে চায় টম।

—'ব্রুলোর আমাদের দেবতা, হোরাস হ্রদের গভীর জলে তাঁর মন্দির। তিনিই হলেন হীরের বাপ।'

আতান আঁতকে উঠল, 'সে কি! হীরের বাপ বলে কোন হীরে আছে নাকি?'

আকামেন এ বিষয়ে বেশি মুখ খুলতে চায় না। বলল, 'হ্যাঁ, আছে। সিংহাসনের সামনে বেদীতে।'

আতান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

টারজানের দলকে বন্দী করে নৌকোয় তুলে আশাইরীরা নিয়ে আসছিল। টারজান ওর দলকে ইংরিজিতে বলল, 'অন্ধকার সুড়ঙ্গ পেরোবার সময় আমি মুখে আওয়াজ করব। তখন প্রত্যেকে দুজন করে যোদ্ধাকে জোর করে জলে ফেলে দেবে।'

তাই হল। অন্ধকারে হঠাৎ আশাইরীরা ঝুপঝাপ জলে পড়ে গেল, ওদের প্রচণ্ড ঠেলা খেয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই ওরা সামলে নিয়ে আবার আক্রমণ করল। টারজান লড়াই করতে করতে বন্দী মাঝিদের বলল, 'তোমরা মুক্তি চাও? তবে আমাদের দলে এসো।'

এই শুনে দাস-মাঝিরাও আশাইরী যোদ্ধাদের ধরে বেদম প্রহার দিতে লাগল। শত্রুদের সব্বাইকে জলে ডুবিয়ে ওরা থেটানের নির্দেশমত অন্ধকারে থোবোদের দেশে ঢুকে পড়ল। আশাইরের অন্য নৌকোগুলো এদের খোঁজ না নিয়েই এগিয়ে গিয়েছিল। কাজেই তারা বাধা দিল না। কিন্তু থোবোরা এতগুলো বাইরের লোক দেখে পথ রোধ করল। তারপর দেখল ওদের রাজার ভাইপো থেটান এদের সঙ্গে রয়েছে। তবু তারা থেটানকে বন্দী করল, থোবোতে বাইরের দুনিয়ার লোক নিয়ে আসার জন্যে। টারজানের দলের লোকেদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল। রাজা হেরাটের কাছে বিচারের জন্য ওদের নিয়ে যাওয়া হবে।

★

এদিকে হেলেন আর ডার্নোকে যখন আশাইয়ের রানী অটকার সিংহাসন ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে আতান টম আর লালটাস্ককে দেখে তো অবাক। এরা এখানে এল কি করে?

অটকা হেলেনকে বললেন, 'কেন এসেছ এ নিষিদ্ধ নগরে?'

—'আমার ভাই ব্রায়ানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।'

—'মিথ্যুক! হীরে চুরির মতলব তোমাদের।'

আতান বলে উঠল, 'না না, ঐ মেয়ে নির্দোষ। ওর সঙ্গের লোকটা হীরের লোভে এসেছে।' এ-কথা যেই বলা ডার্নো অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে আতানের গলা টিপে ধরল। আশাইরী যোদ্ধারা ডার্নোকে টেনে হিঁচড়ে ছাড়িয়ে নিলে। নইলে আতানকে ও হয়ত মেরেই ফেলত। তারপর রানীর হুকুমে ওকে একটা খাঁচায় পুরে অন্ধকার একটা লিফ্‌টের মতো ঘরে বন্ধ করে, নিচে নামিয়ে নিয়ে ওরা চলল। বহুক্ষণ নামার পর খাঁচা এসে থামল একটা বিশাল লম্বা বারান্দায়। সে বারান্দা পেরিয়ে ডার্নোকে নিয়ে যাওয়া হল রাজা ব্রুলোরের ঘরে। বৃদ্ধ ব্রুলোর সিংহাসনে বসে ছিলেন।

তিনি বললেন, 'আবার হীরে চোর এল? এত লোককে খেতে দেব কি করে?' রাজার সামনে একটা সুন্দর বাক্স সাজানো রয়েছে। সেই ঘরে সারি সারি খাঁচা আর প্রত্যেক খাঁচায় বন্দী একজন করে মানুষ। খেতে না পেয়ে নুয়ে পড়েছে তাদের দেহ, লম্বা চুল-দাড়িতে মাথা-মুখ ঢাকা। ডার্নো বুঝল তাকেও এমনি এক খাঁচায় কাটাতে হবে বাকি জীবন।

ওর পাশের খাঁচা থেকে একজন শ্বেতাঙ্গ বলে উঠল, 'তুমি

কে? হীরের কথা শুনলে কোথায়!' ডার্নো বলল, 'আমি হীরের খোঁজে আসিনি। আমি এসেছি আমার বন্ধুর ছেলে ব্রায়ান গ্রেগরির খোঁজে।'

—'সে কি! আমিই তো ব্রায়ান! তুমি আমার বাবার বন্ধু? নাম কি তোমার?'

—'পল ডার্নো। জাহাজে কাজ করতাম মিঃ গ্রেগরির সঙ্গে। তিনি আর তোমার বোন হেলেনও এসেছে। তারাও বন্দী। ব্রায়ান বলল, 'এই সর্বনাশের জন্য আমি দায়ী।'

অনেক কথা হল। ওদের পাশের খাঁচাতেই যে রয়েছে তার নাম হার্কুফ। 'এক সময় ও পুরোহিত ছিল। কিন্তু ঐ বুড়ো রাজাটার সঙ্গে ঝগড়া করায় ওকে বন্দী করা হয়েছে। 'বলল ব্রায়ান। 'অবশ্য খাঁচায় বন্দী সবাই বাইরের দুনিয়ার নয়। কিছু আশাইরীও আছে। রানীকে চটালেই এখানে বন্দী হতে হয়। কিছু থোবোদেশের মানুষও আছে।'

ওদের মধ্যে যখন এইসব কথাবার্তা চলছে তখন হেলেনকে গন্ধ তেল মাখিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে এখানে। ও প্রধান পুরোহিতের দাসী হয়ে থাকবে। আশাইরী মেয়েরা বলল, 'ভাগ্যিস্ তুমি সুন্দরী, নইলে ঐ যোদ্ধাদের দাসী হয়ে থাকতে হতো।'

ওকে দেখে ব্রায়ান চিৎকার করে উঠল খাঁচা থেকে, 'হেলেন!'

হেলেনও ওর ভাইকে দেখে চিনল। গাল বেয়ে নেমে এল জলের ধারা। 'পল্, তুমিও এখানে!'

রাজা ক্রুলোর চিৎকার করলেন, 'হল্লা থামাও!' তারপর হেলেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোত্থেকে আসছ তুমি? নাম কি তোমার?'

—'হেলেন। আমি আসছি আমেরিকা থেকে।'

—'আমেরিকা? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একজনও বলছিল সে আমেরিকা থেকে আসছে। সে মিথ্যুক। ও রকম কোনো দেশই নেই। তুমিও সব সময় সত্যি কথা বলবে। আরাধনার রীতিগুলো জেনে নিও ভাল করে।' তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, 'শোন, তুমি জাইথেবের সেবা করবে।' এই বলে জাইথেবকে দেখিয়ে দিলেন। এই জাইথেবের কাছেই থাকে এই খাঁচাগুলোর চাবি। ক্রুলোর তারপর হীরের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়ে চিৎকার করে বললেন, 'সবাই শোন, আজ আমি জাইথেবের সঙ্গে এই হেলেন বলে মেয়েটির বিয়ে দিলাম।'

ডার্নো ভাষা বুঝল না। ব্রায়ানকে জিজ্ঞাসা করল এর মানে। ব্রায়ান রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হেলেনের বিয়ে হল, ঐ জাইথেব শয়তানটার সঙ্গে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।'

অসহায় ডার্নো খাঁচার মধ্যে থেকে বলে উঠল, 'আমিও যে ওকে ভালোবাসি!'

রাজা হেরাট তাঁর যোদ্ধাদের নিয়ে বসেছিলেন। প্রত্যেকের মাথায় কালো পালক। রাজার মুখে চাপ দাড়ি, বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। পাশে বসেছিলেন রানী সেন্থেব। রাজার মুখ বড় দাম্ভিক, বড় নিষ্ঠুর।

হেরাট ওঁর ভাইপো থেটানের ওপর খুবই চটে ছিলেন, থোবোদের নিয়ম ভঙ্গ করে বাইরের লোক ডেকে এনেছে বলে। থেটান রাজাকে সব কথা বলল, কেমন করে টারজান ওকে তুয়েন বাকার অতিকায় প্রাণীর হাত থেকে বাঁচিয়ে বন্ধুর কাজ করেছে। ভেবেচিন্তে রাজা বললেন, 'ওদের শাস্তি হওয়া উচিত মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু মকুব হবে যদি আমার সর্ত ওরা মেনে চলতে পারে। ওদের একজন ক্রীড়াঙ্গনে একটা আশাইরী যোদ্ধা মারবে, একজন সেখানে একটা বুনো সিংহ মারবে আর সব শেষ সর্ত, আমায় আশাইরের মন্দির থেকে বড় হীরেটা এনে দিতে হবে।'

এরপর গ্রেগরি, টারজান আর লাভাককে একটা অন্ধকার ঘরে দেয়ালের সঙ্গে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হল। ওদের ভাবনা মগরার জন্য। ওকে নিয়ে কি করবে ওরা?

আশাইরে আকামেন আতান আর লালকে বলছিল, 'আমার জন্যেই তোমরা বেঁচে গেলে, নইলে তোমাদেরও অন্ধকার ঘরে পচে মরতে হত।'

ওরা দুজন এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাল আকামেনকে। আকামেন বলল, 'শুধু কৃতজ্ঞ থাকলেই চলবে না, সেই কথাটা মনে আছে ত?'

আকামেন রানীর ভাই। রানী মারা গেলে ও রাজা হতে পারবে। এ ব্যাপারে আকামেন ওদের সাহায্য চায়। রাজা হলে ও আতান আর লালকে আশাইর থেকে মুক্তি দেবে। লালটাক্স আর আতান এক কথায় রাজি।

পরদিনই ক্রীড়াঙ্গনে খেলার ব্যবস্থা হল। প্রথম সর্ত অনুযায়ী টারজান লড়তে নামল আশাইরী যোদ্ধার সঙ্গে। রাজা হেরাট তাঁর রানী আর পারিষদ নিয়ে দেখতে

এলেন সে লড়াই।

আশাইরী যোদ্ধাটি মাথা দিয়ে টারজানের বুকে ঢুঁ মারল। অন্য কারও বুক হলে পাঁজর ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যেত। টারজানের কিছু হল না। টারজান গর্জন করে আশাইরীর ঘাড় কামড়াতে এল। ভয় পেয়ে একলাফে ছিটকে পালাল আশাইরীটি। বলল, 'তুমি মানুষ না জন্তু?'

টারজান বলল, 'আমি বনমানুষের রাজা টারজান।'

আশাইরীর পরের বারের আঘাতটা একটু অসতর্ক মুহূর্তে সামলাতে পারল না টারজান। পা পিছলে পড়ে গেল। লোকটি টারজানের বুকে চড়বে বলে লাফ দিল। টারজান কিন্তু ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। এক মুহূর্তে দেহটা গুটিয়ে একপাশে সরে গেল। আছাড় খেয়ে পড়ল লোকটি। জোর জমে উঠল লড়াই। আশাইরীটি হঠাৎ খেপে গিয়ে একটা ছোরা বার করে টারজানের দিকে তেড়ে এল। এটা লড়াইয়ের আইন-বিরুদ্ধ। টারজান তার হাত ধরে ফেলে শূন্যে তুলে তাকে মঞ্চের বাইরে ছুঁড়ে দিল। লোকটা মাটি থেকে উন্মাদের মত উঠে দাঁড়াল, তারপর ছুরিটা নিজের বুকে বসিয়ে দিল।

ওর দেহটা মাটিতে পড়ে যেতেই রাজা টারজানকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন, 'এ লড়াইয়ে ওর যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন তুমি মুক্ত।'

রানী টারজানের বলিষ্ঠ দেহের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'এমন শক্তিশালী মানুষকে কক্ষনো হত্যা করা উচিত নয়।'

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'আর মেয়েটির কি হবে?'

রাজা একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'ওর কোন ক্ষতি হবে না। তিনটি সর্ত পূরন হতেই ও-ও ছাড়া পাবে। এবার বল তোমাদের মধ্যে কে সিংহের সঙ্গে লড়বে।'

টারজান বলল, 'আমিই লড়ব।'

—'সে কি, তোমায় তো মুক্তি দিয়ে দিয়েছি।'

—'তা হোক আমিই লড়ব।'

সিংহাসন-ঘর তখন জনশূন্য। শুধু খাঁচায় রয়েছে বন্দীরা। ডার্নো ব্রায়ানকে বলল, 'হেলেনকে কোথায় নিয়ে গেল?'

ব্রায়ান বলল, 'জানি না। নেহাৎ বরাত জোর না থাকলে এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।'

জলে নামার অদ্ভুত পোষাক-পরা একটা লোক ত্রিশূলে করে মাছ গিঁথে এনেছে। ওরা পোটোম। পুরোহিতদের পরেই ওদের পদাধিকার। ওরা জলের তলায় নেমে মাছ শিকার করে। সারা গায়ে টান টান চামড়ার মতো জামা, মাথায় শিরস্ত্রাণের সঙ্গে পিঠের একটা যন্ত্রের যোগাযোগ রয়েছে। এই পোষাকে ওরা যতক্ষণ ইচ্ছে জলের তলায় থাকে।

জাইথেব হেলেনকে ওপরে নিয়ে গিয়ে একটা ঘর দেখিয়ে বলল, 'এটা তোমার।' বিলাসবহুল জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো সে ঘর। জাইথেব হেলেনের দিকে হাসিমুখে এগোতে যাবে এমন সময় হেলেন একটা ভারি ফুলদানি তুলে ছুঁড়ে মারল ওকে। জাইথেব লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। হেলেন বুঝল ও আর বেঁচে নেই। দেহটাকে টেনে এনে একটা আলমারিতে পুরে ফেলল। তার আগে জাইথেবের কোমর থেকে চাবির গোছা আর ধারালো ভোজালিটা বার করে নিয়েছিল। তারপর নেমে এল সিংহাসন ঘরে। চাবি খুলে ঢুকে দেখে যে যার খাঁচায় ঘুমোচ্ছে। প্রথমে ডার্নোকে ঘুম থেকে তুলে খাঁচা খুলে বার করে আনল। তারপর ব্রায়ানকেও মুক্ত করল। ব্রায়ান অনেকদিন পর মুক্তির স্বাদ পেল। বলল, 'ওদের বন্দী পুরোহিত হারাকুফকেও ছেড়ে দাও। ও এখান থেকে পালাবার গোপন পথ জানে। বন্যা কিংবা জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে বাঁচার জন্য একটা পথ আছে।'

শুধু হারকুফ নয়, সব বন্দীকেই একে একে মুক্ত করা হল। তার মধ্যে একজন থোবো বন্দীও ছিল। চুপিসাড়ে ওরা হারকুফের পিছন পিছন দালান পেরিয়ে একটা বিশাল পাথর সরিয়ে, অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে চলল। এই সময় ওরা পৌঁছে গেল বাইরে। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা। হেলেন বলল, 'আমরা কোথায়?'

হারকুফ বলল, 'এটা আশাইয়ের পাহাড় অঞ্চল। এখান থেকে যত দূরে সম্ভব পালাতে হবে। ওরা জানতে পারলেই খুঁজতে লোক পাঠাবে। একটা গোপন গুহার খোঁজ জানি। দরকার হলে সেখানে রাত কাটাব আমরা।'

মগরাকে খুব আদর যত্নে রেখেছেন হেরাট। তার একটাই কারণ। রানী করতে চান। এই প্রস্তাব শুনে মগরা রেগে গিয়ে বলল, 'মেনথেব থাকতে তুমি আমাকে রানী করতে চাইছ? আমি মেনথেবকে বলছি।'

এই শুনে রাজা ভয়ে চুপ করে গেলেন। ওদিকে রানী তার দাসীর কাছে গল্প শুনছিল। কোনো গল্পই তাঁর পছন্দ হয় না, অগত্যা টারজানকে ডেকে পাঠালেন। নতুন এই লোকটির মুখে নতুন গল্প শুনতে চান। টারজান ওঁর ঘরে এলে রানী বললেন, 'তুমি তো মুক্তি পেয়েছ। তবে আবার কেন সিংহের সঙ্গে লড়বে?'

টারজান বলল, 'আমিই লড়ব। জিতলে আমার বন্ধুদের মুক্তি দেবে তো?'

রানী বললেন, 'ওরা মরুক গে। তুমি থেকে যাও আমাদের দেশে।'

এমন সময় রাজা ঢুকলেন রানীর ঘরে। টারজান বলল, 'আমি তোমার খোঁজে এসেছিলাম, কিন্তু দেখলাম তুমি নেই।'

এ কথাটা ও বলল রানীকে বাঁচাবার জন্য। রাজার কিন্তু রাগ কমল না। তাঁর অনুমতি বিনাই টারজান এ ঘরে এসেছে সেই রাগে বললেন, 'তোমায় দুটো সিংহের সঙ্গে একা লড়তে হবে।'

তাই হল। পরদিন দুপুরে মঞ্চের ওপর টারজানের সামনে দুটো ক্ষুধার্ত সিংহ ছেড়ে দেওয়া হল। ওদের একটা টারজানের দিকে গর্জন করে তেড়ে আসতেই বিপুল বিক্রমে টারজান সেটাকে জাপটে ধরে মাথার ওপর তুলে নিয়ে তাকে ছুঁড়ে মারল অন্যটার দিকে। অন্য সিংহটা উল্টে পড়ে গেল আর তারপরেই দুটোতে শুরু হল প্রচণ্ড লড়াই।

একটা সিংহ অন্যটাকে মেরে ফেলে, টারজানের দিকে তেড়ে এল। টারজান মঞ্চের দেয়ালের কাছে ঘেঁষে গেল, তা-ই রানী উঁচু দেওয়াল থেকে শরীর ঝুঁকিয়ে দেখতে গেলেন! উত্তেজনার বশে টাল সামলাতে পারলেন না। চিৎকার করে নিচে পড়ে গেলেন। কিন্তু মাটিতে পড়ার আগেই সজাগ টারজান শূন্যে ওঁকে লুফে নিল। সিংহটা এই সময় ঝাঁপিয়ে পড়ল। রানীকে সরিয়ে রেখে, পিছন থেকে সিংহটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজান। গলাটা আঁকড়ে ধরল দুই হাতে। ছুরি বার করে ওর হৃৎপিণ্ডে বিঁধিয়ে শেষ করল জন্তুটাকে। বিকট হুংকার করে সিংহ মাটি নিল। সবাই চেয়ে রইল রুদ্ধশ্বাসে।

রাজা বললেন, 'আমার রানীর জীবন দিয়েছ তুমি। তুমি থোবোয় থাকতে পার পরম আরামে। আর যদি ইচ্ছে কর তোমার দেশে ফিরে যেতেও পার।'

টারজান বলল, 'কিন্তু আর একটা সর্ত যে পূরণ হয়নি। হীরেটা এনে দিতে হবে।'

রাজা বললেন, 'সেটা না হয় তোমার ঐ বন্ধুদের কেউ করুক।'

টারজান বলল, 'না, আমিই করব। আমায় আশাইর যেতেই হবে। ওখানে আমার বন্ধুদের মুক্ত করতে হবে।'

—'তাহলে আমার যোদ্ধাদের সঙ্গে নিতে পার।' বললেন রাজা।

টারজান বলল, 'একাই যাব আমি। তবে দরকার পড়লে নিশ্চয়ই সাহায্য নেব।'

আতান টম বেশ ছিল, পরম আরামে যেন নির্ভাবনায় রানী অটকার আতিথেয়তায় সারাজীবন কাটাতে এসেছে। লালটাস্কের মনে অশান্তি। ও বেশ ভয়ে ভয়ে ছিল। আতান ওকে বলছিল, 'আকামেনের সঙ্গে রানীর শোবার ঘরে যাও। কি করতে হবে ও বলবে।'

লাল বলল, 'তুমিই তো হীরের জন্য পাগল, তুমি যাচ্ছ না কেন?'

আতান বলল, 'ছুরিটা তোমার হাতেই ভাল চলে লাল! যা বলছি তাই কর।'

আকামেন জানাল, 'সব তৈরি। রানীর ঘরে কোনো প্রহরী নেই। আমাদের কেউ সন্দেহ করবে না। সন্দেহ করবে দুদিন আগে রানীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল যে লোকটির, তাকে।'

আকামেন লালটাস্ককে নিয়ে চুপিসাড়ে রানীর ঘরে ঢুকল। লালটাস্ক কোপ বসাতে যাবে এমন সময় ঘরের ফাঁক-ফোঁকর থেকে যোদ্ধারা বেরিয়ে এসে ওদের ঘিরে ফেলল। হৈ-চৈ তে রানীরও ঘুম ভেঙ্গে গেল। উনি উঠে বসলেন। রানী আদেশ দিলেন এদের দুজন আর আতান টমকে নিয়ে সিংহাসন-ঘরে যেতে।

সিংহাসন-ঘরে যাবার কথা শুনে টমের সে কি আনন্দ, ঐ ঘরেই যে সেই হীরে আছে!

ওদের তিনজনকে তিনটে খাঁচায় পুরে রাখা হল। প্রত্যেক পূর্ণচন্দ্রের দিন ওদের ওপর অত্যাচার করা হবে।

টারজান, গ্রেগরি আর লাভাককে বলল, 'হেলেন আর ডার্নোর খোঁজে আশাইর যাচ্ছি। তাছাড়া হেলেনকে এনে দিতে হবে সেই হীরে। তবেই তোমাদের মুক্তি।'

—'অন্য সর্তগুলো?' লাভাক জানতে চাইল। 'তুমি সিংহ মেরেছ?'

—'হ্যাঁ।'

লাভাক আর গ্রেগরি দুজনেই টারজানের সঙ্গে আশাইরে যেতে চাইল। টারজান বলল, 'শুধু লাভাক চলুক।'

থেটান ওদের আশাইরের পথে বিদায় জানাল। এদিকে সেই নজন বন্দী আশাইর ছেড়ে পালাচ্ছিল। ওদের পিছনে ধাওয়া করে আসছে যোদ্ধারা।

টারজান লাভাককে বলল, 'মানুষের গন্ধ পাচ্ছি। দাঁড়াও, গাছে উঠে দেখে আসি।' গাছের ডালে দোল খেয়ে যেন উড়ে চলল টারজান।

এক জায়গায় ছ'জন আশাইরী ঝাঁপিয়ে পড়েছে পলাতক মানুষগুলোর ওপর। ডার্নো, হেলেন, ব্রায়ান আর হারকুফ পালাবার চেষ্টা করল না। দাঁড়িয়ে ধরা দিল। আশাইরী যোদ্ধাদের একটা বর্শা একজন বন্দীর দেহে গিঁথে গেল।

টারজান আশাইরীদের হুংকার শুনে সেইদিকে এগিয়ে এল। একজন যোদ্ধা হেলেনকে ভয় দেখাতে আসতেই ডার্নো তাকে এক ঘুঁসি কশাল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বর্শা তুলল ডার্নোকে গিঁথে ফেলতে। কিন্তু তার আগেই একটা তীর এসে বিঁধে গেল তার দেহে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল যোদ্ধাটি। আরেকজন ব্রায়ানকে মারতে গেল। তার বুকেও বিঁধল তীর। ওরা বুঝল না অলক্ষ্যে থেকে কে এমন লড়াই করছে। ওরা যখন হতচকিত, তখন গাছের আড়াল থেকে আওয়াজ এল, 'আমি টারজান, বনমানুষদের রাজা। এদের ছেড়ে যাও, নয়তো মরবে।'

তবু তারা গেল না দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে ওদের বুকে বিঁধতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একজন যোদ্ধাও বেঁচে রইল না।

টারজান লাফিয়ে নেমে এল ওদের তিনজনের সামনে।

হেলেন শুনল ওর বাবা বেঁচে আছেন। লাভাক অপেক্ষা করছে একটু দূরে থোবো রাজ্যের দিকে। ব্রায়ান বলল, 'চল আমরা তাহলে থোবোর দিকেই যাই।'

টারজান বলল, 'না, আমায় এখন আশাইরে যেতে হবে। হীরেটা নিয়ে এসে রাজা হেরটের হাতে তুলে দিতে হবে। তবেই গ্রেগরি আর লাভাকের মুক্তি। লাভাককেও সঙ্গে নেব।' ওরা সবাই বলল, ওরাও আশাইরে যাবে টারজানের সঙ্গে। হারকুফও সঙ্গে থাকবে পথ দেখাতে।

এদিকে মগরা আর গ্রেগরি রাতের অন্ধকারে থোবোদের রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। মগরার একান্ত অনুরোধে থেটান ওদের পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। রাজা হেরাটকে মগরা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না।

টারজানের দল আশাইরে ঢোকার সেই গোপন পথের মুখে এসে পৌঁছেছিল। হেলেন বলল, 'আচ্ছা হারকুফ, রাজা হেরাট হীরে পেতে এত আগ্রাহী কেন?'

হারকুফ বলল, 'আসলে ঐ হীরেটি থোবোদের। অটকার যোদ্ধারা ওটা ওদের দেশ থেকে লুঠ করেছিল।'

ডার্নো জিজ্ঞাসা করল, 'হীরে উদ্ধার করা সত্যিই সম্ভব হবে?'

হারকুফ বলল, 'ক্রলোর কখন নেশা করে ঝিমিয়ে থাকেন আমি জানি। তখন হীরের ঘরে কেউ থাকে না। আর চাবি তো হেলেনের কাছে রয়েইছে। ক্রলোরের ঘরে গিয়ে মৃত্যুভয় দেখিয়ে ওকেও তুলে নিয়ে আসা যাবে। ওকে মিথ্যা দেবতা সাজিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। ঐ হীরের আসল দেবতা হচ্ছে চোন।' ও সূর্যের দিকে তাকিয়ে সময়ের আন্দাজ করে নিয়ে আবার বলল, 'যা করবার এখুনি করতে হবে।'

টারজান বলল, 'হারকুফের সঙ্গে আমি যাচ্ছি। এক ঘণ্টার মধ্যে যদি না ফিরি তবে তোমরা আমাদের পায়ের দাগ দেখে থোবোয় ফিরে যেও।'

গোপন পথে ওদের দুজনকে দূর থেকে দেখতে পেল একজন পুরোহিত। সে সন্তর্পণে ছুটল খবর দিতে।

গ্রেগরি আর মগরার সঙ্গে পথে দেখা হল তিনজন মানুষের। ওরা ক্রলোরের খাঁচা থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে চলেছে। ওরা তুয়েন বাকার এ তল্লাট ছাড়তে চায়। ওদের মুখে গ্রেগরি আর মগরা শুনল গতকাল টারজান গেছে আশাইরে। অন্যরাও যে বেঁচে আছে সে কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হলেন গ্রেগরি। ব্রায়ান এতদিন পরে মুক্তি পেয়েছে একি কম আনন্দের কথা, গ্রেগরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায়, কোনদিকে গেছে তারা?' লোকগুলির কাছ থেকে পথের একটা অস্পষ্ট হদিশ নিয়ে ওরা দুজন এগিয়ে চলল।

টারজান আর হারকুফ পৌঁছে গেছে ক্রলোরের মন্দিরের কাছে।

হারকুফ বলছিল, 'আমি ক্রলোরের ঘরে যাচ্ছি। তুমি হীরের বাক্সটা নিয়ে নাও। আমি প্রতিশোধ নেবার সুযোগ

পেলাম এতদিনে! ক্রুলোর নিপাত যাক।'

বড় বড় লাভা পাথরের আড়ালে আশাইর যোদ্ধারা লুকিয়ে ছিল। ওরা আগেভাগেই খবর পেয়ে গেছে, রানীর হুকুমে এদের দুজনকে জ্যান্ত ধরতে চায়। টারজানকে দেখেই ওরা চিনল, এই সেই বনমানুষ যে সুড়ঙ্গের মধ্যে যুদ্ধ করে বহু আশাইরীকে মেরেছিল।

ডার্নো গল্প করছিল হেলেনের সঙ্গে। লাভাক আর ব্রায়ান বসেছিল উল্টো দিকে। হঠাৎ লাভাক দেখল একদল আশাইরী যোদ্ধা তেড়ে আসছে। ওরা পালাবার সুযোগ পেল না। ওদের ধরে নিয়ে যোদ্ধারা ফিরে চলল আশাইরে।

হারকুফ একটা লাভা পাথর সরিয়ে ভিতরে ঢুকল, জানল না ওরা আশাইরীদের ফাঁদে পা দিল। দালান পেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় দুজন যোদ্ধা অন্ধকার থেকে লাফিয়ে পা টেনে ওদের ফেলে দিল। তারপর দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল দুজনকে।

সিংহাসন-ঘর তখন ফাঁকা, শুধু রয়েছে খাঁচায় বন্দী তিনজন, আতান, লাল আর আকামেন। লোকজন তখন উপাসনা করছে যে যার ঘরে।

টারজান আর হারকুফকে নিয়ে চলল ওরা। ওরা দেখল একটা ঘরে ডার্না, হেলেন আর লাভাককেও পুরে রাখা হয়েছে। ক্রুলোরের অনুমতি নিয়ে খাঁচায় পোরা হবে সবাইকে।

তারপর আরাধনার শেষে সবাই জাগল। ক্রুলোরের আদেশে সব্বাই একটা করে খাঁচায় বন্দী হল। আতান টম ওদের বলল, 'কি, দেখা হল আবার তাহলে?'

টারজানকে ডেকে পাঠালেন রানী অটকা। ও হাত বাঁধা অবস্থায় দৃপ্ত ভঙ্গিতে গিয়ে দাঁড়াল রানীর সামনে।

রানী বললেন, 'তুমিই সেই খুনী, যে সুড়ঙ্গের যুদ্ধে আমাদের অনেক যোদ্ধা মেরেছ? রণতরী লুঠ করেছ?'

টারজান বলল, 'হ্যাঁ, গতকালও অনেক আশাইরী মেরেছি।'

রানী বললেন, 'তুমি কেন এসেছ?'

—'আমি আমার বন্ধুদের মুক্তি চাই।'

—'তুমি কি আতান টমের বন্ধু?'

—'আতান আমার শত্রু।'

যতই রাগ করুন, টারজানের হাবভাবে মুগ্ধ হলেন রানী। ভাবলেন একে তাঁর দলে রাখলে বেশ হয়। এমন সাহসী যোদ্ধাও কদাচিৎ দেখা যায়। বললেন, 'তুমি যদি আশাইরে বন্ধুর মত থাক তবে তোমায় বন্দী করব না।'

—'আর আমার বন্ধুরা? ওরা মুক্তি পাবে তো?' জানতে চায় টারজান।

—'না!' কঠোর হয়ে রানী বললেন, 'ওদের মুক্তি নেই।'

এই শুনে টারজান নিজের মুক্তিও চাইতে পারল না। ওকেও তাই একটা খাঁচায় পুরে রেখে দেওয়া হল।

উপাসনার শেষে আশাইরীরা যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ক্রুলোর এসে বসলেন তাঁর সিংহাসনে। বাজনার সঙ্গে আশাইরী মেয়েরা ওঁকে ঘিরে নাচতে লাগল। নাচগান যখন জমে উঠেছে তখন হঠাৎ একটা মিছিল এগিয়ে এল। সে মিছিলের সাজসজ্জা চোখ মেলে দেখার মত। বাঁশি বাজিয়ে ওরা রানীকে নিয়ে আসছে। ক্রুলোরের মেয়েদের নাচ থেমে গেল। ওরা অভিবাদন জানাল রানীকে। রানী গম্ভীর মেজাজে এসে বসলেন ক্রুলোরের পাশের বেদীতে। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'বন্দীদের আমরা দৈহিক নির্যাতন দিয়ে মেরে ফেলব তিলে তিলে। মেয়েটিকে বলি দেওয়া হবে পবিত্র হোরাসের পূজায়। ও জাইথেবকে খুন করেছে।'

একজন টোম এসে হেলেনকে পরিয়ে দিল জলে নামার পোষাক। খাঁচা থেকে অন্য সবাই শুধু দেখল, কিছু করতে পারল না।

আতান টম হীরের দিকে চেয়ে পাগলের মত কি সব বিড় বিড় করতে লাগল। লাভাক আর ডার্নো চেয়ে রইল হেলেনের গমন পথের দিকে।

উঙ্গোর গরিলারা তুয়েনবাকার দিকে চেয়ে আছে। দূরের বন-জঙ্গলে খাদ্যের খোঁজে যাবার কথা ভাবছে ওরা।

তিন জন টোম হেলেনকে ধরে নিয়ে চলল। ওকেও টোমদের মত জলে নামার পোষাক পরান হয়েছে। একটা ঘরে অনেক টোম শুয়ে বসে গল্প করছিল। তাদের পোষাকগুলি দেয়ালে টাঙ্গানো, ত্রিশূল দাঁড় করান আছে দেয়ালে। বিশাল দরজা ঠেলে একটা ঘরে ওকে নিয়ে যাওয়া হল। সে ঘরের গায়ে ঝোলানো নানা যন্ত্রপাতি। দরজা খুলে ওকে একটা লম্বা গোলাকৃতি ঘরে পোরা হল। সেখানেও অনেক রকম যন্ত্রপাতি আর হাতল। হেলেন বুঝতে পারছিল না কি করে তাকে মারা হবে। মৃত্যুর চিন্তা তার মাথায় এসেছে কিন্তু ভয় পায়নি সে। সেই অদ্ভুত পোষাক পরা একজন টোম একটা হাতল ধরে টান দিতেই হুড় হুড় করে জল উঠে আসতে লাগল। দরজা খুলে ওকে টেনে নিয়ে দুজন টোম চলল জলের তলা দিয়ে। মৃত্যু-চিন্তা মাথায় না থাকলে জলের তলায় মনোরম বাগান দেখে অবাক হবারই কথা। স্বচ্ছ জলে সূর্যের আলো চুঁইয়ে পড়ছে। কত অজানা গাছপালার সবুজ সম্ভার। ওকে নিয়ে ওরা জলের তলায় একটা বাতাস-ঘরে গেল। ঘরটার জল বার করা হল যান্ত্রিক উপায়ে। হেলেনের গা থেকে জলের পোষাক খুলে নিয়ে ওকে ওরা একটা মই দিয়ে নামিয়ে দিল সেই ঘরে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অন্য একটা পথে জলের তোড় ঢুকতে লাগল সেই ঘরে। ইঁদুরের মত ওকে মারা হবে জলে চুবিয়ে।

অমিত শক্তিধর টারজানের কাছে আশাইরীদের এই খাঁচার লোহা বাঁকিয়ে বার হয়ে আসা মোটেই শক্ত কাজ নয়। সন্ধ্যা হতেই টারজান সেই শক্তি প্রয়োগ করে বেরিয়ে এল। একই ভাবে মুক্ত করল হারকুফকে। অন্যান্য বন্দীরা তখন তাদের খাঁচায় ঘুমে অচেতন। বাঁকা লোহাকে এমন ভাবে সোজা করে দিল যাতে চট করে না বোঝা যায় ঐখান দিয়ে কেউ বেরিয়ে গেছে।

হারকুফ ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। টোমরাও তখন যে যার ঘরে ঘুমোচ্ছে। ওদের ঘর থেকে তিনটে পোষাক আর ত্রিশূল চুপি চুপি তুলে নিয়ে ওরা এগিয়ে চলল। ঘর পেরিয়ে ওরা সেই পোষাক পরে নিল। ওদের এখন আর আলাদা করে চেনার উপায় নেই, ওরাও যেন টোম বনে গেছে।

হেলেন তখন প্রাণে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। হাঁটু ছাড়িয়ে জল উঠে এসেছে ওর কাঁধে। টারজান আর হারকুফ টোমদের সেই সুন্দর বাগান পেরিয়ে হেলেনের ঘরের দিকে সাঁতরে চলল।

টারজান যখন হেলেনের সেই মরণ-ঘরের দরজা খোলার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করছে তখন একজন টোম ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে দেখল দেয়াল থেকে কটা পোষাক উধাও। এমন ব্যাপার কখনো ঘটেনি। ও তাড়াতাড়ি সিংহাসন-ঘরের দিকে ছুটল। সেখানে দেখে দুটো খাঁচা ফাঁকা। ঘুম থেকে জেগে উঠে অন্য বন্দীরাও বুঝতে পারল না কি করে দুজন বন্দী পালাল। ছজন টোম পোষাক পরে তৈরি হয়ে নিল বন্দীদের ধরতে যাবে বলে।

অনেক চেষ্টার পর টারজান হেলেনের ঘরের ওপরকার দরজাটা খুলে ফেলেছিল। হেলেনের বিবর্ণ চোখ দুটোও দেখতে পেল। ওর মুখ অবধি জলে ডুবে গেছে। ঐ পোষাকে টারজান আর হারকুফকে দেখে হেলেন বুঝল না ওরা কারা। জলের তলায় কথা বললেও শোনা যায় না। ও শুধু দেখল দুজন টোম দরজা খুলে ওর দিকে জলের পোষাক এগিয়ে দিচ্ছে। ও চটপট সে পোষাক পরে নিয়ে জল থেকে উঠে এল। এইটুকু বুঝল, ওরা আর যাই হোক, শত্রু নয়।

হেলেনকে নিয়ে বেরিয়ে আসছে এমন সময় সেই ছটা টোমের সম্মুখীন হল ওরা। জলের তলায় এভাবে লড়াইয়ে টারজান তেমন অভ্যস্ত ছিল না। তবু ওর ত্রিশূলের খোঁচায় দুজন টোম সঙ্গে সঙ্গে খতম হল। অন্য টোমরা বুঝল এরা সামান্য প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। চারজন চারদিক থেকে ওদের ঘিরে ধরল, দূরত্ব রেখে। ওদের একজন হেলেনের দিকে তেড়ে এল। টারজান আর হারকুফও ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদের দুজনের ত্রিশূলে বিঁধে মরতে লাগল টোমরা। একজন বাকি ছিল। সে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল। টারজান ছুটল ওকে ধরতে, পাছে ও গিয়ে আরো টোমদের ধরে নিয়ে আসে। সাঁতরে গিয়ে ওর পা ধরে টেনে নিয়ে এল টারজান। এত গায়ে গায়ে যুদ্ধে ত্রিশূল অচল। তাই ওরা দুজনেই ছুরি বার করল। টারজান ওর কব্জি পাকড়ে ধরবার আগেই ও টারজানকে পা দিয়ে এক ঘায়ে কাত করে ছুরি বসাতে এল। কিন্তু হেলেন আর হারকুফ ততক্ষণে এসে পড়েছে। ওরা ত্রিশূল বিঁধিয়ে মেরে ফেলল সেই টোমকে।

●

ক্রলোরের মন্দিরে পূজারী, যোদ্ধা সবাই উদভ্রান্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে, ওরা ভেবেই পাচ্ছে না খাঁচা

থেকে দুজন বন্দী কিভাবে উধাও হল। শুধু ডার্নো লক্ষ্য করল টারজানের খাঁচার দুটো শিক সামান্য বাঁকা। ও তখন ভাবল, টারজান যখন পালাতে পেরেছে তখন ওদের বাঁচার আশা আছে।

একটা টোম মহা উত্তেজিত হয়ে সিংহাসন-ঘরে ঢুকে টান মেরে ওর মুখ থেকে পোষাক সরিয়ে ব্রুলোরকে বলল, 'হ্রদের ছোট ঘরে গিয়ে দেখলাম মেয়েটা পালিয়েছে! হোরাসের জলে পড়ে আছে ছটি টোমের মৃতদেহ। হে দেবতা, এ অশরীরী কোন শয়তানের কাজ!'

ব্রুলোর রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অশরীরী না আরো কিছু। এ হচ্ছে সেই শয়তান হারকুফ আর টারজানের কাজ। যে করে হোক ধরে আনো দুটোকে! যে আনবে তার ভাগ্যে নাচছে বড় রকমের পুরস্কার।'

টারজান আর হারকুফ হেলেনকে নিয়ে হোরাসের গভীর জলে সরে গেছে। টোমদের দেহ থেকে ওরা খুলে নিয়েছে তিনটি জলের পোষাক। টারজানের মাথায় একটা মতলব এসেছে, একটু দুঃসাহসিক, তবে এ ছাড়া পথ নেই।

জলের নিচে টারজানকে আবার লড়তে হল। একটা বিরাট সামুদ্রিক সাপ হেলেনের শরীর পাকিয়ে ধরেছিল। টারজান অমানুষিক শক্তিতে ছুরি দিয়ে ওটার দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে তবে প্রাণ বাঁচাল হেলেনের। হেলেন মনে মনে ধন্যবাদ জানাল এই অচেনা বন্ধুকে। বিশাল সাপটার মৃতদেহ যখন জলের ওপর ভেসে উঠল তখন সবে সকাল হচ্ছে। হেলেনের পরিশ্রান্ত দেহটা টেনে নিয়ে সাঁতরে টারজান তীরে উঠল। হারকুফও এল ওর পিছনে, জলের পোষাকগুলো সঙ্গে নিয়ে।

ওরা জলের পোষাক খুলে ফেলল। হেলেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, টারজান! আবার তাহলে আমরা প্রাণে বাঁচলাম?' হারকুফ ওদের একটা গুহায় নিয়ে গেল। তারপর মাছ ধরে এনে আগুন জ্বেলে রাঁধতে বসল।

টারজান ভেবে রেখেছে টোম সেজে ওরা আবার ব্রুলোরের মন্দিরে যাবে। অন্য তিনটি জলের পোষাক পরিয়ে টোম সাজিয়ে ডার্নো ব্রায়ান আর লাভাককে নিয়ে আসবে।

হেলেন হারকুফের কাছে জানতে চাইল জলের তলায় ঘর তৈরি করে সেখানে হাওয়া-বাতাসের ব্যবস্থা করা কি করে সম্ভব হল। হারকুফ শোনাল সেই মন্দির-ঘরের ইতিহাস।

কয়েক হাজার বছর আগের কথা। হোরাসের জলের এক জায়গায় সর্বদা একটা ফোয়ারা দেখা যেত। কেউ বুঝত না এর প্রাকৃতিক কারণ। একবার এক আশাইরী বিজ্ঞানী সোনা তৈরির গবেষণা করতে গিয়ে নেহাৎই অঘটনে একটা নতুন ধাতু পেয়ে যান। সে ধাতু জলের সংস্পর্শে এলেই অক্সিজেন তৈরি হতে থাকে। এই ধাতুর মুখোশ তৈরি করে একদিন এক দুঃসাহসী আশাইরী সেই জলের নিচে গভীরে ডুব দিল ফোয়ারার কারণ জানতে। নিচে একটা জায়গায় পৌঁছতেই ফোয়ারার জলের সঙ্গে সে-ও ছিট্‌কে শূন্যে উড়ে এল। ভাগ্যিস্ বেশি আহত হয়নি। বোঝা গেল জলের নিচে এক জায়গায় একটা বাতাসের উৎস আছে। অনেক বছর ধরে অনেক পরিশ্রমে জলের নিচে সেই বাতাসের উৎসমুখে এই মন্দির তৈরি হল। বাতাসের মুখ খুলে দিয়ে ঘরের জল সব সরিয়ে দিলে ঘর ভরে যায় হাওয়ায়। এই ভাবেই বাতাসের মুখ খুলে ঘরটি প্রাণীর বাসযোগ্য করা হয়েছে। শোনা যায়, বহুকাল আগে বিরাট আগ্নেয়গিরি তুয়েন বাকার বিস্ফোরণে ওর মুখের একটা বিরাট অংশ ভিতরে খসে পড়ে কিছু বাতাস রুদ্ধ হয়ে যায়। সেই বাতাসই একটা ছিদ্রপথে নদীর তলা দিয়ে এই ভাবে বেরিয়ে আসছে সমানে।

গ্রেগরি আর মগরা গোপন পথে না ঢুকে অন্য একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। অপূর্ব সুন্দর গুহাটি। ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা চূণের জল পড়ে পড়ে লম্বা লম্বা থাম তৈরি হয়েছিল। যেমন সুন্দর তাদের আকৃতি, তেমনি অপূর্ব রং।

ওরা অবাক হয়ে দেখতে লাগল। যত এগোয়, তত অন্ধকার গ্রাস করে ওদের।

মগরা বলল, 'কেউ যেন আসছে আমাদের পিছনে?'

কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। আর কিছুটা এগোতেই অন্ধকারে কয়েকটা অদৃশ্য হাত ওদের চেপে ধরে তুলে নিয়ে চলল।

একটা দালানে ওদের আনা হল। সাদা পোষাকের বিরাট চেহারার সব মানুষ চারদিকে। ওরা সোয়াহিলি ভাষা জানে। গ্রেগরির তাতে সুবিধা হল। ওরা বলল, 'চোনের মন্দিরে ঢুকেছ কেন? কে তোমরা? নিশ্চয়ই

আশাইরের কিম্বা আটকার চর, আমাদের শত্রু।'

গ্রেগরি বোঝাবার চেষ্টা করলেন, বললেন, 'আমরা পথ হারিয়ে এখানে এসেছি। কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই। তুয়েন বাকা থেকে চলে যেতে চাই আমরা।'

ওরা বলল, 'আমাদের দেবতার কাছে তোমাদের বিচার হবে। আসুন তিনি।'

★

হারকুফ ঝোপঝাড় ঠেলে নৌকো খুঁজে পেল না। বহুদিন আগে ও একটাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছিল। টারজান ঠিক করল একটা নৌকো আশাইর থেকে চুরি করে আনবে। হেলেন আর হারকুফও টারজানের সঙ্গে যেতে চাইল, কোনো বারণ শুনল না।

আশাইরের দিকে অর্ধেক পথ গেছে এমন সময় মশালের আলো চোখে পড়ল টারজানের। ও সে-পথ থেকে অন্য দিকে মুখ ঘোরাল। আশাইরী প্রহরীরা একটা সন্দেহ-জনক আলো দেখতে পেয়েছিল, ওরা বলছিল, 'আজ রাতে আমাদের কোনো নৌকো বার হয়নি, এ নিশ্চয় থোরোর দেশের নৌকো।' রাতে নৌকো চুরি করতে বেরোলে জলে নেমে টারজান একটা বিরাট হাঙরের সামনে পড়ে গেছিল। ওটার পেটের নিচে সাঁতরে গিয়ে ছুরি দিয়ে আঘাত করল সে। বিশাল ল্যাজের ঝাপটায় জল তোলপাড় করে ফেলতে লাগল হাঙরটা। একসময় হোরাসের জল লাল হয়ে উঠল। ল্যাজের ঝাপটা বাঁচিয়ে কোনমতে সরে এল টারজান। ও জানে জলের রঙ দেখলে আশাইরীরা ওকে ধরে ফেলবে, কিন্তু এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। টারজান যেই জলের ওপর ভেসেছে অমনি ওকে একটা নৌকো থেকে খপ করে ধরে কয়েকজন লোক টেনে তুলল। টারজান দেখল ওদের মাথায় কালো পালক। এরা থোবো যোদ্ধা। থেটানও রয়েছে ওদের সঙ্গে। ও জানতে চাইল টারজান একা এই হোরাসের জলে কি করছে। টারজান বলল, 'আশাইরে যাচ্ছিলাম নৌকো চুরি করতে। নদীর ওধারে তুজন বন্ধুকে রেখে এসেছি, আমাদের তিনজনকে নিয়ে ক্রুলোরের মন্দিরে পৌঁছে দাও তোমরা। আমাদের সঙ্গে জলে নামার পোষাক আছে। ক্রুলোরের মন্দির থেকে বন্দীদের উদ্ধার করতে হবে। তাছাড়া হীরেটা আনতে হবে হেরাটের জন্যে।

থেটান বলল, 'হীরের আর প্রয়োজন নেই। হেরাটের বন্দীরা পালিয়ে এসেছে।'

টারজান বলল, 'তাই নাকি? গ্রেগরি আর মগরা মুক্ত? তবু হীরে এনে হেরাটকে তুষ্ট করতে চাই। ওর সাহায্য ছাড়া তুয়েন বাকা থেকে ফেরা যাবে না।'

থেটানের নৌকো ফিরে চলল টারজানকে নিয়ে, হেলেন আর হারকুফকে নিয়ে আসতে। আশাইরী যোদ্ধারা ইতিমধ্যে ওদের দেশ থেকে ছটা রণতরী নিয়ে ভেসে পড়েছে।

তীরে এসে হেলেন আর হারকুফকে জলের পোষাক পরিয়ে থেটানের নৌকো আবার ভেসে পড়ল। তিরিশটি দক্ষ দাস-মাঝি নিঃশব্দে টেনে নিয়ে চলল সে নৌকো।

মাঝ নদীতে ওরা মুখোমুখি হল আশাইরী রণতরীর। যুদ্ধের উন্মাদনায় ওরা হুঙ্কার করে ঘিরে ধরল থেটানের নৌকো। থেটান নৌকোর মুখ চটপট ঘুরিয়ে নিল। টারজান, হারকুফ আর হেলেন মাথার শিরস্ত্রান ভালো করে এঁটে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

★

টারজান আর হেলেন জলের তলায় গভীর অন্ধকারে সারারাত কাটিয়ে দিল। সকালের আলোয় হোরাসের জল ঝিকমিক করে উঠতে হারকুফকে খুঁজল ওরা। ওকে কোথাও দেখতে না পেয়ে ওরা তুজনেই ক্রুলোরের মন্দিরের দিকে সাঁতরে চলল। কিছু দূর গিয়েই হারকুফের সঙ্গে দেখা। টারজান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হারকুফ ইশারায় ওদের ডেকে এনে দেখাল একটা বহু পুরনো নৌকো। সে এমন ভাবে হাত পা নাড়ছিল যে মনে হচ্ছে ও উত্তেজিত। নৌকোটা বালির সঙ্গে গেঁথে আছে। ওটার সারা গায়ে গজিয়েছে সামুদ্রিক গাছপালা। নৌকোর চেনের সঙ্গে লেগে আছে দাস-মাঝিদের সারি সারি কঙ্কাল। হারকুফ ওটার মধ্যে ঢুকে কি একটা খুঁজতে লাগল। হাতড়ে বার করে নিয়ে এল একটা মনিমাণিক্য খচিত বাক্স। সে ওটাকে নেড়ে চেড়ে ফের লুকিয়ে রেখে দিল সেখানে।

টোমদের বাগানের গাছপালার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল ওরা তিনজন। দিনের আলোয় ওরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাইল না। সন্ধ্যে হল। ব্রায়ান, ডার্নো, লাভাক, আতান, লাল আর আকামেন যে যার খাঁচায় বসে কাঁচা মাছ খেয়ে নৈশ আহার সারছিল। উপাসনার সময় হতে সিংহাসন-ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। ওরা তুজন এগিয়ে গেল আর হেলেন একা অপেক্ষা করতে লাগল।

টারজান আর হারকুফ ওদের ত্রিশূলে একটা করে মাছ গেঁথে নিয়ে বাতাস-ঘর পেরিয়ে এগিয়ে চলল। একজন টোম ঘর থেকে ঘুমচোখে ওদের দেখে ভাবল ওরা ওদেরই লোক।

হেলেন জানে টারজান ঠিক সবাইকে মুক্ত করে আনবে। ও খানিকটা নিশ্চিন্ত মনেই অপেক্ষা করছিল একা একা। ও টের পায়নি ওর দিকে এগিয়ে আসছে একটা সাদা মূর্তি।

বন্দীদের ঘরে ঢুকে টোম সেজে এরা প্রথমে মাছগুলো ফেলে দিল। টারজান দুই হাতে প্রবল শক্তিতে মোচড় দিয়ে খাঁচার শিকগুলো বাঁকিয়ে দিল। লাভাক, ডার্নো আর ব্রায়ান বেরিয়ে এল। আতান টমের দলও হারকুফের কাছ থেকে তিনটি জলের পোষাক নিয়ে ওরা পরে ফেলল। টারজান বাকি কজনকে বলল, 'তোমারা গোপন পথে পালাও। রাস্তা জান কি?' আকামেন এ দেশেরই লোক। ও জানে সে পথের হদিশ। আতান বলল, 'আমি জেনে নিয়েছি ওর কাছ থেকে।'

আতান মুক্তি পেয়েই জাপটে ধরল সেই হীরের বাক্স।

হেলেনকে পাকড়ে ধরল সেই সাদা মূর্তি। ও কিছুতেই ছাড়াতে পারল না নিজেকে। ঝটাপটি করতে করতে ওরা ভেসে উঠল জলের ওপর।

এদিকে হীরের জন্য ব্রায়ান, আতান আর লালের মধ্যে বেঁধে গেল প্রচণ্ড হাতাহাতি। টারজান ওদের থামাতে চাইল, পারল না। এতদিনের উদগ্র বাসনা ওদের নিবে যাবার নয়। হৈ চৈ শুনে একজন টোম ছুটে বেরিয়ে এল। তাদের দেহে এখন জলের পোষাক নেই, শুধু হাতে ত্রিশূল। টারজান আর হারকুফের হাতেও ত্রিশূল ছিল। ওরা লড়তে লাগল টোমদের সঙ্গে। হীরের বাক্স শেষ পর্যন্ত আতানই পেল কাড়াকাড়ির মধ্যে। ওটা নিয়ে ছুটল দালানের দিকে। এমন সময় উদভ্রান্তের মত ক্রুলোর এসে পড়লেন, সব দেখেশুনে চিৎকার করতে লাগলেন, 'নিপাত যাক পাপীরা। যোদ্ধারা কই, মেরে ফেল, মেরে ফেল, লোভী পাপীদের।' কিন্তু টোমরা কোণঠাসা হয়ে গেছে টারজানের আক্রমণে। হারকুফ এবার ওর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়ে গেল, ও তেড়ে এল ক্রুলোরের দিকে ত্রিশূল উঁচিয়ে। ক্রুলোর ওর পায়ে পড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগলেন কাতর কণ্ঠে। অমন তর্জন গর্জন কোথায় পালিয়েছে! হারকুফ ছাড়ল না। ত্রিশূল বিঁধিয়ে দেবতাকে মেরে ফেলল। টোমরা আকামেনকে মেরে ফেলেছে, ও বেচারার আর পালানো হল না। টারজানের দলের সবাই জলের পোষাক পরেছে। টারজান ওদের নিয়ে হাজির হয়েছে বাতাস-ঘরে। আতান আর লালটাস্ক পালিয়েছে, ব্রায়ান ওদের ছাড়ল না, ঐ হীরের জন্যই ও এতদিন পচে মরেছে আশাইরীদের খাঁচায়। এই সময় আশাইরী যোদ্ধার দল ছুটে এল। ব্রায়ান মরার ভান করে পড়ে রইল। ওর পাশ দিয়ে রণহুঙ্কার দিতে দিতে চলে গেল যোদ্ধারা।

টারজানের পিছু পিছু সবাই হাজির হয়েছে বাতাস-ঘরে। যোদ্ধারা ওদের পোষাক দেখে প্রথমে ভেবেছিল টোম। কিন্তু এতক্ষণে বুঝেছে ওরা শত্রু। ওরা তাড়া করে এল। টারজান কোন রকমে ওদের ত্রিশূল নিয়ে ওদের সঙ্গে লড়তে লাগল। এমন সময় হারকুফ ছুটে এসে ঘরের কলকব্জার একটা হাতল নামিয়ে দিল। কোথা থেকে হুড় হুড় করে জল ঢুকে ডুবিয়ে দিতে লাগল মন্দির আর ঘরদোর। টারজান কটা যোদ্ধাকে মেরে শুইয়ে দিয়েছে। বাকিরা এগোতে পারল না, জলে হাবুডুবু খেতে লাগল। টারজানের দল জলের পোষাকে নিরাপদে ভাসতে লাগল।

★

হোরাসের জল থেকে হেলেনকে তুলে সেই সাদা প্রেতের মতো মানুষটা ওকে নিয়ে এল এক অন্ধকার গহ্বরে।

মগরা আর গ্রেগরি তাদের গহ্বরে বন্দী। কখন আসবেন আসল দেবতা চোন, বিচার হবে ওদের। ওরা গহ্বরের মধ্যে একটা জলাশয়ের ধারে বসে আছে পুরো একটা দিন। ঐ জল থেকে হঠাৎ ভেসে এল দুজন। মাথার শিরস্ত্রাণ সরাতেই দেখা গেল ওদের একজন হেলেন! গ্রেগরি অবাক হলেন। ওরা শুনতে পেল ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। গ্রেগরি সে ভাষা বুঝলেন। ওরা বলছে, 'চোন আসছেন, আমাদের আসল দেবতা আসছেন।'

গ্রেগরি বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। ওদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে। হেলেনকে যে ধরে এনেছে সে তার শিরস্ত্রাণ খুলল। সাদা দাড়ি একটা বুড়ো। জলের পোষাক খোলা। হেলেনকে দেখে বুড়ো অবাক, বলল, 'অ্যাঁ, আশাইরে আবার মেয়ে টোম কোত্থেকে জুটল? এ কাকে আনলাম?'

হেলেন বন্ধু না শত্রু তাও ওরা ঠিক করতে পারল না। ওরা ঠিক করল তাদের প্রথামতো গ্রেগরির নাড়ি ভুঁড়ি কেটে ফেলা হবে। তাতে যদি ও বেঁচে থাকে তবে প্রমাণ হবে ও বন্ধু এবং নির্দোষ।

মগরা রেগে চিৎকার করে বলল, 'এই তোমাদের দেবতার বিচার? আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। তবে কেন ওর প্রাণ নেবে?'

সেই সাদা দাড়ি লোকটি, যিনি ওদের দেবতা চোন, মগরার রাগ দেখে বললেন, 'খুব তেজী আছে মেয়েটা। একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে ভালো দাসী হবে আমাদের।'

আতান হীরের বাক্স জাপটে ধরে উন্মাদের মত ছুটে চলেছিল। পিছনে তাড়া করেছিল লালটাঙ্ক আর ব্রায়ান গ্রেগরি।

সেই বনমানুষের দলটা পাহাড়ের ওপরে পোকা-মাকড় শিকার করছিল। ওদের অদ্ভুত আচরণ দেখে ওদের মজা লাগল। ওরা ভাবল নিশ্চয় একটা মজার নতুন খেলা করছে। ওরাও আতানকে তাড়া করে ধরে ফেলল। তারপর ওর হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে পাহাড়ে পালাল। সেখানে এক জায়গায় বাক্সটা ফেলে দিয়ে আবার পোকা খোঁজায় মন দিল।

এদিকে আতান হীরে হারানোর শোকে বিকট আর্তনাদ করছিল ওদের দিকে চেয়ে। ওর মাথার ঠিক নেই। হীরে হাতছাড়া হয়ে ও প্রাণে বাঁচার ইচ্ছা পর্যন্ত হারিয়েছিল। ওর সেই বিকট চিৎকার শুনে বনমানুষরা খেপে গেল। ওরা দল বেঁধে পাহাড় থেকে নেমে এল। দূর থেকে ব্রায়ান আর লালকে দেখতে পেয়ে, ওদেরই তাড়া করল। তাড়া খেয়ে ব্রায়ান আর লালটাঙ্ক একটা গুহায় ঢুকে পড়ল। বিশাল গুহা পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এক প্রান্তে এসে দেখল সুন্দর একটা ঘর। কিন্তু দাঁড়ালে চলবে না। বনমানুষরাও ঢুকে পড়েছে। ওরা দিক বদলে অন্য মুখে ছুটতে লাগল। রেগে বনমানুষরা হুঙ্কার দিতে লাগল গুহার মধ্যে।

টারজান, ডার্নো আর হারকুফ এসে দেখল হেলেন নেই। হারকুফ যে বাক্সটা পেয়েছিল সেটা নৌকোর মধ্যে লুকানো ছিল। কি করবে ভাবছে এমন সময় এক বিপদ ঘটল। পাঁচটা সমুদ্র-ঘোটক একসঙ্গে ওদের আক্রমণ করল। দুটো তেড়ে এল টারজানের দিকে। টারজান প্রাণপণ লড়াই করল বাঁচার জন্যে। বাকিরাও এলোমেলো ত্রিশূল চালিয়ে লড়াই করতে লাগল। ডার্নো একটু কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাভাক এগিয়ে এল ওকে বাঁচাতে। ডার্নোকে বাঁচাল বটে, কিন্তু অন্য একটা সমুদ্র-ঘোড়ার শিঙের খোঁচা ও সামলাতে পারল না। টারজান অনেক-গুলো জন্তুকে মেরে ওদের সাহায্য করতে এসে দেখল লাভাকের দেহটা অসহায় ভাবে পাক খাচ্ছে। ওকে ডাঙ্গায় তুলে আনা হল শুশ্রূষার জন্যে, কিন্তু ততক্ষণে ওর মৃত্যু হয়েছে।

টারজান বলল, 'ক্রুলোর মৃত। হীরেও চুরি হয়ে গেছে থোবার রাজার কাছে গিয়ে আমি কি বলব?'

হারকুফ তার কুড়িয়ে পাওয়া বাক্সটা খুলে বলল, 'টারজান, এইটাই সেই আসল হীরে। দেবতা চোন সর্বদা এই বাক্সটাই সঙ্গে রাখতেন। একবার রানী অটকার দল তাঁর নৌকো ডুবিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে আমি ছিলাম, তাই আমিও বন্দী হয়েছিল। ঐ ভাঙা নৌকোটা দেখে আমার সব মনে পড়ে গেল। বাক্সটা ডুবে গিয়েছিল। এতদিনে পেলাম। এই হীরেটা নিয়ে হেরটের কাছে যাও।'

টারজান আর ডার্নো থেকে গেল। হারকুফ গেল হেরটের কাছে। হারকুফ হীরের বাক্স তুলে দিল হেরটের হাতে। বলল, 'এই সেই মহান হীরে। এই হীরে উদ্ধারের কাজে আমরা যাদের কাছে সব থেকে ঋণী তাদের তুমি সাহায্য করবে না, রাজা?'

রাজা হেরট চিনলেন এই তাঁদের সেই বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া পূজারী। তিনি খুব খুশি হলেন আসল দেবতা চোনকে ফিরে পেয়ে। আদেশ দিলেন বিশাল রণতরীর সমাবেশ করার। ওরা এবার আশাইর দখলে যাবে।

আসল দেবতা চোন তাঁর পূজারীদের নিয়ে সেই গুহা-মন্দিরে সমবেত হয়েছেন। গ্রেগরিকে বেঁধে রাখা হয়েছে, ওর পেট চিরে দেখা হবে। তুয়েন বাকার ধারেকাছে যারা আসে তারা হীরের লোভেই আসে। সে পাপের শাস্তি মৃত্যু।

টারজান আর ডার্নো ঠিক করেছিল ওরা আবার আশাইরে যাবে। হেলেন হয়তো আবার ধরা পড়েছে ওদেরি হাতে। এমন সময় ওরা দেখল বনমানুষের দল দূরে পাহাড়ের একটা গুহায় ঢুকছে।

ব্রায়ান আর লালটাঙ্কও বনমানুষদের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে গহ্বরের সেই মন্দিরেই এসে হাজির। সেখানে হেলেন আর গ্রেগরিকে দেখতে পেল ওরা। হেলেন চিৎকার করে উঠল, 'আরে ব্রায়ান।'

ব্রায়ান ছুটে এল ওর বোনের দিকে। এই হৈ হট্টগোলে

পূজারীদের কাজে বাধা পড়ল।

বনমানুষদের পিছু পিছু টারজান আর ডার্নো সেই গুহায় ঢুকেছে। ওরা তো এমন সুন্দর একটা গুহা দেখে অবাক। টারজান বলল, 'মানুষের গন্ধ পাচ্ছি ধারে কাছে।'

চোন ভীষণ রেগে বললেন, সরে যাও, সরে যাও সবাই।'

ওঁর ছুরিটা এবার গ্রেগরির পেটে বসবে। এমন সময় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল বনমানুষের দল। তারা হঠাৎ এতগুলো মানুষ দেখতে পেয়ে ক্ষেপে গিয়ে তাদের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। টারজান ওদের শিষ্ট হতে শিক্ষা দিয়েছিল। সে শিক্ষা তখন ওদের মনেই ছিল না। চোন চিৎকার করে অভিশাপ দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর গলা অত হট্টগোলের মধ্যে শোনাই গেল না।

এর মধ্যে দুটো বনমানুষ হেলেন আর মগরাকে কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগল। ওদের তুলে নিয়ে ওরা ছুট লাগাল। টারজান দৌড়ে এসে গোরিলাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল, 'মাঙ্গানি, ডান ডো।' সে ভাষা কোনো মানুষ বুঝল না। চোনের শাপান্ত পর্যন্ত থেমে গেল তাতে। গ্রেগরি উঠে বসলেন। মেয়েদুটিকে কিন্তু পাওয়া গেল না।

তাদের নিয়ে বনমানুষ দুটো ছুটে চলেছিল। তার পরই গুহার শেষ, হোরাস নদীর তীরে। হেলেন আর মগরাকে রেখে বনমানুষদের নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হল। একজন বলল, 'এরা টারজানের। টারজান জানতে পারলে আমাদের মেরে ফেলবে।'

আরেকজন তাই শুনে বলল, 'তাহলে ওদের আমরাই মেরে ফেলি!' হেলেন আর মগরা চুপি চুপি পিছু হঠছিল। জলের ধারে পৌঁছতেই, বনমানুষরা ওদের দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল। কিন্তু ওরা ধরবার আগেই দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল হোরাসের জলে।

চোন তখন চিৎকার করছিলেন, 'আমি আসল দেবতা। তোমরা কেন এই মন্দিরকে অপবিত্র করলে! আমি সব্বাইকে অভিশাপ দিচ্ছি।'

টারজান গম্ভীর গলায় বলল, 'চোন তো কবে মরে গেছেন, নৌকোডুবি হয়ে।'

—'কে, কে বলেছে তোমাকে?'

—'হারকুফ।' বলল টারজান।

চোন বললেন, 'হারকুফ? সে বেঁচে আছে?'

টারজান বলল, 'নিশ্চয়ই! হীরের বাক্স নিয়ে সে থোবো দেশে চলে গেছে। ভাঙা নৌকোয় আমরা খুঁজে পেয়েছি সেই হীরের বাক্স।'

চোন বললেন, 'রানী অটকার দল আমাদের আক্রমণ করেছিল। আমি ডুবুরির পোষাক পরে, নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম। তাই মরিনি। পালিয়ে এসে এই গুহায় বহুদিন ধরে বাস করছি।'

টারজানের দেরি করার উপায় ছিল না। ডার্নোকে নিয়ে মেয়েদের খুঁজতে চলল। বনমানুষদের সভা বসে গেল, এক জায়গায় সমবেত হতে।

চোন তখন হীরে খুঁজে পাওয়ার সংবাদে মহানন্দে স্তব পাঠ করতে আরম্ভ করেছিলেন।

জলে পড়েই হেলেন আর মগরা আবার আশাইরীদের রণতরীতে বন্দী হয়েছিল। আশাইরীরা হেলেনকে চিনতে পেরে বলল, 'একে রানীর কাছে নিয়ে গেলে, ভালো পুরস্কার মিলবে।'

রানী অটকার কাছে ওদের নিয়ে যাওয়া হল। রেগে চতুর্ভুজ হয়ে রানী ওদের বন্দী করার আদেশ দিলেন। লোহার চেনে হাত পা বেঁধে অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখা হল।

লালটাস্ক আতানকে দেখেই বাক্সটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল। আতান ওটা অনেক কষ্টে ফের উদ্ধার করেছে পাহাড় থেকে, অত সহজে ছেড়ে দেবে কেন? প্রচণ্ড মারামারি শুরু হল দুজনে এবং লাল ওটাকে কেড়ে নিয়ে ছুট দিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে টম একটা ভারি পাথর তুলে ছুঁড়ে মারল লালের মাথায়। মাথা ফেটে মরে পড়ে রইল লাল।

টারজান যখন গন্ধ শুঁকে সেই দুটো বনমানুষের কাছে পৌঁছল, তখন এদের কাছে হেলেন আর মগরা ছিল না।

—'মেয়েরা কোথায়?' হাঁকল টারজান। বনমানুষদের একজন জলের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ঝাঁপ দিয়েছে।'

টারজান দূরে দেখতে পেল আশাইরের রণতরী। বনমানুষ বাহিনী নিয়ে ও আশাইরে যাবার জন্য তৈরি হল। চোন বললেন, 'আমার দলের লোকজনও যাক তোমাদের সঙ্গে।' তারাও ত্রিশূল আর ছুরি নিয়ে তৈরি হল।

অটকা খবর পেলেন থোবো থেকে এক বিরাট বাহিনী ওদের আক্রমণ করেছে। রানী হুকুম করলেন সমস্ত যোদ্ধাদের নিয়ে লড়াইয়ে নামতে।

আশাইর আর থোবোর মধ্যে যুদ্ধ বাঁধল। দুদলই প্রাণপণে লড়ে গেল, যেন শেষ বারের মত তারা নেমেছে শক্তি পরীক্ষায়। তুয়েন বাকার শাসক কে হবে তার একটা চরম ফয়সালা করে নিতে চায় দুজনেই।

আশাইরীরা সকলে যখন যুদ্ধ করতে ব্যস্ত, টারজান তার বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়ল নিষিদ্ধ নগরীতে। অটকার মুখোমুখি হতে হবে। ফটকের প্রহরীদের পেড়ে ফেলে সে রানীর সিংহাসন-ঘরে ঢুকে পড়ে বলল, 'মেয়ে দুটি কোথায়? তাদের মুক্তি চাই। ওদের না পেলে তোমাকেই তুলে নিয়ে যাব আমরা।'

অটকা নিষ্পলক চেয়ে রইলেন। তাঁর দেহ মৃদু মৃদু কাঁপছিল। 'ঠিক আছে, ফিরে পাবে মেয়েদের'। বললেন তিনি কোনমতে।

হেলেন আর মগরাকে ছেড়ে দেওয়া হল। টারজান তাদের নিয়ে ফিরে চলল। এদিকে ঐ যুগান্তকারী যুদ্ধে হেরাটের জয় হয়েছিল। ওরাও ঢুকে পড়েছিল নিষিদ্ধ নগরীতে। টারজান ফিরে এলে চোন খবর পাঠালেন হেরাটকে তাঁদের মন্দিরে আসতে। হেরাট আর চোনের দেখা হল। ওঁরা সম্মিলিত ভাবে টারজান আর ওর বন্ধুদের ধন্যবাদ জানালেন। এতদিন পরে সেই মহান হীরে খুঁজে পেয়ে তাঁরা তাঁদের আসল দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করলেন।

গ্রেগরির দলের জন্য হেরাট নৌকো সাজাবার ব্যবস্থা করলেন। যাতে ওরা স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে তুয়েন বাকা ছেড়ে যেতে পারে। হঠাৎ একটা উন্মত্ত চিৎকার শুনে সবাই তাকিয়ে দেখে হেরাটের দুজন যোদ্ধা আতান টমকে টেনে নিয়ে আসছে। একজন বলল, 'এই লোকটার কাছে একটা বাক্স আছে।' আতান টম প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ছিল বাক্সটাকে। ওরা টানাটানি করে ছাড়িয়ে নিলেও পাগলের মত চেঁচামেচি শুরু করল, 'দিয়ে দাও, ওটা আমার হীরে। ওটা নিয়ে দেশে যাব। সারা প্যারিস শহর কিনে নেব আমি। দিয়ে দাও!' বাক্সটা খুলতে গড়িয়ে পড়ল এক টুকরো কয়লা।

তাই দেখে স্তম্ভিত হয়ে আতান টম যন্ত্রণায় বুক চেপে ধরে মাটিতে পড়ে গেল। আর উঠল না।

ব্রায়ান গ্রেগরিকে বলল, 'এই তুচ্ছ জিনিসটার জন্যে আমরা এত কষ্ট ভোগ করলাম! মরতে মরতে বেঁচে গেলাম। অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস, এটাই আসল হীরের বাপ, কারণ কয়লা থেকেই সত্যি করে হীরে হয়।'

মহামহীয়ান টারজান

টারজান দি ম্যাগনিফিসেন্ট

কিছু অশান্তিকর রাজনৈতিক গুজবের মূলে কতখানি সত্যি আছে তার বিষয়ে তদন্ত করতে টারজান নিজের এলাকা থেকে অনেক দূরে, বিষুবরেখার পাঁচ ডিগ্রি উত্তরে, একটা মরুভূমি পার হতে হচ্ছিল। জায়গাটা তার একেবারে অচেনা ছিল। সে জানত এর কোথায় জল পাওয়া যাবে, খাবারের সম্ভাবনাও আছে। হঠাৎ বালির ওপর একটা বছর কুড়ির পুরনো নিগ্রো কংকাল দেখে, কৌতূহল বশতঃ সেটা নাড়াচাড়া করতেই একটা চেরা কাঠের খাঁজে গোঁজা তেল-কাপড়ে জড়ানো চিঠি পেল।

চিঠিটা কুড়ি বছরের পুরনো, তাতে মাউন্টফর্ড বলে একজন লোক লিখছেন কাতর এক আবেদন: মাফা নদী যেখানে নিউবাড়িতে পড়েছে, তার কাছেই মালভূমিবাসী কা জি রমণীদের হাতে তিনি আর তাঁর স্ত্রী বন্দী। ও দেশে নিগ্রোরা যায় না; গেলেই কা জি মেয়ের তাদের মেরে ফেলে। শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের তারা বন্দী করে রাখে এবং তাদের বিয়ে করতে বাধ্য করে। গোড়ায় কা জিরা কালোই ছিল, কিন্তু বংশে বংশে সাদা পিতৃত্বের ফলে তাদের রং অনেক ফিকে হয়ে গেছে। এদের হাতে বন্দী হবার কিছু দিন পরে তাঁর স্ত্রীর একটি মেয়ে হতে, তিনি মারা যান। কা জিদের সমাজ অতি জঘন্য; কা জি রমণীরা ভীষণ হিংস্র এবং দক্ষ যোদ্ধা। মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য মাউন্টফর্ড বড়ই চিন্তিত, তাই তিনি সাহায্য ভিক্ষা করেছেন। শ্বেতাঙ্গ সৈন্যবাহিনী ছাড়া কেউ তাঁদের উদ্ধার করতে পারবে না। কা জিদের একটা কোটি কোটি টাকা দামের হীরে আছে। বিখ্যাত কালিনান হীরের দ্বিগুণ তার ওজন। বিজয়ীরা সেটি দখল করতে পারবে। একজন ক্রীতদাসকে ঘুষ দিয়ে এই চিঠি

পাঠানো হয়েছিল। ঐ কংকাল সেই হতভাগ্যেরি। টারজানের মনে হল জলের অভাবে তার মৃত্যু হয়েছে।

কুড়ি বছর আগে বিখ্যাত ভূ-পর্যটক লর্ড আর লেডি মাউন্টফর্ডের আফ্রিকাতে নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে কাগজে লেখালেখি হয়েছিল। এবার সে রহস্যের সমাধান হলো। কিন্তু কুড়ি বছর দেরি করে হল। বন্দী মাউন্টফর্ডও সম্ভবতঃ এতদিনে গত হয়েছেন আর ছোট মেয়েটিও কি ঐ পরিবেশে বেঁচে আছে?

এই সব ভাবতে ভাবতে টারজান যাচ্ছিল, এমন সময় দেখে একটু দূরে মাথার ওপর শকুন ঘুরছে আর ফাঁকা ঝোপের পাশে একটা সিংহ অপেক্ষা করছে। কেন করছে, তা-ও চোখে পড়ল। বালির ওপর একজন হতভাগ্য শ্বেতাঙ্গ পড়ে আছে আর মাঝে মাঝে মাথা তুলে, উঠে বসার চেষ্টা করছে। ভাল করে দেখে টারজান বুঝতে পারল সিংহটার পেট ভরা, কৌতূহলের কারণে বসে আছে। অমনি বিকট স্বরে টারজান বনমানুষদের জয়ধ্বনি দিল আর সিংহও ল্যাজ তুলে পালাল। টারজান লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'লেগেছে নাকি?'

—'না। জল আর খাবারের অভাবে এই দশা।'

টারজন তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, 'চল, জল আর খাবারের সন্ধানে।'

*

জলের কাছে পৌঁছে লোকটাকে নামিয়ে মনে হল প্রায় বেহুঁশ। কিন্তু ঠোঁটের ফাঁকে কয়েক ফোঁটা জল দিয়ে, হাতে মুখে একটু জলের ছিঁটে দিতে অনেকটা সুস্থ হয়ে, নিজেই আরেকটু জল খেল। তখনো ঠিক প্রকৃতিস্থ বলা যায় না। বিড়-বিড় করে বকতে লাগল, 'কি সুন্দর দেখতে. কিন্তু কি শয়তান! সেটার এক কোটি ডলার দাম হবে, একটা মেয়ের মাথার সমান বড়।'

শেষ পর্যন্ত টারজান বলল, 'চুপ করে শুয়ে থাক তো, আমি খাবার আনছি।'

কয়েকটা ছোট পাখি আর একটা খরগোশ মেরে এনে কাঠকুটো জড়ো হলে, একটু আগুন জ্বেলে, পাখিগুলোর পেট পরিষ্কার করে, পুরু কাদা মাখিয়ে, উনুনের মধ্যে পুরে দিল। খরগোশটাকে কুটে কাঠি ফুটিয়ে গ্রিল্ করল।

এতক্ষণ পরে লোকটার জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে এল। মনে পড়ল টারজান ওকে সিংহের মুখ থেকে বাঁচিয়েছে, জল খেতে দিয়েছে। আরো জল খেয়ে সে বলল, 'তুমি কে?'

—'তুমি কে তাই বল আগে। আর এই নির্জন জায়গায় একা করছই বা কি? অবশ্যি তারো আগে খেয়ে দেয়ে গায়ে জোর কর।'

পাখিগুলোকে উনুন থেকে বের করে পোড়া কাদার খোলা ভেঙে ফেলতেই, সঙ্গে সঙ্গে পালকটালকও খুলে এল। সুগন্ধ বেরুল। নুন ছাড়া মাংস সে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল। পরে এক অদ্ভুত গল্প বলল।

—'আমার নাম উড্, আমি আমেরিকান, ভ্রমণ-কাহিনী লিখি। তাই পৃথিবীর কোথায় অজানা অদেখা জায়গা আছে, তাই খুঁজে বেড়াই। কুড়ি বছর আগে লর্ড আর লেডি মাউন্টফর্ডের অদৃশ্য হওয়ার কথা পড়ে অবধি এই অজ্ঞাত অঞ্চলে সে রহস্যের সমাধান করব স্থির করলাম। সঙ্গে জুটল আমার বন্ধু নিউইয়র্কের রবার্ট ভ্যান অইক্। সে অর্ধেক খরচ দেবে। তাতে আমার সুবিধাই হল। এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ডে, আফ্রিকায় এক বছর পড়াশুনো করে বুঝলাম লেক রুডল্‌ফের উত্তর-পশ্চিম নিউবারি নদীর একটা জায়গার পর তারা নিখোঁজ। মনের মতো অভিযান। খাসা এক সাফারি ঠিক করলাম। দুজন শ্বেতাঙ্গ শিকারীও পাওয়া গেল; আফ্রিকা সম্বন্ধে তাদের অজানা কিছু নেই; তার ওপর অভিজ্ঞ, দক্ষ।

নিউবারি নদী পর্যন্ত চমৎকার এলাম। তারপর দেখি গ্রামের সংখ্যা খুবই কম, নিগ্রোরাও যেন কি রকম ভীতু। তারা আমাদের লোকদের এমনি ভয় দেখাল যে এরাও রাতারাতি ভেগে পড়ল। বাকি রইলাম বব আর আমি আর ঐ দুই শিকারী স্পাইক আর ট্রল্। এই সময় থেকে আমাদের মনে কেমন একটা ভয় পাওয়া, চমকে ওঠা ভাব ধরল। অথচ বব্ আর আমি এর আগেও প্রাণ হাতে করে, নানা বিপজ্জনক জায়গায় ঘুরে এসেছি। দেখতে পাচ্ছি না কিছু, অথচ কেমন গা শিরশির করছে। সবাই মিলে স্থির করলাম রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরেই যাই। লোক নেই, কাজেই কিছু নেব না। খালি রাইফল্, রিভলবার, অ্যামিউনিশন আর খাবার, ব্যস্!

রাতে এত সব স্থির করে, সকালে কিন্তু ফেরার পথ না ধরে, কোনো কথা না বলে চারজনে উজানেই চললাম। আমি টের পাচ্ছিলাম উল্টো কাজ করছি, তাই জোর করে পা দুটোকে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্ট করেছিলাম। কিন্তু পারছিলাম না, মনে হচ্ছিল আমার চেয়েও শক্তিশালী কিছুতে আমাকে চালাচ্ছে।

মাইল পাঁচেক যাবার পর দেখি পথে সাদা চুলদাড়ি একটা লোক পড়ে আছে। অথচ তার বয়স পঞ্চাশের নীচে, তা-ও বোঝা যাচ্ছিল। শরীরে কিছু দোষ দেখলাম না, কিন্তু মনে হল সে মরতে বসেছে। খালি বলে 'ফিরে যাও। এই ক'জন কিছুই করতে পারবে না। ওরা তোমাদের পেয়ে বসবে। কিছুতেই পালাতে দেবে না। আমাকেও দেয়নি কুড়ি বছর ধরে। এখন যদি বা সুযোগ পেলাম, মরতে বসেছি। ঐ লোকটার শক্তিতে সব হচ্ছে। মস্ত বাহিনী নিয়ে এসে তাকে মেরে ফেল। সব শক্তি একা ওরি হাতে।'

আমি বললাম 'কে সে?'

—'জায়কা। ওঝা, জাদুকর যাই বল, হয়তো স্বয়ং শয়তান। মেয়েটাকেও শয়তানী বিদ্যা শেখাচ্ছে।'

—'কিন্তু তুমি কে?'

—'আমি মাউন্টফর্ড।'

তারপর হীরেটার কথাও বলল। তারপর কেমন যেন চিন্তাগুলো গুলিয়ে যেতে লাগল। শেষ কথা বলল, 'মেয়েটাকে বাঁচাও। মাফকাকে মেরে ফেল।' এই বলে চোখ বুজল।

ফিরে যাবার ক্ষমতা ছিল না আমাদের। গেলাম কাজিদের দেশে। কোন মেয়ে-বন্দী দেখলাম না। মাফকাকেও দেখলাম না। প্রাচীন এক দুর্গে থাকে সে। এদেশী দুর্গ নয়। মনে হয় ক্রুসেডাররা করেছিল। একটামাত্র প্রবেশপথ, সেখানে ষণ্ডা ষণ্ডা কাজি মেয়ে-যোদ্ধা পাহারা দেয়। ঐ বাড়িতে হীরেটা আর জাফ্‌কা থাকে। রানীও ঐ বাড়িতেই থাকে। কাজিরা বলে রানীর, এমনকি জাফকারো সব শক্তি ঐ হীরে থেকে পাওয়া। সবাই ওটাকে ঘাঁটে। রানীকে দেখেছি। অতি সুন্দর দেখতে। কিন্তু দুটো উল্টোরকম ব্যক্তিত্ব ওর। একটা কোমল, দয়ালু, মিষ্টি। একটা হিংস্র, নিষ্ঠুর। ওর নাম গনফালা। হীরের নাম গনফাল। গনফালাই আমাকে পালাতে সাহায্য করেছিল। পরে হয়তো মাফকাকে বলেও দিয়েছিল, নইলে আমার এ দশা হবে কেন?'

—'দলের অন্যদের কি হল?'

—'সবাই বন্দী। নিরাপদেই থাকবে ওরা। কাজিরা ওদের বিয়ে করবে। কালো লোক এলে ওরা মেরে ফেলে। কারো কালো ছেলে হলে তাকে মেরে ফেলে। এখানে অন্য পুরুষ নেই, যোদ্ধারাও মেয়ে। ছয় মাস হল আমরা এসেছি। যে যা চাই পেয়েছি। বব চায় অ্যাড্‌ভেঞ্চার, আমি চাই ভ্রমণ-কাহিনীর তথ্য। স্পাইক আর ট্রল চেয়েছিল হীরে, তার বদলে একেক জনের সাতটা করে বিয়ে-করা স্ত্রী হয়েছে। গনফালাই শ্বেতাঙ্গদের বৌ ঠিক করে, হীরের সামনে বিয়ে দেয়।

আমাদের সঙ্গে অনেক গল্প করে; বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে অশেষ কৌতূহল। বড় মিষ্টি, কিন্তু বড় নিষ্ঠুর। তবু আমি ওকে ভালোবাসি। ও-ও হয়তো আমাকে ভালোবাসে, কিন্তু রানীর বিয়ে করার নিয়ম নেই। মাফকা যদি আমাদের ভালোবাসার কথা জানতে পারে, আমাদের মেরে ফেলবে। ভেবেছিলাম সৈন্য এনে বন্ধুদের আর পারলে গনফালাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব। সে-ই আমাকে পালাতে সাহায্য করেছিল।'

*

টারজান বলল, 'এবার কি করবে ভাবছ?'

স্ট্যানলি উড্‌ লোকটা সম্বন্ধে তার ভালো ধারণা হয়েছিল। তার কাহিনীও সত্যি বলেই মনে হয়ছিল। এবার সে অদ্ভুত কথা বলল, 'আমি তো ইচ্ছামতো কাজ করতে পারি না। মাফকা সব করায়। সন্ধ্যা থেকে একটা অদৃশ্য শক্তির প্রভাব টের পাচ্ছ না? যেমন আমাদের অলক্ষ্যে কেউ আমাদের দেখছে।'

টারজান বলল, 'এখানে এসে অবধি অনেক কিছু দেখলাম, শুনলাম, কিন্তু কোনোটাই মাফ্‌কা নয়। ভয় নেই।'

—'তুমি তাকে চেন না।'

—'আফ্রিকা চিনি। নিজেকে চিনি।'

—'তুমি দেখছি সাক্ষাৎ টারজান!'

টারজান বুঝতে পারল কথাটা ঠাট্টা করে বলছে। উড্‌ হঠাৎ বলল, 'তুমি জাফকার চর নও তো? কি নাম তোমার?'

—'জন ক্লেটন। ধরে নিচ্ছি তুমি এখান থেকে গিয়ে সাহায্য এনে বন্ধুদের মুক্ত করতে চাও।'

—'নিশ্চয়। কিন্তু এখন আর তা হবে না। মাফকা আর গনফালা যেতে দেবে না।'

টারজান বলল, 'এখনি তোমাকে বহির্জগতে নিয়ে যেতে পারছি না। আমার লেক টানাতে কাজ আছে। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার। অনেক অভিজ্ঞতা হবে, কিন্তু সে বিষয়ে লিখতে পাবে না। কি বল?'

স্ট্যানলি উড্‌ তাতেই রাজি। তবু তার অদৃশ্য শক্তির ভয় যায় না। টারজান বলল, 'এবার ঘুমনো যাক। সকালে উঠে রওনা হব।'

টারজান কাছে থাকলে সাহস পায় উড্। তার পাশে শুয়ে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল। টারজান অনেকক্ষণ জেগে শুয়ে মাফকার আর হীরের অদৃশ্য ক্ষমতার কথা ভাবল। তারপর সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে তাকে পাশে না দেখে স্ট্যানলি ভাবল, লোকটা সরে পড়েছে। মিছিমিছি অচেনা লোকের ভার নেবে কেন? সত্যি সত্যি মাফকার লোক নয় তো? মাফকাকে দেখেনি সে। মনগড়া একটা চেহারার কথা ভাবে। বুড়ো, কুৎসিত নিগ্রো, কুঁজো, চামড়া কোঁচকানো, ছুঁচলো করা হলদে দাঁত, কাছাকাছি বসানো লাল চোখ।

এমন সময় গাছের ডালে শব্দ হল। হরিণ শিকার করে টারজান ফিরেছে। উড্ তো অবাক!

—'কি দিয়ে মারলে?'

—'কেন, ছোরা দিয়ে।'

—'কাঁধে করে নিয়ে এলে? টারজানের চেয়ে তুমি কম যাও না।'

তারপর পেট ভরে খাওয়া হলে, টারজান বলল, 'কিছু মাংস কেটে সঙ্গে নেওয়া যাক। আবার কবে জুটবে কে জানে। বাকিটা ডাঙো উঙো খাক।'

—'তারা কে?'

—'হায়না আর শেয়াল।'

—'ও আবার কোন ভাষা?'

—'মানুষের ভাষা নয়।' উড্ চুপ।

ক্রমে ওরা মাফা আর নিউবারি নদীর সামনে এল। এখানে মাফানদীর সরু খাতের পাশে কাজি দেশের পথ। সেখানে পৌঁছে উডের পা আপনা থেকে সে দিকে চলল। সে ডেকে বলল, 'উপায় নেই, ভাই। আমাকে এ পথে যেতেই হবে। তুমি পার তো চলে যাও।'

টারজান বলল, 'তুমি সত্যি আমার সঙ্গে যেতে চাও?'

—'চাই, কিন্তু পারছি না।'

টারজান তাকে টপ করে কাঁধে ফেলে নিউবারি নদীর পথ ধরল। তার কোনো কথায় কান না দিয়ে, টারজান উত্তর দিকে চলল। সে যে উডের কথা অবিশ্বাস করছিল, তা নয়। ওখানে নাকি পঞ্চাশ জন শ্বেতাঙ্গ বন্দী আছে। কেউ কেউ বহু দিন আছে। মাফকা না থাকলে হয়তো তারা বেরোবার চেষ্টা করত। তবে কাজিরাও মস্ত যোদ্ধা। এই সব বকে যাচ্ছিল উড।

টারজান জানতে চাইল, কার সঙ্গে যুদ্ধ করে? উড্ বলল পুব দিকে জুলি বলে আরেকটা জাত আছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এক সময়, দুজনে একই দলে ছিল। তাদের দুজন ওঝা ছিল। একজন হল মাফকা, অন্যজন উরা। দুজনে বনত না। তাই দুটো দল হয়ে গেল। আগে যখন একটা দলই ছিল, তাদের দুটো মণি ছিল। একটা গনফাল; অন্যটা সবুজ পাথর, হীরেটার সমান বড়। দুটো এক জায়গায় থাকলে, তাদের অসীম শক্তি বোঝা যায়। আলাদা করে শক্তিটা একটু কমেছে। উরা সবুজটা নিয়ে ভেগেছে! দুই দলই দুটো মণির অধিকারী হতে চায়, তাই যুদ্ধ হয়।

এক ঘণ্টা পরে উড্কে নামিয়ে দিয়ে টারজান বলল, 'এবার বোধ হয় নিজেই চলতে পারবে।'

দুজনে উত্তরে হাঁটতে লাগল। উড একবার ফিরে উল্টোদিকে ছুটেছিল, টারজান ওকে ধরে আনল। লোকটা চলে গেলেও ওর আর কি? কিন্তু ইচ্ছা করে তো আর যাচ্ছে না। মাফকা ওকে বাধ্য করছে। তা তো হতে পারে না। তাই ধরে আনা। উড নিজেও বুঝতে পারছিল কেউ তাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে অসহায়। রাতে ওরা নিউবারি নদীর ধারে শুল। সকালে উঠে টারজান দেখল উড তার পাশে নেই।

*

উডের চলে যাওয়াতে মাফকার জাদুবিদ্যা বিষয়ে টারজান নিঃসন্দেহ হল। তার চতুর বুদ্ধি দেখে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাও হল। সাত পাঁচ ভেবে নিজের কাজ স্থগিত রেখে টারজান উডের পাছু নিল। তবে নদীর তীর ধরে না গিয়ে পুবদক্ষিণের পাহাড়ে জায়গার দিকে চলল। ঐ পাহাড়ই কাজি দেশের স্বাভাবিক প্রাচীর। পথে গভীর খাদ আর উঁচু খাড়াই পড়ল, তাই তিন দিন সময় লাগল, মাফা নদীর উৎসের কাছে পৌঁছতে। সেখান থেকে কাজি নগর এক দিনের পথ।

টারজান জানত মাফকা তার আগমনের আশায় থাকবে। এ বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহই ছিল না যে মাফকা তার গতিবিধি ভালো করেই জানে। তা সেটা তার গুপ্তচরের সাহায্যেই হক, বা মানসিক ক্ষমতার জন্যেই হক।

তৃতীয় দিনে একটা উঁচু শিখর থেকে দেখল অনেক নিচে সরু কিন্তু দুরন্ত মাফা নদী বয়ে যাচ্ছে। আরো দূরে দেখতে পেল পাহাড়ের গায়ে একটা ফাঁক। ঐ বোধ হয় নাফার

গিরিপথ। তাহলে ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা কাজি আর জুলি দেশের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত মাফার উৎসের কাছেই হবে। পশ্চিম থেকে বাতাস বইছিল। বনের আর বন্য জন্তুর গন্ধ আসছিল নাকে। কিন্তু পুব দিকের টিলার পিছন থেকে তাকে যে কেউ দেখছে, তা সে টের পেল না।

বারোজন জংলি চেহারার যোদ্ধা ছিল সেখানে। সাতজন শ্বেতাঙ্গ, পাঁচজন কালো। জানোয়ারের ছাল পরা, তীর-ধনুক, বেঁটে বল্লম হাতে। পিঠে মোষের চামড়ার ছোট ঢাল ঝুলছিল। হাতে, পায়ে, গলায় গয়না পরা। টারজান নদীর ধারে গিয়ে জল খেল। সঙ্গে একটু মাংস ছিল, তা-ও খেল। ওরা আড়াল থেকে দেখল। ওদের পাণ্ডা একজন বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ। তাকে অন্যরা ডাকছিল লর্ড বলে।

আগের রাতে বুনো জন্তুর জ্বালায় টারজানের ঘুম হয়নি। তাই টিলার গায়ে, একটা ঝোপের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল বেলা পড়ে এলে। চোখ চেয়ে দেখল তার নিরস্ত্র শরীরের ওপর বল্লম বাগিয়ে এক দল লোক ঘিরে আছে। লর্ড প্রথম কথা বলল, 'তাহলে ধরেছি তোমাকে, কাজি!' তার চেহারা দেখে ব্রিটিশ মনে হলেও, ঐটুকু বলতেই ইংরেজি, গালা এবং আরো গোটা চারেক ভাষা ব্যবহার করল। টারজান উঠে দাঁড়ালে লোকটা ইংরেজিতে বলল, 'ওর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাও। বেশ অদ্ভুত আছে।'

ব্যাটা তাহলে ইংরেজ। টারজান বলল, 'তুমি কে? কে বলেছে আমি কাজি?'

সে বলল, 'যে বলেছে আমরা জুলি।'

একজন অনুচরকে বলল, 'ওর হাত দুটো পিছনে বাঁধো।'

ওকে ওরা পাহাড়টার অন্য দিকের ঢাল দিয়ে নামাল। প্রথম দিকে পথটা খুব খাড়া, পরে ঢালু হয়ে এল। খাদ থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে দেখল দূরে একটু মিটমিটে আলো। একটা গ্রামের বেড়ার ভিতরে আগুন জ্বলছিল।

লর্ড ডাক দিতেই ফটক খুলে গেল। ওরা ঢুকলে গ্রামসুদ্ধ সবাই বেরিয়ে এল! অনেকেই শ্বেতাঙ্গ। মেয়েরা প্রায় সকলেই তাই। তারা চ্যাঁচাতে লাগল, 'তুমি এবার মরবে, কাজি।'

একজন মেয়ে বলল, 'বড়ই দুঃখের কথা লোকটা কাজি। নইলে কি খাসা স্বামী হত বল দিকিনি।'

—'উরা কি ওকেও সিংহের সামনে ছেড়ে দেবে?'

—'না, না, অমন মাথা যার, তাকে সিংহের সামনে ছেড়ে দেবে না কখনো।'

প্রধানের ঘরটা বেশ বড়। তার সামনে মেয়ে-যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে। কাজি বন্দী আনা হয়েছে শুনে, যোদ্ধাদের দলপতি একজনকে বলল, 'উরাকে বলে এসো একজন কাজি বন্দী এনেছে।'

একটু বাদে সে ফিরে এসে বলল, 'লর্ডকে বলেছে বন্দী নিয়ে যেতে।'

টারজান ইচ্ছা করেই এতক্ষণ গালা ভাষায় কথা বলছিল। একবারো বলেনি যে ও কাজি নয়। তার কারণ ওর অদম্য কৌতূহল।

ও ভাবছিল কাজিদের শত্রুদের কাছ থেকে হয়তো এমন কিছু জানা যেতে পারে, যার সাহায্যে বন্ধুদের উদ্ধার করা সহজ হবে। একটা আধা অন্ধকার হল-ঘরে ঢুকল ওরা। তার দুদিকে চামড়ার পরদা ঝোলানো দরজা। কয়েকটাতে মেয়ে গার্ডরা নিচু খাটিয়াতে শুয়ে বসে আছে, কয়েকটা মাটিতে বসে কি যেন খেলছে। দেয়ালে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলছে। ঘরের অন্য মাথায় বিশাল এক দরজা! ওরা আসতেই দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে একটা মস্ত ঘর; তার অন্য ধারে মঞ্চের ওপর সিংহাসনে কে বসে আছে। দেয়ালে ভালো ভালো চামড়া, রেশম, সুতির কাপড়, গালচে ইত্যাদি ঝুলছে। হয়তো লুটের মাল। তাছাড়া মানুষের শুকনো মাথা, চুল দিয়ে ঝুলে আছে। সিংহাসনে বসা উরা।

সে কি বিকট চেহারা। ঝাঁকড়া চুলো এই বড় মাথা, শুঁটকো শরীর, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, পরণে জানোয়ারের ছাল। শুকনো মুখের চামড়া হলদে; তার ভিতর দিয়ে যেন খুলির হাড় দেখা যাচ্ছে। চোখদুটো নরকের আগুনের মতো জ্বলছে। এই হল উরা। সামনে টেবিলের ওপর প্রকাণ্ড একটা পান্না ঝিকমিক করছে। তার ভুতুড়ে আলো প্রদীপের আলোর সঙ্গে মিশে গেছে। উরা নিগ্রো নয়। তবে চীনেও হতে পারে। যে কোনো দেশের-ও হতে পারে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, হতাশার সুরে উরা বলল, 'দাদা কেমন আছে?'

—'তাকে তো আমি চিনি না।'

—'তুমি কাজি হয়ে সেই পরম জোচ্চোর, মিথ্যাবাদী, অকৃতজ্ঞ খুনেটাকে চেনো না?'

—'আমি তো কাজি নই। আমার একজন লোক নিখোঁজ হয়েছে, তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

উরা রেগে গিয়ে লর্ডকে বলল, 'তবে যে বললে কাজী ধরেছে ?'

—'যেখানে ধরেছিল, সেখানে আর কেউ তো যায় না।'

—'তুমি একটা নিষ্কর্মা। এ্যাই, লর্ডকে বন্দী কর।'

টারজানের দিকে ফিরে উরা বলল, 'কাজি না হলেও, মফকার চর তুমি, তাতে সন্দেহ নেই। এ্যাই, এটাকেও বন্দী কর। দুজনেই মরবে।'

*

উরার বাড়ির দোতলার ঘরে দুজনে বন্দী হল। ছোট ঘর, তার একটামাত্র জানালা, তাতে কাঠের শিক দেওয়া। গার্ড দরজা বন্ধ করে চলে গেলে, টারজান জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল একটা উঁচু পাঁচিল ঘেরা উঠোন। সেখানে খানিকটা ছায়া দেখা গেল। গন্ধ থেকে টারজান বুঝল কিসের ছায়া। লর্ডকে বলল, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই বলতাম আমি কাজি নই আর তুমিও এই বিপদে পড়তে না।'

লর্ড মাথা নাড়ল, 'পড়তাম ঠিক-ই। উরা আমাকে দেখতে পারে না, ভয় পায়। কাজি দেশের চেয়ে এখানে পুরুষদের প্রাধান্য বেশি। আমাদের সশস্ত্র যোদ্ধা হতে দেয়। এখান থেকে পালাতে হলে কাজি দেশ দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। উরা শুনেছে এক দল বিদ্রোহী সবুজ পাথর চুরি করে, তাই দিয়ে কাজিদের ঘুষ খাইয়ে, পালাবে। ও ভাবে আমি এ দলের পাণ্ডা। যাদের সন্দেহ করে, সবাইকে একে একে নানা অছিলায় সরাবে।'

টারজান বলল, 'তুমি বোধ হয় ইংরেজ ?'

—'তাই তো ছিলাম। এই জঘন্য দেশে কুড়ি বছর আছি। আগে কাজিতে, এখন এখানে। আজকাল এ জাতের রংটা প্রায় সাদাই হয়ে গেছে, তাই শ্বেতাঙ্গ ধরে বিয়ে করার দরকার নেই। হঠাৎ যদি কারো কালো সন্তান হয়, তাকে মেরে ফেলে। তাছাড়া জুলিতে তরিতরকারি ফলের কিছু অভাব আছে। এখন আর জনসংখ্যা বাড়লে চলবে না। তাই উরা ঝপাঝপ শ্বেতাঙ্গও মারছে! এরা বলে মাফকা উরা অবিকল এক রকম দেখতে, জমজ ভাই, চিরকাল এখানে ছিল। আমার বিশ্বাস বহুকাল আগে কলম্বিয়া থেকে ঐ পান্নাটা চুরি করে নিয়ে এসেছিল দুজনে। হীরে কোথায় পেল জানি না। তবে ওদের যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে, সেটা সত্যি। সে ক্ষমতা নাকি পাথর দুটোর ওপর নির্ভর করছে। পাথর গেলে ক্ষমতাও যাবে। তাই এত ভয়। আমার মৎলব ছিল উরাকে মারব। তা আর হল না। নিজেই সিংহের পেটে যাব। তোমাকেও মেরে ফেলবে। উরা তোমার মগজ খেতে চায়। সাহসী লোকের মগজ খেলে সাহস বাড়ে, তাই এদের বিশ্বাস।'

টারজান বলল, 'সিংহও তোমাকে খাবে না আর উরাও আমার মগজ খাবে না।'

—'কি করে বলছ ? পালাব কি করে ? জানালার নিচে প্যান্থার!'

—'জানালা বানিয়েছে কি বোকার মতো দেখেছ ?'

এই বলে একটানে টারজান জানলা খুলে আনল। দুটো মোটা শিক তুলে, একটা লর্ডকে দিল, একটা নিজে নিল। 'এই তো বেশ অস্ত্র হল।'

খুব শব্দ হয়েছিল, কিন্তু প্যান্থারটা ছাড়া কেউ সাড়া দিল না। সেটা ওপরে তাকিয়ে গর্জাতে লাগল। টারজান বলল, 'শহর থেকে বেরোতে পারলে তুমি পালাতে পারবে ? নাকি মাফকার মতো উরাও জাদুর জোরে আটকে রাখবে ?'

—'সেই তো মুশকিল। তাই তো ওকে মেরে ফেলা দরকার।'

—'মেয়েরা কি বলে ?'

—'তারা কেউ উরাকে দেখতে পারে না। কিন্তু বেজায় ভয় পায়।'

—'ও মলে কি হবে ?'

—'সব সাদা কালো বন্দীরা মেয়েদের সঙ্গে এক জোট হয়ে বাইরের জগতে যেতে চেষ্টা করবে। জুলি মেয়েরা যে যার নিজের আলাদা স্বামী চায়। এখানে দশ-বারো জনের একজন স্বামী।'

—'ওরা উরাকে মেরে ফেলে না কেন ?'

—'ওর অলৌকিক ক্ষমতাকে ভয় পায়! শুধু যে মারবে না তা নয়, আর কেউ মারতে গেলে বাধা দেবে।'

—'উরা কোথায় শোয় ?'

—'ওর সিংহাসনের পিছনের ঘরে। কেন ? তুমি কি— ?'

—'আমি ওকে মারব। আর তো উপায় দেখি না।'

—'পারবে না। প্রায় ভগবানের মতো ওর শক্তি। কেনই বা এ ঝুঁকি নিতে চাও ?'

—'আমার দেশের একজন কাজিদের বন্দী। জুলিদের সাহায্যে তাকে ছাড়াতে পারি।'

—'সভা-ঘরের ভিতর দিয়ে ছাড়া ওর ঘরে যাওয়া যায় না ?'

—'আছে পথ। কিন্তু তুমি যেতে পারবে না। এই উঠোনের দিকে একটা জানালা আছে। সেটাতে পৌঁছতে হলে উঠোন পেরোতে হবে।'

—'জানালা ভাঙতে গেলে তো শব্দ হবে।'

লর্ড বলল, 'ওর জানালায় শিক নেই।'

—'প্যান্থার ওকে মারে না কেন?'

—'তাকেও জাদু দিয়ে বশ করে রেখেছে।'

—'উরার বিষয় কি জান বল।'

—'একা থাকে। কাউকে ঢুকতে দেয় না। দেয়ালের ফোকর দিয়ে সকালের খাবার দেওয়া হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে ওঠে। তিনটে ঘর ওর। ব্রেকফাস্ট খাবার এক ঘণ্টা পরে ঘরে যায়। নালিশ, আবেদন, সব শোনে। কোথায় কি কাজ হবে, শিকার হবে, লুঠপাট করা হবে সব বলে দেয়। তারপর ঘরে যায়; রাতের খাবারের সময় সভা-ঘরে আসে।'

সব শুনে টারজান বলল, 'বাঃ, আমার এতে সুবিধাই হবে।'

—'প্যান্থারের ব্যাপারটা ছাড়া।'

—'দেখা যাক।'

ততক্ষণে প্যান্থার আবার দেয়ালের কাছে গিয়ে শুয়েছিল। টারজান জানালার ভিতর দিয়ে একটা ঠ্যাং গলিয়ে দিল।

—'ও কি? নামবে না আশা করি?'

—'নামব না কেন? নইলে উরার ঘরে যাব কি করে? প্যান্থার তো ঘুমোচ্ছে।'

—'জেগে যাবে।'

কোনো কথা শুনল না টারজান, নিচে নেমে গেল। লর্ড নিশ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগল। অর্ধেকটা পথ পেরিয়েছে, এমন সময় প্যান্থার জেগে গেল। টারজান তার দিকে এক লাফ দিল, সে-ও তেড়ে এল।

*

নিঃশব্দে ছুটে এল প্যান্থার। টারজান জানালার শিকটা তুলে পাঁই পাঁই করে ঘোরাতে লাগল। তারপর প্যান্থারের লাফের সঙ্গে সঙ্গে মাথায় বাড়ি লাগল। প্যান্থারের খুলি আর লাঠি এক সঙ্গে ভাঙল। নিচের আরেকটা জানালা থেকে এক জোড়া চোখ জ্বলজ্বলে চোখে সবটাই দেখল। টারজান উরার জানালার কাছে গিয়ে উরার গন্ধ পেল, চটি পায়ে হাঁটার আর একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দও শুনল। তাহলে উরা সব দেখেছে! টারজান নিঃশব্দে জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল। সে-ঘরে কেউ নেই দেখে নিঃশব্দে দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ল। উরার গলা শোনা গেল, 'তুমি দেখতে পাচ্ছি আমরা যেমন ভেবেছিলাম, তার চেয়েও আগে, এবং আরো বেশি কষ্টকর মৃত্যু বরণ করবে।'

শত্রুকে ফাঁদে ফেলতে পেরে, উরার সব রাগ পড়ে গেল। সে বলল, 'এইভাবে কিছু দিন রাখব তোমাকে। তোমার সামনে খাবদাব। তুমি বসে বসে দেখবে। খুব কষ্ট দিয়ে মারব তোমাকে। আমার একমাত্র ভালোবাসার জিনিস ঐ প্যান্থারটাকে তুমি মেরেছ বলে।' তারপর একটা লোহার ডাণ্ডা এনে ছোট আংটার আগুনে গনগনে গরম করে তুলে বলল, 'প্রথম কাজ চোখ দুটোকে জ্বালিয়ে দেওয়া। যাতে নিজের কষ্ট নিজেকে দেখতে না হয়।'

টারজান একবার জালের দড়িগুলো পরীক্ষা করে দেখল। উরা বলল, 'হাতিতেও ও দড়ি ছিঁড়তে পারবে না।'

কাছে এসে লোহাটা তুলে ধরে চোখে খোঁচা দেবার চেষ্টা করল দুবার। দুবার-ই টারজান ওর হাত ঠেলে দিল। হাতে একটু ছ্যাঁকা লাগল, ঐ পর্যন্ত।

তার পর উঠে গিয়ে হাত বাঁধবার জন্য একটা দড়ি নিয়ে এসে ফাঁস-গেরো দিয়ে উরা আচ্ছা করে ওর গায়ের সঙ্গে হাত দুটোকে বেঁধে ফেলল। তারপর বিশ্রী করে হেসে বলল, 'আগে ডান চোখটা।'

ঠিক সেই সময় টারজানের পিছনের দরজা খুলে মোটা শিকটাকে হাতে নিয়ে লর্ড লাফিয়ে ঢুকল। তাই দেখে উরা ভয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, দয়া ভিক্ষা করতে লাগল, গরম লোহা দিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগল। শিকের এক বাড়ি দিয়ে লর্ড উরার মাথা চৌচির করে ফাটিয়ে দিল। এবার একটা ছুরি এনে দড়িদড়াগুলো কেটে দিল। তারপর দুজনে মিলে ঘরগুলো পরীক্ষা করল, শিশি, বোতল, উনুন, টেস্ট টিউব, প্রেত-তত্ত্ব আর জাদুবিদ্যার বই, একটা স্ফটিকের গোলক। কিন্তু সবার সেরা ঐ অপূর্ব সবুজ পাথর।

লর্ড বলল, 'পাথরটা নিয়ে চলে যাই। কেউ কিছু টের পাবার আগে।'

—'আর তোমার বন্দী বন্ধুরা?'

—'ওরা হলেও পালাত।'

—'কাজিদের দেশের মধ্যে দিয়ে কি করে যাবে? মাফকার ক্ষমতা যতটা বুঝলাম, উরার চেয়েও বেশি। আমি বরং আগে গিয়ে, তাকে ঘায়েল করি।'

—'আমিও সঙ্গে যাই ?'

—'না। ওর বশীকরণ প্রভাবে পড়লে তো মুশকিল হবে।'

টারজান পান্নাটাকে একটা পরদার টুকরোয় জড়াচ্ছে দেখে লর্ড বলল, 'ও কি করছ ?

—'ওটা থাকলে মাফকার সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হবে।'

লর্ড চটে গেল, 'আমাকে কি বোকা পেয়েছ ?'

টারজান বলল, 'বাধা দিও না। দেখলে তো চিতা-বাঘের কি অবস্থা হল। এটার সাহায্যে বন্ধুদের মুক্ত করব। তারপর ওটাতে আমার কোনো লোভ নেই। আমার যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে।'

লর্ড চটল, কিন্তু বাধা দেবার চেষ্টা করল না। ন্যাকড়া দিয়ে মণিটা পুঁটলি বেঁধে টারজান কোমরে ঝুলিয়ে নিল। ছুরিটা গুঁজে বলল, 'আমি এখন যাচ্ছি। একদিন পরে যারা যেতে চায়, সকলকে নিয়ে তুমিও এসো। আমার কাজ সেরে, নিউবারি আর মাফানদীর সঙ্গমের কাছে মণিটা পুঁতে রাখব। তিন সপ্তাহ পরে মণিটা জুলিদের ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

—'জুলিদের দেবে ? তাতে আমার কি লাভ ?'

—'যেই নিক, আমার কিছু এসে যায় না। তুমিই তো বলেছিলে দল বেঁধে কাজ করবে।'

টারজান জানালা দিয়ে উঠোনে বেরিয়ে গেল। লর্ড ছুটল গার্ডদের খবর দিতে। তার অন্য মতলব।

*

লর্ড রক্ষীদের বলল, 'ঐ কাজিটা উরাকে মেরে মণি নিয়ে পালিয়েছে '

অমনি পাঁচ সাতজন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'উরা মরে গেছে !' তারপর সুখবরটা ঘোষণা করবার জন্য ছুটল বাইরে। সেখানেও সকলে আহ্লাদে আটখানা। লর্ড যতই বলে, 'মণিটাও নিয়ে গেছে !' তারা কান দেয় না। টারজান ততক্ষণে কিছু দূর এগিয়েছিল, কোলাহল শুনে ব্যাপারটা আঁচ করে নিল। টারজান যে-পথে এসেছিল, সেই পথেই তাড়াতাড়ি চলল। পিছন পিছন চলল জুলি যোদ্ধারা, তাদের সাদা স্বামীরা আর কালো দাসরা। ততক্ষণে লর্ড তাদের বুঝিয়েছিল যে মণিটা বেচে তারা সভ্য জগতে সুখে থাকতে পারবে। ও লোকটা সেটা নিয়ে পালাচ্ছে, তাই ওরা রেগেমেগে ছুটে চলেছিল।

যতই এগোয় টারজান, মনে হয় সঙ্গে কেউ বা কিছু আছে। জানে কিছু নেই, তবু মনে হয়। তার কোনো শব্দ নেই, গন্ধ নেই, তবু যেন সে আছে। হঠাৎ মনে হলো এ হল সবুজ মণির প্রভাব। এর-ই জোরে উরার অত ক্ষমতা হয়েছিল। সঙ্গে থাকলেই কি অধিকারী ক্ষমতা পায় ? অমনি সে মন ঠিক করে ফেলল। পথের ধারে বিশাল এক পাথরের পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

কিছু পরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে জুলিরা তাকে ছাড়িয়ে গেল। সবার আগে লর্ড। তার পিছনে জনা পঞ্চাশ পুরুষ, বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ; তার পিছনে শ চারেক মেয়ে-যোদ্ধা। টারজান মনে মনে তাদের বলতে লাগল, 'ফিরে যাও! ফিরে যাও। গ্রামে গিয়ে অপেক্ষা কর!' তারা তবু এগিয়ে যেতে লাগল।

মণিটাকে চামড়ার মোড়ক থেকে বের করে হাতে নিতেই হাতটা চিন চিন করে উঠল। কেমন মনে হল শরীরে একটা নতুন শক্তির সঞ্চার হচ্ছে। আবার মেয়েদের মনে মনে ডাকতে লাগল। থমকে দাঁড়াল কয়েকটা মেয়ে। একজন পুরুষ বলল, 'কি হল ?

—'আমি ফিরে যাচ্ছি।

—'কেন ?'

—'তা জানি না। ফিরে যেতেই হবে। উরা ডাকছে।

সব মেয়েরা ফিরে চলল। লর্ড বলল, 'যাক গে।' বলে দাঁড়িয়ে রইল। পুরুষরা দোমনা করছে দেখে, লর্ড বলল, 'চল। যত কম লোক, ভাগের টাকা তত বেশি।'

—'মণি তো এখনো পাইনি।'

—'একটু পরেই পাব। সে একলা, আমরা পঞ্চাশ জন। চল, এগোই।

কেউ এগোয় না।

—'চল।'

—'তুমি যাচ্ছ না কেন ?'

—'তোমরাই বা যাচ্ছ না কেন?'

—'পারছি না যে।'

সবাই দাঁড়িয়ে রইল। মণি হাতে টারজান বেরিয়ে কাছে এসে বলল, 'তোমরা পঞ্চাশ জন আমার সঙ্গে কাজি গ্রামে আসবে। আমার লোকরা সেখানে বন্দী। তাদের ছাড়িয়ে আমরা ওদেশ ছেড়ে চলে আসব। যার যেদিকে ইচ্ছা যাব।'

লর্ড বলল, 'মণিটা? আমাকে ভাগ দেবে বলেছিলে।'

—'তুমি আমাকে খুন করতে চেয়ে সে অধিকার হারিয়েছ। তোমার মতো পাপিষ্ঠের হাতে পড়লে অনেক অনিষ্ট হবে। আমার কাজ সারা হলে মণিটা নিউবারির জলে ফেলে দেব।'

লর্ড বলল, 'অত টাকার জিনিস জলে ফেলে দেবে? আসলে তোমার ওটাকে নেবার ইচ্ছা।'

টারজান বলল, 'তা তুমি যা ইচ্ছা ভাবতে পার, এখন চলতো।'

চলল সবাই কাজির দিকে। পরদিন সন্ধ্যায় একটা উঁচু জায়গা থেকে টারজান কাজি শহর আর মাফকার বাড়ি দেখতে পেল। একটা উপত্যকার ধারে খাড়া চুণা পাথরের পাহাড়, তার গা ঘেঁষে শহর।

সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে টারজান বলল, 'আমরা অনেক হেঁটেছি, সামান্য খেয়েছি। অন্ধকার হবার আগে যাওয়া ভুল হবে। এখন বিশ্রাম করা যাক।' মাটিতে একটা দাগ কেটে টারজান বলল, 'এটা কেউ পার হয়ো না!' তারপর সবুজ পাথরটার ওপর হাত রেখে টারজানও ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত হল। তখনো চাঁদ ওঠেনি, চারদিক অন্ধকার। মণিটা অন্ধকারে জ্বলছিল। লর্ড বুঝেছিল মণি থেকেই টারজানের ক্ষমতা। টারজানকে মেরে ফেলার মতলব ও ছেড়ে দিয়েছিল। আস্তে আস্তে ঘুমন্ত টারজানের পাশ থেকে মণিটাকে তুলে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

*

হঠাৎ টারজানের ঘুম ভেঙে গেল। আরো আগে ওঠা উচিত ছিল। হাতড়ে দেখে মণিটা নেই। লর্ডও নেই। ঘুমন্ত লোকরা আর তার কথা শুনবে না। টারজান লর্ডের গন্ধ শুঁকে নিউবারির উপত্যকার দিকে চলল। চলতে চলতে দূরে সবুজ আলো দেখে বুঝতে পারল ঐ যে লর্ড কাজি নগর পেরিয়ে নিউবারির দিকে চলেছে। ঠিক এই সময় টারজান চিতা ধরার ফাঁদে পড়ে গেল। সে এমন গভীর যে বেরিয়ে আসা গেল না। কাজিরা এসে তাকে কখন ধরে নিয়ে যাবে, তার অপেক্ষায় বসে রইল টারজান। সারা রাত ঐ ভাবে কাটল। পরদিন সকালে তারা এসে যখন ওপর থেকে ঝুঁকে দেখতে লাগল, টারজান লক্ষ্য করল বেশির ভাগই মেয়ে, কয়েকজন পুরুষও আছে। তারা তো ওকে দেখে অবাক!

—'এই নাকি চিতাবাঘ!'

—'মাফকা খুশি হবে!' একটা দড়ি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'বগলের নীচে বেঁধে নাও, টেনে তুলব।'

টারজান বলল, 'ও মাথাটা ধরে রাখ, নিজে উঠব।'

ওপরে উঠে এসে আটজন মেয়ে বল্লম হাতে ওকে ঘিরে দাঁড়াল। চারজন পুরুষ ছিল, তাদের হাতে বাঘ ধরার জাল। সবাই সাদা।

—'কে তুমি?'

—'শিকারী'

—'এখানে কেন?'

—'নিউবারি যাবার পথে ফাঁদে পড়ে গেছি।'

—'কি করে ঢুকলে? কাজি দেশে ঢুকবার একটামাত্র পথ, সে দিক দিয়ে তো আসনি।'

—'পাহাড়ের ওপর দিয়ে এবার এসেছি। এবার ছেড়ে দাও, চলে যাই।'

—'চলে যাই আবার কি?'

—'তুমি আমাদের বন্দী।'

—'যা বল, তোমরা আট বল্লম, আমি এক ছোরা!'

সেই ছোরাটাও নিয়ে নিল। ওরা শহরের দিকে চলল। যে কোনো সময়ে টারজান পালাতে পারত, কিন্তু তাহলে কাজ হত না।

চারজন পুরুষের একজন সুইস, একজন পোল, একজন জার্মান, একজন ইংরেজ। সবাই কাজিদের মিশ্র ভাষা বলে। ইংরেজটির নাম ট্রল্। তাহালে সে-ই উডের সঙ্গে ছিল। তার কাছে টারজান শুনল উড আবার ধরা পড়েছে। মাফকার হাত থেকে পালাবার উপায় নেই। মাফকা ওকে মেরে ফেলেনি, কিন্তু খুব চটেছে। একদল ব্রিটিশ সোলজার এলে মাফকা জব্দ হবে।

—'কেন? হীরের শক্তিতে সোলজার থামানো যাবে না?'

—'বোধ হয় না। তাই আমরা কেউ পালালে ও বেজায় ঘাবড়ায়।'

—'তাহলে উড্‌কে মেরে ফেলবে নাকি?'

—'আমাদের তাই বিশ্বাস। কারণ পালানো ছাড়াও গনফালার সঙ্গে ওর বড্ড বেশি ভাব। সেটা খুবই দুঃখের কথা, কারণ মেয়েটা নিগ্রো। এখানকার সাদাদের মধ্যেও নিগ্রো রক্ত আছে। আমার ছয়টা ঐ রকম বৌ হয়েছে।'

কাজি শহরের চারদিকের দেয়াল আর সব বাড়ি চূণা পাথর দিয়ে তৈরি। কারণ পাশের পাহাড়টাও তাই। সব বাড়ি একতলা বা দোতলা। খালি মাফকার দুর্গ চারতলা। তার গায়ে বয়সের ছাপ। মনে হল দুর্গটা আর কিছু বাড়ি বহুকাল আগে তৈরি। রাস্তায় সাদা কালো পুরুষ, মেয়ে-যোদ্ধা আর ছোট ছোট কয়েকটা মেয়ে দেখা যাচ্ছিল।

দুর্গের ভিতরটা উরার বাড়িরই মতো, তবে আরো ভালো করে সাজানো। টারজানের সঙ্গে সেখানে খালি মেয়ে যোদ্ধারা ঢুকল। একটা মস্ত ঘরে মঞ্চের ওপরে সিংহাসন। তাতে অবিকল উরার জোড়া বসে আছে। সে টারজানকে দেখে চিনতে পারল না। যোদ্ধারা রিপোর্ট দিলে মাফকা কেমন যেন অবাক হল।

—'কে তুমি?'

—'আমি একজন ইংরেজ। শিকার করতে এসেছি

—'কেন?'

—'খাবার জোগাড় করবার জন্যে।'

বুড়োর পাশে অন্য সিংহাসনে পরমাসুন্দরী এক মেয়ে বসে। এ-ই তবে গনফালা! কথা বলার সময় মাফকা তার হাত রেখে ছিল বিশাল এক হীরের ওপর। এ-ই তবে গনফাল! সুন্দর করে সেজেগুজে, চুপ করে বসেছিল মেয়েটি। ক্ষমতার প্রতীক্ সে, কিন্তু তার কোনো ক্ষমতা নেই। বুড়ো বলল, 'ওকে নিয়ে যাও।'

গনফালা বলল, 'ওর জন্য বৌ ঠিক করে দেব না?'

—'এখন নয়। ওকে একটু নজর করে দেখা দরকার।'

তারপর রক্ষী ওকে ওপরতলার একটা বড় ঘরে বন্ধ করে রাখল। দুটো বেঞ্চি ছাড়া সেখানে কোনো আসবাব ছিল না। এক দেয়ালে আলো-হাওয়ার জন্য সরু সরু জানালা কাটা ছিল। উল্টো দিকে একটা বিলিতি ধরণের মস্ত চিমনি। যাতে কখনো আগুন জ্বালা হয়েছে বলে মনে হল না। চিমনিটার ভিতরে ঢুকে ওপরে তাকিয়ে মনে হল না যে ধোঁয়া বেরোবার পথ আছে। ওটা কি তবে শুধু সাজাবার জিনিস? না কি অন্য উদ্দেশ্যও আছে।

চিমনির মধ্যে ঢুকে ওপরে হাত বাড়িয়ে ছাদ পেল না। পিছনের দেয়াল হাতড়ে আঙুলে একটা খাঁজ পেল। দুহাতে খাঁজটা ধরে ধীরে ধীরে শরীরটাকে একটা চওড়া তাকের ওপর তুলে ফেলল। তাকটা বেশ কয়েক ফুট চওড়া। আস্তে আস্তে পা দুটোও তুলে ফেলে উঠে দাঁড়াল। ছাদটা আরো এক ফুট উঁচুতে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল টারজান। কিছু পরেই একটু আলো চোখে পড়ল। নিচে একটা ফাঁক। তার নিচে ঐ রকম এক চিমনি। সেই চিমনি দিয়ে টারজান অন্য একটা ঘরে নেমে পড়ল। উল্টো দিকের জানালায় গনফালা দাঁড়িয়ে ছিল। সে কিছু লক্ষ্যই করেনি।

টারজান প্রথমেই ঘর থেকে বেরোবার দরজার খিলটা খুলে রাখল।

*

টারজান ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে, ওকে দেখে মেয়েটি অবাক হল, কিন্তু চ্যাঁচাল না। টারজান বলল, 'ভয় পেও না। আমি তোমার অনিষ্ট করতে আসিনি।'

কি করে যে টারজান এল মেয়েটি তা ভেবেই পেল না।

টারজান বলল, 'স্ট্যানলি উড্ কোথায়? আমি তার বন্ধু! তার কি হবে?'

—'তাকে এরা মেরে ফেলবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমি রানী। আমাকেই তার প্রাণদণ্ড দিতে হবে।'

—'তুমি তো একবার তাকে সাহায্য করেছিলে।'

—'আর পারব না। মাফকা জানলে দু'জনকেই মেরে ফেলবে।'

—'আমি যদি স্ট্যানলি উড্‌কে আর তোমাকে এখান থেকে পালাতে সাহায্য করি, তুমি খুশি হবে না? তবে কেন সাহায্য করবে না? আমি মাফকার সঙ্গে একলা দেখা করতে চাই। সে কোথায় বল।'

—'বলছি। সে—'

হঠাৎ গনফালার শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে উঠল। মুখের ভাব বদলে গেল। সে চ্যাঁচাতে লাগল, 'গার্ড! গার্ড! শিগগির এসো।'

টারজান দৌড়ে দরজার খিল লাগিয়ে দিল আর গনফালা একটা ছোরা তুলে ওর দিকে ছুটে এল। টারজান ওর এই হঠাৎ মেজাজ বদলের কথা জানত, তাই ওর হাতটা ধরে ফেলে অন্য পাশে একটা দরজা দেখে, সেটি খুলে, ওকে পুরে, এদিক থেকে খিল তুলে দিল। এবার এক লাফে চিমনির মধ্যে ঢুকে, সুড়ঙ্গ দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। পিছন থেকে শুনতে পেল দরজাটা ভেঙ্গে পড়ছে।

গনফালা অন্য ঘর থেকে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে আর ডাকছে। এদিক থেকে খিল খুলে দিল রক্ষীরা।

টারজান শুনতে পেল গনফালা বলছে, 'ধরেছ তাকে?'

—'কাকে ধরব? এ ঘরে তো কেউ নেই।'

—'শিগগির মাফকাকে জানাও সে পালিয়েছে।'

টারজান আর অপেক্ষা না করে, নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে বেঞ্চির ওপর বসে রইল। জনা ছয়েক যোদ্ধা-মেয়ে ঘরে ঢুকে বলল, 'কোথায় গেছিলে?'

—'কোথায় যাব?'

—'রানী গনফালার ঘরে যাওনি?'

—'কি করে যাব, বল?'

একজন মাথা নেড়ে বলল, 'এখানেই তো আছে। আবার তাই নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? মাফকা বুঝুক।'

এক ঘণ্টা পরে জনা বারো মেয়ে-যোদ্ধা ওকে লম্বা করিডর দিয়ে হাঁটিয়ে রানীর ঘরগুলো ছাড়িয়ে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেল। সে ঘরে একটা টেবিলের ওপর রক্তমাখা কাপড়ে-ঢাকা একটা কি ছিল আর মস্ত হীরেটা। তার ওপর মাফকার হাত। টারজান নিশ্চিন্ত। সে বুঝেছিল তার ওপর মাফকার কোনো প্রভাব নেই। মাফকা ভারি বিরক্ত। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, 'রানীর ঘরে কি করে গেলে?'

—'কে বলেছে গেছি?'

—'গনফালা তোমাকে দেখেছে।'

—'ও ঠিক জানে আমাকে দেখেছে? মহান মাফ্‌কা কি ওকে সেই রকম ভাবাতে পারে না?'

মাফকা বলল, 'কিন্তু আমি যে তা করিনি।'

—'হয়তো আর কেউ করেছে।'

তাহলে মাফকা গোপন সুড়ঙ্গের কথা জানে না। দুর্গের এ অংশটা নিশ্চয় মাফকার আমলের আগেই তৈরি। কিন্তু কেউ অনুসন্ধান করেনি কেন? এ ঘরেও তো সেই রকম চিমনি রয়েছে।

মাফকা বলল, 'মাফকা ছাড়া সে ক্ষমতা আর কার থাকতে পারে?' কিন্তু ওর কথায় অনিশ্চয়তার সুর। এ ঘরের পাশেই মাফকার শোবার ঘরটাও দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। মাফকা বলল, 'আমার রক্ষীদের না জানিয়ে কেমন করে জুলি গেছিলে?'

—'কে বলেছে?'

—'আমার ভাইকে মেরে, পান্না নিয়ে, এখানে আমাকেও মারতে এসছ!'

—'কে বলেছে?'

হঠাৎ রক্তমাখা কাপড়টা তুলে মাফকা বলল, 'এই লোকটা বলেছে।'

টারজান চেয়ে দেখল লর্ডের কাটা মাথা। তার পাশে সবুজ পাথরটা। তার মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন হল না। মাফকা বলল, 'এই ভাবে মাফকার শত্রুরা মরে। তুমিও মরবে। অন্য ষড়যন্ত্রকারীরাও মরবে।' তারপর যোদ্ধাদের বলল, 'একেও দক্ষিণের ঘরে অন্য দণ্ডিত বন্দীদের সঙ্গে রেখে দাও।'

টারজানকে কিন্তু তার আগেকার ঘরটাতেই নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আর কেউ ছিল না। ওরা চলে গেলে জানালা দিয়ে কাজি শহর আর কাজি উপত্যকার দিকে চেয়ে রইল টারজান। মনে একটা মতলব ছিল। কিন্তু সেটাকে কার্যে পরিণত করার আগে উডের কাছ থেকে আরো কিছু তথ্য জানা দরকার। এই সময়ে দরজা খুলে রবার্ট ভ্যান অইক, উড্, স্পাইক আর ট্রলকে ঐ ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গার্ডরা চলে গেল। উড্ তো টারজানকে দেখে অবাক!

—'তুমি এখানে কি করছ?'

—'তুমিও যা করছ। কখন মারবে তার জন্য অপেক্ষা করছি মাফকা এক্ষুণি বলল, সকলের প্রাণদণ্ড হবে।'

স্পাইক বলল, 'এই উড্ যদি গনফালার সঙ্গে ভাব না জমাত, তাহলে এসব কিছুই হত না।'

উড্ অমনি চটে গেল। ভ্যান অইক ধমক দিয়ে ওদের থামাল। উড্ও বলল, 'মন্দ বলেনি স্পাইক। আমারি ভুল হয়েছে। কি করি বল। ওকে যদি একবার দেখতে, ক্লেটন।'

টারজান বলল, 'দেখেছি।'

—'সভা-ঘরে বোধ হয়?'

—'তাও দেখেছি। পরে ওর ঘরে গিয়েও কথা বলেছি আর মেজাজ বদলানোর অদ্ভুত ব্যাপারটাও লক্ষ্য করেছি। মাফকা ওকে চাবিবন্ধ করে রাখে।'

—'আচ্ছা, ওর কি মাথার গোলমাল আছে মনে হয়?'

—'না, ঐ মেজাজ বদলের অন্য কারণ আছে। সে যাই হোক, আমাদের হাতে মোটে সময় নেই। যা করবার এখনি করে ফেলতে হবে।'

—'ঘরে বন্ধ থেকে কি করে করব?'

—'সেই তো মজা। আমরা পাঁচজন ছাড়া অন্য বন্দীরা কি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে?'

—'হ্যাঁ, প্রায় সকলে দেবে।'

উড্ আরো বলল, 'ঐ গনফলটাই মাফকার শক্তির কারণ। ওটা হাতাতে পারলে ওর ক্ষমতা চলে যাবে।'

—'পারব হয়তো।'

সকলের মতে সেটা অসম্ভব। টারজান বলল, 'উড্, তুমি না বলেছিলে গনফল বিষয়ে এরা খুব অসাবধান, যে কেউ হাত দিতে পারে? তুমিও দিয়েছ?'

উড্ হাসল, 'এবার ফিরে এসে বুঝলাম, সেটা নকল। মাফকা কেমিস্ট্রি জানে। ও সেটা বানিয়েছে আর সেটাকেই সকলের চোখের সামনে রাখে। আসলটাকে লুকিয়ে রাখে। তবু কাছে কাছেই রাখতে হয়।'

ভ্যান অইক্ বলল, 'আসলটা হাতাতে হলে, রাতে মাফকার ঘরে ঢুকতে হবে।'

টারজান বলল, 'গনফালার ঘরের পাশেই তো ওর ঘর?'

—'তা বটে। কিন্তু মধ্যিখানের দরজাটা বন্ধ রাখে। গনফালাকেও বিশ্বাস করে না।'

টারজান বলল, 'আমরা বোধ হয় মাফকার ঘরে ঢুকতে পারব। দাঁড়াও, দেখে আসি। কেউ সঙ্গে এসো না। এক্ষুণি আসছি।' এই বলে চিমনির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঐ সুড়ঙ্গটা দিয়ে গনফালার ঘরে ঢুকবার ফাঁকটার ওপারেও আরো খানিকটা এগিয়ে পর পর তিনটে ফাঁক পেল। ঐ-খানেই সুড়ঙ্গ শেষ। শেষ ফাঁকটা দিয়ে একটা সবুজ আলোর আভা আসছিল। কান পেতে গভীর ঘুমের নাক ডাকানি শুনতে পেল। ছোরা হাতে নিয়ে টারজান সেই ঘরে নেমে পড়ল।

*

ঘরটা বেশ বড়। দরজাগুলো ভিতর থেকে বন্ধ। সরু খাটে মাফকা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এক পাশের টেবিলে গনফাল আর সবুজ পাথর। তাদের পাশে একটা ছোরা, একটা তলোয়ার। অন্য পাশের টেবিলে আরো অস্ত্র। একটা প্রদীপ মিটমিট করছে। নিঃশব্দে পাথর দুটিকে আর অস্ত্রশস্ত্র সবকটি তুলে, সুড়ঙ্গের ভিতরে তাকের ওপর রেখে এল টারজান। তারপর মাফকার কাঁধে হাত রাখতেই সে জেগে গেল। টারজান কড়া গলায় বলল, 'নড় না। তাহলে তোমার কোনো ক্ষতি করব না।'

মাফকা উদভ্রান্তের মতো চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে প্রাণে মেরো না। যা চাও তাই দেব।'

টারজান বলল, 'বাধ্য না হলে আমি কোনো বুড়ো, কিম্বা মেয়ে, কিম্বা শিশুকে মারি না। আমি যা চাই তা আমি নিজেই নিই।'

মাফকাকে উপুড় করে বিছানার চাদর থেকে লম্বা লম্বা ফালি ছিঁড়ে, হাতের কব্জি, হাঁটু, পায়ের কব্জি বেঁধে ফেলল। তারপর মুখে একটা গ্যাগ্ লাগাল যাতে হল্লা করতে না পারে। মণিদুটো সুড়ঙ্গেই লুকনো রইল। টারজান গনফালার ঘরে যেতেই সে খুশি হয়ে উঠল।

—'ভাবছিলাম তুমি এলে ভালো হয়। কেন এসেছ?'

—'উড্ আর তার তিন সঙ্গীর প্রাণদণ্ড হয়েছে জান?'

—'জানি। আমিই দিয়েছি।'

—'তোমার সাহায্য পেলে ওরা পালাতে পারে।'

—'কি লাভ তাতে? মাফকা আবার ওদের টেনে এনে, আরো নিষ্ঠুর সাজা দেবে।'

—'মাফকা কিছু না বললে, মেয়েরা তোমার কথা শুনবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'পারলে তুমিও কাজি ছেড়ে চলে যাবে?'

—'যাব।'

—'কোথায়?'

—'ইংল্যাণ্ডে। একজনের কাছ থেকে অনেক স্নেহ পেয়েছি, সে এখন নেই। কিন্তু সে বলত পারলে ইংল্যাণ্ডে চলে যেও। সঙ্গে নেবার জন্য একটা চিঠিও দিয়েছিল।'

—'তাহলে চিঠিটা নিয়ে তৈরি হও। একটু পরেই সকলকে নিয়ে আসছি। কিন্তু তোমাকেও সাহায্য করতে হবে।'

তারপর নিজের ঘরে ফিরে, বন্ধুদের নিয়ে ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে আবার এগোল। মণিদুটোকে দেখে তারা হাঁ। মাফকার ঘরে নেমে তাকে ঐ রকম হাত পা বাঁধা অবস্থায় দেখে কারো মুখে কথা সরে না। স্পাইকের আর ট্রলের চোখ লোভে চক চক করে উঠল। টারজানের কথায় উড্ আর ভ্যান অইক মণিদুটোকে নিল, অন্যরা দুজন মাফকাকে তুলল। দরজা দিয়ে এ-ঘর থেকে পাশের ঘর; সে ঘর থেকে তার পাশের ঘর; এই ভাবে গনফালার ঘরে পৌঁছল।

গনফালা ব্যাপার দেখে বাক্যহত। বাকিদের মতে মাফকাকে মেরে ফেললেই আপদ চোকে। কিন্তু টারজান শুনল না। 'এরা মাফকাকে ঠাকুরপুজো করে। তাকে

মেরে ফেললে, এরা নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়বে। জীবিত অবস্থায় আমাদের সঙ্গে থাকলেই সুবিধা হবে।'

এই সময় বাইরের করিডরে একটা হট্টগোল শোনা গেল। সবাই মাফকাকে ডাকছে। টারজান গনফালাকে বলল, 'যোদ্ধাদের ডেকে জেনে নাও ওরা কি চায়। আমরা পাশের ঘরে বসছি।'

যোদ্ধাদের ডাকতে তারা বলল, 'জুলিরা যুদ্ধ করতে আসছে। তারা তাদের মণি ফেরত চায়। মাফকা ওদের দুর্বল করে দিলে, আমরা মেরে ফেলতে পারব। নইলে ওরা দলে ভারি।'

গনফালা বলল, 'মণি নেই, উরা নেই, ওরা দুর্বল হয়েই গেছে।'

তবু যোদ্ধারা মাফকাকে দেখতে চায়। গনফালা বলল, 'যোদ্ধারা গিয়ে জুলিদের মেরে ফেলুক। তারপর সভাগৃহে এসে মাফকাকে দেখতে পাবে।'

ওরা চলে গেলে টারজানের পরামর্শে গনফালা নকল হীরে চামড়া দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে এল। তারপর সভাঘরে বাঁধা অবস্থায় মাফকাকে সিংহাসনে বসানো হল। গনফাল হীরেটাকে যথাস্থানে রাখা হল। গনফালা তার সিংহাসনে বসল। বাকিরা দাঁড়িয়ে রইল।

ভ্যান অইক জুলিদের সবুজ পাথরটা এনে, চামড়া দিয়ে চাপা দিয়ে রাখল। ক্রমে সকলে সেই ঘরে এল। মাফকার ঐ অবস্থা দেখে তাদের রাগ দেখে কে? গনফালাকে তারা জিজ্ঞাসা করল, 'এর মানে কি?'

টারজান বলল, 'এর মানে মাফকার ক্ষমতা শেষ হয়েছে। সারা জীবন তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করেছে সে। তোমরা খেটেছ, সে তার সুফল ভোগ করেছে। কত অত্যাচার করেছে। তোমরা ওকে ভয় কর, দেখতে পার না। ভয়টাই বেশি।'

—'মাফকা আমাদের ক্ষমতা দিয়েছে। সে ক্ষমতা হারালে, আমাদের সর্বনাশ হবে।'

—'ক্ষমতা হারাওনি। তবে ওর হাতে আর নেই।'

—'ওদের মারো! ওদের মারো!' বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে যোদ্ধারা ছুটে এল। টারজান গনফলে হাত রেখে বলল, 'থামো! রানীর সামনে হাঁটু গাড়ো!'

কথাটা সবাই শুনল কি না সন্দেহ। কিন্তু সবাই হাঁটু গেড়ে বসল। টারজান বলল, 'যাও, জুলিদের ক্যাপ্টেনদের ডেকে নিয়ে এসো। ঠিক আসবে ওরা। লড়াই বন্ধ হবে।' তারপর বন্ধুদের বলল, 'গনফলের মতোই সবুজ পাথরটার শক্তি। যার কাছে থাকবে, সে সেই শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে। মন্দ কাজে যেমন, সৎকাজেও তেমনি সে শক্তি লাগানো যায়।'

খানিক বাদে সত্যি এল জুলিরা। টারজান বলল, এখন তোমরা সকলে উরা আর মাফকার ক্ষমতা থেকে মুক্ত হলে। তোমাদের কাছে মাফকাকে রেখে আমরা চলে যাচ্ছি যাদের ইচ্ছা আমাদের সঙ্গে আসতে পার। গনফালকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। তাহলে মাফকা আর অত্যাচার করতে পারবে না। এ দেশের বাইরে যাবার সময় তোমাদের হীরে তোমাদের হাতে দিয়ে যাব। তোমাদের কয়েকজন হীরে নেবার জন্য আমাদের সঙ্গে আসতে পার। ভোর হয়েছে আমরা এবার রওনা হব। এই নাও, মাফকাকে ধর।' এই বলে বুড়োকে কোলে তুলে যোদ্ধাদের কাছে বিদায় নিল।

বাইরে এক দল সাদা আর কালো মানুষ ওদের সঙ্গে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। টারজান প্রকাশ্য ভাবে গনফাল নিয়ে চলেছিল। ভ্যান অইক সবুজ মণিটা লুকিয়ে নিয়ে চলেছিল। ওরা সবাই যেতে চায়, কিন্তু ভয় পাচ্ছিল। 'মাফকা আমাদের মেরে ফেলবে।'

দুর্গের ভিতর থেকে ভীষণ রাগের আর বিদ্বেষের চিৎকার শোনা যেতে লাগল। টারজান বলল, মাফকা আর কাউকে কখনো মেরে ফেলবে না।'

*

নিরাপদ শান্তিতে গনফাল আর টারজানের নেতৃত্বে ওরা কাজি দেশের মধ্যে দিয়ে চলল। অনেকেই যেন নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। খালি মনে হচ্ছিল হয়তো এক্ষুণি ওদের চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে মেরে ফেলা হবে। শেষ পর্যন্ত নিরাপদে নিউবারি উপত্যকায় সকলে পৌঁছল। টারজান সেখানে হীরেটা ভ্যান অইকের হাতে দিয়ে বলল, 'আমি এখন নিজের কাজে যাচ্ছি। হীরেটা কাল সকাল অবধি তোমার কাছে রাখো। তারপর ঐ কাজি যোদ্ধাদের হাতে দিয়ে দিও।'

যোদ্ধাদেরো বলল, 'ওটা সৎকাজের জন্যেই ব্যবহার কর, যদি ব্যবহারই কর। উড্ তুমি গনফালের ভার নাও, গনফালার হয়ে। সুখ পাবে কি না জানি না, তবে অভাবে পড়বে না।'

ট্রল আর স্পাইক বলল, 'আমরা কিছুই পাব না? ঐ

পাথর দুটো আমাদের সকলের সম্পত্তি। লণ্ডনে নিয়ে বিক্রি করে, সমান ভাগ করা উচিত। কি বল ভ্যান অইক?' কিন্তু তার সমর্থন পাওয়া গেল না।

সে-রাত্রে ক্যাম্প করা হল, রান্নাবান্না চড়ল। উড্ আর অইক এখন নেতা। কালোদের মধ্যে অনেকেই নানা কাজে অভ্যস্ত, তারা খুশি হয়ে কাজে লাগল। যাবার আগে টারজান উড্ আর ভ্যান অইককে ট্রল আর স্পাইক সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল দক্ষিণে তিন দিনের পথ পার হলে গ্রাম পাবে। তারা যথাসাধ্য সাহায্য করবে।'

টারজান চলে গেলে সকলের মন খারাপ হল। আবার কবে দেখা হবে?

ভ্যান অইক্ বলল, 'একেক সময় মনে হয় ও-ই টারজান। নইলে অমন লোক আফ্রিকায় কি করছে?'

রাতে সাদাসিধে খাওয়া হল। কাল স্পাইক আর ট্রলের শিকার করতে যাওয়ার কথা উঠল। কিন্তু শুধু বল্লম আর ছোরা দিয়ে কি শিকার হয়?'

ইউরোপ আমেরিকার লোকগুলি বন্দুক ছাড়া শিকারের কথা ভাবতেও পারে না। খালি উড্ বলতে লাগল, 'বল্লম দিয়ে তো এদিককার লোক বড় শিকারও মারে।'

হঠাৎ ভ্যান অইক বলল, 'তীরধনুক দিয়ে শিকার হয়। এখানকার নিগ্রোরাই নিশ্চয় পারে।'

কমুদি বলে একজনকে ডাকা হল, 'তোমরা তীরধনুক দিয়ে শিকার করতে জান?'

—'হ্যাঁ, বোয়ানা।'

—'কিন্তু তীরধনুক বানাতে পারবে কি?'

—'হ্যাঁ, বোয়ানা, সবাই বানাতে জানে।'

—'বানাতে কি কি লাগবে, এখানে পাওয়া যাবে?'

—'নদীর ধারে অনেক পাব।'

ঠিক হল রাতেই খাওয়াদাওয়ার পর ওরা গিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে আসবে। আজ রাতেই কিছু তীরধনুক তৈরি করতেও হবে। শিকার না পেলে, কাল খাওয়াদাওয়া বন্ধ। সেদিন পূর্ণিমা ছিল, জিনিসপত্র এনে নিগ্রোরা তীরধনুক বানাতে বসল। গনফালার জন্য একটা ছাউনি করা হয়েছিল, তার সামনে কাজি থেকে আনা কিছু জানোয়ারের ছালের কম্বল পেতে শুয়ে শুয়ে ওরা ভবিষ্যতের বিষয়ে জল্পনাকল্পনা করতে লাগল। জুলিদের রত্নটা বিক্রি করে গনফালা অনেক টাকা পাবে। সুন্দর বাড়ি করে, আনন্দে দিন কাটাতে পারবে। ভ্যান অইক্ বলল, 'কিন্তু তোমাকে সাবধান থাকতে হবে গনফালা। লণ্ডনেও অনেক মন্দ লোক আছে।'

—'মাফকার মতো খারাপ?'

—'অন্য দিক দিয়ে দেখলে, আরো খারাপ।'

তারপর সবাই শুতে গেল।

গনফালার চোখে ঘুম নেই। এই সুন্দর নিরাপদ জগৎটা কি ভালো। হঠাৎ কানে এল কারা যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, 'লোকটা পাগল। হীরেটা কেন অসভ্য-গুলোকে ফিরিয়ে দেবে? দুটো পাথরেরি ভাগ দেওয়া উচিত আমাদের। লণ্ডনে কি প্যারিসে বেচলে দুটোর দাম হবে পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড।'

—'আর সবুজ পাথরটা দিল কি না ঐ নিগ্রো মেয়েটাকে। ঐ আমেরিকানটাই সবটুকু বাগাবে। শেষটা নিগ্রো মেয়ে বিয়ে করবে!'

আর অপেক্ষা করল না গনফালা। অন্ধকারের মধ্যে ছুটতে লাগল।

ভোরে উঠে উড্ কামুদিকে ডাকল। 'চল, সব গুছিয়ে ফেল। সকাল সকাল বেরোতে হবে।'

হঠাৎ ভ্যান্ অইক চেঁচিয়ে উঠল, 'স্ট্যান, হীরেটা কেউ নিয়ে গেছে!'

চমকে উঠল উড্। তাড়াতাড়ি নিজের বিছানা হাতড়ে বলে উঠল, 'সবুজ পাথরটাও নেই দেখছি।'

—'কাজিরা নেয়নি তো?'

কিন্তু না, তারা তো সবে ঘুম থেকে উঠছে। ওদের বিছানা পত্র দেখা হল। তখন দেখা গেল স্পাইক আর ট্রল্ও নেই।

উড্ বলল, 'ওদের পিছনে ধাওয়া করতে হবে। গনফালাকে কি করে খবরটা দেব?'

কিন্তু গনফালার ছাউনিতে গিয়ে দেখা গেল সে-ও নেই! উড্ স্তম্ভিত। 'ওকেও তাহলে ওরা নিয়ে গেছে। বব্!'

ভ্যান অইক্ মাথা নাড়ল, 'তা কি করে নেবে? ও চ্যাঁচালেই পারত।'

উড্ বলল, 'তুমি কি বলতে চাও সে ইচ্ছা করে ওদের সঙ্গে চলে গেছে?'

—'হয় তাই, নয় সে ওদের সঙ্গে যায় নি। আলাদা গেছে। এক দিক দিয়ে তাতে সমস্যা মিটে গেছে। নিগ্রো মেয়ে বিয়ে করলে, আমেরিকায় টিকতে পারতে?'

—'যাই হোক না কেন, ওর জন্য সব কষ্ট সইতে পারতাম। আরেকটা কথা। দেখেছিলে তো মণি দুটোর কি রকম বশীকরণ শক্তি? ওরা যদি ওকে বশ করে নিয়ে গিয়ে থাকে? পাথর তো ওদের হাতে।'

নিগ্রোদের কয়েকজন ট্রল আর স্পাইকের পায়ের চিহ্ন খুঁজে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের পিছনে এরা ধাওয়া করল।

*

টারজান উত্তর দেশে কাজ সেরে আবার দক্ষিণে চলেছিল। জুলি কাজি থেকে ফেরা যাত্রীদের কথা মনে হচ্ছিল। তারা নিশ্চয় পথে ভালো শিকার পেয়ে আরামে গেছে। এত দিনে সেই গ্রামের কাছেও পৌঁছে গেছে। সেদিন সন্ধ্যা বেলা সে গাছ থেকে গাছে ঝুলে চলেছে, হঠাৎ নাকে এল টারমানগানি মেয়ের, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ মেয়ের গন্ধ আর সেই সঙ্গে সিংহের গন্ধ। তার মানে বিপদ। একটু এগোতেই মেয়েটিকে দেখতেও পেল। ক্লান্ত, অবসন্ন, গাল বসে গেছে, হতাশ ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। পিছনে যে সিংহ তা জানতেও পারে নি। হঠাৎ ফিরে সিংহকে দেখতে পেল। সিংহটা চাপা গর্জন করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, দুচোখ জ্বলছিল তার। তারপরেই পা গুটিয়ে বিকট হুংকার দিয়ে লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে একজন বাঘছাল পরা বিশালদেহ মানুষ তার পিঠে পড়ল। সে-ও গর্জন করছিল। পা দিয়ে সিংহের গা আঁকড়ে ধরে লোকটা বার বার তার গায়ে ছোরা বসাতে লাগল। শেষটা সিংহ এলিয়ে পড়ল। তার গায়ে পা রেখে টারজান তার রক্ত-জল-করা হাঁক দিল। তারপর মেয়েটিকে বলল, 'এ কি গনফাল! কি হল? তুমি একা কেন?'

কিছু কিছু বলল গনফালা। ওকে বিয়ে করে উড্ দুঃখ পায়, তা ও চায় না। তাই পালিয়ে এসেছে। ও জানত এই পথে টারজান ফিরবে। কোথাও আশ্রয় পায় নি, তাই কাজি ফিরে যাবার কথা ভাবছিল।

টারজান বলল, 'ওখানে ফিরে যাওয়া যায় না। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।'

—'তাহলে কোথায় যাব?'

—আমার সঙ্গে যাবে আমার বাড়িতে। উড্ পরে মণি নিয়ে সেখানে আসবে। যখন যেখানে ভালো লাগে তখন সেখানে সুখেশান্তিতে থাকবে।'

এর কয়েক সপ্তাহ পরে, টারজান ওকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছল। জেন ওকে সান্ত্বনা দিল, কত আদর যত্ন করল।

কিন্তু চারদিকে খোঁজ করেও উড্ কিম্বা ভ্যান অইকের দলের সন্ধান পাওয়া গেল না। টারজান ভাবছিল একবার ওদের খোঁজে বেরোবে। সময়ই সে সমস্যা মিটিয়ে দিল।

দুজন শ্বেতাঙ্গ একটা ছোট সাফারি নিয়ে ঘন অন্ধকার বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ঘুরছিল। উড্ বলছিল, 'ক্রমাগত পুব দিকে গেলে তো কোন গ্রাম পাওয়া উচিত।'

হঠাৎ দেখে এক দল মাথায় লম্বা কালো যোদ্ধা। মাথায় তাদের পালকের সাজ। ওদের দেখে যোদ্ধারা এগিয়ে এল। কালো হলেও চমৎকার দেখতে তারা। এখন লোক ভালো হলেই বাঁচা যায়।

দলের নেতা বিশুদ্ধ ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করল, 'বোয়ানারা এ দেশে কি শিকার করছেন?'

উড্ বলল, 'পথ হারিয়েছি, গাইড খুঁজছি।'

—'তাহলে বড় বোয়নার কাছে চলুন।'

—'তাঁর নাম কি?'

—'তাঁর নাম টারজান।'

—'তোমার নাম কি?'

—'মুবিরো।'

একঘণ্টা পরে ওরা টারজানের বাংলোতে পৌঁছে গেল।

টারজান নিজে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতেই, ওরা বলে উঠল, 'ক্লেটন!'

টারজান বলল, 'তোমাদের খবর না পেয়ে বড় ভাবনা হচ্ছিল। কোথায় গেছিলে?

ওরা তখন তাকে সব কথা খুলে বলল। দুটো পাথরই হারিয়েছে শুনে টারজান বলল, 'হয়তো ভালোই হয়েছে। ওগুলো দুঃখ ছাড়া কিছুই এনে দিত না।'

উড্ বলল, চুলোয় যাক পাথর দুটো। আমি গনফালাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

—'তাকে পাবে মনে হয়। আফ্রিকাতে কাউকে খুঁজে বের করা আমার কাছে খুব শক্ত নয়। আগে চল তোমাদের ঘরে। স্নান কর, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পর। যা আছে তার মধ্যে কিছু নিশ্চয় তোমাদের গায়ে লাগবে।

ভ্যান অইক্ আগে বারান্দায় উঠে দেখে আরাম কেদারায় একজন সোনালী চুল মেয়ে শুয়ে একটা ইংলিশ পত্রিকা দেখছে। ওকে দেখে লাফিয়ে উঠে সে বলল, 'বব্!'

—'গনফালা!'

—'সে কোথায়? ভালো আছে?'

—'আমাদের সঙ্গেই আছে। স্পাইক আর ট্রলের হাত থেকে পালালে কি করে?'

—'কি যে বল! আমি তো একলা গেছিলাম।'

—'কেন গেছিলে?'

তখন গনফালা স্পাইক আর ট্রলের কথাবার্তার বিষয় বলল। ভ্যান অইক বলল, 'তোমার ও ধারণা একেবারে ভুল, উডের সঙ্গে আমার ও বিষয়ে কথা হয়েছে।'

এই সময়ে উড্ও বেরিয়ে এল। এত দিন এত কষ্টের পরে দুজনে আবার দুজকে কাছে পেল।

সেদিন সন্ধ্যায় সকলে মিলে ওদের ভবিষ্যতের কার্য-সূচী বিষয়ে আলোচনা করছিল। গনফালা বলল, 'আগে একবার লণ্ডনে যেতে হবে, সেখানকার কলোনিয়েল আপিসে একটা চিঠি দিতে হবে। নিয়ে আসি চিঠিটা। আমি তো পড়তে শিখিনি।'

এই বলে চিঠিটা নিয়ে এল। টারজান সেটি খুলে পড়ল। তাতে লেখা, 'আমার মেয়ের হাতে এই চিঠি দিচ্ছি। যদি কখনো সৌভাগ্যক্রমে সে কাজিদের হাত থেকে মুক্তি পায়, এই চিঠি দিয়ে নিজেকে সনাক্ত করতে পারবে। ওর জন্মের পরেই কাজিদের হাতে ওর মায়ের মৃত্যু হয়। ওরা ওকে গনফালা নাম দিয়ে, রানীর আসন নেবার জন্য মানুষ করেছে। ও জানে না যে আমি ওর বাবা। মাফকা বলেছিল সে কথা ওকে বললে সে ওকে মেরে ফেলবে। ইতি।—মাউন্টফর্ড।'

*

রাত নামছিল। আটজন লোক তাদের সামান্য জিনিস-পত্র নামিয়ে একটা জলাধারের ধারে ক্যাম্প করার যোগাড় করছিল। দলের মধ্যে দুজন শ্বেতাঙ্গ, বাকিরা নিগ্রো। সকলেরি সঙ্গে তীরধনুক আর বেঁটে বর্শা। সঙ্গে ছিল আগের দিনের শিকার করা মাংস আর চামড়ায় জড়ানো দুটো বাণ্ডিল। একজন শ্বেতাঙ্গ বলল, 'নিগ্রোরা বড় ভয় পেয়েছে।' অন্যজন বলল, 'ওরা জানে এটা নরখাদকের দেশ।'

প্রথমজন বাণ্ডিল দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঐ দুটোকে আমারো ভয় করে। অভিশপ্ত জিনিস ওগুলো।'

—'ক্লেটনের সঙ্গে দেখা হলে তো ও দুটোকে কেড়ে নেবে। সে ফিরে আসবে বলেছিল।'

কাছেই সিংহ ডাকল। ওদের ভয় বাড়ল। হঠাৎ একজন নিগ্রো বলল, 'বোয়ানা, দেখুন!'

জনা বারো যোদ্ধা এগিয়ে এল। ট্রল শান্তির ইঙ্গিত করল। তাদের নেতা এগিয়ে এসে বলল, 'বাণ্টাঙ্গোদের দেশে কি করতে এসেছ?'

—'গাইড্ খুঁজছি। আমাদের পিছনে বন্দুকটন্দুক নিয়ে বড় সাফারি আসছে।'

নেতা বলল, 'সব মিছে কথা। কেউ নেই তোমাদের পিছনে।'

ট্রল তখন স্পাইককে বলল, 'পাথর দুটোর ক্ষমতা দেখা যাক।'

এই বলে গনফলের মোড়কটা খুলতে লাগল। নেতা বলল, 'কি ওটা?'

—'বড় ওষুধ। দেখবে?'

—'পছন্দ হলে নিয়ে নেব।'

ট্রল সাদা পাথর বের করতেই ওরা অবাক। পাথরের ওপর হাত রেখে ট্রল বলল, 'চলে যাও! চলে যাও! অস্ত্র নামাও!'

কেউ গেল না, অস্ত্র নামাল না। উল্টে বলল, 'মোটেই যাব না। অস্ত্রও নামাব না।'

ট্রল্ বলল 'হীরেটা যে কাজ করছে না?'

স্পাইক বলল, 'দেখি তো। তোমরা অস্ত্র ফেলে চলে যাও। নইলে মরবে!'

নেতা স্পাইকের মুখে লাথি মারল। সঙ্গে সঙ্গে বিকট হুংকার দিয়ে একটা প্রকাণ্ড সিংহ ওদের দুজনকে ডিঙিয়ে নেতার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। স্পাইক গনফল তুলে, সঙ্গীদের বলল অন্য পাথরটা নিয়ে সঙ্গে আসতে। এই বলে বনে পালাল।

সারা রাত ছুটল ওরা, ভোরে একটা ছোট নদীর ধারে থামল। এবার ট্রল বলল, 'আমরা ওটাকে চালাতে জানি না।'

স্পাইক বলল, 'আমি তো চালালাম। ওটাকে একটু

ঘষে চালাতে হয়।'

—'বাজে কথা। সিংহটা এমনিও আসত। মাংসের গন্ধ পেয়েছিল।'

—'বেশ, আবার দেখাচ্ছি। দাও তো দেখি পাথরটা।'

এই বলে পাথর নিয়ে ট্রলকে দু একটা ছোটখাটো হুকুম করল। সেগুলো ট্রল অনায়াসে অবজ্ঞা করল। তাই দেখে হতাশ হয়ে স্পাইক বলল, 'নাঃ, গনফালা না থাকলে এটা কাজ করে না।'

ট্রল বলল, 'সবুজ পাথরটা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখ না।'

কিন্তু কোথায় সবুজ পাথর? নরখাদকদের দেশ থেকে পালাবার সময় সেটাকে কেউ তুলে আনেনি।

*

গনফালা, উড্ আর ভ্যান অইক রেল টারমিনাসের দিকে রওনা দিয়েছিল। ওরা দেখে আশ্চর্য হল যে গনফালা ওদের সঙ্গে সমানে হাঁটতে পারে। সে বলল কাজি মেয়েদের সঙ্গে সে শিকারে যেত। টারজান ওদের সঙ্গে ভালো সাফারি দিয়েছিল। এক দিন হেঁটে ওরা ক্যাম্প করেছিল। এখানে একদিন থেকে শিকার করার ইচ্ছা ওদের। বড় ভালো শিকারের দেশ এটা। ভ্যান অইকের বড় শখ কিছু ট্রোফি নিয়ে যাবে। টারজান অনুমতি দিয়েছিল।

রাতে ধুনির আলো অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। জানোয়াররা তাই দেখে আকৃষ্ট হয়, আবার ভয়ও পায়। মাইলখানেক দূর থেকে স্পাইক আর ট্রল্ও সে আলো দেখতে পেয়েছিল।

স্পাইক বলল, 'ওখানে নিশ্চয় লোকজনও আছে। তারা আমাদের পথ বাতলে দিতে পারবে।'

—'তারপর ক্লেটনের কাছে রিপোর্ট করুক আর কি।'

—'একবার দেখে এলেও তো হয়।'

—'এ সিংহের দেশ, সঙ্গে বন্দুকও নেই।'

—'কিছু শুকনো মাংস সঙ্গে নিলে হয়। ওরা সে মাংস খুব ভালোবাসে।'

কাছে গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে গনফালা, উড্ আর ভ্যান অইক্‌কে দেখে ওরা আশ্চর্য হল। ট্রল বলল, 'যদি গনফালাকে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ও আবার পাথরটাকে চালু করে দেবে। ক্লেটনের বেলায় যেমন করেছিল।'

আড়ালে দাঁড়িয়ে ওরা কালকের শিকারের ব্যবস্থা শুনল। গনফালা ক্যাম্পে থাকতে রাজি নয়। সে শিকার করে অভ্যস্ত। শেষ পর্যন্ত স্থির হল তিনজন তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ে, ভালো শিকার আনতে পারবে।

পরদিন ভোরে ওরা রওনা হল। তিনজনেরই সিংহ মারার শখ। এখানে প্রচুর সিংহ। ক্যাম্পের উত্তর পশ্চিমে একটা টিলার ওপরে পাথরের পিছন থেকে ট্রল আর স্পাইক ওদের শিকারে বেরোনো দেখছিল। টিলার নিচে ওদের সাফারির ছয়জন নিগ্রো অপেক্ষা করছিল। গনফালা, ভ্যান অইক আর উড্ তিনজন তিন দিকে গেল। গনফালা আর তার বন্দুকবাহী অন্যদের চেয়ে আরো পুবের পথ ধরলেও, ওদের চোখের আড়াল হয়নি। এ ব্যবস্থা উডের পছন্দ ছিল না। গনফালার সিংহ মারার চেষ্টায় তার আপত্তি ছিল। সে শোনেনি। এই অল্প ক-দিনে গনফালা বন্দুক ছোঁড়ায় দক্ষ হয়ে উঠেছিল। তাতে উড্ কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিল। সে তো আর ঐ দুই পাষণ্ডের কথা জানত না।

ক্রমে গনফালা সঙ্গীদের চোখের আড়াল হয়ে গেল। এদিকে ঝোপঝাপ থাকাতে ট্রল আর স্পাইকের ওর পিছু নেওয়া সহজ হল। সে বেচারা ভাবতেই পারেনি যে আটটা লোক তার সঙ্গে চলেছে। দূরে পুবে গুলির শব্দ শুনে সে ভাবল অন্যরা কেউ ভালো শিকার পেয়েছে। বন্দুকবাহীকে বলল, 'ভুল দিকে এলাম মনে হচ্ছে।'

সে বলল, 'না,। তাকিয়ে দেখুন।'

একশো গজ সামনে ঝোপের মধ্যে থেকে একটা সিংহের মাথা দেখা গেল, ওদের দিকে চেয়ে আছে। আস্তে আস্তে সিংহটার পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল গনফালা। সিংহ একটুও রাগ দেখাল না; ওর দিকে চেয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু গনফালা এক পা এগোলেই দাঁত খিঁচোল। আড়াল থেকে ট্রল্ আর স্পাইক চেয়ে রইল। গনফালার বন্দুকবাহী একটা ঢিল তুলে ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে সিংহ তেড়ে এল।'

বন্দুকবাহী বলল, 'এবার মারুন!' গনফালা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। গুলিটা লাগলেও, সিংহ তবু তেড়ে এল। বন্দুকধারী গুলি করল, গুলি ছুটলই না। তখন সে বন্দুক ফেলে দে-দৌড়। অমনি সিংহ গনফালাকে ছেড়ে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে তাকে মেরে ফেলল। সেই মুহূর্তে সিংহটাও ঢলে পড়ল।

তখন ট্রল আর স্পাইক এগিয়ে গেল। গনফালা জানত ওরা খারাপ লোক, চোর; কিন্তু ওর নিজের যে কোনো

বিপদ আছে তা ভাবে নি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা এখানে কি করছ?'

স্পাইক বলল, 'স্টেশনে যাবার পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

ট্রল ততক্ষণে মৃত বন্দুকধারীর বন্দুক অ্যামিউনিশন উদ্ধার করে, কাছে এসে বলল, 'বাঃ, কি সুন্দর বন্দুকটা, দেখি একটু।'

বলে গনফালার বন্দুটাও নিয়ে নিল। বন্দুকধারীর মৃতদেহ ক্যাম্পে নিয়ে যাবার কথা তুলতেই, স্পাইক বলল, 'আমরা তো তোমাদের ক্যাম্পে যাচ্ছি না।'

—'তাহলে একলা ওকে নেব কি করে?'

—'তুমিও সেখানে যাচ্ছ না। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।'

—'না, মোটেই যাব না।'

—'দেখ, কেন মিছিমিছি গোলমাল করছ?'

—'তোমাকে যেতেই হবে। নইলে গনফাল পাথরটা কাজ করবে না। আমরা তোমার সাহায্যে মাফকার মতো দুর্দান্ত হয়ে উঠব। তুমি রানী হবে। যা চাও পাবে। বলতো তোমাকে বিয়ে করব।'

ট্রল্ রেগে গেল, 'মোটেই ও তোমার সম্পত্তি নয়, স্পাইক!'

গনফালা বলল, 'আমি কারো সম্পত্তি নই। পাথর নিয়ে ইউরোপে যাও; বড় লোক হও; আমার কোনো আপত্তি নেই। খালি আমাকে ছেড়ে দাও।'

ট্রল্ বলল, 'তাহলেই হয়েছে। সেটি হবে না।'

*

ভ্যান অইকের দ্বিতীয় গুলিতে তার সিংহ মরেছিল। গনফালার তিনটে গুলির শব্দও সে শুনেছিল। উড্ কোনো সুবিধা করতে পারে নি। গনফালাকে না দেখে ব্যস্ত হয়ে ওরা মরা সিংহটাকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে, যে দিক থেকে গুলি শুনেছিল, সে দিকে এগিয়ে গেল। দেখল বন্দুকধারীর মৃতদেহের ওপর মরা সিংহ পড়ে আছে, কিন্তু গনফালার কোনো চিহ্ন নেই। তবে কি অন্য পথে সে ক্যাম্পে ফিরেছে? কিন্তু এখানেও তাকে না পেয়ে ওরা বড়ই দুর্ভাবনায় পড়ল। নিজেদের দলটিকে তিন ভাগ করে বন ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল। সারা রাত ধরে গনফালা আর ট্রল স্পাইক দক্ষিণ থেকে সন্ধানকারীদের গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। পরদিন দুপুরে হতাশ হয়ে তারা ক্যাম্পে ফিরল।

উড্ বারবার বলতে লাগল, 'মরবে কেন? দুটো বন্দুক আর অ্যামিউনিশন সঙ্গে নিয়েছে তো।'

ভ্যান অইক্ বলল, 'অনেক সময় পিছন থেকে ঝাঁপ দিয়ে সিংহ তার শিকার ধরে নিয়ে যায়।'

উড্ বলল, 'তুমি এগিয়ে যাও, আমি আরো খুঁজব।'

—'একা?'

—'না, টারজানের কাছে গিয়ে তার সাহায্য নেবে।'

শেষ পর্যন্ত নিজে না গিয়ে টারজানকে সাফারির লোকের হাতে চিঠি পাঠিয়ে, উড্ তার খোঁজার কাজ চালিয়ে গেল।

দশ দিন পরে সারা দিন বৃথা ঘুরে ঘুরে অবসন্ন দেহে খাটিয়ায় শুয়ে উড্ ভাবছিল কি কুক্ষণেই গনফালাকে একা শিকারে যেতে দিয়েছিল।

এমন সময় টারজান এসে বলল, 'এর মধ্যে কি কি জানতে পেরেছ বল।'

উড্ বলল গনফালার কোনো চিহ্ন পায়নি, কিন্তু বনের মধ্যে আরেকটা ক্যাম্পের চিহ্ন দেখেছে। সেখানে টারজানকে নিয়ে যেতে সে বলল, 'দশ-বারোটা লোক ছিল। যৎসামান্য জিনিসপত্র। ভালো খেতে পাচ্ছিল না। মনে হয় বন্দুক ছিল না। একটা বুড়ো মাংস খেয়েছে। হাড় ভেঙে ম্যারো খেয়েছে কেউ কেউ অর্থাৎ সঙ্গে নিগ্রোও ছিল। রাতে মাটিতে শুত। দিন দশেক হল চলে গেছে। সঙ্গে কিছু পোঁটলাপাটলি। দেখা যাক কোন দিকে গেছে।'

পায়ের দাগ ধরে ওরা সেই জায়গায় গেল, যেখানে গনফালা সিংহ মেরেছিল।

টারজান বলল, 'এই দলটাই গনফালাকে ধরে নিয়ে গেছে।'

—'তাহলে ওদের ধাওয়া করতে হয়।'

টারজান বলল, 'আমি এগোচ্ছি। তুমি আমার চিঠি নিয়ে আমাদের বাড়ি যাবে। একদল ওয়াজিরি যোদ্ধা নিয়ে ফিরবে। এ কাজটা দরকার। তাছাড়া একা গেলে তাড়াতাড়ি এগোবে।

দু-দিন ধরে টারজান চিহ্ন দেখে উত্তর দিকে চলল। তারপর বৃষ্টিতে চিহ্ন ধুয়ে গেছিল। এটা বানটাপো। নরঘাতকদের দেশ। একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। একটা টিলার ওপর চড়ে দূরের উপত্যকায় অনেকগুলো গ্রাম দেখা গেল। কুঁড়ে ঘরের দরিদ্র গ্রাম সব। চারদিকে গাছপালা; পাশেই বন। উপত্যকার মধ্যিখানের গ্রামটাই সবচেয়ে বড়।

ঐখানে নিশ্চয় প্রধান থাকে। অমাবস্যার রাত নামল, টারজানও গাছ থেকে নেমে উপত্যাকার দিকে এগোল। এখানে ওখানে মিটমিট করে আগুন জ্বলছিল। গ্রামবাসীরা রান্নাবান্না করছিল। পাহাড় থেকে সিংহ ডাকল। টারজানও আকাশের দিকে চেয়ে বনমানুষদের যুদ্ধের ডাক দিল। গ্রামের লোকরা চমকে উঠল। একজন বলল, 'ভূত ডাকছে!'

আরেকজন বলল, 'না, উনি হলেন ওয়াজিরিদের প্রেত-দেবতা।'

গ্রামের বেড়ার ভিতরে মস্ত একটা গাছ। তাতে চড়ে কিছু দেখতে হলে, বেড়ার মধ্যে ঢোকা দরকার। তাহলে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। যদি শ্বেতাঙ্গ বন্দী থাকে এখানে, তারা নিশ্চয় ঘরে বন্ধ আছে। এরা ঘুমোলে, দেখতে হবে। না দেখে এখান থেকে যাওয়া নয়। ক্রমে খাওয়া দাওয়া সেরে গ্রামবাসীরা শুতে যাবার আগে কিছু নাচ-গান করতে লাগল। এরি জন্য টারজান অপেক্ষা করছিল। সবার অলক্ষ্যে বেড়া টপকে, ভিতরে ঢুকে, সে ঐ গাছে উঠে বসল।

সেখানে থেকে দেখতে পেল প্রধানের কুঁড়ের সামনে প্রধানের সঙ্গে কয়েকজন বসে গান শুনছে। প্রধানের পায়ের কাছে জুলিদের সেই সবুজ পাথর! এতে কোনো ভুল নেই। তাহলে স্পাইক আর ট্রল এদিকে এসেছিল। ওরাই নিশ্চয় গনফালাকে ধরে নিয়ে গেছে। ওরা কি এখনো এই গ্রামে আছে?

রাত বাড়ল। গান বাজনা থামল। যে যার শুতে গেল। নাক ডাকার শব্দ কানে এল। বাইরে সিংহ কাশল। টারজান গাছ থেকে নেমে প্রতিটি ঘরের বাইরে থেকে শুঁকে বুঝলেন যাদের খুঁজছে তারা এখানে নেই।

প্রধানের ঘরের বাইরে মাটিতে সবুজ পাথরটা পড়ে ছিল। টারজান প্রধানের ঘরে ঢুকে, তার গলা টিপে ধরল। অমনি সে জেগে গেল। টারজান বলল, 'বাঁচতে চাও তো শব্দ কর না। সবুজ পাথর দেখে বুঝলাম তোমাদের কাছে দুটো সাদা পুরুষ আর একটা সাদা মেয়ে এসেছিল। কোথায় তারা?'

প্রধান তখন কি ভাবে পাথরটা পেয়েছিল সব বলল। সিংহের ভয়ে সাদা লোক দুটো পাথর ফেলে পালিয়েছিল। এর বেশি সে কিছু জানে না। তবে একটা সাদা পাথরও ছিল; পালাবার সময় সেটা তারা নিয়ে গেছে। ঐ লোকদের সঙ্গে কোনো সাদা মেয়ে দেখেনি। কোনো সময়েই কোনো সাদা মেয়ে গ্রামে আসেনি।

সে রাতটা টারজান ঐ গাছে কাটাল।

*

নরখাদকদের দেশ এড়িয়ে দিনের পর দিন ট্রল আর স্পাইকের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে গনফালা ক্লান্ত হয়ে গেছিল। ওরা ভালোই ব্যবহার করত। ও কোনো কথা বলত না বলে, ওরাও ওকে বিরক্ত করত না। একজন নিগ্রোর হাতে পাথরটা থাকত। দুজনেরি ভয় যে গনফালার সাহায্য নিয়ে অন্যজন তাকে বধ করবে।

এদিকে নাকি উপবনের মতো সুন্দর একটা জায়গা আছে, স্পাইক কয়েক বছর আগে দেখেছিল। এখন তারা সেটাকেই খুঁজছিল। স্পাইক বলল, 'চমৎকার জায়গা, মিস্, বাগানের মতো। সামান্য কিছু গ্রামবাসী ছাড়া কেউ থাকে না।'

—'তাহলে সেখানে গনফল দিয়ে তোমাদের কি সুবিধা হবে?'

—'কেন হবে না?'

—'মনের কতকগুলো ক্ষমতা না থাকলে, ওটা কাজ করে না।'

—'তোমার আছে সে ক্ষমতা?'

—'মাফকার কথায় মাঝে মাঝে আমার হাতেও কাজ করেছে পাথরটা। তারপর আর চেষ্টা করিনি। কিন্তু যতক্ষণ না আমি নিশ্চিন্ত হচ্ছি তোমরা কেউ আমার ক্ষতি করবে না, ততক্ষণ আমি চেষ্টাও করব না।'

তখন স্পাইক আর ট্রলের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। তারা পরস্পরকে দোষ দিতে লাগল। গনফালা বলল, 'তোমাদের একজন যদি মরেও যাও, বাকিজনের কোনো সুবিধা হবে না। কারণ আমি সাহায্য করব না। আর টারজান তোমাদের ধরলে, তোমাদে কপালে দুঃখ আছে।'

ওরা তো অবাক! এর মধ্যে টারজান আসে কোথেকে?

গনফালা বলল, 'আসছে, কারণ ক্লেটন হল স্বয়ং টারজান। তাছাড়া পাথরটার সাহায্যে আমিই তো তোমাদের নস্যাৎ করে দিতে পারি।'

এতক্ষণে ওদের চৈতন্য হল। তাই তো! তাহলে দেখতে হবে পাথরটা যেন গনফালার হাতে না পড়ে!

ওদের একজনের হাতে থাকলেই ভালো হয়। তারপর ওরা ক্যাম্প তুলে এগিয়ে চলল।

ঐ সময় অনেকটা দক্ষিণে বনের ধারে দাঁড়িয়ে টারজান চারদিকে চেয়ে তিনটে গাছের অবস্থান দিয়ে মনে মনে জায়গাটা চিহ্নিত করে, বল্লম দিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ে, তার মধ্যে সবুজ পাথরটা পুঁতে রাখল। ঐ গাছগুলোর একটা থেকে পনেরো পদক্ষেপ দূরে আরেকটা গাছেও দাগ দিয়ে রাখল। ট্রল আর স্পাইকের অবস্থাটা টারজান আঁচ করে ফেলেছিল। গনফালকে কাজে লাগাবার মানসিক ক্ষমতা তাদের নেই। তাহলে গনফালাকে দিয়ে চেষ্টা করতে হবে বলেই নিশ্চয় তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। গনফাল আর গনফালার সাহায্যে রাজত্ব করতে হলে কাজি দেশের মতো জায়গা কোথায় পাবে? এই ভেবে দুদিন ধরে টারজান উত্তর দিকে চলল।

এর মধ্যে বনের মাঝে কানে এল টানটরের ক্ষীণ কণ্ঠে সাহায্যের ডাক। সে কোনো বিপদে পড়েছে। সর্বদা এরা দুজনে দুজনকে সাহায্য করে থাকে। হয়তো এটা একটা অচেনা হাতি, কিন্তু টানটরের জাত তো। তাদের সকলের সঙ্গেই ওর বন্ধুত্ব। খুঁজে দেখতে হবে। খুঁজতে গিয়ে দেখে একটা হাতিধরা ফাঁদে হাতি পড়েছে। খালি মাথাটা গর্তের ওপরে। দুটো হায়না চারদিক থেকে বিরক্ত করছে। কাছে গিয়ে বুঝল, বেশ কিছু দিন আগে টানটর ফাঁদে পড়েছে। জল পায়নি, খেতে পায়নি, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। বনের ভাষায় তাকে আশ্বাস দিয়ে, কচি কচি বাঁশের ডগা এনে তাকে খাওয়াল টারজান। তাতে খাবার আর জল দুই-ই থাকে। টানটর অনেকটা সুস্থ হল। তখন ফাঁদের পাশ কেটে, গর্ত থেকে হাতির উঠে আসার ব্যবস্থা করতে লাগল টারজান। বল্লম, ছোরা, হাত, সব কাজে লাগিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে খেটে তবে পথ হল। তবে বিশাল জানোয়ারটা আস্তে আস্তে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারল। বিশাল পুরুষ হাতি। একটা দাঁত একটু কালো-মতো। বেরিয়ে এসে, টারজানের গায়ে শুঁড় বুলিয়ে তাকে ভালো করে চিনে নিয়ে হাতিটা জলাশয়ের খোঁজে চলল। টারজান আবার উত্তর দিকের পথ ধরল।

দিনের পর দিন কেটে গেল। টারজানের বাড়িতে অপেক্ষা করে করে উড্ হয়রান হল। শেষটা মুবিরো ওর পেড়াপিড়িতে ছয়জন যোদ্ধার সঙ্গে ওকে রওনা করিয়ে দিল। ওয়াজিরিরাও নরখাদকদের দেশ এড়িয়ে ঘোরা পথ ধরল। এর পরেই পলাতকদের কিছু সন্ধানও পাওয়া গেল। একটা বন্ধুভাবাপন্ন গ্রামে খবর পেল যে দুজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, একজন মেয়ে আর ছয়জন নিগ্রো ওখানে রাত কাটিয়ে গেছে। উত্তর দিকে সামনের গ্রাম অবধি গাইড নিয়ে গেছে তারা। সে গ্রাম থেকেও গাইড নিয়ে নিরাপদে তারা এগিয়ে গেছে। যাক, গনফালা তাহলে ভালো আছে। কেউ খারাপ ব্যবহার করছে না। অর্থাৎ ঝড়বৃষ্টির ফলে টারজানই ভুল পথে আর উড্ ঠিক পথে চলেছিল।

*

উত্তরের এক গ্রামের মোড়লের কাছে ট্রল আর স্পাইক গাইড চেয়ে এই প্রথম বাধা পেল। মোড়ল বলল, 'আর গ্রামটাম নেই এদিকে, গাইড দিতে পারব না।'

সাদা লোকদের সে পছন্দ করত না। বিশেষ করে যাদের সাফারি দেখে এমন পয়সাওয়ালা মনে হয় না। তবে খারাপ ব্যবহার করে একবার যা বিপদে পড়েছিল! সেই কোন দূর থেকে সাদা সিপাইরা এসে খুব জব্দ করেছিল। নইলে মেয়েটাকে কালো সুলতানদের কাছে অনেক টাকায় বিক্রি করা যেত। স্পাইক বলল, 'গ্রাম নেই তো উত্তরে কি আছে?'

—'উঁচু পাহাড়।'

—'সেই রকম জায়গাতেই তো আমার উপত্যকা।'

তখন মোড়লের মাথায় বদ্ বুদ্ধি এল। সে বলল, 'কাল গাইড দেব।'

গনফালাকে স্পাইক বলল, 'এবার বোধ হচ্ছে, সেই উপত্যকাটা পেয়ে যাব।'

গনফালা বলল, 'খুব একটা নিরাপদে থাকতে পারবে না। টারজান আর স্ট্যান্‌লি উড এল বলে।'

—'ও জায়গা তারা খুঁজে পাবে না। শেষ পর্যন্ত গাইডদের নেব না। আরেকটা উপত্যকার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। প্রথমটাকে দেখতে পেলেই গাইড ছেড়ে দেব।'

—'টারজান আর উড্ ঠিক খুঁজে বের করবে।'

—'আচ্ছা, এখন থামো দেখিনি।'

এতদিন ওরা মন্দ খায়দায়নি। শিকার করত। কিছু মাংস গ্রামবাসীদের শস্য আর তরকারির সঙ্গে বিনিময় করত। আজ খুব ভালো করে খাওয়াদাওয়া হল। গনফালাকে একটা আলাদা কুঁড়েঘর দিয়েছিল মোড়ল! সবাই পরিশ্রান্ত; শোবামাত্র স্পাইক আর গনফালা ঘুমিয়ে পড়ল। ট্রলের কিন্তু ঘুম আসছিল না। ভাবছিল কি সহজে স্পাইককে সাবাড় করা যায়! কিন্তু ভয়-ভয়ও করছিল।

ঘরের বাইরে গিয়ে দেখে গ্রামসুদ্ধ সবাই ঘুমে অচেতন।

একটা রান্নার হাঁড়িতে হোঁচট খাওয়াতে খানিকটা শব্দ হল। পা টিপে টিপে সে গনফালার ঘরের দিকে এগোল। গনফালা পায়ের শব্দ শুনে চমকে জেগে গেল। 'কে? কে?'

ট্রল বলল, 'চুপ কর। শোন, ঐ উপত্যকায় যাওয়া হতে পারে না। স্পাইক আমাকে মেরে, তোমাকে ওখানে আটকে রাখবে। তার চেয়ে আমার সঙ্গে ইউরোপ চল। প্যারিস যাওয়া যাবে।'

গনফালা রেগে গেল, 'কোথাও যাব না তোমার সঙ্গে।'

চটে গিয়ে ট্রল ওর গলা টিপে ধরল। ও ভীষণ জোরে একবার 'স্পাইক' বলে ডাক দিল। ডাক শুনে স্পাইকের ঘুম ভেঙে গেল। ছুটে গেল সে গনফালার ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে গনফালাকে ছেড়ে ট্রল্ স্পাইকের সঙ্গে ঝুটোপাটি লাগিয়ে দিল। গ্রামবাসীদেরো কেউ কেউ উঠে এসেছিল। গনফালা তাদের কাছে ছুটে গেল। মোড়লের কাঁচা ঘুম ভাঙাতে তার মেজাজ খিঁচিয়ে গেছিল। এই সময় ঝুটোপাটি থেমে গেল; টলতে টলতে স্পাইক বেরিয়ে এল।

গনফালা ভাবল নিশ্চয় ট্রল্‌কে স্পাইক মেরে ফেলেছে। একা স্পাইকের হাতে পাছে পড়তে হয়, সেই ভয়ে সে গ্রামের অন্য ধারে বেড়ার পাশে একটা ঘরের আড়ালে লুকোল। ট্রল কিন্তু মরে নি মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গেছিল। কিছু পরে জ্ঞান ফিরতে, সে-ও বেরিয়ে এল। সকালে স্পাইক সে গ্রামের পথের মধ্যিখানে বসে আছে। চিন্তাগুলো গুলিয়ে গেছে।

স্পাইককে দেখেই বলল, 'কি ব্যাপার?'

—'কি আবার ব্যাপার, তুমি ট্রাক্ চাপা পড়েছিলে।'

—'বল কি! দেখতেও পাইনি!'

এই সময় ট্রল্ বেঁচে আছে দেখে গনফালাও নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে এল। ট্রল্ বলল, 'কে ঐ মহিলা? আমার বোনের মত দেখতে লাগছে।'

স্পাইক তাড়াতাড়ি বলল, 'কিছু খাবার খেয়ে, এবার রওনা হলে ভালো হয়।'

সকালের খাওয়ার পর ওরা তিনজন গাইডদের দুজনের পিছন পিছন রওনা দিল। স্পাইক চলল আগে আগে, ট্রল আর গনফালা তার পিছনে। হঠাৎ ট্রল বলল, 'তোমার নাম কি?'

গনফালা সুযোগ বুঝে বলল, 'নিজের বোনের নাম ভুলেছ? আমি গনফালা।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি গনফালা বটে।'

স্পাইক গাইডদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসে বলল, 'ওরা আর যাবে না। সামনেই নাকি ভুতুড়ে ভূমি। আমাদের সাফারির লোকরাও ঘাবড়ে গেছে। সামনে নাকি সাদা মানুষেরা থাকে, তারা ওদের ধরে সিংহদের খাওয়াবে।'

গনফালা বলল, 'চল, বন্ধুদের কাছে ফিরে যাই। আমি ওদের রাজি করাবো তোমাদের গনফাল দিয়ে দিতে।'

স্পাইক মাথা নাড়ল। সে রাজি নয়। ঐ উপত্যকায় সে যাবেই। কাজেই গাইড ছাড়াই ওরা এগোতে লাগল। ট্রলের মানসিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি। তার ধারণা গনফালা ওর বোন, কাজেই গনফালাকে রক্ষা করা ওর কর্তব্য। সেইজন্য সর্বদা হাতে একটা রাইফেল রাখত।

অনেক দিন ধরে ওরা পাহাড়ে জায়গায় হাঁটছে তো হাঁটছেই। একদিন সন্ধ্যায় দেখে আকাশে কিসের লাল রং অথচ সূর্য ডুবে গেছে। স্পাইক বলল, 'ওটা কি বুঝতে পারছ?'

—'বোধ হয় দাবানল।'

—'না, ওটা আগুন-পাহাড়। এবার উত্তর পশ্চিমে গেলেই চার পাঁচ দিনে উপত্যকায় পৌঁছে যাব। সেখানে আমরা সুখে ঘর কন্না করব।'

এবার গনফালা ভয় পেল না, সে জানত ট্রলকে বললেই সে স্পাইককে মেরে ফেলবে। পর দিন সকালে দেখা গেল ছয়জন অনুচরের মধ্যে দুজন ভেগেছে। ভাগ্যিস গনফালকে নিয়ে যায় নি। এখন থেকে গনফাল পাশে নিয়ে স্পাইক রাতে শোবে। ট্রলের কাছে পাথরটার নামও করত না সে। ট্রল সব ভুলে গেছিল। দুপুরে ওরা এক মস্ত উপত্যকায় পৌঁছল। তার খানিকটা বনে ঢাকা। একটা নদী মাঝখান দিয়ে বয়ে, পাহাড়ের খাঁজে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মানুষের পায়ের শব্দ শুনে ওরা আসল পথ ছেড়ে, ঝোপঝাপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে চলল। তারপর আবার খোলা প্রান্তরে পৌঁছল। স্পাইক বলল 'বনের কিনারা দিয়ে তাড়াতাড়ি চল।'

সেখান থেকে গনফালা একবার পিছনে তাকিয়ে দেখল। এক ডজন নিগ্রো চেনে বেঁধে ছটা সিংহ নিয়ে আসছে। তাদের পিছনে অদ্ভুত সাজ করা ছয়জন শ্বেতাঙ্গ। তাদের পিছনে আরো জনা কুড়ি শ্বেতাঙ্গ। তারা একটা মানুষের রক্তাক্ত কাটামুণ্ডু নিয়ে এগিয়ে আসছিল।

গনফালা বলল, ওরা হয়তো বন্ধু লোক।'

স্পাইক বলল, 'না চল, অনেক কষ্টে এতদূর আসা গেছে।' এই বলে গনফালার হাত ধরে টানল। অমনি ট্রল্‌ও তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল, 'ছাড়ো বলছি, আমার বোনকে!'

আবার দুজনে লেগে গেল। হঠাৎ সিংহ সহ দলটা ঘুরে তাড়াতাড়ি যে দিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই ফিরে চলল। এরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখল যোদ্ধা পিঠে নিয়ে একশো হাতি এগিয়ে আসছে। ট্রল্‌ আর স্পাইক তখনো খামচা-খামচি করছে!

*

যেখানে গাইডরা ওদের ছেড়ে গেছিল সেই পর্যন্ত পলাতকদের পিছু ধাওয়া করে, স্ট্যানলি উড মুশকিলে পড়ে গেল। হাতির পায়ের ছাপে অন্য পায়ের দাগ নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। ক্লান্ত দেহে সে এগোচ্ছিল, হঠাৎ একজন ওয়াজিরি হঠাৎ বলল, 'দেখুন, বোয়ানা, একটা শহর! সত্যিই তো! বেড়া দেওয়া গ্রাম নয়, দেয়াল ঘেরা শহর। উড বলল, 'এ কোন শহর?'

ওয়াজিরি বলল, 'জানি না তো। এদিকে কখনো আসিনি। হয়তো মেমসাহেব ঐখানে আছেন।'

—'কিন্তু সবাই মিলে বন্দী হলে তো চলবে না।'

—'আমরা ওয়াজিরি!'

—'তা হতে পারে, কিন্তু অতবড় বাহিনীর সঙ্গে ছয়জন কি যুদ্ধ করবে? তার চেয়ে আমি বরং যাই। তোমরা ফিরে গিয়ে মুবিরোকে বল আমরা টারজানকে পাচ্ছি না। সে যা হয় করবে।' ঘোর অনিচ্ছায় তারা ফিরে চলল।

আবার টারজান ওস্থার উপত্যকার ওপরকার মালভূমির ধারে দাঁড়িয়ে সোনার শহর ক্যাথনির দিকে চেয়ে রইল। প্রথম দেখেছিল বন্ধু ভ্যালথরের সঙ্গে। তার বাড়ি ক্যাথনির জাতশত্রু অ্যাথনিতে। এখন ক্যাথনির এরাও বন্ধুলোক। নিষ্ঠুর রানী নিমোনি মারা গেছে। তার জায়গায় মাটির নিচের কারাগার থেকে তার ভাই অ্যালেকস্টারকে উদ্ধার করে, রাজার আসন দিয়েছিল টারজানের বন্ধুরা—থুডস, ফরডস, গেমনন। নিমোনির প্রধান পরামর্শদাতা টোমসও নিশ্চয় স্বর্গে গেছে। বন্ধুরা ওকে দেখে খুশি হবে।

মনের আনন্দে নিচে নেমে সোনার সেতু পার হয়ে সে এগোতে লাগল। রক্ষীরা অনেকক্ষণ ধরে ওকে লক্ষ্য করছিল। একজন বলল, 'টারজান আসছে।' গেটের কাছে পৌঁছলে তারা ওকে অভ্যর্থনা জানাল।

—'তোমার জন্যই অ্যালেকস্টার রাজা হয়েছিল। তুমি তার প্রাণও বাঁচিয়েছিলে। এখানে বস, তাকে খবর পাঠাই।'

অনেকক্ষণ পরে মুখ লাল করে সে ফিরে এসে বলল, 'দুঃখের কথা আর কি বলব। হুকুম হয়েছে তোমাকে বন্দী করতে।'

টারজানের মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। ওর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিল ওরা। তারপর ওকে দোতলায় একটা ঘরে বন্ধ করে রাখল। ঘরে একটা বেঞ্চি ছিল, টারজান তার ওপর শুয়ে রইল। সন্ধ্যার পর একজন লোক এল; টারজান উঠে বলল, 'গেমমন!'

সে-ও বলল, 'টারজান!' বলে ওর কাঁধে হাত রেখে বন্ধুত্বের সম্ভাষণ জানাল।

টারজান বলল, 'তোমাকে দেখে বড় খুশি হলাম। সবাই ভালো আছে তো, ডরিয়া, তার মা বাবা, তোমার বাবা ফরডস?'

—'সবাই ভালো আছে; কেউ সুখী নয়। এ দেশটা বড় দুঃখী।'

—'কি ব্যাপার বল তো। ভেবেছিলাম নিমোনির মৃত্যুর পর সকলে সুখে থাকবে।'

—'আমরাও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু অ্যালেকস্টার-ও টোমসের প্রভাবে পড়েছে। টোমসই একরকম রাজত্ব করছে। যোদ্ধারা আর নাগরিকরা তাকে দেখতে পারে না। আরেকটু বাড়াবাড়ি করলেই বিদ্রোহ হবে আর টোমসও খতম হবে। কিন্তু তুমি আবার এলে কেন?'

—'এলাম কারণ দুজন শ্বেতাঙ্গ একটি মেয়েকে চুরি করে পালিয়েছে। ঐ মেয়ে আর তার ভাবী স্বামী আমার অতিথি ছিল। কয়েক দিন আগে দুজন নিগ্রোর কাছে শুনলাম

তারা ওদের গাইড ছিল। এইদিকে লোকগুলো এসেছে।'

গেমনন্ বলল, 'আমি বোধ হয় জানি ঐ মেয়ে কোথায়। অ্যালেক্স্টার আমাকে মাঝে মাঝে অ্যাথনি লুঠ করতে পাঠায়। অর্থাৎ টোমস পাঠায়। এই আশায় যে আমি যুদ্ধে মরব। সঙ্গে খুব কম লোক দেয়। কয়েকদিন আগে গিয়েছিলাম ঐ ভাবে। বনের ধারে দেখেছিলাম দুটো লোক মারামারি করছে। মেয়েটি আমাদের দেখে ছুটে আসছিল। এমন সময় হাতি চেপে অ্যাথনির দল এসে পৌঁছল। আমরা সরে পড়লাম। ওরা হয়তো তাদের বন্দী করেছে, যেমন টোমস তোমাকে করেছে।'

—'তা সে এবার আমাকে কার সঙ্গে লড়াবে?'

—'তাতো জানি না। বুনো জন্তু বা সিংহ হতে পারে। আজ আমার এক বন্ধু গার্ড দিচ্ছে, তাই আসতে পারলাম। যদি দরজা খুলে রাখি আর তুমি পালাও, সে বেচারা মারা পড়বে। তোমার কিছু মনে হচ্ছে?'

—'হ্যাঁ, তোমার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো। কিছু করতে চাও তো তোমার ছোরাটা আমাকে দিয়ে যাও।'

*

টারজানকে অ্যালেকস্টার প্রাণদণ্ড দিল। টোমসের প্ররোচনায়। সেই বীথিকায় ওকে নিয়ে এল। ও দেখতে পেল সেই শোভাযাত্রা, রাজার সেই সিংহ-টানা রথ, তার পিছনে চেনে-বাঁধা সিংহ! কিন্তু আজ আবার জাদ-বালজা এসে ওকে বাঁচাবে এমন আশা করা যায় না। সেই আগের দৃশ্যের পুণরভিনয় হল। দুপাশে সেই যোদ্ধার সারি; সেই সিংহ এসে ওর গা শুঁকলো। টোমস আহ্লাদ রাখার জায়গা পাচ্ছিল না। অ্যালেকস্টার সিংহ দেখে ভয় পাচ্ছিল। টারজানের চেন খোলা হল। যে যার বাজি ধরল। অ্যালেকস্টারের দিকে তাকাল টারজান। ত্রিশের নিচে বয়স, দুর্বল থুতনি, নিষ্ঠুর মুখ। এই নাকি নিমোনির ভাই! সে টারজানের দিকে তাকাতে পারছিল না। চোখ নামিয়ে নিল। বিরক্ত হয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি কর। বিরক্ত লাগছে।'

একটু বেশি তাড়াতাড়ি করে ফেলল তারা। শিকারী সিংহটার কলার থেকে চেন আগেই খসে গেল। শিক্ষিত খুনে সিংহটা সামনে যাকে পেল তাকেই আক্রমণ করল। বল্লম হাতে যোদ্ধারা এগিয়ে এলেও, দর্শকরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে দুর্বলদের মাড়িয়ে পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। অ্যালেকস্টারের কি ভয়। রথে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'যে ঐ সিংহ মারবে, তাকে এক লাখ টাকা দেব!'

কেউ কানও দিচ্ছিল না। যোদ্ধাদের বল্লমের খোঁচার উল্টো ফল হল। সিংহটা সোজা রাজার দিকে তেড়ে এল। সে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। টোমস উল্টো দিকে পালিয়েছিল। যোদ্ধারা সিংহ ঠেকাতে গেছিল। ক্রীড়াঙ্গনে রাজা আর বন্দী। হঠাৎ বন্দী কোমর থেকে একটা ছোরা বের করে সোজা সিংহের সামনে দাঁড়াল। ততক্ষণে সিংহটা দু-পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বন্দী তার পায়ের তলা দিয়ে গলে, তাকে জাপ্টে ধরে, পিঠে চড়ে বসল। তারপর জানোয়ারে মানুষে গড়াগড়ি। তারি মধ্যে মানুষটা বারবার ছোরার কোপ দিচ্ছিল আর তারো মুখ থেকে সিংহের মতোই গর্জন বেরোচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ছোরা গিয়ে হৃদ্‌পিণ্ডে পৌঁছল আর সিংহ মারা পড়ল। টারজান তার গায়ে পা রেখে জয়ধ্বনি দিল। রাজার কি ভয়! 'ওকে নিয়ে যাও! নিয়ে যাও।'

—'নিয়ে গিয়ে কি করব?'

—'মেরে ফেলবে!'

—'ও যে এক্ষুণি আপনার প্রাণ বাঁচাল।'

—'আচ্ছা, এখন বন্ধ করে রাখ তো। পরে দেখা যাবে।'

লজ্জায় সেই রাজপুরুষের মাথা নিচু। যেতে যেতে সে বলল, 'এ তোমার প্রতি যোগ্য ব্যবহার হল না।'

টারজান বলল, 'বলেছিল না যে সিংহ মারবে, সে যা চায় তাই দেবে। লাখ টাকা দেবে।'

—'তেমন হলে কি চাইতে?'

—'কিচ্ছু না।'

—'তুমি কিছুই চাও না?'

—'চাই, কিন্তু শত্রুর কাছ থেকে নয়।'

—'আমি তো ভাই তোমার শত্রু নই।'

টারজান বলল, 'কাল থেকে জলপান করিনি, কিছু খাই নি।'

রাজপুরুষ হেসে ফেলল, 'চাইতে হবে না। ও-সব এমনি পাবে।'

যে লোকটি খাবার আর জল আনল, সে টারজানের মুগ্ধ ভক্ত। ফোবেগের কথা উঠতেই টারজান বলল, 'সে বেঁচে আছে তো?'

—'হ্যাঁ। এখনো সে মন্দিরের রক্ষী।'

—'তাকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।'

যাবার সময় যোদ্ধাটি বলল, 'মদ ছুঁয়ো না। কেউ এলে দেয়ালের দিকে পিঠ করে দাঁড়িও।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল টারজান। সেই পুরনো দৃশ্য। অন্য ধারে নাগরিকরা ছোট ছোট জটলা করছে। পথিকরা দাঁড়িয়ে শুনছে, ক্রমে ভিড় বাড়ছে। একজন যোদ্ধা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে তাদের কি বলতে লাগল। এই লোকটাই খাবার এনে দিয়েছিল। চিৎকার শোনা গেল, 'টারজানকে মুক্তি দাও।' ফোবেগকে দেখতে পেল টারজান। সে চ্যাঁচাচ্ছে 'ছুয়ো অ্যালেকস্টার! ছি! ছি!' ভিড় থেকেও সেই চিৎকার উঠল।

কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ওদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করতেই, মারামারি লেগে গেল। লোকে ক্ষেপে উঠছিল। টারজানের গলা থেকে একটা চাপা গর্জন বেরিয়ে এল। একে একে জানালাটার শিকগুলো সে খুলে আনল। নিচে একটা উঠোন। সেখানে কেউ ছিল না। সিংহ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ভিড় ঠেকাবার জন্য। নাগরিকরা হটে যেতে বাধ্য হচ্ছিল। টারজান খিড়কি দোর দিয়ে বেরিয়ে, ভিড়ের আর সিংহগুলোর মাঝখানে দাঁড়াল। অনেকে ওকে দেখেই চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে একটা রব উঠল, তাতে বিদ্রোহের ধ্বনির সঙ্গে আস্থা আর আনন্দের সুর।

একজনের হাত থেকে মশাল নিয়ে টারজান বলল, 'সামনের সারির সকলে মশাল আর বল্লম নাও।' বলেই এগিয়ে গেল, সঙ্গে গেল মশাল আর বল্লমধারীরা।

পিছন থেকে তাড়া খেয়ে যদি বা দু-একটা সিংহ এগোল, কেশরে আগুন ধরে যেতেই তারা পিছন ফিরে দৌড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো দৌড়ল। নাগরিকরা তাদের তাড়া করে যাচ্ছিল। টারজান হাত তুলে তাদের থামাল, 'ওর চেয়েও বড় শিকারের পিছনে যাচ্ছি,—অ্যালেকস্টার আর টোমস।'

ফোবেগ তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমিও সঙ্গে যাব।'

অমনি ভিড়ও ক্ষেপে উঠল, 'ফটকে চল! ফটকে চল!'

টারজান বলল, 'আরো সোজা রাস্তা আছে। এসো।'

খিড়কি দোর দিয়ে প্রাসাদের হাতায় ওরা ঢুকে পড়ল। অ্যালেকস্টার আর কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি খেতে বসেছিল। রাজার বড় ভয়। টোমসকে বলছিল, 'সব তোমার দোষ! বুনোটাকে বন্ধ করে রাখতে বললে কেন? এখন ওরা আমাকে সিংহাসন থেকে নামাতে চায়। মেরেও ফেলতে পারে। কি হবে?'

টোমস বলল, 'বুনোটাকে ছেড়ে দাও না।'

একজন রাজপুরুষের দিকে ফিরে অ্যালেকস্টার বলল, 'হ্যাঁ, যাও, তাকে নিয়ে এসো। কেউ ফটকে গিয়ে ওদের সে-কথা জানিয়ে দাও।'

প্রথম লোকটি দরজা খুলেই বলল, 'এই তো টারজান।'

রাজা, টোমস আর অন্যরা লাফিয়ে উঠল! টারজান, ফোবেগ আর তাদের সঙ্গীরা ঘরে ঢুকল। রাজা আর টোমস পালবার চেষ্টা করেছিল। টারজান তাদের ধরে ফেলল।

রাজা বলল, 'বুঝতে পারছ না, আমি তোমার মুক্তির আদেশ দিয়েছি। টাকা দেব তোমাকে, সিংহপুরুষ করে দেব, ঘরবাড়ি দেব—'

টারজান বলল, 'বড় বেশি দেরি করে ফেলেছ।'

—'তুমি আমার কি করবে?'

—'কিছু না। তোমার প্রজারা কি করে, তার জন্য আমি দায়ী নই। তবে ওরা যদি থুডসকে রাজা না করে, আমি বলব ওরা আহম্মুক!'

একথা শুনেই নাগরিকরা থুডসকে ডাকতে লাগল। কথাটা চারদিকে ছড়িয়ে গেল। থুডসের বংশ রাজার বংশের চেয়েও উঁচু। তাঁকে সকলে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে।

রাজার মুখ সাদা। মনে হল ওর বড় বোনেরি মতো অ্যালেকস্টারও একেবারেই প্রকৃতিস্থ নয়। উঠে পড়ে, আস্তে আস্তে টোমসের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি এই সর্বনাশের মূলে। তুমি আর মাতুজা। বছরের পর বছর আমাকে বন্দী করে রেখেছিলে। আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছ, কিন্তু আর কারো জীবন নষ্ট করতে পাবে না।' এই বলেই হঠাৎ তলোয়ারের এক কোপে টোমসের মাথা কেটে ফেলল। তারপর পাগলের মতো হেসে উঠে, ঐ তলোয়ারের মুখটা নিজের বুকে ঠেকিয়ে, তার ওপর আছড়ে পড়ল। এই ভাবে ক্যাথনির শেষ পাগলশাসক অ্যালেকস্টারের মৃত্যু হল।

অ্যাথনি শহরের সিংহদ্বার দক্ষিণমুখী, কারণ ঐ দিকেই তাদের জাতশত্রু সোনার শহর ক্যাথনি যাবার পথ। অ্যাথনির যোদ্ধারা ঐ পথেই লুঠের আশায় ক্যাথনি যায়। ক্যাথনির যোদ্ধারাও ঐ পথেই আসে। ভারি মজবুত আর সুরক্ষিত ঐ সিং-দরজা। তার সামনের খোলা মাঠে হাতিদের কুচকাওয়াজ হয়। উত্তরে অ্যাথনির ক্ষেত-খামার, সেখানে কাজকর্ম চলে। দক্ষিণ থেকে কেউ এলে বড় একটা জন-

মানুষের দেখা পাওয়া যায় না। সেদিন দুপুরে একজন দ্বাররক্ষী বলল, 'দক্ষিণ থেকে একটা লোক আসছে। ক্যাথনির লোক বলে মনে হচ্ছে না।'

সেনাপতি ভালো করে দেখে বলল, 'ক্যাথনির লোক নয়। কিন্তু হয় পাগল, নয় বেজায় সাহসী। নইলে একলা আসে?'

লোকটা হল স্ট্যানলি উড্। সে ওদের কথা বুঝল না, কিন্তু শান্তির ইঙ্গিত দিল। রক্ষীরা ওকে ভিতরে আসতে দিল। এরা সকলেই শ্বেতাঙ্গ, পথচারীদের বেশির ভাগও তাই। কিছু নিগ্রোও ছিল। সকলের অত্যন্ত কৌতূহল, কি অদ্ভুত কাপড়চোপড়, অস্ত্রশস্ত্র। শেষেরগুলো তো গার্ডরা সরিয়ে নিল। ভাষা বুঝতে না পারায় ওর বড় অসুবিধা হচ্ছিল; গনফালার কথা জিজ্ঞাসা করতে চায়, তা সে উপায় নেই। এরা বন্ধু ভাবাপন্ন কি না তাও টের পাচ্ছিল না। অদ্ভুত সাজপোশাক। অ্যাথ্নির লোকদের সাজসজ্জার কথা আমরা আগেও শুনেছি; উড্ এই প্রথম দেখল। সাদা গায়ের রং, কিন্তু যোদ্ধাদেরো নাগরিকদের মতো গয়না গায়ে। তবে গয়নাগুলো বর্মের কাজও করতে পারে। ওকে শহরের মধ্যিখানে একটা বড় ঘেরা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। যেন একটা পার্কের মধ্যে সুন্দর একটা বড় বাড়ি; তার চারদিকে ছোট ছোট বাড়ি আর কি সুন্দর বাগান।

গেট দিয়ে ঢুকেই একটা ছোট বাড়িতে একজন সেনাপতি ধরনের লোক বসেছিল। তার কাছে ওকে জিম্মা করে দিয়ে প্রথম অফিসারটি বিদায় নিল। তাকে দেখে যতটা ভদ্র শিক্ষিত অভিজাত মনে হচ্ছিল, এ ততটা নয়। বড় অমার্জিত। উডের ভাষা বোঝা যাচ্ছে না দেখে, রেগে টেবিল চাপড়াতে লাগল। তার আদেশে উডকে একটা বড় একতলা বাড়িতে বন্দী করে রাখা হল। খানিকটা ঘেরা জায়গা, তার এক ধারে একটা খোলা শেড। সেখানে জনাপঞ্চাশেক লোক। পাঁচিলের বাইরে প্রহরী। হঠাৎ কে তার নাম ধরে ডাকতেই, চেয়ে দেখল স্পাইক আর ট্রল। দেখেই রাগে গা জ্বলে গেল। স্পাইক হাত তুলে বলল, 'দোহাই, রাগমাগ কর না, ভাই। সবাই একই ফাঁদে পড়েছি, কাজেই একসঙ্গে কাজ করা ভালো।'

উড বলল, 'গনফালা কোথায়?'

—'আমাদের বন্দী করেই, ওকে অন্য কোথাও নিয়ে গেল। তার পর আর দেখিনি। শুনেছি প্রাসাদে আছে। কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির তাকে ভারি পছন্দ। গনফলটাও নিয়ে নিয়েছে।'

উড বলল, 'কিন্তু ওকে চুরি করে আনলে কেন? যদি তার কোনো ক্ষতি করে থাক, তাহলে—'

ট্রল্ রেগে উঠল, 'ক্ষতি? আমি থাকতে আমার নিজের বোনের ক্ষতি কে করবে?'

উড তো অবাক! স্পাইক তাড়াতাড়ি বলল, 'নিয়ে যেতে হয়েছিল, কারণ ওকে ছাড়া গনফাল কাজ করছিল না।'

—'আবার সেই পাপ পাথর!'

—'ঠিক তাই। ঐ পাথর কারো কোনো মঙ্গল করেনি। আমাদের কি লাভ হল? সবুজ পাথর হারালাম। গনফাল হারালাম। এখন সারাদিন আস্তাবল থেকে হাতির নাদি সাফ করছি! আর কোন দিন কি ভাবে আমাদের নাকচ্ করে দেয়, তার জন্য অপেক্ষা করছি।'

একমাত্র স্পাইক ইশারায় আর দু-চারটে নিগ্রো ভাষার জগাখিচুড়ি দিয়ে ওদের সঙ্গে কাজ চালাতে পারছিল। সে বলল, 'ওরা জানতে চায় তুমি কে। আমি বলেছি বিদেশের এক ক্ষমতাশালী দেশ থেকে এসেছ তুমি। ঐ যে লম্বা চওড়া সুদর্শন লোকটিকে দেখছ, ওর বুদ্ধিশুদ্ধি ঢের বেশি। ও আমাদের এখানকার ভাষা শেখাচ্ছে।'

—'ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

স্পাইক বলল, 'ও হাতিদের দেখাশুনো করে। আগে বড় পদ ছিল। কয়েক মাস আগে এখানে বিদ্রোহ হয়। তাতে অনেক গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ লোকরা মারা পড়ে। এ লোকটি ভালো, সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, তাই ওকে এখানে হাতির আস্তাবল পরিদর্শকের কাজ দিয়েছে। এখন যারা দেশ শাসন করছে, তারা লোক ভালো নয়। এসো ভ্যালথর, আমার পুরনো বন্ধু স্ট্যানলি উডের সঙ্গে আলাপ কর। কি জ্বালা! ও ইংরেজি জানে না তা ভুলে যাই।'

এই বলে জগাখিচুড়ি ভাষায় পরিচয় পর্ব সারল। উড্ আর ভ্যালথর দুজনেই খুশি। তারপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভ্যালথরের কাছে উড্ এতখানি অ্যাথনি ভাষা শিখে ফেলল যে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারত। ওদের কাছেই উড্ শুনল বিদ্রোহর পর ফোরস ক্ষমতাসীন হয়েছে। বন্দীশালার খাবার বড় কম ও খারাপ; খাটুনি বড় বেশি! নিচু শ্রেণীর লোকরা এখন বড় বড় অফিসার হয়েছে, তাদের ব্যবহার বড় জঘন্য। গনফালারো কোনো সংবাদ নেই।

ভ্যালথর বলল, 'সুন্দরী হলে তার প্রাণের ভয় নেই।

আমরা সুন্দরীদের মারি না। এরিথ্রাও মারে না। তারাই এখন দেশ শাসন করছে। অ্যাথনির রাজা জাইগোর জায়গায় তারাই ফোরসকে বসিয়েছে।'

উড্ বলল, 'খুব সুন্দরী সে। না হলেই ভালো হত।'

ভ্যালথর হাসল, 'না, না, ফোরস তার ধারেকাছে যেতে পারবে না। ফোরসের বৌ মেনোফ্রা বড় দজ্জাল মেয়েমানুষ। গমফালা তার কাছে নিরাপদে থাকবে। যদি না ফোরস মেনোফ্রাকে ঘায়েল করে!'

ভ্যালথর আরো বলল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ষড়যন্ত্র চলছে। ফোরসের শাসনে অনেকে বিরক্ত। জাইগোর ভক্তও আছে অনেক। তাছাড়া জাইগো আর তার দলের লোক ও বন্ধুরা পাহাড়ে বনে লুকিয়ে আছে। সুবিধা বুঝলেই রাজ্য আবার জয় করে নেবে। উড্, ভ্যালথর, স্পাইক, ট্রল এদের কর্তব্যের মধ্যে একটা ছিল, রোজ সকালে হাতিদের কুচকাওয়াজ করানো। একদিন সবে সে কাজ সেরে, হাতিগুলোর পা সাফ, গা-মোছা এইসব করছে, এমন সময় তাদের একটা বুনো হাতি ধরার কাজে ডাক পড়ল। সেটার নাকি যেমন বিশাল দেহ, তেমনি বদ মেজাজ।

যে যোদ্ধা ওদের সঙ্গে চলেছিল সে ভ্যালথরের কাছে এসে বলল, 'যাদের সব হাতি ধরতে যাবার কথা তারা মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে। তাই এত সাহস বেড়েছে। এদের দেখে দেখে যোদ্ধাদের ঘেন্না ধরে গেছে। আপনার মতো একজন সত্যিকার পুরুষের নেতৃত্বে আমরা আবার হাতি চড়তে চাই।'

ভ্যালথর বলল, 'চড়বে হয়তো। যদি সাহস থাকে।'

সামনে থেকে একজন যোদ্ধা জানান দিল, 'হৈ-য়া!'

বুনো হাতিটাকে দেখেছে সে! হাতি দেখে ভ্যালথর-ও অবাক্, 'কি বিরাট, হয়তো তেমনি মেজাজ-ও। তাহলে খেল জমবে ভালো! এত বড় হাতি বড় একটা দেখা যায় না।'

উড্ বলল, 'আমাদের কি করতে হবে? ও নিজে ধরা না দিলে, ধরা যাবে মনে হচ্ছে না।'

—'তাই করা হবে। কয়েকটা মাদী হাতিকে ওর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। তারাই ওকে ভুলিয়ে গেটের বাইরে ঐ হাতির খোঁয়াড়ের ভিতর নিয়ে যাবে।'

শুঁড় তুলে বুনো হাতি জোরে ডেকে উঠল। সেনাপতি দাসদের হুকুম দিল, 'মাদী হাতি নিয়ে এগোও।'

কিন্তু নিজে এগোল না, এরিথ্স্ তো। দাসরাও তাই। ভয়ে ভয়ে সামান্য এগোতেই হাতি তেড়ে এল মাদীগুলোকে ছড়িয়ে ফেলে, সোজা সেনাপতির দিকে! সে তো পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু তার হাতিটা আগের আমলের যোদ্ধা হাতি, সে পালাবে কেন? টেনে তাকে পাশ ফেরাতেই, বুনো হাতির সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষণ। পোষা হাতির অফিসার-সুদ্ধ পতন! অফিসারটি উঠেই দৌড় দিল, যা কখনো করতে নেই! নিমেষের মধ্যে হাতি তাকে মাড়িয়ে মাংসের দলা বানিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিল। ভ্যালথর আর তার পিছনে উড্ তাদের মাদী হাতি নিয়ে ছুটেছিল, কিন্তু সময় মতো পৌঁছতে পারেনি। তবু ওরা বুনো হাতির দু-পাশে হাতি নিয়ে দাঁড়াল উড্ ভাবছিল ওদেরো ঐ অবস্থা হবে, কিন্তু বুনো হাতির সমস্ত রাগ যেন পড়ে গেছিল। সে শান্ত ভাবে ধরা দিল।

নাগরিকরা, যোদ্ধারা হাতি ধরার কৌশল দেখে মুগ্ধ। উডেরো খাতির বেজায় বেড়ে গেল। ফোরস তাকে ডেকে পাঠাল। ভ্যালথর তাকে সাবধান করে দিল, 'মনে রেখো ফোরসের নিশ্চয় অন্য কোনো মতলব আছে।'

*

রাত নামছিল। টারজান ক্যাথনি থেকে বেরিয়ে অ্যাথনির পথ ধরেছিল। গেমনন মানা করেছিল; অন্ততঃ কিছু লোক সঙ্গে নিতে বলেছিল। টারজান বলল গনফালার খোঁজ নিতে একা যাওয়াই ভালো। থুডস বলল, 'সময় মতো না ফিরলে, সেনা পাঠিয়ে নিয়ে আসবে। তবে তোমাকে এমনি মেরে নষ্ট করবে না। অ্যারিনাতে লড়াবে সে কাজ হাতির আস্তাবল সাফের চেয়ে তোমার বেশি ভালো লাগবে।'

টারজান বলল, 'না। জানোয়ার মারতেও আমার ভালো লাগবে না।'

শেষ পর্যন্ত রাতে রওনা হল। সিংহ দেখলে তার মোকাবিলা করা যাবে। যে-সে সিংহ নয় ওগুলো। বেশির ভাগই ক্যাথনির ফেরারি যুদ্ধ করার শিক্ষিত সিংহ।

সিংহের ডাক শুনতে শুনতে টারজান থেনার উপত্যকায় পৌঁছল। দু একটা সিংহের মোকাবিলা করা সহজ। কিন্তু দল বেঁধে এলেই মুসকিল। হঠাৎ ডাক থেমে গেল। তার মানে শিকারের গন্ধ পেয়েছে। টারজানই সেই শিকার নাকি?

বাতাস তো এদিক থেকেই বইছে। সিংহেরা এখনো এক মাইল পিছিয়ে আছে। বনটা বোধ হয় তিন মাইল সামনে। সিংহরা এগিয়ে আসছে। শিক্ষিত সিংহ বোধ

হয়, তাই এতক্ষণ দম রয়েছে। এবার টারজান দৌড়তে লাগল। বনটা আরো আধ মাইল দূরে। তাহলে হয়তো বেঁচেই গেল। এমন সময় সামনে একটা সিংহ বেরিয়ে এল। মনে হল বুনো সিংহ। অন্যারের সিংহরা নিশ্চয় ওদের দেখতে পাচ্ছিল। একটা বনমানুষের হুংকার দিতেই বুনো সিংহ দৌড় দিল আর টারজান ছুটে একটা গাছে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা শিক্ষিত সিংহও ওকে ধরবার জন্য লাফাতে আরম্ভ করল। একটা আরামের জায়গায় বসে টারজান কাঠকুটো ছুঁড়ে মারতে লাগল। তারপর গাছ থেকে গাছেউত্তরে অ্যাথনির দিকে চলল। টারজান মনে মনে হিসাব করেছিল সেখানে রাতে পৌঁছতে হবে। উত্তর দিক দিয়ে ঘুরে, কারণ সেদিকে রক্ষার ব্যবস্থা দুর্বল। তবু পূর্ণিমা রাতে নগরপ্রাচীর ডিঙোতে হবে। গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যখন একশ ফুটের মধ্যে পৌঁছল, এক দৌড়ে খচমচ করে বেড়ালের মতো পাঁচিলের মাথায় চড়ে, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। নিচেই একটা শেড্, তার খাদে নেমে, রাস্তায় উৎরে গেল সে। অমনি একটা জানালা খুলে মাথা বের করে কে যেন বলে উঠল, 'কে? কে?'

টারজান বলল, 'আমি ডাইমন।'

সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডু ঢুকে গেল, জানালা বন্ধ হল। ডাইমন বড় অশুভ অপদেবতা।

সরু সরু গলি ধরে ক্রমে টারজান নগরের মধ্যিখানে রাজবাড়ির হাতার কাছে পৌঁছল। ও জানত খালি উত্তরের আর দক্ষিণের গেটে রক্ষী থাকে। অন্যগুলো এঁটে বন্ধ থাকে। একটা ব্যবহার হয় না। পশ্চিম থেকে আসতে টারজান গেট কিম্বা রক্ষী কিছুই দেখতে পেল না। নিচু পাঁচিল সহজেই ডিঙিয়ে বাগানে পৌঁছল সে। চারদিক সুগন্ধে ভরা। ঘুরতে ঘুরতে দেখে একটা রাজবাড়ীতে কয়েকটা আলো জ্বলছে। টারজান ফুলের গন্ধের বদলে অন্য গন্ধ খুঁজছিল। রাজবাড়ির পাশে বড় গাছে চড়ে উঁকি মেরে দেখে ভোজসভা বসেছে। শতখানেক লোক খাচ্ছে, হাসছে, গল্প করছে। কেমন অমার্জিত চেহারা অতিথিদের। টেবিলের মাথায় যে বসেছে, সে দস্তুর মতো চাষাড়ে। সোনারুপোর বাসনে খাবার দেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ চাষাড়ে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'মেয়েটাকে আনতে বলেছিলাম না?'

—'কোন মেয়ে, হুজুর?'

—'আরে সেই মেয়ে—'

—'কি করতে হবে?'

—'আনতে হবে।'

—'কে আনবে?'

—'তুমি।'

—'আজ্ঞে না, হুজুর। মেনোফ্রা আমাকে ছিঁড়ে খাবে।

—'সে শুতে গেছে। টের পাবে না।'

—'ঠিক টের পাবে। রাজাকে আর আমাকে কেটে ফেলবে।'

—'এখানে কে রাজা?'

—'আজ্ঞে মেনোফ্রা, হুজুর।'

একজন ক্রীতদাসকে শেষ পর্যন্ত পাঠানো হল। দেখে দেখে টারজান তাজ্জব বনে গেল। ঐ মেয়েটা কি তবে গনফালা? এমন সময় কদাকার দেখতে এক মহিলাকে নিয়ে ক্রীতদাস ফিরে এল।

সে মহিলা এসেই কটমটিয়ে ফোরসের দিকে চেয়ে বলল, 'এই অসময়ে কেন ডেকে পাঠিয়েছ, মাতাল কোথাকার!'

ফোরস মেনোফ্রাকে দেখে ঘাবড়ে গেছিল, 'ইয়ে মানে আমাদের সঙ্গে একটু উৎসব করবার জন্য, বুঝলে?'

মহিলা বলল, 'কিসের জন্য উৎসব?'

—'ইয়ে কি যেন ভুলে যাচ্ছি। এই ক্যাণ্ডস, উৎসবটা কিসের জন্যে যেন?'

পাশে বসা ক্যাণ্ডস তোৎলাতে লাগল। মহিলা ক্রীতদাসকে বলল, 'আমাকে ডাকতে বলেছিল?'

—'বলেছিলেন অ্যাথনিতে একজন মাত্র মেয়ে আছে, তাকে ডাকো। আমি ভাবলাম রানী ছাড়া আবার কে আছে।'

মেনোফ্রা বলল, 'ও, সেই সোনালীচুলো মেয়েটাকে ডাকছিলে বুঝি? দাঁড়াও আগে তোমাকে সায়েস্তা করি। তারপর তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে, তোমার কাছে পাঠাব।' এই বলে ফোরসের একটা কান ধরে অতিথিদের বলল, 'ভাগো সকলে। আর তুমি আমার সঙ্গে চল, রাজা।'

*

টারজান দেয়াল বেয়ে ওঠা একটা শক্ত লতা ধরে ওপরের জানালার কাছে পৌঁছল। জানালায় শিক ছিল না। দুটো লোক মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে ঘুমোচ্ছিল। উল্টো দিকে একটা দরজা। সেটা খুলে একটা করিডরে পৌঁছল। সেখানে অনেক ঘর, অনেক দরজা। আরো করিডরও এদিক ওদিক থেকে বেরিয়েছে। কারা যেন ঝগড়া করছিল। তারপর একটা চিৎকার। তারপর সব চুপ। ঝগড়া করছিল মেনোফ্রা আর ফোরস। টারজান দরজার আড়াল থেকে দেখতে পেল

রক্তমাখা ছোরা হাতে ফোরস সেই ঘর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল। তার মুখটা কেমন ভাবলেশহীন। সে অন্য একটা করিডরে ঢুকতেই, টারজান তার পিছু নিল। একটু দূরে একটা বন্ধ দরজার চাবি খুলে সেই ঘরে ঢুকল। টারজানও দরজা ঠেলে নিঃশব্দে পিছন পিছন ঢুকল। ফোরস কিছু টের পেল না। ঘরে মিটমিট করে একটা প্রদীপ জ্বলছিল। হাত পা বাঁধা গনফালা আর উড্ দু কোণে পড়েছিল। দুজনেই টারজানকে দেখে অবাক! টারজান ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে তাদের চুপ করতে ইশারা করল। ফোরস একটু একটু দুলছিল।

—'ওঃ! দুজনেই এখনো আছ দেখছি! মেনোফ্রা মরেছে, এই দেখ তলোয়ার! তারপর তোমাকেও মারব উড্। ঐ মেয়ে আমার বৌ হবে।' এই বলে যেই না এক পা এগিয়েছে, ইস্পাতের মতো শক্ত আঙুল ওর ডান হাতের কব্জি চেপে ধরেছে। তলোয়ার খসে গেছে আর ফোরসও ধপ্ করে পড়েছে।

—'টুঁ শব্দ করলেই মেরে ফেলব।'

—'তুমি যা চাও তাই দেব, আমাকে মেরো না।'

—'যা চাই তাই নিচ্ছি। খবরদার নড়বে না।' এই বলে উডের বাঁধনগুলো কেটে দিয়ে, তাকে বলল, গনফালার দড়িগুলোও কেটে দিতে। 'তারপর ঐ দড়িদড়া দিয়ে একে বাঁধো, মুখে গ্যাগ্ পরাও।'

টারজানকে উড্ সব কথা জানাল। হাতি ধরার পর, ওকে ডেকে পাঠিয়ে ফোরস গনফালার কাছে নিয়ে এসে গনফল মণি দেখিয়ে বলেছিল, 'শুনেছি তোমরা দুজনে মিলে ওটা দিয়ে জাদু করতে পার। আমাকে দেখাও।' জাদুটাদু হয়নি, উপরন্তু ফোরস বুঝে নিয়েছিল গনফালা উড্কে বিয়ে করবে। তাই রেগে দুজনকে বেঁধে রেখেছিল।

এইসব কথা হচ্ছে হঠাৎ মনে হল কে যেন পা ঘষটে হেঁটে আসছে। দরজা খুলে গেল। মেনোফ্রাকে দেখা গেল। গলায় আর কাঁধের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছিল, কিন্তু বুদ্ধিটা ঠিকই ছিল। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে, চাবি লাগিয়ে, সে প্রহরীদের ডাকাডাকি করতে লাগল।

প্রহরীরা এলে মেনোফ্রা বলল, 'ঘরে একটা বুনো ঢুকে বন্দীদের মুক্ত করে, রাজাকে বেঁধে ফেলেছে। মেরে ফেলতেও পারে। তা আমি চাই না। ঘরে ঢুকে বিদেশীদের ধর আর রাজাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

দরজার ভিতর থেকে টারজান বলল, 'আমার অনুমতি ছাড়া ঘরে এলে, রাজাকে মেরে ফেলব।'

উড্ ফোরসকে বলল, 'তোমার দেখছি উভয় সংকট। মেনোফ্রা তোমার নাগাল পেলে, তোমার হয়ে গেল।'

গ্যাগ্ থাকাতে ফোরস চুপ! ঘরের বাইরে যারা ছিল, আর ঘরের ভিতরে যারা ছিল, কেউ ভেবে পাচ্ছিল না, কি করবে।

টারজান উড্কে বলল, 'আমি তো জানতাম এখানকার লোকরা ভারি ভদ্র। তবে ক্যাথ্নিতে শুনছিলাম বিদ্রোহের ফলে এখানে শাসনের ভার অন্য লোকের হাতে। ভেবেছিলাম অন্ততঃ অভিজাত লোকরা ক্ষমতায় এসেছে। এ যে দেখছি উল্টো ব্যাপার।'

উড্ বলল, 'বিদ্রোহের ফলে অভিজাত বংশীয়রা হয় মরেছে, নয় বন্দী, নয় বনে পালিয়েছে।'

—'তাহলে আমার বন্ধু ভ্যালথর কিছুই করতে পারবে না।'

উড্ বলল, 'সে যে আমারো বন্ধু। আস্তাবলের কাজ দেখে।'

দরজায় টোকা পড়তেই টারজান বলল, 'কি চাও?'

—'রাজাকে রানীর হাতে ছেড়ে দিলে, তোমাদের কোনো ভয় নেই।'

তাই শুনে ফোরস কিলবিল করে উঠল। টারজানের কথায় ওর গ্যাগ খুলে দেওয়া হল। ফোরস বলল, 'ওর হাতে আমাকে দিও না। আমাকে মেরে ফেলবে।'

উড্ বলল, 'সেটা তোমারি দোষ।'

টারজান বলল, 'একটা রফা করা যাক। আমাদের ছেড়ে দেওয়া হক আর এদেশ থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা হক।'

—'দেওয়া হবে!'

উড্ বলল, 'হীরেটাও দিতে হবে।'

—'দেব।'

টারজান বলল, 'তোমাদের কথার ঠিক নেই। তাই শেষ পর্যন্ত তুমি সঙ্গে থাকবে।'

—'আমি সব কিছুতে রাজি। খালি ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।'

—'তাছাড়া ভ্যানথরকেও ছেড়ে দিতে হবে।'

—'দেব।'

—'গার্ডরা তোমার কথা শুনবে?'

ফোরস বলল, 'তা জানি না। সবাই ওকে ভয় পায়। তার কারণও আছে।'

—'বেশ, দরজার কাছে এসে ওদের বোঝাও।'

ফোরস দরজার কাছে গিয়ে খোশামুদে গলায় বলল, 'শোন গো, মদ খেয়ে কি করি না করি তার ঠিক নেই। কিছু মনে কর না। এদের ক-জনকে নিরাপদে দেশ ছেড়ে যেতে না দিলে, এরা আমাকে মেরে ফেলবে।'

মেনোফ্রা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'মিষ্টি কথা রাখো! এ্যাই গার্ড—ভীতু কোথাকার, ওদের টেনে বের করে আন না।'

ফোরস বলল, 'খবরদার! আমি রাজা। মানা করছি।'

—'আমি রানী। গার্ড, রাজাকে উদ্ধার করে আনো!'

—'আমি বেশ আছি উদ্ধার হতে চাই না।'

প্রধান গর্ড বলল, 'বরং ক্যাণ্ডস্‌কে ডাকি। তিনি যা বলেন।'

এবার উড দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'মেনোফ্রা, রাজাকে আমাদের এ-দেশের সীমান্ত অবধি পার করে দিতে দাও না। তারপর সে তোমার কাছে ফিরে আসবে।'

মেনোফ্রা বলল, 'ও যদি ফাঁকি দেয়?'

—'কি করে দেবে?'

—'তা জানি না। সারা জীবনই তো সবাইকে ফাঁকি দিচ্ছে।'

—'তোমার সঙ্গে যোদ্ধা থাকবে। কি করে ফাঁকি দেবে?'

—'তা বটে। কিন্তু আমার একটুও অপেক্ষা করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমার কি অবস্থা করেছে দেখেছে তো?'

—'হ্যাঁ। সাংঘাতিক অবস্থা।'

ক্যাণ্ডস এসে রানীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে, ডেকে বলল, 'সব ঠিক হয়ে গেছে। সূর্য উঠলেই তোমরা রওনা হয়ে যাবে। রাতে ও-পথ নিরাপদ নয়। কথা দিচ্ছ রাজার কোনো অনিষ্ট করবে না?'

—'কথা দিচ্ছি।'

—'তাহলে তোমাদের রক্ষীদের ঠিক করি গিয়ে।'

উড্ বলল, 'ব্রেকফাস্ট দিতে ভুলো না।'

—'না, কখনো না।'

*

নানা রকম গল্পে রাত কাটল। ভোরে দরজা খুলে দুটো হাঁড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে, দরজা আবার কে বন্ধ করে দিল। একটা হাঁড়িতে ঘন স্টু, অন্যটাতে জল। চামচ ছুরি, বাসনপত্র কিছু নেই। বেশ ভালো স্টুটা। টারজানের ছুরির সাহায্যে মাংস খুঁছিয়ে তুলে খেল ওরা। ঝোল আর জল খেল পালা করে চুমুক দিয়ে। খেয়ে উঠেই কিন্তু সকলের বড্ড ঘুম পেতে লাগল। একে একে সবাই ঢলে পড়ল। টারজান বলল, 'ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। বিষও হতে পারে।' এই বলে অচেতন হয়ে পড়ল।

মেনোফ্রার চমৎকার করে সাজানো ঘরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মেনোফ্রা, কৌচে শুয়ে ছিল। তার পায়ের কাছে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা উড্ আর গনফালা। পাশে ক্যাণ্ডস দাঁড়িয়ে। অন্য দিকে হাত পা বাঁধা ফোরস অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিল। মেনোফ্রা ক্যাণ্ডসকে বলল, 'বুনোটাকে খোঁয়াড়ে ভরেছো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর গায়ে এত জোর যে চেন করে রেখেছি।'

এই সময় উডের জ্ঞান ফিরল। পাশে গনফালা পড়ে ছিল। তার নিশ্বাস ফেলা দেখে বোঝা গেল সে বেঁচে আছে। গনফালা চোখ খুলে বলল. 'আমরা কোথায়।'

—'আমরা এখনো বন্দী। এরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

ক্যাণ্ডসের দিকে চেয়ে বলল, 'এই তোমাদের কথা রাখা? অন্যজন কোথায়?'

ক্যাণ্ডস বলল, 'নিরাপদেই আছে। রানীর বড় দয়া, কাউকে মেরে ফেলেননি।'

—'আমাদের নিয়ে কি করা হবে?'

মেনোফ্রা বলল, 'বুনোটা ক্রীড়াঙ্গনে যাবে। তোমাকে আর মেয়েটাকে দিয়ে আমার দরকার আছে। তাই এখনি মরবে না।'

—'কি সে কাজ?'

—'দেখতেই পাবে। ক্যাণ্ডস, পুরোহিত ডাকো।'

ফোরসেরো জ্ঞান ফিরল। 'তাহলে তুমি আমাকে

উদ্ধার করেছ গো ?'

—'তুমি তাকে যা খুশি বলতে পার। আমি অন্য রকম বলি।'

পুরোহিত এলে, উড্ আর গনফালাকে দেখিয়ে মেনোফ্রা বলল, 'এদের বিয়ে দাও।'

সাদাসিধে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। তারপর মেনোফ্রা গার্ডকে বলল, 'এবার ঐ লোকটাকে বন্দীশালায় নিয়ে যাও আর ফোরসকে আর ঐ মেয়েকে আমার পাশের ঘরে বন্ধ করে রাখো।'

টারজানের জ্ঞান হল ক্রীড়াঙ্গনের খোঁয়াড়ে। লোহার চেনে বাঁধা অবস্থায়। একটু পরেই উড্‌কে এনে সেখানে ঢুকিয়ে আবার গেটে তালা দিয়ে রক্ষীরা চলে গেল। উডের কাছে সব কথা শুনল টারজান। উড্ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে চেন করেছে, কিন্তু আমাকে করেনি কেন ?'

—'বোধ হয় আমার জন্য কোনো রকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হচ্ছে।'

সন্ধ্যার আগে অন্য বন্দীরা কাজ সেরে ফিরে এল। ভ্যালথর এগিয়ে এসে টারজানকে দেখে অবাক হল। 'সত্যি তুমি, টারজান ?'

উড্‌কে বলল, 'ভেবেছিলাম আর দেখা হবে না।'

সব কথা শুনে ভ্যালথর উড্‌কে বলল, 'যতদিন মেনোফ্রা বেঁচে আছে গনফালা নিরাপদে থাকবে। কিন্তু সে আর কত দিন ? ক্যাণ্ডস একটা কিছু করবে, যদি সে বড় বেশি কাপুরুষ না হয়। ফোরস আবার রাজত্ব করবে। অমনি তোমাকে মেরে ফেলবে। জাইগোর দল এসে ক্ষমতাসীন না হলে, কোনো আশার আলো দেখি না। এখনি ওরা আসতে পারে। নাগরিকরা আর যোদ্ধারা ফোরস, মেনোফ্রা আর এরিথ্রাদের ওপর হাড়ে চটা।'

এই সময় একজন লম্বা নিগ্রো এসে বলল, 'আমাকে মনে আছে, হুজুর ?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়। তুমি গেম্বা। থুডসের বাড়িতে কাজ করছিলে। এখানে কবে এসেছ ?'

—'অনেক মাস আগে হুজুর, আমাকে বন্দী করে এনেছে। সেখানে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে।'

—'গেলে তোমার ভালো লাগত, গেম্বা। তোমার পুরনো মনিব এখন রাজা হয়েছেন। টারজান এখানে বন্দী জানলে তিনি সৈন্য নিয়ে লড়াই করতে আসতেন।'

ভ্যালথর বলল, 'কিন্তু খবরটা পাবেন কি করে ?'

টারজান বলল, 'এই কলারটা খুলতে পারলে, আমিই গিয়ে তাদের নিয়ে এসে সবাইকে উদ্ধার করি।'

বেশ কিছুদিন কাটল। নামে ফোরস রাজা হলেও, শাসন করছিল মেনোফ্রা। শহরের নাম বদলে নাকি মেনোফ্রা-নগর করা হচ্ছে। রোজ বন্দীরা কাজ করতে বেরিয়ে যায়। খালি কলার বাঁধা টারজান সারা দিন পড়ে থাকে। তার সে মানসিক কষ্টের কথা ভাবা যায় না। শরীরের কষ্টে তার কিছু হত না। ভিতরে ভিতরে চাপা আগুনের মতো রাগ জমতে থাকে। এক দিন শোনা গেল যে কয়জন বন্দী পালাবার চেষ্টা করেছিল। একজন রক্ষী মারা পড়েছে। কয়েকজন বন্দী ভেগেছে। জেরা করার সময় যোদ্ধাদের নির্মম ব্যবহারের কথা ভাবা যায় না। রক্ষীরা গেলে বন্দীদের ধৈর্যও যেন বাঁধ ভাঙবার জোগাড় হল। ভ্যালথর তাদের সাবধান করতে লাগল। কিছুদিন অপেক্ষা কর। নাগরিকরা আর যোদ্ধারা আরেকটু ক্ষেপে উঠুক। বাইরে থেকেও সাহায্য আসার কথা।

সে রাতে খাবার সময় একজন অফিসার এসে ভ্যালথরের গলায় লোহার কলার পরিয়ে গেল। পরস্পরের সঙ্গে কিছু অপমানকর কথার আদান-প্রদান হল। যাবার আগে লোকটা বলে গেল পরদিন ক্রীড়াঙ্গনে ওদের দুজনের খেলা হবে খ্যাপা বুনো হাতির সঙ্গে।

*

টারজান ভ্যালথর দুজনেই খ্যাপা হাতির সঙ্গে লড়তে গিয়ে মরবে। এ কথা শুনে বন্দীশালার সকলের কি রাগ। ভ্যালথরের অপরাধ তার প্ররোচনায় বন্দীদাসরা পালাবার চেষ্টা করেছিল। উডের কি দুঃখ। দুই বন্ধুকেই কি হারাবে ? টারজান কথাটাকে কানেই তোলে না।

ভ্যালথর বলল, 'আমি হস্তী পুরুষ, সিংহের চেয়ে হাতির কাছে মরতেই খুশি।'

টারজান বলল, 'হাতিরা আমার বন্ধু। তাদের সঙ্গে লড়তে আমার ইচ্ছা করে না।'

—'এ হাতি কারো বন্ধু নয়।'

—'জাতটাই আমার বন্ধু।'

লড়াইয়ের দিন সকাল হল। উডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন ওরা ক্রীড়াঙ্গনে গেল, তখন বিকেল হয়ে এসেছে। রাজবাড়ির সামনে থেকে শোভাযাত্রা বেরোবে। হাতি চড়ে গণ্যমান্যরা যাচ্ছে। তাদের খোলা হাওদা

মেনোফ্রার হাওদার ছাদ ছিল। সে একা বসেছিল। একশো হাতির মিছিল। পথের দুধারে দুসারি নাগরিক। তাদের মুখে কথা নেই। কেউ জয়ধ্বনি দিল না। টারজানের আর ভ্যালথরের ওপর সকলের চোখ। সিংহদ্বারের বাইরে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা ক্রীড়াঙ্গন।

টারজানের মনে হল বেড়াটা বড়ই পল্‌কা। আরো অনেক বন্দী আনা হয়েছিল। দেখে মনে হল তারা উচ্চবংশীয়। ক্রীড়াঙ্গনের ভিতরে একটা কাঠের মাচার মতো করা হয়েছিল। যারা লড়াই করছে, তারা সেখানে অপেক্ষা করবে। রাজ মিছিল একবার চারদিক ঘুরে এল। মেনোফ্রা নেমে তার আসন নিল। অর্ধেক জায়গা তখনো খালি, আরো লোক আসছিল।

প্রথম খেলায় একজন সশস্ত্র পেশাদার এরিথ্রস যোদ্ধার সঙ্গে একজন পূর্বতন রাজপুরুষের যুদ্ধ, তার হাতে একটি মাত্র ছোরা। এ তো খেলা নয়, খুন। টারজান বলল, 'আমি বোধ হয় পালোয়ানটাকে মেরে ফেলতে পারতাম। ও বেচারি কায়দাটা ধরতে পারেনি।'

একজন গার্ড বলল, 'তুমি হায়ার্ককে মারতে পারবে ভেবেছ?'

—'কেন পারব না? ওতো আনাড়ির একশেষ, তার ওপর ভীতু।'

—'কি যে বল, ওর মতো সাহসী কম আছে।'

—'সেটা ঠিক।'

দ্বিতীয় খেলার যোদ্ধাদের ডাকতে এসেছিল যে অফিসার, তাকে গার্ড কথাটা জানাতেই, সে বলল, 'দেখি মেনোফ্রাকে বলে। এ খেলাটা হলে সেটা হতে পারে।'

পরের খেলায় এক বুড়ো বন্দীর হাতে ছোরা দিয়ে নামানো হল, তারপর একটা বুড়ো সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হল। দাঁতপড়া, লোম ওঠা, ক্ষুধার্ত। টারজান বলল, 'তবু শরীরে তেজ আছে, বুড়োটাকে মেরে ফেলতে পারে।'

ফেললও তাই অল্পক্ষণের মধ্যেই। গার্ড বলল, 'এটাকেও তুমি মারতে পার নাকি?'

—'পারি বোধ হয়।'

হায়ার্কের সঙ্গে টারজানের যুদ্ধে সম্মতি দিয়েছে মেনোফ্রা। সে খবর নিয়ে অফিসারটি আসতেই গার্ড বলল, 'ও বলছে সিংহটাকেও মারতে পারে।'

অফিসার বলল, 'তা কি করে হয়? তার আগেই তো হায়ার্ক ওকে মেরে ফেলবে।'

টারজান বলল, 'দুটো লড়াই এক সঙ্গেই করব না হয়।'

অফিসার আশ্চর্য হল, 'একটা দেখবার মতো খেলা হবে বটে। এক্ষুনি মেনোফ্রাকে বলছি।' একটু বাদেই সে ফিরে এসে বলল, 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

ভ্যালথর বলল 'হায়ার্ক কি বলে?'

—'তার খুব পছন্দ হয়নি। বলছিল, বৌয়ের অসুখ, বাড়ি যাওয়া দরকার। আর কেউ বুনো মারার সম্মান পাক।'

মেনোফ্রা বলল, 'হায়ার্ক এক্ষুনি খেলায় না নামলে তার প্রাণদণ্ড হবে।'

ভ্যালথর বলল, 'বাঃ, চমৎকার রসবোধ তো!'

এদিকে টারজানের কলার খুলে হাতে ছোরা দেওয়া হল। হায়ার্ক তাকে দেখেই ছুটে এল, ভাবছিল ওকে তাড়াতাড়ি সাবাড় করে, সিংহ ছাড়ার আগে সরে পড়বে। সিংহের খাঁচার দরজা খোলা নিয়ে অসুবিধা ছিল। সিংহটার মেজাজ বিগড়ে গেছিল, সে শিকের ফাঁক দিয়ে থাবা চালাচ্ছিল। হায়ার্ক বর্শা বাগিয়ে ছুটে এল, নাগালে পেলেই টারজানকে ফুঁড়ে দেবে। খেলানো টেলানো নয় এবার। টারজান একটু নিচু হয়ে এগিয়ে এল। ছোরাটা কোমরে গোঁজা, হাত খালি। হায়ার্ক বেশ ঘাবড়াচ্ছিল। সিংহটা ছাড়া পেয়ে যদি ওর-ই ঘাড়ে লাফায়? ততক্ষণে টারজান কাছে এসে গেছিল।

হায়ার্ক তার বুক লক্ষ্য করে বর্শার বাড়ি দিল। টারজান বর্শার হাতল ধরে ওর হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে দূরে ফেলে দিল। হায়ার্ক তলোয়ারের হাতলে হাত দিতেই, তাকে ধরে ঘুরিয়ে দিল টারজান।

এই সময়ে সিংহটা ছাড়া পেল। হায়ার্কের কলার আর কোমরবন্ধ ধরে তাকে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল সিংহের দিকে। তারপর হায়ার্ককে একটু ঠেলে দিতেই সে ছুটতে আরম্ভ করল।

মেনোফ্রার আসনের সামনে পৌঁছতেই সিংহটা তাকে ধরে ফেলে মুণ্ডু কামড়ে শেষ করেই খেতে আরম্ভ করে দিল। নিঃশব্দে তার পিছনে গিয়ে কেশর আর পিছনের চামড়া ধরে তুলে এক পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল মেনোফ্রার আসনের দিকে। ধাক্কার চোটে মেনোফ্রা পড়ে গেল আর সিংহটা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এলোপাথাড়ি ছুটে, অনেককে জখম করে, বনে পালাল।

প্রধান অফিসার টারজানকে বলল, 'রানীর দিকে

সিংহ ছুঁড়লে কেন? তোমাকে হয়তো মুক্তি দিতেন। তার বদলে তুমি আর ভ্যালথর এবার খ্যাপা হাতির সঙ্গে লড়বে।'

ভ্যালথর দুঃখ করছিল, 'তুমি আমার শহরটাকে চিনবার সুযোগ পেলে না। তোমাকে এখানে এসে মরতে হচ্ছে, এ বড় দুঃখের কথা।'

—'আহা মরিনি তো এখনো।'

—'ঐ হাতিটা ধরতে আমি সাহায্য করেছিলাম। ভীষণ তেজী, বদ মেজাজী আর বিশাল হাতি।'

হাতির খোঁয়াড়ের দরজা খুলে দিতেই, ভীষণ চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে হাতি তেড়ে এল। প্রথমটা ওদের দুজনকে হয়তো লক্ষ্যই করেনি, তারপর ফিরে ওদের দিকে এল। তখন টারজান দেখল প্রকাণ্ড হাতিটার একটা দাঁত সাদা, অন্যটা একটু কালোমতো। শুঁড় তুলে কাছে এল হাতি, টারজান হাত তুলে বলল, 'দান-ডো, তান্তর! টারজান ইয়ো!' হাতিটা থেমে গেল। টারজান তার সামনে গিয়ে, তার শুঁড়ে হাত রাখল। ভ্যালথরকে পিছনে দাঁড়াতে বলল। হাতিটা শুঁড় নামিয়ে টারজানের সর্বাঙ্গে বুলোতে লাগল।

টারজান বলল, 'নালা টারজান! নালা টারমানগানি।' এই বলে ভ্যালথরকে পাশে টেনে আনল। হাতিটা শুঁড় দিয়ে টারজানকে আর ভ্যালথরকে মাথায় তুলে নিল। প্রথমে প্রাঙ্গণের চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করল, তারপর যেখানে বন্দীরা আটক ছিল, সেখানে পৌঁছে টারজানের হুকুমে পরপর ভিতরের আর বাইরের বেড়া ভেঙে দক্ষিণ দিকে ছুটল। যোদ্ধারা তাদের হাতিতে উঠে একটু পরেই পিছু নিল। কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না। ক্যাথনির সৈন্যদল যোদ্ধা সিংহ নিয়ে দলে দলে এগিয়ে এল।

*

ভ্যালথর বলল, 'পুবে চল। জাইগো আর তার বিশ্বাসী অনুচররা ঐ পাহাড়ে আছে।'

টারজান বলল, 'বন্ধুদের কাছ থেকে পালাব কেন?'

—'চিনতে পারলে, তবে তো। শিক্ষিত সিংহ ওদের। হাতির পিঠে লাফিয়ে চড়ে লোক টেনে নামায়।'

—'তবে হেঁটেই চল।' হাতির পিঠ থেকে ওরা নেমে পড়ল। টারজান হাতিকে কি যেন বলে দিতেই, সে শুঁড় তুলে সংহার মূর্তি ধরে এরিথ্রার হাতিদের দিকে ছুটে গেল। এরা দুজন ক্যাথনির দলের দিকে এগোতে, ওদের দল থেকে গেমনন ছুটে এল। আমরা তোমাদের উদ্ধার করতে যাচ্ছি যে।'

—'কি করে জানলে আমি বিপদে পড়েছি?'

—'গেম্বা বলেছে। ও তো পালিয়ে এসেছে। সোজা থুডসের কাছে খবর দিয়েছে।'

টারজান বলল, 'আমার দুই বন্ধুকে উদ্ধার করতে হবে। ফোরসের যোদ্ধারা অনেকে এখানে বেরিয়ে এসেছে, এই হল আক্রমণ করার সময়।'

—'থুডস্ সেটা বুঝেছে। এখন আক্রমণ করা হবে।'

ভ্যালথরের সঙ্গে মেননের আগেই চেনা ছিল। থুডস ওদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, 'থুস্ সহায় হলে, জাইগো আবার সিংহাসনে বসবে।

তারপর অনুচরদের বললেন, 'যুদ্ধের সিংহগুলো ছেড়ে দাও।'

ভীষণ যুদ্ধ হল। শেষ পর্যন্ত ক্যাথনির জয় হল থুডস্ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে অ্যাথনির ভিতরে প্রবেশ করলেন বন্দীশালা থেকে উড্ আর অন্য বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। স্পাইক আর ট্রল্ও ছাড়া পেল। তারপর গনফালার খোঁজে ওরা রাজবাড়িতে গেল। বিশেষ কেউ বাধা দিল না। গার্ডরা সব পালাল। টারজানকে আর উড্কে একজন দাস গনফালা যে ঘরে বন্দী, সেখানে নিয়ে গেল। বাইরে থেকে বন্ধ ঘর। দরজা খুলে ওরা দেখে, ছোরা হাতে গনফালা দাঁড়িয়ে। তার পায়ের কাছে ফোরসের মৃতদেহ। ওদের দেখে সে ছুটে এল, 'মেনোফ্রার মৃত্যুর সংবাদ পাবার পর, ওকে মেরে না ফেলে আমার বাঁচার উপায় ছিল না।'

জাইগোকে আবার সসম্মানে সিংহাসনে বসানো হল ঘর ছাড়ারা আবার ঘরে ফিরল। টারজান বলল, 'এবার তোমরা সকলে শান্তিতে থাকতে পারবে।'

থুডস আর জাইগো একসঙ্গে বলে উঠল, 'শান্তিতে কে থাকতে চায়?'

টারজানের দলবল এক সপ্তাহ মনের আনন্দে কাটিয়ে দক্ষিণের পথ ধরল। কিছু দূর গিয়ে মুবিরোর আর একশো ওয়াজিরির সঙ্গে দেখা। তাদের সঙ্গে সকলে মিলে টারজানের বাংলোতে ফিরল। সেখান থেকে স্পাইক আর ট্রল দেশে ফিরে গেল। কথা দিল এদেশে আর আসবে না। যাবার সময় গনফাল পাথরটা ওদের দিয়ে দিল টারজান। উড্ আর গনফালা তো অবাক!

টারজান পরে বলল, 'ওটা কি আসল পাথরটা ভেবেছ? ওটা হল নকলটা। আমার কাছে আসলটা আছে। সবুজ পাথরটা বাণ্টাঙ্গো দেশে পুঁতে রেখেছি। একবার গিয়ে আনতে হবে। ও দুটো থেকে সভ্য জগতে তোমাদের কিছুটা টাকাকড়ির সুবিধা হবে।

টারজান এবং ফরেন লীজিয়ন

টারজান অ্যান্ড দি ফরেন লীজিয়ন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানীরা হংকং সিঙ্গাপুর জয় করবার পরেও সুমাত্রার রবার-চাষের ধনী মালিকদের কেউ কেউ কিছুতেই বিশ্বাস করেননি যে ডাচ্ ঈস্ট ইণ্ডিজের মতো ক্ষমতাশালী উপনিবেশও ওদের হাতে পড়তে পারে। এর ফলে যখন সুমাত্রা দ্বীপ জাপানীরা দখল করে ফেলল, তখনো কয়েকজন ডাচ্ ব্যবসায়ী সেখান থেকে তাদের পরিবারবর্গকে কোনো নিরাপদ জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেননি। হেণ্ড্রিক্ ভ্যান্ ডার মিয়ার এঁদের একজন। তাঁর এই একগুঁয়েমির ফলে শেষ মুহূর্তে রুগ্না স্ত্রী আর চোদ্দ বছরের মেয়ে করিকে নিয়ে, লামকাম আর সিং-তাই বলে দুজন বিশ্বাসী চীনে চাকর সহ পাহাড়ে পালাতে বাধ্য হলেন। রবার খামারের কর্মীরা রয়ে গেল। তারা জানত জাপানীরা এলেও তারা বেকার হবে না।

ভ্যান ডার মিয়ার বড় বেশি দেরি করে ফেলেছিলেন। পাহাড়ে গ্রামবাসীরা কেউ আশ্রয় দিতে চাইত না। বড় জোর এক বেলা খাইয়ে, কি এক রাত শুতে দিয়ে রওনা করিয়ে দিত। চারদিকে জাপানী চর গিজগিজ করছিল, ডাচ্দের কেউ সাহায্য করেছে জানতে পারলে, জাপানী মিলিটারি অফিসার আর সৈনিকদের কাছে রক্ষা ছিল না। প্রাণে মেরে, গ্রাম জ্বালিয়ে তবে ছাড়ত। বড় নিষ্ঠুর আর জঘন্য তাদের ব্যবহার। এই ভাবে অনভ্যস্ত শরীরে ঘুরে ঘুরে, ভয়ে, ক্লান্তিতে, জ্বরে, করির মা মারা গেলেন। তখনো পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছিল। কোনো কোনো গ্রামবাসী নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে সাহায্য করেছিল। তাকু মুদা

বলে এইরকম একজনের বাড়িতে করির মা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। তখনো মৃতদেহের সমাধি হয়নি, বিশ্বাস-ঘাতক গুপ্তচরের কাছে খবর পেয়ে জাপানীরা এসে হাজির ভ্যান ডার মিয়ার তাদের সঙ্গে কথা বলতে বেরিয়ে যেতেই, কথার বদলে বেয়নেটের আঘাতে তারা তাঁকে মেরে ফেলল। তার সঙ্গে লামকাম ছিল, সে-ও বাঁচল না।

তখন সিং-তাই করিকে নিয়ে ঘরের মেঝেতে গর্তের মধ্যে নেমে প্রাণ বাঁচাল। সেই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে গভীর জঙ্গলে পৌঁছে, ওরা একটা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিল। দুদিন পরে, সন্ধ্যায় একবার গ্রামে ফিরে সিং-তাই দেখল ডাচদের আশ্রয় দেবার জন্য জাপানীরা গ্রামবাসীদের মেরে ফেলে, গ্রাম জ্বালিয়ে, চলে গেছে।

এর পর দু বছর কেটে গেল। করি আর সিং-তাই দুর্গম এক পাহাড়ি গ্রামের মোড়ল তিয়াং উমরের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল। ঐ গ্রাম থেকে ব্যাপারীরা মাঝে মাঝে বহির্জগতের খবর নিয়ে আসত। আমেরিকার নৌ-বাহিনী জাপানীরা ডুবিয়ে দিয়েছে। আফ্রিকা, ইউরোপ, রাশিয়া, সর্বত্র জার্মানরা জয়ী এই ধরনের সব দুঃসংবাদ। ঐ গ্রামে এক বিদেশী এসে একদিন ঘুরে গেল। করির সোনালী চুলের দিকে তার নজর গেছিল। তাই দেখে সিং-তাই ভয় পেয়ে করিকে চুল কেটে কালো রং করে, গ্রামের ছেলে সাজিয়ে নিল। গ্রামের কাছে বনের অড়ালে একটা গুহায় ওরা আশ্রয় নিল। অদূরে ছোট ঝরনার বনে ফলমূল ছিল আর তিয়াং উমর, ডিম মুরগি মাংস প্রায়ই পাঠাত। আলম বলে একটি ছেলে খাবার পৌঁছে দিত। তিন জনে ভারি ভাব।

এর মধ্যে ক্যাপ্টেন তকুজো মাৎসুও আর লেফটেনাণ্ট হিদেও সোকাবে ভারি কামান দাগবার ভালো জায়গার খোঁজে একদল সৈনিক নিয়ে সেখানে এল। তারা গ্রামের বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের খুশি করে, নিজেরা অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার আশায়, হো-সিন বলে এক গ্রামের প্রধান দু-বছর আগে ভ্যান ডার মিয়ারের এদিকে আসার কথা বলে দিল। মেয়েটি তাদের বুড়ো অনুচরের সঙ্গে তখনো নাকি এদিকে কোথাও লুকিয়ে আছে, এ-ও বলল। এর কদিন পরে ঐ লেফটেনাণ্ট তিয়াং উমরের গ্রামে এসে, তাকে নির্মম ভাবে মারধোর করেও কোনো খবর বের করতে পারল না। তখন উমরের বুড়ি স্ত্রী স্বামীর কষ্ট আর সইতে না পেরে বলল, 'আলম বলে ছেলেটি সব জানে।' তারা আলমকে বলল, 'ফেরারিদের লুকোবার জায়গা দেখিয়ে না দিলে, গ্রামের প্রত্যেকটি লোককে মেরে, গ্রাম জ্বালিয়ে দেব। অনেক জায়গায় তাই করেও ছিল ওরা। আলম ওদের গুহাটা দেখিয়ে দিল। সোকাবে সেখানে গিয়ে সিং-তাইয়ের পেটে বেয়নেট বিঁধিয়ে, করিকে বন্দী করে নিয়ে চলে গেল।

●

যুদ্ধের এলাকার একটা এয়ার ফিল্ড থেকে লাভলি লেডি বসে একটা চমৎকার লিবারেটর প্লেন সুমাত্রায় ফটোগ্রাফিক উদ্দেশ্যে ছাড়বার জন্য প্রস্তুত। প্লেনটা আর ক্রু-র সকলেই আমেরিকান, বাদে কর্নেল ক্লেটন বলে আর-এ-এফের এক পর্যবেক্ষণকারী। উড়োজাহাজের ক্রু-র সাধারণ সদস্যরা ব্রিটিশদের খুব পছন্দ করত না। ক্লেটন প্লেনের ব্যাপারে দক্ষ। কখনো কো-পাইলটের, কখনো পাইলটের জায়গাতেও মাঝে মাঝে বসছিল। প্লেনটাতে বোমাটোমা ছিল না। শান্তিপূর্ণ ফটোগ্রাফির অভিযান।

ক্লেটন লোকটা আসলে নাকি একজন ইংলিশ ডিউক, কিন্তু কোনো রকম চাল ছিল না তার। সকলের সঙ্গে সমানের মতো মিশত। অনেক সময়ে সিগারেট খাওয়াত, গল্প করত। শিকাগোর সার্জেণ্ট টোনি রসেটি তাকে পছন্দ করত না। শুঁকো চেহারার টোনির ডাক নাম ছিল শৃম্প, বা কুচোচিংড়ি। শৃম্পের বন্ধু সার্জেণ্ট জো বুবনোভিচ্ ব্রুকলিনের লোক। কলেজে পড়ুক আর নাই পড়ুক, নিজে প্রচুর পড়াশুনা করেছে।

বিষুবরেখার ওপর সুমাত্রা দ্বীপ এগারো শো মাইল লম্বা। তার তীররেখা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আধঘণ্টা কাজ করার পর জাপানীদের টনক নড়ল, এ তো শত্রুদের প্লেন। অমনি মাটি থেকে অ্যাক্-অ্যাক্ কাজে লাগল। পাডাং-এর কাছে পৌঁছলে, জাপানী উড়োজাহাজও পিছু নিল। নিচে থেকেও গোলাগুলি বাড়ল। এক সময় কক্‌পিটে গোলা লাগল। কো-পাইলটের প্রাণ গেল। ন্যাভিগেটর তার জায়গা নিল। বড় বেশি গোলাগুলি দেখে পাইলট লুকাস তীর ছেড়ে একটু ভিতর দিকে এগিয়ে গেল। পাহাড়ের ওপরে কুয়াশাতে খানিকটা গা-ঢাকা দেওয়া যাবে। পরপর প্লেন ঘুরিয়ে ঘরে ফেরা যাবে। তেইশ বছর বয়স লুকাসের, কিন্তু দক্ষ এয়ারম্যান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তার মনে হল প্লেনটাকে হাল্‌কা করলে সুবিধা হবে। বড় বড় প্লেন পিছু নিয়েছে, অবস্থাটা সঙ্গীন। সব কিছু নিচে ফেলে দিতে

বলল সে, কামান, গোলাগুলি লাইফ-র‍্যাফ্‌ট্‌। প্রায় সমস্ত পথ ডাঙার ওপর দিয়ে যাওয়া। প্যারাসুট থাকলেই হল।

পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকটা আসবার পর পাহাড় থেকেও গোলাগুলি শুরু হল। এমন একটা সময় এল যখন লুকাসও বুঝল প্লেন বাঁচানো যাবে না।

ল্যাজের দিকটা উড়ে গেছিল ততক্ষণে। দুজন অল্পবয়সী এয়ারম্যান্‌ সহ। তারপর বনের ওপর সকলকে প্যারাসুটে করে নামার আদেশ দিল লুকাস্‌। সে সবার শেষে নামবে। নামবার সময় বম্ব-এর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ক্লেটন একটু বেহুঁশ হলেও, সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে কর্ড টেনে নিরাপদে নামতে পেরেছিল। পাশ দিয়ে তিনটে এঞ্জিনের গর্জন ছেড়ে লাভলি লেডি উড়ে গেল। যেখানে পড়বে, অমনি আগুন ধরে যাবে। ধ্বংসাবশেষ থেকে শত্রুদের কিছু জানবার উপায় থাকবে না। এদিকে ভীষণ বৃষ্টি নেমেছিল। গাছ-পালার ওপর নামল প্যারাসুট, মাটি থেকে দুশো ফুট উঁচুতে ডাল-পালায় আটকে, ক্লেটনের প্রাণ বাঁচাল। কিছু দূরে লাভলি লেডিও মাটি নিয়েছিল। এখন সে দাউ দাউ করে জ্বলছিল।

ক্লেটন একটা মোটা ডালে উঠে বসে ভিজে কাপড়-চোপড়, জুতো মোজা, পিস্তল অ্যামিউনিশন, সব ফেলে দিল। রইল খালি কোমরে জড়ানো চওড়া বেল্ট, তাতে একটা ছোরা গোঁজা। এবার প্যারাসুটটার সিল্ক কেটে নিয়ে, তাতে দড়িদড়া জড়িয়ে, বাঁদরের মতো তরতর করে নেমে এল। সিল্কটা দিয়ে দিব্যি একটা নেংটি তৈরি করা গেল। অমনি মনে ফুর্তি এল। মনে হল কি যেন হারিয়ে ছিল, আবার খুঁজে পাওয়া গেছে। দেশের কাজ যদি করতেই হয়, সে তো উলঙ্গ থেকেও করতে বাধা নেই। বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। আকাশের দিকে মুখ তুলে জয়ধ্বনি দিতে ইচ্ছা হয়েছিল। নেহাৎ শত্রুদের দেশ বলে চেপে গেল।

সঙ্গীদের কথা মনে হল। যারা জীবিত আছে তারা নিশ্চয় প্লেনের কাছে যাবার চেষ্টা করবে। তার আগে একটা লতা গাছ খুঁজে নিতে হবে। সেটি পাওয়াও গেল। বড় বড় পাতা দুহাতে চটকে রসটাকে হাতে, পায়ে, মুখে, গলায়, সারা গায়ে মেখে নিল। তাহলে আর মশা কামড়াবে না। তারপর গাছ থেকে গাছে এগনো। পথে দেখল পাইলট জেরি লুকাস হোঁচট খেতে খেতে প্লেনের দিকে চলেছে। গাছ থেকে নেমে আসতেই, ওর ঐ চেহারা দেখে জেরি তো হাঁ! লোকটা ক্ষেপে গেল নাকি?

—'ঠিক আছ তো, কর্ণেল?'

—'নিশ্চয়। আর তুমি?'

—'আমিও।'

তারপর স্টাফ্‌ সার্জেন্ট বুবনোভিচ্‌কেও দেখা গেল। সেও কর্ণেলকে দেখে আঁৎকে উঠেছিল। 'কাপড় চোপড়, বন্দুক, গুলি, কি হল?'

—'সব ফেলে দিয়ে হালকা হয়েছি।'

কর্ণেল বুঝিয়ে বলল, 'এখানকার আবহাওয়ায় চব্বিশ ঘণ্টায় বন্দুকে মরচে পড়ে অকেজো হয়ে যায়। ছোরাই ভালো। তবে ব্যবহার করে সেটাকে চকচকে রাখতে হয়। শব্দ করে না। শত্রুপুরীতে নিঃশব্দে কাজ করে।'

লুকাস বলল, 'সকলে নেমেছে তো?'

লেফটেনান্ট বার্ণহ্যাম আর আমি এক সঙ্গে লাফিয়েছিলাম।

লুকাস মুখ তুলে ডাক দিল, ক্ষীণস্বরে উত্তর এল, 'রসেটি বলছি। শিগগির এসে আমাকে নামাও।' দেখা গেল একশো ফুট উঁচুতে প্যারাসুটের হার্নেস সুদ্ধ সে ঝুলছে। সে বলল, 'কি করে নামাবে?'

লুকাস বলল, 'কে জানে!'

বুবনোভিচ্‌ বলল, 'পাকলে আপনি পড়বে!'

—'চালাকি রাখ। ঐ ন্যাংটো লোকটাকে কোথায় পেলে।'

—'চুপ ইডিয়ট্‌! উনি কর্ণেল ক্লেটন।'

ক্লেটন বলল, 'ও বুঝি ইংলিশদের ওপর চটা?'

—'কিছু মনে কর না, কর্ণেল, শিকাগো থেকে এসেছে, কিছু জানে না।'

শৃম্প আবার বলল, 'নামাবে কি করে?'

বুবনোভিচ্‌ উত্তর দিল, 'কাল বলব।'

শেষ পর্যন্ত লতা বেয়ে উঠে ক্লেটন ওকে কাঁধে করে নামাল। লুকাস বলল, 'নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।'

বুবনোভিচ্‌ বলল, 'দেখেও করছি না।'

কিছু পরে বার্ণহ্যামের মৃতদেহ পাওয়া গেল, দুর্ভাগ্য-বশতঃ তার প্যারাসুট খোলেনি। বন্ধুরা মনের দুঃখে তাকে কবর দিয়ে, অন্য দিকে চলল। সকলে মশার কামড়ে অস্থির হচ্ছে দেখে, ক্লেটন তাদের সেই লতা দেখিয়ে দিল। তাদেরও জ্বালা জুড়োল। বনে অনেক বাঘ। ক্লেটনের নেতৃত্বে একটা

গাছের কুড়ি ফুট উঁচুতে, জট পাকানো ডালপালার ওপর মাচা তৈরি হল। সেখানে রাতে শোয়া হবে। কর্ণেল বলল, 'সারা দিন বাঘের গন্ধ পাচ্ছি।' রসেটি তো অবাক।

প্যারাসুটের কাপড় পাকিয়ে শক্ত দড়ি হল। তাতে বেঁধে কয়েক গোছা বড় বড় পাতা ওপরে তোলা হল। বিছানা হবে। ক্লেটন বলল, 'এখানকার ফলমূল চিনি না। বাঁদররা যেগুলো খাচ্ছে, তাই খেতে হবে। কাল শিকার করা যাবে।'

বুবনোভিচ্ কয়েকটা ফল দেখে চিনল, 'ঐ তো ডুরিও জিবেথিনাস, যাকে বলে ডুরিবান। ঐ সিম্‌ফ্যালাপাস সিনডাক্টিলাস, অর্থাৎ বড় গিবন, যেটা খাচ্ছে।'

—'ফলটার বিশ্রী গন্ধ, কিন্তু স্বাদ ভালো, উপকারীও। স্থানীয় লোকরা ওর বিচিও পুড়িয়ে খায়।'

ক্লেটন ভাবছিল আমেরিকানরা কি আশ্চর্য জাত। ঐ সার্জেন্ট বুবনোভিচের ব্রুক্‌লিনে বাড়ি, কলেজ প্রোফেসারের মতো ভাষা!

এর মধ্যে রাত পড়ল। নিচে বাঘের কাশি শোনা গেল। শৃম্প বলল, 'ওরা কি?'

—'ও ডোরাকাটা, অর্থাৎ বাঘ!'

—'জঙ্গল প্রশিক্ষণ বিভাগ কত কি শেখাল, কিন্তু বাঘের কথা তো কিছু বলেনি!'

শৃম্প আর বুবনোভিচ্ ঘুমোলে লুকাস আর ক্লেটন মাচার ধারে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগল। দুজনেরি মত দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রতীরে গিয়ে, একটা নৌকো জোগাড় করে অস্ট্রেলিয়া যাবার চেষ্টা করলে হয়। লুকাসের মনটা বড় স্নেহশীল। সে বলছিল যারা গেছে, তারা তো গেছেই। কিন্তু আরো যাদের দেখা পাওয়া যায়নি, তাদের জন্যেই ভাবনা হয়।

অনেক গল্প করল লুকাস। শৃম্প নাকি দুর্ধর্ষ গানার, তার জন্য খেতাব, পদক সব পেয়েছে। বড় দুঃখে ছোটবেলাটা কেটেছে, বেশিদূর লেখাপড়া করেনি, কিন্তু একেবারে খাঁটি মানুষ। বুবনোভিচ্ উচ্চশিক্ষিত, কলাম্বিয়ার গ্র্যাজুয়েট; জুওলজি, বটেনি, অ্যান্থ্রপলজিতে বিশেষজ্ঞ। নিউইয়র্কের আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারেল হিস্টরিতে কাজ করে।

এদিকে করি ভ্যান ডার মিয়ারকে বন্দী করে দুই জাপানী অফিসার চলেছিল। আলম সঙ্গে ছিল। তার দুঃখের আর সীমা নেই। করি স্থির করেছিল তেমন তেমন হলে আত্ম-হত্যা করবে। সোকাবে দলবল সহ সে রাতটা তিয়ং উমরের গ্রামে কাটাল। করির সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করতে সাহস পেল না। তাহলে ক্যাপ্টেন মাৎসুও ওকে মেরে ফেলবে। আলম দো-ভাষীর কাজ করছিল। করি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে কখনো ডাচ্ গেরিলা দলের কাউকে দেখেছে কি না। আলম তাদের না দেখলেও তাদের কথা শুনেছিল। জাপানীদের দুর্ব্যবহারের ফলে অনেক স্থানীয় লোকও তাদের সঙ্গে জুটেছিল। তাকু মুদার গ্রাম যেখানে ছিল তার পাশ দিয়ে গেল ওরা। সেখানে কখনো মানুষের বসতি ছিল বলে মনে হয় না।

মাথার ওপর এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল। সেটা ভেঙে পড়ার শব্দও কানে এল। জাপানীদের প্লেন ভেবে করি খুব খুশি। সোকাবে একবার তদন্ত করার কথা বলেছিল বটে, কিন্তু বড় দূরে বলে আর গেল না। মাৎসুও ক্যাম্পে যখন পৌঁছল তখন অন্ধকার হয়ে গেছিল। মাৎসুও বলল, 'বন্দীরা কই?'

—'চীনেটা মারা পড়েছে। এ হল সেই ডাচ্ মেয়ে, ওরা একে ছেলে সাজিয়ে রেখেছিল।'

মাৎসুও বলল, 'ভালো। ও আমার কাছেই থাক তাহলে।'

সোকাবে বলল, 'তা কেন? আমি এনেছি, আমার কাছে থাকুক।'

মাৎসুও চটে গেল, 'আমি একজন ক্যাপ্টেন, তুমি সামান্য লেফটেনান্ট। আমার কথা মতো কাজ হবে।'

সোকাবেও দমবার পাত্র নয়। সে বলল, 'দেখ, জেনারেল হিদেকি তোজো আমার মামা। তোমার বাপ-জ্যাঠারা চাষাগিরি করে। বাড়াবাড়ি করলে বেশি দিন ক্যাপ্টেনগিরি চলবে না, মেয়েটি থাক নিরাপদে। কর্ণেল এসে ব্যবস্থা করবেন।'

★

রাতে গাছ ধরে কেউ বেজায় ঝাঁকাতে লাগল। জেরি লুকাস চেয়ে দেখে বলল, আমাদের কয়েক ফুট ওপরে মস্ত এক বাঁদর বসে গাছ ঝাঁকাচ্ছে।'

বুবনোভিচ্ বলল, 'মোটেই বাঁদর নয়। ওটা পঙ্গো পিগমিরাস, যদিও পঙ্গো জাইগ্যানটিকাস নাম হওয়া উচিত ছিল।'

লুকাস বলল, 'আরে ওটা ওরাংউটান।'

বুবনোভিচ্ বোঝাল, 'মালয় দেশের ভাষায় ওরাং

উটান, তার মানে হল বন-মানুষ।'

শৃম্পের ভাবনা, 'ও কি চায়? নরখাদক নাকি?'

বুবনোভিচ্ বলল, 'ফলমূল খায় ওরা। তবে চটে গেলে তোমাকে আমাকে ফালাফালা করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে।'

ততক্ষণে ওরাংউটানটা চলে গেছিল। তখন এরা লক্ষ্য করল ক্লেটনও তো গাছে নেই। পড়েটড়ে গেল নাকি? এই সময় একটা মরা হরিণ কাঁধে নিয়ে গাছে ঝুলতে ঝুলতে ক্লেটন উপস্থিত হল। 'এই নাও ব্রেকফাস্ট। শুরু কর।'

এই বলে ছোরা দিয়ে রাং থেকে বড় একটা টুকরো কেটে কাঁচাই খেতে শুরু করে দিল। শৃম্প স্তম্ভিত। 'রান্না করা হবে না?"

—'কি করে হবে? সব তো ভিজে সপসপে।'

একটু দো-মনা করে সকলেই কাঁচা মাংস খেল। ক্লেটন বলল, 'চিবোলে তত ভালো লাগে না। সুবিধা মতো টুকরো কামড়ে গিলে খেতে হয়।'

—'কি করে জানলে?'

—'সিংহদের কাছে শিখেছি।'

লুকাস তাই করে দেখে বলল, 'মন্দ লাগে না।'

ক্লেটন বলল, 'এবার একটা থাকার জায়গা ঠিক করতে হয়। কেউ যদি ইচ্ছা কর তো পকেটে একটু মাংস ভরে নিয়ে, পরেও খেতে পার। তবে প্রচুর শিকার পাওয়া যাবে।' কেউ ইচ্ছা করল না, তাই বাকি মাংসটাকে ঠেলে নিচে ফেলে দিয়ে ক্লেটন বলল, 'ডোরাকাটা খাবে এখন।'

ঝরনা ছিল কাছেই, সেখানে জল খেয়ে, ওরা জানোয়ার-চলা পথ দিয়ে পশ্চিম দিকে চলল। এই দিকেই সমুদ্রতীর। তবে অনেক দিনের হাঁটা পথ। যাই হক, কিছুদূর গিয়ে, হঠাৎ ক্লেটন থেমে হাত তুলে বলল, 'সামনে একটা লোক আছে।'

শৃম্প রসেটি বলল, 'কাউকে দেখছি না তো।'

—'আমিও দেখছি না। তোমরা হাঁটতে থাক, আমি একটু এগিয়ে দেখি।' এই বলে গাছে ঝুলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সিং-তাই কিন্তু মরেনি। বেয়নেটের খোঁচাটাতে ব্যথা লেগেছিল খুবই, তবে কোন মারাত্মক স্থানের ক্ষতি হয়নি। গুহার একেবারে ভিতরে দুদিন রক্তাক্ত দেহে সে পড়ে ছিল। তারপর কোনো মতে বেরিয়ে এসেছিল। পানাহারের অভাবে আর রক্তপাতের ফলে শরীরটা বড়ই দুর্বল হয়ে গেছিল। ওর মনে হচ্ছিল করি যদি বেঁচে থাকে, তাহলে ওকেও বাঁচতে হবে, করির জন্য। হঠাৎ সামনের গাছ থেকে একটা কালো চুল, ছাই রঙের চোখ তামাটে রঙের দৈত্য নেমে এল। দৈত্য ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করল, 'লাগল কি করে?' সিং-তাই হংকং-এ বহু ইংরেজের বাড়িতে কাজ করেছিল। সে-ও ইংরিজিতে বলল, 'জ্যাপ বাঁদর বেয়নেট ফুটিয়ে দিয়েছিল।'

—'কাছাকাছি আছে নাকি তারা?'

—'আছে হয়তো।' সিং-তাই ক্লেটনকে সব কথা বলল।

—'যে গ্রামে তারা আছে মনে করছ, সেটা কত দূরে?'

—'এক কিলোমিটার দূরে হবে।'

—'গ্রামের লোকেরা কি জাপানীদের পছন্দ করে?'

—'না, দুচক্ষে দেখতে পারে না।'

এই সময় ক্লেটনের সঙ্গীরাও এসে পৌঁছল। সিং-তাই একটু ভয় খাচ্ছিল, কিন্তু যেই শুনল এরা আমেরিকান, অমনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'মেলিকান! তাহলে এবার মিসিকে বাঁচানো যাক।'

সিং-তাইয়ের কাহিনী শুনে সকলে স্থির করল তিয়াং উমারের গ্রামে যেতে হবে। ক্লেটন সিং-তাইকে কোলে তুলে নিয়ে চলল। তিয়াং উমার ওদের দেখে খুশি হল। সে বলল আগের দিন সকালে মেয়েটিকে নিয়ে জ্যাপরা চলে গেছে। গ্রামের একজন ছেলেকে দো-ভাষীর কাজ করবার জন্যে নিয়ে গেছে। এরা যদি অপেক্ষা করে, সেই ছেলেটি অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরবে, তার কাছে সব জানা যাবে। ক্লেটন একা বনে চলে গেল। শৃম্প বলল 'হয়তো একটা মোষ কাঁধে নিয়ে ফিরবে।'

মোষের বদলে এক গোছা সরু শক্ত গাছের ডাল আর বাঁশ নিয়ে এল। তাই দিয়ে তীরধনুক আর চমৎকার একটা বল্লম হল।

প্যারাসুটের কাপড় দিয়ে ধনুকের তূণ তৈরি হল। শৃম্পের এ-সব অস্ত্রের প্রতি ভারি অশ্রদ্ধা। ক্লেটন বুঝিয়ে বলেছিল এ দিয়ে শুধু শিকার করা যাবে না, এগুলো আত্ম-রক্ষার অস্ত্রও বটে। খুব একটা আশ্বস্ত হয়নি শৃম্প।

সন্ধ্যার সময় আলম ফিরে এসে খবর দিল ঐ মেয়েকে নিয়ে দুই জ্যাপ অফিসার ঝগড়া করেছে কিন্তু করির কোনো ক্ষতি করেনি কেউ। জলভরা চোখে সিং-তাই ক্লেটনকে বারবার বলতে লাগল মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে। তাতে সকলেই রাজি। তবে ক্লেটনের আর বুবনোভিচের উদ্দেশ্য করিকে বাঁচানো আর লুকাস আর শৃম্পের উদ্দেশ্য জাপানী মারবে। তারা স্ত্রীজাতির ওপর চটা। লুকাসের

যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক ছিল, ও চলে আসার দু-মাস পরেই সে আরেকজনকে বিয়ে করেছে আর শৃম্পের মায়ের হাতে নির্যাতনের ফলে সে নারী-বিদ্বেষী!

পরদিন ভোরে ওরা রওনা হয়ে গেল।

ক্লেটনের কাছে পথের ওপর জাপানী দলের পায়ের ছাপগুলো একটা বইয়ের খোলা পাতার মতো স্পষ্ট। সন্ধ্যায় ওরা গ্রামটাতে পৌঁছল। অন্যদের বাইরে রেখে ক্লেটন পর্যবেক্ষণ করতে গেল। প্রহরীর বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না; গ্রামে ঢুকতে অসুবিধা হল না। আকাশে চাঁদ ছিল না; তারাগুলো পর্যন্ত মেঘে ঢাকা। কয়েকটা বাড়িতে টিমটিম করে আলো জ্বলছিল। গন্ধ শুঁকে কোন বাড়িতে করি আছে, সেটা জানতে ক্লেটনের দেরি হল না। জ্যাপ অফিসাররা তখনো খিটিমিটি করছিল, হয়তো করিকে নিয়েই।

গ্রামের অন্য প্রান্তে একজন প্রহরী পাইচারি করছিল। তাহলে তো চলবে না। তাকে নেই করে দিতে হল। মৃতদেহটা গ্রামের বাইরে রেখে এসে, সঙ্গীদের কাছে গেল ক্লেটন। লুকাসকে বলল, 'তিন মিনিট বাদে এই পিছন দিকটাতে হল্লা করবে, পার তো বন্দুক ছুঁড়বে, ঢিল ছুঁড়বে, ব্যতিব্যস্ত করে তুলে, আরো চার মিনিট বাদে একেবারে হাওয়া হয়ে যাবে। তারপর গ্রামের ওপারে জন্তু-হাঁটা পথের ধারে আমার জন্য অপেক্ষা ক'র।' এই বলে গ্রামের সামনের দিকের সেই বাড়িটার কাছে লুকিয়ে রইল।

হল্লা শুরু হতেই দুই জ্যাপ অফিসার সেদিকে ছুটল। অমনি টারজান ঘরে ঢুকে দেখল হাত পা বাঁধা অবস্থায় করি পড়ে আছে। টপ করে তাকে কাঁধে তুলে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। কিছু দূরে গিয়ে তাকে নামিয়ে হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিল। সে ডাচ্ ভাষায় বলল, 'তুমি কে?'

ক্লেটন বলল, 'চুপ।'

অন্যরাও চুপি চুপি ওদের সঙ্গে ছুটল। সকলে অন্ধকার বনপথ ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। ক্লেটনের মুখে ঐ একটি ইংরিজি কথা শুনে করির সব ভয় দূর হয়ে গেছিল। একঘণ্টা পরে যখন পিছন থেকে কোন সাড়াশব্দ শোনা গেল না, তখন ওরা নিশ্চিন্ত হল।

আলমকে ওদের সঙ্গে দেখে করি আরো নিশ্চিন্ত হল। তাকে সব কথা জানানো হল। সিং-তাই বেঁচে আছে জেনে সে বড় খুশি। সারা রাত হাঁটতে তার কোনো আপত্তি ছিল না। দু-বছর ধরে তো কেবলি হেঁটেছে। ভোরে তিয়াং উমারের গ্রামে পৌঁছে, খাওয়া দাওয়া করেই ওরা আবার রওনা দিল। জাপানীরা নিশ্চয় এখানেই করিকে খুঁজতে আসবে। ওদের জন্য এরা যাতে কোনো বিপদে না পড়ে, তাই এত সতর্কতা। করি আর সিং-তাই বনের ভিতরে আরো অনেক লুকোবার জায়গা জানত। এবার সঙ্গীরা রয়েছে। গ্রামের এত কাছে না থাকলেও চলবে।

সিং-তাইয়ের শরীরের এমন অবস্থা যে তাকে নিয়ে যাওয়া গেল না। তিয়াং উমার বলল তাকে একটা নিরাপদ গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখবে। অন্যদের পথ দেখিয়ে করি গভীর বনে নিয়ে গেল। কোথাও গভীর খাদ, দুরন্ত নদী, সেগুন গাছের বন, বিশাল বাঁশঝাড়, মানুষের সমান উঁচু ঘাসে-ঢাকা মাঠ। এমন সব জায়গা যেখানে গ্রামের সংখ্যা খুব কম। ক্লেটন আগে আগে যেত, তীর ধনুক দিয়ে শিকার করতে, তাই খাবারের অভাব হত না। কখনো পাখি, কখনো হরিণ। ক্যাম্পে আগুন জ্বেলে মাংস রান্না হত। লুকাস আর শৃম্প দুই স্ত্রী-বিদ্বেষী সর্বদা করিকে এড়িয়ে চলত। যদিও শৃম্প অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করেন মেয়েটা দেখতে খারাপ নয়। মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পাট্রিজ্ উড়ে গেল। টং করে তীর ছোঁড়ার শব্দ হল, একটা পাখি পড়ল। শৃম্প বলল, 'বিদ্যেটা শিখতে হবে।'

শেষ পর্যন্ত সকলেই তীর ধনুক বানাতে আর ব্যবহার করতে শিখতে আরম্ভ করল। তাতে একটু বিশ্রামও হত, পরস্পরের সঙ্গে একটু চেনাজানাও হত। শৃম্পের ব্রিটিশ-বিদ্বেষ হয়তো একটু কমল। করি পর্যন্ত ধনুকের ছিলা বাঁধাতে, তীরে পালক পরানোতে দক্ষ হয়ে উঠল। জেরি লুকাসের পাশে বসেই কখনো কাজ করত। ওরা কথা বলত না, বিশেষ দরকার না হলে। তবে জেরি লক্ষ্য করেছিল এত রকম কাজ সত্ত্বেও করির হাতের আঙুল কি সুন্দর আর পরিষ্কার। ওর নিজেরগুলোর দিকে তো তাকানো যায় না। ওর চেয়ে ভালো ইংরেজিও বলে। জেরি আনাড়ি আঙুলে পালক বাঁধতে পারে না, করি দেখিয়ে দিতে গেলে খুশি হয় না। ভালো করে জেরি কথা কয় না। করি ছেলেমানুষ, ভারি দুঃখিত হয়। জেরি যখন হঠাৎ বলল, 'দাও, আমি নিজেই পারব, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।' করির চোখে এমন একটা করুণ ভাব দেখা দিল যে জেরির ভারি কষ্ট হল, 'কিছু মনে কর না, না ভেবে বলেছি।'

করি বলল, 'তুমি আর ঐ ছোখাটো সার্জেন্ট আমাকে পছন্দ কর না। আমি কি কোনো অন্যায় করেছি?'

লজ্জা পেয়ে জেরি বলল, 'নাঃ, আমি পারি না, আরেকটু দেখিয়ে দাও।'

তীর খেলায় করি ছিল ওস্তাদ। সে বলল দু-বছর হল্যাণ্ডের স্কুলে আর্চারি ক্লাবে তীর ধনুকের অভ্যাস করেছিল। ভারি কাজের মেয়ে। সকলের জুতো ছিঁড়ে অকেজো হয়ে গেছিল। ক্লেটন হরিণের চামড়া এনে দিল। তাই দিয়ে নতুন জুতো জামা তৈরি করা হবে। চুণাপাথরের পাহাড়ের গায়ে দুটি ব্যবহারযোগ্য শুকনো গুহা দেখে, সেখানে কয়েকদিন থাকা স্থির হল। বাঁশ দিয়ে ছুঁচ হল। করি জামা জুতো সেলাই করতে বসল।

একদিন পুরুষরা সবাই বেরিয়ে গেছে, করি কাজে ব্যস্ত, এমন সময় জনা দশেক স্থানীয় লোক এসে ওকে ধরে নিয়ে চলল। জাপানীরা নাকি, যে ওকে আর সিং-তাইকে বন্দী করতে পারবে, তাকে বখশিস্ দেবে।

সূর্যাস্তের সময়ে পুরুষরা ফিরে ওকে না দেখে অবাক হল। শৃম্প বল, 'পালিয়ে গেছে।'

জেরি লুকাস চটে গেল, 'পালাবে কেন? আমাদের কাছে থাকাই ওর রক্ষা পাবার একমাত্র উপায়।'

তীর ধনুক পড়ে আছে। পালায় নি, শিকারেও যায়নি, তবে গেল কোথায়?

ক্লেটন বলল, 'দশজন স্থানীয় লোক ওকে ধরে নিয়ে গেছে।'

লুকাস বলল, 'হয়তো ইচ্ছা করেই গেছে।'

ক্লেটন বলল, 'না। এই দেখ দাগ। টেনে হিঁচড়ে নিয়েছে কিছুদূর। তারপর কাঁধে তুলে নিয়ে গেছে।'

এই সময় বৃষ্টি নামল। ক্লেটন বলল, 'বৃষ্টিতে আর গন্ধ পাব না। কিছু দাগ দেখতে পাব আলো হলে। ভোরে যাওয়া যাবে।'

ভোরে ওরা রওনা হয়ে গেল। কিছু দূর বয়ে নিয়ে করিকে তারা নামিয়ে হাঁটিয়ে ছিল। একটু বেলায় বাঘের গন্ধ পেয়ে সকলে গাছে উঠল।

সেদিন সন্ধ্যায় একটা অধিত্যকার ধারে ডাকাতগুলো ক্যাম্প করেছিল। ধুনি জ্বেলেছিল, বাঘ তাড়াবাড় জন্য। একটা লোক ধুনিতে কাঠ দেবার জন্য জেগেছিল। করি কয়েকঘণ্টা ঘুমিয়ে হঠাৎ জেগে দেখে পাহারা দেবার লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে। আগুনও নিবে গেছে। এক দিকে অন্ধকার বনে মৃত্যুর ভয়, অন্য দিকে তার চেয়েও ভয়াবহ জীবন। করি নিঃশব্দে উঠে সঙ্গীদের পাশ কাটিয়ে বনে ঢুকে পড়ল। ভোর হলেই ওরা ওর খোঁজে বেরোবে নিশ্চয়। তার আগে যতটা দূরে সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে। ভয় করছিল। বনে কত রকম নিঃশব্দে বিচরণের শব্দ। বাঘের কাশি শুনে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। একটা শক্ত লতা মুখে এসে লাগল। সেইটে ধরে উঠতে লাগল। বাঘটা এসে লাফ দিল, লতা দুলে উঠল কিন্তু ছিঁড়ে পড়ল না। অবশেষে গাছের ডালে উঠে বসতে পারল করি। বাঘটা নিচে লাফালাফি করতে লাগল। মনে পড়ল আরো কত বিপদ আছে বনে। অজগর আছে। কিন্তু ঐ আমেরিকানরা ওর খোঁজে নিশ্চয় বেরোবে। জেরি লুকাস ওকে পছন্দ না করলেও বেরোবে।

রাত ভোর হতেই নেমে পড়ে করি আবার হাঁটতে লাগল। এবার অনেক তাড়াতাড়ি।

★

গাছে বসে রইল লাভলি লেডির দল, বাঘটা গেলে নামবে। ওরা ক্লেটনের সঙ্গে এত বেশি গাছে চড়েছিল যে শৃম্প বলছিল এবার ওদের ল্যাজ গজাবে। বুবনোনিচ্ বলল, 'তাহলেই তোমার ষোল কলা সম্পূর্ণ হবে।' চারদিকে দিনের বেলা বনে যে শব্দ কানে আসছে, সব শুনতে পাচ্ছিল। খালি বাঘটা চুপ। হঠাৎ একদিক থেকে হেলে দুলে বাঘ আসতে লাগল আর উল্টো দিক থেকে করি! দুজনে একশো ফুট তফাতে মুখোমুখো দাঁড়িয়ে পড়ল। করি ভয়ে আড়ষ্ট। এই সময় গাছ থেকে একটা নেংটি পরা লোক বাঘের পিঠে নামল। তার সঙ্গে সঙ্গে আরো তিনটে লোক ছোরা হাতে গাছ থেকে নেমে বাঘের দিকে দৌড়ে এল। সবার আগে ব্রিটিশ-বিদ্বেষী শৃম্প রসেটি।

প্রথম লোকটি বাঘের গলা এক হাতে জড়িয়ে ধরে, পাদুটোকে বাঘের পিছনের পায়ে লটকে, ডান হাতে ছোরা ধরে, বাঘের বাঁ ধারে কোপ মারছিল। বাঘটা চাপা গর্জন করে মাটিতে আছাড়ি-পাছাড়ি করছিল। লোকটির গলা থেকেও একই রকম শব্দ বেরোচ্ছে শুনে, করির হাত-পা ঠাণ্ডা। শেষ পর্যন্ত বাঘটা এলিয়ে পড়ল আর তার গায়ে পা রেখে ক্লেটন বনমানুষদের জয়ধ্বনি দিল। সঙ্গে সঙ্গে জেরি লুকাস তাকে চিনে ফেলল। জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক —বনমানুষের ছেলে টারজান!

এক মুহূর্তে টারজান আবার জন ক্লেটন হয়ে, করিকে বলল, 'পালাতে পারলে তাহলে!'

—'তোমরা এসে না পড়লে তাতে কোনো লাভ হত না।'

—'একটু বস দিকিনি। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।'

—'তা সত্যি।' বলে সে বসে পড়ল।

জেরি লুকাসের মুখে হাসি ধরে না। শৃম্প পর্যন্ত বলে বসল, 'তুমি ফিরেছ বলে বড্ড খুশি হলাম, মিস্।' বলে মুখ লালটাল করে অস্থির!

করি টারজানকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভয় করছিল না?'

'—আমি তো জানতাম ওকে মারতে পারব, তবে আবার কিসের ভয়?'

বুবনোভিচ বলল, 'আমাদের বেজায় ভয় করছিল।'

—'তবু, আমার সাহায্যে ছুটে এসেছিলে। ঐ হল আসল সাহস।'

জেরি বলল, 'তুমি টারজান, তা বলনি কেন?'

'—তাতে কি এসে যায়?' করির বিশ্রাম করা হলে, ওরা ক্যাম্পের পথ ধরল। টারজান সবার পিছনে রইল, যাতে ডাকাতগুলো এলে, আগে সময় মতো টের পায়।

নানা রকম গল্প করতে করতে ওরা যখন ক্যাম্পে পৌঁছল, তখন করির মন ভারি খুশি। করি গুহার ভিতরে গেলে, বাকিরা পরামর্শ করতে বসল। এতদিনে সকলেই মেনে নিয়েছিল, যে উড়োজাহাজে পাইলট জেরি লুকাস যেমন ছিল নেতা তেমনি মাটিতে নেমে টারজানই তার বাহুবলের অভিজ্ঞতার আর বুদ্ধির বলে সকলের মান্য। টারজান বলল, 'ডাকাতগুলো খুব কাছে আসার আগেই থামিয়ে, কথা বলতে হবে। করি বলছে ওদের বন্দুকটন্দুক নেই, খালি একটা করে সোজা লম্বা ক্রিস্ আর একটা বেঁটে ভারি পারাং। আমরা চারজন তীরন্দাজ।'

করি বলল, 'পাঁচজন।'

'হ্যাঁ, পাঁচজন। কিন্তু দরকার না হলে কাউকে মেরে ফেলা হবে না। তীর ছুঁড়বার দরকার হলে আমি বলব। ঐ যে ওরা প্রায় এসে পড়েছে।'

★

ডাকাতদের দলপতি ইস্কান্দার ঘুম থেকে উঠে যেই দেখল বন্দিনী পালিয়েছে আর পাহারাদার ঘুমোচ্ছে, রাগে অন্ধ হয়ে সে বেচারাকে কুপিয়ে কেটে ফেলল। লোকটা বড় নিষ্ঠুর। তারপর দলবল নিয়ে করির পায়ের দাগ ধরে তারাও বনে ঢুকে বাঘটার মৃতদেহ দেখে অবাক হল। ছোরা দিয়ে বাঘ মারা তো আর সম্ভব নয়। বিকেলের মধ্যে গুহার কাছে পৌঁছে গেল ডাকাতরা।

ইস্কান্দার অনুচরদের বলল, 'পুরুষ তো খালি চারটে। মেরে ফেল ওগুলোকে। মেয়েটার যেন আঘাত না লাগে।'

ক্রিস্ বের করে নিশ্চিন্তে তারা এগিয়ে এল। একশো ফুট দূরে থাকতে, টারজানের কথায় করি বলল, 'থামো। এদের পাঁচজনের হাতে পাঁচটা ধনুক।'

ইস্কান্দার হাসল, বলল, 'চার্জ!'

টারজানও বলল, 'ছোঁড় তাহলে।'

টারজান ইস্কান্দারদের পায়ে তীর ছুঁড়ল, আরো চারজন তীর খেল। দুজন থামল, দুজন তবু তেড়ে এল। বুকে তীর খেয়ে মরল তারা। টারজান করিকে বলল, 'ওদের বল যদি অস্ত্র ফেলে, হাত তুলে এগোয়, তাহলে প্রাণে মারব না।'

তারা তা করল না। টারজান বলল, 'ধনুকে তীর পরিয়ে, আস্তে আস্তে এগোও। এতটুকু চালাকি করতে দেখলে, মেরে ফেলবে।'

জেরি বলল, 'করি তুমি এখানে থাক। হয়তো মারামারি হবে।'

করি হাসল, কিন্তু কথা শুনল না। টারজান তার প্রকাণ্ড ধনুকে তীর লাগিয়ে ইস্কান্দারকে বলল, 'দশ অবধি গুণব, তার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে দুহাত না তুললে, সবাইকে মেরে ফেলব।'

করি দো-ভাষীর কাজ করল। পাঁচ অবধি গোণা হলে আগে ইস্কান্দার, তারপর তার অনুচররা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত তুলল। টারজানের হুকুমে রসেটি সেগুলোকে কুড়িয়ে নিজেদের তীর উদ্ধার করে আনল। তারপর টারজান করিকে বলল, 'ওদের বলে দাও, মৃতদেহ নিয়ে চলে যেতে আবার এলে সবাই মরবে।'

যাবার আগে ইস্কান্দার অস্ত্রশস্ত্রগুলো ফেরত চেয়েছিল। টারজান রাজি হয়নি। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আর মরা বাঘটার অবস্থা মনে করে কিছু বলতে সাহস পায়নি। রাগে ফুলতে ফুলতে চলে গেছিল। শৃম্প বলল, 'সব কটাকে মেরে ফেললেই নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। জাপানীদের কাছে সটান গিয়ে এই জায়গাটার কথাটা বলে দেবে। তুমি লোক মারাতে বিশ্বাস কর না?'

—'না।'

—'জাপানীদেরও না?'

—'ওরা আমাদের শত্রু, ওদের কথা আলাদা। যুদ্ধ শেষ না হওয়া অবধি যত পারি জ্যাপ মারব। তবে ওদের ওপর আমার ব্যক্তিগত রাগ নেই। কারো ওপর নেই। প্রতিশোধ নেবার জন্য একবারই মানুষ মেরেছি। আমার পালিকা মা কালাকে মেরেছিল এম্বঙার ছেলে কুলঙ্গা, তাকে মেরেছিলাম। কালা ছাড়া কেউ আমাকে ভালোবাসত না, আমিও কাউকে ভালোবাসতাম না। আমি ভাবতাম কালা আমার সত্যিকার মা।'

গুহার মুখে বসে করি হরিণের আর পাখির মাংস রাঁধছিল, লুকাস তাকে সাহায্য করছিল। হঠাৎ করি বলল, ডাকাতটাকে কেন জিজ্ঞাসা করলে কোনো আমেরিকান-এর মধ্যে প্লেন থেকে নেমেছে কি না?'

—'আমার দুজন ক্রু-র সন্ধান পাচ্ছি না, মৃতদেহও খুঁজে পাইনি। হয়তো বেঁচে আছে কোথাও। রেডিওম্যান ডগলাস্ আর গানার ডেভিস। যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করি, তাদের ওপর আমার রাগ নেই। রাগ হল যারা যুদ্ধ বাধায়, তাদের ওপর।'

করি বলল, 'যদি নিজের চোখে দেখতে রুগ্ন মাকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, শেষটা মরে মুক্তি পেলেন, নিজের বাপকে বেয়নেট বিঁধিয়ে মেরে ফেলেছে, তাহলে হয়তো রাগ হত!'

হঠাৎ ওর হাত চেপে ধরে লুকাস বলল, 'আহা, বেচারি!'

করি বলল, 'তখন কাঁদিনি। কিন্তু তুমি সমবেদনা দেখালে কাঁদব।'

রাতে ওরা প্লেটের বদলে বড় বড় পাতার ওপর খাবার রেখে, কাঁটার বদলে চোখা বাঁশের টুকরো দিয়ে খেল। গেলাসের বদলে লাউয়ের খোলায় জল খেল। শৃম্প আর জেরি করিকে আমেরিকান ভাষার প্রথম পাঠ দিল।

খাবার আগে টারজান গাছ থেকে দুটো বড় বড় টুকরো পুরু ছাল কেটে এনে, গোল করে ছাঁটল। বৃত্ত দুটোর এক ধারে ছয়টা করে খাঁজ কাটল। খাবার পর জেরি বলল, 'ও দিয়ে কি হবে? দেখে মনে হচ্ছে পাঁচটে করে আঙুলওয়ালা বড় বড় চ্যাপ্টা পা।'

টারজান শুনে খুব খুশি। সে বলল, 'ঐ ডাকাতগুলো নির্ঘাৎ জাপানীদের ডেকে আনবে। ওরা পায়ের চিহ্ন দেখে এতদূর এসেছিল। ওদের একটু ধোঁকা দিতে হবে। প্রথমে যেদিকে আমরা যেতে চাই না, সেই দিকে বেশ খানিক দূর অবধি পায়ের চিহ্ন রেখে যাব। তারপর বনের ভিতরকার শক্ত জমির ওপর দিয়ে একটু ঘুরে এখানে ফিরে এসে গন্তব্য পথে একজনের পিছনে একজন এমনভাবে এগোব, যাতে আগের জনের পায়ের ছাপে পরের জনের পা পড়ে। আমি করিকে কাঁধে করে নিয়ে যাব, কারণ অত বড় পদক্ষেপ ওর পক্ষে কষ্টকর হবে। সবার শেষে বুবনোভিচ্ দু পায়ে ঐ চক্র বেঁধে, আমাদের ছাপের ওপর পা ফেলে যাবে। যে দেখবে সে ভাববে হাতির পায়ের ছাপ।'

রাতে একেকজন আড়াই ঘণ্টা করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা হল। ভোরে বাসি ব্রেকফাস্ট খেয়ে ওরা ঐ ভাবে রওনা হয়ে গেল। এক মাইল পায়ে চাকা বেঁধে হেঁটে বুবনোভিচ্ একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আর চাকার দরকারও ছিল না।

হঠাৎ টারজান বলল, 'সবাই গাছে চড়। একটা সত্যিকার হাতি আসছে। একলা হাতি মানে খ্যাপা হাতিও হতে পারে।'

সবাই গাছে উঠল; কিন্তু টারজান নিচেই রইল। তার কারণ বলল, 'আমার একটা ধারণা একটু পরীক্ষা করব। তেড়ে আসার আগে ওরা কান আর শুঁড় উঁচু করে ডাক ছাড়ে। তা করলে, আমিও গাছে উঠে পড়ব।'

হাতিটা এসে টারজানকে দেখেই কান আর শুঁড় তুলল। এবার তেড়ে আসার কথা। তখন টারজান তার সঙ্গে আফ্রিকার বনমানুষদের ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করল। ওর ধারণা এ ভাষা অধিকাংশ জানোয়ার বলতে না পারলেও, বুঝতে পারে। টারজান বলল, 'ইয়ো, টানটর, ইয়ো!' হাতিটার কান আর শুঁড় নেমে গেল। টারজান বলল, 'যুদ্'। একটু দোমনা করে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে, শুঁড় বাড়িয়ে টারজানের সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিল।

টারজান ওর শুঁড়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'আবু চাঁদ নালা!' হাতিটা আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসল। টারজান ওর শুঁড়টা নিজের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নালা বৈয়াট্!' হাতিটা ওকে নিজের মাথার ওপর তুলে নিল। টারজান বলল, 'উঙ্ক্!' হাতিটা ওকে নিয়ে উঠে পড়ে আস্তে আস্তে এগোল। বন্ধুরা গাছে বসে ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত।

একটু পরেই টারজান হেঁটে ফিরে এসে বলল, 'এবার এগোনো যাক।'

জেরি বলল, 'যদি বিপদ ঘটত? এ ঝুঁকিটা নেওয়া ঠিক হয়নি।'

টারজান বলল, 'আমার দেশের হাতিরা আমার বন্ধু। কতবার তারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। ওরা সহজে কিছু ভোলে না। এই যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল, এর ফল-ও ভালো হবে। তাই বলে তোমরা কেউ এসব চেষ্টা কর না। মাড়িয়ে থেঁৎলে দেবে।'

এর পর বনের চেহারা বদলাল। খুব উঁচু সোজা গাছ, তাদের গা-জড়িয়ে লতা উঠেছে। এত ঘন বন যে বেশি আলো আসছে না। কিছু দূর এগোতেই বন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। সামনে খাদ। খাদটা একটা উপবনের মত; গাছপালা, ঘাসজমি; জনমানুষের চিহ্ন নেই। খালি দূরে একটা গাছতলায় একটু কালো ছায়া। হরিণ চরছে।

টারজান ছায়াটাকে দেখিয়ে বলল, 'ওটার বিষয়ে সাবধান! বাঘের থেকে ভয়ংকর!'

—'বুনো মোষ নাকি?'

—'না, ও হল বুটো, অর্থাৎ গণ্ডার। চোখে ভালো দেখে না, কিন্তু নাক আর কান বড় সজাগ। ভীষণ ছুটতে পারে; শিং দিয়ে গুঁতিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।'

করি বলল, 'এখানকার গণ্ডারের বড় বড় দাঁত থাকে, তাই দিয়ে লড়াই করে।'

এই সব বলতে বলতে ওরা খাড়ি বেয়ে নিচে পৌঁছল। টারজান বলল, 'তোমরা এখানে চুপ করে অপেক্ষা কর। আমি ওখান দিয়ে ঘুরে একটা হরিণ মারি। গণ্ডার যদি উঠে দাঁড়ায়, নড়চড় না। তবে এদিকে এগোলে, গাছ নিও।'

টারজান তো ঝোপঝাপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই তাকে আবার দেখা গেল; হরিণ মারল একটা।

হঠাৎ গণ্ডার উঠে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। হয়তো মানুষের গন্ধ পেয়ে থাকবে। সে ক্রমে ওদের দিকে এগোতে থাকল; মনে হল মারতে আসছে না, দেখতে আসছে। কিন্তু তার পরেই ঝড়ের মতো ছুটে আসতে লাগল। তখন শৃম্প একটা অভাবনীয় কাজ করে বসল। আড়ভাবে গণ্ডারের সামনে দিয়ে ছুটল! এদের ছেড়ে গণ্ডার তার পিছু নিল। তাই চেয়েছিল শৃম্প। সকলে হতভম্ব, নড়বার চড়বার ক্ষমতা ছিল না কারো। যতই দৌড়াক, শৃম্প গণ্ডারের সঙ্গে পারবে না। তার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল ছোট মানুষটা। কিন্তু ততক্ষণে একলাফে টারজান গণ্ডারের পিঠে চড়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছোরা বের করে জানোয়ারটার মাথার পিছনে গায়ের জোরে ছোরা বসিয়ে শিরদাঁড়া কেটে দিল। আর কি গণ্ডার বাঁচে!

শৃম্পের দিকে ফিরে টারজান বলল, 'এর চেয়ে বড় বীরত্বের দৃষ্টান্ত জন্মে দেখিনি, সার্জেন্ট!'

বুবনোভিচ বলল, 'সাধে কি ওকে অতগুলো মেডেল দিয়েছে!'

পাঁচজন খাইয়ে এত মাংস দিয়ে কি করবে? টারজান হরিণের ভালো ভালো টুকরো আর গণ্ডারের পিঠ থেকে খানিকটা মাংস কেটে আলাদা করে রাখল। তারপর নদীর ধারে বড় একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে আগুন জ্বালাল। শৃম্প গণ্ডারের মাংসটাকে দেখিয়ে বলল, 'ওটাকে খাবার কথা ভাবছ না আশা করি?'

টারজান বলল, 'দুঘণ্টা বাদে তুমিও ওটাকে তৃপ্তি করে খাবে।' এই বলে গর্তের গনগনে আগুনের ওপর চামড়ার দিক করে, মাংসটা রেখে, তার ওপরে লতাপাতা আর সবার ওপরে মাটি চাপা দিয়ে রাখল।

এদিকে করিরা হরিণের মাংস গ্রিল করেছিল, সেগুলো খাওয়া হল। আজকাল ওদের বাছ-বিচার কমে গেছিল। দরকার হলে কাঁচা মাংসও খেত সবাই। তবে রান্নাই পছন্দ করত। বাইরেটা পোড়া, ভিতরটা কাঁচা, সবটাতে ধুলো-মাটি লাগা হলেও আপত্তি ছিল না। সকলে মিলে শৃম্পের সুখ্যাতি করতে আরম্ভ করাতে শৃম্প ভারি অপ্রস্তুত। 'আমার কোনো বাহাদুরি নেই। কিছু না ভেবেই ছুটেছিলাম। সব মা মেরির কৃতিত্ব।'

বুবনোভিচ বলল, 'তাই নাকি! আমি বলি বুঝি টারজানের।'

সকলে হাত দিয়ে ধরে, দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে হরিণের মাংস খাচ্ছিল। ঝুলকালি মেখে সবার ভূতের মতো চেহারা। জেরি ভাবছিল যুদ্ধের পর যারা দেশে ফিরবে, তারা আবার

সেখানকার জীবনযাত্রায় নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে তো? করির মতে সকলেই বদলে যাবে এই যুদ্ধের ফলে। আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়ে যাবে। সে বলল, 'টারজান দুঃখ করে আমি জাপানীদের ঘৃণা করি বলে। কিন্তু ঘৃণা আমার মনকে আরো উন্নত করে দেয়। তাছাড়া সবাই মিলে একজনকে ঘৃণা করলে, নিজেদের সম্পর্কটা আরো উন্নত হয়।'

এদিকে টারজান গণ্ডারের কুঁজ রোস্ট উনুন থেকে বের করে আনতেই চারদিক সুগন্ধে ভুরভুর করতে লাগল। বাস্তবিক বড় ভালো খেতে হয়েছিল মাংসটা, নরম, রসাল, সুগন্ধী। রাতে বুনো কুকুররা বাকি মাংস নিয়ে মারামারি করল। ভোরের দিকে বাঘ এসে ওদের তাড়িয়ে নিজে খেতে বসল।

সুমাত্রাতেও অনেক বিশ্বাসঘাতক লাভের আশায় জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করত। তাদের মধ্যে আমাট্ একজন। নদীর ধারে শ্বেতাঙ্গকে ক্যাম্প করতে দেখে সে জাপানী অফিসারদের কাছে রিপোর্ট করতে ছুটল।

সন্ধ্যা হয় হয়, গন্তব্যস্থান আরো দু কিলোমিটার দূরে। হেনকালে সামনে বাঘ বেরুল। কোনো মতে একটা গাছে উঠে আমাট্ প্রাণ বাঁচাল। সারা রাত সেখানেই আটকা।

পরদিন ভোরে আমাদের ছোট দলটি যখন খাড়াই বেয়ে উঠে আসছিল, সেই সময় গাছ থেকে নেমে আমাট হন্তদন্ত হয়ে ছুটে নিজের গ্রামে ক্যাম্প করা জাপানীদের কাছে খবর দিল পাঁচটা সাদা চামড়া এদিকে লুকিয়ে আছে। লেফটেনাণ্ট কুমাজিরো টাডা ওর কথা বুঝতে না পেরে এক লাথি ছুঁড়ল। ব্যথার চোটে আমাট চেঁচিয়ে উঠতেই তার মুণ্ডু কাটবার জন্য তলোয়ার বের করল। ভোরে ঘুম ভাঙালে তার মেজাজ বিগড়ে যায়। ভাগ্যিস্ সার্জেণ্ট ভাষাটা জানত তাই আমাট রক্ষা পেল।

বনপথে যেতে যেতে তার পায়ের ছাপ দেখে টারজান বলেছিল, একজন দিশী লোক এই পথে কাল গেছে, এইখানে বাঘের দেখা পেয়েছে, এই গাছে রাত কাটিয়েছে, সকালে এই পথে গেছে। তারপর বলল, 'এইখানে সে লোকটা এদিকে পথ ধরেছে, আর কজন বড় বড় পা-ওয়ালা লোক অন্য পথ ধরেছে। তারা দিশীও নয়, জাপানীও নয়। তোমরা একা মানুষের দাগ ধরে এগোও। আমি এদিকটা দেখে আসি।'

খানিকটা এগোবার পরেই কুমাজিরো টাডার লোকেদের সঙ্গে দলটার প্রায় মুখোমুখি। সে সময় জেরি আর করি একটু পেছিয়ে পড়েছিল। তারা ঝোপের মধ্যে লুকোল। টাডা আরগন ইউনিভার্সিটির ছাত্র। বুবনোভিচ্ আর শৃম্পকে অন্যরা হয়তো কিছু মারধোর করত, কিন্তু টাডা বাধা দিয়ে, তাদের নাম ধাম নম্বর ইত্যাদি লিখিয়ে নিল। আমাট বলেছিল ওরা পাঁচজন আছে। তার মধ্যে দুজনকে বন্দী করে, টাডা লোক পাঠাল বাকিদের খোঁজে। তারা ততক্ষণে ঝোপ থেকে বেরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আবার হাঁটা দিয়েছিল।

এদিকে টারজান গাছ থেকে গাছে ঝুলে মাইল দুই যাবার পর বনমানুষদের হাঁকডাক শুনতে পেল। মনে হল মারামারি ব্যাপার। তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেখে গাছের ওপর একটা ওরাংউটানের বাচ্চাকে অজগর সাপে জড়িয়ে ধরেছে। ধাড়িগুলো কিছুতেই বেচারাকে ছাড়াতে পারছে না। লড়াই বটে, তবে সাপের সঙ্গে। বাচ্চাটা তারস্বরে চাঁচাচ্ছে বলে বোঝা গেল, সে তেমন জখম হয়নি। টারজান তাই দেখে বনমানুষদের ভাষায় চিৎকার করল, 'ক্রি-ই-গাঃ! টারজান বুন্দোলো হিস্তা!' অর্থাৎ 'টারজান সাপ মারবে।' ওরাও, 'মারো, মারো!' বলে চেঁচিয়ে উঠল। টারজান তার ইস্পাতের নতো আঙুল দিয়ে সাপটার গলা টিপে ধরে, পা দিয়ে বাচ্চাটাকে সুদ্ধ সাপের গা জড়িয়ে ধরল। তারপর অন্য হাত দিয়ে গলাটা যেখানে ধরেছিল, তার পাশে কোপ দিতে লাগল। খানিকটা ঢিল দিল সাপটা, অমনি বাচ্চাটাকে টেনে বের করে আনা গেল। তারপর টারজানকে নিয়ে সাপটা আছাড়ি পিছাড়ি করতে করতে মাটিতে পড়ল। অনেক ডালপালা থাকাতে টারজানের আঘাত লাগল না। মাটিতে পড়তেই অন্য ওরাংউটানরাও নখ দিয়ে, দাঁত দিয়ে সাপের গা ক্ষতবিক্ষত করে দিতে লাগল। ততক্ষণে ছোরার কোপে সাপের মাথা কেটে আলাদা হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে নিজের পরিচয় দিয়ে, ওদের সঙ্গে ভাব করে ফেলল টারজান। মরা সাপের গায়ে পা দিয়ে সে জয়ধ্বনি দিয়েছিল। তাই শুনে আরো অনেকগুলো বনমানুষ ব্যাপার দেখতে হাজির হল। আগের দলের পাণ্ডা উগলো টারজানকে উপকারী বন্ধু বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু নতুন দলের দাম্ভিক ওজুকে আচ্ছা করে পিটিয়ে, যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়ে, তবে বন্ধু বলে মেনে নেওয়াতে হল।

উগ্লোর কাছে খবর পাওয়া গেল যে এক ঘণ্টায় সূর্য

যতখানি আকাশ পার হয়, ততখানি দূরে কয়েকজন সাদা মানুষ তাঁবু করেছে। অর্থাৎ মাইল তিনেক দূরে সম্ভবতঃ ডাচ্ গোরিলাদের ক্যাম্প আছে। অমনি টারজান সেদিকে চলল। ওজু পিছন থেকে দাঁত কিড় মিড় করতে লাগল।

জেরি লুকাস আর করি স্বপ্নেও ভাবেনি ওদের খোঁজে লোক আসবে। জেরি দুঃখ করছিল ওর সামনে দুই বন্ধু বন্দী হল, অথচ ও কিছু করতে পারল না। করি এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিল যে সবাই বন্দী হওয়ার চেয়ে এই ভালো। এমন সময় কানে এল জাপানী কণ্ঠস্বর। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল এরা। করির মুখে একটা কঠিন ভাব এসেছিল। প্রতিশোধ নেবার সুযোগ এল বোধ হয়। ঝোপের পিছনে সরে গিয়ে তীর ধনুকে পরিয়ে দুজনে তৈরি। কুড়ি ফুটের মধ্যে এলে তবে আক্রমণ করতে হবে। জাপানীরা ধীরে সুস্থে হাঁটছিল। ফেরারি ধরবার খুব আগ্রহ দেখাচ্ছিল না। কুড়ি ফুটের মধ্যে এলে করির তীরে একজন পড়ল; অন্যজনের বুকে না লেগে জেরির তীর তার গলায় লাগল। ছোরা বের করে তার বুকে বসিয়ে দিল জেরি। করি অন্য লোকটার বন্দুক খুলে নিয়ে, বেয়নেটটা তিনবার তার গায়ে বিঁধিয়ে বলল, 'বাবাকে এই ভাবে মেরেছিল।' ওর মুখে হিংসার ভাব ছিল না, কেমন একটা অনুপ্রেরণার ভাব ছিল। মৃতদেহ দুটোকে টেনে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিল ওরা।

টারজান গাছ থেকে গাছে যেতে যেতে দেখল সামনে একটা গাছে মাচার ওপর একটা দাড়িওয়ালা সশস্ত্র লোক পাহারা দিচ্ছে। তাকে দেখে খুব আস্থা হল না। একটু ঘুরে একটা নিরালা উপত্যকার কিনারায় পৌঁছে নিচে তাকিয়ে দেখল একটা অপরিচ্ছন্ন ক্যাম্পের বাইরে জনা কুড়ি পুরুষ আর মেয়ে শুয়ে বসে মদ খাচ্ছে। সকলের কি রকম অমার্জিত হিংস্র চেহারা। ওদের সঙ্গে একজন যুবকও ছিল, তা দেখে অন্য রকম মনে হল। লোকগুলোর সঙ্গে ছোরা, পিস্তল, রাইফল সবই ছিল। দো-আঁশলা মনে হল। টারজান ভাবল এদের সঙ্গে যত কম কারবার করা যায় ততই ভালো। দুঃখের বিষয়, যে ডালে ও বসেছিল, সেটি ভেঙে ওকে নিয়ে নিচে পড়ল। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন ওর হাত পা বাঁধা। লোকগুলো ওকে ঘিরে নানা ভাষায় নানা প্রশ্ন করতে লাগল। ও প্রথমে বোবা সেজে রইল। তারপর সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলল। সে আর ওরা বুঝবে কি করে? এর পর বিরক্ত হয়ে লোকগুলো তাদের গাছতলায় ফিরে গিয়ে, মদের বোতল তুলে নিল। খালি অন্য রকম যুবকটি কাছে বসে রইল। অন্যরা মদে মশগুল হয়ে পড়লে, সে নিচু গলায় বলল, 'নিশ্চয় তুমি ইংরেজ, নয়তো আমেরিকান। ঐ ভাঙা বম্বারে ছিলে। যদি মনে কর আমাকে বিশ্বাস করতে পার, একটু ইশারা কর।'

তারপর যুবককে ঐ দলের ইতিবৃত্ত বলল। 'জাপানীরা এলে এরা পাহাড়ে পালিয়ে এসেছে। অধিকাংশই জেলখাটা কি জেল-ভাঙা দুষ্কৃতকারী। কেবল নিজেদের স্বার্থ বোঝে। আমার রেজিমেণ্ট আত্মসমর্পণ করলে আমাকে বন্দী করে রেখেছে, মারেনি। কারণ এদের দলের কয়েকজনকে আমি চিনি আর তাদের উপকারও করেছি। তবে আমাকে বিশ্বাস করে না। ওদের ভয় আমি যদি সত্যিকার গেরিলাদের কাছে ওদের কথা জানিয়ে দিই। ওরা জাপানীদের সঙ্গে কারবার করে। তোমাকে ধরিয়ে দেবে ঠিক করেছে। তাহলে টাকা পাবে। আমার নাম টাক ভ্যান ডার বস। রিজার্ভ অফিসার।'

লোকগুলো মদ খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করছিল। এদিকে নজর দিচ্ছিল না। টারজান এবার কথা বলল, 'আমি ইংরেজ। আমার নাম ক্লেটন। এখান থেকে পালাতে চাও?'

—'চাইলে কি লাভ? এখানে ঢুকবার একটামাত্র পথ, সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারাদার থাকে।'

টারজান বলল, 'আমরা পাঁচজন আছি। আমাদের ইচ্ছা পায়ে হেঁটে দক্ষিণ উপকূলে গিয়ে, নৌকো জোগাড় করে অস্ট্রেলিয়া যাই।'

—'সে তো পাঁচশো মাইল।'

—'সে কষ্টটা করতে হবে।'

ভ্যান ডার বস্ বলল, 'বেশ। আমিও যাব। হয়তো কিছু কাজেও লাগতে পারি।'

—'তাহলে পাহারাদারের জন্য ভাবনা নেই। ওকে পেরিয়ে যেতে পারব।'

—'অন্ধকার হলে তোমার বাঁধনগুলো কেটে দেবার চেষ্টা করব।'

—'ও আমি নিজেই ছিঁড়ে ফেলতে পারব। তোমাকে কি খুব নজরে রাখে রাতে?'

—'একেবারেই না। কিন্তু বাঘের ভয় আছে।'

—'তা হোক গে।'

শৃম্প রসেটিকে আর বুবনোভিচকে মেরেধরে, বেয়নেটের খোঁচা দিয়ে প্রাণান্ত করে, ওরা গ্রামে পৌঁছল। সেখানে হাত পা বেঁধে ওদের একটা কুঁড়ে ঘরের মেঝেতে ফেলে রাখা হল। ওরা শুয়ে শুয়ে অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় জাপানীদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত শৃম্প মরিয়া হয়ে মেরি-মাতার নাম করতে লাগল। গতবার প্রার্থনার ফলে টারজানকে পেয়েছিল। বুবনোভিচের বাড়িতে বৌ-ছেলে ছিলা। সারা রাত সে ভগবানকে ডাকল।

সকালে দুটো জাপানী সোলজার এসে ওদের বাঁধন কেটে দাঁড় করিয়ে দিল। দাঁড়াবে কি, হাত পা আড়ষ্ট। বারে বারে পড়ে যাচ্ছিল; তাই দেখে কি মার! গ্রামের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে, টাডা বলল, 'আমার সব কথার উত্তর দেবে?'

বুবনোভিচ্ বলল, 'না!' টাডা তলোয়ার তুলল।

এদিকে ডাকাতগুলোর ক্যাম্পে মদ খেয়ে সব চুর। গভীর রাতে ভ্যান ডার বস ছোরা নিয়ে টারজানের বাঁধন কাটতে এলে, টারজান বলল, 'খুলে ফেলেছি।' সে তো অবাক! একটু এগিয়ে টারজান বলল, 'দাঁড়াও। ছোরা দাও।'

মাচায় উঠে পাহারাদারের গলা চিরে ফেলতে তার বেশি সময় লাগল না। রাইফল এবং মৃতদেহটা নিচে ফেলে টারজান নেমে এসে সঙ্গীকে বলল, 'চল। পাহারাওয়ালা কিছু বলবে না। এই নাও রাইফল। পিস্তল, অ্যামিউ-নিশনও নিয়ে নাও।'

একটা ছোট নদীতে গা থেকে রক্তের দাগ মুছে, পায়ের দাগ দেখে ওরা সেই মোড়াটাতে পৌঁছল। তারপর অন্য পথটা ধরল। সবে আলো হয়েছে, এমন সময় একটা গুলির শব্দ কানে এল। খুব কাছে থেকে। জেরি আর করি ঠিক করেছিল টারজানের জন্য ঐখানে অপেক্ষা করবে। মাটি থেকে কুড়ি ফুট উঁচুতে একটা ডালে বসে ওরা শৃম্প আর বুবনোভিচের জন্য চিন্তা করছিল। টারজান ফিরছে না দেখে করি বলছিল, 'ওর নিশ্চয় কোনো বিপদ হয়েছে।' রাতের ঘণ্টাগুলো যেন বড় বেশি লম্বা।

শেষটা লুকাস বলল, 'তোমার অস্ত্রশস্ত্র আছে, তুমি এখানে থাক। আমি গিয়ে দেখি ওদের কি হল। জাপানীরা বড় নিষ্ঠুর।'

কিন্তু করি জোরজার করে ওর সঙ্গে চলল। তখনো অন্ধকার ছিল. কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। গাছপালায় ধাক্কা খেতে খেতে ওরা এগোল। নানা অবান্তর গল্প করছিল ওরা। যুদ্ধ বড় খারাপ জিনিস, যুদ্ধ হওয়া উচিত নয়, এই সব।

হঠাৎ দেখে সামনে একটা বাঘ! করি বলল, 'মেরো না।'

জেরি বলল, 'এই খুদে বন্দুক দিয়ে বাঘ মারাও যায় না।'

—'বাঘটা চলে যায় না কেন? মনে হচ্ছে ওর খিদে পেয়েছে।'

কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে, বাঘটা ঝোপে ঢুকে গেল। তারপরেই বন শেষ হয়ে গেল। সামনে একটা ছোট গ্রাম, ওরা বলে কামপং। সেখানে অনেক লোকের সমাবেশ, জাপানী সোলজার আর গ্রামবাসী। হঠাৎ দেখে সর্বনাশ। টাডা তলোয়ার তুলেছে, শৃম্প আর বুবনোভিচ্ এক্ষুণি মরবে। সঙ্গে সঙ্গে জেরির রাইফ্লের গুলি ছুটল। টাডা পড়ল। করির গুলিতে একজন জ্যাপ সোলজার মরল। তারপর দুজনার গুলিতে একের পর এক লোক পড়তে লাগল। ততক্ষণে টারজানও পৌঁছে গেছিল। তার সঙ্গে ভ্যান ডার বস্। দুজনার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। সবগুলি কাজে লাগল।

কামপং-এ হুলস্থুল ব্যাপার! তার সুযোগ নিয়ে বুবনোভিচ্ আর শৃম্প বন্দুক, গোলাগুলি, কয়েকটা হাতবোমা পর্যন্ত তুলে নিয়ে, পর পর কয়েকটা বোমা ছুঁড়ে দিয়ে, বনে ঢুকে পড়ল। তখনকার মতো এ-অঞ্চলের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটল। বনে সকলে মিলিত হল। শৃম্প বলল, 'দেখলে তো, ওরা শুনেছিল।'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' করি বলল, 'কারা?'

শৃম্প বলল, 'গড্ আর মা-মেরি।'

টাক ভ্যান ডার বস্কে দেখে করি আহ্লাদে আটখানা। বহু দিনের স্নেহের সম্বন্ধ তাদের। জেরি একটুও খুশি হল না। টারজান এসব কথায় কান না দিয়ে গ্রামটাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখল মুষ্টিমেয় জাপানী বাকি। এবার তাদের নিশ্চিহ্ন করলে ভালো হয়। সকলেই রাজি।

জেরির পাশে দাঁড়িয়ে করিও লড়াই করেছিল। বুবনোভিচ্ আর শৃম্প রসেটি যেন ক্ষেপে গিয়ে বেয়নেটের সাহায্যে জাপানী মেরেছিল। গাঁয়ের লোকরা ভয়ে আধমরা। জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য, তাদের না কোতল করা হয়। কিন্তু সে সব কিছু হল না। তাদের খালি বলা হল খাবার দাবার জোগাতে। তারা

বলল পঁচিশ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের কাছে আরেকটা বড় ঘাঁটি আছে। এরা এখানে অপেক্ষা করছিল, নতুন দল এসে তাদের রিলিফ দেবে।

আমাট এদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করতে লাগল। একবার ভেবেছিল গিয়ে বড় দলটাকে খবর দিয়ে আসে। কিন্তু তার বড় বেশি ঝুঁকি। এরা তো আর ওর বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা জানে না। টারজান আমাটের কথা শুনে বলল, 'আমি একা গিয়ে একটু দেখে আসি, তোমরা এখানে থাকে। বদলি দল এর মধ্যে এলে তার মোকাবিলা করতে পারবে তো?'

শৃম্প বলল, 'নিশ্চয় পারব। কত আর আসবে? হয়তো আমাদের চারগুণ। তার বেশি হবে না। একজন পাহারায় থাকব, খানিকটা এগিয়ে। তাহলে সময়মতো খবর পাব। বড় ক্যাম্পটা বোধ হয় এখান থেকে পনেরো-ষোলো মাইল দূরে। আজ বিকেলের আগে কেউ পৌঁছবে মনে হয় না।'

জেরি বলল, 'তাহলে তুমি এক মাইল এগিয়ে যাও। দেখলেই খবর দেবে।'

করি বলল, 'প্রত্যেকে হাতবোমা নিয়ে পথের দু-ধারের গাছে লুকিয়ে থাকলে কেমন হয়?'

খুব ভালো। অন্ধকার হলেই যে যার জায়গা নিও। ওরা সম্ভবতঃ রাতে কিছু করবে না।' এই বলে টারজান রওনা হয়ে গেল।

ডাকাত দলের হুফ্‌টের মেজাজ সর্বদাই খারাপ থাকে ঘুম থেকে উঠে বলল, 'বন্দীরা কোথায়?'

—'দুজনেই নিখোঁজ।'

—'কে পাহারা দিচ্ছিল?'

—'হিউগো। আমাকে রাত বারোটায় ডেকে দেবার কথা, তা সে আসেনি।'

—'যাও, তাকে ধরে আনো।'

একটু পরেই খবর এল হিউগো মরে গেছে, কে তার গলা কেটেছে।

সারিনা বলল, 'বুনোটা নিশ্চয়।'

হুফ্‌ট বলল, 'তার হাত বাঁধা ছিল। ভ্যান ডার বস কেটেছে।'

—'বাঁধন কাটা নয়, ছেঁড়া।'

সারিনা বলল, 'বুনোটা দড়িও ছিঁড়েছে।'

দলে আরো মেয়ে ছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র সারিনার কথাই সকলে মানত। হুফ্‌ট বলল, 'আমরা ওদের ধরে আনছি। মেয়েরা ক্যাম্পে থাকো।'

এ দিকে জেরি তার দলবল হাতবোমা নিয়ে রওনা হয়ে গেছিল। গ্রামের লোকদের বলে গেছিল কোনো চালাকি করলে সবাই মরবে। আমাট ভেবেছিল ওদের সঙ্গে গিয়ে কে কোথায় লুকোয় দেখে, জ্যাপদের বলে দেবে। ওদের কথায় ঘাবড়ে গিয়ে বরং ডুরিয়ান ফল পাড়তে গেল। হুফ্‌ট্‌ তাকে গাছ থেকে নামিয়ে বলল, 'সব কথা ফাঁস করলে ভালো, না করলে ওকে মেরে ফেলা হবে। আমাট তখন গোটা দলটার সমস্ত কীর্তির কথা বলে দিল।

—'কোথায় গেছে তারা?'

—'বনে গেছে, সন্ধ্যায় ফিরবে। ওদের সঙ্গে একজন মেয়েও আছে, জাপানীরা তাকে খুঁজছে। অনেক টাকা দেবে।' এই সময় কিছু দূর থেকে বোমা, গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল। কোথাও দস্তুরমতো লড়াই হচ্ছে। কয়েক মিনিট বোমা-গোলার শব্দের পর কিছু রাইফ্‌লের আওয়াজ তারপর সব চুপ। বিজয়ী দল নিশ্চয় এই গ্রামে আসবে। হুফ্‌ট্‌ তার সঙ্গীদের নিয়ে বনের ধারে গা-ঢাকা দিল। একটু পরেই টারজান শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর একজন মেয়ে দেখা দিল। তাদের সঙ্গে মেলা অস্ত্রশস্ত্র। পুরুষরা গ্রামের একটা ঘরে গেল, তাদের ঘাঁটিয়ে দরকার নেই। মেয়েটি একা অন্য ঘরে গেল, তাকে বন্দী করতে হবে। সামনা-সামনি যুদ্ধ হুফ্‌ট্‌কে দিয়ে হবে না, যদিও পিছন থেকে ছোরা মারার অভ্যাস আছে। চালাকি করতে হবে।

আমাটকে বলল, 'মেয়েটিকে বল ওর বাবার এক বন্ধু বনের ধারে ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

করির সঙ্গে লারা বলে একজন গ্রামের মেয়ে ছিল, সে আমাটকে তাড়াবার চেষ্টা করেছিল। আমাটের গলা শুনে করি বেরিয়ে এসেছিল। আমাট বলল, একা এসেছেন লোকটি, দাড়ি আছে। দেখা করতে চান। কিছু সন্দেহ না করে করি বেরিয়ে গেল। লারা আর আমাট ছাড়া কেউ কিছু জানল না।

স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে গেরিলাদের অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর পেল না টারজান। খালি এইটুকু শুনল পুব-দক্ষিণে ষাট-পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে একটা আগ্নেয়গিরির কাছে তাদের আস্তানা। বনের মধ্যে দিয়ে সেই দিকে চলল টারজান। কি সুন্দর ঘন বন,

কত জন্তুজানোয়ার, বাঁদররা কিচিরমিচির করছে। টারজান তাদের ভাষা বোঝে। তারা আগ্নেয়গিরির পথ দেখিয়ে দিল। বলল সাদা মানুষ আছে সেখানে। তারা বড় খারাপ। মেরে ফেলে।

সে-ক্যাম্প খুঁজে বের করেছিল টারজান। পরণে সেই বাঘছাল, সঙ্গে শুধু তীর ধনুক ছোরা। সকালে কিছু ফল পেড়ে খেয়েছিল আর একটা শিকার করা খরগোস। জনমানুষের চিহ্ন নেই কোথাও। গিরিখাতের মধ্যে ক্যাম্পটা। একটা মোটে প্রবেশপথ। সেখানে একজন দাড়িওয়ালা ডাচ্ পাহারা দিচ্ছে। পঁচিশ ত্রিশ গজ দূর থেকে নিজের পরিচয় দিল টারজান। লোকটি তাকে অপেক্ষা করতে বলে, ডাক দিল সঙ্গীদের। তিনজন লোক বেরিয়ে এল, ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, তাদের মধ্যে ডি লেটেনহোভ বলে একজন ফার্স্ট লেফ্‌টেনাণ্টও ছিল।

তার কাছে সব কথা খুলে বলল টারজান। এ ইনচার্জ নয়। ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্স সেদিন অনুপস্থিত। টারজান কি চায়? টারজান বলল, ও জানতে চায় কোথায় জাপানী ক্যাম্প আছে, যাতে সেগুলো এড়িয়ে যেতে পারে। কোথায় ডাচ্ ক্যাম্প আছে, সেখানে সাহায্য পাওয়া যায়। ওরা নৌকো নিয়ে আফ্রিকা যেতে চায়। টারজানের সঙ্গে ইংরিজিতেই কথা হচ্ছিল। কিন্তু জার্মান আর ডাচ্‌ও তার ভালো জানা ছিল। ওকে নানা ভাবে পরীক্ষা করল এরা। নিজেকে সনাক্ত করার কাগজপত্র নেই, খালি মুখের কথায় হবে কেন? জার্মানদের চরও তো হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন না ফেরা অবধি ওকে বন্দী করে রাখাই স্থির হল। অস্ত্রশস্ত্র গেরিলারা নিয়ে নিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্যাম্প, সেখানে কোনো মেয়ে ছিল না। সব কিছুতে এমন একটা শৃঙ্খলা চোখে পড়ল যে টারজানের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল এরা সত্যিই গেরিলা যোদ্ধা, ডাকাত টাকাত নয়।

পরে লেটেনহোভকে উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে সব কথাই বলল। যখন করির আর টাক ভ্যান ডার বসের বর্ণনা পর্যন্ত নির্ভুলভাবে দিল, ওর কথা বিশ্বাস না করে উপায় রইল না। ওরা এদের চেনা মানুষ, এতকাল এদের ধারণা ছিল দুজনেই প্রাণ হারিয়েছে। বেঁচে আছে শুনে সকলে খুশি। শেষ পর্যন্ত লেফটেনাণ্ট যখন জানতে চাইল আগন্তুক টারজান সেজে আছে কেন? তখন আর থাকতে না পেরে একজন সৈনিক বলে ফেলল, 'উনিই যে টারজান, জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক!'

টারজান বলল, 'আমি কি এখনো বন্দী?'

—'না। তবে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবেন না।'

করি বনপথে ঢুকেই দেখে একশো ফুট দূরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার চেহারাটা খুব সুবিধার মনে হল না। লোকটা বলল, 'গ্রামে ঢুকতে ভয় হচ্ছিল, এখানকার লোকরা বন্ধু না শত্রু না জেনে।'

করি বলল, 'এখানকার শ্বেতাঙ্গরা সবাই বন্ধু।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাকিরা তাকে ঘিরে ফেলল। করির মনে হল এই ডাকাতগুলোর কাছ থেকেই টারজান, আর টাক পালিয়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করল 'কি চাও তোমরা?

হুফ্‌ট্ বলল, 'তোমার কোনো ক্ষতি করব না। চুপচাপ সঙ্গে এসো। বেশিক্ষণ আটকে রাখব না।'

—'আমাকে দিয়ে কি দরকার?'

—'সেটা দুদিনেই টের পাবে।'

—'আমার দলের লোকরা পিছন পিছন এসে তোমাদের আচ্ছা করে সাজা দেবে।'

—'ওরা মাত্র চারজন। একেবারে মুছে ফেলে দেব।' এই বলে ওকে নিয়ে রওনা দিল।

রাত হয়ে গেল, তবু থামে না। করি ক্লান্তির ভান করলে, ওরা ওকে ঠেলে নিয়ে চলল। এদিকে রাতের খাবারের সময়ে করি এল না দেখে জেরি আমাটকে পাঠাল ওকে ডাকতে। একটু পরে ফিরে এল সে, 'মিস্ তো বনে গেছিল, ভাবলাম ফিরে এসেছে। কিন্তু ঘরে তো দেখছি না।'

—'কোন দিকে গেছিল সে?' আমাট উল্টো দিক দেখিয়ে দিল।

ওরা সকলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে করির খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। সকলেরি সন্দেহ হচ্ছিল আমাট মিথ্যা কথা বলছে। অনেক ডাকাডাকি করে গ্রামে ফিরে এল ওরা। গ্রামবাসীদের ডেকে গ্রামের মধ্যিখানে জড়ো করল। গোড়ায় যাদের জিজ্ঞাসা করল, তারা কিছু জানে না বলল। তারপর লারার পালা এল। অমনি আমাট সরে পড়ার তালে ছিল, শৃম্প তার ঘাড় ধরে নিয়ে এল। ভ্যান ডার বস লারাকে জেরা করে অন্যদের বলল, 'এ বলছে আমাট এসে করিকে বলেছিল ওর বাবার এক বন্ধু ওর জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু ও যেন একলা যায়। ঐ দিক দিয়ে বনে গেছিল করি।' বলে আমাট যেদিক বলেছিল তার উল্টো দিক দেখাল।

তখন গায়ে বেয়নেট ঠেকিয়ে আমাটকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। সে বলল সে বনে ডুরিয়ান পাড়ছিল, এমন সময় কুড়িজন লোক ওকে বন্দী করে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে, করিকে ঐ কথা বলতে বাধ্য করেছিল।

জেরি বলল, 'এদের কাছ থেকেই হয়তো টারজান আর ভ্যান ডার বস্ পালিয়েছিল।'

—'তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

বসেটি আমাটকে মৃদু একটা বেয়নেটের খোঁচা দিতেই সে হাউমাউ করে উঠল। জেরি বলল, 'আমারো তো ওকে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু ওভাবে কাজ করা ঠিক নয়।'

করি আর দস্যুরা সন্ধ্যায় এক জায়গায় পৌঁছলে তিনটে টোকা শোনা গেল। হুফ্‌ট্‌ও একটা গাছের গুঁড়িতে দুবার বন্দুকের বাড়ি দিল, একটু থেমে আরেকবার দিল। একজন মেয়ের গলা এল, 'কে?'

—'হুফ্‌ট্‌।'

—'ভিতরে এসো। আমি নামছি। বাবা, এ কি মেয়েমানুষের কাজ। আর কাউকে বসাও।'

ঐ মেয়েটির নাম সারিনা। হুফ্‌ট্‌ বলল, 'কাউকে বসাতে হবে না। এখানকার পাট তুলে চলে যেতে হবে।' অমনি দুজনের মধ্যে খ্যাঁচাখেঁচি লেগে গেল। অন্ধকার থেকে লোকদের কেউ বলল, 'আরে বাপু, ঝগড়া থামাও। ঘেন্না ধরে গেল।'

—'কে কথা বলল?' সব চুপ।

কয়েকটা মশাল জ্বলল। দলের মেয়েরা এসে করিকে দেখে বলল, 'আবার একটা ছোট ছেলেকে আনলে কেন?'

—'ছেলে না, মেয়ে।'

মেয়েটা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওকে দিয়ে কি হবে?'

'—জাপানীরা ওকে খুঁজছে।'

হুফ্‌ট্‌ বলল, 'ভাবছি ওদের দেব না। আমিই রাখব।'

সারিনা বলল, 'দেখ, আমার অনুমতি ছাড়া ওসব চলবে না।'

মশালের আলোয় দেখা গেল বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হবে তার, ছিপছিপে শক্ত শরীর। সর্বদা সঙ্গে পিস্তল আর পারাং থাকে। এ তো বাইরের কথা, ভেতরেও ওর এমন তেজ যে ঐ দস্যুদের দলেও সকলে ওকে ভয় আর মান্য করে চলে। ওর বাবা ছিল খাঁটি ডাচ্, খুনে গুণ্ডা, জলদস্যু। শেষটা ফাঁসি গেছিল। মামা-বংশ বোর্নিওর নরখাদক। জাপানীরা যখন দ্বীপ দখল করেছিল, সারিনা কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য জেল খাটছিল। জেলের সব কয়েদীই বেরিয়ে এসেছিল। ওদের কথাবার্তা শুনে করি বেচারা ভয়ে কাঠ। অন্য পথে এবং পায়ের চিহ্ন না রেখে, দস্যুরা সে-স্থান ছেড়ে গেল। সারিনা সর্বদা করির পাশে পাশে রইল। করির ভয়ও করছিল, আবার নিশ্চিন্তও হচ্ছিল।

ভয়ে, দুশ্চিন্তায় সেই রাতের অন্ধকারে ভ্যান ডার বসের নেতৃত্বে ওরা সেই পরিত্যক্ত ক্যাম্পে পৌঁছে, তাজ্জব বনে গেল। রাতটা সেখানে কাটিয়ে, সকালে কোথাও কোনো পায়ের দাগ না দেখে আবার গ্রামে ফিরে এল। আমাট ওদের দেখেই গাছে চড়ে লুকিয়ে রইল। এদিকে টারজান গেরিলাদের ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্সের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি এলে, সকলে মিলে পরামর্শে বসল।

টারজান বলল, 'কাল আমি রওনা হবার সময়ে ওরা একটা জ্যাপ রিলিফ পার্টির মোকাবিলা করতে বেরোচ্ছিল। তার যে ফলাফল আশা করছি, তার থেকে মনে হয়, তোমরা কিছু বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র পেতে পার।'

ভ্যান্ প্রিন্স অবাক হলেন। একজন মেয়ে নিয়ে পাঁচজন লড়ে কুড়িজনকে উচ্ছেদ করবে? টারজান বলল, 'ওরা, ঐরকম। মেয়েটা প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা।'

ভ্যান প্রিন্স অবাক হলেন। ছোট্ট করি ভ্যান ডার মিয়ারকে তিনি ভালো করেই চিনতেন।

টারজান বলল, 'আমি এখনি ফিরে যাচ্ছি। তোমরাও তাহলে এসো। একসঙ্গে কাজ করলে জোর বাড়বে।'

ভ্যান প্রিন্স বললেন, 'তাহলে কাল দেখা হবে।'

এদিকে ভোর বেলায় দস্যুর দল একটা উপত্যকায় পৌঁছল। পুরুষরা বিশ্রাম করতে চায়, সঙ্গে মদের বোতল আছে। মেয়েরা পাহারা দেবে। তারা কাল রাতে খানিকটা ঘুমিয়েছিল। করির চোখে ঘুম ছিল না। মাথায় ঘুরছিল পালাবার নানা ফন্দি। সারিনা ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে কাদা। এখান থেকে গ্রামে ফেরার পথ করির মুখস্থ। আশেপাশের ভূখণ্ড তার জানা। আরেকটু এগোলেই বোধ হয় সেই গণ্ডারটার হাড়গোড় দেখতে পাবে। একটা পারাং হাতে পেলে হত। সারিনা একটু অন্যমনস্ক হলেই পারাঙের এক বাড়ি। তারপর করি পালাবে।

হঠাৎ সারিনা বলল, 'তোমার নাম কি?'

—'ভ্যান ডার মিয়ার।'

—'করি ভ্যান ডার মিয়ার। তোমার মায়ের মতো দেখতে তুমি।'

—'মাকে চিনতে তুমি? তা কি করে হতে পারে?'

—'মা, বাবা দুজনকেই চিনতাম। তুমি যখন হল্যাণ্ডে স্কুলে পড়তে, আমি তাঁদের বাড়িতে কাজ করতাম। কত যে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে। বড় ভালোবাসতাম তাঁদের। আমাকে যখন পুলিসে ধরেছিল, কত সাহায্য করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু দো-আঁশলারা কখনো ন্যায়-বিচার পায় না। ক্ষমাও পায় না। আমি সাদা হলে ছাড়া পেতাম। তাঁদের জন্য আমি তোমাকে পালাতে সাহায্য করব।'

করি বলল, 'তোমার নাম কি?'

—'সরিনা।'

—'শুনেছি তাঁদের কাছে তোমার কথা।'

—'গাঁয়ের পথ চিনতে পারবে?'

—'পারব।'

—'এক্ষুণি রওনা হয়ে যাও। রাইফল্ ছুঁড়তে পার তো?'

—'পারি।'

—'তাহলে গুডবাই।'

সারিনাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমো খেয়ে করি ছুট দিল।

যতটা মনে হচ্ছিল তার চেয়েও দূরে নদীটা। বিকেলে করি দেখে দুটো জ্যাপ আর কজন স্থানীয় লোক ক্যাম্প ফেলছে। এখন আর এগোনো যাবে না। গাছে চড়ে ঘুমিয়ে রইল করি। রাতেও ঘুমতে সাহস পেল না। বাঘ কাশছিল।

সন্ধ্যায় গ্রামে ফিরে এসে করির কথা শুনল টারজান। তার কোনো পায়ের দাগ বা চিহ্ন পাওয়া যায়নি শুনে বলল, 'কিছু থাকতে বাধ্য। আলো ফুটলেই বেরোব।'

ভোরে লারাকে ডেকে বলা হল গেরিলারা এলে তাদের করির কথা জানাতে হবে। তারা যেন ঐখানে অপেক্ষা করে।

করি অদৃশ্য হয়ে গেলে সারিনা আরেকজন মেয়েকে ডেকে দিয়ে নিজে শুতে গেল। তার পর আরো দুবার গার্ড বদল হল। করির অনুপস্থিতি কেউ লক্ষ্য করল না। সকালে তাকে না দেখে হুফ্ট্ যখন রাগমাগ করতে লাগল, মেয়েরা সকলেই বলতে লাগল তাদের পাহারার সময়ে করি ঠিক ছিল। হুফ্ট্ কোনো সুবিধা করতে পারল না।

যে সময়ে টারজান দলবল নিয়ে করির খোঁজে বেরোচ্ছিল, করি গাছে বসে সেই দুটো জ্যাপ আর তাদের দিশী সঙ্গীদের ক্যাম্প তোলা দেখছিল। দিশীরা হল সেই ইস্কান্দারের দল, যারা আগে একবার করিকে চুরি করেছিল। তারা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলে করি নেমে গ্রামের দিকে হাঁটা দিল। ইস্কান্দারের দল এগিয়ে গিয়ে হুফ্ট্দের দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, জাপানীদের জানাল এরা বন্ধু লোক। জাপানীরা করিকে ধরতে চায়। তাকে যে ধরিয়ে দেবে সে টাকা পাবে। হুফ্ট্ আর ইস্কান্দার দুজনেরি বড় লোভ। দুঃখের বিষয়, তারা সবাই এত মদ খেয়েছিল যে কিছুতেই আর দিক ঠিক করতে পারল না। তারপর সারিনা বলল, 'এই তো চিহ্ন দেখছি।' বলে ওদের অন্য পথে নিয়ে গেল।

ডাকাতদের পরিত্যক্ত ক্যাম্পে পৌঁছে টারজানই চিহ্ন খুঁজে বের করে এগিয়ে গেল। এক ঘণ্টা পরে বাকিরা বন থেকে সেই উপত্যকার কাছে পৌঁছে দেখে টারজান অপেক্ষা করছে। সে বলল, 'দস্যুরা একটু আগে এই পথে গেছে। করিও একা এবং অনেকক্ষণ আগে গেছে। যে করেই হক সে পালিয়েছে। দস্যুদের দলে দুটো জ্যাপ আর কটা অন্য লোক জুটেছে। আমি করির চিহ্ন ধরে এগোচ্ছি। গাছে দাগ দিয়ে যাব, তোমরাও তাই দেখে এসো।'

করি মনের অনেন্দে গ্রামের দিকে চলেছিল। একটু পরেই বন্ধুদের দেখতে পাবে। ঐ গ্রামটাই তার বাড়ি।

হঠাৎ বুঝল বাঘ পিছু নিয়েছে। তাকে দেখাও গেল। বন্দুকটাকে গাছে ঠেকিয়ে, লতা ধরে ঝুলে পড়ল করি। লাফঝাঁপ দিয়েও নাগাল পেল না। তখন সে অপেক্ষা করতে বসল। কয়েকটা বাঁদর এসে জুটল। সেটা ছিল ডুরিয়ান গাছ। করি একটা ফল বাঘের গায়ে ছুঁড়ে মারল। অব্যর্থ টিপ। বাঁদররাও দেখাদেখি ফল ছুঁড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত বাঘ পালাল। একটু পরে করি নেমে পড়ে বন্দুকটা আবার তুলে নিল। ভয়ে ভয়ে গ্রামের দিকেই যাচ্ছিল সে, এমন সময় এক পাল বনমানুষের পাল্লায় পড়ল। এরা টারজানের সেই দল। ওজু করিকে তুলে নিল টপ করে। বন্দুকটা ছুটে গেল। ভয়ের চোটে সব বনমানুষ একদিকে পালাল আর ওজু পালাল অন্য দিকে। আতঙ্কে করিকে নামাতে ভুলে গেল। ছুটে চলল গভীর বনে।

জেরি, বুবনোভিচ্, শৃম্প, ভ্যান ডার বস্ নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে একটা গাছে দাগ দেখে বুঝল এই পথে করি গেছে, ডাকাতরা যায়নি। টিলার ওপর থেকে দূরে একটা গুলির শব্দ শুনতে পেল। টারজানের তো বন্দুক নেই, করির আছে বলে ওরা জানত না। তাহলে নিশ্চয় জ্যাপরা আসছে। জেরি বলল, 'আমি একশো গজ আগে আগে যাচ্ছি, তোমরা পাশের ঝোপে লুকিয়ে থাক। আমি প্রথম গুলি করব, তারপর তোমরা পাশ থেকে লেগে যেও।'

শৃম্প বলল, 'আমি আগে যাই, ক্যাপ্টেন।'

—'বেশ। কিন্তু খেয়াল রেখো।' শৃম্প আগে গেল।

টারজান গুলির শব্দ শুনেছিল। করি নিশ্চয় জ্যাপদের হাতে পড়েছে। তারপর দেখল পথে একটা রাইফ্‌ল পড়ে আছে। জাপানীদের গন্ধের বদলে বনমানুষদের গন্ধ নাকে এল। গাছ থেকে নেমে পড়ে দেখল, বন্দুকের কাছে করির পায়ের দাগ শেষ আর একটা বড় ওরাংউটানের পায়ের দাগ শুরু। অর্থাৎ করিকে সে তুলে নিয়ে গেছে। ওরাংউটানের চিহ্ন ধরা খুব সহজ। বনের মধ্যে একটু খোলা জায়গা, সেইখানে করিকে বগলে চেপে ধরে, ওজু লড়াই দিতে প্রস্তুত। করি আরেকটা গর্জনও শুনতে পেল। ওজু ওকে ফেলে দিয়ে টারজানের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধে লেগে গেল। সহজ লড়াই নয় এ। ওজু চেষ্টা করছে টারজানের টুঁটি কামড়াতে। টারজানের একটা হাত ওজুর চোয়াল ঘুরিয়ে রেখেছে। অন্যটাকে ওজু জাপ্টে ধরে আছে। করি তো স্তম্ভিত। ওদের চারদিকে ঘুরছিল সে, সুবিধা পেলেই গুলি করবে। হঠাৎ টারজান পা দিয়ে ওজুকে জাপ্টে ধরে মাটিতে ফেলে দিল। ওজু ওর বাঁ হাতটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। তারপর টারজানের হাতের ছোরা চকচক করে উঠল। কয়েকটা কোপেই ওজুর শেষ। তার গায়ে পা রেখে টারজান জয়ধ্বনি দিল। করি ধপ করে বসে পড়ল।

টারজান বলল, 'একেবারে হয়রান হয়েছে তো? আর ভাবনা নেই। জেরিরাও আসছে।' এই বলে টপ করে করিকে তুলে নিয়ে গাছে উঠে পড়ল।

কিছু পরে করি বলল, 'তুমি ভারি আশ্চর্য মানুষ।'

—'আমি যত না মানুষ, তার চেয়ে বেশি জানোয়ার। ঐ যে ওরা আসছে। বাতাসে ওদের গন্ধ পাচ্ছি।'

একটু পরেই সকলে এসে পড়ল। ওদের দুজনকে দেখে তাদের কি আনন্দ! ভ্যান ডার বস ওকে আদর করে বলল, 'আর কখনো আমাদের চোখের আড়াল হয়ো না।'

আবার সকলে গ্রামের পথ ধরল। টারজান আগে আগে চলল। কিছু পরেই অন্যরা এসে দেখল টারজান দুজন দাড়িওয়ালা শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে কথা বলছে। এরা গেরিলা দলের পাহারাদার। অন্য দুটি পথেও পাহারার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমাট শৃম্পকে দেখেই বনে পালাল।

ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্স আর লেফটেনান্ট ডি লেটেন-হোভ দুজনেই করিকে আর টাককে ভালো করেই চিনত। কত দিনের কত গল্প হল তাদের মধ্যে। জেরি, বুবনোভিচ্, রসেটি বন্দুক সাফ করতে বসল। এখানকার স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়াতে সব কিছুতে মরচে ধরে যায়। একটু বাদে ভ্যান প্রিন্স আর ডি লেটেনহোভ এদের সঙ্গে বসল, ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের একটা পরিকল্পনা করা দরকার। ঠিক হল দুই দল এখনকার মতো একসঙ্গে মিলে কাজ করবে। তাছাড়া এ গ্রামটাও নিরাপদ নয়। যে জ্যাপরা রিলিফ হল তারা বেসে যখন ফিরবে না নিশ্চয় তদন্ত করতে একটা দল আসবে। এর চেয়ে ভালো জায়গা গেরিলারা জানে, সেখানে আস্তানা করাই বেশি নিরাপদ। টারজান ভাবছিল এতে ওদের দক্ষিণে এগোনোর পথে বাধা পড়বে, কিন্তু ভ্যান প্রিন্স বলল, সেই জায়গা থেকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে সহজ পথ আছে। টারজান জেরিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি বল, জেরি?' জেরি কি ভাবছিল, টারজান আরেকবার জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, 'সকলে যা চায়, আমিও তাই চাই।'

কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছিল জেরি। আসলে টাকের সঙ্গে করির এত ভাব দেখে তার মন খারাপ হয়ে গেছিল। বুবনোভিচের সেটা চোখে পড়তেও দেরি লাগেনি।

পরন্তু যাওয়া ঠিক হল। গেরিলাদের জুতো ছিঁড়ে পরার অযোগ্য হয়ে গেছিল, তাই স্যাণ্ডাল সেলাই হচ্ছিল মেয়েদের সাহায্যে। এদিকে করি ক-দিন থেকে জেরির বিষণ্ণ বদন দেখে ভাবছিল ওর শরীর খারাপ হয়নি তো? সে কথা জেরিকে জিজ্ঞাসা করতে, সে বলল, 'না, কিছু হয়নি।'

ব্যস্, আর কিছু না। কত যে দুঃখিত হয়ে করি চলে গেল, তা-ও লক্ষ্য করল না জেরি। সে নিজের দুঃখেই ডুবে ছিল। পরে যখন নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হয়ে করিকে ডাকল, সে-ও অভিমান করে যেন শুনতেই পায়নি এমন ভাব দেখিয়ে ঘরে চলে গেল।

এদিকে আমাট গিয়ে জাপানী বেসে সমস্ত খবর দিয়ে এসেছিল। তাই শুনে কর্ণেল কাঞ্জি তাজিরি রেগে আগুন হলেন। তিনি হুকুম দিলেন ভোরে দুটো পুরো কম্প্যানি গিয়ে ডাচগুলোকে উচিত শিক্ষা দেবে। আমাটকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খাবার পর ডাচদের চারজন পাহারা বসাবার ব্যবস্থা দেখে টারজান বলেছিল আরেকটু এগিয়ে একটা লোক রাখলে ভালো হয়। এদিকে লারা করিকে বলেছিল আমাট কাল রাতে গ্রামে ফেরেনি। খুব সম্ভব জাপানীদের খবর দিতে গেছে। ভ্যান প্রিন্স বললেন, 'বেশির ভাগ লোকই এগিয়ে রাখব তাহলে। গ্রামে কম লোক থাকবে, পাছে কিছু শত্রু এদিকে এসে পড়ে।'

টারজান বলল, 'পাহারা রাখার দরকার হবে না। আমি নিজে আগে গিয়ে দেখে এসে সময় মতো খবর দেব।'

ভ্যান প্রিন্স বলল, 'ওরাও থাক, তুমিও যাও। তোমার সঙ্গে ওরা ফিরে আসবে।' গেরিলারা ক্যামুফ্লাজ করে গাছপালার সঙ্গে মিশে গিয়ে পথের ধারে লুকিয়ে থাকল। জাপানীরা যখন ওদের সামনে এসে পড়বে, ক্যাপ্টেনের ইশারায় ওরা গুলি ছুঁড়বে। প্রত্যেকেই সামনে একজন শত্রু পাবে।

সব ঠিকঠাক হলে, অপেক্ষা করার সময়ে টাক দেখে তার পাশেই জেরি। এই তো জেরির মন ভালো করে দেবার সুযোগ। কথায় কথায় টাক বলল সে তার স্ত্রীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু করির বাবা কারো পরামর্শ শুনলেন না। ছোটবেলা থেকে করি আর টাক এক সঙ্গে মানুষ হয়েছে। বলা বাহুল্য এ-কথা শুনে জেরির, মনের মেঘ কেটে গেল। সে বলল, 'আমি একটা গাধা!'

টাক বলল, 'যা বলেছ!'

টাক আর জেরির যে ভাব হয়ে গেছে সেটা লক্ষ্য করে শৃম্প আর বুবনোভিচ্ নিশ্চিন্ত হল। এই সময় টারজান ফিরে এসে বলল, 'ক্যাপ্টেন, তোমার বন্ধুরা আসছে। দুটো কোম্পানি। ওদের সঙ্গে হাল্কা মেশিনগান আর ছোট মর্টার আছে। কম্যাণ্ডে আছে এক কর্ণেল। ওরা দু'মাইল দূরে আছে।'

ক্যাপ্টেনও সবাইকে চুপ করতে বললেন, জাপানীরা চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।

গ্রামের রক্ষীদলের নেতা ডি লেটনহোভ। সে বারবার করিকে কোনো নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে বলছিল। করি শুনছিল না। বলল, 'আমাকে একটা মেয়ে বলে মনে কর না। মনে কর একটা রাইফ্ল, দক্ষ লোকের হাতে ধরা।'

ওদের কথার মধ্যিখানে বন থেকে গোলাগুলির শব্দ আসতে লাগল।

জেরি সবার আগে জ্যাপদের দেখতে পেয়েছিল। সামনে তিনজন লোক সাবধানে চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগোচ্ছিল। তারা ভাবছিল কেউ তাদের এই হঠাৎ আক্রমণের কথা চিন্তাও করেনি। তাদের জন্যে যে কেউ লুকিয়ে বসে থাকতে পারে, এটা তাদের কল্পনার বাইরে ছিল। সেই তিনজনের একটু পিছনেই কর্ণেল চলেছিলেন, তাঁর পিছনে আমাট, তার পেটে বেয়নেট ঠেকিয়ে একজন জাপানী সেপাই। তার পিছনে প্রথম কোম্পানির সোলজাররা গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি। তার পিছনে দ্বিতীয় কোম্পানি।

ক্যাপ্টেন গুলি ছুঁড়তেই জাপানী লাইনের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ। জেরি পর পর তিনটে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল দ্বিতীয় কোম্পানির ওপর। জাপানীরা বনের দিকে এলোমেলো গুলি ছুঁড়তে লাগল। কয়েকজন পিছু ফিরে দৌড় দিল। শৃম্প মহানন্দে পটাপট জ্যাপ ফেলতে লাগল, শেষটা বন্দুক গরম হয়ে জাম হয়ে গেল! যারা পালাচ্ছিল,

তাদের মধ্যে ছিল কর্ণেল আর আমাট। আমাট বুঝেছিল কর্ণেল ওকে মারতে চায়, কারণ তার বিশ্বাস আমাট জেনেশুনে ওদের এই বিপদে ফেলেছে। এক গুলিতে শৃম্প কর্ণেলকে শেষ করল। আমাট ঝোপে ঝাঁপ দিল। হতাহতদের ফেলে বাকি জাপানী বনে পালাল। ভ্যান প্রিন্স কয়েকজনকে লাইনের পিছন দিকটা রক্ষার ভার দিলেন। কয়েকজনকে বললেন শত্রুদের অস্ত্র আর গোলাগুলি সংগ্রহ করতে। আরো কয়েকজন দুই পক্ষের আহতদের গ্রামে নিয়ে যেতে বললেন। একজন আহত জ্যাপ তার সাহায্যকারীকে গুলি করার পর আর কোনো আহত বেঁচে রইল না।

হঠাৎ রসেটির খেয়াল হল জেরি কোথায় গেল। অমনি খোঁজ পড়ে গেল। বুবনোভিচ্ আর রসেটি শেষ পর্যন্ত পেল তাকে, চিৎ হয়ে পড়ে আছে, বুকের বাঁ দিকে শার্টটা রক্তে লাল। দুজনেই ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। শৃম্প বলল, 'মরেনি। নিশ্বাস পড়ছে।'

বুবনোভিচ্ বলল, 'ও মরলে চলবে না।'

পরম স্নেহে জেরিকে ওরা তুলে নিয়ে গেল। ডাচ্‌রাও তিনটি মৃতদেহ আর পাঁচজন আহতকে নিয়ে যাচ্ছিল।

টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'খারাপ অবস্থা?'

বুবনোভিচ্ বলল, 'তাই মনে হচ্ছে।' গ্রামের একটা গাছতলায় আহতদের শোয়ানো হল। গেরিলাদের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিল, কিন্তু ওষুধপত্র কিছুই ছিল না। ডাক্তার যথাসাধ্য করছিল। করি সাহায্য করছিল। গ্রামের মেয়েরা ব্যাণ্ডেজ সিদ্ধ করে স্টেরিলাইজ করে দিচ্ছিল। জেরিকে দেখে করির মুখটা সাদা হয়ে গেল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। তারপর শৃম্প বুবনোভিচ্ ডাক্তার আর করি তাদের এই প্রিয় মানুষটির প্রাণ বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য করতে লাগল। করি একবার জিজ্ঞাসা করল, 'খুব খারাপ অবস্থা কি?'

ডাক্তার বলল, 'মনে হয় না। গুলিটা হার্টে লাগেনি, মনে হচ্ছে ফুস্‌ফুস্‌ও বেঁচে গেছে। মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে নি। বোধ হয় শক্ আর রক্তক্ষরণে অজ্ঞান হয়ে আছে।'

পিঠে একটা ছোট ফুটো দিয়ে গুলিটা বেরিয়েও গেছে। ক্ষতটা পরিষ্কার করে, ঢিলে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে, ডাক্তার বলল, 'একজন কাছে থেকো।'

করি বলল, 'আমি থাকব।'

বুবনোভিচ্ আর শৃম্পকে নিয়ে ডাক্তার অন্য রুগীর কাছে গেল। করি বসে রইল; মাঝে মাঝে কপালে জলপটি দিতে লাগল। খানিক বাদে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জেরি চোখ খুলে, করিকে দেখে একটু হাসল।

করি বলল, 'তুমি ভালো হয়ে যাবে, জেরি।'

জেরি বলল, 'এখনি তো ভালো হয়ে গেছি।'

আহতদের জন্য ডুলি তৈরি করা হচ্ছিল। এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। জাপানীরা প্রতিশোধ নিতে নিশ্চয় আসবে। ভ্যান প্রিন্স গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিল। করি বলল, 'তা কর না। লারা বলেছে এখানে মাত্র দুজন লোক আছে যারা জাপানীদের পক্ষে। মোড়ল আর আমাট। আর কেউ না।' তখন মোড়লকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। লারাকে ভ্যান প্রিন্স জানিয়ে দিল আর কাউকে কিছু বলা হবে না। তারা তো অনেক সাহায্য করেছে।

এই সময়ে টারজানের অদর্শনে অনেক ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এখান থেকে এখনি ক্যাম্প সরানো হচ্ছে তাকে জানানো দরকার। বুবনোভিচ্ বলল, 'ও নিয়ে ভাবতে হবে না। কোন দিকে গেছি লারা ওকে বলে দেবে। ও শুঁকে শুঁকে হাজির হবে।'

আসলে জেরির ঐ অবস্থা দেখে টারজান গরম হয়ে উঠে, পলাতক জাপানীদের পিছু নিয়েছিল। বনের তিনজন অফিসার ওদের আবার দলবদ্ধ করছিল। টারজান গাছ থেকে প্রথমে তীরধনুক দিয়ে অফিসার তিনটিকে, তারপর যতগুলো সোলজারকে পারে মারল। তীর ফুরিয়ে গেলে, গুলি চালাল। গুলি ফুরোলে গ্রামের দিকে ফিরল। কয়েকজন আহত শত্রু নিজেদের গা থেকে তীর খুলবার চেষ্টা করতে লাগল আর কেউ রইল না। টারজানের মনে হল জেরির জন্য কিছুটা বদলা নেওয়া গেল।

তখনি গ্রামে না ফিরে আদিম অরণ্যের গহন গভীরে ঢুকে লতামণ্ডিত অতিবৃদ্ধ মহীরুহর গায়ে বিশাল অর্কিডের শোভা দেখতে লাগল সে। হঠাৎ চোখে পড়ল ছোট জানোয়ার ধরার ফাঁদ। মানুষের বসতি থেকে দূরে যাবার জন্য এখানে আসা, আবার ফাঁদ কেন? চারদিকে ছোট ছোট বাঁদরের লাফালাফি। খুদে একটাকে ফুসলে কাঁধে বসাল টারজান। নিকিমার কথা মনে হল। একটা অদ্ভুত গন্ধ নাকে আসতে সেদিকে চলল টারজান। দেখে ছোট একটা হ্রদ, তার ধারে ধারে কাঠের মাচা করে জলের ওপরে ছোট

ছোট ঘর। সে ঘরের চারদিক খোলা। সেখানে কুচকুচে কালো চুল, তামাটে গায়ের রং, বেঁটে বেঁটে মানুষরা থাকে। কাপড় পরতে শেখেনি তারা, সভ্যতা জানে না। টারজানের মনে হল এদের কত সৌভাগ্য। ছোট বাঁদরটা বাঁদুরে ভাষায় বলল, 'খুব খারাপ গোমাঙ্গানি, মানু খায়।'

টারজান ওদের দিকে বন্ধুত্বের ইঙ্গিত করলে, ওরা তীর-ধনুক বের করল। টারজানের মনে হল ঠিক করেছে। সাদা মানুষদের যত দূরে রাখা যায়, ততই মঙ্গল। খুদে বাঁদর কেটা ওর কাঁধে বসেই রইল।

সেই দস্যুদের পুরনো আস্তানায় গেরিলাদের অস্থায়ী ক্যাম্প হয়েছিল। শৃম্প রসেটি বিকেলের দিকে মাচায় বসে পাহারা দিচ্ছিল। নামবার সময় হয়ে গেছিল এমন সময় পেন্টেলুন বন্দুক অ্যামিউনিশন বেল্ট আর পারাংধারী ছিপছিপে একটা ছেলে এগিয়ে এল। ওকে দেখে সে দাঁড়াল। শৃম্প দেখল ছেলে নয়, মেয়ে। সে বলল, 'হল্ট!'

মেয়েটা বলল, 'হল্ট তো করেইছি।'

—'তুমি কে? অত অস্ত্রশস্ত্রই বা কেন?'

সে উলটে বলল, 'করি ভ্যান ডার মিয়ার তাহলে তোমার কথাই বলেছিল। মেয়েদের পছন্দ কর না; মজার ইংরিজি বল।'

শৃম্প বলল, 'ইংরিজি না, আমেরিকান বলি। তাতে মজার কি আছে? তুমি কে?'

—'আমি সারিনা। করিকে খুঁজছি। আমার সঙ্গে কেউ আসেনি।'

—'এগিয়ে যাও।' এই বলে বন্দুকের ঘোড়া থেকে হাত না নামিয়েই মাচা থেকে নেমে সামনে দাঁড়াল।

—'হাত তোল।'

দু-হাত তুলল সারিনা। তার পিস্তল পারাং নিয়ে নিল শৃম্প। দেখতে দেখতে দুজনার ভাব হয়ে গেল। পথের ধারে বসে পড়ে সে বলল, 'ঐ ডাকাতদের দল ছেড়ে চলে এসেছি। করির কাছে থাকতে চাই। একজন মেয়ে সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধা হয়। ও এই ক্যাম্পে আছে না?'

—'তা আছে। তবে ওর মেয়েটেয়ে দরকার নেই।'

—'আমি জানি। তবে কি আমাকে এখানে থাকতে দেবে না?'

—'করি বললেই দেবে।

এই সময় শৃম্পের রিলিফ এসে পৌঁছল। সারিনাকে দেখে ডাচ্ ভাষায় কি বলল, শৃম্প বুঝল না।

সারিনা বলল, 'আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছে।'

শৃম্প ওকে ক্যাম্পে নিয়ে গেল। গাছতলায় ডুলির ওপর জেরি শুয়েছিল, পাশে করি।

সারিনাকে দেখে সে লাফিয়ে উঠল। 'সারিনা, তুমি এখানে?' সারিনা থাকতে চায় শুনে করি জেরিকে জিজ্ঞাসা করল।

সারিনা করির বন্ধুর কাজ করেছিল, কাজেই জেরির কোনো আপত্তি ছিল না। তবে ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্স কি বলেন শোনা দরকার। শৃম্প তার কাছে সারিনাকে নিয়ে চলল।

সারিনা বলল, 'আমার পিঠে বেয়নেটটা না ঠেকালেই কি নয়?' ভালো ইংরিজি বলে সারিনা। শৃম্প বেয়নেট নামিয়ে নিল।

করি বলল, 'আমিও যাই। আমি সব বললে ক্যাপ্টেন রাজি হবেন।'

ক্যাপ্টেন সব শুনে সারিনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐ ডাকাতদের দলে জুটেছিলে কেন?'

আর কোনো উপায় ছিল না। নইলে জাপানীদের হাতে পড়তে হত।'

—'বেশ তাহলে থাকো।'

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ওরা জেরির কাছে ফিরে এল। কিছু দূরে বসে বুবনোভিচ্ বন্দুক সাফ করছিল। সে-ও কৌতূহল রাখতে না পেরে, এসে জুটল। করি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এত ভালো ইংরিজি কোথায় শিখলে, সারিনা?'

—'গিলবার্ট দ্বীপে একটা ক্যাথলিক মিশনারি স্কুলে বাবা সর্বদা মাকে আর আমাকে ওঁর সঙ্গে জাহাজে নিয়ে যেতেন। দু-বছর টারাওয়ার স্কুলে ছিলাম। নইলে আমার উনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাবার জাহাজে কেটেছিল। আমার ছোটবেলাতেই মা মারা গেছিলেন। বাবা লোক খুব ভালো ছিলেন না হয়তো, কিন্তু আমি অগাধ স্নেহ পেয়েছি। মনে হয় শিক্ষিত লোক ছিলেন। জাহাজে ভালো লাইব্রেরি ছিল। সবাই তাঁকে ডাকত বিগ্ জন্ তাঁর আসল নাম আমিও জানি না। আমাকে ন্যাভিগেশন শিখিয়েছিলেন। আমি তাঁর মেট্ হয়েছিলাম। মদ খেয়ে যখন বেহুঁশ হতেন, আমি তখন ক্যাপ্টেনও হতাম।'

জেরি বলল, 'এখন তিনি কোথায় ?'

—'কি জানি, হয়তো নরকে। একজনকে মারার অপরাধে তাঁর ফাঁসি হয়েছিল। সেই সময়ে করির মা-বাবা আমার জন্য যা করেছিলেন, তা ভুলবার নয়।'

পরে শৃম্প বলেছিল, 'ঐ একজন মেয়ে বটে!'

বুবনোভিচ্ বলল, 'কে ? করি ?'

—'না, এলেনর।'

পরদিন সকলে আবার ক্যাম্প ভেঙ্গে, আহতদের দোলায় তুলে এগিয়ে চলা। জেরির দোলার পাশে করি, তার পিছনে সারিনা, তার পাশে শৃম্প। পিছনে বুবনোভিচ্ আর কজন ডাচ্ গেরিলা। সারিনার প্রতি শৃম্পের দুর্বলতা দেখে বুবনোভিচের বড়ই ভাবনা হচ্ছিল।

এদিকে দু-দিন টারজানের দেখা নেই। তবে কি ওকে ছাড়াই কাজ করতে হবে নাকি ? তার ওপর এই সময় জেরির অবস্থা আবার মন্দের দিকে গেল। জ্বর এল, জ্বর বাড়ল, ভুল বকতে লাগল। খালি যে-সব বন্ধু যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল তাদের কথা বলে আর মেবেল বলে কাউকে ডাকে। ওরা সবাই ভয়েই মরে। ওষুধপত্র নেই, যন্ত্রপাতির মধ্যে একটা থার্মোমিটার। তবে কি জেরিকে হারাতে হবে ? সকলের ভালোবাসার এই মানুষটি দু-দিন লড়াই করে, ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠল। করি শুনে নিশ্চিন্ত হল মেবেল মানে জেরির মা। মোটেই তাঁর নাম মেবেল ছিল না, তবু ওদের বাবা তাই বলে ডাকতেন, তাই ছেলেমেয়েরাও তাই বলত। সত্যি কথা বলতে কি শুনে করি বড় শান্তি পেল। জেরির ঐ অবস্থাতেই ক্যাম্প তুলে নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল।

নতুন ক্যাম্পের জায়গাটা একটা উপত্যকায়। তার এক মাথায় চূণাপাথরের খাড়াই ; সেখানে একটা ছোট নদীর উৎস। খাড়াইটার গায়ে অনেক গুহা। সেগুলোকে সু-রক্ষিত করাও খুব শক্ত কাজ হবে না মনে হল। এখানে একটা স্থায়ী আস্তানা করার সিদ্ধান্ত নিলেন ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্স। চারদিকে গুজব ম্যাক-আর্থারের বাহিনী ক্রমে কাছে আসছে। জেরির শরীর সম্পূর্ণ সারলেই পাহাড় পার হয়ে, পুব দিকের উপকূলের পথ ধরবে এরা। টাক ভ্যান ডার বস্ আমেরিকানদের সঙ্গে যাবে। সুমাত্রা বিষয়ে ওর কিছু জানতে বাকি নেই। ও থাকলে সুবিধা হবে। এদিকে অ্যালাইরা সমুদ্রতীরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেই, পিছন দিক থেকে গেরিলারা জাপানীদের জ্বালাতন করতে পারবে। করিকে ওরা থেকে যেতে বলেছিল। টাকও বলেছিল মেয়েরা দুজন সঙ্গে না থাকলে বাকি চারজন পুরুষের নিরাপত্তার সম্ভাবনা বেশি হবে।

করি রাজি হল না। মেয়ে হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে ওরা পুরুষদের চেয়ে কম যায় না। জেরি, বুবনোভিচ, রসেটি ওকে সমর্থন করল।

ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্সের মেয়েদের যাওয়াতে মত ছিল না। এই সময়ে টারজান এসে উপস্থিত হওয়াতে, সমস্যা মিটে গেল। টারজানের কাঁধে বসা কেটা বাঁদর এত লোক দেখে ভয়ের চোটে প্রাণপণে ওর গলা আঁকড়ে ধরল। টারজান বলল, 'ওরা বন্ধু, কেটা। ভয় পেও না।'

কেটা বলল, 'ভয় পাচ্ছি না। ওদের কামড়ে দেব।'

তারপর দুপক্ষের খবর দেওয়া-নেওয়া হল। টারজান জেরিকে বলল, 'তোমার অবস্থা দেখে, বনে গিয়ে বাকি জাপানীগুলোকে সাবাড় করে দিয়ে এলাম। তারপর বনে বনে খানিক ঘুরলাম। তবে একটা ভালো কাজ হয়েছে। দু-জায়গায় শত্রুদের কামানের ঘাঁটি দেখে এসেছি। একটা হ্রদে বেঁটে উপজাতিদের 'জলের ওপর বাস দেখে এলাম। অবিশ্যি বন্ধুত্বের চিহ্ন দেখালে, তীরধনুক বের করল!'

ভ্যান ডার বস বলল, 'ওরা নরখাদক। কেউ কাছে যায় ওরা চায় না। তবু যারা যায়, তারা ফেরে না। অনেকে বলে ওরা চিরযৌবনের রহস্য জানে।'

টারজান বলল, 'তা হতে পারে। আফ্রিকাতেও অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি।'

সারিনার সব কথা শুনে, তাকে দলে নেওয়াতে টারজানের কোনো আপত্তি হল না। তারপর নানা

রহস্যের গল্প হল। টারজান জোর গলায় বলল চিরযৌবন সত্যি পাওয়া যায়, ঠিকমতো ওষুধ পেলে। তারপর বলল, 'আমার কত বয়স ভাব তোমরা?'

—'ত্রিশের নিচে।'

—'তার চেয়ে অনেক বেশি। আফ্রিকার এক দুর্গম প্রদেশ থেকে দুটি মেয়েকে উদ্ধার করে আনতে গিয়ে আমরা ঐ ওষুধ পেয়েছিলাম। যারা যারা সেটি খেয়েছি, তারা কেউ বুড়ো হইনি। আমাদের দলে একটা ছোট বাঁদর আছে, সে-ও না। চিরকাল বাঁচতে আমার আপত্তি ছিল না, যদি সুস্থ থাকা যায়। কিন্তু প্রিয় বন্ধুদের হারানো বড় দুঃখের ব্যাপার। যাক্ গে, যে কোনো দিন তো গুলি খেতে পারি।'

গেরিলারা ওদের নাম দিয়েছিল 'দি ফরেন লীজিয়ন।' করি বলত সিং-তাই থাকলে মিত্র পক্ষের চার মহাদেশের প্রতিনিধি পাওয়া যেত। ঐ উপত্যকাটা ছিল আদর্শ গেরিলা ঘাঁটি। মুহূর্তের মধ্যে গুহায় ঢুকে পড়া যেত। আকাশ থেকে কিছু বোঝা যেত না। টারজান শিকার করে মাংস জোগাত। চারদিক পর্যবেক্ষণ করত। একবার বেরিয়ে সেই ডাকাতদের সন্ধান পেল। তারা এখন প্রকাশ্যে জাপানীদের সহকারী। মাৎসুও, সোকাবের সঙ্গে তাদের বড় ভাব। নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। সোকাবের মামা ক্ষমতাচ্যুত হওয়াতে মাৎসুও তাকে যাচ্ছে-তাই অপমান করে।

করি সিং-তাইয়ের জন্য চিন্তা করত। টারজান ঠিক করেছিল যাবার আগে একবার তিয়াং উমরের গ্রামটা হয়ে যাবে। অনেকটা পথ ফিরে যেতে হলেও, শেষ পর্যন্ত গিয়েওছিল। বাইরে থেকে সাবধানে পযবেক্ষণ করে হঠাৎ আলমকে দেখতে পেয়ে, গাছ থেকে নেমে পড়ল। গ্রামবাসীরা ওকে দেখে চিনতে পেরে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। তাদের কথা টারজান বুঝতে পারল না। এক বুড়ো ডাচ্ ভাষা জানত, সে দো-ভাষীর কাজ করল। আলম করির সংবাদ শুনে খুব খুশি হল। সিং-তাইয়ের খোঁজ করতে আলম জানাল সে-ও ভালোই আছে এবং ঐ গ্রামেই আছে, কিন্তু দিনেরবেলা বেরোয় না, কারণ মাঝেমাঝে খবর না দিয়ে জাপানী চররা খোঁজ নিতে আসে। টারজানের সিং-তাইয়ের সঙ্গে দেখাও হল। তার আঘাতটা সেরে গেছে, শরীরও সুস্থ। টারজান তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানেই থাকতে চাও, না কি আমাদের সঙ্গে আসবে? আমরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে চেষ্টা করছি।'

সিং-তাই বলল, 'তোমাদের সঙ্গে যাব।'

—'বেশ, তবে এখনি চল।'

এদিকে ওদের 'ফরেন লীজিয়নের' সদস্যরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। জেরি এখন একেবারে সেরে উঠেছে, খালি টারজানের জন্যে অপেক্ষা করা। বন্দুক সাফ করে, তেল দিয়ে তৈরি। এসব কাজে মেয়েরা দক্ষ। এক দিন সারিনা বলল, 'টোনি অনেকক্ষণ হল শিকারে গেছে, এখনো ফেরেনি।'

জেরি বিরক্ত হল। গুলির শব্দ জাপানীদের কানে যেতে পারে। সারিনা বলল সে তীরধনুক নিয়ে গেছে।

এমন সময় একটা খরগোশ মেরে নিয়ে এল শৃম্প। সবাই ঠাট্টা করতে লাগল, পঞ্চাশটা লোকের মধ্যে কি ভাবে ভাগ হবে? শৃম্প বলল, 'পঞ্চাশ কেন? খালি করি আর সারিনার জন্য।'

এই সময়ে প্রহরী ডাক দিয়ে জানাল দুজন লোক আসছে। তারা হল টারজান আর সিং-তাই। দুজনের কাঁধে দুটি হরিণ। বুড়োকে দেখে করির যে কি আনন্দ!

টারজান বলল, 'আমাদের যাবার আগে আরেকটা কাজ করতে হবে। করিকে যেখান থেকে উদ্ধার করেছিলাম, তার কাছে হুফ্‌টের দল আস্তানা গেড়েছে। তারা এখন খোলাখুলিভাবে জাপানীদের শাকরেদ। ঐ গ্রামে জ্যাপরা এখনো আছে। সিং-তাই বলছে কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা দুজন আমেরিকান বন্দী আছে তাদের কাছে। গ্রামের লোকরা বলছে যে উড়োজাহাজ কিছুকাল আগে ভেঙে পড়েছিল, এরাও তাতে ছিল।'

শুনেই বুবনোভিচ্ বলল, 'নিশ্চয় ডগলাস আর ডেভিস। চল, ক্যাপ্টেন, তাদের উদ্ধার করে আনি।'

টারজান বলল, 'রাতারাতি কাজ সারতে হবে। যারা তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে পারে, শুধু তারাই চলুক। জনা কুড়ি লোক চাই।'

ভ্যান প্রিন্স বললেন, 'যতজন দরকার সঙ্গে নিয়ে আমিও যাব।'

ফরেন লীজিয়নের পুরুষ সভ্যরা সবাই যাবে। মেয়েদের নিতে টারজান একেবারে নারাজ। ডাক্তার রীড বলল, 'ক্যাপ্টেন লুকাসেরো যাওয়া উচিত নয়। আবার অসুখে পড়লে সব পরিকল্পনা মাটি।' এর ওপর কথা চলে না।

সেই গ্রামে মাৎসুও আর সোকাবে সারা রাত ধরে মদ

খেয়েছে আর ঝগড়া করেছে। ওদের অনুচররাও এত মাতাল হয়েছে যে তাদের ভয়ে গ্রামের মেয়েরা বনে পালিয়েছে। ভোরের ঠিক আগে অনুচররা প্রায় সকলে বুঁদ হয়ে পড়ে ছিল, মাৎসুও আর সোকাবে তখনো ঝগড়া করছিল। একজন মাত্র গার্ড ডিউটি দিচ্ছিল, ঠিক প্রকৃতিস্থ না হলেও, খানিকটা নেশা ছুটেছিল তার। মেজাজ খুব খারাপ। বন্দীদের ওপর ভারি চোটপাট করছিল। ডেভিসের বয়স পঁচিশ আর ডগলাসের কুড়ি।

গার্ডকে ডগলাস বলল, 'থেমে যাও তোজা মাতলামি কর না।'

রেগেমেগে গার্ড বলল, 'এ জন্যে তোমাকে মরতে হবে।' এই বলে বন্দুক তুলল।

ঘরের ছায়ার পাশ দিয়ে একটা লোক ওর পিছন থেকে এগিয়ে এল। মাৎসুও আর সোকাবের ঝগড়া এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, তারা পিস্তল বের করে পরস্পরের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে গার্ডও বন্দীদের দিকে গুলি করল এবং একটা হাত তার গলা জড়িয়ে ধরে, ছোরা দিয়ে মুণ্ডুটা প্রায় আলাদা করে ফেলল। ডগলাস জিজ্ঞাসা করল, 'লাগল নাকি, বিল্?'

—'না. এক মাইল দূর দিয়ে গুলি গেল। কিন্তু একটা কিছু হচ্ছে এখানে।'

গোলাগুলির শব্দে মাতাল সেপাইদের ঘুম ভেঙে গেছিল, তারাও টলে পড়তে লাগল। গ্রামের উল্টো দিক থেকে ভ্যান প্রিন্স গোলাগুলি শুনে ভাবল বুঝি টারজানকে মারার চেষ্টা হচ্ছে। দলবল নিয়ে সে ঘরের আড়াল দিয়ে ছুটে এল।

ততক্ষণে টারজান বন্দীদের জিজ্ঞাসা করে নিয়েছে, 'তোমরা কি ডেভিস আর ডগলাস?'

—'হ্যাঁ'।

—'গেটটা কোথায়?'

—'তোমার সামনে। কিন্তু তালা দেওয়া।'

নিমেষের মধ্যে তালা দেওয়া গেটের দুপাশের দুটো লোহার খুঁটি ভেঙে তুলে ফেলল টারজান। ডেভিস আর ডগলাস মুক্তি পেল। টারজান ভ্যান প্রিন্সকে ডেকে বলল 'ওরা ছাড়া পেয়েছে। চল, বেরিয়ে পড়া যাক।' সকলে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। গ্রামের উল্টো দিক থেকে তখনো হৈচৈ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ওরা বনের মধ্যে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগোতে লাগল কত গল্প, কত মস্করা। এদের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সে রক্ত সম্পর্কের বাড়া।

★

এর দুদিন পরে, 'ফরেন লীজিয়ন' রওনা হয়ে গেল। তারা এখন সংখ্যায় দশজন। প্রথমটা নবাগতরা মেয়েদের দেখে ঘাবড়াচ্ছিল, পরে বুঝল ওদের সমান দক্ষ হয়ে ওঠা সহজ কাজ নয়। শৃম্পের পরিবর্তন দেখে ওরা অবাক। শৃম্প আর জেরি লুকাস আগে নারীবিদ্বেষী ছিল। এখন তাদের চেনা যায় না।

পথ বড় দুর্গম। পদে পদে পারাঙ দিয়ে ঝোপঝাপ কেটে এগোনো। খাড়া পাহাড় বেয়ে নামা। দুরন্ত নদী পার হওয়া। রোজ বৃষ্টি, কাপড়চোপড় ভিজে সপ্‌সপে। জুতো স্যাণ্ডাল পচে গেল। টারজান শিকার করে আনত। ক্রমে সকলে কাঁচা মাংস খেতে শিখে গেল। সবচেয়ে বিরক্ত কেটা। যখন ডগলাস ডেভিসকে উদ্ধার করতে গেছিল, অন্যরা ওকে একটা গাছে বেঁধে রেখে গেছিল। ও রেগে তিন বেচারা ডাচ্‌কে কামড়ে দিয়েছিল। ক্রমে শৃম্পের সঙ্গে কেটার খুব ভাব হয়ে গেল।

এর মধ্যে একদিন একটা বেশ বড় শুকনো গুহা পেয়ে, ওরা একটু আরাম করল। আগুন জ্বেলে গা গরম করল; কাপড়চোপড় শুকলো; সিং-তাই চমৎকার রান্না করে খাওয়াল। কতটা আসা হল, আরো কত দূর যেতে হবে, তার হিসাব হল। আরো একশত পাঁচ মাইল পরে পাহাড় ডিঙিয়ে, আবার ওপারে যেতে হবে। তাতে লাভলি লেডির লাগত কুড়ি মিনিট। কোন বিষয়ে যে আলোচনা না হয় তার ঠিক নেই। ডাচরা বলল, ওরা এদেশে আসবার আগে রাজারা আর সুলতানরা অকথ্য অত্যাচার করেছে; বড় বড় দেশ থেকে নৌবাহিনী এসে দেশ ছারখার করেছে; খালি ডাচ্‌রা সাধারণ লোকদের জন্য কিছু করেছে। শৃম্প বলছিল লড়াই না থাকলে, বাস করার পক্ষে চমৎকার দেশ এটা। বুবনো-ভিচ্ বলল, 'খেপেছ? ব্রুকলিন্ ছাড়া কোথাও যাব না।'

ডেভিস বলল, 'আমি যাব টেলাসে।'

করি জানতে চাইল, 'ভালো জায়গা?'

—'অমন জায়গা হয় না।'

—'তবে যে জেরি বলল ওক্লাহোমা সবচেয়ে ভালো।'

ডগলাস বলল, 'ক্যালিফর্নিয়া।'

সারিনাকে শৃম্প বলল, 'ইলিনয়।'

শেষটা টারজান এই বলে মিটিয়ে দিল, 'প্রত্যেক আমেরিকান দুনিয়ার সেরা দেশের, সেরা প্রদেশের, সেরা

শহরে থাকে। তাই আমেরিকা এত ভালো।'

তারপর দিনের পর দিন চলল সেই দুঃসহ দুর্গম যাত্রা। সারিনা মাঝে মাঝে শৃম্পকে ভালো ইংরিজি শেখাবার চেষ্টা করত, সকলে হাসত। বুবনোভিচ্ কেটার সঙ্গে ভাব করতে গেল, কেটা ওকে কামড়ে দিল।

এক মাস শারীরিক কষ্টে কিন্তু নিরাপদে কেটে গেল। তারপরেই বিপদ ঘনিয়ে এল। টারজান পথের নিশানা দেবার জন্য একটু এগিয়ে গিয়েই দেখে এক দল জ্যাপ্ সেপাই। আড়াল থেকে টারজান দেখবার চেষ্টা করছিল কজন লোক তারা। ফিরে গিয়ে নিজের দলকে সাবধান করে দিতে হবে। হঠাৎ কেটা চ্যাঁচাতে লাগল। মাথার ওপর থেকে একটা অজগর টারজানকে জড়িয়ে ধরল। ছোরা বের করে কোপও দিল সে, কিন্তু ওকে নিয়ে সাপটা ঝপ করে নিচে পড়ল। জাপানীরা তলোয়ার বেয়নেট দিয়ে সাপ কেটে টুকরো করল। কেটা পালাল। টারজান বন্দী হল। তাকে ঘিরে ফেলে, বেয়নেট বাগিয়ে যে দিকে 'ফরেন লীজিয়ন' যাচ্ছিল সে দিকেই চলল জাপানীরা। কেটা গিয়ে শৃম্পের গলা জড়িয়ে ধরে কাতরভাবে কিচিরমিচির করতে লাগল। একটা কিছু হয়েছে বুঝে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে সে দেখে এল টারজান বন্দী হয়েছে। খবর শুনে সকলে স্তম্ভিত!

জেরি বলল, 'কজন ওরা?'

—'কুড়িজন।'

—'আমরা নয়জন। যথেষ্ট আছি।'

—'ওদের পিছনে ধাওয়া করে, সুবিধা বুঝে আক্রমণ করতে হবে।'

বন থেকে বেরিয়ে একটা সরু গিরিখাতের কিনারায় পথ পৌঁছেছিল। তার নিচে জাপানীদের অস্থায়ী ক্যাম্প দেখতে পেল টারজান। কিছু জিনিসপত্র, কটা ভারবাহী টাট্টু। সব এলোমেলো পড়ে আছে, ভারি বে-বন্দোবস্ত। এরা বড় আনাড়ি। সেই ভালো। পালাবার পক্ষে সুবিধা। আচ্ছা করে টারজানের হাত-পা বেঁধে, দড়ির অন্য মাথা একটা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা হল। একজন লোক ঘোড়াটাতে চড়ল। 'যা-যা জিজ্ঞাসা করব, সব ঠিক ঠিক জবাব দিলে ঘোড়াটাকে বেত মারা হবে না। তোমার কম কষ্ট হবে।' বলল দলের নেতা।

টারজান কোনো জবাব দিল না। জ্যাপ অফিসার লোকটাকে কি একটা বলতেই সে বেত ওঠাল, অমনি একটা রাইফলের শব্দ আর ঘোড়াটা পড়ল। আরেকটা শব্দ হল; এবার অফিসার মুখ থুবড়ে পড়ল। তারপর এক ঝাঁক গুলি আর সেপাইরা ঝপাঝপ পড়তে লাগল। যারা পারল তারা পাহাড় বেয়ে দৌড় দিল। নয়জন রাইফলধারী তখন ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন আহত সৈনিক ওদের দিকে গুলি ছুঁড়তেই, করি তাকে গুলি করল। জেরি টারজানের দাড়ি কেটে দিল। গুণে দেখা গেল ষোলজন মরেছে। ছিল জনা পঁচিশেক। তার মানে বাকি আছে গোটা নয়। একজন মৃত জাপানীর গুলি-বন্দুক তুলে নিয়ে, টারজান আগে আগে চলল। সবকটাকে শেষ না করতে পারলে নিস্তার নেই। একে একে অনেকেই মারা পড়ল। শেষ কজন নিজেদের বোমা ফাটিয়ে আত্মহত্যা করল।

আরো ছয় সপ্তাহ পরে মোয়েক মোয়েকো পাহাড়ের নিচে সমুদ্রের ধারে ওরা পৌঁছল। অনেক জাপানী ঘাঁটি এড়িয়ে, ঘোরা পথে আসতে হয়েছিল। এক কিলোমিটার দূরে একটা জাপানী অ্যান্টি এয়ারক্রাফট ঘাঁটি। তার কাছে একটা গ্রামে সারিনার বন্ধুবান্ধব আছে। তাদের কাছে নৌকো পাওয়া যেতে পারে। সারিনা বলল, 'একটা সারং থাকলে, এই অস্ত্রশস্ত্র রেখে, দিনের বেলাতেও আমি গ্রামে যেতে পারি। কেউ সন্দেহ করবে না।'

টারজান বলল, 'আমি সারং এনে দেব।' রাতে একটা গাছে চড়ে টারজান গ্রামের ওপর নজর রাখল। একজন জাপানী অফিসার একটা বাড়িতে ঢুকল। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল গ্রামবাসীরা তার উদ্দেশে ভ্যাংচাচ্ছে, গাল দিচ্ছে। সবাই ঘরে গেলে টারজান নেমে একটা ঘরের বাইরে থেকে একটা সারং অর্থাৎ কাপড় তুলে নিল। একটি মেয়ে দেখতে পেলে, তাকে বুঝিয়ে বলল, 'কাল ফেরৎ পাবে। আজ একটু দরকার আছে। আমিও জাপানীদের শত্রু। কাউকে বল না।'

পরদিন সকালে সারং পরে গ্রামে গেল সারিনা। ওকে দেখে পুরনো বন্ধুরা ছুটে এল। সারিনা বলল, 'তোমরা যে যার কাজে যাও। জাপানীদের যেন চোখ না পড়ে।'

ওরা বলল গ্রামের প্রধান আলাউদ্দিন শা জাপানীদের দেখতে পারে না। সে সাহায্য করবে। বাস্তবিকই তাই। বুড়ো মানুষটি অনেক অপমান সয়ে এখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সে বলল, 'গ্রামের বাইরে কয়েক কিলোমিটার

দূরে একটা বড় নৌকো নদীতে লুকিয়ে রেখেছি। সেইটে নাও। খুব সাবধানে কাজ কর, যাতে আমরা বিপদে না পড়ি। আমরা কিছু বলি না বলে এখানকার জাপানীরা তেমন দৃষ্টি রাখে না।'

ঠিক হল একটা বাড়িতে রোজ বুড়ো কিছু কিছু খাবার জমা করে রাখবে, রাতে সারিনা এসে নিয়ে যাবে। বুড়ো ছিল তার বাপের বন্ধু।

এক মাস লেগেছিল নৌকো তুলে, যথেষ্ট খাবার দাবার নিয়ে যাত্রার প্রস্তুতি শেষ করত। তারপর এক অমাবস্যার রাতে, নৌকো করে ওরা রওনা হয়ে গেল। ভাঁটার মাথায়, পালের সাহায্যে নৌকো ভেসে চলল। ওরা সাদার্ন ক্রস্‌কে লক্ষ্য রেখে সোজা দক্ষিণে চলল। ন্যাস দ্বীপ ছাড়িয়ে গেলে একটু পশ্চিম দিক নিতে হবে। তারপর কোকোস দ্বীপ অবধি আর ভাবনা নেই। সকালে দেখা গেল চারদিকে উন্মুক্ত সাগর, কোথাও কিছু নেই। বড় বড় ঢেউ উঠছে। শৃম্প তো বমি করে করে হয়রান। দিনের পর দিন কাটল। কোকোস নিরাপদে পার হওয়া গেল। চারদিকে শুধু জল আর জল, তারপর দূর দিগন্তে একটু ধোঁয়া দেখা গেল। সেটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল ওরা। ব্রিটিশ জাহাজ হলে বাঁচা যায়। জাপানী হলেই মুশকিল। জাপানী জাহাজই বটে। স্থির হল যাই থাক কপালে শেষ পর্যন্ত লড়াই করা হবে। কোনমতেই আত্মসমর্পণ নয়। কাছে এসেই জাহাজটা কামান ছুঁড়ল। লাগল না। যুদ্ধের জাহাজ নয়। বাণিজ্যপোত।

আবার কামান ছুঁড়ল জাহাজ; এ গোলাটা আরেকটু কাছে পড়ল। জাহাজের আর নৌকোর মাঝখানে এক হাঙ্গরের পাখনা দেখে কেটা অবাক। হাঙ্গর কি তা জানে না বেচারি। এখন চারদিকে গোলাবর্ষণ। শেষ পর্যন্ত একটা এসে নৌকোতে পড়ল। জেরি দেখল সিং-তাইয়ের শরীরের আধখানা আকাশে উড়ে গেল। ভ্যান ডার বসের একটা পা-ও গেল। বুবনোভিচ্ আর ডগলাস তার অচেতন শরীরটা তুলে ধরে রাখল। এই সময় হাঙ্গরটা ভ্যান ডার বসকে ধরে টান দিল। টারজান ছোরা হাতে ডুব দিয়ে হাঙ্গরটাকে মারল। খানিকটা ভাসন্ত কাঠের ওপর টাককে শোয়াল ওরা। প্যান্ট ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হল। কেটা একটা কাঠের টুকরোয় বসে কিচির মিচির করতে লাগল। বুবনোভিচ্ শৃম্পকে বলল, 'মেরিকে ডাকো!'

—'ডাকছি তো প্রাণপণে!'

হঠাৎ চোখের সামনে একটা বিকট বিস্ফোরণ হয়ে, জাপানী জাহাজ দুটুকরো! আরেকটা বিস্ফোরণের পর দুটো টুকরোই ডুবে গেল।

শৃম্প বলল, 'ঠিক শুনেছেন, দেখছ?'

বুবনোভিচ্ বলল, 'এবার আমাদের সাগর পার হবার ব্যবস্থা করতে বল।' সঙ্গে সঙ্গে তিনশো গজ দূরে ভু-স করে একটা ব্রিটিশ সাবমেরিন ভেসে উঠল।

শৃম্প বলল, 'মেরি মা কখনো ফেল্ করেন না।'

সাবমেরিনটা ঘুরে ওদের কাছে এলে, হ্যাচ্ খুলে লোক-জন বেরিয়ে এল। সবার আগে ভ্যান ডার বসকে সাবমেরিনের ডেকে শোয়ানো হল। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণটা বেরিয়ে গেল। দুঃখে সকলের বুক ভরে গেল। তাকে সলিল সমাধি দেওয়া হয়েছিল।

ক্যাপ্টেন বোল্টন এদের সব অভিজ্ঞতার কথা শুনে বললেন, 'কপাল গুণে অনেক বিপদ কাটিয়ে এসেছ তোমরা। কিন্তু আমার এখানে এই সময়ে উপস্থিত হওয়াটা নিতান্ত দৈব ঘটনা।'

শৃম্প বলল, 'না, তা নয়, সবটাই মা-মেরির কীর্তি।'

জেরি বলল, 'অব্যিশ্যি টারজানও তাকে কিছুটা সাহায্য করেছে।'

শেষে বোল্টন বললেন, 'আর ভাবনা নেই। আমরা সিড্‌নি যাচ্ছি সোজা। একটু পরেই তোমরা আশার্স হোটেলের সুখাদ্য খেতে পাবে।'

এই ভাবে মাত্র একজনকে হারিয়ে বন্ধুরা সকলে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছেছিল। কেটাও।

এ গল্পের শেষে আরেকটা সুখবরও দেওয়া উচিত। জাহাজ সিডনি পৌঁছবার আগেই জেরির সঙ্গে করির আর শৃম্পের সঙ্গে সারিনার বিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন বোল্টন।

টারজান আর খ্যাপার কথা

টারজান অ্যান্ড দি ম্যাড ম্যান

সাধারণ মানুষের চেয়ে টারজানের চোখ কান ইত্যাদি অনেক বেশি প্রখর। বন্য জন্তুর মতোই সে অনুভব করত জঙ্গলের অদৃশ্য অজানা বিপদকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যেত।

টারজানের সবচাইতে বড় শত্রু হল মানুষ। সাদা-কালো এই দু-রকম মানুষের সঙ্গেই বারবার তার ঝগড়া বেধেছে। টারজান তাদের শাস্তি দিয়েছে।

গাছের ডালে ঝুলে চলাফেরা করে টারজান। এমনি-ভাবে সে চলেছে একদিন। হঠাৎ কানে এল একটি মৃদু শব্দ—দূর থেকে ভেসে আসা একটি ধাতব ধ্বনি।

নিঃশব্দে সেই শব্দের উৎস লক্ষ্য করে দ্রুত গতিতে চলল টারজান। ধাতুর ওপর ধাতব জিনিসের ঘা! ঐ শব্দ নিঃসন্দেহে মানুষের তৈরি। কাছে এগোতে এগোতে টারজানের কানে আসে জুতোর চাপা আওয়াজ, মানুষের কথাবার্তার ক্ষীণ ধ্বনি।

বাঁয়ে ঘুরে একটা চক্কর খেয়ে চলে টারজান। যাতে পিছন থেকে লক্ষ্য করতে পারে লোকগুলিকে। দেখতে পেল, নদীর তীরে খানিকটা খোলা জায়গায় কুড়ি-তিরিশটি

মানুষ। তাদের মধ্যে দু'জন মাত্র সাদা মানুষ বাকিরা কালো দেশী মানুষ। লোকগুলি নদীর ধারে তাঁবু খাটাবার আয়োজন করছে। কে জানে, হয়তো এরা নিরীহ শিকারীর দল। সন্দিগ্ধ টারজান, পাতার আড়ালে বসে তাদের দেখে। অন্ধকার নামুক, তখন আরও কাছ থেকে ওদের লক্ষ্য করা যাবে।

টারজানের কানে অন্য শব্দ ভেসে আসে। নদীর জলে দাঁড় ফেলার আওয়াজ। নৌকোতে আসছে কারা এদিকে?

তীরের লোকগুলি প্রথমে টের পায় নি। ক্রমে চারটি ছিপ নৌকো এগিয়ে আসে কাছে। টারজান দেখতে পেল প্রথম নৌকোতে দু'জন সাদা মানুষ, তাদের একজনকে যেন তার চেনা চেনা ঠেকে।

তীরের একজন কালো মানুষ এবার দেখে ফেলে আগন্তুকদের। সে চীৎকার দিয়ে সাবধান করে দেয় সঙ্গীদের। সামনের নৌকোর আরোহিরাও এবার তাদের দেখতে পায়। নৌকোটি তীরে ভেড়ে। সেই দু'জন সাদা মানুষ জনা কয়েক অস্ত্রধারী দেশী সৈনিক নিয়ে এগিয়ে গিয়ে কথা বলে। তাদের কথাবার্তা শুনতে পায় না টারজান। যাহোক চারটি ক্যানুই ডাঙায় টেনে তোলা হয়। আগন্তুকরাও অন্য দলের পাশে তাঁবু খাটাবার তোড়জোড় শুরু করে।

*

দ্বিতীয় দলের সাদা মানুষ দুটিকে দেখে প্রথম দলের পেলহাম ডাটন খুশি হল না। লোক দুটো কেমন ধূর্ত চোয়াড়ে দেখতে। যাহোক সে ভদ্রভাবেই তাদের অভিবাদন জানাল।

ডাটনের পথপ্রদর্শক শিকারী বিল গ্যাণ্ট্রি আগন্তুকদের একজনের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, 'হ্যালো টম। অনেক দিন বাদে! মিঃ ডাটন, এ হচ্ছে টম ক্র্যাম্প। এখানকার পুরনো লোক।'

ক্র্যাম্প একটু মাথা নুইয়ে বন্ধুকে দেখিয়ে বলল, 'এর নাম মিনস্কি।'

গাছের আড়ালে বসে ক্র্যাম্পকে চিনতে পারল টারজান। লোকটা হাতির দাঁতের এক কুখ্যাত চোরা শিকারী। বছর দুই আগে ওকে টারজান এই অঞ্চল থেকে বের করে দিয়েছিল। লোকটা যেমনি অসৎ, তেমনি সাংঘাতিক প্রকৃতির। অন্ততঃ দুটি দেশের পুলিশ ওকে গ্রেফতার করার জন্য খুঁজছে। অন্য তিনটি সাদা মানুষকে টারজান আগে কখনো দেখেনি। ডাটনকে দেখে তার ভাল লোক বলেই মনে হল। গ্যাণ্ট্রির প্রকৃতি ঠিক বুঝতে পারল না। তবে ইভান মিনস্কিকে ক্র্যাম্পের ধরনের লোক বলেই মনে হল।

ক্র্যাম্প আর মিনস্কি নৌকো থেকে তাদের জিনিষপত্র নামাবার তদারকি করতে লাগল। ডাটন তার নিজের তাঁবুতে ফিরে গেল। কিন্তু গ্যাণ্ট্রি নতুন আগন্তুকদের সঙ্গে রইল।

কাজ শেষ হলে ক্র্যাম্প গ্যাণ্ট্রিকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে করছটা কি?'

তারপর ডাটনকে দেখিয়ে বলল, 'ওই লোকটা কে? পুলিস-টুলিস নাকি?' বোঝা গেল সে কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেছে।

গ্যাণ্ট্রি আশ্বাস দিল, 'ওকে ভয় পাবার কিছু নেই। ও আমেরিকান। ইংরেজ নয়।'

—'শিকার করতে এসেছে?' জিজ্ঞেস করল ক্র্যাম্প।

গ্যাণ্ট্রি বলল, 'আগে একবার এসেছিল শিকার করতে, টিমোথি পিকারেল নামে এক ধনী বৃদ্ধের সঙ্গে। পিকারেল এডিনবারার লোক। সেবারও অমি ছিলাম ওদের পথ-প্রদর্শক শিকারী হয়ে। টিমোথি পিকারেলের সঙ্গে ছিল ওর মেয়ে সাণ্ড্রা। একদিন ক্যাম্পে একটা লোক এসে হাজির হল। বিশালকায় চেহারা। সুদর্শন। পরণে কেবলমাত্র নেংটি। লোকটি তার পরিচয় দিল—টারজান। কিহে নামটা শুনেছ কখনো?'

ক্র্যাম্প দাঁত কিড়মিড় কর উত্তর দিল, 'হুঁ শুনেছি বৈকি। বেটা জঘন্য লোক। আমাকে এই খাসা হাতির দেশ থেকে বছর দুই আগে তাড়িয়ে ছেড়েছিল।'

গ্যাণ্ট্রি বলে চলে, 'বোঝা গেল পিকারেলরা, বাবা আর মেয়ে, টারজানের নাম জানে! ওরা বলল যে টারজান নাকি কোথাকার লর্ড না ডিউক। ওরা টারজানকে বেজায় আপ্যায়ন শুরু করে দিল। তারপর একদিন মেয়েটি টারজানের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে উধাও হল। দু'জনের কেউই আর ফিরে এল না।

প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম যে ওরা মারা পড়েছে।

হপ্তাখানেক খোঁজাখুঁজির পর এক দেশী লোকের কাছে শুনলাম যে টারজান নাকি মেয়েটিকে চুরি করে হাত পিছমোড়া করে বেঁধে গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে গেছে। খবর

শুনে বৃদ্ধ পিকারেল শোকে মৃতপ্রায় হয়। আর এই ডাটন প্রতিজ্ঞা করে যে সে মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনবেই আনবে! আসলে মেয়েটির ওপর তার বেশ টান ছিল। বৃদ্ধ পিকারেল অসুস্থ শরীরের জন্য এবার আর অভিযানে আসতে পারেনি। তবে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে কেউ যদি তার মেয়েকে নিরাপদে অক্ষত দেহে ফিরিয়ে আনতে পারে, তাকে এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবে। এবং জীবিত বা মৃত টারজানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে পাঁচশো পাউণ্ড। এই উদ্দেশ্যেই আমরা এবার এখানে এসেছি। সুতরাং তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।'

ক্র্যাম্প বলল, 'তোমরা কি ভেবেছ এখানে টারজানকে খুঁজে পাবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেশ বেশ আমারও তাই মনে হয়। লোকটার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া আছে। তাছাড়া ওর মাথর দাম যখন পাঁচশো পাউণ্ড, তখন এ ব্যাপারে খানিকটা সময় দেওয়া যেতে পারে। আমি তার সন্ধান জানি।'

—'কি ভাবে?'

জংলী নরখাদক ওয়ারুতুরি জাতির কাছ থেকে ওর হদিস পেয়েছি। ওদের দলপতি মুটিমবয়ার সঙ্গে আমার ভাব আছে। ওয়ারুতুরিরা আমার কাছে এক নগ্নপ্রায় সাদা মানুষের গল্প করেছে। সেই লোকটা নাকি তাদের জাতের অনেক স্ত্রী আর ছেলেপুলে চুরি করেছে। ওর বাস নাকি রুতুরি পর্বতমালার পাদদেশে জঙ্গলে। কাঁটাঝোপের বন পেরিয়ে। ওখানে কোনও সাদা মানুষ যাকে বলে জানতাম না। কিন্তু ওয়ারুতুরিরা জানে তার গোপন আস্তানা। একবার কয়েকজন ওয়ারুতুরি ওকে অনুসরণ করে গিয়েছিল অনেক দূর। কিন্তু কাঁটাঝোপের বন পেরোবার পর আর এগোতে সাহস হয় নি। কারণ এর বাইরে যেতে তাদের নিষেধ আছে।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্র্যাম্প বলল, 'বেশ আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। টারজান এবং মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করব।'

—'তুমি টারজানকে গুলি করার চেষ্টা করবে, তাই না?' বলল গ্যান্টি।

—'অবশ্যই। তার সঙ্গে যদি পনেরো শো পাউণ্ড পুরস্কারটাও মেলে মন্দ কি?'

—'উঁহু, পুরস্কারটা নেব আমি' গ্যান্টি জানায়।

—'বটে বটে,' ক্র্যাম্প দেঁতো হাসে, 'সেটি হচ্ছে না। আমি অবশ্য একাই যেতে পারি। আর তুমি যদি পিছু নেবার চেষ্টা কর নরখাদক ওয়ারুতুরিদের দেব তোমার পিছনে লেলিয়ে। বিষ মাখানো ছুঁচলো বাঁশের টুকরো নিয়ে ওরা তোমার জন্যে ঝোপের আড়ালে আড়ালে অপেক্ষায় থাকবে বুঝেচ? তবে তোমায় সঙ্গে নেব। কারণ ওই দুর্গম অঞ্চলে যত বেশি বন্দুকধারী সঙ্গে যায় ততই সুবিধে।'

ঘাবড়ে গিয়ে গ্যান্টি বলল, 'বেশ তাই হবে। আমি ভাই, মজা করছিলাম।'

—'ডাটন আবার ভাগ বসাবে নাতো?' জিজ্ঞেস করে ক্র্যাম্প।

—'আরে না না। ওর ওসব লোভই নেই। ও শুধু মেয়েটাকে উদ্ধার করতে চায়।' জানাল গ্যান্টি।

ক্র্যাম্প বলল, 'মিনস্কিকে দলে টানতে হবে। আমি আর মিনস্কি আধাআধি বখরা। মিনস্কি লোকটা এমনিতে খারাপ নয়। তবে বড্ড মেজাজী এবং রেগে গেলেই গুলি চালায়।'

ক্রমে রাত্রি নামে। শ্বেতাঙ্গদের খাবার পালা সাঙ্গ। দেশী কালো মানুষরা তখনো রান্না-বান্না করছে। মস্ত ধুনি জ্বালানো হয়েছে। অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে আসে কত বিচিত্র রহস্যময় আওয়াজ, নানান জীব-জন্তুর ডাক। পেলহাম ডাটন ছাড়া আর কারও মনোযোগ নেই সেদিকে। জঙ্গলের জীবনযাত্রায় তারা অভ্যস্থ।

ডাটন বসে বসে বিষণ্ণ মনে সাণ্ড্রার কথা ভাবে। খাবার সময় ক্র্যাম্পের মুখে শুনেছে ওয়ারুতুরি জাতির কথা এবং তারা কি বলেছে সেই বনমানুষটার সম্বন্ধে। তার কবল থেকে কেউ নাকি উদ্ধার পায় নি কখনো। সে কি পারবে সাণ্ড্রাকে ছিনিয়ে আনতে? যদি তা না পারে অন্ততঃ প্রতিশোধ চাই। ক্র্যাম্প বলেছে, সে নাকি নর-বানরের আস্তানার পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। দেখা যাক।

হঠাৎ একজন দেশী লোকের ভীত বিস্মিত কণ্ঠের চিৎকার শুনে শ্বেতাঙ্গরা মুখ ফিরিয়ে দেখল—কেবল মাত্র কৌপীনধারী এক দানব আকৃতির তামাটে মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

—'এই সেই শয়তান নর-বানর', বলতে বলতে লাফিয়ে উঠে টারজানকে লক্ষ্য করে ক্র্যাম্প পিস্তল ছুঁড়ল।

ক্র্যাম্পের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল, সঙ্গে সঙ্গে টারজানের ছোঁড়া একটা তীর এসে বিঁধল তার ডান কাঁধে। ফলে তার পিস্তলধরা হাত অসাড় হয়ে গেল। হট্টগোল লেগে গেল তাঁবুতে। চকিতে টারজান অদৃশ্য হল বনের আঁধারে।

—'বুদ্ধু!' ক্র্যাম্পকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠল ডাটন, 'ও তাঁবুতে আসছিল। আমরা ওকে প্রশ্ন করতে পারতাম।'

ডাটন চিৎকার করে ডাকল, 'টারজান টারজান ফিরে এসো। আমি কথা দিচ্ছি তোমার কেউ ক্ষতি করবে না। বলে যাও মিস পিকারেল কোথায়?'

কথাগুলি টারজানের কানে পৌঁছল কিন্তু সে আর ফিরে গেল না। ক্র্যাম্পের গুলি খাবার তার ইচ্ছে নেই। সে জানে ক্র্যাম্প প্রতিশোধের অপেক্ষায় আছে।

সে রাতে গাছের ডালে শুয়ে ঘুমোবার আগে টারজান অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—কে এই মিস পিকারেল? কেনই বা ওরা ভাবছে আমি তার হদিস জানি?

সকালে একটা হরিণছানা মেরে খিদে মেটাল। দিনে গাছের ডালে ঘুরতে ঘুরতে টারজানের নজরে এল মাটিতে ঝোপের আড়ালে একদল আদিবাসী। টারজান তাদের নিয়ে মাথা ঘামাল না বা বিশেষ সতর্ক হোল না। কারণ এই অঞ্চলের দেশী লোকেরা তাকে বন্ধু ভাবে। রক্ষক ভাবে। কিন্তু হঠাৎ একটা বর্শা সাঁ করে ছুটে গেল টারজানের গা ঘেঁসে। মুহূর্তে টারজান লাফ দিয়ে লুকোল ডালপালার অন্তরালে।

কে এই আততায়ীরা? একটা চক্কর দিয়ে টারজান তাদের পিছনে গিয়ে হাজির হোল। দেখল, প্রায় জনাকুড়ি দেশী যোদ্ধা জটলা করছে। মুখে তাদের সন্ত্রস্ত ভাব।

যোদ্ধাদের একজন বলে উঠল, 'টিপ ফসকালে যে? এবার কি হবে? টারজান নির্ঘাৎ প্রতিশোধ নেবে।'

আর একজন বলল, 'আমরা বোকার মতো কাজ করেছি। উচিত ছিল অপেক্ষায় থাকা, কবে ও আমাদের গ্রামে আসবে। তখন প্রথমে ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতাম। তার ফলে অসতর্ক হতো টারজান। তারপর সবাই মিলে ওকে ধরে বেঁধে ফেলতাম।'

—'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

অন্য একজন বলে, 'বনমানুষদের রাজা টারজানকে আমার বড় ভয়।'

আর একটি লোক বলে ওঠে, 'কিন্তু পুরস্কারটার কথা ভাব। উঃ কত টাকা! গ্রাম শুদ্ধু সবাই বড়লোক হয়ে যাব।'

এদের কথাবার্তা শুনে টারজান অবাক। সে মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারল না। সে ঠিক করল উপজাতিদের গ্রামে হানা দেবে। জানতে হবে রহস্যটা কি?

এই সব গ্রামের লোকের হালচাল টারজানের মুখস্ত। যেদিন রাতে নাচগান খানাপিনা নেই সেদিন গ্রামের সবাই গভীর ঘুম দেয়। কেবল একজন সান্ত্রী পাহারা দেয় তাদের রাজার কুটীরের সামনে।

রাত নিশুতি হওয়া অবধি গ্রামের বাইরে গাছে বসে অপেক্ষা করল টারজান। তারপর নিঃশব্দে কুটীরগুলি ঘিরে গোঁজ দেওয়া বেড়া টপকাল। দেখে নিল পালাবার রাস্তা। একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল ঝুলে আছে বেড়ার ভিতরে, ওতেই কাজ হবে।

নিঃশব্দ পায়ে কুটীরগুলির ছায়ার আড়ালে আড়ালে এগোয় টারজান। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষগুলির নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসে। তবে গাঁয়ের খেঁকী কুকুর-গুলোকে বিশ্বাস নেই। যদি হঠাৎ তাকে দেখে ফেলে ডাক শুরু করে?

অল্প শীত পড়েছে। সর্দারের কুটীরের সামনে রক্ষীটি আগুন পোয়াতে পোয়াতে ঢুলছিল। সহসা টারজানের বজ্রমুষ্টি একহাতে চেপে ধরল তার গলা, অন্য হাত চাপা দিল তার মুখ। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'একদম চুপ। ভয় নেই, প্রাণে মারব না।' রক্ষীর দেহটা কাঁধে ফেলে হাঁটা দিল টারজান।

বন্দী প্রথমে ভয়ে অসাড়। তারপরই সে ছটফট করতে লাগল প্রাণভয়ে। মুহূর্তের জন্য আলগা হয়েছিল তার মুখের চাপা। অমনি দিল এক চিল চিৎকার। তৎক্ষণাৎ তার কণ্ঠরোধ করে চিৎকার থামিয়ে দিল টারজান কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল অনেকে। ঘুম জড়ানো চোখে ছুটে এল যোদ্ধারা। ডাকতে ডাকতে টারজানের পিছু নিল কুকুরগুলো। এক ধাক্কায় সামনের এক বিশাল যোদ্ধাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছুটল টারজান। বেড়ার গায়ে ঝুঁকে পড়া গাছের ডালে লাফিয়ে উঠে বেড়া ডিঙিয়ে ওপাশে পড়ল।

ব্যাস আর ছোটবার দরকার নেই। টারজান জানে এক্ষুণি গ্রামের লোক তাকে তাড়া করে আসবে না আপাতত নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করে সময় নষ্ট করবে চট করে কিছু করে ওঠা ওদের ধাতে নেই। ততক্ষণে সে অনায়াসে পালাবে দূরে জঙ্গলের গভীরে। বন্দীকে সে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল মাটিতে। কঠোর স্বরে হুকুম করল 'চল আমার সঙ্গে, চটপট। আমার কথা শুনলে তোমার ক্ষতি করব না। নইলে'—

অন্ধকারে টারজানের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বন্দী বলল, 'কে তুমি?'

উত্তর হল, 'আমি টারজান।'

থরথর কেঁপে উঠল বন্দী। মিনতি জানাল, 'দোহাই বোয়ানা টারজান। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।'

বনের ধারে একটা গাছের ডালে বন্দীসহ লুকিয়ে বসে, গ্রামের দিকে নজর রাখতে রাখতে টারজান জেরা করতে শুরু করল, 'মনে রেখো সত্যি কথা বললে, তোমার কোনো ভয় নেই, কিন্তু মিথ্যা বললে মরবে।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যি বলব,' উত্তর দেয় বন্দী।

—'কেন তোমার গ্রামের যোদ্ধারা আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল?'

—'দামামার ধ্বনি যে আমাদের জানিয়ে দিল তুমি আমাদের মেয়েদের আর বাচ্চাদের চুরি করতে আসছ তাই নির্দেশ এল তোমাকে হত্যা করার।'

—'কিন্তু তোমরা তো আমাকে অনেক দিন ধরে চেন। তোমরা কি জান না যে টারজান নারী বা শিশুদের ক্ষতি করে না।'

—'কিন্তু ওরা যে বলল, ওয়ারুতুরিরা দেখছে তোমাকে মেয়েদের আর বাচ্চাদের চুরি করে, কাঁটা বনের সীমানা পেরিয়ে রুতুরি পর্বতের পাদদেশে তোমার আস্তানার দিকে নিয়ে যেতে।'

—'ওয়ারুতুরিদের কথা তোমরা বিশ্বাস কর? জান না ওরা নরখাদক এবং মিথ্যাবাদী।'

—'হ্যাঁ সে আমরা জানি। কিন্তু আমাদের নিজের গ্রামের তিনজনও যে সচক্ষে দেখেছে তোমাকে মাত্র এক চাঁদ আগে। তুমি একজন সাদা মেয়ের গলায় দড়ি বেঁধে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিলে।'

টারজান রেগে বলল, 'মিথ্যে কথা। তোমাদের এই এলাকায় আমি বহুদিন আসি নি।'

ভীত বন্দী উত্তর দিল, 'আমি নিজে দেখেছি বলছি না বোয়ানা। ওই তিনজন দেখেছে, তাই বলছি।'

টারজান বলল, 'যাও গাঁয়ে ফিরে যাও। তোমার লোকদের বল সেই তিনজন টারজানকে দেখেনি, ভুল করেছে। ওরা কোনও দুষ্ট লোককে এই কাজ করতে দেখেছে। সে টারজান নয়। আমি টারজান, সেই বদ লোকটাকে খুঁজে বের করে হত্যা করব। যাতে তোমাদের মেয়েরা আর বাচ্চারা নিরাপদে থাকে।'

এই বলে টারজান রুতুরি পর্বতমালার দিকে রওনা দিল। তার উদ্দেশ্য প্রকৃত রহস্যটা কি জানা এবং অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া।

দুপুরের কিছু পরে সে বনের ভিতর একটি দেশী লোকের মুখোমুখি হল। লোকটি টারজানকে দেখেই তাক করে ছুঁড়ে মারল বর্শা। তারপর প্রাণপণে ছুট দিল।

যোদ্ধাটিকে চিনে অবাক হোল টারজান। তার এক বন্ধু উপজাতি সর্দারের ছেলে। সবাই কি এখন তাকে ভয় করছে? তাকে শত্রু ভাবছে? কেউ তার ছদ্মপরিচয়ে এই কু-কর্ম করছে। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

টারজান সেই যোদ্ধাটির পিছু ধাওয়া করে ধরে ফেলল। তারপর প্রশ্ন করল, 'আমি তো তোমাদের বন্ধু। তাহলে আমাকে মারতে চাইছ কেন?'

এই যোদ্ধাটিও আগের রাতের রক্ষীটির মতো টারজান সম্বন্ধে একই কথা শোনাল। বলল যে, দামামা ধ্বনি তাদের জানিয়েছে যে শ্বেতাঙ্গ মেয়েটিকে চুরি করার জন্য চারজন সাদা মানুষ বিরাট শিকারী দল নিয়ে টারজানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

টারজান ভাবল, ও এই জন্যই হয়তো ক্র্যাম্প তাকে গুলি ছুঁড়েছিল। এই জন্যই আর একটি শ্বেতাঙ্গ জানতে চেয়েছিল মিস পিকারেল কোথায়?

টারজান কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধাটিকে বলল, 'যাও তোমার জাতের লোকদের বল গিয়ে আমি টারজান, কোনো মেয়ে বা বাচ্চাকে কখনো চুরি করিনি। কোনও সাদা মেয়েকেও ধরে নিয়ে যাইনি। এসব অন্য কোনও দুষ্টু লোকের অপকর্ম। টারজানের নাম ভাঙিয়ে সে এই সব করছে।'

—'হয়তো কোনও পিশাচ।' কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধাটি বলে ওঠে।

টারজান দৃঢ়স্বরে বলল, 'দানব বা মানব যেই হোক না কেন আমি তাকে ঠিক ধরব। যদি সাদা মানুষদের দল এই পথে আসে, আমি যা বললাম তাদের জানিয়ে দিও। যাও।'

*

সাণ্ড্রা পিকারেলের মন বিষাদে আচ্ছন্ন। অরণ্য-প্রকৃতির অজস্র সৌন্দর্য কিছুই তার ভালো লাগছে না। জঙ্গলকে তার শুধু মনে হচ্ছে ভয়ংকর অশুভ রহস্যময়।

বলির জন্তুর মতো গলায় দড়ি বেঁধে যে লোকটি তাকে নিয়ে চলেছে, প্রথমে তাকে ভীষণ ভয় করছিল সাণ্ড্রার। কিন্তু ক্রমে তার ভয় কমল। কারণ এত দিন কাটল অথচ লোকটি তার কোনো ক্ষতি করল না। লোকটিকে তার এক হেঁয়ালী মনে হচ্ছিল। এই গভীর জঙ্গল দিয়ে দিনের পর দিন হাঁটতে হাঁটতে সে কদাচিৎ কথা বলেছে। কেমন চিন্তিত রহস্যময় মনে হচ্ছে তাকে।

দেখলে মোটেই দুষ্টপ্রকৃতির মনে হয় না। বেশ সুপুরুষ, বয়স কুড়ির কোঠায়, মুখে সরলতা মাখানো। কিন্তু ও সাণ্ড্রাকে নিয়ে চলেছে কি উদ্দেশ্যে? সেদিন তারা বিশ্রাম নিতে বসলে সাণ্ড্রা পুরনো প্রশ্নটা ফের জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমার কথার উত্তর দাও না কেন?'

যেন চিন্তার জাল ঝেড়ে ফেলতে লোকটি একবার মাথা নাড়ল। তারপর সাণ্ড্রার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, 'আমি কে? কেন, আমি টারজান।' তারপর সে একটু কাছে ঝুঁকে ফিসফিস করল, 'আমি কিন্তু দেবতা নই। তবে একথা যে তোমাকে বলেছি তা ওদের বলে দিও না।'

—'কাদের?' জিজ্ঞেস করে সাণ্ড্রা।

—'আলেমটেজোদের। ডা-গামা বলে আমি দেবতা। কিন্তু রুইজ বলে আমি মোটেই দেবতা নই, শয়তান। আলেমটেজোদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটাতেই নাকি আমার আবির্ভাব হয়েছে।'

—'ডা-গামা আর রুইজ কে?' সাণ্ড্রা অবাক হয়ে বলে।

—'ডা-গামা হচ্ছে রাজা,' উত্তর দেয় লোকটি, 'আর রুইজ হচ্ছে তার প্রধান পুরোহিত। রুইজ আমাকে সরাতে চায়। কারণ বুঝছই তো প্রধান পুরোহিতের চাইতে খোদ দেবতার ক্ষমতা ঢের বেশি। ও প্রথমে ডা-গামাকে বুদ্ধি দিয়েছিল আমাকে মেরে ফেলতে, কিন্তু ডা-গামা রাজি হয়নি। তখন রুইজ বোঝায়, দেবী না থাকলে দেবতা কোনও উপকারে আসে না। ডা-গামাও তাই বিশ্বাস করে আমাকে একজন দেবী জোটাতে আদেশ দেয়। নইলে আমাকে নাকি হত্যা করা হবে। তুমি হবে সেই দেবী। তাই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে আমাকে ওরা আর হত্যা করবে না।'

—'কিন্তু তুমি ওখানে ফিরছ কেন?' সাণ্ড্রা বলে, 'প্রধান পুরোহিত আবার হয়তো কোনও ছুতোয় তোমায় মেরে ফেলবে।'

—'তাহলে আমি কোথায় যাব?'

—'যেখান থেকে তুমি ঐ দেশে গিয়েছিলে, সেইখানেই পালিয়ে যাও।'

লোকটির মুখে কেমন হতবুদ্ধির ভাব ফুটে ওঠে। বলে, 'তা যে সম্ভব নয়, কারণ আমি এসেছি স্বর্গ থেকে। ডা-গামা তাই বলে। আমি নাকি আকাশ থেকে ভাসতে ভাসতে নেমে এসেছি মাটিতে। ওরা সবাই দেখেছে। কিন্তু আমি যে আবার ভেসে আকাশে উড়ে যেতে পারছি না। আর উড়তে পারলেও স্বর্গ কোথায় খুঁজে পাব কি ভাবে? আমি কিন্তু মনে মনে জানি আমি দেবতা নই। আমি কে জান? টারজান।'

সাণ্ড্রা বলল, 'তুমি আমাকে আমার নিজের লোকেদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। আমি কথা দিচ্ছি, তারা তোমার কোনও ক্ষতি কববে না বরং উপকারই করবে।'

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, 'না না, ডা-গামার কথা না শুনলে ও ভীষণ চটে যাবে।'

সাণ্ড্রা অনেক চেষ্টা করেও লোকটিকে তার প্রস্তাবে রাজি করাতে পারল না। তাকে পাগল বলে মনে হয় না। মুখ দেখে মনে হয় নির্বোধ নয়। কথাবার্তা শিক্ষিতের মতন। কিন্তু অতিরিক্ত সরল। কে জানে কেন ডা-গামার বোঝানো ওই অদ্ভুত ধারণাটা ওর মনে গেঁথে গেছে। কিছুতেই তা বদলানো যাচ্ছে না। সাণ্ড্রা ভেবে পায় না কি করবে? এ লোকটি কখনোই টারজান নয়। টারজানের অনেক গল্প সে শুনেছে। টারজান কখনোই নিজেকে দেবতা ভাবে না। বা কারো হুকুমে চলে না। অথচ এই লোকটি বলছে সে টারজান। আশ্চর্য!

আবার যাত্রা সুরু হয়।

এতদিন নীরব থাকার পর লোকটির বাক্যস্রোত যেন খুলে যায়। সে বলে ওঠে, 'তুমি চমৎকার দেবী হবে। ডা-গামার নিশ্চয় পছন্দ হবে তোমাকে। দেবী করার উদ্দেশ্যে আমি কত কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে আর বাচ্চাদের ধরে নিয়ে গেছি। কিন্তু কালো মেয়েদের ওরা দেবী করতে চায়নি। সেই বন্দীদের অনেকেই গেছে আলেমটেজোদের রক্ষকদের

ভোজে। ওরা মানুষ খায়।'

---'আলেমটেজোদের রক্ষক কারা?' প্রশ্ন করে সাণ্ড্রা

এই প্রশ্নের উত্তর শোনার সুযোগ হোল না সাণ্ড্রার। কারণ ঠিক তখুনি একদল বীভৎস রংমাখা জংলী যোদ্ধা হঠাৎ ঘিরে ফেলল তাদের।

নকল টারজান ফিসফিস করে বলল, 'ওয়ারুতুরি।'

ওয়ারুতুরিদের সর্দার মুটিম্‌বোয়া চিৎকার করে উঠল, 'টারজানকে পেয়েছি।'

দুজন যোদ্ধা তৎক্ষণাৎ বর্শা দিয়ে গেঁথে ফেলতে যাচ্ছিল টারজানকে, কিন্তু সর্দার বাধা দিল। বলল, 'ওকে এখন মারব না। ওকে আমরা ভোজ খাব। একটু একটু যন্ত্রণা দিয়ে শেষ করব ওকে।'

ভীত সাণ্ড্রা নকল টারজানকে বলল, 'বুঝছ ওরা কি বলছে?'

—'হুঁ', মাথা নাড়ে লোকটি। বলে, 'ভেব না আমি ঠিক পালাব। তারপর এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাব তোমায়।'

বন্দী লোকটি ও সাণ্ড্রা চলেছে। সামনে পিছনে যোদ্ধার পাহারা। সাণ্ড্রা ভেবে পাচ্ছে না কি ভাবে ওই লোকটি পালাতে পারবে। হঠাৎ নকল টারজান মুখ তুলে এক তীব্র চিৎকার দিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্শার খোঁচা মেরে তাকে থামিয়ে দিল যোদ্ধারা।

তবু ওয়ারুতুরিরা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। একটু বাদেই দূর থেকে ভেসে এল এক তীক্ষ্ণ চিৎকার। উত্তেজিত ভীত যোদ্ধারা বন্দীদের সঙ্গে নিয়ে দৌড়তে শুরু করল।

সাণ্ড্রা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, 'কে যেন উত্তর দিল তোমার ডাকে। কে ও?'

মৃদু হেসে লোকটি বলল, 'ও দেবতার একজন ভৃত্য। এখুনি ওরা এসে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।'

দূরের ওই চিৎকারটা অদ্ভুত। অপার্থিব মানুষের গলা বলে মনে হয় না।

দলটা জঙ্গলের ভিতর একটা খোলা জায়গায় এসে হাজির হোল। আবার তারা হাঁটতে লাগল। একটু জিরোতে পেয়ে যেন বেঁচে গেল ক্লান্ত সাণ্ড্রা। হঠাৎ দলের কয়েকজনের ভীত চিৎকার শুনে, পিছন ফিরে আঁতকে উঠল সাণ্ড্রা। দেখল একদল বিশালকায় বনমানুষ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আক্রমণ করেছে ওয়ারুতুরিদের। তাদের প্রচণ্ড শক্তি। হাতের পায়ের বড় বড় নখের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কালো মানুষগুলো। সাণ্ড্রাকে বয়ে নিয়ে প্রাণ ভয়ে দৌড় দিল ওয়ারুতুরি যোদ্ধা। অনেক দূর পালিয়ে তারা থামল। তখন আবিষ্কার করল যে, নকল টারজান অদৃশ্য হয়েছে।

সাণ্ড্রা ভাবল, ওই লোমওলা ভয়ংকর বনমানুষদের হাতে পড়ার চেয়ে এই কৃষ্ণাঙ্গদের বন্দী থাকা বরং ভাল। এরা তবু মানুষ। এদের বুঝিয়ে শুনিয়ে, মুক্তিপণের লোভ দেখিয়ে হয়তো মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারবে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে সে অবাক হচ্ছিল। ওয়ারুতুরি যোদ্ধাদের হাতে পায়ে এত সোনার গয়না কেন? এদের কি টাকার লোভ দেখিয়ে বশ করা যাবে?

ক্রমে একটা গ্রামে পৌঁছল তারা। সেখানেও প্রচুর সোনাদানার ছড়াছড়ি। গ্রামের মেয়েগুলো সাণ্ড্রাকে যেন ছিঁড়ে খাবার যোগাড় করল। তার জামা ছিঁড়ে দিল, মারতে লাগল। হয়তো একদম মেরেই ফেলত। সর্দার এসে বাঁচাল তাকে। সর্দার গ্রামের মেয়েদের বলল, 'ব্যাস ব্যাস আর নয়। এখন ওকে ছেড়ে দাও। আসছে কাল রাতে আমাদের ভোজ হবে।'

সাণ্ড্রা সোয়াহিলি ভাষায় সর্দারকে বলল, 'আমায় ছেড়ে দাও, দোহাই। কত মুক্তিপণ চাও বল।'

হা হা করে হেসে উঠল সর্দার, 'সাদা মানুষদের কাছ থেকে আমরা কিছু চেয়ে নিই না। দরকার হলে কেড়ে নিই।'

—'তাহলে আমায় নিয়ে কি করতে চাও তোমরা?'

সর্দার মিচকে হেসে, রান্নার হাঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে, নিজের ভুঁড়িতে হাত বোলাতে লাগল।

*

টারজান ওয়ারুতুরি উপজাতির এলাকায় প্রবেশ করল। সে জানে, এই লোকগুলো নিষ্ঠুর নরখাদক জংলী। সেজন্য ভয় নেই তার। শুধু একটু সতর্ক থাকল।

তার আসল উদ্দেশ্য সেই জোচ্চোর সাদা মানুষটিকে খুঁজে বের করা, যে তার নাম ভাঙিয়ে কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে। সেই চুরি যাওয়া শ্বেতাঙ্গ মেয়েটি যদি উদ্ধার করা যায় ভালই। তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ওর নিজের লোকদের কাছে। কিন্তু তার আসল কাজ নকল টারজানকে ধ্বংসকরা। যে তার বন্ধু উপজাতিদের মেয়ে ও শিশুদের চুরি করছে।

ওয়ারুতুরিদের এলাকায় প্রবেশ করার পর দ্বিতীয় রাতে বিশাল এক গাছের ডালের খাঁজে শুয়েছিল টারজান।

হঠাৎ তার কানে এল ঢাকের আওয়াজ। মন দিয়ে শোনে সে। আগামী রাতে এক ভোজ হবে কাছের কোনও গ্রামে। ঢাক বাজিয়ে নেমন্তন্ন হচ্ছে অন্য গ্রামের লোকদের।

টারজান ভাবে, নরমাংসের ভোজ হবে নাকি? ওয়ারুতুরিরা নরখাদক। কাল ওই গ্রামে গিয়ে জানতে হবে ব্যাপারটা। এরপর টারজান ঘুমিয়ে পড়ে।

মুটিম্‌বোয়া সর্দারের গাঁয়ে দলে দলে লোক আসছে অন্য গ্রাম থেকে। বন্দী সাগুরা তার কুটীরের দরজা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে সব। অবশেষে তাকে নিয়ে যাওয়া হল বধ্যভূমিতে।

অনেকগুলি হাঁড়িতে টগবগ করে ফুটছে জল। পা-বাঁধা পাঁচটা ছাগল পড়ে আছে, সর্দারের কুটীরের সামনে বিরাট এক গাছের নিচে মাটিতে। সাগুরাকে হিঁচড়ে নিয়ে রাখা হল ছাগলগুলোর পাশে। গ্রামের ওঝা এবং আরও কিছু লোক তাদের ঘিরে উন্মত্ত নাচ শুরু করল। আরম্ভ হল গান এবং প্রবল ঢাকের বাদ্যি।

হঠাৎ এক চিৎকার দিয়ে ওঝা লাফিয়ে গিয়ে পড়ল একটা ছাগলের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ছুরি দিয়ে সে কেটে দিল ছাগলটার গলার নলী। গানে তখন বিলাপের সুর। ওঝা ছাগলটার মাংস কেটে কেটে মন্ত্র পড়ে দিতে লাগল যোদ্ধাদের। সেই মাংসের টুকরো হাতে হাতে নিয়ে ফেলা হতে লাগল হাঁড়ির ফুটন্ত জলে। এইভাবে একে একে পাঁচটি ছাগলকে জবাই করে তাদের মাংস ফেলা হল রান্নার হাঁড়িগুলোতে। সাগুরা বুঝল এবার তার পালা।

খুব শক্ত ধাতের মেয়ে সে। মনে প্রাণপণে সাহস আনল। মরার আগে এই জংলীগুলোর সামনে একটুও দুর্বলতা প্রকাশ করা চলবে না। মনে এল বাবার কথা, বন্ধু-বান্ধবদের কথা, পেলহাম ডাটনের কথা।

ওঝা রক্তমাখা ছুরি হাতে এগিয়ে এল সাগুরার দিকে। যোদ্ধারা নাচছে তাকে ঘিরে। গানের সুর চড়েছে। হঠাৎ এক আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ওঝা। দেখা গেল তার বুক ফুঁড়ে বিঁধে আছে একটা তীর। ঠিক তখুনি সামনের গাছ থেকে সাগুরার পাশে লাফিয়ে নামল এক শ্বেতাঙ্গ, তার পরণে শুধু মাত্র নেংটি। গান বাজনা থেমে গেল। সকলের হতভম্ব চোখ তখন আহত ওঝার ওপর। সেই মুহূর্তে বন্দী মেয়েটিকে নিয়ে গাছের ডালে অদৃশ্য হল সেই শ্বেতাঙ্গ আগন্তুক।

সাগুরারও মনে নেই ঠিক কি কি ঘটেছিল। ভয়ে ও বিস্ময়ে তখনো সে প্রায় অজ্ঞান। শুধু মনে আছে তার কোমর ধরে কেউ তুলে নিল মাটি থেকে। তারপর গাছের ডালে ডালে সর্দারের কুটীর পেরনো, বেড়া টপকানো। যখন তার চেতনা হল, দেখল জঙ্গলের মধ্যে বিশাল এক গাছের উঁচু ডালে সে বসে আছে। আর একজন পুরুষ সবল হাতে ধরে আছে তাকে, যাতে সে পড়ে না যায়।

—'তুমি কে?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করে সাগুরা।

—'আমি টারজান,' গম্ভীর গলায় জবাব এল!

সাগুরার মনে হল গলার স্বর যেন একটু অন্যরকম। তবু ভাবল এ নিশ্চয় সেই লোক, যে তাকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিল। যে বলেছিল, তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। সাগুরা বলে উঠল, 'ডা-গামা তাহলে ঠিকই বলে। তুমি নিশ্চয় দেবতা। তা নইলে আর কেউ আমায় বাঁচাতে পারত না।'

টারজান বলল, 'তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না।'

—'না বোঝার কি আছে। তুমিই তো আমায় গতকাল বলেছিলে যে ডা-গামা তোমাকে ভাবে দেবতা কিন্তু তুমি নিজেকে ভাব টারজান।'

উত্তর হল, 'আমি তোমাকে গতকাল দেখিনি। তোমাকে কখনো দেখিনি। বনমানুষদের ছেলে টারজান।'

—'তার মানে তুমি আমাকে বাবার তাঁবু থেকে এখানে চুরি করে আননি।'

—'সেটা অন্য লোকের কাজ। যে আমার নকল সেজেছে। আমি তাকে হত্যা করার জন্য খুঁজছি। সে কোথায় আছে জান? সে-ও কি ওয়ারুতুরিদের খপ্পরে পড়েছে?'

—'না না সে পালিয়েছে,' জানাল সাগুরা, 'সে বলেছিল, ফিরে এসে আমায় ফের নিয়ে যাব।'

—'সেই লোকটার সম্বন্ধে যা জান বল দেখি।'

সাগুরা বলল, 'লোকটা অদ্ভুত। মনে হয় ভদ্রলোক। সে আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করেছে। কোনও ক্ষতি করেনি।'

—'তোমাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল কেন?'

—'ও বলছিল ডা-গামার বিশ্বাস ও একজন দেবতা। ডা-গামা নাকি ওকে হুকুম দিয়েছে, একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়ে ধরে এনে ওর দেবী বানাতে। আমার মনে হয় লোকটার মাথায় একটু ছিট আছে। তার নিজের বিশ্বাস সে হচ্ছে

টারজান। তুমিই কি আসল টারজান?'

উত্তর হল 'আলবৎ।'

—'আমি যে ওয়ারুতুরি গ্রামে আছি তা তুমি জানলে কি করে?'

—'আমি জানতাম না। ঢাকের বাদ্যি শুনে বুঝলাম, আজ এই গ্রামে ভোজ আছে। আন্দাজ করলাম হয়তো নরমাংসের ভোজ। খোঁজ পেয়েছিলাম, তুমি এই অঞ্চলে এসেছ। তাই দেখতে এলাম ব্যাপারটা।'

—'তুমি কি আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তারা কোথায় জান?'

—চারজন শ্বেতাঙ্গ দলবল নিয়ে আমাকে মারার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওটাই নিশ্চয় তোমাদের সাফারি।' তিক্ত হেসে জানাল টারজান।

—'চারজন কেন? তিনজন শ্বেতাঙ্গ। আমার বাবা পেলহাম ডাটন, এবং আমাদের গাইড গ্যান্টি।'

—'ওই দলে আর একজন আছে। নাম ক্র্যাম্প। সে আমায় গুলি করেছিল কিন্তু ফসকেছে।'

—'উঁহু, ক্র্যাম্প বলে তো কেউ ছিল না আমাদের দলে!'

সাগুর বর্ণনা শুনে টারজান বুঝল যে মেয়েটির বাবা ওই সাফারিতে নেই। তবে ডাটন এবং গ্যান্ট্রিকে চিনতে পারল। বলল, 'ক্র্যাম্প লোকটা বদমায়েস। অন্য লোকটা বোধহয় ক্র্যাম্পের সঙ্গী। তাকেও ভাল লোক মনে হয় না।'

উঁচু গাছের ডালে, টারজানের তৈরি ডালপালার বিছানায় শুয়ে, সেই রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমল সাগু। ভোরে ঘুম ভেঙে সে দেখে টারজান নেই! তাকে একা ফেলে ও কি চলে গেল? অরণ্যরাজ্যের লোকগুলোর সবারই ব্যবহার কেমন অদ্ভুত! খিদেয় জ্বলছে পেট। এক টুকরো খাবার নেই কাছে। হতাশ হয়ে সাগু ভাবে তবে কি অনাহারে মৃত্যু লেখা আছে বরাতে। যদি না সে তার আগেই কোনো হিংস্র জন্তুর পেটে যায়।

হঠাৎ মৃদু শব্দ শুনে ফিরে দেখে টারজান লতায় ঝুলে নামল তার পাশে। টারজানের হাতে কিছু ফল।

—'খিদে পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করল টারজান।

—'হুঁ।'

—'তাহলে খাও।'

—'আমাকে কি এখানে ছেড়ে চলে যাবে?'

—'না, তোমায় পৌঁছে দেব তোমার লোকদের কাছে।'

ডাটনের সাফারি দলের টাটকা মাংসের প্রয়োজন। সকাল বেলা ক্র্যাম্প একটা জলের গর্তের কাছে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসেছিল শিকারের আশায়। হঠাৎ তার কানে এল কথার আওয়াজ। সে দেখতে পেল দুটি শ্বেতাঙ্গ নারী ও পুরুষ আসছে এদিকে। মেয়েটি বোধ হয় সাগু পিকারেল। আর টারজানকে চিনতে তার ভুল হল না। ক্রূর হাসি ফুটল তার মুখে। সে রাইফল তুলে ভাল করে নিশানা করে গুলি ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল টারজান। তার মাথার ক্ষতস্থান থেকে তখন গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে।

*

টারজান পড়ে যাওয়া মাত্র ক্র্যাম্প লাফিয়ে উঠে মেয়েটিকে ডাকল।

—'কে তুমি?' ক্রুদ্ধ সাগু প্রশ্ন করে।

—'আমিও তোমার খোঁজ করছি। আমার নাম টম ক্র্যাম্প।'

—'একে গুলি মারলে কেন? তুমি যে মেরে ফেলেছ ওকে।'

—'ঠিক করেছি। তোমায় হরণ করার শাস্তি।'

—'কিন্তু ও আমায় চুরি করেনি। বরং আমার প্রাণ রক্ষা করেছে। আমায় পেলহাম ডাটনের সাফারি দলে ফিরিয়ে নিয়ে আসছিল।'

টারজানের নিথর দেহে বুটের এক ঠোকা মেরে ক্র্যাম্প বলল, 'যাকগে, ও খতম হয়ে গেছে। চল আমার সঙ্গে ডাটনের কাছে। আমাদের তাঁবু মাইলখানেকের বেশি দূরে নয়।'

—'ওর জন্য কি তুমি কিছু করবে না?' টারজানকে দেখায় সাগু।

—'যা চেয়েছিলাম করেছি। এখন চল আমার সঙ্গে।'

—'ওকে কবরও দেবে না?'

—'আমি কবর খননকারী নই। হায়না আর শেয়ালে ওকে কবর দেবে। চল চল।' সাণ্ড্রার হাত পাকড়ে ক্র্যাম্প টেনে নিয়ে চলল তাঁবুতে।

—'আমি শুনেছি তুমি একটা বাজে লোক', রেগে বলে সাণ্ড্রা।

—'কে বলেছে?'

—'টারজান।'

—'বটে বটে।'

ঝোপের আড়াল থেকে একজোড়া রক্তচক্ষু কিন্তু সমস্ত লক্ষ্য করছিল!

বিকেলে শ্বেতাঙ্গ শিকারীরা ফিরল তাঁবুতে। ডাটন ফিরল সবার শেষে। সাণ্ড্রাকে দেখে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে এল। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'ওঃ তুমি ফিরেছ। আমি যে সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কে তোমায় উদ্ধার করল?'

—'আমি,' জানাল ক্র্যাম্প, 'এবং সেই শয়তান টারজানকে আমি শেষ করে দিয়েছি। আর কখনো ও মেয়ে চুরি করবে না।'

—'আঃ আমি বারবার বলছি ওই টারজান আমায় চুরি করেনি। বরং আমায় উদ্ধার করেছে ওয়ারুতুরিদের হাত থেকে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে। এই লোকটা টারজানকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে মেরে, ফেলে এসেছে জঙ্গলে। দোহাই ডাটন তুমি কি লোকজন নিয়ে আমার সেই উপকারীকে অন্তত ভদ্রভাবে কবর দেবার ব্যবস্থাটুকুও করবে না?'

—'নিশ্চয় নিশ্চয়,' জানায় ডাটন, 'কত দূরে? রাতের আগে যাওয়া যাবে তো?'

—'বেশি দূরে নয়,' জানাল সাণ্ড্রা।

—'জায়গাটা তুমি খুঁজে পাবে তো?' বলল ডাটন।

—'মনে হয়।' সাণ্ড্রা ইতস্তত করে।

—'বেশ, ওকে কবর দিলে যদি তোমাদের প্রাণে শান্তি হয়, চল আমি নিয়ে যাচ্ছি সেখানে। অবশ্য হায়নারা কি আর এতক্ষণে ওর কিছু বাকি রেখেছে?' বলল ক্র্যাম্প।

সেই জলের গর্তের কাছে পৌছল সবাই। একি! টারজানের দেহ কোথায়! ক্র্যাম্প থ।

ডাটন বলল, 'ও হয়তো মরেনি, আহত হয়েছিল।'

—'কক্ষনো নয়,' প্রতিবাদ করে ক্র্যাম্প, 'কেউ ওকে নিয়ে গেছে।'

সাণ্ড্রা টারজানের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল কয়েকবার। কিন্তু কোনও উত্তর এল না।

ডাটন বলল, 'সাণ্ড্রাকে এক টারজান বন্দী করল। আর এক টারজান উদ্ধার করল। আসলটা কে? খুবই রহস্যময় ব্যাপার।'

—'যাকে আমি হত্যা করেছি ও-ই আসল টারজান,' জানাল ক্র্যাম্প, 'অন্য টারজানকে আমি চিনি না। টারজানকে নিশ্চয় সিংহ-টিংহ টেনে নিয়ে গেছে। আরে ও লোকটার ওপর সাণ্ড্রার এমন টান আছে জানলে না হয় ওকে মারতাম না।'

—'খবরদার,' তাকে ধমকে ওঠে ডাটন, 'তোমাকে আর আমাদের দরকার নেই। তোমরা দু'জন এবার যেতে পার। সাণ্ড্রাকে আমি ওর বাবার কাছে নিয়ে যাব।'

—'কিন্তু আমি আর মিনস্কিও যে তোমাদের সঙ্গে যাব,' বলল ক্র্যাম্প, 'কারণ সেই পুরস্কারের টাকাটা যে চাই।'

—'কিসের পুরস্কার?' সাণ্ড্রা প্রশ্ন করে।

—'তোমার বাবার ঘোষণা করা পুরস্কার। এক হাজার পাউণ্ড তোমার উদ্ধার করার জন্য এবং পাঁচশো পাউণ্ড তোমার হরণকারীকে বন্দী বা হত্যা করার জন্য।'

—'তাহলে একটা পুরস্কারও তোমার ভাগ্যে জুটবে না। কারণ তুমি যাকে মেরেছ সে আসলে আমার উদ্ধারকারী। এবং যে আমায় চুরি করেছিল সে এখনো শাস্তি পায়নি।'

—'সে দেখা যাবে।' গরগর করে ক্র্যাম্প।

দলটা যখন তাঁবুতে ফিরল কতগুলি রক্তচক্ষু তখন ঝোপের আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিল তাদের। তবে তার মধ্যে একজোড়া চোখ হিংস্র নয়। সেই চোখ দুটি একজন মানুষের। যে নিজেকে টারজান ভাবে। আর অন্য চোখগুলি ভয়ানকদর্শন বিশালাকায় লোমওলা বনমানুষদের। শিকারীরা চলে যাওয়ার পর তারা ঝোপের বাইরে এল। তাদের সঙ্গে একটি বন্দী কালো মেয়ে। সাণ্ড্রাকে হারিয়ে নকল টারজান অগত্যা এই কালো মেয়েটিকে নিয়ে যাচ্ছে ডা-গামাকে শান্ত করতে। সাণ্ড্রাকে জীবিত দেখবে সে ভাবতে পারেনি।

অন্ধকার হবার পর নকল টারজান ও বনমানুষের দল শিকারীদের তাঁবুর কাছে এগিয়ে গেল নিঃশব্দে। ডাটন ও সাণ্ড্রার কাছ থেকে দূরে বসে তখন ক্র্যাম্প মিনস্কি

আর গ্যাণ্ট্রি ফিসফিস করছে।

—'পুরস্কার আমার চাইই,' বলল ক্র্যাম্প, 'শুধু তাই না আমি দু'গুণ টাকা আদায় করব।'

—'কি ভাবে,' গ্যাণ্ট্রির প্রশ্ন।

ক্র্যাম্প বলল, 'প্রথমে ডাটনকে খুন করব কায়দা করে, যেন লোকে ভাবে দুর্ঘটনা। তারপর আমি আর মিনস্কি মেয়েটাকে আটকে রাখব। তুমি তখন যাবে ওর বাবার কাছে। বলবে, প্রাণপণে যুদ্ধ করেও তার মেয়েকে রক্ষা করতে পারিনি। তুমিও বন্দী হয়েছিলে। আপাতত মুক্তিপণ আদায়ের জন্য তোমায় ছেড়ে দিয়েছি। তিন হাজার পাউণ্ড পেলে তবে আমরা তাঁর মেয়েকে মুক্তি দেব। ওই তিন হাজার আমরা ভাগ করে নেব প্রত্যেকে এক হাজার করে।'

—'ওসব খুন-খারাপির মধ্যে আমি নেই। আমার সুনাম আমি নষ্ট করতে চাই না,' আপত্তি জানাল গ্যাণ্ট্রি, 'তাছাড়া ডাটন লোকটি ভাল।'

মিনস্কি বলল, 'ডাটনকে খুন করার দরকার নেই। আর একটা মতলব শোন। আজ রাতে তোমাকে মুখ-হাত-পা বেঁধে রেখে আমরা মেয়েটাকে নিয়ে পালাব। সকালে ডাটন যখন জানতে পারবে, ওকে বলবে যে আমরা বলে গেছি, তিন হাজার পাউণ্ড মুক্তিপণ পাঠালে তবে আমরা মেয়েটিকে ছাড়ব। উপিন্দি নদীর ধারে পবন্‌জা সর্দারের গ্রামে তোমার হাতে টাকাটা পাঠাতে হবে। দু'মাস আমরা অপেক্ষা করব। তার মধ্যে টাকা না এলে মেয়েকে খোয়াবে।'

—'যদি আমায় অবিশ্বাস করে? আমার হাতে টাকা না দেয়?' গ্যাণ্ট্রি বলে।

মিনস্কি বলল, 'বলবে, ক্র্যাম্প বলেছে টাকা না আনলে তোমায় খুন করবে। ক্র্যাম্পের যা সুনাম, লোকে ঠিক বিশ্বাস করবে তোমার কথা।'

—'তোমারও কিছু সুনাম কম নয়,' ক্র্যাম্প দাঁত খিঁচোয় মিনস্কিকে।

—গ্যাণ্ট্রি বলল, 'আমায় ঠকাবে না তো?'

—'আরে ছি ছি। আমি বন্ধুকে ঠকাই না,' আশ্বাস দেয় ক্র্যাম্প।

ওই তিনটি বদমায়েস লোকের মনে মনে কিন্তু তখন অন্য মতলব ঘুরছে। ক্র্যাম্প ও মিনস্কি ভেবেছে, টাকাটা পেলেই গ্যাণ্ট্রিকে খুন করে পুরো টাকাটা দু'জনে হাতাবে। ক্র্যাম্পের মতলব, এরপর মিনস্কিকে খুন করে সে মেরে দেবে গোটাটা। গ্যাণ্ট্রির মতলব, টাকা হাতে পেলেই সে চম্পট দেবে এদেশ ছেড়ে সোজা হলিউডে। সেখানে ছদ্ম পরিচয়ে বাস করবে।

নকল টারজান গোপনে লক্ষ্য করল যে সাণ্ড্রা তার তাঁবুতে চলে গেল। গ্যাণ্ট্রিও তাঁবুতে ঢুকল। ক্র্যাম্প আর মিনস্কি তাদের জিনিস বাঁধাছাঁদা করে কুলিদের দিয়ে মাল রওনা করিয়ে দিল। ওই দু'জনের একজন গ্যাণ্ট্রির তাঁবুতে একবার ঢুকেছিল। কিন্তু কুলিরা ওদের মাল নিয়ে গেলেও ওরা রওনা দিচ্ছে না কেন?

সাণ্ড্রার ঘুম আসছে না। মনে কেবলই আসছে টারজানের শোচনীয় মৃত্যুর কথা। হঠাৎ তার তাঁবুর পর্দা সরিয়ে নিঃশব্দে ঢুকল ক্র্যাম্প এবং মিনস্কি।

বিশাল এক গোদা বনমানুষ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় জলের গর্তের দিকে যাচ্ছিল জল খেতে। বনের বাসিন্দারা চট করে খোলা জায়গায় আসে না শত্রুর ভয়ে। আগে আড়াল থেকে দেখে নেয় চারধার। এমনি দেখতে দেখতে বনমানুষের নজরে এল জলের গর্তের কাছে ঝোপের আড়ালে একজন সাদা মানুষ। সাদা মানুষটি রাইফেল তুলল। তাক করল এবং গুলি ছুঁড়ল।

টারজান পড়ে যাওয়ার আগে অবধি বনমানুষটি দেখতে পায়নি তাকে বা সাণ্ড্রাকে। বন্দুকবাজ এবং সাদা মেয়েটি চলে যাবার পর বনমানুষটি বেরিয়ে টারজানের কাছে এল। উলটিয়ে দেখল তার মুখ। একটা করুণ স্বর বেরিয়ে এল বনমানুষের গলা থেকে। তারপর সে প্রচণ্ড বলশালী লোমওলা হাত দুটি দিয়ে টারজানকে কোলে তুলে নিয়ে ঢুকে গেল বনের ভিতরে।

সাণ্ড্রা চমকে খাটে উঠে বসে ধমকে উঠল, 'কি চাই তোমার?'

—'চোপ্,' পাল্টা ধমক দিল ক্র্যাম্প, 'তোমায় আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। চেঁচামেচি না করলে তোমার কোনও ক্ষতি করব না।'

—'মিঃ ডাটন কোথায়?' জিজ্ঞেস করে সাণ্ড্রা।

—'ঘুমচ্ছে। যদি চিৎকার দিয়ে ওকে জাগিয়ে তোল, ও খুন হয়ে যাবে।'

—'তোমাদের মতলবটা কি? আমায় কোথায় নিয়ে যাবে?'

মিনস্কি বলল, 'শোন, তোমায় আপাতত একটা গোপন জায়গায় আটকে রাখব। তোমার বাবা আমাদের তিন হাজার পাউণ্ড মুক্তিপণ দিলে তবে তোমায় ছাড়ব।'

সাণ্ড্রা বুঝল বাধা দিয়ে লাভ নেই। এরা সাংঘাতিক লোক। সে বলল, 'বেশ আমি যাব কিন্তু পোষাক পরে নিই। কটা জিনিস নিয়ে নিই সঙ্গে।'

—'বেশ নাও। আমরা অপেক্ষা করছি,' বলল ক্র্যাম্প।

নকল টারজান এবং তার বনমানুষ সহচররা সাণ্ড্রার তাঁবুর পাশে ওঁৎ পেতে ছিল। সাণ্ড্রাকে নিয়ে ক্র্যাম্প আর মিনস্কি তাঁবুর বাইরে আসা মাত্র তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। বনমানুষরা আক্রমণ করল ক্র্যাম্প ও মিনস্কিকে। সেই সুযোগে নকল টারজান সাণ্ড্রাকে ছিনিয়ে নিয়ে পালাল।

গোলমালে ঘুম ভেঙ্গে ডাটন ছুটে এল রাইফল হাতে। দেখল, মাটিতে পড়ে আছে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহে ক্র্যাম্প ও মিনস্কি।

—'কি ব্যাপার?' জানতে চায় ডাটন।

মিনস্কি উত্তর দিল, 'মিস পিকারেলের তাঁবুর ধারে কি যেন নড়াচড়া করছে দেখে আমরা বেরিয়ে আসি। সঙ্গে সঙ্গে ডজন খানেক বিরাট বিরাট গোরিলা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে টারজানও ছিল। টারজান মিস্ পিকারেলকে নিয়ে পালিয়েছে।'

—'চল চল, ওকে উদ্ধার করে আনি,' ডাটন উত্তেজিত।

—'কোনও লাভ নেই,' জানাল ক্র্যাম্প, 'ওরা সংখ্যায় অনেক। তাছাড়া অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছু। গুলি ছুঁড়লে মেয়েটির গায়ে যদি লাগে? সকাল অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

—'তাহলে এখন কি করি?' ডাটন অস্থির।

দু'জনের এই কথার ফাঁকে মিনস্কি নিঃসাড়ে গিয়ে গ্যাণ্ট্রির তাঁবুতে ঢুকে তার বাঁধন কেটে দিল এবং জানিয়ে দিল কি ঘটেছে। বলল, 'তুমি ডাটনকে নিয়ে একটু এগিয়ে খোঁজাখুঁজির ভান করে ফিরে এসে, সেই ফাঁকে আমি কুলিদের ফিরিয়ে আনছি। ওরা কেউ নেই দেখলে ডাটন সন্দেহ করবে।'

গ্যাণ্ট্রিকে নিয়ে মিনস্কিকে বেরিয়ে আসতে দেখল ডাটন। পাছে তার সন্দেহ হয় তাই মিনস্কি বলল, 'আচ্ছা ঘুম বটে গ্যাণ্ট্রির। কিছু জানতেই পারেনি। ওকে ঠেলে তুললাম।'

ডাটন বলল, 'আমি মিস পিকারেলকে খুঁজতে যাব। কে আসবে আমার সঙ্গে?'

শুধু গ্যাণ্ট্রি রাজি হল যেতে।

অন্ধকার জঙ্গলে খানিক দূর ঢুকে ডাটন অনেক খোঁজাখুঁজি ডাকাডাকি করল কিন্তু কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। অবশেষে ডাটন হতাশ হয়ে ফিরল তাঁবুতে। ঠিক করল, সকালে দলবল নিয়ে খুঁজতে বেরোবে। ডাটন ফেরার আগেই অবশ্য কুলিদের ফিরিয়ে এনেছিল মিনস্কি।

পরদিন সকালে। নকল টারজান এবং তার বনমানুষ সহচরদের সঙ্গে চলেছে দুটি বন্দী নারী। একজন ওয়ারুতুরি জাতের কালো মেয়ে, অন্যজন শ্বেতাঙ্গিনী সাণ্ড্রা। দলটা সামনে হেঁটে চলেছে। রুতুরি পর্বতের পাদদেশে কাঁটা-ঝোপের বনে না পৌঁছনো অবধি তাদের স্বস্তি নেই। নকল টারজানের ভয়, যদি ওয়ারুতুরিরা বা সাদা মানুষরা তাদের মেয়েদের খোঁজে তাড়া করে আসে। এমন কি খেতে বসে সময় নষ্ট করতেও তার ভয়। মেয়ে দুটির আর পা চলে না। রাতে খানিক ঘুমিয়ে নিয়ে ফের তারা রওনা হয়। দুপুরে পৌঁছয় কাঁটাঝোপের বনের কিনারে। সেই কাঁটাবনের ভিতর দিয়ে শুঁড়ি পথ ধরে এগোয় দলটা।

এতক্ষণ নকল টারজান কদাচিৎ কথা বলেছে। এবার স্বস্তি পেয়ে সাণ্ড্রাকে বলল, 'এখন আমরা নিরাপদ। এইবার আমি ডা-গামার জন্যে দেবী আনতে পেরেছি।'

সাণ্ড্রা বলল, 'কেন আমায় ধরে আনলে? আমি তো তোমার কোনও অপকার করিনি।'

—'আমিও তোমার ক্ষতি করব না বরং মস্ত উপকারই করব। তুমি দেবী বনে যাবে। কত ঐশ্বর্য পাবে। আলেমটেজোর সবাই তোমার পুজো করবে।' উত্তর দিল নকল টারজান।

—'আমি দেবী হতে চাই না,' বলল সাণ্ড্রা।

—'অকৃতজ্ঞ।' চটে গেল লোকটি।

পাহাড়ের পাদমূলে এক সরু গিরিপথ। সামনে খুঁটির বেড়া। একটা ঝর্নাধারা ওই পথে পাহাড় থেকে নেমে আসছে।

—'এই কি আলেমটেজো?' জিজ্ঞেস করে সাণ্ড্রা।

—'না। এই জায়গা হচ্ছে আলেমটেজোর রক্ষকদের বাসস্থান। এর পিছনে আলেমটেজো।'

হঠাৎ ভয়ংকর সিংহের গর্জনে আকাশ বাতাস কেঁপে

উঠল। 'সিংহরা যদি আক্রমণ করে?' সাগুা ভয় পায়।

—'পারবে না। কারণ ওরা আসতেই পারবে না কাছে।'

ঘনবদ্ধ উঁচু বেড়ার ভিতর দেখা গেল অসংখ্য সিংহ, মানুষের গন্ধ পেয়ে ক্ষেপে উঠেছে।

বেড়ার গা দিয়ে খাড়া পাহাড়ী সিঁড়ি। মেয়ে দু'জনকে হাত ধরে টেনে তুলতে লাগল বনমানুষরা। নিচে সিংহগুলো লাফাচ্ছে। হঠাৎ কালো মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল। নকল টারজান মেয়েটিকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে সিংহদের মুখে। গর্জন করে মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সিংহগুলো।

—'জানোয়ার।' চেঁচিয়ে উঠল সাগুা।

—'আমি মোটেই জানোয়ার নই। আলেমটেজোর রক্ষকদের তো খাবার চাই।' লোকটি প্রতিবাদ করে।

—'এবার বুঝি আমার পালা?'

—'কক্ষনো না। তুমি তো হবে দেবী।'

অনেকখানি উঠে সামনে পড়ল খাড়া পাহাড়। এই খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে বনমানুষরা টেনে তুলতে লাগল সাগুা আর নকল টারজানকে, পাথরের খাঁজে খাঁজে আঁকড়ে আঁকড়ে। সেকি ভয়াবহ যাত্রা। একবার ফসকে পড়লে চুর চুর হয়ে যাবে দেহ। সাগুার মাথা ঘুরছে। হঠাৎ যে বনমানুষটা সাগুার হাত ধরে টেনে তুলছিল তার পা ফসকাল। সে পড়ল সাগুার ঘাড়ে। সাগুা পাহাড়ের খাঁজ আঁকড়ে প্রাণপণে চেষ্টা করল ঝুলে থাকতে, কিন্তু পারল না। বনমানুষের বিষম ভারি দেহের দ্বিতীয় ধাক্কায় সে উল্টে পড়ল।

*

নিবিড় অরণ্যরাজ্যে বিশাল গাছগুলির তলায় সামান্য একটু খোলা জায়গায় জনা বারো বিরাটকায় বনমানুষ মাটিতে শোয়া একজন সাদা মানুষের নিথর দেহ ঘিরে বসে।

—'মরে গেছে কি?' জিজ্ঞেস করে গাউন।

—'না।' গরগর করে জানাল বনমানুষদের সর্দার উঙ্গো।

একজন বনমানুষী মুখে করে জল এনে ছিটিয়ে দিল লোকটির কপালে। জুথো নাড়া দিল সেই বিশাল লোকটির দেহ।

টারজানের চোখের পলক একটু কাঁপল। তারপর সে চোখ খুলল। ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকাল বনমানুষদের পানে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। দুর্বল হাতখানি তুলে কপালে রাখল। অনুভব করল জমাট রক্ত। সে উঠে বসতে চেষ্টা করল। উঙ্গো তার পিঠে হাত দিয়ে মৃদু ঠেলে বসিয়ে দিল। টারজান দেখল তার সারা গায়ে শুকনো রক্তের ছোপ।

—'উঙ্গো, আমার কি হয়েছিল?' টারজান জিজ্ঞেস করল।

উঙ্গো বলল, 'সাদা মানুষ আগুনের নল ছুঁড়ল। দুম্। টারজান পড়ে গেল। উঙ্গো তাকে নিয়ে পালিয়ে এল।'

—'সাদা মেয়েটি কি হল?'

—'সে ওই সাদা মানুষটার সঙ্গে চলে গেল।'

টারজান বুঝল, সাগুা তার নিজের লোকদের কাছে ফিরে গেছে। নিরাপদে আছে। কিন্তু ওকে গুলি মারল কে? সবাই এখন তার শত্রু। তার নামধারী জোচ্চোরটাই এর জন্য দায়ী। সেই লোকটিকে খুঁজে বের না করা অবধি তার শান্তি নেই।

টারজান চটপট সেরে উঠতে লাগল। গুলিটায় তার মাথা ছড়ে গিয়েছিল তবে হাড় ফুটো হয়নি। একদিন সে উঙ্গোকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার মতো দেখতে আর একজন সাদা মানুষকে দেখেছ কি?'

উঙ্গো আঙুল তুলে বোঝাল—হ্যাঁ, দুবার। আর তার সঙ্গে থাকে কিম্ভূত বনমানুষের দল!

—'কোথায়?'

উঙ্গো হাত ঘুরিয়ে দেখাল জঙ্গলের দিকে। তবে জায়গাটা কোথায় ঠিক বোঝা গেল না। তারপর একদিন টারজান এই বনমানুষদের সঙ্গে যাত্রা করল রুতুরি পর্বতের উদ্দেশ্যে।

সাগুা পড়তে পড়তেও বেঁচে গেল। একটা বনমানুষ ধরে ফেলল তার পায়ের গোছ। মাথা নিচু করে ঝুলতে ঝুলতে সে দেখল, যে বনমানুষটা তার ঘাড়ে পড়েছিল সে আছড়ে পড়ল সিংহদের ডেরায়।

বনমানুষটা সাগুার পা ধরে আছে কিন্তু টেনে তুলতে পারছে না। এভাবে আর কতক্ষণ? সাদা মানুষটির গলা শোনা গেল। 'দড়ি ছুঁড়ে দিচ্ছি। নিজেকে বেঁধে ফেল তাতে। তারপর তোমায় টেনে তুলে নেব।'

দড়ি এসে পড়ল সাগুার হাতের কাছে। তাই দিয়ে সে বেঁধে ফেলল নিজেকে। তারপর একটু একটু করে তাকে টেনে তোলা হল।

লোকটি সাণ্ড্রাকে বলল, 'ওঃ খুব বেঁচে গেছ। তুমি সত্যি সাহসী।'

যে বনমানুষটি পড়ে মারা গেল তার জন্য দুঃখ হল সাণ্ড্রার। লোকটি বলল, 'কি আর করা যাবে। এমন দুর্ঘটনা হয় মাঝে মাঝে। তবে সিংহগুলো আজ পেট ভরে খেল।

ক্রমে পাহাড়ের খাড়াই কমল। ওরা চুড়োয় পৌঁছল। পাহাড়ের চুড়োটা সমতল। কাছেই বন। একটি ঝর্না-ধারা জলপ্রপাত হয়ে লাফিয়ে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। অপূর্ব সেই দৃশ্য।

সাণ্ড্রাকে ঘাসের ওপর শুয়ে বিশ্রাম করতে দেওয়া হল। লোকটি বলল, 'ব্যাস এখন আমরা নিরাপদ। তুমি কাছে থাকলে আমার খুব ভাল লাগে। আনন্দ হয়। কেন বুঝি না? জান, আমি দেবী চাই না। তোমায় এখানে আনতে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল না। আমি বুঝি তুমি আমায় ঘৃণা কর। জান, সুখ কাকে বলে আমি কখনো বুঝিনি।'

সাণ্ড্রা বলল, 'তুমি আমায় নিয়ে এখানে না আসলেও পারতে। তুমি আমার বাবার সাফারি দলের সঙ্গে থাকতে পারতে অনায়াসে।'

—'কিন্তু ডা-গামা যে বলেছে তোমায় আনতে। না আনলে সে ভীষণ চটে যাবে।'

—'তোমার এখানে ফিরে আসার দরকার ছিল না। তুমি কক্ষনো এখানকার মানুষ নও। তুমি আশ্চর্য লোক।'

—'ঠিক বলেছ, আমি অদ্ভুত। হয়তো আমার মাথার ঠিক নেই। হ্যাঁ তাই হবে।'

সাণ্ড্রা বলল, 'তোমার কাজের মাথামুণ্ডু নেই।'

—'কেন?'

—'তুমি আমায় চুরি করেও এত দয়া দেখাচ্ছ। অথচ ঠাণ্ডা মাথায় ওই কালো মেয়েটিকে ফেলে দিলে সিংহের খপ্পরে।'

—'এতে অন্যায় কি হয়েছে? সকল প্রাণীরই খাদ্য দরকার। ওয়ারুতুরিরা মানুষ খায়। সিংহরা ওই ওয়ারুতুরি মেয়েটাকে খেলে কি দোষ? সিংহরা ঈশ্বরের নানান প্রাণীকে হত্যা করে খাও। সিংহরা অন্য প্রাণীকে খাবে না কেন?'

—'কিন্তু ওই মেয়েটা যে মানুষ?'

—'ওই মেয়েটা নিষ্ঠুর নরখাদক। তাকে খেলে কি পাপ হয়? আর তোমরা যখন নিরীহ হরিণ মেরে খাও? তোমাদেরই তো পাপ হয় বেশি।'

—'নাঃ তোমার সঙ্গে আমার মত মিলবে না। আর তার দরকার বা কি?' বলল সাণ্ড্রা।

—'না না দরকার আছে বৈকি। কারণ তোমাকে আমার ভালো লাগে। আমি চাই তুমিও আমায় পছন্দ কর।'

—'তুমি কি ভেবেছ, যে আমায় চুরি করে এনে এই বাজে জায়গায় সারাজীবন আটকে রাখতে চায়, তাকে আমি পছন্দ করব?'

লোকটি বলল, 'আলেমটেজো খারাপ জায়গা নয়। ভারি সুন্দর জায়গা। হয়তো তুমি একদিন আলেমটেজোকে আর আমাকে সত্যি পছন্দ করবে।'

—'কখনো নয়,' মেয়েটি উত্তর দেয়।

লোকটি দুঃখিত ভাবে বলল, 'আমার কোন বন্ধু নেই। ভেবেছিলাম তুমি হয়তো আমার বন্ধু হবে।'

—'কেন, এখানকার লোকেরা?'

—'আমি যে তাদের দেবতা। দেবতার সঙ্গে কি কারও বন্ধুত্ব হয়?'

তারা আবার রওনা দিল বন লক্ষ্য করে। আধমাইল-টাক বনের ভিতর দিয়ে যাবার পর একটা খোলা জায়গায় পৌঁছেই থ হয়ে গেল সাণ্ড্রা। খোলা জায়গার মাঝখানে এক বিরাট দুর্গ। সাণ্ড্রা বুঝল এই দুর্গ পর্তুগিজদের তৈরি। সপ্তম শতকে তৈরি এমনি এক প্রাচীন পর্তুগিজ দুর্গ সে দেখেছে, অ্যাবিসিনিয়ায় বাবার সঙ্গে শিকারে গিয়ে।

অ্যাবিসিনিয়ায় পর্তুগিজদের উপনিবেশ স্থাপন নিয়ে সাণ্ড্রা অনেক পড়াশুনা করেছে। এই লোকটির মুখে শোনা অনেকগুলি নামের বিশেষত্ব তার মনে আসে। রাজা ডা-গামা, প্রধান পুরোহিত রুইজ, বনমানুষ সাঞ্চো আর ফার্নাণ্ডো। এ সবই পর্তুগিজ নাম। সে এক নতুন রহস্যের মুখোমুখি হয়।

*

সাণ্ড্রাকে অপহরণ করার পরদিন ভোরে উঠে ডাটন দেখল যে তাদের দলের অনেকগুলি কুলির পাত্তা নেই। সর্দার কুলি বলল, 'হুজুর, ওরা রাতে পালিয়েছে। ওরা শুনেছে, কাল রাতে এসে টারজান আর তার বনমানুষের দল সাদা মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে। টারজানকে ওদের দারুণ ভয়। তাছাড়া তোমরা নাকি ওয়ারুতুরি নরখাদকদের দেশে যেতে চাও? তাই ওরা ভয় পেয়েছে। হুজুর তোমরাও

যেও না ওদিকে।'

ক্র্যাম্প বলল, 'টারজানকে আমি খতম করে দিয়েছি। আর হাতে বন্দুক থাকলে নরখাদকদের আমি পরোয়া করি না। পুরস্কার আমি ছাড়ছি না। আমি যাব সাণ্ড্রার খোঁজে।'

মিনস্কিরও তাই ইচ্ছে। আর ডাটন তো যাবেই। অগত্যা গ্যাণ্ট্রি সঙ্গে যেতে রাজী হয়। বাকি কুলিদের কোনও রকমে রাজি করিয়ে রওনা দেয় তারা।

সামান্য বিশ্রাম নিয়ে তারা চলতে লাগল। দেশী লোকগুলির মুখে ভয়ের ছাপ, কথা বলছে না মোটে।

বিকেলে একজন উপজাতীয় যোদ্ধাকে পালাতে দেখে ক্র্যাম্প তাকে গুলি করে পেড়ে ফেলল। মৃতদেহটি দেখে সে মন্তব্য করল, 'ওয়ারুতুরি যোদ্ধা। দেখ ওর সুচাঁল ঘষা দাঁত। এরা নরখাদক। কি আশ্চর্য, দেখ, লোকটার গায়ে কতগুলো সোনার গয়না!

কুলিদের ভাব দেখে বোঝা গেল বেশ ভয় পেয়েছে। রাতে তাঁবু ফেলা হোল জঙ্গলে। ভোরে উঠে দেখা গেল সব ক'জন কুলি পালিয়েছে। রয়েছে মাত্র চারজন সাদা শিকারী। হতভাগা কুলিগুলো তাদের অনেক খাবার আর প্রচুর বন্দুকের গুলি, ছুরি, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্রও চুরি করে নিয়ে গেছে।

গ্যাণ্ট্রি বলল, 'আর আমাদের এগোনো উচিত নয়। কুলিরা বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। এই নরখাদকগুলো নর-মাংসের লোভে সব কিছু করতে পারে।'

—'কিন্তু পুরস্কার? আর মিস পিকারেলের কি হবে?'

গ্যাণ্ট্রি বলল, 'এই বিশাল অরণ্যে মিস পিকারেলকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। যদি বা খোঁজ পাই আমরা চার-জনে কি তাকে উদ্ধার করতে পারব?'

ডাটন বলল, 'মিস পিকারেলের খোঁজে আমি যাবই।'

ক্র্যাম্প বলল, 'আমিও যাব।'

গ্যাণ্ট্রি বারণ করল ক্র্যাম্পকে, 'সামান্য কটা টাকার লোভে কি প্রাণটা খোয়াবে?'

ক্র্যাম্প বলল, 'শুধু পুরস্কার নয়। আর একটা উদ্দেশ্যও আছে। কালকের ওয়ারুতুরি যোদ্ধাটার গায়ে দেখেছি কত সোনা। ওকে দেখে একটা জনশ্রুতি মনে পড়েছে আমার। রুতুরি পর্বতে নাকি সোনা পাওয়া যায়। তাল তাল সোনা। ওয়ারুতুরিরা যদি সেই সোনার খনি খুঁজে পায়, আমরা পাব না কেন?'

মিনস্কি বলল, 'তাহলে আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।'

গ্যাণ্ট্রির পক্ষে একা ফেরা সম্ভব নয়। অগত্যা তাকেও যেতে হবে এদের সঙ্গে।

ক্র্যাম্প বলল, 'শুনেছি সেই সোনার ভাণ্ডার পাহারা দেয় দুটি উপজাতি আর হাজার সিংহ।'

মিনস্কি বলল, 'তাহলে ওয়ারুতুরিদের হাতে সোনা আসে কিভাবে?'

ক্র্যাম্প বলল, 'পার্বত্য জাতি দুটির নাকি নুন আর লোহার অভাব। ওরা মাঝে মধ্যে নেমে এসে ওয়ারুতুরিদের কাছ থেকে সোনার বদলে নুন আর লোহা কিনে নিয়ে যায়।'

ডাটন বলল, 'আমার দৃঢ় ধারণা মিস পিকারেলকে রুতুরি পর্বতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তোমরা যদি ওই পথে যাও আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। তাতে দু'পক্ষেরই সুবিধে। কি বল?'

—'ঠিক ঠিক,' জানাল মিনস্কি।

স্থির হল, শিকার করে এখান থেকেই প্রচুর মাংস সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ওই পথে শিকার মেলে না। ভোরে চারজন শিকারে বেরুল—এক একজন, এক এক দিকে। ডাটন গেল পশ্চিমে।

পশুরাজ নুমা ক্ষুধার্ত। বয়স হয়েছে। আজকাল তাই সে আগের মতো জোরে শিকার ধরতে পারে না। সে অনেকক্ষণ ধরে ডাটনের পিছু নিয়েছিল। ঝোপের আড়ালে আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগুচ্ছিল কাছে। লুকিয়ে লক্ষ্য করছিল সাদা শিকারীটির গতিবিধি।

বাতাসে গন্ধ পেয়ে বনভূমির আর এক শিকারীও টের পেয়েছিল ডাটন আর নুমার অস্তিত্ব। এই দু'জনের চাইতে তার বুদ্ধি বা অনুভূতি অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। কৌতূহলী হয়ে গাছের ডালে ডালে ঝুলে সে এগিয়ে যেতে লাগল সাদা শিকারী ও পশুরাজের দিকে।

ডাটন দক্ষ শিকারী নয়। কোনও শিকার তার চোখে পড়ছিল না। খানিক গিয়ে সে বাঁয়ে ঘুরল। যদি এধারে কিছু মেলে। অমনি সিংহটাকে দেখতে পেল। গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে।

ডাটন ভয় পেয়ে গেল। সে কখনো সিংহ শিকার করেনি। ভয়ে সে পিছতে লাগল একটা গাছের দিকে। যদি গাছে ওঠে রক্ষা পাওয়া যায়। গাছটার কাছে গিয়ে ওপরে তাকিয়ে সে বেজায় দমে গেল। সব চাইতে নিচের

ডালটা অন্তত দশ ফুট উঁচুতে। কি করে চড়বে অতখানি? নুমা এবার উঠে দাঁড়াল। গরগর করতে করতে ধীরেসুস্থে এগিয়ে আসতে লাগল ডাটনের দিকে। মরিয়া ডাটন রাইফেল তুলে যথাসম্ভব টিপ করে ঘোড়া টিপল। গুলি খেয়ে মুহূর্তের জন্য বসে পড়ল সিংহটা। তারপর ক্ষিপ্ত পশুরাজ প্রচণ্ড গর্জন করে তীরবেগে ধেয়ে এল।

*

প্রাচীর-ঘেরা আলেমটেজোর দুর্গ দেখে সাণ্ড্রা পিকারেলের মনে আশা জাগল, এরা হয়তো সভ্য জাতি। এদের বুঝিয়ে হয়তো তার মুক্তির ব্যবস্থা সম্ভব হবে।

দুর্গের বাইরে কোনও লোককে দেখা যাচ্ছিল না। সাণ্ড্রার সঙ্গী নকল টারজান তার ছুরির বাঁট দিয়ে আঘাত করল বন্ধ ফটকে। দুর্গপ্রাকার থেকে উঁকি দিল একজন—'কে? ও—দেবতা আপনি!'

—'হ্যাঁ,' উত্তর দিল সাণ্ড্রার সঙ্গী, 'ফটক খোল। আর ক্রিস্টোফোরো ডা-গামাকে গিয়ে খবর দাও যে আমি এক-জন দেবী নিয়ে ফিরে এসেছি।'

দুর্গের ফটক খুলে গেল। ভিতরে প্রকাণ্ড চত্বরে প্রবেশ করল সাণ্ড্রা আর লোকটি। সঙ্গী বনমানুষের দল তখন ফিরে গেল পিছনের বনে।

কয়েকজন সৈনিক নজরে এল। তাদের রং তামাটে, মাথায় সোনার শিরস্ত্রাণ, গায়ে সোনার বর্ম, নিম্নাঙ্গ খালি, পায়ে অদ্ভুত আকৃতির জুতো। তাদের কোমরে বর্শা, কুড়ুল, হাতে মান্ধাতা আমলের গাদা বন্দুক। অবশ্য ওসব বন্দুকের গুলি নেই গত চারশো বছর।

চত্বরের একধারে বাগানে কাজ করছিল কিছু মেয়ে-পুরুষ। এরাও তামাটে বর্ণ। পুরুষদের গায়ে চামড়ার জামা, মস্ত কানাওলা টুপি। মেয়েদের ঊর্ধ্বাঙ্গ খালি। কোমর থেকে জড়ানো শুধু একখণ্ড বড় কাপড়। সাণ্ড্রা ও তার সঙ্গীকে দেখে তারা নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাল।

সাণ্ড্রা হতভম্ব। এরা কি সত্যি এই লোকটাকে দেবতা ভাবে! এরা কি সবাই পাগল? দুর্গের ভিতরে দেখা গেল আলখাল্লা পরা কিছু পুরুষ। তাদের গলায় পুঁতির মালায় ক্রুশ ঝুলছে। এরা হয়তো পুরোহিত। এক মস্ত ঘরে ঢুকল সাণ্ড্রারা, দেখে মনে হয় রাজদরবার। কক্ষের এক প্রান্তে মঞ্চ। তার ওপর তিনটে সিংহাসন।

সন্ন্যাসীরা সাণ্ড্রাদের নিয়ে গেল মঞ্চে। গাদাগাদা মেয়েপুরুষ ঢুকছে দরবার কক্ষে। তারা নত হয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে সাণ্ড্রা এবং সেই লোকটিকে। মঞ্চে সাণ্ড্রাকে বসানো হোল, বাঁ দিকের সিংহাসনে। সেই লোকটি বসল ডান ধারের সিংহাসনে। মাঝের আসনটি রইল ফাঁকা।

বেজে উঠল শিঙ্গার আওয়াজ। ঘরের একপ্রান্তে একটা দরজা গেল খুলে। শোভাযাত্রা ঢুকল সেই পথে। শোভাযাত্রার শেষ মাথায় একজন মোটাসোটা লোক। মাথায় তার সোনার মুকুট। পিছনে দুসারি সৈনিক।

মুকুটপরা লোকটি মঞ্চে এসে সিংহাসনে বসা সাণ্ড্রা ও সেই লোকটিকে নতজানু হয়ে নমস্কার জানাল। তারপর বসল মাঝের সিংহাসনে।

আবার শিঙ্গা বাজল। ফের ঘরে ঢোকে এক শোভা-যাত্রা। তাদের সামনে কালো আলখাল্লা ও টুপি পরা এক ব্যক্তি। তার গলায় পুঁতির মালায় লাগানো ক্রুশ। তার রং ঢের কালো। চেহারা ইহুদিদের মতন। বাজপাখির মতন বাঁকা নাক। ওই নিশ্চয় প্রধান পুরোহিত রুইজ। রুইজের পিছনে এল রাজার সাত স্ত্রী। রাজার স্ত্রীরা বসল মঞ্চে রাজার পায়ের কাছে। আর রুইজ দাঁড়াল মঞ্চের নিচে, জনতার দিকে মুখ করে।

সে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বান্টু ও পর্তুগিজ মেশানো ভাষায় বলল যে এবার আমরা দেব-দেবী দুই-ই পেলাম। এবার থেকে আমাদের সৌভাগ্যের সূচনা হবে।

এরপর রুইজ শুরু করল নানা রকম বিচিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান—মন্ত্র পড়া, হাত নাড়া। পুড়ছে কড়া গন্ধের কোনও ধূপ। ধোঁয়া উঠছে। মাঝে মাঝে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছে বুকে।

সাণ্ড্রা বুঝল যে এরা নামে খৃষ্টান হলেও, আচার-আচরণে প্রকৃত খৃষ্টানের কোনো লক্ষণ নেই। বরং এদেশী অসভ্য জাতির কুসংস্কারের প্রভাবই বেশি। জনতার সম্ভ্রম-ভরা দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। সাণ্ড্রা অবাক হল এদের কাছে এত সোনা এল কোত্থেকে? নকল টারজান এবং রুইজ ছাড়া নারী-পুরুষ সবারই অঙ্গে গাদা গাদা সোনার আভরণ। রাজার সাত রানী তো সোনার গয়নার ভারে ঝুঁকে পড়েছে। ঘরে প্রচুর সোনার পাত্র। সাণ্ড্রার একঘেয়ে লাগছিল। তার চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে। হঠাৎ চিৎকার শুনে চটক ভাঙল।

সে দেখল, নাচতে নাচতে ঢুকছে একদল মেয়ে। তাদের পিছনে দু'জন সৈনিক টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে বছর বারোর একটি নিগ্রো মেয়েকে। পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে

মেয়েটা। সজোরে ঢাক বাজতে লাগল। মেয়েটিকে এনে চেপে ধরা হল রুইজের সামনের বেদীতে।

প্রধান পুরোহিত অদ্ভুত কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। তারপর বের করল একটা ছুরি। ভীত নিগ্রো মেয়েটি ভেঙে পড়ল কান্নায়। ঝলসে উঠল রুইজের হাতের ছুরি। আমূল বিদ্ধ হল মেয়েটির বুকে। এই ভীষণ দৃশ্য দেখে মূর্চ্ছিত হল সাণ্ড্রা।

*

সিংহটা আক্রমণ করতেই ডাটন ফের গুলি করল। কিন্তু ফসকাল। হঠাৎ যে গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল ডাটন তারই ডাল থেকে একজন নেংটি পরা মানুষ লাফিয়ে পড়ল সিংহটার পিঠে। এক হাতে সে জড়িয়ে ধরল সিংহের গলা। প্রচণ্ড বলে হাঁটু দিয়ে দুপাশ থেকে চেপে ধরল সিংহের পেটের কাছটা। যেন ঘোড়ায় চড়ে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের লম্বা ছুরিখানা দিয়ে সে বারবার আঘাত করতে লাগল সিংহের দেহে। সিংহটার মতনই গর্জাতে লাগল মানুষটি।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত ডাটন ওই মানুষটিকে সাহায্য করতে সিংহকে গুলি মারতেও পারল না, পাছে তা লোকটির গায়ে লাগে। সে থ হয়ে দেখতে লাগল এই অদ্ভুত যুদ্ধ।

সিংহ প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে পিঠের মানুষটাকে। কিন্তু পারল না। অবশেষে গুলি এবং ছুরির আঘাতে আহত সিংহটার বিক্রম স্তিমিত হয়ে এল। থরথর করে কেঁপে সে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল। এরপরই সেই আশ্চর্যদর্শন শ্বেতাঙ্গটি তার পরাজিত মৃত শত্রুর দেহের ওপর এক পা তুলে দিয়ে প্রচণ্ড জোরে এক হাঁক দিল—বিচিত্র টানা সুরে। ডাটন জানত না যে এই হাঁক হচ্ছে যুদ্ধে জয়ী পুরুষ বনমানুষের বিজয় হুংকার। তারপর লোকটি ডাটনের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি তো পেলহাম ডাটন?'

—'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?'

—'আমি তোমায় আগে দেখেছি। আর যে মেয়েটিকে তুমি খুঁজছ তার কাছেও তোমার বর্ণনা শুনেছি।'

—'তুমি কে?' প্রশ্ন করে ডাটন।

উত্তর হোল, 'আমি বনমানুষদের ছেলে টারজান।'

—'কোনজন?'

—'টারজান একজনই আছে।'

লোকটির কপালে ক্ষতচিহ্ন দেখে ডাটন বলল, 'বুঝেছি, তুমি মিস পিকারেলকে উদ্ধার করেছিলে। তোমাকেই গুলি করেছিল ক্র্যাম্প।'

—'ও ক্র্যাম্প বুঝি গুলি করেছিল আমায়?'

—'ক্র্যাম্প ভেবেছিল তুমিই মিস পিকারেলকে চুরি করেছিলে।'

—'হুঁ, ও পুরস্কার আর প্রতিশোধের কথা ভেবেছে। ও খারাপ লোক। ওকে আমি ঠিক বাগে পাব। তুমি এখানে একা একা কি করছ?'

—'শিকার করছিলাম,' জানাল ডাটন, 'আমাদের কুলিরা পালিয়েছে। মাংস চাই। সবাই শিকারে বেরিয়েছি।'

—'অন্যরা কারা? ক্র্যাম্প, মিনস্কি আর গ্যাণ্টি বুঝি?'

—'তুমি ওদের নাম জানলে কি ভাবে!'

—'সেই মেয়েটি আমায় বলেছে। সে বলেছিল, একমাত্র তোমাকেই বিশ্বাস করা যায়।'

—'ঠিক। ওদের তিনজনকে আমিও বিশ্বাস করি না।'

—'মিস পিকারেল কোথায়?' জিজ্ঞেস করে টারজান।

—'তাকে আবার চুরি করে নিয়ে গেছে। একজন শ্বেতাঙ্গ আর তার সহচর বনমানুষের দল। ওই লোকটাই বোধ হয় নিজেকে টারজান বলে পরিচয় দেয়।'

—'তোমরা কি মিস পিকারেলের খোঁজে বেরিয়েছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে তো দেখছি আমরা একই পথের পথিক। আমিও সেই নকল টারজানের খোঁজে চলেছি। আমি তাকে ধ্বংস করব।'

ডাটন বলল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে?'

—'না। তোমাদের সঙ্গীদের আমার পছন্দ নয়। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যে আফ্রিকার জঙ্গল সম্বন্ধে দক্ষ তোমার তিন সঙ্গীই সামান্য কটা টাকার জন্য এরকম বিপদের মুখে চলেছে! কেন? মাত্র চারজনের পক্ষে এ কাজ অসম্ভব।'

—'ওদের আর একটা উদ্দেশ্যও আছে,' বলল ডাটন, 'রুতুরি পর্বতে নাকি সোনার খনি আছে। ওরা সেই সোনা খুঁজে বের করতে চায়।'

—'থাকতে পারে কিন্তু সেই সোনার কাছে ওরা কখনোই পৌঁছতে পারবে না।'

—'তুমি যে একা একাই রুতুরি পর্বতে যেতে চাইছ? আমরা চারজন যদি না পারি তুমি একা পারবে কি করে?'

উত্তর হল,'আমি পারব। কারণ আমি হচ্ছি টারজান।'

ডাটন টারজানকে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই। তুমি যদি মিস পিকারেলের হরণকারীকে ধরতে পার, আমিও মিস পিকারেলকে ফিরে পেতে পারি। আমার সঙ্গীদের ওপর ভরসা নেই। যদি সোনার খনি পেয়ে যায় আর ওরা মিস পিকারেলের খোঁজ করবে না।'

—'তা ঠিক।'

—'তাহলে আমাকে তোমার সঙ্গে নাও,' বলল ডাটন।

—'তোমার সঙ্গীরা যদি তোমায় খোঁজে?'

—'খুঁজবে না। আমায় তাদের কোন দরকার নেই। ভাববে দুর্ঘটনায় পড়েছি।'

—'বেশ যদি আমাদের মতো চলতে পার আমার সঙ্গে এস। তোমাকে বনের পশুর মতনই ব্যবহার করতে হবে। তারা বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। খাদ্যের প্রয়োজনে অথবা আত্মরক্ষা ছাড়া জীব হত্যা করে না। মিথ্যা কথা বলে না।'

'তুমি দেখছি বনের পশুদের কথা খুব ভাব।'

—'সেটা স্বাভাবিক। কারণ আমি আজন্ম বনেই লালিত। বড় হবার আগে আমি মানুষ দেখিনি। জানতাম না আমার মতো আরও কেউ আছে। তারও পরে দেখি শ্বেতাঙ্গ মানুষ।'

—'তোমার বাবা-মা?'

—'তারা আমার জন্মের পরেই মারা যায়।'

ডাটন বলল, 'মানুষ সম্বন্ধে আমিও অনেক সময় এই রকম ভাবি। আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমার ক্যাম্পে ফেরার দরকার নেই।'

টারজানকে অনুসরণ করে চলল ডাটন। সরু এক নদীর ধারে অল্প খোলা জায়গায় উপস্থিত হল তারা। ডাটন সভয়ে দেখল দশ-বারোটা বিশাল বনমানুষ সেখানে বসে। তারা গর্জন করে উঠল। টারজান এগিয়ে গিয়ে অদ্ভুত ভাষায় তাদের সঙ্গে কি জানি কথা বলতে, তারা শান্ত হল। টারজান ডাটনকে বলল, 'এস ভয় নেই। তোমাকে ওদের শুঁকতে দাও। আমি বলেছি তুমি আমার বন্ধু। তবে বেশি কাছে ঘেঁষ না।'

বিশাল বনমানুষরা এসে ডাটনের গা শুঁকল। একজন হঠাৎ ছিনিয়ে নিল তার রাইফল। টারজান ফের অজানা ভাষায় তাদের কিছু বলতে, তখনি ফিরিয়ে দিল সেটা। টারজান বলল, 'ওরা আগ্নেয়াস্ত্র দেখতে পারে না। ওদের বলেছি, এই অস্ত্রটি শুধু খাবার জন্য শিকার করতে আর আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে। মনে রেখ।'

ক্ষুধার্ত ডাটনের জন্য খাবার যোগাড় করতে বনে ঢুকল টারজান।

খানিক বাদে বেরিয়ে এল, কাঁধে মৃত এক হরিণছানা। তারই একটা পা কেটে ডাটনকে দিয়ে বলল, 'আগুনে ঝলসে নাও।'

বাকি মাংস ছুরি দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে টারজান বিললো বনমানুষদের মধ্যে। বনমানুষরা সাধারণতঃ নিরামিষাশী। তবে কখনো কখনো মাংস খায়। ডাটন স্তম্ভিত হয়ে দেখল, টারজান সেই পশুদের সঙ্গে বসে কাঁচা মাংস চিবোচ্ছে। তাদেরই মতো গরগর করছে। খাওয়ার পর টারজান ডাটনকে বলল, 'এখানে শুয়ে ঘুমোও। বিপদ দেখলে বনমানুষরা তোমায় সতর্ক করে দেবে। আমি ঘুরে আসছি।'

ক্র্যাম্প, মিনস্কি ও গ্যাণ্ট্রি তাঁবুতে ফিরে এল। গ্যাণ্ট্রি বলল, 'ডাটন ফেরেনি যে!'

ক্র্যাম্প বলল, 'ও চুলোয় যাক। না ফিরলেই ভাল। ওকে আমাদের দরকার কি?'

মিনস্কিরও দেখা গেল তাই মত।

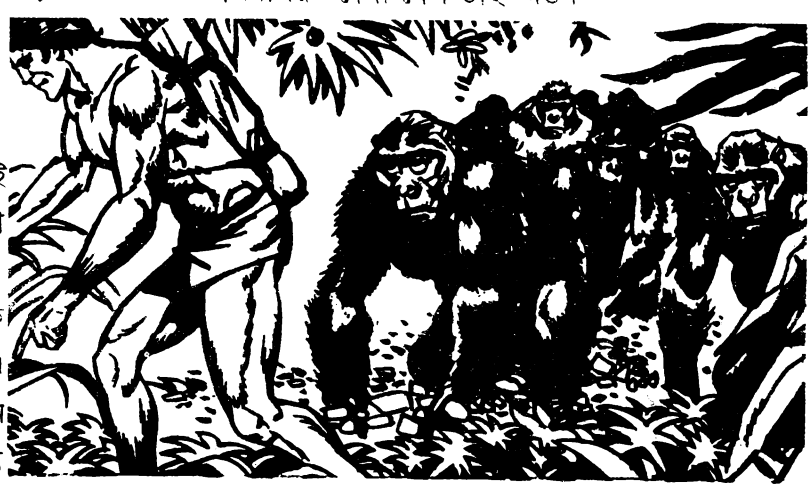

গ্যাণ্ট্রি বলল, 'বিকেলে তোমরা একটা চিৎকার শুনেছিলে কি?'

ক্র্যাম্প বলল, 'হ্যাঁ কেমন যেন চেনা চেনা—'

গ্যাণ্ট্রি বলল, 'স্থানীয় লোকরা বলে পুরুষ বনমানুষরা শিকার করে নাকি ঐ রকম চিৎকার দেয়।'

গ্যাণ্ট্রি আর মিনস্কি শুয়ে পড়ল আগুনের পাশে। ক্র্যাম্প পাহারায় রইল। ওরা পালা করে পাহারা দেবে ও বিশ্রাম করবে।

ক্র্যাম্প বসে ভাবছিল পুরস্কার এবং সোনার খনির খোঁজ পেলে কি করব? আচমকা জঙ্গলের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'ফিরে যাও তোমরা। যদি প্রাণের মায়া থাকে ফিরে যাও নিজেদের দেশে। যাও ফিরে।'

ধড়মড় করে উঠে বসল গ্যাণ্টি ও মিনস্কি। সভয়ে ফিসফিস করল. 'ও কার গলা? কে?'

*

জ্ঞান ফিরতে সাণ্ড্রা দেখল যে সে একটা চামড়া-ঢাকা কৌচের ওপর শুয়ে আছে। প্রধান পুরোহিত রুইজ ঝুঁকে আছে তার ওপর। কি সব মন্ত্র পড়ছে। পাশে দাঁড়িয়ে চারজন দেশী মেয়ে ও একটি বছর-কুড়ির ছেলে, ভীত চোখে দেখছে তাকে। সে চোখ খুলতেই তারা নতজানু হয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল।

রুইজ বলল, 'আমি দেবীকে স্বর্গ থেকে ফিরিয়ে এনেছি। তোমরা ভাল করে ওর পরিচর্যা কর।' এই বলে অভিবাদন করে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সাণ্ড্রা নতজানু দেশী লোকগুলিকে সোয়াহিলিতে বলল, 'উঠে দাঁড়াও।' তারা উঠে দাঁড়ালে জিজ্ঞেস করল সাণ্ড্রা, 'কে তোমরা?'

—'আপনার ক্রীতদাস।'

—'তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

—'আজ্ঞে আমাদের মারবেন না। আমরা আপনার যথাসাধ্য সেবা করব।'

—'আমি তোমাদের মেরে ফেলব কেন?'

—'আজ্ঞে প্রধান পুরোহিত কত দেশী লোককে মেরে ফেলে আলেমটেজোর রক্ষকদের খেতে দেয়। দেবী হয়তো আরও বেশি মারবেন।'

—'তোমাদের ভয় নেই। তোমার নাম কি?' ছেলেটিকে প্রশ্ন করে সাণ্ড্রা।

—'কিয়োমিয়া, কিভাবে আপনার সেবা করব বলুন?'

সাণ্ড্রা উঠে বসে দেখল ঘরখানা বেশ বড়। আসবাব খুব কম। একটি টেবিল ও কয়েকখানা বেঞ্চি রয়েছে মাত্র। মেঝে মোষ ও সিংহের চামড়ায় ঢাকা। ছোট ছোট জানালা। ঘরের কোণে ধুনি জ্বলছে।

সাণ্ড্রা বলল, 'কিয়োমিয়া, আমার চানের ব্যবস্থা কর, পোষাক আর খাবার চাই। আমার খিদে পেয়েছে।'

ক্রীতদাসরা এমন অবাক হয়ে তাকাল যেন দেবীর আবার খিদে কি? যাহোক তারা বেরিয়ে গেল।

একটু বাদে তিনটি মেয়ে সাণ্ড্রাকে পাশে স্নানের ঘরে নিয়ে গিয়ে গরম জলে ভাল করে চান করাল, চুল আঁচড়ে দিল। কিয়োমিয়া নিয়ে এল পোষাক। মেয়েরা তাকে পোষাক পরিয়ে দিল। নরম চামড়ার পোষাকের ওপর পরালো সোনার সুতোয় তৈরি জামা, সোনার ফিতে দেওয়া জুতো। দেবীর পোষাকই বটে।

খেতে বসল সাণ্ড্রা। টাটকা ফল নানা রকম এবং মাংসের স্টু। পরিবেশন করল ক্রীতদাস-দাসীরা। সাণ্ড্রার খাওয়া শেষ হতেই শিঙ্গা বাজল এবং রাজা ডা-গামা ঘরে ঢুকল।

সাণ্ড্রা উঠল না। রাজা নিচু হয়ে অভিবাদন করল তাকে।

সাণ্ড্রা গম্ভীর স্বরে বলল, 'তুমি বসতে পার।'

হুকুমের সুর শুনে রাজা একটু অবাক হয়ে সামনের বেঞ্চে বসল। তারপর ক্রীতদাসদের আদেশ দিল ঘর ছেড়ে চলে যেতে।

সাণ্ড্রা বলল, 'না, কিয়োমিয়া থাকবে।'

রাজা বিরক্তভাবে বলল, 'বেশ।'

বেচারা কিয়োমিয়া ঘামতে লাগল ভয়ে। কার কথা মানি? রাজা না দেবী? ডা-গামা বলল, 'আপনার সব ব্যবস্থা হয়েছে তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'দেবতা আপনাকে কোথায় পেয়েছেন?'

—'দেবীকে কোথায় পাওয়া যায় জান না?'

—'হয়তো উনি ঠিকই বলেছেন।'

—'কি বলেছে?'

—'আপনি নাকি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন!'

—'দেবতাই জানে।'

—'আপনি খুব সুন্দরী। আপনার নাম কি?'

—'আমার নাম সাণ্ড্রা। তবে তুমি আমাকে দেবী বলে ডাকবে। কেবল মাত্র দেবতা আমায় নাম ধরে ডাকতে পারে।'

—'রাগ করবেন না। আমি হচ্ছি রাজা। আপনি আমায় ক্রিস বলে ডাকতে পারেন।'

—'না,। আমি তোমায় ডা-গামা বলেই ডাকব। এই নামটা পেলে কোথায়?'

—'আমার নাম ক্রিসটোফোরো ডা-গামা। আমার

পূর্বপুরুষ ভাস্কো-ডা-গামার ভাই প্রথম ক্রিসটোফোরো-ডা-গামা।'

—'কি করে জানলে?'

—'আলেমটেজোর ইতিহাসে লেখা আছে।'

সাগুা বলল, 'আমি শুনেছি ভাস্কো-ডা-গামার ভাই ক্রিসটোফোরো চারশো বছর আগে মুসলমানদের হাতে পরাজিত ও নিহত হয়।'

—'ভুল শুনেছ। ক্রিসটোফোরো অর্ধেক সৈনিক নিয়ে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নেয়। তাদের বংশধররা এখানে এই দুর্গ বানায়। ক্রীতদাস রাখে। মুসলমানরা তাড়া করে এসে আস্তানা নিয়েছিল এই উপত্যকার অন্য পাশে। তাদের সঙ্গে আজও আলেমটেজোর মাঝে মাঝে যুদ্ধ হয়।'

—'আলেমটেজো নামটা যেন চেনা চেনা,' বলল সাগুা।

—'ওই দেশ থেকে আমার পূর্বপুরুষ এসেছিল।'

—'হুঁ মনে পড়েছে। আলেমটেজো পর্তুগালের একটা প্রদেশ।'

—'পর্তুগাল! নামটা আমাদের ইতিহাসে পেয়েছি। আমার ইচ্ছে করে দিগ্বিজয়ে বেরুই। পর্তুগালটাও জয় করি। কিন্তু ওসব দেশের খাওয়া কি আমার সহ্য হবে? এই আলেমটেজো চমৎকার দেশ।'

—'ঠিকই। আচ্ছা সেই মুসলমানদের জয় করতে পেরেছ?'

—'না। তাছাড়া সবাইকে জয় করলে যুদ্ধ করব কার সঙ্গে?'

সাগুা বলল 'ঠিক আছে, এবার তুমি যেতে পার।'

রাজা বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'এখন যাচ্ছি, তবে পরে আসব। আমাদের নিশ্চই খুব বন্ধুত্ব হবে।'

রাজা সাগুার ঘর থেকে বেরনো মাত্র রুইজের মুখোমুখি হোল। প্রধান পুরোহিত বলল, 'এখানে তুমি কি করছিলে ক্রিস?'

ডা-গামা রেগে বলল, 'তোমার কি? আমি রাজা। আমি যেখানে খুশি যাব।'

—'ক্রিস্, খবরদার। ওই মেয়েটার ওপর তুমি নজর দেবে না।'

ডা-গামা আরও রেগে বলল, 'আমি রাজা। দেব-দেবীর সঙ্গে আমার সমান সম্মান।'

—'বাজে কথা। তুমি ভাল করেই জান, ওই লোকটা দেবতা নয়। এই মেয়েটাও দেবী নয়। লোকটা কিভাবে আকাশ থেকে পড়ল কে জানে? কিন্তু ও আমাদেরই মতন নশ্বর। বুঝেছি, তুমি ওই লোকটাকে দেবতা বানিয়ে তোমার তাঁবে রেখে রেখে চার্চের ওপর কর্তৃত্ব করতে চাও। কারণ চার্চের ওপর যার কর্তৃত্ব সে-ই দেশের আসল শাসক। তবে মনে রেখ লোকে ওদের দেব-দেবী বলে বিশ্বাস করছে। আমি যদি তাদের বলি যে তুমি দেবীর ক্ষতি করেছ, ওরা তোমায় ছিঁড়ে ফেলবে। মনে রেখো অনেকের মতে ডা-সেরা তোমার চাইতেও ভাল রাজা হতে পারে।'

ডা-গামা সতর্কভাবে বলল, 'আঃ আস্তে। ঠিক আছে পেড্রো, ঝগড়া নয়। আমাদের দুজনেরই একই অভিসন্ধি। তবে তুমিও জেন ডা-সেরা রাজা হলে, পেড্রো রুইজ মরবে এবং কোয়েসা ডা প্রধান পুরোহিত হবে। এমনকি আমার রাজত্বেও সে প্রধান পুরোহিত হয়ে যেতে পারে।'

রুইজ গোমড়া মুখে কোনও রকমে হাসি টেনে বলল, 'ঠিক আছে, আর ঝগড়া নয়। আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছিলাম। তবে তুমি যখন রাজা, তুমি কি আর অন্যায় করতে পার?'

সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শোনার পর রাতে গ্যাণ্ট্রির ভা. ঘুম হল না। সকালে সে ক্র্যাম্প আর মিনস্কিকে বলল, 'ও গলা কার মনে হয়? সোয়াহিলিতে বলল বটে কিন্তু দেশী লোকের গলা নয়। ও গলা কোন মানুষের বলে মনে হল না আমার।'

ক্র্যাম্প ধমকায়, 'বাজে বক না, চল আমরা রওনা দিই।'

গ্যাণ্ট্রি বলল, 'আমি রুতুরি পর্বতের দিকে যাচ্ছি না। আমি ফিরে যাব।'

ক্র্যাম্প বলল, 'ভীতু কোথাকার। ভালই হল, পুরস্কারের ভাগিদার কমল। যাও কেটে পড়।'

গ্যাণ্ট্রি দক্ষিণ দিকে ফিরে চলল। যেতে যেতে ফিরে তাকাল সঙ্গীদের পানে। সে জানত না এই তার শেষবারের মতন শ্বেতাঙ্গ মানুষের মুখদর্শন। কারণ দুদিন বাদেই ওয়ারুতুরিদের নরমাংস ভোজ উপলক্ষ্যে দামামা ধ্বনি শুনে বোঝা গেল তার ভাগ্যে কি ঘটেছে।

*

টারজান চলে যাওয়ার পর ডাটনের ঘুম এল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল যে এই টারজানই সাগুাকে

অপহরণ করেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে ও ভাব জমাচ্ছে কেন? হয়তো আমাকেও বন্দী করে মুক্তিপণ আদায় করতে চায়। টারজানকে সে আর বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভাবল 'আমি একাই যাই। রুতুরি পর্বতে গিয়ে খুঁজে দেখি। টারজান লোকটা হয়তো পাগল। ওর আগেই আমায় রুতুরি পাহাড়ে পৌঁছতে হবে। এই সুযোগ।' ডাটন উঠে পড়ে নিঃশব্দে ঢুকে গেল বনে। দু'একটি বনমানুষ তা দেখেও মাথা ঘামাল না।

একটু বাদেই ফিরে এল টারজান। ডাটনকে না দেখে সে জিজ্ঞেস করল বনমানুষদের। দুজন বনমানুষ ডাটনকে চলে যেতে দেখেছিল। তার বেশি কিছু জানে না তারা। টারজান চিৎকার করে ডাকল ডাটনের নাম ধরে। কোনও সাড়া এল না।

দ্রুত চলেছে ডাটন। টারজানের আগে রুতুরি পর্বতে পৌঁছে উদ্ধার করতে হবে সাণ্ড্রাকে। কিন্তু ডাটন কখনো একলা চলে নি আফ্রিকার অরণ্যে। বনের মধ্যে চলার কায়দা মোটেই জানে না।

বনে চলতে হয় যথাসম্ভব নিঃশব্দে। যাতে শত্রুরা টের না পায় অথচ তাদের আওয়াজ শোনা যায়। যেতে যেতে ডাটন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ভাবে শিস দিচ্ছিল, গুনগুন করছিল। হঠাৎ তাকে ঘিরে ধরল একদল জংলী যোদ্ধা। তাদের গায়ে প্রচুর সোনার গয়না। আর তাদের ছুঁচাল দাঁত দেখে ডাটন বুঝতে পারল এরা ওয়ারুতুরি নরখাদক। সে রাইফল তোলার আগেই একজন জংলী ছিনিয়ে নিল সেটা। তার দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে বর্শার খোঁচা দিতে দিতে তাকে নিয়ে চলল, যে পথে সে এসেছিল।

ডাটনের ক্ষীণ আশা জাগল, হয়তো টারজানও এই পথে আসবে। যদি তাকে উদ্ধার করে! সাণ্ড্রাকেও তো ও একবার উদ্ধার করেছিল ওয়ারুতুরিদের কবল থেকে। কিন্তু বড় রাস্তা থেকে ওয়ারুতুরিরা বাঁয়ে একটা শুঁড়ি পথে মোড় ফিরতেই ডাটনের সব ভরসা উবে গেল।

যে ওয়ারুতুরি ডাটনের রাইফলটা কেড়ে নিয়েছিল যেতে যেতে সে সেটা নিয়ে ক্রমাগত টেপাটেপি করছিল। হঠাৎ বন্দুকের ঘোড়া টিপতেই গুলি ছুটল। এবং সামনের ওয়ারুতুরি যোদ্ধার পিছন থেকে হৃদ্‌পিণ্ড ফুঁড়ে গুলি বেরিয়ে গেল।

এই দুর্ঘটনার ফলে থামল দলটা। মৃত লোকটির ভাই ভীষণ চটে ডাটনকে খুন করতে যাচ্ছিল। সর্দার তাকে আটকালো। কারণ শিকারকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে, জ্যান্ত হাঁটিয়ে গ্রামে নিয়ে যাওয়া ঢের সোজা। দলের যে লোকটি মারা পড়েছে তাকেও তারা নিয়ে চলল বয়ে। একটা ডালা বানিয়ে, তার ওপর চাপিয়ে। নিজের লোকও যখন মারা যায় তার মাংস এরা নষ্ট করে না, খিদে মেটায়। ডাটনের হাত খুলে তাকেও লাগিয়ে দেওয়া হল শবদেহ বহন করার কাজে।

*

রাজা বিদায় নেবার পরের দিন বিকেলে সাণ্ড্রা কিয়োমিয়ো আর দুজন রক্ষী নিয়ে দুর্গের বাইরে বেড়াতে বেরোলো। দুর্গের বাইরে অনেক খড়ের ঘর। সেখানে থাকে সাধারণ লোকেরা এবং সৈনিকরা। সাণ্ড্রাকে দেখেই তারা নতজানু হয়ে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছিল।

এক জায়গায় ঘেরার মধ্যে কিছু মোষ ছিল। সাণ্ড্রা অবাক হল। কারণ সে জানত আফ্রিকার বুনো মোষ পোষ মানে না। কিয়োমিয়ো বলল, 'এগুলো যুদ্ধের মহিষ। আলেমটেজোর লোকে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে এদের লেলিয়ে দেয়। আরও মোষ আছে। তাদের চরাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—'এই মুসলমানরা কারা?' জিজ্ঞেস করে সাণ্ড্রা।

—'আমি তাদেরই জাতের ছেলে,' বলল কিয়োমিয়ো, 'পাশের পাহাড়ে আমাদের গ্রাম। আমার বাবা খুব বড়লোক। আমরা আসলে গালা। কেন যে এরা আমাদের মুসলমান বলে! আমাদেরও যোদ্ধা মহিষ আছে। আমরা মাঝে মাঝে এখানে আক্রমণ করি। সেই সময় একবার আমি ধরা পড়ি। তারপর আমায় ক্রীতদাস করে রেখেছে। আমাদের দু'দলেরি মোষ খুব উপকার করে। যুদ্ধ করে। ওদের দুধ খাই, মাংস খাই।'

কিয়োমিয়ো আরো বলল যে, এই উপত্যকার ওধারে পাহাড়ে সোনার খনি আছে। তাল তাল সোনা মেলে সেখানে। আলেমটেজোর বেশি সোনা নিতে পারে না। কারণ এরা সেখানে গেলেই আমরা ওদের আক্রমণ করি। খনিগুলো আমাদের গ্রামেরই কাছে।

সন্ধ্যে বেলা কেউ সাণ্ড্রার ঘরে টোকা দিল। কে? টোকা দিয়ে তো কেউ ঘরে ঢোকে না এখানে। সাণ্ড্রা আসতে বলায় ঘরে ঢুকল দেবতা নামধারী লোকটি।

দেবতা চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'আশা করি তুমি ভালই আছ?'

—'হ্যাঁ শুধু যদি আমায় এরা একলা থাকতে দেয়।' উত্তর দেয় সাগু্রা।

—'মানে?'

আগের দিন দুষ্ট উদ্দেশ্যে আগমনের কথা সাগু্রা বলল।

লোকটি রেগে বলল, 'ওটা শয়তান। তোমায় এখানে এনেছি বলে আমায় মাফ কর। জানি না কেন আমি ওর হুকুম পালন না করে থাকতে পারি না! ঠিক আছে, আমি তোমাকে রক্ষা করব। তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাব এখান থেকে।'

লোকটি বিদায় নিল। সাগু্রা বুঝল এখন ওর ওপর ডা-গামার প্রভাব অনেকখানি কেটে গেছে। প্রথমে সে এই লোকটিকে ঘৃণা করত। এখন মনে হোল, লোকটি তত খারাপ নয়। ওর কাছে সে কতদিন বন্দী অবস্থায় ছিল। কিন্তু সে কোনও খারাপ ব্যবহার তো করেনি।

দেবতা সাগু্রার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলল। দুর্গের এই অংশেই বারান্দার শেষ প্রান্তে তার ঘর। যেতে যেতে সে দেখল, রুইজ সাগু্রার ঘরের দিকে যাচ্ছে।

সাগু্রা শোবার জন্য তৈরি হয়েছে। হঠাৎ ঘরে ঢুকল প্রধান পুরোহিত।

—'কি চাও?' খেঁকিয়ে উঠল সাগু্রা, 'অনুমতি না নিয়ে আমার ঘরে ঢুকবে না।'

শয়তানি হাসি ফুটল রুইজের মুখে। বলল, 'ওই দেবতা যদি তোমার ঘয়ে আসতে পারে, প্রধান পুরোহিত এলে কি দোষ?'

—'বেরিয়ে যাও,' ধমকাল সাগু্রা।

—'রাগ কর না। তুমি যদি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর, তুমি যা চাও তাই পাবে। আমরা দু'জনে এই রাজ্যের অধীশ্বর হোব।'

—'বেরিয়ে যাও,' ফের বলল সাগু্রা।

পুরোহিত এসে চেপে ধরল তার হাত। 'কিয়োমিয়া আমায় বাঁচাও,' চেঁচিয়ে ওঠে সাগু্রা।

মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে ছুটে এল কিয়োমিয়া। পুরোহিত তাকে হাতের এক ঘায়ে ফেলে দিল। ফের সে লাফিয়ে উঠে আক্রমণ করল পুরোহিতকে। রুইজ এবার সাগু্রাকে ছেড়ে দিয়ে চকিতে ছুরি বের করে বসিয়ে দিল কিয়োমিয়ার বুকে। সে ধরাশায়ী হোল।

এই সুযোগে সাগু্রা পালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাইরে বেরোবার আগেই তাকে আবার ধরে ফেলে রুইজ। টানতে টানতে নিয়ে এল ঘরের ভিতরে। অসহায় সাগু্রা প্রাণপণে বাধা দিতে থাকে। চিৎকার করে। ঠিক তখুনি ঘরের দরজাটা খুলে গেল।

*

টারজান বনমানুষদের নিয়ে ধীরে ধীরে যখন উত্তর দিকে এগোচ্ছে তার কানে এল গুলি ছোঁড়ার শব্দ। গাছের ডালে ডালে ঝুলে সে তাড়াতাড়ি চলল শব্দের উৎস লক্ষ্য করে।

অবসন্ন ডাটন সেই শব দেহের ভার কাঁধে নিয়ে আর যেন চলতে পারছিল না। প্রাণের আশাও বুঝি আর নেই। হঠাৎ একজন দেশী শব-বাহক আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ল। দেখা গেল একটা তীর বিঁধে আছে তার কাঁধে। গুলি খেয়ে মৃত লোকটির ভাই ডাটনকে লক্ষ্য করে বর্শা তুলে বলল, 'এটা এই সাদা মানুষটারই কীর্তি।'

সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হাতের তীর খেয়ে সে-ও পড়ল মাটিতে। ভীত কালো মানুষদের চমকে দিয়ে অন্ধকার থেকে ভেসে এল গম্ভীর কণ্ঠস্বর—'সাদা মানুষকে ছেড়ে দাও।'

যোদ্ধারা তিনজন মৃত সঙ্গীকে ফেলে রেখে বন্দীকে নিয়ে এগিয়ে চলল। আবার শোনা গেল সেই গলা—'সাদা মানুকে ছেড়ে দাও।'

ওয়ারুতুরিরা দৌড়তে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় জনকে বিদ্ধ করল তীর। ডাটনকে ফেলে রেখে এবার চম্পট দিল তারা।

কয়েক মুহূর্ত বাদে টারজান গাছ থেকে নেমে এসে ডাটনকে বলল যে তাঁবু থেকে দূরে একা আসা তোমার উচিত হয়নি। বুঝল সে যে ইচ্ছে করেই পালিয়েছিল টারজান তা বুঝতে পারেনি। ঠিক করল, হোক উন্মাদ, তবু এই লোকটির সঙ্গে যাওয়াই নিরাপদ। সাগু্রাকে পেলে তখন নাহয় পালানো যাবে।

টারজানের দল অনায়াসে কাঁটা ঝোপের বন পেরিয়ে, গিরিখাদের ভিতরে ঢুকে, সিংহদের আস্তানার পাশ কাটিয়ে পৌঁছল সেই খাড়া পর্বত চূড়ার তলায়। পদচিহ্ন দেখে বুঝল এই পাহাড়ের গা বেয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সাগু্রাকে। ডাটনকে জিজ্ঞেস করল, 'পাহাড়ে চড়তে পার?'

—'পারি। আমি অনেক পাহাড়ে উঠেছি কিন্তু তুমি উঠতে পারবে কি? আর এই বনমানুষরা? এরা যে বড্ড ভারি।'

—'দেখা যাক।' ঠাট্টার হাসি টারজানের মুখে। সে

বনমানুষদের কিছু ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে তারা দ্রুত বেগে সেই খাড়া পাহাড় বেয়ে চড়তে শুরু করল। পিছনে উঠতে লাগল টারজান। স্তম্ভিত ডাটন তাদের পিছু নিল।

ঘণ্টাখানেক চড়ার পর তারা শিখড়ে পৌঁছল। ডাটন হাঁপাতে হাঁপাতে স্রেফ শুয়ে পড়ল মাটিতে। টারজানের মুখে তখন মুচকি হাসি।

আবার চিহ্ন ধরে এগোতে এগোতে তাদের কানে এল ভীষণ কলরব চিৎকার। টারজান কান পেতে শুনে বলল, 'যুদ্ধ হচ্ছে। তীর ছোঁড়ার টংকার শুনতে পাচ্ছি। চল এগিয়ে গিয়ে দেখি।'

ডাটনের মনে হল লোকটার মাথা খারাপ। নইলে এত হট্টগোলের মধ্যে তীর ছোঁড়ার আওয়াজ পাচ্ছে বলে!

বন পেরিয়েই বিশাল এক প্রাচীন দুর্গ দেখে তারা থ। দুর্গ প্রাকার থেকে সোনার শিরস্ত্রাণ ও বর্ম পরা তামাটে রঙের সৈনিকরা নিচে কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকদের ওপর ছুঁড়ে মারছে বর্শা, তীর, পাথর ইত্যাদি। নিচের সৈন্যের হাতেও ওই সব অস্ত্রশস্ত্র। তারা প্রাণপণে দুর্গ প্রাকারে উঠতে চেষ্টা করছে।

টারজানরা এমন অবাক হয়ে যুদ্ধ দেখছিল যে খেয়ালই করেনি একদল কৃষ্ণকায় সৈন্য তাদের দেখে ফেলেছে। ওই সৈন্যরা আচমকা আক্রমণ করল টারজানদের। ফলে যুদ্ধে টারজানের দলের দু'জন বনমানুষ মারা পড়ল আর ডাটন বন্দী হল। আরও কৃষ্ণকায় সৈনিক তেড়ে আসতে লাগল। বেগতিক বুঝে টারজান গাছে উঠে ডাল-পালার আড়ালে অদৃশ্য হল।

*

ডাটন বন্দী হবার আগের রাতে দেবতা নামধারী লোকটি নিজের ঘরে যেতে যেতে রুইজকে সাণ্ড্রার ঘরের দিকে যেতে দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে ফের সাণ্ড্রার ঘরের দিকে চলল। যেতে যেতে তার কানে এল নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। সে এক দৌড়ে গিয়ে সাণ্ড্রার ঘরের দরজা খুলল। দেখল, রুইজ সাণ্ড্রাকে চেপে ধরেছে। মাটিতে রক্তাক্ত কিয়োমিয়া। চার ক্রীতদাসী ঘরের কোণে ভীত জড়সড়।

একটানে সে রুইজকে তুলে দাঁড় করাল। ক্ষিপ্ত রুইজ তৎক্ষণাৎ ছুরি বের করতেই সে এক মোচড়ে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল। তারপর রুইজের ঘাড় ধরে তাকে ছুঁড়ে দিল খোলা দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক পদাঘাতে তাকে ছিটকে ফেলল বারান্দায়। এরপর দরজা বন্ধ করে সে সাণ্ড্রাকে বলল, 'ওঃ খুব সময়ে এসে পড়েছি।'

কৃতজ্ঞ সাণ্ড্রা বলল, 'তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। কিন্তু এখন তোমার কি হবে?'

লোকটি নির্বিকার ভাবে বলল, 'দেবতাকে ওরা কি করতে পারে?'

সাণ্ড্রা মাথা নাড়ল, 'রুইজ আর ডা-গামা জানে তুমি দেবতা বা আমি দেবী নই। কিয়োমিয়া কাল ওদের এমনি কথা বলতে শুনেছে।'

—'হতে পারে। আমিও নিজেকে কখনো দেবতা বলে ভাবি নি।'

—'তাহলে কে তুমি?'

—'জানি না। না না আমি হচ্ছি টারজান।'

—'কক্ষণো নয়। কারণ টারজানকে আমি দেখেছি। তুমি তার মতো দেখতে নও। যদিও তোমাদের আকৃতি ও পোষাকে মিল আছে।'

—'তবে আমি কে?'

—'তুমি কি তোমার পুরনো জীবনের কথা কিছু মনে করতে পার না?'

—'না। এরা বলে আমি আকাশ থেকে নেমেছি।'

—'যে পোশাকে তুমি এসেছিলে সেসব কোথায়?'

—'আমি এই পোশাকেই এসেছিলাম।'

—'হতেই পারে না।'

এরপর লোকটি কিয়োমিয়ার মৃতদেহ বারান্দায় রেখে এসে সাণ্ড্রাকে বলল, 'আমি দরজার কাছে শুচ্ছি। তোমাকে একা রাখা উচিত হবে না।'

সাণ্ড্রা তাই নিশ্চিন্তে ঘুমল। লোকটির সম্বন্ধে সব ভয় তার ভেঙে গেছিল।

সকালে সাণ্ড্রার ঘরে প্রাতরাশ খেতে খেতে লোকটি বলল, 'এখান থেকে আমাদের পালাতে হবে। ডা-গামার দুর্গ তোমার পক্ষে একেবারে নিরাপদ নয়।'

—'ওরা কি যেতে দেবে আমাদের?'

—'ডা-গামা বা রুইজ ছাড়া কেউ আমাদের আটকাবে না। অন্যরা আমাদের দেব দেবী মনে করে।'

—'কোথায় যাবে?'

—'তোমার বাবার কাছে।'

—'কিন্তু সেই খাড়া পাহাড় বেয়ে নামব কি করে? আমি পারব না।'

—'আমি আমার বনমানুষদের সঙ্গ নেব সাহায্য করতে। ওরাই হবে আমাদের যাত্রাপথের রক্ষক। ওরা দুর্গের সামনে বনে থাকে। আমি ওখানে গিয়ে ওদের ডেকে নেব।'

—'বেশ চল তাহলে।'

দু'জনে সোজা ফটক দিয়ে বেরোল। গ্রামের মধ্য দিয়ে চলল যেন বেড়াচ্ছে। কেউ তাদের আটকালো না। বরং নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাল। বনে ঢুকে নকল টারজান বলল, 'ব্যাস, এবার আমরা নিরাপদ।' তার কথা শেষ হতে না হতেই একদল কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক তাদের ঘিরে ধরল। এই গালা সৈনিকরা রাতের অন্ধকারে এই বনে চুপিসাড়ে এসে লুকিয়ে ছিল।

নকল টারজান বুঝল বাধা দেওয়া বৃথা। সে ভাবল যদি আলেমটেজোরা আমায় দেবতা ভাবতে পারে এই জংলীদেরও সেই কথা বিশ্বাস করানো যাবে না কেন? তাতে হয়তো ফল হবে। সে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'জান আমরা কে? আমি একজন দেবতা আর ইনি আমার দেবী।'

বোঝা গেল কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধাদের মনে একথা ছাপ ফেলেছে। তারা খানিক ফিসফাস করার পর তাদের দলপতি এগিয়ে বলল, 'আমরা আপনাদের কথা শুনেছি।'

—'বেশ তাহলে আমাদের যেতে দাও,' হুকুম দিল নকল দেবতা।

দলপতি ঘাড় নাড়ল, 'তা হয় না। আপনাদের সুলতানের কাছে নিয়ে যাব।'

তখুনি শোনা গেল ভীষণ অট্টরোল। দলপতি উত্তেজিত হয়ে বলল, 'ওরা এসে গেছে। এবার আমরা দুর্গ আক্রমণ করব।' এক সহকারীকে হুকুম করল, 'দশজন যোদ্ধা নিয়ে এঁদের দু'জনকে সুলতানের কাছে নিয়ে যাও।

*

ক্র্যাম্প আর মিনস্কি চলেছে রুতুরি পর্বতের দিকে। মিনস্কি খাবার জন্য শিকার করতে চাইতেই ক্র্যাম্প বাধা দিল, 'খবরদার, গুলির শব্দ পেলে ওয়ারুতুরিরা টের পাবে। ফল-টল খেয়ে কাটাও।'

—'কিন্তু ওদের সর্দার মুটিম্‌বোয়ার সঙ্গে তো তোমার খুব ভাব আছে।'

—'না। মানে একবার মাত্র দেখা হয়েছিল। সেবার আমাদের সঙ্গে অনেক বন্দুক থাকায় বোধহয় ভয়ে কিছু বলেনি। কিন্তু আমাদের দু'জনকে পেলে কি আর ছেড়ে দেবে?'

মিনস্কির বড্ড আপশোস হতে লাগল এই লোভী মিথ্যুক ক্র্যাম্পের সঙ্গে আসার জন্য। এখন তার পক্ষে একা ফিরে যাওয়াও যে অসম্ভব।

জঙ্গল পেরিয়ে আসার পর ক্র্যাম্প বলল যে আর ভয় নেই। দেখ, কাঁটাঝোপের বনের পিছনে ওই রুতুরি পর্বতমালা। ওখানে সোনা আছে। দেখা গেল ডান দিক থেকে কিছু লোক চলেছে কাঁটাবনের দিকে। মনে হল ওরা সাফারি পার্টি। কারণ ওদের দলে রয়েছে কয়েকজন সৈনিক এবং বোঝা মাথায় পাঁচজন কুলি। সৈনিকদের রং তামাটে। গায়ে তাদের সোনার বর্ম, সোনার শিরস্ত্রাণ। তাদের দেখে মনে হল শ্বেতাঙ্গ। তাই ক্র্যাম্পরা ভরসা করে এগিয়ে গেল ওদের দিকে। আগন্তুকরা থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল ক্র্যাম্পদের।

কুলিদের মধ্যে একজন ছিল সাদা মানুষ। সে হেঁকে বলল, 'তোমরা কি ইংরিজি বোঝ?'

—'হ্যাঁ, বুঝি,' উত্তর দেয় ক্র্যাম্প।

লোকটি বলল, 'তাহলে কাছাকাছি কোনও ইংরেজ অফিসার থাকলে তাকে খবর দাও যে আমি ফ্রান্সিস-বোল্টন চিল্টন রুতুরি পাহাড়ে ক্রীতদাস হয়ে রয়েছি। আর তোমরা পালাও। ধরতে পারলে এরা তোমাদের ক্রীতদাস করে রাখবে।

মিনস্কি বলল, 'ওদের কাছে দেখছি বন্দুক নেই। আমরা গুলি ছুঁড়ে অনায়াসে এই লোকটিকে উদ্ধার করতে পারি।'

ক্র্যাম্প বাধা দিল, 'না আমরা বরং ওদের ক্রীতদাস হয়ে যাই। তাহলে ওদের সঙ্গে গিয়ে সোনার খনির সন্ধান পাব। তারপর পালাব।'

মিনস্কি বলে, 'এতখানি ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হবে?'

ক্র্যাম্প তেতে বলল, 'তাহলে তুমি পালাও। আমি ওদের সঙ্গে যাব।'

অগত্যা ক্র্যাম্পের সঙ্গে মিনস্কি এগিয়ে গেল লোকগুলোর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘিরে ফেলল সৈনিকরা। আচমকা তাদের রাইফল দুটো কেড়ে নিয়ে বন্দী করল তাদের। ক্র্যাম্প সোয়াহিলিতে বোঝাল, 'আমরা বন্ধু হতে চাই। তোমাদের রাজ্যে গিয়ে তোমাদের সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমাদের বন্দী করছ কেন?' লোকগুলো তার কথায় কানই দিল না। হুকুম দিল, 'বোঝা মাথায়

নাও। তোমরা এখন আমাদের ক্রীতদাস। চল।'

বর্শার খোঁচার ভয়ে বাধ্য হয়ে মাথায় মাল নিয়ে হাঁটা দিল ক্র্যাম্প ও মিনস্কি। বোল্টন-চিল্টন বলল যে, তারা এখন চলেছে আলেমটেজো রাজ্যের দিকে। 'আমি জানি না সে কেমন দেশ। আমি দু'বছর ধরে গালা জাতির ক্রীতদাস হয়ে ছিলাম। আলেমটেজোদের পাশের পাহাড়ে গালাদের গ্রাম। কয়েক সপ্তাহ আগে সোনার খনিতে কাজ করে ফেরার সময় আমরা এই আলেমটেজোদের হাতে বন্দী হই। এখন চলেছি ওদের গ্রামে। গালারা আমার ওপর তেমন অত্যাচার করেনি। তবে আলেমটেজোদের সম্বন্ধে সাংঘাতিক সব গল্প শুনেছি। ওরা নাকি নরবলি দেয়। পোষা সিংহদের নরমাংস খাওয়ায়।'

মিনস্কি চিল্টনকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি দু'বছরের মধ্যে এখান থেকে পালাতে পারলে না?'

—'না। ঢের চেষ্টা করেছি। জান, বৃদ্ধ অক্ষম ক্রীতদাসদের গালারা না খেতে দিয়ে মেরে ফেলে। আর আলেমটেজোরা তাদের সিংহকে খেতে দেয়। হে ভগবান তোমরা যদি শখ করে বন্দী না হতে, আমিও হয়তো উদ্ধার পেতাম।'

মিনস্কি ক্র্যাম্পকে দেখিয়ে বলল, 'এ লোভী লোকটার জন্যে।'

ক্র্যাম্প বলল, 'ঘাবড়িও না, আমি দু'ছরের আগেই ঠিক পালাব। একবার সোনা খনির খোঁজটা পেয়ে নিই।'

বোল্টন-চিল্টন বলল, 'এই আলেমটেজোরা নাকি কখনো একই পথ ধরে তাদের দেশে আসা যাওয়া করে না যাতে পথের হদিস না পায় কেউ। পথের চিহ্নগুলো ভাল করে লক্ষ্য করে নাও। ভবিষ্যতে পালাবার জন্য হয়তো দরকার হতে পারে।'

আলেমটেজোদের সঙ্গে গালাদের যুদ্ধ বেশিক্ষণ টিকল না। একটু বাদেই দুর্গের ফটক খুলে যুদ্ধ-মহিষে টানা কুড়িটা রথে চড়ে সৈন্যসহ ডা-সেরা আক্রমণ করল গালাদের। গালারা হেরে গিয়ে পালাল। যাবার আগে দুর্গের বাইরে কিছু খড়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল এবং কিছু কৃষককে বন্দী করে ধরে নিয়ে গেল। বহুকাল ধরে দুই রাজ্যের মধ্যে এই ভাবেই যুদ্ধ চলছে। যে যখন সুযোগ পায় অন্যদের আক্রমণ করে। বিজয় উল্লাসে ডা-সেরা ফিরে এল দুর্গে।

গাছের আড়াল থেকে টারজান এই অর্থহীন যুদ্ধ লক্ষ্য করল। হঠাৎ তার কানে এল বনের মধ্যে বনমানুষদের গর্জন ও আস্ফালন। শব্দ লক্ষ করে ডালে ডালে গিয়ে টারজান দেখল তার সঙ্গী বনমানুষদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে আর একদল অপরিচিত বনমানুষ। দু দল তর্জন গর্জন করছে।

টারজানের সঙ্গী বনমানুষদের সর্দার উঙ্গো গর্জাল—'আমি উঙ্গো বনমানুষদের রাজা।'

—'আমি মালগাস। আমিই বনমানুষদের রাজা।' অন্য দলের সর্দার গর্জন করে বলে।

দু'জনের লড়াই প্রায় শুরু হতে যাচ্ছে সহসা টারজান গাছ থেকে লাফিয়ে নামল দু'জনের মাঝখানে। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি টারজান। আমি সমস্ত বনমানুষদের রাজা।'

মালগাসের দল টারজানকে দেখে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। তারা যাকে টারজান বলে মানে এই সাদা মানুষটিও যে অনেকটা তারই মতন দেখতে। তারপর মালগাস বলে উঠল, 'তুমি আসল টারজান নও। আমি তোমায় মারব।'

—'তাহলে মরতে হবে তোমায়,' হুমকি দিল টারজান।

বিশাল মালগাস ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজানের ওপর। অন্য বনমানুষরা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কে জেতে। যে জিতবে সেই হবে তাদের রাজা।

মালগাস যতবারই টারজানকে ধরতে যায় সাঁৎ করে সরে যায় টারজান। হঠাৎ পিছন থেকে টারজান তার গলা চেপে ধরল একহাতের লৌহমুষ্টিতে। অন্য হাতে তার কানের ওপর মারতে লাগল দমাদম ঘুষি। মালগাস কিছুতেই ছাড়াতে পারল না টারজানের মুঠি। ক্রমে তার চেতনা লোপ পেতে থাকে। তারপর মালগাসকে এক বিরাট ঝটকায় তুলে তাকে উল্টে মাটিতে আছড়ে ফেলল টারজান।

পরক্ষণেই ফের এক আছাড়। মালগাসের আর নড়াচড়ার শক্তি রহিল না। টারজান লাফ দিয়ে তার বুকে চড়ে বসে প্রকাণ্ড ছুরি তুলে গর্জন করল—'কাগোডা।' আত্মসর্পণ কর।

অসহায় মালগাস ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ করলাম।'

টারজান উঠে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ে হুংকার দিল, 'আমি টারজান। সমস্ত বনমানুষদের রাজা। শোন উঙ্গো আর মালগাস, তোমরা এখন আর ঝগড়া করবে না। দু দলে এই বনে শান্তিতে থাকবে। যখন আমি ডাক দেব, আমায় সাহায্য করতে আসবে। মনে রেখ এই আমার আদেশ।'

রাতে অবশ্য টারজান বনমানুষদের সঙ্গে রইল না। দুর্গের গায়ে একটা গাছে উঠে শুয়ে থাকল।

*

পরদিন ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে টারজান নদীর জলে স্নান করে কিছু ফল-টল খেল। তারপর গিয়ে হাজির হোল দুর্গের ফটকের সামনে। ফটকের সান্ত্রীরা তাকে দেবতা ভেবে ফটক খুলে দিল। টারজান ভিতরে ঢোকবার পর তাদের কেমন সন্দেহ হোল।

ঠিক তখুনি ভীষণ হট্টগোল শুনে টারজান দেখল দুর্গের সামনে চত্বরে এক বিশাল খ্যাপা মোষ ফোঁস ফোঁস করছে। লোকেরা পালাচ্ছে প্রাণ ভয়ে।

তখন এখান দিয়ে যাচ্ছিল ডা-সেরা। মোষটা তৎক্ষণাৎ তাড়া করল ডা-সেরাকে। সামান্য তরবারি নিয়ে ওই ক্ষ্যাপা দানবের বিরুদ্ধে যোঝা অসম্ভব। তাই ডা-সেরা পাঁইপাঁই দৌড় দিল।

টারজন বুঝল লোকটার পরিত্রাণ নেই। মোষটা তার পাশ দিয়ে ধেয়ে চলেছে তাকেই লক্ষ্য করে। টারজানের দিকে তার নজর নেই। টারজান কয়েক পা ছুটে লাফিয়ে উঠল মোষটার ঘাড়ে। এক হাতে ধরল তার শিং, অন্য হাত তার নাকের কাছে ধরে মাথাটা বাঁকাতে লাগল। মোষটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু সেই প্রচণ্ড বলশালী জীবের মাথাটা বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারল না মাটিতে। মোষটা উঠে দাঁড়াল। টারজান তার মুখোমুখি দু'হাতে তার দুই শিং ধরে আছে।

মোষটা ঘাড় নিচু করে ঠেলতে লাগল টারজানকে ফুঁড়ে ফেলতে। কিন্তু অসীম বলশালী টারজান শিং দুটো ধরে মোষটার ঘাড়টা ক্রমে পেঁচিয়ে তাকে ফেলে দিল মাটিতে। ওই ভাবেই ঠেসে রাখল তার মাথাটা। অবশেষে নিস্তেজ হয়ে পড়ল ক্ষ্যাপা মোষ। অনেকগুলি পশুপালক দৌড়ে এসে বেঁধে ফেলল তাকে। টারজান মোষটাকে ছেড়ে দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

ডা-সেরা খানিক দৌড়েই মরিয়া হয়ে তরবারি হাতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। তারপর সে এবং চত্বরের অন্য লোকেরা স্তম্ভিত হয়ে দেখেছিল এই অসম্ভব কাণ্ড। অপরিচিত বিদেশীর অমানুষিক শক্তি ও সাহস।

মোষটাকে খোঁয়াড়ে নিয়ে যাওয়ার পর ডা-সেরা এসে টারজানকে বলল, 'কে তুমি? তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। বল কিভাবে এর প্রতিদান দেব।'

—'আমি বনমানুষদের রাজা টারজান।'

—'তা কি করে হয়? আমি টারজানকে জানি। সে দু'বছর ধরে আলেমটেজোদের দেবতা হয়ে আছে।'

—'আমিই আসল টারজান। অন্য লোকটি নকল।'

ডা-সেরা চিন্তিত ভাবে বলল, 'আমার সঙ্গে চল। তুমি এখন আমার অতিথি।'

—'তুমি কে?'

—'আমার নাম ওসোরিও ডা-সেরা। আমি আলেম-টেজোর সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি।'

ডা-সেরা আশেপাশের সৈন্যদের উদ্দেশ করে বলল, 'মনে রেখো। ইনিই হচ্ছেন আসল দেবতা। অন্যজন নকল।' সবাই অমনি নতজানু হয়ে টারজানকে অভিবাদন জানালে, টারজানকে নিয়ে ডা-সেরা দুর্গে তার নিজের ঘরে গেল।

খবরটা রুইজ আর ডা-গামার কানে পৌঁছল। রাজা ডা-সেরা ও নতুন টারজানকে ডাকতে পাঠাল।

নিজের ঘরে বসে ডা-সেরা বলল, 'তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। এবার আমার কর্তব্য তোমায় দাসত্ব কিম্বা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা।'

—'তার মানে?'

—'এখানে বাইরের লোক এলে তাকে ক্রীতদাস করা হয় অথবা বলি দেওয়া হয়। ভয় নেই, আমি প্রজাদের বোঝাব যে তুমিই আসল দেবতা। তাহলে রাজা বা প্রধান পুরোহিত তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

—'আমি কাউকে ভয় পাই না। তাহলে এখানে আসতাম না।'

—'তুমি কি জন্য এখানে এসেছ?'

—'যে নিজেকে টারজান বলে বেড়াচ্ছে, যে আমার বন্ধুদের মেয়েদের আর ছেলেপিলেকে চুরি করছে, যার জন্যে আমার দুর্নাম হয়েছে, সেই লোকটাকে খতম করতে।'

ডা-সেরা বলল, 'আমি, রাজা ডা-গামা বা প্রধান পুরোহিত কেউই মনে করি না যে ওই লোকটি সত্যি দেবতা। কিন্তু সাধারণ লোক তাই ভাবে। কিন্তু তোমার আজকের কীর্তি শুনলে লোকে তোমাকেই দেবতা ভাববে নিশ্চয়ই।'

—'কিন্তু আমি তাদের ঠকাতে চাই না। সেই ভণ্ডটা আর যে শ্বেতাঙ্গ মেয়েটিকে সে চুরি করে এনেছে, এরা কোথায়?'

—'মুসলমান গালা জাতির লোকেরা তাদের গতকাল বন্দী করে নিয়ে গেছে। ওরা পাহাড়ের নিচে থাকে।'

—'তাহলে আমি সেখানে গিয়ে ওকে ধরব।'

—'মুসলমানরা ভয়ংকর জাত। ওরা তোমায় হত্যা করবে।'

—'না আমি যাবই।'

—'ঠিক আছে তাড়াহুড়োর দরকার কি? গালারা ওই লোকটিকে হয় মেরে ফেলবে অথবা দাস করে রাখবে। তুমি আলেমটেজোয় থেকে আমায় কিছু সাহায্য কর।'

—'কি রকম?'

—'ডা-গামা আর রুইজ বড় জঘন্য লোক। ওদের সরাতে চাই। যদি প্রজারা তোমায় দেবতা বলে মানে তোমার হুকুমকে ওরা ডা-গামার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।'

—'তখন কে রাজা হবে, তুমি?'

—'এই রাজ্যের যোদ্ধারা আর অভিজাত পুরুষরা যাকে রাজা করবে, সেই সিংহাসনে বসবে।'

এই সময় দূত এসে খবর দিল যে ডা-গামা দরবার কক্ষে তাদের দু'জনকে তলব করেছে।

*

বন্দীদের নিয়ে গালারা হাজির হল তাদের সুলতানের প্রাসাদের সামনে। এদের গ্রামে বেশির ভাগই খড় বা পাতায় ছাওয়া কুটীর। দু-একটি মাত্র পাথরের বাড়ি।

সদলে বেরিয়ে এল সুলতান আলী। বিশাল চেহারার এক নিগ্রো। তার মাথায় ছাতা ধরে আছে একজন। আর একজন পালকের চামর দিয়ে তার গা থেকে সমানে মাছি তাড়াচ্ছে। সুলতান বসল একটা টুলের ওপর। সবাই দাঁড়াল চারধারে।

বন্দীদের এক রক্ষী সুলতানকে অভিবাদন করে বলল, 'আমরা আলেমটেজো থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরেছি আর এই দু'জনকে বন্দী করে এনেছি।'

সুলতান রেগে চেঁচিয়ে বলল, 'কি আস্পর্ধা তোমাদের। এই সাদা মানুষ বন্দী দু'জনকে দেখাতে আমায় অসময়ে বিরক্ত করলে। ওদের কারাগারে নিয়ে যাও।'

—'হুজুর এরা সাধারণ বন্দী নয়। এরা আলেমটেজোর দেবতা আর দেবী।'

সুলতান হুংকার দিল, 'আল্লা ছাড়া আর কেউ দেবতা নয়। এই মেয়েটাকে আমি রাখব। আর পুরুষটির জন্য যদি দুশো মোষ মুক্তিপণ দেয়, তাহলে ওকে আলেমটেজোয় ফেরৎ পাঠাতে পারি।'

সাণ্ড্রা ভাঙা ভাঙা সোয়াহিলিতে সুলতানকে বলল, 'আমরা তোমাদের শত্রু নই। আমরা বিদেশী। আলেমটেজোয় আমরা বন্দী হয়ে ছিলাম। এখন আমাদের ছেড়ে দাও।'

আলী বলল, 'ওই পুরুষটি বলবান। ও খনিতে কাজ করবে। আর তোমার জন্য দুশো মোষ মুক্তিপণ দিলে, তোমায় আমি রাজা ক্রিসটোফোরোর কাছে ফেরত পাঠাব।'

—'আমায় ছেড়ে দিলে আমার বাবা তোমায় দুশো মোষের দামের চেয়ে বেশি টাকা দেবে। নইলে আমার লোকেরা এসে শাস্তি দেবে তোমাদের।'

—'কি দেবে তোমার বাবা?'

—'সোনা।'

সুলতান হা হা করে হেসে বলল, 'আমাদের প্রচুর সোনা আছে। সাদা মানুষদের আমরা ভয় পাই না। এদের নিয়ে যাও। মেয়েটাকে আমার বাড়ির মেয়েদের কাছে রাখ। তবে ওর ওপর যেন অত্যাচার না হয়।'

বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হল।

সাণ্ড্রার সঙ্গীকে আটকে রাখা হল একটা খোঁয়াড়ের মতো ঘেরার মধ্যে। জায়গাটা ভীষণ নোংরা। সে দেখল, উঁচু বেড়ার গায়ে ঝুলছে একটা টাটকা নরমুণ্ড। পালাতে গিয়ে ধরা-পড়া বন্দীর কাটা মাথা।

বিকেলে খোঁয়াড়ের দরজা খুলে ঢোকানো হল জনা কুড়ি ক্রীতদাস। তাদের মধ্যে একজন সাদা মানুষ—পেলহাম ডাটন। 'ডাটন তুমি।' লোকটি অবাক।

ডাটন জ্বলে উঠে বলল, 'তোমায় আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে।'

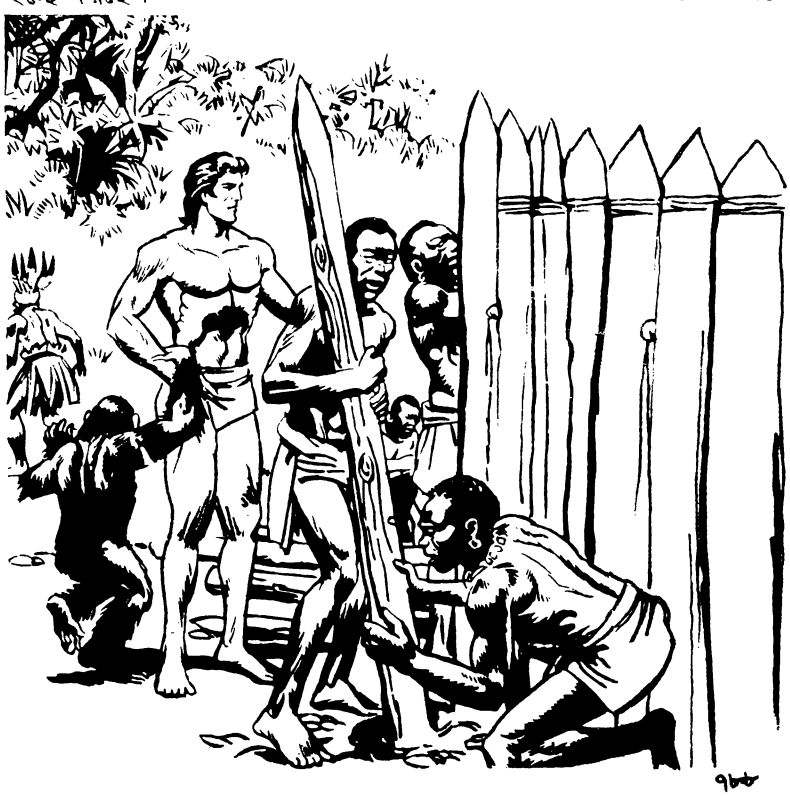

লোকটি বিষণ্ণ সুরে বলল, 'সত্যি আমার মরাই উচিত। কিন্তু সাণ্ড্রাকে রক্ষা করার জন্যই আমাকে যে বেঁচে থাকতে হবে। আমি ঠিক বুঝি না কেন আমি ডা-গামার সব হুকুম পালন করি। ডা-গামা আমায় বলেছিল যে ওর রাজ্যে দেবী করার জন্য একজন সাদা স্ত্রীলোক চাই। সাণ্ড্রাই প্রথম শ্বেতাঙ্গ মেয়ে যে আমার চোখে পড়ে। তাই ওকে নিয়ে যাই আলেমটেজোয়। কিন্তু পরে বুঝেছি রাজা ডা-গামা বা প্রাচীন পুরোহিত রুইজ আমাকে বা সাণ্ড্রাকে মোটেই দেবতা বা দেবী ভাবে না। ওদের অন্য কোনও মতলব আছে। আমি সাণ্ড্রাকে উদ্ধার করে পালাতে গিয়ে এই গালাদের হাতে বন্দী হই।'

—'সাণ্ড্রা তোমার সঙ্গে বন্দী হয়েছে?'

—'হ্যাঁ। এস আমরা দু'জনে মিলে তাকে এখান থেকে উদ্ধার করি।'

লোকটি চেপে ধরে ডাটনের হাত। জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এখন কোত্থেকে আসছ?'

—'সোনার খনিতে সারাদিন কাজ করে। ওখান থেকে পালাবার উপায় নেই। কড়া পাহারা।'

লোকটি বলল, 'আমাদের তাড়াতাড়ি কিছু উপায় করতে হবে। সুলতান ডা-গামার কাছে সাণ্ড্রার মুক্তিপণ হিসেবে দুশো মোষ চেয়েছে। তা না পেলে সাণ্ড্রাকে তার হারেমে পুরবে, বউ করবে।'

ডাটন বলল, 'তুমি জান সাণ্ড্রাকে কোথায় রেখেছে?'

—'জানি। সুলতানের প্রাসাদের পাশে একটা বাড়িতে।'

সে রাতে বহুক্ষণ ধরে দু'জনে পালাবার উপায় চিন্তা করেও কোনও কূল-কিনারা পেল না।

রাজার দূত ডা-সেরার ঘরে ঢুকতেই ডা-সেরা তাকে ধমক লাগাল, 'নতজানু হও। দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে আছ যে?'

ভীতু দূত নতজানু হল। ডা-সেরা তাকে বলল, 'রাজাকে বল সমস্ত অভিজাত ব্যক্তি আর সৈনিকদের দরবার ঘরে ডেকে আলেমটেজোর আসল দেবতাকে অভ্যর্থনা জানাতে।'

দূতের মুখ থেকে খবরটা হু হু করে রটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রটে গেল টারজানের অমানুষিক শক্তির কাহিনী। দরবার ভরে গেল লোকে।

—'এটা ডা-সেরার চালাকি,' ডা-গামা ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'ও একজন দেবতা খাড়া করতে চায় যাকে ও চালাতে পারবে। প্রজাদের বল যেহেতু তুমি প্রধান পুরোহিত, তাই কে আসল আর কে নকল দেবতা, তা তুমি চিনতে পার।'

রুইজ উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, 'আমরা জানি আসল দেবতাকে মুসলমানরা নিয়ে গেছে, তাই আমাদের প্রমাণ পেতে হবে কে এই নতুন আগন্তুক।'

জনসাধারণের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়। ঠিক তখনই ডা-সেরার গলা শোনা গেল দরজার কাছ থেকে, 'আমাদের আসল দেবতা এসে গেছেন।' ডা-সেরা আর টারজান এগিয়ে এল মঞ্চের দিকে।

জনতার এক অংশ বলে উঠল, 'হ্যাঁ ইনিই আসল দেবতা।' আর এক অংশ চেঁচাল—'ভণ্ড। মিথ্যে কথা।'

ঘরের মাঝখানে থেমে ডা-সেরা বলল, 'তোমরা এই দেবতার আশ্চর্য ক্ষমতার কথা শুনেছ নিশ্চয়ই। কোনও মানুষের পক্ষে ক্ষ্যাপা মোষকে খালি হাতে কাবু করা কি সম্ভব? আর আগের জন যদি সত্যি দেবতা হতো, মুসলমানরা কখনো তাকে বন্দী করতে পারত না।'

জনতার ভিতর বেশির ভাগ বলে উঠল, 'ঠিক ঠিক।'

—'ওই ভণ্ডকে সিংহের মুখে ফেলে দাও,' হুকুম দিল ডা-গামা।

কয়েকজন যোদ্ধা ধেয়ে এল টারজানের দিকে। তাদের একজন টারজানকে লক্ষ্য করে তলোয়ার চালাল। মুহূর্তে সরে গিয়ে টারজান সেই আক্রমণকারীকে দু-হাতে তুলে ধরে ছুঁড়ে দিল অন্যদের ঘাড়ে। ব্যস্, বেশির ভাগ লোকের আর সন্দেহ রইল না টারজানের দেবত্বে। তারা ছুটে এল মঞ্চের দিকে। ডা-গামা আর রুইজ প্রাণভয়ে পালাল ঘর ছেড়ে এবং ওসোরিও ডা-সেরা হল আলেমটেজোর নতুন রাজা; টারজান হল তাদের দেবতা। কোয়েসেডা হল প্রধান পুরোহিত। নতুন রাজা আর টারজান বসল সিংহাসনে।

নতুন রাজা ঘোষণা করল যে একটা মস্ত ভোজ লাগাও। এই সময় একজন খবর দিল যে তিনজন শ্বেতাঙ্গ দাস এবং প্রচুর নুন ও লোহা নিয়ে এসেছে আলেমটেজোর যোদ্ধারা। খুশি হয়ে ডা-সেরা তাদের দরবার ঘরে নিয়ে আসতে হুকুম দিল।

সমস্ত ব্যাপারটায় টারজানের মহা বিরক্তি লাগছিল। সে ভাবছিল, এবার ওঠা যাক। সেই সময় তিনজন শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস নিয়ে ঢুকল কিছু সৈনিক। তাদের মধ্যে দু-জন বন্দী হল ক্র্যাম্প আর মিনস্কি। তারা সিংহাসনে বসা টারজানকে দেখে থ।

টারজান বোল্টন-চিপ্টনকে জিজ্ঞেস করল, 'ওই লোক

দুটোর সঙ্গে তুমি জুটলে কিভাবে? তুমি বোধহয় ইংরেজ?'

চিল্টন জবাব দিল, 'হ্যাঁ আমি ইংরেজ। ওদের আমি আগে চিনতাম না। আমাকে আর ওদের দু-জনকে আলাদা আলাদা বন্দী করেছে। আমি দু বছর আগে গালা জাতির হাতে বন্দী হয়ে ক্রীতদাস হয়ে ছিলাম। এখন এদের হাতে বন্দী হয়েছি।'

—'বেশ, তোমাকে হয়তো আমার কাজে লাগবে।'

—'তুমি এদের রাজা?' জিজ্ঞেস করল চিল্টন।

—'না, এই ডা-সেরা হচ্ছে রাজা। আমি হচ্ছি এদের দেবতা।' টারজানের মুখে মৃদু হাসি খেলে।

—'এ্যাঁ!' চিল্টন অবাক।

ডা-সেরা টারজানকে বলল, 'তুমি কি শ্বেতাঙ্গ বন্দীদের চেন?'

—'হ্যাঁ তিনজনকেই চিনি। এই চিল্টনকে আমি চাই। অন্য দু-জনকে নিয়ে তোমার যা খুশি করতে পার।'

নতুন রাজা টারজানের আদেশের ভঙ্গিতে কিঞ্চিৎ অখুশি হলেও রাজি হয়ে বলল, 'বেশ ওকে তোমার ক্রীতদাস করে দিলাম।'

ক্র্যাম্প আর মিনস্কিকে নিয়ে যাওয়া হল ক্রীতদাসদের বাসস্থানে। চিল্টন ভোজের পর টারজান আর ডা-সেরার সঙ্গে ঢুকল ডা-সেরার ঘরে।

টারজান চিল্টনকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি গালাদের সব খবর জান?'

—'তা জানি।'

—'শোন একজন দুষ্ট লোককে হত্যা করব বলে আমি এতদূর এসেছি আর একজন ইংরেজ মেয়েকে আমি উদ্ধার করতে চাই। ওরা দু-জনেই এখন গালাদের হাতে বন্দী। আমি ওদের খোঁজে গালাদের গ্রামে যাব। তোমাকেও সঙ্গে নেব। যদি আমার উদ্দেশ্য সফল হয় তুমি মুক্তি পাবে।'

চিল্টন হতাশ ভাবে বলল, 'পারবে না। তুমি দেবতা হও বা নাই হও, ওদের হাতে বন্দী হবে।'

টারজান বলল, 'আমি জানি, আমি দেবতা নই কিন্তু আমি হচ্ছি বনমানুষদের রাজা টারজান। আমি ঠিক পারব।'

বোঝা গেল টারজানের কথা চিল্টনের বিশ্বাস হল না।

টারজান ডা-সেরাকে বলল, আমি যে লোকটাকে আর যে ইংরেজ মেয়েটির খোঁজ করছি, তারা গালাদের গ্রামে রয়েছে।'

ডা-সেরা বলল, 'জানি। আজ সকালে গালাদের সুলতানের দূত এসেছিল এক প্রস্তাব নিয়ে। যদি দু'শো মোষ মুক্তিপণ হিসাবে তাদের দেওয়া যায়, তাহলে ওদের দু'জনকে ফেরত পাঠাবে। ডা-গামা সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে।'

টারজান বলল, 'তাহলে চল, এখুনি গালাদের গ্রাম আক্রমণ করে ওদের দু'জনকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি।'

—'কি দরকার এখন যুদ্ধে?'

—'বুঝছ না, নতুন রাজা একটা বড় রকম যুদ্ধে জিতলে সমস্ত প্রজারা চট করে তার বশ্যতা স্বীকার করবে।'

ডা-সেরা বলল, 'তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ। আমি একটু ভেবে দেখি।'

*

গালাদের গ্রামে নোংরা কুটীরে শুয়ে বন্দী সাণ্ড্রা ভাবছিল, ডা-গামা কি তাদের মুক্তিপণ দেবে? তারা কি এখান থেকে উদ্ধার পাবে?

তার রহস্যময় সঙ্গীর কথাও বারবার তার মনে আসছিল। ওই লোকটির আসল পরিচয় কি? ওর জন্য সহানুভূতি হচ্ছিল সাণ্ড্রার।

যে মেয়েটি সাণ্ড্রাকে খাবার দিতে এল, তার কাছ থেকে জানা গেল যে ডা-গামা সাণ্ড্রাদের মুক্তিপণ দুশো মোষ দিতে রাজি হয়নি। ফলে সুলতান তাকে বিয়ে করবে। দুশ্চিন্তায় উন্মত্ত সাণ্ড্রা একটা ছুরি চাইছিল। সে আত্মহত্যা করবে। কিন্তু কেউ তাকে ছুরি এনে দিল না।

খনির কাজ সেরে ফিরে নকল টারজান ও ডাটনও শুনল এই দুঃসংবাদ। সাণ্ড্রাকে নিয়ে পালাতেই হবে। কিন্তু পরদিনও তারা তেমন কোনও সুযোগ পেল না।

গালাদের গ্রামে সুলতানের বিয়ে উপলক্ষে মহা ধুম লেগেছে। বিকেলে একজন সৈনিক এসে সুলতানকে খবর দিল যে গ্রামের পিছনে আলেকটেজো সৈনিকদের তাঁবু পড়েছে।

আলি একটু চিন্তিত হল। ওরা কি পিছন থেকে রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করতে চায়? এমন তো কখনো হয় না। বরাবর সামনে থেকেই আক্রমণ করে। যা হোক সুলতান তার সমস্ত সৈন্য এবং ক্রীতদাসদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হুকুম দিল। তবে যুদ্ধের প্রস্তুতির সঙ্গে বিয়ের আয়োজনও চলল।

রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে আলেমটেজোদের হাজারখানেক যুদ্ধ-মহিষ এগিয়ে চলল গালাদের গ্রামের দিকে।

তাদের পাশে চলেছে টারজান এবং চিল্টন। টারজানের পিছনে উঙ্গো আর মালগাসের বনমানুষের দল। যুদ্ধ-মহিষদের পিছনে আসছে আলেমটেজোর সৈন্যদল। মোষগুলির ফোঁস-ফোঁসানি এবং সৈন্যদের পায়ের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল গালাদের গ্রামে বিয়ের উৎসব উপলক্ষে নাচ-গানের হৈ-চৈ-এ। উৎসবের আনন্দে মত্ত গালাদের মন থেকে তখন শত্রু আক্রমণের দুশ্চিন্তা প্রায় মুছে গেছে।

সুলতান আলি এসে যখন সাণ্ড্রার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার প্রাসাদের দিকে হঠাৎ এক সান্ত্রী চিৎকার দিল—'আলেমটেজোরা আক্রমণ করেছে। সাবধান।'

সুলতান সাণ্ড্রার হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটল যুদ্ধ পরিচালনা করতে। নকল টারজান ডাটনকে ফিসফিস করে বলল, 'এই সুযোগ। যুদ্ধের হট্টগোলে আমরা সাণ্ড্রাকে নিয়ে পালাব।'

বর্শার খোঁচা খেয়ে ক্ষিপ্ত যুদ্ধ-মহিষগুলি দুদ্দাড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ল গালা গ্রামের ওপর। নকল টারজান ও ডাটন সাণ্ড্রার কুটীরে ঢুকে তার নাম ধরে ডাক দিল। কিন্তু সাণ্ড্রা সেখানে নেই। সে তখন সুলতানের প্রাসাদের পাশে অন্ধকারে লুকিয়ে আছে।

যুদ্ধ-মহিষ আর বনমানুষদের আক্রমণে বিপর্যস্ত গালারা পালাতে শুরু করল। তাদের পিছনে শোনা গেল আলেমটেজোর সৈন্যদের হুংকার। সাণ্ড্রা ভাবল, আবার ফের আলেমটেজোর হাতে পড়ি কেন? সে একটা ফাঁক পেয়ে দৌড় দিল। নকল টারজান তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল। পিছনে দৌড়ল ডাটন।

নকল টারজান সাণ্ড্রাকে নিয়ে নিরাপদে সরে গেল। দূরে শোনা গেল যুদ্ধের অট্টরোল।

সাণ্ড্রা বলল, 'কে যেন আমাদের পিছু নিয়েছে?'

—'ও ডাটন,' বলল নকল টারজান।

—'এ্যাঁ! পেলহাম!' দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে ওঠে সাণ্ড্রা।

—'সাণ্ড্রা।' ডাটন ছুটে আসে, 'এবার আমরা বোধ হয় সত্যি মুক্ত হলাম।'

নকল টারজান তৎক্ষণাৎ বুঝল ডাটন সাণ্ড্রাকে ভালবাসে। হয়তো মেয়েটিও ভালবাসে সাণ্ড্রাকে। তার কোনও আশা নেই।

সাণ্ড্রা আর ডাটন উচ্ছ্বসিত আনন্দে গল্প করতে করতে চলল সামনে। তাদের পিছু পিছু বিষণ্ণ হৃদয়ে চলল নকল টারজান।

ডা-সেরার সৈন্যবাহিনী গালাদের গ্রাম তছনছ করে দিল। সুলতান আলিকে বন্দী করল। টারজান কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও সাণ্ড্রা বা নকল টারজানকে দেখতে পেল না। নিশ্চয়ই সুযোগ পেয়ে লোকটা সাণ্ড্রাকে নিয়ে পালিয়েছে। কাল সকালে তাদের অনুসরণ করতে হবে। টারজান বনমানুষদের নিজেদের আস্তানায় ফিরে যেতে বলে, চিল্টনকে জানাল যে, আসছে কাল আমি তোমাকে নিয়ে ওদের খোঁজে বেরুব। সেই ভণ্ডটাকে ধরে হত্যা করার পর, তোমাকে কাছাকাছি কোনও উপনিবেশে পৌঁছে দেব।'

চিল্টন বলল, 'এইখান থেকে নিচে নামার দুটো রাস্তা আছে। একটা পথ বেশ সহজ। সে পথ আমি মোটামুটি চিনি। টারজান ঠিক করল, ওই সহজ পথটা ধরেই তারা নামবে।

আলেমটেজোরা যখন যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল সেই হট্টগোলের সুযোগে ক্র্যাম্প ও মিনস্কি পালিয়ে দুর্গের সামনের বনে লুকিয়ে ছিল। রাতের অন্ধকারে তারা পালিয়ে চলল ওই পাহাড় ছেড়ে।

ক্র্যাম্প বলল, 'সকাল হলে আমরা সোনার খনির খোঁজ করতে পারব।'

মিনস্কি সাফ জানিয়ে দিল যে, সোনায় তার দরকার নেই। কোনরকমে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলেই যথেষ্ট। সোনার খোঁজে ক্র্যাম্প একাই যাক। রাতে তারা পর্বতমালার যে অংশে লুকিয়ে ছিল সেই জায়গার কাছেই আশ্রয় নিয়েছিল সাণ্ড্রা, ডাটন আর নকল টারজান।

ভোরে উঠে সাণ্ড্রা ভাবছিল এবার তার ভাগ্য কোন পথে চলেছে কে জানে? এই পাহাড় থেকে নামতে পারলেও পেরোতে হবে ওয়ারুতুরিদের জঙ্গল, তার পরেও গভীর বনভূমি। তার দুই সঙ্গী সাহসী সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের কাছে অস্ত্র বলতে শুধু আছে তীর-ধনুক। যদি সেই আসল টারজান তার সঙ্গে থাকত, সে নিশ্চিন্ত হত।

ডাটন ও নকল টারজানও ঘুম থেকে উঠল। সেই খাড়া পাহাড় বেয়ে নামার কথা ভেবেই সাণ্ড্রা শিউরে উঠল। নকল টারজান বলল যে, আর একটা সোজা পথও আছে ঘুরে ঘুরে। সে খুব ভাল করে চেনে না সে পথ, তবে জানে উত্তর-পশ্চিমে, ওই দিকে। তিনজনে সেই রাস্তা ধরেই এগোল।

টারজান বনমানুষদের ফিরে যেতে হুকুম দেওয়ার পরেই উঙ্গো এবং মালগাসের দুই দল আলাদা হয়ে গেল। বনমানুষদের দলগুলির মধ্যে মোটেই সদ্ভাব নেই।

বনমানুষরা যেখানে খাবার খুঁজছে তারই কাছাকাছি ছিল ডাটন, নকল টারজান আর সাণ্ড্রা। তারা ভীষণ ক্লান্ত। কিছু খাবারও জোটেনি তাদের। সাণ্ড্রা আর বুঝি চলতে পারে না; ডাটনের শক্তিও প্রায় নিঃশেষ। নকল টারজান বলল, 'তোমরা দু'জন অপেক্ষা কর, আমি দেখি কোনও শিকার পাই কিনা?'

অন্য দুজন তাতে রাজি হল না। সবাই একসঙ্গে থাকাই নিরাপদ।

হঠাৎ বনের মধ্যে নড়াচড়া দেখে নকল টারজান বলল, 'ওখানে কোনও বড় জন্তু লুকিয়ে আছে,' বলে সে তীর ছুঁড়ল। যার গায়ে তীর লাগল সে নকল টারজানেরই অনুগত দলের এক বনমানুষ। আহত হয়ে ক্ষিপ্ত গোদা বেরিয়ে এসে নকল টারজানকে আক্রমণ করল। দলের অন্যরাও তেড়ে এল। নকল টারজান তাদের শাস্তি করতে অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু তারা আজ প্রভুর আদেশ মানল না। নকল টারজান এবার বর্শা নিয়ে আক্রমণ করল আহত বনমানুষটাকে। সে এক ঝটকায় কেড়ে নিয়ে—তাই দিয়ে এক প্রচণ্ড ঘা কষাল তার মাথায়। মৃতবৎ নিথর দেহে মাটিতে পড়ে রইল নকল টারজান। এরপর আর একটা বনমানুষ ডাটনকে জাপটে ধরে তার গলায় থাবা বসাতেই রক্তাক্ত ডাটন গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। সাণ্ড্রা প্রাণপণে দৌড়ে পালাতে গেল, কিন্তু তাকে ধরে ফেলল সর্দার বনমানুষটা। এক থাবায় তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে সে আনন্দে গর্জন করে উঠল। অমনি আর একটা বনমানুষ সর্দারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাণ্ড্রাকে নিয়ে গোদাদের ভিতর কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। অবশেষে বিজয়ী বনমানুষ সাণ্ড্রাকে তুলে নিয়ে চলল। দলটাও চলল তার পিছনে। এখন আর কেউ তার কাছ থেকে মেয়েটাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে না। ডাটন আর নকল টারজানের নিস্পন্দ দেহ পড়ে রইল বাঁশ বনে।

*

ক্র্যাম্প আর মিনস্কি হন্যে হয়ে খুঁজেও কোনও খাবার পেল না। রাতে তারা আশ্রয় নিল গুহায়। অন্ধকার থেকে ভেসে এল ক্ষুধার্ত সিংহের ডাক। সিংহটা দেখল মাটিতে পড়ে দুজন মৃতপ্রায় মানুষ। তাদেরই একজনকে মুখে তুলে নিয়ে ঝোপের মধ্যে বসে খিদে মেটাল সে।

পরদিন সকালে ক্র্যাম্প আর মিনস্কি আবিষ্কার করল নকল টারজানকে। সে তখন সবে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। সে-ও ক্র্যাম্পদের চিনতে পারল। জিজ্ঞেস করল, 'সাণ্ড্রা কোথায়?'

—'জানি না,' বলল ক্র্যাম্প, 'তুমিই ওকে চুরি করে এনেছ।'

—'ডাটন আর সাণ্ড্রা আমার সঙ্গে ছিল কাল অবধি। বনমানুষরা আমাদের আক্রমণ করেছিল। ওরাই বোধ হয় ধরে নিয়ে গেছে দু'জনকে।'

মাটিতে চাপ চাপ জমা রক্ত দেখে ক্র্যাম্পরা বুঝল কেউ নিশ্চই মারা পড়েছে। বনমানুষরা নিশ্চই ডাটনকে মেরে ফেলে সাণ্ড্রাকে হরণ করেছে। তিনজনে তাকে উদ্ধার করতে বনমানুষদের পিছু নিল।

উঙ্গো আর তার দলের বনমানুষরা বনে খাবার খোঁজে ঘুরছিল। তাদের কানে এল ভারি ভারি পায়ের শব্দ। কারা আসছে এদিকে? উঙ্গো সতর্ক হল।

খানিক বাদেই বন ফুঁড়ে বেরিয়ে এল অন্য বনমানুষদের দল। তাদের দলের স্যাঙ্গো চলেছে সামনে। তার কোলে একটি সাদা মেয়ে। তৎক্ষণাৎ উঙ্গো স্যাঙ্গোর কাছ থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিতে লাফিয়ে পড়ল সামনে। বেচারি সাণ্ড্রাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া চলল। দেখতে দেখতে দুই দল বনমানুষে লেগে গেল তুমুল লড়াই। সাণ্ড্রা স্যাঙ্গোর হাত ফসকে পড়ে গেল মাটিতে। লড়াইয়ে মত্ত বনমানুষদের তখন আর তার দিকে খেয়াল নেই।

এই সুযোগে সে গুঁড়ি মেরে সরে গেল যতদূরে পারা যায়। ক্রমে শান্ত হয়ে আসে সেই যুদ্ধের হুংকার আর্তনাদ। সাণ্ড্রা তখন অনেক দূরে নিবিড় জঙ্গলের গহনে, অসহায় একাকী।

নকল টারজানের সঙ্গে চলেছে ক্র্যাম্প ও মিনস্কি। কণা খাবার তাদের এখনো মেলেনি। তিনজনেই অবসন্ন। মাঝে মাঝে ঝগড়া করছিল ক্র্যাম্প আর মিনস্কি। টারজান নামধারী ধমকে থামাচ্ছিল দু'জনকে।

আসল টারজানের মতন এই নকল টারজান পাহাড়ে জঙ্গলে চিহ্ন ধরে পথ চলতে তত দক্ষ নয়। তাই সে ভুল দিকে চলে গেল। ক্রমে তারা এমন জায়গায় হাজির হল

যেখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে গভীর গর্ত খোঁড়া হয়েছে।

গর্তের ভিতরে তাকিয়ে ক্র্যাম্প চেঁচিয়ে উঠল, 'সোনা, এ যে সোনার খনি! দেখ, তাল তাল সোনা পড়ে আছে ভিতরে।'

এ যে গালাদের সোনার খনি সেটা ঠিকই। যুদ্ধের কারণে আপাতত এখানে কেউ কাজ করতে আসেনি। সোনার পিণ্ডগুলো ছড়িয়ে আছে মাটিতে। ক্র্যাম্প আর মিনস্কি নেমে গেল খনির ভিতরে। নিজেদের গায়ের কোট খুলে সোনার পুঁটুলি বাঁধতে লাগল। ক্র্যাম্প টারজানকে বলল, 'তুমিও কিছু সোনা নাও। আমার এই প্যান্টটাও বেঁধে ফেল। সব সোনা আমরা তিনজনে ভাগ করে নেব। উঃ আমরা কোটিপতি হয়ে যাব।'

নকল টারজান মাথা নাড়ল, 'সোনার আমার দরকার নেই। তোমরা সোনা বয়ে নিয়ে যাবে কি করে? তোমরা তো হাঁটতে পারছ না এমনিতেই। আমি সাণ্ড্রার খোঁজে চললাম। যদি বাঁচতে চাও তো সোনার লোভ দমন করে আমার সঙ্গে এসো।'

ক্র্যাম্পরা তার কথায় কান দিল না। নকল টারজান একাই চলে গেল।

সোনার বোঝা কাঁধে নিয়ে ক্র্যাম্প আর মিনস্কি কয়েক পা যায় আর বসে পড়ে, হাঁপাতে থাকে, ঘামতে থাকে ঝলসানো রোদের তাপে। ফের ওঠে। কোনরকমে সোনার বোঝা টানতে টানতে তারা গর্তের ধারে উঠে শুয়ে পড়ল ক্লান্তিতে। তাদের মনে তখন অতুল ঐশ্বর্যের স্বপ্ন।

রেটেং নামে একজন গালা যোদ্ধা শিকারের সন্ধানে ঘুরছিল পাহাড়ে। কোনও শিকার না পেয়ে তার মন খারাপ। ভাবছিল সুলতান আলির কথা। আলেম-টেজোরা সুলতানকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। কে জানে কি আছে সুলতানের ভাগ্যে?

গালাদের যে দলটা নকল টারজান এবং সাণ্ড্রাকে বন্দী করে, সেই দলে ছিল রেটেং। দেবীকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল। সেই দেবীর সৌন্দর্যের কথাও তার বারবার মনে আসছিল। হঠাৎ সে দেখে পাথরের পাশ থেকে বেরিয়ে আসছে সেই দেবী। সে লাফ দিয়ে এগোল দেবীকে ধরবার জন্য।

অবসন্ন সাণ্ড্রা এই বর্বর জংলীটাকে দেখেই পিছন ফিরে দৌড়ল। কিন্তু সামান্য যেতে না যেতেই তাকে ধরে ফেলল রেটেং।

রেটেং ঠিক করল এই মহামূল্যবান বন্দীটিকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া চলবে না। তাহলে অন্যরা ঠিক কেড়ে নেবে দেবীকে। একে নিয়ে আপাতত এই পাহাড়ে থাকবে সে। একটা গোপন গুহার সন্ধান সে জানে। তার কাছেই জল আছে, ফলটলও পাওয়া যায়। সাণ্ড্রার হাত ধরে সে টানতে টানতে নিয়ে চলল সেই গুহার দিকে।

সাণ্ড্রা বুঝল তার ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে। ঠিক করল, তার আগেই সে আত্মহত্যা করবে। নজরে পড়ল লোকটার কাঁধে ঝোলানো তূণে কয়েকটি তীক্ষ্ণ ফলা তীর। ঐ তীর একটা পেলে ছুরির মতন নিজের বুকে বসিয়ে আত্মহত্যা করা যায়। এই মতলবে সাণ্ড্রা বলল, 'আমার হাত ছেড়ে দাও। হাতে লাগছে। আমি পিছনে চলছি।'

লোকটা জানে, সাণ্ড্রার পক্ষে ছুটে পালানো সম্ভব নয়। তাই সে হাত ছেড়ে দিল। এক ফাঁকে টুক করে একটা তীর তুলে নিল সাণ্ড্রা। তীরের ফলা নিজের বুকে বসাবার আগে লোকটার পিঠ দেখতে দেখতে সাণ্ড্রার মনে নতুন এক অভিসন্ধি জাগতেই সে ফলাটা বসিয়ে দিল রেটেং-এর পিঠে। মারাত্মক ভাবে আহত রেটেং পিছন ফিরে হিংস্র গর্জন করে লাফ দিয়ে পড়ল সাণ্ড্রার ওপর। টিপে ধরল ওর গলা।

যে নিজেকে টারজান বলে সেই লোকটি একা একা পাহাড়ে ঘুরছিল খাবারের খোঁজে। তার মন খুব বিষণ্ণ। ভাবছিল, এখন সে কোথায় যাবে? আলেমটেজোয় ফিরতে তার ইচ্ছে নেই।

হঠাৎ তার কানে এল এক আর্তনাদ। লোকটি বর্শা বাগিয়ে ছুটল সেই শব্দ লক্ষ্য করে। তারপর সামনে এক দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

মাটিতে শুয়ে আছে নিথর সাণ্ড্রা। আর তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে এক গালা যোদ্ধা। যোদ্ধাটির পিঠে আমূল বসানো একটা তীর। নকল টারজান লোকটাকে টেনে তুলে দেখে মরে গেছে।

সাণ্ড্রারও কি প্রাণ নেই? কান পেতে বোঝা গেল তার হৃদ্‌স্পন্দন চলছে। একটু বাদেই সে চোখ খুলে লোকটিকে দেখে ভাবল, আমি নিশ্চয়ই মারা গেছি। পরলোকে দেখা হল আমাদের।

লোকটি সাণ্ড্রার ভাব বুঝে উজ্জ্বল মুখে বলল, 'আমরা কেউই মরি নি। দু'জনেই বেঁচে আছি। এই লোকটাকে তীর মারল কে?'

সমস্ত ঘটনা বলল সাণ্ড্রা। বর্বর গালা যোদ্ধাটি তার গলা ভাল করে টিপে ধরার আগেই মারা যায়। সাণ্ড্রাও অজ্ঞান হয়ে যায়।

—'পেলহাম কোথায়? ও কি মারা গেছে?' জিজ্ঞেস করে সাণ্ড্রা।

—'হ্যাঁ।' দুঃখিত ভাবে জানায় লোকটি, 'তবে সেই ক্র্যাম্প আর মিনস্কি এখনো বেঁচে আছে। সোনার খনিতে সোনা কুড়োচ্ছে। কিন্তু ওদের পক্ষে সোনার ভার বহন করে ফিরে যাওয়া হয়তো সম্ভব হবে না।'

একটা ছোট হরিণ মারল লোকটি। চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে ঝলসাল তার মাংস। অনেকদিন পরে খিদে মিটল দু'জনের। পান করল ঝর্নার জল। একটা গুহায় আশ্রয় নিল রাত কাটাতে। দু'জনের মনই ভরে উঠেছে সুখে। সাণ্ড্রা বলল, একদিন তোমার নিশ্চয় মনে পড়বে তোমার অতীত জীবনের কথা।'

*

ক্র্যাম্প আর মিনস্কি সোনার খনির পাশে খানিক অবসন্নভাবে শুয়ে থাকল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে কোনরকমে গিয়ে কাছেই একটা গাছের ছায়ার আশ্রয় নিল। তাদের সোনার পুঁটলিগুলোও সঙ্গে টেনে নিয়ে গেল সেখানে।

গোটা দিনটা তারা রইল সেখানে। আশা, যদি সেই টারজান নামে লোকটা কিছু খাবার নিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু টারজান ফিরল না। মিনস্কি বলল, 'ও আর আসবে না। ওর তো আর সোনার লোভ নেই।'

ক্র্যাম্প গজগজ করে, 'বেটার দেখা পেলে ওকে আমি খুন করব।'

রাত নামলে মিনস্কি ঘুমিয়ে পড়ল। ক্র্যাম্পের মনে লোভ জাগে, এই সুযোগে মিনস্কিকে খুন করে ওর সোনাটাও হাতাই। তারপর ভাবে, থাকগে। নিজের সোনাটুকু বয়ে নিয়ে যাবারই শক্তি নেই তার। অবশেষে সেও ঘুমল।

ঘুমের পরে সকালে খানিক তাজা লাগে। দু'জনে উঠে পড়ে। পিঠে সোনার বোঝা নিয়ে ধীরে ধীরে চলে। ক্রমে রোদের তেজ বাড়ে। তেষ্টায় দু'জনের গলা শুকিয়ে কাঠ, ঠোঁট ফুলে উঠেছে। ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে জিরোচ্ছে। নিদারুণ কষ্টে ঘোলাটে হয়ে যায় চিন্তা। মরীচিকা দেখতে থাকে। ক্র্যাম্প ভুল বকতে শুরু করল। হঠাৎ মিনস্কি একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। সে তখুনি আর উঠতে পারল না। ওই-ভাবেই পড়ে রইল।

ক্র্যাম্প ভাবল, মিনস্কি বুঝি জল পেয়েছে গর্তে। 'সব জলটা খেয়ে নিও না,' বলতে বলতে সেও এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গর্তে। কোথায় জল!

খানিক আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকার পর মিনস্কি বলল, 'আমি জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। স্রোতের আওয়াজ।'

ক্র্যাম্প শুনল—হ্যাঁ ঠিক। সামনের উঁচু পারটার পিছনে খাদ দিয়ে নিশ্চই বয়ে চলেছে নদী। সোনার বোঝা রেখে দিয়ে, পাথুরে উঁচু পার বেয়ে মিনস্কি উঠতে চেষ্টা করে। দুর্বল হাত যায় ফস্কে। গড়িয়ে পড়ে নিচে। ক্র্যাম্পও উঠতে গিয়ে পড়ে গেল। 'যাও জল নিয়ে এস,' ক্র্যাম্প মরিয়া হয়ে আদেশ করে মিনস্কিকে।

—'আমি পারব না,' মিনস্কি পাশ ফিরে শুয়ে থাকে।

—'কি, ভেবেছ আমি মরলে আমার সোনাটা নেবে? বটে!' বলতে বলতে ক্ষিপ্ত ক্র্যাম্প এবার একখণ্ড সোনার তাল বের করে বারবার আঘাত করতে লাগল মিনস্কির মাথায়। চূর্ণ করে দিল তার মাথাটা। ক্র্যাম্প চিৎকার করতে লাগল অর্থহীন ভাষায়। উন্মাদ হয়ে গেল সে। মিনস্কির এবং নিজের সোনার গাঁটরিটা নিয়ে বারবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। প্রতিবারই টলে পড়ে গেল মাটিতে। অবশেষে সোনার তাল আঁকড়ে শুয়ে সে হু হু করে কেঁদে উঠল।

টারজান ধীরে সুস্থে আলেমটেজোদের উপত্যকা থেকে চিল্টনের দেখানো সহজ পথটা ধরে নিচে নেমে চলল। সে লক্ষ্য করল ধারে কাছে খাবার মতো কিছু নেই। তাই সে পাশের পাহাড়ে ঘুরে এল। চিল্টনের ইচ্ছে ছিল না সময় নষ্ট করার। কিন্তু সে বুঝল যে টারজান তার নিজের খেয়াল মতো চলে।

কাছের পাহাড়টায় মাংস ও ফলমূল পাওয়া গেল। শিকারের অর্ধেক মাংস চিল্টনকে দিয়ে বাকি মাংস নিজে খেতে বসল টারজান। চিল্টন সভয়ে দেখল, টারজান বন্য পশুর মতো স্রেফ কাঁচা মাংস দাঁতে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সে বলল, 'আমি তো কাঁচা মাংস খেতে পারি না।'

টারজান বলল, 'তাহলে ঝলসে খাও। কাঠ যোগাড় কর। আমি আগুন জ্বেলে দিচ্ছি।'

পরদিন চিল্টনের মনে হল যে টারজান উদ্দেশ্যহীন-ভাবে ঘুরছে। আসলে টারজান মোটেই সে ভাবে চলছিল না। সে কোনও নতুন জায়গায় গেলে সব খুঁটিয়ে দেখে চিনে রাখে। চিল্টন টারজান বা বন্য পশুদের এই স্বভাবের কথা জানত না।

হঠাৎ টারজান থমকে গিয়ে এক দিক দেখিয়ে বলল, 'ওইখানে কোনও শ্বেতাঙ্গ মরে পড়ে আছে।'

—'কি করে বুঝলে, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

—'আমিও দেখতে পাইনি, তবে বুঝেছি।'

চিল্টন ধরতে পারেনি, টারজান বাতাসে ভেসে আসা গন্ধ থেকে ব্যাপারটা টের পেয়েছে।

একটা খাদের ধারে এসে তারা দেখল সত্যি দু'জন শ্বেতাঙ্গের মৃতদেহ পড়ে আছে।

—'তুমি বুঝলে কি ভাবে?' চিল্টন অবাক।

টারজান মৃদু হেসে বলল, 'বুঝতে পারি। তবে এ শিক্ষা তোমাদের অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে পাওয়া যায় না। এই লোক দুটো অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং জল তেষ্টায় মারা গেছে।'

টারজান মৃত লোক দু'জনের পাশে পড়ে থাকা পুঁটলি দুটো খুলতে চিল্টন চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে এ যে সোনা! সোনার তাল।'

টারজান তিক্তস্বরে বলল, 'হ্যাঁ এই লোভেই এই বাজে লোক দুটো জীবন দিল।'

—'তুমি এই লোক দুটোকে চিনতে?'

—'বিলক্ষণ।' টারজান ক্র্যাম্পকে দেখিয়ে বলল, 'এই লোকটা আমায় একবার খুন করতে চেষ্টা করেছিল।'

চিল্টন সোনার তালগুলো হাতে নিতে টারজান বলল, তুমি এসব সঙ্গে নিতে চাও?'

—'তারপর এদের মতো মরি আর কি? সোনায় আমার দরকার নেই! এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলেই যথেষ্ট।'

—'বেশ তাহলে চল, রওনা দিই,' বলল টারজান।

*

চোখে ভোরের সূর্যের আলো পড়তে সাণ্ড্রার ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ খুলে দেখল যে একটা গুহার ভিতর পাথরের মেঝেতে শুয়ে রয়েছে। এখানে কেন? সে ভয় পেয়ে উঠে বসে। তারপর পাশে ঘুমন্ত লোকটির পানে চেয়ে তার মন পরম স্বস্তিতে ভরে উঠল। সে উঠে বাইরে গিয়ে পাহাড়ী নদীর জলে হাত মুখ ধুল, জল খেল। যখন ফিরে এল সেই লোকটি জেগে উঠে বসেছে।

লোকটি সাণ্ড্রাকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল ঘুম হয়েছে তো?'

—'হুঁ, চমৎকার।'

—'তুমি এখানে আর একটা দিন বিশ্রাম নাও, তারপর আমরা রওনা হব।'

সারাদিন ধরে সাণ্ড্রা লোকটির সঙ্গে গল্প করল। বলল, তার নিজের বাড়ির কথা। বাবার কথা। শৈশবে হারানো তার মায়ের কথা। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার অতীত জীবনের কথা কিছুই কি মনে পড়ে না?'

—'না,' মাথা নাড়ে লোকটি।

সাণ্ড্রা বলল, 'আমি এটুকু বুঝেছি যে তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে। তোমার আচরণই তার প্রমাণ। আর তোমার উচ্চারণ শুনে মনে হয় তুমি একজন আমেরিকান!'

—'কে জানে? আমার কিছুই মনে পড়ে না,' হতাশ ভাবে বলে লোকটি।

চিল্টন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখল টারজান নেই। সে ভাবল, হয়তো ও আমায় ফেলে চলে গেছে! এই বুনো লোকদের স্বভাব বড় বিচিত্র। আমাকে আর ওর দরকারটা কি? ও একাই দিব্যি চলে যাবে। ভীত চিল্টন চিৎকার করে ডাক দিল, 'টারজান। টারজান।'

পিছনে কেমন শব্দ শুনে চিল্টন ফিরে দেখে স্বয়ং টারজান,

তার হাতে একটি শিকার করা বুনো শূয়োরের ছানা এবং কিছু ফলমূল। চিল্টন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

টারজান বলল, 'আমি খুব ভোরে উঠে বেরিয়েছিলাম। জান, যে লোকটাকে আমি এতদিন ধরে খুঁজছি এবার আমি তার পদচিহ্ন আবিষ্কার করেছি। ও ছাড়া এই রাজ্যে খালি পায়ে আর কোন শ্বেতাঙ্গ চলাফেরা করে? এবার আমি তাকে ধরব এবং খতম করব।'

—'এ ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করা সভ্য মানুষের পক্ষে উচিত কাজ নয়।'

—'আমি তোমাদের সভ্য মানুষ নই,' গম্ভীর স্বরে জানাল টারজান।

টারজান যে কিভাবে পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলল চিল্টন তার মাথামুণ্ডু বুঝল না। সে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ টারজান থমকে গিয়ে বলল, 'কেউ আসছে এদিকে। আমি যাচ্ছি। তুমি পিছনে এস,' বলেই সে দৌড়তে শুরু করল।

পায়ের শব্দের কাছে এসে টারজান খুব অবাক হল। দু'জনের কথাবার্তার আওয়াজ আসে তার কানে। কারা?

এদিকে সাণ্ড্রা আর যে নিজেকে টারজান ভাবত সেই লোকটা মহা আনন্দে হাত ধরাধরি করে আসছিল। সাণ্ড্রা ভাবতেও পারেনি যে আর একজন তার সঙ্গীকে হত্যা করবে বলে দৃঢ় চিত্তে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। তারপর হঠাৎ আসল টারজান তাদের সামনে আবির্ভূত হতেই সাণ্ড্রা চেঁচিয়ে উঠল, 'টারজান তুমি! কি আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি মারা গেছ।'

টারজান কোনও উত্তর না দিয়ে অন্য লোকটিকে স্থির চোখে দেখতে থাকে। হ্যাঁ এই সেই লোক। তারই মতন পোশাক। সে তার নিজের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে লোকটিকে বলল, 'তোমার অস্ত্র মাটিতে ফেলে দাও।'

—'কেন?' হতবুদ্ধির মতো প্রশ্ন করে লোকটি।

—'কারণ আমি তোমাকে হত্যা করব। তবে তার আগে তোমায় লড়াইয়ের একটা সুযোগ দিতে চাই।'

অন্য লোকটি হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে নির্ভীক ভাবে বলল, 'জানি না তুমি কেন আমায় মারতে চাও। তবে তুমি চেষ্টা করতে পার, আমি প্রস্তুত।'

টারজান বলল, 'আমি তোমায় মারব কারণ তুমি আমার নাম ভাঙিয়েছ। আমার বন্ধুদের স্ত্রী আর শিশুদের হরণ করে মেরে ফেলেছ বা ক্রীতদাস করেছ। সবাই ভেবেছে এ আমারই কাজ। ফলে তারা সবাই আজ আমাকে শত্রু ভাবে। তাই তোমায় মরতে হবে।'

সাণ্ড্রা হঠাৎ দুই পুরুষের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে টারজানকে বলল, 'শোন এই লোকটিকে মের না।'

টারজান অবাক হয়ে বলল, 'কেন? তাছাড়া ও তোমায় চুরি করেছিল, সেই জন্যেও তো ওকে হত্যা করা উচিত।'

সাণ্ড্রা বলল, 'না-না ও খারাপ লোক নয়। ও কোনও মানসিক রোগে ভুগছে। ও ভুলে গেছে নিজের আসল পরিচয়। আমি ওকে বুঝিয়েছি যে ও আসলে টারজান নয়। আলেমটেজোর রাজা ক্রিসটোফোরো ডা-গামার নির্দেশেই ও এইসব কুকর্ম করেছে। ও আসলে ভাল লোক।'

—'আর কিছু বলবে?' প্রশ্ন করে টারজান।

—'হ্যাঁ ওকে আমি ভালবাসি।'

টারজান সেই লোকটির দিকে ফিরে বলল, 'তোমার কি কিছু বলার আছে?'

লোকটি বলল, 'মিস পিকারেল ঠিকই বলেছে। আমি সত্যি জানি না আমার আসল পরিচয়। এমনকি বুঝতেই পারতাম না যে আমি অন্যায় করছি। এখন আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। মিস পিকারেলকে তাই ওর বাবার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আর আমার জন্য যাদের মৃত্যু ঘটেছে, যারা ক্রীতদাস হয়েছে, তাদের জন্য অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই তো এখন আমার করবার নেই।'

টারজান কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটিকে দেখে, মাটি থেকে নিজের অস্ত্র তুলে নিল। মানুষের চরিত্র সে বোঝে। বলল, 'আমি তোমাকে মিস পিকারেলকে তাঁর বাবার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করব। ওর বাবাই ঠিক করবে তোমায় নিয়ে কি করা উচিত।'

অন্য লোকটি মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল, 'ঠিক ঠিক। এখন এই মেয়েটিকে নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।'

টারজান সাণ্ড্রাকে বলল, 'তোমার দলের অন্য লোকেরা কোথায়?'

সাণ্ড্রা বলল, 'ডাটন বনমানুষদের হাতে মারা পড়েছে। অন্য দু'জনের খবর জানি না।'

টারজান বলল, 'ক্র্যাম্প আর মিনস্কিও মারা পড়েছে, তেষ্টায় আর ক্লান্তিতে। আমি তাদের মৃতদেহ দেখেছি।'

সাণ্ড্রা আঙুল তুলে বলল, 'দেখ, কেউ আসছে এদিকে। কে ও?'

টারজানকে অনুসরণ করে আসছিল চিল্টন। টারজান তাকে দেখিয়ে সাণ্ড্রাকে বলল, 'ও আমার বন্ধু।'

চিল্টন দেখল টারজানের সামনে একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ এবং একটি শ্বেতাঙ্গ নারী দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এসে পুরুষটিকে ভাল করে লক্ষ্য করে চিল্টন বেজায় অবাক হয়ে এগিয়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে বলল, 'আরে র‍্যাণ্ড তুমি! কি আশ্চর্য! আমি তো ভাবছিলাম, তুমি দু'বছর আগেই মারা পড়েছ।'

পুরুষটি ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি ভুল করছ। আমি তোমায় কখনো দেখিনি।'

চিল্টন দারুণ অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে? তুমি আমাকে চিনতে পারছ না! আরে আমি ফ্রান্সিস্ বোল্টন চিল্টন।'

পুরুষটি ফের মাথা নাড়ল।

সাণ্ড্রা আগ্রহ ভরে চিল্টনকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি একে চেন?'

—'আলবৎ। ও যে আমায় চেনে না বলছে, এ কথার কারণটা কি বুঝছি না?'

সাণ্ড্রা বলল, 'আমার ধারণা ওর স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। ওর পরিচয় কি জান?'

—'ও হচ্ছে জুনিয়ার কলিন টি র‍্যাণ্ডলফ্। আমেরিকান। বাড়ি পশ্চিম ভার্জিনিয়ায়।'

সাণ্ড্রা র‍্যাণ্ডকে বলল, 'দেখ আমি ঠিকই ভেবেছিলাম। তোমার বাড়ি আমেরিকার দক্ষিণ প্রদেশ।'

—'তুমি এদ্দিন কোথায় ছিলে?' র‍্যাণ্ডকে জিজ্ঞেস করল চিল্টন।

—'আলেমটেজোয় ছিলাম। আমি কে তুমি ঠিক জান?'

—'নিশ্চয়।'

সাণ্ড্রার মুখে স্বস্তি ফুটল, 'যাক এদ্দিনে তোমার পরিচয় পাওয়া গেল।' সে চিল্টনকে বলল, 'তুমি কি ওর সম্বন্ধে আর কিছু জান?'

—'জানি বৈকি। আমরা বছর খানেক স্পেনে উড়োজাহাজ চালিয়ে বেড়িয়েছি। আমরা দু'জনেই দু'জনের বাড়ির খবর সব জানি। আমাদের খুব বন্ধুত্ব হয়েগিছল।'

সাণ্ড্রা ইতঃস্তত করে বলল, 'আচ্ছা ও কি বিবাহিত?'

চিল্টন প্রশ্নের কারণ বুঝে মৃদু হেসে বলল, 'তখনো তো বিয়ে হয় নি। অবশ্য এই দু'বছরের মধ্যে কি করেছে জানি না।'

সাণ্ড্রা নিশ্চিন্ত হল।

টারজান সব শুনছিল। যাক লোকটাকে যে তখন হত্যা করিনি, এ ভালই হয়েছে। সে ডাক দিল, 'চল এবার রওনা দিই।'

পথে যেতে যেতে সাণ্ড্রা চিল্টনের কাছ থেকে র‍্যাণ্ড সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে নিল। সে রাতে বিশ্রাম করার সময় আগুনের ধারে বসে সাণ্ড্রা চিল্টনকে বলল, 'তুমি সবাইকে বলে দাও, র‍্যাণ্ড এখানে এল কি ভাবে।'

—'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। সব বলছি। জান র‍্যাণ্ডের দারুণ নেশা ছিল বাজি ফেলায়। আর সেই কারণেই আমরা আজ এখানে এসে পড়েছি।'

—'কি ভাবে?' প্রশ্ন করে র‍্যাণ্ড।

চিল্টন বলে চলে, 'আমি আর র‍্যাণ্ড প্রায়ই টারজানের গল্প করতাম। টারজানের কথা র‍্যাণ্ডের মনে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল। ও টারজানের প্রচুর গল্প পড়েছিল। টারজানের গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিল। টারজান যা যা করত, তাই করতে চেষ্টা করত। চেহারাটা বানালো প্রায় টারজানের মতন। তীর ছোঁড়া অভ্যেস করল। ওর খুব ইচ্ছে করত, আফ্রিকায় গিয়ে টরেজানের মতো জীবন কাটায়। আমি ঠাট্টা করতাম যে, সত্যি আফ্রিকার জঙ্গলে গেলে তুমি সাত দিনেই অক্কা পাবে।

'এই ভাবে ঠাট্টাতামাশা হতে হতে একদিন র‍্যাণ্ড জেদ ধরল ও আফ্রিকা যাবেই। স্রেফ টারজানের মতন পোষাক পরে, টারজানের কাছে যা অস্ত্র থাকে তাই নিয়ে মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে ও একা একা কাটাবে পুরো এক মাস। এক হাজার পাউণ্ড বাজি। র‍্যাণ্ডের উড়োজাহাজে চেপে গিয়ে ওকে আমি নামিয়ে দেব মধ্য আফ্রিকার কোনও নির্জন জায়গায়। সেখানে ও এক মাস কাটাবে। মাঝে মাঝে আমি উড়ে যাব ওর মাথার ওপর দিয়ে। নিচ থেকে ও আগুন জ্বেলে ধোঁয়ার সংকেত দেবে। একটা জায়গায় ধোঁয়ার অর্থ ও বহাল তবিয়তে আছে। দু জায়গায় ধোঁয়া উঠলে বুঝব যে ও সাহায্য চায়। যদি র‍্যাণ্ড পুরো মাসটা এই ভাবে কাটাতে পারে, আমি দেব হাজার পাউণ্ড। আর যদি না পারে, ও আমায় দেবে হাজার পাউণ্ড।

'তারপর র‍্যাণ্ডের উড়োজাহাজ চালিয়ে আমরা দু'জন রওনা দিলাম। যেখানে নামতে চেয়েছিলাম তার কাছেই

ছিল পাহাড়ের শ্রেণী। আকাশে মেঘ থাকায় নিচে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। যে কোনও সময়ে পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়ার ভয়। আন্দাজে উড়ে চলেছি হঠাৎ আমাদের উড়োজাহাজের এঞ্জিন গেল বিগড়ে। ঠিক করলাম প্যারাস্যুটে করে লাফ মারব। এছাড়া উপায় ছিল না। আমি প্রথমে লাফ মারলাম। ব্যাস, তারপর থেকে দু'বছরের ভিতর আর র‍্যাণ্ডের দেখা পাইনি।

'মাটিতে নেমে র‍্যাণ্ডের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু র‍্যাণ্ডকে দেখতে পেলাম না। তখন আমি কাছের গ্রামটায় ঢুকতেই গালাদের হাতে বন্দী হই। তারপর থেকে সুলতান আলির ক্রীতদাস হিসেবে পৃথিবীর এক সেরা খনিতে আমায় কাজ করতে হয়েছে প্রায় দু'বছর।

র‍্যাণ্ড বলল, 'বুঝেছি, এই জন্য আলেমটেজোয় বলত যে আমি আকাশ থেকে নেমে এসেছি। আমি ওদের দুর্গের কাছে নেমেছিলাম। তবে আমার কোনো কথাই মনে নেই। কিন্তু আমি কি সত্যি এ্যারোপ্লেন চালাতে জানি?'

চিল্টন বলল, 'হয়তো এখন ভুলে গেছ। তবে একসময় তুমি আমাদের মধ্যে একজন সেরা পাইলট ছিলে।'

—'সেই উড়োজাহাজটার কি হল?' জিজ্ঞেস করে সাণ্ড্রা।

চিল্টন বলল, 'সেটা নিশ্চয় আলেমটেজোর কাছে কোথাও আছড়ে পড়েছে।'

র‍্যাণ্ড বলল, 'কৈ আলেমটেজোরা তো সেরকম ঘটনার কথা কিছু বলত না?'

—'এ যে আর এক রহস্য!' মন্তব্য করল সাণ্ড্রা।

*

পরদিন সকালে টারজানরা পাহাড়েরপাদদেশে পৌঁছবার জন্য নামতে লাগল। পথে চোখে পড়ল, ক্র্যাম্প আর মিনস্কির কঙ্কালের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে আছে। হায়না শিয়াল আর শকুনে প্রায় শেষ করে ফেলেছে মৃতদেহ দুটি। পাশেই পড়ে আছে তাদের সোনা ভর্তি গাঁটরি দুটো যার জন্য তারা প্রাণ হারিয়েছিল।

গালা বা আলেমটেজোরা গোপন সহজ পথে সমতলে নামে, ভুল করে টারজানরা সেই পথ থেকে কয়েক মাইল সরে গেল। ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেল কয়েক শো ফুট নিচে পাহাড়ের গায়ে চাতালের মতন প্রকাণ্ড এক সমতল ভূমি। মাইলখানেক লম্বা, প্রায় আধ-মাইল চওড়া জায়গাটায় কোন গাছ নেই, শুধু লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা। টারজান সেইদিকে আঙুল তুলে বলল, 'দেখ, ওখানে একটা উড়োজাহাজ পড়ে আছে।'

উত্তেজিত চিল্টন বলল, 'ওটা নির্ঘাৎ র‍্যাণ্ডের উড়োজাহাজ।'

সাণ্ড্রা বলল, 'তা কি করে হয়? বিমানটা তো দেখছি ভাঙেনি। একেবারে আস্তই আছে।'

ঘণ্টাখানেক পাহাড় বেয়ে নেমে তারা উড়োজাহাজটার কাছে পৌঁছল। চিল্টন দেখে বলল, 'হ্যাঁ র‍্যাণ্ডেরই উড়োজাহাজ। মনে হয় এটাকে ওড়ানো যাবে। তেমন কিছু জখম তো দেখছি না।'

কথাটা ঠিক। বিমানের চাকাগুলো যদিও বসে গেছে কিন্তু আর কোনও ক্ষতির চিহ্ন নেই।

সাণ্ড্রা বলল, 'র‍্যাণ্ড নিশ্চয়ই এটাকে এখানে নামিয়েছিল তারপর ভুলে গেছে।'

র‍্যাণ্ড বলল, 'আমার তো মনে হয় না। কারণ আলেমটেজোরা বলত আমি নাকি বাতাসে ভেসে ভেসে নেমেছি।'

চিল্টন বলল, 'উড়োজাহাজটা নিজে নিজেই অবতরণ করেছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, তবে অসম্ভব নয়। এমন কাণ্ড কয়েকবার আগেও ঘটেছে জানি।'

র‍্যাণ্ড উড়োজাহাজটার চারধারে ঘুরে পরীক্ষা করতে লাগল। তার উৎসুক চোখ জ্বলজ্বল করছিল। এরপর সে উড়োজাহাজের ভিতরে ঢুকল, পিছু পিছু অন্যরাও।

র‍্যাণ্ড পাইলটের আসনে গিয়ে বসল। যন্ত্রপাতিগুলি নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল, পরম মমতায় হাত বোলাতে লাগল তাদের গায়ে। ভীষণ জোরে আঁকড়ে ধরল হুইলটা।

একটু বাদেই শিথিল হয়ে গেল তার দেহ। সে পিছনে ফিরে সজল চোখে বলে উঠল, 'সাণ্ড্রা, সাণ্ড্রা, আমার সব মনে পড়ে গেছে, সমস্ত ঘটনা।'

চিল্টন বলল, 'হুঁ, অনেক সময় এমনি হয়। অতীত জীবনের কোনও প্রিয় বস্তুকে দেখে হারানো স্মৃতি ফিরে আসে। এই উড়োজাহাজটা যে ওর ভীষণ প্রিয় ছিল।'

র‍্যাণ্ড ধীরে ধীরে বলতে থাকে, 'মনে পড়েছে, চিল্টন লাফ দেবার মিনিট পাঁচেক বাদেই আমি প্যারাস্যুট নিয়ে লাফ দিই। ক্রমে নেমে আসতে থাকি আলেমটেজোদের দুর্গের সামনের চত্বরে। ওপরে তাকিয়ে তখন অবাক হয়ে দেখছিলাম সোনার বর্মধারী তামাটে রঙের কিছু মানুষ।

তারপর ঠিক মাটিতে নামার মুখে আমি ধাক্কা খাই দুর্গের দেওয়ালে। এর পরেই নিশ্চয় আমি জ্ঞান হারাই। আমার স্মৃতিও লোপ পায়।'

—'তোমার কি মনে হয় বিমানটা এখন ওড়ানো যাবে?' জিজ্ঞেস করে সাণ্ড্রা।

—'হ্যাঁ,' র‍্যাণ্ড ভরসা দেয়।

উড়োজাহাজের টায়ার পাম্প করা হল। যন্ত্রের ছোটখাটো ত্রুটিগুলি সারিয়ে ফেলল র‍্যাণ্ড। তেল দেওয়া হল মেসিনে। ঘণ্টা দুই বাদে ইঞ্জিন চালানোর জন্য তৈরি হল র‍্যাণ্ড। অন্যরা তখন কেবিনে বসে আছে উৎকণ্ঠিত চিত্তে, দম বন্ধ করে। গর্জন করে উঠল ইঞ্জিন। প্রপেলার ঘুরতে শুরু করল।

র‍্যাণ্ড বলল, 'চাকাগুলো চলবে তো? তোমরা নেমে যাও। আমি একবার একা একা চালিয়ে দেখি।'

অন্যরা কেউ রাজি হল না এই প্রস্তাবে। তারা সবাই থাকবে।

সেই সমতলভূমি দিয়ে এগোতে লাগল উড়োজাহাজ।

টারজান বলল, 'তোমার ইচ্ছে করলে এখানে আবার এসে নামতে পারবে। মিনস্কি আর আর ক্র্যাম্পের সোনা ভর্তি গাঁটরিগুলো তো কাছেই পড়ে রইল।'

চিল্টন বলল, 'আমার বা র‍্যাণ্ডের আর সোনার শখ নেই। টিমোথি পিকারেলের কন্যারও নিশ্চয় সে লোভ নেই। তবে তোমার যদি ইচ্ছে থাকে—'

টারজান হেসে বলল, 'সোনা নিয়ে আমি করবটা কি?'

উড়োজাহাজটির ছোটার গতি বাড়ে। তারপর অনায়াসে উঠে পড়ে আকাশে।

টারজানের জাহাজ ডুবির গল্প

টারজান অ্যান্ড দি কাস্টএ্যাওয়েজ

গোড়ায় কিছু পুরনো ইতিহাসের কথা বলতে হচ্ছে। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার দক্ষিণে ইউকাটানের মায়া যোদ্ধা টুটুল সিউ তাঁর উক্সমাল রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। ১৪৫২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তাঁরি এক বংশধর, দুঃসাহসিক অভিযাত্রী চাক্ টুটুল সিউ অনেকগুলো বড় বড় ক্যানু তৈরি করিয়ে, সেই যে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দিয়েছিলেন, আর তাঁদের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সে কথা থাক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অশান্তিময় জগতে ফিরে আসা যাক। 'সাইগন' বলে একটা লড়ঝড়ে স্টীমার মোম্বাসা থেকে ইউনাইটেড স্টেটসে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। জাহাজটা একটু অদ্ভুত। একজন বন্যজন্তু সরবরাহকারী সেটি ভাড়া নিয়েছিল। কিছু জানোয়ার এরি মধ্যে জাহাজে তোলাও হয়েছিল, বাকি একটা বড় দাঁও-এর জন্যেই একটু দেরি হচ্ছিল। জাহাজের ডেকে ক্রাউজ বলে এক জার্মান আবদুল্লা বলে একজন আরবের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছিল। ক্রাউজ বলল, 'আর দেরি করা যায় না, আমার বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো গণ্ডগোল হবে না তো? বুনো হলেও মানুষ তো? তায় শ্বেতাঙ্গ।'

আবদুল্লা বলল, 'বলছি মাথায় চোট লেগে তার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে। চমৎকার শরীর। কিন্তু কথা বলেও না, বোঝেও না। কাঁচা মাংস খাইয়ে দিলে খায়, না দিলে খায়ও না।'

ক্রাউজ বলল, 'ওকে আফেসিয়া বলে স্বীকার করছি, বুনো জন্তুর সঙ্গে ওর খেলা দেখিয়ে বিস্তর টাকা কামাতে পাড়ব, কিন্তু তোমার এত আগ্রহ কেন?'

আবদুল্লা বলল, 'লোকটা ইংরেজ অর্থাৎ তোমার শত্রু। আর দাস-ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে আমার বড় ক্ষতি করেছে, তাই আমারো শত্রু। তবে ভীষণ হিংস্র, এই অবস্থাতেও ওকে বন্দী করতে তিনটে নুডালো গ্রামবাসী মরেছে।'

ক্রাউজ বলল, 'কত দিতে হবে তোমাকে?'

—'আমার সাফারির খরচ আর একটা সিংহের দাম।'

ক্রাউজ তার এক বান্ধবীকেও এনেছিল জাহাজে। তার এই অপেক্ষা করাটা পছন্দ হচ্ছিল না। কারণটাও বুঝে উঠছিল না। এই সময় আবদুল্লা তার বন্দী বুনোকে নিয়ে এল। কাঠের একটা শক্ত খাঁচায় ভরে, দু-হাত বেঁধে। কাজটা যে বে-আইনী হচ্ছে দুজনেই জানত। হোক জড়-বুদ্ধি। একটা মানুষ তো। ক্রাউজ কোনো ঝামেলার মধ্যে যেতে চায় না। সে বলল, 'আমি বিকেলে সব আইন রক্ষা করে জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে অপেক্ষা করব। সেখান থেকে তিনবার আলো দেখিয়ে সংকেত করব। তুমি একটা ধাও ভাড়া করে খাঁচা শুদ্ধ লোকজন নিয়ে বুনোটাকে জাহাজে তুলে দেবে।'

সে রাতে সাইগন থেকে সংকেত পেয়ে বুনোটার খাঁচা চাপিয়ে ধাও নিয়ে আবদুল্লা জাহাজের গা ঘেঁষে নোঙর করল। ওপর থেকে দড়ি নামিয়ে খাঁচার সঙ্গে বাঁধা হল। আবদুল্লা ওপর থেকে দড়ি ধরে সাহায্য করছিল, হঠাৎ একটা দোলা লেগে সাইগন জাহাজ কাৎ হয়ে ধাও থেকে সরে গেল। খাঁচাটা জাহাজের গায়ে ধাক্কা খেল, ওপর থেকে যারা টানছিল তারা খাঁচাটাকে তুলে ফেলল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই জাহাজটা দোল খেয়ে আবার ধাওটার ওপর এমন জোরে আছাড় দিল যে খালাসী সমেত ধাও তখুনি তলিয়ে গেল। সব কটা লোক মারা পড়ল। খালি আবদুল্লা ডেকের ওপর রয়ে গেল। সে মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। ক্রাউজ ধমক দিল, 'বেঁচে আছ সেই ঢের, আবার কথা! মোটেই ফেরা হবে না। তোমাকে আমেরিকা নিয়ে গিয়ে বুনোর সঙ্গে খেলা দেখাব। আর তাতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তো বিনি পয়সায় আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। চরে খেও।'

●

পরদিন সকালে ভারত মহাসাগর পার হয়ে সাইগন জাহাজ ক্রমাগত উত্তর পুব দিকে ভেসে চলল। ডেকের জানোয়ারদের সাড়াশব্দ নেই। মধ্যিখানে আগাগোড়া মাদুর দিয়ে মোড়া একটা কাঠের খাঁচা। জ্ঞানেট লাওন ক্রাউজকে বলল, 'এবার তোমার বুনোটাকে দেখতে পারি?'

ক্রাউজ বলল, 'কাল যা ধকল গেছে, বেঁচে আছে আশা করি।'

—'এখনো দেখনি?'

—'আবদুল্লার কথায় মনে হয় ওর সঙ্গে কারবার করা বিপজ্জনক। দেখি গিয়ে।' একটা দিশী মাল্লাকে ডেকে বলল, 'মাদুরটা কেটে খুলে দাও।'

স্মিট বলে জাহাজের সেকণ্ড মেট এসে বলল, 'কি আছে ওতে?'

—'একটা বুনো।'

মাদুর খোলা হলে দেখা গেল বলিষ্ঠ সুন্দর এক শ্বেতাঙ্গ খাঁচার মধ্যে বসে আছে। জ্ঞানেট তো অবাক!

—'বুনো কোথায়? ও তো একজন শ্বেতাঙ্গ!'

স্মিট বলল, 'একটা মানুষকে জানোয়ারের মতো খাঁচাবন্ধ করে রাখবে?'

ক্রাউজ বলল, 'ওর বাইরেটাই সাদা। লোকটা একটা ইংরেজ।'

স্মিট খাঁচায় থুতু ফেলল। তাই দেখে জ্ঞানেট চটে গেল. 'কক্ষনো এমন করবে না।'

ক্রাউজ বলল, 'তোমার তাতে কি? শুনলে তো ও একটা ইংরেজ। আমাদের শত্রু। কিছু বুঝতে বা বলতে পারে না।'

জ্ঞানেট বলল, 'যাই হক, আর যেন এমন না হয়।'

এই সময় ফার্স্ট লেফটেনাণ্ট হান্স ডি গ্রুট কাছে এল। বছর পঁচিশ বয়স, সুন্দর চেহারা, বাটেভিয়া থেকে কাজে জয়ন করেছে, প্রাক্তন ফার্স্ট মেট নিখোঁজ হবার পর। স্মিট তার ওপর হাড়ে চটা। তারই ফার্স্ট মেট হবার ইচ্ছা ছিল। ক্যাপ্টেন লারসেন অসুস্থ। নাবিকদের মধ্যে বেশির ভাগ চীনে, কিম্বা ল্যাস্কার। তাদের মধ্যে বনিবনাও ছিল না। ক্রাউজ জাহাজটাকে এবারে চার্টার করলেও, লারসেনের সঙ্গে তার কথা বন্ধ। ডি গ্রুট তো এসেই বলল, 'এ তো শ্বেতাঙ্গ। মোটেই ওকে খাঁচাবন্ধ করে রাখতে পার না। তোমার কাছে বুনো হতে পারে, কিন্তু হাতের বাঁধন খুলে দিতে হবে।'

ক্রাউজ বলল, 'নিচে থেকে একটা বড় লোহার খাঁচা এনে, তাতে ওকে পুরে, বাঁধন খুলছি।'

এই সময় আবদুল্লা এসে বলল, 'কুত্তারো অধম।' বলে বুনোর গায়ে থুতু দিল। জ্ঞানেট ওর গালে টেনে এক চড় মারল। ক্রাউজ তাতে আপত্তি জানালে জ্ঞানেট মুখ তুলে বলল, 'যে-ই ও রকম ব্যবহার করবে, তাকেই চড় মারব।'

আবদুল্লা ছোরা বের করেছিল, ডি গ্রুট ওর হাত ধরে ফেলল। সে বলল, 'আমিও বলছি ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করলে, আমাকে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

একটা প্রকাণ্ড লোহার খাঁচা হোল্ড থেকে তুলে কাঠের খাঁচার পাশে রাখা হল, যাতে দরজা দুটো মুখোমুখি লেগে থাকে। দুটো দরজাই ওপর থেকে তুলে দেওয়া হল। কিন্তু বন্দী নড়ল না। ক্রাউজ রিভলবার তুলে বলল, 'ঢোক্ এখানে, হতভাগা!' লোকটা তাকাল না পর্যন্ত।

জ্ঞানেট বলল, 'আমি দেখছি।' এই বলে লোহার খাঁচার উল্টো ধারে দাঁড়িয়ে এমন ইঙ্গিত করল, যেন ডি গ্রুটের হাতের বাঁধন কেটে দিচ্ছে। বন্দী বড় খাঁচায় ঢুকে জ্ঞানেটের দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়াল। জ্ঞানেট দড়ি কেটে দিল। হাত দুখানি ফুলে নীল হয়ে গেছিল। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে বুনো লোকটি জ্ঞানেটের দিকে তাকাল।

ডি গ্রুট বলল, 'চমৎকার দেখতে, না?'

জ্ঞানেট হুকুম করল ওর জন্য জল আর খাবার আনা হক। দুদিন ওর মুখে কিছু পড়েনি। কি খায় কে জানে।

আবদুল্লা বলল, 'জঙ্গলে জানোয়ার মেরে কাঁচা মাংস খায়।'

ক্রাউজ বলল, 'বেশ তো, জাহাজে জানোয়ার মরলে, তা-ও দেওয়া যাবে।'

বন্দী অনেকক্ষণ আবদুল্লার দিকে তাকিয়ে রইল; শেষ পর্যন্ত সে সরে গেল।

খাবার এলে জ্ঞানেট ওকে জল দিল। একটু জল খেয়ে কাঁচা মাংস নিয়ে খাঁচার এক কোণে বসে খেতে খেতে লোকটা চাপা গর্জন করতে লাগল। ক্রাউজ বলল, 'সিংহের মতোই শোনাচ্ছে। কি নাম ওর?'

—'টারজান।'

*

সাইগন জাহাজ ভারত মহাসাগর পার হয়ে সুমাত্রা থেকে দুটো হাতি, একটা গণ্ডার, তিনটে ওরাং-উটান, দুটো বাঘ, একটা প্যান্থার, একটা টেপ্রির তুলে, সোজা শিঙাপুর চলল। ক্রাউজের বড় ভয় ডি গ্রুট যদি বাটেভিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে মানুষ বন্দীর কথা জানিয়ে দেয়। সেখান থেকে আরো কিছু জানোয়ার তুলে দক্ষিণ চীনা সাগরের ওপর দিয়ে ম্যানিলার দিকে রওনা হল। তারপর পানামা প্রণালীর আগে আর কোথাও জাহাজ লাগবে না। ক্রাউজ মহা খুশি। এ দিকে জাহাজে অশান্তি ঘনাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন লারসেন তখনো শয্যাশায়ী। ডি গ্রুট ভালো অফিসার হলেও, নেহাৎ বয়স কম এবং অনভিজ্ঞ। রাতে স্মিট যখন ওয়াচে থাকত, তার সঙ্গে লস্কর জবু শিং-এর কি সব শলা-পরামর্শ হত; শিং আবার অন্য লস্করদের বোঝাত।

চাঁদ লস্কর বলল, 'তাহলে জন্তুগুলোকে কি করা হবে?'

—'সব জলে ফেলে দেওয়া হবে। ডি গ্রুট, ক্রাউজ আর অন্যদের সঙ্গে। স্মিট বলেছে।'

—'তা কেন? ওগুলো তো অনেক দামে বিক্রি করা যায়।'

—'ধরা পড়লে, ফাঁসি যাব।'

জবু শিং বলল, 'মোটেই না। শিঙাপুরে খবর পাওয়া গেছে জার্মানি আর ইংল্যাণ্ডের মধ্যে লড়াই বেধেছে। এটা ইংরেজদের জাহাজ, কাজেই জার্মানদের অধিকার আছে এ জাহাজ অধিগ্রহণ করার। জাহাজের জন্য টাকা পাব, জানোয়ারদের জন্যে না।'

চাঁদ বলল, 'ইলিলি দ্বীপের একটা লোক জানোয়ার কেনে। জানোয়ারগুলো ফেলতে দেব না।'

এদের কথাবার্তা চীনে নাবিক লুম-কিপের কানে গিয়েছিল। সে লস্করদের জাতশত্রু। অবিশ্যি তার মুখ দেখে বোঝা গেল না ওদের কথা শুনেছে।

লোহার খাঁচার লোকটা খাঁচার ছাদের শিখ ধরে প্রায়ই ঝুলে এদিক থেকে ওদিকে যেত। পাইচারি করত। কেউ কাছে এলে থেমে যেত। জ্ঞানেট লাওন ওর খাওয়া-দাওয়া দেখত, ওকে ফ্রেঞ্চ শেখাতে চেষ্টা করত, কিন্তু কোনো সুবিধা করতে পারত না।

টারজান জানত ওর কি হয়েছে। ও কোনো ভাষা বলতে বা বুঝতে না পারলেও, চিন্তাশক্তির কোনো ক্ষতি হয়নি। ও জানত যে যেমন করেই হক ও পালাতে পারবে। কিন্তু মানুষ বা জন্তু কারো সঙ্গে কথা বলতে না পারাটা তার মনকে বড় পীড়া দিত। খাঁচার শিক ও বেঁকিয়ে, নিজে বেরিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু তা হলে এরা ওকে গুলি করে মেরে ফেলবে।

স্মিট আবদুল্লাকে বলেছিল 'লস্করা আমাদের পক্ষে। চীনেদের কিছু বলা হয়নি, লস্করদের সঙ্গে ওদের ঝগড়া। মবু শিং বলছে চীনেরা এলে, ওরা এর মধ্যে নেই!'

আবদুল্লা বলল, 'ঐ তো মাত্র কজন। গোলমাল করলে, জলে ফেলে দিলেই হবে।'

স্মিট বলল, 'চীনেরা না থাকলে জাহাজ চলবে না।'

—'লারসেন আর ডিগ্রুট ছাড়া জাহাজ চলবে?'

—'চলবে না কেন? উবানোভিচ আছে, সে ফার্স্ট মেট হবে আর মবু শিং সেকেণ্ড মেট।'

—'তুমি ক্যাপ্টেন হবে?'

—'নিশ্চয়।'

—'আমি কি হব?'

—'তুমি? কেন, তুমি অ্যাডমিরেল হবে।'

সেদিন বিকেলে ডি গ্রুটের কাছে গিয়ে লুম-কিপ ওদের ঐ কথাবার্তার বিষয় সব বলে দিল। লারসেনের তখনো খুব জ্বর, ভুল বকছে। তখন সে ক্রাউজ আর জ্যানেটকে সব কথা বলল। ক্রাউজ জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কি করা যায়?'

ডি গ্রুট বলল, 'স্মিটকে এখুনি অ্যারেস্ট করছি।'

ক্যাবিনের দরজা খুলে স্মিট বলল, 'তাই বুঝি?' লস্করদের ডেকে বলল, 'ওদের বাঁধো!'

ডি গ্রুট জ্যানেটের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'খবরদার। মহিলাদের গায়ে হাত দেবে না।'

তখুনি ঝুটোপুটি লেগে গেল। খালি ক্রাউজ কিছু বলল না। শেষ পর্যন্ত ডি গ্রুটকে মাথায় বাড়ি দিয়ে অজ্ঞান করে, ওকে আর জ্যানেটকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল লস্কররা। ক্রাউজ বলল, 'এতো বিদ্রোহ। তোমার ফাঁসি হবে।'

স্মিট বলল, 'মোটেই না। আমি ফিউরারের নামে ব্রিটিশ জাহাজ দখল করেছি।'

টারজান বুঝতে পারছিল একটা কিছু হয়েছে। কি হয়েছে তা-ও আঁচ করেছিল। সময়মতো ওর খাবার আসে না। লস্কররা ঘুরে বেড়ায়, চীনেরা খাটে। একজন চীনেকে হাতের বুড়ো আঙুলে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে বেত মারা হল। তারপর পাশে একটা বড় লোহার খাঁচা আর ছোট কাঠের খাঁচা এল। তারপর ডি গ্রুটকে আর ক্রাউজকে বড় খাঁচায় আর জ্যানেটকে ছোটটাতে বন্ধ করা হল। একজন মহিলাকে এভাবে রাখা বিষয়ে আপত্তি জানাল ডি গ্রুট, কিন্তু কোনো ফল হল না।

স্মিট বলল. 'ওকে বুনোটার খাঁচায় ভরে দিতে পারি ও যদি তাই চায়।'

জ্যানেটের বন্দী মানুষটার জন্য দুঃখ হলেও তাকে বেশ ভয়ও করছ। কাজেই এ বিষয় আর কেউ কিছু বলল না। কিন্তু কিছু বাদেই কয়েকটা লস্কর জ্যানেটের খাঁচাটা টারজানের খাঁচার পাশে ঠেলে নিয়ে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে জ্যানেটকে ঐ খাঁচায় ঢোকাবার চেষ্টা করছে দেখে জ্যানেট মাথা উঁচু করে সগর্বে নিজেই হেঁটে ঢুকে গেল। টারজান তাকে সাহস দিতে চাইল, কিন্তু সে যে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছে! তাই একটু হাসল. এর আগে টারজানকে খোঁচা দেবার জন্য স্মিট একটা হার্পুন এনেছিল টারজান অতি সহজে সেটা টেনে নিয়েছিল। এর পর থেকে ভয়ের চোটে কেউ ওকে জ্বালায়নি। এখন জ্যানেট ভয় পাচ্ছে দেখে হার্পুনটা নিয়ে টারজান ওর কাছে এগিয়ে গেল। ডি গ্রুটের কি ভয়। যদি মেরে ফেলে! টারজান হার্পুনটা জ্যানেটকে দিয়ে, খাঁচার অন্য ধারে গিয়ে বসল।

স্মিট রাগের চোটে লাফাতে লাগল। 'এ মোটেই বুনো নয়! তুমি আমাকে ঠকিয়েছ, আবদুল্লা!'

আবদুল্লা বলল, 'বেশ তো, তুমিও খাঁচায় ঢুকে দেখ না বুনো কি না।'

*

পরদিন সকালে ঐ খাঁচার দুই বাসিন্দাই খুব খুশি। জ্যানেট খুশি নিরাপদে রাত কেটেছে বলে আর টারজান খুশি, কারণ ফুর্তির চোটে জ্যানেট যে ফরাসী গান গুনগুন করে গাইছিল, ও তার মানে বুঝতে পারছিল। মস্তিষ্কের আড়ষ্টতা যেমন হঠাৎ হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ কেটেও গেছে! দুজনের মধ্যে গল্প জমে উঠল। জ্যানেট টারজানকে ক্রাউজের মতলব, স্মিটের বিদ্রোহ ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলল।

তার কথা শুনে টারজান মনে মনে হিসাব করে নিল এই জাহাজে যারা আছে, তাদের মধ্যে শুধু জ্যানেট, ডি গ্রুট, চীনেরা আর অবশ্যই সমস্ত জানোয়াররা উদ্ধারের যোগ্য। ডি গ্রুটের ঘুম ভাঙলে, সে জ্যানেটকে বলল, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

—'আমি স্মিটের সঙ্গে কথা বলে দেখব যদি তোমাকে ছেড়ে দেয়, তাহলে ক্রাউজ আর আমি ওর নামে নালিশ করব না।'

জ্যানেট বলল, 'আমি খুব নিরাপদেই আছি। স্মিট যতক্ষণ কাপ্তানি করছে, আমি বেরোতে চাই না।'

—'কিন্তু স্মিট যদি সত্যি সত্যি ওকে খেতে না দেয়, তখনো কি নিরাপদে থাকবে?'

জ্যানেট হেসে বলল, 'ও কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে পারে। সত্যি যদি তেমন হিংস্র হয়, সাবধানে কথা বল।'

—'ও তো আমার কথাও বোঝে না, বেরোতেও পারবে না।'

ক্রাউজও বলল, কক্ষণো পারবে না।'

এই সময় স্মিট এসে জ্ঞানেটকে বলল, 'বেঁচে আছ দেখছি। ওকে কিছু খেলা শিখিয়ে দিও, তাহলে তোমাকে ওর ট্রেনার বলে, দুজনার খেলা দেখাব। ব্যাটা ঘুমোচ্ছে, না মরে গেছে?'

হঠাৎ গরাদের ফাঁক দিয়ে টারজানের হাত বেরিয়ে স্মিটের একটা পায়ের কব্জি চেপে ধরে টেনে খাঁচার ভিতরে ঠ্যাংটা নিয়ে এল। স্মিট চ্যাঁচাতে লাগল! টারজান তার পিস্তলটি তুলে নিল। তারপর ঠ্যাংটা ধরে প্যাঁচ দিল। স্মিটের চিৎকারে আবদুল্লা, জবু শিং, চাঁদ ছুটে এল বটে, কিন্তু টারজানের হাতে পিস্তল দেখে থমকে দাঁড়াল।

টারজান বলল, 'এক্ষুণি খাবার আর জল আনতে বল, নইলে ঠ্যাংটা ছিঁড়ে আনব।'

শুনে সকলে স্তম্ভিত! তাহলে হয়তো ওদের সব কথাই ও শুনেছে। ক্রাউজ ভাবছিল ওর হাতে এখন পিস্তল উঠেছে, মেরেও ফেলা যাবে না। হঠাৎ ডি গ্রুট চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবধান! পিছনে চেয়ে দেখ।' সঙ্গে সঙ্গে জবু শিং পিছন থেকে টারজানকে গুলি করতেই সে পড়ে গেল। স্মিট তাড়াতাড়ি সরে গেল, কিন্তু জ্ঞানেট টারজানের বন্দুকটা তুলে জবু শিংকে গুলি করল। ডান হাতে লাগতে জবু শিংহের পিস্তল খসে পড়ল। জ্ঞানেট সেটিও সংগ্রহ করল। তারপর টারজানের বুকে কান পেতে হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকপুকি শোনার চেষ্টা করতে লাগল। এই সময় একটা ইংলিশ জাহাজ দেখা দিল। স্মিট রেডিও করে একজন ডাক্তারের সাহায্য চাইল। জবু শিং খুব ক্যাওম্যাও করছিল। টারজান চুপ করে পড়ে ছিল। অন্য জাহাজটাতে ডাক্তার ছিল। স্মিট একটা নৌকো করে তাকে আনতে চলল: সঙ্গে গেল যন্ত্রপাতি অস্ত্রশস্ত্রসহ একদল লস্‌কর। জাহাজটি একটা ইয়াট। তার কাছে গিয়েই স্মিটের দল তাতে চড়াও হয়ে, ইংলিশ পতাকা নামিয়ে জার্মান নিশান তুলে দিল।

ইয়াটের যাত্রী একটি মেয়ে আর জনা পঁচিশেক পুরুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ক্যাপ্টেন বলল, 'এর মানে কি?'

স্মিট বলল, 'এর মানে জার্মান সরকারের নামে আমি এই জাহাজ অধিগ্রহণ করলাম। তোমরা সকলে আমাদের সামরিক বন্দী।'

ক্যাপ্টেন বলল, 'এটা তো যুদ্ধের জাহাজ নয়, অস্ত্রশস্ত্রও নেই। তোমাদেরো বাণিজ্যজাহাজ, বন্দী করবে কি করে?

ফ্ল্যানেলের প্যান্ট পরা এক লম্বা যুবক বলল, 'সে কি ভাই—'

স্মিট রূঢ় ভাবে ধমক দিল চোপ ঐ কথা বলার জন্যেই অধিগ্রহণ করা উচিত। ডাক্তার কোথায়? কাজে লাগো।'

ডাক্তার জবু শিং-এর ক্ষত বেঁধে দিতে গেল। স্মিট যেখানে যত অস্ত্রশস্ত্র পেল সংগ্রহ করতে লাগল। ইয়াট চালাবার জন্য কয়েকজন নাবিককে রেখে বাকিদের বন্দী করে নিজেদের জাহাজে নিয়ে গেল। যুবক বলল, 'একি অত্যাচার বল দিকিনি।'

মেয়েটি বলল, 'এর চেয়েও মন্দ অবস্থা হতে পারত অ্যাল্‌জি। এখন হয়তো তোমার আমাকে বিয়ে করতে হবে না।'

অ্যাল্‌জি বলল, 'তা বলা যায় না ভাই এ হয়তো আরো খারাপ!'

●

টারজানের মাথায় গুলিটা আসলে লাগেনি। গা ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে কয়েক মিনিট কিঞ্চিৎ অবসন্ন হয়ে পড়ে ছিল। তারপর সুস্থ হয়ে অন্য জাহাজ থেকে বন্দীদের আগমন দেখতে লাগল। খাঁচার ভিতর থেকে টারজান আর জ্ঞানেট অবাক হয়ে দেখছিল। জ্ঞানেট বলল, 'স্মিট দেখছি জলদস্যু বনে গেছে। অত বন্দী দিয়ে ও করবেটা কি?'

কি করবে একটু পরেই বোঝা গেল। স্মিট নবাগতদের আটজন নাবিককে সাইগন চালাবার কাজে সাহায্য করতে পাঠিয়ে দিল। আরো দুটো লোহার খাঁচা এনে আগন্তুকদের বলল, 'কে কোন খাঁচায় থাকবে বল।'

অ্যালজার্নন রাইট স্মিথ বলল, 'সে কি! মহিলাদেরো

ওর মধ্যে পুরবে নাকি ?'

—'সব শূওরকেই পুরব।'

সিন্ধু ঘোটকের মতো গোঁফ-ওয়ালা এক বয়স্ক ভদ্রলোক মুখটুখ লাল করে বললেন, 'ইংরেজ ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে এ কি রকম ব্যবহার ?'

মেয়েটি বলল, 'আহা, চট কেন কাকা ? ও যা বলচে তাই করাই বুদ্ধির কাজ।'

দলে আরেকটি মহিলাও ছিলেন, বছর পঞ্চাশেক বয়স, গায়ে পায়ে দিব্যি ভারি-ভারিক্কে। তিনি বললেন, 'আমি ওর মধ্যে ঢুক্‌ছিনে বাপু।'

মেয়েটি বলল, 'আমাদের যখন কোনো ক্ষমতাই নেই, তখন আর ঝামেলা বাড়িয়ে কি হবে, কাকি ? চল, ঢুকে পড়া যাক।' এই বলে কাকা কাকিকে নিয়ে সে ঢুকে পড়ল।

অন্য খাঁচায় ক্যাপ্টেন বোল্টন, সেকেণ্ড মেট টিবেট, ডাক্তার ক্রাউচ আর অ্যাল্‌জি ঠাসাঠাসি করে বসল। স্মিট সামনে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। 'বাঃ, দিব্যি এক চিড়িয়াখানা হল আমার !'

হঠাৎ মিসেস লী-র ছোট খাঁচাটার ওপর চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠলেন, 'ছি ! ছি ! লোকটা যে প্রায় উলঙ্গ !'

প্যাট্রিশিয়া বলল, 'দেখতে কিন্তু ভালো, কাকি।'

—'বলছি তাকাবে না ওদিকে। ঐটা ওর বৌ নাকি ?'

এই সময় বন্দীদের খাবার এল। এক হাঁড়ি স্টু, কি দিয়ে তৈরি কে জানে। যেমন জঘন্য দেখতে খেতেও তেমনি। টারজানের জন্য কাঁচা মাংস। সেই মাংস খেতে খেতে ওকে সিংহের মতো চাপা গর্জন করা দেখে, মিসেস লী আঁৎকে উঠলেন !

ওদের সঙ্গে একটু রসিকতা করার উদ্দেশ্যে জ্যানেট টারজানকে জোরে জোরে জিজ্ঞাসা করল, 'ক্যাপ্টেনের মাংস কেমন লাগছে ?'

টারজান বলল, 'গত সপ্তাহের সুইডটা খেতে আরো ভালো ছিল।'

মিসেস লী-র নাড়ি ছেড়ে যায় আর কি ! প্যাট্রিশিয়া বলল, 'আহা, ঠাট্টাও বোঝ না, কাকি ?'

এর মধ্যে হোল্ডের ক্ষুধার্ত জানোয়ারগুলো এতক্ষণ খেতে না পেয়ে অস্থির হয়ে গর্জাতে শুরু করে দিল। মিসেস লী স্বামীকে ধমকাতে লাগলেন ওদের থামাতে পার না উইলিয়ম ?'

তারপর চীনে আর ভারতীয় খালাসীরা ওদের খেতে দিতেই সব চুপ করল।

রাতে বাতাসের বেগ বাড়ল, সমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠল, জাহাজ দোল খেতে লাগল। একজন লস্‌কর এসে সব খাচায় বালতি ভরা জল আর ঝাঁটা দিয়ে গেল। যে যার নিজের খাঁচা সাফ করবে। টারজানের খাঁচা বাদ পড়ল ; বালতি দিতে হলে দরজাটা একটু তুলতে হয়, সে সাহস কারো নেই। আরো রাতে একজন লস্‌কর একা এসে সব ঠিক আছে কি না দেখে যায়। দরজা খোলে না সে ; তাছাড়া সঙ্গে একটা পিস্তল আনে। কর্নেল লী সেই লোকটাকে পাঁচ পাউণ্ডের একটা নোট দিয়ে বললেন, 'আমাদের জন্য চারটে চেয়ার আর কম্বল এনে দাও।'

নোটটা পকেটে পুরে সে বলল, 'ও সব আনতে পারব না।'

●

তারপর সে কি ঝড়বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ। জানোয়াররা ভয়ে দাপাদাপি করতে লাগল। টারজান খাঁচায় দাঁড়িয়ে ঝড় উপভোগ করছিল। চেয়ে দেখে পাশের খাঁচায় ইংরেজ লোকটি নিজের কোটটা স্ত্রীর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছেন আর মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝড় দেখছে। টারজান লস্‌করটার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সে এল না। আজ না এলেও কাল আসবে, নয়তো পরশু। টারজান অপেক্ষা করে থাকবে।

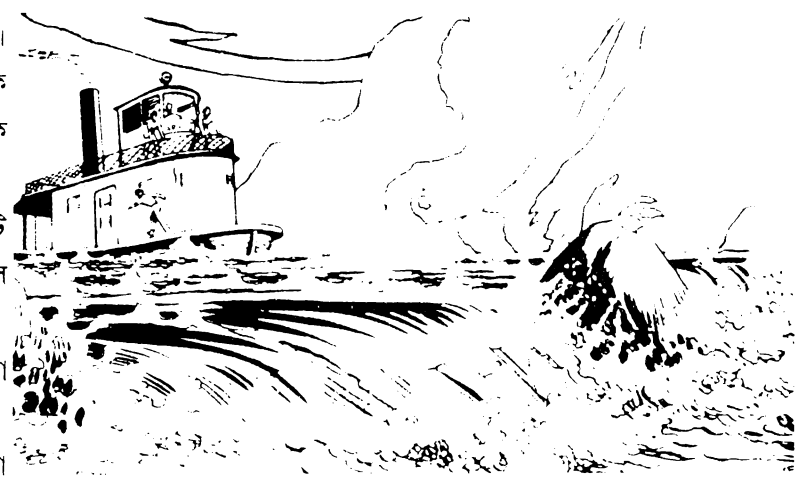

ঝড়ের বেগ বাড়ল। ঢেউগুলো মাঝে মাঝে ডেকের ওপর ভেঙে পড়ে ওদের ভিজিয়ে দিচ্ছিল। তারি মধ্যে জ্যানেট শুয়ে পড়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। প্যাট্রিশিয়া খাঁচায় পাইচারি করছিল। টারজান তাকে দেখছিল। ওর বলিষ্ঠ চলাফেরা, স্থিরচিত্তে বিপদকে গ্রহণ করা, তার ভালো লেগেছিল।

হঠাৎ প্যাট্রিশিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'ক্যাপ্টেনকে খেতে কেমন লাগল ?'

—'বড্ড নোনতা।'

দুজনায় আলাপ হয়ে গেল। মেয়েটি বলল, 'তুমি ইংরেজ ?'

—'আমার মা বাবা ইংরেজ। আমার নাম টারজান।'

—'ঐ খাঁচায় ঢুকলে কি করে ?'

—'আবদুল্লা আবু নেজিম প্রতিশোধ নিচ্ছে। একজন আফ্রিকান মোড়লেরো আমার ওপর রাগ আছে। তার সাহায্যে আমাকে বন্দী করে আবদুল্লা ক্রাউজের কাছে বেচে দিয়েছে। সে বুনো জানোয়ারের ব্যবসা করে। আমার পাশের খাঁচায় সে বন্দী। স্মিট ছিল সেকেণ্ড মেট। সে আর লসকররা বিদ্রোহ করে অন্যদের বন্দী করেছে।'

জ্যানেট বলল, 'সাইগন জাহাজ দেখতে এমন কিছু না হলেও, ঝড় মাথায় করে টিকে থাকতে পারে।'

সারা রাত ঝড় চলল। ঝড়ের মাথায় সাইগন তখনো ছুটে চলেছিল। থেকে থেকে একটা বড় ঢেউ ভেঙে হতভাগ্য বন্দীদের স্নান করিয়ে দিচ্ছিল। মিসেস লী স্বামীকে বকছিলেন, 'দেখ, দি টাইম্‌স্ ছাড়া অন্য কাগজ পড়া তোমার উচিত হয় নি। ঐ বি-বি লোকটার দুঃসাহসিক অভিযানের কথা না পড়লে তুমি দিব্যি নিরাপদে ইংল্যাণ্ডে বসে টাইমস্ পড়তে! ঐ লোকটা কি একটা সাগর ছেঁচে তুলেছিল বলে তোমার এখানে আসার কি দরকার ছিল বাপু ?'

সেদিন ওদের ধারেকাছে কেউ এল না। জল বা খাবারও দিয়ে গেল না। জানোয়ারদেরো না। তৃতীয় দিন বিকেলে দু-জন চীনে নাবিক খানিকটা ভিজে বিস্কুট দিয়ে গেল। কি আর করা, গাঁউ-গাঁউ করে তাই খেয়ে ফেলল ওরা।

এদিকে মিসেস লী চুপ করে বসে থাকলেন। তাই দেখে তাঁর স্বামী আর প্যাট্রিশিয়া ভেবেই মরে। একটা গুরুতর কারণ ছাড়া ওর খুঁৎখুঁৎ করা কখনো বন্ধ হয় না।

রাত ন'টায় বাতাস পড়ে গেল, চার দিক থমথমে চুপ। জ্যানেট বলল, 'সাইক্লোনের কেন্দ্রে পৌঁছেছি।'

টারজান বলল, 'একটু বাদেই আবার শুরু হয়ে যাবে।'

—'মধ্যিখানে না ঢুকে, বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল।'

টারজান বলল, 'এই ভালো।'

—'তার মানে ?

—'এক্ষুনি বুঝবে।'

স্মিট এসে বলল, 'জীবজন্তুরা কেমন আছে ?'

ডি গ্রুট বলল, 'অন্ততঃ মহিলাদের একটা ক্যাবিন দাও। নিদেন হোল্ডে থাকতে দাও।'

স্মিট বলল, 'আর কমপ্লেণ্ট শুনলে সব জলে ফেলে দেব।'

মিসেস লী কাঁদছিলেন। তারপর অশোক বলে সেই লস্‌করটি এল ইন্সপেক্‌শন করতে। একটু তফাৎ রেখে লস্‌করটা ওদের খাঁচার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, দুহাতে চাড় দিয়ে দুটো শিক বেঁকিয়ে, টারজান বেরিয়ে পড়ল। জ্যানেট দেখে থ'!

★

লস্‌করটা লীদের খাঁচার পাশের খাঁচার সামনে যেই পৌঁছেছে, পিছন থেকে ইস্পাতের মতো শক্ত আঙুল ওর গলা টিপে ধরে, খাপ থেকে পিস্তলটি তুলে নিল। জ্যানেটও খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল, স্মিট আর জবু শিং-এর পিস্তল দুটি নিয়ে। লস্‌করটা হাত পা ছুঁড়তেই টারজান তার কানে বলল, 'চোপ। নইলে মেরে ফেলব।' তারপর তার গলা থেকে খাঁচার চাবির গোছা খুলে নিয়ে, জ্যানেটকে বলল, 'এসো, সবাইকে খুলে দাও।' তারপর ফিসফিস করে বলল, 'পুরুষরা আমার সঙ্গে এসো। কর্নেল মেয়েদের নিয়ে এখানে থাকবেন। খাঁচার বাইরে এলেও, কাছাকাছি থাকবেন, যতক্ষণ না আমরা ফিরি।'

ডি গ্রুটকে ছাড়া হল কিন্তু ক্রাউজের সঙ্গে লস্‌করটাকে পুরে সে খাঁচাটা আবার বন্ধ করা হল। জ্যানেটকে একটা পিস্তল দিয়ে টারজান বলল, 'কেউ গণ্ডগোল করলেই গুলি করবে।'

একটা বন্দুক দিল ডি গ্রুটকে, একটা দিল নাইয়াডের সেকণ্ড মেট টিবেটকে। 'এবার চল, ব্রিজ দখল করতে হবে। ডি গ্রুট জাহাজটাকে চেনে, বাকিরা কোথায় অস্ত্রশস্ত্র পাবে বলতে পারবে। লড়াই করতে কাজে দেবে এমন জিনিস যা পাবে নিয়ে আসবে।'

ততক্ষণে সাইক্লোনের কেন্দ্র ছাড়িয়ে জাহাজ আবার বাতাসের দাপটের সামনে পড়েছে। টারজান আর টিবেট ব্রিজে গিয়ে স্মিটকে আর চাঁদকে নিরস্ত্র করে ফেলল। টারজান টিবেটকে বলল, 'তুমি হুইল নাও। কেউ বাধা দিতে এলে, গুলি কর।'

বন্দুক দেখিয়ে স্মিট আর চাঁদকে নিচে নিয়ে গিয়ে ক্রাউচদের সঙ্গে খাঁচায় পুরে দিল। তারপর বন্দুকের শব্দ শুনে নিচে গিয়ে দেখে লস্‌করদের সঙ্গে ওদের লোকদের লেগে গেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন লস্‌কর মরল বাকিরা

আত্মসমর্পণ করল। স্মিটের ক্যাবিনে নাইয়াডের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেল। উবানোভিচ আর বাকি লস্করররাও পরাজয় স্বীকার করল। চীনেরা আর নাইয়াডের নাবিকরা পাগলের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বাঁচল। এই ভাবে টারজান জাহাজ দখল করেছিল।

মিসেস লী-র তখনো ধারণা সে একটা বুনো এবং ক্যাপ্টেনকে আর সুইডকে খেয়ে ফেলেছে। নাইয়াডের ক্যাপটেনকে জাহাজের ভার দেওয়া হল, ডি গ্রুট ফার্স্ট মেট, টিবেট সেকণ্ড মেট। জাহাজে তো মাত্র দুটি ক্যাবিন। একটাতে কর্ণেল আর মিসেস লী থাকবেন অন্যটাতে মেয়েরা দুজন। এই ব্যবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট। এঞ্জিনিয়ার উবানোভিচ একটু গাঁইগুঁই করে বলল, 'আমার এঞ্জিনিয়ারের পদে থাকতে আপত্তি নেই। ঐ খ্যাপা স্মিটটার চেয়ে খারাপ তো কেউ হতে পারে না।'

—আরবটা কোথায় গেল?'

—'সে তো এঞ্জিন রুমেই থেকে গা গরম রাখার চেষ্টা করে।'

ঝড়টা আরো ঝেঁপে এল। পিছন থেকে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল এবং আবদুল্লা পিস্তল হাতে দেখা দিল।

*

আবদুল্লা আরেকবার টারজানের দিকে গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু জাহাজটা এত দুলছিল যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তখন টারজান ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনে একসঙ্গে মইটার ওপর থেকে নিচে ডেকে পড়ল। আবদুল্লা পড়ল তলায়। যে দুজন নাবিককে ক্যাপ্টেন বোল্টন পাঠিয়েছিলেন তারা ছুটে এসে দেখে আবদুল্লা পড়ে আছে, টারজান উঠে পড়েছে। তারপর চাবি নিয়ে ক্রাউজের সঙ্গে আবদুল্লাকেও পোরা হল। মরে গেছে কি বেঁচে আছে, তা দেখলও না টারজান।

ঝড় বেড়েই চলল। ভোরের আগে জাহাজ একটা জলের খাদের মধ্যে পড়ে উল্টোয় আর কি। তারপরেই ঢেউয়ের মাথায় চড়ে আবার উল্টো দিকে কাত হল। কেবলি মনে হয় এই বুঝি শেষ মুহূর্ত এল! এই গতিটাকে অস্বাভাবিক বোধ হওয়াতে, আঁকড়ে-পাকড়ে কোনোমতে ব্রিজে উঠে টারজান দেখে দুজন নাবিক হুইল ধরে ঝুলে আছে, ক্যাপ্টেনও কোনোমতে খাড়া। হাল কোথায় উড়ে গেছে।

বোল্টন বললেন, 'এমন ধারা জন্মে দেখিনি। স্মিট বেল্লিকটা রেডিও ভেঙে রেখেছে। কোথাও খবরও দেবার জো নেই।'

জাহাজটা এখানে প্রায় শুয়ে পড়ে, আবার সোজা হল। আলো ফুটতে শুরু করলে কানে একটা নতুন শব্দ এল। ক্যাপ্টেন বললেন, 'ওটা কিসের শব্দ জান?'

টারজান বলল, 'জানি। ঢেউ ভাঙার শব্দ।'

—জাহাজটাকে গুঁড়ো করতে ঐটুকুই বাকি ছিল।'

আলো বাড়তেই দেখা গেল সামনে একটা দ্বীপ, তাতে এক আগ্নেয়গিরি পাহাড়ের গা ঘন গাছপালায় ঢাকা, শিখর কুয়াশাচ্ছন্ন। দ্বীপ থেকে সিকি মাইল দূরে প্রবাল-মালা। তারি ওপর ঢেউ ভাঙছে এবং সেই দিকেই সাইগন জাহাজ গড়িয়ে চলেছে। বোল্টন বললেন, 'প্রবাল রীফের ঐখানে একটা ফাঁক আছে। এই সময়ে নৌকো নামালে সকলের প্রাণ বাঁচানো যায়।'

বোল্টন লোক-লস্করদের বললেন ডেকে এসে নৌকোর কাছে তৈরী থাকতে। কিন্তু এক দল লস্কর প্রথম নৌকোটা চটপট নামিয়ে, নিজেরাই চড়ে বসল; কিছুতেই তাদের ঠেকানো গেল না। আরেক দল দ্বিতীয় নৌকো দখল করার চেষ্টা করতেই বোল্টন বললেন, 'যে হুকুম অমান্য করবে তাকেই গুলি করে মারা হবে।'

পিস্তল দেখে তারা ক্ষান্ত হল। ক্যাপ্টেন বললেন 'আগে দেখা যাক ঐ নৌকোটার কি হয় তারপর আরেকটা নামবে।'

লস্কররা দক্ষ মাঝি, কিন্তু আবহাওয়া বিরূপ। অতি কষ্টে লাইফ-বোটটা এগোচ্ছিল। কর্নেল লী বললেন 'জাহাজটা যত রীফের কাছে যাবে, ততই নামার অসুবিধা।'

প্যাট্রিশিয়া বলল, 'তবু নৌকো নামালে হত না? সাইগন যদি ঢেউয়ের মাথায় রীফের ওপর আছড়ে পড়ে, তবেই তো হয়ে গেল!'

টারজান বলল 'ঝড় কমে আসছে, সমুদ্রও শান্ত হচ্ছে। রীফের ওপারে ঢেউ নেই। রীফে আটকালেও সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ভাঙবে না। জাহাজে থাকাই বেশি নিরাপদ।'

সকলের চোখ প্রথম নৌকোর ওপরে: সকলের বিশ্বাস ওরা বাঁচবে না।

একটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে আরেকটু হলেই নৌকোটা প্রবালমালা পার হয়ে শান্ত জলে পড়ত। দুঃখের বিষয় মাথাটা একটা খোঁচামতো প্রবালে ধাক্কা খেয়ে, উঁচু হয়ে উঠল। মাঝিরা ঝপাঝপ লেগুনের জলে পড়ে, দিব্যি হেঁটে পার হয়ে গেল। লেগুনটা অগভীর।

হাওয়া এবং ঢেউ দুই-ই পড়ে যাচ্ছিল; সাইগন ধীরে

ধীরে রীফের দিকে এগোতে লাগল। সাইগনে লাইফ-বেল্ট ছিল মাত্র খানকতক। মহিলাদের তিনজনকে তিনটি দেওয়া হল। ঢেউ যদি জাহাজটাকে আস্তে আস্তে প্রবালের ওপর তুলে দেয়, তবেই সবচেয়ে ভালো। আছড়ে ভাঙবে মনে হল না আর রীফ পার করে লেগুনে নামানোর সম্ভাবনাও কম। জাহাজে ভেলা ছিল, সে সব হাতের কাছে রাখা হল। নৌকোর দড়ি তৈরি করা হল। ক্রাউজ চ্যাঁচাতে লাগল, 'আমরা কি ডুবে মরব?' তাদের ছেড়ে দেওয়া হল।

●

একটা বড় ঢেউ জাহাজটাকে তুলে প্রবালমালার ওপর দুম্ করে নামাল। কড় কড় মড় মড় করে তলার নানা অংশ ভাঙলেও জাহাজ সেখানে চেপে বসল। আরেকটা বড় ঢেউও তাকে উল্টোতে পারল না। সবাই নামল। মিসেস লীকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দড়ির সাহায্যে নামানো হল। তারপর ভেলায় আর নৌকোয় করে ওরা লেগুন পার হতে লাগল। সাঁতারুরা সাঁতরে গেল। এবার টারজান বলল, 'কয়েকজন সাহসী স্বেচ্ছাসেবক চাই। আমার বন্ধুদের মুক্তি দেব।' বন্ধু মানে বুনো জন্তুরা।

কর্ণেল লী বললেন, 'ওসব হিংস্র জন্তু মেরে ফেললেই ভালো হয়।'

টারজান বিরক্ত হল, 'কই, মানুষ-বন্ধুদের বেলা তো এ কথা বলেন নি। এরাও আমার বন্ধু। এদের মধ্যেই মানুষ হয়েছি। সাবালক হবার আগে মানুষ দেখিনি; কুড়ি বছর বয়সে প্রথম সাদা মানুষ দেখেছি। যার যার ইচ্ছা, আমার সঙ্গে এসো।'

কর্ণেল লী বললেন, 'ঠিক বলেছ, ভাই। আমি আছি তোমার সঙ্গে।'

তারপর ডি গ্রুট, বোল্টন, টিবেট, ক্রাউচ, নাইয়াডের নাবিকরা কজন আর বেশ কিছু চীনেও সঙ্গে থাকবে। বাকিদের জাহাজ থেকে নেমে পড়তে বলা হল।

প্রথমেই ওরাংউটানদের ছাড়া হল। তারা টারজানের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কথা বলল, ওকে জড়িয়ে ধরল, ছোট ছেলেরা ভয় পেলে যেমন করে। জাহাজের হোল্ডের বড় দরজা খুলতে মাহুতদের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় আর আফ্রিকার হাতিগুলো বেরিয়ে, জলে নেমে সাঁতরে ওপারে উঠল। বাঘ-সিংহের আর ছোটবড় অন্য জন্তুদের খাঁচা টেনে বাইরে এনে দরজা খুলতেই পিলপিল করে বেরিয়ে সাঁতরে ওপারে চলে গেল। লেগুনের পাশে বেলাভূমি, তার পরেই ঘন বন। তার মধ্যে সকলে অদৃশ্য হয়ে গেল। খালি অজগরটাকে গুলি করে মেরে ফেলা হল। তাকে ছাড়া বিপজ্জনক।

সবাই নামলে নাবিকরা নৌকো আর ভেলা নিয়ে ফিরে এসে জাহাজ থেকে রসদ, আসবাব, বাসনপত্র, সব রকম দরকারি জিনিস নামাতে শুরু করল। দুদিন লাগল কাজ সারতে। তৃতীয় দিনে কাজ যখন প্রায় সারা, তখন পাহাড়ের শিখরের ঘন গাছপালার আড়াল থেকে জনা বারো লোক ওদের পর্যবেক্ষণ করছিল। বহুকাল পরে এ দ্বীপে বিদেশীর আগমন হল। ওরা অবিশ্যি কিছুই টের পেল না।

●

এই অলক্ষ্যদর্শীরা সবাই যোদ্ধা। পালকের মিনে আর রঙীন সূতির কাজ করা নেংটি পরা। পিঠে অস্ত্রশস্ত্র, পায়ে চামড়ার স্যাণ্ডাল। একজনের সাজের ঘটা বেশি; তার গায়ে জেডের আর সোনার গয়না, মুখে সূক্ষ্ম উল্কি করা। ইনি হলেন সাটল দিন, একজন অভিজাত পুরুষ। সকলের সঙ্গে তীর, ধনুক, বল্লম, পাথর ছুঁড়বার গুল্‌তি। তাছাড়া সকলের হাতে মণি বসানো লম্বা তলোয়ার। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে, তারা বনে মিলিয়ে গেল। জাহাজের মানচিত্র আর যন্ত্রপাতির সাহায্যে হিসাব করে বোল্টন বললেন, 'কি জানি হিসাবে ভুল-ও থাকতে পারে। তবে মনে হচ্ছে আমাদের চারদিকে বহু শত মাইলের মধ্যে কোনো ভূমিখণ্ড নেই। আমরা দক্ষিণ প্রশান্ত মহা-সাগরের কোথাও আছি!'

ডি গ্রুট তো অবাক! 'সে আবার কি? ম্যাপে নেই এমন কোনো জায়গা আছে নাকি? সে যাই হক, এসেছি যখন তখন নিশ্চয় আছে। এখান থেকে কেউ আমাদের উদ্ধার করবে সেই সম্ভাবনা আছে কি?'

—'চাঁদ থেকে উদ্ধার হবার যতটা সম্ভাবনা ঠিক ততটা।'

সবাই কাজে লেগে গেছিল। কর্ণেলের, তাঁর স্ত্রীর আর জ্ঞানেটের এবং প্যাট্রিশিয়ার জন্য কুঁড়ে তৈরি হয়েছিল। টারজান বলেছিল, 'দুটো ক্যাম্প হক। আবদুল্লা, ক্রাউজ, স্মিট, উবানোভিচ আর লস্করা আলাদা ক্যাম্প করুক।' ক্রাউজকে ডেকে বলল, 'তোমার লোকজনদের নিয়ে দুদিনের পথ দূরে গিয়ে ক্যাম্প কর। আমাদের দশ মাইলের মধ্যে এলে আমি মেরে ফেলব। যাও।'

উবানোভিচ বলল, 'যাব নিশ্চয়। কিন্তু জিনিসপত্রের ভাগ নিয়ে যাব।'

—'কিছু পাবে না। প্রাণ নিয়ে পালাও।'

কর্ণেল আপত্তি করেছিলেন, টারজান রাজি হয়নি।

উবানোভিচ চ্যাঁচাতে লাগল, 'কতকগুলো ধনীক্ সম্প্রদায়ের লোকে সুখে থাকবে আর শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার করবে! তোমাকে আমার চেনা আছে। ধনী ক্ষমতাশালীদের খোশামোদ কর!'

অ্যালজি বলল, 'বক্তিমে করছে শুনেছ?'

প্যাট্রিশিয়া বলল, 'হাইড পার্কের মতো।'

শেষ পর্যন্ত আবদুল্লা উবানোভিচকে টেনে নিয়ে গেল। ওরা উত্তর দিকে চলল। উবানোভিচ শেষ অবধি শাপাতে শাপাতে গেল।

আশেপাশের বনে খাবার জিনিস অনেক ছিল, নারকেল, কলা, ব্রেডফ্রুট, পেঁপে নানা রকম কন্দ। মিষ্টি জলের ঝরনা। লেগুনে প্রচুর মাছ। ক্যাম্প খাটানো হলে, জাহাজে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তার ওপর টারজান তীর-ধনুক বল্লম ইত্যাদি তৈরি করে নিল। দ্বীপে বুনো জানোয়ার ছাড়া হয়েছে।

এর পর একদিন ভোরে টারজান সবার আগে উঠে, বনে গিয়ে গাছে ঝুলে ঝুলে এগিয়ে চলল। হঠাৎ ফিরে দেখে ওরাংউটান দুটো পিছন পিছন চলেছে। বনমানুষদের ভাষায় টারজান বলল, 'শিকার করছি। শব্দ কর না।'

তিনজনে নিঃশব্দে চলল। পাহাড়ের ঢালের নিচের দিকে হাতিরা কচি পাতা খাচ্ছিল। পরস্পরকে অভিবাদন করে, টারজান একটা মস্ত আফ্রিকান হাতির কাছে গিয়ে ওর প্রিয় টানটরের সঙ্গে যে ভাষায় বলত, সেই ভাষায় কথা বলল। তাকে ভাষা না বলে কতকগুলো শব্দ বলা চলে, ওরা সবাই তার মানে বোঝে। এ-ও বুঝল। টারজানের গায়ে আস্তে আস্তে শুঁড় বুলিয়ে দিল। টারজান বলল 'নালা, টানটর, নালা!' হাতি ওকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে মাথায় তুলে নিল। টারজান বলল, 'বান্দো!' ওর কানের পিছনে চুলকে দিতে লাগল। অন্যরাও নিশ্চিন্তে চরতে লাগল। ওরাংউটানরা ভয়ে গাছে বসে রইল।

এর পর টারজান একটা পরীক্ষা করে দেখল। বনের মধ্যে কিছু দূরে গিয়ে ডাক দিল, 'যুধ, টানটর, যুধ বৈট্!' হাতিটা দূর থেকে উত্তর দিয়ে, গাছপালা ভেঙে হাজির হল! টারজান ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'বান্দো টানটর!'

সামনে খাড়াই। ওরা তিনজন এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে একটা থাকের মতো পেয়ে সেটা ধরে একটু এগিয়ে গাছে ঢাকা একটা মালভূমিতে পৌঁছল। নাকে এল বুনো শূওরের গন্ধ। সবে শিকার করার কথা ভাবছে, এমন সময় একটা সিংহ আর একটা মানুষের গন্ধও নাকে এল। মনে হল সিংহটা মানুষের পিছু নিয়েছে। টারজান গাছে গাছে সেদিকে এগোল।

★

থাক-চান সিংহ শিকার করছিল না, বুনো শূওর শিকার করছিল। পিছনে সিংহ লেগেছে, তাও টের পায়নি। বনের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় পিছনে চাপা গর্জন শুনে ফিরে দেখে বিকট এক জানোয়ার। অমনি দৌড় লাগাল থাক-চান; বলা বাহুল্য সিংহ পিছু নিল। তখন থাক-চান ফিরে দাঁড়াল বল্লম হাতে। একবার আছাড় খেয়ে উঠে দাঁড়াল মানুষটা। সিংহ তেড়ে এল না একটু তাড়াতাড়ি হেঁটেই এগোল।

থাক-চান বুঝল সাক্ষাৎ মৃত্যু আসছে। হঠাৎ গাছ থেকে অচেনা জানোয়ারটার পিঠে একটা নেংটি-পরা মানুষ নামল। নেমে পা দিয়ে জানোয়ারটার পিছনের পা জড়িয়ে ধরে, এক হাত দিয়ে গলা জড়াল। জানোয়ারটা লাফঝাঁপ করেও তাকে ফেলতে পারল না। অন্য হাতে লম্বা একটা ছোরার কোপ দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাকে মেরে ফেলল মানুষটা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মরা জন্তুটার গায়ে পা রেখে বিকট এক জয়ধ্বনি দিল। থাক-চান শিউরে উঠে, দুহাতে নিজের কান ঢাকল।

উক্সমাল দ্বীপে এমন গর্জন কেউ কখনো শোনেনি। এ কি মানুষ, না দেবতা!!

★

থাক-চানদের অনেক দেবতা। তাদের মধ্যে এ যে কোনটি তা সে ভেবে পেল না। হয়তো বনদেবতা চে। সেই নামেই তাকে ডেকে, থাক-চান কৃতজ্ঞতা জানাল। চে যে ভাষায় উত্তর দিল, সে থাক-চানের অজানা। টারজান তখন তীরেরর ফলা দিয়ে মাটিতে একটা শূওর এঁকে, ছবিটার গায়ে তীর ছুঁড়ে বোঝাতে চেষ্টা করল সে শিকার করতে এসেছে। এবার থাক-চান বুঝতে পেরে, ওকে ডেকে নিয়ে গেল। গাছের ওপর ওরাংউটান দুটোকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে, তাদের লক্ষ্য করে তীর ধনুক তুলতেই, টারজান সেগুলি কেড়ে নিয়ে, ওরাংউটান দুটোকে ডাকল। তারা নেমে ওর পাশে দাঁড়াল।

থাক-চান বুঝল এরাও দেবতা। তার বড় ইচ্ছা তাড়াতাড়ি চিচেন ইটজা নগরে ফিরে গিয়ে এইসব অত্যাশ্চর্য

কথা সবাইকে জানায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল পুরোহিতরা হয়তো চটে যাবে। বলবে মিথ্যাবাদী। সেই অপরাধে তাকে বলিও দেওয়া হতে পারে। তার চেয়ে এদের চিচেন ইটজায় নিয়ে গিয়ে, সবাইকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিলেই, তারা বিশ্বাস করবে।

টারজান ভাবছিল বুঝি শূওরের খোঁজে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। হঠাৎ বনের শেষে দেখে এক আশ্চর্য শহর! তার মাঝখানে টিলার ওপর একটা মন্দির। শহরের মধ্যিখানটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা; পাঁচিলে কয়েকটা ফটক আছে। পাঁচিলের বাইরে খড়ো ঘরের সারি। নিশ্চয় গরীবরা থাকে। টারজান প্রথমটা সন্দেহবশতঃ এগোচ্ছিল না। তারপর কৌতূহলী হয়ে থাক-চানের সঙ্গে চলল। ক্ষেতে পুরুষ-মেয়েরা চাষের কাজ করছিল। ভুট্টা, শিম, কন্দের ক্ষেত। চারশো বছর আগে এ সবের বীজ আর মূল চাক-টুটুল-সিউ সঙ্গে এনেছিল।

থাক-চান সকলের কাছে ঘোষণা করল এরা দেবতা। দুঃখের বিষয়, এই সময় ওরাংউটান দুটো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, বনের মধ্যে অদৃশ্য হল। থাক-চান তাদের অনেক ডাকল, তারা কান দিল না। এদিকে সামনের ফটকের রক্ষীদের সঙ্গে একজন অফিসারও অপেক্ষা করছিল। যে যোদ্ধারা পাহাড় থেকে ক্যাম্পটা দেখতে পেয়েছিল, এ অফিসার তাদেরি নেতা। সে বলল 'তুমি কে? ও কাকে এনেছ?'

—'আজ্ঞে আমি শিকারী থাক চান। ইনি বনদেবতা চে। আমাকে সিংহের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।'

অফিসার সাট্‌ল্ দিনের খুব আস্থা হল না। তবে আগন্তুক সকলের মাথার ওপর লম্বা; চেহারাও দেবতারি যোগ্য। কিন্তু সমুদ্রের উপকূলে যারা এসেছে এ তো তাদের একজনও হতে পারে। 'কে তুমি? যদি বনদেবতা চে হও, তাহলে প্রমাণ দাও।'

থাক-চান বলল 'উনি আমাদের ভাষা বোঝেন না।'

—'দেবতারা তো সব বোঝেন।'

—'তা বোঝেন হয়তো। কিন্তু বলতে ঘৃণা হয়।'

টারজানকে রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। এতক্ষণ পরে টারজানের সন্দেহ হতে লাগল ফাঁদে পড়েনি তো? রাজবাড়িতে তাকে চিচেন ইটজার প্রধান পুরোহিত চাল-ইপ-সিউয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। প্রথমটা খানিকটা প্রভাবিত হলেও, পরে সাট্‌ল্-দিনকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঐ যারা জাহাজ ভেঙে উপকূলে আছে, তাদের কেউ নয় তো?'

—'তা হতে পারে।'

—'তবে তো সামান্য মানুষ। দেবতা হলে জাহাজ ভাঙত না। ঝড়ও দেবতাদের মানে। অর্থাৎ এ একজন মানুষ। তবে একে দিয়ে দেবতাদের উপযুক্ত বলিদান করা যেতে পারে।'

●

থাক-চানের তো চক্ষু স্থির। কিন্তু কিছু বললে তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে। ভালোয় ভালোয় সে কেটে পড়ল। ওদের ভাষা না বুঝলেও, হাব-ভাবে টারজান টের পেয়েছিল পরিস্থিতি সুবিধার নয়। পাশে একসারি থাম। তারপর বাগান; তার পিছনে এক-তলা এক সারি বাড়ি। তার পিছনে কি তা দেখা না গেলেও, পাঁচিলটা কাছেই। পাঁচিলের বাইরে ক্ষেত, তার পরেই বন। এক ঝাঁকি দিয়ে যোদ্ধাদের ঝেড়ে ফেলে, টারজান লাফিয়ে প্রধান পুরোহিতের মঞ্চে উঠে পড়ল। তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, এক দৌড়ে পিছনের একটা একতলা বাড়ির ছাদে চড়ে, ও পাশের পথে নামল। তাকে দেখে নাগরিকরা ভয়ে পিছিয়ে গেল। টারজান গেটের রক্ষীদের সরিয়ে বাইরে পৌঁছল। দুঃখের বিষয়, মাথায় একটা ঢিল লাগাতে, সেখানেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

যখন জ্ঞান হল, দেখে সে একটা ঘরের মধ্যে কাঠের খাঁচায় বন্ধ। ছোট ঘর, একটি মাত্র জানলা, সেটা আবার ছাদের কাছে। ঘরের একটি দরজা, সেটা বাইরে থেকে বন্ধ! কপালে কি আছে কে জানে। এদের মুখগুলো বড় নিষ্ঠুর। খাঁচা ভেঙে বেরোনো খুব সহজ হবে, কিন্তু ঘর থেকে বেরোনো মুস্কিল। জানালাটার মধ্যিখানে পাথরের গরাদ। খাঁচার পিছন দিক থেকে দুটি কাঠের শিক খুলে দরজার কাছে বসে রইল টারজান। কেউ না কেউ আসবে নিশ্চয়।

এর মধ্যে যে রাত কেটে আবার দিন হয়েছে, তবে তার জ্ঞান ফিরেছে, সেটা সে টের পায়নি।

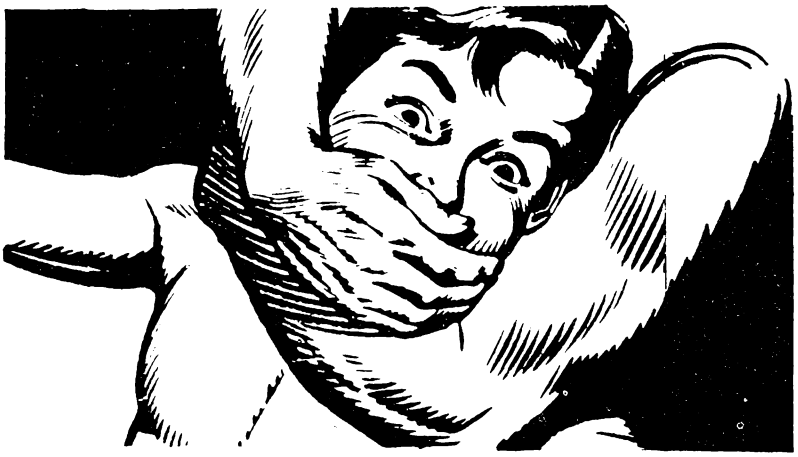

বাইরে শিঙার শব্দ শোনা গেল। অনেক লোক জমেছে বোঝা গেল। এই সময় টারজানের ঘরের দরজার খিল খুলে একটা লোক ঘরে ঢুকল এবং কাঠের শিকের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গেল। টারজান দরজার কাছে গিয়ে দেখে, সামনেই খানিকটা খোলা জায়গা, সেখানে একটা বেদীর ওপর একটি অল্পবয়সী মেয়েকে হাত পা ধরে শুইয়ে রাখা হয়েছে আর একটা জমকালো সাজপরা পুরোহিত তার বুকের ওপর দামী পাথরের এক ছোরা তুলেছে।

এক নিমেষে পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে টারজান মঞ্চে উঠে পুরোহিতের হাত থেকে ছোরা কেড়ে নিয়ে, তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল যারা মেয়েটাকে ধরে রেখেছিল তাদের গায়ে। বাকি দুটোকে ডাণ্ডার বাড়ি দিয়ে পেড়ে ফেলে, মেয়েটাকে কাঁধে তুলে, এক লাফে মন্দিরের বাইরের গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। পথে লোকজন ছিল না, টারজান অলিগলি দিয়ে পাঁই পাঁই ছুটতে লাগল। ক্রমে অনুসরণকারীদের গলার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এল। এক লাফে একটা শেডের ছাদে চড়ে, পাঁচিল টপকে, বনের দিকে দৌড়ল। মেয়েটির নাম ইটমিল চা। তার মনে হল স্বয়ং দেবতাই তাকে জীবন্ত অবস্থায় গ্রহণ করেছেন।

★

এদিকে ক্যাম্পের জীবনযাত্রা কর্ণেল লীর তত্ত্বাবধানে সামরিক নিয়মে চলেছিল। আদর্শ ক্যাম্প যাকে বলে, এ-ও তাই। লেগুনে মাছ ধরা হয়, বনে শিকার করা হয়। মেয়েরা ঘরকন্নার দিকটা দেখে। টারজানের রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হওয়া নিয়ে সকলের ভাবনা। তবে মিসেস লী বললেন, 'এই প্রথম নিজেকে নিরাপদ মনে হচ্ছে। কখন কাকে খেয়ে ফেলে তার ঠিক কি?'

জ্যানেট বলল, 'আমাকে তো ওর খাঁচাতেই পুরে রেখেছিল। কই কিছু তো করেনি।'

মিসেস্ লী বললেন, 'হুঁঃ!'

জ্যানেটকে তিনি ভদ্রসমাজভুক্ত মনে করতেন না. একবার মন ঠিক করলে, কারো সাধ্য ছিল না তাঁর মত বদলায়। প্যাট্রিশিয়া বলল, 'যাবার আগে অস্ত্রশস্ত্র বানাচ্ছিল। বোধ হয় শিকারে গেছে। বাঘ সিংহে ধরেনি তো?'

মিসেস লী বললেন, 'ও-ই তো ওগুলো এখানে ছেড়ে ছিল। ঠিক হয়েছে।'

অ্যালজার্নন রাইট-স্মিথ, ক্যাপ্টেন বোল্টন আর ডঃ ক্রাউচ শিকারে বেরিয়েছিল। বনের মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ল মস্ত থাবার ছাপ। হয় বাঘ, নয় সিংহ। ক্রাউচ আর অ্যালজি সেটাকে পরীক্ষা করে দেখল। ক্রাউচ বলল, 'বাঘ নিশ্চয়!' এই সময় বাঘটা দেখা দিল। ঝোপঝাড় ভেঙে বাঘটা এগোতে আরম্ভ করতেই, বন্দুক ফেলে অ্যালজি গাছে চড়ল। অন্যরাও ওকে অনুসরণ করল আর সঙ্গে সঙ্গে বিশাল এক বেঙ্গল টাইগার এক লাফে গাছের গোড়ায় হাজির। শিকার হাতের বাইরে চলে গেছে দেখে কি তার রাগ!

অ্যাল্জি বলল, 'ভাগ্যিস গাছগুলো ছিল। আমি খুব গাছ ভালোবাসি!'

বাঘটা এক লাফ দিয়ে একটুর জন্য অ্যাল্জির নাগাল পেল না। বার দুই চেষ্টা করে একটু দূরে গিয়ে, শুয়ে পড়ে অপেক্ষা করতে লাগল। 'ই কিরে বাবা! কতক্ষণ ঐভাবে থাকবে?'

বোল্টন বললে, 'বেঙ্গলে একটা লোককে সারা রাত গাছে বসিয়ে রেখেছিল বাঘ!'

অ্যালজি বলল, 'বন্দুকটা হাতে থাকলে, ব্যাটাকে গুলি করতাম।'

ক্রাউচ বলল, 'তুলে আন না কেন?'

শার্ট ছিঁড়ে দড়ি পাকিয়ে তাতে একটা ফাঁস বানিয়ে অনেক কষ্টে বন্দুকের একটা অংশে আটকে অনেকটা তুলেও এনেছিল অ্যালজি। হঠাৎ তেড়ে এসে বাঘ এক লাফ দিতেই ফালি সুদ্ধ বন্দুক আবার পড়ে গেল।

✱

ক্রাউজ তার স্যাঙাৎদের নিয়ে দশ মাইল দূরে যায় নি। চার মাইল গিয়ে, আরেকটা ছোট

নদীর ধারে ক্যাম্প করেছিল। টারজান ওদের অস্ত্রশস্ত্র আনতে দেয়নি বলে সকলের খুব রাগ।

উবানোভিচ বলল, 'রাতে গিয়ে চুরি করে আনলে হয়।

—'আগে তুমি গিয়ে দেখে এসো।' বলল স্মিট।

— তুমি নিজে যাও না। আমাকে হুকুম করছ কেন?'

দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেধে যাচ্ছে দেখে ক্রাউজ বলল, একজন লস্করকে পাঠাও না।'

কুলদ্রুপ বলে একজনকে ডাকতেই, সে বলল, 'আমি যাব না। মাটিতে বনে বাঘ আছে।'

স্মিট তাকে এক ঘুঁষি মেরে ফেলে দিল। খুব রেগেছিল লোকটা। তবু গেল শেষ অবধি।

অ্যালজি হঠাৎ বলল, 'বাঘটা ও কি করছে?'

— কিছু শুনেছে, তাই দেখছে।'

এদিকে কুলদ্রুপ ঠিক করেছিল অন্য ক্যাম্পে গিয়ে এদের মতলবের কথা বলে দেবে। এই ভেবে সেদিকে এগোচ্ছিল। তাকে দেখেই গাছ থেকে এরা তিনজন চেঁচিয়ে সাবধান করে দেবার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু সে কেমন ঘাবড়ে গেল। ওদের চোখের সামনে বাঘটা বেচারাকে ধরে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। একটুক্ষণ তার চিৎকার শোনা গেল। তারপর সব চুপ। এরা তিনজনে স্তম্ভিত। তারপর নিঃশব্দে নেমে ক্যাম্পের পথ ধরল।

ক্যাম্পে কর্ণেল লী ভেবে পাচ্ছিলেন না নাবিকদের আর কি কাজ দেওয়া যায়। মিসেস লী চটে গেলেন, 'ও আবার কথা। আমি তো দেখি মেলা কাজ রয়েছে।'

—'চুপ করে বসে থাকলেই লোকে ক্রমে অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে।'

জ্যানেট আর ডি গ্রুট বসে গল্প করছিল। ক্যাম্পে সব চুপচাপ। এমন সময় শিকারীরা ফিরে এসে তাদের বিকট অভিজ্ঞতার কথা জানাল। কর্ণেল বললেন, 'তার মানে আর শিকারে যাওয়া নয়।'

মিসেস লী চটে গেলেন, 'তোমার দোষ। তুমি কেন ঐ বুনোটার কথা শুনে ওদের ছেড়ে দিয়েছিলে!'

—'তাই করাই উচিত বলে মনে করি। কে জানে ওকে হয়তো মেরে ফেলেছে।'

—'বেশ হয়েছে। ঐ রকম খালি গায়ে যে মহিলাদের সামনে ঘুরে বেড়ায়, তার বাঁচা উচিত না।'

প্যাট্রিশিয়া বলল, 'ভুলে যেয়ো না, কাকি, ও-ই তোমাকে সাইগন জাহাজ থেকে উদ্ধার করেছিল।'

ইটজিল-চাকে নিয়ে বনে পৌঁছেই টারজান গাছ ধরে ঝুলে পড়ল। একটু পরেই সে টানা একটা ডাক দিল। অমনি দুটো অদ্ভুত জীব বকর বকর করতে করতে গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে এসে হাজির হল। ইটজিল-চা অবাক হয়ে দেখল বনদেবতা চে তাদের সঙ্গে ঐ রকম ভাষায় কথা বলতে লাগল। ঐ তবে দেবতাদের ভাষা! গাছের নিচে একটা বিকট জন্তুর মৃতদেহ পড়ে ছিল। এটার হাত থেকেই বোধহয় থাক-চানকে চে বাঁচিয়েছিল।

আরো কিছুদূর গিয়ে দেবতা ওকে মাটিতে নামিয়ে দিল, ও তখন হেঁটে চলল। অন্য দুটো দেবতা পিছন পিছন হেঁটে চলল। তারপর একটা খাড়াই বেয়ে নামল ওরা। চে ওকে আবার কাঁধে করে নামাল। নিচে পৌঁছে অদ্ভুত করে ডাক দিতেই বিশাল একটা জানোয়ার বন থেকে বেরিয়ে এল। মেয়েটা কখনো হাতি দেখেনি। সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছা গেল। জ্ঞান ফিরলে দেখে সেই জানোয়ারের মাথায় বনে চে-র সঙ্গে সে দিব্যি চলেছে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, লুম-কিপ ওদের জন্য রান্না করছিল। মাছ ভাজা, কন্দ সিদ্ধ, ফল। লুম-কিপ খুব খুশি। এরা বড় ভালো ব্যবহার করে, কাজও খুব হাল্কা। সকলে বসে গল্প করছে, হঠাৎ প্যাট্রিশিয়া বলল, 'ও কি! দেখ দেখ!'

বন থেকে বেরিয়ে এল হাতির মাথায় বসে টারজান আর একটা মেয়ে, তার পরনে বিশেষ কিছু নেই। ওদের পিছনে দুটো ওরাংউটান। বন থেকে বেরিয়ে হাতি থামল আর টারজান মেয়েটাকে নিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে এল।

টারজানকে দেখে সবাই চুপ। মিসেস লী স্বামীকে বললেন, 'এই সব অসভ্য বুনোর সঙ্গে এক ক্যাম্পে আমি থাকতে পারব না। প্যাট্রিশিয়া যেন ওদের সঙ্গে না মেশে।'

কিন্তু টারজান এসেই প্যাট্রিশিয়াকে বলল, 'তুমি এর ভার নাও।'

সে বলল আমি?

কর্ণেল লী বললেন, এর মানে কি?'

তখন টারজান সব কথা খুলে বলল। শুনে প্যাট্রিশিয়া বলল, নিশ্চয় আমি ওর ভার নেব।

টারজান কর্ণেলকে বলল আমাদের এবার প্রস্তুত হতে হবে। ওদের অনেক যোদ্ধা দেখে এলাম। তারা নিশ্চয় মেয়েটাকে নিয়ে যেতে আসবে। বনে গেলে বড় দল করে যেতে হবে।'

কর্ণেল বললেন, 'আমি তো হুকুম দিয়েছি কেউ যেন বনে না যায়। আজ বোল্টন, ক্রাউচ আর অ্যাল্‌জি একটা বাঘের পাল্লায় পড়েছিল।'

●

এর পর ছয় সপ্তাহ নিরুপদ্রব একঘেয়ে ভাবে ক্যাম্পের সময় কাটল। প্যাট্রিশিয়া ইটজিলকে ইংরিজি শেখাত। ইটজিল টারজানকে মায়া ভাষা শেখাত। একমাত্র টারজান মাঝে মাঝে বনে গিয়ে শূওর মেরে আনত। মিসেস লী গজগজ করতেন, একটু কাপড় জোগাড় করে ইটজিলের জন্য একটা গাউন করে দিতে হবে ইত্যাদি। বুনোটাকেও প্যাণ্ট পরতে হবে। ইট্‌জিলের কাছ থেকে অনেক কথা জানতে পেরেছিল প্যাট্রিশিয়া। ইটজিলের ধারণা টারজানই হল বনদেবতা, তার কাছেই ওকে বলি দেবার আয়োজন হয়েছিল। তা-চে-ই ওকে উদ্ধার করে এনেছে। ওর নিজের বাপ পুণ্যলাভের আশায় ওকে বলি দিতে এনেছিল। ঐ দ্বীপটার নাম উক্সমাল। অনেক শো বছর আগে ঐ নামের শহর থেকে এদের পূর্ব-পুরুষরা এসেছিল। এ-সব শুনে প্যাট্রিশিয়া বলেছিল, 'এরা তাহলে মায়া বংশীয়।'

ক্রাউচ্‌ বলল, 'শুধু তাই নয়, এরা ওদের পুরনো আচার-অনুষ্ঠান আজ পর্যন্ত পালন করে চলেছে। পণ্ডিতরা এখানে চমৎকার গবেষণার ক্ষেত্র পেতে পারেন। হয়তো মধ্য আর দক্ষিণ আমেরিকার স্তূপের আর মন্দিরের গায়ে লেখা লিপি-গুলোর পাঠ উদ্ধার করতেও পারবেন।'

টারজানকে জিজ্ঞাসা করা হল ঐ গ্রাম ছাড়া কি এখানে আর কোনো গ্রাম নেই। সে বলল, 'তা জানি না। তবে মায়াজাতীয় ছাড়াও অন্য লোক আছে এখানে। ইটজিল বলছিল দ্বীপের উত্তর দিকে খুব মন্দ লোকদের বসতি আছে। একবার জহাজডুবি থেকে যারা বেঁচেছিল তারা এখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে গেছে। তাদের বংশধররা ওখানে থাকে। দ্বীপের মধ্যিখানে থাকে আদিবাসীরা। তারা নরখাদক।'

ডি গ্রুট এসে কর্ণেল লীকে বলল, নাবিকরা জানতে চাইছিল, সাইগনের ভগ্নাবশেষ দিয়ে ওরা একটা নৌকো তৈরি করতে পারে কিনা যাতে করে এ-দেশ ছেড়ে যাওয়া যায়।

এতে কারো আপত্তি ছিল না, তবে প্রশ্ন হল কোথায় নৌকোটা বানানো হবে। রীফে জায়গা হবে না। এদিকে করলে ভাসাবে কি করে? লেগুনের জল অগভীর। টারজান বলল, 'এক মাইল উত্তরে একটা সরু উপসাগর আছে, সেখানে প্রবালমালা নেই।'

হাঙ্গামাও আছে, এক মাইল পথ উপকরণ কাঠ কুটো বয়ে নিয়ে যেতে হবে। ডি গ্রুটের বাবার জাহাজ তৈরির ব্যবসা, সে না হয় ডিজাইন করে দিল। এই সব জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল।

●

চুলক্রুপ যখন দুদিনের মধ্যে ফিরল না, স্মিট জোর-জার করে আরেকজন লস্করকে পাঠাল, সে-ও ফিরল না। তাদের আলাদা ক্যাম্প, সেখানে তারা খুব কাজে ব্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় লোকটাও যখন ফিরল না, স্মিট আরো দুই জনকে ডেকে পাঠাল। হাঁড়িমুখ করে তারা ওর গালাগালি শুনে, আবার ক্যাম্পে গিয়ে বসে পড়ল। বনে গেল না। রেগেমেগে স্মিট্‌ উচিত শিক্ষা দেবে বলে তাদের ক্যাম্পে যেতেই, তীরধনুক বল্লম হাতে পনেরোজন লসকর তার সম্মুখীন হয়ে বলল, 'আমরা আর তোমাদের হুকুম মানব না। গেট্‌ আউট্‌!'

স্মিট্‌ চটে বলল, 'এতো বিদ্রোহ!'

লম্বা চওড়া একজন লস্‌কর ধনুকে তীর লাগিয়ে, আবার বলল, 'গেট্‌ আউট।'

স্মিট গুটিগুটি ফিরে গিয়ে বলল, 'ওরা বিদ্রোহ করেছে।'

তাই শুনে উবানোভিচ মহাখুশি! 'বাঃ! এইতো চাই! গণতন্ত্রের জয়! আমিও ওদের সঙ্গে যোগ দেব।' এই বলে সত্যি সত্যি সেখানে গিয়ে গণবাদের জয়গান শুরু করল।

একজন লস্‌কর বলল, 'গেট্‌ আউট!'

সে তো অবাক! 'আমি তোমাদের দলে যোগ দিতে এসেছি যে! একসঙ্গে আমরা—'

ওরা বলল, 'গেট্‌ আউট!'

উবানোভিচ্‌ও গুটিগুটি ফিরে এল। সে রাত্রে ওদের চার জনকে পালা করে ধুনি জ্বেলে রাখতে হল। লস্‌করদের দেখা নেই। তারা তো নিজেদের ক্যাম্পে পড়ে ঘুম দিচ্ছিল। তাদের ধুনি নিবে গেল। ছোট ক্যাম্পটাতে আবদুল্লা পাহারা দিতে দিতে সিংহের চাপা হুংকার আর মানুষের আর্ত চিৎকার শুনতে পেল। বুঝল একজন লস্‌করকে সিংহে নিয়েছে। ক্রাউজ টারজানের ওপর খুব তর্জন গর্জন করতে লাগল। তার জন্যেই এই বিপদ ঘটল। স্মিট বলল, 'সব তোমার দোষ। একটা শ্বেতাঙ্গকে খাঁচায় ভরেছিলে কেন?'

—'আবদুল্লা বলল যে!'

সে রাতে দুই ক্যাম্পে কারো ঘুম হল না।

পরের রাতেও লস্করা ধুনি জ্বালাল না; সেদিনও একটা লোকের প্রাণ গেল। ক্রাউজ বলল, 'সিংহটার এই রকম অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। এর পর আমাদের পালা! আমি বাপু, গাছে ঘুমুব।' এই বলে গাছের ওপর মাচা তৈরি করল। ওর দেখাদেখি বাকিরা তাই করল। সকালে ওরা স্থির করল টারজানের কাছে মাপ চেয়ে, আবার একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করবে।

●

চাঁদ লস্কর ওদের যাওয়া দেখে, সঙ্গীদের বলল, 'চল আমরাও যাই।'

এদিকে টারজান খুব ভোরে উঠে জলযোগ সারল। সেদিন তার দ্বীপের অন্য দিকটা দেখে আসার ইচ্ছা। প্যাট্রিশিয়া আর ইটজিলও সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু টারজান তাদের নিল না; একাই রওনা হল।

চিচেন ইটজার প্রধান পুরোহিত খুব রেগে ছিল। মন্দির অপবিত্র হয়েছে, বলি চুরি গেছে। রাজা চাল ইপ সিউ বলল, 'হয়তো তা হয়নি। ও-ই সত্যিকার চে।'

—'কক্ষণো না। ও ঐ জাহাজ-ভাঙা দলের লোক। দেখ রাজা, দেশের মঙ্গল চাও তো একশো যোদ্ধা পাঠাও ঐ ঘাঁটি থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করে আনতে।'

টিবেট একদল নাবিক নিয়ে নৌকো করে সাইগন জাহাজ থেকে তক্তা দড়ি উদ্ধার করে আনতে গেছিল। বাকিরা সকালের জলখাবার খেতে বসেছিল। ইটজিল চা হাঁড়ি মুখে বসেছিল। জ্যানেট এসে ডি গ্রুটের পাশে বসল। কর্ণেল লী জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্যাট্রিশিয়া ওঠেনি?'

জ্যানেট বলল, 'সে তো আমার আগেই উঠে গেছে। গেল কোথায়?'

মিসেস্ লী বললেন, 'সেই বুনোটাকেও তো দেখছি না। আমি জানতাম এই রকম একটা কিছু হবেই, তুমি তো শুনলে না।'

—'কি হবে?'

—'বুনোটা নিশ্চয় ওকে ধরে নিয়ে গেছে।'

ইটজিল বলল, 'অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর দুজন দুদিকে চলে গেল।'

কর্ণেল বললেন, 'প্যাট যদি বনে গিয়ে থাকে, আশা করি টারজান সঙ্গে আছে।'

টারজান সঙ্গে নিল না বলে, রেগেমেগে প্যাট্রিশিয়া উত্তর-পুব দিকে চলেছিল। জমি ক্রমে ঢালু হয়ে উঠছিল। সে বুঝেছিল কাজটা ভালো হচ্ছে না, তবু একগুঁয়েমির জন্য ভাবছিল একটা টিলায় চড়ে দ্বীপটাকে দেখবে। পাহাড়ের খানিকটা উঠে ওর হাঁপ ধরে গেল! তখন প্যাট্রিশিয়া বিশ্রাম করতে বসল।

ক্যাম্পে মিসেস লী বলছিলেন 'তোমাদের দু একজনের ওকে খুঁজতে যাওয়া উচিত।'

অ্যালজি বলল, 'আমি যাচ্ছি, তবে কোন দিকে যেতে হবে তা জানি না।'

এই সময় ওদের চোখে পড়ল সমুদ্রতীর ধরে ক্রাউজ, স্মিট, উবানোভিচ, আবদুল্লা ওদের দিকে আসছে। এরা তখনি পিস্তল নিয়ে তৈরি হল। কিন্তু ক্রাউজরা বিনীত ভাবে নিজেদের বিপদের কথা বলে, আশ্রয় প্রার্থনা করল কর্ণেল বললেন, 'তোমাদের থাকতে দিলে, টারজান এসে রাগ করবে।'

মিসেস লী বললেন, 'তুমি তো দলের নেতা। ওর কথায় কি এসে যায়?'

ক্রাউচ বলল, 'আশ্রয় না দেওয়াটা অমানুষিক হবে।'

জ্যানেট বলল, 'ওরাও তো অমানুষিক ব্যবহার করেছিল।'

শেষ পর্যন্ত স্থির হল, টারজান ফিরে আসা পর্যন্ত থাকুক ওরা, তারপর সে যা পরামর্শ দেয়।

প্যাট্রিশিয়া খানিক বিশ্রাম করে উঠে বনে ঘুরতে লাগল। অপূর্ব সুন্দর সব গাছ, ফুল, অর্কিড। হঠাৎ সামনে এক বাঘ বেরিয়ে এল। ভগবানের নাম করে প্যাট্রিশিয়া রাইফেল তুলে পর পর দু-বার গুলি ছুঁড়ল।

●

ঐ লোকগুলোকে থাকতে দেওয়া জ্যানেটের আদৌ মনঃপুত ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে লস্কররাও এসে উপস্থিত হল আর বন থেকে দুটি গুলির শব্দ শোনা গেল। কর্ণেল চমকে উঠলেন, 'প্যাট্রিশিয়া নিশ্চয় বিপদে পড়েছে।'

মিসেস লী আশান্বিত ভাবে বললেন, 'বোধ হয় বুনোটাকে গুলি করতে হয়েছে।'

কর্ণেল, ডিগ্রুট, অ্যাল্‌মি, ক্রাউচ বোলটন সকলেই বন্দুক নিয়ে বনের দিকে রওনা দিল। তারা চলে যেতেই স্মিট স্যাঙাৎদের বলল, 'চল, বন্দুক অ্যামিউনিশনের কি উপায় করা যায় দেখা যাক।'

মিসেস লী চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'ওকি করছ? ও দিকে যেও না, খবরদার!'

জ্ঞানেট তার রাইফল আনতে ছুটল, স্মিট তাকে ধরে ঠেলে ফেলে দিল। তারপর ঘরে যতগুলি বন্দুক ছিল সব সংগ্রহ করে, পিস্তল দেখিয়ে লস্‌করদের সেগুলো বইতে বাধ্য করল। শুধু তাই নয় যাবার সময় ক্রাউজ জ্ঞানেটকেও টেনে নিয়ে চলল। জ্ঞানেট আপত্তি করতে, তাকে প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে দিল। মিসেস লী বললেন, 'যাও না, বাপু, ওর সঙ্গে। তুমি তো ওরি দলের লোক।' ওরা সগর্বে বিদায় নিল।

সাট্‌ল দিন আর তার একশো যোদ্ধা বনের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে, এগোতে লাগল। এতে পায়ের ছাপ ধরা শক্ত হয়। ওরাও বন্দুকের শব্দ শুনে চমকে উঠল। এমন তো কখনো শোনেনি। হঠাৎ সাট্‌ল দিন থমকে দাঁড়াল। পথের মধ্যি-খানে অদ্ভুত একটা ডোরা-কাটা বিকট জন্তু মরে পড়ে আছে। আর তার পাশে লম্বা কালো চকচকে একটা চোঙা মতো হাতে নিয়ে অদ্ভুত পোষাক পরা একজন দাঁড়িয়ে আছে। সাট্‌ল দিন তাকে একজন মহিলা বলে চিনতে পারল। ঐ চোঙার সাহায্যেই নিশ্চয় জন্তুটা মরেছে। তাহলে ও ঐ ভাবে মানুষও মারতে পারে। হুকুম পেয়ে নিঃশব্দে মায়া যোদ্ধারা প্যাট্রিশিয়াকে ঘিরে ফেলল। তাদের দেখেই প্যাট্রিশিয়া বুঝল তারা কে। টারজান আর ইটজিল চা এদের কথাই বলেছিল। তাছাড়া প্যাট্রিশিয়া মায়া সভ্যতা নিয়ে অনেক পড়াশুনোও করেছিল। এদের সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি সম্বন্ধে ওকে বিশেষজ্ঞ বলা চলে। ইটজিল চা র কাছে শেখা অশুদ্ধ মায়া ভাষায় প্যাট্রিশিয়া বলল, 'আমাকে নিয়ে তোমরা কি করবে?'

সাটল দিন বলল, 'চিচেন ইটজাকে নিয়ে যাব। রাজা যা বলেন, তাই হবে।'

চারজন যোদ্ধা ওকে নিয়ে ফিরে চলল। বাকিরা ক্যাম্পের দিকে চলল।

কর্ণেল লী আর তাঁর সঙ্গীরা টিলার ওপর চড়তে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়লেও, থামেননি। হঠাৎ বিকট রণ-ধ্বনি দিয়ে পালক-পরা যোদ্ধারা তাঁদের আক্রমণ করল। তাদের প্রধান অস্ত্র গুল্‌তি আর নুড়ি। এক ঝাঁক বন্দুকের গুলি তাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলেও তারা ঘাবড়াল না, আরো এগিয়ে এল। কর্ণেল বললেন, 'তাহলে মারো!' এবার রাইফেলের গুলিতে চারজন যোদ্ধা পড়ল। অন্যরা একটু ঘাবড়ালেও, সাটল দিন তাদের সাহস দিয়ে এগিয়ে এল। কর্ণেল বললেন, 'মারো! মারো! আমাদের যেন তলোয়ারের নাগালের মধ্যে না পায়!'

দূর থেকে বিকট শব্দ করে মৃত্যু আসতে দেখে, শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে বনের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে, তারা পালাল। কর্ণেল লীর সঙ্গীরাও দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে বনের মধ্যে ছুটতে ছুটতে একটা ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে, ঘণ্টা খানেক ঝোপেঝাড়ে হাতড়ে বেরিয়ে, হঠাৎ দেখে বন শেষ হয়ে গেছে এবং তারা ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে।

চিন্তিত মুখে টিবেট বেরিয়ে এসে খবর দিল নৌকো বোঝাই কাঠ নিয়ে রীফ থেকে ফিরে এসে দেখে স্মিট আর তার দল সব অস্ত্রশস্ত্র আর জ্ঞানেটকে নিয়ে পালিয়েছে। ডি গ্রুটের মুখ সাদা হয়ে গেল। 'কোন দিকে গেছে ওরা?'

—'মনে হচ্ছে ওদের পুরনো ক্যাম্পে।'

ডি গ্রুট বলল, 'আমি চললাম।'

ওর সঙ্গে টিবেট আর দুজন নাবিকও চলল। কর্ণেল বললেন, 'জঙ্গলের দিক থেকে, ঝোপের আড়ালে বসে গুলি চালালে সব চেয়ে সুবিধা হবে।'

★

দূর থেকে টারজান মায়া যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াইয়ের শব্দ শুনে, সেই দিকে এগোচ্ছিল। কিন্তু পাহাড়ে জায়গায় এত প্রতিধ্বনি যে ভুল দিকে গিয়ে, স্মিটদের ক্যাম্পের কাছে বনের ধারে পৌঁছে দেখল চার পাপিষ্ঠ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরছে। জ্ঞানেটকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে ক্রাউজ। মাথায় বোঝা। অমনি সে পরিস্থিতিটা বুঝে নিল, কিন্তু কি করে কি হল তা বুঝতে পারল না। অন্য শ্বেতাঙ্গরা কি মারা পড়েছে? প্যাট্রিশিয়া আর ইটজিল কোথায়? মিসেস লী-কে নিয়ে টারজান মাথা ঘামাল না।

কর্ণেল ফাঁপরে পড়েছিলেন। চারজন মাত্র সশস্ত্র লোক তাঁর। গিন্নিকে অরক্ষিত রেখে প্যাট্রিশিয়ার খোঁজে যান কি করে? দলটাকে দু-ভাগ করারো উপায় নেই। স্মিটরা, কিম্বা মায়া যোদ্ধারা আবার আসতে পারে। সেই সময় উক্সমল দ্বীপের রাজার সামনে প্যাট্রিশিয়াকে হাজির করা হচ্ছিল। রাজা খুশি হলেন। প্রধান পুরোহিত বলল, 'বাঃ, দেবতারা এমন বলি পেলে খুশি হবেন।' রাজা চেয়ে দেখলেন মেয়েটি বড় সুন্দরী। বললেন, 'ভাবছি কিছু দিন ওকে আমার সেবিকাদের সঙ্গে রাখব। দেবতারা ওকে চাইবেন মনে হয় না।'

প্যাট্রিশিয়া ওদের কথা মোটামুটি বুঝতে পেরে বলল, 'একজন দেবতা তো আমাকে আগেই পছন্দ করেছেন। আমার ক্ষতি করলে তিনি চটবেন।'

রাজা অবাক হলেন, 'এযে মায়া ভাষা বলে দেখছি।'

প্রধান পুরোহিত বলল, 'কিন্তু অশুদ্ধ ভাবে।'

প্যাট্রিশিয়া বলল, 'মানুষের ভাষা দিয়ে দেবতাদের কি হবে?'

তখন রাজাতে আর প্রধান পুরোহিতে তর্ক বেধে গেল, এ কি সত্যি দেবী এবং বনদেবতা চে'র পছন্দ করা, নাকি সাধারণ মানুষ? শেষ পর্যন্ত স্থির হল ওকে আপাততঃ কুমারী-মন্দিরে নিরাপদে রাখা হবে।

কিছু দিনের মতো রেহাই পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে প্যাট্রিশিয়া চিচেন ইটজা নগরীর আশ্চর্য স্থাপত্য দেখতে লাগল। সামনে একটা লাভা দিয়ে তৈরি বিশাল পিরামিড। তার এক পাশের খাড়া সিঁড়ি দিয়ে তাকে শিখরের কুমারী-মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হল। এখানে প্রধানা পূজারিণীর তত্ত্বাবধানে জনা পঞ্চাশেক অভিজাত বংশের মেয়ে থাকত। পবিত্র আগুন যাতে কখনো না নিবে যায় তাই দেখত এরা, ঘর ঝাঁট দিত। ভারি সম্মানিত এ-সব কাজ। ইচ্ছা হলে মেয়েরা চলে গিয়ে সংসারীও হতে পারত। ওপর থেকে প্যাট্রিশিয়া দেখছিল পিরামিডের পায়ের কাছে প্রাসাদ, মন্দির, গরীবদের খড়ের ঘর। তার বাইরে ক্ষেত, তারপর বন।

টারজান গাছের আড়াল থেকে ঠিক সুবিধার মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিল। স্মিটরা আরো কাছে এল। লস্করা বোঝা নামাল। তারপর ধনুকে তীর লাগিয়ে, সাবধানে লক্ষ্য স্থির করে, তীর ছুঁড়ে দিল। খট করে সেটা সোজা ক্রাউজের হৃদপিণ্ডে বিঁধে গেল। অন্যরা চমকে উঠল। উবানোভিচ বলল, 'ওর কি হল?'

স্মিট বলল, 'তীর খেয়ে মরে গেছে।'

আবদুল্লা বলল, 'বনমানুষটা ছাড়া কেউ এভাবে ওকে মারতে পারত না।'

—'কোথায় সে?'

টারজান আড়াল থেকে বলল, 'এই যে এখানে। শোন জ্যানেট; আমার গলার শব্দ শুনে এদিকে এসো। কেউ বাধা দিতে গেলে, তার ক্রাউজের দশা হবে। আমার সঙ্গে অনেক তীর আছে।'

স্মিট চ্যাঁচাতে লাগল, 'সেই বুনোটা! ওকে আমি শেষ করব।' এই বলে আন্দাজে গুলি ছুঁড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে বুকে তীর খেয়ে কাৎ হয়ে পড়ল।

জ্যানেট বনের কিনারায় পৌঁছতেই টারজান গাছ থেকে নেমে এল। জ্যানেট তাকে সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপার খুলে বলল।

—'কি আশ্চর্য, কর্ণেল ওদের ঢুকতে দিলেন?'

জ্যানেট বলল, 'ঐ বুড়িটার কাজ!'

—'চল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে গিয়ে দেখি।'

ওরাও অন্য ক্যাম্পে পৌঁছল আর ঠিক সেই সময় ডি গ্রুট, টিবেট আর দুই নাবিক স্মিটদের ক্যাম্পে পৌঁছল। জ্যানেটকে ওরা দেখতে না পেলেও, এটুকু চোখে পড়ল যে দুটো লোক মাটিতে পড়ে আছে আর লস্করা ভয়ে জড়োসড় হয়ে একধারে বসে আছে। আবদুল্লা ওদের দেখেই বুঝল এদের কাছে কোনো দয়া-ক্ষমা পাবে না। তাই রাইফল তুলে গুলি করল, সে গুলি কারো গায়ে লাগল না। ডি গ্রুট আর টিবেট ছুটে এল, পিছন পিছন বর্শা হাতে নাবিকরাও ছুটল। ডি গ্রুট টিবেটকে বলল, 'উবানোভিচকে নাও। আমি আরবটাকে নিচ্ছি।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে দুজন পড়ে গেল। উবানোভিচ, ক্রাউজ, আবদুল্লা, তিনজনেই মরেছিল। স্মিট তখনো বেঁচে ছিল। বেদনায় ছটফট করছিল। ডি গ্রুট জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্ লাওন কোথায়?'

—'বুনোটা তাকে নিয়ে গেছে।' এই বলে সে-ও মল।

ডি গ্রুট বলল, 'ভগবানের দয়ায়, সে এখন নিরাপদে আছে।'

তারপর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র অ্যামিউনিশন নিয়ে, লস্করদের মাথায় আবার বোঝাগুলো চাপিয়ে ওরা ক্যাম্পে ফিরে গেল।

★

জ্যানেটকে নিয়ে টারজান ক্যাম্পে পৌঁছল। ওর অনুপস্থিতিতে যা যা ঘটেছিল, সে সব শুনে তার খুব বিরক্ত লাগলেও, মুখে শুধু বলল, 'ওদের এই ক্যাম্পের ধারে কাছে আসতে দেওয়া উচিত হয়নি। যাই হক যা হবার

তা হয়ে গেছে। এখন প্যাট্রিশিয়াকে খুঁজে আনতে হবে। ঠিক জানেন ওকে মায়া যোদ্ধারা ধরে নিয়ে গেছে?'

কর্ণেল বললেন, 'গুলি শুনে তদন্ত করতে গেলাম আমরা। তা পথে শত খানেক মায়া যোদ্ধার মোকাবিলা করতে হল। তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলাম। প্যাট্রিশিয়াকে না দেখলেও, মনে হয় ওরাই ওকে বন্দী করেছে।'

মিসেস লী বললেন, 'আশা করি এখন তোমার মন উঠেছে? আমি তো এই অভিযানে আসতেই মানা করেছিলাম।

কর্ণেল বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ সব আমার দোষ। কিন্তু সে কথা বললে তো কোনো সুবিধা হচ্ছে না।'

টারজান ইটজিলকে জিজ্ঞাসা করল, 'বল দিকিনি ওকে নিয়ে ওরা কি করবে?'

—'হয়তো মাসখানেক কিছু করবে না। তারপর কোনো দেবতার কাছে বলি দেবে।'

—'কোথায় রাখবে?'

—'সম্ভবতঃ পিরামিডের মাথায় কুমারী-মন্দিরে। জায়গাটা খুব সুরক্ষিত।'

—'আমি ঠিক যেতে পারব।'

ইটজিল চা বলল, 'আশা করি তুমি সেখানে যাবে না?'

—'আজ রাতেই যাব।'

ইটজা ব্যাকুল হয়ে বলল, 'যেও না! যেও না! ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।'

টারজান বলল, 'না, না, কেউ আমাকে মেরে ফেলবে না।'

—'তাহলে আমাকেও নিয়ে বনে চল। এখানে আমার ভালো লাগে না।'

—'কেন, সবাই তো ভালো ব্যবহার করে।'

—'আমি ভালো ব্যবহার চাই না। তোমার সঙ্গে যেতে চাই।'

কিন্তু টারজান কিছুতেই রাজি হল না। নিজের শেডে গিয়ে ইটজা খাটে শুয়ে খানিকটা রাগমাগ করে, আস্তে আস্তে উঠে, সকলের অলক্ষ্যে বনের মধ্যে ছুটে পালাল।

এই সময় ডি গ্রুট দলবল নিয়ে ফিরে এল। জ্যানেট ডি গ্রুটকে দেখে কেঁদে বলল, 'আমি ভাবলাম, ওরা তোমাকে মেরে ফেলেছে।'

ডি গ্রুট বলল, 'আর তোমার কোনো ভয় নেই। ওরা সবাই মরে গেছে।'

এদিকে ইটজিল বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছিল ভয়ে বুক দুরু দুরু করছিল, তবু রাগে অভিমানে সে সব ভুলে সন্ধ্যায় চিচেন ইটজা পৌঁছল। আশ্চর্যের বিষয়, কোনো জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে দেখা হল না। ফটকের রক্ষী ওকে চিনতে পেরে ঢুকতে দিল। প্রধান পুরোহিতের পায়ে পড়ে ইটজিল বলল, 'আমি বলতে এসেছি, যে লোকটি আমাকে বেদী থেকে তুলে নিয়ে গেছিল, সে আজ রাতে সাদা মেয়েটিকে নিয়ে যেতে আসবে।'

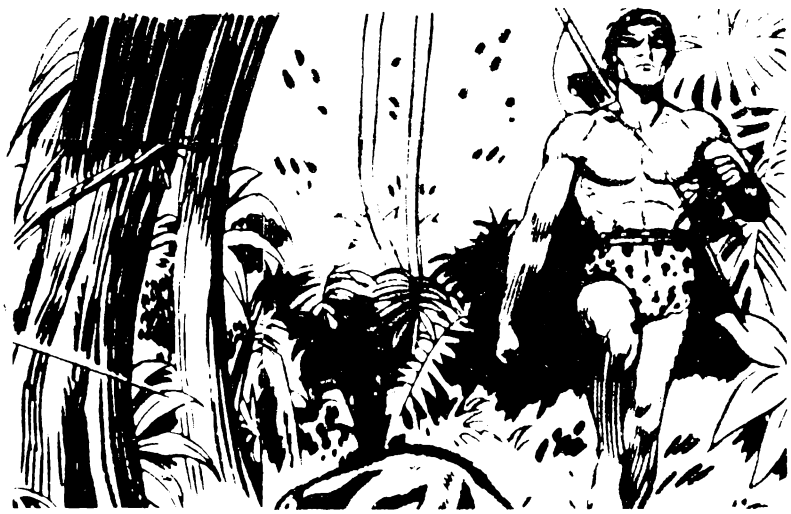

প্রধান পুরোহিত বলল, 'এর জন্য তোমাকে সম্মানিত করা উচিত, কাজেই তোমাকে আবার দেবতার কাছে বলি দেওয়া হবে।'

তারপর ইটজিল চা-কে একটা কাঠের খাঁচায় বন্ধ করা হল।

বনের মধ্যে ইচ্ছা করেই ধীরে সুস্থে চলেছিল টারজান, কারণ রাত দুপুরের আগে পৌঁছবার ইচ্ছা ছিল না তার। ততক্ষণে আশা করা যায় বেশির ভাগ লোক ঘুমিয়ে পড়বে। মৃদু মৃদু বাতাস বইছিল। নাকে আসছিল টানটরের গন্ধ। সে এখানে কচি গাছ-গাছলার খোঁজ পেয়েছিল। সে কাছে এলে টারজান তাকে ডাকল। টানটরের মাথায় বসে টারজান বনের ধারে নামল; ক্ষেত পার হয়ে পাঁচিল টপকে বিনা বাধায় পিরামিডের পায়ের কাছে পৌঁছল। কুমারী-মন্দিরের প্রবেশ-পথের ভিতরে বারোজন যোদ্ধা লুকিয়ে ছিল। যেই টারজান ভিতরে ঢুকেছে, ওর মাথার ওপর দিয়ে একটা জাল পড়ে ওকে অসহায় বন্দী করে ফেলল।

একজন পুরোহিত বেরিয়ে এসে তিনবার শিঙায় ফুঁ দিল। যেন জাদু বলে শহর জেগে উঠল, চারদিকে আলো জ্বলল, লোকে মন্দিরের দিকে ছুটে এল।

টারজানকে অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামানো হল। খুব সাজসজ্জা করা পুরোহিতরা ওকে ঘিরে ফেলল। প্যাট্রিশিয়াকেও আনা হল। তারপর ঢাক পিটিয়ে, শিঙা ফুঁকে, রাজা আর প্রধান পুরোহিতের পিছনে লম্বা এক মিছিল চলল শহরের মধ্যিখান দিয়ে, পুবের ফটকের বাইরে। টারজানকে দোলায় চাপিয়ে চারজন পুরোহিত বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তার পিছনে রক্ষীসহ প্যাট্রিশিয়া, তার পিছনে খাঁচায় পোরা ইটজিল চা। মাথার ওপর পূর্ণিমার চাঁদ।

বনের মধ্যে দিয়ে একটা পাহাড়ের পাদদেশে ওরা পৌঁছল। তারপর পাকদণ্ডী ধরে পাহাড় চড়ে, নিবে যাওয়া আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে মিছিল একেবারে তলা অবধি নামল। সেখানে একটা গর্তের ধারে মিছিল থামতেই বাঁশি, ঢাক, শিঙা একসঙ্গে বেজে উঠল। জালের দড়ি কেটে টারজানকে গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। ইটজিল চা অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল, 'ওকে মেরো না, ও সত্যিই বনদেবতা চে!' প্রধান পুরোহিত ধমক দিয়ে ওকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল।

●

প্যাট্রিশিয়া গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছিল, হঠাৎ ইউকাটানের প্রাচীন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একটা কথা তার মনে পড়ে গেল। ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছিল, গর্তের ভিতরে সূর্যের আলো পড়েছিল। প্যাট্রিশিয়া দেখল টারজান আস্তে আস্তে প্রায় সত্তর ফুট নিচে জলের ওপরে সাঁতার কাটছে। প্যাট্রিশিয়া ডেকে বলল, 'শোন টারজান, এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমি পড়েছি। এর নিয়ম হল যাকে বলি দেওয়া হল, সে যদি বেলা বারোটা অবধি বেঁচে থাকে তাহলেই তার দেবত্ব প্রমাণ হয়। তখন তাকে তুলে নিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়। তার সঙ্গে ধন মান আর সে যা কিছু চায়। যেমন করে পার ততক্ষণ পর্যন্ত ভেসে থেকো।'

কুয়োটার ব্যাস একশো ফুট হবে, ধারটা একেবারে খাড়া। জল বেশি ঠাণ্ডা নয়। নাগরিকরা সঙ্গে খাবারদাবার এনেছিল। কুয়োর পাশে তারা যেন চড়ি-ভাতি লাগিয়ে দিল। সূর্যটা আস্তে আস্তে মাঝ-গগনের কাছে এল। পাশেই একটা সূর্য-ঘড়ি। তাতে যে-ই বারোটা বাজল, নাগরিকরা টারজানের নামে জয়ধ্বনি দিল। ইনি হলেন বনদেবতা চে! এখনি এঁকে জল থেকে তোলা হক। লম্বা এক দড়ি নামানো হল, টারজান সেটি ধরে নিজেই বেয়ে ওপরে উঠে এল। নাগরিকরা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তার প্রসাদ আর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে লাগল। রাজা আর প্রধান পুরোহিত অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। টারজান বলল, 'আমি মানুষের বেশে দেখতে এসেছিলাম তোমরা আমার চিচেন ইটজার সন্তানদের কি ভাবে প্রতিপালন করছ। দেখে খুশি হতে পারলাম না। পরে আবার আসব। আজ আমি বিদায় নিচ্ছি। এই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আমার আদেশে ইটজিল চা-কে মুক্তি দিয়ো আর কখনো এ রাজ্যে নরবলি দিও না।'

প্যাট্রিশিয়ার হাত ধরে টারজান রওনা হয়ে গেল। নাগরিকরা দলে দলে সঙ্গে চলল। সীমানায় এসে টারজান হাত তুলে বলল, 'আর এসো না তোমরা', তারপর টানা একটা ডাক দিয়ে প্যাট্রিশিয়ার সঙ্গে শস্যক্ষেত পার হতে লাগল। বন থেকে টানটরকে বেরিয়ে আসতে দেখে নাগরিকরা ভয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল। টানটর আগে প্যাট্রিশিয়াকে, তারপর টারজানকে মাথার ওপর তুলে নিয়ে আবার বনে চলল। টারজান ফিরে দেখল সব নাগরিক হাঁটু গেড়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে রেখেছে।

এদিকে ক্যাম্পে দীর্ঘ রাত, তারপর প্রায় সারা দিন দুঃখে হতাশায় কেটেছিল। টারজানকে আর প্যাট্রিশিয়াকে ফিরে পাবার আশা সকলে প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। মিসেস লী বলছিলেন, 'কেন ওকে একা যেতে দিলে। এতক্ষণে প্যাট্রিশিয়া বেঁচে আছে কিনা কে জানে!'

কর্ণেল লী বললেন, 'কেন এ-সব বল, বলতো? লোকটার কাছ থেকে আমরা সাহায্য আর উপকার ছাড়া কিছু পাইনি।'

—'ওর মৎলব বোঝ না? আমাদের খুশি করে প্যাট্রিশিয়াকে বিয়ে করে একসঙ্গে ধন মান পাবার মৎলব!'

এবার ডি গ্রুট আর থাকতে না পেরে বলল, 'ম্যাডাম, যাকে আপনি বুনো বলেন তিনি আসলে জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক, একজন ইংলিশ ভাইকাউন্ট।'

মিসেস লী বললেন, 'বাজে কথা!'

—'মোটেই বাজে কথা নয়। ক্রাউজ আমাকে বলেছিল। আবদুল্লাও ওঁকে বহু বছর ধরে চেনে।'

জ্যানেট এইখানে বলে উঠল, 'ঐ যে টারজান আর প্যাট্রিশিয়া এসে গেছে!'

মিসেস লী বললেন, 'বাঃ, প্যাট্রিশিয়ার পাশে লর্ড গ্রেস্টোককে চমৎকার মানিয়েছে তো!'

হাতির পিঠ থেকে প্যাট্রিশিয়া দূরে সমুদ্রের বুকে একটা জাহাজ দেখতে পেল! তখুনি সমুদ্রের ধারে কাঠকুটো শুকনো পাতা দিয়ে আগুন জ্বালা হল, প্রচুর ধোঁয়া উঠল। ডি গ্রুট কয়েকজন নাবিককে নিয়ে একটা নৌকো করে এগিয়ে গেল। জ্যানেট বলল, 'ওরা আমাদের দেখতে পায়নি।'

কিন্তু একটু পরেই জাহাজটা দিক বদল করে দ্বীপের কাছে এল। কর্ণেল বাইনকুলার চোখে লাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঐ তো নাইয়াড! এদিকেই আসছে।'

নাইয়াড জাহাজ ওদের সকলকে তুলে নিয়ে গেল। সেই রাতে ঝকঝকে চাঁদের আলোয় নাইয়াডের ডেকে বসেছিল ওরা! ডি গ্রুট টারজানকে ডেকে বলল, 'জ্যানেট বলছে জাহাজের ক্যাপ্টেন নাকি আমাদের বিয়ে দিতে পারেন না। তাই কি?'

টারজান বলল, 'মোটেই না। খুব পারেন।'

*

বিশ্বের হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন মালার্গান এক বছরের বেশি সময়ের মধ্যে নগণ্য অ্যামেচারের পদ থেকে স্রেফ ঠেঙিয়ে পিটিয়ে বক্সিং-এর ছোটখাটো একটা রাজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পয়সাও কামিয়েছিল বিস্তর। তার ম্যানেজার জোই মার্ক্স বারবার বলেছিল আরো গোটা কতক লড়াই দিলেই এত টাকা জমবে যে তখন ছুটি নিয়ে যে ভাবে ইচ্ছা মনের সাধ মেটাতে পারবে। তা কে কবে ভালো কথা শোনে? ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে এই শেষ খেলাতে সদসৎ উপায়ে জিতে এবং সমান পরিমাণে বাহবা আর ধিক্কার কুড়িয়ে মালার্গান বলে বসল এবার লম্বা এক ছুটি নিয়ে সে দুনিয়া দেখবে। কোথায় এক বিজ্ঞাপন দেখেছিল অনেক দিন আগে—'নৌ-বিভাগে যোগ দিয়ে দুনিয়া দেখ!' তা সে নৌ-বিভাগে যোগ না দিয়েই এখনি দুনিয়া দেখবে।

ম্যানেজার বলল, 'বেশ তো। আমারো অনেক দিন থেকে নায়গারা জলপ্রপাত দেখার ইচ্ছে। না হয় দুজনে গিয়ে'—

বাধা দিয়ে মালার্গান বলল, 'রেখে দাও নায়াগারা! আমি আফ্রিকা দেখব। তুমিও সঙ্গে যাবে!'

—'ও বাবা! সেখানে গিয়ে কি করবে?'

—'শিকার করব। ফিরে এসে বসবার ঘরে হিংস্র জানোয়ারের মুণ্ডু ঝোলাব। সিংহ, গণ্ডার, হাতি! কেমন খেল হবে বল দিকিনি!'

—'তা তুমি যেতে পার, আমি যাব না।'

—'আলবৎ যাবে! খবরের কাগজওয়ালাদের খবর দাও।'

খবুরেকাগুজেরা নানা মন্তব্য করল। কেউ বলল, 'টারজানকে আমাদের ভালোবাসা দিও।'

কেউ বলল 'সাবধান! তোমাকে না ফালাফালা করে ছিঁড়ে ফেলে।'

চ্যাম্পিয়ন বলল, 'কি যে বল! আমি ওর ফিল্ম দেখেছি। আমাকে ছেঁড়া ওর কম্ম নয়।'

—'দশ ডলার বাজি!'

—'দূর, তোকে বেচলে দশ ডলার পাব না।'

কিছুদিন পরে একটা ভার-বোঝাই ট্রাক বনের কিনারায় থেমে কিছু অনুসন্ধানকারী পাঠিয়েছিল বনে।

এই এলাকায় চাকায় চলা জিনিস এই প্রথম। তুবড়োনো সোলার টুপি মাথায় দিয়ে একজন শ্বেতাঙ্গ ট্রাক চালাচ্ছিল। তার পাশে একজন নিগ্রো বসে। ট্রাকের বোঝার ওপর আরো ক'জন শুয়ে ছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল।

উপত্যকার ওপর দিয়ে ট্রাকের দিকে একজন লোক এগিয়ে আসছিল। হাল্কা ঢেউ খেলানো চলার ঢং, প্রায় বাঘেরি মতো। পরনে নেংটি, অস্ত্র বলতে তীর ধনুক বল্লম আর কোমরে গোঁজা ছোরা। রোদেপোড়া কালো গা হলেও, সে নিগ্রো নয়। কাঁধে বসা খুদে বাঁদরটাকে লোকটি বলল, 'নিকিমা ঐ দেখ টারমাঙ্গানি!' খুদে বাঁদর উঠে দাঁড়িয়ে গাল ফুলিয়ে বাঁদুরে ভাষায় বলল, 'চল মেরে ফেলি।' ঐ ওর স্বভাব। এদিকে ভীতুর একশেষ। কিন্তু টারজানের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

ট্রাকের লোকটা দূর থেকে ওকে দেখে প্রস্তুত হয়ে রইল। এদেশের লোকদের কথা কিছু বলা যায় না। পাশে বসা নিগ্রোটি বলল লোকটা শ্বেতাঙ্গ কিন্তু ঐরকম সেজে থাকে। ট্রাক-চালক বলল, 'অর্থাৎ দুই খ্যাপার মধ্যিখানে পড়েছি।'

ট্রাকটার কাছে এসে বীর নিকিমা এক লাফে গাছ নিল। টারজান শ্বেতাঙ্গকে বলল, 'এখানে কি করছ?'

—'ট্রাক চালাচ্ছি ভাই।'

—'আমার কথার উত্তর দিলে না?'

চালকের নাম মেল্টন, বড্ড খাটুনি গেছিল তার, মেজাজ খিঁচড়ে ছিল। অমনি পিস্তল বের করল। পিস্তল সুদ্ধ হাতটা ধরে তাকে টেনে বের করে পিস্তলটা কেড়ে নিল টারজান। ট্রাকের নিগ্রোরা তো অবাক। লোকটা মেল্টনকে

ধরে বেড়াল ছানার মতো ঝাঁকি দিল। মেল্টন ঘাবড়ে গেল। টারজান সোয়াহিলি ভাষায় নিগ্রো ছোকরাকে বলল, 'রাইফল ফেলে দাও।'

ছেলেটা দোমনা করছিল, মেল্টন বলল, 'ফেলে দাও।' তারপর টারজানকে বলল, 'দুটো খ্যাপা ইয়াঙ্কির গাইড আমি।'

—'কোথায় তারা?'

—'ভগবান জানেন। একটা হাল্কা গাড়িতে সকালে রওনা দিল। আমাকে বলে গেল বনের ধারে অপেক্ষা করতে। ওরা বিকেলে শিকার সেরে ফিরবে। অথচ এখনো দেখা নেই।'

—'এখানে আনলে কেন? এটা তো নিষিদ্ধ এলাকা।'

—'আমি ওদের আনব কেন, ওরা আমাকে এনেছে। মালার্গান কারো কথা শোনে না। ওর ম্যানেজারটি ওর কথামতো চলে।'

টারজান বলল, 'দেখ, এটা সিংহের এলাকা। তারা বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছে। ওদের ডেকে নিয়ে সরে পড়। আর এদিকে এসো না।' এই বলে বনের দিকে পা বাড়াল।

মেল্টন বলল, 'তুমি কে?'

—'টারজান।'

তাই শুনে মেল্টন একেবারে থ! টারজান ততক্ষণে বনে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সূর্য ডোবে-ডোবে। একটা হাল্কা গাড়িতে বনের এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে দুটো লোক এগোচ্ছিল। একজন চালাচ্ছে, অন্যজন পাশে কোনমতে আঁকড়ে পাকড়ে বসে আছে। তার চোখ লাল আর কেবলি হাঁচছে। ম্যানেজার মার্ক্স বলল, 'আহা, একটু আস্তে কর না, ভাই। হে-ফিবারের জ্বালায় মলাম, তার ওপর হাড়গোড় ভেঙে চুরচুর হচ্ছে।'

চালক বেগ বাড়াল। 'অমন করলে তুমি স্প্রিং, টায়ার, ম্যানেজার, সব হারাবে!'

—'আমার ম্যানেজারের দরকার নেই।'

—'যথেষ্ট দরকার আছে। ঐ বাঁধাকপি কান ছাড়া তোমার আছে কি?'

—'তাই বুঝি?'

—'হ্যাঁ, তাই।' একটু বেগ কমাল মালার্গান।

—'এত তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয় কেন? আমার খিদে পেয়েছে। সে ব্যাটাকে বলেছিলাম বনের ধারে অপেক্ষা করবে। তার তো দেখা নেই।'

একটা সিংহ কাশল। 'ও কি?'

মার্ক্স বলল, 'শূওর।'

মালার্গান বলল, 'দিনের বেলা হলে পোর্ক-চপের ব্যবস্থা করতাম। আচ্ছা, ঐ ইংরেজটাকে ঝেড়ে ফেললে কেমন হয়?'

—'কে ট্রাক চালাবে?'

—'তা বটে। কিন্তু এমন ব্যবহার করে যেন আমরা দুটি খোকা, কিছুই জানি না। ও-সব চলবে না। কোন দিন না রেগেমেগে একটা ডান-পট্‌কান ঝেড়ে দিই!' এমন সময় আলো দেখা গেল। ট্রাক এসে পৌঁছেছে।

মেল্টন জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু পেলে নাকি?'

—'কয়েকটা বুনো মোষ দেখেছিলাম। তারাও পালিয়ে গেল।'

—'ভাগ্যিস পালাল!'

—'তার মানে?'

—'তার মানে তোমাদের অন্ততঃ একজনকে তো সাবাড় করতে পারত।'

মালার্গান চটে লাল, 'আমি গরু ভেড়া ভয় পাই না।'

মেল্টন বলল, 'আজ এখানেই তাঁবু করা যাক, এখন আর জলের খোঁজে ঘোরা যাবে না। যা সঙ্গে আছে, তাতেই চলে যাবে। কাল তো ফিরে যেতেই হবে।'

মালার্গান বলল, 'ফিরব কেন? শিকার করতে এসেছি, শিকার করব।'

—'একজন লোক যে বলে গেল এটা নিষিদ্ধ এলাকা।'

—'সে বললেই হল? কে সে?'

—'তার নাম টারজান।'

—'ঐ আনাড়িটা। ও কি ভাবে ও বললেই আমি যাব?'

মেল্টন বলল, 'তা যাওয়াই ভালো।'

—'আমার যখন ইচ্ছে হবে তখন যাব।'

নিগ্রোরা ট্রাক থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে তাঁবু ফেলা, উনুন ধরানোর কাজে লেগে গেল। তাড়াতাড়ি এগোতে গিয়ে একটা লোকের সঙ্গে মালার্গানের ধাক্কা লাগল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চড় খেয়ে নিগ্রো বেচারা বসে পড়ল। মেল্টন মালার্গানকে বলল, 'ঢের হয়েছে। অনেক সয়েছি, আর নয়। কখনো ওদের গায়ে হাত তুলবে না।'

—'ও, তোমারো বুঝি মার খাবার শখ হয়েছে?' এই বলে মালার্গান চড় তুলল। মেল্টন পিস্তল বের করে বলল, 'এসো, আমি অপেক্ষা করছি।'

অমনি মালার্গানের ভোল বদলে গেল, 'আরে আমি ঠাট্টা করছিলাম।

তাঁবুর পাশে সিংহের কাশি শোনা গেল। মালার্গান বলল, 'সেই শূওরটা? ওটাকে মেরে ফেলা যায় বোধ হয়।'

মেল্টন ট্রাকের স্পটলাইট জ্বালতেই প্রকাণ্ড সিংহের মুখে আলো পড়ল। এক মিনিট তাকিয়ে থেকে জানোয়ারটা সরে গেল। মালার্গান বলল, 'শূওর না আরো কিছু।'

বাবাপোরা নরখাদক হলেও দাঁত ছুঁচলো করত না। বলিষ্ঠ সুগঠিত চেহারা ওদের। কোনো পুজোটুজোর বালাই ছিল না। মানুষের মাংস খেতে ভালো লাগত, তাই খেত। জানোয়ারের মতো মানুষ শিকার করত ওরা। সকলে ওদের ভয় করত। সম্প্রতি টারজান খবর পেয়েছিল যে ওরা ওর অঞ্চলে ঢুকে লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সেই তদন্তেই ওর আসা। ওর পিছন পিছন মুবিরোও তার ওয়াজিরি যোদ্ধার দল নিয়ে আসছিল।

পরদিন সকালে সাপখোপ, বিষাক্ত গেছো পিঁপড়ে এড়িয়ে টারজান চলেছিল। হঠাৎ কানে একটা অপ্রত্যাশিত শব্দ এল। মোটরগাড়ির এক্স্‌হস্টের শব্দ। আওয়াজটা ক্রমে কাছে এল এবং সেই সঙ্গে কট-কট-কট করে মেশিন-গানের শব্দ। এক পাল জেব্রা পাশ দিয়ে ছুটে গেল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট মোটরও ছুট ছিল। একজন চালাচ্ছিল, একজন গুলি ছুঁড়ছিল, এলোপাতাড়ি জেব্রার পালের মধ্যে। কয়েকটা মরে পড়ল, কয়েকটা আহত হল। শিকারীরা ফিরেও তাকাল না। রাগে টারজান কাঠ। যে যে জেব্রাগুলো মর্মান্তিকভাবে আহত, সেগুলোকে—মেরে ফেলে, গাড়িটার পিছনে চলল। জেব্রার পাল একটা খাড়াই উঠে, ওপারে নেমে গেলে, মোটর থামিয়ে মার্ক্স বলল, 'বেড়ে শিকার হল, ভাই। ক্যায়সা গুলি চালালে!

মালার্গান বলল, 'আরে আমি মেরিন কোরের সেরা গোলন্দাজ ছিলাম! এক পাল সিংহ পেলে আরো খেল দেখাতাম।'

বনটার ঐখানেই শেষ। ঝোপঝাপের পিছনে কিছু নড়াচড়া হলেও, এরা টের পায়নি। দুজনে নিশ্চিন্তে চুরুট ফুঁকতে লাগল।

তারপর মালার্গান বলল, 'চল, ফিরতি পথেও সব ঝেঁটিয়ে সাফ করা যাক। এক মাসেই এভাবে হাজার মাথা সংগ্রহ করা যাবে। তার ওপর বসে ফটো তোলাব।'

মার্কস বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। ওটা কি?'

—'আরে হাতি যে! কি মজা!'

এই বলে বন্দুকের ঘোড়া টিপল। একটার পিছনে একটা সাতটা হাতি বেরিয়ে এল। বন্দুকটাও জাম্ হয়ে গেল।

মালার্গান বলল, 'কি জ্বালা! পালাবে যে!'

মার্কস বলল, 'পালাচ্ছে না। এদিকে আসছে।'

হাতিরা চোখে কম দেখলেও, শেষ পর্যন্ত গাড়িটাকে ঠাওর হল। অমনি ডাক ছেড়ে তারা তেড়ে এল। মেশিন-গানের জ্যাম্ ছেড়ে গেছিল। কট-কট-কট করে গুলিবর্ষণ হতে লাগল। একটা হাতি পড়ে গেল। কিন্তু একটা মস্তান গুলি খেয়ে ব্যথার চোটে ক্ষেপে উঠে, গাড়ির ওপর আছড়ে পড়ল। মালার্গান আর মার্কস অন্য দিক দিয়ে কোনোমতে নেমে পড়ল। গাড়িও উল্টে গেল আর হাতিও মরে পড়ে গেল।

গাড়ি তো চুরমার। মালার্গান বলল, 'দেখ কি কাণ্ড! এখন ট্রাকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

মার্ক্স থরথর করে কাঁপছিল, 'যদি হাতিটা না মরত, তাহলে কি হত! ব্রড্‌ওয়েতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

বলা বাহুল্য, ওদের অস্ত্রশস্ত্র গাড়ির তলায় চাপা পড়েছিল।

নিকিমা মহা চটেছিল। মেশিনগানের কট্-কট্-কট্ শুনেই টারজানের কাঁধ ছেড়ে গাছ নিয়েছিল। কিন্তু তবু তার সঙ্গ ছাড়েনি। যদিও সে ভেবে পেত না, এমনিতেই দুনিয়াতে এত ঝামেলা, তার এই মনের মানুষটা তার ওপর আরো ঝামেলা খুঁজে বেড়ায় কেন?

টারজান আরো মেশিনগানের শব্দের সঙ্গে আহত আর রাগত হাতির ডাক শুনেই টের পাচ্ছিল কি মর্মান্তিক বেদনাময় ঘটনা ঘটছে। টানটর কষ্ট পাচ্ছে, এ তার সহ্য হচ্ছিল না। টারজানও একটা হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হয়ে গেছিল। টারজান আর নিকিমা ছাড়া অন্য লোকেও ঐ সব শব্দ শুনেছিল। তারা নিঃশব্দে, বনের আড়ালে, অতি সাবধানে এগিয়ে আসছিল। ঐ শব্দের মানে সাদা মানুষ, তার মানেই বন্দুক। সংখ্যায় বেশি মানুষ না হলেই ভালো। টারজান যখন খাতের এদিক থেকে নিচে তাকিয়ে দেখছিল, উল্টো দিক থেকে তারাও দেখছিল। কিন্তু পিছন থেকে বাতাস বইছিল বলে টারজান তাদের উপস্থিতি টের পায়নি।

মার্ক্স আগে টারজানকে দেখে মালার্গানকে জানান

দিল। টারজান আস্তে আস্তে নিচে নেমে এসে, নীরবে ওদের কাছে এল। মালার্গান কোমরে বন্দুকের ওপর হাত রেখে বলল, 'কি চাও?'

হাতি দেখিয়ে টারজান বলল 'তুমি মেরেছ?'

—'হ্যাঁ। তাই কি?'

—'আমিও মারব।' এই বলে তার দিকে এগিয়ে গেল। মালার্গান পিস্তল ছুঁড়ল। তার আগে টারজান এক বাড়ি দিয়ে পিস্তলটাকে উঁচু করে দেওয়াতে মাথার ওপর দিয়ে গুলি চলে গেল। তারপর পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মালার্গানের মুখে বিশ্রী একটা হাসি দেখা দিল। সে ভাবছিল, বোকাটাকে এবার বাগে পাওয়া গেছে। টারজানের থুতনি লক্ষ্য করে ডান হাতে এক প্রচণ্ড ঘুঁষি ঝাড়ল। ঘুঁষি লাগল না। মালার্গান তো অবাক হল যখন এক চড়ে টারজান ওকে শুইয়ে দিল। মার্ক্স ভয়ের চোটে নাচতে লাগল, 'ওঠ হতভাগা, উঠে ওকে খুন করে ফেল!'

নিকিমাও উত্তেজনার চোটে নাচছিল। মনে মনে নয় অবধি গুণে মালার্গান উঠে পড়ে তেড়ে এল। বুনোটাকে মেরেই ফেলবে। কিন্তু পারলে তো! দুজনে দুজনাকে জাপ্টে ধরে সে কি লড়াই। টারজানের ডান হাত চেপে ধরে, তার পেটে ভীষণ ঘুঁষি মারছিল মালার্গান, তখন বাঁ হাতে তাকে তুলে মাটিতে আছড়ে তার গায়ের ওপর চড়ে গলা টিপে ধরল টারজান। মালার্গানের সে কি চিৎকার! 'বাঁচাও জোই, বাঁচাও! আমাকে মেরে ফেলল যে!'

এই সময়ে একশোজন বলিষ্ঠ বাবাঙ্গো নিঃশব্দে ঢাল বেয়ে নেমে এল। তিনটে শিকার জ্যান্ত ধরার এমন দ্রুতপায়ে সুযোগ কোথায় পাবে?

লড়াইবাজরা টের পাবার আগেই বাবাঙ্গোরা টারজানকে অনেক কষ্টে, মালার্গানকে কম কষ্টে, আর মার্ক্সকে বিনা কষ্টে হাত পা বেঁধে বন্দী করে ফেলল। নিকিমা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে উপত্যকা পার হয়ে চলল।

ঘন বনের ভিতর দিয়ে বন্দীদের নিয়ে একশো যোদ্ধা চলেছিল। মালার্গান আর মার্ক্স ভেবেই পাচ্ছিল ওদের নিয়ে কি করা হবে। সরু একটা পায়ে-চলা পথ দিয়ে যাওয়া। শেষে ওরা পৌঁছল ছোট একটা নদীর ধারে পরিত্যক্ত একটা গ্রামের কাছে বাবাঙ্গোদের ঘাঁটিতে। চারদিক থেকে মেয়েরা আর ছেলেপুলেরা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে শিকার দেখতে এল। মালার্গান আর মার্ক্স ক্লান্তির চোটে বসে পড়ল, টারজান খাড়া দাঁড়িয়ে পালাবার উপায় ভাবতে লাগল। অন্যরা দুজনে বলাবলি করছিল এবার কি হবে কে জানে। টারজান হঠাৎ বলে বসল, 'রেঁধে খাওয়া হবে, আবার কি হবে? তার আগে হাত-পা ভেঙে জলে চুবিয়ে রাখা হবে। তখন তোমাদের ঠিক সেই রকম কষ্ট হবে, যেমন কষ্ট ঐ নির্দোষ জেব্রা আর হাতিদের তোমরা দিয়েছ।'

মুলাবগান বলল, 'কিন্তু ওরা তো জানোয়ার, আমরা মানুষ।'

—'তোমরাও জানোয়ার। ওদেরি মতো বেদনায় কষ্ট পাও। বাবাঙ্গোরা খাবার জন্য মারে। তোমরা জেব্রা বা হাতি খাও না, খালি মজা করবার জন্য মার।'

মার্ক্স কাঁদতে লাগল. সে ভেঙে পড়ছিল। মালার্গানও ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু অন্য ভাবে। সে বলল, 'এ ভাবে আমি কখনো চিন্তা করিনি। এখন মনে হচ্ছে কেন মারলাম!'

একটা খুদে বাঁদর উপত্যকার ওপর দিয়ে, বনের নানা বিপদের মধ্যে দিয়ে, যত তাড়াতাড়ি পারে ছুটে চলেছিল। মেল্টন মরা জানোয়ারের চিহ্ন দেখে এগোচ্ছিল। রাগে দুঃখে তার মন ভরে যাচ্ছিল। খাদের ধারে পৌঁছে, নিচে তাকিয়ে উল্টোনো গাড়ি, মরা হাতি দেখে, সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছিল। মনে হল এই সর্বনাশের জন্য ওরা নিজেরাই দায়ী। এখন আর কিছু করার সময় নেই।

সে রাতে বাবাঙ্গোরা উৎসবে মেতে উঠেছিল। তাদের কথা থেকে টারজান বুঝল পরদিন ওদের হাত-পা ভাঙা হবে। মালার্গানের পাশে শুয়ে সে বলল, 'তোমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুচ্ছি। দেখ তো আমার হাতের বাঁধন খুলতে পার কি না। তারপর আমি তোমারটা খুলে দেব।'

মালার্গান বলল, 'ও-কে।'

বনে একটা সিংহ গর্জন করে উঠল। শুনে বাবাঙ্গোদের কি ভয়। কিন্তু আর ডাক না শুনে ওরা ভয় ভুলে আবার নাচ-গান শুরু করল। তারি মধ্যে টারজান মালার্গানের হাতের গিঁটগুলো একে একে খুলে ফেলল। তারপর সে টারজানের বাঁধন খুলে দিল। মার্ক্সের বাঁধনও খোলা হল।

এবার টারজান বলল, 'এই বেলা চল। হামাগুড়ি দিয়ে শব্দ না করে।'

বনের দিকে এগোল টারজান। একা থাকলে অনেক আগেই বনের নিরাপত্তায় পৌঁছে যেত। কিন্তু একশো ফুট এগোবার পরেই মার্ক্স একটা হাঁচি দিল। আর যাবে কোথায়? অনেকগুলো বাবাঙ্গো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টারজান লাফিয়ে উঠে বলেছিল, 'বনের দিকে দৌড় দাও।' বলেই নিজে গাছে উঠে পড়েছিল। মালার্গানও উঠতে পারত, কিন্তু সে মার্ক্সকে সাহায্য করতে গিয়ে, ধরা পড়ল। তার আগে দিব্যি এক ফাইট্ দিল। তারপর মাথার পিছনে এমনি লাঠির ঘা খেল যে জীবনে এই প্রথম অজ্ঞান হয়ে গেল।

টারজান তার এই স্বার্থত্যাগ দেখে মনে মনে খুশি হল এবং এদের উদ্ধার করার উপায়ের কথা ভাবতে বসল।

এদিকে নিকিমা মুবিরোদের কাছে পৌঁছে কিচির-মিচির করে যা বলল, তাতে মুবিরো বুঝল তাড়াতাড়ি করতে হবে, টারজানের সাহায্য দরকার।

ট্রাক থেকে মেল্টন মুবিরো আর ওয়াজিরিদের দেখে ভাবছিল এরা বন্ধু, না শত্রু। কাছে এলে লক্ষ্য করল যোদ্ধাদের মাথায় পালকের সাজ, সংখ্যায় তারা শতখানেক হবে। নিশ্চয় যুদ্ধ অভিযান। ট্রাকের মাথায় শোয়া নিগ্রোদের ডেকে মেল্টন বলল, 'বাড়তি বন্দুকগুলো বের করে রাখো।'

ওদের একজন বলল, 'ওদের গুলি করবেন না, বোয়ানা, ওরা ওয়াজিরি যোদ্ধা। আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।'

মুবিরো হাত তুলে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথা থেকে আসছে?'

মেল্টন খাদের মধ্যে কি দেখেছে তা বলল।

মুবিরো বলল, 'তোমার দুই বন্ধু ছাড়া আর কোনো সাদা মানুষ দেখনি?'

টারজান বলে, 'একজনকে দেখেছি।'

মুবিরো বলল, 'তোমরা বনের ধারে ক্যাম্প কর। ওরা যদি বেঁচে থাকে, আমরা ওদের নিয়ে আসব।'

নিকিমার কথায় সে বুঝেছিল যে টারজানও ঐ দলটার হাতে পড়েছে। ওরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল।

বাবাঙ্গোদের ঘাঁটিতে সবাই রেগে গিয়েছিল। একজন বন্দী পালিয়েছে। এ দুটোর তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা দরকার। টারজান ওয়াজিরিদের আশায় অনেকটা এগিয়ে গিয়ে সারা দিন অপেক্ষা করে, সন্ধ্যাবেলায় হতাশ হয়ে আবার বাবাঙ্গোদের আড্ডার কাছে গাছে বসে রইল। সেখানে দুই হতভাগ্য বন্দীকে পেড়ে ফেলে হাত-পা ভাঙার জোগাড় হচ্ছিল। ধুনির আগুনের পিছনে দু জোড়া সবুজ চোখ জ্বলছিল, দুটো ল্যাজ নড়ছিল। ওঝা গদা হাতে মার্ক্সের দিকে এগিয়ে আসতেই সে চেঁচিয়ে উঠল।

আর থাকতে না পেরে মালার্গান এক লাফে সকলের হাত ছাড়িয়ে ওঝার চোয়ালে এমনি এক ঘুঁষি চালাল যেমনটি জন্মে সে চালায়নি। চোয়াল ভেঙে ওঝা অজ্ঞান। হঠাৎ সিংহের ডাক শুনে সকলে তটস্থ! দুই সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়তেই সব বাবাঙ্গো উঠে পড়ে দে দৌড়। সিংহী নদী থেকে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল। সিংহটা মালার্গান উঠে পড়বার আগেই, তার ওপর চড়াও হল। এমন সময় টারজান তার পিঠে লাফিয়ে পড়ল। সিংহের গায়ে দুই ঠ্যাং পেঁচিয়ে, এক হাতে গলা জড়িয়ে ধরে, অন্য হাতে তাকে বারবার ছোরার কোপ দিয়ে টারজান তাকে মেরে ফেলল। পশুরাজের সব লাফঝাঁপ বিফল হল। তখন তার পিঠে পা রেখে টারজান তার জয়ধ্বনি দিল। সে-বিকট ডাক শুনে বাবাঙ্গোরা সেই তল্লাট ছেড়ে পালাল।

টারজান ডাক দিল, 'এসো।' তারপর মালার্গান আর মার্ক্সকে নিয়ে বন্দীদশা, মৃত্যু আর বাবাঙ্গোদের পিছনে ফেলে এগিয়ে চলল।

পরদিন মেল্টনের ক্যাম্পে মার্ক্স আর মালার্গান বিশ্রাম নিল। ওয়াজিরিদের নিয়ে টারজান চলল বাবাঙ্গোদের ধরে, উচিত শিক্ষা দিয়ে, ঐ এলাকা থেকে দূর করে দিতে। যাবার আগে টারজান মার্ক্স আর মালার্গানকে বলল, 'আফ্রিকা থেকে চলে যাও। আর কখনো এসো না।'

মালার্গান বলল, 'সে আর বলতে?'

মার্ক্স বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে নিউইয়র্ক চল, বক্সিং লড়ে লাখ ডলার পাইয়ে দেব।'

টারজান মাথা ঘুরিয়ে, ওয়াজিরিদের পিছন পিছন রওনা দিল। নিকিমা ওর কাঁধে বসে সাদা মানুষদের গাল দিতে লাগল।

ভোরবেলার তাজা বাতাসে টারজান তার বন্য এলাকার জানোয়ার-চলা পথ ধরে নিঃশব্দে ঘুরছিল। এদিকে গাছপালা কম; মাঝে মাঝে খোলা জায়গা; তাই সে তাড়াতাড়ি এগোতে পারছিল। আরো ঘন বন হলে গাছে গাছেই চলত সে, তার প্রথম বয়সে লব্ধ বন্য ক্ষমতাগুলো এতটুকু কমেনি। খুব সজাগ সতর্ক ভাবেই সে চলেছিল।

টারজান টের পাচ্ছিল বাঁ দিকে একশো ফুট দূরে একটা সিংহ শুয়েছিল,; তার পাশে একটা আধ-খাওয়া জেব্রা। দেখতে পায়নি কিছু, গন্ধে বুঝেছিল। ভরপেট সিংহ কাউকে কিছু বলে না। নাক যতই তীক্ষ্ণ হক, পিছন থেকে বাতাস বইলে সামনের কোনো গন্ধই নাকে আসা সম্ভব নয়। তাই একটা বিশেষ গন্ধ সে পায়নি, কিন্তু কানে এসেছিল অনেক দূরে ডাঙ্গো হায়না ডাকছে। টারজানের চুল শিরশির করে উঠল। সে হায়নাকে বড় ঘৃণা করত। নোংরা স্বভাব, গায়ে দুর্গন্ধ। তবে ডাঙ্গো কোনো অন্যায় না করলে, টারজানও কিছু বলত না।

অন্য দিকে যাবে ভাবছে, এমন সময়ে ডাঙ্গোর গলার সুর বদলাল। ডাল ধরে ঝুলে পড়ে টারজান বাতাসের বেগে ঐদিকে এগোল। দেখতে হবে কি ব্যাপার। নিকিমা বাঁদরটা কাঁধ থেকে নেমে, অন্য বাঁদরদের সঙ্গে খেলায় মাতল। তার পরেই টারজান দেখতে পেল একটা আধ-ভাঙা উড়োজাহাজ পড়ে আছে আর পাঁচ-ছয়টা হায়না চারদিকে ঘুরছে। তাদের মুখ থেকে নাল ঝরছে।

ঘেন্না দমন করে টারজান গাছ থেকে নেমে পড়ল। হায়নাগুলো দাঁত খিঁচিয়ে খানিকটা সরে গেল। টারজান তীরধনুক নামাল না পর্যন্ত। হঠাৎ ধেড়ে হায়নাটা ওর টুঁটি কামড়াবার জন্য লাফিয়ে উঠল। টারজান হায়নার গলা টিপে ধরে, শরীরটাকে একবার শূন্যে পাক দিয়ে, দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অন্যগুলো অমনি মৃতদেহটার ওপর হামলে পড়ল।

উড়োজাহাজটা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েনি। একটা ডানা কুঁকড়ে গেছে, নামবার ব্যবস্থাও ভাঙাচোরা। পাইলট ককপিঠে বসে আছে, মাথাটা ইন্সট্রুমেন্ট বোর্ডের ঠেকে ঠেকে আছে। প্রাণের সাড়া নেই। ইটালির সামরিক প্লেন। ককপিঠে উঠে মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখল পাইলট দুর্ঘটনায় মরেনি, তার গলায় গুলির চিহ্ন। হয়তো দু-তিনদিন আগে মারা গেছে। মনে হয় উড়ন্ত অবস্থায় গুলি খেয়ে, নিজেই প্লেনটাকে নামিয়ে, তবে মরেছে। সঙ্গে আরো লোক ছিল। প্লেনের চারদিকের মাটিতে জুতোর ছাপ, সিগারেটের পোড়া টুকরো, সেলোফেন কাগজ।

মৃতদেহের গলার বাঁদিকে গুলির ফুটো। সঙ্গীরা হত্যাকারী হলে তো হয় ডানদিক নয়, পিছন থেকে গুলি করতে হত। ওপর থেকে গুলিটা এসেছিল। হয়তো অন্য কোনো প্লেন থেকে। আশ্চর্য ব্যাপার, কারণ এদিকে কোনো প্লেনেরই আসার কথা নয়। অন্য প্লেনটা গেল কোথায়? খুঁজতে গিয়ে একটা ডান হাতের দস্তানা পেল। সেটা শুঁকে নামিয়ে রাখলো। গন্ধটা ওর চেনা হয়ে গেল। তারপর বল্লম হাতে হুঙ্কার দিতেই হায়নাগুলো পালাল। তখন পায়ের দাগ পরীক্ষা করল টারজান। দুজন লোক দিন দুই আগে ঐ ছাপ রেখে গেছে। তাদের খুঁজে বের করা উচিত। হয়তো কোনো বিপদে পড়েছে। দুদিনের ছাপে এখনো ক্ষীণ গায়ের গন্ধ লেগে আছে। একজনের পা খোঁড়া বোঝা গেল।

ওকে দেখে পিঠে তুলে নেবার জন্য টানটর হাতি এসে হাজির। তার কানের পিছনে চুলকে দিয়ে, বিদায় দিল টারজান। পায়ের ছাপ ধরে চলা তো হাতির পিঠ থেকে সম্ভব নয়। একটু পরে পেট্রলের গন্ধ পেল। অথচ সেই সঙ্গে মানুষের গন্ধ নেই। নিশ্চয় আরেকটা প্লেন নেমেছিল এখানে। পেলও তাকে. ভেঙেচুরে পড়ে আছে। এই প্লেন থেকেই কেউ তাহলে আগের পাইলটকে গুলি করেছিল।

এটার ল্যাজের দিকটা মেশিনগানের গুলিতে জর্জরিত।

দ্বিতীয় প্লেনে মেশিনগান ছিল না, খালি একটা রিভলবার ছিল। কিন্তু এর পাইলট মরেনি, সে কোথাও চলে গেছে। আরেকটু দূরে তালগোল পাকানো একটা প্যারাসুট দেখে বোঝা গেল দুই নম্বরের পাইলট তাতে ঝুলে নেমেছিল। টারজান মনে মনে বলল, এক নম্বর প্লেনে মেশিনগান ছিল। ও-ই নিশ্চয় দুই নম্বরকে আক্রমণ করেছিল। তার মেশিনগান নেই। পাইলটের রিভলবার ছিল, তাই দিয়ে এক নম্বর পাইলটকে সে মেরে ফেলেছে। এক নম্বর নামতে বাধ্য হয়েছিল। তার দুই সঙ্গী আর দুই নম্বর পাইলট তাহলে প্লেন ছেড়ে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো এতদিনে সকলেই মরেও গেছে। সব তো বুঝলাম, কিন্তু কেন ব্যাপারটা ঘটল? দুই নম্বর একটা ইংলিশ প্লেন, পাইলটও সম্ভবতঃ ইংরেজ, অন্য দুটো ইটালিয়ান। টারজানও ইংরেজ। কাজেই, তাকেই আগে খোঁজা দরকার এবং সিংহরা তার নাগাল পাবার আগেই এইভাবে টারজান নিজের অজ্ঞাতসারে লেফটেনাণ্ট সেসিল জাইল্‌স্ বার্টনের সন্ধানে বেরিয়েছিল।

হরেস্ ব্রাউন বলে একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক গবেষক ছিলেন। মেরি গ্রেহাম বলে তাঁর সেক্রেটারিটি তাঁর গবেষণা বিষয়ে সব কথা জানত। কিন্তু সে বড় বেশি কথা বলত। এখন হরেস্ ব্রাউন এমন একটি জিনিস উদ্ভাবন করেছিলেন, যা যুদ্ধের সময়ে অনেক কাজে লাগে। মেরি সে-কথা জানত। সে একদিন একটা পার্টিতে গিয়ে ঐ বিষয়ে অনেক কিছু বলে এল। ঐ ছিল তার দুর্বলতা। দেখতে ভালো নয়, তাই চটপট কথা বলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করত। লোক খারাপ ছিল না। মেরি ঐ পার্টিতে জোসেফ ক্যাম্বেল বলে একজনের কাছে ব্রাউনের উদ্ভাবনের বিষয়ে অনেক কিছু বলে ফেলল। 'ভেবে দেখ যুদ্ধের সময় ঐ উদ্ভাবন কত কাজে লাগবে। তিন হাজার ফুট উঁচুতে থাকলেও যে কোনো ইণ্টার্নেল কম্বাস্‌চান এঞ্জিনের ইগ্‌নিশনের বারোটা বেজে যাবে। হাজার গজের মধ্যে কোনো ট্যাংক বা ট্রাক আসতে পারবে না ইত্যাদি.....' জোসেফ ক্যাম্বেল লোক ভালো ছিল না। তার ডাক নাম জো দি পুচ্। পুচ্ হল কুত্তা। সে তো দু-কান খাড়া করে শুনছিল। ভাবছিল জিনিসটাকে কি করে নিজের স্বার্থে লাগানো যায়।

মেরিকে বলল, 'ইস্! ওটাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।'

—'তা হয় না। পাছে চুরি যায় তাই খুলে রাখা হয়েছে। মিঃ ব্রাউনের কাছে খালি এক সেট নক্সা আছে।'

—'তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলা যায় না?'

—'না, তাও হয় না। উনি লণ্ডন রওনা হয়ে গেছেন ওঁর ইচ্ছা ঐ উদ্ভাবনটা থেকে দুটি মাত্র দেশ উপকৃত হয়....'

এদিকে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হরেস্ ব্রাউন চুক্তি করে ফেলে, লণ্ডনের একটা ছোট যন্ত্রপাতির দোকানে মেশিনটার অংশগুলো জুড়ছিলেন। ব্রিটিশ সামরিক বিভাগ আর উনি নিজে ছাড়া আর কারো এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরে জানবার কথা নয়, তাই নিরাপত্তার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়নি। কমশালার কাছে একটা ছোট বোর্ডিং হাউসে একটা ঘর নিয়ে ব্রাউন ছিলেন। সেখানে নিকোলেই জুবানেভ বলে একজন দেশত্যাগী রুশও থাকত। আমেরিকা থেকে সদ্য আগত একজন লোকের সঙ্গে জুবানেভের ভাব হয়েছিল ঐ বোর্ডিং হাউসেই। ব্রিটিশ সরকারের একজন গুপ্তচর দুজনার ওপরেই নজর রাখছিল।

কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন সকালে দেখা গেল রাতারাতি হরেস্ ব্রাউনকে কে খুন করেছে এবং তাঁর নক্সাগুলোও জুবানেভ আর ক্যাম্বেল বলে নবাগত আমেরিকানটি নিখোঁজ। সরকারের বিচিত্র ক্ষমতা থাকে; তার জোরে এক সপ্তাহের মধ্যেই রোমে জুবানেভ আর ক্যাম্বেলের সন্ধান পাওয়া গেল। অর্থাৎ সেখানকার সরকারের কাছে নক্সা বেচার চেষ্টা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে লেফটেনাণ্ট সেসিল জাইল্‌স্ বার্টন ক্রয়ডন থেকে রোম যাত্রা করল। সংবাদপত্রের খবর, সে কেপটাউন যাচ্ছে।

জুবানেভ কাউকে বিশ্বাস করত না। হ্যাণ্ডব্যাগের তলায় গোপন খাপে নক্সা লুকিয়ে, সেটি হোটেলের ঘরে রেখে, ইটালির এক বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেল। দাম ঠিক হয়ে গেল। ক্যাম্বেল আর জুবানেভ মহা খুশি। টাকা পেলে আজীবন সুখে থাকা যাবে। অবিশ্যি নক্সা অনুসারে মেশিন তৈরি হলে, তার সাফল্য প্রমাণ হবার পর টাকাটা পাবে। কিন্তু হোটেলের ঘরে ফিরেই তাদের চক্ষুস্থির! ওদের অনুপস্থিতির সুবিধা নিয়ে ঘরটা কে কে তচ্‌নচ্ করে গেছে। ব্যাগও আছে, গোপন খাপও আছে, কিন্তু নক্সা নেই।

তখুনি সেই বিশেষ ব্যক্তিকে ফোন করা হল। রোম

থেকে বেরোবার সব পথ ও পন্থার ওপর পাহারা বসানো হল। কিন্তু এই হুকুম জারি হবার পঁচিশ মিনিট আগে, লেফটেনাণ্ট সেসিল জাইল্‌স্‌-বার্টন কেপটাউন রওনা হয়ে গেছে। সেও ঐ হোটেলেই উঠেছিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা দ্রুতগামী সামরিক প্লেন চড়ে ক্যাম্বেল, জুবানেভও রওনা হল। তাদের পাইলটের নাম লেফটেনাণ্ট টরলিনি।

জাইল্‌স্‌ বার্টনকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল সোজা বানগালি প্রদেশে যাবার। সেখানে তার বাবা ছিলেন রেসিডেণ্ট কমিশনার। নক্সাগুলো সেখানে রেখে ওকে কেপটাউনে যেতে হবে যেন কাগজে যেমন দিয়েছিল উড়োজাহাজের কসরৎ দেখাতে। ঐ নক্সা চুরির ব্যাপারটা যত কম জানাজানি হয়, দেশে দেশে সখ্য বজায় রাখার ততই সুবিধা। কিন্তু বানগালিতে উড়োজাহাজে আবার পেট্রল নেবার ব্যবস্থা না থাকায় জাইল্‌স্‌-বার্টন টিউনিসে নামল তেল নিতে। এয়ারপোর্টের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছে, এমন সময় একজন স্থানীয় লোক এসে বিশুদ্ধ ইংরিজিতে বলল, 'এখানে দেরি করলে, ইটালির লোকরা আগে কেপটাউনে পৌঁছে যাবে।'

ফরাসী অফিসারদের একজন বলল, 'রেস্‌ হচ্ছে বুঝি? তা তো জানতাম না।'

জাইল্‌স্‌ বাটন বুঝল ওর পিছনে লোক লেগেছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে আবার আকাশে উড়ল। মনে মনে ওদের টিউনিসের চরটিকে তারিফ না করে পারল না। টিউনিসে আধ ঘণ্টা নষ্ট হল। তবে অন্ধকার হবার আগে যদি ইটালিয়ানরা ওকে নজর করতে না পারে, তাহলে হয়তো পার পেয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। সূর্যাস্তের সময় থেকে সে প্লেন ওর পিছু নিল এবং সারা রাত সমানে লেগে রইল। একবার বানগালি পৌঁছতে পারলে নক্সাটা নিরাপদ।

সকালে ইটালিয়ান সামরিক প্লেনটা পাশাপাশি উড়ছিল। পাইলট একজন ইটালিয়ান; কিন্তু আরোহীদের চেনা গেল না। তবে ধরে নেওয়া যায় ওরা ক্যাম্বেল আর জুবানেভ। বানগালি হয়তো পঞ্চাশ মাইল দূরে। অন্য প্লেনটা মেশিনগান চালাতে আরম্ভ করল। ওর সঙ্গে শুধু একটি রিভলবার। সেটি তুলেই শত্রুপ্লেনের পেটে গুলি করল। এবার ওরা পিছন থেকে তেড়ে এল। বার্টন পরপর চারটে গুলি ছুঁড়ে, এঞ্জিন বন্ধ করে, প্যারাসুট নিয়ে আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে পড়ল। অন্য প্লেনটা এলোমেলোভাবে উড়তে উড়তে একটা টিলার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাটন কিন্তু নিরাপদে মাটি পেল। প্লেনটা কিছুদূরে ভেঙেচুরে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে প্যারাসুট খুলে ফেলে, চেয়ে দেখে কোথাও জনমানুষের চিহ্ন নেই। বানগালা সম্ভবতঃ একটু দক্ষিণ-পুবে পড়বে। যে নক্সা-গুলোর জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছিল, সেগুলোও নিরাপদ। শত্রুরা নিশ্চয় পিছু নেবে জেনে, আন্দাজে সে বানগালার দিকে হাঁটা দিল। ও না জানলেও সিংহের দেশ ওটা; নরখাদকদের বাস এবং বানগালার দূরত্ব তিনশো মাইল।

টারজান তো সেসিল জাইল্‌স বার্টনের চিহ্ন দেখে চলেছে। এখন মজা হল ঐ বিপদসঙ্কুল অঞ্চলে অনভিজ্ঞ বার্টনই নিরাপদে এগিয়ে চলল আর টারজানই নরখাদক বুইরোদের হাতে বন্দী হল। দুজনার মধ্যে অনেক দিনের শত্রুতা। মোড়ল এমপিঙ্গুর ছেলে চেমুঙ্গো ওকে বন্দী করে মহা খুশি। ব্যাপার হল, বুইরোরা শিকার করতে করতে ওর পিছন থেকে এগিয়ে আসছিল। বাতাস আসছিল সামনে থেকে তাই টারজান ওদের গন্ধ পায়নি। হঠাৎ সামনে একটা আহত সিংহ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে টারজানকেই আক্রমণ করল! পিছন থেকে চেমুঙ্গোও পুরনো শত্রুকে দেখেই বর্শা ছুঁড়েছিল। সে বর্শাটা টারজানের পিঠে বিঁধল, সে পড়ে গেল। অন্য যোদ্ধারা ততক্ষণ সিংহটার মোকাবিলা করছিল। তার হৃদ্‌পিণ্ডেও বর্শা বিঁধল, সে মরে পড়ে গেল। মরা সিংহ আর সাদা বন্দী নিয়ে যোদ্ধারা ফিরলে গ্রামে আনন্দ উল্লাস পড়ে গেল। ওঝা টারজানকে দেখে বলল, 'ও আপদকে বেশি দিন রাখা নয়, এখনি মেরে ফেল।'

কিন্তু গ্রামবাসীদের অনেকেরি বড় ভয়, মারলে যদি পিশাচ হয়ে প্রতিশোধ নেয়। শেষটা মোড়ল বলল, 'এখন কিছু করে কাজ নেই। ওর পিঠের ক্ষতটাতে ওষুধ দেওয়া হক। এর মধ্যে, যদি কোনো অমঙ্গল না হয়, তখন না হয় ভোজ দেওয়া যাবে।

এঁটে বেঁধে রেখছিল হাত পা; থেকে থেকে পেশী ফুলিয়ে ঢিলে করে নিত টারজান; ওরা আবার আঁটত। পায়ের সঙ্গে বাঁধা হাত, ভারি অপমান লাগত টারজানের। খালি নাক আর কান কাজ করে আর সবচেয়ে প্রখর সেই

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি, যা টারজানকে কত সময়ে বাঁচিয়েছে। হঠাৎ টারজান সচেতন হয়ে উঠল, মনে আশার আলো দেখল। তখন সে বসে বসে দুলতে লাগল। রক্ষী জিজ্ঞাসা করল, 'কি করছ?'

—'দেবতার নাম করছি।'

তা করুক, তাতে কোনো সুবিধা হবে না।

ক্রমে দোলার সঙ্গে সুরটা আরো জোরে হতে লাগল। হঠাৎ বজ্র-নির্ঘোষের মতো একটা শব্দ করে টারজান থামল।

গভীর জঙ্গলে টানটরের কানে সে শব্দ গেল; নাকেও একটা গন্ধ এল। অমনি ডাক ছেড়ে দলবল সংগ্রহ করে সে ছুটে চলল, ছোটখাটো গাছপালা মাড়িয়ে ভেঙে, বড় গাছের পাশ কাটিয়ে। একেবারে বুইরো গ্রামে পৌঁছল তারা। তাদের পায়ের বজ্রধ্বনি টারজানের কানে সবার আগে পৌঁছল। গ্রামের বেড়া ভেঙে ব্যূহ ঢুকে পড়ল। টারজান ডাকল 'টানটর, এসো! আমার কাছে এসো?' কিছু বলার দরকার ছিল না। ঘরের চাল উড়ে গেল, টানটর তাকে মাথায় তুলে নিল। তারপর শুঁড় তুলে আদেশের জন্য দাঁড়িয়ে রইল। ততক্ষণে গ্রামের একটা ঘরও আস্ত ছিল না। গ্রামবাসীরা সবাই পালিয়েছিল। টারজান বলল, 'চল!' চলল সবাই। ভোর হয়ে আসছিল। ছোট বাঁদররা এসে টারজানের হাতের পায়ের বাঁধন দাঁত দিয়ে কেটে দিল। এবার ওদের আদর করে বিদায় দিল টারজান। বন্দী অবস্থায় শুয়ে শুয়ে দূরের গ্রাম থেকে ঢাকের সংবাদ শুনেছিল সে, বানগালির রেসিডেন্ট কম্যাণ্ডার তাঁর বন্ধু টারজানকে জানাচ্ছেন তার এখনি বানগালি আসা দরকার।

জাইল্‌স্ বার্টন কি করে যে ঐ সিংহের নিবাস ঘন বনে ভুল দিকে বানগালি খুঁজে, তবু বেঁচেছিল, সেই এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পোকামাকড়, শিকড়বাকর খেয়ে, চুলদাড়িতে মাথামুখ ঢেকে, ছেঁড়া কাপড়চোপড় পরে একদিন একটা টিলার ওপর থেকে লম্বা এক সারি মানুষকে উপত্যকা পার হতে দেখল। শোলার টুপি পরা শ্বেতাঙ্গ, সঙ্গে কালো বাহকের সারি, দস্তুরমতো একটা সাফারি। সঙ্গে দুজন মহিলাও ছিল। ভাঙা গলায় ইংরিজিতে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে, হোঁচট খেতে খেতে, সে যখন ওদের কাছে এসে পৌঁছল, ওকে তখন একজন কম বয়সী ইংলিশ বৈমানিক বলে চিনবার উপায় ছিল না। সাফারিতে লেডি বারবারা র‍্যামস্‌গেট আর তার ভাই লর্ড জনও ছিল। এরা চেনা বন্ধু, কিন্তু নিজের পরিচয় এবং দুর্দশার ইতিবৃত্ত খুলে বলা সত্ত্বেও, ওকে সনাক্ত করতে তাদের সময় লেগেছিল। তাতে বার্টন ভারি দুঃখিত হয়েছিল। দলের মধ্যে রোমানফ্ বলে একজন লম্বাচওড়া লোক বলল বানগালি ওখান থেকে দু-শো মাইল দূরে।

র‍্যামস্‌গেটদের সঙ্গে রোমানফের দলের দেখা হয়েছিল দু-সপ্তাহ আগে। পরস্পরের সুবিধার জন্য এই বিপদসঙ্কুল অঞ্চলে ওরা একসঙ্গে চলেছিল। রোমানফ্‌দের সঙ্গে আরো দুজন শ্বেতাঙ্গ ছিল। তাদের নাম, স্মিথ আর পিটারসন। তাদের নাকি বাহকরা পালিয়েছে, তাই এদের সঙ্গে জুটেছে। গোডেনস্কি বলে এক ফটোগ্রাফারও রোমানফের সঙ্গে ছিল। ডানক্যান ট্রেণ্ট হল লর্ড জনের বন্ধু। টমলিন তার ভ্যালে। বারবারার মেডের নাম ভায়োলেট। লর্ড জন জানোয়ার মারতে আসেনি, ফটো তুলতে এসেছে।

বার্টনও ওদের দলে জুটে গেল। নক্সাগুলো নিরাপদে ওর পকেটে রইল। কিন্তু ক্রমে নানা ঝামেলা দেখা যেতে লাগল। বারবারার সঙ্গে বার্টনের ভাব দেখে, ট্রেণ্ট মহা রেগে গেল। গোডেন্সকি ভায়োলেটের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করত, ভায়োলেট তাকে পাত্তা দিত না। তাতে গোডেন্সকির মেজাজ বিগড়ে থাকত। লর্ড জন গোডেন্সকিকে বলল বানগালি পৌঁছে তার ছুটি হয়ে যাবে। এই ভাবে ক্রমে দলটার মধ্যে কেমন একটা বিদ্বেষের ভাব গজাতে লাগল। তার ওপর রোমানফের গাইড গল্ট বাহকদের মারধোর করাতে বার্টন আপত্তি করেছিল; দুজনার মধ্যে মারামারিও হয়ে ছিল। গল্ট হেরে গেছিল। এই ভাবে বার্টনের তিন শত্রু হল। ট্রেণ্ট, গোডেন্সকি, গল্ট। কিন্তু তার পরদিনই বানগালি পৌঁছে যাবার কথা, তাই এ-সব তুচ্ছ কথা নিয়ে বার্টন মাথা ঘামাল না। খুশিমনেই শুতে গেল।

ঠিক ভোরের আগে খুব শীতও পড়েছিল। নতুন রক্ষী পাহারা দেবার ডিউটিতে এল। তখনো তার চোখে ঘুম ছিল। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে আগুনের ধারে বসে সে তো ঘুমিয়েই পড়ল। হঠাৎ চমকে জেগে সামনে দেখে একজন প্রায় উলঙ্গ শ্বেতাঙ্গ ওর পাশে বসে আগুন পোয়াচ্ছে। আস্কারিকে সে সোয়াহিলি ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কার সাফারি?'

—'তুমি কে? যদি পিশাচ হও, তাহলে আমার ক্ষতি কর না, আমি খাবার এনে দিচ্ছি।'

—'আমি টারজান। এটা কার সাফারি?'

—'দুজনের। বোয়ানা রোমানফ্ শিকার করে। বোয়ান র্যাম্‌সগেট ছবি তোলে।'

তার দিকে চেয়ে টারজান বলল, 'পাহারা দিতে এসে তুমি ঘুমোচ্ছ, তোমাকে বেত মারা উচিত।'

—'না, না, ঘুমোইনি। চোখে ব্যথা কি না তাই চোখ বুজে ছিলাম।'

টারজান বলল, 'আগুন প্রায় নিবেই গেছিল। আমি কাঠ দিয়ে আবার জ্বালিয়েছি। সিম্বা এসে কাউকে তুলে নিয়ে যেতে পারত। ঐ তো ঐখানে সে বসে আছে। তার চোখ দেখতে পাচ্ছ না?'

এতক্ষণ পরে, সিংহের চোখ দেখতে পেল আস্কারি। টারজান একটা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই সিংহ পালাল। 'আবার এলে ওর মাথার ওপর দিয়ে গুলি কর। নইলে আহত সিংহের হাত থেকে রক্ষা পাবে না।'

হঠাৎ টারজান জিজ্ঞাসা করল, 'কে মারা গেছে?'

আস্কারি বলল, 'না না, কেউ মরেনি।'

টারজান শ্বেতাঙ্গদের তাঁবুর দিকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ দিক থেকে মরা মানুষের গন্ধ পাচ্ছি।'

লোকটা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'না, না, কেউ মরেনি। যাই, রাঁধুনেদের খেতে দেবার সময় হয়ে গেল।'

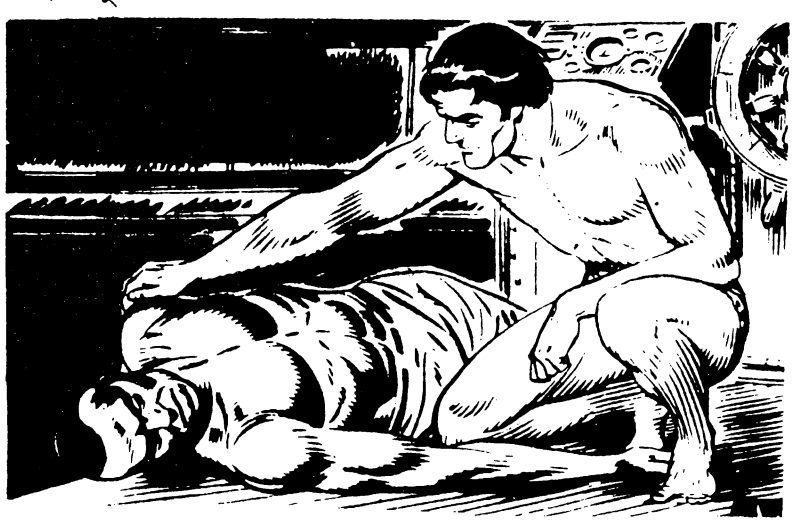

এই বলে ছুটে গিয়ে রাঁধুনেদের সঙ্গে আরো কয়েকজনকে ডেকে দিয়ে র্যাম্‌সগেটকে বলল, 'ক্যাম্পে পিশাচ এসেছে, সে নাকি মরা মানুষের গন্ধ পাচ্ছে।'

র্যাম্‌সগেট তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলল, 'তুমি কে? রাতে খালি গায়ে বনে ঘুরছ কেন?'

—'আমি টারজান। তুমি কে?'

—'র্যাম্‌সগেট। তুমি নাকি বলেছ, ক্যাম্পে মরা মানুষ আছে?'

টারজান বলল, 'তার গন্ধ পাচ্ছি।'

র্যাম্‌সগেট শিউরে উঠল, পিশাচ না হলে নির্ঘাৎ পাগল। ওকে খাবার দাবার দিয়ে ঠাণ্ডা করা যাক তারপর লোকজনদের ডেকে বলল, 'শিগগির কর তাড়াতাড়ি বেরোতে চাই আজ।'

গাইড গল্ট এসে বলল, 'এ আবার কে?'

—'বেচারাকে কিছু খেতে দেবার ব্যবস্থা কর। সবাইকে ডেকে দাও।'

সবাই উঠে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বার্টনের ছোকর ছুটে এসে বলল, 'শিগগির এসো বোয়ানা। বোয়ানা বার্টন তাঁবুতে মরে পড়ে আছে।'

ছুটে গেল সবাই; স্তম্ভিত হয়ে দেখল পানামা সুট পরে বার্টন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। গলায় কালসিটের দাগ, পিঠে একটা ছোরা মেরে হৃদ্‌পিণ্ড ফুটো করে দেওয়া হয়েছে।

র্যাম্‌সগেটের সঙ্গে টারজানও এসেছিল। সে-ই বার্টনকে কোলে করে খাটিয়ার ওপর শুইয়ে, কম্বল চাপা দিল।

গল্ট আস্কারিদের চারজনকে সোয়াহিলিতে জেরা করতে লাগল। তিনজন বলল তারা কিছু দেখেওনি, শোনেওনি। চতুর্থজন বলল তার চোখ ব্যথা করছিল তাই একটু চোখ বুজে ছিল। তারপর চেয়ে দেখে অদ্ভুত লোকটি ওর পাশে আগুন পোয়াচ্ছে। গল্ট বলল, 'মিথ্যাবাদী। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে।'

—'তা হতে পারে।'

—'তাহলে বোয়ানা বার্টনের তাঁবুতে গিয়ে তাকে মেরে ফেলা ওর পক্ষে খুবই সহজ?'

—'হ্যাঁ, বোয়ানা। কিন্তু কেউ জানতে পারার আগেই ও আমাকে বলেছিল, ক্যাম্পে কেউ মারা গেছে।'

টারজান বলল, 'আমি আসার আগেই মরেছিল।'

—'তুমি কখন এসেছিলে তাই কেউ জানে না।'

রোমানফ আর র্যাম্‌সগেট এসে সব কথা শুনল। র্যাম্‌সগেট বলল, 'অচেনা লোককে মেরে ওর কি লাভ?'

স্মিথও বলল, 'পাগলে কি না করতে পারে?'

লেডি বারবারার মনটা দুঃখে ভরে গেছিল। তবু সে বলল, 'এই ক্যাম্পেই কয়েকজনের ওর ওপর রাগ ছিল!' বলে ট্রেন্টের দিকে তাকাল।

টমলিন বলল, 'মিঃ ট্রেণ্টের সঙ্গে ওর মারামারি হয়েছিল আমি ট্রেণ্টকে বলতে শুনলাম ওকে মেরে ফেলবে।'

ভায়োলেট বলল, 'গোডেন্সকিও ঐ কথা বলেছিল।'

গল্ট জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি করে জানলে ক্যাম্পে কেউ মরেছে?'

—'গন্ধ পেলাম। আমি টারজান। বনমানুষদের কাছে মানুষ হয়েছি। বনে বাঁচতে হলে ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করতে হয়। বিশেষতঃ নাক, চোখ আর কানকে।'

নিবোধরা কেউ ওর কথা বিশ্বাস করল না। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল ওকে বেঁধে বানগালি নিয়ে যাওয়া হবে।

এরা কেউ টারজানকে চিনত না। ওর ছাই রঙের চোখের ভাষাও কেউ বুঝত না। গল্ট ওকে বন্দী করবার জন্য এগোতেই, টারজান পিছু হটে গেল। ট্রেণ্ট অমনি পিস্তল বের করে বলল, 'নড়লে মেরে ফেলব।' সঙ্গে সঙ্গে টারজান পিস্তলসুদ্ধ হাতের কব্জিটা ধরল। গুলিটা ওপর দিয়ে ছুটে গেল, পিস্তল পড়ে গেল।

ট্রেণ্টকে সামনে ঢালের মতো ধরে টারজান পিছু হটে যেতে লাগল। পাছে ট্রেণ্টের গায়ে লাগে, তাই কেউ গুলি করতে পারত না। ছোরা বের করে টারজান বলল, 'সবাই চুপ করে দাঁড়াও, নইলে একে মেরে ফেলব।'

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল, টারজান ট্রেণ্ট সহ ক্রমে বনের দিকে পিছোতে লাগল। কেউ কিছু করতে পারল না। হতাশ হয়ে সকলে ক্যাম্প তোলার তোড়জোড় করতে লাগল। এমন সময় ট্রেণ্ট ফিরে এসে র‍্যাম্‌সগেটকে বলল, 'একটু ব্র্যাণ্ডি খাওয়াও ভাই, হাতটা বোধ হয় ভেঙেই ফেলেছে! শেষটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে গাছে চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল!'

—'কোনো ক্ষতি করেনি তো?'

—'না, না আমাকে একটা ছোট ছেলের মতো টেনে নিয়ে গেল! ও-ই নিশ্চয় বার্টনকে মেরেছে। তারপর স্রেফ কেটে পড়েছে।'

কিছু পরে বার্টনের মৃতদেহ নিয়ে সাফারি রওনা হয়ে গেল। সেদিন বানগালি পৌঁছনো গেল না। আবার ক্যাম্প করতে হল। কারো মুখে হাসি নেই। রাতে আবার মহা হট্টগোল, গুলির শব্দ। সবাই ছুটে বেরিয়ে এল, 'কি হল? কি হল?'

স্মিথ বলল 'খ্যাপাটা আবার এসেছিল। এবার পিটারসনকে মেরে গেছে। আমি গুলি করলাম। লাগল কি না জানি না।'

পিটারসন চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছিল। কেউ এসে বুকে ছোরা মেরে গেছিল। বলা বাহুল্য সে রাতে কারো চোখে ঘুম এল না।

বানগালিতে কর্ণেল জেরাল্ড জাইল্‌স্ বার্টনের বাংলোতে তাঁর সামনে টারজান বসে ছিল। কর্ণেল বলছিলেন, 'আমি তো অনেক দিন আগেই তার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এত কাছে এসেও তাকে ফিরে পেলাম না বলে কষ্ট হচ্ছে। কে এ-কাজ করল মনে হয়?'

—'ওরা বলছে আমি করেছি।'

—'পাগল নাকি।'

—'সাফারির তিনজনের ওর ওপর রাগ ছিল। তিন-জনেই ওকে মারবে বলে শাসিয়েছিল। তবে ও হল রাগের কথা, আমি তার কোনো মূল্য দিই না। একমাত্র ট্রেণ্ট বলে একজনের পক্ষে কাজটা সম্ভব হতে পারত। লেডি বারবারা বার্টনকে পছন্দ করে বলে তার বড় হিংসে।'

—'তুমি এখানে থেকে ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করে দিয়ে যাবে তো?'

—'সে আর বলতে।'

—'আরেকটা কথাও তোমার জানা উচিত। আমার ছেলের সঙ্গে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাগজপত্র ছিল বাইরের লোকে জানত ও লণ্ডন থেকে কেপটাউন যাচ্ছে, কিন্তু কাগজগুলো আমার কাছে রেখে যাবার কথা ছিল।'

টারজান বলল, 'এবং একটা ইটালিয়ান সামরিক প্লেনে তিনজন লোক ওর পিছু নিয়েছিল।'

কর্ণেল তো অবাক, 'কি করে জানলে এত কথা?'

—'দুটো প্লেনকেই দেখলাম যে। বার্টনের প্লেন ওরা

মেসিনগান করে নামিয়েছিল, কিন্তু সে নিরাপদে প্যারাস্যুটে করে নেমেছিল। সেটাকেও দেখেছি। অন্য প্লেনটার পাইলটকে বার্টন গুলি করে মেরে ফেলেছিল। সে প্লেনটাকে নামিয়ে তবে শেষ নিশ্বাস ফেলে। অন্য লোক দুটো নিরাপদে মাটিতে নেমেছিল। তাদের একজন খোঁড়াচ্ছিল। আমি তোমার ছেলের চিহ্ন দেখে পিছন পিছন এসেছিলাম। ওটা সিংহ আর নরখাদকদের দেশ। বুইরুজাতের তারা; আমাকে বন্দী করে দেরি করিয়ে দিল। মাত্র আজ ভোরে এই সাফারিটার নাগাল পেলাম।'

—'ঐ লোক দুটো কি আমার ছেলের কাছ থেকে কাগজগুলো নিতে পারে না?'

—'না তারা তো অন্য দিকে যাচ্ছিল। মরেটরেও গিয়ে থাকতে পারে। ইটালিয়ান বোধ হয়?'

—'না। ক্যাম্বেল হল আমেরিকান, জুবানেভ রুশ। লণ্ডন থেকে ওদের খবর জানিয়েছে। সেখানে স্পাইগিরি আর খুনের জন্য ওদের খোঁজা হচ্ছে।'

টারজান বলল, 'কাল কাগজগুলো পেয়ে যাবে।'

—'তা যাব। কিন্তু কে তাকে মারল সেটাও জানতে ইচ্ছা করে।'

বানগালির বাইরে ক্যাম্প করার ব্যবস্থা হচ্ছিল। সাফারির সঙ্গে দুটি মৃতদেহ। র‍্যাম্‌সগেট আর রোমানফ কর্ণেল বার্টনের কাছে রিপোর্ট করতে গিয়েছিল। কর্ণেল তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

র‍্যাম্‌সগেট বলল, 'বড় দুঃসংবাদ এনেছি, কর্ণেল।'

—'আমি সব জানি।'

—'কি করে জানলেন?'

—'কাল রাতে খবর পেয়েছি।'

—'খুনী কে, সে বিষয়ে আমরা এরকম নিঃসন্দেহ। কাল রাতে সে আরেকটা খুন করে গেছে।'

ঠিক এই সময় দরজা খুলে টারজান বেরিয়ে এল। তাকে দেখে এরা দুজন আঁৎকে উঠে বলল, 'ঐ তো! ঐ তো খুনী!'

কর্ণেল মাথা নাড়লেন, না, তা নয়। আমার বন্ধু টারজান আমার ছেলেকে মারতে পারে না। তাছাড়া কাল রাতের খুনের জন্য সে দায়ী হতে পারে না, কারণ সন্ধ্যা থেকেই সে আমার কাছে আছে।'

র‍্যাম্‌সগেট বলল, 'আমার বোন আর আমি চাই এ ব্যাপারটার ভালো করে তদন্ত হোক। মিঃ রোমানফেরো নিশ্চয় সেই মত।'

রোমানফ্ তার কথায় সায় দিল। অন্যদের সঙ্গে টারজানকে ক্যাম্পে ঢুকতে দেখে সকলে স্তম্ভিত। কর্ণেল বার্টনের কথায় ক্যাম্পের সব শ্বেতাঙ্গদের আলাদা করে জেরা করা হল। কর্ণেল তখন ভায়োলেট, টমলিন, লেডি বারবারা, গোডেন্সকি, ট্রেন্ট, গল্ট স্মিথকে পিটারসনের মৃত্যু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি নাকি খুনিকে দেখেছিলে?'

স্মিথ বলল, 'দেখেছি মনে হচ্ছিল, তবে ভুলও হতে পারে।'

—'আমার ছেলের মৃত্যুর জন্য কাউকে দোষী করতে চাও কেউ?'

বারবারা বলল, 'আমার মনে হয় ডান্‌ক্যান ট্রেন্ট দায়ী।'

ট্রেন্টের মুখ সাদা হয়ে গেল। টারজান কর্ণেলের কানে কানে কি যেন বলল। কর্ণেল বললেন, 'টারজান তোমাদের কয়েটা প্রশ্ন করবে, তোমরা তার যথাযথ উত্তর দেবে।'

টারজান রোমনফের ভ্যালে পিয়েরকে বলল, 'তোমার ছুরিটা দেখতে পারি?'

—'আমার ছুরিটুরি নেই স্যার।'

গল্টকে বলল, 'তোমার ছুরি দেখি।'

খাপ থেকে ছুরি বের করে দেখাল সে। টমলিনের ছুরি ছিল না। তারপর স্মিথের, গোডেন্সকির, ট্রেন্টের ছুরিও দেখল। শেষে স্মিথকে বলল, 'পিটারসন কিভাবে খাটে মরে পড়েছিল?'

—'চিৎ হয়ে।'

—'খাটের কোন দিকটা দেওয়ালের পাশে ছিল?'

—'বাঁ দিকটা।'

র‍্যাম্‌সগেটকে বলল, 'স্মিথকে কত দিন চেন?'

—'মাত্র কয়েক সপ্তাহ। ওরা দুজন আমাদের দলে এসে জুটল। বলল ওদের লোকজন পালিয়েছে।'

—'সে সময়ে স্মিথ খোঁড়াচ্ছিল না?'

র‍্যাম্‌সগেট আশ্চর্য হয়ে বলল, 'হ্যাঁ। বলল পা মচ্‌কে গেছে।'

স্মিথ রেগে বলল, 'তাতে কি হয়েছে? বলিনি লোকটা পাগল।'

টারজান ওর কাছে এসে বলল, 'তোমার বন্দুকটা দাও তো।'

—'আমার বন্দুক নেই।'

—'তাহলে তোমার শার্টের বাঁ দিকে কি ফুলে রয়েছে ?' এই বলে সেই পকেটের ওপর হাত রাখল !

স্মিথ বলল, 'নিজেকে যত চতুর ভাবো, আসলে তা নও, বুঝলে ?'

টারজান লেডি বারবারাকে বলল, 'ট্রেন্ট কাউকে মারেনি। স্মিথ্ই দুজনকেই মেরেছে !'

স্মিথ তো রাগে অন্ধ, 'মিছিমিছি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।'

কর্ণেল বললেন, 'কেন স্মিথকে দোষী বলছ ?'

টারজান বলল, 'তাহলে কথাটা একটু বদলে বলতে হয়। ক্যাম্বেল ওদের মেরেছে। এর নাম স্মিথ নয়, ক্যাম্বেল। যাকে কাল মেরেছে, তার নামও পিটারসন নয়, জুবানেভ।'

স্মিথ বলল, 'এ সব কথার কিছুই তুমি প্রমাণ করতে পারবে না।'

টারজান হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল। মনে হল সকলের মাথার ওপর সে এতখানি লম্বা !

টারজান বলল, 'যে লেফ্‌টেনাণ্ট বার্টনকে মেরেছিল, তার গায়ে খুব জোর, সে বেঁয়ো ; তার ডান হাতের একটা আঙুল কাটা। বার্টনের গায়ের ক্ষত দেখে বোঝা যাচ্ছে বাঁ হাতে ধরা ছোরা দিয়ে মারা হয়েছে। গলায় বুড়ো আঙুল, তার পাশের দুটো আঙুল আর কড়ে আঙুলের ছাপ দেখা যাচ্ছে। চেয়ে দেখ ক্যাম্বেলেরো ঐ আঙুলটি নেই। ছুরি দেখাল বাঁ হাতে ধরে। জুবানেভের বুকেও বাঁ হাতে ধরা ছোরা দিয়ে মারা হয়েছে।'

রোমানফ্ বলল, 'কিন্তু কেন দুটো খুন করল ?'

—'কারণটা ক্যাম্বেলের শার্টের ভিতরেই পাওয়া যাবে : লেফটেনাণ্ট বার্টন ঐ জরুরি কাগজগুলো নিয়ে এখানে আসছিল। একটা ইটালিয়ান প্লেনে পাইলট, ক্যাম্বেল আর জুবানেভ ওর পিছনে ধাওয়া করে। দুটি প্লেনই ভেঙে পড়ে। ইটালিয়ান পাইলট প্রাণ হারায় ; ক্যাম্বেল আর জুবানেভ হেঁটে রওনা দেয় এবং এদের সঙ্গে জোটে। বার্টনও কাগজগুলি নিয়ে এই সাফারিতে যোগ দেয়। বাকিটা বুঝতেই পারছ। বার্টনকে মেরে কাগজগুলো নিয়েছিল ক্যাম্বেল। পাছে ওগুলো ইটালির কাছে বিক্রি করে যে টাকা পাবে, সেটার ভাগ দিতে হয়, তাই সে জুবানেভকেও মেরে ফেলল। এই নাও কাগজগুলো।'

এই বলে ক্যাম্বেলের শার্টের ভিতর থেকে কাগজগুলি বের করে টারজান বার্টনকে দিয়ে দিল।

পরে স্থানীয় পুলিশের লোক এসে ক্যাম্বেলকে ধরে নিয়ে গেল। র‍্যাম্‌সগেট জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে বুঝলে জুবানেভ ঐ প্লেনে ছিল ?'

—'কক্‌পিটে ওর একটা দস্তানার গন্ধ শুঁকেছিলাম। সে গন্ধ আমি ভুলিনি। এখানে পিটারসনের মৃতদেহেও সেই গন্ধ পেলাম। এসব হয়তো তোমরা সভ্য মানুষরা বিশ্বাস করবে না। এবার আমি বাড়ি চললাম। স্বজাতিদের দেখে খুবই ভালো লাগল, কিন্তু বনের টানের জোর বেশি। বিদায়।' এই বলে টারজান বনে চলে গেল।